

মল নাথ উবাচ : চার গাঁচ মাসের মধ্যে সরকারকে উৎখাত করব



রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের মেপথ্য অতিভাবক কমল নাথ তার অস্থ-গামীদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, বিরোধীদের নেতাদের তালিকা তৈরী করে যেন আগামী এক মাসের মধ্যেই সেই তালিকা তার হাতে দেয়া হয়। তিনি সেই তালিকা যথাসময়ে পেশ করবেন।

গত বিশ জাভুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লেনে কমল নাথ সহ ইন্দিরা কংগ্রেসের নবনির্বাচিত কয়েকজন সদস্যকে সম্বন্ধা জানানো হয়। সেই সম্মেলন শুরু হবার আগে

ইন্দিরা কংগ্রেসী সভ্যদের বেশ কয়েকটি গোপনীয় সঙ্গে কমল নাথ আলাদাভাবে কথা বলেন। কমল নাথের কাছে বলা হয় যে, সি পি এম ক্যাডারদের এবং নেতাদের দোরাস্তো তারা নাকি নিজ নিজ এলাকার সংগঠন করতে পারছেন। পুলিশও নাকি সি পি এমের কথাই শুনেছে। সব কিছু শুনে কমল নাথ বলেছেন যে, "কুছ পরোয়া নেই। তোমরা কাজ শুরু করে দাও। আমি দেখছি কি করা যায়। তোমরা যাদের কাছ থেকে বাধা পাচ্ছ বা পাবে বলে মনে কর তাদের নামের একটা তালিকা তৈরী করে আমাকে দিও। সেই সঙ্গে পুলিশ অফিসার-দের নামের তালিকাও করবে। আমি দেখব কি করা যায়।"

কমল নাথের বসিষ্ঠ মহলের কাছে কমল নাথ জোরপূর্ব্বভাবেই শেখাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়

ই-কংগ্রেস ও আর এস এসের আঁতাত প্রমাণিত

জনতা পার্টির একটি অংশ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস বিগত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) কে জয়ী করতে সক্ষম-ভাবে পূর্ণ সমর্থন করেছে বলে দৃপ্তপেত্র বিগত সংখ্যায় আমরা যে তথ্য প্রকাশ করেছিলাম তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল তাঁর সমর্থক ৩৭ জন এস এস এস কে নিয়ে কংগ্রেসে(ই) যোগদান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাছাড়া, বিহারের দাস-মন্ডিন্ডার সমর্থক জনতা এস-এল-এদের মধ্যে দুটি ভাগ হওয়াও তার অন্ততম সত্য ঘটনা প্রমাণ করছে। অপরদিকে, মধ্যপ্রদেশের জনতা মন্ত্রিসভার মধ্যেও এনিয়ো রাজনৈতিক বিরোধ তুলে উঠেছে এবং সেখানেও এক নতুন পেঁটো স্বা-মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের পাওয়ার মন্ত্রিসভাতেও এর খানিকটা প্রভাব পড়েছে বলে জানা গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরো বলতে চাই, সারা ভারতে জনতা পার্টি রাজনৈতিক ভাবে যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের (ই) বিরোধিতা করছে সেক্ষেত্রে কেবল বিধানসভার বিগত নির্বাচনে জনতা পার্টির ওখানকার নেতৃস্বয় সঙ্গে কংগ্রেসের (ই) মোর্চা গঠন করা কিসের ইচ্ছিত বহন করছে ?

বিশ্বস্ত হুজ্জে আমাদের কাছে খবর আছে যে, জনতা পার্টির যে অংশ কেবল বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের (ই) সঙ্গে মোর্চা গড়ে-ছিলেন তারা আর এস এসেরই সমর্থক এবং আর এস এসের সূর্য-ধিনায়ক শ্রীদেওরসের নির্দেশেই তারা ওখানে কংগ্রেসের(ই) সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাম ও গণতান্ত্রিক মোর্চার বিরুদ্ধে পাক্টা মোর্চা গড়ে-কেরলের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)-কে জয়ী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, কেলেং মনুষ্য পোড় খাওয়া মানুষ। তারা পশ্চিমবঙ্গের মালুয়ের মতই দীর্ঘদিন ধরে সচেতন। ১৯৫৭ সাল থেকে লড়াইয়ের পর লড়াই করে ইম্পাতের জায় কঠিন ও কঠোর হয়ে গেছেন। ১৯৫৯ সালে অবিভক্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তথাকথিত "গণ-অভ্যুত্থান" দেখে তারা অনেক কিছু শিখা লাভ করেছেন। তাই কেরালার মালুয় এবার রাজনৈতিক-ভাবে কংগ্রেসের (ই) মোকাবিলা করে সি পি আই (এম) এর নেতৃত্বে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে জয়ী করে তাদের সেই ঐতিহ্যকেই অব্যাহত রেখেছেন।

রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে দিল্লীতে তদ্বির

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। সব গোষ্ঠীই তাদের মনো-নিবেদিত প্রার্থীর ক্ষমত দরবার করতে চাইছে।

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত গণিধান চৌধুরী কেন্দ্রে হওয়ার সভাপতির পদে ইচ্ছা করেন। সেই পদে দাবিয়ার অনেক। প্রধানতঃ বামের নিয়ে গঠিত দরবার চলছে তাদের মধ্যে সবুজ সাতার, অজিত পাড়া, কাজী বদুল গফ্ফর এবং ভোলা সেন প্রভৃতি।

প্রদেশ ইন্দিরা কংগ্রেসের অন্ততম স্পাদক স্বরূপ মুখার্জী তার বসিষ্ঠ শাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়



মাসাম থেকে অ-অসমীয়া বিতাড়নের পুরনো কথা

গণ প্রতিনিধি নলিনী পাল

আসামের দালা আরো ভয়ঙ্কর ধারণ করেছে। এরই মধ্যে আসামে এবং মেঘালয়ে আরো বেশ কিছু অ-অসমীয়া মালুয় হতাহত হয়ে-ছেন। বহু অ-অসমীয়া মালুয় ওখানে খাদ্য হারিয়েছেন এবং তাদের বহু ভূমির সেখানে পোড়ানো হয়েছে। ক্ষিপ্রতাকামী এবং লম্বাকবিরোধী গোবাজরা ওখানকার পুলিশ ও ভারী কর্তা ব্যক্তিদের একাংশের কানী পেয়ে আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্যপ্রতি আপার আসামের পুলিশ-বান্দালী তৈল বিশেষজ্ঞ

ডঃ রবি মিত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার যদিও পশ্চিমবঙ্গের মালুয় এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার এব্যাপারে এখনো উদাসীনতা অবলম্বন করে চলেছেন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মালুয়েরা এব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থাসহ আসামের অ-অসমীয়াদের পূর্ণ নিরাপত্তার দাবী জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদিও আসাম এবং মেঘালয়ের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তথাপি তারা এব্যাপারে অসহায়। কারণ,

ভারতের সংবিধান এবং ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। নিরস্ত্রণ ব্যবস্থা যা কিছু সবই দিল্লীর হাতে। কারণ, আসামে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। মেঘালয়ে যদিও সংবিধান অস্থায়ী একটি মন্ত্রিসভা রয়েছে তবু সেখানে বিদেশী মিশনারীরাই অ-অসমীয়া নিধন যজ্ঞের কলকাটি মাড়ছে। একথা আমার নয়, বর্তমান কেন্দ্রীয় বাহ্যমন্ত্রী নীহাররঞ্জন লস্করও এটা অস্বীকার করেছেন।

অতীতের ঘটনা

প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আসামের ব্যাপারে অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি যেন সে কথাগুলি স্মরণ করে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা-সহ অ-অসমীয়া ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙ্গালীদের দ্রুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

১৯৬০ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে আসামের বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালী বিরোধী যে দালা এবং নিধন যজ্ঞ হয় তাতে শুধু বাঙ্গালীরাই মারা পড়েন শেখাংশ ১৩শ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

কেরালায় অনন্য ইতিহাস

ইন্দিরা-মঙ্গলমের চোখে ঘুর কেড়ে নিয়ে কেরালায় আবার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারই গঠিত হল। কেরালার রাজনীতি সচেতন স্বাধীনচেতা মানুষ কংগ্রেসের (ই) জোয়াল আর একবার দূরে মিলেপ করে দিয়েছে। কেরাল বিধান সভার মোট ১৪০টি আসনের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বা ৯৩টিই দখল করে নিয়ে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এক অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনে যখন প্রায় গোটা দেশই ইন্দিরা তরঙ্গাবাহিতে বিপর্যস্ত, তখন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পরে কেরালাই আবার নে-তরঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্য লোকসভার নির্বাচনেও কেরালের ভোটারেরা ইন্দিরা গান্ধীকে বিমুগ্ধ করেছিলেন, সেদিনও জয় হয়েছিল বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টেরই।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুতে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিণীত। প্রথমতঃ এ রাজ্যের মানুষ আর একবার প্রমাণ করলেন ১৯৭৭ সাল তাম্রা হিন্দুস্থানে যে কংগ্রেসে একাধিপত্যের যুগের অবসান সূচনা করেছিল, সে ধারা অন্ততঃ তিনটি রাজ্যে অব্যাহত রয়েছে। কেরালা অবশ্য গোড়া থেকেই বামপন্থী রাজনীতিতে দীক্ষিত, ১৯৫৭ সালে এখানে পুজিবাদী হুনিয়ার প্রথম কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হওয়ার সময় বিশ্বের যুগপৎ বিশ্বয় ও প্রশংসা অর্জন করেছিল। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী যে বিরোধীদের কখনই বরদাষ্ক করেন না তার প্রত্যক্ষ পরিচয় সেদিনই—আজ থেকে বিশ বছর আগেই—দিয়েছিলেন যখন তিনি যড়যন্ত্র করে কেরালার আড়াই বছরের কমিউনিষ্ট শিল্প সরকারের পতন ঘটান কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। তারপর ১৯৬৭ সালেও কেরালায় ই এম এল নাটুগিরিপাদেই নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারের মতো বামপন্থী মুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু একই যড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে কংগ্রেস ফ্রন্ট সরকারের মধ্যে ফাঁটল ধরিয়ে সরকারের পতন ঘটায়। সেই ক্রমাগত বাম রাজনীতি-বিরোধী কংগ্রেসী যড়যন্ত্রের জবাব এবার কেরালার মানুষ চূড়ান্তভাবেই দিয়েছেন।

কেরালায় বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার তাৎপর্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে হৃদয় প্রসারী হতে বাধ্য। প্রথমতঃ লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল বামপন্থী দলগুলোর পক্ষে আশাচর্য না হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার পরে কেরালায়ও বাম গণতান্ত্রিক

সরকারের প্রতিষ্ঠা সময় বেশ ব্যাপক ভিত্তিতে বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রবল প্রতিবেগ সঞ্চারিত হবে। সাধারণ মানুষ দেখতে পেরেছেন, জনতা ও লোকদল যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে বামপন্থী শাসিত রাজ্যগুলোই ইন্দিরার অশেষের বোঝাকে কণ্ঠ দিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যই বৈরতন্ত্রের ইন্দিরা কংগ্রেসের একমাত্র ঘোষা ও নির্ভরশীল বিকল্প। স্বভাবতই এবার নতুন উৎসাহ ও উদীপনা নিয়ে লোকসভার ভিতরে ও বাইরে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য আন্দোলন গড়ে উঠবে, প্রসারিত হবে। প্রমজীবী মানুষ মাজেই জীবনের, বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন, তাদের সামনে এবার উজ্জল ভবিষ্যতের দিগন্ত উন্মোচিত হল।

কেরালায় আর একটি ম-কংগ্রেসী (ই) সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত ভারতের কেন্দ্রের রাষ্ট্রকাঠামোর আদর্শ অমুখ্যায়ী পুনর্বিভক্ত হবার ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। এখন আর কোন অজুহাত দেখিয়ে একটি অকংগ্রেসী (ই) গণতান্ত্রিক রাজ্য সরকারকে পারের জোরে উচ্ছেদ করে দেওয়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের পক্ষে সহজ হবে না। কারণ ভারতবাসীর মতো বিশ্ববাসীও স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনে শঙ্কিত, তার কথাবার্তা আচার-আচরণ বিশ্লগণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। কাজেই সে দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ইন্দিরা মঙ্গলমের পক্ষে আদৌ সহজ হবে না। তবে ফন্সী-ফিকির যে নিত্য নতুন উদ্ভাবিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের, তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মী ক্যাডার লক্ষ্যকর্মের অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। কেরালার এই ফলাফলের পরে সি পি আইকে পোটা বা ভেঙে ইন্দিরাঘৃণী করে তোলায় প্রয়াসও একটা ধাক্কা খেল। হরিদ্বারের মুখ্যমন্ত্রী ভজ্জলসাল সমেত ৩৭ জন জনতা এম এল এ মাথা মুড়িয়ে ইন্দিরার পদতলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন—অবশ্যই পদের স্থায়িত্বের লোভে। শ্রীমতী গান্ধী ও লক্ষ্মণশর্মার মাথা ধরে সেই দলভ্রাতাগীদের কোলে টেনে নিয়েছেন। অমরুণ প্রচেষ্টা ইন্দিরাগণী কেরালারও চালাবেন। কিন্তু ইতিহাসের গতিক পিছনে ঠেলে দেবার সময় প্রয়াস সংগ্রামী মানুষ কি ব্যর্থ করে যেবে না?

রিজ হোটেল অধিগ্রহণের দাবী

রিজ কমিউনিস্টাল হোটেলটি গুনরায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রমিক অসম্ভাব্যের জন্ত নয়। বকেয়া ইলেকট্রিক বিল না মেটানোর জন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হোটেলটি বন্ধ হয়ে রয়েছে গত নভেম্বর মাস থেকে। এই হোটেলের কর্মসংস্থান সাড়ে তিনশত। তারাও আজ প্রায় বেকার।

১৯৭৫ সালেও একবার হোটেল কর্তৃপক্ষ এই হোটেলটি লক আউট ঘোষণা করেছিলেন। কারণ প্রমিক কর্মচারীদের বেআইনী ছাঁটাই ও বেতন কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন

করেছিলেন। পরে জরুরী অবস্থার স্বযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষের হুঁট এন এল সি পি ইউনিয়নের সহযোগিতায় ১৬২ জন কর্মীকে ছাঁটাই করে হোটেল খোলা হয়। কর্মচারীদের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ তিন দফায় ছাঁটাই কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু পরে মালিকপক্ষ তা কার্যকর করেনি।

বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থার কাছে এই হোটেল কর্তৃপক্ষের ধেনার পরিমান প্রায় তিন কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষের আচরণ দেখে মনে হয় যে

হোটেলটি চালু করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কম। তাছাড়া হোটেলের টাকার হিসাবও কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ মতাবস্থায় এই হোটেলটি যদি বন্ধ হয়েই যায় তাহলে এখানকার কর্মচারীরা এক অনিশ্চিত অবস্থায় পড়বেন।

এই হোটেলের কর্মচারীদের দাবী রাজ্য সরকার এই হোটেলটি অধিগ্রহণ করে নিজেস্বীয় পরিচালনা করার ব্যবস্থা করুন। রিজ হোটেল কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, প্রথমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদেব বোষ এবং পর্যটনমন্ত্রী শ্রীপরিমল মিত্রকে অবহিত করা হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচয়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস

মিহির আচার্য

The Permanent Settlement in Bengal (A study of its operation 1790—1819) By Sirajul Islam
Published by Bangla Academy, Dacca.
Price : Taka 25.00

বঙ্গাবস্থায় গ্রন্থটি পবেষণামূলক। মনন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল-আফ্রিকান স্টাডিজ কর্তৃক ১৯৭২ সালে গ্রন্থটি ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রির জন্ত অমুমোদিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে মূল গবেষণাটির কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে এটি গ্রন্থের আদল নিয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশবিভাগোত্তর কালে উত্তর বাঙলার যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছে স্বাভাবিক কারণেই। কারণ এর উপর ভিত্তি করে তথাকথিত বাঙালী ভদ্রলোক সমাজ গড়ে উঠেছে—যাদের ধ্যানধারণাই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চালিত করেছে। এ সত্যকে অস্বীকার করা যায়না। যদিও বৃহত্তর সমাজে এর প্রতিক্রিয়া কতখানি স্তম্ভ হয়েছে তাও বিচার্য বিষয়। কারণ এখনো পর্যন্ত আমাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম ব্যবহৃত বস্তু এই ভূস্বামী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গড়ে উঠে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, শাস্ত রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই স্বীকার করে নেয়াই ইতিহাসিক হবে যে, অধিকাংশ মানুষের শ্রেণীগত দৃষ্টিতে এই জমিদার কেন্দ্রিক ধ্যানধারণা সত্য হতে পারেনা।

পবেষক সিরাজুল ইসলাম উপরে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেননি। সমস্ত এটা তার আলোচ্য বিষয়ও ছিলনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনা করার সময়সীমা বেছে নিয়েছেন ১৭৯০ থেকে ১৮১১ সাল। তার মতে ১৭৯০-ই ভিত্তিভূমি, কারণ এই বছরই দশ শালা বন্দোবস্ত করা হয় ভূস্বামীদের সঙ্গে, পরবর্তী ফলশ্রুতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালের। দশ শালা ব্যবহার বিধি-বিধানই ১৭৯৩-এ “চিরকালের জন্ত অপরিবর্তনীয়” বলে ঘোষিত হয়। এ যুক্তি গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সময়সীমাকে তিনি ১৮১১ পর্যন্ত বেছে মিলেন কেন? সেখানেও তাঁর মন্তব্য রেখেছেন। লেখক বলছেন ১৮১১-এ পত্তনী

আইন প্রচলিত হয়। ১৭৯০-১৮১১ একটি আদর্শ সীমা। এই পত্তনী ব্যবহার বর্ধমানের রাজা, চিরস্থায়ী বস্ত্রের কঠোর চাপ থেকে অব্যাহা পাবার জন্ত তিনি কিছু জমি পত্তনী দিয়ে দেন। এই পত্তনী ব্যবহার বর্ধমান জমিদারদের চাপ লাঘব হলে কালে ভূমিব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা হয়। কর্তব্যরালিশের অ-উদ্বেগই ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে কারকে পত্তনী ব্যবস্থাকে আইন করে নিতে হয়।

লেখকের পর্যবেক্ষণমূলক সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে এই:

(১) এর ফলে রাজ্যের পক্ষে জ-অর্থনৈতিক বস্তু রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।

(২) জমির মালিকানার ভিত্তি এক জমিদার শ্রেণী বা আধ-সমাজের ভিত্তি, তার প্রতিষ্ঠা হল।

(৩) অক্ষম ও অযোগ্য দারদের বিভাজন ও নতুন দারদের প্রবেশের পথ খুলে হল।

(৪) এই নাটকীয় পরিব-প্রাথমিক রেশ-মিলিয়ে যেতেই দারদের সংগঠিত বিক্ষোভে ১৮১১-এ কোনো দারের বাজনা বা অধিকার লাভ করল জমিদার-তালুকদার, পত্তনীদার প্রভৃতি স্বত্ত্বোপাধীর নিয়োগ আইন হল। যদিও জমিদার শ্রেণী দারি বিক্রয়ের আইন রদ ক-পারল না।

লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙলা দেশে সময়-শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। কিন্তু তা হয়েছে বিরাট এক সামাজিক অলার মুহুর্তে। সরকার হয়তো ধরনের কৃষি বিপ্লবের সূচনা ক-চেষ্টাছিল কিন্তু বাস্তবে উল্লেখ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। থেকে রাজতন্ত্রের অধিকারের বি-বদ্ধ জমিদারপণের জমিদারি প-করণ, বাজনা আদারের ব্যা-সরকারী বিবেচনামূলকতা পূর্বা-অধিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

• চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে দাবী পাঠক এই গ্রন্থে অনেক চ-পাবেন যেগুলির সঙ্গে নিজের বি-চনাশক্তি মিলিয়ে নিতে পারবেন

রাজনীতি

মন্ত্রিসভা গঠনে বাধাবিপত্তি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

অনেকেই কাছেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিজ্ঞাটা একটু অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। মন্ত্রিসভার ঘাটের নেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তবে তাদের নাম মন্ত্রগান্ধীর সঙ্গে জড়িত একথা অনেকেরই জানে। কেউ কেউ বলেন নতুন মন্ত্রিসভার প্রত্যেকটি নামই গান্ধী মন্ত্রগান্ধীর অমুখোদিত পেরেছে।

যারা মন্ত্রিসভার “অতি-অবজ্ঞা” তালিকায় ছিলেন, তাদের কারো নামই দেখা গেল না। যেমন বহু-বংশীলাল, ভিলি শুক্লা, বসন্ত-না পাতিল, এম. কে. পাতিল, গিরীশ পাতিল, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, শ্যামলাল সেন, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, কামেশ্বর কাশিম, জগদীশ মিশ্র, কেদার-নাথ ও কারো নামই নেই। অথচ অনেকেরই ধরে নিয়েছিলেন যে এই মন্ত্রগান্ধী মহারথীরা অবশ্যই মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হবেন কারণ এরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর আত্মজ্ঞান-প্রাপ্ত সবারই পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউই মন্ত্রিসভায় স্থান পান নি। ভবিষ্যতে কেউ কেউ হয়তো পেতে পারেন। তবে বোধ হয় তার আগে তাদের নাম কিছু পরীক্ষা দিতে হবে।

অনেকেই যে ভবিষ্যতে মন্ত্রী হবেন না এবং যারা হবেন তারাও নোমত দপ্তর পাবেন না এটা অব্যবহারিত। এদের কেউ কেউ হতে রাজ্যগুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর কর্তব্য হতে পারেন। তবে যদি রাজ্যগুলিতে মন্ত্রন করে নিয়মিত হয় এবং কংগ্রেস (ই) সংখ্যা-গুণতায় পায় তাহলেই এদের একটা স্থান হতে পারে।

কিন্তু তার আগে শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রসভা তালিকা তৈরীর ব্যাপার-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাহী-মন্ত্রের কথা যদি অর্থহীন না হয় তবে শ্রীমতী গান্ধী ও তার মন্ত্রসভার নাকি শুক্রবার ‘জুমা-মন্ত্র’ পর শপথ গ্রহণের ছিল। দিল্লীর জুমা মসজিদে ইমাম সৈয়দ আতাউল্লাহী নাকি জ্যোতিষীদের কথার গ্রহণের দিম বহুসের জন্তে প্রকাশ করে শ্রীমতী গান্ধীকে লেখেন। অবশ্য এখন এই শ্রীমতী গান্ধীর কোন কতি-

বুদ্ধি হবে না। শ্রীমতী গান্ধী নমন বহুগুণাও নিরাশ হয়েছেন। অন্ততঃ শ্রীমতী গান্ধীকে একটা শুক্রবার দপ্তরের ভার দেওয়া হবে এটা সবাই আশা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তাকে ডাক ও তার যোগাযোগ দপ্তর দিতে চান।

রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণ অমুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধী একটা চেয়ার ছিল। ঐ চেয়ারে তার নাম লেখা ছিল যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে। কিন্তু আশাহত বহুগুণা গোঁসা করে আপন ঘরে বিল দিয়ে বসেছিলেন, শপথ গ্রহণ অমুষ্ঠানে যানই নি। অতএব তার জায়গায় তাড়াহুড়া করে অন্য নাম দিতে হলো। শ্রীমতী গান্ধী আগের পেশ করা তালিকায় নাম কেটে নতুন নাম বসাতে চাইলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী রেড্ডি বাদ দাখলেন। তিনি বললেন সব কিছু কেসামানিক হতে হবে। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীকে নতুন তালিকা করতে হলো। কিছু কিছু দপ্তর বহুগুণাতেও হলো। প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম লেখা চেয়ার ছিল দর্শকদের মধ্যে। তিনি উপস্থিত ছিলেন না। বশপাল কাপুরের টেলিফোনের মাধ্যমে শ্রীমতী গান্ধী ঘাটের শপথগ্রহণের জন্তে রাষ্ট্রপতিভবনে হাজির থাকতে বলেন। শ্রীমতী গান্ধী কাছে সেই টেলিফোন যায় নি। হঠাৎ ১৪ই জানুয়ারী শপথগ্রহণ অমুষ্ঠানের সময় ডাক পড়ল প্রথমবার। তিনি টেলিফোন পেয়েই ছুটলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। সময় বে নেই।

আরেকজন ব্যক্তি কিছু শপথ গ্রহণ অমুষ্ঠানে শপথ গ্রহণের জন্তে তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শপথ না নিয়েই চুপিসাড়ে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে চলে আসেন। ইনি হলেন শুক্রবার বা আত্মদ। তার নাকি ক্যাবিনেট মন্ত্রী হবার কথা ছিল, কিন্তু শপথ গ্রহণ করতে এলে তিনি দেখেন তার নাম রয়েছে রাষ্ট্র-মন্ত্রীর তালিকায়। অতএব গোঁসা, কোভ এবং প্রাধান।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর যে তাকে মন্ত্রিসভার কোনদিন নেবেন তার সম্ভাবনাও খুব কম। প্রাধান-মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভার সদস্য বাছাই করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি অনেক ভেবেচিন্তেই এই তালিকা তৈরী করেছিলেন। ১১

জানুয়ারী থেকে ১৪ জানুয়ারী সকাল পর্যন্ত তিনি দলের সদস্যদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন নি। শুধু বশপাল কাপুরকে তিনি বলে দিয়েছিলেন আগের দিন রাতে টেলিফোন করে ঘাটের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে হবে তাদের ঘেন আনিয়ে দেওয়া হয়। কাপুর যথা নির্দেশ কাজ করে-ছিলেন।

বহুগুণা মন্ত্রীর কাপুরের টেলিফোন পেয়েছিলেন। কিন্তু যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রী হবার সাধ তার ছিল না। তাই তিনি পেলেন না। যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে রাখা তার চেয়ারটি খালিই রইলো। অতএব বিরক্ত প্রাধানমন্ত্রী শপথগ্রহণ অমুষ্ঠানের আগে মন্ত্রিসভার তালিকা-বদলাতে বাধ্য হলেন।

ঘটনাবিধি কৌতুকাবহ। শুক্রবার আত্মদ বা বহুগুণা মন্ত্রের মত পদ বা দপ্তর না পেয়ে গোঁসা করলেন। অনেকে আবার ডাকও পেলেন না। যারা পেলেন এবং যে সব দপ্তর পেলেন তাতে অনেকেই হয়তো

অর্থনীতি

আগামী বাজেটে কি দেখবো ?

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সামনে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নির্বাচনের সময় কংগ্রেস (ই)-এর দাবীপত্রা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে পণ্যমূল্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারই প্রধানতঃ জনমনকে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শ্রীমতী গান্ধী দরদাম কমানোর যে চালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কলেই তার পক্ষে অনেক বেশী ভোট পড়েছে।

কিন্তু এখন এটা ইন্দিরা সরকারের পক্ষে একটা বড় বিশেষ হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ত্রিপুরা ও দেশের আরো কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে সর্বত্রই ইন্দিরা গান্ধী এক অদম্য মানবী হয়ে উঠেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বহু ভারতীয় ভোটদাতা ইন্দিরা গান্ধীকে প্রায় দেবীর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তারা বিশ্বাস করেন ইন্দিরা গান্ধী ইচ্ছা করা মাত্র জিনিস পত্রের দরদাম কমে যাবে, তাদের ঘরে ঘরে খাবার জুটবে, শীতের কাঁথা

আশান্ত হইবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ও দলনেত্রী হিসেবে তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন তিনিই জানেন। কিন্তু এভাবে রাজ্যভক্ত বটা তো শুভ লক্ষণ নয়। শুক্রবারেই যদি গান্ধী থেকে যায়, তাহলে ভবিষ্যত কি দাঁড়াবে ?

শোনা যায় বহুগুণা মন্ত্রীর নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী খুশী নন। ইতিমধ্যে বহুগুণা মন্ত্রীর বনিষ্ঠ বন্ধু শাহী ইমাম আতাউল্লাহ শাহ বোখারী নাকি শ্রীমতী গান্ধীর কাছে চিঠি লিখে কথার খেলাপ করার জন্ত কোভ জানিয়েছেন। তার বনিষ্ঠ মহল থেকেই জানা গেছে যে মন্ত্রিসভার মূলমন্ত্র মন্ত্রী নেবার সময় শাহী ইমামের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তা করেন নি। তাই তার কোভ।

লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী অবশ্যই বহুগুণা ও শাহী ইমামের সাহায্য চেয়েছিলেন। তখন তাদের হয়তো কোন কোন ব্যাপারে আশাসও দিয়ে থাকতে পারেন। নির্বাচনের আগে শ্রীমতী গান্ধী নিজেও আশা করতে পারেন নি যে তিনি এত বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পারেন। একবার তো তিনি ভবিষ্যতে কোয়ালিশন করার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রথম বুদ্ধি ও বিচারশক্তি তার

কাছে জনসাধারণের একাংশের মধ্যে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণের দিকটা তুলে ধরেছিল। তাই তিনি যত বেশী সম্ভব বিরোধী-দের নিজের দলভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। শুধু বহুগুণা, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিই নন, বাবু জগজীবন রামও তার লক্ষ্য ছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধীর ভুল হয় নি। তিনি ভোট পেয়েছেন অনেক কম, কিন্তু আসন পেয়েছেন তুলনায় অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ তার প্রধান বিরোধী দল জনতা ও লোক-দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই ব্যবধান বাতে দিন দিন বেড়ে চলে তার দিকেও শ্রীমতী গান্ধী নজর রেখেছিলেন। বহুগুণা, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, বাবু জগজীবন রামকে তিনি যে হাড়ে হাড়ে চিন-তেন তার নির্বাচনী কৌশল তারই প্রমাণ দিয়েছে, তিনি জিতেছেন এবং ভালো করেই জিতেছেন। এখন তার দলের সবাইকেই তার নির্দেশ-অনুসারে পালন করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তঃসলিলা কলঙ্ক মত কোভ ও গান্ধী বিরোধের ষোড়শ-বইতে থাকবে। কোন এক মুহূর্তে এই অন্তঃসলিলা কোভ কি ভাবে বাইরে-কেটে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। এই মুহূর্তে শ্রীমতী গান্ধীও মা।

হুঃখ হুঃখ। এবং লক্ষ্য কমতা এখন শেষ প্রান্তে।

লোকসভা নির্বাচনের সময় ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তারা শাসন চালাতে জানেন। সুতরাং তাদেরই ভোট দেওয়া উচিত। লোকেরা উচিত কর্মটি করেছেন এখন বলটি ইন্দিরা কংগ্রেসের সীমানায়। লোকে আশা করছে এখনই পোল হবে।

তাই মনে হয় ইন্দিরা কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি পালনের জন্তে দীর্ঘ সময় পাবে বলে আশা করা। প্রতিশ্রুতি দেবার পর তা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ কংগ্রেসের অভ্যাসের মধ্যে নেই বলে আগেও দেখা গেছে। সুতরাং ভোট দিলেও লোকের চোখে এখনও প্রত্যাশা ও সংশয় একত্রে জড়িয়ে আছে। আবার যারা ভোট দিয়েছেন তারা সমস্ত ভোটদাতাদের মাত্র ৪২-৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ ভোট দাতাদের মধ্যে প্রতি একশোজনে শেবাংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

মতামত

নেহেরু পরিবার ও সমাজতন্ত্র

ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনের আগে লক্ষ্যবলে গেলেন যে তাঁর লক্ষ্য হলো ভারতকে "সমাজতান্ত্রিক" আদর্শে গড়ে তোলা। কিন্তু "সমাজ-তান্ত্রিক" শব্দটার তাৎপর্য বা এর গভীরতা সম্পর্কে তাঁর একান্ত ব্যক্তি-গত অভিমতটা কি তা আজ অবধি কারকে জানাননি।

"সমাজতান্ত্রিক" কথাটা তাঁর পিতা ও ভারত ভাগের অন্ততম হোতা জবাবলাল নেহেরুও আলোচনা করেন নি। সেই যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য হোঁক হোঁক করছিলেন তখন থেকে। তারপর থেকে তিনি আদর্শ প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন। এবং তাঁর চিন্তাভাবনা গভীর আর হিমালয়ের বুকে ছড়িয়ে দেয়ার নাথ কারনা করতে করতে "সমাজ-তান্ত্রিক" ভারতের স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি। কিন্তু স্বপ্ন দেখা ও বাস্তবে দেখার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাই নেহেরুর স্বপ্নের ভারত তিনি তাঁর জীবিতকালেই চোখ খুলে বাস্তবে দেখে গেছেন ও আশঙ্কিতও চোখে আঙুল পুরে দেখিয়েছেন। নেহেরুর জীবনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো রাজতান্ত্রিক পন্থার উত্তরাধিকারীদের নির্বিশেষে সিংহাসন প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করার জন্য কোটি কোটি লোককে নিরক্ষরতা ও অস্বচ্ছতার গহবরে আঁকড়ে ধরা। বড় বেশী রোমантиক ছিলেন বলে খুব সমাজকে বিপণ

গামী করার মহত্বময় প্রচেষ্টার লক্ষ্য লক্ষ্য বেকার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্য ও অঙ্গ করার আলোচনা সংগ্রামী। তিনি দেশী লোকের কথাই খুব একটা ক্রক্ষেপ করতেন না, যেহেতু বিদেশীদেরই তিনি ভারতের ন্যায়গতিক ভাবতেন। বিশেষ করে লর্ড/লেডি মাইন্টব্য্যাটেনের বংশধর-দের। তাই 'ইংলিশম্যান' হয়ে বিদেশের দিকেই তিনি তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বিদেশীরা তাঁকে পছন্দ অথবা তাঁর কোনো কাজে প্রশংসা করছে কি না। কিংবা কৃতিত্ব প্রকাশে উৎসাহিত হচ্ছে কিনা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা "সমাজ-তান্ত্রিক" শব্দটি ইংরেজী ভাষার ব্যক্তি-গত অর্থ বলে জানতেন। এবং "সমাজতন্ত্র" গঠন করতে গেলে কি কি উপাদানের প্রয়োজন ও কেসমভাবে তার প্রকৃত চেহারা কুটে উঠবে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বোঝাবার অবকাশ পাননি।

তাঁরই জেদী ও রাগী মেয়ে "কালান্দার কাহিনী" রচয়িত্রী ৬০ বছরের প্রিয়দর্শিনী বিনি এক সময় গোটা দেশটাকে স্বযোগ বুঝে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে সোজা কথায় জেল-খানা বানিয়েছিলেন এবং ক্রাফ্ট-গোয়েবল্ড-হিমালয় এই সব মহত্ব-জাতির কলংকিত আনোয়ারেরও লজ্জা দিতে গিয়েছিলেন—এবং বে

কারণে কাশিম নাজীর শয্যা দখলী ইত্যাকার বিবিধ উপাধি ঝংকারে অলঙ্কৃত করেছিলো দেশবাসী, সেই তিনি তখনো দেশকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে এনে ফেলেছেন বলে রেডিও টেলিভিশন ও সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করছিলেন।

আবার ১৯৮০র লোকসভা নির্বাচন প্রাক্কালেও এই একই কথা বলে গোটা ভারতবর্ষে চলে বেড়ালেন। এবং বলা বাহুল্য তার তাৎপর্যটুকু ব্যাখ্যাও করলেন না। কেননা তাঁর বাবার নামে সোভিয়েত "নেহেরু পুরস্কার" দেয়া সবচেয়ে তিনি কিছু ভয়ানক কমিউনিষ্ট বিবেচী। অর্থাৎ সমাজ কথা হলো পৃথিবীতে সমাজ-তন্ত্র গড়ে উঠেছে একমাত্র সাম্যবাদী রাষ্ট্রেই, অর্থাৎ কোনো দেশে নয়।

তাঁর টাটা বিড়লা সিন্ধিয়া কানোরিয়া গোয়েন্দা ইত্যাদি ২৫টি পরিবার ও জোতদার জমিদার সহ ভারতের বৃহত্তম শোষণকারী স্বার্থ, স্বাক্ষর, বৈতন্যে রেখে তিনি কেসম-ভাবে কমিউনিষ্ট পন্থার "সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র" গড়ে তোলেন তারই প্রতীকার রইলো। এমন কি তাঁরই "যোগ্য পুত্র" এবং তাঁরই উত্তরাধিকারী মারুতি কেলেকারী ও নির্বাক-করণের জমক ভাবীকালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান লক্ষ্মী গান্ধীর অপেক্ষাতেও থাকবো। আমরা না থাকি আমা-দের প্রজন্মের থাকবে, অবশ্য যদি এরই মধ্যে ঐ বজ্রাত চাষা-কৃষো আর হাফুড়েরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে না ফেলে।

অচিন্ত্য সীতার

আগামী বাজেট

৩য় পৃষ্ঠার পর

৪০ জনের মত ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ দেশে এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নীরব রয়েছে অর্থাৎ তারাও জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত। সরকারের কার্য-কলাপ তারা নজর করেন। এই নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লব্ধ হয়ে উঠা মাত্র দেশে আয়তন পরিবর্তন ঘটে যায়। জাঁদরেল জাঁদরেল মন্ত্রি, সেনাপতিরা হালে, পাণি পান না। সুতরাং কেবল যারা ভোট দিলেন তারাই নন, ঐ নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জনগণের কাছেও নতুন সরকারের অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্দিরা গান্ধী প্রথম ইমিংস সমাপ্তির পর দ্বিতীয় ইমিংসে ব্যাট দিয়েছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার খেলোয়াড়ী আচরণ লেখা ও খেলার সঙ্গে তার নিজের দলেরও ভাগ্য চূড়ান্ত রূপে নির্ধারণ করবে।

এর এখম ওপেনিং শুরু হবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, কে জী র রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেট পেশ করার মধ্য দিয়ে। ক্রিকেট খেলা পাঁচ বছরের। তবুও খেলার স্বজ্ঞাপাটেই বোল্ড আউট হওয়া কোন কাজের কথা নয়। এই বাজেটের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধীর ও তার দলের মনো-ভাব ও কার্যব্যবস্থা প্রতিফলিত হবে।

বাজেটে কি থাকবে? কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সূচীকা প্রকাশিত হবার আগে আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য রয়েছে তার ভিত্তিতে বিচার করতে গেলে আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই: (১) জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী বেড়ে গেছে (২) মুদ্রা-ক্ষীতি বিরাট বার্ষিক হার প্রায় ২০ শতাংশ (৩) আবাদী রপ্তানী বানিজ্যে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ঘাটতি (৪) উৎপাদন ক্ষমতা সত্ত্বেও উৎপাদন কমে যাচ্ছে, (৫) বেকারের সংখ্যা ১২২৫ কোটি। (৬) নিদারুণ খরা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন ১৯৭১-৮০ সালের থেকে কমে নি, (৭) বিদেশী মুদ্রা, লোনা ও এস, ডি, আর এর মজুত তহবিল বেড়েছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে, (৮) বাজেট ঘাটতি ২৫০০ কোটি টাকা শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন তিন হাজার কোটি টাকা হবে বলে এখন অনুমান করা হচ্ছে।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বাজেটে কি কি প্রস্তাব করা যেতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

ইন্দিরা সরকার যদি দরদাম কমাতে চান তাহলে, (ক) তাদের বাজেট ঘাটতি কমাতে হবে, (খ) চিনি, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্য, লবণ

কোরোসিম এমনি কিছু কিছু পণ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বানিজ্য প্রবর্তন করে; রেশন দোকান মারফত সারা দেশে একই দামে পেশলি বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই চা-তারতম্যের দরপ নিত্য সামগ্রীগুলি চোরা পথে স্থানীয় মজুত করা অশাস্ত্রজনক হবে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজ প্রস্তাবের মোর বিরোধিতা করবেন। বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্য সরকার আরো কর বসাতে পাবে। কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আর-কর ইত্যাদি প্রত্যেক কর বসানোর বিরোধী। সুতরাং কর বসাতে গেলেই সরকারকে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় এমন সব নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর উপর কর বসাতে হবে। এই কর বা উৎপাদন শুল্ক পরোক কর। এই কর দ্বারায় সঙ্গে বোঝা হয়। কলে জিনিসপত্রের দাম কমা হলে থাক বরং বাড়বে।

অর্থ দিকে কর না বসিয়ে বাজেট ঘাটতি মেটাতে হলে বিদেশ থেকে কড় করে আনা পাত্ত: ঘাটতি মেটানোর ব্যয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুদ্রাক্ষীতি বটে। কারণ বিদেশী মুদ্রা পালতে এদেশী টাকা দিতে হয়। সে টাকা বাজারে কাগজী নোটের পরিমাণ বাড়ার। অর্থ দিকে বিদেশী ঋণের স্বত্ব ও কিস্তি বাবদ ঋণ শোধের দায় বেড়ে যায়। বিদেশী চাপের কাছে মাথা নত করতে হয়, তাদের অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে হয়, যা দেশবাসী পান না।

কেউ কেউ বলেন দেশে উৎপাদন বাড়লেই জিনিসপত্রের দাম কমবে পারে। কিন্তু এদেশে অসত্য: তা হ'ল না, আমরা দেখেছি। যেম এটাই বাস্তব ঘটনা। সুতরাং উৎপাদন বাড়লেই দাম কমবে সাধারণ মূল্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং বাজেট পেশ করার সময়ও নতুন ইন্দিরা সরকারকে খুব সতর্ক ভাবে পা বাড়তে হবে।

ইন্দিরা গান্ধী এর আগে একটানা এগারো বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন। তিনি যদি বলেন যে জিশ বছরের পরিপ্রেক্ষিতে ও অধ্যবসায় গড়া অর্থনীতি আড়াই বছরের জমতা দলীর শাসন ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে, তাহলে তা হজম করা কঠিন। কারণ অর্থনীতি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়, আলাদা কোঠাবাড়িও নয়। অর্থনৈতিক পলিপি একদিনে কার্যকরীও করা যায় না, স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্বকার একটানা গতি প্রবাহকে বদলে দেওয়া যায় না।

ক্রীড়া পর্বদের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া পর্বদের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে গত ১২ই জানুয়ারী লকাল দশটা নাগাদ রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের অতিথি ভিহ্যামাল ইউনিটের একটি ট্রেন ওয়াগন বেহালার পার্ক পাড়া রোডে আজাহ হিম্ম জ্বলের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটির মধ্য: তল্লিউ এম সি ৪৬০৭। গাড়িটি বে রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের, তা গাড়ির বর্ত্তিতে বড় বড় হরফে লেখা থেকেই বোঝা গেল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী এবং পদাধিকারবলে রাজ্য ক্রীড়া পর্বদেরও সম্পাদক শ্রী অশোক ভট্টাচার্য। অশোকবাবুর সঙ্গে ছিলেন তাঁর জী-পুত্র। তাঁরাও নামলেন এবং আজাহ হিম্ম জ্বলের ঠিক সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাজিতে ঢুকে গেলেন। গাড়িটি বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর অশোকবাবুরা বেরিয়ে

এলেন। গাড়িতে উঠলেন এবং গাড়িটি চলে গেল।

এমন হচ্ছে এই যে, অশোকবাবু তাঁর জী-পুত্র নিয়ে রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের এই গাড়িতে করে এই যে, বেহালার ঘুরে গেলেন এটা নিশ্চয়ই খেলাধুলার উন্নতিবিধানের জন্য নয়। যে বাজিতে তিনি এসেছিলেন সেই বাজিটির মালিক তাঁরই পিতা শ্রীকালী ভট্টাচার্য। একথা জোর করেই বলা যায় যে, তিনি এই গাড়ি নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের গাড়ি নিয়ে বেহালা বাবার ঘটনাটা অশোকবাবু বাতে অস্বীকার না করতে পারেন সেজন্য ছবি তুলে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে প্রকাশ করা হবে। সব থেকে বড় প্রশ্ন হল: রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের গাড়ি তিনি এভাবে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন কি না সে বিষয়ে বোঝা খবর নেবার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে

অশোকবাবুর মত ছুঁড়ে ড্রিউ বি সি এল অফিসার যিনি নিয়মের বাইরে চলেননা বলে জাহির করে থাকেন।

অশোকবাবু সম্পর্কে আরো কিছু কিছু তথ্য আমাদের কাছে এসেছে যা জনস্বার্থে প্রকাশ করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অশোকবাবু একা ছুটি গাড়ি ব্যবহার করেন। একটি গাড়ি পান রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী হি সা বে এবং অপরটি পান রাজ্য ক্রীড়া পর্বদের সম্পাদক হিসাবে। ছুটি গাড়ি তিনি নিশ্চয় একসঙ্গে ব্যবহার করেন না। একটি গাড়ি সরকারী এবং অপরটি আদ্য সরকারী। তিনি যদি একটি গাড়ি ব্যবহার করেন তাহলে অপর গাড়িটি তখন কে ব্যবহার করে? তার মত এই জাতীয় স্বযোগ অতীতে একমাত্র পেয়েছেন প্রাক্তন পূর্ত্বমন্ত্রী শ্রীভোলা সেন। তিনি মন্ত্রী হিসাবে একটি গাড়ি শেবাংশ ১০০ পৃষ্ঠার

ইতিহাস পাঠকের চোখে সাম্প্রদায়িকতা

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দুনিয়াটা মানুষের কাছে তখনই বাস্তব হয়ে ওঠে যখন সে জাত-পাত-বর্ণ-ধর্ম, আত্ম-সর্বস্বত্বতা এবং ব্যক্তিপূজা ইত্যাদির খোলস সরিয়ে নিজে, নিজের প্রতিবেশীকে ও নারা দুনিয়ার মানুষকে অর্থনৈতিক ভিত্তির নিরিখে শোষণ শোষিতের, নি পীড়ক নি পীড়িতের আপ-কাঠিতে দেখতে দেখে। কিন্তু সব দশে সব যুগেই শোষণশ্রেণী নিজে-ধর লুণ্ঠন ও নিপীড়নের অধিকার চায়। রাখে রাখে অপরিকল্পিতভাবে নামা রকম ব্যবস্থা বানায়। এই ব্যবস্থাই হল রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, আইন বিচার প্রভৃতি উপরিথাকের চাল-তলোয়ার ও মনোহারী দোকান-পসার।

উনিশ শতকের মধ্যযুগভোগী হিন্দু ঐতিহাসিক ও বুর্জোয়া-জমিদার নতাদের একাংশ বলতেন এবং তাঁদেরই শিষ্য-প্রশিষ্যরা আম ও বলেন যে, প্রাচীন ভারতে, ঋগ্বেদ-যুগের সময়ে সব মানুষ অহিংস ও ঐক্যবিশিষ্ট ছিল, আশ্রমিক জীবনে আধ্যাত্মিক লাভনা নিয়েই থাকত। অথচ আরব, চীন, গ্রীস থেকে আসা বোন পৃথকই এ কথা বলেননি। আসলে ছোট একটা গোষ্ঠী ও সব নয়ত। মঙ্গল ও তাদের রচনা, তাদের মধ্যেই চালু ছিল। বৈদিক যুগে পরিচিত সময়ে, অনগ্রসর উপাধীন-পদ্ধতির কারণে পশুপালন-ধর্ম মানুষ গো-মাস খেত, মহা-রতে যুদ্ধ, খুন সবই হয়েছে। অথচ রাজকীয়বাদের ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকরা সেই যুগকে ধর্ম অহিংসার যুগ বলে লেবেল দিয়েছেন। 'হিন্দু' শব্দটি এসেছে দ্রাবিড়, ইণ্ডিয়ান বা ইণ্ডিয়ান থেকে, অর্থাৎ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে, আদৌ সাম্প্রদায়িক বোঝাতে নয়। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ধর্ম সম্প্রদায় বোঝাতেই চালু হয়েছে। এই সব ভ্রান্তিকল্পের শুরু হয়েছেন তিন-ন—সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের এজেন্ট-মূল মিল (যিনি ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ প্রত্যয় খোপে ভাগ করে দি জাতি-র বীজ রোপণ করেছেন), প্রত্যয় শিল্প-বিপ্লব বিরোধী লোয়ার (ম্যাক্স মুলারের স্বকৃত নাম) এবং উগ্র জাতীয়তা-পোষিনো, দার মধ্যে জার্মানীর সারের পূর্বসূরীকে পাওয়া যায়। করা যায়, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত

'মেঘ' শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে মুসলমানরাই শুধু নয়, সমাজের নিম্ন বর্ণের অধিবাসীদেরও মেঘ বলে হের এবং অপসৃত করা হয়েছে। 'স্বন' বলতে আসলে বোঝাতো অযোগ্য গ্রীকদের সম্পর্কে আসা আরব-গ্রীক-রোমীয় সবাইকে; কিন্তু 'পড়েছি স্বনের হাতে' বলে হিন্দু জাতিবাদের চূড়ান্ত হয়েছে শব্দের ব্যবহার।

ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিকরা ১৯ শতকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে যেমন বিদেশী মুসলমান আমল ও হিন্দু নিপীড়নের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন, তেমনি ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তা-বাদ জাগাতে গুপ্ত-যুগকে হিন্দু ভারতের 'স্বর্ণযুগ' বলে দেখাতে চেয়েছেন। অথচ সেই পূর্বে শিল্প-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বা কিছু শ্রেষ্ঠ সবই বৌদ্ধ দর্শন-সংস্কৃতির মূল্যবান কসল। তাছাড়া এই পূর্বকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও বর্ণাশ্রম প্রথার কড়া বাঁধন সম্পর্কে ধোঁরববচন চড়া হয়ে বলা হয়েছে; অথচ এই সময়কার শিলালিপিসমূহে দেখা যায়, বর্ণাশ্রমের বাঁধন এ সময়ে যথেষ্ট আলগাই ছিল। ভারতের প্রচলিত জাতীয় ইতিহাসে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম নয়, বস্তুবাদী চার্বাক দর্শন-সংস্কৃতিও তেমন গুরুত্ব পায়নি, যেমন গ্রীক গণতন্ত্রের পিথাগোরাস ও হেরাক্লিটাস পরবর্তী মধ্যযুগীয় ইউরোপে ক্যাথলিক যাজক ও রাজতন্ত্রের চাকার নিচে পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য পড়ে গিয়েছিল বলা ঠিক নয়, ফেলে রাখা হয়েছিল। কারণ যাজকতন্ত্র কখনই পার্থিব জীবনতন্ত্রকে, বস্তুবাদী চিন্তা-দর্শনকে সহ্য করতে পারে না এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থই তার মৌলিক কারণ। গজনির মামুদ ও সেই স্বার্থে হিন্দু রাজাদের প্রাসাদ ও মঠ-মন্দির ধ্বংস করেছে, লুণ্ঠ করেছে; কলনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে বর্ণিত হিন্দু রাজা হর্ষ ও সেই তাড়নায় হিন্দু মন্দির লুণ্ঠ করেছে। এ সবের পশ্চাতে কোন ধর্মপ্রচার বা ধর্ম-সংহারের আবেগ ছিল না। উগ্র মুসলিমদের ওয়াহাবী আন্দোলনের রূপটা ধর্মীয় হলেও, মূল প্রেরণা ছিল মুসলমান অভিজাতদের অর্থনৈতিক বন্ধন (ব্রিটিশদের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে) ও পুনরুদ্ধারের আশা। ভারতীয় সমাজবিকাশে অর্থ-নীতির কারণেই বর্ণভেদ প্রথারও

বিবর্তনও এতো ক্ষত্রিয় রাজার অভ্যুত্থান হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের প্রতিরোধেই বণিক বা বৈজ্ঞানিক এবং নারীরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতার নীতি বুঝতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বন্ধনে নীতির সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের ভিত্তি সম্পর্কে সন্ধ্যাক জ্ঞান অপরিহার্য। তবেই ইতিহাস পাঠ ঠিক হবে।

। দুই ।

এ দেশে জাত-পাত বা সাম্প্রদায়িক প্রমাণ, বিরোধ-সংঘাতের ঘটনা হুটির পশ্চাতে কখনই, শাসকশ্রেণীর পক্ষে ধর্মীয় ভাবাবেগটাই বড় হয়নি, মূল থেকেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার ও বাড়ানোর তাড়না এবং প্রজা সাধারণের বিরোধ-দমনের তাগিদ। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ হুটির কোর্সলকে বায়ে বায়ে প্রয়োগ করেছে। এই কাজে মুসলমান অভিজাতশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের একাংশ এবং হিন্দু মধ্য-বিত্তশ্রেণী ও শ্রেষ্ঠ-মহাজনের হল পরস্পর চুঁ মারামারি করেছে, কখনও বা প্রতিরোধ আন্দোলন ভাঙার প্রয়োজনে, স্বাভাবিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশে বায়ে বায়েই ভেদের কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে উদ্ভেদনা হুটি করেছে। মেকলিয় শিক্ষানীতির 'ডাউনওয়ার্ড ফির্টারেশন' নীতি ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে রাখলেও সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিষ নিচের দিকে ছড়াতে চেষ্টা চালিয়ে গেছে সমানে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। উনিশ শতকের শুরু থেকে মুসলমান ওয়াহাবীদের ধর্ম-যুদ্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী উদ্রাবনা যথেষ্ট জাগিয়েছিল সত্য। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায়, প্রথমতঃ মুসলমান পরিবারগুলির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিভাবিমুখ পশ্চাৎপদতা বাসা বাঁধল, দ্বিতীয়তঃ রামমোহন-ভিরো-জিও-বিভাসাগরের প্রগতিমুখী সংস্কার আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং তৃতীয়তঃ অনতিকালের মধ্যেই হিন্দু-মেল-আর্ধ সমাজ ইত্যাদি পুন-রাজীবনবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিল। দেখা গেছে, ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানে সিপাহী-দের নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত রাজা-মহারাজা ও নবাব-বাদশাহরা এবং তাতে মুসলমান মৌলভীরাই

সাহায্য দিয়েছিল হিন্দু পণ্ডিতরা নয়। ১৯১০ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে নতুন জমিদার পদ স্থাপিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই বর্ণহিন্দুদের দেওয়া হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ রাজশক্তি বুঝেছিল, যে সব মুসলমানদের রাজ পরিবারের হাত থেকে সম্পদ ও ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের আবার নতুন করে ক্ষমতা ও অর্থ সম্পদের স্বাদ দেওয়া যায় না।

অতঃপর 'মহারাজার রাজত্ব' থেকে ব্রিটিশ শাসক এ দেশের ভারতবোধ বা জাতীয়তাবোধকে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা দিয়ে যে ভাবে ভেঙে রাজনীতি চালু করে-ছিল, তাতে ভাষা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক স্বযোগ সবতেই মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ ওয়াহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ তাঁরা ভুলতে পারে না।

অবশ্য ব্রিটিশ শাসক হিন্দুদের সেই অংশকেই মোটা ঘুষ দিয়ে কিনে নিয়েছিল এবং সীমাবদ্ধ মাপে স্বযোগ-সুবিধা দিয়েছিল, যারা ছিল বর্ণহিন্দু বিত্তশালী পরিবার। এই ভাবেই ওরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তথা মধ্যযুগভোগী কুশীলবী ও প্রভাব-শালী মিডলমান বানিয়েছিল; অর্থাৎ শ্রেণীদুষ্টির হিসাবটা ঠিকই রেখেছিল।

কিন্তু, এ সবের নিচের তলায় হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ জ্ঞান নির্বি-

শেষে যে বৃহত্তর জনসমাজ রয়ে গেল, সেখানে ওয়াহাবী ধর্ম প্রচারকদের বাণী, হিন্দু-মেল বা আর্ধ সমাজের 'প্রাচীন ভারত' কিংবা ব্রিটিশদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও হিন্দী-উর্দু ভাগ ইত্যাদি ভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কিছুই পৌছয় নি। ওদব সাম্প্রদায়িক প্রমাণ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীরই মারামারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। মাঝে মাঝে তার চেউ গ্রামে গ্রামে আছড়ে যে পড়ে নি তা নয়। কিন্তু সেখানে কোনদিনই সাম্প্রদায়িক সাপের ডেরা তৈরী হয় নি। যদিও ব্রিটিশ শাসক অল্পগত বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সেটাই চেয়েছিল, তবু গ্রামীণ জনজীবনের স্বাভাবিক মিশ্র-সংস্কৃতির প্রতিরোধে সেটা হয়ে ওঠে নি। তবে নিঃসন্দেহে একটা কাজ হয়েছিল। বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ও মধ্যবিত্ত মুসলমানরা যতই ভাগ হয়ে থেকেছে, ততোই মোয়া বিলির হের-কের করে, ওদের মধ্যে আত্মগত্যের প্রতিযোগিতা বাড়ানো গেছে।

১৮৫৭ সালের পর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের খেলায় গো-হত্যা ও গো-রক্ষা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও দালা বাধানোর পর উর্দু বদলে হিন্দীকে আইনের ভাষা করার উদ্যোগ নেয়। সে সময়ে আদালতে নীলকরদের সেরেস্তায়, জমিদারদের সেরেস্তায় আমলারা ছিল অধিকাংশই উর্দুভাষী মুসলমান। এই সময়ে বেইলি দায়ে, জর্জ কায়ল প্রমুখ বহু ব্রিটিশ অফিসার হিন্দীর পক্ষে ওকা-লতি করেন এবং ১৮৭২ সালে হিন্দীকে সরকারীভাবে আদালতের শেখাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়

আপনার সমস্ত জোরে চম্বীর লাভল-ধরা-মুঠো আরো শক্ত হবে, মাঠে-মাঠে ফলন আরো বাড়বে, ঘরে-ঘরে আসবে সম্ভুলতা-দ্রুত গড়ে উঠবে নতুন প্রতিমবঙ্গ!

মাত্র ৫ টাকা দিয়ে লাভজনক সঞ্চয় এখানে আজই শুরু করুন।

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড
হেড অফিস ৪ ১৭, আর, এন, মুখার্জী রোড কলিকাতা-৭০০০০১
ঢেয়ারম্যান ৪ জে এম বিশ্বাস

সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্প : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

নিত্যরঞ্জন ঘোষ

বাজারের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। বইয়ের বাজারে এখন হাহাকার। গল্প উপভাস কবিতার বইয়ের বাজার যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা একবার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ছোট খাট পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। বড় কারবারীদের কথা বলছি না। এ কারণেই যে কারবার যত বড় তার মারপ্যাচও তত বড়। বেশি টাকার কারবারে কুঁকি কম, কম টাকার কারবারে অনেকটাই অনিশ্চিত। তাছাড়া ছোট কারবারীরাই সংখ্যায় বেশি, সংখ্যায় বইও এরাই ছাপেন বেশি। এঁদের অবস্থা যে কতটা খারাপ তা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত। বই ছাপানোর খরচ প্রতিদিন বাড়ছে, বিজ্ঞাপনের খরচ বিরাট, কিন্তু বই কেনার লোকের সংখ্যা কমশই পড়তির দিকে। মনোপলির অস্তিত্ব লক্ষণগুলি বইয়ের ব্যবসায়ও প্রকট। নামীদামী লেখকের বইও এখন ছোট প্রকাশকেরদোকান থেকে বেরুলে বাজার পাচ্ছে না। অথচ এমনটা হবার তো কথা নয়। অতীত, অনটন, প্রাথমিকের উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ তো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর থেকে হিন্দি সিনেমা হাউস পর্যন্ত ভিড় কোথাও কম করছে না। সাহিত্যের অস্ত্র মূল্যের কথা না হয় বাদই দিলাম, তার বিমোদন-মূল্যের জন্তও তো মানুষের বইয়ের পাড়ায় আনাগোনা বাড়ার কথা, যেমনটা বেড়েছে অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের ক্ষেত্রগুলিতে। অথচ শুনে আসছি, এবং কথাটা সত্যি বলেই মনে করি, এই ভারতব্রহ্মে বাঙালীরাই নাকি সাহিত্য পাঠে অগ্রণী। উপহার দেওয়ার জন্তেও বাঙালী এতকাল বইয়ের বাজারেই ভিড় করেছে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু হালফিলের খবর বাঙালী নিমন্ত্রিতরা আজকাল আর বইয়ের দিকে তেমন ঝুঁকছে না, অস্ত্র টুকটাকি জিনিস না হয় নগদ টাকা খামে পুরে দেওয়াই তারা পছন্দ করছে। এই মন্দা সবচেয়ে বেশি থাকে কাতর করেছে সে বাংলা ছোটগল্প। কবিতার বই সাধারণত আরতনে ছোট হয়, কবিতা নিয়েই টাকা জোগাড় করে ছাপেন-টাপেন এবং বিক্রি হবে না ধরে নিয়েই তাঁরা অন্তরের তাগিদে এই কর্মটি করে থাকেন। উপভাসের প্রকাশক পাওয়ায় সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত উজ্জল। প্রকাশকরা বাজারের মাড়ি টিপে এটা বুকেছেন যে, উপভাস তবু কিছু

না কিছু বিক্রি হয়, কিন্তু ছোটগল্পের বই লোকে কিনতেই চায় না। কারণটা কি? এমন তো নয় যে ছোটগল্প আজকাল যত খারাপ লেখা হচ্ছে উপভাস তার চেয়ে কম খারাপ লেখা হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ছোট গল্প পড়তে যতটা মনোযোগের দরকার উপভাস পড়তে ততটা মনোযোগের দরকার হয় না। ছেড়ে-ছুড়ে খাবলে-খুলে যেমন খুশি পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত একটা কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট গল্প ওভাবে পড়লে কিছুই পাওয়া যায় না, ছোটগল্প পাঠকের কাছে অনেক বেশি মনোযোগ দাবি করে। তাহলে কি এমন কিছু ঘটেছে যে পাঠক আর তেমন মনোযোগী হতে পারছে না? ঘটেছে বই কি, তবে তার জন্ত দায়ী পাঠক নয়। সাহিত্যই পাঠকের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলায় আর তার মনোযোগ দাবি করতে পারছে না। এ কারণেই সাহিত্যের যে শাখা-পাঠকের যত বেশি মনোযোগ দাবি করে তার কপাল তত মন্দ। ছোট গল্প উপভাসের চেয়ে পাঠকের মনোযোগ অনেক বেশি দাবি করে বলেই বইয়ের বাজারে তার আঙ্গ এত অনাদর। অর্থাৎ সমস্তটা উপভাসের যা ছোটগল্পেরও তাই, তফাৎটা শুধু পরিমাণগত।

ছোট গল্পকে অবলম্বন করেছে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমরা পাঠকের মনোযোগ হানির উৎস সন্ধান করবার চেষ্টা করব। যেহেতু পরিসর কম, অনেক বক্তব্যই আমাদের এখানে সূত্রাকারে রাখতে হবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, মতপার্থক্যের অবকাশও বিস্তর। এ বিষয়ে একটা ধোরালো বিতর্কের সূচনা হলে অনেক জট ধুলে যেতে পারে, এবং ছোট গল্পের লেখক এবং পাঠকের এ থেকে সমভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব। আমরা মনে করি অনেক ছোটগল্প লেখক না কেনে একটা চক্রান্তের শিকার। একদল জীবনটাকে একটা আদর্শের শক্ত মাটির ওপর দাঁড় না করেই কলম নিয়ে লিখতে বসে গেছেন, আরেকদল আদর্শ বলে যেটাকে ধরলেন সাহিত্যে-নেটার প্রয়োগের ব্যাপারটা সঠিকভাবে না বোঝার তাদের সাহিত্য চিন্তারও গোড়ার গলদ থেকে গেল।

কথাটা একটু খোলসা করা যাক। একটা কথা প্রায়ই শুনি—‘বামপন্থী’ সাহিত্য। বস্তুটা যে কি

তা আমার ঠিক জ্ঞান নেই। যে লেখক বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন—তাঁর রচিত সাহিত্যই কি বামপন্থী সাহিত্য? তাহলে তো অল্পবয়সী বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী সাহিত্যিকের লেখাও বামপন্থী সাহিত্য। একটা প্রশ্ন রাখছি—একটা নিটোল হৃদয় প্রেমের গল্প যদি একজন বামপন্থী লেখক লেখেন তাহলে সেটা কি হবে? বামপন্থী গল্প? আর যদি একজন দক্ষিণপন্থী লেখক লেখেন? দক্ষিণপন্থী গল্প? একটা পরিচ্ছন্ন হাসির গল্প সম্পর্কেও একই প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। সময় সময় উচ্চকণ্ঠে হাসা, মাঝে মাঝে একটু প্রেম-ভালোবাসায় আবিষ্ট হওয়া তো মানুষের পক্ষে জীবনসংগ্রাম রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের চেয়ে কম জরুরী নয়। কিন্তু একটা নিটোল প্রেমের গল্প বা হাসির গল্পকে রাজনৈতিক চিন্তার নিরিখে বিচার করা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ এই সব গল্পের মৌল প্রেরণাগুলি মানুষের জীবনে জলবায়ুর মতোই প্রয়োজনীয়। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, যে জীবনদর্শন রূপ জীনা সু থেকে বামপন্থী রাজনীতি মামক স্পিলি-জের উদ্ভব সেই একই জীনা সু থেকে বামপন্থী সাহিত্যের ধারারূপ যে স্পিলি-জি-তারও জন্ম। আমাদের গোলমালটা হয় এইজন্য যে আমরা মনে করি একটা স্পিলি-জি (অর্থাৎ বামপন্থী রাজনীতি) জন্ম দিয়েছে আরেকটি স্পিলি-জি (অর্থাৎ বামপন্থী সাহিত্যের), এবং এই ধারপাটাই অনেক সময় আমাদের সাহিত্য চিন্তাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে ফেলে। এমনও হতে দেখি, যে সাহিত্যিক আক্ষরিকভাবে বামপন্থী রাজনীতির প্রোগানগুলিকে তুলে ধরে না তাকেই প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া হয়। অথচ, ঋতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, হয়তো সেই সাহিত্যিকই মানুষেরই খাৰ্বে অনেক গভীরে চলে যেতে পেরেছে, অথবা মানুষকে উপহার দিয়েছে কিছু আত্ম-প্রদ আলো হাসি গান। যেহেতু বামপন্থী রাজনীতি আর বামপন্থী সাহিত্যকে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা বেশ প্রবল, আমি তাই বামপন্থী সাহিত্য কথাটাই বদলে ফেলার পক্ষপাতী। দায়বদ্ধ সাহিত্য বলে ব্যাপারটা অনেক বিরাট ব্যাপক একটা সূত্র পেতে পারে। কেননা সংসাহিত্য মাত্রই দায়বদ্ধ সাহিত্য, তার দায়দায়িত্ব মানুষের মঙ্গল-

মঙ্গলের সঙ্গে গভীরভাবে অন্তর্যাপ্ত। এখানে উৎসমুখের সেই জীবনদর্শনের প্রশ্নে গিয়ে বলতে পারি, যে স্বাধীন জীবনদর্শন বৃহত্তর মানুষকে মানুষের অধিকার দেবার জন্ত বামপন্থী রাজনীতির জন্ম দেয়, সেই একই জীবনদর্শন জন্ম দেয় দায়বদ্ধ সাহিত্যের। স্বাভাবিকভাবেই দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের রাজনৈতিক-আত্মগত বামপন্থী রাজনীতির দিকে থাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাজনৈতিক প্রোগানগুলিকে কাগজে কলমে ধরে রাখতে পারলেই তাঁর কাজ শেষ। তাঁর কাজের সঙ্গে রাজনীতিকের কাজের ফারাক যে-বিস্তর তা বোধহয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এই পৃষ্ঠপুট থেকে নির্দিষ্টভাবে এবার ছোট গল্পের বিষয়টিতে আসা যেতে পারে। বাংলা ছোট গল্পের ঐতিহ্যটি বড় কম নয়। বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ সমৃদ্ধ শাখাটিকে ধারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বুঝে যাওয়া হিউ-ম্যানিস্ট থেকে মার্কসবাদী পর্যন্ত অনেকেরই লক্ষ্য পাওয়া যাবে। এরা যে বহু সার্থক ছোটগল্প রচনা করতে পেরেছিলেন তার কারণ এই যে, বৃহত্তর মানুষের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে দায়বদ্ধ সাহিত্যের শর্তগুলি এঁদের লেখার প্রতিপালিত হয়েছিল। এঁদের বেশির ভাগই কিন্তু সচেতনভাবে এ কাজটা করেননি, করেছিলেন সাহিত্যের চিরায়ত ঐতিহ্যের অনুসরণে এবং ব্যক্তিগত সত্যতার প্রেরণায়। কারণটা বাই হোক, ছোটগল্প লেখার কাজটা কিন্তু চলছিল ঠিক রাস্তায় এবং চলছিল বলেই পাঠের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পকে পাঠকের দ্বারা অনাদৃত হতে দেখি না। তারপরই হল বিপদের সূচনা।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ধনতন্ত্র সহন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিষয়াদি যেন কোমোক্রমেই মানবসমাজকে কলুষিত করতে না পারে। এই সময়কার আমেরিকার কথা স্মরণ করুন। কম্যুনিষ্ট জুজুর ভয়ে সিনেটর ম্যাকার্থীর কমিটি বহু আমেরিকানের জীবন হুমিযাহ করে তুলেছে। ভয়ের হাওয়াটা জোরদার করবার জন্য রোজেনবার্গ সম্প্রতি কে একটা হা অকর বিচার-অভিমনয়ের

শেষে প্রাণ হও দেওয়া হয়ে ছে। সময় বিধে র কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদ অগ্রাহ করে সেই দণ্ডদেশ কার্যকরীত করা হয়েছে। যেখানেই ধনতন্ত্রের হুমলতা প্রকট সেখানেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তার সাহায্যের বরাতর আর সহস্র চক্রান্ত নিয়ে হাজির। ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল সহস্র সমস্রাকটকিত দেশেও ধনতন্ত্র নিরাপদ নয়। এখানেও ধনতন্ত্রকে দৃঢ়তুল করার কাজ জোরদার করা দরকার। এবং এ কাজটি করতে হলে বুজোয়া ডেকাডেন্সের বিষ সাহিত্য মারফৎ সমাজদেহে প্রবেশ করানো অবশ্য-কর্তব্য। অতীত ক্ষেত্রে এ কাজটা নানানভাবে চলছিল। এই পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যকে বিধাক্ত করার চেষ্টা প্রথম স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেল পাঠের দশকের শেষদিকে। একটা জিগির তোলা হল—‘ছোটগল্পে নতুন রীতি’। ছোটগল্পে গল্প খাটখাটী লেখলে, বাংলা ছোটগল্পে আধুনিক করতে হলে কাহিনী-নির্মাণ লিখলে চলবে না। জীবনের বাস্তব সমস্রাগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে মনের গভীরতম স্তরে-ডুব দিয়ে সত্যাহুসন্ধান (যা কল্পে ঘোমতা) চালাতে বলা হল। অর্থাৎ সাহিত্যে হুবোধ্যতা ও ঘোমতাকেন্দ্রিক জীবন-বিমূর্ততার অহুপ্রবেশ ঘটানোর প্রহু-একপেরিসেন্ট শুরু হয়েছিল। ছোটগল্পকে দিয়ে, ‘ছোটগল্পে নতুন রীতি’ সূচনুর একটি প্রোগান মারফৎ ছোটগল্পকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে উপভাসের ব্যবসারটা অনেক জমজমাট, ওখানে একপেরিসেন্ট করতে গিয়ে ব্যবসায় কুঁকি নেওয়া যায় না। ছোটগল্পে একপেরিসেন্ট লফল হলে তখন সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সময় সাহিত্যশরীরকেই বিধাক্ত করা সম্ভব হবে। পরবর্তীকালে যে এটা লক্ষ্য হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের লং পাঠক মাত্রই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে কেউ হয়তো বলবেন, এখন যেহু সরাসরি পরমা দিয়ে লেখক হয় তখনো তো তাই করা যেত, অনাবশ্যক সুরিয়ে নাক দেখানো কেন। প্রশ্নটা অসঙ্গত নয়। তবে উত্তরটাও খুব কঠিন নয়। যেহেতু সাহিত্যে তখনো মনোপলির প্রবেশ ঘটেনি বা বুজোয়া প্রবেশ ১০ম পৃষ্ঠায়

চরম হতাশা চরম বিভ্রান্তির ভোট—গজিটিং না নিগেটিং?

শ্রীপতি নন্দী

ভোট-বিলাসের দ্বারা বৈরাচারকে প্রতিহত করা যায় না, এমন কি তার আরো ভয়ানক পুনরাবৃত্তিও তৈরী করা যায় না। আবার, স্লোগান লব্ধ লাভ দায়িত্ব-বিবোধী 'লড়াই'গুলিও ছায়ার লগ্নে যুদ্ধের মতই নিষ্ফল—মূল বস্তুকে আঘাত করে না।

বামপন্থীদের অনার 'লাইন' হাটুভাঙ্গা জনতা পার্টির খণ্ড খণ্ড দশা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সেই অনেক-দেখা দৃষ্টান্ত—সবকিছু এককাতী হয়ে যে লক্ষ্যলঙ্ঘন নির্বাচনী তোলপাড় শুরু করলো, সে ধূলিকণার অবসানে ভারতীয় 'গণতন্ত্র'র মুখচুবি বীভৎস দেখালেও বিস্ময়কর নয়। মেকী লড়াইয়ের ফলাফল কতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, ১৯৮০-র নির্বাচনে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাকে বাদ দিলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত আবার প্রত্যেক ও স্থানই হলো।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই?

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য লড়াই বৈকি। গণংকারকুল যে সময়ে নেতা-নেত্রীদের নেতা হন, ধর্মীয় ষাগ-বজ্ঞ ও পুণ্যস্থান যে সময়ে বিজয়লাভের ঐশ্বরিক উপায় হিসাবে গণ্য হয়, জয়-শুভকী-ভাবেশী-জগৎশুভকী-ইমাম-মানগুলি যে সময়ে বড় বড় দলগুলির নিকট একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে, হরিজনদের প্রাণে সাম্প্রদায়িকতা আশা-ভরসা জাগিয়ে তুলতে বাবুজী-মাঠাকরুণজীরা যে সময়ে বর্ণবৈষম্যবাদী আবেদনে "আপনজন" হয়ে ওঠেন, মুসলিমদের ক্ষেত্রে যে সময়ে ইমামকুল নির্বাচনী 'টেটামেন্ট' পাঠে উদ্বাস্ত হয়ে ওঠেন, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য লড়াইটি তখন কোন্ মর্যাদানে হয়ে থাকে? ধর্মীয় গুরুবাদ, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ধর্মভীরুতা, বর্ণভেদ ও সাম্প্রদায়িক আবেদনের কড়াপাকে সামন্ততান্ত্রিক বিঘাত-বিকারগুলি বধন রাজনৈতিক ভোজ্যবস্তু হয়ে ওঠে, নির্বাচনী অপকৌশলের সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণভেদ প্রচার মঞ্চে-বাওরা ভিতটাই তখন উত্তপ্ত

হয়ে ওঠে।

পরিচিত দৃষ্টান্ত—সম্প্রদায়িকতা ও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণগত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে 'নিম্নমেশন' পর্ব শুরু হয়, তার পরবর্তী পর্বায়ে অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচার পর্বে সে পালে হুমকা হাওরা লাগে—প্রথমত: ভোট ভাগাভাগির কাজে কুশলী 'নেতা'দের ও লাধু-বাণাজী-দের প্রচার চাতুর্ষ্যে, দ্বিতীয়ত: ধর্ম বর্ণ-সম্প্রদায়িক বিষয়ক অস্বাভাবিক সাংবাদিকত্বের অজস্র বোগ-বিয়োগে আর উত্তেজক 'নরীকার', এবং তৃতীয়ত: বিভ্রান্ত নির্বাচকমণ্ডলীর আসরে-আসরে আশা-উত্তেজনায় জয়-পরাজয়ের হিসেব-নিকেশ। একটানা কয়েক মাস জুড়ে এরূপ হিষ্টিরিয়ার ফলাফলটি বেরপ হতে পারে, তেমনটি হচ্ছে, এবারও হয়েছে। মোকদ্দমা, এ সমস্ত অন্তত যোগাযোগটি যেদিকে ভারী, ফলাফলও সেদিকে ভাল; আর তাছাড়া "ভাঙনের তীরে ঘর বেঁধে কিবা ফল।" ভোটদায়কদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকে লটান 'ডিফেকশন'। ফলে সাম্প্রদায়িকতা-বর্ণভেদপ্রচার নামাজিক ভিত্তি ও বৈরাচারের উপাদানগুলি শুধুই অক্ষত থাকছে না, আরো দৃঢ়-ব্যবস্থিত হচ্ছে।

অতএব, এ 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইটি' মেকী ছিল, এবং ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে চিরটা কাল এমনটি ছিল। শাসকশ্রেণীর দলগুলির দৃষ্টিতে নির্বাচনে ভোট-প্রাপ্তির জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদবিচারে দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়াটাই বড় কথা—না হওয়াটা কোন্ কাজের নয়—দাঙ্গা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যে অমূল্য 'সুযোগ' এনে দেয়, দাঙ্গাহীন অবস্থা তা কেড়ে নেয়, বিগত চুবুছরে এ দলগুলিই জামনেদপুর, বারানসী, আলিগড়, হায়দরাবাদ সহ ভারতের নানান স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ণবৈষম্যগত দাঙ্গা বাধিয়ে ১৯৮০-র নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দলগুলির মোকাবেলা করতে—

না কংগ্রেস, না জনতা-জনসংঘ—রাজনীতিগত ও সাংগঠনিক উপায়ে ভারতের কোন্ অঞ্চলেই কখনও সক্রিয় ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাহলে, ভারতে মালিক-শ্রমীর দলগুলির মধ্যে যে কোনটির 'নীতিতে' প্রত্যেক কিংবা পরোক্ষরূপে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বেথতে পাওয়া রাজনৈতিক নাবালকতা ছাড়া আর কি?

কার্যতঃ, ইন্দিরা কংগ্রেসকে শুধুমাত্র বৈরাচারী বলে প্রচার করার মধ্যে এবং জনতা পার্টিতে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক রূপে চিহ্নিত করার মধ্যে ফলতঃ ইন্দিরা কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ বা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বলে পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সম্ভব নেই, ভারতের সাংখ্যালঘুদের শক্তিত মানসপটে ধর্মনিরপেক্ষতার এরূপ পার্টিকিট ইন্দিরা কংগ্রেসের লপকে প্রচারে সহায়ক হয়েছে—বিশেষতঃ বধন-পরিচিত বামপন্থী দলগুলি এরূপ প্রচারে লম্বুসারিতে ছিল। জনতা-লোকদলও একই তুল করেছিল—শুধুই বৈরাচারী ইন্দিরাকে চিহ্নিত করেছে, লগোজীয়া সাম্প্রদায়িকতা জীবি ইন্দিরা কংগ্রেসকে জনসমক্ষে তুলে ধরেনি, এবং এরূপে সাম্প্রদায়িক কলঙ্কের সর্বস্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিল। বিভ্রান্ত ভোটদায়কদের একটা বড় অংশ যতাবতই তাহলে তাদের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ভোট ইন্দিরা কংগ্রেসকে দিল (পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা বাদে) অবশ্যই বিকল্প অবলম্বনের অত্যাধিকার। এ ভোটগুলি পজিটিভ, না নিগেটিভ?

এ হল 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী' ঘটনার একপাঠ। অপর পাঠে গুরুজী-ভাবেশী-জগৎশুভকী-ইমামজী সহ ছোটবড় ধর্মগুরুদের নির্বাচনী প্রচার, বৈদিক ষাগ-বজ্ঞের অমুঠান দ্বারা ইন্দিরার 'প্রায়শ্চিত্ত' গুলি ও সহস্র সহস্র মন্দিরে ইন্দিরা গাছীর পূজা-উপাসনাগুলি নির্বাচনে যে ধর্মবিশ্বাস বান ডেকে আনলো তার প্রবল টানে নানা সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্ত ভোটদায়ক অপর এক বিপুল অংশ তাদের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় আস্থা-ভোট একই কংগ্রেস (ই)-কে দিল। ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিলে এরূপ গুরুবাদী উপাসনাবাদী শক্তিশালী টান ভারতের প্রায় সর্বত্রই আকর্ষণরূপে প্রবল। তাহলে, ধর্ম-

নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে লড়াইয়ের প্রসঙ্গ ইন্দিরার এরূপ ভোটপ্রাপ্তিযোগ্য পজিটিভ, না নিগেটিভ? অবশ্যই, 'নিগেটিভ'।

আধাসামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ভিত্তি ও উপ-বুদ্ধির আনন্দাত্মিক উপরিকাঠামোর রচিত রাষ্ট্রধর্ম এবং তার পরিচালক শাসকশক্তিগুলি বৈরাচার কিংবা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোন সুযোগ এনে দেয় না, দ্বিভেদে অক্ষয়—পারে শুধু এরূপ লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে আরও অব্যাহতিরূপে জটিল করে তুলতে, অর্থাৎ বৈরাচারের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে কিংবা সাম্প্রদায়িকতার দাবীকে বৈরাচারকে আরো তাতিয়ে তুলতে পারে। এ করণ অথচ বাস্তব ভিত্তির পটভূমিকার ভারতীয় নির্বাচনের ফলাফলকে বিচার করতে হবে—পজিটিভ, না নিগেটিভ?

বৈরাচার বিরোধী লড়াই?

লাইনহীন, লক্ষ্যহীন বৈরাচার বিরোধী-কোলাহলের একই দশা হলো—মেকী লড়াইয়ের নির্মম ফলশ্রুতিরূপে বৈরাচারী শক্তি প্রত্যেকরূপে আবার গাঁট হয়ে বসলো।

বৈরাচারবিরোধী স্লোগান নিষ্ফলই বাস্তব, কিন্তু এর সাংবিধানিক সাংগঠনিক, রাজ্যীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট মূলতঃ অস্পষ্ট। বৈরাচারের ভিত্তি ও উৎসগুলিকে চিহ্নিত না করে বৈরাচার বিরোধী স্লোগান দিলে ব্যাপারটা এতটা লক্ষ্যলঙ্ঘন হওয়া সম্ভবপর বিগত নির্বাচনে তা সাধারণভাবে স্পষ্ট হয়েছে। শ্রেণীগত চেতনার অত্যাধিকারের অধিকাংশ মানুষ বৈরাচার বলতে ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত খেচ্ছাচারকে, তার কামনা বাসনা, তার পারিবারিক আশ-পিতৃশ্রু, ভূখিহীন ক্ষমতালিপ্সু ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অত্যাধিকার দ্বারা বাস্তবের একাংশ যদি এ সমস্ত

ব্যাপারগুলিকে কারো 'ভুল মানসিকতা' বলে জ্ঞান করে এবং পরিষ্কার চাপে সাংশোধনযোগ্য বলে বিবেচনা করে থাকে সেক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গাছীর পরাজয়কে তার 'বাড়াবাড়ির জন্য কঠিন শাস্তি' রূপে যেনে নেওয়া তাহলে পক্ষে অনেক সহজ। বস্তুতঃ এরূপ একটি যত্ন প্রচার কার্য বিগত দু'তিন বছর জুড়ে বিভিন্ন মহলে চালু ছিল। উল্লেখ্য, ইন্দিরার বৈরাচারী ব্যক্তিত্ব ও অত্যাচারগুলিকে খোদ জনতাদলের ভাষায়ই 'ভুল' (mistakes) ও 'ইমার্জেন্সী বাড়াবাড়ি' (Emergency excesses) রূপে আখ্যায়িত হয়েছে। সুতরাং 'অমৃতপু' ইন্দিরার 'অমৃতপু'কে এবং 'ভবিষ্যতে ইমার্জেন্সী জারী না করার' রাপীয় প্রতিশ্রুতিকে জনসাধারণের একাংশ ক্ষেমাধেমা করে থানিকটা ছন-সহযোগে গিলে নিয়ে থাকে, তাহলে এ বিপজ্জনক ঘটনার কতিপয় ঘটনা জনতাদলের ততটা ইন্দিরার নয়।

বর্তমান ভারতের পরলো নব্বয় বৈরাচারী ব্যাপারে নানারূপ আইনী, আদালতী ও কমিশন মার্কা তামাসা চললো, এবং যে ভাবে আইনের এজিয়ার, আদালতের এজিয়ার, কমিশনের এজিয়ার ও বিশেষ আদালতের এজিয়ার প্রসঙ্গের জটিল জটিল আবেদে সমগ্র ব্যাপারটাকে ও তার উদ্দেশ্যগুলিকে ঘোরালো-প্যাচালো ও লক্ষ্যলঙ্ঘন করে তোলা হলো, তেমন নজীর বিধে ইতিহাসে বিরল। অথচ ১৯৭৭ এর নির্বাচনে জনগণের মেজাজে কোন তামাসা ছিল না—তা ইন্দিরা-বিরোধী ছিল, কারণ তা বৈরাচার-বিরোধী, ধান্দাবাদী-বিরোধী, শোষণ-পীড়ন বিরোধী ছিল—আজো তাই আছে, তবু বৈরাচারবিরোধী লড়াই রূপ পেলে না; আইন-আশ্রয়ী গোষ্ঠী-লড়াই গণ লড়াই করে না—অতএব, বিকৃত বৈরাচারী প্রায় বাস্তবের একাংশ যদি এ সমস্ত

স্বাধীনতা সঙ্গীত
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাধার জনস্ব
বিশু নারায়ণী প্রাইভেট লিমিটেড
১১, কেমাস চট্ট সিংহ লেন, পোঃ বালী, হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০১৫-৬৪-২৪৪৫
ফ্যাক্স: ৬৪-২০১৫-৬৪-২৪৪৫
২৪ ঘণ্টা সেবা
ফোন: ৬৪-২০১৫-৬৪-২৪৪৫

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
পর্ষদ প্রকাশন
১। তাপগতিতত্ত্ব / শ্রীশোকেশ্বর ঘোষ / ২৪০০
২। পরমানু ও কেন্দ্রিক গঠন পরিচয় /
ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল / ৩৩০০
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১০

এখানকার সরকার ভাঙার কথা নয়

সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় সেরকম ভাবে যে পরি-
স্থিতিতে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মত রাজ্য
সরকারগুলি চুম্বক করে কেন্দ্রীয়
হস্তক্ষেপে ভাগ্য নয়। অসুস্থ ইতি-
মধ্যে তো নয়ই। এটা আর বাই
হোক উনসত্তর-উনআশি সাল নয়।
আশির দশক। ঘটনাবলি সত্তর
দশকের মাঝে পঁচাত্তর ও সাতাত্তরের
দুটি স্মরক চিহ্ন আছে। এবং স্বাধী-
নতা পরবর্তী যুগের প্রাথমিক সমস্যা-
গুলি বড়সড় হয়েছে। অর্থনৈতিক
সমাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে আছে।
আছে আঞ্চলিক ও সীমান্তবর্তী দেশ-
গুলির উদ্বেগমায়ন ঘটনাবলী এবং
রাজনৈতিক লংকট। তাই বড় জয়ের
দাকল্যে উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস (ই)
দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সামনের
অসামান্য সমস্যাগুলি নিয়ে সজ্ঞত
কারণে ব্যস্ত সমস্ত থাকবেন।

অনেক প্রত্যাশাপূর্ণ সাতারের
নির্বাচনী রায়ের পর এবারের নির্বা-
চনী রায়েও আশা-আকাংক্ষার যে
অতিমত প্রকাশ পেয়েছে সেদিকে
দৃষ্টি ও সময় এখানেই না দিলে নয়।
এটা প্রিয়তী ইন্দিরা ভালই বোঝেন।
তিনি এও জানেন তাঁর দলের মধ্যেও
পুনর্গঠনের প্রয়োজন কতখানি। তাঁর
নিজের বয়স সামলাতেও তাঁকে মনো-
যোগ দিতে হবে। যেভাবে এবং
যাদের নিয়ে তার দল গঠিত হয়েছে
এবং তারপর এই ক্ষমতা এসেছে তাতে
কিছু পাওয়ার প্রস্নে, ক্ষমতার প্রস্নে
তার দলের মধ্যে বিবাদ বেশ ঘোঁরা
হতেই থাকবে। আর দেশের বড়
বড় সমস্যাগুলোও আরও বড় হয়ে
দাঁড়াবে। এবং ছ মাসের মধ্যেই
তা বোকা হবে। বদলাবদলি ও
ভাঙাভাঙি করতে গিয়ে অস্বাভাবিক
বয়ে যাবে। কিছু অসুস্থ না দেখাতে
পারলে পরে ক্রমে ক্রমে অস্বস্তি
পরিস্থিতিও সামাল দেওয়া রীতিমত
কঠিন হয়ে পড়বে। তাঁর দলে
স্বযোগ্য সহযোগীর সংখ্যাও বড় কম।
সুতরাং রাজনৈতিক চতুরালিতে যত
অভ্যুত্থান তিনি হান না কেন তাঁকেও
সমঝে চলতে হবে। তাঁর বিরোধীরা
না হলে তাঁকে সমস্ত বুকে বেশ বেগ
দেবেন। সেজন্য অনেক কষ্টে ফিরে
পাওয়া ক্ষমতা যেসব কারণের জন্তে
সেইসব প্রত্যাশার মুখে আশা জাগান
ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার সঙ্গে
রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে অহেতুক
ঘর্ষে তিনি যাবেন না। যাতে স্বার্থে
লাগে এমন কাজ করার চেয়ে বরং যা
করবেন তা খুব হিলাব কবে। তবে

পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার মত
অবস্থা আছে বলে উত্তরপ্রদেশ-বিহার
পাঞ্জাব প্রভৃতির মত নড়বড়ে সরকার
গুলি বদল কাঁড়ার কেএ এই মত
যোগানর সম্ভাবনা থাকলেও জনপ্রিয়
সরকারকে অজনপ্রিয় করিয়ে দিলে
তবেই তার পতন ঘটানর দিকে
ঝুকবেন। নতুন আগামী নির্বাচনে
বিপক্ষে পূর্ণ হস্ত করার পরিবেশ
পড়ে তুলবেন। ক্ষমতায় এসেছেন

বলে প্রতিশোধের জন্তে হস্তে হস্তে হয়ে
এমনভাবে ক্ষমতা কেড়ে যাবেন না
যাতে এই ধারণা আবার সৃষ্টি হয় যে
তিনি ক্ষমতালিপ্সু বলে একাজ কর-
ছেন। এবং আরো ক্ষমতা নিয়ে
নিজের ও লোকপালদের আত্মতৃপ্তির
দিকে এগুচ্ছেন। সেজন্য তাই একান্ত
অনিবার্য না হলে আগ্রাসনের বুল-
ভোজার চালবেন না। অসুস্থ এখন
পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বা অবস্থা তাতে

এখানকার সরকার ছুটি বেশ মজবুত।
তার উপর লোকসভা নির্বাচন সি
পি এম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের
দলগুলির লক্ষ্যও বড়। এখানে তার
দল ভোট বা পেয়েছে তা যতখানি
পছন্দযোগ্য বলে তার চেয়ে বেশী
সি পি এম তথা বাম বিরোধী ভোট
হিসেবে। তাতে লক্ষ্য আসেনি।
আর বামফ্রন্ট সংগঠনের পাশে তাঁর
দলের সংগঠন ধারে কাছে আসে

না। দলের নেতৃত্বও তেমন উল্লেখ-
যোগ্য নয়। এছাড়া বামদলগুলি
নির্বাচনে দ্বিধীতে বা ঘটনার আশায়
ছিল তা না ঘটায় ইন্দিরা-আতঙ্কে
এবং বিজয় উৎসবের ব্যবস্থা দেখে যে
হতাশা ভাবনা ও ভয়ের মুখে পড়েছে
তার থাকা ক্রমশ কাটিয়ে উঠছে।
সমর্থক ও কর্মীদের সাময়িক হতভম্ব
অবস্থা কেটে যাচ্ছে। আশাত সামলা
বার প্রস্তুতিও চলছে। তাই তিনি
আজকের দিনের পরিণত জনসাধা-
রণের কাছে অসময়ে অপরিণত দল-
পত অবস্থা নিয়ে আসতে চান না।
কারণ বর্তমান সরকার ভাঙলে পরে
পরবর্তী সময়ে তাঁদেরই লাভ হবে।

প্রজাতন্ত্র দি আবেদন

- গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে
অক্ষুণ্ণ রাখুন।
- শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার
মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।
- শ্রমক্ষেত্রে মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে
প্রসারিত করুন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী
জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।
- ক্ষেত্রে বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা
করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ
জোরদার করুন।
- এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।
- জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও
শক্তিশালী করুন।
- প্রতিক্রিয়াশীল কায়দা স্বার্থের সকল চক্রান্তের
বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।



এরকম সম্ভাবনাই প্রাধান্য পাবে। তাঁর দলের দ্বারা এখন নির্বাচন হোক বলছেন, এই ঠরা এলেন বলে উদ্ভাসিত দেখাচ্ছেন তাঁদের মতে তিনি মত দেবেন না। তিনি পোড় খাওয়া ঝাড় রাজনীতিবিদ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে খুবই তৎপর। তবু তাঁর হিসেবেও হেরফের হয়। তিনি সবজাতীয় ঈন। স্তরায় প্রতিভুল পরিবেশে অথবা মাথা গলিয়ে নাকানি চোবানি খাওয়ার খুঁকি তিনি কখনই নেবেন না।

তিনি এবং তাঁর পুত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকটা তলিয়ে দেখতে

নিয়মে, বাজিরে দেখতে গিয়ে যা উপ-যুক্ত বলে ঠিক করবেন তা বখাসময়ে করবেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সঙ্গে ভাল ব্যবস্থা করে সহযোগিতা করে এখানে একটা ভাল সম্পর্কের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আগ্রহী হবেন। একতা তাঁরা যে খুবই আন্তরিক এটাও অন্তর্ভুক্ত দেখাতে চাইবেন। খামোখা বিরোধের আগুন উত্তেজিত হবেন না। সামনে অগ্নিগর্ভ আসাম অঞ্চল ভয়ানক অবস্থায় আছে। আর নবভারতীয় রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা এখন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে

মিতান্তই যদি রাজ্যসভায় নিজের দলের সদস্য বৃদ্ধি করতে কি রাজ্য ক্ষমতা হাতে নিতে এগোন তাহলেও সেইমতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে দয়াকরমত কড়া দাওয়াই দিয়ে এগুতে এগুতে পারেন। ফাঁদ পাতে পারেন। বামেলার উত্তেজনাকর বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটনার উত্তোপে মদত যোগাতে পারেন। কিন্তু তাকি শুধু আগের কার্যক্রম ধরেই এগুতে পারে? তারজন্ত নতুন ধরনের কৌশলও চাই। কেন না এদিকের জনগণও কম অভিজ্ঞ নন এবং বাম দলগুলিও কম সংগঠিত নন। তাছাড়া বিগত দশকগুলির বিশেষ করে সত্ত লম্বা

দৈনন্দিন দশকের পটভূমিতে দেশের ও বিশ্বের বর্তমান অবস্থা যেভাবে আরও কঠিন ও জটিল হয়ে উঠছে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

মাধ্যমিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৬১ নং মট সেন, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গ দুর্জয় ঘাঁটি

সপ্তম লোকসভার কল্যাণে সংবুদ্ধোদয় গণতন্ত্রীরা চিন্তায় পড়েছেন। লক্ষ্যপ্রস্তাব মালিকরা বুকে বল পেয়েছে কারণ প্রমিক-কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করতে এবার তারা নিশ্চিন্ত হবে। আর বামপন্থীরা আশার আলো দেখছেন কারণ বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বুজোয়া গণতন্ত্রীরা চিন্তায় পড়েছেন কারণ বামপন্থীদের লোকসভায় ক্ষমতা বেড়েছে আবার বুজোয়া গণতন্ত্র বিপর্যয় হবে বৈরতন্ত্রের হাতে অবস্জাতাবী রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্ম।

ষষ্ঠ লোকসভায় সি পি আই + সি পি এম + আর এস পি + ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যসংখ্যা ছিল (৭+২২+৩+৩)=৩৪। এবার দাঁড়িয়েছে (১১+৩৫+৪+৩)=৫৩। সি পি আই এর অবস্থান নিয়ে এখনও চিন্তায় কারণ আছে বটে। ডাঙে শ্রমতী গান্ধীকে আবার অভিনন্দন জানিয়েছেন। পার্টির মধ্যে দারুণ লড়াই চলছে ডাঙে পন্থী আর ডাঙে বিরোধীদের মধ্যে। ৭০ সাল থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণে যেতে যেতে জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করে সি পি আই এর যে অবস্থা হয়েছিল তাতিগা কংগ্রেসের আত্মসমালোচনা করার পর থেকে আজ তার ভাবমূর্তি কিছুটা ফিরেছে। মণিপুরে সি পি আই ছুঁটোর মধ্যে একটা ও বাট সমস্তের বিধানসভায় ৪টা আসন (সি পি এম ১) পেয়েছে। কেরালার ছুঁটো ও উত্তরপ্রদেশে একটা পেয়েছে। উত্তর প্রদেশের গাজীপুর আসনে সি পি আই প্রার্থী বিজয়ী কং (ই) প্রার্থীর চেয়ে মাত্র পাঁচ হাজার ভোট কম পেয়েছে। আজ সি পি আই বামপন্থী জোটে থাকলে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লাভ হবে। নভেম্বরের প্রথমে সি পি আই, সি পি এম, লোকদল ও কং (আ) মিলে যে পার্টির ঐতিহাসিক সমাবেশ করে তার ৭০-৭৫% ছিল সি পি আই এর কৃতিত্ব।

আর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা যা দেখিয়েছে তার কল্যাণ বিচার করে বুজোয়া শিবির চুস্তিচায় পড়েছে। বিহারে সি পি আই ৪টি আসন পেয়েছে। বঙ্গার, খাগাড়িয়া জেলাবাসী কেন্দ্রগুলোর সি পি আই প্রার্থীরা ভালো ভোট পেয়েছে। শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

বাম



পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পঞ্জিটিভ বা নিগেটিভ

৭ম পৃষ্ঠার পর

বিনা লড়াইয়ে বহাল-তব্বিতে টিকে
রইল।

লব্ধের মধ্যে যে সূত্র বিচরণ করে,
সর্বমুখ্যে সে পালায় না। স্বৈরতন্ত্র ও
যেচ্ছাচারী এ নিবিড় লব্ধের ক্ষেত্রে
আইনী লব্ধি দিয়ে স্বৈরাচারী আইনী
ধরার তোড়জোড়গুলি যে নিষ্ফল
গ্রহসনের বিরক্তিকর আসর জাঁকিয়ে
তুলেছিলো, জনগণের স্বৈরাচার
বিরোধী স্বেচ্ছা সেক্ষেত্রে হতাশার ও
বিস্মৃতিতে হুঁসল হয়ে পড়লো,
সংহতি হারালো, পথ হারালো এবং
বিপরীত প্রক্রিয়ার টানে আরো
বিস্মৃতি, আরো হতাশাগ্রস্ত, আরো
লক্ষ্যহীন হলো। লড়াইয়ের লাইন,

হাতিয়ার ও সংহতি বেধানে অল্প-
পন্থিত, লড়াইটি সেক্ষেত্রে শুধুই
পরাজয়ের ভক্ত লড়াই। এক্ষেত্রে
স্বৈরাচারী বিরোধী শক্তির স্বৈরাচার-
মুখী বিলম্ব পদক্ষেপ পঞ্জিটিভ, না
নিগেটিভ? অবশ্যই নিগেটিভ।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, স্বৈরতন্ত্র-
বিরোধী স্বেচ্ছা বাস্তব হওয়া লব্ধিও
লড়াইটি যদি মেকী হয় তাহলে
একজনে দারী কে? বিলম্ব জন-
সাধারণ? কিংবা যারা মেকী
লাইনকে লাচ্চা বলে চালিয়ে
থাকেন, তারা? স্বৈরতন্ত্রবিরোধী
লড়াই যদি আস্তবিরোধী ফল ফলার,
তাহলে সেক্ষেত্রে দারী কে? হতাশা

গ্রস্ত, বিভক্ত জনসাধারণ? কিংবা
যারা নির্বাচন প্রণালী বাহ্যিক সম্পর্কে
লব্ধ প্রকার মোহাঙ্ক লব্ধারকে
জনমনে ছড়িয়ে দিয়ে এ বৌলিক
লড়াইয়ের মূল প্রতিপক্ষকে আড়ালে
থাকতে সহায়তা করে থাকেন,
তারা?

তাহলে, 'স্বায়ী সরকার'?

ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী
প্রচারে প্রধান লব্ধ ছিল জনতা
সরকারের ব্যর্থতাগুলি; নিজের পক্ষে
বলার মত প্রায় কিছুই ছিল না—
নিভাতই কখনো প্রার্থনা, নিভাতই
'পারিবারিক হররানি'র নামে
জনমনে করুণা-সঙ্করের চেষ্টা, আর
একটা 'স্বায়ী' সরকারের প্রতিশ্রুতি।
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বায়ী
সরকারের প্রতি জনগণের কতটা প্রভা

ভা ল বা না অবশিষ্ট রয়েছে সেটা
বিতর্কের বিষয় হলেও জনতা দলের
শইন: শইন: ভাঙন, জনতা (এস)
দলের পুনর্গঠনিক ভাঙন, লোকসভা
কং (আ) জোটের ভাঙন—স্বায়ী
প্রাণি একদিকে যেমন একটি অতি-
সাম্প্রতিক হতাশার উল্লেখ করেছিল,
তারই পটভূমিকায় মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণে
ও আসাম-মে ঘা লয়ের পরিস্থিতি
নিয়ন্ত্রণে হাটু-ভাঙা চরণ-সরকারের
অক্ষম স্বর্ষকের ভূমিকা-লব্ধাংশ
নিবিশেষে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক
ছড়িয়ে দিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ
নাই। অসহায়তার মনোভাব
অনেকগুলি তাত্ত্বিক-তাত্ত্বিক যোগা
দিয়েছিল। চোখের সামনে—বা
অস্থিতিশীল, চোখের বাইরেও তাকে
স্বায়ীকরণে কল্পনা করা যায় না;
অতএব জনতা যে স্থিতিশীল সরকার
পরিচালনার দাবী হারালো, কংগ্রেস
(ই) তাই পেল। জনতার অসদৃশ্য
কং (ই)-এর সঙ্গতিরূপে দেখা দিল।
নির্বাচনের পক্ষ পাওয়া মাত্রই এ
অবস্থার নিয়ম মার্কিন ভাবে সাম্প্র-
দায়িক ও বর্ণবৈষম্যের মজলিশ-
গুলিতে স্বায়ী সরকারের তেরী বেজে
উঠলো। বিড়লা-নেতৃত্বে একচেটিয়া
পুঞ্জির বৃহত্তম গোষ্ঠী অকৃতজ্ঞ নয়,
বেহিসেবীও নয়—অতএব, কাঁড়ি
কাঁড়ি টাকা আর শত-লক্ষ জীপ-
গাড়ীর এলাহী ব্যবস্থার গ্রাম-ভারত
তোলপাড় হলো।

যোশা জলে মাছ ধরার চমৎকার
মওকা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার
সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি—যতটা শক্তি
শালী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তি-
গুলি সে তুলনায় অনেক অসংগঠিত,
হুঁসল; আবার স্বৈরতন্ত্রের উৎস ও
ভিত্তি যতটা প্রবল, প্রকৃত স্বৈরতন্ত্র
বিরোধী শক্তি সে তুলনায় অতিশয়
লব্ধগণ্য।

শোষিত মানুষগুলি শোষণ-মুক্তি
চার—তবু, এ নির্বাচনের মাধ্যমে
তারা তাদের ক্ষুধার অরুকে নিশ্চিত
করতে, কিংবা মালিক-মহাজনদের
শোষণ থেকে পরিচোধের পথ খুঁজতে,
কিংবা সাম্প্রদায়িক, গোষ্ঠীবাদ, বর্ণ-
বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে, কিংবা
স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের
অধিকারকে নিশ্চিত করতে কোন পথ
পায়নি, পেতে পারে না। না হলে,
'ইন্দিরা হাওয়া' যত বড়ো হাওয়া
হোক না কেন, জনগণের নিঃশাস
নেবার মত একফোটা হাওয়াও এতে
মিলে নি, মিলবে না।

স্বৈরতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করতে হবে
রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মধ্যে,
কেন্দ্রের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির সম্পর্কের
বিচারে, রাষ্ট্রের বাহিত ও ব্যবস্থিত
অর্থনীতিতে এবং এসব কিছুর প্রতি-
রুদ্ধক শাসকশ্রেণীর জাতীয় ভূমিকায়।

ও আন্তর্জাতিক আঙ্গুণ্ডো
বিচারে।

সমস্ত লড়াইয়েরই লাইন আ-
—যেমন আঙ্গুণ্ডোর তেমন শব্দ
পক্ষেরও লাইন আছে। আধাসাম্প্র-
দায়িক সমাজ যেমন সাম্প্রদায়িকতা
ভিত্তি, জেমসি এ সমাজসহ উপ-
বৃদ্ধোয়া শ্রেণী, জাতীয় চরিত্র
আমলাভ ও সাম্রাজ্যবাদী কার্য-
ব্যবস্থাপনা যে অক্ষম রচনা করে,
অক্ষম বেয়েই স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা
স্বৈরাচারী শাসকরা আপন আপ
সমস্ত লব্ধি করে। প্রসঙ্গত: মনে রা-
দরকার, প্রকৃত দেশাত্মবোধ বাহে
বাড়-বাড়ন্তের পক্ষে অস্ত্রায়, যে
টিকে থাকার তাগিদেই তারা নিঃ-
সাম্রাজ্যবাদী মণিকাকন যোগে গৈ-
চারকে আরও মজবুত করে তোলে
একই ব্যবস্থার পুনর্বিভাসের ভক্ত-
তারা নির্বাচনকে কাজে লাগায়
এদের অক্ষমগুলিকে না জানলে
লড়াইয়ের লাইন জানা হয় না।
অতএব, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও
স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াইটিও করা যায়
না।

ভূজয় ঘাটি

৯ম পৃষ্ঠার পর

মধুবনী কেন্দ্রে সি পি আই উ-
ভোগেন্দ্র বা মাত্র তিনহাজার ভোটে
হেরেছেন। প্রমিত অধুষিত জাম-
সেধপুরে সি পি আই প্রার্থী খু-
ভালো ফল করেছেন। মওরাদা
(তপ) কেন্দ্রে সি পি আইয়ের প্রার্থী
প্রথম প্রার্থী প্রায় একলক্ষ আঠাশ
হাজার ভোট পেয়েছেন। উগ্র বাম-
পন্থী বলে পরিচিত মার্কসবাদী কো-
অর্ডিনেশন তিনটি কেন্দ্রে প্রার্থী দি-
ছুটিতে জিতেছেন। হুমকা (তপ)-
ও ধানবাদ কেন্দ্রে জিতেছেন শিবু
সোয়েন ও একে রায়। গিরিডিতে
একো অর্ডিনেশন প্রার্থী বিনোদ-
বিহারী মাহাতো ৫৬,২৮৭টি ভোট
পেয়েছেন। একই সঙ্গে বিহার
বিধানসভার শিকারীপাড়া (তপ)-
কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও প্রাক্তন স্বা-
ধ ও মুক্তিযোদ্ধা ও বর্তমান মা: কো:
এর ডেপুটি মুখ ১০,৭৩০ ভোটে কং
(ই) প্রার্থীকে হারিয়েছেন। পশ্চিম-
বঙ্গে বা ফল হয়েছে তা নিয়ে শ্রীমতী
গান্ধীর স্মৃতি হলে না। তিনি পশ্চিম-
বঙ্গের ভোটেরদরকে ভালোভাবেই
জানেন। মনে পড়ছে ৭৪ জনে
শ্রীমতী গান্ধীর কথা, "গুজরাট-
বিহারে যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তা ২৪
ঘণ্টার ভিতরে লম্বা করবো না।"
ত্রিপুরার ছোটো সিটও বামপন্থীরা
পেরেছেন।

বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে নতুন উপনগরী

বি-বা-দ্বী বাগ থেকে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং গড়িয়াহাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে
বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলীতে একটি নতুন উপনগরী গড়ে উঠছে। গড়িয়া আর বাঘাঘাট রেল ষ্টেশনের মাঝামাঝি
এই ভায়গাটা পড়ছে। এই নতুন উপনগরীটিতে যেতে হলে গড়িয়ার স্বেচ্ছা মল্লিক রোড বা টালিগঞ্জের
নেতাজী স্মৃতিচিহ্ন রোস রোড ধরে যাওয়া বাবে। গড়িয়ার বাস টার্মিনালের কাছে কাছনগো পার্কের পিছনে
এক কিলোমিটারের মধ্যে এই উপনগরীটি তৈরী হবে। ইষ্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস নামের একটা নতুন
রাস্তা স্ট লেক থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে সেটা নতুন উপনগরীটির ভেতর দিয়ে বাবে।

বাড়ী তৈরীর জমি ও এলাকা বিষয়ে

এই উপনগরী নির্মাণের জমি, এম, ডি, এ ৩৭৬ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। এখানে বাড়ী তৈরীর
জমি, সবরকম শ্রেণীর আয়ের মানুষের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্র, পার্ক আর খেলাধুলার মাঠ, বাজার, স্কুল
হাসিনাতাল, দয়কল সব কিছুই ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া মর্দমা, জল সরবরাহ, রাস্তা, বিদ্যুৎ ইত্যাদিরও
সুব্যবস্থা হবে। ১৯৮২ সাল নাগাদ উপনগরী নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

এ বিষয়ে কয়েকটি সাধারণ জ্ঞাতব্য

বাড়ী তৈরীর জন্য ৩০ বর্গমিটার থেকে ২০০ বর্গ মি: পর্যন্ত নানা মাপের জমি বিভিন্ন আয়ের লোকদের
জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এইসব প্রকারের জমি পরিবারগুলির আর এবং জমির আরতন অস্থায়ী আর্থনামিক ৫,০০০
টাকা (ঘর ও পায়খানা সমেত) থেকে ২২,০০০ টাকার মত হবে।

প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- আর্থিক দিক দিয়ে হুঁসল শ্রেণীর মানুষের বাড়ি তৈরীর জন্য (বাড়ের পরিবার কিছু মালিক আর ৩২০
টাকা পর্যন্ত) ছোট প্লট (মধ্যে একটি ঘর ও পায়খানা ব্যবস্থা) থাকবে।
- নিম্নবিত্ত শ্রেণীর (মালিক পারিবারিক আর ৬০০ টাকা পর্যন্ত) বাড়ি তৈরির জন্য ছোট প্লট (মধ্যে
একটি ঘর, একটি রান্নাঘর ও পায়খানার ব্যবস্থা) থাকবে।
- মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বাড়ের মালিক পারিবারিক আর ১৫০০ টাকা পর্যন্ত) তাঁদের জন্য বাড়ি তৈরীর জমি
থাকবে।
- উচ্চবিত্ত মানুষ (বাড়ের পারিবারিক আর মালিক ১৫০০ টাকার ওপরে) বাড়ি তৈরীর জন্য জমি
পাবেন।

বিভিন্ন ধরনের প্লটের বিস্তৃত বিবরণের জন্য
কানাড় ব্যাঙ্ক, শিয়ালদা ব্রাঞ্চ,
১৪-১৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড
কলকাতা - ৭০০০১১

এই ঠিকানায় ৫ টাকা মূল্যের পুস্তিকা পাওয়া যাবে। এই পুস্তিকায় ক্রমিক লব্ধা দেওয়া আবেদনপত্র
থাকবে। বিভিন্ন ধরনের জমি কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এই আবেদন পত্রের সঙ্গে ৪৫/১৫/১১৫/৪২৫/১১৫ টাকা
সমেত (জমির মাপ ও পারিবারিক আর অস্থায়ী) ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০-র মধ্যে জমা দিয়ে ওপরের ঠিকানায়
দ্রুত পাঠাতে পারেন। মনি অর্ডারে ৮-১৫ পাঠালে রেজিষ্ট্রী ডাকে পুস্তিকা ও আবেদনপত্র ব্যাঙ্ক থেকে
পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

উপসংহার

নতুন উপনগরীটির জনলব্ধা হবে ৩০,০০০ হাজার। সি, এম, ডি, এ-র এই পরিকল্পনাটির জন্য
'হাডকো' ৩ কোটি টাকা খণ্ড হবে বলে দাব্য করেছেন। জমি কেনার ব্যাপারে এটা একটা বড় সুযোগ।
বিশেষ করে সমাজের হুঁসল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে।

(ডেপুটি সেক্রেটারী (এস্টেট), সি, এম, ডি, এ, ৩ এ অকলাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সুধেন্দু মৈত্র

গত দশকে কয়েক বৈশী বৈশী হারে সব রাজনৈতিক দলই প্রগতিশীলতা ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে “জনগণ” নামক শব্দকে মূলধন করে এগোতে চাইছে। আজকাল প্রগতিশীল পত্র পত্রিকাতে তেমন সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি ও বুদ্ধিবীর্ষদের কর্তব্য এবং অকর্তব্য সম্পর্কেও নানা মতামত ও মন্তব্য বৈশী বৈশী হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব আলোচনায় “উচিত” এবং “অনুচিত” সম্পর্কেই বক্তব্য পাই। কেন উচিত এবং কেনই বা অনুচিত বিবেচিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত না পাওয়ার আমাদের মত সাধারণ অজ্ঞ-জনের দিশেহারা অবস্থা কাটছে না।

কারণ সংস্কৃতির প্রধানত: দুটো রূপ আমরা কল্পনা করতে পারি। প্রথমটা বাহ্যিক রূপ। যেটার সঙ্গে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা যুক্ত। এটাকেই আমরা সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করি। সংস্কৃতির এই বহিঃপ্রকাশ তো আর আকাশ থেকে আসে না। এই ব্যবহারিক সংস্কৃতি অদ্বাদশভাবে জড়িয়ে আছে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক মানসিকতার সঙ্গে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটে সামাজিক মানসিকতার মধ্যে।

তাহলে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সাংস্কৃতিক বহিঃরূপটি আসলে অন্তরঙ্গ রূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তবে বাস্তবিক প্রশ্ন আসবেই যে এই অন্তরঙ্গ রূপের স্রষ্টার ভূমিকা কী? অর্থাৎ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কীভাবে এবং কেন অতিথিকে “দাও-রান” মাত্র পেতে বলতে দেবার মানসিকতা পরিবর্তিত হয়ে “বস-বার” করে টেবিল চেয়ার ব্যবহার শুরু হল।

ব্যক্তি মানসিকতা ও চরিত্র সাধারণ অর্থে পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে এই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা কিসের ওপর নির্ভরশীল? মানুষের জীবন ধারণের মূল উপাধিগুলি সংগ্রহের পদ্ধতিই নির্ধারণ করে তার মূল চরিত্র কাঠামো যেটা আবার নির্ধারক শক্তি হিসেবে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার স্রষ্টার ভূমিকা নেয়।

চিন্তাকে এইভাবে চালিত করলে স্বাভাবিক পরিণতি এই যে মানুষের

মূল প্রয়োজন যেটার জন্ত বেসব উপাদান পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেই অনুযায়ী সভ্যতার স্তর নির্ণীত হয়। আর যেহেতু সংস্কৃতি ঐ সভ্যতার অঙ্গ হওয়ায় সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশও সেই অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ সভ্যতার ক্রমোন্নতি উপাদান পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ওপর নির্ভর করছে এবং সাংস্কৃতিক স্তরও নির্ভর করে ঐ সভ্যতার স্তরের ওপর।

সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐ দেশের জলবায়ু তথা ভৌগোলিক অবস্থান-যেমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে তেমন প্রভাব বিস্তার করে জীবন ধারণের মৌলিক ও প্রধান পদ্ধতিগুলি। বলা বাহুল্য সংস্কৃতি বিশেষের এই সব উপাদান-গুলিও পারস্পরিক প্রভাব সম্পন্ন হতে বাধ্য। জাতীয় জীবনের অন্তর্গত ব্যক্তির চলার-বলার, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য-পানীয় গৃহসজ্জার যেমন ঐ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটবে, তেমন প্রকাশিত হবে সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য নাট্যালা ইত্যাদি অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশে।

তাহলে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির আলোচনায় এক বটকার কোমো-টাকে ভাল বা মন্দ লেবেল এঁটে দেবার প্রবণতাকে বাহ্যিকের আমা-দের প্রথমত: বিবেচনা করা উচিত যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে উপাদান পদ্ধতির কোন স্তরে আমা-দের অবস্থান? তথাকথিত মজুর-কৃষক বর্গবীর্ষদের কাছে প্রশ্ন যে আজও গ্রাম দেশের প্রান্তবর্গে মানুষের সম্মুখে ঘোমটা ফেলে কথা বলাকে “অ-লভ্যতা” বলে মনে করেন। সত্যিই কি সেটা অলভ্যতা? আমার অবস্থা-পন্ন কৃষকের ছেলে অতিথিকে “দাও-রান” মাত্র বিছিয়ে বসতে দিতে লজ্জা পায়, কারণ তার ইচ্ছা চেয়ার-টেবিলে বসতে দেওয়া। সত্যিই কি মানুষ বিছিয়ে বসতে দেওয়া লজ্জার বিষয়? আজও শহরের প্রগতিশীল নামধারী স্বচ্ছল পরিবারের কত বৃদ্ধ পিতাকে বন্ধু বাস্তবদের সম্মুখে উপস্থিত করতে লজ্জা হয়—এই ঘটনা কি আমাদের জানা নেই? এগুলো কি সংস্কৃতির অংশ নয়?

আসলে সাধ আর সাধের মধ্যে যখন বিস্তর পার্থক্য দেখা দেয় তখন মধ্যমের মধ্যে থাকে একমাত্র অসম্ভাব। মনে হয় “প্রগতিশীল” বুদ্ধিবীর্ষদের (১) সমালোচনায় তেমন এক অসম্ভাবের রেশ-ভেসে

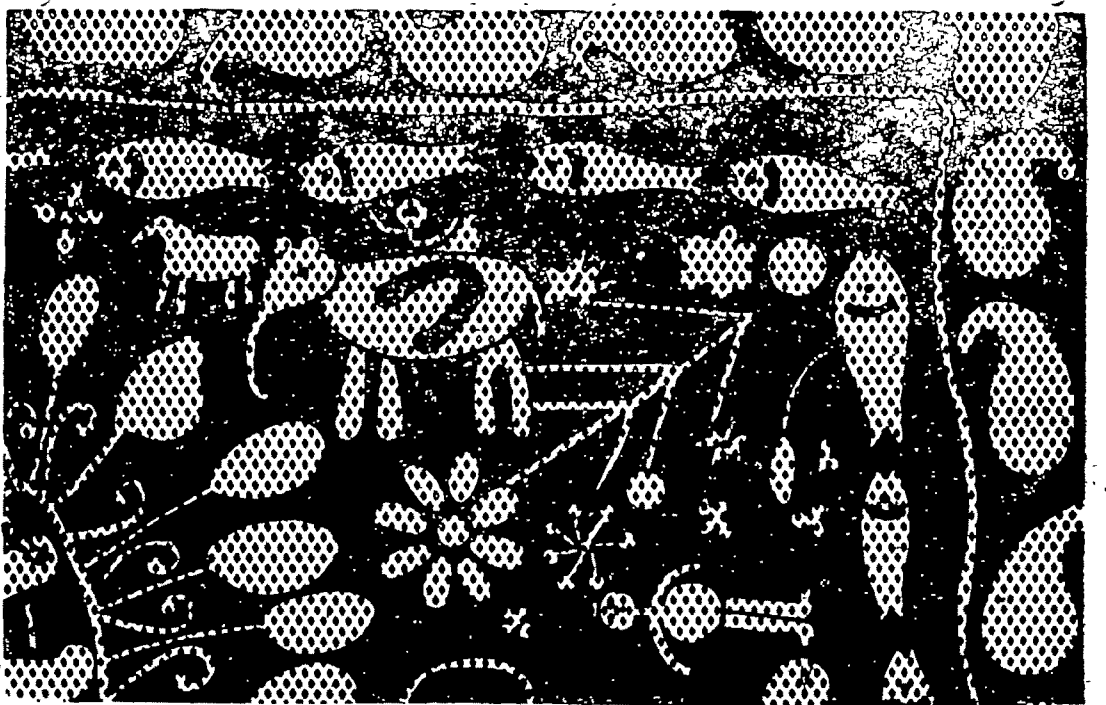
আসে। হবেই বা মা কেন? দুর্গান্ত রক্ষণশীল ও বুর্জোয়াদের মূখপত্র ছিলেবে গত কয়েক দশক ধরে প্রচার করেও “সমাজসচেতন-ও প্রগতিশীল” বাঙালী যখন বিশেষ এক দৈনিক সংবাদপত্রকে ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় সর্বাধিক প্রচারের সম্মান দেয় তখন হতাশা আসবেই। কল্যাণ-কেই যখন কারণ হিসেবে নির্দেশ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তখন হিন্দী সিনেমা বা “বারবধুকেই” অপ-সংস্কৃতির বাহন বলে চিহ্নিত মা করে “কারণ” হিসেবে চিহ্নিত করি। আসলে হিসেব নেবার কষ্টসাধ্য কু-কি নিতে চাই না—কেন ঐ বিশেষ “পত্রিকা” বা হিন্দী সিনেমা বা মকের ক্যাবারে নৃত্য আমাদেরকে এত আকর্ষণ করে। তাসা তাসা স্লোগানধর্মী গরম গরম বক্তব্য সাম-রিক ভাবে জনসাধারণকে আকর্ষণ করলেও আবার মুহূর্ত পরে তারা ফিরে যায় “আপন” মানসিকতায়। এটাই হবে আর এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের স্বরণ রাখা দরকার যে মাত্র তিন দশক পূর্বে আমরা জাতীয় জীবনে সামন্ততান্ত্রিকতার গাটছাড়ার

সংকল্প ঘোষণা করেছি। অথচ বাস্তবে আজও জাতীয় জীবনের “আর” সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভরশীল। যে কৃষি আবার সেই চির পুরাতন “দেবতার” দ্বারা উপর আচ্ছাদিত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং দেশের ৮০ ভাগ লোক যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব উপাদান পদ্ধতিতে বাঁধা তখন তৎজাত মানসিকতা ও তার প্রকাশ যেভাবে থাকা উচিত তাই আছে। আমরা বিশ বা ত্রিশ দশকের মান-সিকতার ধারক ও বাহক বৃদ্ধ পিতা মাতাকে যতই প্রজ্ঞা ও ভক্তি প্রদর্শন করি মা কেন, ব্যক্তি জীবনে সেই ভাবধারা প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করবার মূখ্যমী করতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্যই-বলি আর অক্ষমতাই বলি দেশ সামন্ততান্ত্রিকতাকে বিদ্যায়িত্বের ধনতান্ত্রিক পথেও চলতে পারল না। কিংবা সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্রের উর্ধ্বে যে বাস্তবিক যুগ তাকেও দুহাত তুলে গ্রহণ করে আপন করে নিতে পারল না। ফলে আমরা একুল-ওকুল ছুঁল হারিয়ে অনাথ শিশুর মত শুধু ভাগ্যকে অভিলাষ দিচ্ছি।

আমাদের “শিক্ষিত” ও “ভজ-জনদের” দিকে তাকালেই কি কোন আশার আলো দেখতে পাই? ঔপ-নিবেশিক শিক্ষাক্রম পরিভ্রমণশীল মানসিকতা, গত ত্রিশ বছরের বাস্তবিক উপাদান পদ্ধতির যতটুকু অগ্রগতি তার উচ্ছিন্নভোগী হয়ে অবস্থান করছে। বাধ্য হয়ে যেমন কৃষক মজুরের খাতার নাম লেখাচ্ছে, কিন্তু গ্রামে ফিরেই আবার কৃষিভিত্তিক মানসিকতার শিকার হচ্ছে, তেমনি “শিক্ষিত” মধ্যবিত্ত অবরোধ (১) হেতু কলে কারখানায় কাজ করছে, কিন্তু মধ্যম জালম-পালম করছে “মধ্যবিত্তের” মানসিকতা, আর ভদ্রদাতা ঔপনিবেশিক অধিকর্তার।

তাহলে প্রশ্ন, আমরা কোন্ সংস্কৃ-তির পক্ষে প্রচার করব? আর কাকেই বা অপসংস্কৃতি নাম দেব? ধনতান্ত্রিক প্রথা বর্তমানে শত্রু বলে চিহ্নিত হলেও তার এককালীন প্রগতিশীল ভূমিকাকে আমরা যে কারণে স্বীকার করতে বাধ্য হই ঠিক সেই কারণেই আগামী দিনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদেরকে সংস্কৃতির শেবাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়



অনেক পরিবর্তনের নায়ক সংস্কৃতির পরিবর্তন নেই

সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয়। তা' চিরন্তন। কিন্তু তার পরিবেশের মধ্যে ছোট বড়, যা কিছু পরিবর্তনের নায়ক নিঃসন্দেহে সে নিজেই। এই পরিবর্তনের পরিক্রমা সব সময়েই কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট নয়। কলকাতা তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট। যে কোন বাহ্যিক পরিবর্তনে সেই সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয়। তা কালজয়ী। এই শতাব্দীর গতিপথে পরিবর্তনের অনেক বিজয়ফলক উদ্ভীর্ণ কলকাতা যখন আসন্ন শতাব্দীর সিংহদ্বারে উপনীত হবে, তখন সে উদ্ভীর্ণ গৌরবে উজ্জ্বল। ভূগর্ভস্থ নিশ্চিত-ভাবেই সেই অনেক বিজয়ফলকের অন্যতম, বিভিন্ন পরিবর্তনে সেদিনের সেই কল্লোলিনী কলকাতার মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিন্তু অলভ্য, শাস্তত।

ইতিহাস পাঠকের চোখে

৮ম পৃষ্ঠার পর

ভাষা করা হয়। এতে বহু মুসলমান আমলার জীবিকা বিপর্যয় হয়, এবং সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও সম্প্রীতিতেও প্রচণ্ড চিহ্ন পেল। আলিগড় মুসলিম আমোলনের অন্ততম মেতা সৈয়দ আহমদ খান উচ্চ অভিজাত পরিবারের সন্তান হলেও, হিন্দুসেলার সময় থেকে তিনি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে ও হিন্দু-মুসলমানদের প্রগতিশীলী প্রেক্ষার পক্ষে আন্দোলন করেছেন। এবারও উহু হঠানোর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কারণ তিনি জামতেন-উহু ভাষা ও সূফী সাহিত্যের মধ্যেই হিন্দু মুসলমান প্রেক্ষার উপাদান থেকে গেছে। অপর পক্ষে ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমির আলি হিন্দী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ‘জাতীয় মুসলমান এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলিম বিদ্যালয়ীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে হিন্দু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের সমকক্ষ হবার আহ্বান জানান। এই কাজে সৈয়দ আহমদ খানের সাহায্য ছিল না। কিন্তু ১৮৮৫ সালে ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর মত বদলায় এবং যথাসময়েই বিপ্লবের বেক নামে এক সাম্রাজ্যবাদী চরের খপ্পরে পড়েন, যিনি ১৮৯৫ সালে লণ্ডন মুসলিম এসোসিয়েশনে বলেন—‘হিন্দু-মুসলমান প্রেক্ষা অসম্ভব। মুসলমানরা যেমন দ্বারাভাই নৌরজি ও বাঙালী রাজনীতিবিদদের পায়ে মেরে মেরে না বসেন।’ এইভাবেই ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি তৈরি করা হয়। হয়ত এই আঘাতেরও প্রয়োজন ছিল। নইলে হিন্দু-মুসলমান প্রেক্ষার পক্ষে ও এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে হাতে-মার্টের সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাবে প্রতিরোধে নেমে পড়ত না।

৥ তিন ৥

বিবেকানন্দের সহোদর প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তিরিশের দশকে তাঁর ‘ভারতীয় একজাতীয়তা গঠন সমস্যা’ গ্রন্থে বলেছেন—‘এক জাতীয়তা উদ্ভূত হইবার জন্য এক-রক্তের, এক ধর্মের লোকসমষ্টি হইবার প্রয়োজন নাই। মার্কসীর ব্যাখ্যায়-লারে ভারতে দম-ঐতিহাসিক রুষ্টির একত্বা রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যও একসূত্রে গ্রথিত। এক্ষণে তাহারা বহি বোকে তাহাদের স্বার্থ এক, তাহা হইলে একজাতীয়তা অর্জনে কোন বিঘ্ন নাই।...বহিচ বুর্জোয়া ক্রাশনালিস্টরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যের ধরা তলিয়াছেন। এক্ষণে শোনা যায়

হিন্দুর ও মুসলমানের কৃষ্টি পৃথক। একই গ্রামে অবস্থিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কৃষ্টি ও তাহার বাহন সম্যকভাবে প্রকারে পৃথক তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। পুনঃ শোনা যায়, বাঙালী, উড়িষ্যাবাদী ও বিহারের লোকদের কৃষ্টি ও সম্যকভাবে পৃথক। বুর্জোয়া ক্রাশনালিস্টরা কৃষ্টি অর্থে কি বুঝেন তাহা হাই জানেন। তবে ইহা বোকা যায় যে, শ্রেণীগত কার্যে স্বার্থের কারণে অনেক ভাঙ-তার প্রয়োজন হয়। সেইজন্যই নানা প্রকারের বিভ্রান্তির ও বিভেদের কথা উঠে।’ অর্থাৎ শাসক ও শোষক শ্রেণী, বিদেশী ও স্বদেশী নির্বিশেষে নিজেদের ক্ষমতা রাখার স্বার্থে এখনই নির্বাচিত জনগণের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ হানা বেঁধেছে, তখনই এসব সাম্প্রদায়িক বিষ বিলি করেছে।

এর মধ্যে গণ ও পুত্র্যর বৃদ্ধি অনেক দল গড়িয়ে গেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লক্ষ্য হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নির্মাণ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তি দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাদীবাদের বর্বরতাকে কোপঠালা করেছে, সোভিয়েত লালফৌজের হাতে হিটলারী ক্যানিস্ট শক্তির পতন ঘটছে। এবং এরই মধ্যে খণ্ডিত জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের কারণে (বিচ্ছাদিত) দেশভাগ হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান ঘোষণা করেছে—ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের কথা।

সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নতুন মহাভারত কমিউনিষ্ট ও প্রমিক-কৃষক নিধনই পরম রাজনীতি, ভারতের স্বাধীনতা এনেছে কংগ্রেস দল, ভারতের স্বাধীনতা এনেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারত একটি হিন্দু-রাষ্ট্র ইত্যাকার ধনিক শ্রেণীর পাচালি।

তিরিশের দশকে জার্মানীতে হিটলার ইহুদি নিধন-রক্ত সন্ধান করে জাতিগত বিশুদ্ধতার মতবাদে দেশ-টাকে ভাসিয়ে বললেন—এই শতাব্দীতে গণতন্ত্র হল ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা; হুতরাং হারা প্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের গণতন্ত্রের কথা বলে, কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সেইসব বিবেকী বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদেরও খতম করা জার্মান জাতীয়তাবাদীদের পবিজ কর্তব্য।

এবার দেখুন, পরম তত্ত্ব বৈয়তন্ত্রী ইন্দিরার (যিনি নিজেই হল, নিজেই নেত্রী, নিজেই ভারত) সঙ্গে উগ্র হিন্দু

সাম্প্রদায়িক হল আর এস এস ও জনসংঘের সঙ্গে কেমন মিল। ইন্দিরা জরুরী অবস্থা আরি করে, RAW দিয়ে দারা দেশের গণতন্ত্র হত্যা করেন। ১৯৬৭ থেকে ৭৮ সাল পর্যন্ত সরকারী হিসাবেই ৩৩১৫টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। আর এস এস-এর তাত্ত্বিক মেতা পোলওয়ালেকর বলেন—জনগণের দারা জনগণের গণতন্ত্র, বহুটি একটি পৌরাণিক ধারণা ছাড়া কিছু নয়। শুধু তাই নয়, তিনি সেই তিরিশের দশকের জার্মান ক্যানিস-বাদের জয়গান করে বলছেন—জার্মানীর (হিটলারী আমলের) জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিভঙ্গী, দারা হিন্দু-স্বামে বাস্তব প্রয়োণের জন্ত, আমাদের কাছে একটি অমূল্য শিক্ষা। দেখা যাচ্ছে ভারতের মত বহুজাতিক, বহু ধর্মাবলম্বী জনগণের দেশে এই উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের ‘পাকিস্তান’তে (১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮) লিখেছে—‘ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মত বহুজাতীয় তত্ত্ব মানুষের জীবন উন্নত করতে পারে না।’ এরা ভারতীয় সমাজকে হিন্দু সমাজ বলে। ১৯২৫ সালে এরাই প্রথম হিন্দু-স্বাম বহলে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রোগাম দেয়—‘হিন্দী হিন্দু হিন্দু স্তান।’ এরা সমাজের পরিবর্তনে অবিশ্বাসী, এরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিচার অবিশ্বাসী, এদের ধারণা বা এরা প্রচার করে—যে সমাজকে আমরা হিন্দু সমাজ বলি তা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। সেই প্রাচীন হিন্দু জীবনদর্শন ও তত্ত্ব-জ্ঞানকেই পুনরুজ্জীবিত করতে হবে রামচন্দ্র, অজুন, শ্রীকৃষ্ণ, আর্য চাপকা, ছত্রপতি শিবাজী, রামদাস স্বামী, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু অবতারও সাধকদের দিন ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের বক্তব্য, জাত-পাতের বাধন আলগা হয়েছিল বলেই (বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রাধিকারে) বিদেশী মুসলমানেরা এদেশে প্রাঙ্গণ করেছিল। এদের কাছে বা কিছু বিদেশী (সম্ভবতঃ মার্কিনী টাকা ছাড়া) সবই অমজ-লয়, এরা অ-হিন্দী ভাষা কাউকে বলতে দেবে না, এরা অ-হিন্দুদের নিজেদের ধর্ম পালন করতে দেবে না। এরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দী ভাষা-সংস্কৃতির অকোপালে সবাইকে প্রাঙ্গণ করতে চায়, আকগানিস্তান থেকে ইন্দোমেশিয়া পর্যন্ত হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। এরাই অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী, অর্থাৎ অবাধ শোষণের এবং এরাই রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার আন্দোলন ধরল করতে চায়। এই উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিরই উপগ্রহ (নাকি ছুঁগ্রহ?) মড়ার খুলি-ওয়ারা

আমলমার্গী, বুদ্ধিভ্রান্ত প্রাদেশিকতার তাত্ত্বিকের আমরা বাঙালী, আমরা অহমিয়া, আমরা ভোজপুরী ইত্যাদি দলবল। তাহলে এরা কি চায়? এরা কি এটাই চাইছে না যে রাজ্যে রা জ্যে হিন্দু মুসলমান-পার্শ্ব-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল মেহমতি মানুষ, বাঙালী, অসমীয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষ শোষিত, বঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন ও যুগ-মান হয়েই থাকুক? যুক্তির হিসাবে তো সেটাই দাঁড়ায়। তাহলে নিঃসন্দেহে ওরা, দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদার-জোতদারদের শোষণের পক্ষে, ভারতের গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে মানুষের শত্রু রূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

আজ যে-মানুষ কটি-কটির লড়াই করছেন, শোষিত অত্যাচারিত শ্রেণী রূপেই গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসার ও সংগ্রামী প্রেক্ষা গড়ে চলেছেন, যে

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

৮ম পৃষ্ঠার পর

পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলতে হবে। বর্তমানে বাংলা উপভাস গল্পের কদর কমে যাচ্ছে এবং ক্রমশঃ পাঠককুল “শিকিতা” মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ পত্রপত্রিকার বেরোচ্ছে। কিন্তু হ্যারল্ড রবিণ্ডের ইংরেজী উপভাসের বই আধুনিক শিক্ষিত ছেলেরা “মোহন-সিরিজের” বইয়ের মতই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে ও পড়ছে। প্রশ্ন আসে, কেন? শরৎচন্দ্রের বইও আজকালকার “আধুনিক” ছেলেরদের আকৃষ্ট করে না। কেন?

আসলে ধার্মিক উৎপাদন পদ্ধতি সমাজে বতর্টা অল্পপ্রবেশ করেছে দমাজ ও সামাজিক মানসিকতার ততটা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনের দিকে গিছু দাঁড়িয়ে “সং” না টক-উপভাস-সিনেমার খিরেটার উপস্থাপনা ও প্রযোজনা সত্যিই আশ্চর্য—“সং” কিনা, এ প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া আজ অসম্ভব। পূর্বের মত “আমার” ছেলে তার কাকাকে পারে হাতে দিয়ে প্রণাম না করলেই অ-মৃত্যু হয়ে গেল, একথা আমরা বললেও ছেলেরদের কিছু বাবে আসবে না।

কোনটা অপসংস্কৃতি আর কোনটা হি বা স্বাভাবিক ও স্বস্থ সংস্কৃতি তার মান নির্ণয় করতে তাই প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য দেশের অর্থনীতি কোন সূত্রে বাধা। বর্তমানের প্রগতিশীল বাজা আর রাধাকৃষ্ণের গাথা বা শিব চূর্ণার পালা নয় যেমন মত, তেমনি মত এইসব ব্যাবহল যাজা যখন

মানুষ হুমিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলি-র শিক্ষা ও নিজেদের জীবনের অত্যাচার ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার পোড় খেয়ে সমাজটাকে বদলাতে নেমেছেন, তাঁদের কাছে এই সব পচা গলা বিভেদকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী অশক্তি কতটুকু উত্তেজনা ও বিলাসিতা সৃষ্টি করতে পারে? ওরা যাঁদের টাকার ও যাঁদের প্রচার-মাধ্যমে মানুষের বিরুদ্ধে ভাড়া খাটছে, সেই কার্যেই যাঁদের রাজনৈতিক দল-গুলিই তো চূড়ান্ত মীতি হীনতা ও বহুজাতীয় মর্দমার পড়ে গেছে, ভেঙে ভেঙে মেহমতি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবু, আজও, পচা মর্দমার কাঁধের মাথামাথি মাতাল-গুলোর মত এই সব বুর্জোয়া দলগুলো আর্ন্ত চিংকার জুড়েছে।

গ্রামে গিয়ে “প্রগতিশীলতার” ধ্বজা উড়িয়ে যায়, তখন দর্শকবৃন্দের আর্থিক সজ্জির হিসাব নিলে দেখা বাবে বাস্তবে দারা “জনসাধারণ” তাদের স্থান হয় না। তাহলে তাদের “উন্নতির” জন্ত বর্তমানের প্রগতিশীল বাজার জয়যাত্রা? “ব্যারিবেড” বা “জগন্নাথ” দেখতে হাঁড়ের ভীড়ে টিকেট পাওয়া যায় না, তাঁরা ব্যক্তি-সামাজিক ও কর্মজীবনে কোন সংস্কৃতির ধারক বাহক? পরি-সংখ্যান নিলে দেখা বাবে হয়ত এরা প্রত্যেকেই এই “বারবু” বা হিন্দী সিনেমারও পৃষ্ঠপোষক।

মূলতঃ উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কে বাধ দিয়ে সংস্কৃতির উন্নততর বহিঃপ্রকাশ যে আবাস্তব ও করনা প্রস্তুত, সে কথা মানব সভ্যতার ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি অল্পপ্রবেশ করলে স্বীকার করতেই হবে। আর সংস্কৃতি মূলতঃ সভ্যতার অঙ্গ বলে তার মান ও ঐ সভ্যতার স্তর ও মানের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। হুতরাং সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির বিচার বিবেচনার প্রথমতঃ উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্ক এবং তৎপ্রসূত সামাজিক মানসিকতার হিসাব মেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান ভাণ্ডারকে “বিজ্ঞান-সাগরী জ্ঞান” বলে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হতেই হবে।

আসাম

১ম পৃষ্ঠার পর

মি, গোহাটি শহরের একস্থানে একটি মারাঠী পরিবারের শিশুকে পুড়িয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। নিহত শিশুর মা এবং বাবা অত্যন্ত বিতাড়িত বাকালীয়ে নজে-তখন শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে এনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে গিয়ে সন্তান-হারী ঐ মা-বাবার সঙ্গে আসি সাক্ষাৎ করি। তাঁরা আমার কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমিই প্রথম কল-কাতার দৈনিক সংবাদ পত্রের পাতায় ঐ ঘটনাটি পনের দিন তুলে ধরি। সংবাদটি যদিও একটি বাংলা দৈনিকে তখন প্রকাশিত হয়, তথাপি সরকারি এবং বেসরকারি মহলে এনিরে পতীর ক্রীড়া পর্বদ

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

পেতেন এবং সি এম ডি এর চেয়ারম্যান হিসাবে একটি গাড়ি পেতেন।

শোনা যায় এর আগে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীভ্রাত্ত বোষকে সরিয়ে এই পদে বদলি ব্যাপারে শ্রীভ্রাত্তাচাৰ্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন এবং সেই কাজে তাকে মদত দিয়েছেন রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের বেশ কিছু ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মী। এখন সেই সব ছুর্নীতিপরায়ণ কর্মীদের ইশারাতেই অশোকবাবুকে চলতে হচ্ছে এবং সেনে সেনেই বহু ছুর্নীতিকে তিনি প্রাশ্রয় দিয়ে চলে-ছেন, কেননা তা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যেই অশোকবাবু বেশ কিছু ছুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন বলে জানা গেছে।

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীভ্রাত্ত বোষ নাকি ছিলেন খুব কড়া মানুষ। যে সব রিপেয়ারিং কাজের নামে ক্রীড়া দপ্তরের কতিপয় কর্মচারী নিজেদের লোক দিয়ে অথবা বেনামে কাজ করিয়ে পরশা লুটছিলেন তা বোষ মহাশয়ের আমলে বন্ধ হয়। স্বভা-বতই তাকে সরিয়ে দেবার জন্য চূড়ান্ত শুরু হয়। ফলে ভ্রাত্তবাবু যেচ্ছায় এই দপ্তর থেকে সরে যান। সম্ভাব্য ব্যাপার হল ভ্রাত্তবাবু এখন রাজ্য স্টারীর ডিরেক্টর তখনও তাকে সরিয়ে অশোকবাবু চার্জ নিয়েছিলেন এবং ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারির চার্জও ভ্রাত্তবাবুর কাছ থেকে অশোকবাবুই নেন। এর মধ্যে কোন রহস্য

উদ্বেগের স্রষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক মহলে এটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পিতা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরই মধ্যে এনিরে দিল্লীর বিভিন্ন মহলে প্রচণ্ড সোরগোল শুরু হয়ে যায়। মহারাষ্ট্রেও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষেরা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন।

আমাদের অবস্থার তখন ক্রমশঃ অবনতি ঘটতে থাকায় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু বামপন্থী এবং অত্যন্ত

গণতন্ত্রপ্রিয় এম পিদের চাপে পড়ে অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এত্যাপারে আসামে এবং পশ্চিমবঙ্গে সরেজমিনে তদন্তের জন্ত পাঠিয়ে-ছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী কোচবিহার বিমান ঘাটিতে অবতরণ করে আসাম থেকে বিতাড়িত ওখামকার বাকালীয়ে আশ্রয় শিবিরে গিয়েছিলেন। কোচ-বিহারের ঐ বাকালী আশ্রয় শিবিরে যাওয়ার পথে তিনি স্বামী হারা, পুত্র হারা এবং স্বজনহারা ক্ষুব্ধ বাকালী মহিলাদের হারা যেভাবে বাধা পেয়ে-ছিলেন আশা করি আলো তাঁর সেই

স্মৃতি মনে আছে। কালো পতাকা এবং কালো শাড়ী দিয়ে আমাদের বিতাড়িত ক্ষুব্ধ ওই বাকালী মহিলারা তাঁকে ওখানে অভ্যর্থনার নামে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন।

অবশেষে, কোচবিহারের জেলা শাসক পুলিশকে লাঠিচার্জের হুকুম দিয়ে ক্ষুব্ধ আশ্রয়প্রার্থী বাকালী মহিলাদের ছত্রস্তম্ব করে শ্রীমতী গান্ধীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়ে-ছিলেন।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীনেহরুর যৌথ চেয়ারম্যানিও তখন-কার মত আসামে অবস্থা আয়ত্তে এনেছিল, তথাপি শ্রীনেহরু তাঁর

মেয়ের প্রতি এই অশোভন আচরণ সহজে মেনে নিতে চান নি।

তিনি তৎকালীন বাকালী এম পি'দের কাছে বিশেষতঃ ডঃ রায়ের ভাইবি প্রাক্তন এম পি শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর কাছে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন শ্রীমতী গান্ধী কি অতী-তের অভিজ্ঞতা স্মৃতিচারণ করে আসাম ও মেঘালয়ের সমস্যা এবং অসমীয়াদের নিধনযজ্ঞ বন্ধের জন্ত কত এগিয়ে আসবেন?

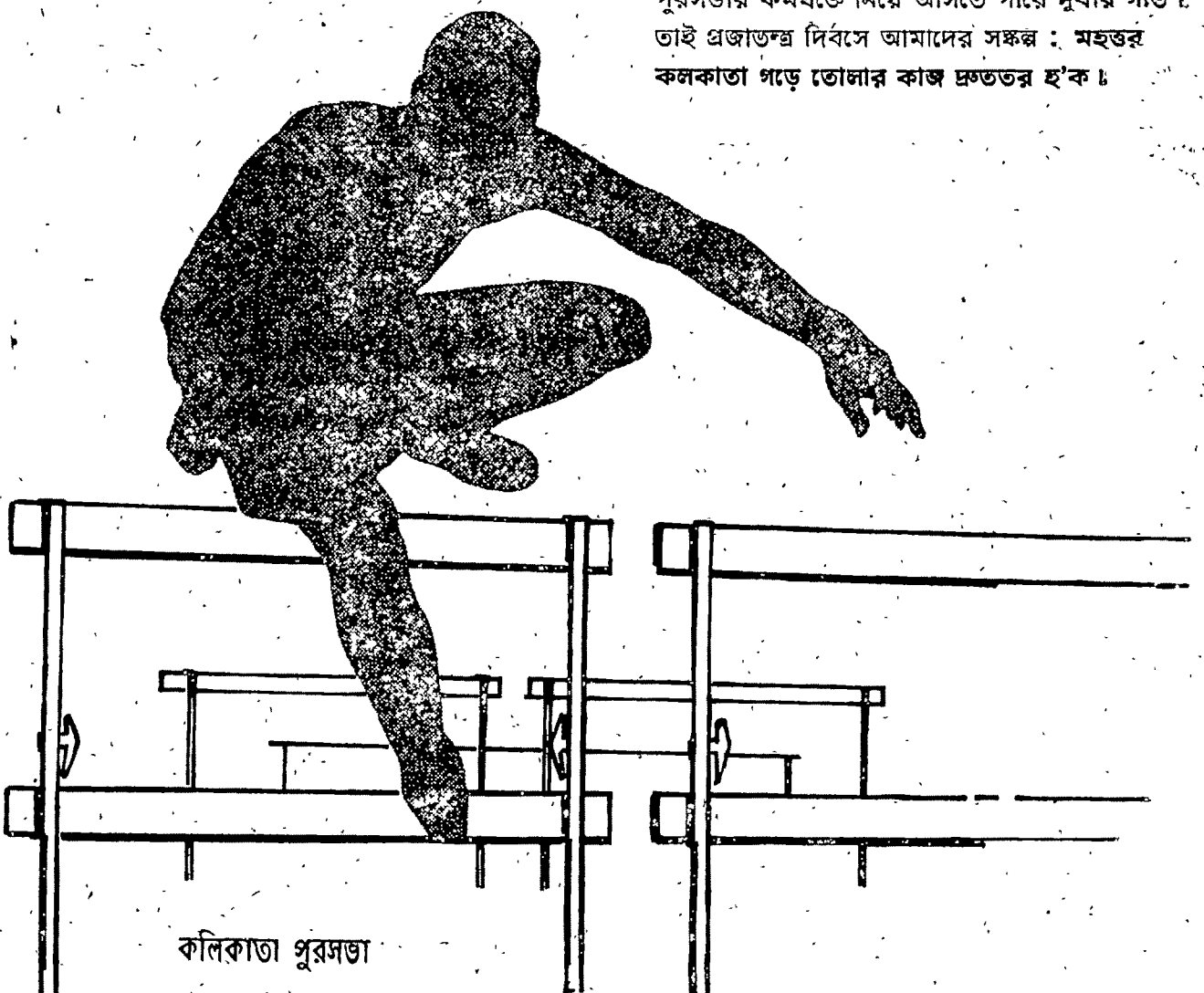
উল্লেখযোগ্য, ১৯৬০ সালে আসাম এবং বর্তমান মেঘালয় একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবিচলিত কর্মপ্রবণতা

আমরা দুস্তর বাধা

অতিক্রম করে চলেছি

হ্যা-ঠিক তাই। কলকাতাকে, মানে কলকাতার নগরজীবনকে, সব দিক থেকে আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা জানি এ কাজ সহজ নয়। একমাত্র আপনাদের সাবিক-সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ্যপূরণ সম্ভব করতে পারে। পুরসভার কর্মসূচী নিয়ে আসতে পারে দুর্বার গতি। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের সঙ্কল্প : মহত্তর কলকাতা গড়ে তোলার কাজ দ্রুততর হ'ক।



কলিকাতা পুরসভা

আসানসোল কেন্দ্রে: সি পি এম হারল কেন ?

দুগুণ লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্বত-কৃষি-শিল্প সমৃদ্ধ যে আসানসোল শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় ভারতের লংগ্রামী মানুষের কাছে, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে প্রতিভাত হয়েছে লংগ্রামের যুঁহু প্রতীকরূপে সেই আসানসোল আজ বাংলার লংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারীর কাছে বলস্ব, বাংলার লড়াই কৃষক শ্রমিকের কাছে বিশ্বাসঘাতক রূপে আখ্যায়িত। প্রাক-স্বাধীনতা কাল থেকে খেটে খাওয়া মানুষের লংগ্রামের মরদামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে যে-আসানসোল দুগুণ লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে সেই আসানসোলের শ্রমিক কর্মচারী, মধ্যবিত্ত মানুষ সসীলগুণ করেছেন তার অতীত পরিমাকে।

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে আসানসোলে বিজয়ী ইন্দিরা কংগ্রেস। পরাজিত মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার প্রার্থী বহু লংগ্রামের লাক্ষী, বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রীরবীন্দ্র সেন। কিন্তু কেন এমন হল? মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নিশ্চয়ই এই “বিশ্বকর” পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ করবে, কটি-বিচ্যুতির সূশোধনও করবে।

উৎখাত করে দেব

১ম পৃষ্ঠার পর

বলেছেন যে, পরবর্তী চার পাঁচ মাসের মধ্যেই এই রাজ্যের সি পি এম প্রভাবিত বামস্বপ্নট দরকারকে উৎখাত করে দেব। তার পরেই নির্বাচন হবে। সুতরাং সেইমত প্রস্তুত হতে হবে। কমল নাথের তত্ত্বাবধায় এই রাজ্যের যুব কংগ্রেসী (ই) কতিপয় নেতা সেইমত প্রস্তুতও হচ্ছেন বলে জানা গেছে। ভোলায় ভোলায় যুব কংগ্রেস (ই) কর্মীদের কাছে খবর পৌঁছে দেয়া হয়েছে যে, ভোমরা সংগঠন আরম্ভ করে দাও। প্রয়োজনে যারদাঙ্গা করতেও পিছপা হবে না। তারপর যা হবার আমরা দেখব।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক মহলে একদিন সঙ্ঘ গান্ধীকেই সকলে মুখকতু নামে অভিহিত করতেন। এখন থেকে সেই স্থান আরও একজন দখল করলেন তার নাম কমল নাথ। অনেকেই এখন বলতে শুরু করেছেন যে “একটা রামে রক্ষা নেই স্ত্রীকব দোশর।”

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে এ-পরাজয়েরও প্রয়োজন ছিল। আসানসোলের সংগঠনের প্রতি নতুন করে নতুন ধোঁয়ার প্রয়োজন যে রয়েছে এবারের নির্বাচনী ফলাফলে রয়েছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। সাংগঠনিক অবস্থার পরিচয় মিলেছিল ১১ এর এপ্রিল মাসে রাজ্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষে যেদিন এই আসানসোলে পদার্পণ করেছিলেন সি, আই, টি ইউ-র সভাপতি বি, টি, রণ-বিত্তের। প্রাকান্ত সমাবেশে রণবিত্তের বক্তব্য শুনেই হাজার হাজার লোকসভা নির্বাচনের মতনক মানুষ। অথচ শিল্পক্ষেত্রে সি আই টি ইউর আধিপত্য যে পর্যায়ে তাতে সর্বভারতীয় সভাপতির হাজার হাজার শ্রমিক সমাবেশই ছিল প্রত্যাশিত। সেদিন আসানসোলের অবস্থা সবাই দেখে-ছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নুসিং চক্রবর্তীও ছিলেন উপস্থিত। প্রকাশ, সে সময়ই নাকি সাংগঠনিক দুর্বলতা সম্পর্কে নেতৃত্বকে জানানো হয়েছিল কিন্তু ব্যবস্থা কিছুই নেওয়া হয়নি। তাই বিগত কয়েকমাসে সংগঠন শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আসানসোল বিশ্বকর পরাজয়।

পরিসংখ্যান

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সঙ্গে তথাকথিত সমঝোতা করে রবীন্দ্র সেন প্রায় ১ লক্ষ ৬২ হাজার ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন ৭২ হাজার ভোটে। ১৯৭১ এর নির্বাচনে তিনিই জিতেছিলেন প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে। এবার তিনি ভোট বেশী পেয়েছেন চার হাজারের মত কিন্তু অপর পক্ষে ভোট বেশী পড়েছে ৮০ হাজারের মত, ফলে রবীন্দ্রবাবুর পরাজয় ঘটেছে প্রায় ৭ হাজার ভোটে।

বিগত বিধানসভার পরিসংখ্যানের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় আসানসোল লোকসভা আসনের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার আসনের মধ্যে ছটিতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থীরা ও একটি আসনে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরা মোট ভোট পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কিছু বেশী। সেই দিক থেকে এবারের লোকসভা নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ভোট বেড়েছে ২৬

হাজার। বিগত বিধানসভার নির্বাচনে সাতটি আসনে কংগ্রেস ও জনতা প্রার্থীরা মোট ভোট পেয়ে-ছিলেন যথাক্রমে ৭০ হাজার ও ৫৪ হাজার। লোকসভার ভোটের ফলাফলে দেখা যায় ১ লক্ষ ২০ হাজার (বিধানসভার নির্বাচনের তুলনায়) ভোট যেমন বেশী পড়েছে, কংগ্রেস (ই) প্রার্থী বেশী পেয়েছেন তেমনি প্রায় ১ লক্ষ ভোটেরও অধিক। জনতা প্রার্থী পেয়েছেন বিধান সভার নির্বাচনের প্রায় অর্ধেক ভোট অর্থাৎ ২৭ হাজারের কাছাকাছি।

১৯৭৭-এর বিধানসভার নির্বাচনে যে রানীগঞ্জে জনতা কংগ্রেসের মিলিত ভোট ছিল ১১ হাজার ৫৭ ও মার্কসবাদী প্রার্থীর ভোট ছিল ২৪ হাজার ৫৭ এবার সেখানে ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী এ কাই পেয়েছেন ২০ হাজার। জনতা ২ হাজার এবং সি, পি, এম প্রার্থী ২১ হাজার ৮৭। হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল প্রকৃতই শোচনীয়। এই কেন্দ্রেই অন্তর্গত বারগুরের ইকো ও বারগুটাওড় কারখানা। বিধানসভার নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস জনতার মিলিত ভোট ও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ভোট ছিল যথাক্রমে ১৫ হাজার ৩৭ ও ২৪ হাজার। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ২৭ হাজার ৩৭, জনতা প্রার্থী প্রায় ৩ হাজার আর রবীন্দ্র-বাবুর প্রাপ্ত ভোট মাত্র ২১ হাজার ৫৭। সেদিক থেকে বিচার করলে সর্বাপেক্ষা সমালোচিত কেন্দ্র ঘাট-বনীর অবস্থা অনেক ভাল। কারণ বিধান সভার নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস-জনতার মিলিত ভোট ও সি পি এম ভোট ছিল যথাক্রমে ২২, ৫৩০ ও ২২, ৫১৪। আর্বাং সি, পি, এম কংগ্রেস-জনতার মিলিত ভোট অপেক্ষা ১৬টি ভোট কম পেয়েছিল। অপরদিকে এবার কং (ই) পেয়েছে প্রায় ২৪ হাজার, সি, পি, এম ২৭ হাজার ২৭। অবশ্য কং(ই) ও জনতা ও কংগ্রেস প্রার্থীর মিলিত ভোট প্রায় ৩০ হাজার। এছাড়া রবীন্দ্রবাবু আসানসোলে পরাজিত হয়েছেন ৭ হাজার ভোটে, কুলটিতে ১ হাজার ভোটে ও উখরায় ১ হাজার ভোটে। কিন্তু বিধানসভার নির্বাচনে আসান-সোল ও কুলটি ছাড়া সব কেন্দ্রেই (বারাবনীর ১৬ ভোট নিয়ে) বাম-

কণ্টের প্রার্থীরা জনতা-কংগ্রেসের মিলিত ভোট অপেক্ষা অধিক ভোটই পেয়েছিলেন।

সাংগঠনিক দৃষ্টি থেকে দেখা যাচ্ছে, আসানসোলের মানুষ কিন্তু বাম-কণ্টের রাজত্বকে ভেদন কিছু পেয়েছে বলে উপলব্ধি করতে পারেনি। কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিত। কিন্তু কাজ করতো না। বামস্বপ্ন প্রতিশ্রুতিও তেমনি কোন কাজও এখনও পূর্ণতা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। সব কিছুই এখনও পরিকল্পনার জেরেই রয়েছে। অপর দিকে এ অঞ্চলে পকারেভের কোন অভিজ্ঞ নেই। ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রাণের ঘোরারও বইতে পারেনি, তেমনি তারা কোন পরিবর্তনই অগ্রসর করেনি—সংগঠনের মধ্যে তাদের তেমনভাবে টেনে আনা যায় নি। তৃতীয়ত, কল্যাণ খাদ্যানের শ্রমিকরা এখনও অসংগঠিত। সি, আই, টি ইউর সদস্য লংগা বাড়লেও ভোটের বাজ্রে তার প্রতিকলন

রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভাপতি

১ম পৃষ্ঠার পর

লোক অজিত পাণ্ডাকে পরবর্তী সভাপতি করার জন্ত ঘোর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। স্বরত সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং সঙ্ঘ গান্ধীর সঙ্গে রাজ্যের সাংগঠনিক অবস্থা এবং পরবর্তী সভাপতির ব্যাপারে বেশ কয়েককটা আলোচনা করেছেন। জানা গেছে, স্বরত দলকে শক্তিশালী করে তোলার জন্ত অজিত পাণ্ডার নাম সভাপতি পদের জন্ত প্রস্তাব করেছেন।

স্বরত দিল্লীতে আলোচনার সময় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন। জানা গেছে শ্রীমতী গান্ধী এবং সঙ্ঘ গান্ধী স্বরতের প্রস্তাবের ওপর কোন মতামত দেন নি।

এদিকে আবদুল সাত্তার, সোয়েম মিত্র, হুসল ইসলাম প্রভৃতি নেতারাও দল বেঁধে গিয়েছিলেন দিল্লীতে। এদের দিল্লী যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি করার জন্ত তথ্য সংগ্রহ করা। এদের পক্ষ থেকে ছুটি নাম সভাপতি পদের জন্ত উঠেছে বলে জানা গেছে। একজন আবদুল সাত্তার এবং অজিত পাণ্ডা। গোপী বক্তব্য আবদুল সাত্তার অথবা কাজী আবদুল গফফরকে দলের সভাপতি করা হোক। কারণ এই

ঘটেনি—একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। আসানসোল শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে রয়েছে সাধারণ মানুষের বহু অভিযোগ। মানুষের সেই কোভও মূলধন করেছে কংগ্রেস (ই)। কিন্তু অপরদিকে বিগত তিরিশ বছরে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি যে কাজ করতে পারেনি, সেই কাজ করেছে বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটি। সে কাজের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়নি। অবশ্য চেষ্টাও হয়নি। একটা কমিউনিষ্ট পার্টি কি উদ্দেশ্য নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করে সেই লক্ষ্যই বোধহয় আসানসোল আজ বিশ্বত।

কিন্তু লংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী তারা কাজ করেন রেলের ইঞ্জিন কারখানায়, কাজ করেন কেবলস কারখানায়, ইকোতে বা ওয়াগান শিল্পে, লাইকেল কারখানায়, তারা কিতাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাঁদের শ্রেণীর প্রতি—এ প্রস্তাবের জবাব পাওয়া প্রকৃতই মুখিল।

ছই মেন্ডারই দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা আছে। এরাও শ্রীমতী গান্ধী এবং সঙ্ঘ গান্ধীর সঙ্গে ও কথা বলেছেন।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী অথবা সঙ্ঘ কেউই কোন মতামত করেন নি।

প্রফুল্লকান্তি ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন নেতা চান তোলা সেনকে বরকত নাথের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে। এ ব্যাপারে শত ঘোষ (প্রফুল্লকান্তি) সঙ্ঘ গান্ধী এবং কমল নাথের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে শতবাবুর দোতায় খুব সফল হয় নি।

বাংলা ছোটগল্প

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

স্বার্থে সাহিত্যকে কাজে লাগানোর চেষ্টাও তখন পর্যন্ত হয়নি, তাই এই-লব রীতির জিগির সৃষ্টিকারী দ্বালালের ছোটগল্প লেখকের চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না, বিশেষ করে এদের শক্তিমান বৃহৎ-বংশটি যখন আন্তরিক সভ্যতার তাগিদেই অনিবার্যভাবে বামপন্থী রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার শিবিরেই সম্মুখ-বেত। খোলাখুলি টাকাপয়সা দিয়ে কিনে নেবার প্রস্তাবে এঁদের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা দ্বালালের জানা ছিল না। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

ই-কংগ্রেসীদের দৌরাভ্যো লালকেল্লায় তরজাইর লড়াই বন্ধ

ইন্দিরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দৌরাভ্যোর কলে এবারকার প্রকাশ্যে দিবসে রাজধানীর লালকেল্লায় উদ্‌-তরজাইর লড়াই (মুশাহিরা) অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ছেদ টানতে হয় মাঝপথেই।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, প্রতিবারের মত এবারও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লির লালকেল্লায় মুশাহিরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু (২৪শে জানুয়ারী) ইন্দিরা কংগ্রেসী মন্ত্রণা বাহিনীর দাপটে অনুষ্ঠানের মাঝপথেই ছেদ টানা হয়। ঘটনাক্ষেত্রে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর রিপোর্ট মোতাবেক দিল্লির কোতোয়ালী থানা একটি সামলা রুজু করেছে। পুলিশী বিবরণ উদ্ধৃত করে রূপের মর্যাদা প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, গণগো-লের ক্ষতপাত হয় ২৪শে এপ্রিল রাত প্রায় দশটা নাগাদ। প্রোতাদের একাংশ হঠাৎ চীৎকার চোঁচামেচি শুরু করে দেয়। দিল্লি প্রশাসন এবং শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

ইন্দিরা সরকার দলভ্যাগ বিরোধী বিল আনছেন

শীঘ্রই ইন্দিরা সরকার দলভ্যাগ বিরোধী বিল সংসদে পেশ করবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া এক সংবাদে জানা গেছে। প্রথমে স্থির হয়েছিল যে, দলভ্যাগ বিরোধী বিলটিকে সংসদের চলতি অধিবেশনে পেশ করা হবে। কিন্তু ইন্দিরা সরকারের অনেকেই এই অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, রাজ্যে রাজ্যে বহু বিরোধী দলের নেতা আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। আরো অনেকেই দেখেন। ফলে অনেক রাজ্যেই অকংগ্রেসী (ই) সরকার আমাদের সরকার হয়ে যেতে শাশাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব সঙ্কয়েকে দেওয়া হচ্ছে

সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেসের সাংগঠ-নিক দায়িত্ব সঙ্কয় পাছীকে দেওয়া হতে পারে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

ইন্দিরা কংগ্রেস সৃষ্টি হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সঙ্কয় পাছী দলের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। অবশ্যই তিনি এসব করছিলেন মনোযোগ থেকে। কিন্তু লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর এখন তিনি মনোযোগ থেকে দল পরিচালনা করেন এ ইচ্ছা তার

কট্টর সমর্থকদের নেই। সঙ্কয় র কট্টর সমর্থকদের দাবি সঙ্কয় এবার সন্ধানের দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিন।

কিছু অত্যাশাহী সঙ্কয় সমর্থকের মতে সঙ্কয় পাছী এখনই মন্ত্রিসভায় চোকা উচিত ছিল। আবার কারও কারও মতে তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভায় চোকা সঙ্কয়ের উচিত নয়। বরঞ্চ কিছু দিন সংগঠনের দায়িত্বে থেকে দলকে "নিজের ভাবধারায়" সুসংহত করে নেওয়া উচিত।

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



ত্রয়বিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১ শুক্রবার, ১লা ফেব্রুয়ারী ৮০ ৬০ পরসো

বাবুজী সকাশে বহুগুণা



বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেল বহুগুণার ব্যক্তিগত দূত জনতা নেতা বাবু জগদীবন রায়, চন্দ্রশেখর ও মোতারজী দেশাইর দ্বারা দোরে দোরে বহুগুণার একান্ত গোপন চিঠি নিয়ে ছোট্টাছুট করছেন। বহুগুণা তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জনতা পার্টিকে যদি পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তিনি তাঁর সবশক্তি নিয়ে উদ্যোগের পাশে এসে দাঁড়াবেন। তবে গোপন পত্রে এ মতামতও রাখা হয়েছে যে, চরণ সিন্কে দলে নেওয়া হলেও কোন-ভাবেই নেতৃত্ব যেন তাঁর হাতে না যায়। কারণ জনতা দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ক্ষত চরণ সিন্কে তিনি সম্পূর্ণ দায়ী করেছেন। বহুগুণার এই পদক্ষেপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইন্দিরা শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ যাবার পাসপোর্ট পেতে ভারতীয়দের অসুবিধা

বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল

ময়াদিল্লীর মসনদে জনতা সরকারের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে গমনেচ্ছু ভারতীয়দের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে যাওয়ার পাসপোর্টের জন্য যে কোন আবেদনকারীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ নির্দেশের ধরন সম্পূর্ণরূপে পুলিশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের শত শত আবেদনকারী নানান্তরিত হুঁজোং ভোগ করছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দাবী করা হয়েছে যে, অবিলম্বে জনতা সরকারের আমলের ঐ নির্দেশ বাতিল করে বাংলাদেশ গমনেচ্ছু ভারতীয় নাগ-

রিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা যথাসম্ভব সহজ করা হোক।

সরকারী সূত্রে জানা গেছে, আগে প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাক্সিট্রিট বা সরকারের কোন ডেপুটি সেক্রেটারী সুপারিশ করলেই বাংলাদেশ

চীনা পত্র পত্রিকা জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে

চীনা পত্রপত্রিকার ভারতীয় গ্রাহ-করা কয়েকমাস ধাবৎ ওদেশ থেকে পাঠানো কোন কাগজ পত্রই পাচ্ছেন না। এদিকে কিছু তাঁরা তাঁদের বিদেশের বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, অত্যন্ত জরুরিগতভাবে কাগজ পত্র যাচ্ছে। দিল্লিতে চীনা কুটনৈতিক মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও খবর পাওয়া যায় যে, ওখান

গমনেচ্ছু ভারতীয় নাগরিকদের পাস-পোর্ট দেওয়া হতো। যদি কেউ তা দিতে অপারগ হতেন তবে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ঐ আবেদন পত্রটি তৎস্থের জন্ত যথারীতি রাজ-নৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের কাছে

থেকে পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি ঠিক ঠিক পাঠানো হচ্ছে।

পরে সংবাদে প্রকাশ, বন্দরের ছুটি বৃহৎ ট্রেন ইউনিয়নের পাওয়ার হুক্ত করে ঘন ঘন 'অয়েসে' যাতায়াত করছে এবং মেরিন আফসারদের সঙ্গে যোগ-দাঙ্কসে চীন থেকে প্রেরিত পত্রপত্রিকা বই ইত্যাদির বাণিজ্যগুলো সাগরের

পাঠানো হতো। এতে কেউ বিশেষ কোন ওজর ও আপত্তি উত্থাপন করেন নি। দীর্ঘ দিন ধরেই ঐ ব্যবস্থা ছিল এবং সেই অস্থায়ী পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছিল।

শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

জলে ফেলে দিচ্ছে। এটা প্রথম জানা-জানি হয় কাস্টমস অফিস সূত্রে। কারণ লিট অস্থায়ী হিসাব মেলাবার সময় হিসাবে গরমিল হচ্ছে। পরে ঘটনাটি জানা যায় জাহাজের কিছু কিছু প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ কর্মীর কাছ থেকে। তৎস্থে প্রকাশ, এটা চীন বিরোধী রাজনৈতিক চক্রান্ত।

সম্পাদকীয়

ইন্দিরার আবার সে-খেলা ?

লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার এবং বিরোধী দলগুলো আশঙ্করূপ শক্তি নিয়ে ফিরে আসতে না পারার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মনের আমন্দে তামাম হিন্দুস্থানের বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে পারবেন ভেবেছিলেন। সে বিশ্বাস থেকেই তিনি বিনা প্রতিবাদে অকংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকার বা বিধানসভাগুলো ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে কংগ্রেসী (ই) কাণ্ডা তুলে দেবার সর্বপ্রকার আয়োজনে লেগে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো তাঁর চালাকি ধরে ফেলেছে, 'স্বাধীন সরকার' ধোঁকা দিয়ে সরল জনগণকে বিভ্রান্ত করা গেলেও লোকসভায় ও রাজ্যসভায় বিরোধী নেতারা তার আরিফুরি ফাঁস করে দিচ্ছেন। রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই সি পি আই'র ভূপেশ গুপ্ত, জনতা-র লালকৃষ্ণ আদিবানি এবং কংগ্রেসের (আর্গ) এ জি কুলকার্নি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা করে জবর আঘাত হেনেছেন।

বিরোধী পক্ষ এ পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার-রচিত যে ভাষণ রাষ্ট্রপতি সর্দার বেল্লিওয়ালা সংসদের যৌথ অধিবেশনে পাঠ করেছেন তাতে তুল তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে পূর্ববর্তী জনতা ও লোকদল সরকারের বিরুদ্ধে বিবোদ্যার করা হয়েছে। ভাষণটি একেবারে সামুদ্রিক, গভীরগতিক, নতুন কোম কথা বলা হয়নি, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সেই বিশ দফা কর্মসূচির পুরনো কাহিনীই; অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ বা বেকার সমস্যার সমাধান নতুন কিছু বলা হয়নি। বোধহয় ইন্দিরা সরকারের সে ধরনের কোন কর্মসূচি নেই কিংবা তার সময়ও এখন তাঁদের নেই। দ্বিতীয়তঃ এখন সরকার ব্যস্ত রাজ্য রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার, বিধানসভা ভাঙার বা দলত্যাগ ঘটানোর কাজে। প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসাবে বিশেষ বিমানে রাজ্য রাজ্যে উড়ে গিয়ে সংবিধান-বহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষত্রিকার এবার অবতীর্ণ হয়েছেন জরুরী অবস্থাকালীন অত্যন্ত নায়ক বশপাল কাপুর। রাজ্যসভায় দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের আগেই শ্রীমতী গান্ধী ছলে-বলে-কৌশলে অকংগ্রেসী রাজ্যগুলোকে কড়া করতে চান। রাজ্যসভাতেই অভি-

যোগ উঠেছে যে মহারাষ্ট্রের শাসন পাওয়ার সরকারকে পছন্দ্য করার জন্য কংগ্রেস ই দশ কোটি টাকার ভাণ্ডার খুলে বসেছে। অথচ মুখে শ্রীমতী গান্ধী বিরোধীদের সঙ্গে সহযোগিতার কথাই বলেছেন। কেন্দ্রীয় জনতা সরকার যখন মটি অ-জনতা রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন ইন্দিরা, গান্ধী তখন তার তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। আজ তিনি সেই পুরনো পথই ধরেছেন, উল্টোপাল্টা অজুহাত পাড়ছেন কখনো সরকার ভাঙা সম্পর্কে স্বগ্রামী কোর্টের রায়, কখনো হরিজনদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে। দু'দিকের তৌ ছেলের অভাব হয় না। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে দুই কংগ্রেস ই-সদস্য এ আর আন্তলে ও কল্লনাথ রাই তো উদ্ভূত কণ্ঠেই বলে ফেলেছেন যে, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাবে বিধানসভার নতুন নির্বাচন তাঁরা করাবেনই। স্বভাবতই শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের (ই) এ কাজকে বিরোধী নেতারা সংবিধান বিরোধী এবং 'গণতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষনক' আখ্যা দিয়েছেন।

লোকসভায় লোকদল নেতা চরণ সিং, সি পি আই এম নেতা দময় মুখার্জী, সি পি আই নেতা ইন্দিরাজিৎ গুপ্ত একে একে ইন্দিরা গান্ধীকে সংঘত হবার জন্য দরকর করে দিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে দলত্যাগে মত্ত হলে কেন্দ্রেও সে রোগ সংক্রামিত হবে এবং তিনি নিজের জালে নিজেই অড়িয়ে পড়বেন বলে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। অ-কংগ্রেসী (ই) শাসিত ন'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও এই মর্মে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে সরকার ভাঙার খেলা থেকে যদি তারা এখনই বিরত না হন, তবে রাজ্য-রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে, প্রশাসনের মনোবল ভেঙে যাবে এবং রাজ্যগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থায়ী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন জাগ্রত হবে। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা গোটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। সংবিধান ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কাঠামোকে ভেঙে তখন চ না করে, সমস্ত ক্ষমতা নিজের বা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে না নিয়ে, ডিক্টেটর না হয়ে কি শ্রীমতী গান্ধী গণতান্ত্রিক শাসন চালাতে আসেন না? তাঁর এই গণতন্ত্র বিধ্বংসী পদক্ষেপের পরিণাম ১৯৭৭ সালে কী হয়েছিল তিনি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে সঙ্গের প্রাক্ত রাজনীতি করার ব্যাপারে এখন আর দলের কারও কোন আপত্তি নেই। অবশ্য আপত্তি করার মুক্তিও তাদের হাতের কাছে নেই। শ্রীমতী গান্ধীরও ইচ্ছা সঙ্গের ধীরে ধীরে দলের হাল ধরুক।

আগামী মার্চ-এপ্রিল নাগাও এ আই সি সি (ই)-র পুনর্গঠন হতে পারে। সেই সময় সঙ্গকে দলের কোন পরামিত্রকারী করা হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ সঙ্গকে দলের সাধারণ সম্পাদক করা না হলেও এ আই সি সি-র অন্ততম সম্পাদক করা হবে।

এ ব্যাপারে দলের প্রধান নেতা-দের মতামত বাচাই করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী অথবা সঙ্গ কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলছেন না। যা কিছু আলোচনা চালাচ্ছেন তা এ আর আন্তলে এবং কল্লনাথ রাইয়ের মত কট্টর সঙ্গের সমর্থক গোষ্ঠীর কর্তব্যাক্রিয়া।

তবে সঙ্গ যে পদেই থাকুন না কেন রাজনৈতিক ক্ষমতা যে তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ দিল্লীতে রাজনীতির খবরাখবর রাখেন এমন লোক লবাই জানেন যে, সঙ্গের বর্তমানে কিছু না হয়েই কি প্রচণ্ড ক্ষমতার অবিকারী। বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলের যে সমস্ত নেতা দিল্লীতে দরবার করতে আসছেন ছোট বড়

নির্বিশেষে তাদের প্রত্যেকেই একবার করে সঙ্গের গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে তার মতামত নিচ্ছেন তাদের লম্বা সমাধানের ব্যাপারে। আবার কোম কোম নেতা তো শুধু সঙ্গের গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতেই দিল্লীতে আসছেন।

ভাবসাব দেখে বা মনে হচ্ছে, সঙ্গ এখন মন্ত্রী হওয়ার থেকে সংগঠনের কাজেই অড়িয়ে থাকতে আগ্রহী। কারণ সঙ্গ মনে করছেন যে, পেছনে স্বল্প সংগঠন না থাকলে তার মন্ত্রী হয়েও খুব হয়তো লাভ হবে না।

রাজনৈতিক মহল অপেক্ষা করছেন কিস্তি সঙ্গকে প্রাক্ত রাজনীতিতে নামানো হয় তা দেখার জন্য। আগামী ৩০৪ মাসের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

রাজ্য জনতা পার্টিতে ভাঙন আসন্ন

রাজ্য জনতা পার্টিতে ভাঙন একরকম প্রায় অবশ্যজাবী। প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে জনতা পার্টিভুক্ত সংগঠন কংগ্রেসীরা খুব শীঘ্রই হয়ত জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করবেন। সেই আভাস পাঠ হয়ে উঠেছে জনতা পার্টির কর্মী সম্মেলনে গত ২৭শে জানুয়ারী। তথ্যাত্মক মহলের ধারণা যে, জনতা পার্টিভুক্ত সংগঠন কংগ্রেসীরা নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করার পর ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন।

জনতা পার্টির কর্মী সম্মেলন ডাকা হয়েছিল নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এই রাজ্যে কেন একটি আসনেও জনতা পার্টির প্রার্থীরা পেলেননা তা আলোচনার জন্য। কিন্তু মহার বিষয় হল কর্মী সম্মেলনটি একদমর প্রায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংগঠন কংগ্রেসপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আর এস এস এবং জনসংজ্ঞার প্রতি আক্রমণাত্মক ভাষার বক্তব্য রাখেন। তখন আর এস এস এবং জনসংজ্ঞা গোষ্ঠীর কেউ কোন আপত্তি করেননি। যখন জনসংজ্ঞা গোষ্ঠীর পক্ষে বিধানসভা সদস্য বিজু কান্ত

শাস্ত্রী বক্তব্য বলতে ওঠেন তখন সংগঠন কংগ্রেসীরা চীৎকার শুরু করেন। তারপরই শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ নেতা সম্মেলনময়ল থেকে চলে যান।

সংগঠন কংগ্রেসীদের আলাদা অস্তিত্ব ঘোষণা করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজ্য জনতা পার্টির বিভীত চেয়ারম্যান প্রফুল্ল সেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন জনতা পার্টি গঠনে আমরা বরাবরই আপত্তি করে-ছিলাম কিন্তু আমাদের আপত্তি টেকেনি। আমরা এখনও জনতা পার্টিতে থাকতে চাইনা। আমরা প্রস্তাব জনতা পার্টি ভেঙে দিয়ে জনতা ফ্রন্ট গঠন করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। আমরা অর্থাৎ জনতা ফ্রন্ট নির্বাচন জড়ব নিজেদের মধ্যে আসন ভিত্তিক সমঝোতার মাধ্যমে, জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে নয়।

জনতা কর্মী সম্মেলনে জনৈক বক্তা ১৮ই জানুয়ারীর 'দপণ' তুলে দেখান এবং বলেন যে, এই দেখুন এই পত্রিকার লীড নিউজে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনের আগে গোপন বোকাপড়ার মাধ্যমে ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী হতে আর এস এস সাহায্য করেছে।

ই-কংগ্রেসীদের দৌরাভা

১ম পৃষ্ঠার পর

দিল্লির চীফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলার শ্রীকে এস সাহানির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানো হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই অহুষ্ঠানের উজ্জ্বল দিল্লি প্রশাসন।

জানা গেছে যে, সাহিত্য কলা পরিষদের নামাঙ্কিত একটি হিন্দী ব্যানার ফেস্টুনকে কেন্দ্র করেই নাকি গুণগোল আরম্ভ হয়। এই হিন্দী ফেস্টুনটি নাকি মুশাহিরা অহুষ্ঠানের উদ্-ব্যানারকে প্রায় চেকে দিয়েছিল। প্রোতাদের একাংশ এই ঘটনার উদ্বেজিত হয়ে ওঠেন এবং বলতে থাকেন যে, উদ্-ব্যানারটিকে চেকে দিয়ে উদ্-ভাষার অর্থবাদ করা হয়েছে। গুণগোল বাড়তে থাকার উজ্জ্বল দিল্লি অহুষ্ঠান মারপথে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

গুণগোল এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যা প্রায় দাঁড়া দাঁড়ায় আকার ধারণ করে। দিল্লি প্রশাসনের চীফ একজিকিউটিভ কাউন্সিলার শ্রীকে এন সাহানি এবং দিল্লি মেট্রো-পলিটান কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান বেগম খুরশিদা কিদো-

রাইয়ের গাড়ি ঘিরে ধরে এবং ইট পাটকেল ছোড়ে। এই ঘটনার বেশ কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে সাংবাদিকদের কাছে বেগম কিদোরাই অভিযোগ করে বলেন যে, গুণগোল বারা করেছেন তারা ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক এবং এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। তিনি বলেন যে, দিল্লী প্রশাসন অহুষ্ঠানের উজ্জ্বল এবং বৈধানে বিশেষ ব্যক্তির অপমানিত হন সেখানে পুলিশ ছবির মত চূপ করে দাঁড়িয়ে গুণগোল দেখেছে—এটা বিশ্বাসজনক। গুণগোল থামতে পুলিশ কোন ব্যবস্থাই নেয় নি বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

বেগম কিদোরাই এক পক্ষে কেন্দ্রীয় বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিংকে অহু-রোধ করেছেন যে, এই ঘটনার দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক এবং পুলিশী অপমার্যতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। তিনি বলেছেন এটা খুবই উদ্বেগজনক। কেননা সরকারী অহুষ্ঠানেই যদি এই ভাবে গুণগোল হয় তখন অস্ত্র সব অহুষ্ঠানে গুণগোল হলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

রাজনীতি

আসাম ও মেঘালয়ে নতুন খেলা

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হবার পর অনেকেই আশা করেছিলেন যে আড়াই বছরের রাজনৈতিক নির্বাসন তার পরিবর্তন ঘটাবে। তিনি নিজেও এমন আশা হওয়ার মত কথাবার্তা বলছিলেন। যেমন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতি-নিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন তিনি দেশে কোন দিন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবেন না কারণ ঐ-ধরনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই প্রসব করে। তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন যে ভিন্ন মতাবলম্বী রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে তার সরকার সঠিক আচরণ করবেন, জবরদস্তি করে সেগুলি ভেঙ্গে দিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যে। একদলীয় সরকার পঠনের চেষ্টাও তিনি করবেন না।

সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘোষণা দেশের জন্মে ময়, বিদেশী স্বাবাদিকের মারফত অল্প দেশের মানুষদের কাছে তিনি তার মানসিক পরিবর্তনের কথা জানাতে চেয়েছেন। অথচ কোন ভারতীয় সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি সাক্ষাত পর্বত করতে চাইছেন না। এমন কি তার শপথ গ্রহণের সময় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

মনে হয় তিনি বিদেশের মানুষের কাছে যা বলতে চান, দেশের মানুষের কাছে তা বলতে চান না। এর কারণ কি?

একটু ভাবিয়ে দেখলে বোঝা যায় শ্রীমতী গান্ধী অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তিনি ইতিমধ্যেই এমন ভাবে কাজ করা শুরু করেছেন যার ফলে মনে হতে পারে দেশের লোককে তার রাজনৈতিক নির্বাসনের জন্মে সাক্ষা দিতে চান। জরুরী অবস্থার সময় তিনি যে ভাবে চলছিলেন, যে ভাবে তার পুত্রের সংবিধান বহিষ্কৃত করে দেশের প্রতিটি ব্যাপারে কলক্যাঠি, নাড়ছিল এবং জনমনে ব্যাপক বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল সেই ধারাই আবার প্রবর্তন করা হচ্ছে।

সত্যকথা জরুরী অবস্থার সময় তারা অধ্যাত্তি লাভ করেছিলেন, তাদের কাউকে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয়নি। কিন্তু ওয়াকি-বহাল ব্যক্তিত্বই দেখতে পাচ্ছেন যে নতুন মন্ত্রিসভায় তাদের নেওয়া হয়েছে তাদের ভাবভঙ্গী, চলাফেরা এমন কি বাচনভঙ্গী পর্বত সঙ্গর গান্ধী

নিয়ন্ত্রণ করেন। শোন যার নতুন খরাষ্ট্রমন্ত্রী জেল সিং সঙ্গর গান্ধীর কথা ছাড়া এক পাও চলেন না। এমন কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তার অসাধারণ অপত্যস্নেহে সঙ্গর গান্ধীর পরামর্শ না মেনেই বছর বিপদ থেকে উদ্ধারও পেরেছেন। সুতরাং পুত্রের প্রতি তার আস্থা একটু বেশী থাকারই কথা।

কিন্তু দেশবাসীর ক্ষতিসা হবার কারণ আছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আবার এমন সব পরামর্শ-দাতার কথায় চলছেন যাদের দেশ-বাসীর কাছে সুনাম নেই। সম্প্রতি আসাম ও মেঘালয়ে যে সকল ঘটনা ঘটেছে দেশবাসী মাজেই তা অবগত আছেন। নলবাড়ী মজল দে, জুলিয়ায়ান, নাহারকাটিয়া, শিলং, উড়িষ্যাতে বা ঘটেছে তাকে কেবল পাশবিক আখ্যা দিলেই সবটা বলা যায় না। একজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানী ডঃ রবি মিত্রকে মিথ্যা টেলিফোন করে এনে যে ভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে সাধারণ মানুষ তাতে বিচলিত না হয়ে পারেন না। হাজার হাজার অনসমীয়া ও অধাসিয়া ভারতবাসী এই অজলী রাজস্ব বিপন্ন।

তারের জানমাল, মান সম্মানের নিরাপত্তা নেই। দেশের সীমানার মধ্যে দেশের মানুষকে জানোয়ারের মত তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘর বাড়ি জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তসার্ত, নিরীহ শিশু বৃদ্ধা নর নারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। পুলিশ ও রাষ্ট্রপতির প্রশালন নির্বিকার। আশুন জলছে, রক্ত ঝরছে, নিরুপায় মানুষ দলে দলে ঘর বাড়ি ছেড়ে পরপার্শ্বী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন তো জনতা বা লোক-হলের ত্বল কেন্দ্রীয় সরকার নেই, জবরদস্তি কংগ্রেস (ই) নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। তবু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন? কোন অদৃষ্ট হাতের ইসারায় জবরদস্তি রাজ্যপাল জালম প্রসাদ সিং সাম-রিক বাহিনীর স্ফাগ মার্চ বন্ধ করে তাদের ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন? হাকামাকারীরা দাবী করেছিল বলে? তাহলে এই হাকামাকারী কারা? যাদের কথায় রাজ্যপালের আদেশ টলে? যে রাজ্যপাল ইন্দিরা গান্ধীর বশবৎ এবং ইন্দিরা সরকারের বেতনভূক তিনি কেন শাস্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

করতে অপারগ? নির্বাচনের সময় ইন্দিরা গান্ধী দেশে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আসাম ও মেঘালয়ে কি সেই আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কিসের জন্মে ইতঃস্ততঃ, কিসের জন্মে হাকামাকারীদের এত তোরাজ? তারা কি তবে সত্যই ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক? তাদের সঙ্গে আর এস এস ফ্যান্ডিসের হাত মিলিয়েছে?

একদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই নেতা যশপাল কাপুর ও শঙ্কর-দয়াল শর্মা, অপরদিকে আর এস এস-জনসংঘী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মা একই স্বরে কথা বলছেন দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অন্ততঃ আসাম ও মেঘালয়ে এই দুটি দল হাত মিলিয়ে চলেছে। যশপাল কাপুর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কেবল নির্বাচনী এজেন্টই নন, তার ঘনিষ্ঠ

অর্থনীতি

স্বর্ণযুগয়ার পরিণতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

সোনার দাম নিয়ে বিশ্বজোড়া রপ্তানুল পড়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে এক আউল সোনার বাজার দর ছিল ৩৬ ডলার। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যে এই দাম ৮৭০ ডলার অবধি উঠলো।

কারা এই সোনা কিনছে? কেন কিনছে? এর পরিণাম কি?

প্রথমতঃ এই সোনা কিনছে আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও জি। তারা কোন মজেলের পক্ষে সোনা কিনছে, না নিজেদের মুনাফার খাতিরে সোনা কিনছে তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু লণ্ডন, জুপিং, হংকং এবং নিউইয়র্কের সোনার বাজারে ব্যাংকগুলিই প্রধান ক্রেতা। হয়তো কোন কোন দেশের সরকারও ব্যাংকের মারফতে সোনা কিনছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে তা জমা হতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ বিভিন্ন দেশের মজুত তহবিলে সোনার অংশ কম নয়।

সোনা কেনার উদ্দেশ্য নানা রকম। সোনার মূল্যমূল্য এখনো খুব বেশী। গ্রেসামের বিধি অনুসারে "খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে।" কাগজী

পরামর্শদাতাও বটেন। আর শঙ্কর-দয়াল শর্মা ইন্দিরা গান্ধীর কপার একবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে খুশিতে ভগমগ হয়ে বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর কত দয়া, আমার মত ব্যক্তিকেও তিনি কংগ্রেস সভাপতি ও মন্ত্রী করেছেন, অথচ তার বাগানের মালী হবারও যোগ্যতা আমার নেই। এহেন দুই ব্যক্তি আসাম-দফর করে এসে বলেছেন আসামের হাকামাকারীরা নাকি খুব নম্র ও শান্ত প্রকৃতির, তাদের বক্তব্যে ধারালো যুক্তি আছে এবং তাদের আন্দোলনও খুব শান্তিপূর্ণ। যখন এই ভ্রমহোদয়েরা স্বমহম বিমানবন্দরে হাকামাকারীদের সা টি-ফি কে ট দিছিলেন তখন জুলিয়ায়ানে আশুন জলছে, ডঃ রবি মিত্রকে পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে দশহাজার নরনারী শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যে ঐ এক-দিনেই পনেরো জন নিহত, শত শত আহত হলেন।

এর পর জনসংঘী-জনতা নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী আর প্রাক্তন-মন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মাও সাটিকিকেট দিলেন হাকামাকারীরা শান্ত ও অহিংস। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী

নয়। তারা সন্ত কারবেই আন্দো-লন করছে। কংগ্রেস (ই) এবং আর এস এস-জনসংঘের এমন নিবিড় একাত্মতা অতীতে এমন ঘনিষ্ঠ হতে আর কোনদিন দেখা যায় নি। সুতরাং যে অভিযোগ উঠেছে যে আসাম ও মেঘালয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস ও আর এস এস এর যৌথ উন্মোচনই বর্তমান হাকামা শুরু হয়েছে এবং এই দুই অন্তত শক্তির যোগ মাজসেই অনসমীয়া ও অধাসিয়া-ভারতীয়েরা নিগৃহীত, আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছেন, এই অভিযোগ কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

কংগ্রেস (ই) এবং আর এস এস নেতৃবৃন্দই যে আসাম ও মেঘালয়ের মর্মজ্ব ঘটনার জন্মে দায়ী তার আর কোন প্রমাণের দরকার আছে কি? গৃহদাহ, খুন, বিতাড়ন নাকি শাস্তি-পূর্ণ আন্দোলন। এবিষয়ে দুই অন্তত শক্তিই একমত। সম্ভাবতঃই আলিগড়, জামশেদপুর হারদরাবাদের হত্যাকাণ্ডীরা শিলং নলবাড়ী জুলিয়া-জানের হত্যাকাণ্ডীদের সাক্ষাত বলেই মনে করে। তাই তাদের কণ্ঠস্বর অভিন্ন। এই বৈরত্বই ও সাম্প্রদায়িক অন্তত শক্তিগুলি এখনো শেখাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

টাকা, রপোর টাকা আর স্বর্ণমুদ্রা বাজারে সমান ভাবে প্রচলন করা যায় না। সব চাইতে 'খারাপ টাকা' অর্থাৎ কাগজী টাকা অপেক্ষাকৃত ভালো স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে বাজার থেকে গোপন মজুতে রূপান্তরিত করে। গ্রেসাম বিধি এটাই বলে।

মনে পড়ে ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস সম্মেলনের কথা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র পুনর্গঠনের প্রয়োজন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের প্রয়োজন সবচাইতে বেশী। তেজী মন্ডার বিশ্বশৃঙ্খলা, মুদ্রা ও সোনার বাজারে বিশ্বশৃঙ্খলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশ্বশৃঙ্খলা। তখন আমেরিকাই একমাত্র দেশ যুদ্ধ যার গায়ে আঁচড়টি দিতে পারে নি অথচ যুদ্ধ সামগ্রী বিক্রী করে মুদ্রার দেশ-গুলির বিপুল ধনভাণ্ডার যার করতল-গত। আমেরিকার প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতা, ইউরোপের প্রয়োজনেরও সীমা নেই। তবু দেনা পাওয়ার মাধ্যম স্থির করা কঠিন। দীর্ঘ-কালের জন্মে বটেনের পাউণ্ড টালিং আন্তর্জাতিক দেনাপাওয়ার হিসাব মেটাতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে বটেন সর্ব্বথুইয়েছে। তার মূল্যের ক্রম কমতাকমেছে। চাহিদাও কমেছে। তাই ব্রেটন উডসে ঠিক হল এখন থেকে মার্কিন ডলারও বৃটিশ পাউণ্ডের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ মুদ্রার সর্বাধা পাবে। আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিল তার ডলার মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে যে কোন সময় সোনা দিতে সে বাধ্য থাকবে। ইউরোপের কোন দেশের এত সোনা নেই, তারা তাদের মুদ্রা ভাঙ্গিয়ে সোনা দেবার অঙ্গীকার করতে পারে না। সুতরাং ইউরোপীয় দেশগুলি প্রতিশ্রুতি দিল তারা তাদের দেশের মুদ্রার বদলে সর্ব্বথু মার্কিন ডলার দিতে বাধ্য থাকবে।

অর্থাৎ সোনা হল আর্থিক আস্থার মেরুদণ্ড। আমেরিকা সর্ব্বথু তার ডলার বদলে সোনা দেবে, ইউরো-পের দেশগুলি পাউণ্ড ফ্রাঁ, মার্ক বদলে ডলার দেবে, এই বৈত কাঠামোর উপরে নয়া আর্থিক ব্যবস্থার বনিয়াদ স্থাপিত হল। দারা বিশ্বের বাণিজ্য এলাকাকে হার্ড কারেন্সী (ডলার) ও 'সফট কারেন্সী' (পাউণ্ড প্রভৃতি ইউ-রোপীয় মুদ্রা) এলাকায় ভাগ করে দেওয়া হল।

শেখাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

অসমীয় সাহিত্যিকদের প্রতি

মিহির আচার্য

আমাদের বিদেশী বিভাজনের নামে সুপ্রসিদ্ধিতভাবে যে ভাবে “বাঙালী” নিধন শুরু হয়েছে তাতে যে কোনো উত্তরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিচলিত না হয়ে পারেন না। অথচ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে বেহুনাশায়কভাবে নিশ্চুপ। কথাটা যেন সত্যিই হয়ে উঠেছে যে, রাজনীতির অর্ধ-ছলেবলে কোশলে পড়ি ধূল, মানবতাবোধ বলে সেখানে কিছু নেই। বিষয়টা আরো উদ্বেগজনক যখন সাময়িক প্রেসিডেন্ট-শাসন সেখানে প্রচলিত হয়েছে এবং মিলিটারিকে পর্বস্ত প্রভুত রাণা হয়েছে, কেন্দ্রীয় পর্ববেক্ষকও ঘুরে গেলেন, তা সত্ত্বেও বাঙালী হত্যা নিত্যই থটে চলেছে।

সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে আমাদের সাহিত্যিকদের যে কোনো মোংরা রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এ দেশের মতো আসামেও উত্তরবুদ্ধি সম্পন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মী আছেন তাঁদের কাছেই আমাদের আবেদন, এ ব্যাপারে আপনাদের এগিয়ে আসুন। রাজনৈতিক কূচকের জাল ছেঁদন করে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করুন। কারণ দীর্ঘকাল মানুষকে রাজনৈতিক দাবা-খেলায় খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে, শোষিত নিপীড়িত মানুষের চেহারা যেমন পশ্চিম বাঙালার তেমনি আসামেও। এই ধরনের বিশেষ খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রাম-ও সৌহার্দ্যকেই নষ্ট করে। অর্থনৈতিক চরম দুঃস্থতার কারোমীথার্থ এইভাবেই প্রাদেশিকতার বিষবাপো জীবন-ধারণের পবিত্রতম সংগ্রাম থেকে-মানুষের মনকে সরিয়ে দিতে চায়।

দমদম ষ্টেশন নরককুণ্ড

দমদম ষ্টেশনটি উত্তর শহরতলীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন। দৈনিক হাজার হাজার যাত্রী এই ষ্টেশনটিকে ব্যবহার করেন। আশ্চর্যের কথা হল এই যে, ষ্টেশনটি কার্ভত পরিণত হয়েছে এক নরককুণ্ড। কয়েকটি প্লটিকর্মে ভবঘুরেরা তাদের প্রায় হারী আত্মনা পড়ে তুলেছে। নানারকম অবৈধ কাজও চলছে ষ্টেশন চত্বরের মধ্যেই। রাত হবার সঙ্গে ষ্টেশনটির রূপই যায় বদলে। প্রকান্তে মদ বিক্রী এবং মাতালদের দৌরাঙ্ক্য মহিলা যাত্রীদের পক্ষে দমদম ষ্টেশন ব্যবহার করা এক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক বুদ্ধিবেধানে বিভাজন সেখানে ‘জাতির বিবেক’ সাহিত্যিক-দের, সর্বজনীন কল্যাণের জন্তে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। বহু রাজনীতি বরাবরই দেশের স্ব স্ব জীবনকে আঘাত হানেন। সাধারণ মানুষ প্রায়শই অসহায়বোধ করেন। মানব মনের কর্মী লেখকেরা, মানুষই তাঁদের প্রধান উপভোজ্য বলেই, মানবতার এই অপমৃত্যুকে বরদা্ত করবেন না। প্রাদেশিকতা একটা অস্বস্থতা, একটা বিকার, হুতরাং অস্বস্থতা কখনোই স্ব স্ব জীবনের নিয়ামক নয়। দেশে স্ব স্ব লোকই সংখ্যায় বেশি। সংসারটা অস্বস্থ রূপীতে ছেয়ে যেত। এই বিকারের অবস্থা বেশিদিন জিইয়ে রাখা যায় না, এ সত্য উদ্বোধনকারীও জানেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মাজাধিক কতি হয়ে গেছে এবং এ-কতিতে উদ্বোধনকারী ছাড়া, গোটা সমাজজীবনই চরম কতিগ্রস্ত হবে।

এ কথা বোঝার দরকার আছে যে, রাজনৈতিক ধুরন্ধররা যতই বোকা-বার চেষ্টা করুন আসামের অর্থনীতি পিছিয়ে পড়ার কারণ হতভাগ্য কয়েকজন চাকরিরত বঙ্গসন্তান এবং তাঁদের বেছে বেছে নিধন করলেই তাঁরা অর্থনৈতিক সজ্জিত হয়ে পাবেন, তাহলে ভুল করছেন। এককালে বাঙালী ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে যেখানে যেখানে ইংরেজ গেছে তারই পায়ে বাঙালীরা চাকরির সন্ধানে সেখানে গেছে। এইভাবেই আসামে, উড়িষ্যার চাকরিস্থানে অনেক বাঙালী

সেখানে আছেন, কেউ কেউ হারী বাসিন্দা। কিন্তু সেই সব জায়গার থেকে তাঁরা যে বাঙালীর “নিজস্ব কোনো স্বার্থ” দেখেছেন, এমন নজির নেই। বাঙালীর অনেক দুর্নীত থাকতে পারে, কিন্তু প্রাদেশিকতার শিকার বাঙালী হয়নি। আমাদের কলকাতা এই হিসেবে পীঠস্থান, হরিহরছত্রের মেলা। কলে কার-খানায় আপিসে-আদালতে অবাঙালীরাও মিলেমিশে সংপ্রতিদেপীর মতো বাস করছেন। আমরা বাঙালীরা কোনো কালেই আমাদের আচার-অর্চন-বিশ্বাস দিয়ে তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করি না। এমনকি রাঙলা আমাদের সরকারি ভাষা হলেও, তা গ্রহণে অবাঙালীদের আমরা বাধ্য করি না।

অসমিয়া, ওড়িয়া, বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতি এমনকি ভাষা ও আঙ্গুর বন্ধনে সংযুক্ত। স্বধে স্বধে এই প্রদেশগুলি অভিন্ন। অসমিয়া

ওড়িয়া সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগসূত্র বরীক্ষমাথ তে বটেই বোধকরি চৈতন্যদেব পর্বস্ত প্রতিষ্ঠা। এটি সাংস্কৃতিক বন্ধন, কোনো বর্বরতার ধাবার একে পংক্ত করবার চেষ্টা অমৈতিহাসিক হবে। সেই কারণেই অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীদের কাছে আবেদন, আপনাদের এসময়ে চুপ করে থেকে প্রতিজ্ঞার হাত শক্ত করবেন না, বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হোন। তা না হলে আপনাদের নিশ্চ পতাদেশের বিবেক-বান মানুষ ভিন্ন অর্থে মেবেন। তার কলে-সং, নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক হিসেবে আপনাদের মূল্য বিনষ্ট হবে। সে বড় শোচনীয় ব্যাপার। বিবেক-হীন লেখক কোনো কালেই জনমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন না। ভবিষ্যত তাঁকে আত্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে। কারণ একথা মনে রাখতে হবে সাহিত্যিক কোনো দেশে জন্ম-গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর সার্থক সৃষ্টিকর্মে তিনি স্বদেশ-ব-কালের উদ্দেশ্যে, তিনি চিরকালীন, তিনি আন্তর্জাতিক।

সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা (২)

নিত্যরঞ্জন ঘোষ

বুর্জোয়া ডেকাডেন্ট সাহিত্যের যৌকম বিষয়গুলিকে (জয়েসীর জটিলতা, কাকতার মরবিড ভগ্ন, অভিবাদী দর্শন এবং সর্বোপরি যৌনতা) দারুণ একটা intellectual bewour দিয়ে প্রচার করা হতে লাগল। যেম এইসবই সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। টোপটা বিকলে গেল না। কি বামপন্থী শিবিরভুক্ত কি শিবির বহিষ্ঠূত বহু দায়বদ্ধ ছোটগল্প লেখকই এই টোপ গিলে বদলেন। দায়-টায় মাথায় উঠল, তাঁরা বিটকেল সব গল্প লিখে এ ঠর পিঠ চুলকোতে লাগলেন আর পাঠক মিশ্রবে তাঁদের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। এইসব লষ্ট গল্প-

লেখকদের মধ্যে এমন কিছু লেখকও ছিলেন যারা সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এঁরাও অপেক্ষাকৃত অরাজনৈতিক চিন্তাভাবনার গল্পকারদের সঙ্গে সমান ভালে অসাব্যাক দুর্বোধ্যতার ভাষাক্রান্ত, যৌনতা-জটিল গল্প লিখে চললেন। আর আমাদের তথাকথিত বামপন্থী সংস্কৃতিচিন্তার নায়কেরা এইসব দেখে-শুনেও হয় গোলাবুদ্ধির দোষে কিছুই বুঝতে পারলেন না, অথবা বুঝেও বগল বাজাতে বাজাতে যে দায় আখেরের ভাবনার ব্যস্ত রইলেন। সঠিক রাজনৈতিক চিন্তার অভাবের ছিন্নপথে যে পাপ এইভাবে একদিন ছোটগল্পের শরীরে প্রবেশ করেছিল, ক্রমের তা সাহিত্যের অভ্যন্তর শাখাকেও কলুষিত করেছে। ধীরে ধীরে বটে গেছে এক মৃত্যুমুখী ভগ্নপত পরিবর্তন। বইয়ের-পাড়ার গেলে শোনা যায় এই মৃত্যুশব্দটাননি।

কিন্তু মৃত্যুতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের বিশ্বাস জীবনে, সংগ্রামে। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, জালে-মোড়া কোনো বিরাট বাড়ির আশ্রয় থেকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের লাহাঘ্যপুষ্ট কয়েকটা দালাল বাংলা ছোটগল্প তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের রক্তরস সব শুষে নিয়ে তার ধর্মনীতে প্রবাহিত করবে মেশিনের তেল, মগজটাকে খুবলে খুলে নিয়ে সেখানে বসিয়ে দেবে

একটা কমপিউটার, তারপর এই অটোমেটনটিকে ব্যবহার করবে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থে। আমরা জানি বেশ কিছু পদলেহী তাঁড়কে এরা পুরস্কার, চাকরি, গ্রন্থপ্রকাশের সুযোগ দিয়ে একটি বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের তাবোদার লেখকবাহিনী তৈরি করেছে। এইসব লেখকেরা মদ মেরেমাছবে ডুবে থেকে, কি এক আশ্চর্য কারণে কয়েকজন সর্বভারতীয় প্রভাবক ধর্ম-ব্যবসায়ীর ভজনা করে, বৃহৎ পত্রিকার দপ্তরে চাকরি করে, জীবনবিমুখ সাহিত্যরচনার কাজে লিপ্ত থেকে এ ঠর পিঠ চুলকে নাচন-কৌদন করে থাকেন। এঁদের মধ্যে দাঁড়ের কলমে কিছু দায় আছে তাঁরা কিন্তু একদা দায়বদ্ধ সাহিত্য-শিবিরেই দামিল ছিলেন। এঁরা ঐতিহ্যের অহুসরণে এবং অন্তরের তাগিদে এই শিবিরভুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক প্রেরণার কোনো কাজ করা এক জিনিস আর রাষ্ট্র ও সমাজপ্রেক্ষিতের স্পষ্ট ধারণাগত প্রত্যয় থেকে সেই কাজকে শেষ পর্বস্ত জাঁকড়ে থেকে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেওয়া আরেক। এঁদের লামনে সঠিক রাজনীতি রাখা যায়নি বলেই এঁরা বিকিয়ে গেলেন। যেসব লেখকের আদর্শবোধ যথেষ্ট গভীর ছিল তাঁরাও তাঁদের সাহিত্য-কর্মের পরিপূরক রাজনৈতিক সহায়তা-বঞ্চিত হয়ে বেশিদিন অসম-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁদের অনেকেই দীর্ঘ হয়ে গেলেন,

কেউ কেউ গল্প লেখা ছেড়ে-অত কিছু ধরবার চেষ্টা করলেন। তথাপি বাংলা ছোটগল্পের প্রাণবান দায়বদ্ধ ধারাটি কুচ্ হয়ে যায়নি। কয়েকজন আদর্শবান ছোটগল্প লেখক সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁরাই আবার পাঠককে বাংলা ছোটগল্পের প্রতি মনোবাগী করে তুলতে পারবেন। কারণ অভিজ্ঞতা আর মননে সন্মুখ এই লেখকেরা শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রেরণার বশে দায়বদ্ধ সাহিত্যের শিবিরে আদেমননি, তাঁরা লচতেন ভাবে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনই এসেছেন। বাংলা ছোটগল্পের বর্তমান অন্ধকার অধ্যায়ের পর আলোকোজ্জ্বল নতুন অধ্যায়টি এঁদের হাতেই লেখা হবে। এ কাজে এঁদের যোগ্যতা লম্বা আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

বইয়ের বাজারের বর্তমান দুঃস্থাই আমার এই বিশ্বাসকে আরো পতীর করেছে। এই বাজারে সব-রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অন্ধকারের সাহিত্যই পাচ্ছে। তবু প্রচারের দামাদা বাজিরেও আর পাঠককে ধরে রাখা যাচ্ছে না, নতুন পাঠক টানা যাচ্ছে না। বই কেনার পাঠকের অনাগ্রহ থেকেই প্রমাণ হয় বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের তাবোদার লেখকবাহিনীকে ক্রেতা-পাঠক বর্জন করেছে। সূনি প্রভুত। সংপঠিত সং লেখকেরা এগিয়ে এসে বাংলা ছোটগল্প তথা বাংলা সাহিত্যকে অন্ধকারমুক্ত করুন।

কলকাতার বহু সংবাদপত্র

ও বামপন্থী আন্দোলন

হীরেন বসু

কলকাতা বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখানে বামপন্থী আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী সরকারকে বিপর্যস্ত করেছে। তারা এই আন্দোলনের মোকাবিলা করেছে লাঠি ও গুলি দিয়ে, মারধরকে নিহত ও আহত করে। ১৯৬৬ সালে খাওয়ার দাবিতে এই আন্দোলন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল এবং তৎকালীন বিকৃত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীধরচন্দ্র সেনকে জনগণের কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল, বার পরিণতি ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর, রাজ্য কংগ্রেসের পরাধীন্যক অতুল্য খোব ও কংগ্রেসের পরাজয়।

কিন্তু কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রে এইসব আন্দোলনের কতখানি প্রতিফলন ঘটেছিল সত্যতাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে। সংবাদপত্রগুলি কি তাদের প্রতিবেদনে ও সংবাদচিত্রে প্রকৃত ঘটনাকে তুলে ধরেছিল? পুরনো কাগজের ফাইল খাটলে দেখা যাবে তারা প্রায় সবক্ষেত্রেই সংবাদকে বিকৃত করেছে, একদেশ-দর্শী ও পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে, সরকারী প্রেস নোটার অঙ্করণে আন্দোলনকারীদের চরিত্রকারী ও গুণা আখ্যা দিয়েছে। মনে পড়ছে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের কথা। এই আন্দোলনে জেমারেল ডায়ারের রেকর্ড ভেঙে ২২০০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল, ধর্মতলায় গ্রাম থেকে আসা অসহায় মারী-বুড়দেরও লাঠিপেটা করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছিল। চারদিনের রক্তাক্ত নাটকে সরকারী মতে ৩৯ জন নিহত এবং ৩০০ জন গুলিবিদ্ধ হয়, যদিও বেসরকারী হিসেবে প্রকাশ, হত্যের সংখ্যা ৭০ থেকে ১০০র মধ্যে, গুলিবিদ্ধ ওরতর আহতের সংখ্যা ৩০০ এবং মোট আহত ৩০০০। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রে পুলিশের নির্মম লাঠিপেটা ও গুলিচালনার কোন ছবি বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। সেখানে শুধু দেখা গেছে অলঙ্ঘন বা অপ্রিদ্ধ হ্রাস-বাসের ছবি এবং প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে ‘জুহুতকারী-দের’ ‘গুণামীর’ কথা। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একমাত্র

দৈনিক বহুমতী কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধকে ভাষা দিয়েছিল কংগ্রেসী মন্ত্রী অশোক সেনের কাগজ হওয়া সত্ত্বেও, অবশ্যই অশোক সেনের ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং কিয়দংশে বিবেকামন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনমনীয় মনোভাবের জন্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দৈনিক বহুমতীর অত্যন্ত বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে চরিত্রগত বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিখ্যাত সাইবাড়ির ঘটনার প্রতিবেদনে। ১৯৬৬ সালে অবশ্য প্রতিবেদনে অসততা ও বিকৃতিতে সকলকে টেকা মেরেছিল আনন্দ বাজার গোষ্ঠী। তেরমি জনগণের স্রোতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইঁদুরের গর্তে মুখ লুকিয়েছিল। বসিরহাটের কাছে একদিন আনন্দবাজারের সংবাদ বিভাগের এক কর্তা ব্যক্তি দহ অস্ত্রাভরা গাড়িতে ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক ঘেরাও হবার পর থেকে এই পত্রিকা গোষ্ঠীর কোন প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফারকে আর বাইরে পাঠানো হত না। তারা অস্ত্র কাগজের বা বাইরের কোন সংবাদ এজেন্সীর প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রতিবেদন বা ছবি সংগ্রহ করতেন। সেই সময় আনন্দবাজার গোষ্ঠী এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে, একদিন যাত্রিক গোলযোগে তাদের বিজ্ঞানের আলো নিভে যেতে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এই আশঙ্কা যে আক্রমণকারীর দল অঙ্ককার করে দিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। এই ভীতি কিন্তু এদের অসংসারবাদিকতার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এ ব্যাপারে শুধু আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, যুগান্তর-অমৃতবাজার গোষ্ঠীও একই পথের পথিক।

ব্রিটিশ যুগে এই সংবাদপত্রগুলির একটা জাতীয়তাবাদী ভেক ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন এরা অচ্ছলতার মুখ দেখেনি। ১৯২৬ সালে আনন্দবাজার যখন পুনঃপ্রকাশিত হয় তখন এই কাগজ একেবারেই চলত না আর সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মালিকানাধীন শ্রীগৌরাক্ষ প্রেসের দোষা বাড়ত। তখন আনন্দবাজার ছিল গান্ধীবাদী, তাই স্বরাজ্য পার্টির লোকেরা কাগজ বাজারে বেরোলেই পুড়িয়ে দিত। এই অবস্থায় মাখনলাল সেন আনন্দবাজারে যোগদান করেন পরিচালক রূপে এবং তাঁর

সঙ্গে আসেন লত্যাশ্রমাধ মজুমদার ও অমৃতচন্দ্র সেনগুপ্ত যথাক্রমে সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক রূপে। প্রথমদিকে সাফলেশন ও আর্থিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয় না এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার বারবার কাগজ বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু মাখনবাবু জেদের সঙ্গে কাগজ চালিয়ে যান এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রায় আট হাজার টাকা ধার করেন, যে টাকা তিনি ফেরতও পাননি বা তার বিনিময়ে কোন শেয়ারও পাননি। অতঃপর মাখনলাল সেনের স্বযোগ্য পরিচালনায় আনন্দবাজারের সাফলেশন বাড়তে থাকে। তখন থেকে আনন্দবাজার সম্পর্কে সুরেশবাবুও আগ্রহ দেখাতে থাকেন এবং অর্থ-খাজল্যের ক্ষেত্রেই তিনি কাগজের দখল নিয়ে নেন। কয়েক বছরের মধ্যেই নীতিগত ব্যাপারে সুরেশবাবুর সঙ্গে মাখনবাবুর বিরোধ বাধল এবং মাখনবাবু দখলবলে আনন্দবাজার ত্যাগ করে গেলেন। সুরেশবাবু এইটাই চাইছিলেন। মাখনবাবু পাছে কোন শেয়ার চেয়ে বলেন তাই তাঁকে তাড়িয়ে সুরেশবাবু নিশ্চিন্ত মনে আনন্দবাজারের মালিক হয়ে বসলেন। ফলে ফেপে চোল আনন্দবাজারের নীতি তখন গোলায় গেল। ‘জাতীয়তাবাদী’ তকমা এঁটে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক আনন্দবাজার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসততা ও দুর্নীতির জন্ম দিল। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যুগে যাদের ইতিহাস কলঙ্কময় তারা যে স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে বামপন্থী আন্দোলনের বিরোধিতা করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। বামবাজারী কাগজের আঙ্কের রমরমার ইতিহাসও কলঙ্কহীন নয়। এরা সকলেই ১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিজ্ঞাপন চেপেছে, যে বিজ্ঞাপনে আন্দোলনকারীদের গুণা আখ্যা দেওয়া হত। এরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে সম্পাদকীয় বাধা রাখতেও লজ্জা বোধ করেনি। অর্থাৎ পণ-আন্দোলনের সঙ্গে এদের বিচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে তখন থেকেই।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর এই বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাকাল থেকে পার্থক্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং দ্বিতীয় মহাশেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

স্বর্ণ যুগের পরিণতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই নয়টি বিষয়বস্তু ভাঙন ধরা শুরু হল। সোনাকে কেন্দ্র করে ব্রেটন উডসে যে ডলারের নাগপাশে ইউরোপীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে বাঁধা হলো, পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার অমোঘ নিয়মেই তা ভেঙে পড়তে লাগল। মার্কিন মুদ্রার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু মার্কিন অর্থনীতি, পুনর্গঠিত ইউরোপীয় অর্থনীতিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছিল না। মার্কিন আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণ অবশ্য এর ক্ষেত্রে মূলতঃ দায়ী। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও স্বকার জন্ত আমেরিকা সারা বিশ্বে প্রায় দশ হাজার সামরিক বাহিনী বসাল, সামরিক গোয়েন্দা তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে মার্কিন সেনাবাহিনী স্বেচ্ছায়ের করল। কমিউনিজম তেঁকানোর নামে আমেরিকা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাহারাঘার হয়ে উঠল। বিপুল সামরিক ব্যয়ভারের বোকা থেকে মুক্তি পেয়ে জাপান, পশ্চিম জার্মানী ও ইউরোপ খুব তাড়াতাড়ি তাদের অর্থনীতিকে আবার গড়ে তুলতে পারল। ফলে একটা সময় এল যখন বাণিজ্যিক পণ্যের বাজারে আমেরিকা পিছু হঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় দেশগুলির হাতে প্রচুর ডলার মজুত হয়েছে। এদিকে রিজার্ভ মুদ্রা হবার স্বযোগে কাগজী ডলার ছাপিয়ে আমেরিকা বিভিন্ন দেশে স্বর্ণ ও লরী বাড়াতে শুরু করেছে। স্তরায় একদিকে ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, অন্য দিকে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা মজুত ডলার ভাঙিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীত মত সোনা পাবার দাবি করতে লাগল। সোনার সর্বজনগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক দায় তিল আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার। আমেরিকা ঐ হিসেবে ডলার বদলে সোনা দিতে লাগল। ক্রমে তার সোনার ভাণ্ডার খালি হবার মুখে। ১৯৬৮ সালে সোনার দাম ৩৫ ডলার ছাড়িয়ে ৮০ থেকে ৮৫ ডলার হয়ে গেল। ফলে ৩৫ ডলারে সোনা কিনে আবার সোনা বিক্রী করে ৮০ ডলার প্রাপ্তি অর্থাৎ টাকায় পাঁচ সিকে মুনাফা। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে আমেরিকা সোনা দিতে অস্বীকার করল এবং ব্রেটন উডসের চুক্তি ভঙ্গ করল।

ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ৩৬০ ইয়েনে এক ডলার নতুন হার হলো ২৬০ ইয়েনে এক ডলার। বাজারে বিক্রী হতে লাগল ১৬০ ইয়েনে এক ডলার। জাপানী ইয়েন, জার্মান মার্ক, ফরাসী ফ্রাঁ, ব্রিটিশ পাউন্ড, মার্কিন ডলার

কোন মুদ্রাই সরকারী হয়ে আর বিকোচ্ছে না। সব মুদ্রারও একটা সরকারী দর আরেকটা কালোবাজারী দর। সরকারী মুদ্রার দর সোনার হিসেবে সরকারী দরে অর্থাৎ আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার প্রায়। বেসরকারী দর ৮৭০ ডলার। স্তরায় সরকারী দরে কেনা বেটা নেই। সবটাই বেসরকারী বা কালোবাজারী দর। জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাধ দিয়ে বলা যায় এখন সরকার এবং সরকারী মুদ্রাকে কালোবাজার নিয়ন্ত্রণ করেছে। সরকারী দর দাম কেবল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভজ-পোশাক, আসলে কালোবাজারই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একটা ছুটি দেশের নয়, প্রায় সবদেশের সব দেশের পুঁজিবাদী সরকারকেই।

সোনার দাম বেড়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে কারণ সব সরকারী মুদ্রারই ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ কোন মুদ্রা দিয়েই আগের অঙ্কপাতে পণ্য কেনা যাচ্ছে না। সোনার মুদ্রামূল্য অনেক। তাই সোনা কেনার আগ্রহ বেশী। কিন্তু এই অবস্থাতেও ডলারের বাজার দাম যাতে অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ে না যায় তার জন্তে আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল অনবরত সোনা বিক্রী করেছে। আমেরিকা মাসে প্রায় লাড়ে সাতলক্ষ আউন্স সোনা ১৯৭২ সালে বিক্রী করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার গত চার বছর ধরে ক্রমাগত সোনা বিক্রী করে আসছে। ১৯৮০ সালের যে মাস পর্যন্ত এই বিক্রী চলবে। আশচর্য সোনার থাকতি মিটেছে না। টাকা কড়ির উপর এখন ব্যবসায়ীদেরও বিশ্বাস নেই। বড় বড় শিল্পপতি এমন কি বহুজাতিক কর্পোরেশন-গুলিও সোনা কিনছে। অনেক সরকারও কিনছে কারণ কাগজী-মুদ্রার উপর কারো বিশ্বাস নেই।

আবার সোনার সেনদেমে ফটিকাবাজি মুদ্রা এত বেশী যে আন্তর্জাতিক উৎপাদনে পুঁজি লরী না করে সক্ষম পুঁজিপতিরা সোনার বাজারে লরী করেছে। এ জন্তেই প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটা আসল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পূর্বসূচক।

শেয়ার বাজারে মন্দার দরুণ সাধারণ লরীকারকেরা মার খায়, সর্বস্বান্ত হয়। সোনার বাজারে এই বিপর্যয়কর ফটিকাবাজি অনেক দেশের সরকারকে দেউলে করে ছাড়তে পারে। কারণ কাগজী টাকা ছাপানোর মধ্যে যে সব সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তাদের দেউলে হবার বাকী নেই।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (৯)

ডঃ এ আর মল্লিক

অজুন দাস

বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চা দীর্ঘ দিন থেকে একটি বিশেষ গণিতের লীমাবদ্ধ। তা হলো মুসলমানদের জীবনযাত্রা এবং তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। একে আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক বা সংকীর্ণ মনে হলেও আসলে কিন্তু ব্যাপারখানা তা নয়। এই প্রয়াসের মধ্যে একটি বেদনা যেমন লুকিয়ে আছে, তেমনি হতাশা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টাও কম নেই। কারণ এই দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে মুসলিম শাসনকে বিকৃত করেছে তাতে এছাড়া গত্যন্তরও ছিলো না। এখন যেকোন প্রকারে মুসলিম অবদান খুঁজে বার করতে না পারলে এই সম্প্রদায়ের আত্মিক মৃত্যু ঘটবে। অতএব বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বিরাট অংশ এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রখ্যাত ইতিহাসিক ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক তেমন একজন বুদ্ধিজীবী যিনি 'বাংলার ইতিহাসে মুসলিম অবদান' সম্পর্কে চিন্তা করেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার বিষয়ও একারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে লীমাবদ্ধ। এই গবেষণার তিনি মুসলিম সমাজের—বিশেষ করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপ অবলোকন করেছেন এবং তার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস রচনা করেছেন।

সরকারী কলেজে থেকে তাঁর শিক্ষকতার সূচনা। সরকারী কলেজের শিক্ষক থাকাকালেই তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যান এবং উচ্চশিক্ষা শেষ করে তিনি রাজশাহী বিভাগে যোগদান করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

আসাম ও মেঘালয়

৩য় পৃষ্ঠার পর

যে দেশের পক্ষে কত বড় বিপদ আসায় ও মেঘালয়ের ঘটনা আবার তা প্রমাণ করলো। সারা দেশের মানুষকে এই দুটি অন্তঃশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। যতদিন এরা দেশ থেকে নিষ্কিন না হয় ততদিন এই লড়াইয়ে কান্ডি নেই। স্বাধীনতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদ এদের পেছনে মদত দিচ্ছে। তাই আসাম মেঘালয় সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল অশান্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ কিছুকাল কাজ করার পর তিনি চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (Project Director) হিসেবে চলে আসেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে যোগদান করেন। শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত জনপদ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এমন একটি নির্জন স্থানে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা, বিভিন্ন বিভাগ পুনর্গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় সব বিষয় নিয়েই তাকে মাথা ঘামাতে হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে এ জাতীয় সমস্ত সমস্যার মোকাবেলা করেছেন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো। ডঃ মল্লিক এই সময় সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই জানেন না, এই সুযোগে তিনি তাঁর লেখকমণ্ডির আত্মা-ইন্ডিতে একটি বৃহত্তর আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এতে মনে হয় তাঁর সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিলো। তাঁর এই কর্মপ্রেরণার প্রমাণ পাওয়া গেছে ২৫শে মার্চের সামরিক অভ্যুত্থানের পর। এই সময় তিনি সরাসরি সামরিক সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে এক ছুঁবার প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধে অংশ গ্রহণকারী সামরিক ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পর্যন্ত তাঁর হাতেই ছিলো। অবশেষে এই অকল পাকিস্তানী সৈন্যদের করতলগত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তিনি যেমন নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উথিত বিভিন্ন প্রকার প্রসঙ্গও তিনি সমাধান প্রদান করছিলেন। সেদিন ভারতে অবস্থানরত রাজনীতিকরা তাঁর উপর কি পরিমাণ নির্ভর করে থাকতেন তা চিন্তা করা যায় না।

স্বাধীনতার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং নতুন সরকারের অগ্রদূত কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের সচিব হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ একটি নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে যে খুবই উপযোগী হয়েছিলো একথা আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষাবিভাগের সচিবের পদ থেকে তিনি কিছুকালের জন্য ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ভারতে হাই কমিশন থাকাকালীন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দেন এবং একটি দ্বিভাষী ও কর্মমুখী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী আনয়ন করেন। এই সংশোধনীর আওতায় সব রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)' নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক এই সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। অবশ্য অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করার আগেই শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটে। অবশ্য পরে ধোন্দকার মোনাতাক আহমদের সরকারে তিনি যোগদান করতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু অল্পদিনের ভেতর সেই সরকারেরও পতন ঘটে। অতঃপর তিনি তাঁর জীবনের অপরিসরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় শিক্ষকতায় ফিরে যান। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে রয়েছেন।

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিকের মূল গবেষণা হলো অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ। এই গবেষণা কর্মটি British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি মূলতঃ দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। একটি হলো - বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলন বলতে তিনি মূলতঃ ফরায়েবী ও ওয়াহাবী আন্দোলন বুঝিয়েছেন। এর ভেতর ওয়াহাবী আন্দোলনের বিস্তৃতি ছিলো গভীর। এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে ছিলো। ফলে তাকে এর একটি সার্বিক রূপ দৃষ্টিতে তুলতে হয়েছে। একারণে তিনি লৈঙ্গর আহমদ ত্রেলভীকে মধ্যস্থলে রেখে সমগ্র আন্দোলনটিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরপর বিশ্লেষিত হয়েছে বাংলাদেশে তার বিকাশ। এর প্রেরণার বিশেষ ভাবে কাজ করেছে

তিতুমীরের কৃমিকা। ডঃ মল্লিক এই গ্রন্থে বহু চর্চার মূল থেকে মানা রকম তথ্য সংগ্রহ করে একে একটি তথ্য-নিষ্ঠ মৌলিক কর্মে রূপান্তরিত করেছেন। দ্বিতীয়ভাগে তিনি আলোচনা করেছেন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে। এই সমস্তটি যে খুবই জটিল তা বিস্তারিত জানেন। কারণ প্রথম দিকে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি-অধোগতি নিয়ে নানা মূর্নির নানা মত। কেউ এর জন্যে দায়িত্বকে দায়ী করেছেন, কেউবা সংস্কারকে, অনেকে আবার এর

কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্র

৩য় পৃষ্ঠার পর

বৃহত্তর সময় নিউজপ্রেস বেচে কলকাতার বাংলা সংবাদপত্রগুলি বৃহৎ শিল্পে পরিণত। স্বাধীনতার পর এদের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ষ্টেটসম্যানের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে, এরা নিজেরাই এক একটি বৃহৎ শিল্প আর ষ্টেটসম্যান বিভিন্ন শিল্প-মালিকদের একটি মুখপত্র এবং অন্ততম শিল্পও বটে। উত্তরের স্বার্থ একই এবং উভয়েই শাসক শ্রেণীর মুখপত্র। স্বীয় স্বার্থে এরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়। তাই কোনরকম বিরোধ বা আন্দোলনের প্রকাশ দেখলেই তার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে দেয়। অসত্য, অর্থসত্য ও বিকৃত সংবাদ প্রচার করে এরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। ১৯৬৭ সাল থেকে এইসব সংবাদপত্রের পাতা উল্টে গেলে এই সম্পর্কে অনেক চাকল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ ১৯৬১ সালে যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে রবীন্দ্র দত্তাবরের ঘটনার প্রতিবেদন। প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে এরা দিনের পর দিন মিথ্যা কথা লিখে গেছে, এমন কি তথ্যকথিত নিরপেক্ষ ষ্টেটসম্যানও এই অশ্রুচারে গলা মিলিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রের চেহারার বড় চাকচিক্য আসছে, এদের বতই আধুনিকীকরণ হচ্ছে, প্রচার সংখ্যা ও প্রকাশনীর লংঘা বাড়ছে, ততই এরা সাধারণ মানুষ, তাদের কৃষ্টি কৃষ্টির লড়াই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আজ কোন বড় শিল্পে—যারা অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দেয়—ধর্মঘট হলে বৃহৎ সংবাদপত্রে প্রমিক-কর্মচারীদের বস্ত্রব্য প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হয় কালিকদের চাউস প্রমিক-কর্মচারী বিরোধী বিজ্ঞাপন। কিন্তু ধর্মঘটদের তো আর অত টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষমতা নেই। তাই জনসাধারণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্কে তুল বোঝে। ষ্টেটসম্যানকে

ভেতর একটি সময় সাধনের ঘরে উত্তরবিধ কারণকে মুসলিম শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা বলে দাবি করেছে ইত্যাদি। ডঃ মল্লিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করেছে এবং এর নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৭৮২ খ্রীঃ কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন থেকে এর সূচনা এবং পরিণতি মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ইংরেজের কৃমিকা পর্যন্ত। এতে হিসেবে বিচার করলে গ্রন্থটির মূল অপরিসীম।

শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় অনেক নিরপেক্ষ বলে মনে করেন। কিন্তু ষ্টেটসম্যান মোটেই নিরপেক্ষ নয়, ভবে আনন্দবাজার-মুগাক্তর যেমন গণ-আন্দোলন বা বামপন্থী আন্দোলন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতার চক্ষুজ্ঞার বালাই রাখে না, ষ্টেটসম্যান ততখানি নির্লজ্জ নয়, সাংবাদিক রীতিনীতি কিছুটা মেনে চলে। তবে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে ষ্টেটসম্যানও নিরপেক্ষতার ঘোমটা খুলে ফেলে।

আজ সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্প। লাক্ষিতে লাক্ষিতে তার আয় বাড়ছে। প্রভাব প্রতিপত্তিও বাড়ছে। এক সময়ে বাংলা সংবাদপত্র ছিল রাজনীতি-করা ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল। সামান্য বেতনও নিয়মত পাওয়া যেতনা। তাঁরা সকলেই আজ অবসর প্রাপ্ত, কেউ কেউ স্বর্গত। দুটি বেতন বোর্ডের পর সাংবাদিকদের বেতন অনেক বেড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়ছে। সাংবাদিকতার নতুন নতুন ছেলে আসছে। খেলাপড়ার ভাল, সপ্রতিভ, ইংরিজী বা বাংলা ভাল লেখে। কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসী রাজত্বের অধিকাংশ সাংবাদিকের মতই সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, মালিকদের মত্রে দীক্ষিত। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে এই যে বিরাট অস্ত্রাচলছে—শতকরা ৭০ ভাগ লোক অনাহারে অধাহারে থাকছে, মুষ্টিমেয় লোক সমস্ত সম্পদ কৃষিগত করছে, চারদিকে নৈরাজ্য, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, বদমায়েসি, চুরি-জুয়াচুরি তা নিয়ে মালিকদেরও যেমন মাথাব্যথা নেই, তেমনি সাংবাদিকদেরও নেই। এরা যদি মাকিনী বা ইউরোপীয় সাংবাদিকদের মত প্রেশনালও হতে পারত তাহলেও এই সূয়া গণতন্ত্রের দেশে কিছুটা স্বস্তি আসা ফেলা যেত।

["রক্ত স্বাক্ষর" পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত]

উত্তরপ্রদেশের চিঠি

নির্বাচনে চরম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি-সঙ্কীর্ণতা

স্বর্নাশ্রমাদ মল্লিক

অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের (ই) বিজয়লাভ হয় নি।

১৯৭১এ কলিত ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় মুখ্য তুলে ইন্দিরাজীর শৈল্পিক সম্প্রদায় কংগ্রেস-আর (Congress requisitionist, পরে Congress

লোকসভা কুক্ষিগত করেছিল, উত্তরপ্রদেশের ৮৫ কেন্দ্রে ৭০ আসন

জিতেছিল। সেই দলের পাওয়া জন

ভোট ছিল মোট ভোট-সংখ্যার মাত্র ৮.৫৬%। আত্মপাতিক হিসেবে এই

দলের ভোট ৭৭ লাখে কম দাঁড়ায়

২৫ শতাংশে। তখনও বর্তমান

কংগ্রেস (আর) দলের ২য় মহারথীরা

ইন্দিরাজীর সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৭৭-এর “জনতা চেটে” নির্বাচনে উত্তর

প্রদেশে ৮৫র মাকে একটিও আসন

কংগ্রেস (ই)র বরাতে জোটে নি।

আর আজ জোর করে চাপানো মধ্য-

বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের (ই) প্রাপ্তি-

যোগ—আসন সংখ্যা ৫১ কিন্তু জন-

ভোটের অল্পপাতে মাত্র ৩৫%।

উল্টো ভরকে জনতা এবং লোকদলের

প্রার্থীদের পাওয়া ভোটের অল্পপাত

যোগ করলে অনেক বেশী দাঁড়ায়।

হু একটি কেন্দ্রের উদাহরণ দিচ্ছি:—

(১) দেওরিয়া—প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস

(ই) প্রার্থী শ্রীমামরণ রাই জিতেছেন

মাত্র ৭৭ ভোটের ব্যবধানে, অথচ

তার প্রাপ্ত ভোটের অল্পপাত মাত্র

৩২.৮১%; পক্ষান্তরে, জনতা এবং

লোকদল প্রার্থীদের যুগ্মভাবে ধরলে

দাঁড়ায় ৬১%। (২) হরিদ্বার—এখানে

লোকদল প্রার্থী বিজয়ী; জনতা

প্রার্থীর পাওয়া ভোটের সঙ্গে আর

ভোট (কংগ্রেস-ই দলের প্রচার বয়ের

মুখ্য সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাহকে ধন-

বাহ।) পেলেও হেরে গিয়েছেন

যদিও ভোটে দাঁত বসাতে পারেন নি

বলে।

কিন্তু তা বলে কংগ্রেস-ই যে

জাতিবাদ বা সাম্প্রদায়িক ঐক্যজি-

তার মনোভাবকে প্রকাশ দের নি এবং

দিয়ে নির্বাচনে নিছক দলীয় সুবিধা

হাসিল করে নি এমন নয়। রামপুরের

নবাবহুল থেকে এক প্রার্থী মনোনীত

করে (নবাবজাদা জুলফিকর আলি

খাঁ) এই দল ১৯৭১ সালের পূর্বে যে

সামন্তী পরম্পরা ছিল তা পুনর্বীর

প্রবর্তন করল। এ ছাড়া মীরটেকে

শ্রীমতী মহলিনা কিংওয়ে-এর পক্ষে

সংখ্যালঘু ভোট এককটি রূপে যাতে

পড়ে, সে জেতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক-

তার মূলে উসকানি দিয়েছে। বস্তুতঃ

নেহেরুর আমলে নির্বাচনী রাজ-

নীতিতে যেভাবে ক্ষমতার দখল দিয়ে

কংগ্রেস দল রাতারাতি সংখ্যালঘুদের

মহারথী রক্ষক সাজতো এবং পরে

প্রয়োজন মিটে গেলে সংখ্যালঘু নাগ-

রিকদের আসল দাবীগুলি করতে

উপেক্ষা—যথা সাম্প্রদায়িক সামাজিক

বৈশিষ্ট্যবোধ, শিক্ষাগত স্বায়ত্তশাসনা-

ধিকার, প্রাণ ও সম্পদের সুরক্ষা হেতু

সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত সংখ্যার পুলিশ

এই দলীয় প্রার্থীর ভোট ছাড়িয়ে

গেছে। কানপুরে কংগ্রেস (ই)

দলের প্রার্থী ছিলেন জনাব আরিক

মোহাম্মদ খাঁ, ইনি জনতা-ত্যাগী

লোকদলও ত্যাগ করে ইন্দিরাজীর

কাছে নীতি বিক্রয় করে টিকিট

নেন। (অথচ, আগষ্টের শেষে

বনারলী দাম-মজিনগুজীর বিধান-

সভায় শক্তিপরীকার সময় এবং

তারও পূর্বে ইনি লোকদলের ছিলেন

চ্যাম্পিয়ন প্রবক্তা।) কানপুরের

চয়নগঞ্জ মহল্লার প্রচুর মুসলমান

শ্রমিক বাস করেন। তাদের মধ্যেও

শ্রমিক-ঐক্য বিনাশের চক্রান্তকারী

কংগ্রেস (ই) দলের নেতৃবৃন্দ সংখ্যা-

লঘু সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে-

ছেন; এদের রাজনৈতিক বিবেকে

বাহেনি—অবশ্য বিবেকের বালাই

যে এ-দলের নেই তা নির্বাচনে

সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে। তবে,

কানপুরের ভোটাররা দলীয় আত্ম-

গত্যের মোহ কাটিয়ে যে উঠছে

তার প্রমাণ এ কেন্দ্রে নির্দলীয় প্রার্থী

“বোড়াওয়াল”র তৃতীয় স্থান

(ভোট যুদ্ধে) অধিকার।

“পশ্চাদপদ জাতি” প্রতি দরদে

উপলে ওঠার পরম্পরা যে দল প্রথমে

স্বাপসা সমাজবাদের পোশাক পরিয়ে

জনগণের সামনে পেশ করে, তা হল

তথাকথিত পশ্চাদপদ প্রার্থী জিতে-

ছেন। অদূর ভবিষ্যতে গরীব এবং

প্রকৃত পশ্চাদপদের মাক থেকে

অবস্থাপন্ন “নেতা” হেঁটে বের করে

তাকে টিকিট দিয়ে লোকসভায়

জেতানো হয়ত কিছুটা ক্ষমতা-

রাজনীতির পরিধি বাড়াবে। তবে

সুদূর ভবিষ্যতে এধরনের নীতিহীন

খেলোয়াড়ি উক্ত জাতিদের জন-

সাধারণ ধরে ফেলবে। তখন অবশ্য

এই দলগুলির উচ্চ বংশজাত নেতারা

অনেকেই রক্তক্ষ থেকে অপস্থত।

যদিও ১৯৭৭-পরবর্তী অধ্যায়ে উচ্চ

বর্ণের রবরবা নির্বাচনী ক্ষমতা

রাজনীতিতে চালানো গেল—জন-

শ্রুতি এই যে, আর এস এস দল মুখে

স্বীকার না করলেও ভেতরে ভেতরে

ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ইন্দিরাজীর ব্যক্তি-

কেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন

যুগিয়েছে—কিন্তু, সমাজে নিয়

জরোদ্ভূত রাজনৈতিক গণচেতনা

আগলে এমনি কৌশল শাসকশ্রেণী

এলিটদেরই মুখোশ খুলে ফেলবে।

বুলন্দশহর কেন্দ্রে ইন্দিরাসমর্থক

ব্রাহ্মণ-জাতি-নেতৃবাহীন অনেক

প্রামাণ্যে অস্ত্র দলের প্রার্থী বা

সমর্থকদেরকে ঢুকতে পর্বস্ত দেওয়া

হয়নি। তবু কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে

হারতে হয়েছে লোকদলের কাছে।

ওদিকে বারানসী কেন্দ্রে মনোম-

নের অন্তিম তারিখ ফুরোবার ঠিক

আগেই আর এস এস তাদের এক

প্রতিনিধিত্বশীল প্রার্থী দাঁড় করালো;

উদ্বেগ ছিল হত-বশ কংগ্রেস (ই)

প্রার্থী কমলাপতি জিলাঠীকে

জেতানো ও লোকদলের রাজনারা-

য়ণীকে হারানো। উদ্বেগ সফল

হয়েছে। তবে সংখ্যালঘু-ভোটে-

জেতা জিলাঠীজী তাঁর অপস্থায়মান

রাজনৈতিক প্রভাব কি করে বজায়

রাখবেন, কতদিন রাখবেন তাঁর

আপন পুত্র মায়াপতি জিলাঠীর (ও

পুত্রবধূর) রাজনৈতিক বিরোধের

সামনে সে-রহস্ত অপেক্ষা করে দেখ-

বার মতই-বটনা।

এলোমেলো করে, লুটেপুটে পাওয়ার

ধারা স্বদেশের রাজনীতিতে অস্থায়ী

করে এবং বৈদেশিক রাজনীতিতে

জোটনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ধৃত্যমির

সঙ্গে বিসর্জন দিয়ে সোভিয়েত-রুশ-

মার্কী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে

সম্মোপন মজত করা ইন্দিরাজীর

নব-বৈধানিক একনায়কী রাজত্বের

যে হবে মূল মন্ত্র, সে-ঈশারা

ইতিমধ্যেই মিলেছে আকগানিস্তান

প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ভারতের

ওকালতীপূর্ণ নীতি ব্যাখ্যানের সঙ্গে

ঐ ছোট্ট এশীয় দেশে কশী হস্তক্ষেপ

তথা সমরভাষিান সমর্থন করার।

দলত্যাগ বিল আনছেন

১ম স্ট্রোর পর

পারে। তাই বিলটিকে সংসদে পেশ

করার উপযুক্ত সময় এখনো আসে

নি।

মজার কথা হল দলত্যাগকে

প্রশ্ন দিয়ে ইন্দিরা সরকার রাজ্যে

রাজ্য সরকার ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের

সরকার গঠন করার যে স্বাধা বড় স্বাধ

চালাচ্ছেন তার শিকার যাতে আবার

ই সরকারকে না হতে হয় সেই ব্যব-

স্থাকে স্থানান্তিত করতেই-দলত্যাগ

বিরোধী বিল আনার পরিকল্পনা

করা হয়েছে। এই বিল কার্যকরী

হলে কোন সংসদ সদস্য বা বিধান-

ডঃ এ আর মল্লিক

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘ইতিহাস

পত্রিকা’ নামক জাণালে তিনি

“ভারতের মুসলিম জাগরণে মাওলানা

মোহাম্মদ আলীর অবদান” নামে

একখানা প্রবন্ধ লিখেছেন। এই

প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার

ভারতীয় রাজনীতির একটা রূপ-

রেখাও প্রদান করা হয়েছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

বাণ্যাবিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

কাঁচা ফিল্মের অহতুক মূল্যবৃদ্ধি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাজারে রূপের মূল্যবৃদ্ধির জন্য হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ম কোম্পানি সশ্রুতি সিনে প্যাকেজিং ও সিনে সাউন্ড নেগেটিভ কাঁচা ফিল্মের দাম শতকরা কুড়িভাগ বৃদ্ধি করেছে। অথচ মজার কথা হল, বিদেশী কোম্পানীগুলি রূপের মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাদের ফিল্মের দাম বাড়ায় নি। হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ম কোম্পানি হল ভারতের একমাত্র ফিল্ম তৈরীর সংস্থা এবং সেখানে থেকেই ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা কাঁচা ফিল্ম ক্রয় করতে বাধ্য। এই সংস্থার ফিল্মের দাম কখনই আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য নয় এবং দামও বেশী। কিন্তু কোন উপায় নেই—এই নিয়মানুযায়ী ফিল্ম অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে ভারতের চিত্র প্রযোজকদের। এই পরিস্থিতিতে 'ইউইটিওয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন' লগ্নত কারপোরেই হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভারতের প্রযোজক-বুল সভাপতি: ই. বীতিমত স্ক্র। তবে

এ আঘাত বাংলা ছবির জগৎকে যেভাবে প্রভাবিত করবে, তেমনটি আর কোথাও করবে না। বাংলা ছাড়া হিন্দি ও অন্যান্য ছবির প্রযোজকরা তুলনায় অধিক শক্তিশালী—তাদের মূল্যকার অল্প-অনেক বেশি—তাই তাদেরকে এই মূল্যবৃদ্ধি তেমন কিছুট কাবু করতে পারবে না। কিন্তু বাংলা ছবির প্রযোজকদের যে হাল, তাতে এই মূল্যবৃদ্ধিতে ছবির সংখ্যা হ্রাস পেতে বাধ্য। একেই বাংলা ছবির সঙ্কটময় অবস্থা—তার ওপর ফিল্মের এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ—সহ না হবারই কথা। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে 'সাদা কালো'র তোলা প্রতিটি ছবির প্রযোজকদের প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার বাড়তি বোঝা বহিতে হবে—অথচ টিকিটের দাম বাড়ানোর কোন উপায় নেই তাঁদের। কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে অবিলম্বে দৃষ্টিপাত করুন এবং রূপের দাম বাড়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যা না করেই অহতুক এত বেশি কাঁচা ফিল্মের মূল্যবৃদ্ধি কেন হল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থ-রক্ষা করুন।

গণমঞ্চ

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুগ্ম সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে গত দু'বছরের মতো এবারও ১২ই জাহ্নবী শনিবার থেকে হাজরা পার্কে গণমঞ্চ-র অস্থায়ী উদ্বোধন হয়েছে। প্রতি শনিবার লক্ষ্যের দক্ষিণ কলকাতার এই পার্কে একাধিক/পূর্ণাঙ্গ নাটক, মুকতিনয়, আবৃত্তি ও গণসঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে।

১২ই জাহ্নবী উদ্বোধনী দিনে ধর্মতলার সেমিন মন্ডির পাদদেশ থেকে প্রায় পাঁচশো জনের একটি মিছিল অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিহার-মূলক স্লোগান দিয়ে হাজরা পার্কে আসে। সেখানে প্রথমে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে থিয়েটার গ্রুপ, এজিট গ্রুপ, শিবপুর পদাতিক গোষ্ঠী, রণভেরী ও কমলোদ্য হাশগুপ্ত। রিভলুশনারী লোপ গোষ্ঠী নাটক করে 'বায়েরন'। প্রথম দিনের অস্থায়ী দলকেই আকৃষ্ট করে।

উত্তরপ্রদেশের চিঠি

১ম পৃষ্ঠার পর

আসন্ন মনোবর্তী

কেবল শাসক কংগ্রেস (ই) দলের 'গণতান্ত্রিক' উদ্যোগ প্রচারকরা-বাই বস্ক, লখনৌ এর ওপর নয়া দিল্লীতে পুরানো বৈরতম্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ইতিমধ্যেই জনতা বিধায়কী দলের নেতা শ্রীমতী মল্লিকা পাণ্ডের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বদলে দেবার জন্য জীবন্ত গণাধিপত্যের ওপর প্রচণ্ড খাটানোর চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৩শে জাহ্নবী উত্তর প্রদেশ বিধান সভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে। জনতা বিধায়কী দলের অধিকাংশ এম এল এ যদি বনারসী দাস মন্নিমণ্ডলীর আত্মবাড়ির দেবার উদ্দেশ্যে আত্ম-জ্ঞাপক ভোট দেয়, তাহলে স্থানীয় কংগ্রেস (ই) দলের তা বড় তা-বড় নেতারা বোলে পড়ে যাবে। কেন না, মার্চ মাসের ভেতরই যদি বিধান-সভা ভঙ্গ করিয়ে নির্বাচন করানো না যায় তো সংখ্যালঘু জনভোটে অল্পপাতির হিসেবে প্রাপ্য সিনেটর অনেক বেশী পাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত কংগ্রেস (ই) নেতাদের উচ্চাশা গোমতীর তলে ডুবে। রাজ্যের জনগণ দেবীতে (যখন জুন মাসে) বিধান সভার পুনঃনির্বাচন হলে কংগ্রেস (ই) বিরোধী পার্টি-প্রার্থীদেরকেই বিজয়ী করাবে। তেমনি সম্ভাবনাই প্রবল। তাই আতঙ্ক

চিত্র প্রদর্শনী

প্রতি বছরের মত এবারও সরকারী চাকরলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল।

প্রদর্শনীতে ড্রয়িং এবং পেইন্টিং, ভারতীয় রীতির পেইন্টিং, কম্পি-রাল আর্ট, আলোকচিত্র, স্কেচ, জল-রঙ, গ্রাফিক্স, বাটিক, কাটখোদাই, চর্মশিল্প, ম্যুরাল, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভাগে আনুমানিক ২৫০ জন ছাত্র ছাত্রী ৫২৬টি-শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের প্রদর্শনীতে উন্নতমানের না হলেও বলা যায় ভারতীয় রীতির পেইন্টিং কম্পি-রাল আর্ট, আলোকচিত্র এবং ম্যুরালে শিল্পীরা তাঁদের মূল্যবান দৃষ্টি দিয়েছেন। পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ভাস্কর রায় তাঁর ৬"×২" এর টেরাকোটা পদ্ধতির ম্যুরালের জন্য রাজ্যপালের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন। ভাস্করের হাতের দক্ষতা একে পরিচুত করেছে। এই একই বর্ষের ছাত্র বিমল কুণ্ড ও তাঁর ৬"×২" এর টেরাকোটার স্থলর ভাস্করীর জন্য দলবল্লভ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ৫ম বর্ষের ছাত্রী চিত্র শ্রী সরকারের ৪"×১২" এর প্রাইমের কাজও প্রশংসনীয়। এরা সকলেই তাঁদের পেইন্টিং এও বহুদূর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রেবা হালদারের 'স্টিল লাইফ' ও রঙ-তুলির সামগ্র্য স্থলরভাবে রক্ষা করা

বহুগুণা

১ম পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসের ভাঙন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তবে বহুগুণার রাজনৈতিক ভবিষ্যতও যে মোটেই আশাশ্রয় নয় এটা সহজেই অস্বপ্ন নয়। কারণ বাবুদী চন্দ্রশেখর জমতা পার্টিকে পুনর্বিভাগের চেষ্টা করলেও বহুগুণার প্রভাবে বিশেষ উৎসাহ পোষণ করেননি। অল্পরূপভাবে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের কাছেও এটা জানাজানি হয়ে গেছে যে, বহুগুণা নতুন করে বাবুদীদের পেছনে ছুটছেন। এর ফলে, ইন্দিরা কংগ্রেসীদের ভেতরকার যে অংশটা বহুগুণাকে ছুঁইনের বিধানবাতক বলে চিহ্নিত করে, তারা ঠেকে ভাড়াবার অন্তে আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে কম্পি-রাল আর্টের ৪র্থ বর্ষের অমিতাভ এবং ৫ম বর্ষের কুশল কবের বিভাগ পনের জন্ত ডিভাইন মনোরম। কুশল এবং ৫ম বর্ষের তাপস সরকারি আলোকচিত্র ভাল লাগার মতো তাপস বড়ুয়ার 'ওমর খৈয়াম' 'নৈকত' ভারতীয় রীতির পেইন্টিং দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য স্থিতি।

বেশ কিছু তেল-রঙের ছবি বিদেশীরা কিনে নিয়ে গেছেন ভারতীয়রাও ছবি সংগ্রহে ব্যাপারে আগ্রহী হলে শিল্পীদের প্রসারক হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নীরত শক্তির ভেতর আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। আশা কর ভবিষ্যতে রোমাঞ্চিক দৃষ্টিভঙ্গি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আরো বেশী কল্যাণমুখী চিত্রার ছাপ রাখবে তাঁদের স্থিতিতে।

পাসপোর্ট

১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু, আন্তর্জাতিক ব্যাপার জনত হল কেন্দ্রীয় সরকারের মননে বদলেই পুরানো ব্যবস্থা একদম পাল্টে দিলেন এবং ম্যাক্সিট্রেট ও ডেপুটি সেক্রেটারী র সুপারিশ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করে বাংলাদেশ গমনের জন্য পাসপোর্টের নব আবেদনপত্রের তদন্তের দায়িত্ব একমাত্র পুলিশের উপরেই অর্পণ করা হয়। একে মানানসই আবেদনকারীদের প্রচণ্ড ছুতোগ বোড় বায় এবং আকোত অব্যাহত আছে। আরো অভিযোগ পাওয়া গেছে, এক প্রেনীর পুলিশ আবেদনকারীদের মানানসই হয়-রাপ করছে।

ওরাকিবহাল মহল দাঁড়িয়েছেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সামগ্রিকভাবে এই পাসপোর্টের আবেদনপত্রের তদন্তের ব্যাপারে পুলিশ-তদন্ত ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে জন প্রতিনিধি যথা এম এল এ, এম পি, পৌর প্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ গমনের ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হোক।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

- ১। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা / ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী / ১০.০০
- ২। আলোকের সমাবর্তন / শ্রীহাগরজন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২.০০

৬৪, রাজা সুবোধ মল্লিক স্টোর, কলিকাতা-১৩

ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডাস্ট্রিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডব্লু ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছে থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম ও টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রয়

রেফা: নং ০৫ / টেন্ডার/২৮৭ তার ১১-১১-৮০

"অ্যাক্স টেক হোয়ার ইজ বেসিসেস" এক্স-কোলিয়ারী/ওয়ার্কশপ/ই সি এল ইউনিটের আনুমানিক ৬২১০টি খালি তেল/গ্রীজ ড্রাম বিক্রয়ের জন্য। কেমিয়ারের কাছে ১০ টাকা (অগ্রত্যাগপযোগ্য) নগদে/মনি অর্ডারে ১২০০ টাকা (টেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ দিন আগে পৌছাতে হবে) দিয়ে ২০.০৮.৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে কন্ট্রোলার অফ টেন্ডারিং অফিস, সীকভোরিয়া, পো: দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২১.০৮.৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। সবচেয়ে ভাল দর দিয়ে প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট জিনিসের বা মূল্য তার ৫% হুজ ছাড়া বারনার টাকা ভিমাণ্ড ড্রাক্টের আকারে টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেন্ডারে প্রদত্ত এরিয়া/কোলিয়ারী/ওয়ার্কশপের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মনিঅর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ তাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

অন্যদিক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দলপ কাবালর ৬১, বট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

অধিকাংশ রাজ্য সরকার বাতিল করার সিদ্ধান্ত গাকা

ইন্দিরা চাইছেন দল ভাঙিয়ে কাজ দার ত

দপন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা। শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী '৮০। ৬০ পয়সা

সি বি আই ডি আই জি এন ফে সিং প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন

কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর ডি আই জি জি এন কে সিং তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা করছেন। তার জন্ত যাতে যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অধিকর্তার নিকট আবেদন করেছেন।

ক্রীসিং "কিসনা কুরশী কা" নাম-স্মার তদন্তকারী অফিসার। গত ২১শে জানুয়ারী গভীর রাতে হঠাৎ তাকে হরিয়ানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে গুরগাঁওয়ে নিয়ে যায়। পরে অবজ্ঞা করে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আবেদনে ক্রীসিং বলেছেন যে, তাঁর গ্রেপ্তারের ঘটনাটা একটা জঘন্য যড়যন্ত্র এবং বড় গুরগাঁওয়ে সাংবাদিকরা উপস্থিত না থাকতেন তবে হয়ত তাঁর ওপর দৈহিক নিধাতন চালানো হত।

এই আবেদন সম্পর্কে এবং ক্রীসিংয়ের জন্ত কোন ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মূখ খুলতে নারাজ। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ক্রীটি সি এ ক্রীনিবাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আবেদন পত্র পাবার শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

এমাজেন্সী আমলের কুখ্যাত অফিসাররা গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরে আসছেন

দেশে গুরুতর জরুরী অবস্থা জারী করার পর খেসব হোমরা চোমরা সরকারী কর্তব্যক্তি অনেক অঘটনের নায়ক বলে জনতা সরকারের শাসন-কালে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কি দূরে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের এখন সমাদর বেড়ে গেছে। এই সব কুশীলবরা কুখ্যাত ও নিষ্পিত হয়ে আবার ইন্দিরা আমলে আরো বড় বড় পদে অভিযুক্ত হচ্ছেন। এদের মধ্যে পি এস ভিন্ডের দ্বিতীয় পুলিশ কমিশনার হয়েছেন। তিনি আগে

ছিলেন দ্বিতীয় পুলিশের ডি আই জি পদে। এই পদের স্ববাদে তিনি জে এন চতুর্বেদীর জায়গায় এলেন। জনতা আমলে তিনি স্বন্দর হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হন। পরে তিনি আদালতের রায়ে এ দায় থেকে অব্যাহতি পান। ঠিক জী স্ববনস্ কাউর বর্তমানে রাজধানীর রাজনীতিতে এসেছেন। কংগ্রেস (ই) দলের টিকিটে নব নির্বাচিত এম পি হয়েছেন। তাঁর বিপক্ষের লোকেরা তিনেরকে কুখ্যাত ও ইন্দিরাকীর

বেশ কয়েকটি অকংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকার ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। এই সূত্রে আরও জানা গেছে যে, কৌশলগত কারণে ইন্দিরা কংগ্রেসে বিরোধ থাকায় এই সরকার ভাঙার ব্যাপারে কিছুটা দেরী হচ্ছে।

কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই তার নতুন পড়ে রাজ্য সরকারগুলির ওপর। একমাত্র অন্ধ, কণাটক এবং হরিয়ানা বাদ দিলে বাকী রাজ্য সরকারগুলো প্রায় সবই বিরোধীদের দখলে।

কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার রাজ্য স্তরের ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতাদের বুকে এখন সাত হাতের বল। এই সব নেতারা ক্রমাগত ইন্দিরা এবং মঙ্গর গান্ধীকে বুঝিয়ে চলেছেন অবিলম্বে এই সরকারগুলো ভাঙা কেন দরকার।

এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী এবং মঙ্গর গান্ধী বেশ কিছু প্রবীণ নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন। সকলেই একবাক্যে অকংগ্রেসী (ই) সরকার-গুলো ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তবে কিতাবে ভাঙা হবে সে ব্যাপারে বেশ কিছুটা মত-পার্থক্য নেতাদের মধ্যে আছে।

কিছু নেতা মনে করছেন, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে দল বদল ঘটিয়ে সরকারগুলোর নিজেরের কাজ নিয়ে আসাই ভাল। তারপর সুবিধামত সময়ে প্রয়োজন হলে বিধানসভাগুলো অন্তর্বর্তী নির্বাচন করা যেতে পারে। এই সব নেতারা শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

একান্ত সেবক বলে চিহ্নিত করলেও তাঁর পক্ষের লোকেরা বলেন, তিনি ত্রাস কেবল কুখ্যাতদের কাছে। আর দ্বিতীয় ডেঙলপমেন্ট অধরিত্রি প্রাক্তন ভাইস চেরারম্যান এবং শাহ কমিশনে অভিযুক্ত জগমোহন দ্বিতীয় উপরাজ্যপালের পদটি উপহার পাওয়ার জন্ত মনোনীত হয়েছেন। ইনি কোহলির জায়গায় আসছেন। উপ-রাজ্যপালের প্রাক্তন বিশেষ সহকারী মঙ্গর-বঙ্গু নবীন চাওলা—যিনি লাক্ষা শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর নতুন সেল খোলা হচ্ছে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক গোপন নির্দেশে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আইকে একটি বিশেষ সেল খোলার কথা বলা হয়েছে। কালো-বাজারী ও মজুতদার বিরোধী নিবর্তনমূলক আটক আইন সংক্রান্ত যে বিলটি লোকসভার সম্মতি গৃহীত হয়েছে রাজ্য সরকারগুলি ঠিকমত তা প্রয়োগ করছেন কিনা তার প্রতি নজর রাখাই হবে এই বিশেষ সেলের একমাত্র কাজ। ইতিমধ্যেই নাকি সি বি আই কর্তৃপক্ষ এই সেল গঠনের জন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যাতে উপরোক্ত আটক আইনটি যথাযথভাবে প্রয়োগ হয় সেজন্যই নাকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে উপরোক্ত গোপন নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সত্ত সমাপ্ত লোকসভার অধিবেশনে উপ-রোক্ত বিলটি নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত সি পি এম লোকসভা সদস্য জিজ্যোতির্ময় বসু বলেন যে, পশ্চিম-বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই আটক আইন প্রয়োগ করবেন না। বিল

উত্থাপনকারী কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রব বৃথোপাধ্যায় তাঁর জবাবী ভাষণে একরকম প্রায় চমকীর সুরেই বলেন যে, এই আইন কি করে প্রয়োগ করাতে হয় তা তাদের জানা আছে। সম্প্রতি কলকাতা সফর-শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

ইন্দিরা-মেনকার ঠাণ্ডা লড়াই

প্রত্যেক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা নিয়ে মেনকার সঙ্গে ইন্দিরার বিরোধ জটিল আকার ধারণ করেছে। মঙ্গরপত্রীর প্রবল ইচ্ছা, তিনি সরাসরি ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। এবং নিজের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস যে, তিনি ভবিষ্যতে একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হতে পারবেন। শ্রীমতী, গান্ধীর আবার সেখানেই ভীতি। কারণ তিনি বিলম্বণ বোঝেন মেনকা তার স্ব-পুত্রের থেকে অনেক বেশী মেধাবী। অর্থাৎ এককথায় মেনকার বুর্জোয়া ক্যোয়ালিফিকেশন শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

কালোকানুন স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক

যতই দিন থাকে নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে লাগানো-পলেক্টারা ইন্দিরা সরকারের গা থেকে ততই ক্রমশঃ খসে পড়ছে। গণতন্ত্রের পথ ছেড়ে শ্রীমতী পাণ্ডী স্বৈর-তন্ত্রের দিকেই আবার ফুঁকে পড়ছেন। ক্রট যেক্রটিটির জোরে লোকসভার সরকার নিবারক আটক আইন পাশ করে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে চমকি দিয়েছেন যে, রাজ্য সরকারগুলো স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ করতে বাধ্য। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্দেশ্যেই যে মুখ্যমন্ত্রীর বাণটি নিক্ষেপ করেছেন তা সহজেই বোকা যায়। কারণ শ্রীমতী বসুজি হলেন, বাম-ক্রট সরকার নীতিগত ভাবে বিনা বিচারে আটক আইনের বিরোধী। তাছাড়া তিনি মনে করেন চোরা-কারবারী, মুনাফাশিকারী এবং মজুতদারদের শাসনো-করার জন্ত বর্তমান আইনই যথেষ্ট, নতুন আইনের কোনো প্রয়োজন নেই।

মজার বিষয় হল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী চরণ সিং যখন প্রথম নিবারক আটক আইনের প্রস্তাব করেন তখনই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারসমূহ বৈধ করে ক্রটি রাজ্য সরকারের ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল। এবং কংগ্রেস (ই) বা সেদিনকার বিরোধী দলনেতা সি এম ট্রিকেন এই ভাষায় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, চোরা-চালানদার কালোবাজারীদের উপর জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায়ের খাড়াই শাসক পার্টি এ-অভিভাষের আশ্রয় নিলেন। একই অভিযোগ আজ শাসক দল কংগ্রেসের (ই) বিরুদ্ধে ঢেউ তুললে কি অস্তায় হবে? জ্যোতিবাবু কিষ্ট টিক এ আশংকাই করেছেন।

কালোবাজারী মজুতদারদের দমন করার জন্ত আজ আবার নতুন করে আইন রচনার প্রয়োজন পড়ল কেন? অত্যাধিকারী পণ্য আইন তো এ উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। প্রণববাবু সাক্ষী পেয়েছেন যে ওই আইন অপরাধীদের ধরার জন্ত, আর নতুন আইন অপরাধ নিবৃত্ত করার জন্ত। সেই সঙ্গে তিনি এযুক্তিও খাড়া করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যেহেতু পুরনো আইনে ১৭ হাজার মামলা ঝুলছে, সেহেতু নতুন আইন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কি এ-স্বীকৃতিও করে বসলেন না যে, পুরনো আইন একেজো,

তার মধ্যে মজুত ফাঁককোঁকর রয়েছে? একজন ক্যাভিনেটমন্ত্রী যদি তাঁর সরকার রচিত আইনের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেন, তার কার্যকারিতার সম্বন্ধে প্রকাশ করেন, তবে সেই কালোবাজারী মুনাফাবাজ মজুতদাররা সে আইনকে কাঁচকলা দেখাবেই। অর্থনৈতিক অপ-রাধীদের শাসনো-করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা জ্যোতি বসুর বিন্দুমাত্র অনীহা নেই; কিন্তু তিনি কোন নাগরিকই বিনা বিচারে আটক রাখা সমর্থন করতে পারেন না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার এবং গণতন্ত্রের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র প্রজ্ঞা ও আস্থা রয়েছে তারা কখনই শ্রেয় সন্দেহের বশে কাউকে বিনা বিচারে একদিনের জন্তও আটক রাখার নীতি অনুমোদন করতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে বার বার দেখা গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক অপরাধী বা সমাজ-বিরোধী দমনের নাম করে যখনই কালো-কানুন প্রণয়ন করেছেন তখনই তা রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর প্রযুক্ত হয়েছে। কত রাজনৈতিক, শ্রমিক কৃষক নেতা ও কর্মীকে পি ডি অ্যাক্ট, মিসা ইত্যাদি কালো কাহুনের জালে আবদ্ধ করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলখানায় পচানো হয়েছে, নির্ধাতন করা হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে? অথচ একটা কালোবাজারী-কেও জগদ্বিজয়াল নেহরু কখনো জ্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে-ছেন কি? তাঁর উত্তরাধিকারীরাও তাঁর পথই অনুসরণ করেছেন।

অতএব জনমত অগ্রাহ্য করে (মনে রাখা সরকার, কংগ্রেস (ই) মাত্র ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে কেন্দ্র সরকার গঠন করেছে, অধিকাংশ ভোট তাঁর বিরুদ্ধেই পড়েছে) নিবারক আটক আইন পাশ করা হল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োগ হবে না ঘোষণা করে জ্যোতিবাবু গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের প্রতিই তাঁর অবিচল প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সংঘর্ষে লিপ্ত হবার প্রস্তাব এখানে ওঠে না, প্রস্তাব অবশ্যই গণতন্ত্র বনাম স্বৈর-তন্ত্রের। বিনা বিচারে আটক রাখার কালো কাহুন ও গণতন্ত্র—এই দুই পরস্পরবিরোধী নীতির, শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান কখনই, কোথাও সম্ভব নয়।

এন কে সিং

১ম পৃষ্ঠার পর

কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সি বি আই মহলই এই আবেদনের কথা ফাঁস করে দিয়েছে। সি বি আই মহলের বক্তব্য হল, কর্তব্য সম্পা-দনের জন্ত বর্তমানে একজন অফি-সারকে হস্তগত করা হচ্ছে। এরকম হলেন ভবিষ্যতে কোন অফিসারই চাকর্যাকর মামলার তদন্তকার হাতে নেবেননা। ইতিমধ্যেই প্রায় শ' কয়েক সি বি আই অফিসার লিখিত-ভাবে শ্রীসিংকে গ্রেপ্তার করার প্রতি-বাদ করেছেন এবং নিন্দা করেছেন। সি বি আই অধিকর্তা শ্রীআর কে পুরমের সঙ্গে বৈঠকে কয়েকজন সি বি আই অফিসার এই ঘটনার বিরুদ্ধে নোডার হয়ে ওঠেন।

শ্রীসিংকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে ইতিমধ্যেই হরিয়ানা সরকার যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খরাস্ট্র এবং আইনমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত বিবৃতি সরকারকে বেশ জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে। যদি সরকার স্বীকার করেন যে, শ্রীসিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাহলে সংসদে অসত্য তথ্য সরবরা-হের দ্বারা আইন এবং খরাস্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ উঠবে। আর যদি সরকারীভাবে বলা হয় যে, শ্রীসিংকে আটকো গ্রেপ্তার করা হয়নি তাহলে স্বভাবতই হরি-য়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে অপহরণ সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতে পারে। শ্রীসিংকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একথা কোন মহল থেকেই অস্বীকার করা হয়নি।

সাংবাদিকদের এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর যুগ্ম অধিকর্তার উপ-স্থিতিতে শ্রীসিং হরিয়ানার পুলিশ অফিসারদের বলেছেন যে, যদি তাঁর বিবৃতি নথিভুক্ত করার জন্তই তাঁকে তাঁদের প্রয়োজন, সে কাজটাতো তাঁর বাড়িতে বসেই করা যেতে পারত। তাছাড়া একাধিক কারার একটা নিয়মও আছে। তা হল এই যে, শ্রীসিংকে নোটিশ দিয়ে বলা চলত থানায় হাজির থাকবার জন্ত। সেরকম কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি।

সি বি আই-এর অফিসার শ্রীকে পি সিং আশঙ্কা করেছিলেন যে, হরত শ্রীএম কে সিংকে হরিয়ানায় নিয়ে গিয়ে দৈহিক নির্ধাতন করা হবে। সে কারণেই তিনি হরিয়ানা পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করে গুরগাঁওয়ে গিয়েছিলেন নিজে গাড়ি চালিয়ে। তিনি থানাতে হাজির ছিলেন এবং শ্রীএম কে সিংয়ের ব্যক্তিগত জামিননামার সাক্ষী হিসাবে

সহি করেন। জানা গেছে যে, এই সব কথা শ্রীকে পি সিং হস্তাক্ষর করে বলতে রাজী।

খরাস্ট্র এবং আইন মন্ত্রক এবং সি বি আই মন্ত্রকের খবর হল নতুন সর-কার ক্ষমতার বসার পর সরকারী কৌশলি বাম জেষ্ঠমালিনীকে সরিয়ে দিয়ে তার আয়দায় শ্রীযোগিন্দার সিং ওয়াসকে বসাবার পরই নাকি কিসসা মামলার তদন্তকারী অফিসার শ্রীএন কে সিংকে নানা কারণে হস্তগত করা হতে থাকে। এখন কিসসা মামলা চলছে হুদ্রী কোর্টে। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীএন কে সিংকে ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্ব-বাপার। কেননা মামলার এই পরিস্থিতিতে তদন্তকারী অফিসারকে ছুটিতে যেতে বলাটা বিস্ময়জনক।

ইতিমধ্যেই শ্রীএন কে সিং দিল্লী হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবে-দন করেছেন। বিচারপতি শ্রীজে ডি জৈন আবেদন অনুসারে হরিয়ানা সরকার এবং দিল্লী প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শ্রীসিংকে যেন গ্রেপ্তার না করা হয়। পরবর্তী দিন খার্ব হয়েছে ৮ই ফেব্রুয়ারী।

আবেদনে তিনি বলেছেন যে, কিসসা মামলার তদন্তকারী অফি-সার হিসাবে মাকতি কোম্পানির ড্রাইভার, শ্রীরাঘবচন্দ্র বিবৃতি নথি-ভুক্ত করা হয়। উক্ত ড্রাইভারের ভাইপো ১৯৭৭ সালের যে মাসে গুরগাঁও থানায় একটি ডায়েরী করেন।

কুখ্যাত অফিসার

১ম পৃষ্ঠার পর

সীপে বদলি আছেন তিনিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ বকশিস হিসাবে পাচ্ছেন। এই পদটি হল নতুন দিল্লীর মিনিউনিপ্যাল কমিটির সভাপতির চেয়ার। যে পদে অধিষ্ঠিত ছাবড়া ছুটিতে চলে গেছেন। এম এন বাব ফিরছেন দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথ-রিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে। সি বি আই-এর ডিরেক্টর আর ডি সিংএর বদলে আসার কথা কে এন প্রদাদের। যিনি সেদিনের জরুরী অবস্থার সময় তথ্য দপ্তরের অফিসার ছিলেন। নতুন প্রিন্সিপাল ইনফর-মেশন অফিসার হচ্ছেন ইন্দিয়ার প্রেস সেক্রেটারী সারদা প্রসাদ। এছাড়া সি বি ডোহার এবং সি আর টামটাও বিশেষ পদে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে চলেছেন। সি-বি ডোহার হরত ক্যাভিনেট সেক্রেটারী হতে পারেন। এখানকার সেক্রে-টারী এন কে মুখার্জী ছুটিতে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত।

বিশেষ জেল

১ম পৃষ্ঠার পর

কালো বৈধ করে ক্রটি সভার প্রণব-বাবু তাঁর লোকসভার প্রস্তাব বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, তদুদ্যম লোকসভার পাশ হয়ে গেলেই কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। রাজ্যসভা থেকেও তা পাশ করানোর প্রয়োজন রয়েছে। সর্বো-পরি রয়েছে রাষ্ট্রপতির সম্মতি। তবেই তা আইন হিসাবে কার্যকর করা চলে। কালোবাজারী ও মজুত-দার বিরোধী নিবর্তনমূলক আইন লংকান্ত বিলটি লোকসভাতেই কেবল পাশ হয়েছে। রাজ্যসভার পাশ হয় নি। তাই এটি এখনও আইন

হিসাবে গ্রাহ্য করা চলে না। সি পি এম পলিটব্যুরোর সদস্য এবং পশ্চিম-বঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তও এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন।

তথ্যাত্তিক মহল মনে করছেন যে, হরত উপরোক্ত আইনটি সাম-গ্রিক ভাবে কার্যকর করার জন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে একটি অডিটাল জারী করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, চরণ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন তদারকী সরকারের আমলেই রাষ্ট্রপতি এক অডিটাল জারী করে উপরোক্ত আটক আইনটি চালু করেছিলেন। ইন্দিরা সরকার এসে সেটিকে বিল হিসাবে লোকসভায় পেশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরল সরকার যে, এই আইন কাজে লাগা-বেন না একথা কেন্দ্র ভাল করেই বুঝতে পারছেন। আশংকা করা হচ্ছে যে সি বি আইয়ের প্রস্তাবিত বিশেষ সেলটিকেই বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হবে এই আইনটি প্রয়োগ করার জন্ত। তদন্তকার এবং আট-কের অধিকারও তাদের হাতেই থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উপরোক্ত বিলটি নিয়ে লোক-সভার আলোচনাকালে বিরোধী লহন্তরা ঘাণধীন ভাষায় এর বিরো-ধিতা করেছেন। বিরোধীদের মতে এই আইন রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর প্রয়োগ করা হবার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ইন্দিরা কেন রাজ্য সরকারগুলো ভাঙতে চান

তপন বসু

দেশব্যাপী বিতর্কের গুঞ্জন হল, কেন ইন্দিরা গান্ধী চক্রান্তমূলক উপায়ে বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলোকে উল্টে দিচ্ছে, নতুন করে নির্বাচনের নামে প্রহসন আর কারচুপির খেলাটা অবিলম্বে সেয়ে নিতে চান? আর সেই মওকাদা বাজারী পত্রিকা-গুলোর শৃংখলায় তার দৃঢ় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের দল প্রশংসা পাবার যুগ্য জালসা, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য (১) আর অসামান্য আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করে চলেছে যে, রাজ্যসভার নিজের দলের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচন অস্থগত সমাপ্ত করতে চান। শাসক শক্তির আপাদমস্তক জটিল সংকটকে আড়াল করার অক্ষম এই প্রচেষ্টাকে নজীরহীন, ভণ্ডামী আর প্রতারণা আখ্যা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পার্লামেন্ট-শোভন ভাষা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

আসল ব্যাপারটা হল শাসক শ্রেণীর মধ্যকার তীব্র-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এমন একটা কাটল সৃষ্টি করেছে যার মধ্য দিয়ে আসল সত্যটা বেরিয়ে পড়ছে। ইন্দিরাগণী নিজেও বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতবর্ষের বুজোরাশ্রয়ী আর তাদের শাসন অপরিবর্তিত রাখতে পারবে না। আর সেই কারণে দলত্যাগ বিরোধী আইন পাণ করে তিনি নিজ শাসনকে যতটা সম্ভব দীর্ঘায়ী করার চেষ্টা করছেন। তবে সমস্ত রকম ভয়াবহতা ও ছঃখদর্পণের কারক হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্সিবাধ কমবেশি এই উপকারটা করে থাকে যে, সমাজহেদের বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠান-গুলোতে যা কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত জীর্ণ ও বৃত্ত ক্যান্সিবাধী আক্রমণ তাকে নির্মমভাবে প্রকট করে তোলে, তার মুখোশ খুলে দেয়, তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

ইন্দিরার জুয়ুয়াহী নতুন করে শুরু হবার পর থেকেই সূচিত হয়েছে একের পর এক আক্রমণ। প্রেস কমিশন বাতিল হয়েছে। মিনা, ডি, আই, আর, পুনরায় চালু করার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। শ্রমিক কর্মচারীদের বোনাস বাতিল করা, বাধ্যতামূলক জমা প্রকল্প চালু করা, স্বেচ্ছামূলক অবসরগ্রহণ নিয়ে সরকারী ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। নিজের দলের দুর্নীতিপরায়ণ লোক-গুলোর বিরুদ্ধে গঠিত সবকটা কমিশন বাতিল করা হয়েছে। সব-থেকে উল্লেখযোগ্য হল, চরণ সিং,

মোরারজী দেশাই, জগজীবন প্রতুতির পরিবার পরিভ্রমের ওপর প্রতিহিংসা-পরায়ণ আক্রমণের রু-প্রিন্ট করা শুরু হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই চিনি, ইম্পাত, দস্তা, লিমেন্ট, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদির উৎপাদন যথাক্রমে ৫০% থেকে ৫৫%, ৫০% থেকে ৬০%, ৪০% থেকে ৪৫%, ১০%, এবং ৫০% থেকে ৬০% হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯ লাখের ভিত্তিমূল্যের তুলনায় এই অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই প্রাইস ইনডেক্স নাম্বার হল ১৩৯। বাজার দর আকাশচুম্বী। অথচ নির্বাচনের আগে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নির্বাচনী তহবিল বাবদ কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে আর তাদের কাছে প্রতিশ্রুতির ফাল্গুন ওড়ানো হয়েছে। স্বতাবতই এর পর মনোপলি হাউসগুলোর মজির ওপর বাজারদর নির্ধারণ করার দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আর একটা পর্বত প্রমাণ করে বোঝা জনসাধারণের কাঁধের ওপর চাপবে। তা হল, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফ্রিকার শূন্য, দক্ষিণ পশ্চিম

এশিয়া, ইন্দোচীন ও মধ্যপ্রাচ্য সহ সূ-পৃষ্ঠের এক বিরাট পরিধি জুড়ে বাজার দরগুলোর আক্রমণ শুরু করার ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া তার নয়া উপনিবেশগুলো থেকে কোটি কোটি রুবল আদায় করতে বন্ধপরিকর। স্বতাবতই ভারতও তা থেকে ছাড় পাবে না। বিশেষ করে ১৯৭১ সালে মৈত্রী চুক্তির নামে ভারত-সোভিয়েট দাম্রিক চুক্তির বলে সোভিয়েট প্রশাসন তার দেশের মরচে ধরা সাবেরিকি অস্ত্রগুলো ভারতকে কিনতে বাধ্য করবে এবং অজুহাত হিসাবে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন এই অসার যুক্তিতর্কের অবতারণা করার চেষ্টা করবে। সুতরাং ইন্দিরাকেও 'চার পাহাড়ের' মত ভারী ট্যাক্স আদায় করে জন-গণের কঠরোধ করার জন্য কোমর বেঁধে আসতে নামতে হবে।

অতএব মার্চ মাসে বাজেট অধিবেশনের আগে সরকার ভাঙা আর নির্বাচনের পালা শেষ করে না নিলে শ্রীমতীর ভবিষ্যত অন্ধকারা-চ্ছন্ন।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে ই-কংগ্রেস সমর্থকদের সন্ত্রাস ও হামলা

কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার কায়ম হবার পর থেকে কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থকরা বিভিন্ন উল্লাসে মত্ত হয়ে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন সৃষ্টি করেছে এবং হামলাবাজী শুরু করেছে বলে দর্পণের সংবাদ-দাতারা জানাচ্ছেন।

চিত্তরঞ্জন থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, একদল ছাত্র পরিষদ (ই) সমর্থক ও কর্মী কলেজ ছাত্র সংসদ জোরপূর্বক দখল করার জন্য স্থানীয় কলেজে হামলা চালায়। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ও সমর্থকরা খবর পেয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত হবার কিছু পরে গোলমালের আশঙ্কায় পুলিশ আসে। তারপরে আর ছাত্র পরিষদ (ই) নামধারী হামলাবাজরা হামলা করার লাহল পায়নি। তবে তারা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের দেখে নেবে বলে শাসিয়ে গেছে।

রাইনা থেকে পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী কংগ্রেস (ই) দলের গুণ্ডাদের টাড়ির আঘাতে কেওড়া গ্রাম

নিবাসী শিবু সাতরা নামে এক ক্ষেতমজুর গুরুতর আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাস-পাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পুলিশ ও জনকে গোপন করেছে। কয়েকজন পলাতক। বড় বৈদ্যনাথ এলাকার কৃষক সমিতির সম্পাদক শ্রীমণী কোডার এবং তার

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

আটক আইনের সুবিধা নিয়ে পুলিশ ও আমলারা টাকা বোজগার করবে

মাবারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দল কেন্দ্রীয় মনমদে বসার পরেই চরণ প্রবর্তিত নিবর্তন-মূলক আটক অর্ডিন্যান্সি আইনে পরিণত করার কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের একশ্রেণীর মাবারি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে-ছেন।

এঁরা বলেছেন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের এই নতুন আটক আইনের বলে তাঁদের নেকড়ের মুখে ছেড়ে দেওয়া হল। এঁরা নেকড়ে বলতে একশ্রেণীর কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসার ও পুলিশকেই ইঙ্গিত করে-ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যদিও বলেছেন কেন্দ্রের এই নতুন আটক আইন এই রাজ্যে চালু করা হবে না তথাপি একশ্রেণীর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আইনের ফাঁকফাদে তুলে বা দোহাই দিয়ে তাঁদের মানাভাবে হয়রান করবে

বলে তাঁরা অস্থম্বান করছেন। তাঁদের অস্থম্বানের সপক্ষে তাঁরা বলেছেন যে, তাঁদের শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে হয়। শিল্প স্থাপন লাইসেন্স সংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে এক্স-পোর্ট ও ইমপোর্টের ব্যাপারে সরকারী অস্থমতি, ইনকাম ট্যাক্স, কেন্দ্রীয় শুল্ক এবং আবগারী বিভাগের কাজকর্ম এবং কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে কেন্দ্রের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই কেন্দ্রীয় সরকারের নানান কাজের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁদের হয়রান করা হবে। তাছাড়া, কল-কাতায় যারা বিভিন্ন পণ্যবোঝার ব্যবসা করেন তাঁদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভিন্ন রাজ্যের উপরে নির্ভর করতে হয়।

কাপড়, সুতো, চিনি, জবণ, তেল, মশলা এবং আরো বহু জিনিস প্রধানতঃ ভিন্ন রাজ্য থেকেই এ রাজ্যে আমদানী করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের একাংশ ভিন্ন রাজ্যের যে কোন অশ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ব্যবসায়ীদের হয়রান করতে পারবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা শুধু কংগ্রেসে (ই)র উপরেই খাপ্পা হন নি, তাঁরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংয়ের উপরেও চরণ কোত্ত প্রকাশ করেছেন।

চরণ, চরণ সিংয়ের দল এবং কংগ্রেসে (ই)র নির্বাচনী তহবিলে তাঁদের সাধ্যাভ্যাসী "দান" দিতে হয়েছে।

উত্তর দলেরই কথা ছিল যে, নির্বাচনে জিতে এলে দাতারা ওই দানের ভাষা "প্রতিদান" পাবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, চরণের দল যদিও নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেছে, তথাপি ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল কেন্দ্রে ক্ষমতা পেয়ে তাঁদের কথার খেলাপ করেছে এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন পাশ করে সঙ্গে সঙ্গেই একটি মারপাছ তৈরী করেছে।

ওই শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী মহল আরো বলেছেন যে, ঐ মারপাছ বৃহৎ শিল্পপতি বা বড় ব্যবসায়ীদের ওপরে কোনদিনই প্রয়োগ হবে না। কারণ, শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

চোরাচালানি ও অন্যান্য অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য শিলিগুড়ি শহর

আগলারদের কল্যাণে স্থানীয় বাজার বিদেশী দ্রব্যে ছেয়ে গেছে এমন একটি মহকুমা শহরের নাম শিলিগুড়ি। এই মহকুমার হাজার হাজার মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন দু'পয়সা রোজগারের আশায়। পুলিশ এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের খানাতারানি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছেনা। বরং দিনে দিনে আগলিং বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে যে, আগের তুলনায় বর্তমানে আগলাররা অনেক বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই শহরে আগলারদের মধ্যে প্রায়ই অন্তর্দলীয় লড়াই হয়। সেই লড়াই প্রায়শই দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিণত হয়ে থাকে।

শিলিগুড়ি শহরের এবং আশ-পাশের গ্রামের বেকার যুবকরা এবং সুন্দরী যুবতীরাও আগলিংয়ের কাজে নেমে পড়েছেন। এই কাজকে তারা সহজ এবং লাভজনক পেশা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রয়েছে ছোট-বড় স্থানগত আগলার দল। নকশালবাড়ির কিছু ঘুরে মেচী নদীর তীর বরাবর ৫০ মাইল বিস্তৃত ভারত-নেপাল সীমান্ত। এই সীমান্ত অঞ্চলের প্রায় সবটাই অরক্ষিত। তাই কোনরকম বাধা ছাড়াই এপার থেকে এপারে মানান ধরনের জিনিসের আনাগোনা হয়। নেপাল থেকে এপারে চলে আসা দ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া কাপড় চোপড় বা পোশাকই বেশি। তাছাড়া আসে রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, কলম এবং লেডিস ছাতা। চোরাপথে আমদানী করা এইসব মূল্যবান বিদেশী সামগ্রীর ক্রেতা বা গ্রাহীতা বনে আছে শিলিগুড়ি শহরে। পরে সেইসব দ্রব্য আবার চোরাপথে চালান হয়ে যায় ভারতের অন্তর্ভাগে। এমন কি বাংলাদেশেও। প্রকৃত দিবালোকে সকলের চোখের সামনেই চলছে এই অবাধ চোরাচারবার।

নকশালবাড়ি এলাকার মনিরাম গ্রামপকারেতের প্রধান ভাষ্যমান এই প্রতিবেদককে বলেন যে, আগলিং এই অঞ্চলের যুবক যুবতীদের নৈতিক

অধঃপতন ঘটানো। আইন শৃঙ্খলার অবনতি হবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষ এই পেশার প্রতি বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছেন কারণ অর্থ রোজগারের এত সহজ পথ আর হয় না। কোন কোন জায়গায় নকশালবাড়ি থেকে সীমান্তের দূরত্ব তিন মাইল বা তারও কম। শয়ে শয়ে গ্রামবাসী স্বর্ষোদয়ের আগেই সীমানা পেরিয়ে নেপালে চলে যায় আর থলে বোকাই বিদেশী দ্রব্য নিয়ে ফিরে আসে আটটা বাজার আগেই। সকাল সোয়া আটটার পানিঘাটা মোড় থেকে প্রথম যে বাসটি শিলিগুড়ি ছাড়া করে সেই বাস ধরে ওপার থেকে নিয়ে আসা জিনিস নিয়ে এই আজব পেশায় নিযুক্তরা রওনা হয় শিলিগুড়ি। মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে দাম অথবা কমিশন বুকে নিয়ে ফিরতি বাসে চলে আসে।

মজার কথা হল, যে পানিঘাটা মোড় থেকে এই সব চোরাই চালানিরা বাসে ওঠে সেখান থেকে নকশালবাড়ি থানার দূরত্ব মাত্র দেড়শত গজ। পুলিশ নিশ্চয়ই অন্ধ নয়। খবরও তারা রাখে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশের মাকের ডগা দিয়ে এই কারবার চলছে।

যদি আপনার কোন বিদেশী জিনিসের দরকার হয়, সকাল আটটার আগে চলে যান পানিঘাটা মোড়ে। পেয়ে যাবেন। আশ্চর্যকর কম দামে। বাসগুলি চোরাপথে নিয়ে আসা বিদেশী দ্রব্যে বোকাই থাকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক দলের কর্মীদের অভিযোগ, সিমেন্ট, কেরোসিন তেল জাতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চোরাপথে নেপালে চালান হয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে সিমেন্টের আকাল থাকলেও প্রায় প্রতিদিনই ট্রাক ট্রাক সিমেন্ট সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে পাচার হচ্ছে।

পুলিশী স্তরের খবরে জানা যায় যে, গোপন চেষ্টার সহ একটি ট্রাককে পুলিশ অতি সত্ৰতি বাজেয়াপ্ত করেছে। গত দেড় বছরে বহু বিদেশী দ্রব্য ছাড়াও প্রায় এক লক্ষ টাকার

বস্ত্র পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে চোরাচালানীদের কাছ থেকে। প্রায়ই পুলিশ ইতস্তত খানাতারানি করেছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের বাজেয়াপ্ত বিদেশী দ্রব্য শিলিগুড়ি এবং নকশালবাড়ির কাস্টম কর্তৃপক্ষের গুদামে পড়ে আছে। এই সব গুদামেও নাকি মাঝে মাঝে চোরাচালানীরা হানা দেয়। কিছুকাল আগে নকশালবাড়িতে অবস্থিত কাস্টমস কর্তৃপক্ষের গুদামে চোরাচালানীরা হানা দিয়ে প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা মূল্যের বাজেয়াপ্ত দ্রব্য লুট করে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের অধিকাংশই নাকি পুলিশ উদ্ধার করেছিল।

পুলিশ বাহিনী বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহরের পুলিশ কর্তৃপক্ষ আগলার এবং অন্যান্য অপরাধীদের মোকাবিলা করতে প্রায় অক্ষম বললেই চলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশেরই জরনৈক মুখপাত্র এই প্রতিবেদককে বলেন যে, তাদের লোকবল কম থাকায় আগলার এবং স্থানীয় অপরাধীদের দমন করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শিলিগুড়ি শহরে যে খানাটি আছে তার লীমানা বা এলাকা হল নব্বই বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় তিমলক্ষ। থানার স্টাফ: একজন ইন্সপেক্টর, দশজন সাবইন্সপেক্টর, দশজন সহকারী সাব ইন্সপেক্টর এবং মাত্র আঠারো জন কনস্টেবল। এই শক্তি নিয়ে আগলারদের দোরাখ্য এবং স্থানীয় অপরাধ দমন করা প্রায় অসম্ভব বলেই পুলিশ মহলের প্রবীণ কর্মচারীরা মনে করেন। সব থেকে অসুবিধার সৃষ্টি করে যে বিষয়টি তা হল এই যে, শিলিগুড়ি শহরের অধাংশ জলপাইগুড়ি থানার অধীন। শিলিগুড়ি শহর থেকে জলপাইগুড়ি থানার দূরত্ব ২৫ মাইল। সেখানকার হুবহু অবস্থায় অপকর্ম করতে সাহস পায় কেননা তারা এটা ভাল করেই বুকে গেছে যে, জলপাইগুড়ি থানা এলাকার অপরাধ করলে স্থানীয়ভাবে শিলিগুড়ি থানার কিছুই করণীয় নেই। তাছাড়া লোকে ২৫ মাইল দূরে অভিযোগ দায়ের করতেও যায় না।

পুলিশ মহল অবশ্য একথা স্বীকার করেন যে, শিলিগুড়ি শহরে এবং সমগ্র মহকুমার অপরাধের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৭৮

সালে ১০টি খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৭৯ সালে খুনের ঘটনা ঘটে ২২টি। ডাকাতি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনাও বাড়ছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহর, ফানিহেওরা এবং নকশালবাড়ি এলাকায়। কোন কোন মহলের মতে অপরাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এবারকার রেকর্ডভুক্তকারী থানা। তাদের মতে চাবাগানে এবং ক্ষেতখামারে কাজ প্রায় না থাকায় অবস্থার প্রতিকরা বাচার তাগিদে অপরাধ করছে।

শিলিগুড়ি শহরে বেড়াতে গিয়ে যে কোন মানুষ প্রকৃত দিবালোকে ঘটে যাওয়া রোমহর্ষক অপরাধের বেশ কিছু বিবরণ শুনেতে পাবেনই। শুনেতে আমাকেও হয়েছে।

জেলা কর্তৃপক্ষের মতে এই অঞ্চলে কোনরকম রাজনৈতিক উত্তেজনা নেই। তবুও দাঙ্গা হয় এবং সেই দাঙ্গা বারাক্রমে তরা হয় প্রত্যক্ষভাবে না হয় অপ্রত্যক্ষভাবে আগলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিছুদিন আগে জনবহুল হিলকাট রোডে একটি হোটেলের বিক্রয়লব্ধ লম্বা টাকা দিনতপুরে বন্দুকের মুখে লুট হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যার পর দোকান পাট খোলা রাখাকে নিরাপদ মনে করেন না।

স্থানীয় মানুষ সবসময়েই একটা আতঙ্কে ভোগেন। এই বৃষ্টি কিছু হল। কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীও এখানকার মানুষ হতে চাননা। কেননা প্রত্যক্ষদর্শী হলেই থানায় যেতে হবে দাকী দিতে আর দাকী দিলে তার পরদিন বে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবেনা তার গ্যারান্টি কোথায়? একটি ঘটনায় এক দোকান লুট হল কিন্তু পুলিশের কাছে পুষ্টিত দোকানের কোন কর্মচারীই দাকী দিতে রাজী হলনা প্রাণভয়ে।

শিলিগুড়ি শহরটা একবার চক্কর দিয়ে এলেই যে কোন মানুষের পক্ষে বুকে ওঠা হয়ত অসম্ভব হবেনা যে, এই শহরে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। প্রকৃতই চোলাই মধু বিক্রী হয়। তাই থেয়ে রাস্তায় মাতলামি এবং মারামারি লেগেই আছে। স্বাধীনতার পর থেকে অধ্যাবধি এই শহরের জনসংখ্যা অমেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরও বেড়েছে, বেড়েছে পাকাবাড়ি। কিন্তু কোন কিছুই যেন ছিঁচি নেই। সবই কেমন যেন থাপছাড়া। অসু-মোহিত কাঠামোতে গোটা শহরটা যেন ছেয়ে গেছে। কোন কিছুই যেন মানে হয়না। কোন কিছুই বোকা যায়না। যেমন বোকা যায়না বেকার ছেলের পরণে বহুমূল্য পরি-

ধের দেখে যে, এই জিনিস সে পেল কোথায়। বহু দোকানেই পেছনের দরজা দিয়ে আগলিং করা জিনিস বিক্রয় হয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহর থেকে এই শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তুলনামূলকভাবে বেশ বেশি। ডাক্তারদের কিন্ অত্যধিক। চাশিরও এই শহরের অর্থনীতিকে অনেকাংশে চাঙ্গা রাখে। এই অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীর অভাবে কলে টাকা-কড়ির লেনদেন একটু বেশি। যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল: সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, সীমান্ত রক্ষা বাহিনী, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ এবং প্রতিরক্ষা ও পোয়েন্সাবাহিনীর অন্যান্য শাখার নীলামগুলি। এই নীলামকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে বেশ কিছু টাকার লেনদেন হয়।

শিলিগুড়ি শহরের রাস্তাঘাটও বেশ জ্যামজমাট হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিকেলের এবং সকালের দিকটার হিলকাট রোড বাস, ট্রাক ট্যাকসি এবং রিকশার বোকাই থাকে। এমনতেই এই রাস্তা জনবহুল। অবস্থাটা যে কি হয় তা সহজেই অসুধের। অভিযোগ যে, এই শহরের হাজার হাজার রিকশাই নাকি অসুস্থমোহিত। কিন্তু এই থানার ট্রাকসি কনস্টেবল আছেন মাত্র নয় জন। তাদের পক্ষে এই শহরের রাস্তাঘাট সামলানো সহজ নয়।

তাছাড়া শিলিগুড়িকে দার্জিলিং এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার বলা হয়। রাষ্ট্রীয় অতিথি, সরকারী পদাধিকারীরা এবং বিদেশী পর্যটকরা অহরহ এই শিলিগুড়ি শহরকে ঘুরে বান। বিগত দু'বছরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অন্তত চারবার এই শহরের ওপর দিয়ে গেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালতো অহরহই আসছেন। তখন পুলিশকে এই লব উচ্চপদাধিকারীর নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হয়, কলে দৈনন্দিন যে কামেলা তাদের পোয়াতে হয় তাতে কাক থেকে যায়।

শিলিগুড়ি শহর যেন একটা খুঁড়ে ভারত। এমন কোন সস্ত্রদায় নেই যাদের বাস এই শহরে নেই। যাদের অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে এই শহরে এসে আশ্রয় নেয়। জায়গা বা দেশ বলতে এখন এই শহর। এই শহরে ঘুরতে এলে যে কোন মানুষের পক্ষে বুকে অসুবিধা হবেনা যে, এই শহরে টাকা হাওয়ার উড়লেও জীবন বলে বস্তুটিকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

সমুদ্রের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য
বিশ্বনাথারী ও এগ্রিকালচারাল ফার্ম (প্র.) লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহ স্ট্রেন, গো. বালী. হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০২৫ ও ৬৪-২৪৪৬
ফার্ম: বৈদ্যনাথী - হুগলী
দিল্লী রোড ও জয়দেবপুর রোডের সংযোগস্থলে
ব্রাঞ্চ: মেওজফুলী হুগলী
ফোন: ৬৬৮/৩৭৭

অর্থনীতি

ইন্দিরার দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

১৯৮০ সালে আমরা ভারত-বাসীরা এমন এক কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত করেছি যে সরকার অবিলম্বে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে বড় বড় কাগজে দামী দামী বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি বলে ভোট চাওয়া হয়েছিল। জনতা ও লোকদল কি করতে পারে আমরা তা দেখেছি। সুতরাং আমরা ইন্দিরা কংগ্রেসকেই ফিরিয়ে এনেছি। যদিও অতীতে গরিবী হটানোর প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করে নি, (বরং তাদের লক্ষ্য গরিবী বেড়ে গেছে) তাই আমরা এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না যারা সারা ভারতে সরকার গঠনে সক্ষম এবং অতীতের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। কেবল, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় যারা সরকার গড়েছেন তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আছে, তারা জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করেন বলে স্বনাম অর্জন করেছেন, কিন্তু সারা ভারতে তাদের সরকার গঠনের মত শক্তি এখনই নেই। সুতরাং আমরা তাদের শক্তিশালী বিরোধীদের সূক্ষ্ম পালনের ক্ষেত্রে ভোট দিয়েছি।

কিন্তু আসল কথা দাম কমানো। আসল না হোক পরলা কথা। নির্বাচনের আগে তারা দেশে তীব্র খরা। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের জল, বাল-বাচ্চা গরু বাছুর জোড়ানমরদ সবাই শুকিয়ে গেছে। তখন নির্বাচন। জিজ্ঞেস নেই, ক্ষেতে কলের লাঙ্গল চলে না, ক্ষেতে পাম্প করে জল দেওয়া যায় না। কেরোসিন নেই, ঘরে গায়ে আলো জ্বলে না। ছোট ছোট সেচের পাম্প বন্ধ। তখন এলো ভোট। বুঝতেই পারেন দেশের মানুষ ভিত্তিবিহীন হয়ে কাকে ভোট দেবে? তাই ইন্দিরা কংগ্রেস জিতেছে, সরকার গড়েছে।

এবার দাম কমানো হবে। কমাতেই হবে। কারণ আমরা যারা ভোট দিয়েছি তারা স্বামী সরকার এসে কড়া হাতের মোক্ষ দাওয়াই দিয়ে দামের রশিটাকে টেনে নামাবেন আশা করেই দিয়েছি। আমাদের কাজ আমরা করেছি এখন তাদের কাজ তারা করুন। সরকার বানিয়ে দিয়েছি এখন সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখুক।

কিন্তু নমুনা দেখে ক্রমশঃ ভরসা হারিয়ে ফেলছি। ভোট দেবার আগে চিনি পাওয়া যেত ৩-৮০ পয়সা

কিলো, সরকার হবার ১৫ দিনের মধ্যে ৫-২০ হয়েছে। লাবান, দেশ-লাই, কাগজ, তেল, কাপড়, লবণ সব কিছুই দাম বেড়েছে। কেরোসিন ডিম্বেলের তো পাতাই মিলছে না। মাছ মাংস দুই থাক, একমুঠো ছুন-ভাতও শেষ পর্বত জুটে কিনা জানি নে। রাজ্য সরকার রেশনে ডাল দিতেন তাই ডাল পাওয়া যেত তিন টাকা কিলো। দেশলাই ১২ পয়সা একটি, রেপসীড তেল সাড়ে আট টাকা কিলো। এখন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না। সারা ভারতের নেত্রী নাকি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালার মানুষ খোলাবাজারের সুবিধে থেকে বঞ্চিত হোক সেটা চান না। তাই মাঝে মাঝে বামপন্থী রাজ্য সরকারকে বিনাবাজার জিনিসপত্র কিনে রেশনে বিলি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। সারা দেশে যে দুর্গতি চলছে, পশ্চিমবঙ্গ, কেরাল ও ত্রিপুরার মানুষ তা থেকে কেন বঞ্চিত হবেন? সুতরাং দাম কমানোর আগে জিনিসপত্র যাতে একদম না পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপর দাম কমানোর দরকার হবে না। যে জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল না, তা একটু বেশি দাম দিয়ে ভারতের গরীব লোকেরা খুশী হয়েই কিনবেন। দাম কমানোর দাবি না করে যে কোন দামে জিনিসপত্র পাবার দাবী জানাবেন। দাম কমানোর কোন প্রসঙ্গই উঠবে না। গত ত্রিশ বছর ধরেই এ নিয়ম চলে আসছে।

ত্রিশ বছর ধরে বলছি কারণ আজ যারা কেন্দ্রে ক্ষমতার বসেছেন, গত ত্রিশ বছর তারাই ক্ষমতায় ছিলেন। মাঝখানে মাত্র আড়াই বছর তারা বমবাসে গিয়েছিলেন। এখন ফিরে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের মুখে বলেছেন গত আড়াই বছরে দেশের অর্থনীতি ভেঙেচুরে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। তার আমলে ত্রিশ বছর ধরে যে অপূর্ণ নিখুঁত অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়েছিল মাত্র আড়াই বছরে নাকি সেই ইমারত ধসে পড়েছে।

অর্থনীতিকে ইমারতের সঙ্গে কাউকে তুলনা করতে শুনি নি। কারণ অর্থনীতি একটা বিরাট বিহীন, গতিশীল প্রক্রিয়া। এই অর্থনীতি উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের নিরিখে পরিমিত। সঞ্চয়, বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বিনিময় ও মুদ্রা ব্যবস্থা

এই অর্থনীতিকে সচল রাখে। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, অর্থনীতিকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করা যায়, কিন্তু অর্থনীতিকে নয়। অর্থনীতির কতগুলি নিয়ম নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ, অপরিবর্তনীয়। যেমন বজ্রাধাবন, ভূমিকম্প, বৃষ্টি এগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা। মানুষ কোনদিন হয়তো এগুলিকে বন্ধ করতে পারবে না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বজ্রাধাবন ধরে রাখা, ভূমিকম্পের অগ্রিম সতর্কতা জ্ঞাপন, ভূমিকম্প নিরোধক গৃহ সেতু ইত্যাদি নির্মাণ, এসব মানুষই করে থাকে। মানুষ যেমন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তেমনি সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ বেঁচে থাকার জন্তেই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু যে সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ কোন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব থেকে তারা

রাজনীতি

১৯৭১ ও ১৯৮০-র মধ্যে পার্থক্য

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধীর নব কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়। তখন তার মোগান ছিল "গরীবী হটাও"। তখন ইন্দিরা কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছাড়াই বহু কৌশল বিরাগিতার লক্ষ্যবিন্দু হন নি। এবং বিরোধী-দলগুলিই ইন্দিরা কংগ্রেসের অবিরাম আক্রমণের ফলে বিশেষভাবে হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ চালানো হয় সি পি আই (এম)-এর উপর। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের লাজানো নির্বাচনে জাল মন্ত্রিসভা গঠনের দুর্কমটি ক্রমে সারা ভারতে সম্প্রসারিত হয়।

ইন্দিরা গান্ধী তখন নিজের দলীয় নেতা ও মন্ত্রিসভার লোকসভারও রেহাই দেন নি। ইন্দিরা কংগ্রেস সুপরিচালিত ভাবে সমাজ-বিরোধীদের এককাটা করে সংগঠন গড়ে তুলে শুরু করে। ছাত্র পরিষদ ও যুব-কংগ্রেসের উপরতলায় দুয়েকজন রাজনৈতিক ছাত্র এবং মীচু তলার হতাশাগ্রস্ত কিছু সংখ্যক তরুণ যারা আত্মপরায়াগতা ও সাময়িক মজানির মোহে যে কোন অশালীন সমাজ-

উৎপন্ন সামগ্রী এমন ভাবে বিনিময় ও বন্টন করে যার ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয় আর বড়লোক মালিকদের রমরমা দেখা যায়।

দাম কমানোর অর্থ যারা বাধা মাইনের চাকুরে, দিন মজুর, ছোট ছোট দোকানদার বা ব্যবসায়ী তারা একটু বেশী সুবিধা পাবেন, অল্পদিকে এক-চেটিয়া মালিক, ফাটকাবাজ, চোরা-বাজারীদের অসুবিধা হবে। যেমন জিনিসপত্রের দর যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে মজুত মালের দাম বেড়ে যায়। কোন খরচা না করে খুঁকি না নিয়েই মুনাফা বেশী করা যায়। একশো টাকা দরের জিনিস যদি বিক্রী করার আগে তিনশো টাকা হয় তাহলে দুশো টাকা উপরি লাভ। এই দাম বাড়ার ফলেই চোরাবাজারী, মজুতদারী সৃষ্টি হয়। আবার বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা যখন কোটি কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ধার নেয় এবং যখন ঐ টাকা খাটিয়ে অতিরিক্ত দুশো টাকা করে মুনাফা করার পর ঋণের টাকা শোধ করে তখন মজুত মালের হিসেবে তাকে কম টাকা দিতে হয়। যেমন ১০০ টাকা দরে ১০টি মাল কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ১০০০

টাকা ধার নিল কেউ। ব্যাংকের টাকার মজুত ঐ মাল যখন ৩০০ টাকা দর হলো তা থেকে সে ৩০০০ টাকা পেল। ব্যাংককে যখন সে ১০০০ টাকা শোধ দিল তখন চলতি দামে কেনা মালের হিসেবে ১০টি মালের টাকা ফেরত দিতে হয় নি। সে ফেরত এদিল যখন ৩টি বা ৪টি মালের দাম। ৬৭টি মালের দাম মুনাফা হিসেবে তার হাতে রয়ে গেল (মালের বা টাকার আকারে)।

সুতরাং দাম বাড়ুক এটা সাধারণ মেহনতী মানুষ চায় না। একমাত্র ধনী ব্যবসায়ী ফাটকাবাজরাই দাম বাড়ুক এটা চায়।

কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী কোটিপতি ফাটকাবাজদের এত ভোট নেই। গরীব মানুষের ভোট অনেক বেশী। তাই ফাটকাবাজ, মজুতদার কোটিপতি ধনী ব্যবসায়ীরাও তাদের পেটোয়া রাজনৈতিক দলের মুখ দিয়ে দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। কিন্তু তারা কোনদিন দাম কমানা না। গত ত্রিশ বছরের দাম ওঠানামার পরিসংখ্যানের দিকে চোখ বুলালেই এটা ঠাহর করা যায়। শুধু ভোটের জন্তেই প্রতিশ্রুতি। শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বিরোধী কাজে পশাদপদ নয় তারাই ইন্দিরা কংগ্রেসী ছাত্র ও যুব সংগঠনের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিল। ইন্দিরা কংগ্রেস এদের উৎসাহ দিয়ে পুলিশের প্রাশ্রয়পুষ্ট সমাজ-বিরোধী শক্তিতে পরিণত করে। ছাত্রপরিষদ সাধারণ ছাত্রদের পণ টোকাটুকি, পরীক্ষার ফলাফল কেনাবেচা করে সম্ভার কিস্তিমাতের পথ বাংলার। যুব-কংগ্রেসীরা তো পাড়ায় ভীতি বরপ হয়েই উঠেছিল। ঐ সময় জনৈক যুবকংগ্রেসী নেতা এমন ক্ষমতা মদে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি বিরোধী দলের নেতাদের কণ্ঠে ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি শোনার দাবি পর্বত জানালেন।

ঐ যুব নেতার নাম এখন উল্লেখ করে লাভ নেই। কারণ তারও মোহতল হয়েছে। তিনি নিজেই এখন ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনি দিতে চান না বরং তার কঠোর বিরোধিতা করছেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধী পূজা সঙ্গের ক্ষেত্রে তাকে যুব কংগ্রেস সভাপতির আদন খালি করে দিতে বাধ্য করেন। পূজা সঙ্গকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একান্ত-বশব্দ ও অল্পগত অল্পচরদেরও বলি দিতে

শ্রীমতী গান্ধী পিছুপা হননি। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মর্যাদা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ভৃত্যদের চেয়ে খুব বেশী ছিল না। আমাদের চাবাগামে ব্রিটিশ মালিকেরা "হঠাবাহার" নীতি অর্থাৎ হুকুম মাত্র পোটলা পুঁটলি নিয়ে পিছু হটে বাগান ছেড়ে কুলিদের চলে যেতে বাধ্য হবার রেওয়াজ চালু করেছিল। শ্রীমতী গান্ধীও মন্ত্রিসভার সদস্য, কংগ্রেস(ই) রাজ্য মুখ্য-মন্ত্রীদের প্রতি "হঠাবাহার" রেওয়াজ চালু করেন।

এই ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করার পরও শ্রীমতী গান্ধী স্বামী মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন নি। তার দলের মধ্যেই তিনি বিরোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। চন্দ্রশেখর, জগজীবনরায়, ওয়াই বি চাবন, মোহন ধারিয়া, স্বরণ সিং, চরণ সিং, সি স্বরাজনিকম অনেকের নাম করা যায় যারা একদা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তারাও তার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। ফলে অনেকেই জেলে আটক হন। পরবর্তী ঘটনাবলী ভারতের ইতিহাসে শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আফগান বিপ্লবের নব অধ্যায়

অমর রাহা

লিওনিদ ব্রেজনেভ সেরিন প্রাথমিক প্রতিনিধিত্ব করে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে হাকিজুলা আমিন কমতা হুজল করেই আগ্রাসনী শক্তিসমূহকে সাহায্য করতে শুরু করেছিলেন এবং দেশের অন্তর্ভুক্ত চালায়েছিলেন নৃশংস ও অকথ্য অত্যাচার। এমতাবস্থায় চূপ-চাপ বসে থাকার অর্থ হোল সোভিয়েতের দক্ষিণ সীমান্তে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার স্বযোগ করে দিয়ে সোভিয়েতের নিরাপত্তা বিস্তারিত করা। তাই বধন বাবরাক কারমালের নেতৃত্বে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গণঅভ্যুত্থান করে আমিনশাহীকে উচ্ছেদ কোরল তখন সোভিয়েত সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত-আফগান চুক্তির শর্ত অনুযায়ী।

বাবরাক কারমাল এক বেতার ভাষণ দেন গত বছরের ২৭শে ডিসেম্বর। তখনই সরকারীভাবে জানা গেল আমিনের পতন, বিচার ও মৃত্যুও কার্যকরী হওয়ার কথা। ঐ বেতার ভাষণে প্রথম শোনা গেল যে হাকিজুলা আমিন ছিলেন “দেপ-ও-দশের শত্রু”, “ইসলাম-বিরোধী”, “সি-আই-এ” চর। কিন্তু, এ সব বিশেষণে আমিনকে এতদূর-কেউই সাজানর চেষ্টা করেন নি—না এদেশে, না বাইরে। বীর বেতার ভাষণ-শোনা গেল এবং বীর সম্বন্ধে ব্রেজনেভ এত কথা বললেন তিনি এতদূর ছিলেন কোথায়?

পারচাম হলের নেতা হলেন বাবরাক কারমাল। এখন বলা হচ্ছে যে ১৯৭৭ সালের মার্কাসাকি কারমাল খালক হলের তারাকি আমিন নেতৃত্ব মেনে নিয়ে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল বিপ্লবের পথ স্বপ্ন করে। তবে দেখা যায় যে ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল বিপ্লবের পর জুন মাসে বাবরাক কারমালকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান হয়ে আগে। তিন মাস পর পৃথুত করে ডেকে পাঠান হয় দেশে। বাবরাক কারমাল খেচ্ছায় নির্বাসনে থাকাই পছন্দ করলেন। এ সম্বন্ধে বর্তমান পুনর্গঠিত রেভলিউশনারী কাউন্সিলের সহ সভাপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হুজতান আলি খেস্তনম প্রাথমিক বলেছেন: “১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে কে লঠিক, কেই-বা প্রান্ত তা এখন বল বলা না। কিন্তু এই স্বপ্নের কলে বাবরাক কারমাল লহ বহজন হল থেকে বিভাঙিত হন। খেস্তনম নিজেও তাঁদেরই একজন। আর, এঁরা লবাই হোলেন পারচাম

হলের।” উক্ত ঘটনা মেনে নিলে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বে বাবরাক কারমাল ছিলেন না ১৯৭৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের আগের দিনেও। কারণ, তখন তালই বা মন্দই হউক ছিল হাকিজুলা আমিন নেতৃত্ব বলে এবং সরকারে। “অতএব, স্বাভাবিক প্রশ্ন হচ্ছে যে সোভিয়েত-আফগান চুক্তির ৪র্থ অনুচ্ছেদকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সোভিয়েতকে আহ্বান জানাল কোম নেতৃত্ব-হল বা রাষ্ট্রের? আর, বাবরাক কারমাল কি তখন আফগানিস্তানের ত্রি-সীমান্ত ছিলেন? শুধু তাই নয়। ১৯৭৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোথায় হোল গণ-অভ্যুত্থান, কেই বা দিনের বেলায় হাকিজুলা আমিনকে তিন তিনবার বাড়ীর বাইরে আসার জন্য জানিয়েছিল অহরোধ এবং কোন্ বিপ্লবী-বিচারালয় আমিনপোষ্টী ও তাঁর বন্ধুবান্ধবকে বিচার করে তড়িৎদণ্ড দিল মৃত্যুদণ্ড?

এখানে ১৯৭৮ সালের ৫ই মের কাবুলের একটি ঘটনার উল্লেখ করলে ধারণা হবে না। ঐ সময়ে জেনারেল এপিশেভের আফগানিস্তানে অবস্থান সম্বন্ধে হাকিজুলা আমিনকে প্রশ্ন করলে আমিন উত্তর দেন: “১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত যা করেছে তা ঠিকই করেছে।” সংবাদদাতার মতে সেরিনকার নাটকের নায়ক ছিলেন জেনারেল এপিশেভ। এখানে ব্রেজনেভের কথা উল্লেখ করলে অস্বাভাবিক হবে না: “আমরা যদি চূপচাপ বসে থাকতাম তবে আফগানিস্তান হয়ে পড়ত সাম্রাজ্যবাদের শিকার এবং আগ্রাসনী শক্তিসমূহ এদেশকে চিলির অবস্থায় নিয়ে যেত। আর, গণবিপ্লবকে রক্তগলায় ডুবিয়ে দিত।” স্বল্প কথায়, সাউর বিপ্লবের মঙ্গল কামনায় এবং মহান অক্টোবরের দেশের নিরাপত্তার জন্যই আমিন নেতৃত্বের অবসান ঘটানর মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিঃসন্ত নের সোভিয়েত নেতৃত্ব এবং আফগানিস্তানে প্রেরণ করে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী।

এসব দেখে মনে হয় বাবরাক কারমাল হলেন ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের তখা কখিত গণ-বিপ্লবের শিখতি। এরই জন্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই যুগোস্লাভ পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি লংবাদলংহা তা ন যুগের কূটনৈতিক সম্পাদককে কাবুল ঘটনা নিয়ে একটি বিবৃতি দেন। ঐ বিবৃতিতে সোভিয়েতকে অভিযুক্ত

করা হয়েছে সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য। জাতিসংঘের যুগোস্লাভ রাষ্ট্রদূত মিলজান কোখালিনা নিরাপত্তা পরিষদে আফগান ব্যাপার আলোচনা কালে বলেছেন: সামরিক হস্তক্ষেপ আজকাল ডাল-ভাতে পরিণত হয়েছে এবং তা দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে, দক্ষিণপূর্ব ও সেন্ট্রাল এশিয়ায়। সর্বদেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সব থেকে বড় বিপদ হোল অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। তাছাড়া, প্রত্যেক দেশের অধিকার হোল স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে সামাজিক রাজনৈতিক বিকাশকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

এসব লেখাতে মনে হবে যেম আমিনের হয়ে কেউ ওকালতি করতে নেমেছে এবং লিওনিদ ব্রেজনেভ এই আমিনের উকিলদের স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে এখন বারা আমিনের জন্ত অশ্রু ফেলছেন তাঁরা তারাকি নিধনের সময়ে ছিলেন কোথায়। কথাটা একদিকে মিথ্যে নয়। কিন্তু, সেদিন না এদেশের কমিউনিস্ট কাগজপত্রে না সোভিয়েত কাগজপত্রে তা নিয়ে তুঁচাচটে লাইনও কি বলা হয়েছে? বলা তো হয়নি, বরং নানাভাবে বোকানর চেষ্টা করা হয়েছে বুজোরী লংবাদপত্র মাধ্যমে যেম তারাকি হঠাৎ আহত হয়েছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশের নিউ এক বা পিপলস ডেমক্রাসিতে সি পি আই বা সি পি এম আমিন বিরোধী বা তারাকির সমর্থনে একটি কথাও উচ্চারণ করে নি। সোভিয়েত নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বোধহয় একই কথা প্রযোজ্য।

এমতাবস্থায়, যুক্তিপূর্ণ হোল ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল থেকে ১৯৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তান সম্বন্ধে স্থিতি চক্রবর্তী লিখিত পিপলস ডেমক্রাসির প্রবন্ধ ও নিউ এক প্রকাশিত সাধন মুখার্জীর তিন দফার প্রবন্ধ অনুধাবন করা। এখানে বলা ভাল যে তারাকি আমিন সরকারের আমরণে সাধন মুখার্জী, স্থিতি চক্রবর্তী, এম রাজশেখর রেড্ডি প্রভৃতি বার সাউর বিপ্লবের দেশ দেখতে। এঁরা বুঝেছেন নানা জায়গায়। গেছেন আফগান-ইরান সীমান্তে এবং আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে। এঁরা যেমন দেখা করেছেন নেতৃত্বদের সঙ্গে তেমনি মিশে-

ছেন সাধারণ লোকের সঙ্গে। এঁদের মতে আফগানিস্তানে জীবন যাত্রা স্বাভাবিক, বিরোধীরা অস্তিত্ব বলতে যদি বোকা যায় রাতের অন্ধকারে তুঁচাচটে গুলির আওয়াজ এখানে-সেখানে তবে তা হয়ত আছে। কারণ সামন্ততন্ত্র বিরোধী সাউর বিপ্লবে পরাজিত হিটলারের প্রতিক্রিয়া যে নেই তা বললে ভুল হবে। সাধনবাবু জোয়ের সঙ্গেই তাঁর ১৯৭৮ সালের ১ই সেপ্টেম্বরের প্রবন্ধে বলেছেন, “আফগানিস্তানের কোম অংশই বিরোধীদের কন্ডার নেই। যদি তা আছে বলা হয় তবে বলতে হবে ভারত সরকারের শাসনের মধ্যে মিজোরাম বা নাগাল্যান্ডও নেই।” শুধু তাই নয়, সাধনবাবু ছিলেন আফগান-ইরান সীমান্তে হেরাত হোটেলের। হেরাত প্রদেশের ১২টি অংশের প্রত্যেকটি অংশে আছে গড়ে ১৫০ জন করে সশস্ত্র তলানটির এবং এছাড়া রয়েছে অস্ত্রাস্ত্র সশস্ত্র মিলিশিয়া ও সেনাবাহিনী। এমনি আছে অস্ত্রাস্ত্র স্থানে। তাছাড়া, আফগানিস্তানের ঐক্যমিত্র উলমার সাধারণ জিরগা গত বছরের ৮ই আগষ্ট খালাকি রাষ্ট্রকে সমর্থন করে এ ঘোষণায় নিজেদের কথা বলেছেন। এই ঘোষণায় অংশ নিয়েছেন আফগানিস্তানের ২৬টি প্রদেশের সকল উলমাই। আর, বাবরাক কারমাল বিপ্লবী কাউন্সিলের নিকট এক বিবৃতিতে বলেন যে উলমাদের কাউন্সিলের প্রধান আবদুল আজিজ সিদ্দিক খুশী হয়েছেন “মার্কিন

দাম কমানো

৫ম পৃষ্ঠার পর

ভোটের পর মন্ত্রী হলে পুলিশ পাহারা বসে। সাধারণ লোক তখন দূরে থেকে দেখে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, কাছে যেতে পার না। প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি ভাঙ্গুরের যে অভিযোগ করেছেন তার ভাষণ ও আচরণ থেকে তার হৃদিসও মেলে না। যেমন তিনি ভাঙ্গুরের কথা বলার সময়েও স্বীকার করেছেন যে জনতা লোকদল গ্রামের মাছবের জন্তে কিছুটা কাজ করেছে। তবে তার জন্তে শ্রীমতী গান্ধী নিজের পূর্ব-তন সরকারের কৃতিত্বই বেশী দাবী করেছেন কারণ পূর্বতন কংগ্রেসী সরকার সেচ, বিদ্যুৎ, কারিগরী ও গবেষণার ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই নাকি জনতা সরকারের আমলে গ্রামের এতটা উন্নতি হয়েছে। আরেকটু পিছিয়ে বলা যায় ব্রিটিশ সরকার রাস্তাঘাট, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ ও ডাকের ব্যবস্থা করেছিল বলেই ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার

সাম্রাজ্যবাদী দালাল আমিন জুন্ম শাহী” থেকে মুক্ত হওয়াতে এবং সমর্থন জানিয়েছেন নতুন অধ্যায়কে যাক, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধনবাবু দেখিয়েছেন যে কাবুল কান্দাহারের সর্বত্রই রয়েছে সামরিক ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাট রয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, বিরোধীরা অস্তিত্ব বলতে বোকার রাতের অন্ধকারে একটা তুঁচা গুলির আওয়াজ। উলমাদের সমর্থন তারাকি-আমিন সরকারের পেছনে। ৬৪টি উপজাতির মধ্যে সমস্ত স্বদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন প্রাণশাস্ত্রিক প্রয়াস, ক্ষেত্রে-খামার ও কারখানায় যেমনতী মাছবের কল্যাণে নানাবিধ প্রয়াসের ফিরিস্তি ইত্যাদি রয়েছে সাধনবাবু লেখায়। শুধু তাই নয়, সাধন মুখার্জী তাঁর ২০শে সেপ্টেম্বরের নিউ এক প্রবন্ধে বলেছেন যে ১৯৬৫ সালের জাহাঙ্গীরী থেকে তারাকি আমিন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। সামরিক বাহিনীতে প্রাক-বিপ্লব কালে সমস্যা ছিল দু হাজারেরও বেশি। আর, নূর মহম্মদ তারাকি যখন ১৯৭৮ সালের ২৬শে এপ্রিল প্রেপ্তার হলেন তখন গৃহবন্দী অবস্থায় থেকেও আমিন ২৭শে এপ্রিল সামরিক বাহিনীর সাহায্যে উচ্ছেদ করলেন হাউদ সরকারকে। সাউর বিপ্লব হল সফল। এরপর সোভিয়েত আফগান চুক্তি সম্পাদনা করার সময় শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

গ্রামের লোকের জন্তে কিছু কাজ করতে পেরেছে।

কথায় বলে “চাঁচীর সালুন পাতে পাতে ভিন্ন স্বাদ।” প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম এগারো বছরের আমল আর ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া আমলের মাঝখানে জনতা সরকারের স্বল্পকালীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে জনতা সরকারের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও এমন কিছু করা সম্ভব ছিল না যা শ্রীমতী গান্ধীর আমলের অর্থনীতিকে ভেঙে উঠে দিতে পারে। শ্রীমতী গান্ধীও এমন কিছু করতে পারবেন না যা জনতা সরকার উত্তরাধিকারস্বত্বে তার আমল থেকে পেয়েছিল এবং তারা শ্রীমতী গান্ধীর নতুন সরকারের জন্তে রেখে গেছে এমন কিছুই পরিত্যক্ত হবে না। তবু শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে দাম কমানেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমরা তা বিশ্বাস করেছি। অতএব আমরা চাই দাম কমুক। শ্রীমতী গান্ধীও কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাই চান?

ভারতে মানবাধিকার গদদলিত

কল্যাণ বোস

তৃতীয় বিশ্বে ভারতই হয়ত একমাত্র দেশ যে দেশে মানবিক মূল্যবোধ এবং মানবিক অধিকার কোন মর্যাদা পায়নি। সামগ্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের মত দেশ যেমন বিশাল তেমনি তার জনসংখ্যাও অনেক। এ দেশে সমস্তা আছে। কিন্তু সেই সমস্তা সমাধানের কোন চেষ্টা এতাবৎকাল দেখা যায়নি। এদেশের শাসকবর্গ গণতন্ত্রের মুখোশ পরে মানবাধিকার সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথাই বলে থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার বর্ণ বিবেচন সম্পর্কে এদেশের শাসকবর্গ অনেক বড় বড় কথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন। কিন্তু নিজের দেশে অস্পৃশ্যতার নামে প্রাচীনকাল থেকে যে বর্ণবিবেচনা চলে আসছে তা দূর কি ভাবে করা যায় সে বিষয়ে কোনদিনই কার্যকরী কিছু করেননি। জাতিবিবেচনা বা বর্ণবিবেচন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এদেশের শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা জাতিবিবেচনা প্রসঙ্গে কুস্তীরাশি বর্ণন করেই কাছ হয়েছেন। অন্য দেশে কোথাও যদি নৃশংস হত্যার মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা হয় তাহলে গণতন্ত্রের মুখোশ পরা এদেশের শাসকবর্গ তার তীব্র নিন্দা করেন অথচ নিজের দেশেই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার হয় সে বিষয়ে তারা থাকেন উদাসীন।

মানবাধিকার সম্পর্কিত বহু কথাই এবাবত আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু এদেশে এমন কিছু ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে যা মানবাধিকারের পর্দায় পড়লেও সে সব বিষয়ে কোনদিনই কেউ মাথা ঘামায়নি। ১৯৭১ সালের ৮ই মে ফিলিপাইনে অসুস্থিত এশিয়া ফোরাম অন হিউম্যান রাইটসের কনসালটেন্ট মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই নিবন্ধে সেই আলোচনা থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে।

এদেশে অস্পৃশ্যতার নামে নিম্নবর্ণভুক্তদের উপর বর্ণহিন্দু বা বর্ণ অত্যাচার করে তা অবর্ণনীয়। তামিলনাড়ুর সালেমের রাজাখী নামের সেই কিশোরীটির কথাই ধরা যাক। জমিদারের বাড়িতে উচ্চবর্ণের জন্ত রক্ষিত পানীয় জলের পাত্র থেকে জল পান করার অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়। হত্যা করার পর

তাকে একটি কুপে ফেলে দেওয়া হয় এবং আত্মহত্যার একটি কাহিনী সাজানো হয়। উচ্চবর্ণভুক্ত আত্মা এবং পুলিশরা অতি সহজেই এই সাজানো গল্প মেনে নিল। আশ্চর্য এই দেশ।

গ্রামের কুরো থেকে যখন অস্পৃশ্য বলে কথিত ব্যক্তিরের জল নিতে দেওয়া হয়না তখন এদেশের আইন-কানুন মুখ বুজে থাকে। মানবিক মূল্যবোধই বা কোথায় হারিয়ে যায় যখন অস্পৃশ্য বলে কথিতদের জুতো পায়ে দিয়ে অথবা হাঁটুর নিচে ধুতি নামিয়ে উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত এলাকার রাস্তা দিয়ে চলতে দেয়া হয় না? এদেশে নিম্নবর্ণ বলে কথিত ব্যক্তিরা বাস করে ভীষণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে। যে ঘরে তারা বাস বাস করে তা অন্ধকূপেরই নামান্তর। আলো বাতাস নেই বললেই চলে। এদেশে ক্রীতদাস প্রথা বা দারবান কৃষকপ্রথা বরাবরই চালু ছিল। তবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৪৩ সালে আইন করে তামিলনাড়ুতে এই প্রথা

হয় ১৯৭৬ সালে যখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, জেলা কালেক্টরের অফিসের সামনেই তারা মৃতদেহ দাফ করবে। তামিলনাড়ুর আজম্বর গ্রামের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এক ছাত্র শহুরে সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে বর্ণহিন্দুদের জন্ত নির্দিষ্ট সড়ক দিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যায়। সেই অপরাধে তাকে একটি গাছে বেঁধে বেধন প্রহার করা হয়। তামিলনাড়ুর সালেমে জর্জনক হরিজনকে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার অপরাধ, সে বর্ণহিন্দু বাতায়াক্ত করে এমন একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করার দাবী করেছিল।

তামিলনাড়ুর থানজাবুর জেলার একটি গ্রাম ভালপপকুডডি। এই গ্রামে উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণ উভয় সম্প্রদায়েরই বাস। তবে নিম্নবর্ণের সংখ্যা কম। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় নিম্নবর্ণের মানুষেরা রাস্তার থুথু পর্বস্ত ফেলতে পারবেনা। এমনই বিধিনিষেধ। অমান্য করলে কঠিন

প্রথারই মতম। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে অবশ্য এই প্রথা আইন করে রদ করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ হলেও এই প্রথার প্রচলন রয়ে গেছে। বিশেষ করে বেঙ্গাল ও জেলার সাউ-ব্রাঞ্চি এবং বিলাপুর জেলার আধনিতে এই বাসবী প্রথার প্রচলন এখনও অব্যাহত রয়েছে। এই প্রথাভাবারী বহু ভক্ত তার অবিবাহিত কন্যাকে দেবী ইয়েলামনার নামে উৎসর্গ করেন। তার পর থেকে তারা “দেবীর সেবিকা” হিসাবেই পরিচিত হয়। নিম্নম অস্পৃশ্য সেই যুবতীকে প্রথমে ধর্ষণ করে মন্দিরের পুরোহিত। তার পর থেকে সেই যুবতী পরিণত হয় মন্দির বেড়ায়। শোনা যায় যে, উত্তর কানাড়ায় প্রায় প্রতি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ঘরেই একটি করে বাসবী আছে।

গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলার কাঠাদা গ্রামে এক অস্পৃশ্য যুবতী বর্ণহিন্দু পরিবারের যুবক দ্বারা ধর্ষিতা হয় যখন যুবতীটি বনে জালানী কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। পাছেযুবকটিকে সনাক্ত করতে পারে সেই জন্ত যুবতীটির জিহ্বা এবং চোখ নষ্ট করে দিয়ে পরে তার পলা কেটে দেয়া হয়। (সানডে ২২ এপ্রিল, ১৯৭৮) ১৯৭৮ সালের মে মাসে আগ্রাতে

মৃতদেহ দুটি এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছিল যে, সেগুলিকে সনাক্ত করা যায় নি। ভারতবর্ষে এমনই একটি দেশ যে দেশে নিম্নবর্ণজাত উচ্চপদাধি-কারীরাও অপমানের হাত থেকে রেহাই পাননা। প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীজগদীবন রাম সংস্কৃতে-পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণহিন্দু সেই মূর্তি-টিকে গলাজল দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করেন।

শ্রীকান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অস্পৃশ্যতাবোধ খুব প্রবল। যেসমস্ত অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্ণজাতরা শ্রীকান ধর্মগ্রন্থ করেছেন তাদের জন্ত গীর্জায় আলোচনা বসার ব্যবস্থা করা থাকে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশের জেলাগুলিতে এই প্রথা চালু রয়েছে।

১৯৭৭ সালের ২৬শে মে তপনীল সম্প্রদায়ের ১৩ জন কৃষি শ্রমিককে হাত বেঁধে নিকটবর্তী একটি ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের একের পর এক গুলি করে হত্যা করে আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয়। এক ব্যক্তি গুলি লাগাতেও মরেনি। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা শেষে সে লাফিয়ে উঠে আত্মত্যাগীদের একজনকে ধরতে চেষ্টা করে। একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং দেহটি পুনরায় আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনা ঘটে বিহারের বেলচিতে। তবে এই ঘটনার জন্ত বর্ণহিন্দু জমিদারেরা দোষী নন। এই ঘটনার নারক হল অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কৃষি শ্রমিক-দ্বারা। বিহার সরকার এবং কেন্দ্রের জনতা সরকার বললেন এই ঘটনা দুই সমাজবিরাোধী দলের কলহের ফলশ্রুতি। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। আসল ঘটনা হল বেঁচে থাকার আন্দোলন করতে গিয়েই এই সব হতভাগারা প্রাণ দিল।

১৯৬৮ সালে তামিলনাড়ুর থানজাবুর জেলার এক অখ্যাত গ্রাম কিজভেনমানীতে ৪২ জন হরিজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এখানে কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে প্রাধান্য হরিজনরাই। মজুরী হিসাবে তারা পেত মাত্র সাড়ে চার সের ধান। এত কম মজুরীতে তারা চাষের কাজ করতে অস্বীকার করে। মজুরী বৃদ্ধির দাবী নাকচ করে দিয়ে কৃষির মালিকরা অস্ত্র জারগা থেকে কৃষিশ্রমিক নিয়ে এসে কাজ করতে গেলে গ্রামের হরিজন কৃষিশ্রমিকরা বাধা দেয়। জমিদাররা ভাড়াটে শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

নিম্নবর্ণের লোকদের ওপর বর্ণহিন্দুদের বীভৎস অত্যাচার

রদ করা হয়। তখনও পর্বস্ত ক্রীতদাস বা দারবান কৃষকরা মালিকের বিনামূল্যে কোথাও যেতে পারতনা। প্রকারান্তরে এদেশে আজও সেই ঘৃণ্য প্রথা চালু আছে। ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু যে নিদারুণ নিপীড়ন এবং দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়-ভুক্তরা বাস করতেন তার পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই।

তামিলনাড়ুর একটি গ্রাম কার-গুডি। এখানে অস্পৃশ্যদের জন্ত নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই বা ছিল না। কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেতে হত বহু দূরে। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়েরা কাবেরী নদীর তীরে তাদের জন্ত স্থান করার দাবী জানায়। কিন্তু যেহেতু উচ্চ বর্ণ অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই কারণে তাদের সেই দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। অস্পৃশ্যরা তাদের দাবীতে অচল থাকায় উচ্চবর্ণের গুণ্ডাদের হাতে তাদের নিগৃহীত হতে হয়। শেষ পর্বস্ত তাদের এই দাবী যেটানো

শক্তি পেতে হবে। যদি কোন নিম্নবর্ণজাত সম্প্রদায়ের মানুষ উচ্চবর্ণের কোন মহিলাকে সঙ্গ গাড়িতে করে প্রসবের জন্ত নিয়ে যায় সেই গাড়ি চালক উঠে বসে চালাতে পারবেনা। তাকে বরাবর হেঁটে যেতে হবে। নিম্নবর্ণের মানুষেরা উচ্চবর্ণের মানুষের বাড়ির সামনে উৎসবের বাজনা পর্বস্ত বাজাতে পারবেনা। অথচ উচ্চবর্ণ-ভুক্তরা নিম্নবর্ণের বাড়ির সামনে এসে বাজনা বাজাতে পারে।

উত্তর ভারতের সিমলা জেলার ফারলে ১৯৭৬ সালের ১২ই মে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এক যুবককে অমানুষিক ভাবে প্রহার করা হয় কারণ সে তার মা এবং বোনকে জমিদারের বাড়িতে কাপড় কাচতে যেতে দিতে আপত্তি করেছিল। বহু জারগায় অস্পৃশ্য বলে কথিত ব্যক্তিরা মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করার সাহস করেনা পাছে তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

কর্ণাটকে একটি সামাজিক প্রথা আছে যার নাম “বাসবী” প্রথা। এটি “দেবদাসী” বা “মন্দির বেড়া”

যাতব সম্প্রদায়, যারা পেশায় মুচি, তাদের নেতা ডঃ বি আর আবেদক-রের জন্মদিন উৎসব পালন করে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হিংসাশ্রয়ী কাণ্ড ঘটে। লুট, দাঙ্গা এবং খুনে যার শেষ হয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, এই সব হিংসাশ্রয়ী কাণ্ডে প্রতি-লিয়াল আর্থড কনস্টেবুলারীও আনন্দে অংশ নিয়েছিল। পরে সেই এলাকার সাদ্য আইন জারী করা হয়েছিল।

তামিলনাড়ুর ভিছুপুরমে এক বর্ণহিন্দু ব্যবসায়ী এক নিম্নবর্ণের মহিলার স্ত্রীজতাহানি করে। এই ঘটনা পরে দাঙ্গা এবং লুটপাটে পর্ববনিত হয়। শক্তি নারক নিম্নবর্ণজাত ১২ বছরে এক বালককে গাছে বেঁধে অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয় যার ফলে তার মৃত্যু হয়। অগ্রা কলোনিতে ১১ বছরের এক নিম্নবর্ণীয় যুবককে গলায় দড়ির গিট পরিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত ধরে “টাগ অব ওয়ার” খেলা হয়। তারও মৃত্যু হয়। ঐ দাঙ্গার নিহত ১৭টি মৃত-দেহর মধ্যে ২টি মৃতদেহ ভিজাপুরম সরকারী হাসপাতালে আনা হয়ে-

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১১)

ডঃ আহমদ শরীফ

অজুঁন দাস

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপর গবেষণার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। অন্ততঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রকাশিত মধ্যযুগের সাহিত্য কর্ম দেখলেই একথা অস্বীকার করা যায়। বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে বিস্তারিত। বাংলা একাডেমী এ খাবৎ বহু মৌলিক গ্রন্থ যেমন প্রকাশ করেছে। তেমনি মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উপর কাজও করেছে প্রচুর। একথা আজ ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলার আদি নিদর্শন বলে কথিত চর্যাপদের পঠন পাঠনের প্রথম সূচনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—যার উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ। আজ সে ঢাকার মধ্যযুগীয় সাহিত্যের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। অনেকে জানেন, এই বাংলাদেশও যেসব পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তার পেছনে ওপার বাংলার একজন কৃতসম্মানের বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি হলেন মূলী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহিত্য-সাগর। আজো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত বহু পুঁথিতে তাঁর নাম পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সেই ধার্মিক অঙ্গ রেখেছেন মূলী সাহেবের স্ত্রীগোত্রী ডঃ আহমদ শরীফ। তাঁর একক প্রচেষ্টায় এই দেশে মধ্যযুগের উপর যত কাজ হয়েছে অত্যন্তদের সব কাজ মিলিয়েও তার সমতুল্য হবেনা। এই ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত হুজুরগাঁও গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯২১ সালে। গোড়া থেকেই তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় মোরাদাখালি জেলার ফেনী কলেজ থেকে। সেখান থেকেই তিনি গবেষণা সহকারী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। বেশ কিছুকাল তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন।

ডঃ আহমদ শরীফ রাজনীতি করেন না। তবে বাংলাদেশে এ খাবৎ রাজনৈতিক উদ্বেগ হাসিলের উদ্দেশ্যে যত প্রকার প্রতিক্রিয়াসূচক পৃথক পৃথক সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ

করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ডঃ শরীফের কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার ছিলো। তিনি সেসব ব্যক্তির ভেতর একজন যারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি সংরক্ষণের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এরফলে তাঁকে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাকালে তিনি যেভাবে দিন কাটিয়েছেন তা সত্যি ভরাবহ। তাঁকে শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। লেখানে অশেষ স্বপ্নার ভেতর তাঁর দিন কেটেছে। পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পর যেসব ব্যক্তি কোন প্রকার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেননি তাঁদের ভেতর ডঃ আহমদ শরীফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ সমগ্র বাংলাদেশে ডঃ আহমদ শরীফের বশ ও সুনামের পেছনে এই নির্লোভ ও নির্দোহ মনোভাব কম কাজ করেনি। তবে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ কি তা অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু তাঁর ভেতর সরকার বিরোধী (Anti establishment) মনোভাব এত বেশি যে তা কখনো কখনো তাঁকে একজন নেতিবাচীতে পরিণত করেছে। এই নেতিবাদকে কেউ কেউ মৈরাজ্যবাদও আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু ডঃ আহমদ শরীফ যে মৈরাজ্যবাদী মন তা তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝা যাবে। অথচ তার নেতিবাদী ভূমিকারও একটা বিশ্লেষণ প্রদান করা সম্ভব। ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগ তিনি দেখেছেন। শুধু দেখেননি, তাঁর উপলব্ধি করার বয়সও তখন হয়েছিলো। যে উৎসাহ ও উদীপনা তিনি এই আন্দোলনে লক্ষ্য করেছেন, অচিরেই তাঁকে ধুলুটিত হতেও তিনি দেখেছেন। এগি ভেতর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও যে বহু গলদ ও অব্যবস্থা লুকিয়েছিলো তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। যে হিন্দু মুসলিম বিরোধ একদিন এই দেশকে বিভক্ত করেছে তাই ১৯৭১ সালে মুখ্যবাদান করে আত্মপ্রকাশ করেছে বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ রূপে। ডঃ শরীফ মনে করেন এর শেষ নেই। এজাতীয় মনোভাব মড়ক ও মহামারীর মতো একটা জাতিকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে

ভারতের ভূমিকাও তাঁকে বিস্মিত করেছে। তিনি মনে করেন স্বাধীনতা জয় করতে হয়, ছিনিয়ে আনতে হয়; তাকে হান হিসেবে গ্রহণ করা যায়না। অথচ, তাঁর মতে, ১৯৭১ সালে ভারত দাতার ভূমিকাই পালন করেছিলো। ডঃ শরীফের এই বক্তব্য বাংলাদেশে প্রতিবাদিত হয়েছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে ডঃ আহমদ শরীফের অবদান মধ্যযুগীয় সাহিত্যে লামনা একথা আগেই বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহম্মদ আবদুল হাই লাহেব বলতেন, ডঃ আহমদ শরীফ যখন হেঁটে যান তখন নাকি তাঁর মনে হতো যেম গোটা মধ্যযুগটাই হেঁটে যাচ্ছে। এই উজ্জ্বল মাধ্যমে সম্ভবতঃ জন্মাব অবদুল হাই তাঁর মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চার প্রতিই সঙ্গীত স্বীকৃতিই প্রদান করেছেন। ক্লাশে তিনি প্রায়ই মধ্যযুগীয় সাহিত্য পড়াতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে

মানবাধিকার পদদলিত

৭ম পৃষ্ঠার পর গুণ্ডা বাহিনীর হাতে বন্দক তুলে দেয়। জমির মালিকের হকুম তামিল করতে সেই গুণ্ডার দল হরিজম কৃষি জমিকদের পাড়া আক্রমণ করে মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে। আতঙ্কিত শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলারা একটি মাটির ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ ভাড়াটে গুণ্ডার দল ঐ ঘরের দরজার বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে আশ্রয় ধরিয়ে দিয়ে দলকে পুড়িয়ে মারে। এই ঘটনা আদালত পর্যন্ত পড়ালেও দোষীরা কিছু শাস্তি পায়না।

বিহারের বিজিতপুরে ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে ১৬২টি হরিজন

আফগান বিপ্লব

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর তারাকির নেতৃত্বে আফগান দলে নাজাজদের মধ্যে ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী, উপ প্রধানমন্ত্রী এবং বৈদেশিক মন্ত্রী হাফিজুল্লা আমিন।

নূর মহম্মদ তারাকি বলতেন: “বিপ্লব রপ্তানিতে আমরা বিশ্বাস করি না...” আর, হাফিজুল্লা আমিন সাধন মুখার্জীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন “বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র,” “প্রোলেতারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের” সঠিক গুরুত্বের কথা। আজ, ওরা উত্তরেই নেই, আছেন বাবরাক কারমাল তারাকি-আমিন নেতৃত্বে সম্পাদিত সোভিয়েত-আফগান চুক্তির ৪র্থ অঙ্গচ্ছেদ বলে।

তাঁর সমতুল্য শিক্ষক খুব বেশি নেই। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গি একেবারেই যেরো। বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত রূপক ও উপমা মাধ্যমে তিনি পড়াতেন। তিনি চট্টগ্রামের কবি সৈয়দ হুজুতানের উপর কাজ করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন—যা পরবর্তীকালে ‘সৈয়দ হুজুতান ও তাঁর কাল’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ‘মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সমাজ’ নামে একখানা গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সমাজের প্রতিকূলনকে তিনি চক্ষুগ্রাহ্য করে তুলেছেন। অতি সম্প্রতি তাঁর একখানা ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ‘বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য’ নামে এই গ্রন্থ খানার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি গোটা কালটিকে স্ফুট ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন—যা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি পাঠকের

পরিবার অধ্যুষিত গ্রামে ২৪ বর্গা বাবত সন্ধান চালায়ো হয়। সেই সঙ্গে চলে নারী ধর্ষণ লুটপাট ইত্যাদি। মহিলাদের ওপর গণধর্ষণ চালানো হয়। বহু যুবতী নির্ধোজ। অস্বাভাবিক ক্রোড়ে কাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে অথবা তাদের ওপর কামলালসা চরিতার্থ করার পর তাদের হত্যা করে ক্রোড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। মজু নামে একটি গর্ভবতী যুবতীকে এমনভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে যে তার গর্ভস্থ সন্তান পৃথিবীর আলো দেখতে পারিনি। মজুও যত। ঐ গ্রামের বহু লক্ষম যুবক নির্ধোজ। মনে করা হচ্ছে যে, তাদের খুন করে লাস গুম করে দেয়া হয়েছে। হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের এবিধ আচরণে পুলিশ কিছু বরাবরের মত বর্ণহিন্দুদেরই পরোক্ষ সহায়তা করেছে।

ভারতের প্রতি প্রান্তে প্রতিদিনই এই জাতীয় ঘটনা ঘটছে। যা আমরা জানতে পারিনা। মজার কথা হল সম্প্রতি এবং বর্ণ বিচ্ছেদের ঘটনাটা জমির মালিকানা সত্ত্বের সঙ্গে অস্বাভাবিক জড়িত। হিন্দু সোশাল কোড অনুসারে সম্প্রদায়জাত কোন ব্যক্তি জমি বা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেনা। এই আইন অবশ্য ব্রিটিশ আমলেই রদ করা হয়েছে। তবুও আজকের দিনে নিম্নবর্ণের হাতে জমির পরিমাণ খুবই কম। এই হল ভারতের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ডঃ শরীফ অনেকগুলো পুঁথিও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো ‘পুঁথি পরিচিতি’ (১৯৫৮), ‘চন্দ্রাবতী’ (১৯৬৪), ‘সায়লা মজু’ (১৯৬২), ‘মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ’ (১৯৬৩), ‘মুসলিম কবির পদসাহিত্য’ (১৯৬৩), ‘মধ্যযুগের গীতি কবিতা’ (ভূ-১৯৭২), ‘সামসুল মলুক বহিউজ্জামান’, ‘নবীবংশ’ (১৯৭১), রহস্য বিজয়’ (১৯৭১) ইত্যাদি।

মধ্যযুগের সাহিত্যিকর্ম ছাড়া তিনি বহু মননশীল রচনা লিখেছেন যার অনেকগুলোই এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ সব প্রবন্ধ আধুনিক সাহিত্য ও জীবন-জিজ্ঞাসা সম্পর্কেও তাঁর মতামত রয়েছে। এসব মতামতের ক্ষেত্রে তিনি ইতিমধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর জাতীয় রচনা সংকলনের ভেতর ‘বিচিত্র চিন্তা’ (১৯৬৮), ‘সাহিত্য সংস্কৃতি’ (১৯৬৯), ‘সাহিত্য ও জীবন’ ‘কালিক ভাবনা’ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান চেহারা।

কংগ্রেস সরকার তিন দশ বাবত দেশ শাসন করেছে। তাঁর পরে কিছুদিন জনতা। বর্তমানে কেন্দ্রে আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। বরাবরই কংগ্রেস ভূমিস্বত্বের কথা বলে এসেছে। প্রথমে দিকে সরকারী হিসাব অনুসারে বল হয়েছিল যে, হরত ৫০০ লক্ষ হেক্টর জমি উচ্চ হিসাবে পাওয়া যাবে। ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। কিন্তু কংগ্রেসী আমলে ভূমি লস্কারে মাত্র ২০ লক্ষ এক অর্ধাং ০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে বলে সরকারী পরিসংখ্যানে বল হয়েছে। কংগ্রেসী আমলের ভূমি লস্কার জমিদার শ্রেণীর কাছে হা মানতে বাধ্য হয়েছে। জমিদার শ্রেণী বহু জমি বেনামে দখল করে আনে যা খুঁজে বার করা কংগ্রেসীদের কাজ নয়। যদি সত্যি সত্যি কোন দিন ভূমি লস্কার ভারতবর্ষে হ তাহলে বড়লোকদের স্বার্থে এলা আঘাত পড়বে যা তাদের আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবেনা এবং হরিজম ভূমিহীন সেই সব নিম্নবর্ণজাতীয় জমিদার এবং বড়লোকদের ক্ষতি কেটে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত বাতায় খাস নিতে পারবে।

পাক-ভারত যষ্ঠ টেস্ট ম্যাচের

নায়ক আশিফ ইকবাল

রাণা ভট্টাচার্য

শেষ দুদিন সাড়া আগিয়ে পাক-ভারত যষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ অবশেষে অমী-মাংসিত ভাবে শেষ হল। সেই স্বাধীন ভারত ২-০ ম্যাচে এগিয়ে থেকে রাবার নিজে দখলে নিয়ে এল।

শেষ টেস্ট ম্যাচের পাঁচ দিনের খেলায় পাক দলের অধিনায়ক আশিফ ইকবালের একটি সিদ্ধান্তই যা চমকপ্রদ। চতুর্থ দিন সকালে ইন্ডেনের সমস্ত দর্শক এবং উপস্থিত ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা যখন ভাবছিলেন এই ক্রান্তিকর টেস্টের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হৃদয়পরাহত সেই মুহূর্তে সবাইকে চমকে দিয়ে আশিফ ইকবাল দলের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

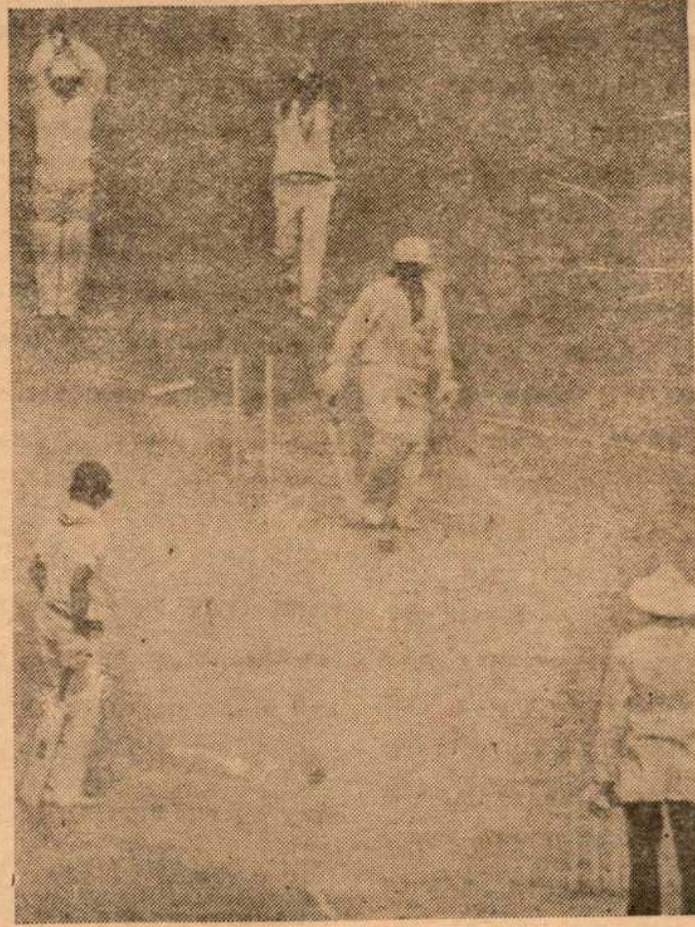
আশিফ যে অবস্থায় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, সচরাচর এ জিনিস দেখা যায় না। পাকিস্তান তখন ৩৯ রানে পিছরে। এই অবস্থায় আশিফ যে কুঁকি নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসা করার মত। সঙ্গে সঙ্গে আশিফ প্রমাণ করেছেন দল-নায়ক হিসাবে তার বিচক্ষণতা। অবশ্য এই সিরিজে আশিফ প্রকৃতই ব্যর্থ। একটা টেস্টেও তার দল দফল হতে পারেন নি। অধিনায়ক হিসাবে এ ব্যাপারে তার কিছুটা দায়িত্ব আছে বৈকি। তাছাড়া গোটা সিরিজে তিনি তার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও দেখাতে পারেন নি। ৬টি টেস্টে ১০টি ইনিংস খেলে তিনি মোট রান করেছেন ২৬৭। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রান ৬৪। আশিফ মোট বল করেছেন ৩১২ ওভার এবং ১০টি মেডেন দিয়ে ৭২ রানের বিনিময়ে উইকেট পেয়েছেন মাত্র দুটি।

এই সিরিজের ব্যর্থতা দিয়ে আশিফকে বিচার করলে ভুল হবে। ৫৭টি টেস্টে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তান দলের বিদ্যায় অধিনায়ক

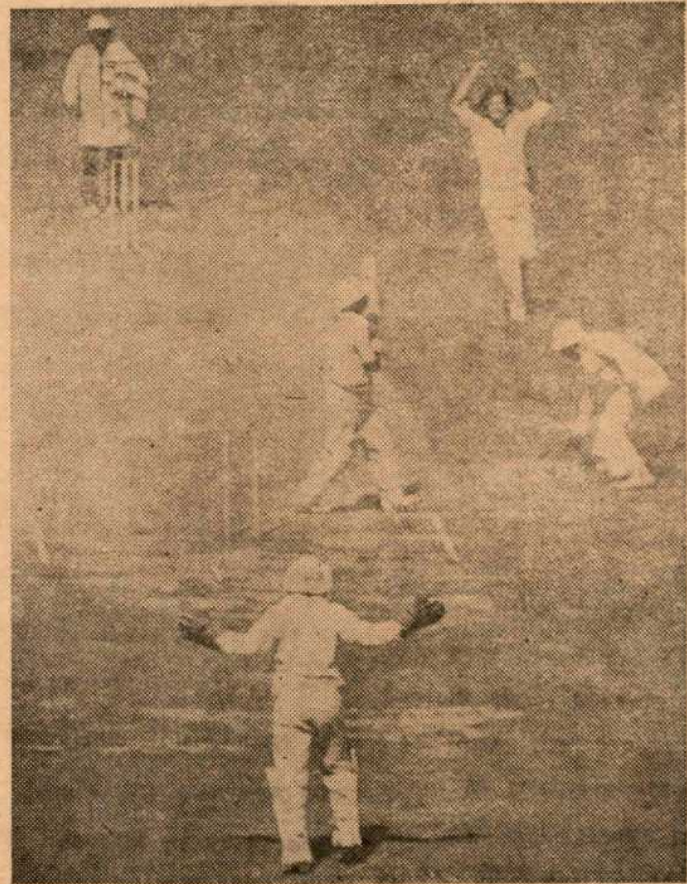
আশিফ ইকবাল তার টেস্ট জীবনে অনেক কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। দারুণ বিধে ক্রত রান নেওয়ার ব্যাপারে তিনি অন্ততম। তার স্বাক্ষর দ্বিতীয় ইনিংসে ইন্ডেনের বৃকে বিদ্যায় বেজায় কিছুটা রেখে গেছেন।

ইন্ডেনে টেস্ট শুরু হওয়ার আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা এবং চতুর্থ দিনে প্রায় নজিরবিহীন ভাবে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা মারফৎ ক্রান্তিকর যষ্ঠ টেস্টে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে আশিফ কল-কাতার হাজার হাজার ক্রীড়াভ্রমারগীর মনে এক অননুভূত স্থতির ভার রেখে গেলেন। সে দৃশ্য তোলা যায় না যখন ইন্ডেনে উপস্থিত ৮০ হাজার দর্শক এবং ১১ জন ভারতীয় খেলোয়াড় বিদ্যায় পাক অধিনায়ককে শেষ বিদায় অভিনন্দন জানালেন।

গভাসকার অস্থির থাকায় দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করতে আসেন চৌহানের সঙ্গে রজার বিনি। ১২ মিনিটে নটি বল খেলে শূন্য হাতে বিনি ফিরে যাওয়াতে একথা প্রমাণ হল গভাসকারকে ছাড়া ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তনের কথা ভাবাই যায় না। তাছাড়া চৌহানকে এখনও ভারতীয় দলের স্বার্থে প্রয়োজন আছে। তেমনি বিনির পর কিরমানি খেলতে এসে ১২ মিনিট উইকেটে থেকে শূন্য রান করে ফিরে গেলে অস্থিরতার জন্ম এই টেস্টে অংশ গ্রহণ করতে না পারা দিলীপ বেঙ্গ-সরকারের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তারপর অবশ্য এক-রকম বাধ্য হয়েই গভাসকার খেলতে আসেন। গভাসকার ৩৫ মিনিট ক্রীজে ছিলেন এবং সন্দীপ পাতিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে ইন্ডেনের দর্শকদের স্পোর্টিং ক্রিকেট উপহার দিয়ে গেছেন।



প্রথম দিনের খেলায় ঘাউড়ীর বলে সাদিক মহম্মদ বোল্ড আউট।
ছবি : বিভাস সোম



প্রথম দিনের খেলায় ইমরান খান বলে সুনীল গভাসকার আহত।
ছবি : বিভাস সোম

এই টেস্টে কপিল দেবের ডাবল লাভ অবশ্যই ভারতীয় ক্রিকেটে এক স্মরণীয় ঘটনা। বিদ্যুৎ মানকড়ের পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি ডাবল লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এবং কপিল সবচেয়ে কম বয়সে ডাবল পাওয়ার কৃতিত্বও অর্জন করলেন। এর আগে আর কোন ভারতীয় পেস বোলায় এই সম্মানের অধিকারী হন নি।

এই টেস্টে সন্দীপ পাতিলের ভূমিকা ভারতীয় দলের আগামী দিনের আশা ভরসা। এই টেস্টে তিনি যে শুধু ভারতীয় দলের সর্বোচ্চ স্কোরার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা নয়। সাবলীল ভঙ্গি-মায় উইকেটের চারিদিকে ঘুরে খেলে তিনি প্রমাণ করেছেন তার যোগ্যতাকে। ভারতীয় ক্রিকেটে কপিল এবং সন্দীপের ভূমিকা উজ্জল ও সার্থক হবে বলে আশা রাখি।

একটি পত্রিকা

সং, স্বপ্ন, সংগ্রামী চলচ্চিত্র-আন্দোলন অত্যন্ত দেশের মত আমা-দের দেশেও ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। চল-চ্চিত্রকে শুধুমাত্র চিত্রবিনোদনের বস্তু হিসাবে গণ্য না করে শিল্প মাধ্যম রূপে তাকে মর্যাদার আসনে বসাবার প্রচেষ্টা ফিল্ম সোসাইটির সভ্যরা চালাচ্ছেন নানাবিধভাবে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ যার অন্ততম। চল-চ্চিত্র মাধ্যমের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীর, সুচিন্তিত, বিশ্লেষণ মূলক লেখা প্রকাশের দায়িত্বও তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। ফিল্ম সোসাইটিগুলির কেন্দ্রীয় সংস্থা ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ ইন্ডিয়া ইংরাজী মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার'-এর নবম সংখ্যা প্রবোধকুমার মৈত্রের সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটিতে ভারতীয় চল-চ্চিত্রে বর্তমানে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে স্থলিত আটটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, যা থেকে বিতর্কমূলক চিন্তার পোরা ক পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রের দুই দিকপাল সত্যজিৎ রায় এবং রাইনহার্ড হাউসেন সঙ্গে সাক্ষাৎকার এই দুই কৃতী শিল্পীর সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে। চিদানন্দ দাশগুপ্ত, কবিতা সরকার, উৎপল দত্ত, শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ লেখকদের পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছেন নবীন লেখকেরা।

ইন্দিরা মেনকা

১ম পৃষ্ঠার পর

বলতে যা বোঝায় সঞ্জয়ের চাইতে তা অনেক বেশী। স্তব্ধতা তিনি কিছুতেই চাইবেন না, রাজনীতি বা প্রশাসনিক যে কোন ক্ষেত্রেই প্রতি-ভার বিকাশে মেনকা সঞ্জয়ের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রমাণিত হোক। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পূজ-কেই ভারতবাসীর কর্ণধার হিসাবে দেখে যেতে চান, পূজবধূকে নয়।

এদিকে মেনকাও নাছোড়বান্দা। এনিময়ে মেনকার সঙ্গে তার স্বামীরও যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়েছে। মা-বেটা যৌথ উত্তোগে মেনকাকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, যেহেতু তাঁর (মেনকার) দলের সাংগঠনিক কাজ ও প্রচার যন্ত্র সংগঠিত করার যোগ্যতা আছে সেহেতু তার এতেই আত্ম-নিয়োগ করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। এডওয়ার্ডসের ধর্মদর্শন / শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্তী / ১০০

২। সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান / শ্রীমাপ্রসাদ দাশ / ২৬০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন নিয়ে তদন্ত কমিশন হতে পারে

প্রার্থীদের প্রতি হাইকোর্টে মামলা না করার নির্দেশ

ইন্দিরা-সঞ্জয় অভিযোগের পক্ষে তথ্য চেয়েছেন

ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা রুজু না করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের ভয়ভূতির পর রাজ্য কংগ্রেসের অনেক নেতাই দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীকে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে সি পি এমের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ জানিয়ে আসেন। এই সব নেতাদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে

ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজয় স্থানান্তরিত করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক কারচুপির আশ্রয় নিয়েছেন। রাজ্য নেতারা আরও অভিযোগ করেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্র যদি এখনই কোন ব্যবস্থা না নেন তবে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি পি এমকে কোন নির্বাচনেই পরাজিত করা যাবে না।

ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধী রাজ্য নেতাদের কাছে এই সব অভিযোগের সমর্থনে তথ্যাদি দেখতে শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

দপন

ত্রয়োদশ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮০। ৬০ পয়সা

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি

হতে পারেন আবদুস সাত্তার

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি সম্ভবত আবদুস সাত্তার। যদিও স্বরত মুখার্জীরা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জোরালো দাবী জানিয়েছেন পরবর্তী সভাপতি পদে অজিত পান্ডাকে মনোনীত করার ক্ষমতা, কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বরত-বাবুদের দাবীকে আমল দিতে রাজী নন বলে বিশ্বাসস্থলে জানা গেছে।

কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার দলের এই রাজ্যের নেতৃত্বান্বিতদের সার্ব জনিয়ে দিয়েছেন যে জোরদার সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হও। গোষ্ঠী-বিবাদ ছেড়ে সংগঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার জন্য রাজ্য ইন্দিরা

কংগ্রেসের দুই বিবাদমান গোষ্ঠী ইন্দিরার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। এই রাজ্যের ব্যাপারে কতদূর কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে সঞ্জয় নাথ কমল নাথ প্রতিনিধিত্ব করছেন। গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীকে অবহিত করেন।

চলতি সপ্তাহে কমল নাথের সঙ্গে স্বরত মুখার্জীর এক গোপন বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে কমল নাথ বলেন যে, এই রাজ্যে দলের মধ্যকার বিবাদ দূর করতে হলে পরবর্তী রাজ্য সভাপতি পদে আবদুস সাত্তারকে বসানোই হয়ত সঙ্গত হবে। স্বরত-বাবু অবশ্য কমল নাথের এই প্রস্তাবের শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

চোরাচালানের দায়ে কুটনীতিকের পত্নী গ্রেপ্তার

ফরাসী দেশের ভূমিক প্রথম সারির সামরিক অফিসার গত জুন মাস থেকে দরকারী কাজে সজীক এদেশে বসবাস করতে শুরু করেন। জাহাজারী মাসের শুরুতেই সজীক কাজকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পর ২৩/১১/৮০ তারিখে এ ফরাসী কুটনীতিকের স্ত্রী প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তার স্ত্রী ফ্রান্সের শ্রীমতী হ্যাডার গলফার কাস্টমস পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। কাস্টমস পুলিশ শ্রীমতী গলফারের গ্রেট কোর্টের কলার, হাতার পটি ও কোর্টের অভ্যন্তর অংশবিশেষ

থেকে সাড়ে তিন কেজি অফিয় ও প্রায় ২৫ ভরি সোনা উদ্ধার করে। গোপন স্থানে সংবাদ পেয়ে পুলিশ এই তথ্যসী চালায়। মিলেস অবশ্য তিনি যে চোরাচালানকারী নন এটা প্রমাণ করার জন্য এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ওখানে চক্ষু বিশেষজ্ঞের সহকারী হিসাবে চাকুরীজীবনে তার কতদিন অধ্যয়ন হয়ে যায় এবং ভূমিক বন্ধুর পরামর্শ মত তিনি এ মাদক দ্রব্য সেবনের অভ্যাস করেন। এতে উপকারও হয়। আর এ



চার পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা হবে

ইমার্জেন্সী একসেস ইনকোয়ারারী কমিশনে ঘোষী সাব্যস্ত রাজ্য পুলিশের আই বি বিভাগের সেই চারজন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে শীঘ্রই মামলা আরম্ভ হবে। কমিশন স্থলে জানা গেছে যে, কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার যেনে নিয়ে-

ছেন এবং সেই সুপারিশ অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা হবে। এবং অভিযোগ অনুসারে মামলা চলবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঘোষী সাব্যস্ত চারজন পুলিশ অফিসার হলেন শ্রীমশোক ধাসনবিশ, শ্রীমন্তোষকুমার সেন, শ্রীমহিরকান্তি মিত্র এবং শ্রীরতনলাল মুখার্জী। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা ভূমিক শ্রীশঙ্কু রক্ষিতকে গ্রেপ্তার করেন এবং তৃতীয় ডিগ্রীর অত্যাচার চালান। সর্বোপরি সেই আটকও নাকি ছিল অধৈর্য।

ইতিপূর্বে কমিশনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট তিনটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এই মামলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিচারপতি শ্রীহরতোষ চক্রবর্তী সুপারিশ করেছেন যে, ভারতীয় হওবিধি আইনের বিভিন্ন ধারার এই চার পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হোক।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা

অন্তর্বর্তী রিপোর্ট কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। সম্ভবত সেই অন্তর্বর্তী শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

রাজ্য বিধানসভা সদস্যের কীর্তি

কিছুদিন পূর্বে রাজ্য বিধানসভার শিডিউলড কাষ্ট কমিটির বৈঠক শুরু হবার কিছু পূর্বে গোয়খা লীগের বিধানসভা দপ্তর শ্রীদেওপ্রকাশ রাই বিধানসভা সচিবালয়ের জনৈক ডেপুটি সেক্রেটারীকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে ধান। উক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী তখন দৌড়ে শিডিউলড কাষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত বিশ্বাসের কাছে ঢুকে পড়ে আশ্রয়লা করেন। শ্রীদেওরা নরমুলা নামক এক বিধানসভা সদস্য শ্রীরাইকে ধরে ফেলেন। ঘটনা আর বেশীদূর গড়ায় নি।

বিধানসভা সচিবালয় স্থলের খবরে প্রকাশ যে, শ্রীরাই কমিটির শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

বিরোধীরা হুঁশিয়ার!

কথামালায় দু'রাখা মেসেজের ছলের অভাব হয় নি, সে পুঙ্খই যেমনাবকটির ঘাড় মটকেছিল তার বাপ ভুল বোলা করার অভ্যুত্থানে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের হুই অকংগ্রেসী (ই) সরকারের পছন্দ্যুত করার ভুল ইন্দিরা গান্ধী ও ছলের আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের মাদারগ-পুর এবং বিহারের পরশবিয়া ও দোহিয়ার ঘটনাকে পুঙ্খ করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) নেতারা রাজ্য দুটোকে ছলের ভাবে আনতে উঠে পড়ে লেগেছেন। 'বারারদী দাসের আর গড়িতে থাকার অধিকার নেই'—উত্তরপ্রদেশের লোকদল সরকার সম্পর্কে এ রায় দেবার পর কেন্দ্রীয় জাহাজঘরী এ পি শর্মা ও একই স্বরে বিহারের জনতা সরকারের গর্ভন চেয়েছেন। লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার পর সঙ্গর গান্ধী তো যেম দশদম বনে গিয়েছেন। দশমুখে তিনি অকংগ্রেসী (ই) সরকার ও বিরোধী দলগুলো সম্পর্কে বিমোদন্য করে চলেছেন। কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর গত এক মাসে কংগ্রেসী (ই) নেতারা যে আচার-আচরণ, হুঁশিয়ার করে চলেছেন সে সবেরই লক্ষ্য যে দেশে বৈরত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সেটা ক্রমশই ফটিকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

নারায়ণপুর বা পরশবিয়া দোহিয়ার ঘটনা অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং অব্যাহত—এ বিষয়ে কোন মহলেই লংশর নেই। উত্তর কেন্দ্রেই শাসক ও বিরোধী দল-গুলোর পক্ষ থেকে ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য দুটোতে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে শ্রমজী গান্ধী বা কংগ্রেসী (ই) নেতৃবৃন্দ যে প্রচার শুরু করেছেন সেটাই ছলচাতুরীরই নামান্তর। ইন্দিরাগান্ধী আত্মকমতার ফিরে এসে বেলচি, কানপুর, আলিগড় জগদীশপুর পুর্নিয়া মদীয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ অভিযোগও তিনি তুলতে ভোলেননি যে এসময় কেন্দ্রে নাকি লংগিষ্ট নেতারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে বানমি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য বেশ কয়েকজন সদস্য যে নদীয়ার ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে শাস্তি সভা করেছিলেন, তা তিনি সবসে চোঁপে গিয়েছেন। তিনি রিস্ত হবার চেষ্টা করেছেন তুর্কমান

গেট, রেওয়ান্দা, পিপলী, মুজকরনগর ইত্যাদির ঘটনা। তিরিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে একটি বছরও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবিভেদভিত্তিক হাঙ্গামা ব্যতিরেকে কেটেছে? কিন্তু তখন কবে কোন রাজ্য সরকারকে নয়াদিগ্নি বা কংগ্রেস হাইকমান্ড কমতার থাকার 'অযোগ্য' মার দিয়েছেন? আজ আসামে যে-কিছু চলছে তার প্রতিকার শ্রমজী গান্ধী কীভাবে করতে চাইছেন? আজ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বহিঃকংগ্রেস (ই) সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকতেন, তবে প্রধানমন্ত্রীর বা তার অস্থচরতার তা চোঁপেই পড়তনা। কিংবা পড়লেও বেয়ালুস হুজর কত ঘেঁতেন। কারণ সেফেজে রাজ্য সরকারের গারে কাঁচা ছিটালে সে-কাঁচা কেন্দ্রের গারে গিয়েই লাগত।

লক্ষ্য স্থির রেখে পরিচিত ছক করেই ইন্দিরা সরকার সে লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছেন। অকংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকার বা বিধানসভাগুলোকে রাজ্যসভার শিবাবিকী নির্বাচনের আগেই ভেঙে দেওয়া অথবা ব্যাপক দলভাগ্য ঘটিয়ে রাজ্য সরকারগুলো বগলদাবা করা, যেসব ঘটছে কর্ণাটক হরিয়ানার। কিন্তু অ-কংগ্রেসী (ই) বিরোধী দল নেতারা এ-বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়েও এ আক্রমণ প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করছেন কি? প্রতিরোধ আন্দোলন, গণ আন্দোলন এমন কি লবশেষে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নেতা মাধু হিরিপাধ, গণ অভ্যুত্থানের কথাও বলেছেন। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সংকল্পও ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্রে এ-সংকল্প কতখানি বাস্তবে রূপান্তরিত হবে সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় থেকেই থাকে। কারণ এখনো জনতা, লোক দল ও কংগ্রেস নেতাদের যথারীতি পরস্পরের প্রতি কদমিনিক্ষেপে ক্রান্তিহীন দেখা থাকে। বিরোধী দলগুলোর অন্তঃরিোধ থেকে করদা তুলে নেতিবাচক ভোটে বেরন করে শ্রমজী গান্ধী কমতার প্রত্যাবর্তনে একদিন লক্ষ্য হয়ে-ছেন, অহরুপ আত্মবাতী আচরণ তারা অব্যাহত রাখলে অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলোকেও অচিরেই ইন্দিয়ার পায়ের তলায় চলে যেতে দেখা যাবে না কি? এমন কি সেফেজে বিধানসভার নির্বাচনেও বিরোধী দলগুলো মুলোয় বিশেষ যেতে পারে। অতএব এখনো সময় আছে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার হুঁশিয়ার হবার।

তদন্ত কমিশন

১ম পৃষ্ঠার পর

চান বলে জানা গেছে। রাজ্য মেতাদের পক্ষ থেকে নাকি এ ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য কেন্দ্রীয় হুই মেতার কাছে পেশ করা হয়েছে।

এরপর দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী ও সঙ্গর গান্ধী রাজ্যের হুই মেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং বরকত পণ্ডিতান চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। জানা গেছে এই হুই মেতাও অভিযোগের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রণববাবু এবং বরকত দাহেব পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক-সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বরকত দাহেব মালদহ কেন্দ্র থেকে জয় লাভ করলেও প্রণববাবু বোলপুর কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।

জানা গেছে, ইন্দিরা গান্ধী এবং সঙ্গর গান্ধী এ ব্যাপারে বেশ কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গেও কথা বলেন। জানা গেছে, তোলা সেন,

বিধানসভা সদস্য

১ম পৃষ্ঠার পর

সদস্য না হয়েও বৈঠকে যোগ দিতে চাওয়ার উক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী বলেন: তা কি করে সম্ভব? এই কথাতেই নাকি শ্রীরাই চটে বান এবং ডেপুটি সেক্রেটারীকে ধারালো ভোজালি নিয়ে ভেঙে বান। জানা গেছে যে, শ্রীরাই নাকি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

কমিটির চেয়ারম্যান রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস সমস্ত ঘটনা শোনেম এবং শ্রীরাইকে বলেন যে, এ জাতীয় আচরণ করা তার উচিত হয়নি। মন্ত্রীর সঙ্গেও নাকি শ্রীরাই অত্যাচার করেন। শ্রীরাইকে বুঝিয়ে দেয় পাঠাবার পর অবশ্য কমিটির বৈঠক হয়। জানা গেছে যে, এই ঘটনা সম্পর্কে রাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে কমিটির সদস্যদের জানিয়েছেন।

একজন ডেপুটি সেক্রেটারীর সঙ্গে একজন বিধায়কের এই জাতীয় আচরণে বিধানসভা সচিবালয়ের কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। তাদের মতে শ্রীরাইয়ের বিরুদ্ধে বধ্যবধ ব্যবস্থা নেয়া হোক। বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে আরও জানা গেছে যে, এর এল এ হোটেলের শ্রীরাই মন্ত অবস্থায় কর্মীদের ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রায়ই তাড়া করেন। সকলেই বলেছেন শ্রীরাই বাতে সংঘত হন সেফজ উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনই নেওয়া দরকার।

আব্দুল সাভার প্রমুখ ইন্দিরা কংগ্রেসের আইনজীবী নেতারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন বসানোর ব্যাপারে আইনগত কোন বাধা নেই। জানা গেছে এ ব্যাপারে আরও কিছু আইনজ্ঞেরও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রাজ্যের পুরাক্রান্ত কোন প্রার্থীই যেম নির্বাচনী মামলা রুজু না করেন। দলীয় প্রার্থীরা নির্বাচনী মামলার জড়িয়ে পড়লে তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যাপারে আইনগত অস্থবিধা দেখা দিতে পারে বলে কয়েকজন আইনজ্ঞ মতামত দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আইনজ্ঞরা একথাও বলেছেন, নির্বাচনের ব্যাপারে তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং তার হুঁশিয়ারের ভিত্তিতে কোন রাজ্যের নির্বাচন বাতিল করা যায় না।

তবুও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন এবং ব্যাপারটি এখন আইনমন্ত্রকের বিবেচনাধীন আছে।

রাজ্যের বেশ কিছু মেতার সঙ্গে কথা বলে রাখা হয়েছে যে, রাজনৈতিক কারণেই কেন্দ্র তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারেন। কারণ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অহুজল হলে তার ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন এ রাজ্যে গড়ে তোলা যাবে এবং এই রিপোর্টকেই হাতিকার হিসাবে বারজুট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মর্ভাবনা রয়েছে আছে।

পুলিশ অফিসার

১ম পৃষ্ঠার পর

রিপোর্টগুলি বিধানসভার রতর্দান অধিবেশনে পেশ করা হবে।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে যে, প্রথম তিনটি প্রতিবেদনে যে সব মামলা সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেছেন তার অধিকাংশই তনানী চলতে পারে এমন আপাতগ্রাহ্য অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

আরও জানা গেছে যে, তনানী শেবে যেসব মামলার ক্ষেত্রে দোষ প্রমাণিত হয়েছে সেইসব ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করার প্রকৃতি চলছে। যে তামিকার প্রথমই রয়েছে উপরোক্ত চার-পুলিশ অফিসারের মামলাটি।

আয়ুর্বেদ ছাত্রদের দাবী

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে, যা পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল তা নিয়ে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও ইন্টার্নরা জে, বি, রায় ষ্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহাকরণ বার। ছাত্র প্রতিনিধিদের এক ডেপুটেশনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আখান যেম যে, এই সমস্ত ব্যাপারে তিনি শনিবার ১৫/২/৮০ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং সমস্ত দাবী কার্যকরী করবেন।

রিজ সরকারীভাবে কোনরূপ সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রী ও ইন্টার্নদের কাছে পৌঁছানি। তাই কলেজ

প্রাঙ্গণে ৪ দিন অবস্থানের পর ১২ই ফেব্রুয়ারী জে, বি, রায় ষ্টেট আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও ইন্টার্নগণ মিছিল সহকারে এসপ্যান্ডেট ইষ্টে বেলা ১২টা থেকে পুনরায় অবস্থান ধর্মরটের সামিল হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে দাবী কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থান করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা লাগাতার বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

দাবীগুলি হল (১) বি, এ, এম, এস কোর্সের অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অবিলম্বে ঠাক সেট আপ

করতে হবে; (২) বি-এ এম-এস (প, ব, আ, পরিবর্ধ) ছাত্রদের অস্ত্র অস্ত্র রাজ্যের ভার সংকিশ্ত লাইসেন্সিয়েট ও পরমর্ভী এম বি বি এস চালু করতে হবে; (৩) আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের ই-এম আই ডীস-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; (৪) চিকিৎসা বিভাগের অস্ত্র সাধারণ ভার হাউস ঠাক ও ইন্টার্নদের সমান ভাতা দিতে হবে; (৫) আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের হেলথ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; (৬) আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের অধিকার দিতে হবে।

দেখে শুনে মনে হয়, এ দেশের অধিকাংশ এম এল এ, এম পি-দের পেছনে কুহুর লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। এ নিয়ে মনঃসম্মতি করণীয় আর কিই বা থাকতে পারে? যারা মনিব ছাড়া বাঁচেন না কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় মনিব পার্টার, কুহুরেরাও তাদের ঘণা করে। যারা আত্মবিক্রয়ের জন্য ছোটোছোটো করে, ঘর কবাকবি করে, 'জনপ্রতিনিধি'র উদ্বোধনী এমন বস্তুর বিকিকিনির চালাও ব্যবস্থাটি অবশ্যই ভারতীয় 'সমাজতন্ত্র'-নমুনা। বাজারটি চমৎকার ফেপেফুলে উঠছে, দেশী মাল দেশী খেদের, খাদ্যবস্তুর মতই দেশী উপকরণে দেশী প্রযুক্তি বিভাগ দেশী বয়ন-শিল্প। তবে যিনি বিক্রেতা তিনিই বিক্রেতা—চাহিদা মাত্রই অচেনা যোগান আত্মনির্ভরতার পক্ষে এক বিস্তারিত পদক্ষেপ বৈধ। বিদেশী মুদ্রাও লাগে না, দেশী মুদ্রার দমজ্ঞ কাল কারবার।

বন্দরযাত্রী রাজনীতির সর্বশেষ অবস্থানস্বরূপ এ তেজী কারবারে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই নিশ্চয়ই অসাধারণ। রামা শ্যামার ব্যাপার নয়, রীতিমত কেউ কেউ তাদের 'রাজনীতি'। রীতিনীতির তোরাক বা রা করে খাদি-টুপি রাজনীতিকরা তাদের কেউ নয়, কোনকালেই ছিল না। গাছীবাড়ী সংগঠন পদ্ধতির যারা খোজ রাখেন তারা সবাই জানেন যে, এ দলে নীতিবোধের কোন বালাই কখনিকালেও ছিল না। আত্মসম্মতিস্বার্থের মনঃ উপায়গুলি স্তম্ভ হয়ে উঠলে এরা চিরকালই নির্বিধার পটকে পড়ে নিরুদ্ভাট উপায়ের সন্ধানে। রাধাল না হলে গরুর দল পথ চিনে চলতে পারে না, আবার গরু না হলে রাধাল বেকার। অত উপায় বন্ধন নেই, তখন গরু আর গোপাল এক হবই। অতএব, মতুন গরু, মতুন গোপাল—চলতি ভাষায় 'ডিফেকশন'।

গরুর পাল গোয়াল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু গোয়ালিনীর উপর রাগ করে নয়, নিতান্তই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অতঃপর দিন করেকের অশ্রুবিদগ্ধন—অবশ্যই কারো অশ্রু নয়; দিন করেকের মড়াকালা—অবশ্যই ঘাটের মড়া জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি; দিন করেকের তর্জন-গর্জন—অবশ্যই প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে। অতঃপর নির্বাচনে সিদ্ধিলাভ মাত্রই ডাক-সাইটে গোপালের পালে ভিড়ে বাও। গোপালের মা ডাকলাইটে গোয়ালিনী; কপাল কিরবে গোয়াল মিলবে। এদের কেউবা আধাশাস্ত্র প্রভু—চাবীকে জরিহাড়া তিটেছাড়া

গোয়ালিনীর গোয়াল

শ্রীপতি নন্দী

করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে দান নিয়ে মজুতদারী করেন, কিন্তু নির্বাচনী সরকারের ক'দিনে সুমিহাস-প্রধার বিরুদ্ধে ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে বাধ্য হয়ে ওঠেন; এদের কেউবা পুঞ্জির মালিক—দেশী-বিদেশী পুঞ্জির সঙ্গে ভাগীদারীতে বিদেশের বাজারে সস্তা মালের যোগান দেন, দেশের শ্রমিক জন-সাধারণকে নির্যমভাবে শোষণ করেন, আরো শোষণের খোঁজ দেন; কিন্তু নির্বাচনী সভাগুলিতে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' প্রতিশ্রুত পদাবলী পাঠ করেন; এদের কেউবা স্থানীয় বণাটে চ্যাণ্ডা—লুটপাটের অমন বাজারে নিজের না থেকে নিজস্ব 'ছাজনেতা' 'স্ববনেতা' ইত্যাদি; আবার কেউবা স্বর্ণের দললে ভূর্ণিত 'আইনজীবী'—আইন-ফাঁকির আইন জানেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কূটকৌশল আয়ত্ত করেছেন, কামিনী-কাঞ্চন লোভী যুবকদের গোলাঘাতার অতঃ-আখ্যাস দেন—অতএব, তাদের 'নেতা'। এরা কখনো মখনো গোয়াল ছেড়ে দিলেও গোয়ালিনীকে ভুলতে পারে না, কেননা গোয়ালিনী রক্তাক্তমালিনী হয়েও রাজনিক প্রসাদ বিতরণে দৃষ্টি রাখেন, পারি-বারিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসিনী, পূজা-র্চনার যাপনকে পুণ্যস্থানে ও দৈবা-চারের গণনার অটল আত্মাশীল; পিতৃভাগ্যে ভাগ্যবতী, পুত্রগর্বে গরবিনী—কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও সরকারী টাকায় পারিবারিক কল্যাণ-প্রাধানে এবং আইনের আশ্রয়ে থেকে আত্মলভকে বুদ্ধাচুর্নিত দেখাতে লিঙ্ক-হুগা। অতএব, প্রকৃত দেশাত্মবোধ বাদের বাড়-বাড়ন্তের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ, তারা সকলেই গোয়ালিনীর গোয়ালের টানে ঘুরপাক খেয়ে "পাপীর জুয়ারে পাপ মাগিছে সহায়"।

একটা আইন করতে যে দেশে পনের দিন সময় লাগে না, অভিজ্ঞতা জারী করতে লাগে পনের মিনিট, গরীবশাসনের দে আইন সে আদা-লত ভাগ্যবানদের লেজাঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনা, কিন্তু জুর্জগাদেয়ে কঠোর শাসনে রাখে। শত শত কমিশন-কমিটি আর স্পেশ্যাল কোর্ট-গুলি সেখানে রাজকোষের বাহশাহী অপচয় মাত্র—রাজকীয় আইনকলার রাজকীয় বাহার। গোয়ালিনীর গোয়াল এক প্রশংসিত জীর্ণ—কার

সাধ্য তার বোহ ত্যাগ করে। অত-এব, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের বোলকলা অক্ষর রাখতে ১৯৬৭ থেকে চৌক বছর পার করে দিয়েও ডিফেকশন-বিরোধী আঃনের এক পংক্তিও লেখা হলো না। আমের শাস নিঃশেষ হবার পরও আঁটিটি কামড়ে এরা ধরে থাকতে চায়, পাছে আঁটির গারে লেগে থাকা মিঠেল প্রলেপটুকু অপর কেউ চেখে নেয়।

এরাই যেন কি সব 'প্রতিশ্রুতি' দিয়েছিল; তাদের দল আছে, প্রতীক আছে—এমন সব কথাও বলেছিল। কয়েক বছর পর পর একমাত্র এমন প্রতিশ্রুতি বিতরণের সময়েরই সাধারণ মাহুয় এদের দৃষ্টিতে সম্ভাব্য হয়ে ওঠে—'শালা'র পরিবর্তে 'ভাই' হয়, 'ভুই'—এর বদলে 'আপনি'। হঠাৎ-কৃতজ্ঞ সরল মাহুয় কাগজে ছাপ মেয়ে এদের করে-খাওয়ার ব্যবস্থাটি করে দিতে পারে, সে 'অধিকার' তার আছে;

বলিভিয়ায় আবার অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি

তপন বসু

অভ্যুত্থান-সম্বন্ধ বলিভিয়ার আবার একটা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সিংহা-লনচ্যুতির নাট্যাভিনয়ের ড্রেস রিহা-গাল পূর্ণোত্তমে চলেছে। বাধীনতার পর ১৯৭ বছরের মধ্যে এটা হ'বে ২০১ তম কুপ এবং বিগত ২০ মাসের মধ্যে চতুর্ভুতম। প্রাসাদ বড়বড় ও সামরিক অভ্যুত্থানে ঠাসা বলিভিয়ার ইতিহাস বৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানে সর্বশেষ বড়বড় সংগঠিত হয় গত ১লা নভেম্বর ওয়ালটার গুয়েতারাকে সামরিক কুপ মারফৎ গৃহচ্যুত করার মধ্য দিয়ে। একই দিনে প্রাসাদ বড়বড়ের উদ্যোক্তা কলোনেল অ্যাল-বার্টো নেথুশ নিজেকে বলিভিয়ার স্বাধীন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। অভ্যুত্থানের সময় অ্যালবার্টোর সক্রিয় সহযোগী ছিল এয়ার কোর্স ও পুলিশ এই দুই বাহিনীর প্রধানেরা। কিন্তু পদাতিক বাহিনীর ফিল্ড মার্শাল ডেভিড প্যাভিলা এ ব্যাপারে অ্যাল-বার্টোর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এবং কোনরূপ সহযোগিতা করেন নি। ফলতঃ তাকে নেথুশ প্রশাসন কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে হেনস্থা হতে হয়।

অবশ্য একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ওয়ালটার গুয়েতারাকে কমতাহুত করার ফলে মনঃ বলিভিয়ারাবাদীই

কিন্তু এদের গলার লাগাম পরিয়ে দিতে পারে না—সে অধিকারটি তার নেই। অতএব, ভোটপ্রার্থির ভয় বধারীতি ধস্তবাহ জানিয়ে খ্রী'গরু' দেশের ঋণ শোধ করতে পারেন উদ্বরণুতির ভয় বৃদ্ধি চরে না বেড়িয়ে গোয়ালিনীর গোয়ালে যদি ঠাই নেন এতে করণীয় আর কি আছে?

গোয়ালিনীর দুধ শাসককুলকে বলীয়ান করে। গোয়ালিনী নিজে দুধ দেয় না—দুধ সংগ্রহ করে দুধ বিলোয়। অতভাবে বলতে গেলে, গোয়ালখানাই গোয়ালিনীর উপায়, অবলম্বন—আর গো-কুলের আশ্রয়। বুর্জোয়া রাজনীতির নির্জলা নির্বা-সের দুঃস্থানে শাসকশ্রেণীর শাসনবয় বত জোরদার হয়, গোয়ালিনীর খুঁটিও ততই-শক্ত হয়।

একটি এম এল এ অন্যান এক লাখ ভোট মারে—বিশ-বাইশ হাজার ভোট পেয়ে এক ভোটারের নোর্বতোম কমতাকে'কে লোপাট করে দিতে পারে। একটি এম পি কমসে কাম দাত লাখ মাহুয়ের ভোটাধিকারকে তার ইচ্ছামুযায়ী কাজে লাগাতে পারে—অবশ্যই পিতৃকুলের মাতৃকুলের কল্যাণ মাখনে। অবাধ তামাশার এ রমরমা

বলিভিয়ায় আবার অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি

কুপ। এবং তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত আইনসম্মত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রস্তুত উন্নতি সাধনের জন্য তিনি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের অগ্র-গতির জন্য তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের উদ্যোগকে নিয়োজিত করেন। বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গেও গুয়ে-তারার আমলে সম্পর্ক সবথেকে ভাল হয়। স্বতাবতই তাকে গৃহচ্যুত করতে গিয়ে বেথুশের পক্ষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গুয়েতারার বিরুদ্ধে অসার যুক্তিতর্কের অবতারণা করে কাণ্ডজানহীন আক্রমণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

লা-পালের মিলিটারী কলেজের প্রাক্তন কামাতার অ্যালবার্টো নেথুশ ১লা নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে বলেন "এই সরকার দাবিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং জাতীয় ও শালন কাঠামোকে মেনে নেবে। কিন্তু একই দিনে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের অংশীদার ও গণ প্রজাতান্ত্রিক

ব্যবস্থাটি অবশ্যই 'স্বায়ী সরকার' গঠনের সর্বশেষ ঠেক রাজনৈতিক জোচ্ছুরি ও অর্থনৈতিক ব্যতি-চারের অমূল্য মস্তকা—ভারতীয় সংবিধানের সম্বলজালিত ব্যবস্থা। সংবিধান থেকেই নির্বাক, সংবিধান প্রণেতার যে ব্যবস্থাকে 'নিধানের বিধান' বলে জানেন, আইন-আদা-লত থেকেই অর্থবর্ষ বর্ষক, সেক্ষেত্রে এমন। "আইন-শৃঙ্খলা"র সারসত্য-টুকুকে উপলব্ধি করে এবং "প্রতি-কারহীন শক্তের অপরাধে"র প্রতি-কারকল্পে নিরুপায় 'সার্বভৌম' ভোটারকুল যদি কুহুরের শরণাপন্ন হয়, তাহলে ভারতের সংসদীয় গণ-তন্ত্রের ইতিহাসে কুহুরকুলের সক্রিয় 'অপোজিশন'এর এ সুমিকাটি অবশ্যই একটি নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দেবে। 'নেতা'-কুল ও কুহুরকুলের এ অভিনব স্বপ্নের মীমাংসা বাই হোক না কেন, 'আইন-শৃঙ্খলা'র নামে মাহুয়ের বেলায় বা চলতে পারে কুহুরের বেলায় তা একেবারেই অচল। কশ-মার্কিনের এমন রঙ-মহলে প্রজাতন্ত্রের পুতুলনাচ বধার্থই বধার্থ।

বলিভিয়ায় আবার অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি

ইউনিয়নের লভ্য ৭৭ জন সংসদ সদস্য—যারা সংসদে বেশীর ভাগ আসনের অধিকারী এই সামরিক অভ্যুত্থানকে ঘণাতরে বিচার জানিয়েছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বানজার পরিচালিত জাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন দল সংসদ অধিবেশনে অগ্রপথিত ছিলেন। বলিভিয়ার শ্রমিকদের জলী সংগঠন দি সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন কেডা-রেশন-এর বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টা সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শহরের রাস্তার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ছাজদের এক বিরাত সংঘর্ষ ঘটে।

প্রাক্তন মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য লহ ওয়ালটার গুয়েতারার স্বয়ং খোদ লা-পালে অবস্থান করে অ্যাল-বার্টো সরকারের বিরুদ্ধে বিজোহ পরিচালনা করছেন। এবং এব্যাপারে দেশের অধিকাংশ রাজ-নৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, ছাজ ও শিক্ষক সমিতিগুলি ও বিশাল লংঘ্যাপরিষ্ঠ জনগণ গুয়ে-তারার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এটাও লহজই অহুয়ের যে, পদাতিক বাহিনীর প্রধান ফিল্ড শেবাংশ ১০ম পুঠার

মতামত

রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি প্রশ্নে

“দর্শন” কাগজে শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আরো এক মিথ্যা আশ্বাস” লেখাটি খুবই আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম।

প্রকৃতপক্ষে যে সব বীর বিপ্লবীরা আজও ভারতের বিভিন্ন অঙ্গকারাগারে বন্দী রয়েছেন এবং প্রতিনিয়ত স্বত্বায় সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের ধোয়া সন্তান। ভারতের ব্যাপক মেহনতী, শোষিত মানুষের চিরস্বামী মুক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সমস্ত রক্তমাখা শোষণ, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে সেই সব বীর বিপ্লবীরা আত্মনিয়োগ করে-

ছিলেন। শত শত যুবক শহীদ হয়েছেন। তাঁদের রক্ত দান কখনও ব্যর্থ হবে না। ভবিষ্যতে মুক্ত ভারতবর্ষের উজ্জল স্বর্গলোকে তাঁদের নাম চিরদিন জল জল করবে।

প্রতিক্রিয়ালীল ও আত্মত্যাগের দেশের সংস্কৃতির শোষণবাহীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে জনসাধারণকে বোকা-নোর-চেষ্টা করছে যে এ সব বন্দীরা সবাই লম্বাঘাড়ের, কিছু প্রকৃত অর্থেই সব বীর বিপ্লবীরা বর্তমান ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী। কারণ যে সমাজের মালিক দেশি বিদেশী মরখাদকরা, রক্তচোষা জমিদার আর মহাজনরা প্রকৃত বিপ্লবীরা সেই সমাজের অবশেষই বিরোধী। সেই

সমাজব্যবস্থাকে বলপূর্বক ধ্বংস করাই কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র শোষণবাহীরাই পটা পটা ভারতের এই বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে মোহাচ্ছন্ন করার চেষ্টা করে। তারা শোষণ ও শোষিতের সহাবস্থানের একনম্বর প্রবক্তা, ওরা বক্তৃলাকদের কেনা হালাল।

বীর বিপ্লবীদের সমাজ-বিরোধী বলাটা মতন কিছু ব্যাপার নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবৈধ ফসল গাছী ভারতের বীর সন্তানবাহীদের বহুবার সামাজ্য-বিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সেইসব বীর সন্তানরা আজও প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে বেদীপায়মান।

৩০ বছরের কংগ্রেসী কৃশাসন এবং বিশেষত ক্যানিষ্ট ইন্সিয়ার জরুরী অবস্থার বহু সোমার টুকরো অমূল্য প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেইসব বিপ্লবীদের হত্যাকারীরা আজও বহাল ভবিষ্যতে যুগে বেড়াচ্ছে। কোন প্রচলিত আইনই তাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারছে না। আমার দৃষ্টি

বিবাহ, সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয় যেদিন বিপ্লবী জনগণ প্রতিক্রিয়ালীলদের কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি মূল্য স্বপ্নে আসলে আদায় করবেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়ালীল শক্তিকে বড় মনে হতে পারে কিন্তু ইতিমধ্যেই তাদের কয় শুক হয়ে গেছে। এটাই অমূল্যক বস্তুবাদী চিন্তাধারা। শেষ

বিচারে জনগণই বিধি ইতিহাসের নিরস্তা শক্তি। প্রচণ্ড গণবিপ্লবের জোয়ারে জনগণ তাঁদের অন্তরের প্রিয় ঐশ্বর্য বন্দী বিপ্লবীদের হিনিয়ে নিয়ে আসবেন—আসবেনই। আমরা সেই উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে আশা নিয়েই চলেছি।

শঙ্করনাথ সেনগুপ্ত

গ্রামাণ হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার চাই

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীন ডাইরেটর অফ হোমিওপ্যাথীর উদ্যোগে পঞ্চায়েত ডাইরেটরদের সাহায্যে গ্রাম গঞ্জে প্রতিটি অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানের গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে পঞ্চায়েত হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সে আশা চার বছর আগের কথা। শতদেড়ক হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ বাকি। বাকি কেন্দ্রে এখনও সরকারী স্বীকৃতি যার নি কিংবা কেন্দ্র চালু নয়, বন্ধ। হুগলী জেলায়

শ্রীরামপুর মহকুমার আইরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাধপুরে একটি হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে বহু বছর ধরে। ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের চাকুরীর নিয়োগপত্র পাঠাবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ পঞ্চায়েত ডাইরেটর ডাইরেটর অফ হোমিওপ্যাথীকেও বার বার লিখছেন। উত্তর নেই। বলাবাহুল্য কেন্দ্রটি সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে কয়েক বছর আগে। সরকার ক্ষত নিয়োগ পত্র পাঠান।

এএফ কামরুদ্দীন আহমদ

আইরা / বাধপুর

সি পি এম সমর্থকদের বাড়িতে

ই-কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সশস্ত্র হামলা

গত ৩১শে জানুয়ারী একদল সশস্ত্র ইন্সিয়ার কংগ্রেস সমর্থকদের পৈশাচিক আক্রমণে মগুরদা বহুপুর অঞ্চলের অন্তর্গত নয়াগ্রামের একই পরিবারের ৫ জন সার্বজনিকভাবে আহত হয়। এই রক্তাক্ত আক্রমণ চলাকালে গুণ্ডারা লগর্বে বলে—বিগত নির্বাচনে সি পি এম-কে সমর্থন করার জন্য এই শাস্তি দেওয়া হ’ল। এই গ্রামের চারটি বাড়ী আক্রমণ করা হয়। প্রতিটি বাড়ীর টালির ছাদ ভেঙে ভেঙিয়ে দেওয়া হয়। আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কতখানি প্রাণ জ্বলের হেতু-মাটির আশ্রিত রহমানের বাড়ী। ইন্সিয়ার, ফার্সী, কুড়াল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বিকাল ৫টার সময় গুণ্ডারা তাঁর বাড়ী চড়াও হয়। ঘরের দরজা বন্ধ করেও তাঁর পরিবারের কেউ রেহাই পায় নি। গুণ্ডারা তিন ঘরের শক্ত কাঠের দরজা কুড়াল শাবল দিয়ে ভেঙে ফেলে, তারপর আক্রমণ চালায় মাহমুদের উপর। রহমান সাহেবের ১০ বছরের বৃদ্ধা মা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, গুণ্ডাদের অস্ত্রের আঘাত থেকে এই চলাফেরার অক্ষম বৃদ্ধাও রেহাই পান নি। তাঁর রক্তে ঘরের মেঝে, দেওয়াল ভিজে যায়। ওরা জানুয়ারী আমরা সেই রক্তের দাগ বচকে দেখে এমেছি। বৃদ্ধার রক্তাক্ত বিছানা এখনো সেই

ভাবেই রাখা আছে, আর তিনি এখনও যত্নের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছেন মালদা সদর হাসপাতালে।

এই আক্রমণে রহমান সাহেবের ছেলে আনোয়ার এবং দুই ভাইপো নজরুল ইসলাম ও কলিমুদ্দিন মারাত্মক ভাবে জখম হয়। তারাও হাসপাতালে। আর এক ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন রহমান সাহেবের ভাই বদ্রিচন্দ্রান এবং তাঁর স্ত্রী হাসনাবাণু। ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডাদের শাবলের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে কাঠের দরজা ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই গুণ্ডারা বদ্রিচন্দ্রানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই রক্তস্রুত বদ্রিচন্দ্রান মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হাসনাবাণু মেঝে হয়েও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পান নি। তাঁর ও তার সোমার গলার হারটি হিনিয়ে-মের। তিনিও প্রহত হন। বদ্রিচন্দ্রান এখন হাসপাতালে।

গুণ্ডারা রহমান সাহেবের বাড়ীর প্রতিটি ঘর তহনহ করেছিল। বাস ভেঙে ১০০ টাকা নিয়ে গেছে। কাঠের চেয়ারগুলো ভেঙেছে। একটা কিল্প রেডিও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। রক্তাক্ত কাপড় চোপড় ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

শতাধিক গুণ্ডা সেদিন আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। রহমান সাহেবের বাড়ী ছাড়াও গুণ্ডারা সেদিন অন্তত ৩ আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল নয়াগ্রামেরই লিয়াকত আলীর বাড়ী। এই বাড়ীর ৪টা ঘরের ছাদের টালিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে আদমার জড় হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগেই এই বাড়ীর উপর দিয়ে একটা কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে। এই বাড়ী থেকে একটা চামড়ার স্টা-কেন লুটিত হয়েছে, তাতে ছিল ২ ভরির মোনার অলঙ্কার এবং ১৩শ টাকা। এদের রক্ত রোক্তাগের প্রধান অবলম্বন একটা ঘোড়ার গাড়ী গুণ্ডারা ভেঙে ফেলেছে।

আক্রমণের পরবর্তী শিকার হন পরীক দরজী মোজাম্মেল হক। বাড়ীর বাইরের বারান্দাটাই ছিল তাঁর হোকাম। তখন বিকাল। মোজাম্মেল হোকামে সেলাইয়ের কাজ করছিলেন। পাশে লিয়াকতের বাড়ীতে বসন তুলকালাচ চলছিল, সেই সময়ই কয়েকজন গুণ্ডা তার বাড়ীতেও চড়াও হয়। মোজাম্মেল ঘর বন্ধ করে ছাদের একটা কুঠরীতে তার বাচ্চা ঘেরকে নিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর তরুণী স্ত্রী লালোরা বিবি তাড়াতাড়ি পালিয়ে পেশখা ১০০ পুঁছার



ইফকো লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়াস একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত অস্থায়ী-টিকাদার / সরবরাহকারী / প্রকৃতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরের / পার্শ্বেটেন্ডের ভিত্তিতে মূল্য করা টেন্ডার :

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ

রেকা: নং (১) এ সি টি / ডি এম আর / ল্যাব ট্রাক। ৮০-৮১ / জেন / ৫৬ / ৮০ / ৭৩ / তাং ৩০-১-৮০

(২) এ সি টি / ডি এম আর / ৫৪ / ৮০ / ১৯৮০-৮১ / ৭৪ তাং ৩০-১-৮০

(১) তামোরা কোলিয়ারী থেকে সিরিমিট জরুর ২ (৭ ও ৮ সি টি) হয়ে ও ত্রিপুর কোলিয়ারী থেকে দামরা কোলিয়ারীতে দৈনিক পরিবহনের জন্য এবং তাঁদের আরোহণ স্থানে যথাক্রমে ফিরিয়ে আনার জন্য। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দর অস্থায়ী প্রতি ট্রাকের জন্য ৮৫ টাকা নির্দিষ্ট করেছেন। চুক্তির সময়কাল ১-৪-৮০ থেকে ৩১-৩-৮১। (২) দামরা কোলিয়ারী কর্তৃপক্ষের নিকট অস্থায়ী-বধন প্রয়োজন গাহ’র্য করলা সহ ই সি এল ওয়ার্কশপ। ট্রাক ও অস্ত্রায় জায়গার ট্রাকের জিনিসপত্র, বিভিন্ন ধরনের প্রাক্ট ও মেসিনারী পরিবহন, লোডিং ও আনলোডিং। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য টেন্ডারদাতাদের নিজেদের আয়ত্তে নিজেদের ট্রাক থাকা দরকার। ১৯৮০-৮১ সালে চুক্তি থাকবে। প্রতি সেটের জন্য নগদে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিয়ে (প্রত্যাপনযোগ্য) ২১-২-৮০ তারিখে / আগে / পরে দামরা কোলিয়ারীর প্রোডাকশন ম্যানেজার / হেড ক্লার্ক / কেশিয়ারের কাছ থেকে শর্তাবলী সহ টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে। ৪-৩-৮০ বেলা ৩৩০ টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৪ টায় দামরা কোলিয়ারী, ত্রিপুর এরিয়া, পো: কালিপাহাড়ি, জেলা বর্ধমান টিকানার এজেন্টের অফিসে খোলা হবে। টেন্ডার খোলার দিন কোন টেন্ডারপত্র দেওয়া হবে না।

সামান্য: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেন্ডারে প্রদত্ত এরিয়া/কোলিয়ারী/দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আত্ম-মানিক ধরনের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মনিঅর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌঁছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দোষার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

আফগান সংকটের গোড়ার কথা

শতদল সেনা

আফগানিস্তানে সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রীতিমত উদ্বেগ করে তুলেছে। এর কারণও আছে। আফগানিস্তান পাকিস্তান ও ইরানের সাধারণ সীমান্ত এই উদ্বেগের প্রধান কারণ। ইরানের তেলের উপর আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান অনেকটা নির্ভরশীল। ইরানের উপর এই মুহূর্তে আমেরিকার প্রভাব নেই। ইরানে পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় বালুচ উপজাতিদের একটি পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলার এক অনেক দিনের পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরী করতে চায়। এর জন্যে সি আই এ এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছিল।

সি আই এ এই পরিকল্পনা সারা দক্ষিণ এশিয়াকে কুক্ষিগত করার জন্যে সতর্কভাবে রচনা করা হয়েছে। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিদের নিয়ে ইউনাইটেড ট্রেটস অব আসাম গড়ে তোলার পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতীয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ইউনিয়ন অব বালুচ পিপলস রিপাবলিক গড়ে তোলার মূল লক্ষ্য এক। ভারতীয় উপমহাদেশকে সীড়ানী আক্রমণের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশীরা এলাকায় পরিণত করাই এর আসল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে ধাপে ধাপে সাধনো হয়েছে। সি আই এ এর বিভিন্ন কর্মকর্তাকে এর বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের পর মার্কিন সেনেট কোন দেশের সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে সি আই এ যে চেষ্টা করতো তা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট কার্টার এখন আবার সি আই একে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। এর জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ মার্কিন প্রতিরক্ষা ভান্ডার থেকে যোগানো হবে।

এই নয়া নির্দেশে সি আই এ হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার বিশিষ্ট সংবাদ সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে জানা যায় যে আফগানিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এডলফ ডাংসকে গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে বন্দন হত্যা করা হয় তখন শ্রাবণ যুক্তরাষ্ট্র জনগণতান্ত্রিক আফগান সরকারের প্রেসিডেন্ট নূর মুহম্মদ তারাকর বহলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হাফিজুল্লাহ সঙ্গে যোগাযোগ করে। নাহে মার্কিনবাসী

বিশ্ব ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী আমিন মার্কিন কাঁদে পড়েন। আফগানিস্তানে চিলির মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। আলেক্সের মত প্রেসিডেন্ট তারাকিও প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিনের হাতে নিহত হন। হাজার হাজার গণতান্ত্রিক আফগান বিপ্লবের সমর্থক নিহত অথবা কারাবন্দী হন। চিলির পিনোচেত যেমন শাস্তিরাগো ষ্টেডিয়ামে চল্লিশ হাজার কমিউনিষ্ট ও গণতান্ত্রিক দলের সমর্থকদের আটক করে বেছে বেছে হত্যা করতে শুরু করে হাফিজুল্লাহ আমিনও অল্পকাল মার্কিন পরিকল্পনা কার্যকরী করে। বিপ্লবকে ঘৃণিত করে তোলার এই হুচতুর পরিকল্পনা সি আই এ এই রচনা। আমিন তার প্রধান ঘৃণি হয়ে পড়েন।

এদিকে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল জিয়াউল হক গোড়া থেকেই এই মার্কিন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গে মিশরের প্রেসিডেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের নবলক বন্ধু আনোয়ার সাদাতও যোগ দেন। পাকিস্তান ও আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে দোজী সিন্ধা শিবিরগুলিতে আফগান মোল্লাতন্ত্রের অস্থায়ী তথাকথিত বিদ্রোহী আফগানদের সামরিক ট্রেনিং দিতে থাকেন। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই সংবাদ শুধু জানতেন তাই নয়, আফগানিস্তানে বিদ্রোহীদের আক্রমণে মুফতী পরিহিত পাক সেনাওলও যে অংশ নিতে চলেছিল মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। আক্রমণের দিনক্ষণ বহন ঠিকঠাক, হাফিজুল্লাহ আমিনের আত্মদম্পত্যের ব্যবস্থা পাকপাক এবং আফগান গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পেছন থেকে ছুরি মারার পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বমুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বতন তারাকি সরকারের আমন্ত্রণে ও চেকোস্লোভাকিয়ার আফগান রাষ্ট্রদূত বারবাক কারমালের নির্বাহক অনুরোধে পারম্পরিক সাহায্য চুক্তির বলে আফগানিস্তানে সেনাদল পাঠায়। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কবল থেকে আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সোভিয়েত সরকার তারাকির আমলে ইতস্ততঃ করেছে কারণ তখন আমেরিকা ও পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে দাঁতাত বা সমঝোতার মরীচিক

রূপের কোন সুঁকি নেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। যদি নূর মুহম্মদ তারাকির সাহায্যের অহরোধ সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতস্ততঃ না করে সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করতো তাহলে নূর মোহাম্মদ তারাকির মত অভিজ্ঞ এককামী গণতান্ত্রিক নেতাকে খাতকদের হাতে প্রাণ দিতে হতো না, হাজার হাজার আফগান বিপ্লবীর প্রাণও রক্ষা পেতো।

শেষ পর্যন্ত বাস্তব পরিস্থিতি দাঁতাতের মরীচিকায় সম্মোহিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি করে আসে। বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই চিলির শোচনীয় পরিণতি থেকে আফগানিস্তান রক্ষা পায়।

ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী মিত্রদের আর্দ্রনাশ শুরু হয়ে। যে দেশ নিজের ভাষায় মর্যাদার স্বার্থে সাধারণ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস পায় না, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভয় দেখিয়ে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছে। এর প্রধান কারণ একচেটিয়া বুর্জোয়া জেণ্ডার কাছে জাতীয় মর্যাদা বলে কিছু নেই। তাদের কাছে মুনাকার সাম্রাজ্যই বড় কথা। মার্কিন অর্থনীতি এমন "বৃত্ত" হয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে। বেকার সংখ্যা এবারের মত বেশী ১১৩০ মালের মন্দার সময়েও হয় নি। মার্কিন দেশে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির হার বছরে ২০ শতাংশ। ইউরোপের মিত্র দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমালে আমেরিকা কিছুটা রক্ষা পেত কিন্তু কোন মিত্রদেশই রাজী হচ্ছে না। আফগান সংকটের অছিলায় আমেরিকা নতুন যে যুক্তজোট বাঁধতে চায়, ক্রান্ত তাতে রাজী নয়, পশ্চিমজার্মানীও নয়। আফগান সমস্যা নিয়ে আমেরিকা ও তার পশ্চিমী মিত্র দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে-বৈঠক হবার কথা ক্রান্ত তাতেও যোগ দেবে না বলে সাক জানিয়ে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদের নিজের অস্তবস্ত প্রাধান্য লাভ করেছে এটা স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মন্ত্রণের আশায় কথা। দুঃখের বিষয় চীন এই সময় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আফগানিস্তানের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। যে গণতন্ত্র-আফগান কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিয়েছে, শিল্পব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছে, শিক্ষার শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

অর্থনীতি

ইউনিডো সম্মেলনের বার্থতা

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

নয়া দিল্লীতে ইউনিডো বা রাষ্ট্র-সংঘের শিল্পায়ন সংস্থার অধিবেশন শেষ হয়েছে। পরে আরো আলোচনা করার আশান দিয়ে যে এক্ষণতের দলিল প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মূল প্রশ্নটিকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে রাজ, কোন মীমাংসা হয়নি।

অবশ্য, বিকাশশীল দেশগুলির ক্ষত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আহুত এই সম্মেলন যে ব্যর্থ হবে তা গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি এখন ক্রমাগত সংকটে বিপর্যস্ত তখন সাম্রাজ্যবাদী শিল্পায়ন দেশগুলি বিকাশশীল দেশগুলির ক্ষত শিল্পায়নকে যেনতেন প্রকার বাধা দিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। স্তত্রায় নয়া দিল্লীতে চলতি বছরের ২১শে জানুয়ারী থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের শিল্পায়ন সংস্থার তৃতীয় সাধারণ সম্মেলন যে সাফল্য লাভ করবে না তা প্রায় অস্বাভাবিকই ছিল।

সংস্থার একত্রিকিউটিভ ডিরেক্টর ডাঃ কানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে যোঝাতে চেয়েছিলেন যে আন্তর্জাতিক "মন্ডা" রোধের ক্ষেত্রে তাদের বিকাশশীল দেশসমূহের ক্ষত শিল্পায়নে সম্মত হওয়া উচিত। তার মতে বিকাশশীল দেশসমূহের ক্ষত শিল্পায়ন ধনী শিল্পায়ন দেশগুলির সঙ্গে বাজার সৃষ্টি করবে। কথাটা আংশিক সত্য। ক্ষত শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলি পশ্চিমী শিল্পায়ন দেশগুলির কাছ থেকে উপযুক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কারিগরী জ্ঞান কিনতে চাইবে। ফলে শিল্পায়ন দেশগুলি বর্তমান বছরেই যে বিশ্বব্যাপী মন্দার আশঙ্কা করেছে তা অনেকটা কেটে যাবে।

কিন্তু শিল্পায়ন পশ্চিমী দেশগুলি বিকাশশীল দেশগুলিতে স্বাধীনভাবে শিল্প বিকাশ লাভ করুক এটা চায় না। তারা মনে করে যে বিকাশশীল দেশগুলির ক্ষত শিল্পায়ন শেষ পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের প্রভাব হ্রাস করবে কারণ নতুন নতুন দেশ শিল্প-বিস্তারে সমর্থ হলে বিশ্বের বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে এবং তাদের মূল্যের হার কমে যাবে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন বিকাশশীল দেশে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠলে তাদের নিজস্ব দেশের শিল্প কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কারণ অধিকাংশ বিকাশশীল দেশই শিল্পের

নানা কাঁচামাল ও তৈজ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাদের শিল্প ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বর্তমান শিল্পায়ন দেশগুলির পক্ষে সম্ভব হবে না। শিল্পায়ন দেশগুলি তাদের একচেটিয়া স্বার্থ হ্রাস করে সামগ্রিক ভাবে কোন কোন বিকাশশীল দেশকে বিশেষ স্বযোগ সুবিধা দিতে রাজী হলেও তারা এমন কিছু করতে চায় না যা ফলে স্বাধীনভাবে তাদের একচেটিয়া স্বার্থ হ্রাস হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পায়ন দেশগুলি যে সব শিল্প এখন আর চলে না বা অত্যধিক মাত্রায় প্রমিত্রের সেগুলি নিজস্ব দেশ থেকে উঠিয়ে এনে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বসাতে রাজী। কিন্তু নতুন ও ক্রমবর্ধমানশীল কোন শিল্প তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বসাতে দিতে তারা আর্দ্র রাজী নয়। যেমন তুলো ও কার্পাসজাত বস্ত্রশিল্প এখন প্রায় অচল, তার কারিগর পলিয়েস্টার প্রভৃতি কৃত্রিম আঁসজাত বস্ত্র স্থান অধিকার করেছে। স্তত্রায় তৃতীয় বিশ্বের দেশে কার্পাসজাত বস্ত্রের কল বসানোতে তাদের আপত্তি নেই, কিন্তু পলিয়েস্টার শিল্প নৈব নৈব চ। তেমনি সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পও নয়।

অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা শোচনীয়। শিল্পায়ন দেশগুলির শিল্পায়ন হ্রাস এবং মুদ্রা-ক্ষীতির হার বৃদ্ধি তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে মারাত্মকভাবে সাবাত করেছে। একদিকে পশ্চিমী দেশগুলিকে তারা অপেক্ষাকৃত সম্ভাবনায় কাঁচামাল সরবরাহ করতে এবং মুদ্রা-ক্ষীতিজ্ঞানিত চড়া দামে তাদের শিল্পায়ন পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে তারা স্বদেশেও এই "সামর্য্যাদী-কৃত মুদ্রাক্ষীতি ও মূল্যবৃদ্ধি" হুঁজোগে পড়েছে। পরিণাম হিসেবে তাদের আন্তর্জাতিক ঘনোপাণনার হিমাবে বিরাট ষাটতি যেটানোর গুরুভার নিতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই শিল্পায়ন ধনী দেশগুলির প্রাইভেট ব্যাংক থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৭০-৭১ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ডলার, ১৯৭৭-৭৮ সালে এ পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮৮০ কোটি ডলার। বছর বছর এই ঋণের স্থপ ৩-৪%ই তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের খায় প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবার শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১১)

ডঃ আনিসুজ্জামান

অজুন দাস

বাংলাদেশ যে কয়েকজন কৃতি সন্তান সম্পর্কে পৌরব অহুতব করতে পারে তার তেতর ডঃ আনিসুজ্জামানের নাম সবার আগে উল্লেখ্য। এই বুদ্ধিদৃষ্টি শিক্কটি একেবারে তরুণ বয়স থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জন করেছেন। এমন নির্লোভ, নির্মোহ ও নিরহকার ব্যক্তিত্ব শুধু বাঙলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই বিরল।

ডঃ আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার মোহনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম এ পাশ করেন এবং ১৯৬০ সালে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগ থেকে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের যেসব ছাত্র পরে শিক্ষকতাক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের ভেতর ডঃ আনিসুজ্জামান নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন তা একমাত্র তাঁর নিরলস অধ্যবসায়ের গুণেই সম্ভব হয়েছে। একমাত্র এই কারণেই তিনি শিক্ষক হিসেবে সার্থক এবং একই কারণে দলমতনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রের কাছেই তিনি জনপ্রিয়। ১৯৬৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর ঢাকা থেকে চাটগাঁ আসার কারণ কি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন যে পদোন্নতি নাকি এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা পালন করে নি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অভ্যন্তরে ধারিত মতভেদ ও দলাহলির জটাই নাকি সেই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছিলেন। একথাটাতেই ডঃ আনিসের মনোভাব যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। যে বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন, সেই বছরই বাঙলা বিভাগের কৃতি অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো দুর্ঘটনাক্রমে কারণে। অনেকের ধারণা, তিনি বিভাগীয় দলাহলির ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করেছিলেন। ডঃ আনিসের ব্যক্তি-

গত চরিত্র, সাধারণ ও সাধাসিধে জীবনের প্রতি তাঁর অসুরাগ উপলব্ধি করতে হলে এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের ঘটনাটি লামনে আনতেই হবে। ঢাকার তাঁর বাড়ি রয়েছে, মা-বাবা রয়েছেন, সর্বোপরি একটা পুরনো পরিবেশ রয়েছে, এসব ছেড়ে শুধু পদোন্নতির লোভে ঢাকা ত্যাগ করা তাঁর মতো লোকের পক্ষে অসম্ভব। ডঃ আনিসুজ্জামান এখনো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছেন।

১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে অনেকের সঙ্গে ডঃ আনিসুজ্জামানও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেই সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে চলে আসেন এবং বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে দুর্বার কর্মপ্রেরণার পরিচয় প্রদান করেন তা সত্যি বিশ্বাসকর। সবচেয়ে মজার কথা হলো, বিজয়ের পর অনেকের মত ডঃ আনিস কোন প্রকার পদোন্নতি বা অস্ত্র কোম লোভনীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ পাবার আশ্রয় বসে না থেকে সোজা এসে তাঁর পুরনো কাজে যোগদান করেন। তিনি শিক্ষকতার কাজেই নিয়োজিত থাকবেন এই তাঁর ইচ্ছা।

ডঃ আনিসুজ্জামানের নির্লোভ মনোভাব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আমি দুটো ঘটনা উল্লেখ করছি। বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুকাল পর বঙ্গবন্ধু তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর উপর শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণের কথা বলেন। সাধারণতঃ সচিবের পদগুলো সিভিল সার্ভিসের লোক থেকেই নিয়োগ করা হতো। সেক্ষেত্রে ডঃ আনিসুজ্জামানের পক্ষে এই পদ গ্রহণের আশ্বাস ছিলো অচিস্তানীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সচিবের পদ মর্যাদার দিক দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের পদ থেকে উচ্চতর। আনিসুজ্জামান সে পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান। এই অসম্মতি প্রকাশের পেছনে একমাত্র কাজ করে শিক্ষকতার প্রতি তার আগ্রহ। শেখ সাহেব আনিসুজ্জামানের আপত্তি অগ্রাহ করেন। ফলে তিনি তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীনের শরণাপন্ন হন। তাজউদ্দীন আনিসুজ্জামানের বনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অবশেষে তাজউদ্দীনের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি

লাভ করেন। শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর এজাতীয় আরো একটি ঘটনা ঘটে। তখন জনাব আবুল ফজল প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য। এই সময় বাঙলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদটি শূন্য হয়। এই পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি আনিসুজ্জামানকে অসুরোধ জানান। তাঁর ধারণা আনিসুজ্জামান একাডেমীর কাজ সূচাক্রমে চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু এবারও আনিসুজ্জামান পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। অজুহাত সেই একটাই—শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে চান না। আজ যেখানে বহু খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীও বিভিন্ন বড়কুটা ধরে পদোন্নতি চান সেখানে ডঃ আনিসুজ্জামানের এই নির্দিষ্টতা ও নিরাসক্তি সত্যি বিশ্বাসকর।

ডঃ আনিসুজ্জামান এ যাবত বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছেন। বহু সম্মেলনে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং কোথাও কোথাও বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এইসব প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৭৮ সালে তিনি বাঙলাদেশের বিস্তৃত জনপদে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সম্পর্কে একখানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধখানা জাপানের একটি সংকলনে প্রকাশিত হবে।

আনিসুজ্জামানের মূল সাহিত্যকৃতি মুসলমানদের ভেতর সাহিত্য লিপ্যনীর বিকাশের উপর। তাঁর সেই গবেষণাকর্মটি ১৯৬৪ সালে 'মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আনিসুজ্জামান ১৭৭ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম মানসের বিকাশ দেখিয়েছেন। এই বিশাল পরিধির ঐতিহাসিক পটভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান যে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেছেন তা সত্যি বিশ্বাসকর। এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিকও গোটা সময়টিকে এমন সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন নি। বিশেষতঃ এই সময়কালে মুসলিম মানসের বিকাশ প্রসঙ্গে তিনি যে মুক্ত বুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় প্রদান করেছেন তা অস্বতপূর্ব। তাঁর মূল সাহিত্যকর্মের সূচনা মিশ্র ভাষারীতির কাব্য থেকে। এই রীতিকেও তিনি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তাঁর আর একটি অসাধারণ কাজ হলো 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র'। এই গ্রন্থটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মুসলিম সম্প্রদায় ও প্রকাশিত পত্রপত্রিকার আর্থিকাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়ের

বিবরণী প্রদান করেছেন। প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকার সূচীপত্র এবং পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা পর্যন্ত মতায়ত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থেও ডঃ আনিসুজ্জামানের পরিচয়ের ছাপ রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁর আর একটি অসাধারণ কাজ হলো রবীন্দ্রনাথের উপর একটি প্রবন্ধ সংকলন। এই গ্রন্থে বাঙলাদেশের বহু শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীর রচনা সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো তৎকালে উদ্ভিত প্রবল রবীন্দ্র-বিরোধিতা তথা বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী সরকারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ।

স্বাধীনতার পর তার আরো দুখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'মুন্সীর চৌধুরী' (১৯৭৫) নামক গ্রন্থে তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী মুন্সীর চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম আলোচনা

করেছেন। এই আলোচনার আনিসুজ্জামান একজন দক্ষ সমালোচক হিসেবে নিজ শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধরনের সন্ধান' ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 'চর্চাপদের সমাজচিত্র' শীর্ষক আলোচনাটি খুবই উপাদেয়। তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন, চর্চাপদে বিস্তৃত সমাজ নগরকেন্দ্রিক। এছাড়া মুসলিম সাহিত্য ও সমাজ বিশ্লেষণাত্মক আরো দুখানা প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

সম্প্রতি ডঃ আনিসুজ্জামান লণ্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কোম্পানী আমলের কিছু চিঠিপত্র নিয়ে কাজ করছেন। এগুলো প্রকাশিত হলে বহু নতুন সামাজিক তথ্য আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ইউনিডো সম্মেলনের ব্যর্থতা

৫ম পৃষ্ঠায় পর

আন্তর্জাতিক মহাজনদের কাছে তাহের হাত পেতে দাঁড়াতে হচ্ছে।

১৯৭০-৭৪ সালে আন্তর্জাতিক শিল্পোৎপাদনের মাত্র সাত শতাংশ বিকাশশীল তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির হাতে ছিল। ঐ সময় লিবার অল্পভিত ইউনিডো সম্মেলনে স্থির করা হয় যে ২০০০ সাল নাগাদ এই অংশ ২৫ শতাংশে ওঠাতে হবে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে শিল্পোৎপাদনে ২৫ শতাংশ অংশ পেলেও এই সমস্ত বিকাশশীল দেশে মাথাপিছু শিল্পোৎপাদন প্রায় একই মাত্রার থেকে যাবে। অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে বিকাশশীল দেশসমূহের মাথাপিছু আয়ের যে বিরূপ ব্যবধান এখন রয়েছে, ২০০০ সালেও তার পরিবর্তন হবে না। অস্ত্র কথার শিল্পোন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলির মধ্যে এখন যে ব্যবধান রয়েছে তা ২০০০ সালেও স্থায়ী হয়ে থাকবে।

১৯৭৩-৭৪ সালে বিকাশশীল দেশগুলি সারা বিশ্বের শিল্পোৎপাদনের মাত্র সাত শতাংশ উৎপাদন করেছে। হিসেবে দেখা যায় ১৯৭৭-৭৮ সালে ৯ শতাংশ হয়েছে। এই হারে শিল্পোন্নত দেশে ২০০০ সাল নাগাদ এই হার ১৩ বা ১৪ শতাংশের বেশী হতে পারে না। ইউনিডোর ডিরেক্টর ডাঃ কানে নিজেই তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ২০০০ সাল নাগাদ ২৫ শতাংশ শিল্পোৎপাদন অর্জন করা অসম্ভব।

শুধু তাই নয়। বিভিন্ন বিকাশশীল দেশে এখন যে ধরনের সামাজিক কাঠামো রয়েছে তার ফলে ২৫ শতাংশ শিল্পোৎপাদন সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য কমবে না। কারণ বিকাশশীল দেশগুলি যদি ক্রমাগত অসম বানিজ্যের শিকার হতে থাকে তাহলে শিল্পোৎপাদনে নিশ্চয় অবস্থা দেখা দিতে পারে। বর্তমান ধনবৈষম্য তিরিক সমাজ কাঠামো এই শোচনীয় অবস্থাকে আরো কঠিন করে তুলবে। অর্থাৎ বিকাশশীল দেশসমূহের জনগণের দারিদ্র্য স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়ে বসবে।

সুতরাং সমস্ত বিকাশশীল দেশকে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি অসমবানিজ্য এবং স্থায়ী মুদ্রাক্রান্তি ও মূল্যবৃদ্ধির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে নিজেদের উন্মোচনে বিভিন্ন বিকাশশীল দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্পায়নে এগিয়ে আসতে হবে। আশার কথা, ভারতের মত কারিগরী জ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তার সঙ্গে বহু দেশের জনগণের আত্মনির্ভরশীল উন্মোচন হিলিত হলে বিকাশশীল দেশসমূহের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাওয়া যাবে। সুতরাং এখন নতুন করে ভারতে হবে এবং নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন পথে চলতে হবে।

একটি দশকের বিষয় বিদায় লগ্নে

সুধেন্দু মৈত্র

সত্তর দশক মুক্তির দশক। এটা ছিল কল্পনা আশা। কিন্তু হায় আমাদের চোখের সামনে দিলে এমন একটা দশকে চলে যেতে দেখলাম যে দশক শুধু ছাপ রেখে গেল বিশ্ব-কর যুগ-অবিধাঙ্গ আর হতাশার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ-নৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলি ক্রমাগত ঘূর্ণিত মধ্যে পড়ে তাকালো আর ভাবলো। নতুন আশার আলোটিও তখন নিতে পারল না। কোন আশাসের বাণী রেখে গেলো না আগামী দশক এই আশীর দশকের জন্ম।

সত্তর দশকের অন্তিম তারতীয় এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে ছিল অনিশ্চয়তার প্রতীক। কেন্দ্রে ছিল শ্রমজী গান্ধীর সংখ্যালঘু সরকার। আর আমাদের প্রদেশে ক্ষীণ আশাসের বাণী বহনকারী বাম-পন্থী সরকার বিশ্বাসঘাতকতার আদিম অস্ত্রে নিহত। ভাবপ্রবণ আবেগ উদ্বেলিত বাকালী। এই শতাব্দীর শুরুতে বাকালী তরুণের দল দেশ মুক্তির পতাকা সামনে রেখে প্রাণ দিয়েছে অকাতরে। সেই একই প্রবণতার স্বযোগ নিয়ে একদল তাত্ত্বিক আবার তাদের সামনে মুক্তির স্বপ্নজাল বুনলেন। ব্যক্তি স্বার্থে নয়, সমাজ ও দেশের স্বার্থে তারুণ্যের শক্তি নিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল একদল তরুণ। চাইল দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে তাদের বিশ্বাসমত মুক্তির বাণী। অপরদিকে ব্যুরোক্যাটের দল, যারা তারুণ্য হারিয়ে শেষ দিনের অপেক্ষায় "অভিজ্ঞতার" কানাগলিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা হায়নার কত কাঁপিয়ে পড়ল। আবার রক্ত। শতাব্দীর প্রথমে কত রক্ত করেছিল, তার হিসেবে কে দেবে? এবার কত রক্ত গেলো তার হিসেবেই বা কে নেবে?

দেখা দিলো পূর্ব পাকিস্তানের "বাকালী দেশ" স্থাপনের স্বপ্ন। শুক্র হল ১৪ দিন ব্যাপী ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। "হিভিনীল" "গরিবী হঠাৎ" সরকার চাই। নির্বাচন হল ১৯৭১ সালে। শ্রমজী গান্ধী ১৮০ সালের নির্বাচনের মতই ৩০০টি অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ নিজ দলের সত্য নিয়ে ফিরে এলেন ক্ষমতায়।

নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গেও হল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার নেতৃত্ব এবার নিলো "বামপন্থী" নামধারী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক ও এক মাত্র "সমাজতন্ত্রী দল" এস, ইউ, সি।

কলে বামপন্থী সরকার গঠন হল না। নেবে এলো রাষ্ট্রপতির শাসন।

পূর্ব ঘুরে চলে আপন নিয়মে। তাই ১৯৭১ সালই শেষ বছর নয়। এলো ১৯৭২-এর নির্বাচন। সংগে নিয়ে এলো ভারতীয় রাজনৈতিক চিত্রে ও গণতান্ত্রিক অভিধানে একটি নতুন পরিভাষা। "রিগিং"-কারচুপি ছিল। "কমসু ভোটিং" নামে একটি শব্দ ছিল। কিন্তু সত্তর দশকের বিশ শতাব্দী সময় পার না হতেই তার এত ব্যাপক ও বীভৎস প্রকাশ হক-চকিয়ে দিলো গণতন্ত্রের স্বাধারী-দেহকে।

নিঃশব্দে উবে গেল "মত্যা" "মিথ্যা" বামপন্থীদের দল। রক্তাশ্রয়ী ও রক্তদানকারী অভিধাম লেবেল আঁটা দলটিকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের নাম ব্যবহারকারী দল-উপদল গোষ্ঠী স্বস্বময়ের অপেক্ষায় অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলো। যে দলের জয় হল নতুন নামে ১৯৬৪-র শেষে এবং বাস্তবে যারা তাদের কার্যকলাপ ১৯৬৭-র নির্বাচন দিয়ে শুভ উদ্বোধন করল, তারা শেষ করল ১৯৬৯ এবং ১৯৭১ ও ১৯৭২ এর নির্বাচন দিয়ে। অপরদিকে অপর কোশলী দল লেনিনের নাম জপ করতে করতে গাঁটছড়া বাঁধল শাসক দলের সংগে।

ইতিহাস নিজে নিজে রচিত হয় না। মানুষই তাকে রচনা করে। আর সত্তর দশক দেখিয়েছে ভবি-ব্যতের ইতিহাস দেশে দেশে রচিত হবে একমাত্র শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে ও ইচ্ছায়। যাটের দশকে বিশ্ব রাজ-নৈতিক মানচিত্রের গৌরবে উজ্জল নামটি ছিল ভিয়েতনাম। সত্তর দশক দেখেছিল তার পূর্বাঙ্গ উত্থান। আবার এই সত্তর দশকই দশকের ভূমিকা গ্রহণ করলো ভিয়েতনাম কম্যুনিষ্ট ও চীনের ত্রিভুজ। যারা একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব জনমতকে অমানিশার মধ্য রাজির মধ্যে ঠেলে দিলো।

ভারতবর্ষ দেখলো ১৯৭৭-এর নির্বাচনসহ ফলকে জনগণের গণ-তান্ত্রিক অধিকার অর্জনে জয়যাত্রার শুরু হিসেবে লক্ষ বার প্রচারিত হতে। কিন্তু ডেমোক্রাসি আর মনোভ্রান্তির পার্থক্য আজও বুঝতে পারল না। ভারত দেখলো গণতন্ত্রের নামে বুদ্ধ লোপুণ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের হিমায় কাড়াকাড়ি আর ছেঁড়া ছেঁড়ি।

দেখলো একই মার্কস-এঙ্গেলসের পুজারী দুই সাম্যবাদী দল একে অপরকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে পিছপা নয়। আরও দেখলো এদেরই একদল অপর দলকে শাসক গোষ্ঠীর লেজুড় আখ্যা দিয়ে চলতে চলতে নিজস্বাই আবার শাসক-বুলের লেজুড় বনে গেল। আরও দেখলো সত্তর দশকের প্রবক্তা হল নিজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে শাসক দলের কপাপ্রার্থী হল।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কাটল ধরেছিল দুই দশক-পূর্বেই। বিশ্ব-জনমত বুঝতে চেষ্টা করছিল এই মতাদর্শগত পার্থক্যের ফলাফল। কিন্তু হায়, সত্তর দশক সে স্বপ্নও ভেঙে দিলো। মতাদর্শের বিরোধিতা তার গভীর অভিক্রম করে অস্ত্রের বন-বনোনির শেষে পরিণত হল। চিহ্নিত মিলিত শত্রুকে পক্ষতুচ্ছ করার আশায় তোষামোদের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। বর্তমানের পর্যায় হল, শত্রু যে শত্রু, সে আমার মিত্র। জ্ঞান নীতি শব্দগুলি থাকলো, তুচ্ছ মানবওটি জাতীয় স্বার্থে ব্যাহত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁড়ে আন্তর্জাতিক-তাবাদ নামে একটি শব্দকে বিকৃত ও ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আমাদের দেশের চিত্র কি পেলাম? ভারতের লোকপ্রতি গড় আয় ১৯৭০ সালে বছরে ছিল ৬৩৬ টাকা। আর দশক শেষে সেটা মাত্র ১২ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ৬৪৮ টাকার অপরদিকে রাস্তার গাস ১৯৭০ সালে ছিল ২৩ টাকা, বেড়ে দাঁড়াল ৪০ টাকায়। সাধারণ স্তরের কাপড় মিটারে প্রতি ছিল ২ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ৫.৫০ টাকা। প্রতিটি টাকার ক্রয় ক্ষমতা ১৯৬০ সালের মূল্যমান ধরে ১৯৭০ এ ছিল মাত্র ৫৪ পরমা। আর দশক শেষে সেইটা অর্ধেক হয়ে দাঁড়াল মাত্র ২৮ পরমাতে।

মূল শিল্পগুলি দেশের অর্থনীতিকে মূলতঃ ধরে রাখে। তাই আমরা রোগান তুললাম জাতীয়করণের। এই দশকের গোড়াতে ১৯৭০ সালে কেন্দ্রে জাতীয় শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩টি যেখানে মূলধন বিনিয়োগ ছিল মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। দশক শেষে কেন্দ্রীয় শিল্প সংস্থাগুলির সংখ্যা দাঁড়াল ১৮০তে, যেখানে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াল ১৫০০০ হাজার কোটি টাকা। কল কি হলো? সম্পদ সম বন্টনের পথে এগোতে পেরেছি?

সত্যতার অগ্রগতি মানেই উৎ-

সাহন পদ্ধতির অগ্রগতি। শিকা-সংস্কারের অগ্রগমন উৎপাদন পদ্ধতির উন্নততর পদ্ধতির সংগেই গাঁটছড়া বাঁধা। ব্যক্তি পরিবার গোষ্ঠী দলের অগ্রগতিশীলতা বজায় রাখতে গেলে উৎপাদিত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মান পরিমাণ ও পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতির দিকে নজর রাখতেই হবে। জীবনের মূল্যবোধগুলির নব রূপায়ণ করতে হবে ঐ দিকে নজর রেখেই। প্রাক-তিক সম্পদের ওপর প্রমবিনিয়োগ করেই মানুষ চিরকাল তার প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। তাই যে 'তত্ত্ব' কেই সমর্থন করিনা কেন, সম্পদের সৃষ্টি প্রথমে প্রয়োজন, তারপর প্রয়োজন সম্পদের সৃষ্টি সম বন্টন। কিন্তু শুধুমাত্র সম্পদের সম-বন্টনের ধ্রুনি অগ্রগতিশীলতার ধারক বাহক নয়। কারণ সেটা হয়ে পড়ে দাবী আছে কিন্তু দায়িত্ব নেই ধরনের নির্বোধ দাবী। কলে সেই স্বপ্ন পথে দেখা দেয় ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন মাসের জরুরী অবস্থার ঘোষণা। আবার দেশ-ব্যাপী অরাজক দাবীর জোয়ারে ভেসে আসা ১৯৮০ সালের জাহ্নবীর প্রথম সপ্তাহের নির্বাচনী ফলাফল।

স্বরণ রাখা প্রয়োজন স্বাধীনতা-উত্তর কালে মাত্র চারটি বছর জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নেতিবাচক হয়েছে। তার দুটি বছরই সত্তর দশকের উপহার। আরও লক্ষণীয় সেই দুটি বছর ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭১-৮০। সংগে সংগে এটাও খেয়াল রাখা সরকার যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি বছরে দুই শতাংশ হারে। এই অবস্থার অবশ্যস্বাভাবী ফল অসহ বেকারত্বের বৃদ্ধি। সরকারী নথি-পত্রেই যে বেকারত্ব এই সত্তর দশকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ সালে

ছিল ১১ লাখ সেটা বেড়ে সর্বকালীন শীর্ষে পৌঁছল ১১০ লাখে বলে খবরে প্রকাশ। কৃষির আধুনিকীকরণ না হলে ভারতের প্রায় ৬৫ কোটি জনতা থাকবে দীর্ঘাহীন চর্যার মধ্যে। এমনতেই কৃষিতে প্রমাদিকা ঘটছে বলে প্রকাশ। তারপর আছে ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যা। এখন কৃষিকে আধুনিকীকরণ মানেই বেশী বেশী লোকের বেকারত্ব। আর ঐ বেকারত্ব বোচাতে গেলেই শিল্পের অগ্রগতি অবশ্য প্রয়োজন। এই সাঁড়াশী আক্রমণ কি শুধুমাত্র গরিবী হঠাৎ আর হিভিনীল সরকার পড়ব স্নোগানে প্রতিহত করা যাবে?

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাই সত্তর দশকের বিদায়লগ্ন ছিল স্বাধীনতা বিষয় সুরে ভরা। এক-কালীন হতাশাগ্রস্ত বিশ্বজনমতের আশা তরসার প্রদীপগুলি একে একে এই দশকে বিদায় নিলেন। যেমন ১৯৭০ সালে বাটরাও রাসেল, ১৯৭১ সালে গায়েল আব্দুল নাসের, ১৯৭৭ সালে বিজোহী কালো সঙ্গীতজ্ঞ পল রবসন, ১৯৭৭ সালে বিখ্যাত চার্লো চ্যাপলিন, ১৯৭৬ সালে মাও সে-তুঙ ও চৌ এন লাই প্রভৃতির বিদায়।

ভেমনি অপরদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিয়দ-বিয়দ রূপ সত্তর দশকে প্রকট। সমাজ-তান্ত্রিক জয়যাত্রার পদধ্বনি ক্ষীণ। যাত্রাকলীটি স্থিরিত। আশাশীল আলোহীন যাত্রীকে দিক নির্দেশ করতে সত্তর দশক অসমর্থ।

দেশের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বিবর্তিত রাজনৈতিক স্নোগানেব বীভৎস নয় প্রকাশ কেন্দ্রে স্বপ্রকাশিত। সার-নীতি বিবর্তিত কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আফগানিস্তানে আগ্রাসনের নিন্দা

বিপ্লবী, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধি-জীবীদের প্রস্তুতি মন্থননের আত্মা-রক পরিষদ এক বিবৃতিতে আফ-গানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের নিন্দা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "১৯৮৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া দখলের পর আফগানিস্তানে রুশ সামরিক আগ্রাসনে রাশিয়ার সাম্রাজ্য-বাদী চেহারা আবার নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাবৈদার কিউ-বান ও ভিয়েতনামী বাহিনীর সহায়-তার এলোলা, ঊষিওপিহা ও কম্যু-চিয়ার আগ্রাসন ও দখলদারি চালানোর পর সরাসরিভাবে এবার রুশবাহিনী আফগানিস্তান দখল করেছে। রুশ-আফগান মৈত্রীচুক্তির দোহাই পেড়ে রুশবাহিনী তার আগ্রাসনের সমর্থনে ওকালতি করছে অজ্ঞান ধরনের মৈত্রী চুক্তির দোহাই

পেড়ে ঠিক এক বছর আগে রাশিয়ারা কম্যুচিরা দখল করেছে। রুশ আফগান মৈত্রীচুক্তি, রুশ-ভিয়েতনাম মৈত্রী চুক্তি ও রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি আলগে যে সামরিক চুক্তি এই সত্যটি দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা তাই ভারতের শান্তিকামী জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি বাতিল করার দাবিতে মোচ্চার হোন, আফগানি-স্তানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি অতি বৃহৎ শক্তির যুদ্ধ উত্তেজনার সৃষ্টি লব ধরনের অপপ্রয়োগকে ব্যর্থ করুন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার মুণোমুখি দাঁড়িয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র গ্রাসের দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মানুষ গর্জে উঠুন। আহুন, আফগান জনগণের স্ত্রাসংগত ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাই।"

সরকারী আনুকূল্য এবং

গ্রন্থ প্রচারের সমস্যা

মিহির আচার্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারে একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন যেখানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রই আনন্দিত হবেন। প্রথম দিকে খবর এসেছিল যে সরকার এবার নিজের উচ্চাঙ্গেই গল্প-উপন্যাস জাতীয় স্বজন, শিল্প সাহিত্য প্রকাশ করবেন। খবরটা পেয়ে অনেক ছুঃখ লেখক আশার মতো আশ্বস্ত হয়েছিল। সরকারের এই উৎসাহজনক প্রস্তাবে যথার্থিতি আশঙ্কাজনক ও হৃৎকান্ড পত্রিকা সরকারবিরোধী কটাক্ষও শুরু করেছিল। বিশেষ করে আনন্দ-বাজারের প্রতিক্রিয়া চরমে ওঠে। কারণ তাঁরা এতদিন ধরেই নিয়ে ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপারটা তাঁদের ইচ্ছা করা। কাজেই সরকারের এ ধরনের প্রস্তাব তাঁদের মনোপলিয়ানার ওপর একটা বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ।

সরকারী এই স্বপ্রস্তাবে আমরা যখন আশ্বস্ত তখন দ্বিতীয় দফার খবরটা এসে, না, সরকার প্রকাশকের দায়িত্ব নিচ্ছেন না। তাঁরা উপযুক্ত পাণ্ডুলিপির লেখককে গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অল্প পক্ষাংশ পাসেন্ট অসুস্থান দেবেন। লেখককেই টাকাটা দেওয়া হবে, কিংবা লেখক যদি কোনো প্রকাশকের মারফত আবেদন করেন তাহলে অসুস্থান প্রকাশককেও দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় দফার সরকারী প্রস্তাবের মধ্যে খুব বেশি নতুনত্ব কী এসে? সরকার পরাবরই তো কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য বইয়ের লেখককে অসুস্থান দিয়ে আসছেন। সরকারী অঙ্কুল্যে এ ধরনের বই বাজারে পাওয়া যায়। রেকর্ডের বইয়ের জায়গায় না হয় এখন কিছু গল্প উপন্যাস বেরোলো। তাতে বাস্তবে কিছু কাজ হবে কী?

আমার চেনাপরিচিত এমন অনেক ছুঃখ লেখক আছেন যারা ধারণার করে, কিংবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ধার করে ছকখানা বই-বাজারে বের করতেন। সেই বইগুলির অদৃষ্ট কী? সম্ভবত সরকারীমূল্য তার খবর রাখেন না। বাস্তবকে টাকা দিয়ে কোনোরকমে ১০০ কপি বাধাই করে পাঁচ দশ কপি দোকানে, কিছু বন্ধু-মহলে এবং কিছু উপহার দেবার পর বাস-পাকি বই আর বাধানোর সুযোগ পাওয়া যায়। কর্মী বাই-ওয়ারের ওখানে আছে, সেখানে পোকার কাটলেও না বাইওয়ার না-লেখক, কারও কিছু করার নেই।

কাজেই আমাদের বিবেচনার সমস্যাটা কেবল কোমোরকমে বই ছেপে দেয়ারই নয়। তার চেয়ে প্রধান এবং একমাত্র সমস্যা বিক্রির। লেখকের বই বিক্রির কোনো সংগঠন নেই, বাজারী দোকানদারের কাছে এ জাতীয় লেখকের কোনো চাহিদা নেই। লেখকের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন করারও আর্থিক কোনো কমতা নেই।

এই অবস্থায় সরকার যতই অসুস্থান দিন বই প্রচারিত হওয়ার কোনো দৃষ্টি রাখা নেই। সরকার এবং লেখকের ব্যক্তিগত টাকা খরচ করেও কোনো সার্থকতা দেখা যাবে না।

তার চেয়ে আমাদের সুচিন্তিত প্রস্তাব শুধু গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অসুস্থানই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে বই প্রচারের ব্যবস্থাও সরকারকে নিতে হবে। এবং এ কাজ সরকারের পক্ষে হুঃখ নয়। যেহেতু সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত লাইব্রেরির সংখ্যা কম নয়। তাতে করে ১১০০ কপি একটি এডিশন চালিয়ে দেয়া কষ্টকর নয়। সরকার বাধ্যতামূলকভাবে গ্রন্থটি সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরিগুলিতে দেবার ব্যবস্থা করবেন। লাইব্রেরিগুলিকে এইভাবে নির্দেশ দেবেন অথবা নিজেরাই বইটি কিনে লাইব্রেরি-গুলিকে উপহার দেবেন।

মনে হয় না এই ব্যবস্থা নিলে কারুর সমালোচনার অবকাশ আছে। কথা উঠতে পারে বইটির যোগ্যতা-অযোগ্যতার। কিন্তু সে-প্রশ্নও তো গোড়াতেই মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। কারণ সরকারী কমিটিই সর্বোচ্চ পাণ্ডুলিপির বিচার করছেন। লেখক যতই আত্মাভিমানী হোন, সরকারী মনোনয়ন তাঁকে মেনে নিতেই হবে। যাতে পরবর্তীকালে গ্রন্থটির অসারতা নিয়ে কথা না ওঠে।

আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে কোনো লেখকই আপত্তি করবেন না। এবং ফলে পক্ষপাতিত্ব কিংবা দলবাদের কথাও উঠবে না। কারণ লেখক জানেন সমগ্র সাহিত্য জগতের কল্যাণের ভিত্তি এই ব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তিগত লেখকের কথা ভেবে এ ব্যবস্থা হচ্ছে না। এমনিতে যখন বাড়ল বইয়ের প্রকাশ এবং প্রচারের ব্যাপারে নাভিশ্বাস উঠতে তখন এইভাবেই সরকার যুঃখ অবস্থাকে ফিঁদে তুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার আগে সরকারকে সবদিক ভেবে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে। তা না হলে শুধুমাত্র গ্রন্থপ্রকাশের অসুস্থান দিয়েই জটিল সমস্যাকে মোকাবিলা করা যাবে না। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই সরকারকে আমরা এই পরামর্শ দিই।

ইউসুফ চ্যাহিনের কয়েকটি ছবি

মিহির সেনগুপ্ত

সম্রাট ফিআংসব ৮০০ত তৃতীয় বিংশ শতাব্দীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। উন্নয়নশীল দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রাজ-নৈতিক-সা-সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্বর হিসাবে চলচ্চিত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ছবি ছাড়া এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সীমাবদ্ধ, যদিও বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন ছবি নিয়ে আলোচনার স্বড় বয়ে গিয়েছে। ইজিপ্ট তথা সমগ্র আরব-দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়িক হিন্দী ছবিরই কার্বন কপি এ ধারণা পাণ্টা-বার কিছুটা কারণ ঘটল বাজারের ইউসুফ চ্যাহিনের ছবি ছবি দেখে। তাঁর তৈরি-মোট ছবির সংখ্যা উন-ত্রিশ, তা সত্ত্বেও এই ছবিগুলি থেকে সমাজ-সচেতন পরিচালক হিসাবে চ্যাহিনের মূল্যায়নের একটা চেষ্টা করা যায়। কয়েক বছর আগে কল-কাতায় ফিল্ম সোসাইটির এক প্রদর্শনীতে তাঁর 'দি ল্যাও' (১৯৬১) ছবিটি দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। গ্রামভিত্তিক সমাজে জমিদারের দাপট, কৃষকদের প্রতিরোধ, অত্যাচার ও শোষণের বিভিন্ন দিক ছবি-টিতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়ে-ছিল। চ্যাহিনের সবুটি ছবিতেই অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদের স্বর স্পষ্ট। পরে আল-জিরির ছবির একটি উৎসবে 'দি স্পারো' (১৯৭০) ছবিটি কলকাতায় দেখান হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইজ্রায়েলী যুদ্ধে নিজের দেশের পরা-ভয়ের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি এই ছবিটিতে। মজুতদার-কালোবাজারীদের দোয়াস্তা, আমলা-ভাষিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাধারণ মানুষের দুর্দশা, রাষ্ট্রের বিপর্যয়ের মুহূর্তেও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মূল্য তোলায় চেষ্টা ইত্যাদিকে তিনি আক্রমণ করেন তীব্রভাবে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে নানানভাবে। বিভিন্ন দেশের শাসক-শ্রেণী বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছবির প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করেছে। কিছু সময়ের ভক্ত তাঁকে নিজের দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিন দেশে আশ্রয় নিতে হয়েছে। 'রেজিস্ট্রান' (১৯৬৬) তাঁর পরিচালিত দ্বিতীয় ছবি। বর্তমানে হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা ওমর শরিফের প্রথম অভিনয় এ ছবিটিতে। জমিদারের মেয়ের সঙ্গে সাধারণ চাষীর ঘরের ইজিনীয়ার ছেলের প্রেম। অতাবতই পিতার আপত্তি। ছবিটির শেষ দৃষ্টের সময়ে,

দত্তা ও প্রেমের ক্ষেত্রে। অভিনাট-কীরতা আছে; শ্রেণী সম্বোধতার ব্যাপার নিয়েও আপত্তি উঠতে পারে যেদিক থেকে প্রায় হিন্দী ছবি, কিন্তু অসাধারণ অস্ত্রধানে। রক্ত গ্রামীণ প্রান্তরের সঙ্গে মিশে আছে চরিত্র। প্রকৃতি যেখানে নির্মম, লড়াইয়ের প্রয়োজন যেখানে প্রতি পক্ষকে। স্বপ্ন, সীমাবদ্ধ, গতানুগতিক মানসি-কতার উদারতার স্থান নেই। চোখের বদলে চোখ 'এই নিষ্ঠুর প্রবণতাকে সমালোচনা করেন চ্যাহিন এ ছবিতে। বিশেষ সামাজিক প্রেক্ষা-পটে ঘটনাকে প্রোথিত করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত।

১৯৬৬ সালে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মের দুটি ছবি তোলেন তিনি। 'কাররো টেশন' সেখানকার কুলি, ফেরিওয়াল, ছোট ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের দৈনন্দিন জীবনে প্রেম-ভালবাসা সংগ্রাম-ব্যথা-বেদনার ইতিহাস। প্রধান চরিত্রে চ্যাহিন নিজে স্বল্প অভিনয় করেন। অন্য ছবিটি 'জামিলা—দি আলজিরি-য়ান' একটি সাধারণ মেয়ের গল্প, যে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এখানে সংগ্রাম অস্ত্রধারে। স্বাধীনতার লড়াইয়ের মেয়েদের অবদানকে বিশিষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফরাসী

ই সি রিক্রিয়েশন-ক্লাবের 'নীলদর্পণ'

ইষ্টার্ন কোলম্বিড রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক অসুস্থানে প্রতিবারের মত এবারও হারুন চাকলা সৃষ্টি হয়ে-ছিল। সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল-কুমার চক্রবর্তী তাঁর লক্ষিত অচ মনোজ্ঞ ভাষণে এই সংস্থান কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অফিস পাড়ার নাটকে তাঁদের একটা স্থানম আছে এটা দাবী করেন। 'নীলদর্পণ' দেখে মনে হল অমলবাবুর দাবী অব্যক্তিক নয়।

পতবারে তারা 'অজার' করে নাট্যমোদী সমাজে বিস্তার জাগিয়ে ছিলেন। এবার শ্রীমনিলা মুখো-পাধ্যায়ের স্বল্প পরিচালনায় তাঁরা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' মঞ্চ-করলেন। নীলদর্পণের গল্প পুরানো হলও এখনও এর একটা সমরোপ-যোগী মূল্য আছে। সেখানেই নাটকটির বৈশিষ্ট্য। দলগত অভিনয়ে সবলেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী গীতা দে'র সাবলীল অভিনয় দর্শকমনকে লহ-জেই নাড়া দিয়েছে। দেওয়ান গোপীর চরিত্রে শ্রীমল্ল ভট্টাচার্য এবং তোরাপের বেপরোয়া চরিত্রে অভি-

উপনিবেশবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সংগঠিত মুক্তিবাহিনী একজন জামিলা। ছবিটির শেষ-কাল ড্রয়ারের 'দি প্যাশন' জোয়ান অফ আর্ক'-এর স্টে-তুলনীয়।

চ্যাহিনের সাম্প্রতিককালের ছবি 'আলেকজান্দ্রীয়া হোয়াই?' (১৯৭৮) আন্তর্জাতিক ট্রল্লির প্রথম পর্ব শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে একটি ছোট ছেলের অভিনেতা হবার কথা। পারিপার্শ্বিক অসুস্থতা বি-অবস্থার মধ্যেও যে নিজের আকাঙ্ক্ষা-অবিচল থাকে এবং সফল হয়। উপ-স্থাপনা বেশ জটিল। বহু ধরনের চরিত্র, নানা ধরনের টানা-পোড়ন-কিন্তু বেশ দক্ষভাবে উপস্থাপিত-বিভিন্ন শ্রেণী ও তাঁদের প্রতিনিধি-রূপ চরিত্রদের মধ্য দিয়ে চ্যাহিন ইজিপ্টের এক জটিল সামাজিক অব-স্থাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

সবুটি ছবিতেই জড়িয়ে আছে সাধারণের ওপর তাঁর দৃষ্টির নিদর্শন। সাধারণ মীপীড়িত মানুষদের প্রতি দয়দ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ছবির মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সচেত-নতা বিকাশের চেষ্টা চ্যাহিনের ছবিগুলিকে এক ভিন্ন স্তরের চলচ্চিত্র-হিসাবে গণ্য করতে আমাদের বাধ্য করে।

জিত মল্লিক তাঁদের পূর্বনাম অক্ষয় রেখেছেন। অত্যাচারী রোগের ভূমিকায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় চ্যকলা সৃষ্টি করতে কোন ক্রটি রাখেন-নি। ব্যক্তিগত অভিনয়-উৎকর্ষতার নিরিখে সর্বশ্রী রূপ লাবা, তুষার সরকার, নেপালকৃষ্ণ বাহুরী, কান্তিক চন্দ্র দাস, নরুল আমিন চৌধুরী, অমিতকুমার মুখার্জী, মনমোহন কল্ল ও দিলীপকুমার মিত্রের উল্লেখ অনর্থী-কার্য। আলো এবং শব্দ সংযোজনায় সৃষ্টি দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে ভাষ্করীশাস এ শ্রীপতি দাস।

আফগানিস্তান

১ম পৃষ্ঠার পর
অধিকার সার্বজনীন করেছে এবং গোষ্ঠী মোরাত্তরের প্রস্তাব থেকে আফগান জনগণকে মুক্ত করার দৃষ্টি-কাজে বর্তী সমাজতান্ত্রিক চীন সেই আফগান গণতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শোষণের হাতে ফিরিয়ে দিতে চাইছে এটা ভাবাও যায় না।

বাঁশরী বস্তাপচা ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছবির ঐক্য যে সর্বাত্মক, তা বুঝি আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'বাঁশরী' ছবিটি। অনভিনব কাহিনী, তার বিস্তারিত শিথিল, চিত্রায়ণেও গভীর-পটভূমি—এমন একটি ছবির প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে কেউ হয়তো অস্বস্তি করবেন না। জানিনা, এ ছবি পয়সা পাবে কিনা। যদি পায়, তবে সেটাই হবে একমাত্র লাভ।

ঐপ্রকারের কাহিনী বস্তাপচা আবাস্য। এ কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক অমীম ব্যানার্জী। চিত্রনাট্য রচনার প্রতিপদেই অসতর্কতা লক্ষ্য পড়ে। পরিচালনা ছাড়া একটি নিকোয়েল বাধে মামুলি। নাটক রচনার ক্ষেত্রে বাস্তবতার যোগ নেই এবং যুক্তির বালাই না থাকায় গোটা ব্যাপারটি বিরল ও বিরক্তিকর লাগে। নিরক্ষর গ্রাম্য যুবতীর ব্যথা বেদনা স্ক্রীনে তুলতে গিয়ে কেন যে তাকে সব সময় সাজিয়ে রাখতে হবে, স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া চিঠি হাতে কেন তাকে পথে পথে ঘুরতে হবে চিঠি পড়বার জন্য যখন তার ঘরেই দরদী সোপানিনী রয়েছে দোকানীর শরতানিকেই বা অত্যানি প্রাধান্য দিয়ে নারী নির্ধাতনকে

আবদুস সাত্তার

১ম পৃষ্ঠার পর

পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন রাজ্য কংগ্রেস (ই) সংগঠনের হাল কমল নাথ ধরলেই সব থেকে ভাল হয়। কমল নাথ বলেছেন: তা হয় না। তিনি বলেছেন: সাত্তার সাহেব সভাপতি হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

পরবর্তী রাজ্য কংগ্রেস (ই) সভাপতি পদের দাবীদার এখন অনেক। অজিত পাণ্ডা, আবদুস সাত্তার এবং আবদুল গফফার ছাড়া আর বেশব নাহ শুনা যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকান্তি মোহন এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শংকর-প্রসাদ মিত্র। সভাপতি কে হবেন তা স্থির করবেন সঙ্গর গান্ধী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা অস্বাভাবিক করবেন মাত্র। তাই কমল নাথ যদি এই রাজ্যে হলের হাল ধরেন তাহলে ও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তবে হলের ভেতরকার ধরনের অস্বাভাবিক সাত্তার সাহেবেরই সভাপতি সবচেয়ে বেশী।

মেলোড্রামা স্তরে নিয়ে এসে কতখানি আবেদন সঞ্চার করা গেল, গ্রামের মোড়ল ও সাজপাড়াই বা কোন বিশেষ কারণে অসহায় নারীর প্রতি নির্মম হল—এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ভার। ছবির মারককে দেখে মনে হয় সত্তর দশকের টাইপ, অথচ গ্রামের যে পরিবেশ ও চর্চা দেখা গেল, তা আত্মকালের। তবে এ ছবিতেও চিত্র পরিচালক ছাড়া একটি দৃষ্টে চমক সৃষ্টি করেছেন। নারী-কার যন্ত্রণাটি সুরচিত। হাতী দ্বারা আক্রান্ত মারক ও নারীকার চমকে ওঠাটুকু দেখে সত্যিই চমকিত

মঞ্জুরী অপেরার

অশ্রুসঞ্চার সামাজিক পালারূপে প্রচারিত 'শবরীর সংসার' বিশ্বের অশ্রুপাত ঘটানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু দর্শকগণের কতখানি অশ্রুসঞ্চার হলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ বোধেই আছে। দুর্বল কাহিনীর শিথিল বিস্তারিত ছক বাঁধা ঘটনাগুলি শুধু মামুলি ব্যাপার বলেই এখানে গণ্য হয় না, পরন্তু আবেগ উচ্ছ্বাস, বেদনা কান্না ও অন্তর পীড়ন নির্ধাতনের অপরিমিত পরিবেশনে বিরক্তির লক্ষ্যই করে। বাত প্রকৃতিভয়ের মধ্য দিয়ে এ যুগের মানসিকতার স্নাইফাক্স রচনার মূল্যায়ন এ পালায় প্রত্যক্ষ করা যায় নি বলেই তা দর্শক মনে আবেদন সৃষ্টিও করে না। পালা রচনা করেছেন শক্তিপদ সিংহ।

বড় ভাই ছোট ভাইকে জরি-দারির সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করল কুচক্রীর মরণ্যায়। ছোট ভাই ব্রজনারায়ণের জী শবরীর সংসারে নেবে এলো দুঃখ দুঃশা—সেই দুঃশাকে চরমে টেনে আনা হল কিছু অবাস্তব অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেই কুচক্রী বীরেশ্বরের লাবেকি চণ্ড চক্রান্তের জাল বিস্তার করা, বড় ভাই ব্রজনারায়ণের নির্বোধ সরলতা ও পরিণামে অসু-শোচনীয় ভূতানলে দগ্ধ হওয়া, নির্ধা-তিতা শবরীর কাতরতা, পলাতক ব্রজনারায়ণের নাটকীয় রূপান্তর ও পরিশেষে দুঃখের দমন ও সন্ততার জয়—সবকিছু উপস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পরিমিত ও যুক্তিবোধের অভাব। তবে পালা নির্দেশনার ভাবের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ দ্রব্যাব্যাকের রীতিতে অতীত ঘটনার উল্লেখ, অপ্রকৃতিস্থ ব্রজনারায়ণের ক্ষুধাভা-

হতে হয়। আরও চমকিত হই ছবির শেষাংশে, যেখানে নারীকা একদা লালিত হয়েছিলো বাঘের দ্বারা, তাহদেরকে শান্তি দিতে হুম্ব দিচ্ছে নারীকে—এটা যদিও স্টাণ্ডে তবুও চমকে উঠি। যদিও এ ছবিতে অল্প খয়ের সংখ্যা বেশী এবং নারীকও শেষে খড় হল তবুও উপসং-হারে নারীক একটা রূচ ফেলে রেখে নারীকার কাঁধে তর দিয়ে এগিয়ে গেল এই দৃশ্যটি ব্যঙ্গনা মুখর সন্দেহ নেই। হুম্ব কুশারীর লগ্নীত পরি-চালনার উৎসাহ ব্যঙ্গ করেকটি পান শুভতে ভাল লাগে। ক্যামেরার কাজ নিরম্যমের। অভিনয়ে সুব্রজা মুখোপাধ্যায় স্বাভাবিক নিষ্ঠার পরি-চয় রেখেছেন। তাঁর পাশে মিঠুন চক্রবর্তীকে কোনদিকেই মানার নি।

শবরীর সংসার

নার প্রকাশ দৃষ্টের শিল্পসম্মত প্রয়োগ উল্লেখের দাবী রাখে। লক্ষণ দালের সুর সৃষ্টিতে করেকটি দৃষ্ট ব্যঙ্গনা মুখর হয়ে উঠেছে। আলোক সম্পাতে লম্বীর বোস ও দেবানীষ ব্যানার্জীর কাজও কিছু দৃষ্টকে ভাব্যপরিপাক করেছে।

স্বর্কুমারের ব্রজনারায়ণ যেমন প্রাণময় তেমনি ব্যক্তিত্ব- উজ্জল। তাঁর স্বরূপে কিছু উত্থান পতনও আছে—কিন্তু তা নাটকীয় গান্ধীর্বে সংঘত তেমন নয়। মাঝে মাঝে তাঁর নির্বাক অভিব্যক্তি নজর কেড়ে নেয়। শবরী চরিত্র রূপায়ণে অনিমা করের অভিনয় সংবেদনশীল। বাহু মুখাঙ্গী, তাপসকুমার, শচীন হাল-দার, কণু বিহাস ও অনিতা সাহা চরিত্রোপলব্ধি অভিনয় করেছেন। তারক রায়ের অভিনয় উপভোগ্য।

দি ট্রান্স সাইবেরিয়ান

এক্সপ্রেস

হলিউডি ধাঁচে তৈরি রাশিয়ান ছবি 'দি ট্রান্স সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেস' একটি আকর্ষণীয় থ্রিলার। জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বত্রে এক জাপানী ব্যব-সায়ী বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলে জাপানী ইন্টেলিজেন্স তাকে বিশেষ স্বত্ব করে দেখে না। উক্ত ব্যবসায়ীর জী এই ঘটনা প্রসঙ্গে মিহত হরার পরও হতোম্ব না হয়ে ব্যবসায়ীটি রাশিয়ার পথে ট্রেনে চড়ে বসে এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টাও শুরু হয়ে যায়—এখানে সাসপেন্স রচনার যন্ত্রের ছাপ পড়ে। চিত্র পরিচালক এডার উরাস্তবায়ের হলিউডকে অস্বস্তি করলেও তাদের ছবির উন্নত মানের পৌছতে পারেননি। অভিনয় ও ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়।

বোর্টোল্ট ব্রেখটের জন্মজয়ন্তী

দর্পণের প্রতিনিধি

সংগ্রামী নাটক, বিজোহী নাটক, গণচেতনার নাটক, বিপ্লবের নাটক—এসবের সঙ্গে এক হয়ে যিশে আছে বোর্টোল্ট ব্রেখটের নাম। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ছিল এই বিশিষ্ট নাট্য-কারের ৮২ তম জন্মদিন। এই দিন-টিকে 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠী প্রচার সঙ্গে স্বরণ করলেন এক অস্বস্তানে তাঁর রচিত দুটি একাত্তিকা অভিনয় করে। 'উকি' নাটকের স্থান জার্মানী, কাল হিটলারের আমল। যার বাড়ি উকির দাগ, তার অস্ত্র রাখার ঠং পেতে থাকে হিটলারের খুন্দী অসু-চরিত্র আর যুক্তিহীন সন্দেহের বশে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে নির্দেশ, নাধা-রণ বাহুবলের ঘাড়ে উকির দাগ বসিয়ে দেয় রাজী সমর্থকেরা। অতি আপন-জনও ঘাড়ে হাত রাখলে ভয় হয়। 'সমাদান' নাটকটির স্থান চীনদেশ, কাল কমিউনিষ্ট বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব। অল্পন যুগে অভিনয়ের উপযোগী করে নাটকটিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। চরিত্র অভিনেতা যুয়ে ফিরে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। আন্দোলন সংগঠনে মানাবিধ জটিল-বিচ্যুতি নিয়ে প্রাণ তোলা হয়েছে এবং তার উত্তর খোজারও চেষ্টা হয়েছে নাটকটিতে।

গ্লোবে কোষ্টা গাভরাসের 'জী'

কিন্ম ফাইনান্স কর্পোরেশনের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি ভাল ছবি কিনে এনে আমাদের দেশে প্রদর্শিতরক কিন্তু বাস্তবে বা দেখা গিয়েছে তাতে উৎ-লাহিত বোধ করা দ্রব্য হয় নি। তবে কোষ্টা গাভরাসের রাজনৈতিক ছবি 'জী'র ব্যবসায়িকভাবে মুক্তির ব্যবস্থা করে তারা অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদী হলেন। ইতিপূর্বে ছবিটি কলকাতায় কয়েকবার প্রদর্শিত হয়েছে। কোন একটি দেশে সেনা-বাহিনীর ক্রমতা ধ্বংসের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে সোজা জীবন্তব্য রেখে। নিজেদের প্রয়োজনে গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে ফেলতে বিধা করে না শাসক-শোষক শ্রেণী। ঘন-সংবদ্ধ চিত্রনাট্য নিপুণ পরিচালনার সঙ্গে, মিক্স থিও ডোরাকিসের অসাধারণ আবহ সংগীত যিশে গিয়ে তৈরি করে এক বিচিত্র উন্মাদনা। রাজনৈতিক প্রচারের বাহন হিসাবে চলচ্চিত্রকে শিল্পসম্মত ব্যবহারের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত ছবিটি।

ছবিটি এ সপ্তাহে প্রোব সিনেমায় মুক্তিলাভ করছে।

দুটি নাটকই সুপরিচালিত ও সু-অভিনীত। বিশেষ করে 'সমাদান' নাটকটিতে সংগীত, গান ও যুক্তি-ময়ের উপযুক্ত প্রয়োগ বিশেষ প্রশং-সার দাবী রাখে। অভিনয়ের আগে বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থ-নৈতিক অবস্থার ও প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রসে-নিয়াম ধর্ম ও অঙ্গনমধ্যে অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন অশোক মুখোপাধ্যায়।

সমাজ সেবার

মহৎ কাজে

যাত্রা উৎসব

১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তিলজলা সবুজ সংঘ ও সমাজ কল্যাণ পরিষদ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করেছে তার বহুমুখী সমাজসেবামূলক কার্যাবলী। ইতিমধ্যেই হাতব্য চিকৎসালয়, পাঠাগার, সেলাইকেন্দ্র, টাইপিং শিকাকেন্দ্র স্থাপন, খেলাধুলার সামগ্রিক উন্নতি, দরিদ্র শিশুদের জন্য রুটি ও শিশুখাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে অবহেলিত ও অগ্রসর তিলজলা-তপসিয়া অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের নিয়ম ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় তারা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত এতবড় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নেই কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই তারা এই অঞ্চলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। একতর দান হিসেবে লগ্নীভূত ১১ কাঠা জমিতে প্রাথমিক কার্যাবলী ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য তিলজলার অন্তর্গত ২০.৫ নং পিকনিক গার্ডেন রোডে ১০ই থেকে ১১শে এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতা যাত্রা উৎসব অর্গঠিত হবে। এই উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত পাঁচ হাজার আসন সম্বলিত সুসজ্জিত মঞ্চ অভিনীত হবে যথাক্রমে জমতা অপেরার ভাস্কর পণ্ডিত, মোহন অপেরার নরসিং দত্ত, আর্ষ অপেরার, নাগিনী কচ্ছা, লোকনাট্যের পাগলা রাজা, ভারতী অপেরার রিক্তা এবং নট কোম্পানীর দেবী হলতানা।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সবার অকুণ্ঠ সাহায্য ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন সংঘের কর্তৃপক্ষ।

আর এম এসের বিশ্বাসঘাতকতা

জগজীবন রামও একই কথা বললেন

বিশেষ প্রতিনিধি নলিনী পাল

বিগত লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির অন্ততম শক্তিশালী গ্রুপ আর এম এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ দ্বারা ভারতে বিশেষ করে উত্তর, পশ্চিম এবং মধ্যভারতে কংগ্রেস (ই)-কে দক্ষিণভাবে সমর্থন করেছেন বলে স্বপ্নের পাতায় যে চাকল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা জনতা পার্টির নেতা বাবু জগজীবন রামের কথায় আরো একবার দৃঢ় প্রমাণিত হল। উল্লেখযোগ্য, নির্বাচনের পরে কংগ্রেস (ই) এবং আর এম এসের গোপন

আতাতের কথা দলিত্তারে একমাত্র দর্পণই দূর্বপ্রথম ফাঁস করে দেয়।

প্রসঙ্গত বলা হরকার, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী জনতা নেতা বাবু জগজীবন রাম হায়দ্রাবাদে অস্থিতি একটি হলীয় কর্মসভায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, আর এম এস জনতা পার্টির সঙ্গে বিগত লোকসভার নির্বাচনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে এবং ওরা কংগ্রেস (ই) জয়লাভে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে কংগ্রেস (ই) এভাবে জয়ী হতে

পারত না বলে বাবুদী অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য, জনতা পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অন্ততম বাবু জগজীবন রামের হায়দ্রাবাদে প্রদত্ত এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ও বক্তৃতা কলকাতার অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্রে বহিঃপ্রবেশে ভালভাবে প্রকাশিত হয় নি, তথাপি বিহার এবং হিন্দি ভাষাভাষী অসংখ্য রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তা কলাও করে প্রকাশিত হয়েছে।

দারাজাততে জনতা পার্টির নেতারা বিগত লোকসভার নির্বাচনের পরে এ নিয়ে বহিঃ আর এম এস-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হৈ চৈ করছেন তবু আর এম এস-এর নেতারা বা জন-সঙ্ঘীরা এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করছেন না। তাঁরা মৌন অবলম্বন করেছেন। তাতে বোকা বাজে, যৌনই সঙ্গতির লক্ষণ।

বহু ক্ষেত্রে পুলিশের বৈষম্যমূলক আচরণ

প্রশাসনের অন্ততম হাতিয়ার বা সেকুরিটি পুলিশ কি না করতে পারে। দক্ষিণা থাকলে প্রশাসনের স্বার্থে পুলিশ সব কিছু করতে পারে। কিন্তু পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণা প্রকাশ করে তাদের ক্রমতা প্রয়োগ করে না। উপরন্তু তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আচরণ করে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সাধারণ নাগরিকের কোন জিনিস ধোয়া

গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা খুঁজে বার করা বা উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। অথচ, কোন ভি আই পি বা হোমরা চোমরার কোন জিনিস ধোয়া গেলে তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুঁজে পাওয়া যায় বা উদ্ধার করা হয়।

যেমন ধরুন, কদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভি আই জি হেড কোয়ার্টারের মোটর গাড়িটি ছুঁতরা নিয়ে যায় এবং এ গাড়ি করেই ওরা

বাস্তবহারী সমিতির রাজ্যব্যাপী আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ স্থানীয় পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৫০০ কোটি টাকার হাতিতে রাজ্যব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তবহারী পরিষদের (ইউ সি আর সি) কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সমিতির বিশেষ সভায় ৮ই ফেব্রুয়ারী রাতে ওই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের ১ অস্থায়ী ভেলায় ভেলায় ও স্থানীয় গণতান্ত্রিক সংস্থার সঙ্গে

উদ্বাস্তুরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং জমায়েতে সামিল হবেন।

আসাম এবং মেঘালয়ে বিদেশী বিতাড়নের নামে বেভাবে উদ্বাস্তু এবং অ-আসামীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান পরিচালিত হচ্ছে তাতে সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করে ভারতের সংহতির স্বার্থে উদ্বাস্তুসহ সমস্ত অ-আসামীদের জীবন ও জীবিকা রক্ষার হাতি জামানো হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের পুনর্বাসন শিল্প সংস্থা বা আর আই সিতে বর্তমানে কয়েক হাজার প্রমিত-কর্মচারীর জীবিকাচ্যতির যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সভায় তাতেও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

আচরণ

ডাকাতি করে বলে সংবাদে প্রকাশ। এনির বখোঁ হৈ চৈও হয়।

অবশেষে, রহস্যজনকভাবে প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত ওই গাড়িটি উত্তর শহরতলীর খড়হুখ থানা এলাকার পানিহাটির শ্রমশ্রমচার্টের কাছে পাওয়া যায়।

তাছাড়া, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিতে বসার কিছুদিন বাধে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর ছেলের একটি ব্রিককেস অপহৃত হয়। পুলিশ ওই ব্রিককেসটি উদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহরেই নয়, রাজ্যব্যাপী এক বিশেষ অভিযান চালায়।

আমার মনে পড়ে আরো একটি ঘটনার কথা। কয়েক বছর আগে উল্টাডাঙ্গা থানা এবং লেকটাউন থানার সীমান্তে দুর্গাপুর ব্রিজের কাছে ভি আই পি রোডে কয়েকজন জাপানী পর্যটকের সব কিছু ছুঁতরা ছিনিয়ে নেয়। প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ অপহৃত বৈদেশিক মূল্যসহ সব জিনিসই রহস্যজনকভাবে উদ্ধার করে দেয়।

নাৎবাদিক জীবনের ব্যক্তিগত অতিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা আছে, যাতে পুলিশের সুনাম ও কর্মতৎপরতা জড়িয়ে আছে। কিন্তু ওরা কিংবদন্তি মহলের প্রশ্ন যে, সাধারণ নাগরিকদের অপহৃত জিনিসের উদ্ধারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের আচরণ বৈষম্যমূলক কেন? পুলিশের ওই মনোভাব কি উদ্বেগমূলক না গাফিলতি?

সশস্ত্র হামলা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বাম। কলে ওয়ারা মোজাম্মেলকে খুঁজতে থাকে। মোজাম্মেল তখন তাঁর বাচ্চা মেরেকে নিয়ে ছাদের বৃষ্টিতে পারসার খোঁপে আত্মপোষন করেন। ওয়ারা মোজাম্মেলের বাড়ীর চালির ছাদ উপড়ে কলে আক্রোশ মেটায়। তাঁর হোকাম ঘরটা একেবারে ভেঙে ফেলে। আর শাবল কুড়ালের ঘায়ে টুকরো টুকরো করে তাঁর একমাত্র কন্যা রোজগারের অবলম্বন সেলাই মেশিনটি। ওয়ারা মোজাম্মেলের হোকাম থেকে ২০০ টাকার কাপড় চোপড় নিয়ে গেছে। ওয়ারা মোজাম্মেলের হোকামটি বিধ্বস্ত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে তাঁর ব্যবসার বাবতীর অবলম্বন।

এ গ্রামে ওয়ারা আরও কিছু বাড়ী আক্রমণের মতলবে ছিল। কিন্তু পুলিশ ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছুটে আসে। পুলিশ দেখে ওয়ারা পালিয়ে যায়। পুলিশ লম্বা মতো এসে না পৌঁছালে খুন অথমের সংখ্যা অনেক হ'ত। আক্রমণের বীভৎসতার পুলিশও হতচকিত হয়ে পড়ে। কালিয়াচক থানার মতুন অফিসার তৎপরতার সঙ্গে আজিজুর মাষ্টারের বাড়ী থেকে ৫ জন আহতকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পুলিশ পাজাকোলা করে আহতদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। আক্রমণের পৈশাচিকতার পুলিশদের চোখও অশ্রুজ্বল হয়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ দৃশ্যজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার এতানোর ক্ষমতা অনেক আশপাশের গ্রামে এবং শহরে আত্মগোপন করে আছে। লোকসভার নির্বাচনে বরকত সাহেবের শাকলো অজিশর উৎসাহ ইন্দিরা কংগ্রেসীদের বিজয় অভিযানের এ এক রক্তাক্ত অধ্যায়। প্রাক নির্বাচনী প্রচারে বরকত সাহেব সি পি এম সমর্থকদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য যে প্ররোচনা অভিযান চালিয়েছিলেন এই সব খুন অথমের মধ্য দিয়ে বরকত সাহেব ও তাঁর সমর্থকদের রক্ত পিপাসা বুঝি পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

আক্রমণ চালানোর সময় ওয়ারা জীবন হিংস্রতার দাঁতে দাঁত চেপে একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বলেছে—বল শালি দি পি একে আর তোট দিবি। এই গ্রাম কংগ্রেসের, এখানে সি পি এমবাচ্চী চলবে না। [‘গৌড়কুমারি’ থেকে]

বলিভিয়া

৩য় পৃষ্ঠার পর

মার্শাল - তেতিড প্যাড্রিনা তার সমর্থকদের নিয়ে ওয়ারালটারকে সহযোগিতা করছেন বলে অ্যালবার্টো লরকারের ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘ জমে উঠছে। বলিভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) সশস্ত্র পেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। যদিও সি পি বি (এম-এল)-এর কাছে ওয়েভারার নেতৃত্বও গ্রহণীয় নয়, তথাপি কৌশলগত ভাবে তারা ওয়েভারার পরিচালিত অক্ষমতার সঙ্গে সাময়িক যৌথী স্থাপন করেছে। সব মিলিয়ে এটা পরিষ্কার যে, অ্যালবার্টো লরকারের পতন আসন্ন।

বিষম বিদায়

৭ম পৃষ্ঠার পর

দলগুলির জোট বাঁধা আর জোট ছেঁড়ার খেলায় প্রগতিশীল আর অ-প্রগতিশীল দলগুলি তুল্যমূল্যে পরিণত।

ভারতীয় জনমত “ক্লাস্তি আমার কমা কর প্রভু” বলে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু কে তারে আশা দেবে? তাই সমস্ত দশককে মমত্বহীন বিদায় জানাতে বাধ্য হওয়ার জন্য হুঃখিত।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১ নং স্ট লেন, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। গতিবিজ্ঞান / ডঃ প্রদীপ নিরোগী / ১২.০০

২। পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ) / ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী / ১০.০০

৬৫, রাজা স্তবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সবুজের সত্য

সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য

বিপ্লবী নারায়ণী ও গ্রিকাল চারাল ফার্ম (প্র) লিঃ

১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ বালী, শাওড়া

ফোন: ৬৪-২০২৫ ও ৬৪-২৪৪৫

ফার্ম: বৈদ্যনাথী হাট ৬২-২৪৪০ রাস্তা: গৌড়ামূলী হাট

দিল্লী রোড ও ভারতবর্ষের রোডের সংযোগস্থল ফোন: ৬২-১৩৭৭

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক হীরেন বসু, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদ রায়, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, স্ট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

চরণ সিং চান জনতা পার্টির সঙ্গে লোকদলের সমঝোতা

দিল্লীতে বিজু-চন্দ্রশেখর বৈঠক

দপন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। শুক্রবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী ৮০। ৬০ পয়সা

রাজ্য ই-কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী দুটি অফিস থেকে কাজ চালাচ্ছে

রাজ্য - ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই-গোষ্ঠী এখন দুটি প্রদেশ অফিস থেকে কাজ চালাচ্ছে। আন্দোলনের ব্যাপারেও ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই প্রদেশ অফিস থেকে দুই রকমের

আন্দোলনের ডাক দেওয়া হচ্ছে। গত শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের নামে অন্ততম সম্পাদক হরত মুখার্জী বিধানসভা অতিথানের ডাক দিয়েছিলেন। এই অতিথানের কর্মসূচীর পেছনে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি বরকত সাহেবের সম্মতি ছিল। কিন্তু এই আন্দোলনে বরকত হরতর বিরোধী গোষ্ঠী সাত্তার সাহেব এবং তার অঙ্গগত লোকমুরা কেউই যোগ দেন নি।

এই গোষ্ঠীর প্রদেশ অফিস এখন থিয়েটার রোডে। বরকত সাহেবের অঙ্গপন্থিত প্রদেশ কমিটির অন্ততম দুই-সভাপতি আবদুল রউফ আমিনসারী এখন ঐ অফিস থেকে প্রদেশ কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। থিয়েটার রোডের অফিসে রাজ্য শাখার অন্ততম দুই সাধারণ সম্পাদক হুজু ইসলাম এবং গোবিন্দ নন্দর পালা করে বসছেন। সাত্তার আমিনসারী সাহেবরা এখন পাটো একটা আন্দোলনের ডাক দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর মধ্যেই যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাদা ভাবে একটা কর্মসূচী নেওয়া হবে। এবং যুব কংগ্রেসের কর্মসূচীতে সাত্তার আমিনসারী সাহেবরা যোগ দেবেন।

বরকত সাহেবের অঙ্গপন্থিত হরতবাবু ডঃ হরেশ সরকার রোডের অফিস থেকে একাই প্রদেশ কমিটির কাজকর্ম চালাচ্ছেন। হরতবাবু এখন বিভিন্ন জেলা কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে দিল্লীতে তথ্যের গুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে উত্তর ২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হরষিত ঘোষের বিরুদ্ধে আক্রমণ শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

লোকদলের সভাপতি চরণ সিং জনতা পার্টির সঙ্গে একটা সমঝোতার আসতে চান বলে খবর পাওয়া গেছে; বিশেষ করে জনতা ও লোকদল শাসিত সরকারগুলো ভেঙে দেওয়ার পর চরণ সিং দুই দলের ঠেকোর ওপর জোর দিচ্ছেন বলে রাজনৈতিক মহলের খবরে প্রকাশ।

লোকদলের অন্ততম নেতা বিজু

পট্টনায়ক দিল্লীতে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেন। ওরাকিবহাল মহলের সূত্রে প্রকাশ বিজু পট্টনায়ক নাকি চন্দ্রশেখরকে দুই দলের একজোট হয়ে বিধানসভা নির্বাচন জড়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। বিজু আরও বলেছেন যে, চরণ সিং এ ব্যাপারে কোন শর্ত ছাড়াই জোট বাঁধতে আগ্রহী।

জানা গেছে, চন্দ্রশেখর লোকদল নেতা বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে বৈঠক

তত্ত্বের কর্মবর্ধমান বিশদ সম্পর্কে ঐক্যমত হয়েছেন। তবে চন্দ্রশেখর লোকদল নেতার সমঝোতার প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি।

এদিকে নয়টি অ-কংগ্রেস (ই) সরকার ভেঙে দেওয়ার পর অন্তান্ত বিরোধী দলগুলোও জোট বাঁধার আগ্রহী। আর্গ কংগ্রেসের সভাপতি দেবরাজ আর্গ লোকদল, জনতা, শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



জগজীবন জনতা পার্টি ছাড়বেনই

এটা অস্বস্তির নিশ্চিত যে, জগজীবন রাম আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী রাজধানীতে তার অঙ্গগামীদের যে সভা ডেকেছেন সেই সভার পর তিনি হয় কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসীর পুনরুজ্জীবন ঘটাবেন অথবা নতুন দল গঠন করবেন।

এই পৃথক অভিষেকে জিরাম ও তার অঙ্গগামীদের ইন্দিরা কংগ্রেসে প্রবেশের প্র্যাকটিক্যাল ব্যাধা করা যায়, কারণ ই-কংগ্রেসে তাদের প্রবেশের জন্য বেশ জোরালো নেপথ্য তৎপরতা চলছে বলে জানা গেছে। জগজীবন রামের পুত্র জিহরেশ রাম ইতিমধ্যে শ্রীমঙ্গল গান্ধীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন। অন্তান্ত কয়েকজনও এ ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গত লোকসভা নির্বাচনের আগেই জিরামের কংগ্রেসে যোগদানের কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু তার কঠিন শর্ত তখন ইন্দিরা কংগ্রেস গিলতে পারেনি। এখন অবশ্য নেতৃত্ব স্থানী এই কারণে যে, তখন জিরাম ই-

কংগ্রেসে যোগদান করলে তাদের অয়ের অনেকখানি কৃতিত্ব জিরামের ভাগে চলে যেত।

জনতা পার্টির নেতারাও জগজীবন রামকে আটকে রাখতে চান না। প্রথম কথা, তাদের ধারণা। গত নির্বাচনে জিরাম দলের কাছে বোকা-ধরণ ছিলেন; এবং দুই, গত নির্বাচনে ধরাশায়ী হবার পর থেকে লোকদলের সঙ্গে সমঝোতার আসার জন্য পার্টির নেতারা যে চেষ্টা করছেন জিরাম তার অন্তরায়।

কোন কোন জনতা নেতা মনে করছেন যে, জিরাম নিজে থেকেই জনতা পার্টি ছাড়বেন। তার জন্তে জনতা পার্টিতে খতি নেই। কি করে তাকে সহজে পরিহার করা যায় কোন কোন জনতা নেতা সে কথাও ভাবছেন। একটা উপায় হল, লোকদলের সঙ্গে প্রকাশ্যে সমঝোতার আসা। অপরদিকে জিরামও চেষ্টা করছেন জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে

বাবার সম্মানজনক পথ আবিষ্কারের।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস খবর দিয়েছে, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তারা জানতে পেরেছেন জগজীবন রাম কয়েক দিনের মধ্যেই জনতা পার্টি ত্যাগ করছেন বলে আশা করা যাচ্ছে। আপাততঃ তিনি লোকসভার নির্দল আসন নেবেন, তারপর তিনি ঠিক করবেন ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন না অথবা দল গড়বেন।

বোম্বাই থেকে একজন নামকরা আইনজীবী দিল্লীতে গিয়েছিলেন জিরামকে জনতা পার্টি ত্যাগে নিবৃত্ত করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য নয়টি রাজ্য সফরে রাজী করতে। 'কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।' জানা গেছে জিরাম জনতা পার্টিতে খুব অস্থিতিতেই আছেন এবং তিনি এখানে আর বেশদিন থাকতে চান না।

বহুগুণকে মস্কো চালানোর চেষ্টা

মস্কোর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আই কে গুজরাল সম্প্রতি রাষ্ট্রদূতের কাজে ইজফা দেওয়ার ফলে পরবর্তী সভা ব্যা উত্তরাধিকারী হিসাবে এইচ এন বহুগুণার নাম শোনা যাচ্ছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সূত্রী আক্সেই গ্রোমিকোর সভলবলে ভারত সফর কালে তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তান ও অন্তান্ত আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে বহুগুণার সফল আলোচনা হওয়ার কথা এবং ভারত উত্তরপশ্চিম ইন্দো-চীনা মহল খুবই খুশি। যার ইমান স্বরূপ বহুগুণাকে মস্কোর পারদর্শী রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে বহুগুণা এতে মোটেই প্রস্তুত হননি। একান্ত বিশ্বস্ত মহলের কাছে বহুগুণার বক্তব্য শ্রীমতী গান্ধীর তাকে মন্ত্রীপদ দেবার সুস্পষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঙ্কল্প গান্ধীর প্ররোচনার বহুগুণা বিরোধী একটি ছুট চকু সেই ব্যাপারে বাধা সাধছে। এই কারণে তিনিও বৈকে বসেছেন এবং কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, একমাত্র মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর কোন প্রস্তাবই তিনি মেনে নেবেন না।

সম্পাদকীয়

স্বৈরতন্ত্র এবার বিবস্ত্র হচ্ছে

গণতন্ত্রের বাহারে পোশাক-ত্যাগ করে এবার বিবস্ত্র হয়েই বৈরতন্ত্র মঞ্চে আবির্ভূত হল। একটি কোপেই জবাই করা হল ন'টি রাজ্যের গণতান্ত্রিক সরকারকে, জননির্বাচিত বিধানসভাকে-অকংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলোতে গণতান্ত্রিক শাসন খতম করে দিয়ে চাপানো হয়েছে রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রের শাসন। এরপরে নাকি এগ্রিল নাপাদ সংশ্লিষ্ট বিধানসভাগুলোর নির্বাচন হবে। রাজ্যগুলোকে খড়গাঘাত করার পক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন কারণ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার উল্লেখ করেন নি, শান্তিপ্রাপ্ত সরকারগুলো জানতে পারলেমনা তাদের অপরাধ কী। বোধহয় সেকেন্দ্রে আদালতে মাথলা হত এবং কেন্দ্রীয় সরকারই ঘোষী সাব্যস্ত হতেন সেজন্তই সন্তর্পণে কামেলা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে জন-গণের রায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলোর বিপক্ষে গিয়েছে—এ অজুহাত দেখিয়েই ইন্দিরা সরকার রাজ্যগুলোকে গ্রাস করেছেন। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় জনতা সরকারও অস্বল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আজকের কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথই অস্বল্প করলেন বলে যুক্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেদিন জনতা সরকারের এ-কাজকে 'অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে আজ শ্রীমতী গান্ধী ভেনে-ভেনে সে-প্রাণ্ড পথ অবলম্বন করলেন কেন? সেদিন ন'টি রাজ্যের মধ্যে না তিন সরকারই সেসব উদ্ভীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অথচ আজকের পরিস্থিতি আদৌ তা নয়।

নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর জয়লাভে গণতন্ত্র আবার বিপন্ন হল—একথা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু সেদিনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। দুর্গাও সাময়িককাল ধরে একাধিকবে বলে এসেছে যে কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই) সরকার অচিরেই অ-কংগ্রেস (ই) রাজ্য সরকারগুলিকে ভেঙে দেবেন। প্রথমে ব্যাপক হলত্যাগ ঘটিলে কর্ণাটক, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ তিনটিতে অ-কংগ্রেস (ই) সরকারের জারপা নিয়েছেন কংগ্রেস (ই) সরকার। কিন্তু তাতে ঝকঝকানী বেশি, টাকার প্রাচুর্য এবং সময়ও লাগে বেশি। তাই কামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি ন'টি রাজ্যের উপর কোপ বসানো হল। উত্তরপ্রদেশের মারায়ণপুর বা বিহারের পুরশবিহা ইত্যাদি অজুহাত না দেখালেও চলত, কারণ অস্ত্রাস্ত্র রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট থাকা লক্ষ্যেও রেহাই তো পায় নি।

চরণ সিং চান

৭ম পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেস, সি পি আই, সি পি এম প্রভৃতি হলগুলোকে নিয়ে এক ব্যাপক বিরোধী যোচা গঠন করতে আগ্রহী। দেওয়াজ আর্গ বসেছেন, ইন্দিরা গান্ধীর বৈরতন্ত্র কার্যকলাপের মোকাবিলা একমাত্র এককবন্ধ বিরোধী যোচাই করতে পারে।

ইন্দিরা গান্ধী যে অকংগ্রেসী (ই) সরকারগুলো ভেঙে দেবেন এটা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। শুধু কৌশলগত কারণে কিছুদিন দেরী করা হল। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশা রাজ্য সরকারগুলো দল ভাঙিয়ে

কংগ্রেস (ই) লোকসভার নির্বাচন জিতেছে জনতা ও লোক দল সরকারের ব্যর্থতার দৃশ্য নেতিবাচক তোটে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন চুই তৃতীয়াংশের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা তাঁর জরুরী অবস্থা ও আনুমানিক ব্যবস্থাসমূহেরই প্রতি জনসমর্থন বা অসমর্থন জ্ঞাপক। সে-বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি রাজ্য সরকারগুলো ভেঙে দিয়েছেন কমতানীন হবার মাস খানেকের মধ্যেই। শ্রীমতী গান্ধী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বৈরতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছেন তা তার কয়েকটি কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ ব্যাপক হলত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি তিনটি রাজ্যে কমতা দখল করলেন, অথচ নতুন সরকারের পক্ষে জনরত যাচাই করতে সাহসী হলেন না। দ্বিতীয়তঃ নিবর্তনমূলক আটক আইন পাশ করিয়ে তিনি রাজনৈতিক বিরোধীদের বিনা বিচারে আটক করার পথ প্রশস্ত করলেন। তিন, পোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর এন কে সিংকে গ্রেপ্তার করা হল। চার, জগমোহন, পি এন জিন্দার প্রমুখ জরুরী অবস্থাকালীন নায়কদের কমতার উচ্চাঙ্গনে পুনর্বহাল করলেন। পাঁচ, চারটি সংবাদ পত্রবরাহ একত্রলিখে আবার এক করে 'সমাচার'-এর পুনরাবির্ভাব আয়োজন করা হচ্ছে। অর্থাৎ জরুরী অবস্থার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার কামেলার মধ্যে না গিয়েও পরিস্থিতিকে দেখিকেই ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সত্তর গান্ধীরা যখন দখলবলে আইনের স্বীকৃতি লাভ করেছেন তখন সংবিধান বহিস্কৃত শক্তি বলে আখ্যাত হবার সুকি তো নেই। সেজন্তই বিশ-দক্ষ কর্মহটিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

বিরোধী হলনেতারা সকলেই এক বাক্যে ইন্দিরা গান্ধীর এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করছেন। চরণ সিং এ-চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করেছেন। কারণ কেন্দ্রে ও রাজ্য-গুলোতে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা গণতন্ত্র ও ফেডারেল আদর্শের মূল্যেই কুঠারঘাত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে এম ইউ সি ও চুই মকশালপন্থী শাখা সবেত সন্ত অ-কংগ্রেস (ই) দলই গণতন্ত্রের ওপর ইন্দিরার কমতাবাজীর-মিন্ধা করেছে। কিন্তু জনতা, লোক দল বা অস্ত্র বিশিষ্ট হলগুলো কি শ্রীমতী গান্ধীর দুশ্চরিত্রতার বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্বপরায়ণ ও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীশাসনের মনো-ভাবের কথা কি জানতেন না? এ-খটমা থেকে শিকা গ্রহণ করে তারা যদি আবার এককবন্ধ হন, তবেই বিধান সভার নির্বাচনে ইন্দিরার হঠকারিতার সমুচিত জবাব দিতে পারবেন।

নিজের কজার আনার চেষ্টা কার্যকর হবে না দেখেই শেষ পর্বস্ত ইন্দিরা কংগ্রেসের উচ্চতর পর্ষায়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য সত্তর গান্ধী এবং তার সহকর্মীরা আগে থেকেই সরকার ভাঙার জন্ত চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু প্রবীণ নেতা ভিন্ন মত পোষণ করার রাজ্য সরকারগুলো ভাঙার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কিছু দেরী হল।

বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণের জন্ত জনতা পার্টির কার্যকরী সমিতির বৈঠক বসবে। জগজীবন রামের সঙ্গে চন্দ্রশেখরের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। জানা গেছে জগজীবন রামও পরিস্থিতি

পর্যালোচনা করার জন্ত বৈঠক ডাকার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন।

জনতা পার্টিরও কিছু নেতা মনে করছেন এখন লামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে তার মোকাবিলা করতে চরণ সিং এর প্রস্তাবে দলের নেতৃত্বের রাজী হওয়া উচিত। এদের মতে জনতা-লোকদল-কংগ্রেস এককবন্ধ হলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে নির্বাচনী সম্ভাবনা উজ্জল। তবে বিরোধী হলগুলো বিশেষ করে জনতা লোক-দল সমঝোতা হবে কি না-তা অনেকটা নির্ভর করবে জনতা নেতা-দের ইচ্ছার ওপর।

তেহেরানের মাকি'নী দূতাবাস থেকে গলায়নের কাহিনী

২৭ একর জমির ওপর অবস্থিত তেহেরানের মাকি'নী দূতাবাস গত ৪ঠা নভেম্বরের গভীর রাতে যখন সরিয়তি ইসলামী বাহিনীর দ্বারা দখলীকৃত ও বেরাও হয় তখন উপস্থিত অস্ত্রাস্ত্র ৭৫ জন ব্যক্তির সঙ্গে আরো একজন যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন তেহেরানের মাকি'নী দূতাবাসের ভার-প্রাপ্ত অস্ত্রতম কূটনীতিবিদ রবার্ট এগার্স। ৪ তারিখ রাজিবেলা অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন পালাতে, কিন্তু মাত্র ৬ জনই সফল হয়েছিলেন জনী ইরানী ছাড়াও হাত থেকে রক্ষা পেতে।

৫৪ বৎসর বয়স রবার্ট এগার্সের নেতৃত্বে ২০ জন ইরানী সহ-বাকি ৭৬ জন বখাজমে ১০ ও ৫ জন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ইরানী ছাড়াও বিছানো আল হি'ডতে পারেন নি। ব্যতিক্রম মাত্র ৬ জন, যার-অন্ততম হলেন রবার্ট এগার্স। তার মতে দূতাবাস আক্রান্ত হবার পর স্বতাবতই আক্রান্ত কর্মীরা স্থানীয় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্য আশা করেছিলেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অস্বপ্নস্থিতির ফলে যখন টবরের-মাম জপ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিলনা, তখন হঠাৎ

লোডশেডিং হয়ে যায় এবং দূতাবাসে উপস্থিত প্রত্যেকেই বাড়ীর ছাড়ের ওপর প্রচণ্ডভাবে ঘোড়দৌড়ি দাপা-দাপির আওরাজ পান। আর বিশ্বাসলার স্বযোগ বুঝে তারা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু মি: রবার্ট ও তাঁর চারজন সহকর্মী অর্থাৎ মাকি, লিক-জেক, জোসেফ ও ক্যাথলিন টাকরড এই পাঁচজন ছাড়া সকলেই গ্রেপ্তার হন। রবার্ট তাঁর চারজন সহকর্মীকে নিয়ে দূতাবাস থেকে কিছুদূর তাঁর নিজের দ্রাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৬-৭ দিন বাবং রবার্টের দ্রাটে বন্দী-দশার কাটাবার পর প্রবীণ রবার্ট কানাডিয়ান এজেন্সিতে তাঁর জটীক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কানাডিয়ানরা পলাতক আমেরিকান-দের জন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। আতিথেয়তা করার স্বযোগ পেয়ে কানাডার দূতাবাস কর্মীরা যথাস্থ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে-তাদের (আমেরিকান) রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। এরপর ওদের সঙ্গে একে-মাকি'নী যুক্তরাষ্ট্রের আর একজন পলা-তক—যিনি কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসাবে তেহেরানের মাকি'নী দূতাবাসের ভার-প্রাপ্ত যোগদান করেন। অতএব পাঁচ আর একে ছয়। কানাডিয়ানরা দারিষ নিয়ে এই ছ'জন পলাতক মাকি'নী জন্ত আল ছাড়াও তৈরী করে অগ্নিগত ইরান ত্যাগের ব্যবস্থা করে দেন।

শিশু কিশোরদের মানুষ করার

প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের

—মুখমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু বলেন, দেশের পরীব পছ ছেলেমেয়েদের দেখাওনো করার প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের। গত বছার সময় বহু লম্বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বামস্বপ্ন সরকার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে-ছেন। কিন্তু শুধু সরকারের পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। আমা-দের মতো মিল অর্থনীতির দেশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিরও সেবামূলক কিছু কাজ করা দরকার। ব্রিটানিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আয়োজিত এক অস্থানে মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেন।

আনুষ্ঠানিক ব্যাতি লম্পার ব্রিটা-নিয়া বিলুট কোম্পানী কলকাতার পরীব ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধদের মুখে

একটু হাসি কোটাবার জন্ত লগায়ে একদিন আনন্দদায়ক সময়ের ব্যবস্থা করেছেন। সোমবার এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সাধারণ টেরেসা। সারাদিন পাওয়ার খয়চও বহন করবে কোম্পানী স্বন্দর বাসটিতে প্রথমদিন প্রায় পঞ্চাশজন ছেলেমেয়েকে ডায়-নওহারবার নিয়ে যাওয়া হয়।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সকালে কোম্পানীর মাঠে অস্থগীত এই উদ্বো-ধনী সভার প্রোট ব্রিটেনে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রিচার্ড পারমার-ভাষণ দেন। এখানকার চেয়ারম্যান সাবারওয়ারাল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, চৌধুরীও ভাষণ দেন। যতবাহ জ্ঞাপন করেন ডিরেক্টর জে মুখার্জী।

মধ্যপ্রদেশের পুলিশ ও জমিদাররা

হরিজন যুবকদের খুন করছে

কল্যাণ ঘোষ

বিগত কয়েক বছরে মধ্যপ্রদেশের বান্দা জেলায় ৫০ জনেরও বেশি হরিজন যুবককে পুলিশ গুলি করে মেরেছে বলে জানা গেছে। পুলিশের বক্তব্য হল: পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়েই নাকি এই ৫০ জন হরিজন যুবকের মৃত্যু হয়েছে। অপর দিকে বান্দা জেলার ভারতীয় ক্ষেত্র মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীধরজান লালে মতে পুলিশ নির্দোষ এইসব হরিজন যুবককে মিহিমিহি ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে “এনকাউন্টারের” কথা রটিয়েছে। একশ জনেরও বেশি হরিজন যুবককে লাকানো অভিযোগে জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক পোষণ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে সমগ্র প্রশাসন যত্ন হাত মিলিয়েছে জমিদার এবং কুলাকদের সঙ্গে। শিক্ত এবং চাকুরিজীবী হরিজন যুবকেরা এখন জমিদার এবং কুলাকদের হুম তামিল করতে চায় না। প্রধানত এই কারণেই নাকি প্রায়শই হরিজন সম্প্রদায়ভুক্তদের ঘর বাড়ি জালিয়ে দেয়া হয়, আক্রমণ করা হয়, লাকানো যামলায় প্রেষণার করা হয়। অন্ত্যস্ত নিপীড়ন ব্যবস্থা তো আছেই।

নয়াধিনী থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সাপ্তাহিক “হাউ” পত্রিকার আহ্বারী ১৯৮০ সংখ্যাকে উদ্ধৃত করে প্রাঞ্জনিত নিউজ এজেন্সী জানাচ্ছে যে, বান্দা জেলার জমিদাররা যে সংগ্রাম করছেন তার নেতৃত্বেও রয়েছে হরিজন যুবকেরাই। জমির হক এবং সামাজিক অধিকারের সংগ্রাম বতীত হয়, হরিজন সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের মাজা ততই নাকি বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় ক্ষেত্র মজদুর ইউনিয়ন একমাত্র বান্দা জেলাতেই ১৫ হাজার একর লুকানো জমি খুঁজে বার করে ধল নেয়। ধল নেয়া জমির অধিকাংশই চাষযোগ্য। এই সব জমি বিলি করা হয় তাদের কাছে বাদের একটুও চাষের জমি নেই। এই জমি যারা এতদিন বাবত ভোগ করে আসছিল তাদের রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই রাগেরই প্রতিফলন দেখা যায় হরিজনদের ওপর আক্রমণের মধ্যে।

বান্দা জেলার কুন্তরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বকসাইট, সিলিকা এবং চুনাপাথর। এছাড়া রয়েছে কেন্দুপাতার বন। এই সবকে কেন্দ্র করে

অনার্যসেই গড়ে উঠতে পারে বড় বড় শিল্প। যার মাধ্যমে হাজার হাজার বেকারের কর্ম সংগ্রাম করা সম্ভব। কিন্তু আজও পর্যন্ত এই অঞ্চলে একটি শিল্প গড়ে ওঠেনি। বান্দাতে জলসম্পদের পরিমাণও খুব কম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জেলায় একটিও সেচ প্রকল্প গড়ে ওঠেনি। ফলে কৃষি উৎপাদন রয়ে গেছে সেইখানেই যা ছিল ভারত স্বাধীন হবার আগে। সেচের সুযোগ না থাকায় চাষের কাজের ক্ষমতা জমিদার ও কুলাকরা ট্রাক্টর বা অস্ত্রাস্ত্র যন্ত্রপাতি কিনছেন। তাদের নির্ভর করতে হচ্ছে কৃষি শ্রমিকদের ওপরেই।

সম্প্রায় বাড়াবার আর কোন বিকল্প নং থাকার সামন্ততন্ত্র টিকিয়ে রাখার প্রবক্তা এই সব জমিদার ও কুলাকরা কৃষি শ্রমিকদেরই সর্বাধিক মারাত্মক শোষণ করতে চায়। অস্ত্র দিকে সামন্তপ্রচার বিলোপকারী কৃষি শ্রমিকরা চায় মজুরীর নামে বতটা বেশি সম্ভব আদায় করে নিতে। উত্তর পক্ষের এই লড়াই এখন এই অঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই লড়াইয়ে কৃষি শ্রমিকদের মূলধন হল তাদের সংগঠন, অস্ত্রদিকে জমিদাররা প্রয়োগ করে মানান কারখা এবং পুলিশি সহায়তা নিয়ে কৃষি শ্রমিকদের হারমান করে, হত্যা করে।

হালফিলের কথা, বান্দা জেলার হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু যুবককে গুলি করে মারা হয়েছে, হচ্ছে! অভিযোগ হল এইসব হরিজন যুবকেরা নাকি কৌজী দলের সঙ্গে যুক্ত। কৌজী দলটি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে। এত দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে মিথ্যা এনকাউন্টার-এর নামে কেনইবা হরিজন যুবকদের গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই কৌজী দলের নেতা একজন অল্পবয়সী সম্প্রদায়ভুক্ত যুবক এবং তার দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অজুহাতে কেন হরিজন যুবকদের পুলিশ হত্যা করছে?

কৌজী দলের নেতা যে যুবকটির নাম তার সদাশিব। হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত। বান্দা জেলার বাবেল থানার বাছা-উলি গ্রামে তার বাড়ি। সদাশিব চাকুরী করত সামরিক বাহিনীতে। তার বড় ভাইয়ের বউ খুবই সুন্দরী ছিলেন। একদিন জমিদারের পোষা গুণী ছড়াল সিং সদাশিবের বৌদিকে

কে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ঐ মহিলা কোনমতে সম্মত বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হন এবং নিজের স্বামীর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। ঘটনা শুনে সদাশিবের দাদা তৎক্ষণাৎ ছড়াল সিংয়ের বাড়িতে গিয়ে এই জাতীয় আচরণের জন্য ছড়াল সিংকে সতর্ক করে দিয়ে আসেন। কয়েকদিন পরেই ছড়াল সিং সদাশিবের দাদাকে খুন করে।

দাদা খুন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে সদাশিব ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে। ছড়াল সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং তাতে তার সাজাও হয়। কিন্তু পুলিশি অপদার্থতার কারণেই নাকি উচ্চ আদালতে আপীল করে ছড়াল সিং জামিনে মুক্ত হয়; ততদিনে সদাশিব তার সামরিক বাহিনীর কাজে যোগ দিয়েছে। ছড়াল সিং জামিনে মুক্ত

তারাতলা পোর্ট কোয়ার্টার্সে

সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া দৌরাভা

গার্ডেনরীচ থানা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেনা

সমাজবিরোধীদের দৌরাভা গার্ডেনরীচ থানা এলাকার তারাতলা পোর্ট কোয়ার্টার্সে মাহুঘের বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঐ এলাকার সমাজবিরোধীদের দৌরাভা এমন এক পর্দায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, মহিলা-রাও সমাজবিরোধীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। থানার অভিযোগ করেও নাকি কোন প্রতিকার হয়না। উষ্টে অভিযোগকারীকেই মানাতাবে হারমান করা হয়। পুলিশের পরোক্ষ প্রাঞ্জে তারাতলা পোর্ট কোয়ার্টার্স এলাকার সমাজবিরোধীদের দাপট এখনও অব্যাহত।

নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে যে, ঐ এলাকার সমাজবিরোধীদের দৌরাভা স্থানীয় অধিবাসীরা মান সম্মত নিয়ে বসবাস করতে পারছেন না। ১৯৭৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রাজ্যে আত্মসংক্রান্ত সাত্বে দশটা মাপা দি / ৩২ নম্বর পোর্ট কোয়ার্টারের বাসিন্দা শ্রীমন্তোষ চক্রবর্তীর ঘরে জিতুয়া বাবদ নামক এক

হয়ে সদাশিবের বিধবা বৌদিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এই সংবাদ শ্রীমন্তোষের কাছে পৌঁছালে সে তার সামরিক বাহিনীর রাইফেল নিয়ে পালায়। সদাশিবের বোঝে সামরিক বাহিনীর লোক গ্রামে আসে। ছড়াল সিং এবং তার সাক্ষরদরাদা দাদা সদাশিবের দাদাকে হত্যা করেছিল তারা বুঝতে পারল যে, এবার শিরয়ে শমন নিয়ে তাদের বান্দ করতে হবে। সদাশিব বহুলা নেবার জন্তই সার্ভিস রাইফেল নিয়ে ফেরার হয়েছে একথা তারা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে। ছড়াল সিংরা সদাশিবের নামে নানান গুজব ছড়াতে থাকে। তারা সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানান। সদাশিব গ্রামে এসে সব তুলন এবং আত্মগোপন করল। সদাশিবের দাদা খুন হয় ১৯৭৫ সালে।

তারপর সদাশিব চার বছর আত্মগোপন করে থাকে। তবে জমিদার-জমীদার জানত যে, সদাশিব যে কোন দিন প্রতিশোধ নেবার জন্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই আতঙ্ক থেকেই তারা একটি পক্তিশালী ডাকাত দল গঠন করে পুলিশের পূর্ণ

সহযোগিতা নিয়ে। সেই ডাকাত দলের নেতা ছড়াল সিং। এমন অভিযোগও উঠেছে যে ছড়াল সিংয়ের দলকে পুলিশ বন্দুক সরবরাহ করত। এই অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় পরে একটি ঘটনায় পুলিশী তদানীকালে। পুলিশের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে ছড়াল সিংয়ের দল এলাকার ডাকাতি এবং নরহত্যা শুরু করে। ডাকাতি করার পর রটিয়ে দেওয়া হত যে এই ডাকাতি করেছে কৌজী দল অর্থাৎ সদাশিবের দল।

এই চার বৎসরের মধ্যে কৌজী দল এত বদনামী হয়ে পড়ে যে, সকলের মনে একটা ধারণা জন্মে গেল সদাশিবের দলই বান্দা জেলার বড় এবং শক্তিশালী ডাকাত দল। আসলে সদাশিব এইসব ঘটনার কোনটির জন্তই দায়ী নয়। এই সবই হল ছড়াল সিংয়ের কাজ। কিন্তু রটনার ফল এমনই দাঁড়ায় যে, সব ঘোষ গিয়ে পড়ে সদাশিবের দলের ওপর। কৌজী দলের মধ্যে যোগ আছে এই অজুহাতে নিরীহ হরিজন যুবকদের পুলিশ হত্যা করতে শুরু করে এবং রটিয়ে দেওয়া শেবাংশ ১ম গৃহায়

মুখ্যাত সমাজবিরোধী জোর করে প্রবেশ করে এবং সন্তোষবাবুর ১৫/১৬ বছরের কন্যা বনানী চক্রবর্তীর হাত ধরে জোর করে টেনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে যেতে চায়। সন্তোষবাবুর গী শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী ঐ সমাজবিরোধীকে বাধা দেওয়ার উক্ত জিতুয়া বাবদ তাঁকে মারধোর করে। বনানীকেও মারধোর করে। চীৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের কোয়ার্টারের কয়েকজন বেরিয়ে আসেন এবং বেগতিক দেখে উক্ত জিতুয়া বাবদ চম্পট দেয়। বাবার আগে বলে দিলে যে, সে আবার আসবে।

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই সেপ্টেম্বর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে গার্ডেনরীচ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী হয়। ভারপ্রাপ্ত কর্মী নম্বর ১৫-৯-৭৯ তারিখের ১১৭৭ থানা থেকে কল্যাণী দেবীকে এবং বনানীকে পোর্ট ট্রাস্ট হাসপাতালে পাঠানো হয় আশাত পরীক্ষার জন্য। পোর্ট ট্রাস্ট হাসপাতালের ডি এইচ ১২৩৬৫ এবং ১২৩৬৬ নং টিকিটে দেখা যাচ্ছে যে, চিকিৎসক লিখেছেন যে, ঘৃষি জাতীয় আঘাতের ফলে বনানী এবং কল্যাণী দেবী

আহত হয়েছেন। সন্তোষবাবুর গী এবং কন্যা বনানী থানার তখন (বেলা ১১টা) পুনরায় উক্ত জিতুয়া সন্তোষবাবুর কোয়ার্টারে আসে। দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়। কিন্তু বাবার আগে শানিয়ে যায় এই বলে যে, কি করে মেরেকে বাঁচার দেখব। সন্তোষবাবু ফিরে এসে সব তুলন কোয়ার্টারে গী এবং মেয়েকে রাখতে ভরসা পাননা। দেশে পাঠিয়ে দেন। অব্যাবধি পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

বিগত লোকসভা নির্বাচনকালে নির্বাচনীসভার ভাষণ দিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ১১ই ডিসেম্বর তারাতলা পোর্ট কোয়ার্টার্স ময়দানে গেলে স্থানীয় মাহুঘরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করে এক গণ দরখাস্ত দেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে আসেন কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। স্থানীয় মাহুঘরা সমাজবিরোধীদের দৌরাভা আতঙ্কিত। মুখ বুজে সব সহ্য করা আর মান সম্মত খোয়ানো ছাড়া তাদের যে গত্যন্তর নেই একথাটা তারা বুঝে গেছেন। বহু পরিবার কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

উত্তরপ্রদেশের চিঠি

কেন্দ্র বনাম উত্তরপ্রদেশ

রমাপ্রসাদ মল্লিক

লক্ষ্যে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী : উত্তর ভারতের ঐতিহ্য কৃষ্ণাণ্ডের স্বজন বিবেচনী লড়াই। ঐতিহাসিকতা মহা-ভারতীয় যুগের শুধু নয়, বহুগুণ পেরিয়ে আজ কংগ্রেস (ইন্দিরা) বনাম কংগ্রেস (আদি) যুদ্ধের পরিণতি লাভ করেছে। এ-তথ্য উত্তরপ্রদেশে সকলেরই প্রায় জানা যে, মুখ্যমন্ত্রী বনারসী দাসজী এককাদীন মুখ্যমন্ত্রী তথা “লৌহ-মানব” ঐচ্ছিকতান গুপ্তার রাজনৈতিক সাথী (এবং সাক্ষর) ছিলেন। আজও এর রাজনৈতিক মিজ এবং অঙ্গুতর/অধিকাংশই কংগ্রেস (আদি) মারফৎ কিছু জনতা, কিছু লোকদল, কিছু কংগ্রেস (আর্গ) এবং অচিহ্নিতভাবে আদি কংগ্রেসের পরম্পরা বাহ্যিকের মাঝে অঙ্গবিস্তার সক্রিয়।

বলাবাহুল্য, কংগ্রেসের (ই) এক-মাত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বীহীন/নেত্রী শ্রীমতীজী এগার বছর পূর্বকার কংগ্রেস-বিত্তি ভোলেননি। এবং একথাও তাঁর বিস্মৃত হবার নয় যে, নারায়ণরতে কংগ্রেসী সংগঠন তথা আন্দোলনের প্রাপকজ উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বে যে ব্যক্তিগত যুগিয়েছে তা মূলতঃ সংরক্ষণশীল দক্ষিণমারী—কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের উপস্থিত মেকী সমাজবাদী ও ছদ্মবেশী-বামমারীর মত নয়। আদি কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী ধারা সেকারণে তাঁর প্রধাম প্রতি-পক্ষ। সুতরাং, এবার লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের মরীচিকা-বিজয়ের অন্তে বিচলিত ইন্দিরাজী যে তাঁর দর্বাধিক বিপক্ষমক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে কমতা-পদ থেকে হটিয়ে নির্বাক হতে চাই-বেন এতে আর বিচল কি! প্রসঙ্গতঃ দাম্পতিক লোকসভা-নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) ৫১টি সিট পেলেও জন-গণভোটের হিসেবে তাহা হেরে গেছে। পরিসংখ্যানে দেখুন লোক-দল প্রার্থীরা পেয়েছে প্রায় জন-ভোটের ২৮.৪১%, মোট ৮১,৪২,৮৩৯ জনতা প্রার্থীরা ২২.৪১%, মোট ৬৩,১৪,১৬০, দুই দলের মিলিয়ে শতাংশের হিসেবে অঙ্গুপাত দাঁড়াচ্ছে ৫০.২৪%; অপরপক্ষে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের প্রাপ্তির অঙ্গুপাত ৩৫.৭৪% মোট ১,০১,৭১,২০২।

প্রবচন অঙ্গুদারী কিলিয়ে নাকি কাঠাল পাকানো বার। দম্প্রতি নারায়ণপুর গ্রামের (দেওয়রিয়া জেলা) কাণ্ড উপলক্ষ করে যে রাজ-নৈতিক সুবিধাবাদের নির্লজ্জ খেলা শুরু হয়ে গেছে, তা একধরনের রাজ-

নৈতিক, বোকাবুড়ি। শ্রীমান লক্ষ্য গাঙ্গী বললেন, নারা গ্রামের সকল মহিলার ওপর নাকি পুলিশ কর্ম-চারীরা বলাৎকার করেছে। তাঁর “মাতৃদেবী” প্রধামমন্ত্রী মহাশয়া—তিমকে তাল করবার প্রবল অভি-কৃতি তাঁর বিবৃতিতে পরিচ্ছট—বলতে পারলেন এইটুকু যে, তাঁর “দল্লহ” এমনি ছুটি ঘটনার সম্পর্কেই কেবল। অবশ্য গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার হয়েছে; ধবের কাগজে এপর্বত বেরনো হতাহতের তথ্য বিবরণ মোটামুটি সত্যি। কিন্তু যা প্রকাশ পায়নি তা হল, সম্প্রতি ‘হাতা’ থানার ও সি এবং পি এ সি প্রাটুন-প্রধান দুজনেই স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতাদের পেটোয়া। নারায়ণপুর-কাণ্ডের উদ্ঘাটন করে প্রথমে একজন প্রাক্তন সমাজবাদী জনসেবক কর্মী। তাছাড়া, ‘জাগরণ’ দৈনিকের আক-লিক সংবাদদাতা ও পত্রকার, জা-নালের বিপদ আশঙ্কা সত্ত্বেও, এর বিবরণ প্রকাশনার্থে পাঠান এবং দেয়ীতে হলেও ছাপা হয়। তা রাজ্য বিধানসভার সর্বপ্রথম দাস-ক্যা-বিনেটের একজন মন্ত্রী এ দল্লহে নির্ভীক এবং তথ্যাহুগ বয়ান দেন।

মুখোমুখি : মুখ্যমন্ত্রী বনারসী দাস মহাশয় পুলিশ পূজবদের বাড়াবাড়ি লক্ষ্যে গোড়ার প্রকৃতপক্ষে অবস্থিত ছিলেন না। জেলাধ্যক্ষ অথবা এম পি কেউই গা করেনি ঘটনা লক্ষ্যে। গ্রামাঞ্চলে আলকাল গণচেতনা বেড়েছে; সুতরাং পুলিশের লাবইঙ্গপেক্টর প্রথমে নারায়ণপুরে তদন্ত করতে গিয়ে লাজিত হয়, বার বদলা (বা প্রতিশোধ) দেবার জন্ত থানায় ও সি ১৪-১-৮০ তারিখে পুলিশ পি এ সি-র পুরো ‘অধ্যা’ (অর্থাৎ দল) পাঠায় গ্রামবাসীদেরকে “শিক্ষা” দেবার জন্ত। এরকম পরিস্থিতিতে বা হয়ে থাকে—বেদভুক্ত ‘ম’রধোর—তাই হয়েছিল। তবে নারীধর্ষণের ঘটনা মা-ঘটাই স্বাভাবিক, কারণ পুলিশী মনোবৃত্তি সাধারণতঃ এক দিশায় জিহাংসা চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে তা মোক্ষম মার দেবার রাজ্য নেয়। নারায়ণপুরের ব্যাপার নিয়ে পুলিশ বড়কর্তা গোরখপুর ডি আই জি যদিও বা তত্বেয় অপলাপ করে থাকেন, “শিডিউল্ড্ কাস্ট কমি-শনর”, অর্থাৎ, হরিজনদের স্বাধ-সংরক্ষক অধ্যক্ষ তা করবেন কেন? পরোক্ষ আমলা অঙ্গুদারী করার পর জানিয়েছেন যে, কোনো মহিলার

সম্ম-হানি করা হয়নি। অত্যাচার হয়েছে গ্রামের পুজবদের ওপর, বিশেষতঃ তারা আক্রান্ত হয়েছে, যারা ১৩ জাহুয়ারি তারিখে (রাজ্যে) বৃদ্ধা বনকালী ঠাক চাপা পড়ে মারা যাওয়ার পর টাক-মালিকের ওপর হুঁকী করে বৃদ্ধার ওপর নির্ভরশীল ছুটি নাবালিকার ভরণপোষণার্থে ৫০০ টাকা কতি পূরণ হিসেবে পেয়েছে। টাক-মালিকের প্রতিনিধি পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে মাত্র ৩০০ টাকা দিয়ে কাটবার চেষ্টা করে—যার পরিণতি স্বতঃস্ফূর্ত কংগ্রাম এবং মালিক পুলিশের হুঁকী ভা বে পাটী-আ ক ম পের প্র তি ক্রিয়া। ব্যাপারটা গোড়া থেকে অর্থনৈতিক দাবি-ভিত্তিক লড়াইয়ের চরিত্র নেয়।

কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশে নৈতিকতার মান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং নারীধর্ষণে ঘোঁরবিহীন অপরাধ মুখরোচক চর্চা ও প্রচারের বিষয়রূপে লক্ষ্যলভ্য নারায়ণপুরে পুলিশ-বাহিনীর ধারা একরাজির তাণ্ডবকে অস্ত-রঙে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার মূলে রাজনৈতিক অভি-লক্ষ্য—উত্তরপ্রদেশে লোকদল মজি-মগুলীর অঙ্গুনিহিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পতন ঘটান—এত দুষ্টিকটু যে, প্রধামমন্ত্রীর সুযোগ্য-পুত্রের ভাববৃত্তি এর ফলে মলিনই হয়েছে, উজ্জল হয়নি। আরও আশ্চর্য, শ্রীমতী গাঙ্গীর স্বয়ং নারায়ণপুরে ছুটে যাওয়া এবং দেওয়রিয়া জেলা জজের সততা ও যোগ্যতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া অশোভন তো বটেই অস্বাভাবিকও।

প্রসঙ্গতঃ, কয়েকটি আরও তথ্য উল্লেখ করার দাবী রাখে—(১) রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর ধারা অঙ্গুদারী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্ত দেওয়রিয়া জেলা-জজের নিযুক্তি; কিন্তু প্রধাম-মন্ত্রী তাতে লজ্জা না হয়ে বলেন, উক্ত জজ নাকি গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে রুজু করা মামলার জারিন দেননি, তাই উক্ত তদন্ত বিবাস আগাতে পারে না। আসলে জেলা-জজ প্রতি কেসেই জারিন-আবেদন মঞ্জুর করেন।

(২) সংশ্লিষ্ট ‘হাতা’ থানার ২০ জন পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি ও নারায়ণপুর গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে ধারণ ব্যবহার করার অভিযোগে উত্তর প্রদেশ পুলিশের অপরাধ বিভাগ কার্যকলাপ শুরু করেছে। অপরাধীদের সম্পর্কে কাইম বিভাগীয় তদন্ত চালু হয়েছে

(১৩-২-৮০)। জুডিশিয়াল এন্কোয়া-রারির ভার দেওয়া হবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের কোনো জজকে জেলা-জজের এক্টিয়ার সমাপ্ত করে।

(৩) দম্প্রতি বাবু জগজী বন নারায়ণপুরে গিয়ে খোজ ধরেন নেন, প্রত্যেকভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রামের মহিলা-দের কাছে; তারা কেউই নারী ধর্ষণের অভিযোগ তোলেনি।

নারায়ণপুর কাণ্ড কেন্দ্রের একমাত্র হাতিয়ার নয়। উত্তর প্রদেশের রাজ্য-সরকার পাটানর উদ্দেশ্যে গত ২৩ জাহুয়ারী তারিখে বিধানসভা ভবনের সামনে কংগ্রেসে (ই)র যুব-কর্মীরা এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সে উদ্দেশ্যে দ্বারা প্রদেশ থেকে রাজ-নৈতিক ক্যাডার রূপে প্রচুর মন্তানদের সমাবেশ হয়। কংগ্রেস (ই) রাজ্য সংগঠনের অধ্যক্ষ শ্রীধর্মবীর সহ সর্বশ্রী হরিশ্চন্দ্র রাউত, মুজফফর হসেন এবং রামনারায়ণ জিগাঠী (এম পি জর) ও হঠাৎ উঠতি নেতারা প্রচুর হৈ চৈ করে কিছু পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেদ করা অঙ্গুদারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিধানসভার অন্তরে রাজ্য-পালের ভাবনের সময় কট্যুক্তি নিক্ষেপ; বাইরে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে এটে উঠতে না পেরে—মারকপত্র রাজ্যপালের হাতে দেবার অছিল। কাজেই লাগলো না—জেনারেল কাইম সঙ্গের ছোট পার্কে মনের

কাজ উদগার করেই থালাশ। অবশ্য এই “মহতী” প্রদর্শনী শেষ পর্যন্ত নিছক ভিত্তির খেলায় পর্যবসিত হয়। রাজ্য-রাজধানীর প্রশাসকী আমলাদের প্রয়োজন হয়নি ১৪৪ ধারা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বা কারফিউ লাগাতে। শ্রীমানজী (শ্রীমতীজীর পুত্র সঙ্গর) চালাক ছেলে, অঙ্গুদারিত রইলেন।

সমস্তা সৃষ্টি সমস্তাঃ তবে উত্তরপ্রদেশে সমস্তা দাঁড় করান খুব কঠিন নয়। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পূর্বে, সংখ্যালঘু ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্ত বরাণসী দাঁস মজি-মগুলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিতাবা মুজাহুদারী-তৃতীয় ভাষা শিক্ষার সুবিধা থেকে সংস্কৃত হটিয়ে উর্দু রাখে ফলে প্রচুর প্রতিজিয়া দেখা দেয় এবং তা কেবল পণ্ডিতমহলেই দীর্ঘ-বক্ত থাকেনি। বলা বাহুল্য, নির্বাচনের গতি প্রকৃতির ওপর এর প্রভাবের সংসামান্যই ছিল। নির্বা-চনোত্তর অধ্যায়ে এই প্রায় কেন্দ্রের পক্ষে রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বিগড়ে দেবার এক অঙ্গুরূপে দেখা দেয়। তবে বিলম্ব হলেও এই ভুল পদক্ষেপ রাজ্য ক্যাবিনেট তদ্বয়ে নিয়েছে (১৫-২-৮০)।

এছাড়া সমস্তা ছিল আরকণ নীতির প্রয়োগ নিয়ে। দম্প্রতি চাহুরি-সংক্রান্ত আরকণের বাধা বরাদ্দ রাখাও সমাপ্ত করা হল (উদ্দি-পোষ্ট অফিস সঙ্গর ছোট পার্কে মনের শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়



ইন্টার কোলফিল্ডস্ লিমিটেড

(কোম ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্ত ই সি এল / সি পি ডব্লু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অঙ্গুদারিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত-কারকদের কাছে থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম ও টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেকা : নং : জি এম (ডি এ) / টেন্ডার / ৫১ / ১২৬৭ তার ৫-২-৮০

দিশেরগড় এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্ত। মোট আঙ্গুমানিক খরচ ১৮,৮৪,১১৪ টাকা। ৪-৩-৮০ থেকে ১৫-৩-৮০ পর্যন্ত অফিসের লম্বয়ে কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্ত নগদে ১০০ টাকা দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, দিশেরগড় এরিয়া, বরাচক হাউস, পো: নীতারামপুর, জেলা বধমান থেকে টেন্ডার দীল পাওয়া যাবে। ১৭-৩-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩-৩০টার খোলা হবে।

সাধারণঃ কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেন্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আঙ্গুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের কি, বাবদ মনিঅর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

রাজনীতি

সমস্ত বিরোধী দলকে একত্রিত হতে হবে

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কমতানীন হবার একমাত্র অতি-
 ক্ষমতা হবার দলে দলে ইন্দিরা গান্ধী
 পতনকে আশঙ্কিত করেছেন। ১৭ই
 ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-
 ভায় বৈঠকে ওড়িশা, বিহার, উত্তর-
 প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ
 ওয়ারাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু রাজ্য
 মন্ত্রিসভাগুলিকে বরখাস্ত এবং রাজ্য
 বিধানসভাগুলি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
 গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বরাহমুখী
 জল সিং রাষ্ট্রপতিকে এই সিদ্ধান্তের
 বিষয় জানিয়ে ঐ নয়টি রাজ্যে রাষ্ট্র-
 পতির শাসন প্রবর্তনের জন্তে অতি-
 তাল জারী করা হয়।

এই নয়টি রাজ্য বিধানসভা ভেঙে
 দেওয়ার কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় কং-
 গ্রেস (ই) সরকার ১৯৭৭ সালের
 জনতা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও
 সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তার প্রতি
 সমর্থন জানানোর বিষয়টি উল্লেখ
 করেছেন। কিন্তু দুটি কারণে কংগ্রেস
 (ই) সরকারের ক্ষতি মেনে নেওয়া
 যায় না। প্রথমতঃ উত্তর প্রদেশ ও
 বিহার ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলির
 নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ
 হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেস (ই) ৪২তম
 সংশোধনীয় জোরে এই বিধানসভা-
 গুলির মেয়াদ অনর্থক বাড়িয়ে দিয়ে-
 ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত রাজ্যেই
 শাসক কংগ্রেস দল প্রায়শঃ ভোটের
 মাত্র ৩৪ শতাংশ ভোট পার পক্ষান্তরে
 জনতা দলের ভোট ছিল শতকরা ৬৬
 শতাংশ। ১৯৮০ সালের লোকসভা
 নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দলের ভোট
 বিশেষ বাড়েনি, একই রয়েছে প্রায়।
 কিন্তু জনতা দল ভেঙে যাওয়ার
 তাদের ভোটও দুভাগ হয়েছে। কিন্তু
 জনতা, লোকদল ও কংগ্রেস (আ)
 মিলিয়ে এই নির্বাচনে ৪৪ শতাংশ
 অর্থাৎ অধিকাংশ ভোট পেয়েছে।
 ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ
 ভোটে জয়ী হয়েছে বলেই তার পক্ষে
 ১৯৭৭ সালের নজর খাড়া করার
 সুযোগ ও সুক্তি কম।

ইন্দিরা সরকার যে আশঙ্কিত হানবে
 বোঝা কঠিন ছিল না। কারণ
 বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ব বিরোধীদের
 গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করেন।
 ছলে বলে কৌশলে বিরোধী গণ-
 তান্ত্রিক শক্তিকে বিনষ্ট করাই তার
 লক্ষ্য থাকে। একদল, একনেত্রী ও
 এক পতাকার ধরা তুলে হিটলার
 মুনোভিনী যেমন জার্মান ও ইতালীয়
 জাতির উপর একনায়কত্ব ও বৈর-
 তন্ত্রের শৃঙ্খল চাপিয়ে দিয়েছিল,

তারতেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি
 করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু ভারতের
 বৈরতন্ত্রী সমর্থকদের মনে রাখা
 দরকার যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি
 ঘটানো সম্ভব নয়। তা করতে গেলে
 প্রথম প্রচেষ্টা হবে মর্যাদিক কল্পণ,
 দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় পরিণতি ঘটবে
 প্রহসনের আকারে। কংগ্রেস (ই)
 ইন্ডোজী এবং ফার্ম (মর্যাদিক কল্পণ
 এবং প্রহসন)-এর পথে ছুটেছেন।

ইন্দিরা সরকারের এটা প্রথম
 আশঙ্কিত নয়। ইতিপূর্বে ভজনলাল-
 দের মত জগজীবন সি এফ ডি
 ওয়ালাদের তিনি কিনে নিয়েছেন।
 আসামে কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিসভা গঠন
 করার অভিলাষে সেখানে বিধানসভা
 ভেঙে দেওয়া হয় নি। অথচ আসামে
 সংবিধান ব্যর্থ হয়েছিল, লোকসভার
 স্বাভাবিক নির্বাচন পর্যন্ত হতে পারেনি
 নি। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের
 উপর মর্যাদিক নিপীড়ন চলছিল।
 কিন্তু ইন্দিরা সরকার সেখানে হাত
 দিতে চান নি।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার
 জনগণের রাগ স্পষ্ট। সুতরাং ১৯৭৭
 সালের নজর এখানে খাটে না।
 এই তিনটি রাজ্যের জন্য অন্য ব্যবস্থা
 নেওয়ার চিন্তা হচ্ছে। কংগ্রেস (ই)
 দল ও সমর্থকেরা যে ভাবে অকস্মাৎ
 শাস্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য তৎপর
 হয়ে উঠছে তা দেখে মনে হয় এই
 তিনটি বামপন্থী শাসিত রাজ্যে
 আপাততঃ হস্তক্ষেপ না হলেও বেশী
 দেরী হবে না। ভজনলাল, কেশব
 গগৈ, রামলাল, শেখ আবদুল্লাহদের
 বৈরতন্ত্র ছেড়ে দেবে কারণ তারা
 বৈরতন্ত্রের কাছে সর্বাঙ্গে আত্মসমর্পণ
 করেছেন। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী
 রামচন্দ্রন আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা
 প্রকাশ করেও মাথা বাঁচাতে
 পারেন নি।

বৈরতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ
 করার চাইতে যারা মৃত্যুকেও ভয়
 মনে করেন তাদের পক্ষে এখন বলে
 থাকার সময় নেই। বৈরতন্ত্র তার
 কালো হাতের নখর প্রসারিত করে
 আক্রমণে উত্তত। বৈরতন্ত্রের কালো
 থাণ্ডা গণতন্ত্রের কণ্ঠনালী ছিন্ন করতে
 চায়। কিন্তু আজ তার ক্ষমতা ১৯৭১-
 ১৯৭৫ সালের মত নয়।

আজ বৈরতন্ত্রী শক্তি জনসাধারণ
 থেকে অনেক বেশী বিচ্ছিন্ন। এই
 বিচ্ছিন্নতা দিন দিন বাড়বে। সুতরাং
 জনসাধারণের উপর বৈরতান্ত্রিক
 আশঙ্কিত থামবে না। আজ যে নয়টি

রাজ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের উপর
 আক্রমণ শুরু হল, আগামী দিনে
 বামপন্থী কেরল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার
 দিকে তা সম্প্রসারিত হবে। আজ
 বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির একা
 যত জরুরী হয়ে উঠেছে এতদিন বুঝি
 তা এতটা ছিল না।

বৈরতন্ত্রী শক্তির আক্রমণের মুখে
 আজ বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে
 এক ব্যাপক মোর্চা গড়ে তুলতে হবে।
 একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি-
 গুলির নিশ্চিহ্ন একাই দেশকে বৈর-
 তন্ত্রের হাতছাড়া থেকে রক্ষা করতে
 পাবে।

আমাদের বোঝা দরকার যে
 বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের এই প্রথম
 পর্যায়েই তার হাত চেপে ধরতে
 হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিরোধী-
 দলের মধ্যে বোঝাপড়া স্থগিত প্রচেষ্টা
 শুরু হয়েছে। যদি জগজীবন রাম,

অর্থনীতি

কালো টাকার কারসাজী

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কালোটাকা এখন আমাদের
 দেশের মত অন্যান্য দেশেও পালটা
 অর্থনীতি গড়ে তুলছে, এমন অভি-
 যোগ এসেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা
 তহবিলের তরফ থেকে। যাদের
 প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি বা
 ওয়াশিংটন রিপোর্ট মনে আছে
 তারা সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বহুর
 কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ ইন্দিরা গান্ধী
 প্রধানমন্ত্রী থাকার কালেই এই কমি-
 টির রিপোর্ট চেপে যাওয়ার চেষ্টা
 করেছিলেন। যদি জ্যোতির্ময় বহু
 এই রিপোর্ট প্রকাশ করে না দিতেন
 তাহলে তারা এই কালো টাকার
 কাহিনী কোনদিন জানতেও পেতেন
 না।

কালো টাকার উৎপত্তি ও
 প্রবৃদ্ধির মূলে ধনবাহী সমাজ ব্যবস্থা।
 অগিয়ার বলেছিলেন টাকা জিনিস-
 টাই ধারাপ কারণ এটা বঞ্চনা ও
 শোষণের হাতিয়ার মাত্র, নোংরা
 প্রবৃদ্ধির মধ্যেই টাকার জন্ম। কার্ল
 মার্কস বলেছিলেন অগিয়ারের মতে
 টাকাকড়ি যদি নোংরা প্রবৃদ্ধির ফলে
 জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে পুঁজির জন্ম
 হয়েছে নোংরা প্রবৃদ্ধি ও মাত্রান্তর
 ছাপ পাবে মেখে।

ঐ দুই মহাপুরুষ ঠিক যে অর্থে

চরণ দিঃ এরা ঐ বোঝাপড়া স্থগিত
 পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ান তাহলে
 তাদের সরে যেতে হবে। দলীর
 স্বার্থের ধরা তুলে এখন যারা এই
 ব্যাপক ঐক্যের পথে বাধা স্থগিত করতে
 চাইবে তাদের বর্জন করা ছাড়া
 উপায় নেই। ভারতীয় জনগণ এই
 সব ক্ষুদ্রমনা, পদলোভী ব্যক্তিদের
 কোন মতেই বরখাস্ত করে চলতে
 পারেন না। প্রয়োজন হলে বাম ও
 গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নতুন নেতৃত্বে
 গড়ে তুলতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে অব্যাহত
 আক্রমণ চালানো আগের মত এখন
 অত সহজ নয়। তিনটি রাজ্যে বাম-
 পন্থী শক্তির নেতৃত্বে সরকারগুলি
 এখনো বর্তমান। তাদের পেছনে
 ঐ সমস্ত রাজ্যের ব্যাপক জনগণের
 সমর্থন রয়েছে। সুতরাং সরকার
 থাকুক আর নাই থাকুক জনসাধা-
 রণের ঐক্য বন্ধ আন্দোলনকে
 সংগঠিত ভাবে বৈরতন্ত্রী শক্তির
 মোকাবেলা করার জন্যে তৈরী হতে
 হবে। এর জন্যে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী
 ও তার দৃঢ় মিত্র গ্রামের গরীব ক্ষেত-
 মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্ত মেহনতী

জনগণকে প্রধান ভূমিকা পালনের
 জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আমরা জানি যে বৈরতান্ত্রিক
 শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। একমাত্র
 ব্যাপকতম বৈরতন্ত্রবিরোধী একাই
 বৈরতন্ত্রকে পরাস্ত করতে পারে।

সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে
 বৈরতন্ত্র অত্যন্ত সূচত্বর ভাবে
 মেহনতী জনগণের ঐক্যকে বিনষ্ট
 করার চেষ্টা করবে। কারণ এই ঐক্য
 ও সমঝোতা তার পথের একমাত্র
 কাঁটা। সংবিধান অনুসারে আগামী
 দুসালের মধ্যে রাষ্ট্রপতির এই বোঝা
 রাজ্যসভাতেও অনুমোদিত হতে
 হবে। জনমত যদি প্রবলভাবে আত্ম-
 প্রকাশ করে তাহলে রাজ্যসভার
 কোন বিরোধী দলই কংগ্রেসের (ই)
 সঙ্গে হাত মেলাতে যাবেন না।
 তারপর যদি এই নয়টি রাজ্যে বিধান-
 সভার নির্বাচন হয় তাহলে ইন্দিরা
 কংগ্রেসকে পরাজিত করা অসম্ভব
 হবে না, যদিও সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার
 অনুকূলে থাকবে।

কিন্তু নতুন পরিস্থিতির মূল
 বিষয়টি নজর এড়িয়ে গেলে চলবে
 শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

পুঁজি ও টাকাকড়ির উৎপত্তির ঘটনা
 বর্ণনা করেছিলেন আমাদের কালে
 তা অকরে অকরে সত্য বলে প্রমাণিত
 হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে সত্যতার
 মূল্য নেই। পরম্পরাগত ও দ্বন্দ্ববৃত্তি
 ছাড়া যে ধনসঞ্চয় করা যায়না কার্ল
 মার্কস তার ক্যাপিটাল গ্রন্থে একিউ-
 মুলেশন প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে তা
 দেখিয়ে গেছেন। আমাদের দৈনন্দিন
 অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

পুঁজিবাদী সমাজে তন্ত্র ও পরম্পরা-
 হরণকে মর্ষাধা দেওয়া হয়। লোক-
 সভার কমিটি অন পাবলিক আওয়ার
 টেকিং এর ঘোষণা প্রতিবেদনে তার
 কয়েকটি স্থান উদাহরণ আছে।
 বিয়লা, গোয়েন্দা, সিংহানিরাধের
 আইন ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ
 থেকেই কালো টাকার জন্ম হয়।
 স্বজাতি ও স্বদেশের শোণিত ধারায়
 এর প্রবৃদ্ধি এবং বিদেশী আত্মগতায়
 পুঁজি বিলাসবাতকতা এর পুষ্টি সাধন
 করে। আমরা এর ভূরি ভূরি উদা-
 হরণ দিতে পারি।

এক কথায় পুঁজিবাদ আর কালো
 টাকা একই জিনিসের দুটি নাম।
 পুঁজিবাদই কালোটাকার জন্ম দেয়,
 আবার কালো টাকাই পুঁজিবাদকে
 ক্ষীণ করে তোলে। একেবারে সহো-

দর সম্পর্ক। মাত্রান্তর স্বাধীন তারা
 লিখাংসু, নোংরা শোষণ প্রবৃদ্ধির
 তাড়নায় এরা সমাজ বিরোধী।

সুতরাং পুঁজিবাদীরা কোনদিন
 কালো টাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
 করতে পারে না। ওয়াশিংটন কমিটির
 রাগ চেপে যাবার অন্যতম কারণই
 এটা। ওয়াশিংটন কমিটি বলেছেন
 ১৯৭২ সালে দেশে অন্ততঃ সাত
 হাজার কোটি কালো টাকা আছে।
 কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ইকনমিক
 টাইমস পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক
 এবং বর্তমানে বিজনেস ট্যাগার্ড
 পত্রিকার সম্পাদক ডঃ ডি,এস, ব্রাঙ্ক-
 নেকর তার স্বতন্ত্র রিপোর্টে কালো-
 টাকার পরিমাণ চৌদ হাজার কোটি
 টাকা বলে বিভিন্ন স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ
 করে সুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এই কালো টাকার জন্ম হয়েছে
 অতি লোভের পঞ্চমযায়। লোভ
 ও দ্বন্দ্ব প্রবৃদ্ধির জারজ সন্তান
 কালো টাকা ক্রমাগত বাড়ছে আর
 সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও
 সংস্কৃতিকে ক্রমাগত আবর্জনা রূপে
 টেনে নামাচ্ছে। এমন কি যারা
 একদা এই সমস্ত নীতিহীন সমাজ
 বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশ-
 শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বৈপ্লবিক ভূমিকা কি নিঃশেষিত ?

কালিদাস কুণ্ডু

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে নাকি এক বিশ্বকর নবজাগরণ ঘটেছিল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ এখনও মনে করেন যে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রায়মোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই তথাকথিত নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল। জাগরণ একটা ঘটেছিল বই কি। সেটা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নয়, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে। দীনবন্ধু মিত্র বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য যিনি অত্যাচারিত কৃষক সমাজের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। তিনিই প্রথম প্রগতিশীল বাঙালী বুদ্ধিজীবী বার লেখনী ভলটেরায়ের মতো নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সূত্রিকা সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের সমসাময়িক আরও একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর নাম স্মরণীয়—তিনি হচ্ছেন হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী। 'হিন্দু পেট্রিয়ার' সম্পাদক এই নির্ভীক বাঙালী বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ করেননি, তিনি ১৮৫৭ সালের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহকেও সমর্থন করেছিলেন, সমুচ্চ ধিকার জানিয়েছিলেন ইংরেজদের চরম নৃশংসতাকে। জন ক্রস নটন তাঁর 'দি রিবেলিয়ান ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এই নির্ভীক চেতা বুদ্ধিজীবীর স্মরণীয় প্রশংসা করেছেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালে চরমোচ্চ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচালনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ার' তেজোদৃষ্টি, বলিষ্ঠ ভূমিকাটি অক্ষুণ্ণ থাকেনি।

হরিশ্চন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আরও একটি কারণে। ভবানীপুরের বাবু সম্প্রদায় সভা আহ্বান করে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে নিষেধ করে ইংরেজদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। হরিশ্চন্দ্র সেই সভায় উপস্থিত ছিলেননা। তিনি সভার নিন্দা করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শিশিরকুমার এবং রামগোপাল বোস নবীয়া, বশোহর, পাবনা, মালদহ ও রাজশাহী জেলার বিজ্ঞানী অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের অমাহুষিক অত্যাচারের কাহিনী অগ্রিকরা ভাষায় জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নীলকর চাষীদের সজবদ্ধ অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে শিক্ষিত বাঙালীদের একাংশের মধ্যে

সংগ্রামশীল দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছিল। কিন্তু এ ছিল বিশাল অফকারের সমুদ্রে একটি বিচ্যুত তরঙ্গ মাত্র।

১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনে উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের চেতনার জাতির মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায়ের সমস্তার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় মুক্তির প্রাঙ্গণ আলোড়িত হয়নি। এর কারণটি আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের গর্ভেই নিহিত আছে। ব্রিটিশ পূর্ব যুগের দ্বিতীয়াংশ অর্থের পরিবর্তে মোবাইল মানি স্ট্রিট হওয়ার কলে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হল। কলকাতা নগরকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ ও মধ্যমোশাভী এক নতুন নাগরিক শ্রেণী উদ্ভূত হল। ইংরেজের প্রদানপুষ্ট, উচ্চাভিলাষী এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অভিজাত পরিবারগুলিই (যেমন, মল্লিক পরিবার, ঠাকুর পরিবার, সিমলার দে সরকার) আমাদের উনিশ শতকী বিভাবুদ্ধির প্রেরণা কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বিভার জোরে ইংরেজের কুপার্জন আর অর্থের জোরে কু-সম্পত্তির অধিকার অর্জন—এই দুটোই ছিল এদের জীবনের মূলমন্ত্র। এদের গ্রামের সঙ্গে না ছিল নাড়ীর সম্পর্ক, না ছিল গ্রামবাংলার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতাবোধ। রাজকীর বিলাসিতা ও বিদেশী শাসকের খেতাব লাভের স্বপ্নের মধ্যে এরা যখন বিভোর হয়ে আছেন, তখন আমাদের গ্রাম বাংলায় নেমে এসেছে যুদ্ধ, অবক্ষর ও দর্ভনাশের গাঢ়তম অফকার।

ছিন্নান্তরের মস্তুরের কলে বাংলাদেশের গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। রজনীপাশ দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে দেখিয়েছেন গ্রাম বাংলার সেই সর্বনাশের রূপ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে গ্রাম বাংলার নাতিশ্রাস উপস্থিত হয়েছে। আর আমাদের নবজাগরণের পুরোহিতগণ বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণে নিয়োজিত আছেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাত্তেললাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান বাধা বাধা বুদ্ধিজীবীগণ 'ভব-বোধিনী' পত্রিকার পাতার মননশীল সংস্কৃতির সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। তাহলে কি উচ্চবর্ণের ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে দেশপ্রেমের অন্তর ঘটেছিল, না আমাদের বৈদেশিকতার চিন্তার কিছুটা তেজাল

ছিল ?

আসলে নবজাগরণের মূখটা মধ্য-যুগীয় খোলাস চুকিয়ে অধ্যাত্মবাদ থেকে বুদ্ধিবাদী মানবিকতার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তথাকথিত নবজাগরণ লমাজের বস্ত্র ভিত্তিকে নাড়া দেয়নি। ইউরোপের র্যাডিকাল হিউম্যানিজম যেটুকু মানবিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের দেশের উনিশ শতকী বুদ্ধিবৃত্তি তার ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। ইংলণ্ডের কৃষক বিদ্রোহে মধ্যাঙ্গীরা অন্ততঃ পক্ষে ছড়া বেঁধেছিল—

"When Adam delved and Eve span
Who was then, the gentle-
man?"

আমাদের নবজাগরণের স্থপতিগণ ইতিহাসের ফলকে একটা ছড়াও খোদিত করে রাখেননি উত্তরকালের আমাদের জন্ত।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ধীরে ধীরে স্বল্পবিত্ত অথবা বিস্তারিত বিদ্যাশ্রমী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ তথাকথিত নবজাগরণের তরঙ্গ প্রবাহে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারেনি মূলতঃ এই কারণে যে, পুরাতন সমাজের ভাবগত উপকাঠামো (Ideological super structure) নির্মিত হয়েছিল যে সব পূর্বসূরীদের দ্বারা তাদের চেতনায় সমগ্র দেশের উপস্থিতি ছিল নৈরাশ্রজনকভাবে অহুজ্জল। তাই আমাদের বৈদেশিকতা পর্ববসিত হয় নবোপস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধিকার সংগ্রামে, যে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে চলেছে অধ্যাবধি।

তাহলে আমাদের অতীত কি ধূসর পাণ্ডুলিপি ? ১৯১৮-২২ সালের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মাহুদের অভ্যুত্থান, ভারতবর্ষে এক বৈপ্লবিক ঝড় সৃষ্টি করেছিল। এই সময় থেকেই বাংলাদেশের তথ্য ভারতবর্ষের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের মধ্যে মার্কসবাদের অহুশীল শুরু হয়। রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের ইতিহাস এদের মধ্যে কিছুটা লম্বা বিপ্লবমুখী চেতনা জাগ্রত করে। মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা-বোধ সঞ্চারিত হতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিষ্ট মণ্ডলীর অভ্যুদয় ঘটে। ১৯২০ সালে কবি নজরুল ইসলাম ও মুজাফফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় দাদ্য পত্রিকা 'নবযুগ'

প্রকাশিত হয়।

তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান সংগঠক। তাই কৃষক-শ্রমিকদের লংবাধ পত্রিকাটিতে স্থান পেলেও পত্রিকাটির শ্রেণী চরিত্র সহজেই অহুসের।

অব্যবহিত পরে আরও একটি কাগজ প্রকাশিত হয় মুজাফফর আহমদের সম্পাদনায়। পত্রিকাটির নাম 'গণবাণী' ('লাডল' পত্রিকার পরিবর্তিত নাম)। নাম পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করে আহমদ লাহেব বলেছেন—“কারণ, লাডল শুধু কৃষকের প্রতীক। কাগজখানা কিন্তু আললে ছিল মেহনতী জনগণের মুখপত্র।”

ইতিমধ্যে, ১৯২০ সালে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের 'ঔপনিবেশিক তত্ত্ব' গৃহীত ও প্রচারিত হয়। আন্দলের বিষয়, উক্ত ঔপনিবেশিক থিসিসে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ভূমি সমস্যাকে জাতীয় মুক্তির প্রধান বিষয়বস্তুরূপে তুলে ধরা হলেও আমাদের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীগণ এই বিষয়ে লম্বাক উপলব্ধি বা চেতনার পরিচয় দেননি।

অনেকেই পূর্বের সঙ্গে বলে থাকেন যে, কমিউনিষ্টরাই প্রথম ভারতের পূর্ব স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। স্বাধীনতা একটা প্রস্তাব হতে পারেনা—সে আংশিকই হোক বা পূর্ণই হোক। স্বাধীনতা হচ্ছে একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। তাছাড়া, ভারতের মতো দেশে ভূমি-প্রশ্নের সমাধান ছাড়া 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ব্যাপারটা অর্থহীন নয় কি ?

এইরূপ অর্থহীন প্রস্তাব ও অজস্র উপদলীয় কোন্ডলে দিন কেটে গেছে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের। তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক লংগ্রামগুলি পরিচালিত হতে দেননি মার্কসবাদের তত্ত্বের ভিত্তিতে। তেলেকানার কৃষক বিদ্রোহ পর্যন্ত এই হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিংশের দশক থেকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ মার্কসবাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার উদ্ভূত হতে থাকেন। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এই উদ্বোধনের দ্বারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য দাবী রাখে। ক্যানীবাধ বিরোধী লেখক লং ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি হয়। চল্লিশের দশ—আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনে প্রতি সহায়ত্বদ্বিতীয়া হয়ে ওঠে। স্বকান্ত ভট্টাচার্য, স্বভাব মুখোপাধ্যায় ময়র সেন, রবীন্দ্র গুপ্ত (ছদ্মনাম হীরেন মুখোপাধ্যায়, লরোজ দ ময়রেশ বসু, ননী ভৌমিক, সুলে সাভাল, অরুণাচল বসু, গোলা কুন্স, গোপাল হালদার, অধ্যাপ নীরেন রায়, বিজন ভট্টাচার্য মাসিক বন্দোপাধ্যায়, ঋষিক ঘট প্রমুখ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের লেখা কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির প্রাঙ্গণ বলি। তবে প্রকাশিত হতে থাকে।

দুঃখের বিষয়, কমিউনিষ্ট পার্টি দলিত নেতৃত্বের অভাবে আমাদে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়। পার্টির আভ্যন্তরী উপদলীয় কোন্ডল গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যেও বিভ্রান্তি ও ভাঙন সৃষ্টি করে। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রভাবিত প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনও স্থিতিত হয়ে আসে কাকবীপ-তেলেকানার মস্ত কৃষক-অভ্যুত্থানের শোচনীয় ব্যর্থতা—পরেই মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহচে যে হতাশার অফকার নেমে আসে—সেই হতাশা ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ীর কৃষক-অভ্যুত্থানের দমর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে লমগ্রস্তাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। ১৯৬৭ সালের বসন্তকালে পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে চল্লিশ হাজার কৃষকের অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের বিরোধী অংশ। নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থান সমগ্র ভারতীয় রাজনীতিতে অসুতপূর্ব চাকল্য সৃষ্টি করেছিল। তেলেকানাকাকবীপের কৃষক বিদ্রোহ ছাড়া নকশালবাড়ীর ঘটনার মতো এত বড় চাকল্যকর ঘটনা আর ঘটেনি। বস্তুতঃপক্ষে নকশালবাড়ীর অভ্যুত্থানই ভারতীয় রাজনীতিতে দশদ সংগ্রামের প্রাঙ্গণকে আলোড়িত করে তোলে।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ? একথা ঠিক যে, প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নকশালবাড়ীর কৃষক-সংগ্রাম তেমন একটা দাঁড়া জাগাতে পারেনি। সি পি আই, সি পি এম প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী মহল এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে অস্বজ্ঞাতিক প্রতিক্রিয়ার বড়দ্রা আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন। প্রবীণ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দ্বারা সাহিত্যিকতার শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

কালোবাজার ও আইন

রবি গুহরায়

ব্ল্যাক মার্কেট বা কালোবাজার আমাদের দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত একটা অত্যাবশ্যক সংস্কার পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে মনে হচ্ছে আর কালোবাজারের অবসান ঘটানো যাবে না এবং এর ফলে আমাদের মানসিকতায় একটা কালো প্রভাবের পরিব্যাপ্তি ঘটেছে এবং আমরা এক কালো জাতিতে পরিণত হতে চলেছি। মন আমাদের বিষম কালো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের বাচ্চা ছেলেরাও কালোবাজারের ঠিকানা জানে এবং কালোবাজারে বেচাকেনা করে।

উচিত দামে কোন অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিস বাজারে না পেলে আমরা অসিতে গলিতে হতে হয়ে ঘুরে বেড়ানো জিনিস সংগ্রহ করি। কেবল সংগ্রহ করি বললে ঠিক বলা হবে না, কারণ সে এমনই জিনিস যে না পেলে চলবে না, সংসার অচল হবে, বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা উপোষ করবে। এই একটা বিষয়ে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসহ্য, তাকে রোজ ছবেলা রান্না করতে হবে, ছেলেমেয়েদের দুটো খেতে দিতে হবে এবং নিজেদের খেতে হবে। দৈনন্দিন এই রান্না খাওয়ার কার্যসূচীর কোন প্রকার নড়চড় হবার জো নেই। অল্পবিস্তর লোকেরাই দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই তাদের পক্ষে চাল, ডাল, তেল, হুন ইত্যাদি অনেকটা করে কিনে রাখা সম্ভব হয় না, তাদের প্রায় রোজই কিনতে হয়। এই সব রোজ-কিনে-খাওয়া লোকেরা যদি বাজারে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস না পায় তখন তারা এক সপ্তকের সম্মুখীন হয় এবং বিশেষাঙ্গী হয়ে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে বাধ্য হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে কালোবাজারের বিবাক্ত ক্রিয়াকলাপ এইসব রোজ-কিনে-খাওয়া-লোকদের দুঃখ দুর্দশার কারণ। অপরদিকে বিলাসিতার সামগ্রী যেমন দামী কাপড়, সিগারেট, রেডিও, কনস্ট্রাক্শন ইত্যাদি নিয়ে যে কালোবাজার চলছে সেটা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের দৈনন্দিন জীবনকে কোন প্রকারেই প্রভাবিত করে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। মহাযুদ্ধের সময়ে যে কালোবাজারের সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন ভারতেও সেই বাজার প্রাণাংশা প্রাণাংশ বিস্তার করে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের যে উর্ধ্বগতির সূচনা হয়েছিল সেটা এখনও পর্যন্ত থামানো যায় নি অথবা থামানো হয় নি। স্বাধীনতার ৩০ বৎসরের মধ্যে আজ পর্যন্ত যতগুলি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন সরকার

কারই কালোবাজার অবসানের কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। জহরলাল নেহেরু একবার মাত্র বলেছিলেন “কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসি দিতে হবে”। বাস ওই পর্যন্ত। তারপরে কোন কোন নেতা কালোবাজার নামে একপ্রকার অসৎ ব্যবসার চলছে ইত্যাদি অনেক কথা বলেও সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেন নি। ধবরের কাগজে অনেক সময় দেখা যায় বেশী দাম নেওয়ার জন্য কোন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হোল, আবার একবার দেখা গিয়েছিল কয়েকজন ব্যবসায়ীকে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হোল, কিন্তু এই-সব খুচরো সাজার ফলে কালোবাজারের ব্যাপক প্রতাপ বিন্দুমাত্র কমে নি। অপরদিকে ব্যবসায়ীরা সাবধান হয়ে গেছে যাতে তাদের আর টানা-ই্যাচড়া না করা হয় তার জন্য দিয়ে খুয়ে এমনভাবে কারবার করছে যে-টাকে পাকা ব্যবসা বলা যায়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে জানতে হবে সে টার্ম ঠিক মেনে চলে নি সেই জন্য তাকে কিছু শিক্ষা দেবার জন্য ধরা হয়েছে। আমাদের কর্তারা সজাগ আছেন বলে প্রচারটাও হোল।

বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের পাইকারী বাজার যে সব ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে তারা জানে দেশের কোথায় কতটা মাল আছে, কতটা দৈনন্দিন চাহিদা এবং পরবর্তী আমদানীর সময় ও স্থান। মাল চলাচলের সব খুঁটি-নাটি ধরার ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোর থাকার সরকারের পক্ষে মালের দরদাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। সরকার কঠোর হবার উদ্যোগী হলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে মালের আমদানী কমিয়ে দিয়ে এবং এক ওদামের মাল অল্প শুদামে সরিয়ে ফেলে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে রোজ কিনে খাওয়া লোকদের রাস্তার দাঁড় করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় আর লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে ওঠে।

দেশে বর্তমানে শাসনকর্তাদের নির্বাচিত হবার যে নিয়ম কাছন চলছে তাতে প্রতিটি পদের প্রার্থীদের নির্বাচনের খরচ খরচা বাবদ বিপুল পরিমাণে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। এই নির্বাচনের সবটা টাকা প্রার্থীদের একক উদ্যোগে অথবা তার সংগঠনের পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে তোলা এবং খরচ

করা সম্ভব হতে পারে না এবং সংগঠনকে অবশ্যই কালোবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাতে হয়। সেই যে নিয়ম আছে যে খার সে গুণ গার এই নিয়মের ফলে কালোবাজারীদের হুন্সরী কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করে জনসাধারণকে বাঁচানো শাসনকর্তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না বা হতে পারে না, পরিণামে কালোবাজার প্রশ্রয় পায়।

আমাদের দেশে কালোবাজারের উৎপত্তি অসুস্থমান করতে হলে আমাদের ফেলে আসা পিছনের বছরগুলোর দিকে তাকাতে হবে যখন দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গরম হাওয়া বইছিল। সৈন্য বিভাগের চাহিদা মেটানোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সৈন্যদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই সব ঠিকাদাররা চলতি বাজার দাম অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিয়ে বাজার থেকে মাল তুলে নিতে পারতো কারণ তাদের টেন্ডার দর অনেক বেশী থাকত। সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনকে অত্যন্ত জরুরী গণ্য করে সরকার যে কোন দামে মাল কেনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই সব মিলিটারী কন্ট্রাক্টরদের বিপুল পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী কেনার ফলে বাজারে মালের ঘাটতি দেখা দিল এবং বাজার দরের স্থিতিশীলতা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নতুন ছাপান নোট বাজার ছেড়ে গেল। টাকা ভাঙিয়ে যে খুচরো পরমাণু পাওয়া যাবে তার উপারই নেই। আজকে আমরা থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলি সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল এবং এখনও থামেনি, বরং বেড়ে চলেছে। স্বাধীন সরকার চালাবার বিপুল খরচ মুদ্রাস্ফীতিকে একটা চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে।

একটা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশ-গুলিতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে, কেবল আমাদের দেশে নয় যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে জড়িত সব দেশেই মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার ইত্যাদি দেখা দেওয়াটা যুদ্ধের স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু সেটা জিইয়ে রাখাটাই অস্বাভাবিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জার্মানীতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল এবং পাশাপাশি কালোবাজারও খাদ্যসামগ্রীর চালাও কারবার

চলছিল। দেশের ভবিষ্যৎ অর্থ-নীতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে জার্মানীর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হের লুডভিগ এরহার্ড একদিন সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে অবাধ বাণিজ্যের অহুমতি ঘোষণা করলেন। নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার দখলদার মিত্র বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যাক্স-ওয়েল টেলর আতঙ্কিত হয়ে টেলিফোন করে হের এরহার্ডকে বললেন “আপনি একি করছেন। নিয়ন্ত্রণ তুলে দিলে দেশ যে জাহারামে চলে যাবে”। অবশেষে হের এরহার্ড জানালেন “দেশ জাহারামে পৌঁছে গেছে আর নিচে বাবার জায়গা নেই। আমি একটা শকুট্টেমেন্ট করে দেশকে তোলবার চেষ্টা করছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না দেখুন পরিস্থিতি কোন দিকে যায়।” সেদিন নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার আশ্চর্য ফল হয়েছিল, কালোবাজার নিশ্চিহ্ন হয়ে পণ্যের দাম স্বাভাবিক স্তরে নেমে এসেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে কালোবাজার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এ দুইটি পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক; একটিকে ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না।

সেই কবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আবার একটা মহাযুদ্ধের বোধহয় সময় হয়ে এলো আমাদের দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রথা এবং কালোবাজার চিরস্থায়ী ভাবে রয়ে গেছে এবং যত দিন বাচ্ছে ভোগ্যপণ্যের মূল্যমানকে স্থিতিশীল রাখবার চেষ্টার একের পর এক সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

গত যুদ্ধের সময় সামরিক ঠিকাদারদের মাল কেনার দাপটে বেসামরিক লোকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর অভাব দেশের কোন কোন অঞ্চলে দারুণ সঙ্কটের সৃষ্টি করল। এই অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য তৎকালীন ভারত সরকার বেসামরিক সরবরাহ দপ্তর খুললেন, এই দপ্তরের কাজ হল, উদ্ভূত অঞ্চল থেকে মাল কিনে ঘাটতি অঞ্চলগুলোতে সরবরাহ করা। বড় বড় শহরগুলোতে জনসাধারণের মধ্যে রেশন কার্ড বিলি করে নিয়মিত দৈনন্দিন চাল, আটা, তেল, চিনি, ময়দা, স্নজি ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী উচিত দামে বন্টন করার ব্যবস্থা করা হল। ভোগ্যপণ্যের দাম যাতে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকে, হুপ্রাপ্য হওয়ার ফলে যাতে দাম বেড়ে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে না চলে যায়, অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে হুপ্রাপ্যতার স্বৰূপে বেশী বেশী দাম নিয়ে লোকেদের ঠকাতে না পারে এই সব নানান দিক বিচার করে সামরিক সরবরাহ দপ্তর পত্তন করা

হয়েছিল। সরকারী এই ব্যবস্থাকে বলা হল কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা। কিনের নিয়ন্ত্রণ? না দামের উর্ধ্বগতির নিয়ন্ত্রণ। ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিকে তার সূচনাপর্বে আটকাবার জন্য এই প্রথা চালু করা হয়েছিল।

সেই নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে জিইয়ে রাখার ফলে অসামরিক সরবরাহ, খাদ্য কর্পোরেশন, খাদ্য বিভাগ, পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরো দোকানদার, কর্ডিং পুলিশ ইত্যাদি সবকিছু দপ্তরের এক খিরাট রাবণের গুপ্তিকে খুঁতে হচ্ছে খাদ্য সামগ্রীর দরদামের উপর দিয়ে, যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠছে। সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে আজ চিনি ৬ টাকা হয়ে কিনতে হয়েছে, কাল কত চাইবে কে জানে, আজ পেয়েছি কাল পাব কিনা তাই বা কে জানে। শুধু চিনি নয়, জীবন ধারণের প্রত্যেকটা জিনিস পাওয়া সম্বন্ধে একটা চরম অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী রেশন দোকানের চাল খাবার অযোগ্য, সিদ্ধ হয় না, বুলেটের মত কঠিন হয়ে থাকে, খেলে পেটে বোমার স্প্রিটারের মত কাজ করে। দোকানদারকে বললে বলে, নিতে হয় নাও, নয়ত ছেড়ে দাও। এদিকে ছাড়াও সম্ভব নয়, দুসপ্তাহ না মিলে কার্ড বাতিল হয়ে যাবে স্পষ্ট লেখা আছে। কার্ড বাতিল হয়ে গেলে একপ্রকার পরিচয় পত্রটাই লোপ পেয়ে যায়। কখন কি হয় বলা তো যায় না, কার্ড বাতিলে চালটা নিতে হয়। ও চাল সেদ্ধ করে খাওয়া যায় না, তবে লোহার কড়াইতে ভেজে নিলে চাল ভাজার টিফিন করা চলে, আর ফুটপাথ থেকে ভাল চাল কিনে ভাত রান্না করতে হয়। খিঁকার দিতে হয় সেই শহরের জনতাকে যাদের ফুটপাথ থেকে ভিখারীদের মত চাল কিনে রান্না করতে হয়। খিঁকার দিতে হয় সেই দেশের নেতাদের যারা দোকান থেকে ভাল চাল কেনার ব্যবস্থা করতে পারেন না।

জহরলাল নেহেরুর সময়ে খাদ্য-মন্ত্রী রফি আহম্মদ কিদওয়াই কন্ট্রোল তুলে দিয়ে অসামরিক সরবরাহ দপ্তর টাই বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাজার তৎকালীন মুবাম্বী প্রফুল্লবাবুর বাধা দেওয়ার ফলে সেটা সম্ভব হয়নি, প্রফুল্লবাবু রেশন ব্যবস্থা তুলে দিতে রাজী হননি। এবারের ব্যাপারটা দেখুন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সুরজিৎ সিং বলেছিলেন কর্ডিং তুলে নিন খোলা বাজারে চাল বিক্রি করতে দিন, অভাব হবেনা। স্বাধীন-শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

অজুন দাস

১৯৩০ সাল বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য। এই বছর চাটগাঁও কয়েকজন দামাল ছেলে ইংরেজের বিরুদ্ধে দশজনের বিরুদ্ধে যোষণা করেছিলেন এবং ইংরেজের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামকে কয়েকদিনের জন্য একটি স্বাধীন অঞ্চলে পরিণত করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ১লা জুলাইর রাতে নদীর তীরে পণ্ডিত জগদীশলাল নেহরু ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। তার উচ্চারণ করেছিলেন তাই বাস্তবে রূপ লাভ করার চূর্বীর বাসনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের চট্টগ্রাম শহর দখলের মাধ্যমে। মাষ্টারদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনের প্রচণ্ডতা সমগ্র ভারতবাসী বিস্ময় লাভ করেছিল।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার তখন তরুণ। তাঁর পাঠ্যাবস্থায় এই বিপ্লব সূচিত হয়—যা তাঁকে প্রচুর প্রভাবিত করে। তার ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদার এই বিপ্লবের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন—যিনি এই মহাসংগ্রামে আত্মত্যাগ প্রদান করেন। এই তরুণ বিপ্লবীদের কাছ থেকে অল্প প্রেরণা লাভ করে তিনি অগ্রিমের দীক্ষা গ্রহণ করেন—যা তাঁর পরবর্তীকালের রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কালক্রমে বিপ্লবীরা নিজের কর্মসম্বার প্রতি উপলব্ধি করে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারও এই দলের একজন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

পূর্ণেন্দু দস্তিদারের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় দেশ বিতাগের পর থেকে। রাজনীতিতে তিনিও অনেকের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সরকারের জেল ও জুলুমের প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হন। অবশ্য পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কারাবাসের অভিজ্ঞতা ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন কারাবাসের ভোগ করার পর তিনি মুক্তিলাভ করলেও অচিরেই তাঁকে পাকিস্তান সরকার কারাবদ্ধ করে। তিনি কারাগারে থাকা-কালীন সময়ে বহু রাজনৈতিক উত্থান পতন হয়। এর সূচনা হয় ১৯৪৪

সালের নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচনের সময় তিনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, কারাগারে থেকেই তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে সেদিন চট্টগ্রাম শহরে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো তা আজো মনে পড়েনি। পূর্ণেন্দু দস্তিদার কারাগারে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাই বলে তাঁর পক্ষে প্রচারণা তো বহু হতে পারে না। তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সেদিন যদিও প্রধানতঃ কম্যুনিষ্টদের উত্তোকেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী জোট গঠিত হয়েছিলো, তবু এই কম্যুনিষ্টরাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে সেই নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু থাকার কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অনেক আসনে জয়লাভ করেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের নির্বাচনী প্রচারণার কাজ কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতেই জড় ছিলো। তারা অবশেষে শ্রীদস্তিদারের শিশু পুত্রকে প্রচারণার কাজে নামিয়ে দেন। পুত্র তার পিতার হয়ে জনসাধারণের কাছে ভোট প্রার্থনা করে। এই প্রচারণার তাঁর ছেলের অংশগ্রহণ মূলতঃ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই নামান্তর ছিলো। জনসাধারণ সেই অভিযানে সাড়া প্রদান করেছিলেন এবং শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়েছিলেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি কারাবদ্ধ হন।

১৯৪৪ সালের নির্বাচনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হকের কিছু বক্তব্য এবং সরকারী প্ররোচনার অপ্রতীত বাঙালী অবাঙালী দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বেশে ১৯২ (ক) ধারা জারি হয়। এর পরই ১৯৪৭ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে বেশ সামরিক আইন জারি করা হয়। আবাতো শ্রীদস্তিদার কারাবদ্ধ হন। এবারও তিনি দীর্ঘদিন বাবং কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৬১ সালের জাতীয় গণভাষানের সময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম শহর শত্রু কবলিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানেই কাজ করেছেন। শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

বাঙালী বুদ্ধিজীবী

৩ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে কৃষকের ভারসমত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রমোদ সেনগুপ্ত, প্রখ্যাত কবি সাংবাদিক লমর সেন, অধ্যক্ষ অমির-ভূষণ চক্রবর্তী, উপল দত্ত, কবি সাংবাদিক দেওয়ান দত্ত, প্রভাত গোস্বামী, হুমীতলা রায়চৌধুরী, অমিত সেন, সুপ্রকাশ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে সমর্থন প্রত্যাখ্যান করেছেন বা সমালোচনাপূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

নকশালবাজীর বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ কৃষক সংগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মরাগাড়ে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই জোয়ারে একদিকে যেমন হাজার হাজার তরুণের রক্ত ঝালা হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বজনশীল সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার রক্ত ছয়ার খুলে গিয়েছিল।

কৃষকদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উৎসাহিত বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে। এই সব পত্রিকার মধ্যে 'কালপুরুষ', 'আবাহ', 'পূর্বদেশ', 'দক্ষিণ দেশ', 'পূর্বের হাওয়া', 'কৃষ্ণপাথর', 'কথা ও কলম', 'ঘটনা প্রবাহ'-এর নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ থেকে 'অনীক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। এই সব পত্রিকার মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ক প্রবন্ধ, কৃষক সংগ্রাম বিষয়ক সংবাদ ও স্বজনশীল রচনা গল্প নাটক কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। এই প্রসঙ্গে কবি-সাংবাদিক লমর সেন সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'কৃষ্ণপাথর' পত্রিকাটির নামও কর্তব্য।

নকশালবাজীর কৃষক সংগ্রামের অল্পপ্রেরণায় বাংলাদেশে নতুন করে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৬৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে কলকাতা ও মফঃস্বর শহর-গুলিতে বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। তাদের উদ্ভোগ ও পরিচালনার 'হিমালয় থেকে ভারী', 'লাল লুণ্ঠন', 'কমরেড', 'রপক্কেজে আঁচি' ইত্যাদি নাটকগুলি মার্ঠে-ময়দানে অভিনীত হতে থাকে। চারণ হল, পূর্বাভাস, থিয়েটার গ্রুপ, শিল্পী ফৌজ অগ্নিভাতক ও বাটানগর থিয়েটার ইত্যাদি ছোট ছোট নাট্য সংস্থাকল্পিত স্রষ্টা খুবই অংশগ্ৰহণী। অমল রায় ও মনোজেন বিশ্বাসের মতো সাহসী নাট্যকার নকশাল-

বাজীর কৃষক সংগ্রামেরই প্রত্যক্ষ ফল। এদের নাট্যপ্রদর্শনের মধ্যে শহরে মধ্যবিত্তস্বলভ ভাবুকতা থাকলেও কৃষকদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আন্তরিকতার অভাব নেই। এই ভাবে দুই শতাব্দীব্যাপী অনড় অচল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নকশালবাজীর কৃষক অভ্যর্থান আমাদের মতাদর্শগত অচল-য়তনকে চূর্ণ পর্যায়ের আঘাত করেছে। এর ফলাফল ভারতীয় ইতিহাসে অদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

১৮৬০ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সংক্ষেপে এই হচ্ছে আমাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের প্রায় নিশ্চেষ্ট ভূমিকা। শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সহস্র পশ্চাৎসদন থাকা সত্ত্বেও তাদের এক অতি ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে যে চেতনার উদ্ভাস দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময়ে ফুলিদের মত, তার পরিপূর্ণ ইতিহাস লেখার দায়িত্ব রইলো ভাবীকালের অল্পসঙ্খ্যসংখ্যের উপর। আমার শুধু একটা কথা নিবেদন করার আছে। ভারতবর্ষের প্রতিকূল কৃষক

কালোবাজার ও আইন

১ম পৃষ্ঠার পর

বাবু রাজী হলেন না, বললেন মজুতদাররা সবচালা কিনে নিয়ে চোরাকারবার চালাবে। আমরা বলব স্বধীনবাবু এ অসম্মান সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক এবং কর্তৃনিং চালু রেখে চালের কালোবাজারকে চালু রাখা এক অবৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। স্বভাবতই এর উঠবে তাহলে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তটা আমাদের মতে কি হওয়া উচিত। আমরা বলব কর্তৃনিং থাকবে, কিন্তু সেটা উঠে দিকে কাজ করবে 'চাল, ডাল না নিয়ে দুর্গপাল্লার কোন যাত্রীকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না'।

কালোবাজার হচ্ছে সমাজের একটা ভয়ঙ্কর ব্যাধি। কালক্রমে গোটা সমাজ কালোবাজারীতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই কালোবাজারী ব্যবস্থা বা মাহুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অতিদামে মাল বিক্রির প্রবণতা সমাজের মাহুষগুলিকে অমাহুষ করে তুলছে। যে কোন পণ্যের ভাষ্য দাম অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রবণতা ভাষ্য মজুরী অপেক্ষা বেশি টাকার দাবি আজ কেবল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমস্ত জাতির রক্তে সংক্রামিত হতে চলেছে।

এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দেশকে বাঁচাতে হলে অল্প কিছু সংখ্যক লোককে বিনা বিচারে জেলে পুরে রেখে সম্ভব হবে বলে মনে হয়না। তাছাড়া গণতন্ত্রের

আন্দোলনের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীদের অংশ গ্রহণও সমর্থন অনেকটা ধরি মাহ, না দুই পানির মতো। তাদের বিপ্লব চিন্তায় অনেক ঠাঁক ও তেজাল রয়ে গেছে। তাই মাও-সে-তুং এর কথায় উদ্ধৃত করছি—“In the final analysis, the line of demarcation between revolutionary intellectuals and non-revolutionary and counter-revolutionary intellectuals, is whether they are willing to be identified and actually identify themselves with the masses of workers and peasants.”

“If the intellectuals do not identify themselves with the masses of workers and peasants, they will accomplish nothing.”

প্রতিকূল কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টাই হোক ভারতবর্ষের বিপ্লবের দিক নির্দেশনা।

প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বিচার পাওয়ার অধিকার, বিনা বিচারে মাল্য দেওয়ার আইন গণতন্ত্রের অবমান হুচনা করে। চাই ফৌজদারী আইনের ব্যাপক পরিবর্তন ও অপরাধের গুরুত্বের পুনর্মূল্যায়ন। ইংরেজ আমলের নথিবদ্ধ ফৌজদারী আইনগুলি স্বাধীনতার পরে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয়নি বার ফলে বর্তমানে উদ্ধৃত নতুন নতুন অপরাধের মাল্য দেওয়া যাচ্ছে না। আইনে অনেক অপরাধের কঠিন সাজার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণ মাহুষ মাল্যের ত্রুটি নিয়েও অপরাধ করতে পেছপ হয়না সে ক্ষেত্রে বিনা বিচারে আটক আইনে কালোবাজারী বদ্ধ হবে এটা সম্ভব নয়।

কাছেই নির্বাচিত শাসনকর্তাদের আমরা অস্বপ্নেও করব, বিনা বিচারে আটক আইন পাশ করে পাঁচ বছরের জন্য নিজের কর্মতা অঙ্গরোধের চেষ্টা না করে, আইনের বইগুলো খুলে দেখুন, কোথায় কি ক্রটি বিচ্যুতি আছে তার সংশোধন করুন এবং কালোবাজারের মুঠে আঘাত করুন। প্রসঙ্গত জানাই কালোবাজারের নিষ্পত্তি করে আজ পর্যন্ত অল্পসেখা হয়েছে, কিন্তু সে সবই টয়লেট পেপারের মত উপেক্ষিত হয়েছে। কার বা গোলাজ কে বা দেয় ধোঁয়া।

কালো টাকা

৫ম পৃষ্ঠার পর

বাদীকে হাশিয়ার করে দিতেন, তাঁদের অনেকেই এখন কালো টাকার মালিকদের কাছে আত্ম-বিক্রয় করে দিন গুজরান করছেন।

কালো টাকা ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ কালো টাকাও পুঁজি। পুঁজি যদি মুনাফা উত্তল করতে না পারে তাহলে তা আর পুঁজি থাকে না। কালো টাকাও মুনাফা উত্তলে চিলে দেয় না। তবে পুঁজি যেমন প্রকৃত দিবালোকে আইন কাছন মেনে আইন-আদালতের আশ্রয় নিয়ে মুনাফা উত্তল করে, কালো টাকার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কালো টাকা গোপন পথে আনাগোনা করে। লুকানো পথে আইন ফাঁকি দিয়ে

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

৫ম পৃষ্ঠার পর

না। ইন্দিরা কংগ্রেসের বর্তমান আক্রমণ শুধু প্রথম অভিযান। কয়েক দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাজেট অধিবেশন বসবে। ঐক্যবদ্ধ বিরোধী দল প্রতিপদে এই আক্রমণকে ব্যাহত করতে পারে। বিশেষতঃ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে যখন মেহনতী জনগণের উপর তারা তীব্র আক্রমণ শুরু করবে, তখন সংগঠিত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সংস্কার ভিতরে ও বাইরে তার ঘোকাবেলা করার মত যথেষ্ট শক্তি থাকবে। এবং এই ঐক্যের প্রসারতা ও গভীরতা বাড়বে।

শ্রেনী সংগ্রামের এই নতুন পর্যায়ে মেহনতী জনগণের বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে এই নতুন পরিস্থিতির বিপত্তি ও চ্যুতগণের মধ্যে যে অনাগত দিনের মতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তা উপলব্ধি করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। সারা দেশে এমন প্রবল জনমত ও শক্তি গড়ে তুলতে হবে যা ঐক্যবদ্ধ চিরস্থায়ী ভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়। ভারতীয় অর্থনৈতিক সংকট গভীর পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। স্থিতিশীলতার নামে ইন্দিরা কংগ্রেস সবার আগে স্থিতিশীলতাকেই আঘাত করেছে। আর কয়েক দিনের মধ্যে আরো বিপুল সংখ্যক জনগণের মোহমস্তি ঘটবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি জনজীবন থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হবে। তখন তাকে নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হবে না। কিন্তু এর জন্তে কঠোর আত্ম-ত্যাগ ও সংকল্পের প্রয়োজন। বিপদ যতই গভীর হোক, পরিস্থিতি যতই জটিল হোক, জনগণের বিজয়সম্ভাবনা আজ অনেক উজ্জল।

সমাজ বিরোধী কাজ চালান যা অন্ধকারে গৃহস্থ ঘরে তরুণবৃদ্ধির সামিল। কোন দেশের সরকার, আইন অথবা সামাজিক নীতিবোধের সে পরোয়া করে না।

যেমন সরকারী আন্তর্জাতিক আইনে সোনার দাম বাঁধা হলো আউল প্রতি তেতাল্লিশ ডলার। কালো টাকার মজুতদারেরা এই দর ১০০ থেকে ৮৫০ ডলারে তুলে দিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, মার্কিন সরকার সবাই নিজের মজুত ভাণ্ডার থেকে সোনা বাজারে ছেড়ে দিল। আশা ছিল এত সোনার যোগান দিলে দাম অবশ্যই কমবে। আর্থ-রিকা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল চার বছর ধরে ক্রমাগত সোনা বিক্রী করেও কালো টাকার কারবারীদের খাঁই মেটাতে পারে নি। কারণ সোনা নিয়ে তারা যে কাটকাবাজি করছে তার জন্তে তাদের হাতে অনেক হিসেব-বহিষ্ঠুত কালো টাকা মজুত রয়েছে। আমাদের সাধারণ গৃহস্থের কতদূর নানা শুভ কাজে সোনার ব্যবহার এখন তুলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। অর্থাৎ কালো টাকার কারবারীরা এখন শিল্পখাড়া, ওষুধ, চাল ভাল তেল নিয়েই খুশী নয়, এখন তারা মার্কিনের গহনাপত্র কেড়ে নেবার তালে আছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয় কালো টাকার দাপট এখন পুঁজিবাদী ছিন-রার সব দেশেই অপ্রতিহত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের এক সমীক্ষার বলা হয়েছে ১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ ভাবে রাখা কালো টাকার পরিমাণ ১০০০০ কোটি থেকে ১৩৫০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ভারতীয় টাকার হিসেবে এর আট গুন। ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক-রাজস্ব দপ্তরের মতে দেশের মোট করযোগ্য আয়ের সাড়ে সাত শতাংশ কালো টাকার রূপান্তরিত হয়। পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে বিশেষ বিশেষ পণ্য সেনদেনের ক্ষেত্রে জার্মান ব্যবসায়ীরা চেক বা ব্যাংকের সাহায্য নেয় না, তারা নগদে সেনদেন করে। তার ফলে জাতীয় আয়ের মোটা অংশ থেকে ট্যাক্স আদায় করা দূর থাক, তার পরিমাণই জানা যায় না।

এই অসামাজিক পুঁজির কার্য-কলাপ বন্ধ করা পুঁজিবাদী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এই কালো পুঁজির দরুণ দেশে যে পান্টা অর্থনীতি গড়ে ওঠে তার ফলে বাজেট, মুদ্রা-নীতি, শুদ্ধ ব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে সরকারী-স্তরে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং পুঁজিবাদী সরকারের পক্ষে উত্তর-

সংকট দেখা দেয়। এর একটা সাময়িক সামঞ্জস্য বিধানের জন্তে পুঁজিবাদী সরকার কালো টাকার পরিমাণগত ও গুণগত প্রভাবকে গোপন রাখার চেষ্টা করে। তাই ওয়াশিংটন কমিটির প্রতিবেদন চেপে রাখা হয় আর সমস্ত অর্থনৈতিক পাপের গুরুভার মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী ও তিক্তবৃদ্ধির দায় সরল জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে ভাগ্য ও ভগবানের উপর নির্ভর করে চলতে বলা হয়। আশ্চর্যের কথা এখনো আমরা এই পুঁজিবাদ ও মুনাফা লালসাকে সহ্য করছি। তাদের সমর্থকদের ভোটে ভেতাচ্ছি।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

৮ম পৃষ্ঠার পর

অতপর তিনি ভারতের পথে চাটগাঁ ত্যাগ করেন এবং ভারতে আসার পথে পরলোকগমন করেন।

কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারের বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম তথা পূর্ব বাঙলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন কৃষকদের অধিকার লে-তন করার কাজে। এসব লক্ষ্যের সময় কখনো কখনো তাঁকে প্রবল প্রতি-রোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সাধারণতঃ গ্রামের ধর্মাত্ম ব্যক্তিরাই এসব প্রতিরোধের প্রধান হোতা ছিলো। এসময় তাঁকে জীবননাশের হুমকি পর্ব প্রদান করা হয়েছিলো। এর প্রধান কারণ কৃষকদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণেন্দুবাবু সাহিত্য চর্চাও করতেন। সাহিত্য সাধনাকেও তিনি রাজনৈতিক জীবনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতেন। যে কারণে তিনি চট্টগ্রামের মরমী ও সংগ্রামী কবি রমেশ শিলের জীবনী রচনা করেন। 'বীর-বানু রমেশ শিল' (১৯৬৩) গ্রন্থটিকে তিনি কবির সংগ্রামী জীবনের চিত্র কৃষ্টিয়ে তুলেছেন। তাঁর লব্ধপ্রাপ্ত সাহিত্য কর্ম 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' (১৯৬৭)। এই গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি বাঙলা একাডেমীর অর্থায়ন প্রকাশিত হয়। তার আরেকটি গ্রন্থ হলো ১৯৩০-এর পাহাড়তলী অভিযানের নারিকী প্রীতিভক্তা ওয়াদেদারের কর্ম ও জীবন 'বীরকল্পা প্রীতিভক্তা'। এ ছাড়া তিনি শেখত ও মোশাসার গল্প ও অল্পবাদ করেছেন। এসব গল্প বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হরিজন খুন

৩ম পৃষ্ঠার পর

হতে থাকে যে, পুলিশের সঙ্গে মুখো-মুখি সংঘর্ষে এইসব যুবক নিহত হয়েছে। বাঙ্গা জেলার আরক্ষা-ধ্যক্ষের বিবৃতি অস্বাভাবিক এই জাতীয় সংঘর্ষে ৭৮-৭৯ সালে ১৯ হরিজন নিহত হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। যদিও পুলিশ এইসব এনকাউন্টারে ফৌজীকে (সদাশিব) গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারে নি। ঘটনাতো সাদ্বানো। তাই ফৌজী অর্থাৎ সদাশিবকে পাবার প্রশ্ন ওঠে না।

সদাশিব ওরফে ফৌজী তার দলবল নিয়ে ১৯৭৯ সালের ২২শে জুন আত্মপ্রকাশ করল বাবেক শহরে। তখন সদাশিবের দাখার খুন্সী ছত্রপাল সিং হোটেলের বসে মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত। ফৌজী দলের লক্ষ্য রাখা নিয়ে হোটেলের প্রবেশ করে। ছত্রপাল এবং তার আত্মীয়কে লক্ষ্য করে সদাশিব গুলি চালায়। হুজুনেই ঘটনাস্থলে নিহত হয়। সদাশিব এবং তার দলবল মৃত-দেহ দুটিকে শহরের প্রধান মোড়ে টেনে নিয়ে আসে। সেখান থেকে বাবেক থানার দূরত্ব মাত্র কয়েক গজ। প্রকৃত দিবালোকে ছত্রপাল সিংয়ের মৃতদেহের বুকে পা রেখে সদাশিব এলাকার জমিদার ও কুলাকদের সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, হরিজনদের উপর অত্যাচার হলে তাদের হাল ও ছত্রপালের মতই হবে। পুলিশকে উদ্বেগ করে সদাশিব বলে যে, গুলি চালালে সকলকেই হত্যা করব। পুলিশ, জমিদার ও কুলাকশ্রেণীর কেউই ফৌজী দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে সাহস দেখায়নি। সদাশিব ও তার দলবল এরপর শহর ছেড়ে চলে যায়। এলাকার শোষণ লক্ষ্যবাহকে খোলা চ্যালেঞ্জ করে সদাশিব চলে যায়, কিন্তু তার দিকে আকুল তুলে কিছু বলার সাহস কারো হয়নি।

ছত্রপাল সিং খুন হবার কিছুদিন পরেই বারেক তহশীলের জারী গ্রামে দুই ব্রাহ্মণ যুবক খুন হয়। এরা ছিল সহোদর ভাই। নিহত এক ভাইয়ের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহ-মরণের পথ বেছে নেন। পুলিশ বলতে শুরু করে যে, ফৌজী দলই নাকি এই দুই ব্রাহ্মণ যুবককে খুন করেছে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এই দুই ব্রাহ্মণ যুবক নিহত হয়েছে তা থেকে এটা বোঝা যায় যে, এই হত্যার জন্ত সদাশিবের দল মোটেই দায়ী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ সদাশিবকে এই খুনে জড়িত করেছে।

কেবল হরিজনদের ওপর যুগ্মদ অত্যাচার করার জন্ত। জারী গ্রামে ব্রাহ্মণ এবং রাহপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবতই গণ্ডগোল চলছিল। এমনকি এর জের হিসাবে উত্তর পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়ও হয়েছে এবং কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি খুনও হয়েছে। গ্রামের অনেকেই ধারণা যে, দুই ব্রাহ্মণ যুবক খুন হয়েছে রাজপুতদের হাতে। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে যে, সদাশিবের নামে মিথ্যা রটনা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জারী গ্রামের কৃষি প্রশিকরা খুন হবার সময় থেকে বিগত ছয় মাসের মজুরী পাননি। ভারতীয় ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন বিষয়টি প্রথমে আদালতে নিয়ে যায়। তা ছাড়া কৃষি প্রশিকরা কাজও বন্ধ করে দেয়। জমির মালিকরা প্রথমে আদালতে হেরে গিয়ে হাইকোর্টে আপীল করে। সেখানেও তাদের হার হয়। ফলে দীর্ঘ ছয় মাসের বকেয়া বেতন দিতে হয়। যার জন্ত জমির মালিকরা স্বভাবতই হরিজনদের ওপর ক্রুদ্ধ ছিল। এমন সময় খুন হল দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা। জমির মালিকরা দেখল এই সুযোগ। যদি সদাশিবের নামে এই দোষ চাপানো যায় তাহলে হরিজনদের ওপর অত্যাচার করা সহজ হবে। এ কাজে তারা পুলিশের সহতও পেল। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে শ্রীপাল নামে এক হরিজন যুবককে গ্রেপ্তার করল এবং ১৫ জন হরিজন যুবককে বেদম প্রহার করল। এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত হরিজন যুবক শ্রীপাল মজুরী দাবীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, নিহত যুবকদের পিতা সিন্ধু থানায় হরিজনদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি।

সদাশিবকে পুলিশ এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাকে ধরার মাঝে পুলিশ হরিজন মহলার হানা দিচ্ছে। সম্পত্তি লুণ্ঠন করছে। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে হরিজনদের হরণাণ করছে। মহিলাদের স্ত্রীতাহানি করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশ হরিজন মহিলাকে ধর্ষণ করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

সাপ্তাহিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

মানেকার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর যোগসাজসে চিনি নিয়ে ফটকা

নলিনী পাল

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অল্পতম খাতিয় চিনি। এই চিনি নিয়ে ভারত জুড়ে চিনি ব্যবসায়ীদের একাংশ এবং কিছু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী দারুণ কাঁট কা বাজী শুরু করেছে। ওদের এই কাটকাবাজীর দরুন চিনির দাম ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের মাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এককথায় বলা যেতে পারে সারা ভারতে বর্তমানে চিনির এক মহাসঙ্কট শুরু হয়েছে।

প্রতিদিনই চিনির দাম হ্রাস করে বেড়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এমপর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। এমন কি তা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরেও চলে যেতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

জানা গেছে, সারা ভারতে এবার চিনির উৎপাদন কম। গত বছর যে ক্ষেত্রে সারা ভারতে চিনির উৎপাদন হয়েছিল ৫৮-৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন, এবার সে ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য-মাত্রা মাত্র ৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। তদুপরি বসন্তেরও চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে। ফলে, চতুর্দিকে চিনির অভাব হাহাকার। উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে যে চিনি বর্তমানে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, কাটকাবাজীদের দাপটে তা নিয়ে প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি চলছে।

অপরদিকে, বড় ব্যবসায়ীদের একাংশ রেল মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত এক সি আই অর্থাৎ ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কিছু উচ্চতম কর্মকর্তার উপরে নেপথ্যে প্রভাব বিস্তার করে এই সঙ্কটকে আরো তীব্র করে তুলেছে। ব্যবসায়ীরা রেল মন্ত্রণালয়ের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে কৃত্রিম ওয়োগন-সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং এক সি আইয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের ওপরেও প্রভাব খাটিয়ে চিনি কলগুলি থেকে সরকারের প্রাপ্য লেভির-মাল

খালসে নানাকানে বাধার সৃষ্টি করেছে। এফ সি আই পুরানো মজুত মালও ঠিকমত বাজারে পাঠাচ্ছে না।

প্রলম্বত উল্লেখযোগ্য, সরকারের ব্যবস্থা অসুচারী কথা ছিল, ভারতের সুগার মিলগুলিতে যে চিনি উৎপন্ন হবে তার শতকরা ৬৫ ভাগ সেন্ট্রাল হিসেবে সরকার নেবেন এবং এক সি আইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রেশনের বা স্ক্যাফা মূল্যের দোকানে ঐ চিনি সরবরাহ করে তা জনসাধারণের কাছে নিয়ন্ত্রিত দামে বিক্রী করা হবে। অবশিষ্ট চিনি অর্থাৎ উৎপন্ন চিনির শতকরা ৩৫ ভাগ খোলা বাজারে বিক্রী করার ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে-যে, খোলা বাজারের প্রাপ্য চিনি ব্যবসায়ীদের হাতে যদিও এসে যাচ্ছে তথাপি ওয়োগন বা প রি ব হ মের অভাবের অজুহাতে সরকার বা এক সি আইয়ের প্রাপ্য উৎপন্ন চিনির নিঃসৃত অর্থাৎ শতকরা ৬৫ ভাগ চিনি আর বাজারে আসছে না। এর ফলেই চিনির বাজারে এক সঙ্কটের সৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এই সঙ্কট সত্ত্বেও প্রাথমিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর জন্ত দায়ী কেন্দ্রীয় ভ্রমতা সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জনতা সরকারই পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিবাদ অগ্রাধ করে চিনি সম্পূর্ণ বিমিরণ করে রেশন দোকান থেকে চিনি দেওয়া বন্ধ করে দেন। পরবর্তী ধাপে চরণ সিং সরকার যদিও আবার রেশন দোকানের মাধ্যমে চিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তথাপি তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ, চিনি ব্যবসায়ী এবং শিল্প-পতিরা লোকসানের দোহাই দিয়ে সরকার কর্তৃক কম দামে চিনি সংগ্রহের বিরোধিতা করে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আদালত ব্যবসায়ীদের আবেদনের সশঙ্ক

ইমজাশন বা স্বপিত আবেদন দিয়েছেন। এখন কম দামে শতকরা ৬৫ ভাগ উৎপন্ন চিনি সংগ্রহের ব্যাপারটি আদালতের বিচার্যধীন।

অপরদিকে, উৎপন্ন চিনির শতকরা ৩৫ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ কর্তা ও খোলাবাজারের একচেটিয়া মালিক-ব্যবসায়ীরা এরই সুযোগে গরীব জনসাধারণের খাড় তেজে দুহাতে পয়সা মুঠছেন। তাছাড়া, ওরা নিজের টেলিগ্রাফার ও টেলিফোন মাধ্যমে সারা ভারতের ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে প্রায় প্রতি মুহূর্তে সংবাদ আদান-প্রদান করে চিনির ব্যাপক কাটকাবাজী করছে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ই-কংগ্রেসের অভিযোগ

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস কৃষক সেলের পক্ষ থেকে আরোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ১১শে ফেব্রুয়ারী অভিযোগ করে বলা হয় যে, বামফ্রন্ট সরকার নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করছেন আবার নিজেরাই সেই নিয়ন্ত্রণ ভাঙছেন। অভিযোগে বলা হয় যে, যে সব কারাগার পঞ্চায়েতগুলি ইন্দিরা কংগ্রেসের দখলে সেসব কারাগার পঞ্চায়েতের হাতে প্রানোয়নম বিবরক কোন কমতাই দেয়া হচ্ছে না। যেসব পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের দখলে সেখানে সর্বস্বী তারাই।

ইন্দিরা কংগ্রেসের কৃষক সেলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয় তালুকদার বলেন যে তাদের ৫ হাজার কর্মী হয় গৃহছাড়া, না হয় তাদের বিধা মামলায় জড়িত করে এলাকায় চুকতে দেয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছেন।

আগামী ৫ ও ৬ই এপ্রিল বীর-ভূমের নলহাটিতে কৃষক সেলের রাজ্য সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনে হাজির থাকবার জন্ত শ্রীমঙ্গর গান্ধী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

খিত ১৫-২-৮০ তারিখের রাজ্য-ক্যাবিনেটের মিটিং)। অবশ্য এ রাজ্যে বিহারের মত আরক্ষণ বিরোধী হিংসা বা বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। তাই বজতে হয়, সুদূরদর্শী সাবধানতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়েছেন। নারায়ণপুর গ্রামে শেখাবাধি গেছেন; ডি আই জি (গোরখপুর) এবং এস পি-কে (দেওরিয়া) স্থানান্তরিত করেছেন, অমিচ্ছা সঙ্গেও পুলিশ মহলে (এবং প্রশাসনেও) আসতে দিয়েছেন ভয়ের ও বিধাধ্বংস পরিবেশ। বস্তুত জন-প্রশাসনের পদ্ধতি বজায় রাখতে হলে (বুজোয়া-জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে অন্ততঃ) আমলাতন্ত্রের মনোবল সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক অভিযান—নারায়ণপুরের একটি রাজ ঘটনা বা দুর্ঘটনা মঙ্গল করে—তার আপন নীতি স্বাধিক বজায় রাখাকে বানচাল করবে। কেন্দ্রের প্রশাসন থাকবে জবরদস্ত, রাজ্য সরকারের প্রশাসনী কাঠামো খুশিমত চিলে করে দেওয়া চলবে, এমনি ছুখো মান কোনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডীকে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে যে সাংবিধানিক আইনের প্যাচ দেখিয়ে এসেছেন তা উপেক্ষার বস্তু নয়। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী পালী-মেন্ট পাশ করেছে। রাষ্ট্রপতির দ্বারা সর্বোচ্চ কার্যপালিকা রূপে গৃহীত পঞ্চকপ (যেমন কোনো রাজ্যে ইমার্জেন্সীর ৩৫৬ ধারা বলে ঘোষিত শাসন প্রবর্তন) এই সংশোধনী অসু-চারী ভবিষ্যতে ভারতের বিচার করান চলবে। পূর্ব সংবিধানের ধারা বলে রাষ্ট্রপতির জারি করা কোনো ঘোষণাই তা যে হেতুর ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ভারতের তোলা সম্ভব ছিল না। এখন তা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেই, কান্ড থাকেন নি। দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি সকাশে অন্তরটিপুনি দিয়ে এসেছেন কেন্দ্রকে এই মর্মে যে, উঃ প্রঃ সরকার ভুল, রাজ্য বিধানসভা ৩৫৬ ধারা অসুচারী বাতিল করা হলে তা বে-আইনী সিদ্ধ হবে।

ই-কংগ্রেস কর্মীদের কীর্তি

কল্যাণী থানার কাটাগঞ্জ মাঝ-স্থানের তিনজন মেয়ের উপর ভোক্তা পাচটার দময়ে কাঁপিয়ে পড়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের তিন কর্মী। খবরে প্রকাশ, মেয়েরা শিবরাত্রির দিন রাজি আগ-রপের উদ্দেশ্যে গৌহাটপুর বাজারে একটি সাংস্কৃতিক অস্থান দেখতে যায়। তারা যখন বাড়ী কিয়ছিল তখন পথের মধ্যে ওরা মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। তাঁদের আর্ট চিত্রকারে লোকজন ছুটে আসে। পরে যুবকদের ধরা হয় এবং থানার ডায়ারী করা হয়।

এদিকে স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতা সুশীল রায় অভিযোগ করে-ছেন, সি পি এম কর্মীরা আমাদের ছেলেদের বিনা কারণে মেরেছে। গোপন সূত্রে প্রকাশ, উপরিউক্ত তিন কংগ্রেস কর্মীর একজন গত বছরের আগষ্ট মাসে তাঁর তাইয়ের ছেলেকে হত্যা করে মৃতদেহ ভস্ম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্থানীয় লোক এবং পুলিশের তৎপরতার আশামী ধরা পড়ে।

ছুটি অফিস

১ম পৃষ্ঠার পর

শুরু করেছেন। প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কাজী আবদুল গফফর নাহেবকে স্বরত বাবুর পোঞ্জির লোকেরা ঐ জেলার সভাপতি হিদাবে কাজ চালাতে বলেছেন।

তাছাড়া স্বরতবাবু বিরোধী পোঞ্জির কাজর যে কয়টি জেলা কংগ্রেস কমিটি আছে সেগুলিও ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন। সান্তার সাহেবের গোঞ্জিও বলে মেই। স্বরত-বরক পোঞ্জির হাত থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটি নিজের হাতে আনার জন্ত সান্তার সাহেব কমল নাথের ও প্রবণ মুখার্জীর কাছে আরজি পেশ করেছেন। উত্তর পক্ষের কেউ না কেউ প্রায় রোজই দিল্লী যাচ্ছেন অবস্থা নিজের অসুস্থলে আনার জন্ত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

পর্বে প্রকাশন

- ১। উদ্ভিদ জীবন / গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার / ২০০
- ২। কলম / রামচন্দ্র ভট্টাচার্য / ২০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সবুজের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য
বিপ্লবী নার্সারী ও এগ্রিকালচারাল ফার্ম (প্রা) লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ বালী, হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০১৫ ও ৬৪-২৪৪৫
ফার্ম: বৈদ্যবাটী বগলী ৬২-২৪৪০
দিল্লী রোড ও তারকেশ্বর রোডের সংযোগস্থল
ফোন: ৬২-১৩৭৭

রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্তালিনের একান্ত সচিব

বোশেফ স্তালিনের প্রাক্তন সচিব ও সাময়িককালের জুড সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সাধারণ সম্পাদক বরিস বাজানভ দীর্ঘদিন নীরবতা অবলম্বনের পর ক্রমবর্ধমান আধিপত্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ও হুমকির ছেড়ে সোচ্চার হয়েছেন। এতদিন তিনি ফ্রান্সে নির্বাসনে ছিলেন এবং নির্বাসনে থাকাকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে অত্যন্ত দতর্ক নজর রেখে চলছিলেন। আফগানিস্থানে রুশী আগ্রাসনকে তিনি সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্থানকে প্রিং বোট-এ পরিণত করার জন্য উল্লস আক্রমণের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিশ্বের মেহনতী জনগণের পহেলা মথরের শত্রু এবং এর বিরুদ্ধে চীন ও ইয়ো-রোপের উচিত বিশ্ব সর্বহারার জ্বলন্ত শত্রু ক্ষমতালুপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাময়িক মৈত্রী স্থাপন করা। রিঃ বাজানভ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ভয়ঙ্কর বিপদ কথতে যদি কোন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড তৈরী হয়, তবে তিনি হবেন সেই সংগঠনের এক মথর দপ্তর।

ধাওয়াানের ক্ষমতা বেড়েছে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তৎকালীন অতিরিক্ত একান্ত সচিব শ্রীমার কে ধাওয়াানের এক দফা পদোন্নতি হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার পর শ্রীধাওয়ান হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য একান্ত সচিব। আগের তুলনায় এখন তার হাতে ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই আগের মতই তিনি ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছেন। এখন তিনি যা করছেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একান্ত সচিব এবং একান্ত সহকারী নিয়োগ করা। জানা গেছে যে, মন্ত্রীদের পি এ এবং পি-এস নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইলগুলি আগে শ্রীধাওয়ানের কাছে পেশ করা হত এবং তাঁর কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেলে তবেই নিয়োগ কনফার্ম করা হত। এখানে উল্লেখ্য যে, এই সব সরকারী অফিসারদের সম্পর্কে সমস্ত

আর্টক আইন কার্যকর করার বিশেষ সেলে বাম বিরোধী পুলিশ অফিসার নেওয়া হবে

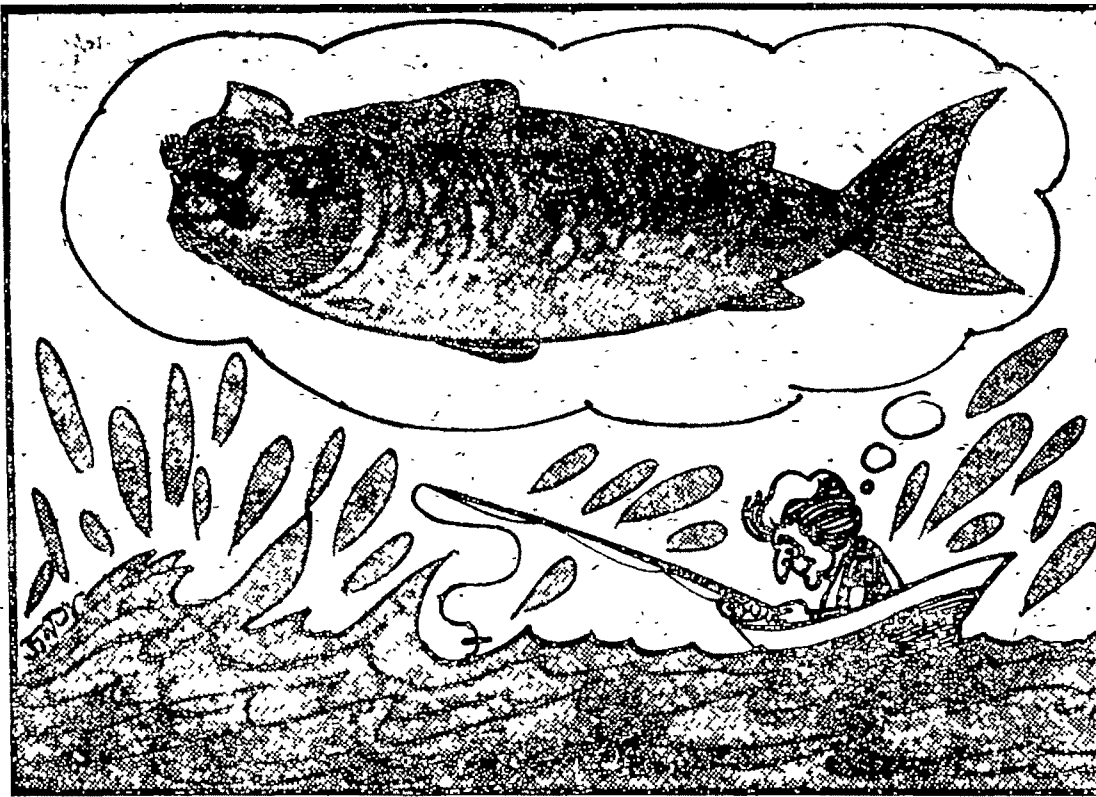
আর্টক আইন কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরাই মন্ত্রক একটি বিশেষ শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মর্মে বিশ্বজুড়ে প্রাপ্ত সংবাদটি ইতিপূর্বে স্বর্ণ প্রকাশ করেছে। গত দশোহে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রব মুখোপাধ্যায় কলকাতায় বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মহা-বেঙ্গল রাজ্য সরকার আর্টক আইন প্রয়োগ সম্পর্কে অসীহা প্রকাশ করেছেন সেই সব রাজ্যের জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার আলাদা ব্যবস্থা হিসাবে একটি পৃথক দপ্তর খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর বেশী প্রণবধা কিছু বলেননি। প্রস্তাবিত এই বিশেষ সেলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার জুড এই রাজ্য থেকে বাছাই কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাদের অতীত ভূমিকা কটর বামপন্থী আন্দোলন বিরোধী। জানা গেছে যে, খুব শীঘ্রই এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরাই মন্ত্রক কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর জুড এই রাজ্যের কিছু পুলিশ অফিসারকে ধার চাইবেন। রাজ্য পুলিশের আই বি এবং গোয়েন্দা শাখা এবং কলকাতা শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার

দপ্তর

ত্রয়বিংশ বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । শুক্রবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ৮০ । ৬০ পয়সা

বহুগুণার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত



প্রাক্তন সি এক ডি নেতা এবং বর্তমানে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হেমবতী নন্দন বহুগুণার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম দফায় উপযুক্ত জায়গা না পাওয়ায় বহুগুণা যে অনন্ত ছিলেন সে খবর আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। বহুগুণা দাবী করেছিলেন মর্যাদা অল্পসারে তাকে অর্ধ দপ্তর দেওয়া হোক। কিন্তু সে দাবী ইন্দিরা গান্ধী এবং সঙ্গর গান্ধী কারুর কাছেই আমল পায়নি। তারপর থেকে বহুগুণা নানাভাবে চেষ্টা করছেন যাতে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি যে মন্ত্রি রাজ্য সরকার ভাঙা হয়েছে তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠার

রুশরা নিজেদের উপদেষ্টাকে খুন করেছে

নয় মহম্মদ তারাকির আমল থেকে কাবুলে অবস্থানরত রুশ কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান ভিক্টর সোভিয়েট প্রশাসনের হাতে নিহত হয়েছেন। রুশরা তাদের নয় উপনিবেশগুলোতে অস্বাভাবিক ও অস্থির এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করার ফলে তাদের পোষ্য রাজনৈতিক পুতুলের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারছেন না এবং এই কারণে এখন তখন একজনকে হত্যা করে অপর জনকে অধিষ্ঠিত করছে। ফলতঃ

হেড সামরিক বাবরাক কারমাল প্রভৃতি সব পুতুলই অনিশ্চয়তার মধ্যে। কারণ সকলেই মনে করছে যে কোন সময়েই শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসতে এবং তাদের জায়গায় অন্য লোক বসানো হতে পারে। এর ফলে রুশী প্রশাসনও খুবই চিন্তিত। সাম্রাজ্যে পুতুল সরকারগুলোকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা ভিক্টরকে মুছায় ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে একটা সাম্রাজ্যে পন্ন তৈরী করেছে। তারা বুটাকে যে, ভিক্টরকে ফ্রেমলিন থেকে এই বলে আদেশ পাঠানো হয়

যে, হাকিজুলা আমিনকে সিংহাসনচ্যুত কর। এবং এই মোতাবেক বাবতীয় পরামর্শ সঙ্গে নিয়ে আমাদের পরবর্তী পরামর্শদাতা মক্কা থেকে কাবুলে পৌছোবার আগেই ভিক্টর ভুলবশতঃ আমিন গোপীকে খুন করেছিলেন। এরপর কৈফিয়ৎ তলব করে তাকে ডেকে পাঠানো হলে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় পৌছে আত্মপ্রাণিত আত্মহত্যা করেন।

তথ্য যাচাই করে তবেই ধাওয়ান সাহেবের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত মিলছে। অর্থাৎ জনতা সরকারের আমলে এই সব আমলাদের ভূমিকা কি রকম ছিল তারই ভিত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে মন্ত্রীদের পি এ এবং পি এস। এখানে উল্লেখ্য যে, জরুরী অবস্থার সব কথ্যাত অফিসাররা হয় নিজেদের পদে ফিরে আসছেন নতুবা তাদের পদোন্নতি ঘটিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিয়োগ করা হচ্ছে। যেমন কথ্যাত পুলিশ অফিসার পি এস ভিন্দার, জগমোহন, নবীন চাওলা ইত্যাদিদের পদোন্নতি ঘটিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় নিয়োগ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বাঘিনী নিরামিষাশী হলেন ?

যথাকালি ন'টা মেম্বারকে ছিঁড়েখুরে খাবার পর বাঘিনী চ্যাড়া পিটিয়ে আনিয়ে দিলেন, তিনি এবার হিংসা ত্যাগ করেছেন, নিরামিষাশী হয়েছেন। কথা-হালার সেই হিংস্র ব্যাঘ্রের ছলচাতুরীর কথা, নতুন শিকার ধরার জন্য মন-ভোলানো আখাসবাক্যের কথা কে ভুলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রায়-বেরিলীতে ঘোষণা করেছেন যে ওই ন'টা অ-কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা—হাড়স্থল মাংসের মতো গেলার পর নতুন কোন রাজ্য গলাধঃকরণে তাঁর বাসনা নেই। অ-কংগ্রেস (ই) রাজ্য বলতে আর বাকি রয়েছে মাত্র তিনটি—পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা। রাজ্য তিনটিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে। কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ পি শর্মা ও আনিয়ে-ছেন-যে, লোকসভার নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য ন'টিতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে হয়েছে। এ-যুক্তি যেহেতু বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যত্রয়ে খাটে না, সেহেতু পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও কেরালার উপর কেন্দ্রের খড়গাঘাত পড়বে না।

এক-একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক এক রকম যুক্তি হাজির করায় এবং অ-কংগ্রেস (ই) হল ও সরকারের প্রতি অহু-স্বত আচরণে শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বাসীর চোখে আর এক-বার বৈরতন্ত্রী ও ভণ্ড প্রতিভাত হয়েছেন। আইন ও শৃঙ্খলার প্রস্নে যদি কোন রাজ্য সরকারকে গদ্যিত করতে হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই তো দরীয়ে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। কেননা কেন্দ্র-শাসিত আসামেই আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাসাতলে গিয়েছে, ব্যাপক খুন-খারাবি, অরিসংযোগ ইত্যাদিই এখানে প্রাত্যহিক ঘটনা, আইনের শাসন, প্রশাসন এ-রাজ্যে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী সে ব্যর্থতার (মৈল সিং-এর প্রস্তাব আন্দোলনকারী ছাত্র-নেতারা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার সে ব্যর্থতা আরো মর হয়ে পড়েছে) দ্বার গ্রহণ করে গদ্যিত্যাগে প্রস্তুত-আছেন কি? দ্বিতীয়তঃ জনমতের প্রতি প্রত্যাখ্যান যদি বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে যেসব কংগ্রেস (ই) এম এল এ লোকসভা নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে ক্ষমতাসীন হারিয়েছেন তারা এম এল এম পদ ত্যাগ করছেন না কেন? বরং পরাস্ত ব্যক্তিদের তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে পূরিত করা হয়েছে। জনমতের প্রতি

প্রকার এই কি কংগ্রেসী (ই) নমুনা? কর্ণাটক, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে পাইকারী দলত্যাগ ঘটিয়ে অ-কংগ্রেস (ই) সরকারকে রাতারাতি কংগ্রেস (ই) সরকারে রূপান্ত-রের স্বপক্ষে জনমত খাচাই করা হয়েছিল কি? তিন, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার কোন, প্রগতিশীল বৈষয়িক নীতিটি পরদা করেছেন অ-কংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকার যার সঙ্গে সহযোগিতা করেননি? বিশ, কর্মসূচি? এ প্রকল্প অহুযারী বেগার প্রমুখের অবসান ঘটানো হয়েছে বলে যে-দাবি করা হয়েছে-তার সঙ্গে সত্যতার কীণতম সম্পর্কও আছে কি?

ওসব ধাপ্তাবাকী ছাড়ান, ব্যাঘ্রমহাশয়, মাংসের প্রতি লোভ আপনি জয় করতে পারেননি, হিংস্র চরিত্র আপনার একটুকুও পালটাননি। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, নিন্দা ও বিচার উচ্চারিত হয়েছে কলকাতার অহুজিত বামফ্রন্ট ও সি পি আইর যৌথ সমাবেশেও। তাদের আশংকা, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী কার্যকলাপের প্রতিবাদ ধনিত না হলে অচিরেই বিপদের বেড়াফাল তাদের, সাধারণ মানুষকে আঠেপুঠে জড়িয়ে আর-একবার ক্রীত দাসে পরিণত করা হবে। মুখে শ্রীমতী গান্ধী, এ পি শর্মা প্রণব মুখার্জী যাই বলে থাকুন, কাজে তাই যে অহুসরণ করবেন—এমন রেকর্ড অস্তিত্বঃ কংগ্রেস (ই) নেতাদের নেই। বরং কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক রাখা, মুখে এক কাজে অস্ত্র করাই তো কংগ্রেস (ই) নেতাদের চারির্জিক বৈশিষ্ট্য। শ্রীমতী গান্ধী আর কোন সরকার না-ভাঙার কথা বলেছেন; কিন্তু শেষ কথা বলার মালিক তিনি না মঙ্গল গান্ধী? পূজ সঙ্করের রাজনৈতিক দুর-দর্শিতা সম্পর্কে প্রশংসাপত্র তো জননী আগেই দাখিল করে রেখেছেন, তারই বুদ্ধিতে চলই নাকি লোকসভায় ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা কংগ্রেসের (ই) পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকারও কি সঙ্করের নিবেশেই ভাঙা হয়নি?

প্রধানমন্ত্রী তো প্রতিশোধ-প্রতিহিংসা গ্রহণের পথ পরিহার করার কথাই বলেছিলেন। তাই শ্রীমতী গান্ধী একরকম আশ্বাস দিলেও বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটানোর মতো সঙ্করচক্র যে আড়ালে ভাসা কাপটীয়ে—তার আওরাজ দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে।

আটক আইন

১ম পৃষ্ঠার পর

পুলিশের গোয়েন্দা এবং এস-বি-বিভাগের কিছু বাছাই করা বামবিরোধী অফিসারকে এই বিশেষ কাজের জন্য চাওয়া হবে। রুগু ওহ নিয়োগী, অশোক ধাসনবীশ, অশীল চক্রবর্তী প্রমুখ কথাত অফিসাররা যদি এই শাখার জন্য মনোনীত হন তাহলেও স্মার্ত্ত্ব হবার কিছু থাকবেন। কেননা এই সব অফিসার অতীতে বাম আন্দোলনকে হমন করার কাজে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন। কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা বুলছে এবং দেউ বা তদন্ত কমিশনে ঘোষী সাব্যস্ত।

এখন দেখার বিষয় হল কেন্দ্রীয়

দ্বারাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের সি বি আই বিশেষ তদন্ত সেলের মাধ্যমে কিভাবে আটক আইনকে কার্যকরী করেন। প্রচলিত আইন অহুসারে জেলা শাসকই আটকাদেশ জারী করতে পারেন। তবে আটক আদেশ দেবার আগে জেলা শাসককে নিশ্চিত হতে হবে যে, যার বিরুদ্ধে আটকাদেশ জারী হবে তিনি একজন মজুতদার, কালোবাজারী অথবা মজুতদার ও কালোবাজারীদের সহায়ক। কেন্দ্রীয় সরকার জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আটক আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে। তাই তারা ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছেন যে, কেন্দ্র যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করার নির্দেশ

দেয় তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা কার্যকর করবেন।

সি বি আই কর্তৃক যে বিশেষ সেল খোলা হচ্ছে সেই সেল যদি জেলা শাসককে দিয়ে আটকাদেশ জারী করতে না পারে তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়ে আটকাদেশ জারী করাবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেলা শাসকরা যদি বিশেষ সেলের কথামত আটক আদেশে স্বাক্ষর করেন সেক্ষেত্রে জেলা শাসকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিতে অপারগ। কেননা আই এ-এস অফিসাররা দলগেই সেক্টাল ক্যাডারের অফিসার। রাজ্য সরকার বড় জোর তাদের বদলী করতে পারেন মাত্র।

কলকাতায় দুই চীনা সাংবাদিকের সম্বন্ধনা

তপন বসু

ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির দক্ষিণ কলকাতা আঞ্চলিক শাখা ও ডাঃ কোটনিস স্থিতি কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক চীনের সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া নিউস এজেন্সীর দুই সাংবাদিক ও ভাষ্যকার হো-চাঙ জিন ও মা গাঙের সম্মানার্থে এক সম্বন্ধনা সভা আয়োজিত হয়। গত ২১শে জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে অহুজিত ইউনিভার্সাল সম্মেলনে যোগদান করার জন্য এই দুই চীনা ভাষ্যকার ভারতবর্ষে আসেন। সম্বন্ধনা সভায় এই দুজনের সঙ্গে দিল্লীস্থ চীনা কূটনৈতিক মিশনের খার্ড সেক্রেটারী ও উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতেই তাঁরা ভারতীয় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে ও তাঁদের মহান সংগ্রামী জনগণ আখ্যা দিয়ে নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি পাঠ করেন।

“প্রিয় ভারতীয় জনগণ,

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় আসার পর থেকেই ভারতীয় বন্ধুরা উচ্চ অভিনন্দনে আমাদের স্বাগত ভরপুর করে তুলেছেন। এখানে আমরা নিজের বাড়ির মত স্বাচ্ছন্দ্য অহুভব করছি। আর এই স্বযোগে আমরাও আমাদের স্বাগতের অহু-কৃতিকে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ করতে চাই। বলা বাহুল্য, এ-দেখে আমরা খুবই উল্লসিত যে ইন্দো-চায়না ফ্রেন্ডশিপ ফেডারেশন ও ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি এদেশে আরো বেশি সংখ্যার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের মিতালীর উচ্ছ্বসে এই মনোরম জমায়েরের আয়োজন করেন।”

নয়াদিল্লীতে অহুজিত ইউনিভার্সাল সম্মেলনের শেষে ওরা এই সংক্ষিপ্ত দলের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। চীন-ভারত সম্পর্কের কার্যকরী অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করাই ওদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। কলকাতায় ওরা ডাঃ বেবেশ মুখার্জী ও ডাঃ বিজয় বসুর সঙ্গে দাফাং করেন, যারা আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় চীনা মুক্তি ফৌজের পক্ষে মেডিকেল টিমের প্রতিনিধি হিসাবে মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমুখদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁরা দাফাং করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ

আলোচনা করেন। এরা কলকাতা একটি স্মারুপাণ্ডচার চর্চিকৎসা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এই সময় কিছু আমাদের দুই দেশের বন্ধুদের ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে।

ভারত ও চীন এই দুই মহা দেশ দুইগুলোর মোট জনসংখ্যার দুই পঞ্চমাংশের অধিকারী এবং দুই হাজারেরও বেশী বছর ধরে এই দুই প্রতিবেশী দেশের স্নাত্ত্ব ও শ্রীতি ঐতিহ্য আছে। অতএব এর থেকে এটা পরিহার যে, ভারত-চীন মৈত্রী বিশ্বশান্তি তথা এশিয়া মহাদেশে পক্ষে কত অপরিহার্য ও স্বাভাবিক পুরাকালে ভারতে অগত চৈনিক পণ্ডিত হিউয়েন-সাঙ সম্পর্কেও চীনের জনগণ ভারতীয়দের কাছ থেকে জানতে খুবই উৎসাহী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা চীনের মাধ্যমিক স্কুলে আবৃত্তিক পাঠ্যসূচী। দুই সাংবাদিক ও ভাষ্যকার এবং চীন কূটনৈতিক মিশনের খার্ড সেক্রেটারী পরিশেষে একথা বলেন যে, “আমাদের পরস্পরের কাছে অনেক কিছুই শেখার আছে।” এবং স্বাগত সহকারে ঘোষণা করেন “আমরা ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে চৈনিকদের জন্য উচ্চ অভিনন্দন বহন করে নিয়ে যাব।”

পরে গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে দুই সাংবাদিক ও খার্ড সেক্রেটারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ একান্তে আলাপ আলোচনার সময় তাঁরা বলেন, “আমাদের দেশে সংবাদ সংস্থা মানে হল, বিশ্ব-সর্বহারী দর্শনকে শক্তিশালী করার জন্য পুঁজিবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিপ্লবকে গড়ে তোলার ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জনমত গঠনের প্রচার মাধ্যম।

নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল

২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার মর্ডার ইণ্ডিয়া প্রেসের কর্মী নরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের জীবনাবসান হয়েছে। এই প্রেসে দীর্ঘকাল দর্পণ ছাপা হয়েছে এবং আত্মসম্মতীয় জরুরী অবস্থায় সময় দর্পণ ছাপার “অপরাধি” লিডার্স রায়ের সরকার প্রেসটি বন্ধ করে দেন যার ফলে প্রেসের সমস্ত কর্মী বেকার হয়ে পড়েন। নরেন্দ্রনাথ দর্পণের একজন অহুরাগী ছিলেন এবং বিভিন্ন ভাবে দর্পণকে সাহায্য করেছেন।

এ ব্যাপারে পৌরসভা প্রশাস্ত
শ্রম মশায়ের এখনি দৃষ্টি হওয়া জন
স্বার্থে দরকার বলে মনে করি ।

আফগানিস্তানের ঘটনা এবং লেখকদের ভূমিকা মিহির আচার্য

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনারা লেখকেরা কী করছেন? জ্ঞান ক পত্রের জ্ঞানকে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি চাইছেন সমাজসচেতন লেখকেরা এর প্রতিবাদ করুন। সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপিয়ে লেখকদের প্রতিবাদ তো ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীরা বিদেশী দূতাবাসে বিক্ষোভ ও সংগঠিত করেছেন। কখনো রাশিয়ান দূতাবাসের সামনে, কখনো মাকিম। কাকুর নিম্নে সোভিয়েত আগ্রা-নগর বিক্ষোভ, কাকুর পাকিস্তানে আমেরিকার যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে। সম্প্রতি সি পি এম নেতা নাহুদরিপা নকশালপছীদের এক হাত নিয়ে বলেছেন, কই, চীন যখন ভিয়েতনাম আক্রমণ করল তখন তাঁরা বোবা হয়ে রইলেন কেন? দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তান নিয়ে নানা মূর্খির নানা মত। বিষয়টা এমন অটল হয়ে যাচ্ছে। লেখকদের বিবৃতির মধ্যে বিষয়টাকে সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কারণ, লক্ষ্য করতে হবে, বিপ্লবের শত্রুতা পূর্বক এই স্বল্পে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এক হাত নিয়ে নিচ্ছেন। প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের কারণে-অকারণে সোভিয়েতবিরোধিতা বরাবরই স্বাধীনতা-এঁরা পরিচিত 'মুক্ত হুনিয়ার' সমর্থক। সমাজ পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এঁরা বিরোধী। বৃহত্তর জনগণের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা জীবন সম্পর্কে এঁদের শিরশীড়া নেই। ফলে বিপ্লবের পরে সোভিয়েতের জয় থেকেই এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এর বিরোধী। ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা যদি সচেতন না থাকি তাহলে এই প্রতিক্রিয়া চক্রেরই শিকার হব। সোভিয়েত নিম্নার ব্যাপারে আমরা ওদেরি 'কোরাস বয়ে' পরিণত হব।

আমাদের সচেতন তরুণদের মধ্যে দেখছি তাঁদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সংবাদ বৃহৎ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করার ব্যাপারে একটা লোভ আছে। পাবলিসিটির লোভ আর কী। এর দ্বারা ধুরন্ধর সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়াচক্র তাঁদের সোভিয়েতবিরোধিতার ব্যাপারটাকেই 'কাজে লাগান। ফলে ওঁরাই আমাদের 'ব্যবহার' করে। এককালে ওঁরা সি, পি, এম-বিরোধিতাকে মধ্য দিতে নকশালপছীদের গভ্যনিখ্যা পাবলিসিটি দিয়ে দুটো পার্টির সংক্যাভার-দের মধ্যে খুনো খুনিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এককালে নকশালপছীদের মধ্যে এইসব কাগজ সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। আজ ও কী সে-দুর্বলতা গেছে?

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্ব প্রথম জনগণের সোভিয়েত গড়ে উঠেছে। অল্পলক্ষ্য থেকে একে পলাটিপে মারবার জন্তে-প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রের অন্ত ছিল না। ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করে সে দেশে প্রথম সমাজতন্ত্রের ভিত স্থাপন হয়েছে। ফলে এই দেশ সম্পর্কে প্রযুক্তিবী জন-সাধারণের মমতার শেষ নেই। চোখের মনির মতো এই মহান দেশকে সে রক্ষা করতে চায়।

প্রতিক্রিয়াচক্র এই পরম সত্যটাকে আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায়। সোভিয়েতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কেই তাঁদের বিরোধিতা নয়, এঁরা সোভিয়েতের অতীত-ভবিষ্যৎ সবকিছুই বিরোধী। এই বিরোধিতা মৌলিক।

কাজেই এখানেই আমাদের অতন্ত্র প্রহরীর মতো সজাগ থাকতে হবে। আমরা যখন আজকের সোভিয়েতের কর্মধারার সমালোচনা করি তখন গোটা সোভিয়েত-ব্যবস্থাকেই নস্যাৎ করে দিইনা, দিতে পারিনা। সবদেশে লজাগ জয়গণই আসল শক্তির উৎস।

সেদিক থেকে মার্কসবাদী চিন্তার বিশ্বাস রাখতে হবে। সোভিয়েত শাসকগোষ্ঠীর কোনো কাজকর্ম যদি মার্কসবাদবিরোধী হয়ে পড়ে তাহলে সেই মূল স্থানেই আমাদের আঘাত করতে হবে। কারণ মার্কসবাদ একটা আন্তর্জাতিক মতবাদ। সোভিয়েত বা চীন কোনো দেশেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

তাহলে এরাটা এইভাবেই ওঠা উচিত যে, মার্কসবাদ কী কোথাও স্বীকার করেছে বিপ্লব অস্ত্র-দেশে রপ্তানি করা যায়? আমরা বিশ্বাস করি একটা দেশের নির্দিষ্ট অবস্থার তলা থেকে বিপ্লবী পরিস্থিতি উঠে আসে। সৈন্ত পাঠিয়ে যদি এক দেশে বিপ্লব সম্পূর্ণ করা যায় তাহলে

তো দেশের অভ্যন্তরে সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ কণিশনের দরকারই হয়না।

আফগানিস্তানে-সোভিয়েত সৈন্ত পাঠানোর ব্যাপারটাকে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখব। সোভিয়েত শাসক গোষ্ঠী বলেছেন, ওদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে, ওরা আমা-

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

অজুর্ন দাস

আমাদের মুক্তি সংগ্রামঃ মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ

প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা। চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৮।

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বহু বিস্তৃত। এই বিস্তৃত পটভূমিকায় ইতিহাস রচনা করা একপ্রকার অসাধ্য। কারণ যে ব্যাপক ও বিস্তৃত তথ্যপুঞ্জের উপর ভিত্তি করে এ জাতীয় ইতিহাস রচিত হয় তা অনেক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক থেকে তা অবৈজ্ঞানিকও বটে। ফলে গোটা সময়কালকে ভাগ করে বিশ্লেষণ করাই নিরাপদ। তাতে তথ্য যেমন উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়, তেমনি সেদিক তথ্যকে যুক্তিগ্রাহ্যও করা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি সেদিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থে মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ ভারতীয় উপমহাদেশের গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করেছেন। এমন নিষ্কলুষ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিনি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। সম্মুখের জনসাধারণ (তার বাড়ি সম্মুখ) তাকে 'আমি গান্ধী' হিসেবে সম্মান করে। এই সম্মান মূলতঃ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি স্বীকৃতিরই নামাঙ্কর।

আলোচ্য গ্রন্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত আগমন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের সংগ্রামের পরিণতি পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বিস্তৃত। মোট বারোটি পরিচ্ছেদে তিনি এই কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আলোচনাটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে রয়েছে এর প্রাথমিক যুগের আন্দোলন-যার সূচনা হয়েছে মীর কাশেম থেকে এবং পরিণতি লাভ করেছে ১৮৫৭ সালে সংগঠিত 'স্বাধীন-তার মহাসংগ্রামে'। এর ভেতর রয়েছে নানা প্রকারের সংগ্রাম-যার নেতৃত্ব প্রদান করেছেন মুসলিম

দের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইত্যাদি সেদিক থেকে আমাদের যুক্তি হচ্ছে- আফগানিস্তানে মাকিম সাম্রাজ্য বাহের আক্রমণের কোনো আশংকা-যবর আমাদের জানা নেই। সে দেশের বিপ্লবী জনগণের বক্তব্যও-শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

সমাজ। এসব আন্দোলনের ভেতর ওয়াহাবী ও ফরায়দী আন্দোলনও অন্তর্ভুক্ত। মোহাম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ বিশেষ মতবক্তার সঙ্গে এই আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উত্তোল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং তার বিরুদ্ধে বা পক্ষে আন্দোলনও এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একটা দিক একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। তাহলে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধর্মনির্ভর হিন্দু জাতীয়তাবাদের আশ্রয়প্রাপ্ত। কারণ এটি আন্দোলনের মৌলিক দিকনির্দেশক যা অল্পবিস্তর সেদিনকার সম্মানবাদী আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিলো। তৃতীয় পর্বে রয়েছে মুসলিম লীগ কর্তৃক আলাহা মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র গঠন প্রয়াস-যার সূচনা হয়েছে ১৯২৭ সালে কানপুর অধিবেশনে। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন- "নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি-লালা লজপত রায় তাহার ঐতিহাসিক 'পিপলস' পত্রিকায়।" (২৯ পৃঃ)

এই গ্রন্থের নব পরিচ্ছেদে লেখক আমাদের মুক্তি সংগ্রামে 'লেখক সংবাদপত্রের' ভূমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ে এদেশে সংবাদপত্র আবিষ্কারের ইতিহাস যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক তার কঠোরোধের প্রচেষ্টাও দেখানো হয়েছে। এই আলোচনাটি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনি নিরপেক্ষও। এই দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক দিকের ক্রটিগুলো সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট ভালো। তবে আর একটু উন্নতমানের হওয়া উচিত ছিলো। এছাড়া বইটির শেষে একটি নির্ধক যোগ করা একেবারে অপরিহার্য ছিলো।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ ক্ষম ও সবল শিশুরাই জাতির সমৃদ্ধ

আজই যে কোন নিকটবর্তী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করে শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর সুযোগ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থা

মাস মিডিয়া ডিভিসন-ইহাতে প্রচারিত।

রাজনীতি

সংবিধান গণতন্ত্র ও ইন্দিরা

—বার্জনৈতিক ভাষ্যকার

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী হবার দেড় মাসের মধ্যে নয়টি রাজ্য সরকার বাতিল করে দিলেন। এই পদক্ষেপ সম্পর্কে দেশের সবকয়টি রাজ্যীয় দৈনিক বিদ্রোহিত হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজের বিখ্যাত দৈনিক ইন্ডু লিখেছে, “মাদ্রাজে ডেকে তুলে তাঁর আক্রমণ করে বসায় মত ব্যাপাটা ঘটে গেল। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত পত্রে যে ন’টি রাজ্যের মন্ত্রি-ভাণ্ডাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হল তার প্রকৃত কারণ কিন্তু তাতে দর্শানো হয় নি। আর রাষ্ট্রপতি রেড্ডিও কেবল টিক দেওয়া জায়গাটিতে সই করেছেন—এর বেশী তাঁর কিছু করারও ছিল না।

১৯৭৭ সালে জনতা হল যে খারাপ নৃশংস স্থাপন করেছিল আজ তারাই তার প্রধান শিকার হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধী যে রাজনৈতিক কুশলতার বীজ বিস্তার করলেন, তাতে সুদূরগামী দিনে তার চলার পথ সুসজ্জিত হবে এমন কথা বলা যায় না।” হিন্দুস্তান টাইমস, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ইণ্ডিয়ান নেশন, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পেট্রিওট প্রভৃতি দৈনিকও হিন্দুস সঙ্গে একমত প্রকাশ করে সম্পাদকীয় লিখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুধু সংখ্যালঘু ভোটেই নির্বাচিত হন নি। তিনি অবিলম্বে দরদার কর্ম-মোহর এবং স্বায়ত্ত্বপূনঃপ্রতিষ্ঠার কর্ম-সূচী প্রচার করে ভোট সংগ্রহ করেছিলেন। তাকে যারা ভোট দিয়েছেন তারাও খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হতে শুরু করেছেন। তাই নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই খেরি ও রায়-বেরিলীর মাহুষের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। এই ভাঁটার টান আরো বাড়বে। আগামী জুন মাস নাগাদ যখন ন’টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে তখন ইন্দিরা গান্ধীর জয়ের নৌকা ভাঁটার টানে চড়ায় আটকে পড়ার সম্ভাবনা কে আটকাবে?

স্বায়ত্ত্বের কথাই ধরা যাক। ইন্দিরা গান্ধী তো প্রথম পদক্ষেপেই ন’টি রাজ্যের স্থিতিশীল সরকারের স্বায়ত্ত্ব বিনাশ করলেন। এর আগে তারই ইচ্ছিতে কর্ণাটক, হিমাচল ও হরিয়ানা-র বিধায়করা দল ত্যাগ করে। কংগ্রেসে (ই) যোগ দিলেন অর্থাৎ ইন্দিরা-কংগ্রেস হলছুট রাজ-নৈতিক ফারদাবাজদের দলে ঢোকা-লেন। ফলে আরাদ্রা-গয়ারাদের

দেশবাসীর কাছে বত স্বপাই হোক ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তারা প্রিয়জন হয়ে উঠল। দেখা গেল যে শে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, তার ও তার পুত্র সন্তান গান্ধীর ব্যক্তিগত ক্ষমতার স্বায়ত্ত্বকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বায়ত্ত্বের কথা তুলে দেশবাসীকে কঁাকি দিয়েছেন, প্রলোভন দেখিয়ে কিছু ক্ষেত্রেও হীন বিরোধী সমস্তকে খরদ করে খোঁয়াড়ে পুরেছেন। সুতরাং জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং অলীক আশ্বাস দিয়ে প্রতারিত করা হয়েছে।

নয়টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার সময় রাষ্ট্রপতির ঘোষণাপত্রে যে কোন কারণ দেখানো হয় নি, রাজ্যপালদের কাছ থেকে সংবিধানগত প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ার কোন রিপোর্টও

অর্থনীতি

ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির ফানুস

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস (ই) হল মার্কিনী চংরে বড় বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে হরেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জনতা হলও প্রচার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে টাউস টাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান। এদেশের নির্বাচনে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচারের ধারা আগে ছিল না। যে দেশে ভোটার সংখ্যার মাত্র সাড়ে চার শতাংশ দৈনিক খবরের কাগজ পড়েন, সেই দেশে জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনী প্রচারের সার্বিকতা যে কি তা বোকা শক্ত। একে যদি কেউ বুঝা যায় বলে মনে করেন তাহলে তাকে ধোঁষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু আজ সেই প্রসঙ্গ তুলছি না। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুঝা-বায়ের প্রতিও একটা প্রতীকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকে। যে টাকাকড়ি মুদ্রা আহারের জন্তে লগ্নী করা যায় না তাকে পুঁজি বলা যায় না। সেই টাকাকড়ি বড়লোকী ভোগবিলাসে আর কত খরচ করা যায়। এদেশের টাটা-বিরলা-সিংহানিয়াদের পরিবার ক্ষুদ্র সমস্ত লোককে লোনা-হীরে-জহরত দিয়ে মুড়ে দিয়েও মুদ্রার সবটা খরচ হয় না। প্রাসাদ, বাগান-

আসে নি। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পদত্যাগ করার অমুযোগ জানিয়েছিলেন, তারপর স্বশ্রীয কোর্টে তাদের আপত্তি দাখিল ও মামলার রায় পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এই সামান্য স্বাধীনতাতুচ্ছ দেখাতে পারেন নি।

তাছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সকল সদস্যও বোধহয় এই সিদ্ধান্তের মুক্তি কি বুঝতে পারেন নি। একেকজন মন্ত্রী একেক রকমের কারণ দেখাচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং মাত্র সপ্তাহখানেক আগে বলেছিলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্য সরকারকে বাতিল করবেন না। তবে কোন সরকার যদি নিজেকে থেকে ভেঙ্গে পড়ে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তাকে কি করে ঠাচাবেন?” অর্থাৎ তখনো হিমাচল, হরিয়ানার মত চোরা পথে এম এল এ আমদানীর চেষ্টা চলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু তা যখন সম্ভব হলো না তখন আইন, সংবিধান ও স্বাধীনতার জন্তে তারা অপেক্ষা করেন নি।

বাড়ি, নিজস্ব মোটর গাড়ির করে, নিজস্ব বিমান সব কিছু দিলেও মুদ্রার বিরাট অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। এই অবশিষ্টাংশ লগ্নী করা কঠিন। লগ্নী করতে গেলে মুদ্রার হার কমে আসে। সুতরাং পুঁজি-বান্ধী অর্থনীতিতে “বুঝাবায় বা” wasteful unproductive ব্যয়ের এখন মস্ত বড় কুসিকা। বিজ্ঞাপন এর বাহন। কিন্তু এই লেখায় তা নিয়ে আপাততঃ আলোচনা করছি না।

আলোচনার উল্লেখ করতে হচ্ছে কারণ বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনপ্রার্থী কংগ্রেস (ই) হল দেশের ভোটদাতাদের বুঝিয়েছিল যে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলেই দেশের মাহুষের হুঃখ দূর হবে। জিনিসপত্রের দরদার কমে যাবে, প্রত্যেক পরিবারে অন্ততঃ একজন লোকের চাকুরী হবে। আরো কত কি। এরকম প্রতিশ্রুতি জনতা হলও দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা তো আর ক্ষমতায় আসে নি। সুতরাং মনে করা যায় যে ভোট-দাতারা জনতা হলের কাকি প্রয়াল ধরে ফেলতে পেরেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস (ই)-এর কাকি তাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

বারবেরিলী থেকে ফেরার পথে শ্রীমতী গান্ধী গোরখপুরে বলেছেন, “এই রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সচসৌমিতা করছিল না, হরিজন ও অমুন্নত সম্প্রদায়ের মহিলারা নিরাপত্তা বোধ করছিলেন না তাই এই রাজ্য সরকারগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। তিনি বলেছেন তৎশীলভুক্ত জাতিগুলির আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরো দশ বছর বৃদ্ধি করে সংবিধানের যে ৪৫তম সংশোধনী পাশ হয় অর্ধেক রাজ্য বিধানসভা তা অমুন্নত না করা পর্যন্ত এই সংশোধনী কার্যকরী করা যেত না। এই ন’টি রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীরা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে অপদস্থ করার জন্তে এই সংশোধনীর অমুন্নত করতে রাজি হননি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন এটা ডাঃ মিত্রা কথা কারণ দিল্লীতে নজন-মুখ্যমন্ত্রী এক সঙ্গে বসে আলোচনা করার সময় সকলেই আগামী বাজেট অধিবেশনে এই সংশোধনী অমুন্নত করার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন।

দেশে কমপক্ষে ১২ কোটি পরি-রায়। প্রত্যেক পরিবারের একজন লোককে কাজ জুটিয়ে দিতে হলে কি করা হবে আশা করা যায়? অর্থাৎ কংগ্রেস (ই) এর প্রতিশ্রুতি মত আগামী পাঁচ বছরে (যদি ইন্দিরা কংগ্রেস ততদিন ক্ষমতায় থাকে) বারো কোটি মতুন চাকুরী সৃষ্টি করা হবে। মোরারজী দেশাই দশ বছরের মধ্যে দেশের বেকার সমস্তা দূর করার কথা বলেছিলেন। তিনি যখন একথা বলেন তখন দেশে শিক্ষিত তালিকাতুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় সত্তর কোটি। ইন্দিরা কংগ্রেস তার দশগুণ বেশী প্রতি-শ্রুতি দিল।

ভারতের বর্তমান লোক সংখ্যা ৬০ কোটি ধরে আমরা ১২ কোটি পরিবারের উল্লেখ করেছি। গড়ে জনকে নিয়ে একটি পরিবার। ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুসারে আমাদের দেশে কর্মক্ষম নাগরী পুরুষের সংখ্যা ৩২ কোটি। বাকীরা হয় শিশু অথবা বৃদ্ধ, অক্ষম। এই হিসাবে আরো দেখা যায় মাত্র দু কোটি নব্বই লক্ষ মাহুষ সংগঠিত অসংগঠিত শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কাজ করেন। এর মধ্যে সংগঠিত শিল্পে (অর্থাৎ ১০ জন কর্মী বিছাঁতের সাহায্য নিয়ে কাজ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত্বশীল মন্ত্রিরাও রাজ্য বিধানসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল ছিলেন না। তাহলে কখন, কিভাবে, কোন মুক্তিবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করা হল? রাষ্ট্র-পতির ঘোষণায় এর উল্লেখ নেই, মন্ত্রিরা এক এক রকম কথা বলছেন। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই সবাই আগে রাহ-গ্রস্ত হয়েছেন, সেখানে যৌথ দায়িত্বের সংসদীয় রীতি উবে গিয়েছে এবং “সংবিধান বহিঃস্থ চক্র” আবার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রাস করেছে তাহলে কি ভুল হবে?

আমরা জানি আমাদের নির্বাচনী নিয়মকানুন এমন অদ্ভুত যে এক সংখ্যালঘু ভোটে নির্বাচিত সরকারও সংখ্যাগরিষ্ঠ হলের রাজ্য সরকার বাতিল করে দিতে পারে। সংবি-ধানে যে ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে সংবিধানের মধ্যেই এমন কয়েকটি বিধান রয়েছে যা তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সংবিধান রচনার শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

করেন এমন শিল্প) এককোটি মাহুষ কাজ করেন। আরো নব্বই লক্ষ মার্কিন ইনডাস্ট্রিতে (যেমন ব্যাংক, বীমা, সরকারী কাজ) ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মরত। বাকী এক কোটি মাহুষ অসংগঠিত শিল্পে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বাকি কোটি কর্মক্ষম লোকের মধ্যে ন’ কোটি লোক কৃষি সম্পর্কিত উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ করেন। সুতরাং আমাদের দেশে মোট প্রায় বারো কোটি লোক সুখে দুঃখে অভাব অমটনে বা কায় ক্লেষে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বাকী বিশ কোটি লোকের জীবিকা অর্জনের মত কাজ নেই। তারা বেকার, অর্থবেকার এবং পরিবারের কোন একজনের আয়ের উপর নির্ভর-শীল। এই সমস্তা বিরাট এবং সমাধানের পথ সহজ নয়। যদিও এই বেকার সমস্তা সমাধান আশা-দের করতেই হবে।

এই বারো কোটি মাহুষের সবাই এমন কাজ রোজগার করেন না যা তাদের পক্ষে যথেষ্ট এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে এখনও অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত পেনশন ব্যবস্থা শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

আফগানিস্তান

সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপের নেপথ্যে

সুসম্পন্ন বন্দোবস্তাদায়

বিদেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের রাজধানী হলেও কাবুল ভারতীয় রাজধানী দিল্লীর অনেক নিকটে। কলকাতা বা মাদ্রাসের মত ভারতীয় শহর দিল্লী থেকে অনেক দূরে। সুতরাং এটা আশ্চর্য নয় যে গত ডিসেম্বরের শেষে সোভিয়েৎ সৈন্য দ্বারা আফগানিস্তান আক্রমণে এবং যেভাবে কশেরা তাদের এতদিনের আশ্রিত আফগান প্রধানমন্ত্রী হাকি-জুল আমিনকে সরিয়ে আর একজন নতুন আশ্রিত আফগান বাবরাক কারমালকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল করল, তাতে ভারতীয় জনগণ চিন্তা-বিস্ত।

তাদের কাজকর্মের সমর্থনকল্পে কশেরা বলছে যে বাবরাক কারমাল আমিনকে পদচ্যুত করার পর ২৭শে ডিসেম্বর রুশ সৈন্যদের তলব করেন। আমিনের পদচ্যুতির পরই প্রায় ৬ হাজার সোভিয়েৎ সৈন্য কাবুল টহল দিতে শুরু করে। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য “আফগান বিপ্লবকে বাঁচানো”। কিন্তু এটা সুবিদিত যে ২৭শে ডিসেম্বরের পূর্বেই কাবুলে সোভিয়েৎ সৈন্য

বিমানে উড়ে আসছিল। ভারত-বর্ষের সরকারী সূত্রে খবর যে ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৪০০০ থেকে ৬০০০ সোভিয়েৎ সৈন্য কাবুলে এসে পৌঁছেছিল।

আফগানিস্তানে কি ঘটছে? খবরের কাগজের সংবাদ অল্পদূরে বর্তমান কাবুল সরকার বিরোধী বিজোহীরা সোভিয়েৎ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে ও এমন কি আফগান সেনার এক বিরাট অংশ বিজোহীদের দিকে চলে গেছে।

আফগানিস্তানের সমস্তাসংকুল অবস্থাটা বুঝতে হলে চলে যাওয়া দরকার ১৯৭৮ এর এপ্রিলে যখন আফগান প্রেসিডেন্ট হাউদ-খাকে সোভিয়েৎ সমর্থিত পিপুল্স ডিমোক্র্যাটিক পার্টি এক সাময়িক ‘কু’র মাধ্যমে হটিয়ে দেয় এবং নূর মহম্মদ তারাকিকে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু সোভিয়েৎ সমর্থক এই হলটি শীঘ্রই নিজেদের মধ্যে হলাহলি শুরু করে। যে ছুটি হল—পারচাম ও খালক পিপুল্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তৈরী করে তারা

আবার পুরাতন পারম্পরিক বিরোধিতায় ফিরে যায়। খালক দলের হাকি জুল আমিন পারচাম দলের বাবরাক কারমাল ও অজা-জের হটিয়ে নেতা হয়ে বসেন। বাবরাক ও তার সঙ্গীরা চেকোস্লোভাকিয়া ও অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ১৯৭৮-এর আগস্টের মধ্যে আমিন আফগানিস্তানের পুরো হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে দাঁড়ালেন এবং তারাকি নামমাত্রই রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে রইলেন। ১৯৭৯ এ আমিন, যিনি এতদিন বিদেশমন্ত্রী ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমিন সরকার দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবের সম্মুখীন হচ্ছিল আফগানী জনগণের কাছ থেকেই। সোভিয়েৎ সমর্থক পিপুল্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আসলে কোন ব্যাপক জন-সমর্থন ছিল না। কিছু সোভিয়েৎ সমর্থক আফগান সেনা-নায়ক, যারা ১৯৭৮-এর সাময়িক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েই এই পার্টি তৈরী হয়েছিল। ফলে, যখন

আমিন সরকার কিছু ভূমি সংস্কার করতে চেষ্টা করল, তখন পারচাম-তারাকি কমিউনিস্ট ও কৃষক দ্বারা রাজনৈতিক ভাবে অসংগঠিত এবং কমিউনিস্ট ও মোজাদেদ প্রভৃতি অসংগঠিত ছিল, তারা প্রচণ্ড বাধা দিতে শুরু করল। জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পরিবর্তে আমিন জোর জবরদস্তি করলেন। এর ফলে বিজোহী শুরু হয়ে গেল। বিজোহীরা, যারা অধিকাংশই ইসলামী মোজাদেদ দ্বারা সংগঠিত, পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়ে আমিন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্ত প্রস্তুত হতে লাগল। সোভিয়েৎ সমর্থক সরকারের বিরুদ্ধে তারা ‘জোহাদ’ ঘোষণা করল। পুরো ১৯৭৯ ধরে আমিন সরকার এই বিজোহী দমনের চেষ্টায় সময় ব্যয়িত করল। সোভিয়েৎ সরকার তখনও আমিনকে মদ্য দিচ্ছিল, সুতরাং তারা বোমারু বিমান পাঠিয়ে আফগান গ্রামাঞ্চল বোমারু বিধ্বস্ত করল বিজোহীদের দমন করার জন্ত। কিন্তু নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হল হাজার হাজার। এর ফলে বহু আফগান আমিন সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেল। বহু ছাত্র অনেকেই বামপন্থী ছিল, কাবুল ছেড়ে পাহাড়ে চলে গেল বিজোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে।

অবস্থাটা অনেকটা ১৯৬০-এর ভিয়েতনামের মত, যখন নো দিন দিয়েম, দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী, যার শিখনে মার্কিনী মদ্য ছিল, তার অত্যাচারের দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিজোহী করে তুলেছিল। বস্তুতঃ, বিয়েমের অত্যাচারই একটা প্রধান কারণ ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি। কারণ বহু যুবক বিয়েমের দ্বারা নিষেধিত হয়ে কমিউনিস্ট পেরিলা ও জাশমাল লিবেরেশন ফ্রন্টে গিয়ে যোগদান করে। শেষে নিজেদের মুখ বাঁচাবার জন্ত মার্কিনীরা কোশলে এক সাময়িক অভ্যুত্থান ঘটাবে বিয়েমকে সরিয়ে আর একজন মার্কিন সমর্থক সেনানায়কদের ক্ষমতায় বসায়।

আফগানিস্তানে কশেরা এই একই পদ্ধতি অহুসরণ করে। যখন তারা দেখল যে আমিনের অত্যাচার আফগানদের শত্রুতাবাপন্ন করে তুলছে, তখন তারা ভাবল যে এবার আমিনকে সরানো দরকার। বাবরাক কারমাল, ও তাঁর দলবলকে পূর্ব ইউরোপ থেকে নিয়ে এসে আমিনের

বিরুদ্ধে এক সাময়িক অভ্যুত্থান ঘটানো হল। ঠিক ভিয়েতনামে মার্কিনীরা যেমন করেছিল। এভাবে কাবুলে এই নয়া সেবিয়েমর্থক সরকারের মুখে নতুন এই মুখোশ বসানো হচ্ছে। ছবি আগে সোভিয়েৎরা আমিনকে প্রাণত্যাগ করছিল; আজ তাঁকে রাখা হয়ে “বেইমান”। এতদিন ধরে যা অপরাধ—মার্কিনদের জলি করে রাখা, কারাগারে তাদের উপনির্ধাতন—যা আমিন পুরো সোভিয়েৎ মদ্য নিয়ে করে এসেছেন তা দ্বারা দায়িত্ব এখন আমিনের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। কশেরা নিশ্চয়ই সাজছে, যদিও কশ বোমারু বিমানই আফগান গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করেছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক কশ দাবি যে তারা আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছে ১৯৭৮-এর এই ডিসেম্বরের কশ-আফগান চুক্তি-অভ্যুত্থানী। যার বিশেষ দ্বারা অহুসারে কশ সৈন্যরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সে দেশে ঢুকতে পারে। মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষও কশের সঙ্গে অহুসরণ এক চুক্তিতে আবদ্ধ। এই চুক্তির ৯ নম্বর দ্বারা অহুসারে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ভারতবর্ষে হস্তক্ষেপ করতে পারে। আগামীকাল ভারতবর্ষের কোন প্রধানমন্ত্রী যদি ভারতীয় জনগণের বিজোহী ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা প্রতিহত করতে অহুসরণ বোধ করেন, তাহলে তিনি সোভিয়েৎ ইউনিয়নকে অহুসরণ করতে পারেন কশ সৈন্য এ দেশে পাঠাতে। এটা খুব সুদূরপর্যায়ত সম্ভাবনা নয়।

এ সম্ভাবনা বর্তমানে এদেশে রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বহুকাল ধরে গোলমাল চলছে—নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অন্যান্য অঞ্চলের ভারতীয় সৈন্য এ বিকোত ধামাতে আজ পর্যন্ত সমর্থ হয় নি। এছাড়াও, এমন দিন আসতে পারে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিকোত দেখা দিতে পারে—যেমন সম্প্রতি পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর মধ্যে ঘটেছিল। কাদের উপর ভারতীয় সরকার তখন নিয়ন্ত্রণ করবে? সহজেই সোভিয়েৎ সৈন্যদের তখন তলব করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি দ্বারা আফগানিস্তানে সোভিয়েৎ হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছে তারা কি এ সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেছেন?—এ এমন এক

কাম্পুচিয়া

গহন অরণ্যে পল পটের সঙ্গে আলোচনার একটি বিবরণ

কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী প্রধান পল-পট মনে করেন ভিয়েতনামীরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবে অতিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না, তার কারণ হল ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে কাম্পুচিয়া মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা মাকডুসার জালের মত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়াও ভিয়েতনামীদের অতিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার আর একটা কারণ হল, তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের চাইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতাই অনেক বেশী প্রবল।

পশ্চিম কাম্পুচিয়ার গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে যে গেরিলা ঘাঁটিটাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়, সেখানে গত ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর একদল জাপানী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথন কালে বঙ্গাবিস্কৃত কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী নায়ক পল পট এই কথাগুলো বলেন। চূর্ণত এই সাক্ষাৎকারে তিনি বর্ণনা দেন কিতাবে পূর্ব থেকে

পশ্চিমের সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত সংযোগ রক্ষা করার জন্ত অশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতির নিপুণ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, “কোন কেন্দ্র আক্রান্ত হলে ভিয়েতনামী সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র ও স্থানচ্যুত করার জন্ত আমরা আমাদের আক্রমণের জন্ত ঘাঁটির ওপর নির্ভর করি। অর্থাৎ সেই ঘাঁটিগুলো থেকে আক্রমণ রচনা করে শত্রুবাহিনীকে হতচকিত করে দি।

চারপাশাব্যাপী স্থায়ী আলাপে তিনি একথাও বলেন যে, কাম্পুচিয়ার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রধান দায়িত্ব এখন গ্রেট জাশমাল পেট্রিটিক রুস ও গণতান্ত্রিক ইনিয়নগুলোর ওপর অর্পিত। এখন তাদের প্রধান কর্তব্য হল, হ্যানয়ের আক্রমণ ও অত্যাচারের হাত থেকে জনগণকে বাঁচাতে কাম্পুচিয়ার গণশক্তিকে দেশের বাইরে ও ভেতরে অসংগঠিত ও শক্তিশালী করা। দেশপ্রেমিক যে কোন ধরনের কাম্পুচিয়ার সঙ্গে পল পটের মধুর সম্পর্ক রয়েছে। মরোদর সিংহাসনের সঙ্গেও তাঁর

সংযোগ খুবই নিবিড়। তাঁর মতে কশী সাম্রাজ্যবাদ ও ভিয়েতনাম সাম্রাজ্যবাদের যৌথ চক্রান্তের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বজনমত, বিশেষ করে এশিয়ানদের সমর্থন তাদেরই পক্ষে। এশিয় দেশগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, এই মহাদেশের প্রত্যেকটি দেশকেই এই ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রুশ-ভিয়েতনাম দুই চক্র যখন বাজার দখলের লব্ধাত্মক আক্রমণে নেমেছে, তখন এশিয়া তথা ভূতীয় বিশ্বের জনগণের পক্ষে কোনমতেই সমঝোতা বা আপোসের পথ গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পুনরায় অহুসরণের জন্ত কাম্পুচিয়াকে আক্রমণের ঘাঁটিতে পরিণত করতে চায়। প্রতিনিধি দলের সামনে তিনি ৩০ লক্ষ শক্তিশালী ও অসংগঠিত কাম্পুচিয়ানীকে নিমূল করার জন্ত হ্যানর কর্তৃক বিধাত টল্লিক অ্যান্ডিড ব্যবহার করার নজীর হাজির করেন।

ভারতে বিদেশী কোম্পানীর শোষণ

ডাঃ দিলীপ রায়

[লেখক ভারতের একজন খ্যাত-নাম অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসর পদে কর্ম-রত। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে তার বিশেষ ভাবে পরিচয় হয় 'এসো' নামক বহুজাতীয় সংস্থার কাজ করার কালে। সেই সময় প্রোফেসর রায় প্রত্যেক ভাবে উপলব্ধি করেন যে বহুজাতীয় নিগমগুলি তৃতীয় বিশ্বের 'দেশগুলির' স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করে চলেছে। -যেহেতু তার পক্ষে এই পরিষ্কৃতির সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব ছিল না সেহেতু তিনি বেশে ফিরে আসেন।]

বর্তমান প্রবন্ধে তিনি বহুজাতীয় নিগমগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

আপনি কি জানেন যে প্রত্যেক দিন ভোর বেলা থেকে রাত্রে শোবার আগে পর্যন্ত প্রতি পাঁচবা দশ মিনিট অন্তর আপনি কোন না কোন বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করছেন? এই কথাটা শুনে হয়ত আপনি চমকে উঠবেন, কেননা আমাদের সরকার রক্ষণ একথাই বলছে যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসে আমরা আত্ম-নির্ভরশীল হয়েছি এবং আমাদের জিনিস বদেশেই নির্মিত। কিন্তু এবার অন্তঃগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা কি বলছে। ভোরে ওঠার পর আপনি হয়ত কোলগেট টুথপেস্ট ব্যবহার করেন, এটা কোল-গেট পালমোলিড (ইতিয়া) লিমি-টেড দ্বারা নিরূপিত। টুথপেস্টের পরে আপনার প্রয়োজন চায়ের। এই চা হয় লিপটন না হলে ক্রক-বগের তৈরী করা। লিপটন বহু-জাতীয় কোম্পানী ইউনিলিভার এবং ক্রকবগও অল্প আর একটি ব্রিটিশ কোম্পানী দ্বারা নিরূপিত। এবারে বসুন আপনি যে ব্রেড ব্যবহার করতে চলেছেন তা ইরাস্টিক নয়তো? ইরাস্টিক হিন্দুস্থান লিভার নামক কোম্পানীর তৈরী এবং এটাও ইউনিলিভার দ্বারা নিরূপিত। আপনার স্নান করার লাবান যদি লাক্স বা স্যেজোনা হয় তাহলে কেনে রাখুন এও হিন্দুস্থান লিভারেরই বস্তু। এবারে আপনার কাপড়ের কথা নেওয়া যাক। যদি আপনার কাপড় টেরিজিন বা টেরিকটের হয় তাহলে কেনে রাখুন যে এই সূতো আই সি আই নামক বহুজাতীয় কোম্পানীর নিরূপিত কেমিক্যালস্ এ্যাণ্ড ফাইবারস-এর দ্বারা তৈরী। কাজে যাওয়ার সময় আপনি যে বাসে উঠছেন সেটা

হয়তো অশোক লেগ্যাও কোম্পানী তৈরী করেছে। এতে লাগান টায়ার হয়তো গুডইয়ার ডানলপ অথবা ফারিষ্টোনই বানিয়েছে। এরা সবাই বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত।

সিগারেট ইতিয়া টোব্যাকো কোম্পানীর তৈরী। এরা ব্রিটিশ আমেরিকান কোম্পানী নামক বহু-জাতীয় নিগমের দ্বারা নিরূপিত। শোবার আগে যদি হস্তমের জন্ত আপনায় কোন ট্যাবলেটের প্রয়ো-জন হয় তাহলে বুটস অথবা ওয়ার্লার হিন্দুস্থানের ট্যাবলেট ব্যবহার করবেন। এরাও কিন্তু বিদেশী কোম্পানী।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় এই সমস্ত জিনিসের নির্মাতা কোম্পানীগুলোকে বহুজাতীয় নিগম বলা হয়। কেননা অনেকগুলো দেশ জুড়ে এদের কাজ ছড়ানো। ভারী বিজ্ঞাপন এবং পেটেন্ট অধিকারের দ্বারা এরা নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারে কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং সেই কারণেই বেশ লাভজনক দাম নিতেও সক্ষম হয়। আরকর দেওয়ার পরে যা লাভ থাকে তার পরিমাণ দেখালেই এটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কীলেক্ট ডাইস এ্যাণ্ড কেমিক্যালস্—দ্বারা আই সি আই নামেই বেশি পরিচিত—উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। এই কোম্পানীতে আরকর দেওয়ার পর মুনাফা হয় মূলধনের ৩২%। এই শতকরা হার পণ্ডে ৫১% ব্যাক-লিড রাউন্ডে ৬৬% এবং কোলগেট পালমোলিডে ৮১%। এইভাবে বহুজাতীয় নিগমগুলি তাদের প্রার-মিতিক উৎপাদন মূল্যের তুলনায় প্রচুর লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এবং এই লাভের একটা মোটা অংশ এরা দেশের বাইরে লগুন নিউ ইয়র্ক জেমেন্টা অথবা ইউরোপের অন্ত কোন জায়গায় নিজেদের মুখ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

আমুন এবার দেখা যাক আমা-দের সরকার এই পরিসর দেশের বাইরে পাঠানো বস্তু করার ব্যাপারে কিভাবে উদ্যোগী হয়েছে। সরকার ৮৮০টি কোম্পানীর (যার মধ্যে ৪৪০টি শাখা, ১৪৬টি নিরূপিত কোম্পানী এবং ১৬৪টি ভারতীয় কোম্পানী) দ্বারা শতকরা ৪০ ভাগ মালিকানা বিদেশী) নির্দেশ দেন, যে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম ১৯৭৩-এর (যাকে ছোট করে 'ফেরা' বলা হয়) অন্তর্গত তাদের বিদেশী অংশীদারী কম করতে হবে।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই সমস্ত বহুজাতীয় নিগমগুলো 'ফেরা' সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা কুণ্ঠিত হল না। বরং এটা তাদের জন্য আরো লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। বেশির ভাগ কোম্পানী তাদের শেয়ার ভারতবাসীদের নামে বিক্রী করে মালিকদের একটা নতুন শ্রেণী গড়ে তুলল। যেহেতু এই কোম্পানী-গুলোতে মুনাফা প্রচুর হয় এদের শেয়ারও বেশ কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়েছে যায়। এছাড়া ভারতীয়করণের এই প্রক্রিয়ার ট্যাক্স সঞ্চয়ের মাধ্যমেও এরা প্রচুর লাভ অর্জন করে নেয়। ভারতে বিদেশী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর উপরে ট্যাক্সের পরিমাণ দেশী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর তুলনায় অনেক বেশী। ভারতীয়-করণের পরে এই সমস্ত বহুজাতীয় নিগমের পণ্য অধিক সংখ্যক অংশী-দারী সম্পন্ন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীদের মধ্যে করা হবে। অনুমান করা হয় যে এই ভারতীয়-করণের জন্ত ভারত সরকারকে প্রতি বছর প্রায় ৫০ কোটি টাকা আরকর লোকসান দিতে হবে।

'ফেরা' অধিনিয়মের বাধা দখলও দেখা গেছে যে কিছু সংখ্যক বহুজাতীয় নিগম নিজেদের বিকাশের জন্ত নতুন কোশল অবলম্বন করেছে। এরা অন্তান্ত বহুজাতীয় নিগমের সঙ্গে শিল্পগত সহযোগিতা স্থাপন করে ভারতে নিজেদের ব্যবসার পুঁজিগত বিনিয়াদের বিস্তার করেছে। যেহেতু এই বিস্তার ভারতবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া শেয়ার পুঁজির দ্বারাই করা সেহেতু বিদেশীদের প্রাথমিক বিনিয়োগিত মূলধনের শতকরা ৪০ ভাগেরও কম হয়ে যায়।

কিন্তু সংখ্যক বহুজাতীয় নিগম তাদের কারখানা অনগ্রসর অঞ্চলে স্থাপন করে, কেন না এর দ্বারা বিভিন্ন রকমের আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় যেমন ট্যাক্সের রিবেট আর্থিক সংস্থা থেকে তুলনামূলক কম সুদে পুঁজি প্রাপ্তি, সরকারী অনুদান এবং অন্তান্ত অনেক লাভ। উদাহরণ স্বরূপ গ্যাজিয়ন কোম্পানীকে নেওয়া যেতে পারে। এরা কেডারেল মুগল নামক অন্ত আরেকটি বহুজাতীয় নিগমের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করে হিমাচল প্রদেশের অনগ্রসর এলাকায় কারখানা স্থাপন করে নেয়। 'ফেরা'র নিয়মামুসারে এদের বিদেশী অংশীদারী বর্তমানে ৪০% ভাগেরও কম। কিন্তু বাস্তবিক এরা ১১ কোটি

৮৪ লক্ষ টাকার মালিক দেখানে ভারতীয়করণের আগে এদের সম্পত্তির মূল্য ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। ৮৩ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পুঁজি ভারতবাসীরা বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও তারা 'এর মালিক নয়। সহযোগিতা এবং অনগ্রসর এলাকায় কারখানা স্থাপনের দ্বারা এই বিদেশী কোম্পানীর মোট ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা লাভ হয়।

অতএব এটা স্পষ্ট যে 'ফেরা' বহু-জাতীয় নিগমের পক্ষে বাধা না হয়ে তাদের বিকশিত এবং সংগঠিত হতেই সাহায্য করেছে এবং এর দ্বারা ব্যবসার আবহাওয়াও তাদের অস্থ-কূলে চলে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ব্যবসারীদের একাংশ অরাজীৱ (denationalised) হয়ে বিদেশী স্বার্থের সেবার লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলা কালীন আমেরিকা যখন পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এবং আমেরিকান সৈন্যরাও যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়ার আমেরিকা 'ফেরা'র মত নীতি গ্রহণ করলো। এই নীতি ভিয়েতনামী-করণ যোজ্ঞা নামে পরিচিত। এই নীতি অনুসারে ভিয়েতনামী সৈন্যকে আমেরিকার খরচ এবং আদেশানুসারে লড়াই করতে হয়। আমেরিকার যুদ্ধ নীতির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরিত্রেও অগ্রগতি পরিবর্তন দেখা দিল।

ভারতসহ অন্তান্ত অনেক দেশে বর্তমানে বহুজাতীয় নিগমের বাণিজ্য রোধ করার জন্ত আওয়াজ উঠেছে। এরকমে এরা নিজেদের পুঁজি সরানো আরম্ভ করা সত্ত্বেও উৎপাদন এবং

সংবিধান গণতন্ত্র ও ইন্দিরা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

সময় এই ধারাগুলি সম্পর্কে আপত্তি উঠেছিল। জবাবে সংবিধান সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ বি আর আম্বেদকর বলেছিলেন, "এই ধারাগুলি (অর্থাৎ ৩৫৬ ধারার মত ধারা-গুলি) ব্যবহার করে একদিন কোন এক খেজাচাটী সরকার সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙ্গে দিতে পারে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কখনো যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে ভারতের কোটি কোটি মানুষ থাকবেন তারাই বা কী দেবেন। সরকার পার্লামেন্টে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রক্ষা করবেন।" ডঃ আম্বেদকর আরো অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু ৩৫৬ ধারা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে এই ধারাটি প্রয়োগের দরকার কোনদিনই হবে না। কিন্তু ডঃ আম্বেদকরের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে শ্রীমতী গান্ধী তার এগারো বছরের রাজত্বে বজ্রিশবার

বর্টনের ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাত থেকে যেতে দিচ্ছে না। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় যে বিদেশী ব্যবসারীদের এই নীতি ইরাজী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারতীয়করণের প্রক্রিয়ারই একটা অংশ বিশেষ। ইরাজ শাসকেরা ইতিহাস সিন্ধিল সার্ভিস ভারতীয়দের জন্ত উন্মুক্ত করে এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া স্থানীয় অফিসারেরা তাদের সহযোগিতাক্রমেই প্রশাসিত হয়েছে। এই সমস্ত ভারতীয় প্রশাসকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করার মধ্যে কোন রকম সন্দেহ ছিলো না। আজ বহুজাতীয় নিগম নিজেদের আর্থিক শক্তি ভারতীয়দের হাতে খুব সহজেই ছেড়ে দিতে পারছে, কেননা ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থেই এরা বিদেশী বাণিজ্যকে রক্ষা করবে। ১৯৩০ এবং ৪০ এর দশকে ভারত এবং এশিয়ার অন্তান্ত দেশে (যেমন বর্মী, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়, সাম্রাজ্যবাদীরা স্থানীয় জনতাকে প্রশাসনের দায়িত্বে অংশ দিয়ে তার সম্মুখীন হয়েছিলো। প্রশাসকেরা বিদেশীদের বিবস্ত হয়ে যায়। এবং অবশেষে বিদেশীরা এই প্রশাসকের হাতেই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। ১৯৭০ এর দশকে বিদেশী বহুজাতীয় কোম্পানীগুলো ভারত এবং এশিয়ার অন্তান্ত দেশের স্থানীয় ব্যবসারীদের একাংশকে নিজেদের আর্থিক লাভের অংশ দিচ্ছে যাতে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং লাভ সুরক্ষিত থাকে।

এই ধারা ব্যবহার করেছেন। এবার নিরে হলো তেজিশবার। স্ততরায় সংবিধান রচয়িতা ডঃ আম্বেদকরের প্রত্যাশা পূরণের দায় এখন জন-গণের। ব্যাপক গণ আন্দোলন এবং অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান-বিকৃত করার, সংবিধানের লক্ষ্যা-দর্শকে স্তব্ধ করার বৈরতত্ত্বী প্রয়াসকে ব্যর্থ করার সংকল্পই আজ সর্বাত্মে প্রয়োজন। সকলে মিলেই গণতন্ত্রের পতাকাকে উল্টে তুলে ধরতে হবে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
বার্ষিক ৩০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা
টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা
ম্যানেজার, দর্পণ
৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৩)

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক

অজু ন দাস

সাহিত্য সমালোচক ও ভাষা-বিজ্ঞানী হিসেবেই ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বিশেষভাবে পরিচিত। তবে আধীনভাবে, মতামত প্রকাশ করার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির অভিব্যক্তি তাঁকে আজ একজন প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীতে রূপান্তরিত করেছে।

১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার অঙ্গুত ফটিকছড়ি থানার বলংপুর গ্রামে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম। তাঁর পরিবারের সবাই ধর্ম-ভীরু। তাঁর বাবা ও দাদা এত-দাফলের একজন বিখ্যাত আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই স্বাধীনতা-প্রিয় আরবি ভাষার অনার্স নিয়ে পাঠ আরম্ভ করেন। চট্টগ্রামের রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্কুল থেকে তাঁর পাঠ্যজীবনের সূচনা। এই স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৯ সালে তিনি প্রখ্যাত বাগ্মী নৈরুদ ইসলাম হোসেন, শিবাজীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর অনলবর্ষা বক্তৃতার অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কংগ্রেসের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দান করেন। এই আন্দোলন তাঁকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিলো যে, তিনি তখন 'আবাহন' নামে একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন—যা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো। প্রথম দিকে তিনি খন্দর পরিধান করতেন। তবে রাজনীতি থেকে সরে আসার পর তিনি খন্দর পরিত্যাগ করেন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ১৯২৯ সালে আরবীতে এম এ পাশ করেন। তিনি প্রিন্সিপাল জগন্নাথী পদক লাভ করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি History of Sofism in Bengal এই শিরোনামে থিসিস রচনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৩৭ সালে শিক্ষা বিভাগে যোগ দান করেন। পরে তিনি রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। এরপরই তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। চাটগাঁ কলেজের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার সময় তিনি যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তা এই কলেজের ইতিহাসে বর্ণাক্ষরে লিপিত থাকবে।

দেশসর কেরার সরকার থেকে যে দর টাকা আসতো সেগুলো এমনভাবে পাঠানো হতো যেন সময়ের অভাবে খরচ করা না যায়। ডঃ হক চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান করে দেখেন তেমন কিছু টাকা প্রায় ফেরত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি সে টাকা ফেরত না দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেন। ফলে সেই কলেজের চেহারাই বদলে যায়। সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে অব্যাহতি লাভ করে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন এবং বিভাগ পরিচালনার কাজে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা-দেশের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিপূর্বে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠানের ভেতর স্কল টেক্সট-বুক বোর্ড ও বাংলা একাডেমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক হিসেবে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন তা এখনো কিংবদন্তী হয়ে আছে। তিনি সাংগঠনিক কাজে যে তৎপরতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন তার সঙ্গে অস্ত্র কারো তুলনা চলেনা। এরপর তিনি নবগঠিত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও মনোনীত হয়েছিলেন।

তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার জ্ঞে আধীনতার পর (১৯৭১) তাঁকে আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়। আত্মসমীক্ষার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নৈরুদ আলি-আহম্মদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগের দরুন তাঁকে সেই পদ থেকে অপসারণ করে তৎক্ষণাৎ ডঃ মুহম্মদ এনামুল হককে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। এই পদে নিয়োজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অসৃষ্টি নানা প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্ম পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯৭৫ সালের তথাকথিত সাময়িক অভ্যুত্থানের পরও তিনি কিছু কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থপারনিউমারী হিসাবে কাজ করছেন।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক সাহিত্যের গবেষণা হিসেবেই সমধিক পরিচিত। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতিগত ভাষা-বিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন বঙ্গের সৃষ্টি প্রভাবের উপর। তাঁর গবেষণা দলটি সম্প্রতি History of Sofism in Bengal নামে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশে সৃষ্টি-প্রভাব এবং বিশেষ 'আগমনপন্থা' আলোচনা করেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৭৭)। এই গ্রন্থে ডঃ হক অতি সংক্ষেপে সাহিত্যের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে ধারা চলে আসছে তাতে মুসলিম অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। এই ইতিহাসটির অন্তিমবিন্দু এই যে, এতে তিনি যে সব যুগ ভাগ করেছেন তার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্তে গোটা যুগের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা নির্ণয় করেছেন। এই পটভূমিকার মুসলমানদের, যে সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে তা একদেশদর্শী মনে হলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি 'বঙ্গের সৃষ্টি প্রভাব' নামক গ্রন্থে বাংলাদেশে সৃষ্টি-প্রভাবের উত্থানপতন আলোচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিলো সম্প্রতি 'মনীষা-মঞ্জুষা' নামে তাঁর একখানা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থে ডঃ হকের মননশীল রচনার স্বাক্ষর রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তরুণ বয়সে তিনি কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর 'আবাহন' কাব্যের কথা আমরা প্রবন্ধের প্রথমে উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রথম কবিতা সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে 'কর্ণধারা' নামে একখানা কাব্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের উপর ডঃ হক যেনব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো হলো 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' ও 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ'। এছাড়া সাহিত্যসাগর আবহুল করিম সাহিত্য-বিশারদের সহযোগে তিনি 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এখন গ্রন্থখানি দুঃখ্য। ডঃ হক সংস্কার ছাড়া এর দ্বিতীয় সংস্করণও করতে চান না। কবীর চৌধুরীর সহযোগে তিনি আবহুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৯) সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তিনি বিখ্যাত আরবী

কবি ইমরুল কাননের 'অসমবউল-মুত্যালাকাত' নামে একখানা গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। গ্রন্থখানা অস্বাভাবিক হয়েছিলো। এই গ্রন্থের একখানা মূল্যবান ক্রয়িকাও তিনি রচনা করেছেন।

বাংলাদেশে প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক বিশেষভাবে পরিচিত। রক্ষণশীল-তাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। পাকিস্তানী আমলে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকারের আক্রমণকে বারি প্রতিরোধ করেছিলেন ডঃ হক

প্রতিশ্রুতির ফাল্গুন

৫ম পৃষ্ঠার পর

নেই। অনেকেরই সক্ষম পূজা কন্ঠার উপর নির্ভরশীল হয়ে অবসর বা বাতিল জীবনের অধিকারী হন। এটাও এক বড় সামাজিক সমস্যা। কিন্তু এখন তা নিয়ে আলোচনা করছি না।

আলোচনার উদ্দেশ্য কংগ্রেস (ই)-এর প্রতিশ্রুতি মত পাঁচ বছরে বাছোঁ কোটি কাজ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কতটুকু তা যাচাই করা। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে গত শত শত বছর ধরে যে শিল্পবাণিজ্যের কাঠামো, কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মধ্যেই বর্তমান ১২ কোটি মানুষ কাজ করছেন। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই কাঠামোর মধ্যে আরো ১২ কোটি কর্মসংস্থান কি আদৌ সম্ভব? অথচ আমাদের এরকম প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এই প্রতিশ্রুতিতে ভুলেছেন। তা না হলে ইন্দিরা কংগ্রেস জিততে পারতো না।

তাবলে ঐ সময়ের মধ্যে কি ১২ কোটি লোকের কাজ হতে পারে না? পারে। কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে তা করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই নেই। যেমন ধরুন, আমাদের দেশে বিভিন্ন সংগঠিত শিল্পে (ছোট বড় মাকারী মিলিয়ে) যদি এক কোটি নব্বই লক্ষ বা প্রায় দু কোটি লোক কাজ করেন। এই শিল্পগুলিতে নানা কারণে পুরো সামর্থ্যমুখ্য উৎপাদন করা হয় না। যদি তা করা হয় তাহলে অতিরিক্ত আরো এক কোটি লোক কাজ পেতে পারেন। বর্তমান উৎপাদন গড়ে ৫০ শতাংশ করে হচ্ছে। যদি পুরো কর্মসংস্থান উৎপাদন হয় তাহলে যেমন জিনিসপত্রের যোগান বাড়বে, দাম কমবে, প্রত্যেক কর্মসংস্থান বাড়বে তেমনি পরোক্ষ কর্মসংস্থানও

তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে কোন প্রকার বিভাগ স্বীকার করেন না। আমাদের ভেতর বহুল প্রচারিত ও প্রচারিত মধ্যযুগকে তিনি 'চিংপ্রাকর্ষের যুগ' মনে করেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর গবেষণা কাজ সম্পর্কে বলেন, "আমি তথ্য উদ্ঘাটনে রত। সত্য উদ্ধার আমার রত। জীবনের সব সত্য সম্পর্কে আমার অনন্ত জিজ্ঞাসা রয়েছে। সারাজীবন সেই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছি।"

বাড়বে। অর্থাৎ ৫০-এখন ৪৮ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন (একটা জিনিষের কথাই উদাহরণ হিসেবে ধরলাম) হয়। যদি আরো ৪০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করা যায় তাহলে প্রত্যেক কাজে শ্রমিক সংখ্যা বাড়বে। এই অতিরিক্ত উৎপাদন পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিপণন, ব্যক্তিগত ইত্যাদি শতাধিক কাজে পরোক্ষ নিয়োগ আরো তিন চারগুণ বেড়ে যাবে ফলে দেশের মানুষ সত্য ইচ্ছামত চিনি পাবেন, চিনি কেনার পরস্যাও তাঁদের হাতে থাকবে। এখন আমরা মাথাপিছু খুব কম চিনি খাই বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে কম। সত্য চিনির অভাব মিটবে, কাজও বাড়বে।

তবে এটা করতে গেলে চিনি কলের মালিকেরা বাধা দেবে। কারণ তারা লোকের সুবিধে করে দেবার জন্তে ব্যবসা ফাঁদেনি। যতবেশী সম্ভব মুনাফা করার জন্তেই তারা ব্যবসা করছে। এটাকেই বলা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন। পুঁজিবাদীরা এই ধরনের উৎপাদন বজায় রাখতে চায়। নাহলে তাঁদের মুনাফা কমে যায়। কাপড়, জুতো, বইপত্র, কেয়োলিন, বৈজ্যাতিক সরঞ্জাম, রেডিও সমস্ত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

বলতে পারেন বেশীর ভাগ লোকের উপকার হলে পুঁজিবাদী উৎপাদন তুলে দিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেস এর সামর্থ্য কমবে না, তা করবেন না। কারণ ইন্দিরা কংগ্রেস পুঁজিবাদীর হাতের পুতুল। ইন্দিরা সরকার ও তাই। তারা মালিক তাদের ইন্দিরা কংগ্রেস কিছুতেই চটাতো পারে না। বরং তাদের পক্ষে লাঠি ধরার জন্তেই সরকার দ্বারা প্রস্তুত থাকে। অতীতে আমরা এই লাঠিবাদীর অজস্র নজীর দেখেছি। ভবিষ্যতেও দেখবো কারণ ফাঁকিতে তুলে আমরা আবার ইন্দিরা কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিয়েছি। অতএব ভুগতে হবে। আর এখন দাবে কলির সন্ধ্যা।

অগ্নিগন্ত উত্তর-পূর্ব অঞ্চল

সুখেন্দু সেনগুপ্ত

আজ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ভারতবাসী মাত্রই উবেগ প্রকাশ না করিয়া পারেন। প্রায় দীর্ঘ ৪৫ মাস ধরিয়া আসামে, মেঘালয়ে, মিজোরামে ও নাগাল্যান্ডে বিদেশী বা বহিরাগত বিভ্রাটের উদ্ভেগে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহা যোটেই শাস্তিপূর্ণ নয়। হিংসা-প্ররীতি আন্দোলনের ফলে আসামের বিভিন্ন প্রান্তে ও শিলংয়ে হাজার হাজার লোক গৃহহারা হইয়া রক্ত-হস্তে কোনও রকমে জীবন রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন। হাজার হাজার বাড়ী অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইয়াছে, বহু জীবনহানি হইয়াছে এবং বহুলোক আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। আন্দোলনকারীরা বরণেটা, জলবাড়ীর বিভিন্ন গ্রামের গরীব, সরল মানুষের ঘাহারা দীর্ঘ-কাল হইতে এমন কি প্রাক-স্বাধীনতা আমল হইতে বসবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন এবং আসামের সমৃদ্ধির জন্য যাহাদের অবদান অসীকার করিবার উপায় নাই, তাহাদেরও বাড়ীঘর পুড়াইয়া দেওয়া, সমস্ত সম্পত্তিকে লুণ্ঠন করিয়া দেয়া নাই, তাহাদের অনেককে অমানুষিকভাবে মারধর করা হইয়াছে, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে বাঙালীরা হিন্দু-মুসলমান, এমন কি সাধারণ সরল অসমীয়াভাষী অনেক লোক কতিপয় হইয়াছেন। অনেক স্থানের অনেক ঘটনা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই, কেননা সংবাদদাতাদের সেই সব যায়গায় ঘাইয়া সঠিক ঘটনাবলী জোগাড় করিয়া প্রকাশ করা বিশেষ কারণে সম্ভবপর নয়, কারণ আসামের পুলিশ ও সরকারী আমলারা অনেকেই তাহাদের সাহায্য করা ত দূরের কথা বরং তাহারা এই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে ইচ্ছন যোগাইতেও কষ্ট করিতেছেন না। আসামের প্রশাসনের দায়দায়িত্ব সনে হইতেছে নিখিল আসাম ছাত্র সংস্থা ও গণ-প্রগতি পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের—তাহারা যে কোনও প্রাণী বা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর হউন না কেন—জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে আসামে ও মেঘালয়ে বিশেষ করিয়া শিলংয়ে, মিজোরামে, মানুষ নিবিধে চলাফেরা করিতে

পারেনা, রুজি-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে, আর এই অবিচার ও অত্যাচার বিরুদ্ধে তাহারা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, শুধু বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কাঁদে। কিসের জন্য এবং কোন কর্মফলের দরুন এই সব অন-সমীয়া মানুষ এই নির্ধাতন ভোগ করিতেছেন বৎসরের পর বৎসর? আশা মে বিশেষ করিয়া বাঙালী ভাষীদের উপর এই আঘাত কয়েক বৎসর পর পরই সজ্জিত হইতেছে। কেন? কিসের জন্য ইহার মূল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহার মূলোৎপাটন যদি করা না যায় তাহা হইলে আগামী দিনে ইহার পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারত সরকার বিধাগত ভাবে পরিহার করিয়া যদি দৃঢ় হস্তে ইহার মোকাবিলা না করেন তাহা হইলে ভারতের অখণ্ডতাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবেনা, ভারত টুকরা টুকরো হইয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।

যদিও আন্দোলনকারীরা বলিতেছেন যে এই আন্দোলন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে তাহাদের বিশেষ অন-সমীয়াদের সকলেরই প্রতি, বিশেষ করিয়া বাঙালীভাষীদের প্রতি। তাহাই যদি না হইবে তাহা হইলে ডাঃ অজুন চক্রবর্তীকে এবং বিখ্যাত কূতবুদ্ধি ডাঃ রবি মিত্রকে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হইল কেন? কি তাহাদের দোষ, তাহারা কি বিদেশী ছিলেন, না বাঙালীভাষী বলিয়া? এর জবাব কে দিবে? হিংসা, বিদ্বেষের মানসিকতার যে তাহারা ভুগিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু আসামের বর্তমান পরিস্থিতিতে উবেগ প্রকাশ না করিয়া পারেন না। যে কোনও দেশপ্রেমিক এবং চিন্তা-শীল ব্যক্তি এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখিয়া উবেগ প্রকাশ করিবেন ইহা নিশ্চিত। জ্যোতিবাসু শুধু বলিয়াছিলেন বহিরাগত বা বিদেশীর লক্ষ্য নিরূপণ করিয়া আইনগতভাবে সমস্তার সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, একদিনে বা দুইদিনেই এই সমস্তার সমাধান কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এই ত তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এরকম তাহার হাজার হাজার কুশীলসিকা দাখ করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর জ্যোতি বসু যে প্রেস কনফারেন্স করিয়াছিলেন সেখানে তিনি বর্তমান সমস্তার প্রতিটি দিক নিয়া তাহার স্থিতিস্থাপনতা ও পরিহার-ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। যদি তাহার বক্তব্যকে ভিত্তি করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকল সমস্যার এবং সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সহিত যুক্ত বৈঠকে সমস্তা সমাধানের একটা স্পষ্ট উদ্ভাবন করেন তাহা হইলেই একমাত্র শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে এবং অশান্ত পূর্বাঞ্চলকে শান্ত করা সম্ভব হইবে।

আসামের তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষকে ভারতের নিরাপত্তার কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে, কেননা আফগানিস্তানের ব্যাপারে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা যে কোনও মুহুর্তে ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারে যাহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা হইতে আমাদের দেশও কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

বহু কষ্টে, বহু রক্তপাতে এবং জীবন বলিদানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সেই স্বাধীনতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চক্রান্তের দ্বারা বিপন্ন হইতে দিতে পারি না। ইহাদের কার্যকলাপকে যদি দৃঢ় হস্তে দমন করা না যায় তাহা হইলে আসামে, মেঘালয়ে, মিজোরামে, মনিপুরে যাহা ঘটতেছে তাহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত অংশেও ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। অন্তর্ভুক্ত ভারতের সংহতির মূলে কুঠারঘাত করা হইবে। আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে, কেননা বৈদেশিক চক্রান্ত অসমীয়া বর্তমান আন্দোলনের দ্বারা প্রবাহিত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালীর অবদান স্মরণীয়। এই স্বাধীনতার জন্য তাহাদের চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, বিশেষকরিয়া আমাদের তহানীতন অদূরদূরী নেতাদের দেশ বিভাগ মানিয়া লইয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য। এই দেশ বিভাগ মানিয়া লইবার জন্যই বাঙালী-জাতিকে আজ নানান দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। একবার হিম্মত উদ্ধার হইয়া সর্বত্র বিলম্ব দিয়া তাহারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। আসামেও অনেকে আশ্রয় লইয়াছেন, মান, লম্বান, জীবন বাঁচাইবার জন্য।

যদি সেই সব মানুষকে আবার আসাম ও অন্তর্ভুক্ত স্থান হইতে উচ্ছেদ করা হয় তাহা হইলে তাহারা কি চিরজীবন বাহারের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে? এর উত্তর কে দিবে? সঙ্কীর্ণতার আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। আমি সকলের আপে ভারতবাসী এই মনোভাব লইয়া চলিতে পারি না। ভারতবর্ষ আমার দেশ, ভারতের যে কোনও অংশে ভারতীয় মাত্রই স্বাধীনভাবে চলাফেরা বা বসবাস করার অধিকারী। যদি আমরা ভাবি আসাম অসমীয়া-দের জন্য, পশ্চিমবঙ্গ বাঙালীদের জন্য, বিহার বিহারীদের জন্য, মাদ্রাজ মাদ্রাজীদের জন্য তাহা হইলে ভারতীয় কাহারা বা এই দেশ কাহাদের?

অসমীয়াভাষীদের ভুলিলে চলিবে না যে আসামের আর মহম্মদ নাহুদার মরিনতাকে ভাদিয়া দিয়া স্বর্গীয় জননেতা গোপীনাথ বরদলুইকে দিয়া প্রথম কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠন করিবার মূলে তহানীতন কংগ্রেস সভাপতি স্বভাষচন্দ্র বসুর অবদান কম নয়। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের দরুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করিয়াছিলেন তখন দেশবন্ধুর পাশে যিনি ছিলেন তিনি আসামেরই এক কৃতি সন্তান স্বর্গীয় তরুণরাম ফুকন। ইহা আজকের কথা নয়। কিন্তু সেই সময় হইতেই আসামে বসবাসকারী অসমীয়া ও বাঙালীদের মধ্যে একটা লড়াই ও হুতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আসামের স্থলে স্থলে উত্তর ভাষাভাষীর মানুষেরা সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন আজ সেই লড়াই থাকিবে না? অসমীয়া, বাঙালী ও অন্তর্ভুক্ত ভাষাভাষীর লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় আসাম এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। কেন তাহা হইলে আজ আমরা ভ্রাতৃত্বভী আন্দোলনের বলি হইতেছি? কিসের জন্য বা কাহার পাশে? যাহাই হউক না কেন আমি একজন আসামবাসী হিসাবে আমার অসমীয়া ভাই বন্ধুদের আহ্বান জানাই। আহুন, আমরা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া আন্তরিক-

তার সহিত এবং খোলা মনে বর্তমান সমস্তা সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করি যাতে আসামের মঙ্গল হয়, সকলেই স্থখে শান্তিতে বসবাস করিতে পারি।

যড়যন্ত্রকারীরা বৈদেশিক মন্ত্রীর বিনিময়ে আসামকে তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নানান কার্যকলাপ চলাইয়া যাইতেছে। আমরা যদি এই যড়যন্ত্রের বলি হই তাহা হইলে সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে এবং বিপদ ডাকিয়া আনিবে। যাহাই ঘটনা থাকুক না কেন এখনও সময় আছে আমাদের সমস্ত দিক গভীরভাবে এবং শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে চিন্তা করিতে হইবে এবং সঠিক পথে চলিতে হইবে এইজন্য যে আমাদের কৃতকর্মের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেন আমাদের অভিধাপ না দেন।

আমরা জানি আসামে অনেক অসমীয়া সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ আছেন। তাহারাও সঠিক পথের নির্দেশ দিয়া এই গুরুতর পরিস্থিতি হইতে সকল সমস্যার ও ভাষাভাষীর মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন। এইজন্য মৃত্যু বরণ করিতে হইলেও তাহা গৌরবের মৃত্যু হইবে।

আফগানিস্তান

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

সোভিয়েত শাসক গোষ্ঠীর বকলমে আমাদের জানতে হচ্ছে।

সত্যকে স্বীকার করতেই হবে কোনো দেশের দেশপ্রেমী জনসাধারণই তাঁদের নাকের সামনে বিদেশী সৈন্তের, সে সমাজতান্ত্রিকই হোক কী সাম্রাজ্যবাদীই হোক, উপস্থিতি চায়না। তাতে দেশপ্রীতির অভিমান ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে। সে কথা মনে রেখে আমরা লেখকেরা অবিলম্বে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্তের অপসারণ চাই। সে দেশের মানুষই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। মৌলিক কৃষিবিজ্ঞান / শ্রীলালজিলাদ জামা / ১৪০০

২। কাচ ও কাচশিল্প / হীরেন্দ্রনাথ বসু / ২০০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক, স্কোয়ার, কলিকাতা-১০

স্থানীয় যুদ্ধের আগুন

রবীন বসু

আফগান সীমান্তে যুদ্ধের লেলিহান শিখা যত জলে উঠছে দেশে দেশে মেহনতী মানুষের হৃদকম্পন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি খুবই জটিল রূপ ধারণ করেছে। একদিকে খাইবার গিরিপথ অধিকার করে রুশরা যে দাপট দেখাচ্ছে তাতে আফগান জনগণ অবসাদ ক্রান্ত। অল্প দিকে বজ্রের দারিদ্র্য পালন করতে চীনও হারপ্রাপ্ত হাজির। আবার মার্কিনী দরবে পুষ্ট হয়ে পাকিস্তানের অস্ত্রপ্রতিযোগিতা আফগান তথা উপসহাদেশের জনজীবন বিপন্ন করায় এক নতুন ফাঁদ। যেমন জিমি কার্টার এখন কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছেন যাতে সামন্ত প্রভুদের পাণ্ডা আত্মরক্ষা খোঁমাইনী আমেরিকান বন্দীদের ওপর অত্যাচার মধ্যযুগীয় চেলিস খানের পর্যায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। কারণ তেলের খনির আরপীরদার কে হবে? দুই বৃহৎ শক্তির কেউই অস্ত্র কবে উঠতে পারছে না।

স্বভাবতই সম্ভাব্য সব রকম কূট অভিনয় প্রয়োগ করার সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। এই কারণেই আফগানিস্থানে সোভিয়েট অস্ত্রপ্রবেশে

আধেরে আমেরিকার লাভ হয়েছে। কারণ, খোমাইনির ধর্মীয় স্বত্বাধিকারে আরব ছিন্নিয়া সহ পুরো ঐশলামিক জগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোধে ফেটে পড়েছিল। আবার এই কোধের আগুনে স্বত্বাধিকারি দিলে-ছিল 'সমাজতান্ত্রিক' রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়া কর্তৃক কাবুল আক্রান্ত হবার এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মার্কিন আশ্বাসে রাতারাতি বিশ্বজনগণের সমর্থন জিমি কার্টারের দিকে ধাবিত হয়।

জিমি কার্টারও কয়েকজন দূতাবাস কর্মীর জীবনের বিনিময়ে তেলের রাজ্য হতে চাইছেন। আমেরিকার আগামী নির্বাচনের জন্য দূতাবাস বন্দীদের মুক্তি কার্টারের কাছে একটা হুমকিয়ার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তাঁর বনিষ্ঠতম প্রতিদ্বন্দ্বী বারট কেনেডি খোমাইনির পরিস্থিতিতত্ত্বকে সমর্থন করার কার্টারের সেই সমস্তা কেটে গেছে। কার্টারের মনোবাসনা চরিতার্থ হলে তেলের ছিন্নিয়া থেকে ব্রেকমেন্ডের বিতাড়ন অনিবার্য। তার মানেই আফগান বিপ্লবীদের শেষ আত্মনা পাকিস্তান সীমান্তে

বিপ্লবীদের মদত দিতে থাকবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা। এই অঙ্কুরোদয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ভারতীয় এজেন্ট ইন্দিরা গান্ধীর সামরিক মায়করা লাহোরের দিকে আগুয়ান হতে পারে। অর্থাৎ চারদিকে লাজ লাজ রব পড়ে যাবে। সমরাজ্যের যোগান দিতে একদিকে সমস্ত খাতে ট্যাক্স বাড়বে, অপরদিকে সামরিক খাতে বরাদ্দ বেড়ে অস্ত্রাভ্যাস খাতে বরাদ্দ অপ্রত্যাশিতভাবে কমবে। গরীব মানুষ, ঘাণের ছন্ন আনতে পাশ্চাত্য ফুরিয়ে যায় তারা ভিত্তারীতে পরিণত হবে।

কিন্তু এই যুদ্ধে সবথেকে বড় মুশকিল হবে আমেরিকার। বিগত বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা ছিল যুদ্ধোত্তর ব্যাপারীর। অর্থাৎ সমরাজ্য বিক্রি করে মুনাফা লোটার জুড়ই সে যুদ্ধ চেয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধে তাকে হাফলদারীর ভূমিকা নিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ভূমিকাটা ছিল হিটলারের। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম-ইউরোপীয় বন্ধুরা বুকে নিয়েছে যুদ্ধে উদ্বাসী দেওয়ার অর্থ হল, অনিবার্য ধ্বংস। বন্ধুরা নিমরাজী। অর্থাৎ বাকের-মুখে ঘোড়সওয়ার। কিন্তু সোভিয়েটের দোস্তরা এখনো পর্যন্ত প্রভু প্রতি অঙ্ক আত্মগত্যে যেতে রয়েছে।

বহুগুণার

১ম পৃষ্ঠার পর

অন্ততম। সম্ভবত যে মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অস্ত্রাভ্যাস রাজ্যগুলোর সঙ্গে উত্তর প্রদেশেও বিধানসভার অন্তর্ভুক্তি নির্বাচন হবে। বহুগুণা এখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য জোর তব্বির শুরু করেছেন। জানা গেছে বহুগুণা তার ইচ্ছার কথা খয়ং ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও বলেছেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী বহুগুণার প্রস্তাবে কোন মন্তব্য করেননি।

অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী যে উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একাই ঠিক করবেন তা নয়। কারণ তাঁকে এ ব্যাপারে কমলাপতি ত্রিপাঠী এবং দল্লর গান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তবে শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে এখনো কারও সঙ্গে আলোচনা করেন নি বলে জানা গেছে।

তবে বহুগুণার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার দাবী যে টিকবে না তা দল্লর গান্ধীর মতিগতি দেখলেই বোঝা যায়। ভাবসাপ দেখে মনে হচ্ছে দল্লর সমস্ত ভেঙে দেওয়া উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা নারায়ণ দত্ত তেওয়ারীকে মুখ্যমন্ত্রী করতে আগ্রহী। নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী জরুরী অবস্থাকালে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এবং যে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী সে সময় দল্লর গান্ধীর এক মন্ত্র লোক হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন তার মধ্যে তেওয়ারী একজন অত্যন্ত সফল প্রতিযোগী। দল্লরের চরম দুর্দিনে তার পাশে থেকে তেওয়ারী প্রমাণ করেছেন তাকে অবিশ্বাস করার দল্লরের কোন কারণ নেই।

স্বভাবতই এহেন লোককে বাধ দিয়ে দল্লর অস্ত্র কারও কথা ভাবতে পারছেন না। ইতিমধ্যেই দল্লর প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তেওয়ারী এবং মহসীনা কিদোয়াইয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। তেওয়ারীর বনিষ্ঠ মহলের স্থির বিশ্বাস এবারও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তেওয়ারীকেই করা হবে, যদি না শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে বিমত পোষণ করেন।

ফলে বহুগুণা যতই চেষ্টা করুন তার পক্ষে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শুধু তাই নয় তিনি যাতে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে কোন রকম প্রাধান্য পেতে না পারেন তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই করা হচ্ছে।

পরের কাঁটা সরাতে নারায়ণ দত্ত

তেওয়ারী এবং আরও কয়েকজন বহুগুণা বিরোধী নেতা শ্রীমতী গান্ধীর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, বহুগুণাকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হোক। বহুগুণাকে সেই মত প্রস্তাবও করা হয়েছিল কিন্তু তিনি রাজী হননি।

আগামী কিছুদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আরও বেশ কিছু নতুন মন্ত্রী নেওয়া হবে। বহুগুণা জেদ ধরে থাকলে হয়তো এবারও তার মন্ত্রিসভার স্থান হবেনা। সে ক্ষেত্রে বহুগুণার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে রাজনৈতিক মহল আশঙ্কিত হচ্ছে।

অরণ্যের অধিকার

সমর বন্দোপাধ্যায়

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ কালপুরুষ নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করল মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'। নাট্যরূপ দিয়েছেন সমর মুখোপাধ্যায়। তিনি এই অভিনয় আঙ্গরে স্বরচনা, নির্দেশনা ও প্রধান চরিত্রে রূপদানের দায়িত্বও পালন করেছেন। মুণ্ডা জাতির মুক্তি সংগ্রামের ভূমিকায় রচিত উপজাত 'অরণ্যের অধিকার' যে গরিমার উজ্জ্বল, তা কিন্তু যথেষ্ট হীনপ্রস্ত মনে হল মঞ্চরূপে। নাট্যরূপে চরিত্রগুলি যথার্থ আছে ঠিকই, কিন্তু যেন সে পরাক্রম নেই—নেই সেই অশার মহিমা। আর মঞ্চায়নেও যে বলিষ্ঠতা অপরিহার্য ছিল, তারও নিতান্ত অভাব লক্ষ্যে পড়ল। দৃষ্ট বিজ্ঞানের শিথিলতা ক্লাইমাক্স রচনার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। এখানে কাহিনী বড় কথা নয়, একটি চরিত্রের অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, সাংগঠনিক চেতনা ইম্পাতদূর নেতৃত্ব, প্রতিরোধের হুঁসি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, আপোসহীন সংগ্রামে সকল শোষিত, অত্যাচারিতকে উদ্ধার করে তোলা—সেই তেজ, দীপ্তি নাটকে কোথায়? নাট্যরচনার যে মুদ্রিয়ানায় বীরসমূহ রচনার যে মুদ্রিয়ানায় বীরসমূহ মুণ্ডার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে পারত তারই একান্ত অভাব। অবশ্য মুক্তিকামী মুণ্ডাজাতির প্রতি, তাদের নেতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা যে করল এবং যেভাবে করল সে প্রসংগ-মঞ্চে তুলে ধরা হয়েছে চমৎকার। শিল্পীদের অভিনয়ের মান খুবই সাধারণ স্তরের। এমন কি বীরসমূহ রূপে সমর মুখোপাধ্যায়ও তার উল্লেখ উঠতে পারেননি।

শিয়ালদহ লাইনে চরম অব্যবস্থা

নলিনী পাল

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন লাইনে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে ট্রেন চলাচল করছে। অধিকাংশ লোকাল ট্রেনই নির্ধারিত সময় সারণী অত্যাধিক চলাচল করছে না। এর দরুন, ওখানে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। লক্ষ লক্ষ যাত্রী চরম হুঁজোগ ভোগ করছেন। আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন ঘুরে এসে আঘাত করছে। যে কোন সময়ে এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। শিয়ালদহ ডিভিশনের বর্তমান প্রধান কর্মকর্তা বা ডি, আর, এম শান্তি বসু একজন দক্ষ এবং সং অফিসার বলে সুনাম আছে। অথচ, তিনিও এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছেন না।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে সকাল থেকে লক্ষ্য পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে কোন আপ ট্রেনই নির্ধারিত সময় সারণী অত্যাধিক ছাড়ছে না এবং কোন ডাউন ট্রেনই আসছে না। ষ্টেশনের একটি গোপিন ঘর থেকে মাইকে প্রায়ই ঘোষণা করা হচ্ছে, অত নব্বয় প্ল্যাটফর্মের গাড়ী ধারাপ

আছে, ওটি কারশেডে যাবে, ওতে কেউ উঠবেন না।

তাছাড়া, এমনও ঘটনা ঘটছে যে, কোন একটি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান আপ ট্রেনে যাত্রীরা উঠে বসেছেন এবং গাধাগাড়ি করে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ রেলের মাইকে ঘোষণা করা হলো যে, গাড়িটি ধারাপ। গাড়িটি কারশেডে যাবে। অগত্যা যাত্রীরা অসহায় অবস্থায় আবার নেমে এলেন। অল্প গাড়ির জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন, দূর থেকে দেখা গেল, অপর একটি ডাউন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে টুকছে। যাত্রীরা ভাবলেন ওই ট্রেনটি হয়ত তাঁদের গন্তব্যস্থলে যাবে। তাঁরা সেই মনোভাব নিয়ে হড়োহড়ি করে আবার ওই গাড়িতে উঠে বসলেন এবং যাত্রা আনন্দ মধুর করতে পারলেন না, জী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা অর্থাৎ ওই যাত্রীরা কামরার মধ্যে গাধাগাড়ি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হয়ত মাইকের আওতা ছাড়া আবার শোনা গেল, এটিও ধারাপ। এ গাড়িটিও যাবে না।

ওটি মেরামতের জন্য কারশেডে যাবে। শিয়ালদহে প্রতিদিন এই ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে যাত্রীরা দলের সীমার এসে পৌঁছেছেন। যাত্রীরা অবিলম্বে এর একটা বিহিত বা সুরাহা চাইছেন। এরজন্য দায়ী কে এটা অবিলম্বে বুঝে বের করার জন্য যাত্রীরা দাবি করেছেন।

রেলের লস্কিট মহল থেকে জানা গেছে, এরজন্য দায়ী প্রধানতঃ রেলের মেকানিক্স বিভাগ। তাছাড়া, ওভারহেড লাইনের তার চুরি, অল্প রেক দিয়ে বেলী ট্রেন চালানো এবং ট্রেনের দুই বগির মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী কাপলারগুলি হুঁসুদের দ্বারা কেটে নেওয়া প্রভৃতি অন্ততম কারণ।

যাত্রীরা প্রশ্ন করেছেন, আইন অত্যাধিকারী গঠিত রেলের নিজস্ব প্রহরী রেলরক্ষী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও রেলের তার চুরি এবং কাপলার কাটা বন্ধ হচ্ছে না কেন? মেকানিক্স বিভাগকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে না কেন? উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় মালপত্র মেকানিক্স বিভাগে সরবরাহ করা হচ্ছে না কেন?

সঞ্জয় গান্ধী সুরতের কাছ থেকে

১০ লক্ষ টাকার হিসাব চেয়েছেন



ত্রয়বিংশ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১ শুক্রবার, ৭ই মার্চ, ৮০ ৬০ পয়সা

রাজ্য ই-ফং সভাপতির পদ নিয়ে

দুই ব্যারিষ্টারের লড়াই

প্রদেশ ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য দুই ব্যারিষ্টারের জোর লড়াই চলছে বলে জানা গেছে। সভাপতি পদের দাবীদার একদিকে প্রবীণ আইনজীবী এবং লোকসভা সদস্য অশোক সেন, অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের তরুণ আইনজীবী ও প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত পাণ্ডা।

প্রথমে আবদুল সাভার সহ সভাপতির জন্য অনেক দাবীদার থাকলেও বর্তমানে অশোক সেন এবং অজিত পাণ্ডার মধ্যেই একজন সভাপতি নির্বাচিত হবেন বলে জানা গেছে। তবে এ ব্যাপারে রাজ্য কংগ্রেসের শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



বরাহনগরে দু দল কংগ্রেসীর সশস্ত্র লড়াই

কংগ্রেসের (ই) উপদলীয় কোমন্ড বিগত জাহ্নবীর নির্বাচনের সময়ে কিছুটা স্থগিত থাকলেও আবার স্বাধীনভাবে চাকা হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের (ই) কর্মীরা নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করেছে। মারপিটের সময়ে ওরা আগেরাঙ্গ এবং অস্ত্র মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তর শহরতলীর বরানগরে

অর্থাৎ ফোলের দিন ১লা মার্চ কংগ্রেসের (ই) দুই দল কর্মীর মধ্যে প্রচণ্ড মারদাঙ্গা হয়েছে। এর দরুন, স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতা মৃগেন লাহিড়ীকে তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্সার সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, লাহিড়ী তার ওই রিক্সার থেকে পর পর গুলী বর্ষণ করে নরহত্যার চেষ্টা করেছে। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির

৩০৭ ধারা অধুয়ারী এক মামলাও রুজু করেছে।

পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ১লা মার্চ স্থানীয় কংগ্রেস (ই) মন্ডান ভূটান চ্যাটার্জী ওদেরই সহকর্মী ছোটকা রায়কে আলমবাজার এলাকার একস্থানে আগেরাঙ্গ নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। তখন বেলা প্রায় ১২-১৫ মিঃ। তাড়াহাড়া, ভূটানরা ওখানে প্রচণ্ড বোমাবাজী শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

টাকা স্বতন্ত্র মুখার্জীর হাতে দেন প্রার্থীদেরকে দেওয়ার জন্য।

এ আই সি সি থেকে পাওয়া ১০ লক্ষ টাকা ছাড়াও অস্ত্র বিক্রির ফলে স্বতন্ত্র বাবু নির্বাচনী তহবিলের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই টাকা কিস্তাবে খরচ হলো তা রাজ্য কংগ্রেসের অনেকের কাছেই অজানা থেকে গেছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

নির্বাচনের সময় বহু প্রার্থীই স্বতন্ত্র বাবুর কাছে টাকা চাইতে এসে ফিরে গেছেন। অনেক প্রার্থীকে আবার টাকা দিলেও নামমাত্র টাকা দেওয়া হয়েছে বলে অনেক প্রার্থীই অভিযোগ করেছেন।

নির্বাচনের পরে বহু প্রার্থী দলে দলে দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর কাছে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। নির্বাচনে পরাজিত বহু প্রার্থীই সঞ্জয়ের কাছে অভিযোগ করেছেন তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ টাকার অভাব এবং স্বতন্ত্র বাবু তার পছন্দমত প্রার্থীদের ছাড়া অন্যদেরকে কোন ব্যাপারেই লম্বাগিতা করেন নি। টাকা ছাড়াও প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনী কাজের জন্য একটা জীপ দেওয়ার জন্য এ আই সি সি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন প্রার্থী ছাড়া আর কেউই জীপ পাননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্বতন্ত্র বাবুর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি ইচ্ছামত প্রদেশ কংগ্রেসের (ই) কাজকর্ম চালাচ্ছেন। এবং এ ব্যাপারে বরকত সাহেবের নাম স্বযোগ মত শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

বাণের বাড়ির ছড়া অনার্য মিত্র

এক
আহা কি হেরিঙ্গ মায়ের মুরতি
তাহার হৃদয়ে ধরেনা ফুরতি,
প্রকাশিল আজি পুরানো কীর্তি
পুরানো আসন জিনিয়া;
সকলেই তার করিবে আরতি
এই ভারতের তিনি যে ভারতী
পুত্র তাহার রথের সারথী;
লহ, তুমি তারে চিনিয়া।
দুই

কোথায় গেলেন রাজনারায়ণ,
কোথায় গেলেন দেশাই
তারা কি আজ ছেড়ে দিলেন
লোক-ভোলানো পেশাই?
লোক ভুলেছেন, ভুল করেছেন
তারও জবাব ভুলেই
ভুল আসলে জড়িয়ে আছে
রাজনীতিটার মূলেই।

তিন
হিম্মৎ থাকে বাও, বজ্রাই গাঁও
যদিও বিদেশ নয়, বিদেশী তাদাও।
যাবে নাকি দিসপুর, গৌহাটি গো?
না-ইবা করলে বিয়ে অসমীয়া বো।
বো যে বাণের বাড়ী, পাইনা দিশা
ফিরতে লাগবে তার পাশপোর্ট
ভিনা।

চার
এক দফা দুই দফা
বিশ দফা কাম,
করিতে করিবে তোর
পাঁচ কিলো ঘাম।
ঘামকরা মুখে চাই
ফুটফুটে হাসি,
ঐ আসে সেই দিন
বড় ভালবাসি।

নিহত কমল ঠাকুর ও হাওড়ার অন্যান্য সমাজবিরোধীদের কাহিনী

কমল ভট্টাচার্য ওরফে কমল ঠাকুরের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস দল হৈ চৈ করে বাজার মাত করার চেষ্টা করেছে। অভিযোগ, কমলকে পুলিশ থানা লক আপে পিটিয়ে হত্যা করেছে। ইন্দিরা কংগ্রেস দলের মতে মৃত যুবক সম্পূর্ণ নিরপরাধ, নির্দোষ। থানা লক আপে কমলকে পিটিয়ে মারার ঘটনা যদি সত্যই হয় তবে চরম নিন্দার যোগ্য। এ জঘন্য কাজের দায় পুলিশকে মাথা পেতে নিতেই হবে। কিন্তু, কংগ্রেসী শাসনে ট্রেনিং প্রাপ্ত পুলিশ বাহিনীর নৃশংসতার ঘটনা তো প্রথম ঘটেনি। রাজ্যের বামপন্থী সমর্থক দলের কর্মীদের হুকুরের মতো পিটিয়ে, গুলি করে মেরে ফেলার

ঘটনা তো এক আধটি নয়, রয়েছে প্রচুর। কই সে ব্যাপারে তো কংগ্রেস (ই) দল কখনো মুখ খোলে নি? আবদুল সাভার ভোলা সেনের দল রাজ্য বিধানসভায় কমল ঠাকুরের ঘটনা বলার সময় এমন ভাব দেখান যেন তাদের রাজনৈতিক জীবনে তারা এই প্রথম এই ধরনের ঘটনা দেখেন। আলিপুর সেক্ট্রাল, বহরমপুর, দমদম, হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলগুলির বন্ধ কুঠরীতে নির্মমভাবে বন্দী হত্যার সময় ভোলাবাবু তো কোন কথা বলেন নি। নাকি তা ছিল বৈষ্ণবীয় হত্যা। কংগ্রেসী আমলে থানা লক আপে, রাস্তাঘাটে পুলিশের রাজ নৈতিক হত্যাও শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

ইন্দিরা বাউন্সার ছাড়ছেন

সব রকম বলে ইন্দিরাজী এবার বাউন্সার বল দিতে শুরু করেছেন। প্রথমে বল নিয়ে তিনি দাঁড়াতেই কর্ণাটকের ক্যাপ্টেন দেবরাজ আর্গ-টার টিম নিয়ে প্যাভিলিয়নে পালিয়েছেন। স্পিন বলে কুপোকাং হয়ে হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের জনতা টিম ছুটো বিপর্যস্ত হয়েছে। তারপর তাঁর ইন স্ট্রাইকার বলের আক্রমণে একই সঙ্গে ন'টা অ-কংগ্রেসী (ই) বলের উইকেটগুলো টপাটপ পড়ে গিয়েছে। একই বল আর পশ্চিমবঙ্গ জিপুরা কেরালার কার্ভকর হচ্ছে না। ইন্দিরাজী এখন তাই মরীয়া, প্রেসার অধম করার জন্য বুকসমান বাউন্সার বল ছুঁতে আরম্ভ করেছেন। আত্মমূল্যে নিত্য ব্যবহার্য ভোপ্যপণ্য সাধারণ মানুষের হাতে পাবার দায়িত্বটা রাজ্যসরকারগুলোর হাড়ে চাপাতে চাইছেন আসলে দায়িত্বটা ঘাঘের সেই কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্বেগ, কেন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগিতার অজুহাত তুলে ঘাতে বাকি তিনটি অ-কংগ্রেসী (ই) সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং এক জরুরী বার্তায় রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত ১০টি রাজ্যের রাজ্য-পালকে এই সর্ম্মে এক নির্দেশ জারী করেন তারা বেন অবিলম্বে আত্ম মূল্যে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি কেরোলিন ডিজেল ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। রাজ্য-গুলো এ-ব্যবস্থা করবে কোথা থেকে, সে-ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে কি? ওটি 'নো বল' হয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর ভেংকটরমন পরের ওভারে ঠিক ভাবে মধ্যে বল ছুঁড়লেন এই কথা বলে যে ওই ব্যবস্থাটা কেন্দ্রই করবে। ইন্দিরা গান্ধী মূল্যস্তর স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই নির্বাচনে বাজীমাং করেছিলেন। কিন্তু পদ্বিতে চড়ে তাঁর কাছে অগ্রাধিকার লাভ করল অ-কংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকারগুলোর উচ্ছেদ সাধন, দেশবাসীর দুর্গতি তার অন্তর স্পর্শ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট

সরকার আর গোড়া থেকেই মূল্যস্ফীতির প্রতিরোধে মূল্যস্তর স্থিতিশীল করা এবং সাধারণ মানুষের জর-ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য আট-দশটি নিত্য ব্যবহার্য ভোপ্যপণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন সরকারের হাতে নেবার এবং নারা ভারতে সেগুলোর একই দর বেধে দেবার দাবি করে আসছেন। কিন্তু কী এক জুজের কারণে সেধিনকার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সরকার ও পরে লোকদল সরকার সে-কথার কর্ণপাত করেননি। যে কারণ ছিল সেধিন পূর্ববর্তী ওই দুই সরকারের সামনে বাধা তা কংগ্রেস (ই) আমলেও অপসারিত হবার আশা নেই। কারণ তাদের দল বা গোষ্ঠী ভিন্ন হলেও লোকদেরই টিকিয়েছে একই জারগার বাধা। পুঁজিবাদের কাঠামো অক্ষুন্ন রেখেই তারা সমাজতন্ত্রের বুলি কপটে বাহাছরি দিতে চান।

পরীষ তার নাগালের মধ্যে চিনি পাবে কেমন করে, চিনিকলমালিকের মুনাফা যে তাতে কমে যায়। এক-ফোটা ডিজেল-কেরোলিনও আসাম থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারছেন কি? রাজ্য সরকারগুলোর হাতে এ-পাশগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুসিয়ে তাম্বা দরে তা খন্ডেরদের বেচার কথা বলা কি নিরুপদ্রবের তাকামী নয়? দোকানে-দোকানে মূল্য তালিকা বুলিয়ে রেখে কী হবে যদি পণ্যের মজুত-ভাণ্ডারটাই থাকে শূন্য? ভাণ্ডার পূরণের ব্যবস্থা না করে ভাণ্ডার থেকে মাল কেমনার নির্দেশ দান ভগ্নায়া, না ভাণ্ডারী পদবাচ্য? নরাদিগির আসল মতলব হল, সাধারণ মানুষের কুখাকে পুঁজি করে অ-কংগ্রেসী (ই) রাজ্য সরকারগুলোকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু সমুদ্রের উথিত তরঙ্গের সামনে যেমন মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করতে হয়, তেমনি ইন্দিরার বাউন্সারকেও বামপন্থী সরকার ও সংগ্রামী মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দেবেন।

ব্যারিফারের লড়াই

১ম পৃষ্ঠার পর
প্রভাবশালী মহলের কাছ থেকে জানা গেল সভাপতি পদে অজিত পাজার মনোনীত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি হবার জন্য অশোক সেন নিজেই দিল্লীতে তহির করছেন। শ্রীসেন প্রথমে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীসেন এ ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁকে সভাপতি মনোনীত করা হলে তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সর্বকণের জন্য দলের কাজে নিজেকে নিয়োগ করবেন। শ্রীসেন সঙ্গর গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তার দাবী জানিয়ে এসেছেন।

সভাপতি পদের অত্যন্ত দাবীদার আবদুল সাভারও নাকি বর্তমানে অশোক সেনকে সভাপতি করার জন্য দিল্লীতে প্রস্তাব করেছেন। সাভার গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নাকি বলা হয়েছে

অশোক সেন উপরলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্যে, স্বতরাং তাকে সভাপতি করা হলে সংগঠন শক্তিশালী হবে।

গত সপ্তাহে দিল্লীতে শ্রীসেন তার বাড়ীতে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এই ভোজসভার নিমন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী, বেশ কিছু এম পি এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের। এই ভোজসভার শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা করেন এবং সংগঠনের দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এদিকে অজিত পাজার হয়ে স্বতন্ত্র মুখার্জী, ভোলা সেন, আনন্দ-গোপাল মুখার্জী প্রমুখ নেতারা দিল্লীতে তহির করছেন। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গনি খান চৌধুরীও অজিত পাজার সভাপতি করার পক্ষে বলে জানা গেছে। যদিও তিনি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করছেন না।

অশোক সেনের ব্যাপারে দিল্লীর মনোভাব পরিষ্কার নয়। কারণ

অশোক সেন আইন ব্যবসা ছেড়ে দলের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কতটা তা বিশ্বাসযোগ্য এ ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তাছাড়া দিল্লীর প্রভাবশালী মহল মনে করছেন অশোক সেনকে এখন সভাপতি করা হলে পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী পদেরও তিনি অত্যন্ত দাবীদার হবেন। যা মোটেই দিল্লীর অভিপ্রেত নয়।

সভাপতি কে হবেন তা মোটা-মুটি কমল মাথ, বরকত সাহেব এবং প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে আলোচনা করেই সঙ্গর গান্ধী সিদ্ধান্ত নেবেন। এবং সেক্ষেত্রে কমল নাথ এবং বরকত সাহেবের সুপারিশই প্রাধান্য পাবে। তবে এরা যে অশোক সেনের হয়ে সুপারিশ করবেন না এ ব্যাপারে অনেকেই নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে রাজ্য কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি পদে অজিত পাজার মনোনীত হবার সম্ভাবনাই প্রবল। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এ ব্যাপারে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানা যাবে।

হাওড়ার সমাজবিরোধীদের কাহিনী

১ম পৃষ্ঠার পর

কি ছিল অহিংস? আসল কথা কংগ্রেসীদের ট্রেনিং পাওয়া পুলিশ যুক্তফ্রন্ট আমলেও যে হত্যার নেশা থেকে দূরে আসতে পারে নি এখনও হু একটি ঘটনার তা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের অপদার্বতার কিছুদিন আগে মন্ত্রী প্রশান্ত শুর ও চেতলায় কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। যা হোক থানা হাজতে বন্দী হওয়া কোন মতেই সমর্থনীয় নয়। বরং এরকম ঘটনার মোকা-বিলার কঠোর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কিন্তু কথা হলো, কমল ঠাকুর কে? কেনই বা কংগ্রেস (ই) এই ঘটনা নিয়ে এত নাচনাচি করছে। গোলাবাড়ি, সালকিয়ার বিভিন্ন মাছ-বের কাছে শুনেছি কমল ঠাকুর এক-জন নামকরা ছুঁড়। শুধু কমল-ই নয় এর সঙ্গে রয়েছে আরও কয়েক-জন নিমাই রায়, উত্তম, গৌতম প্রমুখ। এই এলাকায় নামকরা সমাজ বিরোধীদের দুটি দল রয়েছে। এর একদিকে রয়েছে চোরাই মদ বিক্রেতা সুরজু, লোহার চোরাকার-বারী চাঁদ, সাতার বুকি মানিক, অপর দিকে কমল ঠাকুর প্রমুখ। কমলের মৃত্যুর ঘটনা বুঝতে হলে আরও কয়েকটি ঘটনা জানার প্রয়ো-জন। সুরজু, চাঁদ, মানিক প্রমুখ হলো কুখ্যাত অসং ব্যবসায়ী। এদের প্রচুর পরস। নিজেদের ব্যবসা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই ওরা কুখ্যাত মজান মদমাল্যকে নিয়ন্ত্রিত পরস দিত। কিন্তু এই পরসার ভাগ বসানোর চেষ্টা স্বক করে স্বভাব সিং। ধীরে ধীরে স্বভাবই সুরজু, চাঁদ, মানিকদের দলপতি হয়ে পড়ে।

হঠাৎ একদিন মদমাল্যকে শৃংখ-ভাবে খুন করা হয়। ফলে মদম-লালের স্যাঙাংরা ভীষণভাবে উদ্বে-জিত হয়ে পড়ে। ওরা অর্থাৎ কমল ঠাকুর, নিমাই রায়, রপেন রায়, উত্তম, গৌতম প্রমুখের সঙ্গে নানা বিষয়ে সুরজুদের গুণগোল বাধে। এরই মধ্যে একদিন কমলের চালা রপেনকে একদল লোক খুন করে যায়। কমল নিমাইদের ধারণা, এসব ঘটনার মূল হোতা হল সুরজু, মানিক, চাঁদ প্রমুখের দল। ব্যস আর আর কোথার। কমল ও তার দলবল মারাত্মক অস্ত্রসম্পন্ন সজ্জিত হয়ে কিছুদিন আগে মানিকের ওপর বোমা ছুঁড়ে মারে। পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তারপরেই ঘটে কমলের শোচনীয় মৃত্যু।

এখা পরিষ্কার কমল কোন-কালেই কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত

ছিল না। সমাজবিরোধীরা যেমন করে থাকে এখানেও ঠিক তেমনি রাজনীতির চেহারা বদলের লগ্নে লগ্নে এরাও নিজেদের বদল করে নিয়েছে। এদের দাপটে ভীত সন্ত্রস্ত বহু মানুষ আমাদের বলেছে কমল, নিমাই, রপেন, উত্তম, গৌতম, সুরজু চাঁদ, মানিক সবাই জাতছুঁড়। এরা কখনও কংগ্রেস (ই) কখনও লাল পার্টির লোক বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। আসল কথা হলো, এরা সবাই চোরাকারবারী ও লুঠ-পাটের ভক্ত। শুধু গোলাবাড়ী থানা এলাকার এইসব মজানদের কথাই শেষ নয়। মালিপাচবাড়ী গোলা-বাড়ী থানা এলাকার কুখ্যাত ছুঁড় অজিত উড়িয়া, সোনা, তপন, উত্তম, শঙ্কু প্রমুখের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আত্মসম্মান কলহে ইতিমধ্যে পাঁচ, উত্তম খুন হয়েছে। অজিত উড়িয়া নাকি এখনও হাসপাতালে। যে কোমলিন ব্যাপক খুনোখুনি শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিৎ নয়।

এসব ঘটনার মধ্যেও বিচিৎ ঘটনা হলো প্রশান্তনের নির্-স্থিতিকা। জেলা শাসিকা জেলায় কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের প্রত্যেকের খবরই ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু এদের শাসনোত্তর মত তেমন কঠোর কৃষিকার তিনি এখনও নামেননি। দর্পণের পাতার হাও-ড়ার সমাজ বিরোধীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ধরা পড়েনি কেউ। যারাও ধরা পড়েছে তারা হলো চুনোপুটি রাধব বোয়ালরা যথারীতি বাইরেই রয়ে গেছে।

যতদূর জানা যায়, হাওড়ার জেলা শাসিকা শ্রীমতী লীমা চক্রবর্তী বামফ্রন্ট নেতাদের অনেকেরই খুব কাছের লোক। বামপন্থী দলগুলির অনেকেরই দাবী জেলা প্রশাসন যদি সাধারণ মানুষকে স্বত্তি দিতে চান তবে কালমাত্র বিলম্ব না করে স্বভাব সিং মানিক, সুরজু, চাঁদ, নিমাই, উত্তম, গৌতম, লক্ষ্মী সাউ, মকর খটিক, নারায়ণ, বাবলি, সোনা, পঞ্চম, অজিত প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হোক। সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে নানান্তাবে মিলে পুলিশ কর্মীদেরও ব্যাপকভাবে বদ-বদল করা হোক।

একথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে, সময়মত হস্তক্ষেপ না হলে বাম সরকারকে হাওড়া নিয়ে আরও বিভ্রমণা পোহাতে হবে।

হাসপাতাল, না গরগারখানার ট্রানজিট ক্যাম্প ?

শ্রীপতি নন্দী

ব্যক্তি। দীর্ঘদিনের—শোষণ-পীড়ন আর সামাজিক বিকারগুলি মুখ্য, বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি এখানে গৌণ। 'ডাক্তার'-রা সকলেই যদি চিকিৎসক হতো, তাহলে সরকারী হাসপাতাল নামক বস্তুগুলি কোন সামাজিক উৎপাতের স্থান হয়ে উঠতো না,—একথা বলা চলে। পৃথিবীর সব চাইতে বেশী সংখ্যক দরিদ্র যে দেশে বাস করে সে দেশের হাসপাতালগুলি—নিখাষ সরকারী খরচায় পরিচালিত চিকিৎসালয়গুলি—নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের একটা ভরসা ছিল হয়ে উঠতে পারতো। সমস্যা নেই, অসমস্যা 'হতে-পারতো'র মতই এটাও একটা 'হতে-পারতো'; কিন্তু বাস্তব বিচারে ব্যাপারটি নিগূঢ় কন-থর্ম (Cata-bolic)—'এনাবলিজম'-এর কোন বালাই নেই। প্রচেষ্টাও নেই। অবক্ষয়ের অভিযান, তমসার তপস্বী—বিলোপধর্মী অপকৃষ্টির গড়ে জীবনের মূল্যবোধ কেবলই তলিয়ে যাচ্ছে। অতএব, শিকার আর হীকার নীতিবোধ আর নিরুপবিধি এখানে বিলুপ্ত নাতি।

আবার বলি, ব্যক্তি। দীর্ঘদিনের, কিন্তু এমন মড়করূপে কখনও ছিল না। আধা-উপনিবেশিক ব্যবস্থার লালন-পালনে গজিয়ে-ওঠা এ দেশীয় পাতিলুজোয়া সুবিধাভোগী গোষ্ঠী-গুলির জীবন দর্শন সমগ্র জীবজগৎকে লক্ষ্য দেয়। কাক-শূন্য ও স্বজাতির রক্ত-মাংসে পেট ভরে না, কিন্তু কাক-কৌলিন্য লোভীদের প্রাইভেট বুকি ও গোষ্ঠীবুকির কাছে অশ্রুত বলতে কিছু নেই। উপায় হলেই হলো, পড়তিগুলি, কে আর না জানে।

অল্প-প্রমে অথবা অপ-প্রমে প্রভূত অর্থ উপার্জনের জন্য ফকী-কিকির করে নিতে যতটুকু বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, সুবিধাভোগীরা অবশ্যই সে বুদ্ধি ধরে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ছুঁনীতি-অনাচার-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যারা নিঃশাসে নিঃশাসে উদ্যোগ তোলেন, চিকিৎসাজগতে ব্যক্তি-চারের গরলগুলি কিন্তু জল-ভাতের মতই তাদের মাংস-মজার মিশে যায়। তাহলে সাধারণ মানুষের করণীয় রইল কি? ভিটে বেচ, খটি বেচ, বাটা বেচ আর প্রার্থনা করো—ট্রেড-প্রফেশনের সাহায্যকালো ছাড়া-পথে যে চিকিৎসা-রহস্য স্বপ্ন আকাশ পরিক্রমা করে বেড়ায় তার ছিটে-

ফোটা আশীর্বাদটুকু যেন তোমার রোগশয্যায় নেমে আসে, কিংবা যেন কোন হঠাৎ 'কর্মবিরতি'-র জীলা খেলায় হাসপাতালী চিকিৎসা-পেদাদ অদৃশ্য হয়ে না যায়। নিশ্চয়ই মানুষ আছে সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, 'বুদ্ধিজীবী' সমাজ কিংবা 'দারিদ্রশীল' রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি, কেউ কোথাও জেগে নেই—অবক্ষয়ের কারণ-সুখা আকর্ষণ পান করে এরা অসাড় হয়ে রয়েছে।

অতএব, চিকিৎসা পট্ট গভীর থেকে গভীরতর, ক্রমে গভীরতম হয়ে উঠেছে। ফারদাবুদ্দিন অজ্ঞাত ক্ষেত্রে যেমন এখানেও তেমন—কন্দীবাঙ্গ ও ফেরেজাঙ্গরাই পরিচালক, পরিবেশক, নায়ক ও শাসক। অজ্ঞাত ব্যবসাক্ষেত্রের মতই এখানেও ক্রীকবাঙ্গী, ল্যাভবাঙ্গী, হাংলাঙ্গি, টেঙ্গা, টোকা-টুকি, টোকাটুকি, অজ্ঞতা ও আদর্শ-হীনতার উৎকট দৃশ্য।

পাতিলুজোয়া অবক্ষয়ের অন্ততম ফলশ্রুতিরূপে সমাজ-সচেতন আদর্শ বান চিকিৎসক ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠেছে—জীবনযাত্রার রীতিনীতি এবং জীবিকার উপায়-পদ্ধতির নিয়ম অস্বাভাবী। ভারতীয় সমাজের অজ্ঞাত ক্ষেত্রে যেমন একেজোও তেমন, উৎকট ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন করে যাওয়া মনো-বৃত্তির লোকেরাই হাসপাতালের 'সংরক্ষিত অঞ্চলে' আশ্রয় সংগ্রহ করে এবং একাজে যে যেমন করিৎকর্মী সে তেমন পরমহংস অর্থাৎ অজ্ঞ অনেকের অহুকরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। সরকারী কলেজ হাসপাতালগুলোর কথাই ধরা যাক। বড়-ডাক্তার-ছোট ডাক্তার-ইন্টার্ন-নার্স-নাসিং হোম পর্যন্ত বিস্তৃত 'চেন'গুলি কোন অদৃশ্য বস্তু নয়। তাছাড়াও আর পি, আর এস-ইন্টার্ন-নার্স-ট্রোরকিপার চক্র—নির্দেহ-পক্ষে ইন্টার্ন-নার্স-ট্রোরকিপার চক্র—যে যে ক্ষেত্রে বিভ্রম্যান সেখানে কালো পথে বহু অসাধ্য সাধন অনার্যানেই সম্ভবপর। অসাব্যতই এ সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসা বাহু দৃশ্য, কারেখী কর্মযোগটাই সারসভ্য।

গরীবের জ্ঞান বেগুয়ারিশ মাল—তবুটি এ পোড়া দেশে একমাত্র পুলিশ বিভাগের জামা এমন নয়, হাসপাতালের ডাক্তাররাও জানে হাসপাতালের সরকারী পরিসংখ্যান প্রধানতঃ এ দরিদ্রদের শোকসন্তাপের খতিয়ান। এ সমস্ত সংখ্যাতত্ত্বের জীলাখেলা পার্থিব হয়েও অপার্থিব-রূপে রহস্যময়। নিকাম নিরুপযোগের স্বত কারেখী কর্মযোগটিও ভারতীয়,

কিন্তু তৎসহ হাকবিদ্যায় বদ্যাপণায় দেশী গুণপণায় জীবনী মজমে হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগে দুর্লভ মানবজীবনের পটাপট পরিসমাপ্তির ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই কোন বিধির খেলা নয়। এ পটভূমিকায় ভারতীয় নব্যচিকিৎসক সমাজ সম্পর্কে ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিলের স্থপতি রতামতগুলি প্রাধান্যবোধ্য।

চিকিৎসা বিভাগ অজ্ঞতা যদি অযোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি না হয়, যদি আকাশ-প্রমাণ গ্রেন্থ মার্কে 'পাশ' করা কিংবা চিটিং বিদ্যায় 'পাশ' করা ডাক্তাররাই প্রধান ভরসা হয়, যদি সিনিয়র ডাক্তারের দর্শনলাভ ইন্টার্নদের দর্শনলাভের চাইতেও দুর্লভ হয়, যদি কর্তব্যে পাকি-লতির প্রতিকার লাভের কোন উপায় বা প্রত্যাশা না থাকে, তাহলে ইমার্জেন্সী বিভাগে বা ঘটতে পারে তা মহাজেই অস্বপ্নের। চরম বিশৃঙ্খলা নিঃশব্দ নৈরাজ্য। রোগী আছে—'বেড'-এ, মেঝেতে, রাস্তায়—বৃহত্তর সামাজিক বৈষম্যের বাদবাকী ঘেনা মেটাতে। ডাক্তারের অভাব না থাকলেও ডাক্তারী তৎপরতার অভাব আছেই, আর এ অভাব মেটাতে সব-ট্রেপো ধরা খাউ ইয়ারের ছাত্রদের বাড়াবাড়ি একটা ব্যস্ত সময় ভাব বতায় রাখে। মুখুঁ রোগীর বেহ-প্রাপকে উপকরণ করে নবীশদের ক্লিনিক শিক্সা—'করেন লারেন্স'-এর সঙ্গে অদেশী অভ্যাসের একটা উৎকট পাক। আনাড়ী হাতের দিক্-বেদিক ভঁতোর বোবা রোগীর 'টেতার লিভার'-টাই বুকি টে-সে যায়, তল-পেটের 'লান্স' ছুঁসিয়ে ছুঁসিয়ে শাল-নালাতে খিল ধরায়। কিন্তু ক্লিনিক শিক্সা সহজে ধামে না। হাসপাতালী রহস্তের অচেনা পরিবেশে রোগী ভাবছে, 'ডাক্তারেরা পরীক্ষা করছে, চিকিৎসা শুরু হলো বলে', উৎকট পরিজনরাও ভাবে তাই। ক্লিনিক শিক্সার নিয়ম অস্বাভাবী রোগীর লম্বতি সহযোগিতা আগেভাগে চেয়ে নিতে হয়। কিন্তু মুখুঁ রোগীর ক্ষেত্রে তার সম্মতি সহযোগিতার বিষয়টি অচল। একেজো প্রাক্-সম্মতির প্রস্তুতিকে এড়িয়ে চলার চালু প্রথাটি শুধুই আপত্তিকর নয়, রীতিমত অস্বাভাবিক। মুখুঁ রোগীর তাৎ-কণিক কষ্টমুক্তির ও লাগাতার চিকিৎসা-সারপ্রাভীত অধিকারকে এভাবে এক আপেক্ষিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়গুলি এখানে প্রাধান্যিক

হয়ে দাঁড়ায়, এবং চিকিৎসার কাজে প্রাণান্তকর বিয় ঘটায়। হাতে-কলমে শিক্সার গুরুত্বকে মেনে নিয়েও একথা বজ্রবলে বলা যায়, ক্লিনিক শিক্সার উপকরণ মুখুঁ রোগী নয়, আর গরীব হলেই উপকরণ হয় না। কিন্তু গরীব মরলে বড় জোর একটা ভোটার মরে, আর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই—'ভজলোক'-কুলের দর্শনশাস্ত্রে 'কর-মূল্য' যদি এমন হয়, সেখানে বাড়িত 'বিশেষ চিকিৎসা', 'ইন্টেনসিভ কেয়ার' ইত্যাদি বাত্-কা বাত্-মাজ—'ভজ'কুলের ফ্যাশনাবল্ চালাকী ছাড়া আর কি। প্রস্তুতি অভাবও রাখা যায়—ক'টা ভাগ্যবানের রুগ দেহকে 'বডি' বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, কিংবা 'ক'জন মুখুঁ ধনীরা দেহকে নিয়ে ক্লিনিক্স-এর মহড়া দেবার চুঃসাহস এদের আছে?

যা হোক, অদৃশ্য ডাক্তার এক লম্বরে দেখা দেবেন বৈকি। চড়া মেলাজ, কড়া তাবা—উপলব্ধ অবশ্যই রোগী ও তার পরিজনরা। অতঃপর সামুলী চিকিৎসা—এ টি এস, এটি-বারোটিং, সিডেটিং—যা 'হু-আক্'-রাও করে থাকে; এতে লাগে তুক্, না লাগে ভাক্। আর শুধু পস্তর বা মেলে, প্রকৃত চিকিৎসার সঙ্গে

উদ্বাস্তরা আবার বাস্তহার হল সরকারকে জানিয়েও প্রতিকার হয়নি

ব্রহ্মদেশ (বারা) থেকে আগত ১৬১টি বাল্যলী উদ্বাস্ত পরিবার বেহালার মিকটবর্তী কালুয়া গ্রামে নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য ১১টি বাসগৃহ নির্মাণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে। রাজ্য সরকারের আর্থ ও পুনর্বাসন দপ্তরের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় আর্থ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০০ টাকা ঋণ হিসাবে পেয়ে এই উদ্বাস্ত পরিবারগুলি ৪৭ বিঘা জমির ওপরে বাড়ি তৈরী করেন। যার মধ্যে কয়েকটির নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নাই।

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের উদ্বাস্তদের এসব বাড়ি জবর দখল করে নেন। উদ্বাস্তদের পক্ষ থেকে লম্বস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকেও জানানো হয়। কোন কাজ হয় নি। উদ্বাস্তদের মুখপাত্র হিসাবে শ্রীময় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, আমরা উদ্বাস্ত

তার সম্পর্ক কতখানি সে প্রশ্নটি থেকেই যায়।

তবুতো সরকারী হাসপাতাল, মরেও থির বিশ্বাস হাসপাতালে মরেছি—একবারে পাবলিক-এর গাঁটের পরসায় চালু সরকারী হাসপাতালে। বহুক্ষেত্রেই এরূপ 'অভা-গীর বর্ণ'-লাভে—খোঁয়ার অনন্তধাড়া, মরল বিশ্বাসের জ্বাবে প্রাণান্তকারী তামাসা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো অনেক কমিশন-কমিটি করেছেন, খোঁজ মহানগরীর কলকাতা মেডি-কেল্ কলেজ ও এন্ড আর এন্ড কলেজ হাসপাতালগুলিতে ১৯৭২ সাল থেকে নিধনপক্ষে ইমার্জেন্সী চিকিৎসার ব্যাপারে কোন তদন্ত কমিশন গঠনে রাজী আছেন কি?

অতঃপর ট্রেড-বুদ্ধির পেপ্যাল মনোভাষিক দিক। সব ট্রেড-এরই চক্র আছে, চক্রান্ত আছে—যাকে বলে 'ট্রেড মিক্রেট'। ডাক্তারী ট্রেড-বুদ্ধিতেও তা আছে। বিদ্যা-হাক-বিদ্যা ও অ-বিদ্যায় দীমারেখা মুছে দিতে খার ট্রেড-মিক্রেটগুলিকে নিরুপক রাখতে সাধারণ রুচিবোধ-টুকু বিসর্জন দেওয়া একটা রীতিমত 'ডাক্তারী' ব্যাপার। যেমন, তারা অচিকিৎসকের সুখে এনাটমি, ফিজি-শেবাংশ ১ মণ্ডার

হিসাব এবং উদ্বাস্তই থাকলাম। উপরন্তু আমাদের সাধারণ চালল প্রায় লাড়ে লাড় লক্ষ টাকা ঋণের বোকা। বর্তমানে এই-রাজ্যে যে সরকার আছেন তাঁরা তো দর্পহারী জনপণের প্রতিনিধি। তাহলে আমা-দের প্রতি তাঁদের এই উপেক্ষা কেন? আমরা কাউকে জানাতে বাধ রাখিনি। স্থানীয় সি পি এম দলতুচ্ছ বিধানসভা সদস্য শ্রীনিরঞ্জন মুখার্জীকে সব কিছু জানানো হয়েছে। তিনি স্বউদ্যোগে কিছুই করেন নি। এ বিষয়ে থানার এজাহার লিপিবদ্ধ আছে। প্রশাসনের সর্বত্র অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় আর কিছুই নাই।

উদ্বাস্তদের করণ আবেদন যে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সহায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে উদ্বাস্ত পরিবারগুলির হত জমি এবং আবাস উদ্ধারে দৃষ্টি হোন।

গত ১৫২৮০ তারিখে 'দ্বর্পণ'
কাগজে শতাব্দী সেনের "আফগান
বিপ্লবের গোড়ার কথা" লেখাটিতে
লেখক গোটা ঘটনাকে যেভাবে
বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মনে হয় যে,
নূর মহম্মদ তারাক্কির নেতৃত্বে আফ-
গান জনগণ প্রকৃত গণ বিপ্লবের মধ্য-
দিয়ে আফগানিস্থানে প্রকৃত জনগণ-
তান্ত্রিক পরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,
এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার
দোসররা তাতে বাধ সাধছে। সর্বো-
পর্যি চীন নাকি সেই সাম্রাজ্যবাদীদের
মদত যোগাচ্ছে।

কাবুলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী রাশিয়ার হীন চক্রান্তেরই বিষয়বস্তু। রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব আজ বলছে যে তারা নাকি “এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার” দায়িত্ব নিয়েছে। এই “যৌথ নিরাপত্তার” মর্যাদিক খেলায়ত দিতে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের মুজিবসহ গোটা মুসলিমভার মদন্যদের এবং আফগানিস্তানের জনগণকে। আসল কথা রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্ব আজ প্রকৃত গণবিপ্লবে বিশ্বাস করেনা। যদিও মহান স্টেলিন-স্তালিনের নেতৃত্বে প্রকৃত গণবিপ্লবের মধ্য দিয়েই আজ তার পৃথিবীতে মাথা উঠু করে দাঁড়াতে পেরেছে।

বিপ্লব কখনও রপ্তানি করা যায় না। প্রত্যেক দেশের সমস্ত সেই দেশের জনগণকেই সমাধানের দায়িত্ব দিতে হবে। এটাই মার্কসীয় চিন্তা

ধারা, হুভরাং কাবুলে তারাক্কি আমিন বাবরাকে কক্ষতা লাভ নয়-
জারদের কৃতিত্ব। আবার তারাক্কি
আমিনের কক্ষতাচ্যুত হওয়াটাও
তারদেরই কৃতিত্ব। কারণ এশিয়া
আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় ঐ
ধরনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী
নেতারা কৰবেশী সবাই হোহুল্যমান
চরিত্রের। সাময়িকভাবে রাশিয়ার
মদতে চললেও যে কোন সময় অস্ত
শিবিরে যোগ দিতে পারে। কিন্তু
রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নিজের ব্যর্থতা
চাকবাব অস্ত্র অস্ত্র দেশের আভ্যন্তরীণ
সমস্যা মেটানোর অজুহাতে সেদেশে
সৈন্য পাঠাচ্ছে। এটাও একটা
দাত্রাভ্যাবাদী কার্য। মাকিনী সি
আই এ চক্রের মতো রাশিয়াও কে
জি বি-র মাধ্যমে আজ পৃথিবীর
বিভিন্ন দেশে স্বপ্ন চক্রান্তে লিপ্ত।
রাশিয়ার চক্রান্তের মূল্য দিতে হয়েছে
চেক জনগণকে ও চিলির জনগণকে।

বাজেটের

রবি গুহরায়

প্রথমেই বলে রাখি আমাদের এ লেখার উদ্দেশ্য এ বছরের পশ্চিম বাঙালার বাসগছা সরকারের বাজেটকে নিন্দা করা নয়। এই বাজেটের ফলে চলতি বাজার দরের উপর এ সম্বন্ধে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করাও আমাদের উদ্দেশ্যই নয়। আমরা এই বাজেট প্রচার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করব।

এবারের রাজ্য বাজেটে সামান্য
বাটতি দেখানো হয়েছে। আমাদের
ধারণা অর্থমন্ত্রী ইচ্ছা করলে বাজেটকে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুটা উদ্ভূত অবশ্যই
দেখাতে পারতেন এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই। আমরা মনে করি
অর্থমন্ত্রী যদি উদ্ভূত বাজেট পেশ
করতেন এবং অনেক প্রকার জিনিসের
উপর থেকে যদি কর তুলে দিতেন
তবুও সোণ্যপণ্যের সামগ্রিক দামের
উপর তার কোন অসুস্থ প্রতিক্রিয়া
হত না। অর্থাৎ দর দাম কিছুদিন
স্থিতিশীল থাকতে পারে, কিছু
কমবে না। বাজেটের সঙ্গে সম্পর্ক
রহিত পণ্যের দাম কেন বাজেট পেশ
হওয়ার পরে বেড়ে যায় এটা আমরা
বুঝতে পারি না। বাজেটে বাটতি
হোক অথবা উদ্ভূতই হোক প্রাচীর
বৎসর এই বাজেটের মানে সরকার
করের আওতার প্রতিটি জিনিসের দাম
কিছুটা বাড়বে এবং তার সঙ্গে আ

আফগানিস্থানের ব্যাপারে রাশিয়া বলছে যে, কমতানীন সরকারের অনুরোধেই রাশিয়া সেখানে সৈন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, তৎকালীন কমতানীন সরকারের প্রধান মহম্মদ হাকিমজা আমিনের আমলেই রাশিয়া কাবুলে সৈন্য পাঠায় এবং তার কিছুদিন পর আমিন কমতানীন হন। তবে কি ধরে নিতে হবে যে আমিন তার নিজের সরকারের পতনের জন্যই কশ্মির সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সুতরাং ভবিষ্যতে বাবরাক কারমালও যদি নয়া জারদের যথাযথ দাপট করতে না পারে তবে তার ভাগ্যও তারাকি আমিনের পরিণতি ঘটবে। আসল কথা ভাড়াটে নেতা দিয়ে কোন দেশের স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখা যায় না।

পক্ষান্তরে চীন কিন্তু কোন সম
য়েই অল্প দেশের আভ্যন্তরীণ

পাচটা সাধারণ জিনিষের দ্বারা
 বাড়বে। সাধারণ নাগরিক এই দর
 বেড়ে যাওয়ার দরকারী বাজেট
 নামক এক জটিল ক্রিয়াকলাপকে
 দারী করে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের
 বাজেটকালীন দরবৃদ্ধির শিকার হয়।
 দরকারী এই বাজেট পেশ প্রথ
 কালোবাজারী কারবার পদ্ধতির এক
 প্রকার নৈতিক সমর্থন হিসাবে কাজ
 করেছে। কোন কোন পণ্যের উপর
 অধিক পরিমাণে উৎপাদন শুদ্ধ অবস্থা
 অপর কোন রকম করা বদান হতে
 পারে এটা ব্যবসায়ীরা অনুমান করে
 নিয়ে বাজেটের আগের উৎপাদিত
 মাল চেপে রেখে সেটা বাজেটের পরে
 ছেড়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা
 লুটে নিতে পারে।

সরকার নিজের সংসার চালাবার
কিকিরটা জানেন কিন্তু বাজার দরের
উপর সরকারের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ন
থাকায় ফলে সাধারণ নাগরিককে
চোরাবাজারীদের হাতে আর খেতে
হয়। মন্নিমশাই সরকার চালাবার
বাংলাদেশের খবরের বাজেট পেশ করেন
খালিদ, তারপরে বাজারে কো
জিনিসের কত দাম বাড়লো, কে
বাড়লো তার দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে
সরকারের কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা
আছে বলে আমরা টের পাই না।
কোন জিনিসের বেশী দাম চাইলে
দোকানদারকে যদি প্রর করা হয়

ব্যাপারে নাক গলান নি। যদি সেই
ইচ্ছা তার থাকতো তবে বহুদিন
পূর্বেই সে বলপূর্বক তাইওয়ান দখল
করতে পারতো। অথবা পাকিস্তানে
পূর্ববাংলার ব্যাপারে কয়েক ভিত্তিশি-
লৈক পাঠিয়ে দিতে পারতো, এমন
কি ভিয়েতনাম কম্পুচিয়ার বিবাহে
চীন শুধু নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে
এবং শেষ পর্যন্ত সার্বাজিক সাম্রাজ্য
বাদীদের ক্রীড়নক ভিয়েতনাম যখন
চীনের সীমানায় একতরফা উন্মাদনা
মূলক আক্রমণ চালানো তখন
বেয়াড়া ভিয়েতনামকে একটু শাসন
করেছে মাত্র।

সুতরাং 'চীন সাম্রাজ্যবাদীদের মনত হচ্ছে' একথাটার মধ্যে মূলত সাম্রাজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পৃথিবীর কোন মুক্তিকামী জনগণই রাশিয়ার অবাঞ্চিত অস্তিত্বাবক্ষণ মেনে নিতে পারেনা। সেটা কাবুলের ক্ষেত্রে যেমন সত্য অল্প দেশের ক্ষেত্রেও সেটা একই ভাবে প্রযোজ্য। সত্য কারণেই কাবুলের বীর জনগণ নয়া জার তার পোসা দালালদের সশস্ত্র ভাবে প্রতিহত করছে।

তাহলে সে সোজা বাজেটের কথা বলবে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না সিগারেটের উপর ট্যাক্স বসলে তাহার তারের দাম কেন বেড়ে যাবে। মদের উপর ট্যাক্স বসলে দরবেহ তেলের দাম কেন বেড়ে যাবে। জিনিসপত্রের দাম তো! এমনিতাই বেড়ে যাচ্ছে তার উপর এই বাজেটের উপাত্ত।

প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের পর আবার আগছে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের বাজেট। তাতে আবার এক প্রস্থ নানা জিনিসের দাম বাড়ানো অজুহাত ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করা হবে। একদিকে সরকার আবার একদিকে ব্যবসায়ীরা এই হুঁই গোষ্ঠী মাঝখানে পড়ে আমরা গরুচোর বলে গেছি। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মাংস, তেল, মশলা, চাল, ডাল, আলু, ছন, চিনি, কাপড়, বাই কিনতে বাই না কেন আজকে একদাম, আবার কাল আবার একদাম। সবই বাড়তির দিকে এই দাম বাড়ার বাজেটেরও একটা ভূমিকা আছে, এটা কি করে বন্ধ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বায় সরকার একটি
পরিচ্ছন্ন প্রশাসনিক যোগ্যতার পরিচ-
 দিয়ে কাজ করছেন তাই পশ্চিমবঙ্গে
জনগণ তাঁদের সমর্থন করে যাচ্ছেন
বাহ্যলীয়া বিশ্বাস করে আর বা

রাশিয়া আজ এশিয়ার বিভিন্ন
মুক্তিকামী দেশগুলিতে জনগণতান্ত্রিক
বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য সেইসব
দেশের কিছু তথাকথিত জাতীয়
নেতাদের দ্বारे একটা পেটোয়া পর-
কার তৈরী করার চেষ্টা করছে এবং
লারা বিশ্বকে বোঝাতে চাইছে যে
সেখানে সত্যিকারের গণবিপ্লব
হয়েছে। এভাবে হাজারো চেষ্টা
করেও রাশিয়া শেষ রক্ষা করতে
পারছে না। কাবুল, পূর্বপাকিস্তান,
চিলি, কাম্পুচিয়া, কিউবার যা
হয়েছে সেটা নিছক সামরিক অত্যা-
খান ছাড়া আর কিছু নয়।

সুতরাং বিশ্বাসঘাতক বাবরাক
কায়মালকে দিয়ে কাবুলে যতই
চক্রান্তের জাল রাশিয়া বিস্তার করুক
না কেন আফগানিস্থানের বীর
স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ তাদের স্বাধী-
নতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বীরত্বপূর্ণ
সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন যতদিন না
তারা সত্যিকারের পূর্ণ বিজয় অর্জন
করতে পারছেন। চেয়ারম্যানের
ভাষায়, “দেশ চায় স্বাধীনতা, আভি
চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব।”
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

বাজেটের বেড়াজাল ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব

রবি গুহরায়

হোক এরা জনতার দুঃখ ঘোচাতে
 নিজেদের বিবেকের কাছে প্রতিশ্রুতি-
 বদ্ধ। জনতার পরমা লুটে
 খাবার লোক এরা নন। এটাই শেষ
 আশা। এবারের বাজেট প্রস্তাবের
 বক্তৃতায় আমাদেয় অর্থমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ
 সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়
 কথা বলেছেন। আমরা মনে করি
 এই প্রস্তাব অত্যন্ত লমবোপযোগী
 হয়েছে। যদি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ
 সরকার এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে
 পারেন তাহলে আমরা আশা করব
 রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক নানচিহ্ন
 পার্টে বাবে এবং আজকের বায়ড্রস্ট
 সরকার ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়
 হয়ে থাকবেন।

আমরা প্রস্তাব করছি তারা এক-
তরফা দিকান্ত না করে বাঙালী বুদ্ধি-
জীবীদের কাছ থেকে এবং প্রথ্যাত
অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে একটা
প্রকৃত জনকল্যাণমূলক ব্যাঙ্কিং
ব্যবসায় পরিকল্পনা আহ্বান করুন।
শেষে সরকারী ব্যাঙ্ক একটা হরির
লুটের কারবার না হয়ে পড়ে, তাহলে
কিন্তু কেউ আমানত গচ্ছিত রাখতে
ভয়দা পাবে না। বাঙালার ভবিষ্যৎ
অর্থনীতি এবং জাতীয় সম্মান নিয়ে
যে সব পত্রিকাগুলি লেখালেখি
করছেন তাঁদেরও এ বিষয়ে বিপুল
দায়িত্ব রয়েছে এবং তার লজ্জা এখনই
উভোগী হওয়া উচিত বিবেচনা
করি।

আফগানিস্থানে সোভিয়েত ভূমিকা

শতদল সেন

অতিবিপ্লবী আর প্রতিবিপ্লবী দুই সমাজ ভাই। লেনিনের মতে এরা আকারে সাদৃশ্যে পরস্পর বিপরীত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এরা একই মূল্যের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। না আমি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক অধিবেশনে চারজন মাও আমলের পলিটবুরো সদস্যের (এর মধ্যে উ-তে প্রমুখ রয়েছেন) বহিষ্কার এবং লিউ শাও চির দোষাকালন ও পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি না। কিংবা আমাদের দেশের অতিবিপ্লবীদের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর কোন না কোন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে চলারও উল্লেখ করতে চাই না। ও তো পুরনো কথা। তারা নিজেরাই অনেক ভুল স্বীকার করেছে ন। তাদের প্রেরণা ও আদর্শবাদের উৎস চীনও স্বীকার করেছিল। কিন্তু অল্পদের জন্ত, নিজের জন্তে নয়।

১৯৭১ সালে বাং লা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তান অঞ্চলটা রক্ষার অঙ্ক হাতে সামরিক একনায়ক ইয়াহিয়া খানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। সঙ্গে ছিল সারা ছনিয়ার বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকসন ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে বিমানবাহী রণতরী বহর পাঠিয়ে ভারত ও বাংলাদেশকে ভয় দেখিয়েছিল, এমন কি দৈন্ত অবতরণেরও মহড়া দিয়েছিল। পরের বছরই এই ভাবগত সাদৃশ্যের সাক্ষী হিসেবে নিকসন চীনে গেলেন।

আজ আবার আফগানিস্থান নিয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এবারেও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যমণি 'আমেরিকা' এবং মহাচীনের রাষ্ট্রনায়কেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের তথাকথিত হস্তক্ষেপের অভিযোগে মুখর। শুধু মুখরই নয়, পাকিস্তান ইরান ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রকে ধর্মের স্বত্বাধি দিয়ে আফগানিস্থানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অর্থাৎ আবার বাংলা দেশ লড়াইয়ের সময় যে আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল, পুনরায় তারই শক্তিশালী পুনরাবর্তন ঘটছে। আফগানিস্থানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নিজেদের সাহোপাদদের পন্থে আসরে অবতীর্ণ।

বলা বাহুল্য সংশোধনবাদী সোভিয়েত নেতারা আফগান বিপ্লবের

পক্ষে দাঁড়াতে অনেক ইতস্তত করে অবশেষে পাক-মিশর হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত মুহূর্তে আফগানিস্থান সরকারের আহ্বানে সামরিক শক্তির সাহায্য দিতে বাধ্য হয়েছেন। সংশোধনবাদী নেতাদের আন্তর্জাতিক উদ্বেজনা প্রশমনের একপেশে নীতি অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখে যুক্ত এড়ানোর আগ্রহ শেষ পর্যন্ত তাদের ব্যর্থতাই ভেঙে এনেছে।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারের ভাষা-ডোলে একথা সর্বদাই চেপে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্থানে চিলির ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্তে চেষ্টা করছিল। আমেরিকার এই চুক্তি পাকিস্তান এবং মিশর একযোগে কাজ করছিল। পাক-আফগান সীমান্তে মিশরীয় ও পাক সামরিক উপদেষ্টারা তথাকথিত 'আফগান বিদ্রোহীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল এবং সর্বাধুনিক অস্ত্র-শিক্ষা দিয়ে তাদের আফগানিস্থানের অভ্যন্তরে পাঠাচ্ছিল। আফগান মোজাতিহ এবং অভিজাত জমির মালিক শ্রেণী এই বিদ্রোহীদের পুরো-ভাগে ছিল কারণ আফগান গণতান্ত্রিক বিপ্লব নির্ধারিত কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিয়েছিল, নারী মুক্তি এবং শিক্ষাপ্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিল এবং শোষিত আফগান জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। চিলির আলেন্দে সরকারও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে শোষক শ্রেণীর বিরোধভাজন হয়েছিল এবং আজ আমরা জানি চিলিতে সরকারি মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে কি ভাবে সেখানে দ্যামিস্ত সামরিক জুটো বিনোচেস্ত সরকার কমতা ধ্বংস করেছিল।

আফগান প্রেসিডেন্ট নূর মহম্মদ তারাকি পাক-মিশর-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মিত্র রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু দ্যতাতের মরীচিকা সোভিয়েত সংশোধনবাদী নেতাদের এমন আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল যে তারা সময় মত সামরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসতে বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে নূর মহম্মদ তারাকিকে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত যখন পাক সেনাদল বেসামরিক পোশাকে আফগান বিদ্রোহী সেনা আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে ব্যাপক হামলা চালাতে শুরু করে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফ-

গানিস্থানের গণতান্ত্রিক সরকারের পুনঃ পুনঃ আবেদনে সামরিক সাহায্য পাঠাতে বাধ্য হয়। আফগানিস্থানের বিপ্লবকে চিলির পথে ঠেলে দেওয়া তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর পরই শুরু হয় কার্টারের সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি আর ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে মার্কিন সশস্ত্র শক্তির সমাবেশ।

কোন কোন ধুরন্ধর বিপ্লবী সোভিয়েত সামরিক সাহায্য চাওয়ার পেছনে আফগান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দুর্বলতার জন্তে -খেদ প্রকাশ করে প্রকারান্তরে আফগান বিপ্লব সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তারা বোঝাতে চান বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার আগেই আফগানিস্থানে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা ঠিক হয়নি। তাই তাদের বিদ্রোহী সাহায্যের জন্তে হাত বাড়াতে হয়েছে। আপন শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করার শক্তি তাদের হয় নি। সুতরাং তাদের মতে আফগান বিপ্লবের পক্ষে সোভিয়েত সামরিক সমর্থন না চেয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়াই ঠিক ছিল।

অনেকেরই কিউবা বিপ্লবের ঘটনা মনে আছে। সেখানেও ক্যানিস্ত বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে ফিদেল ক্যাস্ত্রোর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। পরে কিউবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন তখন একযোগে কিউবাকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং এই সমাজতান্ত্রিক সাহায্য লাভ করে কিউবার মত ক্ষুদ্র দেশও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনতিদূরে অবস্থান করেও টিকে থাকতে পেরেছে। এমন কি কিউবার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে গিয়ে ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬২ সালের বে অব পিগস-এর ঘটনা বাদে মনে আছে তারা স্বীকার করবেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন সঠিক ভাবেই কিউবাকে সমর্থন করার ঝুঁকি নিয়েছিল। আজও মার্কিনী সি আই এ এবং সরকার আফগান বিদ্রোহীদের অস্ত্র সাহায্য করছে। মার্কিন সহঃ পররাষ্ট্র সচিব হোল্ডেন তা স্বীকার করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে অবস্থান

অর্থনীতি অভিনন্দনযোগ্য বাজেট

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৮০-৮১ সালের বাজেট সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'অভিনব'। 'পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেও জনসাধারণের কয়েকটি আন্তঃপ্রয়োজন মেটানোর দিকে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র এক অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শক্তিমিত্র নির্বিশেষে কেউই বাজেটের এই অভিনব ব্যবস্থার একপেশে বিরোধিতা করতে পারেন নি।

অভিনব, কিন্তু সমাজতন্ত্রের নকল চাতুরী বাজেটে নেই। তাই এই অভিনবকে আরো বিস্তারিত ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রের' মোড়কে ঢাকা পুঁজিবাদী বাজেট দেখতেই অভ্যস্ত। এত দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এসব কথাই মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই বছরের বাজেটে সমাজতান্ত্রিক ভাব নেই; যা আছে তা হল সরল, সত্য ভাষণে সমাজের ক্ষতগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ এবং সাধ্যমত সংকীর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা ঘোষণা।

ভারতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্বর্ধীর্ঘকালের কংগ্রেসী শাসনে আমরা সাধারণ মানুষ কতবার গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্রের গালভরা প্রতিশ্রুতি শুনেছি, কখনো হয়তো বিশ্বাসও করেছি। কিন্তু পরে পুঁজিবাদী প্রতারণা আমাদের নৈরাজ্যে আচ্ছন্ন করেছে। আমরা হয়তো এর ফলে সত্যতা এবং তথ্য সন্ধান সম্পর্কেই ভরসা হারিয়ে ফেলেছি।

পশ্চিমবঙ্গের এই সরকারী বাজেট আমাদের আবার সেই ভরসা ফিরিয়ে দিল। আমরা এখন বিশ্বাস করতে পারবো যে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেও একটা সংগঠিত বিধাসী সরকার দায়িত্ব সীমার সব নীচুতে অবস্থিত করে যাওয়া জীবন-গুলিকেও আশার উজ্জ্বল করতে পারে, ভরসার ভরপুর করে তুলতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার এবারের বাজেটে যে কয়েকটা নতুন জনহিতকর ব্যবস্থা নিয়েছেন তার যে কোন একটি ব্যবস্থাও গত বর্ষের বছরের মধ্যে কোন রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার নেয় নি।

এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বিনামূল্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা, গ্রামীণ মধ্যবিভদের স্বার্থের সঙ্গে বর্গাদারদের স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধন, রক্ত শিল্পগুলির জন্তে কেন্দ্রীয় সাহায্যের একান্ত মুখোপেক্ষী না থেকে রাজ্যের নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ, পেনশনভোগীদের পেনশন বৃদ্ধি, গ্রামীণ কৃষকের জন্তে পেনশন ব্যবস্থা, পকারেতী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থকরী কসলের ত্রাণ দান দেওয়ার ব্যবস্থা, রাজ্যের নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব,—এগুলি সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

এখাবতকাল বাজেটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নাকীর যোগ থাকতো না। বাজেট বলতেই সাধারণ মানুষের মনে বিভীষিকা সঞ্চার হতো। আর মুনাফাখোরা প্রবৃত্তি উল্লাসে নৃত্য করতো। কেন্দ্রীয় বাজেট, কি রাজ্য বাজেট গত বর্ষের বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে এগুলি মাত্র আরো টাটকা বসানোর শোষণযন্ত্র ছাড়া আর কিছু বলে মনে হতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত তিন বছর ধরে এই ধারণা ভাঙতে শুরু করেন। সীমিত ক্ষমতার দীর্ঘাবস্থার মধ্যেও যে সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণকে একাত্ম করা যায়, তাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের সামান্য উপসম ঘটানো যায়, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তা প্রমাণ করলেন।

শুধু তাই নয়। বামফ্রন্ট সরকার সামান্য অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করে ভবিষ্যত অগ্রগতিকেও স্বাধীন করেছেন। যদি দেশের দরিদ্রতম মানুষেরা এই দরদেব পরিচর পেয়ে ভরসা ও আশাবান হয়ে ওঠেন তাহলে আগামী দিনে তারা আরো দৃঢ়তায় জীবন ও জীবিকার জন্তে হাত প্রসারিত করবেন। পুঁজিবাদী সরকার এই প্রত্যাশা কোনদিনই পূরণ করতে পারবে না কারণ তাদের তাইচ্ছে নয়। মানুষের মনে যে নৈরাজ্য ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার তা দূর করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি ও সাহস এনে দিতে পেরেছেন। ভাগ্য ও ভগবানের রহস্যময় সীলার খেলা থেকে তাদের একেবারে মুক্ত করেন নি বটে, কিন্তু তারা বাধনের দড়ি অনেকখানি শিথিল ও ছিন্ন করে দিয়েছেন।

শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৪)

ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী

অজুন দাস

আমরা ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের অহুচরদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গের খানিকটা আভাস প্রদান করেছিলাম। এই প্রতিক্রিয়া মূলতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকে কেন্দ্র করেই সংগঠিত হয়েছিলো। সেদিন দশম পূর্ব বাঙলার গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করতেন ছাত্র সমাজ—যার পেছনে প্রেরণা যোগাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই হিসেবে একথা সহজেই অস্বীকার করা যায় যে, এই অবস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজের একটা অংশেরও বিরাট ভূমিকা ছিলো। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রশিক্ষকদের অশেষ নির্ধারনের মুখো মুখি হতে হয়েছিলো। সরকারের তরফ থেকে যেমন এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গৃহীত হতো, তেমনি সরকারের লেলিয়ে দেওয়া ছাত্র সমাজও কম যেতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক শারীরিক নির্ধারনেরও শিকার হয়েছিলেন, এমন প্রমাণও আছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে বাইরের গুণ্ডাও লেলিয়ে দেওয়া হতো। ফলে বহু শিক্ষকে জীবন এ জীবিকার ভয়ে কখনো কখনো সামাজিক নিরাপত্তার ভয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলো। এই আত্মসমর্পণের স্রোত কি গতিতে সেদিন পূর্ব-বাঙলার বুদ্ধিজীবী সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তা আজ অনেকের পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আমরা এই সিরিজে তার কিছু কিছু আভাস প্রদান করেছি।

এই স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে না দিয়ে যারা অকুতোভয়ে নিজ নিজ ধ্যানধারণা, চিন্তা ভাবনা ও জনমানস নির্ধারিত মাহুষের সামনে উঠিয়ে ধরেছিলেন, তাঁদের ভেতর ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন কৃষি শিক্ষক হিসেবে তিনি সেদিন আপন দায়িত্ব পালনে যেমন পিছপা হননি, তেমনি অপরকে দায়িত্ব

সচেতন করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। ফলে সরকার সর্বদাই তাঁকে সম্মেলনের চোখে দেখতেন এবং বিভিন্ন প্রকার নিয়ম-তান্ত্রিক স্বযোগ স্ববিধে থেকে পর্বস্ত তাকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতি বিভাগের ব্রীডার হিসেবেই তাঁর বশ ও সুনামের সূচনা। ১৯৬২ সাল থেকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলনের সূচনা হয় তাতে তিনি তাত্ত্বিক সমর্থন প্রদান করেছিলেন। এই সময় স্বাধীনতাকামী ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের কাছে এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর নাম সহজে উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাদের একটা বিকল্প পছন্দ অবলম্বন করতে হয়েছিলো। তিনি ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচিত মহলে 'ম্যাক' স্তার (M.A.C.) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্বস্ত রাজনৈতিক ও ছাত্রসমাজ যেসব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তার পেছনে ম্যাক-স্তারের অবদান। তখন অর্থনীতিবিদরা যেমন বৈত-অর্থনীতি-তত্ত্ব (Two Economy Theory) আবিষ্কার করে পূর্ব-বাঙলার জন্তে আলাদা অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের দাবী জানান, তেমনি রাজনীতি বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাঙলার স্বাভাবিক কথ্য ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা বোষণার ফল হলো ঐতিহাসিক ছ দফা (six point) — ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে কর্মসূচীর মাধ্যমে জয়লাভ করেছিলেন। ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী এই ছয় দফার রূপকারদের একজন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সত্যিকার কর্মধারা সূচিত হয় ১৯৭১ সালের পরে। ১৯৭১ সালে অনেকের মতো তিনিও দেশত্যাগ করেছিলেন। ভারতে থেকে বাঙলাদেশের সপক্ষে জনমত গঠন করার ব্যাপারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, তিনি এই সময় বিশ্বের

বিভিন্ন স্থানও পরিভ্রমণ করেন। এই একই উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ ও জাতি গঠনের যে চাকল্য সৃষ্টি হয়েছিলো, তাতে চৌধুরী সাহেবের দান মৌলিক ও বিরাট। তিনি এসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগদান করেন। উপাচার্য হিসেবে যোগদান করে তিনি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পুরনো সমস্যাবলী সমাধানে মনোনিবেশ করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি সফলতাও অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার পর সরকার তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (U.G.C) চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করেন। এই পদে নিযুক্ত হবার সংগে সংগেই তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশের সব কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেন এবং সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন। এইসব আলাপ-আলোচনার তিনি ছাত্র সমাজের আবাসিক সমস্যার প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করেন। তাঁর সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

তাঁর এই কর্মপ্রণালীকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। তাঁকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেদিনকার রাষ্ট্রপ্রধান, নবগঠিত বাংলাদেশের (বাঙলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হয়েই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে পুনর্গঠনের সূচনা করেন। এই পুনর্গঠনের কাজ শুরু হতে না হতেই এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন এবং শেখ সাহেবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় অনেকের সংগে জমার চৌধুরীও যোগদান করেছিলেন। কিন্তু অচিরে সেই মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে এবং ডঃ চৌধুরী নবায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালেই ১৯৭৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

শিক্ষক হিসেবে ডঃ চৌধুরীর সাকল্য অবিসংবাদিত। তাঁর অসীম জনপ্রিয়তার পেছনে এই সাকল্য যে বহুলাংশে কাজ করেছে তা বলায় অপেক্ষা রাখে না। ডঃ চৌধুরী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার ভেতর পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থানা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে।

অভিনন্দনযোগ্য বাজেট

৫ম পৃষ্ঠার পর

গরীব কৃষক ও ক্ষেত্রমজুর সারা জীবন জমি চাষ করে কসল কলিয়েছেন। সারা জীবন কষ্টে কাটিয়েছেন তার পর জমি হারিয়ে উপায়হীন নিঃশেষে পরিণত হয়েছেন। এদের হৃৎকমর জীবন হয়েছে শরণচক্রে তারা-শ্রমের উপত্যাকার উপকরণ। সমাজের অসহায় খামিহীন বৃদ্ধা পেনশনভোগী বৃদ্ধ অক্ষম, বয়সের ভারে নাজদেহ কৃষক কেউ বায়ফ্রট সরকারের কাছে বাতিল মাহুষ নন। সমাজে তাদেরও স্বীকৃতি আছে। তাই তাদের স্বীকৃতির মনুনা হিসেবে সামান্য হলেও পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্রামশহরের মধ্যবিত্ত সামান্য কৃষি জমির মালিকদের অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। ভূমিহীন কৃষকেরা ছিলেন দীর্ঘদিনের শোষণে জর্জরিত 'অপারেশন বর্গার' কর্মসূচী প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেল অল্প জমির মালিক গ্রামের মধ্যবিত্ত, গরীব বিধবা, বুদ্ধিজীবী এবং শহরের চাকুরী বড় করণিক, পিয়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও অনা-অজানা বহু মাহুষ আগ্রহগ্রস্ত। জমিতে বর্গারব্বের অর্থ তারা সহজে বাজার দামে জমি বিক্রী করতে পারছেন না। অথচ নানা প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের একমাত্র স্রস্কা তাদের ঐটুকু জমি। বঙ্গবাহুল্য বহু কালের সামস্ত শোষণের ফলেই সমাজে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। শোষিত মাহুষেরাও পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। শোষকদের প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি এর সুযোগ নিয়ে শোষিত জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। বায়ফ্রট সরকার এর প্রতিকার করেছেন। এবারের বাজেটে মধ্যবিত্ত স্বল্পবিত্ত মাহুষেরা বাতে বর্গারব্ব সত্ত্বেও জমির জ্বাধ্য দাম পাম তার জন্তে একটি জমি কেনাবেচার সরকারী এজেন্সী গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজন মত এই এজেন্সী জ্বাধ্য দামে বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের জমি কিনবেন তবে জমির মালিকদের ১ থেকে ১৬ হেক্টর বেশী জমি (সাড়ে সাত বিঘা থেকে লাড়ে দশ বিঘার বেশী) থাকলে হবে না। আগামী দিনে কম জমির মালিক বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী ও মজলহীন মাহুষের পক্ষে এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

বিনামূল্যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, বিভাগে বিনামূল্যে টিফিন, খাতা, বই এবং অল্প বৃত্তি মঞ্জুরী সাধারণ অভিজাতবাদের পক্ষে আশাতীত সাহায্য। আর্থিক মূল্যও এর

অনেক। সামাজিক মূল্য ততোধিক। শুধু এই একটা পদক্ষেপ গ্রহণের জন্তেও বায়ফ্রট সরকার মাহুষের প্রজ্ঞা ও ভালোবাসা অর্জন করবেন।

অর্থমন্ত্রীর অন্ততম অভিনব ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের একটি নিজস্ব সরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলি এবং সরকারী লবী প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিমবঙ্গকে সম্মোচিত সহায়তা দানে উৎসুক নন। দেখেই অর্থমন্ত্রী এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫০ কোটি টাকা আমানত রয়েছে। এই আমানত একটা বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির এত নিজস্ব মূলধন নেই। সুতরাং আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী এই ধরনের একটি ব্যাঙ্ক রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, শিল্পায়নে এবং ছোট ছোট শিল্প ব্যবসায় মালিকদের প্রকৃত সাহায্য করতে পারে। এর ফলে কেন্দ্রীয় মুণাপেক্ষিতা অনেকখানি হ্রাস পেতে পারে।

বঙ্গবাহুল্য শোষকশ্রেণীর কাছে এই ধরনের দস্তাবনা কটিকর হতে পারে না। তাই কারেমী বা প্রতিনিধিরা এর বিরূপ সমালোচনার মুখর হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু বায়ফ্রট সরকার এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাদের সাধ্যায়ত্ত থাকবে না। অত্যন্ত রাজ্যও এই মহৎ দৃষ্টান্ত অস্বীকার করবে। জনগণ একে শুভ কামনা ও অভিনন্দন জানাবেন।

নতুন কর আরোপের ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রীর বাজেট অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় দিয়েছে। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন জিনিসের দাম বাড়বে না। মদ লিগারেট-এর দাম কিছু বাড়বে বটে কিন্তু রেশনে যে সকল পণ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে তার ফলে সাধারণ মাহুষের সাধর হবে অনেক বেশী। চা বাগানগুলির উপর যে ট্যাক্স বসেছে তার জন্তে, চায়ের দাম বাড়বে না, কারণ এই ট্যাক্স আরকরের স্থান গ্রহণ করেছে। এসব সত্ত্বেও রাজ্যের ঘাটতি হবে মাত্র ২৩ কোটি টাকার মত। সম্ভবতঃ এ ঘাটতিও থাকবে না।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও জনসাধারণের স্বরদ্বী একটা রাজ্য সরকার যা করতে পারে কংগ্রেসী শাসকেরা তা ধারণায় আনতেও পারে না। কারণ কংগ্রেস এখন লুটপাট সমিতিতে পরিণত। লুটপাট সমিতির সহস্তর জনসাধারণের সম্পদ লুটপাট করে গিয়েছে। তাদের লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। মনে হয় আর কোন দিন ঐ স্বর্গরাজ্য তাদের হাতে পড়বে আসবে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিদ্বন্দ্বি হলেও না। এই বছরের বাজেটে আমরা জনগণের এই দৃঢ় সংকল্পেরই আভাস দেখতে পাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। জায় পরিচয় / ত্রিবিভূষণ তর্কবাগীশ / ১১০০

২। প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান / ত্রিপুরকুমার চক্রবর্তী / ১৫০০

৩৬, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে

সুধী প্রধান

আমার সম্প্রতি সম্পাদিত Marxist Cultural Movement in India—Chronicles and documents—1986-47 বইটির ভূমিকার সংস্কৃতি আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তারিত যে তিনটি উদাহরণ তৎকালীন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটির শেষ সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেন সম্পর্কে পেশ করেছিলেন তা পড়ে বে-সামাল হয়ে তিনি 'এপিক থিয়েটার' কাগজের ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আমাকে গালি-গালাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন।

তিনি যে আমার বইয়ের শিরোনাম থেকে শেষপর্ষদ কিছুই ভাল করে পড়েন নি তা আমার বইয়ের পাঠক মাজেই ধরতে পারবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের পাঠকদের জন্য একটি ৪০০ পৃষ্ঠা বইয়ের সব কিছু তুলে ধরা অসম্ভব। আমার পূর্বোক্ত ভূমিকায় আমি লিখেছি যে গণনাট্য সংঘের ইতিহাস সম্পর্কে ওদের প্রবন্ধে বতুল তথ্য দেওয়া আছে তা সংশোধন করতে একটা গোটা বই লেখা দরকার (আমার ভূমিকার ২৩ পৃঃ)। তাছাড়া ঐ ভূমিকার ১৫ পৃষ্ঠাতে লিখেছি 'পুরনো দিনের আরো কিছু তথ্য আমার বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দিতে হবে।

নিরঞ্জনবাবু তার 'ইতিহাসে' দাবী করেছিলেন যে তিনি প্রথম থেকেই গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটিতে আছেন। তার উত্তরে আমি লিখেছিলাম যে সে কথা সত্য নয়। গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটি তৈরী হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে এবং ঐ বছরের জুলাই মাসে উক্ত কমিটি থেকে প্রকাশিত এক নম্বর বুলেটিনে সর্বভারতীয় কমিটি এবং প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির নামের তালিকা ছাপানো হয়। আমার বইয়ে সেই বুলেটিন সম্পূর্ণ ছাপানো হয়েছে। তাতে সর্বভারতীয় কমিটিতে দ্বিতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সরলা গুপ্তের নাম আছে। আর সংগঠনী কমিটিতে তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি—যেখানে নিরঞ্জনবাবু বা দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তির নাম নেই (আমার বইয়ের ১৩২-১৩৩ পৃঃ)। গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় বুলেটিনে আছে যে দ্বিতীয় শাখা ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস গঠিত হল এবং নিরঞ্জনবাবু সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হলেন (আমার বইয়ের

২৬৮ পৃঃ)। নিরঞ্জনবাবু এখন লিখছেন যে "১৯৪৩ সালের শেষার্ধ্বে যে কমিটি মিটিং হয়" সে খবর নাকি আমি চেপে গেছি। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের শেষ তিন মাস থেকে তিনি পদাধিকার বলে দ্বিতীয় শাখার প্রতিনিধি হিসাবে সর্বভারতীয় কমিটিতে এলেন এই সংবাদ আমি চেপে গেছি। এতো আমার বইয়ে আছে—চাপলায় কোথায়? কিন্তু তার অর্থ কি তিনি প্রথম থেকেই আছেন বা একটি কমিটির সভার স্থির হয়? তিনিই বরং সরলা গুপ্তের নাম চেপে গেছেন। দ্বিতীয়ত: আমি বলছি যে ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের পূর্ব অর্ধাৎ দ্বিতীয় কমিটি গঠিত হওয়ার পূর্ব সর্বভারতীয় কমিটির কোন বৈঠক আদৌ হয়েছিল এমন প্রমাণ নিরঞ্জনবাবুকে দিতে হবে। কারণ কেবল তিনি নন আমার বইয়ের পাঠকরা জানেন যে দ্বিতীয় কমিটি তৈরী হওয়ার আগেই ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আমাকে বাংলা গণনাট্য সংঘের সংগঠন সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় এবং পদাধিকার বলে আমি নিরঞ্জনবাবু আগেই সর্বভারতীয় কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধি হয়েছি। আমার বইয়ে প্রকাশিত বুলেটিনগুলিতে কোথাও ১৯৪৩ সালের শেষের কোন বৈঠকের উল্লেখ নেই। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় কমিটির সে যুগে অত্যন্ত সক্রিয় যুগ সম্পাদক বিনয় রায় ১৯৪৩ সালের নভেম্বর থেকেই পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রাতে বাংলার সাংস্কৃতিক দলের অস্থান সেয়ে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় ফিরেছেন এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে অস্থিত বাংলার ক্যানিষ্ট বিয়োদী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনের প্রস্ততির জন্য কাজ করছেন। পাঞ্জাব সফরে যাওয়ার আগে অক্টোবরে তাঁদের দলবলের রিহাসাল কলকাতায় হয়েছিল। এই সফর সম্পর্কে বিনয়ের হাতে লেখা রিপোর্ট আমার কাছে আছে, যাতে অস্থানের তারিখ ও স্থানের নাম এবং লোক সমাগম ও সাহায্য প্রাপ্তির বিবরণ আছে। সে যুগে পেনে যাতায়াতের নিয়ম ছিলনা এবং গণনাট্য সংঘের এত অর্থও ছিলনা যে বিশেষ পেনে চড়ে বোম্বাই গিয়ে সর্বভারতীয় কমিটিতে নিরঞ্জনবাবুকে বসাবার জন্য ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বিনয়বাবুরা বোম্বাই সমবেত হবেন। কাজেই নিরঞ্জনবাবুর তথাকথিত

কমিটি মিটিং-এর কথা কল্পনা প্রস্তুত এবং সত্য গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা মাজ। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল যে নিরঞ্জনবাবুর বিবরণ মত তার চিঠির মারফত বিনয় রায়ের সঙ্গে হারীন চট্টোপাধ্যায়ের বোগাযোগ হয়নি। আমি সংবাদপত্রের সংবাদ থেকে প্রমাণ দিয়েছিলাম যে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে বিনয় রায়ের আলাপ হওয়ার আগেই বিনয় হারীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই একত্র সাংস্কৃতিক অস্থান করেছেন। অর্থাৎ নিরঞ্জনবাবু লিখেছেন: "বিনয়ের সঙ্গে আমি বোগাযোগ করে হারীনকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম যাতে উনি ছুটিসের ভয়াবহতার উপর গান এবং নাটকের বিষয়ে সেখান একটি স্কোয়াডকে পরিচালনা করতে পারেন।" (এপিক থিয়েটার, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)

হারীনবাবু যখন আগে থেকেই কলকাতায় রয়েছেন এবং বিনয়ের সঙ্গে কাজ করছেন তখন নিরঞ্জনবাবুর এই উক্তি কি একটি ভিত্তিহীন আত্মপ্রতিপত্তি নয়? নিরঞ্জনবাবু এখন বলছেন যে পার্টিমেম্বার হিসাবে তিনি বিনয়কে চিঠি লিখতে পারেন এবং কখন তিনি এই চিঠি লিখেছেন তা উল্লেখ করেননি। সময়ের আড়ালে যতই পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করুন নিরঞ্জনবাবুর লেখার জন্য হারীন বিনয় সংযোগ হয়েছে একথা প্রমাণিত হয় না। পাঞ্জাব সফরে হারীনের নেতৃত্ব সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এর জানুয়ারী মাসের সন্মুখ উল্লেখ না করে আমি কিছুই অত্যাচার করিনি। যে কোন পার্ঠক বুঝবেন যে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে অস্থিত সফর সম্পর্কে রিপোর্ট একটা সাপ্তাহিকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক, ১৯৪৩ সালের বা ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে নয়।

তৃতীয়ত: আমি লিখেছিলাম যে পাঞ্জাব সফররত বাংলা সাংস্কৃতিক দল পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা ছাড়া ইউপি, পিওর কোন শহরে অস্থান করেনি। নিরঞ্জনবাবু বিজ্ঞপ্তি করে জানতে চেয়েছেন "আগ্রা ইউপি, পিওর অস্থান" এই সংবাদ আমি রাখি কি না। ইংরাজী ভাষাতে আমার দখল যথেষ্ট না থাকতে পারে কিন্তু বাংলা তো কিছু কিছু বুঝি, কারণ জন্ম থেকেই এই ভাষায় কথা বলেছি। নিরঞ্জনবাবু তার তথাকথিত ইতিহাসে লিখেছেন: "বিনয় রায়ের

নেতৃত্বে বাংলা শাখা দেড় বর্টার প্রোগ্রাম নিয়ে উত্তর প্রদেশের কয়েকটি শহর (পাঠক লক্ষ্য করুন হুঃ প্রঃ) ভ্রমণ করল। আগ্রার রাজেন্দ্র সিং ঐ সব অস্থানের দায়িত্বে ছিলেন এবং বাংলা শাখার সঙ্গে মিলে উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শাখাও সাংস্কৃতিক অস্থানে বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ করে।" (এপিক থিয়েটার সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) আমি এই তথ্য তুলে বলে আমার ভূমিকার লিখেছি: "Harin was the trainer and led the cultural squad in Panjab and Agra, and not in other parts of the U. P. as stated by Niranjan" এখন পাঠকরা বিচার করবেন কে সত্য গোপন করতে চেষ্টা করেছে?

তাছাড়া আমার বইয়ে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত বিবরণে কোথাও এমন কথা উল্লেখ নেই যে বাংলার সাংস্কৃতিক দল পাঞ্জাব সফরের পূর্ব উত্তর প্রদেশের শহরে শহরে অস্থান করেছে। আমার ইচ্ছা আছে যে আমার বাংলা বইয়ে বিনয়ের হাতে লেখা পাঞ্জাব সফরের পূর্ণ বিবরণ ছাপিয়ে দেব, কারণ এই সফর ভারতে যে চাকল্য সৃষ্টি করেছিল তাতে বিনয়রা মধ্য ভারত ও বোম্বাই প্রভৃতি যায়গায় পরে সাংস্কৃতিক দল নিয়ে অস্থান করার প্রেরণা পান।

আমার বইয়ের আকার বৃদ্ধি পাবে বলে নিরঞ্জনবাবুর রচনায় তিনটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি এখন বলছেন যে আর কোন "ভুল" পাইনি বলেই নাকি আমি নিরন্তর হয়েছিলাম। আমি যে লিখেছিলাম সব ভুল সংশোধন করতে হলে একটা গোটা বই লিখতে হয় সে কথাটা তিনি চেপে গেছেন। তবু এই প্রবন্ধের পাঠকদের জন্য জানাই যে প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত সর্বভারতীয় কমিটির যে স্বল্প বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাও ভুলে ভরা। ১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাসের এপিক থিয়েটারের ২য় পাতায় তিনি লিখেছেন যে প্রথম সর্বভারতীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হলেন ত্রিবেণোবন্ত ঠাকুর ও লীকে, এ আব্বাস। অপর পক্ষে প্রথম সর্বভারতীয় বুলেটিন বা আমার বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে তাতে আছে প্রথম সর্বভারতীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হলেন—বিনয় রায় ও কে, টি চাণ্ডি। আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি প্রথম দিকের কোন দলিল নিরঞ্জনবাবুর হাতে নেই। তাই তিনি স্মৃতিকথার নামে কলকাতার কিছু মতলববাজদের পরামর্শে গালগল্প না কেঁদে অপেক্ষা করলে

বেতেন। তাতে কিছু লভ্যের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিশিয়ে ইতিহাস বিকৃতির কাজ জটিল করে রেখে যেতে পারতেন।

নিরঞ্জনবাবু নিজের অক্ষমতা গোপন করার জন্য বলছেন যে আমি গণনাট্য সংঘ ছেড়ে পালিয়ে 'স্বাধীনতা' কাগজে যোগ দিয়েছিলাম বলে আমার কাছে কোন কাগজপত্র নেই। নানা দলিলপত্র ছাপিয়ে আমি আমার বইয়ের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণ করে দেব যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আমি সে কালের গণনাট্য সংঘে ছিলাম। তবু এই প্রবন্ধের পাঠকদের জন্য জানানো দরকার যে কেবল গণনাট্য নয়, মার্কসবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে আমি ১৯৩৮ সাল থেকেই যুক্ত। নানা সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লেখা এবং দরদী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির মানিক 'গণশক্তি', সাপ্তাহিক 'আগে চলো', 'জনযুদ্ধ' এবং দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তা পার্টিগত। বস্তুত: ১৯৪৩ সালে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা সংশ্লিষ্ট পার্টি ইউনিটের সম্পাদক থাকাকালেই আমার উপর বাংলা গণনাট্য সংঘের সংগঠন সম্পাদকের ভার দেওয়া হয়। তখন আমি ক্যানিষ্ট বিয়োদী লেখক ও শিল্পী সংঘেরও সক্রিয় সদস্য। আর 'জনযুদ্ধ' পার্টি ইউনিট থেকেই পরবর্তী সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির ৪টি সাংস্কৃতিক ইউনিট গঠিত। কিন্তু গণনাট্য সংঘের দায়িত্বের সঙ্গে আমি 'স্বাধীনতা' পত্রিকার জন্য পুলিশের ছাড়পত্র সংগ্রহের ভার পাই। দৈনিক 'স্বাধীনতা'র বাংলা ও হিন্দি সংস্করণের প্রেস লাইনে বহুকাল আমার নাম ছাপা হোত, পরে সন্তোষ চ্যাটার্জীর নাম ছাপা হয়। আর তাই বাংলা গণনাট্য সংঘের সর্বকণের কর্মীদল তৈরী হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি পার্টি তহবিল থেকে ভাতা পেতাম। তাই বাংলা গণনাট্য সংঘের সর্বকণের কর্মীদল রাখার মত অর্থ সংগ্রহ যখন না করা গেল তখন আমি 'স্বাধীনতা' থেকে ভাতা পেতে লাগলাম। তার জন্য গণনাট্য সংঘ ও পার্টি এমো সি যেশ ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন প্ররই ওঠে না। ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত যে আমি গণনাট্য সংঘে 'নৌল দর্পণের' রিহাসাল দিছি একথা প্রমাণ করার যথেষ্ট লোক আছে জীবিত। যে 'শহীদদের ডাক' ছাড়া নৃত্যের কথা নিরঞ্জনবাবু বলেছেন তার প্রধান শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

সামরিক কতৃপক্ষের সঙ্গে জনৈক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকাল গেম

বোম্বাইবাসী এক সাংবাদিক সামরিক কতৃপক্ষের সঙ্গে "সাক্ষাৎকাল গেম" আরম্ভ করেছেন বলে বিখ্যাত-স্থানে জানা গেছে। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় উক্ত সাংবাদিক চাকরী করেন।

মটনার বিবরণে প্রকাশ উক্ত সাংবাদিক বোম্বাইয়ের কোলাবা সামরিক এলাকায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক স্ট্যাটে বসবাস করতেন। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাঁকে ঐ স্ট্যাট ছেড়ে দেবার জন্ত অহরোধ করেছেন। এটাই নাকি উক্ত সাংবাদিকের গৌসার কারণ। এই সাংবাদিক অবৈধভাবে তাঁর পিতার সহায়তায় এই স্ট্যাটটি বাগিয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মেজর জেনারেল এবং সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।

উক্ত সাংবাদিক সপরিবারে গন্ত

স্থান মাস বাত ঐ স্ট্যাটে বাস করতেন। এর আগে ঐ স্ট্যাটটি ছিল সাংবাদিকের মেজর জেনারেল পিতার নামে। তিনি অবসর নেবার পরেও স্ট্যাটখালি করতেন না দেখে অনেকেই উদ্ভটন মহলের কাছে অভিযোগ করেন এবং কারচুপি প্রকাশ হয়ে যায়। এখন ঐ সাংবাদিক সামরিক কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে রিট আবেদন করেছেন যাতে স্ট্যাট হস্তান্তরের বিষয়টি বিলম্বিত করা যায়।

সামরিক কতৃপক্ষকে হুকী দিয়ে উক্ত সাংবাদিক বলেছেন যে, সাংবাদিকের মাধ্যমে তিনি সামরিক কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে কুৎসা করবেন। তিনি যে সাংবাদিকের সঙ্গে যুক্ত তাতে ইতিমধ্যেই তিনি সামরিক কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো শুরু করেছেন বলে এরিয়া কমান্ডের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

উক্ত সাংবাদিকের সম্পাদককে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে কিন্তু তিনি উক্ত সাংবাদিক সম্পর্কে কি ব্যবস্থানেবেন সে বিষয়ে বিধাঙ্ক, কেন না উক্ত সাংবাদিক ঐ সাংবাদিকের মাগাজিন সেকশনের প্রধান।

আরও জানা গেছে যে, তাঁর পিতা মেজর জেনারেল পদে থাকার সময় সরকারীপদের অপব্যবহার করেছিলেন বলে কয়েকটি অভিযোগ ওঠে, ফলে তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর নিতে বলা হয়। সেই সব ঘটনার তদন্ত যাতে ধামাচাপা পড়ে এবং স্ট্যাটটি খাতে না ছাড়তে হয় সেই জন্তই উক্ত সাংবাদিক নানা কারদার সামরিক কতৃপক্ষকে বেকার-দায় ফেলার চেষ্টা করতেন। এই অভিযোগ কোলাবা সামরিক এলাকা কতৃপক্ষের।

এই ঘটনা জানতে পেয়ে বোম্বাইয়ের সাংবাদিকগণ একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করার কথা ভাবছেন। কেননা এই ঘটনা তাঁদের পেশার পক্ষে খুবই লজ্জাজনক বলে তাঁরা মনে করেন। এই সাংবাদিক ইংরাজী সাপ্তাহিক স্ট্রাইট প্রকাশকরছেন।

আফগানিস্তান

৭ম পৃষ্ঠার পর

আজ বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন করেছে। বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাহায্য করা সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শক্তিগুলির একান্ত কর্তব্য। লেনিন নিজেই বলেছেন, "অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঞ্জিবাদের অপরিহার্য নিয়ম। সুতরাং প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমন কি একটি রাজ্য দেশেও সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিজয় লাভ সম্ভব। বিশ্ব লাভের পর ঐ দেশের বিজয়ী সর্বহারাপ্রণী পুঞ্জিবাদ উচ্ছেদ করে এবং সাম্রাজ্যতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে, অবশিষ্ট পুঞ্জিবাদী ছিন্দিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ায়, অত্যন্ত দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক আত্মপক্ষের প্রতি আকৃষ্ট করে, ঐসব দেশে পুঞ্জিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রেরণা দেয় এবং প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দেশের শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।" (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড পৃ: ২৩২-৩৬ ও স্টালিনের লেনিন-বাদের সমস্যাবলী ইং সংস্করণ, মস্কো ১৯৫৮ পৃ: ১১৫)

সুতরাং আফগান বিপ্লবকে সামরিক সাহায্য দান প্রথম সাম্রাজ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শিবিরের পক্ষে লেনিনের অজ্ঞাত নির্দেশ পালন করা ছাড়া

অন্ত কিছু নয়। বিশ্বের প্রমিকশ্রেণী একত্র প্রচণ্ড আত্মত্যাগ করে প্রথম সাম্রাজ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ থেকে আত্মরক্ষার সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জয় থেকেই তার বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসী প্রমিক শ্রেণী জাহাজে অস্ত্র বোম্বাই এবং বন্দর থেকে যুদ্ধ জাহাজ ছাড়তে অস্বীকার করে প্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সবল পরিচয় রেখে-ছিলেন লেনিন তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। তখনও বিত্তীয় বিষয়বুদ্ধে ক্যান্সিস আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সাম্রাজ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাহায্য করার আন্তর্জাতিক প্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে স্টালিন অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধকে স্বপ্ন বলে স্বীকার করেছিলেন। আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান বিপ্লবকে সামরিক সাহায্য দিয়ে পাক-মিশর মার্কিন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে থাকে তাহলে এই স্বপ্ন শোধেরই নমুনা পাওয়া যায়। একে নিশ্চয় নয় বরং অভিনন্দন জানানোই উচিত।

অতিবিপ্লবী এবং অতিবিপ্লবীরা তা মনে করে না। যদি তারা আফগান বিপ্লবের চরমতা দেখেও তাকে সাহায্য করতো তাহলে আর্চর ঘটনা হতো। অতিবিপ্লবীরা আসলে অতি-বিপ্লবীদের মতই ভাববাদী। তারাও

বাস্তব ঘটনাকে পরিহার করে মনো-গত ধারণা নিয়ে চলে। ফলে তারা জঙ্গলের জন্তে গাছপালা দেখতে পায় না বা গাছপালার জন্তে জঙ্গল দেখতে পায় না।

মজার কথা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির ফলে এরা আত্মসমালোচনার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তারা স্বচক্ষে দেখেও বোঝে না কেন তারা জনগণের পরমশত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্লাহাঙ্ক হয়ে উঠেছে। আফগান বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের দেশেও অতি-বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবীদের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। প্রফুল্ল সেন-প্রতাপ চন্দ্রের সঙ্গে তথাকথিত কিছু কিছু অতি-বিপ্লবীও একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিবোধপার করে চলেছে। এদের বলার কিছু নেই।

কারণ রাজনৈতিক বিচারে এরা অপরিণতবুদ্ধি। মার্কসবাদকে এরা মস্ত-বাক্যে পরিণত করেছেন অথচ মার্কস-বাদ যে বাস্তবধর্মী আদর্শ তা বোঝারও তাদের অবকাশ নেই। বিচারবুদ্ধি রহিত হবার ফলেই তাদের অতীতে সহস্র ভুল হয়েছে, অভ্রম মূল্য দিতে হয়েছে। তবু তারা আত্মসমালোচনা ও ভুল শোধরানোর মার্কসবাদী পথে যান নি। বরং প্রতিবিপ্লবের আনন্দ বর্ধন করে তাদের নির্দিষ্ট পথেই পা বাড়িয়েছেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন

৭ম পৃষ্ঠার পর

সংগঠক শ্রীজ্ঞান মজুমদার এখনো বেঁচে আছেন এবং তিনি জানেন উক্ত ছাত্রানুত্তর প্রাথমিক পাঠ্যলিপি রচনা ও সংগঠনে আমার যোগাযোগের কথা।

কিন্তু এ সকল থেকে শুরুতপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, ১৯৫৫ সালে পশ্চিম বাংলা গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্মেলন থেকে একটি 'ইতিহাস কমিশন' নির্বাচিত হয়, যেখানে আমাকে 'কনভেনর' করে নিরঞ্জন সেন, নির্মল ঘোষ, দিগীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত ব্যানার্জী ও সঞ্জয় রায় চৌধুরী ছিলেন। আমি যদি পলাতক হব তবে আমাকে ঐ পদ দেওয়া হলে কেন? তারপর আমার কাছে নিরঞ্জন ও নির্মল বাদে আর সকলে তাঁদের লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। ওদের বারবার বলেও কিছু না পেয়ে অতঃপর লেখা ও আমার কাগজ পত্রের ভিত্তিতে ঐ সময়ের 'স্বাধীনতা'র শারদীয় সংখ্যায় আমি একটি প্রবন্ধ ছাপালাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে ওরা কেন নীরব রইলেন? কারণ ইতিহাস বিকৃতি তাঁদের তরফ থেকে তখনই শুরু হয়েছিল। ওদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু বিনি গণনাট্য সংঘে ছিলেন তার দ্বারায় সম্পাদিত সামরিকপত্র লেখানো হয়—'নবান্ন' নাটক নিরঞ্জন সেনের কর্ণধারত্বে অভিনীত হয়। পাঠকবর্গকে অরণ করানো দরকার যে নিরঞ্জন সেন সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক হওয়ার আগেই 'নবান্ন' লিখিত ও অভিনীত হয়।

নিরঞ্জনবাবু ১৯৬০ সালের পর-বর্তী সময়ের কিছু কিছু যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রজগদীশ বোধিকী কমিটিতে তার সঙ্গে আমিও ছিলাম এবং তিনি 'এপিক

থিয়েটার'কে যে সকল দলিল দিয়েছেন তার কিছু আমার কাছেও আছে। তাতে কি প্রমাণিত হয় যে এখনো সর্বভারতীয় কমিটি আছে এবং তিনি তার সম্পাদক আছেন? পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক তাবাপন সংস্কৃতি কর্মীরা জানেন ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের সময় যখন কমরেড মুজফফর আহমদ প্রভৃতিকে চীনের দালাল বলে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল, যখন প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভা জবজ্ঞ নাট্য নিরঞ্জন বিল বিধান সভায় পেশ করেছিল, 'কলো' নাটক আক্রান্ত এবং উৎপল দত্ত, জোহন দস্তিদার প্রভৃতিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শিল্পী ও জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল, রবীন্দ্র সদনের দ্বার উদ্বাটনের ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল এবং ১৯৭২-৭৭ সালে পশ্চিম বাংলার বুকে সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল সেখানে কিন্তু এই সর্বভারতীয় গণনাট্য নেতার টিকিটির চিহ্ন ছিল না। অপর পক্ষে পার্টির বাইরে থেকেও আমি আমার ক্ষুদ্র সাধ্য মত ঐ সকল প্রতিবে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকার চেষ্টা করেছি।

১৯৫৮ সালে তৎকালীন গণনাট্য সংঘ থেকে পদত্যাগ করার সময় তৎকালীন সংঘের সভাপতি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাসায় আহূত সভায় শ্রীজ্ঞানী লাহিড়ী বলেছিলেন আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করতে। জবাবে আমি বলেছিলাম নিরঞ্জন-বাবুদের মত লোকের পাশে বসে গণনাট্য সংঘের মহান আদর্শের কথা জনসাধারণকে বলতে আমার বিবেকে বাধে। আজ মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক চালানো আমার পক্ষে সময়ের অপব্যবহার।

ফরম ৪
(রুল ৮ দেখুন)

দর্পণ

- ১। প্রকাশের স্থান—৬১ মট লেন, কলকাতা-১৩
- ২। মূল্যাকরের নাম—হীরেন বসু
ভারতীয় নাগরিক ?—হ্যাঁ
ঠিকানা—১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭
- ৩। প্রকাশকের নাম—হীরেন বসু
ভারতীয় নাগরিক ?—হ্যাঁ
ঠিকানা—১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭
- ৪। সম্পাদকের নাম—হীরেন বসু
ভারতীয় নাগরিক ?—হ্যাঁ
ঠিকানা—১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭
- ৫। একমাত্র সত্বাধিকারী—হীরেন বসু
ঠিকানা—১৩/১ জহরলাল দত্ত লেন, কলকাতা-৬৭

আমি, হীরেন বসু এতদ্বারা ঘোষণা করছি উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিবর্তন মত মত।

হীরেন বসু
প্রকাশক

১লা মার্চ, ১৯৮০

চৌকিদার পিপরী গ্রামের ১৫০ জনের জীবন রক্ষা করলেন

২৫ তারিখ রাতে ঘটনা ঘটান সময় বখন পিপরী গ্রামের আশপাশ থেকে আগমনের জেলিহান শিখা চোখে ঝুপড়ে মাহুকের ক্রন্দন আর আতঙ্কিত কানে আসছে তখন হরিজনদের জীবন রক্ষা করার জন্য পাশের গাঁয়ের এক বৃদ্ধ চৌকিদারের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি আট কিলোমিটার হেটে গিয়ে রাত ছুটোর সময় নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন পুনপুনে পৌছান এবং সমস্ত ঘটনার

বিশদ বিবরণ দেন। কর্তব্যরত একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাব ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে তিনজন দপ্তর সিপাই সহ ঐ চৌকিদার পিপরী গ্রামের দিকে রওনা হন। রাত তিনটে তিরিশ মিনিটে ওখান থেকে মাইল খানেক দূরে কল্যাণচকে তারা জিপ থামার এবং পায়ে হেটে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তারা প্রচণ্ড চীৎকার ও কারার

আওয়াজ শুনতে পার, বার ফলে ওরা অহুমান করতে পারে যে, অত্যাচার তখনো পর্যন্ত চলছে। সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কার তখন তারা পেছ হটে এবং চৌকিদারের পরামর্শ মত জীপের কাছে ফিরে গিয়ে ওরা আক্রমণকারীদের দিকে গাড়ীর উজ্জল হেডলাইট ফেলতে থাকে। বিরাট পুলিশ বাহিনীর সমাবেশ হয়েছে মনে হওয়ার ওরা ভুলবশতঃ পলায়ন করে। অর্থাৎ চৌকিদারটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ও বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে অতগুলো মাহুকের জীবন রক্ষা করেন।

পরপারযাত্রার ট্রানজিট ক্যাম্প ?

৩য় পৃষ্ঠার পর

ওলজি-বিষয়ক কোন কিছু উল্লেখ শুনেই শুধু যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাই নয়, রীতিমত বাহুজ্ঞানরহিত হয়ে বক্তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিতে শুরু করেন—এ অভিজ্ঞতাটি প্রায় সকল লোকেরই অগ্নিবিস্তার আছে। বিষয়টি প্রাইভেট চিকিৎসার ক্ষেত্রে বর্তটা বিসদৃশ, দরকারী হাসপাতালে মিস্ত্রীই তার চাইতে অনেক বেশী বিদগ্ধ ও প্রয়োচনাকর। রোগীর খানকটের সময়ে তাকে অস্ত্রোপচার দিতে হতে পারে এটুকু জানতে বা বলতে পারা একটা মামুলী ব্যাপার, অন্ততঃপক্ষে ‘ভাইরাস’ তত্ত্বের মত গুরুগম্ভীর কোন ব্যাপার নয় (অবশ্য হু’একজন ভাইরোলোজিস্টকে বাদ দিলে বাদ বাকী ডাক্তারজুলের ভাইরাসবিদ্যা যে কতটা হাস্যকররূপে নগণ্য সে আলোচনা আপাততঃ থাকুক), কিন্তু মামুলী বিষয়টি সঙ্গ্রহে নিবেদন করতে গিয়ে কেউ যে লসাননে ফিরে এসেছেন এমন ঘটনা হু-ভারতে তুলতে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। আসলে ট্রেডজিওরেক্ট আর প্রোফেসরশাল এয়ারিষ্টো-ক্র্যাসী (!)-র এ সঙ্কল্প অবশ্যটা চিকিৎসকজুলকে এক বিপজ্জনক সামাজিক সম্পর্কের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমরা জানি, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রত্যেকটি বিষয়েরই একটি সামাজিক ইতিহাস আছে, বস্তুতঃ এ সব কিছুই সামাজিক প্রচেষ্টার ফসল এবং এসব কিছুকেই আহরণ ও আয়ত্ত করার অধিকার সকল মাহুকেরই সামাজিক উত্তরাধিকার। কিন্তু সুবিধাভোগের ‘দর্শন’ যাদের বাইবেল তাদের চেতনা দেবে কে? ‘আই এম এ’-র ‘সমাজবিদ্যা’ যদি গোষ্ঠী ‘অভিজাত্যের’ কার্যমী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন হয়, তাহলে চিকিৎসকদের মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভ্রান্তবহ অনজ্ঞতা তাদের মগজের ব্যাধিরূপে এক বিকৃত প্রগল্ভতার রূপ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুরোক্র্যাট-টেকনোক্যাট, গোষ্ঠীধরের শুভ-নিশ্চল জড়াই-এ এবং হাসপাতাল-গুলিতে চিকিৎসকদের ঘন ঘন ট্রাইকের সমর্থনে আই এম এ-র ‘ভূমিকা নিঃসন্দেহে তার ব্যর্থ নেতৃত্বের প্রমাণ হাজির করে।

পথের হিসাবটাও পর্যাপ্ত পরিমাণে মেলাতে পারে, কিন্তু হাসপাতালের শয্যার তরে-থাকা মাহুকের আত্মা-গুলি প্রাণধারণের শেষ প্রহরগুলিতে এ সমস্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে কোটি কোটি স্বীকৃতি আর যে জবাবহীন জিজ্ঞাসাগুলি রাখে তার জবাব দেবে কে? এখানে হজম-না-হওয়া ট্রেড-ইউনিয়ন বিদ্যার সঙ্গে ট্রেডহীন, ইউনিয়নহীন, মৃত্যুমরপার দ্বন্দ্বের পর-পারযাত্রীর শেষ মানবিক অধিকার-টুকু নীরবে বিলোপ পার; এখানে পোষাকী আর মেকী ‘আর্ডসেবা’র দাপটে বোবা আর্ডজুল তাদের ভাঙা-চোরা গুণ্ডাটুকুর আড়ালে অশঙ্ক প্রাণশক্তিকে আঁকড়ে থাকে স্বাভাবিক হঠাৎ ‘কর্মবিরতি’র হঠাৎ-ধাক্কা এ আঁকড়ে-রাখার অধিকারটাও বারের বারে গচ্ছা যায়। সবল পক্ষের নীতিহীন, বিচারবুদ্ধিহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট গোষ্ঠী দাপটের জিম্মায় দুর্বল পক্ষের অস্তিম জীবন স্পৃহা যখন অচিকিৎসা ও ভুল চিকিৎসার জটিল আবর্তে আটকা পড়ে, তখন যারা চির প্রতারিত তারাই শেষবারের মত প্রতারিত হয়। সঙ্গীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও বিকৃত মূল্যবোধ যদি মৌন স্বীকৃতি ভোগ করে তাহলে সুবিধাভোগীরা গোষ্ঠী দাপটের পথে সমাজের দুর্বল-তর অংশগুলিকে আঘাত করে আত্ম-বিস্তারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হাসপাতালে কথার কথার কর্মবিরতির ঘটনাগুলি এ গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়-বাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি, বুরোক্র্যাট-টেকনোক্যাট জড়াইটাও জনসাধারণকে শোষণ-শাসন করার অধিকার নিয়ে শেয়াল-কুকুরের কামড়াকামড়ি বৈ অন্ত কিছুই নয়।

মতামত

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ একদিন কাবুলের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হবেই হবে।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় জনগণকেও চিন্তা করতে হবে যে, “ভারত সোভিয়েত চুক্তি” যেটা মূলত অস-মানজনক চুক্তি, তার অঙ্কহাতে রাশিয়া যদি ভারতের দাবীভৌমত্ব দ্বন্দ্ব করে তবে আমরা ভারতীয়রা কি শুধুমাত্র বন্ধ রাষ্ট্র (?) এই কথা ভেবে নিজেদের অস্তিত্ব বিপর্যয় হলেও উদ্ধারীন থাকবো? শঙ্করারাম দেনগুপ্ত

সশস্ত্র লড়াই

১ম পৃষ্ঠার পর

করেও এক আসনের স্থিতি করে। ছোট্টা রায়েরপায়ে আঘাত লাগে এবং ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। উল্লেখযোগ্য মন্তান ভূটান কংগ্রেসের (ই) যুগেন লাহিড়ী গ্রুপের মন্তান-কর্মী। যুগেন লাহিড়ী গ্রুপের ওই হামলাবাহীর সংবাদ পাড়ায় ও আশে পাশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরোধী পক্ষের কংগ্রেসী (ই) মন্তানরা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপরেই স্থানীয় ছাত্র পরিষদের

(ই) মন্তাপতি তপন দাসের নেতৃত্বে একদল মন্তান ও যুবক পাণ্ডা আক্রমণ বা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ছুটে আসে। ওরা ভূটানকে ধরার জন্য খোঁজাখুঁজি করে। কিন্তু, ভূটানের সাক্ষাৎ না পেয়ে ওই হানাদার কংগ্রেসীরা ভূটানের বাড়ি এবং তার প্রতিবেশী আরো একজনের বাড়ির জিনিষপত্র তল্লাশ ও তালচুর করে বীরমর্পে চলে যায়। হিন্দুদের উৎসব দলের দিনে ওদের মুখে, মাথার এবং দেহে যদিও আঘাত ও রং মাখানো ছিল, তথাপি ওদের হাতে ছিল পিচকারির বদলে কিছু মারপাত্র এবং চকচকে ভোজালী ও

ছোরা।

এরপরে, ওরা তাঁতিবাজারের মোড়ে এক গুপ্তের দোকানের দায়মে গিয়ে জড়ো হয়। স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতা যুগেন লাহিড়ী ও তার রিভলবারসহ ওখানে উপস্থিত থেকে তার ওখানে তার বাহিনীকে উত্তেজিত করছিলেন বলে পুলিশ অভিযোগ করেছে। অবস্থা আইন শৃঙ্খলার বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হওয়ার পুলিশ যুগেনবাবুকে শাস্ত হওয়ার অহুয়োধ করে। কিন্তু, যুগেনবাবু পুলিশের কথার কর্ণপাত না করে উল্টো তার রিভলবার থেকে উপস্থিত জনতা এবং পুলিশের দিকে পর পর গুলী বর্ষণ করেন। তবে, সৌভাগ্যবশতঃ ঐ গুলীতে কেউ আহত হয় নি।

অবস্থা বেগতিক বুঝে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসী (ই) যুগেন লাহিড়ীকে তার রিভলবারসহ এবং ছাত্র পরিষদের (ই) মন্তাপতি তপন দাসকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ মন্তান ভূটানকে মার্কি তখন ধরতে পারে নি। এখন খুঁজছে।

তাছাড়া, পুলিশ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধী অভিযোগের ভিত্তিতে মোট চারটি মামলা রুজু করে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের প্রায় ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরো কিছু কংগ্রেসী মন্তানকে খুঁজছে।

বরানগর থানার রেকর্ডে জানা গেছে, কংগ্রেসের (ই)র দুই গ্রুপের পরস্পরবিরোধী অভিযোগের ভিত্তিতে যে চারটি মামলা রুজু হয়েছে তার নম্বর যথাক্রমে ১(৩)৮০, ২(৩)৮০, ৩(৩)৮০, এবং ৪(৩)৮০ নম্বর।

সর্বশেষ মামলাটি কংগ্রেস(ই) নেতা যুগেন লাহিড়ীর বিরুদ্ধে রেকর্ড করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট মিউনিটি

(কম্যুন ইন্টারন্যাশনাল একত মনত মিনত)

নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডবলু ডি/য়েলওয়ে/কেএসই ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম ও টেওয়ার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সফাওয়ারী দর/শতকরা ভিত্তিক মূল্য করা টেওয়ার :

বিক্রিৎ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং ই সি এল/জি এম/এস এল এন/ইজ (সি)/১১/৭২৫ তাং ২১-২-৮০ বেসরকারী নির্মাণ কাজের জন্য : (১) লালগঞ্জে ‘এ’ টাইপ ডিসপেন্সারী (২) লালগঞ্জে বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (৩) লালগঞ্জে ১০ (দশ) ইউনিটের লিকিউরিটি ব্যারাক। আনুমানিক খরচ ১,৬৫,৩৪৬ টাকা। ১৮-৮-৮০ থেকে ২৪-৩-৮১ পর্যন্ত অফিসের সময় কেশিয়ারের কাছে প্রতি সপ্তের জন্য নগদে ১০০ টাকা অথবা ৫০ টাকা (যেমন প্রয়োজন) দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, সালানপুর এরিয়া, পোঃ কুমারপুর, অশোকপল্লী, আসানসোল থেকে টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ২৫ ৩ ৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে ৩০০ টার খোলা হবে। বায়নার টাকা ২৪-৩-৮০ তারিখে অথবা তার আগে সালানপুর এরিয়ার কেশিয়ারের কাছে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেওয়ারের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

সাম্প্রদায়িক : কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা উক্ত সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ারে প্রদত্ত এরিয়া/কোলিয়ারী/ধপ্তরের ঠিক অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% প্রদান টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতি-নিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দ্বারা অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

দলবদ্ধ আক্রমণ ও নৃশংস হত্যা চলছেই

উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুর এবং বিহারের পরাশবিহার মারকীয় ঘটনাবলীর প্রতি মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই পুনরায় ঘটে গেল বিহারের পিপরী গ্রামে বীভৎস হত্যাকাণ্ড। বলা বাহুল্য উপরোক্ত তিনটি ঘটনাতেই হরিজন সম্প্রদায়-ভুক্তরাই নিহত হয়েছেন। তবে উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুর এবং বিহারের পরাশবিহার হত্যাকাণ্ডের চেয়ে বিহারের পিপরী গ্রামের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা বেশি। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সুপরি-কল্পিত হত্যাকাণ্ড। নির্দয়ভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে হরিজন সম্প্রদায়ের ১৪ জনকে। যারা পুড়ে মরেছেন তাঁরা সকলেই নিশ্চিন্তে ঘুমোছিলেন। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরে আশ্রয় জালিয়ে এদের পুড়িয়ে মারা

হয়েছে। পিপরী গ্রামে হরিজনদের সব কটি বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কুর্মি সম্প্রদায়ের জোতদার-দের ভাড়াটে গুপ্ত বাহিনী। সকলেই তখন গভীর ঘুমে। ঘুম ভাঙল আক্রমণকারীদের নারকীয় উল্লাসে এবং আগুনের লেলিহান শিখার তাপে। ঘুম চোখে আগুন দেখে অনেকেই হতচকিত হয়ে পড়েন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটতে সময় নেয় বেশ কিছুটা। দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে দেখা যায় বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। অন্তোপায় হয়ে কেউ দরজা ভেঙ্গে, কেউ বা ঘরের খড়ের চাল ফুটো করে কোন যতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বাইরে এসেও কি রেহাই আছে। যারা প্রাণ বাঁচাতে বাইরে এসেন তাদের মধ্যে অনেকেই হত্যাকারীদের বন্দুকের

গুলি বুক পেতে নিতে বাধ্য হন। অনেকেই নিহত হন। তখন একটি ঘরের মধ্যে ১৪ জনের একটি হরিজন পরিবার আগুনে পুড়ছে আর একটু একটু করে যত্নরূপী আগুন তাদের একেকজনের প্রাণ নিয়ে নিচ্ছে। ঘর থেকে যারা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং ছুড়তকারীরা যাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে পারে নি তারা সকলে মিলিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কিন্তু এই প্রতিরোধও হত বৈশিষ্ট্য কার্যকরী হতনা যদি না রাত চারটে নাগাদ ঘটনাস্থলে আচমকা পুলিশ এসে হাজির হত।

কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? এর পেছনে কি কোন পুরাতন ঝগড়া রয়েছে। এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বহু বক্তব্যই শোনা যায়। কিন্তু যে

ঘটনাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা চলে সেটা হল একটি মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত এক যুবতী (তারামণি) জনৈক কুর্মি জোতদারের রক্ষিতা ছিল। ঐ যুবতী তার হরিজন স্বামীর বৈধ হেফাজত থেকে পালান এবং রাধিকা সিং নামক এক কুর্মি জোতদারের রক্ষিতা হিনাবে থাকতে আরম্ভ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর জোতদার রাধিকা সিংয়ের ভাই খুন হয়। কুর্মিদের মনে ধারণা হয় যে, এই খুন করেছে হরিজনরাই। এবং এই ঘটনার তারামণির প্রাক্তন হরিজন স্বামীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু পরে মামলায় সে খালাস হয়। তারপরেই এই হরিজন নিধন। সব থেকে মজার ঘটনা হল এই যে তারামণির প্রাক্তন স্বামী যে পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের ১৪ জনকেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যার মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল।

সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল এই গ্রামে এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে সে বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল এবং সে বিষয়ে স্থানীয় পুনপুন থানাও অবহিত ছিল। কিন্তু তারা এই গ্রামে কোন অস্থায়ী পুলিশ চৌকি তো করেই নি, কোন পুলিশ টহলেরও ব্যবস্থা করেনি। পুলিশের পক্ষ থেকে যদি আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে হয়ত হরিজনদের এইভাবে মরতে হত না।

১৯৮০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী বিহারের পরাশবিহার, দোহিয়াতেও ঘটে গেছে অত্যাচার হত্যাকাণ্ড। রাত ১১টার একদল মশজ্জ ব্যক্তি পরাশবিহার গ্রামে গিয়ে বেছে বেছে হরিজন কুটিরগুলির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। কেবলমাত্র অহরিজন হিন্দু এবং মুসলমানদের ঘর বন্ধ করা হয়নি। তারপর প্রতিটি হরিজন কুটিরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। হরিজনরা সকলেই তখন ঘুমন্ত। আগুনের তাপে ঘুম ভেঙ্গে যেভাবে পারল অর্থাৎ দরজা জামালা ভেঙ্গে বাইরে এল। তাদের অনেকে আহত হল। অনেকেই মরল মশজ্জ বহিরাগত গুপ্তার বন্দুকের গুলিতে। এই ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ১১জন। তার মধ্যে ৭জন মহিলা এবং ২জন শিশু। আহত একজনের হান-

পাতালে মৃত্যু হওয়ার মতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ জনে। এই ঘটনার পেছনে রয়েছে একটি পুরাতন ঝগড়া যার কেন্দ্রবিন্দু এক খণ্ড জমি।

এই বছরেই ১১ই জানুয়ারী উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুরে মশজ্জ পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, এক বর্ণহিন্দু জমিদারের বাসের তলার পিষ্ট হয়ে এক হরিজন বৃদ্ধা নিহত হয়। তার দুই নাতি এবং নাতিনি অনাথ হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা বাসের মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করে। বাস মালিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষতিপূরণের টাকা দেয়নি। যে বাসের তলায় হরিজন বৃদ্ধা নিহত হন সেই বাসের চালককে ধরে গ্রামবাসী ক্ষতিপূরণের টাকা চায়। এর পরেই ঘটনাস্থলে আচমকা এসে হাজির হয় পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের ওপর নির্মম পুলিশ অত্যাচার চলে কয়েক ঘণ্টা যাবত। শোনা যায় যে, পুলিশ নাকি অনেক মহিলা ধর্ষণ করেছে।

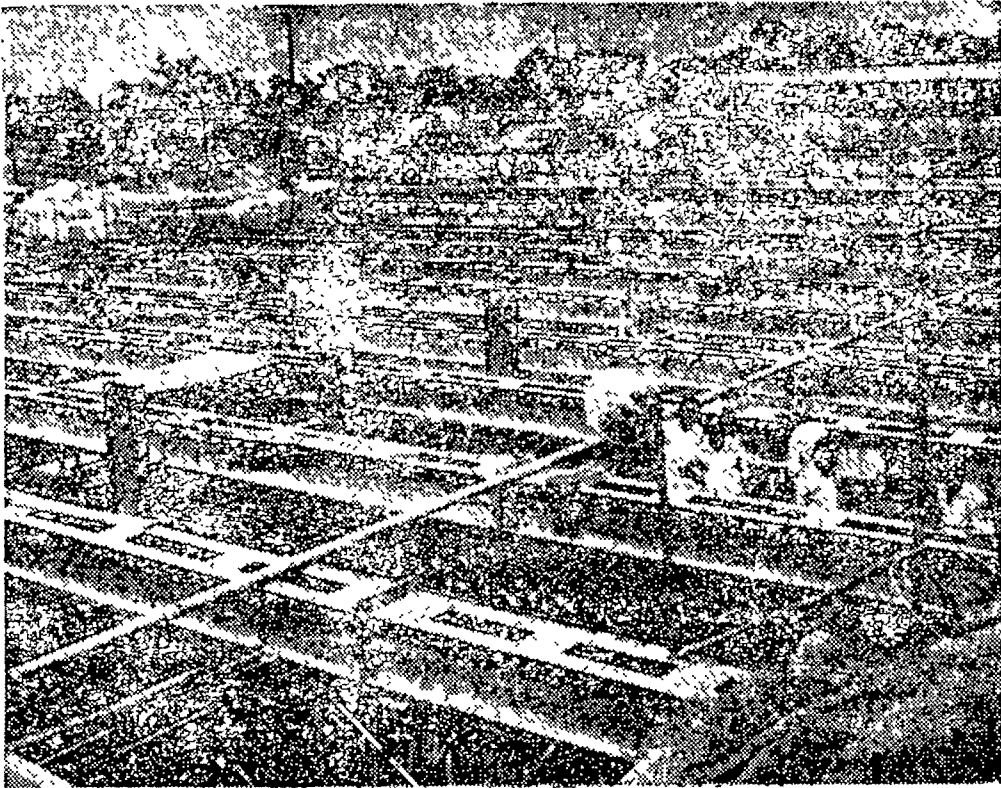
সঞ্জয় ও স্মৃত

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করছেন। কার্যকরী কমিটির সভ্যদেরকে প্রদেশ কংগ্রেসের (ই) কার্যকরী সম্পর্কে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এতে দলের শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সমস্ত অভিযোগ শুনে সঞ্জয় পাণ্ডী দ্বিতীতে স্বত্বাবুদ্ধকে ডেকে পাঠান। এবং এ আই সি সি-র দেওয়া ১০ লক্ষ টাকা কিস্তিবে খরচ হয়েছে তার হিসাব চান। সঞ্জয়ের কথা শুনে স্বত্বাবুদ্ধ এখনো ভাবাচ্যাকা খেয়ে যান, পরে নানা অভিযোগ পেশ করতে থাকেন বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কোন কথাই কান না দিয়ে সঞ্জয় দরাসরি স্বত্বাবুদ্ধকে ১০ লক্ষ টাকা কিস্তিবে দেওয়া হয়েছে তার কাগজপত্র সহ হিসাব দেখতে চান। অনেক প্রতিরোধের পর স্বত্বাবুদ্ধ কবুল করেন যে, সব টাকা বিলি করা হয়নি। বাকী টাকা হিসাব সহ তাত্ত্বিকি তিনি এ আই সি সি-র কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

কলকাতাবাসীর যাদু-গালিচা



মেট্রোরেল দ্রুত রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে—কলকাতাবাসীর চলার জন্য পাতা হচ্ছে যাদু-গালিচা।

গালিচাটি বোনা হচ্ছে লোহা এবং ইস্পাতে। একে শক্তিশালী করার জন্য ১,২০,০০০ টন ইস্পাত, লোহার কাঠামোর জন্য ৬০০০ টন ইস্পাত, পাইলিং এর জন্য ৪০০০ টন, অভ্যন্তরীণ স্তরে চালাই এর জন্য ৮৫০০ টন চালাই

লোহা, এবং ৫০ কিঃ মিঃ ট্র্যাক-এর জন্য ইস্পাতের প্রয়োজন হবে।

দেশের লোহা এবং ইস্পাতের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধিতে আমরা উৎসাহী।



মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

বাবুজী এখনো ই-কংগ্রেসে ভিড়তে চাইছেন

সম্পাদকীয়

জনতা পার্টির
নাতিশ্রাস

যে জনতা পার্টি ইন্দিরা গান্ধীর বৈরতন্ত্র ও তার সমর্থকদের কবর দিয়েছিল সেই জনতা পার্টি কি শেষ পর্যন্ত অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে? ভাবতে অবাক লাগে অকরী অবস্থায় নির্ধাতিত যে সব নেতারা এই পার্টির জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরাই একে হত্যার যড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তাঁরা নিজেরাই ইন্দিরা গান্ধীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ষাড়া জনতা সরকার ভাঙার হোতা সেই চরণ সিং রাজনারায়ণের আজ নিশ্চয় মনে আছে ১৯৭৭ সালে পরাভূত বৈরতন্ত্রীর তৎকালীন দুঃসময়ের এবং নিজেদের কৃতকর্মের কথা।

কী অতীত লগ্নেই না জনতা পার্টির জন্ম হয়েছিল। তাই বোধহয় লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই খেরোখেরি শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর দাবির মীমাংসা ভোক্তাভালি দিয়ে শেষ হলেও নেতাদের খার্বের লড়াই ও আর এস এস প্রাণে মতান্তর ও মনান্তর ধ্যায়িত হয়ে জনতা সরকারের পতন ঘটিয়ে দেয়। মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের পর জনতা পার্টিতে আর এক দফা ভাঙনের সূচনা হয়েছে। ক্ষমতালোভী জগজীবন রায়ের প্রধানমন্ত্রী হবার আশা ধূলিসাৎ হতে তিনি এখন চরম ক্ষুব্ধ। 'বৈত সঙ্গতপদে'র প্রাণে তিনি জনতা পার্টির সংগ্রহ ত্যাগ করে তাকে আর এক দফা ভাঙনের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। নটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর এই ক্যাপ্তারখানা ইন্দিরা সঙ্কটকে উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। সংবাদে জানা গেছে জগজীবন এখনও ইন্দিরা কংগ্রেসে বাবার চেঁচা করছেন। নির্বাচনের আগে ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বহুগুণার কি অবস্থা হয়েছে দেখেও বাবুজীর শিক্ষা হয়নি।

এটা পরিষ্কার যে জগজীবন রায় দলবল নিয়ে জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে গেলে এই দল বকলমে প্রকৃতপক্ষে জনসংঘ হয়ে যাবে, কেবল নামটা থাকবে জনতা পার্টি।

যার অস্তিত্ব যুহুর্ত ঘনীর এসেছে তাকে অস্তিত্ব দিতে কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যায়, সম্পূর্ণ স্বস্থ করা যায় না। কিন্তু জনতা পার্টির এই অবস্থা ভারতবাসীর পক্ষে সোটেই স্বধকর নয়। কারণ জনতা বুজোয়া দল হলেও ইন্দিরা-বিরোধী। ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে জনতা পার্টিরও একটা ভূমিকা আছে এইজন্য-যে, জোটবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তিই ইন্দিরার বৈরতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের অবসান ঘটতে পারে। সমাজ বিপ্লব? সে এখন অনেক দূর।

দপন

ত্রয়বিশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১১, শুক্রবার, ১৪ই মার্চ, ৮০। ৬০ পয়সা

রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভাপতি ঠিক হলেও জট পূর্ববৎ

জ্যোতি বসুর ছড়া

অনার্য মিত্র

এক

ইন্দিরা তুমি কি
স্বদেশী, না বিদেশী
সেটাই বিচার হবে আগে
কোন কোন রাজ্যের
প্রধানমন্ত্রী তুমি
এই নিয়ে খটকা যে লাগে।

আমায় বিদেশ যদি
সেখানে গলানো নাক
নিভান্ত অছচিত হবে,
ঘরোয়া বিবাদ এটা
বহিঃশক্তি তুমি
তোমাকে মানবে কেন তবে?

তাদের দেশপ্রেম
সবচেয়ে খাটি জেন
আর সব সকেলেই পত্ত
শান্তি যিনিই চান
'বিদেশী' আখ্যা পান
যেমন 'বিদেশী' জ্যোতি বসু।

ছই

পাড়ার পাড়ার হামলা
হুদিন আগে করলি যারা
এবার তারা লামলা।
করেছিলি মামলা,
সেই স্ববাদে আমরা এবার
বহলী করি আমলা।

তিম

খুনের কোম খবর নেই
খুনের পরে খুন,
চোরও করেন ঘর লগার
করেন হানিমুন।
খুনের যদি হুদিশ চান
আপনি তবে, পাগল—
হতে পুলিশ খোজেন
রাজ্যপালের ছাপল।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত বিদ্যারী প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি বরকত পনি খাম চৌধুরী প্রার্থী অজিত পাণ্ডা প্রদেশ ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। বরকত-বিরোধী গোষ্ঠী এ

ব্যাপারে তাদের মনোনীত প্রার্থী অশোক সেনের জন্তে দিল্লীর সমর্থন যোগাড় করতে পারেন নি। অজিত পাণ্ডার মনোনয়নে বরকত-বিরোধী গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট।

গত এক সপ্তাহে কলকাতা থেকে

দিল্লীতে দফার দফার প্রায় ৬০।৭০ জন ছোট-বড় অনেক কংগ্রেস নেতাই দিল্লী উড়ে গিয়েছেন অশোক সেন এবং অজিত পাণ্ডার সমর্থনে। বরকত বিরোধী গোষ্ঠী নানাভাবে দিল্লীকে শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়



ঢালাও পারমিট দেবার ব্যবস্থায় সিমেণ্ট কালোবাজারে পাচার হচ্ছে

নলিনী পাল

কলকাতা পৌর এলাকার ভাড়া বাড়ির মেয়ামতি বা সংস্কারের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের অল্প-অল্প সিমেণ্টের চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের খাত দপ্তর-বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে বিনামূল্যে বা বিনামূল্যে চালাওভাবে সিমেণ্টের পারমিট-দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাকে রাজ্যের বায়বীয় সরকারের অনুমতির চাইতে বদনাম বা দুর্নামই বেশী হচ্ছে।

কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ সিমেণ্ট সংগ্রহ করতে পারছেন না। দালালরাই প্রায়ই পারমিটের সিংহভাগ বা শতকরা ৭৫ ভাগ সংগ্রহ করছে। এর সঙ্গে ১১নং মীর্জা গালিব স্ট্রিটের খাত বিভাগের কিছু কর্মচারীরও নেপথ্যে গভীর যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা উপরেই এরাভ্যের সিমেণ্ট

ব্যবহারকারীদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সিমেণ্ট বরাদ্দ না করলে বা সিমেণ্ট সরবরাহ না করলে এরাভ্যের সিমেণ্ট পাওয়ার কোনই উপায় নেই। যেহেতু ভারতের সব ক'টি সিমেণ্ট কারখানার উৎপন্ন সিমেণ্টই কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং বন্টন করে থাকেন।

বর্তমানে যে সিমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকার শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়

কংগ্রেসী মস্তানদের গঞ্জে মিথ্যা প্রচার

বামপন্থী দৈনিকের জনৈক সাংবাদিকের কীর্তি

কথ্যাত যুব কংগ্রেস নেতা গুরু-শরণ ব্যানার্জী, সাট্টা ও জুয়ার রাজা মহম্মদ ইয়াসিন প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতার দু'একজন সাংবাদিক একেবারে উঠে পড়ে লেগে-ছেন। পুলিশের হাতে এদের মাস্তানা-বুধ অবস্থা সইতে না পেরে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের একটি বাহনপন্থী সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় গত কয়েকদিন ধরে বড় বড় রচনা ফেঁদে বসেছেন। আসল ঘটনা হল, রক যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দাবীদার গুরুশরণ ও সাট্টার নায়ক মহম্মদ ইয়াসিন সম্পর্কে পুলিশ ঘেরীতে হলেও কাজে নেমেছে। তাতেই রহস্যজনক কারণে জনৈক সাংবাদিকদের ও তার লাকেরদের গাজরাই শুরু হয়েছে। বাহনপন্থী নেতা ও প্রতাবশালী কয়েকজনকে এরা প্রতাবাদিত করারও চেষ্টা করছেন।

কমসালতি ইঞ্জিনিয়ার অশোক হাজারী ১০/বি থিয়েটার রোডে '৭৪ সাল থেকে তার অফিস চালিয়ে আসছেন। অফিসের ছোটো বর ভাড়া নেন সুপ্রিয় বহুর বাবা টি বহুর কাছ থেকে। সুপ্রিয় বহু '৭১ সাল থেকে তার নিজের কাজকর্ম চালানোর জন্য অশোকবাবুর পাশেই অফিস খুলে বসেন। শোনা যায় তখন থেকেই সুপ্রিয়বাবু অশোকবাবুকে উঠে বাওরার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। তাগাদা বত বাড়ে তিক্ততাও তত বাড়ে। শেষে সুপ্রিয়বাবু তার "ঘনামবত" আত্মীয় গুরুশরণের শরণ নেন। গুরুশরণ, তার ভাইয়েরা উত্তম ব্যানার্জী, জয়দেব ব্যানার্জী, প্রশান্ত ব্যানার্জী প্রায় প্রতিদিনই অশোকবাবুকে উঠে বাওয়ার জন্য হুমকী দিতে থাকেন। অবস্থা বেগতিক বুঝে অশোকবাবু আদালত থেকে ১৪৪ (২) ধারার অধীনে একটি আদেশ নেন।

ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ানো দেখে গুরুশরণরা অশোকবাবুর সংগে বোকাপাড়ার আসার চেষ্টা করেন এবং ঠিক হয় অশোকবাবু '৮১ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত স্বত্বাধীনে অফিস চালিয়ে যাবেন। পরে অজ্ঞাত তিনি উঠে যাবেন। মুখের কথার বিশ্বাস করে অশোকবাবু ১৪৪ (২) ধারার অধীনে আদালতের আদেশের কার্য-কারিতা আর বাড়ানোর আবেদন করেন নি। হঠাৎ ৮ই জাহ্নবীরী সুপ্রিয় বহু গুরুশরণ প্রমুখ ১০/বি থিয়েটার রোডের অফিসে উন্নত অব-স্থায় এসে হাজির হন। অশোকবাবুর ঘরের ডালা ভাঙা হয় এবং একটি

টেম্পো করে মালপত্র পাচার করে দেওয়া হয়। অশোকবাবু ঘটনাস্থলে এসে বোকা বনে যান। পরে জুবুজুদের ভাড়া, খেয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির হন। এ ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার অধীনে একটি মামলাও রুজু হয়। অপরূপত মালপত্র উদ্ধারের জন্য তল্লাশী শুরু হয়। অশোকবাবু আবার নিজের অফিস খুলে বসেন। কিন্তু ১২ই জাহ্নবীরী আবার হামলা হয়। বেনিরাপুকুর থানার অফিসার ইন-চার্জ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/৩৪/৫০৬ ধারার অধীনে আবার একটি মামলা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুরু হয়।

এখানে বলা হয়কার গ্রেপ্তার হওয়ার আগে সুপ্রিয় বহু, উত্তম ব্যানার্জী হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ অশোকবাবুর দোকানের অপরূপত

মালপত্র উদ্ধার করার জন্য কয়েকটি ভারপ্রাপ্ত তল্লাশী চালায়। এবং ডবলু বি ডি ৬৮১১ নম্বরের জামিন বাজেয়াপ্ত করে।

বলাবাহুল্য অশোক ও সুপ্রিয়-বাবুর লড়াইয়ে পুলিশ শান্তি রক্ষার কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু দৈনিক পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক-প্রবর একে কেন্দ্র করেই সুপ্রিয়বাবুর হয়ে ওকালতি করতে নেমে জনগণ ও সরকারকে বিভ্রান্ত করার কাজে মনোনিবেশ করে। এ সাংবাদিকপ্রবর লিখেছেন ১০/বি থিয়েটার রোডে সংশ্লিষ্ট তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে ইষ্টার্ন সুবার্বন ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার আর, কে, হাওয়া, গিয়ে-ছিলেন। কথটি একেবারেই সত্য নয়। গিয়েছিলেন বেনিরাপুকুর থানার অফিসার ইনচার্জ আয়ুব খান। লেখা হয়েছে জগদীবন ভট্টাচার্য নামে জনৈক সাব ইন্সপেক্টরও ইষ্টার্ন সংগে যান। এ বক্তব্যও

ঠিক নয়। গৌজ নিয়ে দেখা গেছে জগদীবন ভট্টাচার্য নামে কোন সাব ইন্সপেক্টর এ ডিভিশনেই নেই।

সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকটি কিন্তু তার দৈনিক পত্রিকার পাতায় একবারের জন্য লেখেননি যে, গুরুশরণ একজন নামকরা মস্তান, প্রতাবক ও অজ্ঞাত নানাওয়ের অধিকারী। এবং যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে দাবী-দার গুরুশরণ ১১৫/২ পার্ক স্ট্রিটের একটি বর ভাড়া নিয়ে কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জীকে হারপণভাবে ঠকিয়েছেন। ৫/৬ বছর ধরেই কোমি ভাড়া গুরু-শরণ কমলবাবুকে দেননি। এলাকার বহু-মাসের-বহু অভিযোগ গুরুশরণের বিরুদ্ধে রয়েছে। কিন্তু কোমি তথ্যই এ সাংবাদিকটির কলমে প্রকাশ পায় নি। পুলিশের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে জাতদ্রুত কথ্যাত মহম্মদ ইয়াসিনেরও গণগান করেছেন সাংবাদিকটি। ইষ্টার্ন সুবার্বন ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে পুলিশ ইয়াসিনের "পেনসিলার" "বুকি" কয়েকজনকে ধরে। ১৭৭ টাকা ৮০ পরশা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাজে-রাপ্ত করে। পরে ইয়াসিন তার সাট্টার বুকি ও পেন সিলারদের

পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত ইয়াসিনকেও গ্রেপ্তার করে। তাকে ১২ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির করা হয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪১/৩২৩ ও-৩৮১ ই, এস ধারার অধীনে ইয়াসিনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরও মহম্মদ ইয়াসিনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই কেসের নথর হল সেকশান কিউ কেস নং ৬৩১। পুলিশ জুয়ার টাকা উদ্ধারও করে। এছাড়া ইষ্টার্ন ডিভি-শনে গত কিছুদিনের মধ্যে আরও ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৬৪ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বরা পড়েছে ৮ হাজার ৫০৭ জিটার চোরাই মদ।

পুলিশ যে নির্দোষ একথা বলার অবকাশ নেই কিন্তু এসব ধরপাকড়ে দেখা যাচ্ছে অনেকই দুর। সমাজ-বিরোধী তো বটেই। এদের সঙ্গে রয়েছেন কিছু ভ্রম পোশাকধারী হোয়াইট কালার ক্রিমিডাল। বিভিন্ন মহলে তাই এসব ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে বাম সরকারকে তুল বোকা-নোর চেষ্টা চলছে। এতে কি এই সাংবাদিকপ্রবর ও তার লাকেরদের হাত মিলিয়েছেন? কিন্তু কোন স্বার্থে?

কলকাতা পৌরসভার বিভাগীয় পরীক্ষায় মস্তানি

কলকাতা পৌরসভার সুনিয়মিত কার্যের পক্ষে ৪০ শতাংশ খালি পদ একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্যানেল থেকে কমা-ঘরে পূরণ করা হয়। গত ১ মার্চ রবিবার সেই পরীক্ষা দিতে মজদুর পর্যায়ের কর্মী সমেত ৪২০ জন কর্মী-পরীক্ষার বসার সুযোগ পেয়েছিল বলে জানা গেল। বেলা ১২-৩৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে চল-ছিল। হারপণ বেকারির জন্য যে সব শিক্ষিত যুবক পিয়ন-গার্ড ইত্যাদি চাকুরি নিতে বাধ্য হয়, তাদের পক্ষে কেরানির ক্ষেত্রে প্রমোশন পাওয়ার এটা একটা সুযোগ। মোট ৩৫০ নম্বরের মধ্যে ১২০ পেলেই পাশ। ১১৭০ এর পরে পরীক্ষার হলে যে পরিষিতি হয়ে আসছিল তাতে তখনকার বিভাগীয় পরীক্ষার আ-হাওয়া সহজেই কল্পনীয়। কিন্তু ১১৭১ থেকে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সর-কারের আর্মলে পরীক্ষার হলের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১১৮ সনে কলকাতা পৌরসভার এই বিভাগীয় পরীক্ষার পরিবেশও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়।

কড়া নজরদারির ফলে নকল করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে গণ-টোকা-টুকির সাহায্যে ভাল পরীক্ষার্থীদের ডিভিও প্রমোশন পাওয়া মস্তানদের পক্ষে অতি সহজ হয় না। ১১৭৮

নম্বরের রাজনৈতিক বাতাবরণের জন্য মস্তানদের এত ব্যবস্থা হায়ে পড়ে হজম করতে হয়। গত বছর প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৪০ জন পাশ নম্বর পেয়েছিল বলে জানা যায়। কিছু লোককে আর-এ-ও করা হয়েছিল। এরকম কড়া নজরদারির বিরুদ্ধে যুব গুরুশরণ থাকলেও এ ব্যবস্থা মস্তানরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

জানা গেল বাইরে থেকে নকল সাপ্লাই বন্ধ করা এবং পরীক্ষা হলে পাড়ার মস্তান এবং চামচাদের হুমকি-বাজি বন্ধ করার জন্য এবারে কেন্দ্রীয় পৌর ভবনেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা ভালই হচ্ছিল। কিছু কিছু মস্তান অবশ্য কড়া নজরদারির বিরুদ্ধে নানা রকম মন্তব্য এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে।

বেলা ১২ ৩৫ মিনিট নাগাদ কাউন্সিল চেম্বারে উপবিষ্ট দুটি মস্তান বলতে থাকে যে, এরকম কড়া নজর-দারি চলতে থাকলে একে বিভাগীয় পরীক্ষা বলা যায় না। আড়াই ঘটীর মধ্যে তারা আড়াইটা লাইনও লিখতে (টুকতে?) পারেনি বলে তারা অভিযোগ করে। আরও দু-চার জন তাদের সংগে গৌ ধরে। একজন হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে অজ্ঞত হলে তাদের সাড়াতেই ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা আসে। তারপর কাউন্সিল

চেম্বারে অজ্ঞত পরীক্ষার্থীদের খাতা তারা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে অজ্ঞত ঘরে গিয়ে এই হলবদ্ধ মস্তান পরীক্ষার্থীদের খাতা ছিঁড়ে দেয়। ঘটনার গতি অজাব-নীর মোড় নেওয়ার অন্তরা অপ্রত্যা-হত ছিল। কয়েকজন ছেঁড়া খাতার পরীক্ষার্থী তো কেঁদেই ফেলে তাদের জীবনের একটা সুযোগ এ ভাবে নষ্ট হল বলে।

বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের এবং ইউনিয়নের মতিগতি এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের কিছু লোক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং জহরের আধ-ভোজন চারের দোকানে নকল সাপ্লাইয়ের কেন্দ্র খুলে চিলের সংগে চোখা বেঁধে উপরের নির্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত ফেলতে থাকে। কিন্তু কড়া নজরদারির ফলে এ সব চোখা কোন কাজে আসে না। হাফে মাকেই দু'একজনকে নিচে গেটের কাছে বেঁধে দেখা যায়। তাদের মারফৎ বাইরে থেকে নির্দেশ আসে—পরীক্ষা ভুল করে দাও।

সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব পরি-কল্পিত। সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত কিছু সদস্য কর্মচারী ভেতরে বেতে দেবার জন্য জেদ করতে থাকে। ব্যর্থ হয়ে তারা আশেপাশে থাকা গেড়ে চোখা সাপ্লাইয়ের চেষ্টা করে। ভালতলা থানার ধবর ছিল যে,

পরীক্ষা ভুল করা হবে। বেলা ১টা পর্যন্ত পুলিশের টিকিটিও পৌর ভবনের আসেপাশে দেখা দেখা যায়নি।

বেলা ১টার পরীক্ষার প্রথম তাপ শেষ হওয়া মাত্র পেট খুলে দিলে মস্তানরা বোমা ফাটার এবং তহারক এবং নজরদারীদের বাপান্ত করে খিঁচি-খেউড় শুরু করে। দু'একজনকে ধাক্কা টাকাও দেয়।

মস্তান পরীক্ষার্থীরা সবলে দাবি জানায় যে, বিভাগীয় প্রমোশনের জন্য পরীক্ষা দেওয়াই চলবেন। পরীক্ষা ছাড়াই এই ৪২০ জনকে প্যানেলভুক্ত করে নিয়ন্ত্রিত ভিত্তিতে প্রমোশন দিতে হবে। সাবাস। পরীক্ষা দিতে পাশ-করার অক্ষমতা তারা স্বীকার করেই নিল। জানা গেল ৪০০ জনের বেশি পরীক্ষার বসেইনি।

অতঃপর পেশাল ডি সি পার্গো-নেলকে বেরাও করে তার ঘরেও তারা ভাঙুর করে। টলিট্যাকের টাইপরাইটার আগেই ভাঙা হয়ে-ছিল। পেশাল ডি সি তাদের দাবি লিখিতভাবে দিতে বললে তারা ঐ একই দাবি লিখে সই করে দিল। নিচে সাঙাতরা ছোরা, পাইপ গ, বোমা ইত্যাদি নিয়ে হাজির থাকল। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে গিয়েছিল।

তাদের বলা হয়েছিল মাধ্য-মিকের বদলে অষ্টম শ্রাশের মান অম্বারী পরীক্ষার বসতে তারা রাজি শেয়াংশ ১২শ পৃষ্ঠায়

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনীহা কেন ?

গার্খ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র সরকারের তৃতীয় বাজেট পেশ করতেই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ নীতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক গঠনের পরিকল্পনা। বহুবোঝিত মুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর কোন অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান শেখ করে আর্থিক সংস্থা সম্পর্কে এ প্রতিমত প্রকাশ করতে হয় কেন ? ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে বিমাতাভুলত চাচণের অভিযোগই বা উঠবে কেন ? প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি রূপায়ণ করতে গিয়েই ব্যাঙ্কগুলি আজ এ সমালোচনার মুখীন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ইকনমিক অ্যাকায়াস, ব্যাঙ্কিং ও ফিন্যান্স কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানের প্রতিফলিত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ নীতি। এবং প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদের স্থানান্তর টানোর খেলায় মত্ত। দেশের কোন অঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলির মোট বিনিয়োগ সেই অঞ্চলের আয়মানের ৪৬.৬৬% আবার কোথাও মাত্র ০.৭%। এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার ভেদে তুলছেন তাঁদের পছন্দমত একটি রাজ্যে সম্পদের পাহাড়, এখানে করছেন তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে, শিল্পায়নে। অপর দিকে বাকী সমস্ত রাজ্যে আয়মানত হুপি হয়েছে প্রচুর, প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাহ্যিক করতে সক্ষম, সে রাজ্যে বিনিয়োগ আয়মানতের মাত্র কয়েক শতাংশ। এ রাজ্যের টাকা চলে আছে অন্য রাজ্যে কলকারখানা গড়ে তুলতে। শুকিয়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী পাব্লিক “ওয়েস্ট বঙ্গল”-এ (সংখ্যা মার্চ ১৬) প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে সংক্ষেপে প্রস্তুত করে তথ্য থেকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্পর্কে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অর্জিত বিনিয়োগ নীতির

চিত্র, পাওয়া যাবে :
রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত আয়মানতের
অঞ্চল কত শতাংশ বিনিয়োগ
করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ	৬০.৮১
পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা ব্যতীত)	২১.৪২
চণ্ডীগড়	৩৪.৬৬
দিল্লী	১১.৫০
তামিলনাড়ু	১৪.২১
মহারাষ্ট্র	৭.২২
অরুণাচল প্রদেশ	৬.৭৫
মিজোরাম	১.৩৬
দাদরা ও নগর হাভেলি	০.২৪
কর্ণাটক	০.৮৪
সিকিম	০.৩১

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্কগুলিতে আয়মানতের পরিমাণ ২,৭২৫.১৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কলকাতার বিনিয়োগ করা হয়েছে ১,৫১৬.২৮ লক্ষ টাকা। আর সমগ্র রাজ্য জুড়ে মাত্র ২২৪.৮৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে চণ্ডীগড়ের অর্জিত বিনিয়োগ করা হয়েছে আয়মানতের প্রায় পাঁচ তিন ভাগ, দিল্লীর ক্ষুদ্র মোট আয়মানতেরও বেশী অর্থ, তামিলনাড়ুতে আয়মানতের প্রায় সবটাই, কর্ণাটকের অবস্থাও তাই, মহারাষ্ট্রেও বিনিয়োগের হার বেশ বেশী। অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, মিজোরামে বিনিয়োগ আয়মানতের নামমাত্র। আসাম, ওড়িশা, বিহারেও বিনিয়োগের অবস্থা ভালো নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগের মাত্রা দেখলে আরও আশ্চর্যজনক চিত্র পাওয়া যায়। কলকাতা ও পশ্চিম দিনাজপুর ব্যতীত প্রায় সমস্ত জেলাতেই বিনিয়োগ আয়মানতের শতকরা চল্লিশ শতাংশের বেশী নয়। নিচের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট :

জেলা	বিনিয়োগ-আয়মানতের শতকরা হিসাব
বাঁকুড়া	২১.৫
বীরভূম	৪৮.৭
বর্ধমান	৩১.১
কোচবিহার	৩২.৭
দার্জিলিং	৩২.৭
হুগলী	২০.২
হাওড়া	২২.৭
জলপাইগুড়ি	২২.৬
মালদা	৪১.৩
মেদীনীপুর	২৮.৩

মুর্শিদাবাদ ৩২.৫
পুর্নুলিয়া ২৮
২৪ পরগণা ১৫.৮
পশ্চিম দিনাজপুর ৪৪.২
কলকাতার গা জুড়েই যে শিল্প-
কল গড়ে উঠেছে সেই চল্লিশ পরগণা,
হাওড়া, হুগলী-জেলাতেই ব্যাঙ্কের
বিনিয়োগের চেহারা দেখলে শঙ্কিত
হতে হয়। কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের
কথা না হয় বাদই দিলাম।
চল্লিশ পরগণার বিনিয়োগ আয়মানতের
মাত্র ১৫.৮%। অর্থাৎ চল্লিশ পরগণা
জেলার মাহুগ জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত
ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে যে পরিমাণ
অর্থ সঞ্চয় করেছেন তার মাত্র কয়েক-
শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে বিনিয়োগ
হিসাবে জেলার শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে
উন্নতি বিধানের। অপর দিকে কেন্দ্র-

জগজীবনের নতুন দলের নেপথ্যে

চন্দন পাঠক

সমস্ত ভাবনা চিন্তার অবসান
ঘটিয়ে জগজীবনবাবু পদত্যাগ করলেন
না তবে দল ভেঙে দিলেন। কারণ
বোধহয় দপ্তরবিহীন হয়ে দিল্লীতে
ধাকার বাতনা তাঁর নেই। রাজ-
নৈতিক গোটা জীবনেই যিনি মন্ত্রী
তিনি মন্ত্রীবিহীন। এতো মাতৃহীন
শিশুর সইয়ার কোলে চড়া। কাজেই
সে সইয়ার দরকার কি ? নিজেই
মা খুঁজবেন এবং তারতবর্ষ বাইপে
মার্চ আর একটি রাজনৈতিক দল লাভ
করবে বাবু জগজীবন রাহের
দরত্রে।

কিন্তু হঠাৎ বাবুজীর এই সিদ্ধান্ত
কেন ? বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজ-
নৈতিক চেহারাটা কি ? ভারতবর্ষ
যতই ছোট নিরপেক্ষ বলে দাবী
করুক না কেন বরাবরই তার রাধি-
কার মতো একটু কোমরঝেলে দাঁড়া-
বার অভ্যাস আছে। কখনও ডানে
কখনও বাঁয়ে। এবং অতীতের ঘটনা
একটু স্মরণ করলেই দেখা যায় উন-
সত্তরে বখন কংগ্রেস ভাগ হয়েছিল
তখন কিন্তু সোভিয়েটের পরোক্ষ সম-
র্থন ছিল এবং সি পি আই সরাসরি
হাত বাড়িয়েছিল, নব কংগ্রেসের
সামনে। জরুরী অবস্থার সমালোচ-
নায় বখন তামাম ভারতবর্ষ মূগুর
তখন কিন্তু একমাত্র দোঙ্গার সি পি
আই ‘অস্থানালপর্বক’ লম্বন করে-
ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরাজীর কাছ
থেকে সরে আসা পর্যন্ত।

শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ে বিনিয়োগ
আয়মানতের মাত্র ৩৪.৬৬%। কেন্দ্রীয়
সরকারের আয়কুল্যে আঞ্চলিক
বৈষম্য দূরীকরণের অপূর্ণ প্রচেষ্টার
অর্জিত চিত্র।

কলকাতা শহর বাদ দিয়ে
পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ
২৭.৪২%। আসানসোল, শিলিগুড়ি
হাওড়া, বর্ধমান শহরে যে অর্থ বিনি-
য়োগ করা হয়েছে তা বাদ দিলে,
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলির
বিনিয়োগ প্রায় শূন্য। গ্রামাঞ্চলে
ব্যাঙ্কের শাখা খুললেই তো গ্রামের
উন্নতি হয় না—প্রয়োজন বিনি-
য়োগের। প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্চলে
ব্যাঙ্কের শাখা প্রসারের উদ্দেশ্যে
গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে নিজেদের
আওতার নিরে আসা। এবং সে অর্থ
অন্তরাজ্যে বা অন্য অঞ্চলে বিনিয়োগ
করা। সরকারী ব্যাঙ্ক আর এ ধরনের
শোষণের ফলে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গ্রাম-
বাংলা ধুকছে।

অথচ সেই মাতান্তর মাল থেকেই
পশ্চিমবঙ্গের সরকার সাধারণ মানুষের

বার্ষিক, রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য
বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে
বারে বারে হাত পেতেছেন ব্যাঙ্কের
কাছে। কিন্তু শূন্য হাতেই দ্বিগুণে
হয়েছে তাঁদের। বর্গাদার, ছোটচাষী,
পতিত জমি তত্ত্ব করা হয়েছে বাদে
তাঁদের শুধু “ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট”
দিয়েও অনীহা প্রকাশ করেছে
ব্যাঙ্কগুলি।

ব্যাঙ্কগুলির এ আচরণ প্রকৃত-
পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিরই
প্রতিফলন। আগামী ভবিষ্যতেও
সে নীতির পরিবর্তনের তো আশাই
নেই, বরং আশঙ্কায় রয়েছে অন্তরূপ।
তাই অশোক মিত্র রাজ্যের নিজস্ব
ব্যাঙ্কে খুলে পকাশ কোটি টাকার
সম্পদ নিয়ে বাংলার উন্নতির যে
প্রচেষ্টার কথা বলেছেন তাকে
খাগত জানাতেই হয়। এছাড়া অন্য
পথ তো নেই। তবে প্রয়োজনীয়
অনুমতি মিলবে কি ? কারণ সেটাও
কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রি-উপরই
নির্ভরশীল।

ইন্দিরা কংগ্রেস এবার কিন্তু
সোভিয়েট ছোঁয়া থেকে অনেকখানি
সরে এসেছে এবং সঙ্ঘবাবুর আমে-
রিকা শ্রীতিও সুবিধিত। সোভিয়েট-
এর আকর্ষণ আগ্রাসন সঙ্ঘে যদিও
বা শ্রীমতী ইন্দিরাজী এখনও পর্যন্ত
সরাসরি কোন সমালোচনা করেন
নি কিন্তু সঙ্ঘবাবু লখনউতে
তেরই কেন্দ্রকারী বললেন, ‘রুশের
আকর্ষণ আগ্রাসনটা কিন্তু এই মহা-
দেশের প্রতি একটা হুমকী মাত্র।’
হয়তো বা সঙ্ঘবাবু মজ বা বলেন
তার মতো কাল তা বলেন এবং
করেন। সবচাইতে লক্ষণীয় ব্যাপার
বহু বিতর্কিত বহুগুণা সাহেব যদিও
বাসা বদল করে শ্রীমতীর ঘরে নাম
লেখালেন কিন্তু এখনও কোন দপ্তর
পেলেন না। সংসদে কিন্তু বহুগুণা
সাহেব সোভিয়েটপন্থী বলেই
পরিচিত।

সোভিয়েট বিদেশমন্ত্রী মিঃ
গ্রোমিকো প্রায় শূন্য হাতেই এবার
ফিরে গেছেন। তাছাড়া আটাশে
ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট উপপ্রধানমন্ত্রী
মিঃ অ্যাই জি-আর্কিপভ-এর ভারত
সরকারকে একটি সাংস্কৃতিক অস্থানে
ভারতের বিদেশমন্ত্রী নরসীমা রাওকে
সভাপতির আসন অলংকৃত করার
জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। নানান
কারণে এবং সমস্যাভাবে তিনি সে
আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন নি।
এবং নিউ ইয়র্কে বাবার পথে লণ্ডনে

বিবৃতি দিলেন কাবুলের ব্যাপারে
ভারত উদাসীন থাকতে পারে না,
কারণ কাবুল যে ভারতের পর নয়
প্রতিবেদী।

ভারতের রাজনীতি যেভাবে
পর্যায়ক্রমে বদলে যাচ্ছে এবং বদলে
যাওয়া পটভূমিকায় সোভিয়েট যে
ভাবে সরে যাচ্ছে ভারতের কাছ
থেকে তাতে কিন্তু সোভিয়েটের
ভারত নীতি বা ভারত প্রসঙ্গে নতুন
করে ভাবনা চিন্তা করতেই হচ্ছে।
ভারতের বুকে একটা বিকল্প শক্তি
সোভিয়েটকে খুঁজে বার করতেই
হবে, যে শক্তি হবে ইন্দিরা আর এস
এস, জনতা বিরোধী এবং পাশাপাশি
সি পি আই-বামফ্রন্টের সংগে সহমতা-
বলধী। যে বিকল্প শক্তির মাধ্যমেই
সোভিয়েট একটু হতো ছাড়তে
পারবে ভারতের বুকে।

এরই মধ্যে বহুগুণা বাবুজীর
ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে গেছে।
বাবুজীর দল ভেঙে দেওয়ার পর
পুরণী মুখোপাধ্যায়-প্রিয়রঞ্জন সাক্ষাৎ
হয়েছে এবং দল ভাঙার পরই কিন্তু
জগজীবন রাহ-বোষণা করেছেন তার
লড়াই কিন্তু ইন্দিরা ও আর এস এস-
মুখী জনতার বিরুদ্ধে। এবং তিনি
তাঁর বন্ধুদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে-
ছেন। বাইপে মার্চ তাঁর নতুন
দলের নাম দেবেন বলে ঘোষণা করে-
ছেন। তথ্যাত্মক মহল ধারণা কর-
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আফগানিস্তানের ঘটনা প্রসঙ্গে

শ্রীমহিরা আচার্যের 'আফগানিস্তানের ঘটনা এবং লেখকদের ভূমিকা' পড়ে অত্যন্ত ব্যথিত রোধ করছি। যে-লেখকের সমাজ চেতনা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে নিরেট হলে, তাঁর সাম্প্রতিক লেখাগুলি যেমন তাঁর চেতনার এক অব্যাহত, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক গুণগত পরিবর্তনের ফলস্বরূপে দেখা দিচ্ছে। সপ্তা-চুয়েক আগে শ্রীআচার্য হঠাৎ মহাশোকাবস্থায় একাডেমী পুস্তক গ্রহণে উৎসাহ জোগাতে চেয়েছিলেন। মিলজ্ঞভাবে, 'মরণের অগ্নিকার'-লেখিকার এ-ব্যাপারে অবশ্য কোনো অস্বীকার পূর্বভাষ ছিলো না। আজ তিনিই হঠাৎ 'বৃহৎ' কাগজে সচেতন তরুণদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রকাশের 'লোভ' আবিষ্কার করে উমা ছুড়ে দিচ্ছেন। আফগানিস্তানে রাশিয়ার ক্ষমতাসীম আচরণের লক্ষ্যে গাইবার জন্তে মিহিরবাবু নিজেকে বড়ো বেশী স্থিতিশীল ও প্রাজ্ঞ বলে আহ্বিত করতে আর্মো পিছপা-হন নি। তাই মুক্তিহীনভাবে 'মাহুদিরিপাদের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে: "চীন বধন ভিয়েতনাম আক্রমণ করল, তখন তাঁরা (যানে, মকশাল-পুহীরা) বোবা হয়ে রইলেন কেনো?" শ্রীআচার্য কিন্তু সি-পি-আই (এম)-নেতাকে পাঁটা প্রশ্ন শোনাতে পারতেন: "কাম্পুচিয়ার ভিয়েতনামী সৈন্যদের বিপ্লব-রপ্তানিকে ধারা মার্কসের নামেই বাগত জানায়, আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কোনো বিতর্ক তুলে লাভ আছে কি?" তাছাড়া, চীনের ভিয়েতনাম-আক্রমণ আর '৬২ সালে চীনের ভারত-আক্রমণ' তো কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যাচেছে শুধু মাহুদিরিপাদের দলের আচরণে। এই দল দুটি 'আক্রমণ'র ব্যাপারে তুরকম মনোভাব প্রকাশ করেছে। আরও অদ্ভুত হলো যে, আফগানিস্তানের ব্যাপারে মাহুদিরিপাট রাজেশ্বর রাও ও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সমস্ত নির্লজ্জতা লাগাতাপি করে নিয়েছেন। 'বৈরতন্ত্র' এব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেনি।

শ্রীআচার্য রাশিয়াকে নিন্দা করতে দ্বিধাবিহীন, কারণ এখানে "বিপ্লবের মধ্য দিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব প্রথম জনগণের সোভিয়েত পড়ে উঠেছে।...ফলে এই দেশ সম্পর্কে প্রজাতন্ত্রী জনসাধারণের সম-তার শেষ নেই। চোখের ধূসর মতো এই মহান দেশকে সে রক্ষা করতে চায়। প্রতিজ্ঞাচক এই পরম সত্যটাকে আমাদের ভুলিয়ে দিতে চায়।" হায়! শ্রীআচার্য কি তবে

আজ মাও সে তুঙ তথা চীমকেই 'প্রতিক্রিয়াচক্রে'র পাণ্ডা বলতে চান? কেনোনা চীমই প্রথম রাশিয়াকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' অভিধা দিয়েছে। এবং বিশ্বের প্রম-জীবী জনসাধারণ প্রতিদিন রুশ সাম্রাজ্যবাদের নবীন মঞ্চবস্তুর স্পর্শ-প্রমাণ পাচ্ছে। দেশে দেশে পোষিত জনতার শত্রু, পুঁজিবাদী বা মেকি সমাজতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে রুশ করে চলেছে ব্যবসায়িক বন্ধুত্বের চুক্তি, যাতে এই সব সরকারেরই স্বার্থে ও আস্থানে সে কোঁজ পাঠিয়ে প্রমজীবী জনতার মুক্তি-আন্দোলনকে চুরমার করে দিতে পারবে। সি-পি-এম ও মকশাল পার্টির সং ক্যাডারদের খুনোখুনিতে, বৃহৎ সংবাদপত্রের ইচ্ছনটাই বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা ছিলো রুশ বন্ধুত্বের সহযোগিতার প্রকল্প-পরিকল্পনাগুলি। যে-দেশে জালিনের শতবর্ষ আসে না যে দেশ আপনায় 'চোখের ধূসি' আপনি উপড়ে ফেলবার চুড়তার বাতে, তাকে অশেষ সমতার আড়ল প্রম-জীবী জনসাধারণ রক্ষা করতে চায়—এ ধরনের আসল নাম শুভব। বাইরের শত্রুতা জয়লয় থেকে এর গলা টিপে ধরতে চেয়েছিলো, মহান জালিন সে অপচেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। আজ সে বেশ আত্মঘাতী হতে চাইছে, এবং তা আবার বিপ্লবেরই নামে। তাই তো সে বিপ্লবেরও শত্রু। যুগা তার একমাত্র অস্বাভাবিক পাওনা, লুঠেরা আমেরিকার সঙ্গে একযোগে। নির্মল সাহা

আসামের ঘটনা

বিদেশীদের প্রাণে আসাম এখন উত্তাল। এবং এই মুহূর্তে গোটা আসামকে যারা পরিচালিত করছে তারা হলো হীনমন্য ও তথাকথিত 'ছাত্র সমাজ'। এদের কাজই হলো হত্যা খুন ধর্ষণ আগুন ও অত্যাচার। এবং এ কাজটা শুধু যে তারা আজ করছে তা নয় "মহারতি" মেহেরর আমল থেকে।

আমার প্রশ্ন হলো: (১) ওরা 'বিদেশী' বলতে কি বোঝে। (২) ভারত সরকার তাঁদের বিদেশী আখ্যাত করেছেন কি না? (৩) ভারতের নাগরিক অথচ এক প্রদেশের মাহুদ অঙ্গ প্রদেশে বসবাস করতে পারেন না? এমন কি সংবি-ধানে আইন সিদ্ধ হলো? (৪) 'বিদেশী'—শুধু এই মামলটুকুর অঙ্ক-হাতে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আরোপ করে সেই নিরস্ত্র নিরীহ বিদেশী মাহুদকে অত্যাচার অপমান খুন করবার অধিকার কে দিলো। আর

মতামত

সেই অত্যাচারই কি শেষ কথা। অর্থাৎ ওটাই কি সমাধানের পথ? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা যা জানি ওয়াও তাই জানে। অর্থাৎ না। এগুলো কোনো সমাধানের পথ নয়। তবু তারা এসব করছে কেন? আমার মনে হয় তার কারণ-গুলো কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক ও বস্ত-জাত। যেমন: (১) ভারতের সবচেয়ে অল্পমত শ্রেনীর মধ্যে আসাম হলো অন্ততম। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সংস্কৃতিতে, কি জীবন ধারণে (২) বেকারী-দারিদ্র্য সামা-জিক ও অর্থনৈতিক দলপাতা ভয়াবহ ও অগ্নিগর্ভ। জমি ও যারগার ব্যাপক অভাব। আর এগুলোকে লোক চক্ষুর অন্ধারালে এবং নিজেদের হতাশা ও ব্যর্থতাকে চাকবার জন্ত তারা নিরস্ত্র মাকিক "মরণের বজ্রের" আয়োজন করে। আর তার প্রধান লক্ষ্য 'বদলা' কিন্তু হত্যাগার সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে হলো। এখন শুধু "বদলা খেদাও" আন্দোলনেই ওরা সীমাবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক নয়, এই অসত্য ও বর্বর তথাকথিত 'খেদাও' আন্দোলনের ধ্বংসে পড়েছেন হত-ভাগ্য মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানরাও। অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওরা এখন যা চাইছে তা হলো একটা পরিপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্রের তার অসমীয়া রাজ্য। সেখানে অন্ত কোনো প্রদেশের লোক ঠাই শুভতে পারবে না। হায়! অক্ষমতা ও ব্যর্থতা চাকার-কি নির্লজ্জ প্রয়াস।

অচিন্ত্য সীতার

দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে

দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট-চেতনা অঞ্চলে (ভবানীপুর-টালিগঞ্জ-আলিপুর নিউ আলিপুর থানা এলাকাধীন) দীর্ঘদিন ধরে এক শ্রেণীর যুবকের কার্যকলাপে জনজীব-নের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। যখন তখন বোমাবাজী, গুলি, খুনের ফলে ছোট বোকানদারদের ব্যবসা ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে। স্থলে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে অভিভাবকেরা উদ্ভিন্ন থাকেন।

কেওভাতলা শাখান কেন্দ্রের দিকি মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে গত একবছরে ছ'জন খুন হয়েছেন। ২৫শে ফেব্রু-য়ারী '৮০ বোমাবাজিতে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা ফুলসাদী রায়চটক মারা যান। এর পূর্বে চেতলায় ১২ ফেব্রুয়ারী '৮০ সন্নীর গোড়ে পুলিশের গুলিতে খুন হন। আমরা ইতিপূর্বে দাবি করেছি ঐ গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান,

নিহত সন্নীরের দ্বারার একটি চাকুরীর ব্যয়সা।

এই এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য লোকসভা সদস্য অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, বিধান সভার সদস্য স্বয়ং ডঃ অশোক মিত্র ও শ্রীঅশোক বসু, ডি, সি (সিউএ), ডি সি (গোয়েন্দা) এ সি. চারটি থানার ও সি, স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা ডাকুন। আশা করি, জনসাধারণের নিরা-পত্তার কথা চিন্তা করে আমাদের এই অহরোধে সাড়া দেবেন।

কল্লোল দাপ্তরিক
সাধারণ সম্পাদক, প্রোগ্রেসিভ পিপলস
ফোরাম, কলকাতা-২৬

পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য

বধ মান জেলার গলনী থানার মিহিগ্রামে ৬ মার্চ ভোররাজে বামফ্রন্ট বিরোধী এক প্রতিজ্ঞাশীল গোষ্ঠী এক পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য করেছে।

পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ওই গ্রামের প্রতিজ্ঞাশীল গোষ্ঠীর অস্ত্রতম দুই নেতার নেতৃত্বে এক সশস্ত্র জমতা ওই গ্রামেরই গরীর মাহুদ স্বধীর বাগদীর বাড়ি ৬ই মার্চ ভোররাজে অকস্মাৎ আক্রমণ করে। হানাদাররা ওই বাড়ীর লোকদের প্রচণ্ড মারধর করে স্বধীর বাগদীর ভাই রবি বাগদীকে গুলী করে হত্যা করে। ওরা ওখানে বেশরোয়াকভাবে বোমাবাজী করে ও তাদের সৃষ্টি করে এবং ওখানে মৃত্যু করা এক খড়ের গাছারও আগুন দেয়। আক্রান্ত বাগদীরের একাংশ যখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাণের তরে এদিক ওদিক পালাজিল তখন ওই হানাদাররা গুলীতে নিহত রবি বাগদীকে টানা-হ্যাচড়া করে নিয়ে গিয়ে ওই জলন্ত খড়ের গাছার নিক্ষেপ করে। পুলিশের অস্থান হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলীর প্রমাণ লোপাট বা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যেই ওরা ওই কাণ্ড করে। হানাদাররা ভেবেছিল খড়ের গাছার আগুনের মধ্যে যদি রবি বাগদীকে পাওয়া যায় তবে হয়ত মরনা তদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। হানাদাররা অবশেষে বাগদী বাড়ির অস্ত্রাস্ত্র জী পুরুষ এবং শিশুকেও ওই আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপন্ন বাগদীরের আপ্রাণ প্রতি-রোধের দরুনই শেষ পর্যন্ত হানা-দাররা ঐ কাণ্ড করতে ব্যর্থ হয়।

শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

স্ববোধ ঘোষ

মিহির আচার্য

প্রথম জীবনে 'কসিন' 'মহা' 'গোজান্দর' 'পরশুরামের কুঠা' শীর্ষক গল্পগুলিতে যে লৌকিকবোধ ইতিহাস চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছি পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিক লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্ববে ঘোষ তাঁদের হাতে জীবনবোধ সংকীর্ণ করে ফেলেছিলেন। অর্থ কমিউনিজম বিরোধিতা এবং এম্টি গ্রিশমেটের অল্পগত সেবক। আহুগত প্রমাণ করার জন্তে 'তিলাজলি' উপন্যাসে কমিউ-কুৎসার মুখর হয়ে উঠলেন। পরবর্তী কালে চিত্রপরিচালক বিমল র 'কসিনের' চলচ্চিত্ররূপে ঘোষার কা-বয় লেখকের আগ্রহে কাহিনী-গান্ধীবাদের তেজাল বেগালে বস্তুবাদী পাঠকেরা ক্রমশ হতাশ হ-লাগলেন যখন দেখলেন স্ববে ঘোষ তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বর্জন করে একের পর এক তথাকথি 'মনস্তাত্ত্বিক' গল্প লিখতে করলেন। এমন কি সে সময় উপন্যাসগুলো প্রেক্ষে সেটিকে উঠে বাংলা দিনেমার কমার্শিয় কাহিনীর প্রেরণা জোগাল।

সব্বেও প্রশংসা করতে হয় লেখ-রচনাত্মক, শব্দনির্মাণ এবং কাহি-বুননের কৌশলে তাঁর নিজস্ব বৈশি-অনন্ততার, যার নাম বলে না দি-লেখককে এক লহরায় চেমা যা-সম্ভবত এটি লেখকের অনন্তব্যি প্রকাশ। এই ভিন্ন ব্যক্তিত্বেরই কাচ স্ববোধ ঘোষ একক, নিঃসঙ্গ, ও-রচনা পরবর্তী লেখকদের অহুপ্র-জোগায়নি, কিংবা প্রভাবও করতে পারেনি। -মৃত্যুর কয়েকব-আগে থেকেই তাঁর লেখনী প্রায়-বাজারে তাঁর অনেক বইও পা-যাননা এবং আজকালকার পাঠক-কাছে তাঁর তেমন চাহিদা ছিল-তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, না-তোর প্রেত বিচারক মহাকাল, ও-বিচারে 'কসিন' 'মহা' 'গোজান্দর' 'পরশুরামের কুঠারের' মতো গল্প-কাল চেতনার স্বাক্ষর বহন-তাঁর প্রতিজ্ঞাশীল-সহকর্ম-যতই তাঁকে 'ভারত প্রেম' কথ-লেখক বলে প্রচার করুন না কেন-খুল পরিচয় কালের ধোপে টি-না।

ভারত মহাসাগরে যুদ্ধ প্রস্তুতি

পরমেশ্বর রায়

ভারত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনবরত শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। পেন্টাগন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইতিমধ্যেই দুটি বিমানবাহী জাহাজ সহ একটি বিরাট নৌবহর ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের দরিয়ায় মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় দশ হাজার নৌ সেনা নিয়ে কয়েকটি জাহাজ পারস্য উপসাগরের অনতিদূরে অপেক্ষা করছে। পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ তড়িৎ গতিতে এই অঞ্চলে আরো নৌবহর ও সেনাদল প্রেরণের জন্তে একলক্ষেরও বেশী মার্কিন সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগরের দিগন্তে গার্মিয়া বীপে ভারী যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন বহর মোতায়েনের জন্তে দিনরাত কাজ করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই বেরণতরী বহর ও নৌ সেনাদল ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হয়েছে তাদের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্তে গত দশায়ে সাতটি তিরিক্ত সরবরাহ জাহাজ পাঠানো হয়েছে। ঐ জাহাজগুলি ভারত মহাসাগরীয় এলাকার বাহিনীগুলির রসদ ও সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক প্রস্তুতির চক্রান্তে অত্যন্ত পশ্চিমী মিত্রদেশগুলিকেও যোগ দেবার জন্তে চাপ সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একযোগে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে যৌথ যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছে। জাপান ও পশ্চিম জার্মানীকেও এই নয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হবার জন্তে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট শ্মিট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্টার ও নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শদাতা ব্রঙ্কেনস্ট্রির সঙ্গে ওয়াশিংটনে বৈঠক করে এসেছেন। এখন তিনি ঘোষণা করেছেন পশ্চিম জার্মানী ও ভারত মহাসাগরে একটি নৌবহর মোতায়েন করবেন। জার্মান নৌবহর তুলনায় ছোট হবে। দুটি ডেস্ট্রয়ার, সাইন সুইপার ও দুটি সরবরাহ জাহাজ এই নৌবহরে থাকবে। এর আগে ফ্রান্স আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ভারত মহাসাগরে নৌবহর মোতায়েন করেছে। ফরাসী রণতরী সমাবেশ প্রধানতঃ সোমালিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু মিশর, ইজরায়েল ও পারস্য

উপসাগরীয় ছোট ছোট কয়েকটি দেশও মার্কিনী যুদ্ধ প্রস্তুতির চক্রে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে কমিউনিজম চোখার নামে যে নয়া উপনিবেশবাদী যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে এসেছে সেনটো, সিয়োটো এবং জাটো যুদ্ধ জোট তার ফলশ্রুতি। কিন্তু কালক্রমে এই যুদ্ধজোটগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। একমাত্র উত্তর অত্যাধুনিক পশ্চিমী সামরিক জোটটি এখনো টিকে আছে। তবে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ এখন জাটো জোটের সকল পক্ষকেই সঙ্গে অসঙ্কেতে ভাল মিলিয়ে চলছে না। মাঝে মাঝে মার্কিন সামরিক আধিপত্য ও চক্রান্ত এই মিত্র দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপর্যয় করে তুলছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট প্রসারকামিতার 'জুজুর' ভয় দেখিয়ে তার সীমানা থেকে বহুদূরে সৈন্য সমাবেশ ও সামরিক প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ১৯৫০ এর দশকে কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপ যেমন এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করেছিল, এবারের মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতি একই ভাবে পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করতে চলেছে।

মার্কিন হস্তক্ষেপের ক্রীড়নক হিসেবে আরব জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক সাদাত এবং পাকিস্তানী সামরিক শাসক জিয়া আফগানিস্তানে ধর্মীয় জিগীর তুলে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছিল। মার্কিন সি আই এ-কে অস্ত্রসম্পদ সরবরাহের দায়িত্ব দিয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার মার্কিন কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা প্রকারান্তরে বাতিল করে দিয়েছেন। এই অবস্থার আফগানিস্তানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে শৈশবেই কর্তরোধ করে হত্যা করার যে চক্রান্ত করা হয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে তা চূর্ণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সরকারের অহরোধ চৌদ্ধ বার উপেক্ষা করার পর, অবশেষে চাপে পড়ে সৈন্য পাঠিয়ে আফগান সরকারকে চলির মত শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। এখন এই অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরীয় এলাকার নতুন চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ও পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, ইরিশোবাংশ চম পৃষ্ঠায়

পুঁজিবাদী সংকট ও বিকল্প পথ

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

অর্থনৈতিক মন্দা এবং মূল্য-ক্ষীতির দরুন সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একদিকে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি এবং অস্ত্রদিকে মূল্যবৃদ্ধির দরুন ক্রয়ক্ষমতার উত্তরোত্তর হ্রাস জনজীবনকে নিষ্পেষিত করেছে। ধনতান্ত্রিক সংকট এখন আর চিরায়ত প্রতিকার ব্যবস্থার উপশম হচ্ছে না। বুজোয়া অর্থনীতিবিদেরা এখন স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে বর্তমান অবস্থার কোন কার্যকরী প্রতিকার ব্যবস্থা তাদের জানা নেই। সম্প্রতি মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন গলব্রেথ বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ফেডারেল বাজেটের প্রায় অর্ধেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রামিক খাতে বরাদ্দ করছে।

সামরিক উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যুদ্ধ ছাড়া কাজে লাগে না। সুতরাং সমরোৎপাদনের অজুহাত সৃষ্টি করার জন্তেও যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করার দরকার হয়। গলব্রেথ ঠিকই বলেছেন, এই সামরিক ব্যয়ভারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংকটের আদি কারণ।

কিন্তু এছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকার অস্ত্র পথ জানে না, পুঁজিবাদী উৎপাদন সর্বাধিক মুনাফার জন্তে সংগঠিত হয়। মুনাফা ছাড়া পুঁজির কোন অর্থ থাকে না। পুঁজিবাদও থাকে না। সাধারণ মানুষের শ্রম শোষণ করেই মুনাফা হয়। সুতরাং পুঁজিবাদও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে। শোষণের ফলে পুঁজির গঠনে পরিবর্তন আসে। নতুন নতুন লম্বী করার জুগোং সৃষ্টি সত্ত্বেও মুনাফার অধিকাংশ নতুন পুঁজি হিসাবে লম্বী করা হলে পুঁজির দুটি অংশ স্থায়ী পুঁজি ও পরিবর্তনশীল পুঁজির অল্পপাত পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমের তুলনায় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি স্থায়ী ধরনের পুঁজির অল্পপাত বেড়ে যায়। তখন স্বাভাবিক নিয়মে শ্রমের পরিমাণও বাড়ানো হলে সংকট দেখা দেয় না যেমন সমাজতান্ত্রিক দেশে ঘটে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই অল্পপাত রাখা সম্ভবই নয়। কারণ অত্যন্ত পণ্যের মতই শ্রমের চাহিদা বাড়লে তার দাম অর্থাৎ মজুরীও বাড়তে হয়। অথচ শ্রমে মজুরী কম না হিলে মুনাফা হয় না। আর মুনাফা না হলে পুঁজির ক্ষমিকাই মূল্যহীন।

সুতরাং পুঁজিবাদীরা সমাজ শ্রম পাবার জন্তে এক সংরক্ষিত বেকার বাহিনী সৃষ্টি করে। কৃষি ক্ষেত্রে সামন্তবাদী শোষণ বজায় থাকলে বহু কৃষক জমি হারাতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে ৬৬ লক্ষ ক্ষমিকীন কৃষক ছিলেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে এদের সংখ্যা পৌনে দুই কোটিতে দাঁড়িয়েছে। জমি হারিয়ে এই কৃষকেরা শহরে কাজ খুঁজতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের আধুনানী বেশী হওয়ায় শ্রমের দাম কমে অর্থাৎ মজুরী কমে যায়। তখন মজুরী শুধু শ্রমিকদেরই কমে না। মজুরীর সামাজিক হারও কমে আসে। ফলে কর্মচারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়েও টান ধরে।

পুঁজিপতিরা সর্বদাই মুনাফা-শিকারের ক্ষমানে থাকে বলেই পুঁজিবাদের দুটি দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয়। এক, পুঁজিবাদ বেকার বাহিনী সৃষ্টি করতে বাধ্য; দুই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির আদিক পরিবর্তনের

অর্থনীতি

ফলে তার মুনাফার হার (মোট মুনাফা নয়) ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য। সুতরাং পুঁজিবাদ টিকে থাকার জন্তে ক্রমাগত বেকার সৃষ্টি করে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা করে। ফলে তার পণ্য বিক্রয় হয় না। অবিক্রীত পণ্য জমে যাওয়ার ফলে তার পুঁজিও অকেজো হয়ে পড়ে। মুনাফা উত্তল করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বহু শিল্প কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লাল-বাতি জালাতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়। এটাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক সংকট।

এই সংকট থেকে আত্মরক্ষা করার জন্তে পুঁজিবাদীরা নানাভাবে চেষ্টা করে। জন মেনার্ড কেইনস একটা পথ বাৎসলেছিলেন। তা হল মন্দার সময় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি এবং তেজীর সময় ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি। কিন্তু এর ফলে ক্রমশঃ সংকট না কমে সংকট স্থায়ী হয়ে যায়। ১৯৭৪ সাল থেকে বিশ্বপুঁজিবাদ প্রায় স্থায়ী ভাবে এই সংকটে পড়েছে। সোনার দাম বৃদ্ধি, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মূল্য সংকট, স্থায়ী বাণিজ্য সংকট এ সমস্তই এই মৌলিক সংকটের খণ্ড খণ্ড বিহঃপ্রকাশ মাত্র।

ইতিমধ্যে সংকটের হাত থেকে

পরিজ্ঞান লাভের জন্তে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ানো এবং খাটতি ব্যয়ের নীতি অহুসরণ করেছে। কিন্তু তার ফলে সংকট কমেই, বরং তা আরো গভীরতা ও পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানে বেকার সংখ্যা অনবরত বাড়ছে, মূল্যের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে এবং সরকারী আয়-ব্যয় নীতি বানচাল হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশেই পাট্টা অর্থনীতি বা কালো-টাকার অর্থনীতি গড়ে উঠছে।

সামরিক ব্যয়বৃদ্ধি করে পুঁজিবাদী সংকট থেকে পরিজ্ঞান লাভের আশা আজ মরীচিকার পরিণত হয়েছে। বিশ্বের নানা স্থানে, নানা অঞ্চলে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে বিশ্বপুঁজিবাদ অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করেছে তার ফলে সবার আগে ঐ পুঁজিবাদী দেশের মানুষেরাই সবচাইতে মারাত্মক আঘাত পাচ্ছেন। তাঁরা ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। ফলে নানা সামাজিক ব্যাধি পুঁজিবাদী সমাজের মূলেই কূঠরাঘাত করছে।

সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি বাজেটের খাটতি, বাণিজ্য খাটতি এবং মূল্যমূল্যের ক্রমাবনতি পুঁজিবাদী উৎপাদনকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফলে আজ পুঁজিবাদী সমাজকে টিকিয়ে রাখার কোন রাস্তাই খোলা নেই। সব দেশের জনসাধারণকেই এটা বুঝতে হবে। এবং পুঁজিবাদী সমাজের মূলে এক সংকটমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্তে সংগ্রাম করতে হবে। পুঁজিবাদ নিজে নিজে সরে যাবে না। তাকে সরিয়ে দিতে হবে। এর প্রথম শর্ত, পূর্ণ গণতন্ত্র অর্থাৎ অবাধ রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার। আমাদের দেশে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের প্রথম পর্যায়ের কঠিন সংগ্রাম। ইতিহাসের এটা শিক্ষা।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী (১৫)

ডঃ কুদরত ই খুদা

অজুন দাস

মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার যে অভিলাস আজ বাংলাদেশে জেগে উঠেছে, তার পেছনে বহু মনীষীর অবদান রয়েছে। তাঁরা এই জাতিকে বার বার হাশিরার করে দিয়েছেন, নিজের মাতৃভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে চালু করতে না পারলে এ দেশের উন্নতি নেই। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যখনি উচ্চারিত হয়েছে তখনি প্রমাণ উঠেছে, তাহলে বিজ্ঞানচর্চা কি ভাবে চলবে? তাদের উত্তর 'ঐ' একটাই—মাতৃভাষায়। এর জন্তে গ্রন্থ রচনা করতে হবে, পরিচয় করে পরিভাষা তৈরি করতে হবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে আবশ্যিক করে দিতে হবে। তাঁদের ধারণা মাতৃভাষাচর্চা ছাড়া জীবনে কোন জাতিই উন্নতি করতে পারেনা।

এই ধারণার মাধ্যমে বারা মাতৃভাষার বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহ প্রদান করে আসছিলেন তাঁদের ভেতর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি-মাতৃভাষার বিজ্ঞানচর্চাকে শুধু যে উৎসাহিত করেছেন তা নয়, এই কাজকে তিনি তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্রত গ্রহণে তাঁকে দুজন মনীষী বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। এর একজন কবি রবীন্দ্রনাথ, অপরজন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই ব্যক্তিত্বের জীবনসাধনাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ

বইয়ের দেশ

৭ম পৃষ্ঠার পর

বর্ধিত জাতীয় পায়—যাতে সে বড়জোর একখানি বই কিনতে পারে। কিন্তু ব্যয়বুদ্ধি না হলে সে অন্তত ৩ খানি বই কিনত।

এখন ভালোহান্দ সবকিছু বিবেচনা করেও বলা যায়, ইজরায়েলের ২ই ব্যবসার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। এমন কি প্রকাশনার ব্যয়ের হার ক্রমবর্ধমান হলেও এখনো তা ছনিয়ার বাজারের তুলনায় রীতিমতো কম বলা যায়। যতকাল ইজরায়েল তাহের বই পড়ার ভালো অভ্যাসটি বজায় রাখবে, ততকাল ইজরায়েলের প্রকাশনা শিল্পের বাজার ক্রমশ তেজী ও আরো তেজী হতে থাকবে। এইভাবে ছনিয়ার বাজারে বইয়ের দেশ হিসেবে ইজরায়েল তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে।

করে ডঃ খুদা তাঁর কর্মজীবনে বাঁপিয়ে পড়েন।

১৩০৭ সালের ২৭শে বৈশাখ, (১৯০০) সোমবার পশ্চিম বাঙলার বীরভূম জেলার, মাঘগ্রামে ডঃ খুদা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিলো রক্ষণশীল। তাঁর পিতা একজন পীর হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি এত সং ছিলেন যে, বাঁকে তাঁকে শিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করা তিনি অসম্মীচিন মনে করতেন। ডঃ খুদার শিক্ষাজীবন এই রক্ষণশীল আবেষ্টনীতেই শুরু হয়। এর তেতর তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাকে বাঙলা শিক্ষার অগ্রপ্রাণিত করেন। এই অগ্রপ্রেরণার তিনি মাঘগ্রাম এম ই স্কুল থেকে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ১৯১০ সালে কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯১৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসা থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সৈধান থেকে ১৯২০ সালে তিনি রসায়নবিজ্ঞান এম-এস-সি পাশ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এখানকার লেখাপড়ার পাট নাড় করে ডঃ কুদরত ই খুদা ১৯২৪ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে লণ্ডন পমন করেন। লণ্ডনে তিনি চার বছর অধ্যয়ন করে ডি এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে এসে ডঃ খুদা 'প্রেম-চাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করেন। তখন পর্যন্ত ডঃ খুদা ছিলেন একমাত্র মুসলমান যিনি এই ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় এই বৃত্তিধারীদের নতুন পিসিস জমা দিতে হতো। আগে পুরানোটা জমা দিলেও চলতো।

১৯৩১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে এই কলেজের এক শিক্ষা পণ্ডা পালন উপলক্ষে তিনি রবীন্দ্রনাথের সংগে পরিচিত হন। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, তাই ডঃ খুদাকে সারা জীবন অগ্রপ্রেরণা প্রদান করে এসেছিলো। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অব্যক্ত হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে তৎ-

কালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। শোনা যায়, এই সময় নাকি তৎকালীন পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ চট্টগ্রাম এসেছিলেন এবং ডঃ খুদাকে আবার কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই অগ্ররোধ ডঃ খুদার কর্মসকলতার স্বাক্ষর।

পাকিস্তান চলে গিয়ে তিনি নিজেকে নানা প্রকার কাজের সংগে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি তি পি আই হিসেবে যোগদান করেন। এই সময় তিনি অশেষ কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন। এই পদ গ্রহণ করার পর দেশে নামা প্রকার রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। এসব গোলযোগে ডঃ খুদা ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধিতা করেন। তাঁর ধারণা, ছাত্রদের গোলযোগে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিলেই তা পরিণামে একটা অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অবশেষে ব্যাপক গোলযোগ ডেকে আনবে। তাঁর

এই উপদেশ অনেক সময়ই কার্যকর প্রতিরোধ হিসেবে ফলপ্রসূ হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ডঃ কুদরত ই খুদা বিজ্ঞান শিল্প পরিষদের পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। এবার তিনি তাঁর সত্যিকার আসন খুঁজে পান, যেখানে তিনি প্রকৃত মাধক হিসেবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। এই পরিষদে ডঃ খুদা যে যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেছেন তা সত্যি অতুতপূর্ব। এই পরিষদে কাজ করার সময় তিনি লক্ষ্য করেন, এদেশে যে সম্পদ লুকিয়ে আছে তাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন সাধিত হবে। পাট কাঠি, হলুদ পিট কয়লা, ইলিশ মাছের তেল, চীনা বাদাম ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস থেকেও দেশীয় সম্পদ গড়ে তোলা যায়। এভাবে তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্তে বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি আঁকেছিলেন। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার কোন সুযোগই তিনি লাভ করেননি।

ডক্টর কুদরত ই খুদার সর্বাপেক্ষা বড় অবদান হলো তৎকালীন পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিরুদ্ধে শাসক চক্রের আক্রমণে প্রত্যুত্তর প্রদান। এই ক্ষেত্রে ডঃ খুদা যে সূক্ষ্মা পালন করেছিলেন তা সত্যি অতুতপূর্ব। তাঁর এই কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে রবীন্দ্রবিরোধী অভিযানের প্রাকালে। বিশেষতঃ রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীতে। সেদিন বাঙলার অস্তিত্ব অঞ্চলের মত ঢাকা-চট্টগ্রামেও রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর তোড়জোড় চলছিলো। এই তোড়জোড়ের পেছনে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ লুক্কায়িত ছিলো সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে কারণে একটা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সরকার রবীন্দ্রনাথবিরোধী প্রচারপার মেতে উঠে। এই প্রচারপার প্রতিবাদে ডঃ আনিজ্জামামার নামা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যাতে পূর্ব শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

- ১। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।
- ২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।
- ৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।
- ৪। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করুন।
- ৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।
- ৬। ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন।
- ৭। এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।
- ৮। জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুন।
- ৯। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই সি এ ২২৯৫/৮০

ইজরাইল বইয়ের দেশ

অমলেন্দু ঘোষ

হুনিয়ার বাজারে ইজরায়েলকে বলা হয় বইয়ের দেশ। কেন বলা হয় সেকথাই আলোচ্য। হুনিয়ার মারচিজে ছোট্ট এক প্রজাতন্ত্রী দেশ ইজরায়েল (১৯৪৮ মে ১৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশ্বায়ক রুতিবের দাবি রাখে। ইংরেজি ১৯৪৪ সালের হিসেব অনুসারে বলছি : শিক্তিতের উচ্চহার, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ও সবার সম্মত সমান অবৈতনিক শিক্ত-শিক্ষা সহ ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বৈতনিক মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজী শিকার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সুখিকা বিশেষ গৌরবময়। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেদের সবার ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ত-শিক্ষা দান ১৯৪৯ সনে দেশের আইন হিসেবে পাশ হয়। এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদের মধ্যে সারা প্রাথমিক শিক্ষা কোনো কারণে শেষ করতে পারেনি, তাদের পক্ষেও বিশেষ সাফ্যাকালীন ক্লাসে যোগ দান আবশ্যিক করা হয়েছে। ইহুদি বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানত হিব্রু ভাষায় (ওল্ড-টেস্টামেন্ট বাইবেল-এর ভাষা) শিক্ষা দেওয়া হয়, যদিও সেই সঙ্গে শেখানো হয় ইংরেজি ও আরবি—যা প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে চালু আছে ১৯২০ খ্রিঃ থেকে। আরবি বিদ্যালয়গুলি অবশ্য শিক্ষা দেয় আরবিতে, যদিও স্কুলের ৪র্থ শিক্ত-স্তর থেকে হিব্রু শেখায়। হিব্রু ভাষায় স্কুলগুলিতে অবশ্য আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তা হলো ঐচ্ছিক।

এখানকার উচ্চশিকার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলি হলো—(ক) হিব্রু ইউনিভার্সিটি, জেরুজালেম; (খ) ইজরায়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হাইফা; (গ) বার ইলান ইউনিভার্সিটি, রামাত গান; এবং (ঘ) টেল আভিভ ইউনিভার্সিটি, টেল আভিভ। এছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে—শিক্ত-শিক্ষণ শিল্প শিক্ষা ও বয়স্ক শিকার ক্ষেত্রে। তাছাড়া, ভাইজ্ঞান বিজ্ঞান কেন্দ্রে আছে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্তালাভের ব্যবস্থা। আর আছে জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন পরিষদ—যার কাজ হলো ভাইজ্ঞান বিজ্ঞানক্ষেত্র ও বীরসেবায় অবস্থিত অ্যারিড জ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠানে গবেষণা প্রকল্পাদির কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে।

ইজরায়েল থেকে প্রকাশিত ২৫টি দৈনিক সংবাদপত্র—১৪টি হিব্রু

ভাষায় ও বাকি ১১টি পত্রিকা মুদ্রিত হয়ত স্থানীয় ১০টি বিভিন্ন ভাষায়—যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ভাষা হলো আরবি। এছাড়া আছে প্রায় ৩০০ সাময়িক পত্র, এবং প্রায় ১০০০ নতুন বই প্রকাশিত হয় প্রতি বছর। তিনটি স্থপরিচিত ও সুবৃহৎ বিয়েটার কোম্পানির অন্যতম হলো—হিব্রু জ্ঞানভান্ডার বিয়েটার টেল আভিভ জাভায়। ইজরায়েলের ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা ও তার সুবৃহৎ মঞ্চ বিশ্ববিখ্যাত।

এখানকার প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও ঘরোয়া ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি সরকারি মন্ত্রিসভার তত্ত্বাবধানে। রাষ্ট্রের ধর্মমত হিসেবে ইহুদি ধর্মমতের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত, তবে সেই সঙ্গে অত্যন্ত সম্প্রদায়েরও নিজস্ব ধর্মচর্যের পূর্ণ স্বাধীনতা ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে আইনের মাধ্যমে।

এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই মোটামুটি বোকা যায়, কেন ইজরায়েলকে বইয়ের দেশ বলা যায়। এই চিত্র আরো পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল এখানে।

বইয়ের দেশ ইজরায়েল

সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্যসূত্রে প্রকাশ—ইজরায়েল ও ইহুদি যেমন একাত্মক, ইজরায়েল ও বই তেমন সমার্থক। অর্থাৎ ইজরায়েল যেন বইয়ের দেশ। স্বর্দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী তাদের বইয়ের ইতিহাস, বই-ছাড়া তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসারের কথা ভাবতেই পারে না। মুদ্রিত বইয়ের মাধ্যমে শিকার সম্ভাবহার তারা সর্বদাই করে থাকে। ভাষা শিক্ষা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতা যখন একটা দরল ও সর্বজনগ্রাহ্য লিপির সন্ধানে নিরন্তর প্রয়াসী, ইজরায়েল তখন একটা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে—হিব্রু ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ ‘বাইবেল’ (Old Testament) ও ইহুদি পুরাণগ্রন্থ ‘টালমুড’ (Talmud) এর মধ্যে। যদিও এই গ্রন্থাদি প্রথম পার্সেন্ট জাতীয় চামড়ার কাপড়ে লিখিত ছিল, তবুও তা ছিল আজকের মুদ্রিত বইয়ের পূর্বসূরী—যার ফলে বই আজ বংশ পরম্পরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান সহায়ক হয়েছে।

সবার ওপরে ইজরায়েল

আজকের হুনিয়ার বইয়ের রাণ্যে সেরা ৫টি দেশের মধ্যে ইজরায়েল অন্যতম। প্রকাশনার ক্ষেত্রে, দৃষ্টান্ত

রূপ বলা যায়, প্রধানত ইহুদি অধ্যুষিত ইজরায়েল—যার লোকসংখ্যা মাত্র ৩ কোটির কিছু বেশি—কিন্তু সেখানে প্রতিবছর মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা যে কোনো দেশের পক্ষে ঈর্ষার কারণ। একমাত্র বিগত ১৯৭৬ সনেই প্রকাশিত হয়েছে ৩,৫২২ খানি বই—যার মধ্যে ১১০০ খানিরও বেশি রয়েছে নতুন বই (অবশিষ্টগুলি পুনর্মুদ্রণ ও বিবিধ)। অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে এই হার হলো প্রতি ১ কোটি অধিবাসীর ক্ষেত্রে ১০০৬ খানি মুদ্রিত বই। যদি এই হার হুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত বড় দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সেই হিসেব দাঁড়ায় এরকম : (প্রতি কোটি লোকসংখ্যার হিসেবে বই) রাশিয়া ৩১০ খানি, সমগ্র ইরোরোপ ৫৫৮ খানি, নর্থ আমেরিকা ৩৮১ খানি। এই চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে, বইয়ের বাজারে ইজরায়েলই (১১০০ খানি) উল্লিখিত লীধস্থানীয়দের অন্যতম, অর্থাৎ সবার ওপরে। তাই বলা যায় ইজরায়েল বইয়ের দেশ।

১৯৭৬ সনে মুদ্রিত পূর্বোক্ত ৩,৫২২ খানি বই কেবলমাত্র ইজরায়েল থেকেই প্রকাশিত নয়; এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে বেশ কিছু বইপত্র আছে যা বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশকদের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত। এক্ষেত্রে ইজরায়েলের উদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের বিক্রয়মূল্য থাকে তার হাতে, আবার বিদেশী প্রকাশকের উদ্যোগে মুদ্রিত বইয়ের বিক্রয়মূল্য থাকে বিদেশীদের হাতে।

রফতানি ও বেচাকেনা

স্বভাবতই ইজরায়েলে প্রকাশিত বইপত্রের বেচাকেনার এক সমৃদ্ধ রফতানি বাজার রয়েছে। ১৯৭৮ সনে ইজরায়েল থেকে রফতানিকৃত মুদ্রিত বইপত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং এই সমস্ত বইপত্রের মূল্য ছিল ৫ কোটি ডলারেরও বেশি (আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা)। তারপরই ছিল ইংল্যান্ড ও জার্মানির স্থান—এদের কাছে রফতানিকৃত বইপত্রের মূল্য ১ কোটি ডলার (প্রায় ৮ কোটি টাকা)। অতঃপর উল্লেখযোগ্য ফ্রান্স ও কানাডার নাম, এদের ক্ষেত্রে বইপত্রের মূল্য কোটি ডলারের কিছু কম। রফতানিকৃত এই সমস্ত বইপত্রের মধ্যে আছে ক্যালেন্ডার থেকে গ্রিটিং কার্ড পর্যন্ত—এমনই ব্যাপক ইজরায়েলের এই প্রকাশনার বাজার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, জেরু-

জালেমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অম্ববাদ সংস্থা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে অম্ববাদ করণের অর্ডার পায় যেহেতু এই সংস্থা বিশ্বের যাবতীয় ভাষায় অম্ববাদ কাজ করে সবচেয়ে ভালোভাবে ও উপযুক্ত দামে।

এই সঙ্গে বলা যেতে পারে ইজরায়েলি বইপত্রের খুচরো বাজারের কথা। ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ বাজারে দেখা যায় জুডাইকা, ট্যালমুড, বাইবেল ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থ সংক্রান্ত বইপত্রের চাহিদাই স্বভাবত বেশি। তাছাড়া, বিপুল সংখ্যক বিদেশী, বিশেষত অ্যাংলো-জার্মান দেশগুলো থেকে আগত ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায়-প্রকাশিত বইপত্রের চাহিদা রয়েছে প্রচুর। বাজারের সর্বপ্রকার বইপত্রের খুচরো বিক্রির মধ্যে মোটামুটি শতকরা ৩৫ ভাগ ইংরেজি বইপত্রের বেচাকেনা করে ‘স্টেইমাজ্‌কি’ নামে এক প্রধান খুচরো বিক্রেতা সংস্থা। আরেকটি নামী খুচরো বিক্রেতা হলো ‘অনুফ-ম্যান’ সংস্থা—যারা বিক্রি করে মোটামুটি ৬০ শতাংশ ইংরেজি বইপত্র। জেরুজালেমের নামী খুচরো বিক্রেতাদের মধ্যে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা আছে যারা কেবল ইংরেজি ‘পেপার ব্যাক’ সংস্করণ বইপত্র বেচাকেনা করে প্রায় ১৫ শতাংশ। এছাড়া রয়েছে আরো কয়েকটি বিক্রেতা সংস্থা—যারা প্রধানত এবং কেবলমাত্র হিব্রু ভাষায় বইপত্রই বেচাকেনা করে।

পাঠ্য বিষয় প্রসঙ্গ

বই বিক্রির মোটা অঙ্কের হিসেব থেকে প্রায় ভাগা ভাগাবিক : কোন্ জাতীয় বই এখানে সবচেয়ে ভালো বা বেশি বিক্রি হয়? এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলতে হয়, বই বিক্রির ভালো-মন্দ, কম বেশি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওপর। যেমন, যেসব অঞ্চল হোটেলের কাছাকাছি অবস্থিত, সেখানে প্রধানত পেপার-ব্যাক সংস্করণ গল্প-উপাঙ্গানের বই বেশি বিক্রি হয়। আবার, জেরুজালেম শহরের কেন্দ্রস্থলে জুডাইকা বা ইহুদি ধর্মসংক্রান্ত বইপত্রই বিক্রি হয় বেশি। জটনক সেরা বিক্রেতা (Ronnie Winch) বলেন : জেরুজালেমে ট্যালমুড প্রাচীনের সংখ্যা-ধিক্যহেতু এখানে ৩ শ্রেণীর বই সবচেয়ে ভালোভাবে বিক্রি হয়, হংগেরা ভাষাভাষা মাতাপিতার চান তাদের ছেলেমেয়েদের হাতে মিক মডল, ডোনাল্ড-ডাক ধরনের বইপত্র তুলে দিতে, এবং এইভাবে উক্ত হংগেরা ভাষী মাতাপিতার তাদের ইংরেজি-রানা বজায় রাখার তৃপ্তিপূর্ণ চান। আরেক জন খুচরো বিক্রেতা (Yeh-

uda Molhpo) বলেন : পেপার-ব্যাক বিক্রিতেই সবচেয়ে বেশি লাভ; আর, বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপাঙ্গান সাধারণত ভালোভাবে বিক্রি হয়; কিন্তু পুরনো বই বিক্রির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক সময় বিক্রির পরিমাণ ও লাভের অঙ্ক কমে যায়।

হিব্রু ও অন্যান্য বই বনাম মুদ্রাস্ফীতি

যদি প্রশ্ন করা যায়, একদা ভিন্ন দেশে শিক্তিত কিছু এখন ইজরায়েলে বসবাস করছেন এমন মানুষ কোন ভাষায় বইপত্র বই পড়তে ভালো-বাসেন? তাহলে বই বিক্রির ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, উক্ত প্রবাসী ইজরায়েলে কম বেশি যতদিনই এখানে বসবাস করেন না কেন, তিনি স্বভাবতই তাঁর মাতৃভাষায় বইপত্র পড়তেই ভালোবাসেন এবং কার্যত তা বেসেও থাকেন, অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তিনি প্রকৃতই বেশ ভালো হিব্রু জ্ঞানেন ও হিব্রুতে বইপত্র কথো-বার্তাও বলে থাকেন। এখানকার প্রায় সমস্ত বই বিক্রেতাই একথা সমর্থন করেন।

যদিও ইজরায়েলিরা হুনিয়ার বই-পড়ারদের মধ্যে সগৌরবে প্রথম সারিতে বিজ্ঞান, তবু তাদের প্রিয় বইপত্রের কেনাবেচার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি বেশ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। জটনক বই বিক্রেতা বলেন, কোনো কোনো ক্রেতা অনেক সময়ে বিশেষ বিষয়ের ওপর বেশ চড়া দামের (1L,500) বইও কিনতে চান; কিন্তু পরসার অস্থিতির ক্ষেত্রে হয়তো তিনি মাস দুয়েক পরে এলেন এবং বিফারিত চোখে দেখলেন সেই বইয়ের দাম (1L,850) আরো ৭০ শতাংশ বেড়ে গেছে। ফলে ক্রেতা হতাশ, বিক্রেতা ততটা না হলেও অন্তত কিছুটা নিরাশ। এই অবস্থার ক্ষেত্রে দায়ী একটি বিশেষ কারণ হলো, বিক্রেতা সংস্থাগুলির নিয়মিত মূল্যবৃদ্ধির চাপ।

প্রকৃতপক্ষে, ইজরায়েলের সেরা বই বিক্রেতাদের অন্যতম এক সংস্থা (Steimatzky) প্রতি হু মাস অন্তত বর্ধিত মূল্যের পুস্তকতালিকা প্রকাশ করে থাকে—যাতে দেখা যায় কম পক্ষে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধির ছাপ। ফলে, প্রায় সর্বপ্রকার বইপত্রের বেচাকেনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও লাভের আনুপাতিক হার সমান তো থাকেই, বরং তা ক্ষয়বর্ধমান। তাই, বিক্রেতারা বলেন, মুদ্রাস্ফীতি তাঁদের বেচাকেনায় সামান্য হলেও ক্ষতি করেছে; যেমন একজন কর্মী জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাত্র ৭০ শতাংশ শেয়াংশ ভেট পুষায়

সাহিত্য দর্পণ

স্বজনী প্রতিভা বনাম সেবাপ্রদ

মিহির আচার্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে জননী টেরেসা (টেরিজা) ও সত্যজিৎ রায়কে ডক্টরেট দেবার বাসি খবরটা উদ্ভূত করবার কোনো প্রয়োজন ছিলনা যদি না সেই উৎসবে শ্রীরায় মন্তব্য করতেন জননী টেরেসার সেবাকর্ম স্বজনশীল শিল্প-কর্ম থেকে অধিক উচ্চাঙ্গের বস্তু। যেহেতু তাঁর আত্মোৎসর্গ এবং দান ইত্যাদি।

এই ভূতি যদি শ্রীরায়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার হত আমাদের আপত্তি করবার অর্থ ছিলনা। কিন্তু তিনি যখন স্বষ্টিকর্ম শিল্পীমাজের হয়ে এ মন্তব্য করেন তখন স্বজনশীল, লেখক হয়ে তাঁর প্রতিবাদ করতেই হবে। ধনী-গরিবের অস্তিত্বকে ধারা শাখত সামাজিক বিধান বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষে সেবা একটি মহৎ ধর্ম বলে কীতিত হবে। কারণ, সকলেই জানেন, অসম সমাজ ব্যবস্থার কারণেই, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক সম্পদ মুষ্টিমেয়র মধ্যে নীমাবদ্ধ থাকার স্বার্থেই, সমাজে দারিদ্র্য, অসুখ-অসুস্থ।

যুদ্ধ প্রস্তুতি

১৯৭১ সাল

জিয়া এবং ইপিওগিরী পশ্চিম এশিয়ার তৈল সমৃদ্ধ ইরান ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বর্তমান মার্কিন চক্রান্তের মূল-লক্ষ্য।

বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই মার্কিন চক্রান্তের ধপসে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতেও মার্কিনী ধারা প্রসারিত। এই অবস্থায় ভারতকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সময় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী বহর পাঠিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন ভারতকে ভীতি প্রদর্শন করতে ইতঃপ্তত করেন নি। মনে রাখা প্রয়োজন যে দিয়োগো গার্সিয়া নৌবাটি ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সামরিক বিচারে বহু দূরবর্তী নয়। দিয়োগো গার্সিয়ার ঘাঁটি থেকে আধুনিক ভারী কামান কোচিন বন্দরকে লগুতও করে দিতে পারে।

এই অবস্থায় ভারত মহাসাগর থেকে মার্কিন ও পশ্চিম নৌবহর অপসারণের দাবী একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

দারিদ্র্য চিরকালীন সত্য বলে বিবেচিত হলে দুঃস্থের সেবা প্রয়োজন। এবং প্রায়শই এই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি তথাকথিত ধনিক শ্রেণীর পুষ্টপোষণায় গড়ে উঠেছে। ফলে ধনতন্ত্র, দারিদ্র্য, সেবা ইত্যাকার বিষয়গুলি একই উৎস থেকে উৎসারিত।

সত্যজিৎর মতে লোকেরা এ-সত্যকে ধ্রু বলে স্বীকার করেন বলে সেবাকে বৃহৎ ধর্ম বলে প্রচার করেন। এবং তাঁদের চোখে স্বভাবতই জননীকে উৎসর্গীকৃতপ্রাণী বলে মনে হয়।

কিন্তু আমরা যারা ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বহুমানসিটা জানি তাদের কাছে সমাজের অধিক মানুষকে দরিদ্র বানিয়ে রেখে সেবা করবার সুযোগ গ্রহণের আসল লক্ষ্যকে ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে ধীর-ধারী করবার দালিশী বলে মনে করি।

পাশাপাশি করুনা করুন এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে সামাজিক সম্পদের ওপর অধিকাংশ মানুষের অধিকার। কৃত্রিম অসুখ তৈরি করবার রাষ্ট্র নামক কলটি নেই। তাহলে বুঝেচারা সমাজস্বত্ব 'সেবা' নামক 'মহৎ' প্রবৃত্তিটি বাস্তবে প্রয়োগ করবার অবকাশ কোথায়?

এদেশে সেবা ধর্মে ব্রতী প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। ভারত সেবাপ্রদ, রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আছে। জননী টেরেসা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী এবং নিম্নতম ধর্মীয় সংস্কারেই তাঁর সেবাসংস্থাগুলি গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই কর্মস্থলে যাবার পথে তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে দুঃস্থ এষেপী খ্রীষ্টান নারীদের দেখি ডেকাটি হাতে খিচুড়ি জাতীয় তরল একটি বস্তু সংগ্রহ করতে; কখনো দুধ, কিংবা বস্ত্র, চিকিৎসারও সুযোগ আছে। আমাদের দেবাদি; দেব মহাদেব যখন ভিক্ষুক তখন এ দেশে ভিক্ষাবৃত্তি একটি ধর্মীয় আদর্শ বলে পরিগণিত হবে আশ্চর্য নয়।

জননী টেরেসার আর একটি মহৎ কর্ম অবৈধলস্কানদের গ্রহণ করে তাদের আদর্শ খ্রীষ্টান হিসেবে গড়ে তোলা।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সরকারী সঞ্চয়না সভার জননীর সেবাদর্শে অবস্থাপন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার থেকেই এ কাজ করা উচিত ছিল, যখন তা সম্ভব হচ্ছে না তখন

জননী টেরেসার এসব কাজকে আপাতত উপযুক্ত মর্যাদা দিতেই হবে ইত্যাদি।

এ পর্যন্ত বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার কথা ভেবে বুদ্ধিমানের মতো আমরা নীরব হতে পারি। কিন্তু বিশ্বত হতে পারি না আরেকজন মহীয়সী বিদেশিনী সেবাকাজের মধ্যে আটকে না থেকে এ দেশকে ভালোবেসে, এ দেশের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে, বিপ্লবী মস্তিষ্ক দেশবাসীকে উদ্ধৃত করবার জন্যে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

সে কথা থাক।

শ্রীরায় সেবাকর্মের মহৎ প্রচার করুন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু তিনি স্বজনশীল স্বষ্টিকর্মকে এর উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েই বিপত্তি

ঘটিয়েছেন। ছোট্টর মধ্যে কোনো নাদুই নেই। প্রকৃত শিল্পী মাজই স্বজনশীল প্রতিভার অধিকারী, সেবাপ্রদীর পক্ষে এ গুণের আবৃত্তিক কোনো শর্ত নেই। উচ্ছ্বাসকে সংযত করতে পারলে শ্রীরায় নিজেই উপলব্ধি করবেন 'পথের পাচালী' কিংবা 'অপরাজিত' স্বজনশীল স্বষ্টিকর্ম হিসেবে তথাকথিত সেবাকর্মের চেয়ে অনেক দ্বারী এবং উচ্চাঙ্গের মানবিক গুণসম্পন্ন। এরই গুণে জালিদাস, সেজনীর থেকে বিশেষ মহৎ শিল্পীরা সাহিত্য-কলা-ভাষ্য-লংগীত প্রভৃতি স্বষ্টিকর্মে জনগণের কাছে তাঁদের মৃত্যুর পরও অমর। স্বজনশীলতার ধর্মই হচ্ছে মানবমনের গভীরে প্রবেশ করে তাকে উদ্ধৃত করা, আনন্দ দেয়া, সৌন্দর্যবোধ গড়ে তোলা,

সেবাপরি নামনিক অহুতিকে জাগ্রত করা। এই কারণেই প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বজনশীলতার অধিকারীকে 'কবি কৃত্ত' পরম গৌরব দেয়া হয়েছে। স্বজনশীল কর্মী 'ষষ্ঠীর প্রাণ'।

অবশ্য শ্রীরায়ের মতো স্বজনশীল মানুষকে স্বজনকর্মতার এই অ-আ-ক-ধ-জ্ঞান দিতে হচ্ছে বলে আমরা সংকোচ হচ্ছে। তিনিও জানেন মহৎ শিল্পী মাজই উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সাহিত্য-শিল্প তাঁদের কাছে পবিত্র ব্রতই, নিছক কেরিয়ার তৈরির হাতিয়ার নয়। প্রকৃত শিল্পী আদর্শ-বান হতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে শ্রীরায়ের ব্যক্তি সময়ে 'আর-ভায়া-কান্ত' করতে চাই না।

যত্ন পরিচয়

লু স্যুনের রচনাবলী

দেবশিশি ভট্টাচার্য

লু স্যুনের নির্বাচিত প্রবন্ধ: অহুবাদ সংকলন
প্রকাশক: নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-১
দাম: সাত টাকা

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত লু স্যুনের নির্বাচিত রচনাবলীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ২০টি প্রবন্ধের অহু-বাদের একটি সংকলন। বাংলা ভাষায় লু স্যুনের প্রবন্ধের অহুবাদ এই প্রথম। সেদিক দিয়ে চারজন অহুবাদক ও প্রকাশকের পরিচয় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

অহুবাদ অর্থাৎ ভাবান্তর করলে মূল লেখকের রচনামূল্যের আলি-কের দক্ষতা বোঝা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তু বোঝা যায়। যেমন, প্রতিভা বিষয়টা সম্বন্ধে লু স্যুন আলোচনা করে ব্যুত্থিয়েছেন। সেটা "কোন উদ্ভট জিনিস নয়, যা-পতীর জগলে বা নির্জন প্রান্তরে জন্মায় বরং তা এমন কিছু যা এক ধরনের জনসাধারণ দ্বারা জন্ম ও লালিত পালন করেন"।

ভাষারও যে ক্রমাগত সংস্কার, সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিকীকরণ করা দরকার তা নিয়ে লু স্যুন লিখেছেন, "সত্য মানুষ এবং বস্তুদের মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে সত্য মানুষেরা তাদের ভাবনা ও অহুত্বগুলো পৃথিবীর অন্তঃপ্রাণে ও উত্তরপুরুষদের কাছে লিখে পৌছে দিতে পারেন। চীনেও লেখা আছে, কিন্তু তা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক লেখা। আরাম কেদারায় পড়ে থাকা সেকেন্দ্রে ভাষা, অপ্রচলিত, সেকেন্দ্রে রসের বর্ণনা দেয়। এর সমস্ত কথাই

অভীতের, এবং তাই এর কোন মূল্যই নেই। স্বতরাং পরম্পরকে বুঝতে অসম আমাদের জনগণ একটা বিশাল খালার উপর হালকা-বালির মতো" (নীরব চীন)।

"একটি বিপ্লবী যুগের সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লু স্যুন লিখেছেন,

তরুণ কবির সংগ্রামী কবিতা

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

অচিন্ত্য কুমার সীতারাম সংগ্রামী কবিতা
এবং নৈকট্য প্রকাশনী ৭০ বঙ্গ বাগান, কলকাতা-৪৮
দাম: দু টাকা

অচিন্ত্যকুমার সীতারাম খান পর-ক্রিশ ছোট মাঝারি 'সংগ্রামী কবিতা' লিখেছেন—এমনই ঘোষণা রয়েছে দুজনেই পুস্তিকাটিতে। কিন্তু সেগুলি কবিতা হয়ে উঠল কিনা এবং সংগ্রামী চেতনার ছাপ সেগুলিতে কতখানি প্রদর্শন হয়েছে দেখা দের কিছু। ছন্দে ব্যাপারে অচিন্ত্যাব্যু-মোটাই সতর্ক নয়, কিংবা তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার করেন না। কিছু কিছু কবিতায় বস্তুবিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু আকর্ষণ লক্ষ্য করে ঠিকই, কিন্তু আঙ্গিক পরিবেশমায় কবিতা-লাবণ্যর অভাব বাহিত রস সৃষ্টি করে না। বরং বলা যায়, স্বেচ্ছমণী রচনার তাঁর কিছু প্রচারমুখী বস্তুবা প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে ইংগিতস্বরূপ।

"চীনে অবশ্য আমাদের কোন গণ-সাহিত্য নেই, বিশ্বের অন্য কোথাও নেই। প্রায় সমস্ত সাহিত্য, সঙ্গীত ও কবিতাই উচ্চ শ্রেণীর জন্ত, যারা সেগুলো তাদের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ভরা পেটে পড়েন।"

যারা বস্তুবিষয়ী সাহিত্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁদের অবলম্বই পড়া দরকার লু স্যুনের লেখা, সাহিত্য ও বিপ্লব, বিপ্লবের জন্ম-অতিবিপ্লবী ব্যাঙতা, বস্তুবিষয়ী লেখক-দের লীগ সম্পর্কে ভাবনা, কিভাবে আমি লিখতে শুরু করি ইত্যাদি লেখাগুলো।

এই সংকলনের অহুবাদও সহজ লাবলীল হয়েছে। আশা করা যায়, উচ্ছোক্তারা এ ধরনের উপহাস-আরও কিছু আমাদের দেবেন।

রায়গা 'লক্ষ্য পড়ল—'ক্যাম্বোজের বিজীষিকার রক্তাক্ত কটি ফুটল গোলাপ'। পুস্তিকার অন্তর্গত রচনা-গুলির মধ্যে বেশ কিছুকেই 'রক্তাক্ত ফুটল গোলাপ' বলা চলে কি? রচনার বিষয়ে 'সত্যজিৎ রায়' আছেন, অবশ্য বিকৃত হয়েই, কিন্তু 'স্বাধিক মটক' নেই কেন? রমেশ বহুসার কি সত্য সত্যই 'মগ সত্যের নয়তা' প্রকাশ করতে পেরেছেন? অত বিহ্বলতা কেন? তবে মাও-সে-তুং' সম্পর্কে লেখাটি কবিতা না হলেও কটি লাইনের মধ্যে তাৎপর্য-পূর্ণ কটি শব্দের উচ্চারণ আছে। 'রাঙা প্রাণ', 'জন্মকের মৃত্যু' ও 'অত্যাচার চলুক' রচনা তিনটির মধ্যেও মূল্যায়নীয় থাকার আছে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ অংকন প্রতীকস্বরূপ বিশিষ্ট।

লালবাজারের টর্চার রুম থেকে ডেনমার্কের হাসপাতালে

বিশেষ প্রতিনিধি

এই প্রথম অ্যামনেষ্টি ইন্টার-কন্টিনেন্টাল একজন ভারতীয় মহিলার চিকিৎসার দায়িত্ব নিল। ইনি এই কলকাতায় ইন্দিরা গান্ধীর রাজ্যে পুলিশী নির্ধাতির ফলে প্রায় পঞ্চাশ বছর গেলেন। শ্রীমতী অর্চনা গুহ এখন ডেনমার্কের বৃহত্তম হাসপাতাল রিগস্ হসপিটালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসা করছেন অ্যামনেষ্টি ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ড্যানিশ মেডিক্যাল গ্রুপ। অর্চনা দেবী এখন দাঁড়াতে বা হাঁটতে অক্ষম। পাঠকের নিষ্ঠুরই মনে পড়ছে, কলকাতার আদালতে অর্চনা দেবীর ইজিচেয়ারে শোয়ানো অবস্থায় আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠার প্রকাশিত ছবি। শুধু ড্যানিশরা নয়, সারা ইউরোপের জনসাধারণ ছিঁকিরে ভারতের পুলিশবীরদের আচরণ দেখে, অর্চনা দেবীর অবস্থা দেখে। যেমন তাঁরা করেছেন বের্লি টেলের 'মাই ইয়ারস ইন অ্যান ইজিয়ার প্রিজন্' বইটার ভারতীয় কারাগারগুলোর অবস্থা জেনে।

১৯৭৭ সালের ২১শে আগস্ট অর্চনা গুহ কলকাতার ব্যাংকপাল কোর্টে তাঁর পক্ষের দীর্ঘ কাহিনী বলেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বাংলা-ইংরেজী বেশী বিদেশী পত্র পত্রিকার ছড়িয়ে যায় এক অসাধারণ সংবাদ। সত্য রাষ্ট্রের নানা রকম প্রতিশ্রুতির খোঁস খসে পড়ে।

শ্রীমতী গুহ ছিলেন কোলকাতা পাল্প জুনিয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষকতার রয়েছেন ১৯৬২ সাল থেকে একটানা গ্রেপ্তার হওয়ার দিন পর্যন্ত। বাস স্টপ থেকে দুই মাইল পায়ের হেঁটে গ্রামের ভেতরে জল। বারোটা বছর এই কষ্টকর যাতায়াত করার মতো দলবল অল্প দেহ ছিল অর্চনার।

১৯৭৪ সালের ১৭ই জুলাই অর্চনা

পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে য.র.এবং বাগদীঘরের অভিযোগ অস্থায়ী স্থানীয় থানার ডায়েরিতে ৬.৮.৮০ তারিখের একটি মাইলা কন্ট্রি করে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করে। হানাদারদের সঙ্গে কয়েকটি লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক ছিল এবং তা থেকেই বেপরোয়াভাবে গুলি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কিন্তু, ওদের ওই সব বন্দুক আটক করা হয়েছে কিনা তা এ পর্যন্ত জানা যায়নি।

দেবী জল থেকে বাড়ি ফিরেছেন ক্লান্ত বোলে। বাড়িতে সেদিন বেড়াতে এসেছে মেজদাদার ছোট ছোট মেয়ে আর রয়েছেন বৃদ্ধা মা, ভাই-বোঁ লতিকা গুহ আর নিম্নের বোনের মতো গৌরী চ্যাটার্জী। লতিকা দেবী কলকাতার গোথেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা আর পৌরী একটা ছোট হুট শিল্পের কারখানার কর্মী। রাত দেড়টার সময় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের মানস ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী ওদের হৃদয় জপের রোডের বাড়িতে ঢুকে ধরে নিয়ে গেলো তিনজনকে অর্চনা, লতিকা ও সৌরীকে।

লালবাজারে বেস্টিক স্ট্রিটের গায়েই সেন্ট্রাল লক আপ। এখানে তিনটে তলাতেই হাজত ঘর। নিচ-তলার অফিস আর বন্দীদের জন্য ডাক্তারখানা। অর্চনা দেবীরা এখানে ছিলেন ছাব্বিশ দিন। অর্চনা গুহকে আবার নিঃশব্দ রাখা হয়েছিলো আর একটা ঘরে পনেরো দিনের জন্য।

সকালে ছোট এক চাঁড় চা, আর একটা বিড়ুট লাইনে বসে দবাই পার। দশটার ভাত, ভাজ, রাহ-তালা, ভাল মানে একশো গ্রাম ভালে দশ লিটার জল আর ভাতের ক্যান। খাওয়ার পর কাউকে কোর্টে যেতে হয়, অস্ত্রের ভয়াবহ অফিস কল। নোংরা, শতছিন্ন, চর্মরোগের জীবাণু ভর্তি কবল—একটা পেতে শোওয়ার, অস্ত্রটা গায়ে দেওয়ার। চিকিৎসা, দাঁতের মাজন, গামছা কিছুই পাওয়া বাবে না। অর্চনা গুহরা এক শাড়ি পরে ঐ ছাব্বিশ দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন।

অর্চনা দেবীকে অফিস-কল করতে গোয়েন্দা। ধর্মের স্পেশাল সেল। যখন তখন, রাত দুপুরেও অফিস কল। পশ্চিমদিকে রাধাবাজার স্ট্রিটের লাগোয়া বাড়িটার ছিলো ঐ স্পেশাল সেল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে পুরো চব্বিশটা পেরিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো অর্চনা দেবীকে ও অন্যান্য বন্দীদের নির্ধারিত অস্থায়ী বোঁ হেঁচড়ে, হুঁড়িয়ে। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারের মতো ওদের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকতো যোগমারী পুলিশগুলো। অফিস-কল, অর্থাৎ নির্ধারিত শেষ করে বন্দীকে আবার যখন ফেরৎ দেওয়া হত সেন্ট্রাল লক আপে, তখন হাওড়ার সার্টফিকেটে লেখা থাকতো 'নো কমপ্লেন, নো ইনজুরি'। একদিন

অর্চনা দেবীর অফিস কলের পর চলার কমতা ছিলনা। গোয়েন্দা কনটেইনল আদিত্য কর্মকার আর একজনের সাহায্যে ঠিকে হাজতে পৌঁছে দেওয়া হোল। দারুণ নির্ধাতন চালানোর পরেও ঐ সার্টফিকেটে লেখা হল, 'নো কমপ্লেন, নো ইনজুরি'। সেন্ট্রাল লক আপের এস, আই-রা বন্দীর চেহারা দেখেও বুঝলেন 'নো ইনজুরি'। ডাক্তারের সঙ্গে চলে পুলিশের বৈঠক।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা ধর্মের স্পেশাল সেল-এর দায়িত্বে ছিলেন ইমপেক্টর রঞ্জিত ওরফে রুণ্ড গুহ নিয়োগী। ডেপুটি কমিশনার বিজুতি চক্রবর্তীর তবিরে ঘোঁড়ো প্রতাপ রুণ্ড গুহ নিয়োগী কাল চালানো তার বাহিনীকে সাজিয়ে, মানস ব্যানার্জী, প্রদীপ ঘোষ, আদিত্য কর্মকার, লক্ষ্যাব, অরুণ ব্যানার্জী, পরিমল, দীনা, শচীন, অসিত, ইছাপুরের প্রাক্তন নকশাল-পহী নেতা কমল দাস ইত্যাদিদের নিয়ে কাল বলতে রাত দুপুরে বাড়িতে হানা দিয়ে যুদ্ধ অবস্থা থেকে তুলে ভয়াবহ নির্ধাতন অবস্থা খুন। ইয়া, আর একটা পরিপ্রহ ওরা করতেন, সংবাদপত্রে গল্পাকারে বিবৃতি পাঠাতেন যে 'উগ্রপন্থীরা পুলিশের আক্রমণ করলে পুলিশ বীরদের সঙ্গে গুলি চালিয়ে শুধু আত্মরক্ষা করতেই সক্ষম হয়েছি, নিজেরা একদম অকৃত অবস্থায় কিয়ে এসেছেন নকশালপহীদের মিহত হেঁচকো নিয়ে।'

অর্চনা দেবীকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিলো ঐ স্পেশাল সেল-এর অধীনে। ঐ সেলের বড় অফিস ঘরের ভেতরে পশ্চিমের ঘরটা হলো ইমপেক্টর রুণ্ড গুহর অফিস ঘর। তবে ভেতর দিয়ে উত্তরের ঘরটা হলো টর্চার চেম্বার। ঐ ঘরের একপাশে আছে একটা তক্তপোষ, আর একপাশে বেসিন ও কল। এ ঘরে বিভিন্ন কারখান নির্ধাতন চালানো হয় যেমন হাত পা এক সঙ্গে বেঁধে কল্লই ও হাঁটুর মধ্যের ফাঁকে একটা লাঠি চুকিয়ে দুটো চেয়ার পাশাপাশি রেখে তার হাতল দুটোতে ঐ লাঠিটা এমনভাবে তুলে দেওয়া হয়; যাতে চেহারাটা '৮' অক্ষরের মতো মাথা নিচে করে বুলে যায়। ঐ অবস্থায় পায়ের পাতার নীচে মোটা লাঠি দিয়ে জোরের সঙ্গে মারার হয়। কখনো এর সঙ্গে কোমরে লাগি মারার হয় আর ফোটা ফোটা ঠাণ্ডা জল-কপালের ঠিক মাঝখানে ফেলা হয়।

এর নাম কচুয়া, অস্ত্র রাজ্যে একে বলে পুলিশের কুর্গিচরণ। প্রত্যেকটা আঘাত মাথার গিয়ে আঘাত করে, খুব জলতেটা পায়।

এছাড়া আছে চুল টেনে টেনে ছেঁড়া। দুজন দুটো-চেয়ারে দাঁড়িয়ে চুল ধরে অর্চনাকে শূন্যে কোঁচায়। ঐ অবস্থায় আর একজন কোমরে লাগি মারতে থাকে। মাথার ওপর চালার ঘুঁষি আর গাঁটা। মোটা একটা হাড়ির একটা দিক চামড়া মোড়া থাকে। সে দিকটা দিয়ে জোরের সঙ্গে মাথার মারে, নারকোল ফাটার মতো শব্দ হয়। ওদিকে লতিকা গুহর গাল ঘেঁষে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাছাতে জমাগত লাঠি মারার হচ্ছে। বন্দীরা যখন বলে থাকে, তখন পুলিশরা যেতে আসতে পা বাড়িয়ে দেয়, চুল টানে, লাগি মারে, রিভলবারের খোঁচা দেয় ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে অশ্রাব্য ভাষা, বন্দীর দেহা ট্যান্ডের টাকার মাইনে পাওয়া ঐ সব রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে গালিগালাজ করে তা কোন পড়া মানুষের কাছে অচিন্ত্যনীয়।

অর্চনা দেবী মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। মুখে কেনা উঠে গেছিল। এছাড়া মগজ খোলাই বা পুলিশদের ভাষায় 'সোনে কা হাত' মারক টর্চারের কথা মনে পড়লে অর্চনা দেবী আজও ঝাঁককে ওঠেন। 'সোনে কা হাত' নামে হিন্দি ফিল্মে দেখানো নির্ধাতনের সব নকল করতে চেয়েছিলো স্পেশাল সেল। বন্দীর চুলের মুঠি ধরে হাত লাটর মতো দেওয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিত মাথাটা। 'ওঃ আঃ করার আগেই খুনরাবুত্তি। ঐ হল 'সোনে কা

কুদরত ই খুদা

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বাঙলার প্রায় সব বুদ্ধিজীবীই লেখেন। নামজাদা বুদ্ধিজীবীদের ভেতর বোধহয় একমাত্র সৈয়দ আলি আহসান সেই সংকলনে লেখেননি। তিনি তখন ইসলামী জুল্যাবোধের পক্ষে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে ঐ আন্দোলনে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেদিন ডঃ কুদরত ই খুদাও ঐ রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন ঐ অভিযানে অংশ গ্রহণ করে যেসব মনীষী ছাত্র ও যুবসমাজকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাঁদের ভেতর ডঃ খুদার সূচিকা, ছিলো সর্বাধিক

হাত'। অর্চনাকে ওরা ছাব্বিশ দিন লালবাজারে রেখেছিল। আত্মীয়দের দেওয়া পরিষ্কার শাড়ি পরতে দেয়নি। এর মধ্যে দুই সপ্তাহ অর্চনা সেন্ট্রাল লক আপের একটা ঘরে একা বন্দী ছিলেন।

দুটো মামলা ছিল অর্চনার বিরুদ্ধে—শিরালদহ ও আলিপুর আদালতে। দুটোর খালি হলে তারপর মিস। পুরা এক বছর জেলে কোনো চিকিৎসা হয়নি। পাঁচশত লালে প্রথম চিকিৎসার অর্চনার শারীরিক অস্থায়ী ভয়ানক চেহারা ধরা পড়লো। পাঠানো হল শেঠ কলকাল কারমানি হাসপাতালে, তারপর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। অর্চনা দেবী তখন পঞ্চাশপাতালেও তাঁকে বিরে থাকতো গোয়েন্দা পুলিশের দল।

অনেক ইটাইটি করার পর অর্চনা গুহকে বাড়ি আনা হল প্যারোল বণ্ড নই করে। ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর। অর্চনা দেবীর নিরাংশ তখন পঞ্চাশ দাঁড়াতেও পারেন না, হাঁটা চলা তো ঘুরের কথা, তখনো মিসার বাড়িতে বন্দী। জনতা সরকার গঠনের পর ওরা মে, ১৯৭৭ মিসা থেকে উনি ছাড়া পেলেন।

কলকাতার চীক মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের অদালতে অর্চনা দেবী অভিযোগ করলেন যে, তার ঐ পঞ্চাশের জন্য দায়ী পুলিশী অত্যাচার। রুণ্ড গুহ নিয়োগী, অরুণ ব্যানার্জী, আদিত্য কর্মকার ও সন্তোষ দে ঐ চারজন গোয়েন্দা পুলিশ অভিযুক্ত হল। ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটির শেয়াংশ ১১শ পৃষ্ঠায়

ব্যাপক। শুধু তাই নয়, পরবর্তী-কালের নানাপ্রকার আন্দোলনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর ঐ সূচিকা বাঙলাদেশের মানুষের কাছে আজো প্রচার বিষয়।

ডঃ খুদা বাঙলা ভাষার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। তিনি মনে করেন, বাঙলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চাও সম্ভব। শুধু মনে করেন বসলে জল হবে, তিনি এসম্পর্কে প্রায় দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। ১৯৩৬ সালে প্রথম গ্রন্থ 'বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান' প্রকাশ পায়। তিনি আরো বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো, বিজ্ঞানের সূচনা, বিজ্ঞানের সরল কাহিনী, জৈব রসায়ন, বিভিন্ন বিজ্ঞান, যুক্তোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প, আমাদের শিল্প সম্ভাবনা ইত্যাদি।

ঐ মনীষী ১৯৭৭ সালে পর-লোক গমন করেন।

চলচ্চিত্র নাটক

‘গঙ্গা আমার মা’ পাল

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমিত আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ‘গঙ্গা আমার মা’ পালটি প্রযোজনা করে রাণার খাড়া ইউনিট সংস্থা তাদের পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পাল রচনায় যে ক্রটি ও দুর্বলতা আছে, প্রযোজনার নিপুণতায় ও অভিনয় কুশলতায় তা অনেকাংশেই চাপা পড়ে গেছে। পাল যদি সুরচিত ও বলিষ্ঠ হত, তবে এই প্রযোজনাই আরও উৎকর্ষ লাভ করে স্রষ্টার হয়ে থাকতে পারত।

গঙ্গা নদীর তীরে যে সব কল-কারখানা গড়ে উঠেছে, সেখানে নিরন্তর যে প্রমিত শোষণ ও নির্যাতন চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে তারই পালারূপ দিতে গিয়ে খপম সেনগুপ্ত কিছু বিকিণ্ড প্রমিত অসন্তোষ দেখিয়েছেন, কিছু স্লোগান তুলিয়েছেন আর অহেতুক কিছু বাচাল চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে বক্তব্য বিস্ময়কে লম্বু ও বিংশংল করে ফেলেছেন। প্রমিত চরিত্রগুলিও প্রতিষ্ঠা পাননি, কারণ ঘটনার আবর্তে সেগুলি কার্যকারণ হুজু তেমন প্রথিত হতে পারেনি। প্রমিত নেতা হয়েও বংশী প্রায়ই অসহায় হয়ে পড়ে, ইউনিয়নের নেতা বংশী মাষ্টার শুধুই কেতাবী বুলি

আওড়ায়—এ সব অবশ্যই দুর্বলতা, যা বাস্তবে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি—কিন্তু এর উল্লেখ ওঠার ইংসিত কোথায়? মিল মালিক ও মালিককে দেখে হাসি পায়। এই ছুটি চরিত্র কল্পনায় পালারূপ হত্যা করেছেন। পাল নির্যাসনায় ও স্রষ্টার রচনায় খপম সেনগুপ্ত কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে-

প্রোফাইল অভিনীত ‘অশ্বমেধ’

স্ববিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে দেশের যুব সমাজ প্রতিনিয়ত যে প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছে, প্রাণ-শক্তি নিঃশেষিত হবার পর তারা যে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হচ্ছে, তারই এক করুণ অথচ জালাময় রূপ ‘অশ্বমেধ’ নাটকটিতে প্রতীকী ভাষে চিত্রিত হয়েছে। মতলববাজ নেতাদের ধ্বংসে পড়ে তরুণের দল কতভাবে যে বিভ্রান্ত হয়, নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত প্রাণ যে বলি হয় দেশের যুব সমাজের অক্ষুণ্ণ প্রাণ-শক্তির যে নিদারুণ অশচয় হয় মাটিকার বিদ্যুৎ নগ্ন বিশেষ মুসলমানের তার রূপ ছুটিয়ে তুলেছেন। নির্যাসনাতেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখ করার মত। বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক প্রোফাইল পটে ‘অশ্বমেধ’ নামকরণটিকে মঞ্চে

ছেন। দুর্বল পালটির উপস্থাপনার বাহার আছে, সে বাহার রূপে রঙ ও আলোর চমকানিতে। মামা ধরনের স্রষ্টার প্রাণে পালটি জমাবার একটা সচেতন প্রয়াসও আছে।

প্রতিটি শিল্পীই নিষ্ঠা সহকারে অভিনয় করেছেন। বংশী চরিত্রে অরুণ মুখার্জী নিপুণ অভিনয় করেছেন। বংশী মাষ্টার রূপে রবি বর্মা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের নাটকীয় উত্থান পতন প্রশংসনীয়। অনীত ভট্টাচার্যের বসন্ত সূন্দর। কেশব রায়ের গঙ্গা মামীও উল্লেখ্য দাবী রাখে। স্রষ্টা সেনগুপ্ত, কমলা বোস ও হাসি সরকারের অভিনয় প্রশংসনীয়।

তিনি বিশেষ অর্থপূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন। একদিকে নির্যাস-বিস্তার সংসার, দারিদ্র্যাত্মক হত্যা গৃহকর্তার রেষার-বোড়ার পেছনে ছোটা, সংসারে সীমাহীন লাঞ্ছনা আর অবক্ষয় মূল্যবোধ শূন্যতা, নেতাদের প্রয়োচনার বিপণ্যমী পুত্রকতা, অন্যদিকে যুগ ব্যবসায়ীর নির্যাসাধীন দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কুট পাশাখেল। মঞ্চে এক নির্মম অথচ অমোঘ পরিণতি সৃষ্টি করে। এরই পাশে বামপন্থী রাজনীতির সম্ভাবনা-ময় আশার আলোও ছুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য পড়ে। মঞ্চে সেট পরি-কল্পনাতে যেমন শিল্প কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ব্যবসায়ীর সঙ্গে ধান্দাবাজ নেতার টেলিফোন করার দৃশ্য যোজনার মঞ্চায়তনের ব্যাপ্তি-টুকুও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে বাবা তারকনাথের ঝাঁক বইবার দৃশ্যে বাড়াবাড়িটুকু পীড়াদায়ক। সেখানে উজ্জ্বলতা থাকতে পারে স্নেহটুকু বোঝাবার জন্য, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য রসহানি ঘটেছে উক্ত বিলম্বিত দৃশ্যে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অ্যাকাডেমী মঞ্চে প্রোফাইল প্রযোজনার অহুষ্ঠিত ‘অশ্বমেধ’ নাট্যাভিনয়ে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হরদেব চরিত্রে নির্যাসক ও নাট্যকার বিদ্যুৎ নগ্ন। তার অভিব্যক্তি ও বাচনিক অভিনয় নির্যাস-মধ্যবিস্ত সংসারের এক অসহায় রেষা-ড়ের চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে। গীতা চরিত্রে শাশি বসুও মিঠার লগে মর্মস্বত্ব অভিনয় করেছেন। ছায়া বোম্বের ‘মামা’ এক দরদী চরিত্র রূপায়ণ। দেবাশিস দত্তকে স্রষ্টা সেন রূপে তেমন স্বাক্ষর লাগল না। কিন্তু অধর শুভাইতের ভূমিকায় পৃথিবী মিল এক উপযোগী টাইপ চরিত্রাভিনয়ের নজির রেখেছেন। বিদ্যুৎ চরিত্রে অহর কয়লা, রতনের ভূমিকায় রবিশংকর সেনগুপ্ত, কাকন রূপে অভিজিত বর্মা, শ্যামল চরিত্রে শক্তি চক্রবর্তী স্বাভিনয় করেছেন।

আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ

দর্পণের সংবাদদাতা

১লা মে প্রমিত দিবসের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু আলোচনা করে দেখেছি অনেক বামপন্থী বন্ধুই জানেন না এরকম আরেকটা দিনের কথা, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঘটনাটা। অথচ বিপ্লবের পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ১লা মে-র মতো ৮ই মার্চও ক্যালেন্ডারে লাল কালির দিন, স্রষ্টার উৎসবের দিন, ছুটির দিন। সেখানে তো আর আমাদের মতো দুর্গা-পূজা, ছুটপূজা ইত্যাদির জন্ত বছরে তেরো পার্বণের জিহটা ছুটি থাকে না।

১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ, অর্থাৎ আজ থেকে ৭২ বছর আগে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের জামা-কাপড় তৈরী শিল্পের দর্গে প্রমিত মহিলারা আন্দোলন শুরু করেন ভোটাধিকারের জন্য, একই কাজে সন্মান রেতন, পুরুষের সমমর্যাদা লাভের জন্য। ১৯১০ সালে ডেন-মার্ক বসলো আন্তর্জাতিক প্রমিত নারী সম্মেলন। ঐ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিখ্যাত প্রমিত নেত্রী ক্লারা জেংকিন নিউ ইয়র্কের ঐ মহিলা আন্দোলনকে অভিনন্দন জানালেন। ঐ সম্মেলনেই ঠিক হলো যে, প্রতি-বছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হবে, অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রমিত মহিলাদের বন্ধু ও ভ্রাতৃদের প্রতীক এ দিনটি। যেমনি ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ঘটনাকে ১৮৮১ সালে প্যারিসে অহুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এজেন্স অভিনন্দিত করে আহ্বান জানালেন প্রতি বছরের ১লা মে প্রমিত দিবস পালনের জন্য।

১৯২০ সালের ৮ই মার্চ ঐ দিবস স্রষ্টা লেনিন এক প্রবন্ধে লেখেন, “নারী-পুরুষের প্রকৃত সাম্য সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোতেও দেখা যায় না। ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থাতে তা সম্ভবও নয়। অন্যদিকে রাশিয়ার সোভিয়েত ব্যবস্থা পুরনো আরের আইন বই-

গুলোর বা বা অসাম্যের চিহ্ন ছিল সব বাতিল করেছে অসমতা এসেই এবং পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে নারী জাতি। প্রমিত মহিলা আন্দোলনের লক্ষ্যই হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মর্যাদা, গৃহদাসদের বন্ধন থেকে মুক্তি।” সামন্ততান্ত্রিক যুগের তুলনায় ধনতন্ত্রে নারী স্বাধীনতা আপেক্ষিক-ভাবে কিছুটা বেড়েছে, লবটা নয়, কারণ বুটেনে ঐ সেদিন ১৯৩০ সালে নারীগণ ভোটাধিকার লাভ করেছে, গত বছরেও ব্রাজিলের রাজ্য মহিলারা মিছিল করে স্লোগান দিয়েছে, “মজুরী বৈষম্য চলবে না”। ধনতন্ত্রে বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন স্বামীরা ক্রীড়ারক-গৃহদাসকে রাস্তা-ঘরের জোয়ালে আবদ্ধ রাখে, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করে (যার মালিক নিজেরা) অথচ মঞ্চে কিছু মধুর বুলি তথা ভালোবাসার খোলস থাকে। প্রকৃত মনোভাবটো কিন্তু জী হুজ ওদের কাছে ভোগের বস্তু।

৮ই মার্চ স্রষ্টা ১৯২০ সালে জাভানও এক প্রবন্ধ লিখে ঐ দিনটির ভাষে ও গুরুত্ব বোঝান। “মানব জাতির প্রমিত সংগ্রামের ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলনেই মহিলারা ছিলেন। সর্বদা প্রমিত সংগঠন তথা কমিউনিষ্ট পার্টির কাজই হল, নারীদেরকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে প্রমিত সংগঠনের পতাকাতে সমবেত করা।”

জাভান মহিলাদের রাজনৈতিক শিক্ষিত করে তোলার ওপর যে গুরুত্ব দিয়েছেন এদেশের কমিউনিষ্ট কর্মীরা বোধহয় তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন না। তাই দেখা যায়, কী সংসদের মধ্যে, কী ট্রেড ইউনিয়নে, মিছিলে, শহীদ মিনার অথবা ত্রিগেডের জমায়তে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ শত-করা পাঁচ ভাগের বেশি নয়। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এমন যে, রাজনীতি ফুটবল-হকি খেলা এ সবই পুরুষের ব্যাপার, মহিলাদের কাজ রান্নাঘরেই। এই ধ্যান ধারণাকে ভাঙার জন্য বামপন্থী কর্মীদের গুরুত্ব সহকারে ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

বিধানসভা বাতিলের প্রতিবাদে সম্মেলন

অগণতান্ত্রিকভাবে ন’টি রাজ্য বিধানসভা বাতিলের প্রতিবাদে গত ৫ মার্চ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি কনভেনশন হয়। ত্রিপুরা হিতসাহিনী সভা হলে আয়োজিত ঐ কনভেনশনে বিধান-সভা সমস্ত অধ্যক্ষ হরিপদ ভারতী বলেন যে, সাতাত্তর লালে জনতা সরকার কর্তৃক ন’টি রাজ্য বিধানসভা বাতিলের সঙ্গে এবার তাঁদের সর-কারের ন’টি বিধানসভা বাতিল করার পার্থক্য আছে। প্রথমত: সাতাত্তর সালের ঐ বিধানসভা-গুলোর সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করে ঐক্যতান্ত্রিক প্রথা চালু করতে সহায়ক হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: তখন ন’টির মধ্যে সাতটি বিধানসভার আয় পাঁচ বছর শেষ হয়েছিল, যদিও কাল ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে তার আয়

এক বছর অগণতান্ত্রিকভাবে বাড়ানো হয়েছিল। তৃতীয়ত, এবারে কং(ই) ঐসব রাজ্যগুলোর গড়ে ৩৭% ভোট পেয়েছে-তখন জনতা পার্টি অনেক বেশি ভোট পেয়েছিল। সেবারে প্রমাণিত হয়েছিল যে ভোটাররা কংগ্রেসকে ময় জনতা পার্টিকে চায়, এবারে কিন্তু ইতিবাচকটা প্রমাণিত হয় নি।

কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবটি পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য। প্রস্তাবে সংবিধান থেকে ৩৫৫ ধারা বাতিলের দাবি জানানো হয়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিটু নেতা বীরেন রায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী আরতি গাঙ্গুলি। সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী অমিতা রায়চৌধুরী।

সমুদ্রের স্রষ্টা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাধার জনস
বিশু নারায়ণ প্রিন্সিপাল ফার্ম (প্র.) লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ হালীঃ গাওড়া
ফোন: ৬৪-২০৯৫ ও ৬৪-২৪৪৫
ফার্ম: বৈদ্যবাটী ২ গলি ৬২-২৪৪০ ব্রাহ্ম: শেওড়া ফুলী বগলী
দিল্লী রোড ও তারকেশ্বর রোডের সংযোগস্থল ফোন: ৬২-১৩৭৭

বিচারের বাণী : জালিয়াতীর আসামীর ছাড়া পেল

ব্যাক অফ বরোদার জালিয়াতী করে ভটনক আমানতকারীর ৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে ব্যাকের কয়েকজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল গত ৩রা মার্চ কলকাতার অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট তা থেকে তাদের খালাস করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাটা অনেকের কাছেই রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে।

জানা গেছে, এই মামলার অস্তিত্ব আসামী সনৎকুমার গুহকে গোপন করে ২০শে ফেব্রুয়ারী অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হয়।

সরকার পক্ষে পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীমোহনেশ মুখোপাধ্যায় পুলিশ যাতে তদন্ত সম্পূর্ণ করার সুযোগ পায় তার জন্য আবেদন করেন এবং আসামীকে জামিন দিতে আপত্তি করেন এই কারণে যে, সে এই জালিয়াতীর ব্যাপারে অত্যন্ত প্রধান মাথা। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত পুলিশের হেজাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী চমৎ আসামী সিটি সেশন কোর্টের চীফ জজের কোর্টে জামিনের আবেদন করেন। সরকার পক্ষ এতে আপত্তি করেন নি, তবে বলা হয় যে, আসামীকে যেন এই শর্তে জামিন দেওয়া হয়, সে

যেন ১৮ই মার্চ পর্যন্ত একদিন অন্তর তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করে। সেই মত চীফ জজ আদেশ দেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, জামিনের আদেশ লেখতে আসামীর আত্মীয়রা তাকে জামিনে মুক্ত করে নি।

এর পরই গত ৩রা মার্চ অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের তদন্ত শেষ হবার আগেই অকস্মাৎ আসামীর খালাস করে দেন। সেদিন বেলা দেড়টার কোর্টে গিয়েই সরকার পক্ষের কৌশলী জানতে পারেন আসামীর খালাস করে দেওয়া হচ্ছে। তাই সরকার পক্ষ এই আবেদন

খণ্ডিত রাখার জন্য একটি আবেদন প্রস্তুত রাখেন যাতে আসামীর মুক্তির আদেশ দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে তারা উচ্চতর আদালতে যেতে পারেন। এই আবেদনের বরান ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং তাঁর নির্দেশে আসামী পক্ষের কৌশলী শ্রীঅজিত পাণ্ডাকে দেখানো হয়। পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীমুখোপাধ্যায় এই আবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করার জন্য তাঁকে সুযোগ দেবার জন্য প্রার্থনা করেন।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বিকেল ৬টার আসামীর খালাস করার আদেশ দেন এবং যখন শ্রীমুখোপাধ্যায়ের জুনিয়ার শ্রীমতী দীপ্তি মিত্র হেড ক্লার্কের কাছে আবেদনপত্র জমা দেন

তখন তা ঐদিন গ্রাহ করা হয় না। পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর মুক্তির আদেশ খণ্ডিত রাখার আবেদন খারিজ করে দেন।

বাবুজীর নতুন দল

৩য় পৃষ্ঠার পর

ছেম বাবুজী এই সমাজতন্ত্রী জনতা গঠন করলে আর্গি কংগ্রেস, লোকদল, ইন্দিরা কংগ্রেসের উপেক্ষিত এবং সোভিয়েটপন্থীরা যোগদান করতে পারেন, এবং যদি এই সমাজতন্ত্রের তকমা আটা নতুন দল শক্তিশালী করা যায় তাহলে কিন্তু বাবুজী বা বহুগুণা সম্পর্কে ইন্দিরাজী নতুন করে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হবেন। উল্লেখ্য যেমন মূল্যায়ন হয়েছিল সি পি আই-এর। এই সমাজতন্ত্রকে ভয়না করেই জগজীবনের দল ভাঙা এবং নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত বলেই পূর্ববন্ধকরা মনে করছেন। এবং সোভিয়েটের এই নতুন দলকেই বিকল্প শক্তি হিসাবে খুঁজে নেওয়া ছাড়া আর অন্য কোম পথ আছে বলে মনে হয় না।

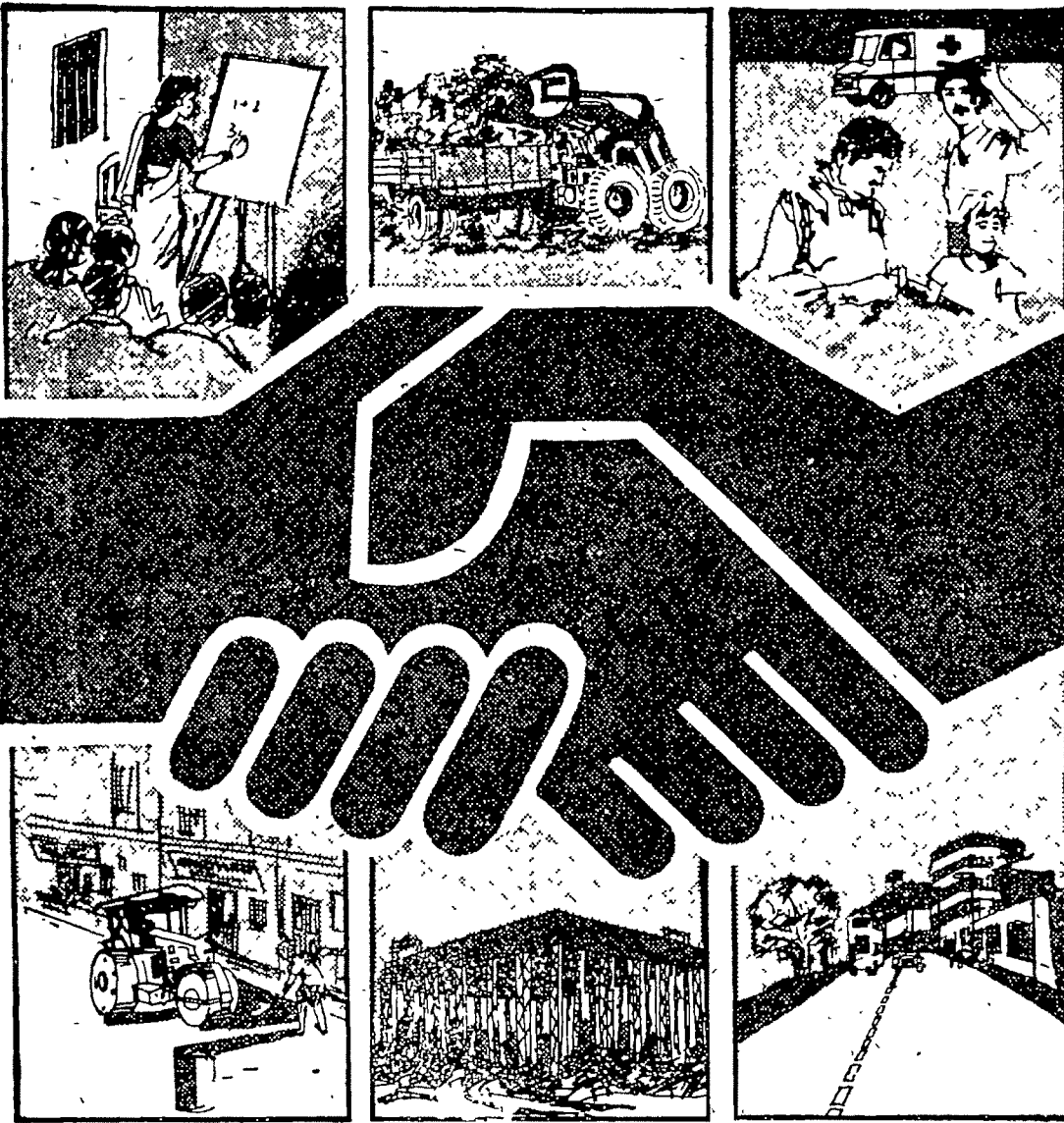
টর্টার চেম্বার থেকে

২য় পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক স্বাক্ষর প্রমাণ স্বীকার করে বাহাদুরি সিটি সেশন কোর্টে পাঠালেম। নিম্নরাজিক পাবলিক প্রসিকিউটর ছাড়া বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে অর্চনা দেবীর সহযোগিতায় মডেল ট্যাঙ্ক/কাউন্সেল অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী ও অমিয় চক্রবর্তী, দ্বারা এই মামলা প্রথম থেকে লড়ে এগেছে। মামলাটি বাতিল করার জন্য কপু গুহ নিরোগী হাইকোর্টের বিচারপতি সলিল দত্তর কাছে আবেদন করেছিল। বিচারপতি অর্চনার পক্ষে রায় দেন। তখন কপু গুহ নিরোগী বিচারপতি সত্যমোচী মুখার্জীর ঘরে পুনর্বিবেচনার আবেদন করে। আবেদনটা এখন প্রায় চাপা পড়ে আছে। পরে কপু গুহ নিরোগী বিচারপতি দ্বারা পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া ও ঐবৈজয় 'ন' নম্বর ঘরে আবেদন করে। ১৯৭১ সালে কপু গুহ নিরোগীর পক্ষে দাঁড়ান ইন্দিরা কংগ্রেসী বর্তমান এম, পি অশোক সেন, নলিনী ব্যানার্জী ও দিলীপ দত্ত। পক্ষে বিপক্ষে তিনাশী শেষ—রায়ের অপেক্ষায় সবাই আছেন।

বিচারের রায় নীচে নিভুতে কীভাবে পারে, অর্চনা দেবী কিন্তু এখন ডেনমার্কের রিগস হাসপিটালেতে শুয়ে কাদছেন।

আপনাদের দেওয়া টাকাতাই আপনাদের নিত্য সেবা



পুরস্কার মিটিয়ে দিন

আমরা জানি আপনারা সবাই নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। সেই জন্যই আপনারা আশা করেন যেমন পুরস্কার দেবেন, পুরস্কারও তেমনি আপনাদের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের পরিবেশে জীবনযাপনের ব্যবস্থাগুলি তিকমত পালন করবেন। আমরাও তাই চাই। পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা, প্রয়োগপালী পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, পার্ক ও উদ্যানগুলি তিকমত রক্ষণা-

বেক্ষণ করা, বস্তীর উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, রোগ নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ-পুরস্কার হাতে এই রকম যে বহুবিধ কাজ রয়েছে, আপনাদের দেওয়া পুরস্কারের মাধ্যমেই তার আর্থিক সংস্থান করা হয়ে থাকে।

আমাদের অনুরোধ, পুরস্কার ফেলে রাখবেন না। এই কর আর কতই বা? নিশ্চয়ই আপনার নিয়মিত খরচের ভেতরেই এর ব্যবস্থা করা আছে।

তবু অনবধানতাবশতঃ কখনও কখনও ভুল হতেও পারে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই ভুলের পরিণামে সম্পত্তি হ্রাস, নীলাম, প্রেক্ষতারি পরোয়ানা বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা অবগতনের আশঙ্কা থাকে।

তাই, পুরস্কার সমন্বয়ত মিটিয়ে দিন। আপনারই নগরজীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করতে আমরা সেই অর্থ খরচ করবো।

সিমেন্ট কালোবাজারে পাচার

১ম পৃষ্ঠার পর

কারের দ্বারা এরাও পাওয়া যাচ্ছে। ব্যক্তি সিমেন্ট পাওয়ার যোগ্য। রাজ্য সরকার কলকাতা পৌর সরকারের এই সহজ ব্যবস্থার এলাকার বাসিন্দাদের দ্বারা বিনা সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের একটি অংশ তদন্তে উৎসর্গ করে ১ টন পর্যন্ত একটি উৎসর্গ হয়ে উঠেছে এবং তারা দরখাস্তে সিমেন্টের পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সরকারী নির্দেশে বলা হয়েছে, পৌর সভার প্রদত্ত ট্যাক্সের রসিদ, বাড়ি ভাড়া রসিদ এবং রেশন কার্ড দেখালেই যে কোন সরকারী হিসেবে একটন সিমেন্টের মূল্য যদিও প্রায় ৫৬৫

বাবুজী ই-কংগ্রেসে ভিড়তে চাইছেন

১ম পৃষ্ঠার পর

ছেন। নির্বাচনের আগে শ্রমতী গান্ধীর যতটা আগ্রহ ছিল এখন জগজীবনবাবুকে দলে টানার জন্য ততটা আগ্রহ নেই। কারণ জগজীবনবাবুর লাহাধ্য ছাড়াই ইন্দিরা গান্ধী কর্তার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ইন্দিরা কংগ্রেসের জনৈক নেতার সঙ্গে কথা বলে শ্রমতী গান্ধীর মনোভাবের কিছুটা ঠাচ পাওয়া গেছে। জগজীবন রাম তার দলে যোগ দিল শ্রমতী গান্ধী এখনও সেটা চান। এবারে উদ্দেশ্য ভোটে জেতা নয়। এবার শ্রমতী গান্ধী চাইছেন জগজীবন রামকে নিজের দলে এনে বিরোধীদের শক্তি কিছুটা ভেঁটা করে দিতে। কিন্তু এর জন্য জগজীবন রামের দেওয়া যে কোন শর্ত শ্রমতী গান্ধী মেনে নিতে মোটেই রাজী নন।

শ্রমতী গান্ধীর তরফ থেকে সোজা হুজি বলা হয়েছে জগজীবনবাবু তার দলে যোগ দিলে তিনি খুশি হবেন কিন্তু তাঁকে অথবা তার সহকর্মীদের মঞ্জী করা হবে কিনা সে ব্যাপারে তিনি আগায় কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন না।

এ অবস্থায় জগজীবনবাবু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং কিছুটা হতাশও। তার সমর্থকরাও ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ব্যাপারে একমত নয়। কেউ বলছেন জগজীবনবাবু আলাদা দল গঠন। কারও মত মতলবলে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুক পড়াই ভাল। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করছেন কংগ্রেসে যোগ

দিয়ে জগজীবনবাবুর উচিত ইন্দিরা গান্ধীর বিকল্প শক্তি হিসাবে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এ মাসের শেষের দিকে জগজীবনবাবু তার সমর্থকদের সভা ডেকেছেন ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করবেন বলে। সেই সভার সিদ্ধান্ত যে, পাকাপাকি কোন ব্যবস্থা হবে রাজনৈতিক মহল তা মনে করছেন না। তবে/এ সভার আলোচনা থেকে জগজীবনবাবুর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর ব্যাপারে কিছুটা ঠাচ পাওয়া যাচ্ছে।

জট পূর্ববৎ

১ম পৃষ্ঠার পর

বোঝামোর চেষ্টা করেছিলেন অশোক সেনকে সভাপতি করা হলে রাজ্যে গোষ্ঠী বন্দের কিছুটা অবসান হবে। দিল্লী যে বরকত-বিরোধীদের কথা শোনে নি তা এখন বরকত-বিরোধীদের কাছে স্পষ্ট।

সভাপতির নাম ঘোষণা করা হলেও প্রদেশ কমিটি পুনর্গঠনের জট এখনও খোলেমি। নতুন কমিটিতে কারা সম্পাদক হবেন এবং কারা কারা কার্যকরী সমিতির সভ্য হবেন তাই নিয়ে সঙ্গর গান্ধীর কাছে দরবার চলছে। তবে কমিটিতে যাতে সব গোষ্ঠীরই লোক থাকে সে ব্যাপারে সঙ্গর গান্ধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

পুনর্গঠিত কমিটিতে এবারও তিন জন সাধারণ সম্পাদক থাকবেন বলে

টাকা তথাপি কালোবাজারীরা খাচ বিভাগ থেকে কোশলে এই সিমেন্ট সংগ্রহ করে তা প্রায় ১১০০ টাকা এবং তারও বেশী মূল্যে খোলা-বাজারে বিক্রী করছে।

জানা গেছে, সিমেন্ট ব্যবসায়ীরা বেশ কিছু বেকার যুবককে প্রলোভন দিয়ে বলে টেনে এনেছে। আবার ওদের দিয়েই বিভিন্ন পাড়ার বাড়ির মালিককে প্রলোভিত করে তার পৌরসভার ট্যাক্সের রসিদ, অথবা ভাড়াটিয়া হলে তার বাড়ি ভাড়ার রসিদ সংগ্রহ করে খাচ দপ্তরে দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিয়ে দিচ্ছে। খাচ বিভাগ বথারীতি অর্থাৎ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বিনা তদন্তে চাহিদা অনুযায়ী আবেদনকারীর নামে সিমেন্টের পারমিট দিয়ে দিচ্ছে।

পারমিটের মাল সঙ্গে সঙ্গেই সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে শুদ্ধাঙ্গ থেকে কালোবাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, যে বেকার যুবকটি পৌরসভার ট্যাক্সের রসিদ বা বাড়ি ভাড়ার রসিদ সংগ্রহ করে লাইনে দাঁড়িয়ে সিমেন্টের দরখাস্তটি খাচ বিভাগে জমা দিয়েছিল, সিমেন্ট ব্যবসায়ীরা ওকে কিছু টাকাওড়ি

জানা গেছে। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ মুখার্জী এবারও সাধারণ সম্পাদক থাকবেন। অল্প ছুটি সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য সোমেন মিত্র, আমজাদ আলি, কাজী আবদুল গফফর, হরবিত শোব, গোবিন্দ মঙ্গর প্রমুখের নাম শোনা যাচ্ছে।

নতুন কমিটিতে আর্গ কংগ্রেস থেকে সন্ত আদা কিছু নেতাও থাকবেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ভোলা সেন, গোপালদাস নাগের নাম শোনা যাচ্ছে। জানা গেছে, সঙ্গর গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বরকত সাহেব আর্গ কংগ্রেস থেকে সন্ত আদা নেতাদের প্রদেশ কমিটিতে নেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

অজিত পাণ্ডার মনোনয়নে বরকত-বিরোধী গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলছেন না। কারণ সঙ্গর গান্ধীকে চটাতে কেউ রাজী নন। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতা এখনও চেষ্টা করছেন যাতে সম্পাদকমণ্ডলী এবং কার্যকরী সমিতিতে তাদেরই প্রাধান্য থাকে। তবে ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বরকত সাহেবের অস্থবিধা হোক হাইকমান্ড এমন কোন প্রভাবে দম্বতি দেবেন না।

দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। প্রকাশ, রসিদ ওরালিও কিছু ভাগ পাচ্ছে।

যার মাঝে সিমেন্টের পারমিট দেওয়া হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সিমেন্টের চুক্তির বাজারে এই সিমেন্ট সে ব্যবহার করেছে কিনা তার কোন তদন্তের বা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা না থাকার কালোবাজারীরা আরো মরিয়া হয়ে এঁ কাণ্ড করছে।

সাধারণ মানুষের বক্তব্যে প্রকাশ সরকারের সিমেন্ট বন্টনের পদ্ধতি ভাল। তবে, সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা সম্ভবজনক ক্ষেত্রে একটি “কটিকা বাহিনী” গঠন করে সিমেন্টের পারমিট গ্রহণকারীদের বাসস্থান এবং দরখাস্তে প্রদত্ত ঠিকানা অনুযায়ী ঘেরামতির অট্টালিকা বা বাড়িগুলি তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে এভাবে সিমেন্ট বন্টন করে সিমেন্টের অভাব কোন দিনই দূর করা সম্ভব হবে না। সরকারী খাচ বিভাগের মীর্জা গালির স্টোর বাড়ির ১ নং শেডটি বর্তমানে সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের একাংশের একটি কালোবাজারীর বাড়িরে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, খাচরী স্থান কুমার এ শেডের পাশেই বেলা ১০ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অফিস করে থাকেন। শহরতলির বাসিন্দাদের সিমেন্টের চাহিদার চিত্রটি পরবর্তী অবস্থায় প্রকাশ করা হবে। ওখানে অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর।

পরীক্ষার মস্তানি

২য় পৃষ্ঠার পর

কিনা। তারা তাতেও রাজি নয়। বিনা পরীক্ষার উন্নীত বলে ঘোষণা করে তাদের প্রমোশন দিতে হবে।

কিন্তু এখানেই তাদের বিরোধ। কেননা, সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ১০ বছর চাকরি করা একজন মজুর হরত প্রমোশন পাবে। কিন্তু একজন পিয়ন তো আগে থেকেই গ্রেডের দরুন তার চেয়ে সিনিয়র। সে তা মানবে কেন? কাজেই বিনা পরীক্ষার প্রমোশনের দাবিতে দললে একমত নয়।

এখন দেখা যাক পরীক্ষা তত্ত্বের জল কোথায় পড়ায়।



ফ্যান্টাস্টিক বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই



১৯৮০

১৪ থেকে ২৩ মার্চ

প্রবেশ পথ : রবীন্দ্র সদনের বিপরীত দিকে

আজ

উদ্বোধন

সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত

মেলায় সময় : সোম থেকে শনি বেলা ৩টে থেকে রাত ৯টা

রবি বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা

প্রতিদিন রাত ৮টার টিকিট বিক্রী মেলায় প্রবেশ বন্ধ হবে। সীজন টিকিট কাউন্টারে পাওয়া যাবে।

উদ্বোধন

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড

৫৫, ভবানী দত্ত সেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। ফরাসী বিপ্লব / শ্রীমদ্রত্নর চক্রবর্তী / ২৭.০০

২। কান্টের দর্শন / শ্রীমদ্রত্নর দাস / ১৫.০০

৩৫, রাজা স্ববোধ মল্লিক ফোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১, রট সেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

ই-কংগ্রেস রাজ্যসভার সদস্য ভাঙ্গানোর চেষ্টা করছে



ত্রয়বিংশ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। শুক্রবার, ২১শে মার্চ, ৮০। ৬০ পয়সা

রাজ্যের ইন্দিরা যুব কংগ্রেস ভেঙে দিতে সঙ্ঘব সন্মত

রাজ্য যুব কংগ্রেস (ই) কমিটি ভেঙে দেওয়ার জল্পা দিল্লীতে বরকত সাহেবের ঘনিষ্ঠ যুব নেতারা জোর চাপ দিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বরকত সাহেবের বিশ্বস্ত কিশোর যুব নেতা সঙ্ঘব গান্ধীর কাছে দাবি করছেন রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রকে সরিয়ে দেবার অস্বাভাবিক পদক্ষেপ করেছেন।

রাজ্য কংগ্রেসের (ই) প্রত্যাশালী মহলে বরকত সাহেবের জ্ঞান রেল সঙ্ঘব গান্ধীর নাকি যুব কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে সন্মত হয়েছেন। এবং অন্তত একজন উপস্থিত লোক, যোদ্ধা হলে যাকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হবে।

সোমেন মিত্রকে সরানোর প্রচেষ্টার মূলে বরকত সাহেব গোষ্ঠীর বিরোধিতা। সোমেনবাবু রাজ্য গ্রাম মহলে বরকত-সহিতর রোধী গোষ্ঠীর লোক। গোষ্ঠী সন্মত বরকত সাহেবের সঙ্গে সোমেনবাবুর

সম্পর্ক খণ্ডিত। এখন স্বাধীন বরকত সহিত-গোষ্ঠী সোমেন মিত্রকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরানোর জল্পা উঠে পড়ে লেগেছে।

রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে একথা প্রমাণ হয়েছে বরকত সাহেব দিল্লীর নেতাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত। সভাপতি বরকত সাহেবের অসহযোগীরা চাইছেন এই স্বাধীন-যুব, কংগ্রেসকে নিজেদের স্বতন্ত্র আনার জল্পা। বরকত গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে কয়েকটি জেলার যুব কংগ্রেস কমিটি ভাঙার ব্যাপার নিয়ে। অভিযোগ, বরকত-সহিত গোষ্ঠীর ডাকে ১৫ই মার্চ বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অস্বাভাবিক পটভূমির যুব কংগ্রেস কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সহিত মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেওয়া যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

আর এস পির সভায় বিভ্রান্তিমূলক প্রচার

সারা ভারত আর এস পির রাজ্য সম্মেলন অস্থগিত হবে আগামী ৬ই থেকে ১১ই এপ্রিল। এই উপলক্ষে পার্টি নেতা ও কর্মীরা প্রচার অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীন ও সঙ্ঘব ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জল্পা প্রচারে কাছে বিপ্লবী আন্দোলনের দাবি দিচ্ছেন। কিন্তু প্রচারকালীন একটা বক্তব্য সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন জায়গায় তারা বলেছেন, "আমাদের দেশ পরাধীন দেশ। অতএব বিপ্লবীদের প্রধান দায়িত্ব হল, জাতীয় মুক্তি অর্জন করা।" আবার কোথাও কোথাও বলেছেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা

অর্জন করা সর্বোপরি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জল্পা চাই স্বাধীন পরিকল্পনা।" এইভাবে এরা অনবরত বিবোধী প্রচার করে চলেছে।

কয়েকদিন পূর্বে বেঙ্গলুরিয়া ঠেগনে তাদের ঐ রকম একটা প্রচার অভিযান চলাকালীন প্রোতাদের মধ্যে জনৈক যুবক বক্তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আমাদের পরাধীন দেশই যদি হবে, তবে আপনাদের পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে কি করে? উপস্থিত নেতা ও কর্মীরা বধ্যাধ জবাবের পরিবর্তে যুবকটির সঙ্গে কথব্য আচার আচরণ করে তাকে সভাস্থল থেকে বিভ্রান্ত

ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা এখন হস্তে হয়ে চেষ্টা করছেন দল ভাঙিয়ে কি ভাবে রাজ্যসভায় গণিততা পাওয়া যায়। এর জল্পা রাজ্যসভায় বিরোধী দলের সদস্যদের নানাভাবে প্রলোভিত করা হচ্ছে।

লোকসভায় ইন্দিরা কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাজ্য সভায় ক্ষমতাসীন এই দলটি সংখ্যা-

লঘু। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি এক বিশেষ ক্ষমতাবলে নয়াটি রাজ্য বিধানসভা বাতিল করে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতির এই কাজটিকে বিধিসম্মত করতে যোষণাটি লোকসভায় ও রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিতে হবে। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে রাষ্ট্রপতির আদেশটি পাশ করিয়ে নিলেও রাজ্যসভায় বিরোধী-

দের শক্তি বেশী থাকায় রাষ্ট্রপতির আদেশটি পাশ করা যাবে না। এদিকে চলতি অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতির যোষণাটি পাশ করিয়ে নিতে হবে। ফলে শাসক দল ইন্দিরা কংগ্রেস বেশ কিছুটা বিপাকে পড়েছে।

এই অবস্থা থেকে পরিজ্ঞান পাও-শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



অরাজনৈতিক যুতাকে কেন্দ্র করে ই-কংগ্রেসীরা রাজনীতি করছে

উত্তর শহরতলীর নিমতা এলাকার এক কিশোরের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এক যুতায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের (ই) পরিবর্তী নেতা

করার উপক্রম করেন।

আর এক জায়গায় জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি তাঁদের প্রশ্ন করেন, "রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে সাধারণত: দেখা যায় সম্মেলনের শেষেই প্রকাশ্য সমাবেশ অস্থগিত হয়। কারণ প্রকাশ্য সমাবেশেই আগামী দিনের গণআন্দোলন ভিত্তিক কর্মসূচী, রাজনৈতিক ধসড়া প্রস্তাব ও ধসড়া কর্মসূচী ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকাশ্যে যোষণা করা হয়।" এই ভজলোককেও বধ্যা-রীতি খারাপ ব্যবহার করে নাগেহাল করা হয়। এখন জনসাধারণ ও অজান্ত দলের কর্মীদের কাছে আর এস পির মার্কনবাদী সততা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে।

ভোলা সেন এবং স্থানীয় কর্মীরা যদিও হৈ চৈ করছেন তথাপি এতে স্থানীয়ভাবে কংগ্রেসের (ই) স্থান্য বাড়ে নি। বরং এতে কংগ্রেসের (ই) দেউলিয়াপনাই প্রমাণিত হয়েছে। যে কোন অস্বাভাবিক বা অপমাত যুতায় সব সময়েই বেধনাধায়ক। একেজ্ঞেও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং স্থানীয়ভাবে দলমত নির্বিশেষে সবাই ঐ কিশোরের অস্বাভাবিক যুতায় জল্পা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। অথচ, কংগ্রেসের (ই) মুষ্টিমেয় লোকেরা এটাকে সঞ্চল করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ফয়দা লুঠবার আশায় সোরগোল তুলেছেন এবং কিশোরটি নিজেদের দলীয় কর্মী বলে দাবী করেছেন, যদিও স্থানীয় মাহবুবের কাছে তাঁদের আচরণ এক হাস্যাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, কিশোরটি আদৌ কংগ্রেসের (ই) কর্মী ছিল না।

দর্পণের প্রতিনিধি এত্যাণায়ে অল্পসন্ধান করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে জানা যায় যে, বোলার পরের দিন অর্থাৎ ২১ মার্চ নিমতা এলাকার গোলবাগানে হিজড়ে জাতীয় এক অবাঙ্গালী ব্যক্তির নাচের দাবীতে স্থানীয় হুটি যুবকের মধ্যে প্রথমে তর্ক বিতর্ক, এবং শেষে ঝগড়া হয়। উভয় পক্ষই লাঠি নিয়ে মুখোমুখি হয়।

এক পক্ষ বর্ধন লাঠি নিয়ে তাড়া করার উপক্রম করছিল তখন তাহু বাগদী (প্রামাণিক) নামে নিহত ঐ কিশোর মীমাংসার জল্পা এগিয়ে যায়। তাহুর চেষ্টায় বিবদমান একজন যুবক রক্ষা পেলেও তাহুর রেহাই পায় নি। অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহুর মাথায় লাঠির আঘাত লাগে।

এখানে উল্লেখযোগ্য তাহু কিন্তু বিবদমান কোন পক্ষেই ছিল না। সে ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তার শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

বাংলার ছুঁড়গ্য

শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মর্দাদা নিয়ে বাংলা হল হার খীকার করেছে দিল্লীর কাছে। রজি টফির কোর্টার ফাইনাল ১৪ই এপ্রিল থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত ইন্ডেনে অনুষ্ঠিত হল।

চারদিনের খেলায় সাধারণতঃ প্রথম ইনিংসের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয়-পর্যায়ের মীমাংসা হয়ে থাকে। একথা মনে-রেখেও বাংলা হল প্রথম ইনিংসে আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারে নি। দিল্লীর প্রথম ইনিংসের ৩৩৭ রানের উত্তরে বাংলার প্রথম ইনিংস ১৫৬ রানে শেষ হয়ে যায়। একমাত্র অধিনায়ক রাহু মুখার্জী ছাড়া বাংলার অন্য কোন ব্যাটসম্যানই সে রকম আস্থা নিয়ে খেলতে পারে নি।

বহিঃ দিল্লীর পেস বোলার সুনীল ওয়ালাসন এবং মদনলালের বোলিং প্রশংসা করবার মত তবুও বাংলার ব্যাটসম্যানরা এদেরকে অহেতুক সমীহ করে ভুলের মাতুল গুনে উইকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তৃতীয় দিনের শেষে বাংলার হার অবধারিতই ছিল এবং শোচনীয় হারের অপেক্ষায় যখন সকলে বসে আছেন তখন চতুর্থ দিনে বাংলা খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধ হয় হঠাৎ আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠেছিল। নাহলে যে মদনলাল ও সুনীল ওয়ালাসনকে প্রথম ইনিংসে এত সমীহ করেছেন বাংলার খেলোয়াড়রা তাদেরকেই মার্ঠের চারদিকে পিঠিয়ে মেয়ে খেলে বাংলার রাহু, প্রণব, বরুণ, উদয়ভাষ্ক দিলীপ বিত্তীর ইনিংসে এত রান পেলেন কি করে? শেষ পর্যন্ত বাংলাকে ৬৬ রানে দিল্লীর কাছে হার খীকার করতে হয়েছে।

চারদিনের খেলায় দিল্লীর অরুণ লাল এবং বাংলার রাহু মুখার্জীর ব্যাটিং সব থেকে বেশী প্রশংসার দাবী রাখে। এরা দুজনেই ধীরস্থির হয়ে মার্ঠের চারদিকে মেয়ে খেলে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজদের প্রতিভারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বোলিংয়ে বাংলার বরুণ বর্ষণ এবং স্বরত পোড়েল মোটামুটি ভাল বল করেছেন। দিল্লীর পেস বোলার সুনীল ওয়ালাসনের বোলিং দেখে মনে হয়েছে আরও অস্থূলকর করলে একদিন ভারতীয় দলে নিজের জায়গা করে নিতে পারবেন। টেষ্ট ক্রিকেটার দিলীপ দৌলী এবং বিশেষ সিং বেদীর বল এবার ইন্ডেনে কার্ধকরী হয় নি। বেদীর ভাগ্যে একটিও উইকেট জোটে নি, আর দিলীপ দৌলীর বুলিতে মাত্র একটি। এই টেষ্ট বোলারের ব্যর্থতা চোখে পড়ার মত।

রাজ্য ই-কংগ্রেসী মস্তানদের দৌরাণ্য

শ্রীমতী, ইন্দিরা গান্ধী আবার কেন্দ্রীয় মননদে ফিরে আসায় পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের (ই) মস্তানদের দৌরাণ্য আবার বেড়েছে। পুলিশের একাংশ এই মস্তানদের মদত দিচ্ছে।

এই অভিযোগ রূপের ময়। কংগ্রেসের (ই) তরুণীবাহক শিল্পপতি-দের একাংশের কাছ থেকে এই অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে, তাঁরা কংগ্রেসের (ই) বিরুদ্ধে দুরাসরি অভিযোগ করতে চাইছেন না। কারণ, ইন্দিরা সরকারের দ্বারাতেই বিভিন্নভাবে তাঁদের অসুস্থত্ব ধম-তাগার পূর্ণ হচ্ছে। দুরাসরি অভিযোগ করলে হয়ত তাঁদের মুনাকার এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যে অস্থবিধা

অরাজনৈতিক খুন নিয়ে রাজনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

বয়েস মাত্র ১৩।১৭ বছর। সে স্থানীয় একটি বাগদী পরিবারের সন্তান। কংগ্রেসীদের দীর্ঘদিনের অপশাসনের মধ্যে এক অভাবগ্রস্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করায় ভাষ্ক বিশেষ কোন শিক্ষালভও করতে পারে নি। অভাবের তাড়নায় সে মাঝে মাঝে রিকসা চালিয়ে কিছু পয়সা কড়ি যোগ্যার করত মাত্র।

মার্ঠির আঘাত লেগে ভাষ্কর মাথা থেকে সামান্য রক্তপাত হয়। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত বৃকস্বারে আচ্ছন্ন লহকরী রক্তার কিছু গুলী-বালি তুলে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে চেপে ধরে ময়পাঠ করে। এতেই হয়েছে ওর কাল। সংবাদ পেয়ে পুলিশ আসে এবং বিবদমান দুটি যুবকসহ ভাষ্ককেও থানায় নিয়ে যায়।

অবশেষে চিত্ত সাহা নামে স্থানীয় কংগ্রেসের (ই) কর্মী বলে পরিচিত এক ব্যক্তির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মালিসীতে উত্তর পক্ষের সম্মতিতে লিখিতভাবে ঘটনাটির মিটমাট ও মীমাংসা হয়। ভাষ্ককে চিকিৎসার জন্য কুড়িটি টাকাও দেওয়া হয়। এর আগেই ভাষ্ককে হাসপাতালে পাঠিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করাণো হয়। কিন্তু, ভাষ্ক নিজের অজান্তর দরুন চিকিৎসকের পরামর্শ অস্ব্যায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র খায় নি। তাতে রোগ আরো বেড়ে যায়। ক'দিন পরে যন্ত্রণাকার উপসর্গ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, তাতেও বিশেষ ফল হয় নি। ১০ই মার্চ রাতে ওর অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। স্থানীয় সি-পি এম কর্মীরা সংবাদ পেয়ে ভাষ্কর বাড়িতে ছুটে যান।

হতে পারে। তাই তাঁরা কোশলে এবং নানাভাবে এই সব কথা নানা-স্থানে বলছেন এবং রাজ্য সরকারকেও জানাচ্ছেন।

গত ১২ই মার্চ নদীয়া জেলার চাকদহ থানার রাণীনগরে কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে বর্ণিত একজন মস্তান ওখানে নির্মীয়মাণ স্থায়ী পেশার মিলের অফিসে হামলা করে চরম দৌরাণ্য করেছে। উল্লেখযোগ্য, কলকাতার অন্ততম মারোরাড়ী ব্যবসায়ী গোঞ্জী চৌডি পরিবার প্রায় ৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে এই কাগজ কল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। রাজ্যের বায়স্কট সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্পের কাজ যদিও এগিয়ে চলেছে, তথাপি

তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্ককে পানি-হাটি এলাকার এক হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার ওই হাসপাতালের ডাক্তারও নিজে দায়িত্ব না নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বেলেঘাটার সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভাষ্ককে আর রক্ষা করা যায় নি। ১১ই মার্চ ভাষ্ক এই হাসপাতালেই মারা যান।

এর পরেই স্থানীয় কংগ্রেসের (ই) কর্মীরা ভাষ্কর এই "দুঃখজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র" করে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ভাষ্ককে নিজদের দলীয় কর্মী বলে রাজনৈতিকভাবে প্রচার করে ভাষ্ককে শহীদ বানায়। কংগ্রেসের (ই) পরিষদীর দলের নেতা ভোলা সেনের কাছে সংবাদ পৌছে দেয়। ভোলাবাবুকে দলীয় কর্মীদের প্রভাবে পড়ে এই অসত্য সংবাদকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে কুংসাহস বিবৃতি দিতে হয়েছে। কংগ্রেস (ই) কর্মীরা স্থানীয়ভাবে এ নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছে ও ২৩টি স্থানে শহীদ বেদী তৈরি করেছে। কিন্তু, এতে তাদের দলীয় কোন প্রভাব বিস্তার হয় নি। বরং অসত্য ঘটনা নিয়ে হৈ-চৈকরায় কংগ্রেসের বদনাম হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, যুবকদের এই কণ্ডার যে মীমাংসা হয়েছিল তার লিখিত একটি দলীয় স্থানীয় থানা-তেও জমা আছে এবং তাতে মালিসীর সভাপতি হিসেবে কংগ্রেস কর্মী চিত্ত সাহাও স্বাক্ষর রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় ওটি একটি অরাজনৈতিক ঘটনা।

অথচ, ই-কংগ্রেসীরা এরপরেও হল বেঁধে নিমতা থানায় গিয়ে বিক্ষোভ জানায়। এখন ভোলাবাবু কি বলবেন?

একশ্রেণীর ইন্দিরা কংগ্রেসী মস্তান-দের দৌরাণ্যে বিভিন্ন শিল্পপতি ও কাগজ কলের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

কারণ, কংগ্রেসের (ই) দৌরাণ্য বন্ধ না হলে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হবে।

থানা পুলিশের দ্বারা প্রকাশ, কংগ্রেসের (ই) কর্মী বলে পরিচিত মস্তানরা এই দিন নির্মীয়মাণ কাগজ কলের অফিসে গিয়ে দাবী করে যে, স্থানীয় কত লোক এই কারখানায় নিয়োগ করা হবে তা এখন অস্বীকার করতে হবে। ওদের বিক্ষোভের সমস্ত কারখানার কর্তৃপক্ষের কেউ ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। কারখানায় কর্মরত একজন কর্মচারীর পক্ষে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। এতেই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে, কংগ্রেসের (ই) মস্তানরা কারখানার কর্মীদের বেহম মারধর করে। তাছাড়া, এই অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং কাগজপত্র তছনছন অফিসটি লুণ্ঠন করে দেয়।

সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ যায়। কিন্তু, পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ এব্যাপারে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে বহিঃ ইন্দিরার থানার ১৭মঘরে একটি কেস-ডায়রী করে তথাপি এখনো পর্যন্ত অপরাধীদের কেউ ধরা পড়েছে কিনা তা জানা যায় নি।

ইন্দিরা যুব কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর

যেয় কয়েকজনকে নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে সঞ্জয় গান্ধীর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এসেছেন। সঞ্জয় গান্ধী রাজ্য নেতা-দের সঙ্গে যুব কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মনে হয় বরকত গোঞ্জী সঞ্জয় গান্ধীকে যুব কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করার ব্যাপারে প্রস্তাবিত করতে পেরেছেন।

বরকত গোঞ্জী সোমেন মিত্রর পরিবর্তে বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য এবং বরকত সাহেবের ঘনিষ্ঠ পৌতম চক্রবর্তীর নাম যুব কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে দিল্লীর কয়েকজন নেতা সোমেনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহিত। যদি তাকে যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তবে সংগঠনের অন্তর্ভুক্তি তাকে রাখা হবে।

শিয়ালদা ষ্টেশনে অ্যাথুলেন্স নেই

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর চলা-চলের কেন্দ্রস্থল শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে কোন অ্যাথুলেন্সের ব্যবস্থা নেই। ওখানে সেন্ট্রাল অ্যাথুলেন্স ট্রিগেডের বহিঃ একটি কেন্দ্র রয়েছে, তবু ডিক্লেয়ার অভাবে তাঁদের অ্যাথুলেন্সটি ঠিকমত চালানো যাচ্ছে না বলে ওই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

অপরদিকে, ষ্টেশন মাস্টারদের পক্ষে জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্ততম যাত্রী বহুল শিয়ালদহ ষ্টেশনে ষ্টেনে প্রতিদিনই নানা ধরনের রক্ত এবং আহত নরনারীরা আসছেন। কিন্তু, অ্যাথুলেন্সের অভাবে তাঁদের সময়মত ষ্টেশন থেকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। রেলের বি আর সিং হাসপাতালে অ্যাথুলেন্সের লক্ষ কোন করলেই তারা সরা-সরি বলে দেয় যে, তাঁদের পক্ষে কোন অ্যাথুলেন্স পাঠানো সম্ভব নয়।

কলকাতা পৌরসভার অ্যাথুলেন্স কর্মীদের কাছে কোন অ্যাথুলেন্সের লক্ষ কথা বললে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলে দেন যে, হ্যাঁ, অ্যাথুলেন্স পাঠানো হবে। তবে, কখন তা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, তাঁদের হাতে গাড়ি কম এবং কল বেশী।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিয়ালদহের তিনটি ষ্টেশনে কর্মরত ষ্টেশন মাস্টার-গণ প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ষ্টেনে আগত হাসপাতালগামী রক্ত এবং আহত নরনারীদের নিয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করেছেন।

যাত্রীদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, যাত্রীরা বেহেতু রেলেরই যাত্রী সেই হেতু রেল কর্তৃপক্ষকেই এর দায়িত্ব বহন করতে হবে। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্বার্থে রেলের উদ্যোগেই শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি অ্যাথুলেন্স কেন্দ্র খুলতে হবে।

ভেজাল খাত

কলকাতা মহানগরীর অন্ততম খাতনামা মিষ্টির দোকান "সেন মহাশয়"-এর বিরুদ্ধে কলকাতা পৌর আদালতের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জীএস কে কয়ের কোর্টে এক মামলা চলছে। পৌরসভার খাত পরিদর্শক আদালতে এক অভিযোগ পেশ করে বলেছেন, "সেন মহাশয়" প্রতিষ্ঠানের ১৫৭ ডি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের মিষ্টি তৈরীর কারখানায় কিছু ভেজাল খাত বন্ধ পাওয়া গেছে। মামলাটি বর্তমানে আদালতের বিচারধীন।

প্রকাশ্য দিবালোকে তেল পাচার চলছে

চরম তেল সংকটের মুখেও তেলের চোরাই চালান যথারীতি চলছে। রাজ্য সরকারকে বৃদ্ধাপূর্ত দেখিয়ে একদল চোরাকারবারী প্রকাশ্য দিবালোকে তেল পাচার করে যাচ্ছে।

চোরাকারবারীরা রমরমা কারবারে চোরাকারবারীরা নিত্যনূতন ট্যাক্সার কিনছে। লরী কিনছে। কলকাতার থেকে বাড়ী ঘর ক্রয় করছে। মোমিনপুরে ১৪ নং হোমেন শা রোড, বেল-ঘরিয়া কামারহাটি জংশন, হাওড়া বোম্ব রোডের ছপাশ-জুড়ে এই তেলের বেপারীরা চোরাই কারবার চলছে।

গৌরী, লালমোহন, নরেন্দ্র সিং, মানকেশ্বর প্রসাদ, সেলিম, রামপথ, রণজিৎ, কেদার সিং, নেবুলাল সিং, আখতার কালিগদ, ছেদি, কুতুব ভূক্ত চোরাদিয়া, তেজ, শিউনাথ, নরসিং গুপ্তা, তারা প্রমুখ কুখ্যাত চোরাকারবারীদের তেলের চোরাই কারবার কোনও কিছুকে পরোয়া না করেই যেমন আগে চলছিল, এখনও তেমন চলছে।

সারা রাজ্য জুড়ে তেলের চরম সংকটের মুখেও এই কারবার যেভাবে চলছে তা দেখে অনেকেই অবাক। পুলিশ থাকে মধ্যে চোরাই গোড়াউন-গুলিতে আসছে। ছোট খাটো কেস দিয়ে ঘুম নিয়ে পুলিশ যথারীতি সবে পড়ছে। দিন রাত সর্বক্ষণ এই

চুরির অভিযোগে ই-কংগ্রেসের রক সভাপতি গ্রেপ্তার

বর্ধমান সদর থানা এলাকার একটি চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ বর্ধমান জেলার রায়না রক কংগ্রেসের (ই) সভাপতি ওমর আলি মণ্ডলকে ২ মার্চ গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া, একই অভিযোগে অভিযুক্ত মণ্ডলের আরো দুইজন সঙ্গী একত্রে ধরা পড়েছে।

পুলিশ অভিযোগ করেছে বর্ধমান থানার ১৮(২)৮০ এবং ১১৮(২)৮০ নম্বরের রেকর্ডে দুইটি চুরির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। গত রক কংগ্রেসের (ই) সভাপতি মণ্ডল এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে।

পুলিশের অভিযোগে আরো বলা হয়েছে যে, মণ্ডলের হেপাজত থেকে কিছু চোরাই মাল পাওয়া গেছে।

কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে আরো

অভিযোগ

মালদা জেলার হবিবপুর থানার

লরী গো-ডাউনগুলি খোলা। যেসব তেলের লরী সড়ক পথে বাতায়ত করছে তার অধিকাংশই সরকারি ধারে চোরাই গোড়াউনগুলিতে নেমে মাল নামিয়ে সরে পড়ছে।

দুর্ভাগ্যের তেল নিয়ে কেলেকারীর বহু তথ্য প্রকাশিত হলেও বামসরকার আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। বলাবাহুল্য তেলের সংশ্লিষ্ট চোরাকারবারীদের হাত মহাকরণ পর্যন্ত প্রসারিত। এর সঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক মাতব্বরও জড়িত।

মহাকরণ থেকে শুরু করে পুলিশের পদস্থ অফিসার সবাই জানেন, ডিজেল, কেরোসিন ও অন্যান্য তেল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নামা অনাচার চলছে। রাজনৈতিক মাতব্বররাও জানেন। কিন্তু কাকতালীয় পরিবেশ। হাজার লেখালেখি করা সত্ত্বেও চোরাই গোড়াউনগুলি সম্পর্কে সরকার নির্লজ্জ উদাসীনতার নীরব। চোরাকারবারীদের চোরাপথে লাখ লাখ টাকা রোলগার করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত সরকার কোন তদন্ত পর্যন্ত করেননি। এমনকি চোরাই গোড়াউনগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে কি-সরকার, কি রাজনৈতিক দলগুলি কারও কোন মাথাব্যথা নেই। এমন কি হাবভাবে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলির এই চোরাইচালানে মদত রয়েছে। দ্বিজী বোম্ব রোডের হু শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

স্বধনগর চরের নিবারণ সরকারের জমি থেকে কংগ্রেসের (ই) কিছু কর্মী ১ই মার্চ জোর করে গমের চারা গাছ এবং অন্যান্য ফসলের কিছু চারা গাছ কেটে নিয়ে গেছে। লুণ্ঠিত চারা গাছের মালিক নিবারণবাবু ঐ থানারই কৃষকগণের বাসিন্দা। পুলিশ ঘটনাটি ৮।৩।৮০ তারিখে থানার ১ নম্বর কেসে রেকর্ড করে এব্যাপারে দুজন কংগ্রেসী (ই) গ্রেপ্তার করেছে। ই-কংগ্রেসীদের হামলা

মালদা জেলার রাতুরা থানার কুমারগঞ্জের সি পি আই (এম) সর্ধক ওরাজেব আলি এবং তাঁর স্ত্রীকে ১ই মার্চ কংগ্রেস (ই)র কর্মীরা প্রচণ্ড মারধর করেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে দুইজন কংগ্রেস (ই) কর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানার ১ই মার্চের ৬নং রেকর্ডে একটি মামলা রুজু করেছে।

দেশ কাল রাজনীতি ছিঃ ছিঃ কী গভীর লজ্জা !

ভারতপুত্র

গত রবিবার নয়াদিল্লীতে অসহায় অন্ধ-প্রতিবন্ধীর ওপর নৃশংস লাঠি-বাজী করে ইন্দিরা সরকার বিশ্বের দৃষ্টিতে নিজেদেরই প্রতিবন্ধী প্রমাণিত করলেন। এ স্থপির, মানবোচিত হাঙ্গামার জয়লাভ থেকে আজ পর্যন্ত কোথাও কখনো অন্ধদের ওপর এভাবে পুলিশ বাহিনীর কাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা কখনো ঘটে নি। শ' ছুয়েক অন্ধ-প্রতিবন্ধী সেদিন দিল্লীর মসনদ দখল করে নেবার জন্তে মিছিলে নামিল হন নি, সেদিন বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে তারা প্রধানমন্ত্রীর হাতে এক ঝুঁক কাগজ তুলে দিতে চেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার তেত্রিশ বছর পরেও অন্ধ প্রতিবন্ধীদের মানুষের করুণা-ভিক্ষা-মজি নির্ভর হয়ে পড়ার জীবন বাপন করতে হয়—এ অবস্থার তারা প্রতিকার প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন দেশের বড়মুণ্ডের কর্তার কাছে। কিন্তু দিল্লীর নগর-কোটালেরা দৃষ্টিহীনদের এ ওহুতা বরদাস্ত করতে পারে নি, তারা সম্রাজ্ঞীর ছুটির দিনের বিশ্রাম-স্থখে ব্যাঘাত ঘটান আশংকাকে লাঠির ঘায়ে অংকুরে বিনাশ করে দিয়েছে। ইন্দিরার পুলিশকে বাহাদুর বাহিনী আখ্যা দিতে হয়।

ইন্দিরা সরকার কি এ-কদর কাপুরুষতার কারণে অহুতপ্ত? মোটেও না। পরবর্তীকালে অন্ধদের সাক্ষাৎ দান করে তাদের নিয়ে ফটো তোলা শ্রীমতী গান্ধীর একটা চিরচরিত অভ্যাসমাত্রিক ষ্টাণ্ট। সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে বহুলির নির্দেশ দান ও ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দান, কমা প্রার্থনা ইত্যাদি কতের ওপর প্রলেপ মাজ। কৃত অপরাধের জন্ত অজ্ঞানোচিত ইন্দিরা সরকারের হৃদয় যে আদৌ অবীভূত হয় নি, তার অকাটা প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৈল সিং-এর সপাট জবাবী। তাঁরই পুলিশের ঘায়ে জনা পচিশ অন্ধ-প্রতিবন্ধীর গুরুতর রূপে আহত হবার ঘটনাকে তিনি সত্যি বলে অকপটে মেনে নিতে পারেন নি, লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি গড়-গড় করে আউড়ে গেলেন যে, পুলিশ নাকি লাঠি চালিয়েছে বলে একটা অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মানবাত্মার প্রতি, কংগ্রেস (ই) সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, সত্যের প্রতি এই তো প্রকার নমুনা।

যারা আপায়র জনসাধারণের

দয়া ও সাহায্যের পাত্র, সেই অন্ধনা-চারেরা যদি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি দয়বী বলে বিজ্ঞাপিত কংগ্রেস (ই) সরকারের কাছে এরকম নির্ভর অমানবিক ব্যবহার পান, তবে অধিকার সচেতন সাধারণ চক্ষুমান, সর্ধক মানুষের ভাগ্যে কী বুলছে? বুলেট আর সজীনের খোঁচা? কারাগার আর ভাগাড়? গণতন্ত্র নাযাইলীর ফোকড় দিয়ে বৈরতন্ত্র কি প্রকাশ হয়ে পড়ছে না? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা!

রাজ্যসভা থেকে গণতন্ত্র বিদায়?

কেবল প্রশ্ন নয়, বলা উচিত, নিয়েছে। সেজন্তাই নটা রাজ্য অ-কংগ্রেসী সরকার ও বিধানসভা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে রাজ্যসভায় গণতন্ত্রের বিধান মতো কোন আলোচনা বিতর্ক হতে পারল না। সেদিন রাজ্যসভায় আইনজ্ঞ চেয়ারম্যান জনাব হিদায়েতুল্লা বিরোধী সদস্যদের আলোচনা-দাবির ওপর তাঁর কলিং-এর খড়গাঘাত করে সেই যে সভা ত্যাগ করলেন, সেটাই তাঁর অগন্ত বাজার মতো হল। ভজ-লোকের টিকির দর্শনই সেদিনকার মতো আর পাওয়া গেল না। কেন, বিরোধীদের এত ভয় কিসের? গণতন্ত্রে বিরোধী হল, বিরোধিতা, মতের বিভিন্নতা তো থাকবেই।

হিদায়েতুল্লা সাহেব কি ইন্দিরা সরকারের মুখ বাঁচাবার জন্তই রাজ্যসভা থেকে গণতন্ত্রকে কেঁটিয়ে বিদায় করলেন? এ কাজে কি তার নিরপেক্ষতা অক্ষর রইল, না কি তিনি পক্ষপাতিত্ব করলেন? লোকসভায় শাসক কংগ্রেসের (ই) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভা এখনো ইন্দিরার মুঠোর বাইরে। রাজ্যসভায় তাই ন'টি বিধানসভা বাতিলের আদেশ নাকচ হয়ে যাবে, ইন্দিরার মুখ পুড়বে বুকেই হয়তো রাজ্যসভায় প্রসঙ্গটির খোলাখুলি আলোচনার রাজ্য বন্ধ করে দেওয়া হল। মুখে বৈরতন্ত্রের নাম না নিলেও কাজে গণতন্ত্রকে খতম করে তার চিতার ওপর বৈরতন্ত্রের কলক তোলাই হল না কি?

নীচে নামার জেদ

আইন ও শৃঙ্খলা পরিহিত ভেঙ্গে পড়ার ঘোড়াই পেড়ে যারা নটি অকংগ্রেসী সরকার তেড়েছেন, তারা

আশাম নিয়ে সাক্ষ্যের সঙ্গে একটার পর একটা হৌচট খেয়ে মুখ দেখান কী করে? প্রথমে ব্যক্তিগত দূত যশপাল কাপুর, দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দূত লৈল সিং এবং সর্বশেষে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সেই যে আসামের সংকীর্ণতাবাহীদেয় কাছে পাচ দকা দাবি মেনে নিয়ে মাথা একবার নত করেছেন, সে-মাথা আর তুলতে পারেন নি। অথচ আইন ও শৃঙ্খলাকে নিত্য দিন জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে, 'বিরোধী'র ছাপ মেয়ে অ-অসমীয়া নাগরিকদের নরক-যন্ত্রণা ভোগানো হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির শাসন চালিয়ে আসামের, তার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায় তো সরকারেরই। কিন্তু বিচারপতির বিচার করে কে?

বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

করবে অবশ্যই দেশের জনগণ। বৈরতন্ত্রীরা যে আবার সদস্যবলে ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সাধারণ মানুষের কাছে তা এখন স্পষ্ট। কিন্তু মাননীয় রাজনৈতিক নেতাদের মাথা ঘেন এখনো পরিষ্কার হয়নি। তা যদি হত, তবে চরণ সিং-রাজনারায়ণ আবার নতুন করে বিবাদে মেতে উঠতেন না। রাজনারায়ণ অবশ্য তার কাজকর্ম কথা-বার্তা আচরণের দ্বারা ইন্ডিকে যে-কোন দলের পক্ষেই রাজনৈতিক লায়ালিটি বা বোকা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু চরণ সিং? জনতার মোরারজী দেশাই? কংগ্রেসের দেবরাজ অর্প? আসলে এঁরা সবাই—ভিন্ন দলের দলী হলেও একই অচল, স্থবির চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। গণতন্ত্রের নামে এঁরা পুজো দেন বটে, কিন্তু বৈরতন্ত্রকে মোখার মতো উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানে এরা অক্ষম, বার্থ।

নতুন নেতৃত্ব দেবার নতুন করে জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তার ওপর তাই জোর দিয়েছেন মার্কসবাদী নেতা মাহুদিসিদ্দিক। বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শিবিরকে জুড়য় করে তুলতে হলে কেবল বাহ ও গণতান্ত্রিক দলের মিলনে কাজ হবে না, চাই আরো ব্যাপক এক্য। অর্থাৎ একদিকে বৈরতন্ত্র, অপর দিকে বৈরতন্ত্র বিরোধী অবশিষ্ট দল। প্রস্তাবটা নিয়ে জাতীয় স্তরে আলোচনা প্রস্তুতি ও উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

আফগানিস্তানের ঘটনা এগড়ে কিছু বক্তব্য

৭।৩।৮০ তারিখে, আশানুভূতি পত্রিকায় পুনরায় শতদল সেন আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষিকার কৃষকী প্রাশংসা করেছেন। রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের অল্প কৃষিকার কৃষকী প্রাশংসা করেছেন। রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের অল্প কৃষিকার কৃষকী প্রাশংসা করেছেন। রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের অল্প কৃষিকার কৃষকী প্রাশংসা করেছেন।

তারতবর্ষে সংশোধনবাদের প্রভাব খুবই গভীর। তারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বস্ত এজেন্টরা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দখল করে নেয় এবং বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বার বার জনগণের প্রকৃত গণবিপ্লবগুলিকে 'হঠকারী' অধ্যায়ে নিয়েছে। সর্বোপরি সংশোধনবাদের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে সঙ্গত কারণেই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেই কারণেই ভারতের বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির ফেরি-ওয়ালাদের কাছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবটা মাদুরের বস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের নয়া-সংশোধনবাদীরা মূলতঃ ইউরো কমিউনিস্টদের এক নম্বর প্রবক্তা, তারা কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে নয়া ভারতের পক্ষে প্রচার করছে।

লেখক কাবুলের পোটা ঘটনাকে কিছুটা বিস্মৃতভাবে অধিবিস্মৃত দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত আফগানিস্তানের বিপ্লবকে (১) প্রাশংসা করার পূর্বে সেই রাষ্ট্রের প্রাচীন চরিত্র কি ধরনের এবং তাদের লড়াইটা কার বিরুদ্ধে সেটাই প্রথমে ঠিকভাবে নিরূপণ করা উচিত। কারণ ভারত, আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, ইন্দোচীনের তিনটি রাষ্ট্র, লিংহল প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলির রাষ্ট্র চরিত্র হলো আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ত তান্ত্রিক। এইসব দেশগুলির বিপ্লবের রূপরেখা নিশ্চিতভাবেই চেয়ারম্যান নির্দেশিত পথেই হবে। এই দেশগুলির বিপ্লবের স্তর হচ্ছে জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লব, অর্থাৎ যেটা মূলত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আত্মকেন্দ্র দ্বিনে আর পূর্বের ধরনের গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না। কারণ বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিকভাবে গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। অধিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী জন-যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সেইসব দেশের

জনগণের চিরস্থায়ী মুক্তি ঘটতে পারে। বর্তমান যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে মাও-সেতুংএর চিন্তাধারা। বর্তমান রাশিয়ার নয়াভারতের বেতনতুক দাদালারা অবশ্য এশিয়া আফ্রিকা জাতি আফ্রিকার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক-আধা-ঔপনিবেশিক দেশ-গুলিতে "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের" কৃষকী কৃষকী প্রচার করছে। কাবুলের বর্তমান সামরিক অভ্যুত্থানের স্ফূর্তিজনক ঘটনাগুলি এই ধরনের "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" কিনা সেটা অবশ্য আমার কাছে অজ্ঞাত।

আফগানিস্তানের অভ্যুত্থানগুলি রাশিয়ার নয়াভারত ও মার্কিনীদের আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার আলোকে আফগানিস্তানে নয়া ভারতের চক্রান্তের স্বরূপটাকে উন্মোচন করাটা যদি 'অতিবিপ্লবী' বা প্রতি-বিপ্লবী' কাজ হিসাবে লেখক চিহ্নিত থাকেন তবে আমার বিশেষ কিছুই বলাই নেই।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাকে লেখক স্বাধীনতা যুদ্ধ (১) বলেছেন, এটা নিতান্তই পেটী বুর্জোয়া ভাবলুতা। বাংলাদেশে যে যুদ্ধ সেটা কার বিরুদ্ধে হয়েছিল? সেই যুদ্ধে কারা প্রধানত অংশ গ্রহণ করেছিল? পূর্ব পাকিস্তান সহ পোটা পাকিস্তানের জনগণের চার প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, রুশ সাম্রাজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ, দাদালা পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্র তাঁদের কাঁধে জগদল পাথরের মতো চেপে আছে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধটা কি ঐ চার প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে হয়েছিল? ঐ যুদ্ধে কি পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত মানুষের ব্যাপক অংশ যোগ দিয়েছিল? মোটেই তা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের আসল ঘটনা হলো ভারতের বৃহৎ দাদালা পুঁজিপতিদের সম্প্রদায়বাদী আক্রমণ চরিতার্থ করার একটা হীন প্রয়াস। যেহেতু পূর্ব বাংলার মেহনতী মানুষের পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছিল সেহেতু পূর্ব বাংলার কিছু বিশাখ্যাত সাম্রাজ্যবাদের দাদালা সামন্ত মন্ত্রিদের লোভে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অঞ্চলটাকে ভারতীয় সম্প্রদায়বাদীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। ভারতীয় সম্প্রদায়বাদীরা সীমান্ত সমস্যার অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানে "মুক্তি-বাহিনী" নাম দিয়ে তাদের সেনা-

বাহিনী ঢুকিয়ে দেয় এবং বলপূর্বক পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে। এইসব স্বল্প অস্ত্রধাতুমূলক কাজ হয় রাশিয়ার নয়া ভারতের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় সামাজিক চীনকে ঘিরে ফেলার অংশ উদ্দেশ্য নিয়ে।

বিশ্ববিপ্লবের লালজুগ মহান চীন সৈনিক দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রদায়বাদীদের ঐ ধরনের স্বল্প অস্ত্রধাতুমূলক কাজকে নিষিদ্ধ করেছিল এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অঞ্চলটার প্রাচীর পাকিস্তানের সরকারকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ইয়াইরা খা বখশ পূর্ব-বাংলার সাধারণ জনগণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একতাবে বিচার করে অত্যাচার শুরু করে তখন কিন্তু ইয়াইরার ঐ পদক্ষেপকে চীন সমর্থন করেনি। এই প্রসঙ্গে চৌ-এন লাইয়ের তৎকালীন একটি বক্তৃতার অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছি। ১৯৭১ সালে আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও যুবছাত্র পিকিংয়ে চৌ-এন

মতামত

লাইয়ের সঙ্গে বখশ দাদালা করেন তখন আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব-বাংলার ঘটনার চৌ-এন লাই বলেন, "ইয়াইরার উচিত পূর্ব বাংলার মেহনতী সাধারণ মানুষ ও পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পৃথকভাবে দেখা। পাইকারীভাবে ব্যাপক জনগণকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁদের উপর অত্যাচার চালানো উচিত নয়।"

চীন সব সময়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত জাতি ও জনগণের জায়গা-লড়াইকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এসেছে। রাশিয়ার নয়া-ভারতের মতো চীন কখনও নিপীড়িত জনগণের ওপর অত্যাচারকে সমর্থন করেনি। ঐটা নয়া-ভারতের অস্থায়ী ভাবে ভারতীয় সম্প্রদায়বাদীদের অপপ্রচার। পক্ষান্তরে রাশিয়া, কিউবা ও এমনকি অকৃতজ্ঞ ভিয়েতনাম ফ্যানিষ্ট ইন্দ্রিয়ার জরুরী অবস্থার ভারতে যে স্বল্প অত্যাচার হয়েছিল সেটাকে নিশ্চিন্তভাবে সমর্থন জানিয়েছিল।

লেখক চীন মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে একটা অন্তত ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে একটি সামাজিক রাষ্ট্র সব সময়েই ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ১৯৬৬ সালে চেয়ারম্যান মাও চীনের চুং

ছিং পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির কথা বলতে গেলে তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, সে দেশের জনসাধারণের সংগে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা যুদ্ধ স্বপ্নের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত মোহ পোষণ করা চলবে না। সুতরাং চীন মার্কিন সম্পর্কটা নিতান্তই কূটনৈতিক সম্পর্ক। লেনিন জাতিগত বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। চীন ও আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বরাজনীতিতে উদ্ভেলনার প্রদর্শন করবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশদকে কমিয়ে আনবে।

আজকে বিশ্বশান্তির পক্ষে প্রকৃত বিপদ কে? সেই বিপদ হচ্ছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। প্রধানত রাশিয়া দ্বারা গত কয়েক বছরে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অস্ত্রধাত হস্তপেক ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার দুবচেককে দখলে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়, নয়াভারতের ১৯৭১ সালে ইন্দ্রিয়াকে ঘিরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে, ১৯৭২ সালে কিউবাকে ঘিরে এ্যাঙ্গোলায় হস্তক্ষেপ করেছে, ১৯৭৬ সালে ভেইয়িটে এবং ১৯৭৭ সালে সোমালিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ চালিয়েছে, আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে এবং সম্প্রতি ভিয়েতনামকে ঘিরে কম্পুচিয়া দখল করেছে। সে এসব কিছু করছে বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এইভাবে রাশিয়া একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ হয়ে উঠেছে।

গত এক দশকে মার্কিনীদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র থাবাটা ক্রমশই বাড়িয়ে তুলেছে রুশ ভাস্কররা। কয়েক বছর আগে হুদানে রুশ প্রভাবিত সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ইথিওপিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান রুশ নয়াভারতের হিংস্র থেকে হিংস্রতরুপটি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে এবং তার সঙ্গে প্রমাণ করে দিয়েছে মাওয়ের বক্তব্যের সঠিকতা, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দ্রিয়ার তার প্রমিত-রুশক মধ্যবিত্তের ওপর যে স্বার্থকে বজায় রাখতে চায়, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় তার প্রত্যেক সম্প্রসারিত করতে।"

যে রুশ প্রেমিকরা চিলিতে

মার্কিন মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আলেন্দে সরকারের পতন ঘটানোর জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা আজ কি বলবেন? বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" বলতে যাদের প্রচণ্ড আপত্তি তারা কিভাবে কাবুলের সাম্প্রতিক রুশ মদতপুষ্ট অভ্যুত্থানকে ব্যাখ্যা করবেন? মার্কিন অস্ত্র দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন মদতপুষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের বর্তমান মডেলটিকে তারা সামাজিক বিপ্লবের এক নতুন তাত্ত্বিক তথ্য ব্যবহারিক ভিত্তি হিসাবে অভিনন্দন জানিয়ে অস্ত্র দেশে বিপ্লব রপ্তানির নয়াউচ্ছ্বাসবাদী অবস্থান গ্রহণ করবেন?

গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সাইনবোর্ড লাগালেই আন্তর্জাতিকভাবে সেটা রাজতন্ত্রের তুলনায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও প্রগতিশীল হয়না। রাজতন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশী কুৎসিত ও স্বল্প শৈবতন্ত্র তো ইতিহাসই প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয় সমাজতন্ত্রের মার্কিনারা হিটলারের জার্মানীতে বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র মার্কিনারা ইন্দ্রিয়ার শালনাধীন ভারতবর্ষে।

কয়েক দশক আগে জাভান এই আফগানিস্তানেরই রাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অনেক গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়েও অধিকতর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানের জন্য। অতি সম্প্রতি কম্পুচিয়ায় সিহানুকের রাজতন্ত্রের উজ্জল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষিকার কথা সবারই বেশ মনে আছে। তাহলে মূল কথাটি হচ্ছে আজকের ইন্দ্রিয়ায় যং বেরংয়ের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্ন এবং সে বিচারে আজও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল কৃষিকা গ্রহণ করতে পারে। কাজেই আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের অবস্থান হয়েছে এই ভাবে আনন্দে আত্মহারা হওয়াটা আর যাই হোক সমাজ-চেতনা বা ইতিহাস চেতনার পরিচয় বহন করে না।

সর্বশেষে লেখক লেনিনের উদ্ধৃতি সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে রাশিয়ার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খবরদারিটা মহান সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান রাশিয়া কি লেনিন নির্দেশিত সর্বহারা প্রাচীর নিয়ন্ত্রণাধীন সামাজিক রাষ্ট্র অথবা আফগানিস্তানে কি প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পুঁজিবাদ বিরোধী কোন সত্যিকারের গণবিপ্লব হয়েছে? সুতরাং লেনিনের রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াটা লেখকের পক্ষে যৌথত্ব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

শঙ্করনাথ সেনগুপ্ত

ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতাল

সম্পর্কে বহু অভিযোগ

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে বর্গীর রাজস্ব চলছে। দরিদ্র রুগীদের অসহায়তার স্বার্থে নিয়ে এই হাসপাতালেরই কতিপয় অসামান্য চিকিৎসক অকৃত্যভাবে চাপ দিয়ে রুগীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হাসপাতালের সার্জন স্থপার ডঃ রণবীর তালুকদারের বিরুদ্ধেই অভিযোগের মাজাটা বেশি। এলাকার সর্বশ্রেণীর মানুষ একবাক্যে এই সাংবাদিকের কাছে অভিযোগ করে বলেন যে, ডঃ তালুকদার এমনই অর্থপিশাচ যে, টাকা না নিয়ে কোন রুগীকেই তিনি পরীক্ষা করেননা। এমন কি মরণাপন্ন রুগীকেও তিনি দেখতে চাননা। অভিযোগে প্রকাশ এই হাসপাতালের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে একটি নার্সিং হোম খুলছেন। আর প্রদান উত্তোক্তা হচ্ছেন ডঃ তালুকদার। সঙ্গে আছেন ডঃ এ বি মেটিয়া, ডঃ এম কে ব্যানার্জী প্রমুখ চিকিৎসকগণ।

গত গনিবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের জনৈক বিধানসভা সদস্য এই হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এর প্রতিকার করার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে ডায়মণ্ডহারবার নাগরিক সমিতির পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি 'খোলা চিঠি' দেওয়া হয়। বিধানসভার লবিতে দাঁড়িয়ে ডায়মণ্ডহারবারের জনাকয়ক দারিদ্রশীল মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম যে, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালটি পরিণত হয়েছে দুর্নীতির পীঠস্থানে।

বিকেল চারটে নাগাদ পৌছে দেখি বিশাল হাসপাতাল ভবনটি খা খা করছে। প্রধান প্রবেশদ্বারে কেউ নেই। এগিয়ে গেলাম ইমার্জেন্সীর দিকে। দেখলাম কর্তব্যরত চিকিৎসক বসে গল্পের বই পড়ছেন। বাইরে বায়ান্দায় কয়েকজন মহিলা রুগী অপেক্ষা করছেন, এই জ্ঞাত যে, ডাক্তারবাবু কখন তাদের কথা শুনবেন। ইমার্জেন্সীতে লটকানো বিজ্ঞপ্তি থেকে বুঝতে পারলাম যে, হাসপাতালে রুগী ভর্তি বন্ধ আছে। গত এই মার্চ জনৈক রুগীর টিটেনাস হওয়ার পর থেকে রুগী ভর্তি বন্ধ। কাছাকাছি কয়েকজনের চীৎকার

শুনে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে কর্তব্যরত চিকিৎসককে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। শুলাম এখানে ক্রমের মধ্যে চলছে রাজার মহড়া। হাসপাতালের মধ্যে রাজার মহড়া? একথা ভাবাই যায়না। বিশেষ করে যে হাসপাতালে রুগী ভর্তি আছে। ইনডোরের ওয়ার্ডগুলির অবস্থা দেখবার জন্য ভিতরে পা বাড়লাম। বাধা দেবার কেউ নেই। যদিও নিয়ম আছে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বাইরের কেউ হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারবেন না। ইনডোর ওয়ার্ডগুলি ঘুরে দেখে বুঝলাম যে, টিটেনাস হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। বায়ান্দায় যে হারে ময়লা জমে রয়েছে এবং ওয়ার্ডের মধ্যে কুতুর ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। রক্ত-পুঁজ মাথা তুলো এবং ব্যাণ্ডেজ ওয়ার্ডের স্ততরে এবং ইতস্তত ছড়ানো।

কথা হচ্ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশংকর মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি সোচ্চার হয়ে বললেন এটা হাসপাতাল না মরক বোঝার উপায় নেই। টাকা না থাকলে চিকিৎসা হবেনা। স্থানীয় জেনিনমগরের এক সি পি এম সুবকের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম ডঃ রণবীর তালুকদারের সম্পর্কে সেও দূর। ইন্দিরা কংগ্রেসের মহকুমা সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম এই হাসপাতাল সম্পর্কে তাদেরও ধারণা ভাল নয়। তার মতে অবিলম্বে এই হাসপাতাল সম্পর্কে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। নিজেই তাঁরা নাকি এই হাসপাতালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবেন এবং গণস্বাক্ষর অভিযান আরম্ভ করবেন। পরে সেই গণস্বাক্ষর সমন্বিত অভিযোগপত্রটি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে তদন্তের দাবী করে।

এই হাসপাতালের ওয়ার্ড স্ট্রাস্ট্রী গুরুপদ রায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ অনেক। শোনা যায় তিনি নাকি এই হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতির হোতা। তাঁর উপর তদন্ত কর্তৃপক্ষ সব জেমেও কিছু বলতে পারেন না, কারণ দুর্নীতি তারাও করেন। এই ওয়ার্ড স্ট্রাস্ট্রী দীর্ঘ নয় বৎসর এই হাসপাতালে রয়েছেন। বদলীর আদেশ নানান কায়দায় রদ করিয়ে আসছেন। এই হাসপাতালের এক্সরে বিভাগেও চলছে দুর্নীতি।

অকরী এক্সরে করার প্রয়োজন হলে দিন পড়বে মাস তিনেক বাদে। টাকা দিলে তখনই এক্সরে হবে। এক্সরে অপারেটর শ্রীমানন্দ কাউরি এইভাবে অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন বলে হাসপাতালেরই জনৈক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জানান। ঐযথ চুরি তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পরমা না দিলে ড্রেসিং হয় না। হাসপাতালের ইনডোর রুগীদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাও খুব নিকটমানের। শোনা যায় এই হাসপাতালের খাদ্য সরবরাহকারী শ্রীবিজলী হালদারের সঙ্গে হাসপাতালের এস ডি এম ও ডঃ এম কে ব্যানার্জীর অন্তত আঁতাত আছে।

প্যাথলজি বিভাগ সম্পর্কেও অভিযোগের অন্ত নেই। এখানকার জনশ্রুতি হল এই হাসপাতালের প্যাথলজিস্ট শ্রীবিলাই হালদার বাইরের চিকিৎসকদের কাজ এখানে করেন।

হাসপাতালের কর্মী নয় এমন জনা দশেক লোক রুগীদের বরাদ্দ খাদ্য খেয়ে দিবি হাসপাতাল চষেরে রয়েছেন। জানা গেছে যে, রুগীদের ধান ইত্যাদি তোলার জন্য যেসব জি ডি এ রয়েছে তারা স্থানীয় লোক তাই তারা বাইরের কয়েকজনকে এনে সেই কাজ করছে কিছু অর্থের বিনিময়ে এবং রুগীদের খাদ্য থেকে তাদের খেতেও দেওয়া হয়। এই সমস্ত ঘটনাই ডঃ ব্যানার্জীর জানা। শোনা যায় এসব ঘটনার নাটের গুরুত্বাকি এস ডি এম ও ডঃ ব্যানার্জীর পি এ শ্রীব্রতাবন পাল।

হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অনেকেই নাকি রাজ্যে কল-বুক গেলেও রুগীকে দেখতে আসেন না। এর মধ্যে ডঃ রণবীর তালুকদার এবং ডঃ এ বি মেটিয়ার নামই উল্লেখযোগ্য। অপারেশন হবে যে রুগীর তার আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার নাম করে টাকা নেয়া হয়। কিন্তু তার জ্ঞাত কোন রসিদ দেয়া হয়না। বলা বাহুল্য যে, সেই টাকা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পকেটস্থ হয়। বিগত দুই বছরের মধ্যে এই হাসপাতালে যে সব ছোট বড় অপারেশন হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে গোপনে খবর নিলেই সব তথ্য ফাস হয়ে যাবে।

ট্রান্সকার হয়ে, যাওয়া কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবত সরকারী আবাসের দখল ছাড়ছেননা অথচ ইমার্জেন্সী স্ট্রাকচার অনেকেই কোয়ার্টার্স পাননি। স্বামী-স্ত্রী যদি উভয়েই সরকারী কর্মচারী হন এবং একজন যদি শেখাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

কিসের আভাস ?

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

তেলের দাম আর সোনার দাম এখন আকাশচুম্বী। অর্থনীতিবিদরা এই ব্যাপারে একমত যে এই দাম বাড়ার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি চরম সংকটে পড়েছে। কিন্তু প্রতিকার কি কেউ বলতে পারেন না।

বিশ্বের তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলি তাদের অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়িয়েছে ১৯৭০ সালের তুন্দর প্রায় দশগুণ। ১৯৭০ সালে এক ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ৩.৫ ডলার, এখন ৩৫ ডলার। কিন্তু রটারডামের আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে দাম কখনো কখনো ৫০ ডলারও হয়েছে।

তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলির মূল্যবৃদ্ধির যুক্তি : তেলের আন্তর্জাতিক দাম ডলারের অঙ্কে ধার্য হয়। ডলারের দাম কমছে অর্থাৎ ডলার দিয়ে অনেক কম অর্থ জিনিসপত্র কেনা যাচ্ছে। এর উপর আমেরিকার মূল্যস্ফীতির হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। স্বতরাং তেল রপ্তানীর উপর একান্ত

আর্থনীতি

নির্ভরশীল এই দেশগুলির আয় কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমেরিকার অর্থনৈতিক সংকটের চাপে তারা ভুগছে। স্বতরাং ডলারের অঙ্কে তেলের দাম বাড়িয়ে নিজেদের আয় রক্ষা করতে চাইছে।

মার্কিন মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট এভাবে দকল দেশেই সংকট সৃষ্টি করছে কারণ ধনবাহী হুনিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব চাইতে বড় বিক্রেতা ও খরিদকার। এর উপর মার্কিন ডলার আন্তর্জাতিক হিসাব মেটানোর উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন দেশের মজুত বৈদেশিক মূল্য তহবিল সংরক্ষণের রিজার্ভ মূল্য বদলে খীকৃত।

১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্টের আগে যে কোন দেশ তার রিজার্ভ তহবিলে মজুত ডলার ভাঙিয়ে আমেরিকার কাছ থেকে সোনা নিতে পারতো। আন্তর্জাতিক মূল্যবাবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ডলারের এই মূল্য ভূমিকা ১৯৪৪ সাল থেকে ব্রেটনউডস সম্মেলনে ধার্য করা হয়। কিন্তু মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতির ফলে ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমেতে শুরু হয়। তখন সব ধনতান্ত্রিক দেশই নিজেদের মজুত ডলার ভাঙিয়ে আমেরিকার কাছ থেকে সোনা আদায় করতে থাকে। ফলে আমেরিকার মজুত

সোনার পরিমাণ বিশ্বের সব চাইতে বেশী হলেও আমেরিকার পক্ষে দায় মেটানো মুশকিল হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি নিক্সন একতরফা ভাবে ব্রেটনউডস চুক্তি বাতিল করে ডলার ভাঙিয়ে সোনা দিতে অস্বীকার করেন।

এরপর থেকে বিভিন্ন ধনবাদী দেশের মধ্যে বাণিজ্যমূল্য মূল্যবৃদ্ধির আকার ধারণ করে। ব্রেটনউডস সম্মেলনে সোনার সরকারী আন্তর্জাতিক দাম আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার ধার্য হয়েছিল। চাহিদার চাপে ১৯৬৮ সালে এই দাম সংশোধন করে ৪২.৮০ ডলার করা হয়, কিন্তু ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক সোনার বাজারে আউন্স প্রতি দূর ৫৫.৮০ ডলার। এরপর কিছু কমে প্রায় ৭১২ ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

সোনার এই অস্বতপূর্ব, অবিদ্যমান হারে মূল্যবৃদ্ধি কিসের ইঙ্গিত? এই ঘটনা ধনবাদী বিশ্বের, গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থার পতন সূচনা করছে। কোন ধনবাদী দেশের মূল্যমূল্য আঙ্গ স্থায়্য নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আর্থিক মূল্য বাড়ছে কিন্তু বিভিন্ন দেশের আর্থনীতিক পরিস্থিতির হার কমছে। অদূরতবিস্তারে এমন এক পরিস্থিতি দেখা দেবে যখন ক্রমবর্ধমান বেকারী, মূল্যস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি সংকট সকল দেশেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করবে।

১৯৬০-এর দশকে, এমন কি ১৯৭০-এর দশকেও কেউ ভাবতে পারতেন না যে বিশ্বের দশম বৃহত্তম কর্পোরেশন এবং আমেরিকার ৩য় বৃহত্তম যোটর নির্মাতা ক্রাইসলার কর্পোরেশনকে রুয় শিল্পের পর্দায় নাম লেখাতে হবে এবং সরকারী তহবিল, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মোটরগাড়ীর এক্সেটরের দয়া ভিত্তি করতে হবে? লকহীড, পেনসেনট্রাল বেলগোড, এমন কি আমেরিকার বৃহত্তম নগরী নিউইয়র্ক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে সরকারী ভরতুকির সাহায্যে দিনগুজরান করতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার দিন আগেই গেছে। এখন একচেটে মালিকদেরই দিন চলে যাচ্ছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের সেরা শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির হার শূন্যেরও নীচে নেমে যাবে শেখাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব

অজুন দাস

দর্শনচর্চায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে। তাই আজ এই বিষয়টি পুরোপুরিই পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ। এর কারণ কি তা গভীরভাবে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। পাকিস্তানী আমলে নানা কারণে এখানকার শিক্ষাক্ষেত্রেও দৌধিনতা নেমে আসে এবং তা ধীরে মননচর্চা থেকে শুরু করে একেবারে পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। যে কারণে এতদিন পরেও বাংলাদেশের কোন জাতীয় পোশাক নেই। পাকিস্তানী আমলেও যা ছিলো, তাকে জাতীয় পোশাক না বলাই ভালো। সেটি বিজাতীয় পোশাকই। শুধু জাতীয় জীবনে স্বীকৃতি লাভ করেছিলো মাত্র। শেখ মুজিব তবু এক্ষেত্রে ধানিকট্টা এগিয়ে গিয়েছিলেন। যে কারণে পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবী ও হাতকাটা কালো কোটকে অনেকে জাতীয় পোশাকের মতোই ব্যবহার করতেন। আজ তাও নেই। এই তো সেদিনের কথা। বিশিষ্ট সাংবাদিক, সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক বার্তা'র সম্পাদক জনাব কামলে লোহানী শুধু স্বাটের অভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপতি সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। স্বাট তাঁর নেই, কারণ তিনি সব সময়

পাঞ্জাবী ও পাঞ্জাবী পরেন। অথচ বাংলাদেশ সরকার স্বাটকে জাতীয় পোশাক বলেও ঘোষণা করেননি। এটি আসলে অরাজকতারই নামান্তর। যেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে কোন প্রকার মননসম্মত ধ্যান ধারণা বিকাশের অবকাশ নেই, সেখানে দর্শন, মনো-বিজ্ঞান জাতীয় তথাকথিত কাকা শিক্ষা যে হবে না তা বলাই বাহুল্য। তবু এই অরাজকতার নিচ্ছিন্ন অঙ্কুরে একটা নিষ্কণ দীপশিখার মতো বাংলাদেশের দর্শনের ক্ষেত্রে ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব আলো বিকিরণ করে চলেছেন। তাঁর এই আলোক-শিখা শুধু যে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশই আলোকিত করছে তা নয়, বরং তার সীমাহীন জ্যোতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পর্যন্ত বিকীরিত হচ্ছে। একমাত্র এই একটি নামের জন্তে এত শৃঙ্খলার তেতরও বাংলাদেশের নাম বিশ্বের অনেকেই জানেন। তিনি একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধারণা যে শিক্ষা মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত নয়, সে শিক্ষা অর্থহীন। যে কারণে তিনি ডুইংকস বিলাসী শিক্ষিতদের কঠোর ব্যঙ্গ ও বিদ্রোহ করতেন। তাঁর চলা-

ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতাল

৫ম পৃষ্ঠার পর

সরকারী কোয়ার্টার পান তাহলে অপর জন বাড়ি ভাড়া ভাতা পাবেন না। এটাই সরকারী নিয়ম। অথচ এই হাসপাতালেই এমন উদাহরণ রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী এই হাসপাতালের কর্মী। একজন কোয়ার্টার পেয়েছেন এবং অপরজন বাড়ি ভাড়া ভাতা নিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধাবত। শোনা যায় এই হাসপাতালেরই কর্মী ধনা মানি এবং স্বহৃদয় মেন ডঃ রণবীর তালুকদারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেন। তাদের কাজ রুগী ধরে নিয়ে আসা। যে টাকা ডাঃ তালুকদার পান তার একটা অংশ এদের পকেটে যায়।

দেখ হর। অনেক সময় কাগজে কলমেই ঔষধ আসে। আসলে তা আসেই না। বিলের টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যায়।

৮০ বিঘে জমির ওপর নির্মিত এই হাসপাতালটিকে অনায়াসেই প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে রূপান্তরিত করা চলে। এখানে নির্দিষ্ট শয্যা সংখ্যা ১২৫টি হলেও অ্যাডমিশন রেজিস্টার অল্পস্বামী রুগী ভর্তি থাকেন দুশো থেকে আড়াইশো। দৈনিক আউটডোরে আসেন প্রায় ৮০০ রুগী। পেয়িং বেডের সংখ্যা ৭৫টি এবং ফ্রি বেড ৭৫টি। তার মধ্যে কেবিন চারটি। কেবিনের ভাড়া দৈনিক ৮ টাকা এবং সাধারণ বেডের ভাড়া তিন টাকা। এসব নিয়েও নাকি প্রচণ্ড দুর্নীতি। এলাকার মানুষের দাবী অবিলম্বে এই হাসপাতাল সম্পর্কে তদন্ত করা হোক। আরও বহু অজানা তথ্য হয়ত বেরিয়ে আসবে সেই তদন্তের ফলে।

ফেরায় একটা সারল্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। 'প্রেইন লিভিং হাই থিংসিং বলে যে প্রবাহ চালু রয়েছে তা ডঃ গোবিন্দ দেব সম্পর্কে বহুলাংশে সত্য। একারণে অনেকে তাঁর চিন্তাধারাকে 'সক্রেটিস'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। যত অসঙ্গত হোক না কেন অনেকে তাঁকে 'বাঙলাদেশের সক্রেটিস' রূপেও অভিহিত করেছেন।

ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব সিলেটের অধিবাসী। যদিও তিনি সিলেটের অধিবাসী তবু তাঁর জীবনের প্রথম দিকটা কেটেছে কলকাতায়। তিনি কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে লেখাপড়া করেছেন। এখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে "আইডিয়ালিজম এণ্ড প্রোগ্রেস" শীর্ষক থিসিসের জন্তে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় দিনাজপুর থেকে। তাঁরই প্রচেষ্টায় দিনাজপুর স্বরেশনাথ কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধাবৎ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ছিলেন। সেখান থেকে ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালে উক্ত বিভাগের প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে তিনি জগন্নাথ হস ও ঢাকা হলের প্রভোস্ট হিসেবেও কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রভোস্ট হিসেবে তিনি যেমন বিশেষ জন-প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, বিভাগীয় প্রধান হিসেবেও তিনি তেমনি যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদার। অতএব তিনি তাঁর উপার্জিত টাকার একটা বিরাট অংশ জনসেবার ব্যয় করতেন। শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি তাঁর অকৃতদার অনুরাগ ছিলো। তিনি পাকিস্তান দর্শন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বহুদিন কাজ করেছেন। এই ক্ষেত্রেও তাঁর সক্ষমতা অবিচলিত। শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। আমেরিকার এক বছরকাজ (১৯৬৩) অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দর্শনের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন। এসব বক্তৃতা বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুধু তাই নয়, তাঁর এই জনপ্রিয়তার বড় প্রমাণ হলো আমেরিকার উইলকিনসবেরীতে "দেব কিলোজিক্যাল

ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা। তাঁর এই স্বীকৃতি ও সম্মান গোটা বাংলাদেশী জাতির গৌরবের কথা। ১৯৭০ সালে এই ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে তাঁকে আবাবো আরশ্বণ জানানো হয়। আমরশ্বণ পড়ে লেখা ছিলো, "ইওর ডিমানাইপ্লস ইনভাইট ইউ, কাম এণ্ড স্পিক।" ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন দেশে গমন করেন এবং ফিরে আসেন ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী হানাদকার বাহিনী সমগ্র বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে তারই নির্মম শিকারে পরিণত হন প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব।

ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব সারাজীবন জ্ঞান সাধনা করে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌছিয়ে দিতে

বিশেষ প্রতিনিধি

দ্বিতীতে এখন তারি ভিড়। কমতা পাওয়ার জন্তে, পদোন্নতি ঘটানোর জন্তে। লোজা কথার যেমন ভাবে হোক আখের গোছানোর জন্তে রাজনীতির লোক থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্মচারী যে ধার মত নেমে পড়েছেন। চেষ্টা চালাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের মত বিচক্ষণভাবে এগুচ্ছেন নানান কারদাকাহন করে, ধরে পড়ে। এরকম সময়ে সবে কংগ্রেস (ই) দলে আসা একদা কংগ্রেস (স) এবং এখনকার কংগ্রেস (আ) দলের প্রাক্তন হোমরা চোমরা সদায় স্বরণ সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতে চলেছেন। এক সময় ইন্দিরাসেনী পরে তীব্র বিরোধী হবার পর এখন ইন্দিরা তরীতে ভিড়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যত গড়তে উঠে পড়ে লেগে পড়েছেন। ইন্দিরারও তাঁকে এখন দরকার। তাই তিনি ননী পালকিওয়ালার জায়গায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমেরিকা যাত্রার প্রস্তাব পাওয়ারাজ রাজী হয়ে গিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সদায়জী ভারত ও আমেরিকার জটিল সম্পর্কের সমস্যাগুলিকে সমাধানের মুখ দেখাতে পারবেন এমন আশা বার্তা করেন তাঁরা মনে করেন, তিনি আগে পর-রাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার সময়কার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে বেশ কাজে লাগাতে পারবেন। আর তাঁর সম্পর্কে একথাটি বেশ চালু আছে যে, তিনি কথা তেমন না বলেও ঘন্টার পর ঘন্টা বেশ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন। এটা তো কম কথা নয়।

এদিকে পররাষ্ট্র দপ্তরের যৌচাকে

না পারলে জ্ঞান শুধু অপূর্ণ নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সে কারণে তিনি দর্শনের ব্যাখ্যাকে অহেতুক জটিল করার পক্ষপাতি নন। তিনি তার দর্শনকে "আলুদর্শন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলু যেমন সব রকম তরকারীতেই খাটে, তেমনি তাঁর দর্শনও জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো দর্শনের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো হলো "আইডিয়ালিজম এণ্ড প্রোগ্রেস", "আইডিয়ালিজম—এ নিউ ডিফেন্স এণ্ড এ নিউ এপ্লিকেশন", "দি এ্যাসপিরেশন অব দিকশন ম্যান", "দি ফিলসফি অব বিবেকানন্দ" 'বুদ্ধ দি হিউম্যানিট' 'আমার জীবন দর্শন', 'তত্ত্ববিদ্যায় ইত্যাদি। 'আর্ট অব স্পিকিং' বলে যে কথা চালু আছে, সে কথা ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব সম্পর্কে বহুলাংশে প্রযোজ্য। তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ছিলো অসীম—যেন রসে ভরপুর।

আখের গোছানোর তদ্বির

বেশ জোর রকম গুণন উঠেছে যে লওনে বুটিং হাইকমিশনার হয়ে অধ্যাপক মৃণাল গোরের পর কে যাচ্ছেন তাই নিয়ে। একদল একটা নামই বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। অবশ্য যদি শির দপ্তরের সচিব হিসেবে এর মধ্যে নামটি বোঝিত না হয়। ইনি হলেন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডাই-রেক্টর মহম্মদ ফরজল। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা ও মধ্যপ্রাচ্যে স্থানায়ের জন্তে ওর পবিত্রতের মত অবদান আছে এবং ঐক্যমিত্র দেশগুলি সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে তাঁর খ্যাতি যেমন ছড়িয়েছিল তেমনি দেশাই সরকারের আমলে তাঁকে দুর্নীতির অভিযোগে ছুটিতে যেতে হয়েছিল। পরে চরণ সিং এর তদারকি মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী বহুগুণার প্রসাদ পান। বাই হোক, তিনি উপযুক্ত একজন বলেই বিলেতে ভারতের হাইকমিশনার হবার সম্ভাবনায় রয়েছেন একথা বলার মত গুরুত্বপূর্ণ লোকও আছেন। যেমন আছেন প্রাক্তন বিশেষ সচিব জগত মেহতার গুণাবলী নিয়ে বদবার মত মাহুয। যিনি মাস ছয়েক আগে চরণ সিং এর আমলে ওই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। এখন তিনি ইরান আফগানিস্থান সম্পর্কে পশ্চিম আফ্রিকা সফরে ভারতের মনোভাব বুঝিয়ে বলার জন্ত গিয়েছেন। ফিরে এসে তিনি মনে হয় পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রদূত হয়ে বন-এ যাবার অপেক্ষায় থাকবেন।

ইন্দিরা কংগ্রেসের খাবায় উত্তরপ্রদেশ

রমাপ্রসাদ মল্লিক

গভর্ণরের কোনো স্থাপত্য বিনাই ১৮ই ফেব্রুয়ারী সকালে খবর চাউর হল, উত্তর ভারতের চাবিকাঠি-রাজ্য উত্তরপ্রদেশে সংবিধানে দেওয়া ৩৫৬ ধারার অবাক প্রয়োগ করা হয়েছে; প্রেসিডেন্টের শাসন চাপানো হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের স্বৈচ্ছিক (রাজনৈতিক) সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হিসেবে। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি—দার-উল-শাফা-স্থিত এম এল এদের সামূহিক হুমুস হয়েছিল বাস্তব। অর্থাৎ, রাজ্য বিধানসভার আয়তন পূর্ণ হবার বহু পূর্বেই তা ভঙ্গ করান হল। এবার পুনঃনির্বাচনের পালা।

প্রাক্তন রাজ্যপাল, গভর্ণর তাপাসে-জীকে উত্তরপ্রদেশ ছাড়তে হল কেবল এজ্ঞা নয় যে, তিনি কেন্দ্রের অভ্যর্থনা অস্থায়ী রিপোর্ট দাখিল করেন নি; জানাননি, রাজ্যে সংবিধানসম্মত পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে। অবশ্য না জানালেই বা কি আসে যায়! নয়া দিল্লীর নতুন মুড় নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন নতুন বাহানা খুঁজে বের করা, এবং রাজ্য প্রশাসনকে কেন্দ্র মার্কী অস্থান শেখানো এখন ক্ষমতা রাজনীতির নবীনতম ঔষধ। গৃহমন্ত্রী জৈল সিং তাই মনে করেন—রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার গোলায় যায় যাক। সংবিধানে নিহিত সজীব রাজনৈতিক নীতি (Principle of federal polity) বানচাল করতেও কেন্দ্রের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। হালে গুল-বর্গা থেকে নির্বাচিত সি এম টিকেন সাহেব একেবারে মধ্যস্থিত মুঘল-সম্রাটের কায়দার রাজ্য সরকার মণ্ডলি কংগ্রেস (ই) দলের কুণ্ঠিত নয় তাদেরকে ভরসার ভাবায় সাবধান করে দিয়েছেন যদি তারা কেন্দ্রের আইনগত নির্দেশনা মানতে বিধা করে তা “বিদ্রোহ” বলে ধরা হবে; মনে করা হবে, সংবিধান উল্লঙ্ঘিত হয়েছে—অন্ততঃ কেন্দ্রের ভাষা অস্থায়ী প্রকৃতপক্ষে হক বা না। স্বাধীন হবার পূর্বে (সকাল বিভাগ একে দেওয়া হয়েছে) ইনি পেশাদার উকিল হিসেবে বহু আইনের প্যাচ-খেলায় বোধকরি নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলেন; তাই এর চোখে আইনের ডাঙাটি খুব আকর্ষণীয় ঠেকেবে, আশ্চর্য কি! তবে কি না তিনি বোধহয় ভুলে গেছেন, ভারতের মত বিরাট, বিশাল জনসম্পদ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন পরম্পরায় অধিকারী মহাদেশে উত্তর প্রদেশসম প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যই এক একটি দেশের মতন স্বকীয় জাতীয়তার

দাবীদার; সে কারণে তাদের আপনাপন অঞ্চলে জনগণের প্রয়োজন ও রাজনৈতিক ইচ্ছাধারী স্থাপিত সরকার উপেক্ষার বস্তু নয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বনারসী দাসজী পূর্বাঙ্কেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর নগদ বিদায় (কেন্দ্রের স্ববরজ্ঞীয় ফলে) আসা। তাই রসমঞ্চ থেকে সরে যেতে বাধ্য হবার পূর্বে তিনি দুটি সংশোধনমূলক কাজ করে গেছিলেন: (১) ত্রিভাষা-স্বামী ভাষা-শিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত সংস্কৃতকে পুনর্বীর আপন স্থান প্রতিষ্ঠিত করা; অর্থাৎ, নির্বাচনের কিছুদিন আগে সংস্কৃতকে অহেতুক হটিয়ে উড়ুকে তার কার্যগার রাগার মত তুলে শুধরে নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, যার ফলে প্রাচীন ঐতিহ্যপ্রেমীরা (তারা সকলেই কিছু আর সাম্প্রদায়িক নয়!) বিরক্তি দূর হবে। (২) শিউলুড কাঠ এবং টাইব (অস্থায়ীত জাতি এবং জন জাতিভুক্ত) প্রার্থীদের চান্দ সরকারী চাকরীক্ষেত্রে তথা শিগ-প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে নির্দিষ্ট আরক্ষণের যে নীতি প্রথম জনতা-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামনরেশ বাহবের আমল থেকে অমূল্য হয়ে আসছিল, তা মূলতঃ উঠিয়ে নেওয়া (১৪-১৫ ফেব্রু: তারিখে গৃহীত প্রাক্তন ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অস্থায়ী)। রাজ্যপাল তাপাসে মহাশয় চড়িছড়ি এই সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করলেন, অর্থাৎ পুরোনো আরক্ষণ-নীতিকে স্থিতিবাহ্য প্রত্যাবর্তন করালেন প্রেসিডেন্টের শাসন রাজ্যে চাপানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সম্ভবতঃ তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল, কেন্দ্রের বিরাগ-ভাজন হবার মত সাম্প্রতিক কৃত-কর্মের ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করা। কিন্তু এটা যে নিতান্ত প্রমাদপূর্ণ পদক্ষেপ (faux pas) হয়েছে তা বোঝা গেল পুরোনো আরক্ষণনীতির পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ায়, ও তা উত্তর প্রদেশের কার্যগার “উচ্চ” জাতিভুক্ত অথচ সমাজ-অর্থনীতিগত কারণে দুর্বল শ্রেণীভুক্ত যুবকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের—বিশেষতঃ, পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো শহরে বাস-জালানো ও পুলিশের সঙ্গে যুগ্মমুখি সংঘর্ষের মত তথাকথিত হিংসার পথ নেয়। এত প্রয়াস শেষেও কিন্তু প্রাক্তন রাজ্যপাল কেন্দ্রের রাজনৈতিক স্বার্থ-রূপী চিহ্নে ভেজাতে পারেন নি। তাঁকে যেতে হয়েছে। ইমার্জেন্সীর পুরনো বাস্তব নতুন রূপে কেন্দ্র ফিরিয়ে আনছে। কেন্দ্রীয় কার্খ-

পালিকার মুঠোর উঃ প্রঃ রাজ্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রী কাঠামোটা এবং শীর্ষস্থানীয় আমলাবর্গকে ধরে রাখাই হল উদ্দেশ্য।

কারেমী স্বার্থ; আইন ও শৃঙ্খলা; নির্বাচন

বানারসী দাস মন্ত্রিমণ্ডলীকে সরানর পেছনে যে শাসকদলীয় স্বার্থ কাজ করছে, তা প্রধান-মন্ত্রী মহাশয় বহু ধানাই-পানাই করেও ঢাকতে পারেন নি। নারায়ণ-পুরের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর পরম্পর বিরোধী উক্তি এমনিতেই স্পষ্ট—কর্ম-চাহীদের, বিশেষতঃ পুলিশ ও তাদের অফিসারবর্গের মনোবল ভেঙে পড়তে দেওয়া হবে না অথচ রাজ্য মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা আরম্ভ করা শান্তি-প্রদায়ী ব্যবস্থা অপেক্ষা আরও ব্যাপক হারে শান্তির বন্দোবস্ত করা চাই। হুঃ না নারীর সন্তান ও স্বরক্ষাই নাকি তাঁর একমাত্র অস্তিত্ব ছিল, রাজনৈতিক স্থিতিবাদ নয়, অথচ দাস-ক্যাবিনেট হটানো, অস্থিবিধানক রাজ্যপালকে সরিয়ে স্থিতিজনক ব্যক্তিকে সে পদে বসানো এবং কেন্দ্রের একান্ত বশব্দ বৃহৎ-অফিসার-কুল থেকে বেছে বেছে উত্তর প্রদেশের প্রশাসনীয় সিঁড়ি উপরে কার্খ-পালিকার শীর্ষে (Summit executive) রাখা হল নবনিযুক্ত রাজ্যপালকে ‘পরামর্শ’ দিতে, কাজ সামলাতে। বস্তুতঃ যা নতুন দিল্লী প্রাণপণে ঢাকবার চেষ্টা করছে, যদিও ঢাকা যাচ্ছে না, তা হল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আমলাবর্গের সিঁড়ি-ধাপে-ধাপে লাগানো যে কারেমী স্বার্থচক্র পরম্পরের মাঝে মিলে মিশে ক্ষমতার খেলায় শাসকী রাজনীতিকদের সঙ্গে শরিক হয়েছে, তারা লোকদল-মার্কী, কিন্তু আসলে আদি-কংগ্রেসের পরম্পরাবাহী; তাদের প্রাদেশিক চৌহদ্দীতে সীমিত উপদলীয় স্বার্থ, প্রাক্তন সামন্তীদের রূপান্তরিত উপশ্রেণীস্বার্থ। ঐ স্বার্থ উঠতি সম্পদ মালিক-কৃষক, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-কেন্দ্রের শেঠ সাহকার, এবং ছোট থেকে মাঝারি শিল্পের (যদিও তিনি মিল, তেল-কল ইত্যাদি) মালিকদের শ্রেণীস্বার্থ। সুতরাং কংগ্রেস (ই) দলের ছাত্তার নিচে সমবেত উঠতি বিত্ত-শিল্পপতিদের (যদিও ইন্ডিয়ানিং বস্ত্র, অ্যান্টিমনিয়ম, সিমেন্ট, বিদ্যে-মহ-ভৈরব কারখানা, ওয়ুথ, রাসায়নিক জ্বা, ইত্যাদি যুনিটের মালিক-বৃন্দ) কারেমী স্বার্থের সঙ্গে তা টকুর খাবে, আশ্চর্য কি! আপাততঃ

পর্যোক্ত স্বার্থজোট বিজয়ী হয়েছে। নতুন গভর্ণর ভারী নেবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন ঘটনা-পরম্পরায় সম্মুখীন তাঁকে হতে হল, অর্থাৎ কেন্দ্রজালিত রাজ্য প্রশাসনকে, যা প্রকৃতই আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা এবং সম্মান নষ্ট করবে। বুজুয়া মহলে সুবিধা ও রেল ভ্রমণের ঠাট বাড়ার বলে যে গাড়িকে মনে করা হয়ে থাকে, তেমনি ‘গোয়তী এক্সপ্রেস’ হল ডাকাতি এই মার্চ তারিখে। বড়লোক ঘাড়ীদের মধ্যে বাদে অলঙ্কার ও টাকা লুট হল, তাদের কেউ কেউ নেপাল রাজ পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই ডাকাতির জের আন্তর্জাতিক রঙ নিয়েছে, কুটনৈতিক সৌজতে নেপাল সরকার ভারতের প্রতিনিধিরা নীরব থাকলেও। তাছাড়া এই গাড়ির ষ্টপেজ খুবই কম। তাই প্রব্রুটেছে রেলরক্ষী বাহিনীর কর্মক্ষমতা ও সজ্জা সম্বন্ধে। রাজধানীতে নতুন দিল্লীর পুলিশের একাংশের ছায়াময় ছমিকা সম্বন্ধে (অপরাধীদের সজবক হুমিয়ার) যেমন জনশ্রুতি শোনা যায়, আজকাল উত্তর প্রদেশের শান্তি ও স্বরক্ষা বজায় রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কেও কথা উঠেছে। তাছাড়া, শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে জাজ্জা প্রমাণরূপে অপরাধ-প্রবণতা এবং অপরাধের পরিসংখ্যান কেন্দ্র চলেছে। নদীর্ঘ

ইতিহাস পত্রিকার লখনৌ এডিশনে প্রকাশিত সি টি আই এর ৭ মার্চ তারিখের সংবাদে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারী মাসে ২৩টি খুন হয়, তার মধ্যে মাত্র একটিকেই কিনারা পুলিশ করতে পেরেছে। গড়পড়তা অপরাধের ফ্রিক্রিটি: দৈনিক গড়ে ১টি খুন, ৩টি ডাকাতি তথা অপহরণ এবং ৭টি চুরির ঘটনা ঘটে। তাছাড়া, গুণ্ডা এবং অপরাধীদের গোষ্ঠীভুক্ত হামেশাই হয়ে থাকে। প্রাদেশিক রাজধানী শহর ও তার উপকণ্ঠেও এমনি ব্যাপার শান্তিকামী নাগরিকদের পক্ষে বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ হবার পরও শান্তি-শৃঙ্খলা জলাঞ্জলি দেবার মত মর্যাদা ও লঙ্ঘ্য-কর ব্যাপার ঘটল—বারবাকিতে নেহরু কলেজের পোড়ো (ছাত্র) হকম সিং গ্রামাঞ্চল থেকে রেলের ফুটবোর্ডে ঝুলে ঝুলে আসবার সময় খুন হয়ে যায় জি আর পি পুলিশের কোনো জওয়ানের অহেতুক ক্রোধোন্মত্ততার শিকার হয়ে। এক্ষেত্রেও প্রব্রুটে, জি আর পি তথা রেল স্বরক্ষার দায়িত্ব মূলতঃ কেন্দ্র এবং পরোক্ষে প্রাক্তন সরকারের ওপর বর্তায়, যে সরকারও আজ কেন্দ্রের করতলগত। আশ্চর্যের কথা নয়, উত্তরপ্রদেশে জনসাধারণের ওপর উপযুক্ত এমনি শেখাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

কিসের আভাস?

৮ম পৃষ্ঠার পর দশ বছর আগে কে ভাবতে পেরেছিলেন? সঙ্কয়ের হার এক বছরের মধ্যে ডলার প্রতি তিন সেন্টে নেমে যাবে? আমেরিকার প্রমুখ উৎপাদন সামর্থ্য একের কোঠায় পৌছাবে। বেকারের সংখ্যা হবে প্রায় এক কোটি? কে ভেবেছিল আমেরিকার ব্যাংক স্ফুদে হার ১৭.৫ শতাংশ হয়ে যাবে যা ১৯৮০ সালে ২০ শতাংশ হতে পারে বলে খ্যাত-নায়া, অর্থনীতিবিদ জামুয়েলসন অল্পমান করেছেন। শুধু আমেরিকাই এই অবস্থা তা নয়। গোটা ইউরোপও এক ধনবাদী রোগে ভুগছে। ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক বাজারভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য ঘাটতি ৬০.১২ বিলিয়ন (একশ কোটি=এক বিলিয়ন) থেকে ১২ বিলিয়ন ডলারে পৌছে গেল। বিশ্বের যে ২৪টি সব চাইতে ধনীদেশ ও ই সি ডির অন্তর্ভুক্ত তাদের গড় পরিবৃদ্ধির হার ১৯৭০-এর দশকের ১০ শতাংশ থেকে ১৯৭৯ সালে এক শতাংশেরও কম নেমে এসেছে।

হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে সারা বিশ্বে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার আসন্ন পতন সম্ভাবনা। সোনার দাম বেড়েছে কারণ একদিকে ফাটকাবাজেরা দ্রুত মুনাফা কামাতে চায় অন্যদিকে ফাঁপা ডলার ও অন্তান্ত্র মূল্যের চাইতে সোনা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য এই বিশ্বাসে লগ্নীকারীরা সোনার দিকে ঝুঁকছে। এমন কি বিশ্বের সব চাইতে বড় বড় ব্যাংক-গুলি পর্যন্ত নিজেদের তহবিলের নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়ে সোনা সঞ্চয় করতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এই শোচনীয় পরিস্থিতি স্বীকার করে বিভিন্ন দেশের মজুত মুদ্রা তহবিলের উপর স্বল্প প্রদানের এক অভিনব ব্যবস্থা স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে। আজ ধনবাদী হুমিয়ার সংকট স্বাধী আকার ধারণ করেছে। কোন প্রতিকার ব্যবস্থা এই সংকটের উপশম করতে পারে না। মত অভিনব ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক ধনবাদের মৌলিক সংকট গভীরতর হবেই। একমাত্র উৎপাদনের উপকরণগুলি সামাজিক মালিকানাধীন করেই এর স্বাধী প্রতিকার হতে পারে কিন্তু পুঁজিমালিকেরা তা শুনতে চাইবে কি?

সি এ ডি সির কাজকর্ম কেমন চলছে

বিশেষ প্রতিনিধি

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনার একটি হল সর্বদীন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প, ইংরেজীতে বলা হয় কমগ্রাহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। হিমঘর বানিয়ে মহাজনদের হাত থেকে মুক্ত করে গরীব চাষীদের লাভবান আলু চাষে নামান, গরীব চাষী ঘাতে ধান গম পাট জুয়া রেখে ব্যাক থেকে টাকা ধার পেতে পারেন তার জন্য বড় গুদাম তৈরী করা, ভোগ্যদ্রব্যের লম্বাঘর দোকানের মাধ্যমে ঘাতে একটু কম দরে গ্রাম-বাসীরা চাল-ডাল, কাপড়-লুঙ্গি পান, ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি হল সি. এ, ডি, সির কাজকর্ম।

ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অপারেশন বর্গার নথিকরণের কাজও চলছে, অকৃষিগত কাজের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে, ঘাতে কাজ ও আয় বাড়ছে। চাষীর জমি সীমাবদ্ধ অথচ কর্মকর্ম হাতের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে কৃষি ছাড়া অন্য ধরনের কাজের কথা ভাবতেই হবে, তাই সি, এ, ডি, সি, মন্ত্র চাষ পুণ্ডালন ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। বর্তমানে গ্রামবাংলার নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলোর সহযোগে

সি, এ, ডি, সি কাজ করছে।

সি, এ, ডি, সি, কেমন কাজ করছে তা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রেরিত দুটো প্রতিনিধি দলে আমিও ছিলাম। প্রথমদিন বাই হরিণঘাটা প্রকল্পে। ১৯৭৫-এর শেষ দিকে এটা শুরু হয়েছে। ঐ সময় ১১২৮৪ একর জমির মধ্যে মাত্র ৩৪৩৪ একর ছিল সেচযোগ্য, বাকিটা অসেচ। '৭৮ সালে সেচ এলাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৩৯ একর। পূর্বে এই এলাকার ৬৩১টা নলকূপ ছিল। সি, এ, ডি, সি, পরে আরো ৫৬টা বসিয়েছে এখন আর বসাবার মতো প্রাকৃতিক অবস্থা নেই। গ্রামে গরীব লোকের সংখ্যাই বেশি, এরকম ৫৩টা ভাগচাষী পরিবারকে অর্থ ঋণ দিয়েছে ২১,২৭৮ টাকা।

মাঠে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি আলু, কপি, বেগুনের চারা বসানোর ক্ষেত্রে, পাম্প থেকে জল দেওয়া ইত্যাদি কাজে প্রকল্পের সহযোগিতার কথা সকলেই স্বীকার করেন। প্রকল্পের ডাইরেক্টর চণ্ডীদাস চক্রবর্তী অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন।

এরপর বাই কালনা প্রকল্প পরিদর্শনে। বারো হাজার একর জমি

এই প্রকল্পের আওতাধীন। এখানে ডাইরেক্টর হলেন সন্তোষ চক্রবর্তী, ডেপুটি ডাইরেক্টর প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোন্ডারের পুত্র দীপকর কোন্ডার। ১৯৭৫ সালে শেষে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। অবশ্য প্রথমে অর্থনীতি-বিদ বিপ্লব দাশগুপ্ত সি, এ, ডি, সির দায়িত্ব গ্রহণের পরই অন্ত জায়গার মতো কালনা প্রকল্পের কাজও গরীব-কৃষকদের স্বার্থে গতিলাভ করে। শুধু কর্পোরেশনের উপরতলার অফিসার-রাই নয়, প্রকল্পের সমস্ত কর্মচারীও এর মধ্যে দিয়ে কৃষকদের সেবা করতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন।

সরকার ও ব্যাক্সের থেকে কর্পোরেশন টাকা ঋণ করে। সেই ঋণের টাকায় মাঠের মধ্যে জল সরবরাহের পাম্প বসানো হয়। হরিণঘাটার মতো কালনাতেও দেখছি ২০টা গভীর ও ১৫০টা অগভীর নলকূপ সি, এ, ডি, সি বসিয়েছে। এখান থেকে চাষীদের ক্ষেতে জল দেওয়া হয়। একর-ইঞ্চি প্রতি দশ টাকা হিসেবে দাম নেওয়া হয়। বোরো চাষে প্রায় ৪৮ ইঞ্চি জল লাগে অর্থাৎ জলের খরচা ৪৮০ টাকা আর আলু চাষে লাগে ২০ ইঞ্চি। জল সরবরাহটাই হলো প্রকল্পের প্রধান কাজ।

মত এগিয়ে আসা নির্বাচন, খুব দীর্ঘ হতে পারার সম্ভাবনা যার নেই আজ, সাধারণ মানুষকে মুক্ত থেকে মুক্ত করে তুলছে। এই সেদিনও যারা ইন্দিরাজীর তথাকথিত ব্যক্তিত্ব-সম্মোহন। (Charisma) দেখছিল, তারা ভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন সুরে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, ঘৃণা চুপিমাড়ে। কারণ বাহু, আজ সারা প্রদেশে কংগ্রেস (ই) মার্কী যশাওগাধের রবরবা।

কায়মী স্বার্থের উপশ্রেণী সংঘাতের পটভূমিকায় নির্বাচনের পূর্বাক্ষ কেমন হতে বাচ্ছে, এর উত্তর জনগণের ব্যাপক মোহভজ্ঞানিত ঔদাত্তে মিলবে খানিকটা। কিন্তু বেশীর ভাগ চশারা বইছে বসন্ত বাহারের মত, এলোমেলো বাতাসে। কিন্তু গ্রীষ্মকাল আসন্ন; নিরাকরণ ধরার মত উত্তপ্ত জনকোপ হয় এক দিশা-দর্শী। সে দিশা প্রদর্শক: কি পেলার? কারা লুটলো মজা? ততদিনে বোর্ড এবং সম্ভবত: বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। সে সময় আর এক ধরনের যুবকের সারি দেখতে পাওয়া যাবে। যাদের খিদে প্রচণ্ড, লম্বাকর্ম।

এখানে চারহাজার ভূমিহীন কৃষককে নিয়ে কৃষক লম্বাঘর সমিতি গড়া হয়েছে। দু'ধরনের ঋণ দেওয়া হয়। শস্তাবাবদ নগদ টাকা আর কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ওষুধ। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা পার তাদের শেয়ারের দরোচ্চ বিশপণ এবং বৃহৎ চাষীদের দেওয়া হয় দশ-গুণ। এই সব প্রকল্পেই কৃষি ক্ষতিক জনিয়ার টেকনিক্যাল অফিসাররা কৃষকদের কোন্ ক্ষেত্রে, কি ধরনের শস্ত বপন লাভজনক হবে, বপনের সময় ইত্যাদি নিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পরামর্শ দেন।

কালনার কৃষকদের মুখে শুনলাম, এবার ঐ পরামর্শে আলু ফলন দারুণ হয়েছে। কিন্তু মজুত রাখার অাব্য-হার জন্ত আলু পচে যাওয়ার সমস্যা আছে, অথবা কৃষকদেরকে মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হবে হিমঘরের জন্ত। তাই সি, এ, ডি, সি তাদের নিজস্ব একটা হিমঘর কালনার বানাবার চিন্তা করছে।

এরপর আছে আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা। আদিবাসী গ্রামে পানীর জলের জন্ত নলকূপ খনন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্ত আদিবাসীদের গ্রামে পায়খানা বসানো হচ্ছে। কলে জল-মাঠে পায়খানার জীবাণু সংক্রামিত হবে না। এছাড়া ব্যাক্সের ডি, আর আই প্রকল্পে সি, এ, ডি, সির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হচ্ছে কুটির শিল্পের জন্ত, যেমন টালি-তৈরী, বিড়ি বানানো, বেতের কাজ, পাপড় চানচুর তৈরী ইত্যাদি। এছাড়া বাজারে তরকারী বিক্রি, চায়ের দোকান করার মতো কাজেও দশ টাকা থেকে সাড়ে সাতশো টাকা ঋণ দেওয়া হয় মাত্র ৪% সুদে। বিয়ের জন্তও ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আছে ধর্মগোলা। শুরুর সময় ছিল ২৯ জন লম্বাঘর। এখন সদস্য সংখ্যা ৫১। লম্বাঘরের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি ধর্মপোলায় প্রয়োজনীয়তা এঁরা স্বীকার করেন।

আমতাবাদ গ্রামে তিনজন বেকার যুবক একটা বিরাট পুতুল জীজ নেন। সি, এ, ডি, সি এঁদেরকে চারাপোনা কেনার টাকা, ও অন্যান্য খরচা বাবদ ঋণ দেন। এঁরা এবছরে মাছের চাষ করে ১৭৫০ টাকা লাভ করেছেন।

গ্রামের এই লম্বাঘর উন্নয়ন প্রকল্পই এখন হচ্ছে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগে। পঞ্চায়েত ও কৃষক সমিতির সঙ্গে সি, এ, ডি, সিও অপারেশন বর্গার বর্গাধারের নাম রেকর্ড করাচ্ছে।

১৯৭৫ সাল থেকে এই কর্পোরেশনের কাজ শুরু হলো বায়কুন্ট আমলে এর প্রদান ও গভীরতা বেড়েছে। কর্পোরেশনের কল-কাতার হেড অফিসের কর্মচারী থেকে হরিণঘাটা, কালনার সমস্ত কর্মচারীই কৃষকদের ও সরকারের পাশে দাঁড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বিপ্লব বান্ধব

সাধারণ মানুষ যখন নৈতিক হতাশ আর ক্ষোভে কতবিকত হয়েছে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অব্যবহার শিকার হয়ে তখন বিপ্লব বান্ধব মহিষাদলে তৈরী হচ্ছে ঐ সমস্ত মানুষের মনে এটা আশার আলো জাগিয়ে তুলতে আর বন্ধুর মত তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। মহিষাদল রাজ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীশ্রীলকুমার চক্রবর্তীর মস্তিষ্কপ্রসূত বিপ্লব বান্ধবের আদর্শ সেবা, সভতা, শৃঙ্খলা ও সাহস। এই চারটি মস্তিষ্ক দীক্ষিত একটি শৃঙ্খল খেজারসেবক বাহিনী লবনময় তৈরী আছে আর্তের সেবার নিজেদের নিয়োজিত করার জন্ত। বিপ্লব বান্ধবের মূখ্য উদ্দেশ্য তাঁর খেজারসেবকের মধ্যে নৈতিক গুণগুলির বিকাশ সাধন এবং শৃঙ্খলভাবে আর্তের সেবা। শ্রীলবাবু ছাড়াও অন্যান্য দ্বারা নিবেদিত প্রাণ হিসেবে বিপ্লব বান্ধবের পাশে আছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক সুবোধ মাইতি, ডাঃ কল্যাণ মাইতি অধ্যাপক বিজুভূষণ সেন, সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঘুনাথ আচার্য।

বিপ্লব বান্ধবের সাহায্যার্থে ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহিষাদল রাজমাঠে টালীগঞ্জ সঙ্গগামীর সঙ্গে তমলুক মহকুমা বাজাই একাদশের এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। একটি গ্র্যান্ডস্টেন্ড গাড়ি কেনার তাগিদে এই খেলার আয়োজন। খেলাটি উপভোগ্য হয়েছিল। ৫ হাজার দর্শকের সামনে টালীগঞ্জ অগ্রগামী দলকে ৩-২ গোলে জিততে বেশ বেগ পেতে হয়। তমলুক একাদশের গোলরক্ষক সঞ্জীব চৌধুরীর অপরূপ নৈপুণ্যের জন্ত তমলুক একাদশ অনেক নিশ্চিন্ত গোলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সঞ্জীব চৌধুরী কলকাতার যে কোন টিমের পক্ষে গৌরবের বিষয় হবেন। তমলুক একাদশে অন্যান্য দ্বারা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী প্রণব বেরা, রবি, পূজক বাগ / সন্ধ্যা মাইতি, স্বরত আচার্য, জয়দেব করণ, সইফুর রহমান, অমিয় মিল, চঞ্চল পাণিগ্রাহী, অমিত মাইতি, বিবেকানন্দ মাইতি, ঋক্টা মালিকার।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

বাৎসরিক ১০ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

উত্তর প্রদেশ

৭ম পৃষ্ঠার পর

উদাহরণ দেখতে পাওয়ার প্রতিক্রিয়া বিষময় হচ্ছে। যদি লখনৌ, কানপুর মীরাট, বারাণসীর মত বড় বড় শহরে (যথা, লখনৌ—শাহনওয়াজ এলাকার মত কেতাদুরস্ত বিলাসবাসনের জায়গা, রেনেসাঁতে খোদাখুঁজি ছাত্র খুনের ঘটনা) উঠতি প্রজন্মের যুবক অপরাধীদলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, এবং শিকার অপব্যবহার দেখা যায় লুপ্তপ্রাপ্ত ডাকাতি এবং বর্ধমান অপরাধের পুনঃপৌনিকতায়, তাহলে কি এ বুঝতে হয় না যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি—যার সঙ্কলন প্রক্রিয়ায় ২০ বছরের মত সামান্য সময় বাদে কংগ্রেসের একটানা একচেটে কর্তৃত্ব ছিল এবং আজ ফের হয়েছে—৮৪, ধ্বংস হতে চলেছে, এবং এই গণতন্ত্র ধ্বংসী পরিণতির জন্ত বিজ্ঞান বুদ্ধিমান শাসক এলিটবর্গ ও প্রশাসকী ব্যুরোক্র্যাট দায়ী? উত্তর প্রদেশের নতুন গভর্নর (পশ্চিমবঙ্গ থেকে সন্ত আগত শ্রীসি পি এন সিং) বিচলিত হয়েছেন, অফিসারদের ডাকলেন। ৭ তারিখে তাতে প্রশাসনের রথী মহারথীরা হল শরিক (পরামর্শদাতা শ্রী জে ডি গুলা সমেত)

কিন্তু প্রশাসনীয় কোলা থেকে বেরিয়েছে কেবল বিবৃতির বেড়াল। সুরাহা করা চাই, দুঃখপা অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় সন্তোষ্য বস্ত্র সরবরাহের। সাইলানো চাই চির-উঠতি দরদামের ও পড়তি উৎপাদনের (যথা চিনির) বাজার। আশ্রয় মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের জন্ত চাই রাজ্য-ভোটার-সুচীর ঠিকসময়ে সংশোধন। খরায় প্রকোপজনিত পরিণামের জের নাকি আজও চলছে, সে কারণে চাই উপযুক্ত ব্যবস্থা (ইদিকে দীর্ঘকালীন বর্ষা মোটামুটি ভালই হয়েছে, রবি ফসলের প্রসপেক্ট মন্দ নয়)। আরও চাই, “কাজের বদলে খাজ, বা আনাজ”, যে প্রোগ্রাম পূর্ববর্তী বনারদী দাস মন্ত্রিমণ্ডলী শুরু করে, তাকে চালু রাখা—১৮ লাখ গরীব, কজিহীন বুকি ত্বাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। চাই অনেক কিছু, নতুন-লাও প্রেসিডেন্সি প্রশাসনের হর্তা-কর্তাদের নজরে যোজনা-সারির গুরুত্ব অগ্রাধিকার কোনটার, সে লক্ষ্যে শলাপরামর্শ ও জল্পনাকল্পনার শেষ নেই কিন্তু কাজ এগুচ্ছে না। কারণ, কেন্দ্র স্বীকার না করলেও জনগণ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে এবং ক্রমশ: পারছে। শিরে শমনের

বই মেলা '৮০

রবীন্দ্রসম্মেলনের সামনের প্রান্তে প্রতিবছরের মতো এবারও বইমেলা শুরু হয়েছে। এবার বইমেলা নিয়ে অনেক বাধা দেখা দিয়েছিলো। অবশেষে পূর্তমন্ত্রী স্বতন্ত্র চক্রবর্তী মিলে হাতে ফাইল নিয়ে মহাকরণে ঘোড়াঘোড়ি করে একদিনের মধ্যেই খালনা মকুফ করিয়ে জমির তার দিয়ে দেন পাবলিশার্স গিল্ড কর্তৃপক্ষের হাতে। মার্চ মাসের প্রথমভাগেই এই বিরাট মেলার আয়োজন হয়েছে।

গত ১৪ মার্চ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় মেলার উদ্বোধন করেন জাতিসংঘ লাইব্রেরীর ডিরেক্টর ডঃ রবীন্দ্র দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর সূচনামূলক বক্তব্যে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক থেকে জাতীয় স্তরে বই মেলার ইতিহাস শোনান অন্যদিকে মূল্য তথা প্রকাশনার হাজারো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন।

পূর্তমন্ত্রী স্বতন্ত্র চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বইমেলা অঙ্গুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতার কথা বর্ণনা করেন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও প্রকাশনার সমস্যা ও বইমেলায়

তেল পাচার ও চোরাকারবার

৩য় পৃষ্ঠার পর

পাশের চোরাই গোড়াউনগুলিতে গেলে অনেকই দেখতে পাবেন যে, রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরা পাচিল ঘেরা গোড়াউনের দেয়ালে লিখে রেখেছেন হাজার হাজার রাজনৈতিক স্লোগান।

রাজ্যের বাম সরকার চান জনগণের সহযোগিতা। এবং সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। এ ব্যাপারে বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। চোরাই গোড়াউনগুলির এলাকা চিহ্নিত করে এইসব গোড়াউনগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে রাজ-

সাক্ষ্য কাহিনী করে বক্তব্য রাখেন। গত বছরে বইমেলায় প্রায় এক কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিলো। এবারে মেলার আকর্ষণ আরো বেশি। উদ্বোধন অঙ্গুষ্ঠানে কালে বইমেলায় কর্তৃপক্ষ হিসেবে পাবলিশার্স গিল্ডকে ধন্যবাদ জানান।

নৈতিক দলে স্থানীয় শাখাগুলি তৎপর হতে পারেন না? সং পুলিশ অফিসারদের নিয়ে তেলের চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য একটি টাঙ্ক কোর্স গঠন করতে পারেন না? পি, ডি, এ্যাংকটের প্ররোপ সরকার চান না। কিন্তু জাত হুঁত তেলের কুখ্যাত চোরাকারবারীদের আটকানোর জন্য কি কোন আইনই নেই?

সদস্য ভাঙ্গানো

১ম পৃষ্ঠার পর

যার জন্য বিরোধী সদস্যদের ভাঙিয়ে নিজের দলে আনার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

জনতা, লোকদল এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংসদ সদস্য বশুপাল কাপুরকে। জনতা, লোকদল এবং কংগ্রেস সদস্যদের নানাভাবে প্রলোভিত করা হচ্ছে যাতে তারা দলত্যাগ করেন। টাকা পরশা ছাড়াও কাউকে মন্ত্রিস্বের প্রলোভনও দেওয়া হচ্ছে।

এ কাজে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতারা কিছুটা সফল হয়েছেন। কয়েকজন জনতা ও লোকদল সদস্য ইতিমধ্যেই দল ত্যাগ করে ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা আশা করছেন আরও কিছু সদস্য ভাঙিয়ে তারা রাজ্যসভায় পরিচিতি পাবেন।

এই আশায় সত্যর মেয়াদ আরও কয়েকদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জনতা, লোকদল, এবং কংগ্রেসের কিছু নীতিহীন সদস্যের ভাবসাবধে মনে হয়েছে তারা ইন্দিরা কংগ্রেসের ফাঁদে পা দিতে পারেন।

অনিলকুল ভট্টাচার্য

কাব্যগ্রন্থ

হৃদয়ে গোলাপ

বিখ্যাত

৯/৩ টেমার লেন

কলিকাতা-৯

আই এন টি ইউ সির দু দল সমর্থকের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট

ব্যারাকপুর মহকুমার জগদল থানার রিজায়েন্স জুট মিলের মাঠে ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা নাগাদ কংগ্রেস প্রভাবিত গ্রন্থিক সংগঠন আই, এন, টি, ইউ, সির দুই দল সমর্থকের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। ওই মারপিটের কবলে পড়ে উভয় পক্ষেরই কয়েকজন বেশ আহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ গিয়ে ওই অবস্থা আরও আনেন। পুলিশ উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধী অভিযোগ অস্বাভাবিক দুইটি মামলা মকুফ করেছে।

পুলিশের বিবরণ অস্বাভাবিক জামা গেছে যে, সম্প্রতি রিজায়েন্স জুট মিলের কর্তৃপক্ষ ওই জুট মিলে লক-আউট ঘোষণা করেছেন। ওই লক-আউটের ব্যাপারেই ওই দিন ওখানে আই, এন, টি, ইউ, সির স্থানীয় কর্মীদের একাংশের উদ্ভোগে একটি সভা ডাকা হয়। কিন্তু, অপর একটি অংশ এর প্রচণ্ড বিরোধীতা করে। তাতেই ঐ কাণ্ড হয়। এক পক্ষের নেতা গোলকেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অপর পক্ষের নেতা ছিলেন গোলকমণি ব্রিষ্। পুলিশ এ ব্যাপারে

একজনকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করে। আরো কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে খোঁজাখুঁজি করেছে।

উল্লেখযোগ্য, আই, এন, টি ইউ সির স্থানীয় একটি অফিসের সামনেই ওই মারপিটের ঘটনাটি ঘটে।



ফ্যান্টাকস বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র এম্বলি চাই

কলকাতার রাস্তা

কলকাতার রাস্তায় যে অস্বাভাবিক অবস্থা, সে কথা আমরা সবাই জানি, মেনেও বলছি।

পথচারী হিসাবে আমরা ভুক্তভোগী আর গাড়ী দ্বারা চালান তাঁদের অবস্থাও কাহিল।

একে তো কলকাতার রাস্তাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় সংকীর্ণ। তার ওপরই জঘাল, গাড়ী পার্কিং আর বহুসংখ্যক বে-আইনী রিক্সা ঠেলার দৌরাখ্য। পাশের ফুটপাথেরও নিস্তার নেই। সেখানে অবৈধ ব্যবসা চলছে অব্যাহত। পথচারীরাই যাবেন কোথায় আর গাড়ীই বা চলেবে কি করে।

তাই সরকার, পুলিশ, সি, এম, ডি, এ, কর্পোরেশন, সি, আই, টি সকলেই একত্রিত হয়েছেন এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কিছুটা শৃংখলা আনতে।

ঠিক হয়েছে যে ব্রাবোর্ণ রোড (বিপ্লবী ঐক্যলোক্য মহারাজ সরণি), ধর্মতলা স্ট্রীট (লেনিন সরণি), এবং বহুবাজার স্ট্রীট (বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট), এই তিনটি রাস্তায় যুক্ত অভিযান চালান হবে। উদ্দেশ্য আর কিছু নয় যাতে পথচারী এবং গাড়ী-ঘোড়া কিছুটা স্বচ্ছন্দে যোগা আসা করতে পারে।

ব্রাবোর্ণ রোডের কথাই ধরুন না কেন।

আগে রাস্তা ছিল ৬০ ফিটের মত। সি, এম, ডি, এ সেটা ১০০ ফিট চওড়া করে দিলেন। আলো বসালেন, ফুটপাথের পাশে রেলিং দিলেন, সামনেই নির্মাণ করলেন বিরাট ব্রাবোর্ণ রোড ফ্লাইওভার।

কিন্তু আদতে হল কি?

চওড়া ব্রাবোর্ণ রোডের ওপরই হু'লাইন করে গাড়ী দাঁড়ায়, ফুটপাথে বসে গেছে হকার, রেলিঙে ঝুলছে কাপড়-চোপড় মাল মশলা আর ব্রাবোর্ণ রোড ফ্লাইওভারের ঠিক মুখেই বাস, মিনিবাস, যাজী তুলছে। এমন কি নিষেধ সত্বেও ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে পথচারীরা আগছেন যাচ্ছেন।

এ সবই বন্ধ করা সরকার। বন্ধ করা হবে। -সবাই যদি চেষ্টা করেন এবং এই সবাইয়ের মধ্যে আমরা ধরছি জনসাধারণকেও। তাঁদের নাহায্য না পেলে আমরা কিন্তু এক পাও এগোতে পারব না।

বিশ্বাস করুন ব্রাবোর্ণ রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট এবং বৌবাজার স্ট্রীট শুধু একবার পরিষ্কার করলেই হবে না, সেগুলিকে বরাবরের মত পরিষ্কার রাখতে হবে।

(সি. এম. ডি. এ কর্তৃক প্রচারিত)

ইন্দিরা কংগ্রেস কমিটি সিমিটিড

(কেন্দ্র ইন্দিরা কংগ্রেস কমিটি সিমিটিড)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এম / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থানসমূহের অস্বাভাবিক ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম এবং টেওয়ার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দর / শতকরাভিত্তিক সীল করা টেওয়ার।
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
রেফা: নং জি.এম./কেও/ই ই (সি) / টেওয়ার / ৮০ / ১০০৪ তাং ৭-৩-৮০

কেও এরিয়ার বিভিন্ন কোলিয়ারীতে বাসগৃহ নির্মাণের জন্য। প্রতিটি কাজের আনুমানিক খরচ ৭৭,০৬৭.৬৪ টাকা থেকে ২,৭৩,৭২২ টাকা। ৩১-৩-৮০ থেকে ৮-৪-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতিটি সেটের জন্য ৫০ টাকা অথবা ১০০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা অথবা একশো টাকা) নগদে দিয়ে (অগ্রত্যাগ যোগ্য) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের (সিভিল) অফিস, কেও এরিয়া জেমারেল ম্যানেজারের অফিস, পো: বহলা, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে টেওয়ার লিঙ্গ পাওয়া যাবে। ১-৪-৮০ / ১০-৪-৮০ বেলা ২ ৩০ টার টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে অর্থাৎ ১-৪-৮০ / ১০-৪-৮০ বেলা ৩টার খোলা হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ার প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা লংগিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের ফি বাবদ যদি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌঁছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে সি এ বি কর্তার অভদ্রতা

ফটোগ্রাফাররা সি এ বি-র কাছে মর্যাদাহীন। সি এ বি-র কয়েকজন কর্মকর্তার আচার আচরণ সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারদের মনে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে।

সম্প্রতি ইডেনে রঞ্জি ট্রফির খেলা চলার সময় সি এ বি-র জনৈক কর্মী কলকাতার জনৈক ফটোগ্রাফারের মুখের ওপর বলেছিলেন, কর্তব্যরত রিপোর্টারদেরকেই শুধু লাঞ্চ দেওয়া হবে, ফটোগ্রাফারদের নয়।

ঘটনাটি ঘটে ১৪ তারিখে লাঞ্চার সময়। সি এ বি-র পক্ষ থেকে রিপোর্টারদের জন্য কয়েকটি লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে আসা হয় প্রেস বক্সে। সি এ বি-র জনৈক ব্যক্তি ফটোগ্রাফারদের একজন প্রতি-নিধিকে তারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ফটোগ্রাফারদের জন্য লাঞ্চ নিয়ে আসতে বলেন। ঐ অভ্যন্তরীণের কথামত একজন যান লাঞ্চ প্যাকেট আনতে যান। যে ব্যক্তি সি এ বি-র পক্ষে লাঞ্চ প্যাকেট দেবার দায়িত্বে ছিলেন

শয়তানের চক্র ?

বড়বাজার থানার নলিনী শেঠ রোডের দোমাপট্রির এক সোনার দোকানে মায়ের অলঙ্কার বিক্রী করতে গিয়ে একটি ১০।১২ বছরে অবাকালী বালক পুলিশের হাতে ১৪ই মার্চ বিকেলে ধরা পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বালকটি জুলে যাওয়ার অচিলায় বাড়ি থেকে গোপনে মায়ের দু ভরির দুটি সোনার বালা নিয়ে ঐ সোনার দোকানে গিয়ে তা বিক্রীর ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু, দোকানদারের এতে লেন্দে হয়। তিনি ওকে আটকে রেখে সঙ্গে সঙ্গে থানা-পুলিশের কাছে ফোনে সংবাদ দেন। পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে অলঙ্কারসহ আটক করে ওর অভিভাবককে খুঁজে বের করে।

বালকটি অগ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পুলিশ এ ব্যাপারে কোন কেস করে নি। ওকে সতর্ক করে এবং থানার রেকর্ড রেখে ওর বাবার হাতেই ওকে অর্পণ করে দেয়।

পুলিশের অহুমান, ওর পেছনে শয়তানের চক্র আছে। তা না হলে সে ঐ কাণ্ড করতে সাহস পেত না। বালকটির বাবা ক্যানিং স্ট্রিটের একজন ব্যবসায়ী। তিনি রবীন্দ্র সরণীতে পরিবারবর্গ নিয়ে বাস করেন। তিনি সোনার দোকানীকে ধনবান জানিয়েছেন।

তিনি ঐ ফটোগ্রাফারকে মুখের ওপর বলে দেন, ফটোগ্রাফারদের আবার লাঞ্চ কি? ফটোগ্রাফারদের কোন লাঞ্চ দেওয়া হবে না।

সি এ বি-র তারপ্রাপ্ত কর্তার ঐ আচরণে অভাবতই উপস্থিত ফটোগ্রাফারদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জানা গেল গত টেস্টেও ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে একই রকম আচরণ করা হয়েছে। সি এ বি কর্তৃপক্ষ শুধু যে ফটোগ্রাফারদের সঙ্গেই অভদ্র আচরণ করেছেন তাই নয়,

উপস্থিত বেশ কিছু সাংবাদিককেও লাঞ্চ প্যাকেট দেওয়া হয় নি।

ফটোগ্রাফারদের বক্তব্য, লাঞ্চ খাওয়াটা বড় কথা নয়। কিন্তু সি এ বি কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের মধ্যে যে মর্যাদার সীমা-রেখা টেনে দিচ্ছেন সেটাই অসম্মানজনক। পরে অবশ্য সি এ বি-র জনৈক কর্মী এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফটোগ্রাফাররা অভদ্র ব্যবহারের প্রতিবাদে একযোগে লাঞ্চ বরকট করেন।

সি এ বি-র সভাপতি মহোদয় যত্নে ছোট-বড় নির্বিশেষে সব সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা হাতে সমান আচার্যের কাছে নিবেদন ব্যাপারটা ব্যবহার পায় সেদিকে নজর অহুসমান করে দেখবেন এবং ভবি-দেবেন।

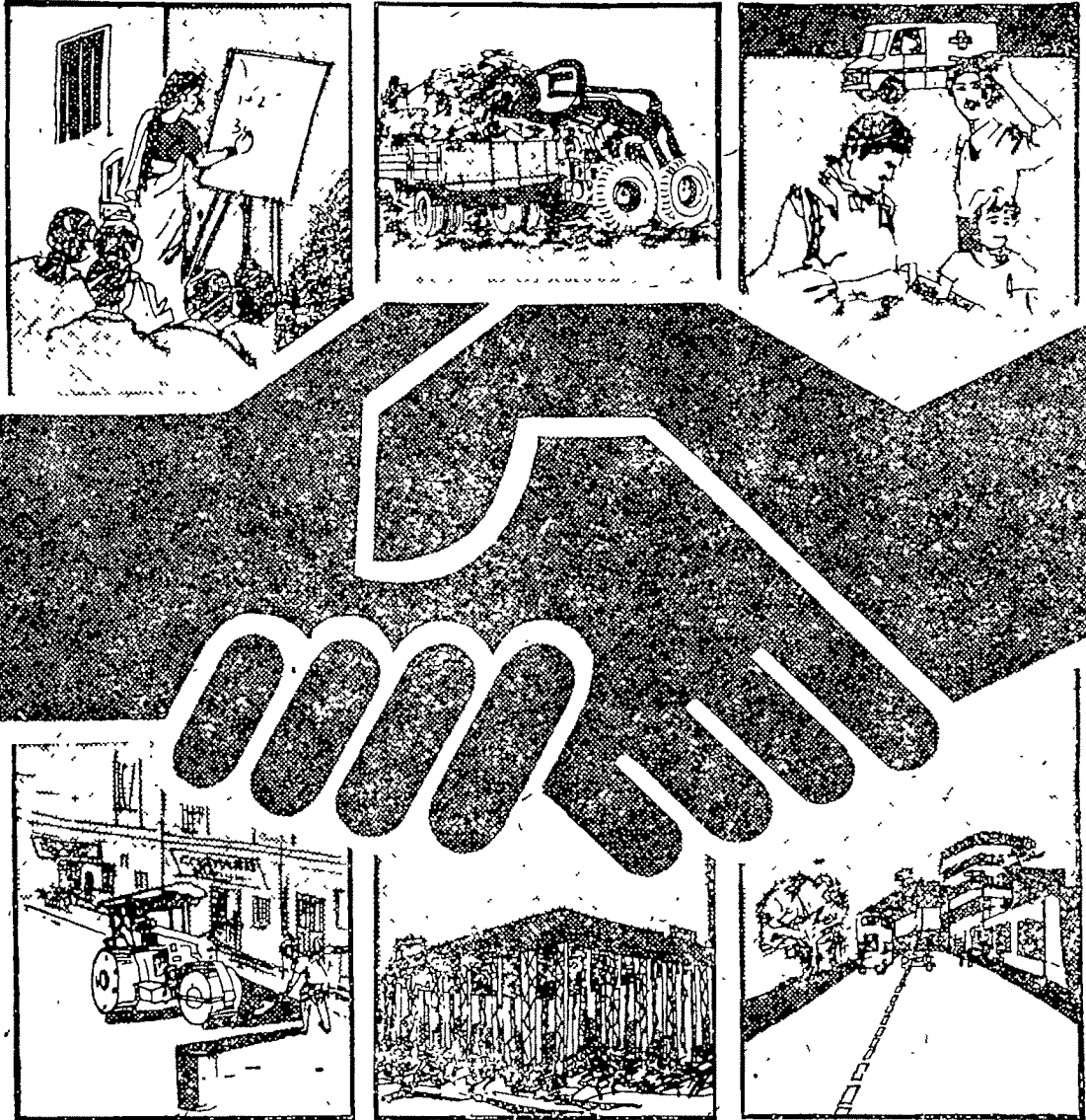
শান্তিচর্চা রাত্রি পুস্তক পর্ব

পর্ব প্রকাশন

- ১। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সংস্করণ) / ডঃ হুসীল রায়চৌধুরী / ১৬০০
- ২। সমাজতত্ত্ব (২য় সংস্করণ) / ড্রিঃ রিমলকৃষ্ণ কর / ১৫০০

৬৬, রাজা হুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা-১৩

আপনাদের দেওয়া ঠিকমতেই আপনাদের নিত্য সেবা



পুরস্কার মিটিয়ে দিন

আমরা জানি আপনারা সবাই নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। সেই জন্যই আপনারা আশা করেন যেমন পুরস্কার দেবেন, পুরস্কারও তেমনি আপনারা স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার পরিবেশে জীবনযাপনের ব্যবস্থাগুলি তিকমত পালন করবেন। আমরা তাই চাই। পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা ও পরিপ্রণালী পরিষ্কার রাখা, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, পার্ক ও উদ্যানগুলি তিকমত রক্ষণা-

বেক্ষণ করা, বস্তীর উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, রোগ নিবারণ ব্যবস্থা গ্রহণ-পুরস্কার হাতে এই রকম যে বহুবিধ কাজ রয়েছে, আপনারা দেওয়া পুরস্কারের মাধ্যমেই তার আর্থিক সংস্থান করা হয়ে থাকে।

আমাদের অনুরোধ, পুরস্কার ফেলে রাখবেন না। এই কর আর কতই বা? নিশ্চয়ই আপনার নিয়মিত খরচের ডেতেরেই এর ব্যবস্থা করা আছে।

তবু অনবধানতাবশতঃ কখনও কখনও ভুল হতেও পারে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই ভুলের পরিণামে সম্পত্তি ক্ষোভ, নীলাম, প্রহতাবি পর্বোয়ানা বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাব্য থাকে।

তাই, পুরস্কার সম্বন্ধে মিটিয়ে দিন। আপনাবই নগরজীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করতে আসসা সেই অর্থ খরচ করবো।

কলিকাতা পুরসভা-মহানগরীর উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার প্রাণকেন্দ্র।

মাতাপুত্রের সঙ্গে আলোচনা করে সুব্রত গোষ্ঠী আন্দোলনে নেমেছে



ক্রয়কিন্ষ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ১ শুক্রবার, ২৮শে মার্চ, ৮০ ৬০ পরিসা

সুব্রত-বিরোধীরা অবরোধ আন্দোলনে নেই

বসিদ্ধ না দিয়ে
টাকা তোলা হচ্ছে

আসাম অবরোধ নিয়ে কংগ্রেস
দল ও তার ছাত্র যুব শাখা বিধা-
বৃত্ত। লোমেন মিত্র-র বিশেষ
অনুগত দেবপ্রসাদ রায় প্রকাশ্যেই
বলেছেন, আসাম অবরোধ যুল সম-
স্তার লম্বাধানের পথ নয়। রাজ্য
যুব কংগ্রেসের অনেকেই ধারণা
তাই। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি
অজিত পাণ্ডা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবল্লভকে
বলেছেন, অবরোধের নামে হিংসা-
মূলক ঘটনায় তাঁর কোন মার নেই।
স্বয়ংকত সাহেবেরও অনুরণ মত।
শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

ই-কংগ্রেসীদের হামলা

বাঁকড়া জেলার কোতালপুর
ধানার মজবুতিতে ১৯শে মার্চ কংগ্রে-
সের (ই) একদল কর্মী একদল সি পি
এম কর্মীর ওপরে হামলা করে দারদর
করেছে। তাছাড়া, ইন্দিরা কংগ্রে-
সীরা ৪ জন সি পি এম কর্মীকে
আটকও করে রাখে। সংবাদ পেয়ে
পুলিশ গিয়ে স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন
মাছবের সহযোগিতায় ঐ অবস্থা
আরও আমে এবং অশান্ত সি পি
এম কর্মীদের উদ্ধার করে। পুলিশ
৩ দিনের ৮ নং কেস-ডাইরী
করে ৪ জন ইন্দিরা কংগ্রেসীকে
গ্রেপ্তার করেছে।

জানা গেছে, সি পি এম কর্মীরা
একটি জনসভা থেকে ফিরছিল, তখন
কংগ্রেস (ই)র কর্মীরা ঐ হামলা
চালায়।

ইন্দিরাপন্থী যুব ছাত্রদের আসাম
বিরোধী আন্দোলনের পেছনে ইন্দিরা
গান্ধী এবং সঙ্গর গান্ধীর পরোক্ষ সম-
র্থন আছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর
পাওয়া গেছে।

এই আন্দোলনের নেতা রাজ্য
ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক
এবং ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা কমিটির
সভাপতি সুব্রত মুখার্জী দিল্লীতে সঙ্গর
গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, বরকত গণিধান
চৌধুরী প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে এই
আন্দোলন শুরু করার আগে আলোচনা
করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আসামে কি ঘটছে

গত ছমাস ধরে আসাম-মেঘালয়ের
ঘটনাবলী ভারতের দৈনিক কাগজ-
গুলোর পাঠকদেরকে চক্কল করে
তুলেছে। সেখানে কি ঘটছে তা
জানার জন্য দিল্লীর নাগরিক অধিকার
রক্ষা সমিতির তিনজনের এক প্রতিনি-
ধিদল গত ১-১৬ ফেব্রুয়ারী
আসাম পরিদর্শন করেন।

ডঃ জি. পি. দেশপাণ্ডে, ত্রিভীরেন
শর্মা ও চমনলাল তিনজনের এই
প্রতিনিধিদল আসামে ব্যাপক ঘোরা-
ঘুরি করে অহুসস্থান করেন। এঁরা

রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের
নেতৃবৃন্দ, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান,
ছাত্র সংগঠন, সাংবাদিক, সংখ্যালঘু
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ও গোহাটি
বিধিবিভাগের শিক্ষক সমিতির সঙ্গে
কথা বলেন।

অহুসস্থান শেষে এক রিপোর্টে
এঁরা বলেছেন, এটা সত্য যে বাংলা-
দেশ থেকে কিছু বেআইনী অস্ত্রপ্রবেশ
ঘটেছে, যদিও প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে
মতপার্থক্য থাকতে পারে, প্রায়তঃ
শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

ইন্দিরা কংগ্রেসের ঘণা রাজনীতি

আসাম নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস (ই)
নেতৃত্ব এক বিচিত্র কাণ্ড কারখানা
শুরু করে দিয়েছেন। আসামের
বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেহারা কি হবে
তাই নিয়ে দল শতধা বিভক্ত। কেউ
বলছেন, অবরোধ হবে। কেউ
বলছেন, না। আবার কেউ বা
বলেছেন, অবরোধ হবে কিন্তু তা হবে
শান্তিপূর্ণ। দলের উগ্র সমর্থকরা
আবার তা মানতে রাজী নয়। তারা
গুণগোল বাঁধানোর জন্য একেবারে
তৈরী। তার প্রমাণও তারা ইতি-
মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আসামের
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ওখানে বা
করছে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই)দলের
কিছু সমর্থক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে একই

পথে পা বাড়িয়েছে।
এখানে বলা দরকার জাতীয়
সংহতির নামে রাজনৈতিক নেতৃত্ব
যে যাই বলুন না কেন হরিজন হত্যা,
সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদে উসকানি
দেওয়ার কাজ দীর্ঘ ৩০-৩২ বছর ধরে
চলেই আসছে। কোনও সুসভ্য
জাতির পক্ষে তাবা সম্ভবই নয় যে,
সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের
বিভিন্নস্থানে গ্রামের পর গ্রাম সাম্প্র-
দায়িকতা, হরিজন হত্যার তাণ্ডে
একেবারে শেষ হয়ে যায়। সাম্প্র-
তিক কালে ভিনরাজ্যের কয়েকটি
গণহত্যার কলঙ্কময় নজীর তারই নব
সংযোজন। কংগ্রেস শাসনাধীন
শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রীর সঙ্গে আসামের আন্দোলনকারী
যুব ছাত্র নেতাদের আলোচনা শেষ
পর্বত ভেঙে যায়। এরপর আসাম
গণসংগ্রাম পরিষদের নেতারা আলো-
চনার যোগ দিতে এসেও সমস্তার
কোন সুরাহা করতে পারেননি।

প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব করেছিলেন
বিদেশী সংস্থা নিধারনের ভিত্তি বছর
হোক ১৯৭১ সাল, কিন্তু আসামের
আন্দোলনকারী যুব-ছাত্র নেতারা
১৯৫১কেই ভিত্তি বছর ধরার সিদ্ধান্তে
অটল থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আন্দো-
লন প্রত্যাখ্যান করে- মীমাংসার পথে
আসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত অহু-
রোধই আসামের যুব ছাত্র নেতারা
প্রত্যাখ্যান করেন।

আসামের যুব ছাত্র নেতাদের
এই আচরণে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষই
অসম্ভব হন এবং আসামের আন্দো-
লনের ব্যাপারে যখন নতুন করে
চিন্তা ভাবনা শুরু করেন তখন
স্বতন্ত্রতাবু পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র পরিষদ
এবং যুব কংগ্রেসীদের পক্ষ থেকে
আসাম বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তাব
দলীয় হাইকমান্ডের কাছে পৌঁছ
করেন।

স্বতন্ত্রতাবু দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী,
সঙ্গর গান্ধী এবং বরকত সাহেবকে
তার আন্দোলনের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা
করে বলেন, রাজ্যে আসাম বিরোধী
শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

পদোন্নতি ও পদপ্রাপ্তি

এখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জানী জৈল সিং গোড়া থেকেই সঙ্গর
গান্ধীর পরামর্শে ওঠেন বলেন।
আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়
ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিও রবার ট্যাম্প হিসেবে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ চালাতেন। কিন্তু
সেই সময় এর সঙ্গে এখন তুলনা চলে
না। তাহলে কি হয় জৈল সিং
জানেন সঙ্গর খুশী থাকলে তাঁর
উন্নতি। সেজন্য নিয়মিত সঙ্গরের
সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁর
নির্দেশ মত কাজ করেন। তাছাড়া
একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই তাঁর মন্ত্রি-
সভায় জ্যোতিষ। বাকি সব ছোট-
খাট উপগ্রহ। বতই তাঁরা-বড় পদের
জাঁকজমকে বড়সড় দেখান না কেন
তাঁরা বিশ্বস্ত সেবক ছাড়া আর কিছু
নয়।

কিন্তু সব বিশ্বস্ত, সব অহুগত
সেবক এখনও মাতাপুত্রের কাছ থেকে
কমতাপূর্ণ পদের পুরস্কার পান নি।
বংশীলাল তাই ইন্দিরা গান্ধীর কাছে
গিয়ে পড়েছেন। জানা গেছে, বংশীর
স্বাভাবিক এত কালো ও কুখ্যাত হয়ে
গেছে যে কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে কোন
জায়গাতে মাতাপুত্র তাঁকে আনতে
শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় প্রধানমন্ত্রীর মতলব

দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী ও সঙ্গর
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায়
কিরে পশ্চিমবঙ্গ প্রবেশ কংগ্রেসের
সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরত মুখো-
পাধ্যায় ছাত্র পরিষদ ও যুবকংগ্রেসের
“আসাম অবরোধ” আন্দোলনকে
আরো জোরদার করতে চলেছেন
বলে সংবাদে জানা গেছে। দিল্লীতে
মাতাপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও
যখন স্বতন্ত্রতাবু এই ঘোষণা করেছেন
তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে,
পশ্চিমবঙ্গে আসাম অবরোধ আন্দো-
লনে তাঁদের উত্তরের সমর্থন আছে।
যদিও প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এই আন্দো-
লনে তাঁর মার নেই বলে জানিয়ে-
ছিলেন, কিন্তু তাঁর বর্তমান মনোভাব
আন্দোলনের বিরোধী নয়। তিনি
চান এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে
হোক।

একথা পরিষ্কার প্রধানমন্ত্রীর
সদ্বিচ্ছা সত্ত্বেও আসামের ব্যাপারে
তিনি কোন মীমাংসার আসতে পার-
ছেন না। আসাম পূর্ববং অগ্নিগর্ভ
হয়ে রয়েছে। অথচ আসামে রাষ্ট্র-
পতির বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারের
কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও আসামকে
শান্তি করতে না পারা প্রধানমন্ত্রীর
অক্ষমতা বলেই গণ্য হবে। তাই কি
তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসাম অবরোধ
আন্দোলনের জুঁ দেখিয়ে সারা
আসাম ছাত্র সমিতি ও গুণ সংগ্রাম
সমিতি তথা- অসমীয়াদের ভীত করে
আসামে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা
করছেন? কারণ স্বতন্ত্রতাবু মুখোপাধ্যায়
ও তাঁর অনুগামীরা যে পথে গেছে
তাও সমান বিপজ্জনক ও বিচ্ছিন্নতা-
বাদী। যে কোন প্রধানমন্ত্রীর নির্দি-
ষ্ট তার মিন্দা করা উচিত, যদি
তাঁর মনে অন্য কোন মতলব না
থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর যে গোপন মতলব
আছে এবং তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের
কংগ্রেসী আন্দোলনকে মদত দিচ্ছেন
সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে গত বুধবার
লোকসভায় তাঁর জোড়ের প্রকাশ
ঘটার। প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্রতাবুদের
মদত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক চিলে দুটি
পাখি মারতে চাইছেন। এক,
আসামকে শান্তি করা এবং দুই
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার
পথ প্রশস্ত করা। হুঁসিয়ার ছেলের
অভাব হয় না কখনও।

রাখাল ভট্টাচার্য

সম্প্রতি প্রয়াত ক্রীড়াসংবাদিক, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, অস্থাবর, সর্বোপরি 'মানবদরদী' পুরুষ রাখাল ভট্টাচার্যকে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলতেন, 'কালের রাখাল'। যিনি যুগকে চরিত্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গত ১৬ই মার্চ তার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার একটি স্বর্ণযুগের অন্ততম শেষ সাক্ষী চলে গেলেন। যে সময়-টাকে বিখ্যাত বিখ্যাত খেলোয়াড়ের জন্ম—যেমন ধ্যানচাঁদ, গোষ্ঠ পাল, সি. কে. নাইডু—এদের সময়কাল কথা যিনি একমাত্র লিখে গেছেন বা জানিয়ে গেছেন তার বিরোধে তাই চিরতরে শেষ হল সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি রোমন্থনের কথা। বিশেষ করে এই ভেজাল সাংবাদিকতার যুগে তিনি ছিলেন একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

দুর্ভাগ্যের পাঠকরা জানেন আরবি ছদ্মনামে তিনি লিখতেন। এমন কি অনেকাধিক চ্যালেঞ্জিং লেখার অধিকাংশ এই পত্রিকাতেই একাধিক বেরিয়েছে।

বিরাট পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি খেলার রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ খোলামুঠে খেলাকে সাহিত্যের এবং জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। ষ্টেটসম্যানে ক্রীড়াসংবাদিক বৃত্তি নিয়ে তিনি সূচনা করলেন বাঙালী ক্রীড়াসাহিত্যের—'কলকাতার ফুটবল' লিখে। আর ইংরেজী সাহিত্যেও এনেছিলেন অলিখিত একটি পুরস্কার—একমাত্র ভারতীয় সাংবাদিক হিসেবে খোদাই করলেন 'উইজ-ডেনের' শততম সংখ্যায় (ক্রিকেট বই : 'হুইটম্যান ক্রিকেট ক্যাভাল-কেড')। তাও জন আলর্টের মত নামী লেখকের হাত দিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি (আর্লট) তার সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন প্রখ্যাত বেরী সর্বাধিকারীর কাছে। যেখা বেরীরা আমার কাছে এবং তাঁর জন্ম-দিনে সকলের কাছে বলে গেছেন।

তার সঙ্গে গত আঠার বছর একাত্ম হয়ে থেকে দেখেছি তিনি কি রাজনীতি কি অন্য কোন বিষয়ে সমালোচনা করতে কখনো মনগড়া কথা বলেননি। সর্বক্ষেত্রে তাঁর সত্য কথা স্পষ্ট করে বলার প্রবণতাই বেশী দেখেছি। খেলার লেখা লিখতে তিনি কখনও কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি। সে ব্যাপারে তাঁর মত নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক লেখক আজ যেন কাউকেই খুঁজে পাইনা। সমালোচনার শেষে তাঁর গঠনমূলক

উপদেশও প্রদানযোগ্য। বর্তমানে 'সময় ধরা' সাংবাদিকতার যুগে তাঁকে বড় বেশী করে মনে পড়ছে।

তিনি মূলতঃ অর্থনীতির ছাত্র হলেও ইতিহাস (খ্রীস্টের ইতিহাস আর রোমের ইতিহাস তাঁর অনবদ্য স্বপ্ন), সংস্কৃত, বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরাজী সবতেই তাঁর সমান দক্ষতা।

সব মিলিয়ে তাঁর বই হয়তো দ্বিগুণের বেশী নয়। কারণ তিনি প্রচুর রচনা যে বিনা অর্থে লিখেছেন প্রত্যেককে সম্বোধন করতে, যেটা না লিখলে তিনি আরও অনেক বই লিখতে পারতেন। আরি-জানি মুখ্যক আশির দীর্ঘ আত্মজীবনী তিনিই 'লিখে' দিয়েছেন—শুধু মুখ্যককে ভালবেসে। আজ যেমন লিখলেই হাত পাতার একটা রেও-রাজ হয়েছে আরবি তার কখনও ধার রাখেন না। সেখানেই আরবি স্বতন্ত্র। খেলা ছাড়াও একই পারি-প্রমিতিক অন্তর প্রবন্ধ, কবিতা এবং ফরাসি মত সম্পাদকীয়ও লিখে দিয়েছেন। জীবনে ধানের সব থেকে বেশী উপকার করেছেন তাঁরাই পিছন দিক থেকে তাঁকে বেশী ল্যাং দেবার চেষ্টা করেছে। সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন হিমালয়ের মতই নির্বিকার।

এই বৈয়াক্ষণিক যুগে তিনি বৈমানান। তাই বোধহয় নিঃশব্দে ঘুমের মধ্যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

শিবরাম কুমার

অচ্যুত গোস্বামী

প্রবীণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা যখন মার্কসবাদকে ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে বর্তমানে স্বদেশ টাকার ব্যক্তিগত ধান্দাবাজীকে পরম আরাধ্য করে তুলেছেন তখন স্বিতধী, নিয়তিমান শ্রীগোবিন্দীর অকাল-মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত আহত করবে। ১৯৪০-এ টাকার প্রগতি জেথক সংগঠনে লেখকের ভূমিকা ইতিহাস-মতে রাখবে। সেই সময়েই শহীদ সোমেন চন্দ্রের সহযোগে তিনি "ক্রান্তি" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। "প্রতিরোধের" সম্পাদনা-কর্মেও চল্লিশের দশকে তিনি যোগ্য-তার স্বাক্ষর রেখেছেন। বামটি বছর বয়সে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বিজয়গড় ঘাটীশ রায় কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

অচ্যুত গোস্বামী একজন মার্কস-বাদী সমালোচক হিসেবে খ্যাতি-মান ছিলেন। "বাংলা উপভাসের ধারা" তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ,

পূর্ববর্তী গবেষকদের কাছে গ্রন্থটি রেকার্ডস বই হিসেবে আদৃত। "কানাগলির কাহিনী" "মৎস্তগন্ধা" "রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর" তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

যা হয়ে থাকে, আদর্শহীন, নীতিহীন, কোনো দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত না-থাকার কারণে তাঁর বিখ্যাত বইগুলি কোনো প্রগতিশীল প্রকাশকের দ্বারা পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এবং আজকের দিনের অর্বাচীন প্রগতিশীল পাঠকেরাও সম্ভবত তাঁকে মনে রাখেননি।

স্বাধীনকাল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাঁর মৃত্যুতে আমরা এক-জন পরম স্বহৃদ-বিচ্ছেদের আন্তরিক বেদনা বোধ করছি। পাণ্ডিত্য যে বিনয় প্রকাশ করে তার মূর্তিমান পুরুষ ছিলেন অচ্যুত গোস্বামী।

মিহির আচার্য

স্বপ্ন রাজনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর রাজ্যে এঘটনার কোনও বিরাম ছিল না। 'আজও নেই। ভারতের সংহ-তির মূল চরম কুঠারাবাত করার চেষ্টাও এই প্রথম নয়। ত্রিপুরা, মেঘালয়, ফুটান, মিজোরাম, প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তার প্রমাণ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর পূর্বকালের ঘটনাবলী বেশ কিছুদিন ধরেই ভয়াবহ। কিন্তু মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর আসাম নিয়ে কোন স্তূ চিন্তা এবং প্রয়োজনাত্ম-যায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী নীতি কম দারী নয়। বিশেষ-বিশেষ রাজ্যকে বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে মরত দেওয়া হয়েছে। এতে সাম্প্রদায়িক দল ও কিছু স্বযোগ সন্ধানী মাহুষের সুবিধা হয়েছে। এই শক্তি এখন নিজেদের রাজ্যকেই এক পৃথক সত্তা হিসাবে বিচার করে সেই মত কাজ করছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসমানাধিকার জাতীয় সংহতি প্রভৃতি যত কথাই বলুন না কেন, আগে তাদের ঠিক করতে হবে বিভিন্ন রাজ্যকে একই চোখে দেখা হবে, না কি বিমাতা-স্বলভ আচরণ করে বিভিন্ন রাজ্যের মাহুষকে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেবেন?

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারও এব্যাপারে সম্ভবত খুব স্বচ্ছ চিন্তার পরিচালিত হচ্ছে না। অদ্বুত ঘটনা হলো, আসামে এখন রাষ্ট্র-পতির শাসন। যা এক কথায় দিল্লীর শাসনেরই নামান্তর। সেখানে বর-বাড়ী লুট হচ্ছে। মাহুষ খুন হচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাঙালী শরণার্থীরা আলিপুরজুড়ে ছুটে

আসছেন। আসামের তেলের পাইপ লাইন অবরুদ্ধ। এমনই অবস্থার জাতীয় অর্থনীতিই ভেঙে পড়ার মুখে। অথচ সরকার কাগজে বিবৃতি দিয়েই খালাস। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং এই আন্দোলনের নেপথ্যে কারা এবং সে সম্পর্কে কতটুকু তথ্য তিনি যোগাড় করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়েই আত্মতুষ্টির উদগার শুরু করেছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের কাজকর্ম নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চিন্তার আর শেষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার "অবনতিতে" তারা নাকি বিস্মিত, অবাক। অথচ দিল্লীতে স্বাধীনতার উত্তর কালে সর্বপ্রথম অফরা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহত হলেন, পোরালিরয়ে আইনজীবীরা শাস্তিরক্ষকদের প্রহারে জর্জরিত হয়ে রক্তাক্ত হলেন। খোদ দিল্লীতে ছাত্র-শ্রম করে পরে নৃশংসভাবে তাকে খুন করা হচ্ছে। সর্বোপরি আসামে বাঙালী খেদানোর নামে যে বর্বরতা চলছে সে ব্যাপারে যেন দিল্লীর কিছুই করার নেই। এর ওপর কংগ্রেস (ই) দল ও তার নেতৃত্ব আসাম অবরোধের নামে যা শুরু করেছে তা এককথায় বাঁধরাছি ছাড়া কিছুই নয়।

আসামে বাঙালী নির্ধাতনের প্রতিবাদে বাঙালীর যেন কোভের সঙ্কার হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্বজাতি শ্রীতি থেকে এধরনের ঘটনার বেদনা পাওয়ার কারণ ঘটলেও আসাম অবরোধ করে এর মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এধরনের ঘটনার বহিঃশক্তি সরাসরি ভাবে আসামে ঢুকে পড়ে অশান্তিকে আরও বাড়িয়েই তুলবে। বাঙালীরা হবেন আরও নির্ধাতিত। কিন্তু কংগ্রেস(ই) নেতৃত্ব একাজেই মেতেছেন।

এব্যাপারে নেতৃত্বের বহু মত। দলনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯শে মার্চ লোকসভায় বলেন যে, পশ্চিম-বঙ্গে ই-র রাজ্য নেতৃত্ব আসাম অব-রোধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তার পরিষ্কার কথা, উত্তেজনা, বুদ্ধি পায় কিংবা পরিহিত্তির অবনতি-ঘটে এমন ব্যবস্থার তাদের সায় নেই। শ্রীমতী গান্ধী সংসদে যেদিন একথা বলেন ঠিক সেইদিনই রাজ্য কংগ্রেসের (ই) সম্পাদক স্বরত মুখোপাধ্যায়-দের দলবল মিডলটন স্ট্রীট, চিঅরল্ডন এ্যাভিনিউতে যথাক্রমে আসাম-তবনের কাছে দক্ষয় করেন আসাম ট্রিবিউন পত্রিকার অফিস তখনই বন্ধ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে এক-তাওব। খণ্ডযুদ্ধ। দলের রাজ্য সন্তা-পতি অজিত পাণ্ডা ২০শে মার্চ সাংবা-

দিকের বলেন, আসামের আন্দোলনের পাল্টা হিসাবে উত্তরবঙ্গে সড়ক অবরোধ তিনি আদৌ চান না। কিন্তু কি ঘটল? সড়ক অবরোধ হলো। করলেন স্বরতবাবুর বাকী সহকর্মী জয়ন্ত ভট্টাচার্য, স্বশোভন বসু, স্বরত সাহা, অশোক মে-প্রমুখ। শুধু ছাত্রপরিষদ গোষ্ঠী নয় ই-র জেলাকংগ্রেস নেতৃত্বও এব্যাপারে স্বরতবাবুর সংগে যৌথ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

২০শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী আসাম আন্দোলনের প্রতিবাদে এরাজ্যে কংগ্রেসের (ই) বিক্ষোভকে পরো-য়ে নিয়ে বললেন আন্দোলন হো-কিন্তু তাতে যেন পূর্ণ সংযম রক্ষা করা হয়। কে সংযম রক্ষা করবে? কিন্তু পরিষ্কার নয়। পথ অবরোধ চলবে। রেল চলবে না ভাঙচুর চলবে। এ কেমন 'সংযম' তাতো বো-হুদর। তবে কি শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম-পুলিশকে অরাজকতা দেখেও তাঁদের চূপচাপ থাকতে হবে একথা বোঝা-চাইছেন। এবং সম্ভবত তাহলে কেন্দ্র আইনশৃঙ্খলা বিপর-বে এরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করে-পারা যাবে। আসাম অবরোধ স্ব-নীতিগত দিক থেকে শ্রীমতী গান্ধী ঠিক কাজ বলে মনে করেন তাহ-তিনি-ই কলমের এক আঁচড়ে দ্বি-থেকেই আসামে রেল চলাচল, টে-চলাচল, সড়ক পথে মালপ-পাঠানো বন্ধ করে দিতে পারেন অরাজকতা হ্রমমে আসামে মিলিটা-পাঠাতে পারেন। নিজের দল-কর্মী দ্বারা আসামে রয়েছেন তাহ-দিয়েও বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোল-কারীদের পাল্টা প্রতিরোধে ঠেকা-পারেন।

অবরোধ আন্দোলন

১ম পৃষ্ঠার পর আন্দোলনের ফলে যেমন রাজনৈ-তিক থেকে লাভ হবে তেম-আসামের আন্দোলনকারী নেতা-ওপরও কিছুটা চাপ সৃষ্টি করা যা-স্বরতবাবুর এই প্রস্তাবে দি-থেকে কোন আপত্তি করা হয়নি এ-স্বরতবাবুকে আন্দোলন শুরু কর-জন অসুস্থতি দেওয়া হয়েছে। অব-এই আন্দোলনে সম্মতি দেওয়া-ব্যাপারে কেন্দ্রের আর একটা মত-কাজ করছে। তা হচ্ছে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে বাধ-এবং এই অবস্থাকেই কেন্দ্র ভালভা-বামরকট বিরোধিতার কাজে লাগা-পারবেন।

যদিও শ্রীমতী গান্ধী আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হওয়া উ-কিন্তু তার মত বাহু রাজনীতিবিদ-একথাটা নিশ্চয়ই অজানা নয়-প্রাদেশিকতার কেন্দ্রিক কেন্দ্র-আন্দোলনই শান্তিপূর্ণ হতে পা-না।

যুগান্তরের হলুদ সাংবাদিকতা

দৈনিক যুগান্তর বর্তমানে হলুদ-সাংবাদিকতার পথ ধরেছে। যুগান্তরে প্রমিত কর্মচারীদের আন্দোলনের সংবাদ আজকাল আর প্রকাশিত হয় না। বরং প্রকারান্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে খর্ব করার জন্য নানা কৌশল নেওয়া হচ্ছে। সংবাদের নামে গল্প ও নাটকেপনা এবং তরল কাব্য করা হচ্ছে। তাছাড়া, যুগান্তরে সাংবাদিকতার খবর বড় করে প্রকাশ করে সমাজে বিবাক্ত আব-হাওয়া ছড়ানোর চেষ্টা করেছে।

একথা দর্পণ বলছে না। অমৃত-বাজার পত্রিকা, যুগান্তর অ্যাণ্ড অমৃত এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের একাধক বার্ষিক সাধারণ সভায় বিদ্যায়ী সাধারণ সম্পাদকের প্রবক্তা সম্পাদকীয় বিব-রণীতে যুগান্তরের ভূমিকা সম্পর্কে এই অভিযোগ করা হয়েছে। ১২ মার্চ ওই সভা ভারত সভা হলে অস্বস্তিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর অ্যাণ্ড অমৃত এম-প্লয়ীজ ইউনিয়ন একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। ইউনিয়নের নেতৃত্বে পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রমিত-কর্মচারীরা শুধু নিজদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়েই লড়াই করছেন না, পত্রিকা গোষ্ঠীর জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধেও এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রগতিশীল ও সংগ্রামী প্রমিত-কর্মচারীরা ধাপে ধাপে লড়াই করে চলেছেন।

সম্পাদকীয় বিবরণীতে আরো বলা হয়েছে যে, লোডশেডিং সমস্যা নিয়ে দারিদ্র্য যখন চিকিত্ত ও বিপদগ্রস্ত তখন যুগান্তর তার সমস্যার কারণ না খতিয়ে অথবা সমস্যা সমা-ধানের পথ নির্দেশ না করে তার বদলে ১৯৭৯ সালের ২৪শে এপ্রিল প্রথম পাতায় তিনটি ছবির জায়গা ফাঁকা রেখে 'আমরা হুঃখিত লোড-শেডিং-এর জন্য রক করা যা় নি' এই ঘোষণা সমেত সংবাদপত্র প্রকাশ করতে চায়।

কিন্তু রাজ্যে কর্মরত যুগান্তর প্রেসের কর্মীরা এই ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। অবশেষে, প্রমিত-কর্মচারী-দের মিলিত ক্ষোভ ও প্রতিবাদের কাছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করে ফাঁকা জায়গার খবর ভর্তি করে কাগজ ছাপতে বাধ্য হন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ২৪শে এপ্রিল সকালের কাগজের রক ২৩শে এপ্রিল রাজ্যে তৈরী করার নিয়ম। কিন্তু, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এইদিন অর্থাৎ ২৩শে এপ্রিল যুগান্তর

প্রেসে সারাদিনে কোন লোডশেডিংই হয় নি।

দ্বিতীয়তঃ একই বাড়ীতে অবস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকার বাণিজ্যিক রক সেইদিন যথারীতি তৈরী হয় এবং তা অমৃতবাজারে ছাপাও হয়।

বামফ্রন্ট সরকারকে হের করার জন্যই যুগান্তর কর্তৃপক্ষ এই ধরনের নীচ মানের সাংবাদিকতার পথ মেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গণতন্ত্রপ্রিয় প্রেস কর্মচারীদের এই প্রতিবাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অসাংবা-দিকদের হস্তক্ষেপবলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছু পেটোয়া এবং মেরুদণ্ডহীন সাংবাদিকের মারফৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে স্থপরিচালিতভাবে অপপ্রচারে নেমেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই অপপ্রচার একদম ব্যর্থ হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, বেশ কিছু সং সাংবাদিক প্রেস কর্মচারীদের এই প্রতিবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে-ছেন।

২৩শে এপ্রিলের পরে এল ২৩শে জুন। এই ২৩শে জুন তারিখের যুগান্তর "নদীয়ার হাটামার ব্যাপক প্রদার"

ই-কংগ্রেসীদের হুমকী ও হামলা

কল্যাণী : কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) কমতার আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণী থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়-গায় কংগ্রেস (ই) কর্মীরা আইন-শৃঙ্খলা বিপর করে তুলতে চাইছে, সি পি এম কর্মী, সি আই টি ইউ ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস (ই) কেন্দ্রে কমতার আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাটাগঞ্জ বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলসে (ই) কংগ্রেস (ই) বনাম কংগ্রেসের (আ) সংঘর্ষ হয়। তাতে উভয় দলের দুইজন কর্মী আহত হয়েছিল।

কল্যাণী পৈপার মিলসে ইন্দিরা কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ মাসের ২০ তারিখে নির্মীয়মান কনকাস্ট ফ্যাক্টরীতে সি পি এম-এর কর্মী কার্তিক মণ্ডলকে কারখানার ভিতর অশ্লাব্য ভাষায় গালাগালি করা এবং শাসানো হয়।

২১শে মার্চ কল্যাণী স্পিনিং মিলের কর্মী শঙ্কু নন্দীকে একদল কংগ্রেস (ই) কর্মী অশ্লাব্য ভাষায় গালাগালি করে এবং দেখে নেওয়ার হুমকী দেয়।

২২শে মার্চ কল্যাণী স্পিনিং মিলের ডেপুটি স্পিনিং মাস্টার শ্রীকুমার প্রধানকে মিলের ভিতরেই ইন্দিরা

নামে ফলাও করে পাঁচ কলমের হেডিং সহ সাপ্তাহিক দাক্ষার সংবাদ প্রকাশ করে। এই সংবাদের মধ্যে অসংখ্য তথ্যগত ভুল ছিল এবং অহেতুকভাবে ফলাও করে দাক্ষকে উত্তম দৈনিকের চক্রান্ত ছিল।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই ধর-নের সাপ্তাহিক দাক্ষকে উত্তম দৈনিকের চেটারও তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

কলকাতার অজান্তে কোন সংবাদ-পত্রই যুগান্তরের মতো নদীয়ার দুঃখ-জনক দাক্ষার সংবাদকে ফলাও করে চাপে নি। এমন কি একই বাড়ীতে অবস্থিত অমৃতবাজার পত্রিকাতেও নদীয়ার দাক্ষার সংবাদ কোনরূপ উত্তম দৈনিক ছাপা হয় নি। বরং তারা অত্যন্ত লংঘনের সঙ্গেই তা প্রকাশ করে।

সম্প্রতি পূর্ণপ্রাস স্বর্ঘগ্রহণকে কেন্দ্র করে যুগান্তর সাধারণ মাস্তবের মধ্যেও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুগান্তরের নাটকেপনা প্রমাণ করে যে, যুগান্তর বর্তমানে এই হলুদ সাংবা-দিকতার পথ ধরেছে।

কংগ্রেসের গুণারা প্রহার করে। থানায় কেস করা হয়েছে।

১৮ই মার্চ কলকাতার এক অবাকালী কল্যাণীর চাঁদমারী অঞ্চলে গ্রেসী ক্যামিকেল ফ্যাক্টরী খুলবেন বলে এই দিন ভিত্তি পুজা করতে আসেন। সেখানেও কংগ্রেসের (ই) কর্মীরা - মাংস, মিষ্টি-ইত্যাদি জোর করে নিয়ে যায়। তাদের বজ্রাতিতে গ্রেসী ক্যামিকেল কর্তৃপক্ষের লোকেরা অবাক হয়েছেন।

চিনির ব্যবসায়ীরা কি পরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন

বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সর-কারের প্রধানমন্ত্রী চীচরণ সিং চিনি ব্যবসায়ীদের কাছে নির্বাচনী তহ-বিল বারদ প্রতি কুইন্টাল চিনি পিছু ৫০ টাকা করে দাবী করেছিলেন। উৎসাহকরা চরণের দাবী মিটিয়ে-ছিল। কিন্তু তারা তাদের রাজ-নৈতিক উপদেষ্টাদের কাছে শুনেছিল যে, চরণ সিং-এর পক্ষে কমতার ফিরে আসার আশা সব থেকে কম এবং প্রধানমন্ত্রীর গদীতে উপবিষ্ট হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী শ্রীমতী গান্ধীর। অতএব উপদেষ্টা-দেরই পরামর্শ মত চিনির ব্যাপারীরা যেখানে চরণকে কুইন্টাল প্রতি ৫০

কুখ্যাত অফিসাররা গুরুত্ব পাচ্ছেন

গুরুতর জরুরী অবস্থার আমলে যেসব অফিসার বহু বিভক্তিত কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা দিল্লীর মননিযুক্ত উপরাজ্যপাল জগ-মোহন ও পুলিশ কমিশনার প্রিতম সিং ভিন্দের প্রভৃতির মতো নতুন সরকারের সদিচ্ছায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি পাচ্ছেন। আত্মসম্মানীয় জরুরী অবস্থার সময় তথ্য দপ্তরে ডেপুটি সেক্রেটারী (ফিল্ড) হিসাবে কাজ করতে গিয়ে কিসসা কুরসিকা কেসে জড়িয়ে পড়েন এবং জনতা আমলে সাসপেন্ড হন আই এ এস অফিসার শাহজিৎ ঘোষ। তিনি এখন বিভাচরণ স্ক্রা ও সঙ্গর গান্ধীর প্রিয়-পাত্র হিসেবে আবার বহাল হয়ে-ছেন এবং তথ্য দপ্তরে ডেপুটি সেক্রে-টারীর মর্যাদা সম্পন্ন বিশেষ সহ-কারীর পদটি পেয়েছেন। তিনি তথ্য মন্ত্রী বসন্ত শার্ঠের সঙ্গে কাজ কর-ছেন। আর একজন কিসসা কুরসিকা মামলার জড়িত এবং বিভাচরণের কুখ্যাত আমলের তথ্য ও বেতার দপ্তরের সেক্রেটারী নৈয়র মুজাফর হাসান বুরগী জনতা আমলে গুপ্তিশার বহলি হবার পর সেখানে মুখ্যসচিব থেকে আবার দিল্লীতে ফিরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এই আমলে তথ্য দপ্তরে বিভাচরণের বিশেষ সহকারী হিসেবে ছিলেন আই এ এস অফিসার ভি এস দ্রিপাঠি থাকে জনতা আমলে তাঁর নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশে ফিরে যেতে হয় এখন তাঁরও দিল্লী আগমন হয়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে জয়েন্ট সেক্রেটারীর মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিশেষ সহকারীর পদটি তিনি পেয়েছেন। তিনি তাঁর কাজের মধ্যে বিশেষ করে জনতা আমলে প্রতি-

রক্ষা বিভাগের কেনাকাটা সমেত জাওয়ার সংক্রান্ত বিষয়টিও দেখবেন। একদা পাহাওয়ার অর্থ বিভাগের সচিব এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিংএর মুখ্যসচিব হিসেবে কাজ করেছেন।

এমন একজন অফিসার বর্তমানে জৈল সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবার পর এই দপ্তরের এগোবলিশমেন্ট অফিসার হয়েছেন। ইনি হলেন স্বর্ঘপ্রকাশ বাগলা। ফিরে এসেছেন নন্দকুমার সিং বাগিয়া দপ্তরের মন্ত্রী প্রব মুখো-পাধ্যায়ের বিশেষ সহকারী হয়ে। একদা ষাঁর বকলমে বাগিয়ামন্ত্রীর কাজ চালানর খ্যাতি হয়েছিল। জনতা আমলে থাকে আগের কর্মসূচি বিহারে ফিরে যেতে হয়, ছনীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হতে হয় এবং অর্থকলেক্টারিতে জড়িয়ে পড়তেও হয়। কিন্তু তিনি প্রব মুখোপাধ্যা-য়ের প্রিয়ভাজন তাই তাঁকে আর দূরে পড়ে থাকতে হল না। আবার তিনি দিল্লী এলেন। এদিকে প্রব মুখোপাধ্যায়ের খুব কাছের লোক বলে অনেক দিনের অফিসার ধর্না দেওয়া লড়েও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব হয়েছেন কে পি এ মেনন। এই তথ্যও জরুরী প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

সি পি এম কর্মীর বাড়ী আক্রমণ

মহিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আমড়াইচি গ্রামে কংগ্রেস (ই) কর্মী কালীপদ মল্লিকের নেতৃত্বে একদল ইন্দিরা কংগ্রেসী স্থানীয় সি পি এম কর্মী সতীশচন্দ্র পালের বাড়ীতে ১৬ই মার্চ ভোররাত্রে হামলা করে চরম দৌরাত্ম্য করেছে। হামলাকারীরা জীপালের জীকেও মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানা পুলিশ এই দিনের থানার ১ নং ডাইরীতে একটি মামলা রুজু করে অভিযুক্ত কংগ্রেস (ই) কর্মীদের খুঁজছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

মতামত

নিরপরাধের শাস্তি

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়া জেলায় রায়দাঙ্গার নিকটবর্তী এক শাখা ক্যানালের পোলের উপর এক লরী ড্রাইভার এক ব্যক্তিকে পিষে দিয়ে চলে যায়। শুনলাম লোকটি অবদরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন। হতভম্ব রাস্তার উপর বীভৎস অবস্থায় ছিন্ন মস্তকে রক্তাধূত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাথার খুলির কতিপয় হাড়ের অংশ রাস্তার পাশে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের শোকাহত ক্রন্দন শ্রুতি শোনা যায়। স্থানীয় লোকজন ঐ স্থানে পাথর দিয়ে রাস্তার উপর ব্যারিকেড তৈরী করেন, কলে রাস্তার উভয় প্রান্তে দূর পাল্লার ডিএসটি সি সহ বেশ কিছু এক্সপ্রেস ও লোকাল বাস দুর্ঘটনাস্থলে বেশ কিছুক্ষণ আটকে পড়ে। মৃত ব্যক্তির পক্ষে সকলেরই সমবেদনা রয়েছে, কিন্তু কণা হল লরী ড্রাইভারের দোষের জন্ত বাস বাত্মীয়া শাস্তি পেল কেন? আদালতে বিচারপতি কারো শাস্তিবিধান দেওয়ার পূর্বে শতবার চিন্তা করে দেখেন যে সে প্রকৃত দোষী কিনা, কারণ আইনেই আছে যে হাজার দোষী ব্যক্তি মুক্তি পায় তাতেও ক্ষতি নেই; কিন্তু একটি নিরপরাধ ব্যক্তিও যেন শাস্তি না পায়। সচরাচর পথে ঘাটে ঠিক এর বিপরীত দিকই প্রতিফলিত হচ্ছে—একের দোষে নিরপরাধ জনগণকে সব সময় শাস্তির বোকা বয়ে বেড়াতেই দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থার শেষ কোথায়?

হরিশাধন ঘোষ
দিগপাড় (বাঁকুড়া)

প্রতিবাদ

আপনার পত্রিকায় ৩১/৮/১২ তারিখে প্রকাশিত “পশুর রক্ত দেওয়ার ফলে মর্যাদাসিক মৃত্যু” শীর্ষক সংবাদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৃষ্টি আকর্ষণ হয়। ঐ সংবাদে বলা হয়েছিল যে বসিরহাট হানপাতালে মধ্যমপ্রাণের বাসিন্দা শ্রীমতী বর্ণা হুডের সীজারিয়ান অপারেশনের পর তাঁর দেহে এক বোতল রক্ত দেওয়া হয়। ওয় আত্মীয় পরিজনরা কলিডাডা মেডিকেল কলেজ থেকে ঐ রক্ত কিনে এনে ডাক্তারদের দেয় এবং রক্তের প্রতিক্রিয়ার পরিণতি হিসাবে বর্ণার মৃত্যু ঘটে। পরীক্ষার দেখা যায় যে ঐ রক্ত মেডিকেল কলেজ থেকে কেনা হয়েছিল তা হল পশুর দেহের রক্ত।

বিষয়টি অস্বস্তান করে আনা

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ

বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীরা দাবী দাওয়া নিয়ে মিছিল মিটিং করছেন

সমাজের সর্বস্তরের সর্বপেশায় নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা মিছিল, মিটিং করছেন। জরুরী অবস্থায় বধন সভাসমিতির কাজ নিষ্কর ঘোষণা করে স্থানের শান্তি চাপিয়ে দিয়েছিলো ইন্দিরা সরকার, তখনকার সঙ্গে আজকের আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাধীনতার পার্থক্য বোকা যায়। এটা বুঝতে পারলেই এই গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইটাও জোরদার হয়ে ওঠে।

১০ই মার্চ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ত্রয়োদশ সম্মেলন শুরু হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সুকোমল সেন বলেন, শিক্ষকরা দেশের কাঠামো তৈরী করেন, তাঁদের দায়িত্ব, বিরাট, বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে মহানুভূতিশীল হলেও আরো একটু ভাবা দরকার। সভাপতির ভাষণে শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জী বলেন, বহুদিন যাবত শিক্ষকরা অবহেলিত হচ্ছেন, বাধ্য হয়ে তাদেরকে আন্দোলনে সামিল হতে হয়েছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সর্ববৃহৎ সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম (৩র্থ শ্রেণী) সরকারী কর্মচারী সমিতির ২৮তম রাজ্য সম্মেলন ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২২রা মার্চ পর্যন্ত বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশ-

গিয়েছে যে রোগিনীর নাম শ্রীমতী বর্ণা দত্ত নর, শ্রীমতী বর্ণা ঘোষ। পরলোক-গতা বর্ণার আত্মীয়রা ঐ রক্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে কেনেন নি। তাঁরা ঐ রক্ত একটি বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে আনেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অবস্থিত “সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক” সঙ্গে ঐ সংস্থার কোন সম্পর্ক নেই। হুতরাং মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্কের নামে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অধীর চক্রবর্তী

সংবাদপত্র উপদেষ্টা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নের ১২ দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে সম্মেলনে বলা হয়, ফেডারেশনের পতাকাতলে দেশের সর্বস্তরের কর্মীদের সামিল করে ঐক্যবদ্ধভাবে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে, কর্মচারীদের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, কর্মীদের মনে সাহস যোগাতে হবে, তাদের সচেতন করে সতর্ক থেকে সংগঠন মজবুত করতে হবে।

১০ই মার্চ ইন্ডেন্টস হল সারা বাংলা ছাত্রাবাস কর্মচারী সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের দশ বছর পর ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন হোস্টেলের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে এই রকম সম্মেলন করার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। সম্মেলনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুটো প্রস্তাব পেশ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিমান সরকার। ২১শে মার্চ ঐ সমিতি বিধানসভা অভিযান করে। দাবি ছিল, ছাত্রাবাস কর্মচারীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৫/১৭ মার্চ বহরমপুরে ক্যোরার্ড রকের কৃষক সংগঠন অগ্রগামী কিষাণ সভার রাজ্য সম্মেলন হয়। ১৪ তারিখে ঐ উপলক্ষে আয়োজিত এক কৃষিবেলায় উদ্বোধন করেন কারা ও পকারেতমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে সারা ভারত ফ্যোরার্ড রকের সাধারণ সম্পাদক চিত্ত বসু (এম পি) বলেন যে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই ভূমি বটন ব্যবস্থাকে রূপায়িত করতে চাইছে। কিন্তু আদালতের নির্দেশে বারবার তা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই ভূমি সংস্কার আইনকে রাখতে হবে আদালতের বাইরে, ছোট চাষী অল্প জমির মালিক আমাদের শত্রু নয়। কোন হঠকারী নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে না যাতে কৃষকরা ভয় পেয়ে কংগ্রেসের দিকে চলে যায়। সারা ভারত অগ্রগামী কিষাণ সভার সভাপতি রাজ্যমন্ত্রী কমল গুহ বলেন, ইন্দিরা গান্ধী জেনে রাখুন বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙা হলে উদ্ভাল আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। সি পি এম সি পি আই-এর কৃষক সংগঠনের নেতারাও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল নার্সিং এসোসিয়েশনের ৭ম রাজ্য সম্মেলন ১৫ই মার্চ

শুরু হয় চিত্তরঞ্জন ক্যাননসার হাসপাতাল হলে। সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাজ্যের স্বাস্থ্যকল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিরুপমা চ্যাটার্জী বলেন, আজও ভারতের যেহেঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পারিনি, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগে দূরের কথা। তাই নারীদেরকে অধিকারের জন্ত লড়াইতে হবে।

১লা এপ্রিল থেকে পেনসন দেওয়া, পে কমিশনের রায় কার্যকর করা ইত্যাদি ১৪ দফা দাবি আদায়ের জন্ত প্রাইভেট কলেজগুলোর প্রায় দশ হাজার কর্মচারী ২০শে মার্চ একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন। এদিন তাঁরা বিধানসভার পূর্বে ডেপুটেশনে যান। দাবি মেটানোর ব্যাপারে সরকারের উদাসীন দেখলে তাঁরা ২১শে এপ্রিল থেকে লাগাতার ধর্মঘট করবেন।

২ই মার্চ কলকাতার ইন্ডেন্টস হল শপ এসমগ্রীক কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের এক সভার দোকান কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। ২৪শে মার্চ সকালে শহীদ মিনারে মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দোকান কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি দেন।

পি, টি, আই, ইউ, এন, আই, হিন্দুস্তান সমাচার এবং সমাচার ভারতী সারা দেশের এই চারটি সংবাদ পত্রবরাহ প্রতিষ্ঠান ১৬ই মার্চ ধর্মঘট পালন করে। সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীদের বেতন হার পুনর্গঠনের জন্ত নিযুক্ত পালের টাই-বুনাালের অন্তর্বর্তী রায়ে সংবাদ

‘পরগাম’ পত্রিকার কর্মচারীদের সংগ্রাম

পরগাম পত্রিকার কর্তৃপক্ষ গত দু মাসে মোট ১৯জন কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন। এছাড়া হাজিরা খাতা, পে-সীট ও আইডেন্টিটি কার্ড চালুর দাবীও কর্তৃপক্ষ মানতে রাজী নন। বেতন বোর্ডের রায় অস্বাধ্যী ন্যূনতম বেতনহারও চালু হয়নি। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার নামে হুঁমাস ধরে শুধু কালক্ষেপ করেছেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপরিউক্ত দাবীতে ২৫ মার্চ মঙ্গলবার প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ প্রেসের কর্মীদের পরগাম পত্রিকার কর্মী হিসাবে স্বীকার কর-

সংস্হাগুলিকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়। ফলে ১৯শে তারিখে প্রত্যন্তী দৈনিক-ভুলোয় দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের খবর মেলেনি।

১৫ই মার্চ সৈফী হলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্মচারী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন হয়। সম্মেলন থেকে একশ জনের একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদকীয় রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার পর বিশ দফার একটি দাবী-পনদ নিয়ে আলোচনা হয়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের ভূমিকা ও কর্তব্য প্রসঙ্গে সমিতির নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদে এস, এফ, আই, এ, আই, এম, এক, সি এস, ইউ ও ছাত্র রকের ডাকে ২০শে মার্চ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্লাস বরকট করা হয়।

২১শে মার্চ বেলা দশটা নাগাদ মগুরায় কাছে জি, টি রোডের ওপর সাঁওতালদের একটি বাহিনী প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে। একটি কোজদারী মাঝালায় জনৈক সাঁওতাল যুবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে এই পরিস্থিতি হয়।

এদিন পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদের বিশাখাপত্তনম জাহাঙ্গীর কান্থামার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। পরের দিনও ধর্মঘট। কারখানা এখন পুলিশের পাহারায়।

পশ্চিমবঙ্গের অস্থূল গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করার জন্ত সভাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন জেলায় ও কলকাতার ধর্মতলার ২১ মার্চ সন্ধ্যা হাজার হাজার সরকারী কর্মচারী মিছিল করে আসেন। মিছিলের স্লোগান ছিল, ‘রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে’ ‘অজিত গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াই করেই রাখতে হবে।’

ছেম না। প্রেস কর্মীদের কট্টা-ক্টরের কর্মী বলে চালাবার চেষ্টা করছেন। অথচ সংবাদপত্রে কোন ঠিকাদারী ব্যবস্থা চলে না বা বে-আইনী তা কর্তৃপক্ষের জানা নেই। রবীন পাণ্ডা নামে জনৈক ব্যক্তিকে ঠিকাদার বসা হচ্ছে। উক্ত ব্যক্তি রেজিষ্টার্ড ঠিকাদারও নন। প্রেসে সরকারী আইন অস্বাধ্যী ন্যূনতম বেতনও দেওয়া হয় না।

এই অবিচারের প্রতিবাদে আপোষ আলোচনার পথ ব্যর্থ হওয়ার কর্মচারীরা সংগ্রামের পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন পরগাম পত্রিকার কর্মীদের সায়সম্মত দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

রোডেশিয়ার স্বাধীনতার নেপথ্যে

পশ্চিমের যড়যন্ত্র

তপন বসু

আজ থেকে ১৪-১৫ বছর আগে রোডেশিয়ার ঔপনিবেশিকতাবাদী খেতাব বেনিয়ারা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করার অব্যবহিত পর থেকেই, অর্থাৎ ১৯৬৫-১৯৬৬ সাল থেকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়করা কিউবাকে অক্ষবিন্দু করে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ সহ রোডেশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য জিম্বাবুয়ের তৎকালীন ইয়ান স্মিথ সরকারের সঙ্গে উত্তরোত্তর অশান্ত আতাত করতে থাকে। কিন্তু মরিশা আক্রমণ, যুদ্ধ আর কুটিল চক্রান্ত রচনা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকতে পারেনা। তাই বনেনী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ব্রিটিশ কিনাল-পতিয়া তাদের বর্তমান পৃষ্ঠপোষক মার্কিনীদের শিক্ষায়তনে রূপ বিভাঙ্কনের অধ্যয়ন শুরু করে ছিল।

একাধিক দেশে সোভিয়েট আগ্রাসনের ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে ভারত মহাসাগরে মার্কিনী সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেনের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। কারণ ১৯৭৭-৭৮ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে, রাশিয়া ও ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলো ঐ দু বছরে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বায়ু যাতায়াত করেছে। আর জল রক্ষিণ আফ্রিকা, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, রোডেশিয়া ইত্যাদি নিয়ে ব্রিটেনের খুঁই ছুঁচিন্তা ছিল। কিন্তু দুই বৃহৎ শক্তির অস্ত্র প্রতিযোগিতা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার আমেরিকা - ব্রিটেনকে অনেকটা আশঙ্ক করতে পেরেছে।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রশাসন রোডেশিয়ার খেতাব শাসকদের সম্পূর্ণ বশতাব্দীকার করার। অথচ একই সমস্তা নিয়ে লুনাফার অল্পমিত কমনওয়েলথ সম্মেলনের কর্ম সমিতির সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদী কায়েরী স্বার্থের ভাবে-হার স্মিথ মুজোরেওরা ফ্যানিষ্টচক কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হয়নি।

১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাস নাগাদ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ইয়ান স্মিথ এক ভূয়া নির্বাচনের মাধ্যমে রোডেশিয়ার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের এক অভিনব কৌশল চালু করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। এ ব্যাপারে তারা স্থানীয় দালাল হিসাবে বিশপ

মুজোরেওরাকে খুঁজে বার করে এবং তাকে দিয়ে সালিসবারীর তথাকথিত 'কৃফাক' সরকার গঠন করে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত কৃফাকদের সঙ্গে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার নির্মম নাটকটি আফ্রিকা এবং তামাম বিশ্বের শান্তিকামী ও গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণসহ জাতিসংঘও মেনে নিতে পারেনি। এমনকি লুনাফার অল্পমিত কমনওয়েলথ সম্মেলনও এই নির্দেশ দিয়েছিল যে "স্বাধীনতার স্বার্থেই ব্রিটিশ সরকার তার প্রশাসনিক ক্ষমতা কয়েক মাসের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে রোডেশিয়ার অধিকার ও কর্তৃত্ব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃফাকদের হাতে অর্পণ করবে।" কিন্তু অবাধ বিস্তারিত নয়নে লক্ষ্য করা গেছে যে, সারা দুনিয়া যখন কৃফাক স্বার্থ বিরোধী চক্রান্তের জন্য ব্রিটিশ কোটিপতিদের বিস্তার জানাচ্ছে, তখন চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটেনের খ্যাচার সরকার রোডেশিয়ার পশ্চিমী পুঁজিহাটীর স্বার্থকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার জন্য স্মিথ-মুজোরেওরা চক্রর কাছে সাঁজোয়া গাড়ীতে করে চক্রান্তের রু-প্রিষ্ট যোগান দিতে থাকে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন মহাযুদ্ধ-কালীন রক্তাক্ত ইতিহাসের খল নায়ক চার্চিলের যোগ্য উত্তরসূরী, ইংল্যান্ডের রাজকীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার চার্চিলের অপর এক উত্তরপুরুষ এবং রক্ষণশীল দলের ধ্রুতর নেতা লর্ড সোমেরসকে রোডেশিয়ার শাঠ্য।

হিংস্র সোমেরস জিম্বাবুয়ে পৌছানো মাত্রই কৃফাক সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে রোডেশিয়ার অধিকার অর্পণ করার নামে ১৫ বছরের জরুরী আইনের ঘোষণা আরো ছমাস বাড়ানো হয়। দেশপ্রেমিক ক্রস্টের যে সমস্ত নেতা ও কর্মী প্রাক-স্বাধীনতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায়, হয় তাদের হত্যা করা হয়, নয় গ্রেপ্তার করা হয়। বিদেশে নির্বাসিত রাজনৈতিক কর্মীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সর্বকক্ষে তাদের বাধা দেওয়া হতে থাকে। অবশেষে জাতীয়তাবাদী কৃফাক নেতা মুগাবে ও নকোমোকে বায়ংবার খুন করার যড়যন্ত্র হতে থাকে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নির্বাচনী কার্যকলাপ শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ অর্থনীতির বিপাক

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

ক্যাথলিক গ্রুপ অব ইকনমিস্টস ব্রিটেনের নামকরা অর্থনীতিবিদদের এক সুপরিচিত গোষ্ঠী। ব্রিটেন ও বিশ্বের অর্থনীতির গতিবিধি ও হাল-চাল সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর মতামত সবার কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার শিকাগো অর্থনীতিবিদদের গোষ্ঠীর মতামতও বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব সম্পন্ন। শিকাগো গোষ্ঠীর মতামত নিয়েই বিশ্ব মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে বিখ্যাত ট্রফিন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার পুনর্বিভাগে ট্রফিন পরিকল্পনার অবদান অস্বীকার করা যায় না।

যাই হোক, ব্রিটেনের ক্যাথলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গত সপ্তাহে প্রকাশিত এক অর্থনৈতিক সমীক্ষার ব্রিটেনের অর্থনীতি ১৯৮০-৮১ সালে কি রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে তার এক সুচিহ্নিত চিত্র হাজির করেছেন। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চাল-চিলের বেশকিছু মিল আছে। বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-চিন্তা আমাদের প্রাক্তন শাসক ব্রিটেনের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়। উভয় দেশেই প্রধানমন্ত্রী জাঁদরেল মহিলা। উভয় প্রধানমন্ত্রীই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি-স্থিরি নিয়ে আনার সর্বধা প্রয়াস করছেন বলে দাবী করেন।

কিন্তু আসলে অর্থনীতির একটা নিজস্ব ধারা আছে। অর্থনীতির গতিবেগ এবং অগ্রগতিতে এই নিজস্ব ধারার উপর নির্ভরশীল। কোটি কোটি মানুষ জীবিকার অন্বেষণে বহু-বিধ উৎপাদন কর্মে আত্মনিয়োগ করে। বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে এই কোটি কোটি মানুষের সংঘবদ্ধ কাজ-কর্মকে সংগঠিত করতে হয়। নতুবা শক্তির অপচয় ঘটে ও ফলাফলের তারতম্য হয়। এই সমস্ত সংগঠন যখন ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে তখন তার প্রধান লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক মুদ্রা অর্জন করা। অতর্কিতক এই লক্ষ্যগুলি যখন সামাজিক মালিকানায় সংগঠিত হয় তখন তার লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও সর্বাধিক ভোগ। প্রথম জাতীয় সংগঠনকে আমরা বলি পুঁজিবাদ, দ্বিতীয় ধরনের সংগঠনকে বলা হয় সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্রিটেন ও ভারতে সমাজতন্ত্রী চিন্তা করার বহু মানুষ আছেন। কিন্তু দুদেশেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি

প্রতিষ্ঠিত। সমাজতন্ত্রী প্রমিকদল যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তখনো ব্রিটেনে উৎপাদন ও বন্টনে পুঁজিবাদী পদ্ধতি অঙ্গসরণ করা হতো। ভারতেও তাই।

ব্রিটেনে প্রমিকদলের আমলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। কারণ পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে বর্তমান যুগে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবু প্রমিকদল পুঁজিবাদ পরিহার করে নি। পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই তারা কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। তারা ইম্পাত, কয়লা, মোটর গাড়ি প্রভৃতি কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছিল। তবু মুনাকান্তিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বজায় ছিল। ফলে অর্থনৈতিক সংকটের কবল থেকে ব্রিটিশ অর্থনীতি রক্ষা পায় নি। আমাদের দেশেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়েছে। তবু অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা ক্রমাগত

আর্থনীতি

বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ মিল অর্থনীতি বা পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পুঁজিবাদের সংমিশ্রণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভোল আদৌ পালাটায় নি। তাই ব্রিটেনের মত আমাদের দেশেও সংকট বাড়ছে। কর্মছে না।

ব্রিটেনের সংকটের চরিত্রটা কি? ক্যাথলিক অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী বলছেন ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল গত বছর মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর যে সরকারী বিধিব্যবস্থা নিয়েছে তার ফলে ব্রিটেন এক ভয়াবহ মন্দা ও যুগপৎ মুদ্রাফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির সম্মুখীন। তারা বলছেন ১৯৮০ সালে ব্রিটেনের মুদ্রাফীতি ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এ বছর ব্রিটেনে বেকার সংখ্যা পনেরো লক্ষ। আগামী বছর তা পচিশ লক্ষ হবে এবং ১৯৮২ সাল নাগাদ ব্রিটেনের মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে পঁয়ত্রিশ লাখ।

ব্রিটেনের জাঁদরেল মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এই সংকট প্রতিরোধের জন্যে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার ফলে পুঁজিপতিদের সুবিধা হবে, কিন্তু সাধারণ ইংরাজ পরিবারগুলি প্রচণ্ড দুর্গতির মধ্যে হাবুডুবু খাবে। থ্যাচারের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার পরলা বাজেটে বড় বড়

আয়করদাতাদের ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। মোটা মাইনের কোম্পানী ডাইরেটরী ও অফিসার-বৃন্দ, শেয়ার বাজারের দালাল ও উচ্চ মধ্যবিত্তেরাও নানা ভাবে ছাড় পেয়েছেন। এদের সংখ্যা ব্রিটেনের ১০ শতাংশ মাত্র। এদের ছাড় দেওয়ার জন্যে ২০০ কোটি পাউণ্ড কম রাজস্ব পাওয়া যাবে। অতর্কিতক বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বেকারী ভাতা ইত্যাদি বাবদ ৩০০ কোটি পাউণ্ড কম ব্যয় করা হয়েছে। আবার ব্রিটেনের সামরিক ব্যয় ৩২০ কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ ব্রিটেন এখন এমন বিপন্ন নহু যে তার পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আদৌ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তবু কেন সামরিক খরচ বাড়ানো হলো? কারণ ব্রিটেনের সমর-শিল্পকে রাজকোষের অর্বে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। এর ফলে মুষ্টিমেয় শিল্পের মালিকেরা মোটা মুনাফা করবে।

ক্যাথলিক গোত্র মতে রক্ষণশীল সরকারের এই নীতি ব্রিটেনে ভয়াবহ মন্দা থেকে আনছে। পাউণ্ডের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে বৈদেশিক বাজারে ব্রিটেনের পণ্যের দাম চড়া এবং প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ পণ্য ক্রমাগত পিছু হটছে। ব্রিটিশ সরকারও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যাংক হ্রদের হার বাড়িয়ে দেবেন। ফলে উৎপাদনমূলক কাজ-কর্ম হাস পাবে এবং জিনিসপত্রের অনটন ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।

ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার আপন প্রেমীবার্বে ব্রিটেনের সাধারণ প্রম-জীবী মানুষের কলিরোজগারের উপর যে আক্রান্ত করছে তা সংকটের বোঝা ধনিকশ্রেণীর উপর থেকে প্রমজীবী জনগণের উপর চাপিয়ে দেবার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

এদেশে আমাদের সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সরকারী নেতারা ব্রিটিশ কায়দা অনুসরণ করতে অন্ত্যস্ত। সুতরাং অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবেলা ফেড়ারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ এই দাবী তুলেছে। নতুন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় বণিক সভার চাপ প্রতিরোধ করবেন তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং কেন্দ্রীয় বাজেটে আপাততঃ নতুন কর না বসিয়ে অপেক্ষা করা হচ্ছে নয়টি রাজ্য বিধান সভার আসন নির্বাচন পর্যন্ত। তারপরেই ২৭০০ কোটি টাকার ঘাটতি মোটানোর জন্যে অন্ততঃ ১২০০ থেকে ১৩০০ কোটি শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

বেগম সুফিয়া কামাল

অজুন দাস

অতীতের অনেক কথাই আজ হাস্তকর মনে হয়। কোন কোন কথা তো একেবারেই অবিশ্বাস—হাস্তকর তো বটেই। বেগম সুফিয়া কামালের জীবনের তেমনি একটি ঘটনা হলো বিমানে আরোহণ করা। আজ একথা কে বিশ্বাস করবে যে, বিমানে আরোহণের ক্ষেত্রে এই মহিলার ছবি পত্রিকার ছাপা হয়ে ছিলো? অবিশ্বাস হলেও একথা সত্য। কলকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সৈনিক সুফিয়া কামালের ছবি ছাপা হয়েছিলো। কারণ তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম যিনি বিমানে আরোহণের করলেন। বলা বাহুল্য এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিলো প্রচুর। তাঁর মাথা ও খণ্ডর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তলব করেছিলেন এবং নিজ বাড়িতে আটক করেছিলেন। আমি আশা করি এই ঘটনার দ্বারা কবি সুফিয়া কামালের সনমানস বোকা সহজ হবে।

১৯১১ সালের ২০শে জুন ব্রিটিশ জেলায় শায়েস্তাবাদ পরগণায় সুফিয়া কামালের জন্ম। তাঁর নানা মৈয়দ মুয়াজ্জহ হোসেন চৌধুরী শায়েস্তাবাদের নবাব ছিলেন। তাঁর বাবা মৈয়দ আবদুল বারি জিপুরা জেলায় আইনব্যবসা করতেন। সুফিয়া কামাল বাবাকে দেখেননি। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত মাস তখন তাঁর বাবা সন্ন্যাসধর্ম (দরবেশি) গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। তারপর তাঁর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সুফিয়া কামাল নানার বাড়িতে জগগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হয়েছেন। এই পরিবারটি ছিলো বেশ অভিজাত এবং সেই পরিমাণে ধানিকটা রক্ষণশীলও। এই রক্ষণশীলতা মেরেদের ক্ষেত্রেই ছিলো সর্বাধিক কঠোর। বিশেষতঃ অবরোধপ্রথা ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেই কঠোরতা বেশি প্রযোজ্য হতো। এই পরিবারে মাতৃভাষা বাংলায় প্রতি অনীহা ভাব থাকলেও সুফিয়া কামালের মা ভালো বাংলা জানতেন এবং এই ক্ষেত্রে সুফিয়া কামালের ওপর যাদের প্রভাবও ছিলো প্রবল। এছাড়া এই বাড়িতে পাঠ-চর্চায় বিশেষ স্বযোগ-সুবিধে ছিলো—যা তাঁকে পাঠ-অধ্যয়নে আকৃষ্ট করেছিলো।

এগারো বছর বয়সে সুফিয়ার বিয়ে হয় তাঁর মামাতো ভাই মৈয়দ নেহলে হোসেনের সঙ্গে। যদিও আগে থেকেই সাহিত্যচর্চায় প্রতি

সুফিয়ার ঝোঁক ছিলো, তথাপি নেহলে হোসেনের উৎসাহ ও অপ্রেরণায় সাহিত্যচর্চায় প্রতি তাঁর ঝোঁক বাড়তে এবং তিনি এই স্বযোগের পূর্ণ সম্ভাবহার করেন। এই সময় তিনি সুফিয়া এন হোসেন নামে সমধিক পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু সুফিয়া এন হোসেনের এই স্বপ্ন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৩২ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের কর্মধারা ভিন্নভাবে প্রবাহিত হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত হন এবং সাত বছর যাবত এই কাজে নিয়োজিত থাকেন। শিক্ষায়ত্নী থাকা কালে তাঁর সাহিত্যচর্চা পূর্ণোন্মেষে চলতে থাকে। এই সময় মাসিক 'সংগীত' পত্রিকার মাধ্যমে যে সাহিত্যের আলস বসতো তা ছিলো জমজমাট। পরবর্তীকালে যেসব মুসলমান শিল্পী সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এই আড্ডায় মিলিত হতেন এবং সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। ১৯৩৯ সালে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। চট্টগ্রামের জনাব কামালুদ্দীন সাহেব তখন কলকাতায় ডিভিশন্যাল একাউন্ট্যান্ট। এই বিয়ের পর তাঁর জীবনে অঞ্চল অবসরিস কিংবে আসে এবং ফলে তাঁর পক্ষে সাহিত্যচর্চা সহজ হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই তাঁর কবি খ্যাতি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর সাহিত্যচর্চায় স্বত্বপাত হয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনা পত্রিকার ছাপা হয়। ব্রিটিশাল থেকে প্রকাশিত 'তরুণ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত এই 'লেখাটি' ছিলো 'সৈনিক বন্ধু' নামে একটি গল্প। এই সময় তিনি সুফিয়া এন হোসেন নামে লিখতেন। আজও তৎকালীন পত্র পত্রিকায় এই নামে লেখা দেখা যায়। এই সময় কবি নজরুল ইসলামের মাধ্যমে তিনি 'সংগীত' পত্রিকায় সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাতে লিখতে থাকেন। 'সংগীত' ছাড়াও তিনি 'অভিধান' নামক পত্রিকায়ও লিখতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর কবিখ্যাতি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন।

সুফিয়া কামালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুবই চমকপ্রদ। সেটা ১৯২৮ সালের কথা। কবির জন্মদিন উপলক্ষে সুফিয়া কামাল একটি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি পাঠানোর কয়েকদিন পরেই কবি তাঁকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। সুফিয়া কামাল তাঁর স্বামী নেহাল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে কবি-গুরুর বাড়িতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। তিনি সুফিয়ার স্বামীকে এই উপদেশ প্রদান করেন, যেন সুফিয়ার কাজে ও কর্মে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেন। জোড়াসাঁকো থেকে ফিরে আসার সময় কবি তাঁকে তাঁর 'গোরা' উপন্যাসখানি উপহার দেন। বইয়ের উপর কবি স্বহস্তে লিখে দেন, "শ্রীমতী কল্যাণীরা সুফিয়া খাতুনকে স্নেহ উপহার দিলায়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৭ই আশ্বিন, ১৩৩৩।" বইখানি এখনো তাঁর কাছে রয়েছে। এর দুই বছর পর (১৯৩০) কাজী নজরুল ইসলামের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় পূর্ব অসুস্থিত হয়েছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটে অসুস্থিত এক সত্কার। এই সত্কারেই মেতাজী স্তাবচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

আরো দুজন পুলিশ অফিসার দোষী সাব্যস্ত

আরো দুজন পুলিশ অফিসার "হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনে" দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এই দুই পুলিশ অফিসার হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রাক্তন বড়বাবু শ্রীকেশ মণ্ডল এবং ঐ এলাকার ডি এস পি শ্রীউদয় দত্ত। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রীহরতোষ চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের নিকট প্রদত্ত রিপোর্টে স্থপাশিত করেছেন যে, এই দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৭/১৯৩০/২০৩/২১১/৩৪৪ এবং ১০৯ ধারায় মামলা করা হোক। এই দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রীবিমান হাজরা নামক জনৈক স্থানীয় সাংবাদিককে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে মিনা আইনে অর্ধেভাবে আটক করা। এই অভিযোগ জরুরী অবস্থাকালীন আভিষা বিষয়ক তদন্ত কমিশনে প্রমাণিত হয়েছে এবং উপরোক্ত দুই পুলিশ অফিসার কমিশনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, জরুরী অবস্থার সময়ে সাংবাদিক শ্রীবিমান হাজরা একটি সংবাদ লিখে স্থানীয় সেনসর অফিসারের কাছে

বেগম কবি সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মে অপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তাদের ভেতর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কাজী নজরুল ইসলামের নাম। সুফিয়া কামাল তাঁকে 'কাজী হাজ' বলে সম্বোধন করতেন। সুফিয়া কামাল এই সময় ওয়েলেসলি স্কোরারের (বর্তমানে হাজি মহসিন স্কোরার) কাছে দ্বিধার বন্ধ লেনে থাকতেন। এই বাল্য কবি নিরমিত আসতেন এবং একটা সাহিত্য আড্ডা গড়ে তুলতেন। তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে এসে আড্ডা জমাতেন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর বেগম সুফিয়া কামাল ঢাকা চলে আসেন এবং তাঁর জীবনকে ভিন্ন এক খাতে প্রবাহিত করে দেন। এই সময় থেকে তাঁর জীবনের গতি এমন একদিকে প্রবাহিত হয়, যার সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ববাংলার মানুষের জীবনে যে প্রবন্ধমানমে আসে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নেই। অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে দেউলিয়ার পরিণত করার যে চক্রান্ত চলে তাতে সার দেওয়া সেদিন অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। তবে নানা কারণে হয়ত সবাই তাঁর প্রতিবাদ করতে পারেনি। ফলে অনেককেই নিজের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিবিকার থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বেগম সুফিয়া কামালের মতো অনেকে তাঁর প্রতিবাদও করেছিলেন। ফলে পাকিস্তানের যে কোন সংকটের সম্মুখীন হতে প্রতিবাদমুখর হতে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের নির্ধারিত মাসুকের দ্বারা আদায়ের সংগ্রামে তাঁকে একাধিকবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে মার্চেও নামতে হয়েছিলো। তবে একজন সমাজ সেবিনী হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ছিলো সর্বাধিক। তিনি নারী মুক্তি আন্দোলনের একজন নিরলস কর্মী। বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনে আদর্শ। তাঁর পর আর কেউ নারীর পক্ষেই এভাবে কাজে বাপিয়ে পড়া সম্ভবও হয়নি। উপায়ও ছিলোনা।

গতপন্থ মিলিয়ে তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলো হলো 'কোরান কাটা' (গল্প); 'সাকের মায়া' 'মায়ার কাজল', 'যৌলজীবন', 'উদ্বাস পৃথিবী', 'দি ওয়ান' (কাব্য) প্রভৃতি। তাঁর কবিতার গ্রামীণ জীবনের যে আবহ ধরা পড়েছে তা সত্যি বিশ্বকর।

আজও তিনি সমাজ ও সাহিত্যের সেবার নিরলস।

পেশ করেন ছাড়পত্রের জন্ম। ঐ সংবাদের প্রতিপাত্ত বিষয় ছিল কিতাবে পুলিশ মহলে দুর্নীতি চলছে এবং দোষী ব্যক্তিদের মিসায় আটক না করে আটক করা হচ্ছে নির্দোষের। এই সংবাদ সেনসরের ছাড়পত্র পারিনি। কিছুদিন পর উক্ত সাংবাদিক স্থানীয় ডি এস পি শ্রীউদয় দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলে উক্ত ডি এস পি সাংবাদিকের নিকট সংবাদ স্বজ্ঞ জানতে চান। সংবাদ স্বজ্ঞ প্রকাশ না করার উক্ত সাংবাদিককে চরম পরিণতির চমকী দেন ডি এস পি শ্রীউদয় দত্ত। এর কিছুদিন পর সাংবাদিক শ্রীবিমান হাজরা আরও একটি সংবাদ লেখেন পুলিশী দুর্নীতির এবং তার সঙ্গে ডি এস পি জড়িত আছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সংবাদটি সেনসর পাশ করেনি। কিন্তু উদয়বাবু এ বিষয়ে জানতে পারেন। ১৯৭৭ সালের ৭ই জানুয়ারী শ্রীবিমান হাজরা যখন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন একজন পুলিশ কনস্টেবল তাকে দাঁড়াতে বলে। ঘটনাস্থলে হঠাৎ দেখা যায় আরও দুজন পুলিশ কনস্টেবলকে এবং শ্রীতারাণদ চাটাজী

নামে একজন লাব 'ইন্সপেক্টরকে'। বিমানবাবুর হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি পরিয়ে ধরা হয়। তারপর বিমানবাবুকে হাটিয়ে থানার দিকে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে। স্বাক্ষর বিমানবাবুর পিতা এই ঘটনা দেখে এগিয়ে আসেন। সব শুনে তিনি এবং একজন আইনজীবী পুলিশ কর্মীদের অহরোধ করেন এইভাবে না নিয়ে বিমানকে বরং রিকশায় করে নিয়ে যান। পুলিশকর্মীরা বলেন ডি এস পি-র কড়া নির্দেশ আছে এইভাবে নিয়ে যাবার জন্ম। থানায় পৌঁছে বিমানবাবু দেখতে পান ডি এস পি শ্রীউদয় দত্ত থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে হাজতে পুরে দেওয়া হয়। মিসার কাগজে প্রকাশ করতে বাধ্য করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, ১৯৭৭ সালের পরমা আহুয়ারী মাসের শোভাযাত্রার দিন তিনি নারী সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রচার করছিলেন এবং শোভাযাত্রার একটি চৌল ফাটিয়ে দিয়েছিলেন।

কমিশন সংগঠিত নথিপত্র তলব করে দেখেছেন এবং সাক্ষ্যগ্রহণে শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

আইনী শৃংখলা আইনী বিশৃংখলা আইনী নৈরাজ্য

শ্রীপতি নন্দী

শব্দ বন্ধ, কাকন-প্রেম পরম ধর্ম। শৃংগর্ত প্রতিশ্রুতি নিত্যই আওরাজ নর, ব্রহ্মও বটে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয়কর ভোটমূল্য আর জিনিসপত্রের অগ্রিমূল্য "দৌহে দৌহারে করে আলিঙ্গন।" রাজনীতির নামে ফারহাবাজীর যজ্ঞ পুজায় ফলাফল লাক্ষ্য—নির্বাচনের পরমুহুর্তে মূল্যমানের রকেট-বাজা, অনাচারের একটানা পঞ্চবার্ষিকী মহোৎসব। 'গণতন্ত্র' সিদ্ধিলাভের মোক্ষ উপায়, বনিকুল আর 'কর্মী'-দের জন্ম টু-পাইসবৃত্তির আদর্শ রাষ্ট্র-নিজাম। পাঁচ দিনের প্রতিশ্রুতি পরবর্তী পাঁচ বছরের প্রতিটি দিন দেশের মুখে ঘাসের পিণ্ডি হয়ে প্রবেশ করে। অতএব, "জিও জিও" জাবর কাটি, বোলাজলে মাছ-ধর, নয়তো শেষ জমিটা জোতদারকে জমা দাও আর তিলে তিলে শুকিয়ে মর। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

এ বছরে মূল্যবৃদ্ধির নতুন রেকর্ড। ডলার-রুবলের পদাশ্রিত ভারতীয় 'রুপেরা' স্বদেশে সর্বশক্তিমান। বিপণ্ড ইমার্জেন্সীর সময়ও মূল্যবৃদ্ধির বান ডেকেছিল—প্রতি-দিনে, প্রতি সকাল সন্ধ্যার দাম বাড়তো (অবশ্য, আকাশবাণীর দেশাববোধক পরিসংখ্যানে অব্যমূল্য নাকি কমে গিয়েছিল—ভাগে ভাগে বহুভাগ) 'গতিশীল উন্নয়ন'-এর নিয়মশৃংখলা অমুযায়ী। তাহলে অব্যমূল্যের একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আছে, গণতন্ত্রের 'কাউণ্ডার ফাওয়ার'-দের তো আছেই, এদের দেওয়া অত্যাশঙ্কক পণ্য আইন আছে এবং ছিল, ডি-আই আর ছিল, অর্থনৈতিক ঠগী ধরার স্বত্ত্ব পিণ্ডি এ্যাক্ট হয়েছে, তবে অমুযায়ী ঠগীকুল জানে: আইন আছে মানীয় মান রাখতে, 'প্রগতি'-কে আরো গতি দিতে।

অতএব, প্রগতিশীল মূল্যমান উদ্বগতি থাকে, মাঝে মাঝে বাজারের চাপে পা মটকালেও কখনও গতিমুখ পান্টায় না; অতএব, মহামান্য ঠগী কখনও ধরা পড়েনি, ধরা পড়বে না, শত্নের মাংস শত্নে খায় না। একচেটিয়া পুঞ্জিবৈরাগী লড়াই।

অতএব, বোলাজলে মস্ত-শিকারী 'সবুজ'-বাহিনী আশার আলোয় মুখ দেবেছে, রাহমুল 'মুক্তিস্বর্গের' রেতেল আলোয় পাথনা মেলছে। আবার 'সবুজ (বাজ) পাখীর অবাধ খেলা—পাড়ার পাড়ার বোম্বটেবাজী, খেয়ালখুশি বোমাবাজী, 'অশারেশন ওয়াগন' আর হানাহানির অহিংসাবিধব, শনি-

কালী-শির-সত্যানারায়ণ পুজার ধর্ম-বিধব, 'খাতা টোকাটুকির 'শিকা-বাচাও' বিধব, রাস্তাঘাটে খেউড় খিতির সাংস্কৃতিক বিধব—কালগুলি নতুন উত্তমে শুরু হয়ে গেছে। তবু কাজের শেষ নেই—'হাত-এ 'হাত'এ 'চেয়ার' চমকিয়ে রক্তারক্তি। সু-শক্তি 'ইযুথ পাওয়ার'।

মুক্তিস্বর্গের কিবা দিন রাত, অষ্টগ্রহর আগরণ। চোখে ঘুম, কি আর ক্ষুদে তারকাধরই বা আছে? শুধুই কাজ—পাটির কাজ, 'জিজিয়া' আদায়ের-কাজ, অঞ্চল ভাপাভাগির কাজ। পাটির কর্মে আর বীরের ধর্মে অবিচল থেকে স্বপোত্রে স্বপোত্রে মৃদুবেশের মূল্যপূর্ব অস্থান করে অতঃপর দেশে আইনশৃংখলার শোকে প্রবাহ বাক্যের 'কুমীর' হয়ে থাকতে হয় যে। অহিংস আন্দোলন! মতো আগ্রহ।

আইন শৃংখলার একেবারে পয়ার পায়; ন নটি রাজ্য সরকার এখন 'মায়ের ভোগে'। আইনশৃংখলার এবার বিগুন কপাল—'জমানা আ গিয়া, ফিরতি আ গিয়া'—মুক্ত আইন আর মুক্তকচ্ছ শৃংখলার লুকুটি-শাসনে ধনমান-ছেলেমেয়েবো ইন্তক বিষয় 'সামলোতে অতঃপর সকলেই তৎপর হবে। আইনশৃংখলার সবুজ মেলা!

মুগ্ধ ব্যাপারটা কাঠামোর বিচারে ভারতীয় হলেও নির্ধারিত জাতীয় চরিত্রহীন। বাতিল-হয়ে-যাওয়া পুঞ্জিবাদী জীবনধারাকে জিইয়ে রাখতে কীপপ্রাণ শাসকশ্রেণী তার শাসনস্বত্বের ধর্ম-কর্ম-দর্শনে আইনী প্রতিক্রিয়ার সমস্ত অন্তঃশক্তিকে সমাবেশ করেছে এবং দেশীবিদেশী পুঞ্জি শাসনের গতিপথ-গুলিকে নিষ্কট করে রাখতে শক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে 'আইন-শৃংখলা'র বিচিত্র বিস্তারিত জাতীয় জীবনের সমস্ত স্তরে বিতরণকামী প্রতিক্রিয়াকে মনস্ত দিচ্ছে।

এ যুক্তি মালিকশ্রেণী, এ দেশ-শ্রোত্রী 'রাজনীতিক' গোষ্ঠীগুলি, এ অধঃপতিত পাতিবুজোয়া শক্তি একই নাড়ীর টানে নড়ে, একের শোকে অপরকে কাঁদে, একের শক্তি অপরকে যোগায়; এরা একই প্রতিক্রিয়ার গরল ধারণ করে, এরা আইনী অরাজকতার বৈচে-বর্তে থাকার খোয়াব দেখে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে 'মুক্তিস্বর্গ' শুধু একটাই নয়, এমন অপদেবতা আরো আছে, এবং ছিল। আর সেবকরাও শুধুমাত্র ভৈরব (ই)

বাহিনী রূপেই নয়; দেশী বিদেশী পুঞ্জির এমন লুটের বাজারে—'মুক্তহিন্দুর' সর্ববৃহৎ বন্দীশিবিরে পাতিবুজোয়া উদ্বৃত্তির বা 'লাইন' হতে পারে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় পাতিবুজোয়ার বৃহত্তর অংশটি চালাকীর গুণে করে খাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতায় নীতিগত ভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, বৃহত্তর জন-জীবনে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে তীব্রতর করতে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

আইনশৃংখলা দর্শন

দ্বিতীয় ধর্ম দ্বিতীয় রাখে। রাখে দ্বিতীয় মারে কে, মারে দ্বিতীয় রাখে কে—একথা কে না জানে? আর কেউ জাহুক ছাই নাই জাহুক, আপন ঐতিহ্যে বলবতী দ্বিতীয় কুচ-পরোয়া করে না। এ ধারে স্বদেশী পুঞ্জির পুষ্টি, ওধারে তাবৎ বিদেশী পুঞ্জির ভুষ্টি চাটখানি কাজ নর। আর 'কাজের' লতাই চাই শক্ত হাঁড়, শক্ত হাতল আর অনন্ত উদ্যম পরমাণু।

কেজ বলে, রাজ্যের দায় রাজ্য-গুলির আর দেশের দায় কেন্দ্রের। সব রাজ্য একত্র যোগ করলে দেশের দায়, অর্থাৎ বিদেশী পুঞ্জির ভারত-সেবা আর ভারতীয় পুঞ্জির বিদেশ-সেবা; তৎসহ দেশগঠন—বিশ্বব্যাকের মূল্য দরিরার পানি—জোয়ারের টানে আসে, ভাঁটার টানে যায়—সঙ্গে নিয়ে উর্বর মাটির উর্বরতা, সস্তা প্রেমের আর কাঁচামালের ডালি; এ জোয়ারজলের মাছ কুমীরের পেটে যায় কিন্তু দরিদ্র দেশবাসী শুধুই স্বপ্নের কড়ি গোনে। পোড়া দেশের সর্ব-ক্ষেত্রেই হাস পাড়ে ডিম আর ডিম খায় দারোগারী—দেশী প্রেমের সস্তা পণ্য দেশীবিদেশী পুঞ্জির ভোগে লাগে। কুমীর আর দারোগার খাই-খাই যেটানো চাটখানি কাজ নর; এজ্ঞে চাই বঞ্চিত জনসাধারণের মধ্যে বশ্যতার শৃংখলা—এক 'হাত', এক জাগার, এক অধঃ শৃংখলা-পাশে খণ্ডে খণ্ডে বিকিপ্ত ভারতকে বেঁধে রাখতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রের শৃংখলা-দর্শন!

তাহলে চাই আইন; উপায়টি অবশ্যই রাজ্যের হাতে তামাক সেবন। কেজ বলে: আইনের কর্তা কেজ, আইনের দায় রাজ্যের। একেজও অধিকারের উৎস কেজ, অধিকারের বিলিব্যবস্থা কেজের মর্জিমাকিক—পাঁচ বছর পর পর শুধু একবার বাজিয়ে নেবে। আইন-

মাকিক, অধিকার-মাকিক শৃংখলা—কেজ যেমন ভাল বাজাবে অমরা তেমন তেমন সখীনাচ নাচবে। কেন্দ্রের দৃষ্টিতে পুঞ্জি হলো শক্তি-কল্পত্রয়, আইন তার রক্ষাকবচ আর আইনী-শৃংখলা তার গ্যারেটি। ফলত: এভাবে পুঞ্জির সঙ্গে প্রগতির, আইন-প্রপেতা শক্তির সঙ্গে নিরীহ ভুক্তভোগীদের, আইনী-শৃংখলার সঙ্গে মুক্তিকামী অস্থির জীবন-প্রবাহের ষাত-প্রতিষাতগুলি যতই তীব্র হচ্ছে, দেশীবিদেশী পুঞ্জিশাহীর সারপত্যগুলি—বেপরোয়া মুনাকা-শিকার, নৈতিক অনাচার, স্বামী মজুরীদাসত্ব, বাধ্যতামূলক বেকারত্ব—ততই বে-আক হয়ে পড়ছে। ভীত সন্ত্রস্ত শাসকশ্রেণী বিংশ শতাব্দীর অতিশাপগুলিকে সর্বভারতীয় আইন শৃংখলার লৌহ খাঁচার সামাল দিচ্ছে। দার্বভৌম প্রজাতন্ত্র।

অমন সাধের খাঁচাকে বাঁচাতে হলে চাই প্রশাসন-বদ্ধ, আর চাই প্রশাসিতের 'শৃংখলাবোধ'। কেজ বলে: দেশ গঠনের দায় তোমার কিন্তু দেশ গঠনের বুলি আমার, সম্পদ-উৎস আমার; গাভীর মুখ তোমার কিন্তু বাঁট আমার, গাছ তোমার ফল আমার, উপায় আমার দায় তোমার। কেজ বলে: প্রাণের দায় প্রাণীর, অতএব যত্নাযত্না তোমার, পোষ্ট মর্টেম আমার; গলা তোমার কিন্তু খাঁকারী আমার—কাটা গেলে তোমার ঘাবে, পোটা থাকলে আমার গুণকীর্তন করবে।

পুলিশ অফিসার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত হয়েছেন যে, শ্রীবিমান হাজরাকে লাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্বেগ প্রণোদিত এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই সাংবাদিক শ্রীবিমান হাজরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ঐ সম্পর্কে রবুনাথগুপ্ত থানার যে মামলা রুজু করা হয়েছিল তাতে যেসব সাক্ষীর নাম ছিল তাদের জেরা করে জানা গেছে যে, সাক্ষীদের অনেকেই ঐ শোভাযাত্রার অংশ নেননি বা এ বিষয়ে অবহিত নন। এছাড়া দায়িত্ব-শীল বহু নাগরিকই কমিশনে বলে-ছেন যে, ঐ সময় বিমান ঘটনাস্থলে ছিলেন না।

কেজ বলে: আইন আমার কিন্তু শাসনের কড়ি রাজ্য সরকারের, বৈদেশিক ঋণ নিয়ে মহাজনী আমার কিন্তু স্বপ্ন পোনার দায় রাজ্যের আর জনসাধারণের, বাণিজ্যমূল্য আমার কিন্তু পণ্যের যোগান রাজ্যগুলির; কর আদায়ের উৎস আমার, অমু-দানের আশায় প্রার্থনা তোমার (রাজ্যের)। কেজারেল ঠিকচার!

আইনী দায়ভাগে একমু অরাজক শৃংখলা সাংবিধানিক ব্যবস্থায় পাকা-পোক্ত—দেশী বিদেশী খোদা-তাল্লাবের খোদগারী উপটোক্তন।

হাজার রাজা, হাজারো উজির। রাজার রাজার মুখ, উজিরে উজিরে ল্যাং-মারামারি। অতএব, নল-খাগড়ার ভবিষ্যৎ উজ্জল! রাজা-উজিরের উদর আছে গিলতে চায়, হাত আছে গোছাতে চায়, মুণ্ড আছে প্যাচ কুণ্ড; মুখ আছে বকতে চায়। এদের উদর-গহ্বর, মুখবির আর মস্তিষ্ক-কন্দর দৈবের দান—অবশ্যই ভারতভূমির অধঃ কল্যাণের জন্ত। কাকনের কোলিন্য আর গাভী টুপির কোলিন্য—দণ্ডীর হাতে দণ্ড, স্বরীর হাতে স্বর। অধঃ মাঠে: হে দণ্ডী হে স্বরী, বোরাও তোমার দণ্ড, বাজাও তোমার স্বর। প্রয়োজনে সংবিধান শোধনে খুঁতেল স্বত্বের খুঁজ ঘোচাও। পচিশ শতাংশ ভোটের জোরে পঁচাত্তর শতাংশ পদান দাও। 'মেক্সিটি'-র মর্মার্থ দৈবের মতই গণিতের স্তীতি।

আইনী নৈরাজ্যে অধৃত আইন কিন্তু শৃংখলার মুখ একটিই মাত্র—'সিদ্ধারের পাওনা সিদ্ধারকে মিটিয়ে দাও' নইলে...। স্বতরাং হে ইতর-শেমাংশ ১ম পৃষ্ঠার

তিনি বলেন যে সেগুলিকে রেখে দেবার নিয়ম। কিন্তু কমিশনে তিনি তা পেশ করতে অক্ষম হন। এর থেকে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উক্ত সেনসর অফিসার ওই সব সংবাদের কপি পুলিশকে সরবরাহ করে থাকবেন।

শ্রীবিমান হাজরাকে গ্রেপ্তার করার ছাত্র, শিক্ষক এমনকি স্থানীয় আইনজীবীরাও তার প্রতিবাদ করে-ছিলেন। তাকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯৭৭ সালের ১৭ই মার্চ। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৭ই জানুয়ারী। পর-বর্তীভাবে যে মামলায় তাকে জড়িত করে মিনা করা হয় তা থেকেও বিমানবাহু অব্যাহতি পান। এর থেকেই এটা প্রমাণিত যে ঐ মামলা ছিল মিথ্যা এবং তাকে অত্যাচারে আটক করা হয়েছিল। কমিশনে ঘোট ৪২ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। তার মধ্যে ১২ জন পুলিশের সাক্ষী।

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

থিয়েটার সেক্টরের পঁচিশ বছর

বিশেষ প্রতিনিধি

একটি ছোট মঞ্চ ১০০ জন বসবার মত ছোট - প্রেক্ষাগৃহ, আলোক সম্পাতের পরিপূর্ণ আয়োজন—এই নিয়ে থিয়েটার সেক্টর নাট্য-আন্দোলনে তার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে গত পঁচিশ বছর ধরে। নাট্য পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকার (ধনঞ্জয় বৈরাগী ছদ্মনামে) তরুণ রায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই থিয়েটার সেক্টর। তরুণবাবুর বাড়ি (৩১এ চক্রবেড়িয়া রোড, লাউথ) এক তলায় সেক্টরের প্রেক্ষাগৃহ। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে তাঁর দল নিয়ে এখানে নিরমিত অভিনয় করে যাচ্ছেন। অধিকাংশ নাটকে প্রধান পুরুষ শিল্পী তিনি নিজে এবং প্রধান মহিলা শিল্পী তাঁর পত্নী দীপাঘিতা রায় বার আটপোরে নাম কৃষ্ণ। তাঁর পুত্র দেবরাজ ও আজ রীতিমত পরিণত অভিনেতা হয়ে উঠেছে। তার পরিচালনার থিয়েটার সেক্টর এখন বক্সিচক্রের 'বিষবৃক্ষ' অভিনয় করছে। এই নাটক অভিনয় করার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই ডাক আসছে। এর আগে পিতা মাতা পুত্রকে আমরা দেখেছি 'অথচ লংঘুক্ত' নাটকে। নাটকে মাত্র তিনটিই চরিত্র।

তরুণ রায় যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তেন তখনই প্রথম 'বন্ধন ও মুক্তি' ও 'সমস্যা' নামে দুটি নাটক লেখেন ও পরিচালনা করেন। সেটা ১৯৪৭ সাল। তখন পেশাদার রজ-মঞ্চ মতপ্রায় এবং বাংলাদেশে আই পি টি এ নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ার এনেছে। কলেজ জীবন শেষ করে তরুণবাবু নাট্য প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় নাট্য পরিষদ। তখন তাঁর মাতুল রঞ্জন সেনের ১০/১ এলগিন রোডের বাড়িতে একটি ছোট মঞ্চে জাতীয় নাট্য পরিষদ লালিত পালিত হয়। এখানে হিন্দী নাটকেরও অধ্বরোদন হয়। তরুণ রায়ের লেখা 'সমস্যা' নাটক বি এম সিংহী কর্তৃক অনুদিত হয়ে অভিনীত হয়। অংশগ্রহণ করেন শ্রীসিংহী, তাঁর পত্নী সুশীলা সিংহী, প্রতিভা আগরওয়াল, শ্রাহানন্দ জালাল ও বব্বী তেওয়ারী।

এরপর তরুণ রায় নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের 'স্থিতি পাষণ' যা তাঁকে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। ১৯৫১-৫২ সালে তরুণ রায় নাটক সম্পর্কে আরো অধ্যয়নের জন্য লণ্ডন যান। সেখানে আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে অজ্ঞাতদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'পোষ্ট অফিস' অভিনয় করে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন।

লণ্ডন থেকে ফিরে তরুণবাবু ১৯৫৪ সালে ইউনেস্কোর থিয়েটার ইনস্টিটিউটের কলকাতা শাখা সংগঠন করেন এবং তা থেকে থিয়েটার সেক্টরের জন্ম। কয়েকজন নাট্যা-মোদীর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং তরুণ রায় ও বি এম সিংহীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১০০ জনেরও বেশি আজীবন সদস্য নিয়ে ৩১এ চক্রবেড়িয়া রোড, লাউথ ঠিকানায় গড়ে ওঠে থিয়েটার সেক্টর। এবং অবিলম্বে এর কর্ম-তৎপরতা শুরু হয়। এরা পরপর পাঁচ বছর একাধিক নাট্য প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন ভাষায় নাট্যা-ৎসবেরও আয়োজন হয়।

মঞ্চ নির্মিত হয় ১৯৫৫ সালে। প্রথম নাট্য প্রযোজনা বারীজনাথ দাশ লিখিত 'পূর্বরাগের ইচ্ছিকা'। তারপর থেকে নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়। এই মঞ্চ ছোট নাট্য দলেরও সুবিধা করে দিয়েছে, যারা নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কারণ বাদে সংগতি সামান্য অথচ যারা নাটক করতে ভালবাসে তারা অল্প ভাড়ায় এই মঞ্চে অভিনয় করতে পারে।

চূর্তাগ্যক্রমে ১৯৬৪ থিয়েটার সেক্টরের মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ আগুনে পুড়ে যায়। কিন্তু অবিলম্বে সংগীত নাটক আকাদেমীর সহযোগিতায় থিয়েটার সেক্টর পুনর্নির্মিত হয়। ১৯৬১ সালে সেক্টর একটি নাট্য বিভাগ চালু করে যাকে এ কেজে পথিকৃত বলা যায়, কারণ এর আগে পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের বিদ্যালয় ছিল না। এখান থেকে এ পর্যন্ত ৭১৫ জন ছেলে মেয়ে নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করেছে।

এ পর্যন্ত থিয়েটার সেক্টর ২৭টি

নাটক, উনবিংশ শতাব্দীর 'কয়েকটি গ্রহন প্রযোজনা করেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা, তাছাড়া আছে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির লেখা। এদের আগামী প্রযোজনা পার্বপ্রতিম চৌধুরীর 'বৃষ্টির অকরে' এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'অকিঞ্চ'। এক সময়ে তরুণ রায় তাঁর দল নিয়ে পেশাদার মঞ্চ রঙমহল ও বিশ্বরূপায়ণে অভিনয় করেছেন।

তরুণ রায়, তাঁর পত্নী দীপাঘিতা রায় ও পুত্র দেবরাজ রায় তিনজনেই জাত শিল্পী। কোন কোন নাটকে তিনজনেই অভিনয় করেছেন, বেশির ভাগ নাটকে অজ্ঞাতদের সঙ্গে স্বামী জী, আবার কোন নাটকে শুধু ছুজনে, যেমন 'পরাজিত নায়ক'। এই নাটকে একটি সেট ও দুটি চরিত্র। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতা, নাট্য রচনার কৌশল ও অভিনয়ের কৃতিত্বে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রযোজনা হয়ে উঠেছে।

পাঠ্য পুস্তকে চলচ্চিত্র কেন?

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনারারি 'ডি-লিট' উপাধি গ্রহণকালে সত্যজিৎ রায় বলে-ছিলেন, চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত করা হোক। সমর্থিত হবার কালে তিনি এমন একটি আকস্মিক ও অব্যবহিত প্রস্তাব দিয়ে বসবেন, লড়িয়ে সেটা ভাবা যায় নি।

সত্যজিৎ রায় শিল্পী, কিন্তু তিনি কতখানি সমাজ সচেতন ও দেশ সচেতন, তাতে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্টই আছে। যে দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্য বিষয়েরই নিয়মিত শিক্ষাদান হয় না, সময় মত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় না, উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাবে বিজ্ঞান চর্চা প্রতিনিয়ত যেখানে ব্যাহত হয়, সুদূরপ্রসারী ও গভীর চক্রান্তের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতা গঠনে নীতি-হীনতা ও উদ্বিগ্নগামিতা যেখানে অবিরাম প্রায়—অর্থাৎ শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেখানে পুরোপুরি নৈরাজ্য চলছে, সেখানে আবার একটি নতুন পাঠ্যবই 'চলচ্চিত্র'র অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব নিতান্ত অবাঞ্ছন্য বলেই মনে হবে।

'চলচ্চিত্র নির্মাণ বিদ্যা', একটি

টেকনিক্যাল বিষয়। শুধু পুঁথি পড়ে চলচ্চিত্র তৈরী করা শেখা যায় না। এর জন্য চাই বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক ও স্তম্ভক মিনি ইন্ডিও। এ দুটো তো এ অঞ্চলে কল্পনাই করা যায় না। বর্তমানে কৃতী পরিচালক হিসেবে এখানে যে কজন আছেন নিতান্ত স্বল্প সংখ্যায়, তাঁরা মাঝে মাঝে ক্লাশ লেকচার দিতে হয়তো পারেন, কিন্তু ধারাবাহিক পাঠক্রম পরিচালনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়—তাঁরা এখন ব্যস্ত পরিচালক। যেখানে ফিল্ম ইন্ডিও বলতে সংখ্যায় মাত্র পাঁচটি দৈনন্দিন টিমটিম করে অস্তিত্বের বাঁচিয়ে রেখেছে সেখানে আবার শিক্ষার্থীদের স্বার্থে যত্নপাতি স্তম্ভক মিনি ইন্ডিও—ভাবাই যায় না। তাহলে চলচ্চিত্রকে পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা কেনই বা সম্ভব এই প্রশ্নে?

চলচ্চিত্র হচ্ছে কম্পোজিট আর্ট। এর বিভিন্ন শাখায় যত্নশীল প্রয়োজন। সে লবের কারণে টেকনিক্যাল শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সেসব শিক্ষা দেবার মত কুশলীই বা কজন এখানে আছেন? একথা মনে রাখতে হবে, এমন কুশলী এখানে হয় তো বেশ কিছু আছেন, যারা অপরকে শেখাতে সক্ষম হবেন না। নিজেরা শিক্ত ও অভিজ্ঞ হলেও অপরকে শেখানোর কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়। শিক্ষাদানটা এক বিশেষ পদ্ধতি-গত জ্ঞান, সেটা অনেককেই অর্জন করেন নি। সুতরাং তাঁদের সেসব বিষয়ে ট্রেনিংএরও প্রয়োজন। সে ট্রেনিং আবার কেবল কারা?

পুনেতে তো একটা ফিল্ম ইন-স্টিটিউট আছে। সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শেখাবার ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে সেটা গড়ে উঠলেও তাঁর অবস্থাও বর্তমানে খুব আশাশ্রয় নয়। তাছাড়া সেখানে শিক্ষার্থী হিসেবে সাধারণের প্রবেশ করার সুযোগ কম। শিক্ষার্তনও সেখানে ব্যয়বহল। সে মিয়ে কোন দাবী বা আন্দোলনও আজ পর্যন্ত তেমন দান বাধল না। পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আবহাওয়াটাই স্ব স্ব করা হোক না কেন।

দেশের বহুবিধ সমস্যা অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। সে সম্পর্কেই শিল্পী কথা বলবেন, সাধারণকে লঠিক দৃষ্টি-কোণে লজাগ করে তুলবেন—এটাই প্রত্যাশিত। নতুবা এ অঞ্চলে চলচ্চিত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত করার প্রস্তাবটা ভাববিলাসী মনের অলস চিন্তা ছাড়া কিছু নয়।

চলচ্চিত্রে চুখন প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠে লক্ষ্যত বসেছেন যে, বাস্তব প্রয়ো-জনে ভারতীয় ছবিতে চুখন আম-দান করা হতে পারে। মন্ত্রী এই কথা থেকে মনে হয়, ফিল্ম সেন্সর-শিপের আওতায় চুখনকে ছাড়পত্র দেয়া যায় কিনা, তাই বিবেচনা করা হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগেও এমন ধারা আর একটি তরুণ উদ্ভাল হয়ে উঠেছিল চুখনকে কেন্দ্র করে। সে সময়ও চুখনের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর মতবাদের উচ্চারিত হয়েছিল।

এ দেশেরই নির্বাক ছবিতে চুখন দেখা যেত তখন। 'থ্রো অফ ডাইন' ছবিতে চারু রায় ও নীতা দেবীকে চুখনরত অবস্থায় দেখা গেছে। ছবি যেমন সবাক হল, তখনই চুখন নিষিদ্ধ হল পর্যায়। মুক্তি হিসেবে দেখানো হয় পাশ্চাত্যের পরিবেশ এখানে নেই—এখানে পর্বে বাটে প্রকৃত স্থানে চুখন প্রথা সিন্ধ নয়, সুতরাং সামাজিক-রীতিনীতিরূচি সংস্কৃতিরক্ষার স্বার্থেই পর্দায় চুখন নিষিদ্ধ।

আজ কিন্তু এটি একটি রীতিমত প্রশ্ন হয়েই দাঁড়িয়েছে। হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠী ইত্যাদি ভারতীয় ছবিতে চুখনের বদলে কাহনা জালসাপূর্ণ যৌনো-ন্তেক দৃষ্টের যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, তাতে সাধারণের মানসিক স্বাস্থ্য, রীতিনীতি বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে কি? ওঠে ওঠে স্পর্শ দেখাতে না পেয়ে অর্ধলোলুপ চিত্র নির্মাতার দল নারক নায়িকার সর্বাক লেহন করে যাচ্ছে এমন দৃশ্যের প্রযোজনা করতে পিছপা হন না সেন্সর বোর্ডকে কলা দেখিয়ে। এই যখন অবস্থা তখন চুখন চালু হওয়াই ভাল। এসব বেলেজাপনা তো কিছুটা যাবে। আর শিল্পের খাতিরে, দৃষ্ট পরিমিতের প্রয়োজনে চুখন পর্দায় রাখাটা সংগতিপূর্ণও—সেন্সরশিপের কর্তারা এদিকটায় সতর্ক দৃষ্টি যদি রাখেন, তবেই মঙ্গল।

সমুদ্রের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উৎপাদন সাগর জন্ম।
বিশ্বনাথারী ও গ্রিকালচরাল কার্ম(প্রা)লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহ লেন, পোঃ বালী, হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০৯৫ ও ৬৪-২৪৪৫
ফ্যাক্স: বৈদ্যবাটী ২২নং ৬২-২৫৪০
দিল্লী রোড ও জয়কেশব রোডের সংযোগস্থল
ফোন: ৬২-১৩৭৭

আইনী শৃঙ্খলা

৭ম পৃষ্ঠার পর

জন, গোয়ার প্রম সম্পদ উপায় আর অধিকার সমূহ নিবেদন কর অর্থ-নৈতিক আর রাজনৈতিক কেন্দ্রী-করণের পায়ে, যাতে মানবীয় মান বাড়ে, ধর্মীয় ধর্ম বাড়ে, দেশী পুঞ্জির গন্তরে বাড়ে, সাম্রাজ্যবাদী অচল পুঞ্জি সচল হয়ে ভারতে রমণান করে, যাতে ছুরাআগা মহাত্মার তুল্যমূল্য পূজা পায়। গান্ধীবাদী পঞ্চায়েৎ রাজ? আইনী দেশপ্রেম?

আইনী নৈরাজ্য

“নররূপী নারায়ণ”

যেমন ছবি তেমন বাহার। আইনী নৈরাজ্য শোক-মিহিলের শৃঙ্খলা ছাড়া আর কি কেউ প্রত্যাশা করতে পারে?

এবারে দেখুন আরো আরো ছবি।

কোন দলের হয়ে ভোট কুড়ালো, ভোল পাণ্টে পাণ্টা দলে ভিড়ে গিয়ে ফারদা লুটলো—সাত দিনে সাত ভোটারের ‘সার্বভৌম অধিকার’কে হাপিস করলো—আইন মতে।

রোডেশিয়া

৭ম পৃষ্ঠার পর

চালাবার সময় ইরান স্থিতি পরি-চালিত রোডেশিয়ান ফ্রন্ট পার্টির দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের ১৩ জনকে মরিশা আক্রমণ করে হত্যা করে। স্বয়ং রবার্ট মুগাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাবার সময় ৬ই ও ১০ই ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত হন। তাঁর নিজের মারাত্মক কিছু না হলেও ওই দু’দিনের আক্রমণের ফলে তাঁর দলের ২১ জন নিহত হয়েছেন এবং ৮০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন।

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, জাতি-সংঘের আফ্রিকান গ্রুপ কমনওয়েলথ সদস্যপদভুক্ত অস্ত্রান্ত বহু বন্ধু দেশ এবং রোডেশিয়ার আশপাশের পাঁচটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এই সমস্ত হিংস্র কার্য-কলাপের বিরুদ্ধে সালিশবারীর অস্থায়ী প্রশাসনের কাছে অভিযোগ পেশ করা সত্ত্বেও সোমেন্স-মুজোরেওয়া চক্র যেভাবে উদ্বাসীন তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, জিহাবায়ে অস্ত্রাধিত নর-হত্যা, রাজনৈতিক আক্রমণ ও অস্ত্রান্ত জটিল সমস্যার সম্মানজনক মীমাংসা করে রোডেশিয়ার অস্থায়ী প্রশাসন কিছুতেই কৃফাদেবের হাতে তাদের জাতি পাওনা ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

বঙ্গ বাহুল্য, শশস্ত্র সংগ্রামের মতবাদে দীক্ষিত, যে দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গত সাত-আট বছর ধরে নির্বাচনের পথ বয়কট করে আসছিল, সেই ফ্রন্টই বন্ধ ও হিতাকাজীদের পরামর্শ

স্বায়ত্তর খোয়াড়ে বরাহধর্মী নিয়ম নির্ধা।

আইন আছে, আসামে অরাজকতা আছে—সহাবস্থানে কিন্তু ‘শক্ত কেন্দ্র’ আছে, স্থায়ী সরকার আছে। দেশী বিদেশী মুনাফাশাহীর ব্যবস্থার শুধুই পুঞ্জিবাদী শোষণ-পেষণের ধরণগুলি বাঁচে, আর কিছুই বাঁচে না; কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, জায় বিচারের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার কিছুই বাঁচে না। নারী ধর্মের দ্বায়ে ঘোষী ব্যক্তির স্বাধীন কোর্টের বিচারে বেকসুর খালাস পায়, নিরীহ অন্ধ মানুষগুলিও খোদ রাজধানীর বুকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আশ্রয় খোজে। আইনশৃঙ্খলা এদের কেউ হয় না। ছশো বিঘে জমি গন্তরে বেড়ে ছ হাজার বিঘে হয়, কিন্তু ছ’ বিঘে জমি ক্রমে এক বিঘে হয়, পরে শূন্য বিঘে—গোটাটাই জোতদ্বারের জিম্মার জমা হয়ে যায়।

অপর পক্ষে, কোর্ট আছে, মামলা আছে—আজ আছে, কাল নেই—কোর্ট লোপাট, মামলা লোপাট। স্পেশাল কোর্ট ছিল, স্পেশাল কোর্ট আর নেই—আইনী ভেঙী। কিন্তু

মত স্বাধীনতা পূর্ব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে রোডেশিয়া স্বাধীনতার অমুর্ক্বে একটা স্বাধিকার আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতি-হাসের অমুর্ক্বে পথে ফিরে গিয়ে অরণ করা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশ পরিত্যাগের পূর্বে ইংরেজ বেনিয়ারাও “ডিভাইড এন্ড রুল” অথবা “বিভক্ত করো এবং কর্তৃত্ব করো” এই ওপনি-বেশিক বোকরণ অমুর্ক্বে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করে ও নেতায় নেতার আত্ম-স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের অবশিষ্টাংশকে জীবন্ত অবস্থায় রেখে গিয়েছিল। ঐতি-হাসিক অধ্যয়নের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদী ঐতিহ্যকে অমুর্ক্বে করে জিহা-বায়তেও নির্বাচনের অব্যবহিত পরে জাতীয়তাবাদীনেতা ব্যক্তিগতভাবে আত্মকলহে মেতে উঠেছে। রবার্ট মুগাবে ও নকোমো দ্বীর্ঘ দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃত্বের শত্রু সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে তথাকথিত জাতীয়, মুক্তির শিক্ষাপাত্র ব্রিটিশ কুচক্রীদের দিকে প্রসারিত করার ফলে, মহান দুই মুক্তি সেনা নিজেদের অজান্তে ইতিমধ্যেই ইংরেজ পুঞ্জিপতিদের রাজনৈতিক পুতুলে পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ ১০০-র দশকের উত্তরভাগে এটা আর একবার নতুন করে প্রমাণিত হলো যে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথে নয়, শশস্ত্র সংগ্রামের রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথেই প্রম-মুক্তির মূলমন্ত্র লুকায়িত।

সাধারণ মানুষ চুরি করে মার খায়, জেলে যায়, জেলে পড়ে। আবার চুরি না করেও মার খায়, জেলে যায়, জেলে পড়ে। আর অসাধারণ লোক অনাচার করেও আগাম জামিন পায়, তাদের ক্রিমিনাল কেন ‘পলিটিক্যাল’ হয়, উকিলে উকিলে ইংরেজী ফোরারা ছোটায়, অমুর্ক্বে ধারা তমুর্ক্বে ধারার মুখ পাঠ চলে; কোর্টের পর কোর্ট পরিক্রমা চলে, জায় বিচারের (১) সন্ধান চলে, সাধারণ মানুষের ভেঙী লাগে। সন্ধানের সন্ধান (investigation) চলে, ‘এক্সায়ার’-এর এক্সায়ার বিচার চলে কিন্তু মূল বিচারের আরম্ভ নেই, শেষ নেই। আইনের দৃষ্টিতে এমন আত্মীয় ভাগ্য কেবলমাত্র ইন্দিরা-সঙ্ঘ-বঙ্গী-লালদের কপালে জোটে এমন নয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাস্তি-স্বয়ংসহাও বিচারক্ষেত্রে এ কৌলিন্ত ভোগ করতে পারে। আইন সংবিধানের সহায়তায় আইনী জাতপাত, প্রিভিলেজ ব্যবস্থা শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা নিজেরাই তৈরী করে নিয়ে শ্রেণীভেদের বিচারে সমস্ত সুবিধাভোগীদের লজ্জা দেখানে ঠাই করে রেখেছে। ধাওয়ান-শর্মা-কাপুর-প্রণব-হাজি মস্তানরাও এ কৌলিন্তের ভাগ পায়; সৌভাগ্য-ভোগের সুরক্ষিত চৌহদ্দীতে অতি-সীমিত প্রতিযোগিতার মাঝে সামান্ত সংখ্যক মানুষের আপাত-সাধারণ ‘অধিকার’গুলি এভাবে আসাধারণ হয়ে ওঠে, সংবিধান-বর্ণিত মৌলিক অধিকারের ‘সমাপ্তপাত’কে তুড়ি মেয়ে একেবারে তুলে উঠে বসে। তারাই পালাবদল করে রাজা হয়, উজির হয়—‘জনহিতায়, দেশহিতায় চ’।

অতএব, অস্ত্রান্ত কেন্দ্রের মতই বিচারের ক্ষেত্রে ভেদাভেদের রাজ্য, অথবা নৈরাজ্য। অতএব, বিশ্ব অক্ষমদেহ দিবসে ভাঙার বায়ে শত অন্ধ শতখান হয়ে গেলে সারা বিশ্বে চমক লাগতে পারে কিন্তু এদেশে বড় জোর একটা তদন্তের আবদার আইন-গ্রাহ হতে পারে; আর স্বাধীন কোর্টের জায় বিচার। “বীর ভোগ্যা বহুধরা” (নারী নির্বাতন সম্পর্কে হালফিল রায়)।

সাংবিধানিক ‘অধিকার’গুলি এ অবস্থায় মরা ছেলে পেটে ধরার সামিল। সাংবিধানিক আইনের ‘বাবা’, দারিদ্র্য বন্ধনা আইন-সম্মত আইন-সম্মত স্ত্রী প্রাপ্ত: প্রচলিত ব্যবস্থায় সাংবিধানিক কাগজে-কলমে যে অধিকার দেয়, হাতে-কলমে সেটিকে আবার কেড়ে নেয়। সাংবিধান-সৃষ্ট পুঞ্জিবাদের গুঁতোয় যারা দরিদ্র, আইনের চোখে তারাই ‘হরিজন’—শেষ মূল গচ্ছা দিয়েও প্রাথমিক

বিচারের দরজা অবধি পৌছাতে পারে না। সাংবিধানিক ‘সমানা-ধিকার’-তত্ত্বের অচল পরমাকে চালাতে পারলে যারা নিজেরাই বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য তাদের সাধের আইন-শৃঙ্খলা—কিছুত আইন কিম্বাকার শৃঙ্খলা—বংশাধিকারিক ‘মহাজম’-দের জিম্মার বংশাধিকারিক ‘হরিজন’-দের ধর্ম-মান-প্রাণ আটক রেখেছে।

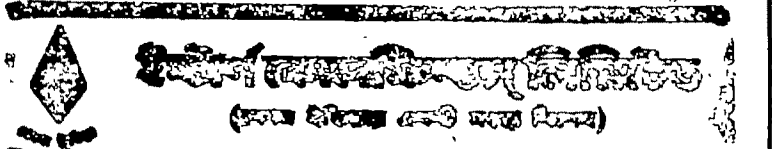
মোদা ‘কথা এই যে, একটি দেশাধিবোধহীন অচল - বিভ্রাসে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক, ভোটার অধিকারের সম্পর্ক, আইনের সঙ্গে জন-জীবনের সম্পর্ক, সরল বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব আইন-অমুর্ক্বে বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্ক, বৈদেশিক ঋণ হাতড়ানোর সঙ্গে ঋণের দার বিলিকরণের সম্পর্ক, দেশীবিদেশী পুঞ্জির সঙ্গে দেশী প্রেমের সম্পর্ক, শৃঙ্খল-শাসিত শৃঙ্খলার সঙ্গে শোষণমুক্তির বাস্তববাদ সম্পর্ক-গুলি অসংখ্য খণ্ড বিখণ্ড হতাশায় ঠাণা এক অখণ্ড নৈরাজ্য গড়ে তুলেছে, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের বৃহত্তর প্রাঙ্গণ এক ভয়াবহ এশীয় উচ্চশয্যা রচনা করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে

রাষ্ট্রের - দৃষ্টিতে যারা বর্ম-জামাই, বিচার-প্রশাসন-আইনমতায়-আশ্রয়ে প্রাঙ্গণে সে’নাড়ুগোপালদের কৌলিন্ত অনন্তরূপে জীবন্ত, সাংবিধানের যদুচ্ছ ‘সংশোধনে’ তাদের ‘অধিকার’গুলি সর্বক্ষেত্রে সুরক্ষিত, প্রসারিত, নিঃশর্ত। আইন-শৃঙ্খলার ‘সংশ্র-স্ত্রায়ে’ হাঙেররা ‘গড়’, হাঙেররাই ‘সিদ্ধার’, তাদের ‘পাওনা’ মিটিয়ে দিতে হবে; তোমার পাওনা তো পেয়েই গেছ—২৬শে জাম্বারীর কুচকাওয়াজ, ‘প্রজাতন্ত্র’।

অর্থনীতি

৭ম পৃষ্ঠার পর

টাকার নতুন ট্যাক বসানো হবে। ঠিক ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকারের মতই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলি ছাটাই করে প্রত্যাক কর’ আরকর ইত্যাদি কমানো হবে। গোটা বোকাটাই সাধারণ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপানো হবে। কিন্তু তার ফলে সংকট কমবে না, বরং বাড়বে। সারা দেশের প্রমজীবী মানুষের আর ও ক্রয় ক্ষমতা কমবে। বেকার সংখ্যাও হাজার হাজারে বাবে। স্বতরাং রিক্রোড ও অসন্তোষ দেখা দেবে। আর তা দমন করার উদ্দেশ্যে আইন ও পুলিশী ব্যবস্থা আরো শক্ত করা হবে। লোকসভা নির্বাচনের এটাই হবে চরম পরিণতি।



নিম্নোক্ত কাজের জন্ম ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত অমুর্ক্বেদিত ঠিকাদার/সরবরাহ-কারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম টেওয়ার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দর ভিত্তিক / শতকরাভিত্তিক সীল করা টেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে :

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

স্কেফা: নং জি এম / কে এ জে / এস আর-ই ই (সি) টি-৩ (বি) / ৮০ / ২৩৬৭ তাং ১৪-৩-৮০

(১) মধুজোর কোলিয়ারীর ৫ ও ৬ স্ট্রাও টোরিং বাক্সার ৫০০ এম টি শক্তিসম্পন্ন ওয়াটার রিজার্ভার (২) মধুজোর কোলিয়ারীর জে কে ইউনিটে ড্রিফট ও মিক্সিং চেম্বার সহ ৫০০ টন শক্তিসম্পন্ন স্ট্রাও বাক্সার (৩) পরাকোল কোলি-য়ারীতে (পূর্ব) ওয়াটার রিজার্ভার (৪) পরাকোল কোলিয়ারীতে (পশ্চিম) ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণের জন্ম। মোট আনুমানিক খরচ ৩,৪৬,৪৬৭৪৭ টাকা। এফ / এম কেশিয়ারের কাছে সেট প্রতি ১০০ টাকা (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্ম) এবং ৫০ টাকা (ক্রমিক নং ৩ ও ৪-এর জন্ম) নগদে দিয়ে ১-৪-৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে সকাল ১০টা থেকে ৪টার মধ্যে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কালোরা এরিয়া থেকে টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ১-৪-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ২টার খোলা হবে।

সাধারণত: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

আসামে

১ম পৃষ্ঠার পর

হেম বরুয়া (প্রাক্তন এম পি) মতে একাত্তর সালের নভেম্বরে এই সংখ্যা ছিল প্রায় সাত লাখ। লোকগণনার হিসেব অনুযায়ী ১৯৩১ সালে বর্তমানের আসাম অংশে অসমীয়া ভাষার সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৬% এবং ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২%। এর থেকে বোঝা যায় যে, নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (এ এ এস ইউ) গণসংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদ বর্তমান আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে যে বলছেন স্বাধীনতার পর থেকে আসামে অসমীয়া ভাষার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন—তা ঠিক নয়।

এটা ঠিক যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মতো আসামকেও অবহেলা করেছে। তৈল শোধনাগার ছাড়া আসামে শিল্প গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এর কারণ হিসেবে বহিরাগতদের বেসাইনী অগ্রবেশ দায়ী নয়।

প্রতিনিধিদের মতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার বিচারে অবশ্যই এই আন্দোলনের সফলতা স্বীকার। সত্যগ্রহের প্রথম পর্যায়ে ১২-১৭ নভেম্বর একমাত্র পৌহাটি শহরেই প্রায় সাত লাখ লোক গ্রেপ্তার বরণ করে। নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের মতে আসাম জুড়ে সত্যগ্রহীদের সংখ্যা ছিল বিশ লাখ। বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। ডিব্রুগড়ের জুলিয়ানানে ২৭ ডিসেম্বরে সত্যগ্রহীদের উপর সেনাবাহিনী গুলি চালালে সন্ধ্যা ৭-০০ থেকে ৮শ মিনিটের মধ্যে সরকারী মতে চারজন নিহত হয় ও কয়েকশত আহত হন। প্রতিনিধিদের অহুস্কার করে জেনেছেন যে এ গুলি চালনা যথেষ্ট ভাবেই হয়েছিল।

অতীতকালীন কামরূপ জেলার বারপেটা মহকুমার নলবারি, মুকালমুয়া এলাকা ছোট্ট চার হাজার ঘর বাড়িতে, আগুন লাগানো হয়েছে,

বিদ্যালয়গুলি আগুন হারিয়েছেন। কতিপয় দলকেই বাঙালী। এর পরেও ডেপুটি কমিশনার বলেন যে নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়নের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ছিল। প্রতি-নিধি হল মুকালমুয়া ক্যাম্পে ৫১০ জন বাঙালী মুসলিম শরণার্থীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিন-চার হাজার অসমীয়া বর্ষা ও অস্তান্ত মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে গ্রামে হামলা করে। রংলির শিবিরে চার হাজারেরও বেশি বাঙালী হিন্দু শরণার্থী রয়েছেন।

গণসংগ্রাম পরিষদ ও নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন রাজ্যের প্রশাসনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে কার্যত: পান্ডা সরকার চালাচ্ছেন। তথাকথিত বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কামরূপের উদ্বাসিত হয়ে ওঠলে যে সব লেখা হচ্ছে এরা তাও সমর্থন করেছেন। প্রতিনিধি-দল একটি দেওয়ালে লেখা দেখেছেন “শাপ আর বাঙালীকে একসঙ্গে দেখলে প্রথমেই বাঙালীটাকে আঁতড়াও।” আর একটা দেওয়াল লিখন: “একটা বাঙালীর মাথার পুরস্কার পঁচিশ টাকা।”

বাঙালীরা স্বভাবতই সন্ত্রস্ত। জুলিয়ানানে খাতনামা হত্যাবিরোধ: রবি মিত্র, পৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ডঃ অরুণ চক্রবর্তী খুন হয়েছেন। আততায়ী সন্দেহে বাঁধেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদেরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

উগ্র প্রাদেশিকতার জোয়ার বইছে আসামে। আসাম সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত ‘পূর্বের গ্রহণ’ শিরোনামের এক পুস্তিকায় শুধুই ‘ব্যাপক বহিরাগতদের অগ্রবেশ’ বর্ণনা করা হয়েছে। দৈনিক ‘আসাম ট্রিবিউন’, ও তার অসমীয়া সংস্করণ ‘দৈনিক আসাম’ পত্রিকাতোও অন্ধ প্রাদেশিক জিগির তুলে লেখা হয়েছে। কেরোসিন লংকটের কারণ হিসেবে ‘বহিরাগতদের’ দায়ী করে সংবাদ ছাড়া হয়েছে। প্রতিনিধিদের কাছে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে

এমন কি আকাশবাণীর পৌহাটি কেন্দ্র থেকেও অগ্রবেশ সংবাদ বেতার তান্ত্র প্রচারিত হয়েছে।

চিরচিত্রিত নিয়মিতদায়ী এই আন্দোলনের নেতারা বামপন্থীদের বিরোধিতার সক্রিয়। বামপন্থী দল-গুলোর কর্মী নেতাদের উপর স্থপরি-কল্পিত আক্রমণ চলছে। সি পি আই (এম), সি পি আই, সি পি আই (এম-এল), আর সি পি আই-এর বেশ কিছু সংগঠক ও কর্মী হতাহত হয়েছেন। সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রীজ্যোতি বহু আন্দোলনকারীদের চোখে আজ সূর্য্যতম ব্যক্তি। বহু সভার তাঁর কুশপুস্তিকা পোড়ানো হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতীয় ক্রিকেট, এস, রাও ছিলেন রাজ্যের মধ্য নির্বাচনী কমিশনার। তাঁকে আসাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। এবং বর্তমানে সে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন জনৈক অসমীয়া অফিসার। রাজ্য প্রশাসনও যে কিস্তাবে তথাকথিত বহিরাগতদের বিভাঞ্চিত করছেন তা জানলে আশ্চর্য হতে হয়। সম্পূর্ণ বেসাইনীভাবে শিবসাগর জেলার জোড়হাটের পুলিশ স্থপার আর, সি, দত্ত, (আই, পি, এস) ১১ অক্টোবর এক আদেশ-বলে বরহাট থানার অধীন কালাকাটা গ্রামের শ্রীধরলাল ধরকে পনেরো দিনের মধ্যে দেশ ছেড়ে যেতে বলেন। এই ধরনের কিছু ঘটনা সংসদ সদস্য ও খ্যাতনামা আইনজীবী সোমনাথ চ্যাটার্জীর মজুরে এলে শ্রীচ্যাটার্জী গত ১২ মার্চ সংসদে তা তোলেন এবং পরেরদিন প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠিও লেখেন। শ্রীচ্যাটার্জী জানান যে, এই বিভা-ড়নের আদেশ ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স আইন অনুযায়ী বেসাইনী।

শ্রীধরের পরিবার ১৯৫২ সাল থেকে আসামের বাসিন্দা। উদ্বাস্ত হিসেবে তাঁদের নামও রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ভারতেই জন্মগ্রহণ করেছে। ১৯৬৪ সালের ফরেনার্স (ট্রাইবুনাল) আদেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের ক্ষেত্রে বিদেশী কিনা তা বিচারের জন্ত নির্দিষ্ট কেনসি ট্রাইবুনালে পাঠাবে। কিন্তু শ্রীধরের ক্ষেত্রে এসব আইনকেই বৃদ্ধান্ত দেখানো হয়েছে। আন্দোলনকারীরা তো অবিচার, বেসাইনী কাজ করছেই, পেছন থেকে বেসাইনী কাজ করে মদত জোগাচ্ছেন আই, পি, এস, অফিসাররাও। আসামে আজ তাই ঘটছে।

আন্দোলন নিয়ে যুব কংগ্রেসে মত বিরোধ

১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু বিচিত্র ইন্দ্রিয়া কংগ্রেস দলের বিচিত্র কার্যবার স্বাধীনতা চলছে। স্বতন্ত্র যুগোপাধ্যায়ের অগ্রগামীরা আসাম অবরোধ আন্দোলনের নামে প্রচুর টাকা পরস্রা তুলছে। কোনও চাদাপজেরই কোন রসিদ নেই। হিসাব নেই। কিছু কর্মীর হালচাল দেখে মনে হচ্ছে আসাম অবরোধের চেয়েও তাদের কাছে বড় কাজ হলো তাল বুঝে টাকা ডোলার কোপ যারা। একাক্ষ তারা ভালোভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বড়-বাজার স্ট্রীটলাকার ছাত্র পরিষদের জনৈক মাতব্বর রীতিমত হুমকি দিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে টাকা তুলছে।

রাজ্যের যুব কংগ্রেসের কর্মতালীন গোষ্ঠী এই আন্দোলনে তাদের সমর্থকদের যোগদান করা থেকে বিরত রেখেছেন। এবং একমাত্র প্রধান মন্ত্রীর অথবা মন্ত্রণাঙ্গীর নির্দেশ ছাড়া তারা এই আন্দোলনে কার্য-করী ভূমিকা নিতে নারাজ। আন্দোলনের আগে যুব কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার বিরোধিতার কলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তার অবদান বটাতে স্বতন্ত্র বাবু একটা পান্ডা চাল দিয়েছেন। যুব কংগ্রেসের মধ্যে তার অগ্রগামী কয়েকজন পদাধি-কারীকে স্বতন্ত্র যুব কংগ্রেসের নামে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে অবস্থা দাঁড়িয়েছে রাজ্যের যুব কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ ছাড়াই কয়েকজন পদাধি-কারী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুব কংগ্রেসকে যুক্ত করে ফেলেছেন।

স্বতন্ত্র-বিরোধী বেশ কিছু ইন্দ্রিয়া কংগ্রেস নেতাও স্বতন্ত্র পরিচালিত এই আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। উত্তরবঙ্গে তাদের সমর্থকরা যাতে এই আন্দোলনে যোগ না দেয় সে ব্যাপারে তারা নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

স্বতন্ত্রও তার বিরোধীদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্ত সর্বতো-

ভাবে চেষ্টা করছেন। কলকাতা থেকে দলে দলে তার সমর্থকদের পাঠানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের আন্দোলনকে জোরদার করতে। আসলে স্বতন্ত্র দেখাতে চাইছেন যে তিনি একক নেতৃত্বেই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

পদোন্নতি পদপ্রাপ্তি

১ম পৃষ্ঠার পর

চাইছেন না। তবে বংশীলাল ওদের জন্ত অনেক কিছু করেছেন বলে তাঁকে রাজ্যপাল করার কথা হয়েছে। তিনি মহারাষ্ট্রে যাবেন বর্তমান রাজ্যপাল শাহিক আলির জায়গায় এরকম সম্ভাবনাও সৃষ্টি হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের এস কে পাতিলও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। আহুগত্যা প্রকাশ করে একটা সুযোগ চেয়েছেন। তাঁকেও রাজ্যপাল করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এদিকে কয়েকজন রাজ্যপালকে বিভাড়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রপতি এই ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন এমন বৃদ্ধান্ত জানা যাচ্ছে তবু তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল প্রজ্ঞান পাটোয়ারী ও গোয়ার উপ-রাজ্যপাল কর্ণেল প্রতাপ সিং তিলি এরা কংগ্রেস (আই)-এর কথামত চলতে আগ্রহী নন বলে মেয়াদ-মুরোবার আগেই বরখাস্ত হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকেও এই সঙ্গে বিদায় নিতে হতে পারে একথাও বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

আর একটা খবর হল, সঙ্গর বন্ধু সংসদ সদস্য কমল নাথ যিনি নেপথ্য থেকে রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি বোধহয় মন্ত্রী হতে পারেন এ সম্ভাবনা নিয়ে দিল্লীর মোচাকে গুঞ্জন উঠেছে। উঠেছে আরও কজন মাতাপুত্রের প্রিয়ভাজন ও সেবকের পদোন্নতি ও পদপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ঘিরে। এই গুঞ্জে বহু-গুণারও একটা স্থান রয়েছে।

প্রকাশিত হলো

আসাম ও মেঘালয়ের চাকলাকর ইতিহাস ভিত্তিক

রাজনৈতিক গ্রন্থ

বেঙ্গল-এর

অগ্নিগর্ভ আসাম—১২'০০

সত্যই কি ওরা বিদেশী? পূর্বাঞ্চলের অগ্নিগর্ভ নেপথ্য কাহিনী।
রাস্তা কি নিষ্ঠুর?

পূর্বাচল—৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

- ১। ভারতের শাসন ব্যবস্থা / শ্রীনিবলচন্দ্র ভট্টাচার্য / ২০'০০
- ২। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক / ডঃ গৌরীপদ ভট্টাচার্য / ১৮'০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক জোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৬১, হট সেম, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

আসাম অবরোধ আন্দোলন নিয়ে গোয়েন্দা

রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার হতাশ



পশ্চিমবঙ্গে আসাম আন্দোলনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে হতাশ করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে আসাম অবরোধ আন্দোলনে রাজ্যের জনগণের ব্যাপক অংশের সাড়া পাওয়া যায় নি। উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু জায়গায় বা আন্দোলন হয়েছে তা ইতস্ততঃ বিকিষ্ট। এই আন্দোলনের ফলে জনজীবনে কোন প্রভাব পড়েনি।

তাছাড়া এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একদল সমাজবিরোধী নিজেদের স্বার্থান্বেষী করার চেষ্টা করছে বার ফলে এই আন্দোলন বেশী দিন চললে তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসে পুরোপুরি সমাজবিরোধী হয়ে কলমে চলে যাবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পেশ করা এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে রাজ্যের কংগ্রেসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এমন কি কংগ্রেস কর্মীরাও বিভ্রান্তিতে ভুগছে। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি।

এই রিপোর্টে অবরোধ আন্দোলন শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

জয়বিশ্ব বর্ষ ১১শ সংখ্যা ১ শুক্রবার, ৪ঠা এপ্রিল, ৮০ ৬০ পয়সা

রাজ্য ই-কংগ্রেসের এ্যাড হক গঠন নিয়ে বিরোধ

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের এ্যাড হক কমিটি গড়ার ব্যাপার নিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

অনেক জলধোলা হওয়ার পর সভাপতি মনোময়নে বরকত-সুদ্রত গৌড়ী জয়লাভ করলেও এ্যাড হক কমিটির তালিকা একচেটিয়া ভাবে পাশ করাতে বরকত গৌড়ী ব্যর্থ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে আলোচনা করে বরকত সাহেব রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের - জন্ত একটি এ্যাড হক কমিটির তালিকা তৈরী করেন। এই তালিকার বাদে রাধা হর তাদের অধিকাংশই বরকত-প্রণব গৌড়ীর পক্ষে। এই তালিকার সাত্তার গৌড়ীর কয়েকজনকে মাত্র জায়গা দেওয়া হয়।

এই তালিকা নিয়ে প্রণববাবু এবং বরকত সাহেব সঙ্গর গাফীর সঙ্গে কথা বলেন। সঙ্গর গাফীর মোটামুটি রাজী হন এবং ঠিক হত জীমতী গাফীর কাছে তালিকাটি অমুমোদনের জন্ত দেওয়া হবে।

এ্যাড হকের তালিকাটি যখন জীমতী গাফীর কাছে অমুমোদনের জন্ত দেওয়া হয়েছে তখন দাভ্যার জন্ত দেওয়া হয়েছে তখন দাভ্যার জীমতী কয়েকজন নেতা দিল্লীতে গেল নাথকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলেন। বরকত বিরোধী গৌড়ীর কয়েকজনের সঙ্গে কমল নাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভাল থাকায় কমল নাথ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হন এবং সঙ্গরের সঙ্গে শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



চিত্তরঞ্জে জ্যোতি বসু : এদিন ও সেদিন

নলিনী পাল

কায়ানগরী চিত্তরঞ্জন দেখে এসাম। স্বর্গতঃ ভাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উত্তোগে গঠিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-নামে উৎসর্গীকৃত এই শহর সব নাগ-রিকের স্তম্ভ উন্মূল ছিল না। স্বাধীন ভারতেও এটি ছিল একটি নিষিদ্ধ এলাকা।

পত ২০শে মার্চ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আগমন উপলক্ষেই এ শহরে গিয়েছিলাম। তিনি ওখানে ঐদিন চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ লেবার ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন।

সভার আগে জীবহর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অতীতের কতকগুলি স্মৃতি বা ঘটনার

কথা মনে পড়ে গেল। তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হল। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীও ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল অতীতের কতকগুলি ঘটনার কথা। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাকালে এই চিত্তরঞ্জেই আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে জ্যোতিবাবুর ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার বিরোধীপক্ষের সরকার-স্বীকৃত নেতা। ব্যংহা অমুমোদিত জ্যোতি-বাবুর সঙ্গে আমিও সাংবাদিক হিসেবে চিত্তরঞ্জন অতিমুখে রওনা হয়ে বাই।

কিন্তু পথিমধ্যে দুর্গাপুরে গিয়ে শুনি যে, আমাদের ওখানে যেতে দেওয়া হবে না। কারণ, চিত্তরঞ্জন-কায়ানগরী এবং নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষিত হয়েছে। অগত্যা ঐ কর্ম-সূচী বাতিল করতে হল।

১৯৬২ সালের পরে এল ১৯৬৬ মাল। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শেষ অধ্যায়। খাতি এবং কেরো-সিনের দাবীতে রাজ্যব্যাপী জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখার তায় তখন জনগণের তুমুল আন্দোলন চলছে। বলিরহাট অঞ্চলে এবং কৃষ্ণনগর শহরে ছাত্র-যুবকরা কেরোসিন এবং খাঁড় চাইতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে বহু হতাহত হয়েছেন। রাজ্যের সর্বত্রই সংগ্রামের পর সংগ্রাম

বর্ণপরিচয়ের ছড়া অনার্য মিত্র

এক.

যুগে ফিরে পুনরায় কংগ্রেস (আ) যদি আসি কিচ, বল কংগ্রেস (রা)।

কংগ্রেস (রা) মানে রামধন গান দেবরাজ আসের থাকে না যে মান।

দয়া করে ডাকে নাই কংগ্রেস (ই) যদি ডাকে, তবু নেতা হি অর শী।

শী যদি সরে যান কংগ্রেস (স) ? হবে কি এ কংগ্রেস (ক) (খ) (গ) ? ছই।

যশোদা দুলাল তুই ননীচোর ডেয়ারীর দুধ খাস রাত ভ'র আহায়ে দুধের বাচ্চা ভগবান এত চুরি মস্তীর অপমান।

দুধ খেয়ে সোনারমণি সোনাটা কত বড় হলি দেখি ধোনাটা।

তিন.

মাঝে মাঝে টিয়ার গ্যাস হু'তিম রাউণ্ড গুলি পুলিশ বড় শাস্ত এখন আছরে বুলবুলি।

খুনে ডাকাত যুগে বেড়ান ধরেন এবং ছাড়েন, বদলী করে শাস্তি দিতে জ্যোতিবাবুই পারেন।

বদলী যদি বদল আনে ছুট করে দমন, তবে কেন লেগেই থাকে সাঁওতালডির শমন ?

তিন.

হেমবতী নন্দন আর কেন জঙ্গল যা হবার হয়েছে তো হয়েছে ; তুলের যাতনা নিয়ে কেঁদেই মরবে যদি দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে।

ও আমার সোনারমণি কাদেনা কাদেনা ধনি ভারত মোহিনী দেখে হাসছে, তারেই মিনতি করো পড়ো তায় পায়ে পড়ো তোমার রাজ্যে ভোট আসছে।

চলছে। বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। হরতাল ও ধর্মঘট চলছে।

ওই সংগ্রামের হাল ঠিকমত পরিচালনার জন্ত জ্যোতিবাবু রাজ্যের বিভিন্নস্থানে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করছেন এবং জনসভাগুলিতে উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন।

ওই সময়ে চিত্তরঞ্জন থেকে জ্যোতিবাবুর ডাক এল। আমিও স্বাধীনতা সাংবাদিক হিসেবে শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

আসাম প্রশ্নে

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রাজ্যপাল শ্রীএল পি সিং আসামে বিদেশী নির্ধারণের প্রসঙ্গে হঠাৎ ১৯৬৭ সালকে ভিত্তি-বছর হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন সারা আসাম ছাত্র সমিতির কাছে। ইতিপূর্বে দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠকে ১৯৭১ সালকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং এরই ভিত্তিতে সারা আসাম ছাত্র সমিতি ও গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে অসফল আলোচনা আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীএল পি সিং ১৯৭১ সালকে ১৯৬৭ সালে নিয়ে বাবার কন্ডা বা নির্দেশ কোথা থেকে পেলেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং অথবা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কি তাঁকে এই মর্মে কোন নির্দেশ দিয়েছেন? কিন্তু সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ঐ ধরনের বৈঠক থেকেই পরিবর্তন করা উচিত—যে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

সত্যই যদি ভিত্তি-বছর ১৯৭১ সালের বদলে ১৯৬৭ করা হয় তাহলে অসমীয়া আন্দোলনকারীদের কাছে নতিস্বীকার করা হবে; রাজ-নৈতিক দলগুলিরও মুখ থাকবে না এবং এটা আবার প্রমাণ হবে আসামের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ইন্দিরা কংগ্রেস সরকার শক্ত হতে পারেন না। কারণ আসামে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে প্রাক্তন জনতা সরকার সমস্তার মোকাবিলা না করে যেভাবে টালবাহানা করে কাটিয়েছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও সে পথেই পথচারণা করছেন। সরকারের দুর্বলতা আন্দোলনকারীদের শক্তি জোগাচ্ছে। আজ যদি ১৯৬৭ সালকে ভিত্তি-বছর হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে এতদিন যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে চুক্তির কথা বলা হচ্ছিল তার কি দুর্গতি হবে? বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি অজ্ঞান করা কি উচিত? ১৯৬৭ সালের পর, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে যারা এদেশে এসেছে তারা আসাম থেকে বিভাজিত হয়ে যাবে কোথায়? একথা পরিষ্কার ভাবে অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গেই আশ্রয় নেবে। তাছাড়া আজ হোক কাল হোক ত্রিপুরারও এই দাবি উঠবে। আসামে বাঙালীদের ওপর মারদাঙ্গা অন্ত্যাত্মক মার্কো মাঝেই চলে আসছে—কখনো কখনো ভয়ঙ্কর আকারে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝা উচিত এবারের বিতান-পর্বেরও প্রধান লক্ষ্য বাঙালী, প্রাদেশিক চেহারাটা ঢাকা দেবার জন্য বলা হচ্ছে 'বিদেশী'।

জ্যোতি বসু

১ম পৃষ্ঠার পর

জ্যোতিবাসুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন রওনা হলো। এপ্রিল মাসে হাওড়া থেকে তুফান এক্সপ্রেসে চিত্তরঞ্জন যাচ্ছিল। আসামের সঙ্গে আরো যারা ছিলেন তাঁরা হলেন অধুনালুপ্ত রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির মুখ-সম্পাদক, প্রাক্তন এম পি এবং বর্তমান সি আই টি ইউ নেতা মনোজেন রায়, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির অন্ততম মুখ সম্পাদক এবং রাজ্যের বর্তমান পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ও বর্তমান এম পি মৈয়দ ইসমাইল।

ট্রেনে ওঠার আগেই হাওড়া স্টেশনে গুনতে পেলাম যে, চিত্তরঞ্জন গণতান্ত্রিক যাত্রাবের উত্তোগে যদিও সেখানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে, তথাপি সরকার পক্ষ তার অমুখতি দেন নি। উপরন্তু কারানগরী চিত্তরঞ্জে ১৪৪ ধারা জারী করে এবং সভা-শোভা-যাত্রা নিষিদ্ধ করে চিত্তরঞ্জন লৌহকপাট বাইরের নাগরিকদের ভক্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ সংবাদ হওয়ার শোনার পরেও জ্যোতিবাসু দমবার পাজনন। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে চিত্তরঞ্জে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপে বসলেন। আশিও লাংবাদিক হিসেবে ওদের অহসরণ করি।

ট্রেনটি আসানসোল স্টেশনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের

গোয়েন্দা রিপোর্ট

১ম পৃষ্ঠার পর

লমে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের আচরণ সম্পর্কেও রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে কিভাবে কলকাতা থেকে আসা উত্তরবঙ্গে আন্দোলনে যোগদানকারী কর্মীরা আন্দোলনের নামে বিভিন্ন জায়গার ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং ব্যবসা করেছেন। কলকাতার ছেলেরা ওখানে গিয়ে কিভাবে নিজের মধ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে রিপোর্টে সে কথাও বলা হয়েছে।

এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু ইন্দিরা গান্ধী-এবং সঞ্জয় গান্ধীর কাছেও পৌঁছেছে। এর পরই দিল্লীতে হলের হাইকম্যান্ডো আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনায় বসেন। কেন্দ্রীয় নেতারা স্পষ্টই বুঝতে পারেন এই আন্দোলনে রাজ্য সরকারকে বিপাকে ফেলা অথবা আসামের আন্দোলনকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা কোনটাই সম্ভব হবে না। পরন্তু এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে। এর পরই পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

বর্তমান ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী প্রাটিকরণে এসে জানালেন যে, আমাদের আসানসোলেই মেমে যেতে হবে। কারণ ঐ ট্রেনে যদিও চিত্তরঞ্জন স্টেশনে আমাদের নামবার কথা ছিল, তথাপি ওখানে শাসকদলের পক্ষ থেকে গোলমাল করতে পারে ওই আশঙ্কার জ্যোতিবাসু সহ অজান্তে নেতাদের ওখানেই নামিয়ে নেওয়া হল। উল্লেখযোগ্য, বিনয়দা আগে থেকেই আসানসোল স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন।

আসানসোল থেকে জীপে করে আমরা চিত্তরঞ্জন নৈষিদ্ধ এলাকার বাইরে চিত্তরঞ্জনরই একটি স্থানে গিয়ে পৌঁছাই। এপ্রিল মাস ওখানে প্রচণ্ড গরম। ভর দুপুরে লুইছে।

চিত্তরঞ্জন বিহার রাজ্যের একদম প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অবশেষে জ্যোতিবাসুর পতামর্শমত ঠিক হল যে, চিত্তরঞ্জন নৈষিদ্ধ এলাকার বাইরে তার লাগোয়া অঙ্গল-বিহার রাজ্যের মিহিঝামে নির্ধারিত ঐ জনসভা হবে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক কোন এজিয়ার নেই। হলোও তাই। শোভা হিসেবে সভায় যোগদানের জন্য যারা চিত্তরঞ্জন নৈষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা জ্যোতিবাসুর নির্দেশ অমুখ্যায়ী সবাই অশ্রুজল সৈনিকের স্তার বিহার সীমান্তের ঐ মিহিঝামে হলে হলে ভাগ হয়ে চলে গেলেন। আমরাও গেলাম।

ওখানে পৌঁছে দেখি সীমান্ত গ্রাম মিহিঝামের এক উচু নীচু মাঠে কিছুকণের মধ্যেই প্রায় ১৫/২০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ মহিলা ছিলেন। বর্ণাশ্রম ভেদা দলো।

অপরদিকে, ওখানে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহিনীর কর্তারা ভাবতেই পারেন নি যে, যে সভা সরকারী মহল নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, উপস্থিত বৃদ্ধি মাঠের জ্যোতিবাসুর নির্দেশ মত কারানগরী চিত্তরঞ্জন বহলে বিহার রাজ্যের মিহিঝামে মুহূর্তের মধ্যে আয়োজন করে কিভাবে সফল করা সম্ভব হলো। এরই মধ্যে মিহিঝাম থানা থেকে পুলিশ এসে হাজির। কিন্তু অশান্তির কোন চিহ্ন না থাকায় ওরাও শান্তি-পূর্ণভাবেই ফিরে গেল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ কুট-বুদ্ধি লম্পার জ্যোতিবাসুর কাছে ব্যস্তব ক্ষেত্রে যে পরাজিত হলো, উপস্থিত জনৈক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার আমার কাছে তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রায় ১৪ বছর পরে গত ৩০শে মার্চ বখন আবার চিত্তরঞ্জে যাই,

তখন কিছু গোয়েন্দা পুলিশের পুরানো কোন অফিসার বা কর্মীদের দেখা পাই নি।

জ্যোতিবাসু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এবার এবং তাছাড়া ১৯৭৮ সালের ২৩শে এপ্রিলও চিত্তরঞ্জন পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার হওয়ার পরে কারানগরী চিত্তরঞ্জে প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছিল, তথাপি পরবর্তী অবস্থায় তা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালে আবার দিল্লীর পট পরিবর্তন এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কড়াকড়ি শিথিল করা হয়। এই ব্যবস্থা কতদিন থাকবে তা কেউ জানেন না। তবে, এবারকার জনসভার অতীতের জনসভাগুলির তুলনায় মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশী ছিল বলে স্থানীয় উদ্বোধনকারী জানিয়েছেন।

আরো উল্লেখযোগ্য, এবার জ্যোতিবাসু চিত্তরঞ্জে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তরঞ্জনলোকোমোটিভ কারখানার কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। এরপরে জ্যোতিবাসু একটি স্থায়ী শহীদ বেনীতে মাল্যদান করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং কারানগরীর স্থানীয় শ্রীলতা ইমটিটি-উটের ফুটবল খেলার মাঠে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় দেশের

ছিনতাই ও কনষ্টেবল গ্রেপ্তার

জলপাইগুড়ি শহরের হাউসিং এস্টেটের কাছে ২৬শে মার্চ রাজি লাড়ে ৭টা নাগাধ স্বরেশচন্দ্র বর্মণ নামে ঐ জেলারই বানারহাট থানার একজন পুলিশ কনেটবলকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশের কাছ থেকে জানা গেছে।

প্রকাশ, ঐ হাউসিং এস্টেটের বাসিন্দা জনৈক মহিলা যখন তাঁর বাসায় ফিরছিলেন, তখন দ্রুত কনেটবলটি মহিলার সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু, মহিলার চীৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে-অভিযুক্ত কনেটবলটির পিছু ধাওয়া করে ওকে ধরে ফেলেন। এরপরে পরে পাইকারি হারে ওর ওপরে বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম পড়ে।

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালী থানা পুলিশ ঐ দিনের ৪৫ নং কেস ডাইরীতে একটি মামলা রুজু করে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় এমএলএ স্থানীয় বহুসংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিহার-রাজ্য নন-গেজেটেড এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের সভাপতি বজেন্দর গোপও ঐ সভায় বক্তৃতা দেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন যে, বিহারের গণতান্ত্রিক যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এখানে বলতে চাই যে, কারানগরী চিত্তরঞ্জে অতীতে যাদের মুখে বিহারের ছায়া দেখেছি, এবার তাঁদেরই মুখে হাঁসিন্দ সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি দেখেছি। এতেই বোঝাচ্ছে যে, ভারতে যদিও অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলছে, তথাপি সংগ্রামী জনজীবনে দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে।

এ্যাড হক গঠন

১ম পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগ করেন। কমল নাথের হস্তক্ষেপের ফলেই শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের এ্যাড হক কমিটির তালিকা অমুমোদন স্বগিত রাখেন।

এখন এই কমিটিতে কারা কারা থাকবে সেই ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতারা একমতে পৌছতে পারছেন না। সঞ্জয় অথবা শ্রীমতী গান্ধী কেউই কোন চূড়ান্ত কথা বলছেন না। যদিও শ্রীমতী গান্ধী চাইছেন একটা আশোষ করে কমিটি করে দিতে, কিন্তু এ ব্যাপারে শেষ কথা বলবেন সঞ্জয় গান্ধী।

কারণ, জনতার মাঝের চোটে ওর দেহে কিছুটা চোট লেগেছিল। জানা গেছে, ওর নম্বর ১১১৫ এবং ঐ ছিনিয়ে নেওয়া সোনার হারটিও ওর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত অফিসে ই-কংগ্রেসী হামলা

মেহিনীপুর জেলার মন্দীগ্রাম থানার ৩নং নন্দীগ্রাম ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ২৭শে মার্চ বিকেলে একদল কংগ্রেস (ই) কর্মী বেআইনীভাবে ঢুকে পঞ্চায়েত অফিসের সব কিছু লুণ্ঠন করে দিয়েছে। স্থানীয় কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে কথিত অমৃত আচার্য ঐ হামলাবাজদের নেতৃত্ব করে। এছাড়া, হামলাবাজরা পঞ্চায়েত অফিসের কর্মরত কর্মীদের মারধরমহ আসবাবপত্রও ভাঙচুর করেছে।

থানা পুলিশ ঐ দিনের ১৫ নং কেস-ডাইরীতে ঘটনাটি রেকর্ড করে কংগ্রেস (ই) কর্মীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে।

কেন্দ্র নীচে নেমেই চলেছে

ভারতপুত্র

একদিকে পুলিশের গুলীতে প্রাণ বধ করা হল দুজন আন্দোলনকারীর অপর দিকে আন্দোলনকারীদের আবির্ভাবের কাছে মাথা অনেকখানি নীচু করা হল—আসামের বিচ্ছিন্নতাকামী স্বাধীনতাবাদী সমস্তার সমাধানে এই-ই হল কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী। সেনাবাহিনীকে আগেই প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, হাইলা-কান্দীতে তারা আন্দোলনের মোকা-বিলায় রণক্ষেত্রে নেমেও পড়েছে। নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগের হুমকিও দেওয়া হয়েছে, যদিও আইনটি রচনার উদ্দেশ্য বর্ধিত হয়েছিল কালোবাজারী মজুতদারী ইত্যাদি অর্থনৈতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং পশ্চিমবঙ্গ কেরালা ও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট রাজ্য-সরকার তিনটির ওপর এ-আইন প্রয়োগের জন্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী চাপ তৈরি করছিলেন। আন্দোলনকারী নেতাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে ‘বিদেশী’ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭-তে নেমে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হয়েছেন রাজ্যপাল এল সি সিং-এর মাধ্যমে। বৃহত্তর দশ বছরের প্রত্যুত্তরে ক্ষুদ্র কমিয়েছে চার বছর; ১৯৭১ থেকে ১৯৬৭-তে। ফারাক রইল ছ’ বছরের। এখন দেখা যাক, হাটু অবধি যারা নেমেছে, গলা জলে নামতে তারা লজ্জিত হয় কি না।

এ ধারণা হবার কারণ রয়েছে। আসামের ‘বিদেশী’ সমস্তার সমাধান প্রচেষ্টার নামে গত পাঁচ মাসে বিস্তর তেল পোড়ানো হয়েছে, দৈনিক কতি মেনে নেওয়া হয়েছে ৫৬০ কোটি টাকার মতো। হাজার হাজার লোক তাদের কয়েক পুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। এ রাজ্যের কংগ্রেসের (ই) একাংশের পক্ষ থেকে ‘অর্থনৈতিক অবরোধ’ কর্মসূচী নিয়ে পাণ্টা জবাব দেবার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু বাস ট্রাক পোড়ানোর, রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা পরিবর্তনকে আহ্বান করে পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য করে তোলার মতলব তাঁরা হয়েছিল। এই অবরোধ আন্দোলনের প্রতি প্রধানমন্ত্রী থেকে অস্ত্রাস্ত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্র ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের নানা জনের নানা কথাই হাজারো প্রশ্ন লাভ করছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে আইন ও

শৃঙ্খলাকে দ্বিগুণ ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী (ই)দের লোফালুফি খেলার বল হতে দিতে রাজি হননি। কথো দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষও পাণ্টা আন্দোলনে লামিল হয়ে। রাজ্য বিধান-সভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বাধীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন মিলাটারী নামিয়েই কেবল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে স্বরত মুখাঙ্কিতা অবরোধ আন্দোলন অব্যাহত রেখে-ছিলেন, তিনি সশস্ত্র গান্ধীর নির্দেশেই কান্স হলে। তবে কি কংগ্রেসের মাধ্যম এখন আর মাতা নেই, গুজুই অভিযুক্ত হয়েছেন?

লোকদলের বিলোপ

ভারতে শিশু যুগের হার বেশি প্রমাণ করার জন্তই যেন আট মাস বয়স না হতেই লোকদল খতম হয়ে গেল। মৃত্যু পরোয়ানাটা জারী করেছেন রাজনারায়ণ। জনতার (এস) সভাপতি হিসেবেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে লোকদল ভেঙে দেওয়া হল। তার আগে অবশ্য দলপতি চরণ সিং তাঁর ভক্ত হুম্মানকে লোকদল থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। গত কদিন ধরে লোকদলের কর্ম সমিতি ও অন্তর্গত সমাবেশ সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে রাজনারায়ণ প্রকাশ্যেই চরণ সিংকে ‘উদ্ধৃত’, ‘বৈরাগ্যী’ ইত্যাদি চোখা চোখা বিশ্লেষণে বিভূষিত করে আস-ছিলেন। দলের একটি সম্মেলনের আয়োজনও করছিলেন নেতৃত্বের অহুমোহনের তোয়াক্কা না করেই। তাই দলীয় শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি ভঙ্গের অপরাধে রাজনারায়ণকে ছ’ বছরের জন্ত দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাঁর প্রাথমিক সদস্য-পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সে ভরে কম্পিত নয় বীর হুম্মানের জুড়। যে দল তাঁকে বহিষ্কারের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, তাঁকে তিনি কমা করবেন কী করে? তাই রাজ্য রাজকীয় চালে লোক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি : লোকদলকে জন্ম দিয়েছে জনতা (এস), কাজেই জনক হিসেবে সম্মানের রক্ত পান করার হক রাজনারায়ণের আছে।

তবে ঘটনাটিকে আরো মর্যাদা দিতে চলেছেন জুজু ফার্মাওজ, মধু লিয়ারে বিজু পট্টনায়ক প্রমুখ রাজ্যের কর্মরতরা। তাঁরা রাজ-নারায়ণের বহিষ্কারকে স্বাগত

জানিয়েছেন। অবশ্য তাতেও রাজকে একেবারে নিঃসঙ্গ বলা যাবে না। কারণ তার হুম্মানের স্মৃতিকা গ্রহণের জন্ত এখন মণিরাম বাগড়ী এগিয়ে এসেছেন। রাজ-নারায়ণের রাজনৈতিক জীবন প্রায় মনিয়ে এসেছে; কিন্তু চরণ সিং বা লোক দলের ভবিষ্যৎ কী?

সাঁচা-ঝুটা

কেবল লোকদল কেন, সাবেক জনতা দলই আবার ভাঙতে চলেছে প্রথমতঃ জগজীবন রাম ময়াদিত্তীতে দুদিনের এক সংমেলন করে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরাই সাঁচা জনতা পার্টি। জনতা দল ভাঙার গৌরব তিনি নেবেন না বলে আগের দিন ঘোষণা করে পরের দিনই খাস জনতা নামে নিজেকে অতিহিত করলেন। অর্থাৎ চন্দ্রশেখর-নানাজী দেশমুখের দলটা ঝুটা জনতা। সম্মেলনে জন-সমাগম আদৌ হয়নি। কিন্তু তাতেও বাবুজী ‘অগ্রগতি’ রোধ করা যায় নি। বৈষম্য সদস্যদের প্রস্তাব নিয়ে জনতা নেতৃত্বের তিনি যথারীতি প্রাক্ক করেছেন, অভিযোগ তুলেছেন ইন্দিরা আর এস এস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে।

কিন্তু বাবুজী কী চান—কেউ খাচ করতে পারেনা। সাঁচা

দেশ কাল স্বাধীনতা

জনতার কর্মসূচীতে নতুন কিছু বিদ্যত হয়নি, কংগ্রেসের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছাই আর এক বার প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। তবে কি বাবুজী কংগ্রেস (আস)-কেই গৌরবান্বিত করবেন দেবরাজ আসের শ্রদ্ধাভিক্ষিত হয়ে? না কি সরাসরি ইন্দিরার পায়ে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বেন? কর্ণাটকে বীরেন্দ্র পাতিলা যদি ইন্দিরার বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াই লড়েও পরে ইন্দিরা মঙ্গিমভায় স্থান পেতে পারেন, তবে বাবুজীর অপরাধই বা কমান অযোগ্য হবে কেন? কেন্দ্রীয় মঙ্গিমভা। কয়েকটি দপ্তর তো শূন্য রাখাই হয়েছে। বহুগুণা ইন্দিরাজীর চোখে নিশ্চয় হতে পারেন, কিন্তু বাবুজীর বিরুদ্ধে তিনি পাবেন কোথায়। আস কংগ্রেসে গেলে ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার কোন আশু সম্ভাবনা তো নেই! অতএব.....

ইন্দিরাকে ওয়াকওভার?

অতএব জনতা দল ভাঙবেই। তার আর একটা কারণ সাবেক জন সংঘীরা আলাদা করে সংমেলন

ডেকেছে। আর এস এস-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাদের পক্ষে কোনো মূল্যের বিনিময়েই সম্ভব নয়, বৈষম্য সদস্য পদ নিয়ে বাড়াবাড়ি আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়—একথাই সংমেলন মঞ্চ থেকে জনে জনে জন-সংঘীরা ঘোষণা করবেন অর্থাৎ হাড়ি পৃথক হল—মুখে একথা না-বলেও কাজে আলাদা হৈসেলের সিদ্ধান্তই হয়তো নেওয়া হবে।

বাস্তবিক, জনতা দলে বর্তমান বিরোধ জনসংঘকে নিয়েই। চরণ-রাজনারায়ণ ফার্মাওজ-লিয়ারে-বিজু দল ছেড়েছিলেন বৈষম্য সদস্যদের প্রসঙ্গে, জগজীবন রামও তাই। চন্দ্রশেখরেরা দেখেছেন আর দলের বীধন বজায় রাখা যাচ্ছে না, তাই ইদানীং তিনিও বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেছেন। বামশ্রমী-আধবানী দেশমুখেরাও দেশস্ত্র জোড়াতালি দিয়ে চলা আর সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু অতঃ কিম্ব? দেওয়ানের নির্দেশে ইন্দিরার সঙ্গে সহযোগিতা? মোটের উপর, আসের বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরাকেও ওয়াক ওভার দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বাজেটের সমবায় সূত্র ও সাম্যবাদ

রবি গুহরায়

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রস্তাবের আলোচনার বলা হয়েছে যে সরকারী মালিকানাধীন উৎপাদনমূলক কারখানা পরিচালনার সমবায় প্রথা প্রবর্তনের ফলে উৎপাদনে প্রকৃত উন্নতি দেখা দিয়েছে। যে সব কারখানায় সরকারী অধিগ্রহণের পরও লোকসান হচ্ছিল সমবায় প্রথা সেই সব কারখানায় কর্মচারীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে এবং কারখানা লাভজনক ব্যবসারে পরিণত হয়েছে। সমবায় প্রথার কারখানা চালালে যে, সেখানে উৎপাদনে উন্নতি দেখা দেবে এটা স্বতঃসিদ্ধ।

মুষ্টিমের ব্যক্তির অথবা একক মালিকানাধীন কোন কারখানায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে সেখানে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে কারখানা লোক-দান বাণিজ্যে পরিণত হতে পারে। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতির কারণ অহুসমান করে আমরা দেখতে পাই, শ্রমিকের কম মজুরী-চালু রেখে তাকে দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতাই প্রধানতঃ দায়ী। খাণ্ড সামগ্রী সম্বন্ধে নিত্যপ্রয়োজনীয়

জিনিসের দাম যে ক্ষেত্রে বৃদ্ধি তিন-চারবার করে বেড়ে যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী বাড়ছে বৃদ্ধি একবার এবং সেই বৃদ্ধিও বাজার দরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। আবার এরকম মালিকও বহু আছেন যারা লোভশেজি, কঁচামালের দরবৃদ্ধির ফলে লোকসান ইত্যাদি বাহানা করে বৃদ্ধির পর বৃদ্ধি মজুরী না বাড়িয়ে কাজ চালাচ্ছেন। কারখানার লাভ লোকসানের হিসাব দেখবার এজিয়ার শ্রমিকের নেই। তারা শুধু মালিকের বিলাসিতার খরচের বহরটা দেখে বুঝতে পারে লোকসানের কথা ঘটটা প্রচার করা হচ্ছে দলটা সত্যি নয়, ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

ধরে নেওয়া গেল ক্রমাগত লোক-সানের ফলে মালিকপক্ষ নিজেদের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া যেটাতে লক্ষ্য হুজেন না। অপর দিকে বাজারে কিন্তু দৈনন্দিন দরবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের মজুরী কোন প্রকারে স্থিতিশীল থাকতে পারে না, তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে মজুরী বৃদ্ধির দাবী করতে বাধ্য হয়। কাল-ক্রমে শ্রমিকদের মজুরী বাড়বার

জায়গাত দাবীগুলি তীব্র আকার ধারণ করে এবং পরিণামে কারখানায় ঊর্ধ্বাধী লক্ষ্য উঠে হয়।

ক্রমাগত অচল অবস্থা সৃষ্টির কারণগুলি আমাদের অহুসমান করে দেখা দরকার। হয়ত এমনও হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অগ্র-গতিকে, অর্থনৈতিক উন্নতিকে পশ্চাদপদ করে রাখতে একটা সর্বভারতীয় বড়মুদ্রমূলক বোঝাপড়া কাজ করছে। উৎপাদনমূলক শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের পিছিয়ে থাকলে পূর্বভারত সময়ে-কলকাতার বিশাল বাজার বঙ্গের বাইরের অন্তঃপ্রদেশগুলির শিল্প মালিকদের হাতের মুঠোর থাকতে পারে, এটা কোন জটিল হিসাব নয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকারখানা-গুলিকে বাঁচিয়ে রেখে শ্রমিকদের অতাব মিটিয়ে দেশের আর্থিক অগ্র-গতিকে অব্যাহত রাখতে বাজেটে প্রস্তাবিত এই সমবায় প্রথার কাজ চালানর পুরিকল্পনা একমাত্র রাস্তা। সমবায় প্রথার পরিচালিত কারখানায় যোগ্যতা অহুসায়ীদারী মজুরীর বৈষম্য অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেটা আকাশ-শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

'এই গান শুনেছি জীবনকে জেনেছি মৃত্যুই শেষ কথা নয়'

‘ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না, নিজে ভাই আমার পল রোব-
মন’ ‘পেট্রোগ্রাড থেকে, ভলগার
তীর থেকে কয়েক লেনিনের
আত্মনা...বাঁধ ভাঙা বস্ত্র, ঘুম
ভাঙা সজ্জায় দুর্জয় কল্লোল গান...’
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আজ জীবনমুখী
সংস্কৃতির জোয়ার বইছে, তাই এ
ধরনের গান, নাটক মুখে মুখে ফুটেছে।
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর তিন মাসে কল-
কাতার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্কৃতি বিরোধী
আন্দোলন। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী
যৌথভাবে মিছিল করল, অন্তেরা
থিয়েটার হলের দারনে বিক্ষোভ
দেখিয়ে কুৎসিত নাটক বরকট করতে
জনসাধারণকে আহ্বান জানাল।
আর লোকসভার নির্বাচনের পরেই
দেখা যাচ্ছে পাল্টা সংস্কৃতির প্রচার,
সে প্রচারে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী-
গুলো যেমন দৃষ্টে তেমনি প্রশংসনীয়
পশ্চিমবঙ্গ বায়ফ্রন্ট সরকারের
ভূমিকা।

১২ই জানুয়ারী থেকে প্রতি শনি-
বার দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে
গুরুত্বপূর্ণ ‘গণমঞ্চ’র অনুষ্ঠান।
এই নিয়ে তৃতীয় বছর চলছে। প্রথম-
দিন ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির কাছ
থেকে প্রায় পাঁচশো সাংস্কৃতিক কর্মী
মিছিল করে হাজরা পার্কে আসেন।
হাজরা পার্কের সমাবেশে নাট্যকার
অমল রায় বলেন, নির্বাচনোত্তর
পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে,

আগামী দিনগুলোতে বাহাদুর থেকে
হিরাসুর মালের মতোই সংস্কৃতির
উপর আক্রমণ তীব্রতর হবে। তাই
সংস্কৃতির মাহাত্ম্যকে সজাগ থাকতে
হবে। প্রতি শনিবারই গান, নাটক,
বাউল গান দেখতে হাজরা পার্কে
প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে। ৬ই এপ্রিল
এ বছরকার মতো শেষ অনুষ্ঠান
হবে। বর্ষার কারণে মুক্তাকাল
বিনামূল্যে এ ধরনের অনুষ্ঠান
চালানো অসম্ভব।

২৬শে জানুয়ারী থেকে ১লা
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তথ্য কেন্দ্রে এক
প্রদর্শনী হয়। উদ্বোধনী পশ্চিমবঙ্গ
মহাফজখানা। এতে দেখা গেছে
অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ১৭৭০ সালের
দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বিবরণ আর তিতু-
মিরের বিজ্ঞোহের বিভিন্ন দলিল।

এর দুইদিন পূর্বে রীক্ষ সরোবরে
‘মুক্তমঞ্চ’র উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
জ্যোতি বসু। দু’একর জমিতে এই
মুক্তমঞ্চ ৩৫০০ জন খোলা আকাশের
নীচে বসে থিয়েটার দেখতে পার-
বেন। সি, আই, টিও তথ্যবাহানে
এই মুক্তমঞ্চ তৈরি করতে খরচা
হয়েছে ১৪ লাখ টাকা। এরমধ্যে
৭ লাখ ৬ হাজার টাকা দিয়েছে
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এ্যান্ড
ইণ্ডাস্ট্রি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মীদের পরীক্ষা
নিরীক্ষার সুযোগ আমরা করে দিতে
চাই। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের

সভাপতি এস, কে, মেহরা বলেন,
আশা করি, এই মুক্তমঞ্চ শিল্প ও
সাংস্কৃতিক জগতে নতুন প্রতিভাবান-
দের প্রয়োজন মেটাবে।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির
বেঙ্গল গেজেটের দ্বিগুণ বার্ষিকী পূর্তি
উললঙ্কে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থা-
গারে ২১শে জানুয়ারী থেকে ২২রা
ফেব্রুয়ারী প্রাচীন সংবাদপত্রের এক
প্রদর্শনী হয়।

৩০শে জানুয়ারী থেকে ৮ই
ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির
উদ্দেশ্যে উত্তর কলকাতার মহেশ্বর
আলি পার্কে এক প্রদর্শনী হয়। ডি,
এ, ভি, পি আরোজিত এই প্রদর্শনীর
উদ্বোধন করেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন-
স্টিটিউট হল ৫ই-১৫ই ফেব্রুয়ারী
সারা ভারত সরকারী কর্মচারীদের
ষাটশ নাট্য প্রতিযোগিতা চলে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার
অধ্যক্ষ মনমোহন হবিবুল্লা বলেন, রাজ্য
বা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের
আমরা কলম পেয়ার কাজেই ব্যস্ত
থাকতে দেখি। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও
সাংস্কৃতিক ও মানবিক মনোভাবের
অভাব নেই। তার জন্মই তো এই
ধরনের নাট্য প্রতিযোগিতার
আয়োজন।

‘আমরা ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে
পারি’—এই গান দিয়ে গণতান্ত্রিক
লেখক-শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলনী
জিপুরা হিতলাধিনী সভা হল ভাষা
আন্দোলনের শহীদ দিবস পালন
করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য যুব-ছাত্র উৎসব
এ বছরে হয় শিলিগুড়িতে। ৫ই-৮ই
ফেব্রুয়ারী প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতি-
যোগিতা শেষ হয়। ১৫-১৭ তারিখ
হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৩শে
ফেব্রুয়ারী মূল উৎসবের উদ্বোধন
করেন জিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন
চক্রবর্তী। এ দিনটি সাম্রাজ্যবাদ-
বিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়।
নৃপেনবাবু বলেন, সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু
মূলধন নয়, প্রভাব বিস্তার করে অপ-
সংস্কৃতির মাধ্যমেও। শিলিগুড়ি
কলেজ ময়দানে ভাষাভক্ত মঞ্চ, গুরু-
দাস মঞ্চ, বাধাধীন পার্কে ঝড়িক ও
তিলকের নামে সাংস্কৃতিক মঞ্চগুলোর
নাচ গান, তুখু ও তাহু গান, লোক-
সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত আবৃত্তি প্রভৃতি
হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ে ২৩শে
ফেব্রুয়ারী ‘কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক’, ২৪
তারিখ ‘নতুন সমাজ গঠনের জন্ম

চেতনার জগতে সংগ্রাম’ ২৬শে
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ‘পঞ্চাশ-
পরতার বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন’,
২৭শে ফেব্রুয়ারী ‘জমির জন্তু জম্মাই
—পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা, শেষ দিন
২৮ তারিখে ‘গণতান্ত্রিক আন্দোলনে
আধিবাসী যুবসমাজের ভূমিকা’ ও
‘শাবিত্য অঞ্চলের উন্নয়নের সমস্যা’
ইত্যাদি মনোগ্রাহী বিষয়ে রোজই
আলোচনা হয়। ২৪ তারিখের বিতর্ক
সভা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-
ছাত্রীরা এতে অংশ গ্রহণ করে।
বিষয় ছিল : শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে
বায়ফ্রন্ট সরকারের নীতি গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধের পরিপন্থী। যুব উৎসব
বলতে শুধু নাটক, সিনেমা, গানই
নয়—এগুলোও ছিল। এখানে
আমাদের একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
উপস্থিত ছিল। আকাশে বাতাসে
ভেসে ওঠে,

• ‘.....বিভেদে কুমন্ত্রণা,
লাধীরে খুনে রাঙা পথে
দেখো, হারনার আনাগোনা
...হ’ শিয়ার, ও সাধী কিষাণ,
মজদুর ভাইসব হ’ শিয়ার।’
হাওড়া জেলার সামভাবড়
পানিডালে অষ্টম বার্ষিক শরণ মেলা
শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

॥ কলকাতা উন্নয়নের কথায় ॥

কলকাতার সাধারণ নাগরিকের মনে অনেক সময়েই প্রশ্ন জাগে যে সি,
এম, ডি, এ-র অনেকগুলি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে কিনা কেন? কত
দিন ধরে কাজ চলবে? কবে দুর্ভোগের অবসান হবে বা কবে কিছুটা
কাজের স্বকল পাওয়া যাবে?

যেমন ধরুন অকল্যাণ্ড স্কয়ারের ভূগর্ভস্থ জলাধারটির কথা। সত্যি কথা
বলতে কি এর কাজ ৩-৪ মাস আগেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু
হয়নি। মাঝে মাঝে জল বন্ধ করতে হয়েছে, নাগরিকরা অসুবিধায়
পড়েছেন। কিন্তু সে অসুবিধা তাঁরা মেনে নিচ্ছেন এই ভেবে যে জলা-
ধারটির কাজ শেষ হলে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেশী পরিমাণে
এবং বেশী চাপে জল পাবেন। আমরাও সেটা জানি এবং জানি বলেই
তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করার আশ্রয় চেষ্টা করছি।

কিন্তু দুর্ভোগের কথা যে পারিনি। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমাদের ইন্ডি
নীলাররা খেটেছেন। কিন্তু হয়নি।

প্রথমত এই ধরনের কাজ এর আগে কলকাতায় হয়নি। কাজেই
আমাদের অভিজ্ঞতাও কম।

দ্বিতীয়ত কাজ করতে গিয়ে এমন অনেকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হলাম
যেগুলি ভাবতেই পারিনি। এক সময় পাইপের সংযোগ দুঃসাধ্য ব্যাপার
হয়ে পড়েছিল। জাহাজের মাঙ্গলের মত চিমনি বসাতে হয়েছে। এক
সময় পাইপের মধ্যে মূশোশ পরা ডুবুরি ঢুকিয়ে ভেতরে লোহার পাত
কাটতে এবং জোড়া দিতে হয়েছে। মাঝে মাঝেই পাইপের অয়েক্ট ছেঁদা
দেখা যাচ্ছে। এগুলিকে ইংরেজীতে বলে “টিংগিং ট্রাবল” —বাংলায় বলতে
হয়, বহুকে বাগে আনবার আগের দাঁতখিঁচনী। আমরা এখনও আশা
করছি যে শীগগীর আমরা বাকী কাজটুকু শেষ করতে পারব এবং প্রতিশ্রুতি
মত দক্ষিণ কলকাতায় বেশী জল দিতে পারব। বিলম্বের জন্য ক্ষমতা
করে মিছি। কিন্তু বিলম্ব করুন চেষ্টার ক্রটি আমাদের হয়নি।

অনেক জায়গায় দেখবেন রাস্তার কাছে বড় বড় ব্লক অচল হয়ে পড়ে
আছে। এর কারণ, হয় বিটুমেন (আলকাতরা) অথবা পাথর কুচির
অভাব। এমন কি মাঝে মাঝে ইটও দুর্জাপ্য হয়ে ওঠে। লোহার সরবরাহ
অথবা ঠিক সাইজের পাইপও সময়মত পাওয়া যায় না।

এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হল যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ
করতে হয়, সেটা আপনাদের একটু জানানো। কারণ জানবার অধিকার
আপনাদের আছে। মাল-মশলা যদি ঠিকমত না আসে (যার দায়িত্ব সি,
এম, ডি, এ বা রাজ্য সরকারের নয়) তাহলে কাজের গতি ব্যাহত হয়। এ
ছাড়াও নানারকম বাধাও আছে। অনেক কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণের
বাইরে।

আশা করি আপনারা জিনিষটি গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং যতখানি
সম্ভব সহযোগিতা করবেন। যেমন ধরুন জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে
অহেতুক বাধা না দিয়ে যদি সাহায্য করেন তাহলে কাজটা ভালভাবেই হয়
এবং তাড়াতাড়ি হয়। সেটাই প্রয়োজন।

কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে অনেক কথা আপনাদের সঙ্গে আছে।
(সি, এম, ডি, এ-কর্তৃক প্রচারিত)

মতামত স্থায়ী কাজ চাই

বেকারভাতা প্রাপ্ত ব্যারাকপুর
ও হুমদম মহল্লা অঞ্চলের কর্মী
হিসাবে আমরা অভ্যস্ত দুঃখের সঙ্গে
নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাদের অভাব
অভিযোগের কথা জানাচ্ছি উপযুক্ত
প্রতিকারের আশায়। সংশ্লিষ্ট
অঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার কর্মীর কর্ম
বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা
গ্রহণ করে তাদের মধ্যে মাত্র
৭০০ জনকে মাত্র কয়েক মাসের
জন্তে নিযুক্ত করা হয় ভোটের
তালিকা প্রস্তুতের কাজে নামমাত্র
পারিশ্রমিকে। ভোটের কাজ শেষ
হওয়া মাত্র আমরা আবার সেই
ভাতাপ্রাপ্ত সরকারী বেকার মাত্র।
কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কী? বারী
এখনো নির্দিষ্ট কোনো কাজ পাননি
তাঁরাই বা করবেন কী? কতদিন
আর এভাবে সরকারী বেকার অ্যাধ্য।
নিরে দণ্ডষ্ট থাকতে হবে? অথচ
সরকারীভাবে নানা সময়ে স্থপষ্ট

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকারী-
ভাবে কোনো কাজে নতুন পদে
লোক নিয়োগের সময় এদের নেওয়া
হবে কিন্তু কার্যত সরকারী তরফে
তার কোনো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে
না। কিন্তু আমরা দিনের পর দিন
অত্যন্ত গানিময় জীবনযাপন করতে
বাধ্য হচ্ছি। যখন মনে হচ্ছে,
ক্রমশ আমাদের কর্মশক্তির অপচয়
হচ্ছে, তখনই আমাদের মন এক
অসহায় ক্রান্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে
উঠছে। এমতাবস্থায় আমাদের
বিনীত নিবেদন, রাজ্যের জনপ্রিয়
সরকার আমাদের কথা আরেকটু
সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রতিশ্রুত
স্বাক্ষরকাজের ব্যবস্থা করুন এবং
আমাদের স্থায়ী ও স্বাভাবিক জীবন-
যাপনের সংগত সুযোগ দিন—যাতে
রাজ্যের অগ্রগতিতে আমরা সর্বাত্মক-
করণে সাহিল হতে পারি।

অলোককুমার ঘোষ চৌধুরী
কালিধাস ভট্ট
মুখ্য সাধারণ সম্পাদক,
নির্বাহনী কর্মচারী ইউনিয়ন

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অপদার্থতার ফলে স্বাস্থ্য দপ্তর নরককুণ্ডে পরিণত

বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর এস পি নেতা ননী ভট্টাচার্যের গোঁসা হয়েছে। ননীবাবু তাঁর গোঁসার কথা কয়েক জনকে বলেছিলেন। এবং বলতে গিয়ে বলাবাহুল্য ননীবাবু স্বাস্থ্য দপ্তরের অনাচার অবিচার ইত্যাদির মূলে-তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। বিধানসভার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পাশ করাতে গিয়ে ননীবাবু দুর্নীতির প্রক্ষে কোনও সহুস্তরই দিতে পারেন নি। পরন্তু বিধানসভার তীব্র সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও মহাকরণের স্বাস্থ্যদপ্তরে বেপরোয়া অনাচার, ভেটোচার, বেসাইনী প্রমোশন, পক্ষপাতিত্ব যথারীতি চলছেই। নতুন উপদর্গ ছুটেছে মদ ও আত্মজিক মানা বিষয়ের অবাধ লেনদেন। গুটিকর আরলা ননীবাবুর অপদার্থতার স্বযোগ নিয়ে গোটা স্বাস্থ্যদপ্তরকে নরক করে তুলেছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে লাখ লাখ সাধারণ মানুষকে। প্রসঙ্গত বলা দরকার স্বাস্থ্যদপ্তরের দচিব বি আর চক্রবর্তী, ডেপুটি সেক্রেটারী ডাঃ এস কে স্কুল, কল্যাণ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন স্বযোগসন্ধানী ধান্দাবাজ অফিসার স্বাস্থ্যদপ্তরকে ভুসিয়ে গোটা বামফ্রন্টের মুখে চুন-কালি দিতে চাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য এ সমস্ত ঘটনা জেনেও মনেও চুপচাপ, নিষ্ক্রিয় দর্শক। চক্রবর্তী, স্কুল, ঘোষ প্রমুখ ঘোড়ল অফিসাররা প্রায় প্রকটভাবেই ননীবাবু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে আবার কাজ হািমিলের সময় তারই প্রশস্তি গেয়ে নানা ধরনের অস্তায় কাজে সই ম্যানেজ করে আনছেন। এমন কি এদের মধ্যে ছ একজন এমনও বলেছেন ননীবাবুর জ্ঞান তো জানা আছে। ভাল করে ইংরেজীও লিখতে পারেন না। যা করার করে নাও।

ননীবাবু দার্শনিকের মত বলেছেন অনেকেই আমাকে কড়া হতে বলছেন। কড়া হতে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কড়া হওয়ার নমুনা দু'এক দিন আগেই দেখা গেছে। দপ্তরের কল্যাণ ঘোষ, তিনি ছিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রাণিণ্ডি বিভাগের এ্যানিষ্টেট ডিরেক্টর। কিন্তু ননীবাবুই কড়া হওয়ার নমুনা হিসাবে বেশ কিছু দিনের অফিসারকে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করে কল্যাণ ঘোষকে ডেপুটি ডিরেক্টর পদে বসিয়ে দিয়েছেন। অথচ ননীবাবুর মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র নততা এখনও অবশিষ্ট থাকে তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে, ননীবাবুই বিভাগের পদস্থ অফিসারদের কাছে মন্তব্য করেছেন যে, কল্যাণ ঘোষের মত অপদার্থ ব্যক্তি খুব কমই রয়েছে। ওর মতে ঘোষ কোন কাজকর্ম করে না, ওকে কম দায়িত্বপূর্ণ কোথাও বদলী করে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি কি করলেন? চক্রবর্তী স্কুলের পরামর্শে নিজের বিভাবুক্তি জমাগুলি দিয়ে কল্যাণ ঘোষকে এ্যানিষ্টেট ডিরেক্টর থেকে একেবারে প্রমোশন দিয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর করে দিলেন। শুধু তাই নয় তাঁকে দেওয়া হল স্বাস্থ্য বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ এক দপ্তর মেডিকেল এডুকেশন রিসার্চ ট্রেনিং বিভাগ। অথচ এই বিভাগে মাত্র দু'তিনমাস আগে ডাঃ পি প্রামাণিককে বসানো হয়। কি হলো কেউ জানেন না। ডাঃ প্রামাণিককে চিত্ত-রঞ্জন সেবাসদনে সুপারিনটেনডেন্ট করে তাঁকে মহাকরণ থেকেই সরিয়ে দেওয়া হল। কেননা ডাঃ প্রামাণিককে না সরানো হলে ধুরন্ধর ঘোড়ল কল্যাণ ঘোষকে বসানো অসম্ভব। আর উনি চলে গেলে স্বাস্থ্য দচিব বি আর চক্রবর্তী ও নানাধরনের কাজকর্মে নানা অসুবিধা। অতএব ননীবাবু একটা অস্বাভাবিক প্রমোশনের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সই করে দিলেন।

দর্পণের পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে আছে পি জি হাসপাতাল সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের কথা। তার বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলা যায় ঐ হাসপাতালের প্রাক্তন সার্জেন সুপার ডাঃ শিশির দেবকে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে ননীবাবু, প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা মণি ছেজী প্রমুখ কয়েকজন তাঁকে দারুণ রকম নাজেহাল করেন। তাঁকে কমিশনের কাছেও দাঁড়াতে হয়। কমিশন তাঁর রায়ে ডাঃ দেবকে দুর্নীতির দায় থেকে সসম্মানে মুক্তি দেন। কিন্তু রায়ের আগেই ননীবাবু কিছু কুচক্রী অফিসারের মদতে ডাঃ দেবকে প্রায় দুশো টাকার বেতন কমিয়ে মহাকরণে বদলী করে নিয়ে আদেন। কমিশনের রায়ে ডাঃ দেব নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে পি জি তে ফিরিয়ে দেওয়া হলো না।

বাজেটের অভিসন্ধি

অর্থ নৈতিক ভাব্যকার

১৯৮০-৮১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন কোন কর আরোপ করা হয় নি। যদিও নতুন অর্থমন্ত্রী আর. ভেঙ্কটরমণ এর আগে বলেছিলেন যে তিনি পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন নি। 'ভোট অন একাউন্ট' পেশ করে পাশ করিয়ে নিয়েছেন।

আমলে ভেঙ্কটরমণ যা মনে করেন, কাজে তা করতে পারেননি। করতে পারেন না। কংগ্রেস (ই) দল যে সকল মনোহর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছু কিছু লোককে প্রতারিত করে ক্ষমতালভ করেছে সেগুলি পালন করার ইচ্ছাও তাদের নেই, তা সম্ভবও নয়। ইতিমধ্যে রাজ-নৈতিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার নয়াটি রাজ্যের বিধান-সভা ভেঙ্গে দিয়েছে। জনতা, লোক-দল ও কংগ্রেস (আ)-এর সমস্তেরা সবাই যোগা তুলসীপাতা নন, অনেক কাছে কংগ্রেস (ই) অনেক বেশী বরদী। আর স্বযোগ লক্ষ্যমী রাজ-নৈতিক ব্যক্তিত্ব তো আদর্শবাদ ও সাধুতার ধার ধারে না তাই তারা দলে দলে কংগ্রেস (ই)-এর মধুভ্রমের দিফে ছুটেছে।

কিন্তু এসবই সাধারণ মানুষের চোখে জঙ্কাকর, ঘৃণ্য কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে কংগ্রেস (ই) জনসাধা-রণকে ফাঁকি দিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তারা জন-গণকে প্রত্যাণ্ড করে না। বিশ্বাসও করে না। হুতরাং ফাঁকি দিয়ে কাজ হািমিল করাই কংগ্রেস (ই)-এর চিরকলে কায়দা। এবারেও তাই হয়েছে। এবার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই ফাঁকি-বাজী বিস্তার গাভ করছে।

কংগ্রেস (ই) সরকার মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে পারেনি। পারবেও না। গত বছর সাধারণ নির্বাচনের আগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম তার আগের বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়েছিল, লোকসভা নির্বাচনের পর এই মূল্যবৃদ্ধির হার আরো বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। গত তিন মাসে আরো ৮-৪ লক্ষ বেকারের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখন তারতের বেকার সংখ্যা ১-৫ কোটি। এরা কেবল তালিকাভুক্ত শিক্ত বেকার। গ্রামেয় অশিক্ত বা স্বল্পশিক্ত পুরো ও আধাবেকার-দের সংখ্যা প্রায় নয় কোটি। নিত্য ব্যবহার্য কেরোসিন, চিনি, কাগজ, দেশালাই, ভিজেল, রামায় তেল সবই আক্রা না হয় দুর্লভ।

বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও হরি-য়ানার কংগ্রেস (ই) দল মাত্র ২৫% থেকে ৩৫% শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছে। সম্মিলিত বিরোধী ভোট অনেক বেশী। হুতরাং কংগ্রেস (ই) নেত্রীর ভয় আছে। এই নয়টি রাজ্যে জয়লাভ বিশেষতঃ হিন্দী ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে জয়-লাভ করতে না পারলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বেশীদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। তার নৈতিক অধিকারও তাদের থাকবে না। বিরোধী দলগুলি যাতে একছোট হতে না পারে জন্তে কংগ্রেস (ই) দলের টাকার খজি খুলে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপও সৃষ্টি করা হয়েছে। জনতা, লোক-দল ও কংগ্রেস (আ)-এর সমস্তেরা সবাই যোগা তুলসীপাতা নন, অনেক কাছে কংগ্রেস (ই) অনেক বেশী বরদী। আর স্বযোগ লক্ষ্যমী রাজ-নৈতিক ব্যক্তিত্ব তো আদর্শবাদ ও সাধুতার ধার ধারে না তাই তারা দলে দলে কংগ্রেস (ই)-এর মধুভ্রমের দিফে ছুটেছে।

কিন্তু এসবই সাধারণ মানুষের চোখে জঙ্কাকর, ঘৃণ্য কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে কংগ্রেস (ই) জনসাধা-রণকে ফাঁকি দিয়ে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তারা জন-গণকে প্রত্যাণ্ড করে না। বিশ্বাসও করে না। হুতরাং ফাঁকি দিয়ে কাজ হািমিল করাই কংগ্রেস (ই)-এর চিরকলে কায়দা। এবারেও তাই হয়েছে। এবার অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই ফাঁকি-বাজী বিস্তার গাভ করছে।

কংগ্রেস (ই) সরকার মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে পারেনি। পারবেও না। গত বছর সাধারণ নির্বাচনের আগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম তার আগের বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়েছিল, লোকসভা নির্বাচনের পর এই মূল্যবৃদ্ধির হার আরো বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। গত তিন মাসে আরো ৮-৪ লক্ষ বেকারের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। এখন তারতের বেকার সংখ্যা ১-৫ কোটি। এরা কেবল তালিকাভুক্ত শিক্ত বেকার। গ্রামেয় অশিক্ত বা স্বল্পশিক্ত পুরো ও আধাবেকার-দের সংখ্যা প্রায় নয় কোটি। নিত্য ব্যবহার্য কেরোসিন, চিনি, কাগজ, দেশালাই, ভিজেল, রামায় তেল সবই আক্রা না হয় দুর্লভ।



সভার অস্থমোদন নিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন ছয় মাস পর্যন্ত চালানো যায় কিন্তু তার মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। শ্রীমতী গান্ধীর রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলনা। কিন্তু দল-ত্যাগের মাধ্যমে তা সংগ্রহ হয়েছে এবং রাজ্য সভায় নয়াটি রায়েয় বিধানসভা বাড়িলের আদেশ অস্থ-মোদন লাভ করেছে। দলত্যাগে উৎসাহহান শেষ পর্যন্ত উৎসাহহাতা-দেরই যে আঘাত করে, চরণ সিং-রাজনারায়ণ কোং তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীমতী গান্ধীও একই পথ ধরেছেন। এই ধরনের নৈতিকবোধশূন্যতা বাহেরাং হয়ে ফিরে আসে।

শ্রীভেঙ্কটরমণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট দেন নি কারণ নয়াটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরো বছরে ট্যাক্স-বৃদ্ধি, এবং কল্যাণমূলক কাজে খরচ কমানোর ফলে লোকের মনে যে তীব্র বিরাগ দেখা দেবে তা কংগ্রেস (ই) দলকে পরাজিত করতে পারে। গত লোকসভা নির্বাচনেও দেখা গেছে কংগ্রেস (ই) দল মাত্র ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬৭ শতাংশ আসন লাভ করেছে। যে নয়াটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল উত্তরপ্রদেশ,

অশোক মিত্রের টার্মস অফ ট্রেড তত্ত্ব ও ভারতের অর্থনৈতিক সংকট

পার্থ মুখোপাধ্যায়

Terms of Trade And class Relations—An Essay in Political Economy : Dr. Ashok Mitra
Publisher : Rupa & Co. Calcutta.
Price : Rs. 18'00

অশোক মিত্র মার্কসবাদী। মার্কসবাদী অর্থনীতির পণ্ডিতরূপে আছে তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এককালের অধ্যাপক, ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, কৃষি-মূল্য কমিশনের চেয়ারম্যান আজ পশ্চিম-বাংলার প্রথম বামপন্থী সরকারের অর্থমন্ত্রী। এসব পরিচয়ই জানা। কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থনীতির এক বিশেষ “টুক”-কে হাতিয়ার করে শ্রেণী সম্পর্কের আলোকে অশোক মিত্র যে অর্থনৈতিক ‘মডেল’ গড়ে তুলেছেন দৃষ্টান্ত, তা এখনও প্রায় অজানা।

অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডোর ‘ক্যাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকনমি’র যুগে বা মার্কস সাহেবের রচনার শ্রেণীভেদ প্রাধান্য লাভ করেছিল। অ্যাডাম স্মিথ শুধু শ্রেণী পার্থক্যের কথাই বলেন নি, শ্রেণীগত বৈরিতার রূপটুকুও স্পষ্ট ছিল তাঁর রচনায়। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ছিল দোহলাহমানতা। ডেভিড রিকার্ডো সে পথের পথিক নন। জাতির সম্পদের প্রকৃতি ও কার্যই শুধু তখন অর্থনীতির বিষয় থাকলো না, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপাদিত পণ্য কোন নিয়মে বন্টিত হবে সেই প্রশ্নই ‘ক্যাসিক্যাল পলিটিক্যাল ইকনমি’র প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। রিকার্ডোর কাছে। জমির মালিক, চাষের জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধনের মালিক আর ঘরের পরিষ্কারের জন্ত উৎপাদন হয় সেই শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য বন্টনের অর্থনৈতিক নিয়ম খুঁজতেই হল অ্যাডাম স্মিথের উত্তরসূরী রিকার্ডো সাহেবকে। আপেক্ষিক মূল্যের টানাপোড়েনে জাতীয় আয়ে শ্রমজীবী ও মূল্যকার অংশের হ্রাসবৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে সেই অর্থনৈতিক ‘টুক’—‘টার্মস অব ট্রেড’-এরই প্রভাব। কিন্তু সামন্ত প্রভুদের গ্রাম ও পুঁজিপতিদের শহরের মধ্যে ‘টার্মস অব ট্রেড’ নিয়ে রিকার্ডো-মালথাস বিতর্ক অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে স্মৃতিচরিত বিশেষ দিক। কারণ সেই তো প্রথম নিজের নিজের শ্রেণী স্বার্থ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সংঘাত। অবশ্য গোড়া মার্কসবাদীরা নাকি আরো এভাবে চিন্তা করেন নি—অভিযোগটা আমার নয়

অন্য অশোক মিত্রের। মার্কস সাহেবের পর আর বন্টনের ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পর্কের প্রভাব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাননি। কারণ কিন্তু একটাই। সেই শ্রেণীস্বার্থ। অর্থনৈতিক চিন্তাকে নিমজ্জিত রাখা হল ‘মার্কসিস্টাল রেভলুশনে, কখনও অপটিক্যালিটির প্রসঙ্গে কিংবা মেকেন্ড বেটের গভীর জালে। শোষণ ব্যাপারটাই ঢাকা দেওয়া হল। প্রত্যেক উপাদানই যদি তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্য পায় তাহলেই তো উৎপাদিত দ্রব্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তাহলে আর শোষণের অস্তিত্ব কোথায়? এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আসেন নি কেউ। তবে কি ব্যতিক্রম নেই? আছে। তবে সবই ইদানীং। এদেরই মধ্যে আছেন পল হুইজি, অস্কার লাজে। আছেন মিচাল কালেক্তি। আছেন শ্রীমতী রোজা লুক্সেমবার্গ।

অর্থনৈতিক কাঙ্ক্ষার প্রতিটিই তো বিনিময় বা বাণিজ্য, হোকনা সে কোন শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, অর্থনীতির এক সেক্টরের সঙ্গে অন্য সেক্টরের বা এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের। প্রতিটি বিনিময় বা বাণিজ্য এক পক্ষ ক্রেতা, অপর পক্ষ বিক্রেতা। ক্রয় বিক্রয়েরও নির্দিষ্ট শর্ত আছে। এ শর্ত হল মূল্য অর্থাৎ বাণিজ্যিক হার। অর্থনৈতিক পরিভাষাতে এই মূল্যকেই বলে টার্মস অব ট্রেড। আমরা তো আধুনিক যুগে বাস করি। তাই ব্যবসার বদলে দ্রব্য বিনিময় আর এখন হয় না। আমরা দিই অর্থ। বিনিময় করি পণ্যের সঙ্গে অর্থের। পণ্যের আপেক্ষিক মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি আমরা বেসী দাম দিতে হয় তবে আমরা বলি টার্মস অব ট্রেড বা বাণিজ্যিক হার বিক্রেতার পক্ষে গেছে। আবার পণ্যের মূল্য হ্রাস পেলে বলি বাণিজ্যিক হার ক্রেতার পক্ষে গেছে। এতো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই বিনিময় বা বাণিজ্যিক হারকেই ভিত্তি করে অশোক মিত্র রচনা করেছেন তার তত্ত্বের নীতি।

মার্কসবাদী হিসাবে গোড়াতাই তিনি ধরে নিয়েছেন আমরা যে সমাজে বাস করি তা শোষণ ভিত্তিক ও শ্রেণী-বিভক্ত। গ্রামাঞ্চলে ধনী-চাষী একদিকে, অপর দিকে ছোট-

চাষী ও ক্ষেত মজুর। শহরাঞ্চলে একদিকে পুঁজিপতি, শিল্পপতি অপরদিকে শ্রমিক। নির্দিষ্ট আয়ের চাকুরী-জীবীরাও তাঁর মডেলে শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অশোক মিত্রের মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যই ক্ষমতা দখল। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করে শ্রেণীর স্বার্থে সম্পদ ও আয়ের পুনর্বন্টন ঘটানো। ইতিহাসের পাতা উন্টলে দেখা যায় সম্পদ অধিকারের নিমিত্ত যুদ্ধ, লুণ্ঠন বা সম্পত্তি বাজে-রাপ্ত করার ঘটনাবলী। কিন্তু মানুষ তো সজ্ঞা হয়েচে—অন্ততঃ আমরা তো—দাবী করি। তাই নিজের শ্রেণীর অধিকারে সম্পদ ও আয়ের বন্টন ঘটানোর পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। শুধুমাত্র মূল্যনীতির পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ ব্যবসার আপেক্ষিক মূল্য বা বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তন ঘটলে সৃষ্টিত সম্পদের থেকেও অধিক সম্পদ জড় করা যায় রাষ্ট্রক্ষমতার আধীন শ্রেণীর অধিকারে। যেহেতু অর্থনৈতিক বিকাশ বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল এবং বিনিয়োগ সংকল্পের

গ্রন্থ পরিচয়

উপর নির্ভরশীল, তাই আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রশ্ন সংকল্প। সম্পদ ও আয়ের পরিমাপের দ্বারা নির্ধারিত হয় সংকল্প। যেহেতু টার্মস অব ট্রেডই নির্ধারণ করে সম্পদ ও আয়ের পরিমাপ তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, বিকাশের সমস্ত প্রশ্নই নির্ভর করে বাণিজ্য হারের উপর। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে যে শ্রেণী, সেই শ্রেণীর স্বার্থেই যেহেতু পরিবর্তন করা হয় বাণিজ্যিক হারের তাই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মৌল-চিন্তা শ্রেণী সম্পর্ক—এটাই তো মার্কসবাদীতত্ত্ব।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যোৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে ছাড়াগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শ্রমিকে বঞ্চিত করে পণ্যে উৎকৃষ্ট মূল্য সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, পণ্য বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট মূল্য মূল্যায় রূপান্তরকরণ। গোড়া মার্কসবাদীরা পুঁজির শোষণ, উৎকৃষ্ট মূল্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু প্রশ্নের ওপর পুঁজির শোষণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন শোষণের অস্তিত্ব ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আছে কি? এ প্রশ্নেরই বিস্তারিত আলোচনার রত-ছিলেন শ্রীমতী রোজা লুক্সেমবার্গ।

কার্ল মার্কস তাঁর ‘ক্যাপিটাল ইন ক্লাস ১৮৮৫-৯০’ গ্রন্থে কৃষকশ্রেণীর ওপর দ্বিতীয় ধরনের যে শোষণের উল্লেখ করেছিলেন তারই ভিত্তিকৃষ্টি লুক্সেমবার্গের মডেল। দ্বিতীয় শোষণের অস্তিত্বই হল অসমহারে বিনিময়। এই অস্ত্রের সাহায্যেই পুঁজিপতিরা ধনতন্ত্রের সংকট সমাধানের চেষ্টা করেন। অশোক মিত্র অসমহারে বিনিময়ের মাধ্যমে শোষণটিকে তাঁর মডেলের প্রধান স্তম্ভ করেছেন।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত চারটি শ্রেণী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সর্বদাই অর্থনৈতিক কাঙ্ক্ষার ক্রিয়াশীল। এই বিনিময় বা বাণিজ্য-গুলিতে তিনধরনের বাণিজ্যিক হার বা টার্মস অব ট্রেড-এর অস্তিত্ব রয়েছে। প্রথমত, কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের মধ্যকার বাণিজ্যিক হার বা কৃষি-শিল্পের বাণিজ্যিক হার রূপে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ ধনী কৃষক বনাম ছোট চাষী ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যকার বিনিময়ের বাণিজ্যিক হার; তৃতীয়ত, পুঁজিপতি-বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার বিনিময়ের বাণিজ্যিক হার। দ্বিতীয় বাণিজ্যিক হার দ্বারা নির্ধারিত হয় শ্রমজীবী, কৃষকের মজুরি, চাষের ও ভাগচাষের শর্ত। এ থেকেই প্রতিকল্পিত হয় কৃষি ক্ষেত্রে ধনীচাষীরা কি রূপ ভিত্তি অব মনো-পলি ভোগ করছেন। তৃতীয় বাণিজ্যিক হার দ্বারা নির্ধারিত হয় শোষণ শ্রেণীর মধ্যকার আয়ের বিভাগ অর্থাৎ জাতীয় আয়ে শিল্পপতি ও সামন্ত প্রভুদের মধ্যকার অংশ কত হবে—এই প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া জমিদার (rural oligarch)-তন্ত্রের হাতে। মূল লিভারটি নিজেদের হাতে রেখে বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক আতাত গড়েছেন জমিদারদের সঙ্গে শ্রেণী শাসন বজায় রেখে রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করতে। নিজেদের স্বার্থে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আতাত করার মাণ্ডল গুণতে হয়েছে তাঁদের। কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের মধ্যকার বাণিজ্যিক হার ক্রমাগতই কৃষিজাত পণ্যের দিকে চলে যেতে দিতে হয়েছে আতাতের মূল্য হিসাবে। অর্থবহ ভূমিসংস্কার করার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। এ সব কতি অবশ্য তাঁরা অন্তরিক

পুথিরে নিয়েছেন রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ভারত সরকারের শিল্পনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করে। উল্লেখ করেছেন প্রতিটি পাই-পয়সা।

বাণিজ্যিক হার কোন পক্ষে হওয়ায় অর্থই তো সেই পক্ষের আপেক্ষিক মূল্যান্তরের উদ্ভব গতি। ভারতবর্ষে যেহেতু বাণিজ্যিক হার ক্রমাগত কৃষিপণ্যের অঙ্কুলে গেছে তাই ভারতবর্ষে ক্রমাগতই কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ার অর্থই একদিকে খাজনাব্যয় জ্ঞাত ব্যয় বৃদ্ধি ও অপরদিকে শিল্পের ক্ষেত্রে কৃষিজাত কাঁচা মালের মূল্য বৃদ্ধিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শিল্পজাতপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। মূল্য স্তরের এই উদ্ভবগতির ফলে মানুষের ব্যাপকতম অংশের ক্রয় ক্ষমতার ক্রমাগত হ্রাস প্রকৃত আয়ের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে। খাজনাব্যয়ের উপর অধিক ব্যয়ের জ্ঞাত আঘাত এসেছে সংকটে। শিল্পজাত পণ্যের বাজারে সাধারণ মানুষ হাতই বাঁধাতে পারেনি। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকেই শিল্পক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে প্রায়-স্থিরতা (quasi-stagnation) অপরদিকে সেই বিস্তারিত বাদের হাতে এসেছে সম্পদ, আয়, তাদের প্রয়োজন মেটাতে বিনিয়োগ হয়েছে বিলম্বজব্যব উৎপাদনে। সে বিনিয়োগও রীতিনীতি মেনে নয়। বাজারের তুলনার বিগুন। সব মিলিয়ে সমগ্র অর্থনীতিতেই অন্তত লক্ষণ। শিল্পক্ষেত্রে মন্দা—ফল হিসাবে হ্যাটাই, লক-আউট, ক্লোজার। খাজনাব্যয় মানুষের নাগালের বাইরে। সম্পদ ও আয় বুর্জোয়া ও ধনীচাষী-সামন্ত প্রভুদের হাতে কুক্ষিগত। অর্থনীতি তার প্রাণচঞ্চল হারিয়ে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন অর্থনীতিবিদেরা সোহাগ করে যার নাম দিয়েছেন স্টাগনেশন—অর্থাৎ ইনক্লেশন ও স্টাগনেশনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কারণটা সেই রাজনৈতিক আতাত।

এই অসহনীয় সংকট থেকে জাতির পথ একটাই। সেই রাজনৈতিক আতাতকে ভাঙতেই হবে। “the collapse of the coalition must be regarded as a positive development towards reacting the forces of growth...” ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হওয়াতেই যাহুর বলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবেই কারণ, তিনিও সেই আতাতের প্রতিনিধি।

পর্যটকের চোখে পাকিস্তান

শ্রেমিলা জুইস

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ আমি আমার পুত্রকে নিয়ে দিল্লী থেকে অমৃতসর য়েলে পাকিস্তান অভিমুখে রওনা হলাম। আমাদের ওপাতে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। পাকিস্তানে থাকার অহমতি আমার মাত্র পাঁচ মণ্ডাহ। পাকিস্তান যাবার উৎসাহ আমার শরীরে শিহরণ সৃষ্টি করে, কারণ পাকিস্তান আমার পূর্ব-পুত্রের জন্মস্থান যেখানকার মাটিতে আছে আমার পূর্ব-পুত্রের স্মৃতি, যেখানকার মানুষকে মনে হয় আমার আত্মীয়, যদিও পেরতের সীমানার ওপাশে পাকিস্তানের সঙ্গে আমার কোন পরিচিতি নেই, আজ যেমন নেই পৃথিবীর অন্তান্ত বহু দেশের সঙ্গে, শুধু বঙ্গদেশ তার ব্যতিক্রম।

এবার এলো সীমানা অতিক্রমের পালা। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেলাম সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার। ঠিক পাকিস্তানের জমিতে পা দেবার আগে মূহুর্তে এগিয়ে এলো এক দীর্ঘকার বলিষ্ঠ পুলিশ কর্মচারী। আমার হামীর নাম জানতে চাওয়ার যখন জানতে পারে যে তিনি ইংরাজ, তখন বলেন “এইরূপ যদি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিবাহ হত তাহলে বোধ হয় পৃথিবীতে যুদ্ধ হতনা।” এবং এই উক্তি পর আমার সঙ্গে ক্রমশঃ করে এইখানেই ছই দেশের সুলীদেয় মধ্যে হাত কোতুকের সঙ্গে সঙ্গে পড়ের আদান প্রদান হয়ে গেল। এর পর থেকে হল পাকিস্তানের মাটি।

এখান থেকে এক বিদেশী গাড়ীতে চড়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করলাম। পাকিস্তানের সব গাড়ীই বিদেশী। শুধু তাই নয়, এখানকার দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী হয়। যার ফলে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন নেই বললেই চলে। লাহোর এক সুবেশা সুন্দরী লাক্ষ্মরী তরুণীর তার সুন্দর। প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা। রাস্তার দুধারে তরু শোভিত। মাঝে মাঝে খুছ স্রোতধিনী। এ রকম কোন শহর আমি এর পূর্বে দেখিনি।

দেই সন্ধ্যায় আমি তারিক আলির পিতা মজহর এবং তাঁর জী তাহিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি এককালে ‘ডন’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তুটোর যাত্রা পছন্দ্য হবার পর নিজে ‘ডিউপেরেন্ট’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশিত

করেন। ইনি একজন মস্তো প্রভাবিত বামপন্থী এবং ইদানীং কালের অত্যাচার কর্তৃত্বিত এবং কিরাউল হক শোষিত পাকিস্তানে মজহর আলি ও তাহিরার আপাততঃ একমাত্র উৎসাহ হল ভারতের আগামী গণ নির্বাচন ও সেখানকার লোকের মানসিক অবস্থা।

আমরা সেদিন বিকালেই বিমান যোগে করাচী অভিমুখে যাত্রা করলাম। করাচীতে আমার শৈশবে ৫টি বৎসর ৪৩ থেকে ৪৮ কেটেছে। করাচী শহরের সঙ্গে লাহোরের অনেক তফাৎ। করাচী কৃত্রিমতাপূর্ণ চোখ ধাঁধান সঙ্গে লজ্জিত। এখানে এসে নাইরোবি ও দার-এস-সালাম-এর কথা মনে পড়ে গেল।

এই শহরে বস্তি খুবই অল্প এবং প্রায় চোখে পড়ে না বললেই হয়। কিন্তু বন্দরে যাবার পথে ব্রিজের তলার বস্তিটি আকারে ছোট হলেও বয়ের যে কোনও বস্তির মত অপরিচ্ছন্ন ও ভয়াবহ। সুসজ্জিত বাক্সার সুউচ্চ অট্টালিকা, বিদেশী গাড়ী ও পণ্য পুরনো দিনের আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যের যোগসূত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানকার পথে-ঘাটে নীলবর্ণ চোখের মোকলীর, হুজা, পাঠান ও বেলুচিয়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বেশীর ভাগ ট্রাকই পাঠান বা বেলুচিদের দ্বারা চালিত এবং এই সব ট্রাক রংবেরঙের পাছাড়া বা অন্তান্ত নানা রকম চিত্রাঙ্কিত। এছাড়া বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ট্রাকের গারে অংকিত কারাগরীক, আইয়ুব খান, উজ্জ্বলাহাজ, ঘোড়া, উট, সুন্দরী নারীদের ছবি।

এখানকার দৈনন্দিন মজুরী প্রতি ৮ বণ্টার মাথাপিছু ২০ টাকা ও কৃষি মজুরী প্রায় ২৫ টাকা মাথাপিছু। এর একমাত্র কারণ মূল্য-ক্ষীতি। এইখানে মাসিক ৫০০ টাকার নীচে রাধুনী পাওয়া অসম্ভব এবং এই দরফীতির একমাত্র কারণ পাকিস্তান নিপুণ ও অনিপুণ ছই ধরনের মজুরই পালঙ্ক রাজ্যগুলিতে চালান দেয় এবং এই সব মজুররা তাদের কর্মস্থান থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পাঠায়। এখানকার অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আরব দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। বতদিন পাকিস্তান ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবে ততদিন আরব দেশগুলি উল্লারের স্রোতে পাকিস্তানকে ডাকিয়ে রাখবে। কিন্তু যদি কোনও দিন এই

অবস্থার পরিবর্তন হয় তবে পাকিস্তান তার নিঃস্ব অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে কি করবে তা আজ একটি বিরাট জিজ্ঞাসা।

এখানে অনেকেরই মতে তুটো তার শালনকালে এই সব গরীব মজুর চাষী ও চাকর তাদের নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তারা আগের মত দলিত, পিষ্ট ও ক্রীতদাস থাকেনি। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে তুটো যে কোন প্রমিক আন্দোলনকে মাথা তুলতে দেননি। এমন কি কয়েকজন প্রমিক নেতাকে একেবারে মেরে ফেলেছিলেন। এই উচ্চহারের মজুরি শুধু সিদ্ধ ও পাঞ্জাবের কয়েকটি অংশে দেওয়া হয়। যে সব জায়গায় সামন্ত প্রথার প্রচলন ছিল পাকিস্তানের পিপলস পার্টির কয়েক জন সদস্যের মতে সেসব জায়গায় এই মজুরীর চল নেই। এই ব্যক্তির কাছে এও জানতে পারলাম যে তুটোর নিজের হাজার একরের উপর জমি সিদ্ধে আছে এবং সেখানে কোন জনমজুরকেই মগধ মজুরি দেওয়া হয় না। সিদ্ধ, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এখনও সামন্ত প্রথা বলবৎ।

আজ পাকিস্তানের সামনে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একম-বস্তিতা। সাধারণ পাকিস্তানী নাগরিক মনে মনে ভয় পায় যে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে। পুশতুনিস্তান ও বেলুচিস্তানের আন্দোলনের কথা অনেকেই হরত জানে না। এখানকার পাঞ্জাবী ও মুজাহির সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সিদ্ধ-বাসীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই সব পাঞ্জাবী মুসলমান বা যারা উচ্চ নৈনিক ও শালনতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগের অধীন তারা সিদ্ধবাসীদের চোখে খুবই ঘৃণ্য।

আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণ ও ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের পর পাকিস্তান নিজেকে খুবই অসহায় ও অরক্ষিত মনে করছে। কারণ তাদের ভয় এই যে পুশতুনী ও বেলুচিয়া রাশিয়ার সাহায্যে তাদের আন্দোলন নতুন ভাবে চালাতে পারবে এবং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে একটি স্বায়ী সরকার গড়ে উঠলে পাকিস্তানে ৭১ সালের পুনরায়ুজি ঘটতে পারে, যার ফলে পাকিস্তান আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত

হয়ে যাবে। আশা করা যায় যে শক্তিশালী ভারত তাদের এই সমস্যাতে সহায়ত্বের চোখে দেখবে এবং তার নীতির মাধ্যমে এই প্রতিবেশী দেশটিকে আশ্বাস দেবে তার নিরপেক্ষতার।

কিছু লোকের মতে আফগানিস্তানের গণজাগরণ যদি বহু সমর্থিতই হয় তাহলে রাশিয়ারদের এই আক্রমণের প্রয়োজন কি? ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কথা মনে রেখে চীন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপের কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কিছু বুদ্ধিজীবীদের মতে এই সমস্যার সমাধান ভারত এবং পাকিস্তান নিজেরাই করতে পারে, যদি না তারা বিশ্বশক্তি রেখারেঘিতে যোগ দেয়। সাধারণ পাকিস্তানীরা জিয়া সাহেবের মার্শাল ল ব্যবস্থাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে এবং তাদের মতে তারা আগেও মুসলমান ছিল এবং জিয়া সাহেবের এই পানচন না খেলেও মুসলমান থাকবে। তাদের এই অভিমত তারা সোচ্চার করে তুলেছে কিন্তু তারা গুলিকে ভয় না পেলেও নবউদ্ভাবিত “কোডা” ব্যবস্থাকে ভয় পায়।

ধনীরা যারা অদূর প্রাচীরের মধ্যে বাস করে তারা জিয়া সাহেবকে তাদের জাতা বলে মনে করে এবং তাদের মতে তুটো বা কিছু করেছে তাই রাজনীতিপূর্ণ। সামরিক কর্মচারী অবশ্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকে।

ভারত পাকিস্তানের কাছে সব-

—এ. এন. এফ.

সুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ

গত জাহুয়ারীর লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে লোকদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ব্যয় বাবদ সুশীল ধাড়াকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীধাড়া ঐ টাকা নির্বাচনে খরচ করেন নি বলে অভিযোগ। সংবাদে প্রকাশ, লোকদলের আর এক নেতা এবং সুশীল ধাড়া ঐ টাকা ভাগাভাগি করে আত্মসাৎ করেন। দলের আরো কিছু ছোট বড় নেতা ব্যাপারটা জানতেন এবং স্বভাবতই তারাও কম বেশী কিছু কিছু উচ্ছিন্ন আশা করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি নিরাশ হয়ে ঐ সমস্ত নেতারা তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে শ্রীধাড়া ও তার সহ-

যোগীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরপের অভিযোগ করেন। চরণ সিং দিল্লী থেকে পর্ববেক্ষক পাঠিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করান। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে পর্ববেক্ষকরা রাজধানীতে ফিরে যান। এরপর রাজনারায়ণ শ্রীধাড়া ও তার সহযোগীকে ডেকে পাঠান এবং অন্তান্ত প্রদেশের নেতাদের সাক্ষাতে তাঁদের সরাসরি “চোর” আখ্যায়িত করেন। কলে পাঠি কর্মীদের কাছে এমন বেইজ্জত যে পাঠি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের পক্ষে অন্য কোন বিকল্প ছিল না। অবশ্য বিধস্ত সূত্রে একথাও শোনা গেছে যে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অহরোধ করলে শ্রীধাড়া পদত্যাগ প্রত্যা-হার করবেন।

সবুজের সজীবতা

সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাবুর জন্য

বিপুল নার্সারী ও প্রিকালচারাল ফার্ম (প্র) লিঃ

১১, কৈলাস চত্বর সিংহলেন, গোঃ বালী, শাওড়া

ফোন: ৬৪-২০৯৫ • ৬৪-২৪৪৫

ফার্ম: বৈদ্যনাথপুরী হুগলী ৬২২৪৪০

দিল্লী রোড ও ভবনেশ্বর রোডের সংযোগস্থল

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের বাস্তবঘূষীদের চক্রান্ত

রাণা ভট্টাচার্য

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরে দুর্নীতি দমনের জ্ঞাত ব্যবস্থা নেওয়ার বাস্তবঘূষী এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই দফতরের নানা পরিবর্তনে পুরনো বাস্তবঘূষীদের স্বার্থে বা পড়েছে। তাই নানানভাবে চক্রান্ত চলছে কয়েকজন অফিসারকে এই দফতর থেকে সরিয়ে দেবার।

ক্রীড়া দফতরে দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। নানা অভিযোগের কথা মনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই দফতরের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে এই দফতরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগের সুরাহা করা যায়। তাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই দফতরের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে এই দফতরে টেবিল ক্রিকেটের টিকিট বিলি, ঘেরা মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই দফতরের অন্যান্য কাজের জন্য কনট্রাক্টর নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে দুর্নীতি অব্যাহত চলত। এবং এ ব্যাপারে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলা জড়িত ছিলেন বলেও অভিযোগ পাওয়া

গেছে।

নি এ বি থেকে রাজ্য সরকারের কোটার যে টিকিট এই দফতরকে দেওয়া হত তা যে কোথায় কিসে বিলি হত তা শুধু ক্রীড়া দফতরের জরনৈক প্রাক্তন ক্ষমতাসালী এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছাড়া আর কেউই জানত না। অভিযোগ এই টিকিট নিয়েও ব্যাপক "বাণিজ্য" চলত। তাছাড়া এই দফতরের বিভিন্ন কাজে ঠিকাদার নিয়োগের ব্যাপারেও দুর্নীতি ছিল।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী তথা ক্রীড়া দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জ্যোতি বসু এই দফতরকে টেলে সাজানোর প্রয়াস নেন। প্রথমেই এই দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয় সং ও নিষ্ঠাবান তত্ত্বাবধায়ক অফিসার অশোক ভট্টাচার্যকে। অশোকবাবু এর আগে ছিলেন স্টেট লটারীর ডিরেক্টর। স্টেট লটারী যখন লোকসন্মানে চলছে তখন অশোকবাবু এই দফতরের দায়িত্ব নেন। ক্রীড়া দফতরে যোগ দেওয়ার আগে তিনি স্টেট লটারীকে লাভজনক সংস্থার দাঁড় করিয়েছেন।

অশোকবাবু ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব নিয়েই প্রথমে দুর্নীতি বন্ধের জ্ঞাত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেন। ক্রীড়া দফতর বর্তমানে দুর্নীতিমুক্ত একথা বলা না গেলেও মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া দফতরের ভারপ্রাপ্ত সচিব রবীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং উপসচিব অশোক ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় দুর্নীতি যে অনেক অংশে কমে গেছে তা বলা যায়। বিশেষ করে টেবিল ক্রিকেটের টিকিট বিলির ব্যাপারে যে দুর্নীতি ছিল তা বন্ধ হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধের জ্ঞাত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং ক্রীড়া দফতরের জরনৈক সহ সচিবকে বদলী করা হয়েছে।

দুর্নীতি বন্ধের জ্ঞাত ব্যবস্থা গ্রহণ করার এই দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজ বাস্তবঘূষী চটে লাল। বামফ্রন্ট সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জ্ঞাত নানানভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। এইসব বাস্তবঘূষী এখন অশোকবাবুর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছেন তাদেরই বশবৎ কিছু কর্মচারীর সাহায্যে।

ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের আন্দোলন

ইষ্টার্ন রেলওয়ের ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাব হিসাবে কর্মরত কর্মীরা স্থায়ী চাকরীর দাবিতে এখন আন্দোলন শুরু করেছেন।

ষ্টেশনগুলোতে টিকিট কাউন্টারে যাত্রীদের ভিড় এড়াতে বাড়তি কাউন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নেন রেল কর্তৃপক্ষ। সেই অঙ্গুসারে ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বাড়তি টিকিট কাউন্টার খোলা হয়।

এইসব কাউন্টারে কাজ করার

জ্ঞাত ছাত্র এবং রেলকর্মীদের আত্মীয় স্বজনকে নিয়োগ করা হয়। পদের নাম দেওয়া হয় ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাব। মাইনে ঠিক হয় মাসে ১৫০ টাকা। ১৯৭৪ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের কাজ করে যাচ্ছেন।

গত ছয় বছরে রেলের যাত্রী সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কাউন্টার বাড়ানোর প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের আয়সঙ্গত দাবী সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে না। অথচ এদেরকে দিয়ে রেলকর্তৃপক্ষ যে কোন স্থায়ী কর্মশিলায় ক্লাবের সমান কাজ করিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে একজন কর্মশিলায় ক্লাবের বেতন আনুমানিক ৬০০ টাকা।

শ্রাশনাজ, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সাধারণ সম্পাদক কেশব কুলকার্নি রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে এক পত্রে বলেছেন, "রেলকর্তৃপক্ষ ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের স্থায়ীভাবে নিয়োগ না করে বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে শোষণ করছেন। এই সমস্ত কর্মীরা দীর্ঘ ছয় বছর ১৫০ টাকার বিনিময়ে

সেবা করে আসছেন। দীর্ঘদিন এই কাজে থাকার ফলে এদের অনেকের সরকারী চাকরী পাবার বয়স সীমাও পেরিয়ে গেছে। এই অবস্থার রেলকর্তৃপক্ষ ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের স্থায়ীভাবে নিয়োগ না করলে এদের ওপর প্রচণ্ড অবিচার করা হবে।"

কয়েকজন আঞ্চলিক রেলওয়ে ম্যানেজার বিশেষ করে পূর্বরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার জন্য রেলওয়ে বোর্ডকে জোরালো সুপারিশ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এদের দাবির প্রতি কোন সুবিচার করা হয় নি।

সম্প্রতি দিল্লীতে ভলান্টিয়ার বুকিং ক্লাবের সংস্থার পক্ষ থেকে প্রচণ্ড ঘোষাল, দেবানিশ সিংহরায় প্রদীপ ঘোষ এবং সত্যনাথ মুখার্জী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দেবী ঘোষালের নেতৃত্বে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী বরকত গণিধান চৌধুরী এবং রেলওয়ে মন্ত্রী জাফর শরীফের সঙ্গে দেখা করে ওদের দাবীদাওয়ার কথা জানিয়ে এসেছেন। জানা গেছে রেলওয়ে মন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে তাদের দাবীর প্রতি সুবিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

বাজেটের অভিসন্ধি

১ম পৃষ্ঠার পর

আজকাল দেশে ছেঁড়া ও সেলাই করা কাপড় পরা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যায়। এক কথায় ইন্দুরা কংগ্রেস যে মানুষের জেত কিছু বাবে না তা এখন লোকে বুঝতে শুরু করেছেন।

শ্রীভৈরবপুর এই জলন্ত আগুনে ট্যাক্সের যত্নহীন দিতে চান না। ভোঁটের আগে আগুনে ঘি ঢাললে কংগ্রেস (ই)-এর প্রাণাদও পুড়ে ছাই হতে পারে। তাই তিনি ভোঁট অন একাউন্ট দিয়েছেন। একবার জিতে গেলে তারপর তাকে আর পার কে। কয়েকমাসের মধ্যে সাধারণ মানুষের মুখে রক্ত ওঠার মত ট্যাক্সের ও মূল্যবৃদ্ধির চাপ পড়বে।

তাই ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে ২৭০০ কোটি টাকা এবং ১৯৮০-৮১ সালের বাজেটে ১২৩৫ কোটি টাকা, একুনে ৩১৩৫ কোটি টাকার করভার ও মূল্যবৃদ্ধির আঘাত আমাদের জ্ঞাত উদ্ভূত হয়ে আছে।

কিন্তু বিদেশী ঋণের সুদ বাবদ ২৭৫৪ কোটি, বড় বড় পুঁজিপতিদের ভরতুকি ১৫০০ কোটি, সাময়িক খরচ ৩০২৭ কোটি, সি আর পি বাবদ ২৫০ কোটি, সাধারণ প্রশাসনিক (স্বামলা খরচ) ৭৮৮ কোটি এবং উন্নয়ন বহির্ভূত খরচ ৬২৫ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

অতীতকে সংহত কৃষি উন্নয়ন, গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য (পরিবার নিয়ন্ত্রণ ছাড়া) ও চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ মাত্র ১৪১৫ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। আবার গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও কাজের বদলে খাজ কর্মসূচী বাবদ বরাদ্দ ৩৫০ কোটি টাকা হাটাই করে মাত্র ৭০ কোটি টাকা করা হয়েছে। বাজেটের এই কয়টি খাত পর্যালোচনা করা হলেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি ধরা পড়ে যায়।

সুতরাং দেশে যে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই গত তিন মাসে মূল্যস্ফুর ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে। এটা আরো বাড়বে কারণ নয়া রাজ্য নির্বাচন হয়ে যাবার পর অর্থমন্ত্রীর খড়গ অপেক্ষা করবে না।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার জনসাধারণের সঙ্গে যে এই বাজেটের লুকোচুরি খেলছেন, তা সরকারের শক্তি বা স্থায়িত্বের পরিচয় নয় বরং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের দামনে দিশেহারা দুর্বলতারই সূচনা করছে। এই দুর্বলতা ক্রমশঃ বাড়বে কারণ অর্থনৈতিক সংকট এখন দারী পুঁজিবাদী বিশেষ স্থায়ী আকার ধারণ

করেছে। কার্টার, ওহিরা, থ্যাচার, যা পারছেন না, পুঁজিবাদী রাজ্য ধরে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারও তা পারবেন না। এর জেত পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব নয়, পুঁজিবাদকে ধ্বং ও শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করা প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকার যদি এটা বুঝতে না চান এবং জনসাধারণের উপর গুরুভার চাপিয়ে দেন তাহলে তাদেরও উচ্ছেদ হবার দিন এসিয়ে আসবে।

স্বাস্থ্য দপ্তর

১ম পৃষ্ঠার পর

ছেন। এখন শোনা যাচ্ছে প্রায়শঃ ও বদলী নিয়ে শ্রীচক্রবর্তীর সংগে অনিলবাবুর খটাখটি অনেক দিনের। স্বাস্থ্যদপ্তরের বিভিন্ন বদলী ও প্রমোশন নিয়ে বেশ কিছু মাথলা মোকদ্দমার নেশা কাহিনীই নাকি ভয়ংকর। দপ্তরের কোন কোন অফিসারকে মদ ও আত্মশ্লিষ্ট জিনিসপত্র না দেওয়ার অনিবার্য ফল হিসাবেই নাকি এখন দপ্তরের কিছু কিছু সংকর্মীকে গাঁটের পরসায় বাড়ী আর আদালতে দৌড়তে হচ্ছে।

এখন কথা হলো, শুটিকর অফিসারের বিরুদ্ধে বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী বলে পরিচিত, দুর্নীতি বিরোধী বলে দাবিদার খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননীবাবু আর কতদিন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। বামমন্ত্রিসভার তিনবছর পার হওয়ার পর ননীবাবুর আফালন তিনি নাকি কড়া হতে পারেন। কিন্তু সে সময় কখন আসবে, গোটা স্বাস্থ্যদপ্তর ভেঙে পড়ার পর? সবশেষে একটা কথা বলা প্রয়োজন বামফ্রন্ট কমিটির কেউ কেউ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেই রায়েোর কোটি কোটি মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পথটি অস্বাভাবিক পদু একটি বিভাগ দিয়ে স্বগম করা বাবে না। জনগণ পারস্পরিক দোষারোপের কথাও আর ভনতে রাজী নয়। সবচেয়ে বড় কথা—গোটা ফ্রন্টকেই কিছুদিন পর জনগণের কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াতে হবে। তখন ?

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট সেন, কলিকাতা-১৩



ফ্যান্টাকস বিক্রয়ের জ্ঞাত ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই

সাহিত্য দপণ

বই মেলা '৮০

মিহির আচার্য

নানান টানা পোড়েনের পর পাব-
লিশাস গিন্ডের উদ্যোগে বার্ষিক বই
মেলা যথারীতি শুরু হয়ে শেষ হয়ে
গেল। এই কদিন লেখক এবং
দোকানী হিসেবে যে অভিজ্ঞতা
সঞ্চিত হল তাই আমার পাঠকের
কাছে নিবেদন করছি। এই বই
মেলা বই প্রেমিকদের আনন্দ ও উৎ-
সাহের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারেনি।
তার কারণ মেলার কর্তৃপক্ষের কাছে
সাহিত্য প্রেমটা বড় হয়ে ওঠেনি,
কোন রকমে কিছু কামিয়ে নেয়ার
দিকে তাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি কাজ
করেছে। তার ফলে সাহিত্যগ্রন্থ,
বিশেষ করে বাঙলা বই মার
খেয়েছে। ইংরেজি নানান ধাঁচের
বইয়ের বাজার, তার সঙ্গে
সোভিয়েত-চীনের বই অধিক পরি-
মাণে খন্ডের পেলেও সবচেয়ে তাৎকালিক
কাণ্ড হয়েছে রেকর্ড কোম্পানি
ইনরেকোর অংশগ্রহণ। এরা
সস্তায় পুরনো রেকর্ডের প্রিন্ট বিক্রি
করে বাজার মাত করেছে। ধরা
যাক একশো টাকা নিয়ে যিনি
মেলায় প্রবেশ করেছেন তিনি প্রথম
চোটেই আশি টাকার রেকর্ড কিনে
নিয়েছেন, বাকি কুড়ি টাকা বরাদ্দ
হয়েছে বইয়ের জন্যে। রেকর্ডের
প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, ক্রেতাদের
দোষ দিইনে। কিন্তু প্রগতি থেকেই
যায় বইয়ের মেলায় রেকর্ড কোম্পানি
কেন? বইয়ের সঙ্গে রেকর্ডের কী
সম্পর্ক? আশা করা যায় মেলার
অন্ততম কর্তৃপক্ষ ঐক্যবদ্ধ ধরও
এর জবাব দিতে পারবেন
না। একমাত্র বলা যেতে পারে
ইনরেকো তার স্টলের জন্য কর্তৃ-
পক্ষকে মোটা টাকা দিয়েছে।
তেমনি চেলসনসের পোস্টারের স্টল,
বই মেলায় তার প্রাসঙ্গিকতা কত-
খানি তাও বোঝা যায়।

বাঙলা দেশে বসে বাঙালী
লেখক এবং দোকানী হিসেবে এই
কদিন যথেষ্ট হীনমস্ততা বোধ
করেছি। কারণ আমাদের মতো
মধ্যবিত্ত স্টলগুলি হয়েছে বিকলা

গ্রানোটোরিয়ারের এক দিকে।
প্রথম দুদিন আলো নেই, চলার
স্বাভাবিক গতি, মাইকের গানও এতদূর
ভেসে আসে না। অর্থাৎ দুয়োরাণীর
মতো অবস্থা। প্রথম দিন কর্তৃপক্ষ
দয়া করে আলো দিলেন রাজি সাফে
আটটার, নটার খাঁপ বন্ধ। সেদিন
গ্রানোটোরিয়ারের দিকের দরজা
খোলা রাখারও ব্যবস্থা হল না।
বারবার নালিশ জানিয়েও কোনো
সুসাহা হয় নি। কারণ আমাদের
মতো বাঙালী দোকানীরা কর্তৃপক্ষের
কাছে উৎসাহজনক মজেল নয়।
অথচ কর্তৃপক্ষের অনেকেই বাঙালী।
বারবার বাঙালীকে প্রগতি রাখছি
এই জুড়ই যে, দেশ বিভাগের পর
এবং সম্প্রতি আসাম গোলযোগের
কারণে বাঙলা বই ব্যবসায়ের নানি-
খাম উঠেছে। বই মেলায় যদি
বাঙলা বইয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বহীন
আচরণ করা হত তাহলে এই দুদিনে
বাঙলা বইয়ের কিছু ব্যবসা হত।
বাঙালী হিসেবে বাঙলা বইয়ের
স্বাভাবিক মর্যাদা আমরা প্রতিষ্ঠিত
করতে চাই। আমরা জানি এমন
পাঠক আছে অনেক আছে যাঁরা
বিশেষ করে বাঙলা বইয়ের জন্যে
চিন্তা করেন, ভালোবাসেন। সে
ধরনের যত্নবান পাঠক যে কষ্ট করে
খুঁজে খুঁজে আমাদের স্টলগুলো ঘুরে
গেছেন এবং সামর্থ্য বহন হলেও কিছু
কিছু কেনবার চেষ্টা করেছেন তার
জন্তে তাঁদের কাছে জামরা কৃতজ্ঞ।
কিন্তু তাঁদের এই ব্যক্তিগত প্রয়াসের
লগ্নে মেলায় কর্তৃপক্ষের কোনো
কৃতিত্ব নেই। ভবিষ্যতে বই মেলা
হলে পশ্চিম বাঙলায় বাঙলা বইয়ের
জন্তে যেন একটি বিশিষ্ট মর্যাদা থাকে
সেদিকে কর্তৃপক্ষকে আমরা সহৃদয়
নজর দিতে পরামর্শ দেবো। তা না
হলে বাঙলা বইয়ের প্রকাশকের
বিশেষ করে বাঙলা বইয়ের জন্যে
আলাদা করে একটা মেলা
করতে হবে। কারণ যথারীতি নিম-
ন্ত্রিত হয়ে পরিবেশনে তারতম্য লক্ষ্য
করলে আত্মসম্মান রক্ষার প্রয়ো-
জনেই তাকে বর্জন করতে হবে।
আমার বিশ্বাস, বাঙালী লেখক-
পাঠক-বিক্রেতার মূখ্যত্ব হয়েই
আমি এই হৃদয়স্পর্শী রাখছি।

এই গান শুনেছি

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

চল ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ
পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী। প্রথমদিন
মেলা ও কথাশিল্পীর জীবনের উপর
বিরাট আকর্ষণীয় এক প্রদর্শনীর
উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার
অধ্যক্ষ মনমোহন হবিবুল্লা। বিভিন্ন
দিনে 'লোনার কেলা' 'চালি
চ্যাপলিনের জীবন কথা', ইত্যাদি
সিনেমা, 'একটি মোরগের কাহিনী'
শীর্ষক নাটক ও মনমাতানো গণ-
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শেষদিন
শিশু দিবস হিসেবে ছিল 'বসে
আকো' প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক-
দিনই অল্পটান কেজের প্রায় দু মাইল
ব্যাসার্ধের বাসিন্দা, গায়ের বউরাও
স্বামী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে অল্পটান
দেখেছেন রাত দশটা পর্যন্ত। 'একটি
মোরগের কাহিনী' নাটকের শিল্পক্ষে-
ত্রে মুগ্ধ হয়েছেন গ্রামবাসী, বুঝেছেন
পোষা মোরগ কিতাবে ধনীর খাবার
টেবিলে এলো আর প্রতিকারের
উপায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা।
সন্ধ্যাবেলা- আশপাশের পাড়ার
কোনো ঘরে লোককে পাওয়া যেত
না, সবাই যেতো জীবনমুখী গান-
নাটক-সিনেমা দেখতে।

১২ই ও ১৩ই মার্চ শিশুর মঞ্চ
ও হাওড়ার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়
সিকিম সাংস্কৃতিক দলের লোকনৃত্য।
ওদিকে তখন বর্ধমানের কাকদার
চলছে তিনদিনব্যাপী রাজ্য যুব
কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় যুব
উৎসব।

১৭ই মার্চ থেকে কলকাতার
রবীন্দ্রনগর প্রাঙ্গণে শুরু হয় শিল্প
মেলা। শিল্প মেলা মানে ইঞ্জিনি-
য়ারিং বা কৃষির শিল্পের প্রদর্শনী নয়।
আসলে হয়েছে চিত্র ভাস্কর্য প্রদর্শনী,
আলোচনা সভা, সিনেমা, নাটক ও
গণ সঙ্গীতের আসর। উদ্বোধনা
ছিল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা-
কুশলী সম্মিলনীর কলকাতা জেলা
কমিটি। এই মেলায় উদ্বোধন
করেন রাজ্যপাল জিভুবননারায়ণ
সিং। ১৮ তারিখ অবনীন্দ্রনাথ
ঠাকুর দিবসে বসে রবীন্দ্র সঙ্গীতের
আসর। সাতদিন ধরে মেলা
চলে।

২২-৩রা মার্চ ২৪ পরগণার
চৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হয় লোনারপুর রুটি
সংসদের সাংস্কৃতিক উদ্বোধন। এখানে
'বিশ্বনাথ প্রবাহ' শিরোনামে পৃথি-
বীর বিভিন্ন দেশের নাটক মঞ্চ
স্থাপত্য, যাত্রা, লোকনৃত্যের ওপর
দৃষ্টিভঙ্গি আলোকচিত্র প্রদর্শিত
হয়।

পূর্ব বাঁদবপুর আন্তঃসংঘ সম্মিলনী
সন্ধ্যাপুর ত্রিকোণ পার্কে ২০শে-

২০শে মার্চ করে গণ সংস্কৃতির
আসর।

গত দু'বছরের মতো এবারও
উত্তর কলকাতায় বসে পাঁচদিন ধরে
গণসংস্কৃতি উৎসব। ১৩ই-১৪ই
দেবদু পার্কে, ১৫ই-১৬ই কুমারটুলি
পার্কে ও শেষদিন হর বেলেঘাটায়।
কলকাতা ও মক্কাবলের বেশকিছু
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এই বিরাট উৎসবের
আয়োজন করেন।

২৬শে মার্চ পশ্চিম বড়িষা সর-
কারী আবাসনে রাজ্য সরকার
নির্মিত 'সমাজ কেন্দ্র' ও সংস্কৃতি
ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
জ্যোতি বসু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,
সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলো যদি স্বস্থ সংস্কৃতি
গঠনে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে
পারে, তবে এগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য
সফল হবে।

বাজেটের সমবায় সূত্র ও সাম্যবাদ

৩য় পৃষ্ঠার পর

পাতালের বৈষম্য হবে না এবং
প্রমিকদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ
করবার কারণ দেখা দেবে না।
সমবায় প্রথার কারখানায়
উৎপাদন বাড়লে, লাভ হলে সে
লাভের অংশ পেয়ে প্রমিকের আর
বেড়ে গিয়ে তার জীবিকা হবে।
আবার যদি লোকসান কোন রকম
দেখা দেয় সে ক্ষেত্রেও প্রমিকের আয়ে
সাময়িক ঘাটতি অবশ্যই দেখা দেবে।
সমবায় প্রথার উৎপাদনে যেহেতু
প্রমিক প্রত্যক্ষভাবে আয় ব্যয়ের
হিসাবের সঙ্গে জড়িত থাকে সেই
হেতু তার পক্ষে পরিপ্রবেশে শৈথিল্য
দেখাবার প্রায় আসে না, কারণ
কাজটা তার নিজের। তা সত্ত্বেও
যদি কারবারে আশানুরূপ লাভ না
হয় তাহলে তার কারণ আমাদের
অজ্ঞাত খুঁজতে হবে। এই অংশায়
আমাদের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ
প্রমিকদের অযোগ্যতা অথবা যন্ত্রের
ত্রুটি কলে উৎপাদিত সামগ্রী নিম্ন
মানের হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অত্ন-
সন্ধান করতে হবে।

আমাদের মতে সমবায়কে সাম্য-
বাদের প্রত্যক্ষরূপ বলা যেতে পারে।
একটা দেশে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার কর্ম-
তৎপরতার সমবায় প্রথার বহল
প্রয়োগ অতি আবশ্যিক। সাম্যবাদ
প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক
দলগুলি তাদের কর্মপদ্ধতি কেবলমাত্র
মিছিল, বিক্ষোভ, সভা, সমাবেশে
সীমাবদ্ধ রেখেছে। সমবায় পদ্ধতিতে
জমি আবাদ করে, কারখানা স্থাপন
করে প্রমিকদের আর্থিক উন্নতির তথ্য
সাম্যবাদের ক্ষুণ্ণের কোন দৃষ্টান্ত
তারা স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়নি।
গোজ নিজে দেখা যাবে প্রত্যেক বড়
দলেরই প্রেস আছে এবং নানা প্রকার
পুস্তক, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি ছাপান
ও বিক্রি হচ্ছে। এই প্রেস ইত্যাদি
দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনে মতো

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি
বিভাগ মার্চ-এপ্রিলে বিভিন্ন জেলা
নিয়ে লোক সংস্কৃতির তিনটে আঞ্চ-
লিক ওয়ার্কশপ ও উৎসবের আয়ো-
জন করেছে। ১৪ই-১৬ই মার্চ
পুর্নালিয়াতে প্রথম ওয়ার্কশপ-উৎসব
পালিত হয়েছে। সমস্ত জেলার
খ্যাত অধ্যাত প্রায় সহস্রাধিক লোক-
শিল্পী তিনটে ওয়ার্কশপে সমবেত
হয়েছেন বা হবেন। আলোচনা
হবে, বিশেষ জেলার বিশেষ লোক
সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা হবে।

পার্শ্ববর্তী ওড়িশা বা বিহারে এ
সব আঙ্গ ভাবাই- যায় না। রাজ-
নৈতিক সচেতনতার অদম্য বিকা-
শের জন্য সাংস্কৃতিক জগতের এই
অবস্থা।

কাজ করে তার তুলনায় ব্যবসায়িক
কর্মতৎপরতা অতি নগণ্য। কোন এক
রাজনৈতিক দলের নেতাকে সমবায়
পদ্ধতি প্রয়োগ করে কারখানা
স্থাপনের কথা বলার উনি জবাব
দিয়েছিলেন "তাহলে কেবল ঐ
ব্যবসায়ী হবে, এখন আমরা যেটা
করছি সেটা আর হবে না।" কথার
কথা বাড়বে কাজেই এবিষয়ে আর
আলোচনা করার প্রয়োজন হয়নি।

আমরা জানি কোন সমাজ বা
সম্প্রদায় এখন একটি মাত্র দিকে তার
উন্নতির কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে
তখন সেই সমাজ কেবল একটি মাত্র
দিকে কুশলতা প্রাপ্ত হতে থাকে।
উন্নতির অপর অংশগুলি অবহেলিত
হয়ে সমাজের উপর বোকা বরূপ হয়ে
ওঠে। রাজনৈতিক সমাজ যদি
দেশের কর্মীদের মধ্যে সর্বজনীন
কুশলতা প্রাপ্তির চর্চা না করে কেবল
একটিমাত্র দিকে তার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ
রেখে অগ্রসর হয় তাহলে সেই একটি-
মাত্র দিকে সর্বাধিক কুশলতা প্রাপ্তির
তার তাকে পরিণামে আভ্যন্তরীণ
সংঘর্ষের দিকে নিয়ে গিয়ে পশ্চাৎগামী
হতে বাধ্য করবে। আমাদের আদর্শ-
বানী রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনে
সরকার গঠনের উপযোগী সংখ্যা-
গরিষ্ঠতা লাভ তাদের রাজনৈতিক
কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক
কুশলতা প্রাপ্তির কথা বোষণা করে।
পরবর্তী কর্মসূচীতে তাদের কিছুটা
শক্তি সমবায় প্রথার কারখানা
স্থাপন, চাষ খাবাদ ইত্যাদি গঠন-
মূলক অর্থকরী কাজে-নিয়োগ করা
আবশ্যিক বিবেচনা করি। সাম্যবাদী
দলগুলির নেতাদের অগ্রয়োজ্ঞানাই
তারা সাম্যবাদের প্রয়োজনীয়তা
প্রমাণের জন্য আমাদের চীন, রাশিয়া
না দেখিয়ে এখানেই তার ছোট ছোট
উদাহরণ স্থাপন করুন এবং এতে
আশাকরি বেশি কিছু কাঠ খড়
লাগবে না।

দেশের কল্যাণকারী ব্যক্তিরা
অবশ্যই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন
যে, এ বিষয়ে আরও বিশদ আলো-
চনা করার এবং সর্বোপরি সমবায়
আইনগুলির সঠিক পর্যালোচনা
করার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

পর্বে প্রকাশন

- ১। গণরাজ্য (প্লেটোজ রিপাবলিক) / শ্রীমধাকান্ত দে / ১৪'০০
- ২। এয়ারিস্টটলের পলিটিকস / শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার / ১৪'০০

৬এ, রাজা স্ববোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আছে বলেই এইসব সভা সমাবেশ মিছিল হতে পারছে

২২শে মার্চ সকালে পানিহাটির কাছে একদল লোক বি, টি, রোড অবরোধ করে বক্সা পাচেক বিক্ষোভ দেখায়। ফলে, রাস্তার গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বেঙ্গল কেমিক্যালের চুল্লি দিয়ে বিধাত্ত গ্যাস বের হবার প্রতিবাদেই এলাকার লোকেরা এই বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশে অবস্থা আয়ত্তে আসে।

বারানাসত কোর্টের আইনজীবীরা আদালতে পানীর জল সরবরাহ ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, উকিলদের বসার জন্য উপযুক্ত জায়গা করা প্রভৃতি দাবিতে ১১ই-২১শে মার্চ কর্ম বিব্রতি পালন করেন। মহাকরণে আন্দোলনকারী আইনজীবীদের এক প্রতিনিধিত্বের সঙ্গে আলোচনাকালে বিচারমন্ত্রী জরুরী দাবীগুলোর অবিলম্বে সমাধান ও অসন্তোষ দাবিগুলো সম্পর্কে সহায়ত্বের সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিলে আইনজীবীরা কর্মবিব্রতির আন্দোলন প্রত্যাহার করে দেন।

ওদিকে ২০শে মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট চত্বরে পুলিশ সুপারের নামেই উকিল ব্যারিষ্টারদের লাঠি-চার্জ করা হয়েছে। ২০শে মার্চ শুক্রবার পুলিশ এটোরায় একটি উপ-জাতি গ্রামে আদিবাসীদের উপর ৪০ রাউণ্ড গুলি চালায়। উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যপ্রদেশ ও শুক্রবারে এখন রাষ্ট্রপতির হুজুমে ইন্দিরা গান্ধীর শাসন চলছে।

২১শে মার্চ কয়েক হাজার মনস্য-জীবী ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান করেন। গ্রাম বাংলার দূর দূরান্ত থেকে, কাঠ-ফাটা রোদে কলকাতার রাজপথে এসেছিলেন বহু মাছুষ বাঁকে বড় বড় এ্যাম্বুলিন্সায়ের হাড়ি নিয়ে। এদিন মিছিলবল শিক্ক সমিতিও বিধানসভা অভিযান করে। সমিতির মাধ্যমিক শিক্কগণ ২১ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি দেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এতে যেমনি আছে পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক দাবি, তেমনি পয়সা-দফাতেই আছে শিক্ষাকে সংবিধানে রাজ্য তালিকাভুক্ত করার রাজনৈতিক দাবি। অর্থাৎ শিক্ক সমাজের সমাজচেতনা বাড়ছে। ধর্মতলা ইষ্টে এই শিক্ক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও

প্রাথমিক শিক্কর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পার্শ্ব দে ও রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আবদুল বারি।

২৪শে মার্চ রাজ্যের পত্রিকিক-সকরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে বিধানসভা অভিযান করেন, ধর্মতলা ইষ্টে এক পথসভার তাঁদের সামনে কং (ই) নেতারা ভাষণ দেন।

মাধ্যমিক শিক্ক ও শিক্কাকর্মী সমিতির (S T E A) নবম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ২২শে-২৪শে মার্চ বোলপুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সাত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, আশামের ঘটনায় উদ্বেগ, শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির অপ্রভাবের শিক্ষা ছাত্রদের বিনামূল্যে বই, কাগজ ও প্রাথমিক আহাৰ ও পে কমিশনের রায় অবিলম্বে প্রকাশের দাবি।

২২শে-২৪শে মার্চ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজির মনস্য-ভারতীয় সম্মেলন বসে কলকাতায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল জিৎসবদ মারায়ণ সিং। শেষ দিনের বিশেষ অধিবেশনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা করেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্টরা। প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে থেকে শহরের হাসপাতালগুলোতে ট্যাণ্ডার ল্যাবরেটরির মাধ্যমে দ্রুত রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইকনমিক টাইমস ও টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সেলস অফিসের সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের ১৩৩ দিন ব্যাপী আন্দোলনের সম্মুখে কলকাতার সাংবাদিকদের একটি সংহতি কমিটি গঠিত হয় ২৮ মার্চ প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কলকাতার টাইমস অফ ইণ্ডিয়া গ্রুপ সংস্থার বিরোধ মীমাংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর উত্তোগকে অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত পর্যায়ে বিষয়টি উত্থাপনের আবেদন করা হয়। ঐ সভায় ইকনমিক টাইমসের (কলকাতা সংস্করণ) সাব এডিটর ও তথাকার ইউনিয়ন সম্পাদক আর পদ্মনাভনের পুননিয়োগ দাবি করা হয়।

২৬শে মার্চ ফেডারেশন অফ প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড এলায়েন্ড কার্মস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের ডাকে তারাপদ যেমো-রিয়াস হলে প্রেস প্রমিক্‌দের এক কনভেনশন হয়। কনভেনশনের শুরুতেই সম্পাদক দুটো প্রস্তাব রাখেন। প্রথম প্রস্তাবে নটি বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার প্রতিবাদ করে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত্নসহ বার্ষিক করার আহ্বান জানানো হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে কুজ প্রেস কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর পরিবর্তন সহ চাকরীর শর্তাবলী পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে কনভেনশনে বাজার দর বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাবার ডাক দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রেস কর্মচারীদের বার্ষিক সংগ্রিষ্ট ৬ দফা এক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

৩১শে মার্চ কায়ার সার্ভিস ওয়ার্কস ইউনিয়নের ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। দমকলের দর দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ইউনিয়ন এই দিনটা পালন করে; সমিতির ৩৫ জন সদস্যের রক্তদানের মাধ্যমে দিনের অহুষ্ঠান শুভ হয়। বিকেলে এক সভায় সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ দমকল কর্মীগণকে সেবামূলক কাজের সঙ্গে গণআন্দোলনকেও তীব্র করে তোলার আবেদন জানান, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দীপেন ঘোষ দমকল কর্মীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের সংহতি জ্ঞাপন করেন। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রামচাঁদ মণিগ্রাম তাঁর বক্তৃতায় বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত বার্ষিক করার জন্য দমকল কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলেন।

পশ্চিমবঙ্গ টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের ২৬ তম রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল ২১-৩০ মার্চ ২৪ পরগণার সন্তোষপুরে। সম্মেলনের উদ্বোধন করে রাজ্য প্রম-মন্ত্রী কৃষ্ণদ ঘোষ বলেন, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ভালার যত্নসহ শুরু হয়েছে। প্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকারের ওপর আক্রমণ হানার চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পূর্ব ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এস, কে, রায় এক প্রেস বিবৃতিতে জানান যে; ১৯৭১ সাল থেকে

চালু হওয়া প্রমোশনের ক্ষেত্রে বৈষম্য-মূলক নীতির অবসান, অসন্তোষ ক্ষেত্রের মতো পে ক্ষেত্রের সমরোপ-যোগী পরিবর্তন, চাকরীর জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা, প্র্যানিং ও ডিজাইন সেলের পুনর্গঠন, ইত্যাদির মতো দীর্ঘদিনের দাবিগুলো আজও পূরণ না হওয়ার গত ৩১ মার্চ বুকে ব্যাজ লাগিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। ২২ এপ্রিল থেকে পর্যবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারগণ 'ধীরে চল নীতিতে' কাজ করবেন।

গত ২৬শে মার্চ মিছিলবল প্রাথমিক শিক্ক সমিতির নেতৃত্বে এক বিরাট গণভেদপুটেশন মারফৎ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ১৫ দফা আন্ত জরুরী দাবীর একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

দমকল জেলা থেকে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ক-শিক্ষিকা বেলা ১টার কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হন। স্থান সংকুলান না হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগেই মিছিল বের করা হয়। স্ববিশাল মিছিলে নেপালী, হিন্দী ভাষী এবং প্রচুর সংখ্যক শিক্ষিকা যোগদান করেন। এসময়ই ইষ্টে

এই কি জীবন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাদারাম স্বভাব কবি ও গায়কের নামে একটা তরুণী আছে পড়ে গেল, আর যেমনি কবি তাকে ধরে তুলতে গেল, তখনই সেই মেয়েটি ফৌস করে উঠে বলল, ছি ছি স্বপ্নে পেরে... চরিত্রহীন লম্পট ইত্যাদি, আর এক চরিত্রহীন গায়ক এমনি ফাঁদ পেতে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাবলা কবিকে গাঁ ছাড়া করল, তার প্রেমদী নন্দিনীকে ভুল বোঝাল—'রাজ-নন্দিনী' ছবির কাহিনীকে এক মোক্ষম ব্রেক কমে এক নতুন দিকে মোড় ফেরালেন স্বপ্নে দাস। শক্তি-মান তিনি সম্মেহ নেই, কারণ এই এক প্যাচে নন্দিনী হয়ে গেল 'রাজ-নন্দিনী' আর গল্পের গন্ধ নাকি গাছে ওঠে, তাই সেই হাদা গায়কও বুঝি শহরের সেই অমিহার বাড়ির কানাচে গিরে হাজির হোল, যেখানে এক লম্পট রাজা তার বিপুল সম্পত্তি ভাবে রাখার জন্য বিবাহের ছলনা করে সেই গ্রামের নন্দিনীকে রাজ-নন্দিনী করেছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হৈয়ালি বদেই ঠেকবে—আজও বিও মনে হবে—তবুও এটি দস্ত্য যে, ছবিতে আজও এমন ব্যাপার স্রাপার দেখানো হচ্ছে, যেখানে রাজমাতা তার উচ্ছ্বল মাতাল ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন, বিয়ে করে স্বস্ত্র জীবন যাপন না করলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এদিকে আবার ছবিতে দেখি, একদণ্ড কাগজ গলায় বাঁধা আট মাসের শিশু জমিদার বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে

মিছিল পৌছানোর পর কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে পঞ্চানন মণ্ডল, গৌহলানন্দ রায়, প্রশান্ত বহু, অরুণ ভট্টাচার্য, বিনয় ভৌমিক ও হিরন্ময় হালদার ছয়জনের এক প্রতিনিধিদল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর স্থির হয় এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দাবীগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

শিক্ক সমাবেশে সমিতির সভাপতি পঞ্চানন মণ্ডল সভাপতিত্ব করেন। স্মারকলিপি উপস্থাপিত করেন অন্ততম সম্পাদক প্রশান্ত বহু। আসাম সমস্তার উপর বিচ্ছিন্নতাকামীদের আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ছরভিস্কির নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক গৌহলানন্দ রায়। সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপার্ব দে, রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আবদুল বারি, মাধ্যমিক পর্যায়ের সভাপতি অধ্যক্ষ ভবেন মৈত্র, বিধানসভার সদস্য শ্রীশঙ্করপ্রসাদ সিংহ, শ্রীমমলানী দাস প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

একবারে ছাদের উচু কাণিশের ওপর হানাওড়ি দিচ্ছে। এ শিঙটি হল রাজারই এক রক্তিতার সন্তান এবং সেই সন্তানের শেষ পর্বত ঠাই হল রাজনন্দিনীর কোলে এবং রাজা বধন বুঝলেন নন্দিনীর প্রেমিক এসে গেছে তারই বাড়ির ঘোর-পোড়ার প্রেমের অমোঘটানে, তখন তিনি অনেক নকশা করে শেষ পর্বত আত্মবাতী হলেন। তারপর তো আর সমস্তা নেই—নন্দিনী আর ক্যাবলা কবির মিলন এবং উপরি পাওনা হল তাদের রাজার ওরসে রক্তিতার গর্ভের সেই সন্তান।

এই কাহিনী লিখেছেন স্বপ্নে দাস, চিত্রনাট্যও তিনি করেছেন, পরিচালনাও তাঁর, আবার অভিনয়ও করেছেন হাদা গায়ক কবির চরিত্রে। এমন গল্প, এমন ছবি সেই ফেলে আসা জিশ দশকেও পাওয়া গেছে কিনা সম্মেহ। তবুও এ ছবিকে সার্বক বলতে হবে, কারণ তা পরমা দিচ্ছে। ভেজাল দিয়ে ছবি যদি মাং করে, তবে খাটি জিনিষের প্রয়োজন কি? আর স্বাস্থ্য—মান দিক স্বাস্থ্য? তা জা হা রা যে স্বাস্থ্যনা কেন! ব্যবসায়ীরা চান সন্নী টাকা মুনাফা সহ ক্ষেত্র পাওয়া—তা বধন হচ্ছে ভালভাবেই স্বপ্নে দাসের ছবি দেখিয়ে, তখনতো তাঁরা 'স্বপ্নে দাস জিন্মাবাদ' বলবেনই। কেউ কেউ আবার বলেন, অধিকাংশ বাংলা ছবি রূপ হচ্ছে—কমার্শিয়াল ছবি তো করতে হবে—স্বপ্নে দাসের ছবি তো তবু পরমা পাচ্ছে—পরমা না পেলে বাংলা চিত্রশিল্প বাঁচবে কি করে? কিন্তু প্রশ্ন একে কি বাঁচা বলে? এভাবে কি বাঁচা সম্ভব?

কলকাতা ও হাওড়া নিয়ে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠনের চক্রান্ত

দপন

অক্টোবর বর্ষ ১২শ সংখ্যা ১১ই এপ্রিল, ৮০ ৬০ পয়সা

মোরারজীকে ভারতীয় জনতা দলে আনার চেষ্টা

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই লম্বা অধিকাংশ মেন্তাকে হাতে লম্বা গঠিত ভারতীয় জনতা দলে নিয়ে আসা যায় তার জন্য এই দলের নেতারা চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা দলের কয়েকজন নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এই দলে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতীয় জনতা দলের সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইকে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ার স্বার্থে এই দলে যোগ দেওয়ার জন্য অত্যাচার করেছেন।

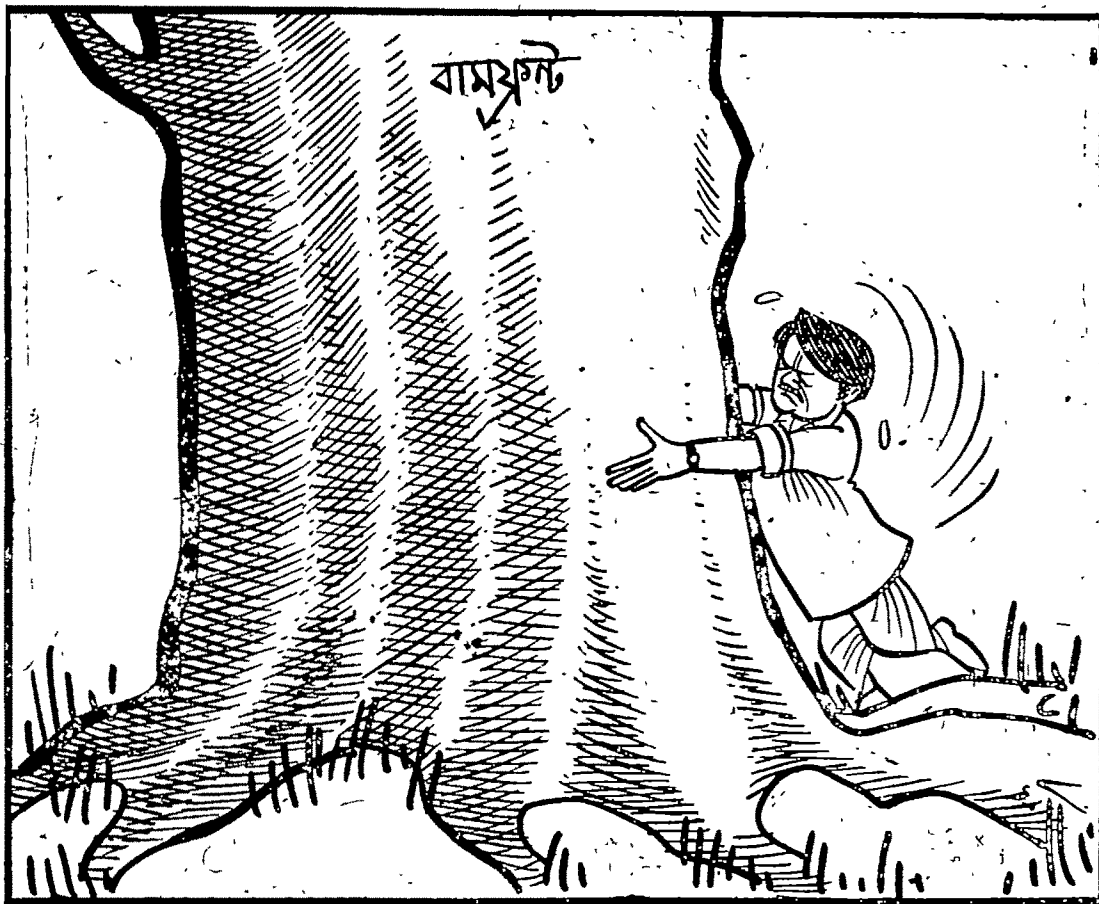
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈতনিক পদের প্রাপ্তি দলের সাম্প্রতিক ভাঙনে মোরারজী দেশাই অনন্ত। জাতীয় কর্মসমিতিতে ভোটাভুটির আগে মোরারজী দেশাই আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন যাতে বৈতনিক পদের প্রাপ্তি দলে ভাঙন না হয়। কিন্তু দলের কিছু নেতার চাপে জাতীয় কর্ম সমিতিতে শেষ পর্যন্ত বৈতনিক পদের ব্যাপারটা ভোটাভুটিতে দেওয়া হয়। ভোটে বৈতনিক পদের বিরোধী গোষ্ঠীই জয়লাভ করেন।

এর পরেই জনতার প্রাক্তন জন-সম্মত গোষ্ঠী আলাদা সংসদীয় ভেদে নতুন দল গড়ার কথা ঘোষণা করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই নতুন দলে এমন কিছু ব্যক্তি শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান এবং দুর্গ কলকাতা এবং হাওড়া শহরসহ শহর-তলীর কিছু অংশ নিয়ে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠন করার জন্য এক প্রেরণা অবাধাঙ্গী শিল্পপতি এবং বড় ব্যবসায়ী গভীর চক্রান্ত শুরু করেছেন বলে বিশ্বাস হচ্ছে। লংবাদ পাওয়া গেছে। এই সব শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের পরিবর্তন নিয়ে স্বকোশলে ধাপে ধাপে এসেছেন এবং নয়া দিল্লীর কতাবের সঙ্গে হাতে হাতে বৈঠক করেছেন।

ওরা নয়া দিল্লীর কতাবের কাছে দাবী করেছেন যে, কলকাতা পৌর শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

অবরোধ



ইন্দিরা কংগ্রেসীদের গোষ্ঠী বিরোধ আরও ভয়ঙ্কর আকার নেবে

ইন্দিরা কংগ্রেসের গোষ্ঠী বিরোধ এখন খুনোখুনির পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই গোষ্ঠীবিরোধ এখন এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে, অবস্থা নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সভাপতি যদিও কানজে বিরুদ্ধ দিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন যে, কংগ্রেসী-

দের এই গুণ্ডাগোলের মূলে সি পি এম, কিন্তু কথাটা যে মোটেই সত্য নয় তা অজিতবাবু নিজেই ভালভাবে জানেন।

খোদ অজিতবাবু এলাকাতাই কিছুদিন আগে উদয় নামে জনৈক কংগ্রেস কর্মী খুন হয়ে গেল। অজিত-বাবু জানেন কারা এই খুন করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক পরিচরও



অর্চনা গুহ ভাল হয়ে গেছেন

লালবাজারে পুলিশী অত্যাচারের ফলে শারীরিক ভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া অর্চনা গুহ দেশের খাতমামা চিকিৎসকদের আশ, ধারণা ও সিদ্ধান্তকে

অবাক করে স্থব্র হয়ে কিরেছেন। এমমেটি ইন্টারন্যাশনালের ডায়ালিসিস বিভাগ রিসার্চ টিম বিশেষ এই প্রথম এ ধরনের কেসে হাত দিলেন ও সফল হলেন। কোপন-হেগেনের রিগস্ হসপিটালেটে প্রায় তিনমাস থাকার পর গত ৩১ মার্চ রাত নটায় অর্চনা গুহ মমদর বিমান-বন্দরে নামলেন। যাকে ট্রেনার করে বিমানে তোলা হয়েছিলো, ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পাঠানো হয়েছিলো; তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

হবু মন্ত্রী

কেন্দ্রে মন্ত্রী হবার আশায় দিন-গুণে এমন এম পিদের মধ্যে নতুন-রাই বড় স্বযোগের অন্বেষণে যাচ্ছেন। আর সঙ্গর গান্ধীও নিজের বশবতের মধ্যে নতুন মুখই পছন্দ করছেন বেশী। তাই শ্রীমতী গান্ধী যদি নটি বিধানসভা নির্বাচনের আগে, একান্ত না হলে তার পরে মন্ত্রিসভা সম্প্র-সারণ করেন তাহলে কে কে স্থান পাবেন এই নিয়ে দিল্লীর রাজনীতিক মহলে চাপা উত্তেজনা বহাল রয়েছে। যতদূর জানা গেছে, অর্থ মন্ত্রী ভেক্টর-রমণ তেমন কিছু ভাল কাজের আশা জাগাতে পারছেন না এবং সঙ্গের সঙ্গে 'কোকা কোলা'র ব্যাপারে মত-পার্থক্য করে ফেলেছেন তাই হয়ত যোজনায় দপরে বদলি হতে পারেন। বা রাজ্য রাজনীতিতেও ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু তিনিও প্রাণপণ চেষ্টা করছেন উন্নতির জন্য। সহজে হাল ছাড়ার পাত্র তো তিনি নন। যদিও পরবর্তী অর্থমন্ত্রী হিসেবে নাম শোনা যাচ্ছে, এম কে পি সালভে এর। অবশ্য প্রণব মুখার্জীর এদিকে হাত না শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় পুরনো কথা ভাবুন

কলকাতার ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও খুনোখুনির কারণ হিসাবে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত পাঁজা বলেছেন, তাঁদের দলে কিছু হুত্বত কারী ঢুকে পড়েছে, তাই এই গণ্ডগোল। কথাটা বলতে বেশ ভালই লাগে, যেন ইন্দিরা কংগ্রেসে যত সচরিত্র, আত্মবিশ্বাসী, মধুর স্বভাবের যুবক ভীড় করেছে, যারা “হুত্ব” শব্দের সঙ্গেই পরিচিত নয়।

আহা, যদি সত্যি সত্যি তাই হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সালের ইতিহাস অজ্ঞাতাবে লিখিত হত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন শ্রীযুক্ত পাঁজাকে ভণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অবশ্য মিথ্যা ভাষণ ও ভণ্ডামি ই-কংগ্রেসীদের পক্ষে নতুন কিছু নয় আর এতে তাদের একটা সহজ দক্ষতাও আছে। তাদের দাবীতে নেত্রীর মধ্যে এই মহৎ গুণ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় দেখা যায়। তাঁর অসুগতরা—যাদের মূল-মন্ত্র চরণ ধরিতে দিও গো আমারে—সহজেই মহান নেত্রীর এই গুণ রপ্ত করে নিয়েছেন।

পাঁজা মশায় নিজেকে ভুলিয়ে আমাদেরও ভোলাতে চাইছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী কি ভুলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরার তৈরব বাহিনীর কার্যকলাপ, বা ১৯৭১ সাল থেকে শুরু হয়ে এমার্জেন্সী পর্যন্ত চলেছিল? প্রধানত: হুত্বতকারীদের লাহাব্যেই ১৯৭২ সালে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা ক্ষমতায় এসেছিল একথা কি বিস্মৃত হবার? যুধ দখল করে সশস্ত্র গুণ্ডারা হাজার হাজার ভোট পত্র বাজে ফেলেছে, বোমাবাজী করে প্রকৃত ভোটদাতাকে কাছে বেষ্টে দেয়নি। এইভাবে এই রাজ্যে-ক্ষমতায় আসার পর ইন্দিরা কংগ্রেসে হুত্বতকারীদের ভীড় আরো বেড়েছিল। তারপর ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একটানা খুনোখুনি, বোমাবাজী, দলবন্ড সশস্ত্র সংঘর্ষ, বিরোধীদের পেটানো, ভীতি প্রদর্শন এবং নারী-ধর্ষণের বিতীবিকাময় দিন। পাঁজা মশায়ের সবই মনে আছে। তবে দোষীকে নির্দোষ সাজাতে গেলে সত্য কথা বলা যায় না।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি

ভারতপুর

আগামে ‘বিদেশী’ প্রাণে এবার সেরানে-সেরানে লড়াই শুরু হয়েছে। কাছাড় বাদে গোটা আসামকে উপ-জাত এলাকা ঘোষণা এবং সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করে আসাম সরকার যে আদেশ জারী করেছিলেন সে আদেশ ভঙ্গিত রাখার জন্য পরের দিমই রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন গৌহাটি হাইকোর্ট। গৌহাটির জর্জেন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের সংবিধানের ২২৬ ধারা অস্বাভাবিক মামলা রুজু করার ভিত্তিতে রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত এই আদেশ হুটি কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শাবার জন্য আসাম সরকারের ওপর ‘শো কজ’ নোটিশ জারী করেছেন। স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছিন্নতাকামী ছাত্র-যুবকদের মনো-বল আবার চাড়া হয়ে উঠেছে, সরকারী-নিবেদনকার কোম পরোয়া না করেই তারা সরকারী ভবন ও তেল-কেন্দ্রগুলিতে জোরদার পিকেটিং চালাচ্ছে, হাজারে-হাজারে আইন অমান্ত করে প্রেঙ্কার বরণ করছে।

গত দশদিকে রাজ্যপাল অসংযত হয়ে ধোঁয়ার ওপর ধোঁয়গিরি করার মতো ‘বিদেশী’ নির্ধারণে কেন্দ্রীয় সরকার-ঘোষিত ১৯৫১ সালকে ১০ বছর পিছিয়ে ১৯৬১ সালে মেমে ছিলেন। নয়াধিকারে সর্বজাতীয় বৈঠকে যে সময়সীমা লাম্বাক হয়েছিল শ্রীমকে তা পরিবর্তনের অধিকার কে ছিল—সে প্রশ্নের কোন সচুর্ভর পাওয়া যায়নি। রাজ্যপাল অবশ্য নিজের ঘাড়েরই মে দায় নিতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজ্যপাল যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বা প্রতিনিধি দেখানো নয়াধিকারী তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন কি? তাছাড়া গণ সংগ্রাম পরিষদ তো প্রোডাতেই ওই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল, গোড়ার সম্মত হয়ে শেষ পর্যন্ত অল আসাম ইন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনও (আসি) মত উঠেছে। ফলে পিকেটিং চলছে, আসাম থেকে এক ফোটা তেলও বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে আসামে জ্বালার রাজত্ব অব্যাহত।

আইন ও শৃঙ্খলার প্রদর্শিত রাজ্য সরকারের এজিয়ারত্ব। কিন্তু বর্তমানে আসামে কোন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার নেই, নয়াধিকারী বকলমে রাজ্য শাসন করছে। কিন্তু কেন্দ্র যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তা আজ আসামের একটি শিশুর চোখকেও ফাঁকি দিতে পারছে না। কিন্তু এখানে মেনা-

বাহিনী নাহিরেই, তাদের গুলিতে হাইলাকান্দীতে ছতন লোক নিহত হয়েছে। অত্যাচারকারী সরকারী সংস্থার (তেল কেন্দ্র ইত্যাদি) ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আসামকে উপজাত এলাকা চিহ্নিত করার অর্থ রাজ্যটিকে শ্রেফ মিলিটারীর হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্র যুবকেরা আরো মেরানা। তারা এসম্পর্কে সরকারী আদেশকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করে কার্যত: সরকার, তার আইন ক্ষমতাকে অকেজো করে দিয়েছে। কাটার খোমেইনি, মার্কিন-সোভিয়েটের মতো ‘বিদেশী’ প্রাণে কেন্দ্রীয় সরকার ও আন্দোলনকারীরা যেন একটা কুটনৈতিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

দেশ কাল রাজনীতি

জানিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলন-স্বগিত না রাখলে তিনি আসামমুখো হবেন না, আসাম জবাব দিয়েছে আলোচনার জন্য তারা আর দিল্লি দৌড়তে রাজী নয়। এবং সরকার যতই চোখ রাঙান, ভয় দেখান, অত্যাচার চালান, ‘বিদেশী’ প্রাণের ফরসালা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন যেমন চলছে, তেমনি চলবে। সত্যি, কেন্দ্রীয় সরকার যে কত দুর্বল, কত ভ্রান্ত আসামের রাজনৈতিক সমস্তার রাজনৈতিক সমাধান এড়িয়ে পুলিশ মিলিটারী জরুরী অবস্থার অস্বাভাবিক উপজাত এলাকা ঘোষণা ইত্যাদি সামরিক কার্য বা কার্যের কৈতোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ। আসাম ঘটনার এক শতাংশও যদি বাস্তবসম্মত দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ জিগুরা বা কেরালায় ঘটত, তবে কংগ্রেস (ই) বা মর্যাদিত কী করত? অস্বাভাবিক করা খুবই সহজ।

জগজীবনের নবজীবন

অবশেষে বাবুজী গতি হল, কংগ্রেসে ঠাই পেলেন তিনি। এদিক থেকে দেবরাজ আসই যেন ইন্দিরা গান্ধীকে টেকা দিলেন। মাত্র দশ দিন আগে যিনি ‘ঝুটা’ জনতা হল ছেড়ে ‘সাদা’ জনতা গঠন করেছিলেন, তিনিই আবার দলের কোন পথ না বাতলে আর্গ কংগ্রেসে যোগ দান করে তাকে ‘আসল কংগ্রেস’ আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক মহলে আবার চমক সৃষ্টি করেছেন। যদিও ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে যে ছু-

মধ্যে ছুবার হল বদলেও ততখানি আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি তবুও নাটকীয়তা অবশ্যই বাবুজী উপহার দিয়েছেন। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতার আসন দিয়েই হয়তো জগজীবন রামের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা হবে। পর মিলে কোন দর কষাকষি হয়তো বাবুজী করেন নি, তবে লোকসভার ভিতরে বা বাইরে দলের প্রধান না হতে পারলে কেবল ভিড় বাড়াবার জন্য তো তিনি দল-ত্যাগ করেন নি।

জগজীবন রাম ইন্দিরার কাছ থেকে কোন উৎসাহব্যক্ত সাড়া না পেয়েই আর্গ কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন—এটাই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের অস্বাভাবিক।

বাবুজীর কংগ্রেসে যোগদানের গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। প্রথমত: জগজীবন কেবল একজন ব্যক্তি মাত্র নয়,

তিনি নিজেকে একটা সংস্থার মতো প্রভাবশালী, প্রবীণ রাজনীতিক। দেশের সামাজিক সম্পর্কের ওপরে তিনি এখনো একটা লম্বাদায়ের নেতা যাদের সংখ্যা আদৌ মগণ্য নয়। তবে আপাতত: বাবুজীর অস্বাভাবিকতার বিশেষ কেউ তাঁকে অস্বাভাবিক করে কংগ্রেসে ঢোকে নি, যেমন তাঁর ডাকে নয়াধিকারী কনভেনশনে তেমন সাড়া মেলে নি। তবে তা সত্ত্বেও কিছু সহকর্মীকে তিনি পুরনো দলে কিংবা পাবার আশা অবশ্যই করতে পারেন।

তুণ্ডু তাই নয়, জনতা পার্টিতে তৃতীয় ভাগমণ্ডল দিয়ে জনসংসীদেয় ভারতীয় জনতা পার্টির গঠনে অবশিষ্ট জনতা দলের একাংশ বাবুজীর পদাঙ্ক অস্বাভাবিক করতে পারেন। চন্দ্রশেখর, রামধন, কৃষ্ণকান্তের উপর কংগ্রেস নেতৃত্ব বহিকার আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিয়েই কান্ত থাকে নি, অগুহে সমসামানে প্রত্যাখ্যানের লাদর আহ্বানও জানানো হয়েছে। সে আহ্বানে শেষ পর্যন্ত কতটুকু সাড়া মেলে বলা শক্ত, তবে বাবুজী যে তাদের মনেও নাড়া দিয়েছেন সেটুকু বোকা যায় সহজেই। সর্বোপরি, যখন এক এক করে কংগ্রেস এম পি এম এল এরা ইন্দিরা কংগ্রেসে পাড়ি জমাচ্ছেন, তখন জগজীবন রামের পুনরাবির্ভাব কংগ্রেসের মর্যাদা নষ্টে নতুন প্রাপের সাড়া, নব জোয়ারের উদ্দীপনা সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে জগজীবনই শুধু নব-জীবন পেলেন না, তাঁর কল্যাণে কংগ্রেসও।

জনতার তৃতীয় অঙ্গচ্ছেদ

বা গত ক’মাসের ঘটনাবলী মধ্য দিয়ে অনিবার্য হয়ে পড়েছে অবশেষে তাই ঘটল। জনতা দলে বৈষম্য সত্ত্বেও প্রাণ-বিরোধী জনসংগঠন ভারতীয় জনতা দল নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবশিষ্ট সাবেক জনতাকেও বাচালেন নিজেরাও বাচলেন। সভাপতি পদে আসীন হয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী জনতা দলের আত্মপূর্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন, মতামতের রপকৌশল বর্ণনা করেছেন—এ উপলক্ষে নয়াধিকারে অস্বাভাবিকতার কনভেনশনে ভাষণ দিয়ে গিয়ে এল কে আবদানী রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতার পদে তাঁর ইচ্ছা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। বাজপেয়ী আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বৈষম্যের শক্তির বিরুদ্ধে একজন করে বিরোধী প্রার্থী দাঁড় করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। অধিকাংশ বক্তাই আর এম এম-এর সঙ্গে তাঁদের যুক্ত থাকার গৌরবের বস্ত্র বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জনসংঘের দলত্যাগে সাবেক সংগঠন কংগ্রেস ও প্রজা পোশালিষ্ট দলের জনতা নেতাদের মধ্যে যেন মতুম কর্মভেদপূর্ণতা দেখা দিয়েছে। তারা চরণ সিং, জর্জ কার্ণাওজ, যুধ লিমারে জগজীবন রামের জনতা দলে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানিয়েছেন।

একদিন তারা বৈষম্য সত্ত্বেও প্রাণে জনসংঘের অনমনীয় মনোভাবের কারণেই তো জনতা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ডাকলেই কিংবা যাবেন এমন এক পায়ে খাড়া নেতার দর্শন এখনো মেলেনি। প্রব্রট এত সহজে মীমাংসা হবে বলে মনেও হয়না। কারণ গত ক’ মাসে জুড়ে অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। মোরারজী দেশাই তো লাক জানিয়ে দিয়েছেন যে চরণ-রাজনারায়ণদের জন্য জনতার আর কখনই ঠাই হবে না। তবে ভারতীয় জনতা দলের ভবিষ্যতই বা কী? ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তাঁরা যতই বলুন আর এম এম কি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প সত্যি ত্যাগ করেছেন, গোড়ামী, দাঙ্গা-দারিকতার উদ্দেশ্যে তারা কখনই কি উঠতে পারবেন? গান্ধীজীও জয়-প্রকাশের ছবি টাকিয়ে যতই তাদের আদর্শের জরগান তাঁরা করুন না কেন, ভারতীয় জনতা পার্টি যে জনসংঘেরই পোশাকী মাম এবং কার্যমী ও প্রতিক্রিয়ার স্বার্থকেই যে তাঁরা রক্ষা করবেন—এ তো জানা কথা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাজপেয়ীজীকে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে বটে, শেখাং ১০ম পৃষ্ঠায়

আমলারা নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলছেন

আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মন্ত্রী বদল হতে পারেন, কিন্তু আমলারা থেকে যান। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নিত্যন্ত দুর্বিনীত ও সরকার বিরোধী আমলারাও টিকে থাকেন এবং মন্ত্রী বদল হলে তাঁরা বাঁড়তি মওকা লোটেন। প্রশাসনের ক্ষেত্রে আই এ এসদের টিকি বাঁধা থাকে দিল্লীতে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে কোন আই এ এস অফিসার খারাপ কাজ করলে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে আদর করে স্থান দেন। এটা জনতা সরকারের আমলেও হয়েছে, এই আমলেও হচ্ছে। সম্প্রতি একজন আই এ এস অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত সি বি আর্ট রিপোর্টকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করে তাঁকে উচ্চাঙ্গনে বসাবার জন্ত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর মন্ত্রী প্রশাসনিক অফিসারদের স্থান বদল করলেন। মন্ত্রী খুব ভালো করেই জানেন যে আই এ এস অফিসাররা “ক্যারিয়ারিষ্ট” প্রতীক। তাঁরা নিজের ভালো চান সবচেয়ে আগে। দেশ রাস্তাভে গেলোও। আর কেন্দ্রে যখন আপাততঃ বামফ্রন্ট সরকার আসছেন। তখন তাঁদেরকে ব্যালান্সের বেলা দেখাতেই হবে। ডবলিউ বি সি এস অফিসাররা আই এ এস অফিসারদের আলোকে আলোকিত। তারা জানেন যে আই এ এস অফিসাররা খালি হলে তাঁদের ক্যারিয়ার শেষ করে দিতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে বিপদের সময়ে মন্ত্রীদেরও করার কিছু থাকেনা। তাই কোনও ডব্লিউ

বি সি এস অফিসার কখনও বাধীন মত প্রকাশ করতে পারেন না। কেবলমাত্র দু একটি ক্ষেত্রে মনিব আই এ এস অফিসার যুক্ত অফিসার হলে মন্ত্রী নিজের ইচ্ছা মতো খাটাতে পারেন খানিকটা ডব্লিউ বি সি এস অফিসারদেরকে।

আই এ এস অফিসারের সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয়েছে অর্থ ও উন্নয়ন দপ্তরে যার মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। উন্নয়ন দপ্তরে মন্ত্রীর সহায়ক হিসাবে আছেন একজন প্রবীণ মাহুয শ্রীদাস সেন। তিনি অত্যন্ত সজাগ মাহুয। তাঁর দপ্তরের কোন অফিসার কোথায় সরকার বিরোধী কাজ করছেন সব খবর থাকে তাঁর কাছে। অনেক আই এ এস এস অফিসার হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন। উন্নয়ন দপ্তরে সেক্রেটারী পদে বেসব অফিসারের বদল ঘটেছে তাঁরা হলেন সর্বশ্রী তরুণ দত্ত, এস আর দাস, স্বর্নজি চৌধুরী, এস কে ঘোষ, তেজোময় ঘোষ প্রভৃতি।

বিধানসভার সেক্রেটারী করে আনা হোল শ্রীপি কে. ঘোষকে। কংগ্রেসী আমলের “বিখ্যাত” স্পীকার অপূর্বলাল মুখুয়ারের সঙ্গে তদানীন্তন অনেককে “টপকানো” সেক্রেটারী প্রবনারায়ণ ব্যানার্জীকে এই সরকার এসেই বদলী করলেন বিধানসভা থেকে পৌরদপ্তরে স্পেশাল সেক্রেটারী হিসাবে। শিবের মতো মন্ত্রী পেলেন প্রবাবু। একদিকে শ্রীপি কে ঘোষ তাঁর ওপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারলেন না, অন্যদিকে প্রবনারায়ণ তাঁর বহুদিনকার বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে মন্ত্রী প্রশান্ত শ্রুরের কাছে ভালো মাহুয হবার তদবির করতে লাগ-

লেন। প্রশান্তবাবু ভেবেছিলেন প্রবাবু হয়তো এখন থেকে ভালো থাকবেন। তাঁকে আস্তে আস্তে দেয়া হোল ক্যালকাটা কর্পোরেশনের প্রশাসকের ভার। বর্তমানে শ্রীঅরুণ সেনের অবর্তমানে প্রবাবু পৌর দপ্তরেরও সেক্রেটারী।

“অভ্যাস যায় না মলে”—প্রবাবু এখনও তাঁর পুরানো বন্ধুদের কথায় চলছেন। মন্ত্রী যা চাইছেন, যা করতে বলছেন প্রবাবু ইচ্ছে করেই গড়িমসি করছেন। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ও বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট এ দুটোই এই বিধানসভার অধিবেশনে পাশ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু প্রবাবুর পরামর্শে এমন কয়েকজন উপদেষ্টাকে অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট কমিটিতে নেয়া হোল (স্বার্থীভাবে) যে তাঁরা প্রচণ্ড বাগড়া দিতে শুরু করলেন। প্রবাবু জানেন যে এই অ্যাক্ট পাশ হয়ে গেলে তিনি আর কলকাতা কর্পোরেশনে প্রশাসক থাকছেন না, সুতরাং দেয়ী হোক। মন্ত্রী মশাই মতলব বুঝতে পেরে ধমকালেন প্রবাবুকে। আরও অনেক ব্যাপারেও পৌরদপ্তরে প্রবাবুর কারসাজিতে ফাইল চলছে না।

উন্নয়ন দপ্তরেও প্রশাসনিক অফিসাররা তাঁদের খেয়ালখুশি মতো চলছেন। প্র্যানিং উপদেষ্টাকে বাইপাস করা হচ্ছে অনেক সময়। মন্ত্রীর মত না নিয়েও এই দপ্তরের কাজ অনেক সময় অন্য দপ্তরকে দিয়ে দেয়া হচ্ছে শক্ততা করে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের “অপসংস্কৃতি বিরোধী” অভিযানের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করছেন অফিসাররা।

শোটা ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। প্রতিটি দপ্তরের অফিসারদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন বর্ণচোরা কি করছেন কে বলতে পারে?

ইন্দিরা গান্ধীর ‘প্রশাসনিক তৎপরতার’ চিত্র

ইন্দিরা গান্ধী কমতা পাবার পর তার প্রশাসনিক তৎপরতার ছবি জনসমক্ষে খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একটি হল, দিন কয়েকের মধ্যেই ৯টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া এবং অপরটি হল, জনতা আমলে প্রত্যাখ্যাত আমলাদের পদ-মর্যাদার সম্মানিত করা।

সত্যি কথা বলতে ইন্দিরা বিধানসভা প্রভুত্বেরই আবার ঠাই দিয়েছেন। জরুরী অবস্থার সময় এই সব ব্যক্তিদের অবদান ছিল অপরিমীম।

বেশন ৫৭ বছর বয়স্ক সৈয়দ মুজফফর হোসেন বার্নেকে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাষ্টা সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রায় ১৭ বছর উড়িষ্যা কাটানোর পর ১৯৬৫ সালে বার্নেকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ-সচিব হন। কিন্তু তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ‘অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার সময়। সেই সময়ে ডি, সি, স্ত্রার নেতৃত্বাধীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিব পদে বার্নেকে নিযুক্ত করা হল। ১৯৭৭-এ জনতা সরকার এসে তাঁকে আবার মুখ্য সচিব পদ দিয়ে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। ‘কিসনা কুশীকা’ মামলার তিনিও একজন অভিযুক্ত। বার্নেকে এখন সম্মানে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

জগমোহন (৫১) পেয়েছেন দিল্লীর লেকটেন্যান্ট গভর্নরের পদটি। এক সময়ে জনসংঘের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার ফলে দিল্লী ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতেও তিনি একটি বিশিষ্ট পদ পেয়েছিলেন। এই সংস্কার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে জরুরী অবস্থার সময় দিল্লীর বাইরে একটি পুনর্বাসন কলোনী গড়ে তোলার সময় জগমোহনের উর্বর মস্তিষ্ক বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে শোনা যায়। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে এখনও কতগুলি মামলা ঝুলছে।

প্রীতম সিং ভিন্দের (৪৫) পেয়েছেন দিল্লীর পুলিশ কমিশনারের পদ। তিনি পুলিশের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৭৫ সালে ডি, আই, জি হয়ে দিল্লী এলেন। জরুরী অবস্থার সময় দিল্লীতে তার কমতা কোন মন্ত্রীর চেয়ে কম ছিল না। স্বন্দর হত্যা মামলার ভিন্দের একজন অভিযুক্ত আসামী। এজন্ড জেলও খেটেছেন কিছুদিন। রাষ্ট্রপতি তাকে পুলিশ পদ দিয়েও সম্মানিত করেছেন। ভিন্দেরের স্নোগান হল : পুলিশের

উচিত কথা কম বলা, কাজ বেশী করা।

বেতার মন্ত্রী বসন্ত শার্ঠের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আই, এ, এম সাহসিৎ ঘোষ (৪০)। তিনি উড়িষ্যাতেই ছিলেন, কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় রাজধানীতে আমন্ত্রিত হলেন। সেই সময় তথ্য মন্ত্রকের চলচ্চিত্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী হলেন তিনি। ‘কিসনা কুশীকা’ মামলার মধ্য বিদ্যাচরণ ছাড়াও শ্রীঘোষও অভিযুক্ত হয়েছেন। জনতা আমলে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। কংগ্রেস (ই) সরকার তাঁর প্রাণ্য সম্মান আবার ফিরিয়ে দিলেন।

বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত নন্দকুমার সিং (৩৯)। আই, এ, এম মহলে ‘নন্দু’ নামে পরিচিত। তিনি প্রথমে বিহারে ছিলেন। প্রয়াত ললিতনারায়ণ রিপ্ত তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তরে নিয়ে আনেন। তখনকার আমলে খুব নাম ডাক তার। জনতা এলো। তাঁকে আবার বিহারে পাঠানো হ’ল। টাকা পরমা নরহয় বেহিসেবের জন্ত তাঁকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছিল। আজ বাণিজ্যমন্ত্রকে আরও উচ্চ মর্যাদার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রাসেল্ড ও জগন সরকারের স্বযোগ হাতে পেয়ে গেলেন।

কেন্দ্রীয় সরাষ্টা দপ্তরের এশটাবলিশমেন্ট অফিসার হয়েছেন সূর্য-প্রকাশ বাগলা। এই লোকটি গোড়া থেকেই জৈল সিং-এর পেছন পেছন ঘুরেছেন। জৈল সিং যখন পাণ্ডাবের মুখ্যমন্ত্রী তখন তার প্রধান সচিব ছিলেন বাগলা। বর্তমানে বাগলার দপ্তরের প্রধান কাজ হল, বিদেশে ভারতীয় দুতাবাসের কর্মীদের নির্বাচন করা, কেন্দ্রীয় সরকারের সব বিভাগে উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়োগ করা। সুতরাং তোবামোদ খোষামোদের একেবারে রান্নাভাজ।

যদিও প্রতিরক্ষা দপ্তরে আপাতত কোন মন্ত্রী নেই, তবু মন্ত্রিহীন দপ্তরের বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হয়েছেন ডি, এম, জিপাঠী (৪২)। জরুরী অবস্থার সময় তিনি বিদ্যাচরণ স্ত্রার বিশেষ সহকারী ছিলেন। ১৯৭৭-এ জনতা দল ক্ষমতায় এসে তাকে পুরোনো আশ্রয়ে অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশে পাঠিয়ে দেন। জাওয়ারি বিমান বিতর্ক উঠলেই জিপাঠির নাম প্রায়ই শোনা যায়।

ইন্দিরা এই সব পুরনো মুখ দিয়েই আজ তার প্রশাসন আবার টেলে দাড়াচ্ছে।

বিপদসংকেত শিকল কেবল জরুরী অবস্থার জন্যই

অকারণে এই শিকল টানলে
অনর্থক ধারাবাহিক বিরূপ
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
আপনার গাড়ীরও দেয়ী হয় এবং
অন্য গাড়ীরও সময় পিছিয়ে
যায়। একজনের হঠকারিতার
খেসারও দিতে হয় অনেককে।

শিকলটানা রু হুন্দ গতিকে
ব্যাহত করে।



দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে



লোকসেবক মালিকের কর্মী-শোষণ ও ধাক্কাবাজীর কাহিনী

বিশেষ প্রতিনিধি

রাজনৈতিক যোগসাজসের কোণাল আর বড়বাজারী উত্তরবঙ্গের সার্বক সংগ্রামে বটাতে পারলে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের আড়ালেও যে একটা তেজস্বী ব্যক্তি জন্মে তোলা যায়, তার প্রমাণ দৈনিক লোকসেবক পত্রিকার কর্তার মুকুল রায়চৌধুরী।

একদা উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের নেতা অধুনা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক স্বভাবে সাংবাদিক মুকুলবাবু ৩০শে মার্চ রবিবার তার পত্রিকা অফিসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পদধূলি পেতে ব্যর্থ হলেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রবন্ধকুমার মুখোপাধ্যায় শক্তিমন্ত্রী বরকত গণিধান চৌধুরী ও সেই সঙ্গে অজিত পাণ্ডা ও স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়েরও আসবার কথা ছিল লোকসেবক অফিসে। মুকুলবাবু মন্ত্রীদের জন্ত বিপুল অর্থবাজার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু তিনি আশাহত হলেন, মন্ত্রীরা এলেন না। কেন এলেন না?

কমতাতোপী মহলের খোঁজ-খোঁজ আর নিরীহ নিষ্ঠাবান পেশাদারী লোকের মাধ্যমে হাত বুলায়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক মেজ্রে ছড়ি বোরাণোর ঘটনা বালী পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে কম নেই। লোকসেবকের নবজন্মের পর মুকুলবাবু সেই উদ্দেশ্য নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন। ১৯৭৫-এ লোকসেবক পত্রিকা সাপ্তাহিক মেয়াদে প্রকাশ করার পর যখনই মুকুলবাবু নিজের অবস্থা বাড়ল, অমনি জরুরী অবস্থার স্বযোগে ১৯৭৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তদানী-কাল তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বিচারপণ্ডিত করকমল দৈনিক লোকসভার প্রথম সংখ্যাটি তুলে দিলেন। এবং ঘটনাস্থলটি গিয়েছিল, ততটা না হলেও লোকসেবক মাজাতিরিজ্ঞ সুরকারী বিজ্ঞাপনই পেতে শুরু করলো।

সংবাদপত্রের চেহারা-চরিত্রের চেয়ে অর্ধের উৎস সন্ধানই মুকুলবাবুর আগ্রহ বেশী। সংবাদপত্রের জন্ত তিনি ধীরে ধীরে সাংবাদিক আমদানী করতে লাগলেন। জু-আড়াইশো টাকার মধ্যেই অধিকাংশের বেতন ধার্য হল। কর্মীদের বঞ্চিত করে সম্পাদক নিজস্ব অর্থ-ভাণ্ডারটি সব সময়ের জন্যই কানায় কানায় পূর্ণ রাখতে চাইলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, লোকসেবকে আরও অর্থ বিনিয়োগের লোভে কয়েকজন ব্যবসায়ীকেও বেশ ভালো পদমর্যাদায় মুকুলবাবু তার পত্রিকার জায়গা

দিলেন। নিম্নে এলেন জনৈক জাহাজের কারবারী ওখা সি এ বি ও আই এফ এর পরিচালন কমিটির সদস্য শরৎচন্দ্র পাণ্ডে। তাকে পত্রিকার প্রকাশক ও ডিরেক্টরের পদ দেওয়া হল। আনা হল চতুর্দশ পত্রিকার সম্পাদক অরুণ রায়কে। পুরোনো লোকসেবকেও অরুণবাবু কাজ করতেন।

অন্যদিকে সাপ্তাহিক লোকসেবক কার্ড: যে দোকানটি দেখাশোনা করতেন, আনন্দবাজার পত্রিকার এককালীন দক্ষিণবঙ্গের সংবাদ-দাতা রমেন দাসকে দৈনিক লোকসেবকের মুখ সম্পাদক করার প্রস্তো-ভন সঙ্গেও চীফ রিপোর্টার করা হল। আর সম্পাদক বেছে বেছে তার পেটোরা ছেলেছোকরাকে সাংবাদিক হিসেবে আমদানী করলেন। তারপর ৭৭ এর মার্চে মুকুলবাবু ভোল পাটালেন।

তাই লোকসেবকের পাতায় বামপন্থী মুখোশের ছবি ছুটে উঠল। বামমন্ত্রী মন্ত্রীদের বিবৃতি আর তাদের জয়গানে লোকসেবক তখন মুগ্ধ। সাংবাদিকরাও সম্পাদকের মজি-মাফিক ব্যবহৃত হলেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন কোন সাংবাদিককেও কাজে লাগানো শুরু হল।

পত্রিকার ব্যবসায়ী ডিরেক্টর শরৎচন্দ্র পাণ্ডা অবশ্য পরামর্শ দিয়ে-ছিলেন: দয়া করে ভোল পাটালেন না, কংগ্রেসী লাইনেই থাকুন। মুকুলবাবু সে উপদেশে কর্ণপাত করেন নি। এসব করতে গেলে তার লাটসাহেবীরা বজায় থাকতো না। তার এই রাতারাতি রঙ বদলে লঙ সাহাবার নীতি যে খুব ব্যর্থ হচ্ছিল এমন কথাও বলা যায় না।

কিন্তু মালিকী কোলিঙ্গ যাবে কোথায়? মুকুলবাবু কর্মীদের মাইনে পাঁচ ছয়-মান করে বাকী ফেলে রাখলেন। রিপোর্টাররা এক রকম ঘরের খেয়ে বনের মোষ ভাড়াচ্ছেন। পত্রিকার সাংবাদিক বাগেরে সম্মান পাচ্ছেন, কিন্তু অফিসে মালিকের কাছে অপমানিত হচ্ছেন আর মাসের শেষে ফুটো কলসী উল্টে দিচ্ছেন (এটা আশ্চর্য্যজনক সাংবাদিকেরই ট্রাজেডী অথবা অস্বপ্ন।)

এই অবস্থার লোকসেবকের বেতনহীন- কর্মীরা ইউনিয়ন গঠলেন। এর সভাপতি হলেন রমেন দাস, আর সম্পাদক হলেন রথীন চক্রবর্তী (বর্তমানে রথীনবাবু সভাপতিগণের কাজ করছেন। কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টিতে তাকে লোকসেবক

ছাড়তে হয়েছে)।

অন্যদিকে লোকসেবক রঙ বদলে বামাচারী হবার সঙ্গে সঙ্গে চীফ রিপোর্টার রমেন দাসকে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আখ্যা দেওয়া হল। অধিকাংশ দিনই তার রিপোর্ট বাতিল করা হত। ছাপা হতনা। অত্যন্ত রিপোর্টাররা তার নির্দেশ মানতেন না। তার কাছ থেকে কোন অ্যাসাইনমেন্ট নিতেন না। রিপোর্টও তার কাছে জমা দিতেন না। এই অপমান মাধ্যমে করে রমেনবাবু রইলেন। কিন্তু প্রবীণ মুখ সম্পাদক অরুণ রায় এই সব নোয়ামি দেখে ৭৮ সালের মে মাসে লোকসেবক ছেড়ে দেন। মাইনে যাদের বাকী ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আজও তা পাননি, মালিকের পেটোরা কেউ কেউ পেয়েছেন।

ছ পাতার কাগজ। স্টলেও চোখে পড়েনা। বিজ্ঞাপনদাতা ও বিনা পরসার প্রাপকরা ছাড়া সে কাগজ কারও নজরে আসে কিনা সন্দেহ। একমাত্র অফিস পাড়ার একটি দেয়ালে নিয়মিত সঁটা হয়। সংবাদপত্র দেখে মনে হয়না, সংবাদ পরিবেশনে সম্পাদকের তেমন আগ্রহ আছে। শুরুতে ছাপা হত মাত্র চারশো কপি। বিশ্বস্ততার খবর এখন ছাপা হয় নাড়ে নয়শো কপি। অভাব সারু-লেশনের জালিয়াতি প্রেস রেজি-স্ট্রারও চোখে পড়ল। দিল্লী থেকে এলেন প্রেস রেজিষ্ট্রারের জনৈক অফিসার। তিনি পরীক্ষা করে ডি এ

ভি পিকে বিজ্ঞাপন বন্ধের সুপারিশ করলেন। মুকুলবাবুর মাথায় হাত। জনতা সরকারের হাতেই বোধহয় তার সাধের তরঙ্গী ডুবে যার।

এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে অন্তত দিল্লীতে গিয়ে তবির করতে হয়। শুধু কোণাল জামলেই হয়না, তা খাটানোর জন্য সময়ের সময় পেটে বিড়ে থাকারও দরকার হয়। দিল্লীর অফিসার ভোলানোর বিড়ে সম্পাদক প্রবরের নেই।

তিনি কোচাঝালানো রিপোর্টার রমেন দাসকেই ধরলেন, সেই সংগে ধরলেন তার পেটোরা এবং সাংবাদিকদের খোল খাওয়ানো এক তরুণ সাংবাদিককে। বিত্তীয় ব্যক্তি বয়সে তরুণ হলেও লোকসেবকের সাংবাদিকটি বাগে-গরুতে এক বাটে জলখাওয়াতে ওস্তাদ। মুকুলবাবু দেখলেন, পারলে এই দু'জনই পারবে। তাদের দিল্লীর প্রেস রেজিষ্ট্রারের কাছে পাঠালেন, যাতে পত্রিকার হিসেবে কারচুপি ধামা-চাপা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা অন্তত: হাতে থাকে। প্রেস রেজিষ্ট্রার উল্লোক বাঙালী। তাই অনেক কারসাজী করে মুকুলবাবু সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

বিপদ থেকে উদ্ধার হলেই বিপদ-তারিণীকে যে রক্ষা করবেন মুকুল-বাবু তেমন পান নন। রমেনবাবু তার বকেয়া চেরেছিলেন, তাই অফিসের ভেতর আবার রমেন বিরোধী অভিযান শুরু হল।

পাঁচ বছরে বিভিন্ন পুঁজিপতি পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ

মুখ্য লোকসভায় গত ১১ মার্চ জিজ্ঞাসিত বর্ষের এক প্রস্তোত্তরে কেন্দ্রীয় আইন ও কোম্পানি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী পি শিবশঙ্কর জ্ঞানান যে, ১৯৭২ সালে বিড়লার সম্পদ ছিল ৫৮০'৪২ কোটি টাকা, পাঁচ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৭০'২০ কোটি টাকা। বাহ্যিক সালে টাটা পরিবার ছিল পুরোতাপে, ৬৪১'১০ কোটি টাকার সম্পদ মূল্যে। বিড়লা জরুরী অবস্থার স্বযোগে, মেহের

	১৯৭২	সম্পদমূল্য
মফলাল	১৮০'৭৪ কোটি	
সিহানিয়া	১২১'৪৫ ,,	
খাপার	১০৬'১৬ ,,	
আই. সি. আই.	১০৫'২১ ,,	
সিদ্ধিয়ার	১০৭'৭০ ,,	

পরিবারের যোগসাজসে টাটাকে লাভান্তরের রেকর্ডে হারিয়েছে বটে তবু কারাকটা ছিল খুবই কম। মাত্র ১২ লক্ষ টাকা। আর কয়েকটি পরিবারের হিসেব দেওয়া গেল। পুঁজিপতি পরিবারের এই শ্রীবৃদ্ধি বটেছে শ্রীমতী ইন্দিরা-গান্ধীর শাসনে, গান্ধী শ্রমিকদের রক্তশোষণ করে। এর পরেও শ্রীমতী গান্ধী 'গরিবী হঠানো', 'হুদিন আসছে' ইত্যাদি বুলি আওড়ান।

	১৯৭৭	সম্পদমূল্য
	২৮৫'৬০ কোটি	
	২৬৭'৩১ ,,	
	২১৫'২২ ,,	
	২০১'২৭ ,,	
	২০০'০৪ ,,	

এমনি করে লোকসেবকের জু-তিনটি বছর পেরিয়ে যায়। জনতা আমলের এই যে দু'তিনটি বছর পেরিয়ে গেল, এই সময়ে নানা বিপদ বিসম্বাদের মধ্যে যে মুকুলবাবুর গাড়ী চড়া কিংবা ব্যক্তিগত জীবনের স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতি হয়েছে তা কিন্তু নয়। ঘরের লোককে তিনি মাইনে দেন নি, কিন্তু অন্ত কাগজের সাংবাদিকদের পুরোদস্তুর ভাল টাকা দিয়ে বেনামীতে তার কাগজে লেখাতে তিনি কষ্ট করতেন নি।

এরই মধ্যে জনতা জমানা বিপুল হল। মুকুলবাবু রাজনৈতিক ভোল-বাজির স্বযোগ নিতে চান, কিন্তু রাজনীতির অন্ত:সলিলা-রূপটিকে বোঝবার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা তার নেই। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে জনতার পুনরাগমন ঘটবে এই আশায় তিনি জনতা দলের প্রবন্ধ সেন ও প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। তাদের বোকাতে চাইলেন এটা জনতার মুখপত্র এবং বামফ্রন্টের বিনাশ ঘটাবে এই পত্রিকা বিশেষভাবে তৎ-পর। কিন্তু মুকুলবাবু নির্বাচনের লক্ষে সবেই বুকতে পারলেন তার প্রবন্ধপ্রীতি কতটা অবিরোধের কাজ করেছে। তিনি দেখলেন, কেহে ইন্দিরা, রাজ্যে বাম। তার মাথি না-হুল মাথি—এই গোলকধাঁধার পড়-লেন মুকুলবাবু।

এদিকে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস (ই) পুরোনো মূর্তিধারণ করেছে। ওদের ধারণা ভারতজুড়ে এখন ইন্দিরাতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে বাম-ফ্রন্ট সরকারে কি আসে যায়? মুকুল-বাবু দেখেছেন বুকে ভরসা পেলেন।

রাত ভোর হল। মুকুলবাবু এবার স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দরজারগিয়ে কড়া নাড়লেন। লোকসেবকের প্রধান সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করার প্রস্তাব দিলেন তাকে। একটা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজের নাম জড়িয়ে থাকবে একি কম কথা। তাছাড়া বামফ্রন্টকে কাবু করতে হলে একটা নিজস্ব সংবাদপত্রও হাতে থাকা চাই। খুব বেশী চাপ দিতে হল না স্বতন্ত্র-বাবুকে। তিনি বললেন: তিনি আছেন এবং থাকবেন। লোকসেবকের মহাজন্ম হলো। মার্চের মাঝ-মাঝি থেকে প্রধান সম্পাদক হিসেবে স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে পত্রিকার অন্তরমহলেও একটা উল্লেখযোগ্য রদবদল হয়েছে। সভাপতিগণের হলধর পটল এসেছেন। তাকে মুকুলবাবু অফার দিলেন দেড়-শেখাংশ ১ম পুঁজার

ইরানের উপকূলে আমেরিকার রণতরী

তপন বসু

মধ্যপ্রাচ্যের শরিয়তি তান-শাহীর নাটের গুরু আয়াতুল্লা খোমেনইনির সব থেকে নির্ভরযোগ্য পাহারাদার বানি-সদর ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর প্রধানকার-প্রশাসন যন্ত্রে আয়াতুল্লা বলিষ্ঠ প্রভাব নতুন করে প্রমাণিত হল। এবং এটাও প্রমাণিত হল যে, মুসলিম ছিন্দ্য়াতে সামন্ততান্ত্রিক মৌলবী সংস্কৃতির আধিপত্য আজও বিদ্যমান। অত্যাচারী শাহের আমেরিকা বেঁচা নীতি ও অমানবিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার একমাত্র বিকল্প ছিল ধর্মীয় গুরু হুজ্জতুল-ফাখর, যেটা সোভিয়েট রাশিয়া খুব ভালই বুঝেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও ঠিক যেমনটি বুঝেছিল ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত করার সময়। ইংরেজ বেনিয়ারা ধর্মের ধূয়া তুলে হিন্দুধর্ম ও পাকিস্তান সৃষ্টি করে হিন্দু মুসলমানের শোষণের আলাদা আলাদা কেন্দ্র তৈরী করে দিয়েছিল এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে স্বাধীনভাবে চিড় ধরিয়ে দিয়েছিল। যার মূল্য আজও দিয়ে যেতে হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ইরান থেকে বিতাড়িত করার জন্য আয়াতুল্লা খোমেনইনিকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরোক্ষ সাহায্য দিয়েছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। যদিও ফরাসী প্রশাসন মার্কিনীদের খুবই অসুগত সাগরদেহ, তথাপি সাম্প্রতিক গৌসার কারণ হল, কমন মার্কেটে সে আমেরিকার কাছে প্রচণ্ড চোটে থাকছে। আর পুঁজিবাদের এইটাই টাজেভী যে মৈত্রী সেখানে সবসময়ই লক্ষ্যসী।

কিন্তু শাহের গুরুত্ব ও অমানবিক নির্ধাতনকেও হার মানালো আয়াতুল্লা চক্রের মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসন। নারী স্বাধীনতা হরণ করে তাদের নতুন করে অস্ত্রপুর্ন পাঠানো হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রীদের বোরখা পরিয়ে জরাজীর্ণ খোমেনইনি পৈশাচিক উল্লাসে শ্রুতানের হাসি হাসতে শুরু করে দিল। সামান্যতম বিরোধিতা থাকলেই কোতল করে প্রতিকূলতার বিলোপ সাধন করা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো। পশ্চাদপদ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির কঙ্কালটাকে কবর থেকে তুলে তেহরানের সংসদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। এইভাবে জনজীবনের ওপর আয়াতুল্লা খোমেনইনির ঐকান্তিক বৈরশাসন কর্তৃক হিংস্র আক্রমণ গোয়েবেলস কিংবা ফ্রান্সের সালাজারের নৃশংসতাকেও নির্বালনে পাঠালো। নিপীড়ন আর অত্যাচারে জরাগ্রস্ত

ইরানী জনজীবন আরো তারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দেশপ্রেমী ইরানীরা খোলাখুলিই বলতে শুরু করেছে যে, হতবুদ্ধি খোমেনইনির মূর্খামির ভুলই দেশের আনাচে-কানাচে মার্কিনী আক্রমণের স্রীং বোট ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

আজারবাইজানের মুসলিম নেতা শরিয়তমাদারী তো ঘোষণাই করে দিয়েছেন যে, ইরানী জনগণ ও আমেরিকার সাধারণ শত্রু হল খোমেনইনি ও তার অসুগামীরা। মার্কিন প্রশাসন শরিয়তমাদারীর এই ঘোষণার দ্বারা ইরানকে গৃহযুদ্ধের আগুনে কলুসে ফেলার ও প্রত্যাশিত আক্রমণ সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়েছিল। অসুমান করা যাচ্ছে এবারকার অভ্যুত্থান হবে বিগত আড়াই বছরে যে কোন বিদ্রোহের চাইতে অনেক বেশী উত্তপ্ত ও সর্ব-গ্রাসী।

ইরানের তরুণ সাংবাদিক ডঃ হাসান আবোদি সম্প্রতি লণ্ডনে বলেছেন, যে, ইরানের সামরিক বাহিনীর মধ্যেই পশ্চিমপন্থীদের পরিচালনায় 'ফোরকান' নামে অত্যন্ত শক্তিশালী এক গোপন সংগঠন আছে। এবং এর নেতা হলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল চমরান। এবং তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করে 'ফোরকানের' সদস্যদের কাছে অত্যাধুনিক মার্কিনী আয়ুধসম্পন্ন পাঠাচ্ছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চমরান ও তার ছোট ভাই, ইরানীয়ান স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান মেহেদী চমরান ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনী ও স্পেশাল ফোর্স থেকে ইরানীয় সর্বকণ্ঠ বলে অভিহিত পদস্থ ব্যক্তিদের হটিয়ে দিয়ে ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের সর্বকণ্ঠদের বসিয়েছেন। ইরানের প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'খবরনাম'-এর প্রবীণ সাংবাদিক মহম্মদ ইউহুস ফ্রান্সে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে বলেছেন যে, খোমেনইনির বাড়াবাড়ির জন্যই ছাত্র যুব গেরিলাদের অনেক আত্মীয় বন্ধু 'ঐকান্তিক গিলোটিন'ের বলি হয়েছেন, আর সেই মওকাদ্দ পশ্চিমপন্থীরা কুড়িম স্বপ্নের গল্প ফেঁদে বিপ্লবী পরিষদ ও যুব-ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাইছে। তাছাড়া একদিকে প্রতিরক্ষা দপ্তর ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, অব্যবহিতভাবে বিশেষ করে পশ্চিম ইরানো-

পের দেশগুলি তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা হরণ করিয়ে দিয়েছে, নয় একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলতঃ অর্থনৈতিক সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই সমস্ত কারণে শিল্প সংস্থাগুলোতে লক আউট, ক্রোড়ার ইত্যাদি এত দ্রুতগতিতে বেড়ে গেছে যে, মারাত্মক রকমের বেকারীর ফলে মহামারী দেখা দিয়েছে। বিনী চিকিৎসার অথবা অনাহার জনিত মৃত্যু প্রভৃতি কারণে সারাদেশের অবস্থা অর্ধনির্জন।

এই বাস্তব অবস্থার স্বর্ণ স্বপ্নে ইরানের পশ্চিমী চক্রকে অভ্যুত্থানের সাজোয়া গাড়ী এগিয়ে নিয়ে যেতে জালানীর কাজ করছে। সি আই এ চক্র তাদের কূট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য নানান কারদার ঘূর্ণ্য খেলায় নেমেছে। তারা আয়াতুল্লা ও তার বহুল প্রচারিত ঐকান্তিক বিপ্লবের প্রতি অসুগত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে খেপিয়ে

তোলার জন্য দেশজুড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অস্থিরতামূলক কার্যকলাপ করতে চাইছে। বিশ্বজনগণের দৃষ্টি যখন আফগানিস্তানে কদমী আগ্রাসনের দিকে নিক্ষিপ্ত এবং ইরানী জনসাধারণের ওপর শরিয়তি-তন্ত্রের অত্যাচারের দিকে তাকিয়ে হতচকিত মার্কিনী প্রশাসন তখন মধ্যপ্রাচ্যে তাদের অসুগামীদের সহায়তায় অভ্যুত্থান মারকং তেহেরান দখল করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে।

তাঁর অসুপস্থিতিতে বানি-সদর ও অন্যান্য সাগরদেহরা প্রতি মুহূর্তে খানার পড়বে একথা উপলব্ধি করে আয়াতুল্লা খোমেনইনি তাঁর পুত্র আহমেদ, পৌত্র হোসেন এবং জামাই আগরানিকে একটা রাজনৈতিক দলিল রচনা করতে বলেছেন, যেটা তিনি দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করতে চান অথবা পুনরায় স্বাধীন অবনতি ঘটলে যাতে রেডিওর মাধ্যমে তাঁর পক্ষে দলিলটা প্রচার করা যায়।

কিন্তু এত দাবিধানতা অবলম্বন করা সম্ভবও তিনি তাঁর বর্তমান

শাসনকে চরম বিপদে হাত পেকের রক্ষা করতে পারবেন কি না সে বিষয় সন্দেহ আছে। কারণ রেহেস্তি, মোন্টাজেরী, শরিয়ত মাদারী ও রফদানজানির মত ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতারা সামরিক প্রধান মুস্তাফা ওমরানের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-বস্ত্রের সব থেকে প্রয়োজনীয় দপ্তর-গুলো দখল করার জন্য ইতিমধ্যেই আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওমরান ফেরারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনদিনের সফরে জাপান গমন করেন। এবং ঠিক সেই সময় নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ও তাইচু-বিমান বন্দরে পৌছোন এবং সেখানে ওমরানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে গোপন আলোচনা চলে। সব থেকে লক্ষণীয় হল আলোচনা শেষ হবার পর তিনি এক মুহূর্তের ভ্রম ও টোকাও শহরের দিকে পা বাড়ান নি। পরের ফ্লাইটেই স্বদেশাভি-মুখে স্বাগত করেন। সবকিছু দেখে শুনে বলা যায় ইরানের ভবিষ্যত ছুরির ফলার ওপর দিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে আমলা পোষার পরিণাম

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৮০০০ কোটি টাকা। এখানে লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা কয়েকটি সংস্থা মুনফা দেখিয়েছে। তার পরিমাণ মাত্র ১৫৭৮ কোটি টাকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এমন কি একচেটিয়া পুঁজি প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের মত অতি সমৃদ্ধ দেশগুলিও রাষ্ট্রায়ত্ত করার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য অবাধ প্রতিযোগিতার এখন কোম অস্তিত্ব নেই। এর কারণ সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ এখন আর কোন দেশেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রাখতে পারে না। চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে কোন দেশের পক্ষেই পুঁজিবাদী নিয়ম আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয়। আর্পাতত আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমরা শুধু পুঁজিবাদী সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার সমস্তা সম্পর্কেই উল্লেখ করছি।

এই শিল্পবাণিজ্যের কর্ণধার কে? লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এরা শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার

বিষয়ে দক্ষ নন। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জেনারেল ম্যানেজার পদে যারা বসেছেন, তারা প্রায় সবাই মিথিল লার্ভিদের সমস্ত। শুধু আমাদের দেশে কেন, প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-

অর্থনীতি

বাণিজ্যের কর্ণধারেরা এমন এক অংশ থেকে এসেছেন যারা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রমিত সমস্যা, উৎপাদন ও বন্টন ও পরিহারযোগ্য ব্যয় সম্পর্কে আরো ওয়াকিবহাল নন। প্রশাসনিক-আমলাতন্ত্রের সদস্য হিসেবে এরা আমলাতন্ত্রের নিলিপ্ততা, নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কে অতিশয় স্পর্শ-কাতরতা এবং বিভাগীয় নোট চালা-চালির হাস্যকর অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। যে সমস্ত আমলা সামরিক বা বেসামরিক প্রশাসন থেকে অবসর গ্রহণের প্রাকালে বা তারপর রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্পের কর্ণধার হয়ে বসেন (অবশ্যই তদ্বিষয়ে জোরে) তারা দীর্ঘকাল ধরেই বিভাগীয় আয়ব্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার অভ্যাসকে ভালোভাবেই রপ্ত করে এসেছেন।

বিভাগীয় ব্যয়ের পরিমাণও সামান্য, প্রত্যেক ফলাফলের কোন হিাব নিকাশ বা দায়িত্ব গ্রহণেরও প্রশ্ন ছিল না। প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে ব্যয়বাহুল্য, অননুমোদিত ব্যয় ইত্যাদি বিশৃঙ্খলাকে তারা গুরুত্ব দেন নি। হয় অধস্তন কর্মচারীকে দায়ী করে কর্তব্য সমাপন করেছেন। নয় মন্থনতা বা বড় কর্তার সাহায্যে অতিরিক্ত অননুমোদিত ব্যয় বার্তা অফ করে রেহাই পেয়েছিল।

ব্যুরোক্রেনী মানে ক্ষমতা আছে দায়িত্ব নেই। কারণ দায়িত্বের সমগ্রতাকে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ভাগ করে রাখা হয়েছে যে yes লিখতে তিন জন অফিসার লাগে। পুরো yes কেউই লেখেন না। স্বতরাং 'ইয়েস' বলার সময় দায়িত্বও কারো উপরেই থাকে না। সরকারী কোষাগারের অর্থ ব্যয়ের অবাধ অধিকার আছে, কিন্তু এখানেও ফলাফলের দায়িত্ব নেই। অডিটর জেনারেল যে অডিট করেন, সেটাও ফলাফলের অডিট নয়। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুরী হয়েছে, সেটা খরচ হয়েছে কি না, কি ভাবে খরচ হয়েছে অডিটর জেনারেল শুধু তাই দেখেন। আমলাপ্রভুরা এই পদ্ধতিতেই শেষাংশ ১৯ পৃষ্ঠায়

গুরু পরিকল্পনা

বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন

অজুর্ন দাস

Bangladesh Public Administration and Society : Dr. M. Anisuzzaman.
Published by Bangladesh Books International Limited,
1, R. K. Mission Road, Dacca 3.
Price 25'00.

লোকপ্রশাসন সম্পর্কে বাঙালি দেশের বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ বাড়ছে। পাকিস্তানী আমলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানিক কাজ হলেও ধারাবাহিক শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে এর গুরুত্ব তেমন ছিলো না। এখন সেই ধারাবাহিকতা রেখেই বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। আমি বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লিখিত গ্রন্থটি পড়েই এই তথ্য জানতে পেরেছি। গ্রন্থটিকে লেখক 'লোক প্রশাসনের বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিষয় সম্পর্কে লেখকের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা গ্রন্থটিকে সাধারণ পাঠকের কাছেও স্বপাঠ্য ও উপাধেয় মনে হবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও প্রফেসর ডঃ এম. আনিজ্জামান প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই গ্রন্থে মোট দশটি প্রবন্ধ রয়েছে। লেখক ভূমিকায় (preface) বলেছেন, প্রবন্ধগুলো ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সালের ভেতর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে লিখিত হয়েছে। যদিও প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে, তথাপি পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রবন্ধগুলোর ভেতর একটা সাধারণ ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। সেই হিসেবে এটিকে একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ আখ্যা দেওয়া যায়।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারো-লেঙ্গ এও সোস্যাল চেঞ্জ'। ডঃ এম. আনিজ্জামান একজন নিপুণ সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি পর্ববেক্ষণ করেছেন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। যে 'ভারো-লেঙ্গ' এই অঙ্কে কোন এক সময় একেবারেই ছিলো না, তাই আজ কি ভাবে ধীরে ধীরে গোটা সমাজকে গ্রাস করেছে তা এই প্রবন্ধ পড়লে যেকোন ব্যক্তির চোখে পড়বে। তিনি এতদসংক্রান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে এম. আনিজ্জামানের গুরুত্বপূর্ণ পর্ববেক্ষণ

হলো, সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে এই মনোভাবে উদ্ভাবনী প্রদান। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "The most Popular movies on the TV screen are: 'the wild wild West', 'the Avengers', 'Uncle', 'Hawai Five-o', 'The Protectors', 'The Saint'. These are crime movies and these might therefore be expected to affect the thoughts, aspirations and behaviour of many a youth regularly viewing such programmes". (9 page) এই পর্বের সর্বাধিক কৌতুককর কথা হলো এজাতীয় উচ্ছ্বাসতার প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব—যাকে আনিজ্জামান সাহেব আশাশ্রয় বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বাংলাদেশ জ্ঞানশালিজম'। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের উৎস অনুসন্ধান করেছেন এবং বহু চর্চায় বল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার আদিম ও প্রাচীন কালের অভিজ্ঞ পর্ববেক্ষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে ডঃ এম. আনিজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গি একজন দক্ষ ঐতিহাসিকের সমতুল্য। এই প্রবন্ধের শেষে কয়েকখানা ছক একে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের নাম এবং তার শাসকদের সময়সীমা ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। এই ছকগুলো প্রবন্ধটির বিশেষ আকর্ষণ। গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১১ দফা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ১১ দফা বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তার একটা চাবিকাঠি। ডঃ এম. আনিজ্জামান স্থলতঃ ১১ দফাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। নীতিনির্বাচনী দফাগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এবং কর্মসূচীনির্ভর দফা হলো ৫-১০ এবং ১০ নং। এই ভাগকেই আবার তিনি চারটি অংশে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হবে (১) স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিষয়ক ১ ও ১১; (২) রাষ্ট্রীয় নীতির তত্ত্ব বিষয়ক ২, ৩, ১২-১৪; (৩) মূল কর্মসূচীবিষয়ক ৫-১০ এবং ১৫; (৪)

জনসাধারণের সঠিক অংশগ্রহণ ৪, ১১, ১৭ ও ১৮। এই বিভাগগুলোকে তিনি ছকের সাহায্যে পাঠকের চক্ষুগ্রাস করে তুলেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ এবং তার যৌগিক গবেষণা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এতে তিনি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। COTA (সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী), NIPA (আশুতোষ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন) এবং BASC (বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেশন স্টাডিজ কলেজ)। লোক প্রশাসন গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনাটি ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী প্রয়াত বুদ্ধিজীবী ডঃ মোজ্জাকুর আহমদের স্মৃতি উপলক্ষে আরোচিত সেমিনারে পঠিত হয়েছে। এতে ডঃ চৌধুরী স্মৃতিকা স্বাধাধ বিলম্বিত হয়েছে।

মোকা কথা গ্রন্থটি বাংলাদেশের প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এম আনিজ্জামান বহু পরিচয় করে প্রবন্ধগুলো লিখেছেন এবং প্রয়োজনবোধে কখনো কখনো সংস্কার করেছেন। এর আর একটি আকর্ষণ হলো গ্রন্থ শেষে একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, পরিশিষ্ট এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে যৌগিক তথ্য পরিবেশন।

এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ উপহার প্রদানের জন্যে আমি প্রশাসককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিষ্টিান ব্যবসায়ীর বিপর্যয়ের সম্মুখীন

যারা মাসখের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে হাসি ফোটান তাঁদের মুখেই আজ হাসি নেই। বর্তমানে তাঁরা এক ভয়ঙ্কর আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। এর প্রধান কারণ বর্তমান বাজারে চিনির অধিযুগ।

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টিান ব্যবসায়ী সমিতির অন্ততম সম্পাদক তাপস হাজরা রাজ্যের মিষ্টিান ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ কথাগুলি বলেছেন।

তিনি বলেন, মিষ্টি তৈরী করার অন্ততম প্রধান উপকরণ চিনি। অথচ বর্তমানে খোলা বাজার থেকে মিষ্টিান ব্যবসায়ীদের যে দামে চিনি খরিদ করতে হচ্ছে, তাতে উপর মিষ্টিানের কোন মতেই পরতা হচ্ছেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষতির বোঝাও বহন করতে হচ্ছে। কারণ, চিনির দাম বাজারে অধিযুগ হলেও খরিদারের স্বার্থে ও তাঁদের দিকে নজর রেখেই বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ঐ ব্যবসা চালাতে হচ্ছে। ভাষা মূল্যে চিনি পাওয়া না গেলে বাজারীর এই প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যবসারে অদূর ভবিষ্যতে আরো সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তাপস বাবু জানান।

প্রসঙ্গত তাপসবাবু বলেন যে, ভাষামূল্যে মিষ্টিান ব্যবসায়ীদের চিনি সরবরাহের দাবি জানিয়ে যদিও সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রায় একমাস আগে জরুরী বার্তা পাঠানো হয়েছে, তবু এর কোন স্রাবাহা হয়নি।

সাহিত্য দর্পণ

সাহিত্য পত্রিকা ও সরকারী আদেশ মিথির আচার্য

লম্বাবত লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সরকার যে কমিটি বসিয়েছিলেন তারি নির্দেশমতো আর্থিক বছরের শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি সরকারী অনুমোদন হল সাহিত্যপত্রিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগরের ক্ষেত্রে চারশো কপি গ্রাহকের বরাদ্দ।

আমরা যারা সাহিত্যপত্র চালাই তাদের পক্ষে এটা নিশ্চয় একটা স্বস্তির বিষয়। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার পক্ষে চারশো কপি গ্রাহক চাঁদা অনেকটা ভরসার বিষয়।

সরকারী আদেশ পাওয়া মাত্র আমরা প্রেরিত তালিকাভুক্ত পাঠাগরকে নিয়মমাত্রিক অর্ডার পাঠাতে লিখলাম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত হিসেবের গোলমাল হয়ে গেল। প্রথম আদেশটিকে নাকচ টুকরে হঠাৎ নতুন একটা অর্ডার এল। গত বছরটির পুরনো সংখ্যাগুলি চারশো কপি করে পাঠিয়ে বিল করে দিল।

দু'নম্বরটি একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা বলে মনে হবে না কি? সবাই জানেন লিটল ম্যাগাজিনগুলি আর্থিক অসদৃশ্যের কারণেই সীমিত সংখ্যায় ছাপা হয়ে থাকে। কোনো লিটল ম্যাগাজিনেরই পুরনো সংখ্যা চারশো কপি করে দেবার ক্ষমতা থাকেনা। কলে সরকারী সহৃদয়তাটি এক রকম বেঘোরে মারা যাবার অবস্থা। এদিকে আর্থিক বছর শেষ হয়ে গেছে।

উপরন্তু এক-এক সোশ্যাল এডুকেশন অফিসার একেকরকম অর্ডার প্রায়ই পাঠিয়ে যাচ্ছেন। কেউ লিখছেন, এক বছরের অন্ত গ্রাহক করে পত্রিকা পাঠান, বছরের শেষে বিল করুন। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা একটা অসঙ্গততার পর্ববসিত হয়েছে। এবং বোঝা যাচ্ছে বছরের শেষে সরকারী এই আদেশনামা শূন্য রসিকতার পরিণত হয়েছে।

আমরা আশা করেছিলাম মুমূর্ষু পত্রিকাগুলিকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে সরকার বাস্তবমুখী কিছু পরিকল্পনা নেবেন। জানিনে সরকারের পরামর্শদাতা কারা, অন্তত তাঁরা যে লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচিত নন সে-ব্যাপারে নিশ্চিত। তা যদি হত তাহলে তাঁরা সরকারকে এই জাতীয় পরামর্শ দিতে পারতেন যে, বার্ষিক গ্রাহক

চাঁদা যে মাস থেকে দেয়া হচ্ছে সে সময় থেকে পুরো এক বছর পত্রিকা পাঠাতে হবে।

এটাই কার্যকর ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। তার কলে বার্ষিক চাঁদা পেয়ে অন্তত চারশো কপি নিশ্চিত ছিল এবং এর সঙ্গে সরকারী-বেসরকারী বিজ্ঞাপন এবং পত্রিকার নিজস্ব উল্লেখ্যে অন্ত্যস্ত গ্রাহক স্টলে বিক্রি ইত্যাদিতে পত্রিকার পরিচালকবর্গ রচনার গুণ বৃদ্ধি করতে পারতেন। কে না জানে একমাত্র সাহিত্যপত্রিকাগুলিই সাধ্যমতো সাহিত্যদর্শন রক্ষা করে চলেছে আজ পর্যন্ত। নতুন নতুন লেখককে তাঁরাই উৎসাহিত করেন। সরকারী এই বিচিত্র হরেক-রকমবা আদেশের ফলে অকারণ জল বোলা হয়ে উঠেছে। এবং পত্রিকার আর্থিক অবস্থা যথাপূর্বম্।

আমরা যারা সরকারী নির্দেশনামায় হঠাৎ উৎসাহে পা বাড়া দিয়ে উঠেছিলাম তারা আবার ক্লান্ত হয়ে সিমোতে শুরু করেছি। কাগজ, ছাপা ইত্যাদির দ্রুতলো সাহিত্য পত্রের শৌধিনতার দিন গেছে। আশ্চর্য, বড় বড় কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের বাজেটে সাহিত্যপত্রের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। যাকে যাকে বিশেষ দু'একটি সংখ্যায় তাঁরা করুণা করেন। তার দ্বারা কাগজ নিয়মিত হয়না। আর, কাগজ অনিয়মিত হওয়া মানেই তার প্রয়োজনীয়তা থাকেনা। গ্রাহকদের কাছেও তার কোনো আগ্রহ থাকেনা। এবং পত্রিকা সত্যি সত্যি বেয়োছে কিনা তার খবরও পাঠকেরা রাখেন না। অর্থাৎ অনিয়মিত প্রকাশের দরুন পত্রিকা মৃত বলেই গণ্য হয়।

দরদী সরকারের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ পত্রিকার বাস্তব সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করুন এবং আমাদের ওপর নির্ভর না করে যা করণীয় তাই করুন।

তা না হলে এলোমেলো কাও-জানহীন আদেশ পত্রিকাগুলিকে তো বাঁচাবে না পরন্তু সরকারও হান্ধাম্পা হবেন। সরকারের সমালোচক প্রতিক্রিয়াশীলরা বলতে সাহস পাবেন, এটা সরকারের প্রোপাগান্ডা স্ট্রাট। আমরা সরকারী সহৃদয়তার ওপর আশ্রয়ান বলেই এই পরামর্শ।

শ্রমিক আন্দোলনের গতি ও পথ

সুধেন্দু মৈত্র

আজ ১৯৮০। ভারতের বুকে ধনতন্ত্রবাদের ঢাকা ঘুরতে শুরু করে একশত বছর আগে সেই ১৮৮০ সালে। একথা ঠিকই যন্ত্রশিল্পের যুগ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। তবু ১৮৮০ সালের আগে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের শুরু ভারতে হয়নি মনে করলে ভুল বলা হবে না।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় বুজো-রাজী তখন থেকেই তার কবর খোঁড়া শুরু করেছিল। আজ আভ্যন্তরীণ কারণেই একটা হিসাব কষবার প্রবণতা আসবে যে ভারতের বুকে বুজো-রাজী সত্যিই কতটা কবর খুঁড়েছে। এখন যে প্রথম প্রশ্নের সমাধান এই প্রশ্নে সর্বাঙ্গী প্রয়োজন সেটা হোল, অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায় ও ধর্মঘটের সংখ্যা এবং Man Days Lost-এর ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধিকেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও দ্রুত বুজো-রাজীর পতনের আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বলে মনে করব কিনা? অপরদিকে যত বেশী বেশী রাজনৈতিক দাবী দাওয়া ভিত্তিক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়বে, ততই বুজো-রাজীর কবর গভীরতর হচ্ছে বলে মনে করব কিনা? এই উত্তর প্রশ্নের প্রাথমিক সমাধান ছাড়া বোধ করি আলোচনা হবে মানদণ্ডহীন বিচার ও বিবেচনা।

যদিও বাস্তবক্ষেত্রে ১৮৮০ সালকে ভারতীয় ধনতন্ত্রের রথযাত্রার শুরু বলে অনুমান করা হয়েছে, তবুও রেকর্ডে পাওয়া যায় ১৮৭৭ সালে নাগপুরের এমপ্রেস মিলে বেতনের দাবীতে দীর্ঘ ধর্মঘট হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের লড়াইতে শ্রমিক শ্রেণী তার নিজের স্বার্থে বারবার নেমেছে। আজ নয় শত বর্ষ পূর্বে। ভারতের বুকে কমিউনিস্ট পার্টির অস্ত্রোদগমের বহু পূর্বে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্মগ্ৰন্থ যদি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২০ সালে বোম্বাই শহরে হয় বলে স্বীকার করি, তবে তার ৪৩ বছর আগে থেকেই অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার লড়াইতে যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণী প্রথমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি নেতৃত্বে ও পরবর্তীকালে

১৮৮১-২০ সালে বোম্বে মিল হাউস অ্যাসোসিয়েশন বা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এ্যামালগামেটেড সোসাইটি অব রেলওয়ে সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড বার্মা ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে শুরু করে।

সুতরাং ১৯২০ সালে এ আই টি ইউ নির ও ১৯২১ সালে শিল্প প্রধান শহরগুলিতে কমিউনিস্ট গ্রুপের জন্মের বহু আগে থেকেই শ্রমিক শ্রেণী বেতন ও কাজের সময় কষাবার লড়াইতে ব্যাপ্ত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯০৮ সালে মহানন্দক তিলককে ধমন ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তখন বোম্বের শ্রমিক শ্রেণী ছয়দিন ধরে ধর্মঘট করে তার প্রতিবাদ করেছিল। আবার গ্রিন্স অব ওয়েলসের অতি-নমন অস্থানগুলি বরকট ও আইন অমান্যের আন্দোলনের সঙ্গী হয়ে, বোম্বের শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট করে শহরের জীবনযাত্রা অচল করে দিয়েছিল। এরই ফলে ৮৩ জন পুলিশ আহত, ৫৩ জন ভারতীয় নিহত, ১৬০ খানি ট্রামগাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া সহ ৩৪১ জনের প্রাণহানি।

বোধকরি এটা খুব সংগত প্রশ্ন যে বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের মূল মানসিকতা কতদূর এগিয়েছে? নন্দেহ নেই সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি ও ধর্মঘট এবং অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের শক্তি বেড়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন রাজনৈতিক সচেতনতা বেড়েছে কি? রাজনৈতিক দাবী আদায়ের ইচ্ছা ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে কি? কিংবা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিপ্রসূত সমাজ ব্যবস্থা কামের করবার প্রতি লোহদুট মনোভাবের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কি?

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে আসানসোলের মত শ্রমিক শ্রেণী অধ্যুষিত আসনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয়ের কারণ ঐ প্রাঞ্চলজোর উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অরণ রাধা দরকার যে আসানসোলের প্রার্থী শুধুমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ছিলেনা, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের

রাজনীতি সচেতন, সংগ্রামী মানুষের লব করটি বামপন্থী দলের মিলিত প্রতিনিধি (সি.পি.আই.সহ)।

একথা ঠিকই যে মাথাপিছু প্রতি শ্রমিকের সত্যিকারের আয় (মুজা-ফুতীর অংশ বাদ দিয়েই) কপাটক, অল্প ও আসাম ছাড়া সর্বত্র বেড়েছে। নীচে ১৯৭১-এর তুলনায় ১৯৭৭-এর সত্যিকারের (Real wage earning) আয় বৃদ্ধির চিত্র দেওয়া গেল।*

উপরিউক্ত চিত্র সবটাই উৎপাদন-শীল (Manufacturing Units) কারখানায়। কিন্তু এই চিত্রের সঙ্গে অপর এক চিত্রের কথা মনে পড়ে যাব না কি? জামশেদপুর হায়দারাবাদ ও আলীগড়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হানাদার চিত্র। এবং এই সব জায়গাগুলির শ্রমিক শ্রেণীর কৃষিকার কথা? খবরের কাগজে প্রকাশিত তথ্যের প্রতিবাদ হয়নি। হবার কথাও নয়, কারণ জামশেদপুরের ঘটনার প্রত্যক্ষ চিত্র পাবার আশা-দেহর অনেকের স্বযোগ হয়েছে। সে চিত্র অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া আদায় ও ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্ব স্ব বৃদ্ধির প্রত্যাশার শ্রমিক শ্রেণী একটি শ্রেণী। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রেবারেবি আঞ্চলিক হানাদার ক্ষেত্রে এরা বিভিন্ন স্বার্থ-ঘেবী গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আসামের এই “বিদেশী তাড়াও” “আন্দোলনে” শ্রমিক শ্রেণীর কোন বিশেষ কৃষিকা চোখে পড়ে কি? বিহারে মাকে মাঝেই যে স্থপ্ত বাজাল খেদা আত্ম-প্রকাশ করে তখন?

এর চাইতেও মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। তারতবর্ষ নাকি অমানিশার স্রব্ধকারে ভুগছিল ১৯৭৫-এর জুন মাসের জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে ১৯৭৭-এর বর্ষ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত। অন্ততঃ শ্রমিক শ্রেণীর কার্যকলাপ থেকে একথা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ জরুরী অবস্থাকালীন খবরাখবরের অভাব থাকলেও তার পরবর্তীকালে ডাল পালার মত যখন নানা খবর গজাচ্ছে এবং ছড়াচ্ছে, তখনও শ্রমিক শ্রেণীর মরণপণ সংগ্রামের কোন খবর মেলেনি।

সর্বপ্রাপ্য তিলকের ছয় বছরের

কারাদণ্ডকে উপলক্ষ করে বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণী সেই ১৯০৮ সালে যে ইতিহাস রচনা করেছিল, তার ৬৭-৬৮ বছর পর তথাকথিত সংগ্রামী ও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী তার কণামাত্র কিছু করেনি। সেই ১৯০৮ সালে ঐ ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে লেনিন বলে- ছিলেন, ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠছে। তিনি অতি-নমন আনিয়েছিলেন। আর আজ? শ্রমিক শ্রেণী এত অচেতন হয়ে পড়ল?

আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত। নীচের চিত্রটি সেটা পরিষ্কার করবে।**

লক্ষ্য করবার বিষয়, কেন্দ্রে শাসকদল যখন বিভক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তখন জোরদার। একথা ঠিক যুক্তি প্রতিষ্ঠাক্ষমণের মতই আশ্চর্য্য একটি মূল্যবান পন্থা। কিন্তু এই উভয়ের ঝাঁক দিয়ে যখন স্ববিধাবাদের অস্থপ্রবেশ ঘটে, তখনই সর্বনাশের দ্বার খুলে যায়। তাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি ১৯৬১-এর যুক্ত ফ্রন্টের আমলে ইউনিয়ন আর আন্দোলনের জোয়ার নামলো বামপন্থীদের কাঁধে চড়ে। তারপর? ১৯৭২-এর নির্বাচনের (?) উটো ফলাফল, রাতারাতি ইউনিয়নগুলি জালের আরগায় তিন রং চড়িয়ে ভোল পাণ্টে নিলো। আবার এসো ১৯৭৭ এর নির্বাচন। তিন রং ভেঙ্গে গেল পলার জলে, আবার কিরে এলো জালে জাল। ঐ গুলো জাল কি? দেখতে যাই লাগুক ওগুলো একটা নতুন রং, যার নাম, যখন যেমন, তখন তেমন। কথাটাও ভেবে দেখা দরকার, কারণ স্ববিধাবাদ এক ভয়ঙ্কর মানসিকতা।

আরেকটা ভয়ঙ্কর লক্ষণের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন অস্বত্ব করি। বিশেষ করে ১৯৭১ সাল থেকে

বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অন্ত শ্রমিক অশান্তির সংখ্যা প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। স্বশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী ছাড়া যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এমন কি যেখানে সে যুদ্ধ শুধুমাত্র আর্থিক স্বযোগ স্ববিধা বাড়াতেই ব্যস্ত। নীচের চিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

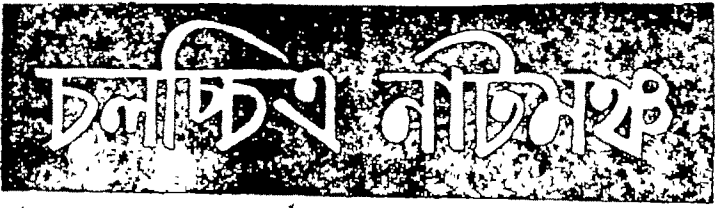
যে প্রশ্নটি বার বার শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেইটা এই যে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, ভারতীয় ইত্যাদি দেশের মত ও পথে যদি আন্দোলন চালিয়ে বৈষয়িক স্বযোগ স্ববিধার প্রত্যাশাই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহলেও বিশৃঙ্খল ও উচ্ছৃঙ্খল আচার ব্যবহার সাহায্যকারী শ্রমিক নেবে না। আর অন্ত মতের পথিক হলে উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খলতার স্থান থাকতেই পারে না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রমিক বিক্ষোভ থাকবেই। এটাও সত্য যে বিনা লড়াইতে মালিক পক্ষ বিন্দুমাত্র স্বযোগ স্ববিধা দেবে না। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে আমাদের দেশেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অর্ধাং শতবর্ষ পূর্বে ১৮৮১ সালে ১৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে পারবে না বলে আইন করতে হয়েছিল। এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্ধাং ১৯০৫ সালেও কলকাতার গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া প্রেসে ধর্মঘট হয়। দাবী-গুলি ছিল রবিবার ও গেজেটেড ছুটির দিনে মাহিনা দিতে হবে। অন্তায়ভাবে করিমানা করা চলবে না ইত্যাদি। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য মালিক পক্ষ বা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদেরকে বর্তমান স্বযোগ স্ববিধা এমনিতে দেয়নি। বহু রক্তক্ষরণ ও ত্যাগ স্বীকার করেই তা অর্জন করতে হয়েছে।

শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

সাল	মোট শিল্পে	আর্থিক ও প্রত্যক্ষ কর্মচ্যুতির	বিশৃঙ্খলা ও অনা		
		অশান্তির সংখ্যা	লাভের জন্ত প্রীতিবাধে উচ্ছৃঙ্খলতার	বায়নি ও	
		অশান্তি	অভ্যন্তর কারণে		
১৯৭১	২৭১২	১৮৩৪	১৪৯	২৭	৬৭২
১৯৭২	৩২৪৩	১৯০০	১৭৬	১৬২	১০০৮
১৯৭৩	৩৩৭০	২১২৫	১৮৯	১৮৭	৮৬৯
১৯৭৪	২৯৩৮	১৮০৬	২০৮	১৭৮	৭৪৬
১৯৭৫	১১৪৩	১২২০	১৪৯	১৭১	৩১৫
১৯৭৬	১৪৫২	১১২	৭৪	১৪০	৩২৫
১৯৭৭	৩১১৭	১৯৭৮	৮২	২৬১	৬২২

* মাথাপিছু আয়	মাথাপিছু আয়	বার্ষিক গড়	**	Dispute	হয় এবং	শ্রমিকের	Man day lost
১৯৭১	১৯৭৭	শতকরা হিসেবে বৃদ্ধি	১৯৭৪ সালে	২১৩৮টি	২০,৫৫,০০০	৪,০২,৮০,০০০	
মহারাষ্ট্র	৩২১৬ টাকা	৩৩৩৮ টাকা	১৯৭৫	১১৪৪টি	১১,৪২,০০০	১,২৩,০০০*	
পশ্চিমবঙ্গ	২১৭৮	৩৩৮৮	১৯৭৬	১৪৫২টি	৭,৩৭,০০০	১,২৭,৭৬,০০০	
তামিলনাড়ু	২২৪৮	২৪৭১	১৯৭৭	৩১১৭টি	২১,১৩,০০০	২,৫৩,২০,০০০	
পাঞ্জাব	২১৫২	৩৩৫১	১৯৭৮	২০৬২টি	২,৬৪,০০০		
উড়িষ্যা	২৭৭৮	৩৫১৩	১৯৭৯ (আগষ্ট)	১৭৪৮টি	১৮,৭৬,০০০	২,৮৮,২৪,০০০	
উত্তরপ্রদেশ	২২৬২	৩৫৫৬					



দুই হাজারের গল্প পো

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনাগুলি সাধারণত: কিছু না কিছু স্বাভাবিক চিত্রিত থাকে, প্রকরণগত ও বিষয়গত পরীক্ষাও কয়েকটা হয়ে থাকে, তাই বলে সবগুলি যে রসোত্তীর্ণতার মাপকাঠি ছুঁতে পারে, তা নয় আর তা প্রত্যাশা করাও বুদ্ধি মন সময় চলে না। অনেক বাধা বিপত্তি ও সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই তাদের প্রযোজনা সম্পন্ন করতে হয়। তবুও দেখানো যেটা সম্প্রদায় মস্তব্য দাবী করে, তা হল তাদের প্রচেষ্টার আন্তরিকতা। এমনই এক আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা গত ১৪ই মার্চ বিজ্ঞান থিয়েটারে দায়ক প্রযোজিত 'দুই হাজারের গল্প' নাট্যাভিনয়ে অত্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের নাটকগুলির মত এটিও মৌলিক নাটক ময় এবং অধুনা মৌলিক নাটকাত্মিকতার লক্ষ্যে বিবল দর্শন বলেই চলে—কোন্ডোর সংগে একথাটি এখানে বলে রাখলাম এই জ্ঞত যে গ্রুপ থিয়েটার-গুলি এদিকে যদি একটু মনোযোগ দেয়।

মিখাইল সালজিকভ স্ট্রেনের কাহিনীর অল্পপ্রেরণায় 'দুই হাজারের গল্প' নাটকটি রচনা করেছেন চম্পন সেন। নাট্যকার কিছুটা দারুণতা দাবী করতে পারেন, কারণ পূজাপাত্রী নামে ও বেশ-সুখায় পুরোপুরি দেশীয় যেমন, তেমনি পরিবেশ ও পরিমণ্ডকে দেশীয় ভাবতে কষ্ট হয় না। কিন্তু দুই হাজারের গল্পের গল্পের অবস্থানের যে দুটি মাত্রা আছে এ নাটকে, তার সাধুসাধানে তেমন সাফল্য দেখা যায় না। বাস্তব ও স্বপ্নের দুই হাজারের রেখা সংযোগ আরও ব্যঙ্গা-ধর্মী ও অর্থপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল।

এ নাটকেও বঙ্গনা ও শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদ ও দ্বিধারও আছে, কিন্তু কাহিনী-বৈশিষ্ট্যের গুণেই তার অভিব্যক্তি বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পেরেছে। এবং নাট্যবস্তুর উপস্থাপনার আকর্ষণ সঞ্চার করে নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রিটার্ডাই আই পি এস (অনারারি) ও অবসর প্রাপ্ত রাজনীতিবিদ—এই দুই হাজারের অবসর জীবনের নামা কথা-বাতা ও আলাপে দুটি ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে লগ্নভাবে। শ্রেণীগত দিক দিয়ে চরিত্র দুটি ভিন্ন

হলেও দেশের অনুসাধারণের কাছে দুটি চরিত্রই কিন্তু সমান বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক। একজন অভ্যাসী আই পি এস আর একজন ভণ্ড প্রতারক স্ববিধাবাদী রাজনীতিক অবসর জীবনেও প্রতারণা, শোষণ ও নির্ধাতন কি কৌশলে চালিয়ে গেছে শুধু স্বার্থবোধ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, তাই তুলে ধরা হয়েছে মঞ্চাভিনয়ে। নিজস্বের অস্তিত্বসংকটের মুখে তাদের অসহায়তা, সরলগ্রামবাসীদের কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকল্পে চক্রান্তের জাল বিস্তার করা ও শেষে গ্রাম-বাসীদের এর বিরুদ্ধে কথোপকথানো চমৎকার ফুটেছে। কনিক সেনের আলোক সম্পাত কিছু মুহূর্তকে নাটকীয়তা দান করেছে। রত্নী চক্রবর্তীর স্বর ও নাটকের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। অভিনয়ে মেঘনাদ ভট্টাচার্য, সুস্মার লসকার, স্বপ্ন ভট্টাচার্য, সুমিতা চ্যাটার্জী, রতন দে ও দীপংকর সেনগুপ্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

আঞ্চলিক ছবির উৎসব

বাংলা কাহিনী চিত্র নির্মাণের ৬০ বছর এবং সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাচালী' ছবিটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১১ই থেকে ১৭ই এপ্রিল কলকাতায় এক আঞ্চলিক ছবির উৎসবের আয়োজন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি-দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গত ২রা এপ্রিল মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই উৎসবের বিবরণ দিয়ে বলেন, ১৯৩২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নির্মিত বাংলা ছবিগুলির মধ্য থেকে নির্বাচিত ৪০ খানি ছবি এবং মারাঠি, তেলগু, মালয়ালম, কানাড়ী, হিন্দি, উর্দু, অসমীয়া ও তামিল ভাষার ২৪টি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। গ্লোব, মিনার্ভা, সোসাইটি, যমুনা ও শিশির মঞ্চে ছবিগুলি দেখা যাবে।

এই উৎসব অরণ্যে কলকাতার রবীন্দ্রসদন ও শিশিরমন্ডলের মাঝখানে একটি আর্ট স্ট্রিম থিয়েটার নির্মিত হবে। ১১ই এপ্রিল মধ্যাহ্ন জ্যোতি বহু শিল্পাস্তাস করবেন। সন্ধ্যা ৬টার রাজ্যপাল টি এন সিং উৎসবের উদ্বোধন করবেন ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সত্যজিৎ রায়।

তথ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, এই উৎসবের উল্লেখযোগ্য দিক হল একটি সেমিনার। এই সেমিনারে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের নানা সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে যেমন আলোচনা হবে, তেমনি পরীক্ষা নিরীক্ষার উৎসাহী তরুণ পরিচালকরা কমাশিয়াল পরিবেশের মধ্যে নব্যধারার ছবি তৈরী করতে যেসব বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে বিষয়েও আলোচনা হবে। এই সেমিনারে যোগ দিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চলচ্চিত্র কুশলী ও স্বাধীন আনছেন।

এই উৎসবের ছবির তালিকার বিপত যুগের বিখ্যাত কিছু ছবির দাবী পাওয়া যাবে। দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস', প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রক্ত অরুণী', মধু বসুর 'আলিবা' ও অভিনয়', উদয়শঙ্করের 'কল্পনা', প্রভৃতি। তবে বর্তমান লেখকের প্রেরণ উত্তরে তথ্যমন্ত্রী জানান যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরও কিছু প্রসিদ্ধ ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' (বাংলা) এদেশে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বাংলাদেশে একটা প্রিন্ট আছে শোনা যায়। তথ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছেন, বাংলাদেশে নির্মিত ঋষিক ঘটকের 'তিতাস একটি মদীর নাম' ছবির একটি প্রিন্ট সরকার কিনে নিলেও ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা ঝামেলায় ছবিটি এখানে প্রদর্শিত হতে পারছে না।

প্রেক্ষাগৃহের অভাবে শিল্পে সংকট

গত ১২শে মার্চ ইণ্ডিয়া 'কিনা ল্যাবরেটরি' প্রোজেকশন কমে অঙ্কিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজনীতিকচাপের কর্ণধার তারাচাঁদ বারজাতিয়া বলেন, গত ১৯৭৯ সালে ভারতে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ৭০০ খানা এবং এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড সংখ্যা। কিন্তু খুবই কোন্ডোর কথা চিত্র প্রদর্শনের জ্ঞত প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা এদেশে একান্তই অপ্রতুল। প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে বহু ছবিই প্রদর্শনের সুযোগ না পেয়ে বাজারদ্বী হয়ে পড়ে থাকবে বছরের পর বছর এবং স্বপ্নের টাকার স্তনতে গিয়ে সেসব আটক ছবির প্রযোজকরা শুধু কতটুকুই হবেন না, ভবিষ্যতেও আর কেউ ছবি তৈরী করতে উৎসাহ পাবেন না—কলে চলচ্চিত্র শিল্পে সংকট আরও বর্ধিত হবে। প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পতার জ্ঞত প্রদর্শকরাও সুযোগ বুঝে চিত্র নির্মাতার ঘাড় ভেঙে অত্যধিক মূল্য লুণ্ঠন।

তিনি আরও বলেন যে, প্রমোদ করের অধিক হার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রেক্ষাগৃহের সাইসেন্সবিধির জটিলতাকে আরও সরল করতে সরকারকে তিনি অনুরোধ করেন।

বসন্তের রক্তিম স্মৃতি

কালিদাস কুণ্ডু

যৌবনের প্রারম্ভে আমাদের প্রিয় ফুলগুলির নাম ছিল, অশোক-কিংক-পলাশ-সিমুল। আঙনে ফুল বসন্তের প্রেষ্ঠ দান। লাল টক-টকে ফুল যৌবনের সম্মান। রুশ বিপ্লব সেই ফুল ফুটিয়েছিল আমাদের চেতনায়, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের দ্বারপ্রান্তে। বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশের বুদ্ধিতে মননে প্রমিত কৃষকের রাজনীতি তথা নতুন সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রেরণা দ্রুত হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরপর দুটো সর্বনাশা যুদ্ধ মাহুষের দাবিক মূল্যবোধে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল, বর্তমান শতাব্দীর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে সংঘটিত দুটো মহৎ বিপ্লব সেই বিপর্যয় মানবিকতার সম্মুখে নিয়ে এল নিরাময়ের আশ্বাস। সর্বহারার বিপ্লব মাহুষের সম্মান কিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ছিল। অগ্নিকুণ্ড বিশ্বাসের ময়ের মতো 'বিপ্লব' শব্দটি আমাদের চেতনাকে ছুঁয়ে গেল। 'বিপ্লব' স্পন্দিত বুক এদেশের এক কিশোর কবি 'নিজেকেই ভাবলেন বিপ্লবপ্রস্তু' লেনিন। যৌবনের আগুন-ছোঁওয়া সেই দিন-গুলোতে বিপ্লব ছিল মুক্ত উচ্চারণ।

উচ্চারণ উত্তরণে সার্থক হল না। অগ্নিপরীক্ষা দীক্ষাতে উপনীত হওয়ার সার্থকতার উত্তীর্ণ হল না। স্বপ্ন ও প্রাণের ব্যবধান বেড়েই চলল। চোখের উপর বিপ্লব নষ্ট হয়ে গেল। লুপ্ত হয়ে গেল।

বিশ্বাস কিছুটা অন্ধ হয়। ঘাড় ধরে মাহুষকে কিছুটা সংকীর্ণ করে তোলে। ষ্টালিনের নেতৃত্বে বিশ্বাস ছিল। কিছুটা ভক্তিও ছিল। তাই ক্রস্চেভের কঠোরীকায়ের মতো মনে হয়েছিল। স্বসন্তের বাইশ পাতার রিপোর্ট পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। তোগলিয়াভির (ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রয়াত নেতা) লাঠি টেটামেন্টকে মূর্ডের প্রল্যাপ ভেবেছিলাম। গুপ্ত হত্যা, কনসেনস-ট্রেনশন ক্যাম্প মতাদ্ব্যতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার অপহরণ—এসব কিছু সাম্রাজ্যবাদের চালাকি বলে মনে হত। এখন সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলব?

ইরানের কমিউনিষ্ট পার্টির বুকের উপর দিয়ে বাথিষ্ট পার্টি সোভিয়েতের ট্যাক্স চালিয়ে নিয়ে গেল। 'সমাজ-তন্ত্রের পিতৃভূমি' বিচলিত বোধ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ কমিউনিষ্ট প্রতিবিপ্লবী বর্বরতার শিকার হল। সোভিয়েতের লাল কোজের বুক কেঁপে ওঠেনি। আজ

আফগানিস্থানের সামরিক অধ্যাপনে ভাগ্যাবেদী নায়কের পরিচাণে সোভিয়েতের হেলিকপ্টার ওড়ে কাবুলের আকাশে। ট্যাক্স আসে, লৈলু আসে বোমারু বিমান আসে জ্বততার সঙ্গে। মুখে তন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদী আচরণ। একে কী বলব! লেনিন বলেছিলেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ।

লেনিনে বিশ্বাস বেঁচে থাকলে একথা বলতেই হয়—সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী হয়ে গেছে।

হায় সমাজতন্ত্র! কথা ছিল, পৃথিবীতে যতদিন পুঞ্জিভাদের অস্তিত্ব থাকবে, সাম্রাজ্যবাদের নথদন্ত থাকবে ততদিন তোমার হাতের তলোয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তৈয়ার। ট্যাক্স কামানের চাকার তলার সেই প্রতিশ্রুতি এখন ধূলিশযা গ্রহণ করেছে। প্রতিশ্রুতির ভগ্ন-তুণের উপর দাঁড়িয়ে একদা সমাজ-তন্ত্রী এখন সমাজবাদের কাহন ওড়াচ্ছে।

তবু বসন্ত আসে। সাঁওতাল পরগণায় মাদল বাজে। দেবার দ্বারে গণেশ পাণ্ডুরা মহাভারতের কাছে জমি খোঁসায়। জুঃস্বপ্নের স্মৃতিশেষে পাহাড়ের চূড়ায় স্বর্ঘ ওঠে রক্তিম। তরায় থেকে স্বন্দরবন পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত মাহুষ কান পেতে থাকে একটি হাঁকের মন্ত—তৈয়ার।

সাম্রাজ্যবাদের পোঙ্কি বেলায় বসন্তের রক্তিম স্মৃতি জাগে। যখন দেখি কাকদ্বীপের সেই বৃক্ষের চোখ বার জওয়ান ছেলে আম গাছের ডালে লাল পতাকা উড়িয়ে ঘোষণা করেছিল 'ইয়া আজাদী বুটা হায়'।

নষ্ট বিপ্লবের বিবাদে ময় নই। অজ্ঞাত বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি এখনও যখন দেখি প্রতিষ্ঠানের লোভনীর হাতছানি জয় করে করে উদ্বাস্ত এলাকার মেয়ে সাহিত্যে ভূমিকম্প আনে 'অরণ্যের অধিকার' লিখে—'অগ্নিগর্ভ' কালের সংকেত রচনার।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

বাৎসরিক ১০ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট সেন, কলিকাতা-১৩

অর্থনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষিত, অভ্যস্ত এবং এই অভ্যাস ছাড়া তাদের পক্ষে কঠিন।

কিন্তু শিল্পবাপিভ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়ম অচল। বৎসরান্তে বা তাঁর আধে-লগ্নী করা অর্থ কতটা মুনাফা অর্জন করেছে তাঁর হিসাব দিতে হয়। এর ক্ষেত্রে সদাশতর্ক থাকতে হয়। কারণ শিল্প পরিচাল-

শ্রমিক আন্দোলন

১ম পৃষ্ঠার পর

অপরদিকে প্রায় থাকছে দেশ ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার চলছে। অপরপন্থ প্রদেশের দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা চলে দেশে সত্যিকার বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান নগণ্য আকারে দুর্বল। বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বিভ্রান্ত, সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক শক্তির তেমন অগ্রগতির আশাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নির্বাচন ম্যানিকেষ্টা, প্রোগ্রাম ও বক্তৃতার বাই বলা হোক না কেন।

এদিকে জনসংখ্যা হ্রাস করে বেড়ে চলেছে। সর্বভারতীয় জাতীয় আর শ্রুতে নেমেছে। ফলে উৎসৃষ্ট মূল-ধনের অভাব ঘটছে। ফলে কল-কারখানার মাধ্যমে গ্রামের বুদ্ধ-অর্থভুক্ত লোকগুলোকে কর্ম সংস্থান করে দেওয়া অসম্ভব। আদলে গ্রামের লোকগুলোর হুঁশা চরমে পৌছেছে উত্তরোত্তর মৃত্যুকীতির চাপে। সেই হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী অন্ততপক্ষে দশ বছর ধরে নিজেদের অবস্থার কিছু পরিমাণ উন্নতি করতে পেরেছে এত টালমাটাল মধ্যেও।

সুতরাং আমাদের সামনে প্রশ্ন, হয় মূলধন দেশেই উৎপাদন করতে হবে কিংবা বিদেশ থেকে আনতে হবে। বিদেশী ধার দেনার তো নাক পর্বত ডুবে আছে। অপর দিকে হিসেবে পাওয়া যায় দেশের মূলধনের স্রষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দেখা যায় ১৯৭৭-৭৮-এ ১৮,৫৩৬ কোটি টাকা।

১৯৭৮-৭৯ তে ২০,৫০০ কোটি টাকা
১৯৭৯-৮০ তে ২০,৬০০ কোটি টাকা
কিন্তু এই ১৯৭৯-৮০-তে বহু মূল্য-স্তর ১৯৭৮-৭৯ র রেখাচিত্র নিয়ে বিচার করি তবে দাঁড়াতে ১৮,৬২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৬ শতাংশ কম। তবে কি গ্রামের লোক বাঁচবে না? অথচ বারাহী দেশে ৭০ শতাংশের অধিকারী। সর্বভারতীয় রাজ-নৈতিক দলগুলির এবং বিশেষ প্রগতিশীল দলগুলিকে এটাই ভাবতে অস্বপ্ন।

কেন যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড মুনাফা। তা থেকেই রিজার্ভ তহ-বিল সৃষ্টি, নতুন লরীর স্বযোগ সৃষ্টি, শ্রমিক কল্যাণ এবং সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন আসে।

আমাদের দেশে ১৮০০০ কোটি টাকা লগ্নী করে ১৫০০০ কোটি টাকা লোকসান করার মূল দায়িত্ব আদিল-তান্ত্রিক পরিচালনা ব্যবস্থার উপরেই বর্তায়। আমলাতন্ত্র ব্রিটিশ আমলের এক সাহায্যী, এর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান উন্নয়ন যজ্ঞে এর কোন মূল্যও নেই। তবু বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠী এদের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের শিরোমণি করে বসিয়ে দেন। ফলে লরীকরা মূলধন নিঃশেষ হয়ে যায়, আর এই অযোগ্যতার মূল্য দিতে হয় অতিরিক্ত ট্যাক্স। জনসাধারণ-কেই তা বহন করতে হয়।

ইংলণ্ডে বিভিন্ন অস্ত্র ও মালমশলা সরবরাহের ডিশো পরিচালনা সমীক্ষা করে জনৈক বিশেষজ্ঞ কত-গুলি স্থপারিস করেন। ফলে ঐ ডিপোগুলির খরচ ২৮ থেকে ৮১ শতাংশ কমে যায়। ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করছেন ভারতীয় দিভিল সার্ভিসের ধাঁচে গড়া ব্রিটিশ দিভিল থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র পরিচালনার লোক নেওয়া ঠিক হবে না।

আমাদের ধারণা যে সরকারী প্রশাসন ক্ষেত্রে থেকে শিল্প পরিচালক গ্রহণ না করাই উচিত। পরিবর্তে পেশাগত পরিচালক ও ব্যবস্থাপক-দের মধ্য থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে পরিচালক নিয়োগ করা সঙ্গত। এদের অবস্থাই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে লাভজনক করে তোলার জন্য বিশেষ উৎসাহও দেওয়া যেতে পারে। যে শিল্প লাভজনক নয়, তাকে লাভ-জনক করে তোলা দক্ষ পরিচালকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ যেখানে সরকার মূল ও ভারী শিল্প, বিদ্যুত ও রাসায়নিক শিল্প, রেল, সড়ক ও বিমান পরিবহনের মত অতি লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছেন।

আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা এবং অযোগ্যতার জন্তে আমরা এর মধ্যেই ১৫০০০ কোটি টাকা হারিয়েছি। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র বা লোকসান করেছে ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রের তা মুনাফায় পরিণত হয়েছে। যেমন বিদ্যুত উৎপাদনের লগ্নী ও লাভ লোকসানের দায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের অথচ এলুমিনিয়াম ধাতু ও রাসায়-নিক শিল্পে কাঁচামালের মত দস্তাবে বিদ্যুত পেয়ে ঐ শিল্পগুলি ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রের এক-

চেটিয়া শিল্পে পরিণত হয়েছে, এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পণ্য ও এলুমিনি-য়াম ইত্যাদি ধাতুর মূল্য অনাবশ্যক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুগার দিতে হচ্ছে জনসাধারণকে। এর জন্তে মূলতঃ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে আমলা-তান্ত্রিক পরিচালনা দারী। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে সফল মুনাফাজনক করতে হলে প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের পরি-চালক নিয়োগ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারী শিল্প পরিচালকদের পেশাগত গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে।

লোকসেবক

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

হাজার টাকা মাইনে, পাড়ী, টেলি-ফোন ইত্যাদি। অধিরচিত্ত হলধর তা লুফে নিলেন। ক্ষেত্রায়ীর শেষ দিকে তিনি লোকসেবকে যোগ দিলেন। সত্যযুগের চাইতে তিনগুণ স্বাক্ষর্য প্রলোভনে লোকসেবকের জন্ত শক্তহাতে হাল ধরতে চাইলেন হলধর। তবে সত্যযুগের চাকরী তিনি ছাড়লেন না। ছুটি নিলেন। বলতে গেলে সম্পাদনার দিক থেকে হলধরকে একরকম সর্বসর্বা করে দেওয়া হল। লোকসেবকে প্রথম সারির পত্রিকা করে তুলতে পাতার পর পাতা লিখে চললেন হলধর পটল। পাড়ী করে হেথাহোথা ঘুর-লেন। টাকা পরস্রাও কিছু পেলেন।

অন্তরিকে চীক রিপোর্টার রমেন দাসকে ফিচার সম্পাদক করা হল। রমেন-বিরোধী চক্রান্তে হলধর ব্যব-হৃত হলেন। দিম করেক যেতেই দুই মোকার পা দেওয়া অধিরচিত্ত সাংবা-দিকটি বুঝলেন এখানে তিনি বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।

এই অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে রমেন দাস পদত্যাগপত্র দিলেন। সাংবাদিক ডিফেক্টর হলধর পটলও সত্যযুগে ফিরে গেলেন। ভাগিন্দ চাকরীটি তিনি ছাড়েন নি।

কথা ছিল স্বতন্ত্রাবু সপ্তাহে ৩ দিন লোকসেবক-অফিসে বসবেন। অবরোধ আন্দোলন ও বায়ফ্রন্ট সর-কারকে উৎখাতের বিশাল কর্মকাণ্ডের ফাঁকে তার সময় কোথায়? তাছাড়া তিনি ভাবছেন, মুজলবাবু হলধর লোক, বেলাইনে চলবেনই বা কেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত মহম্মদ ইউনাসকেও মুজলবাবু ক্ষেত্রায়ীর লোকসেবকের দপ্তরে হাজির করে-ছিলেন। কর্মীরা ভাবলেন লোক-সেবকের ভাগ্যাকাশে স্বর্ষোদয় ঘটল বৃষ্টি। কিন্তু তা নয়, এরও বদলের ঘোঁকাবাজী। এই ঘোঁকাবাজীর আভাস পেয়েছিলেন বলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গত রবিবার লোকসেবকে পদখলি দেবেন বলেও দেন নি। মুজলবাবু এখন মুখে পড়েছেন। অনেকেই বলছেন এই বসন্ত দিনেও তার মুজলিত ভাব কোথায় গেল।

হু মন্ত্রী

১ম পৃষ্ঠার পর

বাড়ানির উপর সাজতের সজাবনা নির্ভর করছে। আর বহু বিতর্কিত ভি সি শুক্লাও মন্ত্রী হতে পারেন। তাঁর লক্ষ্য আছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দিকে।

সঙ্গে একদল তরুণ এম পি নিয়ে সঙ্গর গাড়ী নিয়ে বিশেষ বিমানে উড়ে গেলেন এক এম পির বিবাহ উৎসবে শ্রীনগরে। শুধু কি তিনি, না, আরো কয়েকজন ভি আই পিও গেলেন। গেলেন মন্ত্রী বসন্ত শার্ঠে, মন্ত্রী পি সি শেঠি। এই এম পি হলেন এখনকার অখ্যাত গুলাম নবী আজাদ বিনি আগামী দিনে খ্যাত হবার অপেক্ষায় সঙ্গর-সংগী হিসেবে নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

সুগ্রীম কোর্টের দিনিয়ার অ্যাড-ভোকেট ও বর্ধে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক পি আর মুহল বিনি ভি সি শুক্লা হয়ে কিসসা হুদীকা মামলার কৌশলি হয়েছেন তিনি ভারতের নতুন এ্যাটর্নি জেনারেল হবার কথা প্রায় পাকা এনে ফেলেছেন এমন সময় তাঁর আগেকার বামশ্রমী রাজ-নীতি করার খবরটি এসে গিয়ে তাঁকে বড় বিপাকে ফেলেছে। এরকম অবস্থায় তিনি মুখে পড়লেও তাঁর প্রিয়-জন্মে উঠে পড়ে লেগেছেন। সঙ্গে শুক্লাজী তো রয়েছেনই।

সর্দার স্বরণ সিং রাজনীতির

ই-কংগ্রেসীদের বিরোধ

১ম পৃষ্ঠার পর

দেবাশিস এলাকার লক্ষী বহুর ঘনিষ্ঠ লোক বলে পরিচিত। দেবাশিসের হত্যার অপরাধে প্রদেশে কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ এবং সোমেন মিজর ঘনিষ্ঠ নীরেন চ্যাটার্জী ওরফে চীনাংকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসীদের বিরোধ লক্ষী বোসের সঙ্গে তারই একদা অহুগত চীনা অভিযুক্ত। এদের লড়াইটা এখন জাতি শত্রুতার দাঁড়িয়েছে। লক্ষী বোসের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা সোমেন মিজর ঘনিষ্ঠ লোক বলে রাজনৈতিক মহলে পরি-চিত। ফলে গত সপ্তাহে লক্ষীর সমর্থকরা টালিগঞ্জ থানার সামনে স্বয়ং সোমেন মিজরকেই অকথ্য ভাষায় অপমান করে এবং সোমেন-বাবুর জীপ গাড়ী ভেঙে দিতে চায়। পরে অবশ্য কয়েকজনের চেষ্টায় অবস্থা আরও আসে। মধ্য কল-কাতার মীর্জাপুরেও ঠান্ডা কংগ্রেস কর্মী গোষ্ঠী বিরোধের বলি হয়েছে।

গত সপ্তাহে সোমেন মিজর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা

আবহাওয়া বুঝে নিজেই আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাইছেন। তাই মন্ত্রীর মর্মানী সম্পন্ন আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের পদটি পাওয়ার দিকে প্রথমটা যতটা ঝুঁকি ছিলেন এখন আর ততটা তেমন আগ্রহী নন। বরং তিনি কংগ্রেস (আর্গ) ছাড়া কে সি পুহের মাম এই পদটির জন্ত প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে পছন্দী এখনও কংগ্রেস (ই) দলের সঙ্গে নিজেই মিলিয়ে না দেওয়ার প্রস্তাবটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনাও সেরকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। এদিকে মহম্মদ ফরুজজ-খোজনা পর্বতের সঙ্কট হয়েছেন বলে তাঁর বিলাতে ভারতীয় দূতাবাসে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে জল্পনাকল্পনা চলছিল তা থেমে গেছে।

দিল্লীর এ আই সি সি (ই) অফিসে খুব ভাল ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজান গোছান একটি ঘরে ঢোকার মুখে হেঁসবতীন্দন বহুগুণার সেক্রে-টারী জেনারেল নামের ফলকটি বক-বক করে। তবু তিনি ওই ঘরে বান না বসলেই চলে। ওই ঘরে সাধারণ সম্পাদক বুটা সিং বসেন। তিনি কি বহুগুণা বিরোধী? এমন প্রশ্ন শুনে সদাঁরজী বলেন যে, তিনিওনা বসলে আর এক সম্পাদক এ আর আনতুলে বসে পড়বেন। তাই আগেভাগে এই ব্যবস্থা নেওয়া আর কি।

করে উদ্বের আততায়ীকে গ্রেপ্তার এবং অস্ত্র আনগুণা পরিমিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার বিবরণ যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে কোথাও এই অভি-যোগ করা হয়নি যে, কংগ্রেসী গোষ্ঠী বিরোধের ব্যাপারে সি পি এম জড়িত।

অজিতবাবু নানা ফুল নিয়ে আলোচনা করছেন কিভাবে কংগ্রেসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা কিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু এ কাজ প্রায় শিবেয়ও অসাধ্য। যে বিরোধের সূত্রপাত হয় শুধু ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে সে বিরোধের মীমাংসা সম্ভব নয়। কংগ্রেসীদের গোষ্ঠী বিরোধ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাব-নিকাশ নিয়ে। তাই এই বিরোধ যেটার ব্যাপারে কেউই আশাবাদী নয়।

অনেক কংগ্রেস নেতাই এখন আশংকা করছেন আগামী দিনে এই গোষ্ঠী বিরোধ আরও তরঙ্গর আকার নেবে এবং তার প্রভুতি কংগ্রেসীদের মধ্যে গুরু হয়ে গেছে। অজিতবাবু বাস্তব অবস্থা থেকে মুখ কবিরিয়ে শ্রেফ সি পি এমের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে গেলে উন্টো ফলই হবে।

একজন ধান্ধাবাজ লোহার ব্যবসায়ীকে নিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনে অব্যাহতি লড়াই

একজন ধান্ধাবাজ সুযোগ-সন্ধানী লোহার ব্যবসায়ীকে নিয়ে রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনে দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে কর্পোরেশন জুড়ে একবারে সোরগোল পড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন সংস্কার চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আইনজীবী সংসদ সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জী ও অপর জন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আই, এ, এস অফিসার বারপন্থী বল্লভলিঙ্গ দাশগুপ্ত। দু'জনের কেউই অর্কপ্রভ দেব। দু'জনের কেউই কাউকে ছাড়তে নারাজ। কলে ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরে এখন কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। কর্মীদের শুধু এই নিয়েই চলছে হাজারো আলোচনা। তবে দেব ও চ্যাটার্জীর লড়াইতে একজন

মোরারজী

১ম পৃষ্ঠার পর

যোগ দেন যারা কোন দিনই জন-দন্ডের সমর্থক ছিলেন না। এর মধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী এবং সংগঠন কংগ্রেস নেতা শান্তি-ভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাক্তন জনসম্মতি নেতারা ইতি মধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এস সি চাগলার সমর্থন পেয়েছেন। এখন শান্তিভূষণ এবং রাম জেঠ-মালিনী খুব চেষ্টা করছেন মোরারজী দেশাই সহ প্রাক্তন সং-গঠন কংগ্রেসীদের এই দলে আনার জন্য। মোরারজী দেশাইয়ের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে তিনি নতুন দলের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল তবে এখনই নতুন দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসছেন না।

এদিকে চন্দ্রশেখর আর জনতা পার্টির দারিদ্র্য নিতে আগ্রহী নয়। এই অবস্থায় মূল জনতা পার্টি এক গভীর সম্মতি পড়েছে। কোন নেতাই আর ডাঙা জনতা নৌকার হাল ধরতে চাইছেন না। এই অবস্থায় ভারতীয় জনতা দলে অধিকাংশ নেতা ও কর্মী যোগ দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

অন্য ইউনিয়ন কর্মী খুব উল্লসিত। তাদের ধারণা, এদের লড়াইয়ে নীট লাভ তাদেরই।

মূল ঘটনার শুরু ১২ই মার্চ। এই দিন লোহার কারবারী এস, সি, মোজি এও কোম্পানীর পক্ষ থেকে কোম্পানীরই মালিক বলে পরিচিত হাপিস মোজি লোহার জন্ত সংস্কার কমিশ্যনাল ম্যানেজার বি, সি, জায়েকের কাছে আসেন। মোজি এই সংস্কার কাছ থেকে গত সেপ্টেম্বর নভেম্বর মাসে ১১০ মেট্রিক টন ইস্পাতের পারমিট পান। এর মধ্যে ১০০ মেট্রিক টন নভেম্বর মাসের মধ্যেই মোজিরা তুলে নেন। ইতি-মধ্যে ঈল অধিরিটি অব ইতিহাস গত ৮ই ডিসেম্বর ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানান যে মোজিকে ঈল অধিরিটি পরসরি ইস্পাত বিক্রী করছে। সেজন্য রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর যেন এই কোম্পানীকে আর কোন বরাদ্দ না করেন। কেন্দ্রীয় দপ্তরের নির্দেশায় রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর মোজিদের একথা জানিয়েও দেন। কিন্তু তাদের আকার ঈল অধিরিটি যাই জানাক না কেন ১১০ এর মধ্যে ১০০ মেট্রিক টন তুলে নেবার পর বাকী ১০ মেট্রিক টন ইস্পাত তারা কিনতে চান। এবং ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরকে তা দিতে হবে। জীলায়েকের কাছে হাপিস মোজি একটি বড় ভায়েরী তুলে দেন। ভায়েরীর মধ্যে বড় একটি খাম। জীলায়েক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে জীলা ডিরেক্টর অর্কপ্রভ দেবের সঙ্গে চলে আসেন। জীদেব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খামটি খুলতে বলেন। খুলতেই দেখা যায় রক্ত খামের মধ্যে রয়েছে তিন হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাতে পায়ে ধরে এই ঘটনার থেকে নিজের পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়না। জীদেবের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে মুচিপাড়া থানার যোগাযোগ করা হয়। থানা থেকে পুলিশ আসে। কিন্তু এই টাকার দারিদ্র্য নিতে তারা অস্বীকার করেন। বলেন, এ, সি, মোজির কোন অফিসারই এই টাকা

জমা নিতে পারেন। আইন নিয়ে অমেকক্ষণ কূট কচালীর পর এন-ফোর্সমেন্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকে খবরটি দেয়া হয়। তিনিও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরে পুলিশ পাঠিয়ে দেন। যারা আসেন তারাও আইনের প্রহর তুলে এই টাকা জমা নিতে অস্বীকার করেন। পরে জীদেবের সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার জীমতোন গুহর কথাবার্তা হয়। শেষে নিজের লিট তৈরী করে এনফোর্সমেন্ট পুলিশ এই টাকা নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ পর্যন্ত যা ছিল সবই ঠিক। কিন্তু এরপরেই শুরু হয় গুণ্ডাগোল। সোমনাথবাবুর জুনিয়ার বলে পরিচিত জৈনক দমীর যেন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনার দিনই জুনিয়ার ল' ইয়ার জীদেব, কোমও এক অজ্ঞাত কারণে মামলাটি প্রত্যাহার করে মেয়ার জন্ত জীদেবকে অহরোধ করেন। জবাবে জীদেব জানান, কেল বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এ সম্পর্কে কিছু করতে পারবো না। শুধু একবার নয় বার বারই জীদেব এ ধরনের অহরোধ জানাতে থাকেন। কিছু অর্কপ্রভ দেব তাতে লাড়া দেননি। কিন্তু ঘটনা হলো, নেপথ্যে জল বধারীতি ঘোলা হতে থাকে। হঠাৎ আনন্দবাজারে ২রা এপ্রিল এ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাতে প্রকাশ পায় যে, যুগের মামলা তুলে নিতে রাজী হননি এমন একজন অফিসারকে প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর জীদেবের কাছে চেয়ারম্যান সোমনাথবাবু একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। কিন্তু অর্কপ্রভবাবু চিঠিটি সহজভাবে যেনে নিতে পারেননি। কেননা তাঁর ধারণা চিঠির মধ্যে সোমনাথবাবুর প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। যুগের ঘটনার মোকাবিলা করার জন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর-ই যথেষ্ট বলে জীদেবের ধারণা। এর মধ্যে চেয়ার-ম্যানর মাথা গলানোর নাকি কিছু নেই। দু'পক্ষেই কড়া চিঠি চাপাটি চলে। কেউই কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি। অথচ আসল কথা হলো, দু' জনের সম্পর্কেই অনেকেরই কিছু বলার নেই। সোমনাথবাবু ব্যারিষ্টার হিসেবে স্বনামধন্য। সাধা রণ প্রমিক, খেটে খাওয়া সাধারণ

মাহুষের জন্ত তার আইনগত সাহায্য কারোই ভুলে যাওয়ার নয়। অপরদিকে অর্কপ্রভ বুয়োক্যাটি হলো একেবারে সাধারণস্তরের নন। বাম-পন্থী দলের সংগে ওর মেলামেশার কথা অনেকেই জানেন। তাছাড়া অর্কপ্রভ একজন দক্ষ প্রশাসক, সংস্কার। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় সোমনাথবাবু ও অর্কপ্রভবাবুর মধ্যে লড়াইয়ের মাহুষটি হলেন এক নব্বরের ধান্ধাবাজ এক ব্যবসায়ী। এই ব্যব-সায়ীটিকে নিয়ে ৬১ মাসে তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রী জয়মাল আবেদিন একেবারে মেতে উঠেছিলেন। আবার ৮০ সনে এই ব্যবসায়ীটিই

লাল পার্টির লোকজনের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন।

এখানে বলা দরকার, অর্কপ্রভ-বাবু ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরে '৭৮ সনের ১৭ই এপ্রিল যোগ দেন। সংস্কার '৭৭-৭৮ সনে লোকসান ছিল ৬ লক্ষ টাকা। '৭৮-৭৯ সনে সংস্কার টার্ন ওভার আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ৮ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়ায়। লাভ হয় ৮ লক্ষ টাকা। ৭৯-৮০ সনে মোট টার্নওভার গত বছরের ডবল। মোট-বোলো কোটি টাকা। এর মধ্যে সংস্কার লাভ ১২ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

১ম পৃষ্ঠার পর

এলাকা, হাওড়া পৌর এলাকা, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর এবং আলি-পুর নগর মহকুমার শিল্পাঞ্চলগুলি নিয়ে প্রস্তাবিত ঐ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠন করতে হবে। কারণ, প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র-বিন্দু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ওই অঞ্চলটি। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যদিও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ এবং সংগ্রামী মাহুষগুলি ছড়িয়ে রয়েছে, তথাপি প্রস্তাবিত অঞ্চলটি সামরিক কায়দায় বা কৌশলে একবার কেন্দ্র দখল করতে পারলে রাজ্যের অবশিষ্ট মাহুষ স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়-বেন। এবং কেন্দ্রের সহায়তায় ওদের দমন পীড়নে সুবিধা হবে।

উল্লেখযোগ্য, যারা এই সর্বনাশা যুদ্ধজয়ের কলকাটি নাড়ছেন বা মরাদিগীর কর্তাদের সঙ্গে দরবার করছেন তাঁদের ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় কর্মস্থল বা হেড অফিসগুলি প্রায় সবই কলকাতায়। যদিও তারা যুগ যুগ ধরে বা এলাজ্যে বাপ-ঠাকুর-দার আমল থেকে বসবাস করছেন, তথাপি তারা এখন প্রমিক, কৃষক,

দেশ কাল রাজনীতি

২য় পৃষ্ঠার পর

কিন্তু সংসদ নায়ক বালাসাহেব দেও-রাস যখন আবার ইন্দিরার সঙ্গে সহ-যোগিতা করার নির্দেশ দেবেন তখন সে নির্দেশ উপেক্ষা করার শক্তি ও সাহস ভারতীয় জনতা দলের মধ্যে দেখা যাবে কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, জনতার তৃতীয় অঙ্গচ্ছেদের পর, তিন জম সেক্টরটায় সম্মত চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে দলের ভবিষ্যৎ কী: অবলুপ্তি না পুনর্গঠন?

সহ্যবিস্ত, ছাত্র, যুব, মহিলা এবং অসহায়দের গণতান্ত্রিক মাহুষের উদ্ভাল আন্দোলনের সূত দেখছেন। তাই, তাঁদের এই যুদ্ধ চলছে।

তাঁরা বলেছেন, যে ভাবেই হোক মরাদিগীরকে বুঝিয়ে প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে কেন্দ্র শাসিত একটি অঞ্চলে রূপান্তরিত করতেই হবে।

এটা লক্ষ্য হলো, তাঁদের ধারণা গ্রামের গরীব মাহুষেরা মিছিল করে আর কলকাতা মহানগরীতে আসবে না বা ঢুকতে পারবে না। অসহায় গণ মিছিল ও মিটিং বন্ধ করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় এলাকার প্রশাসনিক কমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। কাজেই মিছিল নগরী কলকাতার গণ আন্দোলন, প্রমিক ধর্মঘট এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মাহুষের প্রত্যাবর্তে দমন করা সহজ হবে।

উল্লেখযোগ্য, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠনের উদ্যোগের এই পদক্ষেপনা আশ্বস্তের নয়। বিগত কয়েক বছর ধরেই নেপথ্যে তাঁরা তাঁদের এই কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছেন।



ফ্যান্টাসিয়া বিক্রেতার জন্ত ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। ভারতীয় দর্শন / ডঃ দেবব্রত সেন / ১৬০০

২। ধর্ম দর্শন / শ্রীকল্যাণ গুপ্ত ও শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৫০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্টোর, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট সেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত

নয়াটি রাজ্যে নির্বাচনের দিন ঠিক করার ব্যাপারে গুরুতর মতভেদ

দুপল

ত্রয়বিংশ বর্ষ। ১৩শ সংখ্যা। শুক্রবার, ১৮ই এপ্রিল, ৮০। ৬০ পয়সা

প্রেসিডেন্সী
জেলে
কংগ্রেসী
আমলে
যা চলত
দেবশিস ভট্টাচার্য

গত তিনবছর ধরে জেল প্রশাসন নিয়ে সারা ভারতে বহু আলোচনা শোনা গেছে। অবিভক্ত জনতা পার্টির বড় বড় নেতারা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা জরুরী অবস্থায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে বহু বই লিখেছেন। জেলবিধি সংস্কারের চক্রান্তে কেউ কম যায় না। ইন্দোনীং সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য স্বরাষ্ট্র বিভাগকে জেলের অবস্থা উন্নততর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেও বাম-ফ্রন্ট সরকারের কারামন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জেল বিধি সংস্কারের জন্য একটা কমিটি গঠন করেছেন। ঐ কমিটি রাজ্য সরকারের কাছে দুটো অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করেছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্সী জেল সম্পর্কে জেল থেকে সচিব জর্জ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতে যা বেনেছি, তা এক কণ্ঠস্বর বলতে হয় জরুরী অবস্থায় লম্বা নিজে যা প্রেসিডেন্সী জেলে দেখেছি আজও সে ব্যবহার চলছে। বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার বেড়েছে বই কয়েকটি, সেই রক্ত-স্বপার শ্রীঅমিতাভ পাট্টনী লক্ষ্যবুদ্ধি করে চলেছেন যদিও আজ মহাকরণের চেয়ারে কংগ্রেসের জ্ঞান সিং পোহন-

নয়াটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঠিক করার ব্যাপার নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। একদিকে লক্ষ্য গান্ধীর নেতৃত্বে বেশ কিছু তরুণ উঠতি মেতা চাইছেন অবিলম্বে নির্বাচন করতে অন্যদিকে কমলাপতি ত্রিপাঠীর মত প্রবীণ নেতারা চাইছেন কয়েক মাসের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দিতে।

লক্ষ্য গান্ধী এবং তার সমর্থকদের মুক্তি হচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনে

দলের বিপুল সাফল্যের জের থাকতে থাকতেই নয়াটি রাজ্যের নির্বাচন হওয়া ভাল। কারণ লোকসভা নির্বাচনের প্রত্যাব রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ওপরও পড়বে। ফলে দলের জয়লাভ অনেকটা নিশ্চিত হবে।

লক্ষ্য গান্ধীর আরও মুক্তি হচ্ছে, এখন বিরোধী দল ছত্রভঙ্গ। সুতরাং এই অবস্থায় নির্বাচন হলে বিরোধীরা একজোট হতে পারবে না। ফলে কংগ্রেস বিরোধী তোটা ভাগ হয়ে যাবে।

এই অবস্থায় দলের জয়লাভ নিশ্চিত হয়ে উঠবে।

কমলাপতি ত্রিপাঠী ও বেশ কিছু প্রবীণ নেতা চান নির্বাচন অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হোক। কারণ ক্রমাগত অব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত কয়েকটি শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

চোর ডাকাতির ছড়া

অনার্থ মিত্র

এক

ওয়ে কাপ্রে বাপ
পুলিশের গায়ে হাত পড়েছে
ইসলামপুর সাফ।

চোর ডাকাতে করবে চুরি
পড়বে না সে ধরা,
চোরের মেসো চোর ধরেনা
বিধান চমৎকরা।

পান্টা দলের হৈ হলো

দুহুই নয় কাস্ত;

বিধানসভার বিবৃতি আর
তদন্ততেই শাস্ত।

দুই

কোন মন্ত্রী মুখ্য বটে

কোন মন্ত্রী গোণ

কোন মন্ত্রী বিবৃতি দেন

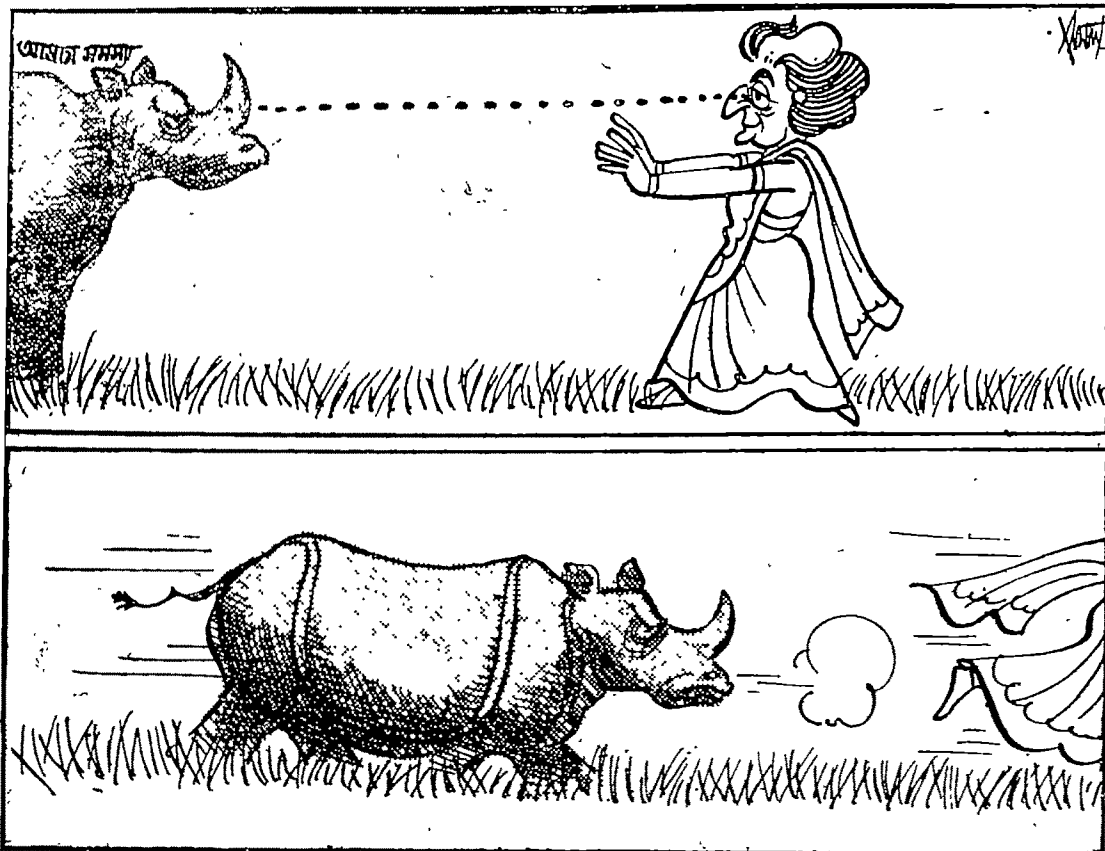
কোন মন্ত্রী যোন।

মন্ত্রী হলোই বিদেশ ভ্রমণ
এবং নানান রাজ্য,
ঘরের মাহুস ছুঁধ পেলে
করেন নাকো গ্রাহ।

মন্ত্রী মানেই সভায় ভাষণ
শোষণ নিপাত থাকে,
হরকার খিল, মন্ত্রী চুপে
মাংস পোলাও থাকে।

তিন

জেলের বাবা বলেন :
খোকা কি উপহার দিবি
নেহাং যখন দেবেই না হয়
দিও রঙীন টি, ভি,।
রঙীন টি, ভি, খপ্প রঙীন
ফুলশয্যার রাত
বুটমুট নয়, লাচা বুলি
বসন্ত কি বাত।



বাম ফ্রন্টের আমলেও তাই চলছে

পাল নয়, বসে আছেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল তথা বামফ্রন্টের শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাণ্ডা ঘরে বসে দেবব্রতবাবু জানতেও পারেন না জেলগুলোর ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে চৌবাচ্চার জ্বালান না থাকলে বন্দীদের কি হুবহু হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর বিধানসভা বা অন্তর্জ কেউ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে, তিনি খোজ নেবেন যুগ্ম, দুর্নীতিবাজ আমলাদের মাধ্যমে আর তাঁরা খেরকম বোঝাবেন, মন্ত্রী মশায় লেখকম বুঝবেন।

কংগ্রেসী জমানার মতো আজও প্রেসিডেন্সী জেলে নগর নারায়ণের খেলা চলছে। মাহ-মাংস-লজির ঠিকাদার সিরাজের সঙ্গে পুরনো বন্দোবস্ত আজও বজায় রেখেছেন জেলের কর্তারা। দেবব্রতবাবু বোধহয়

পর্বিত যে এই বাজারেও বারো টাকা কিলোর মাংস মেলে। বিশ্বাস করুন, খোলা বাজারে যেখানে আঠারো টাকা, সিরাজের তখন টেওয়ার দর বারো টাকা। হোক না, লাঙ্গা ইয়াস ইয়াস করছে মরা পাঠীর মাংস। মাংস আর পচা মাছ নিয়ে সিরাজ জেলে যায় বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। খোলাবাজারের শেষে ফুড়িয়ে বাড়িয়ে যা মিললো তা লাঙ্গাই গেল জেলে। আর কিছু ভালো মাছ রোজই আসে হাস-পাতালের রান্নাবরেনের জন্য। কিন্তু ঐ 'জন্তাই' বটে, অর্ধেক চলে যায় কর্তাদের গিন্নির রান্নাবরেন আর অর্ধেক কর্তা-সিপাই-জমানার-বৃত্তিত আসামী অর্থাৎ মেটরা বিক্রি করে বন্দীদের। দর ভনবেন, ধরম ৫০ গ্রাম ওজনের পাচ পিচ কাটা পোনা

অর্থাৎ আড়াইশো গ্রাম ছু টাকা। বিক্রেতাদের আর ভনবেন, ঐ হাস-পাতালের রান্নাবরেন অর্থাৎ চোকার যে যেট দেখাতুনো করে সেই শায়রুর পায় দিনে কম করেও চল্লিশ টাকা। তাহলে ওদের ভাষায় 'বড়বড় লাইনে' হেড কর্তা কত পান বুঝুন। আর কারামন্ত্রী দেবব্রতবাবু বোধহয় পান মাসে তেরোশত টাকা।

এবার যাই বড় চোকার। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওখানে যেট ছিল ভীম। এখন আছে কালু। ৮০ কেজি সজি রান্না হয় মাত্র ৭০০ গ্রাম তেলে। তেলের গন্ধে লরবে বোঝা যায়। বেলা বারোটার পুইশাক ঢুকলো পরের দিনের জন্য। আর মহাকরণের মন্ত্রীদের বাড়িতে কেন আমরা সকলেই সকালে টাটকা সজি কিনি সেদিনের জন্য। দীর্ঘদিন

বিহারে প্রবাসী বাঙালী ছিলেন, সন্ত প্রেসিডেন্সী জেলে এসেছেন ডেপুটি জেলার শ্রীযোষ। উনি বড় চোকার মাঝে মধ্যে হঠাৎ চমক পরিদর্শন করে কাজ দেখালেন। সজিতে বেশি তেল ঢালালেন। উনি পেছন ফেরামাত্রই কড়া বা লম্বা ড্রায় থেকে সজি তুলে উফ তেল হেঁকে তুলে নিয়ে আবার সজি সেক হল—এমনই একপাট কালু। ওদিকে কর্তারা কিন্তু দেখাচ্ছেন সব বন্দীকেই বিধিযতো মাহ মাংস-তেল দেওয়া হচ্ছে। বাজেটে ববাক বাড়ছে, বন্দীদের ভাগ কমলেও বাড়ি-জমি তো বাড়ছে কর্তাদের।

জেলের মধ্যে তেলের ঘানি আছে। খাঁটি সরষের তেল আজও তিন টাকার মেলে। বিশ্বাস করুন! সরকার-নির্ধারিত ছু টাকা কেজি দরে সিপাই অববা কর্তাজী এক কিলো তেল কিনলেন। কিনে বড় শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় পুলিশ ও সাধারণ মানুষ

উত্তরপ্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলার রক্ষক পুলিশ বাহিনীর লোকেরা একই পদ্ধতিতে গ্রামবাসীদের ওপর উগ্রতা তীব্র চালালো। যাদের ওপর জনসাধারণের জীবন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব তীব্র তাদের এই নারকীয় রূপ অকল্পনীয় হলেও আমাদের সমাজ খেচুতায় নৈরাজ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম বিনাক-পুরের ঘটনা তারই আর এক রূপ। যে সমাজে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর—বিশেষ করে শহরবাসী তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ সততা, আন্তরিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, অস্ত্রাবোধ, অর্থাৎ প্রায় সব রকমের মানবিক গুণ বিসর্জন দিয়ে খাড়াবাকী, ঘৃণোন্মী ও লোককে ঠকিয়ে উপরি রোজগারের চেষ্টায় ব্যস্ত, যেখানে এমন কি বিচারপতিদের জায়গারও নেই।

গত ত্রিশ বছরে আমাদের সমস্ত সমাজটাই প্রায় পাশবিক হয়ে গেল। কোন অভাবনীয় ঘটনাই আর আমাদের মনে দাগ কাটে না। কেউ ঘুষ না খেলে আমরা অবাক হই, কেউ পণের টাকা মেরে না দিলে তার নাম সংবাদপত্রে ছাপা হয়, রোজ সকালে খবরের কাগজে ডাকাতি ছিনতাই রাজাকানি খুনখারাবি নারী ধর্ষণ বধু হত্যার খবর না দেখলে আমরা তৃপ্তি পাই না। এ অবস্থা একদিনে হয়নি। কংগ্রেসী রাজনীতি ও অপশাসন, গান্ধী নেতৃত্ব ইন্দিরার নীতি দেশ ও দেশের মানুষ উভয়কেই নরকে পাঠিয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বের পুঁজি ছিল দমন পীড়নের যন্ত্র—জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক একটি রোয়ট, যাদের শুধু অত্যাচার করতেই দেখানো হয়েছে। দেশ বাণী হবার পর তার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং পুলিশকে আরও তৎপর, সম্পূর্ণ স্বাধীন, আরও পাশবিক যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। তাই পুলিশ আজ সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ। পুলিশ তাদের অস্ত্রতম প্রধান শত্রু। এই শত্রুতার চরম প্রকাশ দেখা গেছে পশ্চিম বিনাকপুরের ঘটনায়। দোহী পুলিশ অফিসারদের ও কনষ্টেবলদের শাস্তি দিয়ে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত করে হত্যার সামগ্রিক প্রলেপ দেওয়া যাবে, কিন্তু স্বামী কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

দেশ কাল রাজনীতি ইন্দিরা গান্ধীর ব্যর্থতা

ভারতপুত্র

পরাসু, পশু হস্ত প্রধানমন্ত্রী রিত হস্তে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন। এটাই চূড়ান্ত চক্র, এটাই শেষ সুযোগ—আসামের আন্দোলনকারীদের এই হুমকিই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আতঙ্কে-ইজিতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এই রাউণ্ডও আন্দোলনকারীদের জিতই বজায় রইল, আর আলোচনার দরজা খোলা রেখে শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করলেন যে শেষ সুযোগের শেষ নেই। প্রচারের মাধ্যমে এমনি একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং একবার রণক্ষেত্রে হাজির হলেই আসাম সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করল যে শ্রীমতী গান্ধীকে ব্যর্থতার বোকা নিয়েই প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে, সমস্ত শক্তি দিয়েও তিনি সমস্যার জটিলতা পান্থর এক হুতোম সরাতে পারেননি। কারণ আন্দোলনকারীরা ‘বিদেশী’ নির্ধারণের ভিত্তি বছর নিয়ে কোন আপস রক্ষার রাজী নয়, ১৯৭১ সাল তো নয়ই, রাজ্যপাল প্রস্তাবিত ১৯৭৩ নয়। সেজন্তই আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন নির্দেশ অচল। আন্দোলনকারীরা ময়াদিহীর রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ করে তেল ও সরকারী সংস্থাগুলিতে স্বাধীনতা পিকিটিং করে চলেছে যদিও এ ধরনের সত্য্যগ্রহ ও ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হয়েছে।

আসামের ছাত্র যুবরা কেন্দ্রীয় সরকারকে উপেক্ষা করার শক্তি পায় কোথা থেকে? প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এর পেছনে বৈদেশিক শক্তির গোপন সহায়তার কথা বলেছেন। কিন্তু কে সেই শক্তি? জাতীয় স্বার্থে নাকি তার নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কিন্তু দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে তখন সে জাতীয় স্বার্থ কি বিনশ হতে না?

অহিংস চরিত্রে নেই, ‘বিদেশীদের’ মধ্যে যে বেশী করে দেখানো হচ্ছে এ সব সত্যও শ্রীমতী গান্ধীর উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধানে বাস্তব পদা অবলম্বনে তাঁর বাধা কোথায়? হল-প্রধান হয়ে তিনি কেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় সম্মিলিত হতে নির্দেশ দিচ্ছেন না? মনে রাখা দরকার যে আসাম সমস্যা সমাধানে বত বিলম্ব ঘটানো হবে ততই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। শ্রীমতী গান্ধী কি ইচ্ছে করেই আসাম সমস্যাকে কুলিয়ে রাখলেন জাতীয় স্বাধীনতার গান্ধীকে অবতীর্ণ হবার সুযোগ দেবার জন্য?

কংগ্রেস কয়ুনিষ্ট আঁতাত
বাবুজীকে বলে পেরে কংগ্রেস

এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ধমকে দিল্লীর ই-কংগ্রেসী কর্তাদের টনক নড়ে

আসামে বাঙ্গালী নির্বাসিত ও বিভাজন বন্ধের দাবীতে শিল্পপতিতে যানবাহন আটক করে আসাম অবরোধ করতে গিয়ে কংগ্রেসের (ই) নেতৃত্ব এক শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির কাছে কড়া ধমক খেয়েছেন।

এ সব ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি পরিবার তাদের কংগ্রেসের (ই) নেতৃত্বকে বলে দিয়েছেন যে, আসাম অবরোধের নামে তাঁদের পণ্যবাহী ট্রাকগুলি আটকসহ পোড়াম হলে তাঁরা কংগ্রেসের (ই) ভাণ্ডারে আর টাকা বা পয়সা কড়ি দিতে পারবেন না।

এরপরেই দিল্লীর কংগ্রেস (ই) কর্তাদের টনক নড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ময়াদিহী থেকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই) কর্তাদের কাছে জরুরী বার্তা ও ট্রাক টেলিফোন আসতে থাকে। অগত্যা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে স্থানীয় কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব বাধ্য হয়ে এই অবরোধ আন্দোলন “আপাততঃ স্থগিত” বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

অপরদিকে, এই শিল্পপতি এবং

নেতা দেবরাজ আর্প যেন সবধোবন লাভ করেছেন। অগামীবনের নামী অগামীদের মধ্যে বিশেষ কেউ তাঁর পক্ষ অঙ্গুলরণ করেন নি, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি যে সমস্ত নেতাদের উদ্দেশে কংগ্রেসের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের কেউই দলে ফেরেননি। কিন্তু তাতেও হতাশ না হয়ে শ্রীমতী ইতিমধ্যে দি পি আই-এম ও দি পি আই নেতা ই এম এল মাদুজিলাহ ও রাজেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে ময়াদিহীতে পঞ্জি ভোজন সেরেছেন। এই ভোজের নীট লাভ হল তিনটি আসাম নয়া রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে একাধিকভাবে কংগ্রেসের (ই) মোকাবিলায় লম্বত হয়েছে।

হুই কয়ুনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচনী লড়াইয়ে সংগে পাওয়া কংগ্রেসের পক্ষে কম লাভজনক ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করা দরকার যে নয়া রাজ্যের সামাজিক কয়টি পকেটে ছাড়া কয়ুনিষ্ট পার্টি ছুটির প্রভাব প্রতিপত্তি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নবগঠিত ভারতীয় জনতা দলের নামের আড়ালবর্তী জনসংঘ-আর এস এস-এর সঙ্গে নির্বাচনী মোটে বাঁধতে কংগ্রেস কয়ুনিষ্ট কেউ রাজী নয়, যদিও হলপ্রধান অটলবিহারী বাজপেয়ী আগম বিধান

সভা নির্বাচনে বৈরতের বিরুদ্ধে তাঁর দলের লড়ার অলৌকিক করেছে।

ভারতীয় জনতা হল আপাততঃ বাহ গেল, কিন্তু লোকদল? শ্রীমতী বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় চরণ লিং-এর প্রভাব লোকদল নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্তই বোধহয় তিনি নির্বাচনী সমস্যাতার সমাধান নিয়ে চৌধুরীজীর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তুত হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রের জনতা সরকারের পতনের পর লোকদল কংগ্রেস আঁতাত তো হয়েছিল। তথ্যবাহক সরকারের শুরিকানি মন্তব্য তারা ভোগ করেছিল। কিন্তু

সে বজ্র তাড়ের টিকল কোথায়? লোকদল নির্বাচনের আগেই অর্থাৎ কঠিন পরীক্ষার পরেই দুই দলের মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি হয়নি কি? অবশ্য রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোন বস্তু নেই। ইন্দিরা গান্ধী অতি কৌশলে একাধিক বিরোধী দলগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন। আবার যদি তারা নিজেদের তুল বুঝতে পেরে হাতে হাত মিলোতে পারে তবেই ইন্দিরার চাতুরীর চোখা অবাব দেওয়া সম্ভব হবে।

ব্যবসায়ী মহল প্রায় তুলেছেন যে, আসামের বাঙ্গালীদের বাঁচানোর জন্য কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব যখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিতে অবরোধ আন্দোলন করলেন, তখন আসামের কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব কেন আসামে বাঙ্গালী বিভাজন বন্ধের জন্য সেখানে আন্দোলন করলেন না? দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ এক রহস্যজনক ব্যাপার।

আসাম থেকে কংগ্রেসীরা (ই) বাঙ্গালী তাড়াবে আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (ই) তার প্রতিবাদ জানাবে এ কেমন কথা। কংগ্রেসের (ই) মধ্যে জাতীয় স্তরে যে কোন একা মেই এই ঘটনাই তার অলম্ব প্রমাণ। একথা আমাদের নয়, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী মহলই একথা বলেছেন।

উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহল আরো বলেছেন, আসাম অবরোধের নামে কংগ্রেসের (ই) ওই অবাস্তব আন্দোলনের ফলে উত্তর পূর্ব ভারতের ব্যবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। কারণ, উত্তর পূর্ব ভারতের একমাত্র পেটওয়ে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি। এই রাজ্য

বা কট হয়েই আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় সরকারী ও বেসরকারী পণ্যবাহী ট্রাকগুলি বাতায়ত করে থাকে।

কংগ্রেস (ই) কর্মীদের ওই অবাস্তব আন্দোলনের ফলে ওই লাভটি রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন পণ্যবাহীর অভাবে দারুণ দুর্গতির মধ্যে পড়েন বলে ওই সব রাজ্যের মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এখন বলেছেন। ওয়াকিবহাল মহল আরো বলেছেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব এবং কর্মীরা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না।

ওদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা বিপর্যয় করা। কিন্তু, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, একমাত্র “শ্রমিক আন্দোলন” ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখন পশ্চিমবঙ্গের বায়কট সরকারের মস্তিষ্কে কংগ্রেস রাজত্বের চাইতে এখানে তাঁরা অনেকগুণ ভাল আছেন। কারণ, অর্থাৎ টাকার দাবীতে পুলিশের একাংশ যদিও তাঁদের কাছে প্রতিমাসেই একবার করে যায়, তবু মস্তানরা আর আগের মত দৌরাঙ্গ্য করতে ভরসা পাচ্ছে না।

সঞ্জয়ের সঙ্গে মন কষাকষিতে ভেঙ্কটরমণের দুর্দিন

এখন অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণের বড় দুর্দিন। কারণ, তিনি সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে মন কষাকষি করে ফেলেছেন। সঞ্জয় গান্ধীর কথামত কমল নাথকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ফাইল দেখান নি। বরং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ঘটনাটি বলতে গিয়ে অল্প-মোহিত কর্তৃপক্ষ এমন একজনকে কি করে তিনি সরকারী ফাইল দেখান তাও জানাতে কষ্ট করছেন। কিন্তু সব শুনে শ্রীমতী গান্ধী চুপচাপই থেকে গেলেন। আর ওই ঘটনার কদিন পরে দেখা গেল, তাঁর হাত থেকে শিল্পায়ন দপ্তর দেখা-শোনার দায়িত্ব চলে গেছে। ওই দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয়ের এক বন্ধু চরণসিং চানানা। তাঁর মত অবস্থা মন্ত্রী পি সি শেঠিরও। শেঠি সঞ্জয়ের কথামত সরকারী নির্দেশ সব সময় মানতে রাজী হচ্ছেন না বলে সঙ্গীত অবস্থার মুখে পড়েছেন। কয়েকটি ঘটনামূলক সাই-রেন লাপান পাইলট গান্ধীর বায়না ধরা ও কয়েকজন পেট্রোল পাম্প মালিকের লাইসেন্স বাতিল করার

কাজ পেট্রোল ও রসায়ন দপ্তরটি খুঁয়ে বসে আছেন। নেহাত একান্ত বিশ্বাসভাজন বলে গৃহ ও শহরবানী উন্নয়ন দপ্তরটি যায় নি। তাছাড়া তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিতে ভি সি গুজার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই স্বাধীনচেতা হতে গিয়ে বড় নায়েবাল হয়ে পড়ছেন।

আবার জ্ঞানী ভৈল সিং সঞ্জয়ের পরম বিশ্বস্ত বলে কি হয় তিনি তাঁর পদের উপযুক্ত যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছেন না। এই জন্ত সঞ্জয় তাঁকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী করার কথাও ভাবছেন তবে বুটা সিং ও দরবার সিং-পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তালিকার নাম ঢোকানর জন্ত চেষ্টা করছেন। সঞ্জয় তাঁদের কথাও ভাবছেন বলে ভৈল সিংকে আরও কিছুটা সময় দিতে পারেন এমন আশাও রয়েছে। এর মধ্যে আরও কয়েক-জনের কি অবস্থা হয় তাই নিয়েও বেশ চিন্তা ভাবনা চলছে। কে যাবেন, কে থাকবেন এবং কে আসবেন এসব জল্পনা কল্পনা দিন দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বড় লবণ ব্যবসায়ীদের কারচুপির প্রতিবাদে বয়কট

কলকাতার বড় লবণ ব্যবসায়ীদের কারচুপির প্রতিবাদে এবং তা প্রতিকারের দাবিতে ক্যালকাটা সন্ট ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে কলকাতার পাইকারি বাজারের মাঝারি লবণ ব্যবসায়ীরা ওই বড় ব্যবসায়ীদের জাহাজে আমদানীকৃত লবণ বয়কট করার সিদ্ধান্ত করেছেন। এতে কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের খুচরা বাজারে অদূর ভবিষ্যতে লবণের কিছুটা দরদী হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে ওয়াকিবহাল মহল অভিযত প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য, রাজ্য সরকারের উদ্ভোগে যে লবণ আমদানী হয় তা নাধারণত রেলের ওয়াগনেই আনা

হয় এবং বেসরকারিতাবে বড় ব্যবসায়ীরা তারতের ভিন্ন রাজ্য থেকে জাহাজে লবণ আমদানী করে থাকেন। বেসরকারিতাবে বড় ব্যবসায়ীদের আমদানীকৃত লবণ কলকাতার পাইকারি বাজারের মাঝারি ব্যবসায়ীরা খরিদ করে তা কলকাতা-মহা রাজ্যের খুচরা বাজারের মুদি দোকানগুলিতে সরবরাহ করে থাকেন।

ক্যালকাটা সন্ট ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের তৈনিক মুখপাত্র অভিযোগ করেছেন যে, কলকাতার বড় লবণ ব্যবসায়ীরা লবণ মূল্য নিয়েও মাঝারি লবণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে কারচুপি করছেন, অকেজো কাঁটায় ওজন দিয়ে প্রাপ্য লবণের তুলনায় অনেক কম লবণ দিচ্ছেন। এতে শুধু মাঝারি লবণ ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, এতে সাধারণ মুদি ব্যবসায়ী এবং দর্পণে জনসাধারণকে এর ভাগী-দার হতে হচ্ছে। মাঝারি ব্যবসায়ীদের অনেকের পুঁজিও এর দরুণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাইই প্রতিবাদে এবং প্রতিকারের দাবিতে মাঝারি লবণ ব্যবসায়ীরা ঐ লবণ খরিদ-বয়কটের সিদ্ধান্ত করেছেন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং স্ট লেন, কলিকাতা-১৩

দাম কমানোর ফাঁকা প্রতিশ্রুতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তারা নির্বাচিত হলেই তাদের সরকার সমস্ত জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন। নির্বাচন শেষ হয়েছে। তারা জিতেছেন। কিন্তু জিনিসপত্রের মধ্যে পেরাড ছাড়া আর কোন জিনিসের দাম কমেনি। বরং জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। সরকারী পরিসংখ্যান বাই বলুক, লোকের নিত্যকার অভিজ্ঞতা হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। আতঙ্কিত লোকজন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছেন, এটা কি হল? ভোট পাবার পরই কি কংগ্রেস (ই) প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেল?

মহাজ কথাকাটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কতগুলি কারণ আছে। দাম বাড়ার বা কম ঐ কারণগুলির উপর নির্ভরশীল। কোন সরকার যদি মূল্যস্তর কমাতে বাড়াতে চান তাহলে তাদের ঐ কারণগুলিকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করে তুলতে হবে। ঐ কারণগুলি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই বোঝা যায় সরকার জিনিসপত্রের দাম কমাতে চান, না বাড়াতে চান। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তো ভোট পাবার ক্ষেত্রে একটা ধোঁকা-বাজি মাত্র।

জনতা পার্টির আমলে প্রথম দিকে জিনিসপত্রের দাম কমছিল। কিন্তু সেই কমার মধ্যেও ফাঁকা আছে। কারণ কৃষকদের ফসলের দাম কম দিয়ে গড়পড়তা মূল্যস্তর কম দেখানো হয়েছিল। অথচ সবাই মনে আছে কয়লা, সিমেন্ট, কেরোসিন, ডিজেল এমন বহু জিনিসের দাম তখন সরকারই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে বিদ্যুতের দাম বেড়েছিল, পরিবহন খরচ বেড়েছিল এবং ঘরবাড়ি ভৈরীর খরচ বেড়েছিল। এই দরদাম বেড়ে যাওয়ার ফলে অত্যন্ত দূর্ব জিনিসেরই দাম বেড়ে গিয়েছিল। অথচ কৃষকদের ফসল, আখ, পাটের দাম পড়ে গিয়েছিল। এই দাম ওঠানড়ার গড়পড়তা হিসেবে হয়তো সাধারণ মূল্যস্তর কিছুটা কমছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন স্বস্তি পান নি।

শুধু জনতা সরকারই বা কেন? এর আগে ইন্দিরা গান্ধী তো একটানা এগারো বছর এদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখন কি দাম বাড়েনি? ১৯৬৪-৬৫ সালে জিনিসপত্রের যে দাম ছিল, (১৯৬৬ সালে ইন্দিরা

গান্ধী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন) ১৯৭৭ সালে কি তার চাইতে কয়েক গুণ বেশী হয়নি? মূল্যস্তরের হিসেবও তো তাই বলে। তাহলে শুধু জনতা সরকারকে দায়ী করেই কি তার পক্ষে আসল দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব? দাম বাড়ার ঘটনা আকাশ থেকে পড়ে না। সরকারী নীতিগুলি দাম বাড়ানো কমানোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। কেউ যদি বলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সম্বন্ধে জিনিসপত্রের যোগান যদি না বাড়তে পারে তাহলেই দাম বাড়বে, তাহলে তাকে বলা যায় ১৯৭১ সালে পশ্চিম-বাংলায় এক কোটি দশ লক্ষ বাড়লী দেশী শরণার্থী ভীড় করেছিলেন। এরা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। ঐ সময়ের বাজারের হিসাবও মূল্যস্তর থেকে

আর্থনীতি

কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

জিনিসপত্রের দাম সরকারের নীতির উপর নির্ভর করে। সরকার যদি অনবরত ঘাটতি বাজেট পেশ করেন এবং ঐ ঘাটতি পূরণের জন্তে কাগজী নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন, তাহলে দাম বাড়বে। সরকার যদি পরোক্ষ কয়ের পরিমাণ বাড়ান তাহলেও দাম বাড়বে কারণ ঐ কয়ের পরিমাণ টাকা দামের সঙ্গে যুক্ত হবে। সরকার যদি ব্যাংকের হাটবনের পরিমাণ বাড়ান তাহলেও দামে তেজী ভাব আসবে। তারপর যদি আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হয় তাহলেও বিদেশী মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রার রূপান্তরিত করার দরুন কাগজী নোট বাড়বে। সুতরাং দাম বাড়বে।

অতএব দাম বাড়ার কারণ

শিয়ালদহ জি আর পি কর্তাদের কার্টি

শিয়ালদহ জি আর পি কর্তাদের কার্টি নিয়ে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গিয়ে ২ এপ্রিল সন্ধ্যার পরে শিয়ালদহ স্টেশনের প্রাটিকরমে তাঁদেরই একজন উর্ধ্বতন অফিসারকে খুশি করার জন্ত রীতিনীতি ভঙ্গ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, ঐ দিন ৪৩ নং আপ হাজিলিং মেলে একটি সেলুনে সিকিমের রাজ্যপাল এবং অপর একটি সেলুনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ট্রাফিক ও রেল-ওয়ের ডি, আই, জি নিউ জলপাই-গুড়ি এবং উত্তরবঙ্গে যাজিলেন। কিন্তু,

অহুসঙ্কানের জন্তে আমাদের সরকারী নীতির দিকে তাকাতে হবে। সরকার কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি তা দেখতে হবে।

কারণ বুজোয়া শ্রেণীর সরকার কোনদিন দাম স্বাভাবিক করে তুলতে পারেনা। দাম বাড়লে ব্যবসায়ী শিরশ্চুতি ও মজুতদারদের লাভ হয়। একশো টাকার কেনা জিনিসের দাম পাঁচশো টাকা হলে কোন সুঁকি না নিয়েও চারশো টাকা মুনাফা করা যায়। এই চারশো টাকা মুনাফা আদে খরিদারদের পকেট থেকে। সুতরাং আসলে দাম বাড়ার ফলে প্রমজীবী মানুষের আয় পরপ্রমজীবী মালিকশ্রেণীর হাতে চলে যায়। সুতরাং দাম কমানো বা বাড়ানো একটা শ্রেণীস্বার্থ পূরণের নীতি, তাই বলেছি সরকার কোন শ্রেণীর স্বার্থ দেখে এটাই প্রধান বিবেচ্য।

ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেশাই বা চরণ সিং-এর সরকার বুজোয়া শ্রেণীরই সরকার। একই ধরনের বোতলে নানা রংয়ের জল। এদের কাছ থেকে দাম স্বাভাবিক করার আশা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং কেউ যদি আশা করে থাকেন যে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পর দাম কমবে, জিনিসপত্র স্থলভ হবে তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়িই হতাশ হবেন। এখনো বাজেটের কর কতটা বাড়বে তা গোপন রয়েছে। কারণ সামনে নটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ঐ নির্বাচন হয়ে গেলেই অর্থমন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমণ তার ছুরি কোষমুক্ত করবেন। ২৭০০ + ১২৩৫ মোট ৩৯৩৫ কোটি টাকার ঘাটতির কতটা ট্যাক্স দিয়ে কতটা নতুন নোট ছাপিয়ে তোলা হবে। দেশবাসী তখন হাড়ে হাড়ে বুঝবেন প্রতিশ্রুতির মূল্য কি?

জি আর পি পুলিশ সুপার ২৩ন ডেপুটি পুলিশ সুপার সহ ট্রেন ছাড়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদিও ডি আই জির রক্ষণাবেক্ষণের জন্তে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন তথাপি ওখানে সিকিমের রাজ্যপালের দেখাভনার জন্ত কোন উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার ছিলেন না। মাত্র ৪৫ জন কনেটবল বা মিপাই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। ওয়াকিবহাল মহল প্রশংসা করেছেন যে, একজন রাজ্যপালের চাইতে কি ডি আই জি বেশী ডি আই পি?

রোগী বিরোধী জনস্বার্থ বিরোধী ধর্মঘাট

শ্রীকান্ত বসুর র

আবার সেই একই অনাচার। হাসপাতালে হঠাৎ চিকিৎসা বিরতি—এবারে নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

দৃষ্টি স্থপরিচিত। সহস্র সহস্র হাসপাতাল-বন্দী মানুষ, সকলেই প্রায় মুগ্ধ রোগী, কিন্তু চিকিৎসা বন্ধ। কারণটি অবশ্যই ধর্মঘাটের ছাড়া কেউই জানে না, জনসাধারণ জানে না, রোগীরা জানে না, কাক পক্ষী-টিও জানে না, অথচ সহস্র সহস্র মানুষের জীবন মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে টাগ-অর্-ওয়ার—একপক্ষে অবশ্যই হাউন্স টাক আর ইন্টার্নদের দখলিত বাহিনী, অপরপক্ষে যেকোন কেউ, যে কোন ছুতো।

হাসপাতালে ঘন ঘন চিকিৎসা বিরতি—যা কার্যতঃ রোগী বিরোধী ধর্মঘাট ছাড়া আর কিছুই দাঁড়ায় না—জনসাধারণকে স্বভাবতই আতঙ্কিত করে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, রোগীবিরোধী ধর্মঘাটগুলি নিশ্চয়ই ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়বস্তু হতে পারে না। মাতালের মাতামাতি, পাগলের পাগলামির জন্তে কেউ ধর্মঘাট করে না, কিন্তু পুত্রহারা পিতা যদি ধৈর্য-চ্যুত হয়ে অসংযত আচরণ করে বলেন, তার জন্তে রোগীবিরোধী ধর্মঘাট হয় কোন্ দেশে? 'রোগী

পক্ষের অভিযোগগুলি সর্বক্ষেত্রেই অকার্য' এমন কথাটাই বা অনাবিল সত্য হবে কেন? চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধের সঙ্গে রোগীরা কিভাবে জড়িত? কিংবা সিনিয়র চিকিৎসক জুনিয়র চিকিৎসককে কোন কটুক্তি করলে সে ক্ষেত্রে রোগীদের দায়িত্ব কোথায়? আর আউট ডোরের ঘটনার ইন্ডোরে প্রতিক্রিয়া কেন? অথচ ব্যাপারগুলি যেমন মালিক-শ্রমিক বিরোধ নয় তেমনি রোগী-ডাক্তার বিরোধ নয়। তাহলে ধর্মঘাট কেন? আদর্শবোধের কথাটা ছেড়েই দেয়া গেল, এ পোড়া দেশে কেউ চিকিৎসকদের কাছে কোন আদর্শের প্রত্যাশা করে না। কিন্তু চিকিৎসকদের কি কোন সামাজিক দায়দায়িত্ববোধ থাকতে নেই কিংবা অন্ততঃ আইনগত বাধ্যবাধকতা? আর ব্যক্তিগত ব্যাপারের জন্ত গোষ্ঠী-গতভাবে আঘাত-প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য-বস্তু কি পুরণারাজী নিরপরাধ রোগী? একপক্ষ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রকার নাগরিক অধিকারের বাইরে, তাহলে এ দুহুতির কোন শান্তি বিধান নেই কেন? কেন এদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে না? ছুঃ ও লজ্জার কথা এই যে

এদের প্রত্যেকটি চিকিৎসককে তৈরী করে নিতে মাথাপিছু প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে থাকে দেশের আপা-মর জনসাধারণ। সে তুলনায় এদের পারিবারিক খরচার পরিমাণ অতি নগণ্য। কিন্তু এ সামাজিক সাহা-য্যের প্রতিদান কি উটকো কোলিক-বোধ, আদর্শহীন জীবনবোধ, গোষ্ঠী-বাদী খেজাচার? অবশ্যই যারা এদের সামাজিক পটভূমিকা জানেন তারা এদের কাছে কোন মানবিকতা বা আদর্শবোধ প্রত্যাশা করেন না। যারা তা জানেন না তারাও করেন না। দৃষ্টান্ত ও মূল্যবোধে পাতি-বুজোয়া বিকারগুলি আজ সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতেচার গোষ্ঠীবাদী ধাপটের জোরে এবং স্ববিধাবাদী গোষ্ঠীবাদের পথে সমাজের দুর্বলতর অংশগুলিকে আঘাত করে আত্ম-

বিস্তারে বেশরোয়া হয়ে উঠেছে। অবশ্য এ সমস্ত গোষ্ঠীবাদীদের গোষ্ঠী-ভাগ আছে। অতিসাম্প্রতিক ব্যুরো-ক্র্যাট-টেকনোক্র্যাট লড়াইগুলি আসলে শিকার নিয়ে শিয়াল-কুকুরে কামড়া-কামড়ি বৈ আর কিছুই নয়।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার পাইপ-পথে, হোস সেক্টরের আর গ্রেস-মার্কেট দৌলতে যে অমূল্য সম্পদ সমাজজীবনে জমা পড়ে তার হিসাবটা সরকারী দায়িত্ব। কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে অশিক্ষা অশিক্ষার লক্ষ্যমূল্য সবচাইতে মারাত্মক—জীবন মৃত্যুর বিচারে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, এবং গুরুত্বভার সংখ্যাবিচারে যেমন ব্যাপক তেমন দুর্জয়ের। কিন্তু গোষ্ঠী-বাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও ঘোড়ার সঙ্গে পাখার সহাবস্থান নিতান্তই বেমানান এবং অসম্ভব তবু নামী-দামী চিকিৎসকদের অধিকাংশের ব্যবসায়িক বুদ্ধি এমন প্রবল যে, ফর্মীভাব গ্রেসভূষণের সঙ্গে এদের নিবিড় সহাবস্থান একটি সহজ বিস্তার

পেরে গেছে।—হুয়ে মিলে প্রায় একাকার। ফলতঃ হাসপাতালে প্রশাসন-মুখলা এবং চিকিৎসাধর্মী ডিসিগ্লিন প্রায় অবলুপ্ত। সমস্ত বন্দী-বাদের বিচারে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূল্যহীন, আত্মসম্প্রদায় সর্বাধিকার।

গণতান্ত্রিক অধিকার নয়, চিকিৎসা-সার স্বার্থ নয়, চিকিৎসা শিক্ষার কল্যাণ নয়, তাহলে কি? এত দুঃসাহস আসে কোথেকে? রোগীটা এখানেই। ব্যাধিটা যদি আকস্মিক হতো, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের হতো তাহলে ব্যাপারটা এরূপ একটা গুরু-তর সামাজিক উৎপাতের কারণ হয়ে উঠতো না। চিকিৎসা জগতের সংরক্ষিত এলাকাতেও তদারকী ব্যবস্থা যে নেই তা নয়—এদের এপেক্স বডি' ('Apex Body') আছে—ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল—চিকিৎসার লাইসেন্স দেওয়া ও কেড়ে নেবার অধিকার এদের রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর একটি শাখা শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

হোমিওপ্যাথি ছাত্রছাত্রীদের অর্থোজিক দাবী

কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষদের কর্মীরা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জমানা নেই এবং বামফ্রন্ট সরকার চলছে। গণ-টোকাটুকি চলবে না, গণ-টোকা-টুকি করলে তা কড়া হাতে দমন করা হবে।

অথচ, ওই কথাগুলি ভুলে গিয়ে ছাত্র পরিষদের (ই) নেতৃত্বে কয়েক'শ হোমিওপ্যাথি পরীক্ষার্থী এবং ছাত্র বিগত মার্চ মাসের শেষের দিকে অর্থাৎ ২৪ মার্চ থেকে কয়েকটি অর্থোজিক দাবী নিয়ে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত হাইকোর্ট পাড়ার ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের এবং উত্তর কলকাতার বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের হোমিওপ্যাথিক-কাউন্সিলের দুটি অফিসে পর পর কয়েক দিন হামলা চালায়। কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষদের হামলার ফলে ওই দুটি কাউন্সিল অফিসে ওই সময়ে কোন অফিসিয়াল কাজই করা সম্ভব হয় নি। এদের এই হামলার ফলস্বরূপ কাউন্সিলের কোন কর্মচারী এবং কর্মকর্তা ওই দুটি অফিসে যেতেও পারেন নি। ওই কংগ্রেসী ছাত্রদের সঙ্গে বেশ কিছু ছাত্রীও ছিল। এদের হামলার সময়ে এরা বা থিথি খেউর করেছে, তাতে এদের আর ছাত্রছাত্রী বলে গণ্য করা চলে না। বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের স্থানীয় অধিবাসীদের একাংশ বলেছেন যে, ওরা কাউন্সিল অফিসে হামলা করার সময়ে যে অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করেছে এবং যে আচরণ করেছে তাতে প্রমাণ হয় যে, ওরা ভবিষ্যত ডাক্তার হওয়ার সম্পূর্ণ অঙ্গপ-

যুক্ত। ওরা প্রায় সমাজবিরোধীদের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

হামলাকারী কংগ্রেসী (ই) ছাত্র-দের দাবী ছিল যে, বিগত হোমিও-প্যাথিক পরীক্ষার যে সব ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে, তাদের শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর গ্রেস দিয়ে পাশ করাতে হবে। তাছাড়া, গণ-টোকাটুকির ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগ রেকর্ড করা চলবে না।

হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলের জর্নেল মুখপাত্র কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষদের কর্মীদের ওই দাবীকে সম্পূর্ণ অর্থোজিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, যারা ভবিষ্যতে ডাক্তার হবেন এবং যাদের হাতে রোগীর "জীবন-মরণ সমস্তা" সমাধানের দায়িত্ব থাকবে তারা পড়া-শুনা না করে জোর করে পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট আদায় করবে—এটা হতে পারে না। অথচ, কংগ্রেসের (ই) ছাত্রছাত্রীরা ওই ছাত্রপরিষদের নেতৃত্বে কাউন্সিল অফিস ছাটিতে হামলা করে তাই চেয়েছিল। কিন্তু, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাছে মাথা নত করেন নি। তাঁরা কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের মতামতকেই "সম্মান" দিয়েছেন।

হোমিও কাউন্সিলের ওই মুখ-পাত্রটি এ সম্পর্কে বলেছেন যে, সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী বিগত অক্টোবর মাসে হোমিওপ্যাথির ডি এম এস কোর্সের প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র ছাত্রীর রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। একনম্বর কেন্দ্র ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আন্তঃভাষ বিভাগে, দ্বিতীয় কেন্দ্রটি ছিল মেদিনীপুরে, তৃতীয় কেন্দ্র বড়গ-পুরে এবং চতুর্থ কেন্দ্র সাঁইথিয়াতে স্থাপন করা হয়।

স্বার্থাতি পরীক্ষা শুরু হয়। গণ-টোকাটুকির অভিযোগও পাওয়া যায়। আন্তঃভাষ বিভাগে পরী-ক্ষার্থীদের মধ্যে গণ-টোকাটুকি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। অগত্যা অবস্থা বেগতিক বুঝে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পরীক্ষা নির্ধারিত শেষ তারিখের আগেই মাঝপথে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট পরীক্ষা পরে অর্থাৎ জাম্মায়ী মাসে নেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য, গণ-টোকাটুকি ব্যাপারে প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্রছাত্রীরাই জড়িত ছিল এবং প্রায় তিন'শ ছাত্রছাত্রীকে হাতে নাতে ধরে তাদের বিরুদ্ধে অভি-যোগও রেকর্ড করা হয়।

অতীত ছাত্র সংগঠনগুলি যদিও এ ব্যাপারে চুপচাপ ছিল, তবুপি কংগ্রেসের (ই) ছাত্র পরিষদের কর্মী, সদস্য ও সমর্থকরা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফেল করা এবং গণ-টোকাটুকির অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রেস দিয়ে পাশ করানোর দাবীতে কাউন্সিলের বিরুদ্ধে অর্থো-জিক ভাবে আন্দোলন শুরু করে দেয়।

অবশেষে, অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং 'আলাপ আলোচনার পরে হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ ফেল করা ছাত্রদের একাংশকে শত-করা ২৪ ভাগ নম্বর গ্রেস দিয়ে শত করা ৫৪ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে উত্তীর্ণ বা পাশ করানোর ব্যবস্থা করেন।

বিল্ডিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি
(সহায় ইতিহাস এবং অর্থ নিয়ন্ত্রণ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত কারকদের কাছ থেকে টেওর নং, কাজের নাম ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী বরতিস্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল্য করা টেওর :

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
রেফা: নং : জি এম / কেডা / ই ই (সি) টেওর / ১০৫৮/১০৬০২ তার ২৮-৩-৮০

অস্থায়ী আবাস নির্মাণের জন্য। ২×৩=৬ (ছয়) রকের জন্য প্রত্যেকটি কাজের আনুমানিক খরচ ১,৪৫,৫৪৫.৭২ টাকা। ২৫-৪-৮০ থেকে ৩০-৪-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে এরিয়া অফিসের কেশিয়ারের কাছে প্রতি দেউর জন্ম (ছটি রক) নগদে ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা মাত্র) দিয়ে (অপ্রত্যাশিত কারণে) একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের (সিভিল) অফিস, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেডা এরিয়া, পোঃ বহলা, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে টেওরপত্র পাওয়া যাবে। ১-৫-৮০, বেলা ২-৩০ টা পর্যন্ত টেওর গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩টায় তা খোলা হবে।

সাধারণ : কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিতল টেওরে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিমারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা লজিস্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেওরের কি বাবদ যদি অর্ডার টেওর গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌঁছাতে হবে। টেওরদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওর খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওরদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

রাইটাস-পথিক ভোলাদা

সংকটে দেশ জর্জরিত : নেতৃত্ব বিহীন

কালিদাস কুণ্ডু

শ্রীপতি নন্দী

এবারের বিধানসভার প্রধান আকর্ষণ ভোলাদা। বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে আত্মভোলা ভোলাদা দীর্ঘদিন একেবারেই ভুলে যেতে পারেননি যে তিনিই ভাতার ভাতার, ভাতার ভাতার মাছের হুগুংখের কথা ধরা-বস্তার কথা পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দায় যে ছিল তারই। দীর্ঘদিনের আইনজীবী, এবং কংগ্রেস-দলীয় বাহুঘটির পক্ষে দেশ সেবার কাজটা দীর্ঘদিন ভুলে থাকা সম্ভব নয়; তাই ভুলে-থাকার ভুল শুধরে নিতে ভোলাদা ভুল করেন নি।

ভোলাদাই দেখাতে পারেন, নিঃশাস বন্ধ করে যে ব্যক্তি আইন-সেবা করতে পারে প্রাণপন দিয়ে সে দেশসেবাও করতে জানে—চাই তুঁৎ দেশসেবার ছাতি-কাটা তুঁৎ। রাখে রাখা মারে কে? প্রার্থনা থাকলে আকাঙ্ক্ষা মিটেবেই, জলের অরুণা করবে—মরুভূমির সামনে মরুভূমির ছায়াপথ। কিংবা হতে পারে মরুভূমির হাতছানি; কিন্তু দম হারালে চলবে না, হুঁম-তেওয়ার চাই হুঁম প্রচেষ্টা।

দিল্লীর আকাশে কালোমেঘ পশ্চিমবঙ্গের কালোহায়া ফেলেছে; তুঁৎ চাতক কাপড়ের কাপড়ের উল্লসিত হয়ে উঠছে—নিভুল নিশানার উড়ে চলে ভাতার ভোলাদা সেন—নহে নহে “নাটো-য়ের বনজতা সেন”।

ভোলাদা উকিল, ভোলাদা বাগিষ্ঠার। কারো পাতে তিনি ভাত যোগাতে পারেন নি, এতে এমন আর কি আছে? আর যেমনই বা কি উপায়ে? ভাত দিতে হলে জমি দিতে হয়, জমি-চোরদের ভূমিভাগ্যে কাঁটা পড়ে; আইনজীবী যদি আইন মানে তবে আইনশৃঙ্খলা গোলার যাবে। জোত-খাই বেশী তার বিদেটা বেশী বলে। আর ‘ট্যাগার্ড অব লিভিং’ বলেও তো একটা বস্তু আছে—যার যেমনটি সাধ-আহ্লাদ তার তেমনটি চাই; আর এতটাই চাই ধনধান্যপুণ্ডে ভরা বস্তুরার একাংশের আধিপত্য— একেবারে ফাগুমেটাল রাইট। আইনজীবী ভোলাদা এসব বোঝেন, আইনমেনে চলেন।

কিন্তু তাই বলে একেবারে বসে থাকেন নি ভোলাদা। সেবার্ধে দীক্ষিত-প্রাণ মাহুধ কতদিন ভুলে থাকতে পারে আশম স্মহান সেবা-ধর্মকে? ভাতারের জনপ্রতিনিধির

করণীয় কাজ সবই একে একে করে গেছেন ‘ভাতারের বিধকর্ম’। রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় বাসবাজীঘের জন্তে হুগুং ছাউনী, অর্গলবন্ধ নিউ মার্কেট, স্বরম্য অ্যাডমিনিষ্ট্রিটিভ বিল্ডিং, আবাসিকবিহীন বিশাল বিশাল কোয়ার্টার ভবন ইত্যাদি স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সূতপূর্ব পি ডবলু ডি মজীর অক্ষর জয়গানে আলো মুখর। বিচিত্র কারুকার্য খচিত পণ্ড হাস-পাতাল হুগুটি আর গাছী আরক ভবনটি পি ডবলু ডি-র ময়দানবদের কীর্তিরূপে যেমন ভোলাদাকে ভাতারে অমর করে রাখবে, তেমনি ভাতারের ক্ষুদ্র পণ্ড সেন বংশীরদের নামাঙ্কিত মরু মরু রাষ্ট্রীয় ফালিগুলি সেন বংশের স্মহান ঐতিহ্য রক্ষার জনমনে প্রেরণা দেবে।

অতীত তার জানা, বর্তমান মুখর, ভবিষ্যৎ নথ-দর্পণে, অতএব ভোলাদা ত্রিকালজ্ঞ। আবার ভোলাদা কাল-অকাল-বুদ্ধ; কাল অকালের ব্যবধান বোঝেন, তাই অকাল বোধন করেন না। অতএব, যথাসময়ে এসেছিল-পথিক হয়েছেন। আবার একই ভোলাদা কাল-অকালের মিলন ঘটতে সক্ষম; অতএব, এ জুন মাসেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবু-কলে ড্রেস রিহার্সাল দিচ্ছেন। ফেভারেল ষ্ট্রাকচারের পরমার্শগুলি যখন যেমন সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখনই ভোলাদা কল্পে মনস্য শিকার করতে হয় এ সন্ধান তার জানা।

কিন্তু সব জ্ঞানের সেবা জ্ঞান যার আছে তিনিই কণ্ঠস্বর। অপর্য পেশাংশ ৭ম পৃষ্ঠার

বি ডি ও অফিসে কংগ্রেসীদের হামলা

বাকুড়া জেলার কোতালপুরের বি ডি ও অফিসে ২ এপ্রিল একদল কংগ্রেসী ঢুকে অফিসটি লুণ্ঠন করে দিয়েছে। ওরা সরকারী কর্মচারীদের টানা হ্যাঁচড়া করেছে, উপস্থিত পুলিশকে মেরেছে। হুঁজন ক নষ্ট-বলের পোশাক ছিঁড়ে ওদের সরকারী ব্যাজ কেড়ে নিয়েছে। এছাড়া থানার ও-দি সহ ৬ জন পুলিশ কর্ম-চারী কিন্তু কংগ্রেসীদের থামাতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছে। অবশেষে পুলিশ থানার ২ দিনের ১নং কেস ভাইরী করে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাক্তন কংগ্রেসী এম এল এ অক্ষর কোলের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দাপ্তরিক লোকসভার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতার ফিরে আসার আগে তাঁর ‘অসমাপ্ত বিপ্লব’ সম্পূর্ণ করার হুমকি দিয়েছিলেন। তবুও বসার অব্যবহিত পরেই তাঁর ‘বৈপ্লবিক কর্মসূচির’ অংশ হিসাবে নরটি অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকার বরখাস্ত করে তিনি পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। রাজনৈতিক পূর্ববেক্ষকদের ধারণা, এই নরটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বা-চনে ইন্দিরা গান্ধীর হল ক্ষমতা করারত করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা—এই তিনটি রাজ্যের বামপন্থী সরকার উচ্ছেদের অভিযানে তিনি যেতে উঠবেন। ইন্দিরা গান্ধীর পরোক্ষ মদতে ইতি-মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র মুখার্জীর নেতৃত্বে যে অবরোধ আন্দোলন পরিচা-লিত হল তার প্রধান উদ্দেশ্য গোপন থাকেনি। অল্প প্রদেশ থেকে নির্বা-চিত লোকসভার সদস্য কমল নাথের বিবৃতি আন্দোলনের লক্ষ্য ও অভি-সন্ধি নগ্নভাবেই উদ্ঘাটিত করেছে।

ওই ধরনের কার্যকলাপ ছাড়া ইন্দিরা কংগ্রেসের আর কী-ই বা করার আছে? দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোচনের মর্যাদ তাদের নেই। সত্তরের দশকের প্রথমভাগে সাময়িক উদ্দীপনা সৃষ্টির চমক ছিল। ব্যঙ্গ জাতীয়করণ, রাজস্বভাতা বিলোপ, তথাকথিত ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ’ ইন্দিয়ার আব-যুতিকে জনমানসে সাময়িক চাক-চিক্য দিয়েছিল। এখন দেশ গভীর সংকটের আবর্তে। বহুজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ছুঁহাতে মুনাকা লুটছে। চিনি-ব্যবসায়ীরা ভো অগ্নিরাজ্যে বাস করছে। অত্যাচারিত পণ্যসমূহের উল্লসিত অগ্রহিত। সিমেন্টের চোরা কারবার চলছে অব্যাহত। শহরের মাহুঘের পক্ষে ভ্রষ্টভাবে জীবন বাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গ্রামা-ঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মাহুঘের জয় ক্ষমতা ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে। প্রান্তিক চাষী, ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষকদের জীবন হুঃসহ হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকটের চাপে দেশের নাভিখাস উপস্থিত। দেশের এই লর্ঘব্যাপী সংকটের মুখে দংসদীর গণতন্ত্রের পাণ্ডারা আত্মকলহে মগ্ন। জনতা পার্টি ভেঙে টুটরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সি, পি, আই, ইতি-মধ্যেই বিভক্ত। সি, পি, এম, একাধক থাকলেও আত্মরক্ষার রণ-কৌশল নির্ধারণে ব্যতিব্যস্ত। দেশকে, জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিকল্প শক্তি অসুপস্থিত। এইরূপ, পরি-

স্থিতিতে দংসদীর গণতন্ত্রের বাহ্যিক ঠাট বেশীদিন টেকসই হয় না।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বিরোধী দলগুলোর বিপরীত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেই ইন্দিরা বৈরতম্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি। ইন্দিয়ার হাত শক্তিশালী হচ্ছে। গণতন্ত্রের সংকট এগিয়ে আসছে।

সময় এখনও আছে। একাধক হলে যে বৈরতম্যকে ঠেকানো যায় তার দাপ্তরিক প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা। এই তিনটি রাজ্যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বাম-পন্থীদের নেতৃত্বে একজোট হয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসকে হারিয়েছে। এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে। হিন্দী-ভাষী প্রদেশগুলির মধ্যে বিহার, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে ইন্দিরা এবার সংখ্যালঘু ভোটে সংখ্যাগরি-ষ্ঠতা লাভ করেছে। জনতার ভোট বিস্তৃত না হলে ইন্দিয়ার বিজয় সম্ভব হত না। আসন্ন বিধানসভার নির্বা-চনগুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ব্যাপক ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলে ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে জয় ছিনিয়ে নেওয়া খুব সহজ হবে না। চরণ, অগ্নীবিন, রাজনারায়ণ ঠেকেও শিখলেন না। তাঁরা এখনও বিবাদের মত্ত। সি, পি, আই-সি, পি, এম, একাধক গুরু করেছে। আর্স কংগ্রেসের সঙ্গে তারা আলোচনা চালাচ্ছে। আশাকরি, লোকদল, জনতা (এম) এবং জনসংঘ প্রভাবাধীন জনতা একেবারে আস্থানে এগিয়ে আসবে।

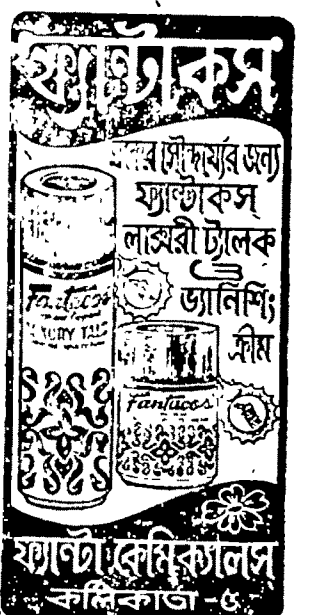
সি, পি, আই, (এম, এল) নির্বা-চনের প্রস্তুতি বিধা বিভক্ত। সত্য-নারায়ণ পন্থীরা ইন্দিয়ার বিরুদ্ধে বামপন্থী-একোয় পক্ষে অভিমত রেখেছেন। পার্টির সেক্রেটারী চন্দ্রপুজা রেড্ডী কোথাও নির্বাচন বর্জ-নের পক্ষে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করা কোনও রাজনৈতিক দলের আত্মসম্মতি ব্যাপার। কিন্তু বৈর-তন্ত্রের বিপদের মুখে মার্কসবাদীরা বিভক্ত থাকলে দেশের বিপদ।

শাসক শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকার আজ চরম সংকটের মুখে। তারা সংকট থেকে পরি-ত্নাপের আশায় প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াচ্ছে, বিচ্ছিন্নতার প্রবণতাকে প্ররোচ দিচ্ছে, গোটা দেশকে অন্ধকার ও বিভেদের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এটা বুজোয়াশ্রমীর আত্মরক্ষার কৌশল।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী শক্তিগুলি পাণ্টা কোন্ কৌশল গ্রহণ করবে? তারা প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে ধর্মগত, ভাষাগত বিরোধের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সংগ্রামলব্ধ চেতনার কাছে বিভেদের রাজনীতি পরাজিত হতে বাধ্য।

ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বুর্জো-য়ারা সংকট সৃষ্টি করে। সংকটের বিহীনতা থেকে দেশকে পরিত্নাপ করতে পারে না। ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় জাতীয় ভাগ্য নিধারণের অধিকার ও সুযোগ পেয়েও সংকটের মুখে বিহীন হয়ে পড়েছেন। আশা-মের আন্দোলন ও পশ্চিমবঙ্গের পাণ্টা আন্দোলন প্রমাণ করেছে কংগ্রেস (ই) দেশের শাসন পরিচালনার অক্ষম। আন্দোলনকারীরা ইন্দিয়ার নির্দেশ মানেনি।

জাতীয় সংহতির বিরোধী শক্তি-গুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ক্ষমতার আসার আগে ইন্দিরা স্বামী সরকারের স্লোগানে আসন্ন গরম করেছিলেন। জাতীয় সংহতির বিনিময়ে সরকারের স্থায়িত্ব হয় না। আসলে দেশের ধনিকশ্রেণীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী এখন স্ত্রীংয়ের পুতুল। বামপন্থীশক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দেখে দেশী-বিদেশী ধনিকশ্রেণীর বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। দেশের ভিতরে বিশ্বংখলা সৃষ্টি করে তারা গণতান্ত্রিক আন্দো-লনকে দমিয়ে রাখতে চায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও উগ্র প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে তারা বামপন্থীদের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এইরূপ পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের গণসংগঠনগুলিকে জুত আন্দোলন মূখী করে তোলা প্রয়োজন।



ফ্যান্সি ব্র্যান্ডের জুত ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই



এপ এ্যাণ্ড সুপার এপ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্য চিত্র নির্মাণে বাট হান্সজার এক বিশেষ স্থান আছে। তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টি 'এপ এ্যাণ্ড সুপার এপ' ছবিটিতে সেই স্থানটি শুধু অক্ষুণ্ণই থাকবে তা নয়, আরও উন্নত রাজ্য বৃত্ত হবে। এটি একটি তথ্য চিত্র, কিন্তু উৎকৃষ্ট কাহিনী চিত্রের মধ্যে যে আকর্ষণ ও আবেদন থাকে, তা এই ছবিটির মধ্যেও পুরোপুরি বজায় আছে। রলেই এক মুহূর্তের জন্য ছবিটি আমাদেরকে অস্তমিত থাকতে দেয় না। আত্মিক পারিপার্শ্যে বিরল নৈপুণ্যের সাক্ষ্য যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় বক্তব্য বিষয়ে এক বিশ্বকর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

কীট পতঙ্গ, লাপ, ব্যাঙ, ছাগল,

ভেড়া, কুকুর, নেকড়ে, হরিণ, পেঙ্গুইন, হাতী, ভিঙ্গি, হাঙর, গিল্পাঙী ইত্যাদি জন্তু জামোয়ারের জীবন-যাত্রা, শিকার সংগ্রহ ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম যেমন কোতুলী দৃষ্টি নিয়ে দেখি, তেমনি পাশাপাশি ইতর জন্তু অপেক্ষা প্রেতের দাবীদার মানুষের লংসারেও অহরহ লীলা খেলা আমরা প্রত্যক্ষ করি ছবির পর্দায়। কিন্তু ছবিটির বৈশিষ্ট্য ও মহিমা হল, সেই প্রেত জীব মানুষও ইতর জানোয়ার অপেক্ষাও কত নীচে মেয়ে অমানুষ হয়ে ওঠে শুধু ক্রমতার সোতে ও দাস্তিকতার দাপটে, তারই অপরূপ দৃষ্টময় উন্মোচন। সেই বিচারে ছবিটির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে ভীর স্নেহ।

ছবিটি দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়না, বনে জঙ্গলে পাহাড় সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে কত পরিপ্রসন্ন আর যত চমকিতকার ছবিটি তুলেছেন বেশ কয়েকটি বছর ধরে। আর শুধু তাই নয়—কি অসামান্য মূল্যায়ন তিনি রূপালী পর্দায় সেই আরণ্যক পরিস্থিতির বাস্তব-বিভিন্ন ঘটনাসমূহ, আবার আবেদন রেখেছেন—মানুষ কি লতাই স্বর্গদ্বার মানুষ। সমুদ্র তটে পেঙ্গুইন পাখীর অগণন সমাবেশের সেই নান্দনিক দৃশ্যই বা তুলনা কোথায়। অরণ্যের হিংস্র জন্তুর নির্মম হিংসা দেখে যেমন শিহরিত হই তেমনি যুদ্ধ মেশাস মস্ত কয়েকটি সামরিক বাহিন্য শহরের পর শহর ধ্বংস করে দিচ্ছে দেখে লজ্জায় লুপ্তিত হই। ক্যামেরার কাজ অসাধারণ তেমনি অসাধারণ সম্পাদনার কাজও। আবহ সংগীতের মাধ্যমে ছবির 'মুদ্র' ফুটিয়ে তোলার কাজ কিন্তু সে তুলনায় কিছুটা দুর্বল। শব্দ গ্রহণ অবশ্য প্রশংসনীয়।

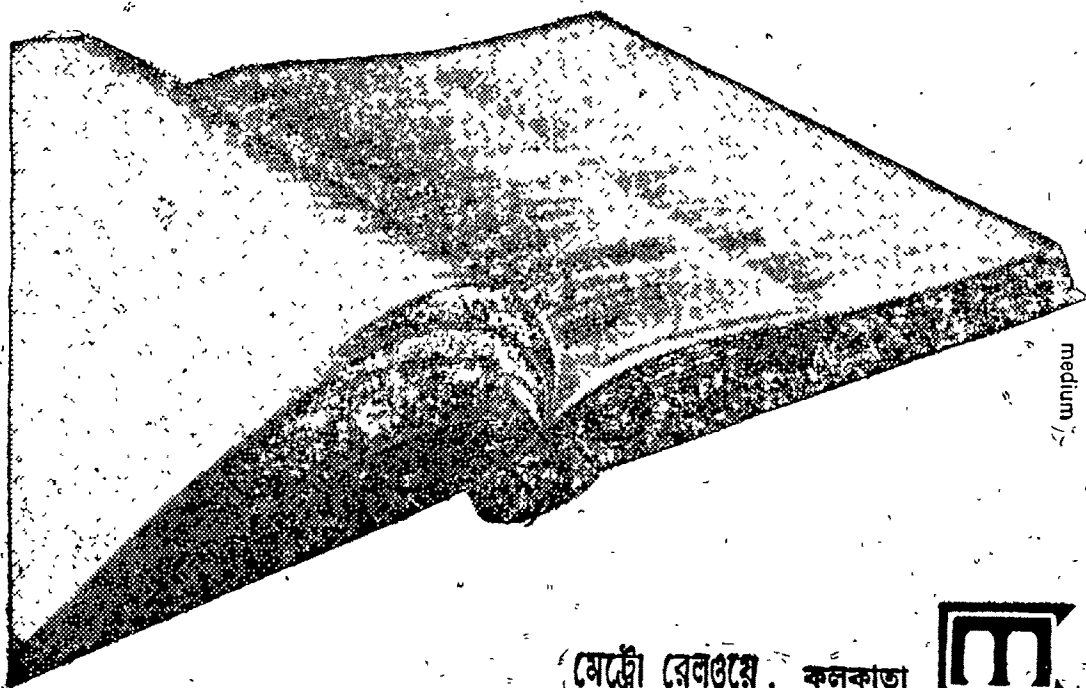
বই জানের সীমান্তকে প্রসারিত করে। অভিজ্ঞতার নির্ভীক, নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। আর, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যত উপলব্ধ হয়, তাকে সময়ে লালন করে তোলে।

বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে অন্তরঙ্গ করার যে সেতুবন্ধ, যার আর এক নাম যোগাযোগ, তার একান্ত প্রেরণার উৎস বই।

বই-ত্রির প্রভাবে রিপুলা এই পৃথিবীর সীমারেখা সংকুচিত হয়ে ওঠে। অপরিচয় সৌহার্দে পরিণত হয়। সর্বত্র সব কিছুই তখন মনে হয় পরিচিত। এমনি করেই তাঁর অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ রচিত হয়। হৃদয়ে হৃদয় যোগ হয়।

এ আমাদের উপলব্ধ সত্য। এই সেতুবন্ধের, এই যোগাযোগের ব্যাপারী তো আমরাও। দূরকে নিকট করার। পরকে আপন করার।

অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ



মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা



তিহার জেলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড

এই সমাজ ব্যবস্থার দুর্নীতি আজ প্রতি স্তরে-প্রতি স্তরে ঘুর ঘুর বাসা করে নিয়েছে। অপরাধীদেরকে জেলে পাঠানো হল, আর তাদের সংশোধনের দ্বারা রক্ষক তাঁরাই অপরাধ করতে থাকেন। পশ্চিম-বঙ্গে তো এসব ব্যাপার লুকলেরই জানা। এবার তখন খোদ রাজধানীর বুকে তিহার জেলের কথা।

আদালতে দণ্ডিত রাকেশ কৌশিক এখন ঐ জেলে আছেন। তিনি স্থলীম কোর্টে একটা দরখাস্তে তিহার জেল সুপারের বিরুদ্ধে অত্যাচার, নির্যাতন, দুর্নীতি, ওষুধ, মাদকের চোরাকারবার ও সমকামিতার অভিযোগ করেছেন। বিচারপতিশ্বর কৃষ্ণ আয়ার ও ফজল আলি দিল্লি প্রশাসন ও উচ্চ সুপারিনটেনডেন্টের কাছে এ লকল অভিযোগের তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত অনেক সুবোধ মার্কণ্ডেয়কে এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে অহরহ করেছেন ও আগামী ১৫ এপ্রিল তৃতীয় দিন ঠিক হয়েছে। রাকেশ কৌশিক ও অন্তত বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার

অন্ত লিয়ার্ডওয়াকে সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা দানের নির্দেশ আদালত থেকে সুপারের কাছে পৌঁছেছে। শ্রীকৌশিক-ভিজিলেন্স বিভাগেও জানিয়েছিলেন।

পরে সুপার ও ডেপুটি সুপার শ্রীকৌশিককে তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য একটা এফি-ডেভিটে স্তর দেখিয়ে বলপূর্বক লই করান। জেলের অনেক বিদেশী বন্দী নাকি গোড়ালিতে একটা উচ্চ-কমতাসম্পন্ন টেপ রেকর্ড লাগিয়ে উক্ত দুই জেল অফিসারের কীর্তি ধরে নিয়েছে এবং যা কাজে লাগিয়ে ঐ বিদেশী ব্যাকমেইল করে থাকে। ব্যাক ভ্যাম ডাক্তারি মামলার অন্তত আসামীদের সঙ্গে ঐ বিদেশী জেলের মধ্যেই মদ-গাঁজার কারবার চালায় এবং বস্ত্রত রাজধানীর সমগ্র জেল এখন বেন ঐ বিদেশীর উপনিবেশ রাজ। এছাড়া ও সুপার ও অন্তত অফিসারদের বিরুদ্ধে টাকা তহরপ, জেলের কারখানা ও ক্যান্টিনের মালপত্র নয়-ছয় হওয়ারও অভিযোগ আছে।

বহরমপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সি ই এস সির মতো বহরমপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীও বেনর-কারী মালিকানাধীনে চলছে। অবশ্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর মতো এদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন কেন্দ্র নেই, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের থেকে বিদ্যুৎ কিনে এই সংস্থা শুধু সরবরাহের ব্যবসা করে। এই কোম্পানী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বহরমপুরে আলোচনা হচ্ছে, জনসাধারণ এই সংস্থা অধিগ্রহণের দাবি করেছেন, কর্মচারীরাও লড়ছেন—তথাপি অবস্থাটা পূর্বেও যা ছিল এখনও তাই আছে। অথচ কোম্পানীর লাইসেন্সের মেয়াদ তিসাত্তর সালের ৭ ফেব্রুয়ারী শেষ হয়েছে।

শ্রীজয়ন্ত বিশ্বাস ৮৮এর ২৬ মার্চ বিধানসভায় এই কোম্পানীর অধিগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উত্তরে বলেন যে, কিছু আইনী বামেলা আছে। এর কিছুদিন পরেই কোম্পানী বিদ্যুতের দায় বাড়ায়। এর প্রতিবাদে তখন আন্দোলন শুরু হয় একটা নাগরিক কমিটির পতাকাতলে। এই নাগরিক কমিটির এক প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন—যে শীঘ্রই কোম্পানিটি জাতীয়করণ করা হবে, বেতারেও তা

প্রচারিত হয়েছিল। ২২ ডিসেম্বর, ৭৮ ভৈরবতলা বাটে নাগরিক কমিটির এক জনসভায় জেলার মন্ত্রী শ্রীবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই ঐ কোম্পানীর জাতীয়করণের আশা লাগিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার আন্দোলনের অন্ত রেট বাড়াতে অসম্মতি দিলেন না কোম্পানীকে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ কোম্পানীর অত্যাচারে অর্জিত হচ্ছেন, একসঙ্গে তিন চার মাসের মোটা বিল হঠাৎ এসে হাজির হলো। সময়ের মধ্যে দিতে না পারলেই লাইন কাটা যাবে। অথচ রাজ্য সরকার কোম্পানীর কাছ থেকে এখন প্রায় বিশ লাখ টাকা মতো পায়। কোম্পানী রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ঐ বকেয়া টাকা মেটাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অনেকের মনেই যে, বিদ্যুৎ পর্ষদের উচ্চপদস্থ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে কোম্পানীর একটা বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীএ কে জৈন অফিসে আসেন না বললেই চলে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এ ধরনের ৪৫টি কোম্পানি অধিগ্রহণ করেছে, তাহলে বহরমপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী অধিগ্রহণে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে কেন।

একটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে

শতাব্দী-উত্তরকালের প্রায় এক শতাব্দী বাবত বাংলায় চলছে যখন 'মাস জায়' অবস্থা তখনই দেশের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত করেন তাদের প্রতিনিধি—তুলে দেন বাংলা শাসনের ভার সেই বিচক্ষণ জন প্রতিনিধি গোপালের উপর।

ইতিহাসের পাতা থেকে যে তথ্য আমরা পাই, তার সারমর্ম এইরূপ। কিন্তু, কর্তৃত্ববর্ণের পরে বাংলার রাজধানী যে কোথায় ছিল তার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে না কোথাও। ই ১৫০ খ্রিষ্টাব্দে গোপালের রাজধানী কোথায় ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত হওয়ার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে হয়।

পত্রলেখক তাই দেশের ঐতিহাসিকদের নিকট বিনীত আহ্বান রাখছে, তাঁরা যেম সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত পরিবেশন করেন।

উক্ত কিরণ চৌধুরী তাঁর প্রণীত 'বদেশ কথা' লিখেছেন—'১৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা....।'

কিন্তু প্রশ্ন, বাংলার সিংহাসন তখন কোথায় অবস্থান করছিল। কর্তৃত্ববর্ণের প্রাসাদে কি? হস্ত বা সেখানেই। কিন্তু কর্তৃত্ববর্ণের প্রাসাদ থেকেই যে গোপাল দেশ শাসনের কার্য চালিয়ে ছিলেন একমাত্র তা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।

যাহোক, কিছু বিক্ষিপ্ত কারণেই পত্রলেখকের মনে এই প্রশ্নটি জেগেছে। কারণগুলি নিম্নরূপ।

অধুনা চাঁচলের সন্নিকটে একটি পুষ্কর সংস্কার তথ্য ধর্মব্রতের সময় একটি শিলাপাট সহ তিনটি ছোট শিলামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং বিগত কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত এই ধামায় এমন অনেক পুষ্কর সংস্কার করার সময়ই বেশ কিছু শিলামূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলিতে বৌদ্ধভাবের প্রভাব রয়েছে বলেই অনুমিত হয়।

মালদা জেলার দু'টি গড় রয়েছে। একটি গৌড়ের গড় ও অপরটি কাণ্ডারপের গড়। গৌড়ের গড়ের পার্শ্বে বিস্তারিত পুরাকীর্তিগুলি মনে কোন সঁপের জাগায় না। কিন্তু কাণ্ডারপের গড়ের আশে পাশে তেমন কোন পুরাকীর্তির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না।—আর হয় না বলেই কি এর সম্পর্কে কোন অগ্রহ থাকার অবকাশ নেই।

এই গড়টি যে নৈসর্গিক কারণেই হয়েছে এমন মনে করার আশা

কোন কারণ রয়েছে বলে মনে হয় না। গড়টিকে ঘিরে রয়েছে অর্ধ বৃত্তাকার একটি খাল, যেমনটি রয়েছে গৌড়ের গড়ের পার্শ্ববর্তী খালটি। অতএব সঙ্গত কারণেই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, দেশাধিপতির অস্থান ব্যতিরেকে এমন ধর্মব্রতের গড় গড়ে উঠতে পারে না এবং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কোন এক দেশাধিপতির আবাসস্থান ছিল এই গড়েরই অভ্যন্তরবর্তী জনপদগুলির কোন একটিতে। এই অভ্যন্তরবর্তী এলাকাগুলিও এককালের সমৃদ্ধিশালী

মতামত

জনপদের সাক্ষর বহন করেছে। জনপদগুলির নামও বৈচিত্র্যময়। যেমন, বঙ্গপাল, ডোমনভিটি (সম্ভবতঃ ধর্মভিটি শব্দের রূপান্তর) দক্ষিণ শহর, সজিব, বীরহলী প্রমুখ। এগুলি যে প্রাচীন জনপদ সেকথা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত Village Dictionary of Malda District গ্রন্থখানিতেও উল্লেখ রয়েছে। আর শিলামূর্তিগুলির অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়েছে এই জনপদগুলিতে অথবা তদনুসন্ধিহিত পুষ্করগুলি থেকেই।

তাই পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে বিনীত আহ্বান, তাঁরা এতদাঞ্চলের রহস্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী হউন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শেখোক্ত শিলামূর্তি তিনটির একটি পত্রলেখকের নিকটেই রয়েছে। অতীত শিলামূর্তিগুলি চাঁচল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কবলে এবং চাঁচল পাঠাগারে [কুমার শিবদাস ইমসটিটিউট ও রাজা শরৎচন্দ্র লাইব্রেরী] সংরক্ষিত রয়েছে।

ঔপতি দাস

সংবাদের প্রতিবাদ

১১ই এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখের দূর্গ পত্রিকার ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন সংবাদে আমাকে জড়িয়ে যেসব কথা লিখেছেন তা অতীব দুঃখজনক।

১২ই মার্চ তারিখে কর্পোরেশনের অফিসের একটি ঘটনার সংক্ষেপে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুচিপাড়া থানার ও নিকে যে চিঠি লেখেন, তার একটি অংশ লিপি পাই। সে সংক্ষেপে আমার সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কোন আলাপ আলোচনাই হয় নি। আনন্দবাজার পত্রিকার ২২রা এপ্রিলের একটি খবরে জানিতে পারি যে অভিযোগ করা হয়েছে সি পি এম সর্গদেব কোন আইনজ্ঞের জুনিয়র নাকি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপর ঐ

ঘটনা সংক্রান্ত মামলা তুলে নেবার জন্ত চাপ দিয়েছেন। সেই খবরে আমার বা আমার কোন জুনিয়রের নাম ছিল না। সে খবর পড়ে চেয়ারম্যান হিসাবে (আইনজ্ঞ: যে অধিকার আমার ছিল ও আছে) ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একটি চিঠি লিখে জানাই যে কোন চাপের কাছে তিনি যে মতি স্বীকার করেন নি তার জন্ত আমি আনন্দিত এবং তাকে অজরোধ করি যেম আইনমত মামলা চালায় হয়। তাঁকে লিখেছিলাম যে ১২ই মার্চের চিঠির অংশ লিপি পাঠান ছাড়া তিনি আমাকে আর কিছু জানান নি। একথা সত্য নয় যে সেই চিঠিতে আমি ঘটনার "বিস্তারিত তথ্য" জানতে চাই। আমার চিঠির মধ্যে কোন 'প্রচ্ছন্ন হুমকি' ছিল বা আমি ঐ মামলার মধ্যে 'মাথা গলাবার' চেষ্টা করেছিলাম—এ বক্তব্য একেবারে অসত্য। আমার ঐ চিঠির মধ্যে সে ধর্মব্রতের কিছু মতামত ও ইঙ্গিত ছিল—এ অভিযোগ অতিসঙ্ঘিক। আমার বিশ্বাস আপনি নিজে সেই চিঠি পড়েন নি, কারণ তাহলে এই ধর্মব্রতের অপব্যবহার করা হ'তো না।

কোন 'দাম্ভাব্য' ব্যবসায়ীর জন্ত আমি কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট কোন সুপারিশ করি নি। তা হ'ত আমার নীতিবিকল। যদি আমার নাম করে বা আমার জুনিয়র পরিচয় দিয়ে কেউ কোন অজ্ঞার কাজ করার জন্ত চাপ দিত তাহলে আমাকে জানানো কর্তব্য ছিল বলে এখনও আমি মনে করি, কারণ তাহলে আমার মতামত আমি জানাতে পারতাম ও যা করণীয় তার ব্যবস্থা নিশ্চয় নিতাম।

আনন্দবাজার পত্রিকার ঐ মামলার ব্যাপারের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বঙ্গলীর আদেশকে জড়িত করা হয়েছে। সে সংক্ষেপে সরকারী প্রতিবাদে বেরিয়েছে, আপনার মন্তব্যে পড়েছে কিনা জানি না। আমার সে সংক্ষেপে কিছু বলার নেই। আপনার সংবাদের বহু অংশ বিচারধীন মামলার বিষয়, তাই সে সংক্ষেপে আমি কোন মতামত প্রকাশ করতে পারি না। তাছাড়া সে সংক্ষেপে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানা নেই বা কিছু বলার বা করার নেই।

কারণ সঙ্গে লড়াই করার মনোবৃত্তি নিয়ে আমি কাকেও চিঠি দিই নি বা সে মনোভাবও আমার নেই। আপনি লিখেছেন যে "হুজুর কেউ কাউকে ছাড়তে পারেনা" আমি খুব জোরের সঙ্গে জানাতে চাই যে এ বক্তব্য আমার সংক্ষেপে প্রয়োগ করা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। কারণ আমি কারো সংক্ষেপে কোন

ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অভিযোগ পোষণ করি না। কারো সঙ্গে আমার কোন প্রকার মোকাবিলা করার প্রয়োজন বা মনোবৃত্তি নেই। সুতরাং কাকেও ধরার বা ছাড়ার কথা আমার সংক্ষেপে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করে নিজ বা অপরের সংক্ষেপে ভাল বা মন্দ বলবার কোন পূর্বা বা প্রচেষ্টা আমার নেই। আর সেই প্রচার যদি অসত্যের ভিত্তিতে করা হয় তাহলে যে তার পিছনে কোন অভিসন্ধি আছে তা মনে করা খুবই স্বাভাবিক।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের কিছু উন্নতি করতে পারব এই আশা ও উদ্বেগ নিয়েই বাসকল্লি সরকার আমার উপর গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব পালন করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তার জন্ত বহু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে, কোন অসুস্থত্ব নিয়ে কোন কাজ করি নি বা করি না। আমার বিবেক এ সংক্ষেপে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের দূরদূর কাঙ্ক্ষা আমি কর্পোরেশনের সমস্ত অফিসার, কর্মচারী ও জনসাধারণের সহযোগিতা, সমর্থন প্রত্যাশা ও কামনা করি। কর্পোরেশনের কাজের ক্ষতি করার কোন বাসনা আমার থাকতে পারে না। যার কৃতিত্ব যেখানে, সেখানে নিশ্চয় তার মাস্ততা হবে। কিন্তু আমি মনে করি কোন ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়, বিশেষ করে তা যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান বা জনগণের প্রতিষ্ঠান হয়।

আমার দুঃখ যে আপনি খবরের সত্যতা কোনরূপ যাচাই না করে বা আমার কোন বক্তব্য আছে কিনা তা না জেমে সংবাদটি পরিবেশন করেছেন। কয়েকটি বিষয়ে যা লিখেছেন তা আমার পক্ষে স্বীকার্যমান নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক হবে না—তাই এই সংবাদের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাইটাস পথিক ভোলাদা

৫ম পৃষ্ঠার পর

উৎসাহী সুনীতি তিন বছরে তিন শত বার ওয়াক আউট করে থাকলেও বালক সুনীতির মোহোপ, প্রবীণ ভোলাদার ইয়েসু হোপ—পশ্চিম-বাংলায় শ্রুত মননদে আগামী জুনের পর—বাহাদুরে দাঁড়াইটা 'রিপিট' করার পর.....

কংগ্রেসী বিধানে যে কোনও ব্যক্তি নেতা-নেত্রী হতে পারে, এজেন্ডা কোনরূপ কাণ্ডজ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয় না।

ফেডারেশন কাপ

রাণা ভট্টাচার্য

কলকাতা মহানগরের ৮০ সালের শুরু হচ্ছে চতুর্থ ফেডারেশন কাপের খেলা দিয়ে। আগামী ১৮ই এপ্রিল থেকে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ফেডারেশন কাপের খেলা শুরু হচ্ছে।

ভারতবর্ষের বাছাই করা বোলটি হল এই প্রতিযোগিতার অংশ নিচ্ছে। কলকাতার দুইজন অমরাগীরা খুবই উৎকর্ষা নিয়ে অপেক্ষা করছে কলকাতার তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলা দেখার জন্ত। কারণ—এবার হল বঙ্গের পর ইষ্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মেহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হলগত অবস্থা কি দাঁড়াল তা ঘোটাঘুটি আঁচ করার সুযোগ ক্লাব প্রেমীরা পাবেন।

প্রতিদিন দুটো করে খেলা রঞ্জি স্টেডিয়ামে হবে। বেলা দুটো থেকে প্রথম খেলা শুরু হবে। দ্বিতীয় খেলা শুরু হবে ৩।৪৫ মিনিট থেকে। মোট ৪টি বিভাগে হলগুলো ভাগ করা হয়েছে—

ক—ইষ্টবেঙ্গল, ডেমপো স্পোর্টস, মকতলাল স্পোর্টস, হিন্দুস্থান এরোনিটলস।

খ—মোহনবাগান, অগজিত কটন মিলস, মালগাঁওকর, ইতিহাস টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রি।

গ—গোয়ার দিসা ক্লাব, টিটানিয়াম, পাণ্ডাব পুলিশ, টাটা স্পোর্টস।

ঘ—মহামেডান স্পোর্টিং, ওরকে মিলস, প্রিমিয়ার টায়ার, ভাসকো ক্লাব।

খেলাগুলো সব ঠিকমত হলে ফাইনাল খেলা হবে ৮ই মে।

ধর্মঘট

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

অবশ্যই রয়েছে যদিও পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিলের নীতিগত অস্তিত্ব নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিক বিচারপতির রায় অন্তর্ভুক্ত অজানা হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তা অবশ্যই অজ্ঞাত নয়। অতঃপর সংরক্ষিত অঞ্চলের সমাচার সম্পর্কে মন্তব্য নিম্নরূপে। সরকার যেখানে নীরব দর্শক, মেডিকেল অ্যানা-মিয়েন্স যেখানে সংগঠক, সেখানে চিকিৎসা নৈব নৈব চ।

প্রেসিডেন্সী জেলে

১ম পৃষ্ঠার পর

একটা পায়ে পাঁচ/ছ কেজি তেল নিয়ে মেটকে গোটা ১০-১২ টাকা গুঁজে দিলেন। হিসেবটা দাঁড়ালো, ছ কেজি তেল বাড়ি গেল মোট ১৮ টাকা, কিন্তু সরকারী ঘরে গেল মাত্র ছ টাকা, বাকিটা 'বড়াকড়' লাইনে।

চলুন দুধ ঘরের খবর নিতে। লুপাল ছুটায় গেটে দুধের ত্যান এল। বড় বড় ক্যান আর বোতলে দুধ, 'বামনচী' কারারক্ষী সমিতির সদস্যরা প্রকাশ্যেই কেটেছি, বোতলে বিমি পরসার সরকারী দুধ ভরে বুক ফুলিয়ে চুরি করলেন আশ্চর্য দুধ। ইয়া, জ্যোতি বহুর রাজস্বের তিন বছরের মাথায় এ কারবার চলছে। ওরাও মিছিল করেন, দাবি করেন, 'মাইনে বাড়াও' আর 'বামনচী' সরকার সংগ্রামের হাতিয়ার।

আর বোতলের এক লিটার দুধ, ছ পাউণ্ডের মডার্ন ব্রেড একটা, চারটে ডিম, চারটে কলা আপনি পাবেন লগ্নাহে মাত্র পনেরো টাকা বন্দোবস্ত। ওগুলো কিন্তু যাচ্ছে বন্দীকপী-রুগীকপীদেব জন্ত। ঠিকাদারের কাছ থেকে কেনা হচ্ছে আমার-আপনার ট্যাক্সের পরসার। পাঁচশো গ্রাম আশুল বাটারের প্যাকেটও ওরা দেয় মাত্র পাঁচ টাকা।

এতো ভিটামিনের কথা, এবার শুধু গাঁজার কথা। পাঁচবার দম মারার মত পরিমাণবিশিষ্ট এক খাম গাঁজা মেলে তিন টাকা, সিপাইরা বাইরে ঐ খাম কেনে বেড় টাকা। মেটকের বিক্রি করে ছ টাকা। মেটরা লাভ করে একটাকা। প্রেসিডেন্সী জেলের ১ নম্বর আর্মদামী ঘর থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘরেই সব সময় দম্ মারো দম্। বাংলা চোলাই, দিমি বিদেশী মালও পাবেন। বোতলের দাম মশটাকা। ইয়া, একেবারে চাঁদের হাট। রাত দুটোর বাজার বলে বড় চৌকায়। জেল পেট খুলে যায় বরাকরের লাইনে। জেল বিধিতে প্রত্যেক

বন্দীকে যে পরিমাণ ডাল প্রত্যাহেবার বিধান আছে তার নিকিতাগ দিয়ে বাকিটা ঠিকাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে জমাদার মুক্তকৈ মনি অর্ডার করে, কর্তাদের গিল্লি। বেড়শো টাকার টিকেটে টিকিন কারিয়ার ভর্তি করে ইডেনে টেস্ট অথবা ফেডারেশন কানের খেলায় উল-কাটা বুনতে যায়।

কমল পাবেন পাঁচ টাকায়। সরকার কমল কিনলেন আর সিপাইরা লম্বা উইন্টার কোর্ট, রেইন কোর্ট গায়ে চাপিয়ে ছ বগলে ছোটো কমল নিয়ে বেজাজে বাড়ি যায়। শ্রেফ চুরি। তারপর পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা, পাঁচ টাকাই লাভ।

বড় পেতলের তাল চুরি হল, বাইরে বিক্রি হল। একটু জানা-জানি হলেই যে কোন আসামীর বাড়ি দোব চাপানো হল। আসামী দোব অধীকার করলে মেরাদীদের রেশন কাটা যায়। আর এই রেশন কাটার জুড় দেখিয়েই কর্তারা মেরাদীদের বশে রাখেন।

বাইরে যেমনি মাথাতারী ডাক্তাররা ৬৪ টাকা ফী নেন, হাসপাতালের সরকারী ডাক্তাররা যেমনি আউটডোরে একেই লাগিয়ে প্রাইভেট ব্যবসা চালান তেমনি প্রেসিডেন্সী জেলের চারজন ডাক্তারও এ ব্যাপারে পেছিয়ে নেই। বন্দী ও ডাক্তারবাবুর নগদ নারায়ণের খেলায় পাওয়া যায় বেডিকেল ডায়েট কার্ড। দুধ, মাখন, কলা, লেবু এই সব সরকারী পরসার ঠিকাদার পাঠালো বন্দী রুগীদেব জন্ত। কিন্তু পরসার অভাবে রুগী পেল না সে পথ্য অথচ পরসার জোরে নিরোগী পেল তা। আর চিকিৎসা? কংগ্রেসী আমলে নকশালপন্থী বন্দীদের ক্ষেত্রে এই ডাক্তাররা ঢালাও চালাতেন এ পি সি গুঁড়ো আর বামফ্রন্টের আমলে মচকে বাওয়া, পুড়ে বাওয়া, মাথাধরা, পেটব্যথা, গলাজালা, দাঁড়ি-কাপি, জ্বর—সব অসুখেরই একটা কমন বাওয়াই পেনাসিড ট্যাবলেট। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে পারলে উনি আপনাকে পিজি, মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর, নীল-

রতন হাসপাতালে পাঠাবার সুপারিশ করবেন, মশারিও পাবেন ডাক্তারবাবুর সুপারিশে, টাকার বিনিময়ে। ওদিকে কিন্তু ডাক্তারবাবু পৃথক একটা হাসপাতাল টিকিটে বন্দী রুগীদেব নামে দামী দামী ভিটামিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ লিখিয়ে সরকারের বাজেট থেকে কিনিয়ে তা বাইরে একটু দোকানদারি করেন।

আর ডেপুটি জেলার নারায়ণ দত্ত চৌধুরী তো জুড়ি মেলা ভার। কোথায় লাগে হাজি মজান, ইউজু-লাল, বুধিয়া। রাসের মুক্তির পর তাকে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের জেল পেট থেকে রিঅ্যারেস্ট করার কথা। শ তিনেক টাকা নগদ নারায়ণ করলেই রাসকে নারায়ণবাবু গোয়েন্দা পুলিশ আমার দুপটা আগেরই ছেড়ে দেবেন। রাসের হয়তো একটা দ্বিধা কোর্ট থেকে থানা

মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ নেবেন ?

আর, এস, পির একাদশ জাতীয় সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতায়। ৭-১১ প্রতিনিধি সম্মেলন হল মহাজাতি সম্মেলন। ৬ই এপ্রিল ত্রিগেড প্যারেড প্রাউণ্ডে প্রকাশ জনসমাবেশ দিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়। এতদিন পর্যন্ত সি, পি, এম ও বিশেষভাবে ইন্দিরা গান্ধীর লতাই হতো ত্রিগেডে। অস্ত্র কোন হল ওখানে জনসভা করেনি। আর, এস, পিও এ ব্যাপারে কুলীন হতে চেয়েছে, যদিও সেদিন ত্রিগেডে মঞ্চটা হয়েছিল বিড়লা দ্রাণেটাগিরাম থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, লতাইলটা দাঁড়িয়েছিল শহীদ মিনারের সম-জায়গায় আর সমাবেশে হাজার চরিশ লোক হয়েছিল।

এসব তো হতেই পারে। কিন্তু সেদিন সভাস্থলে গিয়ে অবাক হয়েছি অস্ত্র কারণে। এতদিন জামতাষ যে, লরি, টেম্পো করে লোক অমা বেআইনী। অথবা ডবলু একে ৬৮, ডবলু। আর এন ৬৩৩ ডবলু বি কিউ ১০৮৮ এই-নম্বরের লরিগুলোতে, ডবলু বি ভি ৩৬৪৩ টেম্পো করে জেলা থেকে লোক আনা হয়েছে। এর পূর্বে আর, এস, পির কোন সমাবেশে এত ভীষণ দেখিনি। ডবলু বি এ ২৩১৬, ডবলু বি বি ৫৫০৬, ডবলু বি সি ১২৩০ জীপগুলো পাওয়া গেল কোন সূত্রে ধরে? এই গাড়িগুলোর মালিকের নাম মাখন পাল দয়া করে জানালে বাধিত হবো। নতুবা নিদুকেরা বলতে পারে যে পূর্বে বা বাস্তু দপ্তরের সরকারী জিপ ব্যবহৃত

হাওতে বাওয়ার কথা আছে। থানার কচুয়া খোলাইয়ের হাত থেকে বাচার জন্ত শ খানেক টাকা নগদ নারায়ণ করলেই রাসকে নারায়ণবাবু 'সিক' অর্থাৎ অসুখ সাজিয়ে দেবেন। এছাড়া বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বাড়ীর মহিলারা এলে চোখে আসে লোলুপদৃষ্টি।

সম্মেলন ঐ বন্দী দেখেতেন বল-লেন, জেলের দলিল বেন সরকার সাবধানে রাখে। ওরা তো জেলই বিক্রি করে দিতে পারে। জেল সংস্কারের কথা শুনে ওরা বুড়ো আঙ্গুল দেখায়। ভিজিলেন্স কমিশনের কথা শুনে মূচকি হলে। সংস্কারজ্ঞে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ হলেও ওদের কুছ পেরোয়া নেই। রাজ্যের বাহাদুরী জেলেই এখন কালোবাজারীরা সমান্তরাল ব্যাক চালাচ্ছে। আলিপুর শেখ জা জেলের ব্যাকটা গুটিয়ে যাচ্ছে মাত্র।

ই সি এলে কম্পিউটার বসাবার চেষ্টা ব্যর্থ

হয়েছে। মঞ্চের পেছনে বিকল চারটের একটা স্টেশন ওয়ান দেখি, নম্বরটা হচ্ছে ডবলু এম বি ৫২৬৬ গাড়িটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছে বিশ্ব বাস্তু লংবা। আর, এস, পি, মঞ্চ এল কি করে? মুখ্যমন্ত্রী কি একটু খোঁজ খবর করে অবাক দেবেন।

ই সি এলে কম্পিউটার বসাবার চেষ্টা ব্যর্থ

ইষ্টার্ন কোলফিল্ডের আসান-সোলের ডাটা প্রেসেন্সিং সেন্টারে কর্তৃপক্ষ উচ্চ কর্মতাসম্পন্ন টি ডি সি ৩১২ নম্বর কম্পিউটার বসাবার চেষ্টা করেছিলেন বহুদিন ধরে। গত ৫ই ও ৭ই এপ্রিল কর্মচারীদের বিকোভের ফলে তা পারদ্রিক বাধা পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি অমাত্র করে এই কম্পিউটার বসানোর জন্ত এক বিরাট পুলিশী বাহিনী নিয়ে যান জৈনিক ম্যাজিস্ট্রেট।

১৯৭৫ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় প্রমুখী লোকসভা সদস্য শ্রীমত মুখার্জীকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইষ্টার্ন কোলফিল্ডে কম্পিউটার চালু করা হবে না। এই কম্পিউটার বসানো প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো অথবা ই সি এলের যুক্ত পরামর্শদাতা কমিটির

গুরুতর মতভেদ

১ম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধারা হওয়ার জনগণের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় নির্বাচন হলে নির্বাচনের ফলাফল দলের অসুস্থলে মাও বেতে পারে।

প্রবীণ নেতারা মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যমূল্য হ্রাসের যে প্রচেষ্টা তার ফল কয়েক মাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ফলে ক্রিনিস-পত্রের দাম কিছুটা কমবে। তাছাড়া রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হলে জনগণের মনে আশ্বাস ভাব ফিরে আসবে। বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মনে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে আশ্বাস ভাব ফিরে আসবে।

প্রবীণ নেতারা মনে করেন না, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হলে বিরোধীরা একজোট হয়ে যাবেন। প্রবীণ নেতারা মনে করেন, বর্তমানে বিরোধী দলের বা অবস্থা, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে একজোট হওয়া সম্ভব নয়। ফলে নির্বাচন কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়া হলে দলের সম্ভাবনা কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

উভয় পক্ষের যুক্তিই শ্রীমতী গান্ধী শুনেছেন। কিন্তু তিনি এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। ফলে নির্বাচনের দিনকণের ব্যাপারটা একটা দোহলায়ান অবস্থায় রয়েছে। নির্বাচন কমিশনও শাসক দলের মনোভাব পরিষ্কার জামতে না পারায় এ ব্যাপারে এপোতেও পারছে না।

তাছাড়া কিছুটা কৌশলগত কারণেও ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করছেন। কারণ আচ-মকা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে বিরোধীদের কিছুটা বিপাকে ফেলাও একটা উদ্দেশ্য।

সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি। ভারত সরকারের হায়জাবাদস্থিত ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লি: কর্তৃক নির্মিত থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার সিস্টেম নামে পরিচিত এই কম্পিউটারের সাহায্যে অতি অল্প লোকের দ্বারা বিরাট কাজ পাওয়া যাবে। এই সমাজ ব্যবস্থার যার ফল বেকারীর উপর ব্যাপক হাটাইয়ের বা। বাস্তবতা কমিটির রিপোর্টেও অবশ্য ইষ্টার্ন কোলফিল্ডে ব্যাপক হাটাইয়ের সুপারিশ আছে। আসানসোল থানার এখন মেশিনটা আছে। ৮ এপ্রিল এই মেশিন বসানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে একটা কন-সেনশন হয়। কনসেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে অটোমেশন বসানোর নিষেধ করে আগামীদিকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

পর্বে প্রকাশন

- ১। পান্ডিত্য দর্শনের রূপরেখা / শ্রীমদ্রামদাস দাস ও
শ্রীনিবন্ধ চক্রবর্তী / ২২'০০
- ২। প্রতীকী ন্যায় / শ্রীজহ্নার রায় / ৭'০০

৬৫, রাজা স্ববোধ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

নির্বাচন কমিটি গঠন নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ই-কংগ্রেসীদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ

দপন

নির্বাচন কমিটি গঠন করা নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস মহলে প্রবল বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। নরটি-রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে এই কমিটি গড়া হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কিছু প্রার্থী নেতা তাদের রাজ্যে নির্বাচন কমিটি যেভাবে এবং যাদের নিয়ে করা হয়েছে তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শুধু নয় তারা

রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

এই সব প্রার্থী নেতারা তাদের অসন্তোষ বা ক্ষোভ চেপে রাখতে চান নি। তারা অনেকেই সরাসরি নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে এসেছেন। এবং নির্বাচন কমিটি পুনর্গঠন করার ব্যাপারে ইন্দিরাগীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

সব থেকে বেশী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে উত্তর প্রদেশে। এই রাজ্যের প্রায় সব প্রার্থী নেতাই রাজ্যের শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

ত্রয়বিংশ বর্ষ। ১৪শ সংখ্যা। শুক্রবার, ২৫শে এপ্রিল, ৮০। ৬০ পয়সা

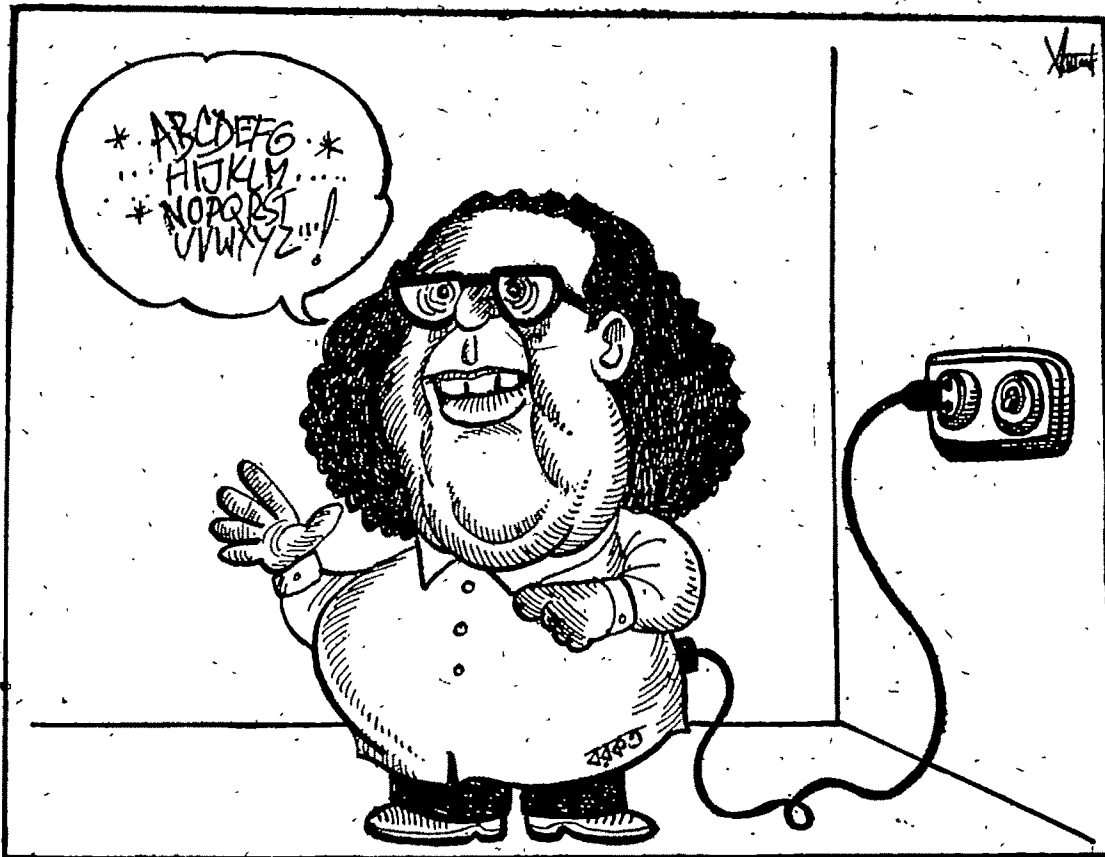
পুলিশের একটি অংশ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে

যড়যন্ত্র করছে

বিশ্বস্তৃত্রে জানা গেছে, পুলিশের একটি অংশ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে গভীর যড়যন্ত্র শুরু করেছে। ওরা ভাড়া নেজে নিজে-রাই প্রচার শুরু করেছে যে, আইন শৃঙ্খলা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ওরা বলছে, আটক আইন না থাকায় আসামীদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাছাড়া, ওরা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্পর্কে বলছে, বীনা-পুলিশ সমাজবিরোধী আসামীদের ধরে আদালতে পাঠালেও হাকিম পুলিশের বক্তব্য অগ্রাহ্য করে আসামীদের জামিনে ছেড়ে দিচ্ছেন। এর ফলে, সমাজবিরোধীদের শাস্তি করতে নাকি ওদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

অথচ, অপর দিকে আমাদের কাছে যে সংবাদ আছে তাতে জানা গেছে, ১৯৭২ সাল থেকে যে সব মন্তান কংগ্রেস ও পুলিশের একাংশের সহযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চরম ধোঁরাখ্য করেছে, এখন পুলিশের একাংশ আবার ওদেরই উদ্বেহিচ্ছে। ওই সব মন্তান ও সমাজ-বিরোধীরা এখন ঐ সব পুলিশের স্বেচ্ছা সহযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ঠ্ট্রেনে লুট, ছিনতাই, নারী হরণ, নারী নির্ধাতন, এবং অন্যান্য দুর্কর্ম করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

এর মূল উদ্দেশ্য রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে নরাদিকীর শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



ইসলামপুরের ঘটনার নেপথ্য কার্যকারণ

৬ই এপ্রিল রাতে সংগঠিত ইসলামপুরের ঘটনা সভ্যতার কলঙ্ক এবং পুলিশী পৈশাচিকতার এক জীবন্ত নিদর্শন। হতবাক ভারতীয় জনসাধারণ একে বিস্ময় না জানিয়ে পারেনি। এদিকে কোপ বুকে কোপ মারতে চেষ্টা করছে সি পি-আই (এম) এর স্বামী ছশমন কংগ্রেস (ই) গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীরা। উগ্র আসাম জাতীয়তাবাদ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেয়েছেন স্বতন্ত্র ও তার সাগ-রেদরা। অতএব এখন তারা ইসলামপুরকে অক্ষবিন্দু করে বামফ্রন্ট বিরোধী আগুনে পাখার হাওয়া দিচ্ছে। বাজারী পত্রিকাগুলোতে

মাটিকুণ্ডা গ্রামে ডাকাতি হওয়ার যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার প্রথম পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে চোরচালানকারী ও পুলিশ দলের মধ্যে। কথিত আছে পূর্ব ও পশ্চিম দিনাজপুর লীমাস্ত এবং বিশেষ করে হিল অঞ্চল চোরচালানকারীদের স্বাধীন আড্ডা এবং শরণ পাল হলেন এই সমস্ত চোরাকারবারীদের পালের গোদা। এদিকে ইসলামপুর থানার সঙ্গে চোরাকারবারীদের খুবই ভাল বোঝাপড়া আছে। পুলিশকে মোটা টাকা খুব দিয়ে চোরচালানকারীরা অবাধে কাজ চালিয়ে যায়।

মার্চের শেষ সপ্তাহে এই সমস্ত অসং-ব্যবসারীদের প্রায় ছ'লাখ টাকার চোরাই মাল বি এস এফ-এর হাতে পরা পড়ে যায়। যার ফলে শরণ পাল ও তার বাহিনী ইসলামপুর থানা কর্তৃপক্ষকে তাদের সাপ্তাহিক বরাদ্দ টাকা দিতে পারেন নি। ফলে ২৪৮০ তারিখে জিলালকে থানার ভেঁকে নিয়ে গিয়ে ধমক দেওয়া হয় এবং মাত্র দুদিনের সময় দিয়ে বলা হয় যে, এর ভেতর টাকার ব্যবস্থা না করলে তারাও (পুলিশ) জানে কি ভাবে শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু শরণ পালরা টাকা জোগাড় করতে না পারায় পুলিশ স্বাধীনতা ৬ তারিখ শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

অশান্তদিনের ছড়া
অনার্য মিত্র

এক
এই যে বাবু, দরজা খোলা
আত্মন বহন, আপন-ভোলা
আমিও ভাল ভূমিও ভাল
লেনিন জালান সবুজ আলো।

দুবুজ তো নয়, সে রঙ লাল
লাল ছিল সে অতীতকাল,
আজ লেনিনের নামান রঙ
নামান রূপে নানান সঙ।

ডাক ছিল সে আগবে কাছে
তুই হবে বাইজী নাচে
সেখায় চোলক বাজায় চোল
জনযুদ্ধের দাতটা বোল।

ছই
কং (আই)-যুবকেরা ধরেছে যে বায়না
তারা আর রাজ্যে বামফ্রন্ট-চায়না
ইন্দিরা কানে শোনে তবু টোপ
খায়না
সে বলে : স্বধোগটা কাছে আর
আয়না।

বিদ্যায় নেই তাই জনতা বিরক্ত
পুলিশের হাত ছুটি রক্তে আদক্ত
ভক্তিও চটে গেছে যত বাম-ভক্ত,
কাপড়ে পড়েছে আজ জ্যোতি-
অমরক্ত।

এমন স্থলের কাল স্বসময় মিলবে?
পরে কি জনতা আর এই টোপ-
গিলবে?
এই বেলা তাড়াতাড়ি হটাৎ এ
সরকার,
'বায়' নাম মুছে দিতে কং (আই)
দরকার।

তিন
আসাতুন্না খোমেনি
একটুও রাগ কমেনি
আমেরিকাও হমেনি
তবু লড়াই জমেনি।

একটা কিছু করুন
মারুন না হয় হয় মরুন
সামনে থেকে সরুন
শাস্তির পথ ধরুন।

হুমকী দিতেই জানেন
জরটা ভেঁকে আনেন
মনে ধারেনা মানেন
তারেও ফাছে টানেন।

চোখ-রাডানো খেলায়
মাছুষ মরে হেলায়
ভয়ের ছবি উঠছে ভেসে
পড়ন্ত এই বেলায়।

সম্পাদকীয়

বিদ্যুৎ সঙ্কট

এই সপ্তাহে বিদ্যুতের অভাবে লোড-শেডিংয়ের দাপট চরম পর্যায়ে গেছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ারদের 'নিয়ম মার্কিন' কাজের ফলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এদিকে দুর্গাপুর প্রকল্পের অবস্থা শোচনীয়, সাঁওতাল-হিতে এক নম্বর ইউনিট ভাল হয় তো দু'নম্বর খারাপ হয়, তারপর দু'নম্বর ভাল হলে তিন নম্বর অকেজো হয়ে যায়। এবং মনে হয় এইভাবেই চলছে ও চলবে। যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিল সেই ব্যাণ্ডেলও এই ডামা-ডোলের হাওয়া লেগেছে এবং সেখানেও যন্ত্র বিকল হয়ে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে বৈজ্ঞানিক পাখার নিশ্চল-তার নাগরিকরা আহি আহি ডাক ছাড়ছে, কলে কারখানায় উৎপাদন কমছে, অফিসে আদালতে কাজ চালানো দায় হয়ে উঠছে। অথচ এর থেকে পরিত্রাণের কোন আশা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। রাজ্যের বায়ুক্রান্ত সরকারও এ বিষয়ে নীরব। যেন সমস্ত ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কেন এমন হবে? নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হুঁতুপরাহত ব্যাপার। ততদিনে অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে। কারণ আমরা দেখতেই পাচ্ছি পরিস্থিতি প্রতি বছরই আগের বছরের চেয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে বায়ুক্রান্ত সরকার প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যে অবস্থা ছিল আজ ১৯৮০ সালে তা চতুর্গুণ খারাপের দিকে। ১৯৭৭ সালের আগে ধারণা ছিল কংগ্রেসী সরকারের অপদার্বিতার বিদ্যুৎ সংকটের দুর্ভোগ। কিন্তু বায়ুক্রান্তের আমলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেছে। শোনা যায় সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র যদি ঠিকমত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহলে কলকাতা ও শহরতলীতে কোন বাটতি পড়বে না। কিন্তু কেন যে এগুলো বারবার খারাপ হয়ে যায়, কেন উৎপাদন বন্ধ হয় তা বোধহয় সরকারও জানেন না। মাঝে একবার দু'বার অন্তর্গত-মূলক কার্যকলাপের কথা শোনা গিয়েছিল। সরকারই বলেছিলেন। বিদ্যুতের সমস্ত ব্যাপারটাই উপযুক্ত তদন্ত করা সরকার। সি.ই.এম.সি.কে কেবল তোরাজ না করে তাদের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কেও নজর দেওয়া উচিত।

নারী-ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে

দেবশিস ভট্টাচার্য

হ্যাঁ, বিশ্বের দরবারে আজ আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা ঘটনা ধরনের কাগজে বেরুচ্ছে, আমাদের বোনের মর্যাদা আজ ধুলোয় গড়াচ্ছে। এতদিন জেনেছি 'শহীদ দিবস', 'শিক্ষক দিবস', 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের কথা আর আজকে শুনিছি 'বলাৎকার বিরোধী দিবস' পালনের আহ্বান। দেশের বৃহৎ দৈনিকগুলো রবিবারের সাময়িকীতে ধর্ষণের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করছে।

৮ই মার্চ ১৯৮০ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের সন্তর বছরে খোদ রাজধানীর বুকে ১১টি মহিলা সংগঠন বিরাট মিছিল করেছে। হাতে প্র্যাকার্ড, মুখে স্লোগান 'স্টপ রেপ'। বোম্বাইতে প্রাক্তন সংসদ সদস্য শ্রীমতী অহল্যা রমনেকারের নেতৃত্বে যে মিছিল হয়েছে তার উল্লেখ্য 'রেপ বিরোধী ফোরাম'। মিছিলকারীদের হাতের প্র্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'রেপ আইন সংশোধন করতে হবে', 'মথুরা মামলার পুনর্বিচার চাই', 'ধর্ষণকারী পুলিশদের অবিলম্বে শাস্তি চাই।' এ ধরনের চারটে দাবি সম্বলিত একটা আরকলিপিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের অভিধান চলছে, যা আগামী সংসদের অধিবেশনে পেশ করা হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান করেছে কিন্তু আজকের অভিযানে তো লজ্জা বোধ হয়, কারণ সেই স্বাধীনতার তেজস্বী বছরের মাথায়, একজন মহিলার প্রধান-মন্ত্রীর ভজন বছরের মাথায় এই মিছিল আর তাতে এই স্লোগান। ধন্য হোক, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ!

২৮শে মার্চ এ নিয়ে সংসদেও দ্বারপ উত্তেজনা দেখা দেয়। সদস্য শ্রীমতী গীতা মুখার্জী (সি.পি.আই) ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও কঠোর শাস্তি-বিধানের জন্ত আইন সংশোধনের দাবি করেন। ইন্দিরা কংগ্রেসের চেম্পতি বৈষ্ণব বলেন, ধর্ষিতাদেরকে সামাজিকভাবে বরকট করা হয়ে থাকে যা অস্বাভাবিক। ধর্ষিতাদের প্রতি সরকারের মানবিক ব্যবহার দেখানো উচিত, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে পথ্য সরবরাহ পর্যন্ত। ঐ দলেরই সদস্য মগনভাই বলেন, তিনি বহু আদালতেই দেখেছেন যে সরকারী উকিলরা যুবতীদেরকে ধর্ষণের বিবরণ দিতে বলছেন। সি.পি.আই. (এম) দলের শ্রীমতী স্বশীলা গোপালনের মতে, নিছক একটা আইন চালু

করলেই হবে না, তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণতঃ একটা ধর্ষণের ঘটনা জানার পর তা নিয়ে তেমন কিছু করা হয় না। ঘটনার পর দু'চারদিন জনসাধারণের মনে একটু উত্তেজনা থাকে, তার পরেই সকলে বেমানম ভুলে যায়। ধর্ষণ সংক্রান্ত একাধিক মামলার আদালতও অবিচার করেছে।

১ই এপ্রিল '৮০ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্য শ্রীমতী অপরাধিতা গোস্বামী সারা ভারতে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার চলেছে সে সম্পর্কে বিধানসভায় একটা প্রস্তাব আনার আবেদন করেন। শ্রীমতী গোস্বামী বলেন, সারা ভারতে মহিলাদের উপর বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের উপর নির্ধাতন ও ধর্ষণ চলেছে। একত্র আমরা পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা ভীষণ উদ্বিগ্ন।

বোম্বাইয়ের ঐ 'রেপ বিরোধী ফোরাম'এর নেত্রী মীরা সাভেরার মতে ওখানে নাকি দৈনিক একটা করে বলাৎকারের ঘটনা ঘটে। ভোর বেলা দু'খ আনতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়েছে, রাতের কথা তো ছেড়েই দিলাম। পালঘরের নিকট গ্রামের পঁচিশ বছর বয়সী ছ মাসের গর্ভবতী আদিবাসী যুবতী মঞ্জুলাকেও রেহাই দেয়নি পল্লী। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সকালে মঞ্জুলা গিয়ে ছিলেন ভাঙ্কারের কাছে। এটাই ওর অপরাধ। তাঁর রক্তাক্ত দেহটা পাওয়া গেল রাস্তায়। ধর্ষণ করেছে সে নৃপত কান্ড হয়নি। পরনের হাকা নীল রঙের শাড়ীটা খুলে মঞ্জুলার গলায় ফাঁস দিয়েছে। ওর পড়ে থাকা মৃত-দেহের পাশে পাওয়া গেছে বজ্রিশ টাকা-দামের তিনটে ড্রাগির বোতল। অর্থাৎ বলাৎকার করেছে সমাজের মাথাভারী পরসাদলা কেউ।

'রেপ বিরোধী ফোরাম' শক্তিশালী হচ্ছে। প্রায়ই অভিভাবকরা এমে থোপ খবর নিচ্ছেন। গতবছরে একমাত্র বোম্বাইতে আটশোটি বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে। ফোরাম আহ্বান জানিয়েছে ধর্ষিতাদের প্রতি 'সমাজের মঙ্গলের জন্ত, লজ্জা ঝেড়ে ফেলে নাহস করে এগিয়ে এমে-ধর্ষণের রিপোর্ট করুন।'

এবার যা নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে, সেই মথুরা মামলা প্রসঙ্গ। ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ মহারাষ্ট্রের দেশাই-গড় থানার প্রায় বোড়শী যুবতী আদিবাসী অম্মত গন্ড সম্প্রদায়ের

মথুরাকে ধর্ষণ করে কনষ্টেবল গণপত ও শ্রীলতাহানি করে আর একজন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী একটা মামলা হয়। দায়রা আদালতে যায় হয় যে গণপত ঘোষী নয়, কারণ এটা ধর্ষণ নয়, বরং ঘোণ-মিলন হতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্ট অবশ্য এই রায় বাতিল করে বলেন, ঐ মিলন বলপূর্বক ঘটে যায় অর্থ বলাৎকার। 'সেশন কোর্টের বিচারপতি দম্মাত ও সম্রাসে মথুরার যুক্ত বস্ত্রতা স্বীকার এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ভুল করেছেন।' হাইকোর্ট বলাৎকারের অভিযোগে ঐ পুলিশ কনষ্টেবল গণপতকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। এর পর ধরা বাঁধা নিয়ে গণপত স্বশ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। স্বশ্রীম কোর্টের বিচারপতি কোশল, বিচারপতি শোবাস্ত সিং এবং বিচারপতি কৈলাসম এবার বোম্বাই হাইকোর্টের রায় নাকচ করে গণপতকে মুক্তি দিলেন। ধর্ষণকারীদের বুকে

বিক্ষোভ ও অনন্তোষ

১ম পৃষ্ঠার পর নির্বাচন কমিটির ব্যাপারে অসন্তোষ। কারণ কোন প্রবীণ নেতাকেই এই নির্বাচন কমিটি গড়ার ব্যাপারে আমল দেওয়া হয় নি। যারা এ ব্যাপারে উপেক্ষিত হয়েছেন তারা সবাই ইন্দিরা গান্ধীর দুর্দিনের সঙ্গী। এদের মধ্যে আছেন মহশীনা কিদোয়াই, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, কমলাপতি ত্রিপাঠী এবং এইচ.এন.বহগুণ।

প্রবীণ নেতারা অভিযোগ করেছেন, উত্তর প্রদেশে যাদের নিয়ে নির্বাচন কমিটি গড়া হয়েছে, তারা অধিকাংশই রাজ্যের রাজনীতিতে একেবারেই অপরিচিত। এই সমস্ত লোক যদি রাজ্যের প্রার্থী মনোনয়নের ভারপ্রাপ্ত হয় তবে এখানে দলের সম্ভাবনা কতিপয় হবে। প্রবীণ নেতাদের অভিযোগ সঙ্গর গান্ধী নিজের ইচ্ছামত কিছু অহুগত ছেলে ছোকরাদের দিয়ে এই কমিটি করেছেন।

নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী, মহশীনা কিদোয়াই প্রমুখ নেতারা সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তাদের অভিযোগের কথা বলেছেন। দলের উত্তরপ্রদেশ শাখার প্রবীণ নেতারা বলেছেন, "যদি এই নির্বাচন কমিটিই বহাল রাখা হয় তবে আমরা নির্বাচনে দলের লাকলোর জন্ত কোন দায় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকব না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আপনার সঙ্গে

বল এল। নারী সমাজ চকল হলে দাবি উঠলো পুনর্বিচারের জ' পুনর্বিচারের শুভানী চলছে।

গত ২৭শে মার্চ দিল্লীতে 'বল' কার প্রসঙ্গে' এক সেমিনারে আয়োজন করে মহিলা আইনজীবীদের ভারতীয় ফেডারেশন এবং ভারতীয় গৃহকর্মী ফেডারেশন। আলোচনাচক্রে স্বশ্রীম কোর্ট প্রধান বিচারপতি বলেন, ধর্ষিতা-মুখ থেকে রিপোর্ট শোনার জ-পুরুষ নয় চাই থানায় মহিলা পুলিশ অফিসার এবং ধর্ষিতার বাড়িতে গিয়ে ডায়েরী নিতে হবে। উচ্চপদ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ তাঁদে বাড়ি গিয়ে ডায়েরী নেয়, তাহলে এক্ষেত্রেও নিতে হবে। শ্রীমতী আরো বলেন তাঁর অভিজ্ঞতার ব-ধর্ষণকারীকে খালি পেতে তিনি দেখেছেন। বিচারপতি শ্রীমতী আরো বলেন, শুধু আইন পরিবর্তন করেই হবে না, চাই চেতনা, এ-ব্যাপার নিয়ে ভারত সরকার বেন-আরেকটা তদন্ত কমিশন না বসান কমিশনের প্রহসনে শ্রীমতী সারা-অুক ভয় প্রকাশ করেন। শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠার

রাজনীতি করছি। আপনার চরম-বিপদেও আমরা আপনার পাশে ছিলাম। কিন্তু এখন কোন ব্যাপারেই আমাদেরকে পরামর্শ করা হচ্ছে না। শুধু তাই নয় নির্বাচনের পরে যারা ইন্দিরা কংগ্রেসে নতুন এসেছে, এমন কয়েকজন নবগতকেও নির্বাচন কমিটিতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ কলমাতা রাই-এর মত লোককেও নির্বাচন কমিটিতে রাখা হয় নি।

ইন্দিরা গান্ধী এরপর সঙ্গের সঙ্গে কথা বলে কলমাতা রাই সহ কয়েক জনকে নির্বাচন কমিটির সদস্য করেছেন। কিন্তু সঙ্গের গড়া মূল কাঠামোর আয়ত কোন পরিবর্তন করতে পারেন নি। যদিও তিনি মনে করেন সঙ্গের একাঙটা ঠিক শোভন হয় নি। ফলে প্রবীণ নেতাদের বিক্ষোভ রয়েছে।

একই অবস্থা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও। এখানেও রাজনীতির অভিজ্ঞতা অথবা যোগ্যতার কথা বিবেচনা না করেই এমন অনেক লোককে কমিটির সদস্য করা হয়েছে যাদের একমাত্র যোগ্যতা শুধু সঙ্গের তাবদার।

সঙ্গের এইসব কাজের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে দলের অনেক নেতাই অসন্তোষ। এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা একদা সঙ্গর এবং ইন্দিরা গান্ধীর খুবই বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

দেশ কাল রাজনীতি

আগুন ছাড়িয়ে পড়ছে

ভারতপুত্র

আমার সমস্ত নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এক অদ্ভুত খেলা খেলে চলেছেন। সকালে নারেন্দ্রী তৈল প্রকল্প এলাকার কাফু জারী করে দুপুরে সে কাফু প্রত্যাহার করে মেবার কোন নজীর আছে কিনা সম্ভব। কাফু জারী করা ছাড়াও সত্যগ্রহীদের গ্রেপ্তার, কাছাড় রাষ্ট্রীয় সমস্ত আসামকে উপকৃত অঞ্চল ঘোষণা, সেনাবাহিনী তলব, পি ডি অ্যাক্টে সত্যগ্রহী গ্রেপ্তার, সরকারী সংস্কার ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আন্দোলনকারীরা আরও মারমুখি হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস (ই) ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলই সরকারের এই দমন ব্যবস্থার সাহায্যে পারেন নি। কারণ তারা মনে করে আসামের বিদেশী সমস্তাটি রাজনৈতিক এবং এর একটি মানবিক দিক রয়েছে। বিপক্ষে চালিত হয়েই হোক কিংবা অর্থনৈতিক কারণেই হোক দীর্ঘকাল এটিকে সুলিয়ে রাখার ফল সমস্তাটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বিদেশী প্রস্তুতিকে বন্ধ করে আজকে আন্দোলন আসামে চলছে তাকে পানিকটা বৃহৎ অর্ধে গণ-অভ্যুত্থান বলাই সম্ভব। এ রাজ্যের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। গণ-অভ্যুত্থানকে লাঠি, গুলি বা গ্রেপ্তার দ্বারা কখনও কোন দেশে কি দমন করা সম্ভব হয়েছে?

সংবাদে প্রকাশ দমন গীড়নের পাশাপাশি সরকার নাকি আন্দোলন-কারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনারও প্রবৃত্তি হয়েছেন। রাজ্যপাল এল পি সিং, নতুন উপদেষ্টা জিসারিন এবং মুখ্যমন্ত্রি প্রমথবর্ম সাহা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন এবং সারা আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করেছেন।

সরকারের অবস্থা এ পূর্বা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। কারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ছই সংস্কার পক্ষ থেকেই প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এই চরমপন্থা দেবার কথা ঘোষিত হয়েছিল যে ১০ই মে'র মধ্যে যদি 'বিদেশী' প্রস্তুতির কয়দালা না হয় তবে সত্যগ্রহ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। ইতিমধ্যে বাইরের তেল ছাড়াও, পাট, কাঁচ, কাঠ ইত্যাদি আসামের সম্পদ পাঠানো বন্ধ করার কর্মসূচীও তারা

নিয়ে চলেছে। আরও উৎসেগের কারণ ঘটছে এইখানে যে কংগ্রেস (ই) সি পি আই এম ইত্যাদি দলের এম এল এদের ওপর অফিস সত্য-গ্রহীরা নিগ্রহ শুরু করে দিয়েছে।

জিহাবোয়ে থেকে ফিরে এসে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে সমস্তাটি রাজনৈতিক এবং তাঁর সমাধান সন্ধানে আলোচনার পথ খোলা আছে কিন্তু এই দার্শনিক তত্ত্বখা আওড়ানই যথেষ্ট নয়—সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া দরকার। কারণ মনে রাখা প্রয়োজন যে 'বিদেশী' দুয়োটা মনিপুর, অরুণাচল প্রদেশেও তোলা হয়েছে, ত্রিপুরাতেও। অশান্ত আসাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নুপেন চক্রবর্তী কলকাতার সাংবাদিকদের বলেছেন, উপজাতি অধ্যুষিত এই রাজ্যগুলিকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন দিলেই সমস্তার স্থায়ী সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এক্য দূরঅন্ত

নটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। অকংগ্রেস (ই) দলগুলি এই সুযোগে আবার একব্যক্ত হবার প্রয়াস চালাচ্ছে, কিন্তু উল্লেখ করার মত দাবীল্যা এখনও অজিত হয়নি। বোম্বাইয়ে বৈষয়িক এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে একটি গতিশীল ও কার্যকর ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেস আর্গ, জনতা এবং লোকদল নেতারা দুদিনের পোপন আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

দেবরাজ আর্গ, শারদ পাওয়ার, রজনী প্যাটেল, উদ্বুদ্ধান অধিকা সোনী, চন্দ্রশেখর, এস এম বোশী, এন জি গোয়ে, মধু গুণবতে, জর্জ ফার্নান্ডেস, মধু লিমায়ে, মোহন ধারিয়া, বৃণাল গোয়ে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই দুদিন শৈল্পতন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে হ'শিয়ারি দিয়ে শৈল্পতন্ত্র বিরোধীদের এককাটা হতে বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তর্জন হল, তত বর্ষণ হয়নি। কারণ আসন্ন নির্বাচনে শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠার

বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় বহুজাতিক সংস্থা

ব্রিটানিয়া লিলি বিস্কুট কোম্পানী গ্রাস করছে

একটি বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কিতাবে একটি বহুজাতিক সংস্থা ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার বিবরণ সম্প্রতি জানা গেছে। সব চেয়ে বিশ্বস্তের ব্যাপার রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও এই বহুজাতিক সংস্থাকে তাদের উদ্দেশ্য দিচ্ছ করতে নানাভাবে ধাহায্য করছে।

পাঠক, আপনারা লিলি বিস্কুট কোম্পানীর নাম নিশ্চয় শুনেছেন। উটোভাটার মুরারীপুকুরে অবস্থিত ৮৫ বছরের এই কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে বাঙালী মালিকানাধীন। শেঠদের মালিকানাধীন এই সংস্থার লিলি বিস্কুট ছাড়াও লিলি বার্লিও বৈঠী হত।

দীর্ঘ দিন ধরে বহুজাতিক সংস্থা ব্রিটানিয়া কোম্পানী অধুনা যার নাম ব্রিটানিয়া ইণ্ডাস্ট্রি এই সংস্থাকে নিজেদের কজায় আনার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে ব্রিটানিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে লিলি বিস্কুটের মালিক শেঠদের কাছে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেঠরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি।

মালিকদের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শুরু হল বড়বন্দ। লিলি কোম্পানীর ইউনিয়নের জর্মনক দালাল নেতার সহযোগিতায় সরকারের কাছে দরবার চলতে লাগল এই কোম্পানীকে ব্রিটানিয়ার মালিকানাধীনে আনার জন্য।

লিলি কোম্পানীর এই দালাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটির সঙ্গে বিদেশের কিছু সম্ভ্রমজনক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ আছে বলে জানা গেছে। জনতা সরকারের আমলে এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটি দিল্লীতে গিয়ে শিল্প দপ্তরকে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, শ্রমিকদের স্বার্থে এই কারখানাটির ব্রিটানিয়ার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ দরকার। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তাই কেন্দ্র প্রস্তাবের জন্য কারখানায় শ্রমিক অশান্তিকে নানাভাবে জীইয়ে রাখা হলো।

দিল্লীতে জনতা সরকারের আমলে শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জর্মনক অফিসার দালাল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাটির ব্রিটানিয়ার পক্ষে ওকালতি করাকে ভালভাবে নেননি। এবং সাময়িকভাবে ব্রিটানিয়ার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের ব্যাপারটি মূলতুবি রাখেন। এর পরে শুরু হয় চক্রান্তের দ্বিতীয় পর্যায়।

এই পর্যায়ে কারখানায় পরি-কল্পনা মাসিক শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয় এবং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লিলি বিস্কুট কোম্পানীকে সরকারী অধিগ্রহণের দাবি জানানো হয়। যখন উক্ত দালাল ইউনিয়ন নেতাটি এ ব্যাপারে তথ্য তদারক করে ব্যর্থ হলেন তখন ইউনিয়নটিকে বামফ্রন্টের একটি শ্রমিক দলের শ্রমিক সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া হল। ইউনিয়নের নতুন নেতারা অনেক তথ্য তদারক করে সংস্থাকে সরকারী পরিচালনা-ধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

লিলি বিস্কুট কোম্পানী ১৯৬৮ সালে জার্মানী থেকে এই শিল্পের দর্বাধুনিক একটি মেশিন এনে বারাসাতে নতুন ফ্যাকটরি খোলেন। নতুন মেশিনটির নাম "হেকোনা"। জার্মান বিশেষজ্ঞরা এমে মেশিনটি চালু করে দিয়ে যান। কিন্তু টাকার অভাবে এই মেশিন এবং বারাসাতের নতুন কারখানা চালু করা যায় নি। হেকোনা মেশিনটি কেনার জন্য এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে টাকাদার করা হয়েছিল কিন্তু চলতি মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় এই মেশিনটিকে কাজে লাগানো যায় নি।

ব্রিটানিয়া কোম্পানীর ১৯৬৮ সাল থেকেই এই মেশিনটির প্রতি নজর ছিল। কারণ বিস্কুট তৈরীর এই দর্বাধুনিক মেশিনটির উৎপাদন ক্ষমতা মাসে ২০০ টন। এবং এই মেশিনকে কাজে লাগাতে পারলে প্রচুর লাভ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে ব্রিটানিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে লিলি বিস্কুট কারখানার মালিকদের প্রস্তাব দেওয়া হয় ব্রিটানিয়ার হাতে কোম্পানীটিকে তুলে দিতে। লিলির মালিকপক্ষ শেঠরা এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

এরপর ব্রিটানিয়ার পক্ষ থেকে চলে সরকারী দপ্তরে আনাগোনা। প্রথমে রাজ্য সরকারকে প্রস্তাবিত করতে ব্রিটানিয়া লম্ব হয়। তারপর রাজ্য সরকারের সুপারিশসহ লিলি বিস্কুট কারখানাকে তাদের পরিচালনাধীনে আনার প্রস্তাবটি দিল্লীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়।

এরপর কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ভাবনা চিন্তা করে লিলি বিস্কুট কারখানাটি সরকারী পরিচালনাধীনে আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। এবং রাজ্য সরকারকে এই কারখানা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

এরপর শুরু হয় ব্রিটানিয়া কোম্পানীর মালিকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত আমলাদের শলাপরামর্শ। বেহেতু ব্রিটানিয়াকে পরাসরি লিলি বিস্কুট কারখানার পরিচালন ব্যবসায় আনা যায় না তাই ঘুরিয়ে ব্রিটানিয়ার সঙ্গে এক কারিগরি সহযোগিতার চুক্তি করা হয়। এই চুক্তিতে ব্রিটানিয়াকে কারিগরি সহযোগিতার বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে হেকোনা মেশিনকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তি আই ডি আর আইনের (১৯৫১) ১৮এ ধারার পরিপন্থী।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অনেকেই অভিযোগ করছেন, ব্রিটানিয়ার বহুদিনের উদ্দেশ্যকে দিচ্ছ করার জন্যই বিনা নোটিশে এই কারখানা অধিগ্রহণ করে ব্রিটানিয়ার সঙ্গে বেসাইনী ভাবে কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি করা হয়েছে।

এই অভিযোগের পেছনে যথেষ্ট সুক্তি আছে। কারণ যে হেকোনা মেশিন ব্রিটানিয়া কোম্পানীতে থাকা তো দুয়ের কথা ঐ সংস্থার পরিচালকরা জীবনে কোন দিন চোখে দেখেন নি তার কারিগরী সাহায্য ব্রিটানিয়া কি ভাবে দেবে? তাছাড়া লিলি বিস্কুট কারখানার পুরনো মেশিনের জন্য ব্রিটানিয়ার কারিগরী সহযোগিতার কি প্রয়োজন? তার জন্য তো এই সংস্থার পুরনো কর্মীদের দীর্ঘদিনের কারিগরি জ্ঞানই যথেষ্ট। তাতেও যদি কোন অসুবিধা দেখা যায় তাহলে এই কোম্পানীর পুরনো পরিচালকদের কাছ থেকেও তো কারিগরী সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারত।

লিলি বিস্কুট এবং লিলি বার্লি কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থা সরকার হাতে নিলেও একই প্রেমিসেসে অবস্থিত শেঠদের মালিকানাধীন অন্য তিনটি কারখানা সরকার অধিগ্রহণ করেন নি। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে শেঠদের মালিকানাধীন অন্য তিনটি সংস্থাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে "নীল" করা হয়েছে বেসাইনী ভাবে।

লিলি বিস্কুট এবং বার্লি কারখানার ভাড়া বাবদ শেঠরা বছরে দেড় লক্ষ টাকার পাবার অধিকারী। কিন্তু সরকার পরিচালন ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার পর এ পর্যন্ত শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠার

বি ডি ও অফিসে ই-কংগ্রেসী হামলা সত্যি এও হয়

অসিত সেন

ইন্দিরা কংগ্রেসের অহিংস কর্মীরা ১৮ এপ্রিল অপরাহ্নে উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের বি ডি ও অফিসে ঢুকে অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর সহ সরকারি কাগজপত্র তছনছ করেছে। তাছাড়া বি ডি ওকে ঐ সব গাছীবাদীরা অকণা ভাষায় গালিগালাজ করেছে। থানা পুলিশ উদ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তার এক রিপোর্ট পাঠিয়েছে। তাতেই ঐ সংবাদ জানা গেছে।

বি ডি ওর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এ ব্যাপারে যদিও একটি মামলা রুজু করেছে, তথাপি থানা পুলিশ অপরাধীদের না ধরার কিকির খুঁজছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কাও করে।

জানা গেছে ঐ দিন বি ডি ও তার অফিসে পঞ্চায়েৎ সদস্যদের নিয়ে বসন একটি সভা করেছিলেন, তখন অহিংস ইন্দিরা কংগ্রেসীরা ঐ কাও করে। ওরা বিভিন্ন দাবীসহ এক মিছিল নিয়ে বি ডি ওর অফিসে গিয়ে বি ডি ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। বি ডি ও ওদের এক-দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলেন এবং মিটিং-এর শেষেই সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান। এতেই অহিংসার পুজারী-দের গোঁসা হয় এবং অপেক্ষা করা যাবে না বলে তারা হুমকী দিয়ে বি ডি ও অফিসে ঢুকে ঐ তুলকালাম

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এও হয়। কী হয়? কেমন করে হয়?

মনে করুন, আশি কোটির উপর অধিবাসী অধ্যুষিত এক দেশ, সমাজ-তান্ত্রিক বলে খ্যাত এক দেশ আপনাকে ঘন ঘন নেনমস্তুর করে নিয়ে যাচ্ছে, ভালো বাইরে বাইরে নানা উপহার উপঢৌকনে লাজিয়ে আপনার নিজের দেশে কিরিয়ে আনছে। আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন, একটু বেশী মাতারই হয়ত হবেন, আমি অন্তত হব। কিন্তু অতিমাত্রায় খুশি হওয়া ছাড়িয়েও আপনি যদি আত্মাধা আটখানা হয়ে ওঠেন, যদি নিজেকে ছুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে করে গলে যান, আত্মা যদি আপনার মস্তিষ্কেও আক্রমণ করে বসে, তবে কী করবেন? তবে আপনার হয়ত মনে হবে সবাই ঐই দেশে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এই উদ্বেগেই সবাই আপনার কাছে ঘুর ঘুর করছে। আপনার সঙ্গে কেউ কোনো কারণে দেখা করলেই মনে করবেন আপনাকে নিশ্চয়ই সে তেল দিতে এনেছে। আর এই মানসিক স্তরে পৌছতে পারলে আপনি বাদশা বনে গেলেন। তখন থাকে বা ইচ্ছা গালাপাল দিতে শুরু করতে পারবেন, নরত জান দেবার তাগিদে তার উপর উপদেশায়ত উজাড় করে দেবেন। এর উপর যদি আবার সেই আশি কোটি মানুষের দেশের কর্তৃ-ধারেরা আপনার দেশের বাট কোটি মানুষের মধ্যে আপনাকেই শুধু বেছে নেয়, সর্ববিষয়ে আপনার পরামর্শ মতই উঠে বসে তবে ধরাকে আপনি লরাজান করলে আপনার অপরাধ কোথায়? শুধু তাই নয়, এমন অবস্থায় আপনি যদি উকিল, মোক্তার বা চিকিৎসক হন, তবে প্রতি বারই ওদেশ থেকে ঘুরে এসে আপনার কী বাড়িয়ে যেতে পারবেন দফায় দফায়। অবশ্য সেই সঙ্গে বিভিন্ন আত্মপ্রাণিক সত্যের সম্মিলিত আপন নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রের আদর্শ উল্লেখ করে বলবেন যে ওদেশে রাষ্ট্র-নিজের নিজের কাজ করে অর্থ রোজ-গারের প্রেরণার নয়, করে জমসেবার অহুপ্রাণিত হয়ে। আর জমসেবার অহুপ্রাণিতা যখন বক্তৃতা দিয়েই সারা গেল তখন চার, আট, দশ, যোলা হুড়ি, পচিশ এইভাবে নিশ্চিন্তে নিজের কী বাড়িয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তাহলেই বা কী হবে? আপনি যে বিরাট রাজনীতিবিদ, ওদেশের

রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে আপনার রাজনীতিতে বিহ্বল বিঘুট। তাই অপর কেউ পেটের ধাঁধায় কারক্লেপে অর্থ রোজগারের জন্য লটেই হলে তাকে ধমকে হয়ত বলবেন ওনব-smalls cause ছেড়ে greater cause এ ঝাঁপিয়ে পড়তে Greater Cause মানে অবশ্যই ঐই দেশের নামে নৃত্য-করা, ওধানকার-মাহুষের বিষয় হা করে শোনা আর পারলে আপনাকে তেল দিয়ে ওখানে যাবার চেষ্টা করা। কলি রোজগার ছাড়াও এসবের বাইরে কারও পারিবারিক জীবনের মারাত্মক আপনাকে নির্ধাত অতি তুচ্ছ মনে হবে।

আপনি নিজেও Greater Cause এই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবেন নিশ্চয়। এই Greater Cause এর একটি দিক ঘন ঘন ওদেশে যাওয়া। সে ত হচ্ছেই তার উপর এখানেও হয়ত মামা কমিটি বামিয়ে সক্রিয় কৃষিকা পালন করতে থাকবেন। এসব কমিটি নিশ্চয়ই রাজনীতিহীন হবে না, কারণ রাজনীতিজ্ঞ দেশের সঙ্গে রাজ-নীতিবিদ আপনার থেকে যাচ্ছে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তাই কমিটির নাম-করণই হয়ত এমন করলেন বা নিগূঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্ষ্য বহন করে। যেমন ধরুন কোটনিস কমিটি। এই নামটি শুধুই ভাঃ কোটনিসের সর্ব-হারার আত্মজাতিকতাবাদী আদর্শ হুঁত হয়ে ওঠে। আর তা ওঠে বললেই, আত্মজাতিক বা জাতীয় কোনো ক্ষেত্রেই মেহমতী মানুষের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ-শাসন নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন হবে না, এসবের বিরুদ্ধে কমিটির তরফ থেকে প্রতিবাদ উচ্চা-রিত হয়ে লামাড একটু বিবৃতিও বেরোবার দরকার হবে না। কারণ আগেই ত বলা হল যে কমিটির নাম-করণ থেকেই এই আদর্শের রূপটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর এই বোধ যখন আপনার চেতনার পরি-কার থাকবে তখন একের পর এক নতুন নতুন চিকিৎসাকেই খুললেই মনে হবে কোটনিস কমিটির শাখা-প্রাশা বিস্তৃত হল। এটাই যে কোটনিস কমিটির দতিকায়ের কাজ তাও হয়ত প্রমাণিত হল ওদেশের সার্টিকিফিকেটের জোরে, ওদের দূতা-বালের বুলেটিনে উচ্ছৃঙ্খিত প্রাশসা নিয়ে হয়ত বেকলো সেই সার্টিকিফেট আপনার গুণকীর্তন সম্বলিত হয়ে। এরপর বাকী থাকবে হয়ত কী করে একে ওকে কমিটির তরফ থেকে ওদেশে ডেলিগেশনে পাঠানো যায়।

এই যখন পারস্পরিক সম্পর্কে অবস্থা হবে তখন ওদেশের সঙ্গে কেউ বইয়ের ব্যবসা করতে হলেও হয়ত আপনার ছুরায়ে গিয়েই ধরা দিয়ে পড়ে থাকবেন। আপনি তাঁর সঙ্গে চাকরের মত ব্যবহার করলেও তিনি নিরুপায়, নিঃশব্দে হয়ত হজম করে যাবেন আপনার গালাগালি আর ধমকানি। কারণ বাট কোটি মানুষের ভারতবর্ষে ওরা যে আপনাকেই একমাত্র মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করে বসেছেন, কাজেই, পাছে ওদের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়েই তাকে চাকর সেজে বসে থাকতে হবে। মুখ ফুটে আপনার কোনো কথা প্রভি-বাদ করার সাহস তাঁর হয়ত আর হবে না। ব্যবসা বন্ধ হলে যদিও তাঁর ক্ষতি হবার কথা নয়, কারণ তিনি হয়ত ক্ষতি দিয়েই ব্যবসা চালাচ্ছেন। কারণ মা হোক লাভ, হোক না ক্ষতি, তিনি ত আমলে টাকা রোজগার করতে ব্যবসা কর-ছেন না। করছেন হয়ত রাজনীতি করার জন্য। তাই এও হয় যে, ছোট্ট একটু ঘরের সঙ্গে রাতারাতি হয়ত গাঁটের পরশা খরচ করে বিরাট ওদাম খরচা নিয়ে তাকে বেশ মোটা টাকা খরচ করে লাজিয়ে ওছিরে নিতে হয়। গাঁটের কড়ি খরচ করে ১০/১২ জন ঠাক রাখতে হয়, কারণ রাজনীতি Greater Cause-এর। এই Greater Cause-এর লেনদেনের জন্য এখানে হয়ত রাজনীতিক ভিড় লেগেই থাকবে।

এ সমস্তই হয়, এই কলকাতা শহরেই হয়, অনেকে দেখেওছেন, তনেওছেন। আবার নিত্য নতুন লোকের নতুন করে অভিজ্ঞতা হচ্ছে—এও হয়। আর এও যখন সত্যিই হয় তখন সাধারণ মানুষ গালে হাত দিয়ে ভাবেন এ কেমন সমাজতন্ত্রের দেশ, কেমন বিচারবুদ্ধি সে দেশের সমাজতান্ত্রিক নায়কদের, এ যে একেবারে শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর অবস্থা। শালুক এমন চেনাই চিনেছেন গোপাল ঠাকুর যে এদেশের ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্কের তারসাম্যই বুঝি বা নষ্ট হয়ে গেল, মানুষকে মানুষ বলে (অবশ্যই এদেশের) গণ্য করার মানসিকতাই বুঝি বিপর্যস্ত হয়ে গেল। পৃথিবীতে এখন একদিকে একটি রাজ্য মানুষের দেশ আর এক দিকে সেই দেশের কাছে বরণ্য এবং গ্রহণযোগ্য এদেশের একটামাত্র মানুষ এটাই পরম সত্য। এও হয়।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

সংশোধনী

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
রেফা: নং: জি এম / কে এ জে / এস আর. ই ই (সি) টি-৩ (বি) / ৮০/৩০.২
তাং ১৪-৮-৮০

মূল টেওয়ার নোটিশ নং: জি এম / কে এ জে / এস আর. ই ই (সি) / টি-৩ (বি) / ৮০/২৩৬৭ তাং ১৪-৩-৮০ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, এতদ্বারা উপরিউক্ত টেওয়ার গ্রহণের তারিখ ২-৫-৮০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হল। অন্ত সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

জেনারেল ম্যানেজার কাজোরা এরিয়া।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট লিমিটেড
(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী/স্থায়ী/সরবরাহকারী/প্রকল্প-কারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম ও নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ায়ী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল্য করা টেওয়ার:

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
রেফা: নং ই সি এল / এ-৭ / ইজ (সি) / টেওয়ার / ৮০-৮১ / ০১ / ৬৪৫
তাং ১২-৪-৮০

পুরুষোত্তমপুর ও সি পি-তে ক্রাশার শেড নির্মাণের জন্য। আনুমানিক খরচ ১,৬০,০০০ টাকা। জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে কেশিয়ারের কাছে ২৮-৪-৮০ থেকে ১-৫-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে প্রতি সেটের জন্য নগদে ১০০ টাকা জমা দিয়ে পাওবের এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ১৭-৫-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ার প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে/অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

শৃংখলাচ্যুত পুলিশ ও বিপথগামী জনতা

চিত্তরঞ্জন মজুমদার

জরুরী অবস্থার সময়ের পুলিশী অত্যাচারের ইতিহাস ভোলা যায় না। দেশজুড়ে পুলিশের আচরণ পান্টানোর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও দু'একটি রাজ্য ইতিমধ্যেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

পাশাপাশি পুলিশের মধ্যেও আত্মোন্মেষের আভাস মিলেছে। যার প্রমাণ গত বছরের দেশব্যাপী পুলিশ বিকোভ। যে বিকোভের অন্ততম দাবী ছিল সমিতি গড়ার অধিকার। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রায় সব রাজ্য সরকারই সে দাবী মেনে নিয়েছেন। ব্যতিক্রম শুধু অসম ও কাশ্মীর এবং সিকিম।

কিন্তু এই সব শুভ-স্বচনার পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে সারাদেশে পুলিশী অত্যাচারের যে সাড়া জাগানো বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল, তা কোনো অংশেই জরুরী অবস্থার সময়ের চেয়ে কম নয়। উত্তরপ্রদেশের নারায়ণপুর, বিহারের পরশবিহা ও মধ্যপ্রদেশের বান্দা তার জলজ্যাক্ত সাক্ষী। এমন কি খোদ প্রধানমন্ত্রীর প্রাসাদের সামনেই ঘটে গেল বিখ্যে বর্বরতম ঘটনাটি। লাঠির ঘায়ে হাজার হাজার অন্ধ মানুষও মানতে বাধ্য হলো : ভারত যথার্থই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ! কদিন আগে আর একটি হলো—পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর। সেখানে “উন্নত পুলিশের দল নৃশংসতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, একটি শিশুকে নাকি জোর করে ধরে আঙনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জালিয়ে দিয়েই পুলিশ কান্ড থাকেনি, গ্রামবাসীদের পুলিশ নির্মম ভাবে পিটিয়েছে। বহু গ্রামবাসী পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি। ইসলামপুরে পুলিশের এই তাওবলীলা এলাহাবাদ হাইকোর্টের মা-নীর বিচারপতি মৌলার ঐতিহাসিক রায়টির কথাই মনে

করিয়ে দিচ্ছে। একটি মামলার বিচার প্রসঙ্গে তিনি তার রায়ে পুলিশকে ‘সংগঠিত গুণ্ডা বাহিনী’ বলে আখ্যাত করেছিলেন। মাননীয় বিচারপতি মৌলার এই বিশেষণ যে কিরূপ দত্য ইসলামপুরের পুলিশের তাওবলীলাই তার প্রমাণ।” সত্যযুগ, ১১ই এপ্রিল ’৮০)

গণতান্ত্রিক বাতাবরণেই যদি পুলিশের চেহারা এই দাঁড়ায়, তবে জরুরী অবস্থার অবলম্বনে পুলিশ যে কী মূর্তি ধারণ করেছিল, তা আজ আর বলায় অপেক্ষা রাখেনা। এবং আগামী দিনে পুলিশ যে কী মূর্তি ধরতে পারে তাও আশঙ্ক্য করতে কষ্ট হয়না।

সে যাই হোক, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশকে ধৈর্যশীল হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ পথে এবং সর্বনিম্ন বলপ্রয়োগে গণ-বিকোভ দমনের সুপারিশ করেছেন। এমন কি চূড়ান্ত পর্যায় ছাড়া গুলি না চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এ সমস্ত নির্দেশকে বুদ্ধাচুর্ন দেখিয়ে দারা দেশে পুলিশ আজ নিজের হাতেই আইন ভুলে নিয়েছে। যারা সমাজের আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক তারাই আজ উল্টো ভূমিকায় নেমেছে।

যদিও পুলিশের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজ নতুন নয়। তবে দিন বদলের সংগে সংগে এবং পুলিশের মধ্যে সচেতনতার সাড়া মেলাতে দেশবাসী কিঞ্চিৎ আশাবিভূ হয়েছিলেন। কিন্তু সে আশার মুখেও বুকি ছাই পড়লো। কেননা দু'টি মৃত্যুর বদলা হিসেবে যদি সাত সাতটি গ্রাম শৃংখলায় পরিণত হয়, তবে কি করে আর আশার আলো চোখে পড়ে।

অবশ্য এ কথা বলায় উদ্বেগ এই নয়, কোনো ঘটনার জন্ত কেবলমাত্র পুলিশই দায়ী এবং যে কোনো ঘটনার স্বত্বপাত পুলিশের দ্বারাই হয়। কিন্তু পুলিশের দায়ের চেয়ে দায়িত্বই যে বেশী, এ কথা ভুলে গিয়ে তো সমাজের আইন শৃঙ্খলার রক্ষক হওয়া না। তাছাড়া হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাকলেই যদি থাকি পোষাকের আড়ালের রক্ত-মাংসের মানুষটিকে ভুলে গেলে চলবে না, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষকেও এ সত্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকতে হবে : “পুলিশ, পোয়েন্টারা আমাদের শত্রু। কিন্তু তারাও আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের মতোই তাদেরও রক্ত শুবে রক্ত-চোষা। আমাদের যেমন মানুষ বলে গণ্য করে না, ওদেরও তাই। কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু লোককে জুড়ুর ভয় দেখিয়ে একে অস্ত্রের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। হাত-পা বেঁধে, বাঁতা কলে পিষছে ওদের রক্ত শুবে শুবে থাকে। জুলুম অবরুদ্ধ করে ওদের দিয়ে তাইকে ঠাণ্ডাচ্ছে। ওদের তো আর মানুষ করে রাখেনি, ওদের হাতের ডাঙা-বন্ধু আর ইট পাথর যেমন, ওরাও তেমনি।” (গোকার ‘মা’)

ইসলামপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের অজুত ভূমিকা দেখে সারা দেশ তো অবাক হলোই, লংগে লিংগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাবমূর্তিও অশ্রু-কাংশে আহত হলো।

“ইসলামপুরের ঘটনায় দুজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত হওয়ার

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন গভীর শোক প্রকাশ করেন। মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশনের এক বৈঠকে লক্ষ্যগণ দু'মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানান।” (আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ১০ই এপ্রিল ’৮০)

যদিও এরপর আর কিছু বলায় থাকে না। তবু বলতে হচ্ছে, কেবলমাত্র নিহত দু'জন পুলিশের জন্ত শোক প্রকাশ করে অ্যাসোসিয়েশন কি নিজেদের আর একবার নয় করলেন না? এছাড়া, সাত সাতটি গ্রামকে শৃংখলায় পরিণত করে পুলিশ যে প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, সেজন্য অ্যাসোসিয়েশন এতটুকুও অহুতপ্ত নয়, পরন্তু তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণকে জোরালো সমর্থন জানানো হয়েছে। তার প্রমাণ : “রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ওই সব ঘটনায় যে শান্তি-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সামান্যই।” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ এপ্রিল ’৮০)

আমাদের জানা নেই, কোনো স্বস্থ সংগঠনের পক্ষ থেকে এরকম প্ররোচনামূলক মন্তব্য দেওয়া সম্ভব কিনা। তবে এই ধরনের মন্তব্য থেকে সংগঠনের সীমাবদ্ধতা তথা তার দৈহিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ পুলিশও যে সমাজেরই একজন, এ সত্যকে অস্বীকার করে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান বাড়াতে ইচ্ছা যোগায়। যার অনিবার্য পরিণতি নিত্য নতুন উদ্ভেজনা এবং অহেতুক রক্তক্ষয়।

তাই আজকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তথা পুলিশ কর্মচারী—প্রত্যেককেই গোড়ার গলদটা ধরতে শিখতে হবে। এবং যতদিন না স্থিতিবস্তুর অবদান হচ্ছে ততদিন যেমন পুলিশ কর্মচারীকে তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও থাকি পোশাকের আড়ালের রক্ত-মাংসের মানুষটিকে ভুলে গেলে চলবে না, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষকেও এ সত্য সম্পর্কে সদা সচেতন থাকতে হবে : “পুলিশ, পোয়েন্টারা আমাদের শত্রু। কিন্তু তারাও আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের মতোই তাদেরও রক্ত শুবে রক্ত-চোষা। আমাদের যেমন মানুষ বলে গণ্য করে না, ওদেরও তাই। কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু লোককে জুড়ুর ভয় দেখিয়ে একে অস্ত্রের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। হাত-পা বেঁধে, বাঁতা কলে পিষছে ওদের রক্ত শুবে শুবে থাকে। জুলুম অবরুদ্ধ করে ওদের দিয়ে তাইকে ঠাণ্ডাচ্ছে। ওদের তো আর মানুষ করে রাখেনি, ওদের হাতের ডাঙা-বন্ধু আর ইট পাথর যেমন, ওরাও তেমনি।” (গোকার ‘মা’)

অর্থনীতির ভগ্নদশা কে এনেছে ?

অর্থনৈতিক ভাণ্ডিকার

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার আগে শাসক কংগ্রেস (ই) দলের নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক সমস্তা সৃষ্টির জন্তে জনতা ও লোকদলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারগুলিকে দায়ী করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে কংগ্রেস (ই) লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তাদের সরকার জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, মোধ করবেন, নিশ্চল অর্থনীতিকে চালা করে তুলবেন এবং প্রতি পরিবারের একজন কর্মকর্ম লোককে জীবিকা নির্বাহের জন্ত চাকরী দেবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) দল জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা যেন “কাজ করতে সক্ষম” এমন একটি সরকার নির্বাচিত করেন। জনগণের সংখ্যালঘু অংশ

অর্থনীতি

এই আহ্বানে সাড়া দেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি।

এখন শ্রীমতী গান্ধী বলছেন যে অর্থনীতিকে সচল করে তোলা দু'চার বছরের ব্যাপার নয়। এতে বেশ সময় লাগবে। কতটা সময় লাগবে, তা অবশ্য তিনি বলেন নি। সেটা নির্দেশ করে বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ আর কেউ না বুঝলেও শ্রীমতী গান্ধী বোঝেন যে অর্থনীতিকে সচল করে তোলার আশাস কার্যতরী করা তার পক্ষে মহৎও নয়, সম্ভবও নয়। তাদের ছেলে ভুলানো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট কুড়ানোর চেষ্টা সার্থক হয়েছে। এটাই মোদা কথা।

যে শ্রেণীনীতিগুলি ভারতের অর্থনীতিতে নিশ্চলতা এনেছে তার স্বত্বপাত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে যখন ১৯৬৫ সালের সংকট সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকেও আক্রমণ করেছিল। ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়ন থেকে অর্থনৈতিক অধোগতির স্বত্বপাত। শ্রীমতী গান্ধী তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বিখ্যাত ব্যাংকের মাধ্যমে মার্কিন সরকারের নির্দেশ পেয়ে সেদিন কংগ্রেস সরকার ভারতের মুদ্রা টাকার দায় কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং রপ্তানী বৃদ্ধির নামে ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে সস্তা দামে পণ্য সরবরাহ এবং আক্রাদামে বৈদেশিক (মার্কিন ও পশ্চিমী) পণ্য ক্রয়কে জাতীয় অর্থনীতির অঙ্গীভূত করেছিলেন।

অনেকেরই মনে আছে এক সময় ভারত সরকার ইমপোর্ট সাবসিডিউ-

শন বা আমদানী পণ্যের বিকল্প তৈরী করতে প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই নীতি ভারতের একচেটিয়া শিল্প মালিকদের জন্তে আত্মসত্তরীণ বাজার সংরক্ষিত করা এবং বিদেশী প্রতিযোগীদের সঙ্গে দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে রচিত হয়। এই নীতি ভারতের বাজারে দেশী-বিদেশী একচেটে মালিকদের সহযোগিতার ভিত্তিও রচনা করে। এভাবেই ভারতে আন্তর্জাতিক পুঁজি ভারতীয় পুঁজির অঙ্গীভূত রূপে শক্তিশালী ছোট গঠন করতে সক্ষম হয়। ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ ও অধোগতির এই ভিত্তি যখন রচনা করা হয় তখন শ্রীমতী গান্ধী এই নীতি রচনার কোন দায়িত্বই তার ছিল না, একথা বলতে পারেন না। স্বতরাং জনতা ও লোকদল উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থনৈতিক অর্থনীতি লালন পালনের দায়িত্ব পেয়েছিল, তারা যদি সেই শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে না পেরে থাকে তাহলে তাদের দায়ী হিসেবে দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু যিনি বা বাবা এই শিশুর জন্ম দিলেন, তারা কি দোষী তুলসীপাতা হয়ে থাকবেন। শুধু কি দায়ীরাই দোষী?

রিজার্ভ ব্যাংকের সরকারী বুসে-টিনে আমদানী যে চিহ্ন দেখতে পাই দেটাও শ্রীমতী গান্ধীর সরকার দীর্ঘকাল ধরে যে অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল তার বিপক্ষে যায়। তিনি জনতা আয়লে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং অর্থনীতি তছনছ করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৭২-৭৩ সালে শ্রীমতী গান্ধীর ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের পর সর্বভারতীয় পাইকারী মূল্যস্তর ১৯৭১-৭২ সালের মূল্যস্তরের চাইতে ১০ শতাংশ, ১৯৭৩-৭৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০.২ শতাংশ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে আরো ২০.২ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এ সময়ে কাগজী নোট প্রচলন বাড়তে থাকে ১৬.০৯, ১৫.৩৮ এবং ৬.৫৮ শতাংশ। ব্যাংক দাফনের অস্থপাত বাড়তে ১৬.১৮, ২০.১৯ এবং ১৮.৪২ শতাংশ। এই সময় ব্যাংকের আমদানত ও দাফনের অস্থপাত—৩.৩, ২.২, এবং ১.১ শতাংশ। ১৯৭৬-৭৭ সালে শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম দফা শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

জনগণের সন্ধানে

সুধেন্দু মৈত্র

ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে একটি শব্দ 'জনগণ'। সব-দেখাই আছে। তবে আমাদের দেশের মত এমন বহুতর ব্যক্তিত্ব অপর দেশে দেখতে পাওয়া যায়না। সুতরাং সংগত কারণেই এই 'জন-গণের' সন্ধান প্রয়োজন হয়ে যায়।

আর গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলের প্রবক্তাদের মুখে অপর একটি শব্দ যুক্ত হয়। সেটা 'মেহনতী' জনতা। মেহনত শব্দ বারী যদি শুধু নিছক শ্রম বোঝাতে চাই, তবে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে টাটা-বিড়লা মকতলাল থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিক এবং ছোট-মাকারী ও বড় কৃষক সবাই শ্রম বিনিয়োগ করে। আর যদি মনে করি মেহনতি জনতা তাহাই, বারী প্রত্যেকভাবে উৎপাদনের সংগে যুক্ত তাহলে সমস্যা বেড়েই যায়।

কারণ তাহলে তো ৩০ লক্ষ ৬৭ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, ৫২ লক্ষ ৩৬ হাজার প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারী, ১১ লক্ষ ১৮ হাজার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন অঙ্গগত কর্ম-চারীর দল সহ মাষ্টার, দোকানদার, উকিল, যোক্তার ও বেসরকারী অফিসের কর্মচারীর তল 'জনগণ' থেকে বাদ পড়ে যায়। তবে আর কার ভোটে ক্ষমতার আর্দ্রা বাবে এবং মজিব করে জনগণের কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে।

অপরদিকে ভারতের ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। আর এই গ্রামে বসবাসকারীদের ৭২.২ শতাংশ লোক প্রধানতঃ কৃষি কাজ এবং অল্প কিছু কুটির শিল্প জাতীয় কাজে ব্যাপৃত। অতঃ এক হিসেবে ভারতের মোট Wage and Salary Group এ আছে ৩২.৭ শতাংশ লোক। যার ৫৬.৬ শতাংশ লোকই গহরে বাস করে।

উপরোক্ত চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনায় একটা বাস্তব কিন্তু অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে আসে। হিসেবে প্রকাশ এই Wage Group এর ব্যক্তিরা গত ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৬-৭৭ পর্যন্ত গড়ে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রায় ডবল। কোন কোন ক্ষেত্রে ডবলেরও বেশী যেমন,

পশ্চিমবঙ্গে	১৯৭০-৭১ এ ছিল ২১৭৮ টাকা	১৯৭৬-৭৭ এ ৪৩০৫ টাকা
মহারাষ্ট্রে	" " ৩২১৬ "	" " ৪২৭৬ "
তামিলনাড়ু	" " ২২৪৮ "	" " ৪১৬৩ "
পাঞ্জাব	" " ২১৫৮ "	" " ৫৫৮১ "
উড়িষ্যা	" " ২৭৭৮ "	" " ৬৬৮১ "

খুবই ভাল হত যদি হিসেবটা ১৯৭১ পর্যন্ত পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের দেশে সেটা আশা করা উচিত হবে না। কারণ তাহলে

হয়ত দেখা যেত ঐ Wage Group-এর আয় বৃদ্ধি ডবলের কত বেশী। এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭০-৭১ এর মূল্যমান যদি ১০০ ধরা হয় তবে ১৯৭২ র শেষে প্রায়মূল্য বৃদ্ধির হার দাঁড়াল ২২৩.৪ অর্থাৎ সোয়া দুইগুণ। সুতরাং ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৭২-৮০ এই তিন বছরের আয় বৃদ্ধি ধোগ করলে অসম্ভব কল্পনা করত হবেনা যে আয়ের বৃদ্ধিও -ঐ সোয়া দুই গুণের কম নয়। অথচ ১৯৭০ সালে ভারতের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৬৬ টাকা এবং দশক শেষে সেটা মাত্র ১২ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ৬৪৮ টাকা বা বলা হলে ৭.১২.টাকাও হতে পারে। অর্থাৎ জনগণের আয় মাথাপিছু বাড়ল ২.১ শতাংশ। আর বিশেষ গোষ্ঠীর আয় বাড়ল সোয়া দুই গুণ।

সেই সম্বন্ধে বলছিলেন ভারতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সত্যিকার জনগণকে, তার সন্ধান পাওয়া খুব মুশকিল। কারণ হিসেবে প্রকাশ ভারতের মাত্র ৮ শতাংশ লোকের গড় আয় মাসিক ১০০ টাকা। যার মানে দাঁড়াল বাকী ১২ শতাংশের মাসিক আয় ১০০ টাকার নীচে। অপরদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংজীর মতে ইন্ডিয়ান এরারলাইমের ড্রাইভারের মাহিনা মাসিক ১৬০০ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেরানী আয় করে মাসিক ১৭০০ টাকা ইত্যাদি। তাঁর কথা ধরাই উচিত কারণ গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে জোরদার করতে মার্কসবাদী দলগুলি তাঁর দলের সংগে আঁতাতে এসেছিলেন। বা হোক, তবু তাঁর কথা বাব দিলাম। কিন্তু সরকারী কর্মচারী ও কর্মীদের ইউনিয়ন সভাপতি মিঃ কুলকারীর কথা তো ধরব? তাঁর মতে তাঁদের মাসিক গড় আয় ৮০০ টাকা। তবে কি দাঁড়াল? মাত্র ৮ শতাংশও নয়, কোন 'শতাংশে' এরা পড়লেন? এদেরকে Privileged class বলে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থ-নীতির 'জনগণ' পাব কোথায়?

মুন্সিফটা কোথায় বিবেচনা করুন। দেশের মাত্র ৩২ শতাংশ Salary and Wage Group এ। তারা যদি Privileged class হয়ে যায় তবে 'জনগণ'কে পাব কোথায়?

কারণ দেশের ৭০ শতাংশ লোক নাম স্বাক্ষরে অক্ষর। তাহলে রইল ঐ ৩০ শতাংশই। এমত অবস্থায় ধরয়ের কাগজের বক্তৃতা, ম্যানিকেষ্টো, প্রোগ্রাম বা পার্লামেন্টের বক্তৃতা পড়বে কে? প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীল বিচার করবে কে? ঘটনা যদি এই ভাবেই নির্বিঘ্নে চলতে থাকত তবে আশঙ্কি ছিল না। কিন্তু যেহেতু সত্যিই সমস্ত দেশের রক্ত মুখে এলে দেব স্বপ্ন থাকতেই পারে না, তাই এই অব-স্থার দেশকে পিছু হঠতেই হবে। হয়েছেও তাই। খবরে প্রকাশ, ১৯৭৮-৭৯ সালে জাতীয় উৎপাদন (G. N. P) ১১,৫০০ কোটি টাকা ছিল। যার মধ্যে কৃষি এবং তৎসহ কার্খকলাপের অংশ ছিল ৩৮,৫০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪২ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭২-৮০ সালে জাতীয় উৎপাদন কমে গেছে। ঐ ১৯৭৮-৭৯-র মূল্যমান অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭২-৮০-তে জাতীয় উৎপাদন মাত্র (G. N. P) ৮৫,৫১০ কোটি টাকা। যার মধ্যে কৃষি ও তৎসহ কার্খকলাপের অংশ ৩৫,৩৫৫ কোটি টাকা। অবশ্য প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও কিছুকালীন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংজীর মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যকারী বাজুটের দমায় যদি মূল্যমান ১৯৭২-৮০-র স্তরে হিসেব করা যায় তবে জাতীয় উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,০০০ কোটি টাকা যার মধ্যে কৃষি ইত্যাদি বাবদ ৩১,২০০ কোটি টাকা বলে অসম্ভব করা হচ্ছে। এটা শুধু মুদ্রাস্ফীতির দান।

গণতন্ত্র। আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক লোক মারিজ্যাসীয়ার নীচে। প্রায় তিনভাগ লোকের অক্ষর পরি-চয় নেই। অথচ পৃথিবীর অত্যন্তম বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক প্রাণায় ভোট দিয়ে সরকার তৈরী করে আবার ভাদে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গত ১৯৭৭ এর নির্বাচনে যখন গণতন্ত্রের জয়জয়কার এবং যখন দক্ষিণ ভারতে ঐ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের ধারক বাহক জনতা দল মুখ খুলে পড়লো, তখন প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাই কী কারণ নির্দেশ করেছিলেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের যুগ্মমন্ত্রীরা তাদের পরিকল্পনাগুলি ভালভাবে রূপায়িত করেছিলেন বলেই কি কংগ্রেসের জয়জয়কার? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন—না। নির্বাচন ভেতবার জন্তে বিশেষ করে যুগ্মমন্ত্রী ভেজল রাও সমস্ত ধরনের

কাগজগুলি কিনে কেলেছিলেন। আরও যোগ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে Mass media ক্রয় করে কেলাই কারণ।

অবশ্য সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন নি, উত্তর ভারতে ঐ একই ভাবে জনতা পার্টি জিতেছিল কিনা? তাহলে বাধীন, নির্ভীক ও নির-শেষ সংবাদপত্রগুলি কোন শ্রেণীকে প্রভাবিত করে? নিশ্চয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যারা লেখাপড়া জানে ও ভক্তলোক। এরাই সরকার স্থাপন করে, ভাঙে, কিন্তু প্রশ্ন থাকে কার-বার্বে? নিশ্চয় নিজ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর-বার্বে। এই আয়ার ভারতবর্ষ। যে ভারতবর্ষে জনগণকে খুঁজে পেতে গেলে যেতে হবে মধ্যবিত্তের দুরারে। যে মধ্যবিত্ত প্রত্যেকভাবে শ্রম বিনি-য়োগ করে সম্পদের সৃষ্টি করে না। ঐ ৭০ শতাংশ গ্রামের লোক এবং কলে কারখানায় প্রত্যেকশ্রমদানজাত উৎপাদিত সম্পদের অংশ আত্মসাৎ করে। যেহেতু এরাই সরকার গড়ে, সুতরাং সেই সরকারকে এদের তুট রাখতেই হয়।

তাই দেখি রেশনের ভতু'কীর টাকা, ট্রাম ও বাসের লোকসানের টাকা, হাউসিং বোর্ডের বাড়ি তৈরী করে দেবার ব্যবস্থা, সরকারী ইট নির্মাণের প্রকল্পে লোকসানের টাকা, ছুফ প্রকল্পগুলির লোকসানের টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি কোটি কোটি টাকা সরকার গুণে চলেছেন। কেন? ঐ মধ্যবিত্তকে স্বপ্ন স্ববিধা দিয়ে তুট না করলে পরবর্তী নির্বাচনে আবার গণ-তন্ত্র মাথা চাড়া দেবে।

ঐপন্যবৈশিক শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার ও মানসিকতা পুষ্ট ভারতবর্ষ যা কিছু শিখেছে বুঝেছে, তা ঐ ইংরেজদের কাছ থেকেই আর ঐ ইংলেণ্ডের ইতিহাস প্রদর্শে পোলাও বলেছেন—“England... has been for centuries peculiarly the land of the middle class; they give the tone to every-thing English, good or bad, and English history has been made by its middle class to a greater extent than the his-tory of any other country.”

বাধীন ভারতের ইতিহাস লেখ-বার সময় সত্যিকার ঐতিহাসিককে ওপরের ঐ লাইন কয়টার পুনরাবৃত্তি করে শুধু ইংলেণ্ডের জায়গায় ভারতবর্ষ শব্দটা বুল করতে হবে।

এবার আবার হিসেব নিতে হবে বর্তমান শিক্ষিত, সমাজ সচেতন এই মধ্যবিত্তের জন্ম ব্রহ্মাস্তর। খল্লা-কারে ওটাও একটু জানা সরকার। নায়ের, গোস্বামী, পাইক, বরকন্দা-জের মত মধ্যবিত্তের দল পূর্বেও

ছিল। কিন্তু মহাত্মা ইংরেজ সম্রাটের প্রয়োজন হল একদল “শিক্ষিত” নেতিভদের। বারী শোষণ ও শাসনের জন্ত নেতিভদের ও শোষণদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করবে। চলতি বাংলার ‘মাসাল’ প্রয়োজন হল।

তাই মেকলে সাহেব উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলেছেন—“In according diffusing European know-ledge” এবং “in naturalising European institutions.” যার জন্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সরকার হয়ে পড়লো হিন্দু কলেজের উদ্বোধন। এরা কারা? বারী ‘মূল্য’ সৃষ্টি করে না। শ্রমজাত উৎপাদিত “মূল্যের” বেশীটা মহাপ্রভুর সেবার-দিয়ে উজ্জিষ্ট নিয়ে সঙঠ থাকে।

আজ নাকি “শিক্ষিত” বেকারের ছড়াছড়ি। আজ নয়, একশত বছর আগে ১৮৮১ সালের হিসেব মিলে দেখা বাবে তখনও তাই ছিল। হিসেব দেখা যায় ১৮৮১ সাল পর্যন্ত গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল ১৭১২ জন মাত্র। কিন্তু তখনই তার অর্ধেক ছিল বেকার। কেন ছিল? তখন ‘ভূমির অভাব ছিল না। জনসংখ্যার চাপ ছিল না। ব্যবসা ও বাণিজ্য নড়েচড়ে উঠেছে, যেখানে সভ্যকার শিকিত হলে বখেট হাত খেলাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু অর্ধেক বেকার ছিল। কারণ ঐপন্যবৈশিক শিক্ষা, মূল্য সৃষ্টির শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা দেয় অপর্যাপ্ত মূল্যের অংশ আত্ম-সাৎ করতে। আজও একই ধার চলছে। শিক্ষা সংস্থারের মহান বাণী গত ত্রিশ বছর ধরে শোনা যাচ্ছে সব মস্তিষ্কের কাছে। কিন্তু সরস্বতী মধ্যই যে সূত। মস্তিষ্ক যে একই শিক্ষার শিক্ষিত। তাই তাঁদের চোখেও জনগণ মানে ঐ স্বশ্রেণীভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মধ্যবিত্তকে শ্রেণী বলা হবে কিনা ইত্যাদি তাত্ত্বিক লড়াই চলবে। কিন্তু সবশেষে জন-গণ মানে ঐ মধ্যবিত্ত।

প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্ত শেষ করতে হয় এই বলে, জনগণের সন্ধানে গিয়ে যদি সমস্ত দেশের জন-সংখ্যার তুলনায় নগণ্য মধ্যবিত্তের শেষ হয়, তবে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির এক কোয়ালিশন করে তার নাম দেওয়া হোক “মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা সমিতি”। ভারতের কপালের লিখন এইটাই।

জাঁ পল সার্ত্তর

মিহির আচার্য

কিছু লেখক আছেন যারা অনার্মানে স্বদেশের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন হতে পারেন। এবং তাঁদের মৃত্যু প্রিয়জন বিচ্ছেদের মতোই করণ। ভরংকর অসহায় ও নিঃসঙ্গ লাগে এই কথা তেবে যে জীবনের হিসেবে পঁচাত্তর বয়েস কিছু দীর্ঘ নয়, কী কতি ছিল তাঁর অগণন প্রিয়জনের মধ্যে আরো কিছুকাল কাটিয়ে বেতে পারলে।

তবু একথা ঠিক যে শেষের দিকে প্রায় অন্ধ সার্ত্তর তাঁর অধ্যয়ন এবং সৃষ্টিকর্ম সৃষ্টিতে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাহলেও তাঁর উজ্জল চিন্তাশক্তি বা তিনি রেখে দিয়ে গেছেন তা বিশাল না হলেও গুণগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ।

সৃষ্টিকর্মকে ধারা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে বেলাতে পারেন তাঁদের সাহিত্য নিছক বানানো জিনিস হয়ে ওঠেনা, প্রকৃত জীবনায়ন তার নাম। জীবন-সম্পর্কে অহু-সন্ধান, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যার তাঁদের রচনার নিজস্ব একটি দার্শনিক উপ-অঙ্গ গড়ে ওঠে। এবং মূলত তাঁদের সৃজনশীল কর্ম—উপন্যাস—গল্প বা নাটক—সেই দর্শনেরই বাহন হয়ে ওঠে। সে দর্শনের নাম অস্তিত্ববাদ, বা সার্ত্তর পরিবর্তন করলেও জনক হিসেবে কির্কগোর্ডের নাম করতে হয়। অতীতকে মার্কসীয় দর্শনের আওতা থেকেও সার্ত্তর কোনো কালেই বেয়িয়ে আসতে পারেননি।

মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের মৌলিক বিরোধও অস্বীকার করা যায়না। যেহেতু অস্তিত্ববাদ ব্যক্তির সূক্ষ্মতাকে গণ্য করে স্থাথেনা। সেখানে ব্যক্তি অপেক্ষা সামাজিক সত্তার উপরই মার্কসবাদ গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এভাবে বিষয়টাকে দেখলে সিদ্ধান্ত বড় যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

কারণ সার্ত্তর যে ‘ব্যক্তির’ কথা বলেন তা সমাজবহির্ভূত নিরালম্ব স্বয়ংস্ব নয়, সে ব্যক্তি সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ, দায়িত্ববান। সে এমন কাজ করেনা বা সমাজের কতি-কারক। ফলে সার্ত্তর ‘সামাজিক নৈতিকতার’ বিদ্যাদী। স্বাধীন, ব্যক্তি চৈতন্তের প্রচারক বলেই যা এর বিরুদ্ধ শক্তি তার বিরুদ্ধে তিনি অস্বীকার প্রতিবাদ। সাহিত্যের গজদস্তমিনার থেকে নেমে আসেন জীবনের মুখোমুখি। সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে নান্দী নাগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নান্দোজনই হোক কিংবা তথাকথিত

বেআইনী প্রচারকর্ম। কারাগারও বরণ করতে হয়েছে সে-কারণে। অধিকৃত দেশবাসীর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে কৌশলে নাটক রচনা করেন। একই স্বাধীনতাস্পৃহার তাকনে সার্ত্তর মোভিয়েটের হাঙ্গেরি আক্রমণ ও অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। যেমন ইন্দো-চীনে মার্কিন আগ্রাসের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। এই ব্যক্তি স্বাধীনতার কারণেই তিনি আজীবন এস্টাব্লিশ-মেন্ট বিরোধী। ১৯৬৪-তে নোবেল পুরস্কারকে অক্লেপে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আলজিরিয়ারে বোতানদের নির্ধাতনের ব্যাপারটাও এই প্রসঙ্গে তিনি মনে রেখেছিলেন। এই দার্শনিক মাহুটি যে বিবাহরূপ প্রথাকে স্বীকার করতে পারেননা তাই দর্শনে যখন তিনি প্রথম হলেন, দ্বিতীয় হলেন সাইমন চ বিতু, তামি সহপাঠিনী, ১৯২৯ থেকে বিবাহ-বন্ধনকে অস্বীকার করে তাঁকেই জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিত করলেন। বলাবাহুল্য এই মহিলাও আজকের জ্ঞানের স্নানমধ্যতা চিন্তাশীল লেখিকা।

একেকজন লেখক থাকেন ধারা ‘লেখকের লেখক’। সার্ত্তরও সেই শ্রেণীর। সম্মানে-অজ্ঞানে ধারা

সাহিত্য দর্পণ

বিশ্ব কত লেখক যে তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শনের ধারা প্রভাবিত তার ইয়ত্তা নেই। স্বদেশের আলবেয়র কামু কিংবা যুগোস্লাভ নোবেল-প্রাপক ইভান আগ্নিক তো বটেই, এমনকি এদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকও ‘পুতুল নাচের ইতি-কথার’ এই অস্তিত্ববাদী দর্শনের ধারা আক্রান্ত।

ছোটগল্পগ্রন্থ ‘ইনটিমেসি’, নাম-গল্পটি তো বটেই ‘দেয়াল’ প্রতি-রোধের গল্প, ‘প্রবন্ধ মেতার বাল্য-কাল’ গল্পে কালিন্ত নারকের অস্বাভাব্য গল্প বর্ণনা করেছেন লেখক। ‘পত-ভ্রম’ গল্পের ভরংবগ দাম্পত্য সম্পর্কে মনঃস্থান সুরত্রে না পেয়ে একটা সংকীর্ণ অন্তর্ভুক্ত গল্পগ্রন্থটিকে প্রকা-শিত সামাজিক সেক্টরী বলে বর্ণনা করেন। বাস্তবী প্রকাশকদের তুচ্ছকার্যকর রীতিই বটে।

তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী দ্বিতীয় যুদ্ধ বিরুদ্ধ সমাজের মর্মভেদী উদ্ঘাটন। ‘এক অব-রিজন’ ‘রিপ্রিভ’ এবং ‘আররন ইন্ দি সোল’ ইংরাজি অহুবাদ। নারক ম্যাথিউ খেন লেখকেই প্রতিবিম্ব। তাঁর বিখ্যাত প্রতিরোধমূলক শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

জাঁ পল সার্ত্তর : যৌবনের রক্তপলাশ

কালিদাস কুণ্ডু

ফরাসী বিপ্লবের পরাজয়ের সর্বা-ধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জাঁ পল সার্ত্তর। অস্তিত্ববাদ থেকে মার্কসবাদ-মার্বাদে উদ্ভূত এই মহান দার্শনিক প্রতিভার দীপ্ত আলোকে আমাদের শতাব্দীর যুগ্মগুণ উজ্জল করেছেন, মহত্ব-জাতির সমষ্টিজাত জ্ঞানভাণ্ডারে রেখে গেছেন পরিণত চিন্তার অক্ষর সম্পদ। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরি-চালিত বিপ্লবের ঐতর্য্য উদ্ঘাটন-কারকে অগ্রাহ্য করে সার্ত্তর রচনা করেছেন অব্যাহা সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গীত। পদ্য উৎসাহনকারী সত্য-তার সর্বব্যাপী অবস্থার মধ্যে বিপ্লব ব্যক্তিত্বের স্বর্ণণ, দত্যাহুসন্ধানের আর্ত প্রচেষ্টা, ‘সিদ্ধপারগামী বিহ্বলের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রা’ ও ‘কল্পিত বিজিত-তার বিবাহ জ্ঞানের শিল্প-সাহিত্যকে যখন গ্রাস করে ফেলেছে তখন জাগ্রত হ’ল জাঁ পলের অন্তর কণ্ঠ—“মাহুয ভাসমান, বিজিত স্বীপ নয়”—“He is a being in action”, তা-ব-বাদী দর্শনের গর্ভজাত Inaction বা নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিপরীতে সার্ত্তর প্রচার করলেন ‘Philosophy in action.’ ব্যক্তির মুক্তি নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নয় বোধ সক্রিয়তার মধ্যে। সার্ত্তর মার্কসবাদের অঙ্গ ভক্ত নয়—critical supporter। বোধ সক্রিয়তার তবু ধীরে ধীরে তাকে মাওবাদে আকৃষ্ট করেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বিজ্ঞাহকে তার সমস্ত বলে মনে করেছেন।

তাই ১৯৬৮ সালে অগ্নিগর্ভ জ্ঞানের বিদ্রোহী ছাত্রদের হাতে জাঁ পল তুলে দিয়েছিলেন যৌবনের রক্তমাখাল। নামতোরের জাভিন কোয়ার্টার্সে, সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত আলিনার ও প্যারিসের পথে পথে সেদিন স্বৈরাচারী গুলের আকাশ-ছোঁওয়া দস্তের বিরুদ্ধে জাঁ পল সার্ত্তর উচ্চকণ্ঠ—“তরুণের এই অভিযান জরাজীর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরমশাল জালুক। হোয়াবা ধারা নবীন পথের স্বাত্রী—চিন্তার দামত্ব ভাঙতো—আমি তোমাদেরই সঙ্গে।”

প্রমিত ছাত্রদের বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গের মুখে ২৪শে মে গুল গণ-ভোটের কথা ঘোষণা করলেন। জ্ঞানের অধঃপতিত কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ওয়ালডেক রাস বললেন—“চলপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার চাই।”

জাঁ পল গর্জে উঠলেন—“জঘন্ত-তম অপরাধ।” গুলকে জিজ্ঞাসা করা হল—“জাঁ পলকে আপনি

গ্রেপ্তার করতেন না কেন?” উত্তরে গুল বললেন—“আমি ভুলটোয়ারকে গ্রেপ্তার করতে পারি না।”

মিডনী ফিনকেলষ্টাইন তাঁর বিত-কিত গ্রন্থ “Existentialism and Alienation in American literature”-এ দেখিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজের সন্ত্রস্তের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তি সত্তার জন্মশ: বিচ্ছিন্নতা মাহুযকে ‘নির্জনতার পূজারী’ করে তোলে, তাকে সমাজ বহির্ভূত করে তোলে।

সার্ত্তর কিন্তু অস্তিত্ববাদকে মার্কস-বাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তি রাষ্ট্রত্বের পীড়নের শিকার হলেও প্রতিরোধ রচনার নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। মার্কস বলেছেন—শ্রেণী বিতক্ত সমাজে প্রম-বিভাগই ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতার কারণ, রাষ্ট্রত্বের পীড়ন নয়। রাষ্ট্র-ত্ব ব্যক্তিকে পীড়ন করে না, শ্রেণীকে পীড়ন করে। তাই শ্রেণীগত-ভাবেই রাষ্ট্রত্বের উচ্ছেদসাধন সম্ভব, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার নয়।

সার্ত্তর দীর্ঘ বিতর্কে এনেছেন। তাঁর “Cretique de la Raison Dialectique” মার্কসবাদের সমা-লোচনা হলেও কোথাও কোথাও পরিপূরকও বটে। উপরোক্ত ‘দ্যানিক সৃষ্টিবাদের সমালোচনা’ গ্রন্থের Question de Methode সার্ত্তর ঐতিহাসিক চেতনাকে তুলে ধরেছে। সার্ত্তর ইতিহাস সচেতন হলেও আশাবাদী নয়। বরং কিছুটা আনাসক্তভাবেই তাঁর কর্মপ্রেরণা উদ্দীপ্ত হতে চায়। “First I ought to commit myself and then act my commitment, according to the time honoured formula that one need not hope in order to undertake work.”

বুর্জোয়া সমাজের আত্মসন্ত্রস্ত স্ব বিরোধিতার ফলে সাহিত্যে আরও একটি ত্বের সৃষ্টি হয়েছে—অ্যাবনারতিটির ত্ব। কামু এই ত্বের প্রধান প্রবক্তা। সার্ত্তর কামুকে অস্তিত্ববাদীদের তালিকা থেকে বারিস্ত করে দিয়েছেন। কামু সার্ত্তর ভাব শিষ্য নয়—জেনপাদ ও হেরডেগারের সঙ্গেই তাঁর চিন্তার সাদৃশ্য বেশী।

সার্ত্তর জীবন দিয়ে প্রমাণ করে-ছেন, কোনও কিছু হওয়াই বেঁচে থাকা নয়, বেঁচে থাকার অব্যই বিপ্লব। সোরেন কেয়ার্কেগোর্ডের মতো তিনি বহিরাগত কোনও অমোঘ শক্তি থেকে উৎসারিত কর্ম

উদ্দীপনাকে স্বীকার করেন নি।

১৯৪৫ সালে ‘অস্তিত্ববাদ ও মান-বিক্রমবোধ’ বিষয়ে প্যারিস বক্তৃতায় সার্ত্তর ঘোষণা করেন—“I can not count upon men whom I do not know. I shall always count upon my com-rades-in arms in struggle”

সংগ্রামরত মাহুযের উপর সর্ধর্ক প্রত্যয় তাকে—অস্তিত্ববাদের জনক কেয়ার্কেগোর্ড থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। অতীতকে তাকে আকৃষ্ট করেছে বিপ্লবকামী জ্ঞানের নবোন্মিত যুগ্মজির প্রতি।

চল্লিশের দশকে যে সার্ত্তর সাক্ষে-তিক নাটক ‘The Flies’ লিখে নান্দী বিরোধী সংগ্রামের উদ্‌বোধন করেছিলেন ঘাটের দশকের শেষ প্রান্তে এসে তিনিই বিপ্লবের জয়গান করেছেন ‘Revolution’ পত্রিকার সম্পাদকরূপে।

তাই মাও-এর মৃত্যুর পর সার্ত্ত-রের প্রধান বিংশ শতাব্দীর সন্ততম শোকাবহ ঘটনা রূপে চিহ্নিত হবে রইল বিশ্ববাসীর মনে।

গুয়াতেমালায় হত্যাকাণ্ড

গুয়াতেমালায় বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র এল্ টেমপেস্তোর সংবাদ-দাতা জোস লিও কাস্তানেভা গত বছরের ১৬ নভেম্বর রাতে আর বাড়ি ফিরলেন না। পরিবারের সৌজন্যে নারায়ণ উৎসবের সঙ্গে কাটালেন ৮ পনের দিন রাখপথে তাকে পাওয়া গেল ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই রক্তক্ষয়ের কলে তিনি যারা গেলেন। কাস্তানেভা গুয়াতেমালায় সাংবা-দিক ইউনিয়ন সিমকোস এর সেক্রে-টারী জেনারেল ছিলেন। এ ঘটনার পাঁচদিন পর বেতার জগতের সংবাদ-দাতা জুলিও সিডার হারনাডেডকেও গুয়াতেমালায় নিয়ে গেল এবং নির্বা-তন করলো, দীর্ঘদিন তাঁকে হান-পাতালে কাটাতে হয়েছে।

গুয়াতেমালায় নাথকরা মানিক পত্রিকা ‘ভায়াগোগো’র বিরুদ্ধে সর-কারী মনোভাব তীব্র হচ্ছে, ফলে সম্পাদক জুলিয়া এদুইভেলের নিরা-পত্তা নিয়ে গুয়াতেমালায় হুগতি-শীলরা চিন্তা করছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর পত্রিকার তৈনিক কর্মচারীকে গুয়াতেমালা শহরের কেন্দ্রীয় ডাক-ঘরে অনর্থক কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করিয়ে শেষাংশ ২ম পৃষ্ঠায়

গ্রন্থ পরিচয়

সমর সেন ও বাবু বৃত্তান্ত

মিহির আচার্য

বাবু বৃত্তান্ত : সমর সেন।

আশা প্রকাশনী : ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১।

মাম : দশ টাকা।

বৈচিত্র্য একটা পদ্ধতি। ক্রমাগত নির্বাচন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে ধাবমান। কোনো মানুষের জীবনকেই খণ্ডাংশ দিয়ে বিচার করা চলে না। কারণ সমগ্র চলমান জীবনের যোগফলকেই গণনা করতে হয়। বিদগ্ধ ব্যক্তি কখনো সচেতন, কখনো অচেতনভাবে আত্মসমালোচনা করতে-করতে প্রৌঢ়ের দিকে এগোন। যিনি এই আত্মসমালোচনাকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন তাঁর কাছে জীবনসত্য একদিন-না-একদিন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অতীতকে ধীরে ধীরে আত্মদর্শন নেই, তিনি জীবনকালেও একরকম তত্ত্বার মধ্যেই জীবনকে কাটিয়ে দেন।

কথাগুলো মনে পড়ল সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' পড়ে। তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতি এবং প্রথম যৌবনে বুদ্ধদেব বহু প্রমুখ মানুষ-গুলির সান্নিধ্যে, সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘোড়াটোপে, বৃহত্তর জনসাধারণের স্পর্শ ঝাঁটিয়ে যে ধরনের নাগরিক বৈদগ্ধ্য তাঁর কাব্যে ছায়াপাত করেছে তাকে শুধুমাত্র 'ডেকাডেন্ট' বলে এক কথায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ এক কথা স্বীকার করতে হবে গ্রামীণ কাব্যভাষা ও রীতিকে স্পৃহায় বর্জন করে সমর সেনই সর্বশ্রেণী সৈনিকের নাগরিক কবির প্রতিিনিধি হতে পেরেছেন। কবি হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক স্বাকার করে নেয়াই বুদ্ধি-

মানের কাজ হবে। সমর সেন যতই পরিচালনা করে বলুন যে পাগলা কুহুরের কামড় থেকে তাঁর কাব্যসুন্দর। সমর সেনের একটা কবি-পরিচয়টি তাঁর জীবন থেকে খারিজ করা যায় না। পরবর্তীকালে তিনি কাব্যচর্চা ছেড়েছেন, হয়তো কবিতা লেখার থেকে আরো গুরুতর প্রয়োজন তাঁকে আহ্বান জানিয়েছে। কেন একজন কবিতাধর স্বজনশীল লেখক হঠাৎ কলম থামিয়ে সাংবাদিক জীবনকে বেছে নেন—এ প্রশ্নের যুক্তিশীল উত্তর সম্ভবত তাঁরও জানা নেই। দেখেছে আরেকজন স্বজনশীল লেখক হিসেবেই সাফাই গাইতে পারি, সেটা টমাস হাডির 'character is destiny' দর্শনের উপলব্ধি। লেখকের বিশিষ্ট মারনিক-গঠন একটা থাকেই, তা অস্তঃসলিলা ফলস্রাবের মতো, উপযুক্ত সামাজিক-আর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর চাপ এমনভাবে ছড়মুড় করে এসে পড়ে যায় উপর যত্ন লেখকেরও কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অদৃষ্টবাহীর মতো শোনাতেও বলতে হয় আমরা 'হুই' 'করি না'। সমর সেন চান-বা না-চান তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া সমাজমনক বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় হিসেবেই গড়ে তুলেছে। শেষ দিকে 'Now' এবং 'Frontier' সাপ্তাহিকের বামপন্থী চরিত্রকে অস্বীকার করার উপায় নেই। 'বিপ্লবী' শব্দটা বহুব্যবহৃত হয়ে এদেশে সস্তা একটা বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। সমর সেন তাঁর মধ্যবিত্ত-দীর্ঘাবস্থার প্রথম সচেতন। "চিন্তায় ও কর্মে সমগ্র আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না।" সমর-বাবুর এই আত্মসমালোচনা এদেশের বিপ্লব-বানাবার ঠিকোঁড়ার নিম্নেরা কী করতে প্রস্তুত?

আবার বলছি বৈচিত্র্য একটা পদ্ধতি। ঝাড়াই-ঝাড়াই করতে করতে সমরবাবু একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। দীর্ঘকাল স্টালিনের দেশ মোতিয়েতে থাকলেও বিপ্লবী হওয়া যায় না—সমরবাবুর এই মন্তব্য অবশ্যই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। রাশিয়াতে

'বুর্জোয়া পাপ' কীভাবে প্রবেশ করেছে, সেখানেও 'লাল ফিতের' দৌরাঙ্গা, পশ্চিমী জীবনের প্রতি অস্ত্র আকর্ষণ, ডলারের প্রতি হাংলামো—সব কিছুই তাঁর চোখ এবং মস্তিষ্ক উপলব্ধি করেছে। এই যে দেখার পদ্ধতি, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমরবাবুকে দারিদ্রশীল করে রেখেছে। তিনি কোনো বামপন্থী দলের খাতায় নাম না-লেখালেও এ দেশের বামপন্থী আন্দোলনের মুক্তি যে একমাত্র 'বিপ্লবের' পথেই সংসদীয় গণতন্ত্র নয়, এ বিষয়ে তিনি বিধাহীন। এবং কোনো রাজনৈতিক দলে না-থাকার কারণেই কোনো পার্টি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হলে তিনি তাঁর কঠোর সমালোচক। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা আছে। স্বাভাবিক। মার্কসবাদকে যিনি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের চেষ্টা করেন ঠিকোঁড়ার মনোবৃত্তি থেকেই পার্টিগুলি সেটাকে তাদের যৌরনীপাটের উপর হস্তক্ষেপ মনে করেন।

টলষ্টয়ের জীবন ও সাহিত্য

লিও টলষ্টয় : জীবন ও সাহিত্য : নারায়ণ চৌধুরী।

প্রকাশক : পপুলার লাইব্রেরি : ১১৭/১ বি বিধান সরণী, কলকাতা-৬।

মাম : দশ টাকা।

লিও টলষ্টয়ের সার্বশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গ্রন্থটি রচিত হয়। বাঙালী পাঠকের কাছে টলষ্টয় চর্চা অতি প্রাচীন। বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ তাঁদের প্রয়োজনে টলষ্টয়কে ব্যবহার করেছেন। কারও কাছে তিনি কথিকল্প। কিন্তু আমরা তাঁকে একমাত্র মহান লেখক হিসেবেই স্বীকার করি। মহান এই কারণেই যে তাঁর অধিকাংশ রচনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতারই ফসল। যে জীবন জটিল, বিক্ষুব্ধ, যন্ত্রণাময়। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মতোই তাঁর সাহিত্য আত্মজীবনী মূলক। এবং আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে ব্যক্তিগত জীবনকে সৃষ্টিকর্মে ঘূর্ণন করতে না-পারলে প্রধান সাহিত্য হতে পারে না। যত্নবীল পাঠক টলষ্টয় রচনার জটিলতায় যে মগ্ন হয়ে পড়েন তাঁর কারণ সাহিত্য নিছক লেখকের কাছে বানানো কাহিনী নয়, সর্বশ্রেণী জীবনায়ন।

লীনারায়ণ চৌধুরী সাম্প্রতিককালের প্রথম সারির সমালোচকের অন্ততম, যিনি দ্বারে পড়ে নিছক বই লেখেন না। যখন বা লেখেন তার মধ্যে তাঁর অধ্যয়ন ও সীরিস মননশীলতা কাজ করে। এই গ্রন্থের বিষয় মহান শ্রেষ্ঠ টলষ্টয়, বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপুরুষ, যিনিই একমাত্র War and Peace লিখতে পারেন, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গুলির মধ্যে একটি। 'উপন্যাস' আখ্যাও যেন এই রচনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এর বিষয়বস্তু একটা যুগকে ধরে রেখেছে, একাধারে ইতিহাস এবং সময় বিজ্ঞানের দলিল। উপন্যাসের চিরচরিত কথ-

থেকে বিচ্যুত হলে তিনি তাঁর কঠোর সমালোচক। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা আছে। স্বাভাবিক। মার্কসবাদকে যিনি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের চেষ্টা করেন ঠিকোঁড়ার মনোবৃত্তি থেকেই পার্টিগুলি সেটাকে তাদের যৌরনীপাটের উপর হস্তক্ষেপ মনে করেন।

৮২-পৃষ্ঠার এই 'বাবু বৃত্তান্তের' সঙ্গে কিছু প্রবন্ধ এবং 'উড়ো বৈ-শীর্ষক' রাজনৈতিক রচনাগুলি আছে। জাগতিক দ্রুততার লেখা হলেও তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ পাঠকে চিন্তাবিত্ত করবে।

কেও যেন শেষাংশে ভেঙে দিয়েছেন লেখক।

লীনারায়ণ চৌধুরী একালের উদ্ভাসিত তরুণের সামনে আলোকবতিকা স্বরূপ টলষ্টয়ের জীবন ও সাহিত্যকে তুলনামূলক বিচারে প্রাঙ্গল ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। বলা বাহুল্য বিদগ্ধ পাঠকের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তাই টলষ্টয়ের প্রামাণিক জীবন এবং তাঁর রচনাগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে মূল্যায়ন করেছেন সেখানে নিঃস্ব মৌলিক কিছু চিন্তা জোর করে চাপিয়ে দিতে চাননি। বরং সমগ্র গ্রন্থে অ্যাকাডেমিক শৃংখলা স্বন্দরভাবে বিভক্ত হয়েছে। যেমন শুরুতে মহান লেখকের জীবন, আত্মজীবনের প্রায়স-এর পরেই সাহিত্য-শিল্পচিন্তার সঙ্গে শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করেছেন এবং শেষের দুটি অধ্যায়ে মূল্যবান অংশ টলষ্টয় ও ভারতবর্ষ এবং লেনিন-গির (শেখত বাহ গেল কেন?) চোখে টলষ্টয়ের স্থপরিচিত মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণকে উদ্ভূত করেছেন।

আমরা আনন্দের সঙ্গে বলতে চাই যে-তরুণ প্রবেশকদের জন্যে এ গ্রন্থ রচিত তাঁরা এই রচনা পাঠে লাভবান হবেন। এবং আমাদের মতো প্রবীণদেরও উপরি পাওনা হাতের কাছে চট করে এমন একটি টলষ্টয়-পরিচিতি তৈরি যে শেষে যাকি। আমরা টলষ্টয়-দৃষ্টিংহু তরুণদের দরবারে এই গ্রন্থটি স্থপারিশ করছি।

অর্থনীতির ভগ্নদশা

২য় পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর শেষ বছরে ব্যাক আমানত ও দাননের অল্পপাত—১৯ শতাংশে দাঁড়ায়। এই চিত্র থেকে কি মনে হয় না অর্থনীতি তখনই হয়ে গিয়েছিল বয়ঃ শ্রমতী গান্ধী যিনি পরবর্তী জনতা সরকারের ঘাড়ের সব অপবাদ চাপাতে চাই-ছেন?

শ্রমতী গান্ধীর পূর্ববর্তী আমলে কাংগড়ী নোট প্রচলন এবং ঐ নোটের পরিমাণ কতটা জনসাধারণের হাতে ছিল (অর্থাৎ জনসাধারণের আয়ের সঙ্গে সমন্বয় ছিল) এবং কতটা সঞ্চয় বা মুনাফার অংশ হিসেবে ব্যাঙ্কে আমানত হয়েছিল তা থেকেও জাতীয় অর্থনীতি কি ভাবে দীর্ঘকাল ধরে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেস আমলে এই অধোগতির স্বরূপাত, জনতা আমলেও তা অব্যাহত ছিল। এতেই বোঝা যায় যে কংগ্রেস (ই) এবং জনতা সরকারের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল না।

যেমন ১৯৬০-৬১ সালে দেশের মোট টাকাকড়ির ৭০% শতাংশ জনসাধারণের হাতে এবং ২৬% শতাংশ ব্যাঙ্ক আমানত ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই অল্পপাত দাঁড়ায় ৬৭ শতাংশ এবং ৩৩ শতাংশে, ১৯৭০-৭১ এ ৫২% এবং ৪০%, ১৯৭৫-৭৬ এ ৫১ ও ৪২ শতাংশ ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫০.৩ ও ৪১%, ১৯৭৭-৭৮ সালে ৪৮ ও ৪২, ১৯৭৮-৭৯ সালের ২৮শে নভেম্বর পর্যন্ত ৪৭% ও ৪২% শতাংশ। অর্থাৎ জনগণের আর্থিক সামর্থ্য ক্রমাগত কমেছে এবং উদ্ভূত ভোগ করে এমন বিশৃঙ্খলাবাদের অধিত টাকাকড়ির পরিমাণ বেড়ে ব্যাঙ্কে মজুত হয়েছে।

এই সংখ্যাগুলি কাল্পনিক নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিবেশিত তথ্য। সুতরাং শ্রমতী গান্ধী নিজেই যে অর্থনীতিকে যতপ্রায় করে এনে-ছিলেন, তার ধারা জনতা আমলেও অব্যাহত ছিল মাত্র। শ্রমতী গান্ধীর সরকার যে অর্থনীতি গড়ে তুলছিলেন, জনতা সরকার তাকে হুহু করে তুলতে পারেন নি। কিন্তু পুরো দায়দায়িত্ব শ্রমতী গান্ধী এখন এড়াতে পারেন না। তিনি যদি সত্য সত্যই দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন তাহলে তাকে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত এগারো বছরের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা তার সরকারও জনতা সরকারের মত জনগণের ক্রোধবহিত ভগ্নদশা হতে হবে। এটাই নিয়তি।

ফ্যান্টা কল
ফ্যান্টা কোল
ফ্যান্টা কোলিক্যাল
ফ্যান্টা কোলিক্যাল
ফ্যান্টা কোলিক্যাল
ফ্যান্টা কোলিক্যাল

ফ্যান্টা কল বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

চলচ্চিত্রোৎসবে বাংলা ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসবের অন্তর্ভুক্ত ৪০ খানি বাংলা ও ২৪টি অসম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষার ছবির প্রদর্শনী অল্পকালীন সময়ে সাত দিন ব্যাপী পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহে। এত বেশী সংখ্যক ছবি যদি দেখানোর উদ্দেশ্যই ছিল, তবে তা পক্ষকাল ব্যাপী করা হলে না কেন এবং ৪০টি বাংলা ছবির মধ্যে বেশ কিছু ছবি এই উৎসবে প্রদর্শনের যোগ্য কিনা—এ প্রশ্ন স্বাভাবিকই মনে জাগে। এ উৎসব যখন মূলতঃ বাংলা ছবির বাট বছর পুঁতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত, তখন ১৯৩২ সালের ‘চণ্ডীদাস’—এর মত অসম্পূর্ণ ছবি তালিকার অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও ‘একদিন প্রতিদিন’ ছবিটি (যা এখনও মুক্তি পায় নি) উদ্বোধনী অহুতানে দেখানোটা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ হলে, সেটাও একটা প্রশ্ন। চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের মধ্যে আমন্ত্রণলিপি পাঠানোর মধ্যেও রয়েছে নীতিগত শৃঙ্খলাবোধের অভাব।

বিগত যুগের অসম্পূর্ণ কিছু বাংলা ছবি এ উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে—যা অনেককেই যেমন আনন্দ দিয়েছে, তেমনি বাংলা তথা ভারতীয় ছবির বিবর্তন ধারায় সে সব ছবির অবদান সম্পর্কেও সজাগ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। ১৯৩১ সালে এদেশে সবাক ছবির প্রচলন হয় এবং ১৯৩২ সালেই দেবকী বহু নিউথিয়েটার্সের ব্যানারে ‘চণ্ডীদাস’ এর মত এক রস লুম্বু ছবি উপহার দেন। সবাক ছবির সেই আদিপর্বে ছবির কাব্যময় পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সেই প্রথম মোহনীর আবহ সংগীত প্রয়োগ করলে পরিচালক দেবকী বহু ও সুরকার রাইচাঁদ বড়াল। রায়ীর ভূমিকায় উমাশরীর সেই আশ্চর্য লম্বত অথচ আবেগ সমৃদ্ধ অভিনয় প্রদর্শন দেখে সেদিনের দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হয়েছিলেন—আজ ৮০ সালেও সেই ছবির অভিনয় দেখে কম মুগ্ধ কিন্তু হই না। চণ্ডীদাস রূপে চণ্ডীদাসের সেই রূপময় ব্যক্তিত্ব ও অভিব্যক্তি আজকের দর্শকদেরও সমৃদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেদনাত্ত রায়ীর মুখে অরণ্য প্রকৃতির রূপ স্থপার ইম্প্রোজ করে রমণীয় যন্ত্রণাকে বনাঞ্চলে ব্যাপ্ত করার ব্যঙ্গনাট্য সে যুগের ছবিকেও যে শিল্পী দান করেছে, তা আজকের চোখেও কম বিস্ময় সৃষ্টি করে না।

জাতপাতের বিচার, নিয়মের প্রতি উচ্চবর্ণের অস্তর জলুম, তার বিরুদ্ধে রায়ী ধোপানীর তীব্র স্বেচ্ছাক্রম প্রতিবাদ, সনাতন ধর্মীয় সংস্কারের বেড়া ভেঙে চণ্ডীদাসের মানবিক উত্তরণ ছবিটিকে আজও তাৎপর্ষ্যে চিহ্নিত করে রেখেছে। এ ছবিতেই প্রথম কৃষ্ণচন্দ্র দে অবতীর্ণ হয়ে অসম্পূর্ণ গান করেন।

১৯৩৭ সালের ছবি ‘আলিবাবা’ ক্ষীরোদ প্রসাদের অপেরাধর্মী নাটকের চিত্ররূপ দানে মধু বহু সে যুগে যে সাকল্যলাভ করেছিলেন, তা আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। নাচে গানে অভিনয়ে ও সজাদার পরিবেশ সৃষ্টিতে ছবিটি যেমন জয়জয়ট, তেমনি আজকের দর্শকও তা উপভোগ করতে কিছুমাত্র অস্ববিধা বোধ করেন না। শুধু প্রহসনই নয়, অতি লোভের পরিণাম কি ভয়ংকর এবং দরিদ্র যদি অকস্মাৎ প্রচুর সম্পত্তি লাভ করে, তবে তারই বা কি অস্বস্তিকর অবস্থা ঘটে, তারও চমৎকার রূপায়ণ রয়েছে ছবিটিতে। মন্থরায়ের কাহিনী অবলম্বনে ১৯৩৮ সালের ছবি ‘অভিনয়’ পরিচালনাতে মধু বহু নৈপুণ্য ১৯৮০ সালেও কম প্রদীপ্ত নয়। টেলিভিশন, হোটেল নৃত্য, সেট সেটিং সমন্বিত সে যুগের আধুনিক ছবিটি এ যুগেও আধুনিকতা ধারায় নি। নাটকীয় চমকটুকু কাহিনীর উপলব্ধিতে যে চমৎকারিতা ফুটিয়ে তোলে সূর্যক পরিচালনার গুণে এবং সেই পর্বে সাধনা বহুর অভিনয় কি জাহ্ন সৃষ্টি করে, ছবিটি তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। ১৯৩৯ সালের নিউথিয়েটার্সের ছবি ‘জীবন মরণ’ পরিচালনা করেন নীতিন বহু। ‘নারিকার উষ্মে ও বিষমতা’ ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক এ ছবিতে চলচ্চিত্র ভাষার কিছু আশ্রয় নিয়েছেন, যা আজও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবির সমাপ্তিপর্বে নারিকার পরিণয় অহুতানটি যির চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাটিও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিনববোধ দাবী করে। তবুও এ ছবিতে কুন্দনলাল সায়গলের গানই বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়—এটি নির্মম সত্য। ১৯৩৯ সালের ‘রক্ত জরতী’ ছবিটি পরিচালনা করেন প্রমথেশ বড়ুয়া নিউথিয়েটার্সের পতা কাতলে। আজও এ ছবিটি ভারতের সেরা

হাসির ছবি হিসেবে গণ্য হবার দাবী রাখে। একদিকে ভণ্ড অর্বলোভীর মিথ্যা ছলনার জালকে ছিন্ন করা অল্পদিকে ধনবানের লুপ্ত প্রতারক মনের মুখোশ টেনে খুলে ফেলা—কাহিনীর এই দুটি দিক ছবিটিতে যে তীব্র স্বেচ্ছার সংগে ফুটে ওঠে, তা আজও অভিনবময়ী সন্দেহ নেই। এ ছবিরই একটি দৃষ্টে বিশ্বের সঙ্কে লক্ষ্য করি সাবজেক্টিভ ক্যামেরার কাজ। অপরাধী গজাননের সামনে রক্ত হাজির। গজানন কিন্তু রক্তের বহলে দেখছে এক পুলিশ। চ্যাপলিনের ‘গোল্ডরাশ’ ছবির একটি দৃষ্টেও সাবজেক্টিভ ক্যামেরার এক আশ্চর্য নিদর্শন অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। সূদার্ত জিমের সামনে চ্যাপলিন হঠাৎ মূর্ণি হয়ে গেলেন। ১৯৪৪ সালের উষ্মের পথে ছবির কাহিনী রচনায় জ্যোতির্ময় রায় ও পরিচালনার বিমল রায় সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ছবির পালা বহলে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছিলেন, যদিও অবশ্য এর পূর্বেই প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘অধিকার’ ছবিতেই তার পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল। উষ্মের পথের নারিকার অট্টালিকার উচ্চমিনার থেকে নেমে নিত্যন্ত সাধারণ দুঃখ মানুষের বাসব নায়কের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেদিনের মত আজও ছবি অবশ্য দর্শক মনে তেমন লাড়া জাগায় না। কিন্তু নারিকার পিতার ভূমিকার বিশদাভাষা ভাড়াই সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও গভীর কণ্ঠস্বর আজও চমকিত করে।

প্রয়াত পরিচালক কৃত্তিক বটকের ক্ষমতার পরিচয়টুকু আজকের দর্শক কিছুটা অবশ্যই শোনেছেন ‘অধ্যাত্মিক’ ও ‘স্বপ্নেরেখা’ দেখে। সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ণ ট্রিলজি দেখে অনেক দর্শকই মুগ্ধ হয়ে আবার নতুন করে হয়তো হতাশ হয়েছেন তাঁরই সাম্প্রতিক কালের ছবিগুলি সম্পর্কে।

জাঁ পল সার্তার

১ম পৃষ্ঠার পর
নাটক ‘দি ক্লাইম’ ‘মো এমিট’ ‘মেন উইথআউট শ্রাডোস’ ‘রেল-পেট্রোল প্রলিটুড’ ইত্যাদি।
তার দার্শনিক গ্রন্থ ছাড়াও বহুলেখ্য, রবীন্দ্রর এবং জেলকেনর আসামী ‘জাঁ জেনে’র উপর গ্রন্থ আছে।
বারট্রেও রাসেল-এর উদ্ভোগে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্লাইমস ট্রাইবুনালের নেতৃত্ব করেন সার্তার।
শেষ জীবনে তিনি বাওবাঁদী গ্রুপ মিটিঙে যোগদান করেন এবং সোভিয়েট নীতি সম্পর্কে মোহমুগ্ধ হন।

ষড়যন্ত্র করছে

১ম পৃষ্ঠার পর
নয়া কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যাতে এ রাজ্যে গরীবের খাণ্ডে গঠিত বায়ফ্রন্ট সরকারকে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে হেয় করা যায় এবং ওরা তারই জন্য নানান ভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে। এছাড়া উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের একাংশ আবার অসন্তান পুলিশের বিরুদ্ধে অসন্তান পুলিশকে অকারণে উত্তেজিত করে জেলিয়ে দিচ্ছে।
১৯৬১-৭০ সালে রাজ্যের বিভিন্ন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে একটি পুলিশ সংগঠনের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়েছিল এখন বিভিন্ন ভাবে আবার সেই চক্রান্তের ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে, রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হওয়ার ঐ পুলিশরা এবার সুকোশলে এগোচ্ছে।
সংবাদে প্রকাশ, আসামকে শাসন করার নামে ক’দিন আগে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা এ রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে আসামপারী বানবাহন অবরোধের যে আন্দোলন শুরু করেছিল তাতেও পুলিশের একাংশ নেপথ্যে ইন্ধন দিয়েছে বলে বায়ফ্রন্টের চেয়ারম্যান স্বরূপ প্রমোদ দাশগুপ্তও অভিযত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, আমাদের কাছে আরো সংবাদ আছে যে ইন্দিরা কংগ্রেসীরা এ রাজ্যের বায়ফ্রন্ট সরকার বিরোধী আন্দোলনের নামে যেখানে আইনশৃঙ্খলা ভাঙছে সেখানেও পুলিশের একাংশ নেপথ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেসীদের আইনশৃঙ্খলা ভাঙ্গার সংবাদ বখাসময় পাওয়ার পরেও ওরা অর্থাৎ ঐ পুলিশ ঘটনাস্থলে দ্রুত যেতে গতিমুখি করছে।
আসল কথা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঐ সব চক্রান্তকারী পুলিশ দীর্ঘ দিন ধরে জমিদার-জোতদার, বহু পুঞ্জির মালিক, শিল্পপতি এবং কারেমী স্বার্থবাদীদের সেবা করতে করতে এখন আর গরীব এবং মেহনতি মানুষের নির্বাচিত বায়ফ্রন্ট সরকারকে সহ করতে পারছে না।
এর ফলে, রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। যেহেতু সরকারের অন্ততম প্রধান শিরদাঁড়া পুলিশ বাহিনী।
আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ঐ সব চক্রান্তকারী পুলিশের ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু ভাল। কিন্তু বায়ফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত খারাপ।
এতেই বোঝা যায়, প্রমোদবাবু বাস্তব ভিত্তিক মস্তব্যক্তি নিকপ্ত বাপের মত ওদের মনের মধ্যে ব্রহ্মশেলের তার দারণ আঘাত করছে।

ইসলামপুরের ঘটনা

১ম পৃষ্ঠার পর
সন্ধ্যা বেলা শ্রীপালের বাড়ীতে হাজির হয়।
মাটিকুণ্ডা গ্রামের লোকজন প্রথমে দেখেছিল যে, পুলিশের লোকজন শরৎ পালের বাড়ীতে চাপান ও হাসি ঠাট্টা করছে। কিন্তু কি এমন ঘটনা ঘটল যে, পুলিশের লোকজন হঠাৎই শরৎ পালের বাড়ীর লোকজনের ওপর হিংস্র নবদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বরফ পুরুষের ওপর শুক হলো বেশরোয়া মারপিট, নারীদের করা হলো ধর্ষণ, এমনকি শিশুও নির্দয় আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার পেল না। আরও প্রায় শরৎ পালের ছেলে পুলিশ আসবার আগেই কেন বাড়ীর বন্দুক নিয়ে পালিয়ে গেল? তাহলে কি তারা বুঝতেই পেরে ছিল, ইসলামপুর থানা পালবাড়ী আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে।
এরপর পালবাড়ীর লোকদের আতঙ্কিত করার জন্যে মাটিকুণ্ডার গ্রামবাসীরা কোথাও হয়ে জুজন কনট্রোলকে হত্যা করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত নয়, মেথ্যাৎই দুর্ঘটনা। আর সেই অপরাধে কি ২৪ বর্টা পরে সুপ্রসিক্রিত ভাবে ও অল্প সজ্জিত হয়ে এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ ও প্রশাসনিক অফিসারদের নিয়ে পোহিয়া, বড়গাছিয়া, ভূবলি, ফুলবাড়িয়া, মাটিকুণ্ডা ও গোয়ালগাছা এই ছিট গ্রাম জালিয়ে দিয়ে নিরীহ ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের বাস্তহারা করে দিতে হবে? শুধু তাই নয়, ঐ ‘দিনও অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল তারিখে ও ইসলামপুর থানার জনৈক অফিসার পোহিয়া গ্রামে একজন মাতৃসন্তবা মহিলাকে নির্দয় ভাবে বলাৎকার করার সময় সেই মহিলা নিহত হন। এবং যে সময় মেয়েরা পালাতে পারেননি, তাদের প্রত্যেকের প্রতিই একই ধরনের শাসনিক আচরণ করা হয়। সব থেকে আশ্চর্যের কথা হল, সবকিছু জেনে শুনেও নির্দয়তাকে ধামাচাপা দেবার জন্ত সরকারও এটাকে ভাঙাতি বলে চালাতে চাইছে।

গুরাতেমানার

১ম পৃষ্ঠার পর
হেনস্থা করা হয়। এরপর থেকে ঐ পত্রিকার ডাক বন্দোবস্ত বেসরকারী ভাবে বাতিল করা হয়েছে। এখানকার যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ, অথবা ইন্দিরা ত্রিগেডের মতোই ওদেশে কমিউনিষ্ট বিরোধী একটা ক্যান্ডিট সংস্থা ইজারসিটো সিক্রেটো আন্তিকমিউনিষ্ট সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। এদের একটা আধা গোপন ‘ডেব্‌ স্কোয়াড’ আছে যারা সরকারী পুলিশের সঙ্গে খাতাতের কাজ চালায়। গতবছরে এরা নাকি হাজার জনকে খুন করেছে। এদের আগামী খুনের তালিকায় নাকি জুলিয়া এসকুই-ভেলের নাম উঠেছে।

ননীবাবু স্বাস্থ্য দপ্তরকে ডোবাচ্ছেন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য সন্ধানী হুঁসী তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে ডোবাচ্ছেন এবং গোটা বায়স্কটের মুখে কালি দিচ্ছেন। একথা আজ কারো অজানা নেই যে স্বাস্থ্য দপ্তরে ভালো শোষ্টি, প্রমোশনের জন্য প্রশাসনিক স্বকীয় প্রয়োজন নেই। এরকম স্বকীয় হাজার হাজার টাকা। খোদ মহাকরণে বসেই এই টাকার লেনদেন চলে। ননীবাবু সাক্ষর আর এস, পি নেতা বলে পরিচিত ভবানী ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী প্রশান্ত সেনগুপ্ত, সি এমএন ভট্টাচার্য, স্পেশাল অফিসার সুপেশ চক্রবর্তী, এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ডাঃ এল, বসু,

ননীবাবুর আশীর্বাদমস্ত সন্ত প্রমোশন প্রাপ্ত ডাঃ কল্যাণ ঘোষ, মেডিকেল কলেজের ডাঃ দ্বিজীপ রায় ও পালের গৌড়া প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাণ্ডার চালা ডাঃ এল, কে, স্কুল প্রমুখ এই টাকা পরমা লেনদেনের ব্যাপারে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। ননীবাবুর অপরাধতার স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী এখন সম্পূর্ণ অকাজে অবস্থায় রয়েছেন। ছড়ি ঘোরাচ্ছেন প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী স্বরত মুখার্জীর তত্ত্বাবধায় নমিনেটেড আই এ এম বি, আর, চক্রবর্তী।

ননীবাবুর জানা উচিত গোটা স্বাস্থ্যদপ্তর এখন চুর্নীতি আর অনা-

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মেলন

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলা-কুশলী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন আগামী ৩রা মে কলকাতার কবকার হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দাঁড়িয়ে এবারের সম্মেলন মানসিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে একটি

দেশ কাল রাজনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

যদিও প্রতিটি আসনে সম্মিলিত বিরোধী দলের একজন করে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেসের (ই) মোকাবেলা করার সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু দলগুলির মধ্যে কোন নির্বাচনী ঐক্যবদ্ধতা বা সমঝোতা হয়নি। অতীতের অবস্থা দুই কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেস (আ) খানিকটা কর্মসূচী ভিত্তিক ঐক্যমতে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। লোকদলের চরণ সিং-এর সঙ্গেও দেবরাজ আর্প-এর কিছু আলোচনা হয়েছে। এমনকি ভারতীয় জনতা দলের সঙ্গেও নাকি চরণ সিং-এর এক রাউন্ড আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে বৈরতন্ত্র বিরোধীরা এখনও ঐক্য থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে অথচ নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনিবেশন জমা দেবার জন্য বাধি রয়েছে আর কটাহিম ?

অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মতি দিয়ে আসন্ন সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। কার্যকরী সভাপতি হয়েছেন পশ্চিম-বঙ্গ বিধানসভার স্পীকার সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ। সম্পাদক, প্রখ্যাত চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা শ্রীঅম্ব-কুমার দাস। কোষাধ্যক্ষ শ্রীকরণ সরকার। এছাড়া সহসভাপতি হিসাবে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী, পৌরমন্ত্রী পাটলি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট লেখক, কবি, সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা কল্যাণলী সাংবাদিক বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক সমিতি ও অধ্যাপক সমিতির নেতৃবৃন্দ, মহিলা সংগঠকের নেত্রী সম্মতি দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠানের পরবর্তী দিনগুলোতে (৬ মে থেকে ১১ মে) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথা আলোচনা সভা, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বল্প সামাজিক দায়বদ্ধ সংস্কৃতির একটি রূপরেখা তুলে ধরার আয়োজন করা হচ্ছে।

চারে ডুবে বসেছে তখন এই স্বাস্থ্য দপ্তরেরই সচিব মহোদয় কারণে অকারণে স্বল্পরবনে লক্ষ লক্ষ লোকের আশঙ্কিত। সেখানে তিনি একা মন। প্রায়ই তার সংগে ক্যামিলি থাকে। প্রশাসনিক কাজকর্মে তাঁর যতনা না মন কোন অফিসারকে কতখানি শাসন করত হলে তার পরিকল্পনাতেই সচিব মহোদয়ের সারাদিন কাটছে, ফলে গোটা দপ্তর জুড়েই কর্মীদের নিজেদের মধ্যে তুলে বোঝাবুঝি অশান্তি লেগেই রয়েছে। আর মীট ফলে গোটা দপ্তরই এখন ডোবার-মুখে। ননীবাবু বলুন তো কোন অপরাধে পি, জির প্রাক্তন সার্জন সুপারকে পি, জি থেকে বদলী করলেন। তাঁর বেতন কমালেন। অপরদিকে পি জি কমিশনে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দাপটের সংগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একবছরের বেশী দিন আগে রিটারার করা সত্ত্বেও মনি ছেজী পি জি'তেই যৌরশীপাটী জমিয়ে বসে রয়েছেন। ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও পি জি'র কোয়ার্টার দখল করে রয়েছেন ডাঃ এ, কে, সাহা। আরও বেশ কয়েকজনও রয়েছেন যাদের সরকারী আবাদে থাকার আদৌ কথা নেই। অথচ ননীবাবু সেক্ষেত্রে চুপ।

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

গ্রাস করছে

৩য় পৃষ্ঠার পর

এক পরমাণু ভাড়া বাবদ শেঠ পরিবারকে দেওয়া হয়নি।

তাছাড়া লিলি বিস্কুট এবং বালি কোম্পানীতে বিভিন্ন পদে শেঠ পরিবারের যারা কর্মরত ছিলেন, সংঘটিত সরকার নেওয়ার পর তাঁদের এক-জমকেও কাজে বহাল রাখা হয়নি। অথচ আইনসম্মত ভাবে এরাও কাজ পাবার অধিকারী। এদের সংখ্যা কম করেও প্রায় ৮০ জন।

শেঠ পরিবারের একটি ডালপোট ব্যবসাও ছিল। এই সংস্থার ৮৫টি গাড়ী লিলি কোম্পানীর বিভিন্ন কাজে লাগানো হত। সরকারী অধিগ্রহণের পর অনেক গাড়ীর হাতিশ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মালিকরা সরকারী পরিচালকদের কাছে এসব অভিযোগ জানাতে গেলে কোন সহুস্তর পাচ্ছেন না।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে শেঠ পরিবারের মোকরা কিছু প্রভাব-

নিরী-ধর্ষণের ঘটনা

২য় পৃষ্ঠার পর

এই আলোচনা চক্রে গৃহস্বর্গী ফেডারেশনের শ্রীমতী সাবিজী নিগম বলেন যে তাঁরা সংগঠন থেকে ৪৩০ জন গণিকার সাফাংকারে জেনেছেন যে শতকরা পঁচাত্তর জন ধর্ষিতা হবার পর সমাজচ্যুত হয়ে এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও সাধা পোশাকে সাফাংকারে নিয়ে গিয়েছিলেন এ তথ্য চাক্ষুস জ্ঞানানোর জন্ত।

বলাৎকার সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের উগ্র কামুক, হিংস্র স্বভাবী, পুরুষ আধিপত্যবাদীরা করে থাকে সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক সন্তানদের যুবতীদের উপর। আর পুলিশ ও সমাজ-বাহিনীর মোকরারই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসামী হয়।

পাড়ার সমাজবিরোধীদেরকে যেমনি পুলিশ ইচ্ছে করলেই শাসন করা যায়, ধর্ষণকারীদেরকেও পুলিশ ইচ্ছে করলেই গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে যেমনি মামী-দাদী ব্যক্তির চাপ পড়লে পুলিশ কাজ দেখাতে বাধ্য হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তেমনি হয়। একটা ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে বোম্বের কাছে এক বাজারে বীণা ও তার বাসী যায়। বাসী বীণাকে বাজারের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বাজারে ঢোকে। হঠাৎ একটা বহু লোক এসে বীণাকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চায়। স্বস্তাধিক্তিত বীণা লোকটার হাত ছাড়াতে সক্ষম হয় ও তাঁর বাসী এসে পড়ামাত্র ঐ লোকটা তার দল সহ একটু উত্তেজনা সৃষ্টি করে চম্পট দেয়। ঐ দম্পতি তখন থামায় গিয়ে ঘটনাটা জানালে পুলিশ তাদেরকে বলে যে, ওদের ধরা সম্ভব নয়। তত্ত্বলোক ঘটনাটা তাঁর এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানালে

শালী লোকের রোষের শিকার হচ্ছেন। দীর্ঘ দিনের বনেদী এই পরিবারটি আজ সরকারী আমলাদের রূপায় বিপর্যয়ের মুখে। রাজ্যের প্রগতিশীল শিল্পমন্ত্রীও শেঠ পরিবারের ভায়সমন্ত অভিযোগের প্রতি আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন।

ঐ সাংবাদিক তত্ত্বলোক তা তথ্য-নীতন মুখ্যমন্ত্রী শরদ পাণ্ডারকে জানান। মুখ্যমন্ত্রীর জলদি হুকুমে চমৎকার কাজ হয়, ঐ থানাই এলাকার ধর্ষণকারীদের লিস্ট দেখে দোষীদেরকে কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করে। এখানে যেমনি মুখ্যমন্ত্রী-তনয়ের ত্রিফ কেন চুরি যাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই পুলিশ ভাউচারে সক্ষম হয়।

বলাৎকার হল এই সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ, একটা বহিঃপ্রকাশ। প্রতিটি ঘটনা নিয়েই চাই জোর গণ আন্দোলন। গত বছরের প্রথম দিকে হারজাবাদে পুলিশ লক আপে স্বামীকে ধন করে রামিজা বিবিকে ধর্ষণ করা হয়। প্রতিবাদে হল থানা ঘেরাও। ডঃ চেন্না রেড্ডীর সরকার বাধ্য হল একটা অন্ততঃ লোক দেখানো কমিশন বসাতে। মথুরা মামলা নিয়ে সারাজাত্যতে তোলপাড় হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে বলাৎকারের বিরুদ্ধে মহিলাদের সরব মিছিলের খবর আসছে। কাজও কিছুটা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব এস.এম. বার্ণে সমস্ত রাজ্যের মুখ্য ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি লিখে কেন্দ্রের নতুন নির্দেশ জানিয়েছেন। তাহল কোন মহিলা আসামীকে সন্দেহ থেকে ভোরের মধ্য একান্তই গ্রেপ্তার করতে হলে সঙ্গে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, মহিলা অফিসার রাখতে হবে। রাতে আসামীর সঙ্গে একজন আত্মীয়ও সঙ্গী হতে পারেন। এখানেও এ নিয়ে গণচেতনতা আন্দোলন গড়ে উঠুক। যুবকেরাও বুলুন, 'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিল তোরা, ভেঁড়েছিল বরবাড়ি তোদের কি আমি জীবনে মরণে কখনও ভুলতে পারি ?'

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। ইম্মা মুহেল কাণ্ট / হুমায়ুন কবির / ৫০০

২। সাংস্কৃতিক মুক্তিবিজ্ঞান / শ্রীমাদ্রাসদ দাস / ২৬০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

সবুজের সজীবতা

সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য

কিশু নাশারী ও গ্রিকাল চারাল ফার্ম (প্রা) লিঃ

১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ বালী, হাওড়া

ফোন: ৬৪-২০৯৫ • ৬৪-২৪৪৫

IBNAGF

ফার্ম: বৈদ্যবাটী হুগলী ৬২-২৫৪০

ফোন: ৬২-১৩৭৭

প্রার্থী তালিকা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ই-কংগ্রেসীদের তুমুল বিরোধ

দুপল

ত্রয়োবিংশ বর্ষ । ১৫শ সংখ্যা । শুক্রবার, ২রা মে, ১৯০৬ । ৬০ পয়সা

নির্বাচনে জেতার জন্য ইন্দিরা রাজ্যে রাজ্যে বিশ্বস্ত লোকদের প্রশাসনের মাথায় বসিয়েছেন

রাষ্ট্রপতি শাসিত রাজ্যগুলিতে নির্বাচন হতে আর একমাসও বাকী নেই। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি কখনই নির্বাচন জেতার জন্য শুধুমাত্র টাকা, প্রচার এবং রঙীন প্রতীকগুলির ওপর নির্ভর করেন না। ক্ষমতা হাতে থাকলে তার হাতে কিছু বাড়তি সুযোগ আসে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক চালচলিও তার মনের মতো করেই সামান্যের সুযোগ পাম। প্রায় দেড়মাস আগে

বিধানসভাগুলি বাতিল করে দেবার পরে পরেই ইন্দিরা সেই চালচলিটি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে ভক্তমহিলা যে শুধু তার দিল্লীর প্রশাসনটিকেই দাবিয়েছেন, তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যপালের পরামর্শদাতা ও সচিব পদে তাঁর 'মন-পসন্দ' লোকদের ঠাই দিয়েছেন। এখানে অবসরপ্রাপ্ত হলেও অনেকেই বিশ্বাসভাজন বলে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

বহুগুণা ও কমলাপতির মতিগতি

রেলমন্ত্রী, কমলাপতি ত্রিপাঠী উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস (ই) কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদিও তাঁর পদত্যাগ পত্র এখনও গৃহীত হয়নি তবু তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের বিষম্বতাও ঘোচেনি। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে সঙ্গর এবং তাঁর সাল-পাড়রা এখন আর ত্রিপাঠীকে পাতা দিচ্ছেন না। তাই ত্রিপাঠীকীর মত কয়েকজন 'সিনিয়র' ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ার বহুগুণা একেবারে দলের ভিতর নিঃসঙ্গ নন। হেমবতী এই অবস্থার নিজের আত্মভাঙ্গন ও লম্বাবস্থার বন্ধুদের সঙ্গে পলাপরাশ করছেন। গোপনে রাজনীতির প্যাচ কষছেন। খুব মেহমত করছেন। শ্রীমতী গান্ধীকে পত্র দিয়ে দেখা করার জন্য ধরাধরি

করেও কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছিলেন না বটে কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি শ্রীমতীর ডাক পেয়ে দেখা করার পর্বটিও দেরে কেলছেন। বন্ধু শাহী ইমামও সঙ্গর গান্ধীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেকেই মনে করেন যে তিনি আর একান্ত অপাং-তেয় থাকবেন না। এখন তিনি কতদূর যেতে পারেন সেটাই দেখার।

ইউনুস

মস্কো যাচ্ছেন ?

অবশেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বড় কাছের মানুষ মহম্মদ ইউনুস কি মস্কো যাচ্ছেন ? এই নিয়ে জোর জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। খুব

ময়টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর রাজ্যে রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের সংসদীয় বোর্ড পর পর বেশ কয়েকদিন বৈঠক করে যে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছেন তাতে রাজ্য স্তরের অনেক নেতাই রীতিমত ক্ষুব্ধ।

বিহারে মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে হিসাব নিকাশ চলছে কেবার পাণ্ডে এবং জগন্নাথ ত্রিপুরার মধ্যে। উড়িশার লড়াই চলছে রামচন্দ্র রথ ও জানকীবল্লভ পট্টনায়কের মধ্যে। উত্তর প্রদেশে লড়াই চলছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সঙ্গর সিং প্রমুখ সঙ্গর গান্ধীর তরুণ সমর্থকদের। মধ্যপ্রদেশে লড়াই চলছে বিচারচরণ গুজর সঙ্গে প্রকাশচন্দ্র শেঠীর। রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে বিরোধ তুলে।

সংসদীয় বোর্ড অস্বীকৃতি করার পর যে প্রার্থী তালিকা বেরিয়েছে তাতে রাজ্য স্তরের অনেক নেতাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে এমন অনেক প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড অস্বীকৃতি করেছে।

শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী লওন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে নিয়োগের কাজটি পাকা করে ফেলবেন। একজন তিনি তাঁর দলের ও কাছের চাইদের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। এখন মস্কোতে নিযুক্ত ইন্স-কুমার গুজরাল সরে আসার অপেক্ষার রয়েছেন। আর লওন ও ওয়াশিংটনে দূতাবাস প্রধানের পদ দুটি খালি হয়ে গেছে বথাক্রমে মৃণাল গোয়ে ও ননী পালকিওয়ালার পদত্যাগে।

জৈল সি বেকায়দার

এখন জানী জৈল সিং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হলেও বেশ আগেকার ব্রহ্মচর্য রেড্ডির মতন অবস্থায় আছেন। তাঁর পরের নাম হিসেবে উল্লেখযোগ্য এই দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



রাজ্য ই-কংগ্রেসে বিবৃতি দেওয়া নিয়ে গোষ্ঠীবিরোধ

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসে এখনো বিবৃতি দেওয়া নিয়ে সমস্যা চলছে। দলের গোষ্ঠী নেতারা একমত হতে পারছেন না কে কে দলের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেবার অধিকারী।

ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ নোমেন গোষ্ঠীর অভিযোগ স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে। ওদের বক্তব্য স্বরূপ সংবাদপত্রে এবং রেডিওতে দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি প্রচার করেন কোন অধিকারে? এদের বক্তব্য প্রদেশ এ্যাডহক কমিটি ভেঙে দেওয়ার পর স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেবার কোন অধিকারই নেই। কারণ তিনি আর দলের কোন পদাধিকারী নন।

এই গোষ্ঠীর সংবাদপত্রে স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রীর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারেও আপত্তি আছে। তাদের আপত্তির কথা রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসপ্রধান অজিত পাণ্ডাকে জানিয়েছেন এবং ব্যাপারটা দলের হাইকমান্ডের কাছেও পেশ করেছেন। এদের বক্তব্য যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে সি সি সি সি কোন কমিটি নেই সেইহেতু স্বরূপ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নিজের নাম প্রচার করেছেন কোন অধিকারে। বিরোধী গোষ্ঠী স্বরূপ বিরুদ্ধে দলের হাইকমান্ডের কাছে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগও পেশ করেছেন।

এদিকে বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে অজিত পাণ্ডাও লম্বাট মন। কারণ দলের বিবর্তমান গোষ্ঠীগুলো যে যার

ইচ্ছামত বিবৃতি দিচ্ছেন দলের পক্ষ থেকে। ফলে একই ইস্যুর ওপর দলের বিভিন্ন নেতার পরস্পর বিরোধী বিবৃতি কাগজে বেরিয়েছে। অজিতবাবু মনে করেন এতে দল সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা হাতাশ্পদ হয়ে উঠছে। আর কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাপারটা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল ছাত্র যুবদের আদাম অব-রোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

পুলিশ লক-আপ

থেকে যুবতী উদ্ধাও

ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ আবার পুরনো ব্যবহার শুরু করেছে। আবার পুলিশ লক-আপ থেকে যুবতী উদ্ধাওয়ের খবরে দিল্লী জোলপাড় হচ্ছে। লোকসভা সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বহু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিংকে এক চিঠিতে লেখেন যে, ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী ভোররাত তিনটে নাগাদ মীরা নামী ২০১২ বছরের এক হরিজন যুবতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে দিল্লীর কল্যাণপুরী থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই মীরার খোজ মিলছে না। পুলিশ নাকি লোক দেখানো খোজ খবর মিছে। ফায়তীর দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারা অনুযায়ী একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

অস্থায়ী পরিবার

হেমবতীন্দ্রন বহুগুণা ইন্দিরা কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সম্ভবত উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে। কানাঘুসা চলছে যে কমলাপতি ত্রিগুণীও পদত্যাগ করেছেন। বহুগুণার ইন্দিরা কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন এবং সেখানে অবস্থান মোটেই সুখের ব্যাপার নয়। তিনি একটি গালভরা পদ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পর মন্ত্রিসভার একটি নগণ্য দপ্তর দিয়ে তাঁকে অপমানিত করা হয়েছিল। তিনি অবশ্য মন্ত্রিসভার যোগ দেননি, কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করা যে তুল হয়েছিল সে কথা নিশ্চয় মনে মনে স্বীকার করেছেন।

শুধু বহুগুণা কমলাপতির মত বয়স্ক ও দীর্ঘকাল রাজনীতি-করা ব্যক্তির যে লালিত হচ্ছেন তা নয়, কী কক্ষে কী রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্র ইন্দিরা কংগ্রেসে ল্যাং মারামারি, গোষ্ঠী বিরোধ, উল্টোপাল্টা বিবৃতি দেওয়া, এমন কি সশস্ত্র সংঘর্ষ পুরোদমে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে দশজন ইন্দিরা কংগ্রেস কর্মী বিরোধী গোষ্ঠীর মতান্বেষণ হাতে প্রাণ দিয়েছে। বিরোধ আরও বাড়ছে এই কারণে যে, দিল্লী থেকে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দিল্লীর খবরদারি নিলজ্ঞ চেহারা নিয়েছে। মনোনয়ন প্রার্থীর সংখ্যা অবশ্য অনেক—সকলেই প্রার্থী হয়ে এবং নির্বাচিত হয়ে মধু লুটে চায়। কিন্তু দিল্লী নিয়ন্ত্রণ নয়, প্রার্থীর যোগ্যতা জনপ্রিয়তা ইত্যাদি কিছুই বিচার না করে কেবল নজর রাখা হচ্ছে বিশেষ এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দিকে। কেন্দ্রে যেমন মন্ত্রিসভার পতিবিধি এবং মন্ত্রীত্বের কার্যকলাপ পুতুল মাচের ইতিকথা, বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজ্যেও তেমনি কিছু রাজ্য নামক পুতুলকে কমতার বসাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু স্বতো থাকবে দিল্লীতে বিশেষ এক ব্যক্তির হাতে, যিনি এদের হত্যাকর্তা বিধাতা, যিনি এদের খেলাবেন।

এইভাবে কতদিন চলতে পারে এটাই প্রধান প্রশ্ন। এই অস্থায়ী পরিবার কতদিন টিকে থাকতে পারে বিরোধ বিসম্বাদ ও কৌতল নিয়ে। বিদ্রোহ ও বিদ্রোহও দেখা দিচ্ছে। যেমন, ওড়িশার জে বি পট্টনায়ককে রাজ্যের মাথার চাপিয়ে দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ঐ প্রদেশের কংগ্রেসীরা বিদ্রোহ।

বাংলা গবেষণার মানদণ্ড

মিহির আচার্য

সমাজের সর্বস্তরে স্ট্যাণ্ডার্ডের ব্যাপারটা এমন নেমে গেছে সেখানে আলাদা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে দুর্গতির চেহারাটা তুলে ধরে লাভ নেই। গবেষণার নাম করে যেখানে ব্যক্তিগত কেরিয়ার ও ব্যবসাই প্রধান তখন গুণগত ঐক্যবোধের প্রশ্ন না-তোলাই ভালো। কোনোক্রমে একটি ডক্টরেট বাগিয়ে নিতে পারলে চাকরির উন্নতি হয়, অধ্যাপকমহলে কেউকেটা হিসেবে নিলক্ষে প্রচার করা যায়। এবং প্রধান লক্ষ্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গদিঅলা চেয়ার।

ভাষা-সম্পর্কে গবেষণা যা হচ্ছে তা না-বলাই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্দিষ্ট বক্তৃতায় 'সম্যতা' 'অধ্যবসায়' কিংবা 'ঐক্যবোধ' বলে যেতে পারেন সেখানে সাধারণ শিক্ষকের কথা থাক। স্বাধীনতার এত বছর পরও প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ অথবা অভিধান রচিত হয়নি। যা আছে তা সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষার আচ্ছন্ন।

আর সাহিত্যের গবেষণা? বাট ভাগ রবীন্দ্রনাথ, জিশ ভাগ লোকসাহিত্য এবং বাহবাফি এলো-পাধাফি।

রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গবেষণার নমুনাই বা কী রকম? 'রবীন্দ্র-কাব্যে ফুল', 'রবীন্দ্রকাব্যে নারী' জাতীয়। এছাড়াও সাংবাদিক হুলন্ত গবেষণাও আছে। যেমন 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', 'জন্ত রবীন্দ্রনাথ', 'প্ল্যাফোর্টে রবীন্দ্রনাথ', 'চমকব্য-লারী রবীন্দ্রনাথ', 'কবি ও সম্মানী' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবীন্দ্রভক্তির কুপার কবির আসল মূল্যায়ন গরহাজির। প্রশংসা চাপাই থাকছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ জিটিশ সামাজ্যবাদের সম্পর্কে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে কিংবা হিজলী জেলে গুলি চালানার ব্যাপারে সমান বিধাওঁড় হয়ে কাস্তিকর উদ্গার করেন "এতো দিনে ইংরাজ শাসনের চরিত্র এদেশে বিকৃত হল"। এই রবীন্দ্রনাথ চর্চাশ বছর বয়সে 'ভারতীতে' মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রানীকে জননী ও ভারতীয় প্রজাকে লজ্জানকপে কল্পনা করে চূড়ান্ত করেছেন। এই রবীন্দ্রনাথ কথ্যাত অ্যাওয়ার্ডসনকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে ছাত্রদের এক হলঘরে বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হন। এবং সম্ভবত বিবেকবোধে অগ্নিগুণের

বিপ্লবী আন্দোলনকে কলংকিত করতে 'চার' অধ্যায় রচনা করে বই প্রকাশ করতে বিধাওঁড় হয়েও এমন সময় বাজারে ছাড়লেন যখন মাস্টাররা স্বর্ষ সেন ফানিকার্চে প্রাণ দিচ্ছেন। এই গ্রন্থ 'Asia' নামক সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। হাজার হাজার কপি কিনে এই বই বন্দী বিপ্লবীদের নৈতিক বল ভাঙবার উদ্দেশ্যে সরকার জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য বিপ্লবীরা কবির এই রচনায় লজ্জিত ও আহত হয়েছিলেন স্বভাবতই। এই রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিংয়ের রেসকোর্সের মাঠে বিপ্লবীদের আক্রমণের হাত থেকে যখন অ্যাওয়ার্ডসন রক্ষা পেলেন তখন ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং বিপ্লবীদের স্বপ্নদ্রোণান্তি ভৎসনা করলেন।

হ্যাঁ এই সব সত্য ঘটনাই রবীন্দ্র-মূল্যায়নের সময় তুলে ধরা দরকার। রবীন্দ্রকাব্যে নদী বা ফুল গবেষণার কোনো বিষয়ই হতে পারে না। ঠাট্টা করে কোনো এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন কোনো দিন সুনব 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ছাদ'-ও একটি গবেষণার বিষয় হবে। কারণ দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের নায়কনারিকারা লম্বা বিলম্ব করতে গিয়ে উন্মুক্ত ছাদকেই উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন।

জিশ ভাগ 'লোকসাহিত্যের' ব্যাপারটা কী? একেকটা ব্যাণ্ডের হাতের মতো অ্যাকাডেমি পজিরে উঠেছে। যোগ্য লোক নিশ্চয়ই সেখানে আছেন কিন্তু অযোগ্য ধান্দাবাজ-দেরই সেখানে তিড় বেশী। এসব কাজকর্ম করতে পারলে সরকারি আধিবাসী উন্নয়ন ইত্যাকার গ্যাডাকল থেকে কিছু সাহায্যও মেলে। এই আর্থিক সুবিধার কারণেই সেখানে মোমাছির চাক বেঁধেছে, 'লোক' ও 'সাহিত্য' সম্পর্কে তাঁদের যোগ্যতা আছে কিনা বাচাই হয়নি।

সম্প্রতি আরেক শ্রেণী গবেষক-মন্ডের উৎপাত শুরু হয়েছে যারা গবেষণার নামে চাকল্যকর চটুল ঘটনা পরিবেশন করবার দিকেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। এমন একটি গ্রন্থ "মাইকেল মধুসূদন দত্ত—জীবন ও সাহিত্য"। সেখানে গবেষক অজ্ঞানিত কিছু খুঁচরো খবর জুগিয়েছেন। যেমন তমলুকে বাবার সঙ্গে গিয়ে মধুসূদনের প্রথম জীবনে 'প্রথম অভিজ্ঞতা' হয়েছিল। ইউরোপে জৈনকা ফরাসি মহিলার সঙ্গে তাঁর 'সঙ্গ' হয়েছিল। মাত্রাদে মধু মদ

নির্বাচনে জেতার জন্য

১ম পৃষ্ঠার পর

যেমন রাজনারায়ণ নাগ (৬৫) পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত আই, জি, মধ্য প্রদেশের রাজ্যপাল সি এম. পুণ্ডার উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন। নাগ সাহেবের অতীত খুবই বিতর্কিত। কিন্তু তিনি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পি, সি, শেঠীর বিশেষ আস্থাভাজন। তাঁর এই নিয়োগ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেননা একটি কোম্পানীর বেসাইনীভাবে পাছ কাটা এবং তাঁর ২ কোটি টাকা প্রাপ্তিযোগ্য—এ ঘটনা নিয়ে বেশ তোলপাড় হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের আদালতে এখনও এ বিষয়ে মামলা চলছে। ঘটনাটিকে নাগ সাহেব আবার জরুরী অবস্থার সময়ে 'পদ্মশ্রী' উপাধিও পেয়েছিলেন।

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন আই. জি. পুলিশ ইন্সপেক্টর আহমেদ (৬৭) বর্তমানে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল সি, পি, এন, সিং-এর উপদেষ্টা হয়ে কাজ করছেন। ১৯৭৩ সাল থেকেই তিনি ইন্দিরা রাজনীতির সমর্থক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর ছেলে ডাম্পি লণ্ডনে শিক্ষিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। ডাম্পি সমস্তের দক্ষিণ হস্ত। গত নির্বাচনে সে আমেরি কেঙ্গে সমস্তের প্রধান প্রচারক ছিল। উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীনি (৭১) আহমেদ সাহেবের পরামর্শ অমুখ্যারী সে রাজ্যে নির্বাচকরণের সরকারী মূল্য ৭২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করেছেন।

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল জয়হরলাল হাতির উপদেষ্টা হয়েছেন কন্নম সিং (৫২)। তিনি বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং-এর পেরায়ের লোক। তাছাড়া জৈল সিং-ই বর্তমানে বকলমে পাঞ্জাবের প্রশাসনিক অধিকর্তা। কন্নম সিং তার দীর্ঘ আমলাতান্ত্রিক জীবনে কখনও পাঞ্জাবে গিয়ে সরকারী দায়িত্ব পালন করেন নি। তিনি মতুন দায়িত্ব পাবার পরই আকালী সরকার নিযুক্ত সব জেলার কালেক্টরদের বদলী করেন, এবং উন্নয়ন খামেক সচিবেরও স্থানান্তর ঘটান।

খেয়ে রাস্তার গড়ে থাকতেন। রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই মধু হেনরিয়েরটা নামী মহিলার সম্পর্কে আলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার প্রশ্ন, মধুকাব্য বুঝতে এই সব ঘটনার কী মূল্য আছে?

অন্তত আরেকজন গবেষককে লিখতে দেখেছি শেষজীবনে কবির যৌনরোগ হয়েছিল।

হ্যাঁ এইসবই গবেষণা নামে চলছে।

তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল প্রহ্লাদ পাটোয়ারীর উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছেন, টি, এন, লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি বরাবরই এ, আই, ডি, এম, কে বিরোধী। আসন্ন নির্বাচনে ডি, এম, কে এবং কংগ্রেস (ই) যোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কার্যকরী হবেন বলে দুই দলেরই বিশ্বাস। এ, আই, ডি, এম, কে মুখ্যমন্ত্রী রামচন্দ্রনের আমলে লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারেই পাভা পাননি, কিন্তু জনতা সমর্থক রাজ্যপাল পাটোয়ারীর চাপে তিনি নাকি বিশেষ কিছু করতে পারছেন না। আর পি থানাকে (৫৭) আবার বিহারে পাঠানো হয়েছে বিহারের রাজ্যপাল এ, আর, কিদোয়াই-এর কাছে। জরুরী অবস্থার সময়ে জগন্নাথ মিশ্রের আমলে তিনি বিহারের মুখ্যসচিব ছিলেন। ১৯৭৭ সালে জনতা কমতার এলে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেবার পর তাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। থানী কমতা পেয়েই বিহার পুলিশ কংগ্রেস (ই) বিরোধীদের অধর্ষ করার কাজে হাত দিলেন। তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিন। একা থাকতে দিন। আমি সংবাদপত্র থেকে দূরে থাকতে চাই।

রাজস্থানের রাজ্যপাল রঘুবল তিলকের উপদেষ্টা হয়েছেন ভামলাল থুরানা (৬১)। জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাষ্ট্র সচিব হিসেবে তিনি বিশেষ নাম করেছিলেন। তারও আগে তিনি ছিলেন রাজস্থানেরই মুখ্যসচিব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর দায়িত্বটি বাতিল করে সঠিকভাবে পালন করতে পারেন, সেজন্য শ্রীমতী গান্ধী তাকে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকার এড্ভিকটিউট চেরারম্যানের পদটিও সাময়িক ছাড়তে বলেছেন।

গোষ্ঠী বিরোধ

১ম পৃষ্ঠার পর

এরপরই অজিতবাবু এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গুপ্তানের সঙ্গে কথা বলেন। অজিতবাবু ইন্দিরা গান্ধী এবং সমস্ত গান্ধীর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছেন।

তারপর ঠিক হয়েছে অজিতবাবুকে না জানিয়ে কাগজে কেউ বিবৃতি দিতে পারবেন না। আর স্বতন্ত্রবাবুকে বলা হয়েছে তিনি যেন দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কোন বিবৃতি না দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং

১ম পৃষ্ঠার পর

ভেট্টাছক্লাইয়ার। তবুও চেরে নামী ও অভিজ্ঞ না হয়েও এই বিভাগের অগর একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী বেশী প্রাধিকার পাচ্ছেন। ইনি হলেন সমস্ত স্বতন্ত্র যোগেন্দ্র ম্যাকওয়ানা।

জ্যোতি বহুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

[ইণ্ডিয়া টুডে পত্রিকার প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর সঙ্গে সম্প্রতি গৃহীত একটি সাক্ষাৎকারের অন্তর্ভুক্ত]

* রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব নিয়ে ইদানীং আপনি বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন; কেন?

: ন'টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস (আই) এর গণতন্ত্র, অবমাননার ছবি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আমরা বলেছি, এটা অবিধাবাদী পদক্ষেপ, এ ব্যাপারে জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যেসব রাজ্যে শাসকগোষ্ঠী দল বদল করে কংগ্রেস (আই)-এর পক্ষ নিয়েছে, সেখানে তো সরকারের পতন ঘটানো হয় নি, কেন? ঐসব রাজ্যের মানুষ তো জনতা দলের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দল বদলের ক্ষমতা তারা পুরুত্ব হল কেন? এটা পরিষ্কার যে এক্ষেত্রে জনগণের মতকে কোন রকম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

* জনতা সরকারও যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেন, তখনও তো তারা একই পন্থা নিয়েছিলেন। তখন তো আপনি প্রতিবাদ করেন নি?

: সেটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। যেমন পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরুন, ১৯৭৭ সালে যখন এখানকার বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হল, তখন বিধানসভার ৫ বছর সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। যেসব বিধানসভার ৫ বছর মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেগুলোই ভেঙে দেওয়া হয়েছে; সেই কারণেই তা অত্যাচার ও অগণ-তান্ত্রিক নয়।

* কিন্তু জনতা দল সেই সময় মুক্তি দেখিয়েছিল যে, জনগণের রাষ্ট্র-দানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা-গুলির বিরুদ্ধেও তারা রাই দিলেন।

: তা সত্ত্বেও কংগ্রেস (আই) দল কি বলেছিল। তারা কি বলেনি যে জনতা কেন্দ্রে ক্ষমতা পেয়েছে বলে, শুধু সেই কারণেই অ-জনতা রাজ্য সরকারগুলির পতন ঘটানো অত্যাচার হবে। এই দল তো এখন হুঁরকম কথা বলছে।

* গণতন্ত্রের সামনে কি এখন কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছেন?

: এ ব্যাপারে এত ভাড়াভাড়ি আমি কিছু বলতে চাই না, তবে, এটা সেটা নানান ব্যাপারে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বা চিঠি পাচ্ছি তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এ রকম চিঠি আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও রেল-

মন্ত্রীর কাছ থেকে পাচ্ছি। রাজ-নৈতিক অসিদ্ধিমূলক বলেই আমরা এই ধরনের চিঠিপত্রের বিরোধিতা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো চিঠিতে কখনও এ রকম ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।

* এই চিঠিগুলো কি অসৌজন্য-মূলক?

: সৌজন্যের প্রশ্ন নয়, এই ধরনের ঘটনাই কখনও ঘটা উচিত নয়। নিজের দলের লোকের একপেশে রিপোর্টের ভিত্তিতেই তারা এসব করছেন। সাধারণ নিয়মে কোন অভিযোগ থাকলে, তা তদন্তের ওপর রাজ্য সরকারের কাছেই পাঠানো উচিত। জনতা সরকারও একটু অন্তরকমভাবে এই একই কাজ করত। ওদের সময়ে সব চিঠিই আসত প্রফুল্ল সেন মারফত। এইসব চিঠিতেই সি পি আই (এম)কে তিলেন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সি পি আই (এম) সমর্থক কখনও কোন সময়ে আক্রান্ত হয়নি, এটাকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? এটা অত্যন্ত আপত্তিকর।

* এই চিঠিগুলো কি আগা-গোড়া লবই ভিত্তিহীন, নাকি কিছু সত্য তার মধ্যে আছে?

: আমি এসব চিঠির উত্তর দিয়ে দিয়েছি। ইন্দিরা গান্ধীকেও আমি উত্তর দিয়েছি। ধরুন, বর্মান্বের জামুয়াখানায় একটি ডাকাতের ঘটনায় একজন যুবককে হত্যা করা হয়েছে। এরকম অভিযোগও জম্মু ও কাশ্মীর চিঠিতে ছিল। কিন্তু আমার রিপোর্ট হচ্ছে, যুবকটির বাড়ীর লোকেরা বলছে, কংগ্রেস (আই) এর একটি গোষ্ঠী তাকে মেরেছে। মৃত যুবকটিও কংগ্রেস (আই) এর।

* আপনার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাজ্য আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা এখন কি রকম?

: সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। অত্যন্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের মাত্রা অনেক কম। অত্যন্ত রাজ্যে তো পুলিশ পেটাতো সি আর পিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিম-বঙ্গে ও রকম কিছুই ঘটে নি। তবে আমরা জানি কিছু গোষ্ঠী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পুলিশ মধ্যে এমন কি লিফলেটও বিলি করা হচ্ছে। আমরা পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলেছি।

* যদি শিল্পে শান্তিকেই আইন শৃঙ্খলার একটা মানদণ্ড হিসেবে দেখা

হয়, তবে তো চেহারা খুবই খারাপ। পশ্চিমবঙ্গে গত বছরে ১ কোটি ৯০ লক্ষ লব্ধ দিবস নষ্ট হয়েছে।

: তাতে কি? তার সংগে আইন শৃঙ্খলার কি সম্পর্ক? শিল্পের শান্তি আইন শৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে না। আপনি কখনও শুনেছেন কি কোন ধর্মঘট থেকে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে? এখানে জনগণ সংগঠিত এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাদের নিয়ন্ত্রণ চাহিদা যখন না যেতে তখনই তারা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়। এটা সংবিধান সম্মত এবং তায়মুদত। কিন্তু গত তিনবছরে ইন্ডোয়স্ট্রি, পাট ও চা শিল্পে এমন অনেক নজীর রয়েছে, যার কোন রকম ধর্মঘট ছাড়াই সমাধান সম্ভব হয়েছে। আমরা শিল্প মালিকদের বলেছি, আইনগত বিধি অনুসরণ করেই রাজ্য সরকার শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি চান। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ধর্মঘট কিতাবে বদল করা সম্ভব?

* রাজ্যে বিনিয়োগের পরি-মাণই বা বাড়ছে না কেন?

: এর কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। আমরা সব সময়েই বলে আসছি, ৫০-এর দশক থেকে পশ্চিম-বঙ্গের সম্ভাব্য লব্ধী দেশের অন্য অংশে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা, এল আই সি এবং কিছু কিছু বেসরকারী শিল্প এই পথে চলছে।

* এ ব্যাপারে আপনার প্রশ্ন কি সফল হয়েছে?

: তেমন একটা কিছু নয়। ও আমরা সব সময়েই বিভিন্ন সভা সমিতি বৈঠক এবং জাতীয় উন্নয়ন পর্বেও রাজ্যের সমস্বত্বের কথা বলেছি।

* বর্তমান পরিস্থিতিতে আপ-নারা কি আবার রাজ্য নির্বাচনের জন্য সাময়িক ভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন?

: কেন? আরও দু বছরের আগে আমাদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে না। এরাই এখনই নির্বাচন হবার মতো কোন ঘটনা ঘটে নি। যদি নির্বাচন আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা আলাদা কথা। তখন জনগণই তার জবাব দেবে।

* কংগ্রেস (আই)-এর যুব ও ছাত্ররা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে অবরোধ সৃষ্টি করেছিল, সে সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?

বিদ্যুৎচালিত ছড়া

অনার্য মিত্র

এক

জ্যোতিবাবু, ছড়া নয়

কথা, মন গড়া নয়

একবার হাটু-জলে নেমে যান;

দেখুন না কতদূর

ছনীতি ভরপুর

নিজের হলের কত অবদান।

সব ভাল সবটুক?

কিছু নেই তুলচুক?

কলঙ্ক ছায়া নেই মুখে?

বেড়েছে যা সীমাহীন

যোথেন নি এতদিন

রাতারাতি দেবেন তা কথো?

অদৃষ্ট প্রশাসন

মিঠে কড়া স্তম্ভ

জানেন না কিছুই, তা নয়,

ছনীতি তিলতিল

কুণ্ডে দেওয়া মুশকিল

লয়না যা, তা সইতে হয়।

বিদ্যুৎ হাহাকার

কার দ্বার কেবা কার

বিতর্কে দিন কাটে দ্বার,

দিনে দিনে মাস যায়

মাসেও বছর যায়

তবু নেই, তবুও উপায়।

কথাচিৎ বিবৃতি

চাপা পাকে দুষ্কৃতি

চেপে চেপে বাধা জমে বুকে

আধারের জটাজাল

সকলেই বেসামাল

ছড়াটা লিখছি, বড় দুঃখে।

ছুই

এমনি করেই চলবো

ধমক ধমক হুকুমী দিয়ে

পাকির কানটা মলব—

এতেও যদি ব্যর্থ হই

জনগণকে বলব।

জনগণই কি শুনবেন

কিই-বা তাকে বলবেন,

“কথা শোনেনা” বললে কি আর

মাজব তাতে গলবেন।

কথা যদি না শুনে তবে

কেমন বটে মন্ত্রী!

কাজকর্ম অচল হবে

তবুও গণতন্ত্রী?

লরকারটা জনপ্রিয়

তবুও নেই মাধ্য,

ঘরের লোক আর পরের লোক

সকলেই অবাধ্য।

নিজের জলে অড়িয়ে নিজের

জটিল-জালে বন্দী

জালার কথা তুলে বলেন:

“হটিয়ে দেবার ফলী।”

হটিয়ে দিলেই বাড়বে জালা,

জানেন বলেই ছুঁতি

তৃতীয় কেউ নেই বলে কি

রণং দেখি মূর্তি?

শৈবতন্ত্র বিরোধী সম্মেলন

গত রবিবার ইলনিভানিটি ইনস্টিটিউট হলে সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত একটানা অল্পস্টিত হল শৈবতন্ত্র বিরোধী সম্মেলন। এই কনভেনশনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু বলেন, শৈবতন্ত্রের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক জনমত। এরজন্য সরকার ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন।

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তি, এস, তারকুও ছিলেন প্রধান অতিথি। উদ্বোধনকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী অরুণ-প্রকাশ চ্যাটার্জী যে খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন তার সমর্থনে সারাদিন ধরে ছোটো পর্ষায় রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী প্রভৃতির বক্তব্য রাখেন। প্রথম পর্ষায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও বিকেলের অধিবেশনে ডাঃ ননী গুহ সভাপতিত্ব করেন।

খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়, শৈবতন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির ৩৫৬ নং ধারা বাতিল করা সরকার।

শ্রীতারকুও বলেন, গণতান্ত্রিক অধি-কার সরকার অল্প সংসদীয় বিরোধী দলের চেয়ে সংসদ বহিষ্কৃত বিরোধিতা অনেক বেশি কার্যকরী। প্রমোদ দাশগুপ্ত, সৌরীন বহু, লক্ষ্মণ রাণা, বিশ্বনাথ মুখার্জী, নিখিল দাশ, সুকোমল দাশগুপ্ত ইত্যাদি সকলেই ক্ষমতায় বসার পর থেকে ইন্দিরা সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের উদাহরণ তুলে দেখান। সংসদে বিরাট ক্ষমতাদিক্য ও বিরোধী দক্ষিণপন্থী শিবির বিপর্যস্ত তাই আজ ইন্দিরা কংগ্রেস বাধাহীনভাবে একটার পর একটা বিল পাশ করছে। এ রাজনৈতিক অবস্থার বুজোয়ারা সমাজের পথ ধরবেই। তাই এখন থেকেই এ ধরনের সম্মে-লন সংগঠিত করে বামপন্থীরা জনমত গঠনে সচেষ্ট হচ্ছেন। এক্যবস্থাবে শৈবতন্ত্র বিরোধী ঝড়াইয়ের মত দেখে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতারা প্রমোদ গুনছেন। চাই আরো এ ধরনের সভা, মিছিল বিক্ষোভ ইত্যাদি।

ইন্দিরার রাজ্য উত্তর প্রদেশে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে সেখানে এক ভয়াল-ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ধাওয়া, বিশেষ করে কংগ্রেসের (ই) নেতা এবং কর্মী পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবনতির ধূস্রা তুলেছেন, তাঁদের এক-বার ইন্দিরাজীর বেনামে পরিচালিত রাষ্ট্রপতি শাসিত ইন্দিরাজীরই নিজ রাজ্য উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকাতে অস্বস্তি করছি।

সেখানে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী হরণ, নারী ধর্ষণ, পাশবিক অত্যাচার, ছলনা, বঞ্চনা এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধগুলি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে এবং তা দ্রুত বাড়ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যাচ্ছে বলে আমাদের কাছে খবর আসছে।

কংগ্রেস (ই) প্রভাবিত ওখানকার সংবাদপত্রগুলিও এসব অপরাধমূলক ঘটনা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা আর চেপে রাখতে পারছে না। তারাও এই সব কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

ইন্দিরাজীর অতি কাছের মাহুষ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষার কান্তি বোমের সম্পাদনার লক্ষ্যে এবং এলাহাবাদ থেকে নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা নামে ছদ্মানি ইংরেজী দৈনিক যুগপৎ প্রকাশিত হয়। গত ২৩শে এপ্রিল লক্ষ্যে থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার তিন কলাম ব্যাপী হেডিং দিয়ে অষ্টম পৃষ্ঠায় ৬ থেকে ৮ কলাম পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের আইন শৃঙ্খলা

সম্পর্কে এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, "Alarming Rise in Crime Rate"

এই সংবাদে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পুলিশের হেড কোয়ার্টারের জনৈক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা হয়েছে, গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে নানা অপরাধ এবং দোরাঙ্গা হয়েছে, এ বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১০ই এপ্রিল অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে পূর্বের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ অপরাধ এবং দোরাঙ্গা বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে অনেক তথ্যও আছে।

অপর দিকে, উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষ কি বলছেন? এই রাজ্যের বিভিন্ন মহলের অভিমতে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য পুলিশের বড়কর্তারা হিসেবের কারচুপিতে বাই বলুন না কেন, তাঁরা প্রকৃত ঘটনা আড়াল করতে চাইছেন। তাঁদের হিসেবের চাইতে অপরাধমূলক নানা ঘটনা এবং হত্যাভয়ের দোরাঙ্গা ইন্দিরাজী এবং বহুগুণরাজ্যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের বহুস্থানে

শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক অধিকার রক্ষায় জাতীয় সম্মেলন

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক অধিকার রক্ষা সমিতি গত ২০ এপ্রিল ইন্ডোরে হলে এক জাতীয় কনভেনশন সংগঠিত করে। কনভেনশনে প্রবক্তা ইন্ডো-হারে বলা হয় যে, এই সমিতি কোন পান্টা ট্রেড ইউনিয়ন নয় বরং সরকারের অস্তায়, অত্যাচার, অবিচারের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার একটা যৌথ মঞ্চ। জাতি-বর্ণ ভিত্তিতে চাকরীর সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কনভেনশনে সকল বজাই নিম্মা করেন। বক্তারা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের মতো বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও, বিভেদ করে শাসনের কার্য নিচ্ছে তাই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মেহনতী মানুষকে নিয়ে বেকারী, জবামূল্য বৃদ্ধি, ছাঁটাই ইত্যাদির বিরুদ্ধে একাবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার কর্মসূচী এই কনভেনশনে গৃহীত হয়।

নারীর ঈচ্ছিত বেইজ্ঞতি হচ্ছে। নিরাপরাধ মানুষ খুন হচ্ছে। উত্তর-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে কি ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে তার কয়েকটি নমুনা আমরা তুলে ধরছি।

তুষারবাবুর সম্পাদিত এই নর্দার্ন ইন্ডিয়ান ২৩শে এপ্রিলের কাগজেই প্রকাশিত হয়েছে যে, ২২শে এপ্রিল লক্ষ্যের অদূরে গগহা থানার মাহা গ্রামের সাহেব রাইয়ের এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি হত্যাভয়ের লুট করে নিয়ে গেছে। ২৩শে এপ্রিল গোরক্ষপুরের তিনস্থানে ২৪ ঘটায় তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। লক্ষ্যে এলাকার গুজাগিরগণ থানা এলাকার গোমতির জলে একটি যুবকের লাশ পাওয়া গেছে।

এছাড়া, ২৩শে এপ্রিল বেরিলি জেলার নিপৌরী থানার অন্তর্গত পাচঘেওরাতে একটি বেআইনী মারণাস্ত্র নির্মাণের কারখানা পুলিশ আধিকার করেছে। এখানে ৪ জন ধরা পড়েছে।

জানা গেছে, যুত ব্যক্তির এই কারখানার নির্মিত মারণাস্ত্রগুলি উত্তরপ্রদেশের তারতের বিভিন্ন স্থানে অর্ধের বিমিয়ে পাচার করত। যুত ব্যক্তিদের সঙ্গে আস্তরাজ্যের এক বিরাট অস্ত্র-চোরাকারবারীও যুক্ত রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এর এক পুত্রও পাওয়া গেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের বহু অপরাধমূলক বেআইনী ঘটনা এবং দোরাঙ্গা প্রতিদিনই ঘটছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

অন্য, পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং বুরঞ্জোদের দ্বারা পরিকল্পিত বিভিন্ন পত্রিকাগুলি এসব জানা সত্ত্বেও সে সব চেপে যাচ্ছে। ওদের বত মাথা ব্যথা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ভাল একথা আমরা বলছি না। তবে, অস্ত রাজ্যের তুলনায় ভাল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তির রাজ্যে না গেলে এ জিনিস বোঝা যায় না। তবে রাজ্যের পুলিশের আত্মতৃপ্তিরও কোন কারণ বা অবকাশ নেই।

দর্পণের গত সংখ্যায় আমরা বলেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশের একটি অংশ যত্নসহ করেছে এবং ওদেরই উত্থানীতে এরা জো খুন, ডাকাতি, রাহাজানি এবং ট্রেনে হামলা প্রভৃতি অপরাধগুলি ১৯৭১-৭২ সালে তৈরী কংগ্রেসের (ই) মতামতই করছে। বামরাই সংবাদগুলি সে কথাও প্রকাশ করতে রাজী নয়।

রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করুন

দলদেই জানেন বহরমপুর ইলেক্ট্রিক সান্দ্রাই কোম্পানী পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে কস দামে বিদ্যুৎ কিনে বেশী দামে বিক্রী করে মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু এই কোম্পানী বিদ্যুৎ বিলের দরুন প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা বাকী রেখে এখনও পর্ষদকে একটি পরসাত না দিয়ে বেশ কয়দা লুটছে। আর সেই সঙ্গে এই কোম্পানীকে একে-বারে দেউলিয়া করে দিলেন খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তার দুই অমুচর—একজন কর্মচারী ম্যানেজার, অপরজন একাউন্ট্যান্ট কাম হেড ক্লার্ক। যদিও এই দুইজন বহুপূর্বেই খেচ্চার অবসর নিয়েও চেয়ার দখল করে বসে আছেন। একাউন্ট্যান্টের সহায়তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদৌ অফিসে না এনে বা বিন্দুস্বাক্ষর কোন জম না দিয়েই যেভাবে বিভিন্ন কোণে কোম্পানী থেকে লাখ লাখ টাকা সরিয়ে নিয়ে তার ব্যক্তিগত ব্যবসায় লাগাচ্ছেন, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। আর অপর-জন নানা বইপত্র এনে কোম্পানীর প্রমিক কর্মচারীদের অব করার পরি-

আমরা মনে করি।
তাই জনদরদী বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের সাহসনয় প্রার্থনা অবিলম্বে এই অব্যবহিত কোম্পানীকে অধিগ্রহণ করে নিষ্পত্তি প্রমিক কর্মচারীদের মুক্তির নিখাম ফেলতে সহায়তা করুন।

ননীবাবুর খেলা

হাসপাতাল ডাক্তারখানা তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য মশাই খোদার নামে লিখে দিয়েছেন—কেউ দেখবার নেই। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরটি নিয়েও উনি খেলা করছেন। প্রচণ্ড জলকষ্টে বধন গোটা পশ্চিমবঙ্গ খুঁচ্ছে ননীবাবু তখন এই সব দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে রাজনীতি করছেন। কয়েকজন সাং-গ্যানিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী কাজ করাচ্ছেন। সব দোষ গিয়ে পড়ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ওপর।

শহরগুলোর জল সরবরাহ নিয়ে বহু বছর ধরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর কাজ করছে। কিন্তু বর্তমান-বছরে (১৯৮০-৮১) কি কি কাজ হবে তার কোনও প্রস্ততি নেই। যে যে শহরে জলসরবরাহ ব্যবস্থা আছে সেখানকার জলসরবরাহী পাইপ লাইনের কোমও নক্ষা এই দপ্তরের কাছে নেই। সামান্য সামান্য ছোট খাটো প্রোজেক্ট ওয়ার্ক করার ক্ষমতা নেই যে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের তার হাতে দেয়া হয়েছে হলদিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট শহরগুলোর জলসরবরাহ ও জল-মিকানী ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও রূপ-রূপ করতে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কয়েকজন ডিরিউ বি সি এন অফিসার ও অর্ধদপ্তরের একজন এ্যানিসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিলে একটা জঘন্য গোপী হুজি হয়েছে। এই গোপী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মনত পেষে যা তা করে বেড়াচ্ছে। এই গোপীর হাত অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ত দপ্তরের অনেক কাজ এই পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের অধীনে আনার জন্ত সর্বোচ্চ স্তরে পর্ষদ যত্নসহ চালাচ্ছে এই গোপী।

মতামত

করনা আটছেন। অথচ নামমাত্র বজ্রীতে যেভাবে প্রতিটি প্রমিক কর্মচারী অস্ত্রান্ত পরিপ্রম করছেন তা দৃষ্টাই প্রশংসনীয়। এদিকে বেশকিছু শেরার হোল্ডার অগ্রিম দেবিয়ে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ শেরারের টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন। কোম্পানীর চেয়ারম্যানও বেশ আর্থের ওড়িয়ে নিচ্ছেন। এ যেন হরিপুটের প্রতি-যোগিতা।

আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, যে দেশে আইন করে মধ্যবস্ত্রের বিলোপ ঘটানো হয়েছে দেশ এবং জাতির দার্ঘে, সেখানে কলকারখানা, গোর-সভা, ধনি এমনকি শিক্কা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, অধিগ্রহণ কিংবা প্রশা-নক নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে এই দুর্নীতিগ্রস্ত কোম্পানীতে অহেতুক সরকারী অর্থ আত্মসাতের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কেন? যে দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না, বধন বিদ্যুতের অভাবে কেতে খাম্বারে, কলকার-খানা প্রভৃতিতে হাজার হাজার প্রমিক কর্মী আজ ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার সামিল তখন বিনা কারণে বহরমপুর ইলেক্ট্রিক সান্দ্রাই কোম্পানীর অধিগ্রহণের ব্যাপারটিকে জুলিয়ে রাখা জাতীয় অপরাধ বলেই



ফ্যান্টাসি ক্রিম বিক্রেতার জন্ত তারতের দর্পণ এজেন্ট চাই

পরিকল্পনার ছুটি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কেন্দ্রীয় সরকার যষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। যষ্ঠ পরিকল্পনা আগামী ১৯৮৩ সালে সমাপ্ত হবার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনতা সরকারের আমলে গৃহীত নীতি-গুলির ভিত্তিতে রচিত ঐ পরিকল্পনা নিয়ে আর এগোতে চান না। জনতা সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করার পর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পরিকল্পনা কমিশনের তিনজন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কৃষি সচিব ডঃ স্বামীনাথন আপাততঃ নবগঠিত পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পঞ্চাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান।

গত সপ্তাহে নবগঠিত পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকে চেয়ারম্যান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, অস্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ এম স্বামীনাথন, সদস্য-সচিব ডঃ মনমোহন সিং, অধ্যাপক মহম্মদ ফজল এবং অর্থমন্ত্রী আর তেজস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে নতুন যষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার অন্ততঃ ৫ শতাংশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিকল্পনা ১৯৮৪-৮৫ সালে সমাপ্ত হবে। এর বেশী বিস্তারিত আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য ২০ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণও পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হয়তো এটা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

নতুন পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির অন্ত্য পঁচ শতাংশ করার যে সিদ্ধান্ত করেছেন বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। গত তিন বছরে জাতীয় অর্থনীতির পরিবৃদ্ধির হার প্রকৃতপক্ষে এক শতাংশের সামান্য বেশী। চলতি আর্থিক বছরে মোট পরিবৃদ্ধির হার নৈতিবাচক বা মাইনাস হবে বলে কেউ কেউ অস্বস্তি করেছেন। কারণ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে খরার দরুণ প্রায় ১১০ কোটি টন খাদ্যশস্য কম উৎপাদন হবে। কৃষি উৎপাদনে এই স্বল্পতা এবং বহির্-বানিজ্যে বাটতির দরুণ মোট পরিবৃদ্ধির হার গত বছরের পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে কি না সেটাই চিন্তার

বিষয়। তার উপর সারা দেশে বিদ্যুত ও জ্বালানি কয়লার উৎপাদন হ্রাসের ফলে মোট শিল্পোৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। রেল ও নদীক পরিবহনের অবস্থা তো সঙ্গীন। কয়লা ও ইম্পাত উৎপাদন কমছে অথচ এর পরও হ্রাসরূপে উৎপাদন পরিবহনের মত যথেষ্ট ওয়াগন পাওয়া যায় না।

সুতরাং আকস্মিকভাবে বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশ করার সিদ্ধান্তকে নিতান্ত ফাঁকা আওয়াজ বলে ধরে নিলে ঘোষ দেওয়া যায় না।

পরিকল্পনা কমিশনের আলোচনার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই সংকল্প কার্যকরী করার কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বাজেটে নেওয়া হয় নি। বরং গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্প, খাতের

অর্থনীতি

বদলে কাজ, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

এতেই বোকা যায় যে দেশের মানুষকে খুশী করার জন্যে যে সকল কথা বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-মন্ত্রীর না করে তা কার্যকরী না করার ব্যবস্থা নেন।

আমরা জানি না, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন কেবল যে মাসে নরটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় সুবিধা করে নেওয়ার জন্যে এই সকল সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন কি না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কলকৌশলের অপেক্ষা রাখে না। অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ সময় দেশের মানুষকে সত্য কথা না বলে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বিজ্ঞানোচিত নয়।

চলতি আর্থিক বছরেই আমাদের প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বহির্দেশীয় লেনদেন ঘাটতি এবং প্রায় চার হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘাটতির ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্যে অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি মটবে। এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির হাতে শেয়াংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

আনন্দবাজার যুগান্তরের মুনাফাবাজীর এবং

সংবাদ পরিবেশনে কুণমণ্ডুকতা

দর্পণের প্রতিনিধি

নয়াদিল্লী : যে কোন একদিনের কলকাতার বাংলা এবং দিল্লীর ইংরেজী কাগজগুলি মিলিয়ে দেখুন। আমার সামনে রয়েছে রবিবার ১৩ই এপ্রিলের কাগজগুলি। প্রথমে আকার এবং মূল্য। আনন্দবাজার এবং যুগান্তর রবিবারীয় অংশ নিয়েও আট পৃষ্ঠা এবং তার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে থেকে আদায় করেছে যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮ পয়সা প্রতি কাগজ। ৪০ পয়সা দ্বারা স্টেটসম্যান দিয়েছে ১৪ পৃষ্ঠা, ৪০ পয়সা দ্বারা হিন্দুস্তান টাইমস্ ১৮ পৃষ্ঠা, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া ২০ পৃষ্ঠা।

দিল্লীতে বসে বাংলা কাগজ দেখতে চাওয়ার জন্য খেসারত দিতে হয়েছে আমার আনন্দবাজার ওয়ালার কাছে আরো ২২ পয়সা এবং যুগান্তরের বেলায় ১৮ পয়সা বিমান ভাঙের খরচা বাবদ। স্টেটসম্যান ও আপনারা কলকাতার পান সুতরাং বিমান মালতের কথা ওঠে না। যদি হিন্দুস্তান টাইমস্ কিনে থাকেন তাহলে অতিরিক্ত বিমান শুধু দিয়েছেন ১০ বা ১৫ পয়সা, তার বেশী নয়। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার বেলায়ও তাই। কলকাতার কীণ কলেবর কাগজগুলির বেলায় বিমান শুধু অত বেশী কি করে হোল তাহলে? দিল্লী থেকে কলকাতার ভাড়ার চেয়ে কি কলকাতা থেকে দিল্লীর ভাড়া তাহলে বেশী? যদি হয় তাহলে কি আনন্দবাজার দে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কিছু করেছে? করা ত উচিত, কারণ দিল্লীর বাঙ্গালীরা আনন্দবাজার যুগান্তর কেনা বন্ধ করে দিচ্ছেন। নিজ প্রদেশ আর ভাষা প্রীতির খেসারত অত উঁচু হারে আর তারা দিতে রাজী নন।

আমি অবশ্য পয়সা দিয়ে রোল আনন্দবাজার যুগান্তর কেনার তাগিদ কখনো বোধ করি নি, কলকাতা বা দিল্লী কোথাও নয়। নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে কখনো কুঠার কারণ দেখি নি, কিন্তু ঐ দুটি কাগজ না পড়লে বাঙ্গালী বজায় থাকবে না তা-ও কখনো মনে হয় নি। বরং আশঙ্কা হয়েছে এবং ক্রমশঃ বাড়ছে যে কেবল আনন্দবাজার এবং অথবা যুগান্তর পড়ে যারা হাল ছুঁয়া সম্বন্ধে জানতে চান তারা আর বেশী দিন বাঙ্গালীর জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে গর্ব করতে পারবেন না।

বিদেশের খবরের ত কথাই

নেই। আনন্দবাজার যুগান্তর কুণ-দুটির মণ্ডুকদের দৃষ্টি অতদূর যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। লাইবেরিয়ার সাময়িক অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রপতির প্রাণনাশের সংবাদ কাগজ দুটি না দিয়ে পারেনি কিন্তু শুধু আনন্দবাজারে যারা খবরটি পড়েছেন তাদের কেউ কেউ হরত এখনো ভাবছেন যে প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম টলবার্ট বোধ হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের আশে-পাশের কোন রাষ্ট্রের প্রদান ছিলেন, নইলে “লাইবেরিয়ার” বেতার থেকে খবরটি উদ্ভূত হবে কেন? আনন্দবাজারওয়ালারা বলবেন ওটা ত পরিষ্কার ছাপার ভুল, সম্ভবই হয়। ঠিক কথা। কিন্তু খবরটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কি করেছেন? দিল্লীর কাগজগুলি সংবাদের লক্ষে ম্যাপ ছেপে পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছে লাইবেরিয়ার কোথায়। আনন্দবাজার অত জারগা কোথায় পাবে? আট পৃষ্ঠার মধ্যে ত “মন্দ মধুর বাতাস আর শান্তি” নিয়ে অসমীর পর্ব বিহ উপলক্ষে পরী উড়ে আদায় অসম্ভব ভাষা ছাপতে হয়েছে প্রথম পৃষ্ঠায়! পরী হচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী—বিহর দিনে আসাম সফরে গিয়েছিলেন।

লেবাননে ইউ-এন কোম্পের ওপর হামলা বা ইরানের সর্বশেষ ঘটনাবলী আনন্দবাজার যুগান্তর পাঠকদের পরিবেশন করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না। ভারতের অভ্যন্তর রাজ্যের খবরও বিশেষ না। দিল্লীর কাগজগুলিতে বিদেশের খবর মোটামুটি এবং দেশের অভ্যন্তর অঞ্চলের খবর বেশ বিশদভাবেই থাকে। সেগুলি জানবার কি কোন প্রয়োজন বাংলা সংবাদপত্র পাঠকের নেই? ধরুন ১৩ই এপ্রিল তারিখের স্টেটসম্যান, টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত কতকগুলি সংবাদ বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অব্যবস্থা, উড়িষ্যায় খাদ্যাভাব, ভাঙের কড়ার নতুন কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের তোড়জোড়, ভজনলাল আর বনসীলালের মধ্যে রেশপোশি, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তুতি। একই তারিখের কলকাতার বহুলপ্রচারিত বাংলা দৈনিক দুটিতে প্রায় কিছুই নেই—মাত্র দু’ এক ছিটেফোঁটা।

আনন্দবাজার যুগান্তরের সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই ভাবেন ওসব খবর

বাঙ্গালীদের না জানলেও চলবে। কিন্তু এল আই নি প্রিমিয়মের হার কমাচ্ছে এই খবরটি ত অন্ততঃ বাঙ্গালীরা জানতে চান। এ কাগজ দুটিতে ত চোখে পড়লো না।

চৌষটি কলাম কাগজে যদি প্রায় চল্লিশ কলামই বিজ্ঞাপন হয় তাহলে আর খবরের জারগা আসবে কোথা থেকে? মানলাম, কিছু বিজ্ঞাপনের ক্ষমতা পাঠকেরা কিছু কাগজ কেনেন। কিন্তু তারা ত নিশ্চয়ই দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতে চান। আনন্দবাজার যুগান্তর পড়লে সে উদ্দেশ্য মিটবে না। আরো দশ বিশ বছর এভাবে চললে এই দুটি কাগজের দ্বারা বাঙ্গালীদের একাংশ হয়ে পড়বে দেশ বিদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধ্যান ধারণা-হীন।

যদি সেজন্য বলি যে আনন্দবাজার যুগান্তর যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮ পয়সার বদলে সপ্তাহের ছ’দিন ছ’পৃষ্ঠা এবং রবিবারে আটপৃষ্ঠা কাগজ দিয়ে শুধু মুনাফাবাজী করছে তাই নয়, সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব এড়িয়ে বাঙ্গালীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে তাহলে কি খুব অস্তায় হবে?

সরকারী ডাক্তারের বেসরকারী চাকরী

কার্টোয়া ২৪শে এপ্রিল : স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার প্রশান্ত কুমার দাস আগষ্ট ১৯৭৮ থেকে আজ পর্যন্ত দৈনিক ৩ ঘণ্টা করে (২-৫টা) ১ সপ্তাহের ৩ দিন স্থানীয় ইন্সটিটিউট হেলথ হোমে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা করে চলেছেন এবং পারিশ্রমিক হিসেবে মাসিক ১৫০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন একজন সরকারী চাকুরে যিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে এখনও উত্তীর্ণ হন নি, এড হক এ্যাপয়েন্টমেন্টে বলবৎ চাকরীতে আছেন তিনি অল্প কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কি চিকিৎসার জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারেন? কলকাতার ইন্সটিটিউট হেলথ হোমের কর্তৃপক্ষ এতটা অপদার্থ কিতাবে হলেন যে, তাঁরা স্থানীয় কোন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন এমন ডাক্তারকে নিযুক্ত না করে উক্ত পদে একজন সরকারী ডাক্তারকে নিয়োগ করে সমস্ত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করলেন? স্থানীয় হাসপাতালের শেয়াংশ ২ম পৃষ্ঠায়

গ্রন্থ পরিচয়

ক্রান্তিলগ্নে বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসা

কালিদাস কুণ্ডু

নিরিখে মধ্যবিত্ত অঙ্ককার : হুশেন্দু মৈত্র

প্রকাশক : সবিতা মৈত্র । ৭৭১৪১, গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা-৭০

মাম : বারো টাকা ।

‘নিরিখে মধ্যবিত্ত অঙ্ককার’ কোন কাব্যগ্রন্থের নাম নয়, লেখকের সং পরিপ্রেক্ষিতে করে একটি প্রবন্ধের সংকলন। ‘বুদ্ধি’, ‘যৌথ জীবন’, ‘তরু’, ‘শিক্ষিতা’, ‘নিরপেক্ষতা’, ‘বিচার’, ও ‘বাঙালী’—এই সাতটি অধ্যায়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ সংকলনটি তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণের প্রতিফলিত বহন করে।

সম্প্রতি বাংলা-প্রবন্ধ সাহিত্যে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার ধারাটি যেন কিছুটা স্তিমিত। হুশেন্দুবাবুর উত্তম ও গবেষণামূলক দৃষ্টিকোণ এই দিক থেকে উৎসাহবোধক এবং চিন্তার খোরাকের দিক থেকে কিছুটা উদ্দীপনামূলকও বটে।

হুমিকায় তিনি বলেছেন— “সুযোগশী সহিষ্ণু মনন প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামের প্রস্তুতি বাড়ায়।” সংগ্রাম ছাড়া তো পথ নেই, তাই খতিয়ান কবে যেতেই হবে।”

প্রাবন্ধিক হুশেন্দুবাবুর এই সংগ্রামী মনোভাব তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অংশত প্রতিফলিত হয়েছে—একথা আপোই বলে রাখছি।

‘বুদ্ধি’ শীর্ষক অধ্যায়টিতে তিনি ‘বুদ্ধি’র যে সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন তার সঙ্গে একমত না হয়েও একথা বলা যেতে পারে, সীমাবদ্ধভাবে উনিশশতকী বাঙালী সমাজে ‘বুদ্ধি’, প্রতিষ্ঠা হয়েছে মূলতঃ বিজ্ঞা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও মাহুষের সহজাত বুদ্ধির সম্মেলনে।

হুশেন্দুবাবু আর একটু পরিপ্রেক্ষ করে বুদ্ধির সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের সম্পর্কটি তুলে ধরতে পারতেন। উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় এমন সামাজিক শ্রেণীগুলি যে বুদ্ধির গর্বে ক্ষীণ, তার ভিত্তি কিন্তু সম্পত্তি, বিজ্ঞা নয়। কেননা, ‘বিজ্ঞা’ কথাটির ব্যবহার ব্যাপকতম অর্থেই। কৃষিজীবী মৎস্যজীবী, শ্রমজীবী—প্রতিটি শ্রমজীবীকেই কিন্তু কিছুটা বিজ্ঞা আয়ত্ত করতে হয়। জীবিকার জন্য বিজ্ঞা—এটা প্রায় আদিম অবস্থা থেকেই চলে আসছে। রাষ্ট্রকর্মতার নেতৃবাসীন শ্রেণীগুলি শ্রেণীগত আধিপত্যের জোরেই বিজ্ঞা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব আহ্বির করে।

‘ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও যৌথ জীবন’ শীর্ষক অধ্যায়টিতে মৈত্র মহাশয় যে আলোচনার স্বতন্ত্রত্ব করেছেন তার সিদ্ধান্তটি কিন্তু সমাজ তত্ত্বের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। তিনি বলেছেন,— “যৌথ পরিবার বা যৌথ জীবন উভয়ই ক্রমশঃ অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হবেই।” যৌথ পরিবার ভেঙে যায় সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদনের সম্পর্কগুলির পরিবর্তনশীলতার জন্য। ‘ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ কোন বহিরাগত ধারণা নয়। সীমাবদ্ধ জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে নগরকেন্দ্রিক মানসিকতা, পুরাতন পদ্ধতিতে শোষিত হওয়ার অমিচ্ছা ইত্যাদি ব্যক্তিকে যৌথ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যৌথ জীবনের ভিত্তি ছিল কৃষিজমির দখল ও পারিবারিক সম্পত্তি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক সম্পত্তি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদেরও উচ্ছেদ হবে, কিন্তু যৌথ জীবনের নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের যৌথ জীবন থেকে শ্রেণীহীন সমাজের যৌথ জীবনে উত্তরণের মধ্যে গুণগত সামাজিক পরিবর্তনের সত্যটি হুশেন্দুবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর একটি কথা, ‘ঐতিহাসিক নিরতির নির্বন্ধে’ তত্ত্বটি হুশেন্দুবাবুর বৈজ্ঞানিক সমাজ সচেতনতাকে বোধহয় একটু আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

‘শিক্ষিতা’—এই অধ্যায়টিতে লেখক A. F. Pollard-কে উদ্ধৃত করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে Pollard-এর মতামত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ‘Without commerce and industry there can be no middle class’—এই মন্তব্যটি একপেশে ও অসম্পূর্ণ। দামস্তত্ত্ব থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ক্রান্তি মুহূর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল ইউরোপে। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বার্ষিক্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক অভিজাত সম্প্রদায় একদিকে স্ব সম্পত্তির অধিকারে, অন্যদিকে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার অগ্রসর হয়ে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিজ্ঞার জোরে বিস্তার

অধিকারী হয়ে অ্যানালিসাইজড হতে চেষ্টা করেছে। বিস্তারিত, বিজ্ঞা-প্রণী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটেছে যুদ্ধ ও দেশবিভাগ-উত্তর কালে।

পরিশেষে একটি কথা, অকণটে বলে রাখা ভাল। হুশেন্দুবাবুর প্রবন্ধগুলিতে নিবন্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্ম গোঁরবের কোন ঘোষ চোখে পড়েনি। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের প্রবন্ধ অনেক সময় আত্মজীবনীমূলক হয়ে ওঠে। প্রশংসনীয়ভাবে লেখক এই ঘোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। বাঙালী ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বর্তমান সংকটের যে প্রেক্ষাপট তিনি তুলে ধরেছেন তা আর একটু বিস্তৃত হলে হুশেন্দুবাবুর সং প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অতিনন্দন কুড়োত বিদগ্ধ মহলে—একথা জোর দিয়ে বলতে পারি।

অর্থনীতি

৫ম পৃষ্ঠার পর

প্রায় ২৫০০০ কোটি টাকা আয়ানত রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ২০ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা ব্যক্তিগত সংকুচিত করা হচ্ছে। কিন্তু নতুন শিল্পোদ্যোগ পড়ে না উঠলে পণ্য সরবরাহ বাড়বে না এবং নতুন কর্মসংস্থানও হবে না।

আসলে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পরম্পরবিরোধী নীতি গ্রহণ করে এগোতে চাইছেন। পেন্সিওনের মত দিনের বেলা বা বুনছেন, রাতে তা খুলে ফেলছেন। এ ধরনের নীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্রাহ্মিত করা ঘরের কথা যেটুকু আছে তাও রক্ষা করতে পারে না। এই নীতি পুঁজিবাদের সংকটকালে দিশাহারা মনোভাবই প্রকাশ করে।

সারা বিশ্বেই এখন পুঁজিবাদী সংকট পরিব্যাপ্ত। এক পুঁজিবাদী দেশ অপর পুঁজিবাদী দেশের উপর তার সংকটের ভার চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। আবার প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশ নিজেকে দেশের যেহেতু মার্জবদের উপর সেই ভার চাপিয়ে দেবার নীতি অহসরণ করেছে। এছাড়া তাদের উপায় নেই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার একই পুঁজিবাদী পরিকল্পনার পথ ধরে চলেছেন। এই পথ পরিত্যাগ করে মৌলিক অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ না ধরা পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা কমিশনই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। বরং হান্ডকরভাবে অপদস্থ হয়ে তাদেরও যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করতে হবে। এই পরিকল্পনারও দুটি হয়ে যাবে।

দেশ বিদেশে যে দিবস পালনের ইতিহাস

১৯৮০ সালের ৪ মে হাইডপার্ক লক্ষ লক্ষ মাহুষের সমাবেশের মধ্য দিয়েই গ্রেট ব্রিটেনে পালিত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস। মার্কসের কথা এলেনর মার্কস ও তাঁর স্বামী এডওয়ার্ড এভেলিং এই সমাবেশের উদ্বোধন নিয়েছিলেন। তাঁদেরই নেতৃত্বে গঠিত অদ্বৈত প্রমিকের ইউনিয়ন যোগ দিয়েছিল এই সমাবেশে। তা ছাড়া লণ্ডন ট্রেডস কাউন্সিল ও “এক্স” কমিউনিষ্টরাও এই সমাবেশে যোগ দেয় গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিষ্ট পার্টির অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০ সালে) টম ম্যানের নেতৃত্বে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত চাটিং আন্দোলনের ব্যর্থতা আর অন্তিমিকে ১৮৪৮ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত শিল্পের বিপুল বিকাশের ফলে যে দীর্ঘ যুগের অক্ষতা এসেছিল, তা অবশেষে ভাঙল।

১৮৯৬ সালে জেলে আটক অবস্থাতেই লেনিন রচনা করেছিলেন যে দিবসের ইস্তেহার। এক মাস পরেই শুরু হল বেশজোড়া স্মৃতোকল ধর্মঘট। এই ইস্তেহার প্রেরণা জোগাল ধর্মঘটে। ১৯০০ সালে খারকভে সংগঠিত হল যে দিবসের বিশাল সমাবেশ।

চীনে প্রথম যে দিবস পালিত হয়েছিল তাঃ সান ইয়াং সেনের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে। চিয়াং কাইশেকের রাজত্বে অবশ্য তা বে-আইনী হয়েছিল।

অনেকে ১৮৮৬ সালের শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলনের কথা জানেন। কিন্তু জানেন না যে এরও পূর্বে ১৮৬২ সালের মে মাসে দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়া ষ্টেশনে বারোশ রেল শ্রমিক করেছিলেন ধর্মঘট। তার ত ব্যঙ্গী হিসেবে এটা আমাদের গৌরব। ভারতে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে যে দিবস পালিত হয়েছিল ১৯২৩ সালের পরলা মে মাজাজের সম্মেলনকতে শ্রমিক নেতা সিদ্ধান্তে চুটিয়ারের সভাপতিত্বে। যে দিবসকে দুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে অস্বরোধ করা হয়েছিল। হাতের কাছে লাল খাণ্ডা না থাকার চেটিয়ার নিজ কন্ডার শাড়ি ছিঁড়ে তা দিয়ে পতাকা তৈরী করেন। চেটিয়ার মীরাট যড়যন্ত্র মামলার অন্ততম আদামী ছিলেন।

১৯২৬ সালে লাহোরে বিভিন্ন পোষ্টারে সজ্জিত হয়ে ধর্মঘটী টাকা

ওয়াল শ্রমিকেরা যে দিবস পালন করেন ও লালখাণ্ডা ওড়ান। সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর আবদুল মজিদ। তিনি ভারতে প্রথম ‘কমিউনিষ্ট যড়যন্ত্র মামলায়’ (পেশোয়ার) দণ্ডিত হন এবং মীরাট যড়যন্ত্র মামলার সাত বছর কঠোর সাজা ভোগ করেন।

১৯২৭ সালেই প্রথম এ, আই, টি, ইউ, সি থেকে যে দিবস পালনের জন্য সমস্ত প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন ‘গণবানী’র বিশেষ সংখ্যায় কবি নজরুল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতকে বাংলার প্রথম তর্জমা করলেন। বর্তমান রঞ্জি স্টেডিয়ামের ময়দানে ধর্মঘটী কেন শ্রমিকরা যে দিবস পালন করেছিলেন।

সে বছর বোম্বাইতেও যে দিবস পালিত হয়েছিল বিরাট উৎসাহের সঙ্গে। ডেনলি রোডের বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন এন, এম, বোশী, ফিলিপ স্মিট ইত্যাদি।

১৯২৮ সালে কলকাতার প্রচীন নন্দ পার্কে যে দিবসের সমাবেশ হয়। ১৯৩২ সালে যে দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে বর্তমান গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক সরোজ মুখার্জীর উদ্বোধনে বে-আইনী কমিউনিষ্ট পার্টির কলকাতা কমিটির নামে যে ইস্তেহারটি প্রকাশিত হয়েছিল তা তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি পায়। ১৯৩৭ সালে যে দিবসের একটি পোষ্টার ছাপার জন্য বর্তমানে সি, আই, টি, ইউ, নেতা কমল সরকারের তিন মাস জেল হয়। এ বছর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশও যে দিবসের অহুঠানে যোগ দিতে শুরু করে। ১৯৩৯ কলকাতা ও বোম্বাইতে এ, আই, টি, ইউ, সি ও জাতীয় কংগ্রেস যুক্তভাবে যে দিবস পালন করে।

১৯৪০ সালের যে দিবসে প্রচীন নন্দ পার্কের সভায় সভাপতিত্ব করেন হুতাঘচন্দ্র বসু। ১৯৪৬ সালে কলকাতার ময়দানের বিশাল সভায় রজনী পাম দস্ত বক্তৃতা করেন। কবি স্বকান্ত ভট্টাচার্য লিখলেন, “পরলা মে’র কবিতা, ১৯৪৬”—

“লাল জ্বাণন ছড়িয়ে পড়েছে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে
কী হবে আর কুহুরের মতো বেঁচে
থাকার ?

মে দিবস পুঁজিবাদ খতমের শপথ দিবস

চন্দন পাঠক

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় যেমন কংস বধের জন্য তেমনি পুঁজিবাদের গর্ভেই জন্ম নেয় সমাজ-বাদ পুঁজিবাদ খতমের জন্য। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আজ যে লড়াই চলছে তারাম হুনিয়াতে তার কিছু প্রথম আশ্রয়স্থান বিশ্বের অন্যতম পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকাতেই ১৮২০ সালে।

পুঁজিবাদ প্রমিত প্রেক্ষণীকে কিতাবে শোষণ করে তা প্রমিতপ্রেক্ষণী প্রথম টের পেলেন ১৮০৬ সালে। ফিলাদেলফিয়ার ধর্মঘটী জুতো প্রমিত নেতাদের বিরুদ্ধে যখন মালিক প্রেক্ষণী যত্নব্রহ্মের মামলা শুরু করলেন। শ্রমীদের থেকে শ্রমীকৃত কাজের নিয়ম চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কিছু আঠারো থেকে কুড়ি বর্ষ পর্যন্ত তখন প্রমিতদের কাজ করানো হতো।

চৌদ্দ বছরে প্রমিতদের চেতনার আঘাত হানতে হানতে অবশেষে ১৮২০ সাল থেকে শুরু হোল প্রমিত শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই। শুরু হোল ধর্মঘট। শুরু হোল ধর্মঘটী প্রমিতদের বিরুদ্ধে অত্যাচার। পাশাপাশি সংগঠিত হতে থাকেন প্রমিতরা। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। দৈনিক দশঘণ্টা কাজের দাবীতে শুরু হয় আন্দোলন। ১৮৫০ সাল থেকে কাজের বর্ষ কমানোর দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছিলেন বিভিন্ন দেশের প্রমিতরা। দিকে দিকে প্রোগান উঠতে থাকে ‘...আট বর্ষ কাজ, আট বর্ষ আমোদ প্রমোদ, আট বর্ষ বিজ্ঞান।’

একদিকে পুঁজিবাদী সংকট দায় কলে প্রমিতদের অমাহুযিক শোষণ, অন্যদিকে মুক্তির নেশা। এমতাবস্থায় ১৮৬৬ সালের ২০শে আগষ্ট ষাটটি বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতি-নিধিরা বালটিমোরে মিলিত হয়ে প্রমিত আন্দোলনের এক শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করলেন যার নাম ‘সামান্য লেবার ইউনিয়ন।’ এবং এই সমিতির নেতা ছিলেন বরসে ডব্লু উইলিয়াম এইচ সিলভিস। পরবর্তীকালে যিনি শুধু সিলভিস নামেই অত্যন্ত প্রিয় এবং পরিচিত ছিলেন। এই সিলভিসই এই ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবসের কনভেন-শানে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, ‘...এই দেশের প্রমিত প্রেক্ষণীকে পুঁজিবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ঠিক এই মুহূর্তের সর্বপ্রথম এবং প্রধান কাজ হোল এমন একটি আইন পাস করা যে

আইনে মালিক যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই কাজের দিন হবে আট ঘণ্টা। এই মহান লক্ষ্যপূরণ করার জন্য সমগ্র শক্তি পূর্ণভাবে নিয়োগ করার সমস্ত আজ আমরা নিচ্ছি...।’

সিলভিসের নেতৃত্বে সামান্য লেবার ইউনিয়নের আন্দোলনের চাপেই কিছু কিছু রাজ্য সরকার সরকারী কর্মক্ষেত্রে আট ঘণ্টা কাজের দাবী মেনে নেয়। এবং ১৮৬৮/৬৯ এ মালিক যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাতেও একটি আইন পাস হয়। দুর্ভাগ্য আমেরিকার। দুর্ভাগ্য সারা বিশ্বের লড়াই প্রমিত প্রেক্ষণীর। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিলভিসের মৃত্যু হয়। সিলভিসের মৃত্যুতে জননের প্রমিত ইউনিয়ন ‘আন্তর্জাতিক’-এর সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ শোক প্রস্তাবে প্রকাশ নিবেদন করা হয়, ‘...সকলের দৃষ্টিই ছিল সিলভিসের উপর। বিপুল কর্মক্ষমতা ছাড়াও প্রমিত প্রেক্ষণীর সেনানায়ক হিসাবে তাঁর ছিল দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতা।...সেই সিলভিস আজ আর নেই...।’ সিলভিসের মৃত্যুতে যে বিপর্ষয় নেমে আসে তাতেই বিলুপ্ত হয় সামান্য লেবার ইউনিয়ন। এই সিলভিসের অন্যতম দাবী আট ঘণ্টা কাজের দিনকে সমর্থন শুধু নয় তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মার্কস তাঁর ক্যাপি-টাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কাজের দিন অধ্যায়ে ১৮৬৭ সালে।

১৮৮১ সাল থেকে শুরু হোল লড়াই। পুঁজির বিরুদ্ধে সরাসরি সামাজিক যুদ্ধ ঘোষণা। পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮১ সালের পর থেকে পৃথিবীটা প্রমিতবী মাহু-বের চেতনার ইতিহাস। এবং চেতনার পুঁজির সঙ্গে কোন আপোষ নেই। ধর্মঘটী তালি বন্ধ যে যেখানে যেভাবে পেয়েছেন লড়াই করেছেন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ আমেরিকার গড়ে পাঁচশো ধর্মঘট ও তালিবদ্ধ হয়। এবং দেড়লক্ষ প্রমিত অংশগ্রহণ করেছেন। ১৮৮৫ সালে সেই ধর্মঘটের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতশো এবং যোগদানকারী প্রমিতের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই লক্ষ।

অপরদিকে পুঁজিবাদও নিজের ছিলন, প্রতিদ্বন্দ্বী দলদল। নাইটস অব লেবার-এর নেতা টেরেন্স পাউভারলি গোপনে গোপনে চক্রান্ত শুরু করলেন। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ, এমন কি নাইটস অব লেবার-এর সংগঠিত সমিতিগুলোকে প্রকাশ্যে ধর্মঘটে যোগদান না করার

পরামর্শও দেন।

কোটবদ্ধ প্রমিতবী মাহুযরা সরাসরি সমস্ত চক্রান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন। এবং নাইটস অব লেবারের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৮৬ সালে পনেরশ বাহাদুরি ধর্মঘট হয় এবং ছ লক্ষেরও বেশী প্রমিত আন্দোলনে যোগ দেন এবং এগারো হাজার পাঁচশো বাহাদুরি প্রতিষ্ঠান এই ধর্ম-ঘটের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ এই প্রতিদ্বন্দ্বী দল দোমি নাইটস অব লেবারকে সরাসরি প্রমিতবী মাহুয প্রত্যাখ্যান করেন। এই সমস্ত ধর্ম-ঘটের মূলকেন্দ্র বহিও বা শিকাগো শহরে ছিল, কিন্তু ব্যাপকতা লাভ করেছিল পিটসবার্গ, ওয়াশিংটন, দিনসিটি, সেন্ট লুই, বালটিমোর, নিউইয়র্ক, ডেট্রয় ইত্যাদি শহরে। মূলদাবী একটা ‘কাজের দিন আট ঘণ্টা’। এবং ১লা মে-র আগের রবিবার সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়নের প্রমিতরা ১লা মে-র আসন্ন ধর্মঘট উপলক্ষে যে ঐতিহাসিক সমাবেশ করেছিলেন তাতে ২৫০০০ প্রমিত জমায়েতে অংশ করেছিলেন।

১৮৮৬ সালের ১লা মে-র আন্দো-লনের জন্য চেহারার এবং নীতিগত ভাবে পরাজিত পুঁজিবাদী মালিকরা তরে শিউরে উঠলেন। এবং বুঝতে পারলেন ১৮৮৬ সালের পর থেকে পৃথিবীটা প্রকৃতপক্ষেই প্রমিতবী মাহুযের এবং পুঁজিবাদের শ্রমীকৃতের। তাই তারাও শুরু করলেন জবজ

আক্রমণ নিষেধের অস্ত্র বজায় রাখতে। যে নৃশংস আক্রমণের সাক্ষী শিকাগোর হে-মার্কেট।

১লা মে-র সকল আন্দোলনের সমর্থনেই তারা যে ম্যাককরনিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী নিরস্ত প্রমিতদের এক সমাবেশে পুঁজিপতি মালিক এবং বুজোয়া শাসন ব্যবস্থার পোষা পুলিশ বাহিনী কাঁপিয়ে পড়লো হিংস্র জানোয়ারের মতো। এবং রক্তাক্ত এই সমাবেশে ছজন প্রমিতবী মাহুয হলেন শহীদ। কয়েক শত প্রমিতবী মাহুয হলেন আহত। সমাবেশ রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্যে শেষ হোল তারা মে ১৮৮৬ সালে।

তারা যে প্রমিত হত্যার এবং পুলিশের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে! তারা যে হে মার্কেট জোয়ারে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী সভার শেষ মুহূর্তে হঠাৎ একটি বোমার আঘাতে একজন মার্কেট নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু হোল প্রমিত আর পুলিশে। যে লড়াইতে চারজন প্রমিত ও নতেরজন পুলিশ প্রাণ হারালেন। তারপর হে মার্কেটের এই লড়াইয়ে স্পাইজ ফিসার, পার্গনস প্রমুখ প্রমিত নেতা বিনাবিচারে ফাঁসীর বকে প্রাণ দিলেন। সেই থেকে শুরু হোল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রমিত প্রেক্ষণীর প্রথম প্রেক্ষণী লড়াই।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রমিত প্রেক্ষণী

মে দিবস

সেখ আমানুল্লা

সময়ের সন্ধিক্ষণ এসে
বুকের এ ব্যথা হলকা আঙনে পোড়ে
বলো না কোথায় যাবো
কোন মাঠে, সরদানে, শস্যের নীড়ে
কিংবা কোন দূর গায়ে বাসা বাঁধা যাবে?
অবশেষে ঘুরে ঘুরে পিঁড়ি পাতি
সর্বহারার রক্তের বিধিত স্বর্গের ঘরে
এই মে দিবসে।

শ্রমতানের উৎসবের আলোকসজ্জায়
ভুলিনি আমরা কেউ ইল্লাত জীবন।
ইতিহাসটা আটকা পড়ে থাকবে না
গুটিকর শহুরের হাতে।
অগণিত শহীদদের দুঃস্বপ্ন রক্তের বীজে
মিশে আছে আমাদের দেহ,
ভয়ের পাঁচিল সব তাই ভালে, ভেঙ্গে যার।
উল্লাত শপথ নিয়ে মে দিবসের রোদ্দুরে রোদ্দুরে
মাহুযের যাত্রা হবে, হয়েছে কোথাও।

একটু সমস্ত হয়ে উঠলেন। মালিক-পক্ষ তাদের এই জরুরি চিরন্তন জর ভেবে নতুন করে শুরু করতে চাইলেন অত্যাচার। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রমিত প্রেক্ষণী নতুন করে জেটবদ্ধ হতে শুরু করলেন।

১৮৮৯ সালে ১৪ই আগষ্ট বাস্তব জর্গ পতনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগঠিত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্যারীতে সমবেত হন। বিভিন্ন আলোচনা ও সভায় এই সমস্ত নেতৃ-বৃন্দের মূল লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়ালো পঁচিশ বছর আগে শিকাগো মহান মার্কস ও এঙ্গেলস যে আন্তর্জাতিক প্রমিত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধ্যান ধারণার চেতনায় চিন্তায় স্মরণীয় আর একটি সংগঠন গড়ে তোলা বা তারই পুনর্জন্ম দেওয়া। এই সব ভাবনা চিন্তায় জন্ম নিল নতুন এক প্রমিত সংগঠন দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিক।

এই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী সভার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আমেরিকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মে মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী চেতনাসমৃদ্ধ আন্দোলনের কথা শুনে এবং মূলদাবী ‘আটঘণ্টা কাজের দিনে’র যুক্তিতে অহুপ্রাণিত হয় প্যারী কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব সর্বমুখ্যি ক্রমে গ্রহণ করলেন।

‘...যাহাতে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে প্রতিটি শহরের মেহনতী মাহুয, তাহাদের নিজ নিজ সরকারের কাছে আটঘণ্টা কাজের সমর-কে আইন করিবার দাবী উত্থাপন করিতে পারেন...সেই উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস একটি বিশাল আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া-ছেন...।’

ঠিক তার দুবছর পর ১৮৯১ সালে ক্রমেলসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পর-বর্তী কংগ্রেসে এই আটঘণ্টা কাজের দাবী-র ‘প্রেক্ষণী সংগ্রামকে আরও গভীরে’ এবং ঐতিহাসিক ১লা মে-র সভা শোভাযাত্রাকে প্রেক্ষণী চরিত্রের উপর আরও বেশী গুরুত্ব দিয়ে ১৮৮৯ সালের প্যারী প্রস্তাবকে আর একটু সংশোধন করে নেওয়া হলো এইভাবে ‘...যেখানেই সমস্ত সেখানেই কাজ বন্ধ রাখতে হবে...।’ এইভাবেই শিকাগো শহরের ম্যাককরনিক কারখানার শহীদদের প্রভা ভানাতে হুনিয়ার মজদুর এক হয়। শিকা-গোর আন্দোলন আন্তর্জাতিকতার রূপ নেয়।

যে মে দিবস পুঁজিবাদীদের বুকে হাতুড়ী পেটার আর প্রমিতদের চোখে শেবাংশ চমপুঠায়

পরগাম পত্রিকায় কর্মী ছাঁটাই ও বেআইনী কার্যকলাপ

সরকারী নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে

কলকাতার পরগাম পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ গত জাহ্নবীরী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে পত্রিকায় মোট ১ জন অসামান্যিক কর্মীকে বিনা নোটিশে ছাঁটাই করে। কর্মীদের অপরাধ তারা ইউনিয়নে অস্বত্ব হতে কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করেছিল এবং কম্পাউন্স বিভাগের বে-আইনী কনট্রাক্ট প্রথা মানতে অস্বীকার করেছিল।

গত দু'মাস ধরে ইউনিয়নের সঙ্গে এবং পঃ বঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশনের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ইউনিয়ন একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। উক্ত দিনে কর্তৃপক্ষ অসামান্যিক ব্যক্তি দ্বারা ধর্মঘট কর্মীদের প্রতি অসামান্যিক আচরণ করে।

ছাঁটাই কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে পরগামে কাজ করছিলেন। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা হওয়া এবং বর্তমানে যথেষ্ট সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়া সত্ত্বেও এখনও মালিকপক্ষ বেআইনী কনট্রাক্ট প্রথা চালিয়ে

যাচ্ছেন যা সংবাদপত্রে চলে না। এছাড়া সংস্থার কৌশলিক নিয়ন্ত্রণ মানা হয় না। যেমন কোন হাজিরা খাতা নেই, কর্মীদের কোন পরিচয় পত্র দেওয়া হয়নি, পে-শীটে বেতন দেওয়া হয় না বেতন বোর্ডের স্থাপনিত অস্থায়ী বেতন ও মহাধর্মভাতা দেওয়া হয়নি। ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হয় না ই, এস, আই ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বলে কিছুই নেই। সর্বনিম্ন বেতন দেওয়া হয় ৮০ টাকা।

ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রম হস্তর এবং বিশেষ করে প্রমমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রম হস্তর খাতাপত্র সহ কর্তৃপক্ষকে উপস্থিত হবার নির্দেশ জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ প্রম হস্তরের নির্দেশ উপেক্ষা করেছে। কনট্রাক্ট ইমপ্লিমেন্টে এই নম রেজিস্টার্ড কনট্রাক্টরকে বে-আইনী বলে জানিয়েছেন। ইউনিয়ন পরগাম কর্তৃপক্ষকে ছাঁটাই কর্মীদের প্রতি মানবিক আচরণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

দুর্গাপুর অ্যালয় ষ্টীল কারখানার শ্রমিকদের গণ-অবস্থান

১৫ই এপ্রিল সারা ভারতব্যাপী এ আই টি ইউ সির দাবী দিবসের ডাকে দুর্গাপুর মিশ্র ইম্পাত কারখানার গেটে অ্যালয় ষ্টীল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ঐ দিন ১২ ঘণ্টার গণ অবস্থান পালন করা হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়ন (এ, আই, টি, ইউ, সি,) ইতিপূর্বে ১৮ই মার্চ অব্যাহত বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম সংগঠিত করার সূত্রপাত করেছে। প্রস্তাব গত ১৫ই এপ্রিল সেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট ইউনিয়নের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অন্ত্য ইউনিয়নের সঙ্গে এরা আলোচনা ও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার উত্তাপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে মিশ্র ইম্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ বলে কিছু লোক থাকলেও তারা কিছু করার মত অবস্থায় নেই। কারখানার ভিতরের বর্তমান অবস্থা খুবই সংকটজনক। ব্যাপক বিদ্যুৎ খাটতির ফলে

পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। তাই সাধারণ শ্রমিকের নিকট অ্যালয় ষ্টীল শ্রমিক ইউনিয়নের অস্থায়ী ঘটনা বা পরিস্থিতির স্রোতে গা না ভাসিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্ররোচনা দিন। এছাড়া কোম বিকল্প রাস্তা নেই। সংগঠিত সঠিক শ্রমিক আন্দোলনই শ্রমিকদের কারখানাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তাদের দাবীগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য ইউনিয়ন সর্বস্তরে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির নেতৃবৃন্দ তথা এম, এস, এ, এম, পি ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আশা করা যায় দাবীগুলি সত্তর মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যথাযথ ভাবে প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টি তাদের এম পি মারফৎ তুলে ধরবে। মিশ্র ইম্পাত কারখানার বার্ষিক সঙ্গে আমাদের জাতীয় বার্ষ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। এমন একটি দৃষ্টান্তপূর্ণ কারখানা আজ ধ্বংস হতে চলেছে।

শপথ দিবস

১ম পৃষ্ঠার পর

উদ্ভাসিত হয় নতুন দিনের স্বপ্ন, নতুন যুগের আলো দেই যে দিবসের স্বপ্ন চেতনার লড়াই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শোষণবাদ বা পুঁজিবাদ নতুন পথে এগিয়ে আসতে থাকে এই যে দিবসের সংগ্রামী চেতনাকে বিলুপ্ত করতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকার ১লা মে-কে শিশু স্বাস্থ্য দিবস বলে ঘোষণা করলেন। এবং এমই মেতৃত্বে ছিলেন নাইটস অব লেবার-এর মতো আর একটি প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়ন আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার। ১৯২৮ সালে ফেডারেশন-এর সম্মেলনে কার্খরী পরিষদের একটি প্রস্তাবেই বোঝা যায় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী ইতিহাসকে অবলুপ্তি ঘটানোর জন্য শ্রমিক দরদী (?) একটি হল কি ন্যাকারজনক কলঙ্কিত পথ নিয়েছিল, “...এর পর থেকে ১লা মে পরিচিত হবে শিশু স্বাস্থ্য দিবস

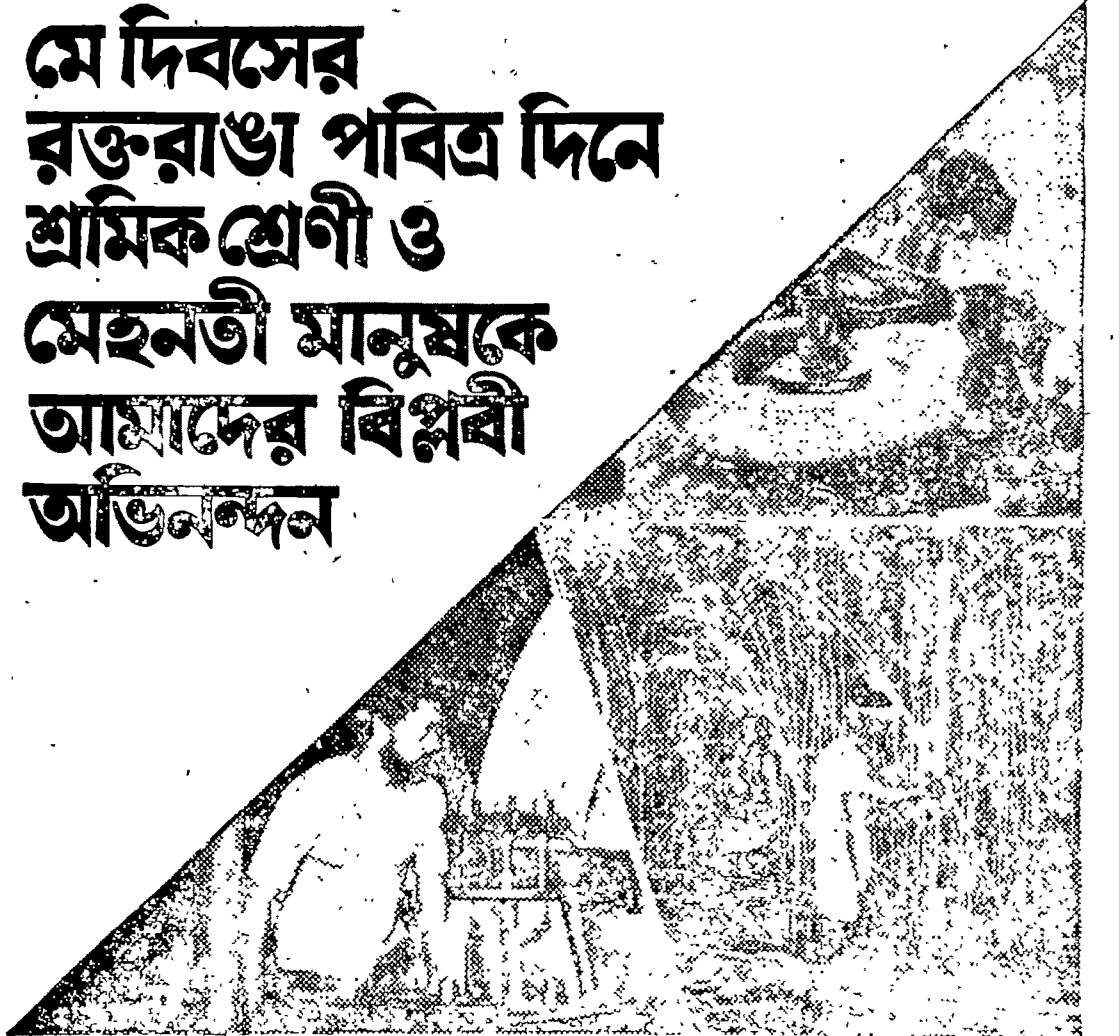
হিসাবে, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিয়েছে ১লা মে-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু-স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে পালন করার জন্য ঘোষণা জারি করতে। এই উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ।... আরও উল্লেখযোগ্য যে এখন থেকে মে-দিবস আর ধর্মঘট দিবস বা কমিউনিস্ট দিবস হিসেবে পরিচিত হবে না।.....”

এতো ঘটনা সত্ত্বেও কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করলো আগামী দিন কখনও পুঁজিবাদের নয়। আগামী দিন পুঁজিবাদের হতে পারে না। আগামী দিন বকিত মাহুকের শ্রমিকদের। সংগঠিত সমাজবাদী মেহনতী মাহুকের। এই সত্যকেই সামনে রেখে ও উপলব্ধি করেই ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ছুরিকে অঙ্কিত কংগ্রেসে ১লা মে-র প্রস্তাবে এঙ্গেলস নতুন এক সংশোধনী সংঘোজন করলেন, “...আট ঘণ্টার দাবীতে ১লা মে তারিখে যে শ্রমিক সমাবেশ তা শ্রমিক শ্রেণীর স্বদৃঢ় সংকল্পের দৃঢ় অঙ্গীকার। এই সংকল্প

হল সামাজিক পরিবর্তনের মারফৎ শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপ সাধন করা এবং এইভাবে শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপের মাধ্যমে সমস্ত জাতির শান্তির পথে আন্তর্জাতিক শান্তির একমাত্র সড়কে পদার্পণ করা।...”

অর্থাৎ ১৮০৬ সালে ফিলাডেলফিয়ার ধর্মঘটী ছুতো শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে বড়বস্ত্রের মামলার পরিণতিতে যে কোড শ্রমিকদের বৃকের মধ্যে দানার বাঁধতে শুরু করে তা আস্তে আস্তে ১৮২০ সাল থেকে রূপ নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়তে থাকে। এবং ১৮৮৬ সালের পর থেকেই মে দিবস ধনিত করলো ক্যাসিট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং সম্ভাব্য বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ ও বৈষয়তান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ও মাহুকের কাছে সংহতির আহ্বান। তাই ১৮৮৬ সালের পর থেকেই বিশ্বের শ্রমজীবী মাহুস মে দিবসকে জানার লাল সেলাম।

মে দিবসের রক্তরাঙা পবিত্র দিনে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষকে আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন



ঐতিহাসিক এই দিনে বায়হ্রন্ট সরকার পুনর্বীর ঘোষণা করছে শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নতির জন্য এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এই সরকার সর্বদা তাদের সঙ্গে ও পাশে থাকবে।

সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর সাথে এই পবিত্র দিনে আসুন আমরা সংকল্প করি সারা দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করব। সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখব। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত এবং সমগ্র গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের একত্রে চোখের মণির মত রক্ষা করব। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েরমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থাকব।

মে দিবস জিন্দাবাদ! ছুনিয়ার শ্রমিক এক হও!

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চলচ্চিত্র নাটক

গোপাল শুধু ভাঁড় নয়

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে আগেও ছবি হয়েছে। সে ছবিতে ভাঁড়ামি ছিল, কিন্তু মজা ছিলনা, খুল রসের রগড়ে জোর করে হাসাবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু ছিলনা রসোত্তীর্ণ প্রহসনের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস। তাই সে ছবি ভুলে গেল। অমল শূরের পরিচালনায় নতুন ছবি 'গোপাল ভাঁড়' কিন্তু ভিন্ন স্বাদের, তবে কখনই তা হাত্ত কৌতুকের নির্মল রসে সজীবিত হয়ে দর্শক চিত্তের আনন্দে উত্তরণ হয়না।

গোপাল ভাঁড়ের নবরূপায়ণে গোপালকে রাখা হয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। গোপাল এখানে শুধুই ভাঁড় নয়—দেশপ্রেমিক, দরিদ্র-বান্ধব, নারী লাহনার ব্যাভূত, সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধিতার দৃঢ়চেতা, রাজনীতিক ও রাজ্য কৃষ্ণ-চক্রের রাজসভার বিদূষক। এত রূপে গোপালকে কুটিয়ে তুলে তার বিদূষক সভার বিকাশ ঘটতে গেলে যে পরিমিতজ্ঞান ও রসবোধের প্রয়োজন ছিল, তারই অতাব ছবিটির দ্বাৰা। দীর্ঘ ১৬ রিলের ছবিতে গোপালের বাল্যকাল থেকে শুরু করে সতীদাহ, রাণী তবামী প্রভৃৎ, আলিবর্দি ও দিরাঞ্জোফোজা, নবাবী পেনার সংগে হিন্দু ও মুসলমানের লড়াই, দিরাঞ্জের প্রতি মীরজাদার বিশ্বাসঘাতকতা, কৃষ্ণচক্রের রাজসভার রামপ্রসাদ পেন, তারতচক্র রায়ের অহঙ্ক ইত্যাদি অনেক কিছু ঠাই দিয়ে পরিচালক হরতো। কিছু বেশী রাজ্যের ইতিহাসমন্ডতার নতুন সাদা আগাতে চেরেছিলেন, কিন্তু এই বিপুল আয়োজনে সেই কিংবদন্তীর গোপাল ভাঁড় তেমন মাড়া দিতে পারল না। মাধু প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে, কিন্তু রসের গোপালকে পাওয়া পেলনা রসসৃষ্টির অভাবেই তাতে সন্দেহ নেই।

এ ছবিতে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ক্যামেরাকে এত দুর্বল লাগল কেন—একটা প্রহর হয়েই দেখা দেয়। রবীন্দ্র বৈষ্ণবের সুর ছবিতে কোন বৈশিষ্ট্য এনে দিতে পারেনি। গতাক্ষিৎ রায়ের ছবিতে সজোব দস্তকে ততটুকু পাওয়া যায়, এ ছবির নাম কৃষিকার বিরাট পরিসরেও তাঁকে ততটুকু পর্যন্ত পাওয়া পেলনা—এটাও কম বিস্ময় নয়।

শোভনিকের 'একাকী সহসা'

মুক্ত অঙ্গন যাকে শোভনিকের ৫১ তম নাট্য নিবেদন 'একাকী সহসা' এক ছোটগল্প স্থলভ চমক ও রসৈন্দর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। নাট্যকার পার্শ্বপ্রতিম চৌধুরী নাট্য কৌতুহলকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে শেষ মুহূর্তের এক মোচড়ে আর্থাৎ মনের একাকীত্বকে সহসা ঘোষণা করেছেন যে মুন্সিয়ানার, নাট্য নির্দেশক কৃষ্ণ কুণ্ডলিক অঙ্কুর কুটিয়েই বক্তব্য বিষয়ের মক উপস্থাপনে রস সৃষ্টি করেছেন।

অসাধু ধনী কন্যামোহন বধন জানতে পারল তার দুয়ারোগ্য কানসার ব্যাবির কথা, তখনই সে তার এতদিনের পাণ ও অভ্যাস বাইরে প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে এক অজুত আনন্দ পেতে চাইল। অতঃপর সংসারে গী পুজ কস্তার কি অবস্থা দাঁড়াবে সে সম্পর্কে লজাগ থেকেও তার আঁধার মন যে মুক্তির আশা পেতে চেরেছিল, তা কিন্তু পারনি। নাটকের শেষ পর্বে বধন সে জানতে পারল যোগ নির্ণয়ে ভুল হয়েছে, তার কানসার হয়নি, তখন সে আবার বাঁচতে চাইল সেই পুরোন দুর্নীতির হকেই। কিন্তু সে সময়েই সে সহসা দেখল, তাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে—

সে সম্পূর্ণ একা—খুবই দেরি হয়ে গেছে—সবাই জেনে গেছে তার কুকীর্তির কথা—সে বাঁচতে চায় কিন্তু কি ভাবে? অবসর হয়ে পড়ে কন্যামোহন। আঁধার দুর্নীতিবাদের এমন পরিণতির ছবি চমৎকার কুটেছে কৃষ্ণ কুণ্ডল অতিনয়ে। অংশ-মানের চরিত্রটি নাটকে প্রতিষ্ঠা পায়নি। অংশমান যেখানে বলে, বাড়ির চারদিকে পুলিশ দেখানে হেমপ্রভা বাক্স নিয়ে পালিয়ে যায় কি করে? তবু মৈজেরী মুখার্জীর অভিনয় শুধু 'হেমপ্রভা' অনেকখানি বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। ধৃতিমান চরিত্রে অসিত বোষ অতিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা ও আলোর ব্যবহার নাটকের মূড়কে কুটিয়েছে।

'মহুয়া' আবার হচ্ছে

গত ত্রিশ দশকে চিত্র পরিচালক হীরেন বসু নিউ থিয়েটারের হয়ে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে 'মহুয়া' ছবি পরিচালনা করেছিলেন। নামকৃষিকার মলিমা দেবী ও নদের চাঁদ রূপে দুর্গাধার অভিনয় করেছিলেন। সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন যে ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ বাচস্পতি, তার নাম 'মহুয়া হুমদী'। গত ২৩শে এপ্রিল গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছবির নায়িকা সিমলে কাপাড়িয়া আরও জানান যে, তিনি বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে বিশেষ আগ্রহী। তার প্রথম 'মহুয়া' ছিল বাংলা। নায়ক নদের চাঁদ রূপে দেখা দেবেন রমিত মজিক।

সিনে কমিউন

বাংলাপুরের সিনে কমিউন (এ/১ বাপুলী মগর, বাংলাপুর, কলকাতা—৩২) তাদের প্রস্তাবিত প্রতি মাসের ২য় শনিবার চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন এ মাসের ১২ই এপ্রিল। আলোচনার বিষয় ছিল সমসাময়িক সমাজ ও চার্লি চ্যাপলিন। আলোচক অধ্যাপক গৌতম ভদ্র। গৌতম-বাবুর বক্তব্য খুবই প্রাঞ্জল ও মানবিক আবেদনে ভরপুর ছিল। যে মাসের ১০ তারিখে অধ্যাপক দীপেন্দ্র চক্রবর্তী আলোচনা করবেন সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে। সভা ৬ টার সকলকে উপস্থিত থাকতে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্ত সদস্য ও চলচ্চিত্র অহুরাগী শুভাভ্যাসীদের কাছে ন্যূনতম পাঁচ টাকা দান করার আবেদন রেখেছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জয়নারায়ণ দে।

বাঙালী মহিলার কুতি

প্রয়াগ ললিত সমিতি (এলাহাবাদ) অনুষ্ঠিত ললিত প্রভাকর পরীক্ষায় (১৯৭৮) সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে বঙ্গ ললিতে (সেতার) হুইজন বাঙালী মহিলা শিল্পী প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাদিকারের গৌরব অর্জন করেছেন। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মর্য পেরে স্বর্ণপদক বিজয়িনী জীমতী শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম স্থানাদিকার করেছেন রৌপ্য পদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছেন কুমারী মঞ্জু নাহা। শিল্পীদ্বয় বেহালায় অধিবাসী। ১৯৭৯ সালে বেহালা ব্রহ্মময়ী ললিত মহাবিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য উভয়েই আকাশবাণী কলিকাতার সেতার শিল্পী জীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী।

সাক্ষাৎকার

৩য় পৃষ্ঠার পর

৩ : রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটানোর জন্ত কেন্দ্রের সামনে অজুহাত তুলে ধরাই এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আসামে অত্যাচারিত পণ্য সরবরাহে অবরোধ সঠিক রাজ্য নয়। আসামের বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি দেশের অন্তর্ভুক্ত সরবরাহ করতে দিচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস (আই) ও আসামে খাতিশত ও অস্ত্র সাহায্যী যেতে দিচ্ছে না—এই দুই কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? জীমতী গান্ধী সংসদে বলেছেন, আসামের বিরুদ্ধে কংগ্রেস (আই) এর আন্দোলন শান্তিপূর্ণ, কিন্তু কলকাতায় যুব কংগ্রেস (আই) এর গুণাবাহিনীর কথা তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি। আমরা এসব সমর্থন করি না এবং আসামের পথেও আমরা চলা পছন্দ করি না।

সরকারী ডাক্তার

৫ম পৃষ্ঠার পর

এস ডি এম ও অসহায় বোধ করেছেন, কারণ ডাক্তার দানকে বিকলে আইটডোর ভিউটির সময় 'কখনই পাওয়া যায় না এবং স্থানীয় জনসাধারণকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্থানীয় এম এল এ ভাঃ হরমোহন সিংহ, ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস ডেঃ ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস, সি এম ও এইচ বর্ধমান প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের জন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রার্থী তালিকা নিয়ে

১ম পৃষ্ঠার পর

যাঙ্গের নাম রাজ্য নির্বাচন কমিটি আদৌ স্থপারিশ করেননি। রাজ্য স্তরের ইন্দিরা কংগ্রেস নেতারা মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন যে, বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। এটা ধরে নিয়েই প্রত্যেক গোষ্ঠী নেতা হয় নিজে অথবা নিজের প্রভাবাধীন লোককে মাতে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসানো যায় তার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন। এর জন্ত শুরু হয় নিজের লোকদের প্রার্থী করার তবির।

সংসদীয় বোর্ডের প্রার্থী মনোনয়নের ধরন দেখে অনেক প্রবীণ নেতাই হুচিন্তা দেখা দিয়েছে। প্রার্থী মনোনয়নের মধ্যে দিয়ে দলের হাইকমান্ড পট্টই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নতুন নেতৃত্ব তৈরী করতে বেশী আগ্রহী। হয়ত কোন কোন রাজ্যে কোন প্রবীণ নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসানো হলেও অনেক রাজ্যেই এবার মুখ্যমন্ত্রীর পদের জন্ত নতুন মুখ ঠিক করা হয়েছে। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আগামী হিসাবনিকাশ সবই নির্বাচনে জয়লাভের লড়াইনাকে সামনে রেখেই।

মধ্যপ্রদেশে কমতা দখলের লড়াই চলছিল ইন্দিরা গান্ধী এবং সঙ্গের দুই বিশ্বস্ত অঙ্গগামীর মধ্যে। এদের একজন ডি সি স্ত্রু এবং অন্যজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি সি শেঠী। উত্তর পক্ষই সঙ্গের সমর্থন দাবী করে আসছিলেন। কিন্তু প্রকাশিত তালিকা দেখে উত্তর পক্ষই বুঝেছেন মধ্যপ্রদেশে সঙ্গ গান্ধী নতুন নেতৃত্ব তৈরী করতে সচেষ্ট। ইতিমধ্যেই সঙ্গ গান্ধী তার বিশিষ্ট শিল্পপতি বন্ধু এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত সদস্য কমল নাথকে এই রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্ত যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছেন। এতে স্ত্রু ও শেঠী উভয়েই ক্ষুব্ধ। কিন্তু করার কিছু নেই। উত্তর প্রদেশেও একই অবস্থা। এই রাজ্যের প্রার্থী মনোনয়নে সঙ্গের যুব বাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছেন। বহুগুণকে তো প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে একেবারে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। প্রার্থী তালিকার তার প্রভাবকে প্রায় অগ্রাহ্যই করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কমলাপতি ত্রিপাঠী, মহসীনা কিরোয়াই, এন ডি তেওয়ারীর প্রভাবকেও বেশী আমল দেওয়া হয়নি।

যদিও সংসদীয় বোর্ড প্রার্থী তালিকা অনুমোদন করেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশ এ ব্যাপারে এসেছে সঙ্গের কাছ থেকে। অবস্থা দেখে অনেক নেতাই মুগ্ধ পড়েছেন। আগামী দিনই বলবে তারা রাজ্যের নির্বাচনে কি কৃষিকা নেবেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্মদ

পর্মদ প্রকাশন

- ১। রাষ্ট্র সংঘ / জীশেখর বোষ ১২'০০
- ২। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা / জীমঙ্গল কুমার বোষাল / ১৫'০০

৬৫, রাজা সুবোধ মজিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

আসামের আন্দোলনে রাজ্যপাল ও মুখ্য সচিবের হাত আছে

১১শে এপ্রিল বেলা একটার আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর আসামের সচিবালয়ের কাছে সরকারীভাবে আদেশ পাঠায় যে, যে ভাবেই হোক 'বিদেশী' বিতাড়ন আন্দোলন রোধ করা হোক। সেই মোতাবেক ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার, মিসা বা পি, ডি, আইন জারি করা অথবা নারেলীর মত তৈল শোধনাগার বা অন্যান্য জায়গা থেকে অবরোধ তুলে দেবার জন্য উগ্র বল প্রয়োগ করা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ২০ তারিখে দুপুর বেলা থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা নির্ভর হয়ে পড়ে। দৈনিক পত্রিকাগুলো অবশ্য এর কারণ স্বরূপ "১৯৫৫ সালের আসাম উপশ্রুত অঞ্চল বিধি ও ১৯৫৮ সালের সশস্ত্র বাহিনীর (আসাম ও মণিপুর) বিশেষ ক্ষমতা আইনের

ওপর স্বগিতাধেশ বহাল থাকার ব্যাপারটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওটা আসল বা একমাত্র ব্যাপার নয়। কারণ তাহলে, বিশেষতঃ ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন থেকে ১৯৭৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত যেগুলো ঘটেছে ধরেই নিতে হবে সেগুলো সংবিধান সম্মত।

প্রকৃত ঘটনা হলো, ইন্দিরা সরকারের ধারণা হয়েছে যে, আসামের সাম্প্রতিক ব্যাপক হাঙ্গামার পেছনে রাজ্যপাল এল, পি, সিং ও মুখ্যসচিব পরমশিবম প্রমুখদের কাছে হাত রয়েছে। সেই কারণে দিল্লী ঘোঁটাঘুটি লিঙ্কান্ড নিয়েছে যে, রাজ্যপাল ও মুখ্যসচিব সহ-আরো করেকজন আই, এ, এস ক্যাডারের অফি-

সারকে স্থানান্তরিত করবে। এল, পি, সিং-এর পরিবর্তে আসামের রাজ্যপাল নিযুক্ত হচ্ছেন জনৈক শ্রীশর্মা। রাজ্যপাল বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা ইতিমধ্যেই বদলি হয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে এসেছেন গুজরাট সরকারের বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা মি: লারিম।

২০ তারিখে ৩: খবর এল, পি, সিং পরমশিবম প্রমুখদের কাছে পৌঁছানো মাত্রই সরকারী আদেশকে শিথিল করে দিয়ে তারা নতুন করে বিদেশী হটাও আন্দোলনকে উত্থানী দিয়েছেন। পরে অবশ্য চাপে পড়ে আবার কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেন। এদিকে বিশ্বস্ত হুজ্জৎ সংবাদ পাওয়া গেল, গোঁহাটি, কামরূপ, কাছাড়, দারাজ ইত্যাদি জেলায় সি, পি, এস, এস, এক, আই, সহ বামশহীদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত শুরু হয়েছে।

বরোদা ডিনামাইট মামলা আবার জিইয়ে তোলা হচ্ছে

বিখ্যাত সেই বরোদা ডিনামাইট মামলাটিকে পুনরায় জিইয়ে তোলা হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত হুজ্জৎ জানা গেছে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের কয়েকজন কান্স অফিসার বরোদা ডিনামাইট মামলার মণিপুর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন এবং প্রয়োজনীয় ধনুড়া প্রস্তুত করছেন।

উল্লেখ্য যে, বিগত জনতা সরকারের আমলে এই মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। এই মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীমুখার্জী, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীপাটোয়ারী, সংসদ সদস্য শ্রীবীরেন শাহ সহ বহু বিরোধী ব্যক্তি। জনতা সরকারের আমলে মামলাটি প্রত্যাহৃত হলেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে জনৈক আইনজীবী দেশের সর্বোচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। সুপ্রীম কোর্ট সেই আবেদনের শুনানী গ্রহণ করেছেন কিন্তু রায় স্থগিত আছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে, দিল্লীতে

খুঁত রায় লাল ওয়ানীর একাধার মত দিল্লী পুলিশ ইতিমধ্যে বরোদা থেকে যে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে তার মধ্যে দুজন বরোদা ডিনামাইট মামলার অভিযুক্ত ছিলেন। বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন নির্বাহনীয় নেতা মনে করছেন যে, বরোদা ডিনামাইট মামলাকে জিইয়ে তোলার ব্যাপারে "দিল্লীর এই সাক্ষানো হত্যার চেষ্টার মামলাটিকে" ব্যবহার করা হবে।

জানা গেছে যে, শ্রীমতী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করা হবে এই বলে যে, বরোদা ডিনামাইট মামলাটিকে প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেন নি। বর্তমান সরকার মনে করছেন যে, এই মামলাটিকে জিইয়ে তোলার অগ্রমতি দেয়া হোক। আরও জানা গেছে যে, জরুরী অবস্থার সময় চালু মামলাগুলি যা জনতা সরকার তুলে নিয়েছিলেন সেগুলি জিইয়ে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

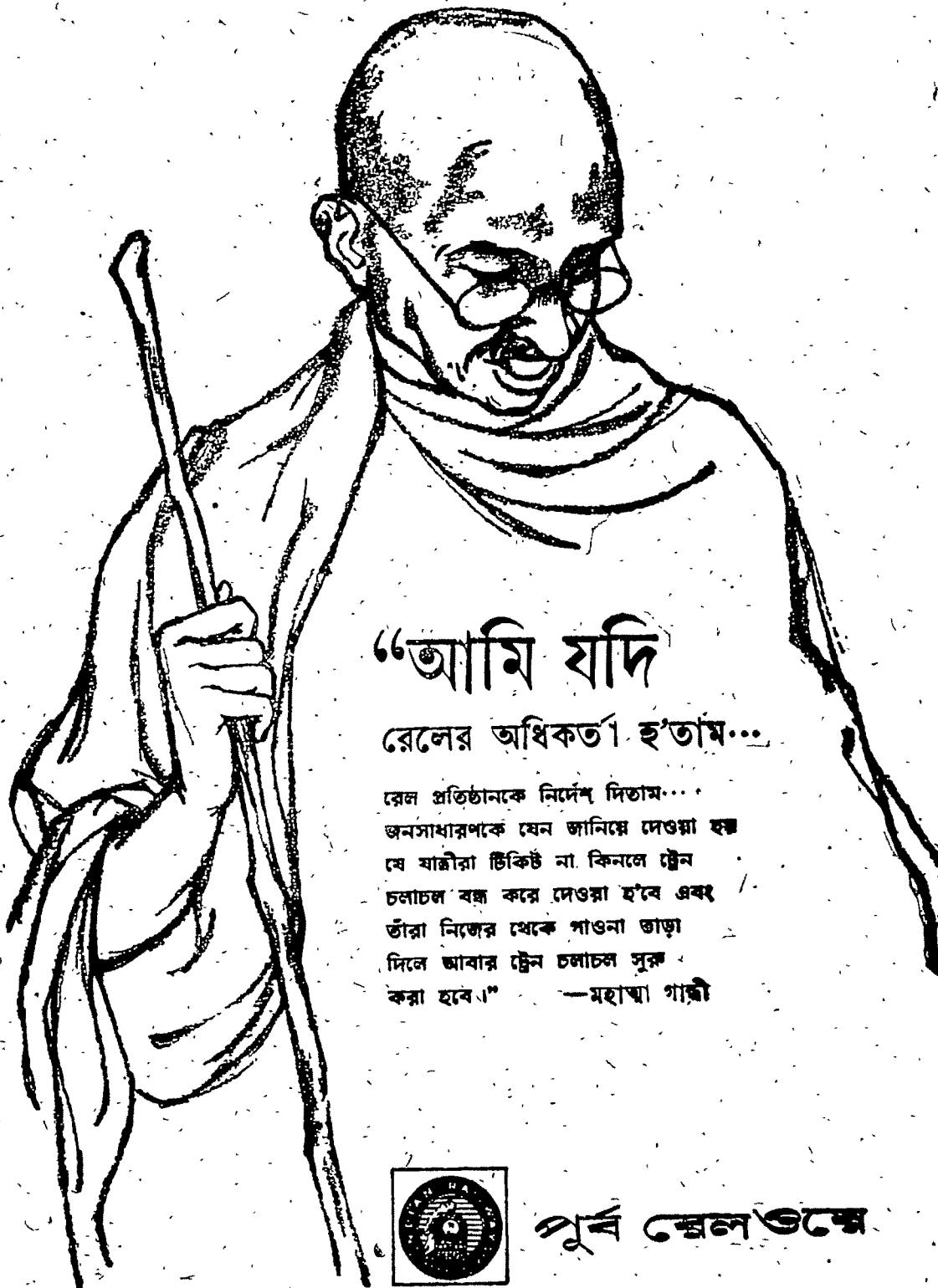
বিধান সভার কিছু জনতা সদস্য আর এস পিতে যোগ দিচ্ছেন

পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টির কয়েকজন বিধানসভা সদস্য বামফ্রণ্টের শরিক আর এস পি দলে যোগ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। জনতা ছেড়ে যাওয়া বামফ্রণ্টের দিকে ঝুঁকছেন তাদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গেছে। একজন হলেন কিরণময় মন্ডল এবং অপরজন হলেন সন্দীপ দাস। এই দুজনের দলভ্যাগ একরকম প্রায় নিশ্চিত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জনতা পার্টির প্রতীক বাতিল হবার পর দলের মধ্যে বিশেষ করে জনতা পরিষদীয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বেশ কয়েকজন জনতা বিধায়ক নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কেবলমাত্র প্রমুখ সেনের অগ্রগামী কয়েকজন জনতা বিধায়ক জনতা পরিষদীয় দলকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে। মাহারাম রায়, প্রজ্ঞা মহান্তি প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া অন্তর্কালেই প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছেন যে, হয় তারা বামফ্রণ্টভুক্ত কোন শরিকদলে যোগ

দেবেন আর না হয় নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দাবেন। কিরণময় মন্ডলের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের যে কথাবার্তা হয়েছে তা থেকে এটা বোঝা গেছে যে, কিরণবাবু আর এস পি দলে যোগ দেবার ব্যাপারে মনস্থির করেই ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে আর কোন জনতা বিধায়ক দল ছাড়ছেন এই প্রশ্নের উত্তরে কিরণবাবু বলেছেন আমার সঙ্গে আরও তিনজন দল ছাড়বেন। তবে তাঁদের নাম বলা বারণ আছে।

ওদিকে জনতা পরিষদীয় দলের নেতা কানীকান্ত মৈত্রের অবস্থা খুবই সন্দেহ। তিনি কোনদিকে যাবেন তা এখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি। তিনি বোম্বাই সান্বেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আবার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন ৬নং মুরলীধর লেনের ভারতীয় জনতা পার্টির অফিসে। তবে যতদূর জানা গেছে কানীকান্ত নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টিতেই যোগ দিচ্ছেন।



“আমি যদি

রেলের অধিকতা হ'তাম...

রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম...

জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাঁরা নিজের থেকে পাওনা জাড়া দিলে আবার ট্রেন চলাচল শুরু করা হবে।” —মহাত্মা গান্ধী



পূর্ব স্ট্রেলভেন

বহুগুণা ইন্দিরা কংগ্রেস ছাড়ছেন

দপন

ত্রয়বিংশ বর্ষ। ১৬শ সংখ্যা। শুক্রবার, ১ই মে, ৮০। ৬০ পয়সা

কয়েকজন বিধানসভা সদস্যদের রেলের কুপন নিয়ে কেলেকারী

কয়েকজন বিধানসভা সদস্য রেল-ওয়ে কুপন নিয়ে কেলেকারী করছেন। নিজেদের রেলওয়ে কুপনে তাঁরা অন্য লোককে রেল-সফর করতে দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। যেসব বিধানসভা সদস্য রেলওয়ে কুপন অপব্যবহার করছেন তারা কেউই কিন্তু শাসক দলের নন। এরা হলেন হরিপদ জানা, নাহুরাম রায়, বীরেন্দ্র মৈত্র, বিনোদবিহারী মাজি এবং পঞ্চানন দ্বিগপতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিনা ব্যয়ে রেল সফর করার জন্য বিধানসভা সদস্যরা রেলওয়ে কুপন পান। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম বিধানসভার সদস্যরা রেলের প্রথম শ্রেণীতে একাকী বিনা ব্যয়ে সফর করতে পারতেন। কিন্তু সচল সমাপ্ত বাজেট অধিবেশনে একটি বিল সর্বসম্মতিতে পাশ হয়ে যাবার ফলে এখন থেকে বিধানসভা সদস্যরা একজন সঙ্গী সহ রেলের প্রথম শ্রেণীতে সফর করার সুবিধা পেয়েছেন।

ইন্দিরা কংগ্রেসের সচল সদস্যগণী সেক্রেটারী জেনারেল হেমবতীনন্দন বহুগুণা ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবেন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে।

বহুগুণার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী এবং দলীয় গান্ধীর বিরোধ শুরু হয় লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই। লোকসভা নির্বাচনের পর মহিলা গঠন করা নিয়ে বহুগুণার কিছু কিছু বক্তব্য ছিল। কিন্তু তার বক্তব্যকে আমল দেওয়া হয় নি।

বহুগুণা নিজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এবং তার সমর্থকদের মধ্যে অন্তত একজনকে মহিলাদের নেবার জন্য অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী শুধু বহুগুণাকেই একটি কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে জায়গা দিতে চান। ফলে বহুগুণা প্রথম দফা এবং দ্বিতীয় দফার মন্ত্রী তালিকায় নিজে অন্তর্ভুক্ত হননি।

এর পরও বহুগুণার জন্য আরও অবজ্ঞা ও অপমান অপেক্ষা করছিল। বহুগুণাকে শ্রীমতী গান্ধী দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন লোকসভা নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের পর মহিলা গঠনের পর নয়টি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে বা দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার কোন মতামতই নেওয়া হচ্ছে না।

বহুগুণা বুঝতে পারছেন যে, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু অনেক দেরীতে বুঝলেন যখন চট করে আর করার কিছু নেই, কারণ ইন্দিরার পালে হাওয়া লেগে গেছে। আন্তঃ আন্তঃ অপমানিত, ক্ষুব্ধ বহুগুণা দলের সদস্য দপ্তরে আশা ছেড়ে শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



ফেডারেশন কাপের খেলায় পুলিশ টাকা কামিয়েছে

ফেডারেশন কাপ ফুটবল খেলাকে বেসরকারি করে কলকাতা পুলিশের বেশ কিছু কর্মচারী দুহাতে টাকা কামিয়ে নিলেন। বড় ক্লাবের খেলাতেই পুলিশ কর্মীরা লাভবান হয়েছেন বেশি। টাকা নিয়ে প্রতিটি বড় দলের খেলাতে ইন্ডেনউজানে ডিউটি-রত অনেক পুলিশ কর্মী মাঠে লোক ঢুকিয়েছেন। দর্শকের ভায়ে ইন্ডেন উজানের গ্যালারী উপচে পড়েছিল এই কারণেই।

গেটে ডিউটিরত ক্রীড়া দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে সমঝোতা করে পুলিশ মাঠে লোক ঢুকিয়েছে ইচ্ছামত। হোমগার্ড থেকে শুরু করে কমন্টেল

থেকে অফিসার পর্যন্ত প্রায় সকল পুলিশ কর্মীই বেআইনী ভাবে লোক ঢুকিয়েছে এবং দুহাতে টাকা লুটেছে।

পুলিশের নাকের ডগায় মাঠের বাইরে টিকিটের কালোবাজারী যেমন হয়েছে ঠিক তেমনিই টিকিট না পেয়ে পুলিশ ও হোমগার্ডদের হাতে দু'পাচ টাকা শুদ্ধ দিয়ে প্রতি দ্বিনই কয়েক হাজার মানুষ ইন্ডেন খেলা দেখেছেন। পেট থেকে বহু টিকিট মাঠের বাইরে চলে এসেছে এবং তা বিক্রী হয়েছে কালো-বাজারে। বহু গেটে টিকিট চেকাররা টিকিট পাঞ্চ করতে নিয়ে ফেরৎ না দিয়ে তা হোমগার্ডদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে পাচার করার জন্য।

সুন্দরবনে মিশনারীদের কীটকলাগ



পশ্চিম জার্মানীর লুথেরান ওয়াল্ড শার্ভিস নামক মিশনারী সংস্থা কলকাতার ফুটপাথের বাসিন্দা কিছু পরিবারকে সুন্দরবনের কুলতলী ধানার ভূবনেশ্বরীতে নিয়ে গিয়েছিল পুনর্বাসনের জন্য। তাদের অবস্থা এখন দলীন। পচিশটি পরিবার খাচ্ছের অভাবে ফিরে এসেছে। যারা রয়ে গেছে তাদের অবস্থা শোচনীয়। সাহেবদের বলতে গেলে “ভিথারিকা বাচ্চা” “বাঙালী কুস্তাকী বাচ্চা” ইত্যাদি শুভে হয়। রাজ্য সরকার সুন্দরবন প্রকল্পকে কাঁচকলা দেখিয়ে মিশনারী সংস্থা যথেষ্টাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

লুথেরান ওয়াল্ড শার্ভিস আটাত্তর মাসে কলকাতার ফুটপাথ বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করে। এই সংস্থা রাজ্য সরকারের কাছে ম' হাজার একর চাষের জমি ও বাড়ি-ঘর, রাজ্যবাট প্রভৃতির জন্য আরো বারো হাজার একর জমি চেয়েছে। পুনর্বাসনের ব্যয়ভার উক্ত সংস্থাই বহন করবে মুখ্য সচিব অমিয়া পেন ২০ মে ৭৮ মহাকুরণে সাংবাদিকদের এ খবর জানিয়েছিলেন। ঐ মিশনারী সংস্থা সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পও করে।

সম্পাদকীয় ভঙ্গমহিলা

ভঙ্গমহিলা বড়ই বিপাকে পড়েছেন। ঘটনাচক্রে পুনরায় কমতা-ধিষ্ঠিত হয়ে-পুত্রসহ মামলাগুলি থেকে অব্যাহতি পেলেন বটে—না হলে কী যে হত, সঙ্গর এতদিনে কারাগারে থাকত নিশ্চয়—কিন্তু সমস্যার পর সমস্যা ভঙ্গমহিলার রাতের ঘুম আর কেড়ে নিয়েছে। দেশের অর্থনীতি একেবারে গোলার গেছে। জন্মমূল্য বৃদ্ধি ও বেশরোয়া কালোবাজারীর চাপে জনগণ দিশেহারা। দেশের ও জনগণের দুর্গতির দার কপনকারী জনতা সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে না হয় মুখরকার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান বা অবস্থার পরিবর্তনের আশা কই, ফলে দেশে অসন্তোষ ধুমুড়িত হচ্ছে, বিক্ষোভ দেখা দেবে। এই বিপদ থেকে ভঙ্গমহিলা উদ্ধার পাবেন কি করে? পথ তাঁর জানা নেই। কিংবা পথ জানলেও সে পথ গ্রহণের ইচ্ছা বা কমতা তাঁর নেই। অতএব এই সমাজের সমাতন দাওয়াই—যা আগে তিনি দক্ষলভাবে প্রয়োগ করেছেন—মাটি, গুলী, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদির দিনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কিন্তু আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভঙ্গমহিলাকে চোখে সর্বে ফুল দেখাচ্ছে। নিরীহ লোকগুলো অঞ্চলটাকে একেবারে কুদৃষ্টি করে তুলল। কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। কারফিউ পর্যন্ত মানে না। হাজার হাজার লোক, এমন কি মহিলা ও শিশুও নিবেদ্যজ্ঞা অসম্মত করে প্রোতের মত রাজ্য নেমে পড়ার বাধ্য হয়ে পুলিশকে কারফিউ প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। কি করে যে আদাম সঙ্কটের অবসান করা যায় তা ভঙ্গমহিলার মাথায় কিছুতেই আসছে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ডাকতেই দিল্লী গেলেন বটে কিন্তু কোন সুরাহা হল না।

সম্প্রতি ভঙ্গমহিলা বড়ই চিন্তিত বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীদের খেয়োখেয়িতে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে সঙ্গর টেক ওভারের জন্ত জমি তৈরি করছে। ক্রমবর্ধী তো, না হলে পৈত্রিক রাজ্য ছাড়বারে যাবে, তিনি আর কতদিন। কিন্তু ছেলেটা মেহাংই নাবালক, কলিকোশল এখনও রপ্ত করতে পারেনি, এমার্জেন্সীতে অত কাণ্ড করেও কারদা কারুন শিখল না। ভঙ্গমহিলা তাই খুব চিন্তিত। সব না ভেঙে যায়।

দেশ কাল রাজনীতি

মনোনয়ন নিয়ে খেয়োখেয়ি

ভারতপুত্র

রথদামাণী বেড়ে ওঠার আগেই জটনক (ই) প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহারাষ্ট্র বিধান সভার সদস্য পদ লাভ করার শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরে যে উল্লাস দেখা দিয়েছে তার স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত নয়, কারণ মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীরা আবার পুনরো খেয়োখেয়ির খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছেন। যে নটি রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ দানী বেধেছে। বিক্ষুব্ধের অভিযোগ মনোনয়ন দানের ব্যাপারে তার বিচার করা হয়নি, শুকতর পক্ষ-পাতিয়ের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধভাগ রাজ্যের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের একটি সাধারণ অভিযোগ হল এই যে গোষ্ঠীভিত্তিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, একটি বিশেষ চক্র পড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। সে গোষ্ঠী ও চক্রের নেতৃত্বে ইন্দিরা গান্ধী নন, সঙ্গর গান্ধীই রয়েছেন—এটাই হল বিক্ষুব্ধের মর্মস্পর্ষকার মূল কারণ।

এবার অবশ্য মনোনয়ন দান ব্যাপারে গোড়াতেই কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের পক্ষ থেকে একাধিকবার বলে দেওয়া হয়েছিল যে দলনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দুইদিনে বারো অবিচল পৈনিকের মত তাঁর কাছাকাছি ছিলেন কিংবা ঐ দুঃসমনয়ে নেত্রী বা দলের স্বার্থে নির্বাচন বা কারাভোগ করেছিলেন তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। রাজ্যে রাজ্যে প্রার্থী তালিকা বাচাই করা হবে সেরকম বিখ্যাত ইন্দিরা দেবকীর সংখ্যা কত মিলবে জানিনা তবে সঙ্গর অহুগতরা যে লাভবান হয়েছেন সে বিষয়ে বিক্ষুব্ধের মনে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গর গান্ধী রাজনীতিতে এসেছেন কদিন হল, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শই বা কি—এ প্রশ্নগুলো স্বভাবত উঠতেই পারে, বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গর গান্ধীই যে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গরের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে বৈরতন্ত্রের যে কোন ফারাক নেই একথা তো বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী (ই)-রা বিশ্বাস হতে পারেন না।

ওড়িশার সঙ্গর গান্ধীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী-স্বকংগ্রেস (ই) নেতা রামচন্দ্র রথের আপন জনেরাই মোট টিকিটের সিংহভাগটি পেয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী এখন নির্বাচনী সফরে ভ্রমণে-

যর মান তখন কংগ্রেসের (ই) মহিলা সভার মেত্রীরা তাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করতে বিধাঙ্ক হন নি। তাদের অভিযোগ রাজ্য বিধান সভার মোট ১০৭টি আসনের মধ্যে যেখানে অন্তত ১৫টি আসন মহিলাদের পাবার কথা, সেখানে মাত্র চারজন আদিবাসী মহিলাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যবতী মহিলা চতুষ্কই নাকি শ্রীরথের বনিষ্ঠ।

অনুরূপভাবে মধ্যপ্রদেশে টিকিট বিতরণের ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতা পি দি ক্ষেট্টিকে কোন পাতা দেওয়া হয়নি। বরং বেছে বেছে এমন লোককে মনোনীত করা হয়েছে যারা শেঠী বিরোধী এবং বাদ্যের অতীত লন্দে-হাতীত নয়।

পাঞ্জাবেও কংগ্রেসে (ই) সন্মাপ্ত স্বরণ সিংকে উপেক্ষা করেছে প্রার্থী তালিকা রচিত হয়েছে। মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দরবারা সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং প্রমুখ নেতার আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রীর খোঁজ জুগ উত্তর প্রদেশেও বহুগুণা এক বিরাট বোমা ফাটিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসের সেক্রেটারী জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। এই অভিযোগই কংগ্রেসে (ই) থাকার আর কোন উপ-যোগিতা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সাংবাদিকদের তিনি সখেদে বলেছেন সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে যতই তিনি কার্যকর ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছেন ততই তিনি আরও বেশি উপেক্ষিত হয়েছেন। স্বভাবতই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নে তাঁর মতামতকে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি, তাকে সম্পূর্ণ চুটো জগমাগে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সীমিত জোট

অবশ্য কংগ্রেস (ই) শিবিরে এই বিশ্বাসাপূর্ণ চিত্রের পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের চিত্রটি বহিঃস্থাপন করা যায় তবে তাতেও আশাশ্রিত হবার কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। কারণ যে জনতা দল ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পশু-দস্ত করে দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছিল সে জনতা পার্টি আজ পাঁচভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটি দলের মধ্যে চন্দ্রশেখরের জনতা, বাজপেয়ীর

ভারতীয় জনতা, চরণ সিং-এর লোকদল এবং কংগ্রেসের দেবরাজ আর্প-রাজ্য বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচনী জোট করার প্রয়াসী হয়েছেন অথচ গত জাহরারী মাসে লোকসভা নির্বাচনে-বিশেষ বটার পর এই তত্ত্বলোকেরাই শপথ নিয়েছিলেন যে বৈরতন্ত্রকে রোধবার জন্ত তাঁরা দলীয় গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মস্তবুত নির্বাচনী ঐক্যে আবদ্ধ হবেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে আঞ্চলিক বা শীর্ণিত সংহতিও তারা শেষ পর্যন্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

একথা ঠিক যে ময়টি রাজ্যের

ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটিতে কে কে থাকবেন

নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি শীঘ্রই গঠিত হবে। বিশস্ত হুজো জানা গেছে যে, এই নবগঠিত দলের রাজ্য কমিটির সভাপতি হচ্ছেন কলকাতার রহমান। কমিটিতে আর বারো থাকবেন তাঁরা হলেন বিষ্ণুকাঙ্ক শাজী, হরিপ্রসন্ন মিশ্র, দুর্গাপ্রসাদ মাধানি, তপন শিকদার, হরিপদ ভারতী, অনিমা বসু, বিনয় সিংহরায়, ডঃ ভবেন চ্যাটার্জী প্রমুখ। বর্তমানে এই দলের পশ্চিমবঙ্গের আস্থারক রয়েছেন-বিষ্ণুকাঙ্ক শাজী।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দল গঠিত হয় জনতা পার্টিতে ভাঙন ধরিয়ে। প্রাক্তন জনসংজ্ঞীদের প্রাধান্য এই দলে বেশি হলেও অজনসংজ্ঞী অনেকেই এই দলে যোগ দিয়েছেন। শান্তিভূষণ, সিকন্দর বখত প্রমুখেরা কোমকালেই জনসংজ্ঞী ছিলেন না। তাঁরা যোগ দিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে বহু জনতা নেতা এই দলে যোগ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই

বেকারদের পেটানো হল

দীর্ঘ তিনমাস কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বন্ধ থাকার পর বিনা নোটিশে প্রথমে নিউ-সি আই টি রোড ও পরে সেন্ট লেকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস স্থানান্তরিত করা হয়। রেজেক্টকৃত কার্ডহোল্ডারদের সি নি রি টি র ভিত্তিতে চাকরী দিতে হবে এই দাবি তুলেছে আনএমপ্লয়েড ফেডারেশন। এক্সচেঞ্জের অফিসারদের স্বজন-পোষণের বিরুদ্ধেও ফেডারেশন নোড্ডার হয়েছে।

বেকার স্বার্থে সেন্ট লেক থেকে

বিধানসভার নির্বাচন হতে চলছে সেগুলির কোথাও হুট কমিউনিষ্ট পার্টি বা বামপন্থী দলগুলির বিশেষ প্রভাব নেই। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার মত এসব রাজ্যেও যদি কমিউনিষ্ট বা বামপন্থী আন্দোলন বা সংগঠনের ভিত্তি গঠন করে যেত তাহলে আজ হয়ত রাজনীতির মেল বিভাজনের চরিত্র অন্তরকম হত। কিংবা এ সাধনা বা আপত্তিক্য লাভ কি। দুর্বলতা তো বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধার দাবিদার দুই কমিউনিষ্ট পার্টিরই। এখনও কি পার্টি দুটির মেত্ব সবক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলনে পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে পেরেছে?

দলে যোগ দিয়েছেন কলকাতার রহমান, দিবাকর কুণ্ডু, ডঃ গোপিকারজন মিত্র, হরপ্রসাদ, ব্রজগোপাল দাস, প্রবোধ সিংহ প্রমুখেরা। ২৪ পরগণা জেলার জনতা নেতা ডঃ ভবেন চ্যাটার্জী আর ৭০০ অহুগামী সহ নবগঠিত ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। অপরদিকে জনতা ঘুর মোটা নবগঠিত এই দলের আস্থ-গত্যা মেনে নিয়েছেন। সকলকে বিস্তৃত করেছেন লুপ্ত রাজ্য শাখার সভাপতি হরিপদ ভারতী। শুক থেকে এই দলের প্রতি তাঁর অনীহা সকলকে বিস্তৃত কবে। তবে জানা গেছে যে, অবশেষে তিনি এই দলে যোগ দেবেন বলে মনস্থির করেছেন।

কাশীকান্দ মৈত্র সহ জনতা পরিষদীয় দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক নবগঠিত এই দলের আস্থ-গত্যা মেনে নিয়েছেন বলে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে।

ভালহৌসি বা ধর্মতলা অঞ্চলে এম-প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস স্থানান্তর করার দাবিতে, স্বজনপোষণের প্রতিবাদে ২১শে এপ্রিল বখন আনএম-প্লয়েড ফেডারেশন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তখন রিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার, জটনক অফিসার-কিছু শুভা নিয়ে বিক্ষোভকারী বেকার যুবক যুবতীদের উপর শারীরিক অত্যাচার ও অশোভন আচরণ করেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রাবার ওয়াক্সে চরম শোষণ এবং

নিপীড়ন : সরকার ও ইউনিয়ন নির্বিকার

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রাবার ওয়াক্সে-এর মালিক মোহনলাল বালাজি শ্রমিক শোষণ এবং নিপীড়নের এক মধ্য-যুগীয় বর্বরতার পুনরাবৃত্তি করছেন।

কলকাতার কিছুদূরে জিলুয়াতে অবস্থিত এই কারখানাটির শ্রমিক সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। হেড অফিস ও সেলস অফিস মিলিয়ে আরও প্রায় শ'তরেক লোক কাজ করেন।

এই সংস্থার কর্মরত মোট সাতশ কর্মী দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভা-রনস্বত দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করছেন। মালিকের বিরুদ্ধে দাবী আদায়ের লড়াই করতে গিয়ে কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন, কয়েক-জন আত্মহীন হয়ে এলাকার বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়া লক-আউট, লে-অক, হাটাই, সাম-য়িক বরখাস্ত হওয়া প্রভৃতি "নিরা-মিষ" আক্রমণের শিকার তো শ্রমিক-কর্মচারীরা হাশেমাই হচ্ছেন।

প্রথমে, কর্মীদের হাজিরার ব্যাপার দিয়ে শুরু করা থাক। সব কারখানাতে যে ভাবে হাজিরা বাধার পদ্ধতি আছে এখানে তার ধার কাছ দিয়ে যাওয়া হয় না। কাড়ি পাফিং, অথবা খাতায় লই, অথবা বাজে টিকিট ফেলা। কোন পদ্ধতিই এখানে মানা হয় না। কারখানার শিফট চালু হবার পর মালিকের বিশ্বস্ত কোন কর্মচারী এসে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখেন কে উপস্থিত, কে অনুপস্থিত। মালিক নিয়োজিত হাজিরাবাবুর নিদ্রাস্তই চূড়ান্ত উপস্থিতি-অনুপস্থি-তির ব্যাপারে। অর্থাৎ মালিকের পেটোয়া লোকটির যদি কোন কারণে কারও ওপর আক্রোশ থাকে তবে কারখানার উপস্থিত থেকেও তিনি অনুপস্থিত হয়ে যেতে পারেন এবং হনও। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করার উপায় নেই।

এই সংস্থার কোন কর্মীরই কাজের কোন নিরাপত্তা নেই। দশ/পনেরো বছর কাজ করছেন এমন বহু কর্মী আছেন যারা এখনো "মাস্টার রোলের" বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এই কারখানায় কোন পে-স্কেল নেই, নেই কোন বাৎসরিক কোন বৃদ্ধির সুপ্ত পদ্ধতি। পনেরো/বিশ বছর কাজ করেও এই কারখানার ভাগ্যহত কর্মীরা গড়ে ১৭৫ টাকার বেপি বেতন পান না। এই কারখানার ক্যান্টিনী অথবা হেড অফিস কোন জায়গাতেই ক্যান্টিনের

কোন ব্যবস্থা নেই, এমন কি পরস্পর দিয়েও এক কাপ চা যোগাড় করার কোন উপায় নেই। শুনলে আশ্রয় হতে হয় কর্মীদের খাবার জলের ব্যবস্থা করতেও মালিক ইচ্ছুক নন।

কারখানা আইনের প্রতি বৃদ্ধা-ঙ্গী দেখিয়ে মালিক এখনো একশো একশ জন কর্মীকে ই এস আই এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আওতা থেকে বাইরে রেখেছেন। এ ব্যাপারে রাজ্যের শ্রম মন্ত্রণালয় জানতে চাইলে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়কে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।

শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস দেবার ব্যাপারে মালিক কোন নিয়ম-কানূনের তোয়াক্সা করেন না। মালিক ইচ্ছামত কিছু টাকা কর্মীদের দেন, তাও আবার কোন সময় আগাম বেতন হিসাবে দেওয়া হয়।

চাকরীর স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ মালিকের মজির ওপর। মালিক যে কোন সময় যে কোন লোককে হাটাই করে দিতে পারেন এবং মালিকের চোখে "বেরাদপ" কর্মীদের বিমা নোটিশে মাঝে মাঝেই হাটাই করা।

এখানে কর্মীদের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। নেই কোন ছুটিনা জনিত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা। ই, এস আই না থাকার এবং মালিক পক্ষের কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার কর্মীরা সমস্ত রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমন কি কার-খানার ভেতর কোন শ্রমিক দুর্ঘটনার পড়লে তার জন্তও কোন চিকিৎসা বা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা নেই।

কর্মীদের ব্যাসরিক ছুটিরও কোন নিয়ম কানুন নেই এমন কি সরকার অনুমোদিত ছুটি থেকেও কর্মীরা বঞ্চিত। অর্জিত ছুটির অধিকার থেকেও কর্মীরা বঞ্চিত।

এতো গেল শ্রমিক শোষণের কথা। মালিক লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন সরকারকেও। সর-কারী স্কোটা থেকে স্রে সব কীচা মাল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই বিক্রী করে দেওয়া হয় কালো-বাজারে। এইভাবে মালিক যেমন লক্ষ লক্ষ কালো টাকা কামাচ্ছেন তেমনি সরকারও বঞ্চিত হচ্ছেন তার পাওনা-কর থেকে।

মিথ্যা ভাউচার এবং ডুপ্লিকেট বিলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করেও হাজার হাজার টাকা সর-

কারকে কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

তাছাড়া হুন্দরমূল পরশরাম বালাজি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নামক একটি সংস্থার মাধ্যমেও মালিক সরকারের কাছ থেকে কর ছাড় পাবার সুবিধা আদায় করছেন। এই ভাবেই মালিক হাজারো ও শোদপুরে আরও দুটি কারখানা খুলেছেন।

কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে মালিকের এই অত্যাচার ও সরকার-বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই করে আসছেন। কিন্তু বার বার মালিকের স্থায়ী চক্রান্ত এবং আক্রমণে শ্রমিক আন্দোলন ভেঙে গেছে।

এই শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে মালিক খুন থেকে শুরু করে যে কোন পন্থা নিতে পিছনা নন।

ট্রেনযাত্রীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে

নলিনী পাল

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বনগাঁ লাইনের বীরা স্টেশনে ৪ঠা মে চলন্ত ট্রেনের কয়েকজন আক্রান্ত যাত্রী এবং তাঁদের সহযোগী উপস্থিত কিছু সাহসী মানুষের পাট্টা আক্র-মণে ঘোঁটা ৬ জন মশরু ছুঁত মারা গেছে। দুর্ভাগ্যের মূল উদ্দেশ্য এবং ভাঙাতির অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এতে পুলিশ বা রেলরক্ষী বাহিনীর কোনই কৃতিত্ব নেই। যা কিছু কৃতিত্ব দাবটাই যাত্রী এবং যাত্রীর জনগণের। তাঁরা বীরের ভায় কাজ করেছেন। এ এক অকৃতপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনায় শুধু এটা একটা নজির হয়েই থাকবে না, এতে চলন্ত ট্রেনের বিক্ষুব্ধ এবং অসহায় যাত্রীদের মনো-বল দৃঢ় হয়েছে।

অতীতে মর্পণের পাতার আমরা কোন কোন সংবাদের মধ্যে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। এটাও তারই ইঙ্গিত বহন করেছে। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের দিন শুরু হয়েছে। এটা ক্রমশঃ - বাড়বে। এর মূল কারণ, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট। লক্ষট এত গভীর- যে, সাধারণ মানুষ আর পড়ে পড়ে মার খেতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা এখন এর প্রতিকার চাইছেন, প্রতিবাদ করছেন এবং প্রয়োজন বোধে কথো দাঁড়াচ্ছেন। বীরা স্টেশনের ঘটনা তারই অন্ততম প্রমাণ। এটাকে নিছক ভাঙাতির

১৯৭১ সালে শ্রমিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ৪ঠা মে একদিন রাতের অন্ধকারে জনৈক বৃদ্ধ কর্মী কার-খানার মধ্যেই খুন হয়ে গেল। আর এই খুনের মাংসলার জড়িয়ে দেওয়া হল ইউনিয়নের নেতাদের। দীর্ঘ-দিন ভোগান্তির পর অবশ্য ইউনিয়ন নেতারা মহামাত্র আদালতের দ্বারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। এছাড়া ভাড়া করা গুণা দিয়ে আন্দোলনরত কর্মীদের ওপর হামলা, পুলিশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ইউনিয়ন নেতাদের মিথ্যা মাংসলার জড়িয়েও মালিক শ্রমিক আন্দোলন বারবার ভেঙে দিয়েছেন।

সাতাত্তর সালের নির্বাচনের পর কর্মীরা অনেক আশা নিয়ে সিটুর নেতৃত্বাধীন ইউনিয়ন গঠন করে-ছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ইউনিয়নের সভাপতি শ্রমিক আন্দো-লনের নেতৃস্থানীয় 'ছয়জন কর্মী'র হাটাই মেনে নিয়ে মালিকের সঙ্গে মীমাংসায় এসেছেন তা বোঝা

ঘটনা বলে ভাবলে ভুল করা হবে। উল্লেখযোগ্য, বীরা স্টেশনের ঐ ঘটনার পরে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আক্রান্ত যাত্রী এবং স্টেশনে উপস্থিত সাহসী মানুষগুলির ঐ যৌথ পাট্টা আক্রমণকে শুধু অভি-নন্দন জানিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি। এঁদের মধ্যে যারা নিত্য যাত্রী তাঁদের ট্রেনে যাতা-রাতের সময়ে যাতে সংগঠিতভাবে চলাচল করা যায় তা নিয়েও তাঁরা ভাবছেন। কারণ, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ভাগ্যের হামলা বা আক্রমণ হলে নিত্যযাত্রীরা সংগঠিতভাবে যাতে মোকাবিলা করতে পারেন তার জন্তই তাঁদের মধ্যে প্রস্তুতিও চলছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, আইস-পুঙ্খলার রক্ষার দায়িত্ব-বহিও রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনীর, তথাপি আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, টিকিট কেটে যারা ট্রেনে ভ্রমণ করেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্ত কি কেন্দ্রীয় সর-কারের অধীনস্থ রেল কর্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব নেই?

যাত্রীদের দাবী অনুযায়ী বলা যেতে পারে, নিশ্চয়ই রেল কর্তৃপক্ষের একেজ্রে প্রাথমিক দায়িত্ব আছে। বহু চলন্ত লোকাল ট্রেনের কামরায় যাত্রী আলো থাকে না। আলোর বাজবুজি চুরি হচ্ছে। রেলের

মুক্তি। মালিক নাকি মাঝে মাঝেই সঙ্কট উক্তি করে থাকেন যে, কোন নেতাকেই উনি পরোয়া করেন না। এবং মালিকের মজি মালিকই কার-খানা চলবে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ কোন আন্দোলন তিনি সহ্য করতে রাজী নন।

মালিকের প্রভাব ক্রমে ক্রমে পুলিশ, শ্রমদপ্তর থেকে শুরু করে এখন ট্রেন ইউনিয়ন নেতাদের ওপর বিস্তার করতে শুরু করেছে। তার ফলশ্রুতি দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক, কোন বৈঠকের নিদ্রাস্তই মালিক মানতে রাজী নয়। কারখানা ইচ্ছে-মত লক-আউট করা হচ্ছে। কর্মীদের ইচ্ছামত হাটাই করা হচ্ছে। কোন প্রতিকার নেই। সম্ভ্রান্তি এই কার-খানা ও হেড অফিসের ছয়জন ইউ-নিয়ন নেতাকে মালিক দেশের আইন-কানূনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হাটাই করে দিয়েছেন। প্রতিকার প্রতিবাদ করার কেউ নেই। কারণ রক্ষকরাই যে তরক্ক হয়ে উঠছেন।

নিজস্ব রক্ষী বাহিনী বা আর, পি, এক থাকা সত্ত্বেও দিন ও রাতে হরদম্ ঐ কাণ্ড হচ্ছে। এতে দুর্বৃত্তরাও আত্মারা পেয়ে যাচ্ছে। এবং লস্কে লস্কে যাত্রীদের নিরাপত্তাও বিপর্য হয়ে পড়ছে।

যাত্রীদের কাছ থেকে প্রভাব এসেছে যে, রেল কর্তৃপক্ষের উচিত অন্ততঃ রাজিকালীন লোকাল এবং দূর পালার ট্রেনের প্রতিটি কামরায় ছুঁজন করে মশরু রেলরক্ষী বা আর পি এক মোতামেন করতে হবে।

যাত্রীরা আরো বলেছেন যে, রেল রক্ষী বা আর পি একের অভাব বা ঘাটতি থাকলে পশ্চিমবঙ্গে এখন বহু বেকার যুবক আছেন। এদের মধ্যে উপযুক্ত কিছু বেকারকে রিক্রুট করে এবং যন্ত্রকালীন ট্রেনিং দিয়ে তাঁদের অবিলম্বে চলন্ত ট্রেনের কামরাসমূহে প্রহরী হিসেবে যাত্রী-দের নিরাপত্তার জন্ত নিয়োগ করা যেতে পারে। একাত্তি করা হলে একদিকে যেমন কিছু বেকারের জীবিকার সংস্থান হবে, অপর দিকে যাত্রীরাও ট্রেনে নিরাপত্তা বোধ করে নির্বিশেষ যাতায়াত করতে পারবেন।

সাধারণ যাত্রীদের একাংশের ধারণা, পুলিশ এবং আর পি একের একাংশ অলং। দুর্বৃত্তদের লস্কে ওদের নেপথ্যে যোগাযোগ আছে। তা না হলে একাত্তি দ্বিলালকে শেবাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

ইন্দিরা সরকারের পুলিশ বাহিনী

গত ১৫-৩-৮০ তারিখের দর্পণ পত্রিকায় "লালবাজারের টর্চার কক্ষ থেকে ডেনমার্কের হাসপাতালে" লেখাটি খুবই ব্যথিত হৃদয়ে পড়লাম। লেখাটি পড়ে বার বারই চেয়ার-ম্যানের একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, "চীনের একশত বছরের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চীনের সেরা সেরা ছেলে মেয়েরা একজন ফাটলে পা বাড়িয়ে দিয়েছে, পড়ে গেছে। আবার আর একজন পা বাড়িয়ে দিয়েছে। এরকম অসংখ্য আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই চীনের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাদের সেই আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করলে আমাদের কণ্ঠে আনন্দ গান, চোখে আনন্দ অশ্রু।"

আমাদের দেশের কিছু বুজোয়া বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানকে বর্বর আখ্যা দেন, মার্কিন শাসকদের, উগাণ্ডার ইদি আমিনকে জঘন্য ভাষায় বিদ্যায় জানান, কিন্তু ভারতে সমাজ বিপ্লবীদের ওপর একের পর এক ফ্যানসিটে ইন্দিরার যে অত্যাচার চলে সে ব্যাপারে তারা সবাই 'অন্ধ' হয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। শ্রীমতী লতিকা গুহ, অর্চনা গুহর মতো বেলেঘাটার তিনটি মস্তানের জননী শ্রীমতী শিখা লাহা পুলিশী অত্যাচারের ফলে আজ সম্পূর্ণ উদ্বাস। কুমারী অসীমা পোদ্দার, নন্দিতা ঘোষাল, শ্রীমতী মেহনত রেড্ডির মতো শত শত বীরাদনা 'এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের' স্বেচ্ছাশ্রমী শোষাবাহিনীর হাতে লাহিতা হয়েছেন। এ অভিশপ্ত লালবাজারের লব-আপে কতো বোবা কান্না আজও গুমরে গুমরে উঠছে।

"সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিক্ষিত আমাদের দেশের পুলিশ চিরকালই ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিরুদ্ধে হত্যা ও ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে কাজ করে এসেছে। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসন শেষ হওয়া সত্ত্বেও এই পুলিশ বাহিনীর কর্তারা ফটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকেই তাদের পাঠ গ্রহণ করে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন কি করে বজায় রাখতে হয় তার কলাকৌশল শিখে আসে। আজই ওরা খুন করছে তাই নয়, এমন কোন বছর নেই যখন এই পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র ভারতবাসীকে গুলি করে-মারেনি। ১৯৫১ সালে যখন গ্রামের মানুষ এসেছিল মন্ত্রীদেব কাছে দরবার করতে তখন একদিনে এই পুলিশ বাহিনী ৮০ জন নিরস্ত্র গ্রামের কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করে। এদের

এই হত্যাকারী চেহারা আমরা দেখি এমন কি খেলার মাঠেও। ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে আট জন দর্শককে পিটিয়ে এরাই হত্যা করে। এই ভাবেই এরা শিক্ষা পায় বাহুয মারার। তাই আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার। এরা ভারতীয় নয়, ভারতবর্ষের মানুষ নয়।"

১৯৭১ সালে কুখ্যাত নির্দার্ষ সুরকারের আমলে ঘৃণিত পুলিশ বাহিনী দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়ী থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লবী নেতা সরোজ হস্তকে গ্রেপ্তার করে। লেখিন রাজে লর্ড সিনহা রোডে গোয়েন্দা দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁর উপর চলে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন। পরের দিন তাঁর হওয়ার পূর্বেই পুলিশ বাহিনী গড়ের মাঠে শ্রবস্তকে নিয়ে যায়। তারপর গুলি করে তাঁকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ গোপনে সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে আজও সরকার জনসাধারণের জাতার্থে ঘটনার সত্যতা

মতামত

প্রকাশ করে নি। এমন কি আমাদের দেশের বাবা বাবা বামপন্থীরাও এ সম্পর্কে একদম না জানার ভান করে বলে আছে। তাদের অস্বাভাবিক নীরবতা পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীলদের মনঃ বোপাচ্ছে।

তার কিছুদিন পর ১৯৭২ সালের ২৮শে জুলাই লালবাজারের অভিশপ্ত লব-আপে ভারতীয় জনপণের মহান নেতা চারু মজুমদারকে পুলিশ হত্যা করে। যদিও প্রতিক্রিয়াশীল ও তাদের পোষা হালালরা মিথ্যা প্রচার করে যে, "শারীরিক অসুস্থতার কারণেই" চারু মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা আজ এইভাবেই গোপনে চোঁয়ের মতো বিপ্লবীদের হত্যা করে বিপ্লবের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের অবাধ লুণ্ঠের কেন্দ্র। ভারতবর্ষে তাই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতাদের গোপনে হত্যা করা হচ্ছে। বর্মার থাকিন থান টুন, পূর্ববাংলার সিরাজ শিকদার, ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবীদের, সিংহলের সশস্ত্র সমাজ বিপ্লবীদের ঠিক একই কায়দায় হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলি ১৯৩৩ সালে জার্মানী

ইতালী আঁপানের ফ্যানসিটে বাহিনীর অত্যাচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ এশিয়ার দেশগুলির অত্যাচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব ফ্যানসিটের নায়ক হিটলার-তোজো মুলোজিনীর অত্যাচারেরই ধারা বাহিকতা। সেদিন ফ্যানসিটের নায়করা জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে অত্যাচার চাণিয়েছিল। আজ সাম্রাজ্যবাদের জারজ সন্তান কংগ্রেসী সরকারও একই কায়দায় বিপ্লবীদের হত্যা করছে।

প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির তুফিকাত বিশেষ লজ্জাজনক কারণ তারা সবাই বিপ্লবীদের হত্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। বামপন্থীদের একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাচার প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ওপর দিয়েই শুরু হয়, পরে সমাজের অত্যন্ত অন্দের ওপরও সেই অত্যাচার নেমে আসে। '৭০ এর দশকে ভারতবর্ষে সেটাই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম। প্রথমে নকশালপন্থীদের হত্যা শুরু হয়, পরে বামপন্থী গদ্য আছে এরকম সমস্ত ছোট বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরও পাইকারী ভাবে অত্যাচার শুরু হয়। তখন ঐসব মেকী বামপন্থীরা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রকৃত সেন মোরারজী দেশাই-বালুপেরীর পরণাম হয়।

প্রথমে নকশালপন্থীদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তারা প্রায় একরকম লম্বর্ন করেছিল এই ভেবে যে অত্যাচার তাদের ওপর হবে না, কারণ তারা তো আর সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিচ্ছে না। কিন্তু অচিরেই তাদের সেই স্বপ্ন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও সং বামপন্থী দলগুলির কাছে আমার বিশেষ আহ্বান, আপনারা কংগ্রেসী আমলের সমস্ত অত্যাচার ও জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলির বিচার বিতর্কীয় নিরপেক্ষ তদন্ত করার জন্য ব্যাপক জনমত গঠন করুন। কারণ ২৩টি রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার টিমটিম করে জুলালেও সারা ভারতে প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তি খুব বেশী। বামপন্থী দলগুলো যেন এরকম চিন্তা না করে যে, সাময়িক খাঙ্কা খেয়ে বৈরাচারী শক্তি মিলে সঙ্শোধন করে নিয়েছে। পরন্তু তারা নিজেদের আরও বেশি রকম ভাবে সংগঠিত করেছে যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশী হিংস্রভাবে বিপ্লবীদের ওপর আক্রমণ চালানো যায়।

শ্রুনারায়ণ দেনগুপ্ত

বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ খুঁকছে

বেঙ্গলগাহিয়ার ভেটেরিনারি কলেজ এক সময় ছিল রাজ্য সরকারের অধীনে। ১৯৭৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে এটি বিধানসভা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যায়। প্রশাসনিক গাফিলতির জন্ত আজ ভেটেরিনারি কলেজ তার পুরনো স্রী হারাচ্ছে। পূর্বের মতো এখন আর কলেজ সীমার মধ্যে বাগানের শোভা নেই। শেতে নেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে সহায়ক বিভিন্ন জাতের গরু।

হাসপাতালের পশু শেডগুলোও জীর্ণদশাগ্রস্ত। সব সময় পশু রোগীর খাণ্ড থাকেন না। অনেক সময় বোগাক্রান্ত পশু দিনের পর দিন বিনাপথ্য থাকে। চিকিৎসার ওষুধও থাকে না। পশুরা মৃত, তাই প্রতিবাদের কোন খবর কেউ পায় না।

কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। উপযুক্ত পরীক্ষাগার নেই। সেজন্ত ছাত্র শিক্ষক উভয় মহলেই আছে অসন্তোষ

ট্রেনযাত্রী

৩য় পৃষ্ঠার পর

এবং ঠাণ্ডা বাতী বোঝাই রাজিকালীন চলন্ত ট্রেনের কামরাগুলিতে ছবুস্তরা হামলা করার স্পর্ধা পায় কোথা থেকে? এখানে আরো বলা দরকার যে, ধার্মা জীবন বিপন্ন করে চলন্ত ট্রেনের ছবুস্তরের মোকাবিলা করবেম, তাঁদের শুধু টাকার অঙ্কে পুরস্কার দিলেই চলবে না। বৃষ্টিপ আমলে কোন কোন ক্ষেত্রে যেভাবে এই ধরনের লাহসী লোকদের পুরস্কার দেওয়া দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হতো এক্ষেত্রেও তার ব্যবস্থা করলে স্বকল পাওয়া যাবে বলে ওয়াকিবহাল মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া, ছবুস্তরের মোকাবিলা করতে গিয়ে কোন নাগরিকের অজহানি বা জীবনহানি হলে তাঁদের জীবন বা তাঁদের পরিবারবর্গের জন্ত পেনসনের

বিকোভ। পুঁথিগত-ভাষিক জ্ঞান প্রয়োগ ছাড়া কোন কাজেই আসবে না।

এছাড়া আছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের চরম ঔদাসীন্য। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পাঁচশো কর্মচারী ডেপুটেশনে কাজ করেন এক অনিশ্চিত অবস্থায়। তাঁরা ডেপুটেশন ভাতা পান না, জি পি ফাওর টাকা কাটা হয় না, প্রমোশন নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগ্রিকালচার ফ্যাকালটির জন্ত যত টাকা ব্যয় করেন ভেটেরিনারি কলেজের বেলায় তা করেন না। তারা পদ যুগ্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ স্থানান্তরের চিন্তা করে তুল করছেন বলে কর্মচারীরা মনে করেন। বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের স্থপতিমিত্র ঐতিহ্যবাহী রেখে এর উন্নতির জন্ত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই আজ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন।

ব্যবস্থা থাকাও উচিত। কারণ, সাধারণ বাতীরা বর্তমানে পুলিশের একাংশের উপরে আর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই তাঁরা দাবী করেছেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে এব্যাপারে যৌথ উত্তোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিয়ালদহ এবং হাওড়া ষ্টেশন কলকাতা মহানগরীর দুটি প্রধান গেটওয়ে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ নয়নারী শহরতলী এবং বাংলায় বিভিন্ন দূর দূর অঞ্চল থেকে ট্রেনে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে কলকাতায় যাতায়াত করে থাকেন। এঁদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতেই হবে। এঁদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাওয়া গেলে অসং পুলিশ ও অসং আর পি একের গাফিলতি সত্ত্বেও ছবুস্তরা আর দৌরাত্ম্য করতে লাহস পাবে না। বরং বাতীরা বিশেষতঃ মহিলারা নির্ভয়ে ট্রেনে চলতে সুরু পাবেন।

সবুজের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাহেব জন্ম
বিশ্বনাথারী ও এগ্রিকালচারাল ফার্ম (প্র.) লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, গোঃ বালী, হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০৯৫, ৬৪-২৪৪৫
ফার্ম: বৈদ্যনাথী হাওড়া ৬২-২৪৪০
দিল্লী রোড ও তারকেশ্বর রোডের সংযোগস্থল
ফোন: ৬২-১৩৭৭

মার্শাল জোসিফ ব্রোজ টিটো

অমর রাহা

গত বছর হাভানার জোট নির-
পেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে প্রেসি-
ডেন্ট টিটোর কৃমিকার স্বীকৃতি
হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব
গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব পাঠ করেন
গিনিয় প্রেসিডেন্ট সেকু তুরে। তার
উপরে টিটো বলেন : “আমরা কোন
দিনই জোটেরকে সমীকরণ বা এক
পর্ষায়ে ফেলার চেষ্টা করিনি, সময়ের
দিক হতে বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
ভিত্তির দিক হতেও। প্রথম দিন
হুতেই আমরা জোট-স্বত্ব নীতি এবং
বৈদেশিক আধিপত্যের বিরোধিতাই
করে আসছি। রাজনৈতিক বা অর্থ-
নৈতিক হীজেরনির বিরুদ্ধে সংগ্রাম
করে আসছি...কাকর রাবার-স্ট্যাম্প
বা সংরক্ষিত অঞ্চল হয়ে থাকতে
স্বীকার করিনি।.....”

অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার
দিন থেকেই টিটো সারা জীবনই চলে
এসেছেন অনাধারিত বৈপ্লবিক পথে।
এই জন্ত তাকে সহ করতে হয়েছে
অশেষ ক্লেশ এবং সম্মুখীন হতে
হয়েছে মানাবিধ স্বপ্নের। জীবনের
উদ্দেশ্য হোল সর্বকালের শ্রেণীসম্পর্ক
অবদানের জন্ত সংগ্রাম করা এবং
কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই স্বপ্নভীর
মানবিকতাই দেখা যায় টিটো
চরিত্রে। আর, এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
ধাকার জন্তই সব সময়ে সংগ্রাম
করেছেন আমলাতান্ত্রিকতা, স্বর্ভ-
বাদ এবং নেতৃত্ববাদ বা হীজেরনির
বিরুদ্ধে।

“এক অস্ত্রের সঙ্গে ব্যবহারে এবং
পারস্পরিক ব্যবহারে সত্য, ঠাণ্ডা ও
নৈতিক নিয়মকে” স্বীকৃতি দেওয়ার
প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্যদের প্রতি-
শ্রুতি আবেদন তা টিটো গ্রহণ করেছেন
মনে প্রাণে এবং এরই বাস্তব প্রকাশ
হোল তাঁর কর্ম-চিন্তায়। এটুকুই সব-
নয়। মার্কস-এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্রথম
আন্তর্জাতিকের আবেদনে রয়েছে :
“মেহনতী শ্রেণীকে নিজের মুক্তি
নিজেকেই অর্জন করতে হবে। মেহ-
নতী শ্রেণীর এই মুক্তি সংগ্রাম নিজে-
দের কোন বিশেষ স্বযোগ-সুবিধা বা
আধিপত্যের জন্ত সংগ্রাম নয়। সর্ব-
শ্রেণীর শাসনের অবদান এবং
সকলের জন্ত সম-অধিকার ও কর্তব্য
পালনের জন্ত হোল এই সংগ্রাম।”
আজ এই নীতির গুরুত্ব অমেক বৈশী।
টিটো কোন দিনই এই মার্কসীয়
নীতির বা মেহনতী শ্রেণীর আন্ত-
র্জাতিকতাবাদের লক্ষ্যনকে স্বীকার
করে নেননি।

টিটোকে জোসিফ ব্রোজ বলে

সকলেই জানে। কিন্তু তিনি নিজেই
ঠিক বলেতে পারেননি ঠিক কখন
থেকে টিটো নামটা এসে নামের সঙ্গে
জুড়ে বসল। তাঁর নিজের ভাষায় :
“আমার” লোকে টিটো বলে জানে
১৯৩৪-৩৬ সাল থেকে।.....বিশেষ
কোন কারণ ছিল না এই নাম গ্রহণে,
তবে আমার, গাঁ আগরথতে এই
নামটার চলন বেশী বলেই বেশী
জাল লেগে গেছে।” কিন্তু, আজ
এই টিটো নাম সমাজতান্ত্রিক সেলফ-
ম্যানেজমেন্ট ও জোট-নিরপেক্ষতা
থেকে গৃহক করে দেখা সম্ভব নয়।

নানা দেশের মুক্তি সংগ্রামের
সঙ্গেও যুক্ত এই নাম। স্পেনের গৃহ-
যুদ্ধের দিন থেকে, আজ পর্যন্ত
অবিচ্ছেদ্যভাবে এই নামটি রয়েছে
লংগ্রামী রাহুয়ের পাশে। লংগ্রাম
করে এসেছেন জোট-বড় দেশের
সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাতে সমঝদার
নীতি সর্বসময়ে পালন করা হয়।
এদিক দিয়ে জার্মান মেহনতী শ্রেণীর
প্রতি এঙ্গেলসের নির্দেশই হোল
মাপকাঠি : কোন আন্দোলনের
পূরোভাগে থাকার চেষ্টা করাও বাঞ্-
নীয় নয়। তবে সংগ্রামের সামনের
সারিতে একটা সম্মানজনক স্থান থাকা
অসম্ভব নয়।” অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক
মেহনতী রাহুয়ের আন্দোলনে কোন
দেশ নেতৃত্বানীর স্থান পেতে পারে
না, পেতে পারে সম্মানের স্থান।
নেতৃত্বানীর স্থান চাওয়ার অর্থ হোল
উগ্র-জাতীয়তাবাদের পরিচয়।

যুগোশ্লাভিয়ার বাইরে এই নাম
সকলে জানল যখন জাতীয় মুক্তি
বাহিনীর সদস্যদের সামনে ১৯৪২
সালে টিটো বক্তৃতা করলেন সর্বাধি-
নায়ক হিসেবে। দীর্ঘ চার বছর
এই দেশ একক সংগ্রাম করেছে
ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে।
বার হাজার দলীয় সদস্য নিয়ে মুক্তি
যোদ্ধার সংখ্যা হোল আশি হাজার।
আর, এই আশি হাজার লড়েছে
জার্মান, ইতালিয়ান, বুলগেরিয়ান,
হাঙ্গারীয়, উতাদি-চেতনিক প্রভৃতির
১৮৫ ডিভিশন, ৭৪ ব্রিগেড এবং ৪৭
রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে। মুক্ত যুগো-
শ্লাভিয়া দেখেছে ঐ আশি হাজারের
মাত্র তিন হাজার যোদ্ধা। অথচ, যুদ্ধ
শেষে এই মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধা
সংখ্যা হয়েছে ৮০০,০০০। এদেরই
থার্ড আর্মির কাছে ১৯৪৫ সালের
১৫ই মে কর্ণেল-জেনারেল লোয়েহর
নেতৃত্বে ৩০০,০০০ ফ্যাসিস্ট সৈন্য
করে আত্মসমর্পণ। তাছাড়া, এই
যুদ্ধকালে সাধারণ নাগরিক সহ হত্যা

সংখ্যা হোল ১,৭০০,০০০—অর্থাৎ,
দেশের জন-সংখ্যা কমেছে ১১%
শতাংশ। আর, প্রতি চার জনে
একজন গৃহহারা।

যুদ্ধ হয় দেশ রক্ষা বা শহর রক্ষা
বা জয় করার জন্ত। এমনি হয়েছে
লেনিনগ্রাদ যুদ্ধ বা স্টালিনগ্রাদের
যুদ্ধ বা অস্ত্রাভা যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধ এবং তার বীভৎস রূপ। এ নিয়ে
বহু কথা, বহু কবিতা এবং বহু লেখা
প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু, খুব কম
লোকই, বিশেষ করে প্রগতিশীল
লোক বলে থাকে নেরেতভার যুদ্ধের
কথা। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল
চার হাজার আহত ও অস্থায়ী সহযোগী
এবং আশি হাজার আবালবৃদ্ধবিতা
শরণার্থীকে ফ্যানিস্ট সৈন্যদের হাত
থেকে রক্ষা করার জন্ত। যুদ্ধের
ইতিহাসে এমন মানবীয় যুদ্ধের নজির
নেই। এ এক মহাকাব্য।

কারলোভাক থেকে নেরেতভার
বিশীর্ষ অঞ্চল। বিশ হাজার মুক্তি
যোদ্ধা টিটোর নেতৃত্বে এখানে লংগ্রাম-
করেছে নব্বই হাজার জার্মান-ইতা-
লিয়ান ও চেতনিক বাহিনীর সঙ্গে।
স্টালিনগ্রাদের জার্মান বাহিনীর
স্বেকার আতা কমান্ডার স্বেকার নিজে
পরিচালনা করেছেন ফ্যানিস্ট
বাহিনী। এই যুদ্ধে ইতালিয়ান সুরগিয়া
বাহিনী সম্পূর্ণ নিমূল হয়। বহুজন
সহ কমান্ডার স্বেকার হন বন্দী। যুদ্ধ
বন্দী সহ মার্শাল টিটো সকলকে নিয়ে
নেরেতভা অতিক্রম করে চলে গেলেন।

জার্মান বাহিনীর বলকান অঞ্চ-
লের কমান্ডার জেনারেল ফন লিউয়র
যখন জাবলনিকায় এসে পৌছলেন
তখন তিনি দেখেছেন একজন মৃত
মুক্তি যোদ্ধা, না পেয়েছেন একজন
আহত মুক্তিযোদ্ধাকে। জার্মান হাই-
কমান্ডের কাছে তাঁর রিপোর্ট হোল
এই। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর হোল
নেরেতভার যুদ্ধ। আর ১৯৪৪ সালে
হিটলারের সহকর্মী ও নাজী নেতা
হাইনরিখ হিমলার বলেছিল : “হের
জোসিফ ব্রোজ টিটো হোল এক বাহু
কমিউনিস্ট এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ।
হুংঘের বিষয় সে আমাদের প্রতি-
দ্বন্দ্বী। তবে এ স্বীকার আশি করব
যে এই ব্যক্তিরই মার্শাল পদ মানায়।
...সে আমাদের শত্রু কিন্তু তবুও
স্বীকার করব যে এমন যদি জনা
বার টিটো আমাদের মধ্যে থাকত
তবে খুসীই হতাম।”

যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে জেনেভা কন-
ভেনশন মানাই রীতি। ফ্যানিস্টরা
কতটা মানত তা ওয়াই জানে।

কিন্তু যুগোশ্লাভ মুক্তি বাহিনী অঞ্চরে
অঞ্চরে এই কনভেনশন মেনে
চলেছে। নেরেতভার যুদ্ধের পর
জার্মানদের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়
যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের। জার্মানরা রাজী
হয়। ফলে, বহু দলীয় সদস্য, মুক্তি
যোদ্ধা ও নাগরিক ফিরে আসে নিজে-
দের লোকজনের মধ্যে। কমিন-
টার্নকে একথা জানালে স্টালিন
বিরূপ মস্তব্যই করেন। ১৯৪৪ সালে
যখন টিটো যোদ্ধা যান তখন স্টালিন
রুচ ভৎসনা করেন। উত্তরে টিটো
বলেন : “কমরেড স্টালিন, তুমি যদি
আমার জায়গার থাকতে তবে রক্তের
ভাবে এর জবাব দিতে।”

ত্রিশ দশক থেকে স্টালিনের
মাথাব্যথা এই লোকটিকে নিয়ে।
এঁদের স্বপ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই।
স্টালিন হিটলারচুক্তি মানতে পারেন
নি টিটো। প্রেসিডেন্সি সদস্য লাজার
কালসেন্ডকী বলেন যে ঐ চুক্তির জন্ত
স্টালিনের নির্দেশ হোল যে জার্মান
অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন সশস্ত্র অত্যা-
খান না করতে। তাছাড়া কমিন-
টার্ন বা স্টালিনের নির্দেশ অমান্য
করে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে আত্মরক্ষা
বা এটি ফ্যানিস্ট কাউন্সিল অব
স্টাশনাল লিবারেশন অব যুগোশ্লা-
ভিয়া ১৯৪৩ সালের ২৯শে নভেম্বর
জাভসেতে ঘোষণা করল নতুন বৈপ্ল-
বিক সরকার গঠনের কথা এবং সঙ্গে
সঙ্গে ঘোষণা করল যে সর্বপ্রকার
চেষ্টা করা হবে যাতে পুরনো সামা-
জিক ব্যবস্থার অবদান হয়।

এদেশের যদি কেউ প্রথম এই
লোকটির সঙ্গে আলাপ আলোচনার
স্বযোগ পেয়ে থাকেন তবে তিনি
হলেন কমরেড এস এস মিরাজকর।
যুদ্ধ শেষে দেখা লাফাৎ। মার্শাল
টিটো কমরেড মিরাজকরকে একটি
সোনার সিগারেট কেসও উপহার
দেন। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে
যারবেদা জেলে মিরাজকর এই
লোকটি দেখে প্রশংসার পঞ্চমুখ।
কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২৮শে জুনের
কমিনকর্ম প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার পর
সব প্রশংসা উবে গেল। ঘোষ কম-
রেড মিরাজকরের নয়।

স্বপ্নের একটা ইতিহাস আছে।
১৯৩৫ সালে কমিনটার্নের সপ্তম
কংগ্রেসকালে টিটো যুগোশ্লাভ
নেতৃত্বকে সোভিয়েতে বশে না থেকে
দেশে ফিরে আসার জন্ত বলেন।
এতে বাধা আসে সোভিয়েত নেতৃত্বের
পক্ষ থেকে। ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয়
কমিটি দেশেই থাকে। এই সময়ে
টিটো হন সেক্রেটারী জেনারেল এবং
কমিনটার্ন থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়া
বন্ধ করে দেন। এসবের ফলে

টিটো বলেন যে স্টালিন-পার্জের
বিপদ থেকে যুগোশ্লাভিয়া বেঁচে
গেছে। শুধু তাই নয়, দল বলিষ্ঠরূপে
শিক্ষিতও হয়েছে।

গত বছরের ১৯শে এপ্রিল
কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে
এক ভাষণ দেন মার্শাল টিটো :
“দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের দিন-
গুলিতে স্টালিন বিশেষভাবে চেষ্টা
করেছেন বিশ্বের কমিউনিস্ট দল-
গুলিকে নিজের নীতির অধীনে
আনবার এবং যুদ্ধের পরবর্তীকালে
এই প্রচেষ্টা বীভৎসরূপে প্রকাশ
পায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির
একটি মনোনিবেশিত এক্য সৃষ্টি করার
প্রচেষ্টার মূখ্য উদ্দেশ্যই হোল হীজ-
মনিজম কায়ম করা।” স্বল্প কথায়,
দলগুলিকে মোরাল স্ট্রাটেজীর অঙ্গ
হিসেবে রাখার প্রচেষ্টাই হোল
স্টালিন নীতি।

এই স্টালিন-নীতি বা বিশ্ব-
কোশলের অঙ্গ হিসেবে রাখার নীতি
ব্যর্থ হয় যুগোশ্লাভিয়ার ক্ষেত্রে। যুদ্ধ-
কালে স্টালিনের প্রচেষ্টা ছিল যুগো-
শ্লাভিয়াকে ভাগাভাগি করে দেওয়া
এবং এই প্রচেষ্টা রূপ পেয়েও পায়
না। শুধু তাই নয়, ডাঃ আর পেত-
কভিচের লেখার দেখা যায় যে যুদ্ধ
শেষে যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া
নিয়ে স্টালিন এক বলকান ফেডা-
রেশন গড়ার চেষ্টা করেন এবং এই
নতুন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর নাম করা
হয় জর্জি দিমিত্রভের এবং টিটোকে
দেওয়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ।
স্টালিনের উদ্দেশ্য হোল এমনি করে
স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়ার অবলুপ্তি
ঘটানো। এই কথা মনে রেখেই
টিটো বলেন : “সকলেই জানে
যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা কোন সম্মে-
লনে দান থয়রাত হিসেবে দেওয়া
হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং প্রতি দশ
জনে একজনের আত্মহত্যার মধ্য
দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই নব দেশ এবং
এও সকলেই জানে যে যুদ্ধক্ষেত্রে এই
দেশের সাময়িক শক্তি হোল
৮০০,০০০ যোদ্ধার।”

শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

আসামের আন্দোলন সম্পর্কে

পার্টি ইউনিটি সি পি আই (এম-এল)-এর বক্তব্য

আসামে গত কয়েক মাস ধরে যে আন্দোলন চলছে তা নিয়ে অনেকের অনেক বিরোধী বক্তব্য থাকতে পারে কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে একথা পরিষ্কার যে, আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সর্বশ্রেণীর অসমীয়া জনগণের অংশ গ্রহণ আসামের প্রশাসন ও জনজীবনকে সম্পূর্ণ পঙ্ক করে দিয়েছে। প্রধান-মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকার এই আন্দোলনের সামনে অসহায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আবার কেউ কেউ

এই আন্দোলনকে “পিকনিক সত্য-গ্রহ” বলে বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইছেন, কিন্তু সমস্তার সমাধানে কোন পথ নির্দেশ করতে পারছেন না। অতএব আসামের সমস্তা নিয়ে আলোচনা করা দরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য রাখা দরকার। এই সংখ্যায় আমরা পার্টি ইউনিটি, সি পি আই (এম-এল)-এর বক্তব্য প্রকাশ করলাম। এরপর আমরা অন্যান্য দলের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করব, অবশ্য যদি পরিষ্কার মতামত তাঁরা বলতে চান।

ভাষার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। অসমীয়াদের নিজের জগৎসৃষ্টিতে অসমীয়া ভাষা ছিল অস্বীকৃত। আলমদি পশ্চিমবাঙলার বাঙলা ভাষার স্বীকৃতি কেড়ে নিয়ে বা মর্ষণা হানি করে অতঃপর কোন ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোন স্বাধীনচেতা ও গণতন্ত্র প্রিয় আত্ম-মর্ষণা সম্পন্ন বাঙালী এই অপমান মুখ বুজে মেনে নেবেন না। অসমীয়া জনগণও স্বাভাবিক কারণে পারেন মি এই অপমানকে সহ্য করতে। ১৯৬০ সালে ভাষা আন্দোলনে নিজেদের বুকের রক্ত ঝরিয়েই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেদের ভাষার মর্ষণাকে। এক্ষেত্রেও এই বাঙালী উচ্চশ্রেণী দাবী জানিয়েছিল আসামকে দ্বিতাবী রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিতে।

এছাড়া পূর্ববাঙলার হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গৃহ-হারা পরীব মূলমানুষের জীবন ধারণের আশায় আসামের গোয়াল-পাড়া ও আশেপাশের জেলাগুলিতে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেন। এইসব জায়গায় জমিদারদের পক্ষে এটা ছিল একটা প্রচণ্ড লাভজনক ব্যাপার। প্রথমতঃ, এইসব গৃহহারা অসহায় কৃষকদের যে কোন অপমানজনক শর্তে নিঙড়ে নেওয়া যাবে; দ্বিতীয়তঃ পূর্ববাঙলার এইসব কৃষকদের উন্নত চাষের কলাকৌশল ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জমিদারদের শস্তের গোলা আরও ফীত হয়ে উঠবে। তাই ভারত বিভাগের আগে পর্যন্ত জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ বাঙলার হাজার হাজার কৃষকে আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদান হিসাবে বাঙালী উচ্চশ্রেণীটির সমস্ত অপকর্মগুলো কুড়িয়েছিল স্বাধীনচেতা অসমীয়া জাতিসত্তার তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণা। এই উচ্চশ্রেণীটির বিরুদ্ধে অসমীয়া জনগণের সংগ্রাম কেবলমাত্র এই গুণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, তা রূপ নিল সমগ্র বাঙালী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড জাতিবিশেষে। একটি নিপীড়িত জাতিসত্তার শোষণের বিরুদ্ধে একটি নিপীড়িত জাতিসত্তার জনগণের সংগ্রাম যেহেতু জাতীয় মর্ষণা ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম তাই সাধারণভাবে এই ঘটনাই ঘটতে দেখা যায়। এই জাতিবিশেষ আরও

বেড়ে গেল যখন আসামে বসবাসকারী মেহনতী বাঙালীরা এই ক্ষুদ্র সংখ্যক বাঙালী উচ্চশ্রেণীটির জাতি-স্বাধীনতার সমর্থনে দাঁড়ালেন। অসমীয়া ও বাঙালী—এই দুই জাতিসত্তার মেহনতী মানুষ শ্রেণীস্বার্থের কথা ভুলে লিপ্ত হন এক ভ্রাতৃত্বাত্মী সংঘর্ষে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে স্বকোশলে এই বিশেষ সৃষ্টি করে—“ভাগ করো, শাসন করো”—নীতির মাধ্যমে প্রায় দুই বছর শাসন চালিয়েছে। ব্রিটিশ পিছু হঠার পর তাদের দ্বারা গড়ে পিটে শিক্ষিত হয়ে ওঠা ভারতের মুসলিম শাসকশ্রেণী এই একই কৌশলকে কাজে লাগিয়েছে। সমগ্র দেশের চা ও অপরিশোধিত খনিজ তেলের প্রায় অর্ধেক উৎপাদন করলেও আসাম রয়ে গেল অবহেলিত। কোনো আধুনিক শিল্প সেখানে গড়ে তোলা হল না। রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বলই রয়ে গেল। এছাড়া ব্রিটিশরা আসামে খনিজ তেল, চা ও তিথার শিল্প প্রতিষ্ঠা করলেও এর সমস্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যেমন ব্যক্তিগত, দিক্রয়, মার্কেটিং, ঠোকেজ ইত্যাদি সূরিয়ে এনেছিল কলকাতায়। এই সব কারণে আসামের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বেকার সমস্তা প্রত্যেক রাজ্যেই ভয়াবহ। কিন্তু আসামে এই বেকার সমস্তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও বাঙালী উচ্চশ্রেণীটির জাতিস্বাধীনতার মনোভাব। তাই শিক্ষিত বেকারদের আন্দোলনও বাঙালী বিরোধী রূপ নিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চিরস্থায়ী করার জন্য ভারতের মুসলিম শ্রেণীগুলোর যোগ-সাজগে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে বিভাগ করে। এর ফলে সাম্রাজ্যিকতার দাবানল জলে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মেহনতী শরণার্থী জনগণের হাহাকার ও বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে ভারত-পাকিস্তানের আকাশ বাতাস। এই সব গৃহহীন মানুষেরা আশ্রয় নিলেন পূর্বপাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী রাজ্য-গুলিতে। যে সমাজে জমি ও উৎপাদনের অত্যাচার উপভোগের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে সেখানে আচমকা বিপুলসংখ্যক গৃহহীন মানুষের ভীড় অবধারিত ভাবেই অর্থ-

দর্পণ ১১ শুক্রবার ৯ই মে, ১৯৮০

নৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে। এবং স্থানীয় জনগণকে ঠেলে দেয় জীবনধারণের জন্য প্রচণ্ড এক প্রতিযোগিতার মধ্যে। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে জেগে ওঠে ঐক্যব শরণার্থী জনগণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। তার উপর আবার এঁরা যেহেতু অতঃপর জাতিসত্তার লোক এবং এমনই একটি জাতিসত্তার লোক যে জাতিসত্তার শোষণের ঐতিহাসিকভাবে অসমীয়া জনগণকে শোষণ ও শাসন করেছে, তাই স্বাভাবিক কারণেই অসমীয়া জনগণ এতে বিক্ষুব্ধ। এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে মেহনতী মানুষের মধ্যে বিভেদ ও রেবারেবি বেড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্য সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো পরিপক হয়।

ভারতের মুসলিম শাসকশ্রেণী-গুলো ও তাদের রাজনৈতিক পার্টি-গুলো অসমীয়া জনগণের এই প্রচণ্ড কোপের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় সৃষ্টি করেছে দাঙ্গা। ১৯৫০, ১৯৬০, ১৯৬৮, ১৯৭২, ১৯৮১-৮০ সালে আসামের মাটি ভিজে গেছে ভ্রাতৃত্বাত্মী দাঙ্গার। তাই যদি এই দুঃখজনক পুনরাবৃত্তিকে ঠেকাতে হয় তাহলে আসামে বসবাসকারী মেহনতী বাঙালী ও অ-অসমীয়া জনগণ এবং পশ্চিমবাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মেহনতী মানুষকে দাঁড়াতে হবে সংগ্রামরত অসমীয়া জনগণের পাশে, তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্ত অস্ত্র, অত্যাচার, অবিচার ও অপমানের বিরুদ্ধে অসমীয়া জনগণের আত্মমর্ষণা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে। যে ঐতিহাসিক কারণে বাঙালী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অসমীয়া জনগণের মনে অবিশ্বাস, বিক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে শ্রেণীগত ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পদক্ষেপ। এটা করতে পারলে তবেই অসমীয়া ও সমগ্র ভারতের মুসলিম শ্রেণীগুলোর সমস্ত বিভেদমূলক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করা যাবে। জাতিসত্তার মুক্তি ও শ্রেণীগত মুক্তিকে একই ধারায় প্রবাহিত করা যাবে। আর মেহনতী বাঙালীরা যদি এটা না করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদান বাঙালী উচ্চশ্রেণীটির জাতিস্বাধীনতা ও ক্ষুদ্র আত্মসম্মানবোধের সমর্থনে দাঁড়ান, যদি তাঁরা জ্যাতি বহু, স্বরত মুখার্জী ও প্রভুসেনের মায়াকান্না ও ভূয়া বাঙালী প্রেমের দ্বারা প্রতারণিত হন, তাহলে তাঁদের সমস্ত অপেক্ষা করে রয়েছে আরো অনেক দুর্দশ।

বেশ কয়েক মাস হতে চলল আসাম ভারতের আত্মস্বাধীন রাজনীতিতে এক প্রচণ্ড গুরুত্ব দাবী করেছে। লক্ষ লক্ষ অসমীয়া জনগণ প্রচণ্ড দৃঢ়তা নিয়ে গণআন্দোলনে নেমে পড়েছেন। উপর থেকে দেখলে এই আন্দোলনের দাবী ও লক্ষ্যগান বৈচিত্র্যময়। কখনও তা “বহিরাগত”দের বিরুদ্ধে, কখনও বা তা “বিশেষী নাগরিকদের” বিরুদ্ধে, কখনও বা তা “অহম মাতৃভূমি, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের” মর্ষণা প্রতিষ্ঠার দাবীতে, আবার কখনও বা “মুক্ত সেনার আসাম গড়ে তোলার” দাবীতে। এই সব লক্ষ্যগান ও দাবীর বৈচিত্র্য নির্ভর করে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী জনগণ ও সংগ্রামকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণীস্বার্থ ও লক্ষ্যের বৈচিত্র্যের উপর। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘ লাগাতার আন্দোলন নিঃসন্দেহে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে এই আন্দোলনের মূলে রয়েছে পৃষ্ঠীত সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণ যেগুলো অসমীয়া জাতিসত্তার জনগণকে আজ বিপুল সংখ্যায় সংগ্রামের মরদ্বারনে টেনে এনেছে। তাই আসাম সমস্তাকে বিচার করতে হলে সমস্তার পৃষ্ঠীত প্রবেশ করতে হবে।

অসমীয়া জাতিসত্তার রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য। শোষণ আক্রমণের বিরুদ্ধে অসমীয়ারা বহু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ যখন তাদের উন্নত শিল্প-ভিত্তি ও সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের মানুষকে পদানত করলো, তখন ব্রিটিশ এটাও আবিষ্কার করলো: আসামের মাটির নীচে

সঞ্চিত রয়েছে অমূল্য তৈল সম্পদ, আসামের ঢালু পাহাড়ী জমি ও জল-বাহু চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত এবং আসাম বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। স্বতরাং শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন। প্রয়োজনীয় বিপুল শ্রমের চাহিদা মেটাতে বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, বিহার ও নেপাল ইত্যাদি রাজ্য থেকে হাজার হাজার গ্রামের পরিশ্রমী মানুষদের আমদানী করা হল আসামে। অসমীয়া শ্রমিকদের পাশাপাশি এইসব অ-অসমীয়া শ্রমিকদের ঘর, রক্ত আর চোখের জলে জমে উঠলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মূনাফার পাহাড়। কিন্তু শিল্প চালাতে হলে চাই পরিচালক ও শাসক। তাই এই প্রয়োজন মেটাতে বাঙলার ব্রিটিশ-ঘেঁষা উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে গড়ে তোলা হল এইসব আমলা ও পরিচালক-দের। এরা তাদের শ্রেণী চরিত্র অস্বাভাবিক ব্রিটিশ প্রভুদের ক্ষুধা মেটাতে অসমীয়া ও অ-অসমীয়া নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী মানুষদের দমন ও শোষণ করেছে। প্রতিদানে ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে এই বাঙালী উচ্চশ্রেণীটি পেয়েছে আসামের উপর রাজনীতিগত ও অর্থনীতিগতভাবে ছড়ি বোরা নোর ক্ষেত্র সাহায্য ও সহযোগিতা। নির্লজ্জের মতো এই বাঙালী উচ্চশ্রেণীটি অসমীয়াদের প্রিয় জগৎসৃষ্টি আসামের বুকেই পদদলিত করেছে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে। নিজেদের বংশধরদের মাধ্যমে এই সুবিধা বজায় রাখার প্রয়োজনে এই উচ্চশ্রেণীটি ব্রিটিশের সহযোগিতায় সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল মাত্র গুটিকয়েক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সমগ্র আসামে ছিল মাত্র ২৮টি হাইস্কুল। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কাজে অসমীয়া

পাঁচশে বৈশাখ : মধ্যবিভের রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা

কালিদাস কুণ্ডু

বাঙালী মধ্যবিভের সাংস্কৃতিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ এখনও এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। শিক্ষিত মধ্যবিভ মাজই রবীন্দ্রনাথের নাটক, কবিতা ও গানকে সাংস্কৃতিক চর্চার উচ্চতম রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন—যেটাকে আমরা পোষাকী ভাষায় বলে থাকি রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতি।

উনিশ শতকী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জিজ্ঞাসা, সন্ধি ও আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগ্রত হয়েছিল তার অত্যন্ত গভীর ভাবগত সংহতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাই মধ্যবিভ বাঙালীর ভাবাবেগের প্রধান অঙ্গপ্রেরণার উৎসস্থল এখনও রবীন্দ্রনাথ।

আমরা অবশ্য একচক্ষু হরিণের মতো বরাবরই একপেশে হিসেব করে এসেছি। মধ্যবিভের আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সমান দিয়েছি। মধ্যবিভের আকাঙ্ক্ষাকেই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রকাশ ভেবে আত্মতৃপ্ত থেকেছি। ফলে, 'জাতি' ব্যাপারটাই বাদ পড়ে গেছে হিসেবের খাতা থেকে। যেমন ধরুন দুর্গাপূজা ব্যাপারটা এখন তো মস্তরমতো জাতীয় উৎসব। জমিদার বাড়ীর পুজোমণ্ডপ থেকে দেবী এখন স্টান মেয়ে এসেছেন সার্বজনীন মণ্ডপে। আনন্দময়ীর আগমনে গোটা দেশটাই নাকি মেতে ওঠে আনন্দে। গোটা দেশের কথা জানিনা। তবে এ দেশটাতো শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মধ্যবিভের নয়। এখানে মুচি, বাগদী, জেলে, কামার থেকে শুরু করে সাঁপতাল, রাজবংশী, মুসলমান সবাই বাস করে। কলকাতার পাড়ার পাড়ার যখন চাকের শব্দ, ততোধিক মাইকের শব্দ আনন্দময়ীর আগমন বার্তা ঘোষণা করতে থাকে তখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বিজীর্ণ অংশে খিজী পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। তিন মাইল দূরের গ্রামের চাকের শব্দ কুচিং শোনা গেলেও তাঁতি পাড়া ও কুমোর পাড়ার শব্দ তা ঢেকে যায়। ময়ূর জাতীয় পাখী হলেও সর্বত্র তার পুচ্ছটি দেখা যায় না।

তাৎক্ষণিকতা ও পল্লবগ্রাহিতা মধ্যবিভ চরিত্রের একটা দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামমোহন বিদ্যালয়-সাপরের সমসাময়িক নাগরিক মধ্যবিভ সন্তা করে সিপাহী বিদ্রোহকে

নিন্দে করেছিল। প্রভুতন্ত্রের পুরস্কারও ছুটেছিল তাৎক্ষণিক। রায় সাহেব, রায়বাহাদুর উপাধি মেডেল বুকে ঝুলিয়ে সমাজ কোলিত্তের আত্মতৃপ্তিটুকু ভোগ করাতো কম সৌভাগ্য নয়।

এই শতাব্দীর বাঙালী মধ্যবিভ ভাসাভাসা ভাবে অনেক কিছু জেনেছে। 'রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক হয়ে দাঁড়িত'—সেই কবে বি. চৌধুরীর মোট বই-এ পড়েছিলাম—এ কথা কি ভোলা যায়?

উপনিষদের মন্ত্র। তা মহাশয় উপনিষদের মন্ত্রটুকু ভুলে ভাসাভাসে টু-পাইন্স কামিয়ে নেওয়ার সময় মনে ছিল তো!

রবীন্দ্রনাথের 'আত্মজাতিকতা বোধ' ও ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে চিন্মোহনবাবু বা হুশোভনবাবুর অতবড় বক্তৃতা শোনার পর বাড়ীর সীমানা বাড়ার জন্য গৃহিণীকে ছাই কেলে প্রতিবেশীকে জব্ব করার পরামর্শটা আপনার সাধারণ কী চমৎকার খেলে গেল।

আজ পাঁচশে বৈশাখের সন্ধ্যার এসেছেন কিনকিনে পাল্লাবী পরে রবীন্দ্র সন্মেলনের বর্ণনা ধারে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য আপনার জীবন ও দৃষ্টিকে নন্দিত করে। সংগ্রামী মাহুদের গান শুনে আপনি চীৎকার করে ওঠেন, "যতসব Propaganda"। আসলে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে স্পর্শও করেনি; আপনি রবীন্দ্রনাথকে বুড়ি-ছুই করেছেন।

এতো গেল মধ্যবিভের কথা। রবীন্দ্র মাসে কিছু রবীন্দ্রকথাও প্রাসঙ্গিক। আমরা ষ্ট্যাচু গড়তেও চাইনা, ভাঙতেও চাইনা। সাদা কথা রবীন্দ্রনাথ আছেন। স্বীকার করা স্পর্শ, অবাস্তবতা। 'আছেন' কেন? এই প্রশ্নের অধো উত্তরকাল দাবী করে আমাদের কাছে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস সেক্স-পীয়ারের মধ্যে মৃত হয়ে উঠলেও জাতীয়তাবাদের যে প্রাচীণ অভ্যুত্থান Emergence of National state ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে আন্দোলিত করেছিল তার পরিপূর্ণ রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি।

ক্লাসিকাল সাহিত্যের লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার আন্তর গরজ থেকেই ইউরোপে মনোচেতনার স্বরূপ হতেছিল। রেনেসাঁসের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এশিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার অভিযানের

মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের তথাকথিত নবজাগৃতি পুরনো শিল্প-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ঘোষণা নিয়ে এসেও সমাজের উচ্চতলাতেই তা সীমাবদ্ধ থাকে এবং বুজোয়ারের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা বিধা-গ্রস্ত ও দুর্বল থাকার কলে তথাকথিত নবজাগরণের স্পন্দন গণ-আন্দোলনে অহুত্ব হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন বৈচেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাসের কয়েকটি অগ্র-করা দশকের তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞা। ১৯০৫ সালের বঙ্গ ব্যাঘ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যে উদ্ভাল আন্দোলন এসেছিল তার স্বপ্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমগ্রভাবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে 'চার অধ্যায়' বা 'বরে বাইরে' উপন্যাসে তাঁর কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, ভারতীয় সত্যতার সন্ধান মূল্য-বোধগুলিকে যুগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে যে জীবন দর্শনকে তিনি তুলে ধরেছেন তা আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিভের মনকে ছুঁয়ে গেছে।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ যে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই একই সামাজিক ভিত্তির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা।

আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা উক্ত সামাজিক ভিত্তি ভেঙে ফেলার লক্ষ্যম থেকে বিরত থেকেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সেই 'গ্রহণকে' গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী,' প্রগতিশীল, উদারনৈতিক মানবতাবাদী ইত্যাদি

বিশেষণে ভূষিত করতে হয়েছে।

'রক্তকরবী' নাটকটির কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে স্বীকার করেছেন—'নারীশক্তির গুঢ় প্রবর্তনায় পুরুষের বন্ধন জাল' ছিন্ন করার বক্তব্যই নাটকের মর্মবস্তু। 'রক্তকরবী' নন্দিনী নামে এক মানবীর পাল্লা। অথচ আমাদের দেশের মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ 'বঙ্গপুত্রীয় রাজার মধ্যে কয়িকু, অন্তর্ভব্বে, জর্জর ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুঁজে পেলেন। অতি উৎসাহে তাঁরা প্রণীতবশত আবিষ্কার করে ফেললেন। একথা কে না জানে যে, পণ্যোৎপাদনকারী সত্যতা ও কৃষি-ভিত্তিক সত্যতা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব বেধানে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথ সেখানে শাস্তি অহুসন্ধান করেছেন কৃষি সত্যতার বট-ছায়ার।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নাকি সামন্ততান্ত্রিক যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই তারসঙ্গত অধিকার বলে মনে করেছেন। কবে হয়তো ভনব রবীন্দ্রনাথের কোন সাংকেতিক নাটকে ইন্দিরা বৈরতয়ের বিরুদ্ধেও সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে।

কুমুদ যদি বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে থাকে, মধুসূদনের ঘর করতে গেল কেন আবার? মধুসূদনের ঔরস-জাত সন্তান কি সামন্ততন্ত্রের প্রতাব মুক্ত হতে পারবে? আমরা এসব প্রশ্ন করিনি কখনও। এদেশে মৃতি পূজা হয়। মৃতি ভাঙার চেষ্টা অপরাধ। একদল রবীন্দ্রনাথকে দেবতা বানিয়েছেন। আর একদল তাঁকে জনগণের পক্ষে টানছেন। রবীন্দ্রনাথ অস্বাভাবিক হলে হানতেন।

"বাধা হয়ে আছে মোর বেড়া-

গুলি জীবনবাড়ার", "বাধে বাধে গেছি আমি ওপাড়ার প্রান্তের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি, সে শক্তি ছিল না একেবারে" ইত্যাদি অকপট স্বীকারোক্তি থাকা সত্ত্বেও জোর করে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবির আসনে বসানোর চেষ্টা কটকট ও হানাকর। 'সত্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ক্যাসীবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে তাঁর মর্মবস্তুকে প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমী সত্যতার অন্তঃসারশূন্য দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করেছেন। উৎকট জাতীয়তাবাদকে নিন্দে করেছেন—সমুদ্র ধিকার জানিয়েছেন তার বর্বর মূখ বিকারকে। তিনি জোর গলায় ঘোষণা করেছেন—"মহুগুয়ে বিশ্বাস হারানো পাশ।" রবীন্দ্রনাথের এই সর্ধক ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাই বলে "তিনি আমাদেরই কবি"—এই ধরনের আত্মগোঁড় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন নয়।

রবীন্দ্রনাথ কাদের কবি? এই প্রশ্নের উত্তর ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, নাটকে—সমগ্রভাবে তাঁর জীবন দর্শনে। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির উচ্চতম বিকাশ ঘটেছে তাঁর বিপুল সাহিত্য কর্মে। উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ, তপোবনাজ্ঞী সত্যতার তথাকথিত শাস্তির হাতছানি রবীন্দ্রনাথকে অবিরত জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত মাহুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এটা রবীন্দ্র প্রতিভার ট্রাজেডি। তিনি আমা-দের কালের প্রেত প্রতিভা হওয়া সত্ত্বেও দুঃবর্তী নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন যার আলো পৃথিবীতে এসে পৌছয় না।

কলকাতা একদিন কলোনিয়ী তিলোত্তমা হবে



কলকাতাকে
পরিচ্ছন্ন রাখুন

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

আসামের আন্দোলন সম্পর্কে

৩৪ পৃষ্ঠার পর

মনে রাখতে হবে জ্যোতি বসু, স্বরূপ মুখার্জী ও প্রফুল্ল সেনদের হাত বহু প্রমিত-কৃষকের রক্তে রাঙা। এইসব শহীদদের মধ্যে অনেকে বাঙালী হয়েও রেহাই পান নি এই খুনে ফুঁরা বাঙালী প্রেমিকদের হাত থেকে। আসলে মূল সংঘাত শ্রেণীস্বার্থের।

নিপীড়িত, অপমানিত, অবহেলিত অসমীয়া জাতিসত্তার লক্ষ লক্ষ মানুষ এটা অস্বস্তি করছেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অতাবহি তাঁদের এই ছদ্মশাসন কারণ। কিন্তু সত্যিকারের জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় সেই সচেতনতা জনগণের মধ্যে আপনাতোকেই আসে না, তা “বাইরে থেকে” বোঝাতে হয়। জনগণের এই অসচেতনতার স্বযোগ গ্রহণ করেছে সমস্ত সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে পালিগামেন্ট ও বিধানসভাই হচ্ছে জনগণের ক্ষমতার হাতিয়ার। তাই তারা বোঝাতে চাইছে যে যদি ভোটার তালিকা থেকে অ-অসমীয়াদের নাম বাদ দেওয়া যায় তাহলেই অসমীয়া জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং এইভাবেই তারা যে সত্যটিকে আড়াল করতে চাইছে তা হল সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেয় না, ক্ষমতা থাকে শাসকশ্রেণীর হাতে। তাই ভোটার তালিকা থেকে এইসব অ-অসমীয়া জনগণের নাম বাদ গেলেও মূল সমস্যা অপরিবর্তিত থেকে যাবে। আর এস এস-এর মত দাপ্তকারিক দল তার সংকীর্ণ দাপ্তকারিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বিপুল সংখ্যক বাঙালী মুসলমান মেহনতী মানুষ এসেছেন, তাঁদের ভাড়াতে পারলেই

অসমীয়া জনগণ নিজের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আবার যে সব রাজনৈতিক দলগুলো পূর্ববাঙলা থেকে আগত জনগণের ভোট বিপুল সংখ্যায় পায় তারা ১৯৫১ সালের সময়সীমার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু অসমীয়া জনগণের মারমুখি মেজাজের সামনে কিছুটা ছাড় দিয়ে ১৯৭১, ১৯৬৭ ইত্যাদি সালকে “বিদেশী নাগরিক” নির্ধারণের সময়সীমা ধার্য করার কথা বলে আসল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। বাজপেয়ী-দেওয়ান থেকে শুরু করে ইন্দিরা-জ্যোতি বসু পর্যন্ত সকলেই আসাম সমস্যাতে বিচার করছে নির্বাচনে ভোট ও গদি দখলের গাণিতিক হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু যখনই আসামের জনগণের একটা অংশ [বর্তমানে হয়ত ক্ষুদ্র একটা অংশই] পার্বত্য নাপা মিজো, মেইতি প্রভৃতি জাতিসত্তার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবছেন, অসমীয়া প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদী শ্রেণীগুলোর দল একই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিংকার করতে শুরু করেছে। ভূইফোড় ভারতপ্রেমিক জ্যোতি বসু “মহানাজী” ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আকৃতি মিনতি করছে যাতে ইন্দিরা গান্ধী আসামে “বিচ্ছিন্নতাবাদীদের” লোহ হস্তে দমন করে। তা না হলে নাকি ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই “বিচ্ছিন্নতাবাদীদের” দমন করার জন্য ইন্দিরা সরকারের নিবর্তনমূলক আটক আইন জারী করার হুমকিতে “জমদরদী” “মহাবিপ্লবী” জ্যোতি বসুর পাটি কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, বরং ইন্দিরাকে মনে মনে অভিনন্দিত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সমগ্র আসামকে উপরুত এলাকা ঘোষণা করে পুলিশ-মিলিটারীর হাতে নির্বিচারে নারী শিশু-সহ জনগণকে হত্যা করার খোলা অধিকার দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এইসব সংশোধনবাদীদের কোনো বক্তব্য নেই। উল্টে তারা এতই খুশী হয়েছে যে মেকী গোলা ও “কুমীরের কামা” প্রকাশ করতেও ভুলে গেছে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীরা অসমীয়া জনগণের শত্রু, ভারতের সমস্ত জাতিসত্তার জনগণের শত্রু, মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্রু।

“বিচ্ছিন্নতাবাদীদের” বিরুদ্ধে

ওদের ভারতপ্রেম এত উৎসাহে উঠছে কেন? ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মমভাবে পরদলিত করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে ভারতের মুংহুদী শাসকশ্রেণী। এই শাসকশ্রেণী জনগণের শেষ রক্তবিন্দুটুকু শোষণ করার জন্য নিজের হাতে সমস্ত ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেছে এবং গড়ে তুলেছে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক-শাসনিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। “কাশ্মীর থেকে কতাকাশ্মারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষ একজাতি, একদেশ,” “বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা” ইত্যাদি শাসকশ্রেণীর প্রোগামগুলোর আসল রূপ হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মমভাবে দমন করে শোষণকে অব্যাহত রাখা। সর্বদা প্রতী লড়াই করে সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবিচার শোষণ ও নিপীড়নকে চিরতরে উৎখাত করার জন্য। সুতরাং যদি কোন জাতি অন্য কোন জাতিকে শোষণ করে অথবা যদি কোনো জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই জাতিকে জোর করে ধরে রাখা হয় তাহলে সর্বদা প্রতী এই অন্তরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সর্বদা প্রতী ও কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে একতা হবে যেচ্ছামূলক, আর এটা হতে পারে তখনই যখন এইসব জাতিসত্তার প্রত্যেকে সাম্রাজ্যবাদ ও মুংহুদী শাসকশ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে শুধু অন্তঃজাতিসত্তার শোষণের বিরুদ্ধেই নয় এমন কি তাদের নিজের জাতিসত্তার শোষণের মুংহুদী শ্রেণীর বিরুদ্ধেও, তাদের হাত থেকে নিজের মুক্ত করে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে নিয়ে আসে সামাজিক মালিকানা, গড়ে তোলে এমন এক সমাজ যেখানে প্রম ছাড়া আর অন্য কোন বিচারের মানদণ্ড থাকবে না। ব্যক্তিমানুষকে বিচার করার জন্য। সুতরাং আজ যদি অসমীয়া জনগণ নিজের স্বাধীন বিকাশকে হুমিষিত করার জন্য অস্ত্রধারণ করেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও মুংহুদী শাসকশ্রেণীর শোষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্য সংগ্রাম করেন তাহলে দোষ কোথায়? আসলে সবকটা ভোটবাজ [পার্টীগুলোর প্রতীকস্বরূপই জাতিসত্তাগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভাষা সংগ্রামের বিরোধিতার তাদের দাঁড় করছে। এরাই আবার দিনরাত “রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই” বলে

চিংকার করে, “রাজ্য কেন্দ্রের উপনিবেশ” বলে গলা ফাটায়। আসলে এদবই তারা করে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের সং আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে শোষণের ভাগ পাওয়ার জন্য। অপরদিকে ভারতের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবীতে সশস্ত্র সংগ্রামরত নাপা, মিজো, মেইতি প্রভৃতি জাতিসত্তাগুলো উপলব্ধি করছেন একব্যবস্থা সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে। এই একতা হচ্ছে জাতীয় শোষণহীন, জবরদস্তিহীন সংগ্রামী জাতিসত্তাগুলোর যেচ্ছা-একতা। এটাই হচ্ছে প্রকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা। আজ এটাই ভারতের বিভিন্ন সংগ্রামরত মুক্তিকামী জাতিসত্তার পথের দিশারী। তাই বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ যেচ্ছামূলক একতা গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে যে জাতিসত্তাগুলো তাদের সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় মুংহুদী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াচ্ছেন কিনা। সচেতনতাকে আনতে গেলে ও সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে গেলে চাই সর্বদা প্রতী ও প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। তা না হলে সংগ্রামগুলো সংকীর্ণতার চোরাগলিতে মাথা টুকে মরবে। আর শাসকশ্রেণী তাদের বিভেদমূলক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে স্রাতুঘাতী-দাঙ্গার সৃষ্টি করবে।

যদি অসমীয়া জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার দাবীতে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করেন তাহলে আমরা তাদের সমর্থন জানাবো।

তাহলে “বহিরাগত” কারা? এই বহিরাগতরা হচ্ছে (১) বাঙালী, মেপালী, ওড়িয়া এবং অ-অসমীয়া অন্তঃজাতিসত্তার লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ যারা সাম্রাজ্যবাদ, মুংহুদী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদের চক্রান্ত ও শোষণের ফলে আসামে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন, অসমীয়া মেহনতী জনগণের সঙ্গে একই সঙ্গে খাম, রক্ত আর চোখের জলে গড়ে তুলেছেন সামাজিক সম্পদ আর প্রতিদানে শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে পেয়েছেন বুলেট, চাবুক আর অপমান। (২) এছাড়া বহিরাগত বলতে বোঝায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস ও স্বার্থরক্ষাকারী এক বাঙালী উচ্চশ্রেণী যারা ঐতিহাসিকভাবে আসামকে অর্থনীতিগতভাবে ও রাজনীতিগতভাবে শোষণ ও শাসন করেছে, অসমীয়া ও অ-অসমীয়া নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী

জনগণকে শোষণ ও অত্যাচার করেছে, অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নির্মমভাবে পরদলিত করে বিকৃত বাঙালী জাতিদান্তিকতার ঘন দিয়েছে এবং ভারতের অন্তঃপ্রদেশের মতো আসামকেও পরদলিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও মুংহুদীশ্রেণীর একেট হিঁসাব কাজ করেছে। মার্কোয়ারী ও অন্তঃজাতিসত্তার শোষণকারী যারা আসামের মেহনতী মানুষকে শোষণ করেছে তারাও অসমীয়া জাতিসত্তার ভাষা আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করে স্রাতুঘাতী দাঙ্গা সৃষ্টিতে উদ্বাসী ও ইচ্ছন ঘোগাচ্ছে এবং এইভাবে অসমীয়া জাতিসত্তার আন্দোলনকে অন্তর্ঘাত করেছে। অসমীয়া মুংহুদী-দের এই সব বহিরাগত শোষণকাজী সকলেই অসমীয়া জাতিসত্তার আন্দোলনের শত্রু।

সুতরাং “বহিরাগত” প্রমটাকে নির্ভেজাল বুর্জোয়া সংকীর্ণ জাতীয়-ভাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা চলবে না, বিচার করতে হবে সর্বদা প্রতী দৃষ্টিকোণ থেকে। বহিরাগত শোষণকারী ও অসমীয়া মুংহুদীরা অসমীয়া জাতিসত্তার অর্থনৈতিক প্রাণপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, কড় কড় করে অসমীয়া জাতিসত্তার স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে। আর এর ফলে রক্ত হচ্ছে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির রিকশ। “বহিরাগত” উচ্ছেদের নামে প্রমিত-কৃষক মেহনতী মানুষ নির্বিশেষে অন্তঃজাতিসত্তার সমস্ত মানুষকে উৎখাত করাটা কোনো মুক্তিকামী জাতিসত্তার ভাষা দাবী হতে পারে না। কিন্তু অসমীয়া জাতিসত্তার বাধামুক্ত স্বাধীন বিকাশের স্বার্থে আমরা বহিরাগত শোষণ ও অসমীয়া মুংহুদীদের বিরুদ্ধে অসমীয়া জাতিসত্তার ভাষা সংগ্রামকে অবশ্যই সমর্থন করি। তাই আসাম সমস্যা কেবলমাত্র অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করার সমস্যা নয়। ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রামকে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা ভুল। আর এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান “বহিরাগত” বা “বিদেশী নাগরিকদের” বিতাড়নের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ১৯৫১, ১৯৬৭ বা ১৯৭১ ইত্যাদি সালকে সময় সীমা বাধার চেষ্টা আসলে ভাঙতা এবং এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আসল সমস্যা থেকে দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের সংকীর্ণ স্বার্থে তথা ভোট ও গদি দখলের স্বার্থে সমস্ত প্রতিক্রিয়া-শোষণ ১ম পৃষ্ঠার



ফ্যান্টাসী-বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র একেট চাই

টিকিট নিয়ে কলেঙ্কারী

১ম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে যোগাযোগ করি। নাহয় রায় বললেন আমি যাচ্ছি না। তবে আমার কুপন প্রত্যোৎসাহকে দিয়ে দিয়েছি যাতে তুমি লোক অন্তত বিনা ভাড়ার যেতে পারো। শুনে আমি কিছু বললাম না। যোগাযোগ করলাম কিংবদন্তি নন্দ্রের সঙ্গে। তখনই তিনি বোম্বাই যাচ্ছেন না। রেলওয়ে কুপনও দেননি। দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্ত্র-দেব সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি।

১৭ই এপ্রিল বিধানসভা সদস্যরা রওনা হয়ে গেলেন বোম্বাই। সঙ্গে গেলেন দলের অনেকেই। রিজার্ভেশন তালিকায় এমন কয়েকজন সদস্যের নাম রয়েছে যাদের কয়েকজনকে পরের দিন অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল বিধানসভা কক্ষে হাজির থাকতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ নিয়ে জানলাম ঐ নামে রেল রিজার্ভেশন হয়েছে এবং লোক চলে গেছে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কে আসল বিধানসভা সদস্য? টেনে করে বোম্বাই গেলেন যিনি, না বিধানসভার হাজির যিনি?

রিজার্ভেশন তালিকায় কাশী-বাবুর নামও রয়েছে। তিনি বোম্বাই যেতে পারেননি অস্থায়ী থাকায়। তার নামেও বিধানসভা সদস্য নন এমন ব্যক্তি টেনে সফর করেছেন বলে জানা গেছে। বিধানসভার সদস্য নন এমন অনেক দলীয় লোক বোম্বাই গিয়েছিলেন। সকলেই এম এ কুপনে টেনে সফর করেছেন একথা আমি বলছি না। তবে একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে, বেশ কয়েকজনই এম এল এ সেক্সে টেনে সফর করেছেন সঙ্গীসহ। এটা অস্বাভাবিক। সম্মুখে দোষী সংশ্লিষ্ট বিধানসভা সদস্যগণ। কেননা এটা তাদের ভাল করেই জানা আছে যে, অসদস্য কেউ এই কুপন ব্যবহার করার অধিকারী নন। তাই তারা জেনে শুনে অস্বাভাবিক করেছেন।

জাতিসংঘে এম এল এ কুপন অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে দিয়ে বিধানসভা সদস্যরা দুর্নীতি করেছেন। অথচ এরাই আবার বায়বীয় সন-কারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে বিধানসভায় অসত্য অভিযোগ উত্থাপন করেন।

এ সম্পর্কে তদন্ত করতে হয়েছে আমাকে বেশ কিছুদিন ধরে। বিধানসভা সচিবালয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের রিজার্ভেশন সফর দপ্তরে এবং জনতা পার্টির বিভিন্ন নেতার কাছে এ সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এই বিধান-

সভা সদস্য একই দিনে টেনে দুই বিপরীত দিকে লম্বা সফর করেছেন বা সম্ভব হতে পারে না।

রাজ্য বিধানসভা সচিবালয়ে থেকে মহারাষ্ট্রের বিধানসভার সচিবকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল কাশী-বাবু, প্রত্যোৎসাহ এবং আরও ৫ জন এম এল এ এর জন্ম এম এল এ হোস্টেলে জায়গা রাখার জন্য।

জনতা পরিষদীয় দলের সচেতক প্রত্যোৎসাহ মহাত্মী খুব ভাল করেই জানেন যে, রেলওয়ে কুপন অপব্যবহার করা বেআইনী। তিনি পুরাতন সদস্য। তাঁর জানা থাকা উচিত যে, বিগত কংগ্রেসী জমানাতেও এই রেলওয়ে কুপন নিয়ে কয়েকজন কংগ্রেসী বিধায়ক কলেঙ্কারী করে-ছিলেন। এম এল এ কুপন নিয়ে

সুন্দরবনে মিশনারী

১ম পৃষ্ঠার পর

রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীন কলকাতা ভেগরেসি কন্ট্রোল বোর্ড কলকাতার লোক সমিতিতে গোবিন্দপুরের কয়েকটি ফুটপাথবানী পরিবারের সমীক্ষা করে। এঁদের পুনর্বাসনের তার নেয় লুথেরান ওয়াল্ড সার্ভিস। '৭১ সালের মে মাসে এঁদেরকে সুন্দরবনের কুলুঙ্গী খানাদীন ভূমিস্বত্বীতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারগুলিকে তখন সংস্থার পক্ষ থেকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল যে, ভূমিস্বত্বী প্রোজেক্টে প্রত্যেককে যোগ্যতা অধ্যায়ী কাজ দেওয়া হবে, অস্বাভাবিক রিজিফ দেওয়া হবে। প্রথম ২১১ মাস কাজ না হওয়ার জন্য রিজিফের ব্যবস্থা হয়েছিল। আবার অক্টোবর মাসে পচিশটি মত পরিবারকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু খাতের অভাবে এরা এক মণ্ডা হয়ে মধ্যমী ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বর্তমানে ওখানে ৪১০২টি পরিবার আছে। এদের অবস্থাও সঙ্গীন। প্রত্যেককেই স্থানীয় দোকানগুলোর বেশ কিছু টাকা দেনা করে বাঁচার মতো পেতে হয়েছে। অনাহারে শাশ্বত বৈরাগীর ২৩ বছরের মেয়ে কল্লনা মারাও গেছে।

লুথেরান ওয়াল্ড সার্ভিসের সুন্দরবন প্রোজেক্টের কর্তা মিঃ জি সাইমনকে ওরা সব জানিয়েছিলেন। শুনে সাইমন ও তাঁর দুই পুত্র জর্জ ও টনি সাহেব বলেন, "ভিত্তিক বাচ্চা, বাঙালী কৃষাক বাচ্চা, বো মিলতা হার লেও, নেহি লেনা হার তব চল যাও। বদম্যাসী করমে সে এস ডি ও সাহেব বায়ীন বোসকো জানতা হার, খবর দেনেসে ও পুলিশ লেকে আরেগা।" ওয়াল্ড সার্ভিসের ডিরেক্টর হভেনে সাহেবের কাছেও পরা বহু আবেদন নিবেদন করে-

রেল সফর করার দায়ের করমা থা নামে খুব কংগ্রেসের এক নেত্রী প্রেরণ হয়েছিলেন। এসব জেনেও প্রত্যোৎসাহ এম এল এ কুপন কলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। যারা কুপন নিয়ে দিয়েছেন, অথচ নিজেরা হয় এলাকার ছিলেন অথবা এম এল এ হোস্টেলে ছিলেন, তাঁরা অনেকেই হয়ত এর গুরুত্ব জানেন না। না জানাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা নতুন সদস্য।

পুরাতন সদস্যরা সব কিছু জেনেও কি করে এই দুর্নীতি করলেন তা ভেবে পাইনি। আমার মনে হয় কুপন কলেঙ্কারী নিয়ে যদি যথাযথ তদন্ত করা হয় তাহলে হয়ত আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

ছিলেন, সাইমন সাহেবের কলকাতা অফিসে এসে কলকাতা করেছেন, এস ডি ও থেকে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মহিলা রাষ্ট্রদূতী নিকুপমা চ্যাটার্জীকেও জানিয়েছেন। কিন্তু কোন উপকার হয়নি। শোনা যায়, ভেগরেসি বিভাগের উপ-সচিব অমল চ্যাটার্জী থেকে বড়-ছোট বহু আমলাই সাইমন সাহেবের বোতলের বদলে নাকি আঁবড়।

যারা ওখানে এখন কাজ করছে ভোর থেকে সন্ধ্যা ছাড়া পর্বত মাটি কাটলে ওদের দেওয়া হয় তিন কিলো গম আর দু টাকা। প্রথম দিকে ৫.৬ জনের পরিবার পিছু দেওয়া হত মণ্ডায়ে পচিশ টাকা। মোনা, মাটির ৭'x৮' এক একটা বরও ঐ সংস্থা এদের জন্ম করে দিয়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘরে থাকা দায়। মাথার পাতলা খড়ের ছাউনি। বাচ্চাদেরকে শুড়ো ছুধ আর পচিমে জার্মানীতে তৈরী এক-রকম বিছুট-রোল দেওয়া হয় বটে কিন্তু প্রায় সকলেরই রিকেটি হেচারি, পরপের জামা-প্যান্ট নেই। প্রকল্প দেখাওনার কাজে স্থানীয় বেকারদেরকে নেওয়া হয়না বললেই চলে। একজনকে দেড়শো টাকা মাইনেতে নিলেও তার চারমাসের বেতন আটকে রাখা হয়েছে। অথচ বর্ধমানের ভাতার থেকে প্রায় চৌদ্দ জনকে আনা হয়েছে।

বামফ্রন্টের নাকের ডগার রাজ্য সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্পকে বৃদ্ধান্ত দেখিয়ে এই বিদেশী মিশনারী সংস্থা কাজ করছে। এরা আসামে বেশ কিছু লোককে নাকি ইতিমধ্যেই ধর্মান্তরিত করেছে। স্থানীয় এম পি সনৎ মণ্ডলও নির্বিকার। আশা করি, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত, সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সকলেই এ ব্যাপারে নজর দেবেন আর ঐ পরিবারগুলোকে তুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচাবেন।

আসামের আন্দোলন

৮ম পৃষ্ঠার পর

শীল ও সংশোধনবাদী পার্টিগুলোর স্বরকবাকবি।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অস্বাভাবিক জাতিসত্তার শোষণের দ্বারা আসামের অর্থনৈতিক প্রাণপ্রবাহ নিরস্ত্র এই দুই নীড়ানীচাদের মধ্যে পড়ে অসমীয়া জনগণের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য [national identity] আজ বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে অসমীয়া জাতিসত্তার সংগ্রাম বলিষ্ঠভাবে তাঁদের ঐতিহ্যময় জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা [assert] ও রক্ষা করার সংগ্রাম। অস্বাভাবিক জাতিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসমীয়া জাতিসত্তার বাধ্যমূলক বিকাশের নিয়ন্ত্রিত আংশিক স্বাধীনতাকে আমরা সমর্থন করি—

(১) অসমীয়া জনগণের জমি হস্তান্তর রোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(২) "উদ্বাস্ত" জনগণের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দায়-দায়িত্ব আসামের জনগণের কাছে চাপানো চলবে না। ভারত সরকারকে সমস্ত উদ্বাস্ত জনগণের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে।

(৩) অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। আসাম রাজ্যে শিক্ষা এবং সরকারী কাজে অসমীয়া ভাষাকে প্রধান মাধ্যম করতে হবে।

(৪) আসামের অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে আসামে দ্রুত শিল্পায়ন করতে হবে যার স্বকলগুলি প্রাথমিকভাবে অসমীয়া জনগণের প্রাণ্য হতে হবে।

কিন্তু যে রাজনৈতিক কারণে আজ আসামের জনগণের এই দুর্দশা তার সমাধান এই সব আংশিক দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রামের মারকং সম্ভব নয়। উপরোক্ত আংশিক দাবীর সংগ্রাম জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি ঘটাবে ও পীড়নমূলক রাষ্ট্রতন্ত্রের চরিত্র উন্মোচন ও তাকে উৎখাত করার রাজনৈতিক সচেতনতার সঞ্চার করতে সাহায্য করবে। এই রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে লম্বা কৃষি বিপ্লবে। এই সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামই পারে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও মুৎসুদ্দী শোষণকে উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারকে উন্মুক্ত করতে, সামন্তবাদের শৃঙ্খলকে ভেঙে কোটি কোটি কৃষকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য

আনতে, পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে, পারে এমন এক শোষণমূলক সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে জমি ও অস্বাভাবিক উৎপাদন উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের রাজনৈতিক এবং যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করা হবে তার জরায়ান দিয়ে নয় বরং সমাজে তার প্রমের অবদান দিয়ে। যদি আজ সমগ্র অসমীয়া জাতিসত্তার জনগণ অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ান, উত্তর পূর্ববঙ্গের সংগ্রামরত জাতিসত্তাগুলোর সঙ্গে ও ভারতের শ্রমিক কৃষক-মেহনতী জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসুদ্দী শাসক শ্রেণীর শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবীতে সংগ্রাম করেন, তাহলে আমরা সেই জাতীয় সংগ্রামকে সর্বাঙ্গতঃ সমর্থন করব। আমি অসমীয়া জাতিসত্তার আন্দোলন এই পথে বিকশিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন জাতিসত্তা ইতিমধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন; আর অস্বাভাবিক অসমীয়া জনগণের আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় শাসক শ্রেণীর বিবেচনামূলক মনোভাব এবং তার উপর হীন পীড়ন অসমীয়া জনগণের হযোগী জাতীয় মুক্তি আকাংক্ষা জানিয়ে তুলবে।

জোসেফ টিটো

৫ম পৃষ্ঠার পর

কমিনফর্ম ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের নির্দেশে যুগোস্লাভ দলের সদস্যদের প্রতি আত্মীয় আনান টিটো নেতৃত্বের অপদায়ন করার চেষ্টা করতে। নানাভাবে ১৯৪৮—১৯৫০ পর্যন্ত অন্তর্গতী কাজ ও নীতিতে নানারূপ অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টাও করে চলে কমিনফর্ম। ১৯৫৫-৫৬র পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আবার হাঙ্গারী ও চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার পর শোভিত্সের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে—কখনও ভাল, কখনও বা নষ্ট। এমনভাবে চলে আসছে দশর্ক।

তাই, গত বছরের ১৫ই মে এম-এক-আর-ওয়ার্ল্ড প্রেসেমরির অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট টিটো বলেন: "ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক জটিলতার মধ্য দিয়ে এদেশের বিকাশবাহাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজ করে যেতে হবে। চলাটা হয়ত অত সহজ হবে না। ...তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অভিজ্ঞতার ঐক্যবাহী প্রেসিডেন্সি নিজেদেরকে নিঃপত্ত উৎসর্গ করবেন দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।" এমনি সুরেই তাঁর আহ্বান ছিল গত বছরের ১৯শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অধিবেশনে: "শ্রমের অতীতে... শ্রমিক ভেদনি ভবিষ্যতেও সমাজতন্ত্র, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের পক্ষে নিঃপত্তভাবে সংগ্রাম" করে যাবে এই দেশ ও হুদু লুপ্তাবের সঙ্গেই।"

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

সং চলচ্চিত্রের আন্দোলন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সং চলচ্চিত্রের সাধু প্রয়াস এদেশে প্রচণ্ড স্বকম মার খাচ্ছে, সং চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও প্রদর্শন ক্রমে ক্রমে গভীর সমস্তার মুখোমুখি হচ্ছে, কায়মী পুঁজিবাদী ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির পাণ্ডাঘের চক্রান্তের শিকার হচ্ছে নব-তরঙ্গের চিত্র নির্মাতার দল। সং চলচ্চিত্রের তবিত্যৎ কি—ইত্যাচার বিষয়কে কেন্দ্র করে গত ১৩ই এপ্রিল শিল্পমঞ্চে বেশ কিছু প্রবীণ ও নবীন চলচ্চিত্রকার আলোচনা করলেন। তবে সে প্রসঙ্গ তোলবার আগে সং চলচ্চিত্র কাকে বলে ও তার আন্দোলন ও সমস্তা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার জীবন-মুখী বক্তব্যকে রূপ দেয় যে চলচ্চিত্র, তাকেই সং চলচ্চিত্রের অভিধায় চিহ্নিত করা যায়। সং চলচ্চিত্রের সমস্তা মূলতঃ নির্মাণ ও প্রদর্শনগত। কোন ছবি যদি না চলে, তবে সে জাতীয় ছবি নির্মাণের উৎসাহে যেমন ভীটা পড়ে তেমনি সে রীতির ছবি প্রদর্শনেও বাধা আসে ব্যবসায়িক কারণে। কিন্তু ছবি যদি চলে অর্থাৎ দর্শক-বন্দিত হয়, তবে সেখানে নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা না দেবারই কথা। সং চলচ্চিত্রের পক্ষে দর্শক-বন্দিত হতে কোন রীতি বা নীতিগত বাধা আছে কি? তাতো থাকার কথা নয় আর তা থাকবেই বা কেন? সং চলচ্চিত্র যদি আবেদনশীল হয়, ক্ষয়ক্ষতি কাহিনীর উপস্থাপনা যদি মনে রেখাপাত করে, আদিক সর্বত্র না হয়ে যদি ছবির বক্তব্য সংবেদনশীল হয়, তবে তা দর্শক অভিনন্দন লাভ করবেই। একথা যদিও আজ

সত্য যে, চলচ্চিত্র শুধুই দর্শক মনো-রঞ্জন করবে না, দর্শকের বাস্তব চেতনা-র স্ব স্ব জীবনবোধ ও অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়ে সংগ্রামে উত্তরণ ও ফুটিয়ে তুলবে সংগে সংগে। তবুও কোন-ছবি যদি বক্তব্য প্রধান হয়ে শুধুই প্রকরণগত নৈপুণ্য-দেখায় তবে তা সাধারণের কাছে সচরাচর গ্রাহ্য হয় না—সেখানে আমন্ত্রণের যোগ থাকলে তবেই তা উপভোগ্য হয়ে দর্শক চিত্তকে স্পর্শ করে। আর 'কমার্শিয়াল' ছবি হিসেবে বাজারে আজ যা চালু আছে, তাতো শুধুই জীবন বিষয় চিন্তাধারার প্রাণের বিকৃত ঘোমচেতনার বিস্তার। এই প্রেমীর ছবি সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয়। আর জনকটির পরিবর্তন ঘটতে গেলে স্ব স্ব রচনার পরিচ্ছন্ন ছবি দেখিয়েই-তা করতে হবে এবং সেসব ছবির আবেদন সঞ্চারের কসরতা থাকিও দরকার। কিন্তু এদেশের অভিনয়শিল্পারায়ণ পরিবেশক ও প্রদর্শক গোষ্ঠীর বেনিয়ানুলত প্রবৃত্তি সং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ছবি যদি মুক্তিই না পায়, তবে সে ছবির প্রকৃতি বিচারই বা কেনন করে হবে। তাই জনমত সৃষ্টির জন্য আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন। সরকারেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা থাকিও দরকার।

কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসবের অধীভূত সেদিনের আলোচনা অঙ্ক-ঠানে বক্তারা কিন্তু কিছুটা আপোসধর্মী হয়ে আত্মসমীক্ষা করে গেলেন। সমস্যার ছবি তারা তুলে ধরেছেন, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির আক্রমণের কথাও বলেছেন এবং

তাদের বক্তব্য অগ্রাহ্য হবারও নয়—তবুও সং চলচ্চিত্রের সপক্ষে জনমত গঠন ও আন্দোলনের জরুরী আবশ্যিকতা সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ তারা বোধ করছেন বলে মনে হল না। এম, এস, মধু বললেন, নিজের দেশের কথা তুলে, আপন এতিহাসকে হারিয়ে পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অল্পকরণ করে তরুণ পরিচালকের দল এদেশের সাধারণ দর্শকের কাছে থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে। কিছু উদাহরণিকতা ও আত্মসমীক্ষিতাও ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। কমার্শিয়াল ফিল্ম ব্যবসারীদের মনো-যোগ আকর্ষণ করতে হবে আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই। আজকের এই সামাজিক কাঠামোর এছাড়া গতি নেই। পুণা ফিল্ম আর্কাইভের পি, কে, নারায়, ফিল্ম ইন্সটিটিউটের স্নাতক সচিব মির্জা, দক্ষিণের শ্রীনাগভরন, মহারাষ্ট্রের নচিকেত পটবর্দন, জুব-নেবরের নীরদ মহাপাত্র, এখানের নিমাই ধোয়, বুদ্ধদেব দাশ-গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই বললেন, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সংগে যোগাযোগ রেখেই সং চলচ্চিত্রকে বাঁচতে হবে। নইলে দর্শকের কাছে থেকে দূরে সরে গিয়ে লব-ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কেউ কেউ আবার বললেন, এই মুহূর্তে একতাই প্রয়োজন। সমস্যাটি ব্যবসারী ও পরিবেশকদের দলে এনে আপন অহংকার বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কথাগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু কখনই তা সংগ্রামী আন্দোলনের শপথকে প্রাধান্য দিয়ে উচ্চকিত করেনি।

অ্যালফ্রেড হিচকক

সারা বিশ্বে এক বিস্ময়কর আতঙ্ক-বিলাসে মজিয়ে রেখে অ্যালফ্রেড হিচকক ৮৩ বছর বয়সে অন্তিম-শয়নে চির বিশ্রাম নিলেন। তাঁর এক একটি ছবি দেখা মানেই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়—সেখানে ভয় আতঙ্ক, বিহ্বলতা, পরিহাসের উপ-ভোগ্যতা ও সর্বোপরি রসধন আনন্দের শিহরণ মনকে কত রঙেই না নাচায়। মিসমন্ডেহে আশ্চর্য কমতাবান চলচ্চিত্রকার ছিলেন তিনি।

ছবির জগতে তিনি প্রথম এসে-ছিলেন লন্ডনে সেই ১৯২০ সালে লাম্বা এক পেটোর ও টাইটেল লেটারার হিসেবে। অসামান্য কর্ম-সাধনার বলে তিনিই শেষে বিহার নিলেন রহস্য চিত্রের এক অবিদ্যরূপী আতঙ্কর স্রষ্টা রূপে। হিচকক বা আমাদের দেখাবেন, তাই আমাদের

দেখতে হবে এবং শিউরে উঠতেও হবে—কোন প্রকার অবকাশ নেই—কত বাস্তবিক অথচ কত ভয়ঙ্কর। তাঁর ছবিতে 'মার্ডার' বত সহজে এসে আমাদের ছন্দ চমকে দেয়, আর কারও ছবিতে তেমনটি নয়। হত্যাকারীও সচরাচর প্রচ্ছন্ন থাকে না, তবুও রহস্যের আকর্ষণও বিন্দুমাত্র কমেনা। হত্যার বিভীষিকার পর পরিহাস তরল ভঙ্গীর সেই বিনোদী মেধাজটুই বা আর কার ছবিতে পাওয়া গেছে, জানি না।

হিচককের প্রথম পরিচালিত ছবিটি হল নির্বাক—১৯২৬ সালের 'হিলজার'। তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'ব্ল্যাকমেল' হল ১৯২৯ সালের। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি বহু ছবি করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'দি ম্যান হু মিউট মার্চ', 'দি সিক্রেট এজেন্ট', 'স্যাবোটাজ', 'দি লেডি ড্যান্সেস', 'বেবেকা', 'রোপ', 'ডাডো অফ এ ডাউট', 'স্কল রাউণ্ড', 'স্টেজ ফ্রাইট', 'দি রঙ ম্যান', 'স্টেয়ারস অন এ ট্রেন', 'টু ক্যাচ এ 'ক্যামিলিও', 'ডারাল এম ফর মার্ডার', 'রিয়ার উইণ্ডো', 'দি বার্ডন', 'ভার্টিগো', 'নাইকো', 'টোপাক', 'নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট' প্রভৃতি। তাঁর শেষ ছবি দেখা গেছে 'ক্রেন্ডি'।

হিচকক ছবিতে অভিনয়ও করে-ছেন, তবে পরিচালন-কৃতিত্বের তুলনায় সে পরিচয় নিতান্তই স্নান। কিছু স্বধী সমালোচক তাঁর ছবির ট্রিটমেন্ট ও টেকনিক্যাল এক্সি-য়েন্সির জুয়নী প্রশংসা করলেও তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসন দিতে নারাজ। তার কারণ, তাঁর ছবি শুধুই 'ক্রাইম থ্রিলার' এবং মানবিক সত্য, মূল্যবোধ ও মহিমার কথা কিছু বলেনা। জীবনের অস্তিত্ব, লংকট, অবকর ও তার উত্তরণে কোন দর্শন-চিন্তার পরিচয়-অবশ্যই তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় না—একথা সত্য। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে, অপরাধ প্রবণ মনের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে-মুন্সিয়ানার তিনি সেগুল-য়েতে ফুটিয়ে তোলেন, মার্ডার ঘট-য়েও যে শৈল্পিক পরিমিত্তি বোধে মেলাভ্যামাকে প্রাণের না দিয়ে গোটা ছবিকে মার্ডার করেন না, বিভীষিকা-লঙ্কারের পরও যে মৈথুণ্যে তিনি হিউমার সৃষ্টি করে দর্শকদের একটার-টেন করেন, তা বুরি আর দ্বিতীয় কারও ছবিতে দেখা গেলনা। আর্থার কোমানডয়েল বা আগাথা ক্রিস্টি অথবা অন্ত কোন প্রথিতযশা গ্রহ-কারের কোন সুপরিচিত রহস্য

কাহিনীর আশ্রয় তিনি মেনেনি, কারণ বহুপঠিত কাহিনীর চিত্ররূপে-মেই অজানা রহস্য আর থাকেনা। তাঁর অধিকাংশ ছবির কাহিনী-ছবির জটাই রচিত এবং ছবিতে রূপায়িত হয়েছে তাঁর বত খ্যাতি। একদা ক্রফো এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন হিচককের এবং সেখানেই ক্রফো প্রসঙ্গক্রমে বিশ্লেষণ করে দেখি-য়েছেন—হিচককের ছবির বিষয়-বস্তুত মধ্যে যে অপরাধপ্রবণতা, তা হল তাঁর ক্যাথলিক পরিবারের প্রভাবেরই ফল।

বহুগুণা

১ম পৃষ্ঠার পর

ছিলেন। লেকচারারী জেনারেলের বর ফাঁকাই পড়ে থাকে। পরে অবশ্য এই ঘরে বুটা লিং বসা শুরু করেন।

বহুগুণার হস্ত মনের কোণে ক্ষীণতম আশা ছিল যে, উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে তার সমর্থকদের মনোমগ্নন দেওয়া হবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশের মোট ৪২৫টি বিধানসভা আসনে মধ্যে তার সমর্থকদের জন্ত মাত্র ছয়টি আসন বরাদ্দ করা হল। ফল বহুগুণা বুঝলেন আর কোন মোহ রাখার প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করলেন।

বহুগুণাজী ইন্দিরা কংগ্রেস ছাড়িয়েছেন এখাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পর কি করবেন তাই নিয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। বহুগুণা তার অন্ততম বন্ধু ও হস্ত দ্বিতীয় জামা মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবার গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে জাগিয়ে তুলবেন অথবা অন্ত কোন দলে যোগ দেবেন সেটাই প্রশ্ন।

আগ কংগ্রেসের অন্ততম নেতা জগদীবন রায় সম্প্রতি বহুগুণার সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। জানা গেছে জগদীবনবাবু তাকে ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে শবর পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে তার সমর্থক বেশ কিছু নেতা ইন্দিরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবং তারা নির্বাচনে মিলেবাই প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন।

বাইহোক বহুগুণা শাহী ইমাম সহ তার অন্ততম সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে তার দিকান্ত ঘোষণা করবেন।

চলচ্চিত্রের প্রথম পুস্তক পরিদ

পরিদ প্রকাশন

১। পরিপাক, বিপাক ও পুষ্টি / শ্রীদেবজ্যোতি দাশ / ৩০০০

২। খাদ্য ও পথ্য / ডঃ সমর রায়চৌধুরী / ১৫০০

৩৫, রাজা সুবোধি ব্লক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং চন্দ্র কাৰ্যালয় ৬১, হট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

কিছু পুলিশ অফিসার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়

দপন

অবশিষ্ট বর্ষ ১৭শ সংখ্যা ১ শুক্রবার, ২৩শে মে, ১৮০৬ পয়সা

রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের কাজকর্মে

ইন্দিরা গান্ধী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এক জেলীর পুলিশ বড়বড় করছে বলে কিছুদিন আগে ঘর্ষণের পাতার আমরা যে সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম সে সম্পর্কে আরো তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। ওইসব বড়বড়কারী পুলিশের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ পুলিশ অফিসার আছে বলেও বিখ্যাত সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে ওদের বড়বড়ের কর্ম-সূচীর মধ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে-বিলাতিমূলক সংবাদ প্রচার করাও অন্যতম কাজ বলে ওরা ঠিক করছে এবং বর্তমানে তাই করছে। যেমন কোথাও কোম সমাজবিরোধী খুন হলে তাকে কংগ্রেস (ই) কর্মী বলে প্রচার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে-রাই দৈনিক সংবাদপত্রে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ, আমরা

জানি কোন এলাকায় কোম অপরাধ-মূলক ঘটনা ঘটলে থানা পুলিশ তা জনসাধারণ বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে প্রথমে চেপে ধাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। এমন কি যদি কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি থানা পুলিশের কাছে ঐ সংবাদ যাচাই করার চেষ্টা করেন তারা তাও এড়িয়ে ধাওয়ার কিকির খুঁজে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওরা বলে থাকে যে, এখন বড়বাবু নেই বা তদন্তকারী অফিসার নেই। কিছু বলা যাবে না।

অথচ, এখন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখছি উল্টো। আমরা এখানে সব পুলিশের কথাই বলছি না। শুধু বড়বড়কারী কিছু সংখ্যক পুলিশের কথাই বলছি। ওরা সংবাদপত্রের শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

মাঠ ময়দানের ছড়া

এক

এই যে দেখুন হাত,
হাতের মালিক পেট পুরিয়ে
খেতে দেবেন ভাত।
এই যে হাতের রেখা
বৃহস্পতি সদয় হলে
তবেই ভাতের দেখা।
হাতেই পিঠে পুলি,
আবার এ হাত ছুঁতে
রিভলভারের গুলী।
নয়ম হাতের আদর
তেলা মাথায় তেল দেবে আর
নাচাবে নাচ বাঁদর।
যদিও ভাত খান,
খাবার আগে হাতটা চিহ্নন-
বাম হাত না, ডান ?
দুই

খেলার মাঠে খেলার আদর
জোবুসে বাজাই বক্সী কান্দর,
বোম পাউকেল দড়ান দাম
প্রাণের ভয়ে গা ছুঁহুঁ।

খেলার মাঠে সব খেলোয়াড়
পুতুল খেল লক্ষ টাকার ;
দল-মালিকের হাতে স্রুতো
গোল খেলে সে দেখায় স্রুতো।

এ নয় শুধু পায়ের খেলা,
ক্যারাটে আর কুস্তি-ঠেলা,
হাত ও পায়ের শিল্প কারু
না জানলে তার মুখে ঝাড়ু।

এই তো খেলা কেডারেশনের
কলঙ্ক আর দুঃস্বপ্নে,
যে মায়ের পুত্রশোক
এমন খেলা বন্ধ হোক।



রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে খেয়োখেয়ি

এখন কংগ্রেস (ই) দলে সামনের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোর দ্বন্দ্ব বেঁধে গেছে। নির্বাচন বত এগিয়ে আসছে ততই দলের মধ্যে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠীর ভিতর কোন্‌দল মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। কমতা পাওয়ার দাবীতে এবং কমতা ভোপের লড়াইয়ে রাতাপুত্র ভজনা-কারী ছোট থেকে বড়দের মধ্যে যা যা কাণ্ড ঘটছে তাতে ল্যাং মারামারি তো কোন ছার রক্তারক্তি, খুন খারাপিও বাধ যাচ্ছেনা। এই অব-স্থার নির্বাচনে যেন দল জিতে গেছে

এমন ভাবনার কে কোথায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়েও বেশ কাজিয়া চলছে। যে পাণ্ডাব মাতাপুত্র দলের বিশেষ প্রসাদ পাচ্ছে দেখানোও তুমুল কাণ্ড ঘটছে। অনেক অপেক্ষা করে এখনও মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন নি, দলের প্রদেশ সভাপতি দরবারা সিং। একবার প্রতাপ সিং কারয়ণ, আরেকবার অরুণ সিং তারপর জৈল সিং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়ার তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। এবার সুবর্ণ সুযোগের কাছাকাছি এসে তিনি হাল ছাড়তে রাজী নন। জৈল সিং

ও তাঁর দলবলের সঙ্গে দরবারা সাজ-পালদের নিয়ে জোর পথ পরিষ্কারের লড়াই করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ছোটখাট হলেও মাথাচাড়া দেওয়া দাবীদার দাবিদার সিং গরুচা পূর্ণিমা মামলার জড়িয়ে পড়ে রণে ভল দিয়েছেন। তাহলেও সুযোগের সন্ধানে আছেন পাতিয়ালায় প্রাক্তন মহা-রাজার পুত্র সঞ্জয়-প্রিয় এম, পি অম্বদার সিং। আর রয়েছেন হরিয়ানার প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং এম, পি গুরবিন্দার কাউর বার-এর স্বামী হরবচন সিং বার। এই স্বামী-স্ত্রী জুটিও শ্রীমতী গান্ধীর বেশ প্রিয়। তাই চার প্রিয় ও আত্মতাজন দাবী-দারের লড়াই জোর কন্ঠে উঠেছে। জৈল সিং, দরবারা সিং ছাড়াও শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আসাম আন্দোলনের মোকাবিলা নিয়ে ই-কংগ্রেসে মতভেদ

আমাদের আন্দোলন কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমান্ডে বিধাবিভক্ত। কলে ইন্দিরা গান্ধী এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে, কিভাবে এই সমস্তার মোকাবিলা করা যায়।

গত জাহুয়ারি মাসে শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে কমতায় আসার পরও চার মাস কেটে গেছে কিন্তু আমাদের আন্দোলনকে ঘিরে সমস্তা আরও জটিল হয়েছে।

অনেকে আশা করেছিলেন যে,

শ্রীমতী গান্ধী হয়তো এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের ব্যাপক অরাজকতার অবসান ঘটাবেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী এই আন্দোলনের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে কোন কার্যকরী সমাধান বা পথ গ্রহণ করতে পারেন নি।

শেখাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

সবিনয় নিবেদন

লোড-শেডিংয়ের দাপটে ও বাংলা বন্ধের ভয় গত সপ্তাহে দর্পণ প্রকাশ করা যায় নি।

সম্পাদকীয়

আসাম সমস্যা

আসামের আন্দোলন ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। কদিন আগে তিনহুকারিয়ার হাঙ্গামায় মৃত্যুও ঘটেছে। আন্দোলনকারীরা নতি-স্বীকারে রাজী নয়। কেন্দ্রের টাল-বাহানায় তারা এখন বলছে তারা নিজেরাই “বিদেশী” খুঁজে বার করে তাদের আসাম থেকে বিতাড়িত করবে। কয়েক হাজার লোক ইতি-মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে এবং পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে তাতে ভীত সন্ত্রস্ত বঙ্গবাসীরা হলে দলে আসাম থেকে পালিয়ে এলে অবাক হবার কিছু নেই। গণ-গোল চলেছে সমগ্র উত্তর পূর্বা-ক্লেই। কিন্তু যেহেতু আসামে “বিদেশী” বিতাড়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেখানকার লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সেইজন্য এ রাজ্যের অধি-বাসীরা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উদ্বিগ্ন ও প্রতিবাদ মূগ্ধ। ১৭ই মেই বাঙালী বন্দু সেই প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছে, যদিও তাঁতে লাভ কিছুই হয় নি।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয়-য, আসাম সমস্যা সম্পর্কে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। আসামের আন্দোলনকারীরা বলছে ১৯৫১-কে ভিত্তি বর্ধ করে সমস্ত বিদেশীদের বিতাড়িত করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্যঃ ১৯৭১ সালের পর যারা এখানে এসেছে তারা বহিরাগত। কিন্তু আসল সমস্যা কি তাই? যে কোন একটা সালকে ভিত্তি বর্ধ করে তথাকথিত বিদেশীদের বিতাড়ন করলেই কি আসাম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্জে শান্তি কিয়ে আসবে? না, আসবে না, কেননা আসল সমস্যা অনেক গভীরে—সমস্যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বাকার। গত তেরিশ বছরে ভারতবর্ষের অত্যন্ত সমস্যার মত এই সমস্যা সমাধানেরও কোন চেষ্টা হয় নি। নিশীড়িত যে কোন জাতি শোষণ উৎসীড়ন বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেছে তাদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে সাম-রিক বাহিনী। সেই বাহিনী নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে এই জাতির ওপর। নাপাল্যাও তো এই অত্যা-চারের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মার্কসবাদীরা কি এসব কথা বোঝেন না? আনন্দবাজার বা ইন্দিরা কংগ্রেসীদের বা সাজে—সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতার উদ্ধারী দেওয়া—তা কি মার্কসবাদী-দের পক্ষে সম্ভব? একমুখে এক-জনকে বৈরতন্ত্রী বলব, আর একমুখে সেই ব্যক্তির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করব—এ মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্য কাজ নয়। এবং দায়িত্বহীন হঠকারী ও হাস্তকর উক্তিও কোন মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সাজে না।

একটি অস্বস্তিকর রায়

অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীবতুরা রুণু গুহ নিয়োগী এবং অত্যা-পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করে দিয়েছেন।

শ্রীবারিদ সরকার ওরফে কাহ্ন ছিলেন অভিযোক্তা। তাঁর অভি-যোগ এই যে ১৯৭০ সালের ১৩ই নভেম্বর বিকালবেলা তালতলা এলা-কার তিনি তাঁর বন্ধু অশোক দত্তের বাড়ী বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ অভিযুক্ত পুলিশ অফি-সারের মধ্যে কয়েকজন এবং আরও অনেক পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করে অভিযোক্তা কাহ্নকে অশোক দত্ত এবং আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে সুরেশ ব্যানার্জী রোডে বশোদা নিষ্টার ভাণ্ডারের সামনে নিয়ে আসে এবং পরে টাঙ্গী করে লালবাজারে নিয়ে আসে। তালতলায় গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার আসিরা অত্যা পুলিশ অফিসারদের বলে যে এই গ্রেপ্তারের কথা যেন হানীরা পুলিশকে না জানানো হয়।

লালবাজারে কাহ্ন ও অশোক দত্তকে অস্ত্র তিনজন আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হয়। এই তিনজন আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাঁদের রুণু গুহ নিয়োগী-র কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রুণু গুহ নিয়োগী তাঁদের বলে যে কাহ্ন ও অশোক দত্তকে এই দিন বিকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একথা যেন তাঁরা প্রকাশ না করেন এবং প্রকাশ করলেই তাঁদের খতম করা হবে। গুহ নিয়োগী পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অস্ত্র বাস করার জন্য তাঁদের হুকুম করে।

রাতে কাহ্ন ও অশোককে একটি জীপে তোলা হয় এবং জীপে তোলার আগে কাহ্নকে রুণু গুহ নিয়োগী তাঁর শেষ ইচ্ছা কি তা বলতে বলে। কাহ্ন তাঁর একটি পাইলট পেন গুহ নিয়োগীর হাতে দিয়ে তাঁকে ওটা বাড়ী পৌছিয়ে দিতে বলেন। ইতি-মধ্যেই অভিযুক্ত পুলিশ অফিসাররা কাহ্নকে বলে যে কাহ্ন কাজলের সঙ্গে দেখা করতে চান কিনা। কাহ্ন তাঁর সাক্ষ্য বলেন যে কাজলকে কয়েক-দিন আগে মাত্র পুলিশে খুন করে-ছিল।

তারপর কাহ্ন ও অশোক দত্তকে নিয়ে রাতের ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু হ'ল। যাত্রার পথে অভিযুক্ত পুলি-শের একজন কাহ্নকে বললে যে তারা ১১ জনকে ইতিমধ্যেই যমায়ের পাড়িয়ে দিয়েছে, কাহ্ন হবে সংখ্যার কুড়ি।

পার্ক হোটেলের সামনে মস্তপান করে আবার তালতলায় গিয়ে যে এলাকা থেকে কাহ্নকে ও অশোক দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই এলাকার বোমা কাটিয়ে ও গুলি ছুঁড়ে কৃত্রিম সংঘর্ষের অভিনয় করা হ'ল—কাহ্ন সাক্ষ্য বলেছেন—যে-যখন তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয় তখন যে কনষ্টেবলটি তাঁকে হাস-পাতালে পৌছিয়ে দেয় তাঁকে রুণু গুহ নিয়োগী বলে যে সে যেন হাস-পাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে যে তাল-তলায় বোমাবাজির সময় পুলিশ গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয় এবং তখন এই অজ্ঞাতনামা যুবককে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কাহ্ন তাঁর সাক্ষ্য বলে যে রুণু গুহ নিয়োগীর এই নির্দেশ তাঁর কাছে আরও পরি-কার করিয়ে দেয় যে কাহ্নকে গুলি করার সাক্ষ্য রচনা করার জন্য এই কৃত্রিম সংঘর্ষের অভিনয় করা হয়েছিল।

কাহ্নর সাক্ষ্য আরও জানা যায় তিনি ও অশোক দত্ত যে জীপে ছিলেন এই জীপ লহ আরও কয়েকটা পুলিশের গাড়ী তাঁদের কান্দিপুরে নিয়ে যায়। কান্দিপুর থানার ও সি বাইরে এসে “বলির পাঠা ছটোকে দেখি” বলে কাহ্ন ও অশোক দত্তকে মিরীকণ করে।

তারপর পুলিশের অত্যা গাড়ী-গুলো চলে যায়। ছটো জীপ মাজ রেল লাইন পার হয়ে গলার ধার দিয়ে ছুটে চলে। কিছুদূর গিয়ে ছটো জীপই ধারে এবং কাহ্ন ও অশোককে পরস্পর থেকে পৃথক করে কাহ্নকে এক জীপে এবং অশোককে আর এক জীপে মেওয়া হয়। তার-পর কাহ্নকে জীপে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে জীপ থামিয়ে রুণু গুহ নিয়োগী এক পা জীপে রেখে, আর এক পা রাস্তায় রেখে কাহ্নকে গুলি করে। অভিযুক্ত পুলিশের মধ্যে একজন যখন বলে একটা গুলিতে শেষ হবে কিনা, তখন রুণু গুহ নিয়োগী বলে যে রুণু গুহ নিয়োগীর একটা গুলিই যথেষ্ট।

কাহ্ন গুলি খেয়ে জীপের মধ্যে পড়ে যায় কিন্তু জ্ঞান হারায় না। তার জীপ আবার ফিরতি পথে যেখানে অশোক দত্তকে তার কাছ থেকে পৃথক করা হয়েছিল সেখানে নিয়ে আসে। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের মধ্যে উম্মাশঙ্কর লাহিড়ী অশোক দত্তকে জীপের সামনে নিয়ে এসে কাহ্নর দেহ দেখিয়ে বলে হুকুম মত স্বীকারোক্তি না করলে তারও কাহ্নর অবস্থা হবে।

অশোক দত্ত ভয়ে চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু তাকে জীপের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর কাহ্ন কয়েকটা গুলির শব্দ শোনে এবং একজনকে গলার জলে ফেলে দেবার শব্দ শোনে। তারপর অশোক দত্তের গলার “বাঁচাও, বাঁচাও” চীৎকার এবং তারপরই সব নিরুশ চূপ। পরে কাহ্নকে হাস-পাতালে পৌছিয়ে দেওয়া হয় এবং কনষ্টেবল পৌছিয়ে দিতে যায় তাকে বলা হয় সে যেন সংঘর্ষের কথা বলে এবং আরও বলে যেন এই সংঘর্ষে এক অজ্ঞাতনামা যুবককে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই অভিযোগ অচি বিচারপতি বড়ুয়া এবং ধীরেন চক্রবর্তী বললেন যে, বিবৃত ঘটনা অসম্ভব ও অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে বিচারকদ্বয় অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হাজির করা হয়েছে—তার আলোচনা করেছেন এবং নিজ মতামত প্রকাশ্য না করে বসলেন যে ঘটনা নাকি অসম্ভব।

হাইকোর্টের রায়ে আমরা ক্ষুব্ধ

আমরা কোর্টের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—নির্ধাতন করার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করা হলে হাইকোর্টের মামলার বিচারপতিদের রায়ে মামলাগুলি যে কোন কারণেই খারিজ হয়ে থাকে। সম্প্রতি,

(১) বারিহাকাসি সরকারকে গুলি করা ও অশোক দত্তকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত গোয়েন্দা পুলিশ রুণু গুহ নিয়োগী ও অত্যা-দের সেসনস্ কোর্টে বিচারের সময়

মতামত

সম্মতবাক্যে নাকচ করে কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে মামলাটি বাতিল হ'য়ে গেছে।

(২) অর্চনা গুহকে নির্ধাতন করার অভিযোগে অভিযুক্ত গোয়েন্দা পুলিশ রুণু গুহ নিয়োগী ও অত্যা-দের সেসনস্ কোর্টে বিচারের সম্মত-বাক্যে নাকচ করে কলিকাতা হাই-কোর্টের রায়ে মামলাটি নিম্নতর আদালত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজি-স্ট্রেটস্ কোর্টে বিচারযোগ্য বলা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আরও কতকগুলি মামলা, যেখানে পুলিশ অভিযুক্ত—সে সমস্ত ক্ষেত্রেই কলিকাতা হাই-কোর্টের রায়ে অভিযুক্ত পুলিশের পক্ষে গেছে। যেমন—ছটি ভাইকে হত্যা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার শিউ-মঙ্গল সিং ও অব্যানাদের কলিকাতা হাইকোর্ট মাজ কয়েকদিনের মধ্যেই

অচি বারে বারে এই কোর্ট—স্বগ্রীম কোর্ট বলেছেন যে বিচার হ'বে কি হবে না এই পর্যায়ে কোর্টের কর্তব্য হ'ল শুধু দেখা যে, অভিযোগ আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার্য-মুক্ত কিনা। বিচার শুরু হবে কি না, মামলা এই স্তরেই ছিল। স্বগ্রীম কোর্ট বারে বারে বলেছেন যে, এই স্তরে কোর্ট শুধুমাত্র অভিযোগকারীর ব্যক্তব্যই দেখবেন। অভিযুক্ত আসামীর কি বক্তব্য থাকতে পারে তার অনুসন্ধান করার অধিকার কোর্টের থাকবে না। অভিযোক্তার বিবরণ যদি স্বীকার্য না হয়, সে বিবরণ যদি এমন ঘটনার সমাবেশের কথা বলে যা সম্ভব বলেও হতে পারে, তাহলে কোর্ট এই স্তরে হস্তক্ষেপ না করে বিচার শুরু হতে দেবেন।

সমগ্র গাড়ী যখন তাঁর বিরুদ্ধে যাতে মামলা শুরু না হয় এই ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে গিয়েছিলেন স্বগ্রীম কোর্ট তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন যে, এই স্তরে কোর্ট সমস্ত মামলাটিকে একটা ক্ষুদ্র রক্তের মধ্য শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আমিনে মুক্তি দিয়েছে।

পুলিশের পক্ষে এই রায়গুলি কলিকাতা হাইকোর্টের মামলার বিচারপতি শ্রীপূর্ণচন্দ্র বড়ুয়ার কক্ষ থেকেই বারবার ঘটেছে।

যে কোন অন্যান্য আচরণের বিচার হোক—এই আশা ও দাবী নিয়ে আমরা অভিযুক্ত পুলিশদের বিচার করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হ'ই। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট যদি প্রতিজ্ঞা অভিযুক্ত পুলিশের বিচারের সম্মতবাক্যেই বাতিল করেন—তা হলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আমরা মিস স্বাক্ষরকারীরা অমরকেই পুলিশী নির্ধাতনে কতিপয় মৃত বা এখনো জীবিত ব্যক্তিদের বন্দি আত্মীয় বন্ধু। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি আমাদের নির্ধাতিত আত্মীয় বন্ধুদের হৃৎক থেকে নির্ধাতন-কারীর বিচারের দাবী হিসাবে রাখা উচিত।

আমরা আশা করি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অবিলম্বে উল্লিখিত মামলাগুলি রিভিউ করবেন।

রাণু দত্ত—২৫ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
শ্রীট কলিকাতা ২৫। শিখা পাল—
১৭এ সতীশ মুখার্জী রোড, কলি-
কাতা ২৬। সোমা পাল, আরতি
পাল, ভদ্রা দে—১৬/১/১ চন্দ্রনাথ
চ্যাটার্জী শ্রীট, কলিকাতা-২৬।
জিতিকা গুহ—৪ডি৫ কুষ্টিয়া সরকারী
আবাসন, কলিকাতা-৩১।

'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'

দেবাশিস ভট্টাচার্য

ইউ, এন, আই-এর এক সংবাদে জানা গেছে যে ওড়িশার রাজ্য পূর্বে বিভাগের তৈরিক এলেকট্রিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ভূবনেশ্বরে অবস্থিত বাস-স্থান ও বোলাঙ্গির এবং বারিপাদার বাড়ি দুটোর আরকর বিভাগের অফিসাররা ৭ম '৭৯ এর রাতে হানা দেয়। সমাজ বিরোধীদের আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ যেমনি বোমা-ফুরি পাইপগান বা চোলাই মদের রক্তার উদ্ধার করে উদ্ধার হানায় তেমনি আরকর বিভাগ ভবনেশ্বরী, লেখাপড়া শেখা, নতীকারের সমাজবিরোধী 'বাবু' বাড়ির ভাঙারের চালের টিনের মধ্যে পেয়েছে দু লাখ পাঁচ হাজার টাকার নোটের তোড়া। সোনার গয়না মিলেছে লাখ টাকার উপর। শুধু কি এই, ব্যাঙ্কের ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদি উদ্ধারকৃত কাগজ পত্রের দাম হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। এছাড়া আছে শহীদনগরে একটা বড় দোকান আর আছে বেনামী একটা কাপড়ের বেগু। একই রাতে তার স্বত্ব বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়েছিল। বৃদ্ধ স্বত্বমশাই মাকরাতে ঘুম থেকে উঠে এ ঘরনের হানার খাতকে ওঠেন। মেয়ের বিয়ের সময় ইঞ্জিনিয়ার জামাই বানাবার অভিলাবে তো সর্বস্বত্ব হয়েছিলেন। আর আজ 'বাবাজী'র একটু হিসেবের ভুলে আরকর বিভাগকে ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে না পারায় জীবন বাস করতে হলো।

এও দেখেছি, সেলস্ ট্যাক্স বা আরকরের ইমপেক্টর কাম গ্রাজুয়েট জামাইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে স্বত্ব যা মাইনে বলেন তার শিশু উপরিস হিসেব দেন। যে ছেলে ম্যাট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েটের ইংরাজী পরীক্ষার 'ইওর এইম ইন লাইক' রচনা মুখস্ত লিখলো, 'ডাক্তার হয়ে গরীব গ্রাম-বানীর সেবা করবো' সেই ডাক্তার হবার পর স্বপ্ন রচনা করলো নার্সিং হোম খুলে বেগুনা ফাঁদার। আরো কত কি। এই তো বছরখানেক আগেকার কথা। দর্পণে পি, জি, হাসপাতালের দুর্নীতির কথা ধারাবাহিক ভাবে বের হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারাপদ মুখার্জীকে নিয়ে কমিশন করে তদন্ত করালেন। তদন্ত রিপোর্টে কি বলা হয়েছে, একটু ধৈর্য ধরে শুধুন। অধ্যাপক ডাঃ চণ্ডী কর যে পদে কাজ করেন, সেই নদটি নন প্রাকটিসিং। এই পদে থেকে আইভেট প্রাকটিস

করতে হলে রাজ্য সরকারের প্রাক্ত অস্বস্তি প্রয়োজন। কিন্তু তদন্তে জানা গেছে যে, ডাঃ কর অবৈধভাবে আইভেট প্রাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন, যা বেআইনী। কার্ডিওলজির সার্জেন ডাঃ অপূর্ব সাহা একজন রুগীকে দিয়ে একটা পেন মেকার ঘর কিনিতে তা অস্ত্র একজন রুগীর বুক লাগিয়ে ছেন। এবং যে রুগীর স্বর্বে ঐ মূল্যবান পেন মেকারটি কেনা হয়েছিল তার বুক লাগিয়েছেন এটি অস্ত্রস্ত্র মস্ত্রা দামের পেন মেকার। ডাঃ এন, জি, সরকারের চাকরির পদটিও নন-প্রাকটিসিং। কিন্তু তিনি একটা বেসরকারী হাসপাতালের বেতন সমন্বিত-পদ গ্রহণ করেছিলেন যা বেআইনী। এই তিনজন ডাক্তার বাবুকে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে ও এদের কেস ভিজিলেন্স কমিশনে পাঠানো হয়েছে। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে এও জেনেছি যে ডাক্তার-বাবু হাসপাতালে ফিলিপস কোম্পানীর মেশিন কিনিতে বিনিময়ে কোম্পানীর কাছ থেকে নগদে কমিশন না খেয়ে তিন তলা বাড়িটার ওয়ারিং ও দামী দামী ল্যাম্প লাগিয়ে নিয়েছেন। কলেজে এক লটে ১০/১২টা টিলের আলমারী কেনা হল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ওর মধ্যে থেকে একটা আলমারী কমিশন বাবদ নিজের বাড়িতে পাঠালেন। মাঝে মধ্যে এদের হিসেবে ভুল হয় বলেই ধরা পড়েন। ভূবনেশ্বরের ঐ ইঞ্জিনিয়ার যেমন সময়মতো ম্যানেজ করতে পারেন নি, পি, জি-র তিন ডাক্তারবাবুও সেই দশা হয়েছে। নতুবা ক্ষমতার বদাম এক বছরের মধ্যে যেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাঁচ লাখ টাকা কামিয়েছে, ছাড়াপ টাকার বাড়ি কিনিছে, সেখানে এ ব্যবস্থা হল কি করে?

বোধহয় ডাক্তারবাবুদের হ'ল ছিল না। আইভেট প্রাকটিসের নেশার বুদ্ধি ছিলেন, না অস্ত্র কিছুতে জানি না। 'অস্ত্র কিছুতে' হতে পারে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তো ১২মে ১৯৮০ সত্যযুগ পত্রিকা খবর দিয়েছে যে, দশই মে রাতে মেডিকেল কলেজের ভেতরে চোলাই মদ, গাঁজা বিক্রির আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ সত্তরো জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে একজন হাসপাতালের ডাক্তারও আছেন, যিনি গাঁজা খেয়ে বেত'শ অবস্থায় ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারবাবুদের পর

এবার আসি এই সমাজের উচ্চ তলার আর একশ্রেণীর কথা। আই, এ, এসদের কথা বলছি। দিল্লী ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জিইউ, এস, শ্রীবাস্তবের নামে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি সঞ্জয় গান্ধীর মার্কিট কোম্পানিকে বানের বডি তৈরির ঠিকাদারি ও ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয়ের ঠিকাদারি দিয়ে অবৈধভাবে অর্থ লোটার সহযোগিতা করেছেন। নিশ্চয়ই কিছু বিনিময়ে, অথবা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে তদন্ত আর চলছে না। নয়াদিল্লীর পৌরসভা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক সদস্য ভি, এস, আইলাবাদী (আই এ এস) ও কমিটির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম, এস, সচদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে দিল্লী অটোমোবাইল কোম্পানিকে ছ একর পৌরসভার জমি পাইয়ে দিয়েছেন। যেখানে ঐ অটোমোবাইল কোম্পানি একটা হোটেল তৈরী করবে। বেসরকারী ঐ কোম্পানিকে অত্যন্তভাবে এই সুযোগ সুবিধে করে দেওয়ার জন্যই সি, বি, আই, তদন্ত করছিল। ওদিকে ঐ আই, এ, এস, অফিসারদের পকেটেও বেশ কিছু গেছে।

দিল্লীর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা গত ১১মে খবর দিয়েছে যে, উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরের সরকারী গুম সংগ্রহ কেন্দ্রে ওখানকার জেলা শাসক হঠাৎ হানা দেন। কাজ হয়েছে। সমবায় বিভাগের তৈরিক ইমপেক্টরের বাড়িতে দুইইন্ডিয়ান আশি কেজি গম পাওয়া যায়। যার কোন হিসেব দিতে পারেন নি ঐ অফিসার ভক্তলোক। জেলা শাসক তৎক্ষণাৎ তাঁকে বরখাস্ত করেছেন।

উকিল, জজ, ব্যারিস্টার কার কথা বলবো। প্রত্যেক পেণ্ডান্টের মুষ্টিমেয় করেকজন বাড়ে সকলেই লোকের বিপদের সম্ব্যবহার করে অথবা যে কোন হীন উপায়েই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে বাড়তি বেশ কিছু টাকা কামানো যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা শাসক-পুলিশ অফিসারদের আইন শৃঙ্খলা জনিত ক্রাইম কনফারেন্সে এই সব মাথা-ভারী সমাজবিরোধীদের প্রসঙ্গ কখনও ওঠে না। এরা যে বুদ্ধিজীবী কাম সমাজবিরোধী।

এই তো আমাদের পোড়া কপাল দেশ, না হলে রোজগারের কোম্পানীর দাতাশো টাকা মাস মাইনের শিকানবী সঞ্জয় গান্ধী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী সমাবেশে ভাষণ দিতে পারে। জানি না এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন তিনি করবেন কিনা।

কারনানী এস্টেট অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ

বেনিহাপুত্র থানা এলাকার আচার্য জগদীশচন্দ্র বহু রোডে অবস্থিত নামী ও দামী লোকের বাস স্থান কারনানী এস্টেট ভবনে নানা রকম অসামাজিক কাজ কর্ম চলছে বলে ওই ভবনেরই বাসিন্দাদের একাংশের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকাশ, ঐ ভবনে দুই শতাধিক ফ্ল্যাট আছে। তার একাংশে বর্তমানে নামী ঘটিত অসামাজিক কাজ পুণোদয়ে চলছে। তাছাড়া, প্রতিদিনই রাত্রি ১০ টার পরে ঐ বাড়ীর চাষের ওপরে সমাজ বিরোধীদের সম্মেলন হয়। ওখানে মদ, মেয়ে মাছ এবং জুয়ার আড্ডা জোর কদমে চলে। কলকাতার নামী-দামী লোকদের একাংশও প্রায় রাত্রেই ওখানে গিয়ে ওই সম্মেলনের অংশীদার হয়।

হুলিশ সব জানে। স্থানীয়

থানা থেকে শুরু করে উর্দীন পুলিশের একাংশের জাতদারাই ঐ কাও হচ্ছে বলে অস্বস্তান করা হচ্ছে। জানা গেছে, বাড়ির কর্তৃপক্ষ পুলিশ এবং সরকারী মহলে যদিও বহু বার এসব কথা জানিয়েছেন, তথাপি আজো এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না।

অপরদিকে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, কিছুদিন আগে একদিন রাত্রে ওই বাড়ীর একটি ফ্ল্যাটে ভিন্ন রাজ্যের দুই ব্যক্তিকে এবং দুজন অবাঙ্গালী মহিলাকে একত্রে আশ্রিতকর অবস্থায় পেয়ে গ্রেপ্তার করে আদালতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

কারনানী এস্টেট ভবনের শান্তি-প্রিয় বাসিন্দারা অবিলম্বে এই অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন। কারণ, তাঁরা ওখানে শান্তিতে রসবাস করতে চান।

খাচ সংগ্রহ বণ্টন ইত্যাদি এফ সি আইয়ের আওতা থেকে নিয়ে নেবার দাবী

চেষ্টা সালের বারোই ডিসেম্বর ভারতের খাচ কর্পোরেশনকে এক্সেপ্ট হিসেবে নিয়োগ করে তদানীন্তন প্রফুল্ল সেনের পশ্চিমবঙ্গ সরকার খাদ্য শস্য সংগ্রহ, মজুত ও বণ্টনের দায়িত্ব ঐ সংস্থার উপর তুলে করার পর থেকে একদিকে রেশনে সরবরাহকৃত খাদ্য সামগ্রীর মানের ক্রমাবনতি ও অস্ত্রবিক্রে দিকের পর দিন মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এফ সি আই সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিমাণের দিনেই লক্ষ্য রাখে গুণগত মানের দিকে নয়। এছাড়া রয়েছে এফ সি আইয়ের দুর্নীতি, যা লোক-সভা, রাজ্য বিধানসভার আলোচিত হয়েছে ও পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্টেও প্রকাশিত হয়েছে। এ সব কারণেই বামফ্রন্ট সরকারের নমুনা পরীক্ষার পনেরো হাজার টন চাল রেশনে সরবরাহের অংশশুদ্ধ বিবেচিত হয়েছিল।

এদিকে ১৯৭৫ লালেই খাদ্য কর্পোরেশন এক্সেপ্ট হিসেবে কাজ করবে না, এই মর্মে রাজ্য সরকারকে নোটিশ দিয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারকেও দিয়েছে। বিধানসভায় খাদ্যমন্ত্রী স্বধীন কুমার একথা উল্লেখ করেছেন। আজ এই অনিশ্চয়ক স্বরং শাসিত এফ সি আই নিকটতম খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করে প্রশাসনে

জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে এবং রাজ্য সরকারের এক্সেপ্ট হয়েও রাজ্য সরকারকেই উপেক্ষা করছেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা অরবিন্দ ঘোষের উপস্থিতিতে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সকল বক্তব্য জানান। তাঁরা আরো দাবি করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের স্বার্থে খাদ্য সংগ্রহ, মজুত, বণ্টন পরিবহন ইত্যাদির কাজ এফ সি আইয়ের আওতা থেকে নিয়ে রাজ্য সরকারের হাতে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

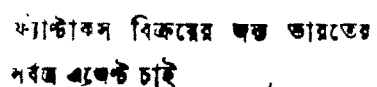
ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

জটিল পুলিশ অফিসারের প্রতি অন্যায় অবিচারের কাহিনী

কিন্তু জিহাদ কিছুতেই অন্তরকে
যেনে নিতে রাজী হন নি। তিনি
হাইকোর্টের আশ্রয় নেবার ইচ্ছা
প্রকাশ করলে তাঁকে ভালো পোষ্টিং-
এর টোপ দেওয়া হ'ল। তিনি তা
প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে পরবর্তী-
কালে হাইকোর্টের নির্দেশে প্রমো-
শন বিলেও আবার, উদ্দেশ্যমূলক
ভাবে তাঁকে বিতর্কিত স্থানে পাঠান
হয়।

অবনয় ভাতা বৃদ্ধির এই স্থা-
রিশটি এখন অর্থ দপ্তরের বিবেচনা-
ধীন আছে বলে জানা গেছে।



সুপ্রীম কোর্ট বনাম পার্লামেন্ট

ভারতপুত্র

সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের ওপর যে রায় দিয়েছেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিমিত। এই রায়ের বলা হয়েছে যে, সংবিধান সংশোধনের কোন এক্সিয়ার সংসদের নেই। দ্বিতীয়তঃ রায়ের এ অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, সংবিধানের নীতি নির্দেশিকাগুলির স্থান মৌলিক অধিকারের উর্ধ্বে নয়। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শিবশঙ্কর এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পুনর্বিবেচনার চেষ্টা তারা উচ্চতর কোন বিচারালয়ের দ্বারা হতে পারেন।

জরুরী অবস্থার স্বযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪২-তম সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তাবিত করেছিলেন। এ সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিচারালয়ের ক্ষমতা ধর্ম করে পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা। সে-পার্লামেন্টের প্রধান যেহেতু প্রধান মন্ত্রী নিজেই, সেহেতু প্রধানমন্ত্রীকে দেশের ডিক্টেটরের আসনে পা কাপোত করা ইচ্ছা ছিল ৪২-তম সংশোধনীর গোপন অভিপ্রেতি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট তাদের রায়ের পরিভার জানিয়ে দিয়েছেন যে সংবিধান একটি পবিত্র বস্তু, তাকে যে সে যখন-তখন ভাঙতে-গড়তে পারে না।

আইন মন্ত্রী যখন ইলিজিটাই দিয়েই ফেলছেন, তখন বোঝাই যায় যে ইন্দিরা সরকার তাদের মনোমত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে সুপ্রীম কোর্টের এই ঐতিহাসিক অথচ সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর রায়কে উলটে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এরকম একটি গুরুতর বিষয়ের নিষ্পত্তি করার জন্য সংবিধানের সংশোধনের জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করাই ছিল উচিত পন্থা। ইন্দিরা সরকার আজ লোক-দস্যুর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানের ইচ্ছামত সংশোধন করতে চাইছেন। রাজ্যসভায়ও তাদের অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভাল। সুপ্রীম কোর্টের সুস্পষ্ট রায়কে নাকচ করার জন্য শ্রীমতী গান্ধী যদি বেঞ্চ গঠন করেন, তবে সেটা এক অর্থে দেশের আইন আদালত ও বিচার ব্যবস্থারই প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করবে। এর দ্বারা গণতন্ত্রের প্রতি তার বিরূপতা এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রতি অহুয়াপও প্রকট হবে। কারণ ১৯৭৭ সালে যে লোকসভার নির্বাচন হয়েছিল, তার অন্ততম ইচ্ছা ছিল : সংবিধানের ৪২-তম সংশোধন।

সেদিন ভারতের জনগণ কংগ্রেস ও ইন্দিরা গান্ধীকে পরাস্ত করে ৪২-তম সংশোধনের বিরুদ্ধেই পরিভার রায় দিয়েছিলেন।

পাবলিক বনাম প্রাইভেট সেক্টর

ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ এবার আরও খোলাখুলিভাবে ভারতের অর্থনীতিকে কল্যাণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তিন-দিন ব্যাপী তাদের বার্ষিক সম্মেলন মঞ্চ থেকে কিজির কর্মকর্তারা এই মর্মে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন কর্মসূচির পরিচালনায় দীর্ঘ মেয়াদে বেসরকারী মালিক বা প্রাইভেট সেক্টরের হাতে তুলে দেবার কথা বিবেচনা করে দেখেন। সেই সঙ্গে অন্ততঃ দুয়েকটি নতুন বা চালু বন্দরের দায়িত্বভারও প্রাইভেট

সরকার এবং সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল ব্যক্তিদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জরূপ। একথা সন্দেহই জ্ঞানেন যে, কংগ্রেস সরকার যতই সমাজতন্ত্রের বুলি কপচান না কেন, দেশের শিল্পবাণিজ্য কৃষি ইত্যাদির চাবিকাঠি রয়েছে একচেটিয়া পুঁজিগতি শিল্পগতি বৃহৎ স্বত্বাধীনেরই হাতে। সেজন্যই ভারতে বড় জোর মিশ্র অর্থনীতি চালু করা হয়, সমাজতন্ত্রের বাস্তব ও দার্শনিক প্রয়োজকে সম্বোধন দিয়ে যাওয়া হয়। জরুরী অবস্থায় এরাই লাভবান হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কারণ তখন প্রমিকেরা তাদের ধর্মঘট করার ট্রেন্ড ইউনিয়ন অধিকার হারিয়েছিল, বেতন মজুরী বৃদ্ধির দাবি তোলা কার্যতঃ নিষিদ্ধ হয়েছিল, শিল্প শান্তির অজুহাতে ১২-১৪ ঘণ্টা প্রম-শোষণ করা অবাধে সম্ভব হয়েছিল বিনা বাড়াতি মজুরীতেই। এদেরই

দেশ কোন রূপগীতি

সেক্টর আওতাভুক্ত করার দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

এ দাবির সমর্থনে অরবিন্দ লাল-ভাই করলা, বিদ্যুৎ, রেল পরিবহন, ব্যক্তিগত ব্যবস্থা ইত্যাদি শিল্পসংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে পাবলিক সেক্টরের ব্যর্থতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ১৯৭১-৮০ সালে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিহার হ্রাস পাবার মূলে ওই কারণগুলোই রয়েছে। কিজির বৃদ্ধি হল, প্রাইভেট সেক্টরকে যদি এই শিল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হত, তবে দেশের আজ এ অর্থনৈতিক দুর্গতি হত না।

পাবলিক সেক্টরের নিম্নায় এত-খানি সোচ্চার ও স্পষ্ট ভাষণ যেমন কিজির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি, তেমনি কয়েকটি মৌল শিল্পের পরিচালনায় গ্রহণে এতখানি মনোযোগ হয়ে উঠতেও তাদের কখনো দেখা যায়নি। পাবলিক সেক্টরভুক্ত বিভিন্ন শিল্পে কাজকর্ম যে আশাহ্বসন নয়, একথা সরকারও অস্বীকার করেন না। কিন্তু বেসরকারী মালিকানাধীন আমল থেকে সরকারী পরিচালনার বহু শিল্পে যে প্রচুত উন্নতি ঘটেছে, এ-সত্যই বা অস্বীকার করা যাবে কেমন করে? তাছাড়া শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়েছিল তো সমাজতন্ত্রের একটি মৌলিক শর্ত পূরণেরই তাগিদে।

কিজির এ-প্রস্তাব কার্যতঃ কেন্দ্রীয়

প্রতিনিধি নেতা নাভাল টাটা যে দেশে পার্লামেন্ট-প্রধান গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট-প্রধান স্বৈরতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন—সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে?

আজ ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার তাই ফিকি বা বৃহৎ শিল্প-পতিরা আনন্দে ভগ্নমগ্ন। ইন্দিরা রাজত্বের মাজ একশো দিনের মধ্যেই তারা যথেষ্ট সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুনাকা বৃদ্ধির পথ তাদের খুলে গিয়েছে। এর পর আর বকলম্ব নয়, দেশের অর্থনীতিকে মোজাহাজি তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ফিকি কয়েকটি পাবলিক সেক্টরের পরিচালনায় বাগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী স্বচতুর মহিলা, তাই অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হয়তো নগ্নভাবে করবেন না, কিন্তু এমন কৌশলে তিনি বৃহৎ পুঁজিকে সম্বল করবেন যে সূপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। অর্থাৎ দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশই ঘটবে, অথচ তাঁর সমাজতান্ত্রিক তাবহুতিটি বজায় থাকবে।

ভারতীয় অর্থনীতির ট্রাজেডি

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

ভারতীয় অর্থনীতির সব চাইতে বড় ট্রাজেডি এখন নাটকীয়ভাবে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। অতি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং অর্থমন্ত্রী ভেক্টরসিং ভারতীয় শিল্প ও বণিক সমিতির সভায় প্রকাশ্যে এই ট্রাজেডির আত্ম-প্রকাশ সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন আর অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পগতি ও বণিকদের দাবি-দাওয়াগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

শিল্পগতিদের দাবিদাওয়াগুলি কি? তারা দাবি করেছেন যে শিল্প সহায়ক ব্যবস্থাগুলি (যথা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, রেল পরিবহন, কাঁচামাল ভারী যন্ত্রপাতি আমদানি, অবাধ রপ্তানি, বন্দর পরিচালনা ব্যবস্থা ইত্যাদি) প্রয়োজন মত উন্নত করতে হবে। তারা আরো দাবি করেছেন যে প্রমিক অশান্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের অন্তে যে ঢালাও ভরতুকি বরাদ্দ রয়েছে তা বজায় রাখতে হবে এবং আরও কমাতে হবে। তাছাড়া সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে যে সব ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প চলছে তাদের অপরিশোধিত স্বপ্নকে মালিকানা শেয়ারে পরিবর্তিত করা চলবে না এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে তাদের ঋণ দানের পরিমাণও বাড়াতে হবে।

অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এগুলি তারা সহায়ত্বের দৃষ্টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করবেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দাবিগুলি স্বতন্ত্রভাবে তাদের প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্রাজেডির শুরু এখানেই। ভারতীয় শিল্পপতিরা তাদের সব দাবি যেনে নেওয়ার পরও কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না। তারা বলতে পারছেন না যে এই দাবিগুলি যেনে নিলেই উৎপাদন বাড়বে, জিনিসপত্র স্থলভ ও সহজলভ্য হবে, বহু চাকুরী সৃষ্টি হবে এবং আন্তর্জাতিক সেনেদেনে আমাদের ঘাটতি হবে না। তারা শুধু বলতে পারেন যদি এ সব করা হয় তাহলে তাদের মুনাকা বাড়বে এবং যদি প্রমিক কর্মচারীদের মুখ জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারা ঐ অজিত মুনাকা রক্ষা করে চলতে পারবেন।

কিন্তু এতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ কি রক্ষিত হবে? কিন্তু বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী শিল্পগতি ও বণিকদের আশ্বাস দিয়েছেন যে যদি তারা সরকারী নীতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে সরকারও তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে উদ্যোগ নেনবেন। আমরা জানি না, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় শিল্পগতি ও বণিক সভাগুলির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান দুর্বলতাগুলি কি করে দূর করতে সক্ষম হবেন। কি ভাবেই বা তারা দেশে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন? কারণ, শিল্পগতি ও বণিকদের দাবিগুলি ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ বিরোধী। এগুলি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এগুলি গ্রহণ ও কার্যকরী করার কথাই চিন্তা করছেন।

অর্থনীতি

এর ফল কি দাঁড়াচ্ছে? শিল্প-সহায়ক ব্যবস্থা বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার শিল্প প্রতিষ্ঠার সহায়ক বটে কিন্তু যে শিল্পগুলি ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত তাদের পক্ষে এগুলির গুরুত্ব ততটা নয়। যেমন চট, চা ও ইনজিনিয়ারিং শিল্পগুলির কথা ধরা যাক। এদের আয়ু-কাল দীর্ঘকালের। এদের মুনাকা ও সংরক্ষিত তহবিল যদি সঠিক ভাবে বিনিয়োগ করা হয় তাহলে তাদের পক্ষে নিজস্ব জেনারেটর ও আত্মস্থতিক ব্যবস্থা করে সংকটের দুর্ভাগ্য মম্ব উদ্ভীর্ণ হওয়া ঋণি নয়। জ্বালানি খরচ শিল্পের সমগ্র উৎপাদন খরচের মাজ ছয় শতাংশ। এই খরচ বিগুণ হলেও উৎপাদন খরচের উপর তার প্রভাব তেমন কিছু বেশী হয় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য বেড়েছে। আমাদের পণ্য এখন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে স্থলভ ও উৎকৃষ্ট মানের হওয়ার সমাদৃত। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার দর চড়া। ফলে ভারতীয় পণ্যের দাম উত্তল হয় বেশী। তবু আমাদের সরকার ভারতীয় পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহ যোগাবার জন্তে ভরতুকি দেন। তার পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। এই টাকা বন্ধ করা হলে ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটের ঘাটতি অর্ধেক কমে যায়। মুদ্রাস্ফীতির একটা বড় কারণ মিটে যায়।

ট্রাজেডি এখানেই যে ভারত সরকার তা করতে চান না। তারা শেবাংশ ঋণ পৃষ্ঠায়

নারী নির্যাতন : একটি সামাজিক সমীক্ষা

মনিলা জুনেজা

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নারায়ণ-পুর, পিণরা, বস্তী ইত্যাদি স্থানে গুণ্ডা, পুলিশ এবং জমিদারদের দ্বারা নারী ধর্ষণের ঘটনা ক্রমাগত সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ-নীতিক পার্টি নিজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘটনাগুলিকে কাজে লাগাবার যথেষ্ট চেষ্টা।

যদিও বা করেছে তবুও এখন অবধি ঘটনাগুলির সঠিক ব্যাখ্যা অথবা পীড়িত লোকদের প্রতি সমবেদনা জানানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা এদের কারো তরফ থেকে করা হয়নি।

নারী হিংসার প্রতিবাদে দিল্লীতে যে গী আন্দোলন সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে এবারে তার প্রধান লক্ষ্য ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

বিগত দুই বছরের এই নারী আন্দোলনের এ যাবতকালীন লক্ষ্য ছিলো এশিয়াবাসী মহিলাদের সতীত্ব পরীক্ষা, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, শারীরিকভাবে হরণ করা এবং গণ প্রথার কারণে ঘটিত মৃত্যু। এ সময়ের মধ্যে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য একটিকে যেমন গী সমস্তা সম্পর্কিত প্রস্নে তাদের নিজস্ব জ্ঞান বৃদ্ধি করা ছিলো অতদিকে তাদের সামাজিক ভিত্তি বিস্তার করার প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান ছিলো। মথুরা মামলার সুপ্রীম কোর্টের যে রায় দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহিষ্কৃত হয়ে ফেটে পড়ে।

১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রের ১৬ বছর বয়স্ক মথুরা নামের এই শ্রমিক গীকে জোর করে দুইজন পুলিশ কর্মচারী খানায় আটক করে তার সংগে বলাৎকার করে। বোম্বাই হাইকোর্ট এই মামলার সেই দুইজন পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালে সুপ্রীম কোর্ট উপরোক্ত রায় খারিজ করে দোষীদের মুক্তি দেয়। সুপ্রীম কোর্টের রায় বলা হয় যে মথুরার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলাৎকার করা হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই রায়ের প্রতিবাদ এবং চ্যালেঞ্জ করে চারজন আইনজীবী প্রস্ন তোলেন যে আইনের কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে পুলিশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এবং তারা এই মামলার পুনরায় তদানির আবেদনও করেন। এবং এর পরেই বোম্বাই, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, পুনা কোলহাপুর এবং ব্যাংগালোরের মহিলা সংগঠনগুলি একযোগে নারী ধর্ষণের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে।

দিল্লীর মহিলা সংগঠনগুলি এর

প্রতিবাদে এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিবাদ সভা ও অন্যান্য কার্যক্রম আয়োজিত করে। অবশেষে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে গণসমাবেশ ও প্রদর্শন করা হয়। এই প্রচার কার্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া, প্রেস কনফারেন্স, সেমিনার এবং হাদপাঠাল, কলেজ ও পুনর্বাসন কলোনিগুলিতে নাটক প্রদর্শন করাও ছিলো। প্রায় ২০টি ছাত্র এবং গী সংগঠন একটি যুক্ত অ্যাকশন কমিটি তৈরী করে এবং ৮৫ মার্চের র্যালিতে প্রায় ৬০০ জন ব্যক্তি প্রদর্শনে অংশগ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ সুপ্রীম কোর্টে মামলার পুনঃতদানির দাবীতে ধরপাও দেওয়া হয়। যুক্ত কমিটির দ্বারা প্রচারিত পত্রিকার যে দাবীগুলি রাখা হয় তার মধ্যে প্রধান দাবী হল, মথুরা মামলার পুনর্বিবেচনা বলাৎকার আইন সংশোধন যাতে প্রমাণের দায়িত্ব মহিলাদের ওপর রাখা হয়েছে, করা বা অহুসারে ভিজ্ঞানাবাদ করার ক্ষমতা কোনো গীকে পুলিশ স্টেশনে আনা যাবে না এবং নারী পুলিশের অভাবে মহিলাদের পুলিশ হাজতে আটক রাখার এযাবৎকালীন প্রথা বন্ধ করা।

এই প্রতিবাদ আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট আন্দোলনের বিষয়-গুলিকে তুলে ধরার জন্য সাংস্কৃতিক উপায় অবলম্বন করা। দিল্লী এবং বোম্বাইএ প্রতিবাদ কার্যের এক প্রয়োজনীয় অংশ ছিলো পথ নাটক এবং তালের মাধ্যমে লোকদের আকর্ষিত করা। দিল্লীতে তিনটি নাট্য সংস্থা, জন নাট্যমঞ্চ, রুচিকা, এবং জাগৃতি 'আওয়ার', এবং 'পুলিশ-চরিত্র' নাটক বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত করে।

যদিও বিভিন্ন শহরে এ যাবৎ মহিলা সংগঠনগুলি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন সংগঠিত করেছে তবুও এবারে বলাৎকার ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত আন্দোলন রাজনীতিক নেতৃত্বের উপর বেশ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সংসদে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে, মহিলাদের খানায় আটক না রাখার নির্দেশ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অপরাধ বিধির নিয়ম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। চীফ জাস্টিস এক সাধারণ বিরুদ্ধিতে বর্তমান বলাৎকার আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়া মথুরা কেসের পুনঃতদানির

জজ অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের তরফ থেকে সুপ্রীম কোর্টে আবেদনও করা হয়েছে।

যদিও সরকারের দিক থেকে এই তৎপরতা দেশের অগণিত বলাৎকারের শিকার মহিলাদের পক্ষে আশার কথা, তবুও এটা ব্যস্তত্ব সত্য যে এ ব্যাপারে রাজ্যে এবং আইনের কর্মগীর অনেক সীমিত। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বর্তমান স্বরূপ এমনই যে লজ্জা এবং ভয়ে অনেক বলাৎকারের ঘটনার খবর জানানোই হয় না। এর কারণ হ'তে পারে—প্রথম আমাদের সমাজ এই নিষেধ অবিচার এবং অত্যাচারের শিকার হওয়া মহিলাদের অস্পৃশ্য বলে মনে করা আরম্ভ করে, দ্বিতীয় পুলিশকে ঘটনার খবর দিলেও তারা রিপোর্ট নিতে অস্বীকার করে। এই ঘটনা যে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে তা বড় শহরগুলির প্রকাশিত অপরাধের সংখ্যার দ্বারা দেখলেই বোঝা যায়, ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে দিল্লীতে বলাৎকারের ঘটনা ৮৮ থেকে বেড়ে ৭২ হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে প্রশাসনের বিভিন্ন শাখা এই ব্যাপারে শুধুমাত্র নীরব দর্শক বা নিকংসাহই থাকে না, বরঞ্চ অনেক সময় দেখা গেছে যে এরাই এই অপরাধ বাড়তে সাহায্য করে অথবা দোষীদের বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এসম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের করিমনগর জেলার কোছর পাকার রাজস্ব্য নারী প্রায় ৫০ বছর বয়স্ক মহিলাকে জমিদারের গুণ্ডারা ক্রয়ক সংগঠন তৈরী করার অপরাধে ধর্ষণ করে। পুলিশ সেই জমিদারের প্ররোচনায় মামলা লিপিবদ্ধ করতেও অস্বীকার করে। ১৯৭৮ সালেই এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ মধ্যপ্রদেশের বেইলাভিলয় লোহ খনির ছাঁটাই হওয়া মহিলা শ্রমিকদের নির্মমভাবে ধর্ষণ করা হয় কেননা তারা আন্দোলন সংগঠিত করার 'অপরাধ' করেছিলো। অনেক সময়ই পুলিশ হাজতে আটক মহিলাদের ধর্ষিত হওয়ার খবর পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোষী পুলিশ কর্মচারীর কোনো শাস্তি হয়না। এবং যদিও বা কখনো তাদের সাজা দেওয়া হয়, আইনের ফাঁক দিয়ে তারা আবার সহজেই বেগিয়ে যেতে সক্ষম হয়, যেমন মথুরা মামলার আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। ১৯৭৮

সালে হায়দরাবাদে রমিজাখা নামে এক মহিলাকে পুলিশ হাজতে ধর্ষণ করা হয় এবং তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার ফলে গণ-রোষের মুখে সেখানে প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক যন্ত্রই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার মত হয়েছিলো, দ্বার চাপে সরকার স্তায়িক তদন্ত করার আদেশ দিতে বাধ্য হয়। জাষ্টিস মুক্তাহার কমিশন এই তদন্তে শুধু দোষী পুলিশ কর্মচারীকেই অভিযুক্ত করে ক্ষান্ত হননি, তার সংগে সরকারের কয়েকজনিক এজেন্টদেরও দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের উপর কোনো পদক্ষেপ আজ অবধি নেওয়া হয়নি। এই দুটো ঘটনায় এবং বিশেষ করে মথুরা মামলার লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে সরকার দোষী ব্যক্তিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় এতদূর এগিয়ে আসে যে তারা এই মহিলাদের 'উচ্ছৃঙ্খল নৈতিক চরিত্রের' নামে অভিহিত করতে একটুও বিধা করেনি। তাই রমিজাখাকে বেস্তাবৃত্তির আইনে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং মথুরা সম্বন্ধে বলা হয় যে সে যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক স্থাপনা করার আগ্রহী। গত দু' বছর ধরে বেলটা, বাজিতপুর, নারায়ণপুর, পিণরা এবং পরাদরিয়ার মত স্থানে যে গণ আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে প্রায় প্রত্যেক

অর্থনীতি

এর পৃষ্ঠার পর

ভরতুকি অব্যাহত রাখতে চান। ফলে বাজারে বিরাট ঘাটতি মেটানোর দায় মেটাতে হবে আমাদের, দ্বারা বেকার অথবা অর্ধবেকার। দুবেলা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও তাদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অথচ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিল্পগুলির যে উৎপাদনক্ষমতা আছে তার সবটা কাজে লাগালেই উৎপাদন বাড়তে পারে এবং অনেক বেশী চাহুরী সংস্থান হতে পারে। কিন্তু কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি শিল্পপতি ও বণিকসভা কেউই বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার কথা বলছেন না। অথচ দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় অর্থনীতি এইখানেই অচলাবস্থায় পড়ে আছে।

এর কারণ কি? কারণ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও শিল্পপতি ও বণিকসভাগুলি জাতীয় স্বার্থের চাইতেও মুনাফা মুগ্ধা অব্যাহত রাখাই বেশী কামনা করে। তারা দেশের যেহনতী মানুষদের প্রেমের উপযুক্ত মূল্য দিতে চায় না, বরং জোর করে তাদের ঘোড়াই নিজেদের পাপের বোঝা চাপাতে চায়। এটা শুধু আমাদের দেশেই

স্থানেই দলিত শ্রেণীর মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এবং এ ঘটনা কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে সরকার বদল হওয়া সত্ত্বেও যথার্থীতি হয়ে চলেছে।

প্রচলিত ভাবে বলাৎকার সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে উদ্ভট রকমের পোশাক আশাকের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে অসামাজিক ব্যক্তিরাই এই অপরাধ করে থাকে কিন্তু এই বৃত্তিও অসামাজিক। এই বক্তব্যের মধ্যে একটা ভুল ধারণা নিহিত আছে যে সরকার এবং রাজ্য মহিলাদের রক্ষক, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাসমূহ এটাই প্রমাণিত করে যে এই সমস্ত অপরাধীদের বাঁচার রাস্তা আইনের ফাঁক এবং সামাজিক নিষ্কৃতি। এবং এই কারণেই আমাদের সমাজের মহিলারা আতঙ্কের জগতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে রাজ্যের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত করার এবং অপরাধীদের রক্ষা করার প্রচেষ্টা। আমাদের ক্ষমতা ব্যবস্থার সংগে এই ঘটনা বিশেষভাবে জড়িত কেননা বলাৎকার রাজ্যের বিভিন্ন অধিকারীদের কাছে সব রকমের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারার একটা অন্তর্বিষয়। এর হাত থেকে বাঁচার শেবাংশ ৭ম পাতায়

নয়, সর্ব কালে সর্ব দেশের পুঁজিবাহীরাই এই অভ্যাস রপ্ত করেছে। দুর্বলের উপর দ্বার চাপাও, নিজেদের দায় খালিস করা, এই তাদের নীতি। আমেরিকার ক্রাইসলার কর্পোরেশন, বোরিং, ফাট বোটন কর্পোরেশন যে ধারার মার্কিন অর্থনীতিকে দুর্বল করে তোলে আমাদের টাটা বিড়লা সিংহানিয়ারাও তাই করে। তারা সরকারী টাকায় অর্থাৎ জনসাধারণের টাকায় ব্যবসা করবে এবং দাম চড়িয়ে জনসাধারণেরই পকেট কাটবে এনিমমই চালু রাখতে চায়। বেআদব যেহনতী মানুষগুলি যদি তা মানতে না চায় তাহলে তারা এমন সরকার চায় যে সরকার জমিদারের গোমস্তার মত প্রজাঠেভাবে এবং খালনা উত্তল করবে। ভারতীয় অর্থনীতির ট্রাজেডি হচ্ছে যে তারা তেমন একটি সরকার পেয়েছে এবং জুন মাসের গোড়াতেই কেন্দ্রীয় বাজেটের মারফৎ জনসাধারণের উপর হামলা শুরু হবে। শিল্প ও বণিক সমিতির সভায় সরকার ও বণিকপ্রত্নদের নাক শোঁকাতকি এই ট্রাজেডিরই স্বজগাত করে। শাসকশ্রেণীর পক্ষে এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি মঞ্চস্থ করার পূর্ব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছেন।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহী সাত বোন

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বে বাংলাদেশ পশ্চিমে বার্মা এবং উত্তরে চীন দ্বারা পরিবৃত্ত ভারতের সাতটি রাজ্য, যাদের সাত বোনও বলা হয়ে থাকে, আজ বেশ কিছুদিন ধরে এক বিদ্রোহী মেজাজ নিয়ে আছে। এই রাজ্যগুলি হল আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশ।

আসামে তথাকথিত 'বিদ্রোহী'দের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন এবং ভারতীয় সৈনিকদের সংগে নাগা এবং মিজোরাম সংঘর্ষের খবর আমরা প্রায়ই কাগজে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাস্তব ঘটনার হদিশ পাওয়ার জন্য এর আরও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার জন্য বিশেষভাবে ভারত সরকারই দায়ী। কেননা বহুকাল ধরেই এই অঞ্চলের বাসিন্দারা অবহেলিত হয়েছে। তথ্যও এই তরুকে প্রমাণিত করে। ভারতের সামগ্রিক চা উৎপাদনের ৬০ শতাংশ (বা ১১৭৭-৭৮-এ ৫৫৫'৩ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে) এবং ৩৫ শতাংশ খনিজ তেল এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় কিন্তু তা মূলত আঞ্চলিক বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য সরকার বিশেষ কোনো চেষ্টা করেনি। উদাহরণ স্বরূপ আসামে যে পরিমাণ খনিজ তেল উৎপাদন হয় তার ৪২ টাকা প্রতি টন হিসেবে রয়্যালিটি দেওয়া হয়ে থাকে অথচ এই তেলের জন্য বর্তমান দর ১৬০০ টাকা প্রতি টন। এই আসামেই ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের যে চা উৎপাদন করা হয় তা কলকাতা ও লওনের কিছু লোকের পরিচালনাধীন। কাগজ তৈরীর কুচা মূল আসাম থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় কাগজে রূপান্তরিত করার জন্য এবং আসামের অধিবাসীরা সেই কাগজই বেশী দামে কিনতে বাধ্য হয়।

যেহেতু আসামে প্রশিক্ষিত বিকশিত করার প্রচেষ্টা হয়নি সেহেতু বহুকাল ধরেই এই রাজ্য আর্থিকভাবে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এই অনগ্রসরতার স্বরূপে আসামের ব্যবসা বাণিজ্য উত্তর এবং মধ্য ভারতের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। প্রতিবেশী রাজ্যের শিক্ষিত বাঙালীরা অত্যন্ত জীবিকাশ্রমোৎসাহিত হয়ে হস্তগত করতে সক্ষম হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের অধিকার

সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সংগে সংগে বাইরের লোকের প্রভুত্বকে আজ আর ভাল চোখে দেখে না।

কিন্তু এর সংগে সংগে এও স্বীকার করতে হবে যে বার্ষিক এবং হতাশার ফলে আসামের যুবক সম্প্রদায় বেশীর ভাগ সমগ্রই ভুল লক্ষ্যে আঘাত করে বসেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ, থেকে প্রচুর বাঙালী এই রাজ্যে চলে আসে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল গরীব চাষা অথবা জেলে ইত্যাদি এবং তারা সমান ভাবে গরীব আসামবাসীদের সংগে সংগে ধনী বাঙালী এবং ধনী আসামীদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ আসামীতাবীদের তুলনায় রাজ্যে এদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে। এবং আসামীরা আজ ঠিকই ভয় করে যে এভাবে তাদের নিজের দেরই রাজ্যে তারা অল্পসংখ্যক শ্রেণীতে পরিণত হয়ে পড়বে। জাহ্নবীর নির্বাচনের প্রাক্কালে যে আন্দোলনের স্বরূপাত হয় তার মূল দাবী হল বহিরাগত বাঙালীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও তাদের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করা। কিন্তু নিজেদের সঠিক অধিকার অর্জনের এই সংগ্রামের প্রবলতার এবং রাগের স্বাধীন অনেক আন্দোলনকারীই দ্বিগুণ বহিরাগত শ্রেণীর লোকদের আক্রমণ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং শাসক শ্রেণী দ্বারা তাদের অধিকার হরণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তারা সাধারণ শ্রেণীর লোকদেরই দোষারোপ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপেও ইহুদিদের এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ধনী ইহুদি ব্যবসায়ী অত্যাচারী চরিত্রের হওয়ার ফলে, ভীষণ ভাবে আর্থিক সমস্তা কবলিত ইউরোপের গরীব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নাৎসি এবং ক্যাসিরা সহজেই সম্পূর্ণ ইহুদি জাতির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়। যদিও এই ইহুদিদের মধ্যে অধিকাংশই সমানভাবে নিপীড়িত শ্রেণীর লোক ছিল। এবং আসামেও ঠিক এই ভাবেই সঠিক বার্ষিক নেতৃত্বের অভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দল যেমন কংগ্রেস (ই) এবং আর এন এস আসামীদের সঠিক লড়াইকে ভাষার লড়াইয়ে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। আসামের কাছে যে সংবাদ এসেছে তার অহুসারে সেখানে আসামী এবং

বাঙালীদের বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে। জাহ্নবীর ৩ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে কামরূপ জেলায় নলবাড়ী এবং মুকালমুয়া অঞ্চলে বাঙালী দের আক্রমণ করে হত্যা করা হয় এবং তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয়। পরে জাহ্নবীর ৯ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে বাঙালীরা (মুখ্যতঃ বাংলাদেশ আগত) সেনা এবং সি আর পি-র সাহায্যে গরীব আসামীদের আক্রমণ করে এবং তাদের উপর অত্যাচার করে তাদের সম্পত্তি লুট করে। ভারতীয় সেনা এবং সি আর পি র ভূমিকাকে এককথার অসত্য বলা যেতে পারে। ভিসেসর মাসের ১২ তারিখে জুলিয়াজানে ১২০০০ লোকের শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর সি আর পি যথেষ্টভাবে যে গুলি-বর্ষণ করে তার ফলে বহুলোক হতাহত হয়। যদিও সরকারীভাবে মৃতের সংখ্যা ৪ জন বলা হয়, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য অনুসারে ১৭১ জন নিখোঁজ। ক্রমশঃ এটা লুপ্ত হয়ে পড়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করে ভাষা কেন্দ্রিক আঞ্চলিক সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে উৎসাহিত। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস (ই)র যুব ক্রুট দ্বারা পাটী আসাম বিরোধী আন্দোলনের স্বরূপাত। আসামে বাঙালীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর ফলে পশ্চিম বাংলার লোকদের মনে যে ভয় এসেছে এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তার স্বযোগ নিতে উৎসাহী। আসামের চাইতে পশ্চিম বাংলার যে বার্ষিক শক্তি বেশী সংহত তারা কি পশ্চিম বাংলার আসামের অবস্থার পুনরুদ্ধার হওয়ার আটকাতে সক্ষম হবে—এটাই আজ বিরাট প্রশ্ন।

তাই বলে সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহের চরিত্র কিন্তু একরকমের নয়। ত্রিপুরার আদিবাসীরা রাজ্যের কিছু অঞ্চলে আরো বেশী কিছু জায়গায় সি পি আই-র (মা. লে.) নেতৃত্বে গেরিলা কৃষক শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা সরকার ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে। নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং মণিপুরে অধিকাংশ অধিবাসীই ভারত সরকার থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবীতে সংগ্রামরত।

নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের অধিবাসীদের স্বাধীনতার দাবী বহুকাল ধরেই অবহেলিত হয়ে আসছে। ভারত স্বাধীনতার প্রাক্কালে জেড এ কিজোর নেতৃত্বে নাগারা ভারত দেশের অংশ বিশেষ হওয়ার অনিচ্ছা

প্রকাশ করে এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকতে চায়। কিন্তু মেহর তাঁদের এই দাবী কোনোভাবেই স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না এবং তার ফলে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে তাঁরা ক্রমাগত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সংগ্রাম শেষ করার চেষ্টার ফল আরো বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় এবং ভারত সরকার অধিকাংশ নাগাদের আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকে—নাগাদের এই সংগ্রাম এখনো অব্যাহত।

অন্যদিকে যদিও মিজোরাম ভারতের অংশ বিশেষ হতে রাজী হয়েছিলো কিন্তু ১৯৫৯ সালের ব্যাপক ভূমিকম্পে ভারত সরকারের মনোভাব তাদের প্রতি যথেষ্ট সহ্যরক না হওয়ার ফলে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মিজো তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় দ্বারা দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্তকে তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে সক্ষম হবে। ১৯৬৩ অবধি তারা মিজো জাশনাল ক্রুট গড়ে তোলে এবং স্বাধীন মিজোরামের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যদিও অধিকাংশ প্রাথমিক পর্যায়ের নেতৃত্ব এখনো ভারতের অধীনে থাকার পক্ষে তবুও অধিকাংশ বিদ্রোহী এখন গভীর জঙ্গল এবং পার্বত্য অঞ্চল থেকে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

মণিপুরের অধিবাসী মেইতেই প্রমুখ আদিবাসী ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। তারা দুটো দলে বিভক্ত—

নারী নির্যাতন

একমাত্র আশা, মহিলাদের দ্বারা এর বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে তীব্র প্রতিবাদের মধ্যেই নিহিত।

যদিও মহিলা আন্দোলন আজ বিশেষ ভাবে বড় বড় শহরেই দীর্ঘমেয়াদ এবং দীর্ঘমেয়াদিক পরিধির মধ্যে জী সমস্তাভিত্তিতে সংগঠিত কিন্তু আবার মতবাদের ভিন্নতার ফলে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত—সরকারী নিপৃহতা সংগে যুক্ত হয়ে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে অনেক সমস্তাই সমাধান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তবুও মধ্যা-মামলাকে কেন্দ্র করে যে যুক্ত আন্দোলনের স্বরূপাত আজ হয়েছে, জী অধিকার অর্জনের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পথে তা নিশ্চয়ই এক বিরাট পদক্ষেপ।

একটি পিকিংগী গণ মুক্তি সেনা এবং অস্ত্রি বার্মার দীর্ঘমেয়াদে বাংলায় পাক গণ বিপ্লবী পার্টি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এই সমস্ত আন্দোলনের বিশিষ্টতা এই যে এদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বারপহী হওয়ার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাগা এবং মিজোরাম তরুণ নেতৃত্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পিকিংগের অনেক কাছাকাছি—যদিও এদের পুণ্যতন নেতৃত্ব ক্রিস্টিয়ান মিশনারীর প্রভাবের মধ্যে ছিলো। ত্রিপুরায়ও সি পি আই (মা. লে.) বিশেষ ভাবে সক্রিয়। শুধু আসাম এবং মেঘালয়ের আন্দোলন বারপহী না হয়ে জাতীয়তাবাদী চরিত্রের যদিও সেখান থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে কিছু রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন যুবক ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে শুধু একটি জাতি একা কোনো স্বাধীনতার লড়াই জিতে পারে না, স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য লেই সমস্ত জাতি এবং শ্রেণীর সংগে এক হওয়া প্রয়োজন দ্বারা নিজেদের ভারতীয় শাসক শ্রেণীর সংগে সর্বজন সংগ্রামে লিপ্ত।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মরণসভা

প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারত-চীন মৈত্রী কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কালিধ্ব দাসের অধিবেশন গত ১১মে তালতলার প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে এক সভা হয়। তাবগভীর পরিবেশের অধিষ্ঠিত এই সভায় বক্তারা কালিধ্ব দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এক প্রস্তাবে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু প্রসঙ্গে তত্ত্বের দাবিও করা হয়। দৈনিক কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতি দাশগুপ্ত, বিজুতি নন্দী, বিমল মিত্র, ভারত-চীন মৈত্রী কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ সভাপতি এইচ. এন. তেকটরাসাইরা, স্বর্গাল সরকার প্রভৃতিরা বক্তব্য রাখেন।

প্রাক্তন বিধানসভা সদস্যের জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন উপ-সচিব জনাব রক্তিমল হক গত ২৩শে এপ্রিল বর্ধমানের কামতাকী গ্রামের নিজস্ব বাসভবনে দেহবিলাস প্রযবোসিস রোগে মহাদা আক্রান্ত হয়ে ৬৯ বছর বয়সে দ্বারা দ্বারা ২৪ এপ্রিল তাঁর সমানে বিধানসভার সচিবালয়ে ছুটি দেওয়া হয়। তাঁর জী, তিমপুজ ও তিন কন্যা বর্তমান আছেন।

গোপাল হালদার ও রবীন্দ্র পুরস্কার মিহির আচার্য

সম্প্রতি রাজনীতিগতভাবে পশ্চিম বাঙলার সি পি আই এম-সি পি আই কাছাকাছি আসার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টে একটা বড় রকমের দুর্ভাবনা ঘুচেছে। পাটি ভাগ হয়ে যাবার পরে সাহিত্য-সংস্কৃতির খ্যাতিমান লোকেরা দলবলে সি পি আই-এ থেকে বান। এর জন্ত সি পি এমের সংস্কৃতি ফ্রন্ট কানা হয়ে যায়। সরকারী পুরস্কার ট্রস্টের দেয়া যেতে পারে এমন লেখকই পাওয়া যায় না। প্রথম বার বামফ্রন্ট সরকার সি পি এমের কাছাকাছি মানুষ নেপাল মজুমদারকে 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। আরেকজন পাটির ঘনিষ্ঠ লেখক আছেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, দস্তবত তিনি এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর 'শব্দচক্র' সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির জন্য পুরস্কৃত হতে পারলেন না। অথচ ওই গ্রন্থটির নিজস্ব গুণেই এই স্বীকৃতি প্রাপ্য।

নারায়ণ চৌধুরীও না হয় গেল। তারপর সি পি এমের লেখক আর কে আছেন?

এই দৃষ্টান্ত দুর্ভাবনার হাত থেকে বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি এম ছাড়া মুক্তি পেলেন। গত বার কবি অরুণ মিত্রকে পাওয়া গিয়েছিল। এবারও কোনো অস্থিবিধে হয়নি। গোপাল হালদারকে 'রূপনারায়ণের কূলে' আত্মজীবনীর জন্য ৭৫ বছর বয়সে পুরস্কৃত করা গেল।

বামফ্রন্ট সরকার পাঁচ বছর পূর্ণ মেয়াদে বিরাজ করবেন। আশা করা যাচ্ছে পরবর্তী বছরগুলিতে পুরস্কার দেবার লোকের অভাব হবেনা। কারণ সি পি আই-এর সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টে অনাথ্য লেখক মজুত আছেন। সি পি এম-এর শক্তিশালী রাজনৈতিক ফ্রন্ট আর সি পি আই-এর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের স্তম্ভ দখিলনে এদেশে মার্কসবাদী চেতনা ক্রমশ উজ্জল হবে।

এটাও গভীর আনন্দের কথা, সি পি এমের চীনপন্থী বদনাম ঘুচেছে, সি পি আই-এর গুরুভায়েরা সি পি এম-কে বিশ্বাস করছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সমস্ত পদক্ষেপ সি পি এম সমর্থন করছেন এবং এতদিন বিতর্কে আসতে না-চাইলেও আজ প্রকাশ্যে চীনেরও সমালোচনা করছেন। সি পি এম-এর এই জাতীয় নতুন প্রয়াস উভয় পাটিকে কাছাকাছি আনতে সাহায্য করছে। অতীত দিকে বৈরতন্ত্রের

বিরুদ্ধে প্রোগামবাস্তিকে অঙ্গুর রেখেও গভীর জলের চুক্তিতে কিংবা আসামে ইন্দিরার সাম্প্রতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সি পি এম-এর পক্ষে উচ্চকণ্ঠ সমর্থক হতে আটকানো। অর্থাৎ বৈরতন্ত্রেরও ভালো কাজ আছে বা কমিউনিষ্টদের সমর্থনযোগ্য। গদি দখলটাই প্রধান কথা হলে এসব প্র্যাগমাটিজম কর-তেই হবে।

রবীন্দ্র পুরস্কারের এবার চূড়ান্ত যে তিন জন বিচারক মনোনীত হয়েছেন তাঁদের চেহারা দেখুন। এক জন ডঃ কুদ্রিয়াম দাশ, যিনি বামফ্রন্ট সরকারী আমলে ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধান হয়েছেন, সতীকান্ত গুহকে রবীন্দ্র-পুরস্কৃত করার সময় ডঃ দাশেরও দায়িত্ব বর্তে ছিল। আরেকজন ডঃ কুদ্রিয়াম চৌধুরী, বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে তাঁর যে কোনো প্রজ্ঞা বা সহানুভূতিবোধ আছে তার কোনো প্রমাণ নেই। অতীত জন মহাশেতা দেবী, জাগিয়ান সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারটা তিনি পেয়ে গেছেন।

এ না হয় সি পি এম সি পি আই-এর বোম্বাশ্চকার ব্যাপারটা গেল। বামফ্রন্টে তো অতীত পাটিও আছে এবং তাঁদেরও ঘনিষ্ঠ লেখক থাকার কথা। যেমন মনে পড়ছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আর এস পি-র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই জানি। গদি দখলও যখন ভাগা-ভাগি হয়ে গড়ে উঠেছে তখন পুরস্কার-ট্রস্টের ব্যাপারে অতীত পাটি সংশ্লিষ্ট লেখকদের স্বযোগ দেয়া হবে না কেন? বিশেষ করে বীরেনবাবু যে একালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি কে অধীকার করবে?

ফ্রন্ট সরকার বলবেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই পুরস্কার ব্যাপারটা ঠিক করা হচ্ছে। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটা এদেশের সব রকম মতলববাজরা ব্যবহার করেন নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি হামিল করার জন্যে। বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলতে যদি মনে করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বর্গ 'প্রাথমিক' গ্রন্থ মনো-নয়নের ব্যাপারটা করে দেবেন সেখানে প্রশ্ন জাগে এই ব্যাপারে 'গণতন্ত্র' কী ভাবে মূল্যিত হল? কে না জানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব অধ্যাপকদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল তথা দ্বিভাষ্যের উপাদক বেশি নেই। 'গণতান্ত্রিক চেতনা' তাঁদের ধারে কাছে নেই। এবং তাঁরা যে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাঠ তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে খবর রাখেন

অসম্পূর্ণ মে দিবস : একটি দৃষ্টান্ত চিত্তরঞ্জন মজুমদার ও বিদ্যুৎ পাল

প্রতিবারই মে দিবস আসে। এবারও এলো। প্রমিত-কৃষক তথা সর্বস্তরের মেহনতী মানুষ প্রত্যেকেই আর একবার স্মরণ করলো ১৮৮৬ সালের সেই রক্তাক্ত ইতিহাস। রক্ত-পতাকা আর মুষ্টিবদ্ধ হাতের মিছিলে ধনিত হলো নতুন নতুন শপথ। কিন্তু প্রাইভেট বা বেসরকারী বানকর্মীরা যে তিমিরে ছিলেন সেখানেই আছেন।

যে আট ঘণ্টা কাজের দাবীতে সারা বিশ্বে মে দিবসের উজ্জল উপস্থিতি প্রাইভেট বানকর্মীরা আজও সেই আট ঘণ্টা কাজের আওতার বাইরে। দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক দিক থেকেও লোপিত।

প্রাইভেট বানকর্মীরা দৈনিক গড়ে টিকিনের তিরিশ মিনিট সহ ১৪-১৬ ঘণ্টা প্রম দিতে বাধ্য থাকেন। এই ১৪-১৬ ঘণ্টার মধ্যে জাইভার ও কণ্ঠস্বরকে তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া আরও যে কত কাজ করতে হয়, যার বিস্তৃত বিবরণের অবকাশ নেই এখানে। তবু যে

এমন দুর্নাম তাঁদের শত্রুও হবেন না। এই ব্যক্তির নাকি প্রাথমিক উল্লেখযোগ্য বইগুলি বেছে দেবেন! একে যদি 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' বলা যায় তাহলে 'প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি' আর কাকে বলা যায়? এই সকল ভুলমোক ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরির ধান্দায় কোনোরকম প্রগতিশীল কর্মের সঙ্গে যুক্ত নন। এমন কি যখন যে সরকার আসেন তখনই তাঁদের আত্মবাহ কর্মচারীতে পরিণত হতেও দেখি করেন না। 'প্রগতি-শীল' সরকারের সময় প্রগতিশীল, 'প্রতিক্রিয়াশীল' সরকারের সময় প্রতিক্রিয়াশীল। অর্থাৎ এঁরা বইয়ের গুণাগুণ বিচার না-করে সরকারের বোঁকটা কোন দিকে সেদিকে নজর রাখেন। যেমন গোপাল হালদারের বেলায়। এঁরা দেখেছেন সি পি এম-সি পি আই পুনরায় ভাই-তাই হচ্ছে, সুতরাং গোপাল হালদারকে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিলে তাঁদের আশ্রয় নষ্ট হবেনা। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এই ভাবেই বুদ্ধি করে বাচেন বলেই তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়।

পদ্ধতি যখন এ রকম তখন গোপাল হালদারের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা তথ্য বলে বলি জানাই।

কয়েকটি কাজের উল্লেখ না করে উপায় নেই তা হলো, লাইন দিয়ে তেল সংগ্রহ করা, মারপথে চাকা পান্টানো, দুর্ঘটনার মোকাবিলা করা ইত্যাদি। এছাড়া ছোটবড় বহু কামেলার কাজ খাড়ে ভুলে নিতে হয় তাদের। এক কথায় রাস্তার বাস নামে মালিকের কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব থাকে বানকর্মীদের।

অথচ প্রতি ড্রাইভারের দৈনিক গড় আর টিকিনের ৩-৪ টাকা সহ ৪০-৫০ টাকা এবং তা প্রতি কনডাকটরের ক্ষেত্রে টিকিনের ২-৩ টাকা সহ ২০-২৫ টাকা। উভয়ের দৈনিক গড় আয়ের চিত্রটা কাগজে কলমে যতটা চমকপ্রদ, বাস্তবে ততটা নয়। কেননা কর্মীদের কোনো নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। ফলে মালিকপক্ষ তাদের যেদিন খুশি ডাকতে পারে আবার যখন খুশি ডাকিয়েও দিতে পারে। সবই মালিকের মজির ওপর নির্ভর করে। এছাড়া বেশীর ভাগ কর্মীর সপ্তাহে ৩-৪ দিনের বেশী কাজ করার মতো দারিদ্র লক্ষ্যতা থাকে না। তার ওপর ৩-৪ দিনের বেশী কাজ পাওয়াও ভো মশকিল। কেননা অল্প হাত কখনো মালিকের দরজায়, কখনো বা ইউনিয়ন অফিসে কড়া নাড়ছে। সুতরাং যারা কাজ পাচ্ছে তাদের মাসিক আর কত দাঁড়াচ্ছে এবং কিতাবে সংসার চলছে, তা আর হিসেব কবে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের না আছে চিকিৎসা-ভাতা, ডিয়ারেন্স এ্যালাউন্স, না আছে প্রতিডেট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় প্রাইভেট বানকর্মীদের অবস্থাটা ঠিক ঠিকে মজুরদের মতো। যতক্ষণ গতর আছে ততক্ষণই মালিকের কাছে তাদের চাহিদা। তারপর সব শেষ।

এই অর্থনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি তারা সামাজিক দিক থেকেও যে কতটা লোপিত, তা আমরা সবাই জানি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বুঝি না এবং বোকার মতো মানসিকতাও হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রাইভেট বানকর্মীদের 'তুই', 'তুই' অপবা 'এই' লম্বাধনের 'গণতান্ত্রিক অধিকার' আজও আমরা অঙ্গুর রেখেছি। বাস আস্তে চললে আজও আমরা ভুল পোশাকের আড়ালের আদিত্ব অসভ্য চেহারাটা প্রকাশ করতে বিধা করি না : 'শালা শুরোরের বাচ্চা!'...

কিন্তু কেন যে বাস আস্তে কিংবা জোরে চলে, তা তেবে দেখার অবকাশ নেই আমাদের। ওই আস্তে কিংবা জোরে চালানোর ওপরই

নির্ভর করে ওদের কাজ-কটির প্রম। আস্তে কিংবা জোরে চলা চালানোর পরের বা আগের বাসকে টেকা দেওয়া সম্ভব নয়। আর টেকা দিতে না পারলে মালিকের কাছে কর্ম-দক্ষতার প্রমাণও দেওয়া যায় না। এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট জায়গার খাজী (যেমন কোনো মিনেমা-শো ভাডার ভিড়) ধরার জন্তও আস্তে কিংবা জোরে চালানোর দরকার হয়। কেননা খাজী না হলে বাসের 'সেল' বা টিকিট বিক্রিও কমে যায়। আর 'সেল' কমা মানে কেবলমাত্র কর্মীদের 'কমিশন' কমা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে তাদের কর্মদক্ষতাও কমে যাওয়া। যার অনিবার্য পরিণতি—'কাল থেকে তুই আর বাসে উঠবি না।'

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, এই অর্থনৈতিক তথা সামাজিক রঞ্চনার শিকার হয়েও প্রাইভেট বানকর্মীদের মধ্যে কোনো আন্দোলন নেই। ইউনিয়ন আছে, কিন্তু তার কর্মসূচী মাত্র বছরে একবারই দেখা যায়। তা হলো—পূজার সময় বাসের মাথার পতাকা উড়িয়ে বোনাসের আন্দোলন। এছাড়া সারা বছরে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো আন্দোলনই থাকে না। মাঝে মাঝে হয়তো দেখা যায়, কোনো কটে কোনো দুর্ঘটনার দরুন কোনো কর্মী নিরবোধ খাজীদেহ হাতে মার খেলে অথবা দুর্ঘটনার মারা গেলে এক বেলা অথবা এক দিনের অন্তর্গত কটে বাস চলাচল বন্ধ থাকে। তাছাড়া কর্মীদের মানা কামেলা নিয়ে ইউনিয়ন এত জড়িয়ে পড়েন যে, আসলের দিকেই নজর দিতে পারে না যেমন, কাকে কবে কোন বাসে ডিউটি দেওয়া হবে—এই ব্যাপারটা সামাল দিতেই ইউনিয়নের নাতিবাস ওঠে। যেখানে ইউনিয়ন শক্তিশালী সেখানে ইউনিয়নের কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা থাকে ঠিকই। কিন্তু মালিকের স্বাধীনতাই থাকে পুরো মাত্রায়। মালিকের মজি হলে নিয়োজিত কর্মীর নামে ইউনিয়নের কাছে মিথ্যে অভিযোগ এনে, তাকে ডাকিয়েও দিতে পারে। সেখানে ইউনিয়নের কিছুই করার থাকে না।

এত দুর্বল সংগঠন যে কোনো অধিকারই ছিনিয়ে নিতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে এ ব্যাপারে প্রতিটি কর্মীরও দায়িত্ব অপরিহার্য। কেননা তারাই তো সংগঠন গড়ে তোলেন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। সুতরাং তাদের সচেতন-তাই সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে সক্ষম এবং তারাই পারেন শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে।
শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

খেয়োখেয়ি

১ম পৃষ্ঠার পর

হরচেন সিং বারের গুরুত্ব বেশ
রহে। তারপর রয়েছে অমৃত্যুর
সিং-এর।

এতো পেল পাঞ্জাবের ব্যাপার।
মধ্যপ্রদেশে বিভাগের গুলি দাড়া
ভাষাচরণ-বিনি কংগ্রেস (আগ)
ছেড়েছেন তাঁকে নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন
পি সি শেঠীর বিরুদ্ধে। এর ফলে
গোষ্ঠী থেকে উপগোষ্ঠীর রেবারেবি
ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী
পরের দাবীদার হিসেবে এগিয়ে
রয়েছেন অর্জুন সিং, পিববন্ধু সোলাংকি
ও মাধব রাও সিঙ্কিয়া। এই আসরে
পাঞ্জাবের দ্বন্দ্ব বুটা সিং-এর মত
তলে তলে কমল নাথও সক্রিয় হবার
মুহুর্তে রয়েছেন। রাজস্থানে দ্বারা
খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁদের
মধ্যে জগন্নাথ পাহাড়িয়া। বেশ ভাল
অবস্থায় থাকলেও সঙ্কল্পের বিশেষ
একজন হিসেবে জনাধন সিং গিলটও
পাহাড়িয়ার পাশাপাশি আছেন।
আর উত্তরপ্রদেশে কখনও নবীনে
প্রবীণে কখনও প্রবীণ-প্রবীণে আবার
নবীনে নবীনে যা কাণ্ড বেঁধে গেছে
তাতে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, দ্বারা
তাঁরা কেউ কাউকে ছাড়ছেন না।
ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতি-
মন্ত্রী সি পি এন সিং অনেকটা
সামনে এসেছেন। পাশেই আছেন
ধর্মবীর, বীরবাহাদুর ও সঙ্কল্প সিং।
তবে উত্তরপ্রদেশে এটা পরিষ্কার যে
বহুগুণা, ত্রিগুণী প্রমুখ নামীদের

মে দিবস

৮ম পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি, বিশেষ করে সর-
কারী বাসকর্মীদের এবং তাদের
সংগঠনেরও এ ব্যাপারে সাধ্যমতো
এগিয়ে আসা নৈতিক কর্তব্য।
কেননা তারা যে স্বযোগ সুবিধার
অধিকারী, একই জেগীর কাজ করে
প্রাইভেট বাসকর্মীরা সে স্বযোগ
সুবিধার কথা ভাবতেই পারেন না।

ছ টুকরো কটির জন্তে দ্বারা ১৪-
১৬ মার্চ অসামান্য পরিশ্রম করেন,
প্রতিমুহুর্তে নিজেদের জীবনকে
বাজি রাখেন, তারা কি আমাদের
কাছে সামান্য সহায়ত্বও আশা
করতে পারেন না? ছুনিয়ার
মহনতী সাহসের মূল লক্ষ্য বথম
এক এবং অভিন্ন, তথম প্রতিটি
মহনতী সাহসের সংগ্রামে সর্বস্তরের
কল মেহনতী সাহসের সক্রিয়
মর্থনের অঙ্গীকারই তো মে দিবসের
কৃত অঙ্গীকার। এবং সেখানেই
তা রক্ত-বরানো মে দিবসের
ব্রহ্মত্ব।

প্রাধান্য খর্ব করে সঙ্কল্প পাণ্ডীর সংগীরা
নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে
যাচ্ছেন।

মহারাজে এ আর আন-
তুলে দলের মূল সংগঠনের তেমন
পছন্দসই না হলেও শ্রীমতী গান্ধীর
বিশেষ আস্থাভাজন বলে রেবারেবির
লড়াইয়ে বেশ এগিয়ে রয়েছেন।
তবে প্রতিভা পাতিজ, তারপর রাম-
রাও আর্ক এবং বসন্তদা পাতিজের
সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মত নয়।
সেখানে অন্তান্ত রাজ্যের মত গোষ্ঠী
ঘন্থে কেউ মাতার নাম নিয়ে কেউ
পুত্রের নাম নিয়ে আবার দুইনাম
ভজনা করে একে অপরের বিরুদ্ধে
কাঁপিয়ে পড়ছেন। বিহার বিবাদের
ইতিমধ্যে ওই নাম স্রবণ করে সাল
পাল নিয়ে পারের মাটি বেশ শক্ত
করে ফেলেছেন ভীষ্মনারায়ণ সিং।
ওর পর আদিবাসী মেতা কার্তিক
ওরাও রয়েছেন। জগন্নাথ মিশ্র
কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও হাল
ছাড়েন নি এবং জগন্নাথের তীব্র
বিরোধী কেদার পাণ্ডেও চেষ্টা
করছেন।

গুজরাটে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্র-
মন্ত্রী যোগেন্দ্র ম্যাকওয়ানা নবার
আগে-আছেন। তারপর আছেন
মাধবানন সোলাংকি। তামিল-
নাড়ুতে ডি এম কে দলের করণামিধি
বেমন-মুখ্যমন্ত্রী হবার আশার আছেন
তেমনি মিজ হল ই-কংগ্রেসের কথাও
ভাবছেন। কেননা ই-কংগ্রেসের
ভেতরমুখ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যেতেও
পারেন এরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে
দেবার মত নয়। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী
ভেঙ্কটরমণকে রাজ্য রাজনীতিতে
নিয়ে যেতে দলের পক্ষ থেকে এমন
চালচালা হতে পারে যাতে ডি
এম কে হল মাথায় চড়ে না বসতে
পারে। এছাড়া ওড়িশাতে ফিরে
আসতে পারেন হলকে গড়ে তোলার
দিকে নজর দিতে ও মুখ্যমন্ত্রী হতে
কেন্দ্রীয় প্রমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্ট-
মায়েক। অবশ্য তিনি মুখে বতই
এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দিল না কেন
সঙ্কল্প এবং তাঁর মার ইচ্ছাই একেজ
বড় হয়ে উঠবেই। আর বতই গোষ্ঠী
উপগোষ্ঠী বিবাদ বিসংবাদ বত কিছুই
হোক না-কেন, বতই মাতাপুত্রের
মমোরজনের জন্ত রেবারেবি চলুক না
কেন না লক্ষ্য রাখছেন ছেলের ভবি-
ষ্যতের জন্ত কে কতখানি কার্যকরী।
ছেলেও বাজিয়ে নিচ্ছেন তাঁর প্রতি
কে কেমন অহুগত থাকতে পারেন
এবং কাকে দিয়ে পছন্দমত কাজ
হানিল করান যায়। এমন কি, এই
বিবাদ বিসংবাদকে কাজে লাগানোর
ব্যাপারটিও তাঁরা তাঁদের কুট কৌশ-
লের বাইরে রাখেন নি।

অস্বস্তিকর রায়

২য় পৃষ্ঠার পর

দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন—লম্বা কিছু
বিশ্লেষণ করার বা লম্বা কি অসম্ভব
এ বিচার করার অধিকার কোর্টের
নেই। বিচার শুরু হবে কি হবে না
এই সিদ্ধান্তে আসার জন্ত অভিযোগ-
কারীর সাক্ষ্য বিশ্বাস উৎপাদন করে
কি করে না এ আলোচনা একে-
বারেই অবাস্তব।

অথচ বিচারপতি বড়ুয়া এই আইন-
বিরুদ্ধ কাজই করলেন। তিনি বললেন
যে, বিবৃত ঘটনা নাকি অসম্ভব,
অর্থাৎ তিনি অভিযোগকারীর সাক্ষ্যকে
অবিশ্বাস করলেন। ঠিক এইটাই
আইনানুযায়ী তিনি পারেন না।

বিচারপতি শ্রীবড়ুয়ার এই রায়
আইনের জগতে অস্বাভাবিক আ-
হওয়ার সৃষ্টি করল। কেননা এই
রকম রায়ের পর আর কেউ কোনও
দিন পুলিশ শত অত্যাচার করলেও
পুলিশের বিরুদ্ধে সামলা করার
জন্ত এগিয়ে আসবে না। এর দ্বারা
গণতন্ত্রের উপর এক নিদারুণ আঘাত
এলো। কেননা গণতন্ত্রের অন্ততম
ভিত্তি হল যে, নির্ধারিত ও অত্যা-
চারিত নাগরিক রাজ্যের সবচেয়ে
শক্তিশালী প্রতিপক্ষকেও বিচারের
কাঠগড়ার দাঁড় করাতে পারবে।
কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে
কি বিচারের বাণী নীরবে নিভতে
কাদবে না?

আসাম আন্দোলন

১ম পৃষ্ঠার পর

ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে খুবই
উদ্বিগ্ন। তিনি এ ব্যাপারে
একটা সমাধানে পৌঁছতে খুবই
আগ্রহী। কিন্তু দলের নেতাদের
মধ্যে আসাম আন্দোলনের মোকা-
বিলার পছন্দ নিয়ে চরম মতভেদ
দেখা দিয়েছে।

সঙ্কল্প গান্ধী এবং তার সমর্থক
তরুণ এবং কিছু প্রবীণ কংগ্রেস নেতা
মনে করেন, আসামের আন্দোলন
এখন যে পর্যায়ে তাতে এই আন্দো-
লনকে ভেঙে দিতে হলে কর্তার
প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
নতুবা এই সমস্যা সমাধান করতে
হলে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী
আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে
নিতে হবে, যা একেবারেই উচিত
হবে না।

কিন্তু প্রবীণ নেতারা মনে কর-
ছেন যে, এই সমস্যার সমাধান
মুখ্যতঃ রাজনৈতিকভাবেই করতে
হবে। প্রবীণ নেতারা মনে করেন
যে, প্রয়োজনে কিছু প্রশাসনিক
সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু
পুরোপুরি প্রশাসনিক লাইনে অর্থাৎ
পুলিশ মিলিটারী দিয়ে এই আন্দো-
লন দমিয়ে দিলে রাজনৈতিক দিক
থেকে দলের ক্ষতি হবে।

ইরানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী
আমাদের বুদ্ধিবীর্ষদের অনেককেই
নাড়া দিয়েছে। আমরা দেখেছি
যে সেখানকার বৈপ্লবিক আদালত
করেক শত লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।
এই সব বিচারের পদ্ধতি ছিল সু-
ক্লিপ ও স্পষ্ট। যেহেতু আমরা এই
ধরনের বিচারে অভ্যস্ত নই, আমা-
দের অনেকেই বলতে শুরু করে-
‘হিলাম’ যে বিচার বেশ ঠিক হচ্ছে
না। কেননা আমরা দীর্ঘ, প্রলম্বিত
ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার দেখতেই
অভ্যস্ত। কিন্তু একটা কথা না বলে
পারছি না। ইরানের এই বিচার
পদ্ধতি জনগণ বেছে নিয়েছে; কারণ
তাঁরা অভিজ্ঞতার দেখেছেন যে কি
করে বড় বড় অপরাধীদের তাদের
পছন্দমতো বা ক্ষমতার জন্ত বিচার
করে আনাই যায় নি, অথবা ছুতো-
নাতা টেকনিক্যাল অজুহাতে তাদের
আদালত খালাস দিয়েছিলেন।
বিস্মিত হবার কারণ নেই যে, জন-
সাধারণ এই ধরনের বিচার ব্যবস্থার
উত্থাপন করে ও সংক্লিপ বিচার
ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। যে
বিচার ব্যবস্থার টেকনিক্যাল অজু-
হাতের প্রাবল্য বেশী, সেখানে ক্ষু-
দ্র অজুহাতের চাপে সত্য ও বিচার হটে
যেতে বাধ্য হয়, সেখানে অচিরেই

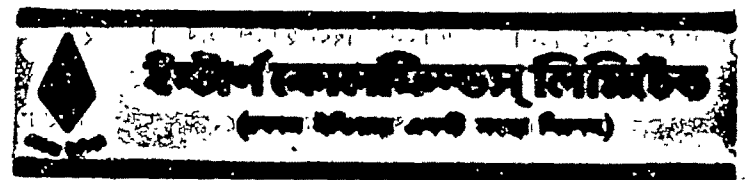
জনগণ সাধারণ বিচার ব্যবস্থার আশা
হারিয়ে ফেলেন।

‘অপরাধের প্রমাণ’ (Proof of
Guilt) নামক গ্রন্থে গ্যানভিল
উইলিয়ামস বলেছেন—

“একজন অপরাধীকে খালাস দেবার
কুসল শুধুমাত্র একজন অপরাধী ছাড়া
পেল এতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা...যদি
এই ধরনের অহেতুক খালাস বেশী
সংখ্যায় দেয়া হয়, তাহলে আইনের
প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে এবং জনসাধারণ
অপরাধীর জন্ত আরও কঠোর শাস্তির
দাবী করতে থাকে। এই ভাবে
অপরাধীর খালাস ক্রমে ক্রমেই
দেশে হিংস্র দণ্ডবিধি আনার পথ
স্বপ্ন করে দেয়”...

হিংস্র প্রতিহিংসার পথও স্বপ্ন
করে দেয়। অরাজকতা যদি কথতে
হয়, আইন ও শৃঙ্খলা যদি প্রতিষ্ঠিত
করতে হয়, তাহলে অপরাধীর
বিচার নিশ্চয়ই হওয়া উচিত।
অপরাধী যেন খুঁটিনাটি কারণে
খালাস না পায়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ
সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা হবে।
আশা করব সুপ্রীম কোর্ট তাদের
রয়ে সত্য বিচারের পথ প্রশস্ত করে
দেবেন।



মিল্লিক কাজের জন্ত ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও
রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অল্পমোদিত ও তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সর-
বরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম এবং
নির্দিষ্ট তারিখ লিখে নীল করা টেওয়ার:

উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ

রেকা: নং: পি ইউ আর / সিউ-বীম / ২৬০ / ৩১ তারিখ ২০-৪-৮০
১০ (দশ) সেট কোয়ার্টার বীম-অ্যাসেসমেন্ট (ড্রয়িং / নমুনা অস্থায়ী) জন্ত।
আনুমানিক মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। সরবরাহের দিন থেকে এক বছরে
গ্যারান্টি দিতে হবে। কেশিয়ার / অ্যাকাউন্টস অফিসারের কাছে প্রতি
সেটের জন্ত নগদে ১০ টাকা (অগ্রত্যাগপণযোগ্য) দিয়ে প্রতিটি কাজের দিনে
প্রতিদিন বেলা ১টা পর্যন্ত টোর / পার্টেজ অফিসারের অফিস, জেনারেল
ম্যানেজারের অফিস (সি, এল, অ্যাং আর), জে কে রোপওয়েড, পো:
কাজোরাগ্রাম (বর্মান) থেকে টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ১০-৬-৮০
বেলা ১১টা পর্যন্ত টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩৩০ টায়
খোলা হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা
চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ারে প্রদত্ত এন্ড্রিয়া / কোলিয়ারী /
দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক
ধরনের ১% ব্যয়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে
হবে। টেওয়ারের কি বাবদ যদি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের
অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌঁছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা
তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ
কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ
অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার
সংরক্ষিত রাখছেন।

চলচ্চিত্র নাটক

বাসু ভট্টাচার্যের 'গৃহ প্রবেশ'

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

খামী জীর দাম্পত্যজীবনের মানা সমস্তা, ভুল বোঝাবুঝি, মান অভিমান, বিরহ বরণা বিচ্ছেদ কামনা মন বেওয়া নেওয়ার গরমিল, অস্ত্র নারী বা পুরুষের প্রতি আসক্তি ছলনা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বিষয় চলচ্চিত্রকার বাসু ভট্টাচার্যকে নিশ্চরই টানে, মইলে তিনি ঐ সব বিষয় নিয়ে পর পর ছবি করবেন কেন? তাঁর পূর্বের দুটি ছবি 'অন্তর্য' ও 'আবিষ্কার' ও বর্তমান ছবি 'গৃহ প্রবেশ' উপরোক্ত বিষয়গুলিই কিছু কিছু ভিন্ন মেজাজে প্রকাশ করেছে এবং সে বিচারে ছবিগুলিকে ট্রলজি বলা যেতেই পারে। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্তা, অভিজ্ঞের লংকট, শ্রেণী লংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়-বস্তু তাঁর ছবিতে প্রত্যাশা করা যায় না, বরং নরনারীর মনের হৃদয় অঙ্কুতি, ভাল লাগা না লাগা হৃদয়বেগ ও সংঘাত—কিছুটা ভাব বিলাসী মন নিয়ে পর্যালোচনা করার কিছু উজ্জল পরিচর তাঁর ছবিতে ফুটে ওঠে। লক্ষণীয়, তিনি এখানে লবঙলিই হিন্দি ছবি পরিচালনা করেছেন। 'গৃহ প্রবেশ'ও বাংলা নয়, এটি হিন্দি ছবি।

পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য বরচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন গুলজারের সহযোগিতায়। খামীজী জীর্ণ ভাড়া বাড়ি বদল করে নিজেদের এক মতুন বাড়ি করার স্বপ্নবোধে কাটিয়ে দিল মূল্যবান দশটি বছর। ইতিমধ্যে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। লংসারের খরচ কমিয়ে মাসে মাসে টাকা জমিয়ে ৫০ হাজার টাকা ধন জমল; তখন তারা দেখল এই দশ বছরে টাকাগুলি অবমূল্যায়নে ঐ অঙ্কের টাকার মতুন বাড়ি করা বা কেনা

অসম্ভব। তখন খামীর মনে এল অবসাদ। অকস্মেই এক তরুণীর লংস্পর্শে এসে বুঝল এই ক'বছর কি নিদারুণভাবেই না খরচ হয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সে তার প্রীকে ত্যাগ করে তরুণীকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে চাইল। প্রী সব কিছু ভেমে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে সেই তরুণীকেই নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জামাল। খামী যখন প্রেমিকাকে নিয়ে নিজের ঘরে এল, তখন দেখল সেই পুরোন বাড়ি হুসংস্কৃত ও প্রী রীতি মত হুসংস্কৃতি। প্রী খামীর প্রেমিকাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পট জামাল, মেয়েটি ভাল, খামী যদি চায় তাকেই বিয়ে করুক। পুরুষের অহংকারে লাগল আঘাত—প্রী মনে কোন হিংসা নেই—তবে কি...। খামী হোলাচল মন নিয়ে বাড়ি পৌছে দিতে গেল প্রেমিকাকে। হঠাৎ রাত্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বিবাহের শোভাযাত্রা শুরু হল, তরুণী রাত্তার ওপারে পৌছল, খামী কিন্তু এপারেই থেকে গেল, মাঝখানে শোভাযাত্রার ব্যবধান। ছুজনেই হাত নেড়ে বিদায় নিল। খামী ফিরে এল নিজেরই ঘরে, প্রী কাছে।

এই কাহিনী নিয়েই একটি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ছবি হতে পারত। কিন্তু কিছু অপ্রাণবিক দৃশ্য, মননশীলতা আরোপের কিছু ঝোঁক ও ক্যামেরার গিমিক প্রসংগটিকে আবেদন ধর্মিতার পরিফুট করে তুলতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ছবির শুরুতেই আবহ-সংগীতের মুছনা তুলে জোড়ার জোড়ার খামী জীর বনিষ্ট আলিঙ্গন ও অন্তরঙ্গ দৃশ্য কাহিনীর লংগে মোটেই তারসাম্য রক্ষা করেনি। অকস্মে তরুণীর লংগে খামীর প্রথম পর্বের আচরণ এতটা অস্বাভাবিক

হবে কেন? প্রেমিকা ও খামীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে যে বিবাহের মিছিল চলেছে, ছবিটিতো সেখানেই শেষ হলে হুসংস্কৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। এই পর্বের দৃশ্য-গুলি সভ্যই চমৎকার। আরও কিছু দৃশ্য বিচ্ছিন্নভাবেই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। লংগীত পরিচালনার কাজ রাই এ ছবিতেও বিশিষ্ট। ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজও নিপুণ। লজীবকুমার, শর্মিলা ও সারিকার অভিনয় কমতা ছবিটির বড় সম্পদ।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষুদ্র

১ম পৃষ্ঠার পর

কৌদল অবিলম্বে মিটিয়ে নিতে বলে-ছেন। এও জানা গেছে শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যের দুই ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতা বরকত সাহেব এবং প্রব-বাবুকে কংগ্রেসীদের বগড়া মিটিয়ে ফেলার জন্য উত্তোগ নিতে বলেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য কংগ্রেসীদের আচরণে এতই ক্ষুব্ধ, প্রদেশ কং-গ্রেস কমিটি পর্বত গঠন করতে আগ্রহী নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রায় দুই মাস যাবত পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের কোন রাজ্য কমিটি নেই। একমাত্র সভা-পতি শ্রীঅজিত পাণ্ডা একাই দলের কাজকর্ম বেখাশোমা করছেন। দলীয় কৌদলের তরে অজিতবাবু এখনও দলের সদর দফতর পর্বত করতে ভরসা পাচ্ছেন না।

বহিঃ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি গঠন করার ব্যাপারে রাজ্যের নেতারা ক্রমাগত দিল্লীতে লজর গান্ধীর কাছে দরবার করছেন। কেউ কেউ আবার শিরপতি কমল মাথকেও ধরে যাতে রাজ্য কমিটিতে ঢুকতে পারেন তার জন্ত চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে কি ইন্দিরা গান্ধী, কি লজর গান্ধী কারও কোন উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। ওরা এখন নরটি রাজ্যে নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। স্ততরাং পশ্চিমবঙ্গের লংগঠন নিয়ে ভাববার কোন অবসর নেই। এ আই সি সি-র বনিষ্ট মত-দের খবরে জানা গেছে জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রদেশ কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে।

পাটোয়ারীর পাটোয়ারী বুদ্ধি

গান্ধী ভক্ত মোরারজী ভাই দেশাই এর আমলে গান্ধীবাদী প্রকৃ-দাস পাটোয়ারী তামিলনাড়ুর রাজ্য-পাল হবার পর বেরকম ছিলেন এখন আর সে রকমটি নেই। আদর্শ ও কর্তব্যের জন্ত দিল্লীর মতুন জমানার কাছে অসদতভাবে মাথা নোয়ানর চেয়ে পদত্যাগ করে মান বাঁচানই শ্রেয় বলে তৈরী হচ্ছিলেন। কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা না বামানর চেয়ে যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থামত চলাই ঠিক করেছেন। ইতিমধ্যে ডি এম কে দলের নেতা করুণানিধির করুণা লাভের জন্ত কিছু উত্তোগও নিয়েছেন। করুণানিধির মধ্যে তিনি দেখছেন নতুন গান্ধীকে। তাই করুণাকে খুশি করতে, দিল্লীর গান্ধী-দের অহুগত থাকতে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তিরিশজনের মত আই এ এস এবং আই সি এস অকি-দারের বদলীর আদেশ অতি দ্রুত অহুমোদন করেছেন। আর এই বদলীর আদেশ যখন কেজের বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র ম্যাকওয়ানা দিয়েছেন তখন তিনি বুকে গিয়েছেন রাজ্যপাল পদে থাকতে গেলে ওই আদেশ অহুমোদন করতেই হবে। সেজন্য পদ বাঁচাতে তিনি মা করেন-নি, এমন কি ব্যাপারটা বুজিয়েও রাখেন নি। তাঁর পাটোয়ারী বুদ্ধি তো কম নয়। প্রকৃদাস হয়ে তিনি উচ্চ পদে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে

এ আর তেমন কি করেছেন। তিনি নতুন গান্ধীকে সেবার লেগে থাকবেন বলে এখনও অনেক কিছু করতে রাজী। কারণ তিনি গান্ধীবাদী তো বটেই বাস্তববাদীও। একত প্রকৃদাস শ্রীমতী গান্ধীর জমানা ফেরার পর তাঁর এবং লজর গান্ধীর বনিষ্ট হবার খুব চেষ্টা করছেন। এবং এও জানা গেছে যে, শ্রীমতী ইন্দিরাকে তাঁর একান্ত অহুগত ভৃত্য হিসেবে থাকার কথা পাটোয়ারীজী পত্র মারফৎ জানিয়েও দিয়েছেন। অঞ্চ সাভাস্তরের এপ্রিলে রাজ্যপাল হবার পর তড়িৎপত্র করে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর পিতার প্রতিকৃতি তাঁর দীমানা থেকে সরিয়ে দেবার আদেশ তিনিই দিয়েছিলেন।

আজ সেসব দিনের ঘটনা তাঁর কাছে খপ্প হয়ে গেছে। বরং তাঁর কাছেই রাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা রটাত্তে বলা বুদ্ধ বরলে তাঁর অভিমানও খুব বেড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃদাসজীর হুজুরেরা চান, যা হবার তা হয়ে গেছে এবার তিনি মানে মানে সরে আসুন। নরত রু-দাড়ান যা কিছু অসদত তার বিরুদ্ধে। অবস্ত এ বিষয়ে তিনি যেমন আশাস অন্তরঙ্গদের দিচ্ছেন তেমনি গান্ধী ভক্তনার দিকে চো-আছেন। নতুন জমানা বাঁদের তাঁরাও তো গান্ধী।

পুলিশ অফিসার

১ম পৃষ্ঠার পর

বিশেষ বিশেষ রিপোর্টারকে টেলি-ফোনে ডেকে ওইসব লংবাহ দিচ্ছে। এটা ওদের কাজ নয় একথা বলব না।

এটা বলব যে, ওরা একপেশে এবং বামজুট বিরোধী রাজনীতি করছে। রাজ্যে আইম-শুখলা সেই এটাই ওরা প্রমাণ করতে চাইছে। একজন সাংবাদিক বলতে চান যে, এই বড়বড়কারী পুলিশ কর্মীরা একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছে এবং এতে বড় বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছে। অঞ্চ, রাজ্যে কংগ্রেস শাসনের লময়ে কিছু ওদের এই ধরনের উৎসাহ ছিল না।

উল্লেখযোগ্য, খবর চেপে থাক এটা কোন সাংবাদিক চাইবে না। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও রাজ্য প্রাশ-

লনের দায়িত্ব গ্রহণ করে কয়েকবার প্রকাশেই বলেছেন, ঘটনা ঘট-নিশ্চরই তা লংবাদপত্রের পাতা প্রকাশ হওয়া উচিত। তাই বলে ঘটনাকে বিকৃত করা উচিত নয় এখন দেখছি কিছু সাংবাদিকও এস বড়বড়কারী পুলিশের সঙ্গে যোগ রেখে তুচ্ছ ঘটনাকেও বিকৃ-করে ফলাও করে লংবাদপত্রে পাতায় প্রকাশ করছে। এতে বোক বাচ্ছে যে, ঐসব পুলিশের সঙ্গে এ শ্রেণীর সাংবাদিকও বামজুট বিরোধ-বড়বড় অংশগ্রহণ করছে।

বামজুট সরকার সব দিক থেকে একটি মুক্ত একথা আমরা বলছি না এ সরকারের অনেক ক্রটি আছে তথাপি বলব, এ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস / শ্রীমোহনম বসু / ১২'০০

(কাণ্ড ও হেগেল)

২। তাপগতিতত্ত্ব / শ্রীঅশোককুমার ঘোষ / ২৪'০০

৩৫, রাজা সুবোধ বসিক ফোরার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্শন কার্যালয় ৩১, রট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

দপন

অবধি বর্ষ ১৮শ সংখ্যা। শুক্রবার, ৩০শে মে, ৮০। ৬০ পৃষ্ঠা

দলের কার্যকলাপে ইন্দিরার কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী বেশ ক্ষুব্ধ

নয়টি রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনের মুখেই একদা ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিচিত কিছু নেতা দলের কাজকর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুরু করেছেন। শুধু তাই নয় নির্বাচনের ব্যাপারেও কোন দক্ষিণ সূক্ষ্মা নিচ্ছেন না।

এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোভাগে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মধ্য-প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র শেঠী। শেঠী মধ্যপ্রদেশে দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে সঙ্গর গান্ধীর কাজকর্মকে নিন্দা করতে শুরু করেছেন।

শেঠী সুযোগ পেলেই বলছেন, কিভাবে তাকে এবং বিচারপণ ভ্রাতাকে হেয় করে সঙ্গর গান্ধী জনৈক শিল্পপতি এম-পি-র পরামর্শে প্রার্থী মনোনয়ন করেছেন। এই শিল্পপতি এম-পি-র নাম কমল নাথ। শেঠী প্রায় প্রকাশ্যেই বলেছেন কমল নাথের পরামর্শেই সঙ্গর এবং ইন্দিরা গান্ধী মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি নতুন দিকে মোড় ঘোড়তে চাইছেন।

কমলাপতি পদত্যাগ করেছেন

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী পদত্যাগ করেছেন বলে বিখ্যাত সূত্রে জানা গেছে। পদত্যাগ করলেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য ত্রিপাঠীকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত পদত্যাগপত্রে ত্রিপাঠী স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করতে চেয়েছেন।

আমলে কিন্তু পদত্যাগের নেপথ্য

দলের হাইকমান্ডের এই সব কাজকর্মে শেঠী এবং সুরা রীতিমত অদৃষ্ট হয়ে নির্বাচনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন। শেঠী তার ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন মধ্য-প্রদেশে কংগ্রেসে (ই)-র নির্বাচনী সম্ভাবনা দলের হাইকমান্ডের কাজকর্মে অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শেঠী এবং সুরার সমর্থকরা রাজকুমার মাধবও সিদ্ধিরা এবং কমল নাথের মনোনীত প্রার্থীদের হয়ে কোন কাজ করতে রাজী হচ্ছেন না।

উত্তর প্রদেশেও একই অবস্থা। সেখানে কমলাপতি ত্রিপাঠী, মহলীনী

কিদেয়াই, নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী প্রমুখ ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা নির্বাচনের কাজকর্মের সঙ্গে দিচ্ছেদের জড়িয়ে রাখতে রাজী হচ্ছেন না। এই সব নেতারাও ইন্দিরা গান্ধী এবং সঙ্গরের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ মহলে সমালোচনা শুরু করেছেন।

এই সব নেতারা আরও মর্মান্বিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশে সঙ্গর অঙ্গামী কিছু যুব নেতার আচরণে। সঙ্গর অঙ্গামী যুব নেতারা উত্তর প্রদেশে প্রায় “জমিদারী” প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন এবং প্রবীণ নেতাদের নামান্তরে অসম্মান করছেন যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেও প্রবীণ নেতারা কোন প্রতিকার পান নি।

এই সব কারণে উত্তর প্রদেশের প্রবীণ নেতারা ইন্দিরা গান্ধী এবং তার দলের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে যাচ্ছে

নয়টি রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচনের পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এক বিরাট রদবদল করা হবে বলে বিখ্যাত সূত্রে জানা গেছে। এই রদবদলের শিকার হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ভেক্টরমণকে সম্ভবত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। দর্পণের

কারণ সঙ্গর গান্ধী। কেন্দ্রীয় রেল-মন্ত্রী সঙ্গর গান্ধীর কাজকর্মে বিশেষ বিরক্ত বোধ করেছেন। সঙ্গর গান্ধীর ছুই স্তম্ভ অঙ্গামী টাইটলার এবং কমল নাথ নানারকম বারন্য নিয়ে রেলমন্ত্রীকে বিরক্ত করেছেন। ত্রিপাঠী তাদের আবহার মেনে নিতে না পারাতে সঙ্গর গান্ধী তাঁর ওপর বেশ ক্ষুব্ধ। এছাড়া উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচনে মোট

সংবাদ সূত্র অঙ্গামী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে একমাত্র ভেক্টরমণকেই। এই আদম বিদায়কে অপমানণ বলাই হয়ত যুক্তিযুক্ত হবে।

কেন এই বিদায়? যতদূর জানা গেছে, সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার ৪৫টি আদমের মধ্যে মাত্র ২৫টি আদম ত্রিপাঠীকে অঙ্গামীদের ভাগ্যে ছোট্টার স্বত্বাবতই রেলমন্ত্রী আরও ক্ষুণ্ণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজন প্রবীণ মন্ত্রী সঙ্গরের এই মতবর্তীকে মেনে নিতে পারছেন না। দিন কয়েক পূর্বে এ বিষয়ে তাঁরা একটি গোপন বৈঠকও করেছেন এবং স্থির হয়েছে যে, নয় রাজ্যের নির্বাচন শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

গান্ধিমের গাড়ী শিল্প মালিকদের মৃত্যুঘণ্টা

আমেরিকার বহু শহরে ব্যবসায়ীরা এখন হোকানের সামনে বোর্ডে ঝুলিয়ে রেখেছেন ‘গাড়ি প্রতি পাঁচশো ডলার রিবেট’। ইতালীর ফিয়াট কোম্পানী গত কদিনে আটাস্তর হাজার প্রমিককে লে-অফ করেছে। মার্কিনী কোর্ড মোটর কোম্পানীর কর্মকর্তারা গত ৭ই মের সভায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাটাই করেছেন। জে না রেল মোটরস্ এ সপ্তাহে আরো মশহাভার

প্রমিককে লে-অফ করেছে, জাইনলার চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসেই লাঞ্চে তিনশো কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করেছে।

খোঁষ আমেরিকায় এখন মোটর গাড়ি ও ট্রাকের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশঃ কমছে। জেনারেল মোটরস্ বর্তমান মন্দার হাটাইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শোনে তিন লক্ষ, অর্থাৎ এ শিল্পে নিযুক্ত মোট প্রমিকের এক-শেবাংশ ২ম পৃষ্ঠায়

অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গর গান্ধীর ইচ্ছামুত্রেই নাকি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে বিদায় নিতে হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ কিছুদিন ধরে “সুভাঙ্গ” সঙ্গরের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বনিবনা হচ্ছিল না। তবে ভেক্টরমণ কবে বিদায় নিচ্ছেন সেটাই একটা বিরাট প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের আগে না পরে? ইতিমধ্যেই অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

জানা গেছে যে, বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীকে দেওয়া হবে অর্থ দপ্তরের ভার। বাণিজ্য দপ্তরের ভার পাবেন সম্ভবত সঙ্গর স্তম্ভ কমল নাথ। শিল্প দপ্তরের ভার কে পাবেন, প্রণব মুখার্জী না কমল নাথ তা নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। তবে মনে হয়

যে, অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বটাও পাচ্ছেন প্রণব মুখার্জী।

এসব ব্যাপারে কলকাতা নাড়ছেন জঙ্গরী অবস্থার অন্ততম প্রধান নায়ক সেই সঙ্গর গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক থেকে ভেক্টরমণকে সরাতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু সঙ্গরের বারন্যর কাছে তাঁর কোন ওজর আপত্তিই নাকি ধোপে টেকেনি। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর অঙ্গামী শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গরকে হাটাতে সাহস পাচ্ছেন না। পাছে সে মারের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করে বসে। মাতাপুত্র নাকি এখন আর একত্রে বাস করেন না। সঙ্গর এখন আলোচনা থাকেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এখনও অব্যক্তি রয়েছে। এই সব দপ্তরের দায়িত্ব এখন প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী কাজের চাপে এই সব দপ্তর সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন এবং তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে আমলাদের ওপর। সঙ্গরের ইচ্ছা শেবাংশ ২ম পৃষ্ঠায়



সম্পাদকীয়

ইন্দিরা গান্ধীর চ্যালেঞ্জ

গত মাসখানেক ধরে নটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক উত্তেজনার গোটা ভারত প্রকল্পিত হয়ে আসছিল বুধবার তার কিছুটা প্রশমন হয়েছে প্রথম কিস্তির ভোটভূমিতে। শনিবার অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনাও সঞ্চারিত হবে। প্রথমবারের উত্তেজনা নির্বাচনী লড়াইকে কেন্দ্র করে, দ্বিতীয় উত্তেজনা তার ফলাফলকে বিবে। আগামী চার-পাঁচ তারিখের মধ্যেই রাজ্য নটির নতুন বিধানসভা গঠিত হয়ে যাবে বলে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস এল শাহদের জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মাস্ক এই নির্বাচনী তরঙ্গে আন্দোলিত না হলেও নটি রাজ্যের নির্বাচনের অর্থই প্রায় মিনি সাধারণ নির্বাচন। কারণ নটি বিধানসভার ৩৭টি আসনের জয় বোল হাজার প্রার্থী দাবীদার দাঁড়িয়েছেন। তাদের মধ্যে সমস্ত বড় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ভোয়িয়েছেনই তার ওপর নির্দল প্রার্থীও রয়েছেন যদিও ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের তুলনায় নির্দলদের সংখ্যা এবার কম। এই নির্বাচনের খাতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে শাহদের সাহেব জানিয়েছেন।

এবারকার নির্বাচনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আইন ও শৃঙ্খলার পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি। সবকটি রাজ্যে চলছে রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রীয় শাসন অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত দায়ী ইন্দিরা সরকারই কিন্তু গত রবিবার পর্যন্ত সবকটি রাজ্য মিলিয়ে নির্বাচনী হাঙ্গামা হয়েছে আড়াইশোটি ঘর মধ্যে কেবল তামিলনাড়ুতেই দুশোটি। এই হাঙ্গামাগুলিতে ন জন লোক মারা গিয়েছে ঘাঘের মধ্যে আবার ছ জনই নির্বাচন প্রার্থী। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের আঘাত পেয়ে আহত হয়েছে ৬০ জন।

গত জাহুয়ারী লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন করলে বিরোধী দলগুলি পরবর্তী নির্বাচনে আবার একজোট হয়ে তার বিরোধিতা করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মুখের সে অঙ্গীকার হাওয়ার ভেলে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

বিরোধী দলগুলির এই বহুদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পুরো জ্বোংগ শ্রীমতী গান্ধী নিয়েছেন। সেইজন্যই তিনি ভুবনেশ্বরে এক সভার দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন যে কেন্দ্রে ও রাজ্য-গুলিতে একই ধরনের সরকার থাকা প্রয়োজন। এর অর্থ সহজ। সংবিধানে ভারতের যে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই ধরনের সরকার গঠন করে দে নির্দেশ উলটে দিয়ে এককেন্দ্রিক শাসনই কামের করতে চান। যার আগের নাম ডিক্টেটরিশিপ অর্থাৎ বৈরতন্ত্র। এবং গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী প্রধার বহলে প্রেসিডেন্ট প্রধান সরকার। এই নির্বাচনে এটাই ইন্দিরার চ্যালেঞ্জ।

বহুগুণার মোহভঙ্গ

হেমবতীমন্ডন বহুগুণা কংগ্রেস-ইর প্রাথমিক সমস্তপদ সহ লোক-লভ্যতা। সমস্তপদ ত্যাগ করার পর তার অস্থায়ীরাও নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। ইতিমধ্যে সাত জন সংসদ সদস্য এবং উত্তর প্রদেশ আইন পরিষদের নজন সদস্য ও ভেঙে দেওয়া বিধান সভার সাতাশ জন সদস্য কংগ্রেস (ই) ছেড়েছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েক জন প্রাক্তন মন্ত্রীও রয়েছেন। কংগ্রেস ত্যাগের কারণ হিসাবে শ্রীবহুগুণা একটি চিঠিতে ইন্দিরা গান্ধী ও সঙ্গর গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী অবিত্তি তার জবাবে বহুগুণার অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে জনমনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় নি।

ইতিমধ্যে দিল্লীর জামা মসজিদের শাহী ইমাম ও কংগ্রেস-ইর পক্ষ থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে বহুগুণা ও শাহী ইমাম দুজনেই গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে বিরোধী শিবির ছেড়ে কংগ্রেস শিবিরে যোগদান করেছিলেন। এই দুজন জনপ্রিয় মেতাই বিধানসভা নির্বাচনী অভিযানে কংগ্রেস ইর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলছেন যে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটেছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের জুশীল খাড়া অনেক টালবাহানা করার পর লম্বলে কংগ্রেসই ইতে যোগ দিয়েছেন। প্রায় এক যুগ ধরে জুশীলবাবু কংগ্রেস (ই) সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন কিনা সেটাই হবে দেখবার বিষয়।

গ্রন্থ পরিচয়

আফগানিস্তান-সোভিয়েত প্রসঙ্গ

Policy of peace Versus Doctrines of war.

Publishers : Peoples Publishing House, New Delhi.

Price. Re. 1'00

আলোচ্য পুস্তিকাটি একটি সংকলন, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে ব্রেকেনভের সঙ্গে প্রাভদার একটি দাফাংকার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রদত্ত প্রাভদার সম্পাদকীয়, সংবাদ সংস্থা তাসের বিবৃতি এবং কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের প্রাঙ্গলিক মতামত।

আফগানিস্তান ইরানের মতো আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রদত্ত যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে ভরা মতামত অবস্থিত, তাই বাস্তব দৃষ্টি তুলে ধরার জন্ত এই পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা-প্রকাশন সংস্থা এই দাবি করেছেন।

প্রাভদার সঙ্গে এক দাফাংকারে ব্রেকেনভ বলছেন যে, আফগানিস্তান প্রদত্ত পর্বত প্রমাণ বিধো কথা ও সোভিয়েত বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা নাকি আটাত্তর সালের এপ্রিল বিপ্লবের পর থেকে আফগানরা তাঁদের ভাগ্য

নিজেদের হাতে ভুলে নেন ও চারিপাশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ও সীমাক্তে যুদ্ধ প্ররোচনা চলতে থাকে বা ঠেকাতে সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানে ঢুকেছে (পৃ-২)। অবশ্য ব্রেকেনভের এই প্রচারের দৃঢ়তাও সন্দেহ ও বিতর্কের উর্ধ্ব নয়।

পুস্তিকার একশ পাঠ্য সোভিয়েত সৈন্য পাঠ্যবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে আফগান সরকার কর্তৃক সোভিয়েত সাহায্য প্রার্থনা। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ শেষ হওয়া মাত্রই সোভিয়েত সাহায্য বন্ধ করা হবে। সোভিয়েত সৈন্য আফগানদের পরামর্শে আসেনি, তাঁদের ডাকা হয়নি বরং পাঠানো হয়েছে। অবশ্য প্রচারমূলক পুস্তিকার এ ধরনের প্রচার খুবই স্বাভাবিক। নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের এ পুস্তিকাটি পড়া উচিত, এমন কি যুদ্ধে অস্ত্র-কারীর মতামতও গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত।

সোভিয়েত আক্রমণের পশ্চাদপট

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং আফগানিস্তান : অজিত মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক : কালেকটিভ পাবলিকেশন, ২নং নওয়াপাড়া রোড, কলি-৫৭

দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের পেছনের ইতিহাস বিস্তৃতাকারে দেওয়া হয়েছে এ বইতে। লেখকের মতে ১৯৭৯ সাল থেকে রাশিয়া তার ক্রমাগত তীব্রতর আত্মসন্ত্রীণ সংগঠে ভুগছিল। সে সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় এবং বিশ্ব আধিপত্যের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানে দে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নৌ ও বিমানবহরের কার্যকলাপগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে চলেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নাকি বর্তমানে ব্যবহার বৃদ্ধির পতির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির গতি মন্দ হয়ে পড়েছে। লেখকের হিসেবে ৭০-৭৪ সালে বার্ষিক তেল ব্যবহার শতকরা ৭.৮ ভাগ কিন্তু সে সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল শতকরা বার্ষিক ৬.৯ ভাগ (পৃষ্ঠা-৮)। কারণ নাকি, তেল নিকাশনে প্রাকৃতিক হুর্দোগ ও নিয়মানের প্রযুক্তিবিদ্যা মতুন তৈল উৎস খুঁজে বের করার পক্ষে বাধা (পৃ-১১)। অবশ্য আজ

বিশ্ব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, সোভিয়েতের প্রযুক্তিবিদ্যার মান খুবই উন্নত। লেখকের দিকান্ত অবিবেচনা প্রসূত।

লেখক এ বইতে 'সোভিয়েতের দক্ষিণমুখী অভিযান' শীর্ষক অধ্যায়ে ইরান, দক্ষিণ ইয়েমেন, সৌদি আরব, পারস্য উপসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ধাবমান সোভিয়েত আঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কিতাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর করছে তার বর্ণনা আছে। মহাকাশে অঙ্গ প্রতিযোগিতাতেও তাই। এদিকে ভাটো দেশগুলোও তাদের প্রতিরক্ষা বাড়িয়েছে। তাই তো বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ বেড়ে গেছে। আফগানিস্তানের বর্তমান ঘটনাবলীও লেখক বিবৃত করেছেন। ধারাবাহিকভাবে তারাকির অপসারণ থেকে বর্তমানে আফগানদের প্রতিরোধ লংগামের কথা। বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের অবস্থাই এ বই পড়া দরকার। কিন্তু দামটা অবশ্যই বেশী হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী কাব্য

বন্দেমাতরম আনন্দমঠ ও বঙ্গ-জীবন কাব্য : শঙ্কু। প্রাণিহান যুগসাহিত্য প্রকাশনী, ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১ দাম : ছয় টাকা।

একটি কাব্যগ্রন্থ। মারকরণেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। কবি 'বঙ্কিমপ্রশক্তি' এবং 'বন্দেমাতরম ও বাঙ্গালী' এই দুটি কবিতা দিয়ে শুরু করেছেন, যেটা অনেকটা কৃত্রিম মত। তারপর 'বন্দেমাতরম ও বঙ্গভঙ্গ' 'বঙ্গ বিচ্ছেদে ভারতমাতার প্রতি বঙ্গ-মাতার বিলাপ' ও 'বন্দেমাতরম-শতবর্ষ উৎসবে বঙ্গমাতার আর্তিদা' এই তিনটি দীর্ঘ কবিতার প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর বিগত একশো বছরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। অকুণ্ঠে স্বীকার করা যায় আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থে বঙ্গদেশী যুগে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং দেশভাগ পরবর্তী যুগে বাঙ্গালীর অধঃপতনের যথার্থ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে কবিতা হিসাবে এগুলি ততখানি দার্ক নয়। চেষ্টাকৃত অস্তিত্বপ্রাণ, অনাধুনিক রচনারীতি, পঙ্ক-ঘোষা পংক্তিতে পাঠকে পড়ে পড়ে হোচট খেতে হয়। অবশ্য কবির প্রয়াস অভিমন্ডনযোগ্য।

মজিসভার রদবদল

১ম পৃষ্ঠার পর

অবশিষ্ট দপ্তরগুলিতে অবিলম্বে মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক। সমস্তের এই ইচ্ছাকে শ্রীমতী গান্ধী আংশিক যেনে নিয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন যে সব দপ্তরে মন্ত্রী নেই সেই দপ্তরে একজন করে রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে। সমস্ত চেয়েছিলেন এই মন্ত্রীরা হোক ক্যাবিনেট পর্যায়ের। এ বিষয়ে একটি তালিকাও নাকি সমস্ত তাঁর মাতার হাতে দিয়েছেন।

সমস্ত চেয়েছিলেন জরুরী অবস্থার আর এক নারক বংশীলালকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হোক। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তাতে রাজী হননি। শোনা যাচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দেখবার দায়িত্ব দেওয়া হবে শক্তিমন্ত্রী বরকত গনিখান চৌধুরীকে। শক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব গপি সাহেবের এজিয়ারে আসবে বাড়তি দপ্তর হিসাবে।

রাজধানীর রাজনৈতিক মহল এখন বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, সমস্ত যা করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী তাতে আপত্তি করতে পারছেন না। শ্রীমতী গান্ধী সমস্তকে ভয় করছেন নাকি নির্ভরশীল বলে মনে করছেন এর উত্তর দিতে পারে ভবিষ্যৎ।

'বহিরাগত' বিতাড়ন নয়, কেন্দ্রের কাছ থেকে অধিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের জন্য অমুন একসঙ্গে লড়াই করি

আসামের আন্দোলনকারীদের প্রতি প্রোগ্রেসিভ পিপলস ফোরামের খোলা চিঠি

আসামের আন্দোলনকারী বন্ধুগণ, আপনাদের প্রচার পুস্তিকাটি পাঠ করে আমরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে পূর্বাঞ্চলের অত্যন্ত রাজ্য-গুলোর মতো আসামও দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে আসামের ৫২.৫ কোটি টন তেল বারোনি শোধনাগারে পাইপের সাহায্যে নিরেখে ওয়া হয়েছে, গোঁহাটি শোধনাগারে যা শোধন করা যেত। এর ফলে টন প্রতি পরিশোধন বাবদ ধরচ ১০৭ গুণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে তেলের টন প্রতি বাজার দর যোলশত টাকা। আসাম থেকে এ তেল শুধে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে আসামকে মাত্র টন প্রতি ৪২ টাকা। বছরে ৮৪০ কোটি টাকার তেল আপনাদের আসাম থেকে নিরে আপনাদের রয়াল্টি বাবদ দেওয়া হচ্ছে মাত্র ২২ কোটি টাকা।

প্রতিদিন তিন কোটি কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাস আসামের তৈল খনি অঞ্চল থেকে অহেতুক নষ্ট হচ্ছে যা দিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ানো যেত এবং আরো শিল্প তৈরী করা যেত। অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আসাম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্দাকে ঐ গ্যাস ব্যবহার করতে না দেওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কতিপয় হয়েছে।

প্রতি বছর চারশো কোটি টাকা মূল্যের ২৭ কোটি টন চা আসাম থেকে উৎপন্ন হলেও তা নির্যস্ত করা হয় কলকাতা ও লণ্ডন থেকে, যদিও সরকারী সংস্থা আসাম টা করপোরেশন গত কয়েক বছরে চরংকার-ফল দেখিয়েছে। আসামের চা আঁক ও মাছাতার আমলের ঔপনিবেশিক নীলাম প্রথা বিক্রয় হয়। যার ফল লোটে কলকাতার কোড়েরা। আসামের বনাঞ্চলের সম্পদ (বাঁশ, কাঠ) অস্ত্র রাজ্যে নিয়ে এসে সেখান থেকে কাগজ তৈরী করে আসামে আবার চড়া দামে বিক্রি হয়। আসামে কাগজকল থাকলে আসামের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমানে চড়া দামে কাগজ কিনতে হতো না।

রাজ্যসভায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৮ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ও এইচ,

এম, প্যাটেলের রাজনৈতিক জবির জোরে গুজরাট যেখানে লেটার অফ ইনডেন্ট এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স পেয়েছে যথাক্রমে ২২টি এবং ১০টি, ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বর্গরাজ্য মহারাষ্ট্র যেখানে পেয়েছে ১৪ এবং ১৯, তামিলনাড়ু পেয়েছে ১৩ এবং ১০, নেহেরু ইন্দিরা চরণ সিংহের উত্তর প্রদেশ পেয়েছে ৮ এবং ১৩টি, সেখানে আসাম পেয়েছে মাত্র ১টি করে। চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে, ব্রহ্মপুত্রের উপর একটা সেতু তৈরী করার জন্যও আপনাদের বিরাট আন্দোলন চালাতে হয়েছিল।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও তাই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় হুগলী সেতুর কাজ দিল্লীর কর্তাদের লাল ফিতায় আটকে আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গাজল ভাগা-ভাগির চুক্তিতে হুগলীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার কলকাতা বন্দরকে বিপর্যয় করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৯৫০ সালে আগত উষ্মান্তদের যে রকম স্বত্বাধীন পুনর্বাসিত করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে উষ্মান্ত উন্নয়নী-বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্ধেকও দেয়নি। কংগ্রেস-জনতা-মব আম-লেই দেখেছি গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ ভূখণ্ডে জবির জোরে তুলো, আখ, চীনাবাদাম বা পাঁজাব, হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তর প্রদেশের জাঠদের কারসাজীতে গয়ের দাম কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পাট-চাষীদের দ্বারা জুট করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া সেই অল্পপাতে কাঁচা পাটের দাম বাড়ানি। এখনো শিক্ষিত বা অশিক্ষিত রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাধিক। লোক-সভার বিগত অধিবেশনে স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার করেছেন যে, ওড়িশার পরেই দ্বিতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।

আসামের মতো পশ্চিম বাংলা-কেও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরেই শোষণ ও বঞ্চনা করে আসছে। এখান থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার যে সম্পদ নেয়, রয়াল্টি বাবদ সিকি ভাগও দেয় না। প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরার জন্য সাংবাদিক রণজিৎ রায়ের The agony of West Bengal বইটা ১৯৭২ সালে ইন্দিরা

সরকারের নেকনজরে পড়েছিল। অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এই ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য ও অর্থনীতির অসমবিকাশ অবশ্যস্বার্থী। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়াতেও এই অবস্থা ছিল। মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ রুশ-ভাষী লোক অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সময়ে আধা পুঁজিবাদী বিকাশ হয়েছিল, তখন অবশিষ্ট ৫৭ শতাংশ অত্যন্ত ভাষাভাষী এলাকার তা হয়নি। রুশভাষী জারের আমলা-রাও অ-রুশভাষীদের "বিদেশী" বলে ভূষিত করত। ঐ সব অঞ্চলকে জার সরকার উপনিবেশ মনে করত। সারা দেশে যখন মোট ১১টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, তার অর্ধেকের বেশী ছিল মস্কো এবং পেট্রোগ্রাডে, ইউক্রাইনে ছিল ১৯টি, জর্জিয়াতে ছিল মাত্র ১টি। বাইকাল-রুশিয়া, আকারবাইজান, আর্মেনীয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখিস্তান, প্রভৃতি রাজ্য-গুলোর একটিও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না।

জনস্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই অবস্থা ছিল। বিপ্লবের পর শোষণ অবস্থানের পর অত্যন্ত প্রদেশগুলোরও দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। সারা দেশ থেকে বেকারী, ভিক্ষাবৃত্তি, গণিকা-বৃত্তি দূর হয়। ১৯২৭ সালে নেহেরু এবং ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অবাক হয়ে যান। কবিগুরু তার 'রাশিয়ার চিঠি'-তে লেখেন, "চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। এরা একটা লম্বা জাতিকে, আপামর জনসাধারণকে সমানভাবে গড়ে তুলতে চাইছে।"

১৯৩৬ সালে প্রবর্তিত শোভিয়েত সংবিধানে ১৩নং ধারায় বলা হলো যে "U. S. S. R has been formed with voluntary union of sixteen state republics." ১৭নং ধারায় অঙ্গ রাজ্যগুলোকে পৃথিবীতে এই প্রথম একটি সংবিধানে "Right to secede from the Union" এই অধিকার দেওয়া হোল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রদেশই বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি কারণ প্রত্যেকেই নোকে যে পৃথক স্বত্ব প্রদেশ রাষ্ট্রের অভিন্ন পার্বণতী পুঁজিবাদী দেশের শিকার হবে। বহু-জাতিক শোভিয়েত ইউনিয়নের সং-হতি শিকারী হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে পুঁজিপতিদের সংগঠিত আক্রমণে জনসাধারণের সংহতি দিনের পর দিন বিপন্ন হচ্ছে। যে প্রদেশের পুঁজিপতিদের পকেটের জোর বেশী সেই প্রদেশই তুলনা-যুক্ত লাভবান হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল এই সময় দেশের রাষ্ট্রপতি, শাসক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, দেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি হিসাবে যথাক্রমে ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ, দেবকান্ত বড়ুয়া ও বি সি ভগবতী এই তিনজন আসাম বাসী থাকার মধ্যে আসামের আশা-মুগ্ধ উন্নতি হয়নি। পশ্চিম বাংলা ও আসাম থেকে নির্বাচিত শাসক পাটির এম পিদের কপালে প্রধান-মন্ত্রি কেন, এমন কি স্বরাষ্ট্র, অর্থ, প্রতিরক্ষা বা পররাষ্ট্র দপ্তরও জোটেনি

স্টেট বাসে প্রচুর চুরি হচ্ছে

স্টেট বাসের কণ্ডাক্টরদের একাংশ বাসের মধ্যে দিন-ছপুয়ে চুরি করছে। রাজীদেব টিকেট না দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অর্ধেক ভাড়া নিয়ে তাঁদের বাসে চড়ার স্বযোগ করে দিচ্ছে। এতে কলকাতা রাজ্যীয় পরিবহন কর্পোরেশনের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

কলকাতা রাজ্যীয় পরিবহন কর্পোরেশনের মহল থেকেই এ-সংবাদ জানা গেছে। তাঁরা বলেছেন যে, ঐ অসং কণ্ডাক্টরদের অধিকাংশই সি পি আই (এম) প্রভাবিত সি এম টি সি পি প্রমিক সংগঠনের লম্বা।

প্রসঙ্গত তাঁরা আরো বলেছেন, এর সঙ্গে জোনাল ইন্সপেক্টরদের একাংশ জড়িত আছে। কারণ, অসং জোনাল ইন্সপেক্টরদের চুরির ভাগ না দিলে সংশ্লিষ্ট কণ্ডাক্টরদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের রিপোর্ট দিয়ে হয়রান করা হয়ে থাকে।

এতো গেল নগদ কাঁচা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার। এর আগেও পুতুর চুরি হয়েছে। ড্রিলিকেট টিকেট ছেপে তা বাসে বাসে বিক্রী করে এক প্রেমী কণ্ডাক্টর, ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন পদস্থ অফিসার একত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা বেআইনীভাবে রোলগার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

একত্রে বাসমন্ট সরকারের পরিবহন মন্ত্রী কিছু নিজস্ব ছদ্মবেশী বিখ্যাত লোক যদি বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডে

বন্ধুগণ, আপনাদের বিক্ষোভের অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণ আমরা বুঝি, কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের দাবী ও গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করতে পারছি না। দিল্লীতে অস্থিতি বর্ধনকারী বৈঠকে স্থিতিস্থাপক ৭১ সাল অথবা ১৯৫১ সালকে ভিত্তি বছর ধরে কয়েক লক্ষ লোককে 'অবাহিত' 'বহিরাগত' হিসাবে ডাঙিয়ে দেওয়ার কি ফল হবে? এর ফলে কি—

- (১) সুমিহীন অসমীয়া চাষীরা সুমি পাবে, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে?
- (২) আসামের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে?
- (৩) শিল্পের ব্যাপক বিকাশ হওয়ার বেকার সমস্যার সমাধান হবে?
- (৪) চা বাগিচার প্রসিক্ষের দায়িত্ব দূর হবে?
- (৫) কাবালীওয়াল (খান) বা ব্যবসায়ী মহাজনদের স্বত্বের ব্যবসা বন্ধ হবে?
- (৬) আসামের বাইরে থেকে যে কয়লা আসে তার দাম কি কমবে? শেবাংগ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

নিয়োগ করেন তা হলেই এ জিনিস জানতে পারবেন। চলন্ত বাসে ভীড়ের মধ্যে এটা অবশ্য লক্ষ্য নয়। কারণ, বাসের মধ্যে ক্যাশ ব্যাগ চেক করতে গেলে রাজীদেব কাছ থেকে নানা কারণে প্রতিবাদ এবং প্রতি-রোধ আসতে পারে। বাসের ট্রিপ শেষ হওয়ার পরেই ঐ ব্যাগ এবং সঙ্গেই তখন কণ্ডাক্টরদের বাস স্ট্যাণ্ডে দেহ তল্লাশী করলেই আদালতের বিরুদ্ধে আসবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাস স্ট্যাণ্ডগুলিতেও অসং কণ্ডাক্টররা দালাল বা নিজস্ব লোক বসিয়ে রাখে। ঐ সব অপেক্ষমান দালাল-দের কাছে টিকিট বাবদ সংগৃহীত কাঁচা পয়সা অসং কণ্ডাক্টররা পাচার করে দেয়।

এক ট্রিপ শেষ হওয়ার পরে নতুন ট্রিপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চলন্ত বাসের মধ্যে ঐ বেআইনী পয়সার খেলা বা চুরি শুরু হয়ে যায়। একত্রে বলা দরকার, এর সঙ্গে স্টেট বাসের এক প্রেমী নিত্যবাজীও জড়িত আছে। রাজীদেব মধ্যে যারা যে কটে বাতায়ত করে, নাম-বার নামের তারা কণ্ডাক্টরদের হাতে অর্ধেক ভাড়া শুদ্ধে দিয়ে চূপচাপ নেমে পড়ে। দেখে তনে মনে হয়েছে এটি একটি সুপারিক্রিয়ত চুরির ব্যবস্থা।

কাজেই, রাজ্য সরকার স্টেট বাসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তত্বী দিয়ে বতাই উন্নতি করার চেষ্টা করুন না কেন, এ চুরি বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে এর পরিচালনা ক্ষেত্রে স্বহিলের লজাবনা নেই।

মতামত

বামফ্রণ্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন, সমাজ-জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন দেখে মনে হয়না যে এখানে কতগুলি বামপন্থী দলের শাসন চলছে। সরকারী অফিসে কর্মচারীদের সময়মতো আসতে বলাও ভাড়াভাড়ি কাজ করার আবেদন বিফলে গিয়েছে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা জানেন যে যদি আজ পঃ বাংলার প্রশাসনে ব্যাপক মানগত পরিবর্তন আসে (নীতিত ভাবে) তাহলে আখেরে লাভ এই সরকারের, সি পি এমের ও ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যতের। কিন্তু তাদের সমস্তদেহ তারা এমনই অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া-লব্ধ করে তুলেছেন যে এই ধরনের আবেদন সাধারণ কর্মচারীর মনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ব্যর্থতা, নেতৃত্বের, সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন সমস্তদের পোলিটিকাইজ করতে পারেননি।

অফিস-খানা-কোর্ট-হাতপাতালে ঘুঘু চলছে সমানে। শোনা যায় মূল্যস্ফটকের সঙ্গে পাজা দিয়ে ঘুঘুর রেট বাড়ছে। কলকাতা পরিবহন কর্পোরেশনের কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রাইভেট বাসের নাকি অর্ধেক রাস্তার নামে। বাকী অর্ধেককে জোর করে রাস্তার নামানোর ক্ষমতা কি রাজ্য সরকারের নেই? কোনো বাড়তি স্বযোগ সুবিধা না দিয়ে সরকারী বাসের ১০ শতাংশ 'এল' মার্ক দিয়ে চালাচ্ছেন। ভাড়া বাড়ানোর পুঁজিবাদী ফাঁক-কিকির বামপন্থীরাও কিছু কম জানেননা। শিক্ষামন্ত্রী যাচ্ছেন খুনের মামলার আসামী অধ্যাপক এমন বিভ্রান্তির অহুষ্ঠানে ঝোপ দিতে। মুখ্যমন্ত্রী যান রৈদের মাঠে আর কামারপুত্র জয়রামবাটীতে "তীর্থ" করতে। রাজ্য সরকার পরিচালিত হোটেলের রোজ ক্যাবারে নাচের আসর বসছে। অল্লীল নাটকগুলি দৃষ্টিতে কিছু তর্জন-গর্জনই হলো। নাটকগুলি দৃষ্টিতে সরকার থেকে কড়া ব্যবস্থা নিলে জন মর্মণের কিছু ঘাটতি থাকতো না। জানিনা, সরকার কেন পেছিয়ে গেলেন।

আমরা অবগত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ও এই নীতিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা দ্বারিত্ব এড়াবার অজুহাত না হয়ে দাঁড়ায়। মাহুস শুধু মন্ত্রীকে ইচ্ছা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় (যেমন প্রশান্ত শূর) পেতে চায়।

ওখানকার মন্ত্রীরা কি বিলাসে ব্যসনে ও আমলাতন্ত্রের জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন।

আর একটা কথা মন্ত্রিসভার গঠন মার্কসবাদীরা ধর্ম-অন্ধ-জাতি-মারী-পুরুষ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে করবেন কেন? আর ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান সংগঠন অথবা কর্মীমাজই কিন্তু ভালো প্রশাসক নয়। পার্টি ভালো কর্মীদের যদি মন্ত্রিসভার গঠন দ্বারা পুরস্কৃত করতে চায় তাহলে প্রশাসনিক কাজকর্ম যেমন ক্ষুদ্র হবে, পার্টিও হারাবে ভালো কর্মী। একটি জাজল্যমান উদাহরণ সম্ভবত অমৃতেশু মুখোপাধ্যায়। প্রায় সকালে দুপুরের গাড়ীর জন্ত হা শিতোশ করে বসে থেকে অবশেষে মুখোপাধ্যায় বোতলে দুধ (?) আনতে আনতে এই কথাটাই মনে পড়ে।

বামপন্থীলগ্নি ভোট ক্যাচিং মেশিনারী এখন দুর্ভেদ্য করে তুলেছেন গ্রামে। যেখানেই ভোটার বেশী ভাল সংগঠন পড়ে তুলেছেন। তাই অল্প নির্বাচন হলে আগামী কয়েকটি নির্বাচনে বামফ্রণ্টকে হারানো মুশকিল। কিন্তু এভাবে চললে কমিউনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ কি?

আশিস দত্ত

আজগুবি তথ্য

কোন-মাহুকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা আমি অপছন্দ করি। কিন্তু স্বস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসাম নিয়ে বা লিখেছেন তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমার প্রথমই মনে হচ্ছে তাঁর সম্পর্কে দুচারটে কথা বলা দরকার। প্রাক্তন নকশালী এবং বর্তমানে একটি তথাকথিত আমেরিকান সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এই ভক্তলোক যখন আসাম আন্দোলনের স্বপক্ষে কথা বলেন তখন আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না যে আসামের আন্দোলনের মদত জোগাচ্ছে বিদেশী শক্তি।

স্বস্তবাবু বলেছেন আসাম থেকে ভারত সরকার চা বাবদ রাজস্বের করে অথচ সেই অহুষ্ঠানে আসামে লগ্নী হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কী অবস্থা? এখানের পার্টি এবং চা মিলিয়ে ভারত সরকার বা আয় করেন তার কতটা আমরা পাই? বছরে ১৬০০ কোটি টাকা ভারত সরকার অর্জন করেন এই রাজ্য থেকে বিভিন্ন খাতে এবং তার বদলে বার্ষিক যোজনায় ১০০ কোটি টাকার বেশী কখনোই আমরা পাই নি। তাহলে

কী আমরাও "বিদেশী খেদা" আন্দোলন শুরু করব? অবশ্য স্বস্তবাবু হয়ত তাই চাইবেন। দ্বিতীয়ত উনি লিখেছেন আসামে বাঙালীরা গরীবী আসামীদের আক্রমণ করেন। কোথা থেকে উনি এই তথ্য পেলেন? উনি আসামে গেলে দেখবেন সেখানে বাঙালীরা কী ভীত অবস্থায় আছেন। রবিন মিজকে হত্যা কী বাঙালীরা করেছিলেন? গোহাটি শহরে বাঙালীরা আজ কিরকম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তা কি তিনি দিল্লীতে বসে বুঝতে পারছেন না, নাকি গোহীম সাহেব তাঁকে তা বুঝতে দিচ্ছেন না?

সর্বশেষে উনি কি জানেন যে আসামে একমাত্র সংগঠিত বামপন্থী হল মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি আজ এই "গণ আন্দোলনের" প্রধান শিকার? অবশ্য "বিপ্লবী" স্বস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হয়ত আসাম আন্দোলনের, এইটাই বিরাট লাকল্য।

স্বস্ত সেন

আমি মন্ত্রী.....

গত ৪ঠা মে রবিবার টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নবনির্মিত ভবনের শুভ ঘারোদানটন উপলক্ষে আমরা লুইস সামিল হয়েছিলাম। পদযাত্রা চলছে রাসবিহারী রোড ধরে, উপস্থিত হলম সতীশ মুখার্জী রোডের লংবোগ স্থলে এমন সময় পেছনে শোনা গেল টালীগঞ্জ ট্রামের ঘটাং ঘটাং শব্দ। আমাদের শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। সঙ্গে আছেন শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশোক মুখার্জী ও অধ্যাপক মঙ্গীপ দাস প্রমুখ বিদগ্ধজন। কিন্তু অকস্মাৎ রোজতপ্ত মন্ত্রী প্রশ্নের কি হল, দৌড়ে এলেন বিশ হাত দূর থেকে পিছনের দিকে, ট্রাম কন্ডাক্টরকে ধকুম দিলেন "ট্রাম থামাও, থামাও"।

একথা শুনে সবিস্ময়ে কন্ডাক্টরটি বললেন—"বাবু, এ ট্রামটি ছেড়ে দিলেই তো আপনাদের শোভাযাত্রা ভালভাবে চলতে পারে।"

একথা শোনামাত্র মন্ত্রীশাই তেজে বেগুনে জলে উঠলেন, ধকুম দিলেন "জান আমি কে? এমুনি ট্রাম না থামালে তোমার চাকুরী ক্ষতম করে দোব। থামাও ইমিডিয়েটলি...আম্পাধী থেবেছ..."।

হার রবীন্দ্রনাথ! দড়ের ঐরাবত আজ তোমার বাহন হলো। ব্যালা-কোইন হুদ তোমার মূর্তি কি লংকোচে স্মরণমান হচ্ছে?

রূপেশচন্দ্র পোদ্দার

বহিরাগত বিতাড়ন

৩য় পৃষ্ঠার পর.

এককথায় জনস্বীবনের সব সমস্তার সমাধান হবে, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনাহার থেকে আসামবাসীরা মুক্তি পাবেন? এই মুক্তির গ্যারান্টি যদি দিতে পারেন তাহলে আপনাদের দাবীমত যে কোন সালকেই ভিত্তিবহুর ধরে কয়েক লক্ষ গরীব জনগণকে বিতাড়নের দাবী ভেবে দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: আপনারা দাবী করেছেন যে 'বহিরাগত'দের বিতাড়নের পর মতুন ভোটার তালিকা তৈরী করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। ধরা যাক, আপনাদের দাবী মত নির্বাচন হল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসাম বিধানসভার ১২৬ জন এর এল এ নির্বাচিত হলেন। তারপর যে কোনও এক রাতের অন্ধকারে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ৩৬৬ ধারা বলে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ভাবে এক কলমের খোঁচায় সে সরকার ও বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

আপনারা তো কেন্দ্রের এ ধরনের বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখেন নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নামে দেশে যে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা চলছে, দিনের পর দিন রাজ্যের ক্ষমতা ধ্বংস করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তো কিছুই বলেন নি।

বন্ধুগণ, আবার বলছি আপনাদের কোন্ডের কারণ অবশ্যই যুক্তি-যুক্ত, কিন্তু বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য ও গতি-প্রকৃতি ভুল পথে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আপনাদের আন্দোলনকে 'পিকনিক মুভমেন্ট' ও 'ধনী মহিলারা ভ্যানিটি ব্যাগে জ্যাম-জেলী-শাওউইচ সহকারে এ আন্দোলন চালাচ্ছে' বলে যে অশোভন মন্তব্য করেছেন তার তীব্র নিন্দা করি। আরও নিন্দা করি ছাত্রপরিষদের রাস্তা অবরোধ করা বা কলকাতার আসামভবন ও আসাম ট্রিবিউন প্রতিকার কলকাতা অফিসে হাজরা করাকে। আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদের বর্তমান আন্দোলনের পিছনে অন্ততঃ মধ্য-বিত্তদের ব্যাপক ভাবে টানতে পেরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লীতে আলোচনাকালে আপনারা অসমীয়া ভাষার কথা বলার দোষাচারী নিয়োগ করতে হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হলেনও আমরা আপনাদের স্বত্বাধী জীতিকে সালাম জানাই। কারণ আপনারা বিদেশী ইংরাজী বা

হিন্দীকে মেনে নেন নি।

আমরা আসামকে উপজাত অঞ্চল ঘোষণা করে সামগ্রিক দমননীতি চালিয়ে ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করি। সত্যিই তো ভারতের শাসকশ্রেণী পুলিশ মিলিটারী খাতে যে ভাবে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে তার কথা ভাগও আসামের উন্নতির জন্যে ব্যয় করেনি।

কিন্তু বন্ধুগণ, আন্দোলনের বর্শা-মুখ পুঁজিপতিদের ও সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে তা তথাকথিত বহিরাগত গরীব জনসাধারণের বিরুদ্ধে চালিত করলেন, এটাই দুঃজনক। আজ আপনারা কার্ভত যা করছেন এর ফলে এক রাজ্যের অফিসে জুলে-কলেজে ভিন্ন রাজ্যের মহিলা-পুরুষ-ছাত্রছাত্রী পাশাপাশি বসতে পারবেন না। এর ফলে আঞ্চলিক সংহতি বিনষ্ট হবে। আর নিজেদের মধ্যে ধোঁয়াধোঁয় করতে দেখে পুঁজিপতিদের মুখে হাসি ফুটবে।

কলকাতার সদ্য অহুষ্ঠিত চতুর্থ সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে আসাম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ আনন্দিত হয়েছে। বর্তমান আন্দোলনের ফলে দর্শকরা খেলার মাঠে আসামের খেলোয়াড়দের শত্রু মনে করেনি। বামপন্থী আন্দোলনের নীতিস্থান পশ্চিমবঙ্গ। আপনাদের জটিল চোখে আসাম দিয়ে দেখিয়ে দেবে কিন্তু বিপন্নীতে সংকীর্ণ প্রাদেশিক ভাষাধর্মমতোভাবে বিপথ-চালিত হবে না।

বন্ধুগণ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের তো সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য লড়াইয়ের সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। ১৯৪৬ সালের ১১ই জুলাই শুরু হওয়া ধর্মঘটের কথা মনে পড়ে। সরকারের হুমকী ও বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত প্রদেশের সঙ্গে বাংলা ও আসামের পোষ্টাল, আর, এম, এস ও পি, এম, জি, অফিসের কর্মচারীরা ২১শে জুলাই থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। সারা আসামে ২১শে জুলাই সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। ২১শে জুলাই কলকাতা অচল হোল।

হাতে হাত মিলিয়ে এরকম লড়াই করার বহু নজীর আছে। আজ আপনাদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, "বহিরাগত" বিতাড়নের ভুল পথ ছাড়ুন, আসুন আমরা একযোগে লড়াই করি কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে রাজ্যের হাতে অধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের জন্ত, ভূমি সংস্কার ও ব্যাপক শিক্ষার নের দাবিতে।

একটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

দিলীপ স্বামী

১৯৮০ সালের অর্থনীতি খুব একটা আশাশ্রয় বলে মনে হয় না। প্রথম তিন মাসে যে ৫ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তার মানে দাঁড়ায় ২০ শতাংশ হারে বার্ষিক মূল্যবৃদ্ধি। এক মাসের মধ্যে চিনির দাম ৪৮০ থেকে বেড়ে ৬০০ প্রতি কে, জি, হয়েছে এবং সিমেন্ট প্রতিব্যাগ ১৫ থেকে ২০ টাকা কমে পাওয়া যাচ্ছে না। হরিয়ারায় যে ডিজেল বিক্রী হচ্ছে ১৫০ লিটার তার দাম। উত্তর প্রদেশে কম করেও ৩০০ লিটার। 'শক্তিশালী' সরকার এবং আর্থিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিবারণ আটক আইন বলবতী হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতি এই জটিলতা ধারণ করেছে।

ঘটতি, পরিকল্পিত অথবা বাস্তবিক যাই হোক না কেন, ক্রমশ ব্যাপক হয়ে পড়ছে। শক্তি, বিদ্যুৎ, কয়লা, বস্ত্রপাতি ইত্যাদি সমস্তই আজ কম সরবরাহের মুখে। গত বৎসরের প্রথম তিনমাসের তুলনায় ১৯৮০-র এই তিন মাসে শিল্পজাত উৎপাদনের হারও নিম্নমুখী। ডিজেল এবং বিদ্যুৎ বাটতির সঙ্গে ব্যাপক খরচ হুত্ব হয়ে কৃষি উৎপাদনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। অজুমান করা হয় যে খরিক উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ কম হবে এবং রবি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই এই ঘটতি হবে আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এর অর্থ হল উৎপাদনের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় প্রায় ১ কোটি টনের বেশী কমে যাবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এর মানে হল রোজগার সুবিধার অভাব, কম আয়, কম খরচ এবং শ্রমবাহী বিকাশের হ্রাস।

এই মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও সরকারী খরচকে আয়ের তুলনায় অনেক বেশী রাখা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংকেত অনুসারে শুধু বাজেট বাটতির পরিমাণই হবে প্রায় ১২৩৫ কোটি টাকা। মত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত সরকারী ধেনার যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সে অনুসারে মোট বাটতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকাও বেশী হবে বলে মনে হয়। এই বাড়তি খরচ মূল্যবৃদ্ধিকে আরো ব্যাপকতর রূপ দেবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। অতীতকালে 'বিশেষ ব্যবসার' দের অর্থের পরিমাণও বিশদ সংকেত দিচ্ছে। শুধু খনিজ তেলের আমদানী হিসাবই প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার মত বা আমদানী মোট বিদেশী মুদ্রা আয়ের ৮০

শতাংশের সমান। ভবিষ্যৎ-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে আমদানী করার কথা, তা বজায় রাখাও এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যহার স্থির করার উদ্দেশ্যে সরকার সিমেন্ট এবং বস্ত্রপাতি আমদানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের বিদেশী ঋণ পরিশোধ করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়। আন্তরিক এবং বাস্তবিক বাটতি যে পরিমাণ হয়েছে তাতে আজ এই প্রশ্নই ওঠে যে আমরা কি পুরোপুরি দেউলিয়া হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি?

এ সম্পর্কে সরকারী প্রতিক্রিয়া কি? 'নতুন' সরকারের মনোভাব বিধানসভা নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করার বলে মনে হয়। নির্বাচনের আগে বাজেট বাটতি পূরণ করার জন্য কয়ের বোঝা বাড়ানো অথবা মূল্যবৃদ্ধি কমাবার উদ্দেশ্যে অসং ব্যবসায়ীদের আটক করা হুইই রাজনীতিক ভাবে অসুবিধাজনক। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য পার্টি কাণ্ডে টাকা আনা বাজেট বাটতি পূরণ করার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় এবং এই টাকা দ্রুত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ই তোলা সম্ভব। সাধারণ এবং রেল এই দুটো বাজেটের কোনোটাতেই বাটতি কমানোর কোনো রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হয় নি। বাট দশকের মাঝামাঝি যে রকম তিন বছরের পরিকল্পনাহীন সময় রাখা হয়েছিল আরেকবার আমরা সেই রকমের পরিকল্পনাহীন সময় দেখতে পাবো বলে মনে হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে কোনো কারণে এই দায়িত্ব বিমুখ মনোভাব নিলে তার প্রভাব আমাদের অর্থ ব্যবস্থার উপর বিপরীতই হবে।

দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গিও খুব একটা আশাশ্রয় নয়। ১৯৬৫ থেকেই দেশে অর্থ বিনিয়োগকারীরা হরতাল করে বসে আছে। ব্যক্তিগত পুঁজি বাক্যার বিস্তৃত না হওয়ার নিম্নে গুটিয়ে রেখেছে। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিও বিশেষ সুবিধা আদায়কারীদের মনোভাবের জন্য বিকশিত হতে পারছে না। কৃষি, ছোট শিল্প এবং রকতানীতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা প্রতি বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া হুড কর্পোরেশনের খাতি মজুদ করার তহবিলে ২৫০০ কোটি টাকা আটকে আছে। সরকারী

সাহায্য এবং ঋক মজুতের উদ্দেশ্যে ২০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষা তহবিলে, সরকারী ঋণের জন্য যে পরিমাণ 'সুদ' দেওয়া হয় তার হিসাব প্রায় ১৫ শতাংশ এবং এছাড়া ২৪ শতাংশ রেখে দেওয়া হয় সরকারী চাকুরিদের বেতন এবং অন্যান্য ঋণ শাসনিক খরচের খাতে। এই সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে যে ১৬ শতাংশ বাকি থাকে তা ব্যয় হয় বিকাশকারী এবং বিদেশী ঋণ পরিশোধে। এবং এই কারণেই জল, বিদ্যুৎ, বাতায়াত ও রাস্তার মত প্রয়োজনীয় সুবিধা বাড়াতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

এবারে দেখা যাক সরকারী সাহায্য কৃষি, ছোট শিল্প এবং রকতানী ক্ষেত্রে বাস্তবিক পরিস্থিতি কি? ১৯৬৭ সালের পরে কৃষিতে একটুখানি বিকাশের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো কিন্তু তথাকথিত 'নতুন' বীজ দেশের তুলনামূলকভাবে বিকশিত অঞ্চলের ধনী কৃষকদের কাছে গিয়ে থমকে পড়েছে। অনেক নতুন ছোট শিল্প 'বিদ্যুৎ, কাঁচামাল এবং বাজারের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বহির্গত রকতানীর পরিমাণ আগের তুলনায় বেড়েছে তবুও আন্তর্জাতিক বাজারে যে ভীষণ মন্দা আরম্ভ হয়েছে তার মুখে ভারতের রকতানী বৃদ্ধি কোথায় গিয়ে ঠেকে বোঝা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র খনিজ তেলের মূল্য পরিশোধ করার জন্যই আমাদের রকতানী বিকাশের হার শতকরা ১০ ভাগ প্রতি বছর হওয়া প্রয়োজন। এ থেকে সরকারী সাহায্য পুঁজি এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিকাশও ক্রমশঃ হয় নিম্নমুখী।

এবং এটাই হ'ল নিষ্ক্রিয়তার ফাঁদ। এটা মনে হয় যে 'প্রাথমিক' ক্ষেত্রগুলি 'সুবিধা' না পেলে ভেঙে পড়বে। এবং যদি এই প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিকে বাঁচানো না হয় তাহলে অল্প ক্ষেত্রে বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরী করা যাবে না। এখন দেখতে হবে যে 'নতুন' সরকার এই ফাঁদ কাটার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়।

আমল ব্যাপার হল 'সুবিধা' দেওয়া হবে কি হবে না। যদি আমাদের ব্যবস্থার 'সুবিধা' দেওয়ার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য শেব সীমার এদে গিয়ে থাকে তাহলে রাষ্ট্র মনোভাব ভীষণাকার ধারণ করতে বাধ্য হবে। তাই আশা করা যাক যে এই 'সুবিধা' এবং ভীষণতার মধ্যে 'স্থিরতার' স্বার্থে একটা সম্মেলন আনা যাবে, যদিও অনেকের মতে এটা আকাশ কুহুম চিন্তা।

সংকটের দায়িত্ব কার ?

অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটু একটু করে পিছু হঠতে শুরু করেছেন। লোকসভা নির্বাচনের সময় জিনিসপত্রের দাম অবিরামবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তার নির্বাচনী ভাষণে প্রাধান্য পেয়েছিল। কেউ কেউ হয়তো তার কথায় বিশ্বাসও করেছিলেন। কারণ জনতা ও লোকহল সরকারের কাজকর্মে সবাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অল্প বিকল্প বা তরসাও ছিল না।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী অর্থনৈতিক দুর্গতির গোটা দায়ভারই জনতা ও লোকহলের মাড়ে চাপিয়ে রেহাই পেতে চাইলেও ঘটনা তা নয়। শ্রীমতী গান্ধী যাই বলুন বাস্তব ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তিনি ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্ব করার সময় থেকেই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল।

কয়েকটা ঘটনার উল্লেখই এটা

অর্থনীতি

বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পরই টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক ও পশ্চিমী দেশগুলির চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকলে দেশের মুদ্রার মূল্য কমে না। ১৯৭৪ সালে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ। মূল্যবৃদ্ধি বাটতি ছিল ২২ ভাগ। এটা আগের বছর অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের তুলনায়। কোন এক বছরে এত বেশী মূল্যবৃদ্ধি ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধির নজীর আজও নেই। শ্রীমতী গান্ধীই তখন দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

এই নিদারুণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল চই যে সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘটের কথা কেউ ভুলে যায় নি। তখন শ্রীমতী গান্ধী ধর্মঘট রেল শ্রমিকদের দমন করার জন্য যে নিদারুণ সহ্যাস সৃষ্টি করেছিলেন তা কেউ ভুলে যেতে পারে না। ১৯৭৫ সালে শ্রীমতী গান্ধী নিজেই অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য কোন উপায় তার জানা ছিল না।

১৯৬২-৭৪ সালের চতুর্থ পঞ্চ-

বার্ষিক পরিকল্পনা স্বগিত রেখে তিনিই বার্ষিক পরিকল্পনার রেওয়াজ চালু করেন। স্বতন্ত্র চতুর্থ পরিকল্পনা কার্যতঃ মাঠে মায়া যায়। তার পরে পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া ও তার পরিণতিও সবারই জানা। পর পর পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার জন্যে যে অর্থনৈতিক সংকট দায়ী, শ্রীমতী গান্ধীর আমলেই তার সৃষ্টি।

১৯৭৭ সালে শ্রীমতী গান্ধী যখন পরাজিত হন, তখন তার সরকার কী সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন? বিদেশী মুদ্রার মজুত তখন ২৩৭৮ কোটি টাকা, খাদ্য শস্তের মজুত ১২০ কোটি টন। লোকহল জনতাদলের সরকার থেকে জাহ্নুরাঙ্গী মাসে কংগ্রেস (ই) সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় মোট বিদেশী মুদ্রার মজুত ছিল প্রায় ৫৩০০ কোটি টাকা এবং খাদ্য শস্তের মজুত ছিল ২২ কোটি টন। অথচ এই কমানোর মধ্যেই খাদ্য শস্তের মজুত করে গিয়ে ১.৫০ কোটি টন এবং বিদেশী মুদ্রার মজুত কমে ৩২০০ কোটি টাকার দাঁড়িয়েছে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। জুতো, সাবান, দেশালাই, চিনি, খাদ্যশস্য কাপড়চোপড়, কাগজ কোন জিনিসটার দাম বাড়েনি?

শ্রীমতী গান্ধীই ব্যক্তিগতভাবে এই অবস্থার জন্যে দায়ী বলছি না। কারণ এই অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে এমন কতগুলি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে যার ফলে সংকটের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এই নীতিগুলি পালটানোর প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি আরো শক্ত করে এই নীতিগুলিকেই আঁকড়ে ধরেছেন।

এবং ঐ দেউলিয়া নীতিগুলি দেশের পুঁজিবাদীদের পক্ষে, জনসাধারণের পক্ষে নয়। শ্রীমতী গান্ধী ঐ ব্যর্থতার পথ পরিত্যাগ করবেন এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তার পক্ষে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই মুখ্য বিষয়। ১৯৬৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস এর ভূরি ভূরি নজীর রেখেছে।

অতি সম্প্রতি তিনি পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করেছেন, কিন্তু নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিশন ও পরিকল্পনা মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন নি। তিনি বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান হার ৫ শতাংশ হবে বলে ঘোষণা করে-শেষাংশ ৮ম পাতায়

শস্য উৎপাদন ও চকবন্দী কার্যসূচী

রবিণ্ডহরায়

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ে। অর্থনীতির পণ্ডিতেরা বলেছেন উৎপাদন পদ্ধতি যদি একই রকম থেকে যায়, কোন পরিবর্তন ঘটান না হয় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে দ্রুত হারে হয়ে থাকে এবং পরিণামে মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। যে সময়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ বাস হতো সেই সময়ে পণ্ডিতেরা এই মতামত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে চাষের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয়। জমি চাষ করার জন্য ইঞ্জিন চালিত ট্রাক্টর আবিষ্কৃত হয়। জল সেচের জন্য বিভিন্ন প্রকার শক্তির দ্বারা চালিত পাম্প ব্যবহার হয়। জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানোর জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক সার ও পোকা মাকড় মেরে গাছ বাঁচানোর জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক বিষ আবিষ্কার হয়। গবেষণার দ্বারা অধিক ফলনশীল উৎকৃষ্ট জাতের বীজ আবিষ্কার হয়। এইভাবে নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে চাষের জমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমতা রেখে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে গণ্য করা হয়।

একটা দেশের স্বাধীন সরকারের পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চাষের কাজের জন্য জমিজমির মালিকানা চকবন্দী হিসাবে বন্টন করা প্রাথমিক কর্তব্য। জমির উপরে ভাগচাষীর সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছেন

সেটা জমি চকবন্দী কার্যসূচীর আগে স্থান পেতে পারেনা। খাদ্য উৎপাদনের কার্যসূচীতে ক্রমসীমার সরকারের একমাত্র কৃষিকা হওয়া উচিত কিভাবে যত বেশী পরিমাণে সম্ভব শস্য উৎপাদন হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। চকবন্দী কার্যসূচীকে অবহেলা করে শুধুমাত্র জমির মালিকানাতে বিশৃঙ্খল ভাবে বন্টন করলে সেটা উৎপাদনের সহায়ক হতে পারেনা। বর্গাদারকে জমির মালিকানা সত্ত্ব প্রদানের কার্যকলাপে সরকার এবং সরকারী দলের কর্মীবৃন্দ যদি নিজেদের সম্পূর্ণ ক্রমতা প্রয়োগ করেন তাহলেও ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। একটা কঠিন দুঃসাধ্য কাজকে এড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ করার প্রবণতা এই বর্গা আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য। আমাদের মনে রাখা উচিত উৎপাদন জমির মালিকানার উপর নির্ভরশীল নয়, কেবলমাত্র পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কে জমি চাষ করল, বর্গাদার করল কি জমির মালিক করল সেটা উৎপাদনকে প্রভাবিত করেনা।

পশ্চিমবঙ্গের চাষের জমিজমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের উপযোগী নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমিজমিকে চাষের যোগ্য করে তুলতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জমিকে চকবন্দী হিসাবে বন্টন করা। বর্গাদার সত্ত্বের প্রমাণপত্র কেবলমাত্র চাষীকে ব্যক্তি থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করবে কিন্তু অপরদিকে তার জমির মূল মালিকের সঙ্গে সম্ভাবনাপূর্ণ করবে। পাঁচ বিঘা জমির মালিকের দু'কাঠার ভাগ চাষ রেকর্ড করা জমিতে শস্যের চেয়ে বেশী ফলবে বিষয়।

আমাদের এই বক্তব্যে কোন জটিলতা আছে বলে মনে করিনা যে তিন একর জমির মালিকের জমি যদি তিন মাইল এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে সৃষ্ট ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে চাষ করা তার পক্ষে কোন প্রকারে সম্ভব হবেনা। কারণস্বরূপ জানাই (১) চাষী নিজের জমিজমি এক জায়গায় না পাওয়ার ফলে নজর রাখা সম্ভব নয়। জমিতে জলসেচ করতে পারবেনা; (২) ট্রাক্টর অথবা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে চাষ করার কাজে নানা অসুবিধা দেখা দেবে; (৩) জমিতে সার

প্রয়োগ করলে সেটা বর্ষার আগে ধুয়ে অপর জমিতে প্রবেশ করবে যেখানে হরত গাছ লাগান হয়নি। অপর দিকে চকবন্দী হিসাবে জমি বন্টন হলে এসব অসুবিধা দূর হবে।

চকবন্দী কার্যসূচী রূপায়ণের পথে প্রধান অন্তরায় মৃত ব্যক্তির জমিতে মালিকানা। বহু বৎসর পূর্বে মৃত পূর্বপুরুষের নামে খাতা খতিয়ান চলছে এবং সঠিক মালিকানা সাব্যস্তের দাবীতে কোর্ট কাচাৰীতে ছুটোছুটি চলছে। এই জটিল অবস্থা থেকে জাণ পাবার জন্য প্রয়োজন কৃষি আইন সংস্কার। কেবলমাত্র কৃষি সংস্কার বললে কথাটা সম্পূর্ণ হয়না। কৃষি আইন সংস্কার করে চকবন্দী কার্যসূচী গ্রহণ করলে প্রভাবশালী লোকের বেনামী জমি রাখার যুগের অবসান হবে, কারণ প্রতিটি চকের দাবিদারকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মালিকানার দাবী জানাতে হবে। এখন যেমন দূরদেশে থাকা ভারতীয়দের নামে, বাড়ীর দুইদল গাইটার নামে পোষা টিয়া পাখিটার নামে, মল-জিরের নামে, শীতলার নামে বহু জমি বেনামে রেখে ভোগ দখল করা হচ্ছে তখন সব চিহ্ন ফাঁক হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি রাখার যে সিলিং আইন আছে তখন সেটাও সঠিক ভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হবে। চকবন্দী কার্যসূচীর সার্বিক রূপায়ণ হলে পশ্চিমবঙ্গের জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যাবে। সর্বোপরি, প্রয়োজন অস্থায়ী বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা সরকারী নির্দেশ কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্গা আন্দোলনের দ্বারা রূপকার তাঁদের কারও দেশে পাড়াগায়ে চাষের জমি আছে বলে মনে হয় না, কারণ তাহলে তাঁদের দৃষ্টি অবশ্যই চাষের মূল সমস্যাটার দিকে পড়ত। পরিশেষে জানাই বর্গা আন্দোলন একটা সাময়িক বন্দোবস্ত। এর দ্বারা কোন দীর্ঘস্থায়ী ফল পাবার আশা নেই। উপরন্তু বর্গাদারী ভগ্নে চাষী জমি ফেলে রাখবে, কিন্তু কাউকে ভাগচাষ করতে দেবেনা। আমাদের উচিত হবে সমস্যা নীতিকে সামনে রেখে চকবন্দী কার্যসূচী গ্রহণ করা।

হাসপাতালে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা

আদামসোল শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কালী সেটাল হাসপাতালে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। একপ্রকার কর্মচারী দুর্নীতি দিনের পর দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুষ না দিলে রুগীদের চিকিৎসা হবে না। অথচ এই হাসপাতালটি হল এই কল্যাণনি অঞ্চলের প্রশাসনের একমাত্র হাসপাতাল। কুয়া নাটিকিকেটের বিনিময়ে একপ্রকার দুর্নীতিবাজ কর্মী হাজার হাজার টাকা কারিগরে নিচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ। চিকিৎসকরা নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নিয়ে চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে চলেছেন।

অপরদিকে এই হাসপাতালে কতিপয় সমাজবিরোধী দৌরাণ্ডা সকলকেই চিকিৎসা করে তুলেছে। সমাজবিরোধীদের উৎপাতে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। নার্সদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। ভয়ে কেউ মূখ থলতে চায়না।

বর্তমানে এই হাসপাতালে জল না থাকার অজুহাত দেখিয়ে রুগী ভর্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পাবলিক হেলথ বিভাগ এই হাসপাতালের জন্য কল্যাণেশ্বরী থেকে জল আনার যে পাইপ লাইন বদিয়েছে তার কাজ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তা চালু হয়নি। নিকটস্থ পরিভ্রমণ করলা খনি থেকে জল ধারণ।

ই সি এলের অফিসারদের উপরি উপার্জনের নতুন ব্যবস্থা

ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড নামক সরকারী সংস্থাটিতে অফিসারদের উপরি উপার্জনের এক নতুন ব্যবস্থা সকল মহলকে বিস্মিত করেছে। এই ব্যবস্থার ফলে অফিসাররা সর্বকণের কর্মী হয়েও ২৬ দিনে মাস ধরে কাজ করবেন এবং তার অতিরিক্ত কাজ করলে উপরি আয় করবেন। অর্থাৎ ই সি এল কর্তৃপক্ষ অফিসারদের বাড়তি অর্থ পাইয়ে দেবার এক বেসাইনী নজির স্থাপন করল।

ভারতে কোন সরকারী শিল্প সংস্থার রবিবার বা শুভার টাইমের জন্য অফিসারদের বাড়তি অর্থ দেবার নিয়ম চালু নেই। কেননা এরা সবাই ২৪ ঘণ্টার কর্মচারী বলে গণ্য হয়ে থাকেন এবং সেই শর্তেই তাঁদের চাকরীতে নিয়োগ হয়। বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক মহলের ধারণা যে এই সংস্থার অফিসারদের এই বাড়তি সুবিধা পাওয়া অসম্ভব সরকারী

আনার জন্য এই হাসপাতালের যে মিশ্রণ ব্যবস্থা আছে তদারকীর অভাবে তাও বিপর্যয়। উল্লেখ্য যে, জল সরবরাহ ও বিদ্যুৎ তদারকির ভার রয়েছে প্রধানত দৈনিক হাঙ্গিরায় করেকজন মজুরের ওপর। এই সব কর্মীদের একাংশের আচরণ সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

পাম্প ঘর থেকে ডিজেল চুরি, তার চুরির ঘটনা তো নিত্যই আছে। কর্মীরা দ্বায়ে ডিজেল পাম্প চালাতে গেলে নানা ভাবে তাদের ভয় দেখানো হয়। অনেকে মনে করছেন এই হাসপাতালটিকে বন্ধ করে দেবার একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে।

এই হাসপাতালের একপ্রকার কর্মচারী টাকার বিনিময়ে কোন কোন খনি প্রশিক্ষণে "আনফিট" নাটিকিকেট দিয়ে তার জায়গায় তার নিকট আত্মীয়কে নিয়োগের পথ করে দিচ্ছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। অবসর গ্রহণের ১৫ দিন আগে আনফিট নাটিকিকেট নিয়ে পুত্রকে কাজে চোতানো হয়েছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। এইভাবে কুয়া নাটিকিকেট দিয়ে এক দুর্নীতিবাজ চক্র হাজার হাজার টাকা কারিগরে নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এই হাসপাতাল সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত হলে হাসপাতালের বহু দুর্নীতি প্রকাশ পাবে বলে অনেকের ধারণা।

শিল্পের অফিসারদের প্রভাবিত করবে এবং তাতে গুণগোল বাড়বে।

ই সি এলে রবিবার কাজ করা নোর জন্য প্রশিক্ষণের দিগুণ বেতন দেয়া হয়। অথচ উৎপাদন হয় অসম্ভব দিনের উৎপাদনের আর্থে-কেরও কম। এই ভাবে লোকসান দেবার নজীর আর কোথাও নেই। এর ওপর অফিসারদের রবিবার কাজ করার জন্য ঢালাও অর্থ পাইয়ে দেয়া হল। ই সি এলের মত কোল ইন্ড্রিয়ার অধীনস্থ অন্য সংস্থাজলিতে অল্পরূপ চেষ্টা হয় কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তা অগ্রহণ করেননি।

ই সি এলে সাধারণ কর্মীদের শুভার টাইমের টাকা দেয়া হয় মূল বেতন এবং মহার্ঘতা। এক করে যা হয় তার ভিত্তিতে। কিন্তু অফিসার-ক্ষেত্রে তারা মাসে মোট যে টাকা পান তার ভিত্তিতে। এই অসাম্য কেন? রবিবার কাজের জন্য বাড়তি শেফাংশ চম পৃষ্ঠায়



ফ্যান্টাসী কেক বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্বত্র ৫০০ টি চাই

নজরুল অশান্ত না বিদ্রোহী ?

কালিদাস কুণ্ডু

“দেখিছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
অশান্ত রোমনসখী দেখেছিলে তুমি।
একা তুমি জানিতে হে কবি মহা ঋষি,
তোমার বিদ্রোহটা আমি ধুমকেতু।”

“তোমারি বিদ্রোহটা আমি ধুম-
কেতু”—রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেই
নজরুলের এই মর্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি।
বিদ্রোহী অগ্নিময়ী নজরুলের কবি-
সত্তার গভীর বেদনাসম্পন্ন অস্থিরতা
ও অশান্ত রোমনস্কতার বিচিত্র জীবন
অভিজ্ঞতারই মহিমাদীপ্ত পরিচয়।
এই ‘অশান্ত রোমনস্ক’ নিয়েই উন্নত
বৈশাখী ঋতুর আকস্মিকতার মত
নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’ সংকলিত করে-
ছিল যৌবনের বিপুল কলরোল।
যুগের হৃদয় কেটে গেলে তার কাব্য
সময়ের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে
স্বায়ত্ব লাভ করবে কিনা এই সংশয়
ছিল কবির মনে কিংবা তার হৃদয়
কাব্য পৌরুষ আদৌ পরোয়া করেনি
তাৎক্ষণিক কালের জুড়টিকে। অজস্র,
অদ্বন্দ্ব প্রাণ-প্রাচুর্যের অধিকারী
নজরুল বাঙালীকে তুলিয়েছিলেন
জীবনের জাগৃতি-গান। বিদ্রোহ ও
সংগ্রাম এবং সংগ্রাম ও বিদ্রোহ—এই
অক্লান্ত, অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত
হয়েছে নজরুলের কাব্য সাধনার
জীবন।

বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? স্বষ্টির
বিরুদ্ধে? বিধির বিধানের বিরুদ্ধে,
না প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে?
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিই ধরা থাক।
কখনও কবি বলছেন: “আমি
বিদ্রোহী তুমি—ভা গ্য বা নের
বুকে একে দেব পদচিহ্ন।” আবার
কখনও বলছেন: “মহাপ্রলয়ের আমি
নটরাজ, আমি ইজরাইল, সেই মহা
হুঁসোংগের নটগুরু।”

স্বভাবতই অনেকের মনে হয়েছে
নজরুলের এই বিদ্রোহ রোমান্টিক
বিদ্রোহ—স্বভাবজাত অরচিত বিদ্রোহ।
এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের কারণ
সমাজ ব্যবস্থা বা বাস্তব পরিস্থিতির
গর্ভে নিহিত নেই।

তবে কি নজরুল ‘রক্তকরবীর’
রাজার মত নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ
সংবর্তিত করেছেন কিংবা তার অশান্ত
মানস প্রকৃতির পশ্চাতে পরাধীন
সাম্রাজ্যবাদ উৎপীড়িত একটি জাতির
মর্মস্বপ্ন জাগ্রত প্রেরণা হয়ে কাজ
করেছে?

এক অর্থে দাব মত কবিই তো
বিদ্রোহী। শেলী, বাইরন, মাইকেল
কে না বিদ্রোহী? কিন্তু শেলী-
মাইকেল যে অর্থে বিদ্রোহী, নজ-
রুলের বিদ্রোহ সেই অর্থে নয়।

শেলীর “ওড টু ডা ওয়েস্ট উইণ্ড”
কবিতাটিই ধরুন। একটি তরুণ
কবি কবির চিত্তে আলোড়ন
সৃষ্টি করেছে। সেই ঋতুর পরিণতি
গভীর প্রশান্তিতে নয়, উদ্বাস অস্থি-
রতার। আর সেই ঋতুটা কাল্পনিক
নয়, বাস্তবিকই ঋতু। কবি সেই
ঋতুর বীণা হতে চেয়েছেন “Make
me thy lyre”। ঋতু তার বীণা-
তন্ত্রে উচ্চ স্বর তুলুক, স্বাক্ষর বসুক
তুলুক। পুরাতন জীবনের শেষ চিহ্ন
শেষ হয়ে থাক, সৌধ রচিত হোক
নবীনের। শীতের গভ্র বিদীর্ণ করে
আত্মক বসন্ত নবীন জীবনের উত্তরীর
উড়িয়ে। এই আশা দিয়ে গেল ঋতু
তার উন্নত সঙ্গীতের মধ্যে। রোমা-
ন্টিক বিদ্রোহী বলবো?

আবার মনে হয়, নজরুলের
‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি আবেগ-অহু-
ত্বের নিদর্শন অস্তব্ধে জর্জরিত।
স্বভাবতই বিপরীত চিন্তা ভাবনা
এসেছে, আবেগ প্রমত্ততা এসেছে।
আবার, অমিতশক্তি যৌবনের
সংগ্রামী অকীকারও উচ্চা রিত
হয়েছে—“যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-
রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না,
অত্যাচারীর খড়া কপাল ভীম রণভূমে
রণিবে না / আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত
সেইদিন হব শান্ত।”

‘বিদ্রোহী’ কবিতাটিতে সংগ্রাম
ভৌতভাবে ধ্বংসের কথা আছে।
ধ্বংসের কথা ‘অভিশাপ’ কবিতা-
টিতেও আছে। মাহুয়ের ক্রিম
সমাজবিধানকে ভেঙে ফেলার জন্য
কবি নিজেকে এক প্রলয়ংকর শক্তি-
রূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু ধ্বংসের
কথাটাই তো বড় নয়, স্বষ্টির কথাও
আছে। নটরাজ তো শুধু বিনাশের
দেবতাই নয়। নৃত্যে তাঁর কল্যাণের
ছন্দও বাজে। তিনি স্বষ্টিরও দেবতা।
নজরুল সমাজের পুণীকৃত আবর্জনা
তুপে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের
হৃদুতি বাজিয়েছেন রক্তমুখি ধারণ
করে।

পরাধীন ভারতবর্ষের মর্মবেদনার
অভিব্যক্তি কবির ব্যক্তিগত অভি-
জ্ঞতার অধিকতর বলিষ্ঠতা অর্জন
করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি
প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের
কবির মধ্যে খুবই হ্রাস। দৈনিক
কবি নজরুল যুদ্ধ থেকে এক মর্যাদা
অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিয়ে সাহিত্য
অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। কবির বোধ
ছিল ভিন্নতর, রুশার্ট ক্রকের মতো
নয়। ক্রকের মতো একথা বলেননি

তিনি—“And think all evil
shed-away. A pulse in the
eternal mind.”

উইলফ্রেড আওয়েন (Wilfred
Owen) আর এক দৈনিক কবি।
তিনিও যুদ্ধের হিংস্রতার প্রত্যক্ষদর্শী।
মাহুয়ের জীবনের অর্থহীনতার কথা
অনুভব করে আতঁনা করে উঠে-
ছেন উইলফ্রেড—“Was it for
this the clay grew tall?”
পাকাত্যের সভ্যতাকে বিজ্ঞপ করে
নজরুল লিখলেন—

“সরলে হুহুর ওহের, ওরা শহীদ
বানায়,
খবর বেরর দৈনিকে।
আর একটি কথায় হুঃখ জানান,
জোর মরেছে দশহাজার দৈনিকে।”

“What passing bells for
those who die as Cattle?
Only the monstrous anger of
gun.”। উইলফ্রেড নজরুল কিন্তু
এরই সঙ্গে শুনেছেন জাগ্রত মাহুয়ের
পদধ্বনি। উখিত তুরকের হৃদয়স্পন্দন
অনুভব করে লিখলেন কবি—

“পরের মূলুক লুট করে ধার, ডাকাত
ওরা ডাকাত,
তারের তরে বরাদ্দ তাই,
আবাত শুধু আবাত।

পদানত শোষিত এক জাতির
দৈনিক কবির কণ্ঠে প্রত্যাখাতের কী
বলিষ্ঠ ঘোষণা!

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেশের
হুঃখ দারিদ্র্য দেখে আতঁনা করে
উঠলেন কবি—একটি বিন্দু হুঃখ নাহি
পেরে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে সে কি
শিশু লাঞ্ছনের হাড়?

নিরম কৃষকের ঘরে নিরুৎসব
ঈদের, মর্যাদিক বিবরণ ছিলেন
নজরুল—

“জীবনে যাদের হরমোজ রোজা
ক্ষুধায় আসে নি নিদ,
আধমরা সেই কৃষকের ঘরে
এসেছে কি আতঁ দৈ?”

নজরুল হুঃখ দারিদ্র্য-হতাশার
অন্ধকারের মধ্যেও আলোর অভ্যর্থনা
দেখেছিলেন। প্রত্যয় দৃঢ়কণ্ঠে তিনি
বন্দনা করলেন নিপীড়িত জনগণের—

“শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়,
সেই হাড় উঠে গান
জয় নিপীড়িত জনগণ জয়
জয় নব উত্থান।”

সাহিত্য পুরস্কারে যোগ্যতার বিচার

নিবারণ চন্দ্র

আমাদের বামফ্রন্ট সরকার
“গণতান্ত্রিক পদ্ধতির” ব্যাপারটা
নিখাদেব সঙ্গে এমন ভাবে আউড়ান
যে মনে হয় এদেশে গণতন্ত্র রক্ষার
টারাই মন্ত বড় পাণ্ডা। বিশ্বের সর্বোত্তম
নিরক্ষরতার দেশে “গণতন্ত্র” শব্দটা
মহার্য রসিকতাও বটে। আশার
কথা যারা আউড়ান এবং যাদের
জন্ত আউড়ান হয় উভয়ের কাছেই
তা শব্দরত্ন ছাড়া কিছু নয়।

উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্র জাতীর
সরকারী পুরস্কারগুলির কথা ভাবা
যাক। বামফ্রন্ট সরকার-উদ্ভাবিত
নতুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুরস্কার
দেবার অয়োজন করা হয়েছে। তার
অর্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধ্যাপক মারফৎ যোগ্য বইয়ের
স্থপারিশ আহ্বান। পরিণামে বই
ঝাড়াই-বাছাই হতে-হতে চূড়ান্ত
নির্বাচনের জন্ত যে কটি বই আসে
সেখানেও বিচারক জরী। অবশ্যই
অধ্যাপক। অর্থাৎ সরকার স্বতঃসিদ্ধ-
ভাবে ধরেই নিয়েছেন সাহিত্যের
একমাত্র অধিদায়ী বোঝা অধ্যাপক।
কী করে ধরে নিলেন? বেহেতু
সরকারের এই বিভাগের মন্ত্রিগণ
স্বয়ং অধ্যাপক? অথচ সাহিত্যের
কারবারী মাহুয় মাত্রই জানেন

সাহিত্য দর্পণ

অ্যাকাডেমিক নাতিকুণ্ডলের বাইরে
অধ্যাপকদের না-আছে অভিজ্ঞতা
না-আগ্রহ। এমন কি সাহিত্যের
অধ্যাপক সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য।
চলমান সাম্প্রতিক সাহিত্য পরীক্ষা-
স্বচীর অন্তর্গত নয় বলে সাম্প্রতিক
সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের না-জানলেও
অপর্যাপ্ত হয়না। অবশ্য সাহিত্যের
ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক লেখার ব্যাপারে
সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাস-কবিতা-
নাটকের অধ্যায়টা তাঁরা ছাত্রদের
দিয়ে জিথিয়ে নেন।

তাহলে বামফ্রন্ট সরকার অধ্যা-
পকদের দিয়ে বিচারক মঞ্জুরী
নির্বাচিত করে কী করে নিশ্চিত
হলেন কাজটা “গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে”
হল?

এদেশে গণতান্ত্রিক চেতনা কথাটা
যেমন মধুর ধান্নাতেমনি অধ্যাপককুল
“গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন” এমন
কোনো সাধারণ প্রমাণ নেই। ফলে
নির্বাচনে অধ্যাপক গোষ্ঠী মাত্রই
সাহিত্য-পুরস্কারের বিচারক
নিযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের
যোগ্যতা-অযোগ্যতা যাচাই করার
কোনো মানদণ্ড সরকার নির্দিষ্ট

করেছেন কী? বহুস্তর সচেতন
পাঠক সমাজ তাঁদের মার মেনে
নেবেন একথা কোর করে বলা যায়
না। পদ্ধতিকে “গণতান্ত্রিক” পালিশ
লাগাবার জন্তে সরকার সে পথ বেছে
নিলেন তাতে স্থিতধারের সঙ্গে
তাঁদের আপত্তি মনোভাবেরই এটি
আরেকটি প্রকাশ। সরকারের সর্ব-
স্তরের কাজকর্মে দেখা যাচ্ছে কতক-
গুলি পাবলিসিটি স্টাফ (তাও জন-
সাধারণের পরসার অপব্যয়ে) দেয়া
ছাড়া “সঠিক প্রগতিশীল বামপন্থী
চেতনা” গড়বার কোনো সাধু লক্ষণ
নেই।

ফলে “গণতান্ত্রিক” ব্যাপারটা
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতেও যেমন কার্য-
করভাবে নেই তেমনি পদ্ধতিও
“স্ববিধাবাদী” এই স্ববিধাবাদী
আক্রমণে গণতন্ত্রের নামে বিচারক-
দের গোষ্ঠীপ্রীতিই পুস্তক নির্বাচনে
প্রাধান্য পায়। এই গোষ্ঠীলক্ষণ
শান্তিনিকেতনীয়, রাবীন্দ্রিক, তথা
আনন্দবাজারীয়। নেপাল মজুরদার
যখন বামফ্রন্ট আমলে পুরস্কার পান
তখন লেখকের কৃতিত্ব নয়, বিষয়
রবীন্দ্রনাথ বলে। এবং এমন একটি
সাহিত্যমূল্যাহীন গ্রন্থের পুরস্কার
বিষয় রবীন্দ্রনাথের কারণেই উৎসে
যায়। বস্তুত এমন বিষয়ের জন্ত
বিচারকদের গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের
অবকাশ নেই।

কিন্তু সমস্তা হয় যখন দেখা যায়
একটি “সংগ্রামী উপন্যাস” বার বার
চূড়ান্ত রায়ের জন্ত উঠে এলেও
তাকে বঞ্চিত করার জন্তে একটি
“কবিতাগ্রন্থকে” অকারণ পুরস্কার
পাইয়ে দেয়া হয় তখন “গণতান্ত্রিক
চেতনার” অর্থ হয় সাহিত্যে “বিপ্লবী
ধ্যানধারণাকে” রুদ্ধ করে নির্ভেজাল
“সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী” কাব্য-
গ্রন্থকে প্রাইজ পাইয়ে-দেয়া। সব
রকম “বিপ্লবী” ধ্যানধারণাকে কাটা
দিয়ে বন্ধ করার জন্তে বামফ্রন্ট
সরকারের সঙ্গে স্থিতধারেরা একমত।
শোষণবাদের এই চেহারা।

এর পরও আছে চূড়ান্ত বিচারের
জন্ত বইটি যদি এমন লেখকের হয়
যার এন্টারিশমেন্ট বিরোধী মতবাদ
স্বয়ং বামফ্রন্ট সরকারের কাছেও
অগ্রিয় তাহলে সে-লেখক বিচারকের
মুখে সহজেই খারিজ হয়ে যান
একটি “পুরস্কৃত হওয়ার অযোগ্য” এই
মন্তব্যে। এমন ঘটনাও আমাদের
জানা আছে। “গণতান্ত্রিক চেতনা
সম্পন্ন” সরকার এই নামজার অমান-
বদনে মেনে নেন। এতে করে সেই
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



নকশাল বিদ্রোহ নিয়ে নাটক

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

চারপাশে তাদেব দ্বাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে গত ২২শে এপ্রিল একাডেমি মঞ্চে নকশাল বিদ্রোহ ও উত্তর কাল সম্পর্কিত ঐতিহাসিক নাটকটি প্রযোজনা করে যে নৈপুণ্য ও সাহসের স্বাক্ষর রাখল তাও কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। নকশাল বিদ্রোহের প্রতি প্রাণী, সমতা ও সমর্থন বোধের অঙ্গুর রেখে সে-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় ও পর্যালোচনা সঠিক দৃষ্টিকোণে তুলে ধরে নাটকীয় প্রসঙ্গে যুক্ত করা রীতিমত দুর্লভ কাজ এবং নাট্যকার ও নির্দেশক অলক রায়চৌধুরী সেই দুর্লভ কাজে নেমে যে কৃতিত্ব দেখালেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। দর্শকগণের লক্ষণীয় যে উক্ত রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক রচনার ও মঞ্চায়নে উপভোগ্য রসসৃষ্টির লগ্নে লগ্নে সচেতন মনের আকর্ষণটুকু বাড়িয়ে দেয়। লক্ষণীয় পণ্ডিতের মাধ্যমে এ দেশের মুক্তি যে সম্ভব নয়, সম্ভব বিপ্লবই হল একমাত্র পথ এবং সে পথে নকশাল বিদ্রোহ যে এক গৌরবোজ্জ্বল পদক্ষেপ, সে-সমাচার যেমন এ নাটকে পাওয়া যায়, তেমনই সে আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সাধারণ জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তি হত্যার অহেতুক কর্মকাণ্ডে পরিণতি লাভ করে যে ব্যর্থতার গানি বহন করে আনে তার বিশ্লেষণও এ নাটকে প্রশংসনীয় মুক্তি তর্কের মাধ্যমে রাখা হয়েছে।

নাটকটির প্রথম দৃশ্য সত্তর দশকের শেষ ভাগে চিত্রিত, যেখানে বিদ্রোহীরা হতাশাগ্রস্ত এবং কোন কোন সংগ্রামী নেতা আবার ভোট ঘুড়ে অবতীর্ণ হতে মনস্থির করেছেন। এরপরই ক্রাশবাক্যে পোটা নাট্য বস্তু পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হয় সেখানে লি পি আই এম এল পার্টির জয় থেকে শুরু করে নকশালবাদের এলাকার সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব ও বিদ্রোহীদের প্রতি লি পি আই এম পার্টির নিলজ্ঞ আক্রমণ পুঁজিবাদী সরকারের নির্মম নির্ধাতন ও শেষে ব্রাহ্ম নীতির শিকারে পরিণত হয়ে বিপ্লবীদের পরাজয় বরণ। এই যে আত্মসমীক্ষা এর মধ্যেও কিন্তু আশা ও উদ্দীপনার ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে তুল করেন নি নির্দেশক। ২২শে

এপ্রিল লেনিনের স্মরণীয় জন্ম দিনে অল্পাধিক অভিনয় মঞ্চে মাও-সে-তুং এর ছবি ও বাণী অত বিরাট পরিসরে স্থলিয়ে রাখাটা সংগতিপূর্ণ হয়নি। লেনিনের ছবি ও বাণী সেখানে বাস্তবীয় ছিল। বাস্তবীয় ছিল সংগীতের ক্ষেত্রে আরও সূচিবদ্ধ প্রয়োগ। তবে আলোর ব্যবহার ছিল বাস্তবিক। রক্ত চরিত্রের অভিনয়ে অলক রায়চৌধুরী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখালেও সংলাপ উচ্চারণে ক্রটি ও ভ্রষ্টতার জন্ত সাক্ষ্য লাভ করতে পারেন নি। স্বপ্না মিত্র, সত্য দাশগুপ্ত ও বিশ্বরঞ্জন বহুর অভিনয় প্রশংসনীয়।

বৃত্ত বৃত্ত

গত ৬ই মে ভারতীয় ভাষা পরিষদ মঞ্চে চার্লস নিবেদিত 'বৃত্ত বৃত্ত' নাটকের অভিনয়ে কিছু রোমান্টিক মুহূর্ত রচনা, উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখার কিছু বিহীনতা ও স্বপ্নভঙ্গের কিছু বিষমতার ছবি পাওয়া গেল ইংগিতধর্মী ব্যক্তির মধ্য দিয়ে। স্থানে যেখানে সব কিছুই শেষ, সেখানে এক তরুণ-তরুণীর আকস্মিক সাক্ষাতে অপরিচয়ের সব কিছু অন্ধকার ঘুচে গিয়ে মিলনের যে আলোর সরপি গড়ে উঠল, তাও শেষ পর্যন্ত নিভাস্ত স্বার্থপরতায় হয়ে উঠল চিত্রা বহিমান। তরুণ ও তরুণীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রেম বিনিময় করল, তা যে কত বড় ছলনা ও কতখানি ভিত্তিহীন, তা এক পাগলের অর্ধপূর্ণ অথচ নিদারুণ ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রেমের মুখোমুখি হয়েই নয়ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুক্তির স্বাদ কেউ পায় না, পায় না আনন্দ উপলব্ধির সেই মুক্তমন, সবাই নিরম্মাফিক কর্মক্ষেত্রে আবর্তিত হচ্ছে। প্রেম ও প্রেমহীনতা, আশা ও নিরাশা—এই আলো ছায়ার স্বপ্ন ও সত্যের রক্তাক্ত তাগিদে আমরা ঘুরে মরছি সেই দৈনন্দিন বৃত্তের মধ্যেই। নাট্যকার ও নির্দেশক বিকাশ জানা এই বক্তব্য কিন্তু দর্শক চিত্তে পৌছে দিতে পেরেছেন।

পূর্ব অভিমতীত 'স্থানে শবের খেলা' নাটকের সমন্বিত রূপ হল বর্তমান নাটকটি। এ প্রযোজনা উন্নত সম্ভব নেই। তবে নাটকের প্রথম দিকের সংলাপ রচনা ও তার

উপস্থাপনা কিছুটা খাপছাড়া ও দুর্বল। পাগলের প্রবেশের পর থেকেই নাটক গতি পায় ও প্রাণবন্ত হয়। অভিনয়ে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় মনে কোন রেখাপাত করেন না। তুলনায় গোপা আইচ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি রূপসজ্জায় আর কি অভিব্যক্তিতে বিকাশ জানা চমকে দিয়েছেন পাগলের ভূমিকায়। দ্বিলীপ মিত্রর আলো ও পূর্ণেশ ধরের আবহ বোধায়।

সীমান্তিক শাখার নাট্যোৎসব

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখা তাদের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২১, ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল বিজ্ঞান থিয়েটারে সংস্থার নতুন পুরোন পাঁচটি নাটক নিয়ে এক নাট্য উৎসবের আয়োজন করেন। নাটকগুলি হল যথাক্রমে 'জোসেফ স্টালিন', 'ক্রিডম রোড', 'বিবসনা বৃহন্নলা', 'ভোরের স্বপ্ন' ও 'বুড়ো শালিকের বাড়ি রে'। একটি সংস্থা বিশ বছর ধরে তাদের অভিনয় বজায় রেখে তারই স্বাক্ষর হিসেবে এক উৎসবের আয়োজন করেছে—এটাই তো একটা বড় খবর, যেখানে নিষ্ঠা ও সত্যতা গৌরব গরিমানের চিহ্নিত হয়ে থাকে। দলের সর্বাধিনায়ক নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা চিররঞ্জন দাসের অনলস প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

'জোসেফ স্টালিন' নাটকটি স্টালিনের জীবনের এক খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে 'স্টালিন' এক নিম্নবিত্ত সংসারে কি নাটকীয়তার আশ্রয় পেলেন ও সেখানে সত্য প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে সেই পরিবারকে সমাজ সচেতন করলেন ও শেষে ছদ্মবেশে অস্ত্রধারী করলেন, নাট্যায়নে সেগুলির উপস্থাপনার আন্তরিকতার অভাব ছিল না ঠিকই, কিন্তু রসাবেদন সঞ্চারে ব্যর্থতার জন্মই নাটকটি বাস্তব আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি। 'ক্রিডম রোড' নাটকটি আমেরিকার দাসপ্রথা শোষণ ও নির্ধাতনকে বিষয় করে গড়ে উঠেছে—কিন্তু নির্ধাতনের সেই ভয়ংকরী রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি, ফলে পোটা ব্যাপারটি মনে তেমন রেখাপাত করে না। পুরোন নাটক 'বিবসনা বৃহন্নলা' অপসংস্কৃতির বিরোধিতার কতখানি সমর্থক ভূমিকা পালন করে—এ প্রশ্ন আজও রীতিমত জাগে। 'ভোরের স্বপ্ন' নাটকটিও বেশ পুরোন, তবুও খাড়া ও কেরো-

দিস সংকটকে ঘিরে ছোট নাটকটি আজও তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কিছু-মাত্র হারায়নি। যথুহন্ন দত্তর প্রহসন 'বুড়ো শালিকের বাড়ি রে' কিন্তু আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় মঞ্চায়ন করেছেন সীমান্তিক সংস্থা। শোষণ-সীড়ম ও প্রতিরোধ চমৎকার রসঘন ব্যঙ্গনার ফুটেছে। চিররঞ্জন দাসের 'জঙ্গলসার' রীতিমত উপভোগ্য। আলো ও সংগীতের ব্যবহারও নিপুণ।

ট্রায়াল বাই কমব্যাট

ওয়ারনার-ব্রাদার্স নিবেদিত ও কেভিন কোনার পরিচালিত 'ট্রায়াল বাই কমব্যাট' ছবিটি একটি অ্যাকশন থ্রিলার। নায়ক এডওয়ার্ড গিফোর্ড আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসে পিতার রহস্যজনক হত্যার অত্মসন্ধান করতে এবং এখানে এসেই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। এ ছবিতে এক বিচিত্র নাইট সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যারা নায়কের পিতাকে হত্যা করে সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে চায়। নায়কের সংগে তাদের রোমহর্ষক সংঘর্ষ ও শেষে সংকটের অবসান—দর্শক সমাজকে কিছুক্ষণের জন্ত হতচকিত করে রাখে ঠিকই কিন্তু ঘটনাগুলির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। ছবিতে কিছু দরস মুহূর্ত অবশ্য উপভোগ্য। জনমিলন ও পিতার কাশি-এর অভিনয় বিশেষভাবেই নজরে পড়ে।

বি এক জে-এর মতে

বেঙ্গল কিনা জার্গালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের চলচ্চিত্র বিচারে ১৯৭৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে গণ্য হয়েছে তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'গণদেবতা'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে শ্রাম বেনেগাল পরিচালিত 'জুহন' ও শংকর ভট্টাচার্য রচিত 'দোড়'। 'গণদেবতার (১)' শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি নির্বাচিত হয়েছে। বাংলা হিন্দি ও বিদেশী ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে যথাক্রমে তরুণ মজুমদার (গণদেবতা), শ্রাম বেনেগাল (জুহন) ও ক্রিসিস কপোলা (গণদেবতার-১)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হলেন 'দোড়' ছবির শংকর ভট্টাচার্য ও 'জুহন'-এর শ্রাম বেনেগাল। বাংলা ও হিন্দি ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসেবে সম্মান পেলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জী (গণদেবতা), অমল পালেকর (গোলমাল), লক্ষ্মী রায় (গণদেবতা) ও শাবানা আজমি (জুহন)। গণদেবতা ছবির শিশু অভিনেতা কাঞ্চন দে বিখ্যাত বিশেষ পুরস্কার পাবে। শ্রেষ্ঠ মৌলিক কাহিনী রচনার জন্ত 'দোড়' ছবির কাহিনীকার সমরেশ মজুমদার পাবেন বাবুলাল চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

পুস্তক ব্যবসায়ী কর্মচারী সমিতির সম্মেলন

গত ১০ মে ইন্ডেন্টস হলে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক-ব্যবসায়ী কর্মচারী সমিতির ২১তম সম্মেলনে অধিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিবি দিশাফিক চুক্তি কার্যকর করা, পে-স্কেল চালু করা ইত্যাদি নিয়ে সমর রক্ত (এম-এল-এ) ও অত্যাচারী বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে বিমল গুপ্তকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বীরেশ্বর নাগ ও আরো পনেরো জনকে নিয়ে একটা নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সম্মেলনে নির্মল দাস সভাপতিত্ব করেন।

ই. সি. এল

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বেতন দিতে ই সি এলের বাড়তি খরচ হচ্ছে লাঞ্চার লক্ষ টাকা।

বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। একে তো রবিবার কাজের জন্ত অফিসারদের বেতন দেবার নির্দেশ সম্পূর্ণ বৈআইনী। এই বৈআইনী নির্দেশের পেমেন্টও হয়েছে বৈআইনীভাবে। ই সি এলের কিনাফ ডিরেক্টর তার সাক্ষ্যে নং ই সি এল/ডি (এক)/৩৭/৭০৬/০৩২৩ (এ) ডাং ২০।১২।৭৯ এ সম্প্রতিভাবে লিখেছেন, "যে সব অফিসার রবিবার কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নাম এবং পেমেন্টের অফ-মোদন চেয়ে আগেই জানাতে হবে।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনরকম অফ-মোদন ছাড়াই পেমেন্ট হয়ে আসছে। পূর্ব অফ-মোদন ছাড়া এই পেমেন্ট হয় কি করে। চীফ কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্টসই বা বিনা অফ-মোদনে ফাও রিজি করলেন কিভাবে?

সংকটের দায়িত্ব

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

ছেন, কিন্তু থলড়া যষ্ঠ পরিকল্পনার কোন রূপরেখা পর্যন্ত দিতে পারেন নি।

শ্রীমতী গান্ধী নিজেই যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করার জন্তে দায়ী, জনতা ও লোকদলের সরকার সেই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করেছে মাত্র। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও এই সংকটের নিরসন করার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ ক্ষমতার আসন তার কয়েকটা থাকা চাই। এই জন্তেই তিনি অসত্য ও অবাস্তব অভিযোগের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন। তবিস্ততে এই সংকট আরো তীব্র হবে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না।

জ্যোতিষ্ময় বস্তুর অভিযোগ

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়াভাবে তাদের বস্তুর বেতায় প্রচার করেন। আভাবিকভাবেই কেন্দ্রের শাসক দল বর্তমান ব্যবস্থার বেতায়কে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগান। অল্প দলের ক্ষেত্রে স্বযোগ সুবিধে অনেক কম। লোকসভা দলই জ্যোতিষ্ময় বস্তু সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। শ্রীমতী বলেন,—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভা প্রশাস্ত শ্রমের বেতায় ভাষণ নিয়ে আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় বেতায় তথ্য মন্ত্রক যে সব কাণ্ডকারখানা করেছেন তাতে রাজ্য সরকার-গুলোকে বেতায় সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে। তিনি বলেন, আমি ডাক ও তার আইন খুঁটিয়ে পড়েছি। আইনতঃ রাজ্য সরকারের পৃথক বেতায় কেন্দ্র স্থাপনের কোন আইন-গত বাধা নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যোতিষ্ময় বস্তু বলেন, রাজ্যের হাতে পৃথক বেতায় কেন্দ্র তো পনের কথা, এখনই যেটা করা সরকার তা হল বেতায় কেন্দ্রের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণ। তথ্য ও বেতায় মন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির গত ১৫ মের বৈঠকে শ্রীমতী এই কমিটির একজন সদস্য হিসেবে এ দাবি তুলেছেন। বৈঠকে শ্রীমতী আরো বলেছেন, দেশের প্রতিটি বেতায় কেন্দ্র কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতি-নিধির নিয়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করা সরকার, যে কমিটি বেতায় কেন্দ্রগুলো চালাবে। শ্রীমতী মতে, আকাশবাণী বর্তমানে শাসক দলের

প্রচারবস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

কমিটির উক্ত বৈঠকে দূরদর্শন প্রদর্শনও আলোচনা হয়। শ্রীমতী আরো বলেন, বেতায় ও তথ্যমন্ত্রী বসন্ত শাঠে রজনী টি, ভি, চালু করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। উপ-গ্রহের মাধ্যমে দূরদর্শন প্রচারও কেন্দ্রের বিপুল আগ্রহ। কিন্তু এতে খরচ পড়বে প্রায় তিনশো কোটি টাকা। যে দেশে খরচ সময় টাকার অভাবে হাতের মুখে তুলার জলটুকুও দেওয়া যাচ্ছে না, সেচের অভাবে ফসল কলানো যাচ্ছে না এ হেন পরিস্থিতিতে রজনী টি, ভির পরি-কল্পনা অবাস্তব। অবস্ত কংগ্রেস (ই) এম, পি, চিত্র তারকা নাগিস দত্ত রজনী টি, ভির জন্তে খুবই ওকালতি করেছেন এই বৈঠকে। জ্যোতিষ্ময় বস্তু বলেন, নীতিগতভাবে আমরা আমাদের মত পরীচ দেশে টি, ভির পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করার যৌর বিরোধী। কিন্তু যখন আমাদের বিরোধিতা অগ্রাহ করে টাকা খরচ করাই হচ্ছে তখন তা স্ববমভাবেই করা উচিত। এ ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বক্তৃতা করা হয়েছে। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ এমন কি শ্রীনগরেও পশ্চিম-বঙ্গের চেয়ে বেশী সময় দূরদর্শনে অস্থান দেখানো হয়।

উক্ত বৈঠকে চিত্রাভিনেত্রী নাগিস দত্ত ফিল্ম শিল্পে ভরতুকির দাবি করেন। শ্রীমতী বলেন, বোম্বাই-এর ছবি নির্মাতারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, তারা তথ্য দপ্তরের অফিসারদের যোগাযোগ করে বহু কাজ হাসিল করেন। দেশের ব্যবস্থাও তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন।

পশ্চিমের গাড়ী শিল্প

১ম পৃষ্ঠার পর

তৃতীয়্যাংশের বেশি।

ফোর্ড কোম্পানী ঘোষণা করেছে যে, গত বার্ষিক সভায় বরাদ্দ চূড়ান্তি সাল পূর্বন্ত যোলশ কোটি ডলার ব্যয়ের পুরোনো কর্মসূচীতে আড়াই শো কোটি ডলার ইটাই করা হয়েছে। কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ কিলিপ কল্ডওয়েল বলেন যে, কোম্পানীর অবস্থা ভীষণ খারাপ। কলে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, পরি-কল্পনা, কর্মসূচী থেকে হিসেব নিকেশ সবই উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। মাল বিক্রির জন্ত বহু মাথা খাটিয়ে নিরুপায় হয়ে কোম্পানী এখন গাড়ি পিছু একশো ডলার থেকে পাঁচশো ডলার রিবেট দিচ্ছে।

ক্রাইসলার মার্কিন সরকারের কাছে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণের যে সরকারী হিসেব দিয়েছিল, তা ইতি-মধ্যেই ঋণাত্মক দিকে ছুবার বাড়তে হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম তিন মাসেই ঋণ ক্ষতি হয়েছে তা এই হিসেবের থেকে বেশি, কিন্তু তা মার্কিন শেয়ার মার্কেট ওয়াল স্ট্রিটের হিসেবের সঙ্গে সমাঙ্গস্যপূর্ণ। গত বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় এবছর ক্রাইসলার গাড়ির বিক্রি ২১% কমে ২৩৫ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি বাজারের মোট বিক্রির ১.৫%; আগের বছর ছিল ১০.৬%। কোম্পানীর এখনও ধারণা যে, চলতি বছরে মোট ক্ষতির পরিমাণ পাঁচাত্তর কোটি ডলারে বেঁধে রাখা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 'ক্রাইসলার লোম গ্যারান্টি বোর্ড' এর আগামী সভায় ঠিক হবে, উক্ত কোম্পানীকে পুনরায় দেড়শো কোটি ডলার ঋণদান প্রদেবে। ইতিমধ্যেই মিশিগান কর্তৃ-পক্ষ কোম্পানীর জরুরী নগদ চাহিদা মেটাবার জন্ত পনেরো কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে।

জেনারেল মোটরস্-এর চেয়ার-ম্যান মিঃ টমাস মারফি গত ৮মে এক বক্তৃতায় জোরালোভাবে সরকারকে যে কোন উপায়ে "প্রোটেকশনিসম" এড়াতে উপদেশ দিয়েছেন। মিঃ মারফির মতে গত বছরে আমেরি-কার মোট গাড়ি বিক্রির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬ লক্ষ ৬০ হাজার। এ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি বা এককোটি পাঁচ লক্ষে।

রাষ্ট্রপতি জির্জি কার্টার সম্প্রতি বারে বারে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানিতে বাধা-নিষেধ বাহনীর নয়।

বর্তমানে আমেরিকার জাপান থেকে গাড়ি আমদানি করা হয়।

আমেরিকার ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কস ইউনিয়ন এর বিরোধী। তাই ইউনিয়ন সরকার থেকে আধা স্বাধীন সরকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক ট্রেড কমিশনের কাছে পূর্বন্ত আয়-হানিতে প্রোটেকশনিসম বা বাধা-নিষেধ চালু করার দাবি করেছেন।

উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ ডগলাস ফ্রেন্সার আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে শিল্পমালিক শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে যে উচ্চ-পর্ষায়ের ত্রিাশক্ষিক বৈঠক বসবে সেখানে এই আমদানিতে বাধা-নিষেধ আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিয়ে বলবেন।

এদিকে রোমে অবস্থিত 'তুরিন গ্রুপের' মালিকানাধীন ফিয়াট গাড়ির কারখানাতেও আগুন লেগেছে। দেশের মধ্যে ফিয়াট-এর চাহিদা গত বছরের তুলনায় দু শতাংশ বেড়েছে তথাপি ক্রাস, ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানীতে কোম্পা-কীর রপ্তানী বাজার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হওয়ার বর্তমান মন্দা দেখা দিয়েছে। কোম্পানীর এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার শ্রমিকের মধ্যে আটাত্তর হাজারকে লে অক করা হয়েছে। এর কলে শুধামে মজুত গাড়ির সংখ্যা কমানো যাবে বলে ওদের ধারণা। লণ্ডনের ফিমানসিয়াল টাইমস এ সংবাদ দিয়েছে।

সাহিত্য পুরস্কার

১ম পৃষ্ঠার পর

লেখককে অস্বাচিত অপমান করা হয় কিনা সেটাও তাঁরা খতিয়ে দেখেন না। অথচ তথাকথিত পদতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঝাড়াই-বাছাই করে অধিক বিচারকের দ্বারা বইটি চূড়ান্ত বিচারের জন্ত এগিয়ে এনেছে। তাঁদেরও বিভাবৃত্তিকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো কর্তব্য। এ দুইজন বই-কোর্টে নিরপরাধ প্রমাণিত হবার পরও স্ত্রীম কোর্টের দ্বারা একজনকে দোষী করে ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা করা।

বামফ্রন্ট সরকারকে আশ্রয়দাতা করার পরামর্শ দিয়ে আভিনেইৎ কারণ যে কোনো মূল্যে যদি অস্ত্রিক রাখাটাই তাঁরা একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করছেন। একথা নিশ্চিত-ভাবে ভাববার দিন এলোছে যে বামফ্রন্ট কোনো "নংগ্রাইট ফ্রন্ট" নয়, মস্তিষ্ক আঁকড়ে রাখবার একটি সুবিধাবাদী ফ্রন্ট। বইটা মজার এই গাড়ার মধ্যে পড়েন তাঁদের কাছে বাইরে থেকে উপদেশ "শত্রু-পক্ষের স্বচরিত্র" ছাড়া কিছু ঠেকবে না।



ইস্টার্ন কোলফিন্ডস্ লিমিটেড

(কোম্পা. ইণ্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্ত ই সি এস / সি পি ডাব্লু ডি / রেলওয়ে / স্টেটীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাদমূহের অহুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম ও নির্দিষ্ট তারিখে নিম্নে দফাওয়ারী দর তিস্তিক / পার্সেন্টেজ তিস্তিক নীল করা টেওয়ার L

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং: ই সি এস / এন এস / ইল (সি) / টেওয়ার / ৪/৪/৬৬
তাং ৬-৫-৮০

নর্থ সিমারসোল কোলিয়ারীর ৩ ও ৪নং ইনক্রাইনে মোটর হাউস এবং ক্যানের জন্ত ফাউণ্ডেশন সহ ফ্যান ড্রিক্ট (সিয়ারপ নীচ) নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ১,৩৭,৮০ টাকা। কেশিয়ারের কাছে নগদে ১০০ টাকা (একশো টাকা মাত্র) দিয়ে ১১-৫-৮০ থেকে ৩৬৮০ পর্যন্ত এডভেটর অফিস, নর্থ সিমারসোল কোলিয়ারী, পো: সিমারসোল, রাজবাড়ি, মেম্বা বর্ধমান থেকে টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ৪৬৮০ বেলা পট্টা পূর্ণ টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে খোলা হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময়, অফিস চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী / দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বাবনার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের কি বাবদ যদি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেওয়ারকাতা অবধি তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দোবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাজনীতি ও সংবিধান / ড: স্রেময় চাকলাদার / ১১'০০

২। প্রযুক্তি সম্পর্কীয় ভবিষ্যৎ / শ্রীপতাকীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় / ১২'০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ষ্টোর, কলিকাতা-১৩



ইস্টার্ন কোলফিন্ডস্ লিমিটেড

(কোম্পা. ইণ্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্তের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছে
সারভিসিং ও মেরামতির কাজ

সারভিসিং ও মেরামতির কাজ: মেক্টেনেল এজেন্সী প্রয়োজন: পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় বিস্তৃত বিভিন্ন কোলিয়ারীতে আই টি আই মেক এন্ডচেঞ্জের বহুসংখ্যক স্প্রিং ৫০/২৫ সারভিসিং ও মেরামতির জন্ত। আগ্রহী ব্যক্তিরা শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকবল বর্তমান কাজের চাপ, কোয়ালিটি শেয়ারের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা, অফিস সেট-আপ, সারভিসের বিবরণ ইত্যাদি বিবৃত করে প্রতিটি টাইপের জন্ত চীফ অক টেলি-কমিউনিকেশন, ইস্টার্ন কোল-ফিন্ডস লিমিটেড, পো: বিশেষগড়: ৭১৩ ৩৩৩, জেলা বর্ধমান-এর কাছে তাঁদের দর দিতে পারেন।

বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কনভেনশন

গত ২৬ মে ইউনেস্কো হল গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে সকল বক্তাই বর্তমান বিচারব্যবস্থার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বারিষ্কার ও অর্থনৈতিক গুহ বনাম রুগু গুহ নিয়োগী ও অত্যন্ত পুলিশ অফিসারদের মামলা দুটোর মায়ের নিরপেক্ষতার সংশয় প্রকাশ করেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী লতিকা গুহ, সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার আদালতে কিতাবে লম্বাজের উচ্চস্তরের ধনী লোকেরা অবিচার পেয়ে থাকেন তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

কলকাতা হাইকোর্ট ও ২৪ পরগণার পাবলিক প্রসিকিউটরস্বরূপে অধীশের মিজ এবং শ্রীমতী গাঙ্গুলী ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী চক্রবর্তীও বিচার ব্যবস্থার গলদগুলো তুলে ধরেন। সিটু, মেতা শ্রীমতী রায় বলেন কিতাবে প্রমিত কর্মচারীরা আইনের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির তরফে কনভেনশনে এক প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবে বর্তমানে বিলিতে ইন্দিরা গান্ধী, লজ্জ, বংশীলাল, সুরা, জগমোহন, দিল্লি পুলিশ কমিশনার তিন্দার ইত্যাদি জরুরী অবস্থার সেই কথাত চক্রের উপর থেকে যেভাবে একটার পর একটা মামলা বিচারপতিরা

তুলে নিচ্ছেন তার নিন্দা করা হয়। অন্তর্দিকে স্বপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত তাঁর চিঠিতে কং (ই)র অস্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ করার ও শেরালদহ কোর্টের বিচারপতি ও ইন্দিরা কংগ্রেস মেতা শ্রীমতী রায় খারারাজনৈতিক স্বার্থে পদত্যাগ করার এই প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীকপিল ভট্টাচার্য।

প্রবীণ নেতারা ক্ষুব্ধ

১ম পৃষ্ঠার পর

ফেলছেন। ফলে নির্বাচনেও এরও প্রতিকলন দেখা যাচ্ছে। দলের প্রায় সব প্রবীণ নেতাই এখন নির্বাচনী আসরে একেবারেই অস্থিহীন। অনেকে আবার তলে তলে দলীয় প্রার্থীর পরাজয়কে অনিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।

অবশ্য মহারাষ্ট্রেও বেশ কিছু নেতা এখন ইন্দিরা গান্ধী এবং লজ্জ গান্ধীর কাজকর্মের বিরুদ্ধে মূখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বনজ দাশ। পাতিল। পাতিল প্রায় প্রকাশ্যেই দলীয় মেত্বের সমালোচনা করছেন। শুধু তাই নয় নির্বাচনেও খুব বেশী সক্রিয় কৃষিকা নিচ্ছেন না। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু দায়িত্বশীল নেতা

পেট্রোল ডিলারদের বিরুদ্ধে অফিসারদের বক্তব্য

গত ২১ মে পেট্রোল পাম্পে ধর্মঘট পালন করে পেট্রোল ডিলার্স এসোসিয়েশন। পূর্বদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ রায় অভিযোগ করেন যে, ডিলার্সগণ মিজেরে দুর্নীতি চাপা দেবার জন্য আই বি পি অফিসারদের উপর মিথ্যা দোষ দিচ্ছেন। বশোর রোডের একটি পেট্রোল পাম্পে তদন্ত কালে অসুখ্য ব্যবসা ধরা পড়লে ধর্মঘট খানার একটা কেসও করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে অফিসারদেরকে

ইন্দিরা গান্ধী এবং লজ্জ গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সমালোচনা করছেন। কেউ কেউ আবার দলই ছেড়ে দিয়েছেন। বারা দল ছাড়েন নি তারা দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীদের প্রায় প্রকাশ্যেই মত দিচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত অহরোধেও এরা কান দিচ্ছেন না।

লজ্জের একদা দক্ষিণবঙ্গ বংশীলাল ও তার রাজ্য হরিনানাতে লজ্জ এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মকে মেনে নিতে পারছেন না। যদিও তার রাজ্যে এখন নির্বাচন হচ্ছে না, তবুও তিনি দলীয় কোন কাজকর্মে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

লজ্জ গান্ধী যদি তার মতে দলকে নিয়ে যেতে চান তবে অনেক প্রবীণ নেতারই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। এবং এ বিরোধিতা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যে ইন্দিরার বিরুদ্ধেও দানা বাধবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন।

কমলাপতি

১ম পৃষ্ঠার পর

মিটে গেলে সব কথা তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীকে জানাবেন।

কমলাপতি জিগাঠীর “একাত্ত গোপনীয়” মার্কী পদত্যাগ পূর্বের খামটি শ্রীমতী গান্ধীর হাতে পৌঁছাবার পরে টেলিফোনে শ্রীমতী গান্ধী রেলমন্ত্রীকে বলেন যে, আপনি কাজ চালিয়ে যান। নির্বাচন মিটে গেলে এই বিষয় নিয়ে ভাবব। জিগাঠী যদিও প্রধানমন্ত্রীর অহরোধ মত এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তবুও মনে হয় না, তার সমস্তার খুব একটা লক্ষ্যমণ্ডলক সুরাহা হবে। লজ্জের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ গদিতো থাকুক এটা যেমন লজ্জ চান না তেমনি শ্রীমতী গান্ধীও চাননা। তাই মনে হয় যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত রেলমন্ত্রীকে বিদায়ই নিতে হবে।

কোমে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আসলে এই পাম্পে বেআইনীভাবে মজুত করা ৮০০০ লিটার হাইস্পিড ডিজেল পাওয়া যায়। রিবডা ও পার্ক স্ট্রীটের দুটো স্টেশন প্রায় টাকা দেয়নি। এই সব অভিযোগে কোম্পানী উক্ত ভিতটি পাম্পে তেল সরবরাহ বন্ধ করেন। যদিও পরে রাজ্য সরকারের অহরোধে দমদমের পাম্পটিতে তেল দেওয়া শুরু হয়েছে।

আই বি পি অফিসার্স এসোসিয়েশনের

নিয়ন্ত্রণের সমর্থনে অল ইন্দিয়া সেক্টর অফ অফিসার্স লংগঠনের সভাপতি আর গাঙ্গুলী ও ইন্দিয়ান অয়েল অফিসার্স এসোসিয়েশনের (পূর্বাঞ্চল) সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, সরকার এখনও এ ব্যাপারে উদ্বাসীন। অফিসারদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি না পেলে তাঁরাও একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের কথা ভাববেন।

সবুজের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য
বিশ্বনাথারী গ্রীষ্মকালচরাল ফার্ম(প্রা) লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ বালী, শাওড়া
ফোন: ৬৪-২০৯৫ • ৬৪-২৪৪৫
ফার্ম: বৈদ্যবাটী ২ গলী ৬২২৫৪০ শাওড়া পোঃ বালী বগলী
দিল্লী রোড ও ভারকম্পর রোডের সংযোগস্থল ফোন: ৬২-১৩৭৭

ইন্টার কোলফিল্ডস লিমিটেড
(কোম ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা বিশেষ)

নিয়ুক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অহরোধিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রকল্পকারকদের কাজ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে ই-ক্যাওয়ারী দরভিত্তিক / শার্পেক্টেজ ভিত্তিক নীল করা টেওয়ার :

উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ

নিয়ুক্ত দফাগুলি সরবরাহের জন্য। (ক) টেওয়ার মধ্য (খ) বিবরণ ও পরিমাণ (গ) টেওয়ার ফী (ঘ) জমা দেবার শেষ তারিখ (ঙ) খোলার দিন
নিয়ন্ত্রণ : (১) (ক) ই সি এল / সি ইউ আর / ০৩ / ইউ জি বি কনভেন্সার / ৮০ / ৫৪ (খ) ১৩টি আগারগ্রাউণ্ড বেন্ট কনভেন্সার (গ) ৫০ টাকা (ঘ) ১০-১৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত (ঙ) ১০-১৮০ বেলা ৩টায়। (২) (ক) ই সি এল / সি ইউ আর / ০৩ / টিপলার / ৮০ / ৫৫ (খ) ২টি বিদ্যুৎ চালিত রোটারী মাইন টাব টিপলার (গ) ১০ টাকা (ঘ) ১৪-১৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত (ঙ) ১৪-১৮০ বেলা ৩টায়। স্পেসিফিকেশনের সিডিউল এবং সরবরাহের শর্তাবলী লহ টেওয়ার হলিল যে কোন কাজের দিনে যেটিরিয়াল ম্যানেজারের (পার্চেস) অফিস, ইন্টার কোলফিল্ডস লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পোঃ বিশেষগড়, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে একই ঠিকানার কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফী মগদে জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া যাবে। উক্ত ঠিকানার কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে পাঠানো মনি অর্ডার তখনই গ্রহণ করা হবে যদি টেওয়ার হলিল পাঠাবার ডাক খরচ হিসাবে টেওয়ার সিডিউল অহরোধী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) পাঠানো হয়। টেওয়ার গ্রহণের শেষ তারিখের তিন দিন আগে টেওয়ারপত্র বিক্রয় বন্ধ করা হবে।

সাধারণ : কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেওয়ারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দ্বিগে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা লংগিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেওয়ারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেওয়ার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌঁছাতে হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ত্যাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

আপনার সমস্ত জোরে চম্বীর
লাঙল-ধরা-মুঠো আরো শক্ত হবে,
মাঠে-মাঠে ফলন আরো বাড়বে,
ঘরে-ঘরে আসবে সচ্ছলতা-দ্রুত
গাড়ে উঠবে নতুন পশ্চিমবঙ্গ!

মাত্র ৫ টাকা দিয়ে লাভজনক সকল
এখানে আজই শুরু করুন।



**ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান
ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

হেড অফিস ৪ ১৭, আর, এন, মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

চেয়ারম্যান ৪ ছে এন বিশ্বাস

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক বীপানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দূরপাল্লার কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

রাজ্যে ই-কংগ্রেসী নেতা নির্বাচন নিয়ে প্রবীণরা ক্ষুব্ধ

দপন

ত্রয়বিশ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা : শুক্রবার, ৬ই জুন, ৮০ : ৬০ পয়সা

৮টি রাজ্যের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে সঙ্গর গান্ধীর ভূমিকায় দলের অনেক নব নির্বাচিত বিধান সভা সদস্য এবং প্রবীণ নেতারা ক্ষুব্ধ বলে জানা গেছে।

পুরো ব্যাপারটাই সঙ্গর পূর্ব পরিকল্পনা মার্কিত করেছেন। অ-কংগ্রেস (ই) শাসিত নয়টি রাজ্য বিধানসভা ভাঙা থেকে শুরু করে প্রার্থী মনোনয়ন এবং বিধানসভার নেতা নির্বাচন পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই সঙ্গর এবং তার কয়েকজন পরামর্শদাতা

পরিকল্পনা মার্কিত করেছেন।

নির্বাচনের আগে যখন প্রার্থী মনোনয়ন করা হচ্ছিল তখনই সঙ্গর ঠিক করে রেখেছিলেন কাদের ওপর তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভা পরিচালনার নেতৃত্বভার দেবেন। শুধু তাই নয়, তার সিদ্ধান্ত যাতে রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা একবাক্যে মেনে নেন তার জন্য তিনি তার অল্পগত লোকদের দলের টিকিট বেশি সংখ্যায় দিয়েছিলেন।

সঙ্গরের পরিকল্পনা প্রায় পুরোটাই সফল হয়েছে। ইন্দিরা কংগ্রেস

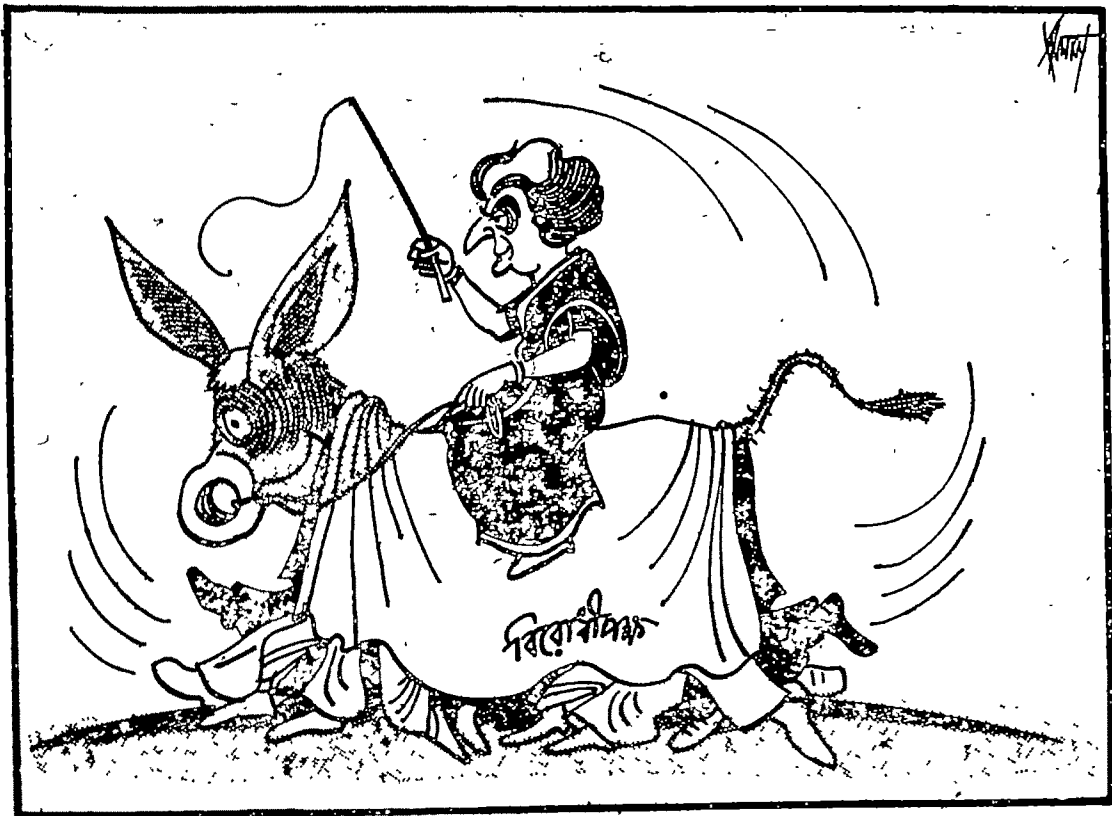
শাসিত ৮টি রাজ্যের মন্ত্রিসভার ওপর সঙ্গরের প্রচণ্ড প্রভাব থাকবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুক্তি হচ্ছে রাজ্য বিধানসভাজিতে নির্বাচিত সব সদস্যই সঙ্গরের অল্পগত নয়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রবীণ কংগ্রেস নেতাও আছেন। তারা মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে সঙ্গরের একপেশে সিদ্ধান্তকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

রাজ্য বিধানসভার মননির্বাচিত সদস্যদের সভার নেতা নির্বাচনের ব্যাপারটি নিতান্তই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়েছে। দিল্লী থেকে সঙ্গর গান্ধী এ আই সি সি পূর্ববৈষ্ণবদের কাছে কারা কারা বিধানসভার নেতা হবেন তাদের নাম বলে দিয়েছিলেন এবং পূর্ববৈষ্ণবদের আরও বলা হয়েছিল যে, সদস্যদের যেন হাইকম্যান্ডের ইচ্ছার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও সঙ্গর এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলেন।

অবশ্য নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে কেউই প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু অনেক বিধানসভা সদস্যই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারছেন না।

‘জীবনদায়ী ওষুধ’র নামে আমেরিকা এদেশে

বিষ গাঠাচ্ছে



কেন্দ্রীয় বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে

পশ্চিমের ওষুধ—সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শোষণের ব্যাপারটা ঠিক অনেকেই বুঝতে পারেন না। পঁচাত্তর দাঙ্গা লগনের নামকরা একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ‘হেসেলমেয়ার গ্রুপ’ এক চাঞ্চল্যকর তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিল। আমেরিকা ও ব্রিটেনের নামকরা সব ওষুধ কুঁবেররা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ওষুধ তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করে কখনও শতকরা ছশো, সাতশো ভাগ লাভ রাখে। সম্প্রতি সানফ্রান্সিসকোর ‘মাদার জোনস’ নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যা লেখা হয়েছে তা জানলে হুচিন্তা বাড়বে। আত্মীয়-স্বজনের জন্ত প্রয়োজনীয় ডাক্তারবাবুর নির্দেশিত ওষুধ কিনতে বিধা লাগবে।

আমেরিকা ও পশ্চিমের শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলোর কয়েকশো কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ ‘ব্যবহারের অযোগ্য’ বলে সরকার বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিল। অমনি রাববোয়াল শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসের দাম বাড়ছে বলে বিশ্বজুড়ে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ। যে জিনিসের দাম বাড়লে সব জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য সেই জালানীর দামই বাড়ছে। কয়লা, রাসার প্যাস, পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিন—সব কিছুই দাম

বাড়ছে। যার ফলে এর প্রভাবে অল্প সব জিনিসের দাম বাড়তে বাধ্য। শোনা যাচ্ছে যে, রেলের মাডলও বাড়বে। তবে প্রথম শ্রেণীর নয়। ভাড়া বাড়ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর। মাল পরিবহনের মাডলও বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে এই বৃদ্ধির হার নাকি হবে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ।

গাড়ির টায়ার, যন্ত্রাংশ, চেনিস ইত্যাদির ওপরও করের বোঝা চাপছে। প্রসাধনী দ্রব্য, চিনি, ডাল, লাবান, তেল ইত্যাদির কোনটাই নাকি নতুন করের হাত থেকে মুক্তি পাবে না। ফলে প্রাপ্যস্তকর অবস্থা হবে দেশের গরীব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের।

মশলা, লোহা, চা, পাট, রেশ, সূতীবস্ত্র, ঘেশলাই, কাগজ, সিমেন্ট, ইয়ারতী দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদির দাম বাড়ছে। দাম বাড়ছে না একমাত্র যে জিনিসের তা নাকি মধ। এমনতেই বাজারে জিনিস পাওয়ার উপায় নেই। বাজারে আঙন। তার ওপরে বাজেটের থাকায় বেশ কিছু জিনিস বাজার থেকে উধাও হতে শুরু করেছে যাতে পরে বেশি মুনাফায় বিক্রী করা যায়। বাজেট পেশ হতে এখনো যে কটা দিন আছে তাতে বলা যেতে পারে যে, বাজার থেকে এখন প্রায় সব জিনিসই উধাও হতে থাকবে।

বি পি এন টি ইউ সি-তে সূত্রতকে অনেকেই মানতে রাজি নন

আই এন টি ইউ সি-র রাজ্য শাখা বি পি এন টি ইউ সি-র বর্তমান কমিটিকে অনেক প্রবীণ নেতাই মানতে রাজী হচ্ছেন না। প্রবীণ নেতারা বলছেন বি পি এন টি ইউ সি-র বর্তমান কমিটি অবৈধভাবে করা হয়েছে। সূত্রাং এই কমিটিকে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব ওঠে না।

বি পি এন টি ইউ সি-তে প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সূত্রত মুখার্জীর বিরোধ দীর্ঘ দিনের। বি পি এন টি ইউ সি-র শিশির গান্ধী, বিষ্ণু ব্যানার্জী প্রমুখ প্রবীণ নেতারা ট্রেড ইউনিয়নে সূত্রত-

বাবুর মাতবরীকে ভাল চোখে দেখেন নি। এই নেতারা আশঙ্কা করেছিলেন যে, সূত্রতকে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারে বেশী খবরদারি করতে দিলে আগামী দিনে তাদের নেতৃত্ব শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

ভয়তাড়য়ার ছড়া

অনার্য মিত্র

এক.

কেউ বলে, জয় সঙ্গরের
কেউ বলে, তাঁর মা'র;
আল কথ্য বলতে পারে
সাধ্য আছে কার ?

মা পরেছেন হলুদ শাড়ী
ছেলের গায়ে জামা,
উত্তরে ফুল ফুটল বটে
দক্ষিণে দামাশা।

দখিন হাওয়ায় ভয় ধরেছে
ছেলের এবং মা'র
বিধানসভা ভেঙে দিলেই
পাওয়া যায় না পার।

দুই.

আসাম রাজ্য যদি
অসমীয়াদের হয়—
গৌহাটী তবে কেন
শুধু গান্ধীদের নয় ?
কাছাড়তে করুজন
কাছা দিয়ে চলছে,
বজাইগাঁওয়ে সব
বাংলা কি বলছে ?
গোয়ালপাড়ার যদি
গোয়ালে মাহুস রয়,
নগাঁওর তবে কেন
ন'জনের বেশী হয় ?

এই যদি তব
নামের মাহাত্ম্য
মাহুদের নামে একি
হতে পারে সত্য ?

সম্পাদকীয় আস্থাহীনতা

যা প্রত্যাশিত ছিল তাই ঘটেছে রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে। জনতা পার্টিতে একাধিক ভাঙ্গন, প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দোহলায়মানতা, সুবিধাবাদ ও নীতিহীন রাজনীতি এবং বিরোধী দলগুলির অনৈক্যে সাধারণ মানুষ হতাশ। তারই প্রতিকলন ঘটেছে বিধানসভার নির্বাচনে। এবং সাধারণ মানুষ সংসদীয় পণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতিও ক্রমশঃ আস্থা হারাচ্ছে। তাই কোন রাজ্যে ৩৫ শতাংশ, কোন রাজ্যে ৪০ শতাংশ ভোটের ভোট দিয়েছে। তার মানে সংখ্যাগুরু ভোটের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হবার তাগিদই অনুভব করেন নি, ফলে সম্পূর্ণ সংখ্যালঘু ভোটে ইন্দিরা কংগ্রেস রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসছে। ব্যতিক্রম শুধু তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাব। তামিলনাড়ুতে বিরোধীরা এক্যবদ্ধ থাকার ফলে ইন্দিরা কংগ্রেস-ডি এম কে ভোট সুবিধা করতে পারেনি। সেখানে ভোটও বেশি পড়েছে। পাঞ্জাবে ন জন সংস্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতায় বসছে। সেখানেও ভোট বেশি পড়েছে।

এই নির্বাচনে দুটি ঘটনা প্রধানতঃ লক্ষ্যণীয়। এক, নির্বাচন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব এবং দুই, ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্কট গাছীর প্রভাব প্রতিপত্তির এক চেটুরী ক্ষমতায় পরিণতি লাভ। গত জাহ্নবীর নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস সংখ্যালঘু ভোটে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করলেও ভোট পড়েছিল কোথাও ৬০ শতাংশ, কোথাও ৭০ শতাংশ মত। কিন্তু এবারের নির্বাচনে সেই সংখ্যক মানুষও ভোট কেন্দ্রে হাজির হননি। এটা হয়ত এক ধরনের আস্থাহীনতা। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আস্থাহীনতাও হতে পারে। কংগ্রেস, জনতা পার্টি, ইন্দিরা কংগ্রেসের কার্যকলাপ স্বরণ করলে এটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

এই নৈরাশ্রয়িক অবস্থার সঙ্কট গাছী কিন্তু শঠৈঃ শঠৈঃ এগোচ্ছেন। ইন্দিরা গাছী ও সঙ্কট গাছীর মাজ কয়েক বছর আগের সমস্ত অপকীর্তি মুছে যাচ্ছে, (নিরপেক্ষ) বিচার-পতিরা তাঁদের সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। আর বিধানসভার নির্বাচনে ত ইন্দিরা কংগ্রেসের জয় মানে সঙ্কটের জয়। যারা এখন এম এল এ তাঁদের অধিকাংশই সঙ্কটের লোক। আহা, তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলে আমরা ভারতবাসীরা কৃতার্থ হই।

দেশ কাল রাজনীতি নির্বাচনের শিক্ষা কী ?

ভারতপুত্র

মে-র বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলকে যদি গত জাহ্নবীর লোকসভা নির্বাচনী রায়ের প্রতিলিপি আখ্যা দেওয়া যায়, তবে অতৃষ্টির দায় পড়তে হবে না। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সর্বত্র ইন্দিরা গাছীর জয়জয়কার; কিন্তু এবারেও তাঁর অধমের ঘোড়া সেবারের মতই দক্ষিণ ভারতের কাদামাটিতে আটকে পিয়েছে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস (ই) বিরাট সাকল্য অর্জন করলেও তামিলনাড়ু আর একবার ইন্দিরাকে কিরিরে দিয়েছে। পাঞ্জাবও তাঁকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত রাজ্যটি কংগ্রেসের (ই) দখলেই এসেছে। বিহারের নির্বাচনী ফলাফলও কংগ্রেসের (ই) গৌরব খুব একটা বৃদ্ধি করতে পারে নি।

কংগ্রেসের (ই) এই জয়লাভকে যদি তার বৈরতন্ত্রী নীতি ও আদর্শের প্রতি ভোটারদের সমর্থন বলে মনে করা হয়, তবে তার দ্বারা সত্যের অপলাপ ঘটান হবে। প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দলগুলোর দুর্বলতাই ইন্দিরার সাকল্যের প্রধান কারণ। গত লোকসভা নির্বাচনে শেচনীর বিপর্যয়ের ঘটনা থেকে বিরোধী দলগুলো কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নি বলেই আজ তাঁদের এই বিরাট খেসারত দিতে হ'ল। অথচ সেদিন বিরোধী নেতারা গগন বিদীর্ণ করে এই ঘোষণা উচ্চারণ করেছিলেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে সকলে এক্যবদ্ধ হয়ে তারা কংগ্রেসের (ই) মোকাবিলা করবে। একে জনতা ও লোকদল সরকার কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে কোন জনস্বার্থবাহী সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী নেন নি বা যেটুকু নিয়েছিলেন সেটুকুও বাস্তবে রূপায়ণ করেন নি, তত্পরি ক্ষমতার লোভে গোষ্ঠীত্ব লিপ্ত হয়ে জনচক্ষে দলের ও সরকারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করে দিয়েছিলেন। সেই পাপের শাস্তি ভোটার সাধারণ গত জাহ্নবীর লোকসভা নির্বাচনে ব্যালট বাক্সের মধ্যে দিয়েই দিয়েছিলেন।

কিন্তু বুজোয়া রাজনীতিকরা ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্যই রাজনীতি করতে অভ্যস্ত। সেই ক্ষমতার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত একটি জনতা দলকে পাঁচটি দলে খণ্ড-

বিখণ্ড করে দিয়েছে। কাজেই সেদিন একটি জনতা ও একটি লোকদলের পক্ষে যেখানে বৈরতন্ত্রের পতি রোধ করা সম্ভব হয় নি; আজ পাঁচদলে বিভক্ত ও দুর্বলতর সংগঠনগুলির পক্ষে ইন্দিরার সঙ্গে পাকড়া লড়াই সম্ভব হবে কেমন করে ?

তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, বিহারের বিপরীত চিত্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে নির্বাচনী ফলাফলের এই বিশ্লেষণ আরো পরিষ্কার হবে। কারণ এই রাজ্য চারটিতে বিরোধী দলগুলি একটা না একটা ধরনের নির্বাচনী সমঝোতার পৌঁছেছিল। তারই ফলে তামিলনাড়ুতে ইন্দিরা গাছী পাকড়া পান নি, অত্র রাজ্য তিনটিতে তাঁকে যথেষ্ট ধকল পোরাতে হয়েছে।

এই নির্বাচনী ফলাফল থেকে

বামপন্থী দলগুলিও অতঃপর শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি ? ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই দুই কমিউনিষ্ট পার্টির শিকড়—জন্মের পক্ষাণ বছর পরেও এখনও গভীরে প্রবেশ করেন নি। তার ওপর দফায় দফায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কমিউনিষ্ট বা বামপন্থী আন্দোলন চূর্বনন তর হয়েছিল। সেই জেতেই আজ সীমিত ক্ষেত্রে দুই কমিউনিষ্ট পার্টি ও অত্র বামপন্থী দলগুলোর জোটবদ্ধতার নীতিত সাকল্যই অর্জিত হয়েছে। এই একেবারে সীমাকে অতিক্রম করে স্বদূরপ্রসারী করা দরকার। ডাকে লাহেবের ধিরোয়ী যে ভ্রাস্ত ও বিপজ্জনক, দুই কমিউনিষ্ট পার্টির মিলিত শক্তির সাকল্যই তার উজ্জল প্রমাণ।

আন্দোলনে ভাঁটা ?

আমাদের আন্দোলনকারীরাই বোধ হয় ইন্দিরার সাকল্যের প্রথম শিকার হল। আগেকার হুঁতুখি তর্জন সর্জন এখন অনেকখানি শান্ত হয়েছে, এখন তারা শুধু মুখ রক্ষা করতে পারলেই বেঁচে যায়। অনেককেই ধরে নিয়ে ছি লেন

বিধানসভাগুলির নির্বাচনী রায় যদি কংগ্রেসের (ই) অঙ্কুলে যায়, তবে প্রধানমন্ত্রী কঠোর হস্তে আমাদের আন্দোলনকারীদের দমন করবেন। এখন না'টি রাজ্যের মধ্যে আটটিতেই দখলে আমার পর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী যে সুবিধেজনক স্থানে পৌঁছেছেন সেটুকু সকলেই বোঝে। তাই হরেক দফা দাবির বদলে আন্দোলনকারীরা এখন কেবল 'বিদেশী' চিহ্নিতকরণের বিষয়টির ওপরেই জোর দিচ্ছেন। আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে।

এদিকে শ্রীমতী গান্ধী আরেকবার আমাদের ব্যাপারে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। আগের বৈঠকে জনতা লোকদল ইত্যাদির প্রতিনিধিরা গরু-হাজির থেকে এই গুরুতর জাতীয় ইস্যুটির প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এবারের বৈঠকেও তারা যদি যোগ না দেন, তবে তাঁরা নির্বাচনে পরাজ হবার গ্রামি থেকে উদ্ধৃত হীনমস্ততাই প্রকাশ করে দেবেন।

আমাদের ঘটনা । বিজনী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চাই

গত ২৬ মে আমাদের সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বানে দাবি দিবস পালনের সময় গোয়ালাপাড়া জেলার বিজনীতে পূর্ণাঙ্গ হাজার জনের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ অংকিতে গুলি চালায়। এর ফলে কুড়িজন মারা যান ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। তৎক্ষণাৎ কাফু জারী হওয়ার আহতেরা চিকিৎসার সুযোগ পান না আর মৃতদেহগুলো শেরাল কুতুরে ধায়। অসমীয়াতায়ী অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত বিজনির এম, ডি, সি শ্রীচণ্ডীরাম সাইকিয়া নিজে গুলি চালাবার আদেশ দেন। সন্ত্রাস্তি নিখিল আসাম সংখ্যালঘু ছাত্র সমিতির সমর্থনে ভাষা ও সাম্প্রদায়িক

একোর জন্ত জাতীয় কমিটি আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত অভিযোগ করা হয়।

এ সম্মেলনে আরো জানানো হয় যে আহু ও গণসংগ্রাম পরিষদ বর্তমান আন্দোলনকে অহিংস বলে প্রচার করলেও আসলে তারা জঙ্গী আন্দোলন করছেন। অসমীয়া-তায়ীরা ক্রমশঃই সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন বলে যে প্রচার করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন, কারণ একাত্তর সালের লোকগণনা অনুযায়ী অসমীয়া-তায়ীরা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭১.৭৬%।

বিজনী হত্যাকাণ্ডকে দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একই দিনে বনগাইগাঁওতে

পনেরো হাজার সংখ্যালঘু মানুষের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আত্ম ও গণ সংগ্রাম পরিষদের লোকেরা পুলিশের নামেই পাথর ছোঁড়ে। মিছিলে অংশগ্রহণের অপরাধে বহু ব্যক্তির দোকানে হামলা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এম, পি, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, সম্মীপ দাশ এম, এল, এ, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বসু প্রমুখ। এঁরা দাবি করেন পক্ষপাতভূলক আচরণের জন্ত রাজ্যপাল এল, পি, সিং-এর অপসারণ, প্রশাসনকে মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়া, বিজনি হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্ত সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত অধ্যাপক, সমস্ত দোষী অফিসারদের বরখাস্ত, কতিপয় জন কতিপয় জন ইত্যাদি।

এদিকে বিজনীতে গুলি বর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়ীম মেন সাংবাদিকদের জানান যে এই তদন্ত করতে হবে অত্র কোন রাজ্যের একজন বিচার বিভাগীয় অফিসারকে দিয়ে।

ভিন্দেরের লোভনীয় পদ

রাজধানীর বিতর্কিত পুলিশ কমিশনার প্রিতম সিং ভিন্দের মাতা-পুত্রের বড় প্রিয়ভাজন। আর তাঁর আত্মগত্যও খুব গভীর। তাই বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশেষ একজন হিসেবে বর্তমান পদ থেকে ভিন্দের চলে এসে প্রধানমন্ত্রীর লিকিউরিটি অ্যাডভাইসার হতে পারেন বলে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে। তিনি ওই লোভনীয় ও বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পদটিতে যোগ দিলে যাতে কমিশনার পদটি পাওয়া যায় সেজন্য

তদ্বির তদারকি এখন থেকেই কিছু বিখ্যাত লোক শুরু করে দিয়েছেন। এখাপারে নিরাপত্তা শাখার প্রাক্তন ডি আই জি ও এখানকার কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ডি আই জি মহাজন দ্বার চেষ্টা এগিয়ে আছেন। ভিন্দের গেলে তিনি যে পরবর্তী কমিশনার হবেন এমন সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত উজ্জল রয়েছে।

অগ্নিগন্ত আসাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

তপন বসু

আসামের তথাকথিত বিদেশী বা বালানীদের কান্না শুনে ভারতবাসী ভক্তিত। আদিম বর্বরতার নৃশংস বলি আসাম প্রবাসী তথাকথিত 'বিদেশী' বা প্রত্যেকটি বালানী আত্মরক্ষাশে অপেক্ষা করেছে বলির পাঠার মত অদহার ভবিষ্যতের জন্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুর ক্রন্দন, নারীর আতঁনাদ কোন কিছুতেই উগ্র জাতীয়তাবাদী, অসমীয়া জনতা বিচলিত নয়। সংকীর্ণতাবাদের আফিম নেশাগ্রস্ত ক্যাপা অসমীয়ারা এলাকা থেকে এলাকার প্রেতন্তু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অগ্নিসংযোগ, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আর ক্রন্দন ঘোলে কামরূপ, কাছাড়, লখীমপুর, দারঙ্গাও ইত্যাদি জেলায় সংখ্যালঘু পল্লী-গুলোর জনজীবন আজ ভীত ও দহন্ত। বিশেষ করে উত্তর কামরূপ মুতাকুশে পরিণত হয়েছে। কিছু বেহনার কথা হলো, অসমীয়া জাতীয়তাবাদের লেলিহান শিখায় যতাহতি দিচ্ছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মত সর্বভারতীয় নেতা অথবা এম, ভি কামাথের মত বহুল প্রচারিত দাপ্তারিকের সম্পাদক। তথাকথিত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী তুপেন হাজারিকা তাঁর বঙ্গ সংস্কৃতি প্রীতির মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে খোলাখলি ভাবেই অসমীয়া। সংকীর্ণতাবাদ থেকে উদ্ভূত 'বালানী হটাও' দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন। নিকট অতীতেই তিনি বহু জায়গায় মন্তব্য করেছেন যে, "Bengal is my second Mother Land." এখন বোঝা যাচ্ছে বালানীদের জন্য তার প্রীতির সবটাই রেকর্ড কোম্পানী-গুলোর সঙ্গে ব্যবসাকে কেন্দ্র করে। বিশ্বস্তমুখে সংবাদ পাওয়া গেছে, প্রাদেশিকতাবাদের দুর্যোগ্য ব্যাধিতে ইঁদুন জোগান দেবার জন্য তিনি সারা আসাম ছাড় দমিতির নেতা প্রজুর মহাস্তকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পরবরাহ করেছেন। জনতা, কংগ্রেস (ই), অথবা আর্গ কংগ্রেসের মত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল-গুলোর কিয়দংশ এই সংঘর্ষে যোগদান করেছে। যেমন, জনতা দলের প্রাক্তন এম, পি, অজিত শর্মা সক্রিয় ভাবে এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্ররোচন দিচ্ছে। দু একটা বিরল দৃষ্টান্ত বাদ দিলে আসামের প্রায় প্রত্যেকটি প্রচার মাধ্যম তথাকথিত 'বিদেশী' উচ্ছেদ ও হত্যা নিয়ে কাকতালীয় রচনাকথা রচনা করছে। তরা-

তহতা ও নিষ্ঠুরতাকে ধামাচাপা দেবার জন্য বালানী পল্লীগুলোর নিষ্ঠুর, ভীত ও দহন্ত পরিবেশকে আসামীয়াদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের প্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মৌন সমর্থন আখ্যা দিয়ে মুখরোচক রহস্তোপস্থাপন মুদ্রণ করেছে। এবং সভ্যতার সব থেকে কলঙ্কিত ইতিহাসকে আরো ক্রোধান্বিত করায় অন্য সুযোগ বুকে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ 'বিদেশী' এলাকাগুলোকে লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণের 'মাদার', সূত্রিতে পরিণত করে তুলেছে।

১৯৭১ সালের নভেম্বরে প্রায়শ্বেই এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে আসামের পুলিশ ও প্রশাসন খোলাখলিভাবেই সমর্থন জানায়। অত্যাচার আর পাঁচটা প্রদেশের মত ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিস্ময় করা সত্ত্বেও ভারতের উত্তর-পূর্বকর্তা হঠাৎই গ্রীষ্মের চুলকানির মত যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠল, আইন শৃঙ্খলার অতিশ্রুত অবনতি ঘটল, এবং এই মওকদার মারোয়াড়ী, গুজরাটি ও সিদ্ধি ব্যবসায়ীরা কটর বামপন্থী বিরোধী দিক-দিকি, ইত্যন্তত: অগ্নিশিখাকে দাবানলে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অর্থ ভাণ্ডার নিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য হস্ত প্রসারিত করল। কিন্তু এত কিছু তরাবহতা সত্ত্বেও একথাটা আরো নির্মম সত্য যে, আসামের সমস্তা চূর্ণম পর্বত শৃঙ্খের মত দুর্লভ্য এবং তার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে ওখানকার স্থানীয় জোতদার, জমিদার প্রণীত কংগ্রেসী নেতারা এবং গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, শাজী, বাঁ মোরারজীর মত সর্বভারতীয় নেতারা কিছু কম দায়ী নন। ব্রিটিশ পুঞ্জিপতি ও আসামী জোতদার-জমিদার প্রণীত চা-বাগান ও হাজার হাজার একর পতিত জমি সম্বন্ধ করে তোলার জন্য কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও চাষ-আবাদে দক্ষ মুসলিমদের সীমান্তের ওপার থেকে বে-আইনী ভাবে পাচার করে নিয়ে এসে ক্রীতদাসের মত খাটাত। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বার্মার আগ্রাসনের দ্বারা আসাম শৃঙ্খলিত হয়। এবং ১৮১৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত ৭-৮ বছর ধরে আসামের জনজীবনের ওপর বর্মী সেনাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার চলতে থাকে। বার্মা কর্তৃক আসামের ভূখণ্ড দখল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও চোখ খুলে দেয়। তারা

উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, উপমহাদেশের এই অকটির অবস্থান সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২৬ সালের শেষ পাদে ব্রিটিশ কিনাঙ্গপতিরা পুনরায় বর্মী সেনাদের দখলদারী থেকে আসামকে ছিনিয়ে নেয়। এরপর, ভবিষ্যতে নয়া-উপনিবেশিক শোষণ চালাবার কুট-উদ্দেশ্যে ইংরেজ তানাশাহী আরো একটা জিমিনা খুব সুখাবধ-ভাবেই বুকেছিল যে, শোষণ ও শাসনের অন্ততম কৌশলগত দিক হচ্ছে, উত্তর-পূর্বকলের শক্তিশালী সরকার বিরোধী সংগ্রামকে বিস্তৃত করার জন্য আসাম থেকে বাঙলাকে পৃথক করা। এবং ১৮৭৪ সালে তাদের স্বপ্নের সৌখ বাস্তবেই নির্মিত হয়ে যায়। বাঙলা থেকে আসাম পৃথক হয়ে যায়, আর একেই বলে ইংরেজ পুঞ্জিশাহীদের আবিষ্কৃত ভিতাইড অ্যাণ্ড কল পলিগি।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ব্রিটিশ আর্মির ছাউনি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, সিদ্ধি, গুজরাটি ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা উত্তর-পূর্ব ভারতে অগ্রবেশ করে ওখানকার আবহাওয়া বিস্ময় ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। মাড়োয়াড়ীরা ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে খাজদ্বা পরবরাহের একচেটিয়া কারবারি হয়ে ওঠে। বৃহৎ বৃহৎ চা-বাগান গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতের ব্যবসায়ীরা সাহেবদের চা-বাগানের এজেন্সী, মহাজনী সুদপোরা ইত্যাদি ব্যবসায় লিপ্ত হয়। সরকারী অফিস-গুলো ব্রিটিশ সওদাগরদের তৈরী 'বাঙালীবাবুদের' আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে বিপুল পরিমাণ ধনি, হার্ডওয়ের মার্চেন্ট, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী, ময়দা কলের মালিক, পেট্রোল পাম্পের মালিক, নিনেমা হলের মালিক ইত্যাদির আমদানী হয়। মারোয়াড়ীরা এখন আসাম, দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয় হিন্দী কলেজ ইত্যাদির পরিচালনা করে। অধিকাংশ পরিবহন সংস্থার মালিক হচ্ছে পাঞ্জাবীরা।

৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ মহিমলা নিজেদের পালা ভারী করার জন্য তৎকালীন পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার মুসলমানকে এপারে আমদানী করে এবং সরকারী স্বরক্ষিত জমিতে তাদের অধিষ্ঠিত করে নতুন নতুন সমস্ত উপনিবেশ গড়ে তোলে।

পরবর্তীকালে কংগ্রেসী সরকারও বামপন্থী আন্দোলনের কর্তৃক করার উদ্দেশ্যে বে-পরোয়াভাবে মুসলিম ভোটার আমদানী করার জন্য সীমান্তের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এবং বামপন্থী আন্দোলনকে হত্যা করার চক্রান্তে অসমীয়া, অ-অসমীয়া সমস্ত রকম ব্যবসায়ীরাই তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ বামপন্থী আন্দোলন কোন ব্যবসায়ীর কাছেই কাম্য বিষয় নয়। তবে ব্রিটিশ জমানার এসব নিয়ে বিশেষ জটিল দ্বন্দ্ব ছিল না। বিশেষত: জাতীয় আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রভাব এই ধরনের বিরোধগুলোকে জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্র নীচে নিমজ্জিত হতে সাহায্য করেছিল।

৩০-এর দশকের শেষার্ধ থেকেই আসামের জনসংখ্যা বাঁধাভাটা টেউয়ের মত মরিয়া গতিতে বেড়েছে। এছাড়া আরো অসংখ্য ও অসীমসংখ্য বস্তুগত সমস্তা কৃষিম-ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, ইংরেজরা বাঙালীদের মধ্য থেকে 'বাবু সম্প্রদায়' সৃষ্টি করে এবং নিজে-

দের কাজের সুবিধার জন্য আসামের সব থেকে দারিদ্রপূর্ণ সরকারী পদ-গুলোতে 'বাবু সম্প্রদায়ের' বাঙালী-দের আসীন করে বাঙলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করে। ভাছাড়া ১৮১৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার শুরু থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত আসামের স্কুল গুলোতে কিছুই পড়ানো হ'ত না। যার ফলে অসমীয়াদের শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারী কাজের অযোগ্য বলে মনে করা হত।

অসম বিকাশের দেশ ভারত মুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আসাম ভূখণ্ড কোন কালেই কৃষি বা শিল্পে অর্থাত্ অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত ছিল না। ব্রিটিশ কিনাঙ্গ ক্যাপিটালও এখানে একমাত্র চা-বাগান ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানি। এবং তারপর সাতচল্লিশোত্তর কালে পড়ার আড়াল থেকে শোষণ করার জন্য নয়া-উপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা চালু করে যাবার পরেও তথাকথিত জনদরদী কংগ্রেসী সরকার অগ্র-শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত সদস্যরা

চুরির দায়ে ধরা পড়েছে

হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত চণ্ডিডালা থানা কর্তৃপক্ষ বামপন্থী শরিক দল-গুলোর কর্মীদের সহযোগিতায় এক চোরাই সিমেন্টের কারখানা আবি-কার করেছে। অবশেষে দেখা যায় এর মালিক হলো স্থানীয় অকল পঞ্চায়েত প্রধানের তাই শ্রীমান। সংবাদে প্রকাশ, অঞ্চলপ্রধান স্বয়ং এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ওয়াপির সময় এও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, এক ভাগ সিমেন্টের সঙ্গে তিন ভাগ মাটি মিশিয়ে লুণ্ঠা দরে সিমেন্ট বিক্রির ফলাও কালোবাজারী চলছিল বে-আইনী কারখানায়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী কট্টাকটরদেরও ঠকানো হয় ঐ নকল সিমেন্ট দিয়ে। আপত্তি-কর ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ডে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলের সভ্যদের অঞ্চলপ্রধান জ্রীদলীপ পান জীবনহানির হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

পুকুরিয়া জেলার পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার মারাত্মক সমস্ত অভি-যোগ পাওয়া যাচ্ছে। জনসাধারণের অভিযোগ হলো, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা পঞ্চায়েতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিছু কিছু দুর্নীতি-

পরায়ণ ব্যক্তির জন্য সেই অতিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যায়নি। পুকুরিয়া জেলার পুকুরিয়া বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকারী বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ৩১০০০ টাকা তহরুপ হওয়ার ফলে উন্নয়নের কাজ আপাতত: স্থগিত আছে এবং ৭৮০০ প্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। এবং এইভাবে সাতুড়ি কমলা বাঁধের জন্য বরাদ্দ ১৫০০০ টাকা হিসাবের গরমিল হওয়ার ৫০০০ হাজার প্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। কোটালডি বড় বাঁধের জন্য ৭৫০০ টাকা ও ১৫০০ হাজার প্রমদিবস, দেকগড়িয়ার জন্য ১০০০০ টাকা ও ২০০০ প্রমদিবস, ধুলুড়ি বাঁধের জন্য ১০০০০ টাকা ও ২৩০০ প্রমদিবস, দস্তহিত বাঁধ ৭৫০০ টাকা, খাড়াহতি বাঁধ ১৫০০০ টাকা, ৩০০০ হাজার প্রমদিবস, ঢেক শিলায় ১০০০০ টাকা ও ২০০০ প্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। এই সবকটি বাঁধের কাজই সাতুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য সাতুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি দি, পি, এম-এর কবলিত। পশ্চিম দিনাজপুর এবং ঝাড়খণ্ড থেকেও একই অভিযোগ আলছে।

মতামত

ভারতবর্ষে ভোট কেন ?

স্বাধীনতার কিছুদিন পর থেকেই আমাদের দেশে ভোট দেওয়ার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু এ ভোট দেওয়া কেন? কেউ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেছেন কি? ভোট দিয়ে জনসাধারণের কোন উপকার হয়েছে কি? আমরা তো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিন বছর দু বছর অন্তর ভোট দিয়ে থাকি। তার বদলে কি পেলাম? ভোট দিয়ে আমরা তো মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। যত দিন যাচ্ছে যত ভোট দিচ্ছি জিনিষের দাম ততই বেড়ে চলেছে। ভোটের আগে বাজারে জিনিষের দাম থাকে ভোটের পরেই দাম বাড়তে থাকে।

কিন্তু আমরা এমন দেশে বাস করি সেখানে সত্যি কথা বললে বিপদ। জিনিষের দাম এখন হু হু করে বাড়ছে কিন্তু আমাদের নেতারা লভা সমিতি রেডিও মারফৎ প্রচার করে যাচ্ছেন জিনিষের দাম কমছে। এক এক সময় মনে হয় আমরা কোথায় আছি মগের মূর্খকে না ঠগের মূর্খকে?

দেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে চাই শিক্ষা। শিক্ষার ভার যাদের হাতে তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে দেশের সাধারণ ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে না পারে। প্রথমত বইয়ের সংখ্যা এত লেগেছে যে ছাত্র ছাত্রীদের বই বয়ে নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর। তারপর মিলেবাস বদল, আজ ম্যাট্রিক, কাল জুল ফাইনাল, আবার হারার সেকেন্ডারী, কাল মাধ্যমিক এইভাবে যেন বাস্তববলের পালা। আবার এখন পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হবে।

যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, যাদের অবস্থা ভাল তাদের ছেলেরা ইংরাজী মিডিয়াম জুলে পড়বে, করেন থেকে পাশ করে আসবে, তাদের ছেলেরা হবে অফিসার দেশ-নেতা। সাধারণ ছেলেরা হবে কুলি, মজুর না হয় বেকারের বোঝা বয়ে বেড়াবে, আর না হয় চুরি, ছিনতাই রাহাজানিও করবে। বোকা হলে পাটি করবে, মরীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়াবে। বাবা দাদাদের বাড়ি বসে ভোটের ক্যানভাস করবে। যুবকরা চিন্তা করেছে কি ভোটের ক্যানভাস করতে গিয়ে দলদলি মারামারি করে তোমাদের কতজনের প্রাণ চলে যাচ্ছে, কত মা পুত্রহারা, বধু স্বামী-হারী হচ্ছে। মরীচিকার লোভে তারা

তো লুটে নিচ্ছে। ভোট ভাদেরই ভাল যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, মিল মালিক, কারখানার মালিক। কারণ ভোটের সময় তারা যা খরচ করবে, ভোটের পরে জিনিষের দাম বাড়িয়ে ৪০-৫০ গুণ টাকা তুলে নেবে। আর জনসাধারণ মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রয়, বিক্রি বাটি বিক্রি করে ক্রয়ঃ পণ্যের ভিত্তি হয়ে যাচ্ছে। ভোট পাবার আগে ভোট গ্রহীতাগণ পাড়ার পাড়ার শহুরে শহুরে, বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান। ভোট পেয়ে যাবার পর আর তাঁরা আমাদের চিনতে পারেন না। তার পরেই দাদাদের রোগা চেহারা ক্রয়ঃ ফুলতে থাকে। আর জনসাধারণ অতাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে চোখে সরবে ফুল দেখে।

আরও মজার কথা আমাদের দেশে যে সমস্ত ভাল জিনিস উৎপন্ন হয় সেগুলো আমরা বিদেশীদের খাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকি। আর পচা জিনিসগুলি আমরা খেয়ে জীবন ধারণ করি। যেমন কনট্রোলার চাল। এ চালগুলি যে কোথা থেকে আসে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজধানী দিল্লীর কনট্রোলে বাসমতি চাল দেওয়া হয়। বাংলার টাকা বাংলার জিনিস অথচ বাংলার বেলা বিমাতাহুল ভাবহার। তাই বলি ভোট কেন?

শেখ এনাম বখশ

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর টালবাহানা

নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৩রা এপ্রিল তিমজান হাউসটাককে লাসপেও করা হয়েছিল ট্রেনী মার্গের সঙ্গে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগে। ৪ঠা মে হাউসটাক-ইনটার্প্র্যােসোসিয়েশন এক মিটিং করে। যে সব হাউসটাককে বরখাস্ত করা হয়েছিল, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় অভিযুক্ত ঘটনাগুলি তাদের পক্ষে ঘটানো অসম্ভব নয়। বিশেষ করে এদের মধ্যে একজন ছাত্রপরিষদ নেতাতো অতিশয় হুঁহুঁ। একমাত্র কলেজের ছাত্র হিসাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব, তাছাড়া বিশেষ সহায়ত্ব ছেলেদের কাছ থেকে পায়নি এই বরখাস্ত হওয়ার জন্য। সরকার এক কমিশন বসায় কলেজের টিচারদের নিয়ে। তারা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত না নিলেও যেমন সাক্ষ্য জমিবেদ করেন, তার ভিত্তিতে আদালতের শরণাপন্ন হলে কী হত বলা যায় না।

সে সব সময় সাপেক্ষ, হাউসটাকশিপ ততদিনে শেষ হবে যাবে বলেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণ তড়িৎভিত্তি একটা সিদ্ধান্ত নেয়।

৪ঠা মেই সভায় কলেজের একজন বেনামী নকশাল নেতা হীরালাল কোনার টেব্রে উঠে বলেন প্রিন্সিপালকে বেরাওটা ঘেন হলো না হয়, পেছাপাশ পাখানা বদল এমন কি জল পর্যন্ত ঘেন না দেওয়া হয়। (প্রিন্সিপাল আগে- নকশাল করতেন। এখন নিরপেক্ষ নামা-বলীর আড়ালে রাজনীতি করেন, অথচ নকশালদের পত্রপত্রিকা বিলি করেন, পোষ্টার মারেন।) শুধু তাই নয় প্রিন্সিপাল আট দশ ঘণ্টা বেরাওয়ের পর-এই দারুণ গ্রীষ্মে যখন এক গ্রাম জলের জন্ত কক্ষ আবদ্ধ করেন এবং ছাত্র পরিষদের ছেলেরাও যখন তা দিতে বাধা দেয় না, একজন ছেলে এক গ্রাম জল দিতে যায়, কোনার তার হাত থেকে জল কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। নকশালরা শুনেছি আদর্শবান। এটা আদর্শের বা মানবিকতার কোন্ পর্যায়ে পড়ে জানা নেই। এর পরে রাতে বেরাও করার মতো ছেলে পাওয়া যাবে না বলে (রাতে ঘুমোতে হবে ত) যখন ছাত্রপরিষদের ছেলেরা কর্মবিরতির ডাক দেয়, কোনো নকশালই তার বিরোধিতা করে না। আগেও এরা কখনও কর্মবিরতি যে কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয় এমন কথা বলেনি। একবারও মনে হয়নি সরকার ও হাউসটাকদের স্বপ্ন কেন হাজার হাজার রোগীর হয়রানি হবে। এদের মধ্যে কতজন মারা গেছে তারই বা জবাবদিহি কে করবে?

পরবর্তীকালে হাউসটাকরা ক্ষমা-প্রার্থনা করলে তাদের ওপর শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এটা 'প্রথম অপরাধ' বলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এক বিবৃতিও দেন। এদিকে আজ দু মাস হয়ে গেল তবু স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার আদেশ কার্যকরী করতে এখনও বজছেন না। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর লগে হাউসটাক ও আই. এম. এর কয়েকজনের মিটিংও তিনি লিখিত কিছু দেন নি। হাউসটাকদের 'শীড়ানীড়িতে' বলেছিলেন আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশিষ্টদের সামনে বলছি, আমার মুখের কথাটাই যথেষ্ট। পরে বিধানসভায় এক বিবৃতি দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি উন্টোপাটা মিথ্যা কথা বলছেন, টালবাহানা করছেন, আই. এম. এর ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছেন। এতে সর্বতোভাবে সরকারই অপরাধ হচ্ছে। এ সব কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কোনো বিকৃত মানসিকতা, না বদমাসেরী?

রজন সাহা
হাউসটাক, নীলরতন সরকার
মেডিকেল কলেজ

স্বাধীনতা সংগ্রামী উত্থাপ

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী বিপ্লববিহারী গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীশীতলচন্দ্র চ্যাটার্জী কিছু বহিরাগত ও স্থানীয় মন্তানদের অত্যাচারে নাজেহাল হয়ে তার পৈত্রিক ভিতে ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অভিযোগ, এইসব ঘটনার পিছনে রয়েছেন শ্রীচ্যাটার্জীর বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র ব্যানার্জী। স্বদেশবাসু প্রায় তিন বছর হল বাড়ির ভাড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আরো অভিযোগ, তিনি তাঁর তিন কন্যাকে মূলধন করে শ্রীচ্যাটার্জীর বাড়ি এ নং ক্রীক রো-র নীচের তলার মধুচক্রের আসর বসিয়েছেন। স্থানীয় এক ইন্দিরা কংগ্রেসীর গুণ্ডার

পোষকতার ১৯৭৬ সাল থেকে সফা হলেই এই মধুচক্রের আসরে সুরা ও সাকির মোতাত্ত শুরু হয়ে যায় এবং রাত যত বাড়তে গেলো চরম বেলেলা-পনার পর্যায়ে যায়। পাড়ার অন্তিম লোকেরাও এদের আচার আচরণে অতিষ্ঠ।

শীতলবাসুর অপরাধ তিনি এর প্রতিবাদ করেন। এই অপরাধে ১৯৭৭ সালের ১লা জাহ্নবীর গভীর রাতে স্থানীয় মন্তান পূজবটি ও স্বদেশবাসু তিন কন্যার "বয়স ফ্রেওয়ার" যত্ন অবস্থায় শীতলবাসুর বাসস্থান আক্রমণ করে। এইসব ঘটনা বার-বার থানার জানানো সত্ত্বেও পুলিশ উদাসীন। অবশেষে পুলিশ কমিশনার ১০ম পৃষ্ঠায়

অগ্নিগর্ভ আসাম

৩য় পৃষ্ঠার পর

পতির উদ্দেশ্যে কোনরূপ পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। এর জন্তও গাড়ী, নেহেরু, প্যাটেল, শাস্ত্রী বা বোরারজী কারোই দায়িত্ব কম নয়। চা, পাট, তেল, ও জাচরাল গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ আসাম থেকে শুধু নেওয়াই হয়েছে, দেওয়া বিশেষ কিছু হয়নি। যার ফলে '৫০ এর দশক থেকে বেকারী তুলে উঠেছে। দমীকায় দেখা গেছে দেশের (আসাম) মোটামুটি ৮০% মানুষ হয় জমিহীন নয় বেকার। এইভাবে কাল ক্রমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যথা যথাস্থানে অসমীয়া জনগণের প্রেণী রাজনৈতিক ঘণ ও প্রেণী সংগ্রাম ঘনীভূত হতে থাকে। কিন্তু প্রতি ক্রিয়াশীল শিবিরের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা দূর্ভাগ্যের ভার জনরোষকে বিপদগামী করে প্রভুদের পিঠ বাঁচাবার রাস্তা সূচন করে দেয় এবং পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী ও এককবল বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে অনৈক্যের ফাটল ধরিয়ে দিয়ে তাকে দুর্বল করে দেয়।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস(ই), জনতা এবং আসাম জাতীয়তাবাদী দল উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে স্বত্বস্বিদ্ধি ঘোষণা করে কমিউনিস্ট পার্টি মানেই 'বাঙালী পার্টি' মোগান তুলে ভোটের বাজার মাং করবার চেষ্টা করে। এবং তথাকথিত 'বিদেশী' মিশন যাকে আলানীর জোগানদারের কাক করে। তারা একথাও প্রচার করতে থাকে যে, এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি মানেই 'বাঙালী সাম্প্রদায়িকবাদ।' কাগজপত্র-গুলো ধৈর্য সহকারে ও ধারাবাহিক

ভাবে প্রচার করতে থাকে যে, 'বহিরাগতদের' মরগাম, 'বিদেশীদের' অগ্রপ্রবেশ ইত্যাদির মূলে একমাত্র কারণ হল, 'বিদেশী বাঙালীদের' দূর্ভাগ্য, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ। অত্যন্ত প্রভাবশালী ও শক্তিশালী প্রচারবহু মারফৎ ভিত্তিহীন রজনী রচনার কাহন্য ওড়ান হতে থাকে, এবং অসমীয়া জনগণের দুর্ভাগ্যের জন্ত অনেকাংশে বামপন্থী পার্টি ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অপদার্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতে থাকে। বলপ্রয়োগ মারফৎ তাদের পান্টা বুদ্ধি প্রত্যুত্তর-গুলোর কঠোরোপ করা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদকের কাছে 'বিদেশী' হটাও আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। আসাম থেকে "বিভাড়নযোগ্য" "বিদেশীদের" তালিকার সঠিক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বারংবার কুরাশা সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ভীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়।

ক্রমে ক্রমে আসাম ও অসমীয়া-দের জন্ত তথাকথিত ভাবনা চিন্তা করে এইরূপ প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা, যেমন, আসাম সাহিত্য সভা, পূর্বাঞ্চলীয় লোক পরিষদ, আসাম জাতীয়তাবাদী দল, দাদা আসাম ছাত্রসমিতি, গণ সংগ্রাম পরিষদ প্রমুখ সংগঠনগুলো এই বাঙালী বিভাড়নের ঘৃণা সাম্প্রদায়িক খুন-খারাপিতে যোগদান করেছে। এবং এদের মধ্যে সারা আসাম ছাত্র সমিতি মুখে যে কথাই বলুক না কেন, আসলে এটি একটি চরম বামপন্থী রাজনীতি বিরোধী সংগঠন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

আগামী বাজেটে আরো দুর্গতির বোঝা চাপবে

অর্থ নৈতিক ভাব্যকার

আগামী ১৫ই জুন লোকসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। ঐ অধিবেশনে বাজেটের চিত্র পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে নয়াগিরি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলও পাওয়া যাবে। রাজ্য বিধান সভাগুলির ঐ নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও কেন্দ্রীয় বাজেটের বিশেষ হেরফের হবে বলে মনে হয় না। কারণ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অবস্থা বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি স্থির করে দেয়। তবে ইন্দিরা কংগ্রেস জাহ্নবীর মাসের লোকসভা নির্বাচনের মত বিপুল ভোটে জয়ী না হলে অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে।

১৯৮০-৮১ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে ২৭০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি দেখানো হয়েছিল। আগের বছরের অল্পমিত ঘাটতিও ৩০০০ কোটি টাকার বেশী। বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ২২৩২ কোটি টাকা। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে পাইকারী খুচরার হিসেবে ১৬.৯ শতাংশ, খুচরার দরের হিসেবে কষা ছয়, তবে ভোগ্যপণ্যের খুচরো ২২ শতাংশের মত বেড়েছে গত এক বছরে। কাগজী টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির হারও প্রায় ২০ শতাংশ। বেকারের সংখ্যা প্রায় ১.২০ কোটি, অর্থাৎ মোট কর্মকর্ম লোকের দশ শতাংশ বেকার। যদি আধাবেকারদের হিসেবে ধরা যায় তাহলে বোধ হয় কর্মকর্ম লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী বেকার।

এহেন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বাজেট রচনার দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত হবে এটা স্বাভাবিক। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মুখে যাই বলুন, কাজের বেলায় পুরো ধনবাদী। ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিক সমিতির সভাপতি কে, এন, মোদী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বণিক সভার দাবি মেনে নিয়েছেন। তাহলে আগামী বাজেটে এর প্রতিফলনও ঘটবে। আবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অকৃত্যকৃত্যমী ও ধনী কৃষকদের উপরেই নির্ভর করতে চান। হরিয়াণার রাও বীরেন্দ্র সিং কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং একজন বড় খামার-মালিকও বটে। সুতরাং তার পক্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পথ সোজা

পুঁজিবাদী পথ। অর্থাৎ আরো সম্ভাব্যে সার, সেরের জল, উন্নত বীজ, ট্রাক্টর ও কৃষিযন্ত্রের সংগ্রহ এবং উৎপন্ন কল চড়া করে বিক্রী করার সুযোগ। বলা বাহুল্য লোকদল নেতা চরণ সিং একই কৃষি নীতিতে বিশ্বাসী। জনতা দলেও এদের প্রভাব আছে।

সুতরাং বাজেট রচনার পদ্ধতি এই নীতিগত ধারণার গভীর ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারে না। এবার দেখা যাক বাজেটের চেহারা তাহলে কি দাঁড়াতে পারে।

বাজেটের ঘাটতি কমানোর ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলির উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসানোই ধনী বণিকদের নীতি। এর ফলে কিন্তু জিনিসের দাম কমে না। কারণ উৎপাদন শুধুই এই ট্যাক্সের

অর্থনীতি

সিংহ ভাগ দখল করে। বৈদেশিক আমদানী ও রপ্তানীর উপর শুদ্ধ, ইত্যাদিও দামের সঙ্গে যোগ হয়। ফলে দায় বাড়বে। কিন্তু আয়কর, সম্পদকর, ইত্যাদি কয় দাম বাড়ায় না কারণ জিনিস বিক্রী হবার পর মুনাফা হয়, তখনই আয়কর দিতে হয়। তার আগে নয়। কিন্তু শিল্পপতি ও বণিক সভার সভাপতি কে, এন, মোদী চান আয়কর, সম্পদকর ইত্যাদি যেন বাড়ানো না হয়। তারা রপ্তানী শুদ্ধ বৃদ্ধিরও বিপক্ষে, আমদানী শুদ্ধ তাদের আপত্তি নেই। কারণ আমদানী জিনিসের মাসুল বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং আমদানী করা জিনিসের দাম বাড়লে নীরস দেশী জিনিসও বেশী দামে বিক্রী হয়। সুতরাং শিল্পপতিরা অল্পপার্জিত মুনাফা উত্তল করতে পারেন। আবার রপ্তানী বৃদ্ধির নামে তারা ভরতুকি দাবী করেন। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বছরে ভরতুকি দেওয়া হয়। বিদেশে পণ্য বিক্রী করে মুনাফা মতই হোক তার উপর শুদ্ধ বসানো হলে তাদের আপত্তি আছে।

এদিকে খামার-মালিক ও ধনী কৃষকদের খাঁকতিও কম নয়। পাইকারী ব্যবসায়ীরাও চান দাম বাড়ুক। কারণ ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি শেষাংশ ৯৯ পৃষ্ঠায়

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিজ বিরোধী সাদা চামড়ার জন্য আনন্দবাজারী সম্পাদকের ওকালতি

আকাশবাণী কি করে প্রচার করল ?

বিশেষ প্রতিনিধি

নয়াদিল্লী ১। নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। অতীতের অভিজ্ঞতার জ্ঞান আমাদের সরকারের পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব আর আমাদের কিছু সাংবাদিকের তো কথাই নেই। কিন্তু অল ইন্ডিয়া রেডিও ওয়র্কে আকাশবাণী জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতালভার আগের দিন যে কাণ্ডটি করলো তার নজির খুঁজে বের করা শক্ত। তাই প্রথমে সন্দেহ হচ্ছে, ভুল শুনেছি কি তাহলে? কিন্তু তাও ত সম্ভব নয় কারণ একটা কি ছুটো শব্দ নিয়ে ত আর খটকা লাগে নি। কয়েক মিনিট ব্যাপী প্রোগ্রাম কি করে সমস্তটা ভুল শুনবো? তবু ভুলের অবকাশ কোথাও রাখবো না স্থির করে তদুপরি দর্পণে খবর পাঠাই নি। ট্রান্সক্রিপ্টের জন্ত অপেক্ষা করছি।

জিম্বাবুয়ের স্বাধীনতা উৎসবে ভারত থেকে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং, তার কিছু আমলা এবং আকাশবাণীর নিজস্ব প্রতিনিধি সহ কয়েকজন সাংবাদিক। উৎসবের আগের দিন দিল্লী থেকে রাত ন'টা পনেরোর পল্টনহাট প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় জিম্বাবুয়ের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবের সঙ্গে এম ভেক্টনরায়ের নামে এক অধ্যাত ভারতীয় সম্পাদকের "এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ" এক টেপ রেকর্ড।

প্রথমে সম্পাদক প্রবরের এক লম্বা মুখবন্দ। তাতে উল্লেখযোগ্য মতুন খবর—জিম্বাবুয়ে নামটি নাকি এগেছে আফ্রিকার রূপকথার কোন পান্থীর নাম থেকে। এই তথ্যটি কোথা থেকে যোগাড় হয়েছে বোকা গেল না। যারা খোজ রাখেন তারা জানেন যে জিম্বাবুয়ে শব্দটি জাহাজি নদীর দক্ষিণাঞ্চলের এক প্রাচীন সভ্যতার স্মারক। ভেক্টনরায়ের ওসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে মলমলারি যান নি। তার ওপরে একটা শুদ্ধ দায়িত্ব কেউ দিয়েছিল, পরে বোকা গেল।

সম্পাদকটির প্রথম প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী মুগাবের প্রতি "আপনি জানেন, শ্রীমতী গান্ধী আপনাদের স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসছেন। ভারতের থেকে আপনি কি রকম সাহায্য প্রত্যাশা করেন?" প্রশ্নের

স্বরটা যেন ওপর তলা থেকে নীচের দিকে ছুড়ে দেওয়া একটা কথার মত।

তৃতীয় বিশ্বের অন্তত নেতাদের মত মুগাবে ভারত থেকে টেকনিক্যাল সাহায্যের কথাই বলেন। কিন্তু আমাদের দেশী সম্পাদক নিজস্ব প্রসাবলীর খন্ডা নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই অস্থায়ী ছনখর প্রশ্ন করলেন "মেট্রিয়েল সহায়তার কথা যদি হয় (মুগাবে তা বলেন নি) তাহলে মুদ্রিল আছে। আপনি জানেন ভারত সরকার সাউথ আফ্রিকা সরকারকে স্বীকার করে না। সাউথ আফ্রিকা বন্দরগুলির ভেতর দিয়ে ছাড়া এই দেশে বা এই অঞ্চলের অন্তত দেশে মালপত্র চালান করার কোন উপায় নেই। সুতরাং ভারতীয় বন্দর দিয়ে ভারতীয় মালপত্র জিম্বাবুয়ে এবং কাছাকাছি দেশগুলিতে চালান করার উদ্দেশ্যে ভারত ও সাউথ আফ্রিকা মধ্যে একটা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা করার জন্ত কি আপনি শ্রীমতী গান্ধীকে বলবেন?"

মুগাবে: "না। আপনারা দক্ষিণ আফ্রিকা সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করুন এমন কথা আমাদের বলার কোন প্রশ্ন ওঠে না। মোজামবিকের বন্দরগুলির ভেতর দিয়ে মালপত্র আমাদের কাছে পৌছাতে পারে।"

ভারতীয় সম্পাদকটি অত সহজে দমবার পাত্র নন। তিন নখর প্রশ্ন পেশ করলেন: "মোজামবিকের বন্দরগুলি খুব কাজের নয়—ভরানক ভীড়, ডেয়ারেজ চার্জ অত্যন্ত বেশী এবং চুরিচামারী প্রচুর। সেজন্য ভারতীয় জাহাজগুলি এই বন্দরগুলিতে ভেঙে না। আফ্রিকা দক্ষিণাঞ্চলে ভারতীয় মালপত্র পৌছে দেওয়ার অল্প উপায় কেবল লিঙ্গাপুর হয়ে—যেখানে ভারতীয় তাহাজ যান। কিন্তু ও রাস্তায় গেলে খরচ পোষাবে না। আফ্রিকা অনেক দেশে ভারতীয় মালের চাহিদা আছে কিন্তু জাহাজী যোগাযোগের সমস্তর জন্ত তারা জিনিসপত্র পায় না এবং তার কারণ ভারত সরকার সাউথ আফ্রিকা যেতান রাজত্ব মানতে রাজী নয়।"

মুগাবে: "আমরা বলবো না ভারত তার বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে সাউথ আফ্রিকা সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করুক।"

এরকম খাপড় খেয়েও লজ্জিত হওয়ার মত লোক আমাদের সম্পাদকটি নন। সাউথ আফ্রিকা বর্ণবিষেধী সাদাচামড়ার হয়ে ওকালতি তার পরেও চালালেন। তার চার নখর প্রশ্ন: "কিন্তু আপনি কি আপত্তি করবেন যদি ভারত বলে, আফ্রিকা দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলি যখন আমাদের মালপত্র চায় তখন সাউথ আফ্রিকা ভেতর দিয়ে ভারতীয় পণ্য জিম্বাবুয়ে, বোতসোয়ানা, জাম্বিয়া চালান করার সুযোগ করা যাক।"

মুগাবে আরেক খাপড় করলেন: "আমাদের জন্ত যদি হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবো।"

ভেক্টনরায়ের বিভাবৃদ্ধির পরিচয়ও কিছু পাওয়া গেল। আফ্রিকা দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলিতে ভারত থেকে মালপত্র পাঠাতে হলে তার মতে, সাউথ আফ্রিকা আর মোজামবিক বাদ দিলে একমাত্র লিঙ্গাপুর দিয়ে সম্ভব। হাদবো না কাঁধবো? আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হতে হলে আজকাল বোধহয় ভুগোলের 'ভ' জানারও দরকার নেই।

কিন্তু সত্যি তদন্ত করার মত বিষয় হচ্ছে এই সাংবাদিকটি মলমলারি গিয়েছিলেন কার হয়ে? কার খরচে? উদ্বেগ ত পরিষ্কার দেখা গেল সাউথ আফ্রিকা সাদা চামড়ার হয়ে ওকালতি করা। তার সঙ্গে কি এই লোকটির মার্কিন অর্থপুট এক প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতার তালিম নেওয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে? পাল্টেপের সন্তোষ এই কথাগুলি সরকারকেও জিপোস করতে পারেন।

সমস্যারিতে গিয়েছিলেন এরকম অল্প ছ একজন ভারতীয় সাংবাদিক এমন কথাও বলেন যে মুগাবের সঙ্গে ভেক্টনরায়ের একাত্তে সাক্ষাৎকারে কাহিনীতেও নাকি কারচুপি আছে। হতে পারে, কারণ এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ টেপ রেকর্ড—এ অত হাস্যবোধে আওয়ায আজকালকার দিনে আসার কথা নয়। কিন্তু সে যাই হোক, আনন্দবাজার মালিকদের শেষাংশ ৮৫ পৃষ্ঠায়

সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে দুই পুলিশ কর্মী কমিশন কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত

সরকারী ক্ষমতা অপব্যবহারের দায়ে আরও একজন পুলিশ অফিসার এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। জরুরী অবস্থা বিষয়ক আতিশয্য নিয়ে তদন্তকারী কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রীহরতোষ চক্রবর্তী এই দুই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৩ ধারার মাধ্যমে দায়ের করার সুপারিশ করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার কমিশনের এই সুপারিশ মেনে নিয়েছেন বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। দোষী সাব্যস্ত এই দুই পুলিশ কর্মী হলেন সাবেক ইন্সপেক্টর অরবিন্দ সোহা এবং কনস্টেবল নম্বর ১৪০৮ ভিয়ার্স ভূবে।

অভিযোগকারিণী হলেন শ্রীমতী মেনকা ভট্টাচার্য। অভিযোগ হল এই যে, শ্রীমতী ভট্টাচার্যের স্বামী শ্রীমন্তোষ ভট্টাচার্যের উপর জরুরী অবস্থার সময়ে পুলিশ অকথা অত্যাচার করেছে যার ফলে অভিযোগ কারিণীর স্বামীর দৈহিক এবং মানসিক ক্ষতি হয়েছে। অভিযোগটি পেশ করা হয়েছিল শাহ কমিশনে। শাহ কমিশন এই অভিযোগটি তদন্তের অঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। তদন্তসময়ে রাজ্য সরকার এই অভিযোগটি তদন্তের ভার অর্পণ করেন জরুরী অবস্থার আতিশয্য বিষয়ে তদন্তকারী এই কমিশনের হাতে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, নিপুণীত শ্রীমন্তোষ ভট্টাচার্য উল্বেড়িয়া কালি মন্দিরের প্রধানপুরোহিত। অভিযোগে বলা হয় যে, একটি মিথ্যা চুরির মামলায় প্রধান পুরোহিত শ্রীমন্তোষকে জড়িত করে মন্দির পরিচালক সমিতি। মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয় এই কারণে যে, অত্যাচারিত শ্রীমন্তোষ দক্ষিণা এবং প্রণামীর ভাগ মন্দির ও কমিটির সদস্যদের দিতে রাজী হননি। কারণ প্রধান পুরোহিত হিসাবে এই সব তাঁরই প্রাপ্য। যদিও অজান্তে পুরোহিতদের তিনি এর ভাগ দিতেন। মন্দির কমিটির সদস্যদের কথামত উল্বেড়িয়া থানার সাব ইন্সপেক্টর শ্রীমরবিন্দ সোহা প্রধান পুরোহিতকে থানায় ডেকে পাঠিয়ে পাঁচ বেধে ওপরে ঝুলিয়ে নিধনরূপে প্রহার করেন। পুলিশ পরিভাষায় এই অত্যাচারকে বলা হয় কচুয়া ডোলাই। এরপর তাঁকে উল্বেড়িয়া থানার ৫ (১২) ৭৬ নম্বর মামলায় জড়িত করে গ্রেপ্তার করা হয়। থানার তার ওপর যে অত্যাচার করা হয় তাতে সন্তোষবাবুর পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যায়। এরপর তার হাতে হাতকড়া এবং কোমড়ে দড়ি পড়িয়ে টানতে টানতে থানা থেকে বের করে গাড়িতে চড়িয়ে বাগনান থানার অধীনে বাইনান গ্রামে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ি তল্লাশী হয়। কিছু পাওয়া যায়নি। সে সময়েও সন্তোষবাবুর ওপর পুলিশ অত্যাচার চালায়। তাকে জল পর্যন্ত পান করতে দেয়া হয়নি। তাকে এবং তার স্ত্রীকেও পুলিশ মোংরা ভাষায় গালাগাল করে।

পরবর্তীকালে মামলায় সন্তোষবাবু খালাস পান। প্রমাণিত হয় যে, তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছিল। কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সন্তোষ ভট্টাচার্যকে পুলিশ অত্যাচারে অভিযোগ করে এবং এই তৃতীয় ডিগ্রীর অত্যাচার চালানোর কোন আইনসম্মত অধিকার পুলিশের নেই।

সন্তোষবাবুর পক্ষে যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই মজাঙ্গ এবং বিশ্বাসযোগ্য। তাদের বক্তব্যকে কমিশন যুক্তিগ্রাহ্য বলে ধরে নিয়েছেন।

অবশ্য অতিমূক্ত পুলিশ কর্মীদের নিজেদের দোষ খণ্ডন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন নথিপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের সেই সব অজুহাত টেকেনি। এমন কি যে মন্দির কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশকে প্ররোচিত করেছিল তারাও এক বৈঠকে প্রধান পুরোহিতের উপর পুলিশী অত্যাচারের নিন্দা করেন লবনময়িত্বক্রমে এবং তার লিখিত বয়ানের অসঙ্গতিও কমিশন দেখেছেন।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা

টাকাড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

ফ্রীল্যান্স সাংবাদিকদের সমস্যা

বিশ্বের অস্তিত্ব, বিশেষতঃ ইয়ো-রোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিকরা সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের সারিতে বিশেষ আসনে উপবিষ্ট। যার ফলে, দেখা যায় সে সমস্ত দেশের অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখক-সাংবাদিকই কোন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত নন বা তাদের বাধ্যধরা কর্মী নন। যার জন্য বহির্বিষয়ের লেখক-সাংবাদিকদের আপন প্রতিভাকে বিকশিত করার সর্বাঙ্গীন সুযোগ থাকে এবং এই কারণেই কারেমী স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের আদর্শকে নিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয় না।

কিন্তু আমাদের দেশে ফ্রী ল্যান্সারদের সমান দেওয়া হয় না। নিরাপত্তাও সম্পূর্ণ বিহীন। ন্যূনপক্ষে সরকারী দপ্তর অহুমোচিত পরিচয় পত্রও ফ্রী ল্যান্সারদের দেওয়া হয় না। কলে প্রতি পদক্ষেপে তাঁদের প্রতি-কূলতার মুখোমুখি হতে হয়। উদাহরণ পরশবিহার নারায়ী-বটনার

সময় জনৈক ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিককে পুলিশ উদ্দেশ্য প্ররোচিত ভাবে আটকে রেখে দেয়। পরে অবশ্য অস্তিত্বের অহুমোচিত তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ওটা করতে বাধ্য হয় নেহাতই চাপ খুঁটি করার জন্য। অর্থাৎ এই ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিকদের কোন আইনসিদ্ধ অধিকার নেই। নিরপেক্ষতা ও ভ্রাসুর নীতিতে বিশ্বাসী ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিকদের বলিষ্ঠ বক্তব্যকে পুঁজি করে বহু ভাবড় রাজনীতিবিদ অনেক সময় বিরোধীদের আক্রমণের সময় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

অবশ্য কাজ ফুরিয়ে গেলে ঐ সমস্ত সুযোগ সম্বাদীদের কাছে ফ্রী ল্যান্সাররা বুদ্ধিজীবী গোত্রভুক্ত বলে বিবেচিত নয়।

আর একটা বেদনাদায়ক ঘটনা হল কারেমী স্বার্থের পুঁজারী বৃহৎ সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিককূল, বাঁদের কাজ হল পুঁজিবাদের পক্ষে

স্বাধীন উকিলের কাজ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতে ফ্রী ল্যান্সারদের সঙ্গে চরম বিরোধী-স্বলভ আচরণ করে থাকেন। বলা, কিছুদিন আগে বৃহৎ সংবাদপত্র-গুলোর সাংবাদিকরা একজন ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিককে কলকাতার বিধানসভা ভবন থেকে প্রায় বাড়ি খাড়া দিয়ে বের করে দেন। তাঁর অপরাধ হয়েছিল যে, তিনি দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় সামান্য কিছুক্ষণের জন্য প্রবেশ করেন।

অতএব আত্মরক্ষা ও অধিকার অর্জনের জন্য তারা সংযত হয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছেন। আগে তাঁদের এক সম্মেলনে অহুমোচিত হয়, যেখানে সমস্ত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন ফ্রী ল্যান্স সাংবাদিক।

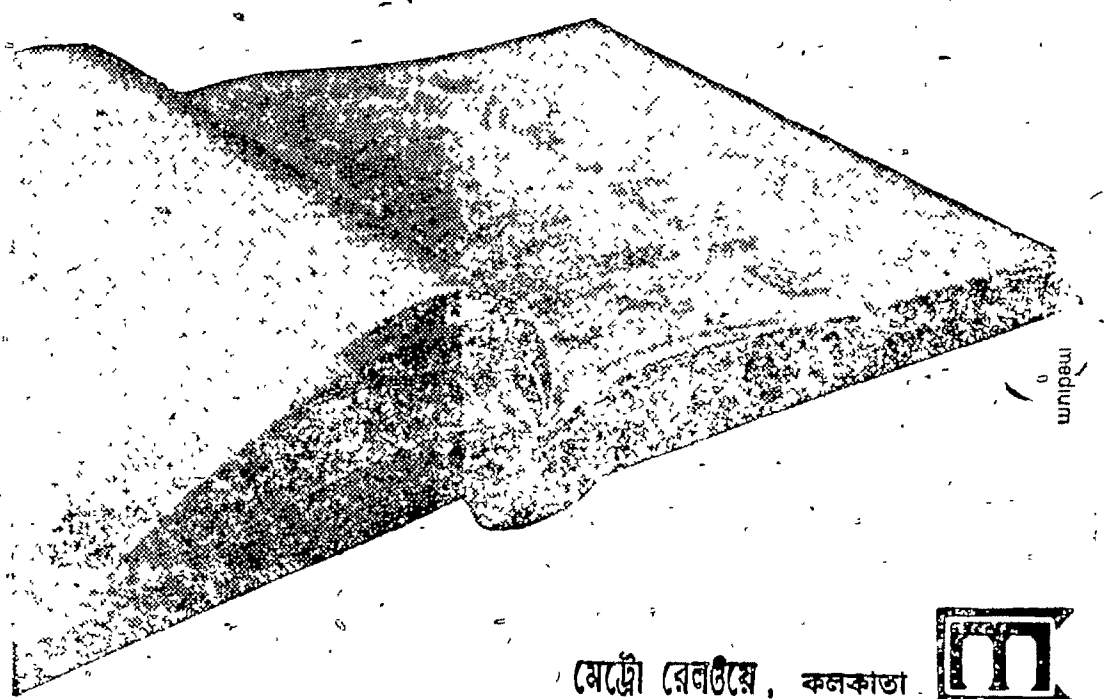
বই জানের সীমাকে প্রসারিত করে। অভিজ্ঞতার নিভীক, নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। আর, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যত উপলব্ধ হয়, তাকে সহজোক্ত মালন করে তোলে।

বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে অন্তর্গত করার যে সেতুবন্ধ, যার আর এক নাম যোগাযোগ, তার একান্ত প্রেরণার উৎস বই।

বই-এর প্রভাবে বিপুল এই পৃথিবীর সীমারেখা সংকুচিত হয়ে ওঠে। অপরিচয় সৌহার্দে পরিণত হয়। সর্বত্র সব কিছুই তখন মনে হয় পরিচিত। এমনি করেই তো অন্তর্গত সেতুবন্ধ রচিত হয়। হৃদয়ে হৃদয় যোগ হয়।

এ আমাদের উপলব্ধ সত্য। এই সেতুবন্ধের, এই যোগাযোগের ব্যাপারী তো আমরাও। দূরকে নিকট করার। পরকে আপন করার।

অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ



মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা



'ক্রীম অব দি সোসাইটি' প্রসঙ্গে

শ্রীপতি নন্দী

ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। দেশী পুঞ্জির তুলনায় আর বিদেশী পুঞ্জির দালাল ভারতীয় পাতি-বুর্জোয়াদের বিশাল অংশটি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দমন্তরূপে অনা-চারে প্রধান সংগঠক। ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের পথে এরা যে শুধুই প্রতিবন্ধক হয়ে আছে এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে দেশের দুর্বলতম শ্রেণী-গুলির বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর নির্মম আক্রমণকে তীব্রতর করে তুলতে এরা সহায়ক হয়।

পাতিবুর্জোয়াদের মধ্যে যারা করিৎকরী তাদের কর্মশক্তি এমন প্রবল হয়ে থাকে যে, তারা অচিরে 'হাতি'-বুর্জোয়ার আস্তাবলে আপন আপন আস্তানা করে নেয়, হাতি-কুলের স্নেহছায়ায় প্রবল প্রতাপ মগ্ন হয়ে শাস্ত্রী হয়ে বসে, তাদের দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতি-বিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ইত্যাদি হয়, তাদের মাল বেচতে মেশিন কিনতে ছুনিয়া চষে বেড়ায়, তাদের রিজার্ভ ফোর্স গঠন করে—তাদের লড়ে বাঁচে, আবার তাদের খাটে শুয়ে সহমরণে যায়। একালের রণী পরকালের সাথী—এমন বন্ধু আর কে আছে!

প্রকারভেদে ও গুণ বৈচিত্র্যে এরাই বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। 'নীলরক্ত'র নীলমণিরা আপনায় রূপে আপনি মুক্ত। নিজেরাই নিজেদের 'ক্রীম অব দি সোসাইটি' বলে অভিনন্দন করে, আত্মবন্দনা করে। আত্মমূল্যায়নে এরূপ অক্ষমতা অবশ্যই অজ্ঞতার নামান্তর। কিন্তু যুগের জীবনে মূর্ততা সর্বদাই হুংবের কারণ হয়ে ওঠে না, অন্ততঃ আত্ম-প্রসাদ লাভের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে না; বরং আত্মগানি ধামাচাপা দিতে ধামার কাজ করে, আত্ম-বিলোপের সম্ভাবনাকে না দেখতে পাবার সোয়াস্তি দিতে পারে। অতএব, নকল 'ক্রীম'-রা বেজার খুশি। কিন্তু কীপপ্রাণ সমস্ত বস্তুর কীপজীবী হয়ে থাকে, এবং ভারতীয় পাতিবুর্জোয়া করিৎকরীরাও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

এ পাতিবুর্জোয়া অবক্ষয় রোধের কোন সহজপন্থা নেই। আধা সামন্ত-তান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার আওতার গড়ে ওঠা পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাণশক্তি যেমন কীপ হয়ে থাকে, ভারতীয় পাতি-বুর্জোয়াদেরও তেমনটি হয়েছে। কারণ জাতীয় বুর্জোয়ার সার্বভৌম

ব্যবস্থাবীনে গড়ে-ওঠা, পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর যে সামাজিক ক্ষমিকা ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণশক্তি থাকে, 'উপ-নিবেশিক কিংবা আধা-উপনিবেশিক ব্যবস্থার গজিরে-ওঠা পাতিবুর্জোয়ার সে ক্ষমিকা প্রাণশক্তি থাকতে পারে না। আর, সাম্রাজ্যবাদী নয়া-শোষণ ব্যবস্থা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সম্ভারণবাদের মনিকাকন শোষণ-ব্যবস্থার নাক মুখ-ও-জো-খাকা পাতি-বুর্জোয়া শক্তি শুধুই যে ক্ষয়িষ্ণু হয় এমন নয়, তা ছাড়াও দেশের জন-সমাজের দুর্বলতর অংশগুলির বিরুদ্ধে দেশী বিদেশী শোষণ শিবিরগুলির আক্রমণের কেন্দ্রগুলিকে এরাই প্রস্তুত করে।' এরূপ শোষণ ব্যবস্থার স্থিতিবস্থাকে বজায় রাখতে এ পাতি-বুর্জোয়ারা নানা কন্দী-কিকিরের ডালপালা ছড়িয়ে ছোটা বড় অসংখ্য শোষণচক্র ও প্রচার বস্ত্র গড়ে তোলে, কীভাবে প্রসেস করে জনসমাজে প্রতিক্রিয়ার বিকার ছড়ায়, নানা জটিল সামাজিক বন্ধন আর নৈতিক ব্যস্তিচারে জনজীবনে সংস্কৃতির ও জীবিকার মানকে দুর্বল করে এবং সমস্ত রকমের সুবিধাবাদ, অবলাদ ও ক্রীততাকে আগুদানী করে যত সব নীতিহীন 'রাজনীতি' চর্চা করে।

অতএব, বণন সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা বৈরাচারকে বায়ে বায়ে সুযোগ করে দেয়, বায়ে বায়ে বৈরা-চারীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়, তখনও এ ক্রীমদের মধ্যে যারা বামপন্থী তারা এ ঘটনার কারণ জানে না, তখনও তারা আধা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সর্বনাশা প্রভাব ও ভূমিকাকে নজরে নেয় না। অবশ্যই তারা সংসদীয় মেকী লড়াইয়ের উপযোগী কোন অব-জেকটিভ কণ্ঠশব্দকে (!) প্রত্যক্ষ করে থাকবে। আসলে সমাজ বিপ্লব বাস্তব 'অবজেকটিভ' নয়, বিপ্লবের 'অবজেকটিভ কণ্ঠশব্দ'-কে তারা দেখতে পাবে কেন? আসলে Scab-রা Scabies. Scab আর Scabies এর অভিন্ন সংসারে বিচ্ছেদ ঘটাবে কে? 'গণতন্ত্রী' মন্ট্রুলের উদ্ভাপবিহীন জীবনে নির্মম হাঙ্গ-কামার বান রোধ করবে কে?

রুশ-মার্কিনের ডব্লু-এজেন্ট ভারতের বুর্জোয়া দলগুলি আর মস্কোর 'লয়েন্স এজেন্ট' পাতিবুর্জোয়া বামপন্থীরা এক অভিন্ন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন দায় পালন করছে; ভিন্নমুখী দায়, অভিন্ন অবজেকটিভ—শাস্ত্রীয় বিভাগ সিম্প্যাথেটিক-প্যারাসিম্প্যাথেটিকের মত। পুঞ্জির স্বার্থে

স্বার্থে বৈধেছে সংঘাত, অতএব দালালে দালালে বেঁধেছে লড়াই। দালালদের কেউ বা শাসক কেউ বা 'বিরোধী'। বেজম্মা অর্থনীতির মরণদশার উদ্ভিন্ন নার্সরা সকলেই দাঁড়াই খুঁজতে বতটা ব্যস্ত, দেশের প্রমিক-কৃষককে নিজ নিজ জাবে টানতে ততটা উৎসাহী; সুতরাং আরো ঘন ঘন নির্বাচন, অর্থাৎ স্থায়ী বেকারগণ আর মজুর দাঁপের বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থাটাকে সংসদীয় উপায়ে বায়ে বায়ে তেল-পালিশ করে রাখতে না পারলে যে সবই যায়।

অপকর্মে সাঙাতির অভাব হয় না; বচাহ-বুঁদে আমলা, অর্থশিক্ষিত শিক্ষক, গ্রেস-ভূষণ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, অপোগণ্ড এ্যাডভোকেট, বিষয়-না-জানা লেখক, ধামাধরা বিচারক, তালকানা সাংবাদিক, গণ-মুখ্য সংবাদপত্র-সম্পাদক—এরা ও সকলেই সহযোগী—ক্রীম-ভাগ্যের খাজনা গুণতে এদেরও সমস্ত মূল্য-বোধ-নিঃশেষ। মালিকী-রাজ্যের এ সমস্ত হেস্পেক্টেবল ভ্যাসালগণ (Vassals) বাস্তব আরো আঁছেন যাদের কেউ বা বিপ্লবী থিয়েটার বায়োপ্লেক করেন—হাওয়া বুঝে পাল তোলেন—মুনাফার কাঁঠাল ভাজতে হাজারো মাথা হাতে-নাতে পেয়ে যান; ক্রীম কুল এ 'সাংস্কৃতিক আপরাইজ'কে উপভোগ করেন, তারিফ করেন, পরকণ্ঠেই 'আত্ম-হিতায় বংশহিতায়' কন্দী কিকিরের পক্ষপূর্ণ নাক মুখ ও-জো-দেন। এদের সকলেরই আক্ষেপ: অবজেক্টিভ কণ্ঠশব্দ 'মেচিওর' করছে না ('রাখালী লো রাখালী, কতই না খেল দেখালি!') তবে এটা ঠিক, যে বতই গভীর জলের 'কিশ' হয়ে থাকেন না কেন, বাস্তবের খাড়া থেকে কারো বাড় বাঁচবে না, ইতি-হাসের খাড়াটি জলে হলে সমান দাঁপটে পাক যায়।

শিক্ষা-সংস্কৃতি কথা

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়টি অবশ্যই আত্মাভিমানী স্বার্থ সচেতন সুবিধাভোগী, পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিশালী ও সংগঠিত অংশগুলি—দেশীবিদেশী পুঞ্জির মকার পথে যারা রসদ কুড়ায়, বৈচে-বর্তে থাকার স্বপ্ন দেখে, নানা উপায় উদ্ভাবন করে—এককথায় চুইয়ে পড়া এক ফোটা রসের আশার জীবনের বহু কিছু মূল্য-বোধকে গুণে গুণে বিসর্জন দেয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ও রাষ্ট্র ব্যব-স্থার এদের বিপুল সংগঠন শক্তির প্রভাব বীভতিমত বিষয়কর। প্রচলিত

ব্যবস্থাগুলিকে সচল রাখতে যেরূপ 'শিক্ষা সাংস্কৃতিক' নেতৃত্ব এরা দিয়ে থাকে, তার মূল্যায়ন থেকেই এরূপ ক্রীম-অভিমান বয়্য নিচ্ছে। বলা-বাহুল্য এরা সকলেই 'শিক্ষিত', 'উচ্চশিক্ষিত'।

তবে, উচ্চশিক্ষিত শুনে কি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত এ শ্রেণীটি জাগে অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ে আদৌ উচ্চশিক্ষিত নয় এ উদ্ভ্রমটিও প্রত্যাশা করা যায়। যামতে-হয়, কলা বিভাগে গোটা তিনেক সহ বিজ্ঞান বিভাগে আরো গোটা বিষয়ে মোটা-মুটি প্রভা-গ্রাহ বিভা না থাকলে কাউকে উচ্চশিক্ষিত বলতে অসুবিধা আছে। 'ভারতীয় ক্রীম' সমাজে প্রকৃত শিক্ষিত প্রায় নাস্তি। তবে প্রকৃত ছবিটা আরো কত চমৎকার হতে পারে তা একটু দেখা যাক। চুটকী বিভাগ চটকদারী বিশেষ-বিশেষ গাঁথা যে শিক্ষা অভিমানের জন্মে এ 'ক্রীম'-দের দাবী সে শিক্ষা ব্যবস্থাটাই বা কেমন?

ভয়েট একটু পল্লীকার কথা-টাই ধরা যাক। তামাশাটি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। ব্যাপারটি যেমন নির্ভেজাল কুটকৌশলে ও কল-কাঠিতে সাজানো তেমনি বিচিত্র রহস্যে ঢাকা। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিষয়টির গভীরে আর না গিয়েও একথা বলা যায়, অনাচারীদের আচরণবিধি কোন সুরল সুর মানে না; অপকর্মের বীকাপথ ছাড়া অন্য পথে তারা চলতে অক্ষম। অতএব, সুবিধাভোগী ও সুযোগ সন্ধানী সমাজের বিশেষ উপায়মন্ত্র বলে জয়েট একটু পল্লীকার মাধ্যমে বংশোদ্ভূতমিক মৌরসী পাটির ব্যবস্থা কার্যম হইছে। খালটি কাটা হয়েছে যাতে কুমীর শিতরা অনা-রাসে ঢুকে পড়তে পারে। বলা-বাহুল্য, খালের মুখে বড় কুমীরেরা; অতএব কুমীর শিত ছাড়া অন্যদের প্রবেশে সহস্র বাধা, এটাই স্বাভাবিক। যা বতী স্ব ভাস্করী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের ব্যাপারটি মোটামুটি এরূপ। যারা যে কোন কিছু অক্লেশে নিজেদের ভোগে লাগাতে পারে তেমন কর্ম-যোগীরাই উপরোক্ত কুমীর শিতদের পিতা-পিতৃব্য। অতঃপর চার-পাঁচ বছরের প্রতীকার শেষে অনারাদে ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ। 'হোম সেক্টরে' 'হোম-পাওয়ার'-এর মজলিশী সম্পর্কে যারা ওয়াকিবখাল, তারা বিষয়টির কার্যকারিতা সহজেই বুঝতে পারবেন। এ পথে যদি সব-টুকু না হয়, তাহলে ঢালাও 'গ্রেস-মার্ক' ব্যবস্থা এবং তাতেও না হুলোলে 'দারিমেন্টারী' পরীক্ষা ও দ্বিতীয় দফার গ্রেসমার্ক। এ

হলো শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বশেষ অবস্থার একটা দিক।

শিক্ষা-সংস্কৃতির আগ্রহ বাস্তব লোপ পেয়েছে কিংবা আদৌ গড়ে ওঠেনি, 'শিখে পাশ' আর 'না-শিখে-পাশ' এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিচারে, তাদের আগ্রহ থাকেনা। অবিভা ডিগ্রি উপায়ে পথে অন্তরায় না হয় তেমন 'ফুল-ফ্রফ', ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাদের ক্ষুড়ি নেই। এরূপ একটা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ঢালাও চিটিংবাজী, হোম সেক্টর আর গ্রেস-মার্কের ব্যবস্থা চালু হইছে, অসাধারণ 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করেছে—তা যেমন সত্য সত্যী ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার ক্ষেত্রে তেমনই আইন পরীক্ষা সহ তাবৎ সাধারণ বিষয়ে। 'দারিমেন্টারী' মহলগুলির গরমটা একাধিক কারণে এর পেছনে মদ্য যোগাচ্ছে। উদ্ভ্রম অবশ্যই 'গঠন-মূলক'—অর্থাৎ আপন আপন 'তথ্য' ই তাউন্স' আগলানো এবং প্রতিযোগিতার কাঁটাপথ থেকে আপন আপন সন্তানসন্ততিদের নিরাপদ দূরত্ব রাখা।

স্পষ্টতঃ, ব্যবস্থাপ্রণে বহু ভাগ্যবান গাথা 'হর্গ' পাওয়ার'-এর অধিকারী হতে পারে, কিন্তু হরিদ মজুরুল এ শিক্ষা ইন্সটিটিউট কুমীরেরা বোম্বার অবস্থিত থেকে যায়। অন্তর যেমন এ শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমন, সংবিধানের দেয়া 'শিক্ষার অধিকার' কোন অগতির গতি নয়; স্রেফ অর্থনৈতিক জ্ঞাতপাতের বিচারে শিক্ষাজগতে প্রবেশের অধিকারটা জীবন্ত অথবা মৃত অর্থাৎ কারো বেলার কামধেনু কারো বেলার বহুয়া খেল। সংবিধানের ছত্রছায়াতে অক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাটা অর্থনৈতিক অব-স্থানের মাপকাঠিতে শিক্ষাজগতের সমস্ত সুযোগগুলিকে সামাজিক সুবিধাভোগের সমান্তরাল করে ধরে রেখেছে যাতে সামাজিক সুবিধা-ভোগের প্রিং বোর্ড থেকে অনারাসে এবং প্রায়-বিনা প্রতিযোগিতার উচ্চশিক্ষার সংরক্ষিত ভগতে লাগিয়ে যাওয়া যায়। অথ ক্রীম ভাগ্য!

আপনার ছেলের হস্তরেখায় 'উচ্চশিক্ষার বৈলেত যাত্রা' আছে, সংবিধানেরও তার সে 'অধিকার' স্বীকৃত; কিন্তু অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ রয়েছে যা সংবিধানের চাইতেও প্রবল। বিলেত যাত্রা বাধ দিন, নিধেনপক্ষে তার জন্ত ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সংস্থান-সম্মান করতে আপনাকে তলার তলার যে পরিমাণ অর্থ অপকর্ম করতে হবে সে হিসাব করুন, শ্রেণী-গত অধিকার তেদের ছক্টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। খুঁটে-কুড়ানী ছেছে শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

গ্রন্থ পরিচয়

শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য

Saratchandra Chatterjee : His life and literature by Narayan Chaudhuri.

Published by India Publishing Agency 89, Mahatma Gandhi Road, Cal 7.

Price : Rs. fifteen only.

কথাটা স্বীকার হয় নেই। তাহলে যে, আবির্ভাবমাত্র শরৎচন্দ্রের অদম্য জনপ্রিয়তা পণ্ডিত সমালোচকগণের সন্মুখের চোখে নিয়েছিলেন-এই বিষয়কে নির্ভর করে যে, জনপ্রিয়তা সত্তা জিনিস, এতে করে রচনার গুণগত উৎকর্ষ প্রমাণ

করে না। এই খণ্ডের পৃষ্ঠা করার পিছনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যেহেতু স্বয়ং কবিকেই জনগণসম্বন্ধে আদ্য করত দীর্ঘ সময় লেগেছে।

এটাও স্বীকার করতে হবে আমাদের দেশে অধ্যাপক-সমালোচকগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার

খাতিরে রবীন্দ্রনাথকেই আশ্রয় করেন। ফলে এই 'রবীন্দ্রিক' সমালোচকবর্গ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে স্ট্যাণ্ডার্ড হিসেবে ধারণ করে শরৎচন্দ্রকে নির্দিষ্ট দ্বিতীয় কী তৃতীয় শ্রেণীর লেখক বলে সত্যসমিতিতে প্রকাশ্যে কবুল করতে বাধ্য পান না। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেকালে এবং একালেও রবীন্দ্র পক্ষ এবং শরৎ পক্ষ অকারণ রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের উপর স্থিতির করে না। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝা দরকার একজনকে বড় আরেকজনকে ছোট করে আখ্যেই কার্যই কোনো লাভ হয় না। এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যেখানে স্বমহিমার দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে শরৎচন্দ্র নেই, আবার শরৎচন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে নেই। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এত বিশাল যে, সেখানে কেউ কারও জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন না। রবীন্দ্র-ভক্তি চূড়ান্ত করতে শরৎ-বিদ্বেষী হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেমন শরৎ প্রেমিক হতে গেলে রবীন্দ্রবিদ্বেষী হবার মানে নেই।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে সরকারী উচ্চপদের কৃপণতা সত্ত্বেও বিগত শরৎ জন্মশতবার্ষিকীতে বেসরকারী সভা-সমিতি, আলোচনাচক্র এবং নানা ধরনের আলোচনা-গ্রন্থ কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে রবীন্দ্রনাথসম্বন্ধী তথ্যকথিত সমালোচকবর্গ এতদিনের শরৎ-বিদ্বেষের সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে না-পেরে এক রকম দায়সার তরল রচনা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রবীণ নারায়ণ চৌধুরীই শতবর্ষ উপলক্ষে নতুন করে শরৎ-মূল্যায়ন করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। শরৎ-সম্পর্কিত তাঁর বাংলা গ্রন্থটি অতি ক্রম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা অবাঙালী ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের জন্য রচিত। বাঙালী পাঠক নারায়ণ-বাবুর বাংলা গ্রন্থে সাহিত্যিকের নবমূল্যায়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। ইংরেজি গ্রন্থটি তাঁর মূল বাংলা গ্রন্থটিকেই আদর্শ করে লেখা। অবাঙালী পাঠক এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তথ্য-কথিত গতানুগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে শরৎচন্দ্রকে নতুন করে আবিষ্কারের আনন্দ পাবেন বলে আমি নিশ্চিত। উপযুক্ত বিজ্ঞাপন ও প্রচারের অভাবে গ্রন্থটি প্রায় অজানা রয়ে গেছে। প্রকাশক এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে সর্বভারতে এই গ্রন্থের প্রচার তথা লেখকের মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

ওপার বাংলার একটি উপন্যাস

আলফ্রা মেরীল : মূর্তজা বশীর।

প্রকাশক : দোলনা প্রকাশনী, বুক সোলাইটি ভবন, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম দাম : তেরো টাকা।

লেখক পরিচয় দিয়েই শুরু করা যাক। মূর্তজা বশীর বনামধন্য ভাবাবিধ উত্তর শহীদজাহের ছেলে। একুশ বছর বয়সে ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করে পরের বছর কলকাতার আসেন। আন্তর্জাতিক মিউজিয়ামে আর্ট অ্যান্ড-সিয়েশন পড়তে। বশীর বরাবর রোমান্টিক, অস্থির, নিঃসঙ্গ, স্থিতিশীল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

এবার উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। সেখানেও দেখা যায় উপন্যাসের নায়ক রেজা শিল্পী। বাঙলা দেশ থেকে কলকাতার আন্তর্জাতিক মিউজিয়ামে পড়তে এসেছেন। শিল্প অভিজ্ঞতার বাইরে নায়কের যে চিত্র পাই সেখানে দেখি তিনি পার্শ্বদর্শী অকলে গ্যারাজের ওপর ছোট ঘরে থাকেন এবং পেরিং-গেট হিসেবে খাবার ব্যবস্থা করেছেন সেই এলাকারই এক বাঙালী ক্রিস্টিান পরিবারে। সেই পরিবারেই ছোট মেয়ে মিতা। পরিণামে বনিহিতা, প্রেম। কিন্তু 'শিল্পীস্বভাবের আত্ম-মগ্নতার কারণেই রেজার পক্ষে মিতার অন্তর্নিহিত প্রেমকে বোঝা সব সময় লজ্জসাধ্য হয়নি। শিল্পীসত্তার অহম্বোধই এই প্রেম প্রোটোনিকের উপরে উঠতে পারেনি। ফলে প্রেমের দৈহিকতা এখানে অহ-পস্থিত। রেজা সম্ভবত মিতার মধ্যে তার প্রেরণার উৎসই খুঁজেছিল। দেহাতীত ইনস্টেটিক এ-প্রেম মিতার মতো মেয়ের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মিতা বুকেছিল রেজার কাছে তার রক্তমাংসের অস্তিত্ব নেই। স্বতরাং বিবাহ-রূপ দায়িত্বে মিতা আসতে পারে না। নারীর বাস্তব বুদ্ধিতেই সে বুঝতে পারে যেরো আটপোরে সংসার শিল্পী রেজা বেশি দিন সহ করতে পারবে না। এবং পরিণামে তার শিল্পীপ্রতিভাও বিনষ্ট হবে। সমূহ বিচার করে মিতা তাকে গ্রহণ করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে তাদের হারানো প্রেমই উত্তরকালে শিল্পী রেজার স্থিতিশীল-

তাকে বর্ধিত করবে। মিতা বিবেচনা করবে তাদের বাড়ির আরেকজন শ্রেয়িংপেন্ট চিন্তকে, যে তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। এই প্রোটোনিক প্রেম পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতাকে' মনে করিয়ে দেয়। কিংবা সৈয়দ মুজতবা 'শবনম'-কে।

এই উপন্যাসের মন্ত গুণ এটি কাব্যিক ভাষা, শিল্পজেনোচিত উপমায় তৈরি করবার কুমত। দ্বিতীয় নায়ক শিল্পী হলেনও সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সচেতন, একদা বিপ্লবের স্বপ্নও ঘাখে। তার স্বদেশ প্রেমিক জেলে বন্দী দাঁড়ায় তবু তার পৌরবোধও মিথ্যা নয়।

বশীর বয়সে তরুণ, প্রেমের অভিজ্ঞতাও তরুণ। অথচ এই অমল তারুণ্যই এই উপন্যাসকে গতিশীল ও তাজা করেছে।

বলা বাহুল্য উপন্যাসের প্রাচুর্য লেখকের চিত্রকর্ম গ্রন্থের অতিরিক্ত আকর্ষণ।

মিহির আচার্য

সম্পাদকের ওকালতি

যে পৃষ্ঠার পর তারিফ করতেই হবে তাঁরা তাঁদের মুখোজ্জস্বকারী পত্রিকা "নিউ দিল্লীর" সম্পাদকের পদের জন্য এমন একটি চৌকস লোক যোগাড় করেছেন। আফ্রিকার লোকজন বলে : "তোমরা কি ?"

আনন্দবাজার কোম্পানীর না হয় লজ্জাস্বর নেই, কিন্তু অল ইণ্ডিয়ান রেডিও-খোদ ভারত সরকারের আকাশবাণী কি করে সাউথ আফ্রিকার কুস্তাজ বিরোধী সাদাচামড়াদের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষে প্রচারে যোগ দিল। জবাব তজব করা বিশেষ দরকার : কি করে এটা সম্ভব হোল? কারা দায়ী? এবং তাদের কি শাস্তি হয়েছে বা হবে?

স্তালিন রচনার বাংলা অনুবাদ

স্তালিন রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭।

দাম : দুই টাকা।

অদর্শন রায়চৌধুরীর সম্পাদনার এই খণ্ডটিতে স্তালিনের ১৯৩৪-৩৭ সালের মূল্যবান লেখাগুলি আছে। এই সময়কালটি স্তালিনের ভাষায় প্রধানত 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা' পর্ব। এ সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ সংবিধানটি রচনা করা হয়।

আঠাশ সাল থেকে প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন গড়ে উঠেছে এক বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও যৌথীকৃত কৃষিব্যবস্থা 'সভ্যত্ব' ও 'কল্যাণ' অর্থাৎ সোভিয়েত ঋষার ব্যবস্থা ও 'যৌথ ঋষার'।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজেও দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণী দ্বন্দ্ব থাকে। লেনিনের ভাষায় 'কমতা-থেকে উৎপাত হওয়ার পর বুর্জোয়াধের প্রতিরোধ কমতা দশগুণ বেড়ে যায়।' তাই স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐ অদ্বুতপূর্ব সমাজ-সৌখ গড়ার কাজেও বিপ্লবের শক্তরা ষড়-যন্ত্রের জাল বুনেছে। প্রতিবিপ্লবীরা তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। এরই পরিপন্থিতে ১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর লেনিনগ্রাদে স্ট্রোলনিত বলাশেভিক কমরেড ক্রিস্তকে হত্যা করা হয়।

'ইউ, এস, এস, আর এর সোভিয়েত সমূহের বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে উপস্থাপিত স্তালিনের প্রতিবেদনে' (পৃ-১১৭-১২২) উপরোক্ত দিকগুলি ভালোই বোঝা যাবে। 'পার্টির কাজের জটিলমূহ এবং ট্রেডুপহী ও অজ্ঞাত বৈতচারীদের নিমূল করার ব্যবস্থাবলী' (পৃ-১২২) অবশ্যই

পড়া দরকার।

আলোচ্য খণ্ডে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক এইচ জি, ওয়েলসের সঙ্গে কমরেড স্তালিনের এক চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকার আছে। কটর আত্মবিশ্বাসী ওয়েলসের মুক্তিগলোকে স্তালিন অমরব্যয় দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলো তথ্যকে দাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন।

স্তালিন বলছেন, 'দেখুন মিঃ ওয়েলস, আপনি স্পষ্টতই এই ধারণা থেকে এগুচ্ছেন যে সব মাস্তুলই ভাল; আরি কিন্তু তুলি না যে অনেক বহুমায়েদ লোক আছে। আমি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভালোই বিশ্বাসী নই' (পৃ-৩৩-৩৪)।

হিংসার প্রয়োগ নিয়ে বর্তমানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বহু মত রয়েছে। স্তালিন কিন্তু ওয়েলসকে বলেছেন 'কমিউনিস্টরা দেখে যে পুর্নানো ব্যবস্থাটি নিজেকে সহিংস পথেই রক্ষা করছে আর সেই জন্যই কমিউনিস্টরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে : হিংসার জবাব হিংসার দ্বাও। একটি সমাজব্যবস্থা দিয়ে অন্য সমাজ ব্যবস্থার অপসারণকে কমিউনিস্টরা নিছক একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে না, গণ্য করে একটি জটিল, দীর্ঘ ও সহিংস প্রক্রিয়া হিসেবে। কমিউনিস্টরা ঘটনাকে তাক্সিল্য করে না।' (পৃ ৩৬) বামপন্থী কর্মীদের নিঃসন্দেহে এ বইটি পড়া দরকার। এ খণ্ডটির অনুবাদ করে নবজাতক প্রকাশন ভালো কাজ করেছেন। অনুবাদ ভালোই হয়েছে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থ পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। পুরাজীব বিজ্ঞা / ডঃ শুভেন্দুসুন্দর বস্তু / ১৯.০০

২। আধুনিক প্রান্তরবিজ্ঞা / ডঃ অনিরুদ্ধ দে / ১২.০০

৩এ, রাজা স্ববোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা-১৩

ক্রীম অব দি সোসাইটি

৭ম পৃষ্ঠার পর

নিতাইয়েরও অল্পরূপ হস্তরেখা আর প্রজাতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে—একই করণ বিজ্ঞপের এপিঠ ওপিঠ হয়ে। সংবিধানের বিধান কাগজপত্র বা দেয়, সমাজব্যবস্থার জোরে হাতে-কলমে তাই কেড়ে নেয়। এক্ষেত্রেও 'ক্রীম' সমাজ আত্মসিক্তির কামনার সংবিধান সাধক কাপালিক।

অতঃপর সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রসঙ্গ। যাদের আদর্শহীন জীবনে অর্থো-পার্জন ক্ষমতালিঙ্গা আর বংশকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই কাম্য নয়, ছাত্র-চাত্রী জীবনের অপরাধবোধ তাদের মনে আতঙ্ক জাগাতে পারে; তারা অপার্থিব শক্তির কাছে আশ্রয় খোঁজে—তীর্থে তীর্থে পূজা দেয়, বস্তার পর বস্তা সেখানে করজোড়ে খাড়া হয়ে থাকে—পাপাচার ও 'পুণ্যাচার'-এর এহেন অপূর্ব সমন্বয় ঘটলে পাপ-পুণ্যের যোগবিরোধ করে। আবার এ ভয়ানক অবস্থাটা এদের ধর্মপ্রাণ ভাব-যুক্তির প্রধাম উপাদান। শুধুমাত্র শ্রীমতী ইন্দিরার জীবনে এ বস্তু ঘটেছে এমন নয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে এদেশীয় প্রায় সমস্ত ভাগ্যবানদের জীবনে এ ছায়া পড়েছে; রামকৃষ্ণ-সাইবাবা-তারকনাথ-সত্যবী মায়ের বাজার উত্তরোত্তর আরো জমে উঠেছে, এখন প্রায় তুলে। জ্ঞানধর্মশিক্ষা-সংস্কৃতির জ্ঞান উপরোক্ত বহুদুর্ভাগ্যের মড়াকারা যে শোনে শুধু, কিন্তু দেশ-আনন্দ-

স্বাধীনতা সংগ্রামী

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

শনারের হস্তক্ষেপে তাঁর বাড়িতে পুলিশ পোষ্টি হয়। কিন্তু মধুচক্রের সহস্র কিছু স্থানীয় গুহরটি ও মারো-ফাড়ী কালোবাজারী অর্থ ব্যয়ে মুচিপাড়া থানাকে অচিরে অকল্যাণ করে ফেলে।

অতএব আলম স্বাধীনতা চলে থাকে। চুই তাঁর ফুটবলার মধুচক্রের কাঁধে পা দিয়েছে। কেউ কেউ সর্ববাস্তব হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। আর এদিকে স্বদেশবাসী শীতলবাবুকে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেগুনী বেশ ভাল-ভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি নতুন কিছু বদমায়েদের আড্ডা হয়েছে এই বাড়িতে। তারা সি পি এমের নাম ভাঙিয়ে শীতলবাবুর ওপর অত্যাচার চরমে তুলেছে। গত ২০শে এপ্রিল তাঁর পুত্র স্বদেশবাসীর লোকজনের হাতে সিপৃহীত হয়। অসহায় স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশীতল-চন্দ্র চ্যাটার্জী এইসব ঘটনার প্রতিশোধবাদের মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাজারের পাতার পাতার, কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশনীগুলিতে কিংবা 'বারবধু-রাধো লাক্স-খুন-লুট'-এর মতো মতো অশাস্ত্রিত বহু সংস্কৃতির মতোই কৃষ্টিহীন সংস্কৃতিবোধ কোন পশুপক্ষীরও কাছে লাগে না। তাদের খণ্ডিত মনোভাব তারা জল খায়, কেলি করে। তারা অনাচার-অশাস্ত্রিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, প্রাচ্য-চারকে আরো ছড়িয়ে দিতে সংস্কৃতি-অশাস্ত্রিতির বিচারবোধকে ঘোলাটে আর অকল্যাণ করে রাখতে অক্লান্ত চেষ্টা করে। তারা অবশেষের মাঝে বাঁচতে চায়, প্রাণতরে পেটভরে, নিজ নিজ স্বাধীনতার প্রয়োজন মেটাতে তারা ছটফট করে বেড়াবে এতে আশ্চর্যের কি আছে? আবার 'ট্যাগার্ড অব লিজি'-এর মতো-আপ রাখতে এদের একাংশ নানারূপ মনোহীন মূল্যহীন 'লাইফ-টাইল' 'আবিষ্কার করবে,' আচার অহুতান অহুতরণ করে জীবন কাটাবে এটাও ঠিক; এমন কি সত্যহীন জীবনের অভাববোধ ঘূচাতে নানারূপ এলোপাথাড়ী চেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে ডজন ডজন 'প্রগ্রেসিভ' বিয়েটার-বায়োফোন দেখে বেড়াতে পারে। স্বভাবতই এদের 'নীতিবোধ' একটা খুল চালাকী বাজ। সাংস্কৃতিক নাট্যাংসবে কাকনগুণে এ নীতিহীন আদর্শহীনরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক, 'শিল্পরসিক'। বিষয়টি নিতান্তই বিদেশী প্রভাবের ফল নয়, এর সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে—অর্থ উপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থার বার খোঁজ পাওয়া যাবে। তবে অর্থনৈতিক-সামাজিক আর রাজ-নৈতিক উপরি কাঠামোর খাজে খাজে যে রূপ-লবী আর মার্কিনী-লবী গড়ে উঠেছে, উদ্ভূত জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এ হিমবাহগুলির অবদান এসব ক্ষেত্রে অহুলনীর; রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক, জন-সাধারণের শিক্ষার স্বীকার আচরণে কী বিকারভিত্তিতে ও মস্তিস্কভিত্তিতে কিম্বা ধরানো হিমেল প্রলেপ মাখিয়ে এরা সংস্কৃতি-অশাস্ত্রিতির বিচার-বোধকে যেমন অসাড় করে দিতে চাইছে, তেমনি ইতিহাসের জগাল-গুলিকে আশ্রয় করে সমাজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে পর্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কার্টারের নয়া 'অপারেশন ইরাণ'

আমেরিকার 'অপারেশন ইরাণ' ব্যর্থ হবার পর প্রেসিডেন্ট কার্টার আবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি যে আবার একটা কিছু করবেন এটা পরিষ্কার হয়ে বাবার পর বিশেষজ্ঞ মহলে খুব আলোচনা চলছে। প্রেসিডেন্টের পরবর্তী পর্ব কি আলোচনায় সে সম্পর্কে কিছু হুঁশিয়ারি মিলেছে। কার্টার বা বা ব্যবস্থা নিতে পারেন তার মধ্যে প্রথমটি হল, অর্থনৈতিক অবরোধ। লারা ইরাণের জল, তেল, ও আকাশ পথগুলি আগলে রেখে যাতে ইরাণী-দের ভাঙে মারার শিকার দেওয়া যায় সেজন্য দরকার হল ইরাণের যেকোনো রাশিয়ার সীমান্তে তাও

এবারের বাজেটে আরো দুর্গতি

৪ম পৃষ্ঠার পর

কেনাবেচা ও মজুত-মালের স্তরে প্রচুর অল্পপাতিত মূল্য আছে।

স্বতন্ত্র বড় বড় শিল্পপতি ও খামার মালিকদের বিবস্ত কোন সরকারই এই দাবীগুলি কার্যকরী না করে পারে না। বাজেট বজুতায় জনহরদী কথা বলতেই হয় কুরণ সাধারণ মানুষ কপে গেলে ভোটের কারবারে লোকসান হতে পারে। তাদের কিছু ছেলে ভুলানো মিষ্টি কথা শোনাতেই হয়। কিছু আশাসও দিতে হয়। বলতে হয় কারো হাতে তো বাজুও নেই। সরকারকে সময় দিতে হবে। সময় পেলে কিন্তু সরকার আরো সময় চাইবেন।

এবারকার বাজেটে বাটতি পুর-পের জন্মে বিরাট বোকা জনসাধারণের খাড়ে চাপানো হবে। চিনি, দেশলাই, বিড়ি, সিগারেট, মারার তেল ইতিমধ্যেই মাথোর সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী ও বোনাস এবং গরীব ক্ষেত-মজুরের আদল মজুরী এর ফলে আরো কমবে। কুড় কর ওয়ার্ক ও গ্রামোয়রমের খরচ কমানো হবে কারণ খামার-মালিকেরা বলছেন যে এই কর্মহুতীর কলে কৃষি কাজের জন্ম সত্তা মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে বেকারী না বাড়লে শহরের শিল্পপতিরা কি করে কারখানার সত্তা মজুর পাবেন? তাই বাজেটের কল্যাণশীল মালিক-দের দাবি পূরণ করতেই হবে। আর তার জন্মে আরো বিদেশী ঋণ চাইতে হবে। বিদেশী ঋণ চাওয়ার অর্থ বহু-জাতিক কর্পোরেশনগুলির হাতে দেশের অর্থনৈতিক সবুজি বন্ধক রাখতে হবে। বাটতি পুরণের নামে বিদেশী ঋণ আর বিদেশী ঋণ পরি-শোধের নামে আর্থিক বাটতি সৃষ্টি, এই পাপচক্র অব্যাহতভাবে চলতে

বন্ধ করা হবে। তারপর এতেও না কাজ হলে বিশেষ বিশেষ কটি জায়গায় বোমা বর্ষণ চলবে। এর পরেও যদি বন্দী মার্কিনীদের মুক্তি ইরাণ না দেয় তাহলে জোর করে তেলের খনি দখল করা হবে। কিন্তু

সতীশ চন্দ্রকে অপাসারণের চেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান সতীশ চন্দ্র যাতে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ আগামী বছরের গোড়ার দিকে শেষ না করে বেতে পারেন সেজন্য এখনই তাঁকে সরানোর চেষ্টা চলছে। উত্তর প্রদেশের কিছু তরুণ এম পি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শংকরানন্দর উপর খুব চাপ সৃষ্টি

থাকবে। গত তেত্রিশ বছরে যা হয়েছে এবারও তাই হবে। সাধারণ মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধারা বদলায়োর কোন উপায় নেই। এবং দুর্গতি থেকে মুক্ত হওয়ারও পথ নেই।

মার্কিন দেশটির ইউরোপীয় বহু দেশগুলি অর্থনৈতিক অবরোধে পীড়িত হয়ে রাজী হলেও বাকি দুটির হুকুম নিতে দায় দিতে নারাজ। পাছে এই জিম্মা পরি-কল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে যুক্ত বেবে যায় এবং এই অবস্থায় পেতে থাকে সোভিয়েত রাশিয়া এগিয়ে আসে।

করছেন। তাঁদের কথা হল, যখন ছিন্নান্তরে শ্রীমতী গান্ধী ওই পদে সতীশ চন্দ্রকে মনোনীত করেন তখন যে একশো জনের বেশী এম পি তাঁর জন্ম স্থপাশিত করেছিলেন তাঁরা অনেকেই সাতাত্তরে জনতা দলের জয়ের পরে শ্রীমতী গান্ধীকে পরিত্যাগ করে যান এবং শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে বিবাহ সমাজে নিন্দাবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ইন্দিরা মহলের এই উদ্যোগের নেপথ্যে অল্প উদ্বেগ কাজ করেছে বলে কিছু শিকাবিদ্ব মনে করেন। তাঁদের মহলের খবর হচ্ছে এই যে, শিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাম মনো-ভাবাপন্নদের কর্তৃত্ব খর্ব করাই এর আদল লক্ষ্য।



ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রিস্ট অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রিস্ট

(সমগ্র ইন্ডিয়ান একাউন্ট অফিস)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকের কাছে থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল্য করা টেন্ডার :

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ

রেকা: নং : ৪২ / ৪১০০ / ৮০ / ১৫২৪ তারিখ ১৬-৫-৮০

দামোদর নদী থেকে দামোদা (এন) কোলিয়ারীতে মিলেকটেড নিয়ার-লোলের ৩নং পিটে হাইড্রলিক শ্রাও টোয়িং-এর জন্য ১ (এক) বছর বালি সরবরাহের জন্য। এক বছর বালি সরবরাহের আনুমানিক পরিমাণ ৮০,০০০ কিউ. এম.।

অমৃতনগর কোলিয়ারীর অ্যাকাউন্টস অফিসার / কেমিস্ট্রারের কাছে ২৫০ টাকা (দুইশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) দিয়ে (অগ্রত্যাগপত্র) ১৮-৬-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে এজেন্টের অফিস, অমৃতনগর কোলিয়ারী, কুহুটোরিয়া এরিয়া থেকে কাজের বিস্তৃত বিবরণ ও চুক্তির শর্তাবলীসহ টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে। টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯-৬-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত এবং ১ দিন বেলা ৪টার টেন্ডার খোলা হবে।

সাধারণ : কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেন্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলিয়ারী ইন্ডারের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা নংসিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হল কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

চলচ্চিত্র নাটক

হিন্দি ছবি 'স্বয়ম্বর'

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃশ্রম-শোধের ব্যাপারটা শুনেই প্রথমে মনে আসে সেই রামায়ণী কথা—দশরথ রামচন্দ্রের প্রসঙ্গ। কিন্তু বি. নাপি রেজিডার নিবেদন এই স্বয়ম্বরের আবেদনটা একেবারেই হাস্যকর মনে হয়। প্রথম একটা হাস্যকর মনে হবে কি তা? বর্তমানে রহিম আদমি পিতা একদা যে ধনবানের সামান্য তৃত্য মাত্র ছিল এবং যার কপায় এত সম্পদ লাভ সম্ভব হয়েছে, তার মৃত্যুর পর তারই ছই কতকালের সঙ্গে নিজের ছই পুত্রের পরিণয়-পর্ব সাধন করে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে যে লাঞ্ছনা পেলে তারই বিধবা প্রভু-পত্নীর কাছে, দুটি লায়েক ছেলে সন্তান আর শশী তাতেই হঠাৎ লুপ্ত হলে অপমানিত পিতা ক্রীয়াস লাগে। কাছে শপথ করল, ঐ দুটি কন্যাকে তারা জয় করে এ বাড়িতেই পুত্রবধূ করে নিয়ে আসবে। এ হেন পিতৃশ্রম শোধের জন্ত সেই ছই ভাই ছই বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারণ করে যে লব উদ্ভট কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত দুটি মেয়েকেই বাড়িতে এনে হাজির করল—তাই নিয়েই ১৭ রিলের হিন্দি ছবিটি প্রমোদ বিতরণের অঙ্গীকার নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত। যদিও এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে ছবিটি

হাসির বদলে বিরক্তির সঞ্চারই করে বেশি, তবু পরিচালক পি. দামশিব রাও কিছু ফ্রেম রচনার মূল্যায়ন দেখিয়েছেন এবং একমাত্র অভিনেতা সঞ্জীবকুমারকে মাঝে মাঝে কিছুটা সহজ করা যায়। অবান্তর ছবিটির সংগীত পরিচালনার রাজেশ রোশন তবু কিছুটা লাঞ্ছনার স্বর তুলিয়েছেন। তবে ছবির নাম 'স্বয়ম্বর' না রেখে 'তরুণী বিজয়' রাখলেই বোধ করি সংগত হত বেশী।

স্বথের পায়রা

অপর্ণা গ্রুপ রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রযোজিত 'স্বথের পায়রা' নাটকটি গত ২৩শে মে কলামদিরে প্রিমতী

আই এন টি ইউ সি ও সুরত

১ম পৃষ্ঠার পর

বজায় রাখা মুশকিল হবে। তাই স্বতন্ত্রতাবুর সঙ্গে শিশিরবাবুর নানা ব্যাপার নিয়ে চলতে লাগল বিরোধ। শিশিরবাবুর সঙ্গে বিরোধের প্রথম পর্যায়ে স্বতন্ত্রতাবু অপর প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বিষ্ণু ব্যানার্জীর সমর্থন নিয়েছিলেন। শিশিরবাবুর বিরুদ্ধে বিষ্ণু ব্যানার্জীকে নিয়ে কমিটি দখলের ব্যাধারে তিনি আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। শিশিরবাবুর সঙ্গে স্বতন্ত্রতাবুর বিরোধ শেষ পর্যন্ত হাডাহাতিতে পর্যবসিত হয়।

এই অবস্থা বেশ কিছুদিন চলার পর স্বতন্ত্রতাবু বি পি এন টি ইউ সি-তে নিজের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের জন্ত দিল্লীতে দরবার করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ পি শর্মা আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি। শর্মাভীর সঙ্গে স্বতন্ত্রতাবুর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। অনেকে বলেন শর্মা যখন আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি নির্বাচিত হন তখন সম্মেলনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শর্মা পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করতে স্বতন্ত্রতাবু এবং তাঁর অঙ্গসামর্যী বিশিষ্ট সুমিকা সেন।

এই ঘটনার পর শর্মাভীর সঙ্গে

আলো দাশগুপ্ত রচিত উক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হল পরিমল সেনগুপ্তের নিপুণ নির্দেশমায়। গীত রচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। আলোক সম্পাত ও আবহ রচনার বথাক্রমে চিত্র সরকার ও অনিল ওঝা ও সম্প্রদায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কল্প নয়।

নাটকটি কোতুক রসালয়ী। কিছু কিছু নিচুয়েশনও রীতিমত কোতুকপ্রদ। কিন্তু নাটকটির নামকরণ নাট্যবস্তুর সঙ্গে ভেদন সামঞ্জস্য রাখা করেনি। স্বথের পায়রা বলতে আমরা বুঝি স্বথিমের-সাবী, দুর্দিনের কেউ নয়। এখানে কিন্তু একটি রাজা পার্টের নাম 'স্বথের পায়রা'—অন্ততঃ এর কোন অর্থবহ পরিস্থিতি নেই। তবে অপেশাদার এক সংস্থার এমন অভিনয় মূল্যায়ন কিছু সচ-রাচর দেখা যায় না। দরোজা ঘোষ, মনিময় রায়চৌধুরী, বুল্লা-সেনগুপ্তা ও সন্দীতা ব্যানার্জীর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বতন্ত্রতাবুর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শর্মাভীর এর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। ফলে বি পি এন টি ইউ সি-তে স্বতন্ত্রতাবুর প্রভাব প্রতিপত্তি বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এদিকে স্বতন্ত্রতাবুর একদা মিত্র বিষ্ণু ব্যানার্জীও তার খবরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে হাত মেলান।

শিশিরবাবু এবং বিষ্ণুবাবুর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়ায় স্বতন্ত্রতাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। শিশিরবাবু এবং বিষ্ণুবাবুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আনন্দগোপাল মুখার্জীকে দলে টেনে মেন স্বতন্ত্রতাবু। এরপর শর্মাভীর প্রভাবে বি পি এন টি ইউ সি কমিটি বাতিল করে আনন্দগোপাল মুখার্জীকে সভাপতি করে এবং স্বতন্ত্রতাবু মুখার্জীকে কার্যকরী সভাপতি করে নতুন কমিটি তৈরী করা হয়। নতুন কমিটি প্রায় পুরোটা স্বতন্ত্রতাবুর দখলে।

শিশিরবাবু এবং বিষ্ণুবাবু নতুন কমিটিকে একেবারেই ঘেমে নিতে রাজী নন। শিশিরবাবু পাণ্ডা বি পি এন টি ইউ সি-র কমিটি চালাচ্ছেন নিজের নামে। এবং দিল্লীতে দরবার করছেন যাতে স্বতন্ত্রতাবুকে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেওয়া যায়।

জীবনদায়ী ওষুধ

১ম পৃষ্ঠার পর

ওষুধ-শিল্পপতিরা ওদের পার্লামেন্টের এজেন্টদের দ্বারা সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য দেশগুলোতে তা রপ্তানি করলেন। আমেরিকাবাসীর পক্ষে যে ওষুধ সেবন করা বিপজ্জনক, ভারতবাসীর পক্ষে তা হয় 'লাইফ সেভিং ড্রাগ'। এ যেন যথাবিস্তার পরিবারের ছদ্মিম বাসী খিচুড়ি বা খরের ছেলে মেয়েকে দেওয়া যাবে না, কিন্তু তা কি চাকর খেলে কিছু হবে না। ওদের নাকি বাসী-পচা সব খাবার শক্তি আছে।

আমেরিকার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য, পররাষ্ট্র ও অর্থদপ্তর এই রপ্তানিতে বহুজাতিক ওষুধ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকে। শুধুমাত্র আমেরিকা গত কয় বছরে একশো কুড়ি কোটি ডলারের ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা না করে ভারতের মতো দেশে পাঠিয়েছে, যেগুলো মানব শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ষাট দশকে 'মেটরোনিডাজোল' এদেশের বাজারে প্রথম এলো। পরে দেখা দেখা গেল এ ওষুধ সেবনে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা আছে। নাকি যুক্তরাষ্ট্রে এ ওষুধের বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ায় তা সেখানকার দোকানে পাওয়া যায় না কিন্তু আজও এখানে বিক্রি হচ্ছে। এটিবেকটি-রিয়াল চিকিৎসার জন্ত তরলাকারে টেট্রাসাইক্লিন পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে এ ওষুধ দশ বছরের কম শিশুদের দিলে দেহের বৃদ্ধি থা-যত হয় না। আমেরিকার এটায়ও বিক্রি নিষিদ্ধ, কিন্তু মার্কিন সরকারের চোখের ডগায় টেট্রাসাইক্লিন তৈরী হয়, ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ-গুলোর তা রপ্তানিও করা হয়।

এরকম আরো কয়েকটা ওষুধের নাম করা যাক। স্বাস্থ্যোপেক্ষ ওষুধ থিয়ানিডাজোল সেবনে চর্মরোগ হতে পারে। পেটের অস্থিরতার প্রতিষেধক ইথামবুটোল অথবা ডায়োক্স নামে পরিচিত হাইড্রোক্সিজেনোলাইনস খেলে দৃষ্টিশক্তি ধারাপ হতে পারে। গাঁটে ব্যথার জন্ত ভারতের ডাক্তার-বাবুরা প্রেসক্রিপসনে অক্সিফেনবুটো-জোন লেখেন, কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপ মহাদেশে তা ব্যবহার হয় না, কারণ ওটা খেলে নাকি রক্ত তৈরীর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভেলসিকল কোম্পানীকে মার্কিন সরকার কনভেল ওষুধ মাত্র এক

বছরের জন্ত গবেষণার কাজে ব্যবহারের অসুবিধা দিলেও দোকানে তা বিক্রি নিষিদ্ধ। কোম্পানি সমুদ্র-পারের দেশে সেটা পাঠানোর জন্ত ঐ গবেষণার অসুবিধাপত্রটাকে বিকৃত করে 'ব্যবহারে মার্কিন সরকার কর্তৃক অসুবিধাদনপ্রাপ্ত' হিসাবে। ইউ, এন, এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলোপমেন্ট চূরাস্তর সালে ভারত, পাকিস্তান, ব্রেনজির মতো দেশে পকাশ লক্ষ ডলার পাঠায় যা দিয়ে ফসতলের মতো হেপ্টাক্লোর, ক্লোর-ডেন, এনড্রিন ইত্যাদি আমেরিকার অব্যবহৃত ওষুধগুলো কেনানো হয়েছে বা বলা ভালো চালানো হয়েছে।

ক্রোরোপ্রোপেন, ডাইব্রোমোর মত পেটিশাইড ডি বি সি পি ও সাতারের আগষ্ট মাসে কালিকোণিয়া বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারণ এগুলো খেলে পুরুষবাহীমতা ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। কিন্তু লস এঞ্জেলসের আববাক কেমি-ক্যাল কর্পোরেশন এ সব ওষুধ জাহাজ ভর্তি করে দক্ষিণ আমেরিকার কলাসমুদ্র দেশগুলোর পাঠাচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনার উপাদান সামগ্রীর ক্ষেত্রেও তথৈবচ। ইউ, এন এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলোপমেন্টের সক্রিয় সহযোগিতায় সস্তার সালের প্রথম দিকে এ, এইচ রবিজ কোং কর্তৃক ডালকন শিল্প মজুত করা নিয়ে যে কলেজারী প্রকাশ হয়েছিল তা অসুতপূর্ব। চূরাস্তর সালে এই ডালকন শিল্প ব্যবহার করে সতেরোজন মারা গেছেন এবং শুধুমাত্র আমেরিকাতেই দুলাখ লোক মৃত্যুশয়ের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন।

কয়েকটি বহুজাতিক কর্পোরেশন আবার মার্কিন সরকারের বিধিনিয়ম এড়ানোর জন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশ-গুলোতেই এ ধরনের বিশপ্জনক ওষুধ তৈরীর কারখানা করছে। মেক্সিকো সহ অন্ত কয়েকটি দেশে এ ধরনের কারখানা গড়া প্রসঙ্গে আটাস্তর সালে মার্কিন কংগ্রেসে আলোচনার বড় ওঠে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ধন-কুবেরদের ক্ষমতা ঢের বেশি।

রাষ্ট্রপতি কার্টার একটু নাড়াচাড়া করেছিলেন মাত্র। বছর দুয়েক আগে তিনি ক্ষতিকারক অব্যাদি রপ্তানিকারক নীতি প্রসঙ্গে ইন্টার-এজেন্সি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরী করেন। ক্যান্সারের জীবাত্মবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ সমুদ্রপারের দেশগুলোর রপ্তানি হলো, কিন্তু উক্ত গ্রুপ কোন ব্যবস্থা নিতে পারলো না। একেই বর্তমানে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্যে মন্ডা দেখা দিয়েছে। এখন কি মন্ডা জিনিস রপ্তানি চলবে না—এ আদেশ দেওয়া সম্ভব ?



ফ্যান্টাসিক কমিক্সের জন্ত ভারতের দর্শক এজেন্ট চাই

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্শক কার্যালয় ৩১, রট সেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

খ্যামটা নাচের ছড়া অনার্য মিত্র

এক
মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
হিন্দি নাট্য চিত্রের তালে
পড়ল এসে ঘোমটা।

জয়ের নেশায় জয়ধ্বনি
আট রাজ্যে আটটা মনি
তবু একটা রইল শনি,
তামিলনাড়ুর ঘোমটা।
জয় করেও তবু মেনকার,
মাথায় দিল ঘোমটা।

ঘোমটা দিয়ে খুঁচ কেঁচে
নতুন বোঁ-এর লাজ রেখেছে
সব রাজ্য ছিমিয়ে নিতে
ফুরায়নি তাঁর ঘোমটা।

সারা দেশটা ঘুরে পেরে
খ্যামটা দেবে ঘোমটা ফেলে
তবু রাজ্য নাচ দেখাবে
ছাড়বে সে এ্যাটমটা,
আপাতত তাই মেনকা
মাথায় দিল ঘোমটা।

তুই
দিনরাত ছুটোছুটি
নিরুপম সোম
লোকে কর, তিনি নাকি
ভাকাতের ঘর।
যমজ ভাকতি হয়
ছপুয়ে ও দিনে
গন্ধের হিসেব বাড়ে
এক তুই তিনে।
হিনতাই রাহাজানি
রেকর্ড ছাড়াই,
জুয়া আর সাটা
পাড়ায় পাড়ায়।
সিনেমায় টিকিটের
র্যাকের বাজার,
ফুটপাতে হাট বলে
চোলাই গাঁজার।

এই নিয়ে চলছেন
স্বরাষ্ট্র (হোম)—
হাক দেন : নিরুপম,
বাড়াও রুদ্রম।
নবাগত, তাই তাঁর
ফুরায়না দম্,
একা একা ছুটে মরে
নিরুপম সোম।

সঞ্জয় এবার নেপথ্য থেকে প্রকাশ্যে

সঞ্জয় গান্ধী এবার বোধহয় দলীয়
রাজনীতিতে প্রকাশ্যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ
হাতে নেবেন। কংগ্রেস (ই) পুঞ্জ
পাওয়া থবরে একথা জানা গেছে।

এতদিন সঞ্জয় গান্ধী দলীয় কার্য-
কলাপের নিয়ন্ত্রণ করতেন নেপথ্যে।
তিনি দলের কোন পদাধিকারী না
হয়েও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সঞ্জয়ই
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। একথা
কংগ্রেস (ই)র তাবড় তাবড় নেতাদের
জানা ছিল বলেই, সবাই দিল্লীতে
দরবার করতে গেলেন। কংগ্রেস (ই)
সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা
করলেও, সঞ্জয়ের সঙ্গে অবশ্যই দেখা
করতেন।

সমস্ত রাজ্য থেকে ইন্দিরা গান্ধীর
ওপর সঞ্জয় অহুগামীরা চাপ দিচ্ছেন
তাকে কংগ্রেসের (ই) সভাপতি পদে
বসানোর জন্য। এ ব্যাপারে করেকটি



ত্রয়বিশ বর্ষ ২০শ সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৩ই জুন, '৮০ ৬০ পয়সা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ইন্দিরাগান্ধীকে
অহুগোধ করেছেন, দলীয় ব্যাপারে
সমস্ত দায়দায়িত্ব সঞ্জয়কে ছেড়ে দিয়ে
তিনি যেন সরকারী কাজকর্ম দেখা
শোনা করেন।

সঞ্জয়কে দলীয় ব্যাপারে দায়িত্ব

দিতে ইন্দিরাগান্ধীর তেমন কোন
আপত্তি আছে বলে মনে হয় না।
তবে প্রথম ধাপেই তাকে দলের
সভাপতি করাটা ঠিক হবে কিনা এ
ব্যাপারে ইন্দিরাগান্ধী চিন্তাভাবনা
করছেন।

শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়



চীন সম্পর্কে আমেরিকার নরম মনোভাব

১৯৪৯ সাল থেকে দীর্ঘ বাইশ
বছর পর একান্তরের মতোই পূর্ণ-
প্রজাতন্ত্রী চীন বিরাট সংখ্যক সদস্য
রাষ্ট্রের সমর্থনে রাষ্ট্রসংঘে আসন
পেল, তাইওয়ান হটলো। চীনের
পররাষ্ট্রনীতি-তথা তাইওয়ান মূল

চীনের অংশবিশেষ—এটা সকলেই
স্বীকার করলো, বাহান্তরের ২১-২৮
ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীন
ভ্রমণ করলেন, উত্তর কোরিয়ার
রাষ্ট্রপতি কিম ইল সঙের মতে
'পরাজিত মিত্রদের চীন ভ্রমণের' অর্থ

পররাষ্ট্রনীতিতে চৌ এন লাইয়ের
কাছে পরাজিত।' ১৯৭১ সালের
আহুয়ারী থেকে চীন-মার্কিন সম্পর্ক
বৃদ্ধি পেল, রাষ্ট্রদূত পাঠানো হল।

তখন আমেরিকার কূটনীতি
ছিল চীন ও মোস্তিয়েত ইউনিয়ন
সম্পর্কে সমন্বয়মোভাব ও সমদ্রব
বজায় রেখে চলা। কিন্তু শেদিন
পূর্ব এশীয় ব্যাপারে আমেরিকার
সহ পররাষ্ট্র সচিব রিচার্ড হক্সকক
বলেছেন যে আমেরিকা চীন সম্পর্কে
নরম নীতি নিয়েছে। অসংক্রামিত
ও সামরিক প্রযুক্তি বিচার কেজোও
নতুন চুক্তি হবে। মার্কিন-চীন
বানিজ্য সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদের
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

শত্রু সম্পত্তিতে নানা দুর্নীতি অব্যবস্থা অবিচার

কতকাতা মহানগরীর বিভিন্ন
পাড়ায় এমন কতকগুলি বাড়ী আছে
যেগুলি আইন-অহুগামী শত্রু সম্পত্তি
বলা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার
এ বাড়ীগুলি দেখাওনা ও রক্ষণা-
বেক্ষণ সহ তাড়াতাড়িদের কাছ থেকে
ভাড়া আদায় করে থাকেন। ওসব
বাড়ীর একাংশে মানান অব্যবস্থা

দুর্নীতি এবং ব্যক্তিচারের আড্ডা
চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া
গেছে। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট-
সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের
সময় যে সব ভারতীয় মুসলমান
কলকাতা মহানগরীসহ পশ্চিমবঙ্গের
বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদের বাড়ীর
পরিত্যাগ করে পাকিস্থানে চলে যান

ভারত সরকার সেই সব বাড়ীর
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরফল,
আইন-করে একটি পৃথক দপ্তরও
সৃষ্টি করা হয়। ওগুলো শত্রু সম্পত্তি
বলে ঘোষিত হয়। বর্তমানে
বোম্বোতে এর কেন্দ্রীয় অফিস। কল-
কাতায় এর একটি শাখা অফিস
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় ত্রিপুরায় আগুন ও হত্যা

ত্রিপুরায় ছয় দিনের দাঙ্গার ৪০০
লোক মারা গেছে, অসংখ্য বাড়িতে
আগুন লাগানো হয়েছে এবং হাজার
হাজার লোক বাস্তুহারা। সেখানে
এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয়
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং ছুটে গেছেন
আগরতলায়।

ত্রিপুরায় গণগোল শুরু করেছে
উপজাতি যুব সমিতি। আশামের
আন্দোলনের অহুগোধে তারাও দাবি
তুলেছে 'বিদেশী হটাও'। তারা
চায় : ১৯৫৯ সালের ১৫ই অক্টোবরের
অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির
পরে যারা এখানে এসেছে তাদের
বহিষ্কার। আশামের আন্দোলন-
কাঙ্গীদেব দাবি যেমন মেনে নেওয়া
সম্ভব নয়, তেমনি উপজাতি যুব
সমিতি যা চাইছে তা অবাস্তব
অর্থোক্তিক ও সম্পূর্ণ অসম্ভব।
উল্লেখযোগ্য যে ত্রিপুরায় বর্তমানে
বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা সংখ্যা-
লবু। সেইজন্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী
প্রিন্সেন চক্রবর্তী উপজাতিদের
অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করে
আসছেন কক্ষতার অধিষ্ঠিত হবার পর
থেকে। জনতা সরকারের বাধা-
দানের ফলে তাঁর মূল পরিকল্পনা
থেকে সরে এসে ১৯৭১ ত্রিপুরা উপ-
জাতি অঞ্চল ছেলা কাউন্সিল আইন
মারফৎ উপজাতিদের অধিকার
সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে
উপজাতি যুব সমিতির পক্ষে অতি-
নন্দিত করা উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রী
প্রিন্সেন চক্রবর্তীকে। কিন্তু-উগ্রপন্থী
যুবকদের হঠকারিতায় সেই আইন
প্রয়োগ মূলত্বী রাখা হল অনির্দিষ্ট-
কালের জন্য।

একথা অনস্বীকার্য, ত্রিপুরায়
বর্তমান গণগোলের জন্ত ইন্দিরা
কংগ্রেস, আমরা বাঙ্গালী ও আন্দ-
মার্কীদেরও কিছু অবদান আছে।
উপজাতিদের অধিকার সংরক্ষণ
প্রচেষ্টার বিপক্ষে এদের আন্দোলন ও
বল উপজাতি যুবকদের উত্থানী
দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
স্বীকার না করলেও একথা সত্য।
এবং রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেস চাপ
ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা
করা হোক। কিন্তু এতে লাভ কিছুই
হবে না, গোলযোগ আরও বাড়বে।
ইন্দিরা গান্ধী দিল্লী এ তুল করবেন
না।

প্রধান বিচারপতির কাছে গণ ডেপুটেশন

দেশ কাল রাজনীতি

কেড়ে টোটকা দাওয়াই ?

ভারতপুত্র

দীর্ঘ ছ'মাস ধরে বিস্তার টাল-বাহানা করার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্মেলন করলেন। এর জন্ত যে সময়টি তিনি বেছে নিয়েছেন তাতে জনসাধারণের মনে এ ধারণা হতে পারে যে শ্রীমতী গান্ধী এতদিন হরতো নটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। অর্থাৎ নির্বাচনে বিজয়ী হলেই তিনি ইচ্ছামতো কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই সঙ্গে সরকারগুলোকে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে মনের মতো করে সাজাবেন। নির্বাচনে তার মনোবাঞ্ছা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে বলা যায়, প্রায় সব ক'টি রাজ্যেই তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের হাতেই নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রে যে পনেরো জন নতুন সদস্য নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যেও তাঁর ছদ্মনির্বাচন বিশ্বস্ত সাথী ও সেবকদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তিনি কি এ পরি-

বর্তনের দ্বারা আশঙ্ক হতে পেরেছেন ? কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলোতে স্বাধীন সরকার গঠনের যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি নির্বাচন জিতেছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি সর্বাংশে রক্ষিত হবে কি ? গত জুলাইরাজীতে আশাততঃ কাজ চালানোর মতো সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নেতৃহীন রেখে দিয়েছিলেন। সেদিন মন্ত্রিসভা বিস্তার হওয়ার দরুন অনেকের মনে ভেবেছিলেন যে যথাসময়ে তিনি মন্ত্রিসভার আয়তন বাড়িয়ে তাকে জিত্তরে রূপান্তরিত করবেন এবং সেই সুযোগে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোও বন্টন করে দেবেন নতুন অঞ্চল উপযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে। কিন্তু সোয়া শুধু ব্যক্তিকে মন্ত্রিধ্বংস করা হল বটে, অঞ্চল শিল্প, ইম্পাত ও খনি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম এবং অসাময়িক বিমান ও পর্যটন দপ্তরের ভার কোন পূর্ণমন্ত্রী হাতে দেওয়া হল না। প্রতিরক্ষা দপ্তরটিও এখনো প্রধানমন্ত্রীর হাতেই রয়ে গিয়েছে যে ব্যবস্থা অস্থায়ী ছাড়া অস্ত্র কিছু নয়। কিংবা রাজধানীতে কয়েকজন বর্তমান মন্ত্রীর পদচ্যুতি সম্পর্কে যে জোর স্রবণ করা শোনা যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী তাকে সহ্য প্রদানিত হবার সুযোগও দেন নি। কয়েকটি দপ্তরের পুনর্বন্টন ঘটতে-হয়েছে অবশ্য, কিন্তু অর্থমন্ত্রীর পদে ভেৎকট-রমণই বহাল রয়ে গিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ গদি কটা শূন্য রাখা হল কেন—এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী মনোমত লোক পান নি বলেই কি আর একবার আর একটা সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন ? হ্যাঁ, তার পুরনো বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যে ইমার্জেন্সী প্রেস সেন্সরশিপ-খ্যাত বিচারক শুক্লাকে তিনি আবার কোলে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু সেদিনকার অবরুদ্ধ বংশীলাল ? তাঁরই জন্ত কি প্রতিরক্ষা দপ্তরটি ইন্দিরা তুলে রেখেছেন ?

লোক বাছাইর ক্ষেত্রে শ্রীমতী তার স্বভাবনিক হিসাব কবে নিয়েছেন। তিনি জানেন যে কংগ্রেস (ই) নেতারা ক্ষমতার জন্ত উন্নত আচরণে অত্যন্ত। গদির জন্ত কামড়াকামড়ি করতে গিয়ে আগের মতো যাতে ঘন ঘন নেতা বদল না করতে হয় সেজন্য বিহার থেকে কেদার পাণ্ডেকে এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে নারায়ণ দত্ত

ভেৎকারীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধা পাতিলকেও তিনি মন্ত্রিসভার পদ দিতে চেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে এ আর আন্তর্জাতিক নিরাপদ কমতা ভোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাতিলজী বেকে বসেছেন। বেকে বসেছেন শ্রীমতী প্রতিভা সিংও। তিনি উপমহাদ্বীপের পদ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অর্থাৎ এত সবুর করার পরেও মেওয়া ফলল না। তার মানে শ্রীমতী গান্ধীর অচিরেই হরতো তাঁর মন্ত্রিসভাকে আবার ঢেলে সাজতে হবে।

উপর থেকে চাপানো নেতা

নির্বাচনের নামে ব্যাপক মার-দাঙ্গা খুন জখমের মধ্য দিয়ে যদিও আটটি রাজ্য দখল করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলোর নেতানির্বাচন পর্ব আদৌ সহজ হয়নি। কিন্তু ইন্দিরা-মার্কী গণতন্ত্রের স্বর্বাদাকে স্তম্ভ করা চলে না। তাই বিধান সভার নির্বাচনকে ঘেমন 'স্বত্ব' ও 'অবাধ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তেমনি নেতা নির্বাচনকেও 'সর্বসম্মত' প্রচার করতে কংগ্রেসীদের (ই) সতর্কতাবোধে এতটুকু বাধেনি।

সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচন হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ পরিষদীয় দলের সভায়। কিন্তু সে সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্বাদা দেওয়া হল কোথায় ? সঙ্গর গান্ধীর বদলে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং।

কেরল উত্তর প্রদেশেই নয়, মহারাষ্ট্রে এ আর আন্তর্জাতিক, মধ্যপ্রদেশে অজুঁন সিংকে, ওড়িশায় জামকী বল্লভ পট্টনায়ককে এবং রাজস্থানে জগন্নাথ পাহাড়িয়াকেও কার্ভতঃ ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি বিহারে জগন্নাথ মিশ্র এবং পাঞ্জাবে দরবারা সিং-এর পক্ষেও, মুখ্যমন্ত্রীর গদি সাত করা সম্ভব হতনা যদি প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ না করতেন। কারণ আর কিছুই নয়। মুখ্যমন্ত্রীর একটি গদিকে বিরে প্রতিটি রাজ্যেই গণ্ডার গণ্ডার কংগ্রেসীরা (ই) মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা খেলেছেন। কাছেই ওপর থেকে চাপানো মুখ্যমন্ত্রীদের জমি কতখানি শক্ত, কতদিন তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দিরা-মনোনীত মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হবে, ভবিষ্যতেই কেবল তা নির্দেশ করবে। অতদিকে তামিল-নাড়ুতে এম জি রামচন্দ্রনের নেতা নির্বাচন কংগ্রেসীদের (ই) আর একবার লজ্জা দেবে—লজ্জাবোধ যদি অবশ্য তাদের এখনো অবশিষ্ট থাকে। আন্দোলনকারীরা দ্বিধাবিশুক্ত সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (আই) ও সারা আসাম গণ সংগ্রাম

পরিষদের মধ্যে কি গুরুতর কোন মতানৈক্য দেখা দিয়েছে ? সংবাদপত্রে ছপকের মধ্যে বিবৃতির লড়াইর কথা প্রচারিত হয়েছে বটে, কিন্তু মৌলিক প্রশ্নে ছপকের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে এটা ঠিক বলে মনে হয় না। কারণ ছপকের নেতৃবৃন্দই আসামে 'বিদ্রোহী' চিহ্নিতকরণে ১৯৫১ কেই তিন্তি বর্ষ হিসাবে ধরার পক্ষপাতী। এই দাবিতে তারা নতুন পর্বারে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে।

তবে আন্দোলনে যে খানিকটা ভাঁটার টান ধরেছে সে কথা আমরা বিগত সপ্তাহেই উল্লেখ করেছি। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কোন তিন্তি বর্ষ না করেই আসামের আন্দোলনকারী ও বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভাষা ও ধর্মগত দলের সংখ্যালঘুদের পাণ্টা আন্দোলন, তাদের ওপর পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ এবং রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদিই বিচ্ছিন্নতাবাদী শিবিরে হতাশা ও জিজ্ঞাসা সঞ্চার করেছে।

ব্রিটেনে প্রতিবন্ধীদের দুর্দশা বাড়ছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত সেনাবাহিনীর বহু প্রাক্তন কর্মচারীর সাহায্যার্থে ব্রিটেনের তদানীন্তন যুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার ১৯৪৪ সালে একটা আইন করলেন, যাতে প্রত্যেক কোম্পানিতে প্রতিবন্ধী ও অন্ধদের জন্ত শতকরা তিনভাগ চাকরিদান বাধ্যতামূলক হল। আজ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ষ অস্ত্র যাবার পর ঘরে অর্থনৈতিক লংকট বেড়েই চলেছে, বিজৈতের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ও লাইন দীর্ঘতর হচ্ছে। কর্মক্ষমদের যেখানে সংখ্যান হচ্ছে না সেখানে কে আর প্রতিবন্ধী অন্ধ পশুদের চাকরী দেবে।

ব্রিটেনের দুটি নামকরা সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান লো পে ইউনিট ও রয়াল ইন্সটিটিউট ফর দি ব্লাইন্ড বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের দমস্তা নিয়ে অহুসস্থান করে যে রিপোর্ট শ্রীমতী থ্যাচার সরকারের কাছে দিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকারের ম্যান পাওয়ার সার্ভিস কমিশনের কাছে প্রদত্ত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৬০ সালে বেসরকারী কোম্পানিগুলো উক্ত আইন ৬১.৮% কেড়ে মেনেছিল কিন্তু ১৯৭৮ সালে মাত্র ৩৬.৮% মেনেছে।

মতামত

সর্বৈব মিথ্যা

৩০শে মে সংখ্যায় 'মতামত' কলকে শ্রীরঞ্জনচন্দ্র পোদ্দার ৪ঠা মে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নব নিমিত্ত ভবনের ছারোদবাটন উপলক্ষে পদযাত্রার যোগদানকারী পূর্তমন্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী সম্পর্কে যা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। আমি মন্ত্রী মহোদয়ের পাশেই ছিলাম এবং ট্রাম কন্ডাক্টর ও তাঁর কথোপকথন স্বকর্ণে শুনেছি। আর সারা কাছেই ছিলেন এবং শুনেছেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী চক্রবর্তী প্রাক্তন এম, পি, জিজ্ঞানেশ পট্টনবীশ, অধ্যাপক, বড়িষা কলেজ, শ্রীজজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, চারুচন্দ্র কলেজ।

তাঁর ব্যবহারে কোথাও মন্ত্রীর অহরিকা প্রকাশ পায় নি। তিনি শুধু কনডাক্টরকে বলেছেন—একটু ধৈর্য ধরুন না। নেমে এসে আপনিও এ মিছিলটি দেখুন। এ মিছিল কলকাতায় নতুন এবং ধৈর্যবানও। জীবনে অনেক তো শ্রমিক মিছিল দেখেছেন, দাবীর মিছিলও দেখেছেন।

অসীম চৌধুরী
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
চারুচন্দ্র কলেজ

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির এক প্রতিনিধিদল গত ১ জুন কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করে একটি আরকলিপি দেন। আরকলিপিতে বলা হয়েছে, "আমরা নাগরিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান বিচার ব্যবস্থার কাছে যাবতীয় অজ্ঞান ও অবিচারের বিরুদ্ধে যথার্থ বিচার দাবি করি। সাধারণ নাগরিক যখন অর্থনৈতিক সামাজিক বা সাময়িক শক্তির দ্বারা নিগৃহীত, অত্যাচারিত হয় বিচার ব্যবস্থার কাছে তার অভিযোগ সুবিচার পাবে এটাই সে আশা করে। কিন্তু আইনের জটিলতার মধ্যে বারবার অত্যাচারী ও দোষীরা কোন শাস্তিই যখন পায় না তখন নাগরিক অধিকার সংক্ষেপে সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

"বহু বৎসর ধরে এদেশে বহু রকম পুলিশী নির্বাসন ও আমলাতান্ত্রিক অবিচারের ঘটনা আমরা জানি। কিন্তু তার থেকেও ক্ষোভের কথা হল অভিজ্ঞ পুলিশ বা আমলারা আদালতে বিচারের আগে বা পরে কলিকাতায় হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পেয়ে যায়। বারিষকান্তি সরকারকে গুলি করা ও অশোক দত্তকে হত্যা করার মামলাটি সম্প্রতি ধারিত্ব হয়ে গেছে। অর্চনা গুহকে নির্বাসন করার মামলাটি সম্প্রতি সেসনস্ কোর্টের পরিবর্তে চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাগিস্ট্রেটের আদালতে বিচারের জন্ত পাঠানো হয়েছে। রঞ্জিত চক্রবর্তী ও সমীর চক্রবর্তীকে হত্যা করার অভিযোগে সাক্ষাপ্রাপ্তরা কয়েকদিনের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়েছে। এই ঘটনাগুলিতে রুগু গুহ নিয়োগী, বিভূতি চক্রবর্তী, শিউমদল সিং ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা জড়িত ছিল। এছাড়াও হরতোষ চক্রবর্তী কমিশন ও শ্রী সরকার কমিশনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরি করা হয়েছে ইত্যাদি দুঃখজনকভাবে পুলিশ ও আমলাদেরকে এ সুযোগগুলো দেওয়া হয়েছে।

"গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ হিসাবে আমরা চাই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত হোক, অপরাধীর বিচার হোক এবং অপরাধীর শাস্তি হোক।"

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ট্রান্সফর্মার কেনা নিয়ে কংগ্রেসী জমানায় অনেক কলেঙ্কারী হয়েছে

রাজ্যবাসী এই যে বিদ্যুৎ সঙ্কট চলছে তা নিয়ে নাকাল হচ্ছে আমরা সকলেই। কিন্তু কেন এই বিদ্যুৎ সঙ্কট? এর উত্তর পাওয়া যাবে কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের ১১.৭.৭৮ সালের কমার্শিয়াল রিপোর্টে। এই রিপোর্টের ৩২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অতীত কার্যকলাপের বিবরণ দেয়া আছে তিন প্রহে। বর্তমান প্রতিবেদনে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কংগ্রেসী জমানার কুকীর কথা থাকছে। যার দায় বহে যেতে হচ্ছে রাজ্যে ক্ষমতানীন বামফ্রন্ট সরকারকে। ট্রান্সফর্মার কেনা নিয়ে অতীতে যে কলেঙ্কারী হয়েছে সে সম্পর্কে অডিটর জেনারেল যে সব মন্তব্য করেছেন তার সারাংশ নিয়েই বর্তমান প্রতিবেদন। এই রিপোর্ট সত্ত্বেও সমাপ্ত বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্টনের ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার নামক যন্ত্রটি অপরিহার্য। যেগুলি ৫০০ ভোল্টের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার সেগুলিকে বলা হয় পাওয়ার ট্রান্সফর্মার এবং অল্পগুলিকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার।

ট্রান্সফর্মারের দাম ৬০০ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। দাম নির্ভর করে বিশেষত্ব এবং ক্ষমতা অনুযায়ী। বেসব ট্রান্সফর্মার ১০০ কিলো ভোল্টের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন সেগুলির কার্যক্ষমতা থাকে সাধারণত ৩৫ বৎসর এবং অল্পগুলি ২৫ বৎসর। তবে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পারদর্শিতার ক্ষেত্রে পরিচালনা করা হয়।

১৯৭৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ১৩ হাজার ২০১টি ট্রান্সফর্মার চালু ছিল বলে জানা যায়। যার মধ্যে ৪৩১টি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার। বাকিগুলি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার। এছাড়াও বহু ট্রান্সফর্মার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভিন্ন গুদামে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই পড়ে রয়েছে খোলা আকাশের নিচে।

ট্রান্সফর্মার কেনাকাটা নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সূত্র এই রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার একটি সংস্থার নিকট ১০০টি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ক্রয় করার জন্য অর্ডার দেয়া হয়। যার দাম ক্ষমতা অনুযায়ী ধার

হয় ৩৮৬০ টাকা থেকে ৭৫০০ টাকার মধ্যে। দ্বি-দর যে, ১৯৭২ সালের জুলাই মাস অবধি প্রতি মাসে ঐ সংস্থা ১০০টি করে ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করবে। কিন্তু ঐ সংস্থা শর্ত অনুযায়ী সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ঐ সংস্থা সরবরাহ করেছে মাত্র ২৭১টি ট্রান্সফর্মার। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে সরবরাহ শেষ হয়ে যাবার কথা। এরপর ২৬৩টি ট্রান্সফর্মার দেবার পর ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস থেকে ঐ সংস্থা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ঐ সংস্থা যে বিল পেশ করে তা থেকে দেয়ীতে সরবরাহের জন্য খেসারত বাবদ ৪৭ হাজার টাকা কেটে নেয়া হয়।

সরবরাহকারী সংস্থার আবেদনক্রমে বরাত বাতিল এবং খেসারত বাবদ কেটে নেয়া টাকা ঐ সংস্থাকে ফেরৎ দেবার সুপারিশ করেন বিদ্যুৎ পর্ষদের স্ট্যান্ডিং টেওয়ার কমিটি। ঐ সংস্থাকে টাকা ফেরৎ দেবার সুপারিশ করা হয় ১৯৭৭ সালের মার্চে। কিন্তু কেন ঐ সংস্থাকে দেওয়া বরাত কোন-রকম খেসারত না নিয়ে বাতিল করা হল সে সম্পর্কিত কোন কারণ কমিটি লিপিবদ্ধ করেননি (১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত)। এদিকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ঐ একই সংস্থাকে ৯টি ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করার বরাত দেয়া হয় বাড়তি দামে। এরপর পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে আরও ৭৩টি ট্রান্সফর্মার গ্রহণ করেন বাড়তি ১লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় করে।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি টেওয়ার আহ্বান করে ১৮টি ১০০ কিলো ভোল্টের তিন ফেজের আর্থিং কাম স্টেশন ট্রান্সফর্মারের জন্য। এই জাতীয় ট্রান্সফর্মার পর্ষদ আগে কখনো ব্যবহার করেনি। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১০টি টেওয়ার জমা পড়ে। মাল্যজের একটি সংস্থা সর্বনিম্ন দর দেয় (৭৩ হাজার ১৭০ টাকা)। কিন্তু সেই টেওয়ার বাতিল করা হয় এই অজুহাতে যে, ঐ সংস্থার অতিজ্ঞতা কম। দুটি সংস্থাকে ১৮টি ট্রান্সফর্মার সরবরাহের বরাত ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতিটির দাম ধার্য করা হয় ১লক্ষ টাকা।

১৯৭৮ সালের জুন মাসে স্টোরস অ্যাণ্ড পারচেজ উইংয়ের টেবিল অডিটের সময় দেখা যায় যে দুটি সংস্থাকে

১২টি ট্রান্সফর্মার সরবরাহের বরাত দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি অতীতে বিদ্যুৎ পর্ষদকে আর্থিং ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করেছে এবং সেগুলি ভালভাবেই কাজ করেছে। কিন্তু অপর যে সংস্থাতিকে বরাত দেয়া হয়েছে সেটি অতীতে পর্ষদকে কিছু সরবরাহ করেনি এবং আর্থিং ট্রান্সফর্মার তৈরীর কোন অতীত অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। এই সংস্থার প্রতিনিধি পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে বলেছে যে, তারা যে ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করবে তার মান বারাপ হবে না। নথিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী যে সংস্থার টেওয়ার বাতিল করা হয় তারা লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে, যদিও আর্থিং ট্রান্সফর্মার নির্মাণের কোন অতীত অভিজ্ঞতা তাদের নেই কিন্তু তারা পাওয়ার ট্রান্সফর্মার নির্মাণ করেছে। তারা যে ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করবে তা যাতে বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য সরবরাহের পূর্বে তারা তাদের উৎপাদিত ট্রান্সফর্মারগুলিকে ফুপালের সেন্ট্রাল পাওয়ার রিসার্চ ইন্সটিটিউটকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবে। ১৯৭৫ সালেও এই সংস্থাটি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করেছে। যে দুটি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয় তার একটি অতীতে সঠিক সময়ের ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করতে পারে নি। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পর্ষদ তাদের কাজ থেকে সরবরাহ পায় নি। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করার কাজ ছিল। চারটি সরবরাহ করেছে। দুটি এখনো বাকি রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। যে অজুহাত দেখিয়ে সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী সংস্থার টেওয়ার বাতিল করা হল সেই একই কারণে, বাতি দুটি সংস্থার টেওয়ার বাতিল হয়। কেন না ঐ দুটি সংস্থাও অতীতে কখনো আর্থিং কাম স্টেশন ট্রান্সফর্মার তৈরী করে নি। তবুও তার ভাগ্যে শিক হ'য়েছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের বহু কলেঙ্কারীর তথ্য এই প্রতিবেদকের হাতে রয়েছে। ক্রমশ তা প্রকাশ করা হবে।

আশংকাজনক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

আমাদের দেশে আজকাল অদূত ঘটনা ঘটছে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা বুঝে পাওয়া যায় না। আমরা ছ লক্ষ টন চিনি আমদানী করছি দেশে চিনির ঘাটতি আছে বলে। সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির দস্তায় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বলেছেন যে তিনি ভবিষ্যতে ভারত থেকে বিদেশে চিনি রপ্তানী করা হবে না। এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। অর্থাৎ আমরা কোন জিনিস দেশে উৎপাদন করব, কোন জিনিস আমদানী বা রপ্তানী করব, তার ঠিক নেই। কারণ সরকারের মতিগতির স্থিরতা নেই। কোন দেশের অর্থনীতি কি এভাবে চলতে পারে?

আবার আমরা সাড়ে চারশো কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে বিক্রয়যোগ্য ইম্পাত আমদানী করছি। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন খুব তাড়াতাড়ি এই আমদানী করা

অর্থনীতি

ইম্পাত দেশে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আমাদের দেশে ইম্পাত শিল্প দুর্বল নয়, তার উৎপাদন ক্ষমতাও দেশের প্রয়োজন যেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। বলা হচ্ছে বিদ্যুৎ ও কয়লার অভাব, রেলপরিবহনের অনিশ্চয়তা এবং অন্যান্য কারণে ইম্পাত শিল্পের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো যায় নি। সুতরাং আপাততঃ আমাদের গুরুতর প্রয়োজনে ইম্পাত আমদানী করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে অবস্থা একটু ভালো হলে আমরা কিছু ইম্পাত রপ্তানী করতে পারব। তাহলে কি আমরা বুঝবো যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে কোন দৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি? অর্থাৎ অর্থনীতিকে পুনরায় স্থিতিশীল করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তো তারা ভোট পেয়ে ক্ষমতার এসেছেন। কার্যকালে দেখা যাচ্ছে তারা হাওয়ার ভালছেন, কোন নীতি স্থির করতে পারছেন না ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করছেন। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এরকম অনিশ্চয়তা ভবিষ্যত বিপদেরই সূচনা করে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে অবিলম্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পর পর আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন

হতে হবে। ১৯৭৭ সালে ত্রিভুজী গান্ধীর দল যখন দীর্ঘকাল পর নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তারা বিদেশী মুদ্রা তহবিলে (নোনাও এম ডি আর বান্ডে) ২৮৬০ কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জনতা সরকারের আমলে দেশের ভেতরে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে ত্রোত্র তেল শিল্পের প্রয়োজনীয় জরুরী কাঁচামাল আমদানী করার ব্যস্থা করা হয়েছিল। আমদানী বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে বিদেশী মুদ্রার মজুত কমলেও ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে বিদেশী মুদ্রার মজুত পাঁচ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে ইন্দিরা গান্ধী যখন আবার ক্ষমতায় ফিরে এলেন তখন দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিল প্রায় একই অবস্থায় ছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন নয়। এখন সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা গভীর হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নানা রকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এই সব সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ভারতের বিভিন্ন রপ্তানী শিল্প সংকটে পড়েছে। বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী, বিশেষতঃ তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ রপ্তানী ক্রিশ শতাংশ কমে গেছে। আমাদের দেশের চটপট কাপের্ট ব্যাকিং এর চাহিদা অনেক কমে গেছে কারণ প্রধান খরিদার আমেরিকায় মন্দার দরুন গৃহনির্মাণ শিল্পের কাজকর্ম অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আমরা আগের বছর যত চা রপ্তানী করেছিলাম, গত বছর অর্থাৎ ১৯৭৯-৮০ সালে তার চাইতে পঞ্চাশ শতাংশ বেশী চা রপ্তানী করেছি কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের দাম পড়ে যাওয়ার রপ্তানী বাবদ দাম পেয়েছি আগের বছরের দমান। আমেরিকায় ভারতের চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানী নিষাধকভাবে কমে গেছে। আগে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বহু পণ্য বিদেশে রপ্তানী হত, বর্তমানে সেগুলো প্রচণ্ড বাধানিষেধের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে সব শেখাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

পূর্ববঙ্গের উদ্ধারের সম্পর্কে জহরলাল নেহরুর প্রতিশ্রুতি

নলিনী পাল

১৯৪৭ সালের আগে অর্থাৎ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাবা তৎকালীন কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সারা ভারতের কংগ্রেস নেতারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বর্তমানে শ্রীমতী সবই ভুলে গেছেন। তিনি যদিও তখন কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন না, তথাপি তিনি তখনকার সব ঘটনা বা ইতিহাস সবই জানেন।

তাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৪৭ সালে ইংরেজ বা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে জন্ম গ্রহণ করা পাওয়ার ক্ষেত্রে বা তাগিদে তৎকালীন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা ভারতের গভর্নর জেনারেল বা রাজ্য প্রতিনিধি স্বর্গত মাউন্টব্যাটেনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে রফা করে ভারত বিভাগ যেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য ভারতের দরজা দ্বারাই খোলা থাকবে। তাছাড়া, দেশ বিভাগের পরেও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের মধ্যে

খাদ্য ওখানে অবস্থান করবেন, তাঁদের সমস্ত রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং এরপরও তাঁরা ওখানে থাকতে অপরাগ হলে ভারতে নিষ্করই তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে যে ঐতিহাসিক নাগরিক সম্মেলন হয়েছিল, যে সম্মেলনে আচার্য জে বি রূপালনী উপস্থিত ছিলেন এবং যে সম্মেলনে নবাব সমিতি বা নিউ বেঙ্গল এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলনেও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে একই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

অর্থাৎ, এখন দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারা অতীতের কথা ভুলে গিয়ে ঠিক করেছেন যে, ১৯৭১ সাল অবধিই ভারতের একটি অদ্বারাজ্য আসামে আগত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু বা হিন্দুদের জন্য ভিত্তিবর্ষ সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। এটা জাতির পক্ষে একটা লজ্জা এবং স্বাধীনতার একটি কলঙ্কজনক ঘটনা।

উল্লেখযোগ্য, তৎকালীন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি আচার্য টাকা স্বপ্নাতা দেশগুলিকে দিতে হবে। বিদেশী স্বপ্নাতারা যে স্বপ্ন দেবে তার দরুন তাদের শিরাজাত সামগ্রী আমাদের কিনতে হবে। তার দাম যত চড়াই হোক। আবার আমাদের বিদেশী মুদ্রা তহবিল ও লেনদেনে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থা থাকার ফলে আমরা আগে আস্ত-জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে “অরেল ফ্রেন্সিলিটি” বাবদ যে বিনামূলীতে ঋণ পেতাম, তাও আর পাব না। এই পরিস্থিতি এড়ানোর পথ কি, আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তা এখনো স্থির করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ তিনি বিদেশী ঋণের বোকা বাড়িয়ে এই আপাত বিশেষের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইবেন। কিন্তু তার ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখা মুশ্কিল হয়ে পড়বে। অর্থনৈতিক পর-নির্ভরতা যে দর্বনাশ ডেকে আনবে, তার ফলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাও এক আত্মহানিক বিষয়ে পরিণত হতে পারে। এই বিপদ সত্তাবনা এত বাস্তব যে অচিরেই দেশবাসী যদি সচেতন হয়ে না উঠেন তাহলে আমাদের হয় তো আবার পরাধীনতার অমর্যাদা ভোগ করতে হবে।

জীবনরাম ভগবানদাস রূপালনী (জে বি রূপালনী) এবং অবিভক্ত বঙ্গের তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি নজর রাখার জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত স্বরূপালীন ছাত্রমন্ত্রিসভার প্রধান প্রখ্যাত গান্ধী-বাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজো জীবিত আছেন। তাঁরাও তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের ঐ সব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অন্ততম সাক্ষী।

অপর দিকে, ভারতেরই অন্ততম অদ্বারাজ্য আসাম থেকে বিদেশী বিভাগের দ্বিতীকৃত প্রাঙ্গণে ওখানকার বিপথগামী ছাত্ররা এবং স্বাধীনতা মূল্য পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু এবং বাঙ্গালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছে তা দেশ এবং জাতির পক্ষে আরো কলঙ্কজনক ঘটনা।

প্রথমে কংগ্রেস (ই) নেতারা যদিও আসামে এবং আশেপাশের রাজ্যগুলিতে ঐ বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তথাপি এখন তা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে বলে বিখ্যাত হয়ে জানা গেছে।

প্রমুখত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনি আপনার বাবা স্বর্গত জহরলাল নেহরু এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অমর্যাদা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে ভিত্তিবর্ষ বা সীমারেখা না টেনে রাজনৈতিকভাবে আপনার কর্তব্য পালন করুন। আসাম, মেঘালয়, মণিপুর এবং অন্যান্য স্থানের পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু এবং হিন্দু বিরোধী-অসন্ত-তম অভিযান এবং হত্যাকাণ্ডগুলি অবিলম্বে কঠোর হস্তে দমন করুন।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা হিন্দুদের সম্পর্কে ঐ ধরনের ইজিভাই ছিল। এছাড়া ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেহরু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভারতে আনার জন্য ভারত থেকে বেশ কয়েকখানা জাহাজ পাঠিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত রেশম সড়ক পথগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। এখনকার যুবকদের অধিকাংশই তা জানেন

না। তা অবশ্য তাঁদের জানতেও দেওয়া হয় নি। তাই এখন এই বিপথগামী আন্দোলন চলছে।

একথা ভুলে চলবে না যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিরাট আত্মতাগ এবং অবস্থানের ফলেই আজ ভারত স্বাধীন।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এবং তৎকালীন বঙ্গদেশের কংগ্রেস নেতাদের বঙ্গভঙ্গে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে সেই সময়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা কতই না কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা কলকাতার বন

বন বাতায়ন করে এ রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের কতই না রক্ত-আশা দিয়ে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আজ তার কি পরিণতি। পূর্ববঙ্গের আগত সেই হিন্দু বা ভারতে ঠাই পাচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার স্বযোগে তাঁরা আবার মরছেন এবং উৎখাত হচ্ছেন। কাজেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য বা আসাম তথা ভারতে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গের মাহাত্ম্যগুলির জন্য কোন ভিত্তিবর্ষ বা সীমারেখা নির্ধারণ করা চলবে না বলে ওয়াকিবহাল মহল দাবী করেছেন।

বেহালায় সমাজ বিরোধীদের দোরাণ্ডা ও পুলিশ নিব্বিকার

বেহালায় সর্বত্রই আত্ম সমাজ-বিরোধীদের দোরাণ্ডা চলছে। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে চোলাই মদ বিক্রী এবং সাট্টা নামক একপ্রকার জুরা খেলার রমরমা বাজার। দুঃখের সঙ্গে একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, বেহালা অঞ্চলে সাট্টা এবং চোলাই মদের এরকম রমরমা বাজার কংগ্রেসী জমানাতেও ছিল না। বামফ্রন্টের আমলে এসব প্রকাশ্যে হতে শুরু করেছে। পুলিশ নিব্বিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থানীয় সি পি এম নেতাদের নিকট আত্মীয় সক্রিয়ভাবে সাট্টা চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

বেহালা ট্রান্সমিটার ওপরে প্রকাশ্যে চোলাই মদ বিক্রী সকলের গা সহ্য হয়ে গেছে। আসতে যেতে সকলেই তা দেখছেন। অর্থাৎ এই বেহালা ট্রান্সমিটার সামনেই রয়েছে সি পি এমের বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিম আঞ্চলিক অফিস। এদের চোখের ওপরেই ঘটে চলেছে অসামাজিক সব ক্রিয়াকাণ্ড। মহিলারা নিরাপদে পথে বেড়াতে পারেন না। বিগত দু বছরে বেহালায় নারী নিগ্রহের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, চোলাই মদ বিক্রীতা এবং সাট্টা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্থানীয় সি পি এম নেতারা রশিদ দিয়ে টাকা নিয়েছেন, নিচ্ছেন। কখনো ৫১ টাকা, কখনো ১০১ টাকা। কখনো কখনো সেই অল্প নাকি বেশ ফীত হয়ে যায়। তবে তার জন্য কোন রশিদ দেয়া হয় না।

বেহালা বিভাগের হানপাতালটি এখন সমাজ বিরোধীদের আড্ডাঘরে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মাহাত্ম্য

চিকিৎসা পায়না। ঔষধ চুরি নিত্য ঘটনা। হাসপাতালের মধ্যে সমাজ-বিরোধীরা রাজত্ব করে। রাজ্যে হাসপাতাল এলাকার মধ্যে প্রায়ই সমাজবিরোধীরা সমবেত হয়ে মধু-চক্র চালায়। হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে আদিম ব্যবসাও চলছে বলে বিভিন্ন স্বত্রে জানা গেছে।

বেহালায় কোথাও আজ আর সমাজবিরোধী মুক্ত নেই। সর্বত্র এরা রাজত্ব করছে। সাট্টা আর চোলাই মদে এতদঞ্চলের যুব সম্প্রদায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। স্থানের ছেলেরাও সাট্টা খেলছে বলে কয়েকটি অভিযোগ পেরেছি। স্থানীয় সি পি এম নেতৃবর্গের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বলে দেখেছি যে, তারা সবই জানেন। কিন্তু প্রতি-কারের কোন ব্যবস্থা নেননা কেন তা বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে এটুকু বুঝেছি যে, স্থানীয় সি পি এম নেতাদের প্রায় না থাকলে এভাবে প্রকাশ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ চলতে পারেনা।

বোমাবাজী আজ বেহালায় নিত্য ঘটনা। প্রায়ই বোমারুটি হয়। এলাকার মাহাত্ম্য ভীত সন্ত্রস্ত। ভয়ে মূখ্য থলতে নারাজ। কেউ কেউ আকিণোষ করে বলেন যে, “কংগ্রেসী আমলে এর থেকে ভাল ছিলাম। আশা করেছিলাম এই আমলে একটু শান্তিতে থাকব। কিন্তু এ যে স্বাধীনতার সেই হয় রাবণ।”

পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি এতদঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কে। পুলিশের বক্তব্য হল: আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কোন উপায় শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

'ক্রীম অব দি সোসাইটি' প্রসঙ্গে

শ্রীপতি নন্দী

দেশীবিদেশী শোষণার্থগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ পাতি-বুর্জোয়া শিবিরগুলি স্বভাবতই জাতীয় দায় দায়িত্বহীন, আজসর্বস্ব। অতএব নিজেরাও বিস্তৃত, নীতি-জ্ঞানহীন, অনাস্থি আর অপকৃষ্টির বাহক ও সংগঠক। তবু এদের বোল আছে, চাল আছে, দক্ষিণপন্থী-বাম-পন্থী কোঁক আছে—অবশ্যই পালা-মাটারী চালাকী বিভার সঙ্গে চমৎকার পুঁজিশাসনের যুগযুগান্তে পরিণত করতে যা যা করণীয় তা সবই করেছে—দেশী-বিদেশী বৃহৎ-পুঁজির খটকাশি অর্থনীতি করেছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী বর্ণভেদবাদী ও আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতিতে সব কিছু তুলিয়ে দিয়েছে, পুঁজিহাটী তর-মরে পরোককরণপুঁজি জবরদস্ত প্রকাশন কার্যে করেছে। এরা উর্দুপরা খানসামাও বটে, আবার বাস্তবপুঁজিও বটে; মার্কামারা, অতএব অজ্ঞাতকুলশীল নয়, ওরা বহুদূর এক পা গলিয়ে দিয়ে আছে; দৃষ্টি বহুপরিচিত। দৃশ্যভরে 'প্রোগ্রেসিভ'-রা—নয়াপুঁজিবাদের বেজার-চিহ্ন 'গোপাল'রা—সিংহাসন থেকে দূরে হলেও রাজদরবারে ব্যক্তিব্যক্ত—'শ্রমিক-শ্রমিক নেতৃত্বের' কথা শুনাতে 'শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী'র ইচ্ছা ব্যক্ত করতে। অবশ্যই এরা খবর রাখে, অভ্যুদয়ে যারা একাজে হাত দিয়ে-ছিল তারা মালিক-রাজ উৎখাত করেছে; অতএব একপ কাজের প্রতিশ্রুতি কবুল না করলে জনতার কাছে কলকে পাওয়া যায় না। অতএব, কলগুণ্ডি একপ মানুষকে আশাবাদী করে তুলতে হবে সাম্যবাদী নয়; নিজেরাও 'কমনসেন্স'-বাদী হয়ে বাঁচতে হবে, সাম্যবাদী নয়; ভোটবুকের জন্ত জনগণকে জোটবদ্ধ করতে হবে, কিন্তু জোটে জোটে একজোট হয়ে রাজনৈতিক গণজোট হলে সমূহ সঙ্কট—স্ববিধা-খড়-মাটি বেরিয়ে পড়বে, তাদের বর ভেঙ্গে পড়বে; আধা-শুণনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে কৃষকের স্বার্থ বা শ্রমিক-কৃষক উত্তরের স্বার্থে শ্রমিক শ্রমিক লড়াইয়ের যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও স্বযোগ রয়েছে সেগুলি যেন দলের অগোচরে থাকে; শ্রমিক শ্রমিক নেতৃত্ব যেন রাজনৈতিক না হয়; বরং পাতি বুর্জোয়ার সবাই 'প্রোগ্রেসিভ' হলেই শ্রমিক শ্রমিক যুগ্মে যুগ্মে 'নেতৃত্ব' ভোগ করতে পারবে। এভাবেই হাতে এসে পড়েছে তিন-তিনটি 'সরকার', আর তেইশটি হলেই বাস

—নটান দিলী। কবলের রূপরেখার সমাজতন্ত্রের 'কমনসেন্স' বসনা তরঙ্গে ধোঁল খাবে। এমন প্রতিভা আর দূরদৃষ্টির ক্ষরণ ঘটে নেই শিকাজীবনে অর্থাৎ ক্রীম-ভাগ্যে করে-খাওয়ার প্রস্তুতিপর্বে (রোগীবিরোধী কর্মবিষয়িত্তে কার্যেই স্বার্থকর্মের সহযোগীদের মধ্যে এ দেশীয় 'বামপন্থী' ডাক্তারী-ছাত্র সংগঠনগুলিও থাকে), বংশ পরম্পরায় তা আরো বনীকৃত হয়, আরো শাঁসালো সর (Cream) বাঁধে। বিংশ শতাব্দীর অন্ত্য অতিশয়গুলোর মতই অধঃপতিত পাতিবুর্জোয়া শক্তিও সমাজবিপ্লবের বিরুদ্ধে একটা তর-তাজা অভিযান। কৃষপন্থী বুজি-বুজির ঠাঁঠেঠাঁয়ে বামপন্থী ইমেজ রক্ষার কাজে যারা তুণ্ড তারা বড়জোর মালিকানার সংশোধন চাইতে পারে কিন্তু পুঁজি সংগ্রহের বাজারে হাত পাততে অভ্যস্ত ভার-তীয় পাতিবুর্জোয়া শক্তিগুলো এক-রাশি অরাজ্জির্ণ 'প্র্যাগ্-মেটিজম' কে নানা রাজনৈতিক কসমেটিকসে মাজিয়ে নিতে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছে। অথ ক্রীম-কীর্তি 'বাম-ইমেজ'!

প্রচলিত রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পাতিবুর্জোয়ার একাংশ সহজেই শিকা-সামন্তিক ও রাজ-নৈতিক নেতৃত্ব ভাগ করে নিয়েছে। একপ নেতৃত্বের গুণাগুণ ও ফলাফল বিচারে প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হলো: এদের 'লাইন' কি? এরা কি দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামন্তিক ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর নেতৃত্বকে, এমন কি পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্বকেও ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই জনগণের উত্তোগ-গুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট, এবং এ পথে নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে দীর্ঘযায়ী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম? স্বভাবতই, শ্রমী সংগ্রামের প্রলে-তারীয় যুগ দেশী বিদেশী পুঁজির দালালদের সম্পর্কে গণনির্ভরতার এ প্রশ্নটি ওঠে না।

যারা দেশী বিদেশী পুঁজি-শাসনের ধর্মে কর্মে জীবনপাত করছে, তাদের একাংশ দেশী-বিদেশী পুঁজির জন্ত লুটের বাজার স্থিতির প্রয়োজনে রাজনৈতিক ও সংসদীয় আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা করে, আর এ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে রাজস্ব আদায়ের ও সমস্ত দমন ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়ার উদ্ভূত ও নিশীড়িত শক্তিগুলি আত্মরক্ষার তাগিদে যখন বিদ্রূত হয়ে ওঠে, তখন স্ববিধাবাদের স্বখটানে বুঁদ হয়ে থাকা পাতি-

বুর্জোয়া অপরাধশক্তি সাধারণ মানুষকে সংগঠনের কাজে এগিয়ে আসেন, যাতে এ বিদ্রূত জনশক্তি লক্ষহীন এলোপাখাড়ী আন্দোলনে শক্তিকর করে, যাতে বাস্তব সংগ্রামের গতি-শীল কর্মসূচী ও লাইন গড়ে উঠতে না পারে, যাতে জনগণ গোপীতে গোপীতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন থাকে, আর এ বিচ্ছিন্নতার বলয়ে আইনী 'মুশকিল আসান' খুলে বেড়ায়। সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ অন্তত পাতিবুর্জোয়া 'ম্যাক্‌তারিং' যতদিন অব্যাহ থাকে, ততদিন যুব সমাজের দায়দায়িত্বজ্ঞান-হীন আদর্শহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট অংশগুলি যদি গোলাবাজার পথ ধরে তাহলে সে গতিরোধেরও কোন আইনী সূত্র থাকে না, থাকতে পারে না; পাতি-বুর্জোয়া লেজুড়-বুজির বেড়াঝালে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যার সমাধান জড়িয়ে রয়েছে সমস্যাগুলির ঘরঘরোয়।

শেষ রাস্তা, শেষ যাত্রা

মনে রাখতে হবে: জাতীয় পুঁজিবাদ গড়ে তোলার যুগ এখন ইতিহাসের বস্তু। আর কোথাও এ যুগে একপ, কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। একপ প্রচেষ্টা মাঝেই এঁচোড়ে পাকতে বাধ্য, একেত্রে সামন্ত বিরোধিতাও নিতান্তই পছ ব্যস্তির আফালন হয়ে থাকবে। হয়েছেও তাই।

এঁচোড়ে পাকা নয়া-পুঁজিবাদ ও আধাসামন্তবাদের মধ্যকার বন্ধ-গুলিকে আশ্রয় করে নয়া পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণী-খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বন্দে লিপ্ত হয়েছে, তা বর্তমান ভারতীয় ইতিহাসের পাতার পাতার স্থম্পট। অতএব, নয়া পুঁজিবাদ ও আধা সামন্তবাদ উভয়েই টিকে থাকার জন্ত ছটফট করছে এবং তা বেপরোয়াভাবে—অবশ্যই বিদেশী পুঁজি শক্তিগুলির সঙ্গে দেশী বাজারটা ভাগ করে নিয়ে এবং ইং-মার্কিন কৃষ শিবিরগুলির আন্তর্জাতিক ষ্ট্র্যাটেজী ও 'প্র্যাগ্-মেটিজম'-এর সঙ্গে যথাসাধ্য সামন্ত বজার রেখে। দেশী ও বিদেশী স্বার্থশিবিরগুলির মধ্যকার এ 'মিটি মিটি খাট্টা খাট্টা' বন্ধগুলির মধ্যেই নিহিত আছে এদেশীয় রাজনীতিতে তাদের নিজ নিজ লবী গঠনের রহস্য। এ বন্ধ-গুলিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এদেশীয় ডান আর বাম, ডানের বাম, বামের ডান হলগুলি। এরা কেউই মানতে চায় না দেশী নয়া পুঁজিবাদ ও আধাসামন্তবাদের জাতীয়-চরিত্রহীন কৃষিকাকে, এরা কেউই দেখতে পায়

না সাম্যবাদী শিবিরগুলির উপ-রোক্ত নিয়ামক কৃষিকাকে; তেমনি দেখতে পায় না উপরোক্ত অপকীর্তি-গুলির প্রধান সংগঠকরূপে প্রচলিত এ সংসদীয় ব্যবস্থাকে। এদের স্বপ্নের প্রধান বিষয়বস্তুটি হলো—পশ্চিমী শিবির কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় শিবির অথবা উত্তর শিবির? অর্থাৎ পরিজাতারূপে বিশ্বব্যাপ্ত সহ পশ্চিমী পুঁজি অথবা কৃষ শিবিরের রাষ্ট্রপুঁজি? কলত: এদের রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন পুঁজি-আনুষ্ঠানীয় উৎস সম্পর্কীয়, অতএব প্রধানত: বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে। এ সমস্ত অপকর্মের জন্ত এরা সকলেই শ্রমিক-কৃষককে ভাবে টানতে চায়—অতএব সংসদীয় ব্যবস্থা এবং নির্বাচন। যারা বাম-ডান আরো এক কাঠি সরেস—এ সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে তারা পর্যন্ত গণতন্ত্রের ধোঁয়াব দেখে। গণতন্ত্রের মানেটাও তেমনি প্রাজ্ঞ—ঠগ-বাছতে অব্যাহ ভোটাদিকার আর গাঁটের কড়ি গজা দিয়ে 'কাণ্ড-মেটোল রাইট' সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় অধিকার।

মানুষ তাহে তার শ্রেণী চিন্তা আর জেন-গম্বী অল্পমাত্রী। দুঃখের বিষয় আমাদের বাম তৎকমা-জাটা মনীষীরা জেনেওনেই মানেন না যে পরিপূর্ণ বুর্জোয়া গণতন্ত্র বস্তুটি পূর্ণা-বয়ব জাতীয় পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অবস্থান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বর্তমান মরণ দশায় আর কোথাও নবজীবনে দেখা দেবার কোন উপায় নেই—পুণ্যকৃষি ভার-তেও নয়। অর্থাৎ যা এঁচোড়ে পাকে তা পর্যন্ত কাঠাল রূপে কখনও দেখা দেবে না—এবারে শুধুই তার পচনের পালা, মুহূঁ প্রাণে আর ঘোবন আসে না, ঠৈগব তো নয়ই—তা সে ডলার গুণেও না, রুবল গুণেও না। অতএব, পুঁজিবাদের 'ক্রীমরস'-ও এতৎসহ কেবলই পচছে।

কিন্তু 'হাতী'-বুর্জোয়া পাতি-বুর্জোয়ারেই-ইমলে চলবে কেন? অতএব, বহির্জগৎ থেকে অবিরাম 'transfusion blood' আসছে—শিল্পপুঁজি ঋণ, মহাজনী ঋণ, সামরিক ঋণ, উন্নয়ন ঋণ, ঋণ মেটানোর জন্ত ঋণ ইত্যাদি। শত শত পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা বর জামাই হয়ে এসে বংশ বিস্তার করছে। সর্বদর্শী ক্রীমগণ এ উপায়ে অর্থনীতির নীচকাঠামোকে বিস্তার করতে আর রাজনৈতিক সামন্তিক উপরিকাঠামোকে উন্নত করতে অটল বিশ্বাসী; বিতর্কটা শুধু পশ্চিমী আর কৃষী উৎস সম্পর্কীয় আপেক্ষিক লাভালাভের অর্থাৎ প্রকৃত আনু-নির্ভর অর্থনীতির বাস্তব উপায় সম্প-র্কিত নয়। তাহলে প্রশ্নটি হচ্ছে: যারা সমাজহেঁহে নিতান্তই উপজীবী

হয়ে কয়রোপের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে, তারা 'ক্রীম' না ক্রিমি? অপকর্ম ছাড়া এদের আর কর্ম কোথায়? পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্ব রাজনীতি-বর্জিত 'বাম অর্থনীতি' কোন অর্থ-নৈতিক হুঁরাহা এনে দেয়না, রাজ-নৈতিক মুক্তির কোন প্রশ্ন তো আর্থী আসে না। উপরন্ত এরাপ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব থেকে অর্থাৎ জনগণের অন্ত্য অংশকে-নেতৃত্ব দানের কৃষিকা থেকে বিচ্যুত করে। বিশ্বের বুর্জোয়া ও নয়া-বুর্জোয়া শিবিরগুলি এটাই চায়। ভারতীয় নয়া পাতিবুর্জোয়ারাও ঠিক তাই করে যাচ্ছে। তাহলে এরা কারা? এরা রাজনৈতিক বামপন্থী না 'অর্থনৈতিক বামপন্থী'? চরম স্ববিধাবাদী অর্থনীতিবাদের পথে সাম্যবাদীদের দালালী, অথবা অন্ত-কথার—ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজি-বাহ বনাম রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি-বাদের প্রশ্নে পশুপ্পর বিরোধী আনু-গত্যের বিরোধ। কিংবা আরো সরল কথায়: পশ্চিমী নির্ভরতা বনাম কৃষ-নির্ভরতার প্রশ্নে জনগণকে বিভক্ত রাখা, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে রাখা বৈ আর কিছুই নয়।

সুতরাং দেশী-বিদেশী পুঁজি-মালিক ও দেশী শ্রমিকদের মধ্যে একপ 'অর্থনৈতিক লড়াই'-য়ের ষ্ট্র্যাটেজী বাদের মর্শন হয়, রাজ-নৈতিক 'অবতরকটিভ ডিভিশন' বাদের চোখে ধরা দেয় না। ফলত: পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অবিরাম, ঘটে, যুগ্মাফীতি স্বায়ী হয়, দেশের অসংগঠিত জন-গণের হর্বলতর অংশগুলি বিবেচ্য: গ্রামীণ জনগণ আরো তীব্রভাবে শোষিত হয়; কিন্তু এ অবস্থায় নিজে-দের জন্তে কখনো কখনো 'মজুরী-বৃদ্ধির ছিঁটেফোটা স্বার্থ' চেয়ে নিয়ে শ্রমজীবীরা যখন আগামী দিনের আরো বৃহত্তর সঙ্কটের পথ করে দেয়, শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



ফ্যান্টাস্টিক বিক্রেতার জন্ত তারতের সর্বত্র একেই চাই

আওয়ারা মমীহা মিহির আচার্য

প্রখ্যাত হিন্দি লেখক বিষ্ণু প্রভাকরের বাঙালী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের স্তম্ভীর্ণ জীবনীগ্রন্থ, যা জনপ্রিয়তার হিন্দি পাঠকমহলে তো বটেই, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার অনুদিত হয়ে অসংখ্য মৌলিক তুলেছে।

আওয়ারা অর্থ ভবঘুরে, মমীহা অর্থ জাপকর্তা। নামকরণের অপরূপ ব্যঙ্গময় বাঙালী লেখক সম্পর্কে বিষ্ণু প্রভাকরের প্রচণ্ড, বিস্ময়, অগাধ প্রেম এবং অনড় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। দায়দারী গজলগতিক জীবনী নয়, দাক্ষ্য, প্রমাণ এবং প্রত্যেক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। বিষ্ণু প্রভাকর স্বজনশীল লেখক বলেই তৃতীয় নেত্র দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবন এবং সাহিত্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা তথা সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করেছেন। এ জাতীয় প্রামাণিক হালিঙ্গ সৃষ্টি করার পরজন্মে তিনি শিক্ষার্থীর মতো বাঙালী ভাষা শিখেছেন, মূল শরৎ সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন, শরৎ-

সম্পর্কে প্রাণ্ড তথ্য সংগ্রহ করেছেন, শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী, বাগদান, দে ভাগলপুর-মজঃকরপুর হোক কিংবা দেবানন্দপুর বাজেশিবপুর, পানিআস, পণ্ডিতিয়া অথবা বর্মী মূলক পর্বত ছুটে গেছেন। তিনি বস্তুতই লক্ষ্য করেছেন, যাকে বলে তন্নিত জীবনী, তা মূল বাঙালী ভাষাতেও পাওয়া যায় না। জীবনীর নাম করে স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে যা মেলে, তা কাল্পনিক মনগড়া কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এর কারণ তিনি স্বীকার করেছেন জীবনের নাম করে এ জাতীয় গল্প কথার প্রচারের ক্ষেত্রে স্বয়ং শরৎচন্দ্রও বহুল পরিমাণে দায়ী। শরৎচন্দ্র নিজেই একে একে সময়ে একে একজনের কাছে বানিয়ে বলে লোকচক্ষে সত্যমিথ্যা ঘুলিয়ে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র জীবন-শান্তেও তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলিকে কাটিয়ে দেবার কোনোরকম চেষ্টা করেননি। বরং ধাঁধাগুলোকে তিনি জিইয়ে রেখে নীরবে কৌতুকস্বপ্ন উপভোগ করছেন। তাঁর সম্পর্কিত বাতুল স্বরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী লেখার উদ্দেশ্য প্রচেষ্টাকেও তিনি

লাগান টেনে সংযত করবার চেষ্টা করেননি। স্বরেনবাবুর জীবনী যে অনেকটাই মনগড়া আভ্যন্তরীণ গবেষণার তার বহু সারাস্বক প্রমাণ ধরা পড়েছে। আন্ততঃ্য মুখো-পাধ্যায়ের পরিবারের উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির ভাণ্ডারী ছিলেন, তাঁর সাম্প্রতিক কিছু রচনার সেই ভুলগুলি তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে স্বরেনবাবু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকালীন



যে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা মিথ্যা শুধু নয়, নিজেকে আহাশ্বকের মতো জাহির করবার হ্যাংলামো ছাড়া কিছু নয়।

মৌভাগ্যের বিষয়, স্বরেন্দ্রনাথের গ্রন্থ অধ্যয়ন করলেও বিষ্ণু প্রভাকর যে সর্বদায় তাঁর সাক্ষ্য আঁচা রাখেন নি সেটা আভ্যন্তরীণ পাঠকের পক্ষে আনন্দের কথা। গ্রন্থ রচনা প্রক্রিয়ায় তিনি যে উমাপ্রসাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন সেটা তাঁকে রক্ষা করেছে। এছাড়াও গোপাল-চন্দ্র রায় ইন্দ্রানী শরৎ-জীবনী লিখে নাম করেছেন, যদিও অমন একটি শরৎ-প্রতিভাকে বোকার জন্তে গোপালবাবুর স্বজনশীল শক্তি লক্ষিত হয় না। যখন দেখি 'মহেশ' গল্পে গোপালবাবু শরৎচন্দ্রের পুণ্ড্রীতির অসঙ্গত নিদর্শন ছাড়া কিছু দেখতে পাম না। 'মহেশ' গল্প যে উৎখাত চাবির প্রমিতজীবনে উদ্ভরণের ঐতিহাসিক হালিঙ্গ, সে লম্বাজভাবিক ধারণাই তাঁর নেই। বিষ্ণু প্রভাকর গোপালবাবুর রচনারও সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু প্রভাবিত হননি।

বিষ্ণু প্রভাকরের এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি বাঙালী ভাষাতেও অনুদিত হয়ে বেরিয়েছে। অস্বাভাবিক করেছেন দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল। অস্বাভাবিক সে-দায়িত্ব পরম যোগ্যতা ও প্রকার সঙ্গে পালন করেছেন। কিন্তু আশা প্রকাশনী বই বাধাইয়ের ফরমা উল্টা পাট্টা করে যে অস্বস্তি চিহ্ন রেখেছেন তাতে শরৎচন্দ্রের প্রিয় বাঙালী পাঠক বিরজিই প্রকাশ করবেন। প্রথম খণ্ডটি ইতিমধ্যে বেরিয়েছে। দাম আঠারো টাকা। দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্তে আমরা উদ্বিগ্ন। এই সুযোগে প্রভাকরজীকে এই মহৎ শিল্পকর্মের জন্তে আশীর্বাদ অভিনন্দন।

‘মধ্যাহ্ন’ পত্রিকার নতুন সংখ্যা

শৈলেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ‘মধ্যাহ্ন’ পত্রিকার একটি সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা এই ধরনের দিগ্নিয়াম পত্রিকা প্রকাশের পক্ষে অস্বস্তিকর নয়। একদিকে যেমন ছাপার খরচ ও কাগজের দাম অসম্ভব বেড়েছে তেমনি অধিকাংশ পাঠকের তরল কৃচির ফলে এর প্রচার সংখ্যা নীমিত। আর ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রতি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিরূপ মনোভাব তো সফল হয়ই জানি। তা সত্ত্বেও সম্পাদকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ‘মধ্যাহ্ন’ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তথ্যসমৃদ্ধ, বিতর্কমূলক ও গুরুগম্ভীর আলোচনা লম্ব প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান সংখ্যাটি পত্রিকার ১১শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা।

এই সংখ্যা শুরু বিশেষ কাম্পুচিয়া ক্রোড়পত্র দিয়ে। প্রথমেই দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্র—‘নয়া-জারের নয়া নাটক’ এবং ‘নয়া-জারের বক-দানব ভূমিকা’ যাতে সোচ্চারিত ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা ফুটে উঠেছে। তাছাড়া আছে ভিত্তেভনাম, হার্কিন-চীন, মানব অধিকার ও আমেরিকা প্রসঙ্গে পল পটের বক্তব্য। অন্ত্য প্রবন্ধে পল পটের আমলে কাম্পুচিয়ার অবস্থা, ভিত্তেভনামী হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক পেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধ পরিস্থিতি, কাম্পুচিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। সম্পাদক স্বয়ং একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া লিখেছেন কাম্পুচিয়া নিয়ে।

দ্বিতীয় পর্বে আছে তিনটি প্রবন্ধ, তিনটি গল্প ও নাইজিরিয়ার একটি একাক্ষ নাটকের অস্বাভাবিক। ‘শরৎচন্দ্র কি আধুনিক?’ প্রবন্ধে অশোক দাস শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। হোমার বিখ্যাত ‘লোকসঙ্গীত সমীক্ষা’ গ্রন্থ সম্পর্কে পূরেশ ধরের আলোচনা তথাকথিত প্রগতিশীলদের বিশ্রান্তিমূলক চিন্তা-ধারার একটি উদাহরণ।

মে দিবস উদযাপন

জলবায়ু প্রাকৃতিক চুর্যোগের মধ্যেও বেলগাছিয়ায় ২২ নং শহীদ কলোনির শিল্পকলা শিক্ষামন্দির প্রাঙ্গণে গত ১১ই মে অপরূপে মধ্যাহ্ন সাহিত্য পত্রিকা তার একাদশ অধিবেশনে মে-দিবস উদযাপন করল। মূল সভাপতি হিসাবে বৃত হলেন প্রখ্যাত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী পি জি পাঠী। মে দিবসের গান দিয়ে উদ্বোধনী

দলীত পরিবেশন করলেন কল্যাণ রায় ও আন্ততঃ্য দান। তারপর প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্ততম স্বতন্ত্র ঐশ্বর্যাদিক ও প্রাবন্ধিক অচ্যুত গোস্বামীর অংশে জুমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। লেখক অচ্যুত গোস্বামীর স্মৃতিচারণ করেন মধ্যাহ্নের সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসু।

সত্যায় ‘বামপন্থী সাহিত্য ও বামপন্থী রাজনীতি’ বিষয়ক আলোচনা হিন্দি ভাষার কবি ও প্রখ্যাত রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী পি জি পাঠী তাঁর স্বললিত বাংলা ভাষায় বিপ্লবী সাহিত্যের ধারার সঙ্গে বামপন্থী চেতন সম্পন্ন মাহুদের একেবারে উপর জোর দেন। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী পত্রিকা যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁরা যদি লম্বিলিত মঞ্চে উপর দাঁড়িয়ে কাজ করেন, তবে বামপন্থী রাজনীতি একটা অসুচোরা মেবে। আলোচনার মধ্যে শ্রীধরম বিশ্বাস বিপ্লবী সাহিত্যের চেহারার জন্ত দেউলিয়া রাজনীতি-বিষয়ের দায়ী করলে শ্রীজি পাঠী দেউলিয়া রাজনীতিবিষয়ের দায়ী করছেন না বলে জানান। এরপর তিনি বলেন জুন মাসে ত্রাশনাল ডেমোক্রাটিক কালচারাল ক্রকের একটি সম্মেলন হতে যাচ্ছে। বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের একেবারে সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে attitude বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্ত অনেক বামপন্থী হল একত্রিত হতে পারছেন না। তবে কাজ অনেক। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন যে কোথায় লেখা আছে যে কাজ এগোতে কেবল গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে? বা সংগঠনকে সর্বদাই গোপন রাখতে হবে? দেখা যাচ্ছে ৬৭’র পরে একটি প্রমিত সংগঠন ৪৫টি উপদলে বিভক্ত হয়েছে। বস্তুত নতুন সঠিক বিপ্লবী দল না এলে পুরানো নেতারা বিপ্লবের পথে অস্বস্তায় হয়ে দাঁড়াবেনই।

বেহালার দৌরাভ্য

৪র্থ পৃষ্ঠার পর নেই। পলিটিকাল প্রেসারে আমরা কোম কাজ করতে পারিনি।

ওনেছি বেহালার কয়েকটি এলাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট গণদরখাস্ত পাঠানো হয়েছে। যার অস্বলিপি দেওয়া হয়েছে জেলা শাসক, আরক্ষ্যক এবং স্বাদীয় বিধায়কদের। এবার হয়ত কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। অন্তত শান্তিপ্রিয় বেহালার বিশিষ্ট অধিবাসীগণ তাই মনে করেন।

প্রকাশিত হলো

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

আলোর ফুলকি

দেড়শো বছরের ধারাবাহিকতার সেকাল ও একালের প্রবীণ ও নবীন দেড়শোজনেরও বেশি লেখকের রচনার সমৃদ্ধ বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অভিনব সংকলন। বারোজন প্রখ্যাত শিল্পীর বারোটি বছরভা আর্ট প্লেট সংলগ্ন। বিশিষ্ট শিল্পীদের অলংকরণে প্রতিটি রচনা চিত্রিত। পনেরো টাকার অফসেটে দ্বি-বর্ষে ছাপা পাঁচশো চল্লিশ পৃষ্ঠার বই।

* যারা কলকাতার বিতরণ শাখা (২৩, আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-১, পঞ্চমতল) এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলা তথ্য অফিসে গ্রাহক হয়েছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে গ্রাহক কুপন দেখে ১০ই জুন থেকে (বেলা ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত) বই দেওয়া হচ্ছে।

* অভ্যন্তর-জেলায় যারা গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসে গ্রাহক কুপন দেখিয়ে আগামী ২০শে জুন থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন।

* যারা কলকাতার বিতরণ শাখায় মানিঅর্ডারে গ্রাহক-মূল্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে। মানিঅর্ডারের রসিদ ও উক্ত চিঠি দেখে বিতরণ শাখায় ১০ই জুন থেকে বই দেওয়া হচ্ছে তবে আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে বই সংগ্রহ করা না হলে ভি পি পি করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের কাছে বই পাঠানো হবে। লক্ষ্যে যে ভি পি পি খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

নতুন করে আর গ্রাহক করা হচ্ছে না।

ক্রীম অব দি মোসাইট

১ম পৃষ্ঠার পর

যাওয়াভী ভুল করে, তখনও সংগ্রামী প্রগ্রেসিভরা' নিজের নতুন 'পাকলো' মুখ হয়ে থাকে।

নাকল্য অর্থাৎ ছিটে ফোটা কিছু জুই বাড়িয়ে নিয়ে এ দারুণ মুজা-কীতির জালাকে কিছুটা গা-সহা করে আনার সাফল্য। দেশের কোটি

কাটি দরিদ্র চাষী ভূমিহীন হয়েছে, কিন্তু শিল্প শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। তিপুর্বে সামাজ্যই, এখন কেউ হয়

না। বছরে বছরে শত সহস্র দরিদ্র ঝাড়বানী পেটের দ্বায়ে দেশত্যাগী হয়েছে বা চালান হয়েছে—দান-জ্বর রূপে। স্বভাবতই 'প্রগ্রেসিভরা'

মিষ্ট-কৃষক-আদিবাসীদের এ জীবন-কটকে কোন রাজনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতি বলে জান করে না। একই

কারণে ওরা পাটচাষীদের বার্ষিক আন্দোলনে চটকল শ্রমিকে ধর্মঘট করাতে সচেষ্ট হয়নি, কিংবা ভূস্বামী-

দের এমন কি দেশী বিদেশী পুঞ্জি-লিক্‌দের সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-জির 'টাইট'-গিরিকে প্রতিরোধের

বী নিয়ে, শ্রমিক-কৃষকের লাগা-গার প্রতিরোধ সংগঠন করতে উৎ-সাহী কিংবা সাহসী নয়, কোন-

পালেই ছিল না।

অতএব, 'ক্রীম' রা' সত্যিকারের ক্রীম: তবে প্রগতির নয়, প্রতি-ক্রিয়ার; সমাজের নয়, নৈরাজ্যের; শিক্ষা-সংস্কৃতির নয়, অশিক্ষা-অপ-সংস্কৃতির।

অতএব, 'ক্রীম'-বাদ একটা গুরু-তর রোগ, ক্রীম রা' বিক্রীত-মগল বিক্রীত-চরিত্র রোগী। এ রোগ আর

রোগী উভয়বস্তই এখন চিকিৎসার বইয়ে। রোগী নিজেই তার রোগ-টাকে আঁকড়ে থাকতে চায়, এ রোগ আর রোগী উভয়েই উভয়কে চায়,

একে অপরকে বাদ দিয়ে বাঁচে না। আসলে 'হাতী' বুর্জোয়াদের দোলায় বসে যে আমীরী মেজাজ মজি তারা

আহরণ করেছে, যে অনাচারী ব্যবস্থাকে তারা প্রাণপণ চেষ্টায় গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থাটাই আজ তাকে

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে দালাল-জুলালরা পাতিবুর্জোয়া 'গোপাল'-গণ হাতী বুর্জোয়াদের

একই খাটে চড়ে একই খাটে ঝাণা-বাসী হতে চলেছে। শেষ বিচারে একই কথা: একালের রথী, পর-

কালের সাথী; এমন বন্ধু আর কে আছে?

সমাজদেহকে কত-বিকৃত না করে যারা বাঁচতে পারে না, ঠাই পেলে আর লাই পেলে তারা সমাজ-

দেহে কত সৃষ্টি করবেই। এ কাজ করতে পারলে তারা শুধুই বাঁচবে না, স্রীতিমত তালেবর হয়ে বাঁচবে। অতএব, Scab-রা Scabies রচনা করবেই, আর Scab-গুলিকে পালন করবে তাদের সৃষ্ট Scabies—এটাই নিয়ম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পতিশীল ইতি-হাসের বিচারে যারা মৃতপ্রাণ বলে ঘোষিত, তাদের 'মমী'-গুলির উদ্ধৃত অবস্থানকে সত্য সত্য করবে কেন? এবং করবে না।

সঞ্জয় গান্ধী

১ম পৃষ্ঠার পর

যদিও ইন্দিরাজী আসল উদ্দেশ্য ধাপে ধাপে সঞ্জয়কে কমতার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করা। যেমনটি করে-

ছিলেন নেহেরুজী তার বেলায়। কিন্তু বিপতকালের শিকা থেকে ইন্দিরাজী এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা

সতর্ক। তিনি এমনভাবে ছেলেকে রাজনীতির পাদপ্রদীপে আনতে চান না যাতে লোকের ধারণা হয় যে,

বংশাধিকারিক শাসনকে তিনি প্রতিষ্ঠা করছেন।

দলের এখন যারা প্রভাবশালী অর্থাৎ তরুণ তুর্কীরা দাবী তুলেছেন তাদের নেতা সঞ্জয় গান্ধীকে দলের

মতাপত্তি করতে হবে। আবার কারও কারও দাবী সঞ্জয়কে যদি এখন একান্তই মতাপত্তি না করা হয়

তবে দলের সেক্রেটারী জেনারেলের পদটি যেন তাকে দেওয়া হয়।

এ আই সি সি সন্মেলন না ডেকে দলের মতাপত্তির পদের রদবদল খুব

দুশ্বব হবে না। বর্তমানে দলের সেক্রেটারী জেনারেল সহ দুটি

সাধারণ সম্পাদকের আসন শূন্য। কারণ সেক্রেটারী জেনারেল হেমবতী

নন্দন বহুগুণা হল ছেড়ে দিয়েছেন আর দুই সাধারণ সম্পাদক এ আর

আন্তুলে এবং বুটা সিং বধাকমে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয়

মন্ত্রিসভার রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। অতি উৎসাহী সঞ্জয় অহুগামীরা

সেক্রেটারী জেনারেলের পদপদে এখনই তাদের নেতার অভিষেক চান। কিন্তু উৎসাহী সঞ্জয় দমর্ষক-

দের এ দাবী ইন্দিরাজী মানবেন কি না সন্দেহ আছে। ইন্দিরাজী চান সংগঠনে সঞ্জয়ের আবির্ভাব ঘটুক এ আই সি সি-র অধিবেশনের প্রস্তাব

শত্রু সম্পত্তি

১ম পৃষ্ঠার পর

আছে। একজন কার্টোডিয়ান এবং একজন সহকারী কার্টোডিয়ানের অধীনে কয়েকজন কর্মচারী এই সব

শত্রু সম্পত্তি দেখা শুনা এবং তদারকী করে থাকেন। এই অফিস থেকে আরো জানা গেছে, যে, বিভিন্ন

জেলার শত্রু সম্পত্তিগুলি জেলা শাসককেই দেখা শুনা এবং তদার-কীর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, কতকাতার অধি-কাংশ শত্রু সম্পত্তিগুলিতেই নানান

দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং ব্যক্তিচারের আড্ডাখানা চলছে। ১০ নং ইন্সট্রাক্ট

রোডের শত্রু সম্পত্তি নামে বাড়ীটি তার জসস প্রমাণ। এই বাড়ীর

নীচের তলাটি একজন অবাকালী ভাড়া নিয়ে সেখানে কয়েকটি পাটি-

শন করে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে আবার কয়েকজন উপ-ভাড়াটিয়াকে

ভাড়া দিয়েছে। তার মধ্যে স্ত্রী তরুণীও আছে। ওখানে নানান

রকম অসামাজিক কাজ লহ দেহ বিক্রীর কারবার চলছে বলে অভি-

যোগ পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে কার্টোডিয়ান অফিসের কিছু কর্ম-চারী এবং পুলিশ ওতপ্রোতভাবে

জড়িত আছে। এদের নিয়মিত মতাই এই সব কাণ্ড চলছে এবং শহরের

নামী দামী লোকদের একটি অংশও প্রায় প্রতি রাজ্যেই ওখানে যৌন

লালসা চরিতার্থ করার জন্য যাতা-য়াত করছে।

এসব বলা দরকার-শত্রু সম্পত্তিগুলি সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ আরো পাওয়া গেছে।

দর্পণের পক্ষ থেকে আমরা যাচাই করার ব্যবস্থা করেছি। দরকার হলে

পরে আমরা আরো বিস্তারিত প্রকাশ করব। ওয়াকিবহাল মহল

বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দূর-সূরি নিয়ন্ত্রিত এই সব শত্রু সম্পত্তির

বাড়ীতে যে ভাবে উপ-ভাড়াটিয়া বসিয়ে কাণ্ডকারখানা চালানো হচ্ছে

তাতে কলকাতা পৌরসভারও আর্থিক লোকসান হচ্ছে। কারণ, এই বাড়ীগুলিতে যদিও ভাড়া বাবদ প্রচুর টাকার লেনদেন হচ্ছে, তথাপি পৌর কর্তৃপক্ষ এর খবর কিছুই জানেন না। জানবার সুযোগও নেই। সবই চোপে যাওয়া হচ্ছে।

ব্রিটেনে প্রতিবন্ধী

২য় পৃষ্ঠার পর

আইন চালু হবার পর থেকে গত চৌদ্দশ বছরে সরকারী পরিদর্শকরা

মাত্র দশটি অভিযোগ দায়ের করেছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩%

চাকরি সংরক্ষণের কোটা যে সকল কোম্পানি লঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে

সাজা করা হয় না। ভারতের মতোই টু পাইলের বিনিময়ে কোম্পানি

সাজা করা ছাড় পায়। দেখে শুনে প্রতিবন্ধী ও অক্ষরাত্তর এখন আর

তাদের জন্য রক্ষিত বিশেষ খাতায় নাম লেখাতে প্রস্তুতও যেতে সাজা

হয় না। জানি না, আর একটা বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে লন্ডনের রাজ্য

অফিসের মিছিলে যার্মায়েট থ্যাচারের পুলিশ দিল্লির রাজ্য ইন্দিরা গান্ধীর

পুলিশের মতো বেপরোয়া লাঠি চালাবে কিনা।

চীন আমেরিকা

১ম পৃষ্ঠার পর

ভাষণে হজরত একথা বলেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্ত-

ক্ষেপের পর থেকেই যার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক

ধারাপ দাঁড়ায়, তাই আমেরিকাও সমদুঃখ ও সমমনোভাব না রেখে-

একটু চীনের কাছে এগিয়েছে। জানি না, এরফলে দেশে দেশে

বিপ্লবীদের চীন সম্পর্কে আজ সংশয় বাড়ছে কিনা।



ইস্টার্ন সিমেন্ট মিলস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নেয়াক কাজের জন্য ই সি এস / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অধুমোচিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে টেণ্ডার ১৫, কাজের নাম এবং টেণ্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে দফাওয়াতী ত্রিভিক্তিক / পার্সেক্টেজ ত্রিভিক্তিক নীল করা টেণ্ডার :

নির্মাণ ও সরবরাহের কাজ

টেণ্ডার নং : ২৮০ তাং ২১-৫-৮০

নেয়াক কমপোজেন্ট ও সম্পূর্ণ এসেমব্লি সহ ১৫০ সেট বাই-কেবল রোপণের শিকেরের জন্য :—(১) হুইল সহ সম্পূর্ণ ৬০১৬ ক্যারেজ অ্যাসেমব্লি (২) হালার ও বাকেরট। (৩) ক্যারেজ জটিল জিনিষ। যাদের উপরিউক্ত জিনিষের এবং

বিশেষ করে ৬০১৬ ক্যারেজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও কারিগরী জ্ঞান আছে ঠারাই কেবল দর দেবেন। কর্তৃপক্ষ নির্মাণের কোন ড্রিং সরবরাহ করবেন

না। কর্তৃপক্ষ যেমন ও যখন চাইবেন টেণ্ডারদাতাদের সেই রকম ড্রিং দিতে হবে।) কেশিয়ার / অ্যাকাউন্ট অফিসারের কাছে প্রতি সেটের জন্য

প্রতি ২০ টাকা দিয়ে সমস্ত কাজের দিনে প্রতিদিন বেলা ১টা পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারের অফিস (সি এস অ্যাণ্ড আর), জে কে রোপওয়েজ,

পাঃ কাঙ্কোরাগ্রাম, বর্ধমান থেকে টেণ্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ১৭-৮-৮০

কাল ১১টা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩ ৩০টার খালা হবে।

আমূল্য : আনুমানিক খরচের ১% বাবদ টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেণ্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেণ্ডার

হাফের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে।

টেণ্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার

খালা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেণ্ডার সম্পূর্ণ

আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে

টেণ্ডারদাতাদের যেকোন অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।



ইস্টার্ন সিমেন্ট মিলস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

সংশোধনী

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ
রেফা: নং : ৪৫ / ৪১০০ / ৮০ / ১৫৭৫ তাং ২৩ ৫ ৮০

দামোদর নদী থেকে দামোদা (এন) কোলিয়ারীর সেল সিলারিগোল ইউ-

নিটের ৩নং পিটে বাজি সরবরাহের জন্য মূল টেণ্ডার নোটিন নং : ৪৫ / ৪১০০ / ৮০ / ১৫২৪ সম্পর্কে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে- উপরিউক্ত টেণ্ডার নোটিন এতদ্বারা বাতিল করা হচ্ছে। এনেক্ট, অমৃত-নগর কোলিয়ারী, কুহুগুট্টিয়া এরিয়া।

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

রঙ্গরূপা প্রযোজিত 'গোরা'

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ই মে রবীন্দ্র সমন্বিত রঙ্গরূপা প্রযোজনার রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপভাস অবলম্বনে রচিত নাটকটির অভিনয় শুরু হল। নটশেখর রমেশ মিত্র রুত নাটকের স্বয়ং অবলম্বনে প্রযোজনায় রঙ্গরূপা নতুন নাট্যরূপটি দিয়েছেন। এই নাট্যরূপের মধ্যে রবীন্দ্রভাবনা অঙ্গুর রয়েছে ঠিকই, কিন্তু নাট্য বিভাগে কিছু শৈথিল্যের প্রকাশও থেকে গেছে। নির্দেশনার দায়িত্ব অবশ্য স্ফটিকরূপে পালন করেছেন স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের উগ্র আধুনিকতা ও সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি তীব্র উদ্ভাসিতকাকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন 'গোরা'র মধ্যে। গোরা যদিও

আইরিশ সন্তান, তবুও সে মনে প্রাণে গোড়া হিন্দু—সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী—আচার নিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদ এখানেই প্রকাশ পেয়েছে যে, গোরা যে আইরিশ, তা সে জানে না—জন্ম বৃত্তান্ত তার অগোচরে রাখা হয়েছে দীর্ঘকাল—পালক হিন্দু পিতাকেই সে মনে এসেছে আপন পিতা বলে। নাটকীয় চরম মুহুর্তে যখন গোরা জানল, সে হিন্দু নয়, জাতে আইরিশ—তখন তার স্বপ্নভঙ্গ ও বিহ্বলতার মধ্যেই সমস্ত আচার নিষ্ঠা ও গোড়ামির দীর্ঘাহীন উদার মানবিক ধর্মে তার উত্তরণ সম্ভব হল। গোরা হিন্দু জাতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম আকস্মিক অথচ অত্যাধিক এক সংঘাতে মহান

দেশপ্রেমে উন্নীত হল—গোরা'র যথাস্থ দৃষ্টি হল আরও প্রসারিত ও স্বচ্ছ। উপনিষদিক চিন্তার আচ্ছন্ন রবীন্দ্র চেতনার এই ভাবাদর্শটুকু আলোচ্য নাট্যরূপে ফুটেছে চমৎকার স্বীকার করতেই হবে এবং এ কাজ অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন, তাতেও সন্দেহ নেই। তবে নাটকটির প্রথমপর্বের দৃষ্ট বিভ্রান্তি সংহতির অভাবটুকু নজরে বিশেষভাবেই পড়ে। দেবশিশু হাসপাতাল সংগীত পরিচালনা ও কনিষ্ঠ সেনের আলোক সম্পাত প্রাশংসনীয়।

নামকৃতিকার অভিনয়ে সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায় আগাপোড়া নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন। স্বতন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পরেশবাবু আশ্চর্য সংঘত। পাহাবাবু রূপে দেবকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছু উপভোগ্য মুহুর্ত উপহার দিয়েছেন। অলকেন্দ্র দেব বিনয় চরিত্রে বিশেষ বৃদ্ধম্ব হয়ে হল না। মীমাংকা গোবামী, চন্দনা সেনগুপ্ত ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক করেছেন। স্বচরিত্রা রূপে শিখা বাগ (মল্লিক) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে ললিতা চরিত্রে মালবিকা মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার বুদ্ধিমত্তা অভিনয় বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে।

অ্যাক্টস ইউনিয়ন

প্রযোজিত 'চুল্লী'

রমেশচন্দ্র সেন আজ এক বিস্মৃত-প্রায় সাহিত্যিক। তাঁর এক উজ্জল গল্প 'ডোমের চিতা' অবলম্বনে 'চুল্লী' নাটক প্রযোজনা করে অ্যাক্টস ইউনিয়ন বিশেষ প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালন করল বলতেই হবে। যদিও মূল কাহিনীর কিছু বিবরণে নাট্যরূপ এই 'চুল্লী', তবুও বলতে দ্বিধা নেই, কাহিনীকারের মূলভাব চেতনা অঙ্গুর রেখেই নির্দেশক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নাটক রচনা করেছেন। তবে নাটকটির আরতন যদি আরও কিছুটা সীমিত হত, তাহলে নাট্যরূপটি হত আরও বেশী সংবদ্ধ।

গত ১৩ই মে বিজয় থিয়েটারে 'চুল্লী' নাটকের অভিনয়ে দেখতে পাই, যারা শ্রমানে শব্দাহ করে, সেই ডোমদের জীবনযাত্রা, ক্ষুধার কাতরতা, শবের অভাবে তীব্র হতাশা আবার শব্দাহকদের সেই আতঙ্ককর 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি শুনে তাদের চোখের উজ্জল দীপ্তি। জীবন মরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনের এই মর্মান্তিক পরিহাস আশ্চর্য নাটকীয়তার রূপ পেয়েছে। হার্ড ডোম মৃত্যুর সংগে অনেক পাঞ্জা

কবেও শেষ পর্যন্ত চিতাশয্যা শায়িত নাথী বহন সেই চিতার আগুনে তাদের হাড়ি বসিয়ে চেয়ে থাকে—তার চোখের জল কখন ঘেন ভকিয়ে আগুন বরছে। এ দৃষ্টের আবেদন সহজে লুপ্ত হবার নয়। নাটকে পুলিশের নারকীয় হত্যার কিছু রাজনীতি প্রসঙ্গও আছে প্রকৃষ্টভাবে যেগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি। তথাপি এটি একটি বলিষ্ঠ প্রযোজনা—উত্তরণের ইংগিত আছে এখানে। অবশী মণ্ডল সোমনাথ, মুখোপাধ্যায়, মিতালী সেনগুপ্ত, বিবনাথ ঘটক ও গীতা চক্রবর্তীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আলো ও সংগীত পরিকল্পনা নাট্যাঙ্গুগ।

প্রাভলভ ইনস্টিটিউট

প্রযোজিত 'অনবয়'

স্বপ্ন মনস্তত্ত্ব—মায়া বা চাঁদ, তা পায় না আবার বা পায়, তা চায় না অথবা সচেতন মন দৃষ্টির বশে বা সনাতন আদর্শের টানে বা উচিত কর্ম বলে উৎসাহ বোধ করে, অবচেতন মন তারই বিরুদ্ধাচার্য করে তথাকথিত নীতিহীনতাকে প্রকাশ দিয়ে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে অসংগত কাজ করে বসে। বামীন্দ্রী উভয়েই পৃথক পৃথক বিচ্ছিন্ন বীপ-বাসী হয়ে দাম্পত্য জীবনে যে জটিল পরিস্থিতি রচনা করে এবং অবশ্যই যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা—'অনবয়' নাটকটি তারই রূপ দিতে চেয়েছে, যদিও তার বাহ্যিক রূপায়ণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

গত ২০শে মে গোবিন্দ সর্দনে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উক্ত নাটকটি অভিনীত হয় প্রাভলভ ইনস্টিটিউটের ত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে। নাট্য নির্দেশনার দক্ষতা দেখিয়েছেন নির্মল বোষ। বিপাশা চরিত্রে জয়া বোস ও ইরাসতী রূপে উল্লি সেনগুপ্ত বৈপ্লব্য দেখিয়েছেন। সরিৎ রায়ের ললিত উপভোগ্য। বিশেষ স্বযোগ না থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদা চরিত্রের অভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

বিনয় চৌধুরীর আবেদন

গত সপ্তাহে ২৪ পরগণা জেলার বাগাইপুর্বে এক সত্যর রাজ্যে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ব্রজেন চৌধুরী বলেন যে, দেশের স্বার্থ অগ্রগতির স্বার্থে প্রকৃত ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন। ভূমি সংস্কারের একটি প্রাথমিক ধাপ হল বর্গীদারদের নাম নথিভুক্ত করা। বর্গীদারদের নাম নথিভুক্ত করার অর্থই হল তাদের চাষের স্বত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ভূমি সংস্কার একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ এবং এই কাজকে সফল করতে হলে সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বর্গীদারদের নাম রেকর্ড করানোর জন্য গণ-উত্তোপ স্থিতির প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই সত্যর অস্ত্রান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধানসভা সদস্য শ্রীহেমেন মজুমদার, ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সচিব শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন। কয়েকজন বর্গীদারও এই সত্যর নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন।

বিধানসভা সদস্য শ্রীমজুমদার বলেন যে, বর্গী আয়ত্তের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা নেমে পড়েছেন বীজতলা তৈরীর কাজে। অপরদিকে জোতদার ও জমির বেনামদাররাও বর্গীদার উচ্ছেদের জন্য পায়তারা করছেন।

সত্যর উপস্থিত কয়েক সহস্র বর্গীদার, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষী, জমির ক্ষুদ্র ও মাঝারি মালিকদের নিকট আবেদন করে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন যে, সমর সীমানা মধ্যে হাজার হাজার নথিভুক্তহীন বর্গীদারদের নাম রেকর্ড করিয়ে মালিকের জমির মালিকানা সত্ত্ব এবং বর্গীদারের চাষের স্বত্ব স্বীকৃতি করুন। শ্রীচৌধুরী বলেন যে, বর্গীদারদের নাম রেকর্ড করার সময় সীমা আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে বর্গীদারদের নাম রেকর্ড করা আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত সাড়ে আট লক্ষেরও বেশি বর্গীদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে।



ইন্টারন্যাশনাল কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি সি ডব্লু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী/স্থায়ী/প্রকল্প-কারকদের কাছে থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিক্ষিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক দীল করা টেন্ডার :
বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং : এ জি টি / জি এম আর / ইজ (সি) / টেন্ডার / ৮০ / ৪৭৪ তার ১৫-৫-৮০

(১) দামরা কোলমিনারীর কোল ডিপোর চারদিকে বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ
(২) দামরা কোলমিনারীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য। আনুমানিক মোট খরচ ১,৬০,০৮১.১১ টাকা। দামরা কোলমিনারীর কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটির জন্য ৫০ টাকা নগদে দিয়ে (অগ্রত্যাগপণযোগ্য) ১৬-৬-৮০ থেকে ১১-৬-৮০ পর্যন্ত যে কোম কাজের দিনে এজেন্টের অফিস, দামরা কোলমিনারী পো: কালিপাহাড়ী, জেলা বর্ধমান থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। দামরা কোলমিনারী ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ২০০৬৮০ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করবেন এবং তা একই দিনে বেলা ১২.৩০টার খোলা হবে।

সাধারণ: কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন এবং সম্পূর্ণ করার সময় অথবা চুক্তির সময়কাল ইত্যাদি উপরিউক্ত টেন্ডারে প্রদত্ত এরিয়া / কোলমিনারী দপ্তরের নির্দিষ্ট অফিস থেকে টাকা দিয়ে পাওয়া যাবে। আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের কি বাবদ যদি অর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১০ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

পর্বে প্রকাশন

১। ভারতের শ্রমিক সম্পদ / দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২.০০

২। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ / সর্বেশ্বর রায় / ১২.০০

৬৬, রাজা সুবোধ মল্লিক স্টোর, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক বর্ষক দীপানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর কার্যালয় ৬১, হট সেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

ত্রিপুরা রাজ্যে

দাঙ্গার নেপথ্য গভীর চক্রান্ত

দাঙ্গা

সুমন্ত সেন

বিত্তীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্থান করে নিয়েছে যাকিনী সাম্রাজ্যবাদকে তেমনি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ইংরেজ মিশনারীদের জায়গার ধীরে ধীরে ঢুকে গেছে আমেরিকান এবং পশ্চিম জার্মান ধর্মসংস্থাগুলি এবং তাদের পরস্পর পরিচালিত বিভিন্ন তথাকথিত সেবা সংস্থা।

উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। এই সব শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠার

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ২১শ সংখ্যা ২০শে জুন, ৮০ ৬০ পয়সা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আন্দোলন নিয়ে ই-কং দল ও মন্ত্রিসভায় সঙ্কট

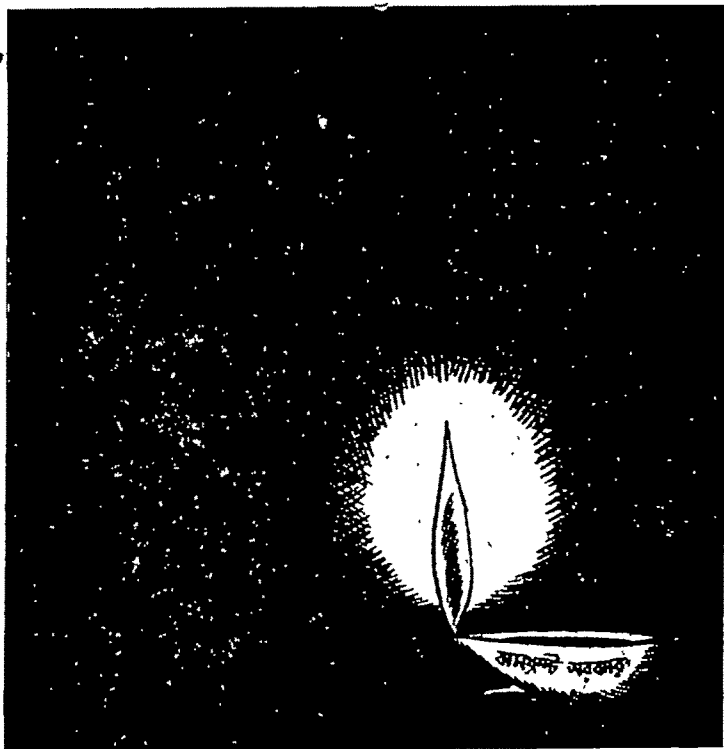
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ার ইন্দ্রিয়া কংগ্রেস দলে এবং মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন আসামের “বিদেশী বিতাড়ন” আন্দোলনের মীমাংসার পৌছানোর আগেই সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য জুড়েই শুরু হয়েছে “বিদেশী” বিতাড়নের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।

ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে এখন যা অবস্থা চলছে তাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বেশ কিছু সদস্য এবং দলের কিছু কর্মকর্তা “সিভিল ওয়ার” বলেই মনে করছেন।

এই অবস্থার জন্য মন্ত্রিসভার কিছু সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং দুর্বল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেই দায়ী করতে শুরু করেছেন। মন্ত্রিসভার এবং দলের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য এই অবস্থার জন্য ইন্দ্রিয়া গান্ধীর ব্যর্থতাকেও একান্ত আলোচনার দায়ী করেছেন।

এই সব প্রবীণ সদস্যদের বক্তব্য হল যে, কখনই ইন্দ্রিয়া গান্ধী আসামের আন্দোলনের ব্যাপারে, কি মন্ত্রিসভার বৈঠকে, কি দলের ওয়াকিং কমিটির সভায় গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। তিনি শুধু শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠার

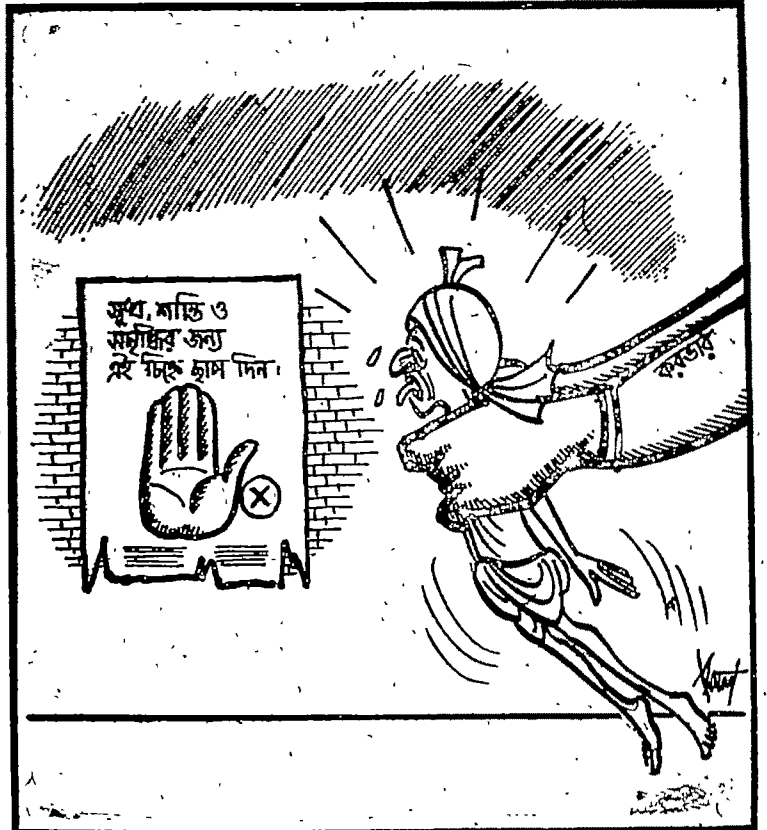


তারকেশ্বরী বিরত অবস্থায়

কংগ্রেস (আর্গ) দলের নেত্রী তারকেশ্বরী সিংহ এখন বেশ বিরত অবস্থায় রয়েছেন। ইদানীং তাঁর দলের সভাপতি দেবরাজ আসের সঙ্গে তেমন বনিবনা হচ্ছে না। এর কারণ, একজন মহিলা। ইমি হলেন, বিদেশ দপ্তরের ডাইরেক্টর নির্মলা প্রসাদ। সম্প্রতি ম্যানিলার ভারতীয় দূতাবাসে তাঁর বদলির ব্যবস্থা হয়েছে।

এই নির্মলা তাঁর সরকারী কাজের সঙ্গে রাজনীতিতেও জোর-কদমে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন।

পালক পিতা দেবরাজ আসের স্নেহ-চ্ছায়ার তিনি কংগ্রেস (আ) দলের ভিতর প্রভাব বিস্তার করা শুধু নয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ঝাঁক পলাচ্ছেন, মত প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। নিজের একটা মহল দলের মধ্যে গড়ার জন্য লেগে পড়েছেন। নেপথ্যে থেকে ক্রমশ নির্মলা যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছেন তাতে দলের গঠনতন্ত্রের ক্ষতি হওয়া ও আদর্শের জলাঞ্জলি যাওয়ার আশংকার তারকেশ্বরী খুবই উদ্ভিগ্ন। নির্মলার মধ্যে সন্তয়ের ভায়া দেখছেন। ইন্দ্রিয়ার দল ছেড়েছেন সন্তয়ের কার্যকলাপে। এবার নির্মলার জন্য আর্গ কংগ্রেসও ছাড়তে পারেন।



আমরা বাঙালী দলের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ

ত্রিপুরার গণ-হত্যাকাণ্ডে “আমরা বাঙালী” সংগঠন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। স্বরণ থাকতে পারে যে, এই আমরা বাঙালী পার্টিই আজ কয়েক মাস আগে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে বিপন্ন ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেছিল। আমরা বাঙালী কোন আঞ্চলিক পার্টি নয়। এটি প্রাইউটিস্ট ব্লক নাম-ধারী একটি সর্বভারতীয় ছোট চক্রের প্রাদেশিক শাখা এবং খুব সঠিক অর্থে এটি একটি বামপন্থী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলন বিরোধী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। এরা বাঙালার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেয়, “বাংলা বাঙালীদের জন্য”, “অবাঙালী পুঁজিপতিরা বাংলা ছাড়ো”। আবার বিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে, “বিহার বিহারীদের জন্য”, “অ-বিহারী পুঁজিপতিরা বিহার ছাড়ো।”

আপাততঃ এদের আসল উদ্দেশ্য হলো, যে ভাবেই হোক ভারতের মুক্ত রাষ্ট্রের কাঠামোয় কাটল ধরানো। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের বৃহত্তম উপনিবেশ ভারতবর্ষের বিশালস্বে ভাগ্যন ধরাতে খুবই উৎসাহী। কারণ এতে শোষণের পক্ষে অস্বল্প পরিবেশ সৃষ্টি হয়। চাকলা-

কর ঘটনা হলো, ভারত সরকার যেমন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদেশে অবস্থানকারী মিশনারীদের চালচলনকে সম্মোহের চোখে দেখেছেন, তেমনি কলকাতার এ্যাকবার্ট স্ট্রিট, নদীয়ার মায়াপুর, বনগাঁও ইছামতী নদীর তীর ও অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত কৃষ্ণ মন্দিরগুলোর সাধুসন্তদের আসাম-ত্রিপুরা নিয়ে তৎপরতা প্রদর্শন-বোধক। আবার সেই কারণেই আমরা বাঙালী পার্টির লোকজনদের ইসকন মন্দিরগুলোতে ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদে প্রকাশ, এরা “অবাঙালী বাঙলা ছাড়ো”, “অবাঙালী ব্যবসায়ী বাঙলা থেকে হাত ওঠাও” প্রভৃতি স্লোগান নিয়ে সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। এবং বিশ্বস্ত হুজুে এও জানা গেল যে ওড়িশাতেও “বঙ্গাল বেদা” আন্দোলনের প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য “আমরা বাঙালী”দের চক্রান্তের মূলে রয়েছে দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রার্থী স্বার্থ। বিশেষ কোন প্রদেশের অধিবাসীদের স্বার্থ নয়।

সঙ্গীত

দুই বামপন্থী সরকারকে হুমকি

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার দুটো রাজ্য সরকারকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়েছেন। প্রথম নিঃশাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং ঘোষণা করলেন যে জিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হবে। দ্বিতীয় নিঃশাসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং পশ্চিমবঙ্গকে কড়া হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। দুটো রাজ্যেই অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন।

জিপুরায় এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক মানুষ। গৃহহীনের সংখ্যা দু লাখের মতো। অবশ্য তুঘের আগুন যে জলে আসছিল এবং যে-কোন মুহূর্তেই তা বিক্ষোভের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বহুদিন আগেই সে-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার মতো একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কতোরা জারী করে বসলেন যে জিপুরায় সরকার বিশৃঙ্খলা হ্রাস, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থ হয়েছে; পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকওয়ানাও একই সুরে হুমকি ছেড়েছেন। অতএব এই সরকারকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের বকলমে লেখানকার শূন্য আসনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস(ই) সরকারই বসবেন। ওরে আমার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্য বাছা রে! আসাধেও তো তোমরা এমন ক্ষমতার আসন দখল করে বসে আছো আট মাস ধরে; পেরেছো কি লেখানকার আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে? কী হচ্ছে সেখানে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে? মনিপুরে তো কংগ্রেস(ই) সরকারই রয়েছে। তবুও কেন মনিপুরে অরাজকতা চলছে?

জিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাপালেই যে রাজ্যটির সমস্ত মিটে বাবে বা কংগ্রেস(ই) সেখানে স্বাধীন সরকার গঠনে সক্ষম হবে—এতখানি ভরসা দলনেতৃবৃন্দও নেই। পৃথকপৃথক যে বৈষম্যমূলক আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হল হয়ে থাকবে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দল সংগঠন ও ব্যক্তিবৃন্দের প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্যই হয়তো বাকোয়ানা নাহেবের বেজো কতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিংকে ঘোষণা করতে

হয়েছে যে জিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা হবে না। পোড়োভেঁও তিনি একথাই বলেছিলেন। জিপুরায় হাঙ্গামার পেছনে বিদেশী শক্তির হাত থাকার কথাও তাকে স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও সেই সংবাদ তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর হারফং আগেই পেয়েছিলেন কিনা তা স্বীকার করেন নি। সেটা মেনে নিলে যে তাকে আবার বিপদে পড়তে হয়। কারণ তখনই তো বেদাড়া প্রশ্রিত তার দিকে নিক্ষেপ হবে: 'তা যদি জানতেন, তবে জিপুরা সরকারকে আগে সম্মুখ করে দেননি কেন?'

ভাবী প্রধানমন্ত্রীকে আগাম কুর্নিশ

ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার জল্পনাকল্পনা চলছে যে ইন্দিরা গান্ধীর পর তত্ত্ব পুত্র সঞ্জয় গান্ধীই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দৃষ্টান্ত: কিছু কংগ্রেসী (ই) সে গবেষণার মালমসলা মুগিয়ে চলেছেন।

অতি সম্প্রতি লোকসভায় দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সঞ্জয়-দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য পাল্লা দিতে দেখা গিয়েছিল। কাজের বি নি ম য়ে খাদ্য প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কি দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন? এটাই ছিল সেদিন লোকসভায় সঞ্জয় গান্ধীর জিজ্ঞাসা। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডি স্বামীনাথন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে জানালেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-রকম সংবাদই তাঁর কাছে রয়েছে। পাছে সহকারী তাঁর গদিটা বেদখল করে নেন সঞ্জয়-ভক্তনার জোরে, সেজন্যই যেন মন্ত্রী-প্রবর বীরেন্দ্র সিং সবিজ্ঞারে সঞ্জয়গণী কাছে নিবেদন করলেন যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে পশ্চিমবঙ্গকে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য কেন্দ্র দিয়েছেন তার ৫০ শতাংশের মাত্র হিসেব পাওয়া গিয়েছে। তাতেও প্রত্ন খুশি হননি অস্থম্যান করে রাও বীরেন্দ্র ঘোষণা করে বসলেন যে, আর কখনো যদি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের নির্দেশ মান্য না করেন, তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ গর্হাম নেওয়া হবে!

এ-হুমকির প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রকাশ করেছেন ভাল। তিনি বলেছেন, মার্কুতি খ্যাত সঞ্জয় গান্ধীর মুখে দুর্নীতির কথা

ই-কং রাজনীতি ও বহুগুণারা

চন্দন পাঠক

গত লোকসভা নির্বাচনে একটি বেশ জুঁসই শোটার দেখা গিয়েছিল দেখানে, যেখানে অবলীলাক্রমে হরিজনদের উপর অত্যাচার করা যায়, যেখানে হরিজনদের ছাড়া মাড়ানোও পাপ। হরিজন ছোট টানার জন্যই সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের কোম কবি ছড়াটি বেঁধে ছিলেন—

‘না জাত পর—না পাত পর
ইন্দিরাজী কি বাতপর
মোহর লাগেগি হাত পর।’

অত্যন্তভাবে মোহর লেগেও-ছিল হাতে। এবং শ্রীমতীর স্বামী শাসন বলতে স্বামী শোষণ বলে সে যতই বলুক না কেন শুধুমাত্র তিনিটি রাজ্য ছাড়া তামাম ভারতবর্ষে তা এল এবং নবগ্রহের কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য এসেই নবগ্রহের শাস্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করল।

গত ছমাসের স্বামী শাসনকালে অন্তর্দ্বন্দ্ব একট হরে উঠেছে। এবং তামাম ভারতবর্ষের যে বর্তমান অবস্থা পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের আগেই তাতে অত জনপ্রিয় স্লোগানটি শাস্তি-স্বস্ত্যয়নের সঙ্গে বেলপাতার বুসরাং হয়ে কিয়ে এসেছে। যা কিয়ে এসেছে তা শুধু বিহার বা পাঞ্জাবের রূপ নয় গোটা ভারতবর্ষের চেহারা-টাই ধরা পড়েছে—

ইন্দিরা কি বাতপর
মোহর লাগাদি হাতপর

হাস্যকর।

আসলে কেন্দ্র নিজেদের দুর্নীতি, অপরাধ, অক্ষমতা ও বৈষম্যমূলক আচরণের পাপ চাকতেই চায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজের বিনিময়ে যে-পরিমাণ খাদ্য দাবি করেছিলেন, নয়াদিগ্গী তা পূরণ করেননি। দ্বিতীয়ত যেটুকু খাদ্যশস্য তাঁরা দিয়েছেন তার ৮০ শতাংশের হিসাব ইতিমধ্যেই তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। জল ও খাদ্য কখনো দল বাছাই করে বন্টন করা সম্ভব নয়, মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার রাজনীতি করেন না—একথাও জ্যোতিবাবু একাধিকবার ওই স্বভাবে ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেসী (ই)দের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত ঘটনা হল, বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের (ই) সমস্ত জারীকৃত ফাল করে দিচ্ছেন বলে তাঁরা চক্ষুপূর্ণ হয়ে পড়েছেন। তাই তাদের উচ্ছেদের জন্য কলী কিকির পায়তান্ডা করা হচ্ছে।

চিনি পৌহছি সাত পর
মিটিকা তেল পাচপর
আউর ডিভেল গুদালাটপর।’

এর মত আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমি ইন্দিরাজীর পদত্যাগে একমত কখনই নয়। কোন সরকার কোন ইচ্ছাতে ব্যর্থ হলেই যে তার পদত্যাগ দাবী করতে হবে এমন বিশ্বাসও আমি বিশ্বাসী নয়। বরং বিশ্বাস করি ইন্দিরাজী পদত্যাগ করলেই বাজার দর তেল মাখানো বাঁশে মূল্যস্ফটক নামক বাদ্যটি তর-তারিয়ে নেবে আসবে না। তবে অনেকের সঙ্গে একমত একটা কথাতে যে ইতিহাসে সেই নাদির শাহ থেকে শুরু করে বেনিয়া ইংরেজ জাত পর্যন্ত সবাই ভারতের বুক থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। কাজে কাজেই ভ্রাম্যমূল্য বৃদ্ধিতে সর্বস্বান্ত ককির হয় গরুমাড়ন পাহাড়ের মতো সাধারণ মানুষ জাতটা। ভোগান্তির একশেষ হয় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের বাঁধের একমাত্র মূল্যায়ন হয় ভোটারের দিন। ‘মিটি তেল’ (কেরোসিন) পাঁচ টাকা লিটারে ভোগান্তির একশেষ হয় সাধারণ মানুষদেরই। বাঁধের কথা কেউ ভাবেননি। স্বাধীনতার তেজি শ বছরেও শুধু ভোটারের দিন ছাড়া।

সঞ্জয়ের ক্ষমতা বাড়ছে

ইন্দিরাজীর গত ছ মাসে স্বামী সরকারের রাজস্ব স্বামী ক্ষমতা বেড়েছে ‘ভাবী প্রধানমন্ত্রী’ সঞ্জয় গান্ধীর। অনেক প্রধান নেতাতো প্রকটভেই বলছেন সঞ্জয় গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর বাদগৃহেই দরবার খুলে বসে-ছেন। তাঁর কথামতোই অনেক ঘটনা ঘটছে দলের মধ্যে। যদিও তিনি পদাধিকার বলে দলের কেউ নন একজন লোকসভার সাধারণ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ছাড়া। [সম্প্রতি অবশ্য সঞ্জয় গান্ধী সে ক্র টা রী র পদ পেয়েছেন] তবুও নবগ্রহের শাস্তি-স্বস্ত্যয়নের পুরোহিত নির্বাচনের টিকিট দেবার ব্যাপারে সঞ্জয় গান্ধীর মতামতই ছিল সর্বশেষ মত। যদিও ইন্দিরাজীই প্রার্থী নির্বাচনে সর্বসর্বা ছিলেন তত্পরি ছিল নামের তালিকার পাশে সঞ্জয় গান্ধীর ‘টিক মার্ক।’ এবং দেখা গেছে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স্ক প্রবীণ নেতাদের উপর মোটেই তুষ্ট নন। প্রবীণরা যেভাবে বালা বহন করছেন তাঁদের উপর তরসা করতে পারছেন না সঞ্জয় গান্ধী। তাই তিনি উত্তরপ্রদেশে কমলাপতি

জিপাঠীর মনোনীত প্রার্থীদের টিকিট দিলেন না। এবং কমলাপতি জিপাঠীও উত্তরপ্রদেশের ইন্দিরাজী কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন দেড়শোজন বিশিষ্ট কর্মীর মদত নিয়ে। সঞ্জয় গান্ধীর এই তাকণোর প্রতি মোহ ও সহানু-ভূতির জন্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী, মোহনলাল স্বধাদীরা প্রমুখ প্রবীণ নেতারাও। যদিও ইন্দিরাজী বলে-ছিলেন সঞ্জয় গান্ধীকে তিনি আর ফিরিয়ে আনবেন না তবুও সঞ্জয় গান্ধী এসেছেন। পুত্রের দাবী ও অধিকার নিয়ে কি না তা আমার জানা নেই। তবে কাগজে কলমে তিনি না এলেও দল বাজীকরের মতো হাতের আঙুলে অঙ্গুত হাতো বেঁধে যে পুতুল নাচিয়ে যাচ্ছেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই কোন বিশেষজ্ঞ মহলেই। সঞ্জয় গান্ধীর আচরণে বসন্তদাড়া পাতিলের মতো প্রবীণ নেতাও মুড়ে পড়েছেন।

এ ব্যাপারে সব চাইতে জম্পেশ খেলাটা জমে উঠেছিল মধ্যপ্রদেশে। রাজ্যের রাজনীতি থেকে শেঠীকে কোণঠাসা করার জন্যই তরুা ভ্রাতৃবৃন্দ একজোট হয়ে নেবেছিলেন আসরে। কিন্তু হঠাৎ শেঠী শ্যামা-চরণ তরুার ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান ও সমর্থন লক্ষ্যে আপত্তি তুললেন যেহেতু শ্যামাচরণ তরুা আর্সি কংগ্রেসে ছিলেন এবং এই শেঠীকে সমর্থন করে বিজ্ঞাচরণ তরুা গত সতেরই এপ্রিল বিবৃতি দিলেন শ্যামাচরণ তরুা ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করেননি। ঠিক দুইদিন পরে শ্যামাচরণ তরুা উনিশে এপ্রিল বিবৃতির প্রতিবাদে বিবৃতি দিলেন তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ না দিয়েও ইন্দিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করতে পারেন। পরবর্তীকালে দুই ভাই-ই তাদের বিবৃতি এবং পাট্টা বিবৃতি তুলে নেন। এবং জানা যায় সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে দেড়ঘণ্টা রুদ্ধবার কক্ষে আলোচনার পর। এবং এই মজার খেলার আরো মজা হোল দুই ভাইকেই মিলেমিশে ইন্দিরা কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার ‘জুটাই নাকি শ্যামাচরণ তরুার জীকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

বহুগুণা কী করবেন?

তরুণ ও প্রবীণের এই ট্রাপিজের খেলায় বহুগুণী বহু দলত্যাগী বহুগুণা সাহেব ব্যালাল টিক রাখতে না পারায় দরুণ বেচ্ছার পদত্যাগ করলেন। এবং জনমানসে নিজের ভাবযুক্তি কিছুটা সন্মিলন রাখার জন্য লোকসভার সদস্য পদেও ইস্তফা দিলেন। এই বহুগুণা সাহেব জনতা রাজ্যে মন্ত্রী থাকা কালে, কোচিন রিকাইনারীজ-এ আমেরিকার সঙ্গে ব্যারেল প্রতি দেয়াংশ ১২শ পৃষ্ঠার

বাজেট ভাবনা

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

বাজেটের আগে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, বাজেটের আগেই কিনে ফেলুন। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন-দাতারা ক্রেতাদের সারধান করে দিচ্ছেন বাজেটের আগে না কিনে পরে কিনতে গেলে বেশী দাম দিতে হবে। অনেক ক্রেতাও তাই মনে করছেন। কেউ কেউ কিনছেনও। তা সে ফ্রিজ টি ভি, টিভিও, পাওয়ার প্যাক এর খদ্দেররাই বেশী। তাদের তৈলতণ্ডুলইছনের মত পেডেস্ত্রিয়ান বাজেট নয়, তাদের ফ্যামিলি বাজেট রোলস রয়েস, জেট বিমানের। গায়ের সাধারণ মানুষ গরুর গাড়িতে যেতে যেতে আকাশে ওড়া বিমানের দিকে যেমন হাঁ-করে তাকিয়ে থাকেন, সমাজের উচ্চতর অধিবাসী এই জেটোয়োহীদের বাজেট ভাবনা শুনে আমাদেরও হাঁ তেমনি বড় হয়। এরা কোন্ লোকের মানুষ?

ভণিতা রেখে আসল কথাটি পাড়া থাক। দেশের ধনীবণিক শিল্প-পতি সমিতি বাজেটের আগে পর পর ছুটি-খতিয়ান দাখিল করে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়ে-ছেন। তারা এবার এক নতুন দাবী তুলেছেন। অত্যন্ত দেশে এ দাবিগুলি এখন অচল বলেই গণ্য হয়। কিন্তু এ আমাদের ভারতবর্ষ। এখানে সাধারণ মানুষ ছাড়া আর সবই অস্বাভাবিক; রাজাজ্ঞানহীন শিল্পপতি, তাদের বংশবধ রাজনীতি-বিদ, সাংবাদিক, অধ্যাপক পণ্ডিত সবাই আজকাল অস্বাভাবিক কথা বলছেন।

শিল্পপতি ও বণিক সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন আগামী বাজেটে যেন এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি হয়, লক্ষ্য বাড়ে, নতুন নতুন লক্ষ্য বাড়ে, এবং উচ্চ মনোভাবটি হচ্ছে যাতে শুধুই মুনাফা বাড়ে। মুশকিল হচ্ছে এই ভ্রম্যহোদয়ের অর্থনৈতিক পরি-বৃদ্ধি বলতে কেবল নিজেদের জীবিকার কথাই ভাবেন। ধনী বড়লোকদের দেশপ্রেম থাকটা অপরাধ নয়, তবে অস্বাভাবিক। আসলে এরা মুনাফা শিকারী, দেশে এবং বিদেশে।

সুতরাং তারা নিজেদের মুনাফা-বৃদ্ধির অব্যবহিত স্বযোগ পাওয়ার জন্যেই নামা দাবী তুলে থাকে। জনসাধারণের ভালো হউক সেটা তাদের মাথাব্যথার বিষয় নয়। তারা নিজেদের নিয়েই রাত। এই ব্যস্ততার মধ্যে তারা দেশের ও দেশের কথা ভাবার সময় পান না।

এবারের বাজেট তৈরী প্রায় সমাপ্ত। সংসদে পেশ করা হবে ১৮ই জুন। ১৬ই জুন রেল বাজেট। দেশের মাছ ধরার কল্যাণ। সবাই পকেট সামলাতে ব্যস্ত। চরণ সিং নিগারেটের দাম বাড়িয়ে ছিলেন ১১৭১ সালের বাজেটে প্যাকেটে দশ পয়সা। এবারের বাজেটের আগে তার দাম প্যাকেটে চল্লিশ পয়সা কম করেছে বেড়ে গেছে। সরকার ডিজেল ও সারের দাম, পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছেন। করলা তাহলে বেশীদিন এ ধরে বাধা থাকবে না। রেলওয়ের হিসেবে ডিজেলের দাম এক পয়সা বাড়লে, রেলের খরচ বাড়ে ১৭ কোটি টাকা। শুধু এবারের ডিজেলের দাম বাড়ার ফলেই রেলওয়ে দপ্তরকে ৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। এ খরচটা কে দেবে? যারা মাল পাঠান তারা এবং যারা রেলগাড়ী চড়েন তারাও। সুতরাং সবাই আরেক দফা পকেট কাটা পেল। দেশের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধি হয় না বটে কিন্তু চড়াভাড়ার অঙ্ক-হাত দেখিয়ে সব মালের কারবারী-রাই আরেক দফা দাম বাড়াবে। অর্থাৎ শিল্পপতি ও বণিকদের মুনাফা বৃদ্ধি ঘটবে। তারা চান এই বাড়তি আয়ের উপর তাদের বা তাদের কোম্পানীগুলিকে যেন আয়কর দিতে না হয়।

এই শিল্পপতি ও বণিকসভার টাইপের (এখন এদের সভাপতি হলেন সঞ্জয় গান্ধী প্রীতিভাজন দিল্লীর শিল্পপতি কে এন, মোদী) সম্ভবতঃ বার দিল্লী মিলে এক লক্ষ বস্তা ময়দা জরুরী অবস্থার সময় ধরা পড়লেও তার গারে আঁচড়টি মাগেনি।) আয়কর, সম্পদকর ইত্যাদি থেকে রেহাই চাইছেন। কারণ এর ফলে নাকি দেশের কতি হবে।

অথচ দেশের সাধারণ মানুষই রাজস্বের গুরুভারের বেশীর ভাগ বহন করে থাকেন আর শিল্পপতি ও বণিকেরা এ থেকে মোটা অঙ্কের কট্টাউ, ভরতুকি ও অত্যন্ত হিন্দার টাকা পেয়ে থাকেন। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৭১ সালের বাজেটে মোট রাজস্ব ৩২০৬ কোটি টাকার মধ্যে ২৩৬০ কোটি বা ৭২.৭ শতাংশই পরোক্ষকর। ১৯৭২-৮০ সালের বাজেটে মোট রাজস্ব ১১৭২৫ কোটি টাকা, পরোক্ষ কর ৮৮২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট রাজস্বের শেবাংশ ৭৫.৫ শতাংশ

মেয়ে চুরি ও বিক্রীর অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশ নিবিঁকার

এই রাজ্য থেকে অসহায় মেয়েদের ফুলসিয়ে অল্প রাজ্যে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে দেবার অভিযোগ করা মধ্যেও নাকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। হগলী জেলার মগরা থানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মেমারী থানার দলুইবাড়ার গ্রামের বাসিন্দা নিমাই বৈরাগীর ১৪ বছরের কিশোরী কন্যা ভক্তি তার মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। মামা সাময়িক বাহিনীতে কাজ করেন। মামা বাস করেন জিবেপীর বাজুদেবপুর গ্রামে। কিছুদিন পর ভক্তি মামার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। চারিদিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, কানন-বালা মিল্লী নামে বাজুদেবপুরের এক মহিলার সঙ্গে ভক্তিকে শেষ দেখা গেছে। আরও জানা যায় যে, ঐ গ্রামের চাঁপা নামে আরও একটি মেয়েও নিখোঁজ হয়েছে। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে মগরা থানার ১৮ই মে ১৯৭৮ তারিখে ডায়রী করা হয়। দ্বি দ্বি পরে চাঁপা নামে নিখোঁজ মেয়েটি জিবেপীতে ফিরে এসে জানায় যে, কাননবালা তাদের তীর্থে নিয়ে বাবে বলে ফুলসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আলানসোল টেশনে সে নেমে পড়ে এবং চলে আসে। ভক্তিকে ওরা

নামতে দেয়নি। তার দ্বি দুই পরে কাননবালা ফিরে এসে তাকে ধরা হয়। চাপ দিতেই সে কবুল করে যে, ভক্তিকে উত্তরপ্রদেশের বেরিলি জেলার ফতেনপুরে বিক্রী করা হয় ১২০০ টাকায়। ভক্তিকে যে কেনে সে তাকে বাগে আনতে না পেরে আরও বেশি দামে অস্ত্রের কাছে বিক্রী করে দেয়।

ভক্তির মামা নানারকম জেরা করে উক্ত কাননবালার কাছ থেকে জেনে নেন যে, এই চক্রের সঙ্গে কারা কারা যুক্ত। সব কিছু জানিয়ে মগরা থানার ভক্তির মামা মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে মগরা থানা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ভক্তির বাবা সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। কিন্তু তাতেও নাকি কোন ফল হয়নি।

ধানীর মাছবের ধারণা যে, মেয়ে চালানের একটি বৃহৎ চক্র এই অঞ্চলে সক্রিয় রয়েছে। সাম্প্রতিককালে লংগর এলাকার গ্রামগুলি থেকে বেশ কয়েকটি মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। পুলিশ যদি সঠিক ব্যবস্থা সময় মত গ্রহণ করত তাহলে হয়ত মেয়ে পাচারের একটি আন্তঃরাজ্য চক্রের হাতিম মিলত।

হাজরা পার্কে টাইপিষ্টদের স্থায়ী শেড

দক্ষিণ কলকাতার হাজরা পার্কে টাইপিষ্টদের স্থায়ী শেড উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৬ জুন 'স্বজাতা সদন' হল এক অস্থানে হাজরা টাইপিষ্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীউৎপল চট্টোপাধ্যায় বলেন যে শিক্ষিত বেকার টাইপিষ্টরা চাকরি না পেরে টাইপ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে হাজরা মোড়ে একটা টুলের উপর বসে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ছিলেন। ফুটপাথের টাইপিষ্ট বলে তাঁরা উপ-বৃত্ত মর্ষাদাও পেতেন না। বুলো, রোদ, ঝড়, জল উপেক্ষা করে পয়সা রোজগারের জন্য এরা খটখট করেই যেতেন।

সম্প্রতি পাতাল রেলের কাজের জন্য হাজরা মোড়ে এদের মাথার উপর যেটুকু শেড ছিল তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বর্ষার মুখে ওদের মাথার এল ঝড়ার বা। তখন এদের এক প্রতিনিধিদল পৌরস্বতী শ্রীপ্রশান্ত শ্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের অসুবিধার কথা বিস্তারিতভাবে

জানালেন। শ্রুর সব জেনে শুনে এদের জন্য হাজরা পার্কে একটি শেড তৈরী করে দিলেন। জায়গা কলকাতা কর্পোরেশনের, শেড তৈরীর খরচা করেছে সি, এম, ডি, এ। মোট খরচ হয়েছে ২৫,৬০০ টাকা। এই শেডের নীচে একসঙ্গে চল্লিশ জন বসে টাইপ করতে পারবে। সারাদিনে ধেপে ধেপে প্রায় দেড়শো জনের জীবিকা নির্বাহ হবে।

স্বজাতা সদনের অস্থানে সভা-পতির ভাষণে শ্রীপ্রশান্ত শ্রু স্বীকার করেন যে পাতাল রেলের কাজের জন্য যে সকল প্রকৃত হকার কতিগ্রস্ত হবেন বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের পুন-বাসনের ব্যবস্থা করবে। তালো কাজ করতে গেলেই বাধা আসবে যেমন এলেছে এই শেড তৈরীর ক্ষেত্রেও। কিন্তু রাজ্য সরকার বাধার মুখে পিছু হটবে না। সভাপতি চিত্তাকর্ষক সাংসতিক অস্থান হয়।

গুণধের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে কনভেনশন

একেই গুণধের দাম অস্বাভাবিক এর উপর আবার গুণধ কোম্পানি-গুলো দাম বাড়ানোর চিন্তা করছে। গুণধের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রে যে ক্যাবিনেট কমিটি গঠিত হয়েছে তার সিদ্ধান্ত মূল্যবৃদ্ধির অস্থগুণে গেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা ভয়ঙ্কর হবে—গত ৭ জুন প্রজ্ঞানানন্দ হলে ইনডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 'আয়ো-জিত এক গণকনভেনশনে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

এই সভায় রাজ্যের সুমি রাজস্ব-মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী তাঁর ভাষণে প্রস্তাবিত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে-ছেন। তাঁর মতে সর্বস্তরের প্রতি-বাদের মাধ্যমেই এই জাতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করা সম্ভব। আই এম এর সভাপতি ডাঃ সমর রায়চৌধুরী বলেন, গুণধ কোম্পানিগুলো গত দশবছরে ১৭% মুনাফা অব্যাহত রেখেছে। তিনি আরো বলেন যে এখানে গুণধ প্রস্তুতকারক ছষ্টচক্র এখনও ডার-বেটিনের গুণধ ডি বি আই বিক্রি করছে, যা আমেরিকার নিবিদ্ধ (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গত সংখ্যার দর্পণে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে)। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীমমরেন্দ্রনাথ সেনও গুণধের তর্যাবহ মূল্যের প্রতিবাদ করেন।

সম্মেলনে উত্থাপিত এক প্রস্তাবে আই এম এ গুণধের উপর সরকারী কর হ্রাস, সরকারী অস্থদান, ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন ও আই ডি পি এলের মুনাফার চেটা বন্ধ করা এবং একটি জাতীয় গুণধ নীতি গ্রহণ করার দাবি তুলেছেন। এই দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা দেশব্যাপী স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সম্মেলন দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে যে তাঁরা যেন গুণধের মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা করেন, দাম কমানোর দাবি জানান। সম্মেলনে ডাঃ রূপেন সেন, ডাঃ নীহার মুন্সী কালান্তর পরিকার সম্পাদক জ্যোতি বাশগুপ্ত, মেডিক্যাল রিগ্রেশনটে-টিভ সমিতির সম্পাদক অমিতাভ গুহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কংগ্রেসী জমানায় ট্রান্সফর্মার কেলেকারীর আরও তথ্য

কংগ্রেসী জমানায় রাজ্য বিদ্যুৎ পূর্বদে ট্রান্সফর্মার কেনা নিয়ে যেনব কলেকারী হয়েছে সে বিষয়ে প্রথম কিত্তি ইতিপূর্বে র্পণে প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সফর্মার সম্পর্কিত কলেকারীর আরও তথ্য আছে। দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রি-বিউশন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব পেশ করে বলেন যে, খড়গপুর-সাব স্টেশনের জন্ত কলকাতার একটি উৎপাদক সংস্থার স্টক থেকে অবিলম্বে (৭.৫ এম ডি এ, ১০২/৩০ কে ভি) একটি ট্রান্স-ফর্মার খরিদ করা হোক। কেননা যে ট্রান্সফর্মারটি রয়েছে তাতে গোল-যোগ দেখা দিয়েছে। চীফ ইঞ্জি-নিয়ার এ বিষয়ে কলকাতার ঐ উৎ-পাদক সংস্থাটির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ৭৫ সালের নভেম্বরে। ঐ সংস্থার দর ছিল সাড়ে নয় লক্ষ টাকা। কথাবার্তার দ্বিহ্ন হয় যে, দাম হবে নয় লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় কর আলাদাভাবে দিতে হবে। আরও স্থির হয় যে, ১২ মাসের মধ্যেই ডেলিভারী দিতে হবে। চটজলদি চাহিদা পূরণের কারণে বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি ১৯৭৫ এর নভেম্বরেই অম্ব-মোদন করেন এবং ঐ সংস্থাটি ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করে ১৯৭৬ সালের মে মাসে। কিন্তু অতীত আশ্চর্যের বিষয় ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া ঐ ট্রান্স-ফর্মারটিকে কোন কাজে না লাগিয়ে অব্যবহৃত অবস্থায় কলে রাখা হয়েছে। কেন তা কাজে লাগানো হয়নি সে সম্পর্কিত কোন তথ্য পর্যবেক্ষণ নথিপত্রে পাওয়া যায়নি। অথচ জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে টেওয়ার না ডেকেই ট্রান্সফর্মারটি খরিদ করা হয়েছিল।

২৫ কে ভি এ সিড টাইপ ট্রান্স-ফর্মার সরবরাহের জন্ত পর্যবেক্ষণ স্ট্যান্ডিং টেওয়ার কমিটি টেওয়ার ডাকে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে। স্থির হয় ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে এমন শিল্পের ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার পিছু দাম দেওয়া হবে ৫ হাজার ১০০ টাকা এবং অম্ব সংস্থার ক্ষেত্রে দাম খার্ব করা হয় ৪ হাজার ৭০০ টাকা। ১৯৭৭ সালের মে মাসে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে না এমন পাঁচটি সংস্থাকে ১৬০টি ট্রান্সফর্মার সরবরাহ করার বরাত দেয়া হয়। এর মধ্যে যে সংস্থাটি ৩০টি ট্রান্সফর্মার সরবরাহের বরাত পায় তারা আবেদন করে যে,

খার্ব ৪ হাজার ৭০০ টাকা দরে ট্রান্স-ফর্মার সরবরাহ করলে তাদের ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক। সুতরাং পূর্ব নির্ধারিত দরের বদলে প্রতিটির দর দেয়া হোক ৫ হাজার ১২০ টাকা। ঐ আবেদন অনুসারে টেওয়ার কমিটি তাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করে কেবলমাত্র আবেদনকারী সংস্থাটির অম্বকুলে দাম বৃদ্ধি করেন ৫ হাজার ১০০ টাকায়। এর ফলে পর্যবেক্ষণ অতিরিক্ত খরচ পড়ে ১০ হাজার ২০০ টাকা। অথচ বাকি চারটি সংস্থা কিন্তু ঐ ৪ হাজার ৭০০ টাকাতেই সরবরাহ শেষ করে। একটি বিশেষ সংস্থার ক্ষেত্রে কেন এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কিত কোন তথ্য পর্যবেক্ষণ নথিপত্রে নেই।

কলকাতার একটি সংস্থা কর্তৃক সরবরাহ করা ১৫১টি ট্রান্সফর্মারের মধ্যে ৩৮টিতে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা করে এই গোলযোগ ধরা পড়ে। গ্যারাণ্টি পিরিয়ডের মধ্যেই ট্রান্সফর্মারগুলির জট ধরা পড়ে। যে সংস্থাটি এইগুলি সরবরাহ করে-ছিল তারা সরবরাহের স্থানে ২টি সারিয়ে দেয় কিন্তু বাকি ২১টি ট্রান্সফর্মার মেরামত না হওয়া অবস্থায় পড়ে ছিল ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত। এগুলি খরিদ করা হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকায়। সরবরাহকারী সংস্থাটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন কোন প্রমা-নিক তথ্য পর্যবেক্ষণ নথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঐ ট্রান্সফর্মার-গুলি মেরামত না হয়ে পড়ে রয়েছে। কিতাবে পর্যবেক্ষণ অর্থ নয়-ছয় করা হয়েছে এসব তথ্য তার এক একটি উদাহরণ মাত্র।

এবার দেখা যাক পর্যবেক্ষণ কলে ট্রান্সফর্মারগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে অভিটার আগু কলকাতার জেনা-রেল কি মন্তব্য করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে একটি এবং ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে আরেকটি, মোট দুটি ৩১.৫ এম ডি এ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফর্মার আধি-সমগ্রগ্রাম লাবস্টেশনে বসানো হয়। এগুলির একটির মূল্য ৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে দুটিই অকেজো হয়ে পড়ে। তার একটিকে মেরামত করে পুনরায় কাজে লাগানো হয় ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে। মেরামতী কাজে ব্যয় শেখাংশ ১১শ পুটার

হীরেন গৌহাই ও আসাম আন্দোলন মিহির আচার্য

খবরে প্রকাশ, আসামের বর্তমান আন্দোলনকারীদের দ্বারা মেরাজো-রই প্রগতিশীল বুদ্ধিবীরা পৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার রীডার ডঃ হীরেন গৌহাই প্রস্তুত হয়েছেন। এই সংবাদে যখন আমরা উদ্ভূত তখনই হাতে এল ২০ এপ্রিল ১৯৮০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন আয়োজিত “আসাম সমস্যা এবং তার প্রতিকার” শীর্ষক সেমি-নারে ডঃ গৌহাইয়ের লিখিত বক্তব্য-সম্মিলিত পুস্তিকা।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিবীরা যখন প্রতিবেশী বুদ্ধিবীরা বসিষ্ঠ কর্তৃ-খর আশা করছিলেন তখনই স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, ডঃ গৌহাই-ই নন, ও রাজ্যের তরুণ বামপন্থী পার্টির ক্যাডাররাও সংগঠন সচেতনতার প্রমাণ রেখেছেন। কলেজের অধ্যাপকদের একটি অংশ, যেমন শশী শর্মা, যোগেন বর্মণ, ভোমেশ্বর চেট্টা, গঙ্গাধর চৌধুরী, উদয়াদিত্য ভারলী, রঞ্জিত ডেকা পোখারী এবং হোমেন বড়গোহাই প্রমুখ সম্পাদক ও নিরুপমা বড়-গোহাই, প্রেসমন্ডিং চৌধুরী প্রমুখ লেখকেরা প্রতিরোধে মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে গণতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী র্যাডিকাল চিন্তাধারাকে তারতর্ঘ্যে, বিশেষ করে আসামের মাটিতে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। তার জন্তে চাই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রস্তুতি ও পরিপ্রম। অস্তথায় বাম-পন্থী চিন্তাধারা ভারতের ইতিহাসে পরাজিত ক্লাউনের আখ্যা পাবে, যাঁদের ভূমিকা বাবতীর মহৎ কর্মকে মূর্খ প্রহসনে পরিণত করা।

এই আন্দোলনের সমাধানের প্রস্নে ডঃ গৌহাই স্থিরনিশ্চিত যে, জোর করে দমিয়ে দ্বারী কয়লালা হবে না কিংবা তত্ত্বাকথিত বিদেশী বিভাডনেও এর হুরাহা নেই। কেবলমাত্র সচেতন বামপন্থী শক্তিই এর সমাধানে লক্ষ্য। বিষয়টি ‘প্রশাসনিক’ নয়, ‘দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত-নের। সংবন্ধ হতে হবে ‘বৃহৎ পুঞ্জি’ ও ‘সামন্তান্ত্রিক শক্তির’ বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

ডঃ গৌহাই শুরুতেই সংশয় প্রকাশ করেছেন, দ্বারা বলেন আসামের এই আন্দোলন ‘জাতির আত্মনিরূপণের’ পরিচায়ক। তাঁদের কাছে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন সে কারণে ‘বাঙালী’ হিন্দু-মুসলমানকে কেন শহীদ করা হবে। তিনি তথ্য প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন ‘বিদেশী’ বকলমে

যে বহিরাগত লোকশক্তি দেখানো হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। গত কয়েক-মাস ধরে ‘আসাম ট্রিবিউন’ ও ‘দৈনিক অম্ব’ এবং অন্যান্য পত্রিকায় বারবার এই প্রশ্নে ‘বাংলাদেশী’ জিগির তোলা হচ্ছে।

‘সংস্কৃতিগত পরিচিতি’ ক্ষুদ্র হবার কোনো আশংকাকেও তিনি বাস্তব বলে মনে করেন না। কারণ উনিশ-শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে আসামে আধুনিক জাতীয় সংস্কৃতির শক্ত বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। চল্লিশের দশকে এদেশের মানুষই রাজ্যটিকে মুসলিম-প্রধান করার যত্নস্বত্রে বাধা দিয়েছে। ১৯৬১-তে অসমীয়া সরকারী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে, আসামের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে বহিরাগতরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রাজা, রেলপথ এ-রাই তৈরি করেছেন। প্রাথমিক জরে বাঙালী শিক্ষিতরাই স্কুল-প্রতিষ্ঠা করেছেন। ব্যবসা-বাণি-জ্যের পন্থনও বহিরাগতদের দ্বারা। এবং তাঁদের এই কর্মধারা বর্তমান আসাম ও তার জাতীয়তাবোধেরও প্রেরণাদায়ী। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এমন কি মরমনলিংহ থেকে আগত মুসলিম চাষিদের যে শিক্ষা করা হয় তাঁরাই এদেশে ‘সম্পদ, ব্যবসা, সাধারণ অর্থনৈতিক প্রতি-পত্তির’ যোগান দিয়েছে।

শিক্ষার বাংলা ভাষার মাধ্যম প্রসঙ্গে ডঃ গৌহাই ইতিহাসকে অম্ব-লম্বান করে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ ১৮৩৭-এ বাংলাভাষাকে প্রচলন করেছিলেন শাসনকার্যের সুবিধের জন্ত, কোনো ভাবাপ্রেরের তাগিদে নয়। বাংলা শাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই আসাম শাসিত হচ্ছিল এবং যেহেতু বাংলা ভাষা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল, তাই আসামে নতুন জমি সংক্রান্ত আইন, আইন-আদালত এবং সরকারী কাজে বাংলাভাষার প্রচলন হয়েছিল। শাসন সংক্রান্ত ব্যৱস্তার লাঘব কর-বার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ এ ‘সিদ্ধান্ত’ নিয়েছিল। এরজন্ত নিশ্চয় বাঙালী-দের দ্বারী করা চলে না। অস্তথিকে মুসলিম প্রধান রাজ্য করার জন্তে মুসলিম লীগের যে পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, তা হয়েছে ১৯৪০-৪৫-এ। আসামের মুসলিম নেতা এবং মধ্যমীরা লাহুল্লা মুসলিম লীগে মাত্র ১৯৩৭-এ যোগ দেন। কাজেই ১৯১১ থেকে যে মতলবের কথা বলা হচ্ছে তার

জন্তে তাঁকে দ্বারী করা যায় না। তাছাড়া, স্বাধীনোত্তর কালে যদি এই মতলব নিয়েই মুসলিম-অম্ব প্রবেশ হয়ে থাকবে তাহলে আমরা আসাম-মের দেই সব মহান নেতৃবর্গ, যেমন মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সিদ্ধিনাথ শর্মা, মতিরাম বোরা, অম্বিয়কুমার দাস কী করে মুসলিম আগতদের নগণ্য-কামরূপ-দ্বারাও জেলায় চাষের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন? তাঁদের ‘মুসলিম অস্তিষামের’ পক্ষ বাহিনী আধা-দেয়া নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি হবে।

ডঃ গৌহাই কঠোরভাবে বলে-ছেন, এ আন্দোলন মোটেই শান্তি-পূর্ণ বা গণতান্ত্রিক কার্যদায় নেই। এই আন্দোলনের নেতারা বাই-তাবুন, ফ্যানিস্ট বটিকা বাহিনী, দ্বারা মূলত ‘সমাজবিরোধী’ দ্বারা রাজ্যে লম্বাস স্থিতি করেছেন। ‘বামপন্থীরা’ ‘দেশজোহী’ আখ্যা পেয়েছেন। প্রথম থেকেই বামপন্থী কর্মীরা, তিনি সি, পি, আই হোন, কিংবা সি পি আই (এম-এল) হোন, আজমণের লক্ষ্য। সংবাদপত্র, প্রশাসন, পুলিশ এককাটা হয়েছে। কাজেই এই আন্দোলনের লক্ষ্য এবং পন্থা—কোনোটাই ডঃ গৌহাই সমর্থন করেন না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমীরা জ্যোতি বহু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কুংসার শিকার হয়েছেন।

ডঃ গৌহাই আরো দেখিয়েছেন যে, ‘বৃহৎ পুঞ্জির’ আধিপত্য কীভাবে আসামী ভূখারী, মাঝারি পুঞ্জি এবং তাঁদের সরকারী একেটদের ক্ষমতা খর্ব করেছে। তারা ভারতীয় শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করতে উৎসুক, যাতে রাজ্যের আরের তারাপ অংশ পায়। অস্তথিকে এরা শ্রেণীসচেতন প্রবর্তীরা মাহুকের শাকসোয় পিছনে ছুরি মারছে। ডঃ গৌহাই সি, আই, এ-র হস্তক্ষেপ কিংবা ব্রিটিশ সর্দার খার্ব সম্পর্কে অবহিত হলেও তিনি মনে করেন ভারতীয় বৃহৎ পুঞ্জি সি, আই, এ-র ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ আন্দোলনকে মদৎ দেবে না। এই মদ্যই এই আন্দো-লনের দুর্বলতার দিক।

On the Present Move-
ment in Assam. by Dr Hiren
Gohain. Sirbhum Publishing
Co. 79 Mahatma Gandhi
Road, cal-9. Price Rupees
three only.

শিয়ালদহ ষ্টেশনের এক শ্রেণীর রেলকর্মী বেপরোয়া টাকা লুটছে

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ষ্টেশনে ব্যাপকহারে টাকা কড়ি লুট চলছে। ওই লুট করছে টিকেট কালেকটরের একটি বড় অংশ। তাছাড়া, ওই ডিভিশনের দুই পাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতেও লুট চলছে। ভ্রাম্যমান টিকেট পরীক্ষক (টি,টি,ই) এবং গার্ড বাবুদের একাংশ শেযোক্ত বটনার অংশ গ্রহণ করে ওই কাণ্ড করছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার দ্বিতীয় কমতার ফিরে আসার পরে ওই লুটের হিড়িক আরো বেড়ে গেছে। এর সঙ্গে রেল পুলিশ এবং রেল রক্ষী বাহিনীর একটি অংশও জড়িত আছে। রেলের ডিভিশ্যালের বা দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মীরা যদিও প্রায় প্রতিদিনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে একদিক-ওদিক ঘুরছে, তথাপি ওখানে তাদের কোন সূত্রিকা আছে বলে মনেই হয় না।

ওয়ার্কিবহাল মহলের অভিযোগ যে, রেলের দুর্নীতি দমন বিভাগের একাংশ এবং টিকেট কালেকটরের

উর্দ্ধতন কর্মীদের একটি অংশ নেপথ্যে ওই লুটের উস্কানী দিচ্ছে এবং মিত্রভাবে সংগৃহীত অর্থের ভাগ নিচ্ছে। একজন টিকেট কালেকটর তো কোম্পানির সঙ্গে বলেই ফেলেন যে, “জামেন দাওয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই কুর্কম আমাদের করতে হচ্ছে। আমাদের ইমিগ্রিয়েট মাথার উপরে যিনি বসে আছেন, তাকে প্রতি সপ্তাহে প্রতি টিকেট কালেকটরকে দশ টাকা করে সেলামী দিতে হয়। তা না হলে শিয়ালদহে তাঁর স্থান হয় না। তাঁকে রোড সাইড ষ্টেশনে অর্থাৎ যেখানে টাকা কড়ি লেন-দেনের সুযোগ নেই শান্তি হিসেবে সেখানেই তাকে বদলী করা হয়।”

এই টিকেট কালেকটর আরো জানিয়েছেন যে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে দৈনিক কমপক্ষে অষ্টাশতাবিধ পাঁচ হাজার টাকার লেনদেন হয়ে থাকে। জানা গেছে, এই অষ্টাশতাবিধ লেন-দেনের প্রধান উৎস প্রধানতঃ ভোগাররা। মফঃসল থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদ্য নিয়ে প্রতিদিন

যেমন বহু ভোগার কলকাতার আসে, তেমনই শিয়ালদহের কোলে মার্কেট-সহ বিভিন্ন পাইকারী বাজার থেকেও আবার বহু ভোগার নানান ধরনের পণ্য খরিদ করে শহরতলীর বাজার-গুলিতে যায়। এই আঁপ ও ডাউনের ভোগারদের কাছ থেকেই প্রতিদিন ওই টাকা আদায় হয়।

এছাড়া, লালগোলা ও গয়া প্যাসেঞ্জার এবং আপার ইন্দিরা এক্সপ্রেসের টি টি ই এবং গার্ড বাবুদের একাংশও ভোগারদের কাছ থেকে নিয়মিত অবৈধভাবে টাকা কড়ি আদায় করছেন। এমনও দেখা গেছে, টি টি ই-দের একাংশ দুই-পাল্লার ট্রেনগুলিতে ডিউটি পাওয়ার জন্ত তার ইমিগ্রিয়েট বস বা ওপর-ওয়ালার কাছে নানাভাবে তহবির করছে এবং প্রলোভনের ও ফাঁদ বিস্তার করছে।

ওই সব টিকেট কালেকটর, টি টি ই এবং গার্ড বাবুদের কাছে তাদের নিধারিত সরকারী বেতন হল গোণ। এবং ভোগারদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ই হচ্ছে তাদের মুখ্য। জানা গেছে, এই সব বেআইনী পরসার এদের মধ্যে কেউ কেউ কলকাতার আশেপাশে বেনামীতে বাড়ীও তৈরী করেছে। অথচ, তারা সরকারী বাড়ীতে থাকছে। টেলিভিশন তো এদের কাছে মামুলী ব্যাপার। তাদের গিন্নীরা টেলিভিশন ছাড়া এখন থাকতেই পারছে না।

দমদম অংশন এবং বালিগঞ্জ জংশন ষ্টেশনেও টিকেট কালেকটর-দের একাংশ ঐ অবৈধ ফলাও কার-বার এবং লুট করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেহেতু ওই দুটি ষ্টেশন হয়েও কিছু কিছু ভোগার যাতায়াত করে থাকে। ওয়ার্কিবহাল মহল আক্ষেপ করে প্রশ্ন তুলেছেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আজ ৩০ বছর, অথচ, শিক্ষিত এই রেল কর্মীদের এই অধঃপতন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি মহল আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে, এটা ঠিক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জৌলতে এই লুট আরো বাড়বে। কারণ, এবারকার রেল বাজেটে আবার ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। তাই ভোগারদের ট্রেনের ভাড়া ফাঁকি দেবার প্রবণতা বাড়বে। টিকেট কালেকটর, টি, টি, ই এবং গার্ড বাবুদের একাংশ এই মওকার আরো লুটের সুযোগ পাবে।

রেলের কর্মী ব্যক্তিরা দর্পণের এই লংবাধের কতটা গুরুত্ব দেবেন জানি না, তবু আমাদের আবেদন দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থে এই সংবাদগুলি খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সরকারী রাজস্ব বাড়বে ছাড়া কমবে না। তাছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ ওই সব রেল কর্মীরাও কম বেশী একটু চিন্তা ভাবনা করবে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে ই-কংগ্রেসে আবার চেপ্টা চলছে

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এখনও ভাড়া জনতার থাকলেও তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের দ্বিতীয় হাইকমান্ডের হট লাইন চলছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিজয় সিং নাহারও এই যোগাযোগের লক্ষ্য হয়ে আছেন। রাজ্য কংগ্রেসে (ই) কিছু নারী ও প্রতীপকে টানার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দলের ভাবমূর্তি যাতে জন-সাধারণের কাছে উজ্জল হয়। আর এঁদের সাহায্যে রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ কাজে লাগান যায়।

একজন প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও বিজয় সিং নাহারের সঙ্গে যোগাযোগ ইন্দিরা কংগ্রেসের তরফে হয়েছে শুধু নয় আলাপ আলোচনাও চলছে। ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসে দলের উত্তর প্রদেশের এক প্রতাব-শালী এম পির—রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত জামাই গণেশ অভিনিউ-এর একটি বাড়িতে এঁদের ওঠেন। তার-পর ডঃ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে কংগ্রেস (ই) দলের দ্বিতীয় হাই-

কমান্ডের তরফে দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং তাঁর প্রতি মাতাপুত্র তথা সর্বোচ্চ কমতার অধিকারীদের মনোভাব বুঝিয়ে বলেন। ডঃ চন্দ্রকে এর আগে দলে পাবার জন্য সিদ্ধার্থ-শংকর রায়ের আমলে দলনেত্রী স্বয়ং সিদ্ধার্থশংকরকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠান। সেই সময় তাঁকে কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা হবে এমন কথা বলা হয়। সেবার অনেকের অনেক অসু-রোধেও তিনি নারাজ হন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্য। কংগ্রেস (ই) দল রাজনীতিক হিসেবে তাঁর সম্মান ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে তাঁকে যেমন চাইছে তিনিও বিজয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিক-টাও গভীরভাবে তেবে দেখছেন। কংগ্রেস (ই) দল তাঁকে পেলে আরও কজন প্রতাবশালী ও নামীকে পাবে এই আশার রয়েছে। তিনিও আশার আছেন এমন একটা কিছু করার যাতে তাঁর সূত্রিকা আবার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে।

মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর মতলব

পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জী সেই কংগ্রেসী জমানার। তাই লোক-সভার নির্বাচনে হেরে গিয়েও রাজ্যসভার সদস্য থাকার সুবাদে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যসভার সদস্য থাকার মেয়াদ ১৯৮১ সালের পরলা এপ্রিল শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি কি করবেন? এই রাজ্য থেকে রাজ্য-সভার সদস্য মনোনীত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা এই রাজ্যে

বামফ্রন্ট সরকার গঠিতে আছেন। বামফ্রন্টের সমর্থন ছাড়া প্রণববাবু জেতা সম্ভব নয়। বামফ্রন্ট প্রণব-বাবুকে সমর্থন করবেনা একথা সকলেই জানে। প্রণব বাবুও জানেন। এই কথা চিন্তা করেই সম্ভবত প্রণববাবু গুজরাট রাজ্যে কিছু জরি খরিদ করেছেন। সেখানকার ভোটার তালিকাকেও তিনি তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছেন। ১৯৮১ সালে গুজরাট রাজ্য থেকে তিনি রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হতে চান।

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

- * সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দম্পতিকে সাহায্য করাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্ততম লক্ষ্য।
- * পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুনভাবে চেলেসেজে জনকল্যাণমুখী করা হয়েছে। এখন এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে খেচ্ছামূলক। কোনও রকম জোরজুলুম বা জবরদস্তির স্থান এই প্রকল্পে নাই।
- * সুস্থান-সুস্থতা মায়ের জন্ত এবং শিশুদের জন্ত নানারকম রোগ প্রতিষেধক টিকা দান এবং পুষ্টির জন্ত বিনামূল্যে ভিটামিন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।
- * জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ্ধতি এতদিন দম্পতিরা গ্রহণ করে আসছেন সেই সব সুযোগ এখনও বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র ধার্মা ভ্যাসেকটমি টিউবেকটমি অথবা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের জন্তই আর্থিক অসুস্থতানের ব্যবস্থা আছে। যে সব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ পাঁচ টাকা এবং ধার্মা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১৫ টাকা (বিনামূল্যে হাসপাতালে অপারেশন, ঔষধপত্র ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সহ) এবং পুরুষদের ভ্যাসেকটমি করিয়ে নেওয়ার জন্ত প্রত্যেককে নগদ ১০০ টাকা (যাতায়াত খরচ পাঁচ টাকা ও জলযোগের জন্ত পাঁচ টাকা অর্থ বরাদ্দসহ) আর্থিক অসুস্থতান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে।
- * নিরুটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই সবরকম সাহায্য ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

রাজ্যের যে কোন হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ নিন।

বিজ্ঞাপন নং ২/৮০-৮১

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের
মাস মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

- ১। কোষতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ব / শ্রীঅমিরকুমার চট্টোপাধ্যায় / ১০.০০
- ২। জগৎ বিজ্ঞান / ডঃ কমলকৃষ্ণ দাস / ১০.০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ভোয়ার, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

২নং মুজাফফর আহমেদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবর্তনের চেউ এসেছে। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পে পরিবর্তনের পালাবদল ঘটেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম ও গ্রামীণ শিল্পের সংগে শহরে জীবনের নিবিড় যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটেছে। আহুন, আমাদের সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীদের রুজি-রোজগারের লড়াইকে স্বাগত জানাই।

'সকলের কল্পনাতে হয়ো না ত্রিয়মান....'

শিবাজী ভট্টাচার্য

কিছু কথা আছে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সে কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বছরে।

আচ্ছা কমরেড জ্যোতি বসু, সাতটি সালে আমরা তো বলেছিলাম অল্প মুখ্যমন্ত্রী, প্রফুল্ল বোয়ের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গড়াটা সঠিক। তখন আমাদের সেনিনের 'বামপন্থী কমিউনিজম ও শিল্পহীন বিশৃঙ্খলা' বইয়ের অন্ততঃ সেই অংশটা পড়ানো হয়েছিলো। যেখানে 'ত্রি টে নের ওয়ার্ল্ড সোশালিস্ট ফেডারেশনের নেত্রী সিলভার প্যাকহাস্ট কে সেনিন উপদেশ দিয়েছিলেন লয়েড জর্জের থেকে ঠেকাতে হওয়ার সন-সোর

বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই সংখ্যার দুটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হল। আগামী সংখ্যায় আরো কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হবে। — সম্পাদক, দুর্গা

মতো প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে পার্লামেন্টে বক করতে। এটা ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গের জনত্বী বনে সাতটি সালে একটা নতুন উদ্দীপনা এল। অমিক-কর্মচারীরা আন্দোলনের নতুন অঙ্গ বার করলেন ঘেরাও। বাড়ির পরিচারিকারাও সম্বন্ধ হয়ে ইউনিয়ন করতে চাইলেন। উত্তরবঙ্গে কৃষক-ক্ষেতমজুররা আওয়াজ তুললেন 'নকশালবাড়ি-খড়িবাড়ি, তোঁ মা র বাড়ি, আমার বাড়ি'। তখন রাজ্যে বিজ্ঞান সংকট ছিল না। অথচ বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সভায় রাজ্যের ভয়াবহ অবস্থার ক্ষোভ প্রকাশ করা হল। খবরের কাগজে বের হলো 'শিল্পপতিরা এ রাজ্য থেকে কারখানা সরিয়ে নিতে চাইছে'।

দ্বিতীয় সাউথ ব্লক সভায় করে একশে নতম্বর রাতে রাজ্যপাল ধরমবীর প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। আটচল্লিশ বস্তার বাংলা বন্ধ হল। সাতদিন ধরে আইন অমান্ত আন্দোলন হল। ত্রিগেডে নেতাদের পিঠে লাটি পড়লো। তিনমাস চললো প্রফুল্ল বোয়ের পি, ডি, এফ মন্ত্রিসভা। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করলেন প্রয়াত জাকির হোসেন।

আটটিতে ধরমবীর বি, বি, বোয়ের রক্ত চোখেও পশ্চিমবঙ্গের মেজাজ অন্ধরকম ছিল। বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাগজগুলো প্রচার করতো যে 'বাঙাল যে সব লাল হো

গিয়া।' কলকাতার ছাত্র নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য ছাত্র পরিষদ কাউকে সংগ্রহ করতে পারেনি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুখী তখন ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি। কোনও গোষ্ঠী কোন্ডলও ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টেও তাই। আই, এন, টি, ইউ, সি-র নেতা খুঁজে পাওয়া যেত না, এন, এল, সি-সির জন্মই হয়নি।

উন্নয়নের মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তৈরি হল। সি, সি, আই (এম) দলের সাতটিতে পাওয়া চ্যু-লিশটা সিট এবার প্রায় বিগুন হল। রাজ্যের যুবকদের অধিকাংশই রাজনীতিতে মাথা গলাতে লাগলেন। বামপন্থী রাজনীতি করাটা একটা ফ্যাশন হল অনেকের কাছে। আবার চক্কাৎ করে সত্তরের ঘোলই মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো হল।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা দেওয়ালে লিখেছিলাম 'যুক্তফ্রন্ট ভাঙলে পরে, জলবে আশ্রয় ঘরে ঘরে'। কিছু কার্যতঃ কিছুই হয়নি। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের প্রতিবাদে আটচল্লিশ বস্তা বাংলা বন্ধ দারুণ সফল হল কিন্তু সত্তরের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙলে সত্তেরোই মার্চ মাজ চলিশ বস্তা বন্ধ ডাকতেই বিধাগ্রস্ত হলো। মহাকরণ আর কর্পোরেশনের লালবাড়ি হুটোর মোহে তখন লবাই আমরা আচ্ছন্ন। যাক সে কথা.....

রাষ্ট্রপতি তি, তি, গিরির নামে ধাওয়ানকে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী তখন এ রাজ্য শাসন করছেন।

তখন আমাদের মূল স্লোগান ছিল, 'অবিভঞ্চে মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে হবে'। একাত্তরের মার্চে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের সঙ্গে এখানেও ভোট হল। হুশো আশিটা আসনের মধ্যে সি, সি, এম (সমিতি নির্দলসহ) ১১৪টা আসন পেলে। কিন্তু সংসদীয় পণতন্ত্রের আইন ভেঙে কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্যপাল দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের নেতা তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজয় সিং নাহারকে মন্ত্রিসভা গড়ার কথা বললেন। ওদের ধারাপাতে বোধ হয় ১১৪-এর চেয়ে কংগ্রেসের ১০০ বড়। অল্প মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী, বিজয় সিং নাহারকে উপমুখ্যমন্ত্রী করে মুসলিম লীগ সি, সি, আই-এর সাহায্যে গঠিত সেই ডেমো-ক্রাসী মন্ত্রিসভা ত্রিশে জুন অবধি টিকলো।

তারপরেও সি, সি, আই, (এম)-কে ডাকা হল না। বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল। দিয়ার্ণ রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। আবার দেওয়ালে লেখা হলো, 'সংসদীয় পণতন্ত্রের বিপর্যয় শাসকশ্রেণীর কাছ থেকেই আসে'।

আনা হোল ডায়ালকে। পুলিশ-বুঝ কংগ্রেস-ছাত্র পরিষদের খেত সন্ত্রাস শুরু আগেরি স্লোগান-তোলা হয়, 'অত্যাচারের পরিণাম, বাংলা হবে ভিয়েতনাম'। শত শত ছেলে খুন হল, হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক পাড়া ছাড়া হল। বাহাদুরের এপারোই মার্চ লাফানো বিধানসভার সাজানো নির্বাচনের পর আমরা দেওয়ালে লিখলাম, 'অত্যাচারের কাছে হাটু গেড়ে মাথা নত নয়, হবে প্রতিরোধ—জ্যোতি বসু'।

কমরেড জ্যোতিবাবু, '৭১-৭৫ এ

পচিশে জুন পর্যন্ত আনা ক্যান্ডি সন্ত্রাসের মুখে দেওয়ালে পিঠে রেখে হাত তুলে দিয়েছি, নানা পতাকা উড়িয়েছি আপনাদের কথায়তো। তারপর জরুরী অবস্থার চূপচাপ।

আবার সাতাত্তরের এপ্রিলে ফিরে এলাম। বিধানসভার নির্বাচনে জয়জয়কার। এবার আর টাকা দিয়ে এম, এল, এ, কিনে মন্ত্রিসভা ভাঙা সম্ভব নয়। তাই গত আগস্টে বিভিন্ন রাজ্যে তখনকার জনতা পার্টির বিধানসভা সদস্যদের স্লোর ক্রস করে লোকদলে যাওয়ার ঘুম দেখে এখানে মহাকরণে এক দিন রিপোর্টাররা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বামফ্রন্টের অবস্থা জানতে চাইলে জ্যোতিবাবু, আপনি বলেছিলেন, 'মাগরে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কিবা ভয়'।

মনে পড়ছে। এখন লোকসভা নির্বাচনের পর আমরা তো পড়েছি মহামুসলি। এখন আপনার মাগরের শয্যা হাজির ঘুরছে। হুটো কথা শোনা যাচ্ছে, (এক) সঙ্গর গান্ধী বেশিদিন এ সরকার সহ করবেন না—বন্ধ কমল নাথকে বলেবর করতে

চাইছেন। (দুট) ইন্দিরা এবার বাম ফ্রন্ট সরকার নাও ভাঙতে পারেন কারণ জ্যোতি বসুর তথ্য, সি, সি, এম নেতৃত্বের সঙ্গে আকগান আসাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে একটা লাইন হয়ে গেছে।

গত ৭ জুনের 'গণশক্তি'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে 'বামফ্রন্টের গত তিনবছরে পার্টির একশো চল্লিশ জন কর্মী কং (ই) ওগাধের হাতে খুন হয়েছে।' আচ্ছা, মুখ্যমন্ত্রী আপনি তো সাতাত্তরেই পুলিশকে বলেছিলেন, 'বাটদিনের মধ্যেই প্রত্যেকটা কেসে আদালতে চার্জশীট দিতে হবে। ঐ ১৪০টা খুনের কোনটায় চার্জশীট হয়েছে জানাবেন।

কিন্তু এসব ধানাই-পানাই থাক। আসল কথার আসি। এখন কি হবে? যদি বামফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয় আবার সেই ৭১-৭৬ এর রাজত্ব ফিরে আসবে। সেবার জরুরী অবস্থা আরির প্রতিবাদে আমরা বারো বস্তার জন্তও বাংলা বন্ধ ডাকতে পারি নি।

অখণ্ড বিশ্বাস প্রথম ও শেষ কথা

যে কোন জনকল্যাণ সংস্থার পক্ষে এই বিশ্বাস অপরিহার্য। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এই বিশ্বাস অর্জন করা অসম্ভব। ঐতিহাসমুদ্র এই মহানগর। সেখানে প্রথম ভূগর্ভ রেল তৈরির কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত অজস্র কর্মী। আপনাদের এই অখণ্ড বিশ্বাসে তাঁরা আজ অনুপ্রাণিত।

আপনাদের সক্রিয় সমর্থনই আমাদের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। এই সমর্থনেই আমাদের কাজের গতি আজ দ্রুততর, সুদূরের স্বপ্ন নিকটতর। প্রয়োজনীয় অর্থের আনুকূল্যে প্রায় সর্বত্রই আমরা কর্মতৎপর। শেষ লক্ষ্যে অব্যাহত গতি।

বিশ্বাস ও সমর্থন এমনি করেই অসম্ভবকে সম্ভব করে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দূরতম স্বপ্ন নিকটতর হয়ে মধুর বাস্তবে পরিণত হয়।



কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনার ভূগর্ভ রেল
মোট্রো রেল, কলকাতা

বামফ্রন্ট সরকার ও সাহিত্য সংস্কৃতির তদন্ত

নিবারণ চন্দ্র

সম্পাদিত আদেশ করেছেন বাম-ফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় বর্ষ পুঁতি প্রস্তুতিতে সরকারের তরফ থেকে সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে কী-উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে দর্পণের পাঠকদের কিছু জানানো। কৈফিয়ৎ স্বরূপ স্বীকার করে মেসার্স বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে, যদিও সরকারের 'সংস্কৃতি' নামীয় একটি নতুন বিভাগ স্থাপিত হয়েছে তা হলেও সংস্কৃতির ব্যাপার স্বেচ্ছাচারে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারি-বাসী সংস্কৃতিমান বিদগ্ধ মানুষদেরই। সরকারের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো তাৎপর্য নেই। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সংস্কৃতির ছাঁচটা সরকারি-বাসী আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আমরা যারা সাহিত্য সংস্কৃতির উপর সরকারি হস্তক্ষেপ পছন্দ করি না তারা জনপ্রিয় সরকারের কাছ থেকে এই-টেই আশা করি, উদ্যোগটা আমা-দেরই থাক, সরকার প্রয়োজনবোধে তাকে সাহায্য করুন, এই মাত্র।

সরকার গঠিত হতেই এই বিভাগের মন্ত্রিসভার সভ্যদের একটা নাটককে কেন্দ্র করে অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাস আত্মজ্ঞান জ্ঞানালেন তাতে প্রগতিশীল মূল থেকে সভ্য-দমিতি মিছিল, এমন কি সংকলন-গ্রন্থ পর্যন্ত প্রকাশিত হলেও, দেখা গেল, আখ্যে কোনো কাজ হল না। সরকারের তরফ থেকে এমন কোনো কসত দেখা গেল না যাতে এই তথ্য-কথিত অসংস্কৃতিগুলোকে বন্ধ করা গিয়েছে। এবং দৈনিক কাগজ খুললেই চোখে পড়ে অসংস্কৃতি বিভিন্ন নাট্যমালার জাঁকিয়ে আসর বসিয়েছে।

আমাদের বিবেচনার বুজোঁরা সমাজব্যবস্থা যেখানে পড়ে গিয়েছে সেখানে এই ধরনের নাটক, কি সাহিত্যের বাড়াবাড়ি একটি ঐতি-হাসিক কার্যকারণের পরিণাম। অসংস্কৃতিকে ঠেকানোর একমাত্র

উপায় বেশি করে স্বয়ং সংস্কৃতি পরি-বেশন করা। তা না করে শুধু অসংস্কৃতি বলে সোরগোল তুললে দেশের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের কাছে তার আবেদন থাকে না। থাকেও নি। পরিণামে সরকারি-উদ্যোগে এই অসংস্কৃতি অভিমান হাস্যকর ব্যর্থতার পর্ববসিত হয়েছে।

সরকারের দ্বিতীয় উদ্যোগ দেখা গেল 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক সরকারি মুদ্রণশ্রমিকের টেলে সাফা-নো। রাত-রাতি 'রবীন্দ্র সংখ্যা' ইত্যাদি করে পত্রিকাটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত হয়ে মুখ্যত সাহিত্য পক্ষে রূপান্তরিত হল। এই রূপান্তর যৌক্তিক কিনা সে প্রশ্ন থাকলেও এর উদ্দেশ্যের জনপ্রিয়তাকে খারিজ করা অসম্ভব হবে। যদিও দলীয়নীতির দিক থেকে প্রশ্ন থাকে সরকারি নীতি ও কর্মোদ্যোগগুলিরই প্রাধান্য থাকা উচিত। সাহিত্য প্রচারের কাজটা বেশিরভাগ প্রচেষ্টার মধ্যে রাখাই নিরাপদ।

এরপর হঠাৎ সরকারি তরফ থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী বার করার উদ্যোগ নেয়া হল কেন বুঝতে পার-লাম না। কারণ এ কাজ সরকারি রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একবার করেছেন। বহু প্রচারিতও হয়েছে স্বল্পমূল্যে এখন বার দাম শোনা যাচ্ছে বহুগুণ বাড়বে। সরকারি হঠাৎ এটাকে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করলেন কেন, কারা এ ব্যাপারে সরকারের উপদেষ্টা, এসব প্রশ্ন আমার কাছে ধাঁধার মতো। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব, তাঁর রচনা-বলী প্রচারের জন্য বিশ্বভারতীই রয়েছে, তাদের প্রচারব্যয়ও কম শক্তিশালী নয়, তা সত্ত্বেও জনসাধা-রণের টাকা খরচ করে এ কাজের দায়িত্ব নেবার তাৎপর্য কী?

আমার সংশয় আছে সরকারের তরফ থেকে কোন্ কাজ আগে কোনটা পরে এই বিচারের কোনো মানদণ্ড তাদের আছে কিনা। রচনা-বলী প্রকাশ করতেই যদি হয় তাহলে অকারণ তেজা মাথায় তেল দিয়ে লাভ কী। বহু খ্যাতিমান লেখক-দের লেখাই অবজার-অন্যদরে আজ আর বাজারে মেই। জনপ্রিয় সর-কারের উচিত ছিল না কি সেইসব লেখকদের বিম্বতি থেকে তুলে এনে সমর্যায় প্রতীতি করা।

সরকারি পুরস্কারের ব্যাপারটাও এই প্রসঙ্গে ওঠে। 'রবীন্দ্র পুরস্কার' তো কংগ্রেসী আমল থেকেই প্রচলিত আছে। তা থাক। কিন্তু 'বিজা-

নাগর' কিংবা 'বঙ্কিমজি', আরো এগিয়ে 'মানিক পুরস্কার'ও তো চালু করা যেত। কেন তা হয়নি?

তুনেছি সরকার বিভিন্ন কমিটি করেছেন। সেই কমিটিগুলি কী প্রসব করেছে আমার জানা নেই। পরিত্যক্তা কমিটি, বার চেয়ারম্যান আচার্য হুজুর লেন, তার কাজকর্ম বন্ধ। কেন? সাহিত্যে হুঁসিতি নিবারণের ক্ষেত্রে একটি কমিটি আছে তুনেছি। এবং সে-কমিটি একজন লেখকের অসীম গ্রন্থের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে তুনেছিলাম। হঠাৎ জানলাম সে-ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি এবং কার্যত কমিটি বন্ধ। 'রাস্তাঘাটের নাম বদল' করার ক্ষেত্রেও একটি কমিটি আছে। যদিও আমার মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নামবাহী রাস্তাগুলো ছাড়া প্রাচীন কোনো নাম বদলা-বার মানে প্রাচীন ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করা। কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল কমিটির জনৈক উৎসাহী কলকাতা করপোরেশন-প্রকাশিত অমল হোম সম্পাদিত 'রবীন্দ্র সম্বন্ধে' সংখ্যাটিকে পুনর্মুদ্রণ করবেন। টাকাও মঞ্জুর হয়েছিল, দৈনিক রক্ষা করেছেন, সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরকারি পাঠাগারে যাতে সুই-ভাবে বই কেনা যায় তার জন্য অনেক টালবাহানা করে বিলম্বিত কমিটি করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে সরকার অত্যন্ত শতকরা হুড়ি ভাগ বই কেনবার ক্ষেত্রে লাইব্রেরিতে আবৃত্তিক লিষ্ট পাঠাবেন। কিন্তু টাকার অভাব এমন সামান্য যে ওই লিস্টের থেকেও বেছে বই কেনবার স্বাধীনতা আছে লাইব্রেরির। কলকাতা লিস্টে যদি আপনার বই থাকেও তাহলে সেটা লাইব্রেরি চিহ্নিত করবে এমন নিশ্চয়তা মেই। আবার লিস্টটাও এমনভাবে হচ্ছে যাতে একই লেখকের ২০ খানা বই চলে যাচ্ছে, অনেকের বইয়ের নামগন্ধ নেই। প্রগতিশীল লেখকদের বরাতেও এ জিনিস ঘটছে, বার ফলে লেখকদের সার্বিক কল্যাণ হচ্ছে না। এবার সরকার উভয় নিয়েছেন সরকার-নির্বাচিত লেখকদের কিছু বই ছাপবার ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য করবেন। বলাবাহুল্য এখানেও কমিটি। তা না হয় বই ছাপা হল, বিক্রি করার দায়িত্ব কে নেবেন?

হঠাৎ আর্থিক বছরের শেষে সর-কারি মুদ্রণ সাহিত্য পত্রিকাগুলিকে আদেশ পাঠালেন বিভিন্ন লাইব্রেরির

অন্তে ৪০০ গ্রাহক করে নিতে। সাহিত্য পত্রিকাগুলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে তাবছে এমন সময় আগের আদেশ নাকচ হয়ে গেল, দ্বিতীয় আদেশে জানানো হল গত বছরের সংখ্যা ৪০০ কপি করে লাইব্রেরি-গুলিতে পাঠিয়ে দিতে। উর্বর মস্তিষ্কই বলতে হবে, সাহিত্য পত্রিকা পুরনো সংখ্যা যদি ৪০০ করেই থাকবে তাহলে আর তাবনা কী

ছিল! কার্যত এই আদেশও বাত-চাল হয়ে গেল।

এইভাবেই সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে সরকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। তাদের সহিষ্ণুকে স্বীকার করেই বিপর-কৌতুকে জিগ্যাস করতে ইচ্ছে করে এই সব বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা কারা? বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে আলাদা ধারণা পোষণ করি বলেই যাতে সরকার সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারে তাই এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ। কারণ সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক।

সি এম ডি এ কি এবং কি কি করে

আমাদের কলকাতা মহানগরীর উন্নয়নের জন্য এই সংখ্যা কাজ করছে। কি কি কাজ?

জল সরবরাহ: অর্থাৎ মহানগরীর ৪৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অত্যন্ত ১০ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা। পলতার পুরোনো ওয়াটার ওয়ার্কসের শক্তি বৃদ্ধি করা থেকে আরম্ভ করে গার্ডেনরীচ এবং হাওড়ার নতুন ওয়াটার ওয়ার্কস বা জল প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। অক্স্যাণ্ড স্কয়ারে ভূগর্ভস্থ জলা-ধার নির্মিত হয়ে গেছে,—স্ববোধ মল্লিক স্কয়ারে কাজ এগোচ্ছে। এছাড়া গভীর নলকূপ খুঁড়ে এবং বিরাট ও ছোট আকারের পাইপের মধ্য দিয়ে পরিষ্কৃত পানীয় জল বিতরণ এলাকায় পৌঁছে।

পথ ও পরিবহন: কলকাতার কাছাকাছি ইষ্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস এবং বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের কাজ যেমন চলছে, তেমনি অনেক রাস্তা চওড়া হয়েছে। যেমন ডায়মন্ডহারবার রোড, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, জগদীশ-চন্দ্র বোস রোড, শরৎ বোস রোড, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, আনওয়ার শাহ রোড ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে (চেতলা, উন্টাডাঙ্গা আর বালিগঞ্জ) ক্লাইভবার বা উড়ালপুল (ব্রাবোর্ন রোড), দাবওয়ে (হাওড়া) ইত্যাদি। শিয়ালদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাইভবার বা উড়ালপুলের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। রাস্তার আলোও সি এম ডি এ দিয়ে থাকে।

নালানন্দমা: বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালানন্দমা খুঁড়ে জল-ময়তার প্রকোপ কমানোর চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়াও আছে নালানন্দমা এবং খালের লংগার, মল নিকালী ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বস্ত্রী উন্নয়ন প্রকল্প: মহানগরীর সমস্ত বস্ত্রীতেই পানীয় জল, পাকা পায়খানা এবং বিজলীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ছাড়া আছে মিউনিসিপ্যালিটি এবং অক্সলগুলিতে স্থানীয়ভাবে জল, রাস্তা, নালানন্দমা, আলো ইত্যাদির কাজ।

নতুন উপনগরী: বৈকুণ্ঠাটা-পাটুলী এবং পূর্ব কলকাতায় দুটি নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। শেষ হলে বহু লোক শুধু বাসস্থান নয় কাজ-রোজগারেরও সুযোগ পাবেন।

এ ছাড়াও সি এম ডি এ নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, পুরোনো প্রাথমিক স্কুলগুলির সংস্কার, হাসপাতাল তৈরি, উদ্যান এবং খেলার মাঠ নির্মাণ এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে গলানগর, গার্ডেনরীচ এবং হাওড়ায় নতুন দুই উপনগরী নির্মাণ করছে। খাটা পায়খানা বিনামূল্যে বদলে স্যানিটারী পায়খানা করে দেওয়া হচ্ছে।

আগে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই জামেন। এসব কাজ সত্ত্বেও হয়েছে কারণ কলকাতা মহানগরীর জনগণ সি এম ডি এ-র কাজের কাজে উপকৃত। শুধু তাই নয়, তাঁরা এইসব উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার। তাঁদের সহযোগিতা এবং সাহায্য ছাড়া উন্নয়নমূলক কাজগুলি সম্ভব হত না।

এখনও অনেক কাজ বাকী। সব কিছু জানতে হলে এমনকি সমালোচনা করতে হলেও লিখতে হবে:—সি এম ডি এ জনসংযোগ বিভাগ, ৩-এ, অক্স্যাণ্ড স্কয়ার, কলকাতা-৭০০০১৭।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
বাগ্মণিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা
ম্যানেজার, দর্পণ

৬১ নং হট লেন, কলিকাতা-১৩

রাজস্থানের চিঠি

অনিশ্চয়তায় সাজানো স্থায়িত্ব

রমা প্রসাদ মল্লিক

জয়পুর ৥ সাজানো স্থায়িত্ব আর বিধানসভার ব্যবস্থা করা দলীয় সংযোগগরিষ্ঠতা, তবু রাজ্য-রাজনীতির রক্তমঞ্চে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধিলাভ। এই জুন তারিখে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমঙ্গলাধ পাহাড়িয়া রাজ্য বিধান-সভা-সদস্যদের বৈঠকে নেতা নির্বা-চিত হলেন বটে, কিন্তু দিল্লীতে। অস্বতপূর্ব ব্যাপার! এই প্রথম রাজ্যসভার নির্বাচন জয়পুরে না হয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে হল। এ নিয়ে কথা উঠেছে সঙ্গত কারণেই, জয়পুরের হাওয়ায়হলের হাওয়া আজ ব্যাকুল। বর্ষায়ান রাজনীতিকরা পর্দার পেছনে দরে গেছেন, তবুও দেখনবাহারি মতৈক্য (Consensus) প্রকৃত ঐক্য আনতে পারেন কৈ।

রাজস্থানের পরম্পরা এখনও রাজনৈতিক—বহিঃ পনতন্ত্রের দোহাই-দেনেওয়ালারা লোকায়ত আদর্শের কথা আওড়াতে ভালবাসেন। মুখ্য-মন্ত্রীজীর শপথ-গ্রহণের দিন (৬ই) বিধিবৎ ব্যবস্থা দশমই যজ্ঞের মতই দেখাচ্ছিল: উপস্থিত ভাবড় তাবড় ব্যারোক্রাটরা, মুখ্যমন্ত্রি, উপমন্ত্রি, অধ্যক্ষ সচিব, পুলিশ মহাধ্যক্ষ, স্থানীয় কমান্ডারের প্রধান, অফিসার-আমলাকুল, প্রেস-“ডালকুতা”রা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী মশায় স্বয়ং হরি-জন; স্বতরাং তাঁর কাছে প্রথম উক্ত জনগণ থেকেই: পূর্ববর্তী ভৈরো-সিং

সেখাওয়ার মন্ত্রিসভার আরম্ভ-করা ‘অন্তোদ্যম’ পরিষেবানার কি হবে। তিনি তার জবাব দিলেন প্রথম দিন: পরম্পরা চলবে। শুধু তাই নয়, ‘কা জের বাবদ খাম্ব’ প্রোগ্রামও চলবে। অর্থাৎ, সমাজের ‘অন্তোদ্যম’ করে বাদে অস্তিত্ব, যারা ‘ভুক্তিত বিকাশ’ (retarded) অবস্থায় থাকছে, তাদের সাহায্য করা হবে। কি তাহে? কোনো কংক্রিট যোজনা সম্পর্কে আভাস পাওয়া গেলনা, শুধু শোনা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের মহানোদীরা অস্পষ্ট কথার ব্যস্তার: “দারিদ্র্য দূর করা হবে, বেকারদের মোকাবেলাও; যুবকদের জম্ম কাজ, বয়োবৃদ্ধদের উপদেশ শ্রুত ইত্যাদি ইত্যাদি।” নতুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সঙ্গে ভাব্য জুড়ে দিলেন যে, বর্ষায়ানদের পরামর্শ নেওয়া হবে যদি বা প্রয়োজন হয়। প্রবীণতম কংগ্রেসী নেতা মোহনলাল স্থাতিয়াজী আজ ঠাণ্ডা মেয়ে গেছেন। সত্যিই তো তাঁর উপ-দেশের দরকার যদি না হয়? প্রয়োজন না হয়, স্বতপূর্ব মন্ত্রীদেও, যথা সর্বশ্রী শিবচরণ মাধুর (শিক্ষা), চন্দন-মল বৈদ্য (বিজ্ঞান), পরমেশ্বর মদেবনা (রাজস্ব)? কি করবেন শ্রীধেত সিং, যদি তাঁর কথাও মনে না পড়ে? যদি তাঁর দশা হয়-গজানগর জেলার এককালীন একছত্র কং-নেতা চৌধুরী রামচন্দ্রের মত? এর অন্তিমিত দশা তুলনীর রাজস্থান কংগ্রেসের (ই) প্রাদেশিক অধ্যক্ষ শ্রীরামকিশোর ব্যাসের সঙ্গে। শেষোক্ত ব্যক্তি এবার নির্বাচিতও হতে পারলেন না কংগ্রেসের (ই) ২/০ অংশাংশপাতিক বিধানসভা-বিজয় পর্বের দিনেও! শোনা যায়, এর হারের পেছনে শাসক কং-ই দলের গোষ্ঠী-বিশেষের দ্বারা ইন্দিরাজীর আশীর্বাদকৃত রহস্য-ময় সুতোটার খেলা কাজ করেছে।

অতঃপর ভাবনা রইল না আর। নতুন মুখ্যমন্ত্রী এখন মিল্কটক, অন্তত: আপাতদৃষ্টে। তবে তাঁর কসত-রাজনীতির জোয়ার রুধতো কে? পোড়া থেকেই ১টি রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণার সময় থেকেই সাবধানী পা কেলে এগুচ্ছেন। প্রথমে ঢোকালেন কেন্দ্রে নির্বাচন প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষমতা কং-ই পার্টির কেন্দ্রীয় চরম-সমিতিতে, আপন-বিশ্বাসী জনকে (৬)। পরে রাজ্য-স্তরে টিকিট বিতরণ করলেও রাজ্য কমিটিতে নিজে অগ্রদূত হলেন। ‘বের’ নির্বাচন কেন্দ্রে (তপশিল-আরকিত) যাতে পার্টি প্রার্থী হিসেবে আপন জীর নাম স্থানান্তিত সেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়

সঙ্কটের কল্পনা

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় পর
অন্তহিকে না ভাগলেও সমস্তা। আমাদের উপর সাধারণ লোকেরা আস্থা হারাচ্ছে। কলেজ ইউনিয়ন-গুলোর সাম্প্রতিক নির্বাচনে বহু কলেজে এস এক হয়েছে, দম-যমে সিটুর সুয়েলনে চিকেন-চিংড়ির মালাইকারী, কই কাতলার বোলের গন্ধে অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধ, পার্টির আঞ্চলিক বহু আদর্শবান নেতাই বলছেন সরকার চালিয়ে পার্টি ক্রমশই শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সরে আসছে, সবকিছুর দাম হ হ করে বেড়েই চলেছে কিন্তু গণআন্দোলন একদম নেই কারণ রাজ্য সরকার বিরত হবে, আর স্বজন-পোষণের কথা লেখাটা তো ঠিক নয়—এসব দেখে অনেকেই থমকে গেছেন। রাজ্য সরকার চালিয়েবার্ধক্য-বৈধব্য ভাতা, বর্গাধার পেনশন ইত্যাদি পাইয়ে দেওয়ার ওদের সঙ্গে আমরা আজ আর পারবো না। ওরাও এ টেক-নিক ভালোই শিখেছে। বরকত মালদার যা করছেন তাতে আমাদের মতো শুধু পাইয়ে দেবার রাজনীতি ভিত্তিক পার্টিগুলোর জেলা দপ্তর পোটাতে হবে।

অবস্থা খুব খারাপ জ্যোতিবাবু আটবট্টির মত নয়, এখন চেম্বা অফ কমার্সের সভার আমাদের সভ্য কারের প্রশংসা হচ্ছে। গত ১ এপ্রিল সিটি ও অস্ত্র তিনটি কেন্দ্রে ট্রেড ইউনিয়ন, ১২ জুলাই কমিশন ইত্যাদি আহত বেকার হলের ষের তন্ত্র বিরোধী কনভেনশন, ২৭ এপ্রিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ষেরত বিরোধী কনভেনশন অথবা ধরন ন পয়লা মের মরদামের জনসভা চোখা দেখে সব নেতারই তো ভয় ধরে গেছে। সত্যি জনসাধারণ নিরাশ হয়ে আর এসব জায়গায় আসছেন না। লকলে বলছেন, মাঝে মাঝে এরকম ক্রট মন্ত্রিসভা, আবার কংগ্রেস, মাঝখানে রাষ্ট্রপতি শাসন, অত্যাচারে-পাড়াছাড়া এ রাজ্য নীতি আর কতদিন চলবে। আগে দেশটিতই, গণশক্তিতে পড়তাম রাজনৈতিক-দেউলিয়াপনার কথা এখন বাস্তবে নিজেদের দেউলিপনার কথা বুঝতে পারছি। মুখ্যমন্ত্রী আমরা আগামী শেতলসালের কন্ন-নার স্মিয়মান নই স্মিয়মান হচ্ছি বাম-পন্থীদের সংকটে।

West Bengal State Federation of Wholesale Consumers' Co-operative Societies Limited

P-1, Hide Lane : Aknar Mansion : 3rd Floor
Calcutta-700 012
(Phone : 27-7012 & 27-7013)
JOIN CONSUMERS' CO-OPERATIVE MOVEMENT
Visit Your Nearest Co-operative Stores or us for :—
1) Pulses
2) Spices
3) Textiles (Controlled and Non-Controlled)
4) Amul Products : Amul Spray, Amul Whole Milk, Amul Butter Etc.
5) Customs Confiscated Foreign Goods
6) 'Coop' Brand Powdered Spices
7) 'Coop' Brand Mustard Oil (Ag Mark)
8) Bangalipi, Tamralipi, Barnalipi, Chatralipi (From Concessional Paper)
9) Common Salt
10) Cycle, Rickshaw Tyres And Tubes

ALSO VISIT—
RETAIL UNIT MEDICAL UNIT
P-12, New C. I. T. Co-Operative Medical Stores
Scheme Extension 88, College Street,
C. I. T. Buildings Calcutta Medical College Camp
Calcutta-700 012 (Near Gate No. 3)
Calcutta-700 012
ENROL YOURSELF AS MEMBER
SEND CONSTRUCTIVE SUGGESTION
ADMINISTRATOR
Sri Bhabani Prasad Chatterjee, M.L.A.

ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অহুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত-কারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / শতকরা ভিত্তিক নীল করা টেন্ডার :
বিস্তৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
১। রেফা: নং : ই সি এল / কে এন টি / সিভিল / ৮০ / ১৫৪৫
তাং ২-৬-৮০
(১) কুহুটোরিয়া কোলিয়ারীর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্বামীনাথ ও সীতারামে ৩০ ইউ-নিটের ৩টি ব্লকের কোয়ার্টার রেরামত। (২) ৩টি দেওয়াল নির্মাণ (৩) কুহুটোরিয়া কোলিয়ারীতে ‘এ’ টাইপ ১২ ইউনিটে জি আই পাইপ লাইন বদানোর কাজ। মোট আনুমানিক খরচ ১,০৭,৬০০.০০ টাকা। যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে ৫০ টাকা (১ ও ২নং আইটেমের জন্য) এবং ১০ টাকা (৩নং আইটেমের জন্য) দিয়ে এক্সেসের অফিস, কুহুটোরিয়া কোলিয়ারী, পো: তোপসি, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে। ২০-৬-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে ২-৩০ টায় খোলা হবে।
২। রেফা: নং : ১৭৪ / ২০২৩ তাং ৩০-৫-৮০।
কাপাসারা ও সি পি অপারেটিং-এর জন্য কাপাসারা কোলিয়ারীর কাপাসারা ইউনিটে একটি নালী স্থানান্তরের কাজ। কাজের আনুমানিক মূল্য ১,৬৪,৫১০.১১ টাকা। কাপাসারা কোলিয়ারীর কেশিয়ারের কাছে ১০০ টাকা (একশো টাকা মাত্র) নগদে দিয়ে (অগ্রত্যাগপন্যোগ্য) ১৭-৬-৮০ থেকে ১-৭-৮০ অফিসের সময়ে বেলা ৪টা পর্যন্ত ডেপুটি সি এম ই / এক্সেসের অফিস, কাপাসারা কোলিয়ারী, মুগমা এরিয়া থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২-৭-৮০ বেলা ৪টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা যাবে এবং একই দিনে বেলা ৪:৩০ টায় খোলা হবে। টেন্ডারপত্র দেবার আগে টেন্ডারদাতার কাজ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করতে হবে, নেক্ষেত্র লংগিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
সাধারণ: আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা লংগিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

অগ্নিগর্ভ আসাম ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক (২)

তপন বসু

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপ দ্বারা প্রথম বেঙ্গে ওঠে বক্তব্য রাখা, পত্রিকা সম্পাদকের কাছে চিঠি দেওয়া, মিছিল ও জনসভা অথবা প্রতিবাদ করা বা দাবী জানানো প্রভৃতি প্রচলিত পদ্ধতিতে। কালক্রমে পিকেটিং সভাপ্রবাহ ইত্যাদির প্রভাব সংগ্রামী স্বেচ্ছাকৃত হিংস্র ও বেপরোয়া করে তোলে। আবেগপ্রবণ মধ্যবিত্ত বা পেটি বুর্জোয়া অবিদ্যে এই শিল্প-স্বল্পত বিশৃঙ্খলার চুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা এই হটকারী দাঙ্গার গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ১৯৭১ সালের শেষ-দিকে শহরাঞ্চলে “বিদেশী” হটাও প্রোগ্রাম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং অস্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতার অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হলো। প্রথমদিকে নেতৃত্ব ছিল অ-পরিপক্ব সংগঠন গণ-সংগ্রাম পরিষদের হাতে। আর রাজনৈতিক অ-রাজনৈতিক সংস্থা নির্বিশেষে এই সংগঠনের পতাকার নীচে জমায়েত হলো। এরপর দাঙ্গা আসাম ছাত্র ইউনিয়নের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবার সময় থেকেই ধূর্ত পরিকল্পনা সারফং বামপন্থী পার্টি-গুলোকে মঞ্চস্থ করা হয় এবং তারপর হিংস্র প্রচারের শিকারে পরিণত করা হয়। পূর্ব আসামের তিন-স্বকিয়া, ডিব্রুগড় ইত্যাদি জায়গা, যেখানে সমস্ত অঞ্চলে বাঙালীরা সংখ্যালঘু, সে সমস্ত জায়গায় প্রথম শুরু হয় বাঙালী বিরোধী লাভা উৎসাহ। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাহ করার মত কিছু কিছু বাঙালী প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যর্থ ও নির্বোধ উদ্ভোগ গ্রহণ করলো। যার পরিণামে অসমীয়াদের উগ্র জাতীয়-তাবাদী মানসিকতা পরোক্ষে প্ররোচনা পায়। এরিকে কোপ বুকে কোপ মারতে আসে মার্কিন মনতপুষ্টি চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংস্থা আর, এস, এস, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থা। তারা অতি সন্তোষে এই আন্দোলনের মধ্যে অংশগ্রহণ করে সাম্প্রদায়িকতার চাঁদ-মারীকে বাঙালীদের দিক থেকে মুসলিমদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। সমস্ত সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র সিং ঘটনা চলাকালীন আসাম সরকারকে খোলাখুলি মন্তব্য করেছিলেন, “বাংলাদেশের হিন্দুদের পরিবর্তে যেভাবেই হোক মুসলমান-দের আসাম থেকে তাগিয়ে দিতে হবে”।

জনৈক ব্যক্তি অফিসারের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে খুব পরিচ্ছন্নভাবে

হিংস্র উদ্বোধনার রক্তচক্ষু লক্ষ্য করা গেল। প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং অথবা চূপ করে বসে থেকে সময় নষ্ট না করে ‘কোড়ে’ প্রচার মাধ্যমগুলো। সরকারী কর্মচারীকে হত্যার পুরো দায়িত্বটা সমাজবিরোধী ও অন্তর্দ্বন্দ্বিতাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খুনীদের পক্ষে মহান দায়িত্ব পালন করেছে।

আন্দোলনের ‘নাড়ী’ হিংস্র প্রাদেশিকতাবাদের ‘স্বরায়’ এমনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, উত্তর গোহাটিতে ছাত্ররা দেশীয় আদিবাসীদের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিল। এবং শতাধিক আদিবাসীকে হত্যা করল। তারা আদিবাসীদের “বিদেশী বাঙালী” আখ্যা দিয়ে মিথ্যাচার করতে দ্বিধা করেনি। তার ছদ্ম পরেই জোশিবোপে কাপড় কলের প্রমিকদের বহন করে নিয়ে যাবার সময় একটা রাজীবাহী মোটরকে ছাত্ররা আটক করে। এবং তারপর নোকোর অসহায় ছুই বাঙালী মুসলমান মাঝিকে তারা পিটিয়ে হত্যা করে। গত ১০-২-৮০ তারিখে গোয়ালপাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে কামরূপ জেলার তবানীপুরে জনৈক ছাত্র নেতার মৃত্যুতে আসাম প্রদেশ স্বার্থ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। প্রকারান্তরে তদানীন্তন জনতা সরকারের পতন রটনে যে মড়ক স্রবণে সরকার সিংহাসনে আসীন হলো, তারা তাদের কার্য-কলাপের দ্বারা কার্যতঃ হটকারী আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ স্ফূর্তি দিল। গণ সংগ্রাম পরিষদ নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের আওয়াজ তুলে রণাঙ্গনে হাজির হলো। সংশোধনের খোঁকাবাজিতে হাজার হাজার আলল নির্বাচকের নাম বাতিল হলো এবং তার চাইতেও বেশী সংখ্যায় নকল ভোটের তালিকাভুক্ত হলো। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন প্রার্থীদের যে লম্বা তালিকা তৈরি করেছিল, স্থানীয় বা প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক স্বীয় পার্টির সেই সমস্ত তালিকা অস্বীকার করা হলো। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আমেরের সহধর্মিণী আবিদা আমেরকে বেরাও করার পর আন্দোলনকারীরা তাঁকে এমনভাবে মাজে-হাল করেছিল যে, পুলিশ, সি, আর, পি, ও মিলিটারীর বোধ প্রচেষ্টার তাঁকে বেরাও মুক্ত করা হয়।

বিশৃঙ্খল অবস্থা যখন তুলে

উঠেছে। স্বাধোগের স্ব-সময় বুকে দীর্ঘ প্রতীকিত আন্দোলন বিরোধী চক্রান্তের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো হলো এবং দিকি দিকি আশ্রয় দশ করে জলে উঠে দাবানলের সৃষ্টি হলো। যার পরিণতির শিকার হলো বামপন্থী সংগঠনগুলোর কর্মীরা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর কর্মীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত ও হত্যা করা হলো, আর নয়তো এলাকা ছাড়া করা হতে লাগলো। সমস্ত গৃহছাড়া কর্মীরা আজও ঘরে কিরতে পারেনি।

বিচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিক ও প্ররোচকদের দ্বারা ছিন্ন চক্রান্তের সহযোগিতায় এগুলো সংগঠিত হচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর এই সমস্ত প্রচার একেবারে ভিত্তিহীন। বরং প্রচার মাধ্যমগুলোর স্ব-সংগঠিত হিংস্র প্রচারই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদে অনাবরণ অসম্মেলন করে চলেছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর গোঁহাটি শাখা তথাকথিত দেশান্ত্র-বোধক গান ও কবিতা আবৃত্তির নামে এই উগ্র মাদকতায় উদ্দীপনা ছুটিয়েছিল। মানবিক অধিকারের দাবীর নামে নৃশংসতাকে অসমীয়া-দের মানবিক ও নাগরিক অধিকারে পরিণত করা হয়েছে।

সাতচল্লিশোত্তর কাল থেকেই উগ্র অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আসামের প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ও মৌলিক শক্তিশালী চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া অ-অসমীয়াদের একাত্ম করার ক্ষেত্রে অসমীয়া শাসক পাণ্ডারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তর ক্ষেত্রেই একাত্ম দুর্বল এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক সম্প্রদায় এই আধা-ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অসমীয়া জাতীয় মুক্তি আত্মপানের স্বপ্ন দেখে চলেছে।

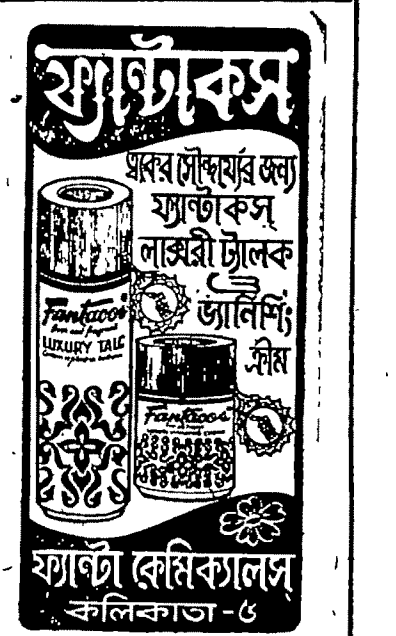
স্বল্পলব্ধ বস্তাবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, “National Chauvinism is by nature fascist and congenitally authoritarian,” এবং একই কারণে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের পরম স্বত্র। স্বতাবতই ভারতীয় বুর্জোয়াদেরও সময় অসময়ের বন্ধ। বলা বাহুল্য এই কারণেই ভারতীয় ও অ-ভারতীয় যে সমস্ত তাবড় তাবড় বুদ্ধিবীরা আসামের আন্দোলনকে সমর্থন করে-ছেন, তাঁদের অনেকেই তা করেছেন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের শ্রেয়সার্থের দিকে তাকিয়ে। কারণ এটাও আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে

যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রমিকদের ওপর অসামান্য নিপীড়ন করে তারপর যখন আসামের কুবক সমাজকে বুটো ‘ঐতিহ্যের স্বপ্ন’ দেখানো হচ্ছে, তখন দেশীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা ও আন্তর্জাতিক পুঁজি উত্তর-পূর্ব ভারতের হটকারিতা ও সংকীর্ণতাকে আলিঙ্গন ও চুষন করছে। তবে এটাও ঠিক যে, আসাম ও অসমীয়াদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাঙালী ব্যবসায়ীরাও চক্রান্তের প্রাচীর ভোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত। এবং সেটাই একবার খতিয়ে দেখা যাক। সাতটি সীমান্ত রাজ্যে অ-অসমীয়া প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় খাঙ্গ, হার্ডওয়ার রপ্তানী, পাট, চা, কমলা, কলা ও সিনেমা ইত্যাদির পাইকারী ব্যবসা মারো-রাড়ী-দের কল্যাণ। সমস্ত রকম বড় বড় খুচরো বিকির দোকানের মালিক হলো গুজরাটি ও মিস্ত্রী। যানবাহন ব্যবসার মালিক হলো পাঞ্জাবীরা। এবং হোটেল রেস্টোরাঁর ব্যবসা করে পাঞ্জাবী ও বাঙালী মুসলমানরা। মেঘালয়ের চিত্র ও প্রায় একই ধরনের, ব্যতিক্রম শুধু কিছু কিছু বাঙালী পাইকারী ব্যবসা ও বড় দোকানের মালিক। মিজোরাম ও মণিপুরে খুব কম সংখ্যক বাঙালী থাকে। ইম্ফল ও অজমার বড় বড় শহরগুলোতে কিছু কেরালাবাসী থাকে এবং এই বাঙালী ও কেরালাবাসীরা যৌথভাবে ভারতবর্ষা সীমান্তে মূল্যবান পাথর ও অন্যান্য মহামূল্যবায়ের চোরা-চালানের ব্যবসা করে। নাগাল্যান্ড ও ডিমাপুরেও কিছু কিছু পাইকারী ও খুচরো বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে।

শতাধিক বছর ধরে এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা সীমান্ত রাজ্যগুলোতে অবাধে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় বা স্থানীয় মানুষকে উপেক্ষা-নীয় ও অত্যন্ত নিরুৎসাহিত ধরনের কিছু কিছু মালিকানা নিয়ে মস্ত পাকতে হয়। ‘প্রবাসী ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ মারোরাড়ী-দের প্রতি আঞ্চলিক মানুষের ঘৃণা এত তীব্র যে, এমন কি গুজরাটি ও মিস্ত্রী ব্যবসায়ীদেরও তারা মারোরাড়ী বলে চিহ্নিত করে থাকে। ‘বিদেশী’ ব্যবসায়ীরা স্থানীয় জনসাধারণকে কখনো কোন চাকরী দেয় না বলেও অসমীয়াদের চরম বিকোভ আছে। নানাবিধ অস-স্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৬০ সালে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। এই সমস্ত দাঙ্গার সময় ক্যানি বাজারে বিকোভকারীদের রোযানলে মারোরাড়ী-দের দোকান পাট লুট-পাট হয়ে যায় এবং কু-জনতা কিছু

কিছু জায়গায় অগ্নি-মংযোগ করে ওদের ব্যবসা কেন্দ্রগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু বিশ্বের ব্যাপার এই যে, বর্তমান দাঙ্গার মারোরাড়ী-দের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয় নি। নির্ভরযোগ্য মহল থেকে মারোরাড়ী-দের বিরুদ্ধে একথা শোনা যায় যে, বাঙালীদের ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ করার কুট উদ্দেশ্যে তারা কিছু কিছু ‘উয়ের খোড়া’ বাঙালী বুরো-ক্রাটকে টাকা খাইয়ে হাত করে-ছিল।

বিদেশী বিভাটনের নামে আসামে যা চলেছে তা কোম বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অথবা একপাকিক ক্রটির ব্যাপার নয়। এর ব্যাপ্তি স্বদূর-প্রসারী। চা বাগান থেকে শুরু করে দায়িক ও অসামরিক প্রশাসনে বাঙালীদের একাধিপত্য ও বৃষ্টিপ লাভ্যাবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া ‘managerial know-how’ কোশ-লের নামে বাঙালী কর্তৃত্ববাদের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে ধ্বংসিত হতে থাকে এই ‘বিদেশী’ উচ্ছেদ নামক বাঙালী বিরোধী হিংস্র প্রবৃত্তি। বিংশ শতাব্দীর প্রায়শ থেকেই ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, কেরানিকুল, পুলিশ দপ্তর ও পোষ্ট অফিস বাঙালীদের একচেটিয়া কর্ম-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এছাড়া ওখান-কার প্রবাসী বাঙালীর দল অতীতে এমন সমস্ত কাণ্ড করেছে, যার ফুলের দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ তাদের নিজেদের বহন করতে হবে। আর সেই সমস্ত কারণেই আজ অসমীয়া-দের সঙ্গে বাঙালীদের সম্পর্ক এত তিক্ত রূপধারণ করেছে। বাঙালীরাই বৃষ্টিপদের শিখিরেছিল যে, অসমীয়া ভাষা হলো, বাঙলা ভাষারই এক বিকৃত ও কুংসিত রূপ। অতএব একে কখনোই সরকারী ভাষা বা কাজকর্মের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেয়াংশ ১০ম পৃষ্ঠায়



ফ্যান্টাসম বিক্রেতার লব্ধ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই

থাপার চক্রের যড়যন্ত্রে হিন্দুস্থান পিলকিনটন কারখানা বন্ধ

এশিয়ার বৃহত্তম কাঁচ কারখানা হিন্দুস্থান পিলকিনটন কারখানাটি গত ২৫শে মে থেকে লক আউট হয়ে রয়েছে। এদেশের অন্যতম একচেটিয়া কারবারী থাপার চক্রের স্বার্থে এই কারখানাটিকে মালিকপক্ষ একতরফাভাবে লক আউট করে দেয়। আন্দোলন হাতে যে সব তথ্য রয়েছে তা থেকে একথা জোর করেই বলা যায় যে, এই একতরফা লক আউট পূর্ব পরিকল্পিত ও যড়যন্ত্রমূলক। আন্দোলনগোষ্ঠীর হিন্দুস্থান পিলকিনটন কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবার কালে প্রায় ১৩০০ শ্রমিক কর্মচারী আজ এক নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। অবশ্য অক্সিসারদের এই লক আউটের আওতার ফেলা হয়নি।

দেখা যাচ্ছে যে, কোনরকম বিনিয়োগ না করেই থাপার হাউস ১৯৭৭ সাল থেকে এই কারখানাটি পরিচালনা করে আসছে। আন্দোলনের বিষয় হচ্ছে পরিচালনার ব্যাপারে থাপার অল্পপ্রবেশ কোম্পানী আইন অনুসারে বেআইনী। থাপার চক্রের বহু চুরি ও দুর্নীতির তথ্য আন্দোলন হাতে রয়েছে। কারখানাটির লক্ষ লক্ষ টাকা নগর করছে এই চক্র। বৈদেশিক বিনিয়োগ আইনও

বাজেট ভাবনা

৩য় পৃষ্ঠার পর

৭৬ শতাংশ। অন্তর্ভুক্ত শিল্পপতি ও বণিকেরা ক্রমাগত ছাড় ও তরতুকি পেয়ে যাচ্ছেন। যত দিন যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের বোকা বাড়ছে তাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর বড় শ্রমিকেরা ক্রিয়, টি, ভি, পাওয়ার প্যাকের প্রেক্ষিতের শাস্তি ব্যস্ত।

১৯৭০-৭১ সালে সাধারণ মানুষকে মোট রাজস্বের ৭২.৭ শতাংশ কেবল পরোক্ষ করের খাতেই বহন করতে হত। এই কর ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৭১-৮০ সালে তা মোট রাজস্বের ৭৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এবারের বাজেটে হয়তো ৮০ ভাগ হবে। কারণ যে সরকার এখন গদীতে বসেছে তারা বড়লোকদের স্বার্থে কণ্ঠাই ভাবে এবং সেই মতই কাজ করে। সাধারণ মানুষের ক্ষতি তাদের মাথাব্যথা নেই। বিশেষতঃ সোট পেয়ে গয়ী হওয়ার পর তো নয়ই। আর পাঁচ বছর পরে নতুন ধোঁকা, নতুন ধাক্কার প্লান তৈরী হয়ে যাবে। সুতরাং বাজেট নিয়ে বগল বাজাও, আর কিছু করার সরকার কি?

বারংবার লজ্জন করেছে এই চক্র। কিন্তু ভারত সরকার আজও পূর্বস্বত্ব এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই সংস্থা সরকারকে আবগারী শুদ্ধ বাবদ দেয় ৮৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা জমা দেয়নি। অথচ অডিটে দেখানো হয়েছে যে, এই অর্থ সরকারকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

লক আউটের পর গত ২১ মে তারিখে জনৈক কে এল লাহিড়ী নামক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকার চেক দেয়া হয়েছে। টাকাও তোলা হয়ে গেছে। কিন্তু কে এই ব্যক্তি? আর কেনইবা তাকে এই টাকা দেয়া হল? থাপার চক্র নিজ স্বার্থে নানা কৌশলে ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু অর্থ তুলে নিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। আরও দেখা যায় যে, থাপার সংস্থার কর্মী গোহাটির জনৈক এম এম ছাবড়াকে ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসে টিয়ারিং বাবদ ২২ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এই ছাবড়ার হোটেল খরচের ১২ হাজার টাকাও নাকি এই কোম্পানী বহন করেছে।

এ যেন এক লুটের কারখানা। থাপার চক্র সেই লুটে ভাগ বসিয়েছে বড় হাতে। দেখা যাচ্ছে যে, এই কোম্পানীকে সোভিয়াম মালকেট জোগাড় করে দেবার নামে মর্ডার এজেন্সী নামক একটি সংস্থার মারফৎ বেশ কয়েক হাজার টাকা লাভিসিং চার্জ বাবদ থাপার আদায় করেছে। এই কারখানার ভাইস-চেয়ারম্যান সি এল নয়োনাও কম যাননা। তিনি এবং থাপার চক্র মিলিতভাবে কারখানাটিকে লুট করে চলেছেন ইচ্ছামত। ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে তার বাংলা সাজানো হয়েছে অতি সম্প্রতি। প্রতি মাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা তিনি নেন বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে। বেতন, ভোজাচ্ছেই। ডিরেক্টরদের ভ্রমণ বাবদ জলের মত টাকা খরচ করা হচ্ছে। এই সংস্থা ১৯৭১ সালের শেষ তিন মাসে রেলকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বিধানসভা সদস্য হারাদন রায় মনে করেন যে, একটি লাভজনক সংস্থাকে ধোঁউলিয়া করার চক্রান্ত চলছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে দিয়ে এই কারখানার হিসাব পরীক্ষা করা সরকার বলে তিনি মনে করেন। তার মতে তাতে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাবে।

সবচেয়ে হাতকর ব্যাপার হল থাপার কোম্পানী এই সংস্থাকে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার একটি চেক দেয়। যা ব্যাংক ডিউরনার করে ফেরত দেয়।

অগ্নিগর্ভ আসাম

১ম পৃষ্ঠার পর

চলে না। এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ব্রিটিশদের মধ্যে এই ধ্যান-ধারণা বিস্তারিত ছিল। শহরাকলঙ্ঘনোতে এবং বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপকূলে বাঙালী মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অবশেষে অসমীয়াদের ওপর নিপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করল। বেশ কয়েকটি বড় শহরে অসমীয়া মধ্যবিত্তরা জম্মলগ থেকেই রুগ্ন রিকিটে শিশুর মত জীবন বাপন করত। অবশেষে দাতচল্লিশোত্তর কালে কংগ্রেস পার্টি ক্রমতঃ আসাম পর অসমীয়া শিশুর রুগ্ন দেহে লামান্ত্র মাত্রায় শক্তিবৃদ্ধি সঞ্চার হয়েছিল। অসমীয়া ভাষাও অগ্রগতির ক্রেজে উৎসাহিত হলো। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিতে কিছু কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হলো। এইভাবে অসমীয়াদের মধ্যে অসমীয়া জাতীয় মুক্তির বাসনা কালক্রমে উদ্ভূত। বাঙালীবিরোধী দাবীতে পরিণত হলো। তাছাড়া এ মুক্তিও যথার্থ যে বিশাল ও জটিল সমস্যা পশ্চিম বাঙলার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় অথবা প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সমাধান করতে না পেয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উষ্মাঙ্গদের লাঠি পেটা করে হুকুমার্য অথবা বেতিয়া ক্যাম্পে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও মন্ত্রীচর্কাপির উষ্মাঙ্গদের বন্দুকের টাঁকমারীর রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে মানা ক্যাম্পের পাথুরে ভূমিতে পাঠিয়েছেন। সেই বাঙলারদের দায়িত্ব অনগ্রসর অসমীয়া অর্থনীতির পক্ষে কোন ভাবেই বহন করা সম্ভব নয়।

মূল প্রশ্ন হলো সমাধানের পথ সম্পর্কে আলোচনা। কারণ সমাধানের নামে যা চলছে তা নিছক অবাস্তব ও খেচ্ছাচারী ক্রিয়াকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ এই ইন্দিরা গান্ধীই উত্তর-পূর্ব ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের পথ কটকা-কীর্ণ করার জন্য অসমীয়া জাতীয়তাবাদের রুগ্ন শিশুকে শুষ্ক করে দিতে হস্ত-সবল করে তুলেছেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সম্মানজনক মীমাংসার নামে দিল্লীতে বলে প্রফুল্ল মহাশয়, ভৃগু ফুকন প্রমুখ ছাত্র ও যুব নেতাদের পরোক্ষ মন্ত্রিণ্ডে প্রলোভন দেখিয়ে বামপন্থী আন্দোলন বিরোধী চক্রান্তের তত্ত্ব রচনা করেছেন। কিন্তু হায়, তিনি সেদিন বোঝেন নি যে, তিনি ক্রাফেনস্টাইন সূতনের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি এও বোঝেন নি যে, বিরোধীদের

সায়েন্স। করার জন্য তারই হাতের তৈরী ধারালো তীর নিয়েই বৃক্কে বুমেরাং হয়ে কিয়ে আসবে। অতঃপর আসামের আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য গতিতে সরিষা ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। কাছ প্রশাসক জৈল নিং থেকে শুরু করে দিল্লীর তাবড় নেতা ও কূটনীতিবিদরা লেজে পোবরে হয়ে আসাম থেকে নিরাশ হয়ে কিয়ে গেছে। স্বভাবতই সরকারী প্রশালনের কাছে একমাত্র বিকল্প হলো বৈরতাত্ত্বিক আক্রমণ। প্রথম পর্বায়ে "উপকৃত এলাকা" নামক দাওয়াই দিয়ে যখন কোন কাজ হলো না, বরং আন্দোলনের রূপ আরো বেয়াদা আকার ধারণ করল তখন গত এপ্রিল মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পরমর্শিবকে হটিয়ে দেবার সময় থেকেই শুরু হয় শ্রীমতী গান্ধীর নারকীয় অদি চালনা। এদিকে অত্যাচার যত বাড়ছে, আন্দোলনকারীরাও ততো বেশী করে কোয়ার বেঁধে আসরে নামছে। মাঝে কয়েকদিন অবশ্য নটি রাজ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৌশলগতভাবে আক্রমণের বহর কিছুটা হালকা ছিল। নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট সি. আর. পি., বি. এল. এক., ই. এক. আর, আর মিলিটারী পাঠানো শুরু হয়েছে।

অযোগ্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও তার দুর্নীতিপরায়ণ পুত্র মঞ্জর গান্ধীই স্বরত মুখার্জীকে বিভ্র-কির দয়লা দিয়ে' জেলিয়ে দিয়ে শিলিগুড়ি অবরোধের নামে বিশৃঙ্খলার আঙুন জালিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? এই বিশৃঙ্খলাকে আইন-সম্মত করার জন্য এবং সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য শাসক পার্টির বজীর প্রাদেশিক শাখা যখন আসাম অবরোধের ডাক দিল তখন দেখা গেল বামফ্রন্টের সবকটি শরিক দলের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও ক্যান্ডিস্ট কংগ্রেসের এই আত্মানের অনুসরণে বাংলা বন্ধ সংঘটিত করল। এবং ফলতঃ সংবিধানের ৪৪ নম্বর সংশোধনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর স্বপ্ন প্রচেষ্টার শক্তি বৃদ্ধি ঘটল ও ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণের আন্দোলন-গুলোকে শাসকবৃত্ত করে মারার আইন-

সম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু বাঙালী হটিয়ে যেমন আসাম ত্রিপুরা অথবা মণিপুরের সমস্ত সমাধান হবে না, তেমনি সামরিক বাহিনীর রাইফেলের জোরে অস্ত্র কষতে গেলেও ফলাফল উল্টো হবে। তার জীবন্ত প্রমাণ, আসামের বর্বরোচিত নারকীয় ব্যাধি মণিপুর থেকে ত্রিপুরা অবধি সংক্রমিত হয়েছে। এবং ভারতবর্ষের ক্যান্সি-বাদী ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি হচ্ছে ও নতুন নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব স্বদীর্ঘকাল যাবৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঙালী নিধন যজ্ঞের এই যে নিষ্ঠুরতা শুরু হয়েছে তার জন্তে সম্পূর্ণ দায়ী গান্ধী নেহেরু থেকে শুরু করে শ্রীমতী ইন্দিরাও। সুতরাং আত্ম-রক্ষার্থে বাঙালীদের উচিত ইন্দিরার বিরুদ্ধে জোট বাঁধা। গত ১২-৬-৮০ তারিখে একটি দৈনিকের কোন এক ভাঁড় সাংবাদিক ক্যান্ডিস্ট ইন্দিরার জন্ত মায়াকারা কেঁদেছেন এবং ভারত যুক্তরাজ্য বহুবিভক্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যুগ্ম সাংবাদিকটির ইতিহাস পড়া নেই বলেই জানেন না যে, কোন পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করেনি। অতএব ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াটা হলো এ দেশের অমিবার্ধ পরিণতি। অথচ নির্লজ্জ সাংবাদিক পুন্ডলিই জরুরী অবস্থার কালে অনেক যত্ন ও লাহুনা ভোগ করেছেন।

অবশেষে এটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে রাখতে হবে, প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাঙালী হটাও দাদায় মেতে না থেকে স্বায়ত্ত শাসন আদায় করার লড়াই শুরু করতে হবে এবং ইন্দিরা প্রশাসনকেও মনে রাখতে হবে যে, সামরিক সমাধানের একমাত্র পথ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া।

সমুদ্রের সজীবতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাজের জন্য
বিপ্লবশারী ও এগ্রিকালচারাল ফার্ম(প্রা)লিঃ
১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন. (পোঃ বালী) হাওড়া
ফোন: ৬৪-২০৯৫ ও ৬৪-২৪৪৫
ফার্ম: বৈদ্যবাটী ২ গলি ৬২-২৫৪০
দিল্লী রোড ও জরকন্দার রোডের সংযোগস্থলে
জেনারেল: ৬২-১৩৭৭

ত্রিপুরায় ব্যাপটিষ্ট চার্চ ও আমরা বাঙালী সক্রিয়

১ম পৃষ্ঠার পর

অঞ্চলের উপজাতি এবং অস্ত্রাভ্যন্তরীণ অনগ্রসরতার স্বযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়া এবং অসন্তোষের বীজ ছড়ানো। প্রথম তৈরী হয় ছোটখাটো হাসপাতাল, স্কুল, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে খ্রীষ্টান করার কাজ এবং এই মাহুগুণির মনে ক্রমশ গৌণে দেওয়া হয় একটাই মন্ত্র—তার-তের অস্ত্রাভ্যন্তরীণ মাহুগুণির সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক নেই, তোমাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর হবে যদি একবার তোমরা স্বাধীন হতে পার। এইসব রাজ্যে বাসবাহী আন্দোলন দুর্বল হওয়ার ফলে সাধারণ মাহুগুণি অতি সহজেই এই বিবেচনাকামী প্রচেষ্টার শিকার হয়ে পড়ে।

অবশ্য বাসবাহী শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে এই শক্তিরানিকটী সাকল্য অর্জন করতে পারে তার প্রমাণ মিলেছে ত্রিপুরায়। প্রচুর অর্থব্যয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরা ব্যাপটিষ্ট খ্রীষ্টিয়ান ইউনিয়ন লক্ষ্য হয়েছে আদিবাসী যুবকদের একাংশকে নিজদের আও-তায় নিয়ে এসে এমন এক আন্দোলন শুরু করতে যার মূল উদ্দেশ্য শান্ত

ট্রান্সফর্মার

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

হয় ৮৮ হাজার টাকা। অপর ট্রান্স-ফর্মারটি ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত অকাজে অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে উৎপাদনকারী সংস্থা ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালের সঙ্গে পত্রবিনিময় চলছে।

ক্যামপাডাঙ্গা লাব স্টেশনে ১৫ এম ডি এ ক্ষমতার দুটি ট্রান্সফর্মার বসানো হয় যথাক্রমে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এগুলির প্রতিটির মূল্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। দুটিতেই যান্ত্রিক পোলমাল ঘেঁষা ঘের যথাক্রমে ১৯৭৪ সালের নভে-ম্বরে এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে। এই ট্রান্সফর্মার দুটি উৎপাদক সংস্থার কারখানার পাঠানো হয় ১৯৭৬ সালের জুন মাসে। এক বছর বাধে (১৯৭৭ এর জুন) ঐ সংস্থাটি জানায় যে, মেয়াদত বাধে ব্যয় হবে ৮৭ হাজার টাকা। পর্ষদের টেওয়ার কমিটি বিবেচনা করলেন যে মেয়াদ-মুক্তি বাধে ঐ সংস্থাটি বা চাইছে তা অনেক বেশি স্বতন্ত্রাং পর্ষদের নিজস্ব কারখানাতেই এগুলি মেয়াদ-মুক্ত করা হোক। স্থির হয় ট্রান্স-ফর্মার দুটিকে ফেরৎ নিয়ে আনা হবে। কিন্তু ১৯৭১ সালের মে মাস অবধি ঐ ট্রান্সফর্মার দুটিকে ফেরৎ আনা হয়নি।

ত্রিপুরাকে অশান্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে এক করে কেন।

ত্রিপুরায় দেখা গিয়েছে ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়নকে পরোক্ষ সাহায্য করেছে “আমরা বাঙালী” নামে কুখ্যাত সংগঠন। একদিকে যেমন পাড়ীরা আদিবাসীদের উদ্দেশে তেমনি এরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে বাঙালীদের আদিবাসীদের প্রতি বিমুগ্ধ করে তোলার জন্য। উদ্দেশ্য একটাই, গণগোল সৃষ্টি করা। এই সংগঠনের চরমরাই ত্রিপুরায় এই মাসের গোড়া থেকে শুরু করতে শুরু করে যে বিভিন্ন জায়গায় আদি-বাসী খুন হচ্ছে। এই গুলব লুণ্ঠ-নের ব্যাপটিষ্ট চার্চ এবং উপজাতি যুবদের নেতারা যারা ওই চার্চের অর্থে পালিত। এরই ফলস্বরূপ শুরু হয়ে যায় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বাঙালীদের উপর নির্মম আক্রমণ।

এই আক্রমণের জন্তই অপেক্ষা করছিল আমরা বাঙালীর লোকেরা। এদের প্রতিশোধের ডাকে সহজেই লাড়ো দেয় বহু লোক এবং উপজাতি নিধন শুরু হয়। কত উপজাতি যারা গিয়েছেন তার সঠিক কোন হিসাব না থাকলেও এটা জানা গিয়েছে যে বাঙলাদেশে গৌরবীর জলে যে সব যুতদেহ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে তার অধিকাংশই উপজাতিদের।

ত্রিপুরার ঘটনার পরিশ্রেকিতে বিভিন্ন মহলে এবং সংবাদপত্রে যে আলোচনা চলছে তার থেকে মনে হয় সব ঘোষাই উপজাতিদের। কিন্তু আসল ঘটনা কি? ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার মোটে ২১ শতাংশ আজ উপজাতি—নিজস্ব তারা সংখ্যা-লঘু। রাজাদের আমলে যে অর্থ-নৈতিক শোষণ তাদের উপর চলত তা অব্যাহত থাকে স্বাধীনতার পরে—নয়া শোষকেরা প্রধানত হলেন মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায় যারা ছলে বলে কৌশলে উপজাতিদের জমি ক্রয়স্বত্ব করে ফেলেন।

ত্রিপুরার মার্কসবাহী কমিউনিষ্ট পার্টি বরাবরই উপজাতিদের জন্ত লড়েছে এবং সরকারে আসার পর এই দল ঠিক করে উপজাতিদের কিছু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। এতে প্রমাদ জনল বাঙালী-দের একাংশ এবং ব্যাপটিষ্ট চার্চ। চার্চ দেখল যে একবার স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে উপজাতিরা আর “স্বাধীনতার” ডাকে লাড়া হবে না এবং সমস্ত অর্থব্যয় পণ্ড হবে। অত-এব একে আটকাতেই হবে, উপ-

জাতিদের খেপিয়ে তুলতে হবে। ওদিকে উপজাতির যত খেপতে শুরু করল তাকে ইচ্ছন জোগাতে লাগল “আমরা বাঙালী” দল। আপাত-দৃষ্টিতে একে অপরের বিরোধী হলেও চার্চ ও আমরা বাঙালী দল এই দুই ঘোড়েল যড়যন্ত্রকারী একই উদ্দেশ্যে কাজ করে চলল। উদ্দেশ্য এমন এক অশান্তি সৃষ্টি করা যা রাজ্যটিকে তেলে ধেবে চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তার দিকে। আর এর ফলে যদি বামফ্রন্ট সর-কারের পতন ঘটে তবে সেটা হবে উপরি পাওনা। অবশ্য এই দুই শক্তির কাছে তার মূল্যও বড় কম নয়।

তবে ত্রিপুরায় এই বৈত শক্তি বেশীদূর সফল হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র সংগঠিত শক্তি মার্কস-বাহী কমিউনিষ্ট পার্টি ইতিমধ্যেই উপজাতি ও বাঙালীদের একই শক্তি কমিটিতে একত্রিত করতে লক্ষ্য করেছে যার রাজনৈতিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া উপজাতিদের একটা অংশ এখনও সি, পি, আই (এম) দল তথা নৃপেন চক্রবর্তী, দশ-রথ দেবের নেতৃত্বের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল। যদি ত্রিপুরা নাগাল্যাও, মিজোরাম, মণিপুরের পথে না যায় তবে তা হবে মূলত বামপন্থার জয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে যে আন্দোলন চলছে তা যে মূলত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আন্দো-লন এতে আর কোন সন্দেহ নেই। হঠাৎ গড়ে উঠেছে Seven Sisters united Liberation Army—সাত বোনের মুক্তি ফৌজ যার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে উঠেছে যে প্রতিটি রাজ্যের আন্দোলনই জড়িত। সাত বোন; অর্থাৎ নাগাল্যাও, মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, আসাম এবং ত্রিপুরা। যে শক্তি এ ধান কার আন্দোলনকারীদের আর্থিক এবং অস্ত্র সাহায্যের মাধ্যমে মনত জোগাচ্ছে তার হেড-কোয়ার্টার শিলং শহরে। নেতৃত্বে অস্ত্রাভ্যন্তরীণ মাহুগুণি আছেন নিকোলস রয় ও তাঁর মার্কিনী স্ত্রী এবং মার্টিন মংকাও যিনি এককালে প্রাক্তন স্বতন্ত্র পার্টির অস্ত্রতম কর্মচার ছিলেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও এদের প্রতাব থেকে মুক্ত নয় যে কারণে প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় দ্বিধা এদের কড়া হাতে দমন করতে অপারগ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অশান্তি সৃষ্টি করার ব্যাপারে যে সব বিদেশী শক্তি কাজ করছে তাদের

মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই রাজ্যগুলিকে ভারত থেকে বের করে আনার চেষ্টা যদি সফল নাও হয়, তাহলেও তাদের ক্ষতি নেই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উপজাতিরা আছেন এবং এই আন্দোলনের প্রতাব তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে যেমন পড়ছে উত্তর বাঙলার রাজবংশী ও অস্ত্রাভ্য-ন্তরীণ মাহুগুণি। বিহার এবং তার সংলগ্ন পশ্চিমবাঙলার জেলাগুলিতে কাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ক্রমশই সংগঠিত হচ্ছে। আসামের বাঙালী বিরোধী আন্দোলন থেকে “শিলা” নিচ্ছেন ওড়িশাবাসী। ক্রমেই একটা অবস্থা দাঁড়াবে যখন ভারতবর্ষ একটা দেশ হিসাবে থাকতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মার্কিনীরা চেষ্টা করে সম্পূর্ণ তাবোদার জমী অথবা ওই ধরনের বৈরতাত্ত্বিক সরকার খাড়া করতে। ভারতেও সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

রাজস্থানের চিঠি

৮ম পৃষ্ঠার পর

হয়, করলেন সে-ব্যবস্থাও (ভাগ্যি, বিপক হল-প্রার্থীদের মধ্যে ভোট-ভাগাভাগি হয়েছিল, তাইতে ভদ্র-মহোদয়্য ভিতলেন, নইলে বলা তো যায়না কিসে কি হয়!) পার্টি-প্রার্থীদের মধ্যে ধর্ম-বন্টনের খেলাতেও মুখ্য ভূমিকা ছিল—কার আবার—জগন্নাথ পাহাড়িরাঙ্গীর। কেন্দ্রের প্রমাদে মহানেন্দ্রীর দয়া দৃষ্টিতে যার উন্নত-উর্ধ্ব গতি শুরুতেই স্থিরীকৃত তার কি সম্পদের অতাব হয়? শুধু একটি বিষয়েই বিটকেল আটকে রইল। রাজস্থানের বিরোধী-রাজনীতি ভয়ানক নীরব-চারী, আর স্বজনভেদী। তাইতে ভদ্র, না জানি কোথা থেকে বেরবে ক্যাকড়া।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির বাংলা মুখপত্র
চিত্রপট
প্রকাশিত হয়েছে
॥ এতে লিখেছেন ॥
কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্নয়ন সেন, সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশেতা দেবী ও আরো অনেকে।
দাম : পাঁচ টাকা
প্রাপ্তিস্থান :
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি
বি ৫, ভারত ভবন
৩, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলকাতা-১২

ই-কং দলে

১ম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রিসভার সদস্যদের ঘটনাগুলি অব-হিত করেই তার দায়িত্ব পালন করে-ছেন। এ ব্যাপারে সমস্ত নিকাতাই তিনি কয়েকজন আমলার পরামর্শের ওপর ভরসা করেই নিয়েছেন।

দলের অনেক নেতাই আস্থা ছিল যে, ইন্দিরাজী হরতো আসামের ব্যাপারে নিজেই একটা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যার ফলে আসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। অনেকেই তাই ইন্দিরাজীর বিচক্ষণতার ও রাজনৈতিক দূর-দর্শিতার ওপর ভরসা করে বলে-ছিলেন। কিন্তু আসামের আঙন এখন সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ার দলের এবং মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক দাব-কমিটির কয়েকজন সদস্য এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। এদের বক্তব্য হল, ত্রিপুরায় এই ব্যাপক গণহত্যার পরিসরনা এবং প্রচণ্ড রক্তের বিচ্ছিন্নতাবাহী আন্দোলনের প্রকৃতি একদিনে শুরু হয়নি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা শাখার রিপোর্টেও এই ধরনের গণগোলের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার দপ্তরের আমলারা আগে থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে চরম অবিবেচকের কাজ করেছেন। এমন কি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গেও এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং সরকারী প্রশাসন বলতে গেলে এখনও অন্ধ-কারে সমাধাম ঘুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমন কি, যে ইন্দিরা গান্ধীকে এক-জন বলিষ্ঠ প্রশাসক এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ বলে অনেকে মনে করেন তিনিও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-গুলিতে যতই আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সঙ্কট বর্ধিত হচ্ছে। এবং অনেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছেন।

শুধু তাই নয় দলের অনেক নেতাই যারা এতদিন ইন্দিরা গান্ধীর যোগ্যতার ওপর আন্তরিকভাবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তারাও এখন হতভান হতে শুরু করেছেন। কারণ ইন্দিরাজী আর কোন বাহু-দণ্ডেই দেশের আইন শৃঙ্খলা অবনতি এবং অব্যমূলের উৎপাতকে রোধ করতে পারছেন না।

বাসের ভাড়া বৃদ্ধি ও লাভের হিসাব

দর্পণের প্রতিনিধি

গত ১৩ জুন থেকে বেসরকারী বাস মালিকরা ধর্মঘট করছেন। তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম ভাড়া ৪৫ পয়সা করার দাবিতে বেসরকারী সিণ্ডিকেট ও বাস ফেডারেশন এই ধর্মঘট ডেকেছে। এদিকে ১৫ জুন থেকে লাল পতাকা উড়িয়ে সিটুর নেতৃত্বাধীন বাস ড্রাইভার কণ্ঠস্বর রাখতে কিছু বাস চালাচ্ছেন। রাজ্য সরকার এদের সমর্থন করেন। তাই পেট্রোল পাম্প থেকে সাময়িকভাবে কার্ড ছাড়াই এদেরকে তেল সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন সরকার। ১৫ জুন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এক নতুন ভাড়ার কাঠামো ঘোষণা করেছেন। এর ফলে বাসে উঠলেই ২৫ পয়সা দিতে হবে। ২৫ ও ৩০ পয়সার পরিবর্তে ৩৫ পয়সা, ৪০ পয়সার জায়গায় ৪৫ পয়সা হল। এতেও কিছু বাস মালিকরা সন্তুষ্ট নন, তারা এখনও ধর্মঘট করতে চান। সরকার

এবার লাইসেন্স বাতিল করার ভয় দেখিয়েছেন। বর্তমানে বাসের খরচা ও ভাড়া সম্পর্কে অসুস্থতান চালিয়ে ধর্মঘটের এই প্রতিনিধি যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার ফলে বলা যায়, মালিকদের ভাড়ার এই পুনর্বিন্যাস মেনে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের বাস মালিকদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তথ্য ডিজেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে, বিদেশী ও বৃহৎ বর্জ্যারদের টায়ার শিল্প জাতীয়করণের দাবিতে সংগ্রাম করা উচিত। এখন লম্বীকার লব্ধ তথ্যে আশা থাক। দক্ষিণ শহরতলীর বড়িয়া থেকে ধর্মতলায় চলে ২১ নম্বর বাস। দশ/বারো কিলোমিটার পথ। এই রুটে ডবলু বি এস ৩৭২১ বাসটি কেনা হয় পঁচাত্তর সালে। এ্যাডিশনাল এম-প্রমেন্ট স্কিমে। মালিক পনেরো হাজার টাকা দেন, বাকি এক লক্ষ

কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্ক দেয়।

বাসের চাকা গড়তে লাগল, বিএল সাহা রোডের ছোটখাটো খানা-খন্দের ফলে মাত্র সাত মাস পরেই চারটে ধারার কিনতে হল। তখন দাম ছিল জোড়া লাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। এখন সাহাবাজারে প্রায় আট হাজার টাকা। বারবার কেনা সম্ভব নয় তাই এখন বেশির ভাগ বাসই তলায় লাগিয়েছে ভাড়ার টায়ার। ভাড়া দৈনিক দশ টাকা। ফেটে গেলে দারিদ্র্য যে ভাড়া দিচ্ছে তার। আলোচ্য বাসটির মাত্র মালিক রোজ টায়ার বাবদ ভাড়া গোয়েন ষাট টাকা। গাড়ি কেনার প্রথম বছর পর্যন্ত ভারী ভারী পার্টস-গুলোর এক বছর গ্যারান্টি থাকে। তারপর মাসে পেমেন্ট পাটনের খরচ ১০০০/১২০০ টাকা। দিনে ৩৫/৪০। মাসে পুলিশ কেস বাবদ আদালত অথবা খুঁজে যায় ৪০০/৫০০ টাকা। অর্থাৎ হিসেব করুন ১৫ টাকা। ছটা ট্রিপে অর্থাৎ বারোবার যাওয়া আসা তেল লাগে মস্তর লিটার। ডিজলে মেশানোর সময় ও কুড়ি দিন অন্তর ইঞ্জিন দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ মজিল লাগে তার দৈনিক হিসেব দু লিটার। এতদিন মস্তর লিটার ডিজেলের দাম ছিল ১০×১১ টাকা ৬০ পঃ=১১২ টাকা আর দু লিটার মজিল ২০ টাকা। অর্থাৎ তেল বাবদ রোজ গড় ব্যয় ১৩২ টাকা। এছাড়া আছে মেরামত খরচ। মাসে প্রায় ২০০ টাকা, দিনে প্রায় ৬ টাকা। প্রতিমাসে ফিল্টার চার্জ প্রায় ১০০ টাকা, প্রত্যাহ ৩ টাকা।

দিগ্বিকটে ফি দিতে হয় দৈনিক ১ টাকা। মোটর ভেহিকলস রোড ট্যাক্স তিন মাস অন্তর ৫২০ টাকা, দৈনিক প্রায় ৫ টাকা। পারমিট ফি চারমাস অন্তর ৫০ টাকা, দৈনিক ১০ পয়সা। বীমা বাবদ বছরে দিতে হয় ১৬০০ টাকা। দিনে ৪ টাকা ৩০ পয়সা। এ বাসে ছটা ট্রিপে দিনে আর হয় গড়ে ৪৫০ টাকা। ড্রাইভার পাম ১১% কমিশন, দুজন কণ্ঠস্বর ৫% করে মোট পাম ১১%, দৈনিক হেয়ার ১০ টাকা, ক্লিনার ৩ টাকা। এদের জন্য মোট খরচ হল ১১২ টাকা।

অর্থাৎ মালিকের যেখানে দারাদিনে আর ৪৫০ টাকা, সারাদিনে ব্যয় ৩৮৭ টাকা, দিনে লাভ ৬৩ টাকা। এ অবস্থায় ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৭৪ পয়সা বাড়লে

দৈনিক খরচা বাড়বে ৭০×৭৪ পয়সা = ৫১৮০ টাকা, প্রায় ৫২ টাকা। ভাড়া একদম না বাড়লে মালিকের দৈনিক লাভ থাকে (৬৩-৫২)=১১ টাকা মাত্র।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাড়ার হার ঘোষণা করেছেন, তার ফলে বাস পিছু দৈনিক আর কমপক্ষে সিকি-ভাগ বেড়ে যাবে। ৪৫০ টাকার দৈনিক আর বাড়বে অন্তত ১১০ টাকা। তাহলে মালিকের থাকবে (১১০+১১), অন্ততঃ ১২০ টাকা প্রতিদিনে, মাসে ৩৬০০ টাকা।

এই তো সোজা হিসেব। এ সম্বন্ধে বাস মালিকরা চোঁচাচ্ছেন, সরকার

কং-ই রাজনীতি

২য় পৃষ্ঠার পর

অশোখিত তেলের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বাইহোক বহুগুণার পদত্যাগ প্রত্যা-হারের জন্য বহুগুণার বিশিষ্ট ও বনিষ্ট বন্ধু বীরেন্দ্রবরুণের কাছে মুজঃফর-মগরে এপেজিলের বংশীলাল যয়ং। কিন্তু বহুগুণা বংশীলালের অহরোধ এবার রাখেননি বা রাধিতে পারেননি।

তবে কি বহুগুণা সাহেব রাজ-নৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করছেন? মোটেই না। বরং তিনি চরণ সিং-এর কাছে একটি পত্র দিয়ে-ছেন বলে জানা গেছে নতুন করে লোকদলে তাঁকে নেবার জন্য। এবং চন্দ্রজিৎ সাহেব, সতপাল মালিক, মধু লিমায়ে প্রমুখ নেতারা বহুগুণাকে পুনরায় লোকদলে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও যয়ং চৌধুরী সাহেব আপত্তি তুলেছেন। 'তিনি যে (বহুগুণা) আবার সুবিধা মতো লোকদলে ছেড়ে যাবেন না তার গ্যারান্টি কোথায়। এবং কেউ যদি সেই গ্যারান্টি দেন এবং বহুগুণার দলত্যাগের পর শান্তি গ্রহণে রাজী থাকেন তবে বলুন।' জানা গেছে প্রস্তাবটি এখানেই থেমে আছে। বহুগুণা সাহেবকে নিয়ে লোকদলের ভেতরে আর কেউ কিছু বলেননি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বহুগুণা সাহেব কী করবেন? নরায়ণ গান্ধীকে যেনে নিয়ে আবার ফিরে যাবেন? তা কোমমতেই সম্ভব নয় আর। রাজ-নীতি থেকে অবসর গ্রহণের বাসনাও তাঁর নেই। হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রী দেবীলালই কি শেষ তরঙ্গ? কারণ দেবীলালও সন্তুষ্ট নন চৌধুরী চরণ সাহেবের উপর। এই দেবী-লালকেই নিয়ে চৌধুরী সাহেব

নির্ধারিত বর্তমান বাস ভাড়া মানতে চাইছেন না কেন? বাস করের-মোট মূল্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ব্যাঙ্ক ফিল্ড ডিপোজিটে রাখলে মাসে স্বয়ং হতো ১০% হারে মাসে ১১২৫ টাকা। অবশ্য বাহকের ব্যাঙ্কে জোন আছে তাঁদের একটু মুশকিল। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে স্বয়ং হার ১৪% এর পরিবর্তে ৬% করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াইতে হবে। কারণ এখনও অন্য কয়েকটি রাজ্যে এই এ্যাডিশনাল এমপ্রমেন্ট স্কিমে খণের স্বয়ং নেওয়া হয় ৬% হারে। পশ্চিমবঙ্গই বা এ সুযোগ পাবে না কেন?

ধর্মবীর বশিষ্ঠকে হরিয়ানার দলীয় সভাপতি করেছিলেন। এবং ধর্ম-বীর বশিষ্ঠই আন্তে আন্তে দেবীলালের সমস্ত অঙ্গুষ্ঠামীর দল থেকে কমতা-চ্যুত করেছিলেন কৌশলে। কাজে কাজেই দেবীলাল এই কোভ থেকেই একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের কথা চিন্তা করছেন বলে জানা যায়। বহুগুণা সাহেব কি তবে দেবীলালের সঙ্গে নতুন দল গঠন করে নিজের কমতা জাহির করবেন? যদি তা পারেন তবে ভবিষ্যতে তাঁর একটা পজিশন তিনি আশা করতে পারেন।

তবে তিনি যাই করুন তাই বাস ভাড়া বর্ধে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে দু'একটি রাজ্যে ছাড়া। তাও আবার ত্রিপুরা অশান্ত, আসাম অরিশত। মস্তর গান্ধী ক্রমাগত কমতাবান হচ্ছেন। এরপর সংসদীয় গণতন্ত্রে ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে নির্বাচনী দামামা বেড়ে উঠবে কি না তা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। তথ্যাত্মক মহল মনে করেন এটিই হয়তো ইন্দিরাজীর শেষ নির্বাচন। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি তা মনে করি না। পঁচাত্তর আবার নির্বাচন হবে এ আশা ও বিশ্বাস আমি রাখি। কারণ ভারত-বর্ষের মতো এতো বিরাট বড় রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের কঠোরোপ করার কমতা ইন্দিরাজীর আর নেই। আপেক্ষিকালীন বা সাময়িক ভাবে অন্ত কোন পদা নিলেও দীর্ঘকালীন কোন ব্যবস্থা নেবার মতো অসীম কমতার অধিকারী তিনি আর নন। বাইহোক বহুগুণা সাহেব যাই করুন না কেন একটু ভেবে করবেন লোকসতার লক্ষ্যপন ছাড়লেও আপনার বাসাবাড়ির ইমেজ কিছু মুছে যাব নি।

হিটলার অথবা রাশিয়া

সাগর চক্রবর্তী

লেনিনের জাতির পোকার রাশিয়া কতো না খপ ছিলো তারে ভালোবাসিয়া।

পুশকিন টলস্টয়, শেক্সপ, নেক্রাসভ
মায়াকোভস্কি, তুর্গেনিভ শলোকভ
অজপি আলো দেন, ভয় ভয় রাশিয়া।
অথচ এমন ক্যানো আজকের রাশিয়া
ঘরে ঘরে আনে দুঃখের বারোমাসিয়া।

প্রস্তুত ছিলার তো দিতে তাজা রক্ত
দেশে দেশে ছিলাম তো শত শত ভক্ত।
এখন অবাধে দেখি, কারা সব আসিয়া
অন্তর কটি কুজি লুট কোরে পোক্ত—
আসন বানাতে চায়, ঘরে ঘরে এশিয়ার;
পুঞ্জির মালিকদের হাত করে শক্ত।
—এরকম চরিত্র হলো ক্যানো রাশিয়ার?

কমাত্তে উত্তেজনা, শান্তির লাগিয়া
মরাজার উঠিল কি কুইকোভ জাগিয়া?
হারয়ে রঙিলী, খুঁজে দেশ যায় তাসিয়া।

মেহনতি মাছবের খেটে খাওয়া ছুনিয়া
ছি ছি করে রাশিয়ার কুকীতি ওনিয়া।
শরিকানা সাম্রাজ্যীয় বখরার যুঁহু
সামিল করতে চায় ছুনিয়াকে শুকু
ছুনিয়ার মাহু কি আকও আছে যুঁহু?

কে দেবে জবাব? হিটলার?

না কি রাশিয়া।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীশানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দলং কার্যালয় ৩১, বট লেন, কলিকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত।

বা মেলে আকাশে খেলা দেখাতেন

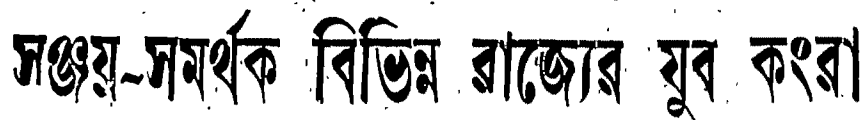
অম্বিকিণ বর্ষ । ২২শ সংখ্যা । , শুক্রবার ২৭শ জুন '৮০ । ৬০ পয়সা

मयदाने द्रुति
जनसभा

ইতিমধ্যে মোহেন মিজর সর্ষক
বীরেন মহাশি, আবহুল রউক
আলসারী প্রমুখ নেতারা উপস্থিত
হন। ওরা দাবী করতে থাকেন
শেখাশ ১২শ পৃষ্ঠায়

অনেকেই সম্মত করছেন বিচার
বিশাগীয় তরফে শত্রু পাক্ষীর বে-
আইনী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত

উল্লেখযোগ্য যে, বিচার বিভাগীয়
তহব্বের রিপোর্ট জনসাধারণ জানতে
পারতেন, কিন্তু বিভাগীয় তহব্বের
রিপোর্ট দিনের আলোর মুখে দেখতে
পাবে না।



মানেকা গান্ধীকে স্বাক্ষরীভূত আনতে চাইছেন

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বোঝা
মাথা ঘামাচ্ছেন তারা হলেন সঙ্গর
সমর্থক বিভিন্ন রাজ্যের যুব নেতারা।
এরা মনে করছেন সঙ্গর গাড়ীর

আমেরিকার যুবরাজ লজর সিং সহ
বেশ কিছু লজর অধুয়ারী যুব নেতা
এব্যাপারে নিজের মধ্যে আলোচনা
শুরু করেছেন। এব্যাপারে যুব
নেতারা কোন প্রস্তাব এখনও
সরকারী ভাবে মনোভাষা গান্ধী অথবা

তবে ইতিমধ্যে আমেথির কংগ্রেস
নেতার আমেথি লোকসভার শ্রুত
আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্ত
শেবাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়

বিশেষ প্রযোজক

লঙ্কায়ের এই চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত
যে বিদ্রোহী ছিলেন তা নয়। আসল
ঘটনা হলো প্রায় সব প্রবীণ নেতাই
লঙ্কায়ের এই চিন্তাধারার ঘোরতর
বিরোধী ছিলেন। লঙ্কায় যখন রাজ্য
বিধানসভার নির্বাচনে প্রবীণ নেতা-
দের অগ্রাঙ্ক করে সম্পূর্ণ নতুন এবং
রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগতদের দলে
সেবাংশে ১২শ পৃষ্ঠায়

সমস্যা

সঞ্জয় গান্ধী

“Man wars not with the dead” অর্থবা মৃত ব্যক্তি সঙ্কল সমালোচনার উদ্দেশ্যে, সাহেবদের এই ভাষ্যমী যদি আমরা গ্রহণ করতাম তাহলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত শ্রীমন্ত গান্ধী সম্পর্কে লেখা অনেক সহজ হত। অধিকাংশ বাঙালী পত্রিকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও তাঁর গুণ গাইতে পারতাম, তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হতে পারতাম এই কান্না কেন্দ্রে যে ভারত একজন অভিনবমানবের মস্তানকে হারাল।

আমরা দুঃখিত আমরা তা পারছি না। শ্রীমন্ত গান্ধীর মস্তান হারানোর শোকে তাঁকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েও আমরা বাধ্য হচ্ছি মৃতের এবং তাঁর মাতার মৃত্যুর জন্যে বা তাঁদের পক্ষে সুখকর হতে পারে না। সঞ্জয় গান্ধী সম্পর্কে লিখতে গেলে একথা আবাস না মনে করিয়ে দিয়ে পারা যায় না যে তাঁর মূল এবং একমাত্র অবদান দেশে এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে বৈরত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি করা। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পার্শ্বসিদ্ধির জন্য কোন মানুষ কতদূর যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উনিশ মাসের জরুরী অবস্থা যার সুযোগ নিয়ে প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধী অসাধারণ এমন পর্দায় পৌঁছেছিলেন, যাতে তাঁকে অতি কুখ্যাত সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসানো যায়। এরই মধ্যে নিশ্চয় মারুতি কেলেকারীর কথা লোকে ভুলে যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ প্রয়াত সঞ্জয় ও তাঁর মার হিংসার শিকার হয়েছেন, পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছেন বহু জননী বাঁদের কথা সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়নি। দিল্লীতে কয়েকটি অকালমৃত্যু ও দুর্ঘটনা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার অকালমৃত্যু ঘটানো হয়েছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, যা ও ছেলের যৌথ প্রয়াসে। সেই সব মৃত্যুর প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করে যায়নি। না, আমরা সঞ্জয়ের জন্ত শোক প্রকাশ করতে পারছি না।

কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে সঞ্জয়ের মৃত্যু নিশ্চয় ঐতিহাসিক আলোড়ন ঘটাবে। যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ না হওয়ার কলে সুবিধা করতে পারছিলেন না তাঁরা আবার মাথাচাড়া দেবেন, তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেবে, যে বিরোধের প্রকাশ এতদিন তবু ঘটে নি। তবে

দেশ কাল রাজনীতি

নাটকীয় প্রবেশ নাটকীয় প্রস্থান

ভারতপুত্র

মাত্র চব্বিশ বছার মধ্যে ভারতের উপর দিয়ে যেন দুটো প্রায় কাণ্ড ঘটে গেল। তবে তার একটি ঘটনা ও অপরটি দুর্ঘটনা। ভারতের রাজনীতিতে যার ধুম-কেতুর মতো আবির্ভাব, ধুমকেতুরই ধরনে সেই সঞ্জয় গান্ধী যে অকালে খসে পড়বেন এবং তাও নিজেরই প্রিয় ছোট্ট বিমানটির বৃকে আকস্মিকভাবে তা যেন চিস্তারও অতীত ছিল। সেদিক থেকে পরিপূর্ণ বয়সে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির মৃত্যুর মধ্যে তেমন অসামান্যতা কিছু ছিল না; যদিও ৮০ বছরের বৃদ্ধ গিরি তেত্রিশ বছরের তরুণ সঞ্জয়ের মতো নতুন সজীবতা প্রদর্শন করেছেন, তবুও সঞ্জয়ের অকাল অন্তর্ধান ভারতের রাজনীতিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি করল তার যেন তুলনাই হয় না। অবশ্যই এ-শূন্যতা ঘটেছে জাতীয় রাজনীতির অনেকখানি স্থান সঞ্জয়ের জুড়ে বসার কারণে।

সঞ্জয় গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৭০ নালে যখন মারুতি মোটর গাড়ি নির্মাণ কারখানা নিয়ে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নাটকীয়ভাবে রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করে যুব কংগ্রেসের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছরের রাজনৈতিক জীবনের মেয়াদে সঞ্জয় একাধারে যতখানি সমালোচনা ও সুখ্যাতি, নিন্দা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠেন অতখানি বৈচিত্র্য দাবি বোধহয় ভারতের আর কোনো রাজনীতিকই করতে পারেন না। জরুরী অবস্থার সময়ে সংবিধান-বহির্ভূত ব্যক্তি

যে বৈরতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে শ্রীমন্ত গান্ধী এবং তাঁর মস্তান দলকে বেঁধে ফেলেছেন সেই কাঠামোর খুব একটা বদল হবে মনে হয় না, কিছুদিন নাচানাচি করেই সবাই আবার নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়বেন। মস্তানবিহীন শ্রীমন্ত গান্ধী যদি আরও কঠোর হয়ে ওঠেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, তাঁর নিঃসঙ্গতাই তাঁকে বাধ্য করবে নিজেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় আরও বেশী সক্রিয় হতে। যারা ভাবছেন সঞ্জয়ের অস্থগতিতে আবার শ্রীমন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠবেন, যেমন পোনা যাচ্ছে সিদ্ধার্থ রায়, তাঁদের নিরাশ হতে হবে।

হিসাবে সঞ্জয় গান্ধীর ভূমিকা একদিকে যেমন বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাকে পরিচিত করেছিল, তেমনি অপরদিকে বিরোধী শিবিরে ঝড় তুলে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সে ঝড় তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি যদিও ইতিমধ্যে দেশবাসী তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কূটকৌশলী বুদ্ধির পরিচরও পেয়েছে। কেন্দ্রের জনতা সরকারের ভাঙন থেকে শুরু করে আটটি রাজ্যে কংগ্রেসের (ই) ক্ষমতার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপই সঞ্জয় গান্ধীর প্রায় একক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশেই সম্ভব হয়েছে—একথা আজ আর অবিদিত নেই।

লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের (ই) আশাতীত সাফল্যে সঞ্জয়ের অবদান, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কংগ্রেসী (ই) মন্ত্রিসভা গঠনে, এমন কি লোকসভার ভিতরে ও বাইরে তার সীমাহীন প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেই দেশে ও বিদেশে সর্বজনীন-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে ইন্দিরার পর সঞ্জয় গান্ধীই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এমন পরিহিত ও দ্রুত সৃষ্টি হচ্ছিল যেখানে সংবিধানের গংশোধন করে প্রেসিডেন্ট-প্রধান সরকারই পার্লামেন্ট-প্রধান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হবে যার প্রধান দুটো পদই (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী) থাকবে ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধীর দখলে।

সঞ্জয় গান্ধীর আকস্মিক বিদ্যায় তাঁর নাটকীয় প্রস্থানে পারিবারিক শাসন নাটকেরও যবনিকা পতন ঘটল বলে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার মন্তব্য করা হয়েছে। সঞ্জয় যেন রাজনীতির মতো জীবনকেও খেলাচ্ছলে নিয়েছিলেন, তা মইলে তিনি একটি আনকোরা নতুন শিকারী বিমান নিয়ে অহেতুক কৌশল কলরব দেখাতে যাবেন কেন। এই অবিস্মৃত-কারিতারই চরম মূল্য তাকে দিতে হল। সঞ্জয়ের বিদ্যায় (তবুও কমিটি গঠন করে বাতিল হল কেন?) কংগ্রেসে (ই) এখন চূড়ান্ত টাল-মাটাল শুরু হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

তার কিছু পুরনো সহকর্মী সহযোগীকে ইন্দিরাজী যেমন কিয়ে পাবেন, তেমনি যুব তরুণদের মধ্যে

চরম হতাশা দেখা দিতে পারে। অত্মদিকে বিরোধী ও বামপন্থী শিবিরেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন রাজনীতির রথকোশল উদ্ভাবিত হবে বলে মনে হয়।

গিরি পতন

ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বরাহগিরি ভেংকটগিরিকে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা গিয়েছে। প্রথম জীবনে রোমানকর আইরিশ নায়ক ডি ভ্যালেরার আদর্শে অনুপ্রাণিত গিরি একজন অ্যানার্কিস্ট, পরে গান্ধীজীর অহিংস সত্যগ্রহ আন্দোলনের শরিক। কিন্তু প্রমিক নেতা হিসাবে তিনি যে এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন, তা আজ তরুণ-তীত সত্যের অন্তর্ভুক্ত। সেদিন নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে কমিউনিষ্ট পার্টিও যে ছিল।

প্রাদেশিক মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কূটনীতিক, রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি—রাজনীতির প্রায় সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদই শ্রীগিরি অলংকৃত

করে গিয়েছেন। কিন্তু শ্রী শংগ্রামের আদর্শে উজ্জীবিত না হলেও প্রমিক আর্থের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল অকুজিম। এ কারণে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগেও কুণ্ঠিত হননি। রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিধগিত হওয়ার ঘটনাটি ভারতের রাজনীতির একটি দিকচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার রাবার স্ট্যাম্প—এ অপবাদ তাকে মইতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যে দায়িত্ব, ক্ষমা, বেকারী শোষণ ও বঞ্চনার মূলোচ্ছেদ ঘটয়ে কংগ্রেসকে তার সমাজতন্ত্রের আদর্শ রূপায়ণে সনিষ্ঠ পরামর্শে সোচ্চার হয়েছিলেন—একথাই বা ভোলা যাবে কেন মনে করে? সে আদর্শে তাড়িত হয়েই তো তিনি শেষ বয়সে ইন্দিরার লেবার পার্টি নামে নতুন সংগঠনের পতন করেছিলেন, ইন্দিরা শাসনের তীব্র সমালোচনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন! ভারতের প্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভি ভি গিরির নাম খোঁদাই করা থাকবে।

একটি নতুন জাতীয় দল গড়ার জন্য তৎপরতা চলছে প্রধান উদ্যোগী চন্দ্রজিৎ যাদব

আবার নতুন একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গড়ার তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। এই দলটি যাতে বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য উদ্যোগীরা এমনভাবে এগুচ্ছেন যাতে অতি বৃদ্ধ নেতারা ক্রমশঃ রাজনীতিতে একদম কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং অবসর নিতে বাধ্য হন। আর নতুনরা বেশী করে জায়গা পান। এই নতুন দলটির নাম—ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস—রাধার সম্ভাবনাই বেশী। দলটির আত্মপ্রকাশ আগস্ট মাসের একটি বিশেষ দিনে হবে বলে উদ্যোগীরা মনে করেন।

এই দলের পরিকল্পনা নিয়ে বিভিন্ন মাথা ঘামাচ্ছেন চন্দ্রজিৎ যাদব। তিনি লোকসভার নেতা চরণ সিংএর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহযোগী থেকে এখন বিরোধী হয়েছেন। নতুন দল গড়ার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দলদ্বারা বহুগুণ্য সবে আলোচনা করেছেন। বহুগুণ্যও দিল্লীতে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। রঘুনাথ রেড্ডি, বি পি মোর্খের সঙ্গেও কথা বলেছেন। উত্তর, প্রদেশ বিধান সভার তাঁর সমর্থকরা কংগ্রেস আর্গ-

এর সঙ্গে চলবেন বলে আর্গ কংগ্রেসের রাজমল্ল পাণ্ডের সঙ্গে মলা-পরামর্শ করেছেন। আর, যু-জিয়ারেও এই দলটি যাতে গড়ে ওঠে তার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। তিনি জর্জ কার্ণাওজ, বি পি মোর্খ, রাজনারায়ণ এবং আর্গ কংগ্রেসের সমাজ-তন্ত্রীদের এর মধ্যে যাতে জায়গা করে দেওয়া যায় সে চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টাতে দেবরাজ আর্গএর সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। কেননা, দেবরাজ তাঁর সহায়ত্ব ও সমর্থনের আভাস উদ্যোগীদের জানিয়েছেন। কিন্তু বাবুজী এ ব্যাপারে কোনরকম সহযোগিতার প্রস্তাবে রাজী নন। তিনি তাঁর এখনকার দল কংগ্রেস (আর্গ)-এর চূড়ামণি হতে চেষ্টা করছেন। অতএব তাঁর কাছে এসব উদ্যোগ এখনও আমল পায় নি। তবে সুযোগ বুঝলে তিনি চলে যাবেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা মনে করেন।

এই নতুন ভারতীয় সমাজ-তান্ত্রিক কংগ্রেসে এখন কংগ্রেস ও জনতার সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্নদের স্থান দেওয়া হবে এবং বাম গণতান্ত্রিক যোগাযোগ সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হবে বলে এর সংগঠকরা মনে করেন। তাঁদের শেবাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়

আনন্দবাজারী 'নিউ মার্কেট'

শ্রীপতি নন্দী

ধনিক-বণিককুলের এঁটো পেয়া-
লার সুখটুকু পান করলে যমপাখীটা
একটু উড়ু উড়ু করে বৈকি; চাই কি
পাখীনা মেলে অজ্ঞাত ঘুরে দেখতে
চাইবে সবুজের বুকে আশুন, গম্বীবে
গম্বীবে, বকিতে-বকিতে হানাহানির
'সম্ভাবনাময়' মুহূর্তগুলি। কলমের
কালাগ্নি হানাহানির হিংস্রতাকে হৃৎ-
মধুর করে তুলতে পারে, আবার
উনানের আশু নে ধাওবদাহনের
উত্তাপ এনে দিতে পারে; এ সমস্ত
কর্তব্য পালন করে একযোগে কাকন
আর কোলিত্ত হুড়িয়ে পিতৃ-মাতৃ-
কুলকে ধন্য করতে যা যা করণীয়
স্বতঃস্ফূর্তেই তাই তার সব কিছুই
সংগ্রহ করা আছে।

চুটকী বিদ্যায় চটকদারী 'রাজ্য-
রাজনীতি', সম্পাদকীয় চটকানি
'কলমী' মূল্যায়ন (মুন্সিয়ানা),
রোমাঞ্চকর সংবাদ পরিবেশনা,
সাংবাদিকতার ছলে ধনিক-বণিকের
আমোদকল্পে ভাঁড়ামির কলকৌশল,
মনবিষম-বিনোদিনী সংবাদ সমীক্ষার
শিল্পীময় ইত্যাদি সব কিছুই পাবেন।
অতএব, ভালকানা সাংবাদিকতা ও
অশান্তির দূতগণ জুটেছে, বাঙালী-
অবাঙালী বিচারে উগ্র 'আমরা

বাঙালী'রা (অবশ্য বাঙালী মুসল-
মানকে দূরে রেখে), ভারত-পাক
সম্পর্কে পাক-বিষেয়ীরা, হিন্দু-মুসলিম
বিচারে হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক, কেন্দ্র-
রাজ্য সম্পর্কের বিচারে রাজ্যবিষেয়ী
ফেজলহুদা, আব্বাস জাতীয় সংহতির
শোকে কণ্ট কাঁদায় কুল ভাসানীরা
একত্র হয়েছে। কাকজ বিক্রী চলছে
লাখে লাখে, শত্রুকুলের মুখে ছাই
নিক্ষেপ করে, আর পাণের আশুন
পাক খেয়ে খেয়ে অপকৃষ্টির ধূস্রবিস্তার
করছে। হার রাখন সেন, রাখন
বিহীন কটীটাও ভোমার কপালে
জোটে নি।

আনন্দবাজারী হোক, আর
আনন্দমার্গী হোক, মার্গ যদি অভিন্ন
হয় মর্মভার ভিন্নধর্মী হবে কেন?।
আর সে মর্মভার বিলকুল খালস না
করতে পারলে সোয়াস্তি বা কোথায়?।
তবে তেমন তেমন সম্পাদকীয় এক-
একখানাতেও এ অসম্ভব খালসী-কর্ম
দৃষ্টান্তে পারে, যেমন দস্তবিলা ১৬ই
জুনের বোমটাবিহীন সম্পাদকীয়তে।
স্বযোগটি (বা উপলক্ষটি) যেমন
আজ্ঞাদে আটখানা হয়ে পড়ার মত
তার সদ্যবহারটাও তেমন বাহুজ্ঞান-
শূন্য না হলে মর্মজালা জুড়াবে কেন?

আনন্দের উৎস ভগবান, পরি-
বেশক আনন্দবাজার অস্তিত্বকে
গোড়স্থিতে তো বটেই। ভগবান
আটাত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে বান এনে-
দিলেন; বজ্রাভ ভয়াবহতার মাজু
শিউরে উঠলো, কিন্তু আনন্দবাজার
ও সহযোগীগণ রোমাঞ্চিত হলো,
বজ্রাভ বর্ণনার রাতনৈতিক বিষয়বিষ
উজাড় করে ঢাললো, মৃত্যুর সংখ্যাকে
কাব্যগুণে জীবন্ত করে তুললো, কিন্তু
মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জন্তে অতুল-
নীয় লড়াইকে নজরেই নিল না।
'সর্বদর্শী' ভালকানা আর কাকে
বলে?

দেশের পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক
ঘটনাগুলি মর্যাদিক, নৃশংস, বিদেশী
চক্র প্রভাবিত, গণ ঐক্যে ফাটল
স্থিতিকারী, বিশৃঙ্খলার, সঙ্কীর্ণতা-
বাহী, জাতীয় ভেদবুদ্ধি-আশ্রয়ী
বীভৎস অপকর্ম—অতএব আনন্দ-
বাজারের নতুন বাজার, নতুন
মতকা। একের পর এক—আসাম
মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম এবং
সর্বশেষে ত্রিপুরা। আসাম, মেঘালয়,
মণিপুর মিজোরামের কথা স্বতন্ত্র,
কেন্দ্রশাসিত ও কং(ই) শাসিত অঞ্চল-
গুলিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও
প্রশাসনিক উদ্বাসীর কথা আনন্দ-
বাজারী 'জাতীয় স্বার্থে' আলোচ্য
হতে পারে না, শত্রু শত্রুদের মাংস
খায় না। কিন্তু পশ্চিমবাংলা ও
ত্রিপুরার অবস্থা ই 'জাতীয় স্বার্থ'
বিশয়।

১৬ই জুনের 'সম্পাদকীয়' একটা
নমুনা দৃষ্টান্ত হতে পারে। ত্রিপুরায়
হঠাৎ-সংঘটিত ঘটনাগুলির সঙ্গে
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যোগাযোগ
কোথায়? কিংবা 'দুস্ত-ব্রাড লে
খিনিন', আকালী দল ইত্যাদি বা
কিভাবে আলোচ্য হয়ে দেখা দিল?
স্ববোধ বাস্তব কৈল সিং-এর ধৈর্য
নিষ্ঠা, জাতীয় স্বার্থে গোপনীয়তা
রক্ষার কাজে তার প্রাপ্য প্রচেষ্টার
কাহিনী কিভাবে এত প্রশংসিত হয়ে
উঠলো? জৈল সিং-এর কোন্ কোন্
অভিযোগ নূপেন চক্রবর্তী কবুল করে
ফেললেন? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কি
লোকসভায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট
অদ্বাবধি পেশ করেছেন? কিংবা
'বিসর্জন' নাটকের লেখক যে নূপেন
চক্রবর্তী নহেন তা আনন্দবাজারের
সম্পাদক মশায়কে বলে দেবে কে?
তথাকথিত উত্তরখণ্ড, ব্রাহ্মণ্ড, 'কাড়-
খণ্ড ইত্যাদিই বা এত বাস্তব হয়ে
উঠলো কি করে? ১৭ই জুনের
সম্পাদকীয় জন্তে দ্বিতীয় উদ্যোগ কি
শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

কেন্দ্রীয় বাজেটের ফাঁকি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডেক্টরমণ তার
বাজেট রচনায় লক্ষ্যণীয় কুশলতা
প্রদর্শন করেছেন। ১৯৮০-৮১ সালের
এই বাজেটের প্রাথমিক চিত্র দেখে
বেশীর ভাগ লোকই মনে করেছিলেন,
এই বাজেট গরীব ও মধ্যবিত্ত জন-
গণের যত্না লাভ ও কল্যাণ স্থষ্টির
উদ্দেশ্যে রচিত। প্রথম দফায় তার
বাজেট সব মহলের অভিনন্দন
হুড়োতে পেরেছে। জাতীয় দৈনিক
'গুলি' এক স্বরে বাজেটকে অভিনন্দন
জানিয়েছে।

কিন্তু একদিনের মধ্যেই অভি-
নন্দনের কণ্ঠ জিমিত। সব কাগজের
সম্পাদকীয়তেই একটা ইতস্ততঃ
অপ্রান্তর হ্র। দ্বিতীয় নজরে নাকি
বাজেটের ক্রটিগুলি তাদের চোখে
ধরা পড়েছে। বোকা গেল ডেক্টর-
মণ প্রথম নজরে তাদের বোকা
বানাতে পেরেছিলেন।

১৯৮০-৮১ সালের কেন্দ্রীয়
বাজেটে নীট ঘাটতি ১৪১৭ কোটি

তাহলেও আশ্রয় হবার কিছু নেই।
কংগ্রেস (ই) সরকারের অর্থমন্ত্রী
জনতা সরকারের নীতি অথবা নীতি-
হীনতা অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্মে
দায়ী করেছেন এবং এখন তার সর-
কারের পক্ষে অর্থনীতির ভয়ঙ্কর
থেকে নতুন অর্থনৈতিক ইমারত গড়ে
তোলা যে কত কঠিন তা উল্লেখ
করতে ভোলেন নি। কিন্তু প্রাক
বাজেট অর্থনীতির সমীক্ষা তার এই
উক্তিকে অসত্য বলে প্রমাণিত করে।
এই অর্থনৈতিক সমীক্ষা তিনিই
প্রচার করেছেন। কিন্তু যদি তিনি
তা মনে রাখতেন তাহলে তার
বাজেট ভাষণে জনতা সরকারের
প্রতি বক্রোক্তি করতে লজ্জা পেতেন।
মূলতঃ জনতা সরকারের সঙ্গে
কংগ্রেস (ই) সরকারের যে বিশেষ
পার্থক্য নেই গত কয়েক বছরের
বাজেট পর্যালোচনা করলে সেই
সম্পর্কে কারো সম্ভেহ থাকার কথা
নয়।

অর্থনীতি

টাকা। রাজস্ব খাতে ১৫৪ কোটি
এবং মূলধনী খাতে ৪৬৩ কোটি টাকা
ঘাটতি। আগেকার এবং বর্তমান
বাজেটে ধার্য করা রাজস্ব বাদ দিয়েই
এই ঘাটতি। স্বতরাং এই ঘাটতি
মেটানোর জন্তে মূলধনী ঋণ এবং
কাগজী নোট ছাপানোর উপর নির্ভর
করতে হবে। এর পরিণামে মুদ্রা-
ক্ষীতির চাপ বাড়তে বাধ্য। স্বতরাং
বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মুদ্রা-ক্ষীতির
চাপ কমাতে যে ভরসা দিয়েছেন
বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই।
অন্ততঃ বাজেট, পরিসংখ্যান এই
উক্তিকে সমর্থন করে না। মূলধনী
ঋণের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহ-
বিল থেকে নামমাত্র সুদে ৫৪০ কোটি
টাকা পাওয়া যাবে বলে ইতিমধ্যেই
ধরা হয়েছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৭৯-৮০
সালে জনতা দলের অর্থমন্ত্রী চৌধুরী
চরণ সিং যে বাজেট পেশ করেছিলেন
সেই বাজেটে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা
নতুন নতুন ট্যাক্স বসিয়ে সংগ্রহ
করার পর ঘাটতি দেখানো হয়ে-
ছিল ১৩৫০ কোটি টাকার মত।
কিন্তু কার্যতঃ ঐ ঘাটতি দাঁড়ায় দ্বিগুন
প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা। মুদ্রা-
ক্ষীতির চাপ ও মুদ্রাবৃদ্ধির যে সকল
ব্যবস্থা অর্থমন্ত্রী করেছেন, তার কলে
১৯৮০-৮১ সালের বাজেটে চূড়ান্ত
ঘাটতি যদি ৩০০০ কোটি টাকা হয়

অর্থমন্ত্রী বাজেটে কয়েকটি পণ্যের
উপর থেকে বিশেষ উৎপাদন শুদ্ধ
তুলে দিয়েছেন। যেমন সস্তাদামের
সাবান, বাই সাইকেল, সেলাই কল,
স্ট্যাণ্ডার্ড রুথ, অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত
পণ্যের উপর বিশেষ উৎপাদন শুদ্ধের
হার শতকরা পাঁচ থেকে দশভাগ
বৃদ্ধি করেছেন। সিগারেটের উপর
এই বিশেষ শুদ্ধ আদৌ ছিল না।
এখন থেকে সিগারেটের উপরেও শুদ্ধ
বসবে। যে কয়টি পণ্যের উপর উৎ-
পাদন শুদ্ধ প্রত্যাধার করে অর্থমন্ত্রী
চমক লাগাতে চেয়েছিলেন তার
মধ্যে সাবান ও স্ট্যাণ্ডার্ড রুথ উল্লেখ-
যোগ্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই কন-
সেশনের কোন মূল্য নেই। কারণ
সাবান শিল্প ১০ শতাংশই এখন ছু'
একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের এক-
চেটিয়া অধিকারভুক্ত। সাধারণের
ব্যবহারযোগ্য কোন সাবান একটাকা
বা পঁচাত্তর পয়সার পাওয়া যায় না।
ভাছাড়া সস্তায় সাবান বাজারমাত
করা বাধ্যতামূলকও নয়। স্ট্যাণ্ডার্ড
রুথের ক্ষেত্রে এই কনসেশন আরো
কৌতুককর কারণ কাগজের কলগুলি
স্ট্যাণ্ডার্ড রুথ উৎপাদনের মাত্রা কমিয়ে
এনেছে এবং স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজ উৎ-
পাদন না করার দিকে ঝোঁক
বাড়ছে। গত বছরই মিলগুলি
স্ট্যাণ্ডার্ড রুথ উৎপাদনের বাধ্যতামূলক
দায় দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়েছিল।
এবার যদি তারা স্ট্যাণ্ডার্ড রুথ উৎ-
পাদন কমিয়ে দেয় অথবা স্বতা
কমিয়ে অব্যবহার্য কাগজ তৈরী করে
শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়



ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড
(কোম ইতিহাস একটি সংস্থা হিসেবে)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও
রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অহুমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত-
কারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট
তারিখ লিখে দফাওয়াতী দরভিক্ষিক / শতকরা ভিত্তিক সীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা : নং : ১৭৪ / ২০২০ তার ৩০-৫-৮০।

কাপাসারা ও সি পি অপারেটিং-এর জন্য কাপাসারা কোলিয়ারীর
কাপাসারা ইউনিটে একটি নালী স্থানান্তরের কাজ। কাজের আনুমানিক
মূল্য ১,৬৪,৫১৩.১১ টাকা। কাপাসারা কোলিয়ারীর কেশিয়ারের কাছে
১০০ টাক (একশো টাকা মাত্র) নগদে দিয়ে (অগ্রত্যাগযোগ্য) ১৭-৬-৮০
থেকে ১-৭-৮০ অবধির সময়ে বেলা ৪টা পর্যন্ত ডেপুটি-সি এম ই / এজেন্টের
অফিস, কাপাসারা কোলিয়ারী, মুগমা এরিয়া থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া
যাবে। ২-৭-৮০ বেলা ৪টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা যাবে এবং একই
দিনে বেলা ৪৩০ টায় খোলা হবে। টেন্ডারপত্র দেবার আগে টেন্ডারদাতার
কাজ গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করতে হবে,
যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সাধারণ : আনুমানিক খরচের ১% ব্যয়মাত্র-টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের
কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মণি অর্ডার টেন্ডার
গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে।
টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার
খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ
বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে
টেন্ডারদাতাদের ধর্মার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার প্রচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গত তিন বছর ধরে- এই রাজ্যে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। কেননা এই সরকার বিশ্বাস করেন গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচীর স্থান সবার ওপরে।

এর জন্য তাঁরা দুটি বিষয়ের ওপর

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

যা বাঁজাচ্ছে অচল। তাহলে কি হবে? অর্থমন্ত্রী বাইসাইকেল আর সেলাইকল ও যন্ত্রাংশকে শুধু থেকে রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু সাইকেলের টায়ার ও টিউবের উপর শুধু বাড়িয়েছেন। এর ফলে কি বাইসাইকেলের দাম কমতে পারে?

অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্ক ও লগী সংস্থাগুলির সুদবাবধি অধিত মূল্যায়ন উপর ৭ শতাংশ হারে কর বসিয়েছেন। এর ফলে ব্যাঙ্কের সুদ শতকরা ১২.০ পরমা হারে বাড়বে। সমস্ত পণ্যের উপরেই এর প্রতিক্রিয়া হবে। কারণ শিল্পকারখানার মালিকেরা তাদের লম্বা খরচই পণ্যের দামের মধ্যে ধরে নেবে।

বাজেট পেশ করার মাত্র কয়েকদিন আগে পেট্রোলিয়াম এবং কেরোসিন ছাড়া সমস্ত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, সার, জাপা ইত্যাদি মৌজ রাসায়নিক পণ্যের দাম বাড়ানো হয়েছে। ফলে বাসভাড়া, রেল-ও সড়ক পথে সাল-পরিবহনের খরচ বেড়ে গেছে। ক্রেতা ও করদাতা জনসাধারণকেই এর মাসুল গুনে দিতে হবে।

এদিকে যে সকল পণ্যের উপর বিশেষ উৎপাদন শুধু বসানো হয়েছে তা থেকেই এবারের বর্ধিত রাজস্বের ২৮২ কোটি টাকার সবটাই আদায় করা হবে। যারা আয়কর দেন তাঁরা রেহাই পেয়েছেন। কিন্তু গরীব মানুষের রেহাই নেই।

বড় বড় শিল্পপতি, বণিক গোষ্ঠী এবং দেশের ছত্রিশ লক্ষ আয়করদাতার জন্যেই অর্থমন্ত্রীর অস্থগহ, বিতরণ করা হয়েছে। দেশের বাটকোটি মানুষের কাছে এই বোকা আরো দুর্বল হয়ে উঠেছে। অর্থমন্ত্রীর আশাস এই কারণেই অর্থহীন। এই কারণেই বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের দ্বিতীয় নজরে এটা ধরা পড়ছে, প্রথম নজরে নয়।

এই বাজেট মনোহর প্যাকেটে রাধা একটি টাইম বোমা মাত্র। প্যাকেট দেখে উল্লসিত হবার কারণ ছিল না, বোমাটি কেটে যখন মূল্য বিস্ফোরণ ঘটাবে একমাত্র তখনই এর সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া বোকা যাবে।

শুকন দিয়েছেন। এক, বর্গাধারদের নাম রেকর্ড ভুক্তি এবং দুই, সিলিং-এর বাইরে বাড়তি ভূমি উদ্ধার। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮৫০ লক্ষ বর্গাধারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কাজে হাত দেবার পর

থেকে গড়ে প্রতি মাসে ২০ হাজার বর্গাধারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ও অস্থায়ী গ্রামীণ প্রশাসিক সংস্থার সহযোগিতার নাম রেকর্ড করার জন্য বর্গাধারদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সিলিং সংক্রান্ত দুটি আইনে এ পর্যন্ত ২৮ লক্ষ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ

একর ভূমি ভূমি। এক বছরে উদ্ধার প্রাপ্ত ভূমি ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৫০০ একর। ১০ লক্ষেরও বেশি ভূমিহীন ও দরিদ্র গ্রামীণ প্রশাসিককে সিলিং-এর বাড়তি ভূমি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫৫ শতাংশ তফশীল সম্প্রদায় ও তফশীল উপজাতির লোক। বাকি ভূমি বিলিও চেষ্টা চলছে পঞ্চায়েতের সহায়তার এবং এইজন্য

পঞ্চায়েতগুলিকে একটি নামের তালিকাও তৈরি করতে বলা হয়েছে।

কেবলমাত্র বর্গাধারদের নাম রেকর্ড করে এবং সজতিহীন গ্রামের প্রশাসিকদের এক খণ্ড ভূমি দিয়ে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটানো যাবে না। তাই তাদের অর্থ সাহায্যের কর্মসূচীও নেওয়া হয়েছে।

আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের সেবার হাত আরও শক্ত হবে

আপনাদের নাগরিক জীবনে কলকাতা পুরসভার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের একাত্মিক সহযোগিতাই আমাদের সেবার হাতকে আরও শক্ত করতে পারে। এই সহযোগিতার ফলে এ পর্যন্ত অনেক কাজ আমরা করতে পেরেছি। আরও সার্বিক সহযোগিতার আশায় আমাদের কাজের একটি মূল্যায়ন আপনাদের সামনে রাখছি।

যে সব নাগরিক-সুবিধার দাবী আপনাদের আছে; আমরা জানি জজালের সুপ, শুক জলকল, রাস্তা পরিঃপ্রণালী কিংবা অন্ধকার রাস্তা সমস্যা অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আপনাদের আছে। ঘনবসতির দিক থেকে কলকাতা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী—এ সব সমস্যার এটা একটা অন্যতম কারণ। এ সব সমস্যা দূর করে আপনাদের নাগরিক সুখ সুবিধাকে আরও বৃদ্ধি করতে আমরা সব সময়েই সচেষ্ট।

নগরীকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা কি করছি? মহানগরীর রাস্তা থেকে আমাদের কর্মীরা প্রতাহ প্রায় ২৫০০ টন জঞ্জাল পরিষ্কার করেন। এই বিভাগের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের ২০০টি লরীর সঙ্গে আমরা যুক্ত করেছি আরও ৬টি পে-লোডার, ৭টি ডাম্পার এবং ২০টি 'নাইট-সেয়েল' ট্রাক্টর। বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০টি নতুন আবর্জনার ড্র্যাট নির্মিত হয়েছে এবং ১০০টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে একটি ওয়ার্ড-ডিপো তৈরীর প্রস্তাব আছে।

দু-পার্শ্ব পরিঃপ্রণালীর সংস্কারের ফলে জল স্থিতিতেই যে সব অঞ্চলে জল জমতো সে সব অঞ্চল এখন এই সমস্যা থেকে মুক্ত হয়েছে।

গত তিন বছরে প্রায় ৭০০ রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে এবং কসবা, টালিগঞ্জ, বেলঘাটা ও কাশীপুর অঞ্চলের প্রায় সব কাঁচা রাস্তাকে পাকা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির জন্য অনেক নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে; জল সরবরাহের লাইনে রিপে মেরামত করা হয়েছে এবং জরাজীর্ণ পাইপ বদল করা হয়েছে।

কলেজ স্ট্রীট, গড়িয়াহাট, মালিকতলা ও হুগ-মার্কেটকে বহুতল সমন্বিত সুপার মার্কেটে পরিণত করার কাজ শুরু হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য বাজারগুলিও অনুরূপভাবে সুপার মার্কেটে উন্নীত করা হবে।

মহানগরীর স্বাস্থ্য রক্ষা আমাদের একটি মৌলিক কাজ। বসন্ত রোগ নির্মূল করা হয়েছে; কলেরা রোগে মৃত্যুর হার প্রায় বিলীন হতে চলেছে। মালিকতলায় একটি বহু-রোগ চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। বোড়ালে ২০০-শয্যা বিশিষ্ট একটি টি.বি হাসপাতালের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি নতুন মাতৃ সেবা সদন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

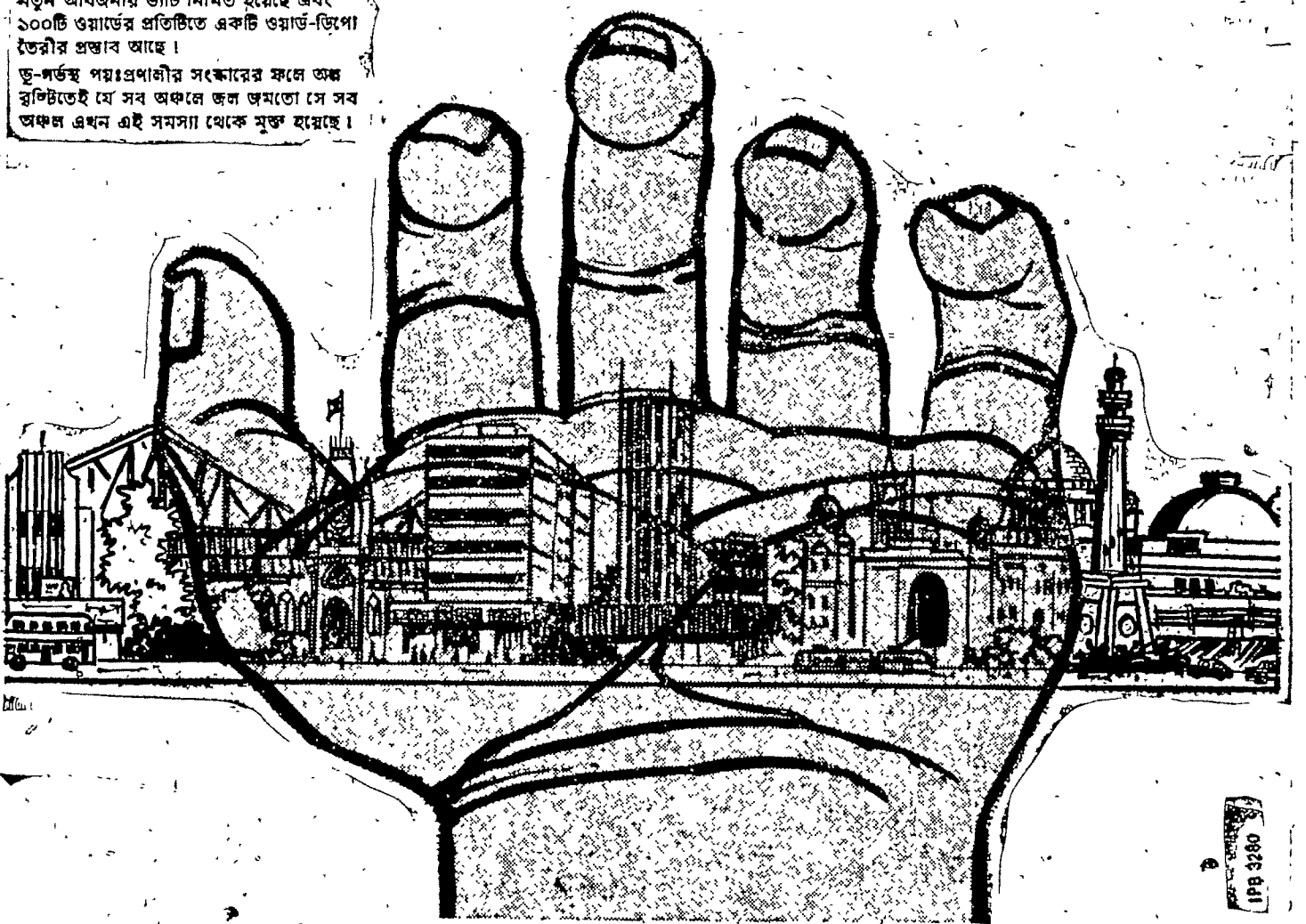
অনেক জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অনেক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আপনাদের একাত্মিক সহযোগিতায় আমরা এই সব কাজ করতে পেরেছি। আপনাদের জন্য আমরা আরও অনেক কাজই করতে চাই।

আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে মহানগরীর পৌর-শাসনভার 'মেয়র-ইন-কাউন্সিল' নামে একটি সংসদে উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতে প্রথম এই রকম একটি সংসদের স্থিতি হলে পৌর প্রশাসনের কাজ অনেক গণতন্ত্র সম্মত ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। আপনাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই এই ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

আপনারা জানেন অল্প সময়ের মধ্যে সীমিত সত্ত্বা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। প্রতিটি নগরবাসীর সহযোগিতাই আমাদের সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। আজ বামফ্রন্ট সরকারের ৩ বছর পূর্তিতে আমরা আর একবার কলকাতাকে তার অতুলনীয় পরিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প নিয়ে।

কলিকতা পুরসভা



জরুরী অবস্থায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের নিগ্রহের কাহিনী

দপণের প্রতিনিধি

পঁচাত্তর সালের ২৬ জুন সেনসরশিপ চালুর ইতিহাস সকলেই জানেন। জুলাই মাসে শুক্রবারের পরিবর্তে বিচারচরণ শুরুতে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী করা হল। শুক্রা নিগ্রহের পছন্দমতো ছ / তিনজন অফিসারকে দপণের আনেন, ২৬ জুলাই '৭৫ ক্রিমতী গান্ধী এক বৈঠকে প্রচার মাধ্যম ব্যবহারের এক বিস্তারিত গাইড লাইন দেন। এই বৈঠকে ঠিক হয়, প্রেস কাউন্সিল বাতিল হবে, সংবাদ সংস্থাগুলো ভেঙে একটা সংগঠনে কেন্দ্রীভূত করা হবে (সমচারি), বিজ্ঞাপন দানের নীতি পর্যালোচনা করা হবে, সাংবাদিক-দের দেয় গৃহের স্বযোগ সুবিধা প্রত্যাহত হবে ও বিদেশী যে সব সাংবাদিক এই গাইড লাইন মানবেন না তাঁদের নির্বাসিত করা হবে।

অমনি কাজ শুরু হয়ে গেল। জনতা সরকার কেন্দ্রীয় তথ্য-ও বেতার মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব কে.এ. দাসকে দিয়ে সাতাত্তরের ২১ মে এক কমিশন গঠন করে। সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে দাস কমিশন ঐ বছরের ২২ জুন এক খেতপত্র তৈরী করেন। দাস কমিশনের ঐ রিপোর্টে জানা যায় জরুরী অবস্থায় আমে-দাবাদের সাপ্তাহিক 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদক, তিনজন পরিচালক

ও পাঁচজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। গোহত্যার বিরুদ্ধে আচার্য বিনোবা ভাবের বিবৃতি নিয়ে 'দৈজী' পত্রিকা এক গল্প প্রকাশ করে। ফলে ঐ পত্রিকা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পত্রিকা বাজেয়াপ্তকরণের এই সংবাদ 'ভূমিপুত্র' ছাপে। শুক্রাটের ভবনগরের মানিক 'মিলাপ', 'ভূমি-পুত্র' প্রকাশিত ঐ সংবাদের পুন-মুদ্রণ করে। ব্যাসু, রাজ্য পুলিশ মিলাপের প্রেসে তালি মেরে দেয়, স্থানীয় গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি হামলা করে ও জুন সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করে। প্রেসের মালিক ও সম্পাদক ধৃত হন। মিলাপের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদককে মিশার গ্রেপ্তার করা হয়। ত্রিপুরার তদানীন্তন কংগ্রেসী সরকার প্রেসে তালি মেরে ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন দানও বন্ধ হয়। 'আসাম ট্রিবিউন'-এর পরিচালকদের সঙ্গে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়ার রাজনৈতিক সংবাত চলছিল। জরুরী অবস্থায় স্বযোগে বরুয়া এই কাগজে ডি এ ডি সি, ইউ পি এস মির বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দেন। পরিচালকদের

উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল ক্রিমতীশচন্দ্র কাকোতিকে সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়নের জন্য। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর রেকর্ড অনুযায়ী ২৫ জন সাংবাদিককে তখন গ্রেপ্তার করা হয়, বাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্বশ্রী কুলদীপ নাথার, কে আর মালকানি, এবং কে আর সুন্দর-রাজন। মধ্যপ্রদেশে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি ৫৯ জন। কিন্তু কোন খবরই তখন কাগজে প্রকাশিত হয়নি।

দপণ পত্রিকার প্রেস মডার্ণ-ইন্ডিয়া প্রেসে পুলিশ তালি মারা হয় ৩ এপ্রিল ১৯৭৬-কারণ পত্রিকা ৩ অক্টোবর শায়দীয়া সংখ্যায় 'কুলদীপ নাথারের মামলার সম-কারের আচরণ সম্পর্কে তীব্র সমা-লোচনা', ও চামলালা সম্পর্কে ছোটো সংবাদ ও 'অং বং চং' নামে একটা ছড়া ছাপানো হয়। কাগজ প্রায় ছ মাস বন্ধ থাকলো। ঐ সংখ্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করা হল। ক্রটিয়ার পত্রিকার ২৬ জুন '৭৫ সংখ্যা নিষিদ্ধ হল কড়া কাঁথুলো সম্পাদকীয়র জন্য। গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ' বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সমগ্র প্রেসে হানা দিল। প্রচুর টাইপ নিয়ে গেল, ম্যানেজার গ্রেপ্তার হলেন। 'কলকাতা' পত্রিকার বিশেষ রাজনৈতিক সংখ্যা নিষিদ্ধ হল এবং সম্পাদক জ্যোতির্ময় বসু, লেখক গৌরকিশোর বোস সহ প্রকাশক ও আরো তিন/চারজন গ্রেপ্তার হলেন। মালদা থেকে প্রকাশিত 'গোড়তুর্নি' পত্রিকার সম্পাদক দীপক চৌধুরী ধৃত হলেন। আরো কত ঘটনা লেখা যায়।

রায়পুরের 'নবভারত' পত্রিকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রায়পুরের টি, ভি, টাওয়ার ভেঙে ছ জন মারা গেলেন অথচ বেতার বা সংবাদপত্রে সে খবর বের হল না। যেমনি বের হয়নি, তুর্কমান গেট, হরিয়ানার শিপলি থেকে এখানে উটোডালা ষ্টেশনে ছাত্রদের উপর গুলি চালনার খবর। রাজনৈতিক মতলবে ডি, এ, ভি, পি'কে হাতের পুতুল বানানো হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর ৪৮ ঘণ্টা ধরে দ্বিতীয় সংবাদপত্র অফিসের পাড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে জরুরী অবস্থায় সময় ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় গান্ধী ও কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রচার করেছিল বেতার, টি, ভি, ও অহুগ্রহ প্রার্থী কাগজগুলো। ফিল্ম ডিভিশন যে সব তথ্যচিত্র তখন দেখায় তাতে শুক্রাট ও বিহারের গণ আন্দোলনকে বিকৃত করে বরং কংগ্রেস পার্টি, বিশেষতঃ ক্রিমতী গান্ধী ও জরুরী অবস্থায় স্বফলের সামাজিক বাগাড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা দেখানো হত।

পঁচাত্তর সালের ১ সেপ্টেম্বর আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্রের অধি-কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ক্রিমতী গান্ধী বলেন, "সরকারী পদে থাকলে সরকারের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক। যদি কোন অফিসারের সরকারী নীতি অশুদ্ধ হয়, মানতে বিধাগ্রস্ত হন, তাহলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।"

এরপরই বিচারচরণ শুরু কর্তো-ভাবে কাজ শুরু করেন। পঁচাত্তরের ২৯ জুন বৈঠকে প্রেস ইনফরমেশন অফিসারদেরকে মন্ত্রী শুক্রা সমস্ত

দৈনিক ও সাপ্তাহিক একটা তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দেন। তিন ভাগে তালিকা হয় (১) বন্ধুত্বপূর্ণ কাগজ (২) নিরপেক্ষ (৩) বিরোধী মনোভাবাপন্ন। সব কিছুই ইন্দিরা ককাসের কর্ম সাপেক্ষে।

পরের দিনের বৈঠকে সেই সব ব্যক্তির নামের তালিকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়, যারা প্রি মেন্সরিশিপের বিরুদ্ধে গণদরখাস্ত পেশের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন।

সঞ্জয় গান্ধী মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আবার সংবাদপত্রের বৈরাদপি লক্ষ্য করেছেন। বসন্ত শার্ঠেও তাতে সার দিয়েছেন।

আবার সংবাদ সংস্থাগুলো ভাঙার কথা উঠেছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সাংবাদিক কর্মচারীদের স্বাধীনতা না থাকলেও প্রেস ব্যারণ-দের যে স্বাধীনতা থাকে, বৈরন্ত্রয়ে তা খর্বিত হয়। জরুরী অবস্থায় 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের' রামনাথ গোয়েকা, 'দি টেটম্যানের' ইরানী-দের যে অবস্থা হয়েছিল।

আনএমপ্লয়েড ফেডারেশনের দাবী

আনএমপ্লয়েড ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ সম্মতি এক সাংবাদিক সম্মে-লনে বলেছেন যে সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থান, কার্ডের মিনিরটি অহু-ধারী চাকরীর দাবিকে প্রাধান্যদান, বেকারভাতা পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে 'দুশো টাকা, বেকারদের ক্ষেত্রে চাকরীর জন্য কোন রকম পোষ্টাল অর্ডার না নেওয়া, শিকাস্তে সকল যুবকের চাকুরির নিশ্চিত ব্যবস্থা

করা, 'এমপ্লয়েড এক্সচেঞ্জ মারকং সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতি-ষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগ ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন করবেন। ফেডারেশন প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের কর্মসংস্থান অহুধারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি দিতে সরকারের কাছে অহুরোধ করেছেন। ফেডারেশনের অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক ক্রিমতী মুখার্জী বলেন যে ক্রমশই তাঁদের সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটছে।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীতে হামলা

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত ২৩ জুন একদল সমাজবিরোধী কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে দোকান বন্ধ করার জন্য জোরজুলুম করে। মধ্য কলকাতার প্রগতিশীল পুস্তকের দোকান ভাশা-নাল বুক এজেন্সীতে হামলা করে। কাঁচের শো-কেস ভাঙচুর করে ও

কর্মচারীদের নিগ্রহীত করার চেষ্টা করে। পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে খেঁজবের করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই হামলার প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এস এফ আই ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল বার করেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ১৫০ বর্ষ পূর্তি

স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু যেখানে পড়াশুনো করেছেন কলকাতার সেই খ্যাতনামা স্কটিশ চার্চ কলেজের আশ্রয় দেওয়া বহুরূপ হল। আগামী ১৩ জুলাই থেকে ১৯৮১ মাল পর্যন্ত বিতর্ক, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক অহুষ্ঠান, সংস্কৃতি ও খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে ১৫০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে বলে কলেজের অধ্যক্ষ ক্রিমতী-কুমার কিসকু এক সাংবাদিক সম্মে-

লনে জানান। এই উপলক্ষে বাংলার স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস প্রকাশ করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্কটিশ চার্চ কলেজের যে সব প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আছেন তাঁরা শুভেচ্ছা-বাণী পাঠাচ্ছেন। ১৩ জুলাই ঐ অহু-ষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ক্রিজিবননারায়ণ সিং। উপাচার্য ডঃ রমেন পোদ্দারও উপ-স্থিত থাকবেন।

হিন্দুস্থান পিলকিনটন কারখানা

সম্পর্কে সি বি আই তদন্তের দাবী

সি পি আই (এম) দলের সংসদ সদস্য ক্রিমতী মুখার্জী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রব মুখার্জীকে লিখিত এক পত্রে (নং:—এস এম / ৮৬৭ / এফ-৭/৮০) আসানসোলার হিন্দুস্থান পিলকিনটন গ্লাস ওয়াকর্সের আভ্য-ন্তরীণ পরিস্থিতি এবং এই কারখানার পরিচালনার দায়িত্ব থাপার গোষ্ঠীর হাতে দেবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে (সি বি আই) দিয়ে তদন্তের দাবী জানিয়েছেন।

এই কারখানার তিনটি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গত মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রব মুখার্জীর নিকট যে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে সি পি আই (এম) সংসদ সদস্য ক্রিমতী মুখার্জী বলেছেন যে, সরকারের পূর্ব অহু-মোদন ছাড়াই কাঁচ কারখানার

পরিচালনার দায়িত্ব থাপার গোষ্ঠীর হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এতে এক ই আর এ এবং এম আর টি পি আইনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, একচেটিয়া পুঁজিপতি থাপারকে কাঁচ কারখানা হস্তান্তরের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার যেন কোন মতেই মেনে না নেন। থাপার গোষ্ঠী এই লাভজনক সংস্থা-টিকে চক্রান্ত করে কমিশনে পরিণত করে এটিকে গ্রাস করতে চাইছে।

প্রমিকরা দীর্ঘদিন ধাবংই এই কারখানাটিকে জাতীয়করণের দাবী জানিয়ে আসছে। কাঁচ কারখানার প্রমিকরা বৈদেশিক শেয়ার নিজেরাই ক্রয় করে পরিচালনার অংশ নিতে চেয়ে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সমর-বাবু মেকখাও উল্লেখ করেছেন তাঁর পত্রে।

বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক সার্থকতা

অরিন্দম সেন

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর পূর্ণ হল। এই তিন বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে-কোন জাতির জীবনে তিনবছর সময় কণিকের বুড়ু মাত্র। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে জনকল্যাণ-মূলক কর্মসূচী সফল করতে কতখানি উদ্যোগ নিয়েছে সেটাই বিচার্য। বামফ্রন্ট কোন অলীক প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে নি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যায়, জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা উপলব্ধ করা যায়, কিন্তু এই সংবিধান ও আংশিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনজীবনের সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান করা যায় না, একথা বামফ্রন্ট গোপন করে নি।

এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ সাক্ষ্য অর্জিত হয়েছে একথা সকলেই অস্বীকার স্বীকার করেন। কতটা রাজস্বাধীনতা তৈরী হয়েছে, বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি করেছে, শিক্ষাবিস্তার ও পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি প্রশমিত হয়েছে, খাদ্য সামগ্রী ও চালের সরবরাহ কতটা বেড়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলনামূলক উন্নতি কতখানি, শিকার, চিকিৎসা ও শিল্পায়নে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে,—এই সব তথ্য সবাই জানেন। কিন্তু শুধু এই সকল সাক্ষ্যের মাপকাঠি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যাবলীর সঠিক ও অর্থবহ মূল্যায়ন করা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের পক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যাবলীর বখা-ষা মূল্যায়ন করা হবে এমন আশা করা অবাস্তব। কারণ তারা ক্ষমতা হাথের মোহে আচ্ছন্ন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসী আমলে যে

অবর্ণনীয় জীবন যন্ত্রণার দিন যাপন করতেন আজ তারা তা ভুলে গেছেন। প্রচুর ঘোষ থেকে সিদ্ধার্থ রায় পর্বত কংগ্রেসী অপশাসনের ইতিহাস তারা মনে করতে চান না। দুর্ভিক্ষ, দলবাজি, পুলিশের অপ্রতিরোধ্য প্রতাপ এবং শাসকদলের সীমাহীন অনাচারের অন্ধকার দিনগুলি তারা ভুলে যাবার চেষ্টা করলেও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা ভুলে যান নি। তাই আজ বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জাহেদের যে সমর্থন, সেটা হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। প্রাত্যহিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অব্যাহত ধারা থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম। এ সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আপন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি, আপন হাতের সৃষ্টি। শুধু ১৯৭৭ সালেই নয়, তারপর থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন, ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত উত্তরোত্তর বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি জনসমর্থন বেড়েছে। বতর্দিন এখানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ততদিনই বামফ্রন্ট সরকার বারে বারে জনগণের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতার ক্রিয়ার আসবেন, এবিষয়ে আজ বোধহয় কংগ্রেসী বন্ধুদের মনেও সন্দেহ নেই। তাই তারা অবৈধভাবে এ সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হোক বলে চেষ্টাচ্ছেন। বোধহয় আশা করছেন ১৯৭২ সালের মত জালজুরাচুরি করে তারা আবার ক্ষমতার ক্রিয়ার আসবেন।

আজ তা আর সম্ভব নয়। আর কোনদিনই বোধহয় তা সম্ভব হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসী অপশাসন, অনাচার ও দুর্নীতির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর তুলনা করে দেখেছেন, তাদের উপর তারা ভরসা রাখতে পারেন। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, বিদ্যুৎ সংকট এসব তাদের সৃষ্টি, কারাই বা তা সমাধানের ক্ষেত্রে অবিরাম কর্মসূচী সাধারণ-মানুষ তা প্রত্যক্ষ করছেন। অতীত রাজ্যের বহু মানুষ কংগ্রেসী শাসিত রাজ্যগুলির পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট

শাসিত পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তুলনা করে ক্রমশঃ বামফ্রন্টের মত বিকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

সুতরাং কংগ্রেস (ই) নেতা ও সমর্থকদের দুর্ভাবনা বেড়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শক। মহারাষ্ট্র, বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস (ই)-এর বিকল্প হিসেবে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস (ই) ক্রমাগত শিল্প হটছে। ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) বতর্টা জন সমর্থন পেয়েছিল, মে মাসের বিধানসভা নির্বাচনে তা হারিয়েছে। তামিলনাড়ু তাদের হাতছাড়া হয়েছে। পাঞ্জাব ও বিহার কিছুদিনের মধ্যে হাতছাড়া হবে এমন সম্ভাবনা আছে। মহারাষ্ট্র কতদিন কংগ্রেস শাসনে থাকবে অসম্ভব করা কঠিন। এমন কি আজ যদি গণআন্দোলন, গণ অভ্যুত্থানের কলে পুনরায় লোকসভা নির্বাচন করতে হয় এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির এক্যবদ্ধ জোট বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেস আদৌ ক্ষমতার কাছাকাছিও আসতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক সাক্ষ্য এইখানে। সারা দেশ জুড়ে এখন যে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটতে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তার অগ্রদূত।

এই সরকার হঠাৎ জন্মায় নি। ১৯৩৯ সালের পর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যে বামপন্থী এক্যের সূত্রপাত হয়েছিল, আজকের বামপন্থী ফ্রন্ট তারই সার্থক পরিণতি। এই বামপন্থী এক্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াস বানচাল করে দেবার ক্ষেত্রে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করেন, কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বাইরে চলে আসেন। তারপর থেকে বামপন্থী এক্য গঠনের প্রয়াস নিরন্তর চলেছে আর এই এক্য গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর অপচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৬৭ সালে যে ফ্রন্ট গঠিত হয় শাসকশ্রেণী তা ভেঙ্গে দেয় দলছুটের লাহাঘে। এই দলছুটের নেতা গান্ধীবাদী প্রচুর ঘোষ, এর উদ্যোগ

ছিলেন গান্ধীবাদী অধুনা জনতা নেতা প্রচুর সেন, প্রতাপ চন্দ্র, বিজয় সিং নাহার। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ১৯৬৯ সালে ফ্রন্টকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান যাতে কোন দলছুট গোষ্ঠী ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিতে না পারে। কিন্তু শাসকশ্রেণী নীরব ছিল না। তারা গোপন চক্রান্ত একদিনের ভিত্তিতে বন্ধ করে নি। প্রথমে সি পি আই কংগ্রেসী ফাঁদে আটকা পড়ে। পরে কয়েকটি বামপন্থী দলও এই ফ্রন্টকে তরকা করতে অস্বীকার করে। ফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। সরকারও থাকে নি। যদিও জনগণ এই ফ্রন্টকে এমন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছিল যে বামপন্থী দলগুলি এক্যবদ্ধ থাকলে এই সরকারকে বরখাস্ত করা সহজ ছিল না। এর পর শাসকশ্রেণী বাম এক্য বিনাশের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তৎপরিত নকশালপন্থীদের কাছে লাগায়। নকশালপন্থীদের এক বিরাট অংশ কাশীপুর বরাহনগর গণহত্যার পর কংগ্রেসের নিকট আত্মসমর্পণ করে। চটকদার বামপন্থী বুলি আউড়ে এরা এবং এস ইউ সি ইত্যাদি আরো দুচারটি বাম ধর্মপ্রাণী দল শাসকশ্রেণীর খাণ্ডে বামপন্থী এক্যের বিরুদ্ধে এখনো সক্রিয়। কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে যে এক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন আর তা সহজে ভাঙা যায় না। দীর্ঘ সংগ্রামের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এই এক্য গড়ে উঠেছে। আবার এই এক্য ভাঙার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর প্রয়াসও থাকে নি। এখন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার ক্ষেত্রে চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তেরও কিছু ছদ্ম বাম হিসাবাদার রয়েছে। কিন্তু জনসমক্ষে এদের মর্দা বা স্বীকৃতি নেই। থাকতেও পারেনা। চীনের চেয়ারম্যান যে অস্ত্র দেশের কোন পার্টির চেয়ারম্যান হতে পারেন না এটা বুঝতে তাদের দশ বছর সময় এবং চৌ এন লাই-এর মত শিককের দরকার হয়েছিল। অবশ্য এদের কিছু সং বিপ্লবী অংশ শাসকশ্রেণীর দালালী পরিত্যাগ করে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তবে বামপন্থীদের ফ্রন্ট গড়ে ওঠার মত এটাও সময় সাপেক্ষ।

আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে তারা একদিকে সারা

ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলার অগ্রদূত একদিকে এই ফ্রন্ট শাসক শক্তির সামনে এক মাঝে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। জনতা, লোকদল এবং নানা পাঁচশিলেী দল এখন আঁচ ইন্দিরা কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত বিকল্প নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ সারা ভারতের সব ফ্রন্ট রাজ্যের জনগণকে এই শক্তির পক্ষে ক্রমাগত টেনে আনছে। ইতিমধ্যেই শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন দল ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে ঐ উদীয়মান বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ইন্দিরা কংগ্রেস স্থানীয় দল ডি এম কে-র সঙ্গে জোট বেঁধেও বরাহনগর হয়েছে, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও বিহারে অল্পের জন্তে রকম পেয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে এই শক্তির প্রভাব ইন্দিরা কংগ্রেসকে মূল্যহীন করে তুলেছে। আসাম ও ত্রিপুরায় ইন্দিরা কংগ্রেসের অসহিষ্ণু ও ক্ষমতালোভী কিছু নেতা ও কর্মী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি (আমাদের) এবং তার পতন ঘটানোর (ত্রিপুরায়) ক্ষেত্রে গোলমাল শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গেও এরা বামফ্রন্ট সরকারের পতন চায়। তাই ক্রমাগত ভ্রমোত্তিযোগ আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবার ধ্বংস তুলে এরা বাজিমাৎ করতে চায়। কেন্দ্রীয় ইন্দিরা কংগ্রেস এ সবই ভালোভাবে জ্ঞাত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আজ ১৯৭২ সালের মত একা নয়। তখন বামপন্থী শক্তিগুলিও বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন তারা এক্যবদ্ধ। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার, কেবলে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার। আজ তামিলনাড়ুতেও গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী জোটের সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক ও নৈতিক নেতৃত্ব বহু ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই) সরকারও নতমস্তকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও পেছনে ছুরি শানাতে তারা কোনদিন কাস্ত হয় নি। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস ছিল এক্যবদ্ধ, বামপন্থীরা বিচ্ছিন্ন দুর্বল। এখন ইন্দিরা কংগ্রেস বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন, বামপন্থী শক্তি সংগঠিত এবং রাজ্য সরকার তাদের হাতে। আজ সারা ভারতেও ইন্দিরা কংগ্রেস দুর্বল। তার প্রশাসন, পুলিশ, রিজার্ভ বাহিনী সবাই আত্মহীনতার কুপছে। সুতরাং আজ যদি ইন্দিরা সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর অত্যাচার হস্তক্ষেপ করে তাহলে সারা ভারতে জনগণের অভ্যুত্থান ঘটবে। এই অভ্যুত্থান যদি গৃহযুদ্ধে পরিণত শেষাংশ চন পৃষ্ঠায়

সমুদ্রের সজীবতা

সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সারের জন্য

বিপুলার্শারী ও গ্রিকালচরাল ফার্ম (প্রা) লিঃ

১১, কৈলাস চন্দ্র সিংহলেন, পোঃ বালী-২, গুডা

ফোন: ৬৪-২০৯৫ • ৬৪-২৪৪৫

ফার্ম: বৈদ্যবাটী, গুলী ৬২২৫৪০

দিব্লী বোড ও তারকেশ্বর বোডের সংযোগস্থল



ফোন: ৬২-১৩৭৭

বামফ্রন্ট সরকার কি করেছে আর কি করতে পারেনি এবং কেন

বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তিন বছর আয়ু পেলে। আরও দু বছর স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা; কিন্তু তা পারবে কিনা তা নিয়ে অনেক রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনা চলছে। সেই প্রশ্নে না গিয়েও সাধারণভাবে প্রশ্ন ওঠে এই তিন বছর বামফ্রন্ট সরকার কি করেছে বা করা উচিত ছিল, কি পারেনি এবং কেন।

অবশিষ্ট এ কথা জুললে চলবে না যে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বত প্রমাণ সমস্তাঙ্গলোর সমাধান তিন বছরেই করা যাবে বা হ'য়ে যাবে, এটা ভাষা বাতুলতা। কিন্তু সেই সংগে আলোচনা করার সময় এসেছে যে এই সরকার আদৌ তা করতে পারে কিনা। বা তা করার প্রচেষ্টা ও মনোবল দেখিয়েছে কিনা।

এই সরকারকে ধন্যবাদ দিই এই অন্তে যে, এ সরকার বা তাঁর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বা অন্ত কোনও মন্ত্রী পাঁচ বছরেও সব সমস্তার সমাধান করে ফেলবে বলে লোককে ভুল বোঝাবার আদৌ চেষ্টা করেননি। বরং, তাঁরা এতবার বলেছেন বা এখনও বলছেন যে তাঁদের সীমিত ক্ষমতার করার মত কাজ খুবই কম আছে, যে লোকের সন্দেহ আগতে পারে যে এই সীমিত ক্ষমতার দোহাই দিয়ে তাঁরা তাঁদের অকর্মণ্যতা ঢাকতে চাইছেন না তো?

সে ঘাই হোক, এ কথা বললে হয়ত ভুল হ'বে না যে প্রমিত মজুরের বেতন বাড়ানোতে সাহায্য করা, কিছু বেকারকে ভাতা দেয়া, কল-কাতা মহলের উন্নয়নকে সামান্য প্ররোচিত করা, পৌরসভার কাজের কিছু উন্নতি সাধন ও রাস্তা ঘাটের উন্নতি ছাড়া মহাশয়লোর লোকেরা এই সরকার থেকে বিশেষ কিছু পায় নি। ভরাবহ বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে ও চলবে বলে মনে হয়; অবস্থা দেখে মনে হয় মুষ্টিমেয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার ও কারনিকের হাতে সরকারকে "ভুতের কিল" খেয়ে হজর করে যেতে হবে। এর কলশ্রুতি হিসেবে নতুন শিল্পের পত্তন ব্যত হ'বে সন্দেহ নেই। তবে গোড়ার গলধ থেকে যাচ্ছে। যারা এখানে শিল্পোদ্যোগে অগ্রণী হ'তে পারে তারা সর্বাঙ্গী প্রায় একচেটিয়া গোষ্ঠী এবং এই সরকার। রাজনৈতিক কারণেই, ইচ্ছা থাকলেও এদের কোনও সাহায্য

বা সুবিধা করে দিতে পারবে না। যেমন পারেনি আগের সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার।

কিন্তু যেখানে এই সরকার কিছু কাজ দেখাতে পেরেছে ও তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠা-বার বা প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করেছে সেটা হ'ল গ্রাম বাংলা। আর তাতে যে কিছু সাকল্য ইতিমধ্যেই এসেছে, তা বিরোধী হলগুলির, বিশেষ করে ইন্দিরা কংগ্রেসের "গেল, গেল" রবই প্রমাণ করে।

তবু সাধারণভাবে এটাই সত্য যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের মানুষের সুবিধা করতে অতীতের কংগ্রেস সরকার যা করতে চেয়েছিল বলে ঘোষণা করেছিল অথচ রাজনৈতিক কারণে করেনি, তার বেশী কিছু করার প্রচেষ্টা করেনি। তার কারণ-টাও খুব সোজা। এই সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই ত আবার সি পি এম বা বাম-ফ্রন্ট নির্বাচন লড়ে সরকার গঠনের আশা করে।

যে ছু-তিনটে বাপার নিয়ে বিরোধীদের এত মোরগোল ও বাম-ফ্রন্টের আশা তা হল: সিলিং এর বাড়তি জমি অধিগ্রহণ ও বন্টন; বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা ও তাঁদের নথিভুক্ত করা যাতে তারা আইনামুগ্ন সব সুযোগ সুবিধা পায়; ও ক্ষেত মজুরের ন্যূনতম মজুরি পাবার ব্যবস্থা করা। আগেই বলে নেয়া ভাল এর কোনও বিষয়েই বামফ্রন্ট সরকার নতুন আইন করে নি। শুধু তারা নিজের মত করে কংগ্রেসী আইন বলবৎ করার চেষ্টা শুরু করেছে। সংখ্যার দিক থেকে যে খুব একগুঁতে পেরেছে তা নয় তবে এই সব কাজ যতটুকু করতে পেরেছে এবং গ্রামের গরীব বা প্রান্তিক চাষী বা বর্গাদারকে যতটুকু ব্যাকের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দিতে পেরেছে তাতেই গ্রামাফলে এক নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে; অপরদিকে "গেল গেল" রব মোচ্য হ'চ্ছে। কারণ সব কটি কাজই গ্রাম, বাংলার চিরচরিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য বহলে দেবার সূচনা করেছে। আর গ্রামের গরীব লোক যদি একাবদ্ধ হয়ে জোতদার দেন্দুদারের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে

ত' এক নতুন যুগের সূচনা!

এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পঞ্চায়ত আন্দোলন। সরকারের উদ্দেশ্য পঞ্চায়তের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভরশীল করে তোলা। আর তা যদি ঘটানো যায়, অংশতও, তাহলে আর বাম-ফ্রন্টকে করার কে? মনে হয় এ-ই সরকারের মানসিকতা। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানো থেকেও বড় প্রশ্ন এর সংগে জড়িত। জমি সংস্কার আইন-প্রয়োগে যারা উপকৃত হবে, সেই গরীব চাষী, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর, যাদের সম্মিলিত ভোট লক্ষ্যে অন্ততের থেকে অনেক বেশী, এদের যদি পঞ্চায়ত কাঠামোর আওতায় এনে ফেলা যায়, তবে গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের আয়ুর্ন পরিবর্তনের সূচনা করা সম্ভব।

কিন্তু এই করার প্রচেষ্টার দুটো দিক আছে। প্রথমত, শাসনময়; দ্বিতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। সরকার বহলে শাসনময় বহলায় না, তার গতি ও প্রকৃতিও না। শাসনময় শোষণবাদীই রয়ে গেছে। তাই তাকে দিয়ে জমি সংস্কারের মত কাজ করানো খুবই কঠিন। কিছুদূর করানো চলে। মৌলিক কিছু করানো সম্ভব নয়।

তাই রাজনৈতিক সংগঠনের জমিকার কথা বড় হয়ে ওঠে। সেখানেও সরকার আপাতত নানা অসুবিধার পড়েছে। কারণ, সংগঠন কাদের নিয়ে? গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের মেরুদণ্ড ও হাত পা সেই সব পরিবার থেকে এসেছে যাদের স্বার্থহানি জমিসংস্কারের মূল লক্ষ্য। তাই দেখা গেছে কি নিয়তম মজুরির প্রশ্নে, কি বর্গাদার নথিভুক্ত করার প্রশ্নে, কোনও না কোনও এক দময় সংগঠন ও জোতদার বা জুখামীর স্বার্থ একা কার হয়ে দাঁড়ায়। দেখে মনে হয় না সি পি এম বা বাম শ্রমিক অল কোনও হল এই অভ্যস্ত মৌলিক সমস্তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে! তাই জমি সংস্কার যতদূর অগ্রসর বা জোরদার হতে পারতো ততদূর হয় নি। কিন্তু এই অসুবিধা কাটিয়ে ওঠাও কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব। তাই এদিকে বামফ্রন্ট সরকারের সাকল্য সীমিতই থেকে যাবে। তবে সাধারণ গরীব লোকের মানসিকতা পাটাতনে ও পাটাতনে। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য বিরাট। এ সরকারের সার্থকতা বা ব্যর্থতাও এই দর্পণেই প্রতিফলিত হবে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বাংলা ছবির উন্নয়ন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আয়ু তিন বছর পূর্ণ হল, কিন্তু বাংলা ছবির উন্নয়নে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে তাঁদের সাকল্য আজও দেখা গেল না। স্বীকার করি চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁরা কিছু উৎসাহ সঞ্চার করেছেন, চলচ্চিত্রকারদের কিছু আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। কিন্তু এই আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে বেশ বৈষম্য ও নজর এড়িয়ে যায় না। যারা নতুন কিছু করতে চান, নতুন চলচ্চিত্র তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যারা উৎসাহী, সেইসব তরুণ পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই বেশ উপেক্ষিত। পরন্তু দেখা গেছে, কিছু প্রবীণ ক্ষমতা-নিঃশেষিত বহুদ্যুতপ্রাপ্ত পরিচালক-তরুণের জোরে সরকারী দাপ্তরিক আদায় করেছেন। আবার কিছু তথাকথিত বামপন্থী প্রগতিশীল চিত্রনির্মাতা, যারা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অথচ সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, সরকারী আত্মকল্যাণ লাভ করেছেন হলবাজি করে। অথচ বেশ কিছু নবীন প্রতিভাভিষম্পন্ন পরিচালক সুযোগের অভাবে মার খাচ্ছেন। সরকার নিজের উদ্যোগেও চিত্র প্রযোজনা করছেন বটে তবে সেখানেও সত্যপ্রিয় রায়, যুগল সেন প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত চিত্র পরিচালকরাই অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। যেখানে তাঁদের ছবি প্রযোজনা করার লোকের অভাব নেই, সেখানে সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ তেজা মাথায় তেল দেওয়া ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। সম্ভাবনাপূর্ণ যে সব তরুণ চলচ্চিত্রকার এই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির বেনিয়ারদের কাছে অজ্ঞান, তাঁদের সাহায্যেই সরকারের এগিয়ে আনা উচিত বলেই তো মনে হয়। যোগ্য পরিচালক যদি নির্ভর সংগে আবদ্ধনধর্মী ছবি করেন, তবে বাংলা ছবির ভবিষ্যত কখনই অন্ধকার হতে পারে না।

ছবি তৈরী হয়, কিন্তু মুক্তির সুযোগ ঘটে না—বিলম্ব চেনের অভাব। এ অভিযোগ তো বহুদিনের। বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য ও সাংস্কৃতিক দপ্তর আজও এর কোন সঠিক সমাধান করতে পারেননি না। তাঁরা অনেক অ্যাডভাইসারি কমিটির মিটিং বসালেন, অনেক আলোচনাও হল, বহু প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল—কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। আজও সেসব অসুবিধারী ক্রমাগত

ছবি মুক্তির কোন বার্ষিকী ব্যবস্থা করা গেল না। ছবিঘর বৃদ্ধির অন্ত সরকার উদ্যোগীতাই গ্রহণ করে উৎসাহ দিয়েছেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তার ফল তো কিছু দেখি না। কোথায় যেন একটা বাধা—কর-ম্যালিটির কিছু মারপ্যাচ থেকে গেছে—নইলে আশাহরুপ প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ হয় না কেন? সরকার কিছু মিনেমা হল অধিগ্রহণ করেছেন বটে এবং যদিও তা ন্যায়মাত্র, তথাপি সেখানে বাংলা ছবি প্রদর্শনে কোন উৎসাহ দেখা যায় না—এটাও কম বিস্ময়কর নয়।

রাজ্য সরকার রঙীন ছবির ওপর সারচার্জ আরোপ করে বাংলা ছবির কি উপকার করলেন বোঝা দুঃস্বপ্ন। একে বাংলা ছবির বাজার সীমিত, তার ওপর করের বোঝা যদি এভাবে চেপে বসে, তবে তার ক্রমবিকাশ কিস্তাবে সম্ভব বুলি না। দর্শক আজ রঙীন ছবি দেখতে চায়, নানা কালো তাঁদের এখন না-পদম্—এ অবস্থায় বাংলা ছবি যদি রঙীন না হয়, তবে লেই সীমিত বাজারেও তা অচল হয়ে যাবে—এটা স্বাভাবিক। আজও সরকারী প্রচেষ্টার কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরির কাজ সম্পূর্ণ হল না।

প্রমোদকর বাবদ রাজ্য সরকার এই চলচ্চিত্র শিল্প থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে থাকেন। সেই আদায়ীকৃত করের একটা অংশ যদি বাংলা ছবির প্রযোজকদের নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী কিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে চিত্র প্রযোজনায় কিছুটা উৎসাহের সঞ্চার হতে পারে। এ সম্পর্কে আলোচনাও কম হয়নি—কিন্তু সে শুধু আলোচনাই, কাজ কিছু হয় নি। স্টুডিও ও সিনেমা কর্মীদের প্রতিভাউৎসাহ, বোনাস ও বেতনহার নির্ধারণে আজও কোন সঠিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

চলচ্চিত্র-শিল্পী কলা-রুশলীদেয় মধ্যে যারা দুঃস্থ, তাঁদের ও অনহার পরিবারবর্গকে রাজ্য সরকার সাময়িকভাবে কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এটা প্রশংসনীয় কাজ নিঃসন্দেহে। কিন্তু যারা কর্মকর্ম হয়েও বেকার জীবন যাপন করছেন, তাঁদেরকে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। ডোল দিয়ে মূল সমস্তার সমাধান হয় না—তাতে রুশলী কর্মীরা কর্মহীন হয়ে ক্রমশঃ কর্ম-শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠার

দক্ষিণ কোরিয়া কি দ্বিতীয় ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে ?

বাদলকৃষ্ণ সেন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশ সালের শুরুতে পূর্ব এশিয়ার ছোট উপদ্বীপ দেশ কোরিয়াকে দখল করার অভি-প্রায়ে সেই দেশটি আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের চক্রান্ত বিফল হয়। শেষ পর্যন্ত ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর কোরিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার সিও ম্যান রীর নেতৃত্বে পুতুল সরকার গঠিত হয় এবং উদ্-ঘাশে কিম হির সেইমের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার শাসন ভার নেন।

এর পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই ছোট দেশটিকে চক্রান্তের বাঁটিতে পরিণত করে রেখেছে। দক্ষিণ কোরিয়াতে তাদের বাঁটি স্থাপন করে উত্তর কোরিয়া এমন কি জন-গণতান্ত্রিক চীনকেও তাদের চক্রান্তের

পরিসীমায় নিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কোরিয়ার যুদ্ধ বিস্তারিত প্রধান শর্ত ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার পর দুই কোরিয়া একত্রীকরণের ব্যবস্থা করা এবং মার্কিন দৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরে যাওয়া। এই চুক্তির কালী তফাতে না তফাতেই দক্ষিণ কোরিয়া সরকার মার্কিন প্ররোচনার বার বার চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করতে লাগল। এমন কি জাতি সংসদের নিষেধ অমান্য করে দক্ষিণ কোরিয়ার মার্কিন দৈন্য ও যুদ্ধ সত্তার বাড়িয়েই চলল। মার্কিন নৌবহর কোরিয়ার সমুদ্র উপকূলে ঢুকে প্ররোচনা দিতে আরম্ভ করল। মোট কথা হল ডলার সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণ কোরিয়াকে তার উপনিবেশে পরিণত করল। সন্ধির শর্তানুসারে দৈন্য অপসারণ ও দুই কোরিয়ার একত্রীকরণের জাতি সংসদের প্রস্তাবের উপরও ভেটো

দিয়ে চুক্তিকে লঙ্ঘন করে চলল। দিন দিন এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে মার্কিন সামরিক বাঁটি বৃদ্ধি করে যেতে লাগল।

সিও ম্যান রীর শাসনকালে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক আইন প্রয়োগ করেই দেশ শাসন করতে হয়েছে। মানুষের গণতান্ত্রিক কোন অধিকার ছিল না। ফ্যাসিস্ট কান-দার ও সামরিক দাপটেনমন্ত দেশকে শাসন করতে গিয়ে জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই বারাদ থেকে ধারাপের-দিকে চলল। সমস্ত দেশ মার্কিন ডলারের উপর নির্ভর-শীল হয়ে পড়ল। এই সব কারণে যে বিকোভ জনগণের মনে সঞ্চারিত হতে লাগল তাকে বিলম্বিত করার জন্য এক সামরিক অভ্যুত্থান মাধ্যমে দেশের এককালের মার্কিন হোসার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুং চ্যাংকে বিতাড়িত করে নতুন মার্কিন হোসার পার্ক হী শাসনভার গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদীরা পুরনো বন্ধুর প্রয়োজন শেষ হলে নতুনকে তার জায়গার বসিয়ে স্বার্থ রক্ষা করে।

প্রেসিডেন্ট হীর রাজত্বকালে মার্কিন ডলারের দৌলতে দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু কিছু নতুন কলকার-খানা ও আধুনিক চাষের খামার স্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা কৃত্রিম পরিবর্তন সাধিত হল। এই সামরিক জোশদ বেধে অনেক অনেক গালগল্পও করেছে। পরবর্তী-কালে এই জৌলমের চাকচিক্য যখন কমে যেতে আরম্ভ করল তখন সঙ্কলের যৌহন্ত হল। ডলার সাম্রাজ্য-বাদ জৌলমের ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত দক্ষিণ কোরিয়াকে তাদের শোষণের কীড়াভূমিতে পরিণত করে ফেলল। সেইখানকার সম্ভা প্রমশক্তিকে তাদের মুনাকার পাহাড়ে পরিণত করল।

এই প্রসঙ্গে উত্তর কোরিয়ার অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চিত্র কিছুটা তুলে ধরা দরকার। সেখানকার সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দেশের জনগণের স্বাধীন ও সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বাক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বোপরি মানবিক অধিকার ও কাজ করার অধিকার ভোগ করছে উত্তর কোরিয়ার জনসাধারণ। দুই কোরিয়া একত্রীকরণ হোক এবং সম-বেত চেটার দুই ভাগ সমুদ্রশালী হয়ে উঠুক এইটাই হল উত্তর

কোরিয়া সরকার ও জনগণের ইচ্ছা। বিশেষ শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিদায় নিক এবং জনসাধারণই তাদের ভাগা নিয়ন্ত্রণ করুক এইটাই তাদের ইচ্ছা। সেইজন্য উত্তর কোরিয়া সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের কাছে চার দফা কর্মসূচী দিয়েছে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭১ সনে। প্রথম হল উত্তর পক্ষের ৪টা জুলাইয়ের যুক্ত বিবৃতির প্রতি প্রকাশ প্রত্যয় জ্ঞাপন করা। (২) উত্তর পক্ষ প্রকাশ্যে একজন অপরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও বিবৃতি প্রকাশ করবে না। (৩) পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাম-রিক কার্যকলাপ বন্ধ করবে (৪) পিরঙ ইয়াঙ বা সিউলে গমগ্রাস্তির ফংগেল-আহ্বান করে সেইখানে সমস্ত হল ও মতের লোককে আহ্বান করা এবং দেশের দুই ভাগের কিতাবে একত্রীকরণ সম্ভব আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই কর্মসূচী খুব পরিষ্কার ও বন্ধুত্বপূর্ণ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে বেবে না। তারা চাইছে এই কর্মসূচীর মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে।

উত্তর কোরিয়ার এই কর্মসূচী দক্ষিণ কোরিয়ার জনসাধারণ আন্ত-রিক ভাবে নিয়েছে। কিন্তু তা হতে দেবে না সেই দেশের শাসন কর্তা পার্ক হী চক্র ও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা। একত্রীকরণ আন্দোলন যতই দোঁচোর হয়ে উঠতে লাগল ততই দমন নীতি হিংস্র ফ্যাসিষ্ট কান্দার চলতে লাগল। গণতন্ত্রের নামাবলী পরে নির্বাচনের প্রহসন করে প্রেসিডেন্ট হী তার নিজের ক্ষমতা আইন সিদ্ধ করে সমগ্র দেশে কড়া সামরিক আইন জারি করে রাখল। এমন প্রহসনপূর্ণ নির্বাচনেও বিরোধী নেতা কিঙ ইয়ঙের নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি ও অন্যান্য বিরোধী হল কিছু বেশী সংখ্যক পার্লামেন্টের আসন দখল করল। সেটাও হী সরকার সহ করতে প্রস্তুত নয়। সংসদে বিরোধীদের কোন সমালোচনাও সহ করতে নাগাল। বিরোধী নেতা কিম সামকে সংসদ থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। এমন কি বিরোধী দলের সদস্য ও গণ-আন্দোলনের কর্মীদের ভেলে পুরে রাখা হল। এইভাবে সেখানে ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কার্যে করা হল। ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে দেশের গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য “গ্যারিসন কমান্ড ল” ঘোষণা করে বিমান, নৌ ও পদাতিক বাহিনীকে এই আন্দোলন দমন করার জন্য নিযুক্ত করা হল। পুসান শহরে হী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র, যুবক এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সাত ঘণ্টাব্যাপী বিকোভ ও অবরোধে এক ইতিহাস সৃষ্টি

করল। এর চেউ দক্ষিণ কোরিয়ার নানান শহরে ছড়িয়ে পড়ল। এদের প্রধান দাবী ছিল “চালু ইউনিয়ন সংবিধান বাতিল কর”, “শৈয়াচানী ফ্যাসিষ্ট সরকার পদত্যাগ কর”।

এই গণ বিকোভ শাসক দলের মধ্যে অস্ত্র-ধ্বংস সৃষ্টি করল। আন্তে আন্তে তা প্রকট হয়ে দেখা দিল। অন্তহিকে প্রেসিডেন্ট হীর মুকবী ও সাম্রাজ্যবাদীরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল এই সেবককে দিয়ে আর কাজ হবে না। এই গণ-বিকোভকে বিভ্রান্ত করতে হলে শাসকের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাদের বশবৎ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে পূর্বতন সেবককে সরিয়ে নতুন সেবককে শাসন ক্ষমতার নিয়ে আসে। যেমন বাট দশকে তৎ-কালীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্র-পতি দিন দিয়েমকে সরিয়ে দিয়েছিল অস্ত্র তাঁবেদারের পথ পরিষ্কার করার জন্য। সেইভাবে ১৯৭১ সনের ২৬শে অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে হী তার বালা বন্ধু ও সহপাঠী কোরিয়ার সেক্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির প্রধান কিম জায়ে কিউ কর্তৃক তিনি নিহত হন। প্রেসিডেন্ট হীর ফ্যাসিষ্ট সঙ্গীদের যড়যন্ত্র যে কত গভীর তা মার্শাল কমান্ডের মুখপাত্র চোন দন হোয়ান ফাঁস করে দেন। কোরিয়ার সেক্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি পাঁচ মাস আগে প্রেসিডেন্ট হীকে হত্যা করার যড়যন্ত্র করেছিল। এই খবর হীর প্রধান সহকারী কাছে ওয়ানও জানতেন। হীর অপসারণের যে চক্রান্ত চলছে তা মার্কিন সর-কারও জানতেন। হীর মৃত্যু সংবাদে কাটার সরকার মোটে আশ্চর্য হয় নি বরং এই হত্যাকাণ্ডের যড়যন্ত্রকে চাপা দেবার জন্য উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী নৌ ও বিমান বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়ে সমস্ত উপলগণে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে চালা করে তুলল।

প্রেসিডেন্ট হীর হত্যাকাণ্ডের প্রায় চার মাস আগে অর্থাৎ ২৯শে জুন থেকে পরলা জুলাই পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ কোরিয়া সফরে গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসেন। তিনি সেখানে গিয়ে প্রথমে ছুটে যান দুই কোরিয়ার অস্থায়ী সীমানার নিজে চোখে সামরিক প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে। তাঁর ভাষণে ও বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার পিরঙ ইয়াঙ সরকারের বিরুদ্ধে উদ্বেজনা সৃষ্টি করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই শোষণ ১১শ পৃষ্ঠায়

বামফ্রন্টের সার্থকতা

এম পৃষ্ঠার পর

হয় তাহলে আর যেই হোক ইন্দিরা কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল করে থাকে সম্ভব হবে না।

মাত্র কয়েক বছর আগেও মানুষ যা চিন্তা করতেন ও পারতেন না পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার এসে সেই দর্পভারতীর বিকল্পকে সাম্রাজ্যের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করেছেন। এই বিকল্প কোম পথে প্রতিষ্ঠিত হবে, শান্তিপূর্ণ না অশান্তি-পূর্ণ গৃহযুদ্ধের পথে তা বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কাজের দ্বারা নির্ধারিত হবে। যদি হারা শান্তিপূর্ণ পথে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে আপন বিকল্প কর্মসূচীর জোরে জনসমর্থনকে নিজে-দের পক্ষে সমবেত করার স্বযোগ না দেয় তাহলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার ভেত্রে ইন্দিরা কংগ্রেসী ও তার সমগোত্রীয় শাসক গোষ্ঠীগুলিই দারী থাকবে।

পাশ্চাত্যবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সার্থকতা ও সাক্ষ্য এখানেই নিহিত। তিন বছরে কতটা কর্মসূচী পালিত হয়েছে অবশ্যই তার হিসাব নিতে হবে। কত লক্ষ বর্গাদার চাষের স্বাধীন অধিকারী হলেন, কত লক্ষ বেকার ভাতা পেলেন কত ছাত্রছাত্রী বিনাব্যায়ে বই ও লেখাপড়া শিখতে পাচ্ছে, ছুপুরে বিনামূল্যে খাবার পাচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাও কিভাবে নির্ভয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কুংদা রটিয়ে সভাসমিতি করছে,

এমন কি বাল-ও কোঅপারেটিভ এর জাঁদরেল কংগ্রেসী বহুমায়েসদের চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সবেও অবিচলিত বামফ্রন্ট সরকার কিতাবে দৃঢ়ভাবে আইন মার্কিক ব্যবস্থা নিচ্ছে, সে সবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই।

কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের সব-চাইতে বড় কৃতিত্ব তারা সারা দেশের মানুষের মনে আশার আলো জালাতে পেরেছেন। সারা দেশে সংগ্রামী মানুষের একাত্ম জোট বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে উঠছে। এই সবকিছুর অগ্রদূত পশ্চিমবঙ্গের বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত বামফ্রন্ট ও তার পরিচালিত রাজ্য সরকার। এই সদ্যোজাত শক্তির কাছে শুধু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলেই নয়, তামিলনাড়ু পাঞ্জাব ও বিহারের জন-গণ নতুন প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। বাকী জনগণও আসবেন। এই সন্ধিক্ষণে বামফ্রন্টের ও তার পরিচালিত সরকারের দায়িত্বও অনেক বেড়েছে। শুধু প্রশস্তির বাণী উচ্চারণ করাই আজ যথেষ্ট নয়। একদা যুক্তফ্রন্টের উপর আঘাত করে ইন্দিরা কংগ্রেস যেমন ১৯৭৭ সালের পতন ডেকে এনেছিল আজ আবার সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাম-ফ্রন্ট সরকারের উপর আঘাত ইন্দিরা কংগ্রেসের পতনকেই ঘরাবিত করবে। যে পথেই বাক ইন্দিরা কংগ্রেসের পতন ঘটবেই। পশ্চিম-বঙ্গের বামফ্রন্ট এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পেরেছে। এখানেই বাম-ফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক সাক্ষ্য।

গ্রন্থ পরিচয়

রাজনীতি-সচেতন কবিতা

মিহির আচার্য

মাঝখানে কঠিন নিষেধ ॥

অমৃত মিত্র। কমল বল।

জ্ঞানের আলো প্রকাশনী, ১৫ কালীবাড়ি লেন, কলকাতা-৩২। দাম চার টাকা।

সত্তর দশকের রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়ার স্মৃতি যে এখনো তরুণরনে বিভ্রাটময় মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাতে প্রমাণ হয় এই আন্দোলনের শক্তি কত গভীরে নিহিত। একখানি ছোট কাব্যগ্রন্থ 'মাঝখানে কঠিন নিষেধ' একই মতো হৃদয় কবি অমৃত মিত্র ও কমল বল সচেতন পাঠক দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। কবিতা যে দারবর কবিতা সে-সম্পর্কে সচেতন। হয়তো কবিতার প্রকাশভঙ্গি কিংবা ছন্দে ক্রটি থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিক উচ্চারণে এদের স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে এই আন্দোলনের সঙ্গে একদা-যুক্ত কবিতা 'মধন ক্রান্ত' এবং ভবিষ্যৎ হয়ে পড়েছেন তখন আমার বিশ্বাস সাম্প্রতিক তরুণরাই এই স্রোতকে সঠিকভাবে লক্ষ্যে বহন করে নিয়ে যেতে পারবেন।

অমৃত মিত্র 'খন্ড-কবিতার' বলেন:

আকাশ ছাড়া পাখির কোম মুক্তি নেই
মাটি ছাড়া বীজের...
শ্রেয় ছাড়া মানুষের পুনর্জন্ম নেই
এবং কবিতার
আর স্বাধীনতা ছাড়া
মুক্তি কিংবা পুনর্জন্ম কোনটাই নেই।

কবি মধ্যবিত্তমানস সম্পর্কে সচেতন:
বাইরে বড় বেশি ওলোট পালোট
হাওয়া

যে করেই হোক
শ্বির থাকতে হবে; যে কোন
উপায়ে

স্বপ্ন থাকা চাই।
'জনশূন্য ময়দানে থাকে খুন করা
হয়েছিল' কবিতার সর্বোচ্চ দস্তুর
স্মৃতিকে মনে রেখে কবি লিখতে
পারেন:

কাকপক্ষীরও টের পাবার কথা
নয়—

তবুও মানুষ টের পেলে
তাক্সি জানলে
বুকের খাচার তারা একই জোড়,
একই স্বপ্ন, ঘণা

একই স্বপ্না এবং ভালোবাসা
গোপনে লালন করছে বহুদিন।

এই ধরনের একশটি কবিতা পবিত্র
আবেগ দিয়ে লিখেছেন অমৃত মিত্র।
উদ্ধৃতি না-বাড়িয়েও বলা যায় প্রতিটি
কবিতাই সম্মান মনোযোগের দাবি
রাখে। তার বিষয় কানপুরের
খবর মিল কিংবা মরিচকাপির
হত্যা হোক।

সদী কবি কমল বলও অমৃত
মিত্রের সঙ্গে উপযুক্ত-সঙ্গত করেছেন
বলা বাহুল্য। যদিও তাঁর কবিতা
লংঘ্য হাত ছাড়া।

'ভূমিকা' কবিতাটির প্রথম লক্ষ্য করা
যায়:

তাঁর জন্তে আলোর হাট ফুলের
মেলা
মঞ্চ
এবং আরও কতকী
তোমার জন্তে গড়ের মাঠ,
ছাউনিবিহীন ঘাসের
গালচে
জিপল জোটেনি।
তিনি এখন ভাবন দেবেন, শান্তি
দেবেন

জড়িয়ে যাবে পা
চুপটি করে দেখে যাওয়াই

তোমার ভূমিকা।
ব্যাক-ভাষণে বীরের চট্টোপাধ্যায়কে
স্মরণ করিয়ে দেয়। কিংবা 'দেয়ালের
তিন পিঠ' কবিতার:

কয়েক বছর আগে
লেখা ছিল
'কমরেড বিপ্লব তোমার ভুলছি
না ভুলব না'
এখন সেখানে
'রাজ্যের হাতে অধিক কমতা
চাই।'

এবং—
মধ্যরাতে ভাগাভাগি হয়—
লাল লেখে: এটুকু আমার
'৭১-৮০

নীল লেখে: ওটুকু আমার -
'৭১-৮০
সবুজ লেখে: ঠাকুর বলেন...
ইত্যাদি

তারপর প্রবল বর্ষণে
সব লেখা সব রং ধুয়ে মুছে
এছাকার হলে

নর্দমা রূপসী হয়।
দেয়ালের ভেতরে
মানুষ,

মানুষের ভেতরে
দেয়াল,
সাবধান।
দেয়ালের উপরে বৈধানো
মদের বোতল ভাঙা কাচ,
সাবধান ॥

'খিয়েটার' কবিতায় রায় দেন কবি:
ঘুমঘোরে-টের পাই
মানুষের ভেতরে মানুষ জেগে
ওঠে

লাথি মেয়ে ভেঙে ছায়
ভাঁড়ামির বাবতীর মঞ্চসজ্জা,
ছিঁড়ে কালাকাল করে অন্ধকার
আর
নাটক তৈরি করে নিজেরাই।
কারণ—
ভূমিকা ঠিকঠাক হলে
কথা ছিল
নাটক চলবে।

॥ দুই ॥

পোষ্টার অথবা কবিতা ॥
পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক: সন্ধ্যা সাহা, শিল্পসাহিত্য
৪১ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট। কলকাতা-১।
দাম পাঁচ টাকা।

এক কালে, 'রাজনীতিসচেতন
কবি' নিরীখে দর্পণেই অল্প কবিতার
সঙ্গে পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ
আমি করেছিলাম। এবং তখন হুঃখ
করেছিলাম, আমাদের মতো পাঠক-
দের জন্তে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ
বাজারে নেই। সেই ক্ষোভ এবার
মিটেছে। পার্শ্বের প্রথম এই কাব্য-
গ্রন্থে জিশটিরও অধিক কবিতা স্থান
পেয়েছে। একসঙ্গে এতগুলো কবিতা
পেয়ে কবির মেজাজকে ধরার পক্ষে
কোনো অসুবিধে নেই। 'পোষ্টার
অথবা কবিতা' নামেই পরিচয়
মেলে। কবি ওই কবিতার বলেন।
পোষ্টার অথবা কবিতা—
যে বা খুশি ভেবে নিতে পারো
আমি চাই কথাগুলো আটটা।

পাচটার গেটে
অনার্সে মিশে থাক
তেতে উঠুক অবস্থানের তাঁবু।
তাঁর কবিতা সম্পর্কে পার্শ্ব
নির্বিধ। বড়লোকের ফুলদানিতে
সাজানো ফুল তাঁর কবিতা নয়, তিনি
কবিতাকে শক্তিশালী অস্ত্রের মতো
ব্যবহার করেন এবং শরনিক্ষেপ ও
লক্ষ্যবস্ত বিদ্ধ করার দিকে সতত
সচেতন। তাই তাঁর কবিতার সহ-
জেই রাজনৈতিক পশ্চাদপট আসে,
প্রতিক্রিয়ার দুর্গে তিনি কামান
দাগেন। অথচ, স্বস্তির বিষয়, তাঁর
কবিতা উদ্বেজনাময়, কিন্তু স্লোগান
সর্বশূন্য নয়। অর্থাৎ কাব্যধর্মকে তিনি
অঙ্গুর রাখেন। রাজনৈতিক কবিতা
রচনার ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে জন-
গণের স্বাধা হবার অভিলাষে

কাব্যকে এমন ভালগার-পর্ষায়
নামিয়ে আনেন- যাতে জনগণের
বোধশক্তিকেই অশ্রদ্ধা করা হয়।
তবু সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার
এই কারণে যে, পার্শ্বের শব্দনির্মাণে
তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল বোঁক
আছে, যা আশংকা হয় নিছক ম্যানা-
রিজমে না পরিণত হয়।

পার্শ্বের কবিতাশক্তিতে আমি
আত্মবান বসেই এই সতর্ক উচ্চারণ।
কারণ এই কবিই অনার্সে 'সনাক্ত-
করণ' কবিতা লিখতে পারেন:
বাতাদে সন্ত্রাসের নথ
রাত-কাপানো নথের শব্দে আমরা
জেগে উঠেছি।
তীর সার্ভাইটে একোড় ওকোড় হয়ে
বাছে

৪০৬টা ফ্ল্যাট,
চোখের কাছে ৪৪টা প্রিয়জনমানের

জাল
দরজার দরজার বুটের লাথি, বেয়নেট
একটা ভয়ঙ্কর হিন্ হিন্ শব্দ
অন্ধকারে চাবুকের মতো নেমে এসে
'পুলিশ! পুলিশ!'

তারপর লম্বা আমাদের
টেনে হিঁচড়ে কাকে কোথায় নিয়ে
পিয়েছিল, জানি না।
সনাক্তকরণের জন্ত
একটা স্যান্ডবোর্ডে ঠাণ্ডা ঘরে আমাকে
নিয়ে আসা হলো:
পাঁচ পাঁচটা গুলির দাগ—
তবু, ঠিক চিনতে পেরেছিলাম
হ্যাঁ, আমি ওর বাবা।
আমার গলার কাছে একটা ঠাণ্ডা
হাত

বুকের ভেতর মরা শরীর
হ্যাঁ, আমি ওর বাবা।

॥ তিন ॥

তোমার মারের পালা শেষ
হলে ॥ বিপুল চক্রবর্তী।

প্রকাশক: সত্যেন্দ্র সেন, ২৩১/৪এ
আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলকাতা-৪।
দাম তিন টাকা।

অগ্রজ কবি সাগর চক্রবর্তীর
মতোই বিপুল একাধারে কবি ও
লোকশিল্পী। ফলে এই কাব্যগ্রন্থে
কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচিত কিছু
লোক-গানের নিদর্শন রয়েছে।
লোক-গানের দাবি প্রবল হয়ে ওঠায়
আলাদা করে এই রচনাগুলির কাব্য-
ধর্ম বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু
যেখানে বিপুল কার্যই করতে চেয়ে-
ছেন সেখানে তাঁর কবিতার সংহত
দীপ্তি সহজেই প্রকাশমান। বিশেষ
করে ছোটো ছোটো কবিতার তাঁর
হৃদয় অধিক লক্ষিত হয়েছে। যেমন
'মানুষের মাঝখানে, এ মাটিতে'
কবিতার কবি বলেন:
পাহাড়ের সব শেষ চূড়ার উঠে
একজন মানুষ

আকাশ ছুঁতে চায়
চেঁচা করে, ভীষণ লাকার
তবু পারে না।
মানুষের মাঝখানে, এ মাটিতে দাঁড়ায়
আরো একজন মানুষ
আকাশ ছুঁতে থাকে
প্রতিদিন.....

কিংবা 'তবু আমি' কবিতায়:
পা ছুঁতে কেটে বাদ দাও
তবু আমি হাঁটব
আমার পথে।
হাত ছুঁতে কেটে বাদ দাও
তবু আমি বাজাব
আমার স্বর।
চোখ ছুঁতে উপড়ে ফেল
তবু আমি দেখব
আমার স্বপ্ন।

'তোমার মারের পালা শেষ হলে'
কবিতায় বিপুল মস্তুর মতো উচ্চারণ
করেন:

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবুকের দাগ
যেন থাকে

এমনভাবে মারো
দাগ যেন বসে থাকে বেশ কিছু দিন
এমনভাবে মারো
এমনভাবে মারো
তোমার মারের পালা শেষ হলে
আমাকে দেখায়, যেন ভোরাকাটা।

বাঘের মতন।
এবং তখন বিপুলের কবিতাব্যবহার
সঙ্গে আমরা এক নিম্নে মিশে
বাই।

বিপুল চক্রবর্তী প্রথম গ্রন্থেই
প্রচুর সম্ভাবনা দেখিয়েছেন, তাই
তাঁর কাছে প্রত্যাশাও বিপুল। আশা
করা যায় বয়স এবং অভিজ্ঞতা
অভিজ্ঞতে তাঁর কবি মেজাজকে নিঃস্ব
একটি স্বতন্ত্র আয়তন এনে দেবে।

ফ্যান্টাস

প্রথম সৌন্দর্যের জন্য
ফ্যান্টাস
লাক্সারী ট্যালক
ড্যানিশি
ক্রিম



ফ্যান্টা ক্রিমিক্যালস
কলিকাতা-৫

ফ্যান্টাস বিক্রয়ের জন্ত ভারতের
সর্বত্র এজেন্ট চাই

নিউ মার্কেট

৩য় পৃষ্ঠার পর

উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? সাংস্কৃতিক নিরুপেক্ষ, পৌকসিহিলের দৃশ্য-রসিক রোমাকিত স্থাপত্য কাণ্যলিক!

মাকাল বড়ই পঙ্কজেশ-হোক না কেন, বিদ্যাবুদ্ধিতে সে কখনোই দাবালক হয় না; কতকগুলো পাকাল কথা পর পর সাজালেই একটা সম্পাদকীয় হয়ে ওঠে না, মাকালবুদ্ধির বাঙালী ছাড়া কিছুই হয় না। ডি পুরায় উপজাতিদের কাউলিল পঠনের অমিকার দেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে দৈনিক কাগজে বাজারী বাজুকের সম্পাদকীয় লেখার অধিকার প্রাপ্তি কি আরো গুরুতর উদ্দেশ্য নয়? আমন্দবাজারী সম্পাদকীয়তার বকসলে 'আমরা বাঙালী'-র ভাষার তীব্র উপজাতি-বিষেয়ী প্রচারের সাজাটি অবশ্যই বাঙালী প্রেমের নিষ্ঠাভ্যোতক নয় বরং উৎকট বাজারী বুদ্ধির মাজা-ধিক্যে উন্নতিত শহুরির শব্দ-সাধনা। অর্থাৎ অস্ত্র অনেকের সর্বনাশে যাদের কপালে পৌষমাল ঘটে থাকে, আমন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী সে রূপ সর্বক্ষেত্রে পৌষপার্বণ অহুতান করে। অতএব, মৃত্যুসংখ্যা শত শত হলে ওদের আর তেমন মেজাজ আসে না, হাজারে হাজারে লাখে লাখে হলে তবেই রম্য রচনার রোমাল লাগে। তবে শহুরিকুলের সাধন-শক্তি বড়ই প্রবল হোক না কেন মৃত্যুকুল মরে গিয়ে শহুরাটাকে সাধনা দেয় না।

অবশ্য কীংপ্রাণের স্ববিধা এই যে কোন স্বল্প সলজ ব্যক্তি সজ্ঞানে তাদের আশ্রিত করে না; আমন্দ-বাজার কেমন সমাচার পরিবেশন করবে, কেমন সম্পাদকীয় লিখবে কিংবা কতটা সংবাদব্রতী হবে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ সব কিছু বিচার করতে গেলে আমন্দ-বাজার কাগজ সৌজীকে বিচার-গ্রাহ করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন বামফ্রন্ট মন্ত্রী ও সি পি আই

(এম) মেতা এরূপ কটাক্ষ করতে গিয়ে কখনো কখনো এর পরিচালক সৌজীকে আত্মপ্রচারের স্বর্ণ স্বযোগ করে দিয়েছিলেন—বামফ্রন্টের শক্তি-শালী প্রতিপক্ষরূপে আমন্দবাজারকে জাহির করে জনসমক্ষে কলরব তুলতে। আমন্দবাজার আছে কি নেই জাতে সমাজবিবর্তনের কিছু যায় আসে না; পক্ষান্তরে আমন্দ-

বাজার ও বুর্জোয়া প্রেস সজাগ মনে আছে বলে দেশে বিপ্লব থেকে আছে এমন প্রগলভ ধারণা বাজারীদের মনে ঠাই পেলেও আমরা জানি, আমন্দবাজারীরা না হুগালেও ইতি-পূর্বেই দেশে বিপ্লব ঘটে যেতো না; কারণ বা মটনা তা-হলো, যতদিন আধাসামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাগুলি উৎখাত না হবে, যতদিন পর্যন্ত এ

আধা-উপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনীতি শেষ স্বথটানে বৃদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে ততদিন আমন্দ-বাজারী সওয়া চালু থাকবে। সমাজ-দেহে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক রক্ত যতদিন অপরিষ্কৃত থাকবে ততদিন অর্থাৎ আমন্দবাজার ধোস-পাচড়া রূপী-চর্মরোগ হয়ে সমাজদেহে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে, কিন্তু

তারপর আর নয়।
কিন্তু তাহলেও, এখানে সেখান সংবাদ কুড়িয়ে এনে যাদের এ সাংবাদিকতা চলে, তাদের 'নিরুপেক্ষ' নিরুপেক্ষ মানের সাংবাদিকতা নিতান্ত অস্তিত্বের তাগিদে উৎকটরূপে বর্ণবিচিত্র হয়েছে। ব্যবসাদার হতে পারে কিন্তু এ খবরের সাধারণের সাধনা কোথায়।

প্রকৃত ভূমিসংস্কারই সমস্যার সমাধান

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর রূপায়ণে জোতদার ও সুদখোর মহাজন—এক কথায় গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ আজ বিপর্যস্ত।

৮ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গাদার আজ উচ্ছেদের আশঙ্কাজীন। 'অপারেশন বর্গায়ন' নথীভুক্ত করে তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ৮ টাকা দৈনিক মজুরীর দাবী অর্জিত হয়েছে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প গ্রামীণ শ্রমশক্তির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার গণভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো পশ্চিমবঙ্গে আজ নতুন আশার সঞ্চার করেছে, উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ।

উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি খুঁজে বার করা, জনসাধারণের দরিদ্রতর অংশের মধ্যে সরকারে ন্যস্ত জমি বিতরণ করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাস্তুজমির দখলকারীদের নাম রেকর্ড করা, অভাবের তাড়নায় হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া, বর্গাদার ও ন্যস্ত জমি বন্দোবস্ত গ্রহণকারী ৬০ হাজার ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মারফত ঋণের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করা, বৃদ্ধ চাষীদের জন্য বার্ষিক্যভাতা চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জোতদার ও সুদখোর মহাজন চক্রের কুক্ষিগত অর্থনৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রায় আমরাও সঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং বট লেন, কলিকাতা-১৩

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচণ্ড সরকারী বিরোধী বিক্ষোভ

২য় পৃষ্ঠার পর

ছিল না। পরলা জুলাই যে যুক্ত বৈরতি হী ও কার্টারের যুক্ত হস্তাকরে প্রকাশিত হয় তাতে মার্কিন সরকার দক্ষিণ কোরিয়াকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী সম্মানে অবস্থান করবে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির সফরের প্রায় তিন মাস পরে অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর হী সরকারের ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ছাত্র ও গণতন্ত্র-কামী যাত্রাবলী গণ-বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে এবং সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২৬শে অক্টোবর হী নিহত হন ও দক্ষিণ কোরিয়ার শাসকের পরিবর্তন হয়। এই ঘটনাগুলি পর পর সাজালে বুঝতে অস্বীকার হয় না যে পুঁজিবাদী ও কমতালোভীদের অস্ত্রবন্দ কত প্রবল হয় গণ-আন্দোলনের মুখে।

প্রেসিডেন্ট হী নিহত হবার পর চাই কিউ হাই অস্থায়ী ভাবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং তার মন্ত্রিসভার শান হাই ভন হাককে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিছুটা কঠোর তা শিথিলও করেন। কিন্তু ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের জন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল নতুন সরকার এই পনের সুরাহা করবেন এই আশায়। তাদের এই দাবী মানার কথা দূরে থাক বরং মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের চাপে

নতুন ভারতীয় দল গঠন

২য় পৃষ্ঠার পর

আশা, কর্পূরী ঠাকুর, দেবীলাল, ডি এন ডেওয়ারী, এ কে এ্যান্টনী, তারকেশ্বরী সিংহ, রঘুনাথ রেড্ডি প্রমুখ বলে যোগ দেবেন।

আর এর বিরোধী মহলের কেউ কেউ মনে করেন, এই দলটি রাষ্ট্রায়ত্তর মতপুষ্টি হয়ে গঠিত হতে চলেছে। বহুগুণ্য উপর এই ভূমিকা নেবার নির্দেশ আছে, তিনি যেন চাবন, চরণ, জগজীবন প্রমুখ বৃদ্ধদের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। কারণ, ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কিছুতেই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনবেন না। তাই ওঁদের যেভাবে হোক অবলম্ব নেওয়াতে হবে।

নতুন রাজনীতিকদের তিড়ে ওঁদের আর মানার না। ওঁদের

দেশে কড়া সামরিক আইন প্রয়োগ করা হয়। যে সামরিক আইন একটু শিথিল করা হয়েছিল, তাও আবার পূর্ণাঙ্গভাবে জারী করা হয়। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে এই বিক্ষোভ সংঘর্ষে পরিণত হয়। ১৭ই মের ছাত্রদের এই বিক্ষোভ ২২শে মে চোঙ্গা এদেশে গণ বিক্ষোভের আকারে দেখা দেয় এবং পরে কোয়ালিডু সহরে মশস্ত্র অভ্যুত্থান ও অবরোধ স্থাপিত করে সমস্ত শহর দখল করে রাখে। সমস্ত দেশ এখন বিক্ষোভে উদ্ভাল। এদের প্রধান দাবী হল প্রধানমন্ত্রী হীক ও লেঃ জেনারেল চান হু হাও-রাকে পদত্যাগ-করতে হবে। সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণ-তান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

সামরিক শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনকে 'রক্তের বস্ত্র' ডুবিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু মুক্তি হল শাসক দলের মধ্যে মতবিরোধ ছড়িয়ে আছে। জং ও সানের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিরোধে এরা কত বিক্ষিত হলেও বর্তমান দেশের আন্দোলনকে মিলিটারির বুটে দরিয়ে দেবার খাৰ্চে আপাততঃ তাদের বিরোধ চাপা পড়ে গেছে সত্য, তবুও প্রধানমন্ত্রী শান হাক পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রেসিডেন্ট চাই মেজর জেনারেল পাক চুঙ হনকে প্রধানমন্ত্রী ও মার্শাল কমান্ডার হিসাবে জেনারেল লী হুই সঙকে নিযুক্ত করলেন। পার্লামেন্ট কার্যতঃ বন্ধ করে রাখলেন। বিরোধীদের জাশনাল এসেছলীতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এমন কি বিরোধী

কাজকর্ম যখন নতুন কোন সম্ভাবনা জাগাতে যখন পারছে না তখন অত গুরুত্ব ওঁরা পেতে পারেন না। বহুগুণ্য সেইমত তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আলাপ আলোচনায় চক্রবর্তনকে তাঁর পাশে পাবেন বলে সংকেতও পেয়েছেন। এখন বহুগুণ্য তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে নতুন দল গড়ার জন্ত উঠে পড়ে যেভাবে লেগেছেন তাতে তিনি, চক্রজিং প্রমুখেরা কতটা কি করতে পারেন তার দিকে রাজনৈতিক মহলের আগ্রহ কম নয়। কারণ, এর গুরুত্ব এখন তেমন না হলেও এক সময় তা যে হয়ে উঠতে পারে এমন সম্ভাবনার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

নেতাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। মোট কথা সমস্ত দক্ষিণ কোরিয়া এক আগেরগিরির উপর বসে আছে। সমস্ত সরকারী অফিস ও অন্তঃস্থ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সৈন্য বাহিনী ঘিরে রেখেছে। কুয়ালিডু অভ্যুত্থান ধ্বংস করার জন্ত সহস্রটিকে চারদিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। সমস্ত কোরিয়া এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কুয়ালিডু সহরের অবরোধ ভাঙবার জন্ত মার্কিন সৈন্যকে নামবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নোথান করে মার্কিন সেনা বাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ জন উইলকিন্সকে। কার্টার সরকার উত্তর কোরিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সশস্ত্র নৌ বাহিনীকে প্রস্তুত করে রাখছে। মোট কথা হল ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী যেই-ভাবে নেমে পড়েছিল তাঁবোদারকে রক্ষা করার জন্ত এইখানেও সেই একই পথে এগুচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট চাই দেশকে সম্পূর্ণ সামরিক শাসনে নিয়ে এসেছেন। শাসন কার্য চালাবার জন্ত তিনি ২৫ জনের একটি পরিষদ গঠন করেছেন। তার মধ্যে ১৭ জন সামরিক বাহিনীর লোক। লেঃ চান ভো হাওয়ান এই পরিষদের চেয়ারম্যান। এই কমিটি গঠনের প্রাকালে চাই বলেছেন 'দেশ আজ বিপদের সম্মুখীন তাই সামরিক শাসন ছাড়া কোন উপায় নেই। তার মার্কিন মুক্তকীর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তবে প্রেসিডেন্ট হাক যদি কেবল বন্দুকের নল আর বেয়নেটের তরঙ্গ করে অশান্ত দক্ষিণ কোরিয়াকে শান্ত করার কথা ভাবেন তাহলে বলতে হবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

কোরিয়ার বর্তমান অবস্থার যে চিত্র উপরে ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতার কিছুটা মিল রয়েছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার কোন দক্ষ বিপ্লবী নেতা ও পার্টি আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না যারা এই গণবিক্ষোভকে গণবিপ্লবে পরিণত করার নেতৃত্ব দিতে পারে। বিপ্লবের পরিধিতি থাকলেই বিপ্লব হয় না যদি না সেই পরিধিতি বৈপ্লবিক দক্ষতা বৈজ্ঞানিক ও চিন্তায় সমৃদ্ধ না হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবের পরিধিতি বিরাট হয়েছে সত্য। লেনিনের ভাষায় বলতে হয় শুধু পরিধিতিতে বিপ্লব হয় না যদি না থাকে সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি যারা প্রতিক প্রেরণী দ্বারা পরিচালিত।

সর্বহারা শ্রেণী যদি বিপ্লবে যোগ দেয় তাহলেই একমাত্র গণতন্ত্রের জন্ত যুদ্ধ জয়লাভ করতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দক্ষিণ কোরিয়ার এই সব পরিধিতির অভাব রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান অগ্নিগর্ভ অবস্থা সর্বহারার বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে। তবে অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়েই এই বিপ্লব আসবে। লুয়ান ও কোয়ালিডু বিক্ষোভ সেই পথের নির্দেশ দিচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তর কোরিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক

বাম ফ্রন্ট সরকার ও বাংলা ছবি

১য় পৃষ্ঠার পর

কমতা হারিয়ে পরনির্ভরশীল অঙ্গ হয়ে পড়ে—যেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় যে পাঁচটি স্টুডিও আজও কোনমতে টিকে আছে, সেগুলির দৈনন্দিন যতদিন না দূর হচ্ছে, ততদিন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দূরবস্থারও অবসান হবে না। স্টুডিও সংকরে সরকারী উদ্যোগ আজ একান্তই বাঞ্ছনীয়।

একচেটিয়া পুঁজিপতির আধিপত্য ও হুতিওয়ালাদের শোষণ বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষয়রোগের অত্যন্ত কারণ। এদের ধ্বংস থেকে এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে স্বল্প প্রযোজনায় একান্ত প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার। প্রযোজনার উৎসাহ আসবে তখনই, যখন চিত্র

পরিবর্তনের ক্ষমতা দক্ষিণ কোরিয়ার বিপ্লবকে সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করবে। রাজনৈতিক বিবর্তনে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিদায় নিতেই হবে আজ হোক কাল হোক যেমনভাবে উপরাজিত হয়ে পালাতে হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে। সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র কাষড়ে অনেক রক্ত বরবে এতে কোন সন্দেহ নেই। জয় সুনিশ্চিত।

মুক্তির নিশ্চয়তা থাকবে সংস্কারাভীত-ভাবে। নইলে ছবি তৈরী করার পরও বাক্সবন্দী হয়ে যদি বছরের পর বছর পড়ে থাকে আর মাসে মাসে হুতির টাকার মোটা অঙ্কের স্বল্প স্তন্যে হয় প্রযোজকদের, তবে এই বিরাট লোকমানের কৃতি নিশ্চয় নতুন ছবি করার উৎসাহ আর থাকে কি? নিয়মিতভাবে সেনসরের তারিখ অল্পব্যায়ী বাংলা ছবির মুক্তির জন্ত অবিলম্বে রিলিজ চেন বাড়াতে হবে এবং প্রদর্শকদের কালো টাকার বেআইনি লেনদেনের পথও বন্ধ করতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দূষিত আবহাওয়া এভাবেই কিছুটা দূর করা সম্ভব এবং এব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব পালনে এড়িয়ে যেতেও পারেন না।

জাতির সেবায় পশ্চিমবঙ্গ-ক্ষুদ্র-শিল্প সংস্থা

এ রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ প্রচেষ্টায় এই সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি অন্ততঃ এই সংস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিতরিত হচ্ছে।

প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ একটি করে শিল্প নিকেতন গঠন করার কাজে এই সংস্থা অতী হয়েছিল। ইতিমধ্যেই সাতটি শিল্প নিকেতন মচল হয়েছে এবং আরও চারটির কাজ সমাপ্তির মুখে। আমরা আশা করছি অনতিবিলম্বে আরও অন্ততঃ আটটি শিল্প নিকেতনের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে পারব।

ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিপণন সমস্তর সমাধান কল্পে আমরা বিভিন্ন প্রচেষ্টা করছি। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানির চেষ্টাও চলছে।

প্রত্যেকটি জেলায় আমরা এক বা একাধিক শিল্প প্রকল্প রূপায়ণ করতে চলেছি। এইসব শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্যাদি মূলতঃ ক্ষুদ্রশিল্প সমূহে ব্যবহৃত হবে।

আমাদের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত। সকলের প্রচেষ্টায় আমাদের প্রয়াস উত্তমোত্তম সাফল্যের দিকে অগ্রসর হবে এ আশা রাখি।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ
কর্পোরেশন লিঃ

৬৬, রাজা হরোদ মল্লিক স্টোর (৪র্থ তল) কলিকাতা-১০

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে অনেক ই-কংগ্রেসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন

সঞ্জয় গান্ধীর আকস্মিক মৃত্যুতে ই-কংগ্রেসী শিবিরে একাধিক বেসন শোকের ছায়া নেমে এসেছে ঠিক অপরদিকে তখন ই-কংগ্রেসের নেতাদের একাধিক মনোযোগ চাপা উল্লাস দেখা দিয়েছে।

একথা কারো অজানা ছিলনা যে, সঞ্জয়ের মৃত্যুর না থাকলে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের মধ্যে অনেকেরই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। অন্তত নেতা হিসাবে। সঞ্জয়ের কোণঠাতে তাঁর দল থেকে অনেক নবীন ও প্রবীণ নেতাকেই একে একে বিদায় নিতে হয়েছে। যারা সঞ্জয়ের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা দলের মধ্যে নিজেদের আসল ক্যাপ্টেন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রায় সব মন্ত্রী কাকাকর্মে সঞ্জয় গান্ধী হস্তক্ষেপ করতেন। যা অনেকেরই ছিল নাপসন্দ। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ করার কোন রকম উপায় ছিলনা। তাঁরা এটা ভাল করেই জানতেন যে, প্রতিবাদ করার অর্থই হল দল থেকে, পদ থেকে বিতাড়িত হওয়া। তাই অনেকেই সেই দুঃসাহস দেখাতে নত।

একমাত্র কেন্দ্রীয়, রেলমন্ত্রী সঞ্জয়ের কাকাকর্মে বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী পদত্যাগপত্রই পেশ করে বসে ছিলেন। পরে অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় তিনি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

করকজন মন্ত্রীর কেন্দ্রীয়, মন্ত্রিসভা থেকে সরে যাওয়া একরকম প্রায় নিশ্চিতই ছিল। এই তালিকায় ছিল অনেকেরই নাম। বলাবাহুল্য সেই তালিকার রচয়িতাও ছিলেন

আকাশবাণী কলকাতা সম্পর্কে অভিযোগ

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ইদানীং উর্দ্ধ ভাষায় গল্প ও আলোচনা চক্র, উর্দ্ধ কবির সম্মেলন করা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অনেকে ভাবতে পারেন যে, মুসলমানদের বিষয়ে বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে কলকাতা কেন্দ্রের অস্থানে। আসলে উর্দ্ধ অস্থানের আধিক্যের সঙ্গে মুসলমান সমাজের বিষয়ে আলোচনার সম্পর্ক নেই। ইদানীং দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা ও কথিকা প্রচার ক্রমশই

প্রয়াস সত্ত্বেও পাড়ী। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এই সব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁদের হস্ত ধারণা যে, এবার হস্ত তাদের আসন পাকা হয়ে গেল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে যারা জানেন তাঁরা একথা ভাল ভাবেই জানেন যে, সঞ্জয় যে কথা মাকে বলে গিয়েছেন তা শ্রীমতী গান্ধী কার্যকরী করতে ভিলমাত্র ধিবা করবেন না। একথা তো আর নতুন করে বলায় কোন প্রয়োজন নেই যে, সাম্প্রতিককালে শ্রীমতী গান্ধী বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন সঞ্জয়ের ওপর। তাই সঞ্জয়ের ইচ্ছানুসারে তিনি কার্যকরী করবেনই পুঞ্জের শেষ ইচ্ছা হিলাবে—একথা ধরেই নেয়া যায়।

সম্পর্কে অভিযোগ

কয়েক আসছে। উর্দ্ধ বা বকর উর্দ্ধ, মহম্মদ, রমজান, উর্দ্ধ-উর্দ্ধ মিলাহ বিষয়ে অস্থানের সংখ্যা কম হচ্ছে। কলকাতা রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর কামিয়ারী মুসলমান কাইজার কালিম-হারের উর্দ্ধ শ্রীতি বতাই আবাতালী মুসলমানদের খুশি করুক না কেন, সেই সঙ্গে তিনি মুসলমানদের ধর্ম বিষয়ক বাঙলা আলোচনার অবকাশ ক্রমশই কমিয়ে আনছেন। জানা গেলো যে মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে আরও অস্থান প্রচার করার ইচ্ছা কাইজার সাহেবের থাকলেও তাঁর অফিসের বেশ কিছু কর্তা ব্যক্তিরা ঐ ধরণের অস্থান আদৌ হতে দিচ্ছেন না।

মানেকা গান্ধী

১ম পৃষ্ঠার পর

শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেছেন।

কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ মহল মনে করেন মানেকা গান্ধীর রাজনীতিতে প্রবেশ খুব একটা অস্বাভাবিক হবে না। কারণ ৭৬ সাল থেকেই মানেকা গান্ধী তার স্বামী প্রয়াস সঞ্জয় গান্ধীকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপে কখনও নেপথ্যে, আবার কখনও বা প্রকাশ্যেই সাহায্য করে এসেছেন। হুজুরা মানেকা একেবারে রাজনীতির সঙ্গে অপরিচিত নন। তাছাড়া মানেকা যথেষ্ট সাহসী ও বুদ্ধিমতী এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

কংগ্রেসের (ই) ঘনিষ্ঠ মহল মনে করেন মানেকার রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য যদি ব্যাপকভাবে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে থেকে প্রস্তাব আসে তবে হয়তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আপত্তি করবেন না।

ই-কংগ্রেসে শূন্যতা

১ম পৃষ্ঠার পর

মনোনয়ন দিচ্ছিলেন তখন বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রবীণ নেতারা ব্যাপক সৌরগোল ভুলে বলেছিলেন যে, এতে দলের ভরাটবি হবে। এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর অনেক ছদ্মনির লজী রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠী পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

দলের মধ্যে এতদিন জড়াই ছিল প্রবীণ বনাম নবীন কংগ্রেসীদের মধ্যে। সঞ্জয়ের পৃষ্ঠপোষণায় নবীন কংগ্রেসীরা রাজ্যে রাজ্যে সংগঠনের দায়িত্ব নিচ্ছিলেন প্রবীণ নেতাদের সরিয়ে দিয়ে। এতে প্রবীণরা মোটেই খুশি ছিলেন না। তারা এই পরিবর্তনের ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অভিযোগ করতেন কখনও আলাদা আলাদা ভাবে কখন বা কয়েকজন মিলে। প্রবীণরা ইন্দিরা-জীকে বোকানোর চেষ্টা করতেন যে, যেভাবে প্রবীণদের সরিয়ে নতুনদের জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে তাতে দলের ক্ষতি হবে।

কিন্তু প্রবীণরা বুঝে গিয়েছিলেন যে, ইন্দিরা-জী নিজেই চান সঞ্জয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের জন্ম হোক। এবং এ ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী সব সময়েই সঞ্জয়কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে এসেছেন। মোট কথা ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে সঞ্জয়ের ওপর আস্থা রাখতেন। এবং সঞ্জয়ের পরামর্শকে তিনি ইদানীং সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিতেন।

একথা ইন্দিরা-জীর পরামর্শদাতা যারা ছিলেন সেই মোহনকুমার মল্লম, ডি পি দার, সিদ্ধার্থ রায়, রজনী প্যাটেল প্রমুখরা আজ কেউ বা মৃত, বাকীরা বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে। ১৯৭৫ সাল থেকে সঞ্জয়ই তার মা ইন্দিরা গান্ধীর অন্ততম পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। অনেক পতন উত্থানের সিঁড়ি ভেঙ্গে সঞ্জয় হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা-জীর প্রধান এবং একমাত্র পরামর্শদাতা।

কলে যতাবতই হলে এবং স কারে সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল দলের ব্যাপারেতো সঞ্জয়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন।

এখন সঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যু ইন্দিরা কংগ্রেসে ব্যাপক শূন্যতা হরতো একদিন পূরণ হবে। প্র সেইখানেই। সঞ্জয়বিহীন, সঞ্জয় অঙ্গগতদের ওপর ইন্দিরা-জী ক আস্থা রাখতে পারবেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন ইন্দিরা-জী হরতে পুরোপুরিভাবে সঞ্জয়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গীদের ওপর নির্ভর করে চাইবেন না। কলে দলের মধ্যে প্রবীণ নেতাদের পরামর্শকে পুরোপুরি না হলেও বেশ কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব কংগ্রেস সংগঠনে এবং সরকারে পড়বে। যার ফলে ভারতের শাসক দলেরও ব্যাপক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

দুটি জনসভা

১ম পৃষ্ঠার পর

সভা আরও কিছুক্ষণ চালাতে হবে কিন্তু উভোক্তারা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে চলে যান। যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যান তাদের সমর্থকদেরও।

হঠাৎ নরুল ইসলাম মঞ্চে উঠে ঘোষণা করেন আবার নতুন করে সভা শুরু করা হচ্ছে। এরপর সোমেন মিজের সমর্থক নেতারা একে একে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। হুজুর ইসলামকে দুটি সভাতেই বক্তব্য রাখতে দেখা যায়।

এই সভায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের মধ্যেও গোষ্ঠীগত বিষয়ব প্রদেশ নেতারা চাপা রাখতে পারেনি।



ইন্টার কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডব্লু ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারীভিত্তিক/শতকরা ভিত্তিক নীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং : ই সি এল/এন এল/ইজ (সি)/টেন্ডার/১/৮০/৭৭৬ ডাং ৭-৬-৮০

(১) একক স্ট্রাকচারের জন্য লাইড ওয়াল ও রক সাপোর্ট নির্মাণ (২) ৩, ৪, ৫/৬ এবং ৭/৮ ইনক্রাইনের ওপেন এক্সক্যাভেশনের আর সি সি স্কোর নির্মাণের জন্য। মোট আনুমানিক খরচ ২, ৩২, ৪৫২.৭১ টাকা। ২৩-৬-৮০ থেকে ৩ ৭-৮০ পর্যন্ত কেশিয়ারের কাছে ১০০ টাকা (একশো টাকা মাত্র) অথবা ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা মাত্র) মগধে দিয়া এজেন্টের অফিস, নর্থ লিয়ারসোল কোলিয়ারী, পো: বীজপুর, জেলা বর্ধমান থেকে টেন্ডার মজিল পাওয়া যাবে। ৪-৭-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৪টা খোলা হবে।

সাম্প্রদায়িক : আনুমানিক খরচের ১% ব্যয়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের কি বাবদ যদি অর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের সনোদিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দ্বারা অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

শ্রীমতী গান্ধী পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। শিল্প ও শিল্পী / শ্রীকমলা দাস / ৩৪.০০

২। বৈষ্ণব পদ সংকলন / শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১.০০

৬৭, রাজা সুবোধ মল্লিক ষোল্লার, কলিকাতা-১৩

সঙ্কট-অনুগামী নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতার লড়াই

দপন

অবধিৎ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা ২৩শ জুলাই ৮০ ৬০ পয়সা

নির্লজ্জ সঙ্কট-প্রশান্তি মারফৎ রাজীবের আগমনের পথ তৈরী হচ্ছে

সঙ্কট গান্ধীর আকস্মিক প্রয়াণে
মাহুয যত না বিস্মিত, তাকে নিয়ে
দেশবাসী হৈ চৈ আড়ম্বর প্রকাশে
বিশ্বাসী তার চাইতে বেশি ভক্তিত।
মনে করার কারণ সৃষ্টি হয়েছে যে,
অত্যন্ত সুপরিণতভাবেই সঙ্কটকে
দেবদূত বা নিদেনপক্ষে রূপকথার
নায়ক বানানো হচ্ছে। মতলবটা
হল ভারতমাতা সঙ্কটের মতো হীরের
টুকরো ছেলে আর কখনো প্রসূর
করেনি, করবেও না; কারণ সে
কেবল ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেই গর্ভে
ধারণ করা সম্ভব। কিংবা শুধু নেহরু-
গান্ধী পরিবারে, পরিবেশেই অমন
মানিক জন্মতে পারে।

গোটা ব্যাপারটাই যে জরুরী
অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির পর্দায়
চলে গিয়েছে—একথা আজ আর
কোন চিন্তামূলক স্বিরমস্তিকের মাহুয
অস্বীকার করেন না। সেদিন বুল-
ডোজার দিয়ে দিল্লীর জুমা মসজিদ
সংলগ্ন গরীব মুসলমানদের বস্ত্র উৎ-
সাহন, নাশবন্দী ইত্যাদি বাড়াবাড়ির
কারণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও
গোটা কংগ্রেস সমেত এই সংবিধান-
বহিষ্ঠৃত ব্যক্তি ১৯৭৭ সালের নির্বা-
চনে যেমন উৎখাত হয়ে গিয়ে-
ছিলেন, তেমন আজও একটি শিক খাঁ
বিমান নিয়ে কসরৎ দেখানোর বাড়া-
বাড়ি করতে গিয়ে সঙ্কট গান্ধীকে
বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে।
বিশ্বায়ের ব্যাপার, কংগ্রেসীদের (ই)
বেমন লাজলজ্জা মেই তেরনি ভারত
সরকারও যেন লজ্জাস্রমের মাথা
থেকে বসে আছেন। তা না হলে
তারা সঙ্কটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে
বিমান দুর্ঘটনার বিচার বিভাগীয়
তদন্তের কথা ঘোষণা করে আবার
সেকথা কিরিয়ে নেবেন কেন? এই

জরুরী প্রস্নে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা
সংসদের উভয় কক্ষে প্রচণ্ড প্রতি-
বাদের বিক্ষোভ ঘটিয়েছেন, রাজ্য-
সভা থেকে তারা ওয়াক-আউটও
করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
দৈর্জ সিং বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে
শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে-
ছিলেন। অসামরিক বিমান পরি-
বহন সংস্থার ডাইরেক্টরের নেতৃত্বে
পরিচালিত তদন্তের রিপোর্ট কি?
এ বাবদে এ পর্যন্ত যেটুকু রিপোর্ট
বেরিয়েছে তাতেই এই অভিযোগ
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে
যে বিমানের কোন যান্ত্রিক গোল-
যোগের কারণে নয়, কেরামতি
দেখাতে গিয়েই সঙ্কট গান্ধী মারা
গিয়েছেন।

সদত কারণেই লোকসভার
জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতি এক
প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সঙ্কটের মৃত্যুকে
কেন্দ্র করে বিভিন্ন দারিদ্রশীল স্তরে
বাড়াবাড়ির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ
করেছেন। বাড়াবাড়িটা কি? বাড়া-
বাড়িটা হোল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার
শোক প্রস্তাব গ্রহণ, কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন
রাজ্য সরকারের অফিসে দুটিদান,
উর্দি পরে তিন বাহিনীর প্রধানদের
প্রায়ত সঙ্কটের উদ্দেশে অভিবাদন
দান, সঙ্কটের শোক মিছিলে যোগ-
দানের জন্যে পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা-
করণ, রাষ্ট্রনেতাদের সমাধিপাশে
সঙ্কটকে স্থানপ্রদান, রাষ্ট্রীয় পতাকা
অর্ধনমিতকরণ, রাজ্য বিধানসভার
অধিবেশন মূলত্ববিকরণ, রাষ্ট্রীয় শোক
পালন ইত্যাদি ইত্যাদি। লোক-
সভার গৃহীত এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে
যে, সঙ্কট গান্ধী একজন এম পি এবং
প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ছিলেন এবং সেই
শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সঙ্কট গান্ধীর মৃত্যুর কয়েকদিনের
মধ্যে দিল্লীতে সঙ্কট অনুরাগী যুব
কংগ্রেসের বাধা বাধা নেতাদের
মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতার লড়াই শুরু
হয়েছে বলে জানা গেছে।

যে সব যুব নেতারা প্রভাব
বিস্তারের লড়াইয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে
নেমেছেন তারা হলেন, আমেধির
যুবরাজ সঙ্কট সিং, কলকাতার শিল্প-
পতি কমল নাথ, গোয়ালিয়রের

রাজকুমার মাধবরাও সিদ্ধিরা, দিল্লীর
জগদীশ চাইটলার, গুজরাটের
যোগেন্দ্র থাকোয়ানা। তাছাড়াও
আছেন ডি সি শুক্লা, ধরমবীর সিং
প্রভৃতি।

এদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে
রেবারেবি দীর্ঘদিন ধরেই ছিল।
প্রত্যেকেই চাইতেন সঙ্কটের এক
নম্বর লোক হতে। কিন্তু সঙ্কটের
উপস্থিতি এবং কৌশলের ফলে এদের

বিরোধ কখনই মাথাচাড়া দিয়ে
উঠতে পারে নি। কিন্তু সঙ্কটের
আকস্মিক মৃত্যুতে ক্ষমতার লড়াইটা
প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।

সব থেকে সুবিধাজনক পরি-
স্থিতিতে আছেন কমল নাথ এবং
সঙ্কট সিং, কারণ এরা ইন্দিরা পরি-
বারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ। সুতরাং
এই দুইজনেই চাইছেন সংগঠনের
শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়



ই-কংগ্রেসী এম পির দাপটে দুভেঁগ

নয়া দিল্লী ২২। লোকসভার এক
মাননীয় সদস্যের জন্ম সেন্ট্রাল রোড
রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ৫০টি পরিবারকে
গত শুক্রবার অশেষ দুর্ভোগ পেতে
হয়েছে। ওখলার তাদের কোরা-
টারে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না,
কারণ ডি ই এস ইউ-র টেকনিশিয়ানরা
সকলে স্ট্রেণ্ডস কলোনীতে
অনৈক প্রভাবশালী যুব কংগ্রেসী (ই)
এম পির বাড়িতে ভবল কানেকশান
দিতে ব্যস্ত ছিল।

জানা গেছে, এম পি মহোদয়
তার বাড়িতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ক্রোড়ে
গিয়ে ঐ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ডি ই
এস ইউ ইঞ্জিনিয়ারকে ফোনে ভয়
দেখান যে, এই অবস্থা চলতে থাকলে
তাকে সাপেপেও করা হবে। তখন
ইঞ্জিনিয়ার তত্ত্বলোক তার সব
লোককে ঐ এম পির বাড়িতে দ্বিতীয়
আরেকটি কানেকশান দেবার জন্ত
লাগিয়ে দেন যাতে কখনও বিদ্যুৎ
বিভ্রাট না ঘটে।

সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের
টাক কোয়ার্টারের লোকেরা কি
ব্যাপার জানতে না পেরে অভিযোগ
করেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ
নিয়ে মাথা নামাবার কেউ ছিল না।

সোমবার এই ধরনের আরো
একটি ঘটনা ঘটে। চুনা মাণ্ডির
এক ব্যাপক অঞ্চলে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ
ছিল না। বাসিন্দারা ঐ দিন
রাতে নিকটস্থ সাব-স্টেশন ঘেরাও
করে এবং বলে যদি এফুনি বিদ্যুৎ

সঙ্কটের মৃত্যুতে সি পি আইয়ের নীতির পরিবর্তন হবে না

সঙ্কট গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতীয়
কমিউনিষ্ট পার্টির ইন্দিরা কংগ্রেস
সম্পর্কে মনোভাব ও বাম ও গণ-
তান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার নীতিতে
কোন পরিবর্তন আসবে না। পাক্কাব
রাজ্য কাউন্সিলের একটি সভায়
উদ্বোধন করতে গিয়ে সি পি আইয়ের
সাধারণ সম্পাদক জিরাজেশ্বর রাও
যা বলেছেন তাতে একথাই মনে
হয়।

জাতীয় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক
পরিস্থিতি এবং নির্বাচনী ফলাফল
ও নির্বাচনোত্তর অবস্থা পর্যালো-
চনা করে তিনি বলেন যে, সি পি
আই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে

সরবরাহ না করা হয় তাহলে তারা
এটি উড়িয়ে দেবে। সাব-স্টেশনের
একজন কর্মী নাকি বলেন যে, সমস্ত
বিদ্যুৎ কর্মীরা শান্তিমনে ব্যস্ত
থাকায় যেসময় করতে দেয়া
হচ্ছে।

তোলার নীতি অক্ষুণ্ণ রাখবে, জন-
গণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায়
ঐক্যকে আরও জোরদার এবং স্বৈর-
তান্ত্রিক শক্তির বিরোধিতা করবে।

জানা গেছে, আগামী ১ই ও
১০ই জুলাই জাতীয় কার্যনির্বাহক
সমিতি এবং ১২ই ও ১৩ই জুলাই
জাতীয় কাউন্সিলের সভায় সঙ্কট
গান্ধীর মৃত্যুর পরবর্তী রাজনৈতিক
পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে।
এবং তারপরই নতুন পরিস্থিতিতে
সি পি আইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে
পরিকল্পনা জানা যাবে।

সমস্যা

রাজীব

১ম পৃষ্ঠার পর

হিসেবে তিনি একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে সরকারী ও বেসরকারী উত্তেজনা হয়েছে তা ভারতের গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শবিরোধী।

এবার গোড়ার প্রশ্নে আসা থাক। আমরা বলেছি যে, একটা দ্বিধা উদ্বেগ নিয়েই সঙ্কটের ঘিরে অমন বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। সঙ্কটের স্তূপে রাজীব কিংবা মনোজা গান্ধীকে বসানোর মতলবেই এই পরিবেশ রচনা করা হচ্ছে। সঙ্কটের নির্বাচনী কেন্দ্র আমেরিকা থেকে প্রার্থী দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে তাই ভাঙার ভাববোধ নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বরসের দিক থেকে মনোজা গান্ধী লোকসভার প্রার্থী হবার মত যোগ্যতাই এখনও অর্জন করেন নি। কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী গান্ধী সঙ্কটের শোকসভার দাঁড়িয়ে বলে কলেছেন যে 'সঙ্কট ছিল আমার সমস্ত শক্তির উৎস' সেহেতু সেই শক্তি আবার তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ তাঁর পাশে চাই এবার রাজীব গান্ধীকে। তা নইলে তাঁর যত্ন যে বিফল হয়ে যায়। ডিক্টেটোরের গহীতে চড়ে বসা হয় না। মেহরু গান্ধীর পারিবারিক শাসন পরিকল্পনা ভেঙে যায়।

পৃথক মন্তব্যালয়?

পূত্র হারানোর পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রথম অঙ্গুরী কাজে হাত দিলেন আসাম নিয়ে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে। বিরোধী নেতারা এই বৈঠকের মাধ্যমে দাবী করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যেন কোন পূর্বশর্ত আরোপ না করেই আসাম আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনাতো যোগ দেন। শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ করেছেন যে ইতিপূর্বে আসাম প্রতিনিধিত্ব দি়া দি়া বৈঠকে মীমাংসা প্রস্তাবে সম্মত হয়েও আসামে গিয়ে গিয়ে আবার মত পার্থক্যে কেন্দ্র-ছিলো। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় ও আসাম রাজ্য সরকারের দুর্বলতাই আন্দোলনকারীদের ঘনঘন মত পরিবর্তনে উৎসাহিত করে আসছে।

আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুরে এখনও বিচ্ছিন্নভাবে হিংসা ও হত্যা-নীলা অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিকল্পিত উত্তর পূর্ব অঞ্চলের জড় পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠনের কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু এতদিন এ ধরনের একটি আলাদা সংস্থা না থাকার অর্থই কি সমস্তাটির লম্বাধান করা বাজিল না?

আসামের ভাষা আন্দোলনই বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উৎস

বাবলকৃষ্ণ সেন

আসামের ভাষা আন্দোলন ক্রম-বিবর্তনে রূপান্তরিত হয়েছে বর্তমান বিদেশী হঠাৎ আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলনের উৎপত্তি উগ্র জাতীয়তাবাদের থেকে। ভাষা ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন—এই ছিল এদের মূল প্রোগান। কিন্তু বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শুধু ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন বলে কান্ড হতে চাইছেন না। তাদের মূল বক্তব্য হল বিদেশী বলে চিহ্নিত করে সব অ-অসমীয়াকে না তাড়ালে দেশকে অর্থাৎ আসামকে রক্ষা করা যাবে না। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ এক ক্রুড়ে অবস্থান করে সমস্ত আসামের জনসাধারণকে বিপন্ন চালিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রায়ই বলেছেন আসামের বর্তমান পরিস্থিতির জন্ত পূর্বতন জনতা ও লোকসভা সরকার দায়ী। যাকে যাকে বিরোধী দলের উপরও ঘোষারোপ করতে ছাড়ছেন না। কিন্তু ভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয় তার শাসনকালে। এমন কি তখন আসামে তাঁর দলের সরকার ছিল।

আসামের ভাষা আন্দোলন কার্যত: ভীষণরূপ ধারণ করে ১৯৭০ সনে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমে প্রসারিত করে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন পরে প্রাত্যহিক হানাহানি সৃষ্টি করে।

আসামের ভাষা আন্দোলনকারীদের দাবী স্বীকার করে নিয়ে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পরিষদে সিদ্ধান্ত নেয় প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ভাষার মাধ্যম হবে অসমীয়া। আরও এক পা এগিয়ে ডিক্রিগন্ড বিশ্ববিদ্যালয় দশম ক্লাসেও অসমীয়া ভাষা শিক্ষার মাধ্যম ঐ সিদ্ধান্ত নেয়। কার্যত: আসামের সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার লেখাপড়া করার অধিকার স্বীকৃত হল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংখ্যালঘুবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ভাষার শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তার ব্যতিক্রম হবে শুধু আসামের সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে একটা খুবই দুঃখের। এই ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান বহির্ভূত। তাই খুবই সূক্তিসম্মত কারণে আসামের সংখ্যালঘু বাঙালী ভাষাভাষীরা তাদের মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগ

পেতে আগ্রহী। ভারতের স্বাভাবিক অঞ্চলে মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগ আছে, তা এখানে থাকবে না এর কোন সূক্তি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারও মূলত: হাইস্কুল পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষার হবে এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কেউ যদি ইংরেজী বিকল্প হিসাবে রাখতে চান তার ব্যবস্থাও আছে।

আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদ পুষ্টি ভাষা আন্দোলনকারীগণ আও-রাজ্য তুলল আসামের সংখ্যালঘুদের ভাষার ও সংস্কৃতিতে সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। অসমীয়া ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার অস্তিত্ব আসামে থাকতে পারবে না। এই ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলল। আসামের ভাষা আন্দোলন নিয়ে লোকসভার বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে সরকারের তরফ থেকে বলা হল, আসামের সংখ্যালঘুদের আন্তে আন্তে আসামের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে যাওয়া উচিত। সরকার সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকারও স্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রধান বিচারালয়কেও উপেক্ষা করা হল। ডি এ ভি কলেজ ও শাহাব সরকারের যাম-লার রায় প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ২১ (১) ও ৩০ (১) ধারা ব্যাখ্যা করে বলেছেন সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মতে অন্য ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই সব উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার মিশে যাবার উপদেশ দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আরও মদত দিলেন। ভাষা আন্দোলন বিপথগামী হয়ে দ্বাদশ পর্যবেদিত হল। তার উপর আসাম সরকার সমর দিয়ে বিধানসভা না ভেঙেই রীতিনীতি, আইন ও সংবিধান এড়িয়ে গিয়ে বিধানসভার এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবকে প্রায় অস্বীকার করে। আসামের কংগ্রেস সরকার মূলত: ভাষা আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনকারীদের কাছে নতি স্বীকার করে নিলেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দাঙ্গা আরম্ভ হল এবং সংখ্যালঘুদের জীবনও লঙ্ঘন করে তুলল।

খুব পরিতাপের কথা হল

আসামের জননেতাগণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিপদ সঙ্কটে জনগণকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আসামে স্বাধীনতা সংগ্রামের ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের অভাব নেই। তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও কার্যকরীভাবে সফল হয় নি সরকারের বিরুদ্ধে। ভাষা আন্দোলন বিপথগামী হল। সেই অন্তত বীজ সেই সময় রোপিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে, সরকারের তুল নীতির জন্ত আজ তা মহীরূপ হয়ে, বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ পরিগ্রহণ করে দেশের অঞ্চলটাকে গ্রাস করতে উদ্ভূত হয়েছে।

ভারতের জনগণের কাছে প্রায় হিলাবে দেখা দিয়েছে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি থাকবে, না দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়বে। এই জটিল পরিস্থিতিতে শাসক দল ও সরকার যুখে এক কথা বলেছেন, কাজে অস্তিত্ব করেছেন। আসাম থেকে আরম্ভ করে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বিদেশী তাড়ানোর আন্দোলনকে মদত দিচ্ছে সেখানকার কংগ্রেস (ই) সংগঠন। আসামের সাতটি রাজনৈতিক দলের সমগ্র সমাধানের জন্ত আবেদন পড়ে কংগ্রেস (ই) নেই এইটাই কি প্রমাণ করে না উপরের কথাগুলির যৌক্তিকতা?

স্বাধীন সরকার গঠনের জন্ত সব কংগ্রেস (ই) নেতা প্রচারে নেমেছেন। কেন্দ্রে ত স্বাধীন সরকার ভাষা আন্দোলনের সমর ছিল, এখনও আছে। এই অবস্থার কি করে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এমন প্রোগান দিচ্ছে যা দেশপ্রোহিতার নামান্তর মাত্র? যেমন "ভারতমাতাকে ত্যাগ কর, আসাম মাতাকে পূজা কর" পোষ্টার লেখা হচ্ছে এই প্রোগান দিয়ে আর তার নীচে লেখা থাকছে United State of Assam (U. S.A)। কোন সাহসে এইসব প্রোগান পথে প্রান্তরে দেওয়া হচ্ছে? কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় সরকার কি এইভাবে বাড়তে দিতেন? নিশ্চয় না। তবে কেন আজ কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিরুদ্ধাচরণে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের প্রতি।

জনতা, লোকসভা ও কংগ্রেস সরকার একই নীতি অবলম্বন করে

একট মতবিরোধ নেই। কারণ সকলেই একটা জায়গায় ঐক্যবদ্ধ। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেখানে গড়ে উঠুক এরা কেউই চায় না। জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়ে উঠলে এদের আসন্ন টলমল করবে। কমতা রাখতে হলে বর্তমান আন্দোলনকে কিছু রহস্যময় করেও টিকিয়ে রাখতে হবে। এইটাই হল বুজোয়া গণতন্ত্রের ধারা। পৃথিবীর সব ধন তান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশের শাসকেরা এই নীতি অবলম্বন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাখতে চেষ্টা করে রুদ্ধ করে।

জনতা সরকার কমতার থাকার সমর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে একেবারে উদ্বা-নীলতা অবলম্বন করে। এবং এইটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রতিপক্ষের উপর নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করে। লোকসভা সরকার একে-বারে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নীরব ছিল। অথচ এই আন্দোলন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে লোকসভার রাজ্যে।

পরপর এই তিন তিনটি সরকারের নির্জীব নীতির সুযোগে আসাম বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জনগণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে বিদেশী নাগরিকেরাই (তাদের ভাষার সমগ্র বাঙালী সমাজ) হল তাদের দুঃখ ও দুঃশার মূল কারণ। এরাই নাকি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। অসমীয়ারা নিজের দেশে সংখ্যালঘু হতে যাচ্ছে। এর ল্যতা একটু ঘাটাই করা সরকার। ১৯৬১ ও ১৯৭১ সনের লোক গণনার রিপোর্ট আলোচনা করা থাক। ১৯৬১ সনের আদম শুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় বেঙ্গাল প্রকৃতি রাজ্যের ২৪ লক্ষ লোক চলে যাওয়া সত্ত্বেও আসামে অসমীয়ারা সংখ্যায় ৭০ শতাংশ আর সংখ্যালঘুবা ৩০ শতাংশ তার মধ্যে যাং লা তা বা তা বীর সংখ্যা ১৭ শতাংশ। ১৯৭১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা গেল অসমীয়ারা ৭১.৭৬ শতাংশ আর বাঙালীভাষা ভাষীরা গিয়ে দাঁড়াল ১১.৪৮ শতাংশে। এই লোক গণনার রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হয় অসমীয়ারা আসাম থেকে উৎখাত হতে চলেছে এই প্রচার একেবারে উদ্বেগ প্রণো-দিত এবং মিথ্যে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আন্দোলনকারীরা এই লোক গণনার হিসেব লোকচক্ষুর আড়াল করে রেখে মিথ্যে প্রচার করে চলেছে। ১৯৪৮ শতাংশ শেবাংশ ৩৪ পৃষ্ঠার

রাজস্থানের চিঠি

প্রধানমন্ত্রীর জাত নিয়ে রাজনীতি

রমাপ্রসাদ মল্লিক

শাসকদল কংগ্রেস (ই) ১টি রাজ্যে নির্বাচনের পর জাতি আত্ম-গতায় অক্ষমতাকে দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ব্যবহার করেছে। এর ফলে পার্টির দাবী—“জাত-পাত” সঙ্গীতের উর্ধ্বে বিচার—মিথ্যা প্রমাণিত হতে চলেছে। তবু দলের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড কমতা-রাজনীতির এই অপকৌশল ছাড়তে রাজী নয়; বরং তা পরম জেদের সঙ্গে প্রয়োগ করে যাচ্ছে, অস্তিত্ব পরিপত্তি বাই হক না কেন। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাতে দলীয় ক্যাবিনেটের শীর্ষে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়েছে রাজপুত বা ‘ঠাকুর’ জাতির প্রতিকূলে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি যে-ব্যক্তি এতদিন ওড়িশার তরফে বিরাজমান ছিলেন, তাঁকে পাঠানো হয়েছে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী রূপে। মহারাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ার “খাস আদমি”কে চাপান হল মুখ্যমন্ত্রী করে শ্রেষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তোরাজ করবার জন্ত। আর রাজস্থানে? এখানেও দলীয় নেতৃত্ব পাঠাল অল্পরূপ এক বিবাসভাজনকে। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের যে সমস্ত তপ-শীলি জাতির প্রতিনিধি এবং নেতৃবৃন্দ অল্পগ্রহভাজন রূপে একদিন রাজনৈতিক ভূমিকা শুরু করেছিলেন সেই জগদীশ পাহাড়িয়া মহাশয়কে কিন্তু এত সুবিধা সত্ত্বেও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী রূপে একা শপথ গ্রহণের পর স্বর্ধ্ব ১৩ দিন মন্ত্রিসভার নামমুচী দাবিল করতে পারেননি। এবং এতদিন ধরে খোঁজ খবর ও রাজনৈতিক অর্ধে উপদলীয় হিসেব-নিকেশ করা সত্ত্বেও মাত্র ৩ জন ক্যাবিনেট স্তরীয় ও ৫ জন উপমন্ত্রী সমেত এক নেহাৎ ক্ষুদ্র ক্যাবিনেট রচনা করতে পেরেছেন। মজার কথা, রাজস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গ-রঞ্জে প্রবীণ, পরিপক্ব ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন যত রাজনীতিক রয়েছেন তারা বলতে গেলে সকলেই দূরে রয়ে গেলেন। স্বদূর রইল পার্টিতে আভ্যন্তরীণ মতৈক্যের স্বপ্ন। শ্রীমতী কমলা বেনিওয়াল এবং শ্রীমতী প্রমোদ গুপ্তা বাদে বাকি সকলেই “নবীন, কাঁচা।”

কংগ্রেসের (ই) ব্যুৎসারঃ

শাসকদল ১টি রাজ্যে অকাজ-নির্বাচনের যুগল ছেড়ে ভেবেছিল, একদলীয় শাসনের একচেটিয়া প্যাটার্ন কেবল যেমন তামাম রাজ্যেও তেমনি জন্মতে বৈচিত্র্য বা বিরোধ

বিলুপ্ত করে দেবে। বিরোধী দলগুলি ক্রমশই আত্মবিক্রি ও ও হতাশায় অভিভূত হয়ে পড়বে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি কমতা-রাজনীতির প্রয়োগেও ব্যবহার করতে পারবেনা। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা তো হয়ই নি, বরং উল্টো কৌক দেখা দিচ্ছে। উদাহরণতঃ নেওয়ারা বাক, ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনে প্রাপ্ত সিট ও ভোটারপাত। এই দল ১৯৯ আসনের মধ্যে পেয়েছে ৩২টি। সারা রাজ্যে ১৮০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ১৪ লক্ষ মতাদায়ক প্রয়োগ করে, অর্থাৎ গড়ে ২২.৩%। এর মধ্যে ভাঃ জঃ পার্টির পাওয়া ভোটের অল্পপাত হল ১৮.৬০% [লোকদল পেয়েছে ১৮.৩% ভোট; সিট সংখ্যা ৭; জনতা পার্টি (চন্দ্রশেখর) পেয়েছে ৭.৩৪%, আসন সংখ্যা ৮; সি পি এম পেয়েছে মাত্র ১.২০%, আসন সংখ্যা ১]

কিন্তু আপাতদৃষ্টে কংগ্রেস (ই) মোট আসন সংখ্যার ২/৩ অংশ, অর্থাৎ ১৯৯-এর মধ্যে ১৩৩টি পেয়ে “বিজয়ী” হলও প্রকৃত জয়লক্ষী ছোটেনি। প্রদত্ত বৈধ ভোটের মাত্র ৪২.১৬% অংশ জুটেছে; অবৈধ ভোট গণনার ধরা হলে এই অল্পপাত আরো কম যাবে। শুধু তাই নয়; কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের বিজয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধীদল প্রার্থীদের মধ্যে ভোট-ভাগাভাগির প্রসাদে পাওয়া। জেতা আসনের মধ্যে ১০টি এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর পাওয়া ভোটের ব্যবধান অত্যন্ত কম, ৫০০-র অনধিক। ১৪টি আরও ক্ষেত্রে “জয়ের” মান মাত্র ১০০০ বা তার চেয়েও কম ভোটের ব্যবধানের ওপর কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

এ তো ভোট-অঙ্কের দিক। সংগঠনের বিচারে আত্মন। নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলগুলির মাঝে যা ভাঙন হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। নির্বাচনোত্তর কালে এই দলগুলির অভ্যন্তরে আর অভ্যবিরোধ বা গোষ্ঠী-বাদের স্বপ্ন দেখা দেয়নি। বরং, ভাঃ জঃ পার্টি—যা আজ রাজস্থানে শাসক-দলের প্রথম ও প্রধান প্রতিদ্বন্দী—তার আন্তর সংগঠন পূর্বাপেক্ষা মজবুত করেছে। এই পার্টির মূল অংশ জনসভ্য তৈরী। সিং সেখাও-রায়-মন্ডলের কালে (জনতা যুগে) কেবল প্রশাসনিক-কার্মিক বর্গে অল্প-প্রবেশ করে ক্ষান্ত থাকেনি, ‘অন্তো-দয়’ এবং ‘কাজের বদলে আনাজ’ পরিষোধনা রূপান্তরিত করার মাধ্যমে

গরীব এবং ধরার প্রকোশে পীড়িত নিম্নস্তরীয় ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কাজ করেছে, দলের জনপ্রিয়তা-বাড়িয়েছে। প্রত্যুতঃ জনসভ্যের মাঝে প্রশিক্ষিত-কৃষক বর্গের প্রতি মোড়ানো (oriented) নীতি প্রয়োগ করার কৌক, ভ্রমপ্রকাশ নারায়ণের আরও আন্দোলনের লক্ষ্য এবং জনপ্রিয়তা ভিত্তিক কার্য প্রণালী থেকে শেখা; এবং প্রমাণ করে যে, জনসভ্যের প্রাক্তন বামধারাবলম্বী “নেতা” দীন-দয়াল উপাধ্যায়ের অল্পহত রাজনৈতিক সংগ্রামের পরম্পরা জনসভ্য দলকে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করেছে। বাস্তব সত্য হল, রাজস্থানে জাতি-জাতিবাদ ও উচ্চ স্তরের কৃষক-মালিক-নেতৃত্ব চালিত লোকদল নির্বাচনের ধাপে ধাপে জন-ভোটের সম্পদ খুইয়েছে; জাহ্নয়ারির লোক-দল নির্বাচনে প্রাপ্ত ১২.০৪% অল্প-পাত থেকে মেমে গেছে ১৮.৩%তে রাজনারায়ণজীর জনতা (এন) আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু অল্প বিরোধী দল-গুলির দ্বারা প্রায় “একঘরে” হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভাঃ জঃ দল তার সংগঠন শক্তি নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে বাড়তে পেরেছে। সাম্প্রতিক-তম নির্বাচন এই দলকে নিরাশাগ্রস্ত করেনি, ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাই নির্বাচনোত্তর কালে এখন কংগ্রেস (ই) সংগঠনের ভেতর থেকে “বাগি” বা বিদ্রোহী-উপকরণ বিতাড়নের পাল্লা—‘দীকর’ জেলায়, উদয়পুরে চিতোরে গজানগরেও—কোথা য় নয়।

বিরোধী দল এবং সি, পি, এম নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে যাবার অব্যবহিত পরেই বিশ্লেষণের বাহানা তুলে শাসক দল এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে লোকদল ও সি, পি, এম পারস্পরিক অভিযোগের বৃহৎখণ্ডিকা খাড়া করেছে। এখানে সি পি এম পার্টির ভূমিকা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে; কেননা, এই দল কংগ্রেসের (ই) বিকল্প হিসেবে জনতা পার্টিতে স্বীকার না করে আত্ম ভবিষ্যতে নির্মীয়মান, প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক বামমোর্চার বিকল্প জন-গণের সামনে সম্ভাবনা রূপে তুলেছে। স্বতরাং এই দলের প্রাক্তীয় সংগঠনের সেক্রেটারি শ্রীমোহন পুনামিয়া নির্বাচনের সময় কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা বিচার্য। ইনি জয়পুর শহরাক-লের অন্ততম ক্ষেত্র ‘বাণীপার্ক’ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে কিছু শিল্প-প্রমিক বাস করেন। ইনি

প্রার্থী হিসেবে যদি তাদের দাবী এবং অধিকার সংহিতা নিয়ে প্রচার চালাতেন, বলার কিছু ছিল না। কিন্তু সেদিকে চিলেখি দিয়ে ইনি পার্টির প্রচারবস্তুকে সরিয়ে আনলেন জয়পুরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী লুপ্পেন প্রোলেতারিয়েতের সম্প্রদায়-কারী চাহিদার দিকে। এরা ‘কচি বস্তি’র (কাঁচা ঘরের বস্তি) বাসিন্দা। প্রায় ১৫১৬ বছর পূর্বে এদেরকে ‘পি কে চৌধুরী’ (প্রাক্তন এম এল এ কংগ্রেস : সংযুক্ত) আপন জমির অংশ বিতরণ করে বিজ্ঞাপিত করিয়ে-ছিলেন লংগল এলাকার। কাল-ক্রমে এরা কাঁচা ঘর পাকা বাড়িতে পরিণত করেছে, আরও কিছু জমি জবরদখল করেছে; এবং ধীরে ধীরে বুর্জোয়া-শ্রেণী হুলত সম্প্রদায়-কারী ভূমিকা নিতে আরম্ভ করল। মার্জীয় দর্শন দ্বারা সামান্ত জানা আছে, সে বোঝে বুর্জোয়া শ্রেণীমান-সিকতা ও সাংস্কৃতিক বেরাটোপের (Culture Superstructure) আওতার প্রভাবিত লুপ্পেনদের প্রতিবিপ্লবী কৌক কি ভাবে দেখা দেয় এবং বিপ্লবী চেতনা দ্বারা সংযুক্ত না হলে তা প্রতিক্রিয়াবাহী ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু রাজস্থানের প্রাদেশিক সংগঠনের সি পি এম নেতা শ্রীপুনামিয়া নিছক নির্বাচনী অবদরবাহ এবং দলীয় জনপ্রিয়তার লোভে ঠিক এমনি প্রতিক্রিয়াশীল কৌক জাগিয়ে তুলতে কার্যকর হলেন; ‘পি কে চৌধুরী’ জীর জমি এবং আশ্রয় পরিপ্রসঙ্গে গড়ে তোলা ব্যবসা জবরদখল করার জন্ত অস্ত্রাণ ও বে-আইনী লোভ বা কাজ কর-ছিল তা জাগিয়ে তুললেন। ফলে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সাহায্য করা হল : সাহায্য করা হল একনারক-তন্ত্রী তথা বৈরাচারবাহী কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর নির্বাচনী জয়ের পক্ষে। রাণী-পার্ক ক্ষেত্রের ভোট ফলাফল দেখুন : প্রদত্ত বৈধ ভোট—৫৬,০৫১ শিবচরণ শর্মা (কং-ই—১৮,৩৩৪—নির্বাচিত)। জগদীশ প্রঃ মাধুর (ভাঃ জঃ পাঃ)—১৬,৮০৪। মোহন

পুনামিয়া (সি পি এম)—১৫,০৬৮। বিশ্বস্তের অবকাশ থাকেনা যখন এ-হেম সুযোগদক্ষানী প্রবৃত্তি এবং নব-সংশোধনবাদের প্রভাবচালিত রাজস্থান-সি পি এম যুনিটের নির্বাচনে কার্যকরী এলেন দেখা যায়, পার্টি টিকিটে দাঁড়ানো ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জনেরই জামানত জব্ব হওয়ার মাত্র এক প্রার্থী জিততে পেরেছেন, তাও মেহাৎ সিটের জোরে।

হায় স্থায়িত্ব ছলনাময়ী!

এত কাঁচা পুড়িয়ে, সন্নিহিত লতক পা ফেলে এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রিসভা করলেন বটে শ্রীজগদীশ পাহাড়িয়া, কিন্তু প্রচুর জয়না করলো অন্তঃরচিত রাজ্য ক্যাবিনেটে একজনও নামকরা বর্ষায়ান কংগ্রেস (ই) নেতা নেই, যার ভাবমূর্তির জোরে স্বাধির মিলতে পারে। ১৩০ কংগ্রেস (ই) এম এল এম মধ্যে অন্ততপক্ষে তিন ফ্যাক্‌ট-গ্রুপ আন্তর বিরোধে প্রমত্ত আজ : কেউ কেউ বলেন (রাজধানী জয়পুরে) চারটি গোষ্ঠী কাজ করেছে। শ্রীপাহাড়িয়ার প্রভাবে বড় বেশী হলে তেজিশ জন : ইনি নিজেও এম এল এ পদ প্রত্যাশী। হ’সাসের মধ্যে তাঁকে কোনো বিধানসভা আসনের প্রার্থী হতে হবে। জনপ্রতি এই যে, যে কোনো আরকিত সিটে দাঁড়ালেই তাঁর পক্ষে বিজয় লাভ সম্ভব নাও হতে পারে।

মন্ত্রিসভার নাম-তালিকা ঘোষণা হবার পর স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ক্যাবিনেটে প্রবীণ ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ কংগ্রেস (ই) রাজনীতিজ্ঞ তথা নেতা-দের একজনও নেই। অল্পপন্থিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বাধিক প্রদেয় শ্রীমোহনলাল সুধাড়িয়া, অল্পপন্থিত সর্বশ্রী হীরালাল দেবপুরা, শিবচরণ মাধুর, জনার্ম সিংহ গহলোত জোখ-পুরের আহমদ বংশ সিদ্দী, অল্পপন্থিত ইমার্জেলী যুগ-খ্যাত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিদেব বোশী যিনি শেবাংশ ৪র্থ পাতায়

প্রকাশিত হল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত মহাপৃথিবীর কবিতা

দাম—আট টাকা

অল্পরাজকর্ম যে স্বজনশীল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে কবিতাগুলি তারই স্বাক্ষর বহন করেছে। কবিতা নির্বাচনে কবির বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। কবিতাগুলি সংগ্রামের, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। এন্ড্রিমো, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের লোকগাথা যেমন আছে তেমনি রয়েছে চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, জার্মানী, পোল্যান্ডের নিগ্রো কবিতার পরিচয় মাও সে তুঙ হো চি মিন-ব্রেশটের অল্পবাদগুলি অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশক ॥ কথামির ১১ ভ্রামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

বাম গণতান্ত্রিক একা নয় সশস্ত্র বিপ্লব

গত লোকসভার নির্বাচনে বৈরাচারী ইন্দিরার একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে বিধানসভার নির্বাচন আর একবার প্রমাণ করে দিল যে ভারতের মতো আধা-গণনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কখনোই জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে না। ভারতের মতো দেশে যেখানে শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী মানুষের ভোতের কোন অধিকার নেই, সেখানে ভোটের কি সার্থকতা? তবুও অমেকে বলবেন যে ইন্দিরাতো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হয়েছেন। সত্যতঃ নির্বাচনে জনগণের অনীহা কোথায়? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতবর্ষের সংখ্যা-ধিকারী মানুষই নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভোট দেয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণ সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আবার কিছুটা সমস্তার দিশেহারা হয়ে মুক্তির সহজতম রাস্তা পাওয়ার আশায় ভোট দেয়। সত্যতঃ ভারতবর্ষের নির্বাচনগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মূলত জনগণের নেতিবাচক ভোটে জয়লাভ করে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বোটা ছুঃখজনক ঘটনা, সেটা হচ্ছে এই যে, ভারতে ৫০ বছরেরও বেশী একটি কমিউনিস্ট পার্টি থাকা সত্ত্বেও আজও ভারতের ব্যাপক জনগণ বুদ্ধী, বেকারী, অশিক্ষার মধ্য দিয়ে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট নেতৃদ্বন্দ্বী লাক্ষ্মীনাথ ও সামন্তবাদের তৈরী বুদ্ধীরা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তির মিথ্যা প্রোগানকে জনগণের মাঝে হাজির করেছে। তারা জনগণকে বোকারনোর চোটা করেছে যে সং ও ছুর্নীতি-মুক্ত প্রশাসনের দ্বারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সরকার গঠন করেও জনগণের উপকার করা যায়। বামপন্থী হলগুলো মন্ত্রী বহুলের মধ্য দিয়ে প্রেরণী শক্তির ঘুম কেড়ে নেবে বলে দাবী করে। এমন কি বাম-ক্রান্তের মধ্যমন্ত্রী প্রমিকদের সভার ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থাকলে তারা জনজীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেবেন।

বুদ্ধীরা রাষ্ট্রব্যবস্থার তেতর মন্ত্রী বহুলের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন, “বুদ্ধীরা পার্লামেন্টারী এবং বহুলাংশে বুদ্ধীরা সাম্প্রদায়িক দেশগুলির সমগ্র ইতিহাস ঘেঁষিয়ে দিচ্ছে যে মন্ত্রী বহুলে

বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ প্রশাসনের আসল কাজ যাকে এক বিরাট আমলা বাহিনীর হাতে আর এই বাহিনীটি আগাগোড়া অগণতান্ত্রিক। এই বাহিনী বুদ্ধীরা প্রেরণী ও জমিদার প্রেরণী সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বন্ধনে আবদ্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে তাদেরই উপর নির্ভরশীল। এই বাহিনীটিকে ঘিরে রেখেছে বুদ্ধীরা সম্প্রদায়বাহীরা আবহাওয়া। এবং নিখাদরূপে এই আবহাওয়া ছাড়া আর কিছুই সে গ্রহণ করতে পারে না। সে নিজের পথে চিরকালের মতো আটকে গেছে। সে অসাড়, সে আবদ্ধ, সে এই আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে অসমর্থ। সে শুধু জানে পুরানো পন্থার ভাবতে ও কাজ করতে। এই বাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্বারা নিখাদ সার্ভিসের কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগের দাসত্বে শুল্কিত। এই বাহিনীর উপর-ওয়ালারা শেরার ও ব্যাংক মারফৎ সম্পূর্ণরূপে কিনা পুঞ্জির দ্বারা। তাদের স্বার্থের ও প্রভাবের ধারক ও বাহক।

“এই রাষ্ট্রবর্ষের মারফৎ বিনা খেলারত্রে জমিদার উচ্ছেদ বা খাজ শক্তির উপর একচেটিয়া অধিকার ইত্যাদি সংস্কার সাধনের চেষ্টা করার মতো এত বড় মোহ আত্মপ্রতারণা ও জনগণকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই বর্ষের সাহায্যে কোন রিপাবলিকান বুদ্ধীরা প্রেরণী করাসী ভূতীর রিপাবলিকের মতো রাজহীন রাজতন্ত্র খাচের একটি রিপাবলিক তৈরী করতে পারে। কিন্তু পুঞ্জির অধিকারগুলি বা পবিত্র (?) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারগুলি বিলুপ্ত করা দূরে থাক, সেগুলোকে ভালভাবে ধর বা দীক্ষিত করার ক্ষমতাও তার নেই।

“অতএব সোশালিস্টদের নিয়ে গঠিত এই প্রকারের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার সর্বদা এই-যেটো থাকে যে, এই সোশালিস্টরা এমন কি যখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ লং তখনও বাস্তবক্ষেত্রে তারা হয় অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার হয়ে দাঁড়ান, না হয় জনগণের ক্রোধ থেকে সরকারকে আড়াল করার বস্ত্র হয়ে দাঁড়ান, সরকার কর্তৃক জনগণকে প্রবঞ্চনা করার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ান।” [লেনিন—“বিপ্লবের একটি মূল প্রশ্ন” রচনা সংকলন, ভ্যলুম ২৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭-৩৬৮, মস্কো সংস্করণ]

এবার আমরা ভারতবর্ষ এবং বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বামক্রান্ত সর-

কারের নীতি ও কর্মপদ্ধতিগুলি লেনিনের মার্কসবাদে বিচার করি। প্রথমতঃ ভূমি সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে বামক্রান্ত সরকার ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। তারা সরকারী খাস জমি বিক্রি ও বর্ণা অপরেশনের মধ্য দিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার সমাধানের ভুল প্রোগানে গ্রামের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। আসল কথা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখে কোনভাবেই গরীব কৃষকের ভূমি সমস্যার সমাধান করা যায় না। জমির সমস্যা সমাধান

মতামত

করতে কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলার বদলে বামপন্থী দলগুলো এটাকে আইনী গণ্ডির মধ্যে সমাধান করতে চাইছে। তারা জমিদারদের বোকাইনী জমি রাখতে পারার ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলছে না এবং জনগণের দৃষ্টিকে আইনী গণ্ডির বাইরে প্রসারিত হতে দিচ্ছে না।

দ্বিতীয় বিদেশী পুঞ্জিপতিদের প্রতিও বামক্রান্ত সরকার উদার মনোভাব গ্রহণ করেছে। তারা বিদেশী শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প স্থাপনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। ঐদব বিদেশী পুঞ্জির আগমনের ফলে আমাদের দেশীয় পুঞ্জির ক্ষয় বেড়ে উঠছে না। বরং বেটু পুঞ্জি ক্ষয় হচ্ছে তার একটা বড় অংশ বিদেশী শোষণের ফলে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই তারা আজকের কয়েক হাজার বেকার ছেলেকে কাজ দেবার মাধ্যমে আগামী দিনের কয়েক লক্ষ ছেলের বেকারত্বের জমি তৈরী করেছে।

বর্তমান রাষ্ট্রবর্ষের চরিত্র ও গঠন সম্পর্কে বামপন্থীরা জনগণকে মোহাচ্ছন্নও করে রাখছে। “রাষ্ট্র যে প্রেরণী শাসনের বস্ত্র” এই সত্য কথাটা বামক্রান্ত সরকার সবসময়েই নিজেকে মন্ত্রীদের মোতে আড়াল করে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে বামক্রান্ত সরকারের আমলেও কংগ্রেসী রাজত্বের মতো সমানভাবে জনগণের উপর অত্যাচার চলছে। নীচের কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে তা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

(১) পৌরসভার মেয়রদের ধর্মঘটে ২০০ জনের মতো প্রমিককে প্রেরণী করা হয়েছে। ধর্মঘট ভাঙার জন্য পুলিশ না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বামক্রান্ত সরকার সে প্রতি-

শ্রুতিভেঙ্গেছেন। (যুগান্তর ২৪।১।৭৭)

(২) গত ১২ই অক্টোবর দুর্গাপুরে ডি ডি সি’র প্রমিক কর্মচারীরা বোনাসের দাবীতে ডি ডি সি’র স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ১২ ঘণ্টা ঘেরাও করে। ঘেরাও থেকে কর্তৃপক্ষকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে ও লাঠি চার্জ করে। (প্রমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল, নভেম্বর ৭৭ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

(৩) গত ২৮শে কার্তিক তারিখে আদিবাসী অধ্যুষিত রামপুর থানার মামরা গ্রামে নিমাই মণ্ডল জমিতে গিয়ে দেখে যে জমিতে সে চাষ করেছিল, জমির মালিক পুলিশ দাঁড় করিয়ে তার ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে। (যুগান্তর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ)

(৪) গত ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা বিভাগে অবস্থানরত মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠি-চার্জের ঘটনাও নিশ্চয়ই সকলেরই জানা আছে।

(৫) গত ১১৭১ সালের ১৫ই জুন এস, ইউ, সি আয়োজিত গণ-মিছিলের ওপর বামক্রান্ত সরকারের পুলিশ বর্বর আক্রমণ করে।

(৬) কলকাতা বন্দরের ধর্মঘট প্রমিকদের ওপর বামক্রান্তের পুলিশ বর্বর অত্যাচার চালায় এবং বেশ কয়েকজন প্রমিককে গুলি করে হত্যা করে।

(৭) গত বছর মরিচবাণির নিরীহ উদ্যোক্তাদের ওপর বামক্রান্ত সর-

রাজস্থানের চিঠি

৩য় পৃষ্ঠার পর

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যেই সঙ্গীন লম্বয়ে নাকি একান্ত বশব্দ ছিলেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্ভতার নিতে প্রায় একপক্ষকাল দেয়ী হয়ে গেল : মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়িয়াজী মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি ; বড়ই দেয়ী হয়ে যার দেখে ঐ সময়টার জন্য লচিবালয়ের লচিব, মহালচিব, উপদলচিবের ঢালাও কর্তৃব্ব ছিলেন মন্ত্রী লম্বপদ্যী ক্ষমতা প্রয়োগের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের—বুদ্ধি প্রশাসনিককর্তব্যাক্তিয়া মাইনে পার মন্ত্রীদের বকলমে কাজ করবার জন্য!

মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলেছেন, সর্বভৌগোলিক ক্ষেত্রের, বর্ণের ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে রাজ্য-ক্যাবিনেটে। কার্ভক্ষেত্রে দেখা গেল, আদিবাসীদের একটি প্রতিনিধিও জুটলো না। এর কারণ কি এই যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল মাত্র ১৬টি আধিম-ভাতি আসন জিততে পেরেছে? অথচ, জাহ্নবীরী লোকসভা নির্বাচনে এই দলের ২১টি

কারের বর্বর পুলিশ অসাম্প্রদায়িক নির্বাতন চালায় এবং বহু উদ্যোক্তাকে গুলি করে হত্যা করে।

(৮) গত ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে বীকুড়ায় গ্রামে বামক্রান্ত সরকারের পুলিশ পাইকারীভাবে অত্যাচার চালায় এবং বিশিষ্ট নকশাল নেতা ভোলানাথ শীটের উপর অসাম্প্রদায়িক দৈহিক নির্বাতন চালায়। ওপরের ঘটনাগুলি একথাই প্রমাণ করে যে, যতদিন চলতি রাষ্ট্র-বস্ত্র বজায় থাকবে, ততদিন গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী কাঁপিয়ে পড়বেই। কংগ্রেসী নেতা কুখ্যাত সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারই থাকুক অথবা কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বহুর সরকারই থাকুক।

বামক্রান্তের দলগুলো রাষ্ট্রবর্ষের এই গণবিরোধী চরিত্রটাকে আড়াল করে জনগণকে মিথ্যা আশ্বস্ত করছে, তাদের প্রকৃত শক্তিকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা জনগণকে বোঝাচ্ছে না বা সেই শক্তিকে গড়ে তোলার কোন বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। এই নীতিতে তারা নীচেরতলা থেকে যে কোন রকম গণ আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রয়াসকে নিকংসাহ করছে। প্রমিক-দের ধর্মঘট, ঘেরাও আন্দোলন না করার পরামর্শ দিচ্ছে। কৃষকদের জমি সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে বাম সরকারের আইনের জন্য অপেক্ষা শেয়াংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

এমন ক্ষেত্রে বহুতর জুটেছিল।

পশ্চাদপদ্য ভাতি ভজর, অহীর, কালবি ইত্যাদিদের প্রতিনিধি এখনও পাওয়া যায় নি : মুখ্যমন্ত্রী অবস্ত্র বলছেন, পাওয়া যাবে। তবে স্বয়ং হরিজম হওয়া সত্ত্বেও ক্যাবিনেটে সহ-হরিজম শ্রীমাদীলাল আর্ধকে নিলেন মাত্র উপমন্ত্রী হিসেবে, তাও আবার পূর্ণমন্ত্রী শ্রীমতী কমলা বেনী-ওয়ালের সঙ্গে সম্বন্ধ করে (কৃষি, পশু-পালন, শ্রম এবং মিসুজি, জেল ও জনকল্যাণ, পূর্নবাসন ইত্যাদি)।

রাজ্য মন্ত্রিমণ্ডলী ঘোষণা হওয়া আর বর্ষীয়ান অভিজ্ঞ পার্টি নেতা তথা রাজনীতিকদের দূরে সরে থাকা, পাশ কাটিয়ে দারিদ্ৰ গ্রহণে অলমস্ত হওয়া, কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে তথ্যাস্তিত্ত মহলে নিদারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

কেত্র অবস্ত্র রাজ্যে আপন পেটোয়া মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুর্কাল যে করে হ’ক বাড়িয়ে দাবার জন্য সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছে এবং দেবে। কিন্তু কতদিন, এবং কতদূর পর্যন্ত এই ঠেকো? ১৯৭৮০

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের দুর্নীতি এবং অপদার্থতার ট্রান্সফর্মার বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় একটি সংখ্যার নিকট ছয়টি ট্রান্সফর্মার (৩ এম ভি) সরবরাহের অর্ডার দেয়। যার আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। ট্রান্সফর্মারগুলি বিদ্যুৎ পর্ষদের হাতে এসে পৌঁছায় ১৯৭১ সালের আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। কিন্তু সেগুলিকে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভিন্ন দাব-স্টেশনে এই সব ট্রান্সফর্মারগুলিকে কাজে লাগানো হয়। কাজে লাগানোর এক বছরের মধ্যে এইসব ট্রান্সফর্মারে গোলযোগ দেখা দেয়। দেয়ীতে কাজে লাগানোর জন্ত এই সব ট্রান্সফর্মারের "গ্যারান্টি গিরিয়ড" উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আইনগত বাধা দেখা দেয়। পর্ষদের কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে সরবরাহকারী সংস্থাটি চারটি ক্ষেত্রে মেয়ামত বাবদ অর্ধাংশ বহন করতে রাজী হয়। দেখা যাচ্ছে যে, মেয়ামত বাবদ খার্ব হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই অর্ধের অর্ধাংশ বহন করতে হবে বিদ্যুৎ পর্ষদকেই। এই ঘটনা এর পরে কতদূর গড়িয়েছে তা অবশ্য ১৯৭৯ সালের মে পর্বন্ত জানা যায়নি। তবে একথা বুঝতে কোন অসুবিধাই নেই যে, পর্ষদ কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার কারণেই বিদ্যুৎ পর্ষদকে এত টাকা গুচা দিতে হয়েছে। ঐ সরবরাহকারী সংস্থাটির সঙ্গে বিদ্যুৎ পর্ষদের কয়েকজনের আর্থিক লেনদেনের কথাও উড়িয়ে দেয়া যায়না। কেননা সরবরাহ করা ট্রান্সফর্মারগুলিকে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হল কেন এবং কেনই বা গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে সেগুলিকে কাজে লাগানো হল?

আরও একটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা দামের একটি ট্রান্সফর্মার (৫ এম ভি এ) ১৯৭৪ সালের জুন মাসে হাতে পেয়েও ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ফেলে রাখা হয়। পরে পরীক্ষা করে তাতে গোলমাল ধরা পড়ে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে। গ্যারান্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সরবরাহকারী সংস্থাটি গোলযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

যদিও পরে ঐ সংস্থাটি বিনামূল্যে মেয়ামত করে দিতে রাজী হয়। তবে পরিবহনের জন্ত যে খরচ হবে তার দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হবে পর্ষদকে। বোম্বাইয়ের কারখানার ট্রান্সফর্মারটি পাঠাতে পর্ষদকে দিতে হবে অনধিক ১৬ হাজার টাকা। এ সম্পর্কে টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্য এখনো জানা যায়নি। ১৯৭৯ সালের মে মাস অবধি ঐ ট্রান্সফর্মারটি কাজে লাগানো হয়নি। এই ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক লেনদেনের কথা উড়িয়ে দেবার নয়।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সেন্দ্রীল স্টোর ভ্রামনগরের কর্ড রোডে অবস্থিত। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে এই সেন্দ্রীল স্টোর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বেশ কিছু ট্রান্সফর্মার এই স্টোরে দীর্ঘদিন ধাবৎই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ২৫ কিলো ভোল্টের কম ৫টি ট্রান্সফর্মার পড়ে রয়েছে ৫ বছরের অধিক সময়। ২৫ কে ভি ক্ষমতার ৬টি ট্রান্সফর্মার পড়ে আছে ১ বছরেরও বেশি। ৫০ কে ভি ক্ষমতার ১১টি এবং ৮টি ট্রান্সফর্মার পড়ে রয়েছে যথাক্রমে ১ বছরেরও বেশি এবং ৫ বছরের বেশি সময় ধাবৎ। ১০০ কে ভি ক্ষমতার ৩টি ট্রান্সফর্মার পড়ে আছে ৫ বছরেরও বেশি সময়। ৫০০ কে ভি ক্ষমতার ১টি ট্রান্সফর্মার পড়ে আছে ১ বছরেরও বেশি এবং ১১টি ট্রান্সফর্মার পড়ে রয়েছে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধাবৎ। ৩ হাজার কে ভি ক্ষমতার ৪টি ট্রান্সফর্মার পড়ে আছে ৫ বছরেরও বেশি সময়। ৫ হাজার কে ভি ক্ষমতার তিনটি ট্রান্সফর্মার, সাড়ে ১২ হাজার কে ভি ক্ষমতার ১টি ট্রান্সফর্মার এবং ১০টি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধাবৎ। এইসব ট্রান্সফর্মার কেনা হয়েছে ২২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকায়।

জরুরী প্রয়োজন চাড়াই কেন এতগুলি ট্রান্সফর্মার কেনা হল? সেগুলির বর্তমান অবস্থা কেমন সে বিষয়ে কোন তথ্য অবশ্য জানা যায় নি।

এছাড়াও কয়েকটি পাওয়ার ট্রান্সফর্মারকে ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে। আপেকার হিসাবের মধ্যে এর উল্লেখ নেই।

১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা মূল্যের তিন এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার ১৯৬৭ সালের আগে কোন এক সময়ে (সঠিক তারিখ নেই) পর্ষদের সেন্ট্রাল স্টোরে আসে এবং পড়ে থেকে থেকে মরচে ধরে যায়। ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে এটিকে পর্ষদের বাবদ-পূরুষ কারখানার পাঠানো হয়। সেখানে এটি মেয়ামত করা হয়। মেয়ামত বাবদ কত ব্যয় হয়েছে তা রেকর্ড করা নেই। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে এটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাকরদা দাব স্টেশনে। এটি সেখানে বসানো হয়েছে কিনা ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত তা জানা যায়নি।

১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মূল্যের

গরীব মানুষের সেবায় নিযুক্ত নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশনের দাবী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের দোহল্যমান নীতির দরুন এই রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং হুদূর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় এবং সেবায় নিযুক্ত প্রায় চল্লিশ হাজার নন রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহা বিপদে পড়েছেন। কারণ, এই সব ডাক্তারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও বিচ্ছিন্নভাবে যদিও তাঁদের রেজিস্ট্রেশনের দাবী করা হয়েছিল, তথাপি সরকার আজো তার সঠিক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ঐ নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের পক্ষ থেকে বারংবার দাবী করা হয়েছে যে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা কার্বে রত এবং অভিজ্ঞ এই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের সরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা নিয়ে তাঁদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হোক। কিন্তু, তাতেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিগত ১৯৭০ সালে রাজ্য সরকার কিছু সংখ্যক নন-রেজিষ্টার্ড অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরীক্ষা নিয়ে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু, তাও সব ক্ষেত্রে নয়। কারণ, অভিজ্ঞ নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে—একথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারের বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এর ফলে,

১ এম ভি এ ক্ষমতার একটি ট্রান্সফর্মার ১৯৬৬ সাল থেকে অব্যবহৃত অবস্থায় মালদার পড়ে ছিল। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং মেয়ামতীর জন্ত এই পাওয়ার ট্রান্সফর্মারটিকে পর্ষদের কলকাতার কারখানার পাঠানো হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ওটি ঠিকই আছে এবং তখন সেটিকে ট্রাকে পাঠিয়ে দেয়া হল মালদার কালিচক দাব স্টেশনে ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে। সেই ট্রান্সফর্মারটি পাঠাতে খরচ হয়েছে ৪ হাজার টাকা। ১৯৭৯ সালের মে মাস অবধি পর্ষদের কাগজপত্র থেকে একথা জানার কোন উপায়ই নেই যে, ওই ট্রান্সফর্মারই কালিচকে বসানো হয়েছে কিনা।

৭৬ হাজার টাকা মূল্যের দেড় এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শিলিগুড়ির আঞ্চলিক স্টোরে এসে পৌঁছায় ১৯৬৬ সালে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের চিকিৎসায় নিয়োজিত এই নন-রেজিষ্টার্ড ডাক্তারদের অধিকাংশই সরকারী উদ্যোগে গৃহীত ঐ পরীক্ষা দেওয়ার বা আবেদন করার কোন স্বেচ্ছাগই পান নি।

অথচ, রাজ্যের শহর এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় চল্লিশ হাজার ঐ ধরনের নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একদিকে যেমন গরীব এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় আত্ম নিয়োগ করেছেন, অপরদিকে তেমনি নিজেদের উদ্যোগে তাঁদের জীবন-জীবী-কার সংস্থান করে নিয়েছেন।

তর্কের খাতিরে, বিতর্ক করা যেতে পারে যে, এই নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা হাতুড়ে। কিন্তু, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে সরকার স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা এবং রেজিষ্টার্ড অনেক ডাক্তারের চাইতে এরা কোন অংশে কম নন, বরং তাঁরা ঐ সব রেজিষ্টার্ড হোমিও ডাক্তারের চাইতে অনেক অভিজ্ঞ। কারণ, বর্তমান হোমিওপ্যাথিক কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে একাংশের নকল করে পাশ করার ঐক্য বেড়েছে। কিন্তু, নন রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে তা ছিল না। সেহেতু তাঁরা কোন সরকারী কলেজে পড়েন নি। অপরদিকে, তাঁরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে গাঢ়া গাঢ়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাংলা

সেই ট্রান্সফর্মার দুটি ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত শুধামে অব্যবহৃত অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে বলে পর্ষদের নথিপত্রে প্রকাশ।

এই জাতীয় ঘটনার এই সব দামী ট্রান্সফর্মারকে কেন এত দিন ধাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে তার কোন কারণ অবশ্য জানা যায়নি।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে কংগ্রেসী জমানায় ট্রান্সফর্মার নিয়ে কি ধরনের কেলেকারী হয়েছে এবং কিভাবে সরকারী অর্থ নষ্ট ছর করা হয়েছে তার বিবরণ বিগত দুটি প্রতিবেদনে দর্পণের পাঠকবর্গকে অবহিত করেছি। বর্তমান প্রতিবেদনেও সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলাম। পরবর্তী প্রতিবেদনে ট্রান্সফর্মার ব্যতিত আরও কিছু তথ্য দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। তার পর শুরু হবে কেবল জয় সংক্রান্ত কেলেকারীর বিবরণ।

বই কিনে এবং তা পড়াশুনা করে, সম্ভব হলে কোন কোন ক্ষেত্রে রিক্রেশনাল কোর্স বেসরকারীভাবে ট্রেনিং নিয়ে তাঁরা ডাক্তারী করছেন। নিজেদের পেশার স্বার্থেই তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে এবং হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র চর্চা করে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যক্তির চিকিৎসা এবং সেবা করে চলেছেন।

কাজেই, বায়ফ্রন্ট সরকারের অবিলম্বে এই সব নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা উচিত বলে ওয়াকিবহাল দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন। এতে বায়ফ্রন্ট সরকারের ক্ষতি তো হবেই না, উপরন্তু এতে তাঁদের প্রভাব বাড়বে। এছাড়া, এঁদের রেজিস্ট্রেশন দিলে রাজ্যের বায়ফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিকভাবে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের গরীব ও দুঃস্থ রোগী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন বলে ওয়াকিবহাল মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রাজ্যের বায়ফ্রন্ট সরকার এই সব নন-রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে রেজিস্ট্রেশন না দিলেও এঁরা কিন্তু, তাঁদের পেশা বন্ধ করেন না। এঁরা যেভাবে এতদিন শহর ও গ্রামের গরীব মানুষের সেবা করেছেন, ভবিষ্যতেও তাঁরা তাই করবেন বলে তাঁদের পক্ষ থেকে হাসিমুখে জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

ইন্দিরা চক্রের ওপর থেকে যে মামলাগুলি তুলে নেওয়া হল

দেবশিস ভট্টাচার্য

এ বছরের চোদ্দই জুলাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শপথ নেন। এরপর থেকেই জরুরী অবস্থাকালীন সেই ইন্দিরা চক্রের উপর থেকে একটার পর একটা মামলা উঠে যাচ্ছে। হর পুলিশ বা সি বি আই অফিসাররা কেসে বথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাব দেখাচ্ছেন নতুন। স্বয়ং বিচারপতিরাই মামলা চালাবার পক্ষে নিজেদের যোগ্যতার নিজেরাই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। মামলার কাগজ পত্র চোখে সামনে নিয়ে বোধ হয় এরা সঙ্গর ত্রিগুণের সূত দেখছেন। দু' একজন ভৌ রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিচারপতি ভগবতীর মতো শ্রীমতীকে চিঠি লেখার ভাষা খুঁজছেন। ম্যাডামের শুভবুদ্ধি থাকার ক্ষমতা দলীয় বিধায়ক-দের মতোই অফিসার, বিচারপতি লকলেই রেস দিচ্ছেন। আর বিচার-পতি শাহ ও অলোক গুপ্তর সংসারে না জানি কত অশান্তিই হচ্ছে। কারণ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের গণ-তন্ত্রের স্বরূপ এরা ভালোই বোঝেন। শাহ কি তুলে গেছেন আটাত্তরের বাইশে এপ্রিল কমিশনের কথা। কমিশন হলে সঙ্গর গান্ধীর সমর্থকরা ভাগব চালালো। সঙ্গর নিজে টেবিলের উপর উঠে গুণাদের নির্দেশ দেন। পরের দিন আনন্দবাজার লিখলো, 'সঙ্গর কখনও সাক্ষিরে ভায়াসের উপর উঠছেন, কখনও আক্কেল গুটিয়ে চেঁচায়ে দাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করছেন: আও, আও, ইয়ার আও। তাঁর সমর্থকরা চেঁচায় ভাচ্ছে। কমিশন হলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চেঁচায় ছোঁড়ে। সরকারী উকিল লীলেখীকে সঙ্গর বলেন, কী দেখছেন? নিজের বাপকে খুঁজছেন। এক সময় বিচারপতি শাহ তীব্রকণ্ঠে সঙ্গরকে বলেন: 'বন্ধন, অনেক হয়েছে। আমি আপনায় বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা আনব।'

শাহ কমিশনের তদন্তের ভিত্তিতে জনতা সরকারের বিশেষ আদালত বিল ১ মার্চ '৭১ লোকসভায় গৃহীত হল। জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়িতে দোষী অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের অস্ত্র বিশেষ আদালত গঠন করা

হল। ২১ মার্চ রাজ্যসভাতেও এ বিল পাশ হল।

একশে মার্চ '৭১ লোকসভায় দেশাই সরকারের বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ধনিকলাল মণ্ডল এক প্রস্তো-ত্তরে বলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লিতে তিনটে ও বাঙ্গা-লোরে একটা মামলা চলছে। বিশেষ আদালত কিং এ হিসেবের বাইরে।

চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে কং (ই) সমর্থন করতে রাজি ছিল। কিন্তু ইন্দিরা চক্রের উপর থেকে মামলাগুলো প্রত্যাহারের শর্তে। তাই চরণ সিংএর ঐ কংস্বামী মন্ত্রিপত্নীর আইনমন্ত্রী শ্যামনাথ কাককার ৪ আগষ্ট দিল্লিতে সাংবা-ধিকদের বলেন, তিনি যদি মনে করেন যে বিশেষ আদালত গুটিয়ে ফেলার ঐচ্ছ রাজনৈতিক চাপ পড়ি-ছে, তাহলে তিনি চরণ সিং মন্ত্রি-সভা থেকে পদত্যাগ করবেন।

সেই বিশেষ আদালতের দপ্তর আজ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্ম-চারীরা বেকার হয়ে যুঁহছেন। শ্রীমতী গান্ধী, সঙ্গর গান্ধী, বিচারপতি সুরা, বংশীলাল, জৈল সিং, পি সি শেঠী, জগমোহন, ভিন্ডের ইত্যাদি সকলের বিরুদ্ধেই মামলা চলছিল। প্রায় সব মামলা উঠে গেছে। প্রথম ছ'জন রাজনীতিবিদের কথা ছেড়েই দিলাম শেষ দু'জন আশাও এখান জরুরী অবস্থাকালীন পরে পুনর্বাসিত হয়েছেন। একজন রাজধানীর লোকসেনা গভর্নর, অস্ত্রধন রাজ-ধানীর পুলিশ কমিশনার।

সদ্য সমাপ্ত ন'টি রাজ্যের বিধান-সভা নির্বাচনে দলীয় কাজে যেমনি শ্রীমতী গান্ধী বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমান ব্যবহার করেছেন তেমনি করেছিলেন সাতাত্তর সালে বঠ লোকসভায় নির্বাচনের সময়।

২২ ডিসেম্বর '৭১ কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লি হাইকোর্টে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ, সাতাত্তরের নির্বাচনে বিমান বাহিনীর বিমান ভাঙা বাবদ ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা তিনি দেন নি, এ আই সি সিও দেয় নি। কিন্তু হারিষ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী গান্ধীর, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত নামে ঐ বিমান নেওয়া হয়েছিল। বহবার তাঁকে বিল মেটাবার জন্য তাগাদ দেওয়া হয়ে-

ছিল। কিন্তু 'এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ' প্রেনে চড়বেন, তার ভাড়া উনি দেবেন কেন, যেখানে কোটি কোটি অর্থাহারী করদাতা আছেন।

তাঁই ৬ মে '৮০ বর্তমান ইন্দিরা সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল ডি পি ওয়াধা আদালতে জানান, পনেরো লক্ষাধিক পাওনা টাকা অভিযোগ-কারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। তখন বিচারপতি এন এন গোখামী মামলাটি প্রত্যা-হারের অঙ্গমতি দেন। ক্ষমতার বসেই অতটাকা শোধের ধর শুনে রাজ্যের পাগলও আতকে উঠেছে।

২৪ মে '৮০—অতিরিক্ত চীক মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আগরওয়াল শ্রীমতী গান্ধী, আর কে খাওয়ান এবং পি এস ভিন্ডারের বিরুদ্ধে ভীম দেন সাতারকে আটক করার মামলা প্রত্যাহার করতে আবেদন দেন। বিচারপতি রায়ে বলেন, এরকম একটা মামলা বানচাল হয়ে গেল, এটা খুবই আকর্ষণের কথা। তবে সি বি আই-এর কথা অস্বীকারি মামলা খারিজের আদেশ দিলাম। তিনি বলেন, যখন বাদী (কেন্দ্রীয় সরকার, প্রা র স্তে দেশাই সরকার) এই মামলা জেতা সম্পর্কে নিজেরাই (এখন ইন্দিরা সরকার) সন্দেহান, তখন বাদীকে মামলা চালাতে বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

শাহ কমিশনের তদন্তের ভিত্তিতে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, পঁচাত্তর সালের ২০ জুলাই বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভীমসেন সাতার শ্রীমতী গান্ধীকে নাগরিক স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ জানিয়ে এক চিঠি লেখেন। চিঠির অন্তর্ভুক্ত বেসাইনীভাবে মিসার গ্রেপ্তার করা হয়। ২২ আগষ্ট '৭১ কোর্টে চার্জশীট দেওয়া হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাল-খানেক পূর্বে পার্লামেন্টের এক প্রস্তো-ত্তরে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের চারজন অফিসার (মি: কৃষ্ণস্বামী, এল, আর, কান্তল, পি-এস, ভাটনগর, ও এ, এস-রাজন) তথ্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করলে তাদের ভীতি প্রদর্শন ও হেনস্থা করা হয়। এ কারণে শ্রীমতী গান্ধী, খাওয়ান ও তহানীন্দন সি, বি, আই, ডিরেক্টর ডি, সেনের

বিরুদ্ধে জনতা সরকার মামলা করে। ১০ জুলাই '৭৮ এক, আই, আর, ও ১৬ এপ্রিল '৭১ চার্জশীট দেওয়া হয়। কিন্তু গত ২ এপ্রিল দিল্লির এ, সি, এম, এম, এস, এম, আগরওয়াল মামলাটি তুলে দেন। কারণ চার্জশীট দিতে নাকি অথবা বেরী হয়েছে। এ যুক্তি লোকসভা নির্বাচনের আগে রাখার আসেনি।

এর কয়েকদিন আগেই শ্রীমতী গান্ধীর মাথা থেকে শাহ কমিশনে শপথ নিতে অস্বীকার করা সংক্রান্ত মামলাটি প্রত্যাহৃত হয়েছে।

সাতাত্তর সালের লোকসভা নির্বাচনে রায়বেরিলীতে স্ত্রীর লক্ষ টাকা মূল্যের ১৩২টি জীপ ব্যবহার করা সংক্রান্ত জীপ কেলেকারী মামলায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বিচার-পতি যোশী রায় দেন—বিশেষ আদালত বেসাইনী ও বাতিল বলে গণ্য করা উচিত।

ইন্দিরা গান্ধীর শপথ গ্রহণের পরদিনই অপর বিশেষ আদালতের বিচারপতি শ্রী এম, এল, জৈনও মারুতি কেলেকারী ও সাতার আটক মামলার রায়ে বলেন, বিশেষ আদালত গঠনের সরকারী ঘোষণাই লংবিধান বিরোধী।

সাতাত্তর সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী পোষ্টার ছাপানোর হুঁসিতি সংক্রান্ত আর একটা মামলা বিশেষ আদালতে ওঠে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী এই মামলার প্রধান আসামী বিচারপতি সুরা বিচারকের কাছে বলেন যে 'এই বিশেষ আদালত বেসাইনী'। বিচারপতিও এ যুক্তি মেনে নিয়ে মামলা তুলে নেন। বিশেষ আদালত চুলোর ওঠে।

এই বিচারপতি সুরা ও সঙ্গর গান্ধী জড়িত ছিলেন 'কিনসা কুরসি কা' মামলায়। রায়ে এঁদের দু' বছর কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে দশহাজার ও পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা হয়। গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে এই দু'গোদেষের বিরুদ্ধে এরা স্বগ্রীষ কোর্টে আপীল করেন। গত ১০ এপ্রিল স্বগ্রীষ কোর্টের তিনজন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছেন, 'কিনসা কুরসি কা' ফিল্মটা পুড়িয়ে দেবার জন্য তাঁরা যত্নবশে লিপ্ত ছিলেন, তনানী থেকে তা প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং দুই অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়া হল। তাঁদের জরিমানা ও দণ্ডাদেশও বাতিল হল। তিন বিচারপতির একশো এগারো পৃষ্ঠার রায়ে এই ছিল সার কথা।

বিশেষ আদালতের বিরুদ্ধে গত বছর পরলা মে সঙ্গর গান্ধীর নেতৃত্বে রাজধানীর জনপথ এলাকার বিকো-ভের সময় দালা-দালামার অভিযোগে শ্রীগান্ধী ও আরো ৩০১ জনের বিরুদ্ধে

ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। ময়াদিলীর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ডি, বি, গুপ্ত গত ৬ মে মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন দিয়ে মস্তব্য করেন এসব দালা-দালামা ছিল 'জনস্বার্থে' এবং 'রাজনৈতিক চরিত্রের'। পাঠক, বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাবেন না কিং!

ছিয়াত্তরের এপ্রিল-মে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী ও সঙ্গর গান্ধী ঐ রাজ্যের আটজন মদ বিক্রেতাকে অস্ত্রায় ভাবে মিসার গ্রেপ্তার করান। ৭১ সালে শ্রীগান্ধী ও শ্রীতেওয়ারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০২, ২২০, ও ১০২/৩৪৪ ধারার মামলা কল্হ করা হয়। লক্কোর এ, সি, এম, এম, ডি, ডি, কেন্দ্রীয় এখন সে মামলা তুলে দিয়েছেন।

দিল্লীর এ, সি, এম, এম, আদা-লতে সঙ্গর গান্ধীর বিরুদ্ধে আর একটা মামলার গত ডিসেম্বরে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছিল, মিনি গান্ধী তৈরীর মারুতি কারখানার লক্ষ ৬,০৬৬ টন ইম্পাত কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। সঙ্গর গান্ধী এই কোর্টে থেকে গত '৭১—৭৫ সালে দিল্লীর কতক-গুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ইম্পাত বিক্রি করেন। অলোক গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টে এ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। জুনে সি, বি, আই আদা-লতকে বলে যে এই অভিযোগের সমর্থনে বথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাব আছে। বিচারপতিও এই অঙ্গহাতে কেস তুলে দেন।

অন্তরিক্ত মারুতি রোড-রোলার কেসে দেয়াত্বনের স্পেটাল জজ জে-কে, মাধুর গত ২৪মে শ্রীসঙ্গর গান্ধীকে খালাস করে দিয়েছেন। অভিযোগ ছিল, শ্রীগান্ধী অয়েল এ্যাও ভাচারে গ্যাস কমিশনকে মারুতি হেভি-ভেহিকলস লিমিটেডের অতি নিয়-মানের রোড রোলার সরবরাহ করে ছিলেন। এই কেসের ন' জন সাক্ষী ও দু'জন রাজসাক্ষী মোদী ও বেহেতাকে আসামীরা ম্যানেজ করে ফেলেন। তারা এই হাওয়ার পার্শ-যান।

জনতা আমলে বংশীলালের তার পুত্র স্বরিন্দার সিং-এর বিরুদ্ধে একজিপিটা মামলা চলছিল। তখন লাল জনতা থেকে কং (ই)-য়ে গেলেন। একটার পর একটা মামলা উঠলো। মামলাগুলোয় না বথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাব ছিল ও ফেব্রুয়ারী '৮০ ইতিহাস এলগ্রে লিখলো, 'বংশীলালের' বিরুদ্ধে আটটা মামলা প্রত্যাহারের অ-কেন্দ্রীয় বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতাবশাল শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠার

ইন্দিরা চক্রের বিরুদ্ধে কমিশন

জনতা সরকার কর্তৃক অবস্থার ইন্দিরা গান্ধী চক্রের হুঁসি, কম-তার অপব্যবহার, পুলিশী অত্যাচার ইত্যাদি অসম্মান করার জন্য অনেক-গুলো কমিশন গঠন করেন। এর মধ্যে (১) প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জে সি শাহর নেতৃত্বাধীন কমিশনের শুনানী খবরে কাগজে চাকল্য স্থপ্তি করেছিল। বিচারপতি অলোক গুপ্ত কমিশন মারুতি সংক্রান্ত ব্যাপারে সঙ্গর গান্ধীকে অভিযুক্ত করেন। এবার ইন্দিরা গান্ধী কমতার এসে শাহ কমিশনের রিপোর্ট বিক্রী বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরাইমন্ত্রকে দিয়ে এক আদেশ জারী করিয়েছেন। শাহ কমিশনের বিচার বিষয় ছিল জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে।

- (২) মারুতি কেলেঙ্কারী প্রসঙ্গে বিচারপতি অলোক গুপ্ত কমিশন;
- (৩) বংশীলালের বিরুদ্ধে রেড্ডী কমিশন;
- (৪) নাগরওয়াল তদন্ত রেড্ডী কমিশন;
- (৫) কর্ণাটক মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধে বিচারপতি প্রোভার কমিশন;
- (৬) দেবরাজ আর্স সহ কর্ণাটক মন্ত্রীদেব হুঁসি তদন্তে ইকবাল হোসেন কমিশন;
- (৭) জরুরী অবস্থার লরেল ফার্মাওজ ও শ্রীমতী স্নেহলতা রেড্ডীর ওপর পুলিশ লক আপে অত্যাচার প্রসঙ্গে সন্তোষ কমিশন;
- (৮) অজ্ঞপ্রদেশে নকশালপহী-দের উপর পুলিশী অত্যাচারের তদন্তে তর্গব কমিশন;

এমার্জেন্সীকে এরা কি চোখে দেখেছিলেন

ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তিয়েতনাম, ও পূর্ব ইউরোপের সরকারগুলি সমর্থন করেন। এরা 'বামপন্থী' কিছু বাক্য সাজিয়ে শুইয়ে বলেন, জয়-প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ক্যান্ট্রিরা যে তাওব শুরু করেছিল তা ঠেকাতে জরুরী অবস্থা জারি করাটা ইন্দিরা গান্ধীর একটা প্রগতিশীল পদক্ষেপ। পচাত্তরের অক্টোবরে পাটনার অসুস্থিত কংগ্রেস সি পি আই-এর ক্যান্সি বিরোধী জাতীয় সম্মেলনে সোভিয়েত নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ছিরাস্তরের ভিনেঘরে গোহাটিতে অসুস্থিত এ আই সি সি অবিবেশনে জি ডি আয়ের নেতারা অভিনন্দন বাণী পাঠান।

আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বিশেষজ্ঞ ও মার্কিন সিনেটের সচিব র্যানসিন আর ভ্যালো ভারত ভ্রমণে

- (৯) প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণের উপর অত্যাচারের তদন্তে আলতা কমিশন;
- (১০) হরিয়াণার বে ও রা না র পুলিশী অত্যাচার প্রসঙ্গে কাপুর কমিশন;
- (১১) হরিয়াণার পিপলি ও নাগিনা গ্রামে নাশবন্দীর ভয়াবহ অত্যাচারের তদন্তে শর্মা কমিশন;
- (১২) জরুরী অবস্থার কেরালার গ্রেপ্তারের পর অনেকের খোঁজ বেলে নি। এ ব্যাপারে অসম্মানের জন্য বিখ্যাত আয়ার কমিশন;
- (১৩) মাদ্রাজ সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদের পেটানো ও দুর্ব্যবহারের তদন্তে দাদাশিবম কমিশন;
- (১৪) অজ্ঞপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও অমাত্য মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে ভিমালাল কমিশন;
- (১৫) উত্তরপ্রদেশের রাঁ কি দি গ্রামে নাশবন্দীর অত্যাচার প্রসঙ্গে রামেশ্বর চন্দ্র কমিশন;
- (১৬) জরুরী অবস্থার তামিল-নাড়ুতে পুলিশ লক আপে নিরা-লানের মৃত্যুতে শ্রীনিবাসম কমিশন;
- (১৭) পঁচাত্তরের গান্ধী জন্মদিনে তিহার জেলে ল্যাটি চার্জের তদন্তে আর কে বারেজা কমিশন;
- (১৮) জরুরী অবস্থার তুর্কমান পেটে গুলিচালনা প্রসঙ্গে আর সি জৈন কমিশন;
- (১৯) জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য মধ্যপ্রদেশে আর এস সাগেনা কমিশন;
- (২০) জরুরী অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য মনিপুরে বলরাম জিখা কমিশন।

আসেন ছিরাস্তরের এপ্রিল মাসে। সিনেটের বিশেষ সম্প্রতি কমিটির কাছে এক রিপোর্টে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে যে জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন তার সম্প্রতি ফল এখন দেখা যাচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ভারতীয় জন-গণের পূর্ণ সমর্থন আছে।"

ছিরাস্তরের চোঁঠা মে শিল-মালিকদের সংগঠন ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয় পক্ষে শ্রীবি, এম, বিড়লা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের খপ্প অস্থায়ী মনল হয়েচে তাই আমাদের এখন জোর কন্মে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এর মাস ছয়েক পূর্বে বোনাস সংক্রান্ত অভিভ্রান্তের মাধ্যমে শ্রীমতী গান্ধী শিল্পপতিদের হুশো কোটি টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে-শেবাংশ চম পৃষ্ঠার

সঞ্জয়ের পাওনা সঞ্জয়কে বিসমিল্লার পাওনা বিসমিল্লাকে

শ্রীপতি নন্দী

মধুগাও থেকে চুইয়ে-পড়া এক-ফোটা করুণার আশার যারা মান-বিক মূল্যবোধগুলিকে একে একে বিসর্জন দিল, সমস্তরূপ অপকর্ম আর চাটুকারবৃত্তি যাদের নেশা ও পেশা, সে সত্যগ্রহী কংগ্রেসীরা কি বলে কি না বলে সে বিষয়টি অবশ্যই বিচারগ্রাহ্য নয়, হতে পারে না। সঙ্গর গান্ধীর মৃত্যুতে শোকবার্তার ভাব্যরচনায় আকাশচুম্বী বিশেষ্য বিশেষণের সন্ধানকার্যে এদের পার-স্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতাটি শোকের লড়াইরূপে যেমন কোঁতুকপ্রদ তেমন কংগ্রেসী বিভাবুজির জ্যোতক। নির্দাক চাটুকার্যচিত তাদের শোকগাঁথাগুলিও স্বভাবতই যতটা শোকজ্ঞাপক তার চাইতে ঢের ঢের বেশী অতিসঙ্ক্ষিপ্তক। চাটুকার লক্ষ্যায়ের শোকবার্তার চরম মিথ্যাচারে সজ্জিত যে সঙ্গর ইমেজ হাজির করা হয়েছে, বহুকীর্তির মহানায়ক বহু-প্রত্যক সঙ্গর চরিত্রের পক্ষে তার কোন মিল না থাকার বাস্তব সঙ্গর ইমেজটি দেশবাসীর কাছে আরো একটু হয়ে উঠেছে।

ভাবকরা অশ্ববিলম্বন করেনি, নিবেদন করেছে। ভীষণ ভীষণ শব্দচ্ছটার বাক্যচ্ছটার তারা আকাশে প্রলয় বাধিয়েছিল; যে সমস্ত জোজ-বাক্যে তারা সঙ্গর বন্দনা করেছে, অমাত্যকে টেকা দিয়ে প্রথমেই সেগুলি বলে ফেলতে না পারলে 'অনেক আরও কাজ অসম্পন্ন থেকে' যাবে (অনেক অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা হুরাশা হয়ে উঠতে পারে), এমন আশঙ্কা ওদের মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কলতঃ ইতিহাসের বই গুলে বাছাই নাম সংগ্রহের এমন হিড়িকটি যতটা মৃতব্যক্তির সম্পর্কে তার চাইতে ঢের ঢের বেশী গুণে মৃতব্যক্তির প্রবল-প্রতাপ জননীর নজর আকর্ষণের উদ্দেশে। অতএব, এ শোক নয়, প্রার্থনা-শ্লোক; "দিল্লীধরী বা" দয়া করেন কিনা জানতে হয় না, তবু তিনিই সর্ব-দর্শিনী, সর্বজ্ঞা, তিনিই বলদ্বাত্রী, বনমান দাত্রী, অভয়দাত্রী, অতএব পরমারাধ্যা; এ সারসভ্য না জানলে সর্বোদয় সাধনা হয় না।

সরকারী প্রচারযন্ত্রের অযুত তরঙ্গে যার বিস্তরপ বিচ্ছুরিত হয়, তার পদাশ্রয়ী ব্যক্তির যেমন বরা-ভরে বলিষ্ঠ, তার মূর্তির-ধরা রাজ-দণ্ডিও রাজরক্তের তাবৎ খাই

মেটাতে সন্ধ্যা-উজ্জ্বল সন্ধ্যা-চঞ্চল—'পরিজ্ঞাপার হৃদয়তাং বিনাশায় চ হৃদয়তাং'। অতএব 'স্ববিস্ময়ের' ধারাবাহিক উত্থান-পর্বটি নিত্যসুই প্রচারগুণে ঘটে যায় নি; তার বাধা-হীন বিরাটমহীন ও ক্ষীণ বেগরোয়া পদক্ষেপগুলি তার জীবনে যে 'সম্ভাব-নাময়তা'-রূপে বাস্তব করে তুলেছিল, তা দেশবাসীর কাছে যতই অব্যাহিত অপ্রার্থিত হোক না কেন, যতই লজ্জাজনক যতই দুঃস্বপ্নময় হোক না কেন, বাস্তব দৃষ্টপটে কিন্তু তা অবশ্য-ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছিল। যারা যুগু তারা এ 'সম্ভাবনাময়' অভিযেক-ক্রিয়াকে উৎসব মুখর করে তুলেছিল, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বস্তুতঃ 'মুক্তিস্বপ্নের' ও 'স্ববিস্ময়ের' এ সৌর-জগতে গ্রহ-বিগ্রহের আবির্ভাব যথা-সময়েই ঘটে আসছিল অর্থাৎ সিংহা-সন আর তার পারাগুলি নিয়মঅস্থ-যায়ী পদস্পর্শ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুভার বেতার পাঠ, জনমোহনের ছুরাচার, ভিনের হিংস্রতা, সেনগুপ্তের প্রভুত্ব, ধাওয়ানের ধূর্ততা, কাপুরের শঠতা, বংশীলালের 'এটা খাও ওটা খাও' বাৎসল্য, বহুগুণার ভাঁড়ানি—চরম আগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার ও উপকরণ-গুলি—শক্ত কেন্দ্রের লম্বাহে-জালিত বশংসুজ্ঞে 'সম্ভাবনাময়' সঙ্গর গান্ধীর পথকে প্রশস্ততর করে তুলেছিল। প্রভুর মুখ প্রবলপ্রতাপ প্রভুত্ব; হৃদয়ের মুখ উজ্জিষ্টবিলাসী হৃদয়ত্ব—এক্কেজে মাতাপুত্রের কৃপাদৃষ্টি ও পুত্রস্বায়ের প্রত্যাশাকে বুকে ধরে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ও অমাত্য অনেকই তাদের প্রভুত্বের প্রতি-যোগিতার নিঃশেষে বিকিরে গেল। অতএব, 'সম্ভাবনাময়' জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল মাত্রাহীন প্রচার গুণে পরম রোমান্টিক, আর কুহুমা-জীর্ণ—যাট কোটি মাহুঘের বগুমুগের কর্জী দশপ্রহরধারিণী জননীর হুনিপুণ ব্যবস্থাপনায়, প্রত্যক তদা-রকীতে, নিখুঁত তালিয়ে।

মনে করার কারণ নেই, ১৯৭৭-৭৯ এর তিন বছরে সব কিছুই ভেঙ্গে পড়ে ছিল। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-উপনিবেশিক বিধি ব্যবস্থার কোন কিছুই এত সহজে পান্টাবার নয়। বিশদ আলোচনা এক্কেজে অপ্রাঙ্গিক। যাই হোক, সিংহাসন-চ্যুত স্বব্রাহ্মণ এ তিন বছরে রাজপুত্রের রাজনৈতিক মহিমা থেকে একদিকের

জন্তও বঞ্চিত হন নি। অতএব, ঘটনাপঞ্জী একই শানক জেবীর আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ছক ধরে এগিয়ে চলেছিল, পরবর্তী নির্বাচনের উপকরণ সঞ্চয় করেছিল।

সে যাই হোক, বিগত নির্বাচনের পর আবার শ্রীমতী গান্ধী একই দিকে এগুচ্ছিলেন, অবশ্যই আরো জোরকন্মে আরো কিপ্র গতিতে। নিশ্চয়ই নিজের হাতটা যতদিন 'শক্ত' থাকে তার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে নিতে চেয়েছিলেন, ঠিক যে পরিকল্পনা অস্থায়ী তার পিতা স্বর্গত নেহরু এগিয়েছিলেন : প্রথমেই এককেন্দ্রিক কংগ্রেস সংগঠনের সর্বোচ্চ পদের নিরঙ্কুশ ক্রমতা প্রদান, বিভীষিতঃ ভাবী রাষ্ট্রনায়কের (ওরফে স্বীয় সম্ভানের) পছন্দসই সাংগঠনিক পুনর্গঠন, এবং দর্শনশেবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-দপ্তরে শুভকণ্ঠে স্থান সঙ্কলন। পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে, সাংগঠ-নিক কাঠামোটা 'নিজ কলে প্রস্তুত' হওয়ার ভাবী রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে রাষ্ট্রীয় একনায়কত্ব মূর্তো করতে এবং এরূপ উত্তরাধিকারকে স্বরক্ষিত রাখতে অপ্রতিরোধ্য বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। (উল্লেখযোগ্য, এরূপ পরিকল্পনার বিরুদ্ধ হওয়ার শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গরকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করার বিরোধী ছিলেন)। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পিত কাজটি সম্পন্ন হয়নি, এবং বোধকরি ইন্দিরার জীবনে ও সঙ্গরের জীবনে এটাই প্রধান 'অসম্পন্ন কাজ' ('unfinished task')।

সঙ্গরের স্বল্পপরিমার জীবনে বা কিছু 'সম্ভাবনা' ছিল তার সবটাই সে পেয়েছিল, দীর্ঘজীবনে বাধ-বাকীটাও হয়ত আসতো, অন্তত এসব ক্ষেত্রে বিবিগত বাধা কিছুই ছিল না। তারতরাষ্ট্র নেহরু পরি-বারের উপর প্রযোজ্য কোন আইন রচনা করেনি; বা কিছু আইন সব কিছুই অমাত্যদের জন্তে। অতএব 'সম্ভাবনা'গুলি কোন কৃতিত্বের সূচক নয়, পূর্বপ্রমাণ বেআইনীর জ্যোতক।

ভারতীয় বিবিবিধানে নেহরু পরিবারের কাজকর্মে কোন বাধা-নিবেদ নেই, অবশ্য অমাত্য অনেকের ও কাজে কর্মে, চলমে-বলমে বাধা নেই কিন্তু তাদের কাজকর্ম, চলা-বলা-গুলি নেহরু পরিবারের দেবার যত-টুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু অবধি আইনের উর্ধ্বে, এরপর আর নয়। অতএব, সঙ্গর অসঙ্কোচে, অসমকটা সহজ সাবলীল ছন্দে আইনকে কদলী-দেখাতেন; নিকটক জীবনে রোমা-টিক হুঃদাহসী হতে বাধা কোথায়? শেবাংশ চম পৃষ্ঠার

গ্রন্থ পরিচয়

অনুবাদ কবিতার সংকলন

মিহির আচার্য

মহাপৃথিবীর কবিতা ॥

অনুবাদ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশক : বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়
১৪, টেশন রোড, কলিকাতা-৩।

দাম আট টাকা।

কথাটা স্বীকার করতে হবে এ দেশে : অনুবাদকর্মের বলিষ্ঠ ঐতিহ্য আজও গড়ে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ মৌলিক কর্মের তুলনায় অনুবাদকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ বলে মনে করা হয়। এবং এমনও বিশ্বাস প্রবল যে মৌলিক ক্রমসম্মতীরা একাত্তরে প্রতিভাধীন প্রয়াস বলে বিবেচনা করেন। অথচ কে না জানে যে স্বজনশীল ক্রমসম্মতীরা অধিকারী না হলে বিদেশী সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা, ভাষান্তর করা যায় না। কবিতার ওপর জোর দিতে চাই এ কারণে যে অল্প দেশের কবিতা আরেকটি ভাষায় বামালভূত হয়ে আনা বিশেষ কঠিন কাজ।

আনন্দের বিষয় এ দেশে রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী মৌলিক কবিও নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কীভাবে অনুবাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তা লেখকও অনুবাদের সঠিক আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনো মানদণ্ড রচিত হয়নি। অর্থাৎ অনুবাদ আক্রমিক হয়ে, না ভাবানুগ স্বচ্ছন্দ হবে—কোনটা যুক্তিযুক্ত কে বলবে? কোনো কবির অনুবাদের আরেক ভাষায় চাষিয়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু মূল ভাষার অনুবাস, বাক্যরীতি কিংবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে লম্বলে উদ্ধার করে আনা কী সম্ভব?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ কবি ডনের লাইন 'For God's sake hold your tongue and let me love' -এর তর্জমা করেন 'মোহাট তোদের একটুকু চুপ কর / ভালবাসিবারে' যে মোরে অবসর'। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কবি কর্মের তুলনামূলক বিচারে এ অনুবাদ অবশ্যই আশা-ব্যঙ্গক নয়। অথচ এই রবীন্দ্রনাথই যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের ODE ON INTIMATIONS OF IMMORTALITY কবিতার পংক্তিকে তাঁর প্রসিদ্ধ "শিশুতীর্থ" কবিতায় আশ্রয়ভাবে ব্যবহার করেন 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা' (And see the children sport upon the shore) তখন অবাক হয়ে বাই। টি এস এলিওটের ভাষায় 'The good Poet welds

his theft into a whole of feeling which is unique' রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "অনুবাদই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।"

আমাদের বিবেচনায় অনুবাদ-কর্মের ব্যাপারে স্বীকরণের ক্ষমতা একান্ত আবশ্যিক।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা-গুলি আক্রমিক তর্জমা করেন নি, প্রতিভাধর কবি বলেই স্বীকরণের স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর আছে। এবং তাঁর সমাজসচেতন বক্তাবাদী দৃষ্টিতে এমন সব কবিতা বেছে যা নিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামী কবিতা। এই নির্বাচন তার বিশিষ্ট কবিমানসের সদ্দেশ্যে গিয়েছে। এর ফলে কবিতাগুলি তর্জমার সীমাবদ্ধতা থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এসেছে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ হয়ে যে একে সন্মত মৌলিক কবিতা বলে ভুল হয়। অর্থাৎ কবিতাগুলি অনুবাদ করতে বীরেনবাবু মৌলিক প্রেরণাই বোধ করেছেন। পাশাপাশি মূল কবিতা হাতের কাছে থাকলে আরো বেশি করে বোঝা যেত বীরেনবাবু মূল কবিতার অলংকার না করে স্বাধীনতা নিয়ে কতদূর সফল হয়েছেন। বিশেষ প্রসঙ্গি ভাবে এই কারণে বীরেনবাবুর সাম্প্রতিক মৌলিক কবিতাগুলিও একই ভঙ্গিতে রচিত।

একটি আপত্তি থেকেই যাক 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত কবিতার সংকলন' পরিচিতির ক্ষেত্রে "অনুবাদিত" শব্দটি নিশ্চিত ভুল, এটি "অনুদিত" হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

একটি আপত্তি থেকেই যাক "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত কবিতার সংকলন" পরিচিতির ক্ষেত্রে "অনুবাদিত" শব্দটি নিশ্চিত ভুল, এটি "অনুদিত" হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল।

ছোট গল্প

ভাসান ॥ চন্দন ঘোষ
পৃষ্ঠক বিশি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-১২।

দাম : পাঁচ টাকা

বর্তমান বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে যে সব গল্প উপভাস লেখা হচ্ছে, তাতে জীবনের ওপর অবি-

ধানই প্রতিফলিত হচ্ছে বেশি। ভাঙনের প্রবল ধস আমাদের ভিত ভেঙে নাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যে সব ধারা এই ভাঙনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেছে, মানবিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, সেই সব ধারাও দিন দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

চন্দন ঘোষের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ভাসান'। বাণিজ্যিক পত্র পত্রিকায় নয়, সচেতন বোধ নিয়ে তিনিও অনেক ক্ষুদ্র লেখকের মতোই লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে লিখে থাকেন। গ্রন্থিত গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি গল্প অন্তত আমাদের চিরায়ত মানবিক মূল্যবোধে উদ্বোধিত করে তোলে এবং সার্থক ছোট গল্পের রসে সিক্ত করে।

এই সার্থক ছোট গল্পগুলির মধ্যে আছে 'ভাসান', 'খেলা শুধু খেলা' এবং 'স্টপেজ'। 'স্টপেজ' কেউ আছে কেউ নেই'। স্বতিস্বর প্রেমের গল্প হিসেবে 'ভাসান' এবং 'স্টপেজ' কেউ আছে কেউ নেই' গল্প দুটি অতুলনীয়, বিশেষ করে কিশোর প্রেমের অনবদ্য চিত্র হিসেবে 'ভাসান' গল্পটি আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। 'খেলা শুধু খেলা' গল্পটিও বাস্তবের কঠিন জগতে একটি হৃদয় মানসিকতার অধিকারী তরুণের উদ্ভবের বেদনালব্ধ চিত্রায়ণ।

অল্প গল্পগুলির ভেতরে 'পাঁচটি শব্দ' ও 'মুখোশ' গল্প দুটি এই সমাজের বেদনাময় অসমতাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে, বিশেষ করে 'পাঁচটি শব্দ'-এর গল্পটি দুঃসাহসী এক মহৎ গল্প কথনের অপরিণত বীজ নিজের শরীরের ভেতর ধারণ করে আছে।

এমার্জেন্সী কি চোখে দেখেছিলেন

৭ম পৃষ্ঠার পর

ছেন আর প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা মালিকরা দেওয়ালে লিখেছে "কঠোর পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রম নেই।"

ছিয়াস্তরের পচিশে জুন কলকাতার এক সেমিনার হলো, জরুরী অবস্থার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমতী-প্রমোদ চ্যাটার্জী সেখানে বলেন, "পাঁচস্তরের পচিশে জুন পর্যন্ত ভারত অকৃতভাবে ব্রিটিশ ও মার্কিন ধাঁচের গণতন্ত্রের পথে গেছে। এখন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন জবরদস্ত রাষ্ট্র-প্রশাসন।"

জুবনেথরে এদিন 'জাতীয় শ্রমজা দিবস' পালিত হয়। এ উপলক্ষে এক জনসভায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী বলেন, "ওড়িশার কুমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে হুড়ি বছর

বলে আমাদের মনে হয়। মেহেপা-জীবনী একটি সুবর্তী সমাজের লাবলীল জীবনযাপনের সঙ্গে সমী-করণের ব্যর্থতার কারণ চিত্র পাঠকে আজ ক'রে তোলে।

প্রথম গল্প গ্রন্থের ভেতর থেকে আমাদের মনে হয়, মানবতা, দয়াদৃষ্টি ও হৃদয়স্বত্ব চন্দন ঘোষের লেখার প্রধান চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এই যুগে এই গল্পগুলিই বিক্রম সং সাহিত্য গড়ে তোলার প্রধান উপকরণ।

অল্প গল্পগুলির ভেতরে লেখকের কিছু কিছু দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়, অভিজ্ঞতার ও জীবনবোধের প্রাঙ্গণ ক্রমশঃ বেশি বেশি করে পরিপত্তির জন্ম আমরা অপেক্ষা করব। 'দীর্ঘস্থায়ী জনস্বত্বের দিকে'-র মতো গল্পের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি, তাই সেখানে লেখকের দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাও অধিকতর। আমাদের বিশেষ প্রশ্ন 'নাগরিক হোলার চালক' গল্পটির দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্নে। এখানে কি মায়কবয়স সত্যি সত্যি পরিমিতির থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়তে পেরেছেন এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন?

ছোট গল্পের গল্পগত শরীর নির্মাণের হাত সাধারণভাবে চন্দন ঘোষের সফল। কিন্তু ভাষা বাক্য গঠন, বানান এবং মূল্য প্রমাদের প্রাচুর্য গল্পগুলি পাঠের সময় আমাদের অগ্রসর করে তোলে। প্রগতিশীললেখকদের এই ক্রটি প্রগতিশীলসাহিত্যপ্রেমীদেরই দৃষ্টি করে তোলে।

আমরা এই তরুণ লেখকের যোগ্য পরিপত্তির জন্ম লাগছে অপেক্ষা করব।

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হলো। কিন্তু কাজ যতটুকু এগিয়েছে তা গত একবছরেই অর্থাৎ জরুরী অবস্থার প্রথম বছরেই হয়েছে।"

কিন্তু সাতাস্তরের বিশেষ ক্ষেত্র-রায়ী স্ত্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক সভায় বিখ্যাত সব আইন-জীবীরা জরুরী অবস্থার তীব্র নিন্দা করে এর প্রত্যাখ্যান ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রত্যাবর্তনের দাবি জানান।

লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক ঘোষণা

ছিয়াস্তরের বাইশে জুলাই লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "এতদিন আপনাদের আমাকে অহেতুক ডিক্টেটর বলেছিলেন। এখন আমি সত্যিই ডিক্টেটর; এবার আমার স্বরূপ দেখবেন।" প্রেস-সেন্সর শিপের দরুণ এ উক্তি তখন প্রকাশিত হয়নি।

সঞ্জয়ের পাওনা

৭ম পৃষ্ঠার পর

আর মওকা পেলে কে না 'দুঃসাহসী' হতে রাজী বিশেষতঃ সে মওকা যদি একেবারে তামাম হিন্দুস্থানের জল-স্থল-অস্তরীকের মৌরসীপাট্টা হয়।

অতএব সঞ্জয় আইন মানতেন না, নেহরু পরিবারের ক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্রও তা মানেন না; অতএব যারা একটি

স্বজাত 'এম পি'র শোকে গোটা রাষ্ট্রব্যবকে ভেঙে ভেঙে করে 'কাঁদালো', রাজকোষকে অধোবিত্তভাবে উগড়ে দিল, তারা যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লিখিত অথবা মৌখিক বিশেষ আদেশের অপেক্ষার ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। কারণ তারা জানতো, নেহরু পরিবার কি চায়, কি তাদের অলিখিত পাওনা। "সি জা রে র পাওনা সি জারকে মিটিয়ে দাও, বিসমিল্লাহ পাওনা বিসমিল্লাকে"—শি'ড়িতে না-বসে-রাজা সঞ্জয় তার পাওনা পেয়েছে, এমন কি 'এম পি' না হলেও তা পেত। সঞ্জয়ের মৃত্যুই প্রমাণ করলো সঞ্জয়ের 'সম্ভাবনা-গুলির' মূলে কৃত্তিক কার বা কাছের। আবার সঞ্জয়ের মৃত্যুই প্রমাণ করলো, নেহরুর মত সঞ্জয়ের ছাইভস্মও রাজকীর। বংশস্বত্রে মনদের আমন্ত্রণে যে ব্যক্তি বছরের পর বছর রোমাঞ্চিত ছিল, নাকের ডগায় দোল-খাওয়া মনসহটি হাতছাড়া হতে দেখলে সে হতবুদ্ধি হয়েছিল। সঞ্জয়ের জীবনে দুঃসাহস না থাকলেও তার মরণে খানিকটা দুঃসাহসের কাঁকুনা ছিল বৈকি।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
মাধ্যমিক ১৫ টাকা
প্রৈমিক ৭.৫০ টাকা

*

টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

যে মামলাগুলি

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট।

গত ১৭ মে, তিওয়ানির চীক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পি, এল, থান্ডা বংশীলালের পুত্র হরিম্মার সিং (এম, এল, এ)-এর মাথা থেকে ছুটো ক্রিমিডাল মামলা তুলে দিয়েছেন। একটা মামলার অভিযোগ ছিল ১৭৪ সালে হরিম্মার জন্মকাল বৃত্তকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। আর একটা কেসে জন্মকাল মহিলাকে নাকি বলপূর্বক উলঙ্গ করা হয়।

এ বছরে ৬ জন দিল্লীর এ, সি, এম, এম, এল, এম, আগরওয়াল স্বামী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে সি, বি, আই এর মামলায় ছেদ টানার নির্দেশ দেন। জরুরী অবস্থার স্বরূপে ১৯৭৬ সালে ছুটো মাদেভিড ব্রহ্মচারী কুমারের থেকে আমদানী সম্পর্কিত শুধু দুইয়ের অধমতপত্র নিয়ে ঐ মামলার স্বত্বপাত। অভিযোগ, ব্রহ্মচারী এ ব্যাপারে জাল মথিপত্রের সাহায্য নেন। সি, বি, আই, প্রিমতী গাঙ্গীর বনিষ্ঠ এই ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে প্রত্যাহার, জাল নথিকে জাল বলে কালানোর দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৭১ এবং ৪৮৬ ধারা অধিনায়ে এই মামলা দায়ের করে।

ম্যাজিস্ট্রেট হাওয়া বুকে রায়ে বলেছেন : স্বামী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতগ্রাহ্য অপরাধ প্রমাণ করার মত যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে।

জরুরী অবস্থার দিল্লী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধিকারী কাল্যে ব্যবহৃত ট্রাকের ক্ষেত্র দৈনিক পূজার টাকা থেকে বাড়িয়ে একশো টাকা করেন। সি, বি, আই জনতা আমলে মামলা দায়ের করে বলে, তখন তাড়া বাড়িয়ে ডি, ডি, এর আর্থিক ক্ষতি হলেও মেসার্স উত্তম প্রকাশ এন্ড কোম্পানিকে অহেতুক ও অন্তর অহুগ্রহ দেখানো হয়েছে। জগমোহন আবার সেই কথটা ফিরে পয়েছেন তাই গত ২৬ মে সি, বি, আই আদালতকে বলে, যে, ঐ তাড়া দাড়ানো যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ডি, সি, আগরওয়ালও মামলা তুলে দিলেন।

এই জুলাই ৩১ মে প্রিমতী গাঙ্গী, এর গাঙ্গী, বংশীলাল, জৈল সিং, রদেও ঘোশী, পি, সি, পেঠা ইত্যাদি পনেরো জনের বিরুদ্ধে জরুরী অবস্থার বিরোধী নেকুবলকে ধমক দাটক করা সংক্রান্ত যে মামলা চলছিল তা বাতিল করে

দেন।

জগমোহন, দিল্লীর জরুরী অবস্থা-কালীন ও বর্তমান পুলিশ কমিশনার পি, এল, জিন্দার ইত্যাদির চার-জনের বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছিল। জরুরী অবস্থার তুর্কমাম গেটে ও ভগৎ সিং মার্কেট এলাকার বেআইনীভাবে সব স্থপতি বুলডোজারের সাহায্যে ভেঙ্গে ফেলা হয়। অভিযোগ এ কাজ করা হয়েছে কাঙ্ক্ষারি করে। কয়েকজন হোকানী এই ভাঙ্গার আদেশ শুনে আদালত থেকে হুগিতাদেশ বার করেন। তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয় ও হুগিতাদেশের দরখাস্ত প্রত্যাহারের শর্তে জামিন দেওয়া হয়। এ মামলাও উঠে গেছে।

পুলিশ কমিশনার পি, এল, জিন্দার 'অহুশাসন পর্বে' স্বল্পরকে গ্রেপ্তার করে শাস্তিবনের কাছে যমুনার জলে ডুবিয়ে খুন করে। জমতা সরকার জিন্দারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং এখন সে মামলা যমুনার জলে। যেমনি কলকাতার অশোক মন্তকে খুন করে গঙ্গার ফেলা ও কাজ সরকারকে গুলি করার অভিযোগে রুগু গুহ নিয়োগীর মামলার আসামীর জর হয়েছে।

অবশ্য জমানা পান্টালে বিচার-পতিদের বিবেচনা বদলানো বাতাবিক। এখন ঐ জগমোহন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযোগ, ১১ এপ্রিল ১৯৭৭ উক্ত পত্রিকা তুর্কমাম গেটে বুলডোজার ও গুলিচালনা সম্পর্কিত রিপোর্টে জগমোহনের মানহানি করেছেন। গত ১৭ মে বিবাহীর কৌতলী পি, এল, সেখী আদালতে যখন জগমোহনকে জেরা করছিলেন তখন বিচারকের সামনেই জগমোহন শ্রীলঙ্কাকে ভয় দেখান। বিচার-পতি নীরবে শোনেম, কারণ জগমোহনের বুকে এখন যথেষ্ট বল আছে।

শাহ ও গুপ্ত কমিশনের তদন্তে যে সকল অফিসার সাহায্য করেছিলেন তাঁদের এখন প্রতিশোধ-মূলকভাবে হরণ করা হচ্ছে। সি, বি, আই অফিসার এন, কে, লিংকে গারদে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৭৭-৭৮ সাল ছিল তদন্ত আর মামলা দায়ের করার বছর, আর ১৯৮০ সাল দাড়িয়েছে মামলা খারিজের বছর। বিচারপতিরা যে ভাইনীর প্রত্যাহার দেখছেন।

চলচ্চিত্র নাটক

‘দর্পচূর্ণ’ এবং ‘দুই পৃথিবী’

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ কাহিনী ‘দর্পচূর্ণ’ নিয়ে ছবি আগেও হয়েছে, আবার হল। এবার ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ রায়। তাঁর আগের ছবিটি ছিল শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’। এটিও রিমেক এবং সেই প্রথম দিলীপ রায় অভিনেতা থেকে চিত্র পরিচালক-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। যদিও এই রূপান্তর চিত্রজগতে কোন যুগান্তর আনেনি এবং তা কেউ প্রত্যাশাও করেনি, তবুও ছবির মধ্যে সহজ গতিময়তার গল্প বলার সরল ভঙ্গী-টুটু তাঁর লক্ষ্য করার মত এবং তা কিছু ক্ষেত্রে দর্শক মনে আবেদন সঞ্চারের ক্ষমতাও রাখে। এটুকুই দিলীপ রায়ের পরিচালনগত গুণ, যা আবার অনেকের মধ্যেই নেই। শরৎ কাহিনীর আবেদন দর্শকমনকে যে আজও বিশেষভাবে নাড়া দেয়, তা অনেকের মত-তিনিও বেশ ভাল করেই বোঝেন এবং সে কারণেই তিনি পর-পর ছবি করলেন শরৎ-কাহিনী নিয়েই। তা করুন—সহজে বাজিমাং যখন হয় তখন বলার কি আছে। কিন্তু শরৎ-কাহিনীকে নিয়ে যুগোপযোগী করার নামে যখন চরিত্রের অহল বহল করা হয়, তখনই ওঠে আপত্তি। শরৎচন্দ্রের গল্প নেব অথচ তার প্রতি স্বীকার্য দেখাব না—এ করেন কথা? ‘দর্পচূর্ণ’ ইন্দু শরৎচন্দ্রের ভাবনার যে রূপ নিয়ে ছুটে উঠেছে, পর্দায় দেখি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এ যেন হাল-ফিল কোন লেখকের কাহিনী নিয়ে তোলা ছবির নারিক। মঠে মন-হানে জলাশয়ের ধারে ইন্দু নেচে নেচে গাইছে নরেনের সামনে—তাবা যার? তার ভাবভঙ্গী চালচলন শরৎকাহিনীর নারিকা স্বলভ মোটেই নয়। সন্ধ্যা রায় এখানে অসহায়। শত্ৰু পাল চরিত্রটি নিতান্ত পার্শ্ব চরিত্র, কিন্তু পর্দায় এই চরিত্রটি বিরাট জায়গা জুড়ে আছে—কারণ এ চরিত্রে উত্তমকুমার অব-তীর্ণ। তাঁর অভিনয় কৃতিত্ব দেখা-বার খাতিরেই শরৎ করমার বাইরেও এই চরিত্রের বিস্তার। এই প্রসঙ্গে চিত্রনাট্য রচনায়ও বিশৃঙ্খলা এসে গেছে। নরেনের বাবা পুরো দেনা শোধ করা লক্ষ্যে শুধু পাল এতকাল পর নরেনের কাছে টাকা দাবী

করছে কোন কারণে—ছবিতে তা পরিষ্কার নয়। ছবিতে কিছু স্টান্ট সাপেক্ষে হস্তির চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল। দাদার বাড়িতে ইন্দু ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখল অনেকক্ষণ, বাড়ির সবাই হৈ চৈ করে উঠল—ইন্দু আত্মঘাতী হল না কি? কিন্তু ইন্দুই শেষে দরজা খুলে দিল—এই অর্থহীন দৃশ্যের যোজননা শেষে বিয়স্তির লক্ষ্যই করে। তবে নরেন-ইন্দুর কিছু বনিষ্ঠ আবেগময় দৃশ্য রচনায় প্রশংসনীয় মৈনুপ্যের স্বাক্ষর আছে। মৌমিজ চট্টোপাধ্যায় নরেনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নিষ্ঠার লগেই। জীর অলঙ্কার যে স্বামী, অহংকার নয়—শরৎচন্দ্রের ‘দর্পচূর্ণ’ এ বাণীটি কিন্তু শেষে পর্যন্ত পর্দায় ফুটে উঠতে পেরেছে। কানাই দের কটোগ্রাকী চলনই। সংগীত পরিচালনার কালীপদ সেন মৈনুপ্য দেখিয়েছেন। শিল্প নির্দেশনার স্বর্ষ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। শব্দগ্রহণ ক্রটিপূর্ণ।

একদিকে আদর্শ নীতি আর সং-পথে থেকে আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেও সাময়িক শান্তি এবং অন্তর্দিকে অসাধু পথে প্রচুর অর্থোপার্জন ও সমৃদ্ধির মধ্যেও দুঃস্বপ্ন অশান্তি আর উবেগ—পরস্পর বিপরীত এই দুই পৃথিবীর চেহারা ফুটিয়ে প্রথমটিরই যে জর ঘোষণা হল নানা ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, তার মধ্যে বেশ কিছু ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেছে। ‘কনট্রাস্ট এফেক্ট’ বাহিত রূপে ফুটিয়ে তুলতে গেলে যে পরিমিত জ্ঞান ও রসবোধ থাকা দরকার চিত্রপরিচালনার মধ্যে তারই একান্ত অভাব। শৌনক গুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন পীযুষ বহু। দুঃখ শিল্পী-দের সাহায্যার্থে শিল্পী সংসদের এটি দ্বিতীয় নিবেদন।

দুই ভাই—মৃণাল ও কুনাল। একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক, অল্পজন অসাধু ব্যবসায়ী-আগলার। এই দুই ভাইকে নিয়ে ভিন্ন দুই জগৎ—এক-দিকে অর্থোপার্জন, অপর দিকে অর্থের প্রাচুর্য। ছবির প্রথমে দেখি বড় ছেলে মৃণালই বাবা, মা ও বোনের দায়িত্ব বহন করছে। হঠাৎই আবি-র্ভাব ঘটল কুনালের—সিনেমার বাবা ছকে ভিলেনের মত—

ছবির জ্বর ও ধারাও পান্টে গেল লগে লগে এবং তারপর বড় অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল। ছোট ছেলে কুনালের অর্থ প্রাচুর্যের প্রভাবে বাবা মা ও বোনের মতি-গতিও পান্টে গেল। নিউ জালি-পুয়ের বিরাট বাড়িতে ব্যয়বহুল পরি-বেশে তারা উঠে এল—এও যদি মেনে নেওয়া যায়, তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, আদর্শবান মৃণাল কেমন করে আসতে পারল অসাধু কুনালের প্রাণাধারে? অবশ্য একথাও ঠিক, মৃণাল যদি কুনালের আবাসে না আসত, তবে পরবর্তী যে সিনেমার ফরমুলা সাক্ষিক সংঘর্ষ দেখা গেল পর্দায়, তা কেমন করে সম্ভব হত? তাই বতাই অর্থোজিকতা থাক—সহজে সমস্তা সৃষ্টি করে সমাধানের দরলীকরণ ও দর্শকের ইচ্ছাপূরণ এ জাতীয় ছবিতেই সম্ভব হয়। সেখানে রসসৃষ্টি ও আবেদন সঞ্চার কতটা হল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোটা অবাস্তব মনে হবে তাঁদের কাছে, যারা শুধুই উচ্ছ্বাস আর আবেগকে প্রকাশ দেন যুক্তির পরোয়া না করে। কুনালের বেসব কাণ্ডকারখানা পর্দায় দেখানো হয়েছে, তা নেহাৎই আরোপিত মনে হয় এবং সে কারণেই বৈপরীত্যের সংঘাতে মৃণালের অমন নিশাধ সত্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতা মনে কোম দাগ কাটে না। অথচ এই দুর্বল কাহিনীটিরই যদি স্বমহত চিত্রনাট্য রচনা করা সম্ভব হত এবং তার চিত্রায়ণে শৃংখলা ও যুক্তি মেনে চলা যেত, তবে এমন একটি অকিকিৎসক ছবি হয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়াত না। বিজয় বোম্বের কটো-গ্রাকী খুবই সাধারণ মানের। সংগীত পরিচালনার আনন্দশংকরও তেমন কিছু দেখাতে পারেন নি। স্বর্ষ চ্যাটার্জীর শিল্প নির্দেশনা নিপুণ। উত্তমকুমারের অভিনয় ব্যতিক্রমপূর্ণ। ভিক্টর ব্যানার্জী কিন্তু অচল। সুপ্রিয়া দেবী, তরুণীশংকর, সুশীল মজুমদার ও সীতা দেবীর অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্ষ কুড়ি, সংখ্যা দুই
নান্দীমুখ
প্রকাশিত হয়েছে
বিশেষ আলোচনা : কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতা : সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী। কবির সঙ্গে একটি তাৎপর্য-পূর্ণ সাক্ষাৎকার। সঙ্গর মজুমদারের বড় গল্প। কবিতা, সংবাদ সংস্কৃতি, লেখক একা প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব ও বিভিন্ন মতামত ইত্যাদি।
দাম : দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা
ঠেলে পাওয়া যাচ্ছে

আসাম

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাভাষাতাবীকে আসাম ছাড়া তাদের হুঃখ দুর্দশা লাগবে হবে এই কথা কোন স্বল্প লোক বিশ্বাস করবে না। বহুজাতিক এই পূর্বাঞ্চলে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। জাতি ও ভাষার ভেদ ও লংঘাত তীব্র হয়ে উঠছে। এই সুযোগে বিদেশী শক্তি ছদ্মবেশে আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সমস্ত পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে একটা ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টি করার চক্রান্ত চলছে। সেই জন্য সমস্ত পূর্বাঞ্চলের আন্দোলনকারীরা "United States of Assam" এই স্লোগান দিচ্ছে। আমাদের দেশের কোন কোন রাজনৈতিক দল এই বিপদকে ছোট করে দেখছেন। বিদেশী শক্তির প্রবেশ বটেছে বলছে বটে কিন্তু তার প্রতিরোধের কোন পথ বাতলাচ্ছে

না। বরং মাঝে মাঝে আন্দোলনকারীদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করতে চাইছে বাংলা দেশের মুসলমানরাই হল আসল বিদেশী। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার ইচ্ছন যোগাচ্ছে।

এখন এক সরকারের অল্প সময়ের মধ্যে দোষী সাব্যস্ত করে নিজে পরিষ্কার থাকার চেষ্টা বুঝা। এর দ্বারা লম্বা সময়ের সমাধান ত হবেই না, বরং বেড়েই চলেবে। যে সমস্ত তাদের সৃষ্ট তা এখন বুঝে যাচ্ছে। এমন কি সমগ্র ভারতের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপদ শুধু কোন পার্টি বা সরকারের নয়, সমগ্র দেশের।

এই সরকার সৃষ্ট পরিস্থিতি থেকে পরিচালনের উপায় লম্ববেতভাবে সকল মতের লোক একত্রিত হয়ে বের করতে হবে। চক্রান্তের মূল আঘাত করতে হবে। এই বিপদগামী আন্দোলনের উদ্ধাত্তাদের

চিহ্নিত করে জনগণকে এদের থেকে বিভিন্ন করার চেষ্টা চালাতে হবে। কাজটা খুবই কঠিন। একমাত্র পথ হল লোকের হুঃখ ও বেদনা লাগবেই জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে, বিদেশী শক্তির চক্রান্ত জনগণের সামনে প্রকাশ করে দিতে হবে। তারা আমাদের অতীতে কি কতি করেছেন, এখনই বা কি কতি করতে চাইছে এর একটা স্পষ্ট ছবি জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিভেদনীতি চালিয়ে ১৯৪৭ সাল ও তার আগের থেকে আমাদের অনেক চোখের জল করিয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে, অভাব অধুনে মৃত্যু হয়েছে। এখনও লক্ষ লক্ষ লোক পুত্র জীবন আপন করছে। এর উপর যদি আবার পূর্বাঞ্চল থেকে বিদেশী নাম দিয়ে লোকদের তাড়ানো আরম্ভ হয় তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় সমস্ত ভারত বিপদে পড়বে, যেটা চাইছে সাম্রাজ্যবাদী ও তার চক্রান্তকারী দোসররা।

শুধু এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিরাম-সঞ্জয় অনুগামী

১ম পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রে সঙ্ঘের যে বাহিনী ছিল তাদের নেতৃত্ব দিতে। শুধু তাই নয় শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হয়ে সরকারী প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করার জন্যও এরা খুব তৎপরতা শুরু করেছেন।

এই অবস্থা দেখে সঙ্ঘের অস্তিত্ব অস্থায়ী বণা জগদীশ টাইলার, মাধবরাও, ধরমবীর সিং, ডি সি স্ত্র, মাকওয়ানা প্রমুখ সঙ্ঘ অস্থায়ীরাও চেষ্টা করছেন সংগঠনের ধীরারিত হাতে নিতে এবং সরকারী প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে।

সঙ্ঘের অস্থায়ীরা ক্রমশঃ লড়াই এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, বলে যে কোন মুহুর্তে ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। অবস্থা দেখে স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অবস্থা বা তাতে যদি শ্রীমতী গান্ধী বিবদমান সঙ্ঘ অস্থায়ীদের কোনওভাবে ঠাণ্ডা না করতে পারেন তবে দলকে ভাঙনের সম্মুখীন হতে হবে।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী তার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধীকে রাজনীতিতে বোগ দেওয়ার জন্য অহুমতি দিয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টারা মনে করছেন রাজীব হয়তো বিবদমান সঙ্ঘ অস্থায়ীদের এককোট করে রাখতে পারবেন।

হীন সংগ্রাম চালানোই হবে না, তার সঙ্গে দেখতে হবে আসামের জনগণের প্রকৃত কোন সমস্যা আছে কিনা। এদের ভয়ের কারণগুলির কোন সত্যতা আছে কিনা তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। শুধু দমন নীতিতে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না, বরং জটিল হয়ে উঠবে।

একথা অবশ্যই করার কোন উপায় নেই যে এতদিন লম্বা পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের কাজে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এই অনগ্রসর অঞ্চলে অস্তিত্ব রাজ্যের থেকে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা উচিত ছিল, যা হয় নি। এই সব কারণে এই সব অঞ্চলের লোকের মনে বিক্ষোভ জন্ম হয়ে আছে। সেই বিক্ষোভকে বিভেদপন্থীরা কাজে লাগিয়েছে। এই অঞ্চলের উন্নয়নের কাজ অতি দ্রুত আরম্ভ করা দরকার। যদি টাকার অভাব হয় অস্তিত্ব রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পেও এইদিকে ঘরাদিত করা দরকার। বেকার সমস্যাই এখনকার ছাত্র ও যুবকের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের বিপদগামী করেছে। পূর্বাঞ্চলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রগতিই এই বিভেদকারীদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে লাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও কিরিয়ে দিতে হবে। জাতীয় সংহতি রক্ষার দায়িত্ব জনগণের সচেতন জমিকার উপর অনেকটা নির্ভর করে। সরকারকেও সেই নীতি রূপায়ণে অগ্রণী হতে হবে। দেশের সমস্ত কমতা ও অর্থ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে।

সরকার ও সব বিরোধী দল বসে ১৯৭১ সনকে বিদেশীদের বাদ দেবার ভিত্তি বৎসর ধরা হয়েছে তার একটা কারণ আছে। ১৯৭১ সনের লোক গণনা (যা আগে উল্লেখিত হয়েছে) প্রমাণ করেছে আসামে অনন্যদমীরা লোক ১৯৬১ সাল থেকে কমতির দিকে। কাজেই সেই বৎসরকে ভিত্তি বৎসর হিসাব নিলে আসামের প্রতি অবিচার করা হবে একথা বললে অস্তিত্ব হবে। এই বৎসরের পর যদি

কোন লোক আসামে ঢুকে থাকে তাহলে তাদের অস্তিত্ব দরিয়ে দেওয়া উচিত। এই ব্যাপারে সকলে একমত। আসল কথা হল ১৯৬১ বৎ ১৯৭১ সন সমস্ত নয়। সমস্ত হল অস্তিত্ব। বড়সরকারীরা কোন মুক্তি মানতে প্রস্তুত নয়। তারা তাদের বিভেদমূলক কাজ চালিয়ে যেতে বহুপরিকর।

মতামত

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

করতে বলছে এবং বড় জোর এস, ডি, ও বা বি, ডি, ও-র কাছে ডেপু-টেননের মধ্যে ব্যাপারটাকে দীর্ঘায়িত রাখার চেষ্টা করছে।

তাই আজ ভারতের সং ও নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্টদের প্রধান কাজ মেহনতী জনগণের প্রকৃত ক্ষমতাকে সংহত করা। যাও সে তুওর ভাষায়, "জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাসের নিয়ন্তা শক্তি"। শোষণ শ্রেণীর তৈরী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের অব্যবহ কল্পনায় নিজেদের ডুবিয়ে ফেলা নয়, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের বিপ্লবের প্রস্তুতি নেওয়া"।

ভারতের দিকে দিকে স্বৈরাচারী পদ্ধতি আবার শোনা যাচ্ছে। একমাত্র প্রতিরোধ ও পাণ্ডা আঘাত করার মধ্য দিয়েই কমিউনিষ্টরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

সুতরাং বাহরুকের দলগুলির এখনও সময় আছে। বেহেতু তারা সরকার গঠন করেছে, সেহেতুই তারা যদি ভেবে থাকে যে, জনগণ তাদের দমননে আছে সুতরাং প্রতিজ্ঞাশীলরা সহজে আঘাত করতে সাহস পাবেনা, তবে তারা শুধুই কল্পনার জগতে বাস করছে। সম্প্রতিকালে চিলি, ইকোনেশিয়ার ঘটনাই প্রমাণ করেছে যে, "জনগণের বাহিনী না থাকলে তাদের আর কিছুই থাকে না"। তাই শুধু বাম ও গণতান্ত্রিক ইকোর আওরাজ তুললেই একা গড়ে ওঠে না বা ক্যান্ডিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। একমাত্র দেশের শ্রেণী সংগঠনের মধ্য দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম তথা সমাজ বিপ্লবই জনগণের একমাত্র মুক্তির পথ।

শঙ্করায়ণ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

পর্ষদ প্রকাশন

১। সমাজবিজ্ঞানীয় ভূগোল / শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য

শ্রীমতী অনিমা ভট্টাচার্য / ২৫.০০

২। ভারতের শিলান্তর ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস /

ডঃ তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী / ১৬.০০

৩। রাজা সুবোধ মল্লিক স্মারক, কলিকাতা-১৩

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম লিমিটেড

(কেন্দ্র ইন্ডিয়া একট মনো নিয়ম)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা টেন্ডার :

উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ

নিম্নোক্ত দফাগুলি সরবরাহের জন্য। (ক) টেন্ডার নম্বর (খ) বিবরণ ও পরিমাণ (গ) টেন্ডার ফী (ঘ) জমা দেবার শেষ তারিখ (ঙ) খোলার তারিখ নিম্নরূপ : (১) (ক) ই সি এল / সি পি ইউ আর / ০০ / মাইনিং টেলিফোন / ৮০ / ৬৪ (খ) ১৬২টি মাইনিং টেলিফোন (ডি জি এম এস অন্তর্ভুক্ত) (গ) ১০ টাকা (ঘ) ২২-৮-৮০ বেলা ১টার অথবা তার আগে (ঙ) ২০-৮-৮০ বেলা ৩টার। (২) (ক) ই সি এল / সি পি ইউ আর / ০৮ / ডি ক্যান / ৮০ / ৬৫ (খ) ৬ সেট অ্যাক্সিয়াল ব্লো ভেন্টিলেশন ক্যান ক্ষমতা ২৫,৫০০ এম ৩ / আওয়ার ২০৪ এম এম ডবলু জি-তে (গ) ২০ টাকা (ঘ) ২১-৮-৮০ বেলা ১টার অথবা তার আগে (ঙ) ২১-৮-৮০ বেলা ৩টার। স্পেসিফিকেশনের সিডিউল এবং সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেন্ডার দলিল মেট্রিয়ালস ম্যানেজারের (পার্চেস) অফিস, ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম লিমিটেড, সাকভোরিয়া, পোঃ দিশেরগড়, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে একই ঠিকানায় কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট ফী নগদে জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে যে কোন কাজের দিনে পাওয়া যাবে। একই ঠিকানায় কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে পাঠানো মনি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি দলিল পাঠাবার ডাক খরচ বাবদ টেন্ডার সিডিউল অস্থায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) বা তার বেশি পাঠানো হয়। টেন্ডার গ্রহণের তিন দিন আগে টেন্ডার পত্র বিক্রয় বন্ধ করা হবে।

সামগ্রিক আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংগ্রহ অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হইবে। টেন্ডারের ফি বাবদ মনি অর্ডার টেন্ডার গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনের) দিন আগে পৌছাতে হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীপাদী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং চন্দ্র কাৰ্যালয় ৩১, মট সেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

দপন

ত্রয়োবিংশ বর্ষ ২৪শ সংখ্যা ১১ই জুলাই ৮০ ৬০ পয়সা



উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গোলযোগে কলকাতা এবং আশপাশের মিশনারীরা জড়িত

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গো ল যোগে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে সমস্ত মিশনারী চার্চগুলো অতি সক্রিয় তার অন্ততম হলো রয়েল ইন্সটিটিউট অফ মিসনরিজ অফ গড চার্চ এবং ধর্মতলা ইন্সটিটিউট অফ মিসনরিজ। উল্লেখযোগ্য, বাঙালী

বিরোধী আশ্রমে উম্মানী দেবার জন্ত অ্যাসেমব্লি অফ গড চার্চের নিজস্ব প্রেসে হাজার হাজার প্রোচনামূলক প্রচারপত্র ছাপানো হয় এবং উত্তর বঙ্গের নেপালী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বিলি করার জন্ত জটিল প্রোগ্রাম শুরু ও চালু করা হয়।

নামক দুই ব্যক্তিকে এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরে অবশ্য শোনা যায় যে প্রতিশ্রুত বোম্বাওনা নিয়ে গোলযোগ হওয়ার নিয়োগিত এই দুই ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করতে পরাজিত হয়। অতঃপর অস্বাভাবিক পরিণামে গোপন যত্নসহ ও গোপন খাতি ফাল হয়ে যাবার আশংকার চক্রান্তের উদ্ভোক্তারা দায়িত্বভারে এই কাজ বন্ধ রেখেছে।

আরো জানা গেছে, এই দুই চার্চের কর্তৃপক্ষই জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করার বোকা দিয়ে প্রতিদিনই গ্রাম থেকে দলে দলে সরল মানুষকে কলকাতায় নিয়ে আসে ও গ্রীচান ধর্মে দীক্ষিত করে। অবশেষে চাকুরী পাওয়ার পরিবর্তে পুরুষেরা 'বাবুদের' বাড়ীর বাবুচি অথবা বোয়ারা কিংবা গির্জার দোরোয়াম প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হয় এবং শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে করেকটি স্বার্থাঘেযী মহল খুব হৈ চৈ করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি কিংবা হচ্ছে না। দিল্লীতে তো নয়ই। অন্যদিকে সঞ্জয় তাঁর অল্পদিনের জীবনে যেসব কাণ্ডকারখানা করে গেছেন তা দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে তত সহজে ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

২৩শে জুন সকাল আটটার সময় সঞ্জয় মারা যান। দিল্লীর আকাশে প্রতিদিন লকালে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীতমর প্রেনে ডিগ-বাড়ী খেতেন। বাহাদুরির জন্ত তার এই খেলা চলতো দিল্লীর মধ্য আকাশে। নিজের বাড়ী, শতরবাড়ীর মাথার ওপর দিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক

প্রেনে কসরৎ দেখানো প্রতিদিন সঞ্জয়ের নিত্য কর্মসূচী। ২৩ জুন ওর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে নির্মম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। দিল্লীর বাবতীর নোংরা বয়ে যাওয়ার ধানের পাশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর উত্তরসূরী সঞ্জয় গান্ধী উৎসবের মৃত্যুর শিকার হন।

সঞ্জয়ের মৃত্যুতে সারা দেশ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে কিংবা মুগ্ধে পড়েছে একথা ঠিক নয়। এই মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছেন তার আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গ ছাড়া একদল স্বার্থাঘেযী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, সরকারী প্রচার ও বাগাড়ম্বর ছাড়া বিমান ছুঁটনার খবর ছড়িয়ে শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

প্রাক্তন সি পি আই (এম-এল) নেতা কানু জান্যালের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

মকশাল আন্দোলনের অন্ততম নেতা শ্রীকান্ত সান্ডাল মনে করেন সি পি আই (এম-এল) নামক সংগঠনটি নামে কমিউনিষ্ট পার্টি হলেও আসলে তারা ছিল সন্যাসবাদে বিশ্বাসী। মার্কসবাদের সঙ্গে সন্যাসবাদের সম্পর্ক বৈরিতামূলক।

শিলিগুড়ি শহরে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীকান্ত সান্ডাল বলেন, "একসময়ে আমিও এই সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি যে, কি ভুল করেছি সন্যাসবাদে বিশ্বাসী হয়ে।" বর্তমানে কানু বাবু কমিউনিষ্ট বিপ্লবী সংগঠনী কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

সি পি এম দলকে সংশোধনবাদী দল হিসাবে অভিহিত করে তিনি বলেন যে, মার্কসবাদের সঙ্গে সংশোধনবাদের সম্পর্কও বৈরী।

তিনি বলেন, কমিউনিষ্ট বিপ্লবী সংগঠনী কমিটির লক্ষ্য হল মার্কস-লেনিন-মাওবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি সংগ্রামী কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলা।

ত্রিপুরা ও আসামের আন্দোলনকে সমর্থন করে কানু বাবু বলেন, প্রতিটি আত্মীয় আত্মীয়ের অধিকার আছে। তাই এই দুই রাজ্যের আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু তা বলে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আমি কোন মতেই সমর্থন করিনা। তিনি বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান



যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন অম-গ্রন্থ জাতিগুলি তাদের ভাবা ও অধিকারের দাবি নিয়ে রাজনৈতিক রণযুদ্ধে আবিস্তৃত হবে। এই সব জাতিগুলি বিাতর প্রেীতে বিভক্ত। প্রমিকপ্রেরী নেতৃত্বে শোষিত প্রেী-শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

রাজ্য ই-কং কমিটি পুনর্গঠন নিয়ে আবার জল ঘোলা

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠনের ব্যাপারে আবার নতুন করে জল ঘোলা শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দুই নেতা বরকত গনি খান চৌধুরী এবং প্রণব মুখার্জী ঘোটাঘুটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। এদের সঙ্গে শিল্পপতি কমল নাথেরও কথা হয়েছিল।

ঠিক ছিল সঞ্জয় গান্ধী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গের জাত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করবেন। কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আবার নতুন করে জটিল হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে যে, সঞ্জয় থাকা-কালীন প্রণব বাবু এবং বরকত সাহেব একমত হয়ে কমিটির সদস্যদের যে নামের তালিকা তৈরী

করেছিলেন এখন রাজ্য ত্তরের অনেক নেতাই আবার নতুন করে তালিকা তৈরী করার জন্ত প্রণব বাবু এবং বরকত সাহেবের ওপর চাপ দিচ্ছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, বরকত সাহেব রাজ্য কংগ্রেস নেতা কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, কমিটি গঠন করা আপাততঃ স্থগিত হইল।

যে সমস্ত রাজ্য কংগ্রেস নেতা পুরনো তালিকার স্থান পান নি অথবা উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে ভায়গা পান নি তারাই আবার নতুন করে কমিটির তালিকা তৈরী করার জন্ত চাপ দিচ্ছেন। এদের মধ্যে আছেন, প্রমুখকান্তি বোষ, হুসল ইসলাম, আবদুস সাত্তার প্রভৃতি নেতারা।

বতদূর জানা গেছে প্রমুখকান্তি শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় কাম্পুচিয়াকে স্বীকৃতি

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতিকে কবরস্থ করে ভারত কাম্পুচিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে। লোকসভায় একথা ঘোষণার সময় বিদেশ মন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহরাও কাম্পুচিয়ার জনগণের জন্য মায়াকারী কৈদে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাইরের বৃহৎ শক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমাধানের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা কাম্পুচিয়ার পুতুল সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভারতই পথ আরও প্রশস্ত করে দিলেন। এটা ভারত সরকারের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্লজ্জ তাবৎকারি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, কাম্পুচিয়ার ভিত্তেভিত্তি বাকলমে বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের অশ্রু উপস্থিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অটল করে তুলেছে। কারণ চীন কাম্পুচিয়ার সোভিয়েত-ভিত্তেভিত্তি পুতুল সরকারকে কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হতে পারে না। নিজের জাতীয় স্বার্থে তো বটেই, এই অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থেও এবং মধ্য-বাহ্যের আগ্রহী নীতির বিরোধিতার জন্য।

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ভারত সরকারের থেকে কাম্পুচিয়া থেকে ভিত্তেভিত্তি নৈমিত্ত অপসারণের দাবি তোলা উচিত ছিল সন্দেহে নেই। সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে পরোক্ষে স্থানীয় আগ্রহী নীতিকেই মরত দেওয়া। হল বলা হয়েছে ইন্দিরা কংগ্রেসের নির্বাচনী ইচ্ছাধারে নাকি কাম্পুচিয়াকে স্বীকৃতি দেবার প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কথা হল, অত্যন্ত ব্যাপারে যখন ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করতে পারছে না তখন এ ক্ষেত্রে এত সংস্কার কী প্রয়োজন ছিল? ইন্দিরা সরকারের দিক থেকে নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল এবং আছে। ভারত-পাক যুদ্ধের সময় থেকে ভারত সরকার পুরোপুরি সোভিয়েত ইউনিয়নের কলার। ভারত সোভিয়েতের প্রধান শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত। এবারের লোকসভা নির্বাচনের পর মনে হয়েছিল ইন্দিরা সরকার বুঝি একটু সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান নীতিতে প্রমাণ হয়ে গেল যে একথা ভুল।

বিধানসভা

বিহারে মারামারি

গত ১১ জুলাই বিহার বিধানসভায় ইন্দিরা কংগ্রেস ও লোকসভার সদস্যদের মধ্যে যুবোদ্যম হয়ে গেছে। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেন ভাষা অসমবাপন নিয়ে ও মাইক্রোফোন স্থানচ্যুত করে। ফলে স্পীকার শ্রী আর এন. বা. বাধ্য হয়ে বিধানসভার অধিবেশন মূলতুর্বা রাখেন।

এই অবতন ঘটে স্পীকার দুটি মূলতুর্বা প্রস্তাব খারিজ করে দেবার

মহারাজা চৌকার চৌচামেচি

চৌকার চৌচামেচির জন্য মহারাজা বিধানসভায় স্পীকার শ্রী আর এন. বা. ১১ জুন সভা দেখিমের মত মূলতুর্বা রাখতে বাধ্য হন। এই গুণগোলের মেতুখ দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন. বা. শাসক ইন্দিরা কংগ্রেসী সদস্যদের সম্মুখ প্রতিবাদ তাঁকে সম্মুখ পাবেনি।

এখানেও গুণগোল মূলতুর্বা প্রস্তাব নিয়ে ঘোঁটাঘুটি ছিল গত সপ্তাহে নাগপুর জেলায় রামচৌকে একজন আসামীর পুলিশের হেপাজতে মৃত্যু

উত্তরপ্রদেশে সভাকক্ষ ত্যাগ

একই দিনে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সমস্ত সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। বাগপতের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্য।

অবশ্য স্পীকার শ্রী শ্রীপতি মিশরা

কানুশাখাল

১ম পৃষ্ঠার পর গুলির সংগ্রাম যদি দানা না বাঁধে তাহলে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। তাই উগ্র জাতীয়তাবাদীরা ত্রিপুরা ও আসাম আন্দোলনের নেতৃত্ব আসতে পেরেছে। এজন্য জাতিগুলিকে দায়ী করা ঠিক হবে না, নেতারা সেজন্য দায়ী হতে পারেন।

ত্রিপুরা ও আসাম আন্দোলনের পেছনে কোন বিদেশী শক্তির হাত আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন, ১৯৪৮ সালে যখন নাগা আন্দোলনের নেতা এ. জে. ড. ফিল্ডকে সাম্রাজ্যবাদের চর বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ফিল্ড

প্রতিক্রিয়ায়। প্রথমটি ছিল শনিবার মধ্যাহ্নে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলী চালনা নিয়ে এবং দ্বিতীয়টি ছিল মুন্সের জেলার অসির গ্রামে অধিবাসন লোককে হত্যা করার ঘটনা নিয়ে। স্পীকার ও মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র কক্ষ ত্যাগের পরও লড়াই চলেছিল।

বিধানসভা পুনরায় বসলে অবশ্য বিরোধী দলের নেতা (সি. পি. আই) এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

এবং তার ফলে যে দালা হয় তার ফলে পুলিশের গুলী চালানার ব্যাপারে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন. বা. বলে দিয়েছিলেন যে, সংশ্লিষ্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের কাছে একজন বিচারপতিকে দেবার জন্য অগ্ররোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু এই বিবৃতি বিরোধীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁরা এই সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা চেয়েছিলেন।

ঘটনার শুদ্ধ বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি. সিংকে একটি বিবৃতি দেবার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী সভাকে বলেন যে, আগামী ১১ই জুলাই তিনি এই বিবৃতি দেবেন।

সাম্রাজ্যবাদের চর ছিলেন না। ছিলেন না বলেই বার বার ভারত সরকার তাঁর সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছেন। কাহ্নাবুর মতে আশাম আন্দোলন অসমীয়া জাতির গণ অভ্যুত্থান। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পক্ষে কোন গণ অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব নয়।

আশাম এবং ত্রিপুরার আন্দোলনকারীরা বিদেশী আধুনিক অস্ত্রের কোথায় পাচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরে কাহ্নাবু বলেন, তারা সংগ্রহ করেছে। আগলিং করে আসছে বা আগলারদের কাছ থেকে কিনছে। বিদেশী অস্ত্র পেলেই আন্দোলনকারীদের বিদেশীরা দাখিল করছে একথা বলা ঠিক নয়। আমরাও কি তাহলে বিদেশী দালাল?

সি. পি. আই (এম-এল) বলে পরিচিত বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করার কোন প্রয়াস ওঠেনা কেননা এ হল গঠনই হয়েছিল

মিশনারী

১ম পৃষ্ঠার পর

মেয়েরা কালক্রমে 'পালী সাহেব', 'বিদেশী সাহেব', 'পুলিশ সাহেব', ইত্যাদিদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয় অথবা 'কি'-এর কাজ করে। কাউকে কাউকে আবার কলকাতা ও আশপাশের নিষিদ্ধ পল্লীগুলোতেও দেখা যায়। চার্ট দুইটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো শাসনাবধীন জুল দুটির টিচিং ষ্টাফ অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রায় প্রত্যেকেই চার্ট কমিটির সদস্য। আদিবাসী উপজাতি অঞ্চলের সুবিধাভোগী অংশটি থেকে কিছু কিছু লেখাপড়া জানা পুরুষ ও মহিলা এই সমস্ত সংস্থাগুলোতে নানা ধরনের কাজ করে। এদিকে আবার নাগাল্যান্ডের একটি ব্যাপ্টিস্ট চার্চের হর্তাকর্তা কাদার পিকাটো সাম্প্রতিকতায় নিয়ে যার বখোঁট দুর্নাম আছে তাকে ইদানীং বন্দন কলকাতায় এই দুটি চার্চে আসতে দেখা যাচ্ছে। বিবর্তন হচ্ছে এ সম্পর্কে জানা গেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী অর্বে পুষ্টি বড়বড়ের এই দুই গোপন ঘাঁটি থেকে উত্তর-পূর্ব-অঞ্চলের দালালকে শক্তিশালী করার জন্য অর্বে ও অস্ত্র আত্মসম্মতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

মাদার টেরেসার দুই শতক ঘাঁটি, অর্থাৎ মরিশপুরের সেন্ট টমাস চার্চ, কুপ ও লোরার সাহুলার রোডের তাঁর রাজি বাগানের আশ্রিতা সম্পর্কেও বখোঁট অভিযোগ আছে। টেরেসার সংস্থাগুলি ও সালভেশন আর্মি সংস্থাটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে যে, এরা অস্ত্রসহা কুমারীদের এই শর্তাবধীনে প্রসবের দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, যা কোনদিন সম্ভাব্য দাবি জানাতে পারবে না। তারপর বাচ্চারা বড় হবার পর বিশেষ করে

সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে।

তিনি বলেন, সি. পি. এম. বলে যোগদান করার কোন প্রয়াস ওঠেনা। কারণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শত্রু দুটি। প্রথমটি হল সাম্রাজ্যবাদ আর অপরটি সংশোধনবাদ। আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে যে কোন দেশেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলা যায়। এই হল আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শিক্ষা।

সি. পি. এম. বলে আমরা যোগ দেব না। কিন্তু তাদের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা আন্দোলন করব। কারণ, প্রমিত, কৃষক, মধ্যবিত্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষের ওপর সি. পি. এম. দলের প্রভাব আছে। জনসাধারণকে মোহমুক্ত করে তুলবার জন্যই আমরা সি. পি. এম. দলের সঙ্গে যৌথ আন্দোলন করতে চাই।

কাহ্নাবু বর্তমানে তরাই অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জলসী ও তাল ও তাঁর সঙ্গে আছেন।

কতটা সম্ভাব্যতার বিভিন্ন অঙ্গ উদ্ভেদে ব্যবহার করা হয়। মাদার টেরেসা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আর একটি অভিযোগ হলো, ১৯৭১ সালে-বাংলা দেশের উদ্বাস্তুদের জন্য সামগ্রী নিয়ে দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপের দরুন তদানীন্তন এক এম.ডি ও সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন এবং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু এই অপরাধকে ধামাচাপা দেবার জন্য মাদার টেরেসা সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

হাওড়ার শিলখানী বস্তিতে বেশ কয়েক বছর আগে জাল থেকে আশা জটনক পালী সাহেব রমরমা আড্ডা জমিয়েছে এবং তথাকথিত 'জনহিতকর' কাজের নামে মূঠা মূঠা টাকা ছড়িয়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জীতান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে। স্থানীয় যত্নদেয় পৃষ্ঠপোষকতার নামে মদ-মাংসের জোগান দিয়ে এই ব্যক্তিটি তাদের নিজের দেহরক্ষীর কাজে নিয়োজিত করে থাকে। অত্যন্ত গোপন প্রুজে জানা গেছে সাতটি লীম্বা রাজ্যের দালাল সঙ্গে এবং 'সেন্টের দিটার' অথবা 'সাত বোন' দংগঠনের সঙ্গে করাদী পালীটি প্রত্যাকভাবে জড়িত।

সঞ্জয়ের নামে

সঞ্জয়ের মৃত্যু নিয়ে আখের গোছানোর ধুম পড়ে গেছে। এর মধ্যে একদা প্রগতিশীল বলে পরিচিতরাও বাক নেই। শোনা গেল, নক্ষত্র গোষ্ঠীর জামল ঘোষ নাকি একেবারে সঞ্জয়ের কৃমিকার-অবতীর্ণ হবেন। তাও শুধু বাংলা নয়, হিন্দীতেও শ্রীবোব সঞ্জয়ের জীবনী-মূলক যাত্রাতে অভিনয় করবেন।

জটনক স্থানীয় বন্দোপাধ্যায় সঞ্জয়ের জীবনীচিত্র পরিচালনা করার কাজে নামছেন। তিনি এখাপায়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। আন্তর্জাতিক ধর্ম হলো, এ সংবাদ আবার হেঁ হেঁ করে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে থেকেও প্রচার করা হয়েছে। তবে কলকাতা দূরদর্শন সম্পর্কে দ্বিতীয় মনোভাব তেমন সুবিধা নয় জেনে এখানকার কর্তৃপক্ষ সঞ্জয় মারা যাওয়ার পর থেকে যা শুরু করেছেন তা অতীতের সমস্ত নজীরকে ছাড়িয়ে গেছে। ২৩ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভি. ভি. গিরির পেশাল বুলেটিন টি, ভি-তে হবার সমস্ত কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ সঞ্জয়ের শেষ কৃত্য প্রদর্শন করে বলেন। শোনা যাচ্ছে সরকারী প্রচার কাজের নাকি এখানেই শেষ নয়। আরও হবে।

দেশ কাল রাজনীতি

নারী শাসনে নারী নির্যাতন

ভারতপুত্র

ভারতে কি এখন শুভারাম চলছে, না পুলিশী রাজত্ব? যে দেশে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে একজন নারী অধিষ্ঠিতা, সে দেশে নারীর ইচ্ছা ও মর্যাদা খুঁটার লুটাবে? গত ১৮ই জুন উত্তর প্রদেশের বাগপতে শ্রীমতী মায়ী ত্যাগীকে যেভাবে তাঁর সর্বস্বত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে তাতে জনমনে আশ্রয় নতুন করে এ-প্রশ্নটি উঠেছে। প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে কারণ, বাগপতের ঘটনা কোন অদূতপূর্ব ব্যতিক্রম নয় বরং অল্পপূর্ণ ঘটনাবলীর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কারণ মধ্যপ্রদেশের খবর, কেবল রায়পুরেই গত কয়েক মাসে নারী ধর্ষণ ও স্ত্রীলতাহানির কুড়িটি ঘটনা ঘটেছে।

বাগপতের ঐ নারকীয় ঘটনার পুনরুল্লেখ এখানে নিম্নরোজম। যেটা উল্লেখ করা দরকার সেটা হোল, এতবড় একটা কেলেকারীকে চাপা দেবার বা হাকা করার পর-কারী প্রচেষ্টা। মায়ী ত্যাগী তার চোখের সামনে স্বামী ও তার দুই বন্ধুকে পুলিশের গুলিতে নিহত হতে দেখলেন। স্বামী হারানোর শোক বেন বখেটে নয় সে জন্তই সন্ত বিধবা মায়াকে প্রকৃত দিবালোকে কয়েকশো জোড়া চোখের, সামনে ঐ পুলিশের দারাই বিবস্ত্র হতে হোল। তাতেও বেন ভারতীয় নারীর মর্যাদা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি, সেজন্ত থানার লক-আপে বড়বাবু মেজবাবুদের লালসা চরিতার্থ করতে হোল। স্বভাবতই ভারতীয় নারী-দের এই চূড়ান্ত অবমাননার লক্ষ্যে বিরোধী হল কোথেকে কোথেকে এবং যুগায় কেটে পড়েছে। তারা এ ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত যেমন দাবী করেছে আবার তেমনি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তাদের গ্রেপ্তার, দাপ্তরিক প্রশমন এবং শাস্তি চেয়েছে। লোকদল প্রধান চরণ সিং এই ইস্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। জর্জ ফার্নান্ডেস দাবী জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশ সরকার (কংগ্রেস-ই) পদত্যাগ করুন।

কেন্দ্রীয় বরাট্রমন্ত্রী জৈল সিং বিরোধী হললোককে বাগপতের ঘটনা থেকে রাজনৈতিক কর্তৃক না তোলার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু

সে কর্তৃক তো তুলতে চাইছে আরই কংগ্রেস (ই) হল। সে জন্তই এক মনগড়া কাহিনী প্রচার করা হচ্ছে যে সে দিন বাগপতে নিহত তিন ব্যক্তি ছিল ডাকাত, পুলিশের সংগে দশজ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েই তারা প্রাণ হারিয়েছে, মায়ী ত্যাগী গ্রামবাসীদের হাতে লাঞ্চিত হয়ে-ছেন।

সংসদীয় এতিনিধি হল বাগপত গিয়ে ঘটনার তদন্ত করেছেন। মায়ী ত্যাগী নয়াদিল্লী গিয়ে নেতাদের কাছে লম্বা ঘটনা বিবৃত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের আলাদাভাবে মায়ী ত্যাগীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে-ছেন। দেখেছেন মায়ার শরীরে অস্তিত্ব অল্প ক্ষতচিহ্ন। বাগপত ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নারীদের মান মর্যাদা, মানুষের নিরাপত্তা অতঃপর অক্ষুণ্ণ থাকবে— ভারতের পরজিহা কোটি নারী ইন্দিরা সরকারের ওপর এ ভরসা করতে পারবে কি?

আবার সৈরতস্ত্রী কোপ

আর কিছু করতে না পারুন ইন্দিরা সরকার যে গণতান্ত্রিক ভার নীতির বেড়া অতি লম্বা চোখ বুঁজে টপকে সৈরতস্ত্রীর ভিত গাঁথতে হুক কারিগর সে-বিষয়ে আর কোন লেশম নেই। এ-মনোভাবের সর্ব-শেষ খাঙ্কর তারা রেখেছেন আসাম সম্পর্কে লোকসভার দুটো বিল উত্থাপন করে। বিল দুটোর দ্বারা কার্যতঃ আসামে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং রাজ্য বিধানসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আসাম আন্দোলন কারীদের নতুন করে প্রশাসন অকল্যাণ করে দেবার হুকুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যেই বিল দুটোর অবতারণা। বাস্তব ঘটনা পরবর্তীকালে প্রমাণ করেছে যে ইন্দিরা সরকারের আইন লাল ফিতার বাঁধনেই ফাইলবদ্ধ রয়েছে, আন্দোলনকারীরা লোকলোকে আঁধো আমল দেয় নি। মধ্যস্থান থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের পবিত্র ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারটি নিপুণহস্তে লোপাট করে দেওয়া হল। এবং সেই সঙ্গে এক চিলে লোকসভা বিধানসভার দুই পাখিকে মারা হল। আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে,

হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় পুলিশের প্রশ্রয়ে সমাজ বিরোধীদের তাণ্ডব

হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এখন চুরি, ডাকাতি, হিনতাই, রাহাজানি অব্যাহত চলছে। কথ্যাত সমাজবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসারদের বিচিত্র সহাবস্থানে জেলার নাগরিকরা তটস্থ ও আতঙ্কিত। পুলিশ প্রশাসনের হালচাল দেখে মনে হতে পারে জেলাতে এখন কোনও পুলিশ প্রশাসনই নেই।

সেখানেই গণতন্ত্রের পক্ষ, এক দফায় ছেদন করা হয়েছে। কিন্তু লোক সভার অধিবেশন চলাকালীন তাকে ভিড়িয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গচ্ছিত রেখে গণ-তন্ত্রের টুটিই চেপে ধরা হল। কেন্দ্রীয় বরাট্রমন্ত্রী জৈল সিং ও রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা অবশ্য বিরোধী সদস্যদের স্তোত্রবাক্য শোনাতে চেষ্টা করেছেন যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে না। কিন্তু ক্ষমতার অপ-ব্যবহারের ওপর যে সরকার দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের কাছে প্রতিশ্রুতির মূল্য প্রত্যাশা করা যায় কি? সঞ্জয়ের স্মৃতিরক্ষা?

নিজের অক্ষমতা চাক্ষুস জন্ত এবার কেন্দ্রীয় সরকার অপরের বাড়ি ঘোষ চাপাতে চাইছেন। জিপুরার ঘটনা তদন্তের জন্ত দীপেশ সিং-এর নেতৃত্বে নয়াদিল্লী একটি সাত সদস্যক প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছেন আগরতলা। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক হল নীতিগতভাবে অস্ত্র আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু ইন্দিরা সরকারের আসল মতলবটা কী? হুজুরত মুখার্জি জিপুরার বায় ক্রপ্ট সরকারের পদত্যাগ দাবি করে-ছেন হাজারায় অপরাধে—এই পরি-প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক হল প্রেরণের তাৎপর্য আছে বৈকি।

গত এগারো মাস ধরে আসামে আগুন জ্বলছে। সেখানে রাষ্ট্রপতির বকলমে কংগ্রেস (ই) শাসনই চলছে। কিন্তু সে সরকার আন্দোলন সমস্যার কোন সমাধানই করতে পারেন নি, তাবা ও কর্মগত সংখ্যা-লব্ধদের মিগ্রহ নির্ধাতন অব্যাহতই রয়েছে। উপরন্তু প্রতিদিন তিন কোটি টাকার মতো আর্থিক ক্ষতি হয়ে চলেছে। আসামের বার্ষিক ক্ষতি হয়ে চলেছে। আসামের বার্ষিক ক্ষতি চাপা দেবার জন্তই কি জিপুরার তৎপরতা প্রদর্শনে ইন্দিরা সরকার অগ্রসর-হলেন? প্রকৃত পুজ সঞ্জয়ের আত্মদানী নীতি ও আদর্শকে জীয়ে রাখার জন্তই কি জননী ইন্দিরার এই পদক্ষেপ?

দিনছপুয়ে খুন্খারাপি চলছে। প্রতিবাদ হওয়ারও যো নেই। অমনি টেনগান মেনিনগান নিয়ে ছুঁড়ুরা পুলিশের নাকের ডগাতেই সাধারণ নাগরিকদের ওপর কাঁপিয়ে পড়বে।

কয়েকদিন আগে কাছন্দে ওলা-বিবিতলা লেনের মোড়ে তরুণপুয়ে জৈনক যুবক, নৃশংসভাবে খুন হল। শোনা যায়, যুবকটি নাকি এলাকার পোরা মিজের সমর্থক। ওকে খুন করে কথ্যাত সমাজবিরোধী অস্ত্রশস্ত্রের চোরা-ই চালানদ্বার বলে অভিহিত খুন ঘন রাজনৈতিক জারি বদলকারী নব পাঞ্জার দলবল। পুলিশ ২২২ জুলাই রাত লাড়ে আটটার সময় বাজে শিবপুর রোড থেকে নব পাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করে। রাত থেকেই কং-গ্রেসী মন্তান সহ বিধানসভার নির্বা-চনে পরাজিত প্রাক্তন প্রার্থী অধিকা-ব্যানার্জী থানায় গিয়ে নব পাঞ্জাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করে। এবং পুলিশ অফিসাররা এদের খাতির দেখানোর জন্তেই গুরুতর অভিযোগে ধৃত নবকে থানা লক-আপে না ঢুকিয়ে সেকেও অফিসারের চেয়ারে বসিয়ে রাখেন। পরদিন নব পাঞ্জা যথারীতি ছাড়া পেয়ে যায়। এবং পাড়াতে মিষ্টি বিতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বাসিন্দাদের প্রশ-হানির হুকুর দিতে থাকে। এর এক নম্বর সাক্ষর শিকারী নীলরতন মুখার্জী রোডে, মুখার্জী বাগানে, কাছন্দে নিত্যদিন হয় হিনতাই, নয় রাহাজানি করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নির্বিকার।

এদিকে শালিমার ইয়ার্ড থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার মাল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। টিকিয়াপাড়া থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত কোনও টেনবাড়ীরই বাতায়াত সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বাউরিয়া, চ্যালাইল, আন্দুল প্রভৃতি টেননেও চলছে নানা অপকর্ম। পুলিশ সব জেনেও চুপ। তারা শুধু মাসকাবারি নিতেই ব্যস্ত। লক্ষ করলে দেখা যাবে টেন ডাকাতি ও রাহাজানির নারক বাগনানের লালু মীর, কালু মীর, নোদো, ছোট গোবরা, বড় গোবরাদের সংগে হাওড়া জেলার বেশ কিছু পদস্থ অফিসারের মাথা-মাখি এখন এক জুজারজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। শালিমার জি, আর, পি-র অফিসার ইনচার্জ হলেন বিনোদবিহারী দিকদার। এর সঙ্গে

শিবপুর পুলিশ লাইনের কাছে বস-বাসকারী যখনই মহা দোস্তি। যখন সম্পর্কে বাজারে চালু কথা হলো, বাউরিয়া, চ্যালাইল আন্দুল টেননের করলাবুকে নিয়ে যে বেপরোয়া দুর্নীতি চলছে তার একজন নাম-করা মাতব্বর। করলা বুকেরের সময় হাজার হাজার টাকার রেলওয়ের করলাও নাকি পাচার হয়ে যায়। পাচারকারীরা এরজন্ত পুলিশকে বেনজরানা দেয় তা যোগাড় করে এই যখন।

জানা যায়, শালিমার জি, আর, পি টিকিয়াপাড়া থেকে কোলাঘাট পর্যন্ত টেনপথে বাজী ও রেল সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার মালিক। পুলিশ জানে শালিমার করলা ভিপো ও শালিমার ইয়ার্ড থেকে করা মাল-পাচার হচ্ছে এবং চোরাই মালপত্র কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু সব জেনেও নির্বিকার। শালিমার ইয়ার্ড থেকে লোহা লকর, মলপাতি, কোনও কিছুই ওয়ানগন জাহিরেদের নজর এড়ায় না। একাজে লিঙ্কহস্ত হলো টমাটো নামে জৈনক কথ্যাত সমাজ-বিরোধী। এর কাছ থেকে চোরাই মালপত্র কেনে টিকিয়াপাড়ার মাতাকের ও গোলাপী সাউ নামে দুই বড় ব্যবসায়ী। হাওড়া থানার অন্তর্গত রায়কৃষ্ণপুর লকবার্টের কাছে স্বদামা সাউয়ের গোড়াউনে মলসা, গম, ডাল, আলু, পেঁয়াজ প্রায় প্রতিটি জিনিস-ই রাতে লরী থেকে নামিয়ে নেয়া হয়। রাতের মধ্যেই তা চলে যায় অজ্ঞাত। দকালবেলা পুলিশ এসে তাদের পাওনা কড়ার-গড়ার বুকে নিয়ে যায়। স্বদামা সাউ তার ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখতে শুধু হাওড়া থানা পুলিশ অফিসারদেরই নয়, শিবপুর থানা, শালিমার জি, আর, পি থানার পুলিশ কর্মীদের নজরানা দিয়ে থাকে। এমনকি হাইওয়ের নজরদারী ত্যানের পুলিশরা সরকারী জীপ নিয়ে এসে মাসিক নজরানা আদায় করে চলে যায়।

শিবপুর থানার অন্তর্গত কাজী-পাড়া, গোলাম হোসেন সর্দার লেন প্রভৃতি এলাকার বেপরোয়া চোলাই মদ, সাট্টা জুয়ার কারবার চলছে। তার নিত্য অংশীদার হলো থানারই কর্তৃপক্ষ পুলিশ কর্মী। তাই কথ্যাত সমাজবিরোধীরা পুলিশী আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদব ব্যাপারে শিবপুর থানার অফিসার রেবতী শেখাংশ গম পুঠার

উত্তরপ্রদেশ ও কেন্দ্রে কি ঘটছে

উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এখনও তাঁর নিজের প্রতাপে আসতে পারেন নি। বতাই তিনি দিল্লীর পছন্দমতই কোন না কেন তিনি ছাড়া আরও কজন আছেন যারা তাঁর চেয়ে দিল্লীর আশ্রয় কয় পাচ্ছেন না। তবে এটা ঠিক তাঁর অবস্থা মোটেই নড় বড়ে নয়। বেশ শক্ত। তাঁর পরে উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেউ না থাকলেও বীর বাহাদুর অধোবিত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর মতামত প্রাধান্য পাবে। এখন

সিনেমা হলে লক-আউট

বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতা, আমানসোল ও ২৪ পরগণার দশটির বেশি সিনেমা হল লক-আউট থাকার ফলে আড়াই-শো সিনেমা কর্মচারী দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন। কর্মচারী ইউনিয়ন বি-এম-পি-ইউর নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। শুধু লক-আউট নয়, বিভিন্ন সিনেমা মালিকরা কর্মচারীদের শারের্তা করার জন্তে হাটাইয়ের-রাস্তা ধরেছেন যেমন আমানসোলের নেত্র সিনেমার। বেহালার পুন্ড্রী সিনেমা গত তিন মাস ধরে লক-আউট করে রাখার ফলে ছাত্রজন কর্মচারী বেকার হয়ে আছেন। স্থানীয় সিনেমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা জিনিতাই চক্রবর্তী অভিযোগ করেন যে, সরকার নির্ধারিত মহার্ঘভাতা দিতে মালিকপক্ষ অস্বীকার করেছেন। এই সিনেমার সিনেমা কর্মচারীদের বেকার মহার্ঘভাতার পরিমাণ হল আশীহাজার টাকার মত। তিনি জানান যে, শ্রমিক-কর্মচারীরা বেকার মহার্ঘভাতা, তাঁদের অন্ত্যস্ত দাবি-দায়িত্ব মিটিয়ে দেবার অহরোধ জানিয়েছেন। এই দাবির পাট্টা ব্যবস্থা হিসেবে মালিকপক্ষ এই লক-আউটের পথ নিয়েছেন।

শ্রীচক্রবর্তী প্রসঙ্গত বলেন যে, বাংলা ছবির বদলে হিন্দী ছবি দেখানোর একটা প্রবণতা রয়েছে সিনেমা মালিকদের মধ্যে। সিনেমা কর্মচারীরা এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, অসীল হিন্দীছবির বিরুদ্ধে শুধু বাংলা ছবি তৈরির আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মচারীরা রয়েছেন। আমরা আশা করি, আমাদের এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের দর্শকরাও লামিল হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ রাজধানী দিল্লীর বাইরে চলে যান তখন বীর বাহাদুর মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতিকা নেন। কাজে কর্ম এই অবস্থা দেখে মুখ্যমন্ত্রীর অস্ত্র অবস্থানের সময় কিছু প্রবীণ মন্ত্রীও নিজেদের মান বাঁচাতে দিল্লীর বাইরে অস্ত্র কাজে চলে যান এবং এই অর্থজিকর অবস্থা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তাঁরা দেখাতে চান না মেচ ও পরিবহনের মত দু'দুটো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অধিকারী বীর বাহাদুর তাঁদের উপরে। তবু বীর বাহাদুরের ভাবনা আছে। তাঁর ভয় দলের প্রদেশ প্রধান ধর্মবীরকে। ইনি যাতে উপমুখ্যমন্ত্রী না হন সেজন্য তিনি চেষ্টা করছেন। তিনি চাইছেন যেভাবে হোক ধর্মবীর দিল্লীতে গিয়ে রাজধানী রাজনীতিতে মেতে থাকুন। সেজন্য দেখানে একটা মনোমত পদ যাতে ধর্মবীরের জুটে যায় তার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করছেন। ধর্মবীর গেলে সঙ্গর সিং সন্তবত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারবেন এবং নতুনদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের একটা সমঝোতা থাকবে। এরকম

রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী বাম ফ্রণ্টের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছেন

বামফ্রণ্টের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যে তিনি পি জি হাসপাতালে মহিলা ঘটিত ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। এ নিয়ে বামফ্রণ্টের দু'একজন নেতার কাছে অভিযোগও গেছে।

দর্পণ বিশেষ ত্রুৎ থেকে ঐ খবর জানতে পারে। তারপর এই প্রতিবেদক পি জি হাসপাতালে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন। যা কিছু জানা গেছে তা অবশ্য লিখলে শালীনতার প্রশ্ন উঠবে। পি জি হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে রামবাবু বেশ কয়েকদিন যাবৎ চিকিৎসার নামে ভর্তি হন। যিনি তিনি মহাকরণে অফিস করেন এবং রাজিবাণন করেন উডবার্ণ ওয়ার্ডে।

রামবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আত্মীয়া পরিচয় দিয়ে একাধিক অবিবাহিতা ও যুবতী মহিলার সঙ্গে রাজিবাণন করছেন। পি জি হাসপাতালের বহু ডাক্তার ও নার্স এই ঘটনা দ্বিমের পর দ্বিম দেখে যাচ্ছেন কিন্তু প্রতিবাদ করার বা ওপর মহলে কিছু জানানোর মাহস তারা দেখান নি। কারণ রামবাবু আর কিছু করতে পারেন না।

চেষ্টা এখন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে।

এদিকে কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে বুটা সিং জাহাঙ্গীর ও পরিবহন দপ্তর দেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে খাতা হবার আগেই আবার তাঁকে দলের অন্ততম সাধারণ সম্পাদকের পদে ফিরে যেতে হতে পারে। আগের এক সম্পাদক এ আর আনতুলে এখন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বস্তদের মধ্যে তিনি এই পদে অস্তিত্ব বলে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে ফিরিয়ে আনার কথা বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

আবার আবহাওয়া বুকে কংগ্রেস (ই) হলে বুঝা অনেককে ভিড় জমাতে চাইছেন। কিন্তু এটা পরি-কার তাঁদের স্থান হবার সম্ভাবনা খুবই কম, বরং না হবার দিকটাই বড় হয়ে উঠছে। কোন কোন পর্ববেদক মনে করেন, যদি কেউ সেরকম কোন জায়গা পান তাঁর তবিস্ত মোটেই উজ্জল হবে না। হলে যুব তরুণদের সঙ্গে মাকবরগীরা কিছু থাকতে পাবেন। তা বলে বুঝা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নিপীড়িত মানুষ

১৫ মে প্রকাশিত কালিদাস কুতুর 'পচিশ বৈশাখ : মধ্যবিত্তের জিজ্ঞাসা' আর ১৩ই জুনের 'সর্বৈব মিথ্যা'-শীর্ষক পত্রখানি প্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই।

শ্রীকুতুর প্রবন্ধটি অত্যন্ত বিস্তারিত। তিনি সমর্থন ও বিরোধিতার দু'নোকায় পা রেখে রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার মুখর হয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা' কেন তার ব্যালাল-শীট এড়িয়ে গেছেন। 'পৃথিবীতে' যার আলো এসে পৌছয় না, তিনি 'দূরবর্তী নক্ষত্র' না এক পৌন গ্রন্থ, তা কী করে বুঝবো? নক্ষত্র হলেও তিনি 'শ্রেষ্ঠ' একথা প্রমাণ হলো কী দিয়ে? রবীন্দ্রনাথ জোর গলায় বলেছেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', এবং শ্রীকুতুর লিঙ্কাস, 'রবীন্দ্রনাথের এই সর্ধক স্মৃতিকা ইতিহাসের পাতায় উজ্জল হয়ে থাকবে'।

মতামত

কিন্তু 'সত্যতার সংকট'-এর 'মানুষের প্রতি' বলতে কোন মানুষ বোঝায়? বাক্যের দীনবন্ধু এনডুজের মতো গারে-মানে না মং ইংরেজকে। কবি বলেছেন : 'এই মং আমি অস্ত্র কোনো জাতির কোনো দম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি।...এই জাতির মর্গত মাহাত্ম্য আমার মধ্যে প্রব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকট-তম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানব জাতির বন্ধু বলে মান্য করি।' অথচ 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই রবীন্দ্রনাথই ক্যান্সিসম আর বলশেভিজমকে একাকার করে দেখলেন, জারতন্ত্র থেকে বলশেভিকতন্ত্রকে তাঁর কখনই সভ্যতার নীতি বলে মনে হয়নি। সাকী আছে 'রাস্তার কথা' বলশেভিকদের তিনি 'মানুষ থেকে' পৃথক বলেছেন; আর কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর মার্কস-এঙ্গেলসকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে মুচ, বল-

দর্পী 'জার'এর তুল্যমূল্য বলে। স্তরায় কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষ বা তাদের চোখের মশিম ব্যক্তি-দের প্রতি বিশ্বাস হারানোতে পাপ আছে বলে আদৌ মনে করেন নি রবীন্দ্রনাথ। আমলে তাঁর বিশ্বাস বিশ্বপ্রেম ব্যাপারটাই নিছক ভাব-বাহী, অর্থাৎ মিথ্যে। কারণ 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস' বলতে মানুষের লগ্নাম মুখর পরিবেশ তথা বস্ত-বিশেষ প্রতি বিশ্বাস বুঝতে হবে—এটাই বৈজ্ঞানিক দর্শনের দাবী। শ্রীকুতুর অবৈজ্ঞানিক দর্শনের পিকার হয়ে পড়েছেন, মার্কসবাদী হয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথকে হারাতে নারাজ। এদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের এটাই ট্রাজিডি।

'সর্বৈব মিথ্যা' শীর্ষক পত্রে অধ্যাপক অসীম চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর সমর্থন করতে গিয়ে হাস্যকর হয়ে পড়েছেন। চট্টগ্রাম বিজ্ঞানের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষটা পঞ্চ বার্ষিক রবীন্দ্র জয়ন্তীর কাছে নান। বামফ্রণ্ট সরকার মার্ক-নীতির আদর্শের তুলনায় রবীন্দ্র আদর্শকেই অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা দানে বন্ধপরিষ্কার। এই কারণেই অপসংস্কৃতির আগের সমরমানিটা ক্রমবর্ধমান কি না তা অবশ্য একটা গবেষণার বিষয়। কিন্তু টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গৃহপ্রবেশ উপ-লক্ষে ক্রমবর্ধী এখন কর্তব্যরত শ্রম-জীবী গ্রাম কনডাক্টারকে উপদেশ দেন : "মেমে-এসে আশনিও মিছিলটি দেখুন।...জীবনে অনেক তো শ্রমিক মিছিল দেখেছেন..." তখন কি প্রশ্ন করা যায় না যে, এইভাবে প্র-না-বি-শীর্ষক মিছিলের প্রতি উচ্চাসবশে সমস্ত শ্রমিক মিছিলকে হের করার অধিকার, কর্তব্যপরায়ণ শ্রমিককে কাজ ছেড়ে মিছিল দেখতে উপদেশ দেবার ক্ষমতা গণতন্ত্র শ্রির মন্ত্রীশাই কোন্ - সংবিধান থেকে সংগ্রহ করেছেন?

নির্মল সাহা

রামবাবু এখন মহাকরণে থাকেন তখন ঘরের লামনে বহু যুবক ও যুবতীকে চাতকপাখীর মতো বসে থাকতে দেখা যায়। রামবাবু বলেন এরা তারকেখর তথা গ্রামাঞ্চলের গরীব বেকার। এদের সঙ্গে বাম-ফ্রণ্টের অন্ত্যস্ত মন্ত্রী ঠিকমতো ব্যবহার করেন না বলে রামবাবু কাছে তারা দুটে আসে তাদের অস্তাব অভিযোগ জানাতে।

রামবাবুর ক্ষমতা নেই তবু এদের প্রলোভন দেখান হয় যে, চাকরী দেওয়া হবে। আর বিভিন্ন জেলার

কিছু সংখ্যক লমাকবিরোধী রামবাবুর দলের দর্শক। এরা এমন অনেক লমাকবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বা পুলিশের কাছে লিপিবদ্ধ আছে।

রামবাবু কোম জেলা দফরে গেলে তার সঙ্গে কোন না কোন মহিলা থাকেই। সবাই কি তার আত্মীয়া? রামবাবুর ঘরের লামনে ভিড় হটাতে একদিন জাপমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

সি পি আই সি পি এমের মিলন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে

এখন সি পি - ই এবং সি পি আই এম—ই দুই কমিউনিষ্ট হল যতখানি কাছাকাছি এসেছে তাতে দুইদলের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষে লক্ষ্যে কিভাবে এক হয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে দু'তরফেই বেশ ভাবনা চিন্তা চলছে। আশা করা যাচ্ছে, দুইদলের মধ্যে ইতিমধ্যে যেসব আলাপ আলোচনা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাব তৈরী করার জন্য দু'পক্ষের বড় বড় নেতারা নভেম্বর মাসের দিকে বারামণীতে এক সঙ্গে বসবেন। এজন্য তাঁরা চৌষটি সালে দল ভাঙার আগে যে অবিস্তৃত কমানিষ্ট পার্টি ছিল তার মেম্বারশিপের উপর গুরুত্ব দেবেন এবং দু'তরফের পক্ষে গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বার করবেন। এ ব্যাপারে রুশ দূতাবাস খুবই উদ্বোধন নিয়েছে। এদিকে রুশ প্রভাব যেমন বাড়ছে তেমনই চীনের যোগাযোগও শুরু হয়ে গেছে।

এই মিলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ই কে নায়েনার খুব আগ্রহী। এই তিন মার্কসবাদী যেমন আগ্রহী তেমনই প্রমোদ দাসগুপ্ত, নীরেন বোষ প্রমুখ নেতারা এর তীব্র বিরোধী। পার্টির ভিতরের কিছু প্রবীণ নেতা এখনও মনে করেন, দলের মাক্যারিসারির বেশীর ভাগই নেতা শুধু নয় প্রাথমিক সমস্তরায় সি পি আই এম-এর পরিচয় মুছে যেতে দিতে কখনই চাইবেন না। এটাকেই ধরে রাখবেন। তাছাড়া পার্টির মধ্যে চীনপন্থী মনোভাবই

বেশী। আর কারা এই মিলনের জন্য একবারে বিধামুক্ত তাও খোলাখুলি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আবার দলের ছোটখাট একটা অংশ অভিন্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে মার্চ গড়ে তোলার আগ্রহী। এছাড়া আছে দলী বামদলগুলির সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা। এরকম নানা কারণ সি পি এম-এর মধ্যে রয়েছে।

সি পি আই হলও তা থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানপথ মুখোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রের এ বি বর্ধন, পাঞ্জাবের লতাপাল ডাং ও মধ্য প্রদেশের হোমি দার্জি প্রমুখ নেতারা সি পি আই এম দলের সঙ্গে পুরো-পুরি মিলনে খুবই উৎসাহী হলেও এস এ ডালের সঙ্গে পলিটব্যুরোর কিছু সদস্য সি পি এম-এর চীনপন্থী মনোভাবের জন্য কোন মতেই তাতে দায় দিতে আগ্রহী নন। বরং তীব্র বিরোধী। আবার দলের মধ্যকার একটা ছোট অংশ বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী নামনে রেখে যুক্তভাবে কাজ করতে রাজী। কিন্তু এক দলে মিলে যেতে নয়।

অবশ্য দু'দলই নিজস্বের ভাগিদে এখন অনেক কাছাকাছি এসেছে, বিশেষ করে যেখানে তারা দুর্বল সেইসব জায়গায়। তবু এক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা থেকেই যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, আগামী নভেম্বরের মিটিং যদি সফল হয় তা হলে দু'দল থেকেই এর বিরোধীদের একটা অংশ বেরিয়ে যাবে। তবে পরিষিতির উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

কলকাতার বাজারে কেলট্রন টি ভি

কেরালা রাজ্য সরকারের সংস্থা কেরালা স্টেট ইলেকট্রনিকস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কাজ শুরু হয় তিনাস্তরের আগষ্ট মাসে। তখন থেকেই কেরালায় ইলেকট্রনিক বিপ্লব শুরু হয়েছে যদিও বর্তমানে ভারতের ইলেকট্রনিক শিল্পের উৎপাদন খুবই সামান্য, লারা পৃথিবীর ইলেকট্রনিক বাজারের মাত্র ৩% শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে কেলট্রন পাঁচ বছরের এক চুক্তি করে টেলিভিশন সেট উৎপাদনের জন্য। ভারতে এই প্রথম একটি রাজ্য সরকারী সংস্থা সঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা চুক্তি হল। ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত

পঁচিশ হাজার টি ভি সেট কেলট্রনের জিবাঙ্গাম কারখানা থেকে বাজারে বেরিয়েছে। গতবছরের মে থেকে বোর্ডে ও পুণ্য কেলট্রন টি ভি বিক্রি হচ্ছে। রাজধানী দিল্লীতেও কিছুদিন আগে এসেছে। এবার কলকাতাতেও বিখ্যাত কেলট্রন টি ভি পাওয়া যাবে।

গত ৩০ জুন কলকাতায় এক অস্থানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র কেলট্রন টি ভি কলকাতার বাজারে চালু করলেন। ঐ অস্থানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কৃষির শিল্পমন্ত্রী ত্রিচিন্তরত মজুমদার। কেলট্রনের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ত্রীক পি পি নাথিয়্যার ইলেকট্রনিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও কেলট্রনের কাজকর্ম নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

জনস্বার্থবিরোধী অর্থনীতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

বাজেটের ফাঁকি এখন প্রায় সবটাই ধরা পড়ে গেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে হ্রাসের ঢাকনি দিয়ে অর্থনৈতিক সংকটের কঙ্কালকে চাপা দেওয়ার যে চালাকি অর্থমন্ত্রী আর, ভেঙ্কটরমণ করেছিলেন তা ধরা পড়ে গেছে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে। সংকটের তীব্রতা এতই গভীর যে চাপা দিয়ে, মলমপুলটিশ লাগিয়ে রোগী সারাবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু আমাদের পক্ষে দুর্ভাবনার কারণ আছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, জাতি অনন্তকাল ধরে টিকে থাকে। সত্যি কথা। কিন্তু ব্যক্তি বা কোন গোষ্ঠী জাতির মর্মমূলে যদি আঘাত করে যেতে থাকে এবং শাসক দল যদি তাতে প্ররম্ব দিয়ে চলে তাহলে জাতির অপরিণীম ক্ষতি হতে পারে। আমাদের পরাধীনতার ইতিহাস বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরদের রচনা। দেশপ্রেমিকদের রক্তধারাতেও সেই কলঙ্ক আলন হয় না।

কংগ্রেস (ই) পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি কার্যকরী করছেন তা ভারতের দু'দিকজায়ে আরো অসহনীয় মর্মস্বত্ব করে তুলতে পারে মাত্র। এই সরকারের প্রথম বাজেট নিঃস্ব মাছবের বাড়ি প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার নতুন কর ধার্য করেছে। অবশ্য চালাকির আবরণে ঢাকা দিয়ে। এর সঙ্গে নামে ১৪১৭ কোটি টাকার বাটতি আসলে আরো ৩০০০ কোটি টাকার কম নয়, এমন বিপুল বাটতি যোগ হবে।

১৯৭১-৮০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন ৩ শতাংশ কমে গিয়েছিল। বর্তমান অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরমণ ও পরিকল্পনা কমিশন আশা প্রকাশ করেছেন যে এখন থেকে বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ বাড়বে। আমাদের এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। কারণ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে আর্থিক মূল্যে উৎপাদনের নিরিখ ঘাইহোক প্রকৃত পরিমাণগত উৎপাদন ততটা হতে পারে না। তবু যদি ধরে নিই যে অর্থমন্ত্রী ও নতুন পরিকল্পনা কমিশনের আশা ফলবতী হবে, তাহলেও বর্তমান সালে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২ শতাংশের কম হতে বাধ্য।

অথচ আমাদের দেশবাসীদের আর্থিক দৈন্য এমন করণ যে তারা সামান্য গ্রামাচ্ছাদনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরীও রোজগার করতে

পারেন না। সরকারী মজুরী ও পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য অমুদ্রারাই দেশের অর্থক লোকই নিঃস্ব। তাদের গ্রামাচ্ছাদনের কোন উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই। প্রায় দেড়কোটি শিক্ষিত রেজিটার্ড বেকার। গ্রামীণ বেকার ও অর্ধবেকারদের এর মধ্যে ধরা হয় নি। স্বভাবতই এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই দেশের মেহনতী মানুষের কোন সুবিধে হয় না। কেবল উপরতলার শতকরা আড়াই জন লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। এই আড়াই জনের মধ্যে কেবল বড় বড় একচেটিয়া দেশী-বিদেশী পুঞ্জিপতিরাই নয়, অসাধু বণিক, ম্যানেজার, সফল পেশাদার ডাক্তার, ব্যবহারজীবী, সাংবাদিক এরা সবাই রয়েছেন। সুতরাং দারিদ্র্য মানুষের কথা বলবে কে? তাদের তো শুধু ভোটেটের সময় প্রতিশ্রুতি দিলেই চলে।

এই লোকঠকানো বাজেটের

অর্থনীতি

ফলে দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। ইতিমধ্যেই পাইকারী দাম ২০ শতাংশ বেড়েছে। বছর শেষে জিনিসপত্র অগ্রিমূল্য হয়ে উঠবে। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ম-জাত সামগ্রী, সার, স্নানপত্র ইত্যাদির উপর ট্যাক্স বসার ফলে পরিবহন, বিদ্যুৎ, সড়ক নির্মাণ, টেলিফোন, জাহাজপড়, প্রাণিকের জিনিসপত্র, কৃত্রিম রবার, ওষুধপত্র, এমোনিয়া, কীটনাশক রাসায়নিক পণ্যাদি সব কিছুই দাম বাড়বে। দারের দাম আগেই বাড়ানো হয়েছে। এবার কল্যাণ, সিমেন্ট এবং ইস্পাতের দাম বাড়ানোর পালা। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আভাসে ইঙ্গিতে বলতে শুরু করেছেন যে কল্যাণ, ইস্পাত এবং সিমেন্টের দাম না বাড়ালে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে লোকনান এড়াবার উপায় নেই। কিন্তু যতদিন আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতা ও শাসকদলের দুর্নীতির ছিঁড় থাকবে ততদিন কি গোটা ভারতমহাশাগরের জলরাশিও ঐ ছিঁড়কৃত অর্থনীতির পাজ পূর্ণ করতে পারবে?

পারবে না, কারণ এই অর্থনৈতিক নীতিগুলি দেশের শতকরা ১৭ জন মেহনতী মানুষকে ফাঁকি দিয়ে শাসনকর্মতায় আদীন শাসক গোষ্ঠীর মুক্তি অর্জনের অত্যন্ত চতুর, স্থচিন্তিত পরিকল্পনা।

দেশের মানুষের কেনাকাটা করার সামর্থ্য নেই, তাই দেশজ উৎপাদনের বাজারই নেই। সুতরাং কলকারখানার মালিকেরা কলকারখানার কাজকর্ম কমিয়ে দিয়েছে। মজুর ও কর্মীদের হাটাই করেছে। ফলে বাজার আরো কমে গেছে, কারণ হাটাই প্রমিক-কর্মচারী বা বেকারদের তো কেনাকাটা করার পরমা হাতে আসেই না, থাকা দূরের কথা। সুতরাং মালিকশ্রেণী ঠিক করেছে দেশে যদি চড়াবামে জিনিস বিক্রী করতে অসুবিধে হয় তাহলে এই সব পণ্য বিদেশে চালান দেওয়া হবে। কিন্তু বিদেশের বাজারে নানা দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। ভারতের শিল্পমালিকেরা তাই ঠিক করেছেন তারা বিদেশীদের কাছে সম্ভাব্যে জিনিস বিক্রী করণেন (যদিও বিদেশেও দাম খুব চড়া) এবং সম্ভা দামে বিক্রীর জন্যে তাদের যে লোকসান (?) হবে তা দেশের সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে তরতুকি দিয়ে পুষিয়ে দিতে হবে। এই তরতুকির পরিমাণ বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। এই তরতুকি বাড় দিলেই কিন্তু বাজেটে ঘাটতি থাকে না। কিন্তু তা কি হয়? কাদের সরকার তা তো বুঝতে হবে।

শু আভ্যন্তরীণ বাজারের বদলে বিদেশী বাজারেই নয়, ধার চাইতেও বিদেশীদের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। গত ৪টা জুলাই বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে যে ভারত-মহাস্রক গোষ্ঠী (অর্থাৎ আমেরিকা ও অস্ট্রাল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী) ভারতকে এবার ১৯৭১-৮০ সালের চাইতেও বেশী ঋণ সাহায্য দেবে। এর পরিমাণ হবে ৩৪০ কোটি ডলার বা প্রায় ২১০০ কোটি টাকা। এর উপরে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল দেবে ৪৪০ কোটি টাকা। এই টাকার অধিকাংশ প্রায় ১০ শতাংশই শর্তযুক্ত ঋণ। অর্থাৎ ঋণদাতা দেশ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র কেনার ঋণ। ঐ সব দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার এখন বছরে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। সুতরাং আমাদের অনেক বেশী চক্রা দামে বিদেশী জিনিস আমদানী করতে হবে। দেশে আমদানী করা জিনিসের সঙ্গে দেশী জিনিসের দামও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকবে। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। কিন্তু আরো বিপদের কথা হলো এই বৈদেশিক ঋণ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রার হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংকে জমা হবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক ঐ বিদেশী মুদ্রার বদলে সমপরিমাণ দেশী মুদ্রা টাকা বাজারে ছাড়বে। ফলে দারদ্র্য শেবাংশ ৪৪ পুষ্টায়

গরুর গাড়ীর উন্নয়ন ভাবনার তিনটি বছর

অজয় আইচ সরকার ও সুমেরু রায়

তমলে অনেকেই আশ্চর্য বোধ করবেন যে, আজকের দিনেও গরুর গাড়ীই আমাদের দেশে পরিবহন ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। গরুর তুলনায় রেলের বেশী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ হলেও গরুর গাড়ী রেলের তুলনায় মাল পরিবহন করে অনেক বেশী। গরুর গাড়ী এত বেশী মাল পরিবহন করা সত্ত্বেও এর উন্নয়নের প্রতি এযাবৎ কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। দুটি পঞ্চদশ সেদিন, যেদিন সারা দেশে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বেড়ে গেল।

অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৬৭-এর গোড়ার দিকে সরকার স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন পত্র, পত্রিকা, রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের গবেষকদের এযাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং আবেদন জানান উন্নত ধরনের গরুর গাড়ীর মডেল তৈরী করার জন্ত। চারিদিকে লাড়া পড়ে যায়। সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা সংস্থাগুলি গরুর গাড়ীর উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান মেলায়ও উন্নত গরুর গাড়ী তৈরীর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

এত হৈ চৈ কিন্তু দেশের অনেকেই বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। তাদের মতে, এটা কি একটা গবেষণার বিষয়? যত সব টাকার প্রাক। মস্তর গতি গরুকে নিয়ে দ্রুত গতির কথা ভাবাই বাতুলতা। তারা একথা মানতে রাজী নন যে, বেশী মাল বহন করতে পারলে প্রকারান্তরে সেও দ্রুতগতিরই সমান। তাদের বক্তব্য, এসব ছেড়ে দিয়ে দেশের সমস্ত রাস্তা-ঘাট পাকা করে ট্রাক জরী চালানোর চেষ্টা করাই উচিত।

অর্থনীতি

৫ম পৃষ্ঠার পর

মুক্তাঙ্গীতি ঘটবে। এর অর্থ আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধি। অর্থাৎ মেহনতী মানুষেরা আরো নিঃস্ব হবেন। গরীবরা আরো গরীব হবেন। ধনীরা হবেন আরো ধনী। মুখে যে বাই বলুন, ইন্দিরা সরকার কার্য-যনোবাক্যে নিজেদের শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর সেবা করার স্থির লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান মুক্তাঙ্গীতি ও মূল্যবৃদ্ধির আশুন জালিয়েছেন। কিন্তু এর জন্মে তাদেরও কল্হায় মূল্য দিতে হবে। ছিদ্ৰবৃত্ত অর্থনীতির পাত্র সেদিন সাধারণ মানুষ আছড়ে তেড়ে কেলেরে নিক্ষেপ করবেন।

কিন্তু এই বিরাট পরিবর্তনের জন্ত প্রয়োজনীয় অনির্ভরতা বা সক্ষমতার অভাব সম্পর্কে তারা কি একেবারেই অজ্ঞ? যতদিন পর্যন্ত না সেই স্থানি আসছে ততদিন আমাদের যা আছে তাই নিয়েই যতটা পারা যায় অগ্রসর হতে হবে। অদীক কল্পনায় গা ভানিয়ে না দিয়ে কার্যকরী পছা অবলম্বন করে এগিয়ে যাওয়াই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য নয় কি?

অজয় আইচ সরকার

আমুন, এবার প্রচলিত গরুর গাড়ীর অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করা যাক। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি গরুর গাড়ী পরিবহন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত আছে এবং প্রতিবছর এই সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত হারে। কিন্তু অপরদিকে, এই পরিবহন কার্যে নিযুক্ত পশু শক্তি বছরে কমে যাচ্ছে প্রায় ১০ ভাগের মতো। এর জন্ত দায়ী প্রচলিত গরুর গাড়ীর গঠন প্রণালী এবং পশুর প্রতি মালবহের নির্ণয় মনোভাব।

প্রচলিত গরুর গাড়ীর বড় অসুবিধা হোল এর গতি মন্দ্রতা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল বহনে অক্ষমতা। এছাড়া গরুর গাড়ীর চাকার পেয়ে রাস্তা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গরুর কাঁধে জোয়ালের চাপ ও রযা লেগে লেগে এমন ক্ষত সৃষ্টি হয় যা অনেক সময়ে ক্যান্সারে পরিণত হয়ে থাকে।

একটি প্রচলিত গরুর গাড়ীর বর্তমান মূল্য ২৪০০-২৮০০ টাকা এবং এর পিছনে বলদের খাণ্ড ও রক্ষণাবেক্ষণ, চালকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি বাবতীয় খরচ বাবদ মাসিক ব্যয় হয় প্রায় ১০৮০ টাকা। এর বারা মাসিক উপার্জন হয় প্রায় ১০০ টাকা। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে একটি গরুর গাড়ী থেকে যা আয় হয় তা তার বাবতীয় খরচ বহনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে চলছে কি করে? কে এই লোকমানের বোকা এযাবৎ বহন করে আসছে?

না, আর কেউ নয়, স্বয়ং চালক এবং বলদ দুটিই। তাদের উপযুক্ত পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে দৈহিক শক্তিকে তিলে তিলে বিনাশ করে এর গতিকে অব্যাহত রেখে চলেছে আজও। এই মর্যাস্তিক উপলব্ধির পরেও কোন স্বস্থ সচেতন মানুষ একে সহজভাবে মেনে নিয়ে প্রতি-কার্যে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেনা। পাজনরা একে খুব বেশী দিন চলতে দিতে। যতদ্রুত সম্ভব এই অবস্থার

অবসান ঘটাতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারই ফল স্বরূপ দিকে দিকে গরুর গাড়ীর উন্নয়ন প্রকল্প গড়ে উঠেছে। গবেষণার দিনের পর দিন ধরে নিরলস গবেষণার ময় রয়েছে এর উন্নতি সাধনে।

আজ অনেকদিন কেটে গেছে, অকাত্ত অনেক হুজুগের মতই সাধারণ মানুষের বিশ্বস্তির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে গরুর গাড়ীর উন্নতির কথা। যারা একটু বেশী আগ্রহী ছিলেন তাদের মধ্যেও অনেকে এ ব্যাপারে আর কোন সংবাদ না পেয়ে প্রায় ভুলে যেতে বসেছেন। আজ তাই আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত একজন গবেষককে হাজির করছি, যিনি আজ তিন বছর ধরে এই গরুর গাড়ীর উন্নয়ন সাধনে লিপ্ত আছেন। এর নাম—সুমেরু রায়। আসিলে ইনি একজন শিল্পী গবেষক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন শিল্পকলায় বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ এই তরুণ গবেষককে আজ আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পেয়ে আমরা যার পর নাই আনন্দিত। আশা রাখছি, ভবিষ্যতে ঐর অকাত্ত-দিকের অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা পরিবেশন করে আপনাদের অনেক অজানা দিকের সন্ধান দিতে পারব।

সুমেরু রায়

সত্যি কথা বলতে কি, শুরুতেই আমি এটাকে একটা খুব সহজ কাজ ভেবেই মস্তবড় ভুল করেছিলাম। শুরুতেই পারিনি শেষ পর্যন্ত এত বড় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আমাকে। অন্যদিকে দু চার মাসের চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করব এই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হয়তো হোতও, যদি সরকার বা মজু কারো কাছ থেকে এযাপারে কিছুমাত্র সাহায্যও পেতাম। কিন্তু না, কারো কাছ থেকে কোন সাহায্যই আমি পাইনি। যা হোক, সে সব কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক—। প্রথম হু' মাসেই এক এক করে তিনটি বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরী করি। আপাত-দৃষ্টিতে অনেকের কাছেই এগুলি বেশ উন্নত কার্যকরী বলে মনে হলেও আমার বেন ঠিক মনপূতঃ হ'ল না। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি যে আমি ভুল পথে চলেছি। ভুল ভাবলো অনেক পরে—। ইতিমধ্যে বহু জায়গাতেই উন্নত গরুর গাড়ী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি বিজ্ঞান মেলাতেও নতুন ধরনের গরুর গাড়ীর মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে তখন দেখতে গেলাম। দ্বিতীতে এগ্নি এক্সপো-৭৭ দেখলাম। সর-

কারের আমন্ত্রণে দ্বিতীতে ট্রান্সপোর্ট ভবনে গরুর গাড়ীর উন্নয়নে ভার-প্রাপ্ত ষ্ট্রিয়ারী গ্রুপের মিটিংয়েও গেছি। সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আরো চারজন গবেষক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নজাগুলিও দেখলাম। নাঃ, কার্ণোপযোগী নিখুঁত মনে হয়নি একটাকেও। তবে একটা জিনিস, এগুলি দেখে অনেক উপকার আমার হয়েছে—, সঠিক দিশায় আসতে পেরেছি আমি। তা না হ'লে আমাকে আরো বেশ কিছুদিন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হ'ত। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি—আমাদের প্রায় অনেকেরই সাবেকী গরুর গাড়ীর প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলি সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণাই নেই। এর-জন্ত দরকার বেশ কিছুদিন ধরে মতর্ক অহুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে থাকা। তাই শুরু করলাম—।

প্রথমেই নজর কেড়ে নিল এক-মাত্র অবলম্বন এর বলদ দুটি। শীর্ণ-কার কপ গরুগুলি কোন মতে হুঁড়িয়ে হুঁড়িতে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খেয়ে পড়বে বুঝি। জোয়া-লের প্রচণ্ড চাপে বযা লেগে লেগে ঘাঁটা পড়ে গিয়েছে ওদের বাড়ে। দগদগে বা-ও হয়েছে অনেকের। তবুও রেহাই নেই, নেই এতটুকু বিশ্রাম বা উপযুক্ত চিকিৎসা। প্রয়ো-জন মত বাতাই পায় না অনেকে।

বুঝতে পারি, গরুর গাড়ীর উন্নতি মানে শুধু গাড়ীর উন্নতিই নয়, সেই সঙ্গে গরুরও যাতে উন্নতি হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। ওর ক্লেশ দূর হ'লে তাতে আমাদেরই লাভ। ওর স্বাস্থ্যই আমাদের সম্পদ। তারপরে আমাদের দেশে যাতে উন্নত জাতের গরু তৈরী করা যায় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আর একটি বিষয় গরুর গাড়ীর উন্নয়ন চিন্তার প্রথমের মনে রাখতে হবে যে, এর কেজমবি কিন্তু সেই গরুই—, যার কাজ খুলো কাটার, আরেন্দী চালে যার গমন। তাই অমথ্য ব্যয় বহল জাঁকজমক পূর্ণ গাড়ী মা-বানিয়ে বথা সম্ভব সাধা-নিধে রাখাই হবে বিজ্ঞানমন্ডত। গরুর গাড়ীকে গরীবের গাড়ী বললেও অত্যাঙ্কি হবে না। আমাদের দেশের গো-বানের চালকরা অধিকাংশই নিরক্ষর গরীব। আমাদের নজর রাখতে হবে যাতে গরুর বাড়ের বোকা হাঙ্কা করতে গিয়ে, শেষে এদের বাড়ের বোকা না বেড়ে যায়। তাই জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার মোটেই চলবে না এতে। উন্নতি-করণের আরেকটি প্রধান কথা হচ্ছে

খরচ-অল্প বাড়ানো যেতে পারে যদি লাভ হয় সে তুলনায় অনেক বেশী। এই সব অনেক বিধি-নিষেধের কথা চিন্তা করেই গবেষক-দের থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। তা'না হ'লে কবেই ছুঁই ছুঁই উন্নত ধরনের গরুর গাড়ীতে বাজার ছেয়ে যেত।

এই যে সাবেকী গরুর গাড়ী, এর বয়স কিন্তু কম নয়। হাজার হাজার বছর অতীতের সেই সব প্রাগৈতি-হাসিক সভ্যযুগ থেকে অস্তাবধি প্রায় একইভাবে চলে আসছে এ। তাই এই গরুর গাড়ীকে উপেক্ষার দৃষ্টি নিয়ে দেখলে মস্ত বড় ভুল হবে। যেমন, এর চাকার দিকটাই দেখা যাক, এতে যে বৃহদাকৃতির চাকা লাগান হয় এ শুধু গরুর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্তই নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বোকা বাবে গরুর গাড়ীতে বৃহদাকৃতির চাকার প্রয়োজন একান্তই। দেখা গেছে ছোট চাকার আধুনিক গাড়ীগুলি গ্রাম্য রাস্তায় খানা-বন্দ, উঁচু ঢিপি বা জমির আল পেরিয়ে যেতে অক্ষম। এছাড়া এক্সেলের উপর স্রীং লাগান অধিক উচ্চতার গাড়ীগুলি চলা-কালীন ভীষণভাবে দুলতে থাকে। কিন্তু বড় চাকার গাড়ীতে এসব অসুবিধা নেই। সেজন্ত টায়ার-রিয়ারীং যাই লাগানো হোক না কেন, গরুর গাড়ীর চাকা ছোট করা মোটেই যুক্তিস্কৃত হবে না। বিশেষতঃ গ্রামের গরুর গাড়ীর ক্ষেত্রে।

সাবেকী গরুর গাড়ীর পাতলা তীক্ষ্ণাচ চাকার অসুবিধা এই যে, ঐ চাকায় রাস্তার ক্ষতি হয় ভীষণভাবে। দীর্ঘদিন ধরে কোন (বিশেষ করে কাঁচা) রাস্তায় এই গাড়ী চলাচল করতে থাকলে দুটি চাকার অবস্থান বরাবর রাস্তা ভেঙ্গে গর্ত হয়ে যায়। অবশ্য হুই পার্শ্বস্থিত গরু দুটির পদাঘাতও এরজন্ত আংশিক দায়ী। বর্ষাকালে ঐ রাস্তায় বৃষ্টির জল জমতে স্বযোগ পাওয়ার অবস্থা এত ধারণা হয়ে ওঠে যে ব্যাহারের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাবেকী গরুর গাড়ীর চাকা দুটি পাতলা ও বৃহৎ হওয়ার বারা ঐ গাড়ীর কর্ণস্ক্রাক পথ কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে, পাতলা চাকা যে দুর্বলতা সৃষ্টি করে সেই দুর্বলতা কিন্তু তাকে খুব একটা স্পর্শ করতে পারে না। পাকা রাস্তায় ক্ষেত্রে যদি ঐ পাতলা চাকার সন্নিভ বরাবর টায়ার লাগিয়ে চালানো হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কিছু কম হলেও কাঁচা রাস্তায় তা খুব একটা লাভদায়ক হয় না। এখন দেখা যাক, ঐ তীক্ষ্ণাচ চাকার পরিবর্তে চওড়া অর্থাৎ প্রশস্তাচ চাকা শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠার

আসামের বিদেশী সমস্যা

বদরুদ্দীন উমর

প্রায় এক বৎসরের কাছাকাছি সময় ধরে ভারতের আসাম রাজ্যে অহিম্মা ভাষী এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে একটা সংঘর্ষের অবস্থা বিরাজ করছে। সংঘর্ষের এই অবস্থা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় নি। এর একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে একদিকে যেমন তৎকালীন বাঙলাদেশ থেকে হাজার হাজার কৃষক পরিবার (যার অধিকাংশই মুসলমান) আসামে গিয়ে পড়ে-থাকা জমি আবাদ করতে শুরু করেছিল, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষিত বাংলা ভাষীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পেশা ও চাকুরীতে মিশ্রিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যীয় মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রথমতঃ, বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে জনসংখ্যার তুলনায় আবাদযোগ্য জমির ঘাটতি এবং আসামে খাল কোকসংখ্যার তুলনায় জমির সহজলভ্যতা। দ্বিতীয়তঃ, শিকাগত দিক থেকে বাঙালীদের তুলনামূলক অগ্রসরতা ও বাঙলাদেশে তাদের শিক্ষা অস্থায়ী জীবিকা অর্জনের অসুবিধা এবং অহিম্মা ভাষীদের তুলনামূলক অনগ্রসরতার কারণে সেখানে বিভিন্ন পেশার বাঙালীদের নিয়োজিত হওয়ার সুবিধা।

এই পরিস্থিতির সাথে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের ঔপনিবেশিক স্বার্থ। উত্তর পশ্চিম দীর্ঘ প্রদেশের মতো আসাম ছিলো ভারতের একেবারে নীমাণ্ডে অবস্থিত একটি প্রদেশ। এ জন্ত একই ভাষাভাষী লোকদের দ্বারা গঠিত উত্তর পশ্চিম দীর্ঘ প্রদেশে তারা যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতো সেগুলির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্ত আসামকে একটি ভাষাগত ইউনিট বা একক হিসেবে গঠিত হতে না দিয়ে তারা সেখানে একাধিক ভাষাভাষী লোকদের বসতি স্থাপনকেই সুবিধামূলক মনে করেছিল এবং বাঙলাদেশ ও আসামের পূর্বোক্তিত অবস্থা তাদের সেই নীতি কার্যকর করার পক্ষে অস্বস্তি ছিলো।

বাঙলাদেশের মধ্য প্রাচ্যে শিক্ষিত পেশাজীবী এবং কৃষকরা বাঙলাদেশ থেকে আসামে জীবিকা ও জমির সন্ধানে গিয়েছিলেন সেখানকার জনগণের উপর নির্ভরতাকারী হিসেবে নয়। উপরন্তু তারা নিজে-

দের দেশ ও ভিটেমাটি ছেড়ে অল্প একটি প্রদেশে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এজন্ত যে তারা নিজেরাই ছিলেন নির্ভরতা।

তৎকালে কলকাতা ছিল শুধু বাঙলাদেশের নয়, সারা ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে কিন্তু বাঙালীদের প্রাধান্য ছিল না। সেটা ছিল অবাঙালীদের। কারণ তারা ই ছিলো অধিকাংশ লাভজনক চাকুরীর অধিকারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ইত্যাদির বড় তরফের মালিক। বড় তরফের এই আধিপত্যের ফলে শিক্ষিত বাঙালীদের আর্থিক জীবন ও জীবিকার উপায় অনেকখানি সঙ্কুচিত ছিল। এই পরিস্থিতির জন্ত বাঙালীদের প্রয়োজন হয়েছিলো বাঙলাদেশের বাইরে জীবিকার সন্ধান করা। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙালীরা দলে দলে প্রবাসী হয়ে-ছিল ভারতের অনেক প্রদেশে এবং সেই সাথে আসামেও। কিন্তু অপর্যাপ্ত প্রদেশের সাথে আসামের একটা তফাৎ ছিলো এই যে, সেই সব দেশের তুলনায় আসামের জনসংখ্যা কম, অনাবাদী জমির পরিমাণ বেশী এবং জনগণের শিক্ষানীচতা কম ছিলো। এই পার্থক্যের ফলে বাঙালীরা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে কৃষক পর্যন্ত, আসামের অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের যে অবস্থান গঠন করতে পেরেছিলেন ভারতের অপর কোন প্রদেশে সেটা সম্ভব হয়নি।

বাঙলাদেশ থেকে, বিশেষতঃ পূর্ব বাঙলা থেকে, দলে দলে কৃষকরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এজন্ত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি জমিদার ও মহাজনরা শুধু যে তাঁদেরকে জরিজমা থেকে উচ্ছেদ করেই কাস্ত হয়েছিল তাই নয়। তারা তাঁদের জীবিকার অপর কোন পথও খোঁজা রাখে নি। সেই অবস্থার জীবিকা ও জমির সন্ধানে বাইরে যাওয়া ছাড়া তাঁদের অল্প কোন উপায় ছিল না। এবং আসামে পড়ে থাকা অনাবাদী জমির তুলনামূলক সহজলভ্যতা তাঁদেরকে আসামের দিকেই চালনা করে-ছিলো। জনসংখ্যার এই স্থানান্তরকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার বাধা না দিয়ে সহায়তাই করেছিলো।

প্রথম দিকে জীবিকা ও জমির জন্ত বাঙালীদের আসামে বসতি স্থাপন তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি না করলেও তিরিশ, বিশেষতঃ চল্লিশের

দশকে, সেটা এক সমস্যা পরিণত হয়। কারণ আসামে বাঙালীদের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন এলাকার, বিশেষতঃ কাছাড়ের তারা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়। বহিরাগত এই জনসংখ্যার চাপ স্বাভাবিকভাবেই জমির পরিমাণ কমিয়ে আনে, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের থেকে অধিক সংখ্যার শিক্ষিত অহিম্মা ভাষীদের সুযোগ সুবিধাকে সঙ্কুচিত করে।

এই পরিস্থিতি যে স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের জন্মদান করবে সেটা ই স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিক ব্যাপারটিই চল্লিশের দশকে ঘটেছিলো গোপীনাথ বরদলৈ-এর মন্ত্রীত্বের সময়। সে সময় 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলন এক বিরাট আকার ধারণ করে এবং ভাষাগত দ্বন্দ্বাত্মকতার বহু লোক নিহত, আহত এবং নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু আসামে বহিরাগত বাঙালীদের সংখ্যাবৃদ্ধি মত্রে বাঙলাদেশ থেকে আসামে বাঙালীদের জীবিকা সন্ধান ও বসতি স্থানান্তর বন্ধ হয় না। এমন কি ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরও পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই জনসংখ্যা স্থানান্তর অনিরমিতভাবে অব্যাহত থাকে। ১৯৪৫ সালে পূর্ব বাঙলার যে খাজসংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা বিয়াজ করে সেই সময় চাঁদপুর এবং অপর্যাপ্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক আসামে চলে। যাওয়ার উপর রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে 'দৈনিক আজাদেব' ২১শে মে, ১৯৪৯ তারিখে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় যে, প্রতিদিন চাঁদপুর থেকে শত শত পাকিস্তানী মুসলমান ট্রেন ও ষ্টীয়ার-যোগে কাজ ও খাজের সন্ধানে ভারতের আসাম প্রদেশে চলে যাচ্ছে। এটা মত্রেই কৃষক ও মজুর অর্থাৎ শারীরিক মেহনত করে যাওয়া লোক। অতিবৃষ্টির ফলে এদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা কোন কাজ পাচ্ছে না। গত এক বৎসরের (১৯৪৮-৪৯) ওপর তাদেরকে তিরিশ চল্লিশ টাকা মণ করে চাল কিনে খেতে হয়েছে এবং পরিণতিতে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। আগামী এক বৎসরের মধ্যে কোন ফসল পাওয়ার উপায় নেই দেখে এই কৃষক মজুররা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু শুধু চাঁদপুরেই নয়, তৎ-

কালীন পূর্ব বাঙলার অপর্যাপ্ত স্থান থেকেও দলে দলে কৃষক মজুরদের, বিশেষতঃ কৃষকদের আসামের দিকে যাওয়ার। খবর বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কি ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীরা খাজ ও খাজের সন্ধানে দেশ-ত্যাগ করে বিদেশের দিকে রওয়ানা হতে বাধ্য হন সেটা সহজেই অস্বমেয়।

এই পরিস্থিতি সে সময়ে সরকারী মহলেও যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করে। এজন্ত ১৯৪৯ সালের জুন মাসের দিকে অস্থায়ী চাকা জেলা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। আখান-নরকারী পত্রিকা দৈনিক আজাদ ২৪শে জুন, ১৯৪৯ তারিখে প্রকাশিত 'আসামে হিজরত' নামে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলেন, চাকা জেলা "মোহল্লের লীগ কাউন্সিলের সাম্প্রতিক অধিবেশনে অত্যন্ত বিষয়ের সহিত চাকা জেলার চরম খাজ সঙ্কটের কথাও আলোচিত হই-রাছে। চরম আর্থিক দুর্ভাবতার সম্মুখীন হইয়া বহু মুসলমান আসামে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উপরোক্ত কাউন্সিলের এক প্রস্তাবে উল্লেখিত হইয়াছে। কাউন্সিল এরূপ হিজরত বাহাতে না হইতে পারে তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্ত পূর্ব পাক সরকারকে অস্বরোধ করিয়াছেন।"

ব্রিটিশ আমলে বাঙলাদেশ থেকে যারা আসামে যেতো তাদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান, কারণ মুসলমান কৃষকরাই তখন ছিলো নির্ভরতাকার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ। পরবর্তীকালে মুসলমানদের আসাম-যাওয়া একেবারে বন্ধ না হলেও তাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে আসে। কিন্তু অপরদিকে হিন্দু আগের থেকে অধিক সংখ্যায় আসাম যেতে থাকে। হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি এবং সেই সাথে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা হাঙ্গামাই হয়ে দাঁড়ায় এই হিন্দু জনসংখ্যা স্থানান্তরের মূল কারণ।

অবশ্য বাঙলাভাষীরা যে শুধু পূর্ব-

পাকিস্তান থেকেই এ সময়ে আসাম যেতো তাই নয়। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও তারা যেতো। এর ফলে শুধু আসাম নয়, ত্রিপুরারও বাঙালীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্বে ত্রিপুরার বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে ছিলো নগণ্য সেখানে এখন তাদের সংখ্যা শতকরা মাত্র।

আসামে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্ত শুধু বাঙালীরাই যাননি। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের অপর্যাপ্ত স্থান থেকেও লোক গিয়ে-ছিলো এবং এখনো তারা সেখানে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই অ-বাঙালীরাই প্রকৃতপক্ষে আসামের ব্যবসা বাণিজ্য এবং সম্পদের বড়ো তরফের মালিক। চা বাগান থেকে শুরু করে সব রকম সম্পত্তিই তাদের আছে। কিন্তু যেটা তাদের নেই সেটা হলো কৃষি জমি, এবং এখানেই বাঙালীদের সাথে অল্প বহিরাগতদের আসল তফাৎ। অবশ্য এদিক দিয়ে নেপালীরা এখন ব্যতিক্রম। আসামে তারাও গেছে কিন্তু শিক্ষাগত মান ও বোয়াত্যা খুব নিম্নতরের হওয়ার জন্ত তারা চাকুরী ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে তেমন কোন স্থান করতে পারে নি। তাদের মূল অংশটিও জমির উপর নির্ভরশীল এবং কৃষক। তাই বাঙালী এবং নেপালীদের সাথেই অসমিয়াদের জমি সংক্রান্ত বিরোধ, অজ্ঞতার সাথে নয়।

আসামে বিদেশী বিরোধী আন্দোলন ও দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রসঙ্গে এ বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ এটা বাদ দিয়ে আসামের বিদেশী সমস্যার চরিত্র বোঝা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আসামের এবং সেই সাথে ত্রিপুরার সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা আকারে হচ্ছে। চল্লিশের দশকেও তাই হয়েছিলো। পরিস্থিতির এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত ইত্যাদি যে ধরনের দাঙ্গাই হোক সাধারণতঃ তা হয় শহর কেন্দ্রিক। গ্রামে সেই সব দাঙ্গা অনেক সময় ছড়িয়ে পড়লেও দাঙ্গার মূল এলাকা এবং লক্ষ্যবস্ত শহরেই থাকে। আসাম ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম ঘটায় কারণ এই দুই রাজ্যে দাঙ্গার মূল শেখাংশ চম পৃষ্ঠায়

সমুদ্রের সত্যতা
সর্বপ্রকার ফল-ফুলের চারা বীজ ও উৎকৃষ্ট উপাদান সাব্বের জন্য
বিশ্বনাথ ঔষধি প্রস্তুতকারী ফার্ম (প্রা) লিঃ
১১, কৈলাস চক্ক সিমুলেন, কোচাবলী-হাওড়া
ফোন: ৬৩-২০৯৫ ও ৬৪-২৬৪৫
ফ্যাক্স: ৬২-২০৭৭
২২, কৈলাস চক্ক সিমুলেন, কোচাবলী-হাওড়া
ফোন: ৬৩-২০৯৫ ও ৬৪-২৬৪৫
২২, কৈলাস চক্ক সিমুলেন, কোচাবলী-হাওড়া
ফোন: ৬৩-২০৯৫ ও ৬৪-২৬৪৫

আসামের বিদেশী সমস্যা

৭ম পৃষ্ঠার পর

উদ্দেশ্য বহিরাগত জমির মালিক বা জমি দখলকারীদেরকে আসামের জমি থেকে উচ্ছেদ করা। এছাড়াই এ আন্দোলন পাড়াবী, মধ্যপ্রদেশীয় ইত্যাদি ভারতের অপরাপর অঞ্চল থেকে আগত সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে মোটেই ততখানি নয় যতখানি বাঙালী এবং সেই সাথে নেপালীদের বিরুদ্ধে।

এবার দেখা দরকার আসামে জমি দখল বন্ধে ঠিক কি বোঝায়? প্রাচীন কাল থেকে আসামের পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীরা এবং নিম্নভূমির অধিবাসীরাও অনেক অঞ্চলে যে পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তার নাম হলো কুম। এই কুম পদ্ধতি অস্থায়ী আবাদের কোন স্থায়ী জমি থাকে না। কৃষকরা এক একটি জায়গা থেকে গাছপালা জলস পলিকার করে ও জালিয়ে দিয়ে সেখানে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলায়। জমিতে জালস অথবা কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করে না। এইভাবে দুই চার বৎসর চাষ করার পর জমির উর্বরা শক্তি কমে এলে তারা এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যায় এবং সেখানে আবার জলস পরিষ্কার করে ফসল ফলায়। দুই চার বৎসর পর আবার তারা চাষের এলাকা পরিচ্যাপ করে অন্যত্র যায়। এইভাবে একই এলাকার পুনরায় যেতে তাদের বেশ কয়েক বৎসর চলে যায়। এজন্য কুম প্রণালী জমিকে বিজ্ঞান হিতে হয় এবং মাথা নিচু জমির পরিমাণও হয় অনেক বেশী।

যে সব বাঙালী কৃষক আসামে গেছে তারা জালস দিয়ে চাষ করে এবং তারা যে জমি আবাদ করে সেটা নির্দিষ্ট, তার কোন বিজ্ঞান হয় না। নেপালীদের দ্বারা অধিকৃত জমির অবস্থাও তাই। এজন্য যে সব জমি বাঙালী অথবা নেপালীরা দখল করে আছে সেগুলি কুম চাষের জন্য আর ব্যবহার করা যায় না। বিপুল সংখ্যক বাঙালী এইভাবে আসামে জমি দখল ও চাষাবাদ শুরু করার ফলে আসামের আদি কৃষকদের মধ্যে দেখা দেয় জমি দখল এবং ক্রমশঃ তা তীব্র আকার ধারণ করে। কারণ কুম চাষের জন্য মাথাপিছু যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেই পরিমাণ জমি পূর্বের মতো আর অনাবাদী রাখা সম্ভব হয় না।

জমি নিয়ে আসামে এখন যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাতে অসমীয়ারা বলছে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নেই এবং বাঙালীরা

বলছে যে আসামে এখনো উচ্চ জমি আছে। এখানে আসল কথা হলো কুম চাষের দিক থেকে দেখলে জমির অভাব ঠিকই দেখা দিয়েছে। কারণ জমিকে বিজ্ঞান দেওয়ার জন্য মাথাপিছু যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন সেটা আগের মতো আর নেই। আবার বাঙালীদের লাভজনক ইত্যাদি সহ চাষের পদ্ধতির দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে আসামে জমির অভাব এখনও ততখানি তীব্র নয়। কারণ এখনও কুম প্রণালী যেমন এলাকার চাষ হয় সেখানে বিজ্ঞান পাওয়া জমি এখনো আছে এবং সেই ধরনের জমি বাঙালীদের মতে অনাবাদী এবং অন্তর্ভুক্ত দ্বারা আবাদযোগ্য।

আসলে জমি উচ্চ অথবা উচ্চ নয়, বাঙালী এবং অসমীয়াদের মধ্যে এই বিতর্ক উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। বাঙালাদের থেকে কৃষকদের বাইরে যেতে হচ্ছে জমির অভাবের জন্য। এই অভাব এখানে এবং পশ্চিম বাংলার উৎপাদন পদ্ধতির অনগ্রসরতার জন্য জমি ব্যবহার মধ্যে কোন ব্যাপক পরিবর্তন সাধন না করার জন্য। জমি সম্পর্কের পরিবর্তন এবং বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ চালু করতে পারলে বাঙালাদের অথবা পশ্চিম বাংলা দুইই কৃষিতে অনেক বেশী উৎপাদনশীল হতে পারে এবং তার ফলে এই সব অঞ্চলের লোকের কাজের সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব।

ঠিক একইভাবে পরিবর্তিত ও প্রগতিশীল উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন ব্যবহার মাধ্যমে আসামেও এমনভাবে জমি সমস্যা ও সেই সাথে কাজের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতে পারে অসমীয়া এবং বহিরাগতদের দ্বারা এবং কাজের ব্যবস্থাও ভালভাবেই হতে পারে।

কিন্তু জমি ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবহার মধ্যে এই পরিবর্তন আনা কি ভারতে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের এবং শোষক শ্রেণীর দ্বারা সম্ভব? না, সম্ভব নয় যেমন একাজ সম্ভব নয় বাঙালাদের ক্ষমতাসীন সরকার ও শোষক শ্রেণীর দ্বারা বাঙালাদের এই পরিবর্তন সাধন করা।

ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সেই সাথে সামগ্রিকভাবে শোষকশ্রেণীগুলির শোষণ ব্যবস্থা যেভাবে সংগঠিত হয়েছে তাতে ভারতের বিভিন্ন এলাকার অসম উন্নয়ন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং হয়েছেও তাই। ভারতের বড়ো পুঁজি—যার অধি-

কাংশের মালিক গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশের লোকেরা—তার শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশের কতকগুলি অঞ্চল থেকে ক্রমাগত সম্পদ নিষ্কাশনের অঙ্কে যানাক্তর করছে। এই অঞ্চলগুলি মূলতঃ হলো আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি প্রদেশ। এবং এই প্রদেশগুলির মধ্যে আসামের অবস্থাই সব থেকে শোচনীয়। সেখানকার তেল, বনসম্পদ, চা ইত্যাদির থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় বড়ো পুঁজি পাছাড়া সমান মুনাফা করছে কিন্তু সেই মুনাফার কোন উল্লেখযোগ্য অংশ অসমীয়াদের কাছে আসছে না, তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

এই ধরনের শোষণ মূলতঃ ভারতের উপরোক্ত কতকগুলি অঞ্চলের বড়ো পুঁজি মালিকদের দ্বারা সংগঠিত হলো আসামে তার বিরুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য বিক্ষোভ নেই। থাকলেও বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের তুলনায় যথেষ্ট কম। এর কারণ আসামে বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জমির উপর বাঙালীদের নতুন মালিকানা এবং মধ্যশ্রেণীভুক্ত জনগণের পেশার ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্য সাধারণ মার্কসের চোখে যতখানি প্রত্যক্ষ ভারতীয় বড়ো পুঁজির শোষণ ততখানি প্রত্যক্ষ নয়।

কিন্তু সেটা জনগণের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট না হলেও বড়ো পুঁজি এবং তার সাথে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণ আসামে যেভাবে রয়েছে তাতে আসামের জমি ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতির মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন বিত্তময় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এবং বর্তমান ভারতীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

এজন্য বাঙালীরা এবং অসমীয়ারা এই দুই নির্ধারিত জনসমষ্টির মধ্যেকার স্বপ্নের অবসান ঘটানোর অথবা তার কোন দহনীয় মীমাংসার আশা কোন সম্ভাবনা আছে একথা মনে করার কারণ নেই। সে সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে একমাত্র এমন একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামের লক্ষ্য হলো, বর্তমান জমি মালিকানার অবসান ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদ।

কিন্তু আসামের বিদেশী সমস্যার প্রতি ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক পার্টিগুলি, এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি, সাধারণভাবে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তাতে এই সংগ্রামের সম্ভাবনা এই মুহুর্তে খুব উজ্জল বলে

মনে হয় না। বাঙালীরা বামপন্থী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে আসাম পরিষিতির দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের পরিবর্তে উগ্র ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রাধান্যই দেখা যাচ্ছে। এজন্য তাদের অধিকাংশই ভারতীয় বড়ো পুঁজির উদ্বেগের ইন্দিরা সরকারের সাথে আসাম প্রসঙ্গে হাত মিলিয়ে বলে আছেন এবং অন্য দ্বারা সেইভাবে হাত মেলাননি তাঁরাও এই ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট বক্তব্য পেশ ও নীতিনির্ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এই ব্যর্থতার পরিণতিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যা ঘটছে স্বাভাবিক তাই এখন আসামে ঘটছে—বিভিন্নতাবাদী আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এবং সেই সাথে অসমীয়া ও বাঙালীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে তবিশ্রুতে আরও বৃহত্তর আকারে ভাষাগত দাঙ্গা হাঙ্গামার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। প্রতি-ক্রিয়াশীল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীরা বিদেশী সমস্যাকে নিজেদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে।

এইভাবে আসাম পরিষিতির যদি অবনতি ঘটে তাহলে তার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ এবং ভারতের অপরাপর অঞ্চল, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলা সহ সমগ্র পূর্বাঞ্চল যে মুক্ত থাকবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং সে কারণেই আসামের বিদেশী সমস্যার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না।

এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় নিশ্চয়ই উল্লেখ করা দরকার। আসাম পরিষিতি বর্তমান আকার ও চরিত্র পরিগ্রহ করার জন্য অনেক মহল থেকেই কোন না কোন বৈদেশিক শক্তিকে দাবী করা হচ্ছে। কমিউনিষ্ট নামধারী ও বামপন্থী কোন কোন সংগঠনও এই সব মহলের অন্তর্গত। একথা মনে হবে, আসামের বর্তমান হাঙ্গামা পরিষিতির সাথে এক অথবা একাধিক বৈদেশিক শক্তির সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আসামের বিদেশী সমস্যার মূল কারণ আসামের অভ্যন্তরের পরিবর্তে বাইরে নিহিত। বাইরের শক্তি অথবা শক্তির উপর সবকিছুর দায়িত্ব চাপিয়ে যে কোন পরিষিতির ব্যাখ্যা খাড়া করা ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বাঙালীদের একটা সাধারণ অভ্যাস। এই অভ্যাসের দাসত্বের জন্য একথা তাদের বোঝার অসুবিধা হয় যে, বিদেশীরা কোন দেশে অথবা এলাকায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে তখনই যখন সেই দেশ অথবা এলাকার আভ্যন্তরীণ পরিষিতির বিকাশ তাদের তৎপর-

তার সুযোগ সৃষ্টি করে। উপলব্ধি এই অক্ষমতার জন্য তারা আভ্যন্তরীণ সমস্যার আসল চরিত্র উপলব্ধি করতে পারে না এবং আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কেরও কোন ধরন রাখে না। আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এই অজ্ঞতা এবং আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টান্ত ও নীতির অভাব বৈদেশিক শক্তিসমূহের আসল স্বীকৃতি ও কর্মকাণ্ডকেও আড়াল করে রাখে। এর ফলে আভ্যন্তরীণ শক্তির মোকাবেলা করা দৃষ্টান্তসমূহ সম্ভব হয় না এবং বৈদেশিক শক্তির প্রভাব ও প্রাধান্যকেও উচ্ছেদ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আসাম পরিষিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এক বা একাধিক বৈদেশিক শক্তির সম্ভাব্য ভূমিকার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু তার থেকেও বেশী প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ পরিষিতির বিকাশ দ্বারা যথাযথভাবে অস্থাবন, সামগ্রিক পরিষিতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং তারই ভিত্তিতে করণীয় কর্তব্য নির্ধারণ।

এ কর্তব্য মূলতঃ ভারতীয়দের। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কতকগুলি স্থানিষ্ঠ ঐতিহাসিক কারণে আমাদের বর্তমান ঘটনাবলী বাঙালাদের উপরও ছায়াপাত করছে। এজন্য আসামের বিদেশী সমস্যার আসল চরিত্রের সাথে পরিচিত হওয়া এবং আসাম পরিষিতির বিকাশ দ্বারা সতর্ক অসুস্থতা এবং অস্থাবন এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালাদের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি করণীয় কর্তব্য।

[বাঙালাদের "নয়া পদ্ধতি" পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত]

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
সাপ্তাহিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা



টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ
৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

যৌনাবেদনপূর্ণ ছবির ব্যবসা

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান কলকাতার যৌনাবেদনপূর্ণ ছবির অসাধু ব্যবসা বেশ জমজমাট। কোন প্রেক্ষাগৃহে রেগুলার তিনটি শো আবার কোন কোনটিতে শুধু দুই শো চলছে এই সব অসীল ছবির। ছবিগুলি কিন্তু হয় মালমালাম, না হয় তেলেগু ভাষার। ভাবি করা নয়, লাটাইটেলও নেই—অথচ এই চূর্বোধ্য ভাষার ছবি দেখতে ছবির উপচে পড়ছে দর্শকে। তিনগুণ চারগুণ দামে টিকিট রাখা হচ্ছে হু হু করে দর্শকের চোখের সাইনে। বিশেষ অভিনয় পূর্ণ জালসা রক্তিম দৃশ্যগুলিই এখানে দর্শকবৃন্দকে চরমরকম আকর্ষণ করেছে—ভাষা এখানে কোন রকম প্রতিকূল নয়।

নির্ভরযোগ্য হুজু খবর পাওয়া গেছে যে, এই সব ছবি মাদ্রাজ সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে বেশ কিছু অংশ কাট ছাঁটের পর। ছাঁটাই অংশগুলি বিশেষ আপত্তিকর ও রুচি বিগর্হিত। কিন্তু কলকাতায় এই সব ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হল সেই সব ছাঁটাই অংশগুলি ধ্বংস করা। এখন বেআইনি কাজ সম্ভব হল কেনম করে, তা দতাই হতবুদ্ধিকর। তারপর ছবির নাম পাটানোর ব্যাপার। যে যে নামে ছবিগুলি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে মাদ্রাজ থেকে, কল-

কাতার প্রদর্শনের সময় সেই সব নাম পরিবর্তন করে এমন সব রসালো ইংরেজী নাম যুক্ত করা হল, যাতে দর্শকবৃন্দ সহজেই প্রস্তুত হতে পারে। 'দি এভিলস অফ রেপ' 'রেড-য়েজ', 'হার নাইটস', 'সেক্সী ড্রীম', 'এ প্যাননেট লাক্সার' ইত্যাদি আকর্ষণীয় নাম দিয়ে যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হচ্ছে, সেগুলির কিছু মালমালাম বা তেলেগু ভাষার তিন তিন নাম আছে। এই টাইটেল পরিবর্তন করে অন্তরানে ছবির প্রদর্শনও এক বড় অশ্রদ্ধা। এই অশ্রদ্ধা চলছে প্রকাশ্যে এবং তা কলকাতার খোদ পুলিশ দপ্তরের অজান্তে নিশ্চয়ই নয়।

এই সব ছবির যারা পরিবেশক, তারা সবাই ভূইফোড়—অজ্ঞাত কুলশীল। জানা গেছে যে, বড় বাজারের ব্যবসায়ী এক প্রেমীর তরুণ সন্তান প্রচুর লাভের আশায় এই সব যৌনোত্তেজক ছবির ফলাও বেআইনী ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। অথচ এই সব ছবিই যদি স্থানীয় সেন্সরের মাধ্যমে স্থলভূত হয়ে আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হত তবে অভিযোগের কিছুই যেমন থাকে না, তেমনি এজার্টার ছবির মধ্যেও যে প্রশংসনীয় ও শিক্ষণীয় দিকটুকু আছে, তারও সবিশেষ উল্লেখ করার অবকাশটুকু পাওয়া যেত।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক 'মড়া'

গত বছরে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আলোচনামূলক ওঠে। আলিগড় ও জামশেদপুরের পর নব্বীয়ার চাপড়াতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। বহু আর্থাগেণী মহল থেকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার চেষ্টা হয়। বামশহী রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে এখানকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরাও পথে নামেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্ত। কয়েকটি নাটকেও বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়।

এরকমই একটি নাটক ডঃ শুভব্রত চক্রবর্তী রচিত 'মড়া' সাম্প্রতি মুক্ত অঙ্গনে আবার মঞ্চস্থ হলো, নাট্যকার বা পরিচালক স্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা নাট্যকারী কেউই বিশ্বাস করেন না শিল্পের জন্তই শিল্প নীতি। তাই এ নাটকের বিষয়বস্তু সহজ, জনসাধারণ তথা দর্শকদের সচেতন করার প্ররোচনাই অভিনন্দনযোগ্য।

গ্রামের রাজার একটি মড়া পড়ে আছে। অচেনা ব্যক্তির মড়া, তাই সংস্কার নিয়ে বিবর্ত, বিবাহ দেখা গেল, গরীব হিন্দু চাষী সম্ভ্রাম অথবা মুসলমান চাষী হালিম কার্ণ উদ্যোগেই চিহ্নিত, নতুন মড়া রাজার পাড়ে

থাকলে যে দুর্গন্ধ টেকা যায় হবে। কিন্তু সংস্কার দেখা দিল ধনী জমিদার বৃন্দাবন আর হায়দারের উপস্থিতিতেই, মৃত ব্যক্তি হিন্দু ণ্ডনা মুসলমান সম্ভ্রামের তাই নিয়ে ওরা গ্রামে-দাঙ্গার আগুন জালিয়ে দিলেন। বিবাদের বিচার করতে ডাকা হলো বাউলকে। বাউল জিহাসা করলো, 'পুরুষ হিন্দু না মুসলমান তা চেনার উপায় আছে কিন্তু মারী হলে চিনবে কি করে? যেমনি পৈতে গলার বারম চেনা যায়, কিন্তু বামনি চিনবে কি করে?'

সাম্প্রদায়িকতা বিভেদ বা সংগ্রাম নয়, প্রেমবিশ্বাস ও সংগ্রামের জন্ত দর্শকগণকে সচেতন করতে এ নাটকের বক্তব্য রাজনৈতিক দিক থেকে ইতিবাচক আর আলিঙ্গন কথার বলতে গেলে পরিচালনা মোটামুটি ভালোই। যদিও সন্তোষবোধী গৌর সেনশর্মার গলা ভাঙা থাকার নাটক কিছুটা ক্রটিগ্রস্ত হয়েছে।

ভারতীয় গণমাটি লজ্জের ইঙ্গিতা শাখার প্রযোজিত তপোবিজয় বোবের 'নর্সিং' গল্প অবলম্বনে 'এখনই সময়' নাটকটি বিষয়বস্তু ও আলিঙ্গন উভয় দিক থেকেই নেতিবাচক হয়েছে। 'এখনই সময়' যে 'কিমের জন্ত' তা বোধগম্য হয়নি। নিছক একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতবাদ জ্ঞাতভাবে প্রচারের চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

গরুর গাড়ীর উন্নয়ন

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

লাগান হলে কি অবস্থা দাঁড়ায়। প্রথমেই দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত খারাপ রাস্তাগুলিকে লম্বান করে নিতে হবে, তা না হলে কোন কিছুই বোকা বাবে না। এখন রবার টায়ারযুক্ত চওড়া চাকার গাড়ী চালিয়ে প্রায় সর্বত্রই ভাল ফল পাওয়া যায়। একমাত্র অতি গভীর কদমাক্ত রাস্তা ছাড়া। সেখানে চওড়া চাকার স্পর্শজনিত বাধা বেশী হওয়ার গাড়ী চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।

গরুর গাড়ীতে তিনটি বা চারটি চাকা বিভিন্নভাবে লাগিয়ে দেখেছি কার্যকরী হয়নি। অজান্তেই তিন চাকা বা চার চাকার গাড়ীও দেখলাম না, আমেরিকা বাড়ে ঐ কমে না। দু'য়ের বেশী চাকা লাগালেই প্রথমতঃ খরচ বেশী পড়ে যায়। তারপর গাড়ী মোড় ঘোরানোর ব্যাপারে অনেক দম্ভতার সম্মুখীন হতে হয়। নয়তো এমন বিরাট আকৃতি ধারণ করে, বা প্রায় সব রাস্তার পক্ষে অগ্রপথ্যগী।

গরুর গাড়ীর উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্যই সাবেকী গাড়ীর তুলনায় অনেক বেশী মাল বহন করানো। কিন্তু গরুর এই সীমিত শক্তির সাহায্যে কি করে তা সম্ভব?—বিদ্যায়ুক্ত আধুনিক গরুর গাড়ী সাবেকী গাড়ীর চাইতে অনেক কম শক্তি প্রয়োগে টানা যায় বলে, বর্তমানতঃই এর যারা বেশী মাল বহন করানো চলে। আর বেশী মাল বহন করাতে পারলেই বেশী উপার্জন হবে, এবং তার যারা গরুর উপযুক্ত খাদ্য ও যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে। তবে চালককে ওদের উপর সহায়ত্বশীল হতেই হবে, রাজ্যভিত্তিক চাপ যাতে গরুর বাড়ে না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তাদের।

অনেকেই মনে হতে পারে, গাড়ীতে বেশী মাল চাপালেই গরুর বাড়েও চাপ অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু না, আধুনিক বা উন্নত গরুর গাড়ীতে সব সময় গরুর কাঁধে লম্বা-যোগ্য প্রয়োজনীয় চাপ রাখা হবে। অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি হ্রাস হতে দেওয়া হবেনা। তা বলে এর জন্ত দু'য়ের বেশী চাকার দরকার নেই। প্রায় সাবেকী গরুর গাড়ীর মতই ঠিক মাঝখানে এগলযুক্ত আরও কোজাকার গাড়ীতে ব্যালান্স করে মাল রাখলে গরুর বাড়ে বিশেষ কোন চাপই থাকেনা কিন্তু তাতে উচ্চ রাস্তার ওঠার সময় বা হঠাৎ ব্রাহ্মুনি লেগে জোরাল গরুর বাড়ে থেকে উঠে যেতে পারে বলে, কিছু মাল সামনের দিকে নিয়ে এসে

প্রয়োজনীয় চাপ রাখা হয়। সেই সঙ্গে বেন্ট দিয়ে গরুর জোরালের সঙ্গে আলগা করে বেধে রাখা হয়ে থাকে। আর জোরালের সঙ্গে যত্ন লেগে গরুর বাড়ে যাতে কত না হয়, তার জন্ত প্যাড ব্যবহার করা হয়।

এই সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, সাবেকী গরুর গাড়ীকেই একটু আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ বিদ্যায়ুক্ত টায়ার, আরম্প টিউব, প্যাড, চতুর্দিক ঘেরা ক্যারিয়ার বক্স, ব্রেক, হর্ণ ইত্যাদির সাহায্যে তৈরী করা হলে তা প্রত্যাশিত কার্যকরী পর্ষায় উন্নীত হতে পারে। কিন্তু না, এই যথেষ্ট নয়, আরো সমস্তা রয়েছে সামনে, যার মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে।

গাড়ী যখন কোন ঢালু রাস্তা (মততল) দিয়ে উপরে উঠতে থাকে, তখন তার সামনের অংশও উপরের দিকে উঠে যাওয়ার হাফা হয়ে যায় এবং সেই সময় গাড়ী পিছন দিকে গড়িয়ে যাবার জন্ত ভীষণ টান ধরে। ঐ সময় গাড়ীকে উপরের দিকে টেনে তুলতে অনেক বেশী শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আধুনিক গরুর গাড়ীতে সাবেকী গরুর গাড়ীর চাইতে অনেক বেশী মাল থাকার এই অবস্থার তার পূর্নকার্যকর হয় অনেক বেশী। উপরন্তু আধুনিক গরুর গাড়ীতে গরুর বাড়ের উপর খুব বেশী চাপ না থাকার গরুর মাটি আঁকড়ে উপরে উঠতে পারেনা। তিন বা চার চাকার গাড়ীর ক্ষেত্রেও এই একই সমস্তা। এখানে গিয়েই আটকে যাচ্ছে উন্নতির চাকা। কারণ এর সমাধান না করে এগিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে—?

এখন, এর প্রতিকার করতে প্রয়োজন অতিরিক্ত শক্তি যোগানের ব্যবস্থা করা, এবং গরুর বাড়ে অর্থাৎ সামনের অংশে প্রয়োজনীয় মত চাপ কমানো বা বাড়ানোর সহজ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই চিন্তার প্রথমেই মনে পড়ে বড়ির স্রীং-এর কথা। গাড়ী যখন লম্বতল রাস্তায় অনারামে চলতে থাকবে, তখন ভাল শক্তিশালী স্রীংকে-চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে জড়িয়ে শক্তি লক্ষ্য করে রাখলে ঐ সময় প্রয়োগ করে কার্যকর হতে পারে। কিছুটা খরচ ও বার্ষিক কামেলা বেড়ে যাওয়ার এই পদ্ধতি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয়না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আর একটি উপায়ের উল্লেখ করছি। এতে সাইকেল রিস্টার মত গাড়ীতে

'প্যাডেল রিস্টার' জুড়ে নিয়ে, প্রয়োজনে চালক ঐ প্যাডেল ঘুরিয়ে অতিরিক্ত শক্তি যোগান দিতে পারবে। গরুর বাড়ে চাপ কমানো বা বাড়ানোর জন্ত চাকার স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া চলে। এটিও ব্যয়-সাপেক্ষ বলে আরেকটি উপায় দেখা যেতে পারে। গাড়ী যখন কোন উচ্চ রাস্তার ওঠতে থাকবে, তখন গরুর বাড়ের জোরাল সালের জুটিকে আলগা করে জোরালকে গরুর আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাস্তার কোণাঠপাতে উপরের দিকে ওঠাতে হবে। এতে ক্যারিয়ার বক্স লম্বতল স্থানের সমান্তরালে থাকার, পশ্চাদটান হবে অনেক কম এবং গরুর বাড়েও কিছুটা চাপ থাকার উচ্চারণের অনেক সহজ হবে। উচ্চারণের সময় আরেকটি সাধারণ যন্ত্রের ব্যবহার খুবই ফলপ্রসূ। যন্ত্রটি চাকা ও এগলের সঙ্গে যুক্ত একটি 'ফ্রি হুইল'। উচ্চারণের সময় এটির ব্যবহারে গাড়ী পিছন দিকে গড়িয়ে যেতে পারেনা। নিম্নোক্তরনের সময় ব্রেকের ব্যবহার খুবই নিরাপদজনক।

মোটামুটি ভাবে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এবার একে আরোও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আশা করছি খুব শীঘ্রই কোন উৎসাহী ব্যক্তি বা সংস্থা এগিয়ে আসবেন একে চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপ দিতে। এ ব্যাপারে যে কোন মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

হাওড়ার তাগুব

৩য় পৃষ্ঠার পর

মোহন নাথ সম্পর্কে এলাকার সাধারণ মানুষের রয়েছে হাজারো অভিযোগ। হাওড়া মেছুরাঘাটের লালু খটিক ও তার দলবল ভোলা, মুদা, গিটিয়া, চান্দাইলের দিলীপ হাওড়া ষ্টেশনের নানাবিধ অপকর্মের সংগে জড়িত। সাধারণ মানুষকে স্বত্তি দিতে পুলিশ হুঁসুড়দের শারেক্তা করা তো দূরের কথা পুলিশের একদল যৌথভাবে মানাভাবে পাপচক্রের সংগে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। অজ্ঞ খবর হলো লিলুয়ার কেবল সিং, ওমপ্রকাশ সিং, ধুরুপ সিং, কমলা মাউ, শিবপুর থানার অস্তর্গত পাঙ্গা সিং পাঙ্গা এলাকার বিক্রম পুরোদমে তাদের অপকর্ম শুরু করেছে।

এর হলো, জেলাশাসিকা স্রীলীনা চক্রবর্তী, ও তার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা আর কতদিন এসব ঘটনার নির্বিকার দর্শক হয়ে থাকবেন?

পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তেলের

চোরাই গুদামে রমরমা কারবার

পশ্চিমবঙ্গে চোরাই তেলের কারবার আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। উপরন্তু আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের এক বিরাট অংশ তেলের চোরাকারবারীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে চোরাই গোডাউন-গুলিতে পুলিশের টাকাও নাকি বেনামে খাটছে। দেখা যাচ্ছে, পুরনো চোরাই গোডাউনগুলি যেমন চোরাকারবারের ফুলে ফেঁপে উঠছে, তার পাশাপাশি নতুন নতুন গোডাউনও চালু হচ্ছে, একমাত্র ডায়ালক্স থানা এলাকাতেই এক লগে ১০১১টি চোরাই গোডাউনে বেশরোয় চোরাই তেলের কারবার চলছে। এই থানায় সি আই অফিস বোম্বের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ। শ্রীবোম সরকারী জিপের তেল পুড়িয়ে কুখ্যাত গোডাউনগুলির কারবারীদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা তুলছেন বলে গুরুতর অভিযোগ। প্রায় প্রতিদিন সরকারী জিপে গ্রীকে অফিসে পৌঁছে দিয়েই বোম লাহেব নাকি টাকা আদায়ের কাজে নেমে পড়েন।

কলকাতা পুলিশ ও তেল পুলিশগুলির মধ্য এই দরবাশা চোরাই তেলের কারবারে বেশ মজার রয়েছে। মাসিক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে এই ব্যবসা দু'ভাগে বিভাজিত চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু লোক দেখানোর জন্য মাঝে মধ্যে পুলিশ বাহিনী চাল তেলোরার গোডাউন-গুলিতে যায়, গিয়ে অপরাধ হুমের নামে "আদায়" নিয়ে আসেন। চোরাকারবারীরা জানে পুলিশের সঙ্গে বলে গোডাউনে হানা রান্নাই মোটা রকমের ঘুষ। দু'ভাগে গোডাউনে পুলিশ হানা দেওয়া রাজাই টাকার বাণিজ্য তুলে দিতে বিন্দুমাত্র বিধা করেনা পুলিশ ও কয়েকমিনিটের মধ্যে চোরাই গোডাউন থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ে। মাঝে মধ্যে ছ/একটি কেস রুজু হয় সভ্য। তাও শুধু কাগজ

কলমে। আটখাট বেধে পুলিশ অফিসাররা চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু করেন না। অবশ্য ছ একজন সং অফিসার নিশ্চয়ই আছেন যারা সভ্যতাই এই কারবার রুজু করতে চান। কিন্তু অসং অফিসারদের দাপট এমনই যে, এরাও বেশীদূর এগুতে পারছেন না।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পুলিশ গোডাউনে হানা দিয়ে মাল বাজেয়াপ্ত করার নামে যা করছে তাও দুর্নীতির চরম। একই মাল বারবার দীকার লিটে দেখিয়ে মামলা রুজু হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা মাল জিন্দা দেয়া হচ্ছে এমন ব্যক্তির হাতে যে চোরাকারবারীদেরই লোক। জিন্দা করা মাল পুলিশের নাকের ডগাতেই পাচার হয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাত। বাজেয়াপ্ত তেলের বহলে জল ভরে রাখা হচ্ছে এমন ঘটনাও বিরল নয়। এছাড়া পুলিশের ওয়ারেন্ট রয়েছে এমন ব্যক্তির হাশে-শাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি তাদের ধরতে পারছেন না। কুখ্যাত কারবারী রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, গৌরী লাউ, আশতার প্রমুখের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট রয়েছে। কিন্তু এরা আজও ধরা পড়েনি। পুলিশ এদের সঙ্গে প্রতিদিন মত মেয়েছেলে নিয়ে ফুটি করছে। কলকাতার পুলিশ কলকাতার অপরাধ হুমারে পারুক বা নাই পারুক তারা কিন্তু দিল্লী বোম্বেরোড, দিল্লী হাইওয়ের নামা অপ-কর্মের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। এই উৎসাহ যদি শুভ হতো তাও নয় মনে নেয়া যায়, তা কিন্তু নয়। কলকাতার একপ্রকার পুলিশ অপ-রাধকে প্রেরণ দিয়ে এসব এলাকার সমাজবিরোধীদের কাছে মাসিক বন্দোবস্ত চান। গত ৩রা জুন কলকাতা পুলিশের কতিপয় অফিসার কয়েকটি চোরাই তেলের গোডাউনে হানা দেন।

সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুতে

১ম পৃষ্ঠার পর

পড়ার পর সঞ্জয়ের মৃত্যুতে দিল্লীর সাধারণ মানুষের চোখে মুখে কোনও উদ্বেগের ছাপ দেখা যায়নি। সঞ্জয়ের কীর্তিতে কতিপয় পরিবারবর্গ অনেকেই এই মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তুর্কমান গেট ও দিল্লী শহরের বিভিন্ন এলাকার সঞ্জয় যেসব কীর্তি করেছেন এবং তাতে কতিপয় পরিবারের কেউই এই মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত নয়। জরুরী অবস্থার সময় দিল্লীর সাধারণ মানুষ সঞ্জয়ের দাপটে যেভাবে নাজেহাল হয়েছেন সে কথা এখনও তাদের মনে রয়েছে। সঞ্জয়ের মৃত্যুর সময় যারা দিল্লীতে ছিলেন তারা অনেকেই জানেন কিছু বশবৎ রাজনৈতিক ধূসর ছাড়া এই বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয়ের মৃত্যু নিয়ে তেমন বৈ চৈ করেন নি। এমন কি এ ঘটনার মনে হয় অনেকেই হাঁক ছেড়ে বৈচেছেন।

খোদ রাজধানী দিল্লীর সান্তার মৃত্যুর মিছিলের সময় সম্পর্কে বিরাট মন্তব্য শুনেছি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যা খুব সাধারণ স্তরের লোকজনেরাও তুলেছেন তা হলো সঞ্জয় যে প্লেন চড়তেন সেটি কার? বিমান ওড়ার তেলের টাকা যোগা-তেন কে? সঞ্জয়ের বন্ধু সাকসেনাই বা কে? প্রতিদিন প্লেনে চড়ে ফুটি করতে যে টাকা খরচ হতো সে রসদ যোগানো হতো কিভাবে। এছাড়া বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসানোর পর তা যেভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে তা নিয়ে দিল্লীর মানুষ অবাক। অনেকেই প্রশ্ন তুলে-ছেন সঞ্জয়ের মৃত্যুতে সরকার এতবড় ঘটনা নিয়ে যে কাণ্ড করলেন তাতে মনে হয় বিমান নিয়েও এমন কিছু কেলেঙ্কারী রয়েছে বা তদন্ত হলে সঞ্জয় ও তার যারের মধ্যে চুনকালি পড়বে। তাই নয়: নয়: করে বিভাগীয় তদন্ত করেই প্রকৃত ঘটনা চাপার চেষ্টা হয়েছে।

দিল্লীতে খত:ফুট মিছিল কিংবা শোক দেখা যায় নি তার কারণ অনেক গভীরে। দিল্লীবাসীদের অনেকেই ধারণা ভারতীয় রাজনীতিতে সঞ্জয়ের আবির্ভাব ও প্রস্থান দুইই ঘোর দুর্নীতিতে। তুর্কমান গেটের ঘটনা, নাসবন্দী, প্রভৃতি নিয়ে সঞ্জয়ের ওপর অসন্তোষ দিল্লীর মানুষের এখনও যায় নি। এমন কি রাজধানীর বেশ কিছু সং পুলিশ অফিসারও যেম মনে হয় সঞ্জয়ের অকাল মৃত্যুতে মিছেদের প্রাণ কি

পেয়েছেন। দিল্লীর তৈনিক পদস্থ সি বি আই অফিসার আমায় বলেন, আমরা এক সমবয়স্ক অবস্থার ছিলাম মশাই। মিত্যানতুন সঙ্গী নিয়ে সঞ্জয় লোক নরতো পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। আর তাই নিয়ে আমাদের কতি। সঞ্জয়ের সাকসেনদয়া দিল্লীর ব্যবসায়ীদের কাছে জোর করে চাড়া তুলবে। কোমও রিপোর্ট করতে গেলেই ডিমোশম। এরপরেই অফিসারটির মন্তব্য, বেশ গেছে—আপদ গেছে।

দিল্লী সরকারী প্রশাসন স্তরের সং অফিসাররা সঞ্জয়ের শোক মিছিল নিয়ে বাড়াবাড়িতে - দারুণরকম বিরত। বিজয়চক, ইতিয়া পেট, কুমসেনম মার্গ, রাজপথ, তিলক মার্গ, ইন্ড্রাথ, রিং রোডের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে দিল্লীর পৌর প্রশাসন যেভাবে সরকারী টাকা চলেছে তার তুলনা নেই। এর সঙ্গে দুই মাস তালে চলেছে সরকারী প্রচার যন্ত্র। দিল্লী টি ভি, ও রেডিও যেতকারজনকভাবে প্রধানমন্ত্রী ত নয় সঞ্জয় সম্পর্কে প্রচার চালিয়েছে তাতে সরকারী কর্মকর্তারাও বিরত। সঞ্জয়ের ব্যক্তিগত বন্ধু পুলিশ কমিশনার পি এস ভিন্দর, লেফটেন্যান্ট গভর্নর জগমোহন শোক মিছিলের নামে প্রচুর সরকারী টাকা উড়িয়েছেন।

সোমবার সঞ্জয় মারা যান। মঙ্গলবার জীবনাবধান ঘটে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির। ইন্দিরা গান্ধীর প্রশাসন এমন নির্লজ্জ যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি প্রজ্ঞা জাপনের ব্যাপারে চরম ওদাসীজ্ঞ প্রকাশ করে। অতদিকে সঞ্জয়ের শোক মিছিলের ধারাবিবরণী থেকে শুক করে টি ভি, সিআ, ডুমেন্টারী কিন্ন সবই তৎপরতার সঙ্গে করা হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গিরি ও সঞ্জয়ের অকাল মৃত্যুর সঙ্গী ক্যাপ্টেন জুভাষ সাকসেনাওরুপ পান নি। সঞ্জয়ের মৃত্যুতে একটা কথা পরিষ্কার, শ্রীমতী গান্ধী ইদানীংকালে তার রাজনৈতিক শক্তির প্রধান খুঁটিটি হারালেন। যেসব অপকর্ম

তিনি নিজে করতে পারছিলেন না সেসব সঞ্জয়কে দিয়ে করাতে তা কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না। সঞ্জয় অবশ্য এসব করতে গিয়ে নিজের কিছু স্বপ্ন সুবিধা অধিার করে নিয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষমতার বার্ষে মাতাপুত্র দুজনেই সমান তালে এগুছিলেন। এখন শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদিও সঞ্জয়ের বিশিষ্ট বন্ধু কমলনাথ, প্রমুখ কয়েকজন নামা কারবার সঞ্জয়ের মৃত্যুর রাজনৈতিক আধের গুঁহানোর চেষ্টা করছেন তাতে তারা কতখানি সাফল্যবশিত হবেন তা বলা মুশ-কিল। সঞ্জয়ের মৃত্যুতে ক্ষমতা হথ-লের লড়াই শুধু দিল্লীতে নয়, বিভিন্ন রাজ্যেও শুরু হয়েছে। দিল্লীতে বসেই এর বেশ ঠাঁচ পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এর ফল স্বদূরপ্রসারী।

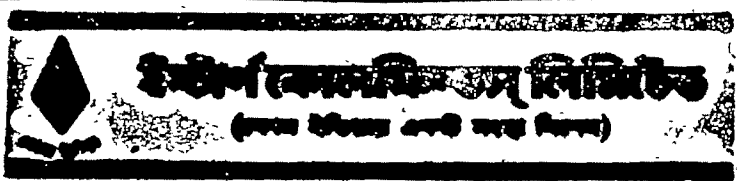
রাজ্য ই-কংগ্রেসী

১ম পৃষ্ঠার পর

বোম্বকে কমিটিতে রাখার ব্যাপারে অনেকেই আপত্তি ছিল। হুজল ইন্সলাম এবং আবদুল সান্তারকে শুধুমাত্র লম্বত হিসাবে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এতে হুজল অথবা সান্তার কেউই খুশি ছিলেন না।

হুজলের দাবী ছিল আবদুল তাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করা হোক। কিন্তু এতে বরকত লাহেব এবং প্রণববাবু কারও কোন সম্মতি ছিল না। সঞ্জয়ও হুজলকে সম্পাদক করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হুজল ইন্সলাম ভেঙে দেওয়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অত-তম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

এখন হুজল, শত বোম্ব, সান্তার লাহেবরা কোমর বেধে লেগেছেন নতুন করে তালিকা তৈরী করে তা ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে অসমোদন করিয়ে নিতে। অনেকে আবার সহকর্মীদের না জানিয়ে বরকত লাহেবের কাছেও ধনী দিচ্ছেন একটু জায়গা পাবার জন্য। তবে ইন্দিরা গান্ধী এখন পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনের কৌড়ল মেটাতে সন্ম-দিতে আগ্রহী নন। ফলে রাজ্য কমিটি গঠন বেশ কিছুটা অনিশ্চিত-মধ্যে থেকে গেল।



সংশোধনী

বিস্তৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: সং ১৭৪/২৫৪৫ তার ২০.৬.৮০

মূল টেন্ডার নোটিশ সং ১৭৪/২৩২৩ তার ৩০.৫.৮০ সম্পর্কে এডওয়ার্ড লংরিষ্ট লকলকে জানানো হচ্ছে যে, কাপাসারার নানা সরামোর জন্য খরচ মূল টেন্ডার নোটিশে প্রদত্ত ১,৩৪,৫১৩.১১ টাকার জায়গায় ১,৮৪,৮৮১.১২ টাকা পড়তে হবে। অজ্ঞাত শর্তাবলী এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

ডেপুটি সি এম ই / এডেক্ট, কাপাসারার কোলিয়ারী, পো: লারসাপাহাড়ী (বামবাধ)।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্বে

পর্বে প্রকাশন

১। বৈজ্ঞানিক রসায়ন / ড: অমিলকুমার দে

/ ড: অজিতকুমার সেন / ১৭.০০

২। ভৌত রসায়ন / ড: মিত্যানন্দ হুতু / ২২.০০

৩এ, রাজা সুবোধ বন্দিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক হীপানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং হুজল কার্যালয় ৩১, হট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাপাবার চেষ্টা করছেন

দপন

ক্রয়কাল বর্ষ ২৫শ শতাব্দী ১৮ই জুলাই ৮০ ৬০ পরগনা

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ইন্দিরা গান্ধীকে শেষ চিঠি কি লিখেছিলেন

অস্বাস্থ্য ভি ভি গিরি মৃত্যুর কিছু
দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধীকে এই চিঠি দেন। এই চিঠির
সারাংশ নিম্নরূপ—

“এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে রাজ-
নৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের তেত্রিশ
বছর পরেও এবং এতগুলো পঞ্চাব্দিক
পরিকল্পনার পরেও জনসাধারণের
অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে আমরা
ব্যর্থ হয়েছি। আজ এই উপমহাদেশে
ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারী অন্ততঃ
পঞ্চাশ শতাংশ জনসাধারণের মাঝার
এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সমাজের হতাশাগ্রস্ত এই লোকের
মধ্যে গভীর হতাশা জেগেছে, যার
ফলে ভারতের ইতিহাসে অকল্পনীয়
এক সামাজিক বঙ্গোপস্রব দেখা দিতে
পারে। একারণে ভারতের প্রধান-
মন্ত্রী হিসেবে আজ আপনার জরুরী
কর্তব্য হল, অত্যন্ত রাজনৈতিক দলের
সহযোগিতার উক্ত তিনটি সমস্যাকে
প্রাধান্য দিয়ে যুদ্ধকালীন চটজলদি
গতিতে মোকাবিলা করা।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারী উচ্ছেদ
ও অর্থনৈতিক সমাজের অর্থনৈতিক-
ভাবে দুর্বল অংশের জন্ত প্রয়োজনে
তত্ব কি দিয়েও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য-
সেবার মূল্যবাহিতা বজায় রেখে মুদ্রা-
স্বাধীনতার মোকাবিলা করা ও এই
দুর্ভাগ্য ভর্তা বা বোম্বারের
আকাজকা ও দাবির পরিবর্তে
প্রত্যেকটি ভারতীয়ের স্বন্দরভাবে
জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে একটা জাতীয়
পরিকল্পনা রচনার জন্ত আজ অন্ততঃ
দুই বছরের জন্ত আপনার নেতৃত্বে কেন্দ্র
শেবাংশ ৩২ পৃষ্ঠায়



‘টন প্রতি ২০ টাকা ঘুষে বরকত অবৈধভাবে
১৩৩টি কয়লার পারমিট দিয়েছেন’—জ্যোতির্ময় বসু

হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী বরকত
গণি খান চৌধুরী মালদাকে মজুন
সাজে সাজাচ্ছেন। গত ১৫ই জুলাই
লোকসভার কোক করলার পারমিট
প্রদানের কলেক্টারি নিয়ে তুমুল
তর্কবিতর্ক হয়। বরকত গণি খান
চৌধুরী বেআইনীভাবে ১৩৩টি
সংখ্যাকে এই পারমিট দিয়েছেন। এর
মধ্যে ১১৮টির ঠিকানা মালদা
জেলায়। কোক করলার পারমিট
পেয়েছে যে সংখ্যা তার কতকগুলোর
মান পড়লেই উদ্বেগ বোধ করা যাবে।

যেমন, মজুরী প্রাক্তন বিধানসভা
কেন্দ্রের অজাপুর রেশম কাটুনি
মহাবায় লং, সোসাইটি ডায়িং
ক্যান্ট্রি, স্প্রিং বেকারী, কটন এ্যান্ড
সিঙ্ক ডায়িং ক্যান্ট্রি, গৌড় বঙ্গ
সিঙ্ক ক্যান্ট্রি, আ ই ডি রা ল
কট্টাকটারল, হুলতারা উইলিং
ক্যান্ট্রি—এইসব আর কি। অজাপুর
কোক ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রি লবচেরে
বেশি পেয়েছে ‘এ’ গ্রেডের ১২০০
টন।

বিদ্রোহে মজুরী অকিলে জর্জন

হচ্ছে। কাজও চলেছে সেইমত।
ইতিমধ্যে সংসদ সদস্য দীপেশ সিং
(বিনি কংগ্রেস থেকে জনতা দলে
ভিড়ে গিয়ে তাঁর এখানকার নেত্রীর
অন্তায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের
শপথ নিয়েছিলেন কিন্তু আবার
ভোল পাটে নেত্রীর পদলেহী হয়ে
শাসক দলের স্বরণ নিয়েছেন এবং
আশ্রয়ও পেয়েছেন) এর নেতৃত্বে
লাত সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি
দল দালাদালায় কবলিত ত্রিপুরার
বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরছেন, নানারকম
তথ্য সংগ্রহ করছেন। অন্তায়
অবিচার, দুর্গতদের দুঃস্বপ্ন, অত্যা-
অভিযোগ, এবং তরুণ দালা-
ঘটে যাওয়ার মূলে কারা আছে
আর তার প্রতিরোধে সরকারী
ব্যবস্থাই বা কেন কাল করছে তার
পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী করবেন।
হিংসাত্মক ঘটনার দুর্গত মানুষদের
জন্ত জাণ ও পুনর্বাসনের হুঁচকি
শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠায়

প্রেম কুমারের হাতে টন-প্রতি কুড়ি
টাকা ঘুষ দিয়ে উক্ত ১৩৩টি সংখ্যা
৩৬,৩৬৬ টন কোক করলার পারমিট
পেয়েছে। এই পারমিট দেওয়ার
ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন স্থপা-
ত্রিশ করেননি। পারমিট দেওয়ার
আগে কোল ইন্ডিয়া রাজ্য সরকারের
লকে কোম আলোচনাও করেননি।
আইন অমুসারে রাজ্য সরকারের
অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোন
পারমিট দেওয়া যায়না। সম্প্রতি
শেবাংশ ১০২ পৃষ্ঠায়

সি পি আই মাক কংগ্রেসীরা ইন্দিরার কাছে ভিড়তে চাইছেন

সি পি আই মাক কংগ্রেসীরা
এখন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ভিড়তে
চাইছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর
পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে আছেন
প্রিয় দাসমুখী, সৌগত রায়, সিদ্ধার্থ
রায়, দেবকান্ত বড়ুয়া, কে ডি মালব্য
ভারতীয় রবি প্রমুখ নেতারা।

একদা এরা সবাই ইন্দিরা গান্ধীর
খুঁই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ইন্দিরা
গান্ধীকে একটি বিশেষ লাইনে নিয়ে
যাবার জন্ত এরা বহুটি প্রস্তাব
খাটাতে পারতেন।

১০ সাল থেকে ১৫ সালের
জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে পর্যন্ত এরা
ইন্দিরা গান্ধীকে চারপাশে ঘিরে রেখে
ছিলেন। কোন সিদ্ধান্তই সিদ্ধার্থবাবু,
দেবকান্তবাবু, কে ডি মালব্য প্রমুখ
নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে
শ্রীমতী গান্ধী নিতেন না।

কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার
পর সঙ্ঘ গান্ধীর স্বত্বাধীনতার সঙ্গে
সঙ্গেই এদের রাজনৈতিক জীবনে
কালোছায়া মেয়ে আসে। সঙ্ঘ
প্রথমেই বেছে বেছে সি পি আই-
প্রেমী নেতাদের, যারা ইন্দিরা
গান্ধীর খুব কাছের লোক বলে পরি-
চিত ছিলেন, তাদেরকে ঘুষে সরিয়ে
ছিলেন। সঙ্ঘের আগ্রাসী ক্রমিকা
দেখে এই নেতারা আর শ্রীমতী
গান্ধীর কাছে যেতে ভরসা পেলেন
না।

তাই ১৭ সালের নির্বাচনে
শ্রীমতী গান্ধী এবং দলের পরাক্রমের
সঙ্গে সঙ্গেই এরা শ্রীমতী গান্ধীকে
ছেড়ে চলে গেলেন। সঙ্ঘের মৃত্যুর
পর এইসব নেতারা এখন নানাভাবে
চেষ্টা করছেন ইন্দিরা গান্ধীর
হারানো বিশ্বাস ফিরে পাবার।

প্রিয় দাসমুখী সম্প্রতি বরকত
গণিখান চৌধুরী, প্রণব মুখার্জী,
ভোলা লেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে
ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার
ব্যাপারে কথা বলেছেন বলে বিশ্বস্ত
সূত্রে জানা গেছে। সিদ্ধার্থবাবু,
কে ডি মালব্য, ভারতীয় রবি, দেব-
কান্ত বড়ুয়া প্রমুখ নেতারা ফিলার
পাঠিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সমোত্তাব
জামবার চেষ্টা করছেন।

সি পি আই মাক এইসব নেতারা
মনে করছেন সঙ্ঘের মৃত্যুর পর
শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় ডাঙা মেরে ঠাঙা

কিছুদিন বিরতি দিয়ে গত সপ্তাহ থেকে আসামে আবার বিদেশী হাট্টাও আন্দোলনের সমর্থকরা শুরু করেছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলি এবং ব্যাঙ্ক ও হাইকোর্টে পিকেটিং। কলে একদিকে যেমন স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে, অতীত তেমন চলছে গ্রেপ্তার। এবং সেই সঙ্গে মিস্ট্রি পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে এমন পীড়নও চলানো হচ্ছে যা এই লম্বা কাঠামোর চরিত্র। আসাম আন্দোলনের নেতাদের সোজা কথা, এই এমন পীড়ন বন্ধ না হলে তারা আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি নয়। এদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তথা কেন্দ্রীয় সরকার আসাম লব্ধ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যা নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী বা যরাস্ত্রমন্ত্রী বিবৃতি ছাড়ছেন বার পাঁচ। বিবৃতি দিচ্ছেন আসাম আন্দোলনের নেতারা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পটভূমি বিধাঙ্ক। কারণ যরাস্ত্র মন্ত্রী জৈল সিং হাজার ছাড়লেও এমন পীড়নের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আসামকে ঠাঙা করতে এখনো সোভাবে চেষ্টা করেন নি। বার জন্ম বার বার আলোচনার কথা বলছেন যদিও আন্দোলনের নেতারা সেই ১১-১২ গৌরবে বসে আছেন। অবশ্য তাঁদের কথাবার্তা অনেক মরম হয়ে এসেছে। আসলে ইন্দিরা গান্ধী কি চাইছেন টালবাহানা করে সময় কাটিয়ে আন্দোলন কিরিয়ে দিতে এবং তারপর ডাঙা পিটিয়ে ঠাঙা করতে? তাঁর দীর্ঘদিনের রাজত্বকালে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তিনি ডাঙার ব্যবহার ভালই জানেন। আসামের ক্ষেত্রে একটা মন্তব্যে এই যে, এ ব্যাপারে “বাম ও গণতান্ত্রিক” শক্তি তাঁর পক্ষে এবং “হকিমপদ্বীয়া” আন্দোলনের সমর্থনকারী। অতএব প্রধানমন্ত্রী যে কোন উপায়ে, অর্থাৎ পুলিশ মিলিটারী দিয়েও যদি আসামের আন্দোলন দমন করতে যান তাঁকে হয়ত বামপন্থীদের বিরোধিতার লক্ষ্যবিন্দু হতে হবে না। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তো তাঁকে ‘আগেই দমন’ জানিয়েছেন। জিপুরায় গুণগোলের পর প্রধানমন্ত্রীর আরো সুবিধা হয়েছে। লম্বাশব্দী কার্ণ-কলাপ দমনের জন্য জিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমূপেন চক্রবর্তীকে কেন্দ্রের কাছে কেবলই পুলিশ মিলিটারী চাইতে হচ্ছে। অতএব আসাম ও লম্বা উত্তর-পূর্বাঞ্চল পুলিশ মিলিটারী ছেড়ে ফেললেও আপত্তি করবে কে?

কিন্তু এর কলে পরিহিত যে আসামে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে এবং লম্বার সমাধান অন্তর্গত একথা কে বোঝাবে?

কর্ণাটকে ময়দা কেলেকারি

গত ১০ই জুলাই কর্ণাটকের বিধান পরিষদে তুমুল হৈ চৈ হয়। বিরোধী নেতা ডি. বি. চন্দ্রমোড়া অভিযোগ করেন যে রাজ্যের কংগ্রেস (ই) মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী সি. এম. ইন্দিরা-হিম অধৈর্যভাবে পনেরোটি ময়দার মিল চালু করার লাইসেন্স দিয়েছেন। ত্রিশ লাখ টাকার ঘুষে এই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং কোন রকম রীতিনীতি মানা হয় নি। শাসক কং (ই) হলেন তহবিলে এই ত্রিশ লাখ টাকার একটা অংশ জমা পড়েছে।

আলোচনার সময় বিধান পরিষদে তখন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমূপেন উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ গোষ্ঠী-কোম্পানের কারণে তিনিও সভাকে জানান যে, বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তার

তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, কেলেকারি এই অভিযোগটি পূর্বে বিধানসভার উঠেছিল ও তখন সংশ্লিষ্ট অফিসারের নামই করা হয়েছিল কিন্তু বিধান পরিষদে মন্ত্রীর নামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

শ্রীচন্দ্রমোড়া এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তোলেন, উপসচিব পর্বারের কোন অফিসার নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব অফিসার গত ১লা জুলাই থেকে অবসর নিয়েছেন। গত মে মাসে এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। একই পরিবারের তিনজন বেলগাঁও, কোলার ও রাইশোরে ব্রহ্মা কল বন্দানোর তিনটে লাইসেন্স পেয়েছে। এই কেলেকারির তদন্তে তিনি বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের মেতুখে একটা সর্ব-দলীয় কমিটি গঠনের দাবি করেন।

তামিলনাড়ুতে বাস কেলেকারি

১১ই জুলাই তামিলনাড়ু বিধান পরিষদেও সরকারের বিরুদ্ধে কেলেকারি-হুন্সীতির অভিযোগ ওঠে। বিরোধী লম্বা শ্রীমূপেন, ভীরাধারী অভিযোগ করেন যে উত্তর আরকট জেলার বাস মালিকদের কাছ থেকে শাসক হল এ, আই, এ, ডি, এমকে টাকা তুলেছে। শ্রীভীরাধারী বলেন যে কাছের কাছ থেকে টাকা তোলা হয়েছে তার একটা তালিকা প্রয়োজনে তিনি সভায় পেশ করবেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডি. আর. নেহুচেত্তিয়ার সভায় বলেন যে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান

গত ৬ই জুলাই দক্ষিণ কলকাতার এতিনিউ সন্মিলনী ক্লাব জিপুরায় সাম্প্রতিক রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান করে। শুধু ফুটবল খেলা নয়, দুর্গতদের সাহায্যার্থে ত্রাণ সংগ্রহে সেদিনও ক্লাবের কয়েকশো ছেলেকে দেখা গেল অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দক্ষিণ সুমিকা গ্রহণ করতে। দরজার দরজার কড়া নেড়ে ওরা একদিকে যেমন চাল-গম, জায়া-কাপড়, অর্ধ ওষুধ সাহায্য চেয়েছে, অতীত সেইসব ঘরে পৌঁছে দিয়েছে মুষ্টিমের সমাজ-বিরোধী দালালকারীদের বিরুদ্ধে ওদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। লংগুহীত চোদ পত টাকা, উনিশ গাঁট জায়া-কাপড়, চাল-গম, ওষুধ-ক্লাব কর্তৃপক্ষ তুলে দিয়েছেন ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘের হাতে। এই সংগ্রহ অভিযানে অত্যন্তদের সঙ্গে ছিলেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় শ্রীমতাজিৎ মিত্র ও শ্রীশান্ত ব্যানার্জী।

উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অমনি শাসক এ, আই, এ, ডি, এমকে মন্তব্য শ্রীমূপেনার অভিযোগ করেন যে, রাজ্য বিধানসভার গত নির্বাচনের ঠিক পূর্বেই কয়েকজন বাস মালিক করণানিধি মুখ্যমন্ত্রী হবেন তখন ডি, এম, কে ও কং (ই)র জোটকে ন’লাখ টাকা ঘুষ দিতে চায়। কিন্তু ন’লাখ টাকার জোটের কর্তারা রাজি হয় না।

এ বি টি এর রাজ্যব্যাপী অবস্থান আন্দোলন

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে গত ১১ই থেকে ১২ই জুলাই সকাল পর্যন্ত পনেরটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ জেলা সমাবেশের অফিসের সামনে অবস্থান করেছেন। কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষকগণ জেলা পরিদর্শকের (প্রাঃ শিক্ষা) অফিসের সামনে অবস্থান করেন। সাতাশ দকা দাবীর একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের জন্য জেলা সমাবেশ ও পরিদর্শকের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি মহোদয়গণের নিকট প্রেরণের জন্য প্রতিটি জেলার সমাবেশ থেকে রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রের উচ্চনিয়ন্ত্রক হুমকি ও বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রতিহত করার সংকল্প ঘোষণা করে একটি প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে বহু সংখ্যক শিক্ষিকা সহ প্রতিটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণের এই অবস্থান আন্দোলনকে সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

কৃষক নেতা রাসবিহারী ঘোষের স্মরণ সভা

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের লক্ষে যুক্ত একটি মাস রাসবিহারী ঘোষ। ১৯৪৮-৫০ সালে কাকদীপে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে শ্রীমূপেনের অবদান সর্বোচ্চ করতে হবে। কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে কয়েকবার জেলও যেতে হয়েছে। অকৃত্যার এই কৃষক-নেতা গত ৭ জুলাই রাতে মারা যান। আজ বামপন্থী আন্দোলনে যে কয়েকজন মাত্র নেতা মৃণে ও কাজে একই আদর্শের কথা বলেন ও করেন, যে কল্পনের জীবনযাত্রা প্রকৃতই কমিউনিষ্টমূলক, রাসবিহারী ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে শারীরিক কারণে তিনি কলকাতার থাকতেন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির লম্বা হিসেবে গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও লক্ষ্যসারণ, বন্দীমুক্তির দাবিতে আন্দোলন লংগঠনে দক্ষিণ সুমিকা নিয়ে ছিলেন।

১১ই জুলাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে প্রায় ১৫০ নেতার স্মরণে এক সভা হয়। এই সভায় রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীমূপেন, মণ্ডল, ‘সুধিন’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমূপেনাথ ঘোষ, জনতা পার্টির স্বতিকর্ষ ভট্টাচার্য, সিটু নেতা শ্রীবীরেন রায় প্রমুখ প্রায় ১০০ নেতার স্মরণে প্রজ্ঞা জানান। সভায় লক্ষ্যপতিত করেন শ্রীকপিল ভট্টাচার্য।

সি পি আই মার্ক

১১ পৃষ্ঠার পর শ্রীমতী গান্ধী সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে অনেকটা ছুঁল হয়ে পড়বেন। এবং সে ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে এলে হল এবং সরকার চালাবার স্বার্থে শ্রীমতী গান্ধী তাদেরকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হবেন।

কিন্তু লম্বা অগ্রগামী বেশ কিছু তরুণ নেতা যারা বর্তমানে শ্রীমতী গান্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ, সেই কমল নাথ, অর্জুন দাস, অগদীশ টাইটলার প্রমুখ নেতারা এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার করে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরা শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন, “বিশ্বাস-যাত্ৰকদের” দলে আর জায়গা দেবেন না। এদের ওপর আর কোনওভাবে নির্ভর করা চলে না। এরা বলে এলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে।

যদিও ইন্দিরা গান্ধী এ ব্যাপারে মিলিগু, তবুও লম্বার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

ত্রিপুরায়

১১ পৃষ্ঠার পর

করা, জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্যীতির পরিবেশ কিরিয়ে আনার লক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি কিতাবে করা যার তার সুপারিশও এই কমিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পেশ করবেন। উদ্দেশ্য মহৎ লক্ষ্যই সেই তবু এর মধ্যে অনেকেই কিছু কিছু করেছেন।

আগে জিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনার কথা কেন্দ্রীয় যরাস্ত্র হস্তের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকওয়ানা লোকসভার বলেছিলেন। যরাস্ত্র মন্ত্রী জৈল সিং-এর বিবৃতিতেও রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে দারী করার বোঁক ছিল। এখন শাসক হলেন বিভিন্ন শাখা আরও জোরদার অভিযানে মেখে পড়ার লিঙ্ক দিয়েছে। যাতে গোপনে মতের ব্যাপার ছিল বলে গুরুতর অভিযোগের যে লক্ষ্য পট হয়ে উঠছিল তার থেকে দুটি অতীতকে ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়। যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কৌশলের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ আসে। এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এই হলেন চেষ্টাই হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতায় জিপুরাকে নিয়ে আসা। আসামে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রপতি শাসন চললেও লম্বার সমাধান হয়নি। লেকখা এখানে উঠলেও তাকে গ্রাহ্য না করার পাজোরারি চেষ্টাও এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আর জিপুরা লংকান্ত কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা কমিটির কাছে দেয়লম ব্যবহার যে কতখানি প্রয়োজন তাও তুলে ধরা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্য থেকে যাতে করণা ওঠান যায় সেজন্য কিছু কিছু নতীর উদ্বাহরণ হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকার লম্বার দশকে লক্ষ্য আন্দোলনের আড়ালে যে খুন জখম ও জ্বালের সৃষ্টি পশ্চিম বাঙ্গালার হয়েছিল সেই লম্বার পশ্চিম-বঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির শাসন চলাকালে মিথুস্ত হয়েছিলেন। এবার এই অবস্থার কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মন্ত্রিসভার লম্বারের নিয়ে বিশেষ কমিটি করেছেন। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের তার একজন মন্ত্রির হাতে দেওয়া হবে। এবং সেটা রাষ্ট্রপতি শাসনের আওতাতে করার চেষ্টা চলবে। এর মধ্যে কোন যদি থাকলে তা অগ্রাহ্য করার বা দমিয়ে দেবার অবস্থা সৃষ্টি করা হবে। আর এই মন্ত্রী দীনেশ সিং কি প্রবণ মুখোপাধ্যায় অথবা যেই পান না কেন তাঁকে কেন্দ্রীয় আশীর্বাদে তা অর্জুন করে নিতে হবে। তাই এখনকার মত লক্ষ্য জিপুরা। যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া খুব বেশী দূরে অপেক্ষা করে নেই।

দেশ কাল রাজনীতি

চেন্নাকে বাঁচানো যাবে কি ?

ভারতপুত্র

কংগ্রেসের (ই) সেই পুরনো রোগটা আবার মোচড় দিয়ে উঠেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেসী(ই) মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডিকে গদিচ্যুত করার জন্য কংগ্রেসীরাই (ই) কোমর বেঁধে আসছে নেন্দে গিয়েছেন। সে কংগ্রেসীরাও আবার বাপে-খেদানো মারে-তাড়ানো ভাড়া করা পোন্টার-সাঁটা কংগ্রেসী (ই) নন, বেড়ালের পলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্মে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে ১২ জনই রেড্ডি মন্ত্রিসভার সদস্য, একজন ডেপুটি স্পীকার এবং একজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। তাদের সঙ্গে রয়েছেন আরো শতাধিক এম এল এ এম পি এমন কি রাজ্যের জনা চারেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যন্ত।

ডঃ চেন্না রেড্ডির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন, তাঁর কাজ করার ধরন ধারন সহযোগিতামূলক নয়, মন্ত্রী এম পি এম এল এদের পর্যন্ত তার দালাল লাভের জন্য ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে হয় ইত্যাদি। স্বভাবতই এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ('বৈর-তন্ত্রী' বিশেষণটা তাঁরা সতর্কতার সঙ্গেই এড়িয়ে গিয়েছেন অবশ্য) নেতাকে অপসারণের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেসী(ই)দের মধ্যে একটা কর্ম তৎপরতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা প্রথমে লক্ষ্যে উপনীত হবার পূর্বা হিসাবে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতরণ করেন, তাতে যখন বিশেষ কাজ হল না তখনই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ১২ জন মন্ত্রী ও ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগপত্র দাখিল করে বসেন।

অবশ্য ডঃ রেড্ডিও একজন সেয়ানা রাজনীতিক। বিদ্রোহী যে সংখ্যালঘু, ২১৫টি আসন বিশিষ্ট বিধান সভার আস্থা যে তিনিই ভোগ করেন তা বোঝাবার জন্যে ১১ জন এম এল একে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা যেন পূজ্যশোকে কাতর নেত্রীকে সমবেদনা জানাতেই গিয়েছেন, আসলে সেই স্বাধীন ডঃ রেড্ডির শক্তিটাই প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচাই করার সুযোগ দিলেন।

বাস্তবিক, পার্লামেন্টারী কনভেনশন, না কনভেনশনের পক্ষে ভারী ভার দৃষ্টিক নিরূপণ শক্ত। কারণ কংগ্রেসী(ই) গিরগিটি চরিত্র সর্বজন-বিদিত, এ-বেলা ও-বেলা রঙ

বদলাতে বিশ্বকোণে তাদের কোম জুড়ি নেই। বিধানসভার শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হলে কোন্ পক্ষ জিতবে হজরত করে কেউ বলতে পারে না, সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি উভয় পক্ষেই। কিন্তু ডঃ রেড্ডির গদির ভিত যে মড়ে গিয়েছে, সর্বজনস্বীকৃত নেতা হিসাবে তার মর্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বলা নিশ্চয়সঙ্গত, গদি নিয়ে এই কামড়াকামড়িতে রাজ্য প্রশাসনের বারোটা বাজছে, সাধারণ সরকারী সাহায্য মঞ্জুরী-নির্ভর সাধারণ প্রমিত কর্মচারী ব্যবস্থায়ীদের সর্বনাশ ঘটছে।

কমতানীন ও কমতাহীন—উভয় পক্ষই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দালাল করেছেন। কিন্তু তিনি নিবিকার থাকাই প্রের মনে করেছেন। দলের অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্রামজন্মের মহাপাণ্ডা বিষয়টিকে অন্ধ্রপ্রদেশের আন্তর্জাতিক ব্যাপার আখ্যা দিয়ে লম্বা সমাধানে সচেতন থাকার কথা শুনিয়েছেন, কিন্তু সমাধান কিছু বাতলাতে পারেন নি। সঙ্কল্প গাফী ও আজ নেই যে চোখ রাঙিয়ে জোড়া-তালি দেবেন। কাজেই রেড্ডি সাহেবের সত্যি বড় দুর্দিন।

রেড্ডিকে যদি শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয় (পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী পদে কে অধিষ্ঠিত হবেন তা অবশ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত) তবে মহারাষ্ট্রের মুখ্য-মন্ত্রী এ আর আম্বেদকর এবং উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর দিনও বনিরে আসবে। কারণ সেখানেও নেতা বিরোধী ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। হরি-রানায় ভজনলালও কি স্থখে সংসার করতে পারছেন? অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ হবে কংগ্রেসী (ই) মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে একটি টেবিল কেন্দ্র, এ-পরীক্ষার যে-পক্ষই আপাতত জয়লাভ করুন, কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলোতে রাজনৈতিক অনিশ্রিততা বাড়বে বৈ কমবে না।

আস-কংগ্রেস (ই) আপস রফা?

এবার খুলি থেকে বেড়ানটা বেরিয়ে পড়ল। আসামে কংগ্রেস (ই) সরকার গঠন করতে চায়। তাহলেই নাকি এগারে মাসের বিদেশী বিভাডন ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন ও সমস্তার স্বই সমাধান করা

দস্তব হবে। আসামে গত আট মাস করে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধান অটল-বিহারী বাজপেয়ী অবশ্য আসামে পিছনের দরজা দিয়ে কংগ্রেসের (ই) কমতা দখল-প্রচেষ্টার তীব্র আপত্তি জানিয়ে রেখেছেন।

আসামের ১২৬টি আসন বিশিষ্ট বিধানসভার কংগ্রেসের (ই) দখলে রয়েছে ৬৭টি। কিন্তু এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতাকে এতদিন কাজে লাগানো হয়নি কেন?

ওদিকে আসুর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আন্দোলন-কারীদের প্রতি সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনার বসতে আগ্রহী। অর্থাৎ যে আইন আদেশ ইত্যাদি জারী করা হয়েছে এবং যার বলে কিছু আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ফেরৎ দেওয়া। জনতা ও ভারতীয় জনতা হলও কোন কোন অংশে আসুর প্রতি সহানুভূতিশীল।

কিন্তু আসাম প্রদেশ কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বে হঠাৎ এখানে জনপ্রিয় সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়ে উঠল কীসের জোরে? এ-জোরই যদি তাদের ছিল তবে এতদিন বিচ্ছিন্নতা-বাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় সে শক্তি প্রয়োগ করেনি কেন? ইতি-মধ্যে আসাম ও মণিপুরের জন্য পৃথক রাজ্যপালের (এইচ সি নারিন বিনি বর্তমানে এম পি সিং-এর উপদেষ্টা) ব্যবস্থা হয়েছে। মনে হয় সবই পূর্ব-পরিকল্পনা এবং হিসাব করেই করা হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আপস রফা করেই কংগ্রেস (ই) এখানে সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছে? তাতে কি ১৯৭১ সালকেই বিদেশী নির্ধারণের ভিত্তি বছর হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে? তাবা ও ধর্মগত সংখ্যালঘু নিপীড়নে এবার কংগ্রেস (ই)কেও দেখতে পাওয়া যাবে কি?

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

মাধ্যমিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা



ঢাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৬১ নং হট লেন, কলিকাতা-১৩

চন্দ্রনগর কলেজের জমিতে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের চেষ্টা

এম এল এ আপত্তি অগ্রাহ্য করছেন

চন্দ্রনগর কলেজের ছাত্র, শিক্ষক মণ্ডলী, অধ্যক্ষ এবং সরকারী কলেজের শিক্ষক সমিতির আবেদন ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে চন্দ্রনগর জমিতে একটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তবানী-বাবুর হুজি এই যে, 'জাহ্নবী নিবাস' নামে পরিচিত এই জায়গাটি রবীন্দ্র-নাথের পদস্পর্শস্থল, তাই এটাই রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

ফরাসী আমলে চন্দ্রনগর সরকারী কলেজের নাম ছিল দুপ্পে কলেজ। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর সরকারী কলেজ এটি। এই কলেজে শিক্ষণের জন্য বত বিভাগ আছে অথচ কোন কলেজে তা নেই। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র এই কলেজেই ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য দাখানিক শুরুর পর্যন্ত পড়ানো হয়। মাত্র চার বিদ্যা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ চন্দ্রনগরের ভারত ভূক্তির পর দ্রুত প্রসারিত হয় এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ইতস্ততঃ মানা বিল্ডিং নির্মিত হয় পরিকল্পনাহীনভাবে। এখনও একটি চারতলা বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে। বর্তমানে কলেজের ভেতরে এমন একটু জায়গা নেই যেখানে ছেলেমেয়েরা বিহীন সময় একটু বসতে পারে, এন এন পি পি প্যারেডের সময় তাদের রাস্তার বেতে হয়, তাদের কমন রুম নেই, উপযুক্ত ক্লাস রুমেরও অভাব। এমন একটি কক্ষ নেই যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনার জন্য জমারোত হতে পারে।

কলেজের এই স্থান লম্বা সমাধানের জন্যই ১৯৬০ সালে কলেজ সংলগ্ন পাঁচ বিদ্যা জমি সরকার অধিগ্রহণ করেন। জমির মালিক কে ডি জালান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। প্রায় চৌদ্দ বছর মামলা চলার পর হাইকোর্ট এই অধিগ্রহণ বৈধ বলে রায় দেন।

১৯৭৮ সালের এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জমি কলেজ অধ্যক্ষের হাতে তুলে দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই জমিতে অধ্যক্ষের বাসগৃহ, ছাত্র-বাস চারটি স্বাতন্ত্র্যের বিভাগের বিল্ডিং এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য লভাকক্ষ ও কমন রুম নির্মাণের

প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব ও একটি পরিকল্পনা ডি পি আইয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু জমিটি কলেজের হাতে আসার কিছু পরেই চন্দ্রনগরের এম এল এ ও পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষকে জানান যে তিনি এই জমিতে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণ করবেন। কলেজের শিক্ষক সমিতি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি হল—

(১) এই জমিতে রবীন্দ্র ভবন নির্মিত হলে কলেজ সম্প্রসারণের পথ চিরতরে বন্ধ হবে।

(২) চন্দ্রনগরে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির অভাব নেই। চন্দ্রনগরের উদ্বিগ্নাঙ্করে একটি রবীন্দ্র ভবন অসমাপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন পড়ে আছে। এই ভবনটি সম্পূর্ণ হলে রবীন্দ্র ভবনের প্রয়োজন মোটে, কলেজের জমি দখল করতে হয় না।

(৩) যে কলেজে সকাল দুপুর ও সন্ধ্যার ক্লাস হয় সেখানে তাদের লেগুন জমির ওপর একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হলে তাতে যে কলেজে পঠন পাঠন বিঘ্নিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষক সমিতির বিরোধিতার ফলে পরিষদীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে কিছুকাল নীরব থাকলেও নিজের থাকেন নি। সি পি এম প্রতাবিত চন্দ্রনগর কর্পোরেশনের মেয়র এপ্রিল মাসের প্রথম দশোহে একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে কলেজের জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের প্রস্তাব পাশ হয়। চন্দ্রনগর কলেজের কর্তৃপক্ষকে এ প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের জমি নিয়ে নেওয়ার আগে যে কলেজ কর্তৃপক্ষের লম্বাতির কোন প্রস্তাব থাকতে পারে একথা ওদের মনে হয়নি। জমির ব্যাপারে এপ্রিল মাসের শেষদিকে উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী ও পরিষদীয় মন্ত্রী যখন 'জাহ্নবী নিবাস' পরিদর্শনে আসেন তখন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-মণ্ডলী পাঁচ বিদ্যা জমির সবটাই কলেজ সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহারের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

জানা গেছে, অধ্যক্ষের কাছে জাহ্নবী নিবাসে রবীন্দ্রভবন নির্মাণের বিরুদ্ধে দুই হাজারেরও বেশি নাগরিক প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। কলে-শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

নারকেলডাঙ্গায়

পুলিশকে টাকা দিয়ে

বেপরোয়া রেলের মাল চুরি

নারকেলডাঙ্গা রেলওয়ে কার-শেড এখন লুটেরাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। যে কোন দিন খুব সকালে চলে আসুন নারকেলডাঙ্গা মেন রোডে রেল ব্রীজের নীচে কারশেডের গেটে। দেখবেন সাইন বোর্ড লটকানো আছে প্রোটেক্টেড প্লেস। অর্থাৎ সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দেখবেন অসংখ্য আর পি এফ, জি আর পি প্রভৃতি দলজ পুলিশ প্রবলভাবে করত। সঙ্গে সঙ্গেই আপনার চোখে পড়বে। ১০।১২ বছরের বেশ কিছু ছেলে মেয়েকে খুড়ি নিয়ে কারশেডে ঢুকতে। ওরা সারাদিনই ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে আসবে। ২।৪ জনের খুড়িতে থাকবে কয়লা, বাকী-দের খুড়িতে রেলের নামী দামী যন্ত্রপাতি। যথা ব্যাটারী, আলো, পাখা, ব্রেক, বিভিন্ন পাইপ, ফিসপ্লেট, আরও কত কি? রেলরক্ষী বাহিনী কিন্তু ওদের কোন ভাবেই বাধা দেবে না। আসলে কারশেডে থারাপু গাড়ী সারাত্রে এলেই তার যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়া হয়। আর তারপর পাচার হয় এই পথে। রেল ব্রীজের নীচেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় জিনিস লুকে নেয় এই চোরাকারবারের মায়ক লু, কালো টুই, রপু প্রভৃতিরা। ওপর থেকে বড় বড় বস্তাংশ, ভারী ভারী বাতিল ইত্যাদি ছুড়ে দেয় রেল রক্ষী বাহিনী ও কারশেড কর্মীরা।

এবার এই বাচ্চাদের পিছনে পিছনে চলুন। ওরা কারশেডের উল্টো দিকেই সরু গলিতে ঢুকে পড়বে। এই গলির শেষে প্রান্তে দোতলা মাঠকোঠা বাড়ীটাই চোরাই মালের গুদাম ঘর। দেখবেন বাচ্চারা মাল নিয়ে দলবে দোতলায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। বাড়ীটা দেখে বাইরে থেকে কিছু কিছু বোকার উপায় নেই। নীচে ব্যাটারীর কারখানা ও ছাতার বাটের ফ্যাক্টরী। দোতলায় সাইন বোর্ড “গ্লাস রোয়িং ওয়ার্কস ইউনিয়ন”। এই বাড়ীর ঠিক সামনেই দেখবেন একটা বড় দাঁড়িপাল্লা ও অনেক রকমের বাটখারা।

দ্বিতীয় পরে দেখবেন কাঁধে রাইফেল, হাতে উর্চ নিয়ে রেলরক্ষী বাহিনীর লোকজন এবং কিছু কার-শেডের কর্মী এই গলিতে ঢুকবে। ওরা লু, রপু কাছ থেকে টাকা

পরশা নেবে। তারপর আসবে স্থানীয় থানার (নারকেলডাঙ্গা) পুলিশ। ওরাও টাকা পরশা নেবে; মদ খাবে। তারপর আসবে ডবলু বি ডি ৫১০৬ অথবা ডবলু বি ডি ৩১২০ নম্বর যুক্ত চারচাকার ছোট লরী। রেলের মাল পূর্বোক্ত দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে এই লরীগুলোতে দলবে বোকাই হবে। তারপর প্রাকান্ত দিবালোকে বড় রাস্তার ওপর কিছু ভাঙ্গা টিম চাপা দিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বিশেষতঃ নারকেলডাঙ্গা থানার সামনে দিয়ে পাচার হয়ে যাবে। এভাবে একবার নয়, লকাল থেকে রাত পর্যন্ত অন্ততঃ পনের খুড়ি বার। এসব ব্যাপার আগের পুলিশ কমিশনার স্বর্গাংক সিংহ জানতেন। জানেন বর্তমান পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমও। কিন্তু কিছুই হয় নি। দিনে দিনে ব্যাবসা রমরমিয়ে উঠছে। কারণ এই লু, ল্যাংড়া রপু (ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোং-এর কর্মী, কয়েক বছর আগে ওরাগন ভাঙ্গার সময়ে পুলিশের গুলিতে পা জখম হয়) কালো টুই, হেবো, রপু ভাই ভোগে ওরফে ভগীরথ এরা তধু পুলিশকে বধরাই দেয়না, এরা সকলে কং (ই) র দল। ওরা দলপ্রতি খুব ঘটা করে সস্তা গাড়ীর মৃত্যুতে শোকসভা করে কালো পতাকা টাঙ্গিয়েছিল। প্রতিদিন লাখ লাখ টাকার রেলের সম্পত্তি পাচার হচ্ছে। আর অতদিকে বিজ্ঞাপন দেখছি জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করুন। কি দরকার জনগণের পরশায় এই রেলরক্ষী বাহিনী আর স্থানীয় পুলিশ পোষায়?

লুদের ডোরার হানা দিলে পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাবে। নিরুপম সোম কি চেষ্টা করবেন? রেলের আমলারা কি এগিয়ে আসবেন এই চুরি বন্ধ করতে? নাকি বধরার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত?

দলপ্রতি হুঁদল ওরাগন বেকারের মধ্যে কয়েকদিন ধরে বোমাবাজী হওয়ার বর্তমানে কার শে ডের আশেপাশে দলজ পুলিশ পোষ্টিং আছে। কিন্তু মাল চলাচলও অব্যাহত আছে। সাধা পোশাকের পুলিশ দল সময় ঘুরছে। কিন্তু ওরা লুদের কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং ওদের সঙ্গে প্রাকান্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে মদ খায়। “হাসি-ঠাটা করে টাকা পরশা নেয়।

গিরির চিঠি

১ম পৃষ্ঠার পর

একটা জাতীয় সরকার গঠন প্রয়োজন। আমার এমুজি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার মধ্যে দলজ আজ হয়েছে বলেই মনে হয়, বতকণ না একটা জাতীয় মজুরী নীতি দৃষ্টভাবে গৃহীত হচ্ছে সমাজের দুর্বলতর অংশের মধ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক চাকল্যের ফলে কতিকারকভাবে হতাশা দেখা দিতে বাধ্য।

আজ আমাদের সংবিধান সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করা দরকার। জন-প্রতিনিধিত্ব আইনের ব্যাপক সংস্কার আর প্রাথমিক কর্তব্য যার ফলে নির্বাচনকে জনোপযোগী ও চুনীতি-মুক্ত করা যাবে।

আমার মতে যে পরিবর্তন করা দরকার, তা হলো,

(১) রাজ্য বিধানসভাগুলোর বর্তমান অবস্থা বজায় রেখেই তারতনক ছটি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি অঞ্চল একজন করে নির্বাচিত অথবা কেন্দ্রের মনোনীত রাজ্যপালের অধীনে থাকবে। বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর এলাকা বেশ খানিকটা কমতে হবে।

(২) রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদ-গুলো বাতিলের কথা গণপরিষদের বিবেচনা করা উচিত। রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনের মতো লোকসভার সদস্য ও বিধানসভা সদস্যদের যারা নির্বাচন করা উচিত। বর্তমান বিধানসভাসকল ও লোকসভার সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে বিগুণও করা যেতে পারে।

(৩) প্রত্যেক বা পরোক্ষভাবে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্থ বা পণ্যে লেনদেন হলে দাতা ও গ্রাপক উভয়কেই অন্ততঃ একবছরের জেল দণ্ড কারাদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তি এবং একবার দণ্ডিত হলেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চির অযোগ্য বলে বিধান তৈরি করা উচিত।

(৪) সংশোধিত আরতনের বিধানসভা কেন্দ্র প্রতি নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা সর্বোচ্চ দশহাজার (দশহাজার সহ) ও লোকসভার আসন প্রতি পাঁচ হাজার টাকা (পাঁচহাজার ব্যতীত) করা উচিত।

(৫) নির্বাচিত এম এল এদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সচিবের সাহায্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্বাচিত বা মনোনীত রাজ্যপাল প্রশাসন চালাবেন। রাজ্যপাল বা এম এল এ-দের মেয়াদ হবে ছ'বছর। রাজ্যপালপদে একবার নির্বাচিত বা মনোনীত হয়ে ছ বছর কাজ চালাবার পর পুনরায় পরবর্তী মেয়াদের জল ছ বছরের

পূর্বে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়া যাবে না। অবশ্য সাধারণের ঐচ্ছক্রে বিধানসভা বা তার সদস্য-দের যারা নির্বাচিত প্রস্তাবিত পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ একটামা বারো বছর রাজ্যপালের কাজ করা যাবে না। প্রথম ছ বছর রাজ্যপাল থেকে পরের ছ বছর এম পি, এম এল এ হওয়া যাবে। সচিবদের ক্ষেত্রেও এই বিধি হবে।

(৬) ছ বছর মেয়াদী লোকসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন আঞ্চলিক বিধানসভা সদস্যদের যারা (বর্তমানে রাজ্যসভার ক্ষেত্রে যা হয়)।

(৭) লোকসভার সদস্যগণ ঐাদের মধ্য থেকে ছজনকে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের হিসেবে তারতের সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করবেন। ঐ সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের কার্যকালের মেয়াদ হবে এক বছর। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা একটামা ছ বছরের বেশি কাজ চালাতে পারবেন না। (৮) মং এ বর্ণিত রাজ্যপালের কার্যমেয়াদ ঐাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অবশ্য ছ বছর অন্তে লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

(৮) বছরে অন্তত চারবার কেন্দ্রের ভোটারদের অবস্থা খোঁজ খবর মেওরা—পরিদর্শন করা এম এল এদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বছরের চতুর্থবার কেন্দ্র পরিদর্শনকালে এম এল এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এম পিরও ঐ কেন্দ্রে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক হবে এবং উৎসাহিত সমস্যাবলীর রিপোর্ট প্রয়োজনে দ্রাসরি সভাপতিমণ্ডলীর কাছে উক্ত এম পি পেশ করবেন।

(৯) (৫) নং বর্ণিত রাজ্যপাল-দের প্রশাসনের মতোই উক্ত সভাপতিমণ্ডলী এম পিদের মধ্যে থেকেই কয়েকজন সচিবের সাহায্যে দেশ শাসন করবেন। যদি কখনও কোন সচিব অথবা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে, তাহলে তদন্তে দ্রুততম স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সাময়িকভাবে রিটার্ন করা হবে।

(১০) গণতন্ত্রের স্বার্থে লোকসভা বা সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচনে সদস্যদের প্রতি রাজনৈতিক দল-বিশেষের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ সদস্যগণ ঐাদের ব্যক্তিগত মত প্রয়োগ করবেন, দলীয় আদেশ নয়।

(১১) প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় দরকার বহন করবে। একেই বধেই লতকতা অবলম্বন করা উচিত।

(১২) ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স ১৮ হবে। বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স হওয়া উচিত বধাক্রমে ২৫ ও ৩০। পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপালিটির ভোটে দাঁড়াতে হলে কমপক্ষে একুশ বছর বয়স হতে হবে।

(১৩) আঞ্চলিক রাজ্যপাল বা উক্ত সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হবার ন্যূনতম বয়স হবে পঁয়ত্রিশ বছর।

(১৪) জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে দুশ জনকে নির্বাচন ব্যতীত লোকসভার মনোনয়ন করার বিশেষ ক্ষমতা সভাপতিমণ্ডলীকে দিতে হবে। প্রশাসনে বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত বিশেষজ্ঞদের সভামত দেশকে উন্নত করবে। মনোনীত ব্যক্তিরা কিন্তু সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হতে পারবেন না।

কেরালা, পাঞ্জাব, হরিয়ানার পথে রাজ্যগুলির উন্নয়নে ক্ষুদ্র রাজ্য গঠনের কথা দ্বিতীয় গণপরিষদকে বিবেচনা করতে হবে। অনধিক দশটি জেলা নিয়ে রাজ্য হবে। দুটি জেলা প্রতি একজন করে কমিশনার থাকবেন যার দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রত্যক্ষ অধীনে। তাঁর মূল কাজ হবে পরিকল্পনার হুঁই রূপায়ণ ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে নয়া কর্মসূচী গঠনে সুপারিশ করা।

কর-কাটামোর পুনর্বিভাগ করার কথাও প্রায়ত ভি, ভি, গিরি তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বলেছেন। গভীর অর্থনৈতিক দল্লটের মোকাবিলায় কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎসাহন বধেই সম্ভব বাঞ্ছনীয় প্রয়োজন।

সভাব্য সকল সুযোগ গ্রহণ করেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। কেবলমাত্র সরকার ভা পাবে না, সমগ্র জাতিকে লক্ষ্য-ভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিকারের অন্ততম উপায় হিসেবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি একটা জাতীয় ব্যাক গঠনের প্রস্তাব করেছেন যেখানে প্রতিটি পরিবারই একমুঠো চাল-বা আটা দান করবে। এইরকম ব্যাক প্রতিষ্ঠান তধু দেশীয় নয়, বিদেশী দান সংস্থার দানও গ্রহণ করার কেন্দ্র হবে।

দলকত্রী স্বীকৃতি অস্থায়ী আজ দেশের ৬৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ কোটি অধাধারে রয়েছেন। তাই ক্ষুধা মোকাবিলায় কর্মসূচীতে ভাগ্যবান পরিবারগুলোর থেকে মাদে একটাকা কর ধার্য করা উচিত।

কেন এই আঞ্চলিকতা ও বিচ্ছিন্নতা ?

কালিদাস কুণ্ডু

আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা সম্রাট-কালে ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর উদ্ভাবন তরঙ্গের মতো ভেঙে পড়ছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে প্রবল হিংসাত্মক বিক্ষোভ-প্রতিরোধের ঘটনায় পূর্ববর্তিত হয়েছে। এই হিংসাত্মক বিক্ষোভগুলি কখনও কখনও ব্যাপক নারকীয় হত্যালীলার যে রেকর্ড স্থাপন করে চলেছে তাকে এককথায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পূর্ব সূচনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। সমসাময়িক কালের বিশ্ব-ইতিহাসে উপজাতির অভ্যুত্থানের 'একাধিক নম্বর' এর কাছে স্থান হয়ে গেছে। পাকিস্তানের পাকতুন বা বেলুচি বিদ্রোহ, ইরাকের 'কুইজান' আন্দোলন, বাংলাদেশের চাকমা-বিদ্রোহ এবং বর্মার খোজাতি-দের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী সংকট থেকে এনেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অভ্যুত্থান ইতিহাসের এক নির্ভর, অমোঘ ইঙ্গিত বহন করে।

স্বভাবতই, রাজনৈতিক দলগুলি এবং নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহল কিছুটা শঙ্কিত ও বিমূঢ়। গোটা দেশজুড়ে যেন বিধ্বংসী তুফান বয়ে যাচ্ছে। সংবাদপত্রের পাতাগুলি মুগ্ধ। আলোচনার টেবিল উদ্ভূত। 'সেমিনারে' বাগ্মিতার উন্নত প্রতিযোগিতা। রাজনৈতিক দলগুলির নরম-গরম বিবৃতি। গায়ে মানে না আপনি মোড়লের আফালন। সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে শরৎচন্দ্রের 'মেঘদূত' গল্পে বর্ণিত সেই 'দক্ষবজ্রের' মতো।

"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য", "বিবিধের মাঝে মিলন মহান", "হেথার আর্থ, হেথার অনার্থ, ত্রাবিড় চীন"—ইত্যাদি জ্বলন্ত বাণীগুলি যে মোড়কে সমস্ত রক্ষিত ছিল এতদিন, কবে যে তা পোকার কেটেছে তার হৃদয় রাখেন নি গায়ে মানে না আপনি মোড়লের দল। এতদিন খুব কাছে ব্যস্ত ছিলাম কিনা! এম, এল, এ হয়েছি, মজী হয়েছি, হজুরের বালা হয়েছি, দুহাতে লুটেছি লাই-সল, পারমিট, গাড়ী বাড়ী আরো কত দব। তখতে বসেছি। হা বা খেলেছি। নিজের আখের গুঁড়িয়েছি। পুত্রের অভিষেকের খোঁরাবে মেতেছি। দেশে পাচ কোটি মানুষ যে নেগটি পরে পাহাড়ে জললে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধ, শিকার আলোক বকিত, লজ্যতার নিশান বাঁচিয়ে

তারের খবর তো রাখিনি। একে-বারে রাখিনি একথা কে বলবে? শীতলাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে মণি-পূরী নাচ দেখছি, অসমীয়া লোক সজীত শুনেছি, নাগামিজো উপ-জাতিদের রমণীয় পোশাক বৈচিত্র্য তারিক করেছি। আর ভোটের সময় ভোটের তালিকা থেকে ওদের নাম বাতিল করিনি। ওদের দরজার গিয়েছি, ওদের পোশাক পরেছি, আসামে অসমীয়া হয়েছি, মণিপুরে মণিপুরী। এইটুকু জন্তই ওদের কুন্তল ধাকা উচিত ছিল। কী অকৃতজ্ঞ! অভ্যুত্থান।

হ্যাঁ মহাশয়, অভ্যুত্থান। চমকে উঠছেন কেন? অভ্যুত্থানের নাম শোনে নি কোন দিন? আপনার/আপনাদের পিতৃ-পিতামহগণ কি বেন একটা করেছিলেন? আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন। "জাতির পিতা" যাকে বলেছিলেন "Deadly but friendly struggle." এই "friendly struggle" আপনাকে/আপনাদের পুরস্কৃত করে মননে বসিয়েছে। ওরা ঠাই পায়নি। ওরা অতিমানে আহত হয়েছে। মুখ ভাব করে বসেছিল। তারপর ক্রোধ। ক্রোধ এখন অশনি সংকেত। কী করবেন আপনি? ব্যর্থতা আপনার ব্যবস্থাপনার।

আমরা যেদিন উৎসব করলাম পতাকা উড়িয়ে—১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭, সেই দিন থেকে আপনারা লজ্জার মাথা ধেরে তিক্ত করে বেড়ালেন ধারে ধারে। লুটেরাদের ডাকলেন, আসন পেতে দিলেন। ব্রিটিশ, আমেরিকান, পশ্চিম জার্মানীর পুঁজি এসে টুঁটি চেপে ধরল আমাদের অর্থনীতির। বাধীন বিকাশের পথ হয়ে গেল বন্ধ। যেটা আপনাদের করার কথা ছিল অথচ করার মুরোদ নেই সেই ধনতান্ত্রিক বিকাশের অসম্পূর্ণতার রক্তপথে উপ-জাতি সমাজ অবহেলা-বঞ্চনার নাগ পাশ ছিন্ন করার মন্ত্রণা পেরে গেছে।

চরিত্রগতভাবে আপনাদের তো ধনতন্ত্র গড়ে তোলারই কথা ছিল, অথচ চরিত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে আপনারা সমাজতন্ত্রের ফাটল ওড়ালেন। ফাটল ফেটে যাচ্ছে।

আপনাদের নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের অবশিষ্ট উপজাতীয় গোষ্ঠী-গুলি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা ধনতন্ত্রের

সংকট। আপনারা বসে আছেন কয় ও পতনের হিমবাহের উপর।

কিন্তু যাদের সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ছিল, তারা মাইয়ের কাছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ওয়াদা রেখেছিল আজ তারা কোথায়? তারা আপনাদের সঙ্গে একমত। হিংসাত্মক ঘটনার বোকা-বিলা করুন। উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করুন কঠোর হাতে। কারণটা কি এই যে, আন্দোলনে নেতৃত্বটা আমাদের নেই কিংবা আমাদের সেই বিনীত ঘোষণা—"Violence is alien to Marxism" তত্ত্ব মহোদয়-গণ, তাহলে আপনারাই বলুন লেনিন যে ছুনিয়া কাপানো বইটি লিখেছিলেন তার নাম হওয়া উচিত কি "State and Revolution না Revolution minus State."

একথা একটা শিশুও জানে যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সর্বোচ্চ সংগঠন রাষ্ট্রপ্রত্যাশী বদ্ব ও সংগঠিত হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নিপীড়ন যন্ত্র। মার্কসবাদে যদি হিংসার স্থান না থাকে তবে হিংসাকে দমন করার জন্য সর্বাধিক শক্তিশালী হিংসা প্রয়োগের জন্য আবেদন কেন? তবে কি, আধুনিক গান্ধীবাদীরা গান্ধীবাদ ছেড়ে হিংসার দর্শনেই বিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন? ইতিহাস উত্তর দেবে।

আমরা শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি। নাগাল্যাও থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বিচ্ছিন্নতার বিপদ দেখা দিয়েছে তার পশ্চাতে কোন বৈদেশিক শক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, আন্দোলনের নেতৃত্ব কোম প্রগতিশীল শক্তির হাতে নেই, একথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। বিপ্লবী শক্তির অস্থ-পস্থিতির স্বযোগে কিছু ভাগ্যান্বেষী চুরতিদলি পরায়ণী মানুষ উপজাতি-দের লজ্জত বিক্ষোভকে বিপথে পরি-চালিত করেছে। ত্রিপুরার নারকীয় হত্যালীলাই তার জলন্ত প্রমাণ। শক্তি প্রয়োগের দৃষ্ট ছেড়ে রাজনৈতিক প্রচারাভিযান বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। ব্যর্থ হ'লে বৈদে-শিক শক্তির আশ্রিত উদ্ধানি রাখাল বাসকের গল্পের নেকড়ে বাঘের মতো বাস্তব সত্যে পরিণত হতে কতকণ।

সাহিত্য দর্শন

আমাদের সময়ের লেখক

মিহির আচার্য

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আমরা যে-আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে উঠ-ছিলাম সেখানে সমবয়সী আরো দশজন গল্পলেখক ও কবি বন্ধুদের মধ্যে ছিল সহানুভূতি বিশ্বাস ও প্রীতির বন্ধন। তখন একেবারে গল্প লিখে বন্ধুদের পাঠক হিসেবে পেতাম, পত্রিকায় বেরোলে অমলিন অতি-নন্দনও জুটত। পেশাগত মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যে ছিল না তা নয়, ছিলনা স্বার্থমগ্ন ইতার ইধা। তার কারণ আমরা কমবেশি একটা আদর্শে বিশ্বাস করতাম।

তারপর সময়ও বদলাতে লাগল, যে সব চরিত্রবান পত্রিকাকে বিরে আমাদের সাহিত্যচর্চা চলত সেসব পত্রিকাও নানাবিধ কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, আমাদের নিত্য ভাব আদান-প্রদানের জায়গাও বন্ধ হয়ে গেলে, পত্রিকার অভাবে অনেকের লেখা শুরু হয়ে গেল, কেউ কেউ বাজারী পত্রিকায় ব্যক্তিগত উত্তোকে লেখার জায়গা করে নিলেও বন্ধুদের পুরনো পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল। বাজারী পত্রিকায় আদর্শনিষ্ঠ লেখকদের স্থান নেই, সে-অস্থূল পরিস্থিতিও গড়ে ওঠে না। কারণ লেখার জন্তে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক আছে, কোনো রকমে সেখানে একজন ঢুকে গেলে আরো দশজনের প্রবেশ সেই লেখকের পক্ষেও অসম্ভব কারণ হয়ে উঠতে পারে।

তারপর ও যে সব লেখক টিকে-থাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন সেটা তাঁদের নিছক ব্যক্তিগত প্রয়াস। বেশির ভাগই কলম গুটিয়ে নিলেন। নেহাতই উৎসাহেব অভাবে। আরা-দের কালে সাহিত্য শুরু করে কত শক্তিশালী বন্ধুরা যে এই না লেখাদের মধ্যে আছেন এবং এখনো শারীরিক-ভাবে বেঁচে আছেন তার দৃষ্টান্ত কম নয়। দুর্ভাগ্যবশত আজকের প্রগতিশীল পাঠকও তাঁদের নাম জানেন না। যেহেতু তাঁদের গল্প-গ্রন্থ নেই, কিংবা ছ'একটি সেখানে বেরোলেও আজ আর পাওয়া যায় না।

খীকুর করতেই হবে বাজারী পত্রিকায় যোগ্যতার জোরে একদা বেশ কিছু গল্প উপভাস লিখলেও আদর্শবাদের পোকাটাকে না-মারতে পেরে নিছক নীতিহীন কমাশিয়াল লেখক হয়ে উঠতে না-পারার জন্য

বেশিদিন সেখানে দরজা খোলা থাকেনি। কারণ ওদের নীতি 'হয় আত্মসমর্পণ নয় আত্মবিসর্জন'। আত্মা বিধাস করি লেখকের বিবেক-বোধ এবং স্রষ্টার স্বাধীন অহংকার না-থাকলে স্বার্থ লেখক হওয়া যায় না। যার দানস্ববোধই নষ্ট হয়ে গেছে সে একজন স্রষ্টা হবে কী করে?

আমার সাহিত্যসাধনার রকম-টাই হচ্ছে এস্টাব্লিশমেন্টবিরোধী। সে দক্ষিণপন্থীই হোক অথবা বাম-পন্থী। অথচ সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে আমি অধিক চিন্তিত, মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। এবং এমন লেখকেরা কোনো কালেই anti-people হতে পারেন না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার দূর-কালীন লেখকেরা যে কলম বন্ধ করে দিয়েছেন তার মূল কারণও একই।

দীর্ঘকাল সাহিত্যচর্চা করে বুকেছি সাহিত্যের বাজারটা বুজোয়া-রাই নিয়ন্ত্রিত করছেন। এখানে যে আমারও দু'একখানা বই কাটে সেটা বুজোয়া বাজারের নিয়মেই। আমি যতই বিশ্বাস করবার চেষ্টা করি না যে, ক্রেতারা আমার ভিন্ন চরিত্রকে স্বাধীন দিচ্ছেন তা নয়। কারণ ব্যক্তিগত চেষ্টায় সাহিত্যে পোলারা-ইজেশন ঘটাবার মাধ্যম আমার নেই। তার জন্যে প্রয়োজন দৃষ্টিক মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী শক্তিশালী সংগঠন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমরা যে কালে লেখা শুরু করেছি, সাহিত্য সংস্কৃতিতে তখন বামপন্থীদের পূর্ব জোয়ার। 'পরিচয়ে' লেখাটা তখন যে কোনো লেখকের পক্ষে-গৌরবের বিষয়। 'দেশ' নামক বিজ্ঞাপনের যে-সুভেনিরটি আজকাল লেখকদের কাছে লাভান্বিত বলে প্রকাশ, সে-পত্রিকাটিতে লেখবার জন্যে সেকালে কারুরই আগ্রহ ছিলনা। 'অগ্রণী' 'নতুন সাহিত্যের' আবির্ভাবমাত্র জনপ্রিয়তা কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, নাহারগণ গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, রমেশচন্দ্র সেন, এমনকি আজকের দলভাগ্যী সমরেশ বসুও ছিলেন এই প্রগতির দলে। কম বেশি সমবয়সী লেখকদের মধ্যে যাদের শক্তিমত্তার আমার অটুট বিশ্বাস সেই শান্তি রায়, আশীষ বর্মা, শেখাংশ চন্দ্র পৃষ্ঠায়

গণশিষ্টমবঙ্গ আইনসভার অতীত ও বর্তমান

কল্যাণ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৮৬২ সাল থেকে। বঙ্গদেশ তখন ছিল অবিভক্ত এবং ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসিত। ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদীয় আইন মোতাবেক ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ১৯৬২ সালের ১৮ই জুলায়ারী বঙ্গদেশের জন্য একটি বিধান পরিষদ গঠন করেন। এই বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এবং কয়েকজন মনোনীত সদস্য। এই পরিষদের প্রথম বৈঠক হয় ১৮৬২ সালের পরমা ফেব্রুয়ারী। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্রান্ট। পরিষদের সদস্যরা বৈঠকের জন্য মিলিত হতেন কলকাতার বেলভেডিয়ায়। অর্থাৎ তৎকালীন গভর্ণর জেনারেলের বাসভবনে। বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগারটিই অতীতে ছিল উপরাজ্যপালের বাসভবন। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করতেই বিধান পরিষদের বৈঠক বসত প্রতি শনিবার বেলা ১১টার। তখন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল অনধিক ১২ জন। ক্রমে ক্রমে এই পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্যপদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। সেই সঙ্গে সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

১৮৯২ সালের সংশোধিত ভারতীয় পরিষদীয় আইন অনুসারে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২০ জনে বৃদ্ধি করা হয়। ২০ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন সদস্য ছিলেন নির্বাচিত এবং বাকিরা মনোনীত। এই সময় থেকেই সদস্যদের প্রস্তাব করার এবং বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা চালাবার অধিকার দেয়া হয়।

১৯০৯ সালের সংশোধিত ভারতীয় পরিষদীয় আইন অনুসারে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়। এবার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ জনে। এই সময়ে হয় যে, পরিষদে বেসরকারী সদস্য সংখ্যায় হার বেশি থাকা উচিত এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও দেয়া হয়। সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব বারা করতেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন মনোনীত সদস্য। এই সময় থেকেই সদস্যরা তাঁদের প্রস্তাব লম্বা সম্পর্কিত অতিরিক্ত প্রস্তাব করার অধিকার পান।

তবে মূল প্রস্তাবকারী সদস্যই অতিরিক্ত প্রস্তাব করার অধিকারী হন। বর্তমানে অবস্থা সে নিম্নমণ্ড বদলেছে। জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার অধিকারও এই সময় সদস্যদের দেয়া হয়।

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইন সভাসমূহকে অধিকতর সাংবিধানিক ক্ষমতা দেয়া হল। আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের আসন বাড়ানো হল এবং সেই সঙ্গে বাড়ানো হল নির্বাচকদের সংখ্যাও। তদানুসারে বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২৫ জনে। তখন হয় যে, এখন থেকে বিশ শতাংশের বেশি সরকারী সদস্য বিধান পরিষদের সদস্য থাকতে পারবেন না এবং নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে সত্তর শতাংশ। কোন বিল উপস্থাপন করতে হলে বা কোন প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হলে প্রস্তাবিত বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন ব্যক্তিকে বিধান পরিষদের সাময়িক সদস্য হিসাবে মনোনীত করার অধিকার বর্তমান রাজ্যপালের উপরে। সাময়িক সদস্য হলেও সভার অপর্যাপন্ন সদস্যদের যে অধিকার প্রাপ্য এই দুইজন সদস্যও সেই সব সুযোগ পেতেন। আরও হয় যে, আইন সভাতে একজন অধ্যক্ষ এবং একজন উপাধ্যক্ষ থাকবেন। অধ্যক্ষ ধিনি হবেন তাঁকে সভার মনোনীত সদস্য হতে হবে এবং পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং রাজ্যপাল সেই নির্বাচনকে অনুমোদন দেবেন। উপাধ্যক্ষ-ধিনি হবেন তাঁকে অবশ্যই নির্বাচিত হয়ে পরিষদে আসতে হবে এবং তারপর সভার নির্বাচনের পর রাজ্যপাল তা অনুমোদন করবেন। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যপালই বিধান পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন। তখন থেকে সেই নিয়মের বদল ঘটল।

১৯২১ সালের আইনবলে বঙ্গীয় বিধান পরিষদ গঠিত হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালের পরমা ফেব্রুয়ারী। উদ্বোধন করেন কননেটর ডিউক। বিধান পরিষদের প্রথম বেসরকারী অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন নবাব স্যার দাশরূপ হুদা। এতদিন পর্যন্ত সভার অধিবেশন বসত বেলা এগারোটায়। এখন থেকে সেই সময় পরিবর্তন করে করা হয় দুপুর তিনটে। এই সভার

সভার একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় ১৯২১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। প্রস্তাবটির উপস্থাপক ছিলেন পরিষদের সদস্য মিঃ আর এম ওয়াস্টন স্মিথ। তিনি ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি। অধিবেশনের স্থান বেলভেডিয়ায় পরিবর্তিত নির্ধারিত হয় কলকাতার টাউন হল। তবে টাউন হল খুব বেশিদিন বিধান পরিষদের বৈঠক হয়নি। নবনির্মিত বিধানসভা ভবনে বিধানপরিষদ স্থানান্তরিত হয়ে যায় ১৯৩১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। এই বিধানসভা ভবন উদ্বোধন করেন তৎকালীন রাজ্যপাল স্যার ক্রানফিল্ড স্টানলী জ্যাকসন।

১৯৩৫ সালে ভারত সরকারের আইন অনুসারে বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য দুটি কক্ষ নির্ধারিত হয়। একটির নাম হয় বিধান পরিষদ এবং অপরটির নামকরণ করা হয় বিধানসভা। স্থির হয় যে, বিধানসভার সদস্য সংখ্যা থাকবে ২৫০ জন এবং এর মেয়াদ হবে ৫ বছর (যদি না আগে বাতিল হয়ে যায়)। পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ন্যূনতম ৬০ জন এবং সর্বাধিক ৬৫ জন। এই পরিষদকে কখনোই বাতিল করা যাবে না তাও স্থিরীকৃত হয় ভারত সরকারের আইনে। তবে মোট সদস্যের এক তৃতীয়াংশ অবসর নেবেন প্রতি তিন বছর অন্তর। তখন বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের আসন সংখ্যা কি ধরনের ছিল তা নিয়ে প্রসঙ্গ ছক থেকে বোঝা যাবে।

বিধানসভা

১) মোট আসন	২৫০
২) ক) মোট সাধারণ আসন	৭০
খ) মোট সংরক্ষিত সাধারণ আসন (তপঃ জন্ম)	৩০
৩) মুসলিম আসন	১১৭
৪) অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসন	৩
৫) ইওরোপিয়ান আসন	১১
৬) ভারতীয় ক্রীড়ান	২
৭) বিভিন্ন শিল্প ও বণিক সভার জন্ম নির্দিষ্ট	১১
৮) জমির মালিকদের জন্ম	৫
৯) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি	২
১০) শ্রমিক প্রতিনিধি	৮
১১) মহিলাদের জন্ম :	
ক) সাধারণ	২
খ) মুসলমান	২
গ) অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	১

বিধান পরিষদ

- ১) মোট আসন ৬৫ (সর্বাধিক) ৬০ (ন্যূনতম)
- ২) সাধারণ আসন ১০
- ৩) মুসলিম আসন ১৭
- ৪) ইওরোপিয়ান আসন ৩
- ৫) বিধানসভার ভোটে মনোনীত ২৭
- ৬) রাজ্যপাল মনোনীত ৬ (ন্যূনতম) ৮ (সর্বাধিক)

এখন থেকে সদস্যদের জন্য মালোহারার ব্যবস্থা করা হল। এর আগে তারা বেসরকারী ভাড়া পেতেন তাঁরা পাবেন। ১৯৩৭ সালের ৭ই এপ্রিল বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন স্যার মহম্মদ আজিজুল হক এবং ১৯৩৭ সালের ১৫ই এপ্রিল বিধান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হল ক্রিস্টিয়ানো চন্দ্র মিত্র। বিধানসভা এবং বিধানপরিষদ—বঙ্গীয় আইন সভার এই দুই কক্ষের সভার কার্য পরিচালনার জন্য “কলস অব প্রেসিডেন্সি” এবং “কন্সাল্ট অব বিজনেস” সভার গৃহীত হয় ১৯৩৯ সালের জুলাইয়ে আলাদাভাবে।

কৃষক প্রজা পাটি এবং বিধান সভার কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর সহায়তায় নিয়ে মুসলিম লীগ দল ১৯৩৭ সালে সরকার গঠন করে। কর্ণধার হল জনাব এ কে ফজলুল হক। সে সময় কংগ্রেস দল পেয়েছিল মোট আসনের মাত্র ২২ শতাংশ। বিধানসভায় মুখ্য বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল কংগ্রেস দল।

মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় জনাব হক ১৯৪১ সালের পরমা ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন এবং ১২ই ডিসেম্বর জনাব হক তার মুসলমান সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং কৃষক প্রজা পাটির সমর্থন নিয়ে একটি নতুন প্রগতিশীল কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। কিন্তু এই নতুন সরকারের আয়ুঃ বেশিদিন ছিল না। ১৯৪৩ সালের ২৯শে মার্চ জনাব হক বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ রাজ্যপাল প্রকাশনের দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেন ভারত সরকারের আইনবলে। ১৯৪৩ সালের বিশেষ এপ্রিল রাজ্যপাল নতুন সরকার গঠনের জন্য খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনকে আহ্বান করেন। ২৯শে এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন নাজিমুদ্দিন সাহেব।

১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ বিধানসভার নাজিমুদ্দিন সরকারের পরাজয় ঘটে। কৃষি বাজেটের ব্যয়বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় অগ্রাহ্য হয়ে যায়। দাবির পক্ষে পড়ে ১৭টি ভোট এবং দাবির বিপক্ষে পড়ে ১০৬টি ভোট। পরের দিন অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ২৯শে মার্চ বিধানসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব নওসের আলি যে কলিং দেন তাতে (অন্ত বিষয় নহ) বলা হয় যে, “সরকারের একটি প্রধান দৃষ্টান্তের ব্যয় বরাদ্দ বিধানসভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারিয়েছেন। এমতাবস্থায় এই সরকারকে এই বিধানসভার সরকারী কার্য পরিচালনা করতে কোনমতেই দেয়া যায় না। বিধানসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলতুবি থাকল।”

১৯৪৫ সালের ৩০শে মার্চ রাজ্যপাল বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং পরের দিন (৩১শে মার্চ) ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তাব ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল মিঃ আর জি কাইজে সরাগরি প্রকাশনের কর্তব্য হাতে নেন। তার কিছুদিন পরেই অবশ্য বিধানসভা ভেঙে দেয়া হয়।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হবার পর থেকে যুদ্ধের জন্য সাধারণ নির্বাচন হতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের ২৯শে আগষ্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল নির্বাচন ঘোষণা করেন। এবং বলেন যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন শীঘ্রই হবে। বাংলাদেশে নির্বাচনী কল্যাণ ঘোষিত হয় ১৯৪৬ সালের পরমা এপ্রিল। এই নির্বাচনে বিধান সভার ২৫০টি আসনের ১১৪টি আসনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে এবং জনাব এইচ.এস. সুরাবর্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২৩শে এপ্রিল সরকার গঠন করে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন ২৪শে এপ্রিল। ১৯৪৬ সালের ১৪ই মে বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে জনাব হুসন আলি এবং জনাব তফজ্জল আলি।

এখন দেখা যাক সেই বিধানসভার কোন দলের সদস্য সংখ্যা কত ছিল: মুসলিম লীগ—১১৪, কংগ্রেস ৮৬, ইওরোপিয়ান ২৫, তপশীল জাতি নির্দলীয় ৬, মুসলমান নির্দল ৩, কমিউনিষ্ট ৩, কৃষকপ্রজা (মুসলমান) ৩, হিন্দু মহাসভা ১, নির্দল হিন্দু ১, ভারতীয় ক্রীড়ান ২ এবং

অন্ততঃ ৬ জন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসকবর্গ মন-স্থির করে যে, ভারতীয় নেতৃবর্গের হাতে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং "ম্যাউন্টব্যাটেন পরিচালনা" অঙ্গসারে ভারতকে দ্বিধাভিত্তি করা হবে।

১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বাংলা দেশের বিধানসভার সদস্যরা দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান। এক গোষ্ঠী অমুসলিম এলাকার প্রতিনিধিত্বের দাবী নিয়ে আলাদাভাবে মিলিত হন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত ১৯৪৭ সালের তেমনা জুন তারিখে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির শর্ত অঙ্গসারে ঘোষণা করে মিলিত হন। ঘোষণা বৈঠকে সদস্যগণ (ইংরেজী দল) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, বাংলাদেশে আরও একটি নতুন বিধানসভা গঠিত হবে সেই সব এলাকার প্রতিনিধিত্বের নিয়ে যারা বর্তমান বিধানসভার যুক্ত থাকতে রাজী নন। মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলির সদস্যগণ বাংলাদেশকে দ্বিধাভিত্তি করার বিরুদ্ধে এবং একটি নতুন বিধানসভা গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। অতীতকালে অমুসলমান এলাকার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশকে দ্বিধাভিত্তি করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। কথিত দুই গোষ্ঠীর এক গোষ্ঠী দেশ ভাগের পক্ষে মত দেন এবং ব্রিটিশ সরকারের শর্ত অঙ্গসারী ভারত ভাগ হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ দ্বিধাভিত্তি হয়ে নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পাশ হয়ে যাবার পর ভারত ভাগ হয়ে যায়। জন্ম নেন পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত এবং পাকিস্তানের আলাদা অস্তিত্ব ঘোষিত হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে ব্রিটিশ দাস জালান এবং ক্রীড়াভাতোব মলিক। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা তখন ছিল ৯০ জন। সদস্যরা সেই সব এলাকার প্রতিনিধি ছিলেন যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দুইজন মনোনীত সদস্য ছিলেন। রাজ্যে কংগ্রেস দল সরকার গঠন করে ৩৯ প্রজন্মের নেতৃত্বে। বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা তখন ২০ জন। কিন্তু ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করার ফলে ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুলাই নতুন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন ডঃ বিধান-

চন্দ্র রায়।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকরী হয় এবং ৩৮২ (১) ধারা (যা মূল্য সংশোধনে (১৯৫৬) বাতিল গণ্য হয়েছে) অঙ্গসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রাজ্যের বিষয়ে নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী হন।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বৈঠক বসে ১৯৫২ সালের ১৮ই জুন। ২০ জন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ব্রিটিশ-কুমার মুখার্জী। মনোনীত ২ জন সহ বিধানসভার সদস্য সংখ্যা তখন ২৪০ জন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল রাজ্যে সরকার গঠন করে।

ক্ষমতা হস্তান্তরকালে আইনগত স্থিতিগতির কারণে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল। ১৯৫২ সালে আবার তা জিইয়ে তোলা হয়। পরিষদের সদস্য হন ৫১ জন। কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান হন ব্রিটিজ সিং নাহার। ১৮ই জুন বিধান পরিষদের বৈঠক হয়। পেরদিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ব্রিটিজী-কুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিধানসভা কর্তৃক ১৯৫২ সালের ৫ই আগস্ট গৃহীত এক প্রস্তাবক্রমে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা খোলা হয়। ১৯৬১ সালেও এই জাতীয় একটি সংস্থা ছিল। কিন্তু তা কোন কাজ করেনি। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর অধিবেশনেই বিধানসভার স্বয়ংক্রিয় ভোট রেকর্ড যন্ত্র চালু করা হয় সরকারীভাবে।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অঙ্গসারে বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। বিধানসভার বেড়ে দাঁড়ায় ২৫১ জন এবং বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫ জন। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর বিধানসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৬ জন (৪৪ জন মনোনীত সদস্য সহ)।

১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভার অধিকাংশ আসনেই কংগ্রেস দল জয়লাভ করে এবং রাজ্যে সরকার গঠন করে। ইতিমধ্যে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৪ জন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল পায় মাত্র ১২৭টি আসন। ফলে সরকার গঠনে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। তখন ১৪টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ক্রীড়াক্ষয় শেখাংশ চন্দ্র পৃষ্ঠায়

বেকারীর বিভীষিকা

রণেন নাগ

এদেশের তরুণ সমাজে বেকারীর জ্বালা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। স্বল্প সর্বস্ব কর্মকর্ম দেহমন দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকলে গোটা সমাজেই তার ক্রিয়াক্ষেপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। অথচ বেকারী সম্পর্কে দেশের সরকার এমন এক ভাবভঙ্গী দেখাচ্ছে যেন বেকারী অজ্ঞাত মহামারীর মতই একটা ঈশ্বর নির্দিষ্ট বিধান। তারা এর কোন প্রতিকার করতে পারেন না। ভগবানের মারের উপর তাদের কোন হাত নেই, আকারে ইচ্ছিতে তারা এটাই বোঝাতে চান। তবে ছোট্ট আগের তারা এই বেকার ছেলেদের "ভোট কর" ক্যাম্পে লগিয়ে দেন। কিছু দৈনিক মজুরী দেন এবং ভবিষ্যতের এক রকম আশাও দিতে বলেন না। স্বাধীনতার আগে এবং পরে বেকারদের সম্পর্কে সরকারী মনোভাব একই রকম গেছে। তারা যেন ভিক্ষুকের সমপর্যায়ভুক্ত।

বেকারী পুঁজিবাদী সমাজের অভিশাপ। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-সামাজিক বিধিব্যবস্থা বজায় রেখে বেকারী দূর করা যায় না। দূর করার কথা বলাও হাস্যকর।

একটু ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে তাকান। ইংলণ্ড ও ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই পুঁজিবাদ সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী খতম করে শিল্প প্রতিষ্ঠার বেগ ত্বরান্বিত করেছে। তাই বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের প্রথম-স্তর থেকেই পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের মধ্যে অহিন্দুল সম্পর্ক। কিন্তু কালক্রমে প্রতিযোগিতার নজর ধরেই প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হল তখন থেকেই তার সামন্তবাদ বিরোধী কৃষিকার অবসান হল। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করা হল, কিন্তু সেই সমস্ত দেশে সামন্তবাদের অবসান না করে বরং তাদের উপরেই বেশী নির্ভর করা শুরু হল। এর কারণ সোভি। প্রথমতঃ এর ফলে স্থানীয় শিল্পবিকাশ বন্ধ থাকবে, দ্বিতীয়তঃ কৃষিক্ষেত্র থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত হবে এবং এই ভূমিহীন কৃষকেরা ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বৃষ্টিচ্যুত গ্রামীণ হস্তশিল্পীরা সম্ভ্রম মজুর সরবরাহের এক অঙ্গরূপ উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এই সম্ভ্রম মজুরেরা তাদের মূল্যবান সংগ্রহের জটিল ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ। শুধু তাই নয়, অসংখ্য বেকার বাহিনী যখন যে কোন কাজের খাওয়ার শহরের কলকারখানার দুটে আসে তখন তারা

আগেই কাজ পেয়েছেন- তাদের বেতন ও মজুরীও অনায়াসে কমানো চলে। ইটাইয়ের তর দেখিয়ে তাদের খুব কম মজুরীতে কাজ করানো যায়। তাহলে দেখা যায় যে মূল্যবাহিত্তিক পুঁজিবাদ স্বতন্ত্র থাকবে বেকারীর অভিশাপও ততদিন থাকবে। কারণ বেকারী হচ্ছে পুঁজিবাদের এক অর্থনৈতিক ভিত্তি। এই ভিত্তি না থাকলে পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না।

দম্পতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সারা বিশ্বে বেকারী বৃদ্ধির এক ভয়াবহ চিত্র হাঙ্গির করেছেন। তাদের পরিচালিত সমীক্ষার দেখা গেছে সারা বিশ্বে সমস্ত কর্মকর্ম মানুষের মধ্যে ৩৫ শতাংশই বেকার। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেকারী খুবই মারাত্মক। পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সী তরুণদের শতকরা ত্রিশজনই বেকার। এই বেকারী দিন দিন বাড়ছে। কয়ার

অর্থনীতি

কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মতে আগামী ২০ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে অন্ততঃ ৭৫ কোটি তরুণ বেকার থাকবে। ব্রিটান, কলম্বিয়া, কেনিয়া ও ফিলিপাইনসে অল্পবয়সী তরুণ বেকারের সংখ্যা মোট কর্মপ্রার্থীদের ত্রিশ শতাংশেরও বেশী। আমাদের দেশেও বেকারের সংখ্যা গত বছরের সওয়া কোটি থেকে প্রায় দেড়কোটিতে পৌঁছে গেছে। এরা কেবল শিক্ষিত ভালিকাতুক্ত বেকার। যদি গ্রাম ও শহরের আধা বেকার ও মরত্মী কাজের হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশের ৪০ কোটি কর্মকর্ম নয়নারীর মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি বেকার বা আধা বেকার।

এই বেকারদের কাজ দেওয়ার কোন দায়িত্ব সমাজ বা সরকারের নেই। যদিও আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাবার অধিকার স্বীকৃত তবুও সংবিধানের অঙ্গ ধারা মতে এর ব্যত্যয় ঘটলে সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন ও কতর্বাচ্যতির অভিযোগ আনা যাবে না। অর্থাৎ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা সংবিধানে ইচ্ছে করেই রাখা হয় নি।

এই বিপুল সংখ্যক বেকারের উপস্থিতি যারা চাকুরীরত তাদেরও বিশর করে তোলে। মালিকরা অনায়াসে কম মাইনেতে নতুন লোক

নিয়োগ করতে পারে। তাই মুখ বুজে বিনা প্রতিবাদে তাদের চাকুরী করে যেতে হয়। মজুরী বৃদ্ধি; বোনাস ইত্যাদি দাবি তুললে মালিক পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ইটাই, লকআউটের আশ্রয় নেয়। কারণ তারা জানে যে মজুর-কর্মচারী পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু যদি এই ব্রিডার্ড বেকার বাহিনী না থাকতো তাহলে মালিকপক্ষকে প্রমিক-কর্মচারীদের দাবি মেনে নিরুই আপোষ করতে হতো। বেকার থাকার ফলে মালিকদের সুবিধা এবং প্রমিক-কর্মচারীদের অসুবিধা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে এটা এক বড় রকমের বিপদ।

এই জট্টাই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বেকারদের পাশে দাঁড়াতে হবে। শুধু নিজেদেরই নয় কর্মপ্রার্থী বেকারদের অন্তেও তাদের লড়াই করতে হবে। পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বেকার সমস্যা থাকবে শুধু এই কথা বলেই রেহাই পাওয়া যায় না। পুঁজিবাদ উচ্ছেদের আগে কিছু স্বস্তি দেওয়া সম্ভব।

বেকারী সরকার ইচ্ছে করলে সারা দেশে বেকার ভাতা চালু করতে পারেন। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিমজার্মানী সব পুঁজিবাদী দেশের সরকার দেশের আইন নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন মজুরীর ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ বেকার ভাতা দিয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের বেকারী সরকার না পারার কোন কারণ নেই। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল সরকার বেকার ভাতা চালু করেছে। বেকারী সরকার এই ভাতার পরিমাণ কমপক্ষে ১০০ টাকা করতে পারেন। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি বেকারদের পক্ষে এই দাবি সর্বদা করে আন্দোলন শুরু করলে বেকারী সরকার নিশ্চিত বসে থাকতে পারবেন না। মূল্যবান ওপর ২৫ শতাংশ বিশেষ কর বসিয়ে এর একটা অংশ বেকার ভাতা ও অনুরাংশ নতুন নতুন ছোট ছোট শিল্প ও বৃষ্টি প্রতিষ্ঠার জন্তে কাজে লাগানো যায়। এর ফলে বেকার সমস্যা দূর হবে না বটে কিন্তু সমাজ জীবনে কিছুটা স্বস্তি আসবে। বেকারেরাও যে সমাজের মূল্যবান সম্পদ সেটা স্বীকৃত হবে এবং পরিপাণে সামাজিক অনুরোধের স্বাভাৱ্য পাবে।

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা

১ম পৃষ্ঠার পর

কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে এই রাজ্যে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু নতুন মন্ত্রিসভার লক্ষ্যবস্তুর শপথ বাক্য পাঠ করেন। কংগ্রেস হল তখন বিরোধী আসনে। নতুন বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৬৭ সালের ৮ই মার্চ। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী এবং শ্রীহরিন্দ্র দাস মিত্র। কিন্তু মন্ত্রিসভার দৃষ্টি দেয়া হয়। খাতি ও কৃষি মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোষ পদত্যাগ করেন এবং তাঁর অস্থগামী ১৭জন বিধায়ক শাসক যুক্তফ্রন্ট থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যা- হার করে নেন এবং রাজ্যপালকে তা অবহিত করেন। এই রাজ্যের রাজ্য- পাল তখন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু কাছ থেকে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালের পূর্ণিমা জুন। রাজ্যপালকে জানাবার পর পদত্যাগী পদস্বারা একটি নতুন পরি- বর্তন ঘটন করেন। নামকরণ হয় “প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট”। নেতা হল ডঃ প্রফুল্ল বোষ। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা বোষণী কর- লেন যে, যদি ডঃ বোষ কোন মন্ত্রি- সভা গঠন করেন তাহলে তাঁর দল সেই মন্ত্রিসভাকে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সমর্থন করবে। যুক্তফ্রন্ট সর- কারের মন্ত্রি থেকে ডঃ বোষ পদ- ত্যাগ করার পর কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে এবং ডঃ বোষ নিজ- তৎকালীন রাজ্যপালের নিকট বৈশ- ক্যের একটি আবেদন দেন। তাতে বলা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপরে বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা নেই তাই তাদের আর গণিতে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই। রাজ্যপাল তখন মুখ্যমন্ত্রীকে এক পত্র- জ্ঞানালেন যে, “যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যেন বিধানসভার অধিবেশন ডাকেন। এবং সেই অধিবেশন যেন কোনমতেই ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় দশ্যাহের পরে ডাকা না হয়। কেননা যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপরে রাজ্য- বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।”

কিন্তু মন্ত্রিসভার সদস্যগণ রাজ্য- পালের এই অস্থিরতা রাখতে রাজী হলেন না। কেননা তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ১৯৬৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে। রাজ্যপাল পুনরায় মন্ত্রী পরিষদকে অস্থিরতা জানিয়ে বলেন যে, ১৯৬৭ সালের তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে বিধানসভার অধি-

বেশন ডাকার ব্যাপারে তাঁরা যেন সম্মত হন। রাজ্যপালকে জানিয়ে দেয়া হল যে, ১৮ই ডিসেম্বরের আগে কোনমতেই বিধানসভার অধিবেশন ডাকা সম্ভব নয়।

১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতীয় সংবিধানের ১৬৭(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল এক ঘোষণা জারী করলেন। তাতে বলা হল যে, শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হল এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা এখন থেকে বাতিল বলে গণ্য হল। এই দিনই অপর এক ঘোষণায় রাজ্য- পাল নতুন মন্ত্রিসভা নিয়োগ কর- লেন। মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ প্রফুল্ল বোষ। এই মন্ত্রিসভা পি ডি এফ মন্ত্রিসভা হিসাবে পরিচিত।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র বোষের পরামর্শমত বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হল। অধিবেশন বসল ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর। ডঃ বোষ ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে দুটি মৌলন পেশ করা হল। একটিতে কংগ্রেস দলের ১২৯ জন বিধায়ক এবং অপরটিতে পি ডি এফের ১৪ জন সদস্য মন্ত্রিসভার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।

বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়- কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভার অধি- বেশন অনিদিষ্টকালের জন্য মূলত্বী করে দেন। তাঁর বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা, মুখ্যমন্ত্রী পদে ডঃ বোষের নিয়োগ এবং ডঃ বোষের পরামর্শে বিধানসভার অধিবেশন ডাকাটা “অসংবিধানিক এবং “বাতিল”, কেননা এই সব ঘটনাই ঘটেছে সভার অগোচরে।

কিন্তু সেই দিনই বিধান পরিষ-

সাহিত্য দর্পণ

১ম পৃষ্ঠার পর

স্ববোধমোহন বোষ, ঋষিক বটক, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, মিহির দেন, সত্য- প্রিয় বোষ। এঁদের অনেকেই আল- স্তক, কেউ মৃত।

মনে হয় সামাজিক-স্বকল্লের মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে আছি। সমকালীন সমস্যাধী কেউ নেই। নিঃসঙ্গ।

এমনটা আমাদের মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্ন করে। যুক্ত-জড়িত-দাংগা- দেশবিশাগ-কমতা হস্তান্তর—বিবিধ অধ্যায় আমাদের চেতনাকে গ্রাস করে রয়েছে এবং এই জটিলতাকে স্বীকার করেই লেখক হিসেবে আমা- রের এগিয়ে আসতে হয়েছে। মাহু- হিনেবে যখন তাঁরা বৈচে আছেন তখন নিষ্ঠাবান লেখক হিসেবে তাঁরা টিকে থাকতে পারলেন না

দেয় চেয়ারম্যান ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ- রায় তাঁর কলিংয়ে বলেন যে, “মুখার্জী মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা সম্পর্কিত রাজ্যপালের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নও করা যায়না।” যাই হোক, অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যো- পাধ্যায় অধিবেশন মূলত্বী করার পর ৩০শে নভেম্বর রাজ্যপাল সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন।

১৯৬৮ সালের ২১শে জানুয়ারী পুনরায় বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হল। স্থির হল বিধানসভার অধি- বেশন বসবে ১৯৬৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। এই সময়ের বাজেট পেশ হয়। সেই কারণেই ডাকা হল। বিধানসভা এবং বিধান- পরিষদের যৌথ বৈঠক শেষ হবার পর যখন আলাহাভাবে বিধানসভার অধিবেশন বসল তখন অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার প্রবেশ করে নিজের আসন গ্রহণ করে পুনরায় অনিদিষ্টকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মূলত্বী করে দেন। তিনি গত ২১শে নভেম্বরে প্রদত্ত তাঁর কলিং-এর উল্লেখ করে বলেন যে, এখন কোন অনিবার্হ কারণ ঘটেনি বার জন্ত তিনি তাঁর কলিং পরিবর্তন করবেন। এই অধিবেশনে বাজেট পেশ হবার কথা ছিল এবং বেশ কয়েকটি বিল উত্থা- পিত হবে বলে স্থির ছিল। কিন্তু বিধানসভার অধ্যক্ষের এই কলিংয়ের ফলে তা সম্ভবপর হয়ে উঠলনা। রাজ্যে একটা অবস্থিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। সেই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেতে রাজ্যপাল বিধানসভা তেজে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার সুপারিশ করলেন। সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে

কেন? বিশেষ করে আমরা যারা আদর্শের কিছুকিছু নিয়েই এসে- ছিলাম তখন লেখক হিসেবে আমা- রের অপসৃত্যর জন্তে দায়ী কে? তাদের অন্ততম হয়ে আমি আজও যখন সাহিত্যের সংসার থেকে, প্রতি- নিয়ত আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হলেও, নড়িনি, তখন তাঁরাই বা এই পরাজয় যেনে নিলেন কেন? এই ধাঁধাটা আমাকে নিরন্তর রক্তাক্ত করে। করে এই কারণেই যে, আমরা যখন এক সঙ্গেই শুরু করেছিলাম তখন এক সঙ্গেই এই গতি অব্যাহত থাকার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যের ধারাবাহিকতার খাতিরে এর দরকার ছিল। বাটের দশকের প্রতিক্রিয়ার বাচ্চারা আমা- রের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সাহিত্য- ইতিহাসকে নতুন করে উদ্ভূত হয়েছে।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হল ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। সেইদিনই ডঃ বোষ মন্ত্রিসভার পদ- ত্যাগপত্র পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিধানসভা তেজে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে।

১৯৬৯ সালের ১ই ফেব্রুয়ারী মধ্যবর্তী নির্বাচন হল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হল। বিধানসভা গঠিত হল সেদিনই। ছদ্ম মনোনীত সদস্য সহসভার সদস্যসংখ্যা এসময় ছিল ২৮২ জন। কংগ্রেস হল জয়ী হয়েছিল মাত্র ৫০টি আসনে। যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়েছিল ২১০টি আসনে। যুক্তফ্রন্টে ছিল সি পি এম, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস এস পি এবং আরও কয়েকটি দল। যুক্তফ্রন্টই সরকার গঠন করল। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীবিজয়- কুমার মুখার্জী ২৫শে ফেব্রুয়ারী শপথ নিলেন রাজ্যপালের কাছ থেকে। নবগঠিত বিধানসভার অধিবেশন বসল ১৯৬৯ সালের ৬ই মার্চ। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার। আইন- সভার উদ্বল কক্ষের যৌথ অধিবেশন বসল ৬ই মার্চ। সেদিন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে নিকট ভাষণ দেন। রাজ্যপালের জন্ত ভাষণ প্রদত্ত করে দেন মন্ত্রিসভা। সেই লিখিত ভাষণ রাজ্যপাল পাঠ করেন। এটাই চলে আসছে। কিন্তু এবার ঘটল ব্যতিক্রম। রাজ্যপাল ভাষণের দুটি অঙ্কচ্ছেদ পাঠ করলেন না। ঐ দুই অঙ্কচ্ছেদে ১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জী মন্ত্রিসভাকে খারিজ করার বিষয়ে সমালোচনামূলক বক্তব্য ছিল। এই ঘটনা নিয়ে তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। যুক্ত- ফ্রন্টের সদস্যরা বিধানসভার ভেতরে এবং বাইরে সমালোচনার মুখর হয়ে উঠলেন রাজ্যপালের এই জাতীয় আচরণের জন্ত।

১৯৬৯ সালের ২১শে মার্চ পশ্চিম- বঙ্গ বিধান পরিষদ বাতিল করার জন্য বিধানসভার একটি বিল উত্থা- পিত হল। পাশও হয়ে গেল। তদনুসারে সংসদেও ১৯৬৯ সালের পূর্ণিমা আগষ্ট অঙ্কচ্ছেদ একটি বিল পাশ হয়ে গেল। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিধান- পরিষদ বাতিল হয়ে গেল।

যদিও বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্রচণ্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই রাজ্যে দ্বিতীয়বারের জন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই সরকার ১৩ মাসের বেশি ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি। বার প্রধান কারণ হল শরিক হলগুলির মধ্যে তীব্র মতানৈক্য, আত্মসমীপ বিরোধ

এবং ক্ষমতার লড়াই। আর সেই সঙ্গে ছিল এ তি ক্রিয়া শীলদের সরকার বিরোধী স্বভাব।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জী তাঁর নিজের সরকারকে “বর্বর” এবং “অসত্য” আখ্যায়িত করেছিলেন এবং নিজেই নিজের নেতৃত্বাধীন সর- কারের বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ শুরু করে- ছিলেন। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে রাজ্যপালের পরিবর্তন হয়েছে। শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে পদে পদে। এসেছেন শ্রীএম এম দাওয়ান।

অবশেষে ১৯৭০ সালেই ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জী পদত্যাগ করলেন। রাজ্যপাল শ্রীদাওয়ান আপ্রাণ চেষ্টা করলেন যাতে রাজ্যে একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করা যায়। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার তিনি রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার সুপারিশ কর- লেন। সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে ১৯৭০ সালের ১৯শে মার্চ রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হল পশ্চিম- বঙ্গে। বিধানসভা কিন্তু তালু হলনা। সাময়িকভাবে দাপণেও করে রেখে ১৯৭০ সালের ৩০শে জুলাই বিধানসভা বাতিল করা হল।

১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ রাজ্যে পুনরায় মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ২রা এপ্রিল নতুন বিধানসভা গঠিত হল এবং সেই দিনই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এবার যে বিধানসভা গঠিত হল তাতে মনোনীত সদস্য এলেন এক- জন। ফলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ২৮১ জন। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার পর কংগ্রেস (আর), বাংলা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, এস এস পি সি পি এস পি এবং গোরখা লীগ প্রমুখ ছয়টি দল একত্রে একটি ডেমো- ক্রেটিক কোয়ালিশন গঠন করল। শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে। শ্রীবিজয়কুমার মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ১৯৬৯ সালের ২রা এপ্রিল। এই সরকারকে সমর্থন জানাল সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সংগঠন কংগ্রেস দল।

সমর্থক হলগুলির নির্বাচিত বিধায়কগণ সহ ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে মোট বিধানসভা সদস্যের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪১ জন। এই নির্বাচনে সি পি এম দল জয়ী হয় ১১০টি আসনে। বামফ্রন্টের প্রধান শরিক হল হিসাবে বামফ্রন্টজুড় অস্ত্র দল- গুলিকে নিয়ে সি পি এম বিরোধী আসনে বসল। নবগঠিত বিধান- সভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭১ সালের ডেসরা যে। অধ্যক্ষ শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠার

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা

৮য় পৃষ্ঠার পর

নির্বাচিত হলেন শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন শ্রীশ্রীযুক্তাঙ্কিত মুখার্জী।

কমতার আরোহণ করার তিন মাসের মধ্যেই এই সরকারের অকালমৃত্যু হয়। বিধানসভার সরকারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী ১৯৬১ সালের ২০শে জুন বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিলেন। বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করার কথা ছিল ২৮শে জুন। আহত সেই অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেলেই মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভা বাতিল করার সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল। সেইদিনই বিধানসভা ভেঙ্গে দিলেন রাষ্ট্রপতি। ২৮শে জুন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। ২৯শে জুন রাজ্য পুনরায় প্রবর্তিত হল রাষ্ট্রপতির শাসন।

১৯৬২ সালের ১১ই মার্চে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেস এবং সি পি আই দলের সমন্বয়ে গঠিত প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স দখল করল ২১৭টি আসন। একজন মনোনীত সদস্য সহ বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা তখন ২৮১ জন। কংগ্রেস দলই সরকার গড়ল। মুখ্যমন্ত্রী হলেন শ্রীসিদ্ধার্থকর রায়। সে সময় শ্রীরাই বিধানসভার সদস্য ছিলেন না। পরে ১৯৬২ সালের ৬ই জুন মালদা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার পর রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হয় ১৯৬২ সালের ২০শে মার্চ। সেদিনই নব-নির্বাচিত বিধানসভা গঠিত হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীরাইও শপথ গ্রহণ করেন ২০শে মার্চ তারিখে। নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ২৪শে মার্চ। অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার এবং শ্রীহরিদাস মিত্র। সি পি এম, আর এম পি, এম ইউ সি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির সমন্বয়ে গঠিত বারফ্রন্ট এই বিধানসভায় মাত্র ১১টি আসন পায়। সি পি এম দল একাই পায় ১৪টি আসন। এম ইউ সি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি পায় একটি করে আসন এবং আর এম পি পায় তিনটি আসন। সি পি এম, এম ইউ সি এবং ওয়ার্কার্স পার্টির নির্বাচিত সদস্যরা সভার যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ

তাদের মতে এই সভার নির্বাচিত অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচন জিতেছেন জুনিটি এবং কারচুপির মাধ্যমে। যদিও এই সব সদস্যের আসনকে শূন্য বলে ঘোষণা করা হয়নি। কেননা এই মর্মে বিধানসভার কোন ঘোষণা আনা হয়নি। আর এম পি দলের নির্বাচিত তিনজন বিধানসভা সদস্য অবশ্য বিধানসভার অংশ নিয়েছেন এবং সরকারের কাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

১৯৬২ সালের ১৪-১৫ আগস্টের মধ্যরাত্রে বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশন বসে বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি বা রক্ত জয়ন্তী উপলক্ষে।

৪২তম সংবিধান সংশোধন অধ্যুসায়ে এই রাজ্যের সমস্ত বিধানসভার আয়ুষ্কাল এক বছর বাড়িয়ে পাঁচ বছরের বদলে ছয় বছর করা হল। কিন্তু এই বাড়তি মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল সমস্ত বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির এক ঘোষণা বলে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বিরাট রাজনৈতিক শট-পরিবর্তন হয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছে। তারপর ১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের নয়টি রাজ্য বিধানসভা বাতিল করে দেন।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জুন মাসে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হয়। এবার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৫ জনে। সি পি এম, কংগ্রেস, বারফ্রন্ট, আর এম পি, আর, সি পি আই, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস এবং কংগ্রেস রক (মা:) দলের সমন্বয়ে গঠিত বারফ্রন্ট ২২৯ বিধানসভা আসনে জয়ী হয়। সি পি এম দল এককভাবে ১৭৭টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়। ২১শে জুন রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। শ্রীজ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে সেদিনই বারফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বিধানসভাও গঠিত হয় সেদিনই। এই নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়ী হয় ২৯টি আসনে এবং কংগ্রেস দল ভেঙে মাত্র ২০টি আসনে। এই দুই দল বিরোধীরা ক্ষমিকা নিল। এই বিধানসভায় এবার নির্বাচিত হয়ে এলেন নকশাল নেতা শ্রীমন্তোষ রাণা। একদিন তার দল নির্বাচন বরকটের ডাক দিয়েছিল।

নবগঠিত অষ্টম বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৬৭ সালের ২৪শে

জুন। অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন সি পি এম দলের জনাব নৈরব্দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কংগ্রেস রকের জনাব কলি মুন্সি শাহসু। জনাব হাবিবুল্লাহ অধ্যক্ষ হবার পর থেকে বিধানসভার অধিকাংশ কাজই বাংলা ভাষায় হয়ে আসছে অষ্টম বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই।

১৯৬৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট কার্যকরী হবার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার প্রিন্সাইডিং অফিসারদের তালিকা।

প্রেসিডেন্ট

- (১) নবাব স্যার শাহন-উল-হুদা (১৯২১-২২)
- (২) মিঃ এইচ ই এ কটন (১৯২২-২৪)
- (৩) কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় (১৯২৪-২৬)
- (৪) রাজা রমণনাথ রায়চৌধুরী (১৯২৭-৩৬)

ডেপুটি প্রেসিডেন্ট

- (১) বাবু হুসেননাথ রায় (১৯২১-২৩)
- (২) মেজর হালিম সুরাবর্দী (১৯২৪)
- (৩) ডঃ এ সুরাবর্দী (১৯২৪-২৬)
- (৪) জনাব খান বাহাদুর মৌলবী ইমাজুদ্দিন আহমদ (১৯২৭-২৯)
- (৫) জনাব রাজাউর রহমান খান (১৯২৯-৩৬)

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট প্রবর্তিত হবার পর বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদের নাম :—

অধ্যক্ষ

- (১) শ্রী আজিজুল হক (৭ এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৪২)
- (২) জনাব নৈরব্দ নওসের আলি (১ মার্চ ১৯৪৩ থেকে ১৪ মে ১৯৪৬)
- (৩) জনাব হুসন আমিন (১৪ মে ১৯৪৬ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭)
- (৪) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জালাল (২১ নভেম্বর ১৯৪৭ থেকে ১৯ জুন ১৯৫২)

উপাধ্যক্ষ

- (১) জনাব আশরফ আলি খান চৌধুরী (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১)
- (২) জনাব নৈরব্দ জালালুদ্দিন হাফেমি (৮ ফেব্রু ১৯৪২ থেকে ১৭ নভেম্বর ১৯৪৫)
- (৩) জনাব তকাজল আলি (১৪ মে ১৯৪৬ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭)
- (৪) শ্রীমন্তোষ মল্লিক (২১ নভেম্বর ১৯৪৭ থেকে ১৯ জুন ১৯৫২)

গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫) অনুসারে গঠিত বিধান পরিষদের প্রিন্সাইডিং অফিসারদের তালিকা :—

প্রেসিডেন্ট

- (১) শ্রীমন্তোষ মল্লিক (১ এপ্রিল

- ১৯৩৭ থেকে ২৭ অক্টোবর ১৯৪২)
- (২) স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় (১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল)

ডেপুটি প্রেসিডেন্ট

- (১) জনাব হামিদুল হক চৌধুরী (১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল)
- (২) জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী (১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল)

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে গঠিত বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানদের তালিকা

চেয়ারম্যান

- (১) ডঃ হুমীতকুমার চ্যাটার্জী (১৯ জুন ১৯৫২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫)
- (২) ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় (২ এপ্রিল ১৯৬৫ থেকে ১ আগস্ট ১৯৬৯)

ডেপুটি চেয়ারম্যান

- (১) ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় (১৯ জুন ১৯৫২ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৬৫)
- (২) শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ (৫ মে ১৯৬৫ থেকে ১ আগস্ট ১৯৬৯)

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে গঠিত বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষদের তালিকা :

অধ্যক্ষ

- (১) শ্রীশৈলকুমার মুখার্জী (২০ জুন ১৯৫২ থেকে ২০ মার্চ ১৯৫৭)
- (২) শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী (৪ জুন ১৯৫৭ থেকে ১৫ মে ১৯৫৯)
- (৩) শ্রীবিজয়চন্দ্র কর (২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ থেকে ১১ মার্চ ১৯৬২)
- (৪) শ্রীকেশবচন্দ্র বসু (১২ মার্চ ১৯৬২ থেকে ৭ মার্চ ১৯৬৭)
- (৫) শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী (৮ মার্চ ১৯৬৭ থেকে ২ মে ১৯৭১)
- (৬) শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার (৩ মে ১৯৭১ থেকে ২৩ জুন ১৯৭৭)
- (৭) জনাব নৈরব্দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ (২৪ জুন ১৯৭৭ তারিখে নির্বাচিত)

উপাধ্যক্ষ

- (১) শ্রীআভতোষ মল্লিক (২০ জুন ১৯৫২ থেকে ৪ মে ১৯৬৬)
- (২) শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন (২১ আগস্ট ১৯৬৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭)
- (৩) শ্রীহরিদাস মিত্র (৮ মার্চ ১৯৬৭ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮)
- (৪) শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার (৬ মার্চ ১৯৬৯ থেকে ৩০ জুলাই ১৯৭০)
- (৫) শ্রীশ্রীযুক্তাঙ্কিত মুখার্জী (৩ মে ১৯৭১ থেকে ২৫ জুন ১৯৭১)
- (৬) শ্রীহরিদাস মিত্র (২৪ মার্চ ১৯৭২ থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭৭)
- (৭) জনাব কলি মুন্সি শাহসু (২৭ জুন ১৯৭৭ তারিখে নির্বাচিত)

এই নিবন্ধ রচনার যেসব পুস্তক ও বুলেটিনের সহায়তা নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :—

- (১) বঙ্গীয়-বিধান পরিষদের কার্য বিবরণী, ১৮৬২-১৯৩৪ এবং ১৯৩৫-১৯৪৬।

- (২) বঙ্গীয় বিধান সভার কার্যবিবরণী ১৯৩৫-১৯৪৬।

- (৩) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্য-বিবরণী, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭।

- (৪) পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের কার্য বিবরণী, ১৯৫২-১৯৬৯।

- (৫) লোকসভা সচিবালয় কর্তৃক ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত "প্রেসিডেন্টস কল ইন দ স্টেটস" পুস্তিকা।

- (৬) ভারতীয় সংবিধান।

- (৭) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১, ১৮৯২ এবং ১৯০৯।

- (৮) গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫।

- (৯) ডিসিশন অব স্পীকার্স অব দ সেলিমেন্টেড এসেমবলী, প্রথম খণ্ড।

- (১০) ইন্ডিয়ান অ্যাক্সিয়াল রেজি-টার, ১৯৪১, ১৯৪৮।

- (১১) বিধানসভা এবং বিধান-পরিষদের সদস্যতালিকা, ১৯৪৬ থেকে ১৯৭৭।

চন্দননগর কলেজ

৩য় পৃষ্ঠার পর

কেয় ছাত্র সংসদ বরাবর এই পরি-কল্পনার বিরোধিতা করেছে। বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের সভাপতিত্বে কলেজের পরিচালন সমিতি দর্প-সম্মতভাবে পরিকল্পনার বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, সেই সভায় চন্দননগর কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান (সি পি এম) উপস্থিত ছিলেন।

তাহাড়া চন্দননগর থেকে তিন কিলোমিটার দূর চুঁড়িয়ার ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি রবীন্দ্র ভবনের উদ্বোধন হল গত ২৫শে বৈশাখ। এতে কি চন্দননগরবাসীর রবীন্দ্র ভবনের প্রয়োজন মিটাতে পারে না? পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা কি এতই ভাল যে, তিন কিলোমিটার দূরে আর একটি রবীন্দ্র ভবন নির্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে?

উজান

নিজে পড়ুন

ও

অপরকে পড়ান

চলচ্চিত্র নাটক

‘অভি’ অসার্থক ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের জন্ম ছবি করা রীতি-মত একটি শক্ত কাজ। ঝাঁকি দিয়ে বাজিমাং করা দেখানে যায় না। সরলতা ও সজীবতা না থাকলে কোম শিশুচিহ্নই ছোটদের আকর্ষণ করতে পারে না—বড়দের তো নয়ই। পার্থক্য শিশু বা কিশোর চিত্র বড়দেরও মন জয় করে। অত্যন্ত পরিচালকের বিষয় হল যে, আজ পর্যন্ত তেমন ছবির দাবি পাওয়া গেল না। স্বল্পিক ঘটকের বাড়ি থেকে পালিয়ে বা লতাজিৎ রায়ের ‘ও, পা, বা, বা’ ও ‘সোনার কেলা’ও তেমন সার্থকতার দাবী করতে পারে না। ক্যামেরার সঙ্গে রিফ্রালিটি মিশিয়ে খিচুড়ি করে দিলেই তা আর আপন চরিত্র বজায় রাখতে পারে না। তরুণ মজুমদারের ‘শ্রীমান পুথীরাজ’—এ মজা ছিল অনেক, তবু তা স্বর্ষ্য-হৃত। ছোটদের’ সংগে সহজভাবে মিশে ছোটদের মন নিয়ে চোখ দিয়ে ছোটদের জন্ম ছবি করতে হয়।

অপূর্ব মিত্র পরিচালিত ‘অভি’ ছবিটিও শোচনীয় ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। মাঃ জয় মুখার্জী অভিনীত অভি চরিত্রটিকে মোটেই ‘দস্যু দামাল’ বলে মনে হয় না। তাকে বরং মনে হয়েছে স্বপ্নালু আদর্শনিষ্ঠ, কল্পনাপ্রবণ এক ভাল ছেলে বলে। তার দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, চাল চলন কখনই ডানপিটে স্বভাবকে সূচিয়ে তোলে না। অথচ তাকে দিয়েই বেশ কিছু চুইসি চরিত্র-পনা ও কিছু চুঃসাহসিক কাজও দেখানো হয়েছে। ফলতঃ গোটা ব্যাপারটাই নিম্জ্ঞাণ লাগে। দুর্বল কাহিনীর দুর্বলতর চিত্রনাট্যের দরুণ ছবিটিতে কোথাও সংহতির ছাপ পড়েনি। কিছু কিছু মজাদার দৃশ্য-

রচনার প্রয়াস আছে, কিন্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তার বাস্তবিক ফলশ্রুতি হয়নি। চুইসিভাতির ছোটদের আদরে এমন আচম্ভক্য রাকস রাজ-পুঞ্জের রূপকথার আমদানি হল কোন্ লজিকে? তারপর নদীর ধারে এক পোড়োবাড়িতে যে সব শয়তানি কাণ্ডকারখানা দেখানো হয়েছে, তা যেমন অবিখ্যাত তেমন শিশুমনের পক্ষে রুচিহীনকর। অভির মৃত্যুতে শোকসভা যখন চলছে, তখনই অভি আবির্ভাব রীতিমত আরোপিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছক বাঁধা মিলনাত্মক ছবির সরলীকরণ মনে কোন আবেদন দগ্ধার করে না। তবে কাঁচা আর পাড়ার দৃষ্ট, দিলীপ রায়ের কাছে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁচা-আমচুরির অভিযোগ পেশ ও শেষে ছোট মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁচা আমগুলি আবার ফেরৎ দেওয়া মনকে কিছুটা অভিভূত করে। ছবিটি বলতে চেষ্টা করেছে শিশু-চিত্তের স্বাভাবিক ঝোঁক ও প্রবণতাকে অবধা দূর না করে তাকে স্বয়ং বিকাশের পথে চালনার জন্ত লক্ষ্যসহ সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষা ছবির অক্ষমতার জন্ত মাঠেই মারা যায়। আনন্দ মুখার্জীর সংগীত পরিচালনা বৈশিষ্ট্যহীন। ক্যামেরার কাজ খুবই সাধারণ। ভারতী দেবী, দিলীপ রায় ও শৈলেন মুখার্জীর অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিত্রপটের নতুন সংখ্যা

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র ‘চিত্রপট’ যথিও ত্রৈমাসিক হিসেবে ঘোষিত, তবু এর প্রকাশ রীতিমত অনিয়মিত। সম্পাদকীয়তে এর কিছু মামুলি কৈফিয়তও দেওয়া হয়েছে। সূচিস্থিত সম্পাদকীয়

অপরাধে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের দাবিদার ও অসাফল্যের বিশ্লেষণ ও বাংলা ছবির ক্রমবর্ধমান দুর্দশার কারণ নির্ণয় মননশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পত্রিকাটি কোন বিশেষ লংঘ্যের চিহ্নিত নয়, তবু দেখি সূচীপত্রে বিভিন্ন ধারার ও রসের রচনা সমাবেশ। আর্ট পেপারে আকর্ষণীয় ছবিও রয়েছে বেশ কিছু। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ অনেক পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যক হয়েছিল।

পত্রিকাটির প্রথম রচনা প্রবন্ধের ‘আমার বেঁচে সরে না মন’ অপ্রাসংগিক মনে হয়। যে হিরণ সাত্তাল চলচ্চিত্র বিষয়ে কখনই খুব অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেন নি, তবু দীর্ঘকাল ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির সহ-সভাপতির পদে ছিলেন, যার এই সুবাদেই তাঁর সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র সূচিচারণা চলচ্চিত্র বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাটিতে কতখানি সূক্ষ্মদৃষ্টি হল—সেটা একটা প্রশ্ন। সেনসরশিপ সম্পর্কিত রচনাটিতে শরীক বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্যমিষ্ঠতার পরিচয় রেখেছেন। সমর সেনের ‘ছবি দেখা’ লেখাটি ভাল লাগে সরলতার জন্ত। স্বল্পিক সম্পর্কে তাঁর আক্ষেপ ও সত্যজিৎ সম্পর্কে বিক্ষেপ অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। লোকসভার নির্বাচক ও লবাক বিদেশী ছবি অনেক দেখেছেন তিনি, কিন্তু সেকালের এদেশী ছবি কি একটাও দেখেন নি? কোন উল্লেখ নেই লেখাটিতে। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা চলচ্চিত্র চিন্তা’ ও সূর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা চলচ্চিত্রে রাজনীতি’ সুলিখিত রচনা। কল্পকুমার মজুমদারের একটি পুরোন লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর সরল মতামতটুকু আজও বাতিল বলে মনে হয় না। ‘সব ভাল যার শেষ ভাল’ রচনাটিতে হীরেন বসু সে যুগের বাংলা ছবি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগা নিয়ে বেশ প্রাঞ্জলিক ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দের অপছন্দের ব্যাপারটা যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়, তখন তার একটা গুরুত্ব এসেই পড়ে। তাঁর কিছু মতামত অবশ্যই অগ্রাহ্য করার নয়, যেমন, ‘উৎসবের পথে’, ‘শহর থেকে দূরে’, ‘ভাগ্যচক্র’, ‘সোনার সোনার’, ‘জীবন যরণ’ ইত্যাদি ছবির প্রসঙ্গে। প্রমথেশ বড়ুয়ার কিছু ছবি সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মতামত অবশ্যই বিতর্কের সূচনা করবে। বড়ুয়ার ছবি অবশ্যই ক্রটিমুক্ত নয়—তার স্বাধাথ মূল্যায়ন বাহ্যমীর। অতীত ঐতিহ্যকে অস্বী-

কার না করে তার উপযুক্ত বিশ্লেষণ মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আলো দেখানোটাই মঙ্গল। ‘মজা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিসির লেনগুপ্ত, সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ও চিত্রর গুহর রচনায় চিত্রাঙ্গীতের ছাপ আছে। জী রেনোয়ারর অস্ব-বাদ ‘অমর সঙ্গে চ্যাপলিন’ ও বুদ্ধদেব বসুর পুরোন লেখার পুনর্মুদ্রণ ‘চালদা চ্যাপলিন’ মূল্যবান সংযোজন। দর্শক লম্বীকা—গ্রামে ও শহরে চিত্রা-কর্ষক। মহাশেতা দেবীর চিত্রনাট্য রচনা কৌতুহল লঙ্ঘার করে। পত্রিকাটির সম্পাদক মৃণাল শেখর রায়। দাম—পাঁচ টাকা।

একটি পত্রিকার জন্ম

গত ১০ই জুলাই চ্যাটার্জী ইন্টার-ন্যাশনাল সেন্টারের দর্বাচন উদযাপন

কল্পনার পারমিট

১ম পৃষ্ঠার পর
এক সাংবাদিক সম্মেলনে লোকসভা সভাপতি জ্যোতির্ময় বসু এ কথাগুলো বলেন।

লোকসভার তর্কবিতর্কের সময় জীবরক্ত গণি খান চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আগলিৎ করে টাকা আর করার মিথ্যা অভিযোগ আনলে লক্ষ্যসহ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্তৃক একটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ লোকসভার ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল। বরকতের এই অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে জর্জ কার্ণাগোজ (লোকদল) ও চন্দ্রশেখর (জনতা) দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আনতে চাইলে কংগ্রেসী লক্ষ্যসহ গলা কাটিয়ে তাঁদেরকে বাধা দেন। যোগাযোগ মন্ত্রী টিফেনও বরকতের পক্ষে লওয়াল করতে থাকেন।

ঐ ১৩৩টি সংস্থার প্রয়োজনীয় ডীলারশিপ লাইসেন্স, ক্যারার লাই-সেন্স ও রোড পারমিট আছে কিনা তা রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখছেন। জ্যোতির্ময়বাবু কোলকাতায় এসে রাজ্যের খাত ও সরবরাহমন্ত্রী সূধীন-কুমারের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেন।

জীবন্ত লোকসভার কোল ইন্ডিয়ান রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার ডি. মালিকের একটা চিঠি দেখান। ‘অতি গোপনীয়’ শিরোনামের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতার সেলস ম্যানেজারের অফিস ১০ ক্যামাক স্ট্রিট থেকে এই চিঠি লেখা হয়েছে মালদার জেলা শাসক শ্রীপ্রসন্নন, আই.এ. এসকে। চিঠির রেকার্ডেশন মথর আছে তারিখ

এক মনোজ্ঞ অহুঠানে ‘শির ও সংস্কৃতি’ নামে এক পাক্ষিক পত্রিকার শুভ জন্মসম্মেলন হুচিত হল। অহুঠানে সভাপতিত্ব করেন শিরপতি-বিনয় চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসনে ছিলেন যথাক্রমে মহাজেন্দ্র তঞ্চ ও শৈলেন মোহান্ত। সাংবাদিক প্রবোধবদ্র অধিকারী সম্বোধিত ভাষণ দেন। শির ও সংস্কৃতি বিষয়ে নির্ভীক নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পত্রিকাটি তার জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবে—সমবেত সূধীজন সকলেই তা আন্তরিকভাবে কামনা করেন। পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদক হচ্ছেন যথাক্রমে সত্যোষ নন্দী ও সুনীল সরকার। পত্রিকাটির প্রথম লংঘ্য উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

৭ এপ্রিল ’৮০।

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার (সেলস) জীবন্তর কাছনগো এই চক্রের সঙ্গে আছেন, ইনিও অবৈধভাবে হার্ড কোক ম্যাকক্যাকচারার্স অসোসিয়েশনকে চরিত্র হাজার টন কল্পনার পারমিট দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে লীকাছনগোর পিতা নিত্যানন্দ কাছনগো হাজি মজানের পাশপোর্টে লই করেছিলেন, বা, মিসে লোক-সভাতেও আলোড়ন উঠেছিল।

লোকসভার লীজেন্ডিং ‘বাসব মজীর বিরুদ্ধে কল্পনার পারমিট প্রদানে দুর্নীতির তদন্ত করার জন্ত একটা সংসদীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। জর্জ কার্ণাগোজ, জ্যোতির্ময়-বাবুও সর্বদলীয় এম পিদের নিয়ে এই কেলেঙ্কারি তদন্ত করার জন্ত অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানান। জীবন্ত বলে, মন্ত্রী সাহেব নির্বাচনী কাজের বকশিস হিসেবে নির্বাচনের পরেই এই ৩৬,৩৬৮ টন কল্পনা-ওদেরকে অবৈধভাবে পাইয়ে দিয়েছেন। এটা লজ্জার বিষয়। প্রধান-মন্ত্রী অহরহ প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলে থাকেন। শ্রীমতী গান্ধীর কথা অহুয্যী এই মন্ত্রীর ঐ চেয়ারে বসার আর কোন অধিকার নেই।

জীবন্ত সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামী দিনে লোকসভায় এই বিষয়ে আরো আলোড়ন উঠবে। কারণ পকেটে ওদের আরো কিছু কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত তথ্যের তাল আছে। জেনেভনে মনে হচ্ছে, বরকত গণিখান চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের বাসরুপ্ত সরকারকে বন্দোপমাগরে-নিকপ করতে গিয়ে নিজেই আজ গোবরের গর্তে পড়েছেন।

অসিদ্ধ রাস্তা পুস্তক পর্ব

পর্ব প্রকাশন

১। সংখ্যাতত্ত্ব / শ্রীরাজকুমার সেন / ২১.০০

২। কোষতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্ব / শ্রীঅমিরকুমার চট্টোপাধ্যায় / ১০.০০

৩এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ফোরার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩ থেকে সূত্রিত এবং দল্ল কাঞ্চালয় ৩১, হট সেল, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

লোকসভার অধিবেশনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল



লোকসভার অধিবেশন শেষ হলেই আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদ-বদল হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে খবর পাওয়া গেছে। এই রদবদলে কিছু নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে এবং কয়েকজনের দপ্তর পরিবর্তন করা হবে বলে জানা গেছে।

কয়লা যায় না ধুলে



চোরাই তেলের কারবারে নয়! তারকা পুলিশী মদতে বন্ডে দিল্লী রোডে রমরমা ব্যবসা

পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে চোরাই তেলের কারবারে নতুন তারকার আবির্ভাব হয়েছে। নাম লাল-মোহন। ডিভেল, পেট্রোল, কেরোসিন ও জুট ব্যাচিং আরেলে ভেজাল

দিয়ে ও চোরাই চালান করে লাল-মোহন এখন লাখ লাখ টাকার মালিক। রাজ্যের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা ও পুলিশের অস্ত্রাভ করেকটি দপ্তরের বেশ বড় বড়

কতিপয় অফিসার লালমোহনের এই কারবারের সংঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ। রাজ্য কয়েকমাসের চোরাই কারবারে লালমোহন তেল ট্যাঙ্কার ও প্রাইভেট গাড়ীর মালিক। এছাড়া দিল্লী বোম্বে রোডের ওপর এইসব কারবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত উমা-চরণ সিং, ছদ্মকদ্দিন, রাজপথ গুপ্তা, নিউনাথ গুপ্তা, রোজকিশোর, দৌলতরাম আগরওয়াল, নরসিং গুপ্তা, রাজেন্দ্র চৌরাসিয়া, ভগবান সাউ নাভির প্রমুখ প্রত্যেকেই এখন লাখ লাখ টাকার মালিক, প্রত্যেকেই নিজেদের ট্যাঙ্কার দিয়ে চোরাই চালান জোরদার করে তুলেছে।

গত ১৮ই জুন দপ্তরের এই প্রতিবেদক দেখেছেন দিল্লী বোম্বে রোডের শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

রাজবংশীদের যারা এতকাল শোষণ করেছে তারাই এখন আন্দোলনের নেতা

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে একটি বাগান ডেঙুরাঝাড়। স্থানীয় ছেলেদের মদ ও মেরেয়াছব পাবার আদর্শ স্থান। আধা শহর আধা চা বাগান। সেই বাগানে এক রাজে (২রা জুলাই) হঠাৎ কিছু রাজবংশী ছুটো বাঙালী বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তাদের একটা বিরাট হল বন্দুক, টাঙ্গি ও তাদের মাহুয শিকারের প্রধান হাতিয়ার তীর ধষুক নিয়ে শহরের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ তৎপর পুলিশের তাড়া খেয়ে আবার ফিরে যায়। জনসাধারণ ভীত ও লজ্জা হলে পুলিশ সারা রাত ধরে পাহারা দিতে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে তারা এমন সব অস্ত্র ব্যবহার করে যার নাম পর্যন্ত তারা জানেনা। অথচ অধিকাংশ সাঁওতাল বা রাজবংশীদের পছন্দসই হাতিয়ার তীর ধষুক।

এই গুণগোলে সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত চা বাগানের বাবুয়া। জলপাইগুড়ির অধিকাংশ বাগানে বাঙালীবাবুদের সংখ্যা খুব কম। সবচেয়ে বড় বড় বাগানগুলোর বাবুর সংখ্যা পঞ্চাশ বা ষাটজন, যেখানে কুলি বা চা শ্রমিকদের সংখ্যা তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার। বর্তমানে সেই সব হস্ত-তাগ্য বা আপাত-দৃষ্টিতে অসহায় বাবুদের অবস্থা অনেকটা অ্যাক্টি-রিপারের সময়ের লগুনের মত। সব মহিলার মনে ভয় ধর্মিতা হবার, সব পুরুষদের ভয় সর্বস্বান্ত হবার। বানার-হাট বাগানের খুনের ফলে সারা রাত ধরে পুলিশের গাড়ির টহল ও তাদের মনে দাগ কাটতে পারছেন না। চামুটি ভূটানের এক লীমাস্ত শহর। সেখানেই এখন পুলিশের ঘাঁটি।

উত্তরখণ্ড আন্দোলনের পথ প্রদর্শক জলপাইগুড়িরই এক সমর-কার রাজারা এবং কিছু অস্ত্রাভ লোক। তরু রায়কত তাদের এক-জন নেতা। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রায়কতরা নিরীহ, সরল এই শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

মিশনারী ফাদারের বাড়ি অস্ত্রাগার আবিষ্কার

গত ৩রা জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার হোলি চাইল্ড চার্চ স্কুলের মিঠাখালের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ একটি ছোট-খাট অস্ত্রাগার আবিষ্কার করে। আঞ্চলিক জনসাধারণ কিছুদিন যাবত একটা রহস্যাবৃত ঘটনা লক্ষ্য করছে যে, সাধারণ কর্মী হিসাবে নিয়োজিত হবার অজুহাতে ঐ চার্চ স্কুলের দার্কট কোয়ার্টারে অবস্থিত সমস্ত আদিবাসী ও উপজাতিদের সমাবেশ হয়েছে।

গত ২রা জুলাই তারিখে প্রায় ৪০০০ সাঁওতাল, মোদেশিয়া ও অন্যান্য আদিবাসী উপজাতি অত্যা-ধুনিক আগেরাঙ্গে সজ্জিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার দশ কিলো-মিটার দূরে মাটিভাঙা গ্রাম থেকে বাঙালী বিরোধী হঠকারী দাঙ্গা শুরু করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং জলপাইগুড়ি জেলার লাড়ে তিন মাইল অত্যন্ত অসহন কলেজ

বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন

প্রবীর দত্তের স্মৃতিসভায় অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই জিয়েতনাম দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্-চ কর্মীদের এক সমাবেশে পুলিশ ও চার্জ করার বিশ বছরের তরুণ প্রবীর দত্ত শহীদ হন। এ বছরের ২০ জুলাই সকালে প্রবীর দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ইকিপ কলকাতার স্মৃতি সড়ক হলো এক সভার প্রধ্যাত আইনজীবী অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় তার তীক্ষ্ণ বক্তৃতায়

বর্তমানে আদালতের অবস্থা শুধু নয় বিচার ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমির বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, শ্রেণী-বিত্তক শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিচার ব্যবস্থার পক্ষপাতভূত হতে বাধ্য, তাই ১০০-১৬ সালের কথ্যাত খুন্সী, অত্যাচারী সব পুলিশ অফি-সাররা আদালতে নির্দোষী হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়ে। অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বাগপতের ঘটনায় পুলিশের শাস্তি

না দেওয়ার ক্ষমতা যেমন কংগ্রেস (ই) সরকারের নিন্দ্য করেন, তেমনি কণ্-ডহ নিয়োগীর মত অত্যাচারী পুলিশ অফিসারগণ বা ইসলামপুরের ঘটনায় দোষী পুলিশের শাস্তি না দেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করেন। অবশেষে অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

ইন্দিরা গণতন্ত্র

গত ২২শে জুলাই লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিইন্ডেল সিং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘ সম্পর্কে মন্তব্য করলে জর্নৈক লম্বা প্রশ্রুতিবাহে কিছু বলার জন্ত উঠে দাঁড়ান। কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেসের তরুণ সদস্যরা তাঁকে চীৎকার করে বলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ফলে লোকসভায় শুরু হয়ে যায় ভীষণ গণ্ডগোল—চীৎকার চৈতামেচি ও শাসানি।

উপলক্ষ্যটা সামান্য। অথচ তাতেই ইন্দিরা কংগ্রেসের তথাকথিত তরুণ সদস্যরা যেভাবে একজন সদস্যের প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে গেলেন সেই ঘটনা এই দেশের গণতন্ত্র বিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের অন্ততম প্রকাশ। লোকসভা বা বিধানসভায় বহু সময় দেখা গেছে সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসক দল বিরোধীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং জাঘা প্রমুখলো তুলতে বাধা দেয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এ জিনিস চলে আসছে। তাই শাসক দলের সদস্যদের বাধা দান, চীৎকার চৈতামেচির সঙ্গে বিরোধী সদস্যরাও টেকা দেবার চেষ্টা করেছেন এবং নিজের বক্তব্য সভায় উপস্থিত করেছেন। এসব আমাদের সহ্য হয়ে গিয়েছিল, আমরা মেনে নিয়েছিলাম যেহেতু আমাদের দেশে শুধু সংসদীয় গণতন্ত্র কেন, কোনরূপ গণতন্ত্রের চিহ্নহীনও ছিল না কয়েক শতাব্দী ধরে।

কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, ১৯৮০ সালের জাঘারী নির্বাচনের পর নতুন লোকসভায় শাসক দলের জতুন ও তরুণ সদস্যরা পুরনো "ঐতিহ্যকে" অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তারা এখন লোকসভায় বিরোধীদের কোন বক্তব্যই শুনে রাঙ্কি নন। ইন্দিরা কংগ্রেসের সদস্যরাই একমাত্র বলার অধিকারী, তাঁরা অভিযুক্ত মিথ্যা বা খুশি বলে যাবেন, বিরোধী দলগুলোর গায়ে কাঁদা ছোটাবেন, কিন্তু প্রতিবাদে কেউ কিছু বলতে পারবেন না, বলতে চেষ্টা করলেই তাঁকে হটগোল করে বলিয়ে দেওয়া হবে এই হল এদের নীতি।

এই "ইন্দিরা গণতন্ত্র"র উদাহরণ প্রায়ই সঙ্গর গাঙ্কী। সঙ্গরের মৃত্যুতে দিব্যদৃষ্টি সাংবাদিকেরা লক্ষ লক্ষ শব্দের মালা গেঁথে এবং সংবাদপত্রের মালিকরা টন টন কাগজ কালি খরচ করে যে প্রশ্রুতি গেয়েছেন তা থেকেও এই কথাটাই বেরিয়ে আসে যে, প্রধানমন্ত্রীর এই সম্ভাষণটি ছিলেন গৌরব গোবিন্দ, যুগ্ম, হঠকারী, অত্যন্ত অসহিষ্ণু, গণতন্ত্র বিরোধী এবং বেআইনী কার্যকলাপে অভ্যস্ত। এই ব্যক্তি সম্ভবত লোকসভায় এলে বিরোধীদের গলা চেপে ধরলেন যার শুরু এমার্জেন্সী থেকে। কিন্তু তাঁর অস্থপিত্বিত্তে কি অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না?

চোরাই তেলের রমরমা কাববার

১ম পৃষ্ঠার পর

বিতর্পিত অঞ্চল জুড়ে চোরাই গোড়া-উনে চোরাই তেলের রমরমা কাববার চলছে। হাইওয়ের পাশে লাইন দিয়ে তেলের ট্যাকার দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক এক করে তা চোরাই গোড়াউনে প্রবেশ করে হয় তেল নামিয়ে যাচ্ছে, নতুন তেলের সঙ্গে অল্প জিনিস ভেজাল করে নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে সরে পড়ছে। লালমোহন, উমাচরণ সিং, আখতার, লালাম, করিম প্রায় প্রত্যেকেই চোরাই গোড়াউনের মুখে দাঁড়িয়ে চোরাই তেলের কাববারের তথ্য তথ্যকি করছে। এদের দুটি গোড়াউন রয়েছে ডোমজুড় থানা এলাকায়। পাকুরিয়া, নিবড়ায় প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার মাল অল্প পাতার হয়ে যায়। সাঁকরাইল থানা এলাকায় আলমপুরেও লালমোহনের একটি গোড়াউন রয়েছে। এলাকার খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, পাকুরিয়া বটতলার মতিলাল, কানু সাউ, উনমানের পর্ষদ মোড়ে নন্দকিশোর সাউ, নিমাই, উনমানি ইট খোলার পাশে রাঙ্কি, মনা, কানু, মুনসিডার গৌরী সাউ, রাজপথ গুপ্তা, শিবনাথ সাউ, ছোট মুখার্জী, রামলাড্ড, বাবুলাল, হুনাথ সিং, রঞ্জিত দত্ত, হুসে, রামবলী বাবন, উত্তর উনমানিতে কুতুবুদ্দিন, কানাইলাল সাউ, লিলুয়া থানার অন্তর্গত চামরাইলে স্বপন, বজবজ পুরনো ডাকঘরের কাছে কাপুর

বিচার ব্যবস্থা

১ম পৃষ্ঠার পর

জন্য জনমত গড়ে তুলতে যজবৃত্ত সংগঠন গড়ার আহ্বান জানান। এল আই সি ডেভেলপমেন্ট অফিসারস এসোসিয়েশনের জিয়ার এন মজুমদারও দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি না দেওয়ার বায়কট সরকারের নিন্দা করেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের মেতা জিয়ারবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্যরাও প্রবীর দত্তের স্বতির প্রতি প্রজ্ঞা জানান।

সভার শুরুতে প্রবীর দত্তের স্বতি নিয়ে ও প্রবীর দত্তের সেবা কয়েকটা কবিতা পাঠ করা হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘও গণদলীত পরিবেশন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীর বিপ্লবী জিগদেশ ঘোষ। যাকে জিঅর্চনা শুধুকে ধরাধরি করে এনে বসানো হয় এবং তিনিও প্রবীর দত্তের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

পণ্ডিত ওরফে ধুরন্দর পণ্ডিত, শালবনীতে লালমোহন আখতার রাধেশ্যাম, উত্তরপাড়ার সান্টার, কলকাতার গোবিন্দ আড্ডি মোড়ে ও ডেভলার দৌলতরাম আগরওয়াল, নরসিং গুপ্তা, টালীগঞ্জ ইটখোলার পাশে তারাচাঁদ আগরওয়াল, বেলঘরিয়া, খড়কা, বিটি মোড়ে অধিকা সিং, উকিল সিং, রাজপথ গুপ্তা, শিউমাথ গুপ্তা প্রমুখ কুখ্যাত চোরাকারবারীরা বৈশ্বায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ঘটনা হলো, পুলিশ এই অপরাধ ধমনের পরিবর্তে এদেরই সহযোগিতা মিলিয়ে তেলের চোরাকারবারে মদত জুগিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঙ্কের কতিপয় অফিসার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন মহলের দাবী হলো এসব ব্যাপারে কে, সি, ব্যানার্জী, বলাই রায়, নিরঞ্জন দত্তিয়ার, আর, আর, ঘোষ, কালী ব্যানার্জী সনাতন সরকার, বীরেন দত্ত, শিবাজী ব্যানার্জী, ডোমজুড় থানা এলাকার সি, আই অমল ঘোষ প্রমুখ সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত শুরু হোক।

জানা যায়, হাওড়ার এ্যাডিশনাল এস, পি কয়েকদিন আগে দিল্লী বোম্বে মোড়ের ওপর কিছু চোরাই তেলের কাববার ধরেন। পরে দেখা যায়, হাওড়ারই জর্নৈক পুলিশ অফিসার কুখ্যাত লালমোহনের সঙ্গে রাতে বসে চৌধুরী সার্ভিস ট্রেনে প্রচুর মস্তপান হৈ হলোড় করছে। শোনা যাচ্ছে, ডোমজুড় থানা কর্তৃপক্ষ তার এলাকার চোরাই গোড়াউন চালানোর স্বযোগ দিয়ে মদ ও মহিলা ছাড়াও প্রতিটি গোড়াউন থেকে মাসিক দেড় হাজার টাকা নজরানা নিচ্ছে। সি, আই অমল ঘোষ সাহেব নাকি নিচ্ছেন ছয়শো কুড়ি টাকা। এই টাকার মধ্যে পাঁচশো মেন সি, আই, স্বয়ং, একশো টাকা তার অফিসের কর্মীদের জন্ত, কুড়ি টাকা বরাদ্দ আর্দালীর জন্ত।

এই সব এলাকার সাধারণ মানুষও জানেন সি, আই সাহেবের জন্ত চোরাই গোড়াউন থেকে পরমা তোলে তারই আর্দালী কপিল দেও সিং। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঙ্কের পুলিশ অফিসারদের জন্তও বরাদ্দ রয়েছে। এর পরিমান হলো গোড়াউন পিছু তিনশো টাকা। পুলিশের সঙ্গে তেলের কারবারীদের বখরা হোল মাসের ৭ তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে তারা তাদের দেয় টাকা দিয়ে দেবে। শর্ত হল পুলিশ

যেন কোনমতেই তাদের না ধরে। যদি পুলিশ ওপর মহলের চাপে কেস কুঁকরতে বাধ্য হয় তবে বাজেরাপ চোরাই তেলের দায়িত্ব তাদেরই মনোমত লোকের হাতে তুলে দিতে হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল ত্যাগ করার আগে আগেই বাজেরাপ তেলই চোরাই পথে যাতে বেরিয়ে যেতে পারে। শুধু রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঙ্ক, জেলা গোয়েন্দা, স্থানীয় থানা, ও পুলিশের আর্দালী, ড্রাইভাররাই যে এদের ঘুষের তালিকায় রয়েছে তাই নয়, লালমোহন, রাজপথ, রাজেন্দ্র চৌরাসিয়া প্রমুখের সঙ্গে লালবাজার সহ রাজ্য পুলিশের জির্ঘস্থানীয় কতিপয় অফিসারের সংগেও বহরম রয়েছে। এরা প্রায় রাতেই গ্রেট ইটার্ন হোটেল, ভিক্টোরিয়া নরতো কোন নিষিদ্ধ এলাকায় চোরাকারবারীদের সঙ্গে মিলিত হ'ন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের প্রায় চুড়োর উঠেছেন এমন এক ব্যক্তি এখন প্রায়ই তেলের চোরাই কারবারীদের সঙ্গে খানাপিনা

স্কটিশ চার্চ কলেজ হোটেলে অরাজকতা

আমরা স্কটিশ চার্চ কলেজের ৬টি হোটেলের প্রায় সাড়ে তিন শত আবাসিকের সংগ্রাহী সংগঠন স্কটিশ চার্চ কলেজ বোডার্স ইন্টার হোটেল কমিটির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কলেজের হোটেলগুলোতে এক চরম অব্যবস্থা ও অরাজকতা চলে আসছে। হোটেলগুলোতে ছাত্রদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই, পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ বলে কিছু নেই, বিজিৎগুলো

মতামত

দীর্ঘদিন ধরে মেরামতির অভাবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, টাকা পরমা কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষ যথেষ্টাচার চালাচ্ছে, এডমিশনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চালাচ্ছে এক জঘত স্বজন পোষণ নীতি, বহু অছাত্র বহু ক্রয় এখনও জবর দখল করে আছে ইত্যাদি নানা রকমের অরাজকতার আমরা অতিষ্ঠ।

এই অরাজকতা দূর করার জন্ত আমরা দীর্ঘদিন ধরে শাস্তিপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে আসছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ওদালীতে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা ১৪ ২৮০ তারিখ থেকে আন্দোলনে নামি। এবং শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষকে বেরাও করতে বাধ্য হই। কিন্তু প্রক্সের শিক্ষকদের হস্তক্ষেপের জন্ত এবং অধ্যক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসার প্রতিশ্রুতি দানের জন্ত আমরা আমাদের বেরাও প্রত্যা-হার করেই নি। কিন্তু অধ্যক্ষের এক-গুয়েমির জন্ত আলোচনা ফলপ্রসূ

করছেন। বলাবাহুল্য, কলকাতার বেশ কয়েকটি নামকরা (?) বাড়ীতেও জবরদস্ত (?) পুলিশ অফিসারটি মহিলা নিয়ে বেলেপাশা করছেন। বলাবাহুল্য এ সবেরই রসদধার হচ্ছে দৌলতরাম, লালমোহন প্রমুখের দল।

বায়কট সরকার যে এসব কিছু জানেন না তা নয়। সবই জানেন। তবুও তারা নিষিকার দর্শক। তবে কি তারা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কাতাই রাজ্য জোড়া চোরাই তেলের কাববার নিয়ে কোন জোরদার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? তারা কি সন্দেহ করছেন এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে তাদের নিজেদের লোকজনও জড়িত? তা বাই হোক লাধারণ মানুষের ধারণা তেল নিয়ে এই বিশাল কেলেঙ্কারীতে বায়কটের মুখে কিছু চুনকালি-ই পড়ছে। এর পুরোপুরি দায় বাম সরকার ও বায়কটের। বর্তমান পরিস্থিতি যা তা থেকে এদের কারোরই দায় এড়ানোর কোনও স্বযোগ নেই।

হয় না। ইতিমধ্যে কলেজে গ্রীষ্মের দুটি পড়ে যাওয়ার ছাত্রদের অসংগঠিত থাকার স্বযোগ নিয়ে অধ্যক্ষ একটার পর একটা জঘন্য পদক্ষেপ নিতে থাকেন। যিথো অভিযোগের ভিত্তিতে তারা নেতৃবর্গের মধ্যে পাঁচজনকে সা স পে ও করেন। হোটেলগুলোকে রি অরপানাইজ করা হবে বলে লম্বা ছাত্রকে হোটেল ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিয়ে একাধিকবার বাড়ীতে বাড়ীতে চিঠি পাঠিয়ে অবিতাবকদের অতিষ্ঠ করে তুলেন। অধৌক্তিকভাবে হোটেলের কিছ বাড়িয়ে ছাত্রদের উপর অর্থ-মৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। এছাড়াও বিভিন্ন মহল থেকে তারা প্রচার করছেন যে তারা কয়েকটি হোটেল তুলে দেবেন, প্রয়োজন হলে তারা পুলিশী ডাঙা প্রয়োগ করতে বিধা-বোধ করবেন না। এইভাবে তারা লাঞ্চে তিনশত আবাসিককে এক চরম অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন।

এইজন্তে আমরা বর্তমানে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অসহযোগ আন্দোলনে নামিল হয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় এম এল এ এবং এম পি কে অহরোধ জানাচ্ছি উপযুক্ত হস্তক্ষেপ করার জন্ত যাতে কর্তৃপক্ষ এ লম্বা অস্তায় পদক্ষেপ নিতে না পারেন, পুলিশ ইত্যাদি ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে এবং আমাদের জাঘা দাবি-গুলো মেনে নিতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়
রজনদাস অধিকারী
স্কটিশ চার্চ কলেজ
ইন্টার হোটেল বোডার্স কমিটির পক্ষে

দেশ কাল রাজনীতি

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নয়া চ্যালেঞ্জ

ভারতপুত্র

আসামের আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এবার এক শক্ত গাউজ ফেলে দিয়েছেন। দু'মুঠাঘের জন্ত—২১ জুলাই থেকে তারা আগুণ-আন্দোলন স্থগিত রেখে কার্যতঃ নয়া দিল্লীর উদ্দেশ্যে তাঁরা এক নয়া চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করেছেন। আসু ও গণপন্থ্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচুর মহাত্ম ও ভক্ত মুকন এক মুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের মাধ্যমে আলোচনা বৈঠকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করেন, তবে তাঁরা ঘাটা তাঁরা নিজেদের অসামু উদ্দেশ্যকেই নথ্য করে ফেলবেন।

উল্লেখ করার বিষয় হল, এক পক্ষ কালের জর্জ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও তেল, পাট, বাঁশ এবং প্রাইউড আগের মতই আসামের বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকবে। নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা বলতে আন্দোলনকারীরা সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশগুলির এবং সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবহার প্রত্যাহার ও বন্দীদের মুক্তি দানই বোঝাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলন স্থগিত রাখাকালীন যাতে কর্মীদের মনোবল ভেঙে না পড়ে সেজন্য সকলকে সাংগঠনিক ব্যবস্থা জোরদার করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া যেসব বিধায়ক আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী সমস্যার সমাধানে

—১৯৮১ সালের নাগরিকদের জাতীয় রেজিষ্টার এবং ১৯৮২ সালের জোটের তালিকাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন না সামাজিকভাবে তাদের বর্জন করে চলার কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট অটলবিহারী বাজপেয়ী আসাম সরকার করে এসে প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক চিঠিতে অবিলম্বে আলোচনা বৈঠক শুরু করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর মতে গান্ধী শান্তি সংস্থার ক্ষমতার ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। শ্রীজগদীশ মনে করেন, যদি এখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চালিয়ে যান তবে আন্দোলনকারীরা আত্মপোষন করে নাশকতা-মূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হবে, আগামী

দিনে বা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। লোকহল নেতা চরণ সিং এবং জনতা নেতা চন্দ্রশেখরও নাকি শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশ্যে অনুরূপ পত্র দিয়েছেন। অন্তর্দিকে জর্জ কার্ণাওজ অভিযোগ করেছেন যে, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্তই শ্রীমতী গান্ধী আসাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে মনোযোগ দিচ্ছেন না। এইচ এন বহুগুণার দাবি, আসাম সমস্যার সমাধানে সর্বদলীয় প্যানেল গঠন হোক।

বাস্তবিক, আসামের আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রকে এক শক্ত পরীক্ষার কেলেন। উদ্যোগটা এখন তাদেরই নিতে হবে। পূর্বশর্ত নিয়ে আলোচনার তাঁরা রাজী নন। তাঁরা এখানে সরকার গঠনের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু 'বিদেশী' সমস্যাকে জিইয়ে রেখে এখানে কংগ্রেসই সরকার গঠিত হলে তার স্বাধীন হবে নীরিত। তাই আন্দোলনকারীদের পক্ষে পোরার জন্ত কংগ্রেস-ই কী কায়দা অবলম্বন করে, সেটাই হবে লক্ষ্য করার বিষয়।

চেন্নার মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আপাততঃ মুখ্যমন্ত্রী চেন্না রেড্ডীর মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন। যখন তিনি ডঃ রেড্ডীকে মন্ত্রাধীনে তলব করলেন তখন প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে অল্পপ্রদেশ এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী লাভ করবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী শেষ পর্যন্ত ডঃ রেড্ডীকে আপাতত কাজ চালিয়ে যাবার অস্থায়ীই দিয়েছেন।

অবশ্য এতে বিক্ষুব্ধের হতাশ হবার কারণ নেই। মনে হয়, ডঃ রেড্ডীর যোগ্য উত্তরাধিকারীর সন্ধান এখনই পাওয়া যাচ্ছেনা বলেই শ্রীমতী গান্ধীকে স্থিতাবস্থার পক্ষে রাখা দিতে হল। কিন্তু ২৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৫ জনই যদি বিপক্ষে চলে যান, তাহলে ডঃ রেড্ডী মন্ত্রিসভার কাজ চালাবেন কাদের নিয়ে? তাছাড়া কংগ্রেস-ই বিধায়কদের একটি বড় অংশও যে ডঃ রেড্ডীকে আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন, তাও পরিভার হয়ে গিয়েছে। এমন কি ডঃ রেড্ডী নিজেও বোধহয় তাঁর শক্তি সম্পর্কে নিঃশঙ্কিত নন। তা যদি হতেন, তবে বিধায়কদের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে রাজী হতে পারতেন না। আহা, কংগ্রেস-ই গণতন্ত্রের কী মহিমা! নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা হল বিধায়কদের নেই, সে ক্ষমতা মাত্র একজনেরই আছে। তিনি হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু যাকে ডিক্টেটর বলা বাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনে দুর্নীতি

মুণালকান্তি দাশ ১৯৭৪ সালের শেষদিক থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডে প্রোডাকশন ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত। ষাঁচ দুঃসাহসিক, দ্বিধাবৃত্তী দুঃখের নানা ধরনের দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই বাংলার তামাসা ধরনের কাগজে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। তবুও কেবলমাত্র মাতৃসজ্জের মায়ের নামাবলী অবলম্বন করে মুণালবাবু কি না করে যাচ্ছেন? কোন অদ্ভুত, আশীর্বাদপুষ্ট মাতৃশক্তি দ্বারা সাহেবকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক ফাইল লোপাট করলেন। আবার মনের মতো কিছু ফাইল তৈরী করে ফেললেন। ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বস্তায় এই মুণালকান্তি দাশ কোন দস্যুচক্র (?) ক্রিয়েট করে লাথো লাথো টাকা দুহাতে গুনেছিলেন? অব্যবহিত পরেই সরকারী মিনিকিট কার্যক্রমে আরো কয়েক লাখ। কুলোকেরা মলকথা বলে এখনো—মুণালবাবু নাকি কোন উদ্ভেদ সিদ্ধির জন্ত শিলিগুড়িতে মাতৃসজ্জের কালীপুজার জটনক মন্ত্রীমণ্ডলকে একাধিকবার আপ্যায়িত করে এনেছিলেন। ইনি সম্প্রতি এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজের এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের একাংশকে কড়া কবে কেলেন।

তার বরাবরের নিয়মিত অভ্যাস কোন কোন সেগল অফিসারদের দিয়ে মাতৃসজ্জ, মাতৃবানীর মোটা মোটা টাকা চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করা। মুণালবাবুর মিস্ট্রি মধুর হাসিতে অনেক বাহু লুকিয়ে থাকে দেখেছি। অলৌকিক সন্তোহনী শক্তির মায়াজালের অনেক দার্ক নজীরও তিনি রেখেছেন। কর্মীদের রাবসেল করার এক্সপার্ট একজন মিস্ট্রি দাশ। আরো মজার ঘটনা যেমন, কোন বন্ধুর সঙ্গে মুণালবাবুর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বভালবাসার চিহ্ন ধরলো কোন কারণে; মুণালবাবু পুরনো বন্ধুকে আত্মগত্যের পুরস্কার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবেনই চরমভাবে। এমন বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মুণালবাবু প্রাইভেট ডিটেক্টিভ কাজে লাগিয়েছেন জানা গেছে। এ্যাগ্রোর আগেকার এ্যাগ্রোনমিস্ট মিস্ট্রি: রায়চৌধুরীকে মুণালবাবু খেলার পুতুলের মতো ব্যবহার করেছেন। বর্তমান এ্যাগ্রোনমিস্ট মিস্ট্রি: পালকে তিনি ভূষণপথে পরিচালিত করছেন এবং এই স্থানীয় অফিসারকে দিয়ে তিনি অনেক খেরাল চরিতার্থ করে নিচ্ছেন। এটা জানবার বিষয় এ্যাগ্রোনমিস্ট প্রোডাকশন ম্যান-

জারের অধীনস্থ, না প্রোডাকশন ম্যানেজার এ্যাগ্রোনমিস্টের অধীনস্থ? সর্বশেষ সংবাদ: বিগত এক সোমবার (১৬৮০) মুণালকান্তি দাশকে কোন এক বিশেষ জারগার গভীর রাত পর্যন্ত দেখা যায়। সেখানে তিনি ঠাণ্ডা মাথা বহুকাহ্ন হাসিল করার পরিকল্পনার ব্যস্ত থাকেন। ঠিক আগের দিনই সরকারী ঘোষণার সারের মূল্যবৃদ্ধির কথা ধরনের কাগজগুলিতে ছাপা হয়। মুণালবাবুর পরিচালিত অপারেশন স্কোয়াড মারকং পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন এ্যাগ্রোর সেল-পয়েন্ট থেকে ব্যাক-ডেটেড ডি, ও, চালান, ম্যানিফিস্ট করিয়ে রবি সোম মঙ্গলবারে ওল্ড রেটের লক্ষ লক্ষ টাকার সার কালোবাজারী করা হয়। না, তোমার মুণালতো

কিছুই চায় না। সে এ্যাগ্রোতে ডেপুটেশন এ্যালাউন্স না নিয়ে রয়েছে (কোন আর্বে?)। এখানে তাঁর ডেপুটেশনের মেয়াদকাল আরো এক বছর বাড়তে পেরেছেন মুণাল। কতৃপক্ষের কাছে মুণাল লিখিত আবেদনে এই ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে তিনি সেম্বেল অব পে নিয়ে এখানেই থাকতে রাজী (তাঁর তো আর বেশী কিছু চাই না!)।

জমদাদারদের টাকার এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন গড়ে উঠেছিল একদিন। মুণালকান্তি দাশ কিসের যোছে এখনো তাঁর মানসরাজ্য এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজের ভিটে মাটি কামড়ে থাকতে চাইছেন? ডেপুটেশনের মেয়াদ দিনের পর দিন শেষাংশ ৪৫ পৃষ্ঠার

রাজ্য হজ কমিটিতে দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন রাজ্য হজ কমিটিতে ব্যাপক দুর্নীতির কথা জানাজানি হয়ে গেছে। বিশেষ করে এ বছর দৌদি আরবে হজ যাত্রার সময় পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটি যে দুঃসহ হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার নির্বাচিত করলেন তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। কমিটির এক প্রোগার সমস্তের নিকট ব্যক্তি এই দুঃসহ। এরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রী মহম্মদ আমিন সাহেবের চেয়ারে ৩০শে জুন প্রায় ১০ জন প্রার্থীর সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। অন্য প্রার্থীদের মধ্যে যোগ্যতা, ধর্মজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী, সমাজসেবায় অতিজ্ঞতা, আরবী উর্দু জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউ প্রদর্শনে আপে থেকে ঠিক করা দুই প্রার্থী কলকাতা কর্পোরেশনের কন্ট্রোলরুমের চাকুরে হাকিম রসিদ এবং মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের কেরানী আবদুল মজিদ নির্বাচিত হলেন।

হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ছিলো প্রার্থীমৌদী আরব ভ্রমণ করে থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হবে। নির্বাচিত দুজন ওয়েলফেয়ার অফিসারের কেউই আরব ভ্রমণ আগে করেন নি। অতিজ্ঞতা কারোর নেই। তবে কোন নিরিখে এদের নির্বাচিত করা হলো? অতিজ্ঞা শিক্ষিত ধর্মজ্ঞানী গুণী ও হজ কমিটি সদস্যদের আত্মীয় বা নিকটব্যক্তি নন এমন ব্যক্তিকে কেন বাছ দেয়া হলো। কমিটির একপ্রোগার এম এল এ

সদস্যও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছেন।

রাজ্য হজ কমিটি হাজার হাজার টাকা খরচ করে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন অনেকগুলো দৈনিক কাগজে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ ছিলো যে কেউ হরখাস্ত করতে পারেন যোগ্যতা থাকলে। অথচ ব্যাপারটি শুধু মুসলমান প্রার্থীর জন্য। এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে অসংখ্য অমুসলমান প্রার্থী হরখাস্ত করেছেন হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার হবার ইচ্ছার। বিজ্ঞাপনের এই মারাত্মক ভুল পরে স্বীকার করা হয়নি। বহু হরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

হজ কমিটির আলাদা অফিস থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রার্থীকে ঠিক সময় চিঠি দেয়া হয় নি। এড়িয়ে যেতে চায় এমন প্রার্থীকে হজ কমিটি দেয়ীতে চিঠি কিংবা ভুল ঠিকানার (ঠিকানা হরখাস্তে থাকা সত্ত্বেও) টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। ইন্টারভিউ শেষ হতেই চিঠি পেয়েছেন প্রার্থীরা।

দাজানো এই ইন্টারভিউ হবার অনেক আগে হজ কমিটির এম এল এ এবং এম এল এ নন এমন সদস্যদের বেশ কয়েকজন অন্য এক স্থানে বসে তাদের নিজস্ব দুঃসহ প্রার্থীকে কত সহজ প্রস্ত করা যায় তা ঠিক করেছেন। বাকি প্রার্থীদের উদ্ভট প্রস্ত করা হয়েছে। প্রার্থীকে বলা হয়েছে উর্দু জামেন কিনা? পশ্চিমবঙ্গ থেকে হজ প্রতিনিধি বাড়লা-ভাষা ভাবী হবেন আশা করা যায়। উর্দু কি বাড়ালী মুসলমানের মাতৃ-ভাষা?

সরকারী সংস্থায় মহিলা কর্মচারীদের উপর খড়গ নামছে

মহিলা প্রধানমন্ত্রীর শাসনে অল্প
কালে যে বলাৎকারের ঘটনা শুধু
বেড়েছে তাই নয়, শ্রমতী পাখীর
নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন
প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মচারীদের উপর
খড়গও নেমে আসছে। গত ১৮
জুলাই লোকসভার মহিলা সভাপতি
পার্লিক সেক্টরে পরিচালকদের মহিলা
নিয়োগ 'কুসংস্কারের' বিরুদ্ধে প্রতি-
বাদ জানান।

শ্রমতী গীতা মুখার্জী (সি, পি,
আই) সভার অর্থমন্ত্রী শ্রীভেক্টর-
মণ্ডকে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের
সাপ্রতিক এক সাক্ষাৎকারে কপি
দেখান। ঐ সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে,
মহিলা কর্মচারীরা অবসরকালে
উদ্ভেদ কেবলমাত্র পুরুষ আত্মীয়-
দেরই ঐ অফিসে মনোনিবেশ করতে
পারবেন। শ্রীভেক্টরমণ্ড প্রত্যুত্তরে
জানান যে, 'ব্যাপারটি সম্পর্কে খোজ
নেওয়া হবে। এরকম কোন সাক্ষা-
তার দেওয়া হবে থাকলে তা
প্রত্যাখ্যান করা হবে।'

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার প্রশ্ন
করেন, যেটি মহিলা জনসংখ্যার
অল্পপক্ষে কর্মরত। মহিলার
সংখ্যা কত? কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী
উত্তরে বলেন যে, সংবিধানে
চাকরীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিচারের
বিরুদ্ধে বলা হয়েছে কিন্তু জনসংখ্যার
আনুপাতিক হারে মহিলাদের কর্ম-
সংস্থানের ব্যবস্থার গ্যারান্টি দেওয়া
হয়নি।

শ্রমতী সুশীলা গোপালন (সি,
পি, আই-এম) লোকসভার অভিযোগ

করেন যে, কেন্দ্রীয় আলোচ্য
ফাটিলাইজার এ্যাণ্ড কমিক্যালস
জিবাঙ্কর কারখানা তিনজন মহিলা
শিকানবিশকে ছাটাই করে সেখানে
তিনজন পুরুষ শিকানবিশকে নিয়োগ
করা হয়েছে। এই ছাটাই করা
হয়েছে এই অজুহাতে যে রাতে
মহিলাদের কাজ করা নিষিদ্ধ।

শ্রীভেক্টরমণ্ড সভার আরো
জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থায়
যেটি ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার জন কাজ
করেন। এরমধ্যে ৪৭,০০০ জন
হলেন মহিলা।

শ্রমতী গীতা মুখার্জী সভার
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল
ন্যারেজন্স রিসার্চের এক রিপোর্ট পড়ে
শোনান। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে
ছটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার গত একদশকে
যেটি কর্মচারীর তুলনায় মহিলা কর্ম-
চারীদের অল্পপক্ষে উৎসেজনকভাবে
কমেছে। শ্রমতী মুখার্জী মতে
পার্লিক সেক্টরের পরিচালকদের
মহিলাদের প্রতি রক্ষণশীল মনো-
ভাবে লক্ষ্যই ঐ হার কমেছে।
শ্রীভেক্টরমণ্ড অবশ্য এই অভিযোগ
অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে,
এটা সত্য যে, মহিলাদের কর্মসংস্থান
একটু সমস্যা হচ্ছে। কারণ প্রসব-
কালীন লবেতন ছুটি দেওয়া সংস্থার
পক্ষে একটু অস্বাভাবিক, তবুও এ
কারণে মহিলাদের নিয়োগে বাধা
দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থমন্ত্রী সভার
আরো আশ্বাস দেন যে, পার্লিক
সেক্টরে মহিলাদের কর্মসংস্থানের
সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সর্বদা
চেষ্টা করবেন।

একটি শোক মিছিল

যোলই জুলাই, শ্রীহরপুর।
মাহেশের রথ। গত বছর ছিল
জয়যাত্রা। এবারও তরুণ তাই।
কিন্তু হঠাৎ শরতের আকাশে ভীষণ
রাগী কালোমেঘ ছড়িয়ে পড়েই
বৃষ্টি। অঝোরে বৃষ্টি। হাটবাজার,
শোকামণি, ফুল কলমজ, কল কার-
খানা সব জুজু হয়ে গেল হঠাৎ।
বন্ধ হয়ে গেল হিম্মমোটর কারখানা,
কে, কে, ঈল, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন
মিল, এমন কি শাহাগড় ভানলপ
কারখানাও। শ্রীহরপুর শহর জুজু
নিশ্রাণ শোকে মুহূর্তমান। তার
চিরপরিচিত নেতা-দীনেন ভট্টাচার্য
আর নেই। মাহেশের কলোনিতে
তিনি তো আর 'আপসহীন লড়াই
শোষিত মানুষের একমাত্র অস্ত্র'
কথাটি বোঝাতে আসবেন না। তাই
তো মানুষ আর মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন
শেষবারের মতো প্রজ্ঞা জানাতে।
আর চোখের জলে শপথ নিতে:
দীনেনদা, তোমার আদর্শ থাক
আমাদের জন্ত—আমাদের উত্তরা-
ধিকারীরা আদর্শায়িত হোক তোমার
আদর্শে। তাইতো কচি বাচ্চা
কোলে মায়েরা দাঁড়িয়েছিলেন পথের
ধারে।

হাতে অধিনিষিত পতাকা পঁয়ষটি
জন খেচ্ছাসেবক, ঠিক তারই পেছনে
শতাব্দিক গণশিল্পীর আত্মজাতিক
সঙ্গীত পরিবেশন, তারই পেছনে
লক্ষ কোটি ফুলের ভেতরে ঘুমিয়ে-
ছিলেন সারাজীবন আপসহীন
সংগ্রামী নেতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের
একান্ত আপনজন "কমরেড দীনেন-
দা"। চোখের জলে বাঁধ ভাঙা
মানুষের স্রোত ভালোবাসার বরষার
জুজু।

মিছিল শুধু মিছিল। কারার
ভেতর গর্জ ওঠে হাজার হাজার
কণ্ঠে "মেহনতী জনতা কো প্যারে
নেতা অমর রহে"। "কমরেড দীনেন
ভট্টাচার্য তুমি কো ভুলেবে নেহী—
কচি নেহী।" মানুষের স্রোত জি,
টি রোডের ধারে। মিছিল ব্রহ্ম-
ণ্ডেরটে—মিছিল হিম্মমোটরে।
মাইকে বিরতিহীন ঘোষণা করে
চলেছেন রূপচাঁদ পাল, শান্তী
চ্যাটার্জী, "কমরেড দীনেনদা,
হাজার হাজার মানুষের বুকের
ভালোবাসার অস্ত্রের প্রকার ঘুমিয়ে
থাক তুমি। আমরা তোমার আদর্শে
মুক্তি সংগ্রামের শপথ নিলাম।
তোমার আপসহীন সংগ্রামের লড়াই
আজও শেষ হয়নি।'

এ মিছিলে কোন বাধা নিষেধ
ছিল না। আপসহীন জনসাধারণের
এ মিছিলে বার বার গর্জ উঠেছে
সমুদ্রের মতো "হামারে প্যারে নেতা
কমরেড দীনেন ভট্টাচার্য, লাল
সেলাম।" শ্রীহরপুরে, মাহেশে
সর্বত্র মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা
করছেন শেষবারের মতো প্রজ্ঞা
জানাতে। মিছিলের প্রথমদিক
থেকে শেষদিক দেখা যাবনি। তিন
তলার বাড়ীর মালিকের অহুমতি
নিখে ছাড়ে উঠে বাই। কোথায়
মিছিল? এতো বাঁধ ভাঙা জল-
স্রোত। পতাকার পতাকার লাল।
বাড়ীর ছাঁচ ব্যালকনি থেকে ছড়িয়ে
দেওয়া ফুল। সামনে এগুতে পারেন
নি, তাই অসীম প্রজ্ঞা ছড়িয়ে
দিয়েছেন ফুলের মালা, ফুলের জবক।
কুঁচো লাল ফুল। লক্ষ লক্ষ মানু-
ষের হৃৎপিণ্ড জুজু আজ। তাকে শেষ
প্রজ্ঞা জানাতেই হবে।

মিছিল চলেছে। বৃষ্টিও মাঝে
মাঝে। তবুও তো বিরাম নেই।
জি, টি, রোডকে স্মৃতি করে ছোট
রাস্তার মিছিল এগিয়ে গেল রাধা-
বল্লভ ঘাটের দিকে। তারও আগে
বেশ কয়েক হাজার মানুষ অগাধ
কাছে এসে হাজির হয়ে আছেন
অনেক আগে থেকেই। প্রায় চার
মাইল রাস্তার জনসমুদ্রের স্রোত
যখন এসে রাধাবল্লভ ঘাটে থাকা
খেল তখন সন্ধ্যা নাড়ে ছটা হবে।

খেচ্ছাসেবকরা যখন পার্ড অব
অনার দিলেন তখনই মিছিল ভেঙে
পড়ে কারার। গর্জ ওঠে জনতার
লাল সেলাম। ভিজ়ে ওঠে চোখের
জলে। আমরা পাশে কালো
ব্যাগ পরিহিত ছুজন খেচ্ছাসেবক
কমালে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন
মাটিতে। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ-
ছিল কারার। শত শত গণশিল্পীর
কণ্ঠে ধ্বনিত হোল আত্মজাতিক
সংগীত। হাজার হাজার কণ্ঠ বলিষ্ঠ
দৃষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, শপথ
নিলেন, "কমরেড দীনেনদা তোমার
অসমাপ্ত কাজ শেষ করার দায়িত্ব
আমরা নিলাম।" এই শপথের সঙ্গে
শেষ হোল এক আপসহীন সংগ্রামী
জীবন।

এ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ

৩য় পৃষ্ঠার পর
রিনিউ করিয়ে তিনি আর কতকাল
এখানে থাকতে চান? ধবরের
কাগজে দিনের পর দিন ছনীতির
কেছা বেরোবার পরও তিনি কেন
বিরেকের তাগিদেও স্বস্থানে চলে
যাবার কথা ভাবলেন না।

একথা আজ দিনের আলোর
মতোই সত্যি যে নানা ছনীতির
নায়ক এম, কে, দাশকে নিয়ে বিভিন্ন
মহলে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে
তা বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে
এখনি সেকথা আশঙ্কা করার অবকাশ
আছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের
দৃষ্টিতে প্রশাসনের কাছে এ্যাগ্রো
ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মীদের দাবি
হলো অবিলম্বে এম, কে, দাশের
বিচার শাস্তি। আর একদিনও দেরী
না করে যুগলবাবুকে এ্যাগ্রো
ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া
দরকার। মনে রাখতে হবে এ্যাগ্রো
ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কখনোই
যুগলকান্তির নয়, জনসাধারণের।
তাই যুগল যাতে কোনদিনই আর
মানুষজন্মের তেজ ধরে ব্যবসা না
করে বেড়াতে পারে তার ব্যবস্থা
চাই।

স্বপ্নানের ধ্বংসস্থাপে স্মৃতিকাগুহ নির্মাণ

আটাস্তরের বজায় হুগলী জেলার
নিজুর থানায় এসে গোপালনপুর
গ্রাম প্কারেতের পায়রাউড়ার পর
আর যেতে পারি নি। শুধু জল.
জল আর জল। তার মধ্যে নতুন
ভেরী গ্রামটি ছিল সম্পূর্ণ চার থেকে
পাঁচফুট জলের নীচে। প্রতি বছরই
বজায় বিরাট নদীর তাগুবে এই ভেরী
অঞ্চল, দেওয়ান ভেরী, খাসের ভেরী,
নতুন ভেরী বজায় ভেসে যায়। এই-
বার রাজ্য সরকার এই ভেরী
অঞ্চলের বাঁধ নির্মাণ ও অস্তিত্ব
সংস্কার কাজের জন্ত বাজেটে অবশ্য
আট কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

নিজুর থেকে প্রায় দশ কিলো-
মিটার দূর এই গ্রামে আজও এমন
বৃদ্ধ আছেন, যিনি জীবনে ইলেকট্রিক

ট্রেন দেখেন নি। বৈজ্ঞানিক আলো
দেখেন নি। স্বাধীনতার তেজিশ
বছর পরেও। বিরাট নদীর তাগুকের
ভীতিকে বুকে রেখে যেখানকার
মানুষ বর্ষার রাতে শুয়ে থাকেন
আজও সেই গ্রামে গত শনিবার
দশই জুলাই হুগলী জেলা পরিষদের
সভাপতি শ্রীশিবপ্রসাদ মুখার্জী
পায়রাউড়া থেকে প্রায় দু কিলো-
মিটার কর্মমাস্ত পথ পায়ে হেঁটে এসে
উদ্বোধন করলেন একচলিশ হাজার
টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যা-
লয়টি। ১ ফুট উঁচু বজ্রশিপি ধানের
উপর তিরিশ ফুট চওড়া লতের ফুট
লম্বা এই ফুল বাড়ীটি শুধু ছাত্রের
জন্তই নয় বজায় সময় দেড় হাজার
মানুষের আশ্রয়স্থলও হোল।

অঞ্চল প্রধান ও তরুণ কবি
হারাদন দাবুই এই উদ্বোধনী
লম্বাবেশে বলেন, স্বাধীনতার তেজিশ
বছরে এখানে কোন পরিকল্পনাই
গ্রহণ করা হয় নি উদ্দেশ্য প্রণোদিত
ভাবেই। কারণ এখানকার মানুষের
প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে করে
যেজাজটাই হয়ে গেছে লড়াই
যেজাজ। যে যেজাজ দিয়ে রাধার
জন্তই এই গ্রামের প্রতি ছিল অব-
হেলা। কিন্তু সরকারের দামান্যতম
সাহায্য পেলে এখানকার মানুষ যে
নিজদের উন্নতির জন্য নিজের পরি-
শ্রম দিয়ে কত তাত্ত্বাভি গড়ে
তুলতে পারেন, অগাধের ধ্বংসস্থাপে
স্মৃতিকাগুহ নির্মাণই তার প্রমাণ।
আড়ম্বরহীন প্রাণের জোয়ারে তরা

বক্তিত এখানকার মানুষ কি প্রমাণ
করলেন না শুধু সামান্য সাহায্য,
তাতেই আমরা পড়ে মের নিজেদের।

সভাপতি, স্থানীয় এম এল এ
ডাঃ গোপাল ব্যানার্জী ভূয়সী প্রশংসা
করলেন এখানকার মানুষের কর্ম-
দক্ষতাকে। কথা দিলেন নিজের
থেকে এই ১০ কিলোমিটার রাস্তার
সুব্যবস্থার।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই রাক্ষসী
বিরাট নদীর ভেরী অঞ্চলের মানুষ
আর কতদিন বিরাট চিকিৎসার মর-
বেম? এখানে কোন প্রাথমিক
স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। বর্ষিক কয়েক
হাজার মানুষের বাস। বর্ষিক উদ্বো-
ধনী সময় পেরিয়ে গিয়েছিল ঘন্টা
দুই তবুও তেবেছি এই আশাধের
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠার

বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক পটভূমি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

বিশ্ব পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক সংকট চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ এখন এক বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংকট থেকে পরিজ্ঞানের কথা ভাবতে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পত্রিকায় এখন ১৯৮০ সালেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধতে পারে বলে আলোচনা চলছে। কারণ বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চাইলেই আজকাল বাধানো যায় না। দেশের জনমতকে এরকমে তৈরী করতে হয়। মিউইরক টাইমস পুর পর কয়েকটি নিবন্ধে ১৯৮০ সালের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১৯১৪ সাল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু ১৯৩৯ সালের পরিস্থিতির তুলনা করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের মোদা বক্তব্য ১৯১৪ এবং ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার প্রাকমুহুর্তে বিশ্বপরিস্থিতি যে রকম ছিল ১৯৮০ সালেও ঠিক একই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট শ্মিথ, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইলস কাহলার বিশ্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক ত্রৈমাসিক "ফরেন এ্যাফেয়ার্স"এ লিখিত প্রবন্ধেও ১৯১৪ সালের প্রাক বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির তুলনা করেছেন। অর্থাৎ পুঁজিবাদী দুনিয়ার কর্মকর্তারা এখনই একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর জন্যে উদগ্রীব কারণ তাদের চির আকাঙ্ক্ষিত শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। একে সাময়িকভাবে রক্ষা করতে হলেও লক্ষ লক্ষ কোটি মূল্য ব্যয় করতে ও কোটি কোটি তরুণ প্রাণ যুদ্ধের যুগকাঠে বলি দিতে হবে। তখন বেকার সমস্তা কমে যাবে কারণ কাজ চাইবার মত সুস্থদেহ জীবিত লোক বড় বেশী বাকি থাকবে না আর তরুণপক্ষে আবার গড়ে তুলতে হলে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার গত ১২ই জুন প্রকাশ্তে শাসিয়েছেন যে পোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবেন না। তিনি গর্ব করে বলেন যে-তার আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির হ্রাসপ্রবণতা রুদ্ধ করা হয়েছে এবং অতলান্তিক জোটের সামরিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইকহোমের শান্তি গবেষণা পর্ষদের ডিরেক্টর ফ্রান্স বার্লো বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন

যে ১৯৬২ সালে কিউবার ক্ষেপণাস্রমোতায়নের বিষয় নিয়ে বিশ্ব যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল এই সংকটের পর বর্তমান সংকটের মত পরিস্থিতি আর কোন দিন দেখা যায় নি। তিনি বলেন ১৯৮০ সালে সারা বিশ্বের সামরিক ব্যয় ৫০০,০০০ কোটি (পাঁচ লক্ষ কোটি) ডলার অতিক্রম করেছে। এর ৭০ শতাংশই ওয়ারশ চুক্তি ও স্ট্রাটোচুক্তিবৃত্ত দেশগুলি সামরিক প্রস্তুতির জন্যে খরচ করেছে।

অবস্থা এখন এমনই চরম যে একটি কম্পিউটারের ভুল সংকেতে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ এক ঘণ্টার মধ্যে নিহত হতে পারেন। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, টোকিও, লণ্ডন, নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন মূল্যায়ন হতে পারে। গত জুন মাসের ৮ তারিখে ব্রিটিশ সেবার পার্টির ফরেন এ্যাফেয়ার্স গ্রুপ এক বিবৃতিতে বলেছে যে

আজগীত

রাজ চারদিনের মধ্যে আমেরিকার যুদ্ধ সংকেতবাহী কম্পিউটারের ভুলে পর পর দুবার বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার যে বিপদ সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখন বিশ্বের সমস্ত সরকার ও রাজনৈতিক দলের মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুদ্ধ বন্ধকে এখন তীব্রগতিতে সাজানো হচ্ছে। যে কোন সময় পারমাণবিক যুদ্ধে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ও দেশ ধ্বংস হয়ে যাবার চরম বিপদের সম্মুখীন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার সম্প্রতি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্রমবাহী ডুবো-জাহাজ, মোবহর, বিমান ও ট্যাঙ্ক-বহর তৈরী করতে এবং তাদের মার্কিন পোলাবিস ক্ষেপণাস্রমের বদলে আরো মারাত্মক ট্রেন ক্ষেপণাস্রম অসজ্জিত করার জন্যে ৫০০ কোটি পাউণ্ড খরচ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। অথচ সেই সঙ্গে তারা ব্রিটিশ জনসাধারণের জন্যে মজুদীকৃত বিনামূল্যে শিক্ষা চিকিৎসা ও বেকার ভাতার খরচ ৬০০ কোটি পাউণ্ড কমিয়ে দিয়েছে।

এই যুদ্ধ প্রস্তুতির মূলে রয়েছে পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক সংকট। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। মূল্যস্ফীতি বছরে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ, হাজার হাজার ব্যবসা লালবাতি জ্বালছে, কোটি কোটি মানুষ বেকার হচ্ছেন। এর

মধ্যে নেমে এসেছে গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দা। অদূর ভবিষ্যতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ একই সঙ্গে অর্থনৈতিক মন্দা মূল্যস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির চাপ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অবসর, মিস্তলগতি করে তুলেছে। এই সংকট গত পাঁচ বছর ধরেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছিল। ১৯৭৫ সালে যে মন্দা শুরু হয়েছিল তা ১৯৭৯-৮০ সালের ভয়াবহ মন্দার চাইতেও ভয়ঙ্কর। ১৯৭৪-৭৫ সালের মন্দা শুরু হবার সময়ে সাতটি দল চাইতে শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদন ১২.৬ শতাংশ হ্রাস পায়। জাপানের শিল্পোৎপাদন ২১ শতাংশ, ইতালীর ১৯.৩ শতাংশ, ফ্রান্সে ১৬.৩ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানিতে ১২.৩ শতাংশ এবং ব্রিটেনে ৯.৯ শতাংশ হ্রাস পায়।

অন্তরিকে গত ত্রিশ বছরে বিশ্বের বড় বড় ৪০০টি বহুজাতিক কর্পোরেশনের মূল্য ৫০ শতাংশ বেড়েছে যে তারা তাদের রিজার্ভ ফাণ্ডের অর্থ বিনিয়োগের জন্যে সামরিক শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায় যে এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি মোট রিজার্ভ ফাণ্ড বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী সরকারের মিলিত রিজার্ভের চাইতেও বেশী। এর জোরে তারা তেল, সোনা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু নিয়ে চরম ফাটকা-বাজি করেছে এবং সোনা তেল ইত্যাদি কয়েকটি সামগ্রীর দাম অবিচল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন সরকার তা দেয় ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারছে না। এখন তারা যুদ্ধাজ নির্মাণের কট্টাঙ্কের মাধ্যমে আরো বেশী মূল্য কামানোর জন্যে জাল বিজ্ঞার করেছে।

আন্তর্জাতিক প্রবাসস্থার প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় একমাত্র ১৯৭৪-৭৫ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই বিশ্বের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রায় দু'কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে বেকারবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ও ই সি ডি সমীক্ষার বলা হয়েছে ১৯৮১ সাল নাগাদ এই শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রতি তিনজন কর্মীর একজন বেকার হবে। ফলে প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশেই দাখলণ মাহুষের ক্ষয়শক্তি হ্রাস পাবে। এখনই পরিস্থিতি এত ভয়ানক যে শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

দুঃসময় এবং ছোটগল্প

মিহির আচার্য

দীর্ঘকাল ছোটগল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সম্পাদক হিসেবে যুক্ত থাকার কারণে এই বিভাগ সম্পর্কে আমার আগ্রহ অপরিণীত। আমার অল্পসংখ্যকীয় তাকনা প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন আমাকে বাঁচতে হয়। কোনো তরুণ লেখক হয়তো বিষয়টাকে ধরেছেন কিন্তু অব্যবস্থাপ্রকাশ-ভঙ্গি হুবহু তার শার্ক হতে পারেন না। আবার কেউ নির্দিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গির অভাবে এলোপাথাড়ি কলম চালিয়েছেন, লক্ষ্যবস্তুর বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। আবার একদল আছেন, যারা সংখ্যায় বেশি, এঁরা জানেনই না সাহিত্য তাঁদের কর্ম নয়, তার চেয়ে ভালো স্বামী কিংবা ভালো কেরানী হওয়া তাঁদের পক্ষে অনেক লাভজনক। সমাজের ও তাতে মজল হয়।

এখন, অস্তিত্ব লেখকদের কম-বেশি সহ করা যায়, কিন্তু আদৌ যারা লেখক নন, তাঁদের থামাবে কে।

আমাদের পরবর্তী তরুণদের জন্যে সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী আমরা উদগ্রীব প্রতীক্ষা করে আছি। আশা করছি তাঁদের জন্যে আমরা বা পারিনি তাঁরা তা পারবেন। কিন্তু বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যেমন প্রতিশ্রুতিবান লেখককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

অথচ অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে নেহাত কম গল্প বেরোচ্ছে না। বিষয়ের চেঁচা আছে কোথাও, দৃষ্টি-ভঙ্গির অভাবে তাও দাঁড়াচ্ছেনা। প্রেমের গল্প তরুণেরাও বয়ঃসন্ধির তাকনা লিখছেন, কিন্তু পড়ে মনে হয় তাঁরা প্রেমের পড়েননি। তাঁদের কে বোঝাবে একটা সার্থক প্রেমের গল্প লেখা সবচেয়ে দুঃসময়। বিশ্ব সাহিত্যেও সার্থক প্রেমের গল্পের উদাহরণ খুব বেশি নেই। প্রেম মানে হাত ধরা-ধরি করে মরদানো যাওয়া কিংবা রেস্তোরাঁর পরদাটানা ঘরে বসে চুমু খাওয়া নয়, কিংবা পিকনিকমহ-স্বপ্নে প্রাপ্ত যৌনচর্চা নয়। এঁরা অন্ধের মতো বাজারী লেখকদের অহুসরণ করেন, ওদের বিস্ত্রিখেউড়-গুলোকে পর্ষদ চালিয়ে দেন। যেন ঠাট্টাই এদের মডেল। এই সহজ অহুসরণপ্রবৃত্তি প্রমাণ করেছে তাদের অধ্যয়ন ও অহুসরণের অভাব। লেখার ইচ্ছা নেই সত্যি, কিন্তু তাই বলে ছোটগল্প চর্চা করতে গিয়ে শেকস্তমপাঙ্গী টলস্টয়-র বীজ না থ শিকারীর মতো আয়ত্ত করব না

হতেই পারে না। এমনকি এ দেশের মানিক-নারায়ণ অশীল জানা, নবেন্দ্র বোষ, রমেশ পেন কিংবা অম্ব পোদ্দার হলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী পড়ব না, এ ভাবাও যায়না। কোনো লেখকই স্বচ্ছ নয়, তাকে এইভাবেই পাঠ নিতে হয়।

প্রেম চুলোর যাক। একটা সুস্থ মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে গল্প গড়ে তোলবারও সাধ্য নেই। অর্থাৎ নিজে, নিজের পরিবার, পরিবেশ—তাকেও লেখতে হয় বোঝবার চেষ্টা নেই।

প্রগতি শিবিরের তরুণদের অবস্থাও তখৈবচ। এঁরা একেকজন রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কর্মী বা লম্বর্ধক। তাঁদের অনেক গল্পে পার্টি লাইন মিলে যাচ্ছে, সেটাই বড় কথা নয়, গল্প রসোত্তীর্ণ, কিংবা শিল্পের ব্যাকরণ যেনে চলছে কিনা সেটাই বিচার্য। এঁরা সমাজের গল্প লিখ-

সাহিত্য দর্শন

ছেন। কিন্তু খেত বা লাল সমাজের তফাত ধরতে পারছেন না। আবার মূলশক্তির প্রতি লক্ষ্য-না থাকার জন্যে কংগ্রেসী মস্তান, নকশাল, কংশাল, সমাজবিরাোধী একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আদল শিকারই অভাব। যেটা প্রথমেই আয়ত্ত করতে হবে সেটা মার্কিনী দর্শন, সর্বহারাজ্ঞেয়ীর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে অহুসরণ ও প্রয়োগ করতে হবে।

তা নাহলে গল্প নিজ নিজ বিশ্বাস মতো পার্টির ফতোয়া হবে, শিল্প-রসোত্তীর্ণ হবেনা।

এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আমাদের পরবর্তী তরুণ প্রগতিশীল লেখকদের গল্প স্বাস্থ্য শিল্পের রূপ নিতে পারছেননা। প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি আমরা প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ তুলে ধরতে পারছি।

এবং যখন সমাজব্যবস্থা একটা বিষয় সংকটের মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে তখন এই জটিল অবস্থার মধ্যে সার্থক গল্প লিখতে হলে লেখককে যথেষ্ট সচেতন ও ক্রমতাত্ত্বিক হতে হবে। আজকের ভীষণ সময়ে সার্থক একটি গল্প লেখা, যথেষ্ট কঠিন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদে দুর্নীতি পাহাড়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদে দুর্নীতির আল ছিন্ন করা তো দূরের কথা, বামফ্রন্ট আমলে দুর্নীতির পাহাড় জমে উঠেছে। বিগত কংগ্রেসী শাসন কালে প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় যে সব দুর্নীতিবাজ লোকদের নিয়ে পর্ষদ অফিসে অনাচার চালিয়েছিলেন, বর্তমান বামপন্থী সভাপতি ভবেন্দ্র মৈত্রয় আমলেও সেই সব দুর্নীতিগ্রস্ত লোকগুলিই বামপন্থী খোলস পরে অবিধ কাঙ্ক্ষ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। খাতা কেনার হাজার হাজার টাকার গরমিল, পরীক্ষার উত্তরপত্র বদল, অসুপরিহিত পরীক্ষার্থীদের (অবশ্যই বিশেষ বিশেষ) যথাযথ খাতা জমা নেওয়া ও তাহদেরকে পাশ করিয়ে দেওয়া। ড্রপস্কট মার্কশীট, অ্যাডভিড কার্ড নিয়ে অবিধ ব্যবসা, অটোমেশন বসিয়ে লাখ লাখ টাকার তহরুপ ইত্যাদি বিষয়ে পর্ষদের সংগ্রামী

কর্মচারী সমিতি তদন্তের দাবী তুললে কর্তৃপক্ষ কষ্ট হয়ে তাদের ওপর নানা রূপ নির্ধাতম ও শোষণ চালান। ধার্মা সংগ্রামী সমিতির সদস্য, তাঁদের কারও চাকরী গেছে, কেউ স্থপারদেসনের শিকার হয়েছেন, চাকরী পেয়েছেন, কারও পাওনা প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে, কাউকে কাউকে পেন-প্রোটেকশন দেওয়া হয়নি। অথচ ধার্মা কর্তৃপক্ষের পক্ষের ইউনিয়নের সদস্য, তাঁরা বছরে হাজার হাজার টাকার ওভারটাইম কামাচ্ছেন, টিকিন অ্যালাউন্স পাচ্ছেন, বিশেষ অ্যালাউন্সের সুযোগ পাচ্ছেন, অজান্তেই প্রমোশন পাচ্ছেন।

সম্প্রতি পর্ষদ অফিসে এইসব দুর্নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে কর্মচারী সমিতির আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। নতুন বেতন হার, পেনশন ইত্যাদি দীর্ঘদিনের অবহেলিত দাবীগুলি সম্পর্কে আলো-

চনার অন্ত সভাপতির কাছে বারবার চিঠি লিখেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অবশেষে গত ১৭ই জুলাই সভাপতিকে পূর্বে চিঠি মারফৎ জানিয়েই কর্মচারী সমিতির নেতৃত্বে কর্মচারীবৃন্দ উক্ত দাবীগুলির সমর্থনে মোড়ার প্রোগাম তুলে সভাপতির ঘরের সামনে সমবেত হন দেখা করার জন্য। কিন্তু ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকে দেখাবার পরও সভাপতি তাঁর কর্মচারীদের সামনে হাজির হলেন না বা সমিতির প্রতি-নিষিদ্ধের সংগে দেখা পর্বত করলেন না। পর্ষদ ইতিহাসে এমন মজির কিছু আর নেই। আর কোম সভাপতি বা প্রশাসক এমন অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক আচরণ করেন নি। বামপন্থী সভাপতি ভবেন্দ্র মৈত্রয় এমন এ ব্যাপারে একমাত্র দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন, তেমনি এই বামফ্রন্ট আমলেই বোর্ডের নার্টিকিট তৈরীর অন্ত প্রথম অটোমেশন বস চালু হল।

কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর বাঁচানোর দাবি

১২ জুলাই বিকেলে কলকাতার শিপিং হাউসে শিপিং এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর বাঁচানোর দাবিতে এক কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনের উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ বোস। সভাপতি-স্বর্গীয় পক্ষে শ্রীমোহন চ্যাটার্জী (এম পি) বলেন যে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর বাঁচানোর দাবিতে বন্দর প্রশ্রিকরা আন্দোলন করবেন। সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবে বলা হয়, কলকাতা বন্দরের সমস্তা শুধু বন্দর বা জাহাজী প্রশ্রিকদেরই সমস্তা নয় এ সমস্তার সঙ্গে সমগ্র পূর্বাঞ্চলই জড়িত। কলকাতা বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হলে পাট-চা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সমগ্র উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের একাংশ ও মেনপাল-ভূটানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কলকাতা বন্দরের যে শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার ফলে আজ এই বন্দরে বছরে মাত্র ৩৫-৪০ লক্ষ টন মাল ওঠানো হয়, অথচ পনেরো বছর পূর্বে এক কোটি টনেরও বেশি মাল ওঠানো হত। দেশের মোট প্রাপ্ত বিদেশী মূল্যের অর্ধেকও কলকাতা বন্দর রোজগার করতো। আজ কলকাতা বন্দরের সমস্তা তিনটি:

- (১) ভাগীরথী হগলী নদীর নাব্যতা;
- (২) বঙ্গপতি আধুনিকীকরণে বিলম্ব ও অব্যবহার;

(৩) শিল্প সম্পর্ক।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নদী-বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাগীরথী-হগলীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ফরাক্কা দিয়ে চলিত হাজার কিলোসেক জল প্রয়োজন এবং ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প চালু হওয়ার প্রথম বছরে গজার অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালের এই নভেম্বর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় জমতা সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদী গজার জল ভাগাভাগি সংক্রান্ত এমন এক চুক্তি করলো যাঁর ফলে আজ ভাগীরথী হগলী নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে, দক্ষিণ-পূর্বের কাছে চড়া পড়ার প্রায় হেঁটে গজা পার হবার অবস্থা হয়েছে। আভাবিকভাবে কলকাতা বন্দরেও আর বিরাট আয়তনের জাহাজ আসতে পারছে না। শুধু কলকাতা নয়, হলদিয়া বন্দরও এরফলে ক্ষতি-গস্ত হয়েছে। উক্ত চুক্তি অস্বাভাবিক ভাগীরথী নদী শুধা ময়তমে মাত্র বিশহাজার কিলোসেক জল পাবে। এখন ফরাক্কা বাঁধ দিয়ে মাত্র ৮/১০ হাজার কিলোসেক জল দক্ষিণে আসছে। এ বছরের জাহাজারীর প্রথম সপ্তাহে নদীর গভীরতা ৩০ সেমি: হ্রাস পেয়েছে যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। আর কিছুদিন পরে হরতো গজা দিয়ে ছোট মোকো চলাচলও করতে পারবে না।

কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে বর্তমানে যে সব বঙ্গপতি আছে তা

দিয়ে বছরে দেড় কোটি টন মাল ওঠানো করা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে তা সম্ভব হচ্ছে না। এরফলে রপ্তানিকৃত বা আমদানিকৃত বহু পণ্য অন্তান্ত বন্দরে ভর্তি বা থালাল হচ্ছে এবং তা বোঝাই, কোচিন থেকে কলকাতার আনা হচ্ছে বা কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরফলে এই ওয়ানগন সঙ্কটের সময়েও রেলমাল বা পথ পরিবহনের ব্যাপক ব্যয় হচ্ছে। অনেকের মনেই যে পথ পরিবহন মরি তথা টেলিকোর মালিকদের সঙ্গে আতাতের অন্তই বন্দর কর্তৃপক্ষ বঙ্গপতির অব্যবহার বা আধুনিকীকরণে উদাসীন থাকছেন।

আজ বন্দরে নাকি 'বাড়তি প্রশ্রিক'র সমস্তা দেখা দিয়েছে, যা লর্ভেব মিথ্যে। বরং বঙ্গপতির পূর্ব অব্যবহার ও আধুনিকীকরণ করে আরো বহু সংখ্যক বোকারের চাকরীর সংস্থান বন্দরেই হতে পারে বলে কনভেনশনের উদ্ভোক্তারা মনে করেন।

কনভেনশনে আরো বহু ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বামফ্রন্ট সরকারের সেচমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় ও তখন খ্যাতনামা নদী বিশেষজ্ঞ শ্রীকপিল ভট্টাচার্য ও শ্রীধরেশ মুখার্জী ভাগীরথী-হগলীর নাব্যতা সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত রাখেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে নানা অভিযোগ

উত্তর নগরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অব্যবস্থা নিয়ে নাধারণ মাহুয়ের বহু অভিযোগ আছে। মেডিকেল কলেজের কর্মীদেরও বহু অভিযোগ এই হাসপাতালের প্রশাসনিক অসদ্ব্যবস্থা সম্পর্কে।

চিকিৎসা প্রার্থীদের স্বার্থে এবং কর্মচারীদের স্বার্থে এই হাসপাতালের কর্মীরা কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কিছুদিন যাবতই প্রশাসনিক রহ-বদলের দাবী জামিয়ে আসছেন। কর্তৃপক্ষ উদাসীন। তাই বহু অর্থ ব্যয়ে নিমিত এই মেডিকেল কলেজ সাধারণ মাহুয়ের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। মাহুয় চিকিৎসা পায়না। প্রয়োজন মত চিকিৎসক নেই। বহু বিভাগে আছে শুধু সাইনবোর্ড। স্থানীয় মাহুয় বহু আবেদন করেছেন উদ্বৃত্ত কর্তৃপক্ষের নিকট। কিছুই হয়নি। তবে আশার কথা যে, এই মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন নিয়ে অতি সম্প্রতি এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেছে। সেই বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ সব আমলাই উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের দারি কল্লের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ এখনই করা দরকার সেগুলি হল এই যে, রুগীদের বাতায়নের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করা, মহানন্দা-বালাগন সেতু নির্মাণ করা, কলেজ ল্যাবরেটরীতে সমস্ত রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আউট-ডোরের সঙ্গে তা যুক্ত রাখা।

মেডিকেল কলেজ ঠোর থেকে ঔষধ সরবরাহ নিয়েও বহু অব্যবস্থা আছে বলে শোনা যায়। চিকিৎসা-প্রার্থীদের এবং কর্মচারীদের দাবী প্রয়োজনীয় ঔষধ-সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। আরও একটি প্রধান সমস্তা হল রুগী পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্সের অভাব। অ্যাম্বুলেন্স বাড়ানোর জন্য দাবী উঠেছে। মেডিকেল কলেজের আরতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। বিশ্বস্তভাবে জানা গেছে যে, বদলীর নির্দেশ পেয়েও বহু চিকিৎসক নানান অস্থিয়ার মেডি-কেল কলেজের কাজে যোগ দিচ্ছেন না। কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা চাহিদা অস্বাভাবিক বাড়ানোর দাবীও কম নয়।

এখানকার এক্সরে বিভাগে এতদিন কোন রেডিওলজি ছিলেন না।

হালে একজন এসেছেন। জনসাধারণের দাবী এক্সরে বিভাগকে ডেলে লাগাতে হবে। ভিজিটিং ফিজিশিয়ানদের নিয়মিত ইমডোরে হুবেলা রুগী দেখতে হবে।

দূর দূরান্ত থেকে যেসব মাহুয় চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন তাঁদের অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেন না। তাদের জন্য অবিলম্বে বিশ্রামাগার করা প্রয়োজন।

কলেজের দারিখণীল অনেকই একবাক্যে বললেন যে, এই কলেজে বর্তমানে যেসব বিভাগ চালু আছে সেগুলিকে সক্রিয় করে তোলা দরকার এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি নতুন বিভাগ খোলাও দরকার। টি বি ওয়ার্ড এবং নিউরো মেডিসিন ও নিউরো সার্জারি বিভাগ খোলার দরকার।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবিকার অভাবও এক প্রকট সমস্তা। সেই কারণে সেবিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনের কথাও কেউ কেউ বল-দেন।

হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যেও ধুমায়িত অসন্তোষ রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত অস্থায়ী কর্মী হিসাবে তারা কাজ করছেন তাদের এখনো স্থায়ী কর্মী হিসাবে গণ্য করা হয়নি। সে কারণে কর্মীরা বিব্রত। প্রয়োজন অস্থায়ী কর্মী আবাস না থাকার অনেককেই কাজে আসতে যথেষ্ট ব্যক্তি পোয়াতে হয়। মেডিকেল ঠোরকে ওয়ার্ড ভিত্তিক বিকেন্দ্রী-করণের প্রস্তাবও অনেক করলেন, কেননা তাতে রুগীদের অনেক সুবিধা হবে।

কর্মচারীদের সমস্তান সম্বন্ধিতের জন্য একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের স্থাপন করার কথাও অনেকে বলছেন। সেই সঙ্গে স্থায়ী বাজার ও একটি বাসগাও নির্মাণের দাবীও অনেকের।

দুর্গা

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
মাগাসিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা



টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্গা
৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

শৈরতন্ত্রের নয় কৌশল বনাম বামপন্থী আন্দোলনের ভৌতা অঙ্গ

বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

দর্পণ পত্রিকার ৪ঠা জুলাই সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত “নিরঙ্ক সঙ্গর প্রশস্তি মারফৎ রাজীবের আগমন পথ তৈরী হচ্ছে” রচনাটির সময়োপযোগী সাহসিকতা এবং সঙ্গর গান্ধীর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্পর্কিত যথাযথ আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ইন্দিরা রাজবংশের আত্মকৃত্য লাভ করে নিজেকে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারত-বর্ষের নীতিভ্রষ্ট রাজনীতিবিদেরা যখন অন্ধ আত্মগত্যা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এবং জনগণের মনে সঙ্গরকে লাক্ষ্য মুক্তি-দূত বানিয়ে একটা দেবোপস্থ ভাবমূর্তি একে দেবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই ধরনের আলোচনা জনগণের ভুল ভেঙে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বৈরতাত্ত্বিক শক্তির অত্যন্ত সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী যাকে অস্বল্প রাজ-মৈত্রিক আবিহাওয়ায় খুব জড়ত তৈরী হয়ে নিতে সবারকমের সাহায্য করে-ছিলেন তাঁর রাজত্বকে পুরুষায়ক্রমিক-ভাবে নেহরু পরিবারের ভোগদখলে রাখার জন্য তার আকস্মিক মৃত্যুতে যে বিরাট ধাক্কা বৈরতন্ত্রের অটল প্রাচীরটাকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রত্বের সঙ্গে বেষ্টন করে তুলিয়ে দিল তা সামলাতে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর স্ত্রীস্বামীর বিভিন্ন রণকৌশল অবলম্বন করতে হচ্ছে। নিরঙ্ক সঙ্গর প্রশস্তি এই রণকৌশলের প্রথম পদক্ষেপ। অস্তুতঃ এমন একটা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় যা আহত কংগ্রেস (ই) সৈন্যদের নতুন একজন রণনায়ককে দাঁড় করাবার কিছুটা সময় হাতে এনে দেবে। ততদিন জনগণ সঙ্গর-শক্তি গাইতে গাইতে নিজা থাক না। রাজীব হোক আর মানেকা গান্ধীই হোক—সম্পূর্ণ নতুন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনগণের মনে আচমকা কিছু যুদ্ধের চমক এনে দেওয়ার প্রতি-শ্রুতি নিয়ে রাজনীতির মঞ্চে নামতে হবে তাকে।

উপরিউক্ত কারণেই খুব ক্ষিপ্ৰ-গতিতে সঙ্গর গান্ধী নামক এক দুর্ভাবিত যুবকের (হুঁত্যাগ্রহে তিনি প্রাথমিক পুত্র) মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৈরতন্ত্রের অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক একটি চরম বিবাহাত্মক নাটকের মহড়া দিলেন রাজধানীর বৃকে। এচও হা হতাশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপতা সমস্ত নিয়ম ভেঙে শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করলো; কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে ছুটি দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল; তিন বাহিনীর

প্রধানেরা উর্দুপরে সঙ্গর গান্ধীকে অতিবাহন জানালেন; সঙ্গরের শোকমিছিলে যোগদানের জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে বিনে পরমায় দ্বিতীয় ভ্রমণের চালাও ব্যবস্থা হোল; জাতীয় পতাকাকে অবনমিত করা হোল, চিত্তাভ্রম নিয়ে বিভিন্ন নদীতে বিসর্জন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস (ই) নেতাদের পার-স্পরিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল; নাংবিধানিক অসংবিধানিক সমস্ত রকমের পদ্ধতিতে প্রচার যন্ত্রগুলিকে সরব করে (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য আকাশবাণী কলকাতার গদগদচিত্ত সংবাদবোবক মাননীয় দেবভূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত সাক্ষাৎ মিশ্রিত সঙ্গর-প্রশস্তি এবং প্রণবশ সেনের থেরো থেরো আবেগকম্পিত প্রবন্ধগুলির অসহ বাড়াবাড়ি) সঙ্গর গান্ধীকে তুলে ধরা হোল একজন দেবতারূপে যিনি ভারতবর্ষের পাপ-মুক্ত করতে ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট এক-জন অবতার হয়ে মর্ত্যধারে আগমন করেছিলেন।

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য রয়েছে। জনমানসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত বৈরতন্ত্রশাসিত তৃতীয় বিশ্বের একটা দারিদ্র্যপ্রাপীড়িত, অত্যাচার-ক্লিষ্ট দেশের জনগণের মনে—যারা যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বিশেষাধারা হয়ে হাতের কাছে যাকেই পাচ্ছে তাকেই মুক্তিদূত বলে মেনে নিয়ে আশার বেঁচে থাকছে আর আশা ভয়ের বেদনায় কাতরাচ্ছে—বৈর-তাত্ত্বিক শক্তির অপরিহার্যতাকে ছলে-বলে-কৌশলে প্রমাণ করা। প্রতিটি বৈরতন্ত্র কবলিত রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং রাজ-মৈত্রিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বৈরতন্ত্রকে একমাত্র স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা (দমন, পীড়ন, দমন এবং নিপীড়ন ব্যবস্থা) হিসেবে জীইরে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে বৈরতন্ত্র তার শাসন কার্যে করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে বেশ কিছুটা সফল হয়। ভারতবর্ষও এই সঙ্গর গান্ধীর ওপর আরোপিত দেবত্ববাদের ধারণাকে বেশ ঢাক ঢোল পিটে প্রচার করা হচ্ছে। কিছু সংবাদ-পত্রও এ ব্যাপারে শাসক শক্তির স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। বৈরতাত্ত্বিক শক্তির তাবোদার হিসেবে বুর্জোয়ারাও সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে আত্মরক্ষার বর্ম করে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মাধ্যমে

প্রতিমুহুর্তে বিস্তোহের ভ্রমহত্যার নিয়োগিত। শোনা গেল সঙ্গর গান্ধীর জীবনী নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরীর কাজও আরম্ভ হচ্ছে—নরক গোষ্ঠীর জনৈক ভ্রামল ঘোষ সঙ্গর গান্ধীর জীবন নিয়ে যাত্রাপালার হাত দিতে যাচ্ছেন। জনগণ যাতে এই বিপজ্জনক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন আরো বেশী করে তার চেষ্টার বৈরতন্ত্র সমস্তরকমের অপচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেই যুব কংগ্রেসের নেতা যাকে মরণোত্তর বহু-প্রশংসিত মাননীয় দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের তথাকথিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তরফ থেকে—তারের সকলেরই কিন্তু এক উদ্দেশ্য—ভেঙে যাওয়ার ভয়ে নিজেকে ভারসাম্যকে রক্ষা এবং শাসকশক্তির স্বনকরে এসে নিজেদের ক্ষমতার চৌহদ্ভিকে সুরক্ষিত করা। তাই এঁরা একটা কৃত্রিম বো হে মিয়ান কে—যার ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, ছিলওনা কোনদিন, যিনি ভারতের কোটি কোটি মানুষের জলন্ত ক্ষুধার সমস্তকে এড়িয়ে গিয়ে ১০০০০ টাকার জনতা গান্ধী বানা-নোর প্রচেষ্টার মারতি প্রোজেক্টকে বাস্তবায়িত করতে সরকারী ক্ষমতা এবং প্রভাবেকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, যিনি সরকারী ক্ষমতার ছত্রছায়ায় আদালত অবমাননা থেকে শুরু করে নির্মম ব্যক্তিহত্যা এবং তাঁর স্বার্থের পরি-পন্থী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যাপক ক্লিয়ারেন্স অশারেশনে নেমে-ছিলেন, যুবশক্তির সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল অংশকে ব্যাপক গুণামি করার নেতৃত্ব দিয়ে যিনি যুবশক্তির উদ্ধাম প্রকাশ দেখিয়েছিলেন, নির্বাচনী পরিকল্পনায় ইন্দিরা কংগ্রেসকে সাক্ষ্যের চাবিকাঠি এনে দেওয়ার জন্য বহু অবৈধ উপায় অবলম্বন করে-ছিলেন, নির্বিকারে হাজার হাজার বাড়ী যিনি বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; সংবিধান বহিঃসূত কর্তৃত্ব নিয়ে যিনি বীভৎসতম দমন-নীতির হোতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; অক্লান্ত অবস্থার জীবন্ত প্রতীক রূপে যিনি বহু অবস্থা অপরাধের অত্যন্ত নায়ক—সেই গণতন্ত্রের পরলো নথরের শত্রু, ক্যানীবাধী নায়কতন্ত্রের উদ্ভব পুরুষকে পরলো নথরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তি বলে চালাচ্ছেন। অক্লান্ত অবস্থার মূর্তিমান বিত্তীষিকা বলে যিনি এই সেদিন বহু পরিচিত ছিলেন, তিনি আজ কোন মায়াময়

বলে আনন্দবাজারী সাংবাদিকদের চোখে পুতচরিত্র সর্বভারতীয় জন-নেতা হয়ে গেলেন? এবারে একটু উটোদিকে চোখ ফেরানো যাক। এই পরিস্থিতিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবার মত ব্যাপার হোল বামপন্থী আন্দোলনের অস্তিত্ব অগ্রাণী বলে পরিচিত সি পি এমের (বিশেষ করে মাননীয় বাম-পন্থী নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর) তাঁদের পরলো নথরের শত্রু সঙ্গর গান্ধীর মৃত্যুতে এমন গদগদ-ভাবে কুস্তীরাষ্ট্র বিসর্জন একটা ভাবিয়ে তোলে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তি-গত শোকপ্রকাশের বাড়াবাড়িও আমাদের চমকে দেয়। মৃত্যু বহিঃ সমস্ত অস্ত্রের কৃতিত্বকে মুছে দেয় তাহলে বৈরতাত্ত্বিক শক্তির যুগ্ম প্রকাশ হিসেবে মুসোলিনী এবং হিটলারের মৃত্যুতে বোধকরি সারা জগতের মানুষের শোকে মুহূর্তান হয়ে থাকা উচিত কিন্তু বাস্তবে হয়েছে উটো। যুগ্মর তীব্রতা এত বেশী ছিল যে মুসোলিনীর মৃতদেহের ওপর এক মহিলা প্রকাশ্যে প্রস্তাব করেছিলেন। তুলনায় সঙ্গরের কৃতিত্ব পরিমাপগত দিক দিয়ে কিছুটা কম হলেও তিনি আন্তঃ আন্তঃ সোপানগুলো অতিক্রম করে উঠছিলেন বৈরতন্ত্রের ক্ষমতার শীর্ষে। বামপন্থী আন্দোলনের নেতাদের এই শোকপ্রকাশের বহর কি শুধু Official docorum? না সঙ্গর গান্ধীর মৃত্যুতে একটা ব্যাপক স্বত্তিবোধ—কোনটা? সাম্প্রতিক বামপন্থী কার্যকলাপ আমাদের কাছে একটা প্রশ্নকেই তুলে ধরে যে সশস্ত্র আন্দোলনের পথে পা না বাড়িয়ে পার্লামেন্টারী প্রথার আলোচনের আশ্রয় প্রদীপের মত বিপ্লবকে জনতার ঘোরগোড়ায় এনে দেওয়ার স্বপ্নে যারা বিভোর সেই সি পি এম নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কতখানি নিরঙ্ক আপোষের পর্যায়ে নামতে পারে। শোনা যায় এবং দেখা যায় জনগণের ওপর এখানে ওখানে একটা বিরাট প্রস্তাব রয়েছে এঁদের। তাহলে তো সংগঠন খুব দৃঢ়। তাহলে অস্তিত্ব রক্ষার এ হেন হীন কৌশল অবলম্বন কেন? অত ভয় কেন অস্তিত্ব রক্ষার? সঙ্গরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এঁরা এই ভাদে কি সেই ভাদে এমন একটা সন্ত্রস্ত মানসিক-তার রোগে ভুগছিলেন। এর এক-টাই মাজ কারণ—রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সরকার ছাড়া এঁরা হুঁটো জগতের মতই নিষ্ক্রিয়। কিছুটা পরিচয় বর্তমান

লেখকের রয়েছে গ্রামাঞ্চলের দৃষ্টি সেই পরিচয়ের আলোকে একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্যণীয়—ডোল ও কনসেনস বা অস্থানীয় লোভ দেখিয়ে এঁরা জনতার মধ্যকার বৈপ্লবিক বিক্ষোভকে বেশ কিছুটা মেরে এনেছেন। সাধারণ মানুষ কিভাবে পাঁচ কাঠা জরি পাওয়া যাবে সেই সুযোগের জন্যই পার্টিয় মিটিঙে যায়। এর বাইরে সামগ্রিক ভাবে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই কর-বার যে মানসিকতা অনেক অধ্যবসারে তৈরী করতে হয় তা সম্পূর্ণ উপ-ক্লিত। আমার মনে হয় ঠিক এই কারণেই যুব কংগ্রেসী মস্তানদের সামান্য একটা ধাক্কা এঁরা কাড় হয়ে পড়েন, পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বিপ্লবের জন্য এখানে ওখানে অল্প আত্মত্যাগকে এঁরা হঠকারিতা বলে উড়িয়ে দেন। এঁদের মতে বিপ্লবের সময় এখনো আসেনি। কবে সেই অনাগত কাল আসবে হবে সম্পূর্ণ পদপালের মত বিপ্লবী সেনারা রাষ্ট্রশক্তিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে? এঁরা বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন যে সংগ্রামের প্রকৃতি নিতে নিতেই কঠোর দৃশক কেটে যায়, বহু প্রাণ অকালে বিসর্জন দিতে হয়। প্রত্যেকটি কতি আমা-দের অনেক মূল্যবান শিক্ষা দিয়ে যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শে অস্থানীয় কোন ভিত্তিহীন সংগঠন নেই বলেই এঁরা যুব কংগ্রেসী ভাড়াটে মস্তানদের ব্যাপক রাজ-মৈত্রিক গুণামি এবং প্রতিশোধের প্রস্তাবে ঠেকাতে পারেন না। তাই এত ভয়।

বামপন্থী আন্দোলনের এই ভৌতা অস্ত্রের জন্য, সংশোধনবাদের ভয়াল প্রতিবিম্বী কার্যকলাপের জন্য ভারতবর্ষের অনেক উপযুক্ত সময়, অনেক বৈপ্লবিক প্রহর বিনা উত্তাপে আপোষিত হয়ে গেছে এবং আজও যাচ্ছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ব্যাপক মরহত্যা, লুণ্ঠাণ, সংগ্রাম এবং পোজি-গত অত্যাচারের সবনাশা বহিঃপ্রকা-শের প্রকৃত উৎস যে অর্থনৈতিক এবং তার ওপর নির্ভরশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা এই মত্যাটা উপলব্ধি করার মত বামপন্থী মনোভাব খুঁজেই পাওয়া যায় না। কিভাবে এই ব্যাপক বিস্তোহের শক্তিপালী মানসিকতাকে (যার বর্তমান রূপ অত্যন্ত যুগ্ম নৃশংস প্রাণেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা) কাজে লাগানো যেতে পারে, সে চেষ্টা না করে এঁরা সব রাজনৈতিক সমাধানের বুদ্ধি শেখাংশ চম পুঁঠায়

হাওড়া বিজ্ঞানচর্চা গার্লস কলেজে বি এড বিভাগে দুর্নীতি

হাওড়ার বিজ্ঞানচর্চা গার্লস কলেজ পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মহিলা মহাবিদ্যালয়। এই কলেজে রয়েছে আর্টস, সায়েন্স, কমার্শ, ও বি এড চারটি স্ট্রিম বঙ্গলী হাওড়া ও কলকাতার চার হাজারের ওপর ছাত্রী। চারজন ভাইস চ্যান্সেলর একজন প্রিন্সিপাল এই বিশালবস্তু কলেজটির শ্রীমত: ও দিব্যবিভাগ চালান।

কলেজটির আর্টস, সায়েন্স ও কমার্শ বিভাগগুলি যথেষ্ট সুনামের মধ্যেই চলছে। পত্রী কার কল ও জরুরী কলেজগুলির তুলনায় যথেষ্ট ভাল। আর্টসের প্রায় সব বিষয়ে অনার্স রয়েছে এবং বর্তমান বছরের বি এ পাঠ টুতে সংক্ষেপে এই কলেজের ছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়েছে। গত বছরও এই কলেজের দুজন ছাত্রী বাংলা অনার্সে প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল। কমার্শে মেয়েদের একমাত্র কলেজ এখন থেকে অ্যাকাউন্ট-টেন্সিতে অনার্স পাচ্ছে মেয়েরা প্রতিবছর।

কিন্তু এই কলেজেরই বি এড বিভাগ সম্পর্কে অল্প অনাচার ও দুর্নীতির কথা লব্ধা শোনা যায়। বি এড বিভাগের খাতাপত্রের ভারপ্রাপ্তা হিসাবে রয়েছেন একজন উপাধ্যক্ষ। তিনি হলেন ডঃ শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী। সংগীতে রবীন্দ্র ভারতীয় ডক্টরেট, সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী চৌধুরী উত্তরভারতময় ভ্রাম্যন্ত পাঠ ও বেদপানের জ্ঞান প্রসিদ্ধ। তিনি সারা বছরই আজ আসাম কাল বারানসী গান গেয়ে বেড়ান। বি এড বিভাগটি কার্যত চালান দুজন অধ্যাপক। এরা ছাত্রীদের কাছে সংক্ষেপে টি কে সি ও এস বি সি নামে পরিচিত। এই দুজনই হলেন এই বিভাগের সর্বশক্তিমাম 'সেশ', এঁদের মজিতেই ছাত্রীদের হয় 'কপে হাতে বড়ি কপে চাঁদ।' ধর্মপ্রাণা শ্রীমতী চৌধুরী সারমের শ্রীতির জন্তও প্রসিদ্ধ। কলেজে যেদিন আসার অবসর তিনি পান পলকে তা আশামের টের পেয়ে বান কলেজ প্রাঙ্গণের সারমেরকুলের উল্লসিত উচ্চকিত আবাহনে। পবিত্র মহার্ঘ মুগা পরিহিতা চন্দন গন্ধ বিধুরা শ্রীমতী চৌধুরী প্রাঙ্গণে প্রবেশমাত্র সারমেরবেষ্টিতা হন এবং করুণাময়ীর মত তিনি সারমেরগণকে খাড়া বিতরণ করতে থাকেন। অধ্যক্ষের সংকীর্ণ জিকোণ গৃহ থেকে ক্লাসরুমগুলি পূর্ব সারমেরগণের দ্বারা পরি-কীর্ণ হয়। কলেজ ক্লাস নিতে অস্থবিধা বোধ করেন প্রত্যেকেই, উপ-

রক্ত যখন তখন ছাত্রীদের এমনভাবে সারমের দ্বারা আত্মপায়িত হতে হয় যে তলপেটে চোদটি বড়শি না ফুটিয়ে তারা শান্তি পায় না। কিন্তু সারমের বিতরণের প্রস্তাব তোলা হলেই বি এড বিভাগের ডি জি ওর প্রধান অধ্যক্ষজন হয়ে ওঠেন; অথচ বি, এডের ছাত্রীদের "অব্যাহতা" ও "অসৌজন্য"র অপরাধে বিতড়ন করতে তিনি বা তাঁর "হুই ভাই" বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ বোধ করেন না। বি-এড ছাত্রীদের বিতরণ ও বিভা-ডনে লব্ধাচা "হুই ভাই" কিতাবে উপাধ্যক্ষকে লামন ভজনে পারত্রিক রেখে মিলেদের ঐহিক ব্যবস্থা গুছিয়ে নিচ্ছেন তার কথা অমৃত লমান শোনাবে।

বি-এড বিভাগে দুর্নীতির দুয়ার তিনটি: (ক) অ্যাডমিশন বা ভর্তির সুযোগ (খ) টাইপেও বা বৃত্তি এবং (গ) এক্সকামেশন বা বহিঃসম।

(ক) প্রথমে ভর্তির দিকটা ধরা যাক। পাশকোর্সে বি এ পাশ করার পর মেয়েরা বলে থাকতে চায় না। বেহেতু বিয়ে বা চাকরীর লভাবনা সূদূর পরাহত তাই 'একটা কিছু নিয়ে থাকতে' মেয়েরা এসে ভীড় করছে বি-এড এ্যাডমিশনে। বিদ্যালয় থেকে পাঠান শিক্ষকের লংরকিত আসন এখন কমেই কমছে বলে 'ফ্রেসার'দের থেকেই প্রায় আড়াইশর মত ছাত্রী ভর্তি করা হয়। মোট অসুযোগিতা আসন তিনশ। এর শ আড়াই এর জন্ত প্রতি বছর হাজার হেডেক ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার বলে। অর্থাৎ ভর্তি হতে সুযোগ পায় মোট ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের ২৫% জন মাত্র। স্বভাবতঃ ধরাধরি চলে। এই কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী বোয়ের লং ও নিরমাহুগ বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি এতই নিরমাহুগ যে কলেজের শিক্ষক কর্মচারী কারো অসুযোগিতা জপারি করে। অসুযোগিতা জপারি করে একটি ছাত্রী ভর্তি বা বৃত্তি মঞ্জুর করেন না। সবটাই তিনি ছেড়ে দেন 'গণতন্ত্র' ও 'স্বাধীনতা' ওপর। কলেজ বি-এড বিভাগে চলতে থাকে রামধুম—'আমরা ছুটি ভাই শিবের গাজন গাই।' সিলেকশন টেস্টের নামে বি-এডের শিক্ষকমণ্ডলী হাজার হেডেক খাতা জমা পাচকে দেখে একরকম 'অনোরিয়ম' নিয়ে নেন। কলেজে ইন্টারমিডিয়াল পরীক্ষার খাতা দেখা ও ছাওলিং করার জন্তও 'অনোরিয়ম' একরকম বি-এড বিভাগেই চলছে। এই পরীক্ষার কলের ভিত্তিতেই যে ভর্তি হয় তা নয়। নানা রকম ক্যাকরা বার করে 'গ্রেস' মার্কস দিয়ে খাতার পাওয়া নথর

বাড়ান হয় এবং ট্যাবুলেশন করে "হুই ভাই" দ্বিতীয় দফা পারিশ্রমিক নেন। ধারা প্রথ করেন, তাঁরাই খাতা দেখেন এবং তাঁরাই ট্যাবুলেশন করেন। তত্তি পরীক্ষার এমন বিশ্ববিদ্যালয়োচিত সমারোহে আবার একই ব্যক্তি একজামিনার ও ট্যাবুলেটর হয়ে দুধকা অর্থ নেন।

কিন্তু এগুলি হল লম্বা দরজার পার্বনী। থিড়কি দরজার পার্বনী আসে সিলেকশন টেস্ট ও সিলেকটেড লিষ্ট প্রকাশের মধ্যবর্তী দিনগুলিতে। কলেজের সহ-কর্মীদের অসুযোগিতা একটি ছাত্রীও নির্বাচিত হন না। কেমনা ভয়ানক নীতিনিষ্ঠ অধ্যক্ষের মতে, যাদের জানাশোনা অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বা কলেজকর্মী নেই, তাদের প্রতি অবিচার তিনি করতে পারবেন না। একচক্ হরিণটি জেনেও না আমার ভাণ করে থাকেন 'বে বি-এড বিভাগের গুটি ছুই "জানা-শোনা"র "খাতা দেখা" ও "ট্যাবুলেশন"র ইচ্ছালা হাতি গলে যাচ্ছে। প্রায়ই এরকম পরিস্থিতিতে কলেজের কোনো কোনো প্রবীণ অধ্যাপককে পড়তে হয়েছে যখন তাঁদের কাছে কোনো অতি সরল কথা এসে আনতমস্তকে প্রায় করেছে—'স্বাধীন বি-এডে অ্যাডমিশন পেতে কত টাকা কার হাতে কিতাবে দেব?'

(খ) দুর্নীতির দ্বিতীয়রক্ত হল লরকারী বৃত্তি। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলে রাজ্য লরকার ফ্রেসার বি এড ছাত্রীদের সকলকেই ৪০ টাকা মাসোহারা দিয়ে থাকেন। যে কলেজে ফ্রেসারদের জন্ত যতগুলি ভর্তির আসন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঠিক ততগুলির জন্তই টাইপেওর টাকা কলেজে আসে। কলেজ কর্তৃক যদি মঞ্জুরীকৃত আসন-লম্বার ভর্তি সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলেই লকলে নির্বাচনে নিরপেক্ষভাবে বৃত্তির অর্থ পেয়ে ব্যয়বহল বি-এড পাঠ শেষ করতে পারে। কিন্তু বি-এড বিভাগের "হুই ভাই" মিহাকণ 'ছাত্রী কল্যাণে ব্যাকুল' হয়ে নির্ধারিত সংখ্যার থেকে কিছু বেশী ছাত্রী ভর্তি করবেনই। আহা, মেয়েরা পড়তে পাবে না? তাছাড়া ডেপুটেড টিচারের অভাবে যখন আসন খালি থাকে তখন "যতগুলি টাইপেও ততগুলি ছাত্রী ভর্তি"-র ছাত্রার্থ বিরোধী নীতি 'আদর্শ শিক্ষক' হয়ে ধারা যেনে মেবেন কেন!

আর এই বাড়তি ছাত্রী ভর্তির রক্ত দিয়েই তৈরী হয় বি-এড বিভাগের অসুযোগ ও পক্ষপাত বিতরণের

স্বর্ণসুযোগ। 'মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি' নীতির কথা বলে মাত্র পাঁচজন সর্ব-সময়ের শিক্ষকের এই বিভাগটি কারেনী আর্থের একটি দুর্গে পরিণত হয়েছে। ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাস পাচক (পূজাবকাশ বাদে) থিয়োরিটিক্যাল ও জাহুয়ারী ফেক্সরারীর মাসখানেক প্রাকটিস টিচিং নিয়ে তথাকথিত এক বছরের কোর্স বি-এড ছাত্রীদের এক কলেজে কাটে নিহাকণ অসমান উবেগে। লরকার 'হুই ভাই' এবং মুক্তিপ্রাণা উপাধ্যক্ষের মমোরজন করতে তৈলারনের সে কি করণ প্রতিযোগিতাই না চলে তাদের মধ্যে। পথে পথে পথে ঘাটে প্রণাম তো আছেই (অথচ এই ছাত্রীদেরই

স্বৈরতন্ত্রের নয় কোশল

১ম পৃষ্ঠার পর

নিয়ে হাজির হয়েছেন। শাসক শক্তি যে এই সুযোগে বন্দুকের মলটাকে আঙুলে আঙুলে শোষিতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কারদা লুটছে—

অর্থনীতি

২য় পৃষ্ঠার পর

শিক্ষোৎপাদন ক্রমাগত কমছে এবং যেটুকু উৎপাদন হচ্ছে তারও আন্তঃ-রীণ বাজার নেই। সুতরাং অভ্র দেশের বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। ভারত ব্রিটিশ জাওয়ার কিমবে না করানী মাইরেজ কিমবে তা নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি উভয়েই ভারতের উপর চাপ দিতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন তৃতীয় দুনিয়াকৃত দেশ আরো বেশী বেশী লাম্বাক্যাবাদী চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। কলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মন কষাকষিও বাড়তে বাধ্য।

কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই বিপজ্জনক দিকটা ব্যাখ্যা করাই কি যথেষ্ট? আই এল ও বা পীস ফাউণ্ডেশনের সতর্কবাণীর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করাটাই এখন আর যথেষ্ট নয়। এই পরিস্থিতি পান্টাতে হবে। পুঁজিবাদী লম্বাক্যাবাদী বজায় রেখে এই সংকটজনক পরিস্থিতি পান্টানো যায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতি স্থায়ীভাবে পান্টাতে হলে, বিশ্বশান্তি স্থায়ীভাবে পান্টাতে হলে, গুণু বিবৃতি, চুক্তি ও ইচ্ছাহার প্রকাশ করাই যথেষ্ট হবে না। পুঁজিবাদী লম্বাক্যাবাদীকেই পান্টাতে হবে। যদি আমরা তা করতে এগিয়ে না আসি তাহলে করিগু পুঁজিবাদ বিশ্ববাসীকে চরম ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে।

যখন বয়স কম ছিল তখন তাদের প্রথম দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে নববর্ষে বিজ্ঞানর পরও প্রণাম করতে দেখা যায় না) এছাড়া রয়েছে সমাতম ভারতীয় আদর্শে গুরুদক্ষিণা। বজ্র, মিষ্টি ও 'কিষ্টি' তিন প্রকারের এই প্রণামী আসে। এ সবের লক্ষ্য ছুটি—(১) টাইপেও তালিকায় নাম ওঠা এবং (২) লটিক সাজেসচান লাভ এবং ফাইনাল টিচিংয়ে উচ্চ নথর পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অর্জন। বৃত্তির অর্থ লাভের জন্ত নির্বাচনী পরীক্ষা হয় প্রতিবছর পূজার দুটির আগে অথচ তার ফলা-ফল বা ভাগ্যবতীদের তালিকা প্রকাশিত হয় ছমাস পরে মার্চ এপ্রিলে। এত দেরী কেন? রহস্তটা এখানেও।

শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠার

এই গুণ রহস্তটা অনেকে জেনেও না আমার ভাণ করছেন। শোষিতের সংগ্রামের মেধাও ভেঙে দেওয়ার এইটেই বোধহয় সহজ পথ। ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে লাম্বাক্যাবাদী যুদ্ধে পরিণত করে শাসক শক্তি এবং তার ভাবকে 'বিজ্ঞানতাবাদী' বলে খুব চোঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সংহতি বিপ্লব হওয়ার বিপদের আশঙ্কায় এঁদের হাতের ঘুমও ছুটে যাচ্ছে। অথচ এই সব অঞ্চলের প্রতি ভারতবর্ষ কতটুকু উন্নয়নমূলক বন্ধুদের হাত বাড়িয়েছে যে আজ ভাই ভাই বলে ডাক দিয়ে বাঁধতে চাইলে এরা পাশে এসে দাঁড়াবে? বাঁধবার জন্ত তো এত-কাল শেকল ব্যবহার করা হয়েছে, সি আর সি মিলিটারী নামিয়ে চালানো হয়েছে, মিসীডন—আজ কেন জাতীয় সংহতি রক্ষার বিপদে লগুঙও হয়ে যাওয়ার ভয়ে সোলাজ-বোধের আত্মনা?

এই গণ আন্দোলনের ব্যাপক জোয়ার—যাকে ভুল পথে চালানো হচ্ছে, এই জোয়ারকে কিতাবে সংহত করে বন্দুকের মলটা থৈরতন্ত্রের তাব-দায় এবং তল্লিবাহকদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়—এটাই বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। থৈরতন্ত্রের সঙ্গে এক আসনে বসে রাজনৈতিক লম্বাধানের হাতকর প্রচেষ্টার কোন কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী শক্তিকে বৃথা লম্বা অতি-বাহিত করতে দেখলে বামপন্থী আন্দোলনকে ভোঁতা অজ্ঞ বলে ধরে নিতে আপত্তি কোথায়?

এবারের ফুটবল লাগে তিন প্রধানের গর্ব খর্ব

রাণা ভট্টাচার্য

৮০-র মরশুমে কলকাতা ফুটবল লীগের তিন প্রধানের প্রাধান্যকে খর্ব করে দিয়েছে ছোট ছোট দলগুলো।

প্রথম খেলায় মোহনবাগান এক্স লসিলনিকে চার গোলে হারানোর পর পুলিশ, ইষ্টার্ন রেল মোহনবাগানকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। এর মধ্যে ইষ্টার্ন রেল মোহনবাগানের কাছ থেকে একটা পয়েন্ট কেড়ে নিয়েছে খেলা অমীমাংসিত রাখার সুবাদে। পুলিশ দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করে এই মরশুমে। একমাত্র ভাটসজ্জকে মোহনবাগান খসিয়ে ৬-০ গোলে হারিয়েছে।

প্রত্যেক খেলাতেই মোহনবাগানের গোটা টিমটাই এখনও পর্যন্ত খুব খাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারছে না। প্রশ্ন, গৌতম ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ক্রীড়া দক্ষতা দিয়ে আক্রমণ ভাগকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেও আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন নি। বিদেশি, পায়ালরা বোঝাপড়া করে পরিকল্পনা মার্কি খেলার থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যই বেশী করে দেখাতে চেষ্টা করেন। কলে সামগ্রিকভাবে দলকে ব্যর্থতার বোঝা বহিতে হয়েছে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম খেলায় বাটাকে দু'গোলে হারালেও এখন খুব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খেলতে পারছে না। রেলওয়ে এক সি এবং বি এন শামশানের ধ্বংসাত্মক

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

দেশ—এই আশ্বাদের গ্রাম—হাফ-জিরজিরে নেংটিপরা আশ্বাদের তেজিশ বছরের ঘোবন। যেখানে নদীর বাঁধ ডিভি সির ক্যানেলের বাঁধ ছাড়া রাস্তা নেই, যেখানে পায়রাউডার জীপ রেখে দুই আড়াই কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যেতে হয়, প্রধানকার অনেক মানুষ আজও বিছানা আলো বা গাড়ী দেখেনি। কতকাল আর কতকাল কতোগুলি নতুন ভেরী গ্রাম এমনি অন্ধকারে গরীবের যুবতী অনুচ্চ মেয়ের মতো কাঁদবে তেজিশ বছরের ঘোবনে? কতকাল আর, কতকাল এমনি কাঁদতে হবে?

আর-এর বিরুদ্ধে ইষ্টবেঙ্গলের জয় আকস্মিক বলাই বোধহয় সঙ্গত।

রেলওয়ে এক সি-র বিরুদ্ধে প্রায় শেষ মুহুর্তে মনোরঞ্জনর দেওয়া গোলে ইষ্টবেঙ্গল এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট হারাবার দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পায়। প্রথম পয়েন্ট হারাবার অবস্থায় ইষ্টবেঙ্গল পড়েছিল বি এন আর-এর বিরুদ্ধে। খেলা শেষ হওয়ার ২১ মিনিট আগে মজিদ এবং তপন দাসের দেওয়া আকস্মিক গোলে ইষ্টবেঙ্গল কোনক্রমে একটা পয়েন্ট হারাবার সম্ভাবনা থেকে রেহাই পায়।

ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা দুর্ভাগ্য বলেই মনে হচ্ছে না। একমাত্র মনোরঞ্জন প্রায় একাই সমগ্র রক্ষণভাগটা আগলে রাখার চেষ্টা করছেন। অবশ্য প্রবীণ হাবিবও মাকে মাকে নিচে নেমে এসে রক্ষণভাগকে সাহায্য করছেন। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের কোন খেলোয়াড়ই সুবিধা করতে পারছেন না। মজিদ এবং জামসেদ কলকাতার ভিজে মাঠে নিজেদেরকে এখনও অভ্যস্ত করে নিতে পারেননি। খেলোয়াড়রা কোন ছকে খেলছেন বলে মনে হয় না।

মহামেডানের অবস্থাও খুব কাহিল। তারকাখচিত মহামেডান দু'গোলে বেহালা ইয়ুথকে হারিয়ে এ বছরের লীগের স্তম্ভ স্থচনা করলেও পরবর্তী খেলাগুলোতে কোনক্রমে লজ্জাকরভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে পয়েন্ট বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। সালকিয়া ফ্রেণ্ডসের বিরুদ্ধে বিতর্কিত পেনাল্টি কিকে একটি গোল দিয়ে এবং প্রথম ডিভিশনে নবাগত মির্জাপুরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী গোল করে কোনক্রমে পয়েন্ট হারানোর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

মহামেডানের কি রক্ষণভাগ, কি আক্রমণভাগ প্রথম থেকেই পরিকল্পনাবিহীন খাপছাড়া ফুটবল খেলে চলেছে। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা কখনই প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বল দলগুলোর রক্ষণভাগের কাছে খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন না। আর বিপক্ষ দলের কাছে যোগ্যতার খেলার বারবার হেরে গিয়ে হুরজিতের মত ভারতখ্যাত আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা লিপ্ত হয়ে বিপক্ষ

দলের নবীন খেলোয়াড়দের মারধোর করছেন এবং এগিরে আসা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের অশোভনভাবে ট্যাকল করছেন।

উয়াড়ীর বিরুদ্ধে মহামেডানের খেলায় হুরজিত এক দুঃখজনক মজীর রাখল উয়াড়ীর তুবার চক্রবর্তীকে ঘেরে। তুবারের অপরাধ সে হুরজিতকে গোল করা থেকে বঞ্চিত করেছে সময়মত আইমসজত বাধা দিয়ে। এই ঘটনা ক্রীড়া মহলে যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট ক্লাবগুলো বড় দলগুলোর খেলোয়াড়দের এবং দর্শকদের আচরণে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

মোট কথা চলতি লীগে দু-একটা দল বাদ দিলে বাকী দলগুলোর বিরুদ্ধে হুম্মর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়ে তুলেছে। এদের মধ্যে রেলওয়ে এক সি, ইষ্টার্ন রেল, বি এন আর বেশ শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে। ইষ্টার্ন রেল ইষ্টবেঙ্গলকে এবং বি এন আর মোহনবাগানকে যথেষ্ট বেগ দেবে বলে মনে হচ্ছে।

জনসেবা সমিতি

সম্প্রতি জনসেবা সমিতি নামে একটি অরাজনৈতিক সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। উদ্দেশ্য: তপশীলি ভাতি, উপজাতি এবং সেই সঙ্গে বর্ণ হিন্দুদেরও সেবা করা। এরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের কাছে একটি দাবিসনদ পেশ করেছে।

দাবিগুলি হল (১) অবিলম্বে ১নং হরিনাথ দে রোডে (ডোমপাড়া) বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করতে হবে; (২) দুঃস্থ শিশুদের জন্য কুটি, দুধ ও পুষ্টি প্রকল্প চালু করতে হবে; (৩) সরকারী ডাক্তারখানা ও সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) মানিকতলা খালের ধারে যেখানে দি এম ডি এ বাগান করেছে সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার পার্ক করতে হবে; (৫) মানিকতলা ডোমপাড়া বস্তির জমি অধিগ্রহণ করে বস্তিবাসীদের মধ্যে বসবাস করার জন্য বিলি করতে হবে; (৬) প্রায় পাঁচ হাজার বস্তির লোকের পায়খানা নেই। যদিও দি এম ডি এ পাঁচ হাজার লোকের জন্য একটি মাত্র পায়খানা করে দিয়েছিল তাও বহুদিন ধরে বন্ধ। একমাত্র খালবার ছাড়া উপায় নেই। এই বিজ্ঞী অবস্থার অবসানের জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এখানে একটি গভীর নলকূপ তিন চার বছর ধরে অকাজে হয়ে পড়ে আছে। সৈটিকে অবিলম্বে চালু করা দরকার। এছাড়া আরো দাবি রাখা হয়েছে।

বি এড বিভাগে দুর্নীতি

৮ম পৃষ্ঠার পর

(গ) বৃত্তিপ্রাপকগণের তালিকা বার্ষিক এক্সকারশান সেরে না আসা পর্যন্ত প্রকাশ করা যায় না। এক্সকারশান হল এই কলেজের বি-এড বিভাগের মধু আহরণী। প্রতিবছর এ সমিতি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রাও অধ্যক্ষের সঙ্গে এক পশলা বিনম্রাং লেগে থাকে। ফুগোল বিভাগের পৃথক এক্সকারশান হয়। ফুগোলের পাঠ টাইম অধ্যাপিকা বি-এড বিভাগে একঘরে, কেননা তিনি তাঁর গ্রুপের এক্সকারশানে যে অর্থবরাদ চান তা পান না। এই এক্সকারশান কে কণ্ঠাঙ্কিত করবেন তা নিয়ে অনেক সমস্কার ও বিসদৃশ ঘটনা কলেজে ঘটে গেছে। সম্প্রতি 'দুই ভাই' আপোষে মীমাংসা করে নিয়েছেন যে একজন এক্সকারশান এবং অন্ততন সোশাল ও স্পোর্টস কণ্ঠাঙ্কিত করবেন। এক্সকারশান কখনই কাছে পিঠে করা হয় না। হয় কাশ্মীর, হরিদ্বার, দার্জিলিং, নয় কল্যাণ-রিকা, অজ্ঞাত ইলোরা। তিনশত টাকার ওপর ছাত্রীদের দিতে হয়। খুবই কষ্টকর তাদের পক্ষে বেড়ানোর জন্য খরচ করা, কিন্তু না গেলে নাকি প্রোফেসরের সঙ্গে সে রিলেশান হয় না যার দ্বারা অব্যর্থ সাজেশান ও ফাইনাল টিচিংয়ের সময় পিতৃহৃদয় মিলবে এবং টাইপেও তালিকারও নাম খুলতে পারবে।

বি-এড বিভাগের এক্সকারশান প্রতিবছরই কলেজকারীর অধ্যায় রচনা করে চলেছে। বিভাগীয় দুজন অধ্যাপক মজীক এবং ধর্মপ্রাণী উপাধ্যক্ষা স্বামী পুত্র ভগিনী প্রাক্তন ছাত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে বাজা করেন এবং শিক্ষামূলক ভ্রমণ বাজীদের মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় বহিরাগতগণ। মুখে তাঁরা বলেন, তাঁদের আত্মীয় পরিজনগণ পৃথক টাকা দিয়ে গেছেন ও থেকেছেন। অথচ কনসেসন রেল টিকিটের সুযোগ থেকে হোটেল ভাড়া সবই হয় যৌথ খরচে। ১৯৭৯ সালে 'বড় ভাই' এর নেতৃত্বে কল্যাণ-রিকা ও দক্ষিণতরত ভ্রমণ করে এল বি এড বিভাগ। অধ্যক্ষকে উড়ো চিঠি ও ভৌতিক টেলিফোন জানিয়েছে যে মাত্রাঙ্কে টিকিট কম থাকার অপরাধে টি টি সি কলেজের কাছ থেকে এক হাজার পাঁচ শত টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এই ধরনের লজ্জাকর অপরাধের জন্য এই কলেজকে র‍্যাঙ্কলিটেড করে ছাত্রীদের রেলওয়ে কনসেসন বন্ধ

করে দেবার কথাও উঠেছে। একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই বধ-মামের ভাগী করার জন্য বাঁদের দুর্নীতি দ্বারা কলেজ পতনিত বডি তাঁদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেবেন?

মজার ব্যাপার হল, কলেজের অধ্যক্ষ এই বিভাগের সব দুর্নীতি, পক্ষপাত ও খেচ্ছাচারের খবর রাখেন এবং এসব বন্ধ করতেও তিনি প্রকৃত আগ্রহী। কিন্তু জয়কাল থেকে এই বিভাগটিকে অলিখিত অটোনমি দিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যে বর্তমান অধ্যক্ষ লড়াই করেও পেরে উঠছেন না। এ বিভাগের বৃত্তি, সাজেশান ও ফাল্ট ক্লাসের আশায় মূখ বুজে সুবোধ বাজিকার মত স্তারেরের দাপট সেরে যায়, কেউ হঠাৎ স্পাটাকাস হতে চাইলে দল বেঁধে স্তারেরের হয়ে সতীর্থকে টিপে মারতে আসে, তুলেও ইউনিয়ন ফি দিয়েও ইউনিয়ন গড়ার কথা তুলে 'দুই ভাই ও বড়দার' বিরাগভাজন হয়না। আর এরই সুযোগ নিয়ে এই বিভাগে আবহমান চলছে দুর্নীতি ও উপরি উপার্জনের ঢালাও সমারোহ। অধ্যক্ষের হাত পরিচ্ছন্ন কিন্তু নিরস্ত্র। সর্বদা হাফাকার করছেন এবং নিফল আফালনে খপতোক্তি করছেন 'আর একটু দেখি...'।

স্বার্থবর্হী তিনি এবছর এপ্রিলে জুলে জুলে বি-এড ছাত্রীদের প্রাক-টিস টিচিং দেখতে গিয়েছিলেন। তাতেই মোচাকে ঢিল। অধ্যক্ষ এতদ্বারা বি-এড বিভাগীয় অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণকে অপমান করেছেন... এর প্রতিকার চাই...আন্দোলন শুরু হল বলে। প্র্যাকটিস টিচিংয়ে গেলে অধ্যাপকগণের দৈনিক ভাতার হার যোল টাকা, ছাত্রীদের টাকার ঐ কদিন তিন কোর্স আহারাধি অতিরিক্ত, কারণ এমনিতেই তো আহারাধি থেকে গরমের দুটি পর্যন্ত দুটি।

এ একভারি স্বর্গরাজ্য। দেড় হাজার টাকা মাসিক বাধা মাহিনা, বছরে সর্বাধিক পাঁচমাস ক্লাস, দু'মাস প্র্যাকটিস টিচিংয়ের আউটডোর এ্যালাউন্স দৈনিক যোল টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখা ও ট্যাবুলেশনের হাজার দুয়েক দক্ষিণা, বি-এড কলেজগুলির ফাইনাল টিচিংয়ে এক্সটার্নাল একজামিনারের সম্মান দক্ষিণাদি ছাড়াও নিজ কলেজের অ্যাডমিশন টেষ্টের খাতা দেখা ও ট্যাবুলেশনের 'অনোররিসম'। এততেও ভরিলনা চিত্ত, তাই সপরিবারে সারা ভাতা বিনা ব্যয়ে ভ্রমণের পরেও জরিমানা! সত্য সেলুকাস, কী বিচিহ্ন এই দেশ ও এর সম্ভাবনীয় শিক্ষককুল।

ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ

২৬শে জুলাই ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশন অনশন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক আইন-জীবী সংঘের পক্ষে শ্রীমান গুপ্ত, শ্রীঅরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এক দাবাদিক সম্মেলনে ঐ ধর্মঘটের হুমকিকে নিছক রাজনৈতিক রণধ্বনি আখ্যা দেন। যে ল' ইয়ার্স এসো-

সিয়েশন এ তাৎকালিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের বিন্দুযাত্র প্রতিবাদ জানাননি, বরং যে এসো-সিয়েশনের বহু মেতাই জরুরী অবস্থার সমর্থক ছিলেন তাদের হঠাৎ দাবি পেশ করেই, রাজ্য সরকারকে আলোচনার সময় ও অবকাশ না দিয়েই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া অবতাই অব্যোক্তিক।

ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশন যে প্রচার করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ কোটি টাকার অর্থদান দিয়েছে সেটি নাকি মিথ্যা। মাত্র ৪ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এবং এ বছর ৮৫ লক্ষের মত পাওয়া যাবে। এই টাকার সমস্তটাই নতুন কোর্ট বিল্ডিং ইত্যাদির জন্য ব্যয় হবে। কোর্ট ফী অথবা স্ট্যাম্প ফী কেটে আইনজীবীদের জন্য প্রতিভেদে ফাণ্ড চালু করার যে দাবি ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশন করেছে, তা একেবারেই বেআইনী। কারণ কোর্ট ফী বা স্ট্যাম্প ফী আইন-জীবীদের রোজগারের কোন অংশ নয়। আইনজীবীরা সরকারী কর্ম-চারীও নয়, যে সরকার তাঁদের প্রতিভেদে ফণ্ডের ব্যবস্থা করবে। গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের মতে ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের লোভ শেড়িয়ে কেঁকানোর জন্য কোর্টে বিকল্প ব্যবস্থা বিপুল ব্যয় লাগবে যা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ফাদারের বাড়ি

১ম পৃষ্ঠার পর

মিছিলকারীদের সঙ্গে হোলি চাইল্ডের পাত্রী সাহেবদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং ঐ চার্চের কয়েকজন জুনিয়ার ফাদার অর্থাৎ বাদেয় ব্রাদার বলা হয় তারা আদিবাসী গ্রামে বসবাস করছে ও ছুটিমাসজুলায় কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে

বাঁ হুড়া জেলাতেও বিশেষতঃ লোনাখুঁচী, পলাশতলা, রাজামাটি, ধুলুই-লাহাপুর, গৌর-সন্তোষপুর, পাঁচকুল, বিজ্ঞানপুর, চৈতন্যপুর, পাথর মৌরা, রাধানগর, মোহনপুর, বনপাকুলে, শালহাট, রাওতারা ইত্যাদি জায়গায় আদিবাসী ও উপ-জাতিরা মিশনারীদের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে বাঙালী বিরোধী চক্রান্ত রচনা করছে।

রাজবংশীদের

১ম পৃষ্ঠার পর

এদেশীয়দের শোষণ করে আজ পুঁঠ। আজ তারা জলপাইগুড়ির ধনী-লোকদের একজন। আজ তাদের মাথা পিছু কয়েকশ একর জমি। এখন এরাই রাজবংশীদের বোকাছে কি তাদের অধিকার কি তাদের দাবি।

উত্তরবঙ্গের নবুকের মত ঠাণ্ডা ছিলো আদিবাসীদের মন। তারা চিনতো মাদল, পুরব টোদি, রজি বা দেশীয় মদ আর অল্পরত্ন হালি। উত্তরবঙ্গে বহু আদিবাসী আছে, তাদের মধ্যে প্রধান রাজবংশীরা আর মধেশিয়ারা আর লুপ্তপ্রায় টোডোরা। এছাড়া আছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, মেপালী, ভুটানী, সিকিমীরা। এদের জীবন শুরু হোত

রুদবদল

১ম পৃষ্ঠার পর

নানা কারণে সঙ্গর গাছী এই দুইজন মজীর ওপর প্রচণ্ড চটে ছিলেন। এবং সঙ্গর গাছীর ঘনিষ্ঠ মহলের মতে এই দুইজন মজীকে বরখাস্ত করার ব্যাপারে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গরের মৃত্যুর পর অবস্থা পাল্টে যাওয়ায় এদের ব্যাপারে শ্রীমতী গাছী আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

মন্ত্রিসভার জায়গা পাবার জন্য এখন থেকেই অনেকেই মুকবি ধরা শুরু করেছেন। অবশ্য কেউই শ্রীমতী গাছীকে সরাসরি তাদের মনের কথা বলতে পারছেন না। ফলে তারা শ্রীমতী গাছীর ঘনিষ্ঠ লোকদের ধরা-ধরি করছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে মজীর প্রার্থীর সংখ্যা শ্রীমতী গাছীকে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ প্রত্যেককে কম বেশী কেউ না কেউ সুপারিশ করছেন।

তবে সঙ্গর-অঙ্গগামী কয়েকজন তরুণ লোকসত্তা সদৃশকে শ্রীমতী গাছী মন্ত্রিসভার নেবেন বলে জানা গেছে। এবং শ্রীমতী গাছীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কারভাবে জানা গেছে যে, বাদেয় আত্মগতের ব্যাপারে নেতৃত্বের মনে সন্দেহ আছে তাদেরকে মন্ত্রিসভার স্থান দেওয়া হবে না।

শ্রীমতী গাছী এখন আর কে ধাওয়া, মহম্মদ ইউসুফ, জগদীশ টাইটলার, প্রবন্ধ মুখার্জী, কমল মাধ, কমলাপতি জিগাঠী প্রমুখ বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করছেন।

পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যেক দিনের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে, জীবন শেষ হোত পাহাড়ের কোলে। অজুত হয়েলা লব গান, পাখি শিকার, নাচ এই ছিলো তাদের পৃথিবী। সাম্প্র-দায়িকতার ধাবা তখনও তাদের ওপর পড়ে নি। বার্ষিকোত্তীরা এদের বস্ত্র মনকে এমনভাবে কাজে লাগাচ্ছে যে আজ তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত। বহু বার ঠেকেও এরা এখনও বাইরের মানুষকে নিজের করতে চায়, তাদেরই আগত করে বক্তৃকে হালি নিয়ে। আজ শান্ত উত্তরবঙ্গের এই অবস্থা শুধু কিছু বার্ষিক্যবীর জন্ম। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে সেই লব সরল, দরাজ, বন্ধু-প্রাণ আদিবাসীদের কেউ নেই যে এই লব কপটতাকে ছিঁড়ে তার পিছনের নোয়া মনস্তলিকে নগ্ন করে তাদের সামনে রাখবে।

নতুন যাত্রাপালা

মজুরী অপেরা এবার যাত্রার আগের নামছে দুখানি পালা নিয়ে। মিহির দে রচিত "হাবসী হারেমের বাম্বা"র সম্পাদনা ও নির্দেশনার রয়েছে শক্তি মুখার্জী এবং সুর-যোজনায় সুধীর বসু। শক্তিপদ সিংহ রচিত সামাজিক পালা "ভাঙ্গনী বধু"-র নির্দেশনার রয়েছে শ্রীভাষর। মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন শ্রীকৃষ্ণার।

৮৭'র নতুন যাত্রাধল রঙমহল যাত্রা ইউনিটের তিনটি পালা নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব শেষ। ধীনবন্ধু রচিত ও সুধীর বসু সুরারোপিত রাজামাটি রাঙা বৌ। কানাই নাথ রচিত অমিয় ভট্টাচার্য সুরারোপিত অভাগিনী বিফুপ্রিয়া ও সনৎ তরুণদার রচিত অজিত বসু সুরারোপিত মতী মজহু। এ দলে যোগদান করেছেন যাত্রাশিল্পী মোহিত বিশ্বাস।

শ্রীমতী গাছী পুস্তক সম্বন্ধে

পর্ব প্রকাশন

- ১। গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব / শ্রীপ্রতীপকুমার চৌধুরী / ১২'০০
- ২। ইলেকট্রনিক্স / ডঃ অনাদিনাথ দা / ১২'০০

৬এ, রাজা সুবোধ মজিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডবলু ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অধুমোদিত ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুত-কারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে নীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং : ই সি এল/জি এম/এস এল এন/ইজ (নি)/২৬৫৩ তাং ২৪ ৬-৮০
লালগঞ্জ জেনারেল ম্যানেজারের অফিস নির্মাণের জন্য। আনুমানিক খরচ ৭,৭৮,৭৭০ টাকা। বেশিরভাগ কাজে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা মগধ দিয়ে ১৫-৭-৮০ থেকে ২১-৭-৮০ পর্যন্ত-বার্ষিক কাজের সময়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, সালানপুর এরিয়া, পোঃ কুমারপুর, অশোক-পলী, আসানসোল-৪ থেকে টেন্ডার হাজির পাওয়া যাবে। ২২-৭-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে ৩-৩০টার খোলা হবে। জমা দেবার তারিখ থেকে ছয় মাসের জন্য টেন্ডার উন্মুক্ত রাখা হবে।

সামান্যতঃ উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ বিভিন্ন টেন্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। বায়নার টাকা-(আনুমানিক খরচের ১%) "কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইস্টার্ন ডিভিসন) এ/সি সালানপুর এরিয়া" নামে আসানসোলে দেয় যে কোন রাষ্ট্রকৃত ব্যাঙ্কের ওপর এ/সি পেয়ী ডিমাণ্ড ড্রাকটের আকারে জমা দিতে হবে। টেন্ডারের সঙ্গে বায়নার টাকার রসিদ পাঠাতে হবে, যা না পাঠালে টেন্ডার বাতিল করা হবে।

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডবলু ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে নীল করা টেন্ডার :

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ

রেফা: নং : ০৩৭৭ / পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া / কে টি ডি বাক্সার তাং ১৭-৭-৮০
অজয় নদ থেকে খোটাডিহি বাক্সারে ৮০,০০০ কিউ মি বালি সরবরাহের জন্য। বেশিরভাগ কাজে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা নগদে দিয়ে (অগ্রত্যাগপনযোগ্য) ১৫-৭-৮০ থেকে ৩১-৭-৮০ পর্যন্ত অফিসের সময়ে (সম্পূর্ণ কাজের দিনে সকাল ৯'৩০টা থেকে বেলা ৩'৩০টা এবং শনিবার সকাল ৯'৩০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত)। ১৮-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩'৩০ টায় খোলা হবে।

সামান্যতঃ প্রস্তাবের সঙ্গে প্রস্তুত মূল্যের ১% বায়নার টাকা ডিমাণ্ড ড্রাকটের আকারে জমা দিতে হবে। উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেন্ডার-দাতাদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড ডাকে ঘেরি হবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। পোষ্টাল অর্ডার/ ব্যাঙ্ক ড্রাকট/ চেকে পাঠানো টেন্ডার ফী গ্রহণ করা হবে না। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ বিভিন্ন টেন্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। অন্ত্যাত্ত বিবরণ উপরিউক্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

অন্যতঃ কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৬৭৪ কাপালয় ৩১, হট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

ই-কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনিষে আসছে

দপন

অগ্নিবিশ্ব বর্ষ ২৭শ নংখ্যা ১১ জুলাই ১৯৫০ ৬০ পয়সা

সঙ্কটময়স্থিতির খবর করে রাজীব রাজনীতিতে আসতে চাইছেন

ইন্দিরা গান্ধীরও একই উদ্দেশ্য

সময় গান্ধীর মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র মুখার্জী জেনেতা থেকে দিল্লী আসেন এবং দিল্লী থেকে কলকাতায় কিংবদন্তি প্রিয় দাসমুখীকে সঙ্গে দেখা করেন। স্বতন্ত্র মুখার্জী দাসমুখীকে অস্বস্তি করেম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক সঙ্গে সি পি এমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। প্রিয় দাসমুখীর সঙ্গে সমঝোতার জন্য স্বতন্ত্র মুখার্জী দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীকে ধরেন। স্বতন্ত্র মুখার্জীর কথা শুনে দাসমুখী তাকে বলেন, "তোমাদের সংগঠনের ভেতরের অবস্থা খুব খারাপ। গুপ্ত-বাজী আর মারপিট। আমার ঠাইল অব ওয়ার্ক-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি সেটা মেমে তোমরা কাজ কর তাহলে ভেবে দেখতে পারি। আর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা আমিই তৈরী কর বো—এটা আমার আরেকটা শর্ত।"

এর এক বছর মেতা দাসমুখীকে দিল্লী থেকে ফোনে ঐ একই ধরনের অস্বস্তি রোধ করেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, এসব ব্যাপারের পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন আছে। তাহলে কি ধরে নেব যে সময় জীবিত অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী সময়ের হাতে অসহায় ছিলেন এবং ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু করতে পারতেন না?

এখানে আরেকটা ব্যাপার জানাতে চাই। রাজীব গান্ধী আ পা ততঃ রাজনীতিতে আসছেন না—এটাই মোটামুটি সাধারণ মানুষের ধারণা। কিন্তু দিল্লীর খবর শ্রীমতী গান্ধী এবং রাজীব মনে করছেন এখনই রাজনীতিতে এলে রাজীবকে সময়সীমার ধারণা পড়তে হবে। কিন্তু রাজীব সেটা চান না বরং স্বতন্ত্র খবর আছে তাতে মনে হয় রাজীব এবং ইন্দিরা শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সঙ্কট আসছে দানা বেঁধে উঠছে। এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে একদল বিক্ষুব্ধ এম এল এ, মন্ত্রীমণ্ডলের আচরণে যারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীদের অপসারণ করতে চান।

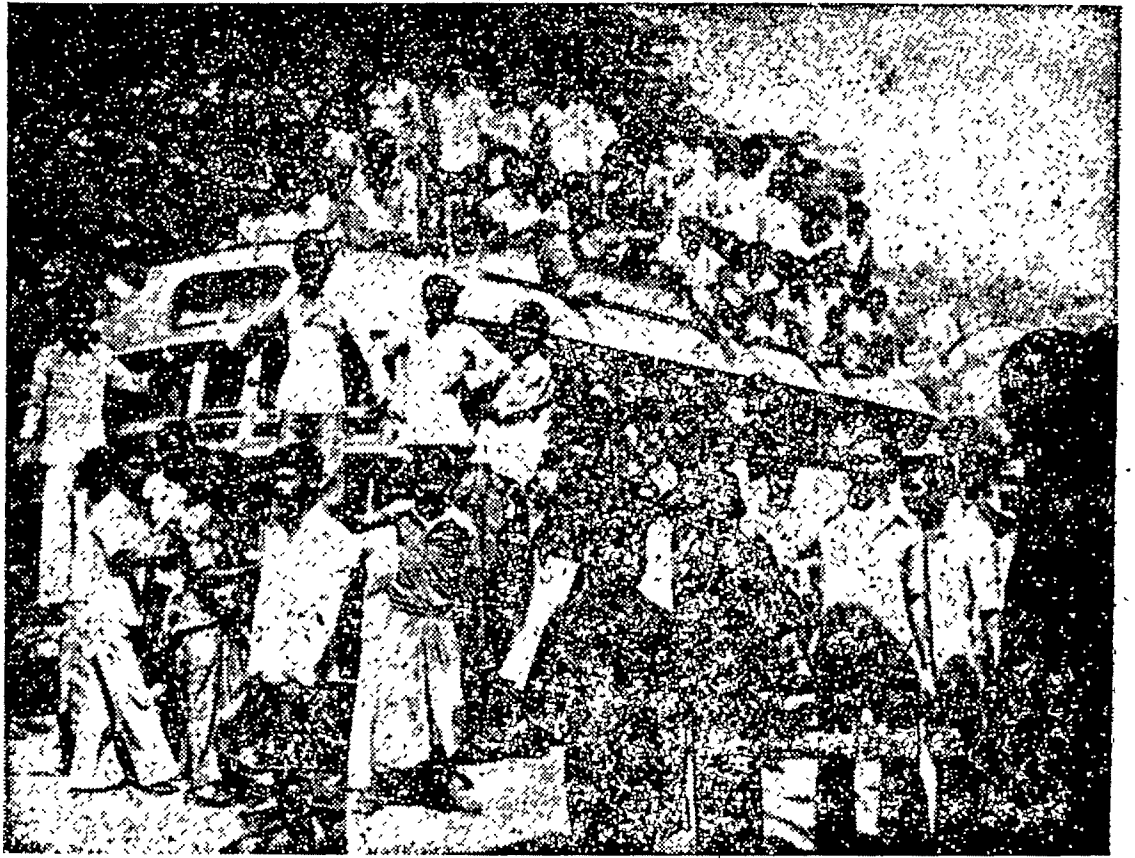
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে

বর্তমানে কংগ্রেস(ই) বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উজ্জয়িনী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর অঙ্গ, কর্ণাটক রাজ্যে শাসন কামতায় আছে।

বেশ কিছুদিন ধরে অঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী চেমা রেড্ডীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধতা জোট বাঁধছিল। প্রথম দিকে এদের লংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু এম এল এ এখন চেমা রেড্ডীর ওপর চটে আছেন নানা কারণে। এদের সঙ্গে চৌকস মন্ত্রীও আছেন। এরা পালাক্রমে দিল্লীতে আসছেন এবং ইন্দিরাগান্ধী কংগ্রেস (ই) হাই-কমান্ডের অন্তর্ভুক্ত নেতাদের কাছে

চরম পত্র দিয়ে যাচ্ছেন যে, চেমাকে না সরালে অঙ্গের মন্ত্রিসভা যেকোন সময় ভেঙে যেতে পারে। ওয়াকি-বহাল মহলের অভিমত চেমা বিরোধীদের মনোভাব থেকে মদত দিচ্ছেন অঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য মরদিনা রাও।

এদিকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, এবং মহারাষ্ট্রেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিরোধীরা জমশই জোট বাঁধা শুরু করেছেন। এর ফলে উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, বিহারের জগন্নাথ মিশ্র এবং শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়



বঙ্গো-বঙ্গো-বঙ্গো-বঙ্গো ১২, ১২-এ বাস কটের নিত্য বাজীরের যে কি রকম প্রাণ হাতে করে দৈনন্দিন বাতায়ত করতে হয় এটি তারই ছবি। বাসটির নং ৩৬১। বাস মালিক, পরিবহন মন্ত্রী, আর-টি-এর সমস্ত কারোই কি এদিকে চোখ পড়ে না? ছবিটি তুলেছেন স্টুডিও ইলোরা-বঙ্গো।

পুলিশের পাশবিক নির্যাতনে মৃত্যু

মটনাখল নাগপুর থেকে জিশ মাইল দূর, টারিস্ট কেন্দ্র রাস্তার পত তেইশে জুন দেখানকার জৈন মন্দিরের কিছু অলঙ্কার চুরি যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যে অসহায়ী পুলিশ তেরো বছরের বালক মতি ধীর ও তেজিশ বছরের রতিরাম

রাউথকে গ্রেপ্তার করে। এর পরেই শুরু হয় ওদের উপর নির্যাতন। রতিরামের মলমলের মধ্যে লোহার রড চুকিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা যে রতিরাম চুরি করার লোক নয়। তথাপি লক্ষ্যের বশে পুলিশ লাব-

ইনস্পেক্টার মি: তারে লক-আপে সব রকম খার্ড ডিগ্রি পদ্ধতি রতিরামের উপর প্রয়োগ করে। পুলিশ হাজতে পনেরো দিন থাকাকালীন রতি-রামকে একদিন নাগপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

রতিরামকে যখন ম্যাজিস্ট্রেট বাদবের আদালতে হাজির করা হয় সেদিন লক-আপে অত্যাচারের খবর শুনে শুনে জনতার ভিড় ভেঙে পড়েছিল। আলাদা রতিরাম আদালতকে লক-আপে তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতনের কথা জানান। ম্যাজিস্ট্রেট এই অভিযোগ শুনে তাঁকে মুক্তির আদেশ দেন ও ডাক্তার দিয়ে চেক-আপ করতে বলেন।

সেদিনটা ছিল চৌঠা জুলাই। শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

শিয়ালদহ স্টেশন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য

শিয়ালদহ স্টেশনে মহিলা কামরাসমাজবিরোধীদের দৌরাঙ্গো মহিলা বাজীরের জীবন ছবিবহু হয়ে উঠেছে। আর এদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কিছু ভ্রাম্যমান-হকার ও মোংরা চরিত্রের কিছু মেয়ে। এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মহিলা কামরার পেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দৈহিকভাবে

মেয়েদের ইচ্ছিত হননের চেষ্টা করে। শিয়ালদহ, দমদম অংশন, বারাসাত এই তিনটি জায়গা ওদের দৌরাঙ্গোর কেন্দ্র। অনেক সময় পুলিশের ডিউটি থাকা সত্ত্বেও ঐ সমস্ত সমাজবিরোধী-দের কাছ থেকে টাকা খেয়ে গাড়ী থেকে নেমে যায়। শিয়ালদহ স্টেশনের তেতরে সমাজবিরোধীদের ৩ নিষিদ্ধপত্রীয়

মহিলাদের আধিপত্য এমন তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, নিত্য বাজীরী আশংকা প্রকাশ করছেন, অবিলম্বে ছবু-ভবের লংখ্যা বাজীরের অপেক্ষা বেড়ে যাবে এবং প্রাক্তন দিবালোকে চুরি, ছিনতাই, রাহা-জামি ইত্যাদি শুরু হবে। সাউথ, মেম, নর্থ প্রভৃতি সবকিছু লোকসম জুড়ে এরা নারী-পুরুষ (সমাজ-

বিরোধী) নির্বিশেষে তাঁর থেকে রাত পর্যন্ত মস্তপান করে উন্নত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় ও অসীল খিন্ডি-খেউড় এবং মারপিট করে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করে যে, বিশেষতঃ মহিলা বাজীরের পক্ষে টেনের জন্ত অপেক্ষা করা বিপদমণ্ডল হয়ে ওঠে। এবং সব থেকে বিষময়ের কথা এই যে, শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় বিনয় ঘোষ

৬৪ বৎসর বয়সে প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক বিনয় ঘোষের জীবনাবসান জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের। গত ৩০ বছরে তিনি বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে যেসব কাজ করেছেন তাতে অনেক নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, অনেক নতুন মূল্যায়ন হয়েছে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করলে বঙ্গদেশ ও বঙ্গবানী উপরুত হত।

বিনয় ঘোষ একেবারে প্রথম যৌবনে 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা' লিখে ছোটখাটো চাক ল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তখন তিনি কটর মার্কসবাদী, রাজনৈতিক বিশ্বাসের জোরে লেখার ভাষা ও বক্তব্য দুটোই তীক্ষ্ণ, যার সঙ্গে পরবর্তীকালের বিনয় ঘোষের যোগ সামান্যই, যদিও তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাস হারাননি এবং এই প্রগতিশীল ও দর্বাণনিক মতাদর্শই তাঁর গবেষণার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিনয় ঘোষ প্রথম জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুস্বরের 'অরবিন্দ' পত্রিকায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন তিনি সক্রিয় রাজনীতি করতেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও ছিলেন। তিনি যুগান্তর ও দৈনিক বঙ্গমতীতে কিছুকাল চাকরীও করেছিলেন। বঙ্গমতর মনে পড়ছে রণধীরের যুগে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব প্রচেষ্টার সময় দৈনিক বঙ্গমতী থেকে বিনয়বাবুর চাকরী গিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে গবেষক বিনয় ঘোষের জন্ম হয়। প্রথমে তিনি যুগান্তরে 'কালপেচার নকশা' লিখতে শুরু করেন, তারপর 'কালপেচার চকলম', যাতে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে জীবন্ত করে তোলেন। তাঁর পরবর্তী লেখা 'কালপেচার বঙ্গদর্শন', যেটি পুনর্লিখিত ও বহু নতুন তথ্য যুক্ত হয়ে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামে পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বিনয়বাবুর গবেষণা ও লেখার বিষয় ছিল বিশেষ করে ব্রিটিশ যুগের বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি (তার মধ্যে লোক-সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত)। তাঁর নিরাসক্ত ও মৈত্র্যাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক কিংবদন্তী ঘুলিমাংস, অনেক কিংবদন্তীর নায়কের পতন হয়েছে, অনেক অসত্যকে কবর দিয়ে তিনি নতুন উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় লেখাতেও লিখতেন এবং বহুকাল আগে 'ক্রিয়ান্দ' ছদ্মনামে এই ধরনের লেখা লিখতেন।

যারা বিনয়বাবুর পরিচিত বা খবির্ত তাঁদের কাছে তাঁর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, নিরসাহবৃত্তি ও বিদ্যোৎসাহ দীর্ঘায় বস্তু।

দেশ কাল রাজনীতি গুপ্ত রাণের নতি স্বীকার

ভারতপুত্র

কংগ্রেস (ই)-শাসিত কর্ণাটকের ধর্মর মাটি কৃষকের লাল রক্তে রঙিন হলো। যুব কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব থেকে মধ্যমস্তরী গদীতে উন্নীত হয়ে গুপ্ত রাণ ও গুলী ও লাঠির সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে চাইছেন। রাজ এক নগ্নাঙ্গের মধ্যে ধারোয়া জেলার মালপ্রভা সেচ-প্রকল্পে তেরো জন লোক জীবন-আহুতি দিয়েছে, এদের মধ্যে অবশ্য তিনজন পুলিশও রয়েছে। মালপ্রভা প্রকল্পে হরিজ কৃষ চাষীরা জলকর ও উন্নতি করে রেহাই চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন। গুপ্ত রাণ সরকার গুলী ও লাঠির ভাষায় সে-কাবির জবাব দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সরকারী নিপীড়নের কলঙ্কটি হিসাবে এইখানে বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সেই আন্দোলনে তীব্র হয়ে দলস-বাচী পরায় কংগ্রেস (ই) সরকার নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুর রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেজন্যই তো পুলিশ সি আর পি বি এস এক ও কাকুর আশ্রয় গ্রহণ।

মালপ্রভা সেচ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে পরীব চাষীরা খানিকটা উপরুত হরতো-হবেন। কিন্তু তার লক্ষ্যসীমা যেখানে ১৯৮০-৮৪ সাল ধরা রয়েছে, সেখানে ১৯৮০ সালেই কর আদায়ের জন্ত কেন সরকার পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছেন? সেচ প্রকল্পের কোনো সুবিধাই চাষীরা এখনো পায় নি, তাদের মাথায় রয়েছে হরেক রকমের ঋণের বোকা। চাবের জন্ত বাড়তি দামে দান, বীজ ও অন্যান্য উপকরণ চাষীদের কিমতে হচ্ছে, এইসব প্রাথমিক দায় থেকে মুক্ত হওয়ার আগেই চাষীরা জলকর, উন্নতি কর যেবেন কোথা থেকে? সেচের জল কি তাঁরা পেয়েছেন যে জলকর দেবেন? উন্নতি কি তাঁদের হয়েছে যে তার দক্ষ ট্যাক্স-গুণবেন?

জলকরের আন্দোলন এত দ্রুত ও মুক্তিগ্রাহক যে অচিরেই তা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে। মজার বিষয় হলো, কংগ্রেস (আ), সি পি আই, জনতা ইত্যাদি বিরোধী দল ছাড়াও কংগ্রেস (ই) এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে। তাই অন্তত ধারোয়া জেলার কৃষক আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাদের

দাবি আদায় করা ও উন্নতি করা মত্বের মধ্যে দীর্ঘাবধি নেই, অব্যমূল্য বুদ্ধির বিকল্পে এক ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। গুপ্ত রাণ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে কর আদায় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সহজেই আন্দোলন বন্ধ করা বাবে বলে মনে হয় না।

কেমন শান্তি আসছে?

আমাদের নাকি স্বাধীনতা দিবসের আগেই শান্তি ফিরে আসবে। মনি-পুরের মধ্যমস্তরী ধোরেঙ্গ সিং করেক-দিন করে আত্ম, গণ সংগ্রাম পরিষদ

ব্রাহ্মপালের উপদেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন সংগঠন মহলকে আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে একটা আপস মীমাংসার নিয়ে গিয়েছেন। পূর্ব শর্ত ছাড়াই আন্দোলন প্রত্যাহার এবং তেল ছাড়া বাকি সব বস্তু সম্পদ চলাচলের ওপর বাধা অপসারিত হয়েছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনিং জানিয়েছেন।

কিন্তু অন্ততঃ প্রথম চোটে ধোরেঙ্গ সিংকে একটা খাতা খেতে হয়েছে। খাতাটা নাকি খোঁজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে থেকেই এসেছে। অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী নাকি এ প্রস্ত-তুলেছেন যে ধোরেঙ্গ সিংকে প্রধানমন্ত্রীর হয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা চালানোর অধিকার কে দিল? 'বিশেষতঃ' সংজ্ঞা নির্ধারণে ১৯৮১ সালকে ভিত্তিবিধি হিসাবে গ্রহণ করতে যদি ধোরেঙ্গ সিং আন্দোলনকারীদের আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তার দ্বারা তিনি কংগ্রেস (ই)

সরকারের ঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে দ্রুত সমস্ত বন্দীকে নিবিচারে মুক্তিদানের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার দমনত হতে পারেন না। তাছাড়া আন্দোলনের মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে আইনামূলক নির্দেশ ও ব্যবস্থা জারী করেছিলেন সেগুলির প্রত্যাহারেও নাকি প্রধানমন্ত্রীর হয়ে দ্রুত ধোরেঙ্গ সিং কথা দিয়েছেন।

বস্তুতঃ কিছু বন্দীকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভা গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্টও দিয়েছেন ধোরেঙ্গ সিং। কিন্তু সত্যি ১০ আগস্টের মধ্যে সমস্ত প্রবের মীমাংসা হয় কিনা, কংগ্রেস (ই) আমাদের ক্ষমতার গরি কিয়ে পাবার জন্ত কী কী উপায়ে ভাষা ও ধর্মগত সংখ্যালঘু স্বার্থ বিলম্বন দেন সেটাই দেখার বিষয় হবে।

রেল প্রশাসনের অব্যবস্থায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে অগ্নিগত পরিস্থিতি

নলিনী পাল

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে প্রতিদিনই অনিয়মিতভাবে লোকাল ট্রেন চলাচলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সেখানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে পর পর দুইদিন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড গোলযোগ এবং নানান অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রথম দিন নিজের থাকলেও পরের দিন কিছু বেপদোয়াভাবে লাঠি চার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে বাহাদুরি দেখিয়েছে। পুলিশের ডাওয়ার আঘাতে শতাধিক শান্তিপ্রিয় রাজী আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু মহিলাও ছিলেন।

আমাদের আগ্রহ যে, শিয়ালদহ ডিভিশনে অবিলম্বে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার বহিঃ উন্নতি না হয়, তবে এই অবস্থাকে বেশী দিন আরও রাখা সম্ভব হবে না এবং এই অশান্ত অবস্থাকে কেন্দ্র করেই আবার আইন-শৃঙ্খলায় চরম অবনতি ঘটবে। তখন সব ঘোষ এসে পড়বে রাজ্যের বাম-ক্রান্ত সরকারের ওপর এবং রেল কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করবেন।

অতীতে দর্পণের পাতায় আমরা এতবারে করেছি মন্ত্রিসভার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু, আলো এর কোন সুরাহা হয় নি।

বরং এই অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চলেছে। মনে হচ্ছে, এ যেন রেলের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার।

আমরা বিভিন্নভাবে তদন্ত করে দেখেছি যে, এরজন্ত রেলওয়ের প্রশাসনই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁদের গাফিলতি এবং ক্রটিপূর্ণ কার্যকলাপের জন্তই প্রতিদিন এই ডিভিশনের লক্ষ লক্ষ ডেলী প্যাসেঞ্জারকে চরম লাহুনা এবং দুর্ভোগ-ভোগ করতে হচ্ছে। উদ্বেগযোগ্য, শিয়ালদহ বিধের অন্ততঃ রাজীবহল রেল ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০১২ লক্ষ ডেলী প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে থাকেন। তারত-বর্ষের কোথাও এই ধরনের রাজীবহল ভীড় নেই। অথচ, রেলওয়ে মন্ত্রণালয় বা রেলওয়ে বোর্ড কোনে তনেই শিয়ালদহের এই রাজীবহল প্রতিদিন দুর্ভোগ এবং বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। রাজীবহল অসহায়ের তার তা নীরবে লক্ষ করছেন। এ এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রসঙ্গত আরো উদ্বেগযোগ্য, একটি লোকাল বৈজ্ঞানিক ট্রেনে যে ক্ষেত্রে ৮০০ থেকে ১০০০ রাজীবহল করার ক্ষমতা আছে সে ক্ষেত্রে এই একটি ট্রেনেই "পিক আপার্স" তিন থেকে চার জন রাজীবহল করা হচ্ছে। ট্রেনগুলির অধিকাংশই নড়বড়ে। রাজীবহল জট-জানোয়ারের

মত চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। মহিলা রাজীবহল বান-ইচ্ছতের কোন বালাই নেই। মহিলা রাজীবহল জন্ত প্রতি ট্রেনেই যদিও একটি করে পৃথক কামরার ব্যবস্থা আছে, তথাপি তাতে স্থান লক্ষমান হচ্ছে না। বহুদিন ধরেই মহিলা রাজীবহল তাঁদের জন্ত আরো একটি পৃথক কামরার ব্যবস্থা করার দাবী জানাচ্ছেন। কিন্তু, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাতেও কর্পাত করছেন না।

এর ফলে মহিলা রাজীবহল বাধ্য হয়ে পুরুষ রাজীবহল সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রেনে চলাচল এবং ঠেলাঠেলি করে ওঠানো করতে বাধ্য হচ্ছেন।

শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেন চলাচলের অব্যবস্থার কথা এই অল্প কথায় লিখে শেষ করা বাবে না। এটা মনে রাখতে হবে, পণ্ডিত জহরলাল মেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯৪৭ সালের তদানীন্তন কংগ্রেস দল দেশ ভাগ করে যে পাপ করেছেন, তার ফল এ যুগের বাঙালী বংশধরদের ভোগ করতে হচ্ছে। কারণ, দেশ ভাগের পর এই শিয়ালদহ ডিভিশনের রেল লাইনের আপোশে লক্ষ লক্ষ হিরমূল মাহুকের স্বামী বানহান গড়ে উঠেছে। অথচ তার দিকে লক্ষ্য পেরোয় ১০মণ্ডার

মোক হুইসেল দপ্তরে দুর্নীতির ফলে সরকার পাওনা থেকে বঞ্চিত এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন

কলকাতা, হাওড়া ও শহরতলীর মানুষদের কলকারখানার ও অন্যান্য বিখ্যাত ধোঁয়ার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোক হুইসেল ডাইরেক্টোরেট নামক একটি দপ্তর আছে। এই দপ্তরের এজিয়ারডুক্ট অফিসের কল-কারখানার চিমনিগুলি থেকে ধোঁয়া উৎসর্গ লক্ষ্য রাখা ও রিপোর্ট করার জন্য কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ওপর এবং বরাহনগর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান ওপর দুইটি পর্বৎকরণীয় আছে, যেখান থেকে রিগলম্যান চার্ট মারফৎ উন্নয়ন, চিমনি, বয়লার ইত্যাদি থেকে নির্গত ধোঁয়ার ঘনত্ব নিরূপণ করা হয়।

এটা কম বেশী সকলেরই জানা যে, কল-কারখানা মোটর গাড়ী, রেলইঞ্জিন, জাহাজ, লক, ইটপাকা প্রভৃতি থেকে নির্গত ধোঁয়া মানব দেহের সুস্থত্ব চোখ প্রভৃতির পক্ষে কি সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এই বিখ্যাত ও ক্ষতিকর ধোঁয়ার জন্য বয়লার ও জানা কাপড়েরও প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। এই কারণে ১৯০৫ সালের মোক হুইসেল অ্যাক্ট অনুযায়ী যে কোন ধরনের বয়লার কারমেন্স অথবা চুল্লী তৈরী করার আগে মোক হুইসেল অফিসের অনুমতি নিতে হয় এবং নির্ধারিত ফী জমা দিয়ে অফিসের ফ্রীং ডিপার্টমেন্ট থেকে বয়লার অথবা চুল্লীর নকশা করিয়ে নিতে হয়। তারপর সেই নকশা অনুমোদন ফী সহ অফিসে জমা দিতে হয়। অতঃপর সেই নকশা মোক হুইসেল ডাইরেক্টোরেটের মাসিক মিটিং-এ অনুমোদনের জন্য আলোচিত হয়। আবেদন ও নকশা অনুমোদিত হলে নকশা অনুযায়ী বয়লার কারমেন্স বা চুল্লী এবং তৎসংলগ্ন চিমনি নির্মাণ করা হয়। তখন আঞ্চলিক ইন্সপেক্টর চিমনি পরিদর্শন করেন। চিমনির উচ্চতা, ব্যাস, লোহার পাতের ঘনত্ব যদি ঠিক ঠিক থাকে তাহলে লক্ষ্যকো একটি চিমনি কম-প্লিটিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এর অর্থ হলো, তারপর চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

কিন্তু মোক হুইসেল ডাইরেক্টোরেটের দুর্নীতিপরায়ণ হত্যাকর্তা শ্রীমূলচন্দ্র ব্যানার্জী বয়লার কারমেন্স অথবা চুল্লীর মালিকদের কাছ

থেকে প্রচুর টাকা ঘুষ খেয়ে ঐ সময় নকশা বাইরে থেকে করিয়ে নেবার অসুস্থতি ঘেঁষে এবং এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। যার প্রমাণ তার বাসভবনে গেলেই পাওয়া যাবে। শ্রীমূল ব্যানার্জীর দুর্নীতি ঐচ্ছিকভাবেই নীতিবদ্ধ নয়। তিনি তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও রাজ্য সরকারের সঙ্গে জালিয়াতি করেছেন। ১৯৫২ সালে মোক হুইসেল সারভিসে যোগ দেবার পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সরকারী সিলভিলিস্ট অফিসারী দেখা যায় যে, শ্রীমূলবাবুর শিক্ষাগত যোগ্যতা হলো এ.এম.আই. (ইঞ্জিনিয়ারিং) কিন্তু তারপর আনুষ্ঠানিকভাবেই হঠাৎ শোনা গেল যে, তিনি কয়েক-পন্থাডেন কোর্সে সি.আই.মেক.ই. (লগুন) ডিপ্লোমা পাশ করেছেন। ঐ একই বছরে তিনি মোক হুইসেল ডাইরেক্টোরেটের চীফ ইন্সপেক্টর প্রতিনিয়তি বোম্বের কাছে বাসবপুত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি জাল বি.ই.এম.ই. সার্টিফিকেট পেশ করেন এবং নিজেকে ডিগ্রীধারী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সবথেকে চাক্ষু্যকর ব্যাপার হলো ১৯৭৪ সালের প্রারম্ভ থেকে তিনি হঠাৎ রটনা করতে শুরু করেন যে, তিনি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে 'এরোলোলের' ওপর রিসার্চ করে ডি.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করে ডক্টরেট হয়েছে। এবং তার মিথ্যা ভাষণ অনুযায়ী শ্রীমূলবাবুর রিসার্চ পেপার পরীক্ষা করেছেন হারভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সিং। আর এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধিত করেছিলেন সত্যেন বসু, যদিও তখন সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। বলা বাহুল্য কোন কিছুই স্বার্থ প্রমাণ নেই।

মিথ্যার জাল রচনা করার পট্ট এই ব্যক্তিটি তার জুয়া ডি.এস.সি. ডিগ্রী সম্পর্কে এমন বোম্বেরা প্রচার শুরু করেন যে, এই রটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরই অফিসের সাধারণ কর্মীরা ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমূলবাবুর ডক্টরেট উপাধি লাভের সম্মানার্থে এক লক্ষেরা লভার আয়োজন করেন ও তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দেন। চরমপ্রহর ঘটনা হল শ্রীমূলবাবু ১৯৭৪ সালে কোথাও থেকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারীর ডিপ্লোমা জোগাড় করেন। যে ডিপ্লোমা লক্ষ্যে হলো ডি.এস.

সি. কিন্তু তিনি কখনো নিজেকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার না বলে ডি.এস.সি. ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক বলে পরিচয় দেন। কাঁচড়াপাড়ার (পূর্ব রেল) ইন্ডিয়ান এপ্রেন্টিস ইঞ্জিনিয়ার্স জার্নালের ১৯৭৬ সালের রিইউনিয়ন সংখ্যায় "ওয়েস্ট ডিসপেন্সাল অ্যান্ড ইনসিমায়েশন" নামক প্রবন্ধে তার স্বাক্ষর করার সময় শ্রীমূলবাবু 'ডক্টর' উপাধিটি ব্যবহার করেন। ১৯৭৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তারই অধস্তন শ্রী দেবী কুমার চক্রবর্তীকে প্রেরিত এক চিঠিতে তিনি ডি.এস.সি. ব্যানার্জী নামে স্বাক্ষর করেন। তিনি একথাও

শিয়ালদহ স্টেশনে পুলিশ ও ভাড়া করা জুগুয়া নিরীহ যাত্রীদের বেদম গিটিয়েছে

গত ২৪ জুলাই শিয়ালদহ নর্থ ও মেইন স্টেশন জুড়ে পুলিশ এবং পুলিশের ভাড়াটে জুগুয়ার তীব্র প্রত্যক্ষ করল হাজার হাজার নিত্যাযাত্রী এক নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।

ঘটনার সূত্রপাত হাবড়া লোকাল দেরীতে ছাড়াকে কেন্দ্র করে। ৬.৫০ মিনিটের হাবড়া লোকাল থারাপ হয়ে বাওয়ার রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বোম্বা করা হয় তিন নম্বর থেকে হাবড়া লোকাল ছাড়বে। তখন বর্তিতে ৭টা বেজে গেছে। তিন নম্বর প্র্যাটকর্মে কোন গাড়ী নেই।

হাজার হাজার নিত্যাযাত্রীর সঙ্গে হুজু হয়েছিল ঘরমুখী খেলার মাঠের দর্শকরা। ৭.৫ মিনিট নাগাদ তিন নম্বর প্র্যাটকর্মে গাড়ী আসে। কিন্তু কপের মধ্যে গাড়ী উপচে পড়ে ভীড়ে। সিগন্যাল দেওয়া লম্বেও গাড়ী ছাড়তে দেয়ী হওয়ার বাজীরা অধৈর্য হয়ে পড়েন। কয়েকজন গাড়ীর কাছে গাড়ী ছাড়ার জন্য দাবী জানাতে থাকে।

শুরু হয় বাজীদের লটল পাত ও মেটারম্যানদের বচসা। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল কিছু মার্কী মারা লোকের উপস্থিতি। এদের মধ্যে দু'একজন গার্ড ও মেটারম্যানদেরকে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেন। হঠাৎ দেখা গেল গার্ড ও মেটারম্যানরা ঐ মার্কী মারা ছেলের সঙ্গেই মেইন স্টেশনের দিকে চলে যায়।

৭.৩৫ নাগাদ বাজীরা অধৈর্য

প্রচার করে থাকেন যে, তাঁর এল, এন, আর রোডস বাসভবনের ছাদের ওপরে ঈল চেয়ার তৈরী করে সেখানে তিনি পরমাণু নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর বাড়ীর ছাদে ঈল চেয়ার আছে এটা সত্য। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য পরে উদ্ঘাটিত হয়। উল্লেখযোগ্য ১৯৭৬ সালে কলকাতা পুলিশের ডিজিটেল ডিপার্টমেন্টে শ্রীমূল ব্যানার্জী কথিত লম্বে ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট জাল বলে প্রমাণ করে। নিজের শিক্ষাবীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির কারণ হলো তিনি চীফ ইন্সপেক্টর হবার আগে একই ডিপার্টমেন্টে এল, কে, বোম্ব নামে

হয়ে স্টেশন মাস্টার নর্থের ঘরে বাস এবং গাড়ী কেন ছাড়ার ছেলে না তার কারণ জামতে চান। ক্রমশই ঐ ঘরের কাছে ভীড় জমতে থাকে। হাজার হাজার বাজী তখন গাড়ীতে ও প্র্যাটকর্মে বোঝাই হয়ে আছেন। এমন সময় পুলিশের আবির্ভাব ঘটে। লাঠি ও চাল নিয়ে। ভীড়ের মধ্যে পুলিশ লাঠি চার্জ করতেই শুরু হয়ে যায় রাস্তা ভাঙে বাজীদের ছোট্ট ছুটি। কিন্তু বাজী লাঠি চার্জের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। পুলিশ এতে কেন্দ্রে গিয়ে কাঁধে গ্যাস চার্জ করা শুরু করে।

একের পর এক কাঁধে গ্যাসের গেল কাঠিয়ে বাজীদের হাট্টে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে আরও পুলিশবাহিনী আসলে পৌছে গেছে। সঙ্গে সেই মার্কী মারা ছেলের হল। এরপর গোট বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ ও তার ভাড়াটে জুগুয়া বোম্বেরা লাঠি চার্জ শুরু করে। মহিলা, বৃদ্ধ, নব্বু বাজী পুলিশের লাঠির দ্বারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রাত লাড়ো আটটা নাগাদ বেদম ভীত লম্বে বাজী গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের ওপর শুরু হয় পুলিশের আক্রমণ। গাড়ীতে অপেক্ষমান বাজীদের পুলিশ টেনে বের করে। তারপর লাঠিচার্জ করে ডি-এস বিজয়ের দিকে বেতে বাধ্য করে।

এই প্রতিবেদক তখন ঘটনাস্থলে। কয়েকজন বাজী "কোথায় বাব?"

অন্ত আর একজন চীফ ইন্সপেক্টর ছিলেন, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা শ্রীমূল ব্যানার্জীর থেকে অনেক বেশী। স্বভাবতই শ্রীমূল ব্যানার্জীর আশঙ্কা ছিল আইনভে: এল, কে, বোম্বই চীফ ইন্সপেক্টর হবেন। অতএব চীফ ইন্সপেক্টর হবার জন্য সরকারের সঙ্গে জালিয়াতি করাটা শ্রীমূল ব্যানার্জীর কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছিল।

চরম অসাধু এই ব্যক্তিটি মোক হুইসেল ডাইরেক্টোরেটকে ঘুরুর বাসায় পরিণত করেছেন এবং সরকারী অর্থায়ন অনুসরণের তহবিল নিয়ে বোম্বেরা তহরর ও দুর্ভন করছেন। যে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই ডাইরেক্টোরেটের পছন্দমত উন্নয়ন, বয়লার বা চিমনি তৈরী না করলে এবং তার ফলে দূষিত ধোঁয়া নির্গত হলে বেঙ্গল মোক শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠার

এই কথা জিজ্ঞাসা করার এই প্রতিবেদকের সামনেই তাদের পেটানো হয়। আর ভাড়াটে জুগুয়া বাজী হাবড়া লোকালের গার্ড ও মেটারম্যানদের সঙ্গে বাজীদের বচসার সময় ধাক্কাধাক্কি করছিল তাদেরকেও লাঠি হাতে বাজীদের ওপর আক্রমণ করতে দেখা যায়।

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে লবিংয়ে নিবেদন করতে চাই। পুলিশ ও ভাড়াটে জুগুয়ার লেলিয়ে দিয়ে বাজীদের রেল চলাচলের অব্যবহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কর্তৃক কি হয়ন করা যাবে? শিয়ালদহ ডিভি-সনে রেল চলাচলের ক্রমবনতি প্রতিটি নিত্যাযাত্রীকেই বিস্ময় করে তুলছে। সঙ্গত অসঙ্গত কারণে ট্রেন চলাচল প্রতিদিনই বিলম্বিত। এই বিলম্বের সময় লীমা আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্বিত। সারাদিনের পরিণামে রাস্তা ঘরমুখী নিত্যাযাত্রীদের লম্বেও একটা লীমা আছে। কোন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদেই রেল কর্তৃপক্ষ লম্বেও ট্রেন ছাড়ার ব্যাপারে লম্বেও দিচ্ছেন না।

দিন দিন বাজী ভাড়া বাজানো হচ্ছে। কিন্তু বাজীদের কোন স্বাধীনতার ব্যবস্থা তো হচ্ছেই না, উপরন্তু ট্রেন চলাচলে নিত্য বিলম্ব। বাজীদের একটা লম্বেও লীমা আছে একথাটা মনে রেখে রেল কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে ট্রেন চলাচল নিয়মিত না করেন তবে একদিন অসংখ্য কিন্তু প্রচণ্ডভাবে কেটে পড়বে। সেদিন ভাড়াটে জুগুয়া এবং পুলিশের সাহায্য নিয়ে পার পাওয়া সম্ভব হবে না।

সেচের ব্যবস্থা দরকার

বাঁহুড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত মরনাপুর অঞ্চলের দিগপাড় মৌজার চারশত একর জমি এবং কুচিয়াকোল অঞ্চলের ফুলনগর মৌজার দুইশত একর জমির সেচ ব্যবস্থার জরুরি প্রয়োজনীয়তা বৃন্দ মিলিতভাবে গত ১৯৭৮ সালে কুচিয়াকোল হাইকোর্টে কংসাবতী প্রজেক্টের এস ডি ও, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং জয়পুর রকের বি ডি ও, কোতালপুর এলাকার স্থানীয় এম এল এ প্রমুখ বিশিষ্ট ভূমিবিদদের উপস্থিতিতে আবেদন পত্র পেশ করেছিলেন। তাঁদের দলের যথার্থীতি আশ্রয় ভাগ্যে জুটেছিল। তারপর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দিগপাড় ও ফুলনগর এলাকার অধিবাসীবৃন্দ পুনরায় কুচিয়াকোল হাইকোর্টে যখন জমি ও রাজস্ব সচিব শ্রীমিন্দ্র চৌধুরী এসেছিলেন তাঁকেও একই আবেদন পত্র দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় ছয়মাস পরে গত ১৮/১১/৭৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তির কংসাবতী ক্যানেল বিভাগ

কত শ্রমের জেদ লাগাতার ধর্মঘট

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যে বিপত্নীক বংশেরে নিত্য প্রয়োজনীয় জীবন দায়িত্ব বাজার দর উন্নয়ন, হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দি রাইফেল ক্যান্টিনী কোম্পানিতে সোলাইটি অ্যাণ্ড স্টোর এমপ্লয়ী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও তারা অনমনীয়ভাবে আমাদের নয় দফা দাবীকে উপেক্ষা করেন এবং গত ১০-১১-৭৯ তারিখে কর্তৃপক্ষ যে চুক্তিপত্র প্রস্তাবিত করেন তা তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির কর্মচারীবৃন্দ গত ৮-৭-৮০ তারিখ থেকে ১২০ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেন এবং উল্লেখ থাকে উক্ত সময়ের মধ্যে জুই মীমাংসা না হলে আমাদের লাগাতার ধর্মঘট চলবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের সহিত কোন রকম আলোচনা বা মীমাংসা না করেই সমিতির কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘটের মুখে ঠেলে দেন। সত্যের নামান অস্বীকার কণা মনে রেখে মীমাংসার জরুরি প্রয়োজনীয়তা এম, এল, এ মামিনীস্বয় সাহা এবং এ্যান্ডিস্টেন্ট লেবার কমিশনারের নিকট মীমাংসার জরুরি আবেদন করি, কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের জরুরি তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

মধুসূদন বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
আর এফ সি এস অ্যাণ্ড এস ই ইউ

(তিন) এর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এন সি রায় কংসাবতী ক্যানেল সাব-ডিভিশন (নয়) এর ১১৩১৮ নং মেমো অরু সা রে সাব-ডিভিশনাল অফিসারকে প্রয়োজনীয় নার্ভে করে সমস্ত কাগজ সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (জুই) এর অফিসে সত্বর জমা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন নার্ভে করার ব্যবস্থা হয়নি।

মতামত

ফুলনগর মৌজার তেলিবাধের মোহানা থেকে যে খালটি উৎপন্ন হয়ে এসেছে তার উপর নদী সেচ পাম্পের ব্যবস্থা করলে দুইশত একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। দিগপাড় এলাকার কুচিয়াকোল হাই কুলের উত্তর প্রান্তে যে আমোদ্যর নদ প্রবাহিত হয়েছে তার উপর একটি ক্ষুদ্র নদী সেচ প্রকল্প গ্রহণ করলে দিগপাড় মৌজার প্রায় চারশত একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। এই মোট ছয়শত একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হলে স্থানীয় গ্রামবাসীবৃন্দকে চাষের সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি মিক্ষেপ করে চাতকপকীর জায় কাতর মননে 'ফটিক জল', 'ফটিক জল', রবে অপেক্ষা করতে হয় না এবং সহজেই উক্ত এলাকা তিন কলসি জমিতে পরিণত হয়ে চাষীদের দুর্দশা মোচনে সক্ষম হয়। এই ছয়শত একর জমিতে আদৌ সেচের ব্যবস্থা না থাকায় স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ চরম দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন। বর্তমানে বৃষ্টির অভাবে জমিতে জল না থাকায় ধান পাছের গোঁড়াতে উই ধরতে শুরু করেছে ও মাটি পরিপূর্ণ ফেটে গেছে। এর সমাধান কোথায়? এ বিষয়ে কংসাবতী প্রজেক্ট ও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হরিশাধন বোষ
দিগপাড় (বাঁহুড়া)

ঠাণ্ডানি প্রসঙ্গে

এদেশে চুরি, পকেটমারা ইত্যাদি অপরাধে অথবা সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের নিরুপলব্ধ প্রহার এমন কি প্রাণান্ত ঘটান হয়ে থাকে। ইহা অত্যন্ত অমানবিক কাজ। নিম্নলিখিত কারণে এই অমানবিক ও পাপবিক কাজ বন্ধ হোক।

(১) ভারতীয় সংবিধানে অপরাধীদের অথবা অপরাধী সন্দেহে কোন ব্যক্তিকেই প্রকৃত অথবা গোপনে ঠাণ্ডানোর কোন নির্দেশ নেই। অপরাধী ব্যক্তি সংবিধান

বহিস্কৃত অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করবেন কেন?

(২) বড় বড় প্রভাবশালী সমাজবিরাোধীরা ট্যাক্সফাঁদী, ঘুবাওয়া, চোরাকারবারী, কালো-বাজারী প্রভৃতি মানারকম অপরাধ সত্ত্বেও যে অধিকার বলে ঠাণ্ডানি খান না সেই একই অধিকার দুর্বল সমাজবিরাোধীরা ভোগ করবেন না কেন? বিবেকহীন, স্বার্থপর, ধান্দাবাজ, অসৎ অথবা মিথ্যে ব্যক্তিরা সংবিধান বহিস্কৃত দুর্বল সমাজবিরাোধী ঠাণ্ডানোর অধিকার ভোগ করবেন কেন?

প্রভাবশালী সমাজবিরাোধীরা সমাজের যে স্বার্থ আঁচ পর্বত আশ্রয় করেছে তার পরিমাণ দুর্বল সমাজবিরাোধীদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশী। তবে দুর্বল সমাজ বিরাোধীরা ঠাণ্ডানি খাবে কোন অপবাদে।

একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে দুর্বল সমাজ বিরাোধীরা অধিকাংশই লাধি ঝাঁটা, অপমান ও অত্যাচার সাধ্য নিয়ে শৈশব কাটিয়েছে। ভালবাসা, লহাছুতি, সংশ্লিষ্ট প্রভৃতি কিছুই পায় নি। অথচ প্রভাবশালী সমাজ বিরাোধীরা পিতামাতা আত্মীয় স্বজনদের আদর স্বস্তি ভাল জুল কলেজে এবং অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক জ্ঞান অর্জন করেছেন। চুরির অপরাধে ঠাণ্ডানি যদি খেতেই হয় তবে সেই জ্ঞানী সমাজ বিরাোধীদেরই তো খাওয়ার কথা, দুর্বল সমাজ বিরাোধীরা ঠাণ্ডানি খাবে কোন যুক্তিতে?

সংবিধান বহিস্কৃত অধিকার ভোগ করার চেষ্ঠা মানেই সংবিধানকে অস্বীকার করা। ঠাণ্ডানি বর্তমান পর্যন্ত না আইন সিদ্ধ হবে ততদিন ঠাণ্ডানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা বর্তব্য। ঠাণ্ডানির পক্ষে যারা ওকালতি চায় তাহাদের প্রথম কর্তব্য ঠাণ্ডানিকে সংবিধান সিদ্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শেখ এমাম বখশ

প্রিন্টিং টেকনোলজিতে বিক্রী ব্যাপার

আমি রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজীর একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং সেই হিসাবে ইনস্টিটিউটের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। যাকে যাকেই দেখি সেখানে বহু বিক্রী ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে এবং তা নিয়ে আন্দোলনও হচ্ছে। আপনাদের পত্রিকারও একাধিকবার এই প্রকার অভিযোগ প্রতিবাদ হতে দেখেছি। সেই ভ্রমসাত্ত্বেই কতকগুলি ঘটনা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে সরকারের এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করছি। ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বা আমার কানে এসেছে তা লিখিই কলঙ্কজনক। ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ সমস্ত ব্যাপারে একপ্রকার কর্মীর কথায় ওঠা বসা করছেন যাদের খুনচাপা স্বভাব, মিথ্যে কাজের মাহুতকে, আশাত দিতে যাদের আনন্দ। এই দলের নেতৃত্ব দারা করছেন তাঁদের মধ্যে একজন বেলঘরিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ইজ মিজের সহযোগী বলে শুনেছি পাই। লামান্ত চাকরীতে

বহাল থেকেও চিট কাণ্ড জাতীয় এক ব্যবসার মৌলতে মোকার চালিত মোটরে চেপে তিনি ইনস্টিটিউটে আসেন এবং বেশী সময় বিভাগের কাজের পরিবর্তে তাঁর দলবলকে নিয়ে ওই ব্যবসার কাজে করেন। এই হাতের কাজ না জানা কেবলমাত্র ম্যাট্রিক পাশ তরলোকটিকে আপাতত নিম্নর লেকচারারের পদে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে। আমাদের আশা ছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এসব বন্ধ হবে। অশিক্ষকের মধ্যে এইভাবে এমন একজন আছেন তিনি ইচ্ছামত লবাইকে মারধোর করার ভয় দেখান। ইনস্টিটিউটের লিখ্যকার প্রকল্প এবং শুণী মাহুতদের বিকল্পে এঁরা দৃষ্টি হয়েছেন এবং চরমভাবে অপমান করেছেন আমাদের প্রকল্প অধ্যাপক পরিতোষ সেনকে। সব চেয়ে অবাক হচ্ছে এই ভেবে যে মূখ্য বিভাগের এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার মত মাহুত নেই।

অনেক প্রাক্তন ছাত্র

শোভারানী কলেজে দুর্নীতি

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে শোভারানী মেমোরিয়াল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক হাওড়া জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত চাকুরী প্রার্থীদের এবং অন্যান্য চাকুরী প্রার্থীর বরখাস্ত অগ্রাহ্য করে সেখানে বেশ কিছু কর্মী মিয়োগ করছেন।

এই বেআইনী লোক নিয়োগের খবর গত বছর দর্পণে কীস হবার পর তিনি অনেক কৌশলে লোক নিয়োগ বন্ধ রাখেন। দর্পণের আরও খবর ছিল সমস্ত মুসলমান চাকুরী প্রার্থীর বরখাস্ত ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন ইনি। অথচ এরা যোগ্যতার দাবি করতে পারে। দর্পণে প্রকাশিত সংবাদে প্রিন্সিপ্যালের মুখোশ খুলে পড়ে এবং সরকারী প্রতি নিধি কানাইলাল শীল সঙ্গে বিরোধ হয়। কানাইলালবাবু কলেজের দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে পদত্যাগ করেছেন। প্রিন্সিপ্যাল রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক কিন্তু এ বছরে সুযোগ বুঝে তাঁর নিজের দাবি ও বৈরীচারিতার টাউশন রক্ষা

করার জরুরি পদ বারের অস্বাভাবিক প্যানেল থেকে তার হাতে বে-আইনী নিয়োগ পত্র পাওয়া ব্যক্তিকে চাকুরী দিতে বাঞ্ছন কলেজে।

এরা লবাই প্রিন্সিপ্যালের আপনজন। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কি দোষ করলো? মুন্সীম ছেলেদের বরখাস্ত কেন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। ইন্টারক্যু হবে না কেন? এ প্রশ্ন রেখেছেন জগৎবল্লভপুর যুব সমাজের প্রতি নিধি, কলকাতা রকের জনৈক যুব কর্মী এবং কাছাকাছি এক বিভাগের কিছু শিক্ষক।

প্রিন্সিপ্যাল লাহেব কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভ্যমারাগণ ঝাঁরের স্বার্থ বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাতাও বাধ লাগছেন। জনসাধারণের ইচ্ছার বিকল্পে বাঞ্ছন। কলেজের বেশ কিছু কর্মচারীকে চাকুরী সংক্রান্ত সুযোগ থেকে অন্তর্যভাবে বঞ্চিত রেখেছেন প্রিন্সিপ্যাল। বৈরীচারী প্রিন্সিপ্যালের এই লোক নিয়োগের খেলা বন্ধ করার জরুরি শিক্ষামন্ত্রী শ্রু বোষকে কলেজ পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে যুব সমিতি জানালে।

দুর্গা

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
মাধ্যমিক ১০ টাকা
তৈমসিক ৭০০ টাকা



টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্গা
৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুস্তক পর্মদ

পর্মদ প্রকাশন

- ১। ভৌত আলোক বিজ্ঞান / ডঃ বিজয়শংকর বসাক / ১২.০০
- ২। নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান / ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী / ১২.০০

৩৬, রাস্তা সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

জিনিসপত্রের দাম বাড়ে কেন

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

বাড়ের পেশ হওয়ার পর পাইকারী মূল্যের প্রাকবাজেট স্তরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। ১৯৭০-৭১ সালকে তিন বছর ধরা হলে গত দশবছরে মূল্যবৃদ্ধির অলিম্পিক রেকর্ড ১৫৫ শতাংশ। এটা সর্বপ্রকার সামগ্রীর দামের হিসেবে। কিন্তু পাইকারী মূল্যে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় না। খুচরো দরে বিক্রয়। এই দাম কত বেড়েছে বললে সরকারী পরিসংখ্যানবিদেয়াও ইতিউক্তি তাকিয়ে চোঁক গেলেন।

সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে অর্থমন্ত্রী ভেটেরমণ এখন নতুন কোন তত্ত্বকথা উদ্ভাবন করে আমাদেবু গায়ে শান্তিবারি ছিটোবার চেষ্টা করবেন। সরকারী তত্ত্ব যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয় সেই তথ্যগুলিই বড় গোলমালে। মন্ত্রীর হুকুমে তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্তে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়, তার অনেকগুলি সরকারী ডিসপেন্সারীতে হাতুড়ে কম্পাউণ্ডারের তৈরী। যেমন সরকারী পরিসংখ্যান দপ্তর বলছেন ১২ই জুলাই যে দপ্তর শেষ হয়েছে সেই দপ্তরে আলানি, বিজ্ঞান, পানীয়, তারাক ও তামাকজাত দ্রব্য, কাগজ ও কাগজ নির্মিত দ্রব্যাদি, চামড়া ও চর্মজাত সামগ্রীগুলির দাম আদৌ বাড়ে নি। খুচরো ক্ষেত্রের আপন অভিজ্ঞতা দিয়েই জানেন তথ্যটা কতটা নির্ভরযোগ্য।

এই সমস্ত তথ্য সঠিক হয় না। কারণ তথ্য বাছাই ও সংগ্রহের পোটা ব্যবস্থাটাই মাদ্রাসকভাবে অপর, সুতরাং নির্ভরযোগ্য নয়। জীবনের সঙ্গে এই ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই। তাই বিশ্বাসভাবে সংগৃহীত খণ্ডচিত্রগুলিকে সমগ্রের স্তর দিয়ে সরকারী কর্তারা দীর্ঘ দিন ধরে পোটা দেশকেই ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। কিন্তু মিররের কাছে এই ফাঁকি নির্মমভাবেই মূল্যহীন। কিন্তু অল্পবিস্তর কাছে এটা নির্মম কৌতুক। যখন কিনতে গেলে বাজারে চিনির দাম ৮ টাকা কেজি, দুরূহের তেল ১৪ টাকা তখন বোম্বাই বাজারের মনগড়া দামের অল্প কবলেই তার কাছে জিনিসপত্র সহজলভ্য হয়ে ওঠে না। অথচ বোম্বাই-এর বাজার রিপোর্টেও দাম কমেছে এমন হদিশ নেই। যেমন বাবাম তেলের রপ্তানী নিষিদ্ধ করার দাম কমেছে বটে, তবে তা খুচরো বাজারে প্রতিফলিত হয় নি।

ধনবাহী সমাজ ব্যবস্থার দাম কমেতে পারে না। অনেক পুরনো দিনের কথা তুলে দুঃখ করেন ব্রিটিশ আমলে সব জিনিস সস্তা ছিল। এখন দাম হয়েছে। বোধহয় স্বাধীনতানা হলেই ভাল ছিল। এই সমস্ত ধারণা এখন সৃষ্টি হয়েছে, দান্য বোধেছে কারণ, মানুষ সোনার পিছে নেই। আসল রোগ ভুলে গিয়ে পুরনো দিনের কথা ভেবে লাভ নেই। আসল রোগ হচ্ছে ধনবাহী। ব্রিটিশ আমলে এবং কংগ্রেসী আমলেও এই ধনবাহী ব্যবস্থাই বজায় ছিল এবং আছে। মনে পড়ে ব্রিটিশ রাজত্বের টাকার আধমণ চাল পাওয়া যেত, তবু একবছরে দেড়কোটি মানুষ অন্নাতাবে মৃত্যু করেছিল। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কলে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ

অর্থনীতি

অন্নাতাবে ছটফট করতে করতে মরণের কোলে ঢলে পড়েছিল। তখন তো চালের দাম ৪০ টাকা মাত্র মণ ছিল।

সুতরাং দরদামের আসল কল-কাঠি না বুঝলে শুধু এ আমল, সে আমলের স্মৃতিচারণ করেই কি আমরা মুক্তি পাব? যারা সমাজের মাথায় বসে আছেন, অজুলি হেলনে সবাইকে চাটাকাচ্ছেন, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের শীর্ষে বসে সোনার পাহাড় তৈরী করে চলেছেন তারা দাম বাড়লে খুশী হন। কারণ দাম তো জিনিস নয়, সম্পদ নয়। দাম বাড়লে কম জিনিস দিয়ে বেশী পরসাদা আসে। দাম বাড়লে ঋণ পরিশোধ করতে সুবিধা। কারণ তখন কম পরসাদা দিয়েই পুরনো ঋণ শোধ করা যায়। ধরুন কেউ ব্যাঙ্ক থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিয়ে পাঁচশ গাউ কাপড় কিনলো। এর পর ধরা ব্যাক দাম বিগুণ হয়ে গেল। তখন মাত্র ২৫০ গাউ কাপড় বিক্রী করেই ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করা যায়। এভাবে ক্রেতাদেবুও কম জিনিস দিয়ে পড়তা খরচ আদায় করা সম্ভব হয় এবং মুম্বাকার হার বেড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে দাম বাড়লে মুম্বাকাও তাড়াতাড়ি জমানো যায়। কিন্তু দীর্ঘকালের হিসেবে এটা টেক-নই ব্যবস্থা হয় না। কারণ শিল্প-ব্যবসায়ীদের মূলধনী জিনিসগুলিরও দাম বেড়ে যায়। তখন মুম্বাকা থেকে জমানো টাকাকড়ি দিয়ে নতুন

যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর করা যায় না। সুতরাং সমাজের সবচাইতে ধনী ব্যক্তির সরকারের উপরেই এই কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দেয়। তাদেরই প্রেরী সরকার তখন তাদের হুকুমত এই সব ব্যবসা জাতীয়করণ করে।

আমরা জাতীয়করণের বিরোধী নই। বরং পক্ষে। কিন্তু ধনবাহী প্রজিয়ার চরিত্র না বুঝে কেবল জাতীয়করণের উপর জোর দিয়ে গেলেই হয় না। রুগ শিল্পকে সারিয়ে তোলায় নামে সরকারী টাকা খরচ করে রোগমুক্তির পর আবার রুগ হয়ে না পড়া পর্যন্ত আগের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা দাম বাড়লে খুশী হন। কিন্তু তাদের আর বাঁধা, তা সে মাস মাইনে হোক বা ছোট ছোট হস্তশিল্পী, দোকানদার, ক্ষেত মজুর ও গরীব চাষীই হোক, দাম বাড়লে তাদের দুঃখকষ্টও বাড়ে। তারা দরদামে স্থিতিশীলতা আনুক তাই চান। কিন্তু যতদিন ধনবাহী ব্যবস্থা থাকবে ততদিন তাদের নিরাশ হতে হবে। কষ্টও লক্ষ করতে হবে।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই দর দাম স্থিতিশীল হতে পারে এবং আর ক্রমাগত বাড়তে পারে। সমাজতন্ত্রের নিয়মে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের রীতিনীতি গৃহক। কোন ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীর স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলে না। সেখানে উৎপাদন বাড়ার অর্থ জিনিসপত্র সুলভ ও সহজলভ্য হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে বেতন বা মজুরী বৃদ্ধি। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বাজারে জিনিসপত্র বেশী আসে এবং সেই বেশী জিনিসপত্র কেনার জন্তে বেশী টাকাকড়ি চাই। মজুরী বেতন ইত্যাদি বাড়িয়ে সে টাকাকড়ির যোগান দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা যা এখন ভাবতেও পারি না, সেই অবতন ঘটে। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম কমে আবার সেই সঙ্গে বেতন ইত্যাদিও বাড়ে। ফলে লোক ভোগ করে বেশী। ভালো খায়, ভালো পরে, মিনেমা দিয়েটার প্রদর্শনী খেলা বেশী দেখে। জীবন কাটার স্বপ্ন স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সমাজ-তন্ত্রে রাজস্বাভ্যাস, জমিদার, ব্যাঙ্ক ও শিল্পের মালিক প্রভৃতি পরগাছা শোষণ প্রেরী নই। বতর্দিন আমরা এই ব্যবস্থা কয়েম করতে না পারছি, ততদিন মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্র্য, অমশন, অপিকা কখন দূর হবে না।

কলকাতা পৌরসভায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি

কলকাতা পৌরসভায় এখন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলেছে। সংস্থার বিভিন্ন দপ্তরে চলছে কর্মী বিক্ষোভ। অপর দিকে পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূরকেও অফিসাররা হুমকি দিতে শুরু করেছেন। আদায় বিভাগ, মোটরযান বিভাগে চলছে চরম নৈরাজ্য। মোটরযান বিভাগ এককথায় পৌরমন্ত্রীকে বেকারদার ফেলে দাবী আদায়ের চেষ্টা করছে। গাড়ী একবার মেরামতিতে গেলে সেই গাড়ী আর বেতছে না। জঞ্জাল অপসারণ করার গাড়ীগুলির ঠিকমত মেরামতি ব্যবস্থা নেই। ফলে গাড়ী বসছে। শহরে জঞ্জাল জমেছে। নতুন গাড়ীগুলি এখন এক জঘন্য অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী ধোওয়া নেই, মেরামতি নেই। জঞ্জাল সরানোর ট্রপ নিয়েও চলছে নানা কারচুপি। এর ওপরে চলছে বেপরোয়া ওভারটাইম।

আদায় বিভাগে-কর আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ। কলকাতার বিশিষ্ট নতুন বাড়ীগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে লাখ লাখ টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হ'শ নেই। অথচ আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত পৌরসভা নিত্যনতুন লক্ষ্যের মুখোমুখি হচ্ছে। এদিকে বর্ষা, জঞ্জাল প্রভৃতি নানা ব্যাপারে শহরের পরিস্থিতি যখন যোরালা হয়ে উঠছে তখন পৌরসভার অফিসাররা আন্দোলনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। এদের বক্তব্য মন্ত্রী প্রশান্ত শূরকে আই, এ, এসরা তুল বুঝিয়ে পৌরসংস্থার এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি টেনে আনতে চাইছেন। পৌরমন্ত্রীকে এরা বোঝাতে চাইছেন পৌরসভা চালানোর জন্ত আই, এ, এস অফিসার অপরিহার্য। এখানে যেন পৌরসংস্থার কোন অফিসারকে কমিশনার কিংবা প্রশাসক পদে বদলানো না হয়। সম্ভবত, পৌর-মন্ত্রী এদের কবলে পড়েছেন। তাই মাত্র কয়েকদিন আগে সংস্থার প্রায় দীর্ঘস্থানে পৌরসংস্থার ডেপুটি কমিশনার অমিলকৃষ্ণ রায়কে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে বসিয়েও সরিয়ে দেওয়া হয়। কমিশনার কল্যাণ বিশ্বাস ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কার্যবাহী পরিদর্শনে লণ্ডন যাওয়ার সময় শ্রীযায়ের হাতে সংস্থার দায়িত্বভার দিয়ে যান। ফিরে এসে তিনি দায়িত্ব হাতে নিয়ে সি, এস,

ডি, এর সচিব মিহির মৈত্রের হাতে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। ফলে শ্রীযায়ের মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদ থেকে সরে যেতে হয়।

শ্রীযায়ের ঘটনায় অফিসাররা দাকণ রকম ক্ষুব্ধ। এদের বক্তব্য এমন কি ঘটনা ঘটলো যাতে শ্রীযায়ের হাত থেকে কমতা কেড়ে নেওয়া হলো। পৌরসভার অফিসার এ্যাসোসিয়েশনের ঘোষিত নীতি হলো-বাইরে থেকে নিত্য নতুন অফিসার এনে সংস্থার পুরনো অফিসারদের মাথায় বসানো চলবে না। এছাড়া অস্বাভাবিক অফিসারদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করতে হবে। এসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে এসব দাবীদাওয়া নিয়ে আলাপ আলোচনা চালালেও কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নি। বরং অফিসারদের মধ্যে বিক্ষোভ জন্মতে আই, এ, এস অফিসাররা নাকি পৌরমন্ত্রীকে ইফন জুগিয়েছেন। এসোসিয়েশনেরই এক "বিলম্বী স্ববক্তা" ট্রেজারার অজিত মুখার্জী দাবীদাওয়া নিয়ে গরম গরম বুলি আওয়ানের পর এখন একে-বারে চূপ। কেননা মাত্র দিনকয় আগে তার বেতন রহস্যজনকভাবে অস্বাভাবিক হারে কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। এর বেতন আগে ছিল ৮০-১১২০ টাকা। এখন ১০৭৫-১৬২৫। অনেকের ধারণা এসোসিয়েশনের মধ্যে ভাঙন ধরানো ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টার জন্তই ঋগ্ন কতিপয় অফিসার পৌরমন্ত্রীকে তুল বুঝিয়েছেন। কোনও ভায় নীতি না বেনে শ্রীমুখার্জীর বেতন বৃদ্ধি করার ফলে পৌর অফিসারদের বিক্ষোভ চরমে গিয়ে পৌচেছে। অফিসারদের দাবী শ্রীমুখার্জীর যে হারে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে তা খতিয়ে দেখে সবাইই নতুন করে বেতন ঝেজ করে দিতে হবে। এর জন্ত বেতন-কমিশনের কোনও অজুহাত দেখানো চলবে না।

অফিসাররা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্ত প্রয়োজনে কাজ নেমে পড়েছেন। এদেরই মধ্যে কতিপয় দুরূহ আবার আধের গোছানোর জন্ত তালে তালে বুজছেন। সব মিলিয়ে পৌরসভার অফিসার ও কর্মী বিক্ষোভে প্রশাসন প্রায় অচলের মুখে। পৌরমন্ত্রী পুরো বিষয়টি একবার খতিয়ে না দেখলে পৌর প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। বলা প্রয়োজন ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌর প্রশাসনে কেউ কেউ খুব নিপুণতার সঙ্গে পৌরমন্ত্রীকে অপহরণ করে কাজ নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতীয় সাম্যবাদ : দর্শনের দৈন্য

কালিদাস কুণ্ডু

ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্বের মতো ভারতীয় সাম্যবাদের একটি অলৌকিক, অসম্ভব দর্শন বিদ্যুৎ-স্রোতের চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে সম্প্রতি। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কাকের লেং এর সাধের নামকরণ হয়েছে 'স্বাধীন পন্থা'। এই তথাকথিত 'স্বাধীন পন্থা' (Independent track) ভারতীয় প্রবক্তাগণ অবশ্যই কোন মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। স্বাধীন পন্থার পূর্বসূরীদের অস্বস্ত পথ দীর্ঘ পরি-ক্রমণের পরও এরা ছাঁদের উপর দাঁড়িয়ে গলা কাটিয়ে চীৎকার করছেন—আমরা, স্বাধীন পন্থের পথিক। এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলেও এরা স্বীকার করতেন যে, বার্তাধীন-কাউন্টর যোগ্য শিল্প টিটো তোপলিয়াসিই এদের ভাবনার প্রেরণাস্থল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীতে দুটি সর্বাঙ্গীক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—(এক) এশিয়া-আফ্রিকা দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও বিকাশ, (দুই) ইটালীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা তোপলিয়াসি, ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা ব্রিস থোরে এবং যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো প্রমুখ সংশোধনবাদী তাত্ত্বিকদের তথাকথিত "স্বাধীন পন্থার" উদ্ভাবন ও প্রচারণা। বস্তুতপক্ষে এই সব তত্ত্বগত ব্যক্তিত্বের যত্নস্বত্বক কৃষিকার জন্মই বাটের দশকের প্রথম-ভাগে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নেমে আসে চরম বিভ্রান্তি ও ভাঙনের বিপর্দয়। আধুনিক সংশোধনবাদীদের অতীতম পাণ্ডা ক্রমশঃ-স্বল্পত উচ্চাচিৎ প্রতিটি শব্দ ছিল থোরে-গোমুলকা-তোপলিয়াসির নির্লজ্জ প্রতিশ্রুতি মাত্র।

বহুল প্রচারিত "স্বাধীন পন্থার" অঙ্গগামীরা শেষ পর্যন্ত মুখোচ্চারণ খুলে কেলতে বাধ্য হয়েছেন। মার্কস-বাদ-লেনিনবাদের পথ বর্জন করে তারা ইউরো-কমিউনিজমের স্বপ্ন-সৌন্দর্য চর্চা করেছেন। ইউরোপের দেশে দেশে মহাস্ত, গৌরবময় ক্যান্সি-বাদী বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য-বিস্মৃত হয়ে তারা 'সমাজতন্ত্রী', সোভিয়াল ডেমোক্রেট ও ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটদের পায়ে তেল মর্দন করছেন কক্ষতার কোল চাটার জন্ত। পার্টির সংগঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর পৃষ্ঠা থেকে তারা মার্কস লেনিনের নাম

মুছে কেলতে গেলেন মতো উদারতাবাদ প্রচার করছেন। দর্পহারার মত-বাহকে চেড়ে তারা আকলিকতাবাদ-পুষ্টি জাতীয়তাবাদের অঙ্গশায়িনী হয়েছেন।

চোখের সামনে 'স্বাধীন পন্থার' চরম অধঃপতনের পরিণাম দেখেও আমাদের দেশের কিছুলংখ্যক 'তত্ত্ব-দর্শী' মূবকে বোল তুলেছেন 'স্বাধীন পন্থার'। এদের পুরোখা এস, এ, ডালো। তাঁর জ্ঞানের অস্ত নেই। এই বিবাসনুটি, বেদজ্ঞ প্রবর সাম্যবাদ প্রত্যাক করেছেন ভারতের চিরায়ত বেদান্ত দর্শনে—কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো যার কাছে অতি তুচ্ছ। ভারতবর্ষের লুপ্ত ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধারের মহৎ কার্য সাধন শেষে (যেমন ভারতীয় নবজাগরণের শেষ পুরোহিত) তিনি তীর্থ পরি-ক্রমণে বেরিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, একচেটিয়া পুজি বিরোধী জাতীয় বুদ্ধোদ্যমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দিরা পাকীর মহিমা প্রচারে।

একথা ঠিক, আজ আর কমিউ-টার্ণ-কমিনফর্মের মতো আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত কোনও কেন্দ্র নেই। মোহনচন্দ্র কেমের অঙ্গ-পরিভিত্তির স্বযোগে "বহু কেন্দ্রিকতা" (Polycentrism) আজ এক বাস্তব সত্য। তাই বলে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের নাম করে স্রোতের কীর্তন কত দিন চলতে পারে?

মার্কসবাদ কোম ব্যক্তিক মতবাদ নয়। তার স্বজনশীলতা ও গতিশীল-তার দিকটা একটি শিশুও উপেক্ষা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশেরই স্ব স্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আছে, অবস্থার তারতম্য আছে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ প্রয়োগ-নির্ভর মতবাদ।

মার্কস-এঙ্গেলস যে দর্পহারী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার স্বপ্ন-ভিত্তি ছিল ইউরোপের উন্নত, ধন-তান্ত্রিক দেশগুলো যেখানে ঐশ্বর্যী ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, দর্পহারী প্রতিক্রিয়ার উত্তর ঘটেছে। এই সব দেশগুলোতে (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি) পুজিবাদের প্রগতিশীল কৃষিকা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর ধনতন্ত্রের শোষণ ও পীড়নের কংস কারাগার (রাষ্ট্রতন্ত্র) ভেঙে ফেলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছিল প্রতিক্রিয়ার উপর। তথাপি, ইউরোপের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চাদবর্তী রূপ দেখেই ঘটে গেল হুনিয়া কাপানো বিপ্লব—মার্কস-

বাদের ব্যক্তিক অঙ্গগমনে নয়, স্বজন-শীল প্রয়োগের স্বীকরণে।

উপরোক্ত স্বীকরণের পদ্ধতি চীন বিপ্লবেও অঙ্গগত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। এতৎ-সত্ত্বেও, ভারতীয় সাম্যবাদের ব্যক্তিকরা আন্তর্জাতিকতাবাদের সুখোশ পরে মর আউড়ে চলছেন 'স্বাধীন পন্থার'।

এই 'স্বাধীন পন্থা' কী বস্তু! আফ্রিকার দেশে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের 'বস্তুগত সাহায্য' দেওয়ার নামে মোতিয়েতের অঙ্গবাতমূলক কার্য-কলাপ ও ইচ্ছাকৃত নির্লজ্জ নীতির প্রতি অকৃত সন্মতন জাপন, কাম্পুচি-য়াতে ভিয়েনামের দখলদারী নৈজ-দের প্রশংসা করা, আফগানিস্থানে মোতিয়েতের ট্যাক, হেলিকপ্টার ও নৈজ প্রেরণকে অভিনন্দন জানানো এবং সর্বোপরি হুনিয়া জুড়ে মোতি-য়েতের আধিপত্য বিস্তার ও আগ্রা-মণের নীতির প্রতি অবিচল ও অনবরত সন্মতন নিবাহিত করা।

ভ্রমরহোদয়গণ! এই পথে যদি "ভারতীয় সাম্যবাদ" আসে এবং এই 'স্বাধীন পন্থা' যদি আপনারা ভারতবর্ষের জন্ত উন্মুক্ত করে দেন, তবে কেনে রাখুন মহান ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক জনগণ সেই পথের ধারে পুণ্ড্রবক হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে না, শঙ্করনিও করবে না। যথার্থোপা-অভিনন্দনই আপনারাদের জন্ত অপেক্ষা করবে।

পূর্তমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইউ, টি, ইউ নিয় (বহুবাজার) সম্পাদক তথা রাষ্ট্রের পূর্তমন্ত্রী শ্রীমতী চক্রবর্তী মধ্য কলকাতার একরা ম্যানসানে একটা ট্রেড ইউ-নিয়ম কলেজ স্থাপনের শুভ প্রচেষ্টার নাকি অস্বীকৃতভাবে বাধা দিচ্ছেন। এর ফলে এন, এফ, আই, টি, ইউ-এর ছ লক্ষ লক্ষের চোখে নাকি বাম-ক্রান্তের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইনস্টিটিউট কর ইন্ডিয়ান লেবারের সভাপতি শ্রীমতী সেন একথা বলেন। পূর্ত-মন্ত্রীর প্রাক্তন কয়েক শ্রীমতী আরো জানান যে, ট্রেড ইউনিয়নে শিকার, আপোষ-মীমাংসা বৈঠকে প্রমিক-দেরকে আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষণের জন্ত ভারতে এই প্রথম তারা একটা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ চালু করছেন। সেজন্ত একরা ম্যানসানের ৫/৬ অংশ ইতিমধ্যেই কেনা হয়েছে। শ্রীমতীর অভিযোগ যে পূর্তমন্ত্রী চৌরঙ্গী পাড়ার ইনস্টিটিউট কর ম্যানজমেন্ট-এর মতো বড় পুজিপতি প্রতিষ্ঠানে হাত না দিয়ে অস্তায়ভাবে ইনস্টিটিউট কর লেবারের একরা ম্যানসান ক্রয়ের ব্যাপারে কুংপা রটাজেন।

একরা ম্যানসানের ৫/৬ অংশ

ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে

ভয়াবহ অবস্থা চলছে

স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে বহু লেখা কাগজে বেরিয়েছে, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাঁশগুপ্ত নিজে হাসপাতালগুলোর ভ্রমবাহ্য অস-স্তোম প্রকাশ করেছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য-পূর্ব তথা পরং। আপনিত্বগী নিয়ে ট্যান্ডি করে হাসপাতালে যাব, ইমার্জেন্সি ডাক্তারবাবুরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে 'ভর্তি'র যোগা কেন, 'একান্ত দরকার' মনে হলেও চিকিটে লিখে দেবেন, 'অ্যাডমিশান নেলে-নারি, রিগ্রেট ইউ গ্রেট ডাট নো-বেড ইজ ড্যাংকাট। ট্রাই ফর আদার গ্রেট হসপিটাল।' লিখে হাসপা-তালের রাবার ষ্টাম্প দেবে দেবেন। ট্যান্ডি নিয়েই আপনিত্ব আর, জি, কর থেকে স্রুদ্র দক্ষিণে বাসুর হাসপা-তালে খাম, রুগী ভর্তি করাতে পারবেন না। যদি না কেউকেটা কেউ আপনার জানাশোনা থাকে। আর মফঃস্বলের হাসপাতালে তো মেকের শুদ্র নয় এক বিছানার দুই সন্ত প্রসূতি শুয়ে থাকেন। রুগী যেম কাঠাল, তাই নোংরা মাছি ভ্রম ভ্রম করে।

বহু হাসপাতালের বহু রিপোর্ট কাগজে বেরিয়েছে কিন্তু উন্নতি না

উক্ত ইনস্টিটিউট কিম্বা গুপ্ত নভে-যে মোট ন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায়। ১৯৭২-৭৩ সালে বেঙ্গ-লিয়ারের ওয়ার্কিং ম্যুজমেন্ট সংস্থা শ্রীমতীর এন, এফ, আই, টি, ইউকে দশলক্ষ টাকা সাহায্য দেয়। এই টাকায় ঐ অংশ কেনা হয়। যেহেতু উক্ত অংশের মালিক ছিল নেপালের রাণা পরিবার তাই ইনস্টিটিউটকে ঐ বাড়ি কেনার জন্ত রিজার্ভ ব্যাকের একচেত্ব কন্ট্রোল বিভাগের অঙ্গমতি নিতে হয়। কলকাতা হাইকোর্টের এক ডিক্রিও এই ক্রয়ের স্বপক্ষে আছে। ঐ বাড়ির বাকি ১/৬ অংশ নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে মামলা চলছিল। গত ডিসেম্বরে কলকাতা হাইকোর্ট এক রায়ে রাণা পরিবারকে বজাচ্ছেন ঐ ১/৬ অংশ ইনস্টিটিউটের কাছে একলক্ষ বাট হাজার টাকায় বিক্রি করতে। পরে অবশ্য এপিলেট আদালতে এই আবেদনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। শ্রীমতী বলেন, পূর্তমন্ত্রী বিভাগীয় বিষয়ের উপর মন্তব্য করে আদালতকে অবমাননা করছেন।

এই অংশ ক্রয়ের জন্তও বেঙ্গ-লিয়ারের ঐ সংস্থা ইনস্টিটিউটকে পুনরায় ছাড়াও অধিক টাকা সাহায্য দিয়েছে। শ্রীমতী আরো বলে বলেন যে একরা ম্যানসান ক্রয়ের ব্যাপারে কোন কারচুপি নেই।

হলেও অবনতি হয়েছে। যে খে বোকা দায়, আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাণ্ডা, না বামফ্রন্টের বিপ্লবী সমাজ-তন্ত্রী নেতা ননী ভট্টাচার্য।

ননীবাবু ও পার্শ্ববর্তী অবস্থার জন্ত পূর্ব কলকাতার পার্ক সার্কাসের জ্ঞানামল-মেডিক্যাল-চিকিৎসা হাস-পাতালের বর্তমান অবস্থার একটি ছবি তুলে ধরছি। হাসপাতালের রাজা রামমোহন রায় রকের দোতলায় পাচনশর বেডের জনৈক রুগী গত নয়ই জুলাই রাত লাঞ্চে নটার মারা যান। সারা রাত ঐ মৃতদেহ বিছানাতেই থাকলো, কেউ তা দরবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। পাশেই চারনম্বর বেডের রুগী শ্রীমতী অধিকারী আশঙ্কাজনকভাবে হার্টের রোগে ভুগছেন। পরদিন সকালে মৃতদেহ সরানো হল। এ রকম হামেশাই ঘটছে, সকাল নটার মারা গেলে মৃতদেহ সরানো হচ্ছে লক্ষ্যের। কারণ হাসপাতাল মর্গের লোকেরা তখন ছিলিম নিয়েই ব্যস্ত, মৃতদেহ ঢাকা দেবার যে পূর্ণায় ব্যবস্থা আছে, তাও ব্যবহার হয় না, হলেও বাধা তালোভাবে হল না। পাথার হাওয়ার দেই পদীর চাঘর উড়ে পাশের বেডের রুগীর মুখে পড়ছে। পাশের বেডের রুগী খাবার হাতে নিয়ে মৃতের মুখ দেখছে। সাময়িক অবস্থা তাদের কেমন হবে তা বোকাই যায়। কল বুক পাঠানো লবেও নাকি ওয়ার্ড বরকে পাওয়া যায় না।

রাত আটটার বেলা গেল, কর্ম-চারীরা এল চাঘর কাঁধে। দশটা বাজা মাত্রই লকলে ঐ চাঘর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ কোন বেড-প্যানের দরকার হলে ঘরের দিটার মার্শ যদি বরদের ডাকেন, শোনা যায় ওদের নাসিকা গর্জন। বহু হাঁক-ডাকের পর উঠেই বররা দিটারঘরে ধমকে বলে 'এখন যান, পরে হবে।' বর বা জমাদারদীনের চাঘর জল রুগীর দুধ গরমের আগেই হিটরে বসাতে দিতে হবে। ওয়ার্ডমাস্টার রতনবাবুও সুইপার-জমাদারদীনের লে নাকি আর্থের জন্মই মধুর ব্যব-হার করেন।

রুগীর খাবার রুগীর কাছে পৌছানোর আগেই নিঃসৃত্য বসন্ত হয়ে যায় ওয়ার্ড বরদের মধ্যে। সাহ-ভিম-মাল, দুধ কটি-ভাত সবই টিকিন বাস ক্যান ভর্তি হয়ে যায় ওদের বাড়িতে। দুধের গাড়ি এল। ক্যান ভর্তি করে ওরা দুধ নিল। শেবাংশ চম পুঠার

বিশ্বের বৃহত্তম বিয়োগাত্মক দৃশ্যটি

শ্রীপতি নন্দী

প্রথমতঃ কমানোর ক্ষমতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেই, তার বাপেরও ছিল না। বাপবোটার উত্তর জমানার যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গায়ে গতরে দশানই করে নিরীহ দেশবাসীকে উপহার দেওয়া হয়েছে, একমাত্র অর্থনৈতিক অত্যাচার ছাড়া তার দেয় আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না। এ অর্থনীতিতে যদি প্রথমতঃ কমানো; জাতীয় আয়ের বন্টনব্যবস্থা প্রসারিত হতো, শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি মারফৎ পণ্যপ্রবাহ স্থলভ হতো, স্বয়ংক্রিয় সাহায্যে যদি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেতো, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তো, যদি অর্থনৈতিক অনাচারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব-পন্ন হতো, শিল্পে স্বয়ং প্রতিযোগিতা চলতে পারতো, তাহলে 'মিশ্র অর্থনীতি' বলে অভিহিত দেশী বিদেশী মিশ্র প্রক্রিয়ার প্রবর্তিত নয়া-পুঁজিবাদ এতাবৎ প্রতিষ্ঠিত সমস্ত অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাকে বাতিল করে দিত। কিন্তু খচ্চর যেমন অশ্বশাবক প্রসব করে না, খচ্চর-শাবক প্রসব করে তেমনি বৈদেশিক পুঁজি নিরস্ত্রিত ও দাসত্বাবাদী পুঁজির ছকে আবদ্ধ ভারতীয় নয়াপুঁজিবাদ তার প্রজন্ম-ধর্ম পালন করছে এবং করবে। অতএব, ভারতবাসীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতি, শিল্প সংস্কৃতি, কর্ম-সংহান, পণ্যের নির্ধারিত মূল্যমান—ও সবের কোন বালাই নেই। বিটলে জন্মের নিয়মধর্ম অস্বাভাবী আতুড়-বয়ে এ নয়া পুঁজিবাদ জন্ম-গ্রহণ করে পড়ায় এ সবের বালাই আরো নেই। অতএব, সর্বপ্রাসী মুনাকশাহী জলছিটানো আশের ছোবড়া নিংড়ে রস বের করছে। অশানবাজীর জীবনে তবু শৈশব কীরে আসে না—IBRD এবং IDA-এর ডলার সাহুলীতেও না; স্বদেশে কড়ি গুণতে ফের স্বদেশে আরো স্বদেশে ডোবে। একটানা বিপ-বছর ধরে বিশ্বের সর্বপ্রধান স্বপ্নগ্রাহী-তারুপে বিশেষ মতুন মতুন রেকর্ড স্থাপি করে ভারতীয় অর্থনীতি স্বপ্নের অতল পাড়ায় ডুবে থেকে একটানা স্বপ্নবুদ্ধির পথে স্বপ্নবুদ্ধির রমরমা ধোয়াব বেধে ও দেখায়। স্বপ্নবুদ্ধির সন্তাবনা কখনও ছিল না হবেও না। 'ইন্ডিজেনাস' শিল্পের ভিৎ আলগা কারণ আভ্যন্তরীণ বাজার তবুই নষ্টচিত হয়ে চলেছে। অতএব বিদেশী বাজার ভরসা হয়েছে। আর 'একপোর্ট ওরিয়েন্টেড' শিল্প

তো জন্মগরেই প্রোবিত্তত্বকা—বৈদেশিক বাণিজ্যের আহ্বানপথে রসদ পায়, নিঃশ্বাস নেয়। কশ-মার্কিনী অস্ত্রজেনের তাগিদ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—জাহাজ চলাচলে বাটটি পড়লেই ছটফটানি শুরু হয়, জাহাজ বন্ধ হলে একেবারে টেঁদে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। অর্থনৈতিক মরণদশা আর কাকে বলে। অতএব, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ বাড়ে কিন্তু অর্থনীতি মজবুত হয় না, চাঙা হয় না। বিদেশী বাজারের আমন্ত্রণে অভিসারী শিল্পনীতি দেশের অর্থনীতির ভিত্তি প্রসার করে না, কিন্তু বিদেশী পুঁজির খাই মেটাতে আর বৈদেশিক ঋণের দায় মেটাতে দেশবাসী দামত-করা পাঠা হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তথাকথিত 'জাতীয় আয়' বাড়ে কিন্তু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমে। শিল্পে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু পণ্যপ্রবাহ আরো দুর্লভ হয়। বৈদেশিক 'সাহায্যের' আমদানী বাড়ে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আরো বাড়ে, স্বয়ংক্রিয় সন্তাবনা আরো কমে—যুগপৎ মূল স্ফীতি আর ঋণের দায় মেটাতে দেশবাসীর সন্তা প্রম আরো সন্তা হয়, উপার্জনের উপর আরো পরোক্ষ কর চাপে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা হয়, দেশী পুঁজি গায়ে-গতরে বাড়ে কিন্তু বিদেশী পুঁজির কজা আরো শক্ত হয়। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে, মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্যের অঙ্কটাও বড় দেখায় কিন্তু ভাতকটি আরো দুর্লভ হয়, হুপ্পা হয়। একই সঙ্গে বছরে বছরে লাখ লাখ গরীব চাষী ভূমিহীন হয়, কিন্তু শিল্পমন্ডুরে পরিণত হয় না। বিজ্ঞান-সম্মত চাষ-আবাদ বত বাড়ে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের বিদেশে চালান ততই বাড়ে—অবশ্যই মুনাকশিকারী এ শিল্প ব্যবস্থার ধোয়াকী বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে। শাপনভাসিক সংবিধান বতই 'সংশোধন' হয় দেশী বিদেশী মালিকশাহীর বিধায়ক কেন্দ্রীয় সরকারের শক্ত মুঠো ততই বেশী শক্ত হয়, সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অধিকারগুলিও ততই লোপাট হয়ে যায়, আর কেন্দ্রীয় শালক গোদীর আকলিকতাবাদী বৈষম্যনীতিও ততই কঠোর হয়; একই কারণে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত বর্ণগত ভেদাত্মকগুলি ততই মাথাচাড়া দেয় এবং অর্থনৈতিক

শ্রেণী দ্বন্দ্বকে আড়াল করে দিয়ে শোষণশ্রেণীগুলিকে ও দেশীবিদেশী পুঁজিশাসনকে আরো সাশ্রয় এনে দেয়। আর একই দামদ্বন্দ্ব মূল্যে গাথা পয়সটি কোটি মানুষের একত্র-শৃঙ্খলিত আশা-উদ্বোধগুলি কিছুত-কিমাকার 'জাতীয় সংহতি'র প্রয়োচনায় এলোপাখাডী আক্রোশে আত্মবাতী হয়ে উঠেছে। প্রায়শঃ কমিশনরূপী পরমাশ্রম্য প্রতিষ্ঠাতকের বক্তা-বোকাই প্রান-কাব্যগুলি নিহেনপক্ষে প্রথমতঃ প্রানের ছকে ধরে রাখতে অক্ষম। কিন্তু মনীষীগণের ব্যর্থতার দায় ইতর জনের ঘাড় মটকায়—মুদ্রাস্ফীতির পায়ের নিবেদিত প্রানগুলি জনসাধারণের ঘাড়ের পরোক্ষ করের বে বাড়তি বোকা চাপায়, প্রানের দাক্ষিণ্যবঞ্চিত কোটি কোটি বেকার ও পেশাচ্যুত প্রমজীবীরাও তার দায় টানতে বাধ্য। প্রায়শঃ কমিশন বেকারবৃদ্ধি চান কি চান না, মূল্য-বৃদ্ধি চান কি চান না, বৈদেশিক ঋণের বোকা বাড়াতে চান কি চান এ প্রশ্নগুলি অবশ্যই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় না। যে কচুর চাষ করে সে কচু-পাতা চায় কি চায় না সেটা গোপ। এক্ষেত্রেও তাই। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজরা এদেশে বেকার-হস্তির উদ্বেগ নিয়ে এসেছিল এমনটি নয়। তারা চেয়েছিল, নিজ দেশে নবজাত শিল্পের প্রয়োজনীয় ধোয়াক সংগ্রহ করতে, নবজাত বুদ্ধোত্তর শ্রেণীর খাই মেটাতে। কিন্তু এতে করে যদি ভারতে দারিদ্র্য বাড়ে, খাদ্যমূল্য বাড়ে, হস্তিক মনস্তর হয় 'তবে তাই হোক'। ইংরেজ-পরিভ্রম্য রাজদণ্ড হাতে নিয়ে ভারতীয় নয়াবুদ্ধোত্তর শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিক্রমে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন ইংরেজ-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক মূলকাঠামোটাকে (বেসিক ট্রাকচার) আঘাত না করে বিদেশী প্রবীণ পুঁজির সহায়তার দেশীয় শিল্প পুঁজিকে গড়ে তুলতে—প্রথমে বৃটিশ নেতৃত্বে পরে ইং-মার্কিন নেতৃত্বে এড্ ইতিয়া কনসোর্টিয়ামের সহায়তায়। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে যদি আশা-নিামস্বতাত্মিক অপরূপগুলিকে আকড়ে ধরতে হয়, যদি সামন্ততান্ত্রিক ধর্ম-ভেদ বর্ণভেদ সম্প্রদায়ভেদ জাতি-পাতের ভেদ ইত্যাদির জিসির চড়িয়ে নির্বাচনী ছুঁচোর কেতন করতে হয়, 'তবু' ভি'আচ্ছা'। দেশীবিদেশী মিশ্রপুঁজির কাঠামোকে শালালো করতে গিয়ে যখন দেশে

বেকারী বাধ্যতামূলক হয়ে এলো, তখনও নয়াবুদ্ধোত্তর 'জাতীয় আয়ের' অঙ্ক সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। দেশের কোটি বেকারটির অবশ্যই খাদ্য অধিকার কিনে নিয়ে খেতে হয়, লাজ চাকতে কাপড়খণ্ড কিনতে হয় অর্থাৎ এরাও মাল কাটায়, ট্যাঙ্কের বোকা টানে, মুনাকশারযোগান দেয়; আবার তারাই ভীড় করে সন্তা প্রেমের অটোজ যোগান দেয়; অর্থাৎ কায়দাটা এমন যে যখন জনসমাজে লবনাশের প্রাবল তখনই ধনিক বণিক সমাজে ও রাজকোষে পৌষের উৎসব। মেসী সংবিধানের ঢেঁকীছাটে কালো টাকাটাও তখন সাদা হয়ে আসে। যে পৈতে গলার নিয়ে নেহরু এহেন দেশসেবার পৌরোহিত্য করে-ছিলেন তারই স্বরূপও ক্রমাক্রমস্বায় জড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধী লে পৌরোহিত্যকে সম্প্রসারণ করেছেন মাজ, এক্ষেত্রে ডলার স্টালিং পুঁজিসহ কবল পুঁজির সহ-আবেষ্টনীতে। যনামধন্ত মজর গান্ধী বেঁচে থাকলে তাই করতেন; অতএব কশ-মার্কিন কেরেবাজের চোখে মজর কোন অ-পাজ ছিলেন না। অতএব, বাধ্যতামূলক বেকারী আছে, বাড়ছে বাড়বে। ভূমিহীন চাষী শিল্প কর্মসংস্থান পায় না, পাবে না। পরোক্ষ করের বোকা—বা বেকার ভূমিহীন সহ দরিদ্র সাধারণকেই প্রধানতঃ বহন করতে হয়—আরো বাড়ছে, বাড়বে। প্রত্যক্ষ কর যা সাধারণতঃ ভাগ্যবানদের দেয় তা কমতে, আরো কমবে। পেঞ্জাই পেঞ্জাই 'পরিকল্পনা'র রাজস্বর স্বজ্ঞে দেশবাসীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশী-বিদেশী স্বতঃপ্রেরিত তোগে লাগছে লাগবে। মূলধন মেশিন আর মেশিন-পানে বোকাই জাহাজগুলি 'এই ভারতের মহাখানবের সাগরতীরে' আরো ভীড় জমাবে, ফিরে যাবে এ দেশীয় সন্তা প্রম আর ভোগ্যপণ্যের আরো আরো উপহার বোকাই করে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবার্ণগুলির সর্বপ্রধান মূগয়াকে অর্থনৈতিক নৈরাজ্যে প্রথমতঃ লাগায় নেই, থাকতে পারে না; অতএব তার উল্ল-মুখী সকার থামবে না, থামতে পারে না। স্বতরাং যে দেশ কিছুটা 'দিতে খুতে পারে,' বিশ্বের একরূপ ছোটবড় লবক'টা দেশের কাছেই এদেশ-বাসীকে ঋণের দ্বারে বেঁধে ফেলা হয়েছে অনেক দিন থেকে। ঋণের দায় দেশবাসীর, কিন্তু 'দুখ খেয়ে বাবে দারোগা লাগে'—বাহবাকী দেশবাসী নিতান্তই গরুর মালিক, গরু-রাখাল, গো মা তার দেশে গোপালন পরসো ধর্ম:। 'সাহায্য' আসছে এবারেও—তুমাজ, 'এড

ইতিয়া কনসোর্টিয়াম' থেকেই অনুন ২০০ কোটি টাকার অঙ্ক, অবশ্যই চড়া হবে। অতএব শ্রীমতী গান্ধী ব্যর্থ হন নি, ব্যর্থ হন নি তার সমাজতন্ত্রী পিতাও। তারা যা চেয়েছিলেন তা লব কিছুই পেয়ে গেছেন মাথ মিটিয়ে, আশাভীত পুরি যা পে। অবশ্যই আশা-ঔপনিবেশিক আশা সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার আত্মপূর্তে আবদ্ধ এবং শ্রেণীচেতনার শিহিয়ে থাকে দেশী পুঁজির ফুলফল ও বিদেশী পুঁজির দালান নেহরু রাজবংশের স্বপ্নগুলি সার্বক হয়ে উঠবে না কেন? স্বতরাং উটকো আর কুঁইকো কয়েক লাখ বাড়িকাজ তালেবরকে বাদ দিলে বাহবাকী স্বপ্নগুলি কোটি দেশবাসীর বর্তমান-ভ্রমহ, ভবিষ্যৎ অচিস্তানীর। বিশ্বের অজ্ঞাত যখন যানব-দামবে জীবন মরণ জড়াই চলছে, ভারতবাসী তখনও দানবের বোকা টেনে মুখ জুড়তে পড়ছে, দম মেবার ফুরলটুকুও নেই। গতদিন পূর্ব্ব একটর পর একটি 'জনপ্রিয় সরকারের' আবির্ভাবে আর তিরো-ভাবে 'নেহরুর স্বপ্ন' সার্বক হয়ে চলবে, ততদিন পূর্ব্ব্ব এ সমস্ত বোকা টানতে হবেই। বোকা আরো বাড়বে—স্বপ্নের বোকা, পরোক্ষ করের বোকা, বেকারীর জালা, অনা-হারের ক্রেশ, অপরূপ অতিশাপ, অচিকিৎসার অসহায় অবস্থা, প্রশান-নিক নির্ধাতন অত্যাচার অগমান—বেজন্মা সমাজব্যবস্থার এ সমস্ত ময়দা-গুলি—ভারতীয় জীবনের অতিশাপ-গুলি মানব সভ্যতারে প্রগতিকে পিছনে টেনে রাখবে এ মূগের এ বৃহত্তম বিয়োগাত্মক দৃশ্যকে আরো মর্যাত্তিক করে তুলবে। ফং (ই) এর এবারকার বাজেটেও একই 'রাহ নাম লং দায়' সন্দীত বাজেট। বাজেট বংশগুটি বানিকটা তেল পালিশ করে হালির করা হয়েছে, কিন্তু ডিউটি (Duty) ছাড় হয়েছে যেমন দেশলাইয়ের কাঠিটি কিংবা কাপড় কাচার সাবানটি হুলস্থল হয়ে ওঠেনি, তেমনি ডিজেল-মূল্য আর রেল-মাস্তলের পিঠে চক্রে বাবতীর পণ্য-মস্তার আরো উন্নয়নশীল হয়েছে—ধরতে ছুঁতে হলে আরো কলি ধপাতে হবে এই যা। যখন-কাল বাহুকীনাগিনীর তত্ত্ব নিয়ানে কণা-মাজ বিভক্ত বাহু থাকে না, থাকতে পারে না।

চলচ্চিত্র নাটক

উত্তমকুমার

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তমকুমারের মৃত্যুতে বাংলা ছবির জগতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, তা শীঘ্রই পূরণ হবে বলে মনে হয় না। তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন না কখনোই, কিন্তু যে একা-স্তিক নির্ভর, পরিচয় ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি তাঁর সীমিত কর্মতার মধ্যেই অভিনয় দক্ষতাটুকু অর্জন করেছিলেন, তেমনটির সাক্ষাৎ বর্তমান বাংলা ছবির নায়কদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

প্রথম আবির্ভাবেই উত্তমকুমার কোন সাদা ভাগাতে পারেন নি, যেমন সাদা জাগিয়েছিলেন একদা প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম কয়েকটি ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় ছিল অচল। পঞ্চাশ দশকে 'বহু পরিবার' ছবিতেই প্রথম তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর 'চাঁপাভাঙার বোঁ' 'লাড়ে চুসান্তর' প্রভৃতি ছবিতে কিছুটা মানিয়ে নিয়ে অভিনয় করেন। বাংলা ছবিতে বরাবরই নায়কদের চেয়ে নায়িকারা কিছু বেশি লক্ষ্যের অপেক্ষাকৃত বেশী কর্মতার পরিচয় রেখেছেন। সুচিহ্না সেন অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সুচিহ্নার বিপরীতে বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করে তবেই উত্তমের ঠাই হয় দর্শক মনে এবং শেষ পর্যন্ত অভিনয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ঐশ্বর্য ধীরে ধীরে তাঁকে একজন দক্ষ অভিনেতা করে তোলে।

একবার এক প্রদর্শন উত্তরে উত্তমকুমার জানান, তাঁর কাছে আদর্শ অভিনেতা হচ্ছেন প্রমথেশ বড়ুয়া। শুনে অবাক হয়েছিলাম— কারণ, প্রমথেশের অভিনয় ধারার কোন ছাপ তো তাঁর অভিনয়ে নেইই, এমন কি প্রমথেশকে অনুসরণ করার কোন লক্ষণও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করিনি। বরং রবীন্দ্র মজুমদার ও বিকাশ রায়ের মধ্যে সে লক্ষণ কিছুটা দেখা গিয়েছিল। কার্টা কার্টা লংলাপ উচ্চারণে ও অভিব্যক্তির তীব্র প্রক্ষেপে বড়ুয়ার যে অনন্ত বৈশিষ্ট্য চরিত্র বিশ্লেষণে ভাস্বর ছিল, তাঁর থাকার কিন্তু কারও মধ্যেই তেমন পাওয়া যায় নি। বড়ুয়াহীন অনন্যসীলতার পরিবর্তে বরং আবেগ

প্রকাশের দিকেই উত্তমকুমারের ঝোঁক ছিল। উত্তমের অভিনয় কিন্তু কখনই বুদ্ধিগোষ্ঠ বলে মনে হয় নি। 'অগ্নিশরীকা', 'শিল্পী', 'সাগরিকা', 'হারানো স্বপ্ন', 'দগুপদী', 'জীবন তৃষ্ণা' প্রভৃতি ছবিতে সুচিহ্না-উত্তম জুটির অভিনয় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানেও লক্ষ্যণীয় যে, সুচিহ্নার রোমাটিক অভিনয়ের ধাঁধা ছিল বেশী। ছবির পর ছবিতে ক্রমাগত অভিনয় করার পর উত্তমের অভিনয় হয়েছিল অনেক পরিণত সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনোই তা অসা-ম্ভাব্যতার দাবি করতে পারে না। অভিনয় শিল্পী তাঁর রসবোধ, কল্পনা-শক্তি ও স্ফূর্তি কর্মতার জোরে অভিনয়ের চরিত্রটির বিশ্লেষণ ও সমা-লোচনা করে অভিনয় মাধ্যমেই যে দ্বিতীয় ভূবন রচনা করেন—সেখা-নেই থাকে তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা। এমন অভিনয় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না উত্তমকুমার অবশ্যই। তিনি অভিনয়ের চরিত্রটির রূপ দিতেন বেশ সাধারণ মাপে, তাতে না থাকত কোন ব্যঙ্গমণা বা কোন অতিরিক্ত যাত্রা। 'অ.ম.জ.ব.', 'জী', বা 'অগ্নিশর'এ হাপট থাকলেও নেই কোন শিল্পের স্বল্প অভিপ্রকাশ। তবে 'মায়ক' ও 'বহুবংশ' ছবিতে তাঁর অভিনয়ের স্ফায়ার অস্বীকার করার নয়। 'বিচারক' ও 'জতুপুং' ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। আবার 'গৃহদাহ' ও 'বিরাট বোঁ' ছবিতে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েও মহিম ও নীলাধর চরিত্র দুটির বিশ্লে-ষণে ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য আরও দেওয়া যায় এবং একথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, উত্তমকুমার এক জনপ্রিয় তারকা। আবার একথাও মিথ্যা নয় যে, জন-প্রিয়তাই গুণমানের বিচারে একমাত্র মাপকাঠি নয়। এমন গুণী শিল্পী বেশ আছে, যারা তেমন জনপ্রিয় নয়। অনেক বেশী অভিনয় কর্মতার অধিকারী হওয়া লয়েও চার্লস লটন কিন্তু গ্রেগরী পেকের সমান জন-প্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। আবার কখনো কখনো উচ্চমার্গের গুণী শিল্পীও অসামান্য জনপ্রিয় হন, যেমন চ্যাপলিন। তবে সাধারণত:

জনপ্রিয়তা লাভ করা যায় সাধারণের ইচ্ছাপূরক চরিত্র সংগতি বজায় রেখে মনোহরকারী অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। সেখানে উচ্চমানের অভিনয়-শৈলীর অভাব ঘটলেও জনপ্রিয়তা অর্জনে বাধা ঘটে না—সাধারণ দেহ-কান্তি, রোমাটিক অভিনয়ের সাধারণ ছলকলা ও প্রচার কৌশলের পদ্ধতি একটি নায়ককে জনপ্রিয় তারকার পরিণত করে—যেমন, উত্তমকুমার।

চলচ্চিত্রে উত্তমকুমারের অবদান বলতে গেলে শুধু এইটুকুই বলতে হয় যে, অধিকাংশই বাংলা ছবি ও কিছু হিন্দী ছবিতে নিরলস অভিনয় মিষ্টার যে পরকাটা দেখিয়ে গেছেন তিনি, তা অভিনয় শিল্পীদের প্রেরণা জোগাবে। কিছু ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনাও করেছেন তিনি, কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় রাখতে পারেন নি। একদা 'অভিনেতা সম্রাট' থেকে লক্ষ্যবলে বেয়ে এসে 'শিল্পী-সংসদ' নামে এক সংগঠন করেন এবং এখানে তাঁর সাংগঠনিক কর্মতারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তাঁর বাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীই বেশী সক্রিয় ছিল। এই শিল্পী সংসদের ব্যামারে দুটি ছবি এ বাবত প্রযোজিত হয় হুগু শিল্পী কলা-কুশলীদের আর্থিক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে। বাংলা ছবির অনেক দশকটম্বর মুহুর্তে উত্তমকুমার বিচ-লিতও কম হন নি—রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কয়েক-বার দরবারও করেছেন দশকট নির-লসের জন্য। এসব অবশ্যই তাঁর স্বর্ণযুগের কাজ।

উত্তমকুমারের আকস্মিক মৃত্যু অবশ্যই শোকাবহ, সন্দেহ নেই। তাঁর মত জনপ্রিয়-শিল্পীর জীবনা-বদানে লম্বা দৃষ্টি বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসায়িক ক্রতির কিছুটা সম্মুখীন হবে। ধারা তারকাকে মূলধন করে চিত্র ব্যবসা করেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই মাথার হাত দিয়ে বলেছেন—এতো বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই বাস্তব বেনিয়ারুত্তির সজ্জাশ্রমক লালসার প্রসংগ তুলে লাভ নেই— কারণ এর মধ্যে আর বাই থাক, চল-চ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন নাথানে সং-প্রদানের কণামাত্রও থাকে না। প্রবল উচ্ছ্বাসে অতিশয়োক্তির মধ্য দিয়েও প্রয়াত শিল্পীর প্রতি কিছু যথাযথ প্রজ্ঞা প্রকাশ পায় না বলেই মনে করি। তিনি কেমন শিল্পী ছিলেন এবং তাঁর অবদান কি—যুক্তি-যুক্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করলেই তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানো লংগত হয়। তিনি কিংবদন্তীর মায়ক ছিলেন না মহা-নাটক ছিলেন না—তা ম হা কা ল ই বিচার করবে।

রঙ্গমঞ্চে যৌনোন্মাদনার নাটক

বাংলা রঙ্গমঞ্চের সমস্ত ঐতিহ্যকে নষ্ট করে অধুনা যে যৌনোন্মাদনা দেখা দিয়েছে রঙ্গালয়গুলিতে, নাট্য লংঘুতির ক্ষেত্রে তা এক বিধ্বংসী পরিণামকেই ডেকে আনছে। নাট্যা-ভিনয় বেখানে লোকশিকার অস্ত্রতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বাধীন স্বীকৃত, আজ সেখানে জনকচিত্র বিকৃতি ঘটিয়ে চিত্রের দুর্বলস্থানে হুড়হুড়ি দিয়ে যৌনোন্মাদনা সঞ্চার করে সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে পঙ্ক করে দিতে চায় সাধারণ রঙ্গা-লয়। এই সব মঞ্চে জীবন বিমূখ ভাবনাকে প্রদর্শন দিয়ে নর নারীদেহের পশরা লাজিয়ে দর্শক সাধারণকে প্রলুব্ধ করা হয়। নাটকের প্রয়োজনে নরতা নয়—মরতা দেখাবার উদ্দেশ্যেই নরতা—তাই এর মধ্যে থাকে কুং-সিত্ত কদম্বতা—শিল্পের নামে ব্যক্তি-চারিতা—বে পি রা বৃ ত্তি র জঘন্য অসত্ততা। যে ক্যাবারে ছিল নামী-দামী হোটেলের আকর্ষণ, তা আজ সাধারণ রঙ্গালয়ে নেমে এসেছে সাধারণের হৃদয়-এজিরারে। রুচি, জমজামা ও শিল্পবোধকে তোয়াক্কা না করে রঙ্গমঞ্চে ব্যবসা জমে উঠেছে। বাস্তব জীবন থেকে কিছুকালের জন্য দুটি নিয়ে সাধারণ দর্শকও দুটে চলেছে—স্বপ্ন কামনাকে লালসার রক্তিম করে তুলতে। অর্থনীতির অকৌশলের বন্ধনে আড়ষ্ট অর্জিত জীবের মেরুদণ্ডটিকে অকোঁক্য করার চক্রান্তে পুঁজিবাদী সমাজের এই খেলায় রঙ্গত দেওয়াটাও চমৎকার।

—তা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। অথচ এ লবের পাশে পাশেই এখানে এখানে কিছু কিছু গ্রুপ থিয়েটার, জীবনধর্মী সমাজ সচেতন সং মাট্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য অমিত বিক্রমে। তাদের থিয়েটারে দর্শক কম স্বভাবতঃই, কিন্তু তারা হতোভয় নয় কখনই।

নাটকে অপসংস্কৃতি রোধের জন্য আইন প্রণয়ন এখন এখনই সম্ভব নয় আর আইন হলেও এখন আইনের ফাঁকটুকু দিয়ে অবৈধ কর্ম চালু রাখার রেওয়াজ আছে, তখন ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো ছাড়া গতি নেই। মাঝে মাঝে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে, মিছিলও বার হয়, কিন্তু তা এতই বিকল্প ও অসংগঠিত যে, তা কোনভাবেই ফলপ্রসূ হয় না। স্বপ্ন সংস্কৃতির স্বপক্ষে স্বসং-গঠিত প্রচার মাধ্যমে জনমত গঠন করতে না পারলে অপসংস্কৃতির বিপক্ষে সাক্ষ্য লাভ করা যাবে না। এই প্রচার চালাতে হবে ব্যাপক-ভাবে সং নাটক রক্ষণ করার মধ্য দিয়ে পত্র পত্রিকার রচনা মাধ্যমে, মিছিল ও সভাসম্মেলনের সাহায্যে। এই উদ্যোগে রাজ্য সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা কিন্তু একান্তই বাঞ্ছনীয়।

হাসপাতাল

৬ষ্ঠ গৃহাঙ্গের পর মিশিয়ে ছিল জল। অমেকেই হাস-পাতালের ভাত, তরকারি পছন্দ করেন না বলে বাড়ি থেকে খাবার আনান। তাদের বরাদ্দ খাবারটা শ্রেক চুরি হচ্ছে। এর সঙ্গে আছে অল্প রুগীর জন্য বরাদ্দ খাবারের পরি-ম্যান হাটাই। আপনাতর আহার ট্যাক্সের পরসার কেনা চুরি করা এই খাবার নিয়ে একপ্রকার কর্মচারী ব্যবসাও চালায়। হুড়ি পরসার ডিম সেদ্ধ। ৭৫ পরসার মাংস-ভাত, ৩০ পরসার একপো দুধ। ওয়ার্ড-বস, হুইপার মাসী, স্পেডাল মাসী ব্যাগে দুধের ক্যান, টিফিনবাক্স নিয়ে গটগট করে চলেছেন। বন্দোবস্ত করা আছে। রুগীর খাবার ঐ মাসীদের বাড়িতে যাচ্ছে। শুধু ওদের বাড়ি কেন, আশপাশের দু/একটা হোটেলও পাবেন ঐ খাবার। আই ডিপার্টমেন্টের সবুজ চাদরও ওদের বাড়ি চলে যাচ্ছে। ঐ কাপড়ে হচ্ছে লাঠা, রাউজ, আটার-ওয়ার। বারো টাকার ওরা ঐ চাদর বিক্রিও করে। কখন বিক্রি হয় ত্রিশ টাকার। হাজার হাজার টাকা হামের অপারেশনের বরপাতি হামে-শাই চুরি হচ্ছে।

রাত আটটার পর হাসপাতালের পেছনের ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে মদ-গাঁজা ঢোকে। সমস্ত ব্যাপারটাই নাকি স্থপার স্বজিত মিত্রের জানা। তিনিও নাকি এই লম্বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ শুনেছি।

শ্রমিক হুইসেলস

৩য় পৃষ্ঠার পর

হুইসেলস অ্যাক্ট ১৯০৬-এর ৮ ও ৮ (এ) ধারা অধীনে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয় এবং এর থেকে জরিমানা বাবদ রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার হয়। কিন্তু চীফ ইমপেক্টর জুনিয়ল ব্যানার্জী কৌশলের খেলা দেখিয়ে শিল্পপতিদের জরিমানার হাত থেকে রেহাই এবং সরকারী কোষাগারের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা মিলে পকেটস্থ করেন।

মিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ও ইন্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাদের ওপর অবস্থিত রিংগলম্যান চার্ট মারফৎ অ্যানিস্টাট ইমপেক্টর-গণ অনিস্টকর ধোঁয়ার বিরুদ্ধে রিপোর্ট তৈরী করেন এবং এই রিপোর্ট মোড়াবে আইন ভঙ্গকারীদের জরিমানা করা হয়। কিন্তু জুনিয়ল ব্যানার্জীর অদৃষ্ট হস্তক্ষেপে এই রিপোর্ট সরকারী লাল ফিতার বাইরে যেতে পারে না। বর্তমানে কলকাতা, গার্ডেন রীচ, নাউথ জুবাবন, বরাহনগর, কামারহাটি, হাওড়া ইত্যাদি অঞ্চল এই ধপের অধীনে আছে। লম্বা অঞ্চলটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা ও হাওড়া। শ্রমিক হুইসেলস দপ্তরের প্রধান হচ্ছেন চীফ ইমপেক্টর জুনিয়ল চন্দ্র, ব্যানার্জী। তিনটি অঞ্চলের জন্ত তিনজন গেজেটেড অফিসারের তদারকি করার কথা। কিন্তু প্রথমতঃ এটি বিশাল অঞ্চল তদারকি করার জন্ত যাত্র তিনজন অফিসার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ কলকাতার পদটি ১৯৭১ সাল থেকে খালি পড়ে রয়েছে এবং খালি পড়ে থাকার কারণ হিসেবে জুনিয়ল ব্যানার্জী এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, এই পদটির জন্ত যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যে দেশে হাজার হাজার প্রাক্সেট ইঞ্জিনিয়ার বেকার আছে সেখানে উপযুক্ত কর্মী পাওয়া যায় না একথা নেহাৎই হাস্যকর। আসল কথা এস লি ব্যানার্জী আত্মবার্ণে দক্ষিণ কলকাতার পদটি খালি অবস্থার ফলে রেখে দিয়েছেন। এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী কুলের লক্ষে জুনিয়ল ব্যানার্জীর বনিষ্ঠতার কথা লক্ষ্যেরই সুবিধিত, যার কল্যাণে তিনি এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসিক বরাদ্দ হিসাবে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে থাকেন। স্বভাবতই এই পদে নতুন ব্যক্তিকে মিলেগ করলে জুনিয়লবাবু চূর্ণীভূতপার্য্য কার্যে অসুবিধা হবারই কথা।

চুরি জালিয়াতির ব্যাপারে জীব্যানার্জীর আর একজন সুযোগ্য সাগরের জুনিয়ল চন্দ্র ব্যানার্জী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ হলো যে, তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন নি এবং শুধুমাত্র বি ও এ টি পরীক্ষার অ্যাডমিশন টেস্ট পাশ করার যোগ্যতা নিয়ে গেজেটেড অফিসার হয়েছেন। অতীতে শ্রমিক কমিশন ডাইরেক্টরেটে কোন মন-গেজেটেড ইমপেক্টরের পদ ছিল না। কিন্তু জুনিয়ল ব্যানার্জীর তদারকিতে একটি মন-গেজেটেড অফিসারের পদ সৃষ্টি করে নুপেন ব্যানার্জীর মত অযোগ্য নন-টে ক মিক্যাল ব্যক্তিকে হাওড়ার মন-গেজেটেড ইমপেক্টরের পদে বহাল করা হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নুপেন ব্যানার্জী মন-গেজেটেড ইমপেক্টর রূপে কাজ করেন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময় হাওড়ার গেজেটেড ইমপেক্টরের পদটি নুপেন ব্যানার্জীর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে খালি রাখা হয়। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এন ব্যানার্জীকে হাওড়ার গেজেটেড অফিসারের পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৭১ সাল থেকে নুপেন ব্যানার্জী দক্ষিণ কলকাতার খালি পদটিও তদারকি করেন। এই সময় কিছুই হুই ব্যানার্জীর মোখ প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। এহেন জীব্যানার্জী বহুদিন যাবৎ আসানসোল, খড়গপুর, শিলিগুড়ি, হলদিয়া, প্রভৃতি জায়গায় শ্রমিক হুইসেলস-এর শাখা অফিস খোলার চেষ্টা করছেন এবং সেই হেতু বড় বড় জীম তৈরী করে সরকারী অস্থানবাসের জন্ত আবেদন জানাচ্ছেন। জনগণের স্বার্থের পক্ষে যদি এ সময় পরিকল্পনা রচিত হতো তাহলে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু যিনি কলকাতা, হাওড়ার ধোঁয়া নিকাশণে ব্যর্থ তিনি লম্বা দেশের রাজ্যের দুঃখ মোচন করবেন একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সব কিছুই পেছনে রেখে অর্থ উপার্জনের ঘৃণ্য পরিকল্পনা।

সবশেষে, জুনিয়ল ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত জীবনের আর একটি রহস্যময় ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে তিনি তাঁর প্রথমা জীকে হত্যা করার পর পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুর ছাড়পত্র লিখিয়ে নিয়ে এই অমার্জনীর অপরাধকে ধামাচাপা দেন। কিন্তু তাঁর এই অমার্জনীর অপরাধের নীরব স্বাক্ষর হচ্ছে জীব্যানার্জীর তদারকিগত গৃহভৃত্য ও তাঁর নিজের কন্ঠ। এর পরের ঘটনা আরো চাকল্যকর।

তাঁর বাড়ীর ছাদে বহু টাকা ধরত করে একটি ষ্টীল চেয়ার তৈরী করে পরমাণবিক গবেষণা করার নামে তিনি একজন মহিলাকে প্রথমা জী মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই রিসার্চ অ্যানিস্টাট হিসাবে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং প্রথমা জী শ্রমতী জীতি ব্যানার্জীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই জুনিয়ল ব্যানার্জী রিসার্চ অ্যানিস্টাট হিসাবে নিয়োজিত এই মহিলাকে বিবাহ করেন।

শ্রমিক হুইসেলস ডাইরেক্টরেটের ওপর একজন লম্বা জীমারক্ষক মিত্র জুনিয়ল ব্যানার্জীর এই লম্বা কেলেকারীর কথা গত ১১/৪/৭৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রর কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন এবং সেই চিঠির কপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার আত্মবিশ্বাসবশতঃ এই অসাধু ব্যক্তিকে সম্পর্কে উদাসীন।

ই-কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর

মহারাজের আবদুল রহমান আদলে রীতিমত নিবৃত্ত বোধ করছেন।

আসলে কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনীত করা হয়েছিল। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীদের অনেকেই মেনে নিতে চান নি। কিন্তু হাইকমান্ডের বিরাগতাজন হবার ভয়ে কেউই খুব বেশী বিরোধিতা করতে সাহস পান নি। কিন্তু সময় গাড়ীর মৃত্যুর পর এই সব বিক্ষুব্ধ এম এল এ-রা আন্তে আন্তে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এবং বন বন গ্রুপ মিটিং করে বিক্ষুব্ধা মুখ্যমন্ত্রী হটানোর কৌশল ঠিক করতে এখন ব্যস্ত।

কংগ্রেস (ই) শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের বিক্ষুব্ধা এখন তাকিয়ে আছেন অজ্ঞের দিকে। অজ্ঞে যদি চেম্বা রেড্ডীকে অপসারণ করা হয় তবে। আন্তে আন্তে সব রাজ্যেই বিক্ষুব্ধা জোর কন্ঠে মুখ্যমন্ত্রী হটাও আন্দোলন শুরু করবেন।

চেম্বা রেড্ডীর লক্ষে শ্রমতী গাড়ীর সম্পর্কে যে খুব একটা ভাল এমন নয়। তবুও শ্রমতী গাড়ী এই মুহূর্তে চেম্বাকে সরাবেন না বলে তাঁর বনিষ্ঠ মহলের স্ত্রী থেকে জানা গেছে। কারণ শ্রমতী গাড়ীও এটা ভাল-ভাবেই জানেন একবার মুখ্যমন্ত্রী বদলের পাল্লা শুরু হলে সংক্রামক ব্যাধির মত অন্তান্ত রাজ্যেও তাঁর প্রভাব পড়বে। এর ফলে রাজ্য সরকারগুলো তো বিপর্য্য হবেই এমন কি এর বাজা কেন্দ্রীয় সরকারকেও বিরত করে তুলবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে

১ম পৃষ্ঠার পর

এ সময় কিছুই ঘটে রেল কর্মী ও পুলিশের চোখের ওপর।

এই সময় দুই ও মেরেরা রাজি বাপন করে মেন সেকশনের ৯ নম্বর প্রাটকর্মের কাছে গো-ডাউনের ভেতর এবং কারশেডের মধ্যে। দিনের বেলা দেখা যায় হয় মতপ অবস্থায় তাওব মৃত্যু করছে, নয়তো লাউথ সেকশনে প্রাটকর্মের বাইরে নেশার ঘোরে টান টান হয়ে ঘুরছে। অথবা রুট রেল ইন্টারলক কেবিনের কাছে জি, আর, পি কিংবা প্রোটেকশন কোর্সের কনস্টবলদের লঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, হলোড় করছে। প্রায় উঠেছে যে, এত খোলাখুলি এই সময় কুকর্ম করার সুযোগ ওয়া পায় কোথা থেকে। জবাবটা খুবই সহজ, রাতের অন্ধকারে রেলকর্মী বিশেষতঃ টিকিট চেকারগুলো এবং পুলিশ ওদের কাছে পরদাও নের আবার দেহও ভোগ করে।

এ সময় মেরেরা আর একটি অমার্জনীর অপরাধ করে যে, বনগাঁও লাইন থেকে নিয়ম মধ্যবিন্ত ঘরের যে সময় মহিলারা ফাউটেন পেন, বল পেন, প্রাস্টিক খেলনা, চিকনী ইত্যাদির ছোট কারখানার অল্প মাইনের চাকরী করতে আসে, তাদের এই ঘৃণ্য পাপের ব্যবসায় প্রবৃত্ত করার জন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় অডিটরদের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় অডিটররা সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসন থেকে অডিট পাওয়ার পৃথকীকরণ দাবী করে আসছেন। কারণ অডিটরকে যদি প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয় তাহলে অডিটর কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাঁদের আরো দাবী অবলম্বনপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্মী সহ বহিরাগত অডিটর দিয়ে অডিট করার প্রথা বাতিল করতে হবে।

বর্তমানে এই নিয়োগের ফলে সরকারকে বছরে রাজস্ব বাতে আনুমানিক ৬০/৭০ লক্ষ টাকা আর থেকে বাকিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই অর্বে বেশ কিছু সুবকের কর্ম সংস্থান হতে পারত। উপরন্তু এই-রূপ নিয়োগের ফলে সমবায় সমিতি-গুলিকে অধিক আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, অন্তান্ত অধিকাংশ রাজ্যে বহিরাগত অডিটর দিয়ে অডিট করানো প্রথা বাতিল করা হয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

১ম পৃষ্ঠার পর

ম্যাজিস্ট্রেটের চোখের সামনেই রত্নরাম হাসপাতালে যাবার জন্ত সাইকেল-রিক্সার উপর ওঠারাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। লক্ষে লক্ষে ক্ষিপ্ত জনতা থানার আশ্রয় ধরিয়ে দেয়। কয়েকটা পুলিশের গাড়িতেও আশ্রয় লাগায়। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় ও বারো ঘণ্টার জন্ত কাছ জারি করা হয়।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

তৃতীয় তালিকাভুক্তির নোটিস

রেফা: নং জি এম / কেও / ই ই (সি) ৫২/১৯২৯ তাং ১২-৭-৮০

কেও এরিয়ায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্ত ক্লাস '৫' ক্যাটিগোরি-১ ঠিকাদারদের তালিকাভুক্তি।

ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের কেও এরিয়ায় ক্যাটিগোরি-১ এর ক্লাস '৫'-এ ঠিকাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্ত সরকারী দপ্তরে, সরকারী সংস্থাসমূহে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা যে কোন স্থানীয় সংস্থার নির্মাণ কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিকাদারদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। তালিকাভুক্তিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারদের আবেদন ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের নির্দিষ্ট প্রো-কর্মার পাঠাতে হবে যা লিখিত অঙ্কুরোধে ১৫ টাকা (পনেরো টাকা মাত্র) নগদে দিয়ে (অপ্রত্য-পূর্ণযোগ্য) জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেও এরিয়া, পো: বহুলা, জেলা বর্ধমান থেকে পাওয়া যাবে। ১৪-৮-৮০ থেকে ২৮-৮-৮০ পর্যন্ত সময় কাজের দিনে অফিসের সময়ে কর্ম বিক্রী করা হবে। আবেদন পত্রের লক্ষে তালিকাভুক্তির রেট দেওয়া হবে। ধারা ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে ক্লাস-৫ এ তালিকাভুক্ত তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। ক্লাস-৫ এ ঠিকাদারের তালিকাভুক্তির আবেদন পত্র ২৯-৮-৮০ বেলা ৪টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে

চোরাই তেলের কারবার সম্বন্ধে আরও তথ্য

বর্ষপের গত সংখ্যায় তেলের চোরাকারবারের সংশ্লিষ্ট পুলিশের সমিতি বোম্বাইয়ে থাকার ঘটনা প্রকাশ করার পুলিশ মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কারো কারো গোঁশাও হয়েছে। কিন্তু বর্ষপ আবারও বলছে এ রাজ্যে বেপারেরা তেলের চোরাকারবারের মূল রয়েছে রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতা এবং পুলিশের নজরবিহীন চুনিতি। রাজ্য এমফোর্সমেন্ট অফিসের লোকজন একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন তেলের চোরাকারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনকারী তারার আশ্রয় ওয়াল ওয়ালে চৌধুরী এবং তার সাগরেশ কাপুরচাঁদ আগরওয়াল, শেখ মহম্মদ কাশিম, দাবির আলি, ইলরাইল শিবনারায়ণ প্রমুখ চুনিতি নিরোধক শাখার ডি, আই, জি-র নাম ভালিয়ে চোরাকারবারের কারবার প্রকাশ্যে হিবালোকে চালিয়ে যাচ্ছে। এদের গায়ে হাত দেওয়ার কেউ নেই। কাপুরচাঁদ শেখ মহম্মদ কাশিম, দাবির, ইলরাইল মেহিনীপুরের ডেবরা থানা এলাকার সীমানপুর্বে চোরাই গোডাউন মারফৎ লক্ষ লক্ষ টাকার তেল পাচার করছে। বজবজ, মহেশতলা থানা এলাকার পুরনো ডাকঘরের কাছেও অল্পরপ গোডাউন মারফৎ কেরোলিন, পেট্রোল, ডি, বি, ও তেল পাচার হচ্ছে।

মহিষাঙ্গ থানা এলাকার নরা হোটেলের মধ্যে একটি বড় ধরনের গোডাউন এখন তৈরীর চেষ্টা চলছে। এরাও উজ্জ্বল তারার আশ্রয় ও তার অন্ততম সাগরেশ কাশিম ও কাপুর।

আশ্চর্যজনক ঘটনা হোল উপরোক্ত কুখ্যাত ব্যক্তির পুলিশের বড় কর্তার নাম ভালিয়ে তাদের বেআইনী চোরাকারবার অব্যাহত রেখেছে। শালকিয়ার কুলচাঁদ, অভি-তাল ফ্যাটেরী জর্জনক কর্মী মনা পাল পুলিশের নাম করে টাকাও তুলছে। পুলিশের মত না থাকলে এসব সম্ভব?

বর্ষপের অসুযোগ রাজ্য এমফোর্স-মেন্ট হস্তের ডেপুটি কমিশনার ডি, আই জি দাহেবরা একটু তদন্ত করে দেখুন, তেলের চোরাকারবারে তার হস্তের কর্মীরা কিতাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ছ একজন লং অফিসার নেই তা বলা নিশ্চয়ই উচিত নয়। কিন্তু তারার সম্ভবত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের আটতলার এমফোর্সমেন্ট হস্তের অফিসার ও কর্মীদের হালচালে হতভম্ব। লং অফিসারদের কেউ গোডাউনে, হানা দেবার জন্ত জীপ ও পুলিশ কর্মী রিকুইজিশন করা মাজই সেই ধরনের লম্বা হস্তের থেকে চোরাকারবারীদের গোপন আড্ডায় পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু এসব লম্বা ও বলা যায় ডি, সি ও ডি, আই, জি, প্রমুখ যদি চেষ্টা করেন তবে টালীগঞ্জ ইটখোলা, মেহিনীপুরের সীমানপুর্বে, বজবজের পুরনো ডাকঘরের সন্নিকটস্থ চোরাই পাউনে হানা দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব নয়। দিল্লী বোম্বে রোডের রমরমা ব্যবসা বন্ধ করাও এমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। চোরাই তেলের কারবার বন্ধ করার জন্ত ছ একজন অফিসার দায়িত্বই আগ্রহী। পুলিশের বড়কর্তারা উপচৌকনের লোভে না পড়লে একাধে ছ একজন লং অফিসারকে দিয়েও তারার আশ্রয় ওয়ালার শায়েস্তা করার কাজে নামতে পারেন।

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি

১ম পৃষ্ঠার পর

রেখে কেন্দ্রীয় সরকার বা রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অহুভাবে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করছেন না আজো বনগাঁ লাইন ভবল করা হয় নি।

অহুভাবে লোক্যাল ট্রেনগুলি চালাতে হলে অবিলম্বে শিয়ালদহ ডিভিশনের পুরানো রেক (গাড়ি) সরিয়ে নতুন রেক দিয়ে লোক্যাল ট্রেনগুলি চালাতে হবে। তাছাড়া,

বোম্বাইয়ে 'রেড রোজ' ছবি বয়কটের আন্দোলন চলছে

বোম্বাইয়ের আধারীর ওসকার থিয়েটারের সামনে একদল মহিলা প্রাইম লিকলেট বিলি করছেন, পথ-নভার বন্ধতা করছেন। ওরা সব 'ফোরাম এগেনস্ট রেশ' সংগঠনের লম্বা। ওই ওসকার থিয়েটার হলে চলছিল 'রেড রোজ' সিনেমাটি। 'রেড রোজ' সিনেমা বয়কট করার জন্ত ওরা বর্ষপের আবেগম ভা-নামে। এই কিসের মহিলাদেরকে বধেই হের করা হয়েছে। রাজেশ খামাকে দেবভুল্য বানিয়ে মহিলাদের উপর তাঁর অত্যাচারকে নটিক বলে দেখানো হয়েছে। 'মেয়েদের এ রকমই হওয়া দরকার' বলে কুংকিত সম্ভব করা হয়েছে। ফোরামের লম্বাভার প্রচার আন্দোলনে কাজও হয়েছে। অনেক অচেতন দর্শক হলে চোকার মুখে আন্দোলনকারীদের রোগাম বক্তব্য শুনে, লিকলেট পড়ে কথাবার্তা বলে ফিরে যাচ্ছেন। অধচ আশ কলকাতার 'সেন্সি ড্রীম', 'রেড রোজ', 'হার নাইটস', 'জী লাতার' ফিল্মগুলি অব্যাহত চলছে দেখে লম্বাহ হর এ শহরকে 'মিছিল নগরী' কলকাতা এখনও বলা যাবে কি না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে ইউকো ব্যাকের সাহায্য

লম্বাতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাঁচটি গ্যাস টার্বাইন বসিয়েছে। হলদিয়া ও কসবার দুটি করে ও শিলিগুড়িতে একটি। আশা করা যায় যে, প্রত্যেকটি ইউনিটে গড়ে ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। বৃটেনের জম ড্রাউম ইনজিনিয়ারিং গ্যাস টার্বাইন লিমি-টেডের কাছ থেকে এগুলো কেনা হয়েছে। প্রায় আঠাশ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুৎ পর্ষদকে দশ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। বাকিটা ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক ও কয়েকটি ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে। অতি অল্প স্টুদে গত মাঠে ইউকো ব্যাঙ্ক এই বাবদ পর্ষদকে চার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। সি ই এস সির মূল্যায়ন প্রকল্প ত্বরান্বিত করার জন্তও উক্ত ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে।

বান্ধু সংমেলনের পঁচিশতম বার্ষিকী পালন

গত ১৬ জুলাই বেকার হলে কোটনিস স্মৃতিস্তম্ভ কমিটি বান্ধু সংমেলনের পঁচিশতম বার্ষিকী স্মরণে এক সভার আয়োজন করে। এই সভার নিধিল ভারত কোটনিস স্মৃতি-স্তম্ভ কমিটির সভাপতি ডাঃ বিজয় বসু, প্রখ্যাত লেখিকা সীমতী মৈত্রেয়ী দেবী বিশ্ব শান্তি স্থাপনে পঞ্চশীল ও বান্ধু সংমেলনের আদর্শ ও গুরুত্বকে তুলে ধরার আহ্বান জানান। এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ অমলেন্দু দে ও অধ্যাপক

কলকাতার গুপ্ত তাঁদের দীর্ঘ ভাবণে পঞ্চাশ লালে ইন্ডোনেশিয়ার বান্ধু শহরে এশিয়া আফ্রিকার উনত্রিশটি দেশের সম্মিলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মেতুবন্দর আলোচনার ঐতিহাসিক পটভূমিকা তুলে ধরেন। সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ দেবেশ মুখার্জী। সভার শুরুতে হোমোগে বিশ্বাস ও লম্বাহার উদ্বোধনী গণ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

রাজীব রাজনীতিতে

১ম পৃষ্ঠার পর

গান্ধী ছত্বেই চান যে পার্টিতে সঙ্গর পছন্দী খব হোক। সেজন্তই রাজীব একটু পরে রাজনীতিতে আসতে চাইছেন। এর পাশাপাশি যদি সঙ্গরের বিমান দুর্ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারটা দেখি তাহলে একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এই বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারে যে ডি জি সি এ নিজেই কিছুটা অভিযুক্ত তিনি কি করে এই তদন্ত করেন? আর বড় একজন ডি আই পির দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তদন্ত করবেন মাজ একজন বিভাগীয় ইন্সপেক্টর? সঙ্গরের মৃত্যুর পর ইন্দিরা গান্ধীর কার্যকলাপ কি তরহস্ত আরো বাড়িয়ে তুলছে।

নতুন গন্তীরা | সাগর চক্রবর্তী

তোলা আমার রাগ কর্যাছে পায়নি বেকার ভাতা
এব এল এ হা তুল কর্যাছেন, নার তোলেমি খাতার।

তোলা যে, না কান্দ আজি
শিখে লাও হে ধান্দাবাজি
পায়ের তলার রাখবে তারে, তুলবে কারে মাথার।

ঐ ট্যাকাটা পাইলে পরে
এমন কি স্থখ আইলতো ঘরে:
জানি তুমি উড়াই দিতে লিখি এবং গাঁজার।।

রাগ কইরো না মহেশরো
ধরো আমার কথা ধরে
তুমি চাখী গেরামবাসী, দিব চাখীভাতা।

তুম অহে পাগলা তোলা
আছাড় খাবার ধরজা খোলা;
দেই পথে কি চলবে, মাকি ধরবে জিশুল কখা
যবে থাকবেনা আর বস্তা।।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক লিপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদ রোড, কলিকাতা-৬ থেকে প্রস্তুত এবং বর্ষপ কার্যালয় ৩১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

আসামের আন্দোলনে বিদেশী টাকা

আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের পকেট এখন বেশ ভারী। উত্তর পূর্বপ্রদেশের বিদেশী মিশনারী সংস্থার নামে রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত্বাব্যস্তকর্তার বিভিন্ন শাখায় লাখ লাখ টাকা জমা পড়েছে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় শিলং শাখায় গত অক্টোবর থেকে এ বছরের মার্চ চার্জকর্তার একাউন্টে বিদেশী সংস্থা থেকে প্রায় ৪৪ লাখ টাকা জমা পড়েছে। রেভারেন্ড ফাদার কবিত চেকে লই করে এই টাকা তুলেছেন। ৮ ও ১৫ অক্টোবর '৭৯ ব্যাঙ্কে ২০, ০১, ৩১০ টাকা মূল্যের আমেরিকান ডলার জমা পড়েছে।

২৪ অক্টোবর '৭৯-৩, ৫১, ১১১ টাকা মূল্যের আমেরিকান ডলার।

৩১ অক্টোবর-৪৫, ২৪৮ টাকা মূল্যের জার্মানীয় মার্ক।

১৬ নভেম্বর-২, ৫২, ১৭৫ টাকার মার্কিনী ডলার এবং ১,১৬, ২৫৪ টাকার সুইজারল্যান্ডের ফ্রাঁ জমা পড়েছে।

১৪ জানুয়ারী ৮০-ব্রিটিশ পাউণ্ডে জমা পড়েছে ২৮৬, ১৪৪ টাকা।

১৮ জানুয়ারী-আমেরিকান ডলার ৩,৬২, ০০৫ টাকা। পরের দিনেই আদে ১৫, ৬৪৪ টাকার মার্কিনী ডলার।

৩০ জানুয়ারী-মার্কিনী ডলারে ৭১,৭১৯ টাকা।

১৬ মার্চ '৮০-ব্যাঙ্কে ৭,২৭, ৭৪৩ টাকার ডলার এসেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়টাই 'আহু' ও 'গণসংগ্রাম পরিষদের' নেতারা আন্দোলন চালান। কেরালার জনপ্রিয় মালয়ালম দৈনিক 'দেশাভিমুখী'র গত বোলই জুলাই সংখ্যায় উক্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা জারী হতে পারে

মোরারজী সরকারের আমলে ভারতের নেতৃবর্গের দেবার দেলের মাগে ১ পরেন্ট করে জবাবদার্য্য অতিমত অজুসারে দেশে অর্থনৈতিক বেড়েছিল। চরণ সিংয়ের আমলে সংকট মোচনে অর্থনৈতিক জরুরী বেড়েছিল ৩ পরেন্ট করে এবং অবস্থা জারী করা একাত্তই জরুরী এবং বর্তমানে ইন্দিরা সরকারের আমলে লঙ্ঘ প্রয়োজন প্রমিক প্রেমীর উপর বাড়ছে ৪ পরেন্ট করে। ভেঙ্কট-নিয়ন্ত্রণ এবং সব রকমের ধর্মবৈতের রাশনের বাজেট বৃদ্ধি ফেটে গেছে। নিষিদ্ধকরণ। কারখানায় উৎপাদন ১৪ই জুন মূল্যমান ছিল ২৪৩.৭, সেটা হ্রাসে সম্পূর্ণরূপে দোষী করা হয় ২৮শে জুন গিয়ে দাঁড়ায় ২৪১.২-তে। প্রমিক প্রেমীকে। কং (ই)-এর প্রমিক শাখা আই-এন টি ইউ নি জুন মাসের এক মিটিংয়ে একই রকম দাঁড়াই বাৎসর্য্য। মধ্য প্রদেশের অবস্থা জারী করা হোক। এ, এন, শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়



ক্রয়বিশ বর্ষ। ২৮শ সংখ্যা। শুক্রবার ৮ই আগষ্ট '৮০। ৬০ পয়সা

আসাম সমস্যা সমাধানের আশা খুব উজ্জ্বল নয়



মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রাজকুমার ঘোষের সিং-এর বৌতোর কলে আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বৈঠকের আবহাওয়া খুঁটি হলেও সমস্যা সমাধানের আশা খুব একটা উজ্জ্বল নয় বলে বিশ্বাস পুজো জানা গেছে।

রাজকুমার ঘোষের সিং প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতি নিয়েই আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ঘোষের সিং 'আহু' এবং 'গণসংগ্রাম পরিষদের' নেতাদেরকে আন্দোলনের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে অহরোধ করেন। আন্দোলনকারী নেতাদেরকে বলেন, আপনারা আন্দোলন তুলে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

স্বরতর সঙ্গে অজিত পাঁজার ঠাঙা লড়াই আগে থেকেই চলছে

রাজ্য কংগ্রেসে (ই)-র কৌদল বৈঠক-করেছেন। কিন্তু সমস্যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী টিফেনও যেটাতে পার-লেম না। কলকাতায় এসে টিফেন স্বরত মুখার্জীর সঙ্গে রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভাপতি অজিত পাঁজার শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

বরকতের দুর্নীতি চাকতে সি পি এম বিরোধী আন্দোলন ই-কংগ্রেসীদের ছলোছলি

সি, পি, আই এমকে এরাড্য থেকে হঠানোর আন্দোলন করতে গিয়ে কং-কংগ্রেসীরা এখন নিজেরাই নিজের প্রতাপকে উৎখাত করার কাজে নেমে পড়েছেন। রাজ্য কংগ্রেসের প্রধান অজিত পাঁজা স্বরত মুখার্জীর প্রোজেক্ট নিমূল করার কাজ যেমন নিপুণতার সঙ্গে শুরু করেছেন তেমনি স্বরতবাবুও অজিতবাবুকে একহাত বেধে মেয়ার জন্ত জোর তৎপরতার নেমেছেন।

১ই আগষ্ট থেকে কংগ্রেস (ই) হল এরাড্য থেকে সি, পি, আই এমকে হঠানোর ডাক দেয়ার সংগে সংগে দলের নিজেদের ধরোয়া

সঞ্জয় গান্ধীর সেই প্লেনের রহস্য আছে

সঞ্জয় গান্ধী ও ক্যাপ্টেন লাকপেনা গত ২৩ জুন যে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান সেই বিমানটির পেছনে বহু রহস্য আছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক লন্ডনে জ্যোতির্ময় বসু (এম পি) বলেন যে, কলকাতার ১৫ নং পার্ক স্ট্রাটের ইন্ডো-সুইস সহযোগিতার টমাস মুন্ডে এ্যাণ্ড কোম্পানীর অত-

তম ডিরেক্টর এপেলী হাউলের সিং পাল কোম্পানীর কর্মকর্তারা কলকাতা ও দুর্গাপুর ফ্যাক্টরিতে যেখানোয় যাতায়াতে মাজ তিন খণ্ডা সময় বাঁচানোর জন্য হিরাডয়ের অক্টোবরে একটা পিটস্ বিমান কেনা সম্বন্ধ করেন। কোম্পানীর অততম ডিরেক্টর ইগন উলক ৪ অক্টোবর '৭৬.

—জ্যোতির্ময় বসু
লগনের মেম্বর শিপিং কোং-কে চিঠি দেম একটা পিটস্ এস-২ এ বিমান জাহাজে করে কলকাতায় পাঠানোর জন্ত।
প্রায় লাড়ে চারলক টাকা দামের এই বিমানটি আমদানীর জন্ত দ্বিতীয় আমদানী রপ্তানী বিভাগের শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

সমস্যা

আর কতদিন ?

না, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে আশাততঃ তবের কোন কারণ নেই। সর্বশেষ খবর হল এই যে, প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি অজিত পাণ্ডা আগামী ১৫ আগস্ট বে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তাতে নয়াদ্বিল্লীর উচ্চ নেতৃত্বের সায় নেই। কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সি এম ষ্ট্রিকেনও গত সপ্তাহে কলকাতায় কিছু বৈঠক উক্তি করে এখন সামলে নিয়ে বসেছেন, আমি তো পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলি নি, আমি মার্কসবাদকে বিদ্যায় করার কথা বলেছি।

গত জাহ্নবীরিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার পর নয়াদ্বিল্লীর কিছু মন্ত্রী ও নেতা এবং এই রাজ্যের নেতা উপনেতাদের কথাবার্তা ও আচার আচরণে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে আর বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হবে না। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাগমনে বামফ্রন্টে মিলিত হল-গুলিও আশঙ্কিত। অল্প অ-কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলির সরকারকে উৎখাত করার পর সেখানে বিধান সভার নির্বাচন ঘোষণার ধারণা হয়েছিল, এই নির্বাচনের পর বুকি বামফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব কাল ধনিয়ে আসবে। কিন্তু এরপর আসামের আন্দোলন তুলে উঠল এবং স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলন দমন করা বা আসাম সমস্যা সমাধানের কোন পথ না পেয়ে এমন বিশেষাঙ্গী অবস্থায় পড়ল যে, অনেকটা তাবলেন ইন্দিরা গান্ধী এখন বামফ্রন্ট সরকারকে বাঁটাবেন না, বিশেষ করে আসামের ব্যাপারে যখন তাঁর পেছনে শেখোজের সমর্থন রয়েছে। ইতিমধ্যে জিপুরায় গুপ্তগোলের ফলে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের কঠোর সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন কার্যের করার দাবি মোচার হয়ে উঠলেও ইন্দিরা গান্ধী কিছু নিশ্চুপই থেকেছেন।

তাঁর বুক থেকে এখন আসামের কাটা প্রায় সরে গেছে। তাই অজিত পাণ্ডার "নি পি এম বাংলা ছাড়ো" স্লোগান ও আন্দোলনের ঘোষণায় মনে হয়েছিল এবার বোধ হয় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ওপর ঝগড়াঘাত আসছে। কিন্তু এবারও যেখা যাচ্ছে মিথ্যা আশঙ্কা। তাই বলে পালে কোনদিন বাম পক্ষের না একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কেননা বামফ্রন্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে এ রাজ্যে নির্বাচন হোক। এটা ইন্দিরা গান্ধী কখনোই চাইবেন না।

দেশ কাল রাজনীতি

বিচিত্র আপসরফা

ভারতপুত্র

অবশেষে আসামে আশার নিদর্শন জ্বলেছে। দশ মাস ব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, সরকারের পক্ষ থেকেও বিতর্কিত নির্দেশ—আসাম উদ্ভূত এলাকা আইন, ১৯৫২ এবং সেনা-বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন, ১৯৫৮ প্রত্যাহত হয়েছে। একদিকে আসাম থেকে বনজ সম্পদ কাঠ বাঁশ প্রাইউড, পাটজবা ইত্যাদি রপ্তানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে প্রথম ধাপ হিসাবে ২০ জন উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারী অফিসারের ওপর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার দরুন প্রদত্ত সাময়িক ভাবে বরখাস্তের নির্দেশ বাতিল করা হয়েছে। গত ২৫শে জুলাই স্বাক্ষরিত আসাম চুক্তি এবং ৩০শে জুলাই লোকসভায় প্রদত্ত কেন্দ্রীয় খরচা মন্ত্রী জৈল সিং-এর প্রতিশ্রুতি অনুসারেই আসাম সমস্যার সমাধানে এ অগ্রগতি অর্জন করা হয়েছে। মূল সমস্যার হাত দেবার জন্য আগামী ১১ আগস্ট ইন্ডো প্রাথমিক এবং ১৮ আগস্ট শিলঙে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আসামে বিদেশী প্রমুখ মীমাংসা হুজুর যেমন সন্ধান করা হবে, তেমনই আন্দোলন সম্পর্কিত বাকি সমস্যাগুলোরও সমাধান প্রচেষ্টা চলবে।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারী নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন ও নিখিল আসাম গণ-সংগ্রাম পরিষদের প্রায় সমস্ত দাবিই মেনে নিয়েছেন যে উদারতা নয়াদ্বিল্লী আগে প্রদর্শন করলে ক্ষতির বহর অন্ততঃ খাদিকটা সংকুচিত থাকত। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনকারীরা অপরিশোধিত তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আশাততঃ চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা বা বিদেশী প্রেরণ ফরমালা না হওয়া পর্যন্ত স্কুলিয়ে রেখেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও তা মেনে নিয়েছেন। তিন, প্রধান-মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দূত মশপাল কাপুর থেকে শুরু করে রাজ্যপাল এল পি সিং উপদেষ্টা সারিম কেন্দ্রীয় খরচা মন্ত্রী জৈল সিং পর্যন্ত যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে সাকল্যের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হোরেজ সিং। এর বাগা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে কেন্দ্রের প্রতি-

নিধির ওপর আসাম আন্দোলন-কারীদের আস্থা সেই, সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে পদের আন্তরিকতা সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের মনে দৃঢ় বর্তমান এবং প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কারণ সমস্যার বিস্তারিত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ও মহাহুত্বাশীল? চার, আসাম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যার যে আত্মপূর্বিক সমীক্ষা প্রচার করা হয়েছে তার প্রথম পাঠে এবিধানই সাধারণ লোকের মনে উৎপন্ন হতে পারে যে সরকার যেন বিদেশী নির্ধারণের সময় সীমার প্রক্ষেপ সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত ১৯৭১ সালের প্রস্তাবকে উল্টে দেবার ভূমিকা করলেন।

কোরামিন দিয়ে জীবন রক্ষা

চেন্না রেড্ডি এ যাত্রাও বৈচে গেলেন। নয়াদ্বিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হবার সাক্ষাৎ করার পর অল্প-প্রদেশের বিতর্কিত মুখ্যমন্ত্রী নাকি স্বপদে বহাল থাকার পাট্টা লাভ

আসাম সমস্যা

১ম পৃষ্ঠার পর

বহন। আপনাদের সমস্যার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে মহাহুত্বাশীল।

আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের বক্তব্য ছিল আগে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং দমন-মূলক সব আইন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। তাছাড়া 'বিদেশী' বাছাইয়ের ভিত্তিও ধরতে হবে '৭১ সালকে। তবেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আসাম আলোচনার বসতে পারি।

জানা গেছে হোরেজ সিং আন্দোলনকারী নেতাদের বলেন, আপনারা বিদেশী বাছাইয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট ভিত্তিও না ধরতে অস্বস্তি করেন। কিন্তু 'আহ' এবং 'গণ-সংগ্রাম পরিষদ' এ অস্বস্তি মানতে রাজী হন না।

এরপর হোরেজ সিং রাজ্যপালের উপদেষ্টা এবং কেন্দ্রীয় খরচা মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার প্রাথমিক আলোচনার রিপোর্ট দেন এবং জানান আন্দোলনকারী নেতারা বিদেশী বাছাইয়ের ভিত্তিও '৭১ সালকে ধরে আলোচনার বসতে রাজী।

করেছেন। তার আগে অবশ্য ডঃ রেড্ডি দেব-দেবীর থানে পূজা দিয়েছেন, লাঠীতে প্রাণপাত হয়ে বর মেগেছেন। আশাততঃ অবশ্য মনে হচ্ছে, পাথর ও রক্তমাংসের দেব-দেবীরা শুক্রের প্রতি কল্পনা প্রদর্শন করেছেন।

কিন্তু শের রক্ষা হবে কিনা সে-বিষয়ে বিস্তারিত সন্দেহ রয়েছে। কারণ একথা স্রীমতী গান্ধী অস্বীকার করতে পারেন না যে অল্পপ্রদেশের কংগ্রেস (ই) বিধায়ক হল চেন্না রেড্ডিকে কেন্দ্র করে পরিষ্কার হুতাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন বিদ্রুক উপদলের প্রকৃত সংখ্যাগত শক্তি কত তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার উপায় অবশ্য রাজ্যের কংগ্রেসী(ই) বিধায়কেরা রাখেননি, কিন্তু ২৬ জন সদস্য বিশিষ্ট চেন্না মন্ত্রিসভা থেকে ১৬ জনই যে পদত্যাগ করেছেন—এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এ অবস্থায় স্রীমতী গান্ধীর আনীর্বাধ নিয়ে মুখ্য-মন্ত্রিসিদ্ধি করা ডঃ রেড্ডির পক্ষে কত-কাল সম্ভব হবে?

বাস্তব কিছু পরিস্থিতিই চেন্না রেড্ডির পক্ষে অস্বস্তি প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমতঃ চেন্নার কোন যোগ্য উত্তরাধিকারীর নাকি সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যিনি দাবিদার তিনি তেলোগামার প্রতিনিধি—সেটাই নাকি তার অপরাধ। কংগ্রেস

কেন্দ্রের কাছ থেকে মতন নির্দেশ পেয়ে হোরেজ সিং আবার আলোচনার বসেন। এবং আন্দোলনকারী নেতাদেরকে কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবের কথা জানান। এই নতুন প্রস্তাবটি কি এ ব্যাপারে হোরেজ সিং মুখ খোলেন নি। তবে আন্দোলনকারী নেতাদের বনিষ্ঠ হুজ থেকে জানা গেছে যে, হোরেজ সিং নাকি বলেছেন কেন্দ্র '৭১ সালকে ভিত্তি-বর্ষ ধরে বিদেশী বাছাইয়ের কাজ শুরু করার জন্য চাপ দেবেন না। হোরেজ নাকি আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আন্দোলন তুলে নেওয়া হলে কেন্দ্র বিদেশী বাছাইয়ের ব্যাপারে আন্দোলনকারী নেতাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেবেন।

এর পরই দ্বিতীতে এবং আসামে আশোষ বৈঠকের ব্যাপারে তৎপরতা শুরু হয়। এবং উভয় পক্ষই তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এনে আলোচনার বসতে রাজী হয়েছেন।

আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে আশোষ বৈঠকের ব্যাপারে যখন তৎপরতা চলছে তখন স্রীমতী গান্ধীর একটি বক্তব্যকে নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা করনা শুরু হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে আসামের এক

(ই) হাইকমান্ড চার্ম অফিসের প্রতিনিধিরই মুখ্যমন্ত্রীর পাওয়া উচিত। মুখে গণতন্ত্রের নামগান করে কাজে আঞ্চলিকতাবাদের প্রদর দান কংগ্রেস(ই)র পক্ষেই তো সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ বিদ্রুকের চাপের কাছে "নতি" স্বীকার করে যদি অল্পপ্রদেশে চেন্না রেড্ডিকে গরিষ্ঠত্ব করা হয়, তবে বিহার উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ওড়িশা ইত্যাদি অভ্যন্তর কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলোতেও রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবে। কার্যতঃ তখন যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে তাকে সামাল দেওয়া হাইকমান্ডের পক্ষেও সম্ভব হবে না বরং রোগটা কেন্দ্র পর্যন্ত সংক্রামিত হতে পারে।

কিন্তু কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব যদি দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রতিও আস্থা জ্ঞাপন করে থাকেন। চেন্না রেড্ডির নেতৃত্বে দলের একটা বৃহৎ অংশই যখন অনাস্থা প্রকাশ করেছে, তখন সে-অংশকে উপেক্ষা করার অর্থ কি অল্পপ্রদেশ-রাজ্য কংগ্রেস(ই) বিক্ষোভ বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেওয়া নয়? জোড়াতালি দিয়ে, কোরামিন দিয়ে—চেন্না জীকে ইন্দিরাজী কত দিন বাঁচাতে পারবেন?

প্রতিনিধি হলকে স্রীমতী গান্ধী বলেছেন, হোরেজ সিংকে তিনি তার দূত হিসাবে আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে পাঠান নি। হোরেজ সিং-এর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি করার কোন এজিয়ারাই নেই। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কার্যতঃ হোরেজ সিং-এর আপোষ হুজের ভিত্তিতেই আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনার বসতে যাচ্ছেন।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন এই বিরুদ্ধি দিয়ে স্রীমতী গান্ধী আলোচনা কলপ্রশ্ন না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি তুলে নেওয়ার রাজ্য পাকা করে রাখলেন। যাতে আসামের সাধারণ মানুষের মনে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-শ্রুতির ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।

আন্দোলনকারী নেতাদের বনিষ্ঠ হুজ থেকে জানা গেছে বিদেশী বিভাটনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কোন প্রতিশ্রুতি না দিলে কেন্দ্রের কোন বক্তব্যই তাঁরা শুনবেন না। স্রীমতী গান্ধীর পক্ষে রাজনৈতিক কারণেই এমন দাবী মানা সম্ভব নয়। যাতে আসাম থেকে কয়েক লক্ষ বাঙালী নতুন করে উদ্বাস্ত হন। এই অবস্থায় রাজনৈতিক মহল মনে করেন আসাম বৈঠকেও সমস্যা মেটার আশা খুব একটা উজ্জ্বল নয়।

নেপথ্য রাজনীতিতে মোরারজী

মোরারজী দেশাই ভারতীয় রাজনীতির আসরে এক পাশে সরে থাকলেও এখনও নিজে যান নি। বর্তমান অবস্থার তাকে প্রায় নির্বাসিত নেতা বলে মনে হলেও তিনি নেপথ্য রাজনীতিতে খুবই সক্রিয়। তার প্রমাণও একাধিক রয়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া উল হক একটি একান্ত গোপনীয় পত্র পাঠিয়ে তাকে পাকিস্তানে আসার আমন্ত্রণ করেছেন। এই গোপন পত্রটি ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বোম্বাইয়ের দমুজ তীরের কাছে দেশাইজীর যে স্মার্ট আছে সেখানে গিয়ে তাকে দিয়েছেন। এবং তাঁর প্রতি প্রেসিডেন্টের আগ্রহ যে কতখানি তা বুঝিয়ে বলেছেন। মোরারজী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর দমুজমত সেখানে বাবার আশা প্রকাশ করেছেন। জেনারেল জিয়া প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অটল-বিহারী বাজপেয়ী এবং মোরারজীর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কেও যোগাযোগ রেখেছেন। কারণ তাঁদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে উজ্জল হবে বলে তিনি মনে করেন।

রাজীব গান্ধী সামনে আসছেন

রাজীব গান্ধী রাজনীতির অন্যতম মহল থেকে এবার সামনে আসছেন। একথা একেবারে নিশ্চিত। আশেপাশ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে রাজীব গান্ধী যে দাঁড়াবেন দেকথা একরকম পাকা হয়ে গেছে। রাজীব ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের পাইলটের পদে ইন্তকণ দিয়েছেন। পারিবারিক পার্টির ফাওর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁর সচিব হয়েছেন জে এন সিং। তিনি আমেরিকি কত কিছু উন্নয়নমূলক উদ্যোগ যাতে ভালভাবে এগিয়ে চলে সেজন্য তদারকি আরম্ভ করে দিয়েছেন। আর খুব সঙ্গোপনে কংগ্রেস (ই) দলের কাজকর্ম দৃঢ়গড় হতে শুরু করেছেন। তিনি চান না এখনই তাঁকে কেন্দ্রে বসিয়ে কিম্বো সোয়গোল আবার দানা বেঁধে উঠুক। কিন্তু রাজীব না চাইলেও সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর আসার পাকা কথা কিছুতেই চাপা থাকছে না।

রেডিও টিভিতে নামী লেখক

প্রখ্যাত হিন্দী লেখক কমলেশ্বর দূরদর্শনের এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল পদটি পেতে চলেছেন। তিনি এই পদে যোগ দেওয়ার জন্য একটি শর্ত রেখেছেন। তিনি চান, বোম্বাইয়ের তাঁর অফিস হোক। তথ্য-মন্ত্রক তাঁর এই শর্ত 'মেনে নিতে পারেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল মনে করেন। কেননা প্রধানমন্ত্রী কিছু নামীদামী লেখক ও সাংবাদিককে এবং টি ভিতে উচ্চপদে যুক্ত করতে আগ্রহী। কমলেশ্বর সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অজানা নয়। তিনি কমলেশ্বরকে খুব পছন্দ করেন। এই যুগে অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক অক্ষয়-কুমার লেনও আকাশবাণীতে বড় পদে যোগ দিতে পারেন।

প্রণবের নতুন দপ্তর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাণিজ্যমন্ত্রী হলেও তার হাতে ইম্পাত দপ্তর অতিরিক্ত হিসাবে আছে। এখন আবার অর্থদপ্তর থেকে রাজস্ব ও ব্যক্তি দফতর বিভাগটি আলাদা করে দেওয়া হতে পারে। তাহলে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এই দপ্তরটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে বেশ জল্পনা কল্পনা চলছে।

দীনেশ সিং গুরুত্ব পাচ্ছেন

এখন দীনেশ সিং কংগ্রেস (ই) দলে তাঁর জায়গাটি বেশ পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। স্বতাবতই দল নেত্রীর একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়ার সংগে সংগে বড়দড় সুমিকা পাওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। বহু আশায় বহুগুণা দলে ভিড়ে ধৈর্য না ধরে যেভাবে দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হলেন দীনেশ সিং সে ভুলে পা না দিয়ে ধাপে ধাপে নেত্রীর মনোয়ত্তম করে যাচ্ছেন। এবং ক্রমশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্থান পাওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, প্রতিরক্ষা দপ্তর উনি পাচ্ছেন। আবার কার্ক কাকর ধারণা, খরাষ্ট্র নরত পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁর হাতে যেতে পারে। সে বাই হোক, প্রতিরক্ষা

বা অস্ত্র কোন পদ এখন তাঁর কাছে অনারাসের ব্যাপার। তিনি চন্দ্র-শেখর এবং বহুগুণার যাতে দলে আসা সম্ভব হয় সেদিকটাও দেখছেন। চন্দ্রশেখর কংগ্রেস (ই) দলে আসতে আগ্রহী। এলে তিনি যাতে অপার্টমেন্ট না হয়ে পড়েন সেজন্য দীনেশ দলনেত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করছেন। বহুগুণা আবার 'দলে আসতে চেয়ে যে চেষ্টা করছেন সে দিকটাও নেত্রীর কাছে বাজিয়ে দেখছেন। এর মধ্যে কংগ্রেস পার্স দলের কিছু-হোমরাটোমরা নেতাও তাঁকে খুব ধরেছেন যাতে ওরা নেত্রীর কাছ থেকে দল সঙ্কেত পান। এই অবস্থায় তিনি এখন অনেকের লক্ষ্যে আছেন। কেননা, দীনেশ দ্বিতীয় রাজনীতিতে আবার জোর কদমে ফিরে আসছেন।

পিতার জন্য

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়ে প্রতিভা দি-তা গ্রহণ করেন নি। এর কারণ, তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল সি পি এন সিং যাতে কেন্দ্রীয় খরাষ্ট্র মন্ত্রী হতে পারেন সেই চেষ্টাই করছেন। আর তিনি এ চেষ্টা করবেন না তো কে করবেন? সি পি এন সিং-এর কতটা হয়ে বাবার উচ্চাশার পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে পাশে দাঁড়ানই কতটা উপযুক্ত কাজ। তাঁর বাবা উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দলের জয় যা করেছেন তাতে প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ পাওয়ার দাবী অনারাসে করতে পারেনই। কিন্তু কতটুকু মন্ত্রী করার জন্য যদি প্রধানমন্ত্রী পিতার নিবেদন নাকচ করে দেন তার চেয়ে আগেভাগে সতর্ক থাকাই ভাল। উপমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাবার পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার সুযোগটাই বড়। তাই প্রতিভা এখন পিতার পাশে থেকে সেই চেষ্টাই চাচ্ছেন যাচ্ছেন। জামী জৈল সিং-এর অবস্থা তেমন ভাল নয়। খরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে তিনি সবিশেষ বিব্রত রয়েছেন। কিন্তু তাঁর বড়লী হওয়ার দিকটা জোরাল হয়ে যেমন উঠছে তেমনি সি পি এন সিং-এর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হওয়ার কথাটিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দলনেত্রী চান পশ্চিম-বঙ্গে তাঁর অঙ্গপত একজন জবরদস্ত রাজ্যপাল পাঠাতে। যাতে তাঁর দল ক্ষমতায় আসতে প্রশাসনের বিশেষ সুবিধা পায়। বাই হোক, কতটা প্রতিভা পিতার জন্য একদিকে যেমন খাটছেন, অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে বলে করে শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

অসম বাণিজ্যের চিরন্তন বোঝা

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

পশ্চিমী হুনিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা এখন আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমরা চলতি বছরে এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য রপ্তানী করার পরিকল্পনা করেছিলাম। গতিক দেখে তা এখন ৬০০ কোটি টাকার ন্যূনতম আনা হয়েছে। অর্থাৎ ৩০০ কোটি টাকা কম। কলকাতা বন্দর থেকে চিংড়ি মাছের রপ্তানী গত মাসে ৭ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকার মেয়ে এসেছে। কারণ আমেরিকার মন্দার দরুন চিংড়ি মাছের দাম কিলো প্রতি ১৭ ডলার থেকে ১০ ডলারে মেয়ে এসেছে। কাপড়চোপড় ও তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।



পূঁজিবাদী আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত আছে। আমরা যখন স্বাধীন ছিলাম না, যখন আমাদের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য, বিদেশী শাসকেরা নিয়ন্ত্রণ করতো তখন আমাদের দেশীয় পণ্য রপ্তানী করতে গিয়ে কম দাম পাওয়া এবং বিদেশী পণ্য আমদানী করতে গিয়ে বেশী দাম দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একে আমরা বলতাম অসম বাণিজ্য। বিদেশী শাসকেরা এই যৌশলে আমাদের পণ্যের কম দাম দিত এবং নিজেদের পণ্যের বেশী দাম দিত। ফলে আমরা বিদেশী পণ্যের বাজারে সর্বদাই হেরাজস্ত থাকতাম। আমাদের দেশের টাকা বিদেশীরা দেশে নিয়ে যেত না, আমাদের দেশেই লগ্নী করত। পাটের ব্যবসা, চট-কল, চা, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি শিল্প তাদের মুঠের তেতরে থাকতো। ফলে অসম বাণিজ্যের হুদিকে ধারালো ক্ষুর দিয়ে তার অর্থনীতির মাথা মুড়িয়ে ধোল ঢালতো।

স্বাধীন হবার পর আমাদের স্বাধীন কর্মকর্তারা ইংরাজদের চির-চরিত শোষণের পথই বেছে নিলেন। দ্বিতীয় মল্লম হাতিবদল হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিলিতি কোম্পানীর বোর্ড-কমে ইংরাজ ডিরেক্টরদের চেয়ারে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় শিল্পব্যবসায়

মালিক এসে বসলেন। বিলিতি ব্যবসা রাতারাতি ভারতীয় ব্যবসা হয়ে গেল।

কিন্তু নীতি পাল্টানো না। তখন থেকে বিদেশী বিক্রেতারা ভারতে পণ্য রপ্তানী করার জন্য ভারতীয় অংশীদারদের উপরেই নির্ভর করতো। অন্তরিক্ত ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে ডলার ও স্টার্লিং এলাকার নামে আমেরিকা ও ব্রিটিশ বাজারের খদ্দেরদের উপর নির্ভর করতে হতো। সুতরাং অসম বাণিজ্যের বহিরাবৃত্তিটা খানিক পাটে গেল। আন্তর্জাতিক বাজারে চা, পাট, ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য, ভারতের রপ্তানীর মাল, অন্তরিক্ত ক্ষত শিল্প-রপ্তানীর ক্ষেত্রে আগ্রহী ভারতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ইংরাজ আমেরিকা জার্মানীর রপ্তানী মাল। এবার ভারতীয় অংশীদারদের সহযোগিতায় চা পাট কাপড় ইত্যাদি ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দাম কমানো হল। এক কোরিয়া যুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তী দুচার বছর ছাড়া ভারতীয় পণ্যের প্রকৃত দামের নিম্ন-মুখী গতি প্রায় স্থায়ী হয়ে যায়। অবশ্য এর সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ীদের নানা বেসাইনী কার্য-কলাপ, অবৈধভাবে বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও বিদেশের ব্যাঙ্কে তা জমা রাখা, পরে মূলধনী যন্ত্রপাতির দাম অতিরিক্ত রকম বেশী দেরিতে আবার সেই মুদ্রায় ক্রয় বাড়িয়ে চলা এসব ব্যাপারও যুক্ত আছে। এক কথায় বলা যায় যে ভারতের পক্ষ থেকে যারা বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারা তা করেন নি। বরং তারা স্বনির্ভরতার বুলির আড়ালে আরো বেশী অসমবাণিজ্য, আরো বেশী বিদেশী ঋণ এবং আরো বেশী কাঁচা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত ভারতীয় অর্থনীতিতে পরনির্ভর করে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মুষ্টি ভারতের অর্থনীতির কণ্ঠ এমন ভাবে চেপে ধরেছে যে আমরা সহস্র সম্ভাবনাপূর্ণ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিদেশী ঋণনির্ভর, বৈদেশিক রপ্তানী নির্ভর অর্থনীতি তৈরী করেছি। ফলে আমাদের পক্ষে এখন পশ্চিমী হুনিয়ার মন্দার শিকার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পশ্চিমী হুনিয়া—অর্থাৎ আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজার ভুক্ত দেশগুলি এই মন্দার কবল থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

প্রগতি সাহিত্যের লুপ্ত অধ্যায়

মিহির আচার্য

সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র মাজি জানেন যে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে প্রগতিশীল লেখক ও পত্রিকার লয়জয়কার অধ্যয়ন ছিল। 'অরুণি' সংবাদ-সাহিত্যপত্র হিসাবে দীর্ঘকাল প্রগতি লেখকদের কাছে উৎসাহের কারণ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের নেতৃত্বে সেখানে 'অরুণি'-কে বিরে অরুণ মিজ, প্রভাত গোখরাই প্রমুখ সক্রিয় কর্মী হিসেবে যুক্ত তো ছিলেনই, অসংখ্য প্রবীণ-নবীন ও আমার মতো তরুণ লেখকও সেখানে তাঁদের মাঝখানে জায়গা করে নিয়েছিল। 'অরুণি' তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করে একদা শুরু হয়ে গেল। প্রগতি আন্দোলনে পত্রিকাটির ভূমিকা আজও গবেষকদের আকর্ষণ করতে পারে। 'পরিচয়' বহু ঋতুক্রম অতিক্রম করে আজও টিমটিম করছে, যদিও সক্রিয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে এখন তার যোগসূত্র ফীণ। নীরঞ্জননাথ রায় নেই, গোপাল হালদারও আর যুক্ত নেই, ননী ভৌমিক, সুনীল জানাও দায়-মুক্ত। স্বীকার করতে হবে এই পত্রিকার সঙ্গে একদা কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সন্ত্য কিংবা সমর্থক লেখকদেরই প্রধান যোগ ছিল। বাইরের লেখকেরা এখানে পাড়া পেতেন না। এর ফলে তৎকালীন প্রগতি সাহিত্যেরই অবিসংবাদী নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। আমাদের মতো তরুণ লেখকদেরও নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে।

এর পর 'অগ্রণী' ও 'নতুন সাহিত্য' প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অগ্রণীর নেতৃত্বে ছিলেন বরকমল ভট্টাচার্য ও প্রমুখ রায়, নতুন সাহিত্যের অনিল দিহা। অগ্রণী ও নতুন সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই সুনীল জানা নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, লমরেশ বসু প্রমুখ লেখকদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

এই সময়ে আরো কিছু পত্রিকা 'মধ্যবিজ্ঞ' 'মুখপত্র' 'ডাক' 'ইন্সপাত' 'চলন্তিকা' 'বন্দ' 'অভ্যুদয়' প্রকাশিত হয়ে প্রগতি সাহিত্যকেই উৎসাহিত করেছে। এদের মধ্যে 'চতুর্কোণ' এখনো টিকে থাকবার প্রয়াস করে চলেছে।

আমার বলবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে যা কিছু সাহিত্যের আয়োজন দেখা গেছে তার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রগতি

লেখকেরা। আর সেকালের তরুণরা রাজনীতি তথা সমাজ জীবনকে যদি কেউ ধরতে চান তাহলে এই প্রগতি লেখকদের জুগিয়েই যেতে হবে। মানিকবাবু তো আছেনই, আছেন রমেশচন্দ্র সেন, সুনীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, লমরেশ বসু প্রমুখ লেখকেরা। বুদ্ধ-ভূক্তিক দাঙ্গা-দেশবিভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের অধ্যায়গুলি যদি জানতে হয় তাহলে এই লেখক-দেরই আশ্রয় করতে হবে।

তারপর বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে পঞ্চাশ দশকের গোড়ালি পর্বে এসে সাহিত্যের বাতাবরণ পাট্টাতে আরম্ভ করেছে। প্রগতি সাহিত্য

সাহিত্য দর্পণ

পত্র, প্রকাশক এবং নানাবিধ কারণে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যগতির কারণে বাজার আস্তে আস্তে দখল করল বুর্জোয়া গোষ্ঠী। সাহিত্য তখন লাভজনক পণ্য হতে আরম্ভ করেছে, আদর্শ বাদ দিয়ে সাহিত্য কমার্শিয়াল হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় যারা আদর্শ নিয়ে প্রগতি সাহিত্যের সেবা করতে এসেছিলেন তারা কমার্শিয়াল বাজারের প্রতিযোগিতায় এবং নিছক কেরিয়ার তৈরির ধান্দায় বিস্ময়ী ছিলেন না বলেই ক্রমশ শুরু হয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেলেন।

কথাটা অবিবাক্ত হলেও সত্য যে মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া লেখকদের শক্তিশালী লেখকদের প্রকাশক নেই। রমেশচন্দ্র সেন, সুনীল জানা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুনীল জানা প্রমুখ লেখকদের বই কী আজকাল বাজারে পাওয়া যায়? অথচ চল্লিশ পঞ্চাশের প্রগতি সাহিত্যের কদমল এঁরাই একদা বলিয়েছেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এই মূল্য-বান ও সমর্থক সময়টাকে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা ধারা এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তারা লচেতন না হলে এই বিলুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে না। দুঃখের বিষয় এই সময়কার সাহিত্য সম্পর্কে অসহস্রাব্দী গবেষক-রাও উপযুক্ত দলিল উদ্ধার করতে পারেন না। তাশমাল লাইব্রেরীতে তো এই কালের পত্র-পত্রিকা পাওয়া যায়ই না এমন কি লেখকদের বইও পাওয়া যায় না। এখনো হয়তো

চিরায়ত কাব্যের অনুবাদ

মিহির আচার্য

চিরায়ত ইংরেজী কবিতা। অম্বাধ কালিদাস মূখোপাধ্যায়। শুকসারী প্রকাশক, ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা ১৪। দাম পাঁচ টাকা।

কালিদাস মূখোপাধ্যায় ইতি-মধ্যেই মৌলিক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। স্বজনশীল কর্মীর পক্ষেই কবিতার ভাষান্তর সার্থকতার দাবি করতে পারে। পনেরো শতক থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত ইংরেজী ক্লাসিক কবিতার নির্বাচিত সংকলন করেছেন কবি। হেনরি হাওয়ার্ড, টমাস র্জ, শেক্সপীয়ার, বেন জনসন, জন ডান, রবার্ট হেরিক, মিলটন, মারভেল, ড্রাইডেন, পোপ, রেক, বার্নস, অয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল-রিজ, ল্যান্ডার, বায়রন, শেলি, কীটস, ব্রাউনিং, টেনিসন, আর্নল্ড, রোসেটি, ব্রাউনিং, হার্ডি, য়েটস, এড্রা পাউন্ট্রপার্ট ক্রক, এলিয়ট, ম্যাকমীস, অডেন, প্লেগার প্রমুখ কবির কবিতা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের ছাত্রমাত্রই এই লকল মৌলিক কবিতার সঙ্গে পরিচিত। অবিকল মূল ছন্দাীতিকে রক্ষা করে অনুবাদক কবিতাগুলিকে বাঙলার রূপান্তর ঘটিয়েছেন। একুত্তি কবিতা, কারণ উক্ত ভাষাতেই অনুবাদকে গভীর অধ্যয়ন ও অংশীনের নিদর্শন রাখতে হয়েছে। পূর্বসূরী কবিরা ইতস্তত কবিতা অনুবাদ করেছেন বটে, কিন্তু এমন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ধারাবাহিকতা অনুসরণে কেউ এ কাজ আগে করেন নি। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুবাদকে বাঙলী সাহিত্যে যথেষ্ট মূল্য দেবে বলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। কারণ আন্তরিক নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

রেকের বহুপঠিত 'টাইগার' কবিতার তর্জমা শুরু হয়েছে এই

কালর ব্যক্তিগত-সংগ্রহে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে সেগুলি যত্নে সংগ্রহ করে লোকসমক্ষে আনা দরকার। সরকারী তরফ থেকে এ ধরনের দূরদৃষ্টিমূলক কর্তব্যগুলি হৃদিশ পাওয়া যাবে না। বেসরকারী বোধ চেষ্টায় এ কাজ এখনি করা দরকার। নতুবা অনাগত ভবি-ষ্যতের কাছে আমাদের কৈকিরত দিতে হবে। বোহেহু এর সঙ্গে আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও যোগ আছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে একত্রে গ্রথিত করতে হবে।

ভাবে: 'শাদুল, শাদুল জসছে উজ্জস / রাজির গভীর অরণ্যতল। / কোন অমর্ত্য হস্ত, দৃষ্টি / তরাল রূপ তোর করল সৃষ্টি। কিংবা রেকের 'এ রেড, রেড রোজ': 'প্রিয়া আমার রাজা গোলাপ, রাজা / ফাগুন দিনে নতুন তুলে আনা। প্রিয়া আমার একটি বেন গান / মধুর আহা মধুর

গ্রন্থ পরিচয়

স্বরে পাওয়া অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'সলিটারি রিচার': 'দেখো তাকে, একাকিনী ফসলের মাঠে / ঐ যে নির্জন ঘরে পাহাড়তলিতে / কাঁটে ধান আর শুধু আপনার মনে গায় গান / এখানে বারেক ধানো, না, ধীরে কন্যা গো প্রয়াণ'। এ ছাড়া

জলপাইগুড়িতে মালিকের লোকেরা শ্রমিক নেতাকে খুন করেছে

জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা এলাকার রাণীনগর আনারস বাগান এলাকার শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক শঙ্কু রায়কে মালিকপক্ষের লোকেরা খুন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১৪ই জুলাই দার্জিলিং জেলার ফাঁসিবেঁওয়া থানা এলাকার একটি নদীতে ভাসমান অবস্থায় শঙ্কু রায়ের কতবিকত মৃত-দেহ উদ্ধার করা হয়।

সংবাদে প্রকাশ, রাণীনগর আনারস বাগানে দীর্ঘদিন ধরেই এক শ্রমিক বিক্ষোভ চলছিল। বেতন বাড়াবার দাবীতে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধাবত আন্দোলন করে আসছিলেন। মালিকপক্ষ নির্বিকার।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৩ জুলাই উক্ত আনারস বাগানের ম্যানেজার হুসল দাস এসে ইউনিয়ন সম্পাদক শঙ্কু রায়কে বলে যে, বাগানের মালিক যুগল পাল এবং মিরজান পাল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শ্রমিকদের দাবীওয়া নিয়ে আলো-চনার জন্য। শঙ্কু রায় সরল বিশ্বাসে উক্ত ম্যানেজারের সঙ্গে শিলিগুড়ি চলে আসেন বাগান মালিকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। তুরপূর্ণ থেকেই শঙ্কু রায় নিখোঁজ। ম্যানে-জার রাণীনগরে ফিরে গেলে তার কাছে শঙ্কু রায় খোঁজ করা হয় এবং সে কিছু অসংলগ্ন উত্তর দেয়। শঙ্কু রায় আত্মীয়দের সঙ্গে হু হু এবং ১৬ জুলাই শঙ্কু নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে কোতোয়ালি থানার ডায়েরী করা

শেলির 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' এর শেষ পংক্তিযুক্ত, 'শোনাতে উদাস এক শঙ্খধনি সম ভাবী বাণী, ওগো ঝড় / শীত যদি আসে, তবে বসন্ত কি থাকে দূরতর?' কিংবা এলিয়টের 'হলো যেন': 'ফিসকাস করি এক সাথে / শব্দহীন অর্থহীন / বা তা স যেমন শুকনো ঘাসের ওপর / অথবা পায়ের শব্দ ইহুরের ভাঙাচোরা-কাচ / আমাদের শুকনো মদের কুঠুরীতে।' অথবা প্লেগারের কবিতা 'Ultima Ratio Regum': 'ভেবে দেখো, দশ হাজারে একটি বুলেট হয়তো খুন করে একটি জীবন / প্রাণ করো: যুক্তিযুক্ত ছিল এত ব্যয় / একটি মৃত্যুর জন্য—যার প্রাণ এত কচি এতই অবাধ / অস্তিত্বের তলে পড়ে আছে—হে ভূবন। হে মরণ।' উদ্ধৃতি দীর্ঘ করে লাভ নেই। কবিতা অম্বাধী পাঠকদের জন্য এই কাব্যগ্রন্থটি অচ্ছন্দে সুপারিশ করা যায়।

হয়। জনসাধারণের চাপে শঙ্কুকে অপহরণ করার দ্বারা পুলিশ বাগানের ম্যানেজার হুসল দাসকে গ্রেপ্তার করে।

ইতিমধ্যে ১৪ জুলাই ফাঁসি-বেঁওয়ার একটি কতবিকত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। লাশ উদ্ধার সম্পর্কে সংবাদপত্রে খবর বের হয়। তাতে যে বিবরণ দেয়া আছে তার সঙ্গে নির্খোজ শঙ্কু রায় থাকার শঙ্কু সনোদর ছুই তাই চলে আসেন শিলিগুড়িতে এবং পুলিশের তোলা ছবি দেখে নিশ্চিত হন যে, এই মৃত-দেহের ছবি তাঁদেরই নির্খোজ তাইয়ের।

নিহত শঙ্কু ছুই তাই বসন্ত ও বীরেন্দ্র এই প্রতিবেদকের দিকট অভিযোগ করে বলেন যে, তারা মনে করেন, তাঁদের তাই বাগান মালিক-দের বড়বড়ের শিকার হয়েছে। অথচ আমরা বধন শঙ্কু রায় নির্খোজ সংবাদ থানার আনাই তখন বাগাবার দাবী করা মধ্যেও কোতোয়ালী থানার পুলিশ বাগান মালিকদের জিজ্ঞাসা-বাদ বা গ্রেপ্তার করে নি। তা যদি করা হত তাহলে আমরা হয়ত শঙ্কুকে জীবিত ফিরে পেতাম না, কিন্তু শেষবারের মত তাকে দেখতে পেতাম এবং মৃতদেহ সংকার করতে পারতাম।

রাণীনগর আনারস বাগানের শ্রমিকরা প্রিয় নেতার মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ। বাগানের মালিকপক্ষের শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

রাণী গাইডিলিওর আন্দোলনের একটি মূল্যায়ন

মোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাছা নাগা নারী নেত্রী রাণী গাইডিলিও বা শুইদালো ভারতীয় জনমানসে, বিশেষত স্বাধীনোত্তর ভারতীয় জনসমাজে অল্প-পরিচিত, অল্প আলোচিত বিশ্ব-নির্ভর একটি চরিত্র। রাণীর আন্দোলনের সূত্র-পাত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সিন্দে তাঁর আন্দোলনের যোগাযোগ অথবা অবদান, সে আন্দোলনের চরিত্র এবং সর্বোপরি 'রাণীর' শেষ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা অস্পষ্ট, ভাঙ্গা ভাঙ্গা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কি? আমাদের ইতিহাস সচেতনতার অভাব? হতে পারে। কিন্তু একথাও ঠিক 'রাণী'র আদর্শ বা কার্য-কলাপ স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতি-হাসের পাতায় কোনরূপ আঁচড় কাটতে পারেনি। গঠনমূলক কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিতে পারেন নি। নাগা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রবাহে 'রাণী' গাইডিলিও বিশ্বস্তির অতলে তলিয়ে গেছেন। অবশ্য কল্পনার রঙে রাজানো অস্বচ্ছ কিংবদন্তীর এক মহানারিক হিসাবে তিনি কিছু উপস্থাপন এবং কয়েকটি বহু পঠিত গ্রন্থে বিবরণিত। সেই মকল গ্রন্থে তিনি গাঙ্গীজীর আদর্শে অহিংসতা, স্বাধীনতাকামী এক মহীয়সী নারী, বা তিনি মোটেই ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসনের অবলম্বিত তিনি চেয়ে-ছিলেন ঠিকই কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার সঙ্গে তাঁর আন্দোলনকে কোনভাবেই যুক্ত করা যায় না কিন্তু 'রাণী'র আন্দোলন উত্তর পূর্ব ভারতের বিত্তীয় এলাকার এক প্রচণ্ড ভাবোন্মাদ-হনার সৃষ্টি করেছিল এবং এই এলাকার জনসাধারণকে কেপিয়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে অত্যন্ত সতর্ক-তার সঙ্গে এই আন্দোলনের মোকা-বিলা করতে হয়। 'রাণী' এবং তাঁর অহিংসেরা ব্রিটিশদের সীতিমত ভাবিয়ে তুলে ছিল। 'রাণী'র প্রেরণার পর তাঁর মৃত্যুর অল্প কৌরালো দাবী ওঠে। অবশ্যই এই দাবী মেনে নেওয়া হয়নি। 'রাণী'র মৃত্যু কাছাড় সংগ্রাম এলাকার অশান্তির দাবী আলাতে পারে এমন ভাবনার 'রাণী' ব্রিটিশ শাসকদের ভাবিয়ে তুলতে পেরেছিলেন—তাঁর আন্দোলনের মূল ভাবপন্থা পেটাই। এই মহিলার আন্দোলনের স্বরূপ অস্বাভাবন করতে হলে কোন পটভূমিকার তাঁর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সে

বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে 'রাণী' গাইডিলিওর নেতৃত্বে কাছা-নাগরা এক দশক বিদ্রোহের সূচনা করে। 'রাণী' এবং তাঁর একান্ত বিবস্ত কয়েকজন যোগ্য অহিংসীদের পরি-চালনায় এই আন্দোলন কাছাড় মনিপুর সংগ্রাম এক বিত্তীয় এলাকার দাবীর মত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল কাছা-নাগা এলাকা থেকে কুকী উপজাতি-দের বিতাড়ন; ব্রিটিশ শাসনের অবদান এবং 'রাণী'র নেতৃত্বে এই এলাকার একটি স্বশাসিত উপজাতিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ শাসকেরা বিদ্রোহ দমনে তৎপর হলে গাইডিলিও এবং তাঁর অহিংসেরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বহুদিন তাঁর অহিংসেরা তাঁকে নাগাখুমির বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে সহায়তা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'রাণী' প্রেরণা হন। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের অবদানই 'রাণী'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না।

বর্তমান শতকের ষাটের দশকে ব্রিটিশ কুকাদ মুখপাঠ্য একটি গ্রন্থে এই ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সংগঠিত বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল কিভাবে ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে একবিচ্ছিন্ন এবং একান্ত-ভাবেই এক উপজাতিক অহিংসের সৃষ্টি করেছে। একদিকে এদের অহিংস স্বাধীনতা স্পৃহা, আদিম লোকাচারের প্রতি তাঁর আশঙ্কি, অতীতের বিদেশী রাজ শক্তির অশৃঙ্খল শাসন বস্ত্রের ক্রমপ্রসারণ, অথবা বলা যেতে পারে উপজাতির জীবনকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস উপজাতি মানসে এক বিস্তৃত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির নিয়মে গড়ে ওঠা এই ধর-নের আদিম আরণ্যক গোষ্ঠীক উপ-জাতি জীবনে আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন দিকের নানতম প্রকাশ এক দিকে যেমন তা দের বিস্তারিত করেছে অতীতের তেমনি উপজাতি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা তাদের মনে এক প্রচণ্ড কোত্তের সৃষ্টি করেছে। এই দুই প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে অসহায় কিন্তু আত্মগরিমার প্রোজ্ঞল এই আদিম লোকগুলোর (নিজের উপ-জাতিদের) মনে এক গণউদ্রাবনার (Mob-Hysteria) সৃষ্টি করেছে।

এই পটভূমিকায় 'আবির্ভূতা' হয়ে-ছেন কতিপয় উপজাতি কর্তৃক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী-রূপে বন্দিতা রাণী গাইডিলিও, কাছা-নাগাদের উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করতে এমন এক রাজ বা একান্তভাবেই উপজাতিক। সঙ্কট-তারিণী এই বিশ্বাস নাগাচিত্তে লহজই উপ হুয়েছিল। এসময় বলা যেতে পারে গাইডিলিওর আগে এই রকম জন দুইয়ক জাতীয় আবি-র্ভাব হয়েছিল কাছা নাগাদের মধ্যে। সুতরাং মহাত্মা-গান্ধীর আন্দোলনের চেট সুহৃৎ নাগাগুলে পৌছেছিল এবং তা 'রাণী'র হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল—এ ধরনের অহিংস অস্বোক্তিক এবং ইতিহাস বিরোধী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে 'রাণী'র আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং নির্দিষ্ট বলা যায়, এই আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাছাড়া একথাও মনে রাখা দরকার যে 'রাণী' এবং তাঁর অহিংসেরা কিন্তু কখনোই অহিংস পথ অবলম্বন করেনি। সহিংস-তার সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত নিষ্ঠুর-তার সঙ্গে তাঁরা 'রাণী'র বিরুদ্ধা-চারণের প্রতিশোধ নেন, কিন্তু শেষ-রকম হল না। গোপন আস্তানা থেকে 'রাণী' বন্দী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আন্দোলনের উপর বনিক পড়ল।

এই আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে বলা যায় যে প্রথম এটি ছিল কুকী ব্রিটিশ বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত এক আন্দোলন। কিন্তু শেষের দিকে সক্রী

স্ববিধাবাদের চরিত্র এতে ফুটে উঠেছিল, এবং ক্রমে জনসাধারণের মনে বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে ইনি মুক্তি পান। পলিটিক্যাল লাকারার হিসেবে তাঁর মানসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু 'রাণী'কে কোন একটি রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয় নি। ভারতীয় নেতৃত্বের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা। এরকম কোন চেষ্টা হলে উত্তর পূর্ব ভারতের নানা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি শাখার মন থেকে ভারত-বিশেষ মুছে ফেলা হত সম্ভব হত। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কিলোর কর্তৃত্ব যখন নাগা-স্বাধীনতা আন্দোলন দামা বেঁধে উঠেছিল তখন 'রাণী'ও আর এক-বার তাঁর আদর্শ 'রাজ' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। অবশ্যই তা-শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

এই আন্দোলনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, 'রাণী' গাইডিলিওর আন্দোলনের মূল সূত্রটি ছিল আধ্যাত্মিকতার সূত্রে বাঁধা। ঈশ্বর প্রেরিত তারিণী তিনি। ঈশ্বরিক ক্ষমতা বলে অসাধ্য সাধনে সক্ষম রাণী কাছাড় এলাকার বিদেশীদের বিতাড়িত করে এমন একটি 'রাজ' এর প্রতিষ্ঠা করবেন বা একান্তভাবেই উপজাতীয়। যে রাজের প্রতিষ্ঠা হলে কাছাড় নাগাদের সমৃদ্ধি আসবে, সেখানে কার্যক পরিপ্রভের কোন প্রয়োজন থাকবে না, শারীরিক দুঃখ বেদনার অভিস্রব থাকবে না, আর থাকবে না যত্নার করাল হাতছানি। এককথায় বলা যায় ফিরে আসবে অতীতের 'স্বর্গভূম'। তেমনি একটি 'রাজের' প্রতিষ্ঠা করতে হলে অতীতের আচার ব্যব-হার সব পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং নতুন চিন্তাধারা 'বিদেশী' ধ্যান ধারণা সমূলে উৎ-

পাঠিত করতে হবে। এই ইউটোপীয় ধরনের 'রাজ' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফল করতে নরমুণের অর্থদান প্রভৃতি বস্ত্র লোকাচারগুলির প্রকাশ পেতে থাকে ক্রমশঃ কাছা নাগাদের মধ্যে। বিগত কয়েক দশক ধরে স্বাধীন অস্ত্রাভ উপজাতিদের কাছে একেবারে কোণঠালা হয়ে পড়েছিল। অস্ত্রাভ আন্দোলন (messianic movement) আন্দোলনের মত রাণীর আন্দোলনও একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করে। রাজ-শক্তির সংগে স্বাভাবিক কারণেই বাধে সংঘর্ষ, এবং ক্রমে তা সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়। একই ধারণার পুনরুজ্জীবন করতে হচ্ছে। 'রাণী'র আন্দোলনের সংগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন মতেই যুক্ত ছিল না। উত্তর আন্দোলন পরম্পর সংপৃক্ত নয়, তবে সমন্বয়মূলক। পরি-শেষে বলি 'রাণী'র আন্দোলনের মূল বীজটি নিহিত ছিল গণ উদ্রাবনার মধ্যে। অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার ভর করে রাণী এবং তাঁর অহিংসেরা অতীতের কল্পিত স্বর্গভূম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন এবং আদিম পার্বত্য কাছা-নাগা এবং অস্ত্রাভ কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি করে-ছিলেন। ভারতের তৎকালীন রাজ-নৈতিক নেতারা 'রাণী'র আন্দোলনকে যদি অহিংস শ্রোতে প্রবাহিত করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সাদৃশ্য করে নিতে পারতেন এবং উপজাতি অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তা প্রবাহিত করতে পারতেন তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক গ্রামিনয় দুঃখজনক ঘটনার কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত এড়ানো যেত। স্বাভাবিক থেকে উদ্ভূত অনেক কঠিন সমস্যার সহজতর শেখাংশ গম পঠার।

এই প্রতীক কী এবং কেন?



ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
কলিকাতা-১৯

ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দেশের জন্তো উৎকৃষ্ট ওষুধের
গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর কার্যমনোবাক্যে নিজেকে চেনে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বজতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুম্বইয়ের একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুমুখে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্
আপনার সেবার



চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

শেষ বিচার

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

আর, ডি, বনশল নিবেদিত 'শেষ বিচার' ছবিটি ধারাবাহিক সাক্ষাৎকারে এক অবিশ্বাস্য যোগফল—যাকে পুরোপুরি 'কয়েমসিডেলের' ক্রিয়াকাণ্ড বলা চলে। ছবির জন্মই কাহিনী, তাই নারিক। যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন, নারিক তখনই ছবির বিপদ উদ্ভারে 'অথবা খল নারিক এগিয়ে আসে উপকারের ছল-নার ভুলিয়ে নিজের মতলব হাসিল করতে। এ ছবিতে এমন ঘটনার যোগাযোগ হরদম ঘটেছে। নারিকের পলাতক। বোন হোটেল নর্তকী হয়েছেন—এতদু নারিকাই জানে—ভিত্তিহীন সা স পেল রচনার খাতিরে। বুদ্ধিমান উচ্চশিক্ষিত নারিক তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা না করেও আদালতে বলে দে খুনী। সমাজবিরোধী সম্পট প্রকৃত খুনীকে না চিনিরে সমাজ সেবক উদার প্রাণ নারিক সব দোষ নিজের খাড়ে নিয়ে শেষে যে সব নিবোধ কৈফিয়ৎ দেয়, তা স্বচরিত্র বিরোধী। কিন্তু এরই ওপর ভিত্তি করে ১৫ রিলের ছবিটি ক্র্যাশব্যাঙ্ক পদ্ধতিতে কত অবতনই ঘটিয়ে গেল যেখানে বুদ্ধি ও লগতির কোন বাসাই নেই। ছবির অন্ততম স্টাক হল, বিচারক অকস্মাৎ শেষে জানতে পারলেন তাঁর ছেলেই প্রকৃত অপরাধী, খুনী, সম্পট! তায়পরায়ণ বিচারক শিতার চোখে ধুলো দিয়ে স্বপ্নের পুত্র বাড়িতে পাশেই দীর্ঘ দিন কেমন করে পাপাচার চালিয়ে যেতে পারে আর বিচারক পত্নী পাশে ছেলের প্রতি কানীর হুম্ব তনে আদালতে এসে কেঁদে কেমন করে ভালিয়ে দিতে পারে—এসব বুদ্ধিমান দর্শকের অবোধ্য মনে হতে পারে—কিন্তু বিশ্বাস করুন, শেষ বিচারের এটাই শেষ মোক্ষম প্যাচ—বদিও আবার শেষেরও শেষ থাকে—তাই এ ছবিতে শেষ চমকটুকু হল—বিচারক তাঁর ছেলের প্রতি কানির রায় দিয়েই লগে লগে বিচারক পদে ইস্তফা দিয়ে ছেলের কাঠগড়ার সামনে এসে ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন—এমন দৃশ্য দেখেও বদি মবাই আবেগে না ভাসেন, তবে আর কি করা বাবে! অধুনা কলেজে প্রথম দুবেই যে প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হওয়া যায় না—লেকচারার, অ্যানি-ক্টেট প্রফেসরের পদ অতিক্রম করতে

হয়—ছির মস্তকজাত ও অপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের আদায়ী ছাড়া। যে কানির হুম্বও হয় না ইত্যাকার বাস্তব বোধের অভাব ছবিটিকে আরও দৈবের পথেই ঠেলে দিয়েছে। কাহিনীকার ও পরিচালক জীবিল রায় ছবিটির ট্রিটমেন্টে সেই মামুলি ধারার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে ছবিটির সম্পাদনায় ও শিল্প নির্দেশনার যথাক্রমে ছল্লাল দৃশ্য ও স্বর্ষ চট্টোপাধ্যায় রুতিবের স্বাক্ষর রেখে-ছেন। শব্দগ্রহণ ত্রুটিপূর্ণ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বর বৈশিষ্ট্যহীন। হুম্বা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এ ছবিতেও একমাত্র সৌন্দর্য।

উত্তম স্মরণে বি, এফ, জে, এ গত ২রা আগস্ট বেঙ্গল কিন্স আর্গালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য-বৃন্দ তাঁদের কার্যালয়ে শিল্পী উত্তম-কুমারের অকাল বিরোগে পতীর শোক প্রকাশ করেন। শোক পতীর পরিবেশে বিভিন্ন বক্তা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে উত্তমকুমারের অবদান সম্পর্কে মঞ্জুর উল্লেখ করেন। নির্মলকুমার বোম্ব, পশুপতি চট্টো-পাধ্যায়, রাগীন্দর কা ও ধীরেন মল্লিক উত্তমকুমার সম্পর্কে আকর্ষণীয় স্মৃতিচারণা করেন। নির্মলবাবু উত্তম স্মরণে একটি একাডেমি স্বাপনের প্রস্তাবও রাখেন। প্রয়াত শিল্পীর প্রতি সাংবাদিকদের শোকনস্ত্র চিত্তের অভিপ্রকাশটুকু লিখিত বরাণে শিল্পীর পরিবারের কাছে পাঠানোর প্রস্তাব শোকসন্তার গৃহীত হয়।

মহম্মদ রফি

মহম্মদ রফি ছিলেন হিন্দি চলচ্চিত্রের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী। কিন্তু চলচ্চিত্রে না এসে তিনি বহি উচ্চাঙ্গ লগীত সাধনার নিমগ্ন হতেন, তবে তাঁকে হয়তো এক প্রপদী শিল্পী-রূপেই পেতাম। একথা বলার কারণ এই যে, তাঁর রেওয়াজি কণ্ঠের যে মেজাজটুকু পরিচর আমরা কিল্মি-গানের মধ্যেই পেয়েছি, তা তাঁর উচ্চমার্গের লগীত চেতনার আভাস-কেই বারে বারে উচ্চকিত করে তোলে। বেশ কিছু ছবিতে তাঁর পাওয়ারাগাশ্রয়ী গান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং ইদানীংকালের অত কোম পুরুষ শিল্পীর কিল্মি গান তেমন দাবী রাখে না।

বিগত দুগে কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুম্ভ-লাল সারগল ও পঙ্কজ মল্লিক কিল্মের গানে অসামান্য প্রতিষ্ঠা পেয়ে ইতি-হাস সৃষ্টি করে গেছেন। অবশ্য তাঁরা শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন অতি নেতা ও—তবু অতি নেতা অপেক্ষা তাঁদের গায়ক সত্তাই ছিল মুখ্য ও আকর্ষণীয়। কিন্তু রফির পরিচর শুধুই গায়করূপে—এমন কি স্বরকার হিসেবেও কোন কুম্বা ছিল না—যেমন ছিল একদা কৃষ্ণচন্দ্র দে ও পঙ্কজ মল্লিকের অসাধারণ খ্যাতি ও পরবর্তীকালে হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়ের খ্যাতি। কিশোরকুমার ও মারা দেয় মধ্যেও স্বর রচনার প্রবণতা দেখা গেছে। রফি কিন্তু নির্ভেজাল গায়ক—অপরে স্বরেই গান গেয়ে-ছেন বরাবর। তাঁর এই একনিষ্ঠতা, নিজস্ব গায়ন পদ্ধতি ও মধুর স্বরেলা কণ্ঠ তাঁকে কেবল গায়করূপেই এমন করে উন্নীত করেছিল, যার নাগাল একালের আর কেউ পাননি বলেই

মনে হয়। তিনি তাঁর কণ্ঠকে লগ্নে চড়িয়েও তাল স্বর তল মা করে যে লগীত হুম্বা সৃষ্টি করতেন, তা অনবদ্য কুমতারই পরিচায়ক। সাম্প্রতিককালে এই উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-কেই কেউ কেউ 'লাউড' বলে আশঙ্কি করেছেন, কিন্তু রফির গায়ন বৈশিষ্ট্য সেখানেই প্রোঞ্জল।

১৯৪১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুর আগের দিন-পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ ছিল অক্লান্ত ও অমলিম। অল্পস অল্প ছবিতে তিনি গান গেয়েছেন নেপথ্য থেকে, অথচ যে কোন জনপ্রিয় চিত্র-তারকার মতই ছিল তাঁর জন-প্রিয়তা। তাঁর গানের আবেদন ছিল সকলের মধ্যেই—সেখানে হিন্দি, অ-হিন্দি বলে কোন ভেদ নেই। রফির কণ্ঠের গভীর গান আবার স্বতন্ত্রমহিমায় উজ্জল। অনেক অকি কিং কর ছবিতেও তাঁর গান বরণীয় হয়ে

আছে—ছবির নাম তলিয়ে গেলে কিছু গান বেঁচে আছে। 'বৈজ্ঞানিক' ছবিতে মালকোশ রাগে তাঁর গাওয়া 'মন তড়পত হরিদর্শন কো' গানখানি কোন দিন কি ভুলে যাওয়া সম্ভব। 'এ ছবিরই 'ও হুম্বাকে রাধাওরাজে গানটিও অরণীয়। 'বরদাত' ছবি 'মায় জিন্মগীমে হরদম যোতাছি রহ হ', 'আম' ছবির 'দিলমে ছপাকে' 'কোহিনুর' ছবির 'মধুম মে রাধিক নাচেরে', 'কাগজ কি ফুল' ছবির 'দেখি কমান্দে, কি ইয়ারি' ইত্যাদি গান আজও দারুণ জনপ্রিয়। 'দ্বিধার', 'কালাপানি' 'গাইত 'হাওরাদ' প্রভৃতি ছবিতে রফির গান অরণীয় হয়ে আছে। 'মোরে শ্যাম ভক্তম গানটিও অনবদ্য। অনেক দারুণ সৃষ্টিকে পিছনে কেলে গায়ক রফির মধুকণ্ঠ চিরতরে শুভ হয়ে গেছে—এ কতির বেদনা সহজে বাবার



আপনার জীবনের
কোনো কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই
ইউকোব্যাক্সের জন্য

ছোট্ট এইটুকু মেয়ে। কিন্তু আগনার
অনেকখানি জুড়ে রয়েছে ও। আগনি তো
চাইবেনই, ভালো করে, ঘটা করে ওর
বিয়ে হোক।



আপনার চিন্তার এই স্মরণীয় মুহূর্তে
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার
স্বপ্ন কী করে সার্থক হবে, আমরা সেই
পরামর্শ দেব।

মনে হয় মাত্র কালকের কথা। যুগ্মে যাবার আগে
বায়না ধরত নতুন পুতুল তার চাই-ই চাই। আর আজ। ঠিক
যেন পাকা বড়ি। আয়নার সামনে সজতে বসেছে।

হঠাৎ আপনার মনে হবে, মেয়ে বড়ো হচ্ছে। ওর
বিয়ে দিতে হবে। খুব বেশি আর দেরি করা চলবে না। কিন্তু
ভাবলেই তো আর হয় না। তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।
অথচ সমল তো মাত্র মাস সাত মাইনে।

এই সব ভাবনার দিনগুলিতে আমরা—অর্থাৎ
ইউকোব্যাক্স আপনার সঙ্গে।

সংসার খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু সঞ্চয় করতে পারেন,
তাই নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা পরামর্শ
দেব, আমাদের কোন সঞ্চয় প্রকল্প আপনার কাজে
আসবে। অতিরিক্ত টাকা জমা না রেখেও একাধিক প্রকল্পের
সুবিধা আপনি ইউকোব্যাক্সে পাবেন।

আর এতে আপনার আয়ও বাড়বে।

আমাদের যেকোনো শাখা অফিসে আসুন। আপনাকে
মেয়ের সেই শুভদিনের সূচনা আজ থেকেই হোক।

আপনার স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাক্স ও আপনি
ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমান

ই-কংগ্রেসে চুলোচুলি

১ম পৃষ্ঠার পর

মিক আলোচনা হয়নি। কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অথচ সি, পি, আই এমের বিরুদ্ধে অজিতবাবু 'হঠাৎ' আন্দোলনে নেমে পড়লেন। এ শুধু অবৈধচলনামাত্র নয় দুর্বৃত্তিরও পরিচায়ক।

এ নিয়ে দলীয় কৌশল কিছুদিন চাঁপাচুপি থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ফেটে পড়েছে। কেননা অজিতবাবু ও হুজুরবাবু দুজনেই সরাসরি সংবাদপত্র ও নিজেদের প্রত্যাবর্তিত কর্মমহলে এসব ব্যাপারে জোরদার প্রচারাভিযানে নেমে পড়েছেন। অজিতবাবুর বক্তব্য, সি, পি, আই, এমের রাজত্ব চতুর্দিকে খুলোখুলি, ডাকাতি, দুর্নীতি। এসবের একটা বিহিত সরকার। এ সরকার টিকিয়ে রাখা মানবিকতা বিরোধী কাজ। ৯ই আগষ্ট থেকে তাই সি, পি, আই এম হঠাৎ আন্দোলন দিয়েই এ সরকারকে লুপ্ত করার কাজে নামতে হবে। এ নিয়ে অজিতবাবু সংবাদপত্রের বিবৃতি দিয়ে বলেন। ব্যঙ্গ আর ব্যঙ্গ কোথায়। চারদিক থেকে বৈ বৈ। দলীয় কর্মীদের প্রদ্ব, সি, পি, আই এমকে হঠানোর সিদ্ধান্ত কেন বৈঠকে নেয়া হোল। কারা নিল। কেনই বা নিল। রাজ্য কংগ্রেসটা কি অজিতবাবুর পৈতৃক সম্পত্তি। তিনি দলীয় কর্মীদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেই সবাই তা মেনে চলবে। এর জন্য কোন পরামর্শ, আলোচনার প্রয়োজন নেই।

হুজুরবাবুর বক্তব্য আরও পরি-

কার... ঠর কথা, সি পি এম হঠাৎ আন্দোলন হচ্ছে বাজে ব্যাপার। এটা লোক দেখানো। বর্তমানে সি পি আই এমের বা শক্তি তাতে কারোর পক্ষেই তাকে লগানো সম্ভব নয়। বরং একে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হবে তাতে দলীয় কর্মীদের বোকার মত দাঁড়িয়ে মার খেতে হবে। এই আন্দোলনের ডাক অজিতবাবুর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত স্বার্থকে কাজে লাগাতে তিনি দলের প্র্যাট-ফর্মকে ব্যবহার করছেন। বর্তমান চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটের মুখে কেউ এমন ডাক দেয়? আসল ব্যাপারটা হলো, সি পি এমকে হঠিয়ে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে এ নিয়ে চলছে দলীয় মাতব্বরদের খেলা। এই পদে বসার জন্য বরকত গণিধান চৌধুরী, প্রণব মুখার্জী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোপালদাস নাগ, আবদুস সাত্তার ও পাঞ্জা নাহেব বরং লড়ে যাচ্ছেন। হালচাল দেখে মনে হচ্ছে বরকত সাহেব, প্রণববাবু এ রাজ্যের দায়িত্বে শেষ পর্যন্ত আসবেন না। সাতার ইতিমধ্যেই আউট। দেবীপ্রসাদ, গোপালবাবু চেষ্টা চালাচ্ছেন। কি হবে বলা মুশকিল। পাঞ্জা সুযোগ বুঝে কাজ দেখানোর জন্য সি পি আই এম হঠানোর আন্দোলনে নেমে কাজ দেখাতে চাইছেন। যদি তার ভাগ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদটা জোটে। হুজুরবাবুর বক্তব্য, পকারেতে নির্বাচনে দু'একটা আসনে জিতে অজিতবাবু মনে করছেন, আর কি এবার রাজ্যটা নিলেই হয়। অথচ খেয়াল করছেন না পকারেতের জেলা পরিষদে কংগ্রেস কোনরকম পাতাই পায় নি।

হুজুরবাবু তার দলীয় কর্মীদের বলেছেন, কয়লার ব্যাপারে বরকতের বেনজীরবিহীন দুর্নীতির কথা সি, পি, আই এম ফাঁস করে দিয়েছে তা ধামাচাপা দিতেই বরকত এখন অজিতবাবুকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। এর জন্য অজিতবাবু বরকতের দুর্নীতির কথা চাঙতে সি, পি, আই, এমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দেন। এরপর সরাসরি নেমে পড়েন সি, পি,

পিতার জন্ম

৩য় পৃষ্ঠার পর

নাশাতাল টেক্সটাইল করপোরেশনে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও পুত্র প্রণবকে বড়সড় পদ পাইয়ে দিয়েছেন। এইভাবে পিতা এবং পুত্রের জন্ম প্রতিভা তাঁর প্রতিভা বিকিরণ করে চলেছেন। এবং এর মধ্যেই রাজধানী রাজনীতিতে মন্ত্রীপরিষদ মর্যাদা পেয়ে গেছেন।

আই এমের বিরুদ্ধে জেহাদে। দলীয় কর্মীদের কাছে হুজুরবাবু বলেন, আপনাকেই ভেবে দেখুন যে-মাত্রটি মিছিলে নেই, মিটিংয়ে নেই, জেলে যাননি তিনি কেন হঠাৎ সি, পি, এম-হঠাৎ আন্দোলনে নামেন? এর মেন পথের কারণ একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। কয়লা নিয়ে কেলেকারী ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য বরকত সাহেব মান বাঁচানোর জন্য রাজ্য কংগ্রেসকে কাজে লাগাতে চাইছেন। অজিতবাবুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নটাও প্রবল। এই দুই মিলিয়েই সি, পি, এম হঠাৎ আন্দোলন। এর সংগে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও যোগাযোগ নেই।

পারম্পরিক দলবদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন, খুনোখুনির মধ্য দিয়েই চলছে রাজ্য কংগ্রেসের ভাঙ্গা তরঙ্গ। যা পরি-স্থিতি তাতে একথা বলা আর অবস্থার পরিবর্তন না হলে শীঘ্রই নিজেদের দলীয় কৌশল নতুন পথে বাঁক নিতে পারে। আর অনিবার্য পরিণতি হলো নির্মম মৃত্যু ও রক্তপাত।

জরুরী অবস্থা

৪ম পৃষ্ঠার পর

এজন কং (ই) এম পিও ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখে অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা জারী করার কথা বলেন। এবং ইন্দিরা গান্ধী ও তার কথার অহুস্রভাবে সাড়া দেন। ইন্দিরা গান্ধী ব্যাপারটা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবছেন। অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা জারী করার প্রতিশ্রুতি সংবিধানে আছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে জনতা সরকারের অর্থ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতীশ আগরওয়াল বলেন জনতা সরকার দু'বৎসরে যে সংকট সৃষ্টি করে, ইন্দিরা সরকার মাত্র দশ দিনে তাই করেছে। বর্তমান সরকারের এক প্রতীক লোক বলেছেন যে গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একমাত্র ৭৬ সালেই জরুরী অবস্থার সময় মূল্য সূচক বেশ কয়েক গিয়েছিল এবং অর্থনীতিতে কিছুটা স্থায়িত্ব এসেছিল। কিন্তু জরুরী অবস্থা জারী আগে মূল্যমান প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং বিশেষ করে সেটা হয় ৭৪ এবং ৭৫ এর প্রথম। তাঁর মতে শুরু হয় রাজনৈতিক সংকট। সেবারে জরুরী অবস্থা জারী করাতে দুটো সংকটেরই সাময়িকভাবে সমাধান হয়। অতএব এবারের সংকট মোকাবিলাতে ইন্দিরা গান্ধী শুধু অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা জারী করতে চাইছেন, কারণ আগের বারের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার আছে।

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

কড়াভাবে আমদানী সংকোচ করেছে। কলে ভারতের লৌহ আকর ও খনিজ পণ্য, কাপড়, লৌহ ও ইস্পাত, চামড়া ও চর্মজাত জুতা, চিনি, ও চিংড়ী এবং অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক মাহ রপ্তানীর উপর বিধিনিষেধ জারী করা হয়েছে।

অন্যদিকে বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাংকের চাপে উদার আমদানী নীতি গ্রহণ করে পশ্চিমী হুনিয়ার সংকটগ্রস্ত শিল্পজাত পণ্য চড়া দামে বিদেশী পণ্য কিনছে। কিন্তু চড়া দামের সুযোগ নিয়ে নিজেদের শিল্প গড়ে তুলছে না। কলে অভ্যন্তরীণ বাজার আমদানী করা মূল্যফীতির চাপে ভেঙে পড়ছে। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য পাঁচ বছর ধরে একটানা বেড়ে চলেছিল। বৃদ্ধির হার ছিল ২২% শতাংশ থেকে ৩১% শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি ২২০০ কোটি টাকারও বেশী।

অর্থাৎ পশ্চিমী হুনিয়ার অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত আমাদের নিদারুণভাবে আঘাত করেছে। পশ্চিমী হুনিয়ার তাহের সংকটের বোকা বৈদেশিক বাণিজ্যমুদ্রে আমাদের ও অভ্যন্তরীণ হুনিয়া দুজনেই বেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বর্তমান সরকার একই পুঁজিবাদী রাস্তায় পা বাড়িয়ে এই বোকা ভারতের যেকোনো মাহের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

কোন লোককে তারা বাগানের ত্রিণীমানার ঘেষতে দিচ্ছেন না। এ বাগানের অপর শ্রমিক মেতা তীর্থকর মুখার্জী জানিয়েছেন যে, বাগানের শ্রমিকরা এখন থেকে সম-বারের ভিত্তিতে বাগান চালাবেন।

হুনিয়ার জনসাধারণের দাবি অবিলম্বে বাগান মালিকদের গ্রেপ্তার করা হোক এবং বখাষণ তদন্ত চালানো হোক।



ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/সি পি ডব্লিউ ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফা-ওয়ারী দরভিত্তিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল্য করা টেন্ডার :

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার নোটিস নং : এস এটি/জি এম/এস ই (সি) ৮০/৬৪৪১ তার ১৭.৭.৮০ থেকে সম্পাদিত।

(১) এম জে থাম থেকে নিমচায় নিউ ইনফ্রাইন পর্বত রাজ্য নির্মাণ (২) নিমচা কোলফিন্ডস নিউ ইনফ্রাইন বাবার জন্য হুনিয়া জোড়ের ওপর মেতু নির্মাণের জন্য। উপরে প্রদত্ত কাজের জন্য মোট আনুমানিক খরচ ১০,০২,৮২৬ টাকা। সাতগ্রাম এরিয়া অফিসের কেশিয়াবের কাছে দফা-ওয়ারী কাজের প্রতি সেটের জন্য নগদে ১০০ টাকা দিয়ে (অপ্রত্যর্পণযোগ্য) ১৪৮৮০ থেকে ২৬৮৮০ বেলা ২টা পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে সাতগ্রাম এরিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্টের (সি) অফিস থেকে টেন্ডার দাখিল পাওয়া যাবে। জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, সাতগ্রাম এরিয়া, পোঃ দেবচাঁদনগরে (বর্ধমান) ২৭৮-৮০ পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে কিছু পরেই খোলা হবে। টেন্ডার খোলার পরে টেন্ডারপত্র গ্রহণের জন্য ১২০ দিন উন্মুক্ত থাকবে।

সামগ্রণ : বাবনার টাকা প্রতিটি কাজের আনুমানিক মূল্যের ১%। টেন্ডারপত্র দেবার আগে টেন্ডারদাতার কাজ দেবার যোগ্যতা সম্পর্কে দাখিল ভিত্তিক প্রমাণ দিতে হবে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। টেন্ডার নোটিসে উল্লিখিত বিভিন্ন অফিস থেকে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অথবা কাজ বিভিন্ন টেন্ডারদাতার মধ্যে ভাগ করে দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন। ডাকে বিলম্বের জন্য ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড দায়ী থাকবে না। পোষ্টাল অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাকট/চেক পাঠানো টেন্ডার ফী গ্রহণ করা হবে না। টেন্ডারদাতা অথবা তাহের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে।

রাণী গাইডিলিও

১ম পৃষ্ঠার পর

সমাধান হয়ত সম্ভব হত। কাছাড়-খনিপুর সংলগ্ন বিজীর্ণ এলাকার উপ-জাতিক মানলে দৃঢ় প্রোথিত 'রাণী'র ভাবমূর্তির কথা স্মরণ রেখে এ ধরনের অসুস্থমান মোটেই কষ্ট কল্পনা নয়। কিন্তু সরকার কোন চেষ্টা হয় নি। ইতিহাসের অনেক ইয়াজিক চরিত্রের মত 'রাণী' গাইডিলিও একদিন বিশ্বতির অতলে তলিয়ে গেছেন সকলের অগোচরে।

গ্রন্থপঞ্জী

- (১) রিভেলিয়াস প্রফেটস : স্টিফেন ফুকাস (পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৭)
- (২) ইউনিটি অব ইন্ডিয়া : জওহরলাল নেহরু (পৃষ্ঠা ১৮৭-১৮৮)
- (৩) আদাম ডিক্টেট গেরেটটার : বিলি এ্যালেন (প্রথম খণ্ড, কাছাড়)
- (৪) দি রাইজিং নাগাস : আসোসো ইনোও
- (৫) পূর্ব পার্বতী : প্রফুল্ল রায়

আসাম অন্মোলন প্রসঙ্গে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি

আসামের আন্মোলনকে সি, পি, আই এম, সি, পি, আই, কংগ্রেস (আ), কং (ই) বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে বিচ্যোভিতা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রকাশ্যে বহিরাগতদের বিতাড়নের জন্ত এই আন্মোলনকে সমর্থন করেছে। জনতা পার্টির একাংশ এই আন্মোলনকে মদত দিচ্ছে। লোকদলের অর্ডার ফার্মাওজ এই আন্মোলন সমর্থন করেছেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আন্মোলনকারীরা মুখ খুলেছেন, এই আন্মোলনে মাকি শ্রমতী গান্ধী কিছুটা হেঁদেছেন। নকশাল-পন্থীদের মধ্যেও বিভিন্ন মত আছে। লক্ষ্য রাণাপন্থীরা সি, পি, আই (এম) এর মতাবলম্বী। পার্টি ইউনিটি গ্রুপ আন্মোলনকে সমর্থন করেছে। প্রোগ্রেসিভ পিপলস কোরাম বহিরাগত বিতাড়নের পরিবর্তে আসামবাসীদের ক্ষোভের মুক্তিলাভের কারণ তথা রাজ্যের অনগ্রসরতা খোঁকার করেও এই আন্মোলনকে কেন্দ্রের হাত

থেকে রাত্তির হাতে অধিক অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আদ্যে রূপ দিতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির বক্তব্য এবার প্রকাশ করা হল।

‘গত দশমাস ধরে সমগ্র অসমীয়াতাবাদীরা বিজোহ করছেন, ষেচারাচাৰী কেন্দ্রীয় সরকারের দাব-রকম কালাকাহন হমন-পীড়নকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা অকৃতপূর্ব আন্মোলন চালাচ্ছেন। যদিও সাধারণ বাঙালী পরিবারদের উপর কিছু হান্ধা হান্ধামার চুংখনক ঘটনা ঘটেছে তথাপি আসামের গণআন্মোলনের মূল শ্রোতকে এর দ্বারা বিকৃত করা ঠিক নয়।

জাতির শৃঙ্খলমুক্তির সমস্যাই এই আন্মোলনের মূলবস্তু। অসমীয়া জনগণের বথার্থ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ ও অকৃতপূর্ব জানানোটাই দাবীদার-শ্রমীর কর্তব্য হবে। ব্রিটিশ আমলের মতোই বৃহৎ বুর্জোয়া-অসমীয়া-শ্রমীর বর্তমান শাসনেও অসমীয়া

নিপীড়িত হচ্ছেন।

এছাড়াও ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অদম্পূর্ণতার জন্ত জাতি-সমূহের শৃঙ্খলমুক্তিও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু অসমীয়াদের মতো ক্ষুদ্র সংখ্যক জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরো তীব্রতর। জাতিসমূহের পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এবং তা আবার সম্ভব কেবল মাত্র জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে। এ কারণে আসামের বর্তমান আন্মোলনকারীদেরকে দেশের জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে প্রাধেয়িকতার উদ্দেশ্যে উঠে একত্ব আন্মোলন করতে হবে।

আসাম আন্মোলনের বর্তমান বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। একদিকে তাঁরা যেমনি আসামে অ-অসমীয়াদের প্রবেশটাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিত্রিত করছেন অন্মোলনকে তাঁরা বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর

এনটার প্রাইজ।

অবশেষে বোম্বের, কাষ্টমস কালেক্টর বিমানটি কারচুপির দ্বারা বাজেয়াপ্ত করলেন। যদিও চল্লিশ হাজার টাকা কতি পূর্ণের বিনিময়ে বিমানটি ফেরৎ পাঠানোর সুযোগও দিলেন। কিন্তু ফেরৎ আর গেল না। ২ মার্চ ’৭৮ সেমুর শিপিং কোঃ মেনার্স জীনা এও কোম্পানীকে জানায় যে বোম্বের অতি আত্ম-জল হাওয়ার দীর্ঘদিন থাকার ফলে বিমানের ইমজলেশন পাটন নষ্ট হয়।

এদিকে বোম্বের পোর্ট ট্রাস্ট বিমানটি নীলামের তালিকার তোলে। নীলাম আর হয়নি। লোকসভার নির্বাচনের পর অবস্থা ঘুরে গেল। এপেক্সী হাউসের পীয়ারীলাল-জিং পালের টাকায় ইন্দিরা গান্ধী এক সময় পূর্ব আফ্রিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞতা বশতঃ ম্যাডাম সব ব্যবস্থা করে দিলেন। অফিসাররা আবার অস্ত্র স্থর ধরলেন। বিমানটি বোম্বের থেকে দ্বিতীয় রাইং ক্লাবে এল। বিমানটি অবশ্য আদৌ যাত্রীবাহী নয় সমগ্র গান্ধী রোজ সকালে দু বটা ধরে কনকন দেখাতে লাগলেন।

মথোই সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান চাইছেন। এঁরা ভারতীয় শাসক-শ্রেণীর হুই উদ্বাস্ত সমস্যা প্রসঙ্গেও একেবারে উদ্বাসী। এটা মত যে, গড় আশি বছর ধরে আসামে অ-অসমীয়া, বিশেষতঃ বাঙালীদের অত্যাচার-অত্যাচারী নতুন হারানোর আশঙ্কা করছেন। কিন্তু এই আশঙ্কার মূল কারণ উক্ত অত্যাচার নয়, বরং জাতীয় নিপীড়ন।

সি, পি, আই (এম) সহ তথ্য-কথিত বমপন্থী হলগুলি এই

স্বতন্ত্র সঙ্কে অজিত পাঁজার ঠাণ্ডা লড়াই

১ম পৃষ্ঠার পর

ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয় বেশ কয়েকমাস আগে অজিতবাবু সভাপতি হওয়ার কয়েক সপ্তাহ বাড়েই। সভাপতি হওয়ার আগে অজিত পাঁজা ছিলেন বরকত-স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর কষ্টের সমর্থক।

স্বতন্ত্রবাবু দ্বিতীতে সভাপতি মনোনীত করার ব্যাপারে অশোক সেম-অজিত পাঁজার লড়াইয়ে অজিত পাঁজাকেই সমর্থন করেছিলেন। অবশ্য অজিত পাঁজার নাম প্রস্তাব করেন বরকত পনিখাম চৌধুরী স্বয়ং। সোমেন, হুজল, সান্তারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অজিতবাবু সভাপতি মনোনীত হন।

এ পূর্বস্বতন্ত্র সব ঠিকই ছিল। কিন্তু গুণগোল বাধল অজিত পাঁজা সভাপতি হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই। সভাপতি হয়ে অজিতবাবু নিজেকে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং স্বতন্ত্রবাবু সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই কমিয়ে দিতে লাগলেন।

এর মধ্যে স্বতন্ত্র সঙ্গে বরকত লাহেবের বিরোধ দেখা দেয় রাজ্য কংগ্রেসের এ্যাডহক কমিটির ব্যাপার নিয়ে। এই ঘটনার অজিতবাবু পুরোপুরি বরকত লাহেবের পক্ষ নেওয়ার স্বতন্ত্রবাবু আরও চটে যান। এরপর অজিতবাবু নির্দেশ দিয়ে স্বতন্ত্র ঘন ঘন কাগজে বিবৃতি দেওয়াও বন্ধ করে দেন বরকত লাহেবের মদতে।

সভাপতি হয়ে অজিতবাবু চেষ্টা করতে থাকেন নিজস্ব একটা গোষ্ঠী তৈরী করতে যাতে স্বতন্ত্র অথবা সোমেনের ওপর দাপটনিক ব্যাপারে তাকে নির্ভরশীল থাকতে না হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জেলার অজিতবাবুর ঘনিষ্ঠ লোকেরা যোগাযোগ শুরু করে যথেষ্ট সাড়াও পান। এই ঘটনার অজিতবাবু বেশ উৎসাহিত হন।

১ই আগস্ট থেকে সি পি এম

আন্মোলনের মর্মবস্তু না বুঝে কার্ভ উদ্ভাবন প্রাধেয়িকতাভিত্তিক শিকার হয়েছে। এর ফলে ষেচারাচাৰী কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্তিশালী হয়েছে।

দবশেষে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি আসাম থেকে সেনাবাহিনীর ও সেনা কালাকাহনের প্রত্যাখ্যান, আন্মোলনে খুঁড় স্কল বন্দীর মুক্তি দাবি করেছে। কমিটি এই আন্মোলনের বিপজ্জনক বোঁক তথা দাপ্তরাধিকার দস্তাবনা সম্পর্কেও সকলকে সতর্ক করেছে।

বিরোধী আন্মোলনের কর্মসূচী নেওয়ার আগে অজিতবাবু স্বতন্ত্র মুখার্জী সহ দলের অনেক প্রবীণ নেতার সঙ্গেই পরামর্শ করেননি। অজিতবাবু এ ব্যাপারে প্রাধেয়িকতা নিয়েছেন সন্ত আর্প কংগ্রেস থেকে আসা জোলা সেম, গোপালহাস নাগ, রামকল সায়েগী প্রমুখ নেতাদের।

কলে স্বতন্ত্র মুখার্জী যে একা অজিতবাবুর ওপর চটেছেন তা নয় তলে তলে অনেক প্রবীণ নেতাও অজিতবাবুর ওপর চটে আছেন। দবার মুখপাত্র হয়েই স্বতন্ত্র অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এ ব্যাপারে মদত আছে বলে বিশ্বস্ত হয়ে আসা গেছে।

এই অবস্থায় অজিতবাবুর সি পি এম বিরোধী আন্মোলনে অংশ নিতে অনেক মেতাই রাজী হচ্ছেন না। ষ্ট্রিকের কোন অয়োজনেই কাজ হয়নি।

বের হচ্ছে

অপেশাদার সাংবাদিক
সমর মিত্রের

“আফগানিস্থান ও
কাম্পুচিয়া

বিশ্বে বাডের কেন্দ্র”

৫০০ টাকা

প্রকাশক: প্যাগোডা হাউস

ডি ৭৭, রামগড় কলোনী

কলিকাতা ৪৭

আফগানিস্থানে রুশ হামলা আর তার ইজিতে কাম্পুচিয়ার ভিয়েনামের আক্রমণ ক্রমের বিশ্বগ্রাসে বড় ধাপ।

এই সব ঘটনা নিয়ে বই

—পায়েন—

কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের দোকানে

১। বুক সাপ্লাই এজেন্সি

২। বসন্তবু বুক টল

৩। নিউ বুক সেন্টার

প্লেনের রহস্য

১ম পৃষ্ঠার পর

চিক কন্ট্রোলারকে আরহানী লাইসেন্স ও কাষ্টমস পারমিটের জন্ত কোম্পানী চিঠি দেয়। টমাস মূল কোং নাকি বিমানটি হান হিসেবে পায় বলে জানায়। সাতাত্তরের ৭ জুলায়ারী ঐ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। তখন দেশে জরুরী অবস্থা চলছে। আমেরিকার নিউ অরলিন্স বন্দর থেকে বোম্বাইয়ের বিশ্বনাথক জাহাজে বিমানটি তোলাও হয় ৭ জুলায়ারী ৭৭। যে দিনে দ্বিতীতে দুপুরে লাইসেন্স মিললো সেদিনই কয়েকঘণ্টা পর ইংল্যান্ডের বন্দরে মাল জাহাজে চাপলো। লাইসেন্স পেয়ে চিঠি দিয়ে মাল বুক করার সময়টুকু পর্যন্ত লাগেনি। সবই বন্দোবস্ত ছিল।

পরে সেমুর শিপিং লিঃ বোকে যে ঐ পিটস বিমানটি বিশ্বনাথক

জাহাজে তোলাই ভুল হয়েছে। কোম্পানী ২০ মে ’৭৭ বোম্বের জীনা এও কোং কে চিঠি দেয় বিমানটি আবার জাহাজে তুলে ফেরৎ পাঠাতে। জনতা শাসনে তখন আরহানী—রপ্তানী ও শুদ্ধ বিভাগের অফিসাররা অস্ত্র স্থর ধরেন। তাই ঐ কোং পাঠানোর জন্ত চিঠি। অফিসাররা তখন জানতে চান যে, বিমানটি ইংল্যান্ডের বন্দরের পরিবর্তে আমেরিকার বন্দর থেকে জাহাজে তোলা হয় কেন? ইংল্যান্ডের পিটস এয়ারোবটিকস কোম্পানীর সঙ্গে আমেরিকার পিটস এভিয়েশন এনটার প্রাইজের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উঠে। শেষোক্ত কোম্পানী কিন্তু জাহাজে তুল করে বিমানটি তোলা হয়েছে বলে কোন চিঠি দেয় না। আসলে বিমানটি কেনা হয় ইংল্যান্ডের কেলী এরোপেন লিঃ থেকে যাদের মাথা হল আমেরিকার পিটস এরোবোটিক ও মেনার্স পিটস এভিয়েশন

শ্রমিক সংগ্রাম পুস্তক পর্ব

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

১। বৈক্যব পদ সংকলন / শ্রীদেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১০০

২। বৈক্যব কবিতায় কালিদাসের

উত্তরাধিকার / ডঃ নরেশচন্দ্র জানা / ১০০০

৩৬, রাজা হুবোথ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর কার্যালয় ৩১, মট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

ইন্দিরার ক্ষোভ প্রকাশেও রাজ্য ই-কংগ্রেসের বিরোধ মিটল না

দুপল

অগস্ত্য বর্ষ ২২শ সংখ্যা ১৫ই আগস্ট ৮০ ৬০ পয়সা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ফারা আসবেন তাই নিয়ে বাঁচাবাঁচি চলছে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কিছু মতামত মূখ্য দেখা যাবে। কোন কোন দপ্তরে হাত বদলও হবে। আর খুব বেশি দেরি নেই। আশা করা যায়, লোক-সভায় বর্ষা অধিবেশন শেষ হবার পর ছুটি মাস ধরে যে অসম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী তা সম্পূর্ণ করবেন। এখনও প্রতিরক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, স্বাস্থ্য, শিল্প ও খনি দপ্তরের ক্ষতি নিয়মিত মন্ত্রী নেই। কয়েকজন মন্ত্রী এগুলির দেখাশোনা করলেও দীর্ঘদিন এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। তাই বাঁচাবাঁচি চলছে কাদের মেওয়া হবে। এজ্ঞা বাক্যে বাক্যে মতামত পুরনো মুখ মুকুন্দের ধরে তবির তাগাদা করে যাচ্ছেন। ইতি-মধ্যে, কয়েকটি মামলায় মামলার দারিতে দারিবেদ হয়েছে।

দীনেশ সিং এখনিই মন্ত্রীর মত মর্শা পাচ্ছেন। তাঁর কাছে বহু-জন্মের আনাগোনা অব্যাহত আছে। দীনেশ সিং হর-পাট্টির, নর মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ পাবেনই। এদিকে মন্ত্রী হওয়ার জন্য খুব আশায় আছেন মহা-রাষ্ট্রের বসন্তদাড়া পাতিল, কান্দীরের মীরকাশিম, রাজস্থানের মোহনলাল সুখাডিয়া। আছেন এস বি চ্যবন, এন কে সি দাসত, খুরশিদ আলম খান (ডঃ আকির হোসেনের জামাতা), মহসিনা কিছোয়াই, প্রকাশ মেহেরোজা, ডি পুজাইয়া প্রমুখ।

এছাড়া আশা করা যাচ্ছে, শক্তি মন্ত্রী গণিধান ছাড়া কেউ বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়বেন না। জৈল সিংএর অবস্থা স্বাভাবিক হলেই বলায় মত না হলেও তিনি বড় জোর কর গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারেন। ডি সি গুজার অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরটি পাবার সম্ভা-বনা কম নয়।

বিদেশ মন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের দপ্তর সভাপতি হবার কথা চলছে বলে বিদেশ মন্ত্রকের দিকে তাকিয়ে আছেন টি এন কল, দীনেশ সিং এবং স্বরূপ সিং। অতীত, যদি আইন মন্ত্রী শিবশংকর বদল হন বর্তমান পদ থেকে তাহলে চণ্ডীগড়ের এম সি জগদীশ কৌশল আইনমন্ত্রী হতে পারেন, না হলে কৌশলের অজ্ঞ শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

কংগ্রেস(ই) সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নরম-গরম কথোপকথন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস(ই) দলের বগড়া বিন্দুমান করেনি। বরঞ্চ তাবলাব দেখে মনে হচ্ছে অজিত পাণ্ডা এবং স্বরূপ মুখার্জীর মধ্যে লড়াই আরও জোরদার আকার নেবে।

অজিত পাণ্ডা ও স্বরূপ মুখার্জীর মধ্যেকার ঠাণ্ডা লড়াই ১৫ আগস্ট উপলক্ষে দলীয় কার্যসূচীকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য আকার নেয়। উভয় পক্ষই কাগজে বিবৃতি দিয়ে লড়াইটা এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যে ব্যাপারটা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীমতী গান্ধী রাজ্য নিজ দলের নেতাদের আচরণে ভীষণ ক্ষুব্ধ। যদিও পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর কোনও দিনই খুব একটা বড় ধারণা ছিল না। কিন্তু রাজ্য নেতাদের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি অজিত পাণ্ডা এবং স্বরূপ মুখার্জী দুজনকেই দিল্লীতে ডেকে পাঠান।

এর আগে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ও বিজ্ঞান মন্ত্রী বরকত গণিধানকে ডেকে লাং পঠ নিক ব্যাপারে কথা বলেন এবং এ ব্যাপারে যাতে একটা মিটমাট হয় তার জন্য ওদেরকে চেষ্টা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু দুজনেই এ ব্যাপারে তাদের অক্ষমতার কথা লড়ে লড়ে জানিয়ে দেন।

এরপর শ্রীমতী গান্ধী এ আই সি সির অন্ততম সাধারণ-সম্পাদক ডাম-সুন্দর মহাপাত্রকে নির্দেশ দেন অজিত-স্বরূপকে দিল্লীতে আসতে বলুন।

ওরা দিল্লীতে এলে ওদেরকে শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

রাজীবের যাকে পছন্দ

রাজীব গান্ধী সম্প্রতি কোন করে রাজস্থানের উপমন্ত্রী নরিন্দর সিং ভাস্কিকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। ডাক পেয়ে নরিন্দর ভাস্কি দিল্লী যান : রাজীবের সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে ছিন্ন হয়, তিনি দিল্লীতে বিশেষ কাজে যোগ দিতে আসবেন। রাজীব তাঁর ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ এই বন্ধুটিকে নিজের বন্ধুর মতই দেখেন। যোধপুর রাজপরি-বারের এই যুবকটি দিল্লীতে সেন্ট

ষ্ট্রফেন কলেজে পড়তেন এবং রাজীব ভাইয়ের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। তিনি লজ্জবত প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক লচিব হিসাবে কাজ করবেন। তিনি এবং জে এন সিং রাজীবের রাজ-নৈতিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য বিশ্বস্ত ও যোগ্য বলে প্রধানমন্ত্রীরও পছন্দের তালিকায় এসেছেন। আর এটা হলে লগদীশ হর মন্ত্রী হবেন অথবা দলের বিশেষত যুব শাখার সংগঠনের গুরু দায়িত্ব পাবেন।

রাজ্য ই-কংগ্রেসীদের আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য গোলমাল সৃষ্টি করা

কংগ্রেস(ই) "সি, পি, এম, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে লম্বা বাংলা ছাড়" আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর এবং গোলমাল সৃষ্টি করা। সম্প্রতি এই দলের লোকজন জেলায় জেলায় লংখালঘুদের মধ্যে বিভেদ-মূলক প্রচার ও বিবেচ ছড়িয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে সি, পি, এম বিরোধী প্রচারে দলীয় সমর্থকদের সমর্থন আদ্যে ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেসের কতিপয় নেতা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ এই সমস্ত নেতা কখনো ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচা যায় বলে মনে করেন না। দিন কয়েক আগে এ রাজ্যের এক প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী সহকারী-দের এক সভায় বলেই ফেললেন যে, রাইটার্স বিজ্ঞান-এর সামনে দিয়ে গেলে চোখ কেটে যায়। সরকারী অফিসার এবং পুলিশ অফিসারেরা কিংও তাকান না। ল্যাপট করা তো অনেক দূরের কথা।

প্রধানতঃ এই নেতা আরও কিছু সাগরের সৃষ্টিয়েছেন। এরা একদিকে

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে লম্বা বাংলা ছাড়" আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর এবং গোলমাল সৃষ্টি করা। সি, পি, এম, সরকার চলে যাচ্ছে। কংগ্রেসের এই পোজির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন কলকাতার কয়েকটি খানার বড়বাবু এবং বেশ কিছু সাব ইনস্পেক্টর। কারণ এরাও মনে প্রাণে চাইছেন, যেভাবেই হোক সি, পি, এম, সরকার বিধায় হোক। তা না হলে নিরীহ লোককে হরণানি করে টাকা আদায় আর অথবা দাঁপট দেধিরে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধান সৃষ্টি এছাড়া কোনটাই তাঁরা করে উঠতে পারছেন না।

পাশাপাশি নদীয়া, চব্বিশপরগণা, মালদা ইত্যাদি নীমাত্ত জেলাগুলোতে দাঙ্গা বাধানোর ভোড়ভোড় নতুন করে শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার সতর্ক না হলে পুজোর মধ্যেই ব্যাপক হাদায়া হবার আশঙ্কা রয়েছে।

অজিত পাণ্ডার মোকাবিলায় স্বরূপ ও তার সংগীরা পাণ্ডা আন্দোলনে নামছে

লোক দেখানো একো কোন কাজ হয়নি। স্বরূপ ও অজিতবাবু তাঁদের নিজের প্রভাবিত সমর্থক-দের নিয়ে ঘরোয়া মিটিং করে যাচ্ছেন। এদের পারস্পরিক জেহাদ শুধু ঘরোয়া মিটিংয়েই আবদ্ধ নেই। দু'তরফেই এখন প্রকাশ্য সভাসমিতি করে তা প্রকাশ করছে।

শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর আদর্শবাহী নিয়ে স্বরূপবাবু এরাও নতুনভাবে অজিতবাবুকে মোকাবিলা করার কাজে নামছেন। আগামী ২৮শে আগস্ট ছাত্র পরি-ষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বরূপবাবু মাকি নদীদ্বীপে বিরাট জমায়-তের ডাক দেবেন। ঐ সমাবেশে পাণ্ডা যুব কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে সোমেন মিত্র যুব কংগ্রেসের সভা-পতি। স্বরূপবাবু মনে করেন সোমেন মিত্র এই পদে থাকার যোগ্য ব্যক্তি-নন। অতএব তাঁকে অপ-দারিত করা-হবে। স্বরূপবাবু সমর্থকরা বলছেন, ঐ সমাবেশে

বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস-কমিটির সদস্য-রাও উপস্থিত থাকবেন। সমবেশে সভাপতিত্ব করবে জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

এদিকে সোমেনবাবুও তলে তলে চেষ্টা করছেন বর্তমান ছাত্র-পরিষদের পাণ্ডা এক কমিটি গঠন করতে। এনিমিত্ত তাঁরা বিভিন্ন মহলে কথাবার্তাও বলেছেন। প্রয়োজন-মত সময়ে ছাত্র পরিষদের পাণ্ডা কমিটির নামধাম সোমেনবাবুও প্রকাশ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

আমি গেল, প্রণববাবু ১৬ই আগস্ট কলকাতার এসে ২৮শে আগস্টের কর্ম-সূচী পাঁকা করবেন। অপরদিকে বরকত গণি সাহেবও স্বরূপ ও প্রণব-বাবুদের কর্মসূচী বানচাল করে দেবার জন্য অজিতবাবু ও সোমেনবাবুদের সঙ্গে মিশ্রিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বলা বাহুল্য বরকত প্রণববাবু লড়াইতেই শুধু রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই লড়াই নয়। শোনা যাচ্ছে এর মেনধ্য কারণ নাকি আরও গভীরে। খবর হলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অজিতবাবু এখন প্রণব বরকত হয়ে অজিত ও স্বরূপবাবু; মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এ মাকি লড়াইয়ের স্বরূপ। শেষ হতে বহু দেরী।

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস

আরও একটা স্বাধীনতা দিবস ঘুরে এসে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই তারতবর্ষে সাদা চামড়ার বদলে কালো চামড়া, অর্থাৎ বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশবাসী ভূত বসে। তারপর আমাদের "পবিত্র" সংবিধান তৈরী হয় যা বিরাট একটি কেতাব এবং যার আইনগত কচক-চানির মধ্যে সাধারণ মানুষের গণের পরে বাচবার অধিকার চাপা পড়ে গেছে। প্রবর্তিত পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশদের হাতে। যেহেতু পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য আমাদের দেশে অল্পপন্থিত এবং ইংরেজরা আমাদের রাজতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে পৌঁছে দিয়েছিল মাত্র সেহেতু যত দিন যেতে লাগল শাসক দল গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা পার্লামেন্টের পবিত্রতা, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈরতাত্ত্বিক শাসন কার্যে করার পথে এগিয়ে চলল।

স্বাধীনতার পর তেত্রিশ বছর পেরিয়ে এসে আমরা দেখছি শাসক দল ও তার কর্তাদের মধ্যে বিন্দু-মাত্র, সত্যতা ও আন্তরিকতা নেই। এই নীতিহীন সুবিধাবাদী জুয়াচোর রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব আজ সবত্র দেখা যাচ্ছে। মধ্যম শ্রেণীর নেতা, কর্মী ও উঠতি নেতা সকলেই এঁদের ঐতিহ্য অঙ্গুলন করে চলেছে। সাধারণ মানুষকে খোঁকা দিয়ে কন্নতা লাভ, টাকা কাটানো ও আখের শুকানো তাদের একমাত্র কাজ। আশঙ্কার কথা এই যে, বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের মধ্যেও আন্তে আন্তে এই বিষ ঢুকছে।

১৯৮০ সালের ১৫ই আগস্টের ছাত্রপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি আমাদের জয়কুম্বিতে এখন সম্পূর্ণ মৈরাজ্য। বৈরতন্ত্র আবার কন্নতার ফিরে এসেছে। নীতি নিরস, আইন কাছনের বালাই নেই। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। কালো-বাজারী চোরাকারবারীদের রায়-রাজত্ব। তারা আইন আদালত পুলিশ কারো পরোয়া করে না। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেওয়া হয় না। সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম অজ্ঞান অবিচারের শিকার। অথচ এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি।

দেশ কাল রাজনীতি

এ তাঁর বাহাদুরী

তারতপুত্র

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন আর একবার ক্রোধে ফেটে পড়েছেন। ক্রুদ্ধা কনিদীর মতো এলো-পাতা ডি তাঁর সমালোচকের দংশনও করেছেন। দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি(ই) আয়োজিত কর্মী-সভার শ্রীমতী গান্ধী গলা স্পর্শে চম্বিয়ে জানতে চেয়েছেন তাঁকে 'দুর্বল', 'ভীক' বলে কারা? দুঃখ কষ্ট সমস্যা ছাড়া তাঁর জীবনের একটি বছরও কাটেনি। কিন্তু যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা তিনি নির্ভয়ে সাহসের সঙ্গেই করেছেন। কর্তব্যবোধকেই তিনি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পারিবারিক সম্পর্কের ওপর স্থান দিয়ে থাকেন। কারণ এমন একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন যেখানে কাজকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়।

কেবল বিরোধী দলগুলোই নয়, সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত বুদ্ধি-জীবীরা পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীকে সম্মতি 'ভীক' 'দুর্বল' আখ্যা দিচ্ছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে শ্রীমতী গান্ধী আজ পর্যন্ত এমন কোন কাজ করেন নি যার মধ্যে দিয়ে শক্তি ও সাহসের পরিচয়

মিলেছে। নির্বাচনের আগে যে সমস্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তার কোনটা তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষ যে সমস্যাটার সবচেয়ে আগে ও বেশি পীড়িত সেই গ্রাম্যল্য বুদ্ধি কি তিনি প্রতিশোধ করতে পেরেছেন? মুজাফ্ফির এতটুকু সংকোচ হয়েছে? মজিসভার গুরুত্ব-পূর্ণ দপ্তর কি এখনো শূন্য পড়ে নেই?

হ্যাঁ, ইন্দিরার সাহস আমরা দেখেছি ১৯৭৫-৭৬ সালে। তাকে সাহস না বলে দুঃসাহস, একভুরেখি-ও ক্রুরতা বলাই ঠিক। তা নইলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে তার নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবার পরও তিনি পুনঃনির্বাচন ছাড়াই গদি আঁকড়ে থাকেন? দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, স্বাধীন বিচারালয়ের মর্যাদা ধুলোর সূটিয়ে দিয়ে সংবাদপত্রের ওপর প্রিসেন্স-সংশ্লিষ্ট জারী করে মিসার সাহায্যে হাজার হাজার বিরোধী নেতা কর্মীকে আটক করে দেশের কারাগারগুলো ভর্তি করে কেছেন, সাংবাদিক বুদ্ধি ভী বী দে র জেলে পোরেন, সংবাদপত্র অক্লিস তছনচ করেন?

ই-কংগ্রেসে বিরোধ

১ম পৃষ্ঠার পর

বলবেন এভাবে রগড়া কাঁটি করলে উত্তরকেই পত্তাতে হবে। যদি ওরা রগড়া বন্ধ না করে তবে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে আমাকে অস্ত্র ব্যবস্থা নিতে হবে।

দিল্লী থেকে তলব পেয়ে উত্তরে সেখানে যান। প্রথমে হুজুনেই শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন কিন্তু তার দফতর থেকে জানানো হয় যে, শ্রীমতী গান্ধী এখন দেখা করতে পারবেন না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ শ্যামসুন্দর মহাপাত্রকে দেওয়া আছে ওরা যেন মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করেন।

মহাপাত্র তখন অস্থায় অবস্থায় হাসপাতালে। সেখানে অজিতবাবু এবং হুজুত হুজুনেই যান। মহাপাত্র হুজুতকেই বলেন আপনারা এই মুহুর্তে কাগজে প্রসঙ্গ বিবোধী বিবৃতি দেওয়া বন্ধ করুন। আর কোন কর্মসূচী নিতে গেলে দলের দবার-সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এটা শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশ।

হুজুতকে মহাপাত্র বলেন, ১৫ আগস্টের আশ্বালনের ব্যাপারে আর যেন তিনি বিরোধিতা না করেন। মহাপাত্র উত্তরকেই রগড়া মিটিয়ে ফেলতে বলেন।

সময় না থাকায় অজিতবাবু তথু প্রণব মুখার্জী এবং বরকত সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দিল্লী থেকে চলে আসেন। কিন্তু হুজুত মুখার্জী দল-নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে কলকাতায় ফেরেন। ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় হুজুতকে বলেছেন "তোমরা রগড়াকাঁটি করলে তার কল তোমাদেরই ভোগ করতে হবে।" আমি চাই মজীর মতবিরোধ যাতে কাগজে বা প্রকাশে না আসে। ইন্দিরা গান্ধী, হুজুতকে সবাইকে নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন।

১৫ আগস্টের শহীদ মিনারের সভার হুজুত মুখার্জী সহ বেশ কিছু নেতা উপস্থিত ছিলেন না। সভার অনেক বক্তাই প্রকাশে হুজুতকে আক্রমণ করে বক্তব্য রাখেন।

সাহসী তো তিনি বটেমই, কারণ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্য গণতন্ত্রকে সমাধি দিয়ে তার ওপর বৈরতন্ত্রের ইমারত তোলার জন্য তিনি কখনই দুঃখ বা অহুর্শোচনা প্রকাশ করেননি। আর পারিবারিক বন্ধন তার কাছে তুচ্ছ কিনা বোকা যার কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর প্রতি শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত, এমন কি পুত্রের মৃত্যুর পরও তাঁর আচরণের মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। লামাক্স মোটর গাড়ির মিজীকে তিনি কন্নতার কোন্ চড়ায় তুলে দিয়েছিলেন তা কি দেশবাসী দেখেননি? হ্যাঁ, শ্রীমতী গান্ধী তার অজ্ঞাত আত্মীয়স্বজনের—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বা সেই স্ত্রী অজ্ঞদের ধোঁক-ধবর রাখেন না বরং দুরেই ঠেলে রেখেছেন যাতে নিজের ছানাপোনাদের একচেটিয়া অধিকারে কেউ ভাগ না বসাতে পারে। কর্তব্যের টানের কাছে নাকি আত্মীয়স্বজন সবই ইন্দিরাগান্ধীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ। মানেকা গান্ধীর মা বা সঞ্জয় গান্ধীর শান্তদীর নামে ব্যবসা ফাঁদার পার-মিট দেওয়াটাও কি কর্তব্যের টানে সম্পাদিত হয়েছিল?

জরুরী অবস্থাকালীন বাড়া-বাড়ির তদন্তে নিযুক্ত কমিশনগুলোর সামনে প্রামাণিক শপথ গ্রহণ না করে শ্রীমতী গান্ধী অবশ্যই সাহস দেখিয়েছেন। ইতিমধ্যে মানে ইন্দিরা—দেশবাসীকে এ-বিশ্বাসের বুলি বোলানো, জাতীয় কংগ্রেসকে ইন্দিরা কংগ্রেস বলে চালানো অবশ্যই সাহসিকতার পরিচায়ক। আদৌ যখন তিনি দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুটো প্রধানের পদই নিজের হাতে রেখে নেতা ও মন্ত্রীদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন, তখন ইন্দিরা গান্ধীকে তো অবশ্যই 'বাহাদুর জেনানা' খেতাব দিতে হবে।

ইন্দিরার তাগা

এ-সভার চারদিন আগে অহুর্শিত আর একটি ঘরোয়া বৈঠকে প্রধান-মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে মধ্যবর্তী নির্বাচনোত্তর কোন কংগ্রেস-ই রাজ্য সরকারকে ভাঙা বা তার নেতা বদল করা চলবে না। কারণ তাতে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী-প্রচারকালীন প্রধান দাবিটাই ধুলিসাং হয়ে যাবে যে স্বারী সরকার কেবল কংগ্রেস ই পড়তে পারে। তাছাড়া তিনি সভার অংশগ্রহণকারীদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে অঙ্গরাজীয় কলহের ফলেই/বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত হয়েও জনতা সরকার ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর উত্তর বক্তব্যই

নির্ভেজাল সত্য। কিন্তু কন্নতা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য যারা কংগ্রেস ই করেন ভাবে কন্নতার বাইরে রেখে খেয়োখো বন্ধ করা যাবে কি? অঙ্গরদেশের মুখ্যমন্ত্রী চেমা রেড্ডির তো এখন তখন অবস্থা। কর্ণাটকের জগু রাও এবং হরিয়ানার তজনলালের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। তাছাড়া মধ্য-বর্তী নির্বাচনের আগেই এখানে সরকার গঠিত হয়েছে।

যে বাস্তব পরিস্থিতিটা শ্রীমতী গান্ধীর চোখে ধরা পড়ছেন না মেটা হল, এখন দেশে জরুরী অবস্থা নেই, এটা ১৯৭৫ সাল নয় যে তার হুজু-মতো দলের সকলেই লোভ হিংসা-ত্যাগ করে ভয়ে গর্তে ঢুকে পড়বেন। মহারাষ্ট্রের এ আর আন্তলে, উত্তর-প্রদেশের বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ক বিহারের জগদাথ মিশ্রের বাহতে কী তাগা বেঁধে দিয়ে, কতদিন ইন্দিরাগান্ধী বিজু দ্বৈর রোষ-বহি থেকে বাঁচাবেন, মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বহাল রাখবেন?

নাবিক ইউনিয়নের অভিযোগ

বর্তমানে নাবিক ও শিল্পী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে বিবাদ চলছে তার কলে অনেকগুলো জাহাজ কলকাতা বন্দরে আটকে আছে। কিছুদিন পূর্বে 'আরাধনা' ও 'বিশ্বজিৎ' জাহাজ দুটির বখাটের ৩৫ ও ৩১ জন নাবিক ছাটাই হওয়ার জন্যই এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের বায়স্কট সরকার এঁদের কাজে পুনর্বহাল করতে বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হন নি। আগষ্ট হলদিয়া ও কলকাতা বন্দরে নাবিকরা ঐ ছুটি জাহাজের ছাটাই নাবিকদের পুনর্বহালের দাবিতে ধর্ম-ঘট করেন। সম্মতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে রুরোয়ার্ড মীমেন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়।

ইউনিয়নের পক্ষে কে. কে. রা গাজুলী অভিযোগ করেন যে, গভী সমুদ্রে এই সব নাবিকদেরে মাহুয়ের খাত হিসেবে ব্যবহারে অযোগ্য খাবার দেওয়া হয়। এ সব নিয়মানের খাবার ওজনের কার-চুপি করে সরবরাহ করে যে স-ঠিকাদার তাদের সঙ্গে শিপিং কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ একটা চক্র জড়িত আছে। বহু টাকার লেনদেন হয় জাহাজগুলোর কোনরকম মেরামত খরচ করা হয় না। সমুদ্র নাবিকদের হুজুতায় পড়তে হয় তাদের আহোদ প্রেমোদের কো-শেবাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

স্বাধীনতাহীনতায়

মহম্মদ হক

উনিশ শ' শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে স্বাধীনতা বিষয়ক যে পবিত্র অহুত্ব সাধারণ মানুষের মনে লক্ষিত ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা-ই বেশ ক্রমে কপূরের মত উবে যেতে বসেছে, এটা বোধনায়ক। সেই অহুত্বের বদলে এখন বিকোভ ও উত্তেজনা বাড়ছে যা দাবানল সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, আসাম থেকে জিপুয়া পর্যন্ত ভেতনই একটা অন্তত ইঙ্গিত কি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? অনেক লোকসকল ও সম্পদ-বিনিষ্ট ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, শুভশক্তি একা-বদ হয়ে এখনও এর মোকাবিলা করতে তেমন আগ্রহ হচ্ছে না, ব্যক্তি কেউ কেউ বা কোন-কোন হল একা-একা বটমানে গিয়ে রাজ-নৈতিক উচিতা বাচিয়ে ধরেনাও দিয়ে মৃতদেহগুলো সনাক্ত করে বিপুল হল বা বিকল্প শালকশক্তির উপর ব্যবসায়ী দ্বার দায়িত্ব ও অপ-বাহ-অপরাধের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা একেবারে খোঁয়া তুলনী-পাতা লাগছেন এবং আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাঁদের ক্ষমতার তুলনামূলক কোন মাহেজ লক্ষ্যের ভারতীয় জনতা ভোটের প্রার্থী জেলে দিচ্ছে লাংবিধানিক প্রণালী মিলেবন করবেন। কি মোহিনী আশা—হায় রে ক্যাপা ভূখণ্ড।

এ সমতাহীন ক্ষমতাই কাল হয়েছিল। দান, দেবা, ত্যাগ, প্রেম-ইত্যাকার আদর্শগুলো কবে যেন

বজোপনাগরে কি ভারত মহাদাগরে বিলম্বিত হয়েছে, সেজন্তে মায়াকামা কেঁদেও লাভ নেই। কামা-সুজ্জাই আর একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল—বহুজনসন্মিতা ও নিমিত্তা রুজ্জাকের মালী-পরিহিতা এক বিশেষ মা একবার পুরোহিতের কাছে আর একবার জ্যোতিষীর কাছে দিনকণ গুণে আনাগোনা করছিলেন, সেই সুযোগে তস্য সন্তান ক্ষমতার ছক একে রকেট-গতিতে সারা ভারত পরিভ্রমণ করতেন এবং তামার যুব-লম্বা তার পুচ্ছ ছুঁতে হীলে রেস শুরু করে দিয়েছিল, আরম্ভ তখন নপুংসক সেজে গালে হাত দিয়ে ভারতভাগ্যবিধাতার কথা ভাব-ছিলেন, নয়ত তাঁড় সেজে তারই জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন যেন এই গতি-বেগের প্রয়োজন ছিল, এই যৌবন-কোয়ারের, যা জাতির মর্ম্মলে প্রকৃত শক্তি যোগাবে, প্রচুর প্রেরণা যোগাবে, এবং অস্বত-লোকে পৌছে দেবে। কিছু পুতুল-মাছের, স্বকথিত নেতার গায়ে নির্বাচনী খাজা দিয়ে যা ক্ষমতার অধিকারী হলেন, কিন্তু সেই মা-ও যখন প্রিয়তম সন্তানের বৈপ্লবিক যাত্রাপথ থেকে সরে দাঁড়ালেন, যেহেতু সন্তানতো তিনি ভারতীয় জনতার প্রাণধর তার হাতে গঁপে দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন? পত্নীই কি তাই? যেহেতু মায়ের মনেও কি বহুতর সংশয় ও সন্দেহ

দেখা দেয়নি? যার পরিপত্তি হত বিবসর ও বিবাদময়—ঐতিহাসিক এক মোগল সম্রাটের এই গণতন্ত্রী সম্রাজ্ঞীকেও ক্ষমতার মুহূর্ত সন্তানের মস্তকে শোভিত করে দূর থেকে অস-হারার মত তা দেখতে হত, অবশ্য যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তা কার্যকরী করার সময় নৌজব্বাশে নিশ্চয়ই সন্তান মায়ের আশীর্বাদ নিত—সেও এক ট্রাজেডি হত—কিন্তু তার চেয়েও বড় ট্রাজেডি যে যমিরে আসবে মায়ের জীবনে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মানুষ নিজেকেও যে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে এক নিমেষেই তার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শত্রু-মিত্র-সমালোচক-গুণগ্রাহী লোকের দৃষ্টি কেড়ে নিল সেই সন্তানই। এই লব-নাশা ইতি কিছু কেউ কল্পনা করেন নি, বা তো মনেই। না-না-না, মা এ মুক্তি কখনো চাইতে পারেন না। অমেকে বাগধিলের মত দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেও মা কিছু পাবার-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইলেন প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে। এ ত এক আশ্চর্য চরিত্র, বেসনাবিধুর ভারতীয় দৃশ্য। এমন আশ্চর্যময়ের পরিচর মা কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি—এই সংঘের প্রতি প্রজ্ঞা নিবেদন করে-ছেন সকলেই। প্রতিপক্ষ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা তাঁর মস্তব্যের লব্ধ রাজনৈতিক পালা কয়তে প্রকৃত হচ্ছিলেন তাঁরও ক্ষতি, আবার রাজনৈতিক অর্থে কিছুটা উৎসাহিতও—কার সঙ্গে আর লড়বেন তাঁরা? অতএব তাঁদের কাজ এবার লব্ধ হয়ে যাবে, তাঁদের পরিচালিত গণতন্ত্রের রথ ইনকিলাবী পতাকা উড়িয়ে সমাজতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশ করবে, কেউ আর পথরোধ করে দাঁড়াবে না। কচি খোকার মত এই ভাবনা আবারও কাল হবে।

ভারতীয় রাজনীতিটাই এক আশ্চর্য মকবিশেষ, যেখানে বুদ্ধরাও খোকা সেজে দিব্য অভিনয় করে এবং অনেকের হাততালিও পায়—ক্ষমতাটা যেন ছেলের হাতে মোরা, তার গুরুত্ব সঠিক কেউই বুঝতে চায় না, নির্ধারিত সময়ে হেনে-থেনে-বলে-ভয়ে মানা অহুতান করে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। বহুতর জন-তার স্ব-শাস্তি-কল্যাণ-নিরাপত্তা-অধিকারের মত বর্ধবল বিচিত্র বর্ণনা তো আমাদের মহামূল্যবান

সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে, পরবর্তী উত্তরসূরীরা এসে সেসব নেড়েচেড়ে দেখবে এবং স্বাধিবিহিত কৃমিকা মেবে। বর্তমান নেতারা ক্লান্ত এবং দ্রাস্ত, অথচ অনেককে দেখি আখের শুছিয়ে নিতে, বেনামে লাইসেন্স-পারমিট হাতিয়ে, দালাল-কোঠা বানিয়ে বংশধরের জীবনকে নিকটক করে দিতে। মুখ-কাটা রাজনীতি কি আর শুধু শুধু হয়? স্বাধীন দেশের মানুষ কি দুটো খেতে-মাথতে পারবে না? ইজ্জৎ-আক-মিরে বাচতে পারবে না? শাস্তিতে যুগুতেও পারবে না?

বিপ্লববাদী গণতন্ত্রী বাম-পন্থীরা কি ভাবছেন? গুরুবাদ-অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে তাঁরা কি জিন্দাবাদ ধর্মী শোনাচ্ছেন? কোন নতুন যুগ শুরু করার পরিকল্পনা নিচ্ছেন কি? বর্গাধারের হাতে কিঞ্চিৎ জমি দিয়ে, কলকারখানার মালিক পোড়ার ধানসাদ্য প্রাচ করে প্রমিককুলের জন্তে ব্যয়বরাদ্দ সামান্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লাধু বুদ্ধি করে, কেরানীকুলের দ্বাৰ্ধে দাবধান।

আমাদের দৃষ্টিতে অলিখিত মামলা শুরু করে ইতিকর্তব্য দাবাধা করতে চাইছেন কি? এর বাইরেও যে নান্দা কুখা ভারত পুড়ে আছে তার কি হবে? দেখানকার জলজ্যাস্ত মানুষগুলোর কি হবে? যাদেরকে খেলনা তেবে শুধু নির্বাচনের সময় নাড়াচাড়া করা হয়, আরম্ভ সোহাগ জানানো হয়, হাতে বাজারে দখ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিছুদিন তারা বেশ চলে দিচ্ছে কথা কয়, যখন দেখে মোহাবিষ্ট হয়, তারপর কড়িকাঠ গোনে, বুড়ো আঙুল চুষে নখের ময়লাগুলো ধায় এবং পরি-শেষে সমস্ত বাধমের পিঁট খুলে দীর্ঘরের কাছে চলে যায়—এই ট্রাজি-পন সমানে চলছে। গণতন্ত্রের এই খেলনাগুলোকে কি অত কোন মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হবে না? তাহলে আর বৎ খণ্ড এলাকার শুধু দাবানল জলবে মা, দারা ভারতকেই তা গ্রাণ করবে, সংবিধানের পাতাগুলো পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লাধু

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

- স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ ও সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দম্পতিকে সাহায্য করাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্ততম লক্ষ্য।
- পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুনভাবে ডেসেলেজে-জনকল্যাণমুখী করা হয়েছে। এখন এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে বেসেফুল। কোনও সরকারি জোরজুলুম বা জবরদস্তির ছান এই প্রকল্পে নাই।
- সন্তান-সন্তবা মায়েরদের জন্ত এবং শিশুদের জন্ত মানারকম রোগ প্রতিবেদক টিকা দান এবং পুষ্টির জন্ত বিনামূল্যে ভিটামিন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ্ধতি এতদিন সম্পত্তিরা গ্রহণ করে আসছেন সেই সব সুযোগ এখনও বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র বীরা ভ্যালেসকটমি টিউবেকটমি অথবা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের জন্তই আর্থিক অহুদামের ব্যবস্থা আছে। যে সব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ পাঁচ টাকা এবং বীরা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ৮৫ টাকা ও বিনামূল্যে হাসপাতালে অপারেশন, ঔষধপত্র ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পুরুষদের ভ্যালেসকটমি করিয়ে নেওয়ার জন্ত প্রত্যেককে নগদ ১০০ টাকা (দাতারাত খরচ পাঁচ টাকা ও জলযোগের জন্ত পাঁচ টাকা অর্থ বরাদ্দনহ) আর্থিক অহুদাম দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে। ভেসেকটমি, টিউবেকটমি অপারেশন ও লুপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি মনোনীত উত্তোক্তাদের প্রতি ভেসেকটমি অপারেশনের জন্ত নগদ আট টাকা এবং টিউবেকটমির জন্ত ছয়, টাকা ও লুপ কেলের জন্ত ২ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই সবরকম সাহায্য ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

রাজ্যের যে কোন হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের সুযোগ নিন

বিজ্ঞাপন নং ১২/৮০-৮১

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাদ মিডিয়া ডিভিশন কর্তৃক প্রচারিত।

আপনার সমস্ত জোরে
কমারগালান্না হাতুড়ি-মেহাই-এর
আহ্বাতে ছিটকে পড়বে
প্রাণের অকলিঙ্গ
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে-দ্রুত
গড়ে উঠবে নতুন পশ্চিমবঙ্গ

মাত্র ৫ টাকা দিয়ে দাভজনক সকল
এখানে আজই শুরু করুন!

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল
কম্পানি লিমিটেড
হেড অফিস: ৪১, জাম, এন, মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১
চেয়ারম্যান: ৪ জে এন বিশ্বাস

Progressive-UIB-11/80

সাংবাদিক ও রা স কর্মচারী

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কর্মচারী আসার পর থেকেই সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, বিশেষতঃ কেরানীজ ও ওর্থ জেদার (বর্তমান 'ডি' গ্রুপ) কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নানা কার্যক্রম, বণা অনিয়মিত হাজিরা, পূর্ণাঙ্গ প্রহা ম, কাজে গাফিলতি, ছুটী ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচার অভিযান যুগপৎ চালিয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ করেছেন বলে অভিযুক্ত জানাচ্ছে। বামফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভাকে কর্মচারীদের সম্বন্ধে 'মোহন' করে লবণভিত্তিক আমলাতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করার মহল উদ্দেশ্যে আপনারা পৌছতে পেরেছেন, এটা একটা ঘটনা। লবণপরি আপনারা এহেন লেখালেখিতে প্রতাপশালী কোঅর্ডিনেশন কমিটিও কোপঠান। স্বাধিকৃত লক্ষ্যমূলক এ প্রসঙ্গে যথোপযুক্ত করেকটি মর্যাদিক তথ্য ও সত্য আপনারা দরবারে নিবেদন করার আছে। আশা করি অস্বাভাবিক করবেন বুকে হাত দিয়ে। লং ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিকতা আপনারা দাঙে না, স্বতন্ত্র জবাব দেবার লং-লাহল আশা করা যায় না।

তদুপায় রাজ্য সরকারের অফিস-দপ্তরে আপনারা নানা কার্যক্রম ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে চলেছেন, অল্প সরকারী অফিস বণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়গুলির অধীন কিংবা অধিগৃহীত বা অংশীদারিত্ব করপোরেশনাদির কার্যালয়গুলি কি ব্যতিক্রম? ব্যতিক্রমগুলিই বা কি অবস্থা? বীমা অফিসগুলিতে?

রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে আপনারা প্রচারিত 'অবস্থা' কি বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই চলছে? আগে কী ছিল মহাপ্রগতি?

যে সব নিষ্পত্তি আপনারা গত তিন বৎসর ধরে করছেন তার কতটুকু নৈতিক অধিকার আপনারা আছে? ছ'পৃষ্ঠার কাগজে 'বন' আপনারা চারপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন নিয়মিতভাবে দিয়ে দিনদিন হার বাড়িয়ে চলেছেন তখন 'জমসাঁথার' অর্থে 'বন' দিয়ে কাজ না করার অভিযোগ আপনারা মানার কি? আপনারা জমসাঁথার পকেট কেটে মুমুর্ষু করছেন, দরাসরি এবং ঘুরিয়ে। বিনিময়ে নামমাত্র 'সংবাদ' যাতে দরচার প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য থাকে না উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাই প্রচার করে চলেছেন। ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ভাড়াটে সাংবাদিকদের কিছু কিছু স্তম্ভিত সত্যতা দেখা যায়, তার শতকরা একভাগও আপনারা মধ্যে নেই। এছাড়া নির্বোধ অজ্ঞতা

প্রায়ই আপনারা ব্যক্তিগত মতামতে পরিচুত। না পড়ে পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি আপনারা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য।

রাজ্য সরকারের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে হয় আপনারা কিছু জানেন না নয়তো জেনেও বিস্ময় করেন না। তারার আমলে একবার কর্মচারীবৃন্দের সরিতিদের বলা হয়েছিল, তারা সরকারের চাকর। স্বতন্ত্র 'দাবী' তাদের সাজেনা, আর্জি করা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি কী আলো বাস্তবে বিস্তারিত নেই। একটা স্বাধীন

মতামত

দেশের সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এমন মনোভাব কী অবস্থা দেখা যেতে পারে? এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতেও এমন পরিবেশ নেই। সেখানে অন্ততঃ কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয় সাধারণ কর্মচারীদের। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট আছেন স্বাধীন দিতে, কিন্তু বাস্তবে সরকারের আমলাতন্ত্র সেই পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি এখনও আঁকড়ে নেই কি? এখানে মজা এই, আমরা কোন অনিয়ম বিনিয়ম করলে কথাত্ত তার বিহিত হয়, কিন্তু কর্মচারী সাধারণের বেলায় কমা নেই, মিতারও নেই। ফুরিফুরি তথ্য আছে প্রতিটি বিভাগে। এমনতরো ব্যাপারকে কী বলা যায়? কোন অফিসে যদি কাজ না হয়, রাজ্য সরকারের প্রশাসন তো অচল হয়ে থাকবে। তা কি আছে? একগুলো নির্বাচন, কঠিন-তম জিনিস পকারে নির্বাচন, বস্তা-ধরার আপমুর্ষবান, সরকারের বহু-মুখী জমসাঁথার প্রকল্পগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম এসব করা করছে? দোষ-ত্রুটি, গাফিলতী, ছুটী কিছু কিছু না থাকার দৃষ্টান্ত জুড়তে কোন সরকারের কাজকর্ম নেই? আপনারা দেখেছেন কার্যকলাপেও কি নেই?

বেতন ভাতার প্রসঙ্গে কি কখনো চুসনা করে দেখেছেন, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কী অবস্থা? গত তেজি বৎসরের ইতিহাসে রাজ্য সরকার বঙ্গকালের মেয়াদে কেন্দ্রীয় হারে মহাবিস্তারিত এদের জুটেই আবার পেছিয়ে পড়েছে। বর্তমানের অবস্থাটাও তাই নয় কি? অস্তিত্ব স্বযোগ সুবিধার কথা না হয় বাহু দেওয়া গেল। তবু যে এরা কাজ করে চলেছেন সাধ্যমত সেজন্ত কি এদের সাধু-বাদ প্রাপ্য নয়?

আরো অনেক অনেক তথ্য আছে

বা দিয়ে আপনারা নিষ্পত্তি প্রচারের ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করা যায়। প্রতিবাদ জানিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ চিঠিপত্র দিয়েও দেখা গেছে সেসব ছাপার মত বুকের পাটা আপনারা তৈরি নেইই, বরং কোম-কোম বিশেষ বিশেষ নাম দিয়ে আপনারা সাইনের এমন সব চিঠি ছাপেন যাতে খুঁজি বা ভাঙা কোনটাই থাকে না। এসবের অন্যতম ও অস্বস্তি ভাবের প্রতিটি স্বার্থ প্রতিবাদ প্রকাশ করার মত কোন স্বযোগ, আপনারা চক্ষুপূর্ণ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নেই। স্বতন্ত্র আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং চালবেনও। রাতারাতি রঙ বহলের গুণে যেমন আপনারা খাট নেই তেমনি হঠাৎ এই হতভাগ্য কর্মচারীদের গুণগ্রাহী হওয়াও আপনারা সম্ভবে না। উচ্চ মহলের আমলাদের তোরাজে আপনারা কর্মচারীদের মুণ্ডপাত করে চলেছেন যাতে করে কর্মচারী আর বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে তুল বোঝাবুঝির ক্ষমতা থাকে। এর অবশেষে কল বীতর্যাস, হতাশা, নৈরাশ্র্যভাব বিরূপতা ও সরকারের জনকল্যাণ-মূলক প্রকল্প ও দৈনন্দিন কাজকর্মে এক ধরনের অবদানহীনতা বিমুখতা ও বামফ্রন্টের ভাবমূর্ত্তি ক্ষয় হওয়া।

স্বীকার করতেই হবে, মুক্ত মগজখোলাই দিয়ে এই মহৎ লক্ষ্যে আপনারা পৌছতে পারেন। আপনারা হের ঐশ্বর্য লম্বা কোটি কোটি হও-বং না হয়ে পারা যায় না।

জনৈক রা. স. ক.

কার্যে দৃষ্ট চক্র

রাজ্যের লবণ চাকুরী প্রার্থীদের মধ্যে বন হতাশা বনিয়ে আনছে ঠিক তখনই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ লোটে একটি দৃষ্ট চক্র কার্যে দৃষ্টান্তের রেকর্ড করছে। এরা দীর্ঘকালের নাম নথীকৃত বেকারদের "কল" পাঠাচ্ছেন না। হঠাৎ নাম লিখিয়ে দিয়ে প্রার্থীকে কলে পাঠাচ্ছেন চাকুরীর ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে ইনাম চাই। এই ইনাম দেবে কত বেকার? কেমনই বা দেবে?

না দেওয়ার কল "কল" নেই। বিদ্রোহ বেকাররা এ ব্যাপারে ফুরি ফুরি নজীর দিতে রাজী আছেন। তাছাড়া চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে লিখেও নাম পাঠাচ্ছেন না। নাম পাঠাচ্ছেন না এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ। কতদিন অপেক্ষা করবেন চাকুরীদাতা? সরকারের হোমিও ডাই-রেসেপ্টের ফাঁকা পত্রের জন্ত লট লেকের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় মিশনারীদের গোপন কার্যকলাপ

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় প্রায় লবণ মিশনারীদের গোপন কার্যকলাপ চলছে অব্যাহত গতিতে। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমরা বাঙালী এবং প্রোটেষ্টেন্ট। তথ্য-ভিত্তিক মহলের ধারণা উত্তরবঙ্গ আমলাতন্ত্রের পেছনে মিশনারী চক্রের হাত রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বহু চার্চ ও মিশনারী সেবা সংস্থা রয়েছে। নতুন নতুন বহু সংস্থাকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। এরা কারা এবং কোথা থেকে আসছে সে সব জানতে এখানকার কেউই তেমন উৎসাহ দেখান না। সকলেরই চেষ্টা এদের কাছ থেকে কিছু হাতিয়ে নেবার। মিলছেও। স্থানীয় মাহু-বের দারিদ্রতা এবং লোভকে মূলধন করে মিশনারী সংস্থাগুলি তাদের গোপন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

মিশনারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত করেকটি অনাথ আশ্রম সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা গেছে এরা মাকি শিশু লংঘন করে বিদেশে চালান দেয়। সেখানে

দীর্ঘদিন নাম লিখিয়ে যোগ্যতাহীন প্রার্থীকে জোর করে উপযুক্ত প্রার্থী বলে চালিয়ে দিয়ে যে কলেজ-দ্বারী করলেন তার তদন্ত হোক।

কামরুদ্দীন আহমদ
বাঁধুপু, হুগলী

ভয়ের কথা

আমি বাঁধুপুত্রে প্রিটিং টেকনোলজির ছাত্র ছিলাম এবং পরবর্তী কালে লণ্ডন কলেজ অব প্রিটিং এর স্নাতক হবার স্বযোগ পাই। স্বদেশের কলেজ সম্পর্কে যে ধারণা আমার মনে রয়েছে তার সবটুকুই হতাশাব্যঞ্জক নয়। তবে জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের পত্রের লগ্নে একটি বিষয়ে আমার মতের পুরোপুরি মিল রয়েছে। প্রিটিং টেকনোলজির বেশ কিছু শিক্ষক আছেন যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব ছাড়াও শিকশক-মূলক মনোবৃত্তির একান্ত অভাব। এইটি বড় ভয়ের কথা। জানিনা এ লমস্যার কোনমতে সমাধান করা যাবে কিনা। কিন্তু প্রিটিং জুন্দের বাহুবলের তাওব যথানিয়ম সম্ভব বন্ধ না হলে ছাত্রের বঙ্গপাতি কিনেও তার মান উন্নত করা যাবে না।

অরূপ ঘোষ

তারের গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে কালো চামড়ার চেয়ে সাধা চামড়ার শিশু-দের ওপরেই এদের মজর বেশি। শিশু সংগ্রহের জন্ত এদের এজেন্ট আছে বিভিন্ন স্থানে। কালো চামড়ার শিশুর জন্ত এজেন্টরা হাম প্রায় তিনশ টাকা এবং লাল চামড়ার নেপালী অথবা ফ্রিয়ার শিশুর জন্ত দেয়া হয় দেড় হাজার টাকা।

সংগৃহীত শিশুদের ছবি তুলে বিক্রয় বিবরণ পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিদেশে। মাহু-বিক্রীতে আইন-গত বাধা থাকলেও পুঁজি নেবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। আইনের ফাঁকে "অ্যাডপ্টেড সন বা ডটার" হিসাবে শিশু চালান চলে যায় বিভিন্ন মূল্যে আকাশপথে। এদের একটু বড় করে নিয়ে ভৃত্য হিসাবে কাজে লাগানো হয় এবং দরকারমত এই সব তথ্যকথিত পুঁজি নেয়া শিশু-দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চোখ, কিডনি, হাট ইত্যাদি তুলে নিয়ে সেদেশের মাহু-বের শরীরে জুড়ে দেয়া হয়। আজ পর্যন্ত কত শিশু মিশনারীদের মাধ্যমে ভারত থেকে বিদেশে গেছে সেখান সরকারের জানা থাকা উচিত। স্বতন্ত্র ভারত সরকার সেদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই সব শিশুদের বর্তমানে কি অবস্থা তা খোঁজ নিতে পারেন। একথা প্রায় নিশ্চিত যে, শঠিক লংঘন মিলবে না।

উত্তরবঙ্গে করেকটি মিশনারী সংস্থা রয়েছে। অল্পমহলে প্রবেশ করতে পারিনি। লবণই যেখনি কেমন যেন একটা চূপ চূপ ভাব। আমার প্রতিটি পর্যবেক্ষণ ওপর ক্ষড়া মজর। তার তেতরেও বতটুকু সংগ্রহ করেছি তাতে জানা গেছে যে, মাকি, ব্রিটিশ এবং সুইস টাকা এদের হাতে আসছে। ব্রিটিশ এবং সুইস টাকা আদে হাত ঘুরে। কিন্তু মাকি টাকা এদের হাতে আসে দরাসরি।

ভাবি আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি এদের নেট ওয়ার্কের কাছে কত পলকা। তা যদি না হবে তাহলে মিশনারী কার্যকলাপ এই উত্তরবঙ্গে হঠাৎ মাথাচাড়া দিল কি করে এবং এদের সক্রিয়তা বাড়ার শ্রেণাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

'পশ্চিম জার্মানীর গোয়েন্দা সংস্থা' চীন-ভারত মৈত্রীতে বাধা দিচ্ছে'

সম্প্রতি লোকসভার সদস্য জ্যোতির্ময় বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন যে, পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দা সংস্থা চীন-ভারত মৈত্রীতে বাধা দিচ্ছে। এ কাজে তাদের সঙ্গে একটি সংবাদ সংস্থাও মৈত্রীতে বাধা দিচ্ছে। জীবন মতে, ভারতে এখন কমিউনিষ্ট বিরোধী ও চীন-বিরোধী দুটি শিবির কাজ করছে। প্রথম ক্ষেত্রে সি, আই, এ ও পশ্চিমী পুজিবাদী দুনিয়া স্বাভাবিক কারণেই তৎপর।

প্রথম ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময়বাবু আরো জানান যে, সম্প্রতি তাঁর এক প্রবন্ধে লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী জিপি, ডি, নরসিং রাও স্বীকার করেন যে, ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চীন সরকারের কাছ থেকে তিব্বতের মধ্যস্থত প্রাপ্ত নদীর অংশ থেকে জল ছাড়ার বৈজ্ঞানিক হাইড্রোগ্রাফিক ডাটা ভারত সরকার পেতে। এর ফলে বস্তা নিয়ন্ত্রণে অনেক সুবিধে হত। বর্তমানে চীন-ভারত সম্পর্ক বিবিধ ক্ষেত্রেই প্রসা-

রিত হচ্ছে। এদিকটাও ভেবে দেখা যেতে পারে, আজ ভারতে বস্তার বিপদ-সংকেত জানানোর আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাই চীন থেকে এই হাইড্রোগ্রাফিক ডাটার আর তত্ত্ব প্রয়োজন নেই।

একটি পত্রিকা প্রসঙ্গে

একটি বাংলা পত্রিকার জ্যোতি বসুর উপর লেখা লেখাটি হাতে নিয়ে জ্যোতির্ময় বসু (এম পি) সাংবাদিকদের দেখান। পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যার বিশ পৃষ্ঠার জ্যোতির্ময়বাবু সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে কোন একটি ব্যাপারে পার্টির কর্তারা ক্ষুব্ধ হওয়ায় জীবন তাঁর আচরণের ক্ষমতা হ্রাস করেন এবং তারপর মনোমুগ্ধ পান। জ্যোতির্ময়বাবু বলেন যে, তিনি জীবনে কোনদিন কারুর কাছে মাথা নত করেননি। পত্রিকাটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে জ্যোতির্ময় বসু খুবই অসন্তোষিত। এর পেছনে কোন একটি নন ব্যাকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নাকি জড়িত।

তেলের চোরাচালানী ও পুলিশ

তেলের চোরাচালানী রা মেদিনীপুর জেলায় এবার নতুন করে কাজ শুরু করেছে বলে দর্পণের কাছে খবর এসে পৌঁছেছে।

মেদিনীপুরের শ্রীরামপুর নানক সিং হোটেলের কাছে মহিষাধল থানা এলাকায় নয়া হোটেলের সমীকটস্থ ভূমিতে বেলারোয়াভাবে তেল পাচারের কাজ চলছে। খবর হলো মহেশতলা থানা এলাকায় পুরনো ডাকঘর, একবাল থানা এলাকায় কাঁটাপুতুরে যে চোরাই গোড়াউনগুলি কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং এর তদ্বির তদারকি যে করছে সেই জাঙ্গিস চল্লিশাব রোডের রতনলাল গুপ্তা মেদিনীপুরেও দারুণ রকম নজির। ফুঁকিলাস রোডের মহম্মদ কামর, দাবির আলি, ইসরাইল, কাপুর্চাঁদ, শালকিয়ার থান সাহেব একবালপুরের পুন্ডরীচাঁদ আগরওয়াল প্রমুখ রতন গুপ্তার সাগরের হিসেবে এসব আয়গায় কাজ করছে।

এ ব্যাপারে রাজ্য ও জেলা গোয়েন্দা দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট থানা এন-কোর্সে কতিপয় অফিসারকে মহ ও মহিলা দেবার কাজে একটি আই-ভেট পাড়ী প্রায় সর্বদাই কাজ করছে

বলে অভিযোগ। গাড়ীটির নম্বর হলো ডবলু এম ডি ১৫৮২ আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো পুলিশ দপ্তরের খাতার কুখ্যাত বলে পরিচিত কাশীনাথ সারোগীর সঙ্গে পুলিশ কর্তাদের ধরম ধরম আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন দপ্তর থেকেই খোঁজ এলেই পুলিশ দপ্তর জানায় কাশীনাথকে ধরা যাচ্ছে না। অথচ কতিপয় পুলিশ অফিসার মহ ও মহিলা নিয়ে এই কাশীনাথের সঙ্গে বসেই জড়ি করছে। থানা প্রয়োজন রতন গুপ্তা পরিচালিত চোরাই গোড়াউনগুলিতে যাতে রাজ্য এনফোর্সমেন্ট দপ্তর অফিসার না রেড করেন সেজন্য কতিপয় অফিসার নিজেসই তৎপর। দপ্তরে গোপন খবর আগেভাগেই রতনের কাছে এরাই পৌঁছে দিচ্ছে। ডি, আই, জি মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানা এলাকায় শ্রীরামপুর, মহেশতলা থানা এলাকায় পুরনো ডাকঘর, একবালপুরের কাঁটাপুতুর, মহিষাধল থানা এলাকায় নয়া হোটেলের সমীকটস্থ চোরাই গোড়াউনগুলিতে কি একবার খুব সতর্কতার সঙ্গে নিজেই হানা দেবেন?

মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে হলে

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

গত কয়েক মাসের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম সাধারণ ক্ষেত্রের আয়তনের বাইরে চলে গেছে। খাতিশস্ত, চিনি, গুড়, রান্নার তেল, গুঁড়া দুধ, মাছ তরিতরকারী সব-কিছুই দাম এত বেশী বেড়ে গেছে যে কারো পক্ষেই দৈনন্দিন কেনাকাটা করাই এখন দুষ্কর। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্বতই একে লঘু করার চেষ্টা করেন না কেন, সাধারণ মানুষের পিঠ যে এই মূল্যবৃদ্ধির ভারে বেঁকে গিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

জনসাধারণকে এই নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে কিছুটা রেহাই দিতে হলেও অবিলম্বে রেশন দোকান মারফৎ ভরতুকি দিয়েও কম দামে এই নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা আশা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে এটা স্বীকার করেন। কিন্তু এখনো কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এদিকে খুচরো বাজারে চিনির দাম প্রতি কেজি ৭.৫০ টাকা, সরষের তেল ১৪.২৫, নারকেল তেল ২৫ টাকা। মাছ দুর্লভ সামগ্রী, আলু হুঁটাকা। সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ।

অথচ বর্তমান সরকার কমভালু আনার পর প্রায় চার লক্ষ টন চাল রপ্তানী হয়েছে। মাছ রপ্তানী করা হয়েছে ২৬২ কোটি টাকার (৪৪ টন-ম্যান ৪টা আগস্ট)। আলু পেরাজ তরিতরকারীও আজ রপ্তানীর দায়গ্রহী। তখন পাই আমাদের সরকারের হাতে খাতিশস্তের বিরাট মজুত, বিদেশী মুদ্রার মজুতও কম নয়। সরকার আশান্বিত ছিলেন দাম কমানোর জন্য সরকার হলে কোক করলা থেকে চিনি, রান্নার তেল সবই আমদানী করা হবে। কবে হবে জানি না। ইতিমধ্যে দেশবাসী যেন কবে পেতে গামছা বেঁধে থাকুন। ফুটো নৌকার জলসেচের-সেউতি আনা হবে, তখন জল ছেকে ফেলা হবে যদি ইতিমধ্যে আরোহীসহ নৌকা ডুবে না যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার মূল্যবৃদ্ধির ঘটনাকে নিত্য স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করছেন বোধ করি। কারণ তাদের নীতিমুখিত ব্যাপার স্যাপার দেখে অত কিছু মনে উদ্বিগ্ন হয় না। দেশে চাল ডাল তেল চিনির বাটতি। অথচ এগুলি তারা অমানবধনে রপ্তানী করছেন। রপ্তানী করলে বিদেশী টাকা আসে বটে কিন্তু জিনিসপত্রের বাটতি হয়। এই বাটতির উপর বিদেশী টাকা ভাঙিয়ে

দেশী টাকাকড়ি বাজারে ছাড়তে হয়। তখন শাখের করাত দুদিকেই কাটে। রপ্তানীর ফলে জিনিসের অনটন হয়, যেটুকু জিনিস পড়ে থাকে টাকাকড়ির বোঝান বেড়ে বাওয়ার ফলে তাও আঁকা হয়ে ওঠে। অথচ এই সাহায্যটা কথাতা কেন্দ্রীয় সরকার বোঝেন না তা কি বিশ্বাসযোগ্য।

জিনিসপত্রের দাম দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর নির্ভর করে। কোন জিনিসের দাম সস্তা অপর জিনিসের দাম আঁকা এটা সাময়িক ঘটনা হতে পারে। কিন্তু সমগ্রভাবে সব জিনিস মিলিয়ে দেখলে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়ছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারেরই হিসাব। কেন্দ্রীয় পরি-সংখ্যান দপ্তর জানাচ্ছেন যে ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম এখন মাত্র আড়াই গুণ বেড়েছে। গত এক মাসের মধ্যে দাম বেড়েছে

অর্থনীতি

১৬ শতাংশেরও বেশী। পেট্রোল ও পেট্রোলজাত জ্বালানি, সার ইত্যাদির দাম কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সরকার প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা বেশী আদায় করবেন। তারপর নানা দফায় ট্যাক্স বসিয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয় ধরে আরো ১৫০০ কোটি টাকা আমাদের বাড়ি চাপবে। সুতরাং দাম স্থিতিশীল হওয়া কিংবা কমা দূরের কথা, রুত বেশী হারে সেটা বাড়বে সেটাই এখন বিবেচ্য।

কেন্দ্রীয় সরকার যদি সত্যিই মূল্যস্তর স্থিতিশীল করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে প্রথমেই তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কারণ তারা কৃষিকারের রাজনৈতিক চাপে পড়ে ৪ লক্ষ টনের মত চাল রপ্তানী করেছেন, হয়তো আরো করবেন। কৃষিকারের চাপে তারা গ্রামের কৃষি মজুরদের কাজ ও মজুরী সংকোচনের জন্তে হুড় ফর ওয়ার্ক কর্মসূচী মন্থন করে দিয়েছেন। এক-চেটিয়া পুষ্টিপত্রের চাপে তারা রপ্তানী শিল্পে বিশেষ ভরতুকি দিচ্ছেন প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। সার ও খাতিশস্ত বাবদ দিচ্ছেন প্রায় ছশো কোটি টাকা। আবার বিশ্ব-ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তাত্ত্বের চাপে বিদেশী পণ্য আমদানির জন্তে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। ফলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্প প্রদায় সংকুচিত হতে চলেছে।

ইতিমধ্যে বকেয়া বিদেশী ঋণের স্বদও কিস্তি বাবদ বছরে ৮০০ কোটি টাকার মত বিদেশে পাঠাচ্ছেন। সবাই জানেন যে আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি শিল্পোন্নত বিভিন্ন পুজিবাদী দেশেও মুদ্রাস্ফীতির হার গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে। ফলে দেশের উৎপন্ন জিনিসপত্রের চাইতে বিদেশী পণ্যের দাম অনেক চড়া। আমদানী করা বিদেশী পণ্যের দাম অনেক বেশী। সুতরাং এই বেশী দামের জিনিসপত্র আমদানী করা হলে দেশী জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই সকল অর্থনৈতিক চাপের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে সত্যিই ইচ্ছুক হন তাহলে তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা দৃঢ় করতে হবে। এই সকল চাপকে প্রতিহত করার- জন্তে তাদের জনসমর্থনের উপর আরো অনেক বেশী নির্ভর করতে হবে। তবেই তারা এই চাপ প্রতিরোধ করে মূল্যস্তর একটি স্থিতি-শীল অবস্থা অনিতে পারবেন। কিন্তু তাদের কি সেই রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে?

'রাজনৈতিক ইচ্ছা' কথাটির মধ্যে শ্রেণী সম্পর্কের সারমর্ম নিহিত আছে। গ্রাম ও শহরের যে সমস্ত অংশ কংগ্রেস (ই) সরকারের সমর্থক তাদের মধ্যে ধনী কৃষক ও খামারের মালিক শ্রেণী এবং এক-চেটিয়া বড় বড় পুষ্টি মালিকেরা রয়েছেন। এদের সামাজিক প্রভাব কম নয়। কারণ অর্থনীতির সমস্ত কলকাটির উপরেই এদের কর্তৃত্ব। এদের ধনসম্পদের সীমাপরিসীমা নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করা এদের পক্ষে সহজ। স্বতন্ত্র পক্ষ এদের সামাজিক প্রভাব অস্বীকার থাকবে, ততদিন কংগ্রেস (ই) রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে এরা সর্বদাই তৎপর থাকবে।

কিন্তু এদের অবাধ মনোকা-মুগ্ধতার কলকৌশলগুলি সরাসরি জনসাধারণকে আঘাত করে বলেই জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ ঘটতে বাধ্য। এই সচেতনতা যাতে শাসক শ্রেণীর মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরতে না পারে তার জন্তে শাসকশ্রেণী সমাজতন্ত্র, গরীবী হঠাৎ, বিশ দফা কর্মসূচী ইত্যাদি ধরনের প্রতিশ্রুতিময় বাক-জাল বিস্তার করে। ফলে তারা কখনো কখনো অনগ্রসর জনসাধারণের একাংশকে প্রভাবাধীন রাখতে সক্ষম হয়। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বাস্তবতা এই অনগ্রসর অংশকেও ক্রমাগত শাসকশ্রেণীর বোঝে ঠেলে দিতে থাকে। শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং-এর জেল হবে না কেন ?

দেবশিস ভট্টাচার্য

বঙ্গবন্ধু গণি স্মরণে ১৩৪৮ কয়লার পারমিট ঘূষের বিনিময়ে অবৈধভাবে দিয়ে কালিয়ুলি মেথে 'এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের' মন্ত্রিসভা আর কতদিন আলো করে রাখবেন তা দেখার বিষয়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্বাস আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন।

ব্যাপারটা হলো আজকের ঐ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং হিরাবতের ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সে সময়কার কার্যকলাপ নিয়ে সাতাত্তরে বহু অভিযোগ শোনা যায়। জনতা আকালী কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাবল ১৪ এপ্রিল, আটাত্তর এ নিয়ে বিচারপতি গুরুদেব সিং কমিশন গঠন করেন। কমিশনের কাছে পঞ্চাশটি অভিযোগ আসে। বিচারপতি গুরুদেব সিং তদন্ত করে তাঁর রিপোর্ট দেন। পাঞ্জাবের বর্তমান কং (ই) মুখ্যমন্ত্রী হরদ্য সিং গত ২৩ জুলাই বিধান-

সভায় এ সম্পর্কিত তিনটে রিপোর্ট পেশ করেন। তদন্ত কমিশন আইন অস্বাভাবিকতা বা করতে বাধ্য।

তদন্তে কি পাওয়া গেল, এবার দু'একটা কথা জানা যাক। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিং, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মাসিবি সিং সিল এবং স্বরাষ্ট্র সচিব সত্যজি নিয়ম কাছন তদন্ত করে উদয় সিন্ধুকে বিচার বিভাগের প্রসিকিউশন এ্যাণ্ড লিটিগেশন দপ্তরের ডাইরেক্টর করেন। হাইকোর্টে তখন উদয় সিং-এর নামে দুর্নীতি সংক্রান্ত একটা মামলা চলছিল। বেশ টুপাইদের লেনদেনে উদয় সিং কাজ হাসিল করলেন, আরো ফোর পাইস দেখার সুযোগ হল। জানি না, শহীদ ভগৎ সিং, শহীদ উদয় সিং-এর কটো ওদের বাইরে বসে তখন বুলছিল কিনা!

সেচ বিভাগের সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিয়ম যোগ্যতাসম্পন্ন সিং বুধ সিংকে নেওয়া হল। রাজ্যের

তদানীন্তন সেচ ও শক্তিমন্ত্রী প্রয়াত গুরুবল সিং সিবরা এর অন্তর্বে বে-আইনীভাবে ঐ পদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মান কমিয়ে দেন।

ডঃ সুখদেব সিং ছিলেন পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। পাঞ্জাবের সে সময়কার কৃষি ও বন-মন্ত্রী প্রয়াত মাস্টার গুরুবল সিং তাঁর লোক ডঃ অম্বক সিং বিমাকে উপাচার্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে সুখদেব সিংকে পরত্যাগে বাধ্য করলেন। শুধু এই নয়, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে গুরুবল সিং ধরে-ছিলেন যাতে ডঃ সুখদেব সিংকে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চে কিরিয়ে নেওয়া হয়। বেআইনীভাবে বরখাস্ত হুপড়ি ভেঙ্গে কেলার পাচটা অভিযোগ কমিশনে আসে। কমিশনের তদন্তে চারটির সত্যতা ধরা পড়েছে। বাধ্যতামূলক নির্বাহকরণের একগাছা অভি-

যোগেরও ভিত্তি আছে। অকারণ হরদ্য সিং ও বেআইনীভাবে মিসার আটকের কতগুলো কেন্দ্রেও বিচারপতি গুরুদেব সিং রাষ্ট্রনৈতিক উদ্বেগ খুঁজে পেয়েছেন।

রাজ্যের তখনকার সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই মুখ্যমন্ত্রী জৈল সিং আজোয়াব সিং মাস্টারকে পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পরিচালন বোর্ডের সদস্য করেন। এরফলক অন্ততম প্রশাসক গুরুনাম সিংকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কমিশনের তদানী চলাকালে জৈল সিং বিচারপতি গুরুদেব সিং-এর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। উত্তরে গুরুদেব সিং সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি নিরপেক্ষতা নিয়েই বিচার করেন এবং মেটা জৈল সিংও জানেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন জৈল সিংই বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে ছুঁছরের জন্য শিখ গুরুদ্যার ট্রাইবুনালের সভাপতি করেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বরং গুরুদেব সিং-এর উচিত ছিল জৈল সিং-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা অভিযোগ করেন যে, গুরুদেব সিং-এর তাই বিচারপতি হরদেব সিংকে জনতা আমলে আকালী সরকার সুপ্রীম কোর্টে রাজ্যের স্ট্যাটিং কাউন্সেল হিসাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু এটা অর্থোডক্স অভিযোগ। কারণ শ্রীহরদেব সিং তাঁর ক্ষমতা, দক্ষতা দেখিয়েই বহু পূর্ব থেকেই রাজ্য সরকারের কৌশলী হিসেবে কাজ করছিলেন। জৈল সিং এই কমিশনের বিরুদ্ধে

পাঞ্জাব হাইকোর্টে পি, সি, জৈল ও জে, এম, ট্যাগোরের ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করেন। আদালত ৫ সেপ্টেম্বর '৭৮ এক রায়ে জৈল সিং-এর আপত্তি নাকচ করেন।

এসব তো হল। এবার লোক-পন্থার নির্বচন ও বিধানসভার নির্বাচনের পর কি দাঁড়ালো। রাজ্যের কং (ই) সরকার গুরুদেব সিং কমিশনের বঙ্গবন্ধু পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব সুখবীর সিং বোদী, এ্যাডভোকেট জেনারেল যোগীন্দার সিং ওয়াহ, লিগ্যাল রিসার্চব্রানচার বজী আফতার সিং, রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ও ডিরেক্টর অফ ভিজিলেন্সকে নিয়ে পাঁচজনের একটা অফিসার কমিটি গঠন করে। এই কমিটি কিন্তু তার রিপোর্টে জৈল সিংকে সব অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন। কমিটির মতে ঐ পরীক্ষাটি অভিযোগেরও কোন ভিত্তি নেই।

এ আকর্ষণ তো জানা কথা। শাহ কমিশনের তদন্তের ভিত্তিতে ইন্দিরা গান্ধী, সত্য গান্ধী, জৈল সিং-এর বিরুদ্ধে যে কেসগুলো ছিল আদালত থেকে ম্যানিপুলেট করে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর এ তো কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় সবে মাত্র পেশ করা হয়েছে। তাই আর আদালত ম্যানেজ করার আসেলা পোহাতে হল না। একটা অফিসার কমিটিতেই সব শেষ। কারণ এগুলোই বিপদের সম্ভাবনা। স্বজন-পোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ তহরুপ, চূড়ান্ত দুর্নীতির অভিযোগে জৈল সিং-এর জেল হবার কথা। এতটা বাঁচিয়ে এখন তো বিচারপতি গুরুদেব সিং-এরই অবস্থা কাহিল, বাবা নামকমীকে উনি বোধহয় সরণ করছেন।

জৈল বন্দী হত্যার জন্য অভিযুক্তদের শাস্তির কি হল ? কারামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রতি রাজ্যের কারামন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ৩ মে '৭৪ সালে হাওড়া জেল ও ১১ জুলাই '৭১ আলিপুর মেশ্যাজ জেলে হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে শ্রী সরকার কমিশনের সুপারিশ মতো দোষী অফিসারদের শাস্তিপ্রদান এখনও হয়নি। এছাড়া বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অতীত জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে হরতোষ চক্রবর্তী কমিশনের ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব হয়েছে এবং বর্তমানে এর উপর হাই-

কোর্ট যে নিবেদন জারি করেছেন তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রীম কোর্টে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এ বিষয়ে উত্তর দিতে সমিতি অনুরোধ জানিয়েছে।

তামিলনাড়ুতে বর্তমানে জেলের অবস্থা সর্বদা খতিয়ে দেখার জন্য তামিলনাড়ু সরকার ঘেরকম 'ওরাচ ভগ কমিটি ফর জেলস' গঠন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলোর উন্নতিকল্পে সমিতি এ ধরনের কমিটি গঠন করতে কারামন্ত্রীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।



স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎসাহ, বিশ্ব-জনীনতার উদ্গাতা এই কলকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র ভারতবর্ষের এক স্বপ্ন-সার্থক প্রতিচ্ছবি। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের মহান মিলন কেন্দ্র।

বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এখানে শিক্ত। সাম্প্রদায়িকতা এখানে নতশির। কলকাতা ধনী-দরিদ্র সকলেরই, জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 'মানুষের' সহর।

চিন্তায় ভাবনায়, শিল্পে-সাহিত্যে, বিজ্ঞান কুশলতায়, প্রাত্যহিক চাল-চলনে এই সহর সারা ভারতবর্ষের একাত্তার ধারক হোক। সুন্দর ও অনিন্দ্য হোক।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়



মেট্রো রেলওয়ে

বঙ্গেশ্বরের (ই) অপারেশন কুইট! আণ্ড টিট

শ্রীপতি নন্দী

এটা ওটা দেখে শুনে অবশেষে অজিত পালা মশাই 'জয় মা বলি' কাঁপিয়ে পড়লেন—কিন্তু গদাঙ্গাগরে কিংবা গদাঙ্গা তালি নিজেও জামেন না। এরূপ বীরত্বপূর্ণ কাজে আগন্তাগেই একখানা বিবৃতি ঝড়তে হয়, পলিটিক্যান্ অজিতবাবুর নিকট এসব কিছুই বিলক্ষণ জানা। বলা বাহুল্য, বিবৃতিটি আছোপান্ত থানা মাল। পড়েই মনে হবে, কংগ্রেস (ই) দলের মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কোন মস্তুর থেকে এ বস্তু নির্গত হতে পারে না।

উদ্দেশ্যটাই অবশ্যই কোন মস্তুর প্রত্যাশিতা নয়—জটনকা বঙ্গদায়িনী 'মহান নেত্রী' (মহতী নেত্রী?) রূপায় একেবারে সাব-মেরিনের মত রাইটারের কাছে ওঠা। অজিতবাবু জানেন, মোট ভোটার সংখ্যার মাত্র ২০-২৫ শতাংশের প্রতিনিধি হয়েও 'মহান দেশের মহান নেত্রী' একটি মোক্ষম বস্তু—আলমুজ্জ হিমাচলের হুগুং-তথা পশ্চাত্তিক সমাজতান্ত্রিক 'কেডা-রেল ট্রাকচার' এখন তার অঙ্গুলির ডগায়। এবং বেশরোয়া 'এমিগ্রেশন' লোকলোকোকেই তার পছন্দ। এইতো অখ্যাত আসামের ততোধিক অখ্যাত ভূত ফুকন তালগোল পাকিয়ে আঙ্গুল ফুলে ছুঁতেনে কদলীপাছ হয়ে গেলো—কাঁচাধানে ফটাকট পৈ ফুটোছে। 'জিনিয়াস'-দের পাওনা মার খাবে না, তবে ভাইনাইটে মুকুবি ছুঁতেনে মমর আর ইযোগের অপেক্ষার থাপটি মেরে বসে থাকতে হবে এই যা।

জীবনটাই তো একটা জুরা—পুশিকিত অজিতবাবুর নিকট এ সত্য বহুকাল আগেই উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। পলিটিক্যাল জুরার ঠেক আছে, আর ঠেক আছে বলেই 'লাইফ' আছে, কপাল মন্দ না হলে কাকন আছে, কোলিঙ্গও আছে। রাজনীতিতে একবারটি ভুল লাগলে তালেবর হতে কতক্ষণ! এতো আর অভিনায়ী নাট্য নয়, সীতিমত পলিটিক্স। এসবের তুক না লাগলেও তরাডুবি হয় না—একদিকে গচ্চা গেলেও অন্যদিকে জমা পড়ে, একই কপালের একুল তাণ্ডে তো ওকুল গড়ে ওঠে। এই তো সেদিনের কথা—স্বতন্ত্র শিলিঙুড়িতে, কলেজ টে, মানিকতলায় আসাম-বিরোধী আন্দোলন করলো, গোটা কয়েক শ্রী টাম-বাস থামালো, ইট-পাটকেন ছুঁড়াছুঁড়ি করলো, রণক্ষেত্রে ভেতন দাকল্য অর্জন না করলেও অচিরে

কেন্দ্রীয় রূপাট্টি আকর্ষণ করলো; অনাপত্ত স্বর্ণ স্বযোগের অপেক্ষার বসে না থেকে যা হোক একটা কিছু লগুতও লঙ্কাও তুক করে দিতে জানে বলেই করিতকর্মী বলে সে দিল্লীতে পৌঁছত, কেন্দ্রীয় 'নীতা-উদ্ধারে' অপরিহার্য বলে পরিগণিত। অজিতবাবু জানেন, এরূপ অধ্যবসারে সফল ফলে; 'মহান নেত্রী'ও এরূপে সফল পেরেছিলেন—যতই ছুটুফটিয়েছেন ততই 'ইমেক' সফর করেছেন, ক্রমে বহুবাহিত হারানো স্বর্গ লাভ। বিবৃতি অজিতবাবু 'জানেন একেই বলে 'প্যারাডাইজ' 'রিগেনড'। নেত্রী ফিরে পেলেন দিল্লীর নবাবী তথা কিল্লি-মস্কো-ওয়ারিশটনের মারোবীর খেতাব।

তাহলে মহান পশ্চিমবঙ্গের ততোধিক মহান কং (ই)-সভাপতির বেলায় 'প্যারাডাইজ' লষ্ট হবে কেন—'গড্ হেল্প হিম হ হেল্প হিম-সেলফ' মিথ্যে হবার নয়, হলেই বা বাঙালির নবাবী তথা দিল্লীর মারোবীর, তবে কি সে ফেলনা? 'কপিকের হলেও স্বপ্নমধুর'। এর চাইতে নয়নাভিরাম সৌভাগ্যের আশা ভূতায়তে কে কবে করে গেছে অজিতবাবুর জানা নেই; নবাবী আর মারোবীর নিয়ে পলিটিক্সে অভ্যস্ত তাবলে চলে না বরং আশ্বাসের কথা এই যে, পুত্রশোকা-তুরা মহান নেত্রী আঞ্জো এঁটো ছিটিয়ে কুহর প্রতিপালন করে থাকেন অর্থাৎ 'গড্ হেল্প হিম হ হেল্প হিম হ'—দেখে শুনে অজিত বাবুর অনেক জানা হয়ে গেছে।

জয় সমাদর। 'মাহ' আর আসাম এবারে বাগে এলো বলে, স্থানীয় পঞ্চায়েতী পয়দাটাও পুলক সঞ্চার করেছে, উত্তরখণ্ড, ঝাড়খণ্ড জমে উঠছে, সমাগত স্লময়ে মহান নেত্রীর প্রবর্তিত প্রথা অম্বাষারী গবংকার ডেকে হিনক্ষণ দেখে যা হোক কোথাও কাঁপ দিতে হবে যে। ১৫ আগষ্ট ও ১৫ই আগষ্ট পছন্দসই। সংকাজে বিস্তর বাধা।

হায়! মাননীয় স্বতপূর্ব স্বাস্থ্য-মন্ত্রী, বর্তমানে বঙ্গেশ্বর (ই) তোমার ডুকুর ডুকুর কামার ভোমারই ঘরের 'পিপল' দকলেই গলা মেলালো না, এ কেমন ডিসপিনি? বর গোছাতে আর বর ভাঙতে রকম রকম 'কম্বুলা' আর 'মলিউশন' বয়ে কলকাতা-দিল্লী ওড়াউড়ি করতে আর যদি উৎসাহ না থাকে তবে সে দোষ তোমার নয়, 'নিয়তি'-র—যে

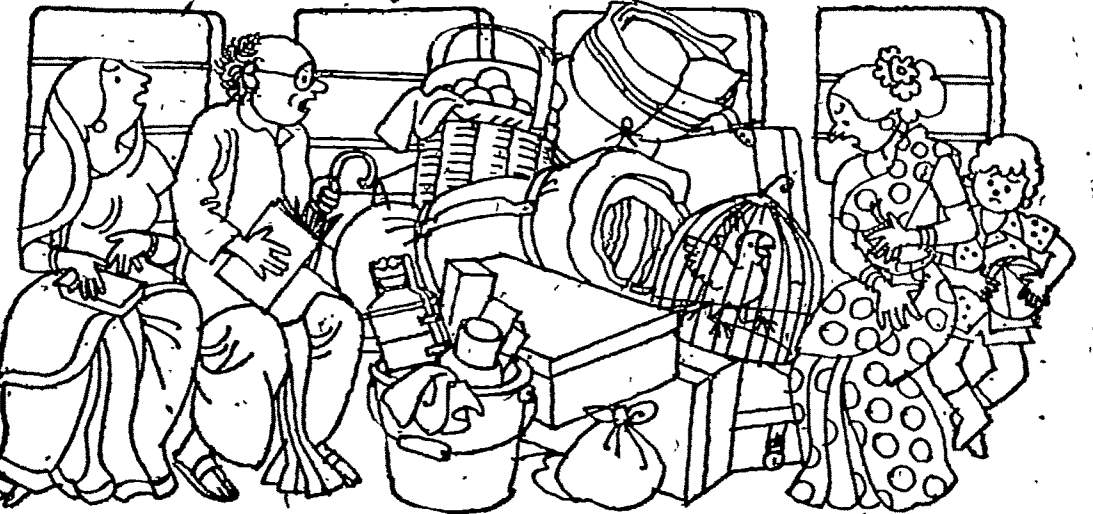
'নিয়তি' তোমার ও তোমার মুকুবি গপি থানের ভাগ্যবিধাতাকে অকালে কেড়ে নিয়েছে। আজ 'এমিগ্রেশন' স্বত্বকে ঠেছে মেরে দেবার ইচ্ছা যদি তোমাকে চকল করে দিবে থাকে, যদি শ্রীমতী পাণ্ডীর 'পশ্চিম-বঙ্গের দিকে নজর রাখছি' আশ্বাসটি তোমার প্রাণে দূর-হতে-ভেদে-আসা রাইটারের সঙ্গীত হয়ে দোল দিবে থাকে, যদি আসাম সম্রাটর আত্ম সমাধান এ সঙ্গীতকে আরো মাতাল করে থাকে, তাহলে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আজ তোমাকে গৃহযুদ্ধে এম্পার ওম্পার করতে হবেই, সিংহাসনের শেষ লড়াই লড়তে হবে জ্ঞাতীত্বের এ উত্তম্প হুত্রে। কিন্তু এক কুরুক্ষেত্রে মীমাংসা হবে না, পরিণাম যথাপূর্ব কেননা, একেজ্ঞে শিবির ছুটো নয়, প্রকৃতপক্ষে যত যোদ্ধা তত শিবির। যাই হোক, এ মগজ কাটা রণ-আকাজ্জার সি পি এর বিতাড়নী যে 'কেলো' অহুঠান করে নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতিটা

করতে চলেছে তাতে বামরাজ্যিক আইন-শৃঙ্খলাগুলি কতটা 'এনথু' ফিরে পাবে জানি না, তবে এ আন্দোলন নামক অস্ত্রের মুখটি বাম ক্রুটের দিকে বাগিয়ে ধরা হলেও তার শান দেওয়া ধারালো দিকটি যে কমল নাথের বিরোধীদের দিকে কল-লাবে এ সত্যটি আপাতী উপদলীয় খুনাখুনিতে আবার প্রমাণিত হয়ে থাকে। জুবে যে লড়াইয়ে নেতাদের প্রাণের ভর নেই, আধিক কর নেই, নিকরী সভাপতি হয়ে না থেকে লেঙ্গুপ লড়াইয়ে সময়ে-অসময়ে নেবে পড়া ভালো—খালা ফলে কখন যে কই-কাতলা ধরা দেয় কিছুই বলা যায় না।

কলকারখানার শ্রমিকের কাজের অধিকারকে অজিতবাবুরা অন্ততঃপক্ষে মুখে অধীকার করতে আর পারেন না, কেননা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আন্তর্জাতিক শক্তি ও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতিটা

এরূপ না হওয়ার কৃষিক্ষেত্রে অজিত-বাবুদের শাবতীর সমগোত্রীররা আধা-সামন্ততন্ত্রী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে জান জড়িয়ে দেন একথা সর্ব-জনবিদিত। বংশপরম্পরায় অমিচাচ্ করেও বর্ণাধার কেন চাষের অধিকার ফসলের ভাষা অধিকার পার না অজিতবাবুরা তা দেখতে যাবেন কেন? তার পূর্বসূরী পাণ্ডীওলায়ট তিন বছর ঢাক ঢোল পিটিয়ে অধি-কাশ চাষজমির বেনাশী হস্তান্তর ঘটিয়ে আর অসংখ্য বর্ণাধার উচ্ছেদ সম্পন্ন করিয়ে তবেই অমিচাচী বিলোপ আইন নামক একটি আইন প্রসব করেছিলেন। অতএব তপস্বান যদি এখন চাষীকে এ জমি পাইয়ে না দেন, যদি বর্ণাধার উচ্ছেদ বন্ধ না করে দেন, তবে জানতে হবে 'নিয়তি' কেন বাধ্যত্রে—তুচ্ছ মানবজীবন শুধু উপলক্ষ মাত্র। অতএব, মহুগ-মুগ 'অপারেশন বর্ণা'কে অপর যে কেউ মানে মালুক, রামরাজ্যের রাম-ভক্তগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। ধর্মের ঢাক হাইকোর্টে ও বাঁজে—'লার্ণেড' হাইকোর্টের শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

নিজের মালপত্রের বোঝায় অন্যের অসুবিধা ঘটাবেন না।



আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে হালকা হাতে চলুন।

কামরার মধ্যেই যাবতীয় মালপত্র বোঝাই করলে নিজেরও অসুবিধা, অন্যদেরও বিরক্তির একশেষ। ভারী এবং বড়-বড় মালপত্রের জন্যে ব্রেক-ড্যানই তো রয়েছে।

কামরার মধ্যে বেশি জায়গা তো নেই—কাজেই যে সব জিনিসপত্র উপরের তাকে কিংবা আসনের তলার রাখা যায়, সেগুলি শুধু সঙ্গে নেবেন।

খোলা রাখবেন, কামরার মধ্যকার জায়গা চলাফেরা আর পা ছড়িয়ে আরামে বসার জন্যেই। এ জায়গাটুকুকে মালপত্র দিয়ে বোঝাই করে সকলের অসুবিধা ঘটাবেন না।



পূর্ব রেলওয়ে



ER 631/80

কং-ইর নেতৃত্বে নকশালদেব একাংশ মালদায় গোলমাল বাধাচ্ছে

নকশালপন্থীদের লিন পিয়াও পন্থী কিছু মহাশয় মুখার্জী বা মিশ্র তত্ত্বাচাৰ্য আভিজ্ঞান এক বিরোধী দ্বারা প্রাক্তন বি, ডি, ও অনিলবরণ রায়ের গোষ্ঠী বলে পরিচিত সম্প্রতি মালদায় গোলমাল করছে। জেলায় কিছুদিনের মধ্যে এই নকশালপন্থীরা তিনজনকে গুলি করেছে। গাজোল থানার ডি, আই, বি একবাড়ির দ্বারাও মালদায়ের মধ্যে নাকি একটি হত্যাকাণ্ড

কাণ্ডানী এস্টেটে কুকীতি

বেনেপুত্র থানা এলাকার আচার্য অগদীশচন্দ্র বসু রোডে অবস্থিত বিখ্যাত কাণ্ডানী এস্টেটে অসামাজিক কার্যকলাপ এগনো পুরোধের চলেছে বলে এই এস্টেটের বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ করেছে।

সম্প্রতি দপণে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে পুলিশ যদিও এই এস্টেট থেকে কিছু বিপদগ্রামী নারীকে অবৈধ কার্বে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ওদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে, তথাপি অসামাজিক কাজগুলি এখনো বন্ধ হয় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা বেড়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, বাড়ীর মালিক পক্ষ এই সব ঘটনা জেনে তেনেই না জানার ভাণ করছেন। অভিযোগকারীদের দৃঢ় অভিমত যে, এস্টেটের কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের একাংশের প্রত্যেক যোগসাজসে এবং ভ্রাতৃত্বময়ই এই সব অসামাজিক কাজ কারখানা চলছে।

কলকাতা মহানগরীর বৃক্ক অবস্থিত কাণ্ডানী এস্টেটের এই অট্টালিকা অনেক নামী-দামী লোক বাস করেন। তাঁরা ওখানকার বাসিন্দা বলে এখন পরিচর্য দিতেও লজ্জা পাচ্ছেন।

তাঁরা বলেছেন, প্রায় প্রতি-দিনই রাতি দশটার পরে এই অট্টালিকার ছাদে স্তম্ভ এবং বাতাবিক অবস্থা থাকে না। থাকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অসামাজিক অবস্থা। এই সময়ে কুখ্যাত মস্তানদের মতের আসর, জুয়ার আড্ডা এবং নারী নিয়ে কুকীতির সব কিছুই ওখানে হয়ে থাকে। সাধা প্রোশাকের পুলিশকেও মাকে মাকে ওখানে আমাগোরা করতে দেখা যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আবিষ্কার করেছে। এরপর হঠাৎ মালদা শহরে পচিশে জুলাই নাগাদ কিছু পোষ্টার পড়ে। ২৮ জুলাই চাক মজুমদারের মৃত্যুদিনে মালদা বজের আস্থান আনানো হয়, সি পি আই (এম-এল) নামে। ২৭ তারিখ রাতে হত্যাবাসের একটি মৃত্যু ভাঙে এই অনিলবরণ রায়ের গোষ্ঠীর নকশালপন্থীরা। গুণগোলের আশঙ্কায় ২৮ জুলাই মালদা বন্দ আংশিক সফল হয়। প্রাইভেট বাস দোকান-বাজার-জল বন্ধ ছিল। চাক মজুমদারের মৃত্যুর প্রতিবাদে এই বন্দ জনসাধারণ করেনি। বরং উক্ত নকশালপন্থীদের হামলার ভয়েই করেছে।

মৃত্যু ভাঙার অভিযোগে ২৮ তারিখ পুলিশ চারজন নকশালপন্থীকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেস (ই)র স্থানীয় নেতারা এর প্রতিবাদে ২৯ জুলাই বেলা বায়োটা নাগাদ শতিনেক লোকের এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সময় মিজ, সময় মুখার্জী, বিশ্বনাথ গুহ, ভামাপদ চৌধুরী, প্রবাল চ্যাটার্জী, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী প্রমুখ পরিচিত কং (ই)র নেতারা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মালদা কোর্ট প্রাঙ্গণে এক পঞ্চমস্তায় এঁরা জোর গলায় বলেন, আর দু মাসের মধ্যেই কং (ই) রাজ্যের ক্ষমতায় আসছে। তারপর জেলা-শাসক ও পুলিশ অফিসারদের দেখে নেওয়া হবে। পঞ্চমস্তায় পর মিছিলকারীরা জেলা শাসক শ্রীপ্রশান্তকে বিয়ে ধরে তাঁর জামা প্যাট টেনে লাঞ্ছনা করে। তাঁর পিণ্ডকে মারধোর করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও লাঠি চার্জ করে। এই লাঠিচার্জের প্রতিবাদে কং (ই) পরলা স্মাগট চকিণ বটায় জন্ম মালদা বজের তাক দেয়।

সন্তোষ রায়ের নেতৃত্বাধীন সি পি আই (এম-এল)-এর মালদা জেলা কমিটির পক্ষে সৌভম চৌধুরী কর্তৃক প্রচারিত এক ইন্ডোহারে এই মৃত্যু ভাঙার ঘটনাকে নিন্দা করা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্ববেশকদের মতে, মালদায় লিন পিয়াও পন্থী নকশালদেব নেতৃত্ব দিচ্ছে বরকত গণির লোকেরা। ২৯ জুলাই কং (ই)র উক্ত মিছিলে এই সব কংশালদেব কয়েকজনকে দেখা গেছে।

কং-ই এম পিদের আবদার

কং (ই) এম পিদের নেতৃত্বে একটি আনকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের হাজারো সমস্যার কোন একটার দাবিতে যে এই আনকলিপি দিচ্ছেন তা কিন্তু নয়। এই দরখাস্তে এম পিরা আজি করেছেন যে, তাঁদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে একহাজার টাকা করতে হবে। অধিবেশনের সময়কার দৈনিক ভাতা ৫১ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করতে হবে এবং সেক্রেটারিয়াল ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করতে হবে। এই দাবিতে এখন সই সংগ্রহ অভিযান চলছে। সত্যিই তো বতাই ওরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন, জবায়মের দাম বাড়ছে ততই এম পিদের দাম বাড়ছে, আরাম-গরাম কিছু বাড়ছে।

বঙ্গেশ্বরের (ই) অপারেশন

১ম পৃষ্ঠার পর
বিচারপতিরাও পরমহংস ভজরাম, এ গুণ্যভূমিতে ইতরজনের হাত থেকে দশাশ্র জোতদারদের রক্ষা করতে তারাও অকুতোভয়।

অতএব, মোক্ষম জোগান—‘সি পি, এম বাংলা ছোড়’, অকাট্য যুক্তি—জাতীয় সংহতি আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদির গলাধাক্কা, শ্রেণী বিশেষের উদ্বেগ ইত্যাদি; দেশের লোকজন এ বিষয়গুলি যাতে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে তার জন্য আন্দোলন। মর্বার অবস্থাই জলবৎ তরল—জাথে জাথে বর্গদার উজ্জ্বল ঘটলে, সহস্র সহস্র একর চাবীর জমিকে ডুবিয়ে ভেঙী বানালে, কিংবা খপের দারে জমি কেড়ে নিলে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র ভূমিষ্ট হয় তার কলে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায়, শ্রেণীবিশেষ কমে এবং জোতদারেরা ও বর্গদারেরা পরম স্নেহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বাঁচে—এম কথ্য বৃক্ক অস্থিধা কোথায়? শ্রেণী-পিরীতির এরূপ মহোচ্চবে জোতদারের গুলিতে এক-শত, গরীব চাষী প্রাণ হারালেও তা যে সত্য্যগ্রহী জমিচোরদের অহিংস-প্রাকটিক্স, এ সহজ কথাটি না বোকার কারণ নেই। তাহলে জমিচোরদের জ্ঞানভিত্তিক ব্যাঘাত ঘটালে অর্থাৎ চৌর্যবৃত্তির শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটালে তা যে আইনসম্মত গুলি বর্ষণের প্রয়োচনা সৃষ্টি করে থাকে, আইন বিশেষজ্ঞ পাঞ্জা সাহেবের নিকট সে লজিক বহু আগেই জামা হয়ে গেছে।

তথু ভাতা নয়, মহারাষ্ট্রের আন-তুলে সরকার রাজ্যের এম পিদের দ্বিতীতে বেসামান্য ঘোরাঘুরির জন্ম রাজ্য সরকারের খরচায় গাড়ি দিচ্ছেন। এজন্য এক ভজন নতুন অ্যামবাসাভার গাড়ি কেনা হয়েছে। অবশ্য মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলের এম পিরা এইভাবে অর্থ নয়ছয় করার বিরোধিতা করেছেন। রাজ্যের এম পিরা দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র দলনে এ নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। সেখানে রাজ্য থেকে নির্বাচিত কং (ই) এম পিরা আনতুলে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। শুক্রবারের কং (ই) এম পি'রাও এখন শুক্রবার সরকারের কাছে গাড়ি দাবি করছেন। রাজ-ধানীর কর্ণাটক ভবনের চারটে গাড়ি এখন রাজ্যের এম পিদের ঘোরা-ঘুরির জন্ম অল্প পরসর ভাতা দেওয়া হয়।

আর বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা? গোপনকর্মে সন্যাস্ত অস্তিত্বাবয়ু সপোজীৱরা কোন চালকেই মাঠে মারা যেতে দেন না; তাদের ‘মাহুখে’ দায় নিয়ে প্রবাহ বাক্যের প্রথা অল্প-যাত্রী সভাপতি মশায়কে একটু চড়া গলায় কলরব করতে হবে বৈকি; তাহলে উত্তরও বাড়খও সমস্তকে উলুকে দিয়ে আইন শৃঙ্খলার নামে কং(ই)-দের হাতে রাষ্ট্রপতি শাসন তথা বেনামী কং(ই) শাসনের কারদা ধরে দিয়ে সি পি এম যে নিজেদের ভরাডুবি ডেকে আনতে চায় একথা অপর কেউ না জানলেও নব্য বঙ্গেশ্বরের জানতে বাকী নেই। তাই পাঞ্জা সাহেবের হাতে এখন অনেক কাজ।

কিন্তু কাজ করে আর সোরাতি কোথায়? সকলেরই মাগছাওয়াল আছে, লাখ-আল্লাহ আছে। কিন্তু প্রণব-স্বতন্ত্রা কাউকে দিয়ে ধুয়ে খেতে জানে না। অতএব, লড়াইয়ের মুখ ছুটি, অথবা তিনটি, তিনটি, অথবা অসংখ্য। তাই সময়ে সকলকেই চিট দিয়ে না রাখলে খরচ বঙ্গেশ্বর(ই)-কেও অষ্টরঙা উদরস্থ করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ‘জ'র মা তারা’।

অর্থনীতি

১ম পৃষ্ঠার পর

ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে সর্বত্র ভয়ের মাহুখই আঁঘাত পান। কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধির নীতি যে শ্রেণী-সরকারের একটি সচেতন পদক্ষেপ এটা নানা ধূস্রজালের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূল্যবৃদ্ধি একটি নিরস্তর ঘটনা। বুর্জোয়া শাসনে মূল্যবৃদ্ধির অর্থ মেহনতী মাহুখের প্রমুখ লক্ষ্য পণ্য রপ্তানিকৃত করে অবিরাম মূল্য আদায়। যেহেতু মূল্যবৃদ্ধি প্রথমে ঘটে এবং মজুরী বেতন তার পেছনে পড়ে থাকে তাই মজুরী বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনের ফলে বেতন ও মজুরী কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কখনো মূল্যবৃদ্ধির সমান হারে বেতন ও মজুরী বাড়ানো হয় না। বরং অনেক আন্দোলনের ফলে যেটুকু বেতন ও মজুরী বাড়তে পারেনা, করার উদ্দেশ্যে শাসক গোষ্ঠী আবার দাম বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা এমন ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যেন বেতন ও মজুরী বৃদ্ধির দরুণই আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো।

সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে কোন গণ আন্দোলনের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত যে বুর্জোয়া শাসনে মূল্যবৃদ্ধি যখন ঘটবেই তখন মেহনতী মাহুখের আর অস্বস্তিক্ত করার জন্তে মূল্যবৃদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান হারে বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি করতে হবে। এমন একটা আইন থাকবে যার অধীনে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও ব্যক্তিগত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন ও মজুরী এই হারে বেড়ে-যাবে।

তাছাড়া প্রত্যেকটি কোম্পানীর আনকরের উপর এমন এক সারচারি বসাতে হবে যার সমস্ত অর্থ বেকারদের মধ্যে চাকুরী সৃষ্টি, ভাতা বন্টন প্রভৃতিতে বেকারী হ্রাসের জন্তে খরচ করা হবে। এক কথায় অবা-মূল্য শিকারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থে সংকুলিত করতে হবে একমাত্র তখনই মূল্যবৃদ্ধির শ্রেণীগুলি মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। তখন তারাও মূল্যবৃদ্ধি করলে সে মূল্য বাড়বে না বরং কমবে, বেকারী বাড়লে তারা যে কম মজুরী দিবে লোক খাটিয়ে অতিরিক্ত মূল্য করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করতে পারবে। মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে গেলে আবেদন নিবেদনে হবে না সরকারের উপর এমন প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে শ্রেণীস্বার্থে সরকার মূল্যবৃদ্ধিতে উৎসাহ না দেন।

এন টি সির চেয়ারম্যান গভীর গাউডায় পড়েছেন

এন, টি, সি পূর্বাঞ্চল শাখার একাউন্টেন্ট চেয়ারম্যান শ্রীমঙ্গল-কুমার ব্যানার্জী ওরফে 'জগদীশ' খুব ধূসর লোক। টুপিবাজী আর হিনাবের কানসাজীতে ঠর জুড়ি খেলা ভার।

কিন্তু এহেন ব্যানার্জী সাহেব সম্প্রতি মহা-গাউডায় পড়েছেন। সকাল-সন্ধ্যা রং পাটানোর ভেতী দেখিয়েও সামাল দিতে পারলেন না তাঁর সাধের গদী। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুগপৎ তদন্ত শুরু করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে।

জনতা আরলে দিল্লীতে জন-সংঘ আর কলকাতায় সি, সি, এম সমর্থক সেজে উনি চেয়ারম্যানের গদীতে অসীন হয়েছিলেন। গদী পোক্ত করতে অফিসার আর কর্মচারীদের লাগিয়েছিলেন এককে অন্তর বিরুদ্ধে।

চলছিল ভালই। কিন্তু বাধা লাগলো লোকসভার নির্বাচন। দিল্লীতে ইন্দিরা কংগ্রেস ক্ষমতার আশায় ব্যানার্জী সাহেব চোখে সরষে ফুল দেখলেন। ধরা পড়ে যাওয়ার এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন।

কিন্তু এত করেও তীরে এসে তরী ডুলো। তাঁর ভেতীবাজীর খেলা যে সবার চোখেই ধরা পড়ে গিয়েছে তা বুঝলেন সম্প্রতি দিল্লী গিয়ে। আর নাথে উনি এতদিন তুপলকী রাজত্ব চালাচ্ছিলেন সেই দিল্লীর বড়সাহেবই স্বরং সরাসরি জানিয়ে দিলেন : অনেক বুজুক লজ্জা করেছি। এবার তোমার বিদেয় নিতে হবে। বিদ্যায় বাটতি নাম করে ধান্দাবাজী চলবে না। মানে ৭০ লক্ষ টাকা লোকসান করার জন্ত তোমাকে আমরা রাখিনি, রাখবো না।

ব্যানার্জী সাহেব ভেবেছিলেন কলকাতায় কিরে বিপ্লবের টুপি মাথায় দিয়ে জয় বাবা তারকনাথের নাম করে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহুর পায়ে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু জ্যোতি-বাবু হুঁসিয়ার লোক। তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীধর মুখার্জীকে জানিয়ে দিয়েছেন অপদার্য ব্যানার্জীকে হঠান। একে দিয়ে এন, টি, সি চলবে না। আঠার হাজার কর্মচারী মারা পড়বে।

সংসদ সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে ব্যানার্জী সাহেবের কুকীর্তি কণা ফাল করে দিয়েছেন। শেষ চেষ্টা হিনাবে একজন ব্যবসায়ী

এজেন্টকে নিয়ে ব্যানার্জী সাহেব গিয়েছিলেন এক কংগ্রেসী নেতার কাছে। ঐ কংগ্রেসী নেতা ব্যানার্জী সাহেবকে হাড়েহাড়ে চেনেন। মোটা দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন।

বিদেয় নেবার সময় হয়েছে বুঝে ব্যানার্জী সাহেব নতুন এক গাল চলেছেন। এক নম্বর সাতাং ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) শ্রীমজুমদারের মাধ্যমে বাজারে চেড়েছেন যে টাটা-বিড়লারা নাকি ঠেকে নেবার জন্ত সাধাসাধি করছে। তাঁর মত এক 'কালোয়াত' পেলে তারা বর্তে যাবে। পাঁচ হাজার টাকা মাইনেতো বাধা।

'কালোয়াতই' বটে। চেয়ারম্যান হবার জন্ত কি তদবির-তদারকই না করেছেন। লজ্জার বালাই নেই। অকস্মে দলবাজীর সুবিধের জন্তে ছজন অপদার্য ডেপুটি ম্যানেজারকে প্রমোশন দিলেন। কেনারেল ম্যানেজার (ভিজিলেন্স) যিনি নাকি দিল্লী থেকে এসেছিলেন তাঁকে বিদেয় দিলেন। ম্যানেজার (এড-মিনিষ্ট্রেশন) ভুললোককে বদলী করলেন পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে। অজ্ঞ অফিসাররা ধারা তাঁর কাছে লাগ দেয় না তাদের পাঠালেন-গরা-কানী।

আইন কাহ্ননের ধার ধারেন না উনি। ব্যাংক অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের নির্দেশ উপেক্ষা করে কাঁবেদারদের ওভারটাইম পাইয়ে দিচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। বাকি খুশি যখন-তখন যেখানে খুশি পাঠাচ্ছেন পেনে করে। রাত ১১টা পর্যন্ত অফিস খোলা। অসং অফিসারদের গোরাবারো। এমন এক চাষচে অফিসারতো বাড়ীই ফেরে না। তাকে নাকি ভোর হোতেই হাজিরা দিতে হয় ব্যানার্জী সাহেবের বাড়ী।

প্রাক্তন ফাইন্যান্সিয়াল এড-ভাইসর এসব বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্যানার্জী সাহেব তাঁকে শিক্ষা দিতে পাঠিয়েছেন বিহারের মোকামার। ফাইন্যান্সিয়াল এডভাইসরের কাজ দেখছেন এখন এমন একজন অফিসার যিনি ফাইন্যান্সের 'ক' বোকেন না। কর্মচারীরা তাঁর নাম দিয়েছেন 'ভজ-হরি'।

ব্যানার্জী সাহেবের এক নম্বর চামচা ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) শ্রীমজুমদার একটি রত্ন। এই সেহিন পর্বত ডেপুটি ম্যানেজার শ্রীমজুমদার ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছেন অনেক তেল খরচা করে। তাঁর

প্রধান কাজ হল সকাল-সন্ধ্যা ব্যানার্জী সাহেবের বেহালার বাড়ীতে হাজিরা দেওয়া। ভুললোক রত্নই বটে। ডেপুটি ম্যানেজার থাকাকালে আটটি কোকিং মেশিন কিনেছিলেন কয়েক লক্ষ টাকায়। অভিযোগ : প্রয়োজন ছাড়াই পুরোনো মেশিন নতুন বলে কিনেছিলেন। মেশিনগুলো কয়েক বছর বাস্তবদ্বী হয়ে পড়েছিল।

আধুনিকীকরণের প্রয়োজনের স্বপ্নাতি কেনা সম্পর্কেও শ্রীমজুমদারের বিরুদ্ধে ত্রিভুজি অভিযোগ। কিন্তু ব্যানার্জী সাহেবের দোস্ত বলে শ্রীমজুমদারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত হয়না। সি, বি, আই ফাইল চেয়েছিল। কিন্তু ফাইল পায়েব করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমজুমদারের দিল্লী-দিল্লী বোরা খাতে গত এক বছরে পেন ভাড়া বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় বিশ হাজার টাকা। অথচ ব্যাংক অব পাবলিক এন্টারপ্রাইজের নির্দেশ এবং সরকারী

নিয়ম অনুযায়ী যে কোন অফিসার পেনে করে যাওয়া-আসা করতে পারেন না। পেনে যাতায়াত করতে পারেন তাঁরাই যাদের মাসিক মূল বেতন ছ' হাজার টাকা বা তার বেশি। শ্রীমজুমদারের মাসিক বেতন চোদ্দশো টাকা।

এহেন চামচা পরিবৃত্ত ব্যানার্জী সাহেব আর কি করেন। ধান্দা দিয়ে চলছিল ভাল। লোকসান কমিয়ে মাসিক ৫০ লক্ষ টাকার দাঁড় করিয়েছেন বলে তারখরে চীৎকার করেছিলেন। গল্প জুড়েছিলেন যে এই লোকসানের জন্তেও তিনি দায়ী নন। দায়ী রাজ্য সরকার আর এন, টি, সি-র কর্মচারীরা। রাজ্য সরকার বিদ্যায় বাটতি সৃষ্টি করেছেন শতকরা ৫০ ভাগ আর ৩,০০০ অতিরিক্ত কর্মচারীর জন্ত মাসিক বেতন বাবদ গুণতে হচ্ছে ২১ লক্ষ টাকা। এছাড়া আশামে গোলমালের জন্ত মাসিক আরও পাঁচ লক্ষ টাকা জলে

যাচ্ছে। অর্থাৎ শ্রীবানীর্জী নিজে মোটেই দায়ী নন। বিদ্যায় বাটতি না থাকলে, অতিরিক্ত কর্মচারী না থাকলে এবং দেশে একটিও ইঁদুর না থাকলে উনি তেতী দেখাতেন।

কিন্তু দিল্লীর বড় কর্তারা ঠেকে ধরে ফেলেছেন। তাঁরা বলেছেন : বিদ্যায় বাটতিতো শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়। সারা দেশ জুড়ে। তবুও এন, শেখাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়

উত্তরবঙ্গে

৪র্থ পৃষ্ঠায় পর

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ আন্দোলন শুরু। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্র যে মিশনারীদেরই সৃষ্টি সে কথা মনে করার মত যথেষ্ট কারণ আছে।

সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে মিশনারীদের সঙ্গে প্রায়ই উত্তরবঙ্গ আন্দোলনের প্রবক্তাদের গোপন শশা-পরামর্শ হচ্ছে। অতি সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে বিদেশী আগমনও খুব বেড়েছে। রাজ্য সরকার যদি এদিকে একটু নজর দেন তাহলে ভাল হয়।

স্বাধীনতা-দিবসের পতাকায় আন্দোলিত হোক

জাতীয় সংহতির প্রতিশ্রুতি, গণতন্ত্রের শপথ

আজ থেকে ৩৩ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই আন্দোলিত পতাকার সামনে রক্তে ও ঘেঁষে কঠোর, উজ্জ্বল জনতা খপ দেবেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের, শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মানুষের শোষণমুক্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্রের।

স্বাধীন ৩৩ বছরের ইতিহাসে সেই খপ, সেই শাপিত শপথ বারে বারে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী চক্র ও তারই অর্ধরহ দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত হেনেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও সাম্প্রদায়িকতার শাপিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাদেশিকতার হিংস্র আক্রমণে। আবার এই আঘাত ভয়ংকর ও নৃশংস হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে।

১৯৮০ সাল সেই হীন চক্রান্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যভূমিতে এই চক্রের পদচারণা। পশ্চিমবঙ্গেও তার অন্তত ছায়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের জাগ্রত গণতান্ত্রিক জনমতকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লালন করা জঘন্য যড়যন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘনায়মান যড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মেহনতী মানুষের সরকার, জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘোকাবিলার অতন্ত্র। গ্রাম গঞ্জের ক্ষেত-খামারে, শহরগল্লকল-কারখানার মেহনতী মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে অর্জিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে সমাজের দুর্বল ও অহুমত শ্রেণীর অধিকারকে প্রচারিত করতে বন্ধপরিকর।

গত তিন বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার তার অতি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধি সত্যকেই রূপায়িত করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর স্বাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার এনেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি : কলকারখানার মেহনতী মানুষকে দিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অধিকার। হীনতম কুটিরও প্রচারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত খবিতনিক শিক্ষার প্রাধিকার। বিচিত্র ও বহুবর্ণ ভাষা সংস্কৃতির আলোকিত দার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে সমুদ্র মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গল্পাঙ্গন বঙ্গভূমিতে। নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে।

দরিদ্রশ্রেণীর জন্ত আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার জন্ত বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির তো জাতীয় সংহতির বনিয়াদ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তো গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের—চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিশ্রুতিই ১৫ই আগস্টের উত্তোলিত পতাকায় আন্দোলিত হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চলচ্চিত্র প্রতিদিন

‘একদিন প্রতিদিন’

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিটোল কাহিনী বলতে কিছু নেই, শুধু একটি ঘটনার কিছু প্রতি-ক্রিয়া ও কিছু মুহূর্ত, উৎসেগ উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে চলচ্চিত্রের নিম্নতম ভাষায় ও ব্যক্তির মূলাল সেনের ‘একদিন প্রতিদিন’ ছবিটিতে। এ যে কতবড় কৃতিত্বের দাবীদার ছবিটি তার পরিমাপ করতে গেলে পূর্বাপর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমী-কার অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এখনই এটুকু বলা চলে অসংকোচেই যে, এষাবৎ বাংলা ছবির বতখানি কাহিনী-নির্ভরতা ছিল, তার অনেক-টাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মূলাল সেনের দর্বাণিক ছবিটি। ফলে চলচ্চিত্র স্বনির্ভর হওয়ার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। আর এটা তো চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার একটা অন্ততম প্রধান বিষয় ছিল। আধুনিক ছবি গল্প বলবে না—দেশ-কাল ও সমাজের কিছু ঘটনা চরিত্র-গত কিছু ভাব-মুহূর্ত প্রকরণগত শৈলীতে ফুটিয়ে তুলবে আপন স্বতন্ত্র মহিমায়।

লক্ষণীয় যে, ছবিটিতে সংলাপ খুবই পরিমিত, স্বক-অভিব্যক্তিই প্রধাত পেয়েছে—ফলে চিত্রবর্তিতা বজায় থেকেছে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এক্সপ্লোনান্ট ফিল্ম নির্মাণে যে গুণগণনা একান্ত বাঞ্ছনীয়, তা তুলে ধরে চলচ্চিত্রকার মূলাল সেন বিরল নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে-ছেন। অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘অবিরত চেনা মুখ’ অবলম্বনের স্বীকৃতি থাকলেও, কি নামকরণে আর কি চিত্রায়ণে এতধু পরিচালকেরই ছবি। অবশ্য এ ছবিতেও নারী লোলুপতা সম্পর্কে কিছু বিচ্ছিন্ন কথা ছবির স্বাক্ষরানে লেখা হয়ে ফুটে উঠে সামগ্র্যসাহানি ঘটায়, ছবির ধর্ম ক্ষুর

করে এবং মূলাল সেনের ছবিতে এ জাতীয় অসংগতি ঘটে থাকতেও দেখা যায়, তবুও স্বীকার করি, এ ছবিগুলির তুলনায় ক্যামেরার গিমিক ও জাগলারি সেই বললেই হয়। অনেক সংঘাত ও পরিণত তিনি। তবে লগীত চেতনা সম্পর্কে এ ধর্মো বুঝি তিনি পুরোপুরি সজাগ হতে পারেন নি। বি, ভি, কারত পরিচালিত আবহ লগীত মাকে মাকে বিসদৃশ লাগে। কে, কে, মহাজনের স্বাক্ষর ক্যামেরা পরিচালনা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। গভীর নক্ষের সম্পাদনা ছবিটির সমৃদ্ধির মূলে অনেকখানি। একটি দিনের একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক মর্যাদিক সত্য ফুটিয়েছে বুদ্ধিধীশ রঞ্জিত ছবিটি।

নবীন মল্লিক সেনের সুপ্রাচীন বাড়িটি ছবিটিতে একটা স্থমিকা নিয়েই যেন হাজির হয়েছে। সেই জীর্ণ বাড়ির মালিকের দত্ত ও মূল্য, এগারো ঘর ভাড়াটির বিভিন্ন মাম-সিকতা ও দৈনন্দিন ক্রিয়া, অন্ততম বাসিন্দা কৃষিকেশবাবু জী ও পাঁচটি ছেলে মেয়ে নিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রায় নিখুঁত রূপটি আশ্চর্য মূল্য-রামায় রূপ পেয়েছে। অবসর প্রাপ্ত কৃষিকেশবাবুর সংসারে বড় মেয়েই একমাত্র উপার্জনশীল এবং অতাব অনটন সেখানে স্বাভাবিক। সেই একমাত্র অবলম্বন বড় মেয়ে অফিস থেকে ফিরতে ঘেরী করেছে—বা কোন দিন হয় না—রাত হয়ে গেল, রাত বাড়ছে—তবু করে না—সংসা-রের সকলের উদ্বেগ, চুশিভা, অস্ত ভাড়াটিরদেরও কারও বা অস্ত কোতুল—এই সব নিয়ে বাস্তব মুহূর্ত-গুলি ছবির পর্দায় পর পর অনবচ্ছিন্ন চিত্র সৌকর্যে ফুটে ওঠে। সংগে সংগে

ছবির বক্তব্যও পরিষ্কৃত হয়—একমাত্র উপার্জনশীল মেয়েটির প্রতি সংসারের কেউ কোন দিন দৃষ্টি দেয় নি, ভাবে নি—মাত্র এক সংকটের মুখোমুখি হয়ে তার ভ্রাতৃ সবারই ভাবছে—এক নির্লজ্জ স্বার্থপরতা নয়? আবার মেয়েটি যখন হৃদয় শরীরে রাত শেষে বাড়ি ফিরে এল—তখন আর এক সংকট। সবারই লক্ষ্যে করছে। এত-গুলি দলিল দৃষ্টির সামনে নিম্পাপ মেয়েটি ভ্রান্ত হতে ক্রমশঃ হুঁকড়ে যাচ্ছে। পুরুষের মতই মেয়েকে কাজ করতে বাধ্য করা হবে—অথচ এতটুকু নিয়ম লঙ্ঘন হলেই ঘোষী হতে হবে, কৈফিয়ত দেবারও অবকাশ থাকবে না। এই অসম বিধানের নিগড়ে নারী লাজনা ও শোষণ ফুটিয়ে ছবিটি যেমন বক্তব্যমুখী হয়েছে, তেমনই হয়েছে বাস্তবধর্মী। গীতা সেন, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতাশংকরের অভিনয় সহজে ভোলায় নয়। অত্যন্ত স্থমিকাও স্বঅভিনীত।

ভাগ্যচক্র

অতি নাটকীয় ও অস্বাভাবিক কাহিনীর চিত্রায়ণ হল ‘ভাগ্যচক্র’। অল্পর বিশ্বাস পরিচালিত এ ছবিটিতে জীবনের যোগ নেই। এখানে মায়ক মারিকারা সবাই ধনী। বিপর্যয় এসেছে ভাগ্য নামে এবং ছবিতে নাটক জমানোর খাতিরে সেই ভাগ্য-কে চক্র করে অবিরাম ঘোরানো হয়েছে মুক্তি সংগতির বালাই না রেখে। এমন কি সচরাচর সিনেমায় যে মিলনাত্মক পরিস্থিতি গড়ে তোলা হয়, ভাগ্যের চাক্ষু ঘোরানো ঘোরানো সেখানে বিরোধাত্মক পরি-পতি এসে পড়ে আচম্ভা। হয়তো সাধারণ দর্শককে আবেগে অভিভূত করতে। মইলে ছবির সিংহভাগ জুড়ে মারিকাকে ‘সত্যী’ প্রতিপন্ন করেও, স্বামী পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্যে কেন মিলন হল না?

ছবির শুরু থেকেই কেন্দ্র এক অস্বাভাব্যতা। মারিকা অতি আধু-নিক হলেই অমন উগ্র স্বভাবের হবে কেন—আশ্রিত পিতৃবৃদ্ধর ছেলের প্রতি সে প্রথম দর্শনেই অমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে কেন—আবার সেই ছেলেটিই বড় হয়ে লাখপতি রূপে একাধিক তরুণীয় মন জয় করে বসল কি করে—তখনো মারিকা তাকে গালে চড় মারল কি করে—বয়সে যথেষ্ট ছোট হয়েও একটা আশ্রিত বর্তমানে লাখপতি তরুণ মারিকার সংগে শেষ পর্যন্ত অত ঘনিষ্ঠ হল কি করে—সেই ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে যখন তুল বোকাবুঝির চূড়ান্ত হচ্ছে, তখনই তরুণটি আসল সত্যপ্রকাশ না করে শেষ দৃশ্যের জন্ত অপেক্ষা করল কেন—এসব প্রশ্নের সমুদ্র পাওয়া সম্ভব নয় জানি, কারণ এ জাতীয় ছবিতে এসবই চলে।

এন টি সি

১ম পৃষ্ঠার পর

টি, সি-র অস্ত্র দলনিভারীগুলো লাভ করেছে কি করে?

বেগতিক বুকে শ্রীব্যানার্জী-নতম এক চাল ছাড়লেন। চাষা দিয়ে রচনা শুরু করলেন: ঠেকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। উনি চল্লিশ কোটি টাকার কর্মজ্ঞান শুরু করেছেন। কিন্তু রিয়াকশনারিরা ঠেকে কাজ করতে দিচ্ছে না। কাজ যদি একাত্তাই না করতে দেয় উনি চলে যাবেন। কেউ আটকাতে পারবে না। কারুর চোখের জলও না। এসেছিলেন বাঙালী এবং বাঙলাদেশের পেরা করতে। কিন্তু মূর্খ বাঙালী ঠেকে চিনলো না।

সত্যই বাঙালী এহেন ব্যানার্জীকে চিনতে পারেনি। চিনলে অনেক আগেই ঠেকে যেতে হতো। আর এন, টি, সি-র ১৮টা মিল ও ১৮ হাজার কর্মচারীও বেঁচে যেত।

গত এক বছরে শ্রীব্যানার্জী এন, টি, সি-টাকে রসাতলে নিয়ে গিয়ে-ছেন। নিজে বেআইনী কাজ করে কর্মচারীদের বাড়ি ঘোষ চাপিয়ে-ছেন। পরম্পরের মধ্যে বিবেচ ছড়িয়েছেন। প্রশাসনটা ধ্বংস করেছেন। কোন আইন-শৃঙ্খলার বালাই নেই। কোম সত্যতার বালাই নেই।

গাড়ীর ব্যবহার চলেছে বজ্রতন্ত্র। নিজে রইলেন দিল্লীতে। অথচ ঠর গাড়ী সেদিন ছুঁটনায় পড়লো রেস-কোর্সের কাছে মধ্যরাত্রে। অভি-যোগ গাড়ী ঠর বাড়ীতে ডিউটি করে ফিরছিল।

গাড়ী সারানোর জন্তও কোন আইন মানেন না উনি। লরকারী নিয়ম গাড়ী সারাতে অন্ততঃ তিনটে কোর্টেশন নিতে হয়। কিন্তু ঠর জন্ত কোর্টেশন লাগবে না। ঠর গাড়ী সারানো হলো কোর্টেশন ছাড়াই এবং নুকিয়ে বিটি-মঞ্জিল মিলের একাউন্টে।

শ্রীব্যানার্জী দাবী করেন উনি দিল্লীর অফিসার। কলকাতার পুলিশী আইন ওর জন্ত নয়। অত-এব কলকাতা পুলিশের অহম্মতি ছাড়াই উনি গাড়ীতে লাল আলো জেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ইদানীং ব্যানার্জী সাহেব হেড অফিসের সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর ওপর ভীষণ চটে গিয়েছেন। এক নম্বর লাভ্য শ্রীমজুমদারকে বলেছেন ওরা আমাকে কাজ করতে দিতে চায় না। স্বতরাং আমি আর হেড অফিসে বসবো না। টেকনিক্যাল ডিভিসনে

বসবো। স্বল্প সম্পূর্ণ করতে হবে। হেড অফিসে বসছেনও না। কর্ম-যজ্ঞ চলছে টেকনিক্যাল ডিভিসনে। চীফ টেকনিক্যাল অফিসারকে ঘর থেকে তুলে দিয়ে উনি স্বপ্ন করে-ছেন সেই ঘর। সামনে নৈবেদ্যের বাতাসার মত শ্রীমজুমদার। ভক্তলোক চীফ টেকনিক্যাল এডভাইজার এঘর-ওঘর করে বেড়াচ্ছেন।

এন, টি, সি-র বোর্ড অবস্ত্র শ্রীব্যানার্জীর ওপর মোটেই দৃষ্টি নয়। ২রা আগস্টের বোর্ড মিটিং-এ মেম্বাররা লাক বলে দিয়েছেন: নভেম্বরে আমরা আপনার স্বাক্ষরকর্মের হিসাব খতিয়ে দেখবো। শুধু বিজ্ঞান-বাতি, চক্রান্ত আর কর্মচারীদের বিশ্বাস আচরণের ধাপা দিয়ে চলবে না। মাসিক লোকসান ১০ লক্ষ টাকা। অথচ আপনি বলে বেড়াচ্ছেন ৫৫ লক্ষ টাকা। এসব ধাপা আমরা বরদাস্ত করবো না।

বাছাবাছি নিয়ে

১ম পৃষ্ঠার পর

কোন পথে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। রাষ্ট্রদ্রোহী চরণজিৎ চান না এবার তাঁর শিল্প হস্তের পূর্ণ মন্ত্রী হতে পারেন। আর গণি ধান যদি তাঁর সাম্প্রতিক চুরবন্দা কাটিয়ে উঠতে পারেন তো টিকে যাবেন, নইলে এখনও তিনি হাঁটাই হয়ে যাবার অবস্থার আছেন।

হলের যুব মহল থেকে যারা মন্ত্রী পরিষদে স্থান পেতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে তাঁরা হলেন: যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামচন্দ্র রথ, মহারাষ্ট্রের গোলাম নবী আজাদ, বিহারের জারিক আনোয়ার, পাঞ্জাবের কানওয়ার মচেন্দ্র সিং, মধ্যপ্রদেশের গরফান ই আজম এবং মাধব রাও সিদ্ধিয়ার। ওরা ছাড়া আছেন ভগবীশ টাইটলার ও কমল নাথ। যদি সিদ্ধিয়ার, টাইটলার এবং কমল নাথ কংগ্রেস (ই) হলের সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান তাহলে অবশ্য ঠরের মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

নাবিক ইউনিয়ন

২য় পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা প্রায় থাকে না, চিকিৎসার ব্যবস্থা তথৈবচ।

শিশি কর্পোরেশনের আকাজিক ডিরেক্টর এম. আর প্রসাদ অভিযোগ করেছেন যে গত ত্রিশ মাসে বিভিন্ন অজুহাতে কতিপয়নের দাবি তোলায় ভারতীয় নাবিকদেরকে নাকি কর্পো-রেশন কুড়ি লক্ষ টাকা কতিপয়ণ বাবদ দিয়েছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে-দাবাদিক বৈঠকে জানানো-হয় যে তারা এ ধরনের কতিপয়ণ-দানের বিরোধী এবং তারা মাত্র কতগুলি ‘অজুহাতের’ ভিত্তিতে এত টাকা প্রদানের তদন্ত দাবি করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাস্তা পুস্তক পর্ব

স্রাতক ও স্রাতকোত্তর পর্বারে পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

- ১। বিজ্ঞানলালের কবিতা ও গান / কবিশেখর কালিদাস রায় / ৬.০০
- ২। শিল্প ও শিল্পী / শ্রীকৃষ্ণলাল দাস / ৩৪.০০

৩৫, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক (পানী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্শন কার্যালয় ৩১, মট সেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

মস্কো সি পি আইকে ইন্দিরার সঙ্গে
সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে

বিশেষ করে কাম্পিটার হেং
 লায়রিন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার
 পর পোল্ডিয়েট কর্তৃপক্ষ বেশ খুশি।
 বহিও আফগানিস্তানের ব্যাপারে
 শেখাং ১০ম পটায়



খেলার মাঠে দুর্ঘটনার জন্য
সরকার পুলিশ প্রশাসন
আই এফ এ সকলেই দায়ী

রা'না যত্নসভা ও পুলিশ প্রশাসন, আই, এফ, এ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বহিঃসিদ্ধান্ত সভতা থাকে তবে তারা কেউই অধীকার করতে পারবে না যে শনিবারের বারবেলার পশ্চিমবঙ্গে এক কলকর অধ্যায় সংযোজিত হতে বাচ্ছে—এ আশঙ্কা তারা করেননি। কিন্তু তারা সবাই জেনেগুনেই ১৬ই আগষ্টের মরণ খেলার যেতেছিলেন। ফেডারেশন কাপের পুনরাবৃত্তি যোধে বহু সভা বহু আলোচনা হয়েছে। পুলিশকেও এব্যাপারে সতর্ক করে রাখা হয়েছে। শুধু ফেডারেশন কাপ নয়, প্রত্যেকটি বড় খেলার দিন খেলার মাঠ ও এলপিয়নেড চত্বরে যে দালা দালাবার সৃষ্টি হচ্ছে পুলিশের

বলা অসংগত নয়, এসবেরই
অনিবার্য পরিণামে শনিবারের
বারবেলায় বলি হলেন ১৪ জন
অসহায় তরুণ। ষড়দূর জানা
যায় ঐ দিন খেলার মাঠের ভেতরের
দায়িত্বে ছিলেন ~~কোন~~ তরুণ
পুলিশ অফিসার মিঃ আমের।
বাইরের ইনচার্জ ছিলেন কলকাতা
পুলিশের পাঁড় মাতাল ~~জি~~
শযাংশ ১০৩ পৃষ্ঠায়

তিনি নাকি তার বন্ধু মহলে বলে
বেড়াচ্ছেন যে ১৯৭৮ সালে যখন
লোকসভার রায়ে ইন্দিরা জেলে যান
শেবাংশ ৭ম পুত্রায়

সঞ্জয়ের জন্মদিনে যুব কংগ্রেস দুভাগ হচ্ছে

স্থির হয়েছে যে, সঙ্গর পাক্ষীর
 অন্তর্নিহিত "সঙ্গরপক্ষী" যুব কংগ্রেসদীর্ঘা
 (ই) • দৃশ্য কর্তৃক চিত্রিত করা
 সত্তা এক স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর
 হাতে দেবেন।

সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস এখন
সরাসরি ছুটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে
রয়েছে। রামচন্দ্র রথ এবং সঞ্জয় সিং
দুই গোষ্ঠির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইন্দিরা
যুব কংগ্রেসীদের মধ্যে সঞ্জয় সিংয়ের
প্রত্যেকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে সর্ব-
শেষাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

ଲାଗ ଭୋକ୍ତ ଲାଗ !

বীণেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ବାଘାଣୀ—

সমস্যা

খেলার মাঠে মারামারি মৃত্যু

১৬ই আগস্ট ইডেনের নারকীর ঘটনার পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার চলতি মরসুমে বাকী লীগের খেলাগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এ মরসুমে খেলা বন্ধ রাখাই এ ঘটনার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিকার নয়। খেলা বন্ধ রাখা উচিত ততদিন যতদিন খেলোয়াড় দর্শকরা খেলার ক্ষয় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারছেন।

১৬ই আগস্টের বর্ষোচিত ঘটনার বিপরীতে কিছু দীর্ঘদিন ধরেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। খেলা দেখতে যাওয়ার সময় থেকে শুরু করে খেলা দেখে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত ছুটি বিশেষ ক্ষেত্র লক্ষ্য করা হইলে বাসে যে তত্ত্বাবধানক আচরণের নমুনা রাখা তো তাই আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট।

হাজার হাজার নিত্যযাত্রীর ট্রাম-বাস ট্রেনে যাবার যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে একদল খেলার মাঠের দর্শক যে আচরণ করত তা মত দেশে কিভাবে সম্ভব ভাবতে অবাক লাগে। গোলমালের ভয়ে খেলা ভাঙার সময় উত্তরমুখী প্রায় সমস্ত যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হত। বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাসগুলো।

আসলে এক প্রাচীর দর্শক যে খেলার ক্ষয় উন্নাদ হওয়ার ক্ষয় অতিক্রম করে ধীরে ধীরে বর্ষের উঠেছে আমাদের সামনেই সেটা আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, আই এক-এ কেউই লক্ষ্য করেও গুরুত্ব দিইনি। তা যদি বিতাম তাহলে ১৪টি অমূল্য জীবন (এ লেখা প্রেসে দেওয়া পর্বত) এ ভাবে হারিয়ে হত না।

১৬ই আগস্টের ইডেনের আব-হাওয়া যে উত্তম তা বোঝা গিয়েছিল খেলা আরম্ভ হওয়ার বন্ট খানেক আগে থেকেই। পৌষে তিনটে থেকে নেতাজী স্টেডিয়ামের দিকে দর্শক আসনে তখন ছপকের ছোটখাটো যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই উত্তেজনা খেলার বিরতির কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশবাণী ভব-নের দিকে দর্শক স্ট্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে বৈদেশ ও দিলীপের একটা অপ্রীতি-মূলক বক্তব্য করে। পেনসব

থেকে দেখা যাচ্ছিল প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সেখানে ছপকে মারামারি হচ্ছে। তবে হাজার হাজার দর্শক বিশেষতঃ হায়ে এদিক ওদিক ছোটখাটুটি করছেন। তার নিচেই ফেনিংয়ের মধ্যেই কিছু পুলিশ বলে খেলা দেখছে। পুলিশ অবশ্য ঘটনা-স্থলে গিয়েছিল এবং তারপর অবস্থা অনেকটা আরম্ভে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বা হবার তা হয়ে গেছে। তবে পুলিশ হস্ত এ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে যে, তাদের উপস্থিতির জন্য মৃতের সংখ্যা শয়ের কোঠার পৌছায় নি।

এই ভয়াবহ ঘটনার দায়িত্ব শুধু সরকার, আই এক এ ক্লাব কর্তৃপক্ষের ওপর চাপালে কিছু কোন সমস্যার সমাধান হবে না। গণপোলের সময় লোহার রড, ভোজালি মারার ঘটনাও ঘটেছে। নিশ্চয় এ সমস্ত অস্ত্রগুলো তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে হাজির হয় নি। এই ঘটনা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করে যে একদল দর্শক গণপোল করার জন্যই মাঠে আসে এবং তাদেরকে প্ররোচিত করার মত কোন ঘটনা না ঘটলেও তারা যে কোন ছুতোয় গণপোল পাকিয়ে তুলতে পারে।

মনে হতে পারে একা পুলিশের পক্ষে ৮০ হাজার দর্শককে সামলানো সম্ভব নয়। কিন্তু পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে গণপোল এড়ানো যেতে পারে। দিলীপ বা বিদেশকে দায়ী করেও লাভ নেই। যদিও খেলোয়াড়দের আচরণ দর্শকদের প্রভাবিত করে। আসলে দিলীপ বা বিদেশ-দের আচরণ তো সত্যতঃ হওয়া উচিতই কিন্তু দর্শক লক্ষ্যকরা যতদিন না সত্যতঃ হচ্ছে, যতদিন না দর্শক-লক্ষ্যকদের একাংশের মধ্যে সমাজ বিরোধী প্রবণতা দমিয়ে দেওয়া যাচ্ছে ততদিন ছুটবল খেলা বন্ধ রাখা উচিত। নচেৎ সরকারকে আরও ক্লেশের মধ্যে যেতে হবে।

এছাড়া একপ্রাচীর পত্র-পত্রিকা এবং ছুটি বাংলা দৈনিকও খেলা-গুলোর প্রতিবন্ধিতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যাতে উত্তেজিত হবার যথেষ্ট ঝোঁক থাকে। জীড়া সাংবাদিকদের উচিত উত্তেজনা কমানোর জন্য খেলার সংবাদকে একে-বারেই প্রাধান্য না দেওয়া।

দেশ কাল রাজনীতি

শ্রেণী সংঘর্ষের সতর্কবাণী

ভারতপুত্র

গত তিরিশ বছর ধরে পনেরোই আগস্ট দিনটিতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা বে-বাধী জাতির উদ্দেশ্যে অসংখ্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিতরণ করে এসে-ছেন, এবার দেশের তেজস্বীতম স্বাধীনতা দিবসেও রোতার টেলি-ভিশন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই কলের গানই বাজতে শোনা গেল। সহজ-সরল বুদ্ধির সাধারণ মানুষ প্রতিবছরই এই ভাষণ শুনে নতুন আশার বুক বাঁধেন : এবার অবশ্যই স্বাধীন আসবে, ঘোষ কর্তা যখন বলেছেন, তখন বাক্যনা হতাশায় অন্ধকার ঘুচে, স্বপ্ন সন্ধানির আলো ফুটে। কিন্তু বছরের পর-বছরের চাকাই কেবল পত্রিকার তিথি-নকশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরতে থাকে, গরিবের কুটির সূর্যালোক প্রবেশের পথ পায়না। এবারও রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি গরিবের হৃদয়ে অশ্রু বর্ষণ করেছেন, নেতাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে-ছেন, কিন্তু আগামী বছরে কি তার ফলশ্রুতি ঘটবে দেখা যাবে, তেজস্বী-তম পুণ্যলগ্নে অস্ত্র স্বর রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে শোনা যাবে?

জাতীয় দিবসকে উপলক্ষ হিসাবে পাওয়া গেলে জাতীয় নেতারা কিঞ্চিৎ আত্মসম্মানের স্বযোগ ছাড়তে পারেননা। সেদিন সাধারণ মানুষের মনের কথা খোলাখুলি বলে কেলার একটা রেওয়াজ এদেশে সৃষ্টি হয়েছে। সেই প্রথা অক্ষয় রেখেই ত্রিভুজি সেদিন তার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে পরিকল্পনামূলক অর্থনৈতিক বুদ্ধির পথ অক্ষয়ণ করার পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য-নীমার নিচেই পড়ে রয়েছে, অর্থ-নৈতিক ত্রিভুজি স্বল্প সাধারণ মানুষ-তো লাভ করেনি, বরং ধনী আরো ধনী এবং দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও গরিবের জুবেলা আহাির জোটে না। কারণ সে-পণ্য সংগ্রহ করার মতো ক্রয়ক্ষমতা তার নেই। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মিত হচ্ছে, সে প্রতিবাদ আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রপতিজী তাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, এ-পরিস্থিতির যদি দ্রুত পরিবর্তন ঘটানো না হয়, যদি ত্যাগের আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ না

হয় এবং সমাজের রূপান্তর ঘটানো না যায়, তবে অচিরে শ্রেণী সংঘর্ষ দেখা দেবে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের তার সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার আহ্বানও রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে এই সংকটের মুহূর্তে বিরোধী দলগুলোরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব রয়েছে যার ভাষা সরকারী নীতি ও কাজ-কর্মের নমালোচনা হতে পারে কিন্তু কখনই নিন্দাজ্ঞাপক যেন না হয়।

কিন্তু দেশের এ-হাল আজ হল কেন, করল কারা?—রাষ্ট্রপতি তার স্পষ্ট ভাষণে তা স্পষ্ট করেন নি। আজ যেমন দেশে সংসদের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে একদলীয় সরকার গঠিত হয়েছে—পরোক্ষে বহু-দলীয় জনতা বা লোকদল সরকারই নিন্দা করা হয়েছে—সে জাতীয় সরকার তো ভারতবাসীর কাঁধের ওপর তিরিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে চেপে বসার স্বযোগ পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু সাধারণ গরিব মাছুষের ক্ষমতা, দায়িত্ব দূরীকরণে কী কার্যকর ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন? দরিদ্রের স্বার্থবাহী অর্থনৈতিক কর্মসূচি যদি তারা নিয়ে থাকেন, তবে আজ কেন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য এত উৎকট হয়ে উঠেছে? কেন মূল্য-বৃদ্ধির কারণে দেশের দিকে দিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে? জনস্বার্থ-মুখী সরকারী নীতি রূপায়ণে বিরোধী দলগুলোর সহযোগিতার কখনই বাটতি দেখা যায়নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থের পরিপন্থী কোন নীতি বা পন্থা অক্ষয়ণ করলে, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হরণকারী ও গণতন্ত্র-বিক্ষংসী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে বিরোধী দলগুলো কেন তাতে সাহায্য করে আত্মঘাতী হতে যাবে।

ত্যাগ যদি কারো করতে হয় তবে সেটা করা সরকার কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বেরই। তা করতে হবে ধনিক ও পুঁজি ভোষণের পথ পরিহার করতে হবে। সামাজিক জ্ঞান বিচার ও অর্থনৈতিক সাহ্যের সৌধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর রচনা করা সম্ভব নয়, বৃহত্তম গণ-তন্ত্রের মর্যাদা বৈরতন্ত্রের সেবকদের

হাতে নিয়ন্ত্রণ নয়—প্রবীণ রাজ-নাতিক সঞ্জীব রেড্ডির এ উপলব্ধি থাকি সন্দেহ এই স্বযোগে স্ব কলকে বেরিয়ে পড়ল না।

বহুসংসদে লঘুক্রিয়া?

আগামী কি বহুসংসদে লঘুক্রিয়াই হল? চাকচোল পিটিয়ে পূর্বনির্ধা-রিত দিনকণ্ঠেই শিলঙে আবহ ও পরিবর্তন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বরাহ্ম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকওয়ানা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূল পরস্তার প্রশ্ন উত্থাপনের আগেই আলোচনাটা দরকচা হয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছে। আন্দোলন-কারীরা সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহত না হলে আগল কাজে হাতই দিতে মারাজ। বৃত সরকারী কর্মচারীদের সূক্তি আদায়ের দাবিতেও তারা অবিচল। তাছাড়া এ-আলোচনা-বৈঠকের যিনি মূল স্থপতি সেই মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী যোগেন্দ্র সিং-এর আসরে অস্থগ্নস্থিতেও তারা ক্ষুব্ধ।

মাকওয়ানা অবশ্য খোলা মনে আলোচনার ক্ষমতাই শিলঙে উপনীত হয়েছেন। এর জন্য তিনি দুদিন বেশি প্রবাসে কাটাতেও রাজি। কিন্তু গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা, আইন ইত্যাদি পাল্টাতে তিনি রাজি নন। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে, আন্দোলনকারীরা তার সম্মানতুল্য, তাদের প্রতি তিনি মহাহুত্মিত্বী। কিন্তু সে-মহাহুত্মির অস্ত্র নমুনাই বোধ হয় আন্দোলনকারীরা পেতে চান। অর্থাৎ শিলঙে কাজের অগ্রগতির বদলে পণ্ডিতমই হল।

যুব কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর ভারতীয় যুব কংগ্রেস (ই) সভাপতি রামচন্দ্র রথ সংগঠনকে শক্তিশালী করার নামে রাজ্য সফরে বেরিয়ে পড়েছেন। উদ্দেশ্য হল নিজের প্রভাব বাড়াবো। রামচন্দ্র রথ সঙ্গর গান্ধী বিরোধী গ্রুপের মাথা ছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার সঙ্গর গান্ধীর মৃত্যুতে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আগামী ১৪ ডিসেম্বর সঙ্গর সিং রামচন্দ্র রথের বিরুদ্ধে অনাগা প্রভাব আনবেন এক তলবী সভা ডেকে শ্রির আছে যে, সেদিনই পাল্টা যুব কংগ্রেসের অভিযুক্ত ঘোষণা করা হবে। শোনা যাচ্ছে সেদিন সঙ্গর সিং আরোজিত এক সভা হবে বোট ক্লাবে এবং তাতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজীব গান্ধী।

হাওড়া স্টেশন এলাকা নরককুণ্ড

পুলিশের সঙ্গে সমাজ বিরোধীদের গাঁটছড়া

মাত্র এক পক্ষ কালের মধ্যে জনবহুল হাওড়া স্টেশন এলাকায় কুখ্যাত ছুঁড়ুদের আওতে একজন শিশু নিহত হয়েছে। কয়েকজন মারাত্মক জখম হন। সূত্রে হয়েছে একজনের আঠার হাজার টাকা। সরকারী গোড়াউন থেকে লরী ভর্তি চাল গয় বাতায়ত কালে পাচার হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল। এক কথায় হাওড়া স্টেশন চমকটি তখন পুরোপুরি নামকরা, দাগী সমাজ-বিরোধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে অথচ ছুঁড়ুদের বখলীকৃত গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া স্টেশন এলাকাটি থেকে জেলা শাসকের বাসভবন মাত্র দিকি মাইল। হাওড়া জি, আর পি প্ল্যাটফর্ম পুলিশ, গোলাবাড়ী থানা সবই রয়েছে, কিন্তু মানা অপকর্মে এলাকাটি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে বোম্বাজী চলছে। চলছে লুট তরাজ মদ ও মহিলা নিয়ে বেপরোয়া হুমুড়। আইন শৃঙ্খলার অবনতির সম্ভবত চূড়ান্ত জটব্য স্থান হয়ে উঠেছে লাখ লাখ টেন ও বাস যাত্রীদের বাতায়ত স্থান হাওড়া স্টেশন এলাকাটি।

এখানে বলা যেতে পারে স্বর্ণ বহবার হাওড়া স্টেশন এলাকায় সমাজ বিরোধীদের নামা অপকর্মের বিস্তারিত তথ্য নাম ধাম সহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু কার্যত কিছুই হয়নি। পুলিশের লগ্নে এলাকার চোর, ডাঙ্গা, ছিনতাইবাজদের গাঁটছড়া এতই শক্ত যে তাতে জেলা প্রশাসনও লম্বাঘাট অসহায়। এরই কল ভুগতে হচ্ছে মিত্য বাতায়ত কারী লাখ লাখ যাত্রীকে।

দিন কয়েক আগে একজন ছুঁড়ু প্রকাশ্য দিবালোকে হাওড়া বাস-ষ্ট্যাণ্ডে বোমা ছুঁড়ে ছুঁড়ে অপর হলকে শায়েস্তা করার জন্য দুটো ছুঁড়ু তর করে দেয়। একপক্ষের তাড়া খেয়ে অপর পক্ষও পাণ্টা জবাব দিতে থাকে। কলে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের প্রাণ টানটানি। ছুঁড়ু বেপরোয়া বোমাবাজী করার পর এলাকা ত্যাগ করলে যাত্রীরা কোন মতে প্রাণ নিয়ে বাড়ী ফেরেন। এই ঘটনার দিন-ই এলাকার চন্দ্র-লোক হোটেল আক্রান্ত হয়। ছুঁড়ুরা হোকানের ভেতর এলো-মেলো বোমা ছুঁড়ে হোকানের মালিকের দাত / আট বছরের নাটিকে নৃশংসভাবে খুন করে।

এলাকার অসহন্য করে থানা যায় স্টেশন চমকে গুণগোলের তর

বহরিন আগে থেকেই। এর-মূল কেন্দ্র হলো স্টেশন সংলগ্ন হাওড়া ফিস মার্কেট। বোম্ব, আগা, দিল্লী ওড়িশা, ভিজাগাপটম, প্রভৃতি জায়গা থেকে এই বাজারের জন্ত মাছ আসে। এই মগ মগ মাছ স্টেশন থেকে ফিস মার্কেটে নিয়ে আসার জন্ত রয়েছে ঠেলাওয়াল। এই মাছ নিয়ে আসার জন্ত মাছের আড়ং-হাররা যে পরমা দ্বিতেন তার শত-করা পরজিহ্ন তাগ নিতেন ঠেলা-ওয়ালদের ঠিকাদার, বাকী পরমটি তাগ-পেতেন ঠেলাওয়াল প্রমিকরা। ঠিকাদার সরানোর নাম করে পরমা খাওয়ার তালে বামজুট মস্তিস্তা আশার পর হাওড়ার কুখ্যাত সমাজ বিরোধী লালু খটিক ফরওয়ার্ড রকের আশীর্বাদ নিয়ে এক ইউনিয়ন তৈরী করে বসে। সুক্রায় কানোরিয়া ও ঋষি বক্রিমচন্দ্র রোডের সংযোগস্থলে সরকারী জমি জবর দখল করে লালু ইউনিয়ন অফিস খোলে। এর উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার

পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর ও গ্রামের উন্নয়ন স্বার্থী ত্রিশ বছর ধরে অবহেলিত। সেখানকার অবস্থা অবর্ণনীয়। তাই লোকাল গভর্ণ-মেন্টে আগু আরবান ডেভেলপমেন্ট নামে একজন দপ্তর তৈরী হয়েছে ১৯৭০ গারিস্টন প্রেস, কলকাতা-১ এই ঠিকাদার। এই কৃত্তিক অবস্থাই পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের। খুব কম ভাড়ায় একটি ছোট বাড়ী নিয়ে শ্রীশূর যে দপ্তর কলকাতায় রেখেছেন তাতে সরকারী টাকা অপব্যয়ের সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তারা এখানে এসে উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রাণ পরামর্শ নিচ্ছেন। শ্রীশূর অত্যন্ত বাস্তব নিষ্ঠ এবং দূরদর্শী তা প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু শ্রীশূরের ছোট মনুষ্য দপ্তর তৈরী হওয়ার পর ডঃ অশোক মিজের টার্টন অ্যাণ্ড কানটি প্র্যানিং দপ্তরের প্রয়োজন কি? তার কার্যের কিচ্ছ-কোথার? নিশ্চয়ই গ্রামগঞ্জ ও পঞ্চায়ত এলাকা। সেখানে প্র্যানিং মানে তো চাষাবাস, মৎস্ত, পবাদি পশু, ডিশ টিউবওয়েল। তার জন্ত ডঃ মিজ এক গাধা আমেরিকা-ফেরৎ বৃহৎ প্রানার, ইঞ্জিনীয়ার ও বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট বাবুগণকে বিরাট মাইনে দিচ্ছেন কেন? কেনই বা মহানগরীতে হাজারখানেক ঠাক

ডেপুটি স্পীকার খনামধন্য পুন্ড কলিমুদ্দিন শায়স। রাজদেও সিং, নওলকিশোর সিং, সুরেশ সিং, রাম-চন্দ্র নাউ, স্বরূপপ্রসাদ নাউ, বশিষ্ঠ মারায়ণ সিং প্রমুখ ঠেলাওয়ালদের ঠিকাদার ছিলেন। এরাও কমতি মন। এঁদের লগ্নেও কম সমাজ বিরোধীর মেলায়েশা ছিল না। এঁদের সঙ্গে লালুর দলবলের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এর বলি হয় বশিষ্ঠ নারায়ণ। হঠাৎ একদিন নৃশংসভাবে পাণ্টা পক্ষের দারা ঘায়েল হয়ে সে মারা যায়। এরই নামাজ আগে পরে ঠেলাওয়াল ঠিকাদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে এক সমিতি গড়ে তোলে। এরপর ছুঁড়ুদের রেবারেবি বিভিন্ন খাতে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটি এখন শুধু পুরনো বিবাহে নীমাবদ্ধ নেই, এখন এলাকার সমাজ বিরোধীদের হালচাল দেখে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, তারা স্বযোগ বুঝে লুটতরাজের কাজ চললেই খুশি। তারা নিজেরা খুশি হয়ে

বসিয়ে বসিয়ে অলস করছেন? কলকাতা ও মেট্রোপলিটান এলা-কার প্র্যানিং সম্পর্কে একমাত্র দায়িত্ব-শীল সংস্থা সি এম ডি এ—তারের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্র্যানিং সেল রয়েছে এবং প্রশাস্ত শূরই তার কর্তা। স্বতন্ত্র মহানগরীতে ডঃ মিজের দপ্তর থাকার কোনও ভিত্তি নেই। ধর্মী শিল্প-পতির কাইফেশার বাড়ীতে অফিস ভাড়া বাবদ বিপুল টাকা বামজুট সরকারের দুর্বল তহবিল থেকে খরচ হয়ে যাচ্ছে ডঃ মিজের দপ্তর রাখতে। অথচ আলানসোল প্র্যানিং সেল ও শিলিগুড়ি প্র্যানিং সেল যথেষ্ট কর্মী ও টাকা পেলে কাজ করতে পারত। মুখ্যমন্ত্রী ঐ সব অফিসের উন্নতিতে আগ্রহী তা সুবিধিত, ডঃ মিজ ও ডা চান, তবু সেটা হচ্ছে না কেন? দপ্তরের আমেরিকা ফেরৎ কোনও মার্কিনগরী পোয়েন্টা, খাঁচের অফিসার চক্র কি ডঃ মিজকে ক্রমা-গত ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন? তাঁর টাকিক প্র্যানিং সেলকে পলু অলস করার জন্ত টাকিক আও টানপোটেশন বোর্ড মানে উদ্দেশ্যবিহীন নতুন দপ্তর বানিয়ে কলকাতার বদে থাকার চক্রান্ত চলছে বলেও জানা গেছে।

ডঃ মিজের পরিকল্পনা-দপ্তর অলস

পুলিশকে খুশি করতে খোটেও পিছ-না ময়। সে ব্যবস্থাও পাকা। শোনা যাচ্ছে শুধু গোলাবাড়ী থানার জটনক অফিসারকে ছুঁড়ুদের জটনক মৃণপাত্র প্রত্যেক মাসের এক তারিখে তিন হাজার টাকা দিবে আসে। তাই হাওড়া স্টেশন এলাকাটি এখন পুলিশের নয়, তা সমাজবিরোধীদের কবলে। এলাকার কুখ্যাত নীতারাম। তোলাউড়িয়া শায়সের, দারভানি, শঙ্কু, মল্লু, নকর, লছমীর বেপরোয়া কাজকর্ম দেখে মনে করা শক্ত যে, হাওড়ার কোন পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। রয়েছে জেলা শাসক। রয়েছে সর্বোপরি তিন তিন জন মন্ত্রী।

পুলিশ জানে, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টের কোয়ার্টারে...এই ছুঁড়ুদের আড্ডানা। এবং এরই সন্নিকটবর্তী জী টামেল দিয়ে সরকারী গোড়াউন থেকে চাল গয় বাওয়ার সময় নীতা-রাম ও তার দলবল লরীগুলিতে বেপরোয়া লুটতরাজ চালায় এবং এ ঘটনা একদিন ময় প্রতিদিন। সত্য-মারায়ণ ধর্মশালার আশেপাশে চোলাই ময়ের কারবার চালিয়ে শঙ্কু, মল্লু, নকর, নীতারাম এলাকাটিকে

নরক করে তুলেছে পুলিশের উপ-স্থিতিতেই নীতারাম, লছমী ভবন রোডের মুখে প্রতি রাতে টন টন লোহা পিঁচুর করছে। পুলিশের এসব কিছুই অজানা নয়।

ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন শায়স কুখ্যাত সমাজবিরোধী লালু খটিকের ইউনিয়ন অফিস উদ্বোধন করার পর থেকে এলাকার অনেকেরই ধারণা, এই মস্তিস্তার পক্ষে এসব সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় এবং তা নয় বলেই দিনের পর দিন এলাকাটি লুণ্ঠন মাছের কাছে তরংকর হয়ে উঠেছে। লুট কারণেই প্রাণ উঠেছে, হাওড়া স্টেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান লুণ্ঠন ও সমাজ বিরোধী মুক্ত রাখার ব্যাপারে সরকারের কি কোন কিছুই করণীয় নেই। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। উনিও কি শুটিক কু কুখ্যাত সমাজ বিরোধীর হাতে হাওড়া স্টেশন এলাকাটি তুলে দিয়ে নির্লজ্জ উদ্বাসীনতায় বুঁদ হয়ে থাকবেন?

টাউন ও কানটি প্র্যানিং দপ্তরে কাজ কিছুই হচ্ছে না

এই চক্রের নারকরা ঐ দপ্তরের তিন-জন "সেক্রেটারিয়েট বাবু"। কংগ্রেসী আমলে এরা তিনটে প্রমোশন পেয়ে খুব উচ্চপদে উঠেছেন। কাইলপজে তাঁদের খেয়াল খুশি ও প্রতিহিংসাপূর্ণ নোটিশ অস্থায়ী কাজ করতে ডেপুটি সেক্রেটারি পর্ষদের অফিসাররাও বাধ্য হচ্ছেন। এই ভিন্নমতের এক-জম হলেন কালো বৈটে চেহারার "সুহৃদ মল্লু" ডাকনামে অত্যন্ত এক অফিসার। এরা প্রায়ই লগ্নে বলেন—"ছুঁড়ুগার্টে নির্বোধ কাঁকিবাঁজ ডেপুটি সেক্রেটারি বা মন্ত্রী আমাদের পকেটে থাকে। ওদেরকে আমরা পুতুল ছাড়া আর কিছু মনে করি না।" এই বাবুদের কর্মদক্ষতার (?) ফলে দপ্তরটি এখন অচল এবং দপ্তরেব বিরুদ্ধে একগাদা মামলা জুলাচ্ছে মহা-মাত্র হাইকোর্টে। এক অজ্ঞাত আকোশবশতঃ তাঁরা অনেক কারি-গরী কর্মীর বার্ষিক ইমক্টিমেন্ট বন্ধ রেখেছেন। কিন্তু ইমক্টিমেন্টের ও দাব আনিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারদের প্রমোশন এবং ড্রাকটসম্যানদের সিলেকশন গ্রেড বহুকাল ধরে আটকে রাখা হয়েছে। সিলেকশন গ্রেডের ব্যাপারে হাইকোর্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বযোগ রেখেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু "বাবু"রা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন,

নীতিব। দপ্তর প্রায় অচল। হাই-কোর্টের এইসব মামলার সরকার পক্ষ যে একটি ক্ষেত্রেও জিততে পারেন নি তা থেকেই "বাবু"দের জর্নীতি, অত্যাচারী চরিত্র এবং বামজুট সরকারের বিরুদ্ধে বড়বড় প্রমাণিত হয়। এদের কুকীর্তির ফলেই স্বপ্রীম কোর্টের একটি মামলাতেও বামজুট সরকার অসহিষ্কার পড়েন ও নাস্তা-বাবু হন।

এই কারিগরী দপ্তরে কারিগরী অফিসার ও কারিগরী কর্মীদের খেপিয়ে তুলে কাজকর্ম অচল করা, অজস্র মামলাতে দপ্তরকে জড়িয়ে থকম করা, বর্তমান মন্ত্রীকে বহু ক্রিম লম্বার মধ্যে জড়িয়ে পাগল করার বড়বড় বানানো, অনেক ডেপুটি সেক্রেটারী ও আই এ এস অফি-সারকে এই দপ্তর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা, সেক্রেটারিয়েটের অজ্ঞাত বাবুদের প্রমোশন নষ্ট করা, কংগ্রেসী সময়ে নিজেদের তিনটে করে প্রমোশন নেওয়া ইত্যাদি বহু কীর্তি অবাদে করতে পেয়ে এই বাবু তিনটির বুকের ছাতি ফুলে উঠেছে। এইসব অপকর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে অনারেরিয়াস বাবদ টাকার কয়েকটি এরা পেয়ে

এন টি সি প্রকল্প শাখার চেয়ারম্যান রাজ্যপাল ও সংসদের অবমাননা করেছেন

এন টি সি (পূর্বকল) সার্বস্বিক-
রায়ী চেয়ারম্যান শ্রীমতী সুনীল
ব্যা না জী তার দুরভিসন্ধিমূলক
বিখ্যাতার দ্বারা শুধুমাত্র ১৮টি মিলের
১৮ হাজার কর্মচারীই সর্বমুখ
করেন নি, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়
রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সংসদকে বিভ্রান্ত
ও চরম অবমাননা করেছেন।

আজ এন টি সি-র সকল শ্রেণীর
কর্মচারীই এক প্রঃ : মা ম নী র
রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় সংসদকে
ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত ও অবমাননা
করার দ্বারা শ্রীব্যমার্জীর বিরুদ্ধে
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না
কেন ?

একথা সকলেরই জানা আছে যে
বর্তমান পরিচালন কাঠামো অস্থায়ী
এন টি সি (পূর্বকল) সার্বস্বিকরায়ী
অংশীদার হলেন : (১) এন টি সি
(দ্বিতীয়) লিমিটেড (২) রাজ্যপাল,
পশ্চিমবঙ্গ (৩) রাজ্যপাল, বিহার (৪)
রাজ্যপাল ওড়িশা এবং (৫) রাজ্য-

পাল, আসাম। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের অর্ধাংশ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-
পালের নামে যে শেয়ার আছে তা
প্রায় ছয় শতাংশ।

আইন অস্থায়ী বার্ষিক রিপোর্ট
ও আর ব্যয়ের হিসাব পরিচালক-
মণ্ডলী অর্ধাংশ বোর্ড অব ডাইরেক্টর ও
প্রধান শ্রমিকদের অর্ধাংশ শেয়ার
হোল্ডারদের সভায় পেশ করতে হয়।
বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশীদারগণ
ওই রিপোর্ট ও আর-ব্যয়ের হিসাব
গ্রহণ করলে, অর্ধাংশ ওই রিপোর্ট
গৃহীত হলে তা পেশ করা হয় কেন্দ্রীয়
সংসদে।

১৯৭১ সালে ১৫ই মার্চের
শ্রমিকদের বার্ষিক সভায় ১৯৭১-৭২
সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট ও আর-
ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়েছে
এবং যা সংসদে পেশ করা হয়েছে
তাতে কতকগুলি সাংবাদিক
বিস্ময়িত তথ্য পরিবেশন করা
হয়েছে। রিপোর্টে এক ভয়ঙ্কর

বলা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের অক্টো-
বরে এক যুগান্তকারী চুক্তি হয়েছে
পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি কেন্দ্রীয় ট্রেড
ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে যার ফলে
পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি মিলে প্রায় ৩০০০
অতিরিক্ত শ্রমিক আধুনিকীকরণ ও
বহুপাতির সম্প্রদায়ের ফলে আর
অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে না এবং
বহুপাতির সার্বিক ব্যবহার বেড়ে
দাঁড়াবে বর্তমান ৭০ শতাংশ থেকে
৯০ শতাংশে। এর ফলে মাসিক
ক্ষতির পরিমাণও কমে যাবে প্রায় ২১
লক্ষ টাকা। অর্ধাংশ মনো-কলবে।

অথচ, এই তথ্যকথিত ওয়ার্কলোড
চুক্তির ধরন যারা রাখেন তাঁরা
জানেন এটা কতবড় মিথ্যা। এই চুক্তি
সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা
সঙ্গে বা জি পাকিস্তানে হয়ে নি।
হয়েছিল বিশেষ তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড
ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে এবং তাও
দ্বিপাক্ষিক ভাবে।

ওয়ার্কলোড মহল জানেন যে
১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে
সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা-
গুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ভাবে স্বতী-
বন্ত্র দিয়ে একটি চুক্তি হয়েছিল।
ওই চুক্তি অস্থায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ছাড়া বিশেষ কমিটি নিয়োগ করবেন
স্বতীবন্ত্রশিল্পে ওয়ার্কলোড নর্থ ঠিক
করতে ও শ্রমিকদের বেতন বা মজুরী
কাঠামো নির্ণয় করতে। ইতিমধ্যেই
সরকার কমিটি দুটি গঠন করেছেন।

কিন্তু ব্যামার্জী সাহেব সরকারের
কাজ অপেক্ষা করেন নি। সভা
বাহবা কেনার উদ্দেশ্যে উনি
দ্বিপাক্ষিক ভাবে তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড
ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে ওয়ার্ক লোড
চুক্তি করলেন এবং তাও মাজ হু'
ধরনের শ্রমিকদের ক্ষতি—Piecers of
Ring Frame ও Weavers of
Room Shed. ব্যামার্জী সাহেব
তুলে গেলেন যে একটি আধুনিক
কাপড় ফলে প্রায় একশো ধরনের
কাজ আছে এবং প্রতিটি ধরনের
কাজে শ্রমিক আলাদা। উনি হু'
ধরনের শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে
বাকী ১৮ ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে
বিকোভ জাগিয়ে তুললেন।

একবারও ব্যামার্জী সাহেব ভাব-
লেন না যে ১৯৮০ সালের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
টাইম্যানালের দ্বারা Piecers দেব যে
মজুরী নির্ণয় করা হয়েছিল তার মধ্যে
একটা বিজ্ঞানমূলক নীতি ছিল এবং
ওর নয়া চুক্তি সেই নীতি বিরোধী।

শ্রীব্যমার্জীর নীতিজ্ঞানহীন
কাঠামো দিতে হচ্ছে ১৮ হাজার
কর্মচারীর মধ্যে ১৮ হাজার

কার্যকর হয়নি। বরং মাজ হু'ধরনের
শ্রমিকদের মজুরী বাড়ার ফলে বাকী
শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চরম
অসন্তোষ আর বিকোভ। উৎপাদন
কমছে। মিলে মিলে চলছে
আন্দোলন।

মজিবাবু এম, টি, সিতে লোক-
সানের জড় দায়ী করেছেন মূলতঃ
রাজ্যের বিদ্যুৎ বিভাগ ও শ্রমিক-
কর্মচারীদেরকে। ওর মতে বিদ্যুতের
মোটটি আর একশো শতাংশ কর্মচারীর
অন্তর্ভুক্তমূলক কার্যকলাপই নাকি
লোকসানের প্রধান কারণ।

কিন্তু আমরা বলি : মজিবাবু,
রাজ্যে বিদ্যুৎ খাটতি আপনার কাছে
শাপে বর হয়েছে। বিদ্যুৎ খাটতি
না থাকলে আপনার ওস্তাদি অনেক
আগেই ধরা পড়ে যেত। আর,
আপনিও মনেপ্রাণে চাননা যে বিদ্যুৎ
খাটতি মিটুক। চাইলে, অনেক
আগেই মিলগুলোতে জেনারেটর
বসাতেন। টাকার অভাব ছিল না।

আপনারই প্রকাশিত "Pro-
gress of modernisation and
expansion schemes of the
mills under NTC (WBABO)
Ltd" নামক পুস্তিকাতে দাবী করা
হয়েছে যে ১৯৭১ সালের মার্চের
আগেই কেন্দ্রীয় সরকার আপনা-
দেরকে জেনারেটর কেনার জন্য ৬০
লক্ষ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করে-
ছিলেন। বিভিন্ন মিলের জন্য বরাদ্দ
ছিল এই রকম : রামপুরিয়া—৬ লক্ষ

২০ হাজার টাকা, গয়া কটন এণ্ড জুট
মিলস—১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা,
মহালক্ষী—৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা,
নেটাল কটন মিলস—৭ লক্ষ ৫০
হাজার টাকা এবং বঙ্গলক্ষী—৫ লক্ষ
৮০ হাজার টাকা। তাহলে কিনলেন
না কেন ?

মজিবাবু, আপনাকে আর
একটা প্রশ্ন : আপনিতো রাজ্য স-
রকারের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন বিদ্যুৎ
খাটতির জন্য। আপনার নিজের
দোষটা কেবে দেখেছেন কি ? কেবে
দেখেছেন কি জেনারেটর সময় মত
বদলে মিলগুলোর দশা আজ এমন
হোত না।

আপনি তো বিবৃতি দিয়ে
শ্রমিকদের ওপর অন্তর্ভুক্তমূলক
কাজের অভিযোগ এনেছেন আর
বলেছেন শ্রমিক ব্যবসায়ী সংযোগে
এই অন্তর্ভুক্ত চলছে। আমাদের
প্রঃ : অন্তর্ভুক্তমূলক কাজ করতে
কে—আপনি নিজে, না শ্রমিক-
কর্মচারীরা ? ব্যবসায়ীদের সঙ্গে
সংযোগ রক্ষা করে কে—আপনি, না
শ্রমিক-কর্মচারীরা ? ব্যবসায়ীদের
গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে কোথায়—
আপনার বেহালার বাড়ীর সামনে, না
অন্ত কোন শ্রমিক-কর্মচারীর বাড়ীর
সামনে ? রাজ্যে বাড়ী ফেরার পথে
যরদানে আপনার সঙ্গে পদচারণা
করে কে—কোন কর্মচারী, না কোন
কোন ব্যবসায়ী ?

সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ও বিজ্ঞান ম্যানেজমেন্টে দারুণ গড়গোল

ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজ-
নেস ম্যানেজমেন্ট ত্রিশার সাল থেকে
কাজ চালিয়ে আসছে। তখন এর
সভাপতি ছিলেন তৎকালীন মুখ্য-
মন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও সহ সভাপতি
ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাচার্য। ম্যানেজমেন্ট ও লেবার
ওয়েলফেয়ারের শিক্ষাপ্রদানে ভারতে
এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে
দারুণ গড়গোল চলছে। ডিরেক্টর
ডঃ ডি, কে, দত্তর খামখেয়ালীপনা
ও অপদার্য পরিচালনের জন্য প্রতি-
ষ্ঠানটি পঙ্ক হতে বসেছে। এর
সুনাম নষ্ট হয়েছে ও সাড়ে তিন লক্ষ
টাকার বেশি আর্থিক ক্ষতিও
হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন
শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেওয়ার
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা চূড়ান্ত
আর্থিক সমস্যার পড়েছেন। এ
মাসের পরলা তারিখে তাঁদের বেতন
দেওয়া হয়নি, ফলে মধ্যবিত্ত কর্মচারী
পরিবারগুলোর অবস্থা খারাপ
হয়েছে।

সংস্থার শিক্ষক ও অশিক্ষক
কর্মী-অভিনেতা কমিটির
প্রঃ : ডি, কে, দত্তর

দখলনে উক্ত অভিযোগ করেন।
তাঁরা আরো বলেন যে, ভর্তি বন্ধ
হওয়ার ফলে কেন্দ্র সাহায্য পাঠাচ্ছে
না। মিরিষ্ট সাহায্য না আসাতে
কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রাণিৎ এ্যাণ্ড
ডেভলপমেন্ট খাতে যে টাকা রয়েছে
তা দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ওটার
ড্রাকটে বেতনের টাকা জোগাড় করা
হচ্ছে। ছু-তিন মাসে এই টাকাও
ফুরিয়ে যাবে।

এই সকল সমস্যার সমাধানে
কো-অভিনেতা কমিটি কতকগুলি
দাবি রেখেছে। বর্তমান ডিরেক্টর
ডঃ ডি, কে, দত্তর অপসারণ, বি-
ভাগালয়ের কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত
অনুযায়ী নতুন পরিচালন বোর্ড গঠন;
বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র ভর্তি পুনরায় শুরু
করা ইত্যাদি। প্রস্তাবের অস্থলিপি
তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বহু ও
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে
পাঠিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে
ইনস্টিটিউটের বিল্ডিং এখন
চূর্ণাভিগ্রস্ত ডঃ ডি, কে, দত্তর
অপসারণের দাবিতে প্রচুর পোষ্টার
দেওয়া হয়েছে। শ্রী বহু নাকি
অনেক প্রতাবশালী জনতা পাঠির
নেতার খনিষ্ঠ আত্মীয়। এই নেতা
সংস্থার বর্তমান সভাপতি শ্রীপ্রফুল্ল
সেনের অতি প্রিয়পাত্র। একারণেই
ডিরেক্টরের বৃদ্ধ বয়সে

দর্পণের সংবাদ লোকসভায়

মাকতি, নাগরওয়াল, তুলহোহন
রায় এম. এম. বিজ লাইসেন্স কলে-
জারী মতো বরকত মিকার করলার
পারমিট প্রদানের কেলেকারী
কাস করেছেন জ্যোতির্ময় বহু।
এবারের লোকসভায় জ্যোতির্ময়বাবু
কার্যতঃ অমাত্রা প্রস্তাব আনেন।
একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর
অভিযোগ লংকাস্ত আলোচনার
প্রধানমন্ত্রী হাউসে অস্থপস্থিত
থাকলেন। আসামীর মুখে কোন
কথা নেই, জেলেরাছবের মতো
সওয়াল করলেন স্টিকেন।
বরকতের জুল ভালসো, বুঝলেন যে
এটা জেলার পক্ষায়েত মিটিং হচ্ছে
না, সংখ্যার কম হলেও ওজনে ভারী
জাধরেল সব এম, পি-রা এককীটা।
বহরমপুরে বরকত সাহেবের লোক
হৈকেছে 'করলার পারমিট নেবে
গো' বলে আর দ্বিতীয় থেকে উনি টন
প্রতিবিশ টাকা বা পকেটে নিয়ে
১৩৪টা পারমিট দিয়েছেন। এমন
কি দশ বছরের ছেলেও করলা
বিক্রির পারমিট পেয়েছে।

জ্যোতির্ময় বহু একজন নিরীহার
পার্লামেন্টারিয়ান। তাই দর্পণের
৬ জুন '৮০ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায়
'জীবনদায়ী ওষুধের নামে আমেরিকা
এদেশে বিব পাঠাচ্ছে' শীর্ষক খবরটা
পড়েই খোজখবর নেন। এই খবরের
শ্রদ্ধ ধরে লানক্রালিসকোর 'মাদার
জোক' নামক মাসিক পত্রিকাটি
সংগ্রহ করে পড়েন। আমেরিকার
সরকার তরুণ বিক্রি নিষিদ্ধ তেজাল
ও সেবনে অব্যোগ্য কৃতিকর ওষু-
ডলো কিভাবে মালটিজাশামাল
কোম্পানীগুলো ভারত সহ-তৃতীয়
বিশ্বের দেশগুলোর রপ্তানী করে
কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে
তার এক চাকল্যকর সংবাদ নিয়ে
মাসিক পত্রিকাটি লিখেছে, 'কর-
পোরেট ক্রাইম অফ দি সেনচুরি।'

জ্যোতির্ময়বাবু সম্প্রতি লোক-
সভায় এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এক
সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি এই
পত্রিকার সংখ্যাটিও দেখান।

লালমোহন ধরা পড়ল তবে চোরাই তেলের কারবার রমরমা

দিল্লী বোম্বে রোডের চোরাই তেলের নামকরা চোরাকারবারী লালমোহন ধরা পড়েছে। ডোমজুড় খানার চার চারটি তেলের ট্যাকারও আটক করা হয়েছে। চোরাই গোড়াউনের আরেক পাণ্ডা গৌরী নাউও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ডোমজুড় খানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৩/১৪৩/৪৪৮ ধারাতে পুলিশ লালমোহনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। কিছুদিন আগে সর্পণ দিল্লী বোম্বে রোডের নয়া তারকা লালমোহন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। পুলিশ দৃঢ়তার সঙ্গে হানা দিয়ে লালমোহন ও গৌরী নাউ প্রমুখের চোরাই তেল, তেল ভর্তি ট্যাকার প্রভৃতি আটক করে। সোমবার ১১ই আগস্ট লালমোহন হাওড়া আদালতে আত্মসমর্পণ করে। বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করেন নি। সে এখন মল্লিক কটক জেল হাউতে।

এদিকে অল্পত বটনা হলো, এখনও ডোমজুড় খানা এলাকাতেই চোরাই গোড়াউনগুলি অব্যাহত চলেছে। এই গোড়াউনগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ, জেলা এনফোর্সমেন্ট একেবারে নিষ্ক্রিয়।

হজ কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ

রাজ্য সরকারের হজ কমিটির দুর্নীতি ও ঢালাও স্বজন পোষণের সংবাদ দর্পণে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিভ্রাট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ফাইল চেয়েছেন হজ কমিটির ব্যাপারে। এখন পর্বত নির্বাচিত দুই অযোগ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনেকেরই সোচ্চার। হজ কমিটির কিছু সদস্যও স্বল্প এই নির্বাচনে। কিছু সদস্য বলছেন হজ বিষয়ক মন্ত্রী মহম্মদ আমীন নাহেব মাত্র পাঁচ ছয় জন সদস্যকে নিয়েই সব কিছু আলোচনা করেন। এরাই পান এদের স্বজনদের জন্য হজ ব্যাজার কোটা। হজ কমিটির চেয়ার-

ম্যান তাই নয়, খবর পাওয়া গেল, এই কারবারের পাণ্ডা খান সাহেব, ব্রিজমন্ড উপাধ্যায়, রণজিৎ চক্রবর্তী, মনসাভিদি এলাকার নতুন করে চোরাই গোড়াউন খুলেছে। ডোমজুড় খানা এলাকার ইটখোলায় পাশে অজুয়াটিতে শেখ সিরাজ, সামান, রাজু, কালু ও নতুন গোড়াউন খুলে বসেছে।

জানা যায় ১৪ মং হোসেন শা রোড (কাটাপুত্র) মহেশতলা খানার পুরনো ডাকঘরের কাছে ময়ূভজ রোড অজুয়া সিনেমার পাশের গলিতে তেলের দু'ঘরী কারবার যা চলেছে তার সংগে জড়িত রয়েছে কুখ্যাত আগলার উদয়রাজ, রাম-বিলাস নাউ, রাধাকৃষ্ণ ভগবান নাউ, আজিলাল নাউ, বিদ্যা নাউ, কানীপুরের নরেন্দ্র সিং, রামানন্দ সিং ওরফে রামানন্দ বাবু।

এই তেলের কারবারে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক তাঁরাচাষ আগর-ওয়ার প্রকাণ্ডেই বলে বেড়াচ্ছে যে তাকে ধরার ক্ষমতা রাজ্য এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের নেই। কেননা দপ্তরের অনেকেই তার সম্পর্কে জানে। কিন্তু তার গোড়াউন ধরার সাহস কারও নেই। কেন নেই, কিইবা তার বন্দোবস্ত সম্ভবত সেই শুধু জানে।

ম্যান বার বার আকাশ পথে বোম্বে যান কেন? কেন হাজীদের সখ-ধনার ব্যাপারে অপমান করা হলো? হজ কমিটির চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সাহেবদের বোম্বেই লম্বা জরুরী হলেও বোম্বেই হজ কমিটি দপ্তর ও হাজী ভবনে (যেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিন লাখ টাকা দান করেছিলেন) পশ্চিমবঙ্গের হাজীদের দেখাশোনা করার জন্য অফিস নেই। পশ্চিম-বঙ্গের হজ ওয়েলফেয়ার অফিসার-রাও বোম্বেই হজ অফিসে জাহাজ হন। এর প্রতিকার হয়নি। হজ-কমিটির বেশ কিছু সদস্য বিশ্বের প্রকাশ করেন তাই নাকি নির্বাচন হয়ে গেছে? এমন কি হাজীদের দেখাশোনা করার জন্য বোম্বেই শহর পর্বত যাওয়া ও কলকাতা ফেরার জন্য সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে ও সি, পি, এম কর্মীদের দিকেই বেশী তাক হয়েছে। ধর্মমানে ধর্ম করতে পাঠিয়ে হাজার কর্মীকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার এই কংগ্রেসী নীতি বাম-পন্থীদেরও অঙ্গসংগণ করতে দেখা যাচ্ছে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

সারা বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ এখন এক অভয় গহ্বরে অর্থ-নৈতিক সংকটের দিকে ছুটে চলেছে। এই সংকট থেকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা আত্মরক্ষা করতে পারবে কি? পুঁজিবাদ কখনো সংকটমুক্ত হতে পারেনা। সংকট মাকে মাকে গুরুতর হয়, কিন্তু বেশ কিছু টালমাটাল খেয়ে পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত টিকে যায়। সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরেই এটা দেখে এসেছেন। পুঁজিবাদের বুদ্ধিজীবী প্রবক্তারা এদিকটা তুলে দেখাতে চান যে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে এমন এক আত্মসংশোধনী শক্তি আছে যা কি না যে কোন সংকট-জনক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বড় ঝাপটা সহ্য করেও টিকে থাকতে পারে। অল্প একটু বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে পুঁজিবাদের প্রাণশক্তি এত প্রচুর যে সে শুধু নিজেই অনন্তকাল ধরে টিকে থাকার সামর্থ্য রাখে না, বরং পুঁজিবাদ বিরোধী মতবাদ ও সমাজ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে আপন পথে টেনে নিয়ে আসে। এরা উদাহরণ হিসেবে সোবিয়েত রুশ ও মাও-উসুয় চীনের দৃষ্টান্ত দেন। এমন কি অনেকে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি “আমেরিকান দক্ষতা ও বিদ্যুতশক্তি” মিলেই সাম্যবাদী সমাজের প্রভাব ও প্রসার-মুখীনতাকে মূল্য দিতেন।

কিন্তু পুঁজিবাদী প্রবক্তাদের এই প্রচারের খোলস এখন খুলে পড়েছে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই আজ সংকটের আবের্ডে খাবি পাচ্ছে। সুতরাং বুর্জোয়া প্রচারের মুখোশ এখন নিজে থেকেই সরে গেছে। আমরা পুঁজিবাদের বীভৎস চেহারা ও মৃত্যু ঘণ্টা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যে সকল বুর্জোয়া প্রচারক সংকট মোচনে পুঁজিবাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে বড়াই করতেন, তারাও এখন উবেগে, আশ-ফায় নীরব। হেলার, গ্রেগকেফল, স্ত্রায়লসনের মত খ্যাতিমানা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এখন খাঁকার করছেন যে বর্তমান পুঁজিবাদী সংকটের কোন সমাধান তারা জানেন না, পুঁজিপন্থে কোন সমাধানের আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়।

কারণ এই সংকটের চেহারা সম্পর্কে মার্কসবাদের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের জানা নেই। পুঁজিবাদের সংগঠনের মধ্যেই তার বৃত্তার উপা-দান রয়েছে। সংকট পুঁজিবাদের মূলগত জিনিস। বর্তমান

সংকট পুঁজিবাদের ঐ সংকট সর্বগ্রাসী এবং সর্বজনীন। এই সাধারণ সংকটের দশায় পুঁজিবাদ কোন কার্য করে তার স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অর্থ কি? যে সংকট থেকে তার পক্ষে পরিচয় লাভের কোন আশা নেই, যে সংকট তার নিজেরই অস্তিত্বের, শিকড় মেলেছে এবং যে সংকট একমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানের মধ্যেই সমাধান খুঁজে পাবে।

বর্তমান দুনিয়া ঠিক এই ধরনেরই এক সাধারণ সংকটের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ সংকট ঐতিনিত্য জনজীবনকে বিধ্বস্ত, নীড়িত করে তুলবে।

—বিশ্বের সব চাইতে ধনী, পুঁজি-বাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই

আত্মনীতি

ধরা থাক। আমেরিকার অর্থনৈতিক চুরবস্থা আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। সারা দুনিয়ার সমস্ত দেশে যত উৎ-পাদন হত চল্লিশের দশকে একা আমেরিকাই তার প্রায় অর্ধেক উৎ-পাদন করত। আমেরিকার উৎ-পাদন সামর্থ্য কমে কমে এখন বিশ্বের মোট উৎপাদনের মাত্র ২০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমেরিকা বিশ্বের আমেরিকা বিশ্বের অস্তিত্ব পুঁজিবাদী দেশের উপর উপর ততটা আধিপত্য খাটাতে পারছে না। আমেরিকায় প্রায় ছুঁকটি বুদ্ধ বুদ্ধা, পেনসনভোগী। তা দে র আর বাড়েনি, আয় বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, ফলে তাদের মধ্যে অভাব অনটন আর হতাশা সর্বব্যাপী। আমেরিকার ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সের ছাত্র ছাত্রীদের চিরকালই নিজেরা আংশিক সময় কাজ করে সেই উপার্জনে পড়াশোনা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দপ্তরের রিপোর্ট বলছে ইতিমধ্যেই ৩১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী কাজের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজ নেই। বেকারের সংখ্যা এখন মোট কর্মকর লোকের ১৭.৬ শতাংশ। গত বছরেও ছিল ১৩ শতাংশের সামান্য বেশী। হিসাবে দেখা যায় ১ শতাংশ বেকার বাড়লে প্রায় মাত্র লক্ষ মানুষ বেকার হয়। তাহলে আমেরিকার বর্তমান বেকার সংখ্যা ৭৫ লক্ষ = প্রায় ১২৬ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার দশ শতাংশ বেকার, দশ শতাংশ পেনসনভোগী অক্ষম, ২০

শতাংশ গৃহস্থালীতে নিযুক্ত মহিলা। মার্কিন প্রমিকের উৎপাদন সামর্থ্য বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ০.১ শতাংশ নেমে এসেছে। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড বলে-ছেন যে আমেরিকার দৈনন্দিন খুচক তার আমলের ১২ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশ উঠেছে। এটাই হচ্ছে আসল চিত্র। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি-বাদী দেশের এই চিত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য অবক্ষয় ও অযোগ্যতার চিত্রই উল্লেখ্য। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের অর্থনৈতিক চিত্রও অসুস্থ। কেউ কম, কেউ বা বেশী। পুঁজি-বাদী বিশ্বের এই অবক্ষয় পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটেরই প্রতিচ্ছবি। বাণিজ্য সংকট, মুদ্রা সংকট, বেকারী ও অর্থনৈতিক অধোগতি এখন সর্বব্যাপী।

মার্কিন আর্থিক সংস্থা ফাট বোষ্টন কর্পোরেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ আলবার্ট, এম, ওকনিলোয়ার বলে-ছেন, “এটা এখন স্পষ্ট যে আমেরিকান জাতির হাতে সংকট মোচনের কোন সম্ভাবনা নেই। যদি বা কোন কৌশলে মুদ্রাস্ফীতির হার কমিয়ে আনা যায় তাহলে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ, প্রচণ্ড, আঞ্চলিক সংঘাত এবং জাতিবিরোধ অনহনীয় রাজ্যের উচ্চগ্রামে উঠবে। একমাত্র মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যেই আমরা পেনসন ভোগীদের পেনসনের ক্রয়ক্ষমতা কমাতে পারি, তেলের দামের বোঝা কমাতে পারি, বিদেশে রপ্তা উল্লারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করতে পারি। এবং সামগ্রিক বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেসামরিক ব্যক্তিদের ক্রয়-ক্ষমতা সংকুচিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভাপকে আমরা আসল রোগ বলে মনে করলে গুরুতর ভুল করবো। আমাদের অর্থনীতির আসল রোগ বলে মনে করলে গুরুতর ভুল করবো। আমাদের অর্থনীতির আসল রোগ হচ্ছে সরকার ও মার্কিনদের আশা আকাঙ্ক্ষার অবাঞ্ছিত বৃত্ত।” আমেরিকার বৃহত্তম শ্রেণীর কোম্পানী মেবিল লিফের অর্থনীতি-বিদ আর্থল্ড সি, সিমিকিন বলেন, “আধুনিক সরকারের পক্ষে মুদ্রা-স্ফীতি নিবারণের কোন পথই খোলা নেই, কারণ তারা জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।” অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শ্রীতিপদ্ধতি জলাঞ্জলি দিয়ে ক্যাপিটালী রাজ্য গ্রহণের পক্ষে এক নির্লজ্জ ও কালতি শুরু হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জার্মানীতে এভাবেই হিটলারের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের এই অভয় পরিণতি সারা বিশ্বের পক্ষেই আশংকাজনক। একমাত্র পুঁজিবাদের অবসানের মধ্য দিয়েই এই অর্থ-নৈতিক সংকটের অবসান ঘটতে পারে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ১০ টাকা
বার্শানিক ১০ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা
ম্যামেজার, দর্পণ

৩১ নং মট সেন, কলিকাতা-১৩

উত্তরখণ্ড আন্দোলনের নেতাদের নতুন দাবি

উত্তরবঙ্গের “উত্তরখণ্ড” আন্দোলনের প্রবক্তারা এখন নতুন এক দাবি তুলেছেন। তাঁরা এখন “কামতাপুর মুক্ত প্রদেশ”-এর দাবি করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরবঙ্গের অবহেলিত ও নিপীড়িত রাজবংশী, মধেশীয় ও আদিবাসীদের হুঃ ধারিত্যকে মূলধন করে তারা উত্তরখণ্ড আন্দোলন শুরু করেছেন তাঁদের অধিকাংশই কিন্তু জোতদার। সম্প্রদায়, কালচাঁদ বর্মা, রবীন্দ্রনাথ রায়, সুধাংশু সরকার, গিরীশ দেবসিংহ প্রমুখ প্রত্যেকেই জোতদার। আজ দ্বিজেন রাজবংশী, মধেশী রায়ের হুঃ প্রাণ তাঁদের প্রাণ কাঁদছে। কিন্তু কেন? স্বাধীন তিরিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে তারা কোথায় ছিলেন?

একথা আজ আর গোপন নেই যে, বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই জোতদাররা উত্তরখণ্ড আন্দোলনের ডাক দিয়ে-

সেবিকাদের প্রতি রাজ্য সরকারের অবিচার

স্বাধীন হওয়ার নার্সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দূর দূর গ্রামে গঞ্জে স্বাস্থ্য-ক্ষেত্রে যেখানে কেউ কাজ করতে চান না সেখানে পেলেই নার্স দ্বিধামণ্ডিত অবস্থায় দেখা যায়। বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সেবার কাজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নার্সিং দপ্তরের মাধ্যমে এই সকল কাজ এতদিন পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। কিন্তু সম্প্রতি নার্সিং দপ্তরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকার অস্বাভাবিক পদক্ষেপ করে সেবিকাদের অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপ করে—এই অভিযোগ করে-ছেন ট্রেড ইউনিয়ন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া।

এসোসিয়েশনের আরো অভিযোগ ডেপুটি ডিরেক্টর অব হেলথ লালসেন (নার্সিং)-এর পদটি নার্সিং-এর সর্বোচ্চ পদ। ১৯৭৬ সালে তৎকালীন সরকার এই পদটির সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গের নার্সিং সমাজকে সম্মানিত করেছিলেন। উক্ত পদটি হঠাৎ শূন্য রাখা হল কোন কারণে? এই পদটিতে গত চার বৎসর ধরে যিনি কাজ করছিলেন তাকেই বা কোন অজ্ঞাত কারণে বখোষকরণ করা না দেখিয়ে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করে নিম্নতর পদে পুনঃনিয়োগ করা হল। কেন এই পদ করা হল তার পক্ষে কোন যুক্তি কি? এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ নার্সিং দপ্তরে হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?

হেন। বামফ্রন্ট সরকারের “কৃষি সংস্কার” এবং “অপারেশন বর্গী” কর্মসূচী এই সব জোতদারদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকানো এবং বেনামী জমি সব জোতদারদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করতে উত্তরবঙ্গের মানুষদের কেনিয়ে ছোঁড়ার চেষ্টা করছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ঘুরে দেখেছি উত্তরখণ্ড আন্দোলন কোথাও তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। বলা চলে যে, এই আন্দোলন এখন হোয়ালা পোস্টারে এবং গোপন সভা সমিতিতেই লীলা-বস্ত্র রয়েছে। মাধারণ বাহুর মনে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়নি।

আনন্দমার্গ, আররা বাঙ্গালী এবং কয়েকটি মিশনারী জাতি সংস্কার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক। দিন কয়েক আগে দার্জিলিং জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীচন্দ্রবর্দীর সঙ্গে

এবং উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল কমিশনার শ্রীমুখার্জি চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা জোরের সঙ্গে বললেন, “উত্তরখণ্ড আন্দোলন” নামে কোন আন্দোলনের প্রভাব উত্তরবঙ্গে নেই। বা হলে তা কেবল কয়েকটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার। রাজ্য সরকার সতর্কতাবলক ব্যবস্থা নিয়ে-ছেন। ভাল কথা। দ্বিপুণ্ড ও আদামে যে ধরনের ঘটনা ঘটে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সতর্কতাবলক ব্যবস্থা নিয়ে ভাল কাজই করেছেন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, তথ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি চৌধুরী উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জনসভা করে গেছেন। জ্যোতিবাসু বিজ্ঞানতাবাদীদের উদ্দেশ্যে হিন্দুসম্প্রদায়কে ভাগ করার চেষ্টা হচ্ছে, এই চেষ্টাকে সরকার কোনমতেই বরদাস্ত করবে না।

বুদ্ধদেববাসু বলেছেন সম্প্রদায়

রায়ের মত জোতদাররা পরীক্ষা সত্য করে চলেছেন। সে তুলনায় বাহুর মত জোতদাররা বিনষ্ট করতে উত্তরখণ্ডীদের দু-একটি গোপন সভার চাইছে। ওপরে ওপরে কিন্তু জোতদারদের মিল রয়েছে। ওদের রাজ্য সরকার এখনকার বেনামী জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে গোয়েন্দা “নেট ওয়ার্ক” জোরদার করেছে। মিশনারী সংস্থাগুলির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আনন্দমার্গ ও আররা বাঙ্গালী এবং প্রাইটিস্ট রকের ওপরেও গোয়েন্দারা নজর রাখছেন।

বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি গ্রাম-গাওঁর সর্বত্র বিজ্ঞানতাবাদ বিরোধী

জন সহযোগিতাই আমাদের কর্মপ্রেরণা হোক

প্রায় তেত্রিশ লক্ষের জন-অসংখ্য কলকাতা। বনবসতির দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। এই মহানগরীকে কেউ বা করে তুলতে চান ‘কলোনিয়ালী তিলোত্তমা’, কেউ বা এর পিঠে জুড়ে দিতে চান ‘পাণা’। পাতাল রেল, উড়াল পুল, দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজ—কত প্রকল্পই না এখানে রূপান্তরিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

আমরা এই বিরাট কর্মক্ষেত্রের পুরোহিত নই। কিন্তু যে অসংখ্য মানুষের সুখ স্বাস্থ্যের বিধান এই কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্য, সেই আপনাদের নিত্য সেবার আমরাই সেবাইত—আপনাদের সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। প্রতিদিন, সব সময় আপনাদের সঙ্গেই আমরা রয়েছি।

এই “কাছে থাকার আত্মাধানী ভেদ করে” একবার আমাদের কাজের মূল্যায়ন করুন। তবে দেখুন, এই মহানগরীর রাজ্য থেকে প্রতিদিন আমাদের কর্মীরা ২৫০০ টন অজাতি পরিষ্কার করছেন; প্রত্যাহ ১৮ কোটি গ্যালন বিতর পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখছেন; স্মৃতিস্তম্ভ পরঃ-প্রণালীর, সংস্কার সাধন করে বহু অঞ্চলকেই বর্ষার জল-প্রাবল্যে হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন; অসংখ্য রাস্তার সংস্কারের মাধ্যমে যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলেছেন। চিন্তা করুন, আপনাদের সুবিধার কথা ভেবেই মহানগরীর প্রধান প্রধান বাজারগুলিকে বহুতলমহালা বাড়ি বাড়ি পরিণত করার প্রকল্পের কথা; সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার আমাদের প্রয়াসের কথা, অথবা মহানগরীর স্বাস্থ্যরক্ষার আমাদের সদাআগ্রহ দৃষ্টির কথা।

দুর্ভাগ্যবশত পৌর-প্রশাসনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচনা এই পুরসভাতেই হতে চলেছে। আইন সংশোধনের মাধ্যমে মহানগরীর পৌর-শাসনভার ‘মেয়র-ইন-কাউন্সিল’ নামে পর্যায়ের উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নগরবাসীর কল্যাণের পথে এমন একটি গণতন্ত্র-সম্মত সুবিধাজনক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমরাই প্রথম নিতে চলেছি।

আমরা যতটুকু করতে পেরেছি তা সবই আমাদের কর্তব্যকর্ম। এই কর্ম সম্পাদনে কৃতিত্বের দাবী না থাকলেও স্বীকৃতির প্রত্যাশা আছে। আমরা জানি আমাদের অনেক কৃতি আছে। আপনাদের, ঐকান্তিক সহযোগিতাই সে কৃতি সংশোধনে সহায়তা করবে, আমাদের কর্মপ্রেরণাকে সহস্রগুণ বর্ধিত করবে।

আমরা চাই আপনাদের চলার রাস্তার অগ্রপ্রবেশ বন্ধ করতে, পুর-সম্পত্তির অপহরণ রোধ করতে কিংবা পানীয় জলের শোচনীয় অপচয় নিবারণ করতে। অননুমোদিত বাড়ী, হকার ও দোকান অধু্যবিত ফুটপাথ, যত্রতত্র জমাল ফেলার প্রবৃত্তি, পুরকর সমরমত না মেটানো—এই সব অনভিপ্রেত কাজের প্রতিবিধানে আমরা সব সময়েই সচেষ্ট।

সীমিত সঙ্গতি নিয়ে নগরজীবনের এই সব অগ্রসর সমস্তার সূত্র সমাধান কেবলমাত্র আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

কলিকাতা পুরসভা

শক্তিমন্ত্রী বরকত বড়ই বিব্রত

প্রশ্ন : থাকবেন, না যেতে বাধ্য হবেন

সুপ্রভাত বন্দোপাধ্যায়

সামনে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মেলনের সংক্রান্ত ব্যাপারটি। তাই শাসক দলের অনেকেই নতুন পুনরায় মুখের মিছিলে আশার আশার দিন গুনছেন। ভবিষ্যৎ ভাবনা করছেন। কি হয় কি হয় ভাবছেন। কিন্তু এই আবহাওয়ার বড় অসম্পত্তি পড়েছেন শক্তি মন্ত্রী। এখন তাঁর সামনে খাঁড়া বুলছে। তিনি কোতল হবেন কি হবেন না মন্ত্রী পরিষদ থেকে তাও নিশ্চিতভাবে জানতে পারছেন না। বরং বরকত গণির বিদায় বেলা ঘনিষ্ঠ আসছে বলে গুঞ্জন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কমলা-কেলেঙ্কারী কীস হয়ে গিয়ে তাঁকে বড় বেকারখার পড়তে হয়েছে। দলের ভিতরে ও বাইরে তিনি বার বার অপমৃত্যু হচ্ছেন। তাঁকে বাঁচানোর জন্য মন্ত্রিসভার বন্ধুরা খুব খাটছেন। সিকেন ও শিরশংকর তাঁর নিয়েছেন বেশি করে। দলের মধ্যেও তাঁকে চালা করার চেষ্টা চলছে। তবু কমলার পারমিট দেওয়ার অবৈধ ব্যাপার-আপারের প্রশ্নটির সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বৈধ সরকারকে এই কেলেকারীতে জড়ানোর চেষ্টা তাঁর পক্ষে তবু নয় মন্ত্রিসভা ও দলের পক্ষেও হস্তম করা বেশ শক্ত। বিতর্ক তুলেছেন বিরোধীরা ব্যাপকভাবে। সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসু এসম্পর্কে নানান তথ্য প্রমাণ নিয়ে এসিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চাপান অভিযোগ গুন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তবুও মন্ত্রিসভা চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পূর্বে দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জনসমক্ষে জোর প্রচার হয়ে গেছে। রূপ করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সময় হরণ করে বিষয়টি থিথিয়ে দেবার প্রচেষ্টা কমলাই ব্যর্থ হচ্ছে, মন্ত্রিসভা ও দলের ধোঁয়া হানি ঘটছে।

এই অবস্থার তাঁকে সরানোর কথা গা বা হলেও তা করা হচ্ছে না। গারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঙ্গপানাপরে কেলতে চাওয়া এই মন্ত্রিত্ব গণিকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে সরালে শাসক দল বড় কায়দার পড়বে। মন্ত্রিসভার মুখ স্কিন হয়ে যাবে। তার চেয়ে বাদ। বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিকে বাঁচানোর চেষ্টা দলের পক্ষ থেকে, মন্ত্রিসভার দিক থেকে মন্ত্রিসভার দিক থেকেই হবে। এই অবস্থা

থেকে কোন রকমে উদ্ধার মিলতেও চো পাবে। পেয়ে যদি না পায়। যার ভরন দেখা যাবে কি করা যায়। আগ বাড়িয়ে কিছু না করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ বরন, তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এদিকেই কুঁকেছেন।

এদিকে ভিতরের খবর হল, দলের মধ্যে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। প্রতিপক্ষের প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতে তাঁকে কোণঠাসা করছেন। পশ্চিমবঙ্গে অজিত পাণ্ডা তাঁর পাশে থাকলেও প্রিয় তাই স্বতন্ত্র ভাল বুকে তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছেন। দাদা বলে পড়েছেন প্রণবের কাছে। তাই বরকত বড় ল্যাঞ্চে গোকর্কে অবস্থার আছেন। নিজের রাজ্যেও তিনি ভৃত্যে থাকেন। বাহের জন্ত করেছেন তাঁরাই তাঁকে বিদ্রোহ হারানো অঙ্ককারের মধ্যে তেলে দিতে চাইছেন। যেন তাঁর কালো মুখ দেখার নয়। তাঁর কালো ইমেজের কাছে কে যেতে চায়। কাছের মানুষদেরও ঠারঠারে এই ভাব। এই অবস্থায় তাই তিনি মরিয়া হয়ে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

ই-কংগ্রেসের জন্তে বিশেষ করে নেত্রী ও তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক ছবিতে আবুল বরকত বিশ্বস্ত যোদ্ধার মত কর্তব্য পালন করেছেন একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর আত্মগত্যাৎ প্রশাস্তীত। বেশ করেছেন অযোগ্য, ধাপ্লাবাজ, আদর্শহীন বঙ্কমা-মেজমা-সেজমা হানীর নেতাদের চেয়ে তিনি যোগ্য। তবু জড়িয়ে পড়া কেলেকারীর জাল তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। তিনি যেমন চেষ্টা ছাড়ছেন না উদ্ধার পেতে, দ্বারে পড়ে শক্তমহলে গিয়েও তেমনি তাঁর জন্ত অজ্ঞ কোন ব্যবস্থার কথা হাইকমান্ডের চিন্তায় রয়েছে। খোঁজা হচ্ছে বিকল্প কোন পদ যাতে ভরাডুবি হলে তিনি যেন তলিয়ে গিয়েও ভেসে ওঠার মত কুটোটির আশ্রয় পান।

তিনি যখন কমলা নাথের কথা মত মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে সেন্ট্রাল কোলকিন্ডের প্রধান কার্যালয় মধ্যপ্রদেশের ছিমওয়ানায় নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন তখন মহারাষ্ট্র লবি থেকে জোর বাধা পান। এতদুপরি দলের হাইকমান্ড নেই সময় তাঁর উপর খুব অধুনি হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষেরও তাঁকে পাকে কেলার

তাঁর মজলুমারী করেছেন জানান, সেটা বুকে চলা যতখানি উচিত ছিল তা না করে তিনি আবার কাঁধে পা দিলেন। অবশ্য এরকম কাণ্ড ঘটে বলে তিনি ভেদন আমল দেননি। তাহলে কি হয়, ঘটনা কীস হয়ে গিয়ে তাঁকে কীসে আটকেছে। বড় চেষ্টা করছেন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তত কীস আটকে যাচ্ছে। তিনি অবাধ হচ্ছেন কি করে কাঁদে চালান হল বিরোধী শ্রীবসু হাতে। গোপন তথ্য কি করে গেল। এক মহল বলছেন, এটা জ্যোতির্ময় বসুর কেরামতি। অফিসার ও কর্মমহলের মাধ্যমে তাঁর কাছে তথ্য গেছে। কেউ কেউ বলছেন, বিরোধী পার্টির তরফে ও মালবহের হানীর মহলের তৎপরতায় জ্যোতির্ময় বসু তৎপর হতে পেরেছেন। আর ওয়াকিবহাল

মহলের কোন কোন জন সবচেয়ে তালুব কথাটি জানিয়েছেন। তা হল এই : এ ত তাঁর দলের লোক-দেবই হাত রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এর শিহনে কাজ করেছে। তাঁর যোগসাজসে কাঁদে পড়রের প্রমাণাদি ভায়া শ্রীনেশ সিং হয়ে বিতর্কিত সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর কাছে পৌছে গেছে।

বরকতবাবু তাঁর অবশিষ্ট ততাকাজীদেয় নিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা লড়ার সময় একটা কথা মনে রেখেছেন। সিদ্ধার্থশংকর মন্ত্রিসভার বিদ্রোহ, মন্ত্রী থাকার সময় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসিয়ে উঁক বসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তা থেকে উদ্ধার পেরেছেন। কিন্তু সিদ্ধার্থশংকর এখনও কড়ে পাচ্ছেন না। আবার নেত্রীর কাছের মানুষ হবার জন্ত ঘুর ঘুর করছেন। তাই বরকত জানেন, উদ্ধারের রাজ্য ধরতে। আর তা ধরেছেনও। এখন আইনগত প্রশ্ন উঠছে কার্যকারণ বিশেষে মন্ত্রী ওই কাজের জন্ত দায়ী হতে পারেন কি না। হলে তা ধোঁবের কি?

মতামত

হগলী জেলার শ্রীমপুর মহকুমার আইরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাঁদপুর ইছাপদর পূর্ত বিভাগীয় লড়কের বাঁদপুর থেকে মশাটী বীতপুর নি ডবলু ডি রাস্তার গোপালপুর পর্যন্ত নামাজ রাস্তা পাকা করা অবশ্যই দরকার। এই রাস্তাটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে পাকা করার কথা ছিল। হয়নি। অথচ কাছাকাছি কোনও গ্রামের অভ্যন্তরে ছোট রাস্তাও পাকা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জেলা পরিষদের অর্ধে গুরুত্বপূর্ণ এই লড়কটি পাকা করা হোক। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন দুই তিনশো পথিক যাতায়াত করে। এই রাস্তা নিকটবর্তী আতুনি রিকি বিদ্যালয়ে যাওয়ার অত্যন্ত পথ। বাঁদপুর গোপালপুরের এই রাস্তা পাকা করা হোক।

এ.এক. কামরুদ্দীন আহমদ
বাঁদপুর, জেলা হগলী

বিপদসংকেত শিকল

কেবল জরুরী অবস্থার জগুই



অকারণে এই শিকল টানলে অনর্থক ধারাবাহিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

আপনার গাড়ীরও দেবী হয় এবং অন্য গাড়ীরও সময় পিছিয়ে যায়। একজনের হঠকারিতায় স্বেসারও দিতে হয় অনেকে।

শিকলটানা স্বচ্ছ মতিকে ব্যাহত করে।



উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প লেখক

মিহির আচার্য

আমাদের পরবর্তী শক্তিশালী লেখকের পঞ্চম শ্রমশীল শ্রমিকের ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্যের ব্যাপারটাকে আমি ব্যক্তিগত কৃতিত্বের মধ্যে আটকে রাখা পছন্দ করিনা। সাহিত্যের প্রকাশ আদর্শ নারী লেখকের জায়গা থাকা উচিত। বিশেষ করে সমাজসচেতন দায়িত্বশীল সাহিত্য সমবেত প্রচেষ্টার শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই অধ্যায় আমি যে প্রায়শ-ই বিরক্ত হই তাঁর কারণ অস্বীকার্য বস্তু লাগিয়েও এমন লেখকের খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য, যাঁদের রচনার পর্যবেক্ষণ ও রচনাভঙ্গি দর্শনের আলোকে স্তম্ভসমূহ হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য যে আর দশটা সময় কাটাবার মনোরমক বস্তু নয় তার জন্য অধ্যবসায়, অস্বীকার, নিষ্ঠা—সর্বোপরি স্বজনী কমতার দরকার, এটা অনেকেই না-বুকে সাহিত্যচর্চা করতে আসেন। হুঁ একটা কাগজে কোনো রকমে একটা লেখা বেরো-

সাহিত্য দর্শন

সেই তাঁরা লেখক বনে' যান। কে বোকাবে তাঁদের দ্বাই লেখক নয়, কেউ কেউ লেখক।

আমাদের সময়ে মিহির সেনকে হুঁ একটি গল্পে প্রতিষ্ঠিতম্পন্ন মনে হয়েছিল। সিরিয়াস এবং ব্যঙ্গাত্মক গল্পে তাঁর দক্ষতা আজো স্বীকার করতে হয়। 'সিদ্ধকাম' তাঁর একটি প্রসিদ্ধ গল্প বা বাঙলা সাহিত্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে উল্লিখিত হতে পারে। পরবর্তীকালে মিহির অণ্ড মনোযোগে সাহিত্য সাধনা বজায় রাখতে পারেননি। সিনেমা ও নাটকের চিত্রনাট্য ইত্যাদি কাজে জীবনধারণের প্রয়োজনকে স্বীকার করেই অবশ্য সাহিত্য থেকে সরে গেলেন। সম্প্রতি ওপার বাঙলা থেকে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে।

আরেকজন মিহির, মিহির মুখোপাধ্যায়, গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ যুগ পরে তিনি বধন লিখতে শুরু করলেন ভখন দেখলাম তিনি আর আমাদের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত নেই। তিনি 'দেশ' পত্রিকায় লিখছেন কালেক্টরে পত্রিকার প্রবোধনকে মিটিয়েই।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অমুনী বাঁহবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধিক আকর্ষণ। বিশেষ করে ছোট ছোট 'মাটিকা'। এখন চিত্তরঞ্জন 'বহরনী' পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যচর্চা রুচ হয়ে গেছে।

সুবোধমোহন ঘোষের সাহিত্য-নিবন্ধী 'অগ্রণী' পত্রিকাকে বিয়েই। সাধারণত নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া মরনারীই তাঁর রচনার উপজীব্য। পরিচ্ছন্ন পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশভঙ্গি, তাঁর গল্পগুলি আজও আদর্শ হতে পারে। 'উৎস' নামে তাঁর গল্পগ্রন্থটি অগ্রণী বুক ক্লাব থেকে বেরিয়েছিল। 'চিতা', 'হাল্লা' 'তদন্ত' গল্পগুলি আজো তরুণদের প্রেরণা দান করতে পারে।

দত্তাগ্রিয় বোম্বকেও এই সময়ে পেরেছিল। অবশ্য ছোটগল্পের চেয়ে উপজ্ঞান রচনার তাঁর পারদ-মতা অধিক প্রকাশ পেয়েছে। একদা মাতান্না থেকে তাঁর একটি উপজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। দত্তাগ্রিয় আমাদের অবর্তমানে 'অগ্রণী' পত্রিকার সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। দত্তাগ্রিয় এখন আর তেমন লেখেন না। তাঁর প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বা 'আধুনিকতাকে' গ্রহণ করেনি, কিছুটা পিউরিটান বলা যেতে পারে।

চিত্ত বোম্বাল নাটকের দল থেকে হঠাৎ-ই সাহিত্যের জগতে হানা দিলেন। এবং তাঁর গল্পের রূপ বস্তু, কথনো কখনো স্রাভিজম-আক্রান্ত, কিছুটা মর্জিত হলেও লেখকের রিয়ালিজমকে নজর রাখা যায়। নিত্যনতুন বিষয়, চরিত্র খুঁজে বার করার প্রবণতা, তথাকথিত বস্তু সংস্কারকে কাটাবার চেষ্টার প্রগতি-শীল মহলেও তাঁর রচনা প্রায়শ-ই বিভক্তিত বস্তু। লেখকের 'গল্পসংগ্রহে' অনবদ্য রচনার স্বাধ পাওয়া যায়। তাঁর 'বরষের কথা' শীর্ষক গল্প বাঙলা সাহিত্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে বিবেচিত হতে পারে। যদিও আমার বিবেচনার সাম্প্রতিক রচনা, 'বোড়-দুয়ার' তাঁর খ্যাতিকে চিরায়ত করবে। 'রক্তে যে গান' 'তটরেখা' 'ওরা তিনজন' লেখকের সাম্প্রতিক উপজ্ঞান।

বীরেন নিরোপীও এই সময়ে কিছু গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন পরবর্তীকালে চিত্রপরিচালক বস্তু বিমল ভৌমিকও। কী জানি কী কারণে বীরেন আজকাল আর লেখেন না। বিমলের কথা ছেড়েই দিলাম। প্রসঙ্গত আমার সমকালীন স্বদিক বটকের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির কথা মনে পড়ছে, চিত্রজগতের আত্মা

লৌকিক কবিতার সংকলন

সীমাবিহীন ১১ অকপকুমার চট্টো-পাধ্যায়। পরিবেশক: বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ১২। দাম পাঁচ টাকা।

কবি অকপকুমার কাব্যগ্রন্থটিকে লৌকিক কবিতার সংকলন বলে দাবি করেছেন। যেহেতু এর বেশির ভাগ কবিতাই বাংলা-বিহার সীমান্তের বাসকুমারীওতাল পরগণা অঞ্চলের কথাভাষার রচিত। এর মধ্যে ব্যতিক্রম motherland নামক

গ্রন্থ পরিচয়

ইংরেজি কবিতাটি। বাকি তিনটি পূর্ব বাংলার কথা ভাষার রচিত। এই আঞ্চলিক ভাষা কবি নিলেন কেন? তার ব্যক্তি, মাটি ও মাছের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে। উদ্দেশ্য বহু। না গরিক সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে তিনি তাঁর কবিতা বৃহত্তর জনগণের দরবারে হাজির করতে চান। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় নিরক্ষরতার দারিদ্র্য বাস্তবতাকে তিনি কী করে দূর করবেন? যদি না তিনি সাধারণের মাথামানে গিয়ে এক কবিতা পড়ে শোনান? আমরা যারা দারিদ্র্য জীবনের সঙ্গে আঠে-পৃষ্ঠে জড়িত তাদের কাছে এক কবিতা-গুলির আবেদন মেহাতাই মুখের স্বাধ পালটানোর মতোই। অনেকটা রবীন্দ্র সময়ে সাঁওতালদের নৃত্য দেখার মতো। আরেকটা, তাবনার বিষয়, কবিতাগুলিতে স্থানীয় সাঁওতাল অধিবাসীদের যে চেতনার স্তর দেখানো হয়েছে তাতে তাদের সরলতা এখনো মধ্যযুগের কুপে আটকা পড়ে আছে বলে বিশ্বাস হয়। যেন হয় না যে, আশেপাশের এত দূর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের চেতনার বিন্দুমাত্র প্রবেশ করেছে। এ ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে যারা আমূল সমাজ পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেন তাঁরা হতাশ হবেন।

'জমিন দিবসের গল্প' কবিতার ত্রৈনিক সাঁওতাল জমিনের পরিচয় তাঁকে সাহিত্যজগৎ থেকে সরিয়ে দিল।

একবারে, হালের লেখকের মধ্যে যদি মুখোপাধ্যায় বখেট কর্মতাত্পর্য হলেও আজকাল তাঁর রচনা দেখিনা। 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

তপোবিজয় ঘোষ কিছু গল্পে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল

জানতে চাইছেন এইভাবে; 'হেই বাবু তোর গোড় লাগি / কে বটেন উনি কুখার বর উনার...' তারপর নিজেই সমাধান করে দেয়: আমরা মুখুয়া মাছই আইজা.../ চিনি নাই...এ হুনা (ছেলে)- গড় কর রে বোটা / গড় কর...হলেন উনি কোন মহাজন' ইত্যাদি।

'ছগু গা ডিহি বা জননী' কবিতার কবি জানিয়েছেন একদা ছগু-ডিহি গ্রামের উপর বর্তমান চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা প্রতিষ্ঠিত। গোড়ার জলাধারে বাঁধ দেয়ার প্রতিবাদে স্থানীয় সাঁওতালরা অস্ত্র ধরে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মারা যায়। কিন্তু কবিতা রচনা করার কালে সেই প্রতিবাদের উত্তাপ কোথায় কবিতায়? ত্রৈনিক সাঁওতালের আত্মজীবনীতে কবি লেখেন: 'কারখানার দানোটার গরুদ্বিম মাইনছেন / আমার মা জননীর মিত্রা দিনটি যানবেন না আইজা / নাকি পুখু কারখানাটাই শহীদ বেহি / বয়লারের আগুন

ঝড়ো সময়ের দলিল

ঝড়ের কাব্য ১১ অতীক গদ্যো-পাধ্যায় পরিবেশক: বুক মার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ১০। দাম চার টাকা।

তরুণ, প্রতিশ্রুতিময় অতীক গদ্যোপাধ্যায় সত্তর দশকের বিপ্লবী রাজনীতি থেকে তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা পেয়েছেন। গ্রন্থভুক্ত কবিতা-গুলির রচনা কাল ১৯৭০-৭৮। সচেতন পাঠক মহলেই এই সময়কার বাতাবরণ পাবেন কবিতাগুলির মধ্যে। যুগপৎ শেতসঙ্গাস ও বিপ্লবী প্রতিজ্ঞার স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া যায় রচনায়, রাষ্ট্রতন্ত্রের অত্যাচারে আত্ম-সমর্পণ না-করে আগামী দিনের বিশ্বাসই বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়া উঠেছে। কলে কবিতাগুলি শুধু সঙ্গীদেরই চিত্র বহন করেনি, তাকে অতিক্রম করে প্রগতিপর্বের ঘোষণাই উনি-য়েছে।

'ঝড়ের কাব্য' কবিতার কবি উচ্চারণ করেন: 'পুরনো পৃথিবী ভাঙো / তছনছ করো এই অন্ধকার।' 'স্বপ্নের রামধনু'-তে কবি বলেন: 'আমি স্বপ্ন দেখলাম / জীবন সেজে উঠছে ভালবাসায়।' 'বরষা অস্ত্র হওয়া ভালো' কবিতার কবি অনেক দৃঢ়, প্রত্যয়ী: 'কারা বোলছো সামনের পথ অন্ধকার? পৃথিবীর বুকে সূর্যকে টান টান করে বেঁধে / মাহব পথ হাটবে একদিন। / তোমরা যদি বোলা / ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় / আমি মানবো না।

উয়ার পিছিম ইলাভের টুকরাও উয়ার ফুল বটে...।' এ ভাবানী সংগ্রামের কোনো উত্তরাধিকার করছে? আমার তো মনে কবির ব্যক্তিগত স্নেহই এখন আরোপিত হয়েছে।

'মাও-সে. তুং-এর তিরো-রাজিতে' আরেকটি কবিতা। এ-অভিজ্ঞতাও কী লৌকিকজীবনটি হয়ে উঠতে পেরেছে যেখানে লেখেন 'কে বইলতে পাবেই ছুঁই খাইকতে / কোন্ মহাজন-উপ-গেলেন / নিজের পেটের ধান্দ আমাদের দিন বিতার (কাটে) দগুপোবানী মহাজনের খবর আম-দের কে দিবে বাপ...' ইত্যাদি। 'পনেরোই আগস্টের গল্প', কবিতা যথেষ্ট আরোপিত। আসলে আ-লিক ভাষার কবিতা লেখব-অতিনব্ব কবিকে এমনভাবে আ-করেছে যে কবি মাহবুলোর চিত্র-তাবনার সঙ্গে স্বাভাব্য বোধ গ-তুলতে পারেন নি। যেটা কর-প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রথম ১১

/ তোমরা যদি বোলা / মাথা নী-করে বাঁচা যায় / আমি মানবো না / চাবুকের অপেক্ষার শিঠ পে-খাকাকে / যদি জীবন বোলা / আ-মানবো না। / বরষা / আ-রুলবো। / সেই অস্ত্র হওয়া ভালো। যে এক পা স্বর্গে / এক পা ম-দিয়ে / আকাশে মাথা ঠেকি-দাঁড়াতো।' রোহ-আটকানো বু-বট গাছটাকে সকলে হাত মিলি-উপড়ে দেবার রূপক 'রোহ' কবিতা-অনার্যাদে এসেছে। 'দমন্ত উঠান-ঘর বাড়িগুলো, / শিশু, বৃদ্ধ, বাচ্চ-নারী অন্ধকারে মুখতার ক- / বসেছিলো এতদিন / রোহ এ-গারে হাত দিতেই / সবাই হে-উঠলো।' অতীক কবিতা-প্রমজীবী মাহবের সঙ্গে একা-করতে চান তাই 'ঠোটে রক্ত নি-এ কবিতা ছুটে যায় কারখানার-প্রসিকের কাঁধে হাত রেখে বলে-আমার বোকাও / কি করে তোমা-রক্ত কারখানার চিমনি দিয়ে-কালো হয়ে উড়ে যায়; / ইত্যাদি

অতীকের আবেগ আছে-প্রতিজ্ঞাও আছে, আশা করা-অধ্যয়ন ও অস্বীকার তবিত্তে-কাব্যকে নিশ্চিত পরিণতির দি-এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্র-প্রতিপৃষ্ঠায় মূঢ় প্রমাদ প্রকাশকে-দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় বহন করেন।

মিহির আচার্য

সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

ইন্ডিয়ান চক্রবর্তী

দেবব্রত বিশ্বাস বসিষ্ঠ বংশে পরিচিত ছিলেন জর্জ বিশ্বাস নামে। জর্জ ছিল তাঁর ঘরোয়া ডাকনাম। আগে এটা আমার জানা ছিল না। ১৯৪৫ সনে মহম্মদ আলি পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলনে উপলক্ষে আই পি টি এর নাচ গানের প্রারম্ভিক সারে জর্জ। সে-আচ্ছা গানের ব্যঙ্গ কাউটার পরেই একটা ভাগি মিষ্টি অথচ খাটা পুঙ্খ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। ঐহি মেয়েলি গলার প্রতিভুলনার দ্রুত ভাল লাগলিস যে বলবার নয়। বহুদিন বাদে কলকাতার এসেছি, এবাইকে চিনি না। পাশ্চাত্যী শাসক বন্ধু এ বিষয়ে বিলম্ব ওরাকেকহাল। আমাঙ্গেন, কণ্ঠটির অধিকাণীর নাম জর্জ বিশ্বাস। অবিখ্যাসীর সুরে প্রতিবাদ করলাম, ভক্তলোকের গায়ের রং থেকে তোটাঙ্গকিরিঙ্গি বলে মনে হচ্ছে না। তিনি আনালেন যে ভক্তলোক যে কেবল ষাঙালী তাই নয়, একেবারে কণ্ঠ ষাঙাল। বাঙালী মরমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। বলা বাহুল্য আমায়ও মরমনসিংহ। জেলাটা কালোয়াতী এবং মেহাতী দুই ষাঙের গানে প্রাবিত হলেও সত্যিকারের শিল্পী জন্মেছে খুব কম। পরিজ্ঞানস্বর চক্রবর্তীর বাঙালী নেত্রকাণায় হলেও বাবার আমল থেকে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদবাসী। বয়ঃ গানে নিখিল সেন এবং সেতারে জিতেন সেন তখন বেতারের ষোলতে কিছু নাম করেছেন। জর্জ বিশ্বাস ভাল রবীন্দ্রসংগীত করেন মনে শোনবার আগ্রহ হল। লামও কিছুদিন বাদে। হারমানিয়ম-নিয়ন্ত্রিত গান যদিও কোনকালেই তেমন ভাল লাগে না তবু জর্জ বিশ্বাসের কণ্ঠের ঐশ্বর্য স্বীকার না করে পারলাম না। তখনকার জর্জ বিশ্বাসের গলার গভীর আমেজ ষাঙের মনে আছে, পরবর্তী হাপানি কবলিত কণ্ঠের পার্শ্ব্য তারা সহজেই ষুঙতে পারবেন। তখনকার কিছু ষাঙোফোন রেকর্ডও তাঁর ষাঙী নৈশর্শন রয়েছে। আমি চঞ্চল যে, ষাঙিয়া দেখ রসের ষ্রোতে প্রাণের ষাঙানি ইত্যাদি গানের কী কোন ষাঙনা হয়।

গানের ব্যাপারে জর্জ বিশ্বাস ছিলেন পুরোপুরি গণতন্ত্রী—ঘরানা- ষাঙর তালিমের ব্যাপারটা তাঁর কাছে ষাঙমস্ততন্ত্রের অবশেষ বলে মনে হত। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ছিল বর্গত অনাদিকুমার দত্তিয়ারের

কাছে হারমোনিয়ম সহযোগে। তখনকার দিনে ষাঙাই রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন বা রেকর্ড করতেন তারা। ষাঙাই হারমোনিয়ম সহযোগেই গাইতেন, এমন কি অমিতা সেন পর্যন্ত যিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে তালিম নিতেন। তানপুণা, ষাঙাঙ্গ ষাঙ বেহালা সহযোগে গাইবার এবং ষেখাবার প্রবর্তন তাঁকে নিজেই করতে হতছিল সংগীতভবনে।

যে কণ্ঠ পুঙ্খ কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত জ্ঞানেছি তার মধ্যে কয়েকটাই তো এখনো মনে পড়ে—বর্গত পঞ্চজকুমার মল্লিক, সুরিঙ্গ ষাঙ, কে এল সায়গল, দেবব্রত বিশ্বাস এবং সুরিময় ষাঙ। পঞ্চজবাবু হরেকরকম গান গাইতেন, রবীন্দ্রসংগীতের তালিম তিনি কারো কাছে পেয়েছিলেন মনে হয় না। তাঁর উচ্চারণও এর অঙ্গুল ছিল না। তবু বতকাল ষাঙাবিক জালিত্য ছিল ততদিন তিনি অপ্রতিষন্ধ্যী। সায়গল সাহেবের আবির্ভাবের সংগে সংগে গানের বাজারে তাঁর একচেটিয়া প্রভুত্ব নষ্ট হল। এরা দুজনে অঙ্গু গান রেকর্ড করেছেন ষাঙ মধ্যে কচিং এক- আধটিকে প্রামাণিক রূপে শিক্ষার্থীর আদর্শ বলে নির্দেশ করা ষাঙ। সুরিঙ্গ ষাঙ ষাঙ একটি রেকর্ড করে ষাঙা ষাঙ—

আমার প্রিয়র ছায়া

আকাশে আজ ষাঙ।

সুরিময়বাবু এতদিনে তাঁর প্রাণ্য সন্ধান পেয়েছেন। এরা সকলেই সুরকণ্ঠের অধিকারী (বিশেষ বয়স পর্যন্ত) তবু ইংরেজীতে ষাঙে বলে ব্যঙ্গ ভয়েস তা ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এবং শচীনদেব বর্মা ছাড়া আর কারো সংগে তাঁর তুলনা হয় না।

হাপানি হওয়ার পর গলার সেই মহিমা কমে গিয়েছিল। গান কণ্ঠ- নির্ভর। গলার জোয়, দম বা জালিত্য চলে গেলে কোন কিছু দিয়েই তাঁর কৃতিপুরণ হয় না। প্রমাণ ভীষণদেব এবং শচীনদেব। তাদের তবু দম ছিল। গলার ভল্যাম এবং টিহার দুই-ই নির্ভর করে দমের উপর। জর্জ বিশ্বাসের দম নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল।

বিষভারতী মিউজিক বোর্ডের সংগে গোস্বালের মূলে আছে উত্তর পক্ষের জেদ। না হলে জর্জ বিশ্বাসও গানে আরো কম অর্কেষ্ট্রা জুড়তে পারতেন এবং বিষভারতী মিউজিক বোর্ড জর্জ বিশ্বাসের নিজ (বা পরম) অঙ্গুবাধ নিয়ে ষাঙা না ষাঙামাঙ্গেই

পারতেন। এতে ইঙ্গন অগ্নিয়ে ছিলেন ষাঙাতীতি কিছু পণ্ডিতব্রত বাজারী সাংবাদিক এবং মিউজিক বোর্ডের কতিপয় ষাঙল। রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজী অঙ্গুবাধ করে তাতে সুর ষেওয়ারে রবীন্দ্রনাথ কি কোন ইনজাংগন দিয়ে গেছেন? তাহলে পরের সুরে তাঁর যে হাজার হাজার গান তা চলে কোন আইনে? শিল্পীর স্বাধীনতার তথাকথিত ক্ষজা- ষাঙারীরা এতে বাদ সাধলেন কোন যুক্তিতে? রবীন্দ্রনাথ তো পৃথিবীর তাবৎ বঙ্গ আঙ্গমাং করেছেন, ষে- কারণে পর ষাঙ ষাঙ ষাঙ ষাঙ চিত্রাঙ্গদা, ষাঙা ইত্যাদিকে এখনি নিষিদ্ধ করা উচিত।

জর্জ বিশ্বাস পরের দিকে টেনে টেনে গান গাইতেন ষাঙ ফলে সুরে জেদং হেরফের হয়তো হত। কিন্তু এঙ্গু হেরফের কি বড় বড় ব্যক্তিদের বেলায় মিউজিক বোর্ড মঞ্জুর করেন না? তাহলে ষাঙচিত সুরে রবীন্দ্র সংগীত প্রাতিনিয়ত আষাঙের কান ষাঙালাপালা করে কি করে? রেকর্ডও এ রকম নজির দেখা ষাঙ। এর কারণ কি? মিউজিক বোর্ড ষে সব রেকর্ডে মঞ্জুরি দেন তাঁর সুর কি ষাঙলিপির সংগে মিলিয়ে দেখা হয়? অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার গানই কি নিতুল হয়?

জর্জ বিশ্বাস ষেচ্ছাকৃত ভাবে রবীন্দ্র সংগীতের সুর বিকৃত করেছেন এমন ঘটনা বিরল। অথচ এমন গান মিউজিক বোর্ড মঞ্জুর করেছেন ষাঙ সংগে ষাঙলিপির দ্রুতম সাদৃশ্যও সেই—ষা গায়কের মনগড়া সুরে।

এই বয়সেও দেখা ষেত জর্জ বিশ্বাসের গানের জন্ত রবীন্দ্রসদন উপচে পড়ছে। একটার পর একটা গানের কর্মমাশ আসছে। এখানেই প্রকৃত শিল্পীর সাকল্য, এখানেই তাঁর ষাঙস পুঙ্খায়। নইলে হাখড়া ষাঙজদের ষাঙসর্ষ সত্য হলে গানের জলসা ষাঙি পড়ে ষাঙত।

তবু একথা স্বীকার করতে হবে ষে, সত্যিকারের শিল্পী জর্জকে আষরা খুঁজে পেতাম মিছিলের গানে, নবজীবনের গানে। স্কাঙর গান জর্জ বিশ্বাসের কণ্ঠে ষত বলিষ্ঠ হয়েছিল তেমন আর কারো কণ্ঠেই জিনি। এই শহরের, এই ষাঙোর মিছিলের চারণ যদি কেউ হয়ে ষাঙেন তবে তিনি হলেন জর্জ বিশ্বাস। তাঁর ষাঙবনে গাওয়া সেই অনবজ গানটির কথা একটু বদলে বলি “তুরি রবে সরবে ষাঙয়ে মম”।

কাজ কিছুই হচ্ছে না

৩য় পৃষ্ঠার পর

এইসব অপকর্ম ও বিপুল আর্থিক অপচয়ের ফলে ষাঙগঞ্জ ও পঞ্চায়ত ষাঙাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হুহল না। বাংলার ষাঙুষ আনলোনা ষে তাদের জন্ত ষাঙ একটা দপ্তর এবং অঙ্গু টাকা ছিল। এই ষাঙোগটির পূর্ণ সম্ভাবহার করতে চলেছে কংগ্রেস (ই) তাদের প্রচার ষাঙানি ষাঙকং। জেলায় জেলায় হুঠোগ পীড়িত ষাঙীয় জনগণের কাছে কংগ্রেস (ই) এই কথাটা প্রচার করবে, “উন্নয়ন আশনাঙের জন্ত নয়, ষাঙজট সরকার আশনাঙের জন্ত ষাঙগ্রহী নয়। আশনাঙের জন্ত ষাঙবে কাঁচা ষাঙরা, কাঁচা ষাঙা নোংরা পানীয় জল, ষাঙা পায়খানা জঙ্গলের পায়খানা, সাইকেল রিঙ্গা, গরুর গাড়ী আর হারিকেন বাতি ষাঙতে কেরোদিন নেই। আশনাঙের ষাঙাকা উন্নয়নের জন্ত বরাদ্দ টাকা চুরি হয়েছে আর দপ্তরটা শহরে বলে ষুঁমিয়ে।”

পঞ্চায়ত নির্বাচনের কলাকল থেকে ষেটু উৎসাহ কংগ্রেস (ই) পেয়েছে ষাঙজটকে ষাঙা ষাঙার ভেবে ষেখতে হবে আসল গলদটা কোথায়। কিছু সরকারী কর্মীর ও অফিসারের জুর্নীতির ফলে ষাঙ ষাঙ একটা শাসকবলকে ভবিষ্যত ব্যর্থতার মধ্যে ভাগ্যের হাতে প্রচণ্ড ষাঙ ষেতে হয়, তবে সেই কর্মীদের জন্ত শাস্তি বলতে কিছুই ষাঙবে না? এইসব কর্মী এখন কাইলপজ থেকে বহু গোপন খবর (আর্থিক খবর) ষাঙজট সরকারের শক্ত শিবিরে পৌছে দিচ্ছে ষাঙতে তারা মজীকে দায়ী করতে পারে জনগণের কাছে। বিরোধী হল এটাও প্রচার করতে হবে, পরিকল্পনা দপ্তরে ষে: অশোক মিত্রের কোনও পরিকল্পনা ফলে মি, ফলেছে প্রচুর ষাঙলা আর কোটি কোটি টাকা নানাভাবে হরির লুট হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এটা এখন কংগ্রেসদের (ই) আক্রমণাত্মক প্রচার হতে চলেছে। সত্যপ্রিয়ী এতবড় তথ্য তারা ছেড়ে দিতে পারে না। জনগণও এই

কথাটা ভাবতে বাধ্য। জুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী বা অফিসারকে কলকাতা থেকে সরিয়ে আশানমোল ষাঙানি দপ্তর বা শিড়িঙড়ি ষাঙানি দপ্তরে ষেখে শিল্পাঙ্কল ও উত্তরবঙ্গে উন্নতি তরা- নোর সম্ভব কমতা মজীর আছে, কিন্তু তিনি কি তা পারবেন? সাংবাদিক জনগণ বা গণতন্ত্রকে কাউকেই তারা পুষোয়া করে না, কারণ তাদের শক্তির উৎস অঙ্গু। ‘ষাঙজট সরকার’ নামে জাহাঙটা ষতই বড় হোক, জাহাঙের তলা জুটো করার জন্ত কয়েকটা অঙ্গুধাতকারীই ষাঙেই নয় কি? বিদ্যুৎ দপ্তরে ও পরি- কল্পনা দপ্তরে তারা রয়েছে।

সাহিত্য দর্পণ

৮য় পৃষ্ঠার পর

গিয়ে নিতুল মার্কসীর মর্শনকে তিনি গল্পে প্রয়োগ করতে পারছেন না। তাঁর ফলে কমতা ষাঙা ষাঙেও তাঁর গল্পগুলি সীমাবদ্ধ ষাঙিকতার উর্গে উঠতে পারছে না। ‘একটি মস্তানী গল্পের ষুঁমিকা’ গল্পটি সময়-বিশেষের দলিল। তপোবিজয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বসিষ্ঠতার ষাঙোগে আষার স্বীকার করতে বাধ্য নেই শিল্পিসত্তাকে যদি তিনি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে তাঁর কাছে ষাঙলা সাহিত্য আশা করতে পারে।

আরেকজন লেখক আষার মনো- যোগ আকর্ষণ করতে পেয়েছেন। তিনি শচীন বিশ্বাস। ‘জীবনষাপন’ নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থও আছে। শচীন আরো একটু পরিপ্রমী হলে সাম্প্রতিক সাহিত্যে ষাঙী আসন করে নিতে পারতেন। কারণ মার্কসীয় মর্শনকে শিল্পসম্মতভাবে গল্পে প্রয়োগ করার বিরল কমতা তাঁর মধ্যে দেখেছি। ‘জীবনষাপন’ গল্পটি তাঁর দৃষ্টান্ত। অঙ্গুদিকে বিষয়- বস্ত ষাঙলেও ষাঙন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতার দরুন রচনার শিল্পায়ন অঙ্গুপস্থিত।

সম্ভব দপ্তকে রাজনীতির তরঙ্গের সঙ্গে ষাঙা এসেছেন তাঁদের মধ্যে ষাঙ ষাঙ সম্ভাবনায়। তাঁর ‘চাষির গল্প’ একটি অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু তিনিও প্রবন্ধ রচনার দিকে অধিক ষাঙ হওয়ার কারণে রস সাহিত্যের দিকটার তেমন মনোযোগ দিতে পারছেন না।

হঠাৎ ‘তামান’ নামক একটি গল্পগ্রন্থ পড়বার দৌভাগ্য হয়েছে। তরুণ লেখক চন্দন ষাঙ। আশ্চর্য সম্ভাবনায়। তাঁর জয়পরিকতির দিকে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করব।

প্রতিদিনের রাঙা পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পূর্ব প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

১। শিক্ষাভঙ্গের ষুঁমিকা / শ্রীমতী সুনন্দা ষাঙ ১৪০০

২। বৈজ্ঞানিক রসায়ন / ডঃ অনিল কুমার ষে / ডঃ অনিতকুমার সেন ১৭০০

৩। ষাঙা স্বেদাঙ্গ মল্লিক ষাঙার, কলিকাতা-১৩

কামারহাটির বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা অধিগ্রহণের দাবি

উত্তর শহরতলীর কামারহাটি এলাকার বি টি রোডে অবস্থিত বেণী (ইঞ্জিনিয়ারিং) কারখানার কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতে না মেয়ে ভাতে মারার চক্রান্ত করছেন। কারণ লোকমানের অজুহাত ভুলে কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রায় এক বছর ধরে কারখানাটি বন্ধ করে রেখেছেন।

অথচ, আমরা জানি, কারখানাটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। ওখানে রেল এবং দেশরক্ষা বিভাগের বহু জিনিষ উৎপাদন হচ্ছে। সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কারখানাটিতে ক্রোড়ার ঘোষণা করে উৎপাদন বন্ধ রেখেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিযত যে এটি একটি শ্রমিক বিরোধী গভীর চক্রান্ত। এতে শুধু শ্রমিক কর্মচারীদেরই ক্ষতি হচ্ছে না, সামগ্রিকভাবে দেশেরও ক্ষতি হচ্ছে।

সি আই টি ইউর অন্ততম নেতা শান্তি ঘটক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, রাজ্য সরকার ওই কারখানাটি খেলার জন্ত যদিও লব রকম চেষ্টা করছেন এবং পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন, তথাপি কারখানার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নিচ্ছেন না। রাজ্য সরকার

সি পি আইকে মস্কোর নির্দেশ

১ম পৃষ্ঠার পর

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ভারতের কাছ থেকে আরও খোলাখুলি সমর্থন আশা করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারত যেটুকু সমর্থন জানিয়েছে তাতেও সোভিয়েট রাশিয়ার কিছুটা নৈতিক বল বেড়েছে।

মস্কোতে ওলিম্পিক চলাকালীন সময়ে সি পি আই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়। সি পি আই নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে ইন্দিরা এবং তার সরকারকে সমর্থনের অস্বীকার সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের বোঝাবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা শ্রমী গান্ধীকে প্রগতিশীল বলে মনে করছেন না। কারণ অর্ধ-নৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমী গান্ধীর নীতি একচেটিয়া পুলিশ মালিকদেরকেই প্রবৃত্তি করেছে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা জানার পরও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করার জন্ত

কারের সুপারিশ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্বাবদ্ধ কারখানার আরো নতুন খণ্ড দিয়ে কারখানাটি চালু করার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষ তাতেও বিশেষ সাড়া দিচ্ছেন না।

উপরন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষ ওই কারখানার ১০০ শ্রমিক-কর্মচারীর প্রতিভেদে ফাণ্ড এবং কর্মচারী রাজ্য বীমার টাকা ছ'বছর ধরে কেটে নেওয়ার পরেও যথাস্থানে ওই ধরনের টাকা জমা দেননি। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী কানাইলাল তট্টাচার্য এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে যতবারই জিদ্দলীর বৈঠক ডেকেছেন, কারখানার কর্তৃপক্ষ ততবারই শ্রীতট্টাচার্যকে দূর থেকে বৃদ্ধা-জুট প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ মন্ত্রীর নির্দেশ অস্বীকারী মালিকরা জিদ্দলীর বৈঠকে হাজির হন নি।

অপরদিকে, কারখানার কর্তৃপক্ষ এরাডোর লুটিত মুদ্রা অস্ত্র পাচার করে দিচ্ছেন। এরই মধ্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ তাঁদের আসল রূপ, মাম, গোজ এবং শয়তানির কথা পোপস রেখে ভারতে আরো তিনটি স্থানে নতুন নতুন তিনটি কারখানা স্থাপন করছেন বলে জানা গেছে। ওরা শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য ছ'মাসের বেতনও আটকে রেখেছেন বলে

সি পি আই নেতৃবৃন্দের নির্দেশ দেন।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দলের বিরুদ্ধে বিকল্প শক্তি হিসাবে ভারতবর্ষে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত করার জন্ত সি পি আই-এর প্রায়শন্যক সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেন। তাছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সি পি আই-এর সঙ্গে একটা ব্যাপক সহযোগিতার আদায় জন্ত সি পি আইকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭২ থেকে ৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় পর্যন্ত সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করে এসেছেন। ৭৭ সালে জনতা সরকারের আবির্ভাবের পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীর কাজের সমালোচনা শুরু করে দেয়। ৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতার ক্ষিমে আসার পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সি আই টি ইউ নেতা শান্তি বাবু বলেছেন যে, বেণী কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বাঁচাতে হলে অবিলম্বে কারখানাটি সরকারের হাতে নিতে হবে। কারণ এক বছর ধরে কর্মহীন শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকাংশই চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে দিনানিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

মানেকার মা

১ম পৃষ্ঠার পর

তখন রাজীর ঠিক করেছিলেন যে, ভারত ত্যাগ করে ইটালী চলে যাবেন এবং সেইখানে স্বাধীনভাবে বসবাস করবেন। রাজীবের স্ত্রী সোনিয়ার এখনও ইটালীর নাগরিকত্ব আছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এরকম দুর্বল স্বভাবের লোক দিয়ে কি কাজ হবে?

এদিকে রাজীবের স্ত্রী সোনিয়াও রাজীবকে তাতাচ্ছে রাজনীতির হাল ধরার জন্ত। পরমা আগস্ট এক, এস, খান নামে এক এম, পি কর্ণাটক ভবনে এক বিরাট নৈশ 'ভোজের আয়োজন করেন। এবং এটা করেন রাজীবের রাজনীতিতে যোগদান উপলক্ষে। কিন্তু রাজীব এবং ইন্দিরা গান্ধী সেই ভোজনসভার যোগদান করেন নি, কারণ ইন্দিরা গান্ধী চান তার পার্টি এবং দেশের সব জায়গা থেকে আগে বিশ্বের অসংখ্য আত্মক রাজীবের রাজনীতিতে যোগদানের জন্ত। তারপর অবস্থা বুঝে রাজীব রাজনীতিতে আসার কথা ঘোষণা করেন। তাতে এটা যোটাযুটি নিশ্চিত যে রাজীব আসছেন। এবং তাকে বেশ শক্তিশালী লবীর বিরোধিতা করেই কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যেই খুশবন্ত সিং, দিল্লীর পুলিশ কমিশনার ভিন্দার, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী ধারণান মানেকার দিকে দাঁড়িয়ে গেছেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছে আগেকার রাজ-রাজারাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন রাজ পরিবারগুলোকে কলহ হ'ত, আজকে এই গণতান্ত্রিক ভারতেও দিল্লীর মনন নিয়ে ইন্দিরার পরিবারে তাই হচ্ছে।

বিধানচন্দ্র কৃষিবিজ্ঞালয়

বিধানচন্দ্র কৃষিবিজ্ঞালয়ের অবস্থা নিয়ে এখনকার শিক্ষকরা হীর্ষদীন ধরেই আন্দোলন করছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা এ প্রসঙ্গে উপাচার্য, মন্ত্রী ও আচার্যের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সুবিচারের আশ্বাস দিলেও এ পর্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেন নি। একারণে আগামী ২২ আগস্ট লাটটি দাবির ভিত্তিতে তাঁরা দাবি দিব্দ পালনের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন।

সকলেই দায়ী

১ম পৃষ্ঠার পর

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার কমলেশ রাই। ভেতর ও বাইরের পুরোপুরি দায়িত্বে ছিলেন ডি সি হেডকোয়ার্টার্স বি কে দাছা। বিকেলে প্রাত্যহিক সংঘর্ষ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই রক্তি টেডিয়ামে ইট চালান হয়েছে। দু'একটি নয়। বজ্রবজ্র ইট ও পাথরের টাই দিয়ে খেলার মাঠের কিছু অংশ ভরিয়ে তোলা হয়েছে। ছুঁল সমর্থকের মধ্যে মাঠের আশেপাশে সকাল থেকেই উত্তেজনা। দু'পক্ষই পরস্পরকে দেখে মেবে বলে চমকি দিয়েছে। ছোটখাটো হাতাহাতি মাঠের বাইরে দুপুরের অনেক আগেই শুরু হয়েছে। পুলিশ কিছু করে নি। তারা তখন "পুলিশ এ্যাসিস্টেন্স"-এর নামে ছোট ছোট ছাউনিতে এ্যামগ্রি-কারারের চোখা লাগাতেই ছিলেন ব্যস্ত। খেলা শুক্র সাপ্তাহ পর থেকেই দু'দল সমর্থক মারমুখি হয়ে পড়ে। ঢিল, পাথরের টুকরো ছোঁড়াছুঁড়ি তখন থেকেই শুরু। কেনসিংয়ের পাশে পুলিশ তখন খেলা দেখতে মগ্ন।

শুধু পুলিশ কেন, খেলার মাঠে জন ছয়েক জনধরনী মন্ত্রী তাদের প্রিয় খেলা দেখছেন। অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণার কথা, মন্ত্রীরা যখন তাদের লথের প্রিয় খেলার মন্ত ঠিক তখনি অববেচক, খেলা পাগল কিছু তরুণ আত্মঘাতী সংঘর্ষে একে একে রক্তাক্ত অবস্থার লুটিয়ে পড়ছেন। অসহ্যার পরিবারের প্রিয়জনরা বজ্রপাত কাতরাচ্ছে। জীবনের শেষ খেলা দেখে এক একজন লাশ হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিচ্ছে। দর্শকসনে উপবিষ্ট কৃষিমন্ত্রী কমল ওহ, খাণ্ডমন্ত্রী সুধীন হুমাং, পকারেত দপ্তরের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্তমন্ত্রী স্বতীন চক্রবর্তী পরে বলেছেন তাঁরা নাকি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। গ্যালারী ও পর চলেছে ধওমুদ। বেপরোয়া ঢিল বাজী। আহতদের আর্ডনাদ। পুলিশ নাকি বুঝতে পারে নি—মন্ত্রীরাও তাই। দ্বিলীপ পালিত ও বিদেশ বহুর মধ্যে হারামারি হওয়ার পর খেলার মাঠে যে মরণ যন্ত্র চলে তাতে খেলা বন্ধ থাকে নি। প্রায় আধঘণ্টা ধরে খেলা চলে। এ সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন যুতার কোলে চলে পড়ে। তাতে কিছু পুলিশ কিংবা মন্ত্রী কারোরই হ'ল হয় নি। এর চেয়ে অপদার্বতা, লষ্টামো কি আর কিছু হতে পারে? মাত্র কয়েক হাত দূরের

বীতংস মারকীর কাণ্ড বাহের চোখ এড়াতে পারে, তাদের হাতে ধারণ মান নিরাপদ একথা মনে ক'অসম্ভব। বছর দুয়েক আগে রাষ্ট্রপূর্তমন্ত্রী গেলেকে নিয়ে যা করেছেন সেকথাও একে অরণ করা যেতে পারে। মনে করা যেতে পারে মন্ত ওলিম্পিকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়ে গোটা মন্ত্রিসভার কাণ্ডকারখানার কথা। এসব দেখে একথা ভাবা যেতে পারে যে মন্ত্রিসভারাজ্যের খেলার প্রসঙ্গটি নিয়ে বেইচ্ছে করেই খেলা খেলছেন মসকো ওলিম্পিকে গেলেকে? রাজ্য বিধানসভার সদস্য স্বভাব চক্রবর্তী, বিনি সারাজীভু ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করে এলেন। অর্শোক বহু বিনি সর্বধে কাটালাকলার মতই সর্বজ বিরাজ মান। খেলার বিনি আদৌ কি বোঝেন না। শুধু এরাই নয়, ছাত্র ফেডারেশনের যুগল দাস, রাজ মন্ত্রিসভার লম্বা স্বতীন চক্রবর্তী কমল ওহ প্রমুখ মন্ত্রীরাও খেলা সমর্থনার রূপে সরকারী স্বীকৃতি পেয়ে মস্কো চলে গেলেন। খেলার মাঠে কেন্দ্র করে দুর্নীতি চলেছে তা শুধু গোটা কর খেলোয়াড়ই সীমাবদ্ধ নয়, আই, এফ, এ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে মহাকরণের দোর গোড়া পর্যন্ত তা প্রসারিত। তদুপাধারণ মানুষ আশা করবে অমূল্য তাক্সা ১৪টি প্রাণের বিনিময়ে সরকার শিষ্কাগ্রহণ করবে। কংগ্রেসী কার্যদার বিচার বিভাগীয় তদন্তাধীন করেই যেন দায়িত্বের অবমান ম'বটে। খোজ নেওয়া হোক, টিকিট বিক্রীর কারচুপি, পুলিশের ভূমিকা ও গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট। এক লগ্নে অন্তর্ভুক্ত হোক খেলার মাঠে ঐদিন সকাল থেকেই ঢিল পাচারে-নেপথ্য কাহিনী।

খেলা বন্ধ করা যোগের ওয়ুধ নয়। এতে যোগের সাময়িক উপশম হতে পারে। কিন্তু যোগ নিমূল হওয়া সম্ভব নয়। সরকার অন্তত খোজারনে বিষয়টি নিয়ে নিজেরা আলোচনা করুন। আত্মগমীকা হওয়া প্রয়োজন মন্ত্রিসভার গোটা ছয়েক মন্ত্রীদল প্রাশাসনের অন্তান্ত পদম্ব অফিসারদের উপস্থিতিতে যে মরযেধ যন্ত্র অচলিত হলো তাতে তাঁদের দা। হিল কতখানি? কাপুসযের "কিছু দেখিনি" বলে এড়িয়ে যাওয়া আর যাই হোক সত্যতা নয়। এতে নৈতিক সমর্থন মেলাও দার।

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র চালানকারী চক্রের কয়েকজন

পাণ্ডার ভারত আগমন । প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ

ভি আই পি রূপে আপ্যায়নের ব্যবস্থা

দপন

কল্যাণ ঘোষ

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র চালানকারী চক্রের কতিপয় পাণ্ডার ভারতে আগমন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের জন্য “ভি আই পি ট্রিটমেন্টের” আয়োজন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দাবি উঠেছে, অবিলম্বে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

দুবাদের প্রকাশ গত জুলাই মাসে

ব্রিটিশ নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক

অস্ত্র চালানকারী চক্রের হোতা ডব্লিউ আর এম মাইকেল ভারতে আসেন। উদ্দেশ্য, ভারত থেকে ২০০টি লেজু-রিয়ান ট্যাঙ্ক ক্রয় করা। মার্কিন টো মিসাইল এবং প্রতিরক্ষা পরিবহনের জন্য পশ্চিম জার্মান বিমান সহ বিভিন্ন অস্ত্র সামগ্রী ভারতকে গছানো তার ভারতে আগমনের অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিশেষ

করে প্রতিরক্ষা সচিব ও রাষ্ট্রমন্ত্রী সি পি এম সিং এই বিতর্কিত অস্ত্র চালানকারীর জন্য ঢালাও আয়োজ প্রমোদের ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি আরও একজন অস্ত্র ব্যবসায়ী ভারতে এসেছেন। তাঁর নাম আইসেমবার্গ। তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে “অস্ত্রের দালাল” হিসাবেই পরিচিত। শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠার

ত্রয়বিংশ বর্ষ । ৩১শ সংখ্যা । শুক্রবার ২১শে আগস্ট ৮০ । ৬০ পয়সা

ইন্দিরার গরের স্থান কমলাপতির

কংগ্রেস (ই) দলে ইন্দিরার গরের স্থানটি এখনও বর্ষাবাস নেতা কমলাপতি ত্রিপাঠীর দখলে রয়েছে। যদিও তিনি একতর বেশ কিছু নেতার বিরাগভাজন হয়েছেন তবুও স্বয়ং নেত্রীর তো বটেই চেন্নী রেড্ডি, বংশীলাল, সি এম টিফেন প্রমুখের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রয়েছেন। অতীতক, বুদ্ধ নম

এমন কেউ ওই পদটির মর্যাদা যাতে পাম সেজন্ত দলের ভিতরকার তরুণেরা খুবই চেষ্টা করছেন। তাই এনিমিত্তে প্রীতিস্বীকৃতিও ভাবছেন। সেজন্ত পাকপাকিতাবে ঠিক না হলেও বিদেশমন্ত্রী নরসীমা রাও দলের হাল ধরতে পারেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল আশা করছেন।

রাষ্ট্রপতি সুযোগ পেলেই

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বতই দ্বন্দ্বম যুগ্মম রাষ্ট্রপতি রেড্ডির চলুক না কেন তিনি সুযোগ পেলেই স্রীমতী গান্ধীকে সম্বন্ধে দেবার চেষ্টা করেন কারণ, তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। তাই মাঝে মাঝে তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তাঁরও নিজস্বতা কিছু অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে, তিনি মোরারজী দেশাইয়ের আমলে বাঁদের পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যপাল নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের অসময়ে বিদায় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আর জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে তাঁর দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করার প্রথা না থাকায় কিছু ভিন্ন কথাও বলে নিয়েছেন। তাঁর ভাষণে দেশে দত্ত হরিজের মধ্যে ব্যবধান বিরাট হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টে তীব্রতর হচ্ছে এমন সব কথা প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চা-রিত হয়েছে সাবধান বাণী। একতর বর্তমান সরকার বেশ বিব্রত বোধ করলেও করার কিছু নেই।

সঞ্জয়শ্রমী আমলারা বিপাকে

দ্বিতীতে কিছু বড় বড় পদে আসীন আমলা বেশ বিপাকে পড়ে-ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ছোট ছেলের বিব্রত বলে ঝাড়া ক্ষমতার বড় লড়া ভাগ পেয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যাহ প্রভুর অবর্তমানে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। ঠুঙ্গের প্রভাব খর্ব করতে বিরোধীরা এখন বেশ

তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র সচিব বুরনি, মন্ত্রীসভা সচিব এস এস গিরগওয়াল, প্রতিরক্ষা সচিব মেনন, দ্বিতীয় উপরাজ্যপাল জগমোহন এবং পুলিশ কমিশনার প্রভৃতির বড়ই বিব্রত রয়েছেন।



ইন্দিরা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়

এখন দ্বিতীতে বতই ভাস্কর ভাঙ্গর বো) বগড়া বাঁধানর চেষ্টা হোক না কেন স্রীমতী ইন্দিরা তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্রে এব্যাপারে একটা ভারসাম্য আনতে চলেছেন। রাজীব ও মামেকাকে ঘিরে ঝাড়া কাজিয়া করছেন, ঝাড়া নতুন নতুন স্বপ্ন দেখে-ছেন তাঁরা সেলব করতে থাকলেও আসল কাজটুকু সারবেন স্রীমতী গান্ধী নিজে। তিনি চান, এ বিষয়ে বত প্রচার হয় হোক। দেখান যাক তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবার রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে। বহু জনের অল্পোথেই আসতে হচ্ছে। নইলে, তিনি যে কি করবেন তা ঠিক করেই রেখেছেন। এ নিম্নে পারিবারিক মহলে আলোচনাও লেরে নিয়েছেন। এবং উপযুক্ত

সময়ের অপেক্ষায় আছেন। এর মধ্যে বত জল্পনা কল্পনা চলে চলুক না।

স্ববর পাওয়া যাচ্ছে, মামেকা-গান্ধী দলের খুব শাখার লড়াপতি শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠার

ভারতের অর্ধেক লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছেন

ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি বাট লক্ষ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তেওয়ারী। মন্ত্রী প্রদত্ত এই পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বর্তমানে দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, দারিদ্র্য সীমার

নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রা মা ফ লে ও আধা-শহরতলীতে বাস করেন এমন বহু মানুষ আধপেটা খেয়ে কোনমতে দিন যাপন করছেন। জব্য মূল্য বৃদ্ধি, আবাসন ব্যয় বৃদ্ধি এবং কম বেতনই এসবের প্রধান কারণ। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী এই সব মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য এ পর্বত কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় নি।

সমস্যা

আবার জরুরী অবস্থার দিকে ?

ভারত জুড়ে এখন প্রায় একটাই ইন্দিরা গান্ধী কি আবার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে চলেছেন? এ-বিজ্ঞানী বামপন্থী হল-গুলোর পক্ষ থেকে যেমন, তেমনি হকিমপন্থীদেরও। গত আট মাস ধরে ইন্দিরা সরকারের কাজের খারা দেখেই বিরোধীদের মনে ক্রমেই এ ধারণা বহুতুল হচ্ছে যে জরুরী অবস্থার বিশেষ ক্ষমতা হাতে না থাকলে শ্রীমতী গান্ধী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসনে অক্ষম।

একটা নতুন সরকারের পক্ষে আট মাস অবস্থাই কিছু দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর স্বদীর্ঘ এগারো বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অথচ তার কোন কাজকর্মের মধ্যেই অতি জরুরী কোন ছাপ মিলছে না। কঠিন মাসিক সরকারী কাজকর্ম অবস্থাই চলেছে, কিন্তু তাতে শাক-দুধ হাতের থাকার নেই, আছে শিকানবিশ, আনান্ধি হাতের এলো-বেলো, বিশৃঙ্খলার চিহ্ন। উপজাত অঞ্চল (বিশেষ আঞ্চলিক আইন ১৯৭৬) আইন সংশোধন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ইন্দিরা সরকারের স্বৈর-তন্ত্রী ষাঁকট্টা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সমস্ত ভারত আজ অগ্নিগর্ভ। উত্তর পূর্ব ভারতে বো গভ প্রায় এক বছর ধরেই আগুন জ্বলছে, বিচ্ছিন্ন-তাবাদের অগ্নি নির্বাণ করা শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা ও কৌশলে তুলোয় নি। উত্তর প্রদেশে জলছে সাম্প্র-দায়িকতার আগুন। সে আগুনে রাজধানীর জংপিওও হুগু হয়েছে। মারী নির্বাচন ও নারী ধর্ষণ এখন সীতা দাবিজীর দেশে, নারী শালিত ভারতের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ভাত-পাতের প্রায়ে দালা-হালায় সমগ্র হিন্দীভাষী অঞ্চলে লেগেই রয়েছে। সেই লগ্নে রয়েছে হরিজন নিগ্রহ, শ্রমিক-কৃষক বঞ্চনা ও নিপীড়ন। অতদিকে মিত্য-প্রয়োজনীয়/ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, অব্যাহত রয়েছে মুদ্রাস্ফোতিও।

ইন্দিরা গান্ধী কোন সমস্যাই সমাধান করতে পারছেন না। এমন কি তার নামাঙ্কিত কংগ্রেস সংগঠন এবং তাঁর আশীর্বাদ স্বত্ব কংগ্রেস সরকারগুলো পর্যন্ত যে ক্ষয়রোপে আক্রান্ত তার নিরাময় ক্ষমতাও অবলুপ্ত। কিন্তু লহজ লরল সত্য

কথাটা স্বীকার করা ইন্দিরার স্বভাব বিরুদ্ধ; তিনি মিসা, পি ডি অ্যাক্ট, বিশেষ ক্ষমতা এবং সব মিলিয়ে জরুরী অবস্থার ঘটটি আবার বাগিয়ে নেবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন।

অথচ প্রতিটি সমস্যাই শ্রীমতী গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি। কিন্তু সেটা মেমে নেবার বদলে কখনো তিনি বিদেশী শক্তির উপর, কখনো বিরোধী হলগুলির উপর দায় চাপিয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছেন। লোকসভার প্রয়োজনীয়-তিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা লগ্নেও তিনি কীপল বিরোধীদের তরে জুজু। কিন্তু তার এ-কৌশল জন-দাধারণ ধরে কেলছে। তারা জানান দিয়েছে যে ১৯৮০ সাল ১৯৭৫ নয়। কাজেই পুরনো কার্যদায় রাত ছুপুরে সবার অলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে নই করিয়ে দেশে জরুরী অবস্থা বা স্বৈরতন্ত্র চাপানো লহজ হবে না। কিন্তু বিরোধী হলগুলোরও কি আত্ম-সমষ্টির অবকাশ আছে? অর্থাৎ জনগণের মধ্যে যদি তারা উপযুক্ত চেতনা বোধ জাগ্রত না করেন, তবে একদিন কাক-তোরে তারা নিজেরদের আবার জেলখানার দেখতে পারেন, দেখতে পাবেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের টু শব্দটিও ওঠেনি।

আকস্মিক আত্ম লাভ

আকস্মিক মৃত্যু হামেশাই ঘটে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক উন্নতি লগ্নেও। আকস্মিক জীবনলাভও অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাল প্রায়শই সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করছে। যেমন হংপিওর বদল, টেস্ট টিউব শিশু, একজন মারীর গর্ভে পর-পুরুষের উত্তরাধিকারীর জন্মলাভ ইত্যাদি।

কিন্তু ডঃ চেমা রেড্ডি যেন সবাইকে হার মামালেন। অজ্ঞ-প্রদেশের এই মুখ্যমন্ত্রী গত ছ'মাস ধরে বেশ জ্বরারোগ্য কর্কট রোগে ভুগছেন। মাঝে মাঝেই রোগীর এখন-তখন অবস্থা হয়। জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ না হয়েও তিনি সেমা কংগ্রেস(ই) রোগ-বিশেষজ্ঞ ইন্দিরা গান্ধীর হাতে নিজেকে গলে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীও তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে ফেলে ছিলেন। সে-পরোয়ানা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পৌছেও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই ঘটল এক আকস্মিক

সমরাস্ত্র চোরাচালানী

১ম পৃষ্ঠার পর

তথাকথিত সেই জাগরার চুক্তির মধ্যস্থতাও করেছিলেন এই ব্যক্তি। তাঁর জন্ম বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে প্রতি-রক্ষা দপ্তর কোন কমতি রাখেননি।

লগ্ননের ৩০ নম্বর মিলনার স্ট্রিটের মাইকেল অ্যাণ্ড কোম্পানীর নাম প্রথম শোনা যায় ১৯৭৬ সালে। সে সময় এই কোম্পানী ১৫ হাজার রাইফেল এবং ১২ লক্ষ কাঁচু-ইথিওপিয়ান বিজোহীদের কাছে বিক্রয় করে চড়া দামে। এই অস্ত্র চালানোর যে চুক্তি হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেরিগুয়াল। মামক কলকাতার একজন ব্যবসায়ী এবং এল কে লক্ষ নামে এক ব্যক্তি।

এরপর ওই মাইকেল ভারত থেকে ১০টি সেকুয়িয়ান ট্যাঙ্ক ক্রয় করতে সমর্থ হয়। প্রতিটির জন্ত সে দাম দেয় ২১ হাজার ডলার। জনতা সরকারের আমলে বোম্বাই বন্দর থেকে "কাম কুজি" নামক জাহাজে বোম্বাই করে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার পাঠিয়ে দেয়। এবং লংবাদ স্ত্র অস্থায়ী এই ট্যাঙ্ক প্রেরণের ঘটনায় লগ্নে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কান্তি দেশাই নাকি ঘটনা। ডঃ রেড্ডি যাতে উঠতে যাবেন—রাজ্যপালের হাতে পদত্যাগ-পত্র পেশ করবেন—এমন সময় ইন্দিরা গান্ধী টেলিফোন করে বলে দিলেন, না, এখন মরা চলবে না।

লতি, শ্রীমতী গান্ধী যেন বাছ জামেন, মরা মাহুযকও আবার বাচিয়ে তুলতে পারেন। ব্যাপার আর কিছুই নয়, কংগ্রেস(ই) থেরো-থেরির কলাপে অজ্ঞপ্রদেশে ডঃ রেড্ডির উত্তরাধিকারী স্থির করা যাচ্ছে না। বটেই তো, বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশ ঠিক মা করে কারোর কি মরা চলে? ডঃ রেড্ডিকে না হর কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার দ্বারা একটা সমস্তার সুরাহা করা গেল, কিন্তু অজ্ঞপ্রদেশকে দেখবে কে? অবশ্য দেখার লোকের অভাব ঘটায় কারণে নয়, বাবদার বেশি জুটে গিয়েছেন বলেই ফরসালা করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কাউকে পাঠিয়ে শ্রীমতী গান্ধী সাবেকী কার্যদায় লোক বিনিময়ও করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের সোয়াস্তি ছেড়ে রাজ্যের স্বপ্ন ভোগে কাউকে এখনো আগ্রহী হতে দেখা যায়নি। রাজ্যের থাকেই গহিতে বসানো হোক অচিরেই আবার গোল বাধবে। বিরুদ্ধ পক্ষের ঐ-অনৈক্যই চেমা রেড্ডিকে আত্ম দিয়ে চলছে। কিন্তু তার গদি রক্ষা করাও তার পক্ষে বেশিদিন সম্ভব নয়।

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী-তনয় কান্তি দেশাইয়ের লেখা একটি চিঠি এবং স্পেন সরকারের লেখা একটি চিঠি মালিখে হস্তগত করে মাইকেল এদেশে এসেছে। স্পেন সরকারের ঐ চিঠির বিষয়বস্তু হল: তারা ব্যবহৃত ট্যাঙ্ক কিনতে চায়।

এখন মাইকেল ভারত থেকে ২০০টি সেকুয়িয়ান ট্যাঙ্ক ক্রয় করতে চায় এবং প্রতিটির জন্ত সে ২৬ হাজার ৫০০ ডলার দাম দিতে ইচ্ছুক। অথচ আন্তর্জাতিক মূল্যমানে তার দাম হওয়া উচিত সোয়া লাখ থেকে দেড় লাখ ডলার। এমনকি সেকুয়িয়ান ট্যাঙ্ক নির্মাতা সিকার্স কোম্পানী যখন জানতে পারে যে, ভারত কিছু ট্যাঙ্ক বাদ দিতে চায় তখন তারা প্রতিটির জন্ত ৮০ হাজার ডলার দাম দিতে চায়।

রাজ্যপতার এই চাকলাকর অবস্থা তথ্যটি কাম করে আজ তব্বতের দাবি জানিয়েছেন সি পি আই নেতা ভূপেশ গুপ্ত।

এই স্বপ্ন চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন বেজর জেনারেল টি এন আমল। সেজন্ত তাঁর পদাবনতি ঘটলে ডেপুটি কমন্ডার করে তাঁকে মাউন্টেন ডিভিশনে পোষ্টিং করে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

রাজ্যপতার প্রিন্ডিংস থেকে জানা যায় যে, ভূপেশ গুপ্ত বলেছেন, এই লব বিদেশীরা কোনভাবে জানতে পারে যে, এল এম-২-বি-১-মামক, ফরাসী ক্ষেপণাস্ত্র ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর বহুলাতে চাইছে এবং তার বিক্রয় ভারত ডায়নামিক্স তৈরী করছে। এই লব বিদেশীরা চাইছে ভারত ডায়নামিক্সে যে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মিত হচ্ছে তার উৎপাদন বন্ধ করা হোক।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মধ্যে এক কায়েরী চক্র স্বার্থাঘেবী লজির রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই চক্রকে যদি অবিলম্বে উৎখাত না করা হয় তাহলে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয় হয়ে উঠবে বলে ভূপেশ গুপ্ত দাবি করেছেন।

এই প্রতিবেদকের লংবাদ স্ত্র অস্থায়ী মাইকেল প্রথমে আস্তানা নিরেছিল অশোকা হোটেলে। পরে বদল করে সে চলে যায় স্ক্রাইজ হোটেলে এবং সেখানে সে তার চক্রের লোকজনদের লগ্নে দেখা করে এবং কয়েকটি গোপন বৈঠক করে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই লব ব্যক্তিরের প্রতি অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এর মেনপা কারণ কি?

অপর অস্ত্র ব্যবসায়ী আইসেম-বার্গ শালক কংগ্রেস (ই) দলের বেশ

কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলেও বিশ্বাস স্ত্র জ্ঞানী গেছে। মনে হয় পেছনের দরজা দিয়ে এই লব নেতারা আই-সেমবার্গের পক্ষে সুবিধাজনক পরি-স্থিতি সৃষ্টি করে দিচ্ছেন।

এই হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাল। যে বেজর জেনা-রেলের পদাবনতি ঘটানো হয়েছে তাকে বারংবার হুমকি দেয়া হচ্ছে যাতে এই ঘটনা প্রকাশ না পায়। ঐ বেজর জেনারেল প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন বলে বিশ্বাস স্ত্রের খবরে প্রকাশ।

আরও জানা গেছে যে, এই অস্ত্র কার্খালপের তথ্য যেহিন-রাজ্যসভায় ওঠে সেহিন মাইকেলের পক্ষ থেকে (যে কোন উপায়েই) লংবাদিকদের বশীভূত করে ফেলা হয়। এবং সে কারণেই লগ্নবত পেট্রিটের মত সি পি আই মার্কী লংবাদপত্রগুলিও এই লংবাদটি চেপে দেয়।

ইন্দিরা রাজীব

১ম পৃষ্ঠার পর

হতে পারেন। বর্তমান সভাপতি রাঘবজয় স্বপ্ন ঐ পদে থাকবেন না। দলের যুব শাখার নিয়ম মত তিনি বয়সের দিক দিয়ে আর সভাপতি পদে থাকার অধিকারী নন। তাঁর লগ্নে অরুণ গান্ধীর ওই আলনটি নিয়ে বিরোধও চলছে। তাই তাঁর অস্ত্র দারিবে লগ্নে বাবার সভাবনা বেশ বাড়ছে। তিনি বুকে পেছেন, নেজীর মতিপতি। সেজন্ত সময় থাকতেই কাজ শুছিয়ে নিতে চাই-ছেন এবং বিরোধ বিতর্কের জালে জড়িয়ে না পড়ে পা বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। তা বলে ইন্দিরা আত্মীয় অরুণ গান্ধীও যে ভাল অবস্থায় অবস্থান করছেন সেটা বলার মত বাতাবরণ এখনও সৃষ্টি হয় নি। সেজন্ত অরুণ তেমন গুরুত্ব-পূর্ণও হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁরও বড় দারিবে পাবার আশার লগ্নে নিরাশাও কম নয়।

আর অতদিকে রাজীব গান্ধী যে শুধু বায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মাকে সাহায্য করতে আসছেন তা মোটেই নয়, তাইয়ের অবর্তমানে বায়ের উত্তরাধিকারী হবার লক্ষ্য নিয়ে দলের হাল নিজে তুলে নেবার জন্ত তৈরী হচ্ছেন। বায়ের অভিভাবকবে তাঁর রাজনীতিতে শিকা নেওয়ার পাঠ নেপথ্যে ছিল, তারের মত উল্লেকযোগ্য ছিল না। এবার তা গভীরভাবে, স্পষ্টভাবে শুরু হতে চলেছে। এবং তিনিও যে কত বড় উচ্চাভিলাষী তা যথাসময়েই প্রকাশ পাবে।

প্রাক্তন কমিউনিস্টের জবানবন্দী

গালিদাস কুণ্ডু

গত ৩০শে আগষ্ট শনিবার আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কবি জহাঙ্গীর মুখোপাধ্যায় 'কবি ও কর্মী' হিসাবে একটি জবানবন্দী রেখেছেন। জবানবন্দী না বলে এই নিবন্ধটিকে আত্মনিবেদন বলাই ভাল।

ভাবতে অবাক লাগে, নিজেকে যিনি একজন 'বিনয় কমিউনিস্ট কর্মী' রূপে পরিচয় দেন, তিনি আনন্দ-বাজারের মতো বোরতর কমিউনিস্ট বিদ্রোহী একটি বাজারী পত্রিকায় 'জহাঙ্গীর' হতে এতটুকু কৃত্তিবোধ করেন না কেন?

প্রবন্ধের সূচনাতোই জহাঙ্গীর কবুল করেছেন—“জ্ঞান দেওয়ার ব্যাপারটা আমার আসে না—রাজনীতির তথ্যজ্ঞান তো নয়ই।” অথচ গোটা প্রবন্ধে তিনি বিনয় পন্থায় জ্ঞানই বিতরণ করেছেন। “সাম্রাজ্যবাদ”, “জাতীয় বুদ্ধিবাদ”, “সি পি আই-সি-পি এম-এর একা প্রচেষ্টা”, “মার্কসবাদের বিপদ”, “ভারত-মোড়িত মৈত্রী”—ছিন্নিয়ার তাবৎ বিষয়ে জহাঙ্গীরের বুদ্ধিই মস্তব্য ছড়িয়ে আছে প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে।

হঠাৎ জহাঙ্গীর চক্ষুমান হয়ে উঠেছেন। “দেশের গতিক ভাল নয়। সাধারণ মানুষের মুশকিলের তেমন আশান হচ্ছে না। মুখ বুজে বার খেতে খেতে কেউ কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশ জুড়ে একটা অস্থির উচ্চাটন স্রবণ। পরিবের খাড়ে লংকটের বোকা চাপিয়ে দিয়ে বড়লোকেরা চাইছে ঝাড়া হাত-পা হতে। সাম্রাজ্যবাদ সদর দরজার না এসে খিড়কি দিকে ঢুকে পড়ার ফন্দি আঁটছে।”

দেশের লংকটে জহাঙ্গীর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কারণটা কি তাঁর অজানা? কেন দেশের হালটা এমন হল? সাম্রাজ্যবাদকে খিড়কি দিয়ে হাত ধরে টেনে এনেছে কে? যে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশটাকে বিদেশী পুঁজির কাছে বিক্রি করে দিল জহাঙ্গীর এবং তার দলীয় নেতৃত্ব এতদিন তো তাদেরই সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। যেদিন দেশের ভাগ্যাকাশে ঐশ্বর্য-ভ্রমের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসে জহাঙ্গীর এবং তাঁর দল সেদিন কী করছিলেন দেশবাসীর জানা আছে। বিরোধী দলগুলোকে জুক ও পুঁজু করে দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী জুকী অবস্থা ঘোষণা করলেন। গণতন্ত্রের সেই দুঃসময়ের দিনে ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা এসে “বুদ্ধিবাদী” নিয়ে দড়া করলেন। তাদের সহযোগিতা

চাইলেন। জহাঙ্গীরের সেই নির্লজ্জ ইন্দিরা প্রশস্তির কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যাবেনি।

ভারত সরকারের তথাকথিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতির প্রতি জহাঙ্গীর মুখোপাধ্যায়ের কী পতীর প্রকা। কমিউনিস্ট পার্টি একদিন এই নীতিকে “গাঢ়রঙ খাওয়া, তলারও কুড়োনা” নীতি বলে বিক্রম করেছিল। পার্টিগত এই ভুলের জন্য জহাঙ্গীর এখন অহুশোচনীয় দৃষ্ট। তা জহাঙ্গীর একটু গলা খুলে বলুন না—বিশ বছরের জন্য “ভারত-মোড়িত মৈত্রী চুক্তিটা” কি গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার উদাহরণ?

ভারতের জাতীয় বুদ্ধিবাদের প্রতি জহাঙ্গীরের কী অপরিমীম সহযোগিতা মনোভাব! সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে জহাঙ্গীর এখন হাতা গুটিয়ে আছেন। চাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। বিধবাক, এইড ইন্দিরা কনসারটরাম, বহুজাতীয় বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাছে যে ইন্দিরা গান্ধী দেশটাকে বন্ধক রেখে দিয়েছেন অন্ততপক্ষে আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য, সেই ইন্দিরা গান্ধী হলেন জাতীয় বুদ্ধিবাদ-প্রতিনিধি এবং তাঁর নেতৃত্বে জহাঙ্গীর এবং সাম্রাজ্যবাদের খাড়াটাকে না মটকে কিছুতেই ছাড়বেন না এমনই ভীষণ প্রতিজ্ঞা।

বেলায় বেলায় জহাঙ্গীরের বয়স হয়েছে। কিছু পালগর, দীর্ঘখাস ও আত্ম সমালোচনা প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু হলে বলার কিছু ছিল না। বসন্ত-মতো তিনি রাজনৈতিক বিতর্কের ফাঁদ পেতেছেন কোশলে আত্ম-কথনের ভিত্তিতে। ভক্তিটি কখনও উদ্ধত, কখনও লক্ষণ।

জহাঙ্গীর দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট বিরোধিতায় হাত পাকিয়েছেন। নষ্ট-বুদ্ধি, বিভ্রান্ত ও আত্মবিক্রীত হলেও তাকে উপেক্ষা করা যায় না। কেননা, জহাঙ্গীর তাঁর বিশদ্বন্দ্য চিন্তা প্রচারণায় নিঃসঙ্গ মন। আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের এক বিরাট অংশ এখনও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। বুদ্ধিবাদীদের একটা বড় অংশ মার্কস-বাদ-লেনিনবাদকে মস্তিষ্কে গ্রহণ করলেও জাতীয়তাবাদের তাবধারা থেকে মুক্ত নয়। তাই তাঁরা মুখে মার্কসবাদের কথা বললেও গান্ধী-নেহেরু-ইন্দিরা প্রমুখ বুদ্ধিবাদী নেতৃশ্রেণী ও পুঁজী

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সঙ্কটের ছায়া

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশ অবধি প্রতিকারমূলক কর বসিয়েছে। আমেরিকার আইনে অবলম্বন করে দেশের পণ্য আমদানীর উপর এ ধরনের ট্যাক্স বসানোর ব্যবস্থা আছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ভারত সরকার পণ্য রপ্তানী বাবদ যে-নগর করতুকি যেন তার কলে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ বাজারে ভারতীয় পণ্যের সঙ্গে আমেরিকার শিল্পজাত পণ্য প্রতিযোগিতা করতে পারছে না।

পারম্পরিক পণ্য চলাচলের উপর ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ ওক তুলে দিয়ে বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছিল। তখন জন-কেনেডি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। তাই এই চুক্তি-কেনেডি বাউণ্ড নাম-করণ করা হয়েছিল। এই চুক্তির সংক্ষিপ্ত নাম ‘গ্যাট’ বা জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্রেড এন্ড ট্যারিফ।

বিশ্ববাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাধা হিসেবে প্রত্যেক দেশের আমদানীর উপর কর বসানো এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যির হয়েছিল ঐ বাধা দূর করা হবে। প্রত্যেক দেশই অল্প দেশকে সমান সুযোগ সুবিধা দেবে, কোন রকম ত্বকের প্রাচীর বসিয়ে বিদেশের পণ্য আমদানীর পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা হবে না। অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে এর ফলে সব দেশেরই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, কলে-বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রপ্তানী বাণিজ্য-বৃদ্ধির কল্যাণে লংকটমুক্ত হবে।

কিন্তু তা হয় নি। কেনেডি বাউণ্ডের ভাবোচ্ছ্বাস কেটে যেতে দেয়ী হয় নি। আমেরিকা, কানাডা, ব্রুটেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ ধারণা করেছিল যে তাদের উন্নত শিল্প ও কারিগরী ব্যবস্থার দরুন বিকাশশীল দেশগুলি তাদের পণ্যের ভালো বাজার হয়ে উঠবে। সম্ভাব্য কাঁচামাল আমদানী করা এবং অতিরিক্ত মূল্যে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে তারা নিজেদের অর্থনীতিকে চালা করে তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকেই শিল্পোন্নত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টাল দামজাতে পারছিল না। ঐ বছর বিশ-ইজরায়েলী যুদ্ধের পর তৈল-দ্রব্য দেশগুলি তাদের জালানি তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়। শিল্পোন্নত দেশগুলি বেশী দামে যুদ্ধ উপকরণ এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী

করে এই বাটতি পুষিয়ে নেয়। তাছাড়া তৈল রপ্তানীকারী দেশগুলির পাওনা ডলার আমেরিকা ও পশ্চিমী ব্যাঙ্কলম্বে আমানত হওয়ার দরুন শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে ডলার হাতছাড়া করতে বাধ্য হয় নি।

কিন্তু তারপরে তৈলরপ্তানীকারী দেশগুলি দেখতে পেল যে তারা তেলের দাম বাড়িয়েছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, লমরোপকরণ, শিল্পজাত পণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির দাম তার চাইতেও অনেক বেশী বেড়ে গেছে।

এর অন্ততম প্রধান কারণ হলো শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উচ্চ হারে মুদ্রাস্ফীতি। এই মুদ্রাস্ফীতির কলে

আর্থনীতি

তৈল বিক্রী করে তারা যে পরিমাণ ডলার অর্জন করে তা দিয়ে যথেষ্ট পণ্য কেনা যায় না। কলে তারা আবারও তেলের দাম বাড়াল। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ছয়বছরে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩৫ ডলার থেকে ৩৫ ডলারে উঠেছে। ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলিও বেকারদার পড়েছে। তারা জালানি ও ইন্ধনশক্তির ক্ষেত্রে তেলের মুখোপেক্ষ। ঐ তেলের দাম বাড়ছে, সুতরাং পণ্য উৎপাদনের পড়তা থরচও বাড়ছে। তাছাড়া যেসব দেশে তৈলখনি আছে সেইসব দেশের তেল বাইরের বাজারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে আর্থ উন্নয়ন বৃহত্তম পশ্চিমী তেল কোম্পানী অনবরত কাটকাবাজি করছে। কারণ বন্টনের ভার তাদের হাতে, তাদের হাতেই সমুদ্রপথে তেল আনা নেওয়ার বড় বড় ট্যাক্সার জাহাজ।

সুতরাং বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না। মুদ্রাস্ফীতির দরুন নিজেদের দেশে পণ্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে গেছে। অস্বস্ত দেশের পণ্য এসে তাদের বাজার ছেড়ে ফেলেছে, কারণ ঐসব দেশের পণ্য দস্তা ও দরুন মামের। এর ফলে আমেরিকার বড় ধনী দেশের শিল্পগুলিও চিরায়িত শিরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। নিজ দেশের শিল্পগুলিকে এই প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তারা ‘গ্যাটের’ লক্ষ্য

সম্পর্কে বড় বড় কথা তুলে পেল। ১৯৭১ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন একতরফাভাবে বাধা দামে ডলার ভাঙিয়ে গোনো দেবার বাধ্যবাধকতা ও চুক্তি অস্বীকার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্পাসজাত বস্ত্র ও পোশাক আমদানীর উপর একতরফা ভাবে দশ শতাংশ সারচার্জ বসালেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সাধারণ চুক্তি একতরফাভাবে লঙ্ঘন করা হল।

ভারত সরকার নিশ্চয়ই এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না। তবু তারা আমেরিকার বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আমেরিকা ও ভারতের পারম্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে প্রায় ১০০ কোটি ডলার। আমেরিকা থেকে ভারত তার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ৬০ শতাংশ, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ৫০ শতাংশ, বিজ্ঞান, কারিগরী ও প্রকিয়াজাত করণের যন্ত্রপাতি ২৫ শতাংশ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১০ শতাংশ এবং তৈল আহরণ ও অন্সন্ধান করার যন্ত্রপাতি ৪০ শতাংশ আমদানী করে। অন্তর্দিকে আমেরিকা ভারত থেকে তার প্রয়োজনীয় পাটজাত প্রবোর ৬০ শতাংশ, কাজু বাহারের ৩০ শতাংশ, চিংড়ী মাছ ২৫ শতাংশ আমদানী করে। তাছাড়া মাইকা, কফি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দামগ্রী ইত্যাদিও আমদানী করে।

একশ কোটি ডলারের মার্কিন বাণিজ্যের ৪০ কোটি ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্য এখন মার্কিন ওকভারে ভারাক্রান্ত হল। অথচ পাকিস্তানী পণ্য এই ওক থেকে রেহাই পেয়েছে। পাইই বোকা যায় মার্কিন সরকার ভারত সরকারের উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করছেন। মার্কিন অর্থনীতির লংকটাবস্থা এই মূল কারণ। ইতিপূর্বে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের ইম্পাত রপ্তানী সম্পর্কেও আমেরিকা অহরূপ ব্যবস্থা নিয়েছে। জাপানও রেহাই পার নি। সুতরাং বিশ্বের সকল দেশকেই বুঝতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল অর্থনীতির সঙ্গে নোদর বেঁধে রেখে কোন দেশের অর্থনীতিকেই চালা করে তোলা যায় না। মার্কিন নির্ভরতা দেশের অর্থনীতিকেই পড় করে। ভারতের পক্ষে এই ঘটনা আরো বিশদ্বন্দ্য কারণ মার্কিন-ভারত বাণিজ্য যে এখনো অতীতের ঔপনিবেশিক অদম বাণিজ্যের ধারায় প্রবাহিত তা উপরোক্ত আমদানী-রপ্তানী পণ্য তালিকা থেকেই প্রমাণিত হয়।

অবলুপ্তির পথে প্রাচীনকালের পোশাক পরিচ্ছদ

ধনঞ্জয় রায়

উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে বারাণসী-বোরাংকোরা করে থাকেন তাঁরা। এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এক ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পড়তে দেখে থাকবেন। যদিও বাঙালী বলেই এরা পরিচিত হুণ্ড, এদের পোশাক পরিচ্ছদে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে পুরুষেরা 'নেংটি' আর মহিলারা 'বুকানি' ব্যবহার করে থাকেন। 'আজুনে'-এর প্রসঙ্গ পরে আসছে।

'নেংটি' আর 'বুকানি'র উৎপত্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রচলন। গ্রামের বড় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বলতে শুনেছি, 'এটা আমাদের লম্ব থেকে দেখে আসছি, বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে'। কিন্তু এর উৎপত্তি যে কবে, দৃষ্টিক্রমে কেউ তা বলতে পারছেন না।

কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষণীয় মধ্যেই এর প্রচলন সর্বাধিক। এদের মধ্যে রয়েছে দেশী (দেশীরা), পলি (পলিরা), কজির প্রভৃতি। এর বাইরেও গ্রামে যে অন্যান্য সম্প্রদায় বসবাস করত তাদেরও কেউ কেউ কাজের সুবিধার জন্য এই পোশাক ব্যবহার করত। তপস্বীলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে এ-ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার যেন একটা নিয়ম বা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

'নেংটি' আর 'বুকানি'র ব্যবহারের পেছনে কিছু কারণও আছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত, সভ্য চাল চলনে অনগ্র-লর, ছিল সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত আর অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপন্ন। কলে, এদের অনেকেই জানত না কাপড়ের ব্যবহার, অনেকেরই লামর্যা ছিল না কাপড় কেনার। বিতীত, যোগা-যোগের অভাবের দরুন আগেকার দিনে কাপড় গ্রামে পৌঁছানো সব

সময় সম্ভবপর হত না। গ্রামবাসী-রাও যে শহর থেকে কাপড় কিনে আনবে যাতায়াত আর যোগাযোগের অভাবে তা ছিল কষ্টকর। কাজেই কাপড় পরার ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে উঠত দুঃসাধ্য। তৃতীয়ত, 'নেংটি' ও 'বুকানি'র ব্যবহারে আব-হাওয়ার প্রভাবও হয়ত কিছু পরিমাণে আছে। কাপড়টি আর ধুলোবালি দেই সঙ্গে গায়ের ঘাম, কাপড় আর ক'দিন টেকে—আর পরিষ্কার-ই বা ক'দিন থাকে? এর চেয়ে 'নেংটি' ও 'বুকানি' ঢের ভাল এমনই এক মানসিকতাও এই পোশাক ব্যবহারের পেছনে রয়েছে। তাই, নিজের প্রয়োজনে দেশীয় প্রথাগত অল্প খরচে নিজেরাই নিজের পোশাক বানানোর তাগিদ অনুভব করেছিল।

গ্রামে যে একসময় কাপড়ের প্রচণ্ড সংকট ছিল এবং 'নেংটি' ও 'বুকানি'র ব্যবহার যে কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছিল, একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। তপস্বীলী জাতি বা উপজাতিদের মধ্যে কারও বাড়ীতে বিয়ে লাগলে বিয়ের কাপড় উত্তর পক্ষ-ই (কন্ডা ও পাত্র পক্ষ) জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে উঠত। তাই, বিয়ের জন্য তারা গ্রামের মধ্যে থাকত মাঝ একটি ধুতি ও একটি শাড়ী এবং সেটি থাকত গ্রামের মোড়ল বা প্রধানের বাড়ীতে। বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে বর ও কমে পক্ষের লোকজন মোড়ল বা প্রধানের বাড়ী থেকে তা চেয়ে আনত। শুধুমাত্র বিয়ের সময়ের সময় বর-কমে 'নেংটি' ও 'বুকানি' ছেড়ে এই ধুতি ও শাড়ী পরতে পারত, বিয়ে হয়ে গেলে আবার এই 'নেংটি' ও 'বুকানি' পরতে হত। 'নেংটি' ও 'বুকানি' পরেই হত ফুলদুজা। এইভাবে এই একটি ধুতি ও শাড়ী দিয়ে শত লক্ষের বিয়ে চলত। এছাড়া, গ্রামের মোড়ল বা প্রধান বা প্রকের ব্যক্তির কাছে পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরা বিশেষ কোন

দরকারে দেখা করতে গেলে ধুতি ও শাড়ী পড়ে যেতে লজ্জা পেতো, এ ক্ষেত্রে 'নেংটি' ও 'বুকানি' পড়ে যাওয়াটাই ছিল এদের রীতি। পূজা পার্বণ, আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যাতায়াত, মেলা হাট—এক কথার সামাজিক যে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে এই সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষরা একসময় 'নেংটি' আর 'বুকানি'-ই পরত।

'নেংটি' বলতে বোঝায়, একফুট চওড়া, আড়াই অথবা তিন হাত লম্বা একখণ্ড কাপড়, কোমরে জড়িয়ে দুই উরুর মধ্যে দিয়ে পেছনে গুঁজে দেওয়া। কেউ কেউ একে 'গংটি'ও বলে। 'বুকানি' বলতে, তিনহাত চওড়া, চারহাত অথবা নাড়ে চার হাতের মত লম্বা, বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে রাখা। একেও কেউ কেউ 'ছেওটা' বা 'দোতি' বলে। 'নেংটি' ব্যবহারের সময় জাদিয়া বা আঙুরউইয়াদের প্রয়োজন হয় না, তেমনি 'বুকানি' ব্যবহারেও রাউজ এবং পেটিকোটের প্রয়োজন হয় না। 'নেংটি'-র প্রচলন কোন কোন শাখা বা লম্বাশীর মধ্যেও দেখা যায়, কিন্তু খাদিয়া, গারো, মনিপুরী ইত্যাদি পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে 'বুকানি'র অনুরূপ একটি পোশাক দেখা যায়, সেখানে তারা এক খণ্ড কাপড়ের পরিবর্তে দু'খণ্ড কাপড় ব্যবহার করে, সেটি ঠিক ঠিক 'বুকানি' না হলেও অল্পটা।

এবার 'আজুনে'র প্রসঙ্গে আসা যাক। এরও প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই। এটি কোন পোশাক নয়। এই সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা যাতে নিজের কাছে সব সময় শিশু সন্তানকে রাখতে পারে, শিশুর হাতে কোন কষ্ট না হয় অথবা জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেতে পারে এরজন্য আজুনের ব্যবহার হয়। এক সাহায্যে ছোট বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে নিয়ে মহিলারা আচ্ছন্ন ভাবে কাজ করতে পারেন; যে কোন জিনিসপত্রও এর সাহায্যে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাতায়াত সহজভাবে করা যায়। আগে যানবাহনের সংকট ছিল, মালপত্র এবং শিশুদের পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যই হয়ত এর প্রচলন হয়েছে এবং এখনও এর ব্যবহার যেম একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। 'আজুনে'র সাহায্যে পিঠে শিশু সন্তান এবং জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েরা যে কোন জায়গার বয়ে নিয়ে যেমন, মেলা-হাটে-আত্মীয় বাড়ীতে-বিয়ে বাড়ীতে ইত্যাদি—এমন কি মাইলের

পর মাইল গেলেও এতে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না। কাজেই ধরে নিতে হয়—'আজুনে'র ব্যবহার জোর করে নয়—অর্থনৈতিক সংকটেও নয়—এদের কাছে এটি যেন অতি প্রয়োজন এবং দরকারী। এখানে বলে রাখি, পাহাড়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যেখানে বিশেষ করে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানেও স্ত্রীলোকেরা 'আজুনে' না হলেও 'আজুনে'র অনুরূপ জিনিস ব্যবহার করে থাকেন। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করার মত, উত্তর-বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে কোলে করে নিয়ে কোন কাজকর্ম করতে যেন অসুবিধাই বোধ করেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'আজুনে'র সাহায্যে শিশুসন্তানদের মেয়েরা পিঠে বেঁধে নিয়েই বিভিন্ন সঙ্গে কাজ করে থাকেন। নানা রঙবেরঙের এই জিনিসটি এরা নিজেরাই তৈরী করেন। এটি লম্বা পাঁচ থেকে ছয় হাত পর্যন্ত হয়, চওড়া দেড় হাতের মত। এটির ব্যবহার দু'ভাবে চলে। প্রথমত, ছেলে-মেয়েকে বা মালপত্র বোঁধে রেখে কাপড়টির একদিক বাম-কাঁধ থেকে এনে বগলের তলা দিয়ে আরেক দিকের সাথে বুকের মাঝখানে বেঁধে রাখতে হয়। বিতীত, পিঠে বাচ্চা বা জিনিসপত্র রেখে সরাসরি বুকের মধ্যে দু'দিকের কাপড় বেঁধে দিয়ে।

যখন সন্তানের অভাব ছিল অথবা যোগাযোগের অসুবিধার দরুন সন্তো গ্রামাঞ্চলে প্রায় পাওয়া যেত না সে সময় পাটের লাটির অবাঞ্ছিত অংশ বাহ দিয়ে চিকন অংশ বের করে তা দিয়ে তাকুরের (দেশীয় বস্ত্র) সাহায্যে সন্তো তৈরী হ'ত এবং এই সন্তো দিয়েই 'নেংটি', 'বুকানি' ও 'আজুনে' তৈরী হ'ত। 'নেংটি' তৈরীর জন্য সন্তোর রং ব্যবহার হ'ত না। কিন্তু 'বুকানি' ও 'আজুনে'-এর সন্তো রং বেরঙের হ'ত এবং এই রং এরা বিভিন্ন রকমের গাছের ছাল ও পাতা যেমন, আমের কুশী, জিগার (জিওল) ছাল, বগবঁইর, চৈতক গাছের ছাল প্রভৃতি দিয়ে নিজেরাই তৈরী করত। দেশীয় পদ্ধতিতে এগুলি তৈরী করার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। 'নেংটি', 'বুকানি' আর 'আজুনে' তৈরী সাধারণতঃ এই প্রকৌতুক মেয়ে-রাই করে থাকে। মোটামুটি পরিণত বয়স থেকে শুরু করে একেবারে বৃদ্ধা না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা এই কাজ করতে পারে। একটি 'নেংটি' তৈরী করতে একজন শ্রমিকের সময় লাগে একদিন, 'বুকানি' আর 'আজুনে' তৈরী করতে একজন শ্রমিকের তিন

থেকে চারদিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। দিন যতই পাণ্টে যাচ্ছে 'নেংটি' 'বুকানি' আর 'আজুনে' এর ব্যবহার ক্রমশই যেন কমে আসছে। পল্লী অঞ্চলে যোগাযোগের অভাব, যাতা-য়াতের অভাবের ব্যবধানও কমছে। কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে মিলছে আর সেই সঙ্গে এখন ব্রিনিস তৈরীর প্রচলনও নিঃশেষ হচ্ছে। আগের মত সন্তোর অভাব এখন আর নেই। দেশীয় তাঁতে আধুনিক বস্ত্রপাতির আয়তনীয় হয়েছে, সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে নানা রকমের সন্তোর রং। তা দবেও, উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে 'নেংটি', 'বুকানি' আর 'আজুনে'-এর ব্যবহার এখনও রয়েছে এবং দেখে মনে হয় তা যেন অতি প্রাচীন কালেরই এক ঐতিহ্য। মায়িকিন কাপড় ছিঁড়ে এখন 'নেংটি' ও 'আজুনে' এর ব্যবহার চলছে। আর অবস্থা! একটু ভাল হতো কিনে 'নেংটি' আর নানা রঙ-বেরঙের 'বুকানি' আর 'আজুনে' তৈরী করে বাজারেও তা বিক্রী করছে। কোথাও কোথাও গামছাগুলোও 'নেংটি' মত করে পরছে।

এছাড়া, পল্লী অঞ্চলে দিন দিন শিক্ষাদীকার প্রসার বাড়তে শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষাদীকার প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের হাট, মেলা, আত্মীয় কুটুমের বাড়ীতে যাতায়াত, পালা পার্বণ এককথার সামাজিক বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানে এই প্রকৌতুক অধিবাসীদের অনেকেই এই পোশাক এখনও ব্যবহার করছে। উত্তর বঙ্গের আধা শহর ও শহরগুলিতেও এই ধরনের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে এদের এখনও দেখা যায়। অবশ্য এদেরই বারা শহরে বাস করে তাদেরকে এ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

অতীতই দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিবর্তিত হ'তে হ'তে একদিন এমনদিন আসবে সেদিন হয়তো এ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবহারও উঠে যাবে—সেই সঙ্গে 'নেংটি' কালের স্মৃতি হস্তা-বলেপে বিনষ্ট হবে উত্তরবঙ্গের তপ-স্বীলী জাতি ও উপজাতিদের পোশাক পরিচ্ছদের একটি স্ব-প্রাচীন ধারা 'নেংটি', 'বুকানি' ও 'আজুনে' এর প্রচলন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

- ১। ভারতের শিলান্তর ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস / ডঃ ভিমিররজন সর্বাধিকারী / ১৯৮০
- ২। কৃষ্ণলম্বুতি বিজ্ঞান ও আলোকচিত্র মিনারল বিজ্ঞান /

সন্ধ্যা রায় / ১৯৮০

৬৪, রাজা সুবোধ ষড়িক স্কোয়ার, কলিকাতা-১০০

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

অশোক চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের জন্ম কেউ দাবী করেন আর এস এসকে আবার কেউ দাবী করেন মুসলিম লীগ, জমাৎ ই ইসলামীকে। আর এর ফলস্বরূপ লুটপুট রাজনৈতিক দলগুলো। প্রয়োজনে এই কুকার্বে ইচ্ছন যোগাতেও তারা কল্পন করে না। কিন্তু প্রশ্ন হল সাম্প্রদায়িকতা কি আকাশ থেকে পড়া জিনিস? নিশ্চয়ই না। একটি সাম্প্রদায়িক চিন্তার ধারাবাহিকতাই মানুষকে স্ব স্ব সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন করে অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ করে তোলে। আর এস এস বা মুসলিম লীগ জমাৎ ই ইসলামী প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক চিন্তা এই ধারায় প্রবাহিত হয়ে একটি পুণীকৃত রূপ পেয়েছে, যার পরিণাম রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে। বর্তমান শতক যেহেতু উনিশ শতকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই হেতু বর্তমান শতকের আলোচনা উনিশ শতকের আলোচনাকে বাধ দিতে হতে পারে না। বর্তমান শতকে বহুবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে—আজও হচ্ছে। এবং যে উদ্ভেদনা চলছে তাতে আগামীদিনে যে এটা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে (যদি এই ভাবেই চলতে থাকে)—ভাবলে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ থেকে যায়। আজ যে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগিত সাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে উনিশ শতকে এবং এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁর জনকও পুরোহিতরা। সাম্প্রদায়িক চিন্তার উদ্বেগ ধারা বহিয়েছেন তারা সবাই হলেন মূলতঃ শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণী বা ভূস্বামী। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তা—যা পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সেলিয়ে দেবে—ছিল না। এর প্রমাণ ১৭৫৭-র পর থেকে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী কৃষক শ্রমীর দলীয় সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়—যেখানে হিন্দু মুসলমান পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়েছে। এই সব দলীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব কখনও ছিল হিন্দু নায়কের ওপর, আবার কখনও বা মুসলমান নায়কের ওপর। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও ভূস্বামীরাই সাম্প্রদায়িক চিন্তার উদ্বেগ বটাতে থাকেন যা শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান-দের সাম্প্রদায়িক রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকেই সহায়তা দিয়েছে এবং যা আজও সাম্রাজ্যবাদকেই সে বা করছে।

শব্দটি ব্যবহার করে মুসলমানদের থেকে নিজেদের আলাদা অভিব্যক্তি চিন্তাকে সোচ্চার করে তোলেন। ১৮১৭ সালের ২০ জুলাইর কলকাতার যে কলেজটি স্থাপন করা হয় তার নাম রাখা হয় 'হিন্দু কলেজ'। পরে এই স্কুলে যে বাংলা পাঠশালা (হিন্দু কলেজ পাঠশালা) স্থাপন করা হয়, সেই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু কৃষকদের সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষাদান করা।^১ রামমোহন নিজেও অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে এবং সচেতনভাবে তাদের বাধ দিয়ে হিন্দু প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা কিতাবে দানা বেঁধেছিল। রামমোহনের মতে শিক্ষা কোন মতেই ধর্মনিরপেক্ষ হবে না—তা হলে অবশ্যই ধর্মদ্রোহ, এবং সে ধর্ম হিন্দু ধর্ম, যা সততই মুসলমানদের বাধ দিয়ে। 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রামমোহন তাঁর চিন্তার প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যাও রেখে গিয়েছেন। তাছাড়া প্রসঙ্গত আরও বলা যায় যে ১৮৩১ সালে তীর্থ-মন্ত্রীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে সমস্ত কৃষকদের ব্রিটিশবিরোধী শ্রেণীভুক্তির প্রতি রামমোহন কোন সমর্থনই জানাননি, তার কারণ এই সাম্প্রদায়িক নীতিই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। পূর্বের জমিদার কৃষক যার যখন তীর্থের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ বাধাবার অপপ্রয়াস করেছিলেন^২ (অবশ্যই স্বেচ্ছাভাবে এই কৃষকদের আত্মসম্মতি স্বত্বলতা সৃষ্টি করে ইংরেজদের কাছে তাদের অসহায় করে-তোলাবার জন্য), তখনও রামমোহন হিন্দুসমাজ দলত্যাগ নিয়ে এ সম্পর্কে কিছু করতে এগিয়ে আসেন নি। বিভাগাগর যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন, তাও শুধুমাত্র উচ্চবর্ণ হিন্দুদের জন্য।^৩ তাঁর লক্ষ্যসমূহ কোন কালেই তিনি হিন্দু সম্প্রদায় বহিষ্কৃত চিন্তা নিয়ে করেন নি। নিরাল-উদ্ভোলা ইংরেজ অহুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে গোপন লড়াই করেছিলেন এটা তো আর মিথ্যে নয়। এখানে তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব নিঃসন্দেহে উদ্ভেদ্য। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের লাম্পটোর কথা তুলে তাঁর নিন্দা করে ইংরেজ রাজশক্তির প্রশস্তি গাওয়ার অর্থ কি দাঁড়ায়?

ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইকে অস্বীকার করা নয় কি? তাই বিভাগাগর যখন সিরাজকে 'ছত্রাচার নবাব' বলে ইংরেজদের প্রশস্তি পান, তখন ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ায়? এখানে কি 'মুসলমান' সিরাজের বিরুদ্ধে 'হিন্দু' বিভাগাগরের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উৎকট প্রকাশ ঘটেনি? সমসাময়িক শিক্ষিত হিন্দু মধ্য-শ্রেণী ও ভূস্বামীরা পত্রপত্রিকা, প্রতিষ্ঠান, মেলা প্রভৃতির নামকরণের মধ্যেও 'হিন্দু' শব্দটি সব সময় উচ্চকিত রাখতেন। রাজনারায়ণ বসু তো সরাসরি বলেই ফেলেছেন যে 'হিন্দু' নাম অতি মনোরম শব্দ; হিন্দু নাম লোপ করার মতো বাতনার বিষয় আর কি আছে? ব্যাপারটা লক্ষণীয়। পত্রপত্রিকার নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কাশী-প্রসাদ ঘোষ তাঁর পত্রিকার নাম রেখেছিলেন 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'হিন্দু পেট্রিঅট'। মধুসূদন দত্ত রাজ্যে থাকাকালীন যে পত্রিকা সম্পাদন করতেন তার নাম 'হিন্দু ক্রনিকল'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার নাম ছিল 'হিন্দু হিউম্যানিটি'। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এ ছাড়া ধরা যাক 'হিন্দু মেলা'। এই মেলা সম্পর্কে গণেশনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে এই মেলার উদ্দেশ্য হল বছরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।^৪ রাজনারায়ণ বসু প্রথমে ইংরেজীতে লেখা উপন্যাস 'ওল্ড ম্যান্স হোপ'-এর বঙ্গানুবাদে নামকরণ করেন 'বুড় হিন্দুর আশা'।^৫ এখানে 'ওল্ড ম্যান্স হোপ'-এর বঙ্গানুবাদে 'হিন্দু' শব্দটি কোথেকে এসে? তবে মানুষ বলতে তাঁরা কি শুধু 'হিন্দু'কেই বুঝতেন, মুসলমানদের নয়? এ ছাড়া উক্ত বইতে রাজনারায়ণ নিখিল ভারতীয় হিন্দু-মহাসমিতি স্থাপনের প্রস্তাবও করেছেন।^৬ আর, এ হেন হিন্দু মেলার পেছনে নবগোপাল মিত্রের কর্মমৈপুণ্য ঠিক তেমন ভাবে ছিল যেমন ভাবে হাওড়া সেতু নির্মাণের পেছনে ছিল স্বত্ব ইঞ্জিনিয়ারদের কীর্তি।^৭ তাহলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রোথিত এবং পুষ্ট করে তোলা হয়েছিল উনিশ শতকেই—আর তা করেছিলেন বাংলার তথাকথিত

রেনেসাঁর মহানায়করা। এরাই হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক নীতিতে কাটল ধরিয়েছেন যা সার্থক ভাবেই সেবা করেছে সাম্রাজ্য-বাদকে যার ফলভোগ আজ আমরাও করছি। এদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই আমাদের শিখিয়েছে হিন্দু জগৎশেঠের তুলনায় মুসলমান মীরজাদারকে বেশী করে বিখ্যাত-বাতক রূপে চিহ্নিত করতে, ছিন্ন-স্তরের মস্তকরের সমকালীন সময়ে অভ্যচারী হিসেবে হিন্দু মিতার যারের নামকে অহুচ্চারিত রেখে মুসলমান রেজা খান নামকে উচ্চরবে প্রচার করতে। আমাদের তেজস্বী সাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তুলেছেন এই সব রেনেসাঁর নায়করা, তাই প্রশ্ন জাগে বাংলার 'নবজাগরণ' কি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নবজাগরণ নয়? বন্ধিত তো সরাসরি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে দেবার দল প্রায়শ পেয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তিনি ইতিহাস বিকৃত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের (কৃষকদের) সম্মিলিত সংগ্রামকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর শ্রেণী সংগ্রামে রূপ দিয়েছেন। তিনি সরাসরি 'নেড়ে মারা'র মোগলান / দি রে ছেন। এমনকি মঙ্গলদেও ভেঙে কবে তিনি রাধামাধবের মন্দির গড়বেন? এজাতীয় নির্লজ্জ উক্তি করতেও বাঁধেনি। মুসলমানরা ভগবান 'বিবেকী' বলেই তিনি তাদের সবশেষে নিপাত করতে চান।^৮ লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মন্ডলেই তাঁর মঙ্গল। যখন সাম্প্রদায়িক বিভাজন তুলে হিন্দু মুসলমানরা একের পর এক ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দলীয় গণবিদ্রোহ সংঘটিত করতেন, ঠিক তখনই বন্ধিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে এদেশে ইংরেজ-বিরোধী গণসংগ্রামের পেছনে ছুরি মেরেছেন। বন্ধিতের সাম্প্রদায়িকতা এতদূর পূর্বসূর গিয়েছিল যে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে তিনি সমর্থন না করার কারণ হিসেবে দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই বিদ্রোহ যদি সফল হত তবে দিল্লী ও লক্ষনৌতে মুসলমান বাদশাহ রাজত্ব করত।^৯ বন্ধিতের এই মুসলমান বিরোধিতা এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে আর এস এস কোন বিচ্ছিন্ন চিন্তার ফলস্বরূপ বলে মনে হয় না। শেষ জীবনে বন্ধিত তো সরাসরি হিন্দু ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। তাঁর বন্দোবস্ত-র গানও পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত।

বন্ধিতের পাশাপাশি আরও এক জনের নাম করতে হয়, যিনি এ ব্যাপারে ছিলেন বন্ধিতের স্বযোগ্য সহযোগী। তাঁর নাম রাজনারায়ণ বসু। জাতীয় সত্তার মানিক অধিবেশনে তিনি যে সব বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্মের প্রেততা'। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রসূত এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক বন্ধিত উচ্চরবে বলে ওঠেন যে রাজনারায়ণের কলমের ওপর পুণ্যবৃষ্টি হোক। তার দোষের হিসেবে বন্ধিত একেজের রাজনারায়ণকে চিনতে ভুল করেননি। ১৮৮৭ সালে রাজনারায়ণ বলেছিলেন 'কৃষক-যেমন পরিচিত ভূখণ্ড কর্ষণ করে সেইরূপ হিন্দুসমাজই আমাদের কার্যের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। আমরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে উদ্বেজিত করিব।... বাহাতে হিন্দু-গণ ভ্রাতৃত্বাবে সম্বন্ধ হয়, বাহাতে বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাজপুত্র, মারাঠী প্রভৃতি হিন্দুগণ সমবেত হয়, বাহাতে তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ (লাভের) জন্য ধর্মদলত কৈ সমস্ত শেখাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

জবানবন্দী
৩য় পৃষ্ঠায় পর

হের প্রশংসা ও স্তুতিবাচনে পক্ষমুখ। নাহুপ্রিয়ার, এস-এ ভালে, হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাবা বাবা "কমিউনিষ্ট" নেতা গান্ধী ও নেহেরুর মধ্যে মহান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা খুঁজে পেয়েছেন। স্বভাব মুখোপাধ্যায় এই ঐতিহ্যের ধারায় লম্পট।

তাই স্বভাববাবুর আক্রমণের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদের পরাশ্রিত ইন্দিরা সরকার নয়—"সীমান্তে খোঁচা পাকানো চীন।" স্বভাববাবুদের চীন বিবেক কমিউনিজম বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। এরা চোখ থাকতেও দেখেন না সাম্রাজ্যবাদীরাই চীন-ভারত বিরোধ জ্বীলিয়ে রাখতে চায়। আর নির্বোধ চীন বিবেকে অন্ধ হয়ে এরা দিনের আলোকের মতো লতাক-ও অস্বীকার করেন। স্বভাব মুখোপাধ্যায় "স্ব স্ব শক্তির সবচেয়ে বিপুল বন্ধু" সোভিয়েত দেশ টাঙ্ক, কামান, লেজ পাঠিয়ে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধিয়েছে, ভিয়েতনামকে শিখণ্ডী করে কম্পুচিয়ার আগুন জালিয়েছে, আফ্রিকার বেশে দেশে নষ্টামি ও অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছে। আফ্রো এশিয়া লেখক লংঘের চাকরীর জন্য স্বভাববাবুরা আর কতকাল এই সব লতাক অস্বীকার করে চলবেন!

উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও ভূস্বামীরা কথার কথার 'হিন্দু'

বন্ধিতের পাশাপাশি আরও এক-

আদর্শবাদী লেখক ও কেরিয়ার মিহির আচার্য

চল্লিশ পঞ্চাশের প্রগতি লেখ-
কেরা শোষিত মানুষের পক্ষে কলম
ধারণ করেছিলেন। কলে তাঁদের
সাহিত্যরুচি ছিল একটা ব্রত।
লেখার ভিন্নতর উদ্দেশ্য তাঁদের কাছে
ছিল না। পত্রিকা ধারা চালাতেন
তাঁরা কম বেশি - একই আদর্শে
বিশ্বাসী, ধারা কালেভাড়া বই ছাপ-
তেন তাঁরাও ছিলেন তাই।

এটা ভালো কি মন্দ এ সম্পর্কে
ডরু থাকতে পারে। কিন্তু এ সত্য-
টাকে অস্বীকার করা যায় না।
সাহিত্যের সংসারে সম্পাদক-প্রকাশক
লেখকের মধ্যে একটা সহমর্মিতা
বিরাজ করত। কিন্তু সমস্তা সৃষ্টি
করল তখনই যখন আস্তে আস্তে
প্রগতি আন্দোলনের সম্পর্কে নানা-
বিধ বাদপ্রতিবাদ সৃষ্টি হোল, কমিউ-
নিস্ট আন্দোলনে বিকৃতি দেখা
ছিল। দেখা গেল ক্রমশ আদর্শের
ব্যাপারে ভাটা পড়ল। মধ্যবিত্ত
শ্রেণির লোকেরা বেশিদূর এগোল না।
পত্রিকা উঠল। বন্ধুত্বাবলম্বী প্রকা-
শকরাও অদৃশ্য হলেন। পুরনো
সম্পর্কগুলো আদর্শভঙ্গের চোরা-
বালিতে মূখ ধুয়ে পড়ল।

পরিণতি হল এই, লেখকেরা
তথাকথিত উদার সম্পাদক ও প্রকা-
শকের পৃষ্ঠপোষক হারালেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোভাগ্য
বলতে হবে, ইতিমধ্যেই বৃহৎ পত্রি-
কার লেখার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হয়ে-
ছেন, তাই তাঁর পক্ষে গোড়ার দিকে
প্রকাশক পাওয়ার অসুবিধে হয় নি।
অন্তত যতদিন পর্যন্ত সাহিত্যে
প্রগতি লেখকের একচ্ছত্র আধি-
পত্য ছিল ততদিন মানিকের বই
ছেপে কোনো প্রকাশক 'প্রগতিশীল'
সঙ্গে ব্যক্তিগত আখের গোছানোর
সুবিধে পেয়েছেন এবং সেই প্রকাশক
নিজে লেখক হওয়ার স্বপ্নে চীন
কিংবা রাশিয়ার লেখক-প্রতিনিধি

হবার পৌরবণ ব্যাপারে নিরুৎসাহ।
কিন্তু পরবর্তীকালে মানিক কমিউ-
নিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত
হয়ে পড়লে বৃহৎ সম্পাদক কিংবা
প্রকাশক তাঁর বই ছাপেন নি, এটিও
ঘটনা। স্বয়ং মানিকেরই যখন এই
অবস্থা তখন অন্তর্ভুক্তদের পক্ষে কেরি-
য়ার তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে
পড়বে তাতে আশ্চর্যের কী!

বরোয়ান রমেশচন্দ্র সেনের মতো
লেখককেও উদার বন্ধুত্বাবলম্বী প্রকা-
শকরা উঠে গেলে বৃহৎ প্রকাশকরা
তাঁর দিকে তেমন মনোযোগ দেন
নি। তাই দেখা যায় এই অসীম
শক্তির লেখক 'কুশপালা' 'শতাব্দী'
'কাজল' ইত্যাদি রচনার প্রতিভার
নিদর্শন রাখলেও তাঁর বেশির ভাগ
গ্রন্থই বাজারে পাওয়া যায় না।
সাহিত্যের কাছ দমালোচকরা পর্যন্ত
সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর যোগ্য
মর্যাদা দেন না।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের প্রথম দিকের
রচনা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকা-
শনী থেকে প্রকাশিত হলেও যখন
তিনি বনিষ্ঠভাবে প্রগতি আন্দো-
লনের সঙ্গে যুক্ত হলেন তখন তাঁর
বই ছাপবার ক্ষেত্রে আর প্রকাশক
পাওয়া গেল না। একমাত্র 'সারস্বত
লাইব্রেরি' থেকে তাঁর 'ছোট বড়
মাঝারি' নামক ছোট গল্প
গ্রন্থটি বেরোবার সুযোগ
পেরেছিল। স্বর্ণকমলবাবুর কোনো
সাহিত্যিকর্মই আজ বাজারে নেই।
তিনি কিছুকাল আগে মৃত হয়েছেন,
তাঁর বহু আগেই তাঁর সাহিত্য কর্ম
লোপাট হয়ে গেছে। আজকের
প্রগতিশীল পাঠকরাও, আমি
নিশ্চিত, তাঁর নাম জানেন না।

নবেন্দু ঘোষ প্রবাসী লেখক,
পাটনার নৃত্যবিজ্ঞান সঙ্গে ওখানকার
'প্রভাতী' পত্রিকার কিছু কিছু
কিংবা রাশিয়ার লেখক-প্রতিনিধি

কার প্রকাশিত উপন্যাসটি বেরোলো
বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'ডাক দিয়ে
যাই' নাম দিয়ে। রত্নারাতি জন-
চিত্ত জর করলেন। একদিকে রাজ-
নৈতিক বক্তব্য, হিউম্যানিজম, ধর্ম
অব কলশাপনেন, দর্শনগরি অভিনব
প্রকাশশৈলীর গুণে গ্রন্থটি সাহিত্যে
ল্যাণ্ডমার্ক হওয়ার যোগ্য। আমার
দৃঢ় বিশ্বাস তরুণ প্রগতি পাঠকেরাও
এর নাম পোনেন মি। সেই নবেন্দু
ঘোষ কলকাতার স্থায়ী হয়ে নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়ের সক্রিয় বন্ধুত্ব লাভ
করে একদা প্রকাশক পেলেও প্রগতি
আন্দোলনের ভাটার কারণে তথা-
কথিত প্রকাশকের 'হাকিম্য'
হারালেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য
গ্রন্থগুলি বাজারে আর পাওয়া যায়
না। তাই নবেন্দুবাবু সাহিত্যে
কেরিয়ার তৈরী করতে পারেন নি,

সাহিত্য দর্শন

শেষ পর্যন্ত চিত্রনাট্যকার হিসেবে
বিস্ময় হারের ইউনিটের সঙ্গে বসে
পাড়ি দিয়েছেন। অথুনা তাঁর
সাহিত্যিক পরিচয় কিছু বন্ধুজনের
স্বতিতে পূর্ণবসিত।

সুশীল জানা, সেকালের অপ্র-
তিদ্বন্দ্বী গল্পকার, বিশ্বাস করা
কষ্ট, তাঁর দিকে কোন বৃহৎ প্রকাশক
হস্তপ্রসারিত করেন নি। যে সব
বন্ধুরা তাঁর বই ছেপেছিলেন তাঁদের
অ্যামেচার উদ্ভব নিঃশেষিত হওয়ার
পর তাঁর বই আর পাওয়া যায় না।
সম্প্রতি এক যুগ পরে তাঁর প্রেট গল্প
বেরিয়েছে ক্ষুদ্র প্রকাশনার সাহায্যে।
তাঁর 'গল্পসমগ্র' পাবার কোনো
সম্ভাবনা নেই।

ননী ভৌমিকের অবস্থা আরো
করুণ। তিনি বাজার থেকেই
অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁর প্রেট গল্প
গ্রন্থ 'ধামকানা' যা প্রগতি গল্পের
ক্ষেত্রে মডেল হতে পারে তা আজ
বাজারে নেই। এমন কি তাঁর
'ধুমোমাটি' উপন্যাসটি একদা বেঙ্গল
পাবলিশার্স বের করেছিল তারও
চিহ্ন নেই।

আজকের সাহিত্যের বাজার
বুজোয়া চরিত্রাভ্যাসী নীতিহীন
আদর্শহীন পণ্যে পরিণত হয়েছে।
তাই চল্লিশ দশকের শেষ প্রান্তে
আমার সঙ্গী লেখকেরাও আজ
অজ্ঞাত। আশীষ বর্মণ, মিহির
সেন, সুবোধমোহন ঘোষ, শান্তি
রায়, রমোজিৎ সেন, সত্যপ্রিয়
ঘোষ, ত্রিফল গোস্বামী, গুণময় নাসা,
স্বর্ধীর করণ প্রমুখ লেখকেরা একদা
ভালো ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে-
ছিলেন আজকের পাঠকের পক্ষে সে-
খবর রাখা সম্ভব নয়।
শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

শিবরাম চক্রবর্তী : একটি জীবনভঙ্গি

সাংখ্যোক্ত নিষ্কাম পুরুষ শিব-
রাম চক্রবর্তী যেমন ব্যক্তিগত জীবনে
তেমন সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে নিজে-
কেই স্বেচ্চে দ্বাতান্তর বরেনে যত্ন-
লোকে পাড়ি দিলেন। কল্লোল
গোষ্ঠীর সঙ্গে একদা তাঁর সংযোগ
থাকলেও তিনি সত্যীর্থের তৎকালীন
রচনার ভঙ্গিসর্বস্বতা—একাধারে
বাউলুলেপনা এবং দেহবাহকে আমল
না-দিলেও ব্যক্তিগত জীবনটাকে
আদর্শ বোহিমিয়ানের মতো গ্রহণ-
করেছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টিও মূলত
অ্যামেচারধর্মী ছিল। বেহেতু থাকে
বলে প্রকেশনাল সাহিত্যিক তা তিনি
ছিলেন না। পারিবারিক বন্ধনমুক্ত
মানুষটির না-জীবন সম্পর্কে না-
সাহিত্যে কোনোরকম বৈষয়িক
আসক্তি ছিল না।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই
লেখক স্তরতে নিরিয়ান সৃষ্টিবাদী
রচনা লিখে এককালে আলোড়ন
এনেছিলেন। 'মকো বমাম পণ্ডি-
চেরী' গ্রন্থে মার্কসবাদের প্রবক্তা হয়ে
পণ্ডিচেরীর ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে
লড়েছিলেন। 'ওরা যখন কথা
বলে' সে সময়ের আরেকটি নিরিয়ান
নাটক।

তারপর এমন কী ঘটল
যার ফলে রাতারাতি মানুষটি মনো-
রকম কমেডিয়ানে রূপান্তরিত
হলেন? অবশ্যই এই কমেডিয়ানের
স্মৃতিকা শেকসপীরের 'কমেডিয়ান
কিংবা পরিচালক-অভিনেতা চার্লস
চ্যাপলিনের মতো হয়ে উঠল না।
সামাজিক বৈষম্য, ক্রটি, অসংগতির
লমালোচনা নয়। নিছক হাসির
এবং হাস্যকরতার প্রতিভা হয়ে উঠ-
লেন তিনি। এবং কিশোর বয়সের
হাসির লেখক। বড়দের জ্ঞেও
হাসির রচনা কিছু উপহার দিয়েছেন
অবশ্যই। এবং হাস্যরসকে Pun-এর
প্রাবল্যে বিরক্তিকর করে তুলেছেন।
তিনি জৈলোক্যনাথও হননি, পরন্তু-
রামও নন। তাঁর হাস্যরস ব্যঙ্গ বা
প্লেবে ভরপুর নয়। নিছক আমাদের
উপকরণ হয়ে উঠেছে। এবং কখনো
কখনো হাস্য কটকটিত বলেও মনে
হয়। এই সব কারণেই মনে হয়
সারাজীবন উদ্দেশ্যহীন নির্বাসন
মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেন-কল, এবং
সাহিত্যের ব্যাপারেও তিনি অ্যামে-
চার জীবন কাটিয়ে গেছেন। এই
উদাসীন মানুষটি, সংসারে কারুর
কাছে বেম কোনো পাওনা নেই,
কাউকে কিছু দেবারও নেই—জীবন
ব্যাপারটাই তাঁর কাছে বিরাট
কাকিবাঙ্গি।

কী এমন রহস্য, যা এখানে
অনাবৃত, যার জন্তে জীবন

ও সাহিত্যে তিনি নিজেকেই
বুঝাঙ্গুলি দেবিয়ে গেলেন!
তাঁর সমকালীন লেখকেরা যখন
আজ পর্যন্ত বৈষয়িক স্বপ্ন এবং প্রতি-
ষ্ঠার জন্ত করেন না এমন কাজ নেই
'তখন এই বিরল অনাসক্তি তিনি কী
করে অর্জন করলেন।

অথচ দেশ, সমাজ, মানবচরিত্র
বা রাজনীতি বিষয়ে তিনি যে অনীহ
ছিলেন এমন নয়। এই লেখকই
একদা অতীত 'বসুমতী'তে 'বাঁকা-
চোখে' জাতীয় রাজনৈতিক-সামা-
জিক টিপ্পনি লিখে অসাধারণ জন-
প্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তী-
কালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেও
তিনি 'অরবিন্দ' কলামে টিপ্পনি শুরু
করেন। বিগত এমারজেন্সিকালে
তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

শিবরাম চক্রবর্তীর হাস্যধারার
বহিষ্কার সঙ্গে মিল খুঁজতে হয়
তাহলে তিনি ইংরাজ লেখক পি জি
ওডহাউস। 'কিন্তু অমিলও আছে।
ওডহাউস তথাকথিত উচ্চমহাজের
মানুষদের ক্রিয়াকলাপের লমালো-
চনা করতে ছাড়েননি।

জীবনের শেষ দিকে 'লেখক
দেবর, পৃথিবী, ভালোবাসা' নামক
আত্মজীবনীমূলক রচনার প্রথম
খণ্ডটি লিখে গেছেন। বিতীর্ণ খণ্ড
লেখার ইচ্ছা ছিল, মৃত্যু সে সুযোগ
দিল না।

আরেকটি ঘটনা শোনা যায়
শিবরাম শরৎচন্দ্রের 'দেমা পাওনা'
উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।
কিন্তু 'বোডনী' নাটকে তাঁর স্বীকৃতি
হিঁদে না। সে কারণে তাঁর ক্ষোভ
ছিল। আসল ঘটনা আজকের
পাঠকের পক্ষে বিচার করা মুশকিল।
'বোডনী' নাটক শরৎচন্দ্রের নামেই
চলে আসছে। কে বলতে পারে-
এটাই শিবরামের নাট্যরূপ কিনা।
অথবা শরৎচন্দ্র নিজেই পাণ্ডুলিপি
মনোনীত না করে সংশোধন, পরি-
বর্ধন করতে করতে স্বতন্ত্র নাটকেরই
রূপ দিয়েছেন।

শিবরাম বেঁচে থাকতে পারি-
বারিক বন্ধন কিংবা আত্মীয়-বন্ধনের
তোয়াকা রাখেন নি বলেই তাঁর
অগণন ভক্ত কিশোর চিত্রকালই এই
উদ্ভট ব্যক্তিকে অকপট আত্মীয়
বলে মনে রাখবে। আর, আমরা
বয়স্করা তাঁর বেঁচে থাকার এই বিশেষ
স্টাইল গ্রহণ করি বা না-করি
শিবরামের কাছে তা মূল্যহীন।
তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চান নি,
আমরা এখন কষ্ট পেলে তাঁর নিজস্ব
জীবনভঙ্গির পরেই কটাক করা
হবে। দীর্ঘ নিশ্বাস চেপেই তাই
আমাদের নীচব দর্শকের স্মৃতিকা।

প্রকাশিত হল

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুদিত

মহাপৃথিবীর কবিতা

দাম—আট টাকা

অম্বাবধর্ম যে স্বর্জনশীল প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে কবিতাগুলি
তারই স্বাক্ষর বহন করেছে। কবিতা নির্বাচনে কবির বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ
করেছে। কবিতাগুলি সংগ্রাহ্য, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। এক্ষেত্রে,
আজিকার আধুনিক অধিবাসীদের লোকগাথা যেমন আছে তেমন রয়েছে
চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, জার্মানী, পোল্যান্ডের নিম্নো কবিতার পরিচয়
মাও সে তুও হো চি মিন-ব্রেশটের অম্বাবধর্মগুলি অনবদ্য।

পরিবেশক ১১ কথাসিঙ্গ ১১ শ্যামচন্দ্রণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০

এক শ্রেণীর পুলিশ অফিসার

চোরাকারবারীদের মদত দিচ্ছেন

কেরোসিন তেল নিয়ে রাজ্য জুড়ে হাট্টাকার। লব্ধ মেই মেই রব। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিলাও উদ্বিগ্ন। কিন্তু রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কোনও হাশ নেই। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অপরাধ করার জন্য একদল পুলিশ অফিসার এখন তেল চোরাইয়ের ব্যাপারে নানাভাবে চোরাকারবারীদের মদত দিচ্ছেন। মেদিনীপুরের ভেবরা, কোলাবাট, পাশকুড়া ২৪ পরগণার বজবজ, খড়দহ, মহেশ-তলা, একবালপুর, বেলখরিয়া, আলিপুর, হাওড়ার ডোমকুড়, শালকিয়া, সাকরহিল থানা এলাকার বেপারোরা চোরাই তেলের কারবার চলছে। হাওড়ার এস, পি, বরুণ মুখার্জী, মেদিনীপুরের রাজেন্দ্রকুমার নিগম ও ২৪ পরগণার এস পি, এইসব চোরাই গোড়াউনগুলির বিস্তারিত তথ্য জানেন। কেন্দ্র ও জেলা এনফোর্স-মেন্টগুলির দপ্তরও এ সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল। কিন্তু নির্বিবাহে কেরোসিন সহ অস্ত্র তেল নিয়ে চোরাকার-বারীদের চোরাই কারবার দিনের পর দিন ফোঁতকার হয়ে উঠছে।

এই কারবারের মহাপাণ্ডা তার-চাঁদ আগরওয়াল ওরফে চৌধুরী পুলিশী ধরা হোওয়ার বাইরে। টালাগল সাহুলার রোডের ওপর ইটখোলায় মধ্যে দ্বারভাটিখানা মহল্লায়, মেদিনীপুরের কোলাবাট থানা এলাকার পাঁচশিলায় শশাঙ্ক-কুমার পাণ্ডার কর্মিতে, হুতাড়াটা থানা এলাকার দেউলপাড়ায়, ভেবরা থানা এলাকার শ্রীরামপুর থানতোড় নামক সিং হোটেলের কাছে তার-চাঁদ দিনে দুপুরে ট্যাঙ্কার থেকে কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, জুট ব্যাচিং অয়েল, কার্পেস অয়েল, মবিল হাজার হাজার লিটার গরিয়ে নিচ্ছে। কেরোসিন বেশাচ্ছে জুট ব্যাচিং অয়েল, ডিজেল, পেট্রোলের সংপে। এক আধ লিটার ময়, হাজার হাজার লিটার প্রতিদিন। এসব চোরাই তেল ও জেলা তেল পাচার হচ্ছে হাড়াবাগান থানা এলাকার পোস্তার শিউমারায়ণের হিন্দুস্থান অয়েল কোম্পানীর গোড়াউনে। দেউল-পাড়ার চোরাই গোড়াউনে যে সব তেল তেলের কুখ্যাত চোরাকারবারী তারচাঁদ সরাজে তা গিয়ে উঠছে চোরাই গোড়াউনেরই এক অংশীদার

শেখ মহম্মদ মহলীন নামে কেরোসিন তেলের এক ডিলারের কাছে। এর ডিলারশিপের হোকানটি রয়েছে সেদিন কুবের চৈতন্যপুরে। মেদিনী-পুরের এস, পি রাজেন্দ্র কুমার নিগম সবই জানেন। দস্তবস্ত সবচেয়ে বেশী জামেন রাজ্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাণ্ডের এস, পি, হেডকোয়ার্টার্স এস, পি, সাক্তাল সাহেব। তারচাঁদ আগরওয়াল সংকে এই অফিসার পুলিশটির বেশ পরিচয় রয়েছে। কেন না যে কোন কারপেই হোক না কেন রাজ্য এনফোর্সমেন্টের সদর দপ্তর থেকে মাত্র পাঁচ কিলো-মিটার দূরে তারচাঁদের চোরাই গোড়াউন বখারীতি চলছে। এবং খবর হলো আগের তুলনায় তা ভালোভাবেই চলছে। এই দপ্তরের ২০১২ জন তদন্তকারী অফিসার থাকা সত্ত্বেও তারচাঁদ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লিটার তেল অবাধে পাচার করছে। মহিষাঙ্গ থানা এলাকার জায়সীলান আগরওয়াল প্রমুখেরও কারবার লক্ষা গ্রামে বেশ জোরদারই চলছে।

আরও অজুত ঘটনা হলো, সাক-রাইল আলমপুরে জনৈক অফিসার পবিত্র রায় চোরাকারবারী নিরাজের গোড়াউন গত ২৯ তারিখে রেড করেন। কিন্তু অভিযোগ চোরাই তেলে ভর্তি একটা ট্যাঙ্কার তিনি ছেড়ে দিয়ে মাত্র কয়েক লিটার চোরাই তেলের এক সামান্য মামলা রুজু করেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছে মালিক নয়, সামান্য এক খালানী। রাজ্য এনফোর্সমেন্টের অফিসার কেশব ব্যানার্জী ডোমকুড় থানা এলাকার নিবন্ধার একটি ঘটনার ২৪শে আগষ্ট এক মামলা রুজু করেন। যে গোড়াউনে শ্রীব্যানার্জী রেড করেন সেটা কুখ্যাত চোরাকারবারী লাল-মোহন, ছদ্মকদ্মিন ওউনাপুর সিংয়ের। কিন্তু অভিযোগ, কার্যক্রে দেখা গেল গোড়াউনের ভিতর ধরা পড়া দুটি ট্যাঙ্কার অমারালে তাদের চোখের সামনে দিয়েই পালিয়ে গেল। মামলা রুজু করা যে তেল আটক করা হলো তা লিখা দেওয়া হলো এই চোরাই গোড়াউনেরই অন্ততম অংশীদার ছদ্মকদ্মিনকে। এলাকার চৌধুরী সান্তিস স্টেশনে এই দিনই দেখা গেল শ্রীব্যানার্জীকে অত্যন্ত আপত্তিকর অবস্থায় চোরাকারবারীদের সঙ্গে হবমব করছেন।

সাম্প্রদায়িকতা

৫ম পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা হয়, তাহাতে আমরা প্রাণপণ স্বপ্ন করিব।^{১৪} এ যেন আর এস এসেরই কণ্ঠস্বর। তাঁর মতে হিন্দু-দের ধর্মপন্থীর অধিকার রক্ষার-জন্ত, হিন্দুদের জাতীয়তাব উদ্দীপিত করার জন্য এবং সাধারণতঃ হিন্দুদের উন্নতি সাধনের জন্তই হিন্দুদের সভা থাকা উচিত। সভায় বক্তব্য রাখা কালে তিনি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে 'হে হিন্দু মহোদয়গণ!' বলে সম্বোধন করেছেন। এমনকি হিন্দু সমিতির জাতীয় পতাকা রাখার উচিত্য সম্পর্কেও তিনি দোঁচোর হয়েছেন।^{১৫} এইভাবে রাজনারায়ণ হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতাকে পুষ্ট করে গেছেন। এই সাম্প্রদায়িক চিন্তা এমন ভাবে প্রসারলাভ করেছিল যে মনোমোহন ঘোষও সমকালীন সময়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন 'এই দুর্বল চাক্ষুষ করিয়া কোন চিন্তাশীল হিন্দু গির খা কি তে পারে?'^{১৬} হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা মন্তব্য করে লিখেছিল যে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু শ্রেণীভেদ প্রচার করে হিন্দু জাতির

এরকম ঘটনা অনেক। এখন একথা বেশ পরিচয় কেন্দ্রীয় সরকার যখন কেরোসিন তেল সহ অস্ত্র তেলে জেলা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন, ঠিক তখন রাজ্য এনফোর্স-মেন্ট ব্রাঞ্চ, জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সহ পুলিশী দপ্তরের কিছু পুলিশ অফিসার রাজ্য সরকারকে বেকারদার ফেলার জন্য তেলের চোরাকারবারী-দের অবাধ সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন।

জানা যায় রাজ্যের ইমপেন্ডের জেনারেল শিবশঙ্কর মিত্র ডি, আই, জি ডি, এন, পাণ্ডেও তেলের চোরাকারবারে পুলিশী কৃমিকার খুব খুশি নম। কিন্তু এ জিনিস বন্ধ করতে হলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের খোল নলচে পাটানো দরকার। সাংঘাতিক কথা হলো ছ একজন সং অফিসার রেড করার কোম পরিকল্পনা কিংবা গাফী ও ফোর্স রিকুইজিশন করা মাত্র সে খবর চোরাকারবারীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। দপ্তরের ইমপেন্ডের, লাব ইমপেন্ডের পর্যায়ে রহবদল করার সঙ্গে-দপ্তরের এস, পি, হেড-কোয়ার্টার্স এস, পি, সাক্তাল মহা-নয়ের কথাও একবার মনে রাখা দরকার। কেরোসিন তেলের হাট্টাকার বন্ধ করতে হলে চোরাই গোড়াউনগুলি লম্বা দরকারের কঠোর পথ অবলম্বন করা ছাড়া কোনও বিকল্প পথ নেই।

মজল করেছেন, 'হিন্দু জাতির অকারণ বৈরীগণ' তার লেখনীর ভরে কাঁপত।^{১৭} একজন মানুষকে 'হিন্দু' বলে প্রচার করার এবং তিনি 'হিন্দু' জন্ম সবকিছুই করে-ছেন—এ ধরনের প্রচারের নমুনা এর চেয়ে আর কিই বা হোতে পারে। দীনবন্ধুর মতো সাম্প্র-দায়িক লেখক শেষ পর্যন্ত এই প্রবহমান সাম্প্রদায়িক চেতনার শিকার হয়েছিলেন তার প্রমাণ হরিশ্চন্দ্রের স্বস্তিসভায় তাঁর বক্তৃতা। মধুসূদনের সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'হিন্দু ক্রমিকল'-এর কথা আগেই বলেছি। এছাড়া মধুর কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তার উৎকট প্রকাশ পাওয়া না গেলেও বক্তৃতে হয় মধু নাহিত্য কিন্তু মূলতঃ হিন্দু সংস্কৃতির থেকে উৎসারিত এবং তাতেই নিপতিত। তাছাড়া - মধুসূদন ছিলেন জয়দেব এবং কৃষ্ণলীলা লহরী প্রভৃতির সবিশেষ পক্ষপাতী। মধু মানসিকতার অন্ততম লক্ষণীয় দিক হল এটি। আর এদিকটিও নিঃসন্দেহে প্রবহমান হিন্দু সাম্প্র-দায়িক চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিবিরকুমার ঘোষ বা-ইই করুন না কেন তিনি কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় রেখেছেন 'নিমাই সরাদান' 'অমির চরিত মানস' প্রভৃতি হিন্দুধর্ম সংস্কৃত বই লেখার মধ্যে এবং পরবর্তী কালে তাঁর 'হিন্দু শ্মিরচুআল ম্যাগাজিন' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। তাঁর সাম্প্রদায়িকত আত্মমুখীন চিন্তার অন্ততম ফল 'লর্ড গোরাল'।

অতঃপরে পৃষ্ঠাই দেখা যাচ্ছে বর্তমান শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও চিন্তা চেতনার বীজ উৎপ হয়েছিল উনিশ শতকে। কলকাতার শহরে শিকিত মধ্যবিত্ত ও স্বাধীনরা ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক সংগ্রামের তীব্রতা থেকে রাজস্বের মনকে দূরে ঠেলে দেবার মানসিকতা থেকেই শুরু করে-ছিলেন 'নবজাগরণ', যে নবজাগরণ ছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যীভিত্তে কাটল ধরিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক সংগ্রামের (হিন্দু-মুসলমানের মিলিতভাবে) শক্তি ধ্বংস করতে এবং এদেশে ইংরেজ রাজ-শক্তিকে লাফলান্নমকভাবে টিকিয়ে রাখতে। এদিক থেকে উনিশ শতকে বাঙালার 'নবজাগরণ' ছিল হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার নবজাগরণ, যা পর-বর্তী কালে জন্ম দিয়েছে হিন্দু মহা-সভা, মুসলিম লীগ, আর, এস, এস, প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের যার অবিবাহ পরিণতি হিসেবে এই শতকের প্রাক ১৫ই আগষ্ট, '৪৭-এর দিনগুলিতে আমরা দেখেছি রক্তাক্ত

দাঙ্গা এবং উত্তর ১৫ই আগষ্ট '৪৭-এর দিনগুলিতেও দেখেছি রক্তাক্ত সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা। বর্তমান শতকের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রক্তপাতের মূল নিহিত আছে উনিশ শতকে। তাই এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের আলোচনাই আগে এনে পড়ে। উনিশ শতকের তাবড়ো 'মহা-পুস্তকরাই' ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিষয় জ্বিয়ে রাখতে। এ ব্যাপারে আরও ব্যাপক আলোচনার দরকার।

প্রমাণপত্রী:

- (১) General Report of Public Instruction in the lower provinces of the Bengal Presidency for 1843 44-P-19
- (২) 'প্রমদ রা ম মো হ ন : বাংলায় তথাকথিত রেনেশ': অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'ভরল', শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪। পৃ-২৫।
- (৩) ইন্ডিয়ান ও ভারত : স্ব-জিত দাশগুপ্ত। পৃ-১২-১৩।
- (৪) 'প্রমদ বিদ্যাসাগর : মান-বতাবাদের স্বরূপ': অশোক চট্টো-পাধ্যায়। 'ভরল' শীত সংকলন ১৩৮৪। পৃ-৩৬।
- (৫) বঙ্কিম মতাদর্শের স্বরূপ প্রসঙ্গে : অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'ভরল' বঙ্গ সংকলন ১৩৮৪। পৃ-৪৫-৪৬।
- (৬) রাজনারায়ণ বসু : বঙ্গীয় নাহিত্য পরিষদ। পৃ-২৬।
- (৭) ভারতের মুক্তি লক্ষ্যী : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ-১০৭।
- (৮) জে। পৃ-১০৬।
- (৯) জে। পৃ-১০৭।
- (১০) ভারতের মুক্তি লক্ষ্যী : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ-১১৫।
- (১১) বঙ্কিম রচনা বলী। 'আনন্দমঠ'। সংস্ক। পৃ-৭১৮।
- (১২) কথানাহিত্যে বঙ্কিম : সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। পৃ-২৫২।
- (১৩) স্বদেশী প্রেরণ চার অধ্যায় : পুলকেশ ঘোষ সরকার। পৃ-২০।
- (১৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আখিন। ১৮০৩।
- (১৫) ভারতের মুক্তি লক্ষ্যী : যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ-১০৮।
- (১৬) জে। পৃ-১১৯।
- (১৭) সোমপ্রকাশ। ১৭ই জুন, ১৮৬১।
- (১৮) 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত : দৃষ্টিপাত': অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'ভরল' বিশেষ শরৎ সংকলন, ১৩৮৬। পৃ-৭৮।

সাহিত্য দর্পণ

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থায় বইয়ের বাজারও চরিত্রাহারী গড়ে ওঠে। কমানিশাল না হলে কেরিয়ার তৈরি করা যায় না। অথচ কমানিশালের চরিত্রের সঙ্গে আদর্শবাহ মেলানো মুশকিল। প্রগতিশীল প্রকাশনা-কেই এই উত্তাপ নিতে হবে। নতুন প্রগতি সাহিত্যের মুক্তি নেই।

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

পথের পাঁচালী

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁচিশ বছর আগে ১৯৫৫ সালে ২৬শে আগস্ট প্রথম মুক্তি দিয়ে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি বহন দেখে-ছিলাম, তখন অবাক হয়েছিলাম আশ্চর্য স্বন্দর ফ্রেমগুলির কাব্য স্বপ্না দেখে, মুগ্ধ হয়েছিলাম গীতিছন্দে সুরা সুললিত শিল্প মুহূর্ত। উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাগৃহটিতে ভিড় ছিল না মোটেই। বিশেষ কারণ মনো-যোগ আকর্ষণ করেছি নতুন ছবিটি, কারণ ছবির পরিচালক মতন, কাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অভিনয়শিল্পী রাও সব নবাগত, সংসীত পরিচালক রূপে আছেন অবশ্য রবিশংকর, কিন্তু তখন বাংলা ছবিতে রবিশংকর আর কতখানি আকর্ষণীয়। সুতরাং উপেক্ষা অবহেলাটাই স্বাভাবিক প্রচলিত ধ্যান ধারণা অঙ্গসারে। সেদিন কে আর আগে তাপে বুকে পেয়েছিল, কি এক অসাধারণ ছবির মুক্তিই না ঘটতে যাচ্ছে এ দেশের মাটিতে, পরবর্তীকালে যা জুবন জয় করে দেশের ছবির রাজ্যে বটাবে পালা বদল। দেশবাসীর লীলাহীন উদ্বলীনতার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' ছবিটির প্রথম প্রদর্শনী অর্জিত হল।

ছবিঘরে ঢুকছিলাম কিছুটা কৌতূহলী হয়ে। উপেক্ষাকিশোরের নাতি, স্বকুমার রায়ের ছেলে ছবি করেছেন। বাইরের দেয়ালটিতে সর্বজয়া তুর্গা আর অপূর্ণ সর্বজনীন আবেদনমণ্ড ভগ্নী, ভেতরের শো-কেসে ষ্টিল ছবিগুলির অদ্ভুত বর্ণ-ময়তা উৎসাহিত করেছিল ছবিটি দেখতে। তারপরেও ছবিটি দেখেছি—আবার দেখেছি। বত বা-র দেখেছি, ততবারই ভেবেছি—ছবিটির প্রাণশক্তি কি অসীম। ছবিতে অপূর্ণতা ছিল, অক্ষমতাও কিছু ছিল না, তানয়। তারই পরবর্তী ছবি 'অপরাজিত' ছিল আরও পরিণত। ছবিতে রিয়ালিটির চেয়ে রোমাঞ্চ-নিজম প্রাধান্য পেয়েছিল, তাই দারিদ্র্য পেয়েছিল মহিমায়িত রূপ—রক্ষ কঠিন বাস্তবতার দারিদ্র্যকে

অতিশাণ রূপে বিকৃত করা হয়নি। বিকৃতিকূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপজ্ঞান যে 'পোয়েটিক রিয়ালিজম', তাই রোমাঞ্চিক সত্যজিৎ রায়কে আগ্রহী করে তুলে ছিল। তবু 'পথের পাঁচালী' অসামান্য শিল্পাভাবে অপরূপ এক চিত্রকাব্য, স্বীকার করতে হুঁটা থাকার কথা নয়।

আজও কি ভোলা যায় সেই কবে দেখা নান্দনিক ব্যঙ্গনা লম্বুক দৃশ্য-গুলি। অপূর্ণকে রেলগাড়ি দেখাতে তুর্গা লংগে নিয়ে ছুটেছে বিজীর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে কাশবন পেছনে ফেলে, অঝোরে বৃষ্টির মধ্যে ছুটি বালক-বালিকার আনন্দ ও আশংকা, জলাশয়ের ওপর গঙ্গা কড়িঙের লাকানি, টেলিগ্রাফ পোস্টে অপূর্ণ কান পেতে শোনা, তুর্গা ও অপূর্ণ পাশে নিয়ে সর্বজয়ার সেই জগৎ-জননী হুলত হাসি, তুর্গার মৃত্যুতে সর্বজয়ার কান্নার লংগে তার শানাইয়ের মুহূর্তকে এক করে দেওয়া এবং হরিহরের শোকতরু মুখের বোবা কান্না, ইন্দিরাকর্ণের মুখে সেই গান—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হোল', বালক অপূর্ণ ছুটি চোখে বিশ্বের বিশ্বয়, ক্রমশঃ পার্থিব জাম-বুচ্ছি—বিদ্বি নেই—বাইরে যেতে হবে—আকাশে মেঘ দেখে ঘর থেকে ছাড়া বগলে নিয়ে অপূর্ণ পথে মায়া, ইন্দিরাকর্ণের মৃত্যুকণের সেই ভয়ংকর নৈঃশব্দের মধ্যে একটা খালি ঘটি গড়িয়ে পুত্রে পড়া আর লংগে লংগে প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়া ইত্যাদি রসোত্তীর্ণ দৃশ্যের স্মৃতি আজও অন্তর সত্তায় অমলিন হয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ 'পথের পাঁচালী'র এক একটি ল্যাওকেপ ও কয়েকটি মডেল দৃশ্য স্মরণ চিত্রকলার গরিমায় ভাস্বর।

১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবির আবির্ভাবে দেশের চলচ্চিত্র পেল প্রথম শিল্প সৌরভ। বিশ বছর বাড়ে ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' কলা আঙ্গিকে ও কাব্য সৌরভে সৃষ্টি করল মনতরঙ্গ। আমাদের চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎকে

করল উজ্জল সত্তাবনাময়। আদ্যার করে আনল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশ্বের দরবারে সর্বাধার আসম পেল বাংলা ছবি। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' কিসের জোরে এতবড় জোয়ারটা নিয়ে এলো? ছবিটির মধ্যে যে লিরিক্যাল ধারা, তাত্ত্বো আপেও ছিল দেবকী বহুর ছবির মধ্যে—'চণ্ডীদাস', 'মীরাবাই', 'বিভাপতি' যার সাক্ষ্য দেবে আজও। তবে 'পথের পাঁচালী'র লিরিসিজম ছিল আরও পরিণত, আরও সংহত। মূলতঃ কাব্য ছন্দের সংহতি, প্রকরণ-গত পরিণতি, শিল্পসৃষ্টির পরিমিত বোধ ও রসাবেদন সজ্ঞারের শক্তি 'পথের পাঁচালী'কে অনন্ত করে তুলেছিল। ছবির ডিটেলস-এর দিকে এতখানি সজ্ঞাগ মনস্তাত্ত্বিক ইতিপূর্বে আরে কোম চলচ্চিত্রকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি।

'পথের পাঁচালী'র নির্মাণকালের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি ঘটনার সাক্ষ্য আমরা পাই। ১৯৫০ সালে পুন্ডভকিন ও চেরকালভের কলকাতা সফর, জা রেপোরার 'রিতার' ছবির সৃষ্টি করতে লে সময় এদেশে আগমন এবং ১৯৫২ সালে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব। এই ঘটনাগুলি সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্র নির্মাণে বিশেষ ভাবে উৎসাহী করেছে এবং 'পথের পাঁচালী' পরিচালনার পাতের জুগিয়েছে। আর এক বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ পরিচালক স্বত্বিক ঘটক ১৯৫২ সালেই তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক' তৈরী করেন। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায় মাটকীরভাবে পঁচিশ বছর পরে। সেই অবহেলিত জীব প্রকৃষ্টি ছবির পর্দায় দেখে তখন মনে হয়, বধা সময়ে ছবিটি মুক্তি পেলে এটিও একটি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারত অল্প ভাবে। কিন্তু তা হয়নি। 'পথের পাঁচালী' সৃষ্টি করল কলমোকেয় রসসমৃদ্ধ সেই অমবচ্ছ ইতিহাস নিতুল পদক্ষেপে। এদেশে ছবির জগতে এল মতন হাওয়া। কিছু মতন প্রাণে সৃষ্টি করল উদ্দীপনা। জয় মিল কিছু উৎকৃষ্ট ছবি। কিন্তু তারপর? প্রভাব গেল কোথায় হারিয়ে? সব তরঙ্গ বেনোজলের চোরা স্রুতিতে কোথায় গেল মিলিয়ে। আজ ভূরি ভূরি বাংলা ছবির আগাহার মধ্যে মানবিক আবেদনে ধস্ত পঁচিশ বছর বয়সের 'পথের পাঁচালী' দারবান বনস্পতির মত স্বচ্ছ দাঁড়িয়ে শিল্প সৃষ্টির বিজয় নিশান শুধু উড়িয়ে যাচ্ছে।

রাজা সাহেব

আদিবাসী রাজা সাহেব রূপে উত্তমকুমারকে মোটেই মানার নি। চুলের একটু কারনাজি, মোটা ডুক আর সংলাপের ভাষা কিছু আদিবাসী সুলভ হলেই যে চরিত্রের আচার আচরণ ও অবয়ব আদিবাসীতে রূপান্তরিত হয় না—এই মোকা কথাটাই ছবিতে বেমানন অগ্রাহ করা হয়েছে। ফলে চরিত্রটির ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারেনি। ছবির নাম 'রাজা সাহেব' হল কেন লেটাও ছবোধ্য। কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতা—তারই দুঃখ দুর্দশার কথা ছবিটির সিংহভাগ জুড়ে আছে। সীতা ও কৃপাসিদ্ধকে রাজা সাহেব প্রথমে আশ্রয় দিয়ে পরে তাঁদেরকে নির্ধাতিত করে। নারী দেহ লোনুপ চরিত্রহীন লম্পট রাজা মিজের হাতেই রাণীকে খুন করে। তার পরই তার স্তবয়ের পরিবর্তন অকস্মাৎ। কুচক্রী দজ্জাল

ডাঙ্গ্রে সি পি আই থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল গড়ছেন

সি পি আই-এর প্রাক্তন চেয়ার-ম্যান এস এ ডাঙ্গ্রে সি পি আই থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল গড়বেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

অবশ্য ইতিমধ্যেই নতুন দল গঠনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র থেকে বেশ কিছু নেতা সি পি আই থেকে বেরিয়ে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ডঃ জগদীশ দাশগুপ্ত, কবি সত্যাব মুখোপাধ্যায় এবং কৃষক নেতা অমল্য হাতির নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী এবং নেতা সি পি আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল করেছেন।

মহারাষ্ট্রে ডাঙ্গ্রেহিতা রোজা দেশপাণ্ডেকে সি পি আই থেকে বহিষ্কার করার পরই ডাঙ্গ্রেহিতার তৎপরতা বাড়তে থাকে। ডাঙ্গ্রে-পন্থীরা একটা কথা স্পষ্ট করে বুঝে গেছেন যে, সি পি আই-এর মধ্যে থাকা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডাঙ্গ্রেপন্থীরা সি পি আই-এর বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তেজস এবং বাইরে থেকে আক্রমণ চালাবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই কৌশলের অঙ্গ হিসাবে বেশ কিছু ডাঙ্গ্রে সমর্থক এখনও সি পি আই-এর মধ্যে থেকে যাচ্ছেন।

যে সমস্ত ডাঙ্গ্রে সমর্থকরা দল থেকে বেরিয়ে গেছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা দল গড়ে তুলবেন। এই

লোভী জরায় চিত্তের পরিবর্তনও আচম্ভক্য হয়। বাংলা সিনেমার এত সহজে আর হঠাৎ স্মৃতি পালক টানোটা সহজ নয়। সত্যজিৎ রায়ের উপায় হিসেবেই গ্রাহ্য হয়ে থাকে যেবেছি—কিন্তু বুদ্ধি আর সৃষ্টির কোন বালাই না যেনে সেই জিশ দৃশ্যের জোলা ছবির মত আশ্রয় যে সেই অসার কাহিনী বিস্তার হচ্ছে, তাতে মনে হয়, সার্বিক বৈজ্ঞ বাঙালী ছবিকে ক্রমশই অস্তোপানের মত জড়িয়ে ধরছে। তারাসংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে অক্ষয় চিত্রনাট্যটি করেছেন, তার শিকার হয়েছেন প্রত্যেকেই। একটু সাদৃশ্য এই যে, আর, ডি, বনশল নিবেদিত এই ছবিটিতে পাওয়া যায় উত্তমকুমারের কিছু অভিনয় নৈপুণ্য। প্রয়াত শিল্পীর অভিনয় যে ক্রমশই পরিণত হচ্ছিল, অকিঞ্চির চরিত্রটির রূপায়ণও সে-পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেনি।

দলের নেতৃত্ব দেবার কথা রাজা দেশপাণ্ডের। সি পি আই থেকে লগ বেরিয়ে আসা নেতারা বিভিন্ন রাজ্যে ডাঙ্গ্রে সমর্থকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এই সব নেতারা আশা করছেন বিভিন্ন রাজ্যের আরও কিছু নেতা এবং কর্মী সি পি আই থেকে বেরিয়ে আসছেন।

লগ বেরিয়ে আসা নেতা এবং কর্মীরা দল গঠনের প্রাথমিক কাজ খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবেন বলে জটনক মুখপাত্র জামিয়েছেন। যে সমস্ত ডাঙ্গ্রে-সমর্থক নেতা এবং কর্মী দলের মধ্যে থেকে বাচ্ছেন তারা দলের মধ্যপন্থী নেতা ও কর্মীদের দলে টানার চেষ্টা করছেন।

রাজেশ্বর রাও এবং কৃপেশ গুপ্তের রাওনৈতিক লাইনকে অনেক নেতা এবং কর্মী মেনে নিতে পার-ছেন না। এরা আবার পুরোপুরি ভাবে ডাঙ্গ্রে সাহেবের লাইনকেও মানতে পারছেন না। এই সব দোহুল্যমান নেতা এবং কর্মীদেরকে দলে পাবার জন্য ডাঙ্গ্রেপন্থীরা খুবই লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন।

জানা গেছে সি পি আই-এর ডাঙন শেষ পর্যন্তে চূড়ান্ত করবেন স্বয়ং ডাঙ্গ্রে সাহেব হল থেকে বেরিয়ে। এবং তার সঙ্গে তখন বাকী সমর্থকরাও বেরিয়ে আসবেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক ১৭শালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদ রায়, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ২৭শ কাৰালয় ৩১, ৪১ সেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

দীনেশ সিং আবার ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছেন : কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পেতে পারেন

দপ্তর

ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা ১১ জুলাই ২০শে আগস্ট ৮০ ৬০ পয়সা

রাজ্য ই-কংগ্রেসের এ্যাডহক তালিকায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ফুর্ক

পশ্চিমবঙ্গের ইন্দিরা কংগ্রেসের এখন সবাই নেতা হতে চাইছেন। অবস্থা যা তাতে অন্ততঃ ৬ জন সভাপতি পদের দাবিদার, ১২ জন সাধারণ সম্পাদক পদের দাবিদার এবং কম করে ১০০ জন প্রদেশ কার্যকরী সমিতির সদস্যপদের দাবিদার আছেন।

গত সপ্তাহে দিল্লী থেকে কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী অজিত পালকে সভাপতি এবং কাজী আবদুল গফ্ফর ও কৃষ্ণবাহাদুর ছেজীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৬ জনের একটি প্রদেশ কমিটি ঘোষণা করেছেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। প্রায় ৪০ জন আঞ্চলিক শেখাংশ চম পৃষ্ঠার



কংগ্রেসী গুণ্ডা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের অশোভন সম্পর্ক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব কি তার মহলা লেকটাউনের প্রতিবেশী মাঝারি-পাল্লার ব্যবসায়ী অধীর বোসের কর্মচারী? নাকি তিনি স্থানীয় মাফিয়া চক্রের হাতে বন্দী? মা হলে মুখ্যসচিব হয়েও পাড়ার ধানার তুচ্ছ বড়বাবু পদে উগ্র সি পি এম বিরোধী নীহার রায়কে পুনর্বহালের জন্ত তিনি এত তৎপর কেন? অমিয় সেন-অধীর বোস আতাত লেক টাউন অঞ্চলে দর্শনবিদিত। মুখ্যসচিব পদে যোগদানের আগে অধীর বোসের ভ্রাতা অমল বোস

ছিলেন তার (অমিয় সেনের) লেক-টাইনস্থিত বাড়ির ভাড়াটিয়া। অমিয়-বাবুর নিয়োগ পাকা হওয়ার সঙ্গে অধীর বোস ভাইকে বাড়ি থেকে সরিয়ে নিলেন। তারপর অধীরবাবুর ইস্টার্ন পেনার মিলস (ই পি এম)-এর গাড়িতে করে মুখ্যসচিবের নতুন কানিচার এল। অমিয়বাবুর জী গীতি সেন এখনও শপিং করেন ই পি এম-এর গাড়িতে। গীতি সেনের পিতৃ-প্রাণে হাজির ছিল ই পি এমের ট্রাক ও আটখানা গাড়ি।

এই সেদিন লেকটাউন ও পাতি-

পুতুরের ইন্দিরা কংগ্রেসী সভানেত্রী-ঘটা করে অর্গত সাহিত্যিক স্ববোধ ঘোষের স্বরণসভা করল অধীর বোসের বাড়িতে। খন্ড স্বরণসভা। খন্ড তার উপস্থিত স্বধীবল। আসরের মূল উচ্চোক্তা কুখ্যাত ওয়া-গন রেকার (তিনবার জেলখাটা) জয় ভট্টাচার্য ও ইন্দিরা কংগ্রেসী যজ্ঞান কেশব সরকার ওরফে জার্মান। হুজুনেই অধীরের স্নেহভক্ত। সে অপূর্ব দারুণত দক্ষিণে প্রধান বক্তা অমিয় সেন।

অভিযোগ, ১৯৭৭-র আগে অধীর

বোস একই উপায়ে প্রাক্তন মুখ্যসচিব বিনয়রঞ্জন গুপ্তকে হাত করেন। দুই মুখ্যসচিবের ক্ষেত্রেই নানারকম লেন-দেনের গুস্তব শোনা যায়।

জরুরি অবস্থার লময়ে ও তার আপে অধীর বোস ব্যাপকভাবে মুখ্য-সচিবের সঙ্গে তার “যোগাযোগ” কাজে লাগান ই পি এমের কর্মীদের উপর হামলার ব্যাপারে। এই কাজে বর্তমান ইন্দিরা কংগ্রেসের গুণ্ডারা ছাড়া তার প্রধান দোসর ছিলেন লেকটাউন ধানার ও সি নীহার রায়। ঐ অঞ্চলে সাট্রার প্রবর্তনকারী

আরও একটি কমিউনিষ্ট পার্টি

আরও একটি কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হতে চলেছে। নাম হবে মার্কস-বাহী ফোরাম। এই দল অবশ্য দাবি করছে, তারা রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ এখনই করবে না।

এই দলে যারা থাকছেন, তাঁদের অনেকেই একসময় সি পি এম দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কেউ বহিষ্কৃত হয়েছেন, কেউ বা দল ছেড়েছেন বা সম্পর্ক ছেঁদেছেন। এদের মধ্যে মনোরঞ্জন রায়, সুচাঁদ সোরেন, সুধাংশু পালিত, সাধন চক্রবর্তী, সাধন সরকার প্রমুখের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

স্থির আছে, ৩১শে আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই নতুন কমিউনিষ্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করবে।

কর বাকি

সম্পদ কর বাকি রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইন্দিরা কংগ্রেসের সংসদ সদস্য মহা-দেব রাও সিদ্ধিয়ার নাম। তাঁর বাকীয়া সম্পদ করের পরিমাণ ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি কোন সম্পদ কর দেননি।

ধর্ম ভেজার এবং হরিদাস মূল্যার বাকীয়া সম্পদ করের পরিমাণ হল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বিগত ৮ আগস্ট লোকসভায় এ সম্পর্কে একটি তালিকা পেশ করেছেন।

শেখাংশ চম পৃষ্ঠার

ও মতপানাসক্ত নীহার রায় বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সেলে ইন্সপেক্টর।

১৯৭৪ সালে বিনয় গুপ্তের মৃত্যুতে ও জার্মান-জয়ের সহযোগিতায় নীহার রায় দিটু পরিচালিত ই পি এম ইউ-নিয়ন অফিস দখল করতে সাহায্য করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেসী ইউনিয়ন।

বিনয়রঞ্জন নিজে কিতাবে জরুরি অবস্থার স্বযোগ নিয়েছিলেন তাও দলের জানা। শুধু তার কন্ডার সঙ্গে মেলামেসার ‘অপরাধে’ স্থানীয় একটি ছেলেকে দিসা-তে জেলে পোরেন নীহার রায়।

অধীর বোস এখন চান, নীহার রায় আবার লেকটাউন ধানার শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠার

সম্পাদকীয় বিদ্যুৎ সংকট

গত সপ্তাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। নিম্নলিখিত সময় কাল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঘোষিত বারো ঘণ্টা-কেও অতিক্রম করে যাচ্ছে বহু এলাকা-য়। এই অসহ্য গরমে বিদ্যুৎহীন কলকাতা আরো অসহ্য লাগছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে বিদ্যুৎ সংবাদ পাঠ করলে ধাঁধার পড়তে হয়। মনে হয় বিদ্যুৎ সংকট মনুষ্য-মুখ। কারণ দেখা গেছে সমস্ত পাওয়ার প্লান্টগুলো—যারা কল-কাতার গার্হস্থ্য, শিল্প ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটায়—ঠিকমত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাহলে কলকাতা ও শহরতলীতে লোডশেডিং হয় না অথবা হলেও নামমাত্র। অথচ দেখা যাচ্ছে গত এক বছরে স্তব্ধতা ভরাবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আরো ধারাপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কেন এই অবস্থা হচ্ছে—এই ধাঁধার কোন উত্তর মেলে না। কেন সাঁওতালদি ও ব্যাঙেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন ইউনিট বারবার ধারাপ হয়ে যাচ্ছে? কেন একটি ইউনিট ভাল হয় তো আর একটি ধারাপ হয়, কেন সাত দিন পরে প্রথমটির টিউব লিকেজ হয় এসব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না। কংগ্রেস আমলে ব্যাঙেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্ভরযোগ্য ছিল এবং উৎপাদনে খুব একটা হেরফের ঘটত না। কিন্তু বামফ্রন্ট আমলে ব্যাঙেলও সাঁওতালদি ও দুর্গাপুরের পথে গেছে।

কেন এমন ঘটেছে—বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এর কোন সহজত্তর মেলে নি। বলা হয়েছে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু না হলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই সি ই এস সিকেই টাকা দেওয়া হয়েছে টিটা-গড়ে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের। বারবার বলা হচ্ছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের দোষেই বিদ্যুতের এই হাল। আমরাও একথা লিখেছি—কংগ্রেসী আমলে এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও। ফ্রন্ট সরকার মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক কার্যকলাপের কথা বলছেন। কিন্তু তেমন জোরের সঙ্গেও নয় এবং প্রমাণ সহও নয়। বর্তমানে তাঁরা গা ঢেলে দিয়েছেন, সমস্ত ব্যাপারটা ভাপ্যের হাতে সঁপে দিয়েছেন। সমস্ত সমাধানের কোন চেষ্টাও নেই। কেন বিদ্যুৎ উৎপাদনে মৈত্রী—এ সত্য ভদ্রতার মারফৎ খুঁজে বার করতেও বোধহয় চান না সরকার। অতএব ভাগ্য যেদিন হুপ্রসঙ্গ হবে সেদিন আমরা আলোকিত হব।

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা মঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকালীন বাংলা মঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন ॥ প্রভাতকুমার দত্ত। পরিবেশক: মণ্ডল বুক হাউস: ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১। দাম: চার টাকা।

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ওপর নির্ভরযোগ্য বাংলা বই তেমন চোখেই পড়েনি এককাল। প্রভাতকুমার দত্ত রচিত 'সমকালীন বাংলা মঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন' পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র কলেবর হলেও মৌলিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা চলে। বিষয়টি বিরাট ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—মাত্র ৭১ পৃষ্ঠায় সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা সম্ভবতই সম্ভব হয়নি। তবে বস্তুতঃ আলোচিত হয়েছে, তার মূল্যও অধীকার করার মর্য।

মুখ্য সচিব

১ম পৃষ্ঠার পর

আমুন। কারণ, ই পি এম প্রমিতিক অসম্ভাব্য তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া চুক্তি-গতবছর সম্পাদিত হয়েছে ই পি এম তা কার্যকর করে নি। কথায় কথায় অধীর বোস কর্মীদের শোনান: 'চীফ সেক্রেটারি আমার নিজের লোক; পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব।'

অধীর বোস এবার ঠিক করলেন নীহার রায়কে লেকটাউনে চাই; ওরকম জবরদস্তি বড়বাবু ছাড়া ঐ কর্মীদের ঠাণ্ডা করা যাবে না। কিছুদিন আগে সরকারী লোকে অধীর বোস, অমিয় সেন ও স্থানীয় কংগ্রেসী এবং গুণাপ্রকৃতির মন্ত্র-ব্যবসায়ী দেবকুমার বোস (ওরফে মেহোহলা) হুমকিবন বেড়াতে গেলেন। সেখানে শলাপরামর্শ হল, নীহার রায়কে ফেরত আনতে হবে।

দর্পণের কাছে প্রমাণ আছে অমিয় সেন প্রত্যক্ষভাবে কলকাতা নেড়ে নীহার রায়ের লেকটাউনে বড়বাবু পদে পুনর্বহাল পাকা করেছেন। স্থানীয় লোকের জিজ্ঞাসা, একই লোক তিনবছরের মধ্যে একই থানায় একই পদে পুনর্বহাল হয় কীভাবে? স্থানীয় ব্যবসায়ীর নির্দেশে পুলিশে রদবদল হয় কেন? এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব এভাবে কংগ্রেসী গুণা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কেন প্রশাসনিক শৃঙ্খলাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন?

ক্ষুদ্রতন পুস্তিকাটিতে নবনাট্য আন্দোলন ও গ্রুপ থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য স্থানিকা সম্পর্কে আলোচনার লেখকের স্বল্প ও নিষ্ঠার পরিচয় নিঃসন্দেহেই পাওয়া যায়। কিন্তু অত স্বল্প পরিধারে বিগত যুগের মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করার আলোচনা মোটেই গভীরতা পায়নি—ভাষা ভাষা ছাড়া ছাড়া মন্তব্য শুধু আকীর্ণ হয়েছে রচনাটি। লেকালের দিক-পাল অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেরই নাম করেছেন লেখক—গিরিশ ঘোষ থেকে শিশির ভাট্টা পর্যন্ত—কিন্তু বিশ্বাসের কথা, যুগের নট ও পরিচালক অর্ধেক শেখর মুস্তাকির নামের উল্লেখ কোথাও নেই। ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৮৭২ সালে ভাট্টাশাল থিয়েটারে সাধারণের মধ্যে প্রথম টিকিট বিক্রির মাধ্যমে 'নীলদর্পণ' নাটকের যে অভিনয় অমৃত্যু হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অর্ধেকশেখর—গিরিশ ঘোষ নয় এবং এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল ও মার্কসীয় বলেই মনে হয়। কিন্তু তিনি যখন শুল্ক মিত্র ও বাদল সরকার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তখন কেমন লংশয় লাগে। শুল্কবাবু ও বাদলবাবু বিশেষ নাট্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য বিচারে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কি প্রকৃতই প্রগতিশীল? শচীন সেনগুপ্ত ও তুলসী লাহিড়ীর মাম-মামা উল্লেখ আছে—তাঁদের কৃতিত্বকে মূল্য দেওয়া হয়নি। মনে রাখতে হবে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য, মূল্যায়নের কোন সহায়ক হয়না। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রগতি বিরোধী প্রযোজনা 'শের আফগান' সম্পর্কে এক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা কতখানি সংগত হয়েছে, লেখককে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তবে পৃথকভাবে প্রতিবাদী নাটক, প্রগতিশীল প্রযোজনা, পাকাত্য ও আঞ্চলিক ভাষার নাটকের বলাহুবা ও অভিনয়, নাটকের সংলাপ, আলো ও বদন থিয়েটার সম্পর্কে তিনি মীরব কেন? প্রেমেনিয়ার ও দর্শকদের মধ্যে ব্যবধান বাংলা থিয়েটারে প্রথম দূর করে ছিলেন শিশির ভাট্টা 'শেষরক্ষা' নাট্যাভিনয়ে। একথা লেখকের কি অজানা ছিল? আরও লক্ষণীয় যে, অভিনয় প্রসঙ্গে সে যুগের ও এ যুগের বেশ কিছু নটের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—কিন্তু কোন নটীর নাম নয়—কেন জানতে ইচ্ছে করে!

সি পি এমের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে রাণাঘাট কলেজ অচল

সি-পি-এমের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে রাণাঘাট কলেজ অচল হয়ে পড়েছে। এই কলেজ পরিচালন সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান সি পি এম হলস্কট। রাণাঘাটের সি পি এম কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে মেহাদ ঘোষণা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য বাইরের লোককে চেয়ারম্যান রাণা চলবে না। স্থানীয় এম-এল-একেই এই পদে বসাতে হবে।

এই কলেজের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা দ্বিমুখের আগে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতাদের কাছে হাজির হয়েছিলেন। উক্ত কলেজের চেয়ারম্যান তখন ওখানে হাজির

ছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বলেন, কলেজে মতানৈবিক আড্ডা হয়েছে। অস্বাভাবিক বুন করা হবে বলে শাসনো হচ্ছে। তাঁরা জানতে চান, এর কোন সুরাহা হবে কিনা।

এই ব্যাপারটা উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শুল্ক ঘোষের নজরেও এসেছে। তিনি নাকি কোন আশার আলো দেখাতে পারেন নি। শিক্ষক সমিতির কোন কোন সদস্য রাণাঘাট কলেজ দ্বি-পালনের প্রস্তাব রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট মহলের আশংকা, অবিলম্বে রাজ্য সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতা ও আমাদের দেশ

স্বাধীনতার জন্তে আমরা দুটি ভাগ করি কিন্তু মনে প্রশ্ন আগে এ কি স্বাধীনতা পেরেছি? সাধারণ মানুষের সংগে নেতাদের সম্পর্ক এখন অনেক ক্ষীণ। রাজনৈতিক হল-গুলো দাঁড়িয়ে আছে পলকা সংগঠনের ওপর। পদ পেয়েই সকলে খুশি। নীচু তলার সঙ্গে উঁচু তলার কোন যোগ নেই। তাই তো স্বাধীনতার পর থেকে ধনী দরিদ্রের ফারাক বেড়েই চলেছে। তেজিশ

পতাকা পোতা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে জাঠালাঠিতে কত-নিরীহ ছেলে তার মায়ের কোলে আর কিরে যেতে পারল না। রাজনৈতিক গগনেও আল ভাষাডোল। তাই রাষ্ট্রের মধ্যে কেডারাল কাঠামোর আবরণ ছিন্ন করে রাজ্যে রাজ্যে চলছে ক্ষমতার লড়াই। এই পরিবেশেই ভারতবাসী চৌজিশতম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

আমরা কি মানুষ? যে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা সেই দেশে মহিলা-দের উপর যে অস্বস্তি অত্যাচার চলছে তার প্রতিকার নেই। সেই সমস্ত পুলিশ অফিসার মেজাজের মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থা আরও স্তম্ভর। ধারী চুরি করছে, ধর্ষণ করছে, শিশুর খাচ্ছে ও গৃহে ভেজাল দিচ্ছে তারা শাস্তি পায় না। ধারী স্বহস্তাবে বেঁচে থাকতে চায় তারাই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, জেলে যায়।

ভামল বিশ্বাস

ডঃ উইলিয়াম কেরির জন্মোৎসব

গত ১৮ই আগস্ট বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কেরি ব্যাপটিস্ট চার্চ মন্ডল সরনে বেঙ্গল ব্যাপটিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে ভারতবন্ধু ডঃ উইলিয়াম কেরির ২১১তম জন্মোৎসব পালিত হল ভাবগভীর পরিবেশে। স্বাগত ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ বললেন, উইলিয়াম কেরি ইংরাজ পুরুষ হয়েও প্রকৃত অর্থেই ভারত প্রেমিক ছিলেন। তাঁর অবদান ভারতবাসী কোনদিন বিস্মৃত হবে না। কেরির মহান স্বতির প্রতি প্রজ্ঞা জানান সমবেত স্বাধীনমণ্ডলী। সম্মিলিত কণ্ঠের গানগুলি ছিল আকর্ষণীয়।

সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় আদর্শ বধির বিদ্যালয়ে সঙ্কট

মুক বধির আজ আমাদের বিরাট জাতীয় সমস্যা। যে বধির হবে সে মুকও হবেই। আমরা সন্তে পাই তাই কথা বলতে পারি। সন্তে না পেলে কেউ কথা শিখতে পারেনা। পশ্চিমবঙ্গের বধিরদের শিক্ষা-লাভের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই চেষ্টা শুরু হয় এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে কলিকাতা মুক বধির বিদ্যালয়। এটি অমেক পুরাতন এবং ভারতের মধ্যে প্রধান। এরপর আরো কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এইসব বিদ্যালয়গুলি কলিকাতা মুক বধির বিদ্যালয়ের পর্যায়ে আজও আসতে পারেনি। এর মূল কারণ সামাজিক চেতনার অভাব এবং সরকারী অসহায়তার অভাব।

বধির অঙ্ক জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তারা সকলেই সমাজের একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব মূলত সরকারেরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদেশে এই বিকলাঙ্গদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব বেশিটাই বহন করে সেখানকার সরকার। আর এখানে সরকারের পুলিশবাহিনী এদের দাবিদারওয়ার মিছিলে লাঠি চার্জ করে। পশ্চিম-বঙ্গে বধির, লম্বা আছে বেশ কয়েকটি। এই রকম একটি সংস্থার কয়েকজন বধির যুবক নিজেরা অগ্রণী হয়ে শেরশালদার কাছে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ১৯৬৭ সালে ১২৫ নং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে বধিরদের কল্যাণ কামনায়। রাজ্যবাসীরা অবস্থিত কলিকাতা মুক বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি বাসনা নিয়ে প্রতিবছর শিক্ষা-লাভে ইচ্ছুক বহু ছেলে মেয়ে কিংবা যার। অল্প বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেলে এই ছেলে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। ঐ যুবকেরা (যারা কলিকাতা মুক বধির বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) ৫/৬টি ছেলে মেয়ে নিয়ে আদর্শ বধির বিদ্যালয় নাম দিয়ে বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্বাটন করেন। ধীরে ধীরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮১০এ পৌছানোর পর অর্ধাভাব দেখা দিল, যা দিল আরো নানা সমস্যা বা বধির যুবকদের পক্ষে অসহনীয়জনক হয়ে উঠল। তখন সেই যুবকদের সঙ্গে ছুজন বিশেষ শিক্ষণ শিকার শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষিকা এগিয়ে আসেন বিদ্যালয়টিকে দল ৩ স্থান করার কাজে। এর ফলে ক্রমশঃ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং

এই সংখ্যা প্রায় সত্তরের কাছে পৌছল ১৯৭৮ সালে। সরকারী স্বীকৃতি লাভের জন্য ১৯৭৫ সাল থেকে চেষ্টা আরম্ভ হল। সরকারী স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য এই বেসরকারী বিদ্যালয়টির অন্ত কোন জায়গা থেকে সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস ও রেলের যে বিশেষ সুবিধে থাকে তা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছিল। সমাজ কল্যাণ দপ্তর গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য দিয়ে থাকেন তা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছিল।

অবশেষে বহু বোরাবুরি ও বহু পরিশ্রমের পর ১৯৭৯ সালের ডায়-রায়ী মাসে সরকারী স্বীকৃতিলাভ করে এই বিদ্যালয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার খানিকটা সুবিধা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণীয়ীরা তাদের সরকারী মাগ্গীভাতার জন্য যে আবেদন নিবেদন করেছেন আজও তার কোন সুরাহা হয়নি। এখনও চলছে সেই বোরাবুরির পালা সরকারী রূপার জন্য। এখানকার শিক্ষক শিক্ষণীয়ীরা প্রত্যেকেই বিশেষ শিক্ষণ শিকার শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিদ্যালয় থেকে এরা যে বেতন পেয়ে থাকেন তা খুবই অল্প। আজকের এই দুমূল্যের বাজারে তাতে জীবনধারণ সম্ভব নয়। সরকারী মাগ্গীভাতার জন্য আবেদন করার পর শিক্ষাদপ্তর বা কাগজপত্র এই বিদ্যালয়ের কাছে দাবী করেছেন, তা সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই বিদ্যালয় সরকারী উদ্যোগ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। মাগ্গীভাতা, সরকারী অসহায়তা ইত্যাদি এই বধির বিদ্যালয়ে না দেওয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যেখানে আজ আরো বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সেখানে একটি স্থানীয় বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার মুখে। শিক্ষক-শিক্ষণীয়ীদের ইচ্ছা থাকলেও বহি অর্ধাভাবে অল্প চাকুরীর খোঁজে চলে যান তবে বিদ্যালয়টি উঠে দাঁড়ায় মুখে এগিয়ে যাবে। কলে বহু মুক-বধির ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। সকলেই আশা করে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বামসংস্কট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন ও সমস্যার সমাধানে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।

শোষণের এক নিম্ন কৌশল

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি এখন চরম হতাশার পর্ববসিত। গত ২১শে জুলাই যে সমগ্র শেষ হয়েছে সেই সমগ্রাহে গত বছরের একই সমগ্রাহ শেষের তুলনায় প্রায় ২১ শতাংশ দাম বেড়েছে। এটা পাইকারী বাজারের দামের হিসেব। খুচরো ক্রেতাদের জন্য দাম বাড়ার কাঁটা সর্বোচ্চ পারদ মাত্রা পর্শ করেছে। ভেটস্ট-রমণের বাজারের পর পাইকারী দাম বেড়েছে ১৬৮ শতাংশ।

দামের আঙনে বহন গৃহস্থের সংসারে আগুন জ্বলছে তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আবাস কিছুর স্তোকবাক্য কেড়েছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐ স্তোকবাক্যের পার্থক্য এতই বেশী যে তার মস্তব্যের জবাব দেওয়াও পণ্ডিত হয়ে দাঁড়ায়। কেবল বলা যায় "তুমিই তোমার বুঝি উপমা কেন্দ্রল" না, একটু ভুল বললাম। আরেকজন ছিলেন। তিনি হলেন চৌধুরী চরণ দিগ। তার ১৯৭৯-৮০ সালের বাজেটে ট্যাক্স বসানোর চতুর্ভুজ হয়েছিলেন। আর মুখে বলেছিলেন এর ফলে দাম মোটে ১ শতাংশ বাড়বে। বেড়েছিল ২০ শতাংশ।

আর ভেটস্টরমণ আরো এককাটি সরেশ। তিনি দাবি করেছেন দাম কমবে। কিন্তু তার মহিমা এমন যে এর মধ্যে ২১ শতাংশ দাম বেড়েছে। দামা বছরে যে এই দাম কোথায় পৌছাবে জানি না। হয়তো দামের খোঁজে মহাকাশ বাজা করতে হবে।

অনেকেই এই মূল্যবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মন। থাকার কথাও নয়। তারা খুচরো বিক্রেতা অথবা ছোট ছোট দোকানদারদের দায়ী করে থাকেন। আবার কোন কোন লোক রাজ্য সরকারকে দায়ী করে হতাশা প্রকাশ করেন। বলেন, কোন সরকারই সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে না।

আমরা জানি টাকাকড়ি দিয়ে জিনিস কিনতে হয়। টাকাকড়ি রোজগার করতে হয়। নতুবা তিকা অথবা চুরি। টাকাকড়ি পাবার আর কোন পথ নেই। এই টাকাকড়ির উন্নয়ন রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। টাকাকড়ির কারবারী হলেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কেনা-বেচার প্রয়োজন অসহায়ী টাকাকড়ি যোগান দেওয়ার দায়িত্ব তাদের উপর। দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও বাজারজাত পণ্যগুলির কেনাবেচা

সুগম করার উদ্দেশ্যে পর্ষাপ টাকা-কড়ির যোগান দেওয়া তাদেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা হলেন কেনাবেচা ব্যাহত হয়। দাম চড়ে যেতে থাকলে কেনাকাটা কম হয়, দাম পড়ে গেলে বাজারে বিক্রীর ক্ষেত্রে কম মালপত্র আনে। সুতরাং অর্থ পরবরাহের ব্যাপারে সদাসতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকে। দামের কেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটে এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই ক্ষেত্রেই দেশের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদেরই দায়দায়িত্ব থাকে।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ একটা নয়। আসলে, মারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পরিচালনা করেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা মূল্যবৃদ্ধির তারতম্য ঘটে। যদি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের মাত্রাও একই নিয়ম অনুসরণ করে। কোন জিনিসের চাহিদা বাড়লে তার দাম বাড়বে এবং যোগান বাড়লে দাম কমবে। এই

অর্থনীতি

বাড়া করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা দ্বারা যোগ্য উৎপাদকদের পুরস্কৃত করে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেয়। এই পুঁজিবাদী ধারণা এখন আর চলে না। কারণ প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিযোগিতার নিয়মই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন একচেটিয়া উৎপাদকরা আবিষ্কৃত হয়েছে যারা কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন পণ্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটাই কন্ট্রল করে রেখেছে। তারা উৎপাদন খরচের ধার ধারে না। কত বেশী দামে ক্রেতা জিনিস কিনতে বাধ্য হবে সেটাই তারা বিবেচনা করে।

যদি দেশের সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে তাহলে দাম বাড়তে তারা বিশেষ সুযোগ পায়। পুঁজিবাদের প্রথম দিকে পণ্যের উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজারদামের একটা সঙ্গতি ছিল। একচেটিয়া পুঁজিবাদের আমলে এখন আর তা নেই। সমাজের বিভিন্ন অংশ নিজ নিজ শ্রম, মেধা ও বুদ্ধিগত নিপুণতার ফলে যে অর্থ উপার্জন করে তার যতটা সম্ভব কেড়ে নেওয়াই একচেটিয়া পুঁজিবাদের লক্ষ্য থাকে। একচেটিয়া থেকে

অপর শ্রেণীর হাতে সম্পদ হস্তান্তরের এটা একটা পুঁজিবাদী কৌশল। বর্তমানে এরা বা এদের লোকেরা সরকার থেকে থাকবেন ততদিন মূল্যবৃদ্ধির হার কমবে না, বরং দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

যেমন চিনির দামের কথা ধরুন। গত বছরের তুলনায় চিনির পাইকারী দাম সরকারী হিসেবে ১২৬.৪ শতাংশ বেড়েছে। চিনির মালিকদের কারসাজি সবাই জানেন। বর্তমান সরকারও তাদের মুনাফা বাজিতে বিশেষ বাধা দিচ্ছেন না। গত বছর চিনির খুচরো দাম কিলো প্রতি ২.৫০ পরসী থেকে ৩ টাকা ছিল। এবার ৮ টাকা, কোথাও কোথাও ১০ টাকা। আখের গুড়ও ৫.৫০ পরসী।

কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়ানোর কৌশলটি এমন যত্নভাবে প্রয়োগ করেন যে সাধারণ মানুষ সহজে তা বুঝতে পারেন না। কাগজী নোট ছাঁপানোর ক্ষমতা কোন রাজ্য সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় সরকারই এ ব্যাপারে একচ্ছত্র অধিকারী। তারা পেট্রল, গ্যাস, কল্যাণ ইত্যাদি পণ্যের দাম প্রথমেই বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর ট্যাক্স বসিয়ে দ্বিতীয় দফা দাম বাড়িয়েছেন। বাটতি বাজেট খরচ ১৪০০ কোটি টাকা করে তৃতীয় দফার দাম বাড়িয়েছেন। তার উপর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে মূলধনী ঋণ গ্রহণ করে সেই বিদেশী অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত রেখে তার সুবাদে নতুন কাগজী নোট বাজারে ছেড়েছেন তাই চতুর্থ দফা মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। এর উপর মজুতদার, চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠন তো আছেই।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বাবা বাবা শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে আবেদন করেছিলেন যে তাদের তো উৎপাদন শুদ্ধ রেহাই দেওয়া হয়েছে এবার তারা যেন ঐ ছাড়ের পরসী দাম থেকে বাধ দেন। তাই সাবান ও টুথপেস্ট তৈরী করেন এমন বহু-জাতিক কর্পোরেশনগুলি শতকরা ২.৫ থেকে ৩.৫ টাকা সাবান ও টুথপেস্টের দাম কমাবে বলে স্বীকার করেছে। আদৌ তারা তা কমাবে কিনা আমাদের সম্বন্ধে আছে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা এগুলির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন ১১ টাকা দামের টুথপেস্টে ৪৫ পরসী এবং ২ টাকার সাবানে ৫ পরসী কমালেও শেবাংশ এর পৃষ্ঠার

রাজ্য সরকারের সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্সের বিরুদ্ধে আই এম এর চক্রান্ত

মহারাজী সরকারের পদাঙ্ক অঙ্কন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও স্বল্প মেয়াদী অর্থাৎ শর্ট টার্ম মেডিকেল কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নতুন একটি সম্প্রদায় উন্নয়ন শোভা পড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার কারণ হলো, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের জন-স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিবারণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সমর্থিত ও বিচক্ষণতার পরিচয়। ছ মাসের ব্যবহারিক শিক্ষা লই তিন বছরের মেয়াদে এই পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ~~এক~~ দিনাজপুর, পুর্নালিয়া, মেদিনীপুর, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, মালদা এই ছ'টি জেলার ছ'টি শিক্ষাকেন্দ্রে স্থাপিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং প্রারম্ভে কোন কেন্দ্রেই ২৫ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী তালিকাভুক্ত হবে না।

লংঘাটির জন্য রাজসরকার,

বিশেষত স্বাস্থ্য দপ্তরের একনিষ্ঠ উদ্যোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেন, কোন গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্রেই এম বি বি এস পাশ করা ডাক্তাররা যেতে চাইছেন না। ফলে ৫০০ মেডিক্যাল অফিসারের পর খালি পড়ে রয়েছে। স্বতাবতই খালি পড়ন্তলিকে পূরণ করার জন্য যখন কোন ডাক্তারকেই নিয়োগ করা যাচ্ছে না, তখন “স্বল্প মেয়াদী মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা” একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে এম, বি, বি, এম, পাশ ডাক্তাররা বলে যেহেতু অতি দ্রুত হাজার হাজার টাকা উপার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন, সেহেতু তাঁদের ওপর নির্ভর করে বলে না থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে তিন বছরের মেয়াদে এম, এম, এফ, ডিপ্লোমা কোর্সের চালু ছিল। এবং এই এম, এম, এফ, পাশ করা ডাক্তারদের সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান আছে। সে

হিসাবে রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনা বাহবা পাবার দাবী রাখে। সুচিন্তিত পরিকল্পনাটিকে বিশ্লেষণ করে অবশ্যই সম্মত করা যায় যে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ও মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়া এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন না। অল্পরপভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্টেট মেডিক্যাল ফেলোশিপ এ ব্যাপারে শুধুমাত্রই উৎসাহ পোষণ করছেন না; অবিলম্বে যাতে এই পাঠক্রম চালু করা যায়। তাঁর জন্য পাঠ্যসূচী রচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু খুবই দৃষ্টিভঙ্গী কথা এই যে, আই, এম, এ, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কিছু প্রতাব-শালী সদস্য তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সরকারী পরিকল্পনাটিকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে আগের হাঙ্গির হয়েছেন, যদিও মুখে তারা অনেক বড় বড় জন-স্বাস্থ্য কথা বলে কুমীরের ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছে। তাঁদের মুক্তি হ'লো, এই পাঠক্রম চালু করার ফলে গ্রামের মানুষদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেডিকেল শিক্ষার মান নীচ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্ববক্তক মহলের ধারণা হ'লো, গ্রামের কোরাক অথবা হাড়ড়ে ডাক্তারদের সঙ্গে শহরের বড় ডাক্তারদের যোগসাজস আছে। যদি ফলে গ্রামের অবস্থাপন মানুষ একটু জটিল রোগের দ্বারা আক্রান্ত হলেই পরনী রোগপারের উদ্দেশ্যে তাঁদের কলকাতার ডাক্তারদের কাছে পাঠানো হয়।

মহাকারে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ঐ শ্রেণীর অর্থাৎ সি পি এম এর সমর্থক বা ঐ দলের মেডিকেল সাব কমিটির সদস্য এমন সব চিকিৎসক মেতারা আই, এম, এ, এর মঞ্চে ব্যবহার করে এই উদ্যোগ বানচাল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। এক কথায় অবহেলিত গ্রামের মানুষদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তাবিত শর্ট মেডিকেল কোর্সকে কবর দিতে আই, এম, এ, বদ্ধপরিকর।

লক্ষ লক্ষ টাকা দ্বিতীতে ফিরে যাচ্ছে অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যায় দপ্তর-ঐ টাকা ব্যবহার করতে রাজী নন। ১৯৭৯ সালে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্টেট ইলেকট্রনিক্স বোর্ড তাদের কাজের জন্য অর্থাৎ গ্রামে বিদ্যায় দেবার জন্য বরাদ্দ ৬৪০'২০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫০'৫০ কোটি খরচ করেছেন। অথচ ইলেকট্রনিক্স বোর্ডকে নতুন এলাকার বিদ্যায় দিতে রললেই নানা অজুহাত দেখান। বোর্ডের নাকি অর্থ নেই।

হুগলী জেলার বিভিন্ন এলাকার বিদ্যায় বর্তমানে বৈষম্য চরমে উঠেছে। জালীপাড়া থানার (হুগলী জেলা) জালীপাড়া রাজ্য বিদ্যায় পূর্ব অফিস মুন্সীকার কাছাকাছি আইরীপোতার তিন বছর ধরে বিদ্যায় সংযোগ ঘটানো হয় না। বার বার দরখাস্ত করলেও কিছু হয় না। এদিকে চণ্ডীতলা থানার কুমীরঝোড়া মনাবপুর প্রভৃতি এলাকায় বিদ্যায় বর্তমানে বৈষম্য লক্ষণীয়। এসব এলাকায় যেখানে দুটি পোল দরকার সেখানে বিদ্যায় বিভাগের কর্মী ও ঠিকাদার চারটি কিংবা কার্যক্ষেত্রে আরও বেশী পোল ধরে দিচ্ছেন। গ্রাহকের খরচ বাড়ছে। জুল এমটিমেট দিয়ে হয়রান করছেন। বিদ্যায় অজুহাত দিয়ে কিছু সাব অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ার গ্রামবাসীকে কষ্ট দিচ্ছেন হয়রান করছেন। হুগলী জেলার শ্রীমতপুর অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ার স্টেট ইলেকট্রনিক্স বোর্ড মহালয়কে বার বার চিঠি লিখেও গ্রামীণ বিদ্যায় প্রকল্পে টানবাটি গ্রামে (আইরা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা চণ্ডীতলা) বিদ্যায় এলো না। স্বয়ং বিদ্যায় লিচি মহালয় চিঠি লিখেছে অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ারকে। কল-প্রতি একবার পরিদর্শন। পরে কোমণ্ডা জাই হলো না। ব্যাপক ঘূষের কারবার চলছে শ্রীমতপুরে বিদ্যায় পর্যবে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি লিখেও উত্তর নেই।

হুগলী জেলার বিভিন্ন এলাকার বিদ্যায় বর্তমানে বৈষম্য চরমে উঠেছে। জালীপাড়া থানার (হুগলী জেলা) জালীপাড়া রাজ্য বিদ্যায় পূর্ব অফিস মুন্সীকার কাছাকাছি আইরীপোতার তিন বছর ধরে বিদ্যায় সংযোগ ঘটানো হয় না। বার বার দরখাস্ত করলেও কিছু হয় না। এদিকে চণ্ডীতলা থানার কুমীরঝোড়া মনাবপুর প্রভৃতি এলাকায় বিদ্যায় বর্তমানে বৈষম্য লক্ষণীয়। এসব এলাকায় যেখানে দুটি পোল দরকার সেখানে বিদ্যায় বিভাগের কর্মী ও ঠিকাদার চারটি কিংবা কার্যক্ষেত্রে আরও বেশী পোল ধরে দিচ্ছেন। গ্রাহকের খরচ বাড়ছে। জুল এমটিমেট দিয়ে হয়রান করছেন। বিদ্যায় অজুহাত দিয়ে কিছু সাব অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ার গ্রামবাসীকে কষ্ট দিচ্ছেন হয়রান করছেন। হুগলী জেলার শ্রীমতপুর অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ার স্টেট ইলেকট্রনিক্স বোর্ড মহালয়কে বার বার চিঠি লিখেও গ্রামীণ বিদ্যায় প্রকল্পে টানবাটি গ্রামে (আইরা গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা চণ্ডীতলা) বিদ্যায় এলো না। স্বয়ং বিদ্যায় লিচি মহালয় চিঠি লিখেছে অ্যানিসট্যাট ইঞ্জিনিয়ারকে। কল-প্রতি একবার পরিদর্শন। পরে কোমণ্ডা জাই হলো না। ব্যাপক ঘূষের কারবার চলছে শ্রীমতপুরে বিদ্যায় পর্যবে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি লিখেও উত্তর নেই।

নকরহাটের চাষীদের ওপর পুলিশী উৎপীড়ন

অথচ সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপ অবোধে চলছে।

তিলজলার পাশে নকরহাটের গরিব চাষীরা আমন ধানের মরতমে চাষ করতে পারছেন না। কয়েক শো বিঘে আবাদী জমি বিনা চাষে পড়ে আছে। ধানের বদলে জমিতে উলুখড়, নকরহাট, মোনাডালার গ্রামে পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো গ্রামবাসীকে চাষ করতে দেবেই পুলিশ হাল থানার দিগে যাচ্ছে। যেমন, দিন দাতক আগে চাষ করতে গেলে পাঁচকড়ি নকরের হাল পুলিশ থানার দিগে যায়। পুলিশ হাল দিগে গিয়েই কান্ড থাকছে না, জমির মধ্যে বড় বড় গর্তও খুঁড়ে রাখছে, যাতে চাষ করতে চাষীরা না পারে। এছাড়া আবার গোছের উপর বিঘ কোড়ার মতো রয়েছে শাপক হলের স্থানীয় নেতারা। কোনো কোনো গ্রামবাসী যখন পুলিশের নিষেধ অমান্য করেও অথবা অলক্ষ্যে চাষ করতে যায় তখন ঐ স্থানীয় নেতারা চাষীদের শাসাচ্ছেন।

এ সবের ফলে নাকি রয়েছে কলকাতাকে কলোনিয়ালি তিলোত্তমা করে তোলার প্রচেষ্টা। নকরহাট, মোনাডাল, রাজডালার জমি নাকি

বর্তমান সরকার নোটিশ দিয়ে অ্যাকোয়ার করেছেন। চাষীরা অবশ্য আজও কোনো কতিপূরণ পার নি। কিন্তু জমি পড়ে থাকবে অথচ চাষীরা চাষ করতে পারবে না, এ কেমন কথা। জমিকে অস্ত্র কাজে লাগানোর আগেই চাষীদের অনাহারের মুখে ঠেলে দেবেন এ কেমন কথা?

নকরহাট মোনাডালার অধিকাংশ তপশীলি এবং কয়েক ঘর সাঁওতাল আদিবাসী আছেন। ওদের স্বাস্থ্য চ্যুত করে সেখানে গড়ে তোলা হবে হাউসিং এস্টেট। এ এলাকার তপশীলি সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে উভাস্ত হয়ে এসেছিল। তাঁদের আবার উভাস্ত করে এক অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের কতি রোজগারের সং ও স্বাভাবিক পথও বন্ধ হয়েছে।

উল্লেখ্য এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সি-এম-ডি-এ পঞ্চাশ গ্রামের খালের পাড় চওড়া করার সময় পাকা ধানে মই দিগেছিল। খালের পাড়ের জমিতে নন্দলাল মণ্ডল, বিজুতিচন্দ্র মন্ডল, হুলাল

মণ্ডল পাটমাই ধান বুনেছিল। এদের প্রত্যেকের এক বিঘে মতো জমি, তার মধ্যে এক থেকে দেড় কাঠা জমির ধান নষ্ট হয়। কিন্তু সি-এম-ডি-এ এর কোনো কতিপূরণ আজও হয়নি।

নকরহাটের আর এক চিত্রও আছে। নকরহাটের পঞ্চাশ গ্রাম খালের পাড় চোলাই মন্ডল কারখানা গড়ে উঠেছে। এই ভাটি-খানাতলো কাকতোর থেকেই চলে বিরামহীন ভাবে। ভাটিখানাগুলি চালিয়ে থাকে বাবুল মণ্ডল, কানাই মণ্ডল, কটিক ও খোকন মন্ডল। নকরহাট জুলের অনতিদূরেই এই ভাটিখানাগুলি। জুলের জানলা দিয়েই এগুলি দেখেছে ছাত্ররা। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের একটা আকর্ষণ জন্মালে। এছাড়া মধ্যে হলোই জারগাটা সমাজবিরোধীদের আধড়ার পরিণত হয়। ফলে মহিলারা লঙ্ঘার পরে চলাফেরা করতে নিরাপদ বোধ করছেন না।

অবাধ চোলাই মন্ডল কুটির শিল্প পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতার জয়জয়মতি। পুলিশ ও ভাটিখানা থেকে মদ খেয়ে বাবার সময় মাসোহারাও নিয়ে যায়।

রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে আই, এম, এ, একটি ভিত্তিহীন মুক্তির অবতারণা করে যে, এর ফলে সুশিক্ষিত ডাক্তারদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেবে। কিন্তু ঘটনাটা ঠিক উল্টো। ১৯৭৯ সালে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগ করার জন্য পারিক দার্ভিস কমিশনকে ৫০০ জন যোগ্য ডাক্তারের লিস্ট পাঠাতে বলেছিল এবং সেই লিস্টের ভিত্তিতে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর কর্তৃক নিয়োগপত্রও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া দিগেছিলেন মাত্র ১২৫ জন ডাক্তার। অল্পরপভাবে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বিধিতে ৪০০ জন ডাক্তারকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু কাজে যোগ দিতে এগিয়ে আসেন মাত্র কয়েকজন ডাক্তার। এই কারণেই রাজ্য সরকার শর্ট টার্ম মেডিকেল কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, শর্ট মেডিক্যাল কোর্সের লব্ধপ্রথম প্রতাবক হলেন, বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান

ভারতের বৃকে দুর্ভার ভয় ও ভাবনা

প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা আকাংক্ষা জড়ানো স্বপ্ন নেওড়ান স্বাধীনতা এসেছিলো তেজিশটি বছর আগে। বিদেশী শাসনের অবসানে এসেছিলো দেশীয় শাসন। জাতীয় সংহতি, জাতীয় ঐক্যের ধ্বনিতে সেদিন মুখর ছিল ভারতীয় নেতৃত্বের মুখ। পরাধীনতার গ্রানি মুছে নতুন সংস্কারের প্রেরণার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল মানুষ আর মানুষ। দেশভাগের মাঙল গানার দিনগুলি তখনকার মত চাপা পড়ে গিয়েছিল উচ্ছ্বাসের উচ্চসত্যায়। অশ্রু সজল বেদনা-স্নান মুখগুলি স্থবিনের ভরসার পরম বিশ্বাসে চেয়েছিল আগামী ভবিষ্যতের পানে। দেশ গড়ার আহ্বান মাড়া দিয়েছিল কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নকে। কিন্তু সেই মাড়া জাপান স্বাধীনতার মাধ, স্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দাখ্যের বাইরে যেতে যেতে বড় কঠিন, বড় দুর্ভাবনার জর্জরিত। মথিত নির্মম নিরাশার আবর্তে।

ত্যাগ তিতিকার তুফাণে মোড়া মাথা ভারি ওপর তলার নেতামহল, ধনপতি মহল ও তাদের সাক্ষাৎ-দেয় ভোগ বিলাসের স্রোতে, অনাচারে অবিচারে মুক কোটি কোটি মানুষের সামনে আজ অন্তহীন লোভ লালসা, আদর্শহীনতা, অবি-যাসের মনোমোহন চেহারাটা কদা-কার বীভৎস হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে এবং তার পরেও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রজ্ঞা-সম্মত ছিল। এখনও বেশ কিছু নেতার কথা উঠলে মর্মে থেকে মর্মাধা দেবার মত মানুষের কোন অভাব নেই। অথচ যে মানুষেরা ঐতিহ্যের প্রতি, মর্যাদার প্রতিভূর প্রতি সম্মান জানাতে বিধাহীন আজ তারাই অসৎ, অকর্মণ্য, গা জোয়ারী শাস্তির পরাক্রম প্রদর্শনে অক্লান্ত বুলিবাজ নেতাদের ভয়ে ভক্তি জানালেও তীব্র ঘৃণা করে, বিপদ আগদের ভয়ে মাম দেয়। স্বতন্ত্রী রাজনীতির বাড়ন্ত দশার স্বধীজন, নির্ভীকজন মাথা গুঁজে লহ করে ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাকে।

এই অবস্থার মধ্যে ভাড়া ভারত-বর্ষ কৃষির উৎপাদনে অসুস্থ। যদিও অধিকার বেশী মানুষ তার স্বকল ভাগ করে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি প্রশংসার্য। তবু আধুনিকতার স্বাদে ধস্ত মুষ্টিয়ের মানুষ। সত্তর ভাগ নিরক্ষর মানুষের আমল অংশ এখনও অম পথ্য, আশ্রয় ওষু,

পোশাক আসাকের মতো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে অক্ষম। জীবনধারণের দুর্ভাবতারে কুসংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ। অনগ্রসর অদৃষ্ট নির্ভর। শিক্ষাদীকার সুযোগ থেকে বহুদূরে। কালো টাকার পাছো, ব্যবসার ক্ষীণ উদ্যমে ধন-পতি মহলের উদ্ভূত অবস্থার পাশাপাশি দেশের অধিকার বেশী মানুষ অভাবনীয় দারিদ্র্যের ফাদে আটকান শিকার।

অপমানে অবিচারে নত মানুষ নিজের নিজের অবস্থা ক্রোড়ে গিয়ে নিরাশ, ক্লান্ত, ব্যর্থ। বৈচিত্র্যে স্থপে শান্তিতে আপন আপন থাকতে চেয়ে, স্থবিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া শাসক কুলের উপর নির্ভর করে আশা ভংগের নিদারুণ আঘাতে কখনও কোভ বিক্ষোভ জ্বালান ছাড়া তেমন কিছু করেনি বলে সংস্বদ জীবন গড়ে ওঠেনি। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে সমাজে দেখা দিয়েছে সংকট। মান-বিক মুদ্রাবোধ চাপা পড়ে গিয়ে বার্ষিকতা, খেজাচারিতা, অসৎ প্রচেষ্টা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পরিণতরা হতাশ। নবীনরা পরি-বর্তন চেয়েও দিশেহারা। হঠকারী চেষ্টার মার খেয়ে, পিছু হঠে সজা চমকে উদ্ভ্রান্ত। চোখের সামনে আড়ম্বর মত বেড়ে চলেছে বঞ্চনার সত্যটা ততই ধীরে ধীরে চাপা আগুনের মত সামনে এসিয়ে আসছে। ভোট দেওয়ার গণতন্ত্রে কালো ব্যবসারী, রাজনীতি ব্যব-সারীরা সংবিধানের বিধানকে কাগজের বাগানে দাজিয়ে রেখে নিজেদের সুবিধামত প্রশাসন স্বরূপে কাজে লাগিয়ে এখন এমন জায়গার পরিস্থিতিকে ঠেলে দিয়ে যাচ্ছে যেখানে সংহতি নেই, সহিষ্ণুতা নেই। নেই জাতীয়তাবোধের বাঁধন, সার্বজনীন উন্নয়নের স্বাভাবিক সম্ভাবনা ও প্রেরণা।

সত্তর দশকের পুচনা পূর্ণত্ব শাসক দলের মধ্যে ঘাহোক রাজ-নৈতিক সংহতি ছিল। ছিল মত বিনিময়ের, তর্ক বিতর্কের অবকাশ এবং নেতাদের নিজস্ব রাজনৈতিক তিত্তি। কিন্তু কংগ্রেস তেড়ে তেড়ে এখন যে অবস্থায় এসেছে তাতে সে সবার দ্বিন আর নেই। পঁচাত্তরের গুস্তর পরিস্থিতির পর থেকে ক্রমত বহিষ্কৃত রাজনৈতিক শক্তি-চক্র প্রধানমন্ত্রীর মদতে মানুষ হয়েছে। নিরমশৃংখলা, স্থিতিবস্থা রক্তার রক্তার নামে অযোগ্য, লোভী বার্ষিক,

চাটুকাররা বুলডোজারের শাপন প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পিতার সময় যেটুকু চম্ভলচ্ছা বর্তমান ছিল তাও বিসর্জন দিয়ে পারিবারিক উত্তরাধিকারী বানাতে ওইরকম অবস্থা সৃষ্টির জন্য এখনও বহুত মেহমত করে চলেছেন। তাই তাঁর দলে তিনিই নেত্রী। বাকি সবাই হাত তোলার দলে। এবং কয়েকজন বাদে এই হাত তোলার বিশ্বস্ত সেবকদের নিজস্ব রাজনৈতিক তিত্তি নেই। নেই অভিজ্ঞতা ও নিজে চলার ক্ষমতা। আছে ইমিরা ও তাঁর পুত্র পরিবারের তজ্ঞাবাবলী। আর নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা আরো ক্ষমতা পাওয়ার প্রতিযোগিতা, খেয়োখেয়ি। সাতাত্তরের নির্বাচনের সুযোগে নির্বাক, রুদ্ধবাক মানুষেরা তাই এদের সরিয়ে জনতাকে আনে। সেখানেও প্রবীণেরা লজ্জাজনকভাবে নিজেদের মধ্যে লড়ে নিজেদের মুখ পোড়ান। এবং আশির শুরুতে পোড়খাওয়া জনজীবনে অন্ধকারের অনিশ্চয়তা এনে দিয়ে ভরাডুবি হন। আসলে তাঁরা ক্ষমতা পেয়ে দেশভ্রতী, নির্লোভ, পরার্থপর হওয়ার চেয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে দেশের দুঃসময়কে অনেক কাছে এনে দিয়ে হানাহানিতে মস্ত হন বলে আবার বিকল্প হিসেবে ইমিরা পুত্রসহ ক্ষমতার ফিরে আসেন। ফলে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের যে সুযোগ এসেছিল তা আবার কেন্দ্রীকৃত হবার পথ পায়। নেত্রী ও তাঁর পুত্র হয়ে পড়েন নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু পুত্র প্রারণে তিল-তিল করে উত্তরাধি-কারী পড়ার কাজে আচমকা ধাক্কা লেগেছে। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীও নির্ভর করতে পারেন এমন একজনকে পেতে চান। তাঁর মনেও ভাবনা, নানা আশংকা ঢুকে গেছে। একজ্ঞ আস-ছেন রাজীব। তাছাড়া ছোটপুত্রের ক্ষমতা ছিল বাদে ক্ষমতার উৎস, দলীয় সংহতির কেন্দ্র তারা এই অব-স্থার অভিভাবক না হলে উন্টে পাল্টে তলিয়ে যেতে পারে। এদের লড়ে তাঁর বহু কারাক। দৃষ্টিভঙ্গীর, মূল্যবোধের, ধ্যানধারণার, কর্ম-কৌশলের এবং প্রজ্ঞার। এদের দ্বি-চলতে দ্বিতীয় ধাপের তার বহনে সক্ষম কাউকে গড়ে তোলা দরকার। এই বোধের জন্য পুত্রের পদাংক অহুসারিরা চার তাঁর পরিবার থেকে যে কোন একজন উত্তরাধিকারী

আছক। এতে দলের কোণঠাশা কিছু প্রবীণের মাথা তোলার সুযোগ কমবে। বাইরের ধুকল লইতে, বিরোধীদের সঙ্গে পাল্ল লড়তে শুধু নয় প্রধানমন্ত্রীর মনোমীতের মনোরঞ্জন করে তাঁর আস্থা-ভাজন হওয়ার একটা নিশ্চিত পথ পাবার উপায় থাকবে। না হলে, গণতন্ত্রে পারিবারিক উত্তরাধিকারীর স্থান তো হবার নয়। কিন্তু এখন-কার অবস্থায় তা অসম্ভব প্রমাণ করার ক্ষমতারজনক চেষ্টাটাই নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হবার স্বাবীদার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অদৃষ্টবাদের সংখ্যা ভারি হচ্ছে।

এই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচা-নোর সংকটে আমলা নির্ভর প্রশাসন আগের তুলনায় অনেক বেশী লজ্জির। তাহলেও সত্তর দশকের আগের মত আমলারা কেন্দ্রীয় দরকারের শক্ত খুঁটি থাকতে পারছে না। অস্থির রাজনীতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেভাবে ওঠান বসান হচ্ছে তাতে তাদের মধ্যে গা বাঁচানর চেষ্টা, আত্মরক্ষার চেষ্টা খুবই বাড়ছে। বাড়ছে কখন কি অবস্থায় পড়ে যেতে হয় এমন ভয় এবং কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোপে পড়ার আশংকা। চলেছে নির্লজ্জভাবে জাবকতা, স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার উপরে যুক্ত হচ্ছে অহুগত সেবকের ভূমিকা। তাই হুকি নিয়ে, উত্তোপ আয়োজন করে কাজের মত কাজ করার উৎসাহ কমছে। কমছে মতু-নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার মাথা ব্যথা। নিরম শৃংখলা রক্ষার দায়সারা ভাবের ভিতর দিয়ে অকালে অনবরত প্রদব করছে অবৈধ কাজ কারবার।

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সরকারের যোগসুত্রে শিথিল হয়ে পড়ছে। যে মুষ্টিয়ের বুদ্ধিজীবী সরকারের পাশে তারা হয় কৃপাকাজী মর চাটুকারি বৃত্তিতে নিজেদের মিশিয়ে ফেলছে। বতই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের কথা বলা হোক না এখানকার শাসকদের তাদের সংস্পর্ক বাঁচিয়ে চলার প্রবণতা বেশী।

এরকম ব্যাপারগুলো ভড়িয়ে পড়ছে দেশ পরিচালন, দেশ গঠন প্রভৃতি কাজের মধ্যে। সেজন্য হুঁ হুঁ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না। আর তা সম্ভব নয় বলেই দেশের ভিতর ভ্রাম্যমূল্য বুদ্ধি, মূর্খা-ক্ষীতি, নিত্য দরকারী জিনিসপত্রের অভাব, বস্ত্র বৈষম্য, বিলাসবহুল ভ্রাম্যমূল্যের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চলনসই জিনিসপত্র কেনা, ক্ষমতার তীব্র অভাব, দুঃসহ বেকারী প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে গুরুতরভাবে

ভড়িয়ে পড়ছে ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়, প্রাদেশিকতা তিত্তিক দালাদালাসী, হানাহানি। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সংকটের ফলে অশান্তি, আইন শৃংখলার অবনতি ও অরিগর্ভ অবস্থা। প্রজন্ম পাচ্ছে বিচ্ছিন্নতা-কারী প্রবণতা, আত্মপ্রবঞ্চনা। আশাহত বঞ্চিতের ঘৃণা ও মাথা তুলে দাঁড়ানর চেষ্টার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি, হঠকারি ব্যাপার স্যাপার থাকলেও একথা আজ দতি্য যে, একটা সার্বিক সংকট চলছে। এবং তা জটিল হয়ে উঠছে। এর পরি-বর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কিতাবে?

এখনও বামদলগুলি ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকারী দলগুলি নিজ নিজ পকেটে সীমাবদ্ধ। দেশের সর্ব-সাধারণের কাছে তারা তাই রাজ-নৈতিক বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। যে গতি, যে নিষ্ঠা ও সামর্থ্য থাকলে এরকম একটা সময়ে তারা এগুতে পারে তার কেমন যেন অভাব দেখা যাচ্ছে। দুর্ভাবনা, হতাশা ও নির্ভরতা তাদেরও গুলিয়ে দিচ্ছে। ঠিক কি ভাবে এগুবে তা ঠিক করতে পারছে না। প্রতিবেশী দেশগুলিও এই অবস্থার বাইরে নেই। বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলিও জটিল পরিস্থিতির আবর্তে। তাহলে কি বৈরাচারী শক্তির হাত শক্ত হচ্ছে? মিলি-টারীও কি স্বপ্ন দেখছে? আমলে একটা ওলোট পালোটের পটভূমি তৈরী হচ্ছে এবং সেটা যে কি রকম এবং কোন শক্তির পরিচালনার অপেক্ষার এখনিই তা জানা নেই। ভারতের বৃকে এখন দুর্ভার ভয় এবং ভাবনা। দুঃসময়ের দিনগুলি এগিয়ে যাচ্ছে সর্বনাশা তরঙ্গের দিকে। একদিন তার ভেতর থেকেই আমল সত্যটা বেরিয়ে আসবে।

অর্থনীতি

এম পৃষ্ঠার পর

তাদের ক্ষতি হবে না। বরং টুপ-পেন্টের টিউবে কম পেট আর লাভা-নের সাইল ছোট করা তো আছেই।

বাঘের কাছে আবেদন করে কোন মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। নরমাংস ও কৃষিরের স্বাদ এবং মুনাকার স্বাদ অনেকটা কাছাকাছি কারণ মানুষের কৃষির শোষণ করেই মুনাকা গড়ে ওঠে। সুতরাং হাতি-রার ছাড়া বাঘের সামনে গিয়ে লাভ নেই। মুনাকা শিকারীদের কাছেও আবেদন নিবেদন জানিয়ে ফল হবে না। আনলে তাদের মূল্যবুদ্ধি করে শোষণ তীব্র করার কৌশলকেই ভেঙ্গে দিতে হবে। এটা এখনিতে হয় না। সবাই মিলে হাত লাগাতে হবে। লড়াই করে মুনাকাশিকারী রক্তলোভী খাপদকে ধতম করতে হবে।

উত্তরপ্রদেশের চিঠি

বামপন্থী পশ্চিম বাংলার লখনৌ আগমন

রমা প্রসাদ মল্লিক

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের “বীরে বাজু কি সরকার” উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌতে আপন কর্মকাণ্ডের ত্রি-বার্ষিকী পর্যালোচনা করেছে চিত্র-প্রদর্শনী, মনোরমমূলক অস্থান এবং সরকারী প্রতিনিধিদের প্রেদ-কনকারেন্স মাধ্যমে। উদ্দেশ্য ছিল (১) উত্তর ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের স্থাপন, (২) বামফ্রন্টের রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক সাফল্যের এক ‘কীকি’, অর্থাৎ সামগ্রিক-তাৎক্ষণিক দৃষ্টিপাত, এবং (৩) কেন্দ্রে ইশিয়ারি—“আমরা আছি, থাকবো।”

সারা ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে এই আয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমপ্রসূ হত কি না তা বিভিন্ন ধারার রাজনীতিজ্ঞদের বিশেষ মত, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে; তা বিতর্কিত বিষয়। তবে এটা ঠিক, রাষ্ট্রভাষাতাত্ত্বিক উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রেষ্ঠ এবং অগ্রণী রাজ্য (কি শিল্প-প্রদ্যে, কি রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক বিকাশে, কি অপরাধ-প্রবণ করিফু সামন্তী সমাজের ক্ষয় মাঝার) উত্তরপ্রদেশের দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্ত অধ্যায়ের চৌকাঠে। দেখিক থেকে বিচার করলে এই ব্যবস্থা এবং আত্মবলিক বন্দোবস্ত (কিছুটা এলাহি) নিরর্থক হয়নি।

অনধীকার এ কথা যে, উত্তর-প্রদেশ আজ দক্ষিণ ও বামপন্থীর লজ্জাত লজ্জা। মার্চ ১৯৭৭-এর নির্বাচন বৈপ্লবিক যুগ-পরিবর্তনের চৈকিতম্য এনেছিল, পরিণতি পারনি আপন সম্ভাবনার। ভারতের প্রভুশ্রেণী রাষ্ট্রের কার্যপালিকা শক্তির সারা প্রয়োগকারী কাঠামোটাই পুনর্বার হস্তগত করতে লক্ষ্য হয়েছে—সংসদীয় রাজনৈতিক পদ্ধতির কুশলী অপপ্রয়োগ দ্বারা। নতুন দিল্লীর ভৌগোলিক সামীপ্য এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল শক্তিকেন্দ্র হিসেবে এ রাজ্য অসম্পূর্ণ সমাজ-বিপ্লবের উত্তরাধিকার ও দায় লভি করেছে। সারা ভারতে আসন্ন জন-অত্যাধানের সত্ত্বতে এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট আজ, যদিও তা পড়া কঠিন আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো, এমন কি প্রগতি পরিপন্থী সমাজগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিক্রিয়াবাহী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার (উদাহরণতঃ মোরাদাবাদের ঘটনাবলী)। সম্ভবতঃ যে বামপন্থী-গণতান্ত্রিক এক্য-সংগ্রামের দাবীদার সি পি এম—

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের প্রধান এবং মেতৃকারী শত্রিক—তেমনি একামুখী আন্দোলন এবং আলোড়ন উত্তরপ্রদেশে সম্ভব। সম্ভবতঃ সি পি এম মনে করে পার্টির আদর্শগত ও কার্যক্রম সংবদ্ধ নীতি প্রয়োগ, উত্তরাভ্যাস দিশাভিমুখে এগুতে পারে। হিন্দী রাজনৈতিক মূলপত্র রাজ্য সি পি এম সাময়িকী রূপে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে; শোমা দায়, দৈনিক রূপে এই প্রচেষ্টার উত্তরণ পর্ব দিল্লীতে হবে। ইমার্জেন্সি বিরোধী যে যুগধাম জন-শক্তি (জয়প্রকাশ নারায়ণজীর কর্তিত ‘লোকশক্তি’) ১৯৭৪-১৯৭৭-এর দিনগুলিকে উদ্ভাল করেছে এক-দলীয় শাসনের জগদল পাথর নয়, বৈরাচারের বিরুদ্ধে, তেমনি উৎসার যদি বাম পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ-নৈতিক পটভূমিতে মধ্য কৃষিকাবলম্বী সি পি এম প্রেরিত করতে চেয়ে থাকে এই রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে, তাহলে তাদের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ অর্থবহ মনে হবে। কিন্তু বিচার বিষয় হল বিরাট ব্যয়বহুল, ৪ দিন ব্যাপী এই প্রচার অভিযানের ফলাফল লক্ষ্যে।

প্রতিক্রিয়া ও সাড়া

প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ: পশ্চিম-বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিনিধি মন্ত্রী জনাব মুহম্মদ আমিন ১১ই তারিখে, রবীন্দ্র রঙ্গশালার হলে অস্থিত ‘জনসভায়’ বা স্বয়ম ইচ্ছিত করেছেন তা হল, সরকারী স্তরে ধারণা যে, উক্ত সভা (এবং আত্মবলিক কাংশন যথা চিত্রপ্রদর্শনী দিনেমা-শো ইত্যাদি) মূলতঃ এক সীমাবদ্ধ এবং ঔপচারিক প্রক্রিয়া। এর চৌহদ্দী পঃ বঃ সরকার তথা উঃ প্রঃ রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ এবং প্রসারনের। জনপতা বলতে বা বোঝায়, ১১ তারিখের মিটিং তা ছিল না। এমনি নির্ণায়ক স্থল যেমনে নিলে প্রায় ওঠে তাহলে কেন এই অস্থানাদির উদ্ভোক্তা এবং লংগঠকবৃন্দ এ মিটিংয়ে বেছে বেছে লখনৌয়ের এমন “বামমতাদর্শী” নেতাদের ঔপচারিক আয়ণ বিতে ডাকলেন, যারা সাধারণতঃ জন-গণের মধ্যে সামূহিক ও সংবেদনশীল লাড়া জাগানয় বিশ্বাস করেন এবং সে কাজে অত্যন্ত।

উদাহরণতঃ ডাঃ মুহম্মদ

হাজিরের বক্তৃতা। এর স্বযুক্তিপূর্ণ ভাষণ কেবল যে পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকারের অস্থূল, ফলতঃ কেন্দ্রের প্রতিকূলে, গিয়েছিল তা নয়, যে যুগোমুখি মন (এই দুই সরকারের) বর্তমানে এক অনধীকার বাস্তব তথ্য—অনেক কেন্দ্রে অস্থূল রেখে দেওয়া হল—তাকে মেনে নিয়ে ইনি এমন অনেক অন্তরীপুনী সত্য উচ্চা-রিত করেন, যার আলি সহ হচ্ছে না বলে এবং তেমনি তাব দেখিয়ে উপস্থিত প্রধান অতিথি উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ব্যাপারটার উক্ত শিক্ষামন্ত্রী ফাহস কোলানো বাড়ী-বাড়ি কেন করলেন বোকা কঠিন। বুকি আত্মজাতিক স্তরে কোনো সভা, সমিতি বা সম্মেলন হচ্ছে; ঔপ-চারিক প্রতিবাদ জাপন না করলেই নয়! তাঁর নিজস্বতার পরেও মিটিং আরও অনেকক্ষণ চলে। স্থানীয় কিছু কিছু “নেতা”—রাষ্ট্রের জন-প্রিয়তার নিরিখে কোনো প্রতিষ্ঠাই নেই—তিড় উপকানো গোচের বক্তৃতা করেন। এঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন, যার সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে (লখনৌ পূর্ব কেন্দ্রে) মাত্র ৬০০ মোট প্রাপ্তিযোগ ঘটেছিল।

প্রায় জাগ্রত থেকেই যার, মক থেকে ভাষণ দেওয়া যদি মিতান্তই ঔপচারিক সীমানার বাধা রাখা উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে এত খরচ করে ১০ কোটি (ন্যামাধিক) জনতার নিবাস এ রাজ্যের রাজধানীতে আসা এবং সর্বসাধারণের ওপর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে এক স্থায়ী ছাপ ফেলার চেষ্টা করা হল কেন? এখানে বামপন্থী এবং বিপক্ষ হল-গুলির লহারতার প্রকৃত অর্থে জন-গণের সত্তা সংপৃষ্ঠিত করা চলতো। বস্তত লংগঠকদের উদ্দেশ্য এবং অবলম্বিত পদ্ধতির মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য থাকলে কার্যক্রমের বিভাজন আরও সুস্থ হতে পারতো এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের বিরত হতে হত না। অবশ্য, প্রেদ কনকারেন্সে এবং রবীন্দ্র রঙ্গশালার মিটিংয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মুঃ আমিন নাহেব খুবই সংযত ও ধীর স্থির বাগিতার শৈলী রেখান, বা ঔপচারিক অব-লনের পক্ষে উপযুক্ত। তথ্য দিয়ে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের মূখ্য দিকগুলি দেখালেন: যথা, ভগচাবীদেবকে জরি অধিকারের

লনহ; আইনী তালিকাভুক্তি ও কবি-কাজে সহায়তা দেওয়া; প্রমিক প্রেমীর শিল্প-গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা; জন-নিপীড়কের কৃমিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে সরিয়ে মালিক-প্রমিক সংঘাতের কেন্দ্রে নিরপেক্ষ কৃমিকা পালন করান; শিল্পকার প্রদ্যার ও ম্যাট্রিক অবধি তা বিনা মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। বেকারদেরকে এবং অস-হার অবলম্বনহীন মহিলা ও বৃদ্ধ-দেরকে সামান্য হলও জীবনধারণের রনহ, ভারত বন্দোবস্ত ভারও উল্লেখ করলেন।

কিন্তু যে বিতর্কিত বিষয়ের উল্লেখ তিনি মনে করলেন রাজ-নৈতিক কুটবুদ্ধি নিহিত, তার মধ্যে অতিসরলের ভোলাপনা যে রয়েছে তা কি তিনি বা পঃ বঃ বাম-সর-কারের অপর প্রতিনিধিরা জানেন না? কেন্দ্রের আসল সকালক তার-তের বিস্ত-পুঞ্জিপতিদের শিখরবর্গ যেভাবে জাহ্নয়ারির নির্বাচনে তাদের আর্থবাহী-কংগ্রেস (ই) দলের বিজয় লাভের পর থেকেই বামপন্থী আদর্শ-

রণারপকারী তিনটি রাজ্যের জন-নির্বাচিত সরকারগুলির বিরুদ্ধে বন্দোবস্ত গ্রহণ করে চলেছে, তাতে লংগণের আর অবকাশ থাকে না, নতুন দিল্লীর স্ববোধিত কাশিত বৈরাচারীরা, কলকাতার কী জন-বিরোধী খেলার প্রাককৃমিকা রচনা করে চলেছে। যেদিন পশ্চিম বাংলার সরকারী সৌহায্যের প্রতীক-অস্থান দ বৌ চ এ মে তোর্জার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন লংগঠকরা পরম আন্তরিকতার সঙ্গে, সেদিনও রেহাই দেয়নি ভারতের উক্ত প্রভু প্রেমীর পরসার কেনা কলচিয়া। হাতকর বেয়া হ পি য় স্তরে এদের প্রচার স্তরের সংবাদ পজে লেখা বেরিয়েছে, পঃ বঃ বামপন্থী সরকারকে ‘চেতাবনো’ বা সাবধান-করে-দেওয়া গালাগালি লমত এই মর্মে যে ১৯৮২ পর্যন্ত কিছুতেই একে টিকতে দেওয়া চলবে না; নির্বা-চনের পূর্বেই বরণান্ত করা চাই (লখনৌ, ‘প্যাণ্ডনিয়র’: ১২-৮-১৯৮০)

শেষাংশ এম পূর্জার

একটি আর্থিক সংস্থা সম্পর্কে

পিয়ারলেস, ফেবারিট, এনডাউ-মেট, লকিতা ইত্যাদির মতো সম্প্রতি আর একটি সংস্থা গজিয়েছে। নাম যমুনা কমার্শিয়াল ফিনান্স (প্রা) লিমিটেড, ৪/২ এ ওয়াটারলু স্ট্রীটে, কলকাতার এর রেজিস্টার্ড অফিস। আসানসোল, নিউজি ও দক্ষিণ কলকাতার পি-২৪৯ পূর্ণ হাস রোডে দুটো শাখা অফিস খোলা হয়েছে।

চারজমের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-দের মধ্যে এম, এ, নাসিম চৌধুরী হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর তিনজন হলেন, কুশিন্দার সিং অরোরা (জৈনিক হিন্দি ফিল্মী গায়কের আত্মীয়), এ হাবেশ চৌধুরী এবং পারবেশ আনন্দ পাণ্ডা। এ বছরের মে মাস থেকে এরা ব্যবসা শুরু করে ছেন পিয়ারলেসের মতোই একেট লাগিয়ে টাকা আদায়, সুদ প্রদান এমনি আর কি।

কোম্পানী বলে, স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউ, বি, আই ও পাঞ্জাব এ্যাণ্ড লিঙ্ক ব্যাঙ্কে এদের কাজকর্ম হয়। এটা নাকি অলম্য। বরং এদের কাজকর্ম হয় ফেডারেল ব্যাঙ্কের বালিপঞ্জ শাখা (কারেন্ট এ্যাকাউন্ট-ম্বর ২১০) ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চিত্তরজন এভিনিউ মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত শাখায়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম, এ, নাসিম চৌধুরী নাকি তিনরকম স্বাক্ষর করেন। চেকে টাকা তোলায়

এক সইয়ে, কলকাতার মধ্যে কর্ম-চারী নিয়োগপজে একরকম সই ও বাইরে একরকম সই।

বর্তমানে সংবাদপজে বিজ্ঞাপন দিবে ক্লার্ক নিয়োগ করা হচ্ছে। নিয়োগের সময় এক হাজার, দু হাজার ও তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জামিন রাখা হচ্ছে। ছশো টাকা মাসিক মাইনের প্রতিশ্রুতিতে একজনকে নেওয়া হয়েছে তিন হাজার টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিটে। আড়াইশো টাকা মাইনে হল এক হাজার টাকা। কেরানী বা অফিসারগেডের চাকরীর ক্ষত পূর্ব শর্ত হিসেবে ডিপোজিটের কথা লন্দেহজনক কারবারী প্রতি-ষ্ঠানই বলে থাকে।

কোম্পানীর অফিসে লাইনবোর্ডে মার আছে ‘যমুনা কমার্শিয়াল ফাই-নান্স (প্রা) লিমিটেড।’ কিন্তু পলিদি টেবিল কাম কল বুকের ১ (এ) ধারায় তথা ১০ ম্বর পাতায় কোম্পানীর নাম উল্লেখ থাকেটে প্রাইভেট কথাটি নেই।

পূর্ণ হাস রোডের দোতালার যে অফিস হয়েছে তা নাকি তাড়া নেওয়া হয়েছে মাত্র তিন বছরের জত। এখন আবার এরা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে বাতারাতে পাশ-পোর্ট তৈরী ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছে। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশও নাকি এই সংস্থাটির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগ ও টাকা জমা রাখার ব্যাপারে কোম্পানীর অস্থির ও নিশ্চয়তা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে।

চলচ্চিত্র নাটক

চেনা মুখ অচেনা গল্পে

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ চেনা থাকলেও সেই চেনা মুখের অন্তরালে অচেনা অজানা যে জীবন, তারই যবনিকা তুলে দেখাল রজন নাট্য সংস্থা গত ১৩ই আগস্ট রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। আগানের পট-ভিত্তিতে ভোমের জীবন অবলম্বনে কাহিনী নাটক রচিত হয়েছে; মঞ্চস্থ করেছে নানা দল। কিন্তু খালোচ্যনাট্যের উপজীব্য বিষয় এক হলেও কিছু স্বাভাবিক দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে। শব্দাহকারী-দের জীবনের স্বপ্ন দুঃখ, আনন্দ বেদনা, চাওয়া না পাওয়ার ব্যথা কান্না ফুটিয়ে তোলার সংগে সংগে সমাজের নানা স্তরের বৈষম্য, শোষণ, কাকিবাড়ি, জুয়াচুরি যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি স্বপ্ন রাজনীতির সঠিক দৃষ্টিকোণে পছন্দ জীবনে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা সঞ্চারও করা হয়েছে। চেনা মুখ অচেনা গল্পে 'নাটকটির রচনা ও নির্দেশনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন প্রণব বসু।

মৃত্যু যেখানে এক শোকাবহ ঘটনা, শব্দাহকারী ভোমের কাছে সেখানে সেটা পরম আকাংক্ষিত, স্বস্তির ব্যাপার—মৃত্যু না এলে রোগ-গার বন্ধ। বৈপরীত্যের এই যে

সংঘাত, জীবিত মানুষকে চক্কল না করে পারে না—অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম কত না নিষ্ঠুর মনে হয়। নাটকে এই ধন্য ফুটেছে ঠিকই, কিন্তু বহুবিধ বিষয় ও প্রসংগের অবতারণা হওয়ার ফলে সেই চেনা মানুষের জীবনের অচেনা কাহিনী মাঝে মাঝেই যোগ-যুজ হারিয়ে খাপছাড়া হয়ে পড়েছে। তবুও স্বীকার্য, নাটকটি বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বালক 'মুসা' চরিত্রটি প্রতীকী মাত্রার বৃত্ত—তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নাটকের পাজপাজীদের উত্তরন সম্ভব হয়েছে—এমন ব্যঙ্গমূলক সঙ্কার কম শক্তির পরিচায়ক নয়। অল্প দিনের মধ্যেই রজন সংস্থা বলিষ্ঠ প্রযোজনার যে স্বাক্ষর রাখলেন, তা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত করবে বলেই আশা রাখি। আগানের একটিমাত্র সেট—বলরাম চ্যাটার্জীর ঘরের ছাপ সেখানে স্পষ্ট। আলো ও সংগীত পরিচালনার ব্যতিক্রমে অমল রায় ও মানিকলাল ব্যানার্জী প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। হেমন্ত মুখার্জী ও অরুণি বসুর নেতৃত্বে কণ্ঠসংগীত নাট্য মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছে যথাযথ। অভিনয়ে টুপু

উত্তর প্রদেশের চিঠি

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

প্রতিক্রিয়াবাদীদের যত্নসহ যে নিপুণভাবে নয়াদিল্লী থেকে পৌহাটি অবধি জাল বুন চলেছে, তা বেরিয়ে পড়ে এই বৈয়তন্ত্রী শক্তিশালিত প্রবক্তাদের কথার ও লেখার। বোঝার বাকি থাকে না যখন জানান হয়, আসামের "গুগোল" বতর্দিন পশ্চিমবঙ্গের বামসরকারের আয়ু ততদিন। আসল সত্য পরম ধূর্তামির সঙ্গে চেপে ধরা হয়েছে। তা হল আসামে একপ্রশ্নীয় উগ্র আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদীদের দিয়ে খেলিয়ে প্রকৃত-নিপীড়িতদের, আন্দোলনকে বিপণ্যগামী করান হচ্ছে, যার ফল-রূপ বাংলাদেশী অধরূপ নিপীড়িত গরীবরা কীকে কীকে পশ্চিমবঙ্গের আসতে বাধ্য হয় এবং পরোক্ষ রাজ্যে স্রার ক জন উত্থানকারী জমিদার-সংস্কারের কাজ হয় বিপর্যস্ত, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক যারা উপরূত হচ্ছিল হয়ে পড়ে দিশাহারা এবং উপরূত রাজ্যের অর্থনীতির কাঠামো-

টাই পড়ে ভেঙে।

জনাব মুহম্মদ আমিন উত্তর প্রদেশ সরকারের পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে এক সমঝোতায় আসতে পেরে-ছেন বলে শোনা গেল। এবার থেকে লক্ষ্মী থেকে কলকাতা অবধি বিশেষ বাস চলাচল আরম্ভ হবে। কিন্তু যে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের গহ্বরে বাম মতাদর্শী পশ্চিমবঙ্গ, গরীব পশ্চিম-বঙ্গ, মুগ্ধ মুগ্ধের উৎপীড়িত শোষিত পশ্চিমবঙ্গকে ধাক্কা মেরে কলে দেবার ব্যাপক চক্রান্ত চলছে নয়াদিল্লী থেকে লক্ষ্মী তক্, তার চলার খবর কি নিয়ে গেছেন ঐ সরকারের প্রতিনিধিরা?

বস্তুত: প্রকৃত বামপন্থী, বিপ্লবী শক্তির উৎস তো বাংলার জনগণের মধ্যে। বাম মোর্চার মধ্যে যেমন ক্যাডারদের জনভিত্তিক কর্মসূচির নিহিত, তেমনি এবং তার থেকেও বেশি বিস্তারিত মোর্চার বাইরেও। সেদিকে নজর পড়লে নতুন দিল্লীর নয়া মুজল বামশাহীর ক্রীড়নক হতে হয় না আর।

আমরা বাঙালীর দুমুখো নীতি

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমরা বাঙালী নামক তথাকথিত রাজনৈতিক দলটির চক্রান্ত-মূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী দোরেন সিং-এর মধ্যস্থতার ফলে অথবা মাগাল্যাণ্ডের বৈরী নেতা লালডেবার অস্ত্র সংবরণ সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে অন্ততঃ-পক্ষে সাময়িকভাবে হলেও আন্তঃসম্প্রদায়িক-সমঝোতায় কীপ আলোক রেখা দেখা দিয়েছে, ঠিক তখনই আমরা বাঙালী পার্টি ত্রিপুরায় বাঙালী স্থান প্রতিষ্ঠা করার দক্ষীণ প্রোগ্রাম নিয়ে রণমঞ্চে হাজির হয়েছে। কলে ইন্দিরা গান্ধীর মনতপুষ্ট কার্যক্রম স্বার্থকেই প্রত্যক-

ভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। কারণ, কংগ্রেস (ই) ও আমরা বাঙালী এই উভয় দলেরই উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্যগুলিতে উত্তেজনা জ্বিইয়ে রাখা। এবং একই কারণে আসামের ব্যাপারে মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী দোরেন সিং অংশ গ্রহণ করতে ইন্দিরা বা লৈল সিং-তাকে প্রথম দিকে প্রকাশ্যে থিকার জানিয়েছিলেন।

আমরা বাঙালী বাঙালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে অবাঙালী বিরোধী আগুন জ্বালাবার জন্য বাঙালীদের প্ররোচিত করেছে আবার অস্ত্রাভ্যর্থন এই বলে উত্তেজিত করেছে যে, বাঙালীরা বিভিন্ন রাজ্যে আধিপত্যবাদ চালিয়ে যাচ্ছে,

অতএব ওদের হটাৎ। ব্যাপক হারে বিপুল আর্থিক করার জন্য এরা আসাম-ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে নিয়মিত অস্ত্র শিক্ষা নিচ্ছে বলে বিশ্বস্ত স্বত্রে খবর পাওয়া গেছে। দেশবাসী আর একটা জিনিস আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হটকারী দাঙ্গার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেস (ই) পার্টি আসাম-ত্রিপুরার বামপন্থী পার্টিগুলো থেকে শুরু করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এবং বাকি ইচ্ছে তাকেই দোষারোপ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বাঙালী পার্টির প্রকাশ্যে অস্ত্রাভ্যর্থন কার্যকলাপ ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এবং এর থেকেই উত্তর দলের দাঙ্গার পেছনে সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারটা সহজেই অসুমেয়।

সরকার, অমর রায়, দেবকুমার দে ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী নিষ্ঠার পরিচর রেখেছেন। হর্গেশ চক্রবর্তীর 'গণ-কায়' চমৎকার উপস্থাপনা। মাঃ সুপ্রিয় চ্যাটার্জী, অর্পিতা বোস ও মিতা চ্যাটার্জী অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

পাকা দেখা

হালকা হাসির ছবি হিসেবে 'পাকা দেখা' মোটামুটি উপভোগ্যই বলা চলে। প্রেম ব্যঙ্গ কিছু নেই, নেই কোন বিশেষ বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা। কিছু বাঙাবাড়ি আর অস্বাভাবিকতার যোগফলে যে তরল হাসির সৃষ্টি হয়, তারই স্বযোগ নিয়েছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সেদিক থেকে তিনি কিছু সার্থকতার দাবীও করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ সিনেমায় পুলিশকে নির্বোধ দেখানোটা ইরীতি হয়ে গেছে—এ ছবিতে পুলিশের নিবুদ্ধিতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে হাসির খোরাক করা হয়েছে—এখানে বাস্তবতার যোগ বিশেষ নেই।

বনজুলের 'বব সংস্করণ' কাহিনীর পরিবর্তন করে 'পাকা দেখা' ছবিটি হয়েছে। সে কারণে কিছু অতিরিক্ত হলোড়, আতিশয্য দোষ ও কোতুক সঞ্চারে অতিশয়তা প্রদর্শন পেয়েছে। কলে দর্শক হেসেছে ঠিকই, কিন্তু ছবিটি রস সৃষ্টি করতে পারেনি, ভাঙামি পর্যায়ে এসে গেছে।

ছবিটিতে বুদ্ধির ছাপ না থাকলেও এক ধরনের দাসপেন্স সৃষ্টিতে পরিচালক সফল হয়েছেন। শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত দর্শক বুঝতেই পারবেন না নায়িকার প্রেমিক প্রবরটি কে।

মৃণাল সেনের আগামী ছবি

মৃণাল সেনের আগামী ছবিরও কাহিনীকার অরবিন্দ চক্রবর্তী। ছবির নাম 'আকালের সন্ধানে'। একটি কিন্নর ইউনিট আকালের বিষয় নিয়ে ছবি করতে গিয়ে আকালের সন্ধানে ঘুরে কিয়ৎ—ছবির বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকু জানা যাবে।

মৃণাল সেন ১৫ই আগস্ট ক্যালকাটা প্রেসক্রায়ে সাংবাদিকদের এক সমাবেশে। এ ছবিটিও হবে ইস্ট-ম্যান কালারে। প্রযোজনা করছেন ধীরেশকুমার চক্রবর্তী। কালার কিন্নর ওপর দারচাঁপ প্রসংগে রাজ্য সরকারের সমালোচনাও করেন মৃণালবাবু।



ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোয়ালিটি ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

টেওয়ার নোটিশ

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ

রেফা: নং জি এম / কেও / টেওয়ার / ২২৮১ (ক) তার ২৮৮০

নিম্নবর্ণিত এজেন্টের ইন্সট্রুমেন্ট আছে এমন অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে কোটেশন আহ্বান করা হচ্ছে সি এল জাহাঙ্গীর কোলিয়ারীর কাজেরা নীম ওয়াশিংয়ের ওপর ওভারবার্ডেন স্থানান্তরের জন্য। (১) সংশ্লিষ্ট কাজ নিম্নরূপ: (ক) প্রায় ৩,৫০,০০০ কিউ মি মাটি (খ) প্রায় ৮০,০০০ কিউ মি পাথর। (গ) নূনতম ঘনত্ব ৪৭ ফুট (ঘ) সর্বাপেক্ষা ঘনত্ব ৬২ ফুট (ঙ) এইসব মালপত্র কোয়ারীতে ভর্তি করতে হবে অথবা ১ কি মি দূরত্বের মধ্যে কোন জায়গায় গাধা করে রাখতে হবে। (২) প্রতিদিন নূনতম ২,০০০ কিউ মি স্থানান্তর করতে হবে। (৩) কোটেশনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে: (ক) মাটি ও পাথরের জন্য প্রতি কিউ মি আদাঙ্গা দর। (খ) কি ধরনের এবং কতগুলি ইন্সট্রুমেন্ট কাজে লাগানো হবে। (গ) শর্তাবলী অনুযায়ী চুক্তি হবে যার বিস্তৃত বিবরণ জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেও এরিয়া, পো: বহলা, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে কোন কাজের দিমে পাওয়া যাবে। (৪) আসামসোলে দেয় 'কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ইস্টার্ন ডিভিশন), কেও এরিয়া'-র অফিসে ডিমাণ্ড ড্রাকটের আকারে ৫,০০০ বায়নার টাকা সহ কোটেশন ১৫৯৮০ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে যা একই দিনে বেলা ৪টার সময় উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার কমিটি খুলবে। বায়নার টাকা ছাড়া কোটেশন গ্রহণ করা হবে না।

টেরিটোরিয়ার সেই রহস্যময় আমেরিকান ক্লাব

সংবাদদাতা প্রেরিত

রাজ্যের পরিকল্পনা দপ্তরের কয়েকজন যুগ্ম ওপর আমেরিকান গোপন নির্দেশাবলী কি আরও জোরদার হয়েছে? পশ্চিম বাংলার লংকট বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে এই দপ্তর কি আগের চাইতে আরও সক্রিয়? কাজের নাম নেই অথচ কোটি কোটি টাকা অপচয় করছেন কেন সরকার তা হুঁবোধ্য। প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভার আমলে আমেরিকান ফনলালটেনসি গ্রুপ (ফোর্ড ফাউন্ডেশন) যে টেকনিক্যাল যন্ত্রের আড়ত খুলেছিল মার্কিন গোয়েন্দাদের পরিভাষায় তার গোপন নাম ছিল “টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড সোসিও ইকোনোমিক ইনভেস্টিগেশন সিস্টেম”। সরকারের সি এম পি ও অর্থ কলকাতা পরিকল্পনা দপ্তর দীর্ঘদিনে

১ম পৃষ্ঠার পর

দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতির জটল শ্রীমতী গান্ধী খুবই চিন্তিত। তিনি মন্ত্রিসভার দপ্তরের অধিকাংশের কাজেই নজর নন। শ্রীমতী গান্ধী এখন বুঝতে পারছেন আত্মপত্য এবং মন্ত্রি চালানো দুটো এক জিনিস নয়। শ্রীমতী গান্ধীর আহুগতের ভিত্তিতে গঠন করা মন্ত্রিসভার যোগ্য লোকের খুবই অভাব।

এই অবস্থার শ্রীমতী গান্ধী কয়েকজন পুরনো অভিজ্ঞ সহকর্মীকে আবার প্রাধিকার দিতে চাইছেন। দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে এখন হীনেশ সিং খুবই আলোচিত নাম। জানা গেছে হীনেশ সিংকে এবার মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার দেওয়া হবে। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে সচিব দলে আলা ইন্দিরার প্রাক্তন সহকর্মী স্বরণ সিংয়ের নামও পোনা যাচ্ছে। জানা গেছে স্বরণ সিংকেও হুঁত আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া হতে পারে।

দূর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

বাৎসরিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দূর্পণ

৩১ নং মট সেন, কলিকাতা-১৩

রয়ের মধ্যেই ছিল সেই সূত। ঠিকানা ১৮নং রবীন্দ্র সরণী। এখানে প্রায় ১৫ জন মার্কিন গোয়েন্দা কয়েক বছর কাজ করেছেন এবং ভারতীয় শিল্পের (কিছু সংখ্যক বৃহৎ ইঞ্জিনার প্র্যানিং এক্সপার্ট ইকোনমিষ্ট আই এ এস অফিসার ইত্যাদি) মাথা কিনে নেওয়ার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের বড় কর্তাদের নির্দেশ পালন করেছেন। ভারতীয় শিল্প প্রায় সবাই একাধিকবার আমেরিকার গেছেন এবং ট্রেনিং নিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই হলেন সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের (টাইম অ্যাণ্ড কান্ট্রি প্র্যানিং) কর্তাচক্র।

পরবর্তীকালে মার্কিন নির্দেশে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মার্কিন প্রতাবিত লবীর পরামর্শে এই কর্তাদের কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়লেন নতুন নতুন দপ্তর সৃষ্টি করে। সেগুলি হল ভূগর্ভস্থ পদার্থপ্রাণী সংক্রান্ত সি এম ডব্লিউ এস এ, কলকাতার উন্নতির জন্ত ধনী শিল্পপতি ও বৃহৎ কনট্রাক্টারের প্রতাবিত আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সি এম ডি এ প্রভৃতি। সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার আমলে এসব তৈরী হল। বামরকট সরকার তা’ নিয়ে আরও বেশী জড়িয়ে পড়লেন। কোটি কোটি টাকা খরচ হল। কিন্তু কলকাতার তথা পশ্চিম বাংলার ছাড়া বেড়েই চলল। ধূসর মার্কিন গোয়েন্দাদের পরামর্শে ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি ভারতীয় শিল্পের দ্বারা এই সব জড়বট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সমগ্র কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি, ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা, জলসরবরাহ, শিল্প, হাউসিং, টেলিফোনের ভূগর্ভস্থ লাইন, ভূগর্ভস্থ জরুরী নালী সবকিছু এমন বীভৎস করে তোলা হল যে তা এখন জনগণের নাস্তিখান তুলে আমছে। কলকাতার রাস্তা চওড়া করা হল না, ভূগর্ভস্থ নালীর মাস্টারপ্লানের খেলা দেখিয়ে তা ধামাচাপা দেওয়া হল। পানীয় জলের সংকট প্রায় দৈনিক অভিজ্ঞতা, ট্রান্সপোর্ট এখন যাত্রীদের কাছে আতঙ্কজনক ব্যাপার, বাসস্থানের অভাবে মাহুয় কুতুর শিয়ালের মত বগড়া করছে। কিন্তু এই ভয়াবহ

পরিকল্পনার আড়ালে বৃহৎ ঠিকাদার সংস্থাগুলি কোটি কোটি টাকা লুটে নিল।

ওয়াশিংটনের পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী একই কাজের জন্ত একাধিক দপ্তর তৈরী হ’ল এবং তাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে তীব্র ঠাণ্ডা লড়াই বাধানো হল। টেকনোক্যাট বনাম টেকনোক্যাট, আই এ এস বনাম টেকনোক্যাট, দপ্তর বনাম দপ্তর, দপ্তরকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী বনাম মন্ত্রী। ধনী শিল্পপতির কাইফের পার বাড়ীতে অফিস রেখে ভাড়া বাবদ কোটি কোটি টাকা সরাসরি ভাণ্ডার থেকে চলে গেল, এখনও চলছে। অথচ পরিকল্পনা দপ্তরের কাজ কলকাতার বাইরে।

এবার দেখা যাচ্ছে আর এক প্রজন্ম ট্র্যাটেজি। টাইম অ্যাণ্ড কান্ট্রি প্র্যানিং দপ্তরের মন গেজেটেড কারিগরী কর্মীদের বৈধ পাওনা প্রমোশন, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি অধোগ সম্পূর্ণ গায়ের জোরে আটকে রাখা। উদ্ভেদ, এই দপ্তরকে পুরোপুরি পংক্ত অর্থ করে তোলা। কারিগরী কর্মীদের ওপর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, প্রমোশন বন্ধ, সিলেকশন গ্রেড বন্ধ ইত্যাদি অত্যাচার চালানোর জন্ত তৈরী করা হয়েছে কয়েকজন “সেক্রেটারিয়েট বাবু” দ্বারা কাইলের মধ্যে কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টির বিশেষজ্ঞ। সেক্রেটারিয়েটের অত্যন্ত বাবুরা যেখানে প্রমোশন থেকে বঞ্চিত, সেখানে এঁরা পনেরো বছরে তিনটে প্রমোশন পেয়ে দপ্তর অচল করার ট্র্যাটেজি চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মী সংস্থাগুলি এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যায়ের অফিসারকে নিজের খুশি মত “নোটিং” দিয়ে কাজ করাচ্ছেন কিছু বাবু। মন্ত্রীকে বহু ব্যাপারে অন্ধকারে রাখা দস্তব - হচ্ছে। সাংবাদিক, জনগণ বা গণতন্ত্রকে কেউ কি জানেন যে এই দপ্তর কি করেছে এতকাল এবং বর্তমানে আদৌ কিছু করেছে কিনা। সি এম ডি-এ তো কলকাতার জন্ত, কিন্তু টি অ্যাণ্ড সি পি কিসের জন্ত?

রাজ্য ই-কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর

নেতা তাদের নাম কমিটি থেকে বাহ পড়ায় কোন্ডে কেটে পড়েছেন। লক্ষী বসু, বারিধরণ, সোমেন, হুসল, হুঁত প্রভৃতি প্রায় ডজনখানেক নেতা দিল্লী গেছেন কমিটির ব্যাপারে তাদের প্রতিবাদ জানাতে। জৈনক প্রাক্তন এম পি এবং কয়েকজন বিধানসভা দপ্তর তো সরাসরি এই কমিটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার জন্ত কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রায় পাঁচ রাস অপেক্ষা করার পর শ্রীমতী গান্ধী দলের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের এ্যাড হক তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার দ্বারা স্থান পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই বরকত সাহেবের অহুগামী। এদের সংখ্যা প্রায় ২৫ জন। এতে সভাপতি অজিত পাণ্ডার অহুগামী আছেন ৫ জন। অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর অহুগামীর সংখ্যা চারজন। এই তালিকার তিনজন আছেন দ্বারা কটর স্বরতপন্থী। বাকী সমস্তরা নিরপেক্ষ বলা যায়।

এ্যাডহক কমিটিতে শ্রীমতী গান্ধী স্বরত মুখার্জী এবং সোমেন মিত্রকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত না করে দুই জন নিরপেক্ষ লোককে সাধারণ সম্পাদক করেছেন। কংগ্রেস (ই) হাইকমান্ডের জৈনক মুখার্জীর হুঁত জানা গেছে, রাজ্যের দলীয় কৌদলে শ্রীমতী গান্ধী তিত্তিবিস্ত হয়ে উঠেছেন। শ্রীমতী গান্ধীর মনে এমন একটা ধারণা হয়েছে সোমেন-স্বরতের বগড়াকে কেন্দ্র করেই দল বিভক্ত হয়ে পড়ছে। ওদেরকে মিলে মিশে কাজ করতে বলেও নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এদেরকে দূরত্ব করতেই সংগঠনের কোন দায়িত্বশীল পদে আনা হয়নি।

কিন্তু এত করেও এদের বগড়া বন্ধ করা যাচ্ছে না। ২৮শে আগস্ট ছাত্র পরিষদের নামে স্বরত ও সোমেন দুই জনই আলাদা আলাদা সমাবেশ ডেকেছেন। এবং উভয় পক্ষই চেষ্টা করছেন তার প্রতিপক্ষের

সমাবেশে যেন কোন কেন্দ্রীয় নেতা না আসেন।

এই অবস্থার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈমমতায় পড়েছেন। ওদিকে পশ্চিম বাংলার সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানাতে বড় ছোট বিভিন্ন ওজনের নেতারা এখনও দলে দলে দিল্লী যাচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে না পেয়ে এরা এ আই সি সি-র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতীর মহাপাত্রের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। অবস্থা দেখে জৈনক কেন্দ্রীয় নেতা স্বরত করেছেন, অন্ততঃ ১০০ জনকে কমিটিতে নিলে তবে অবস্থা কিছুটা সামান্য দেওয়া যেতে পারে।

মহাপাত্র দ্বারকত শ্রীমতী গান্ধী বিক্ষুব্ধের বক্তব্য মোটামুটি শুনেছেন প্রণব, বরকত এবং কমল নাথের সঙ্গেও কথা বলেছেন। মনে হয় বাকী সব ঠিক রেখে কয়েকজনকে সদস্য তালিকার যোগ করা হতে পারে। কিন্তু তাতেও বগড়া মিটেবে বলে নেতারা মনে করছেন না।

কর বাকি

১ম পৃষ্ঠার পর

একচেটিয়া পুঁজিপতি বিভ্রান্তদের কিছু কোন সম্পদ কর বাকি নেই। কারণ, সম্পদ করের আওতায় পড়ে এমন কোন সম্পত্তি তাদের থাকি নেই। যদিও বিভ্রান্ত গোষ্ঠীকে বহু টাকা আয়কর হিসাবে দিতে হয়। আয়কর অনাদারী রয়েছে এমন কোম্পানীর মধ্যে রয়েছে জিয়াজীরাও কটন মিলস। অনাদারী ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। সেকুরি এক্সা এবং সেকুরি স্পিনিং-এর আয়কর বাকি যথাক্রমে ৫২ লক্ষ ২৬ হাজার এবং ৫২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। গোল্ডালিয়র রয়নের বাকি ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। বহুজাতিক সংস্থা আই এম বি ওয়ার্ল্ড ট্রেড কর্পোরেশনের বাকি রয়েছে ১০ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। হরিদাস মুন্ডার এবং ধর্ম তেজার বকেয়া আয়করের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ কোটি ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। হাজি মস্তানের বাকি রয়েছে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এম পি গায়কোয়ার্ডের ৭০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, নবাব মীর বরকত আলি খানের ৬১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এবং ইউরফ এ প্যাটেলের আয়কর বাকি ৫৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

স্রাতক ও স্রাতকোত্তর পর্বে পর্বে প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

১। ভৌত রসায়ন / ডঃ নিত্যানন্দ হুগু / ২২.০০

২। ইউরেনিয়ামের ওপারে / ডঃ অনিলকুমার দে / ১০.০০

৩৫, রাজা স্ববোধ মন্ডিক ভোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কৃষ্ণ গোপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দূর্পণ কার্যালয় ৩১, মট সেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

রাজীব ই-কংগ্রেস সংগঠনের সমস্ত কাজ দেখাশোনা করবেন

দপন

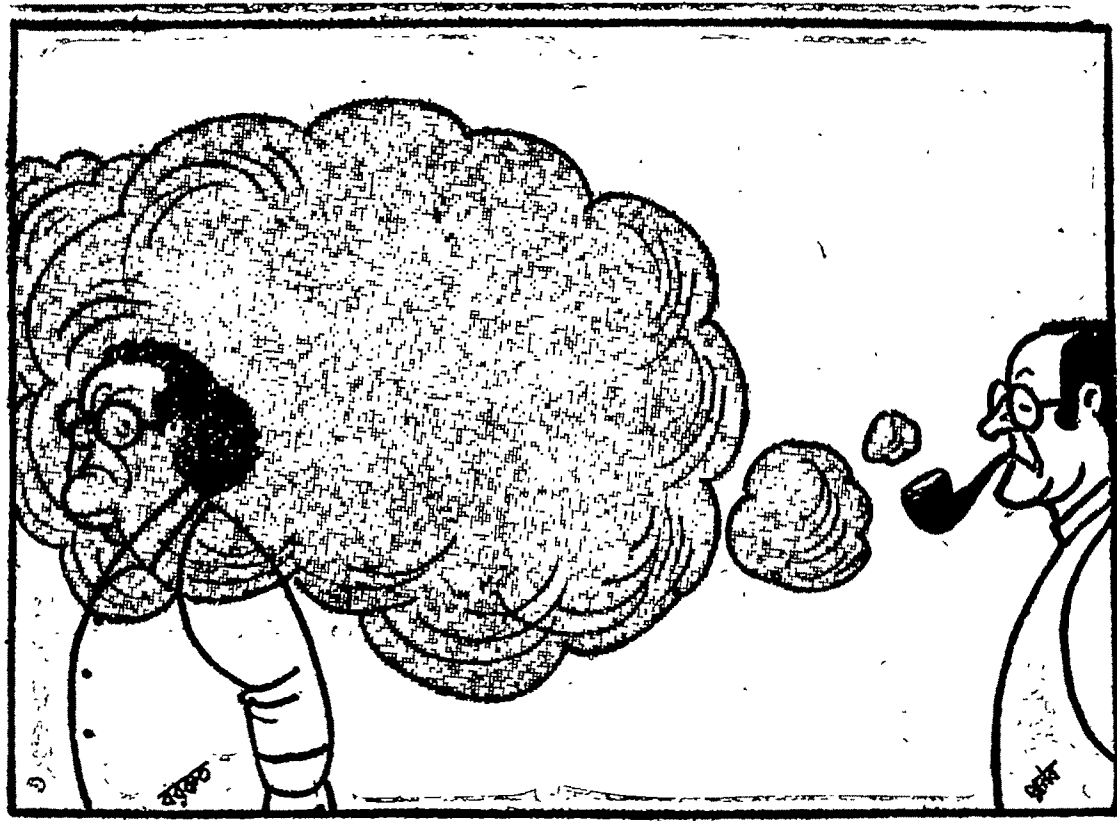
অরবিন্দ বর্ষ ১৩৩৭ সংখ্যা ১২২ই সেপ্টেম্বর, ৮০ ৬০ পরসো

রাজ্য কংগ্রেসে বরকত-প্রণবের ক্ষমতা দখলের লড়াই

রাজ্য কংগ্রেসের (ই) সাংগঠনিক ক্ষমতা দখল নিয়ে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী এখন প্রায় প্রকাশ্যে লড়াইয়ের আসরে নেমে পড়েছেন। এই দুইজন মন্ত্রী হলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানমন্ত্রী বরকত গণিখান চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও ইন্দুস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী।

প্রণববাবুর বিরুদ্ধে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে চক্রান্তের অভিযোগ তোলে দরকত সাহেব। রাজ্যের কংগ্রেস (ই) এম এল এদের এবং বেশ কিছু রাজ্য নেতার সঙ্গে বৈঠকে বরকত সাহেব বলেন, প্রণববাবু নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শুল্কের মধ্যে গোষ্ঠী স্বত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে এ্যাক্টব্য কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সেটা স্বয়ং দলনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই কমিটির বিরুদ্ধে যারা বক্তব্য রাখছেন তারা প্রকাশ্যেই কেন্দ্রীয় বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখছেন। বরকত সাহেব এমন ইঙ্গিত দেন যে, যারা এইসব শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়



বসন্ত শাঠে মন্ত্রিত্ব হারাচ্ছেন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বসন্ত শাঠের বিদায় কি আসন্ন? রাজধানীর রাজনৈতিক মহল সেই আশঙ্কাই করছেন। বসন্ত শাঠেও বুঝতে পেরেছেন যে মন্ত্রিত্বের

গতি তাঁকে খুব শীঘ্রই হারাতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল হবার কথা আছে তা চূড়ান্ত করা হবে ১২ই সেপ্টেম্বরের পরে। এই দেরির কারণ হল কমনওয়েলথ

সম্মেলনের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর ব্যস্ত থাকা এবং অল্প প্রদেয়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেরা রেড্ডির বিজ্ঞান খুঁজে না পাওয়া। শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

অরুণ নেহেরু সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের (ই) সভাপতি হচ্ছেন

ইন্দিরা কংগ্রেসের টিকিটে রায়-বেরিঙ্গী লোকসভা আসনে নির্বাচিত অরুণ নেহেরু সর্বভারতীয় ইন্দিরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন বলে বিশ্বস্তপূজ্ঞে জানা গেছে। বর্তমান সভাপতি রামচন্দ্র রথকে অপসারণ করে সভাপতি পদে আসা হচ্ছে অরুণ নেহেরুকে।

ইন্দিরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি

বা সভানেত্রী পদে সঞ্জয় জায়া মানেকা গান্ধীকে বসানোর জন্য শ্রমবল্ল সিং, সঞ্জয়ের শাও ডী আমতেশ্বর আনন্দ, পাণ্ডাবী মহল খুব তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই তৎপরতা ব্যর্থতার পূর্ববসিত হয়েছে। জানা গেছে যে, সঞ্জয় গান্ধীর মাতা প্রধামমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় ই-কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধী সঞ্জয়-জায়া মানেকাকে দাব বলে দিয়েছেন যে, তাঁর বাড়িতে বলে রাজনীতি করা চলবে না। রামচন্দ্র রথের জারপায় ই-যুব কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে অরুণ নেহেরুকে বারবার ব্যাপারে কমলাপতি জিপিআইও মত দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে ই-কংগ্রেসের ব্যাপারে জিপিআইওর মতামতের গুরুত্ব অপরি-

ণীম। ইন্দিরা গান্ধীও জিপিআইওকে বর্তমানে বেশ দমীহ করে চলেছেন। লকলে ধরেই নিয়েছেন যে, ইন্দিরার পরেই কমলাপতির স্থান। উত্তরপ্রদেশের যুব নেতা এবং কট্টর সঞ্জয়পন্থী সঞ্জয় সিং কিন্তু অরুণ নেহেরুকে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস (ই) সভাপতি পদে বসানোর ঘোরতর শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

অর্থনৈতিক অবস্থা বতাই ধারাপ হবে, বিরোধীরা ততই জোটবদ্ধ হয়ে তার পেছনে লাগবেন এবং অব্যমূল্য বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা তাকে যথেষ্ট বিশপাকে ফেলার চেষ্টা করবেন। এই অবস্থার সংগঠনকে মজবুত করে না। তুলতে পারলে বিরোধীদের মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসে (ই)র সংগঠনের এখন হাল অত্যন্ত করণ। রাজ্যে রাজ্যে বিবদমান গোষ্ঠীগুলো একে অন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে, লড়াই চলছে আদেশ নিরেনন, কে কতটা ক্ষমতার ভাগ পাবে তাই নিয়ে। এই অবস্থা সামাল দিতে শ্রীমতী গান্ধী হিমসিম পাচ্ছেন।

এ আই সি সি (ই)র সভাপতি শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং। তাই যেমন সরকারে সব মন্ত্রীরাই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেকী, তেমনি সংগঠনেও সাধারণ সম্পাদকরা সভাপতির মুখাপেকী। ফলে কি সরকার, কি সংগঠন সব ব্যাপা-

য়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাকেই দিতে হচ্ছে। কিন্তু ভরসা করে যে, সংগঠনের দায়িত্ব কারও ওপর ছেড়ে দেবেন সে রকম কারও ওপর বিশ্বাসও করতে পারছেন না।

এই অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধী চাম রাজীবকে রাজনীতিতে নামাতে। প্রথম দিকে কিছু দিখা থাকলেও বর্তমানে রাজীবরাজনীতিতে মায়ার জল্পামানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। বিখ্যাত হয়ে জানা গেছে যে, রাজীব শেবাংশ চম পৃষ্ঠায়

আলুকাবলির ছড়া

অনার্য মিত্র

শিখিল কবরী বাঁধিয়া দিয়াছ
খুলিয়া খুলিয়া যায়,
আলুখালু কেন বে-আক্ৰ বেশ
বাঁধন না মানে হায়।
বাঁধনের বাঁধা প্রত্যহ দাড়া
বৈধেছ শক্ত বাঁধনে,
বজ্র আটুনি খোলে বারবার
অবাধ-অর্থ সাধনে।

বাজারে বৈধেছ চিহ্নি ও করলা
তার সাথে বাঁধ আলু,
দায়ের বাঁধনে উধাও পণ্য
চারিদিক আলুখালু।
বাঁধনের বধু, তুমি শুধু শুধু
কর বাঁধনের হলনা
হারে আমার লজিত লতার
কঠিন কঠোর লজনা।
সর্বহারার ললনা আমার
জমদরদের বলাকা—
কেন যে মজাও, জালাতেও চাও
বাকুদবিহীন শলাকা।
শিখিল কবরী বাঁধিয়া দিয়াছ
খুলিয়া খুলিয়া যায়,
বাঁধা দিতে জান, বাঁধন জাননা
সেটাই অন্তরায়।

হুই.

যান না মশাই যান তো
দশ টাকাতো পান না ইলিশ
আপনি "হাবাকাত।"
"ইমেজ" নিয়ে চলি বলেই
বুক ফুলিয়ে বলি,
মাছের জন্য আমার "ইমেজ"
দিয়ে না জলাজলি।
সাংহাইতে মাছের ভেড়ি
বীরসুমেতে ব্যাঙ
চীন আম্রাধের মন্ত দেবে,
আমরা ব্যাঙের ঠ্যাঙ।
একটুখানি শান্ত হবেন,
একটুখানি শান্ত,
দশ টাকাতোই ইলিশ দেবো
হবেন নধরকাত।

সম্পাদকীয়

বিরোধী প্রক্যের দুর্বল ভিত্তি

আট মাস ধরে জনগণকে উত্তেজিত করে দ্বিপাক্ষিত হয়ে যুরে বেড়াবার পর চারটি বিরোধী দলকে পাটনায় আবার একাদমে বসতে দেখা গেল। কংগ্রেস (আর্গ), লোকদল, জনতা (জেপি) ও জনতা (এম)-এর পক্ষ থেকে একতুড়ি মেতা একটি যৌথ বিবৃতি প্রচার করেছেন। সে বিবৃতিতে উক্ত দল চতুষ্টয় ছাড়াও লসারিষ এইচ এন বহুগণকে নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আবার একটি ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আগামী সাতই অক্টোবর পাটনায় দলগুলোর একটি যুক্ত কমতেনশন ডাকা হয়েছে।

চার দলকে নিয়ে একটি দল গড়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য আজই প্রথম অস্বীকার্য হওয়া না, সংকল্পটিও এবারই প্রথম উচ্চারিত হওয়া না। গত জাহ্নবীরিতে লোকসভার নির্বাচনী লড়াইয়ে ছত্রভঙ্গ বিরোধী দলগুলো ইন্দিরা কংগ্রেসের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর থেকেই নেতাদের পাল্লা দিয়ে আবার ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সে ডাকে বিশেষ কেউ সাড়া দেয় নি, তাই বিধানসভার নির্বাচনে তাদের কপালে আর এক প্রহর মার ফুটল যদিও নীতিমিত্ত ঐক্যের স্বকল পোত অস্বীকার হয় নি, বাম-পন্থী জোটের লক্ষ্য তো বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। কিসের দ্বারা আজ দল চারটি ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকারিত হয়েছে? অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পালনে ইন্দিরা গান্ধীর শোচনীয় ব্যর্থতার দ্বারা অব্যমূল্য বুদ্ধি, মূঢ়াফীতি, হরিজন ও লম্বালায়ু নির্বাতন, নারী নিগ্রহ, সামগ্রিকভাবে আইন ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব অবনতি ইত্যাদি কারণে জনগণ আজ তিত্তিবিরক্ত। তারা এ দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান চায়, পরিবর্তন চায়। সে পরিবর্তন কোন একটি দলের পক্ষে আনিয়ন করা সম্ভব নয়, তাই তারা বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখতে চায়, ইন্দিরা কংগ্রেসের শক্তিশালী বিরুদ্ধে চায়।

(ইন্দিরা) কংগ্রেসের বিরুদ্ধ দল গঠন করা যে সম্ভব এবং কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠন করাও সম্ভব, ১৯৭৭ সালেই তা বিরোধী দলগুলো দেখিয়ে দিয়েছে। সেদিনকার এই রাজনৈতিক পাল্লা-বদল 'ঐতিহাসিক মটনার' 'ব্যাংকট বিপ্লবের' এবং 'দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতার' গৌরব লাভ করেছিল। কিন্তু সে গৌরব পূর্ব ভারতের আকাশে ক'দিন অবস্থান করতে পেরেছে? মাত্র দাশ মাসের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ আন্দোলনের চাপ ছাড়াই জনতা সরকার তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কেন? এর একমাত্র জবাব নেতাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা। এবং অবশ্যই নীতি ও আদর্শহীনতা, গোড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা।

বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হবার অপরিহার্যতা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু সে ঐক্যের ভিত্তি কী হবে? দল চতুষ্টয়ের পক্ষ থেকে গান্ধীবাদকেই সেই ভিত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীও তো দ্বিবারাজ সেই গান্ধীবাদের শপথ উচ্চারণ করেন। তাহলে ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে এই দল চারটির আদর্শগত অমিল কোথায়? আসলে এরা যেমন একদা গান্ধীবাদী ছিলেন আজ সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা ভাঙিত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তেমনি তারা একদা ইন্দিরা গান্ধীর লক্ষ্যশীলও তো ছিলেন। প্রধানত: রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ, অর্থনৈতিক কর্মসূচী এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রমুখ মনোভাবই একটি রাজনৈতিক দলকে চারিত্রিক বিশিষ্টতা দান করে থাকে। জনগণের স্বার্থ ওই নীতি ও আদর্শের দ্বারা স্বরূপিত হবে না বিপর্যস্ত হবে—তার ওপর নির্ভর করে দলের জনপ্রিয়তা বা যুগ্ম দায়িত্ব। প্রচলিত কমতেনশনে বামপন্থী দলগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষরদামকারী কোন নেতারই এটা স্বজ্ঞাত নেই যে একমাত্র বামপন্থী জোটই ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ শক্তির যোগ্যতা ধারণ করে। কাজেই এটি গান্ধীবাদী দল ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত গান্ধীবাদী দল আধেরে কতখানি যুক্ত হতে পারবে, বিস্তৃত শক্তি হিসাবে সে জনগণের কাছে কতখানি স্বীকৃতি ও স্বীকার্য অর্জন করবে—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মনে হয়, মাননীয় বিরোধী নেতারা এখনো তাদের সংকীর্ণতা ও ক্ষুধার্তবুদ্ধির কোপ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাই দুর্বল ভিত্তির ওপর পাকা ইমারত গড়ার সমস্ত প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত পণ্ড্রবে পর্ববনিত হবার আশংকাই রয়েছে। বামপন্থী দলগুলিই বা কী করছে?

ফরাঙ্কার বাঁধ যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে

কল্যাণ ঘোষ

বিপত্তি মুখে জানা গেছে যে, কেবলমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ফরাঙ্কা বাঁধের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত। যে কোন মুহূর্তে এই বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে জনপদ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা প্রাণিত হতে পারে। এই বিপদের আশঙ্কায় রাজ্য সেচ দপ্তর বতর্টা উদ্বিগ্ন, কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রক কিন্তু সে বিষয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। ফরাঙ্কা বাঁধ ভেঙ্গে গেলে শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হবে বলেই কি কেন্দ্র এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন? যদিও ফরাঙ্কা বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রের।

অপরপক্ষে এক অসমর্থিত সংবাদে জানা গেছে যে, মালদা জেলার পল্লানদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এখনই যদি এই গতিপথ পরিবর্তনকে মোখ না করা হয় তাহলে ফরাঙ্কা বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং পল্লানদী চলবে বাবে বাড়লাদেশে। অষ্টম রাজ্য বিধানসভার নবম অধিবেশনের চতুর্থ দিনে রাজ্যের সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম পল্লানদী গতিপথ পরিবর্তন সম্পর্কে। প্রভাস-বাবু আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন: সরকারীভাবে এই বক্তব্যের সমর্থন করতে পারছি না। তবে খোজ নেব। এখানে উল্লেখ্য যে, সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দেননি। প্রভাসবাবু সেদিন অফিস রেকর্ড বহু কথা বলেছিলেন। সেই সব কথার গুরুত্ব থাকলেও তা প্রকাশ করা শোভন নয়।

গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটির রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অস্তিত্ব পাললিক নদীগুলির মত গঙ্গা নদীও মাঝে মাঝেই তার গতিপথ বদলেছে। দার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত ম্যাপ অনুযায়ন করলেই গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। ১৯২২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৭২ এবং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত দার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপ থেকে বোঝা যায় যে, গঙ্গা নদী ক্রমাগত তার গতিপথ পরিবর্তন করে আসছে। ১৯২২ থেকে ১৯৩৭ সালের ম্যাপ অনুযায়ী রাজমহল থেকে ফরাঙ্কা পর্যন্ত পল্লানদীর স্রোত ছিল প্রায় দোখা। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৮-৫০ সালে গঙ্গা নদী

রাজমহলের আগে গঙ্গা ফরাঙ্কার আগে গতি বদল করেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে নদীর স্রোত উল্লেখযোগ্যভাবে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তাই অসমর্থিত পল্লানদীর এই গতিপথ পরিবর্তনের সংবাদকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়ও তাই আমার প্রশ্নকে উড়িয়ে দিতে পারেন নি।

ফরাঙ্কা বাঁধের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত বলে প্রথমই যে সম্বন্ধ করেছি তার সমর্থন মেলে গঙ্গা ইরোশন কমিটির রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ফরাঙ্কা বাঁধের ঠিক ওপরে বাম তীরে আর এল ৭৪ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বালুভূমির স্রষ্টা হয়েছে এবং বাঁধের দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ফলে মদী ৮০ থেকে ৯০ ফুট গভীর হয়ে গেছে। যার ফলে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী মূর্শিাবাদ জেলার ব্যাপক ভাঙন হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাঙ্কা বাঁধ এক বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হয়েছে।

গঙ্গার এই ভাঙন ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার বর্তমানে জলীপুর্ বাঁধ থেকে দুই মাইল দূরত্ব মাইলে এবং গঙ্গার তীর থেকে ভাগীরথী দূরত্ব মাইল দোখা এক মাইলে এসে গেছে। আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গা ও ভাগীরথী মিশে যেতে পারে এবং তা যদি হয় তাহলে ভাগীরথী নদীর দুই তীরবর্তী মূর্শিাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলি প্রচণ্ড প্রাণহানির সম্মুখীন হবে এবং ফরাঙ্কা বাঁধ যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা এবং সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধনের জন্যই ফরাঙ্কা বাঁধ নির্মিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যেই বিগত জুলাই ও আগস্ট মাসে পল্লানদীর বড়া উত্তর-প্রাচ্য ও বিহার রাজ্যকে প্রাণিত করে পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মূর্শিাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার প্রাণহানির স্রষ্টা করেছে। ভয়াবহতার দিক থেকে এই প্রাণহানি ১৯৭৮ সালের বড়া-কেও ছাপিয়ে গেছে। গত ১৩ই আগস্ট ফরাঙ্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত মালদা জেলার কালি-চাক খানার ডোকা এলাকার ৫ ও ৬ নম্বর প্যারের মধ্যবর্তী বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং গঙ্গা ও পাগলা নদী মিশে গিয়ে সংলগ্ন ১৬০ বর্গ মাইল এলা-

কার ভয়াবহ প্রাণহানির স্রষ্টা হয়।

ফরাঙ্কা বাঁধকে আসন্ন দুই থেকে বাঁচাবার জন্য গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটি একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। ফরাঙ্কা বাঁধের উজ্জানে ও ভাঙিতে ভাঙন প্রতিরোধকল্পে এবং বর্তমান বড়ার আরও যে বহু নদীর ভাঙন ও নদী-অবক্ষণের স্রষ্টা হয়েছে তা প্রতিরোধ করতেই গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটি উপরোক্ত প্রকল্পটি প্রস্তুত করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, চলতি সালের জাহ্নবীরী মাসেই গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের নির্লক্ষ্য উদাসীনতার তা ফাইলবন্দী অবস্থাতেই পড়ে ছিল। এতদিন। আরও উল্লেখ্য যে, সে সময় কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ছিলেন মালদা জেলার নির্বাচিত সংসদ সদস্য এ বি এ পণি খান চৌধুরী। বরকত সাহেব বলে থাকেন যে, মালদার উন্নয়নই নাকি তার জীবন দর্শন। তিনি যদি গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটির রূপারিশটি আগে ভাগেই খতিয়ে দেখে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তাহলে হয়ত ভয়াবহতার দিক থেকে সাম্প্রতিক বড়া মালদা ও মূর্শিাবাদ জেলায় ১৯৭৮ সালকে ছাপিয়ে যেত না।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় অর্থ যেন কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ফরাঙ্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের হাতে দেবার ব্যবস্থা করেন।

আরও দাবি করা হয়েছে যে, পল্লানদীর বাঁধ ও প্যার ভেঙে মালদা মূর্শিাবাদ জেলায় যে ভয়াবহ বড়া হল এবং তার জন্য যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হল তার দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে নদী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক উচ্চকমতা-গম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করুন।

গঙ্গা নদীর বর্তমান আচরণকে উপলব্ধি করে গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটি ফরাঙ্কা বাঁধের উজ্জানে যে যে এলাকার ভাঙন মোখ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবার রূপারিশ করেছেন সেগুলি হল: নাক্ষিপড়া, ধুলিয়ান শহর, আওরদাবাদ উপনগরী, হুর্-পুরের গিড়িয়া অঞ্চল এবং কুতুবপুর শেখজীপুর অঞ্চল।

পাক্ষিপাড়ার নদীর যে তীর ভাঙন হচ্ছে তার থেকে রেল লাইনের দুই মাইল ৫২০ মিটার, হুর্-পুরের গিড়িয়া অঞ্চলে অবিলম্বে ভাঙন মোখ ব্যবস্থা গৃহীত না হলে জালিপুর বাঁধের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হতে পারে এবং কুতুবপুর-শেখজী-পুর অঞ্চলে জালিপুর বাঁধের বাম দিকের গতিপথ বদলকারী বাঁধটির অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হতে পারে যদি না এখনই কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এন টি সির চেয়ারম্যান একজন ব্যবসায়ীকে মুরুব্বী পাকড়েছেন

এন টি সি (পূর্বাঞ্চল) সার্বস্বিক ডিয়ারী চেয়ারম্যান শ্রীমন্নিলাল কুমার ব্যানার্জী এখন শেষ চেষ্টা হিসাবে উত্তর কলকাতার এক স্বতা ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হয়েছেন। এই ব্যবসায়ী এন টি সি-র একজন এক্সেকিউটিভ এবং স্বযোগের ফলস্বরূপ মোটর আশা নানান জায়গায় তথ্যের গুরু করেছেন ব্যানার্জী সাহেবকে গৃহীতে রাখবার জন্ত।

সম্প্রতি এই ব্যবসায়ী তত্ত্বলোক প্রচার করতে শুরু করেছেন যে ব্যানার্জী সাহেবের মত লোক হয় না। এন টি সি-র ভালোর জন্ত তাঁর চেয়ারম্যানের পদে থাকারটা বিশেষ প্রয়োজন।

ভাগ্যের কি পরিহাস! গৃহী রাখবার জন্ত ব্যানার্জী সাহেবকে শেষকালে এক খুচরো স্বতো ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হতে হ'ল। চারিদিকে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেছে। একজনও কর্মচারী বা অফিসার জুটলোনা যিনি ব্যানার্জী সাহেবের হয়ে দুটো কথা বলেন।

জুটবেই বা কোথা থেকে? ব্যানার্জী সাহেবকে সবাই হাড়ে হাড়ে চিনে গিয়েছে। তাঁর পাজার পড়ে কে তার নিজের সম্মান ধোয়াতে বাবে?

শোনা যাচ্ছে এই ব্যবসায়ী তত্ত্বলোক ইদারীকালে এন টি সি থেকে বেশ মোটা অর্ডার পেয়েছেন। স্বতো বরাদ্দের সিংহভাগ আর কি! এতবড় দাঁও মিললে কেই বা না একটু-আধটু দালালি করে।

স্বতো বরাদ্দ নিয়ে এন টি সি-তে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাল লেন-দেন চলছে। ব্যানার্জী লেনদেনের হিসেবটা ভালমতই বোঝেন। স্বতরাং খেলা জমে উঠেছে।

স্বতো বিক্রীর তারপাশ অফিসার তত্ত্বলোক ব্যানার্জী সাহেবের খুশি মাসিক চলতে গররাজী হয়েছিলেন। স্বতরাং তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা তথাকথিত সেলস কমিটি আছে কাপড় বিক্রীর জন্ত। কমিটির মেম্বারদের অবস্থা হাত-পা বাঁধা। ব্যানার্জী সাহেব বা বলবেন তাই যেনে নিতে হবে। নইলে চলে যেতে হবে গরী-মোকাম।

বিক্রীর আগে টেওয়ার ডাকার কোন বালাই নেই। সবই মুখে মুখে। ব্যানার্জী সাহেব বলে দেবেন কোন এক্সেকিউটিভ মাল দিতে হবে। যার কথা বলবেন তাঁকেই দিতে হবে।

ব্যানার্জী সাহেব অবস্থা দাবী

করেন বাজারজাত স্বতোর শতকরা ৫০ ভাগই নাকি উনি সম্ভার সমিতি-গুলোকে দেন। হিসেবটা পরিষ্কার হয় যদি উনি দয়া করে এই সমিতি-গুলোর নাম প্রকাশ করেন।

আমাদের খবর কিন্তু উল্টো। মাত্র তিনজন ব্যবসায়ী এখন স্বতো সিংহভাগ পাচ্ছেন। এর মধ্যে তৃতীয়-জন এখন ব্যানার্জী সাহেবের প্রচার সচিবের কাজ করছেন। সেলস কমিটি মারকো আছে। এই কমিটির বাস্তবে কোন ক্ষমতা নেই।

স্বতো আর কাপড় বেচা নিয়ে অডিটাররা কড়া মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে বিনা টেওয়ারে এ ধরনের বেচা-কেনার নজীর তাঁদের অন্ততঃ জানা নেই। এক দামে বিক্রী হচ্ছে আর অন্য দামে বিল। মুখের কথার এক এক্সেকিউটিভ মাল পাচ্ছেন লাখ-লাখ টাকার। অন্য এক্সেকিউটিভ বেসি দাম দিতে চাইলেও মাল পাচ্ছেন না।

অবশ্য ব্যানার্জী সাহেব বড়াই করে বলে বেড়াচ্ছেন যে স্বতো বরাদ্দে ঘনঘন ওঠা নানার জন্ত আগে ভাগে টেওয়ার ডাকার স্বযোগ কম। দরদাম আগে থেকে ঠিক করে ফেললে ওর নাকি তাতে লোকমানই বেশি।

বাজারের খবর অবশ্য দাঁড়া রাখেন তাঁরা অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে এই মুখে মুখে ব্যবসার স্বযোগ বত-দিন থাকবে ততদিনই ব্যানার্জী সাহেবের সুবিধে। আর এই সুবিধের জন্তই ব্যানার্জী সাহেব সেলস ডিপার্টমেন্টের ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব করেন।

কিন্তু ক্রমে ক্রমেই ব্যানার্জী সাহেবের সাকানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে ভয়ে উনি এখন অফিসেই আশা বন্ধ করে দিয়েছেন। চেয়ার-টেবিল বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন। কর্মচারীরা বলেছে ওকে আর অফিসে ঢুকতে দেবে না।

ব্যানার্জী সাহেবের স্বতোর সংসারে শনির দৃষ্টি পড়েছে। তা না হলে এই পেন্ডিন এয়ারপোর্ট হোটেল পাড়া ছুঁপটা দাঁড়িয়ে থাকার পরও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়।

অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিজের দুঃখের কথা জানাবেন বলে। কিন্তু মন্ত্রীমহোদয় সাফ কথা জানিয়ে দিলেন: দেখা হবে না।

ব্যানার্জী সাহেব বোধহয় জানেন শেষাংশ, এম পৃষ্ঠার

ষষ্ঠ পরিকল্পনার খোলনলচে পাণ্টাতে হবে

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

গত দশগুহে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে ১৯৮০-৮১ সালের ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এবারের পরিকল্পনা জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সর্বসম্মতভাবে ষষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণের কথা আদৌ সত্য নয় বলে জানিয়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের স্বত্রেই এমন একটা প্রচার চলছে।

পাঠকদের হয়তো মনে আছে যে জনতা সরকার ১৯৭৮-৮০ সালে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া দলিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে উপস্থিত করেছিলেন তাতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মধ্যে প্রায় ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প রাজ্যগুলির হাতে হস্তান্তরিত করা হয়। কিন্তু এবারের খসড়া পরিকল্পনার আবার তা কেন্দ্রের হাতে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই দাবির প্রত্যাহারকে সমর্থন করতে পারেন না, এটা না বোঝার কোন কারণ নেই।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন ও আর্থিক সঙ্গতি বন্ধনের ক্ষেত্রেও সমস্যা পূর্ববৎ রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এই মৌলিক দাবীগুলি পরিত্যাগ করতে পারেন না। স্বতরাং জ্যোতি বহু সঙ্গতভাবেই প্রতিবাদ করেছেন। হতে পারে বহু বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মতৈক্য প্রসারিত হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের যোজনা বরাদ্দ চলতি বছর রাজ্য সরকারের দাবিমত ৫৮০ কোটি টাকা অধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে কেন্দ্র রাজী হন নি, এখন রাজী হয়েছেন। স্বতরাং মতৈক্য হয়েছে। আবার ভরতুকি প্রত্যাহার, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের দায়িত্ব রাজ্যগুলির হাতে একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া, এসব বহু বিষয়ে মতৈক্যও রয়েছে। আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের জন্তে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ সুস্থিতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সর্বদাই এক-গুঁয়েমি ও যুক্তিহীন জেদের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যীয় বিষয়গুলি হল: (১) এবারের পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগ এবারত কালের সর্ববৃহৎ পরিমাণ প্রায় এক

লক্ষ চার্লান হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৬৬০০০ কোটি টাকা, (২) এই পরিকল্পনার সঙ্গতি সংগ্রহের জন্ত অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহ ব্যবস্থা ১১০০০ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে, (৩) অতিরিক্ত কর বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ধার্য লক্ষ্যমাত্রা ৭৫০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর জমাদানরূপে গুণে দিতে হবে। (৪) এছাড়া বাজারে বাটতি হবে ৪০০০ কোটি টাকা, নতুন কাগজী মূল্য বাজারে ছেড়ে এই বাটতি পূরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। (৫) এত সব করেও কিন্তু আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন বৃদ্ধির হার হবে ৫ শতাংশ। অজ্ঞের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ চেন্না রেড্ডির মতে এই উন্নয়ন হার বাস্তব-

দৃষ্টান্ত নয়। অতীতের কোন পরিকল্পনাকালেই বার্ষিক তিন শতাংশের বেশী হারে উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পায় নি।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আশা প্রকাশ করেছেন যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার জন্তে অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহ করা কঠিন হবে না, যদি নতুন কর বসানো এবং মূল্যনীতির পরিবর্তন করে মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা যেনে নিতে জমাদানরূপে দৃষ্টান্ত (বাধ্য?) করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত সমর্থন করতে পারেন নি।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে বলেছেন যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কলকারখানার মালিক, রপ্তানী ব্যবসায়ী ও খামার মালিকদের যে ভরতুকি দেন তা উঠিয়ে দিলে অতিরিক্ত সঙ্গতি সংগ্রহের জন্তে জনসাধারণের উপর আরো বেশী কর চাপাবার প্রয়োজন হবে না। বছরে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়। স্বতরাং এই টাকা দিতে নাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বাটতি হবে না, নতুন ট্যাক্স বসানোর প্রয়োজনও হবে না। জ্যোতি বহু তাঁর ভাষণে আরো প্রস্তাব করেছেন যে ডাল, তেল, কেরোসিন, কয়লা, চিনি ইত্যাদি কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য দ্রব্যের দাম কমিয়ে আনার জন্তে

৫০০ কোটি টাকা ভরতুকি দেওয়া হোক। তাহলে জনসাধারণ কম দামে এই জিনিসগুলি নিয়মিত সরকারী রেশনের দোকান থেকে পেতে পারবেন। এই দায়িত্ব পালন অনিশ্চিত করার জন্তে এই জিনিসগুলির পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার জন্তেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপারিশ করেছেন।

বলা বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন নি। স্বতরাং তাদের সঙ্গে পূর্ব মতৈক্যের প্রসঙ্গই ওঠে না।

প্রধানমন্ত্রী একটি খাতি কথা বলেছেন। তা হল সরকারী শিল্পক্ষেত্রে লোকসানের বহর বন্ধ করে এই সংস্থাগুলিকে লাভজনক কারবারে পরিণত করার পরামর্শ। কিন্তু সর্বের মধ্যেই যেখানে স্বত সেখানে স্বতের স্বত কতি এড়ানো সম্ভব নয়। সরকারী আমলাপ্রধান কোন শিল্পই লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না। আরণ আই এ এম, আই জি এম, এ্যাকাউন্টেন্ট ও রাজস্ব বিভাগীয় লোকেরা স্বার্থপর হবার মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন নি। অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের অপরগতা অক্ষমতাও ব্যর্থতার সোপান তৈরী করেছে। সরকারী শিল্প ব্যবসায়ে এবারত ২৫০০০ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়েছে। এই আমলাপুঞ্জবাদের কদ্যানে ইতিমধ্যেই তার ১৮০০০ টাকা লোকসানে গিয়েছে।

এই আমলাপ্রীতি ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও বাতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন। অবসরপ্রাপ্ত আমলার দল দোজাভুজি অফিসে এসে পদানতীন মহিলাদের স্বত সাধারণ মাছ ও কর্মীদের দৃষ্টির হোয়াচ এড়িয়ে কর্মরা বন্ধ করে হিজিবিজি লেখাখোখা করতে থাকেন। তারপর আছে শত শত লাঞ্চ ও ডিনারের পান ভোজন ও ক্রান্তি। সরকারী খরচে আরাম ও চিত্তবিনোদন ছাড়া এই আমলাকুল অন্য কোন কাজে দক্ষ নয়। স্বতরাং বাকী ৭০০০ কোটি টাকা হুঁকে দেবার আগেই এই আমলাদের বোঁটেরে বিদেয় করা দরকার।

পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করার দায়িত্বও বতদিন আমলা-নির্ভর হয়ে থাকবে ততদিন প্রশ্ন বছরেই হোক আর তিনশো বছরেই হোক এফটার পর একটা ব্যর্থতা বরণ করেই যেতে হবে। স্বতরাং পরিকল্পনার খোলনলচে পাণ্টানো ছাড়া ভারতের কোন পরিকল্পনাই দফল হতে পারে না। অতীতেও হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

অর্থনীতি

সুকান্ত আশ্রি এবং শিক্ষকতা

মিহির আচার্য

সাহিত্য-বিষয়ক অবতারণা না-করে ধান ভানতে ময়ীপালের গীত গাইতে বসেছি। গ্রিয়ার পাঠক অপ-রাধ মার্জনা করবেন। এমন একেকটা জটিল সমস্যা একেক সময় বুদ্ধিমান মানুষকেও পুণ্ডিত করে তোলে যখন জনতার আদালতে আশ্রি জানানো ছাড়া উপায় থাকে না।

আপনারা জানেন আমি একজন লেখক এবং এও জানেন জ্ঞান ও বিশ্বাসমতো আমিও মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী, কিন্তু সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা হচ্ছে আমার জীবিকার প্রশ্নে, যেখানে আমি একজন সাহিত্যের শিক্ষক।

যখন এমন একটা বিষয় আপ-নাকে পড়াতে হচ্ছে যা আপনার দার্শনিকবোধের পরিপন্থী সেখানে সেক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য কী? চাকরি বজায় রেখে আপনার বিবে-ককে বন্ধ রাখা অথবা প্রতিবোধ করা? এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, আপ-

সাহিত্য দর্শন

নার বিবেককে রক্ষা করতে গেলে চাকরি বজায় থাকেনা বটে, কিন্তু ছাত্রদের নামনে এ-বক্তব্য রাখতে গেলে ছেলের পরীক্ষাপত্রের সহায়ক হয়না।

নিশ্চয় আপনারা অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে, শিক্ষক মার্কলে বিশ্বাসী হোম কী গান্ধীতে, শিক্ষাক্ষেত্রে তার কী অবস্থিতি হচ্ছে? দর্শন-বিশ্বাসী শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতাকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। তা নাহলে তাঁর দার্শনিকবোধ জীবন-অতিরিক্ত কেতাবী বৈষ্ণবো পরিণত হয়। শিক্ষক তো নিছক নিজেবাস শেষ করার নির্বোধ বয়সই নন।

একটা উদাহরণ ধরা যাক। ঐতিহাসিকগণ কেউ কেউ সিরাজ-দৌলাকে ইংরাজদের অহময়গে জুরায়া চিত্রিত করতে ভালোবাসেন। আবার কেউ তাঁকে বাঙলাদেশের স্বাধীন শেষ নবাব বলে বর্ণনা করেন, যিনি ইংরাজ লুণ্ঠীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

এখন এই বিরোধী মতামতের মধ্যে শিক্ষক হয়ে কোনটিকে ছাত্র-দের নামনে - তুলে ধরা দরকার? ব্যক্তিগতভাবে এদেশে ছনীতি-পরায়ণ ইংরাজ শাসনের চরিত্র আমার কাছে চিরকালই ঘৃণার বস্তু। আমি কোনোদিন এ-শাসনকে 'বিধাতার আশীর্বাদ' অথবা 'অসম্ভব

আমাদের পরিজাতা' হিসেবে দেখতে অসম্ভব মই। সেক্ষেত্রে সিরাজের ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামী ভূমিকাই আমাকে আকর্ষণ করে। যেহেতু আমারও মার্কসবাদী শিক্ষা আমাকেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিসেবে গড়ে তুলেছে। বিভাগ্যবশত মহাশয়ও যখন ইংরাজ ঐতিহাসিকের অহময়গে সিরাজকে 'জুরায়া' 'পাষণ্ড' ইত্যাদি কারণ বিশেষণে ভূষিত করেন তখন বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিশ্বাসী আমি বিভাগ্যগুরুকে সন্মর্শন করতে পারিনি। পাঠ্যপুস্তকে বিষয় বহি-তাই হয় তাহলেও নয়। কারণ আমি এটাও অস্বীকার করতে পারিনি যে, ইংরাজ শাসনের সহবাসে যে 'নতুন বাঙালী মধ্যশ্রেণী' গঠিয়ে উঠল—রায়মোহন থেকে বিভাগ্যবাস পর্যন্ত—সেই গোটা উনিশ শতক জুড়ে 'রাজাহুগত' ও 'বদেশপ্রেম' একাকার হয়ে গেছে। বরং ইংরাজ মুকবিদের পৃষ্ঠপোষণা হারাবার শঙ্কায় তাঁরা ঐতিহাসিকবোধ পর্যন্ত খুঁইয়ে বসেছেন। সিরাজের ব্যক্তি-গত শত দোষ খালন হয়ে যায় যখন দেখি ইংরাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন।

কিন্তু আমার সমস্যাটা সেখানেই নয়। সেটা একে বা রে হা জ আমলের। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্য-পুস্তকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের "মহাত্মা-জীর উদ্দেশ্যে" কবিতাটি রয়েছে। এ বছর এই কবিতাটি পড়ানোর দায়িত্ব এসেছে আমার ওপর। সুকান্তর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বুধ নেই'-তে এ কবিতাটি আছে। সেখানে কবিতার নাম "মহাত্মাজীর প্রতি।" "প্রতি" পাঠ্যপুস্তকে "উদ্দেশ্যে" হয়েছে। জানিনা এ-স্বাধীনতা নেবার অধিকার পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা-দের কে ছিল? বাই হোক এ-কবিতাটি পড়াতে গিয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই কবির জীবনাবলীর আলো-চনা এসে পড়ে। সেখানে বলতে হয় কবির কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্যের কথা, তাঁর মার্কসবাদে বিশ্বাসের কথা। আর, সেখানেই ষটকা লাগে। মার্কসবাদ, শ্রেণী সংগ্রামে আত্মশীল, বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিকার করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেমনটি হয়েছে মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার এবং মাও সে তুঙের নেতৃত্বে চীনে। মার্কসবাদী কবি-কর্মী হিসেবে সুকান্তর এইটাই এক-মাত্র পরিচয়।

অকপটে আমার এটা ভাবণ ছাত্রদের নামনে রাখতে বাধা হয়

দায়বদ্ধ কবির কবিতা

খণ্ড চিত্রমালা সাঁপুইপাড়া ৥
রথান্ত বর্গী। বুকমার্ক ও বক্সিম
চাটুজ্যে ষ্ট্রিট, কলকাতা ৭০। দাম
এক টাকা।

রথান্ত বর্গী ইতোপূর্বেই রাজ-নৈতিক ছড়া রচনা করে সচেতন পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে-ছেন। আলোচ্য বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি কিছু উজ্জল কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশ কোণে নিজস্ব স্বকীর-তার নিদর্শন আছে। এবং তাই উদ্ভাপ ও আন্তরিক সন্নিহারও প্রমাণ আছে। সেই কারণেই কবির উদ্ভারোদ্ভব পরিণতি সাগ্রহে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য কাব্য রচনা নিছক কেরিয়ার তৈরি নয় রথান্তর কাছে। নবর্ষে তিনি দায়বদ্ধ কবি। গ্রন্থের বহু কবিতাতেই তিনি কথ্য আঞ্চলিক ভাষাকে চাতুর্ভের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অভিমানকে সব সময় পরিত্যাগ-করতে পারেননি। কলত গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে পরিমার্জিত শব্দের সর্বত্র শুভপরিণয় হয়নি। যেমন প্রথম

নি। কিন্তু কবিতার বিষয়ে আল-তেই হোঁচট খেতে হল। কতটা বলা সমীচীন হবে কিংবা চেপে-যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের হবে! কারণ আমার বিশ্বাসমতো গান্ধীজী শ্রেণী সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী, তিনি ধনী গরিবের মিলনের কথা ভাবেন। যা মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

তাহলে প্রশ্নটা আসে মাত্র একুশ বছর আয়ুফালে সুকান্তর মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক-ধারণা কী পাকা হয়নি? অথবা ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা ছিল? তা নাহলে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন কেন 'আজ হাত ধরো গান্ধীজী' এবং বিশ্বাস করেন 'মনে হয় তোমারই মধ্যে আমরা যে বৈচে আছি' লিঙ্কান মেন 'তোমাকে গড়ব প্রাচীর ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে' ইত্যাদি। মার্কসবাদী কবিকর্মী সুকান্ত গান্ধীজীর প্রদর্শিত আন্দোলনের পথেই স্বদেশের মুক্তি কল্পনা করেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গান্ধীজীর 'অহিংস' আন্দোলনের প্রতি কবি দৃঢ় প্রত্যঙ্গী। আবার একই কবি যখন 'লেনিন' কবিতার 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন' ঘোষণা করেন তখন গান্ধী-আদর্শ এবং লেনিন-আদর্শে মেলাবার শেখাংশ ষট পৃষ্ঠার

কবিতাটাই ধরা যাক :

ভাগাড়ে শব্দ বসেছে। 'বসে-ছেল' শব্দ গঠন ঠিক আছে, কিন্তু তারার—'হুহু'। হুগু। পচা মাংস।' শব্দগুলি কোন্ গ্রাম্য ব্যক্তির চোখ দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন? 'বসেছেল'-র সঙ্গে পরবর্তী শব্দগুলির ব্যবহার কী চরিত্রাঙ্গবাহী হয়েছে?

গ্রন্থ পরিচয়

আমার বিবেচনায় হয়নি। তারপর আবার, একই কবিতায়—

অমিহীন কয়েক বৃদ্ধ

চাঁদের আলোর

বাঁশ খুঁটি আনল।

খ্যাতিবেড়া তালপাতা

খেঁজুর গাছের শুড়ি।

মাছের বাম দেখে

শব্দ উড়ে পালল।

হুহু পচা মাংস হুগু কিছই থাকল না।

ভোংসায়

বিষপুঞ্জের নিঃশ্বাস বেহনা

চিক চিক করে উঠল।

মনে হয়না রথান্ত চরিত্রাঙ্গবাহী শব্দের নির্বাচনে স্বয়ং কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁকে এ বিষয়ে অধিক মনোযোগী হতে অহরোধ করি।

চীনা কবিতার অনুবাদ

পাহাড়ে বসন্ত ৥ ভাষান্তর
অশোক চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্তী
চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক: বুকমার্ক,
৬ বক্সিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট, কলকাতা ৭০।
দাম এক টাকা।

চৈনিক ভাষার সঙ্গে অপরিচয় জনিত বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে অহুবাদকে মূল কবিতার ইংরেজি অহুবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়। তার ফলে ইংরেজি অহুবাদের সাক্ষ্য অশোকল্যের উপরই সাধারণত বাঙলা অহুবাদের সাক্ষ্য-অশোকল্য বর্তায়। আলোচ্য অহুবাদকবিরও এর ব্যতিক্রম নন। এর ফলে সমালোচক মূল কবিতার সঙ্গে অহুবাদকর্মের তুলনা-মূলক বিচার করতে অসমর্থ হন। অহুবাদকবির মতোই বর্তমান সমালোচক চৈনিক ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরিণামে আদর্শনিষ্ঠ অহুবাদকবির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

এই কাব্য পুস্তিকায় লি রিঙের চারটি কবিতার অহুবাদ করেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। 'পাহাড়ে বসন্ত' কবিতাটি লি রিঙেরই রচিত হুয়ো মো-জো-র চারটি কবিতার অহুবাদক জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়।

বরং অসম্ভব কবিতায় কিছু কিছু পংক্তি পাঠককে মুগ্ধ করে রাখতে পারে। যেমন 'অন্তের ভ্রমিতে বাস, পোলায় কসল.../ ভোরের আগেই এরা ভোর দেখে।' কিংবা 'পোলায় কোনো কথা নি। / শুধু কাশি / এবং অজ হাভাতে শরীরের নির্বাস।' কিংবা 'শুধু আগুনে পোড়েনা-কেউটে সাপ / এবং সেই বাবুটি—যার শরীরের দমস্ত পাপ / নিঃশব্দে বইতে হল রক্তনীর বেধবা বোর / জাকলগাছির হুহুয়া, বেস্মতির।' অথবা 'কলেরা হাঙ্গা মার দয়া / অজ্ঞ কংকাল শরীর নিয়ে / বাতাল খায় সাঁপুইপাড়া / কত রাজা আসে যার ইতিহাসে, / দীর্ঘা আর ঘেঘ আকাশ বিযাক্ত করে / আর মাহু / বসে থাকে / মৃতদেহ হয়ে।'।

উদ্ভৃতি দীর্ঘ করে লাভ মেই। মাহুয়ের শব্দকে আন্তরিক উচ্চারণ যখন অনায়াসে করতে পারেন তখন ভাষাকে তাঁর চরিত্রাঙ্গবাহী বাস্তব করতে হবে। ব্যাপারটা কিছুই কঠিন নয়। গ্রাম্য নিচেরতলার মাহুয়ের চোখ দিয়ে যখন তিনি দেখাবেন তখন চোখটা যেন সাধারণ মাহুয়েরই হয়। তা না হলে সাধা-রণ মাহুয়ের দেখা এবং কবির ব্যক্তি-গত দেখা মিশ খাবে না, কবির ব্যক্তিগত অহুপ্রবেশ, বিশেষ করে শব্দ নির্মাণের ব্যাপারে, আরোপিত মনে হবে।

আবার লুণ্ঠনের ছুরি-কবিতা এরা ভাগাভাগি করেই অহুবাদ করেছেন। মাও সে তুঙের চারটি কবিতার অহুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। লাও শে, আই-চিঙ, তুঙ পি য়ু, লি সি আঙ প্রমুখের কবিতাগুলি অশোক চট্টোপাধ্যায়ের অহুবাদ। মাত্র এক টাকায় চীন সাহিত্যের অহুযোগী পাঠক এই কবিতাগুলির রসাস্বাদন করতে পারবেন। মাতৃ-ভূমির জন্ত দরদ প্রতিটি কবিতার গভীর আবেগ ধ্বনিত করেছে। যেমন লি রিঙের "আমাদের ক্যালেন্ডার" কবিতায়—

লক্ষ্যে পৌছোবার আগে
আমাদের কোনো
অবদার নেই, লাড়া থেকে
নেমে যাওয়া নেই।
কেননা জীবন আমাদের
নিবেদিত মাতৃভূমির জন্ত,
আমাদের
দৈনন্দিন কাজ, অগ্রসরতা,
জীবন
শুধু মাতৃভূমির উন্নতির
অন্তই...
মিহির আচার্য

আসামে বিদেশী হঠাৎ আন্দোলন প্রসঙ্গে

প্রবীণ বিশ্বাস

অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর

প্রঃ আসামে বিদেশী হঠাৎ আন্দোলন কার স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? এর মূল লক্ষ্য কি?

উত্তরঃ যে কোন আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই উহার ইতিহাস, গতি প্রকৃতি ও চরিত্র লক্ষ্য করতে হবে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা-র আন্দোলন বিশেষ করে গণ-স্বত্বাধার যেখানে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল যে এই আন্দোলনের একটি Positive side আছে। কিন্তু পর-বর্তী কালে উহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই আন্দোলনের ভিত্তি জাতিগত বিষয় এবং রাজনীতি এক জঘন্য ধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদ। এই ধরনের রাজনীতি এবং আন্দোলন মেহনতী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিভক্ত করে দেয় বলে স্বার্থ রক্ষা হয় বড় বড় জমিদার মহাজন শ্রেণী, একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী এবং ওদের মনিব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির।

আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ভাষাগত ও ধর্মগত সংখ্যালঘু জাতি মধ্য, বাঙালী হিন্দু মুসলিম, নেপালী ও হিন্দুস্থানী। কিন্তু আমার মতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য আরও গভীরে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল পাহাড়ী রাজ্য পরিবেষ্টিত আসাম। এই সমস্ত রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাদ-পদ। পাহাড়ী জাতিগুলির ভাষা ও সংস্কৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে পৃথক। মিশনারীদের প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ওদের ভিতরে প্রবেশ করেছে। ভারতবর্ষের অন-্য রাজ্য হওয়ার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা ওদের রুচি ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে চাইছে এবং তার ফলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অবলুপ্তির এক ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে অর্থ-নৈতিক সমস্যা এবং অপরদিকে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার প্রবণতা ওদের মধ্যে এনে দিয়েছে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী ঐতিহ্য। শুরু হয়েছে আত্মনির্যন্ত্রণের মত। আসামে বেকার সমস্যা সত্যতঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে উদ্ভূত। তার প্রাকৃতিক সম্পদ চা শিল্প, তেল ও গ্যাস বৃষ্টিপ, রাশিয়া এবং রুমানিয়া প্রভৃতি বিদেশী এবং একচেটিয়া ভারতীয় দালাল পুঁজিশ্রেণী লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। আসামের সম্পদ

আসামকে উন্নত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না। এই সমস্ত কারণে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল এবং উহার সুযোগ নিয়ে কানিসবাদী শক্তি।

আপনারা জানেন ভারতবর্ষকে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দুই অতি-বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও রাশিয়া মরণপণ প্রতিযোগিতার মেয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতি-যোগিতা বন্ধ করে নাই। আসামে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে জমগণকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল এবং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নাগাল্যান্ড, মিজো-রাম, মণিপুরে আত্ম নিয়ন্ত্রণের লড়াই দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও ফলন করা যায় নাই। দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উত্তর পূর্বাঞ্চলে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত রাজ্যের স্বয়ং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য আমদানী করল অতি-সস্তা রাজনীতি। অসমীয়া বৃহৎ শ্রেণী ও ট্রাইবেলদের মধ্যে প্রচার করল বহিরাগত বিশেষ করে বাঙালীদের জন্যই তাদের বর্তমান দুঃস্বস্থা। শুধু তাই নয়, ওদেরকে প্ররোচনা দিয়ে আরম্ভ করে এক জাতঘাতী দাঙ্গা। তাই দেখুন, নাগাল্যান্ড মিজোরামে যে লড়াই শুরু হয়েছিল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে উহা আজ রূপান্তরিত হয়েছে অন্যজাতি বিরুদ্ধে। আসামের লড়াই যদি বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হয় তাহলে বামপন্থী শক্তি সি, পি, আই (এম) এবং সি, পি আই (এম, এল) কেন আক্রান্ত হচ্ছে? কাজেই এই আন্দোলনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যলিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে রাখার এক গভীর চক্রান্ত এবং গণতান্ত্রিক বামপন্থী শক্তিকে অস্বুয়েই ধ্বংস করা।

বর্তমানে আমি একটা সাম্রাজ্য-বাদী চক্রান্তের কথা উল্লেখ করছি যেটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি না। ভারতবর্ষের জমগণ যখন বৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তখন বৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদ তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে মনস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এনেছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ভারত-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে আর-

দানী করেছিল "কোপল্যান্ড স্ক্র"। Coupland নামক এক ইংরাজ এ খুজটি দিয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকাগুলিকে নিয়ে একটি পৃথক পার্বত্য রাজ্য গঠন করার জন্য। আজকের আন্দোলনের নমুনা দেখে মনে হয় বৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদের ছেঁড়া-ছোঁড়া তুলে রাশিয়া অথবা আমেরিকা পুনরায় সেই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে উৎসাহ-না দিয়ে গোটা ভারতীয় মহান জাতিগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ প্রচার করে সমস্ত পাহাড়ী রাজ্য ও আসামকে নিয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থী ঘাটিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে।

প্রঃ এই সব সাম্রাজ্যিক দাঙ্গার ফলে আসাম কি লাভবান হচ্ছে?

উত্তরঃ ভারতবর্ষ তথা আসা-মের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় হচ্ছে সাম্রাজ্যিক দাঙ্গা। ভারত-বর্ষে শাসক শ্রেণী হচ্ছে বড় বড় জমি-দার, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত মোর্চা। এই শাসকশ্রেণীর নিজস্বের দৃষ্টিতে চরম পর্বীর উপনীত হয় তখন জমগণকে বিভক্ত করে দেওয়ার জন্য বাঁধানো হয় সাম্রাজ্যিক দাঙ্গা আসামে দেখুন যখনই শাসকশ্রেণী প্রচণ্ডভাবে বিভক্ত হয়ে কামড়া কামড়ি শুরু করেছে তখনই দাঙ্গা বেধেছে। যেমন ১৯৬০ ইং চালিহা মন্ডিসতার ভিতরের লড়াই, ১৯৭১-৭২ ইং মহেন্দ্র চৌধুরী ও পরশুচন্দ্র সিংহের ১৯৭৭ ইংরাজীতে জনতার ভিতরের লড়াই প্রভৃতি লবগুলির ক্ষেত্রেই সংগঠিত হয়েছে জাতঘাতী দাঙ্গা। তাছাড়া নিজস্ব নেতৃত্ব রক্ষা করার জন্য অথবা রাতা-রাতি নেতা হয়ে যাওয়ার জন্য অথবা প্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপথে পরি-চালনা করার জন্য এক জাতের প্রমিককে অন্য জাতের প্রমিকের বিরুদ্ধে জেলিয়ে দেওয়া হয়। লাভ-বাস হয় জমিদার, মহাজন, পুঁজি-পতিশ্রেণী এবং ওদের আন্তর্জাতিক মনিব সাম্রাজ্যবাদ। কতিপয় হয় প্রগতিশীল শক্তি এবং মেহনতী জমগণ।

প্রঃ আসামের বেকারত্ব, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ইত্যাদির জন্য কি আসামে বহিরাগতরাই দায়ী?

উত্তরঃ তাহলে আপনাদের

পাশ্চাৎ প্রশ্ন করুন, যে রাজ্যে বহিরা-গত নেই সে রাজ্যে কি বেকার নেই? সে রাজ্যের জমগণের মৌলিক সমস্যা কি সমাধান হয়ে গেছে? স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছে বলে কি পাকিস্তানে বেকার নেই? মুসলিমদের জন্য হল পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানে কি স্বাধীনতা নেই? দেখানো কি শোষণ নেই? পাকিস্তান থেকে মুসলিমরা চলে গেলে তবে কেন বর্তমানে শিখদের মধ্যে শিখ এবং মিরানখারি নিয়ে লড়াই হচ্ছে? বর্তমানে বেকারত্ব, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ইত্যাদির জন্য চাই দুই সমস্তার আমূল পরিবর্তন, ভারী শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়, প্রাকৃতিক সম্পদের সুসম বণ্টন ও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। বর্তমান সমাজব্যবস্থার ইহা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। উহা একমাত্র সম্ভব কৃষিবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। এতএব, আমার মতে কোন অবস্থাতেই বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ-তার জন্য আসামের বহিরাগতের (যে অর্থে আন্দোলনকারীরা ব্যবহার করছে) দায়ী নয়।

প্রঃ আসামের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যাবলী কি ভার-তের অন্যান্য রাজ্য অর্থাৎ গোটা ভারতের মূল সমস্যা থেকে পৃথক?

উত্তরঃ পুঁজিবাদের অময় বিকা-পের ফলে প্রত্যেক রাজ্যের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এক হতে পারে না। মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আসামের তুলনা চলে না। আসামের প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অস্বল্প শিল্প গড়ে তুলেছে। তাছাড়া আসামের কৃষি ব্যবস্থা এবং চাষ পদ্ধতি এখনও অত্যন্ত পশ্চাদপদ। আসামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য রাজ্য থেকে পৃথক। আসামের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ হচ্ছে Communication facility এবং cheap labour এর অভাব, যদিও প্রাকৃতিক সম্পদে আসাম ভর-পুর। কিন্তু আসামের মৌলিক সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হতে পারে না। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেই মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তার জন্য চাই সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত মোর্চার বিরুদ্ধে লড়াই।

প্রঃ আসামের এই আন্দো-লনের বর্তমান সংগঠক AASU, PLP, গণসংগ্রাম পরিষদের জন্য

বৃত্তান্ত কি? উত্তরঃ আপনাদের এই প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ। আপনাদের AASU, PLP, গণসংগ্রাম পরিষদ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন অথচ আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই রাখেন নি। সেটা হচ্ছে আসাম জাতীয়তাবাদী দল—যারা প্রথমে বহিরাগত হাওয়ার আসামে উঠিয়ে-ছিল। বর্তমানে আসামের আন্দো-লন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে জাতীয়তাবাদী দল দিয়েই শুরু করতে হয়। ১৯৭৭ ইংরাজীতে কংগ্রেস সরকারের পতনের পর কংগ্রেস দল এত দ্বিভূত ও নিম্ননীর হয়েছিল যে ঐ দলের খোলাখুলি কেহই নিজেকে কংগ্রেস বলে পরিচর দিতে ভয় পাচ্ছিল। তখন আসামকে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কংগ্রেসের B. Team জাতীয়তাবাদীর জয় হয় এবং উহার নেতৃত্ব বেহু কুখ্যাত ডাঃ নেনার আহমেদ। হারানো মরদান ফিরে পাবার জন্য এই দল প্রথমে উগ্রজাতীয়তাবাদী দুরী তুলে বহিরা-গতের বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। এই দল প্রথমতঃ রাশিয়ান সাম্রাজ্য-বাদের তত্ত্বাবাহক। অতঃপর আসামের নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়লাভ করার ঘোষণা-বরবরার নেতৃত্বে আসাম সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনতার প্রধান অংশ সমাজ-তান্ত্রিক দল, প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্ব, বিশেষ করে বৃষ্টিপের সঙ্গে সহযোগিতা শেখাশ ৩১ পৃষ্ঠার

এন টি সি ৩৭ পৃষ্ঠার পর না যে মন্ত্রী মহোদয় ঠিক কাজ কার-বারের সব খবরই রাখেন। আর ঠিক বিবেচন-দেবার সব ব্যবস্থাই পাকা। পুজোর আগেই মজিদাবা-রু স্বপ্নবরটা পাবেন। আমরা আশা করি যাবার আগে উনি যে সবুজ টেলিফোনটা বোর্ডরুম থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে লাজিয়েছেন সেটা ফেরত দিয়ে যাবেন।

কর্মচারীরা অবশ্য ঠিক কাজ থেকে আরও তিনটে হিসেব দাবী করে-ছেন। একঃ উনি চেয়ারম্যান হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কতবার দিল্লী গিয়েছেন এবং প্রেন ভাড়া বাবদ করপোরেশনের ব্যয় হয়েছে কত? দুইঃ উনি এবং ঠিক দাকরের প্রিমিয়-দার জমগণ ভাড়া বাবদ কত চার্জ করে-ছেন করপোরেশনের কাছ থেকে? তিনঃ দিল্লীর হোটেল থেকে উনি কতবার কোন করেছেন ঠিক প্রিয়-তমকে এবং সেই বাবদ খরচটা দিয়েছে কে—করপোরেশন না উনি নিজে।

আসাম

৪ম পৃষ্ঠার পর

রক্ষা করে চলে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার হালালরা গোলাপ বরবরাহ নেতৃত্ব সহ করতে পারছিল না। একদিকে ওকে dis-credit করার জন্য এবং জাতীয়তাবাদী দলকে মোকাবিলা করার জন্য জনতারই আর একটা অংশের পুরো ক্ষমতা নিয়ে তারা PLP. ওরা আসামের উন্নতির জন্য কিছু পরিমাণে অর্থনৈতিক কর্মসূচী রাখলো বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বিদেশীদের বহিরাগত করে বলে আওয়াজ তুলে সরদার গরম করে তুলছিল।

AASU একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন। ১৯৬০ ইং ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রদের সমর্থন কথ্যাত অর্জন করে। প্রথমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে এই সংগঠন গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত ছাত্র সংগঠনের মত AASU একটা স্বাধীন সংগঠনে পরিণত হয় এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উহার Unit আছে। এখন পর্যন্ত এটা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কোন প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস এই সংগঠনের নেই কিন্তু বেহেতু উগ্রজাতীয়তাবাদ হচ্ছে উহার রাজনীতি এবং পাণ্ডা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন আসামে এখনও দুর্বল, তাই উহার কর্মপ্রিয়তা ও Prestige তুলনামূলক।

১৯৭২-৮০ ইং বর্ষের বঙ্গপুত্র উপত্যকার বিদেশী শ্রাণিক বহিঃকারের আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে তখন এই আন্দোলনকে পরিচালনা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠন যথা—আসাম জাতীয়তাবাদী দল, আসাম সাহিত্য দল প্রভৃতির সমন্বয়ে গণসংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। প্রচেষ্টা বাক্যে গণসংগ্রাম পরিষদকে মনো দিচ্ছে অন্তর্ভুক্ত সংগঠন যেমন ACTA এর একটা অংশ, সরকারী কর্মচারী ও আমলাদের সংগঠনের বিরাট অংশ। সমস্ত ছাত্রদের সমন্বয় হচ্ছে সংগ্রাম পরিষদ।

প্রঃ আসামে বিদেশী হঠাৎ বা বঙ্গাল খেদা অভিযান মূলতঃ কবে থেকে শুরু হয়?

উত্তরঃ আশ্চর্য্যকৃত বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের কথা আমরা শুনি ১৯৬০ ইং এবং বিদেশী হঠাৎ ১৯৭৮-৭৯ ইংরাজীতে। কিন্তু এই আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। বঙ্গত-পক্ষে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ উপনিবেশ

ছিল তখনই এই আন্দোলনের বীজ রোপণ করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর আসামকে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে চা শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকশ্রমী আমদানী করে। অতীতে পাক্ষাত্য শিক্ষা বাঙ্গালীরা ভারতের অন্যান্য জাতি থেকে অনেক বেশী শিক্ষিত ছিল। আসামকে শাসন শোষণ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালী আমলা ও আমদানী করা হয়। ক্রমে আসামেও পাক্ষাত্য শিক্ষার প্রসারতা লাভ করে। পুঁজিবাদ ও পাক্ষাত্য শিক্ষা আসামে জন্ম দেয় এক বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের নীতি হচ্ছে Divide and rule। বাঙ্গালী আমলা, ব্রিটিশ প্রয়োগ-চরায় বাংলা ভাষাকে অসমীয়াদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার এক চক্রান্তে সিদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আন্দোলন বাঁতে আসামে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গোটা বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে উত্থান দিতে শুরু করে। তখন থেকেই বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের বীজ রোপণ হয়। ব্রিটিশ একদিকে বাঙ্গালী আমলাকে দিয়ে পরিচালনা করছিল শাসন অতীতে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উত্থান দিচ্ছিল গোটা বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে। ফলে বেথুন, সমস্ত ভারতবর্ষে যখন অন্তর্ভুক্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করতে মরণ পণ লড়াই করছে তখন আসাম তুলনামূলকভাবে শান্ত বহিঃব্যক্তি-গতভাবে কিছু কিছু মহান অসমীয়া স্বাধীনতার আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

বিদেশী হঠাৎ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা Interesting উদাহরণ আপনাদের সামনে রাখছি। বিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা কে না শুনেছেন? কে না শুনেছেন ভারতের বীর লক্ষ্যম সিং-কাহর নাম? ভারতের ইতিহাসে সাঁওতাল বীর সিং-কাহর এক উজ্জল তারকা। সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে সাঁওতাল নেতৃত্বকে দিয়েছিল যুঁহাও এবং অতীতে বঙ্গপূর্বক মিসৌ সাঁওতালবাসীদের নিজ গৃহ থেকে উচ্ছেদ করে গোরালপাড়ার

নিবাসী অঞ্চলে এনে ওদের নজর বন্দী করে রাখে। জন্ম নেয় গোরালপাড়া এলাকার সাঁওতাল Agency. আত্মকে ওদেরকে বহিরাগত বলে বের করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে কিন্তু কার দোষে ওরা বহিরাগত? বিদেশী হঠাৎ আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হয় বহিরাগত হঠাৎ আন্দোলন দিয়ে। এখন বলা হচ্ছে বিদেশী হঠাৎ। আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, “আসাম অসমীয়াদের”। বহিরাগত হঠাৎ আন্দোলন প্রথমে আরম্ভ করে আসাম জাতীয়তাবাদী দল। পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি ১৯৭৭ ইং নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধিবাদ পরাজিত হওয়ার পর জনতা সরকারকে অপদস্থ করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেস নামে বেনামে কোথাও উগ্রজাতীয়তাবাদ, কোথাও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, কোথাও caste conflict আবার কোথাও আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতিতে উত্থান দিতে আরম্ভ করে। এটা উদ্দেশ্যে জন্ম নেয় আসাম জাতীয়তাবাদী দল। বরবরা সরকার যেহেতু আমেরিকা ও রাশিয়া বিরোধী সেহেতু তাহাকে অপদস্থ করে ক্ষমতাচ্যুতের জন্য জনতার ভিতরে আমেরিকার তত্ত্বাবাহক শক্তির মনোপুষ্টি হয়ে জন্ম নেয় PLP. জাতীয়তাবাদী দল প্রধানতঃ বাঙ্গালী বিদেশী, PLP. মুসলমান বিদেশী। দুই দলেরই লক্ষ্য প্রগতিশীল শক্তিকে ধ্বংস করা, সমস্ত সংখ্যালঘু জাতিতে পছন্দ করে রাখা। প্রাথমিক স্তরে জাতীয়তাবাদী দল যে বহিরাগত খেদাও আন্দোলন আরম্ভ করে উহাকে বরবরা সরকার রুড়া হাতে দমন করেন। এ ব্যাপারে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে CPI (ML) আন্দোলন বিরোধী মূল্য তুলিকা পালন করে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে CPI (ML) এর নেতৃত্বে ২০,০০০ মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী প্রচারযন্ত্র এই বিদেশী ও বহিরাগতের নামে অবিরাম প্রচার চালিয়ে জনসাধারণ তথা ছাত্র সমাজকে উত্থান দিতে আরম্ভ করলো। এমন সময় পৌহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের জয়লাভ এবং উহার Deputy Mayor জাতীয়তাবাদী দল পাওয়ার ফলে এই শক্তি নতুন উত্তরে প্রচারে নেমে পড়ে। বিভিন্নতঃ মঙ্গলদেই নির্বাচন কেন্দ্রে এস, সি, সি: পাটোয়ারীর মৃত্যুর ফলে উপ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। শুরু হলো প্রচার যে এই নির্বাচন কেন্দ্রে প্রচুর বিদেশী আছে অতএব এদেরকে নির্বাচনে

অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত হবে না। আর, এস, এস পুষ্টি জনতার কাছে যে ওরা মুসলমান ভোট পাবে না তাই ওদের বের করে দিতে হবে। বরবরা সরকার গদী রক্ষার্থে ওদের দাবীর নিকট surrender করতে বাধ্য হয়ে একটা Tribunal বলিয়ে দিলেন এবং এই Tribunal প্রচার করে দিল যে মঙ্গলদেই নির্বাচন কেন্দ্রে শতকরা ৭০ জন ভোটার হচ্ছে বিদেশী। Tribunal এর মত লংঘার এই অববেচনা প্রস্তুত রাখ মঙ্গল উগ্রজাতীয়তাবাদী শক্তিকে এমনই উৎসাহ দিয়েছিল যে ওরা আওয়াজ তুললো বিদেশী-দেরকে বহিরাগত না করে নির্বাচন হতে পারবে না। তার পরের ইতিহাস আপনাদের সবারই জানা। এই ত হচ্ছে বহিরাগত তথা বিদেশী হঠাৎ আন্দোলনের ইতিহাস।

প্রঃ এই বর্তমান আন্দোলনে কোন বিদেশী শক্তির হাত আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি অসমস্ত দেশগুলোতে দুই অতিবৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চরম প্রতিবেশিতার লিপ্ত। প্রতিটি ঘটনার পিছনে ওদের অঙ্গ হস্ত থাকতে বাধ্য।

প্রঃ এই আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তরঃ উগ্র জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ হচ্ছে প্রতিটি বুর্জোয়া দলের হাতিয়ার। জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন যে অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন তখনই ওরা উহা প্রয়োগ করে। আসামে বুর্জোয়া দল যেমন ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনতা দলের প্রচুর উত্থানিতেই প্রথমে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। এখন নেতৃত্ব হাতে থেকে চলে যাওয়ার ওরা মরাকারা কাঁদছে। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত এ সমস্ত বুর্জোয়া দলের কেউ কেউ বিরোধিতা করতে পারেন কিন্তু উহা প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে। Not that he or she is a democrat বামপন্থী দলগুলো, বিশেষ করে CPI (ML) এবং CPM এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী কতি-গ্রস্ত হয়েছে। এই দুই দল বিরোধিতা করছেন ঠিকই কিন্তু এখনও আসামে বামপন্থী শক্তি দুর্বল এবং বিধা বিভক্ত। মিলিতভাবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করলে হয়ত এতবড় লবণাশ হতে পারত না। আমি যতটুকু আমি পোড়ার দিকে CPI (ML) দলের রাজ্য কমিটি CPM-

কে মিলিতভাবে এই আন্দোলনে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা দিচ্ছিলেন কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। দুই দলের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে একে একেই দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে একই কেন গড়ে উঠবে না? এ কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং দলের ideology. C. P. M এর বর্তমান রাজনীতির মধ্যে প্রতিরোধ নামে কোন শব্দ নেই, যা আসে তা হল আত্মসমর্পণ। আসামে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না তুলে পরোক্ষভাবে উগ্রজাতীয়তাবাদকে লাহায্য করেছে। সং পাটি সভ্য কেন্দ্রের নিপুণীত হয়েছে এবং কাছাকাছি ও পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে মরাকার কৈদেছে। রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদে হালালী করলে রাশিয়ার মনোপুষ্টি হয়ে জাতীয়তাবাদী দল যে আন্দোলন করছে সেটাকে কি করে প্রতি করা হবে? কি ভাবেই বা রাশির বিরোধী CPI (ML)-এর সঙ্গে একত্ব হবে? কোন আন্দোলনকে সেখানে ৭ম পৃষ্ঠার

সাহিত্য দর্পণ

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

চেষ্টাটা আমাদের মতো মচেন না মানুষের পক্ষে দুঃস্থ ঠেকে।

কবিতাটি আলোচনা করবার সময় এসব চিন্তা আমার মাথাক থাকে। কিন্তু বুঝতে পারি ছাত্রদের প্রয়োজনের মেঘের পক্ষে এগুলো কাজের হবে না।

আমরা যারা স্বকায়ের সমবয়সী, তারা জানি গান্ধীজীর প্রতি দুর্বলতার জন্য সর্বোপায়ে কবিতা দায়ী করার মত। তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টি সি, সি, জোশীর নেতৃত্বে গান্ধী ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। স্বকায় দেই পার্টি লাইনে রাখা।

প্রিয় পাঠকেরাই বলুন এমতাবস্থায় মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী শিক্ষক হিসেবে আমার ভূমিকা কী হবে? নাকি বাঙ্গালী অর্থপুঙ্ক প্রণেতা হলে মতো আমাকে মুখের মতো বলতে হবে স্বকায়ের মার্কসবাদে ‘গোড়ামি’ ছিল না, তাই ‘উদার’ কমিউনিস্ট রূপে তিনি গান্ধীজীর প্রশংসা গিয়েছেন।

আমার বিবেচনার পাঠ্যপুর্বে কোনো কবিকে অন্তর্ভুক্ত করা সময় সেই কবিতাই নির্বাচন করা উচিত যার মধ্যে কবির সঠিক মনোভাবের পরিচয় আছে, যে কবিতা নিতুলভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

চলচ্চিত্র নাটক

শত্রু রক্ত যুদ্ধ

সমর বন্দোপাধ্যায়

কামাডার প্রখ্যাত শিল্পী চিকিৎসক ডাঃ নরমান বেখুনের জীবনী অবলম্বনে পালা রচনা করে সুপরিচিত পালাকার শঙ্খ বাগ যেমন অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবেন, তেমনি সেই পালাকে বাজার আসরে অভিনয় মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তরুণ অপেরার শান্তিগোপাল অজস্র ধন্যবাদ পাবেন লক্ষ্য নেই।

যে মহান চিকিৎসক আত্মপ্রতিষ্ঠা, যশ ও অর্থের লোভ ত্যাগ করে দুর্গত ও দুঃস্থ জনের সেবার আত্মনিয়োগ করেছিলেন নিঃস্বার্থভাবে, যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—ছিন্না-জোড়া হরিজ মাছের যে রোগ তা হচ্ছে একটি সামাজিক ব্যাধি—পুঞ্জিবাদী সমাজ ব্যবস্থার শোষণ ও পীড়ন যতদিন থাকবে, ততদিন এ ব্যাধির বিনাশ নেই—সুতরাং এ ব্যাধি থেকে জনগণকে মুক্ত করতে গেলে সমাজ-ব্যবস্থা পালটানো ছাড়া পত্যন্তর নেই, যিনি এই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ত্রিশ দশকে পেন্সে ও চল্লিশ দশকে চীনের মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তি সেনাদের পাশে থেকে মনোবল জুগিয়ে-

ছেন ও তাদেরকে সেবা ও চিকিৎসা করে মুক্তি-সংগ্রামকে সহায়তা ও প্রেরণা দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত যিনি এই মহান ব্রত পালন করতে করতেই নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন, তাঁর জীবন ও আদর্শকে এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার একমাত্র পৌরব দাবী করতে পারেন তরুণ অপেরা।

গত ২৭শে আগস্ট অ্যাকাডেমি মঞ্চে 'শত্রু রক্ত যুদ্ধ' পালাটি অভিনীত হল শান্তিগোপালের নির্দেশনায়। পালা রচনার শঙ্খ বাগ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। জীবনীমূলক পালা রচনার দারিদ্ৰ্য থাকে অনেক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রচনার বিশ্বস্ততা বজায় রাখা, প্রামাণ্য তথ্যের আশ্রয়ে মুক্তি ও মুক্তির পরিচর রাখা—ও সর্বোপরি পালা রচনাকে সত্যাত্মক করে রসোত্তীর্ণ করা। এই স্বকণ্ঠ কালে শঙ্খ বাগ অনেকটাই লাফ লাফাত করেছেন আগের মত। 'লেনিন', 'কার্ল-মার্কস' প্রভৃতি পালা রচনার কৃতিত্ব তাঁর ছিল—সেকথা অরণ করেই

বনছি। তরুণ অপেরাও রাজনীতি ও সমাজ সচেতন পালাভিনয়ে এক বিরল ঐতিহ্যবাহী দল হিসাবেই আজ পরিচিতি পেয়েছে। বর্তমান পালাটিতেও তাদের সে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

মঞ্চে উপর মুখের আবহ সৃষ্টির জন্য যে পটকার আওয়াজ, আলোর অস্থিরতা, টেপেরকর্ডের কোলাহল ও আর্দ্রনাভ—তা শুধুই স্টাণ্ডার্ট বনে হয়েছে। দর্শককে শুধু চমকে দেবার জন্য এই অতিশয়তাই এ জাতীয় পালাভিনয়ের পক্ষে রসহানির কারণ হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টে এক আনাড়ি চিকিৎসকের অবিখ্যাত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কিছু কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা এতই অধোক্তিক ও অবাঞ্ছন্য যে, হাসির পরিবর্তে বিষয়ের উদ্বেগ হয়। নরমান বেখুনের জীবন ও বাদীকে দর্শক সমক্ষে পালাভিনয়টি পৌঁছে দিতে পেরেছে মোটামুটি ঠিকই, কিন্তু রস ও আবেদন সঞ্চারের ক্ষেত্রে তা কিছু তেমন সার্থকতা দাবী করতে পারে না।

নরমান বেখুনের স্মৃতির শান্তিগোপাল আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অস্তিত্ব চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। প্রশান্ত তটচাখের সুর সৃষ্টি পালাভিনয়কে সমৃদ্ধ করেছে।

ইউকো ব্যাঙ্ক প্রযোজিত তথ্যচিত্র

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শিশির মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক প্রযোজিত ও শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত তিন রিলের রঙীন তথ্যচিত্র 'সেভেন' (ইংরাজী সংস্করণ) প্রদর্শিত হল। অল্প, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম-বঙ্গে বাহুড়া বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী ও হরিজনদের জীবন ও জীবিকার নানা উন্নয়নমূলক কাজে ইউকো ব্যাঙ্ক যে উজ্জল ভূমিকা নিয়েছে, তারই প্রশংসনীয় চিত্ররূপ হল এটি। ছবিটির নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সাতটি অঞ্চলের সাতটি আদিবাসী ও হরিজন পরিবারের অন্তরঙ্গ রূপ সাতটি ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে। তবে সাতটি বিভিন্ন পরিবারের চিত্ররূপে আশঙ্করূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য পড়ে না। কালার ফটোগ্রাফী সুন্দর।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

সাপ্তাহিক ১০ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭০০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

আসাম প্রসঙ্গে

৪ঠা পৃষ্ঠার পর

প্রতিরোধ করতে হলে চাই একা এবং প্রধান শত্রুকে চিহ্নিত করা। CPM একা বিরোধী আসামের আন্দোলনে CIA এর অদৃষ্ট হস্ত দেখেছে কিন্তু KGB চক নজর এড়িয়ে যায়। ওরা সাপের মাথা দেখে কিছু লেজ দেখতে পারেনা। এই হচ্ছে আসামে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা। আসামে বার বার দালা হচ্ছে এবং কতিপয় হচ্ছে মেহমতী মানুষ ও তার দল বামপন্থী শক্তি। কোন বামপন্থী দলেরই এককভাবে এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনের মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই। কাজেই এখন এ ব্যাপারে বামপন্থীদের যুক্তমোর্চা আসামে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে আমি ওদের নিকট আবেদন রাখছি উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক একা গড়ে তুলুন।

প্রশ্ন: আসামের এই সমস্যার সমাধান কোন পথে—এ সমস্যা আপনাদের কোন ধারণা আছে কি?

উত্তর: প্রথমত: ব্যক্তিগতভাবে আমি বহিরাগত বা বিদেশী সমস্যা আছে বলে বিশ্বাস করি না এবং উহার কোন সমাধানও নাই। ভারতবর্ষ হচ্ছে অসংখ্য সম্মিলিত জাতির এক মহান দেশ। অনাদিকাল থেকে ভারতে বাহির থেকে লোক প্রবেশ করেছেন, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহান একতা। আমি মনে করি একরাজ্য থেকে অল্প রাজ্যে গিয়ে বসবাস করা প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জন্মগত অধিকার। দ্বিতীয়ত: একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাধীন দেশ থাকলে এবং প্রতিটি দেশে যদি বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য মানুষের জীবনের নিত্য সঙ্গী হয় তবে অসংখ্য চাকুরীর সন্ধানে এক-দেশ থেকে অন্য দেশে লোক যাতা-

য়াত করবেই। "এই অঞ্চল আমার, আর কেউ আসতে পারবে না" এই দৃষ্টিভঙ্গী বাহিরের ওরা অসামাজিক জীব। ওদের চলে যাওয়া উচিত মাউন্ট এভারেস্ট পূর্বে অথবা মহা-নাগরের বুকে কোন নির্জন ঘোপে। ওদের দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় একেবারে পরিপন্থী।

তবুও কেহেহু একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে উগ্রজাতীয়তাবাদীরা সমর্থ লাভ করেছে সেহেতু আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সাংবিধানিক আইন অস্বাভাবিক ১৯৭১ ইং ভিত্তি ধরে আইনী পদ্ধতিতে বিচার করে বিদেশী যারা তাদের বহিষ্কার করা যেতে পারে। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে আসামের কি সমস্যার সমাধান হবে? এমন কি ১৯৭১ সালকে ভিত্তি লাভ ধরলেও কি সমস্যার সমাধান হবে? আসামে দালা হবে না? উগ্রজাতীয়তাবাদ শেষ হয়ে যাবে? বস্তুতপক্ষে সমাধান হবে না। বর্তমানে একচেটিয়া পুঞ্জিবাদ, বড় বড় জমিদার মহাজন ও সাম্রাজ্যবাদের মিলিত শাসন থাকবে ততদিন এই সমস্যা দালা ও উগ্রজাতীয়তাবাদ থাকতে বাধ্য। উহা সমস্যা উৎপাদিত করতে হলে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পাটোতে হবে। বর্তমানে ওদের শাসন থাকবে ততদিন এই সমস্যা দালা ও উগ্রজাতীয়তাবাদ থাকতে বাধ্য। বর্তমানে ওদের শাসন থাকবে ততদিন সমস্যা একটা না একটা অজুহাত সৃষ্টি করে ওরা দালা বাধাবেই। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন একদিনে হয় না। সমস্ত সংখ্যালঘুস্বাতিকে এখনই একাক্য হয়ে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এমন কি অসমীয়া গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সংখ্যালঘু জাতিদের বন্ধু হিসাবে পাবেন।

(সমকালের সৌজন্যে)

চন্দনা মিত্রের

উইলো পাইনের গাছ

'উইলো' গাছ নমনীয়তার প্রতীক এবং 'পাইন' গাছ স্বচ্ছতার প্রতীক।

তরুণ লেখিকা চন্দনা মিত্র চীনের নতুন মানুষের চরিত্রের এই দিকট অস্তরঙ্গতার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে ডাঃ বিজয় বসুর মূল্যবান ভূমিকা। মাও সে তুং ও ডাঃ কোটনিমের দুটি চরিত্র আর্ট গ্রেট সহ ১৬টি আর্ট গ্রেট বইটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

দুশো তিরিশ পৃষ্ঠার বই-এর মূল্য মাত্র পনেরো টাকা।

পরিবেশক

নিউ বুক সেন্টার

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৩৩

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স লিমিটেড

(কেন্দ্র ইন্ডিয়া একটী সংস্থা নিম্নে)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাবদ্ধ ঠিকাদার / সরবরাহকারী/প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক লীল করা টেন্ডার: বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং : ১১ / জি এম কে এন টি / ৫৬৩১ তাং ২৫ ৮ ৮০

(১) অবতনগরে এজেক্টর অফিস নির্মাণ (২) অবতনগরে মেন লাব ট্রেনশন নির্মাণের জন্য। প্রতি ব্লকের জন্য মোট আনুমানিক মূল্য ৫,৮১,৩৯৬ টাকা। কেশিয়ার/অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলারের কাছে ২-১০ ৮০ পর্যন্ত অফিসের সময়ে বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে প্রতি সেটের জন্য ৫০ টাকা অথবা ১০০ টাকা নগদে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কুলুঠোরিয়া এরিয়া থেকে টেন্ডার দাখিল পাওয়া যাবে। ৩-১০ ৮০ তারিখ বিকেল ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বিকেল ৩-৩০টার খোলা হবে।

সাম্প্রদায়িক: জ্ঞাতব্য যদি কিছু থাকে উপরিউক্ত টেন্ডার নোটিশে প্রদত্ত লস্কিট এরিয়া / কোলিয়ারী/দপ্তরে টাকা দিয়ে টেন্ডার দাখিল থেকে পাওয়া যাবে। আনুমানিক মূল্যের ১% বাবদ টাকা লস্কিট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারের সঙ্গে দিতে হবে, তা না হলে টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণের অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের মধ্যে যেকোন অধিকার সংরক্ষিত রাখা হইবে।

স্বতন্ত্রনিয়ম স্বামী জনতা ছাড়ছেন ?

ডঃ স্বতন্ত্রনিয়ম স্বামী কি জনতা (জেনি) হল ছাড়ছেন? এই প্রশ্নটা দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে কম আলোচনার ব্যাপার নয়। এই সুশিক্ষিত ব্যক্তিটির সঙ্গে পৃথিবীর শক্তিশালী কটি দেশের রাজনৈতিক মহলের যোগাযোগ আছে বলে রাজধানী রাজনীতিতে তাঁর একটা আলাদা স্থান হয়ে গেছে। তাছাড়া বাহু রাজনীতিক হিসাবে, সংগঠক হিসাবে তাঁর অত্যন্ত পরিচরিত রয়েছে।

সাবেক জনসংঘী এবং এখনও আর এম এম সংগঠনের বনিষ্ঠ সঙ্গী ডঃ স্বামী বর্তমান জনতা (জেনি) দলের কাজে কর্মে খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন এই দলের সঙ্গে তিনি আর থাকতে চাইছেন না। একদা তাঁর সমর্থক ও পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে কথা-বার্তা চালাচ্ছেন এবং ভারতীয় জনতা দলে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

বসন্ত শাঠে

১ম পৃষ্ঠার পর

ওদিকে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে গুজব যেমন রয়েছে তেমনি রাজনৈতিক তৎপরতাও কম চলছে না। অসাময়িক সরকার হওয়া বিজ্ঞাপন-সূত্র এবং যোগাযোগ মন্ত্রী সি এম টিকেন-জুজনেই তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের দাবিদার। অপর-দিকে একরকম প্রায় নিশ্চিতই হয়ে রয়েছে যে, তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামচন্দ্রা দীনহা পূর্ণ মন্ত্রী হবেন এবং ওই মন্ত্রকেই থাকবেন। শুধু ও টিকেন জুজনেই প্রধানমন্ত্রীর দরবারে নানারকমভাবে নিজেদের আজ্ঞা জানাতে কলরব করছেন না।

এ পর্বত স্বতন্ত্র জাতি গেছে তাতে স্থির আছে যে, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে (২রা অক্টোবর) বহু আলোচিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রহ-বদল ঘটবে। জানা গেছে যে, বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসন্ন এই রহবদলকে কেন্দ্র করে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। প্রায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের গদি দামলাতে ব্যস্ত।

শারদীয় সংখ্যা

দর্পণ

মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে

দাম : ছয় টাকা

মফঃস্বলের এজেন্টরা

সব্বর জানাম এই সংখ্যা

তাঁরা কত কপি চান

শান্তিমনস্ক রাস্তা পুস্তক পরিদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পূর্ব প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। গঠন সম্পর্কীয় ভূ-বিজ্ঞান / ডঃ স্ববীরকুমার ঘোষ / ১১'৬০

২। পুরাজীব বিজ্ঞান / ডঃ স্ববীরকুমার ঘোষ / ১১'০০

৬৬, রাজা স্ববোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

একটি শিশু কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে কেলেকারী

সমাজসেবার উদ্দেশ্যে ১৯৬০

সালে কলকাতার ১০ ডি, বিডম স্ট্রীটে দি সোসাইটি কর চাইল্ড হেলথ এ্যাণ্ড কমিউনিটি ওয়েলফেয়ারের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, কিছু বৈদেশিক সংস্থা ও জনসাধারণের সহযোগিতায় ও আর্থিক অহুদানে ক্রমশঃ এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা গড়ে ওঠে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে উত্তর কলকাতার রামকৃষ্ণ হাস লেনে পরিবার কল্যাণ বিভাগ, চাইল্ড গাইডেন্স ইউনিট ও জড়বুদ্ধি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অলকেন্দ্র বোধ নিকেতন, বিডম স্ট্রীটে পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও লবশেষে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন ভি.আই.পি রোডের কাঁড়গাছিতে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮৫ ভাগ বহন করে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের খাতিয় হস্তগত এই প্রতিষ্ঠানকে বাৎসরিক এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা অহুদাম দেয়। অথচ এই প্রতিষ্ঠানে বৈধ কোন ম্যানেজিং কমিটি নেই, এর সম্পাদক ডাঃ বি এন রায়ই সর্বস্বর্বা। সরকারী টাকা আসছে, অথচ পরিচালনার সরকারের কোন প্রতিনিধি নেই, নেই কোন হ'শ। ডাঃ বি এম রায় রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থাকে নিজের একটা মনগড়া কমিটি দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে থাকেন।

বে লব কর্মীরা দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর ধরে সামান্য বেতনে এখানে কাজ করছিলেন তাহারা গত ডিসেম্বরে চাকুরী হারিয়ে অলকেন্দ্র বোধ নিকেতন ও ভি.আই.পি রোডে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবনের সামনে রাস্তার উপর এখন অবস্থান করছেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভাউচারে মাইমে দেওয়া হয়। প্রতিভেক্ট কাণ্ডের কোন ব্যবস্থা নেই।

সম্পাদক ডাঃ বি-এন রায়ের যেহাচারিতার বিরুদ্ধে ও কর্মীদের ভারসমত দাবি আদায়ের জুলাই ১৯-তে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। ডাঃ রায় ইউনিয়ন কর্মীদের

বিরুদ্ধে একাধিক বিখ্যে সামলা করেছেন, তাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে হুমকিও করিয়েছেন। গত স্বাধীনতা দিবসে ঐ তাড়াটে গুণ্ডারা জুলন মহিলা কর্মীকে নির্গতন করেন।

বহুবার অভিযোগ করার পর রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটা তদন্ত কমিশন করেন। ঐ কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে জমা পড়েছে। গত ২০ জুলাই শ্রীমতী ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী ইউনিয়নকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে, প্রাথমিক তদন্তে আর্থিক কারচুপি ধরা পড়েছে। কিন্তু আজ পর্বতও সরকার কোন পদক্ষেপ নেননি।

অরুণ নেহেরু

১ম পৃষ্ঠার পর

বিরোধী। তাঁর দাবি ঐ পদের যোগ্য দাবিদার মনেকা গান্ধী। লবশ-সুখা কমল মাথ, জগদীশ টাইটলার, সি পি এম সিং বর্দা ও সম্পর্কে এখনও মুখ খুলতে চাইছেন না, কিন্তু ওয়াকেল-হাল মহল মনে করেন যে, তাঁদের মনেকাকেই পছন্দ।

অরুণ নেহেরু এখন প্রতিদিন ১২ নম্বর উইলিংডন ক্রিসেন্টে আসেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেয়া হয়েছে। অরুণ নেহেরু এখনও জেনসন অ্যাণ্ড নিকল-সন নামক ব্রিটিশ সংস্থার চেয়ার-ম্যান। রাজনীতির আসরে তাঁর আবির্ভাব ঘটাই। বিদেশবাসী এই যুবককে এতটা গুরুত্ব দেবার ব্যাপার-টাকে ই-কংগ্রেসের সর্বীন-প্রবীণ নেতাদের মধ্যে অনেকেই ভাল চোখে দেখছেন না।

বরকত-প্রণব

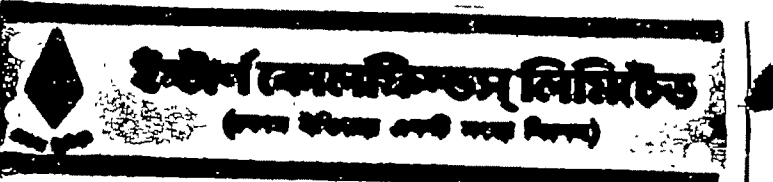
১ম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতি দিয়েছেন তাদেরকে প্রকার স্তরে প্রণববাবুই প্রণয় দিয়েছেন।

বরকত সাহেবের কার্যকলাপে প্রণববাবুও শুরু করে দিয়েছেন তৎপরতা। উত্তর-পূর্ববঙ্গের সন্মেলন শেষ করে প্রণববাবুর গত সোমবার দিল্লী করে যাবার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সফর স্থগিত পরিবর্তন করে দিল্লী যাত্রা একদিন পিছিয়ে দিয়েছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর "কণার হাউসে" প্রণববাবু স্বামী এম এল এদের এবং রাজ্য স্তরের নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যাপারে কথা বলেছেন। যে সব এম এল এ স্বতন্ত্রবাবুর সমর্থক তারা বরকত গোষ্ঠীর লোকজনদের বিরুদ্ধে প্রণববাবুর কাছে অভিযোগ জানান।

প্রণববাবু অবশ্য বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন। তিনি এই সভার বরকত সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে উপস্থিত বিধায়ক এবং নেতাদের বলেছেন যে, আপনারা দলের স্বার্থে মিলেমিশে কাজ করুন। সাংগঠনিক ব্যাপারে প্রণববাবু বলেছেন আপনারা কে কি পদ পেলেন তা না দেখে সংগঠনের জ্ঞাত কাজ করে যান। মিস্টরই অথবা আপনারা অহুত্ব লে যাবে।

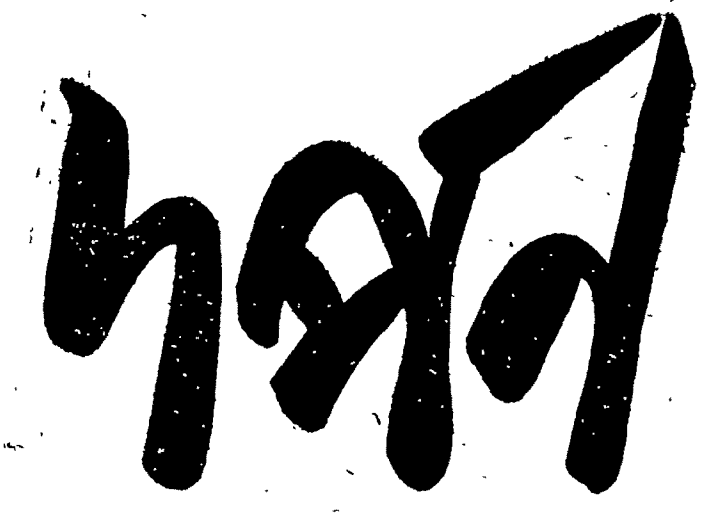
রাজ্য কংগ্রেসের (ই) এ্যাডহকের অধিকাংশ সদস্যই এখন বরকত সাহেবের দিকে। এই অবস্থার প্রণববাবু রাজ্য সংগঠনের ব্যাপারে বরকত সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কোন সংঘর্ষে যাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র মুখার্জী এবং তার অহুগামীদের নিজেদের সংগঠনকে জোরদার করে তুলতে বলেছেন। তিনি স্বতন্ত্রকে এ ব্যাপারে সব রকম মত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



সংশোধনী নোটিস
উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ
রেফা: নং: টেওয়ার বিজ্ঞাপন নং ৩৩৫৭ তারিখ ১৯-৮-৬০
মূল সংক্ষিপ্ত টেওয়ার নোটিস নং ই সি এল / সি ইউ আর / ০৫ / মাইমিং
টেলিফোন / ৫০ / ৬৪ নির্দিষ্ট তারিখ ২২-৮-৬০ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে
জানানো হচ্ছে টেওয়ার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ এতদ্বারা ৩০-৯-৬০ পর্বত
বর্ধিত করা হল।
মেট্রিয়ালস ম্যানেজার (পার্চেস) ইষ্টার্ন কোমফিন্ডস লিমিটেড, সাঁকতো-
রিতা, পো: দিশেরগড়, ৭১৩৩৩৩, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

প্রকাশিত হল
লেখকদের সাহিত্য-পাঞ্জিক
লেখক সমাবেশ
প্রতি সংখ্যার দাম-পঞ্চাশ পয়সা
ষ্টলে খোঁজ করুন
১৭২/৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪

জীবন ও জগজীবন ই-কংগ্রেসে ঢাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন



পরিশেষে বর্ষ ১৯৮৪ সংখ্যা ১৯ শ্রুতবার ১৯শে সেপ্টেম্বর, ৮০ ৬০ পয়সা

মুখ্যমন্ত্রী হাজির হবার আগেই ব্যবসায়ীরা খবর পেয়ে যাচ্ছে ইউ পিতে কালোবাজারী রোধের চেষ্টা ব্যর্থ

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নিত্য দরকারী জিনিস পত্রের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে, যাতে কালোবাজারের মুনাকাবাঙ্গি রোধ করা যায় সেজন্য খুব চেষ্টা করেও কোন ফল পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যেতে নিজে আচমকা নিত্য দরকারী দোকানে হাজির হয়েও কোন বেআইনী কিছু দেখতে পাননি। মালপত্রের হিসাবে কোন গিরমিল নেই। সব ঠিকঠাক। কিন্তু কি করে হয়? গলদেই খবর গোপন হয়ে পেয়েই তিনি হঠাৎ হাজির হয়েছেন। তবু কিছু করতে পারলেন না। এই জিজ্ঞাসার একটা জবাব ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তাঁর গতিবিধির খবর আগে থাকতেই ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে যাচ্ছে। আর তা পাচ্ছে তাঁর কাছের লোকের কাছ থেকে। তিনি বুঝতে পারছেন আসলে গলদটা তাঁর পরি-মণ্ডলের ভিতরে গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডি সি সাহেবের মৎস্য শিকার কাহিনী

কংগ্রেস (ই) কর্মীরা রবিবার মধ্যাহ্নকাতার ষণ্ম তুলকালাম কাণ্ড ঘটান, এবং সন্নিপ কলকাতার জ্যোতি বসু বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, তখন ডি সি সাউথ, এল-পি ও তার ভাই এবং ডি এল পি লজলবলে কলবার বোসপুত্রের গুইন মার্কেটের পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত। রবিবার দুটির দিন। ডি সি, সাউথ নিশ্চয়ই মাছ ধরতে যাচ্ছেন, এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তিনি মাছ ধরতে যে আত্মবলিক ব্যবস্থা নিয়ে-ছিলেন সেখানেই আপত্তি। রাজতন্ত্র আমলে রাজারা যেমন শিকারে বেরোবার সময় পাইক বর-কন্দাজ নিয়ে চলত ঠিক তেমনি লালবাজারের পুলিশ অফিসারদের

কংগ্রেস (আর) দলটি এমনিতেই রক্তহীনতার ভুগছিল এখন যেন তার নাতিশাস ওঠার পালা। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে অচিরে রাজ-নীতির আলয়ে অমর শহীদ হিসেবে হরত মর্যাদা পাবে। ইতিমধ্যে দলের তিন চাই দেবরাজ, চাবম, জগজীবন নিজেদের মধ্যে লুকোচুরি খেলছেন। দল বাঁচানোর কোম চেষ্টাই নেই। চাবম তাঁর মহারাষ্ট্রের সমর্থকদের, বিশেষ করে শাহর পাওয়ারের মত নিয়ে কংগ্রেস (ই) দলে যোগ দেবার জন্য শু মুখিয়ে আছেন তাই নয় একবার ডাক পেলে তিনি মাম অভি-মান ভুলে ইন্দিরাজীর পদতলে কাঁপিয়ে পড়তে বড়ই আগ্রহী। আকুল আগ্রহী বাবু জগজীবন রামও। পূজ্য অরুণকে নিয়ে তিনি গোপনে গোপনে এখনও চেষ্টা করছেন যাতে ইন্দিরাজী তাঁর ওপর কৃপা করেন। তাঁর আর আশা নেই। দেবরাজ সতাপতি পদ আঁকড়ে ধরে মেরেকে নিয়ে দলের বা করছেন তাতে তাঁর আশা করার মত কিছু নেই। দেবরাজ তাঁর নিজের রাজ্য কর্তৃক নিয়ে ব্যস্ত। সেখানে তাঁর উজল ভবিষ্যত আছে বলে তিনি দলের ব্যাপারে কেমন খেম গা ঢিলে ভাব দেখাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাব-ছেন, দেবজী বোধহয় দলের লাইন-বোর্ড উল্টে দেবেন। নরত কংগ্রেস (ই) অথবা অন্য কোন দলে ভিড়ে শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়

পুলিশের একটা জিপ কিছুকণ বাধে বাধেই টহল দিয়ে সাহেবদের খোঁজ খবর নিতেও দেখা গেছে। প্রায় হলো, কয়েকজন পুলিশ অফিসারের ব্যক্তি-গত শখ চরিতার্থের জন্য সরকারী কর্মচারীকে এভাবে কাজে লাগানো এও এক ধরনের ক্ষমতার অপব্যব-শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায়

শারদীয় সংখ্যা
দর্পণ
মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে
দাম : ছয় টাকা
স্বত্বস্বত্বের এজেন্টরা
সবর জানাম এই সংখ্যা
উরা কত কপি চাম

মহাপাত্র মন্ত্রী হতে না পেরে মহা অসুখী

সর্বভারতীয় কংগ্রেস (ই)-র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর মহাপাত্র নিজের বর্তমান পদমর্যাদায় প্রচণ্ড অসুখী। শ্যামসুন্দরবাবু তাঁর বনিষ্ঠ মহলে বলে বেড়াচ্ছেন, আর "রবার স্ট্যাম্প" হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি মন্ত্রী হতে চাই।

শ্যামসুন্দরবাবু সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর থেকেই নিজের প্রাধিকার হ্রাস করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। নানারকম পরি-কল্পনা নিয়ে তিনি কংগ্রেসের (ই) সভামেন্দ্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে পেশ করেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এসব ব্যাপার সন্মেলের সঙ্গে পরামর্শ করার দাবি ব্যাপারে শ্যামসুন্দরবাবুর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয় নি।

সময় গান্ধীর জীবিতকালীন অবস্থায় লাংগঠনিক ব্যাপারে শ্যাম-সুন্দরবাবুর গুরুত্ব একেবারেই কমে গিয়েছিল। সময়েই আকস্মিক মৃত্যুর পর সে অবস্থার সামান্য হের-কের হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর মূখের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় শ্যামসুন্দরবাবু এখন লংগঠনের পদ ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদে চুকে পড়তে চাইছেন। কিন্তু কাজটা খুব কঠিন। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছা না হলে এবং তাঁর বিচারে যোগ্য বলে বিবেচিত না হলে মন্ত্রিপদে স্থান পাবার কঠিন।

তাই শ্যামসুন্দরবাবু এখন মানা-ভাবে চেষ্টা করছেন যাতে একজন মন্ত্রী হতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি আর, কে ধারণা, কল্পনাপতি ত্রিপাঠী এবং রাজীব গান্ধীকে ধরে-ছেন যাতে তাঁর মাম মন্ত্রী হিসাবে এরা সুপারিশ করেন।

শ্যামসুন্দরবাবু আসাম নিয়েও শ্রীমতী গান্ধীর কাছে একটা চমক সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সন্মতি তিনি যখন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দিতে এসে-ছিলেন তখন তিনি আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে শ্যামসুন্দরবাবু আত্ম এবং গণসংগ্রাম পরিষদের নেতাদের বলেন, "আপনারা ত্রিভিবর্ষ নিয়ে জেদাজেদ করবেন না। আমরা আসাম থেকে বিদেশীদের নিশ্চয়ই দূরিয়ে দেব। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর

ওপর ছেড়ে দিই, আপনাদের অন্তঃস্থ হাবি সবই যেনে নেওয়া হবে।" কিন্তু আসামের আন্দোলনকারী শেষাংশ ২২ পৃষ্ঠায় পর

রাজীব
ইন্দিরা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনে বসতে চলেছে বোম্বাই-এ সেই সম্মেলনে রাজীব নেবেন মুখ্য ভূমিকা। পাঁচ বছর আগে যেমনটি হয়েছিল পাঞ্জাবে তাঁর ভাইকে ঘিরে। এবার তাঁর অভিষেক হবে বলে ইতিমধ্যে বেশ তোড়জোর তুল হয়ে গেছে।

রাজনারায়ণ
চন্দ্রশেখর মৌর্যজির মার্কনা পেরেছেন রাজনারায়ণ। কমা চেয়ে ধরে পড়ে যেভাবে রাজনারায়ণ জনতাতে (জেপি) ঢুকতে চাইছেন তাতে তাঁর মন গলেছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর মৌর্যজী-তেদী হবার মত কোন কাজ করবেন না।

তাঁর দল জনতা (এস) ভেঙে দিয়ে পাইকারি হারে দল গড়ান পালা লাগ করে কের জনতার রাজ-নারায়ণ হবেন। আর লোভের কমা খেতে গিয়ে খোসার পা দিয়ে যাতে আছড়ে না পড়েন সে অন্ত সদাপতর্ক থাকবেন। দেশের দুর্দিনে এক সঙ্গে মিলে অন্তায়, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। আবার জনগণের হারান আস্থা ফিরিয়ে আনবেন।

রাজীব সম্মেলন বিশ্বনাথ
এখন পর্যন্ত স্থির হয়েছে এই যে, রাজীব গান্ধী ভাইয়ের কেন্দ্র আবে-ধিতে না দাঁড়িয়ে বরং এলাহাবাদেই লোকসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী হবেন। আমেথি কেন্দ্রটি তাঁদের পারিবারিক জীবনে অন্তত ছায়া ফেলেছে বলে অলুবাধীরা এটা চাইছেন। তাই আমেথির বদলে এলাহাবাদ কেন্দ্রটিতে রাজীব মন স্থির করার জন্য চিন্তা-ভাবনা সেয়ে নিয়েছেন। এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলে সমগ্র সিং আমেথি বিধান সভা সিটি তাঁর খুশখুশ এবং উত্তর-প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর অসুস্থতায় ত্যাগ করবেন। বিশ্বনাথ এখনও বিধান-সভা পদত নন। তাঁকে এ সুযোগটি করে দিয়ে সমগ্র দাঁড়াবেন আমেথি লোকসভা কেন্দ্রে।

সম্পাদকীয়

রাজীবের রাজনৈতিক দর্শন

কিলিরে কাঁঠাল পাকানোর মতো রাজীব গান্ধীকেও রাতারাতি শীর্ষ নেতার উন্নীত করতে চেয়েছিলেন কিছু অতি উৎসাহী ইন্দিরার পারিবারিক শাসনের সমর্থক। কিন্তু রাজীব তাতে রাজি হননি। অবুজ সঙ্কল্পের কী দশা হয়েছিল সেলুলয়েড চিত্রের মতো তা তার চোখের সামনে তো ভাসছে। মারুতি কেলেঙ্কারী নিয়ে পার্লামেন্টে দিনের পর দিন কেঁদার কথা এত শিগগির কী করে ভোলা যায়? জনতা হল ও সরকারের ব্যর্থতা সঙ্কল্পের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের যারা মাস্তগণ্য মানুষ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখনোই যে সঙ্কল্পকে সম্মানের বা প্রচার আসন দেবেন একথা রাজীবের অজানা নেই। তাই সঙ্কল্পের পথে উদ্ধার মতো দ্রুত বেগে প্রবেশ ও প্রস্থান নয়, রাজীব গান্ধী ধীরে ধীরে ক্রমত রাজনীতির শীর্ষদেশে উত্তরণ করতে চান। তার মনের এ-কথাটি তিনি প্রথম খুলে বলেছেন বিশিষ্ট কন্নড়ী পত্রিকা 'লে কিগারো'র প্রতিনিধির কাছে। বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে এটাই তো তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার।

সক্রিয় রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণে গ্লী সোনিয়া গান্ধীর আপত্তির কথা রাজীব অকপটে স্বীকার করেছেন। যে সত্যটা তিনি সঘরে গোপন করেছেন সেটা হল স্রোতস্ব মানেকা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। বক্তব্য: সঙ্কল্পের পুত্র আসনের ওপর গ্লীর দাবিই অগ্রগণ্য—এটাই যে মামেকার বক্তব্য তাতো রাজীবের অজানা নয়। এবং মানেকার রাধাঠেলে ক্রমতার চুড়োর পৌছনো তাঁর

গক্ষে খুব সহজসাধ্য হবে না কেনেই রাজীব ধীরে চল নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে মাতা 'ইন্দিরার বক্তব্যও উল্লেখ করার দাবি রাখে। শ্রীমতী গান্ধী উপরোক্ত সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন যে তাঁর ছেলে-পুত্রদের ওপর কোন সিদ্ধান্ত তিনি চাপিয়ে দেন না, তারা নিজেরাই তা নেয়। সত্যি কি তাই? সঙ্কল্পের কী ক্রমতা ছিল নিজের ইচ্ছার বাপ-ঠাকুরদার বয়েসী প্রবীণ রাজনৈতিক-দেয় বাড়ি চেপে বসার যদি 'ইন্দিরার মত না থাকত? রাজীবকেও নিজের সিদ্ধান্ত মিতে তিনি যেবেন কি? না কি পরোক্ষে ক্রমতার আসনে টেনে নিয়ে আসবেন ইন্দিরা পরিবারে থেকে মানেকাকে রাজনৈতিক ক্রমতার দিকে হাত বাড়াতে না দিয়ে?

রাজীব কি জিনিস হবেন—তার লক্ষণও প্রথম ক্ষেপেই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ (কংগ্রেস-ই) রাজনৈতিক ক্রমতালোভী-বলেই দেশের আজ এ অবস্থা। এ উক্তি করে তিনি মেতা নির্বিশেষে সকলেরই নিন্দা করলেন না কি? তার ক্রমতার লোভ নেই, তবে মায়ের কাছে সাহায্য করার জন্য তিনি প্রয়োজন বোধে রাজনীতিতে অংশ নেবেন। কী সে মায়ের কাঁজ? সেই ক্রমতার অধিষ্ঠিত থাকার, মায়ের ক্রমতা একার হাতে কেন্দ্রীভূত করাই নয় কি? সেটা কি ভোগ না ত্যাগ রাজীব তা ব্যাখ্যা করেন নি। অথচ এটাই তাঁর রাজনৈতিক দর্শন।

চ্যবন জগজীবন

১ম পৃষ্ঠার পর

বেতেও পারেন। এই অবস্থায় তারকেশ্বরী সিংহ, ইউজেন সেলিম, বীকাবিহারী দাস প্রমুখরা একটা বড় রকমের অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। তাঁরা দলের আর্থিক, সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখে বেশ আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কেরলের একনিঃশেষ বিব্রত বোধ করছেন। পশ্চিম বাংলার প্রিয় পুরবীরাও সেই অবস্থার রয়েছেন।

অতর্কিতে ডঃ করণ সিং ইন্দিরা কংগ্রেসে লাইন করা প্রায় শেষ করে এনেছেন। অপেক্ষা করছেন কে সি পছন্দ। আশায় আছেন সবুজ লংকোত মিলবে বলে তাঁদের মত আরও কয়েকজন। তাই পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, কংগ্রেস (আর্গ) বোধহয় আয়ুর্হীন হতে চলেছে।

অর্থাভাবে শুধু নয়, দলের নেতাদের আদর্শহীনতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং হত্যোচ্চ হবার নানা কারণ এর ভিতর জিয়া করছে।

ইউ পিতে

১ম পৃষ্ঠার পর

এদিকে দলের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ধর্মবীর রাজ্য সভার এম পি হয়ে গিয়ে দ্বিতীতেই বেশী পড়ে থাকছেন। চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জায়গা পাবার। কারণ, প্রদেশ কংগ্রেসে ক্রমতা দখলের যে তীব্র লড়াই চলেছে আর তাকে কেন্দ্র করে যেসব কাণ্ড ঘটছে সে সবের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে এছাড়া অন্য কোন পথ তাঁর সামনে খোলা নেই।

দেশ কাল রাজনীতি

কেড়ে রদবদল নয় কেন?

ভারতপুত্র

দ্বিতী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রায়ের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। গত কিছুকাল ধরেই এধরনের রদবদল সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে সরব জল্পনা-কল্পনা চলছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শৃঙ্খলা, এক-একজন মন্ত্রীর হাতে কয়েকটি করে দপ্তর রাখা সর্বোপরি ক্ষমতাসীন হবার আটনামাস পরেও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ম তৎপর হয়ে উঠতে না পারায় রাজধানীতে গবেষণা শুরু হয়েছিল যে শ্রীমতী গান্ধী অচিরেই তাঁর মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে চাকা করে তুলবেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং যখন সে গবেষণা অর্থহীন বলে রায় দিয়েছেন তখন, আপাততঃ নতুন খাতে চিন্তাভাবনার স্রোতে বইতে দেখা বাবে।

অর্থাৎ প্রায় উঠবে প্রধানমন্ত্রী লম্বের দাবিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? নেতৃত্বে তাঁর মতো জাদুরেল পতিশীল ভেঙ্কি-জানা ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার অবনতিভেদ, মাদামারায় হয়ে পড়েছে কেন? কার জন্য প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি এখনো খালি করে রাখা হয়েছে? একথা শ্রীমতী গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছেন যে মন্ত্রিসভার কর্মক্ষমতা আশঙ্করূপ নয়। এর কারণ কী? এক একজন মন্ত্রীর হাতে যদি দু-তিনটে করে দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া থাকে, তবে প্রতিটি দপ্তরের প্রতি লম্বান মনোযোগ স্থাপন করা বা দপ্তর গুলোর প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না। কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও হাজার হোক রক্ত মালেরই মানুষ, তাঁরা কিছু কম্পিউটার বা যন্ত্রদানব নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, বুদ্ধিমতী, বাস্তব-বুদ্ধি সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত হবার মধ্যেও শ্রীমতী গান্ধী সাংবাদিকদের কাছে একপ্রকারেই লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি গায়ের জোরেই যেন বলে দিলেন যে একাধিক দপ্তর হাতে রাখাটা মন্ত্রীদের পক্ষে কিছু দোষের বিষয় নয়, অত্যন্ত দেশেও এর মজীর রয়েছে এমন কি আমাদের দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের হাতেও একাধিক দপ্তর চালাচ্ছেন। অত্যন্ত বিশেষতঃ পূর্ব বা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে কংগ্রেস-ই মন্ত্রীদের কর্মক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, কাণ্ডজার

বিচারবুদ্ধি ইত্যাদির তুলনায় না করা হতো। ইন্দিরার মন্ত্রিসভার সদস্যরা তাদের কার দায়িত্ব কি, কাজের চৌহদ্দি বা সীমানা কোথায় তাই জানেন না। সেজন্যই তো তাঁকে বার বার সংবাদপত্রে বিবৃতিদান নিয়ে মন্ত্রীদের লতর্ক করে দিতে হয়, নতুন করে নির্দেশিকা জারী করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী চাতুর্ধের সঙ্গে তার সহযোগী মন্ত্রীদের বার্ষিকতার দায় আমলা-কর্মচারীদের 'বাড়ি' চালান করে দিয়েছেন। অর্থাৎ অধস্তন সরকারী কর্মচারীরা সময়মতো অফিসে যান না, দিনের কাজ দিমে করেন না এবং মিতাধিম মিটিং বৈঠক করেন বলেই নাকি কেন্দ্রের কাজে পতিবেগ সঞ্চারিত হতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী সহজ সত্যটি স্বীকার করলেন না যে নীতিনিয়ামকদের অর্থাৎ মন্ত্রীদের বা বাবুদের যদি একেজো দেখা যায়, কিম্বা শৃঙ্খলিত দেখা যায় তবে নিছক তার কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রেরণা তো দূরের কথা, উপহাস-তাজিল্য এবং অপ্রত্যাশিত আকর্ষণ করেন। কাজেই নেতৃত্ব দেবার যুরোধ বাড়বে নেই, তাদের হুবেলা হুনিশ করে কর্মক্ষমতার প্রমাণ দেবার কোন তাগিদই তারা অহুতব করেন। আর মন্ত্রীদের মনেও এ-প্রত্যয়-দৃঢ়মূল হয় যে প্রধানমন্ত্রী তাদের কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়েই একাধিক দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়েছেন, তাদের কোন বিকল্প নেই অতএব কাজ করুন-না-করুন মন্ত্রীদের চাকরি তাদের যাচ্ছেনা এমন কি দপ্তরও হাতছাড়া হচ্ছেনা। শ্রীমতী গান্ধী এখনো মনকে চোখ ঠাউরে চলেছেন, সেজন্যই তিনি সরকারের প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে বা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে সেই মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয় রদবদল করছেন না। তাছাড়া তিনি মন্ত্রিপ্রার্থীদের উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন (আহু-গত্যা চাই অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত আশঙ্কায়) করতে পারছেন না বলেও মন্ত্রিসভার পরিবর্তন সাধন করতে পারছেন না।

ডি সি সাহেব

১ম পৃষ্ঠার পর

হার। যেখানে কসবা পুলিশ স্টেশনে এস আই ও কনস্টেবলের সংখ্যা খুবই সীমিত। কিন্তু এই এলাকার কোনো গণগোল বা মিগ্রীহ মানুষের শাস্তি বিহীন হলে পুলিশকে এতটা তৎপর হতে দেখা যায় না।

মহাপাত্র

১ম পৃষ্ঠার পর

নেতারা শ্যামসুন্দরবাবুর অহরোধ রক্ষা করেন নি। তারা সত্যসি শ্যামসুন্দরবাবুকে জানিয়ে দেন, আগে ভিত্তিবর্ষ ঠিক না হলে বিদেশী বিতাড়নের কোন কথাই আমরা শুনতে রাজী নই। আন্দোলনকারী নেতাদের অনেক অহুন্নর বিনয় করেও ভিত্তিবর্ষের দাবি ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাজী করতে শ্যামসুন্দরবাবু ব্যর্থ হন।

শ্যামসুন্দরবাবুর আশা ছিল, আসামের আন্দোলনকারী নেতাদের যদি তিনি এ ব্যাপারে রাজী করতে পারেন তবে মিশরই-শ্রীমতী গান্ধীর কাছে তার মর্ধ্যদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সফল না হওয়াতে শ্যামসুন্দরবাবু বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে আগাম আন্দোলনের নেতাদের শ্যামসুন্দরবাবু অহরোধ করেছেন যে, আমি আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আপনাদের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করব। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এ ব্যাপারে শ্যামসুন্দরবাবুকে বেশী নাক গলাতে দিতে রাজী নয় বলে জানা গেছে।

রাজ্য সরকারী প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২ আগষ্ট আজিপুর প্রথম লজ কেন্দ্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস ওয়ার্কমেন ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের মুখ্য সম্পাদক শ্রীমন্ত্যাকুমা চক্রবর্তী ও শ্রীমতীহারমণ চক্রবর্তী প্রতিনিধিদের কাছে গন্ত একবছরের কাজের রিপোর্ট পেশ করেন। প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন চালু, প্রত্যেকটি কর্মচারীর জন্য বাগ্যানের ব্যবস্থা, কণ্ঠাষ্ট কল বাতিল, পূর্ণ ট্রুট ইউনিয়ন অধিকার, জবায়ুলা বুদ্ধি যোধ ইত্যাদি ৩৮টি দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্পাদকীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে শতকরা ৮৮% কর্মচারীর মতে ভিত্তিতে ওয়ার্কমেন ইউনিয়নের হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক কর্মচারী নাকি তাদের গোষ্ঠীবার্ষিক ব্যক্তিবার্ষিক বজায় রাখার জন্য ভিন্ন ইউনিয়ন বাঁচিয়ে তুলে কর্মচারী আন্দোলনে বিভেদ আনে। রিপোর্টে কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও কেন্দ্রীয়সমের বিস্তার রাখা হয়।

সি পি আই (এম)-এর নয়া কৌশল

কালিদাস কুণ্ডু

জনমানসে সি, পি, আই (এম)-এর ভাবযুক্তি এখন শাসক দল হিসাবেই। ভারতবর্ষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে তার করায়ত্ত। রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হলেও কেরালা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপতি এখন সি, পি, আই (এম)-এর হাতের মুঠোর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়া পৃথিবীর অচ্যুত কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টি শাস্তিপূর্ণভাবে এইভাবে রাষ্ট্রকর্মতায় আসতে পারেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে আদৌ হয়নি একথা বলা যায়না। ইন্দোনেশিয়া ও চিলিতে কমিউনিষ্ট পার্টি নাগবিধানিক-পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। বুর্জোয়া-হাত থেকে রাষ্ট্রদ্বার ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা আংশিকভাবে তাদের ক্ষমতা ভাগ করে নিয়ে এসেব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি Structural reform এর তত্ত্ব হাজির করেছিল। ফলাফল লকলেরই জানা।

আমাদের দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম ক্ষমতায় আসে কেরালা প্রদেশে। ১৯৫৯ সালে 'জনগণের অভ্যুত্থান' হয়েছে—এই অজুহাতে সেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও কমিউনিষ্ট (মার্কসবাদী) তথা বামপন্থী দলগুলি একাধিকবার শাসন ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ভাব-যুক্তি ছিল সংগ্রামী, লক্ষী পার্টিপে। একথা স্বীকার করতেই হবে, মার্কস-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্যপন্থা ও উগ্রতা অনেক পছন্দ না করলেও যুদ্ধের সংখ্যক সাহসের মধ্যে তখন যে উদ্দীপনা ও সংগ্রামমুহুরা জাগ্রত হয়েছিল আজ তার সিকিভাগও অবশিষ্ট নেই।

উপরোক্ত কথাগুলির বলায় উদ্ভূত এই নয় যে, সি, পি, আই (এম) একদিন সত্যিকারের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা পালন করেছে এবং আজ সেই ভূমিকা থেকে লুপ্ত হয়ে সে সংশোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে। সি, পি, আই (এম) লক্ষ্য থেকেই সংশোধনবাদী পার্টি। ১৯৬৮ সালে কলকাতার ত্যাগরাজ লে অস্থিতি পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত তার কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবই এর অঙ্গ প্রমাণ। উল্লিখিত কর্মসূচীটিই ছিল একটি সূচক সংশোধন-বাদী কর্মসূচী।

কৃষি বিপ্লবকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মেরুদণ্ড রূপে স্বীকার করেও ঐ কর্মসূচী শিরবুর্জোয়ারের নেতৃ-

ভূমিকা (নতুন সরকার ও রাষ্ট্রে) মেনে নিয়েছিল। এমনকি কর্মসূচীতে একথাও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব লাভনের চেষ্টা করবে (Our party strives to seek people's democratic revolution through peaceful means)।

একদিকে সংশোধনবাদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীনের পার্টি-নেতৃত্বের প্রতি মৌখিক আহ্বান এবং অন্যদিকে শাস্তিপূর্ণ উত্তরণের সংশোধনবাদী তত্ত্ব—এই স্ববিরোধিতা সি, পি, আই (এম) জনস্বার্থেই অর্জন করেছে।

তথাপি একথা অস্বীকার করা যায়না যে, ১৯৬৭ সালের নকশাল-বাদীর কৃষক আন্দোলনের পূর্বসূরী পর্বত ভারতবর্ষে সি, পি, আই (এম)-ই ছিল একমাত্র বামপন্থী পার্টি যার কংগ্রেস বিরোধিতা বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। “ক্ষেত্রে কিশাণ, কুলে মজুর, জোট বাঁধা ভৈরী হও”—সি, পি, আই (এম)-এর এই মন্ত্রমুগ্ধ প্রতিজ্ঞার বৃক জ্ঞান সৃষ্টি করেছিল, সংগ্রামী সাহসের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়েছিল। “ভাঙ্গে চক্ক খসে হোক, শোষণবাদ নিপাত থাক”—তার এই সোচ্চার, লড়াই কণ্ঠের সাময়িকভাবে হলেও সংগ্রামী-প্রতিশ্রুতি ধ্বনিত করেছিল। খুব সন্তোষ: এই কারণেই অবিস্মৃত কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত নেতা ও বুদ্ধিজীবী দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিতে থেকে গেলেও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অধিকতর জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

অনেকেরই হয়তো মনে আছে, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত লীমাত্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে যখন কমিউনিষ্ট-দের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও বাধাহ-বাদের স্রোত হই তখন তদানী-ন্তন সার্বভারত কৃষকসভার পক্ষ থেকে এ, কে, গোপালন সর্বপ্রথম চীনকে আক্রমণকারীরূপে তৎসনা করেন। একথাও অনেকেরই মনে আছে যে, সি, পি, আই (এম)-এর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ই. এম, এস, নাসিরুদ্দিন তাঁর “Two Programmes—explained” রাজনৈতিক পুস্তিকায় সি, পি, আই ও সি, পি, আই (এম)-এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই বলে ঘোষণা করেন। ১৯৬৪ সালে সি, পি, আই (এম) আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আলাদা

পার্টি হয়ে যাওয়ার পর তিনি জোরের সঙ্গেই বলেন—“On the question of alignment of forces there is no fundamental difference between their programme (C. P. I's programme) and ours.”

সি, পি, আই ও সি, পি, আই (এম)—এই দুই পার্টির মধ্যে রাজ-নৈতিক মতাদর্শগত প্রব্লে মৌলিক পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়েছিল। সি, পি, আই, বরাবরই এই বিভাজনের অস্তে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে দায়ী করেছে। অত্ চীন—বিরোধিতায় পরিচালিত সি, পি, আই, নেতৃত্ব একথা কখনই স্বীকার করেনি যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ও সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র মনো-ভাবের অতই কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হয়েছিল। নেতৃত্বের দৃষ্টিও অবশ্য একটি প্রধান কারণ ছিল।

সি, পি, আই-এর পার্টিনা কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে খোলা-খুলিই বলা হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদে দাম্ভবাদ ও একচেটিয়া পুঞ্জির বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়ারের প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় কংগ্রেস। অতএব, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ কার্য সমাধা করতে হবে। সি, পি, আই (এম) এই বিশ্লেষণকে লাস্ত মনে করেছিল। তারা সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছিল যে, “আমাদের এই নতুন যুগে বুর্জো-য়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম, তারা মধ্যপথে বিশ্বাস-বাতকতা করে। অতএব, প্রতিক-শ্রেনীর নেতৃত্বেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে।”

সি, পি, আই ও সি, পি, আই (এম)-এর মধ্যে এই মতপার্থক্য কোন মৌলিক মতপার্থক্য ছিল না। কমিউনিষ্ট পার্টিতে এই মতপার্থক্য বরাবরই ছিল। তৎসত্ত্বেও কমিউ-নিষ্ট পার্টি বিভক্ত হ'ল। কারণ পার্টির হাজার হাজার কর্মী সংশোধন-বাদী সোভিয়েত নেতৃত্বের সমালো-চনার মুখ হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চীনের পার্টির তদানীন্তন গৌরবময় সংগ্রামকে তারা প্রহার চোখে দেখেছিল।

তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে তখন একটি চমৎকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি

বিদ্যমান ছিল এবং কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ সদস্যই বিপ্লবের প্রতি প্রত্যাশীল ও আত্মবান ছিল।

সি, পি, আই (এম)-ভূমিষ্ট হয়েই এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে-ছিল। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেও গণতন্ত্র বৈপ্লবিক বুলি আও-ড়াতে। হরেক্ষণ কোটার প্রয়োদ দাশগুণ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রকৃত নির্বা-চনী সভাগুলিতেও বলে বেড়াতেম “আমাদের পথ ভিয়েনামের পথ।”

ইতিহাসের পরিহাস এই—যারা একদিন “ভিয়েনামের পথ আমাদের পথ” বলে সভা উত্তপ্ত করতেন তারাই “চীনের পথ আমাদের পথ” রণ-ধবনিকে বিজ্ঞপ্ত করেছেন।

সমস্ত কারণেই একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—সি, পি, আই, (এম) এর হাজার হাজার কর্মী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আত্মশীল থাকা সত্ত্বেও নক-শালবাদীর সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে পার্টি থেকে বেরিয়ে এলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, সি, পি, আই (এম)-এর সদস্য-দের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল মধ্য-বিত্ত ঘরের। মধ্যবিত্ত মানসিকতা বিপ্লবমুখী হলেও অস্থির ও হোচল্য-মান। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্য তেমন একটা কিছু ছিল না। অত্বেই কমিউনিষ্টদের কাছে এই বৈপ্লবিক ঐতিহ্য অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জল থাকায় সেখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অধি-কাংশ নেতা ও কর্মীই পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সি, পি, আই (এম)-এর বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শগত ও কৌশলগত অবস্থান বুঝবার জন্যই অতীতের পৃষ্ঠা-গুলি একটু ওল্টাতে হল। এখনতো সি, পি, আই (এম) সহোদর পার্টি সি, পি, আই-এর খুবই কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এখন সি, পি, আই (এম) নেতৃত্ব পোড়িয়ে-তের প্রতি অনেক বেশি সহায়ত্ব-সম্পন্ন। পার্টির ক্ষমতাও চের বেশি বেড়েছে। তিনটি প্রদেশের শাসন দায়িত্ব তার কাছে ত্ত। এসব কিছু সত্ত্বেও সি, পি, আই (এম) যেন রক্ত-শূন্যতা রোগে ভুগছে। যতই বেশি সে ক্ষমতার দিকে এগুচ্ছে ততই ক্রম-হ্রাসমান উৎসাহ বিধি অস্থায়ী তার

সংগ্রামমুখীনতার ধার কমে যাচ্ছে। জনতা পার্টি ভেঙে যাওয়ার পর গোটা ভারতবর্ষে সি, পি, আই (এম) দলই সবচেয়ে সংহত, সুশৃংখল ও শক্তি-শালী কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারতো। মুখে ইন্দিরা শৈবতন্ত্রের বিরুদ্ধে সি, পি, এম যত তর্জন গর্জনই করুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে সে ইন্দিরার সঙ্গে বিরোধকে এড়িয়ে চলছে অতি সুকৌশলে। এমনকি কতকগুলি প্রশ্নে সে ইন্দিরার হাতকেই শক্তিশালী করে চলছে। একথা সবারই জানা, আফগানিস্থান ও কম্পুচিয়ার প্রশ্নে সি, পি, আই ও সি, পি, আই (এম)-এর বলিষ্ঠ সমর্থন ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে যেতেন। পূর্বাঞ্চলের লংকটেও সি, পি, এম, সর্বশক্তি নিয়ে ইন্দিরার পেছনে দাঁড়িয়েছে। এমন কি সমগ্র গান্ধীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরকারী প্রচার যন্ত্রের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধেও সি, পি, আই, (এম) টু শব্দটি করেনি।

একদিন সি, পি, আই, (এম) জোর পলায় বলত সংসদ ও আইন সভাগুলিকে গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। আজ গণসংগ্রাম ত্ত। দলীয় কর্মীদের বলা হচ্ছে পকারেত দখল কর, পৌর সভা দখল কর। সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কার্য-সূচীই এখন সি, পি, আই (এম) এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মেরুদণ্ড স্বরূপ। সি, পি, আই (এম)-এর এই নয়া-কৌশল তাদের ক্ষমতায়টিকে থাকতে সাহায্য করেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সংগ্রামী ভাবযুক্তি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। পার্টি সদস্যদের মধ্যে হতাশা বেড়ে যাচ্ছে। দেশের যুবছাত্রদের সঙ্গে তার Generation gap-এর পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। হতা-শাজ্ঞ তরুণ সম্ভ্রমার অপনোত্তির শিকার হচ্ছে। তাদের মধ্যে রাজ-নীতি বিষুধতা প্রথম হয়ে উঠছে। বিভ্রান্ত, হতাশাদীর্ণ ও অসংগঠিত এই যুবশক্তিই একদিন প্রতিক্রিয়াশীল-দের বটিকা বাহিনীতে পরিণত হয়। চোখের লাস মনে ইন্দোনেশিয়া থাকতেও সি, পি, আই (এম) এর ঘুম তাড়ছে না।

প্রকাশিত হল

লেখকদের সাহিত্য-পাক্ষিক

লেখক সম্মাবেশ

প্রতি সংখ্যার দাম পঞ্চাশ পয়সা

ষ্টলে খোঁজ করুন

১৭২/১৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড

কলকাতা ১৪

পরিত্যক্ত খাদ থেকে বেআইনীভাবে কয়লা তুলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার

সম্প্রতি বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানা এলাকায় একটি কয়লা কোম্পানীর সন্ধান মিলেছে। নাম পি সি সি এল। অর্থাৎ পুলিশ কোল কোম্পানী লিমিটেড। এই নামকরণ করেছেন জামুরিয়ার অধিবাসীরাই। প দ্বা বি কা র বলে জামুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ এই কয়লা কোম্পানীর চেয়ারম্যান।

আমরা সকলেই জানি যে, ভারতে কয়লা খনন ও কয়লা বন্টনের অধিকার হল কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের। এটি একটি সরকারী সংস্থা। এর অধীনে ৪টি মহাযোগী সংস্থা আছে। ইন্টার্ন কোলফিল্ড তার অন্তর্গত। পূর্বাঞ্চলে কয়লা খননের ও বন্টনের একমাত্র অধিকার ইন্টার্ন কোলফিল্ডস এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের।

অতাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, পি সি সি এল সংস্থাটির ব্যাপারটা কি?

বিস্তৃত তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত খাদ থেকে বেআইনী ভাবে কয়লা উৎপাদন করে পি সি সি এল চালাও কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত চার বছর ধাবৎ যেভাবে এই বেআইনী কয়লা উৎপাদন হয়ে আসছে তাতে সাধারণ মানুষ ধরেই নিয়েছেন যে, এটা আইনী কারবার। কেননা বেআইনী কোন কিছু এরকম বেশরোদ্ভাবে ও প্রকাশে চলতে পারেনা।

আসলে এই পুরো কারবারটাই বেআইনী। পরিত্যক্ত এই খাদগুলি এবং কয়েকটি পুত্র খাদান অতীতে ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানীর। কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হবার পর এগুলির মালিকানা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের তথা কোল ইন্ডিয়া। অঞ্চল ভিত্তিক এর মালিকানা বর্তেছে ইন্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের ওপর।

কারবার বেশ ভালভাবেই চলে আসছিল। হঠাৎ পণ্ডগোল দেখা দিল ১৯শে জুলাই। পরিত্যক্ত এই খাদে কর্মরত প্রমিকদের ওপর ইন্টার্ন কোলফিল্ডের নিরাপত্তা রক্ষীরা গুলি চালায়। ছয়জন প্রমিক গুলিতে আহত হন এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা তিনজন প্রমিককে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পালিয়ে যায় কিন্তু গুলি ও আহত প্রমিকদের কোন আদালতে হাজির করা হয়নি বলে তদন্তে প্রকাশ।

আইনের রক্ষকদের সঙ্গে ইন্টার্ন কোলফিল্ডের নিরাপত্তা অফিসার ঈরাও ও কতিপয় ধান্যবাজ অফিসারের গোপন আত্মতে বেআইনীভাবে এই পুলিশ কোল কোম্পানী লিমিটেডের জন্ম হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে বেআইনীভাবে বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত খাদ থেকে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা তুলে বাজারে বিক্রী করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে এই বেআইনী কয়লা উত্তোলনকারীর দল।

করতে দেখা গেছে। এই বেআইনী কয়লা উত্তোলনকারীদের নিজস্ব বিচার বিভাগও আছে বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে।

এই সব খাদের অধিকাংশই খনি রাষ্ট্রায়ত্ত্বের আগে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে কয়লা খনি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হবার পর। সাধারণত উৎকৃষ্ট মানের কয়লা না থাকলে এবং খনিতে যে কোন মূর্ত্তে বিপদ ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলেই কয়লা খনিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এই বেআইনী কয়লা উত্তোলনকারীরা যে সব পরিত্যক্ত খাদ ও খাদান থেকে বেআইনীভাবে কয়লা তুলে রমরমা কারবার ফেঁদে বসেছেন তার অধিকাংশই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে শেষোক্ত কারণে।

স্থানীয় মানুষের দাবি, অবিলম্বে এই বেআইনী কারবার সম্পর্কে তদন্ত করানো হোক কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আই-কে দিয়ে এবং এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এমন শাস্তি দেয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে কেউ কখনো এই কাজ করার সাহস না পায়। স্থানীয় মানুষের আরও অভিযোগ যে, বেআইনীভাবে কয়লা পাচার করা কয়লাখনি অঞ্চলে নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধাবৎই চলে আসছে তবে এই পি সি সি এলের মত এমন ভাবে আগে কখনো বেআইনী কয়লা উত্তোলন হয় নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অবগতির জ্ঞত জানিয়ে রাখছি যে, কোন কোন স্থান থেকে এই পি সি সি এল অবৈধভাবে কয়লা উত্তোলন করছে এবং করেছে। বাক শিমুলিয়া কোলিয়ারীর ১ ও ৮ নম্বর এবং ১১ ও ১২ নম্বর পরিত্যক্ত সিঁড়ি খাদ, শিবপুর

গ্রাম সংলগ্ন ২টি সিঁড়ি খাদ, নগী-গ্রাম সংলগ্ন পুত্র খাদান ও জামুরিয়া থানার এলাকায় পড়ে এরকম বহু পরিত্যক্ত খাদ ও খাদান। এছাড়াও যে রেল লাইনের ওপর দিয়ে নিম্ন-মিত রেল চলাচল হয় তার ডলা থেকেও এই বেআইনী কয়লা উত্তোলনকারীর দল কয়লা কেটে নিয়েছে। যে কোন মূর্ত্তে ওই রেল লাইন ধসে যেতে পারে। এটা হয়েছে শিবপুর গ্রাম সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত খাদে।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা এই বেআইনী কয়লা উত্তোলক সংস্থার ঠিকাদার ও ডিপোমালিক হিসাবে পরিচিত। বেনারসী আগরওয়াল, মহাবীর ভোকাণিয়া, মাতুরাম মহালিয়া, শেখ জতিক, শেখ আমির, মতি, লামা সিং, হুগাঁওয়াল মণ্ডল, রহিম মিল্লী, পরিহারপুর গ্রামের কুখ্যাত সমাজ বিরোধী শেখ খালেক ও তার সাগরেবরা এবং শেখ খালেক সহ আরও অনেকে।

ওরাকেকহাল মহলের ধারণা যে, এই ঘটনা নিয়ে যদি উপযুক্ত তদন্ত করা হয় তাহলে এই বেআইনী কারবারের সঙ্গে যুক্ত এমন সব ব্যক্তির নাম প্রকাশ পাবে যারা সমাজসেবী হিসাবে নিজেদের দাবী করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত করলে কিছুই হবেনা। কেননা ওপরতলার দারা বলে আছেন তাঁদের জ্ঞাতসারেই এই ঘটনা ঘটছে। টাকার ভাগ মালিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। এবং এই সব লেনদেনের স্মিটিয়েটার নাকি একজন প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য। আজ তিনি কয়েক কোটি টাকার মালিক। অথচ তিনি রাজনৈতিক জীবন তরু করেছিলেন একদম নিখ অবস্থায়।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলিতে তীব্র সাংগঠনিক সংকট

দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সাংগঠনিক সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। বর্তমানে শাসন ক্ষমতার আদীন ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যেও সাংগঠনিক সংকট ইদানীং প্রকট।

জনতা পার্টি আজ বহু বিতর্ক। জনতা (জে পি), লোকদল, আর্প কংগ্রেস দলের অবস্থা এখন প্রায় মিউজিয়ামে যাবার মত। রাজ-নারায়ণের জনতা (জে) এবং জনতা (জে) জন্মই নিয়েছে। বাড়েনি। মাত্র চারমাস বয়স্ক ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্য কোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দেশের বাসবাসী দলগুলির সাংগঠনিক সংকটের কথা-বাইরে বের হয় কম। তাই তা জানা যায় না। সম্প্রতি সি পি আই দলে ভাঙ্গন হয়েছে। জন্ম নিয়েছে আরও একটি কমিউনিস্ট দল। এদিকে সি পি এম দলেও সাংগঠনিক রহস্যময় চলছে। শোমা যাচ্ছে বেশ কিছু নেতাকে সি পি এম থেকে বহিস্কার করা হবে। এদিকে মার্কসবাদী ফোরাম নামে আরও একটি সংগঠন গড়ে উঠছে। মকশাসপত্রীদের বহু গোষ্ঠী নিজেদের আসল সি পি আই (এম-এল) বলে দাবি করছেন।

দেশের জাতীয় রাজনৈতিক দল-

গুলিকে কেন্দ্র করে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোন দলেই বর্তমানে গণতান্ত্রিক দলীয় কাঠামো বজায় নেই। ইন্দিরা কংগ্রেসের কথাই ধরা যাক। সে দল বিগত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। এ আই সি সি এবং তাঁর সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী এখনও পর্যন্ত দলের সংগঠনের দিকে মনো দিয়ে উঠতে পারেন নি। বহু ই-কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের দলীয় কমিটিতে পূর্ণ দায়ের সভাপতি নেই। দলের মধ্যকার গোষ্ঠীত্ব বর্তমানে তীব্র হয়ে উঠেছে। দলে যদি ভাঙন দেখা দেয় তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

বিশেষ করে সত্তর গান্ধীর মৃত্যুর পর দলের আন্তর্জাতীয় কোন্সল তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইন্দিরা কংগ্রেস দলের মধ্যে এখন দুটি শিবির। একটি লক্ষ্যপন্থীদের এবং অপরটি লক্ষ্য বিরোধীদের।

বর্তমানে ইন্দিরা কংগ্রেস দলটি একক বৃহৎ দল হলেও দলের বা অবস্থা তাতে কতদিন যে এই দলের গরিষ্ঠতা বজায় থাকবে তা চিন্তার বিষয়। ইন্দিরা গান্ধী ও এ বিষয় নিয়ে লবিশেষ চিন্তিত।

কিন্তু হঠাৎ এই স্বর্গরাজ্যে অশান্তির স্রোত জলপত ২১শে জুলাই। গুলি চালনার পর এই বেআইনী খনিমুহুর ঠিকাদার বলে পরিচিত পরিহারপুর গ্রামের কুখ্যাত সমাজ বিরোধী শেখ খালেক দলবল নিয়ে ইন্টার্ন কোলফিল্ডের নিরাপত্তা অফিসার ঈরাওয়ের বাসভবনে হামলা চালায়। সম্ভবত কোন পণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। জানিমা এত বড় ঘটনার কথা রাজ্য সরকারের জানা আছে কিনা।

বেআইনী এই কয়লা উত্তোলনের খবর রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। কেননা কয়েক হাজার প্রমিক এই সব পরিত্যক্ত কয়লা খাদ ও খাদান থেকে কয়লা তোলার কাজে নিযুক্ত আছেন। প্রকাশে ডিপো মালিক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিরা টিকে কয়লা বোঝাই করে দিচ্ছেন এবং নকল চালান ধরিয়ে দিচ্ছেন। এই সব বেআইনী ডিপো মালিকদের সঙ্গেই সি এলের নিরাপত্তা অফিসার ঈরাওকে প্রকাশে খোঁস পর করতে দেখা গেছে। জামুরিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ ও পদাধিকার বলে বেআইনী এই পুলিশ কোল কোম্পানী লিমিটেডের চেয়ারম্যান কে ও প্রকাশ্যেই ভৎকর্তৃক নিযুক্ত ডিপো মালিকদের সঙ্গে হিসাব মিকাশ

বিদ্যুৎ তৈরীর অভিনব প্রক্রিয়া

কোন প্রকার জালানীর ব্যবহার ছাড়াই অল্প খরচে সহজে বিদ্যুৎ তৈরী করার এক অভিনব প্রক্রিয়া বের করেছেন পি, এণ্ড টি কর্মচারী ঐহুসালচর শীল। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঐশীল তাঁর প্রকল্পের বর্ণনা দেন।

ওকটা জলের ট্যাঙ্কে বারো লক্ষ গ্যালন জল থাকবে। তার পাশে আর একটা ট্যাঙ্কে দশ গ্যালন জল থাকবে। এবং সেটি মাটি থেকে একশো মিটার উপরে থাকবে। জল যেম প্রথম ট্যাঙ্ক থেকে দ্বিতীয় ট্যাঙ্কে আসতে পারে। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের তলার ৫ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটা নল থাকবে। যার থেকে ১০

বাসের ৫০,০০০টি মল বেরিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে বৃত্ত হবে। এই নলগুলোর ভিতরে জলের চাপে প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে জেনারেটর বোয়ানো সম্ভব। যার ফলে আলো জলবে, পাখা ঘুরবে।

আবার প্রত্যেক বাড়ী থেকেই ঐ জল বেরিয়ে এসে ঘুরে প্রথম ট্যাঙ্কে ভর্তি হবে। অবিরাম এই প্রক্রিয়া চলবে।

ঐশীল তাঁর এই প্রকল্পের পেটেন্ট করানোর জন্য ভারত সরকারে কাছে বহু চিঠি লেখালেখি করেছেন, কিন্তু কেউ কর্পাসত করেনি।

সি পি এমের উদ্যোগে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ইউনিয়ন ভাঙছে

আজ থেকে ৩৪ বছর আগে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ধ্বংস করে শেষ হয়েছে তখন থেকে ধীরে ধীরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খেয়ে গড়ে ওঠা লড়াই প্রতিষ্ঠা স্বল্পকালীন অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীস অ্যাসোসিয়েশন (এ আই বি ই এ) এই প্রথম বিঘ্নিত হতে চলেছে। বলা বাহুল্য এক্যবদ্ধ সংগঠনটির মধ্যে লক্ষ্য রাষ্ট্রনৈতিক দলভুক্ত সভ্য ও কর্মকর্তাই আছেন এবং সি পি এম লক্ষ্য সভ্য ও কর্মকর্তাদের এই বিভেদ পরিকল্পনা তীরা একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের মতে ক্রটি-বিচ্যুতি লক্ষ্যে যে কোন অর্থনৈতিক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই সংগঠনটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এক দাবীকারে তাঁরা বলেন যে, যখন উদ্ভেদ প্রাণোদিতভাবে উৎপাদন কর্মতার সম্পূর্ণ লব্ধ্যবহার হচ্ছে না, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেকারী বেড়েই চলেছে, ক্ষত-গতিকে মজাদাকীতি বটছে, ব্যাপক লোক-আউট, লে-অফ, হাটাই ও তার লক্ষ লক্ষ কালো টাকার দাপট বাড়ছে, যখন বৈয়াক্তিক বেসামাল হয়ে গিয়ে চূড়ান্ত আক্রমণের ফলি আটকে এবং ঠিক এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে যখন একটি বায় ও গণ-তান্ত্রিক এককের উজ্জল সভ্যবনা দেখা দিয়েছে, তখন বিভেদ সৃষ্টির অর্থ হলো কায়মী স্বার্থকে সচেতনভাবে সাহায্য করা। এ আই বি ই এর সদস্যরা অভিযোগ করেন যে, বিভেদ-কারীরা ইতিমধ্যেই ইউকো ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড গবেষণা বা পান্টা ইউনিয়ন গঠন করে এক্যবদ্ধ আন্দোলনে

কাটল ধরিয়েছে। এছাড়াও এই লক্ষ্য বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিগত কয়েক বছর ধরে ব্যাঙ্ক কর্মীদের যৌথ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত বহিস্কৃত দাবী হাওয়া নিয়ে ১৫-১৫ করে কার্যতঃ স্বত্বাধীন হয়ে চলেছে।

উদাহরণ ১৯৭১ সালে গ্রিগোলস ব্যাঙ্কের দারা ভারতবাসী ১২ দিন ধর্মঘটের কলিকতা তাম্বেরই আত্মসম-রীণ চক্রান্তের ফলে নেতিবাচক হয় এবং এই সংগ্রামে পুরোপুরি পরাজিত হবার ফলে বোম্বাইয়ে দুজন কর্মী বরখাস্ত হন এবং আরো পনেরো জনকে তালিকাভুক্ত করে রাখা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিগত আন্দোলনও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় এবং যে অটোমেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল সেই অটোমেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে শেষ পর্যন্ত চালু হয়েছে এই সময় স্বত্বাধীনতার ফলে।

বরোদার অস্থিতি এ আই বি ই এর দুইবিশ্যণী অস্থিতি গৃহীত এক প্রস্তাবে বিভেদপন্থীরা এ আই বি ই এর বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে যে কেস করেছে সে কেস তুলে নিতে বলা হয় এবং বহুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে বিট্টরে নিয়ে নতুন করে এক্যবদ্ধ হবার জন্ত উত্তাপ গ্রহণ করতে আন্তরিক আহ্বান করা হয়। কিন্তু শত চেষ্টা লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতা অমিবার। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নপন্থীরা নিবিড় (সি আই বি ই ইউ) নামে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করবেন।

বহুগুণা মহৎ লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে সফর করে বেড়াচ্ছেন

জনতা ভাণ্ডার অস্ত্রতম নায়ক ও কখনও ইন্দিরাসেনী কখনও ইন্দিরা বিরোধী হেরবতি নন্দন বহুগুণা আবার সর্বভারতীয় রাজনীতির সামনে এগিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। বারি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন এক হয়ে যাতে ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জাতীয় দল গড়ে তুলতে পারে দেয়ত্ব তিনি এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ অঙ্গপ্রদেশ মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু করল উত্তরপ্রদেশ বিহার ও রাজস্থানে সফর করেছেন। এবং

আরও ব্যাপকভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে সফরের অঙ্গ প্রস্তুত হচ্ছেন। এসময়ে নতুন বাম ও গণতান্ত্রিক দল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকে বোঝাতে পেরেছেন বলে তিনি খুব উৎসাহিত হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতির তিনি জানিয়েছেন, যেখানে যেখানে তিনি গেছেন সেখানেই বেশ ভাল লাড়া পেয়েছেন। আর তাঁর উদ্দেশ্য যে সফল হবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছেন। শেষাংশ ৪৪ পৃষ্ঠার

তৈল আহরণে বিদেশী কোম্পানীদের আমন্ত্রণ

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

আমরা কি স্বাক্ষরিত তৈল আহরণ করতে গিয়ে দেশের সাধারণ নীতি-গুলি বর্জন করতে চলেছি? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এদেশে তৈল আহরণ ও আহরণের ক্ষেত্রে বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলিকে সাহায্য করার যে আবেদন জানিয়েছেন তা থেকে অল্প কোন ধারণা হয় না।

আমাদের দেশে স্বাক্ষরিত নীতি তৈল সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে ব্রিটিশ আমলে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেই এক বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট তৈরী হয়। ব্রিটিশ শাসকেরা এই রিপোর্টটিকে গোপন করে বাহ্যিক পাঠিয়ে দেন। কারণ ব্রিটিশ তৈলস্বার্থ এটা বাহ্যিক বলে মনে করে নি। ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম এলাকা থেকে আগাম ও গাঙ্গের উপত্যকা পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে তৈল সম্পদ মজুত বলে ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ বিশেষজ্ঞ রিপোর্টটি নাকি এখন বোম্বাই। পরে আসামে তৈল পাওয়া গেছে, শিলচরের মাসিমপুর ও আসামের ভিগবরে কিছু কিছু তৈল আহরণের চেষ্টা হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের রাণীগঞ্জ অঞ্চলেও তৈলের মজুত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা এই তৈলখনিগুলি থেকে তৈল উত্তোলনের চেষ্টা করেনি।

স্বাধীনতার পর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঐক্য, করলা থেকে তৈল উৎপাদন, খনিজ তৈলের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে তার অসংখ্য উপ-জাত বোঁগ ও রাসায়নিক বস্তু উৎপাদনের সামর্থ্য প্রমাণিত হয়। ফলে দারা ছিন্নরা জুড়ে তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আমাদের জাতীয় সরকার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের এক জাতীয় নীতি স্থির করেন। তদুপরি ভারতের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় জাতীয়িক লক্ষ্যী দপ্তরের সঙ্গে একযোগে ঐ কমিশন দেশের বিভিন্ন এলাকার তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। কাষে উপত্যকা, আন্দোলেশ্বর, আসামের জুলিয়াজান-নাহারকাটিয়া ও শিবসাগর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব্য পাওয়া যায়। সব চাইতে উল্লেখ্য আবিষ্কার বোম্বাই হাই বা বোম্বাই থেকে কিছু দূরে আরব সাগরের গর্ভে তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কার ও বৈদিক প্রায় লক্ষাধিক ব্যারেল তৈল আহরণের সুবন্দোবস্ত। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইনজিনিয়ার-দেরাই এই বিরাট প্রযুক্তিগত লক্ষ্য অর্জন করতে লক্ষ্য হয়েছেন। আজ তৃতীয় ছিন্নরার বহু দেশই তৈল

সম্পদ আহরণে ভারতের কারিগরী সাহায্য গ্রহণ করেছে।

অথচ গড লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকার অসংখ্য আমাদের জাতীয় নীতিকে পরিত্যক্ত করে ভারতের তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের ক্ষেত্রে বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলির সাহায্যের প্রার্থী হলেন কেন তা নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

ভারত সরকার যুক্তি দেখাতে চেয়েছেন যে তৈল ও গ্যাস আহরণের জরুরী প্রয়োজন যেটানোর ক্ষেত্রেই তারা বৈদেশিক বহুজাতিক কোম্পানীগুলির শরণাগত হয়েছেন এ যুক্তি ধোঁপে ঢেকে দা।

বৈদেশিক কোম্পানীগুলি ইতি-

আহরণ

পূর্বে তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকবারই যে চুক্তি করেছিলেন তা একতরফভাবে বাতিল করেছে। ঐনজাক, বার্মাশেল ও ক্যালটেন্স দল্লারি তৈল আহরণের উপযুক্ত প্রযুক্তিবিজ্ঞান হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছে। আজ যখন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞা সমগ্রগর্ভ থেকে তৈল আহরণের সামর্থ্য অর্জন করেছে তখন তারা কেন ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি করতে চাইছে? আমাদের আশঙ্কা যে ভারতের তৈল সম্পদ আবিষ্কারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করাই তাদের গোপন উদ্দেশ্য। তৈল অহুসন্ধান ও আহরণের চুক্তি সম্পাদনে সময় লাগবে, ইতিমধ্যে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন বড় ধরনের কোন কাজে হাত দিতে পারবে না। সুতরাং ভারতের তৈলভাণ্ডার আগের মতই জাতীয় স্বার্থে লাগানো সম্ভব হবে না।

কারিগরী জ্ঞানের যুক্তিও অবা-স্তব। বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি নিশ্চিত লাভের আশা না দেখে কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তর করেনা। এর আগেও আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন জিপুরা, অরুণাচল, মাদ্রা-লাও, আন্দামান ও মহানদী বর্ষীপ অঞ্চলে, অঙ্গপ্রদেশে এবং আরব ও বঙ্গোপসাগর সমুদ্র উপকূলে বিরাট ভাবে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের হরিষ পাবার পরই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি পরিবর্তন ও বৈদেশিক সহ-যোগিতার আহবান আমাদের মত

অনেকেই লক্ষ্য ও লক্ষ্যের সৃষ্টি করেছে।

আমাদের বিজ্ঞানী ও ইনজিনি-য়ারেরা দক্ষ ও কৃশলী। অল্প বহুদেশ তাদের সাহায্য চাইছে। তৈলসম্পদ খননের আগে যে জাতীয়িক লক্ষ্যী প্রয়োজন তারও অগ্রতুল্যতা নেই। আমাদের তৈল, সি পি সি এল প্রভৃতি সরকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছে। বোম্বাই হাইএ তৈল আহরণের ১০ শতাংশ যন্ত্রপাতি এদেশে মকশা করা হয়েছে ও তৈরী করা হয়েছে। বাকী ১০ শতাংশ তৈরীও মকশা করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা যদি খুব জরুরী তৈল অহুসন্ধান, আহরণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করতে চাই, তাহলে একমাত্র দেশীয় সজতির সাহায্যই তা করা যেতে পারে। তাহলে কেন কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ এই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করলেন। তৈল ও রসায়ন দপ্তরের সূত্রে বলা হয়েছে যে এই ব্যাপারে লক্ষ্যী অতাবই নাকি প্রধান বাধা। তাই বিদেশী সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। এই যদি কারণ হয়, তাহলে এই যুক্তি অহুসন্ধান করে কেন্দ্রীয় সরকার একদিন হয়তো প্রতিরক্ষার কোন দায়িত্ব বিদেশীকে হাতে তুলে দিতে চাইবেন।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তৈল শিল্পে বিনিয়োগ ব্যাহত হতে পারে না। কারণ এর অধিকাংশ খরচই দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করা হয়। যেখানে তৈল আমদানী করতে বছরে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লাগে, সেখানে আমরা বছরে ৩০০ কোটি টাকা লক্ষ্যী করতে পারি না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বৈদেশিক কোম্পানীগুলির সঙ্গে কোন গোপন বন্দোবস্ত কোন কর্তব্যাক্তি বা অহু-গৃহীত লোকেরা করেছে কি না এখনই দেশবাসীর সেই দিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অসংখ্য নীতি-বদলের পেছনে এমন একটা ব্যবহার অস্তিত্ব থাকে অসম্ভব নয়। ইতি-পূর্বেও আমরা এরকম দেখেছি।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
বার্ষিক ৩০ টাকা
বাৎসরিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা
টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা
ম্যানেজার, দুর্পণ
৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

সিগারেটের বিজ্ঞাপন

ক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ

“সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের কতিকর” এই সত্যকথাটা সবেও তামাক কোম্পানীগুলি জনসাধারণের মধ্যে তাদের পণ্যাদি বিশেষতঃ সিগারেটপানের কুঅভ্যাস যাতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে তার জন্যে কোন কিছু করতেই পশ্চাৎপদ নন। ইদানীং প্রত্যাশাজী সংবাদ-পত্রগুলিতে নানাভাবে ভারতীয় যুবক-যুবতীদের প্রতিরূতি সিগারেটের বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের সাধারণ ছেলেমেয়েরা ধূমপানের প্রতি যাদের স্বাভাবিক অনীহা রয়েছে তাদেরও এইভাবে মাদক সেবনের কুঅভ্যাসের দিকে আকৃষ্ট করা বাবে এবং তারা এই অভ্যাসের দাসত্বে পড়ে পারাচীবন ধরে তামাক কোম্পানীগুলির কোবাগারে সেলামী দিতে থাকবে। একবার এই ধূমপানে অভ্যস্ত হলে ধূমপারী তাহাকে তার স্বাস্থ্যের ও সুখের যতই হুমকি বলে বুলুক, ধূমপানে তার কত মোটা টাকা অপচয় হতেছে—এ

সকল যতই স্মরণ করুক না কেন ধূমপান ত্যাগ করার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তি খুব অল্প ক্ষেত্রেই তার মধ্যে দেখা যায়।

অন্ত কথায়, তামাক ব্যবসায়ীদের জন্যে অবাধ উদ্বোধীদের মুখা বাড়াবার জন্যে আমাদের দেশে শত সহস্র কিশোর কিশোরীদ্বিককে উদ্বোধন ব্যবসায়িক লালসায় ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

“ধূমপান একদিক দিয়ে মস্তপান অপেক্ষা অধিক কতিকরক : কারণ ধূমপানের কুফল সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় না। অভ্যাসটি অসত্যতার নিদর্শন হিসাবেও পরিগণিত হয় না। সত্য সমাজে বয়ঃ ইহার সমাদর করা হইয়া থাকে। আমার একমাত্র বক্তব্য, বাঁহারা পারিবেন, অভ্যাসটি পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।” (মহাত্মা গান্ধী—ইয়ং ইন্ডিয়া, ৪-২-২৬)

আমার মনে পড়ে বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক ডক্টর প্রমুখরায় বিশেষ করে ছাত্র সমাজের মধ্যে এই কুঅভ্যাসের বিরুদ্ধে অবিরাম কত প্রচারণা চালায়ে গিয়েছেন।

প্রথমত ধূমপানকে একটি নোংরা কুঅভ্যাস বলে স্বীকার করতে হবে। তবেই এই কুঅভ্যাস দূর করার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। পরিবারের অন্য যারা রোগগ্রস্ত করেন তারা অনেক সময় পোস্তদের খাওয়া পড়ার জন্যে যে অর্থ ব্যয় করেন তার তুলনায় নিজেদের তামাকের জন্যে অনেক বেশী খরচ করে থাকেন। আর্থিক দিক দিয়েও ইহা একটি বড় অপচয়।

হুর্ভাগ্যক্রমে, আধুনিক বিজ্ঞাপন অর্থকরী মালিকদের অস্থগামী। অর্থশালী মালিক যদি সামাজিক অহিতকারী কোন ব্যবসায়ের লিগু থাকেন তবে তার বিজ্ঞাপনও অহিতকারী হয়। বিজ্ঞাপন দাতার কুশলতা যত অধিক এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন তত অধিক হানিকর হয়।

সংবাদপত্রের পরিচালকদের উচিত কি এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশে সম্মত হওয়া? তারা নিজেদের জনসেবক বলে প্রচার করেন এবং এই

অজ্ঞাতে ব্যাপক স্বাধীনতা দাবী করেন। কিন্তু এইরূপ শক্তাপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রচারের দ্বারা জনকল্যাণ লাভিত হয় কি?

দেশের সরকারই বা কোন নীতিতে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ বন্ধ করেন না? যদি তারা সিগারেটকে স্বাস্থ্যের পক্ষে সত্যই কতিকর বলে স্বীকার করেন, তাহলে কেন তারা সেই কতিকর পণ্যের প্রচার বন্ধ করবেন না? “সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতিকর”—এই সত্যকথাটা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অবশ্য প্রচার

—এই আইন করেই কি তাঁদের কর্তব্য শেষ হবে? তারা দেখবেন না যে, সিগারেট ব্যবসায়ীরা এই সত্যকথাটা এমনভাবে ছাপার ব্যবহ করেন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যাতে এটি একটি হালিসি ব্যাপার বলে মনে হয় কিংবা যাতে এটি সম্পূর্ণ নজর এড়িয়ে যায়। শুধু বুদ্ধি করে কোনও কুঅভ্যাস বন্ধ করা যায় না। বয়ঃ বাড়তি আয়ের লোভে সরকারই সেই কুঅভ্যাসের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়ে পড়ে। সিগারেট সেবনের কুঅভ্যাস রোধে সরকারী ওদানীত ইহার অসম্ভব নিদর্শন।

রাজ্য বিদ্যাৎ পর্ষদের টেকনিক্যাল

সুপারভাইজিং স্টাফের আন্দোলনের পথো

রাজ্য বিদ্যাৎ পর্ষদের টেকনিক্যাল সুপারভাইজাররা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া আদায়ের দাবিতে আন্দোলনে মেমেছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ টেকনিক্যাল সুপারভাইজারদের দের দ্বারক-লিপির ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশ দাবীগুলি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হওয়া সবেও দেওলো আজও কার্যকর করা হচ্ছে না। এর ফলে উক্ত সুপারভাইজারদের মধ্যে তীব্র অনন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা গত মার্চে পর্ষদের বিভিন্ন আকস্মিক করে বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্ষোভ দেখান।

১লা এপ্রিল, ১৯৭৪ থেকে প্রদেয় ভাত্য চুয়াল্লিশ মাসের বকেয়া বেতন আজও কর্মীরা পান নি। ওয়েল কমিটির ক্রটি বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরা সবেও বেওলো প্রতি-বিধানের জন্য কোন ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি।

মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতার ২০% বরাদ্দা ভাতা বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা, চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধে বৃদ্ধি, হুটিকালীন প্রমদের সুবিধে প্রদান/অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত ভাতা, বিদ্যাৎ ভাতা, পার্বেতা ভাতা—ইত্যাদি বিষয়-গুলোর কোনও সুরাহা হল না। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা নন ডিগ্রোয়া এল, এ, ই, (সিভিলদের) আজও এ, ই, দমতুল পদে প্রমো-শনের কোন ব্যবস্থা হল না। গত চুবাভর থেকে লাব এলিসট্যাট ইন্জিনিয়ার ও শৈশব সুপারের পাঁচশোটি পদ খালি পড়ে আছে।

এ সব অভ্যাস অবিচারের প্রতি-বাদে একশটি দাবির ভিত্তিতে ১০ সেপ্টেম্বর উক্ত সুপারভাইজারদের

একমাত্র সংগঠনের বারোশত সমস্ত গণছুটি নিয়ে কলকাতায় হাজরা পার্ক থেকে মিছিল করে মোমিনপুরে পর্ষদের সদর দপ্তরে ও শিলিগুড়ি চিলড্রেন পার্ক থেকে উত্তরবঙ্গ অ্যাভি-শনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে টেকনিক্যাল সুপারভাইজিং স্টাফ এসোসিয়েশনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক বিশ্বরূপ মহম্মদার উক্ত তথ্য জানান।

বহুগুণা

এম পৃষ্ঠার পর

দেশের ছর্দিনে আজ রাজনৈতিক মেতা ও দলের উপর জনসাধারণ তিতবিরক্ত হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, দল ও মেতাদের কাজকর্মে তাঁরা যেমন হতাশ হয়ে পড়েছেন তেমন বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না দেখে কানর উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। অবিদ্যাস এবং ঘূণার দৃষ্টিতে তাঁরা যেভাবে চেয়ে আছেন তার হাত থেকে পরিভ্রাণ পেয়ে, কি ও সব অবহেলা করে যা খুশি তাই করার দ্বিম ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে। এবং একটা পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই সময়ের চেউ বুকে জনগণের মধ্যে আস্থা কিরিয়ে আনতে বারাকাজে মেমে পড়েছেন বহুগুণা তাঁদের তিতর দিয়ে তাঁর পথ করে নিতে চলেছেন।

এই ধারণা যেসব রাজনীতিকীবীর হয়েছে তাঁরা সত্যকভাবে লক্ষ্য রাখছেন, বহুগুণাকীর উপর রাশিয়ার আশীর্বাদ কতখানি রয়েছে। আর কোন নির্দেশ মত তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।



আপনার জীবনের কোনো কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই ইউকোব্যাক্সের জন্য

যন্ত্রগাতি নিয়ে খেলতে পারলে ও আর কিছু চায়না। আগনি নিশ্চয়ই চান ছেলে আগনার বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হোক।



আপনার ভাবনার সেই স্মরণীয় মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমরা সাহায্য করব।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওর সব খেলাই যন্ত্রগাতি নিয়ে। কখনো প্লিউ দিয়ে পুতুল হাটায়, কখনো ক্রেন চালায়। আবার কখনো আপনার দেওয়া মেকানোসেট দিয়ে কিছু তৈরি করে? এমনই কোনো মুহূর্তে ওকে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে কি করে ওকে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার করা যায়। বই কেনার টাকা অথবা কলেজের বেতন যেন কোনো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

অথচ সমস্ত তো মাত্র ওকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন আর মাস পেলে মাইনে।

অবশ্য এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আছে ইউকোব্যাক্স। মাসের খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু বাঁচতে পারেন, তাই নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। ইউকোব্যাক্সের দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প আপনার কাজে আসবে।

যে মুহূর্তে আপনি স্থির করলেন আপনার ছেলে বড়ো কিছু হবে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যতের সূচনা। আপনার জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাক্স আপনার সঙ্গী।



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমান

উত্তর বিহারে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে

কানু সান্যাল

সম্পাদক কমিউনিষ্ট, বিপ্লবীদের সংগঠনী কমিটি

আমি সম্প্রতি উত্তর বিহারের কোম কোম অংশে ভ্রমণসম্বন্ধে গিয়েছিলাম। এই ভ্রমণ আমাকে উত্তর-পশ্চিমে মুজফ্ফরপুর, বৈশালী ও পশ্চিম চম্পারণ এবং উত্তর পূর্বে পূর্ণিয়া জেলাতে নিয়ে গিয়েছিল। এই সব এলাকার শোষণ ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো এবং জন-সাধারণের বেহুনারাজ্য পরিস্থিতি আমার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে বললে কম বলা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রের বিষয় এটাই যে এই এলাকা-গুলির স্থানীয় জমিদারেরা পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে কৃষকদের ওপর রীতিমত এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

যদিও সেই ১৯৫১ সাল থেকেই বিহারে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন চালু হয়েছে এবং যদিও বর্তমানে প্রত্যেক মালিকের জমি একটি বন্ধে নিয়ে আশার জ্ঞান প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও এই জমিদারেরা ২০০ থেকে ৫০০০ হাজার একর অবধি জমি নিজ দখলে রেখে চলেছে। মেহমতি জনগণকে শোষণ করার জন্য এদের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কারখানা। তাদের কারখানা ও জমি বড়ক মেওরা হল এই সব শোষণের তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত রূপ। যে সম্পত্তি তাদের ইতিমধ্যেই রয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে ওই জমিদারেরা নিজেদের লশস্র বাহিনী তথা সরকারী পুলিশের সাহায্যে গ্রামীণ চাষীদের জমি গায়ের জোরে কেড়ে নেয়। বখাসময় টাকা শোধ করা হলেও তারা বড়কী জমি কেন্দ্র দেয় না এবং এমন কি এ সম্পর্কে আদালতের নির্দেশ পর্বত উপেক্ষা করে। একমাত্র পশ্চিম চম্পারণ জেলাতেই এরকম প্রায় ১০০ ঘটনা আমার নজরে পড়েছে।

এরকম অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে সরকার কর্তৃক গরীব চাষীদের খান জমির পরতা নিয়ে দেওয়া নথিও তাদেরকে জমির দখল দেওয়া হচ্ছে না। জুহান বজের সময় জমিহীন-দের যে জমি দেওয়া হয়েছিল তাও এই শক্তিশালী জমিদারেরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বটাই-দার (ভাগচাষী)দের ক্ষমগতভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ এর জন্য কোন প্রশাসনিক সহায়তা তারা পান না। প্রায়ই তাদের নাথ্য ভাগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা

হয়। কোন বটাইদার এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে অতি অবশ্যই তাকে উচ্ছেদ করা হয়।

এমন কি জাতীয়করণ হয়ে যাওয়া ব্যাঙ্কগুলিও এই সব এলাকার শোষণের ভূমিকা পালন করেছে। কোন কৃষক দরিদ্রতার কারণে ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে না পারলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নির্মমভাবে তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। এরকম একটি ঘটনার একটি লোক জেলে যাবার ছদ্মবেশে 'মধ্যেই সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এই কারণে যে লোকটি অনাহারের কলে মরে যাবার সম্ভাবনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বাড়ি ফিরে আসার পরেই মারা যায়।

বলাই বাহুল্য যে এরকম নৃশংস পরিবেশে মেহমতি জনসাধারণের কষ্টের আর কোন সীমা নেই। বটাইদাররা ছাড়া জমিহীন ক্ষেত-মজুররাও এক জঘন্য ধরনের মধ্যস্থতী শোষণের শিকার হয়ে রয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কঠোর শ্রম করে তারা মজুরী পায় মাত্র ১ প্রেকে ৩ টাকা। এই অল্প টাকার তাদেরকে বেঁচে থাকতে বলা হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন সকল জিনিসের দ্রাঘি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। এরকম হাজার হাজার পরিবারের মাথার ওপর কোন ছাদ নেই এবং পথের ধারে খোলা আকাশের নীচেই থাকতে তারা বাধ্য হয়। বৈশালী জেলার পাওরা গ্রামেই আমি ১০০ পরিবার দেখলাম যারা গ্রামের রাস্তার ওপরই ৫'x৪' স্থপতি বানিয়ে থাকছে। এদের মধ্যে নারায়ণ মাঝি নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হল, যে দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে। এখন সে ক্ষেত মজুর হিসাবেই কাজ করছে। বেদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় ঠিক সেদিন-টিতেও যে অভুক্ত ছিল।

ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থাও খুব একটা ভাল নয়। এ বছর কৃষকরা আলু ১৯ টাকা মণ দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এবং ঠিক এই মুহূর্তে পূর্ণিয়াতে পাট বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৬০ টাকা কুইন্টাল দরে। শহরের মানুষকেও অর্থনৈতিক চরমভাৱে ভুত ভাড়া করে বেড়াচ্ছে। মোতিপুর শহরে একটা চিনির কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার কলকাতা নিবাসী মালিক গত ৮ মাস ধরে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মেটাতে

অস্বীকার করেছে। দেড় হাজার শ্রমিক তাদের পরিবার নিয়ে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকার শ্রমিকদের বলেছেন তারা যেন হিংসার আশ্রয় না নেন।

বস্তুত যখনই এই লুটপাট ও সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণ প্রতিবাদে মুগ্ধ হয়েছেন, তখনই প্রশাসন ঠাণ্ডামাথার জমিদার, মহাজন ও অন্যান্য শোষণকারী পক্ষ অবলম্বনের লিঙ্কাল-নিয়চ্ছে। ১৯৭৯ সালের ১৪ই আগস্ট এক কৃষক সংগঠক কমরেড লাক্ষ্মন দেওয়ামকে খুন করা হয়। খুন করে গদোজী সিং নামে এক কুখ্যাত জমিদার, যার বাড়ি মুজফ্ফরপুর জেলার পারু থানার বিশেনপুর সরাইয়া (দেওয়ানী কোঠা) গ্রামে। এই লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই সে জামিনে বের হয়ে আসে। গদোজী সিং বিজয়ী বীরের মত গ্রামে ফিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কমরেড শিবলাল রামকে খুন করার এক বড়প্রস্তুত করে দেয়। ১৯৮০ সালের ৭ই এপ্রিল সিং ও তার সাদো-পালোরা কমরেড রামকে মারতে যায়। কিন্তু তাকে না পেয়ে তারা অকল প্রধান কমরেড বৈনাথ রায় ও তার ভাগ্নে রঘুংশ রামকে গুলি করে আসে। এরা দুজনেই মারা যায়। এবারে ধরা পড়লে গদোজী সিং মাত্র দুমাসেই জামিন পায়। এই ঘটনাকে ক্রমহাস্যবান জেলে যাওয়ার নিয়ম বলেই সম্ভবত বর্ণনা করা যায়।

এই অপরাধটিকে যে কেবল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু গ্রামবাসীর বিকোভের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য একটা পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাকে সব রকমভাবে সাহায্য করার জন্য পুলিশ আমাদের স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ২০টি কোজদারী মামলা দায়ের করেছে। কৃষক সংগঠনের বিরুদ্ধে তারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪, ১০৭, ও ৩০২ ধারা এবং গুণ্ডা আইনের ধারা ১৪৬ চালাওভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এবছর আমাদের কিছু কর্মী কমরেড লাক্ষ্মন দেওয়ামের স্মৃতিতে নির্মিত শহীদ বেদিটি সংস্কার করতে গেলে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৭ জনের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার মামলা দায়ের করা হয়। অল্পরূপভাবে গত ১৬-৮-৮০ তে কমরেড শিবলাল রাম একটি জনসভায়

বক্তৃতা দিতে গেলে তাকে ও আচা ১০ জনকে গুণ্ডা আইন অহুয্যী গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে গদোজী সিং ও তার দলবলের আক্রমণের প্রধাম লক্ষ্যবস্তুই হলেন কমরেড শিবলাল রাম এবং এই মুহূর্তেই বখা-বখ ব্যবস্থা না নিলে যে কোন দিন তিনি খুন হয়ে যেতে পারেন।

আমি বিশেষ করে অবাক হলাম রায় প্রশাসনের বড় বড় অফিসার-দেরও গদোজী সিংকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাথা নিচু করতে দেখে। ১৫-৮-৮০-তে কমরেড লাক্ষ্মন দেওয়ামের শহীদেয় মুহূর্তবরণের প্রথম বাৎসরিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক জন-সভায় আমার ভাষণ দেবার কথা ছিল। গদোজী সিং-এর নির্দেশে মুজফ্ফরপুর শহরের এস ডি ও ৭ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৪৪ শেবাংশ চর পৃষ্ঠায়

ধারা জারী করে দেন যাতে আমি বক্তৃতা না দিতে পারি। এধরনের বক্তৃতা জনক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এং শহীদবেদীতে মাল্য দেবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে আমি থানায় যাই। সেখানে গিয়ে আমি দেখি যে এস ডি ও, ডি এস পি এবং বড় বড় সরকারী আমলারা গদোজী সিং-এর সঙ্গে বসেই চা খাচ্ছে। এই সব স্থানীয় জলজোকা আমাকে অপেক্ষা করতে অহুরোধ করেন যাতে আমার যাওয়ার ব্যাপারে গদোজী সিং-এর কাছ থেকে তারা "প্রয়োজনীয় অহুযতি" নিতে পারেন। এই সমগ্র বিষয় সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি লিখেছি।

সবুজ কলকাতা (৩)

কিছুদিন আগে থেকে আমরা একটা প্রচার অভিযান শুরু করি যার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাকে একটু সবুজ করা।

প্রতিষ্ঠানগতভাবে কলকাতা কর্পোরেশন, সি, এম, ডি, এ, সি, আই, টি, এবং পি, ডব্লু, ডি, বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছেন এবং লাগাচ্ছেন।

জনগণের কাছে আবেদন করেছিলাম যাতে তাঁরাও সক্রিয়ভাবে গাছ লাগাতে এবং গাছ বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। উৎসাহজনক সাড়া পেয়েছি ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কিন্তু বীরা বড় তাঁরা আমাদের বলেছেন যে এত সমস্ত শহর কলকাতা যেখানে জঙ্গল পড়ে থাকে, ট্রায়ে বাসে ভিড়, জল জমার কষ্ট, সেখানে কলকাতাকে গাছ লাগিয়ে সুন্দরী করার চেষ্টা বাতুলতা।

তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য গাছ লাগানো দরকার কলকাতাকে বাঁচাবার জন্য। দূষিত বায়ু হ্রাস করে অক্সিজেন তৈরি করে গাছ কলকাতাকে এবং কলকাতার মানুষকে বাঁচবার সুযোগ দেবে। বৈজ্ঞানিক, জীৱাত্মকমোহন দাস (বালিগঞ্জ সাইন্স কলেজ) হিসাব করে দেখিয়েছেন যে একটা গাছের তৈরি অক্সিজেন ইত্যাদির দাম হল সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকা। এখন আপনাদাই বলুন গাছ লাগিয়ে বা গাছ লাগাতে বলে আমরা অন্তায় করছি কি না।

ঠিক এই সময়েই এই প্রস্তুতির একটা তাৎপর্য আছে। কিছু কিছু গাছের বেড়া বা বেটমী অদৃষ্ট হয়ে গেছে এবং গাছগুলি গরু ছাগলে খেয়ে গেছে। পাড়ার লোক বা পাড়ার সংগঠন যদি গাছ লাগাতেন এবং গাছের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তাহলে এটা হতো না।

সামনেই তো পূজোর সময় আসছে। বিভিন্ন পাড়ার সংগঠন চালা তুলছেন পূজোর জন্ত। এই চাটার একাংশ কি গাছ লাগাবার জন্ত (এবং গাছ বাঁচাবার জন্ত) আলাদা করে রাখা যাবনা? বন বিভাগের পার্ক ও গার্ডেন শাখা (ইডেন গার্ডেন্স) এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রস্তুত; যেমন তাঁরা আগেও করেছেন।

বিভিন্ন পাড়ার সংগঠন এ ব্যাপারে কি করলেন আমাদের জানাবেন কি?

টাকা:

সম্প্রতি হরিশ মুখার্জী রোডে আমরা জঙ্গল অপসারণের এক নতুন পদ্ধতি চালু করেছি। বার্ষিক উপারে জঙ্গল সরাবার এই প্রচেষ্টা সফল হবে যদি এখানকার লোকেরা সকাল সকাল জঙ্গলগুলি এইসব বিনে ফেলেন এবং হরিশ মুখার্জী রোডের এই ব্যবস্থা যদি সফল হয় তাহলে শ্যামা কলকাতার এ ব্যবস্থা চালু হবে। সবটাই নির্ভর করছে আমরা কলকাতাবাসীরা কলকাতার জন্ত সামান্য কিছু করতে প্রস্তুত কি না তার ওপর।

(সি, এম, ডি, এ থেকে প্রচারিত)

ইন্দিরা-মানেকা বিরোধ চরমেঃ

সঞ্জয়ের টাকা নিয়ে গণ্ডগোল



অগ্নিকিশ বর্ষ ১৩৫৮ সংখ্যা ১ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর, ৮০ ১৬০ পৃষ্ঠা

সুত্রতর আঘাত সম্পর্কে

ই-কংগ্রেসীদের

সন্দেহ

পুলিশ হামলার ব্যাপারে সুত্রত মুখার্জীর অভিযোগের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা একমত নন। এই নেতারা দুলাল মণ্ডকে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও রাজী নন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কলকাতার দুলাল মণ্ডের পুলিশ লক আপে সুত্রতকে কেন্দ্র করে সুত্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) কর্মীরা এক বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলন এখন আর-মুখি হয়ে ওঠে তখন মীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। তারপর ডেকার্স সেনের সামনেও পুলিশ বিক্ষোভরত কংগ্রেস (ই) কর্মীদের হঠাতে লাঠি চার্জ করে।

সুত্রতবাবুর অভিযোগ এই নয় পুলিশ তাকেও প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে। সুত্রতবাবু অস্থায়ী বোধ করার লালবাজার থেকে তাকে পোলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সুত্রতবাবু মারিঙ্গ হোমে ভর্তি হন।

সুত্রতবাবুর বিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই প্রায় এ ব্যাপারে সুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর অভিমতের সঙ্গে একমত। সুত্রত বিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের বক্তব্য, সুত্রত একটা কামেলা পাকিয়ে নিজে রাষ্ট্র-শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠার পর

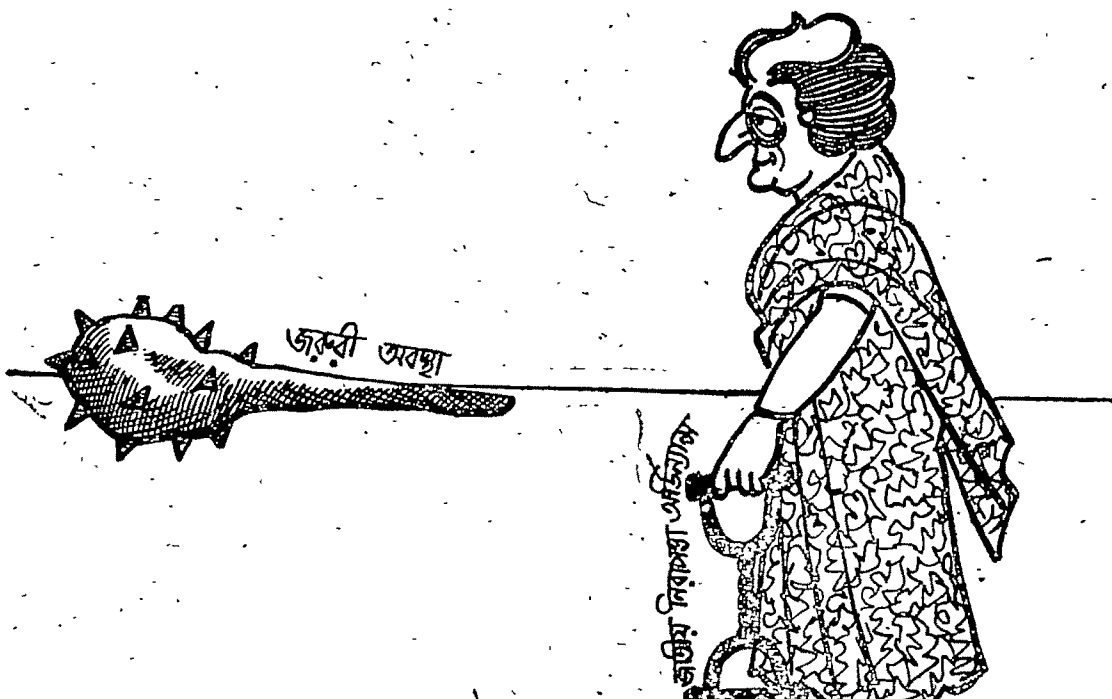
সঞ্জয় গান্ধীর বিধবাপন্থী মানেকা গান্ধী এখন রাজধানীর রাজনীতিতে একঘরে হয়ে রয়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চাননি যে, মানেকা গান্ধী রাজনীতিতে আত্মক। তাই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী উভোগেই মানেকা গান্ধীকে একঘরে করা হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী নিজের সকল লক্ষ্য লক্ষ্য এবং নেতাদের বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন কেউ মানেকা গান্ধীকে নিয়ে কোন দলা-দলিতি না করেন। অপরদিকে মানেকা গান্ধীকে হাশিয়ার করে দিয়ে ইন্দিরাজী বলেছেন যে, আমার বাড়িতে থেকে রাজনীতি করা চলবে না।

ইন্দিরাজীর নির্দেশ উপেক্ষা করে সঞ্জয় স্বয়ং অগণীশ টাইটলার মানেকাকে নিয়ে দু-একটি দলভার করার চেষ্টাও দলকে এড়িয়ে চলছেন। সঞ্জয়ের অপর বন্ধু কমল নাথের মতি-পতি বোকা এমন বেশ ছকর। তিনি যে কোন দিকে হুকবেন তা হুক করে তিনি নিজেরও বসন্তে পারবেন বলে মনে হয় না। বরং একথা বলা চলে যে, সঞ্জয়ের সুত্রত পর কমল নাথের মত সঞ্জয়ের সব দলীই এখন নিজেরের অন্যায় মনে করছেন।

মানেকা গান্ধীকে সঞ্জয়ের শ্রদ্ধা-স্থানে বলাবার জন্য পাড়াবী মহল যে তোড়জোর শুরু করেছিলেন তা ইন্দিরা গান্ধীর মনগলময় হয়নি। সেই কারণেই সঞ্জয় ইন্দিরাজী মানেকাকে “একঘরে” করে রাখতে তৎপর হয়ে উঠেছেন যাতে রাজীব গান্ধীকে পাদপ্রদীপের আলোর নিয়ে আসা সম্ভব হয়। রাজীবের প্রতিষ্ঠার পথটুকু ইন্দিরাজী ধীরে ধীরে বন্ধ করে আনছেন।

সঞ্জয়ের জীবিতকালেই সঞ্জয়-মানেকা মায়ের সঙ্গে একজে বলাবাস করতেন না। সঞ্জয়ের সুত্রত পর মানেকা গান্ধী তাঁর শাওড়ির কাছেই ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাস করছেন তাঁর মায়ের সঙ্গে। স্বতন্ত্রালয় ছেড়ে মানেকা গান্ধী কেন পিলালরে চলে গেলেন তা নিয়ে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে কল্পনার শেষ নেই। নানান ধরনের গুজব শোনা যাচ্ছে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে যে, ইন্দিরা-মানেকার বিরোধ মূলত সঞ্জয়ের টাকার উত্তরাধিকারী কে তা নিয়ে। শোনা যায় সঞ্জয় গান্ধীর ৫০ কোটি টাকা নাকি মানেকা গান্ধী দাবি করেছেন। কিন্তু ইন্দিরাজী তা দিতে সম্মত হননি।

মাত্রাধিক আপো কলকাতার এক যুব নেতা দিল্লীতে গিয়েছিলেন কমল নাথের কাছে। তার ইচ্ছা ছিল এই রাজ্যে মানেকা গান্ধীকে নামনে রেখে কয়েকটি দলভার। শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠার



আনন্দবাজার মালিকের ঔদ্ধত্য

গত ১৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার জেমারেল ম্যানজার অরুণ সরকার অফিস ভবনের পেটে অন্তত তিন চারশো মানুষের সামনে এই পত্রিকার দিটি কনট্রাক্টার শ্রীচন্দ্র পারিঝাকে জুতো পেটা করেছেন। এই জুতো পেটার প্রতিক্রিয়ার লেখিন আনন্দবাজারের প্রধান প্রাইভেট গাড়ী পোড়ানো হয়। অন্তত: সা ত থা না জ্যাম ভাঙুর করা হয়। কিন্তু বিশ্বাসের কথা, এরপরেও অরুণ সরকারকে হাতকড়া লাগিয়ে হাজতে পোরা হয়নি। রাজ্যের বায়ব্ধক সরকার বুরি এই লংবাধপত্র মালিক তনয়কে ভয় করে চলছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে কলকাতার কাগজগুলিতে সামান্যই খবর বেরিয়েছে। আনন্দ-

বাজারে বলা হয়েছে, দিটি কনট্রাক্টারের কিছু কর্মী হামলা করেছিল। অবতবাজার যুগান্তর কিছুই ছাপারনি, প্রেসম্যান একটা মার-মারা লংবাদ প্রকাশ করে দায়িত্ব শেষ করেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর। মালিকের হস্ত কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এই ঘটনার তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

লংবাধপত্র মহল জানেন, আনন্দবাজার পত্রিকার শুরু থেকে কলকাতা এলাকার কাগজ বিক্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাতিরাম পারিঝা নামে একজন কনট্রাক্টার। ১৯২২ সালের ১০ মার্চ আনন্দবাজার যখন ছাপা হচ্ছে তখন হুতাচর বহু একথানা চিঠি দিয়ে পাতিরামকে হকার করতে অনুরোধ করেন। পাতিরাম হকার

থেকে হকার লত্রাট হয়েছেন, অবশ্য পরিপ্রম করে। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর লম্বা কাগজের কনট্রাক্টারি ছাড়া কলেক্ট স্ট্রীটে গুরু স্টল আছে। উনি ওড়িশার লোক। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হলেও পাতিরামবাবু ছিলেন বিনয়ী ও ভদ্র। ১৯৭২ সালে আনন্দবাজারের স্বর্ণ জয়ন্তীর সময় পাতিরাম পারিঝাকে বিশেষ-সম্মান প্রদর্শন করা হয়। পাতিরাম পারিঝা আর আনন্দবাজার একরকম অভিন্ন ছিলেন। সেই পাতিরাম পারিঝা করেকমাল আগে মারা গিয়েছেন। উনি মারা যাবার পর গুরু ছেলে শ্রীচন্দ্র পারিঝা ব্যবসা চালাতে থাকেন।

শিক্ষিত শ্রীচন্দ্র ও বাবার মতো শেবাংশ ২২ পৃষ্ঠার

ই-কংগ্রেসের

অ্যাড হক ভাঙ্গা

হতে পারে

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস (ই) অ্যাড হক কমিটি সঞ্জয়-খুব সীমিত ভেঙ্গে দেওয়া হবে। লংভারতীয় কংগ্রেস (ই) দলের অন্ততম দায়িত্ব সম্পাদক ভাস্কর মহাপাত্র তাঁর পশ্চিমবঙ্গ সঙ্করকালে বিনীত করেকজনকে এই ইজিত দিয়ে গেছেন।

এই খবর চাপা থাকেনি। দাবানলের মত সকলের কানেই তা পৌঁছে গেছে। তাই মতুন করে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। সকলেই চাইছেন নিজের পালা ভারী করতে। বরকত-প্রশব দুজনেই তৎপর হয়েছেন সন্তান্য মতুন কমিটিতে নিজের লোককে বেশি করে রাখতে। ওদিকে বর্তমান অ্যাড হক কমিটির সভাপতি অজিত পাণ্ডা প্রকাশ্যেই বরকতের দিকে চলে গেছেন।

সন্তান্য মতুন কমিটির সভাপতি হিসাবে তোলা সেনকে বলাবার জন্য তৎপরতা চলছে। ই-কংগ্রেস রাজ্য অ্যাড হক কমিটিতে এখন একটি তৃতীয় গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। তারা চায় তোলা-সেনকে সভাপতি করতে।

পশ্চিমবঙ্গ ই-কংগ্রেস রাজ্য নেতাদের প্রতি ইন্দিরাজীর মনো-ভাবও খুব ভাল নয়। এই প্রকাশ্য খেয়ালেখি দেখে এই রাজ্যে দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনিও খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন এমন একজনকে খুঁজছেন যে কিনা সব দিক দামাল দিতে সক্ষম।

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র বিধবংসী অভিন্যাস

বীয়ে, লভক পাসে অথচ এক-
ভরে পুরোরে মতো কারো বাধা
নিষেধের তোয়াক্কা না করে ইন্দিরা
সরকার ২৬শে সেপ্টেম্বর দেশে
জাতীয় নিরাপত্তা অভিন্যাস জারী
করলেন। জনতা সরকারের দৌলতে
রাষ্ট্রপতির পদ প্রাপ্ত নীলম সঞ্জীব
রেড্ডি কংগ্রেসের (ই) জনসার্ববিরাধী
অভিন্যাসে স্বাক্ষর দান করেছেন।
সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক
মতাদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত বিরোধী
হল তার প্রতিবাদে উত্থান হয়ে
উঠেছে। কারণ দুই জনতা পার্টি,
দুই কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস (আগ)
বা লোক হল—কারো পক্ষেই আজ
অভিন্যাসটির শেহনে ইন্দিরা পাড়ীর
আলম মতলবটি ধরে ফেলতে অসু-
বিধা হয়নি।

ধানাই-পানাই পৌরচক্রিকা
বিভিন্ন করা হয়েছে, উচ্চ আদর্শের
কাহিনী কাঁড়তে তো হিটলার
মুসোলিনীর পর আর ইন্দিরাকে
পান্না দেবার কেউ নেই। দেশের
নিরাপত্তা ও সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার
পক্ষে যারা পরিপন্থী বা বিরোধী
কার্যকলাপে নিযুক্ত তাদের শাস্ত জারী
করাই নাকি অভিন্যাসটির উদ্দেশ্য।
এ ধরনের কাজকে বে-আইনী
সাব্যস্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার
ইতিপূর্বেই বহু আইন রচনা করে-
ছেন। প্রচলিত আইনে যে কার্য-
কলাপের মোকাবিলা করা সম্ভব সে
ধরনের কার্যকর্য ঠেকাতে আবার
অভিন্যাসের আশ্রয় নিতে হল কেন?
আলসে ইন্দিরা পাড়ীর সামনে নতুন
পরিহিতির উদ্ভব হয়েছে যার স্রাবল
হিতে হল তার প্রধানমন্ত্রীর পদিত্তে
থাকা হয়না। শোষণ ও বঞ্চনার
বিরুদ্ধে দরিদ্র শ্রমিক-কৃষক-কোষাণী
সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার
লড়াইকে খতম করে দেবার জন্যই
এ অভিন্যাস প্রবর্তন করা হল। কলে-
কারখানার, ক্ষেতে-খামারে ধর্মঘট
প্রতিবাদের কণ্ঠ জরুরি করে দিয়ে ধনী
পুঁজিপতি স্বাধীন স্বার্থ রক্ষার
শ্রমতী পাড়ী রাষ্ট্রপতির বকলমে
জাতীয় নিরাপত্তা অভিন্যাস জারী
করালেন।

সত্যতাই এই গণতন্ত্র বিধবংসী
পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বাম ও দক্ষিণ
সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক হল
প্রতিবাদে হুঁসে উঠেছে। তারা
পাট জামিয়ে দিয়েছে যে এ-অভি-
ন্যাস কুখ্যাত 'মিসার'ই নবতম সং-

স্বরূপ, মিসার মতো এ-অভিন্যাসের
বলেও একজন আধীন সামরিককে
এক বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক
রাখা যাবে। বিনা বিচারে মানুষকে
আটক করে রাখাই যদি কংগ্রেস (ই)
সরকারের উদ্দেশ্য, তবে বিচারালয়-
ভুলোকে রাখা হচ্ছে কি শোভা
বর্ধনের জন্য? যার বা কাজ, তাকে
যদি তা করতে দেওয়া না হয় তবে
তার যারা কি শোভা বৃদ্ধি পায়, না
তত্ত্বাবধীর মুখোশ খসে পড়ে? গত
১৯৫০ সাল থেকেই কংগ্রেস সরকার
কয়েক রকমের বিচিত্র নামে বিনা
বিচারে আটক করার আইন প্রণয়ন
করে আসছেন। প্রতিবাদেই গাল-
জরা প্রতিজ্ঞাতি দেওয়া হয়েছে
দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি, শান্তি ও
শৃঙ্খলা অক্ষুর রাখার জন্য, শুধু
বহুমানসে ন যা জ বি রো ধী দে র
টিট করার জন্য এ-ব্যবস্থা
নেওয়া হল। কিন্তু কাজের বেলায়
যেথা গিয়েছে রাজনৈতিক প্রতি-
পক্ষের পক্ষ ছেঁদেই সরকার এই
আইন প্রয়োগ করেছে।

আজ আইন ও শৃঙ্খলা, ব্যবস্থার
বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি, মারী ধর্ষণ, হরিজন
ও সংখ্যালঘু নিগ্রহ কোম লম্ভারই
সম্মান ইন্দিরা সরকার করতে পার-
ছেন না। এমন কি তার হলের
মধ্যেই রয়েছে অস্বর্কলহের বীজবটিকা
বা অক্লান্ত হয়ে হল ও সরকারের
ভাবমূর্তি সম্মান ধুলোর লুটিয়ে
হিচ্ছে। এই হুঃমহ পরিহিতির
মোকাবিলায় ইন্দিরা সরকারের
শোচনীয় ব্যর্থতার জনমনে ক্ষোভ ও
রোষের আগুন জলে উঠছে। সে
আগুন যাতে ইন্দিরা সরকারের দিকে
শিখা বিস্তার করতে না পারে, তারই
প্রতিবেদক ব্যবস্থা হিসাবে জাতীয়
নিরাপত্তা অভিন্যাস জারী করা হল।
এ ব্যবস্থা যে স্বৈরতন্ত্রের পথেই একটা
পদক্ষেপ তা ইন্দিরার অতীত কার্য-
কলাপই প্রমাণ করে। তিনি এরপরে
সরাসরি জরুরী অবস্থা কার্যে
দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং
ডিক্টেটর হয়ে বসবেন—তারই প্রথম
ধাপ নেওয়া হল। কিন্তু ১৯৮০ সালে
কি ১৯৭৫ এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে নো
দুজব হবে?

সংবাদ চিত্র

একথা সুনন্দীকার্য যে, অক্ষরের
চেয়ে ছবির প্রভাব ও আকর্ষণ অনেক
বেশি। সেইজন্য নিরক্ষর ব্যক্তিগণও

মালিকের তত্ত্ব

১ম পৃষ্ঠার পর

বিনয়ী ও তত্ত্ব। কিন্তু আমন্দবাজারের
বর্তমান পরিচালক জেনারেল ম্যানে-
জার অরুণ সরকার অত্যন্ত ধূর্ত
সত্যবের। মালিক অশোক সরকারের
দ্বিতীয় পুত্র অরুণ সরকার এখন
অন্ত তিন ভাইয়ের সম্পত্তি গ্রাস কর-
বার মতলবে কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ
পদগুলোতে নিজের লোক নিয়োগ
করেছেন। পুরানোদের তাড়া-
ছেন। আমন্দবাজারের অফিস
কলকাতায়, কিন্তু জেনারেল ম্যানে-
জার অরুণ সরকার থাকেন বোম্বা-
ইতে, ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন।
দারুণ ফুটিতে থাকেন। সবরকম
শুণই হয়েছে। সেই অরুণ সরকার
এরপর টিক করেছেন যে, মিটি
কনট্রাক্টারকে তাড়াতে হবে।
ওকে মোটা টাকা কমিশন দেবেন
না। টাকাটা নিজেরাই নেবেন।

তাই কমিশনের হিসেব নিয়ে
শ্রীচন্দ্র পারিবার সঙ্গে বগড়া
লাগিয়েছেন। পারিবার অনেক-
গুলো পাওনা টাকা আটকানো হয়।
উপায়হীন পারিবার তখন এ ১৮ই
সেপ্টেম্বর সকালে বলেন যে, তিনি
আর আমন্দবাজার বিক্রী করতে
পারবেন না। আগের দিন
বিষক্রমী পুজোর জন্তে যুগান্তর বন্ধ
ছিল। তাই সেদিন যুগান্তর সেই
বাজারে, আর সেই কারণে আমন্দ-
বাজার বেশী ছাপা হয়েছে। এদিকে
শ্রীচন্দ্র পারিবার কিছু কাগজ বিক্রী
করবেন না। পেটের সামনে কয়েক
শো হকার। খবর পেলে জেনারেল
ম্যানেজার অরুণ সরকারের কাছে।
একটু পরেই নতুন ফ্ল্যাট পাড়ী
চালিয়ে অরুণ সরকার এলেন
সুতারকিন স্ট্রীটে আমন্দবাজার

ছবি দেখতে বা বুকে অসুবিধা হয়
নী এবং এই কারণেই নিম্নোক্ত এত
জনপ্রিয়তা। কলকাতা প্রেসক্রাবে
অস্থিত ক্যালকাটা ফোটা জাণী-
লিটল ক্রাবের প্রাঙ্গণে দেখতে গিয়ে
এই পুরনো কথাগুলিই আবার মনে
হল। এবং ছবির পর ছবি গত
পচিশ বছরের ঘটনাকে চোখের
সামনে চলচ্চিত্রের মত জীবন্ত করে
ছিল। প্রাঙ্গণমীর অমেক ছবিই
প্রমাণ করে প্রেস ফটোগ্রাফী শুধু
সংবাদচিত্রই নয়, শিল্পকলাও বটে।
এবং এই কথাটা মনে না রাখলে
সংবাদচিত্র মার খেতে বাধ্য।
হুঃমহ বিষয় এদেশের বিজ্ঞাপন
লোভী দৈনিক সংবাদপত্র সংবাদ-
চিত্রের গুরুত্বকে খাটো করে দেখে
এবং স্বানাতাবের বলি হয় এই
সংবাদচিত্র।

শারদীয় সংখ্যা

দর্পণ

মহানয়ার দিন প্রকাশিত হচ্ছে

একটি দীর্ঘ উপস্থাপনা লিখেছেন মৈত্রেয়

পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব কলকাতা। একটি শিশুর কৈশোরে
পদার্থগণের কাহিনী। অল্প তার বসন্তে। বসন্তেই বড় হয়েছে। চরম
দারিদ্র্য তার দিন কেটেছে। তাকে ঘিরে রয়েছে তার আপনজনেরা
আর বস্তির অত্যন্ত লোকেরা—তার বাজা হল অস্তিনেতা বাবা, যিনি
অকালে মারা গেছেন, তার নিরক্ষর মা, স্নেহীলা দিদি, রক্তের সম্পর্কহীন
বাবু, মালি, সমাজ নিষ্পিত বোম্বা এবং আরো অনেক। চরমকার স্বরবরে
ভাষার লেখক কতকগুলি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটা যুগ ও সমাজকে
ফুটিয়ে তুলেছেন।

চারটি গল্প। বিহির আচার্য অশোককুমার সেনগুপ্ত চিত্র বোম্বাল
নিজাধ ঘোষ।

একগুচ্ছ কবিতা

পাঁচটি প্রবন্ধ। রমেন নাথ শ্রীপতি নন্দী নিত্যপ্রিয় ঘোষ রণজিৎকুমার
সেন সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

দামঃ ছয় টাকা

অফিসের সামনে। উনকো খুসকো
চুল, চোখ লাল, বোধহয় রাতের
খোয়ানি তখনও কাটেমি। পাড়ী
থেকে নেমেই অরুণ সরকার নিজের
পায়ের চটি খুলে শ্রীচন্দ্রকে আগাপাছ-
তলা মারতে শুরু করলেন। এই
দৃষ্ট দেখে হকাররা মারমুখি হয়ে
অরুণ সরকারকে মারতে গেলেন।
কিন্তু এই মার থেকে ওকে বাঁচালেন
শ্রীচন্দ্র পারিবার। অরুণ সরকারকে
মারমুখো জনতার হাত থেকে পেটের
মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। অরুণ সরকার

পেট বন্ধ করে লুকিয়ে থাকলেন।
জনতা তখন একটার পর একটা
পাড়ীতে আগুন দিল কিংবা ভাঙচুর
করলো। একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটলো।
কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা
হচ্ছে, এই ব্যাপারে আমন্দবাজার
পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ
করেনি। অতীতকে বামফ্রন্ট সর-
কারও মীরাব। আমন্দবাজারের
মালিক-পুত্রের দৃষ্ট কোন পর্যায়ে
পৌঁছেছে তার একটা পরিচয় এখানে
পাওয়া গেল।

হাসপাতালে চাকরীর নিরাপত্তা নেই

কলকাতার উত্তর শহরতলীর
আড়িয়াহাটে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ
মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, ডাঃ বি, সি,
রায় শিশুসদন, ব্যারাকপুরে অবস্থিত
মেহের চেষ্টা ক্লিনিক ও হাসপাতাল,
হলদিয়ার নিকটে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ
সেবাসদন—এই চারটি হাসপাতাল
একটি ট্রাষ্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত।
এ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদাধিকার
বলে ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক এবং
সম্পাদক বর্তমানে আড়িয়াহাটের
শ্রীজয় ঘোষাল। আড়িয়াহাটের হাস-
পাতাল জুটিতে ইমডোর ও আউট-
ডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও এই হাসপাতা-
লের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কিন্তু যে
কর্মীরা রোগীদের সেবা করেন তাঁদের
দুরবস্থার অন্ত নেই। এই হুঃমহের
বাজারে এখানে একজন নার্সের
বেতন মাসে লক্ষ্যাতুল্য ৮৫ টাকা
মাত্র। দীর্ঘদিন কাজ করেও অনেক
কর্মী আছেন বাঁধা একশো টাকার
কম মাইনে পান। বেতনবৃদ্ধির
কথা বললে কর্তৃপক্ষ হাঁটাই এর ভয়

দেখায়। সম্মান ও নিরাপত্তা বলতে
কিছু নেই, প্রায় মধ্যযুগীয় অবস্থা
চলছে।

এর বিরুদ্ধে কর্মচারীরা এক
ইউনিয়নে সংগঠিত হয়েছেন। এরপর
থেকেই এমপ্লয়ী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে
চলছে হাজারো রকমের ভীতি
প্রদর্শন। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও
আন্দোলন করার সংবিধানগত
অধিকার নিয়ে স্বাধীন জনসাধারণের
সমর্থনে ওরা লড়াই করছেন।

ইন্দিরা-মানেকা

১ম পৃষ্ঠার পর

ওই যুব মেতা কমল নাথের কাছে
তার মনের কথা খুলে বলতেই কমল
নাথ আতঙ্কে উঠে বললেন : একথা
আর কাউকে বলোনা। ম্যাডাম!
তুনে ফেললে রাজনীতি করা চির-
দিনের মত খতম হয়ে যাবে। এরপর
সেই যুব মেতা আর অগ্রসর হতে
সাহস পাননি।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার

রিসার্চ সেন্টার অধঃগাতে যাচ্ছে

কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে নামা কুশীতি ও জুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ। সেন্টারকে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ২০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেন। এই আশা নিয়ে যে, সেখানে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা চালানো হবে ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে। অথচ সেন্টারের বর্তমান ডিরেক্টর ডাঃ জয়জী রায়চৌধুরী যোগ্যতা সন্দেহাতীত নয়। গত কয়েক মাসের মধ্যে ১০ জনেরও বেশি বৈজ্ঞানিক—বাহ্যের মধ্যে অনেকে পি এইচ ডি বা এম এস সি—এই সংস্থা ত্যাগ করেছেন যেহেতু এখানে গবেষণার আবহাওয়া অসুপস্থিত এবং বর্তমান ডিরেক্টর তাঁদের আত্মত্যাগও নম। অভিযোগ, এই ডিরেক্টর কারদাঙ্গি করে ক্ষমতার এলোহেন এবং প্রশাসন চালানো ও গবেষণার ক্ষেত্রে মেতুর্ষ বেওয়ার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অসুপস্থিত। তাঁর বেওয়া অনেক অফিস অর্ডার পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করতে হয়, কারণ সেগুলি সেন্টারের বিধি-অনুযায়ী কার্যকর হতে পারে না। তিনি আশার পর চারজন বিজ্ঞান কর্মী প্রশাসনিক জুর্নীতির বিক্ষেপে তাঁদের অভিযোগের স্বরূপ জ্ঞাত আদালতের দায়িত্ব হন। সেন্টারে এই ধরনের ঘটনা অসুতপূর্ব।

ডিরেক্টর ডাঃ জয়জী রায়চৌধুরী “সেকাফেক” নামে একটি ওষুধ তৈরি করেছেন। তিনি দাবি করেন এই ওষুধ ক্যান্সার সাহায্যে পারে। ১৯৭৪ সাল থেকে মানব দেহে এই ওষুধ প্রয়োগ করছেন যদিও জীব-জন্তুর দেহে পরীক্ষা করার যথেষ্ট তথ্য তাঁর কাছে নেই, যা মেডিকেল এথিক্সে অস্বীকার বলেই গণ্য হবে। তাছাড়া “সেকাফেকের” কোন ক্যান্সার-বিরোধী কার্যকারিতা নেই। সার্বজনীন ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের

ডিরেক্টর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে লিখিত রিপোর্টে বলেছে যে, এই ওষুধের কোন ক্যান্সার-বিরোধী কার্যকারিতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটা টাকা নিয়ে রোগীদের বাড়িতে চিকিৎসা চলছে। তাঁর চিকিৎসাধীনে এক রোগিনী মারা যান। সেই মহিলার ছিন্ন ভেঙে ক্যান্সার। যদিও ডাঃ জয়জী রায়চৌধুরী ড্রাগ কন্ট্রোলার অব ইণ্ডিয়া কাছে অসুস্থতি পেরেছিলেন ইউটারাইন সার্ভিক্সের ক্যান্সার ছাড়া অন্য যে কোন ধরনের ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার। অবশ্য তাঁর হাতে আরো কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি।

অবাক হতে হয় রাজ্য সরকার কি করে এই বুটো ওষুধ মানব দেহে প্রয়োগের দায়িত্ব নেন এবং এর জন্য দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক সাহায্য দেন। পরীক্ষার জন্য চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ২০টি শয্যা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কখনোই এই ২০টি শয্যার রোগী থাকে না। যেখানে ক্যান্সারের রোগীরা অসুস্থ হাসপাতালে বেড পাচ্ছে না সেখানে এই শয্যাগুলি খালি পড়ে থাকে। আশ্চর্য ঘটনা। ডিরেক্টরের এক পেটোয়া ব্যক্তি আছে রিসার্চ সেন্টারে। তাঁর নাম হিমালী চৌধুরী যিনি আই কব পাশ। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাসে ১০০ টাকা দেন “সিকারেক” সম্পর্কে গবেষণার জন্য। প্রথম, এই অযোগ্য ব্যক্তিকে কেম মাসে ১০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে? তবে বর্তমান ডিরেক্টরের যোগ্যতা আছে লোককে হাত করার। সরকারী অফিসার ও রাজনৈতিক দল-নেতাদের তিনি নামান্তরে বশ করতে পারেন। তিনি কলকাতা নেড়ে এখান থেকে তিনজন ডিরেক্টরকে ভাগিয়েছেন।

এই অবস্থার এখানকার কর্ম-চারীরা আশঙ্কায় মধ্যে দিন যাপন করছেন। কারণ তাঁদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা নেই। গত ৫ই মে চন্দ্রনগরে অবস্থিত রিসার্চ সেন্টারের ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতাল রণলাল নন্দী হোমোরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার ডাঃ অমলেন্দু সরকারকে হাঁটাই করা হয়েছে ঐ পদটি তুলে দিয়ে। অথচ এটি স্বামী পদ এবং ঐ হাসপাতালের পক্ষে পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পুঁজিবাদী পরিকল্পনার বিষাক্ত পরিণাম

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

গত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর বর্তমান পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করা হয়েছে। তাই বর্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার আগে আমাদের গত পাঁচটি পরিকল্পনার পরিণতি সম্পর্কেও সজাগ থাকা প্রয়োজন। ১৯৭৮-৮৩ সালেই বর্তমান পরিকল্পনা কার্যকরী করার কথা ছিল। দেশে তখন জনতা সরকার। ঐ সরকার বর্তমান পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেও তা নিয়ে বিশেষ এগোতে পারেন নি। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা ১৯৮০ সালে ক্ষমতার ফিরে আসার পর জনতা সরকারের তৈরী পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন এবং ১৯৮০-৮৫ সালের পাঁচ বছরের জন্যে একটা নতুন বর্ষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করলেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এই মরা কিসিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও যোজনাকমিশন আলোচনা করেছেন।

এই সবতম পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করার আগে আমাদের গত পাঁচটি পরিকল্পনার নীট ফলাফল স্মরণ করতে হবে। কারণ অতীতের পরিকল্পনাগুলি ধারী কার্যকরী করেছিলেন মোটামুটিভাবে তারাই এখন বর্তমান পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করেছেন। কার্যকরী করার দায়িত্বও তাদের হাতেই থাকবে।

গত পাঁচটি পরিকল্পনাকেই কংগ্রেস সরকারের পরিকল্পনা বলে ধরে নিয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হতে পারে যে এই বর্তমান পরিকল্পনাও পূর্ব-গামী পরিকল্পনাগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে কি না। যদি করে তাহলে ফলাফল একই হবে কি না।

মনে রাখা দরকার যে প্রথম পরিকল্পনাটি (১৯৫০-৫৫) আমাদের বৃষ্টিশ্রম প্রভুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়া। ১৯৫৫ সালে যুক্তোত্তর পুনর্গঠন বোর্ড অর্থনীতির যুক্তকালীন গুরুত্ব চর্চা ও কর্মকর্তা দ্বারা দেবার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। একই সময়ে টাটা বিড়লা প্রমুখ যুক্তোত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্পর্কে পরিকল্পনার একটি রুপরেখা প্রকাশ করেন। ঐ সময় প্রয়াত মামবৈষ্ণবনাথ রায়ও একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। প্রথমটি বোম্বে পরিকল্পনা ও দ্বিতীয়টি নিপলস প্লান নামে পরিচিত ছিল। দুটি পরিকল্পনা নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্কও হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গদী-

মণীন হয়ে কংগ্রেসী নেতারা প্রথমে বৃষ্টিশ্রম প্রভুদের পুনর্গঠনের রুপরেখাটিকেই গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশবিভাগের অচিন্ত্যনীয় ওক দারিৎ কাঁধে এসে পড়ায় তারা পুনর্বিবেচনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে লক্ষ্য করে বোম্বে পরিকল্পনার কিছু কিছু অংশ কার্যকরী করেন। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনা খানিকটা বৃষ্টিশ্রম উত্তরাধিকার ও অনেকখানি বোম্বে পরিকল্পনার মিশ্রণে তৈরী হয়। পরবর্তীকালে ২য় ও ৩য় পরিকল্পনার খসড়া ও গৃহীত পূর্বাঙ্গ চিহ্ন দেশে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ফলে যথার্থি অমিশ্রিত অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশকে যেতে হয়েছে।

অর্থনীতি

পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার অনেক বাধা। দেশীয় পুঁজিমালিক টাটা, বিড়লাদের পক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলার মত পুঁজিই ছিল না। ১৯৪৭ সালে বিড়লাদের মোট পুঁজি মোটে ৪৭ কোটি টাকা, টাটার ১৬ কোটি। অতীতের আরো অনেক কম। ভারতের মত এক বিশাল দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে যে বিপুল পুঁজি দরকার দেশীয় পুঁজি মালিকদের তা ছিল না। সুতরাং তারা বৈদেশিক সাহায্য এবং সরকারী লব্ধির উপরই নির্ভর করেছে। তাই মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার নামে আমাদের দেশে সরকারী সাহায্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থনীতির যে সকল ক্ষেত্রে লব্ধির পরিমাণ অনেক বেশী এবং তুলনার লাভের পরিমাণ কম অথচ এগুলি ছাড়া অস্বাভাবিক শ্রম স্থাপন করা যায় না সেগুলি সরকারের তাগিদে দেওয়া হল। যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহন, তৈল, রসায়ন, ভারী ইনজিনিয়ারিং, বিমান নির্মাণ, বীমা ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থাগুলি। অতীতের ভোগ্যপণ্য তৈরীর শিল্প খাতের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এতে লব্ধি অপেক্ষাকৃত কম, মুনাফার হার অনেক বেশী এবং খুব তাড়াতাড়ি মুনাফা তোলা যায়। অতীতের সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পগুলির ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক ও ভারী প্রকৃতির দরকার লব্ধি বিপুল, ফলে পেতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং তাদের উৎপাদ ভারী ও মৌলিক পণ্যগুলি

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে মুনাফা করে।

এর নীট ফল দাঁড়ান গুটিকয়েক বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠী অবিখ্যাত-রকম মুনাফা করে ফীত হয়ে উঠল। যেমন বিড়লা ৪৪ কোটি টাকা ১৯৭৯ সালে ২১০০ কোটি এবং টাটার ১৬ কোটি টাকা ২০৭৯ কোটি টাকার দাঁড়াল। মাত্র ৭৫টি পুঁজিপতি গোষ্ঠী ভারতে মোট ব্যক্তিগত পুঁজি ও সম্পদের ১০ শতাংশ করায়ত্ত করতে সক্ষম হল। অতীতের সরকারী ক্ষেত্রে লব্ধির ২৫০০০ কোটি টাকার মধ্যে ১৮০০০ কোটি টাকা লোকসান হল। ঐ লোকসান দিয়ে পৌছান মুনাফারূপে একচেটিয়া বড় বড় পুঁজিপতিদের দিম্বুকে আর সরকারী লোকসানের তরতুকি অতিরিক্ত কর ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির আকারে দেশের সাধারণ মানুষকে গুণে দিতে হল। আমরা গরীব ছিলাম, আরো গরীব ছিলাম। স্বাধীনতা ছিল তারা আরো ধনী হল। ১৯৭৭-৭৮ সালে আমাদের দেশের ৪৯% মানুষ, মোট ৩১ কোটি মানুষ জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনে দৈনিক আড়াই টাকাও খরচ করার সামর্থ্য রাখেন না। তারপর জীবন যাত্রার খরচ আরো বেড়েছে। ১৯৮০ সালের প্রথম ছ মাসে প্রায় বিপ্লব হয়েছে। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণের হিসেবে এই চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা প্রতি বছর ৫০ লক্ষ করে বাড়ছে। বেকারের সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বের মধ্যে সাক্ষর লোকের হিসেবে আমরা ৭৫তম দেশ। বিপ্লব পানীয় জল পান এমন লোকের হিসেবে আমাদের দেশ বিশ্বের ৮৪তম এবং আয়ুর হিসেবে আমাদের স্থান বিশ্বের ৮৯টি দেশের শেষ লাইনে। এই দুর্বস্থা স্বষ্টির জন্যে পরিকল্পনার দরকার হয় না। অথচ কংগ্রেসী কর্তারা এই ধরনের পরিকল্পনাই দেশের কাঁধে সিন্ধবাদের বুদ্ধের মত চাপিয়ে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজ গড়ার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা চাই। কিন্তু তার জন্যে আগে দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার দরকার। নাহলে যে কোন পুঁজিবাদী দলের সরকারই ক্ষমতায় বসুন, ভারতের গরীব জনসাধারণ যে তিমিরে ডুবে যাবে না।

দুর্গা

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
সাপ্তাহিক ১৫ টাকা
ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা



টাকাকড়ি ও চিঠি
পাঠাবার ঠিকানা
ম্যানেজার, দুর্গা

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

ইন্দিরা কংগ্রেসের নাতিশ্রাস

রমাপ্রসাদ মল্লিক

উত্তরপ্রদেশে স্বাভাবিকভাবেই শাসকবল কংগ্রেস (ই) ছদ্ম 'চ'-র নির্বাচনে জয়লাভের পর পার্টির নেতৃত্বে 'ঠাকুর' জাতির আধিপত্য জমতে দিয়ে ভেবেছিল, এইবার বুঝি লংসদীর রাজনীতিতে তাদের রবরবা-রা সোচ্চার প্রত্যাব-প্রতিপত্তি হায়ে-শার জন্ত ছিন্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু মোরাদাবাদের এবং সেই সঙ্গে লন্স-কিত সন্তল, আলীগড়, এলাহাবাদের ঘটনাবলী ভাষা সারা রাজ্যের জন-গণের ব্যাপক ও তীব্র টানাপোড়েন ও ভক্তিত উত্তেজনা প্রমাণ করে দিয়েছে, পূর্বের মত শাস্ত্রময় অবস্থা আর ফেরবার নয়। যে পরিস্থিতিতে সন্ধ্যা 'শাস্ত্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে জনমত বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা চলছে, তা মোটেই শাস্ত্রদায়িক ছিলনা।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষনাথ প্রতাপ সিং একেবারে থাকে বলা চলে, শিখর

মমৌনরম প্রাপ্ত বরেন্দ্র পাণ্ডি নেতা। তবু তাঁর খুঁটি শক্ত হতে পারেনি। তিনি ঠাকুর জাতির আধিপত্য। উত্তরপ্রদেশের "ভালুকা" রাজ-মৈত্রিক কৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিতে মূর্ত; রাজধানীতে জনশ্রুতি, তিনি নাকি নেহাৎ ভালমাস। একদম ১০ মাল-বাহার, শাজী পয়সার চাঙ্গিয়ে চলছেন আপন আচরণে, রাজনৈতিক জীবনে। খাটি নৈতিক মানদণ্ড থাকবে বজার মুখ্যমন্ত্রী হিদেবে যেমন, একজন রাজনীতিক কর্মী ও নেতা-রূপেও তেমনি। তবু তিনি প্রাজ্ঞীয় পার্টি লংসদীদের দ্বারা বিধিবৎ নির্বা-চিত নন। মরাদিবীর ইশারায় তার নাম লখনৌ থেকে লংসদীদের মিটিং থেকে "সুপারিশ" করা হয়েছিল। তাবখানা, যেন কং-ই লংসদ সদস্যদের হল তাঁকে নির্বাচন করবে, শুধু প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের সম্মতির

অপেক্ষা। আসল মত্যা অন্তঃ। রাজ্যের প্রভু শ্রেণী আত্মজিবা বিভক্ত—জাতপাত এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক নয়। বটকবাদের উদয়ে। ব্রাহ্মণ; "ঠাকুর" (প্রাক্তন নামভী) এবং লংখালখু-মুদলিমদের শিখর বর্গ (এরাও এককালীন নামভী; রামপুর বেরিলি, বুড়াউ; বিজয়নগর, মুরাদাবাদ, আলীগড়, মধ্য লখনৌ, পূর্বী অক্সে আজমগড়, এলাহাবাদ পূর্ব হুদান। মুরাদাবাদে এবং নিকটবর্তী রাম-পুর, সন্তল, বেরিলি, কানকি, লাহ-জাহাপুর ও আলীগড়ও বহু প্রাক্তন নামভ শ্রেণীর এককালীন নবাব-খা বাহাদুররা কং-ইর শিখর-নেতৃত্বের আশীর্বাদ এবং রাজনৈতিক প্রদান ধন্য। তবু এরা পূর্ণরূপে লঙ্ঘন ছিল না। কেননা "জমিদারী-উন্নয়ন" বিল পাস হবার পর (পকাশ হশকে) এরা যেমন; হিন্দু ঠাকুর জাতির

প্রাক্তন জমিদার শ্রেণীকৃতরাও তেমনি মরাদিবীর নাম বাকারি স্থাবারীদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যবিন্দু হল। দ্বিতীয়োক্তরা মোটা-বুট বড়জোতের মালিক; বর্ধিক, প্রায়াকলে "শচাধপার" জাতির (হুদি, আহির, বাধব ইত্যাদি) প্রতিনিধি এবং শাসক বলকংগ্রেস ই লংগঠনে মধ্য-স্তরীয় নেতৃত্ব-কাড়ারের যোগদানকার। কং-ই-র বর্তমান নেতৃবর্গ মরাদিবীর থেকে উত্তরপ্রদেশের শীর্ষ রাজনীতিতে এক মনুষ্য জাতিবাহী সংগেব তরু-করলো। ইমার্জেন্টী যুগের উত্তরপর্ব রূপে। লংক্ষেপে 'ঠাকুর' যুক্ত শচাধ-পার নামে খ্যাত জাতিগুলির সম্ভার: অধস্তন হুমিকার 'হরিকন'। প্রদান বক্তিত হল বর্ধনিন্দুর মাথা ব্রাহ্মণরা; বেখান হল কং-ই বুঝি বর্ধ-হিন্দুরের এজিয়ার খর্ব করতে চায়।

আসলে এটা ছিল একটা চাঙ্গ: ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পূর্ববর্তী জনতা মরী-মণ্ডলীর (ইউ-পি-তে) আরক আর-কণ নীতির জের টেনে চলা। তদিকে মুরাদীতিমিত্ত মুরাদবাদের সঙ্গে প্রায় লয়ান তালে বেড়ে চলেছে বেকারদের বাহিনী। হুতরাং রাজ্যে দীর্ঘাবস্থ চাকুরির জন্ত প্রদান লিঙ্গদের সকলকে খুশি করা গেল না। লংখা-লখু সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রায়ের যুবকরা হল লর্বাধিক বক্তিত। কেননা নিয়োগকারী অফিসার-বর্গের আম-লারা অধিকাংশই হিন্দু বরোবুদ্ধ এবং সেইহু ভারত বিভাজনী রাজনীতির স্বত্ব-ভিত্তিক পরম্পরাবাহী। এরা পারতপক্ষে মুসলিম যুবকদের নিয়োগ করতে চায়না। লংখাওক সম্প্র-দায়ের মধ্যেও আবেদনকারীদের মধ্যে জাতিবাহী তারতম্য করে চলছে।

আমার পূর্বের লেখার দেখিয়েছি, কিতাবে মোরাদাবাদের হস্তশিল্প কারি-গররা মধ্যমস্তরোপী ও অর্থ বিনি-য়োগকারীদের দ্বারা শোষিত হয়। এরা বেশীর ভাগই মুসলমান। Brassware Corporation প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণাঙ্গীরা দ্বারা শুধু হবার পর এদের অবস্থা কিছু উন্নত হয়; কিন্তু ১৯৭৫ এর নভেম্বর শেষে বহু-গুণাঙ্গীকে বিদায় মিতে হল। তারপর ফিরে এল শিল্পে লাইসেন্স প্রাপ্ত রপ্তানীকারক ব্যবসায়ীদের রব-রবা। কারিগররা যে ভিত্তিতে সেই ভিত্তিতেই। এই ধরনের গরীব মুসলমানরা সাম্প্রতিক প্রাদেশিক অতি-কড়াকড়ির হয়েছে শিকার। বড়লোক মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক ভোল পাশটে পা বাঁচিয়েছে। গুলি, ব্যাপক গ্রেফতার, লাগাতার কান্ডি আইনের প্রয়োগ; প্রয়োজনীয় খাবার কেনা সম্ভব নয়, জলের অভাব, নগরের জলাভাবে ময়লাবাহী

ফেরগুলি লম্বা ভরাট; তাতে জরুরী মহানন্দে চরে বেড়াচ্ছে; মহানদীর ছায়া পড়েছে। মোরাদা-বাব নরক হয়েছিল সারা আগের দ্বিতীয়ার্ধ। তাছাড়া, সম্প্রতি-ভারত সরকারের কোনো বৃহৎ আমদানি মণ্ডল-বিদ্যায়-সুই কীম অহু; বারী হরিকনদেরকে জরুরীপালনে লাহায়া করা হয়েছে। কোনো আধুনিক পরিচালিত ফার তৈরী করার দিকে নয়, ব্যক্তি-মালিকানার দিকে লুক করিয়ে। কলে সর্বত্র মল ও অপরিচ্ছন্নতার স্বভাবতই মুসলমান-দের সম্প্রদায়ের লেগেছে জোর আঘাত। শ্রীমতী গাজীর পয়ম বিধানসভায় দূত শ্রীমতীপাল কাপুর হালে মোরাদাবাদে গিয়ে মিটিং করতে পারেননি। কংগ্রেস ই-র জনপ্রিয়তা আজ বিলুপ্ত লংখালখুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই কি সংকট অনপ-নের হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে?

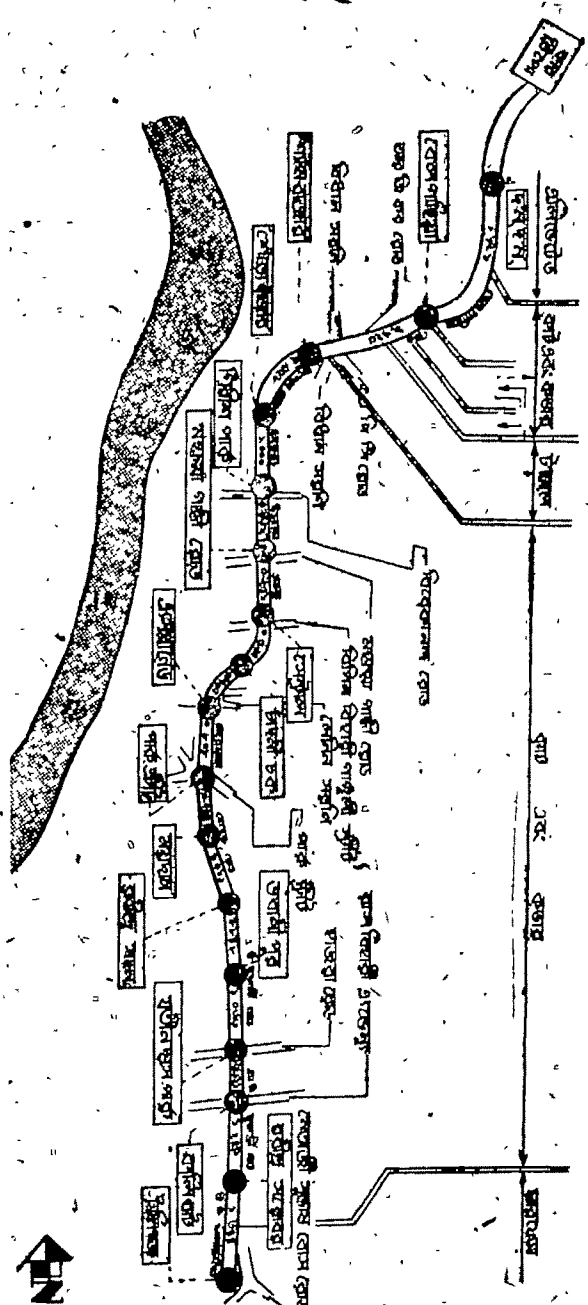
শাসক দলের সঙ্কট চরমে

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের অন্যরে যে সংকট-তা আজ বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। কয়েকদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষনাথপ্রতাপ সিং খুব উচ্চ পর্গায় চড়ানো নৈতিক মান বজায় রাখার কথা বলছিলেন। মোরাদাবাদে শুধু নয়, সারা প্রান্তেই লংখালখু সম্প্রদায়ের প্রতি জনের কাছে কংগ্রেস (ই) আজ এক খনি জমাৎ। তারা দেখেছে বেকারদের পাইকারী হারে মরতে, মৃতের লংখা-দায়িন্দীল বিধানসভা সদস্যদের (বিপক্ষীয়) মতে ২০০০ এর কম নয়। সরকারী পরিসংখ্যানের ১/১০ অংশ মাত্র। কলে প্রাদেশিক সরকারের মততা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লংখালখু মন্ত্রী যে কখন আছেন ক্যাবিনেটে, তাদের অবস্থা লংসদীরে, বাইরে তারা কবে পার না।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী আপন ভাব-বৃত্তি বাড়িয়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে ক্যাবিনেটে তাঁর প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী যে কখন আছেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্বিমুখে গিয়ে শ্রীমতীজীর কাছে হরবার করে এসেছেন। রাজধানী লখনৌতে চাউর খবর, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আপন ক্যাবিনেটের কাঁটা আর আগছা দরিয়ে দল থেকে বিধানসভায় বেছে মম্মিগুণী চলে লাজাতে ঢালাও অসুস্থতি দিয়েছেন।

এক নজরে মেট্রোরেল

পরিকল্পিত পথের দৈর্ঘ্য	১৬.৪৩ কিঃ মিটার
স্টেশন : মাটির উপরে	২ টি
ভূগর্ভে	১৫ টি মোট ১৭ টি
স্টেশন থেকে	
স্টেশনের গড় দূরত্ব	১.০২ কিঃ মিটার
ট্রেনে কোচ সংখ্যা	৮ টি
শ্রেণী	১ টি
কোচের দৈর্ঘ্য	১৯.৫ মিটার
কোচের প্রস্থ	২.৭৫ মিটার
গাড়ির গতি (সর্বোচ্চ)	ঘণ্টায় ৮০ কিঃ মিঃ
গাড়ির গড় গতি	ঘণ্টায় ৩০ কিঃ মিঃ
বিদ্যুৎ	৭৫০ ডি. সি.
বিদ্যুৎ চাহিদা	৪৫ এম. ডি. এ.
বিদ্যুৎ সরবরাহ	তৃতীয় রেলের মাধ্যমে
পরিবহণ সময়	দমদম থেকে টালিগঞ্জ ৩৩ মিনিট
টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানড ১৫ মিনিট	
এসপ্লানড থেকে দমদম ১৮ মিনিট	
যাত্রীবহন ক্ষমতা	দাঁড়িয়ে ২৩৫ জন
	বসে ৬০ জন
প্রতিট্রেনে যাত্রীবহন ক্ষমতা	২৫০০ জন
৬টি ট্রেনের অন্তর	আড়াই মিনিট



মেট্রোরেলওয়ে

কলকাতা

(নির্মাণের পথে)

শরশযায় ইন্দিরা গান্ধী

কালিদাস কুণ্ড

রাজনৈতিক সংকটের শরশযায় ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন শরশযায় শারিত পিতামহ ভীমের মত। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে অস্থির, অসহিষ্ণু, কোথাও বা-মারমুখি হিংসাত্মক প্রবণতা, অত্র-দিকে নিজের দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী কোন্ডল তাকে ক্রমশই বিপর্যস্ত করে তুলছে। দেশের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার মত কৌশল তাঁর হাতে আর একটিও অবশিষ্ট নেই।

সমগ্র দেশ এখন অন্ধকারে ডুবে আছে। ভীতভর বিখ্যাত সংকটের কলে হাঁটাই, লে-অফ বাড়ছে। নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠছে না। গ্রামাঞ্চলের উদ্ভূত শ্রম কাকের লঙ্ঘানে শহরাভিমুখী হচ্ছে। শহরে কাকের সন্ধান না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে হারিজা ও হতাশার জীর্ণ কুঠিরে।

অতীতক, নিত্য ব্যবহার্য অত্যা-বস্ত্রীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। অসামান্য ব্যবসায়ী ও পণ্যোৎপাদকদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকাতো দূরের কথা, সরকার যেন তাদের হাতের পুতুল বনে যাচ্ছে ন দিন।

দেশের এই দর্শন্যাপী সংকটের মুখে ইন্দিরা এখন, বেসামান্য হয়ে জাতীয় নিরাপত্তা অভিযান জারী করে স্বযুক্তি ধারণ করেছেন। প্রতিক-দের ধর্মঘট করার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। পুনরায় দেশ জুড়ে বৈরশাসন কার্যে করার কক্ষী আঁটিছেন।

সকলের মৃত্যুর পর ইন্দিরা কংগ্রে-দের আতান্ত্রীয় দলদলি মতন করে চালা দিয়ে উঠেছে। বেসমকা গান্ধীর সমর্থনে একটি উপদলীয় চক্র সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠেছে। এই পরি-স্থিতিতে খুব ভেবে চিন্তেই ইন্দিরা রাজীবকে রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে তুলতে চেষ্টা করছেন।

দি পি আই ও সি পি আই (এম) বরাবরই সংকটের সময় ইন্দিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাতকে শক্তিশালী করেছে। এখনও আদাম, মেওয়াল, নাগাভূমি ও মনি-পুরের উপজাতীয় অধ্যাখান জনিত সংকটে তারা মূঢ়ভাবেই ইন্দিরাকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সংস-র পদ্ধতিতে রাষ্ট্র কক্ষতা হুহলের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইন্দিরা কংগ্রে-দের সঙ্গে তাদের গৌণ বন্দ ও বিভ-মান। তাই ইন্দিরা এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছেন না। ডাঙে ও তাঁর চুক্তি রোজা দেশ-পাণ্ডের নেতৃবাহীন দি পি আই-এর

ভরাংশকে নিয়ে “জাতীয় সঙ্কট পক্ষ” ভোক্তাভ্য চলেছে। তবে একথা বলা যায়, বতহিম ইন্দিরা সোভি-বেতের ভক্তনা করে চলবেন, ততদিন তাঁর বড় বিপদের দিনে দি পি আই ও সি পি আই (এম) তার উপর থেকে সমর্থন তুলে নেবেন।

তবুও ইন্দিরার দিন কাটে কষ্টক শরনে। দেশের মানুষের মম ভোলাবার দব যাচ্ছে যে খরচ হয়ে গেছে। ‘গরিবী হটাও’ রণধর্মি মিলিয়ে গেছে বাতাসে। ইন্দিরার দেই ভবাকথিত ‘গতিশীল’ নেতৃত্ব এখন ধমকে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক সংকটের গিরিবন্ধে।

দব দেশের বুজোরা শাসকদের কপালেই অঙ্কুর-সংকটের রেখা দেখা যায়। বাণিয়া পুঁজিপতি ও জোতদার মহাজনদের পাহারাদার শাসকরা নিজেদের সংকট নিজেরাই ডেকে আনে।

ভারতবর্ষে সংকট বাড়ছে। বিদেশী পুঁজির পরিণাম পাহাড়ের মত উচু হয়ে উঠেছে। বিখ্যাত ব্যাক, ভারত সহায়ক অর্থ নৈতিক দণ্ড ও বহুজাতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি দেনার দায়ে ভারতবর্ষকে কিনে নিয়েছে। উৎসৃষ্টির এই লঙ্কাকে চাকবায় জন্ত ইন্দিরা হাত বাড়িয়ে-ছিলেন তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের দিকে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার নাম করে ২০ বছরের অস্ত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে—‘ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি’। আর এই মৈত্রীর দ্বার মেটাতে সোভিয়েতের সমস্ত অশকর্ম সমর্থন করতে হচ্ছে ইন্দিরাকে। আকগানিহান ও কাম্পুচিয়ার প্রেরে সোভিয়েতের প্রতি নির্লজ্জ সমর্থন জানিয়ে ইন্দিরা এখন মূখ দেখাতে পারছেন না জোট নিরপেক্ষ দেশ-গুলোর কাছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাঙলা-দেশ ও মেনাল বতখানি সাহদের সঙ্গে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি অঙ্ক-সরণ করতে সমর্থ, ইন্দিরা সরকার সেটুকু করতে পারে না। দ্বিতীতে অহুষ্টিত সাম্প্রতিক জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলনে ইন্দিরার নিঃসঙ্গতা একধাই প্রমাণ করে যে, স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতের ভাব-মুতি এতটুকুও অবশিষ্ট নেই বিধ-বাসীর চোখে।

ইন্দিরার এই চতুষ্কু সংকটের কারণ কি? তাঁর প্রেরী অবস্থান ও প্রেরী প্রতিনিধিদের মধ্যেই উপরোক্ত সংকটের মূল নিহিত আছে। মুখে

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, কার্-ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ও বাণিয়াতন্ত্রকে জীইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অঙ্কপ্রবেশের পথকে স্বগম ও প্রশস্ত করে তোলা—এটাই ছিল তাঁর পিতৃ-দেব জহরলাল নেহেরুর অঙ্কহৃত পন্থা। বোধ্য পিতার বোধ্য কল্পা সেই ঐতিহ্যকেই বহন করছেন। পার্শ্বক্য একটু-যে নেই, তা নয়। জহরলাল বুজোরা গণতন্ত্রের টাটটুকু বজায় রেখেছিলেন, কল্পা ইন্দিরা সেইটুকুও রাখতে পারেন নি। ‘জাতীয় বুজোরাবাদের মহান নেত্রী’ বলে যারা দিমরাত ইন্দিরা ভক্তনা করেন তারা দেশের মৌলিক সমস্তা থেকে মানুষের দৃষ্টি দূরে সরিয়ে দিয়ে ইন্দিরাকে সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে চান। জাতীয় বুজোরা রাষ্ট্রকমতার থাকলে গণতন্ত্র বিপর-হয় না, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা কার্যে থাকে না, শিল্প পুঁজিপতিদের বাজার সংকট তীব্রতম রূপ ধারণ করে না। আসলে, ইন্দিরা গান্ধী হচ্ছেন আরম্ভাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের দর্বাণেকা বিখ্যাত প্রতি নি ধি। আরম্ভাতান্ত্রিক পুঁজির সঙ্গে জমিদার মহাজনদের বিরোধ মেই, আছে গভীর বোকাপড়া। তাই গ্রামাঞ্চলে চলেছে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা, আর শহরাঞ্চলে দেশের বিপুল জনসংখ্যার অঙ্কপাতে খুবই কম সংখ্যক কিছু কল কার-খানার বাণিয়া পুঁজির অবাধ মূন্যাকা লুণ্ঠন। দেশের বিপুল সংখ্যক লোক হারিজা রেখার নীচে জীবন-যাপন করছে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রায় শূন্যের ঘরে। জাতীয় বাজার গড়ে উঠছে না। এখনও শিল্প পণ্যের চেয়ে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি ঢের বেশি। চোরাপথে বিদেশী পণ্য বাজার দখল করে নিচ্ছে।

এই অবস্থায় ইন্দিরাকে যারা জাতীয় বুজোরাবাদের নেত্রী বলে প্রশংসা গাইছেন তারা দ্বিতাবস্থার পক্ষে। প্রেরী সহযোগিতাই তাদের কর্মহুচী।

ইতিহাস সংকটের সমাধান করে। বুজোরা কখনও ভীমের মতো খেজাবৃত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে না। বিপ্লবী-কড় আলম-কোল, ভীল, হরিজন, গিরিজম নির্ধাতমের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। শাসক প্রেরীর মুখোশ খসে যাচ্ছে। শাসক প্রেরীর সহ-বোগীরা জমগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। ভারতবর্ষের আকাশে অগ্নিগর্ভ অশনি সংকেত।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

মিহির আচার্য

বিপ্লব ৪ সেপ্টেম্বর মনীষী ভূপেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ নিঃশেষে বিহার নিল বলে’ যারা অঙ্কযোগ করেছেন তাঁরা বিষয়টাকে আরো-দৃশটা অঙ্কঠানের মতো দেখছেন নিঃশেষে। আমাদের কাছে ভূপেন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় তাঁর বিপ্লবী-মস্তা। এদেশে অসমাপ্ত বিপ্লবের মতোই তাঁর জীবনকাণ্ড যে-ঐঙ্গিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি সে-তো জানা কথা। একজন বিপ্লবীর স্বত্তিত্বপূর্ণ তথনি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে যখন দেশে সত্যিসত্যি বিপ্লব গড়ে ওঠে কিংবা হাতে কলমে আমরা বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু করি। ভূপেন্দ্রনাথের জন্মের একশো বছর পরেও দেশের গুণগত যে-কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং সমস্ত ব্যাপারটা আমরা নিছক আঙ্কটান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শীমাবদ্ধ রেখেছি তাতো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬১-তে কলকাতায় ভূপেন্দ্রনাথ শেষ শিখাম-ত্যাগ করেন। সম্ভবত সর্বোদপক্ষে তাঁর মৃত্যু-সংবাদটিও তেমন গুরুত্ব পায়নি।

যারা আজ তাঁকে স্মরণ করছেন তাঁরাও যে মানুষটির জীবদ্দশার তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার শরিক ছিলেন-এমন নয়। বস্তুত বিপ্লবীর মৃত্যু নিশ্চিত-জেনেই ঐতিহাসিক প্রস-চিন্তের মতো তাঁকে নিয়ে নিশ্চিন্তে গল্পগাছা শুরু করেছেন। এবং চালাকি করে বারবার তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন তিনি বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, ইত্যাদি। যেন ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর পরিচয়েই পরিচিত হয়ে-ছেন। এমনকি ভূপেন্দ্রনাথের নাট্যক্রেত স্বাধিল করে যারা স্বামীজীকে ‘সাম্যবাদী’ বানাবার চেষ্টা করেন তাঁরা কী বলবেন ভূপেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের চিন্তাধারা বা কর্মপন্থা এক ছিল? বিবেকানন্দ বেলেড় মঠ গড়লেন, আর ভূপেন্দ্রনাথ সমাজবাদ পার হয়ে মার্কসবাদে দীক্ষা নিলেন। হরিজ-মারীরদের সেবা নয়, যে-সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে দরিদ্র করে সে-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনই ভূপেন্দ্র-নাথের কাম্য। এ সমাজ-ব্যবস্থার অধিকাংশ মানুষের হারিজ্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেননি ভূপেন্দ্র-নাথ। তবে একথা ঠিক স্বামীজী সেবাকর্মে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একদল আত্মবাহী সন্ন্যাসী গঠনের যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, সাম্যবাদে বিশ্বাসী

মানুষ তাঁর এই সর্বস্বত্যাগী আদর্শকে কাজে লাগাতে পারেন।

সচেতন ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে পি মিজের বৈপ্লবিক দর্শনিত্তে বোগ দেন যে-বছর স্বামীজী বেহ-ত্যাগ করেন। এই কাজে ভগিনী নিবেদিতা, অরবিন্দ, লখারাম গণেশ দেউকরের দারিধ্য লাভ করেন। ১৯০৭-এ, বিপ্লবীদের মূখপত্র ‘মুগা-কুন্ড’-এর সম্পাদক হন। ‘সোনার বাংলা’ ইত্যাদি প্রকাশের কারণে রাষ্ট্রপ্রোহিতার অপরাধে তার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড গ্রহণ করতে হয়। মুক্তি পাবার পর লক্ষ্মীপুরে পরামর্শে আমেরিকা যান। ছা-ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১২-তে স্নাতক এবং ১৯১৪-তে ব্রাউন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলায় এসে তিনি ‘ভারতীয় স্বাধীনতা দর্শনিত্ত’ সম্পাদক নিযুক্ত হলে তাঁর সম্পাদনার ‘ইতিপেনমডেন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিছু-দিন। সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯২১-এ তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের আমন্ত্রণে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মস্কোতে আসেন। রামব্রেননাথ রায় এবং বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ভূপেন্দ্র-নাথ লেনিনের কাছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্র পেশ করেন।

১৯৩৬-এ ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কৃষকসভার অত্রতম সভাপতি হন এবং দুবার অধিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-গুলির মধ্যে ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, সমাজতত্ত্ব, অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস, এবং ইংরেজি ভাষার রচিত Dialectics of Hindu Ritualism, Dialectics of Land Economics of India প্রভৃতি।

বহু ভাষায় পণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ ইতিহাস, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক ও হিন্দু-দর্শন সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

অসমাপ্ত বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার মনঃ সংগ্রামের মধ্যেই ভূপেন্দ্রনাথকে সঠিক প্রজ্ঞা জানানো সম্ভব।

মতামত

ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীরা

‘যে সরকার কাজ করবে তাকেই নির্বাচিত করুন।’

শ্রীমতী গান্ধী এই বিজ্ঞাপনটী ভারতীয় ভোটাধিকারীদের শতকরা অন্ততঃ ২৫ জন মানুষ (আর ধারা ভোট দিয়েছিলেন, তাদের ৪২ জন) বিশ্বাস করেছিলেন বলেই গত আট মাস ধরে তিনি মনস্তবল দিয়েছিলেন। যদিও এই আটমাসেরই মধ্যে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম ১৫ থেকে শত শতাংশ বাড়ার মতকা পেয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অগ্নিগর্ভ লমতা লম্বাধানের পরিবর্তে জটিলতর হতে পেরেছে। বাগপত আর মোরাদাবাদের মতো অল্পশালন-দুঃস্থ পুলিশী তৎপরতাও কম বাড়ছে নি। তার চেয়েও বড় কথা হলো মাত্র এই আট মাসেরই মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী সব কাজের আগে তার পূর্বতন বশব্দ আমলাদেরও প্রায় সকলকেই লস্করানে খণ্ডে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

তাহলেও একটা সরকারের গুণাগুণ বা লক্ষ্য পরিমাপের-পক্ষে মাত্র আটমাস সময় অবশ্যই তেমন ধর্মব্যের মধ্যে কিছু নয়। তবে কল্যাণলতা অল্পমান করা চলে। হুটু চালচা ভাত হয়ে উঠেছে কিমা জানতে হলে যেমন গোটা ইন্ডিরা উপুড় করে সব কটি চালচি টিপে টিপে পরখ করার দরকার হয় না : দু-একটি চাল টিপেই তো মালুম হয়। তেমনই যে কজন অমিত প্রতিভাধর ব্যক্তিকে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর এবারকার গভর্ন-মেন্ট ছাট ওয়ার্কস গঠন করেছেন, তাতে লাদায়ণ বুদ্ধিতেই আন্দাজ করা যায়, শ্রীমতী এ দিকতে খুবলভব তাঁর ৭৫-৭৭ এর লাক্ষ্যকেও অদতি-বিলম্বেই অতি অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারবেন। লঙ্কাত বটনাকটি এই গুণধরদেরই প্রোজ্ঞল প্রতিভার এক-একটি দপর্পে ফল মাত্র।

এ ছাড়া, এই আটমাসেরই মধ্যে আমরা হালফিলের শের-এ বঙ্গাল শ্রীপথান চৌধুরীর করলা-প্রতিভার কথাও ভবেছি। তবুই টেলিফোন-উপোষী কলকাতাবাসীদের প্রতি শ্রীকেনের মেরি আতোয়ানে-হুদত স্বয়ংক্রাণী উপদেশেরও বৃত্তান্ত। লক্ষ্যটি আরও একজনের বিষয়েও কিছু জানা গেল—যা রীতিমতো ‘এ’ মার্কী ছবির মতোই চিত্তাকর্ষক। দ্বিগির একটি অধিক প্রচারিত (এবং শ্রীমতী গান্ধীর পাড় লম্বক) লাণ্ডা-হিকে প্রকাশিত সেই সংবাদটি লভবত

এখানকার অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। বঙ্গবাসীর পোচরার্থে সেটি তাই এখানে লংক্ষেণে উদ্ধৃত করা গেল :

“নতুন দিল্লীর এক ধরোয়া মধ্যাহ্ন ভোজে লাক্ষ্য সহ জৈমক সিমিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রী বনিষ্ঠ কয়েকজন লংবাদিকের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতামত বিনিময় করছিলেন। কথাম্বলে মন্ত্রীশায়ের এক চামচা মন্তব্য করেন : ‘আজকাল ইয়ে ‘রেণ’ কী বারে মে তো কাকি চর্চা হো রহা হয়।’ জুশীল সমাজের ভোজন-টেবিলে এ প্রসঙ্গ তেমন মানানদই না হলেও মন্ত্রী মহোদয় কিছু লঙ্গে লঙ্গেই তার অননুক্রমীয় ভদিতে প্রথমে একটি উচ্চ শায়ের আউড়ে, তারপর উত্তর দেন, ‘ইয়ে সব ব্যাক-ওয়ারন হয়। ‘রেণ’ তো হাজারো

লাল পে হো রহা হয়। আর, আধির আরও তো ভোগনে কী চিল হয়।’ মন্ত্রী মহোদয়ের এই লরল জ্ঞানগর্ভ উক্তি উপস্থিত লংকলেই বেশ রসিয়ে উপভোগ করলেন।

“প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, মারা ত্যাপী লংকাত কলেজারির পর শাসক-বলের বেকজন পদ্য ব্যক্তি সরে-জমিনে এই ঘটনার লত্যাসত্য যাচাই-য়ের জন্ত বাগপত গিয়েছিলেন, এই লিনিয়র ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট একজন।”

[উইক এণ্ড রিভিউ, ২ আগস্ট ১৯৮০]

মমে হচ্ছে এই শেবোক্ত রতুটিই হচ্ছেন শ্রীমতী গান্ধীর হাড়ির লবচেয়ে লরব চাল। এহেন কীতিমান রতু-দেরই হাতে আপায়র ভারতবাসীর ভাগ্য লভ হচ্ছে। স্ততরাং ‘দি নেশন ইজ্ অন দি মুভ’—দেশ আবার নতুন করে এগিয়ে চলেছে। তবে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌছবে, সেইটে ভাবতেই কেমন লভকম্প হচ্ছে।

বকুলা গুপ্ত

শোভারানী কলেজ সম্পর্কে

গত ১লা আগস্ট দপর্পে আমাদের কলেজ লম্বকে যে লংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমরা কলেজের শিকক ও গভর্নিং বডির শিকক প্রতিমিধিরপে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

(১) কলেজে লোক নিয়োগের ব্যাপারে অধ্যকের বিরুদ্ধে যে অতি-যোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কলেজে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অশিকক কর্মচারী নিয়োগের কোন শর্ত নেই। একেজে বেসরকারী কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবিধি মেনে চলে। গত বছর সরকার থেকে জানানো হয় যে, ডি পি আইয়ের কাছ থেকে লব পদের জন্ত আপে থেকে অলুমোদন নিয়ে তারপর যেন নিয়োগ করা হয়। সেই অলুমোদন মন্তব্য পদগুলির জন্ত ডি পি আইয়ের কাছে অলুমোদন চাওয়া হয়েছে। ২৭-৭-৮০ তারিখে গভর্নিং বডির লভার লর্বলম্বতিকমে যির হয়েছে কোন বহল প্রচারিত লংবাদ-পড়ে এই পদগুলির জন্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে এবং স্থানীয় যোগ্য বেকার ছেলেরা যাতে চাকরী পার য়েথা হবে। ডি পি আইয়ের অলুমোদন এখনো আপেলি। কলে লংবাদপড়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়নি। একেজে লরখাত করার এবং তা হিড়ে ফেলার কোন প্রসই ওঠে না।

(২) পরিচালন লম্বিতিতে লর-কারী প্রতিমিধি কানাইলাল শী শিকক বিভাগের ডেপুটি লেক্রেটারীকে লিখেছেন যে, তিনি আশ্ব্যের কারণে

পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

(৩) কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লত্য-নারায়ণ লাদুখীর মর্যর মূর্তি প্রতিষ্ঠায় কিছু শিকক ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আলোচনার জন্ত একটি লভাও হয়। লেখানে শিককরা অধ্যাকে ৪০০ টাকা চাঁদা দিতে অলুমোদন করেন এবং অধ্যক তাতে লামম্বে লম্বত হন। কিছু উৎসাহী শিককগণ প্রয়োজনীয় অর্থ লংগ্রহ করতে না পেয়ে লত্যনারায়ণ খাঁর পুত্র দ্বিজীপ খাঁকে অলুমোদন করেন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দিতে। তবুই লিঙ্কের টাকার লিঙ্কের বাবার মূর্তি স্থাপন করাটা ভাল দেখায় না এই কারণ দেখিয়ে দ্বিজীপবাবু অলুমোদন লামান।

(৪) অধ্যক আসার আপে যে কলজন কর্মচারী লিম্বুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নিয়োগ ছিল অনিরম্বিত। অধ্যক আসার পর তাঁদের নিয়োগ নিরম্বিত করেন এবং তাদের লার্তিল ডি পি আই থেকে নিরম্বিত করান।

অধ্যক অশিকক কর্মচারী, শিকক ও লামগ্রিকভাবে কলেজের উন্নতিতে লিরলস পরিলম্ব করেন। তিনি কলেজে আসার পর বহ অলুমিধা লংগেও উচ্চ মাধ্যমিক (বাণিজ্য ও কলা) শুরু করেন। গত বছর ইউ-লিভারিটি ইলপেইন্টিং টীম অধ্যকের কার্য লম্বতির প্রশংসা করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অ্যাকাউন্টলিতে অমার্স দেবার স্থপারিস করেন। লরকার ও লিখবিভালয় তা লম্বুর করেন। ১৯৭৫ লালে অধ্যক লম্বন

কলেজে যোগদান করেন তখন কলেজের ১৮ হাজার টাকা লম্ব ছিল এবং লাইব্রেরীতে বই ছিল মাত্র ১২ হাজার টাকার মত। তিনি গত পাঁচ বছর অলুমোদন পরিলম্ব করে ৩০ হাজার টাকা ভোমেশান তুলে ৬০ হাজার টাকার ওপর লম্বপাতি ক্রিমে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ খোলেন। লাইব্রেরীর জন্ত ইউজি

‘একটি আর্থিক সংস্থা সম্পর্কে’

দপর্পের ২১শে আগস্ট লংবাদ ‘একটি আর্থিক সংস্থা সম্পর্কে’ একটি প্রতিবেদন, প্রতিবেদক লিরায়লেন, কেমারিট, এনজাউমেন্ট, লকিতা প্রভৃতি লংবাদ লঙ্গে একই লংকিতে ‘লম্বনা কমার্শিয়াল ফাইনান্স (প্রাঃ) লিমিটেড’কে (লবাপত ললেও) স্থান লিয়েছেন, কিছু উল্লেখিত লংবাদলি কি লনলাধারপের লিখাধের অলুমিধা করেছে? যদি তেমন কোন লম্বীর না থাকে তাহলে ‘লম্বনা’ ব্যতিক্রম হবে, এমন বদম্বল ধারণা কিতাবে জম্মাল প্রতিবেদকের?

বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স-এর যে চার লম্বের লাম প্রতিবেদক উল্লেখ করে-ছেন, তারা প্রত্যেকেই লম্বাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। শ্রীলরোয়া লম্বর্কে প্রতিবেদকের কটাক অলুমিত। শ্রীলরোয়া “লম্বনৈক লিম্বী ফিম্বী গায়কের ‘আলুম্বী’ ললেও লেটা কি তাঁর লক্ষে অলুমামনাকর?

‘এলেক্ট লাগিয়ে টাকা আদায়, লম্ব প্রদান’ ইত্যাদি লর্মধারা শুধু ‘লম্বনা’ই অলুমরণ করে না, এল আই দি লম্ব ভারতের তাবৎ ফাইনান্সার কোম্পানীলিই করে থাকে। এতে লোলের কি? এই প্রক্রিয়ার লরেক শত লর্মোৎসাহী লম্বক লাদ লাইমের লঙ্গে কমিশন লম্বধরে লালে ৫০০টি টাকা লংসারে এনে দিতে পারছেন।

কোম্পানীর ব্যাংক এ্যাকাউন্ট লম্বর্কে প্রতিবেদকের লম্বব্য তধ্য-লিষ্টিক নয়। কোম্পানী প্রকাশিত পুস্তিকায় যে চারটি ব্যাঙ্কের উল্লেখ আছে তার প্রত্যেকটিতেই ‘লম্বনা’-র এ্যাকাউন্ট আছে।

ল্যানেজিং ডিরেক্টর তিন লরকম লই করেন—এই অলুমিধোগটি আংশিক লত্য। ব্যাঙ্কের লঙ্গে লেনলম্বেনে তিনি অলুমভাবে লই করেন। এটার লধ্যে লোষণীয় কি আছে, লিষেব করে লখন লাল লই-এর লাম্যমে ব্যাঙ্ক এবং লামানতকারীকে প্রতারণার লটনা প্রতিমিরত লটলে? প্রতিবেদক লম্বান লিলে লানতে পারবেন, লারা লোটা অলুমের চেকে লামেশা লই করেন তাঁদের এই ধরনের লম্বা-কলচেের অলুম্বির লিতেই হয়।

অলিমের লর্মী লিয়োগের লম্বর লম্ব টাকা লামিন লামা হয়। প্রতি-বেদকের এই অলুমিধোগটিও আংশিক লত্য। এই টাকা শুধুমাত্র প্রলেশান

লি ও লরকারের কাছ থেকে প্রা-বার করে ১ লক্ষ টাকার ওপর লংগ্রহ করেছেন এবং কলেজের লিঙ্ক লম্বিলে ৩০ হাজার টাকার ওপর লম্বা হয়েছে।

শক্তলনাথ লাম

চলীলাধন কোল

গভর্নিং বডির অধ্যাপক প্রতিমিধি

লিরায়লের জন্তই লমা লামা হয় চাকরীতে লম্বকর্মজ ললেই তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

কোম্পানীর প্রকৃত লাম : লম্বনা কমার্শিয়াল ফাইনান্স (লি) লিঃ। অনলিবিলাম্বে লনলাধারপের লম্বো-শেয়ার লক্টলের পরিকলনা থাকার পুস্তিকা ছাপার লম্বর ‘লি’ লম্বাটি লই-এর লধ্যে ছাপা হয়নি (লম্বাক্ষীর, প্রথম ও চতুর্থ লভারে ‘লি’ লম্বাটি ছাপার অলুময়েই আছে)। লয়ে লব লপিতেই হাতে ওটি লিখে দেওয়া হয়েছে। লই-একটি লপিতে যদি লর্মীলের অলুমাবধানতার ‘লি’ লাম পড়ে থাকে তবে তার লম্বা কোম্পানী লুম্বিত। অলুম্ব, এই লাম্যম্য লক্টির লম্বা কোম্পানী লম্বর্কে ‘লম্বলম্বলক লারবারী প্রতিষ্ঠান’ লম্বব্যটিও লম্বান লুম্বলম্বক এবং অাপলিকর।

‘লম্বনা’-র পূর্ণ লাল লোলের লেড অলিস ভাড়া নেওয়া হয়েছে তিন বছরের মেয়াদে। প্রতিবেদকের লংবাদলম্ব লিঙ্ক। কিছু এই লম্বরে লাড়ী ভাড়ার শর্তাদি ভাড়াটে লিধারণ করেন না, করেন লাড়ীর লালিক। তাই তিন বছর পর লুম-লবীকরণ করা ছাড়া ‘লম্বনা’—কর্ক-পল্লের আর কি লরগীর থাকতে পারে?

লাম্পোটি লংকাত লংবাদটির লিগলিভার্ধ আমাদের কাছে লুম্পট লম্ব। লাম্পোটি তৈরীর ল্যবলারি প্রতি লম্বি প্রতিবেদক ইল্লিত করে থাকেন তাহলে ললিনয়ে লানাব, ওটি আমাদের লর্ম্মলচীর আওতার লম্বেনা। তবে লিঙ্ক অলুমাবানী-লম্বানী ল্যবলারি থাকার লাম্পোটির প্রয়োজন হয়।

গোয়েল্মা পুলিশ যদি লংবাদটির লম্বর্কে লোজলবর লিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের লিরপ হওয়ার কোন কারণ নেই। লম্বতঃ, লন-লাধারপের অর্থ লিনিয়োগকে লিরাপ করার লার্থে পুলিশের এই তৎপরতাকে ‘লম্বনা’ কর্তৃপক্ষ লাপগু জানাচ্ছেন।

লানিম চৌধুরী

ল্যানেজিং ডাইরেক্টর

লম্বনা কমার্শিয়াল ফাইনান্স (লি) লিঃ

দানবীয় কাল অডিন্যাস বাতিলের দাবীতে সোচ্চার হোন

বকুলমে জরুরী অবস্থা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে

দেবাশিস ভট্টাচার্য

২২ সেপ্টেম্বর রাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা অডিন্যাসে মই করিয়ে নিয়েছেন। এর পূর্বেই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কয়তায় বসেই চরণ সিং-এর প্রাক্তন কেরার টেকার মন্ত্রিত্বের প্রস্তাবিত পি ডি অ্যাক্ট চালু করেছে। এছাড়া জনতা সরকারের আমলে প্রবর্তিত মধ্য-প্রদেশে 'মিসি মিসা' তো বহাল আছে। কং (ই) সরকার গঠনের পর থেকে আশাম লং উত্তর পূর্ব-কলে 'উপজড়ত এলাকা আইন' জারী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের আমলে অল্প প্রদেশে প্রাক্তন তেলঙ্গ রাও সরকার করিম-নগর জেলার দুটি তালুককে (সির-মিসা ও জাগতিয়াল) 'উপজড়ত এলাকা' বলে ঘোষণা করেছিলেন। বা-
জমা রেড্ডীর শাসনে পাকপোক্ত হয়েছে। মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, গুজরাট, তামিলনাড়ুতে অত্যাচার্য্যকীয় সংস্কার ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে অডিন্যাস জারী হয়েছে।

তীব্র রাজনৈতিক সংকটকে ঠেকাতেই এই কালাকাঙ্ক্ষার ভিত গড়া হচ্ছে। 'মিসা'র মতো এবার হল 'জাতীয় নিরাপত্তা অডিন্যাস'। নিম্নলিখিত মতে মিসার বদলে 'মিসা' জাতিশাসনিক ডিক্টিরিটি অ্যাক্টের নামে 'নাউ ইন্দিরা ডিক্টিরিটি অ্যাক্ট' চালু হল। এই কালাকাঙ্ক্ষার বিনা বিচারে সর্বোচ্চ এক বছরের সশ্রু আটক রাখা যাবে। এবং সেই 'মিসা'র মতোই তিনজনের এক বিচারকসমূহী কেসগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এই বিচারকরা নগদ কিছু বিমিসর ছাড়া সাধারণতঃ কেল কনফার্ম করেন। নতুবা পুলিশের বিরুদ্ধে মত দিলে ওদের এই লব অ্যাডভাইসারী বোর্ডের চাকরী ছাড়াই হয়। পুলিশের শত অস্ত্র, অবিচার, অত্যাচারকে চোখ বন্ধে লম্বন করে এই রাজ্যের জনৈক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এ ধরনের কালাকাঙ্ক্ষার পুলিশ বা করে, তার ছোটো উদাহরণ দেই। (১) রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রয়াত অজিত দত্ত ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সমাবেশে

বলেন যে, মালদার এক মুহিদ্দোকা-মের মালিকের কাছ থেকে ঘুস না পেয়ে দারোগা তাঁকে মিসার আটক করে 'তুকনো বোটারুজ্ঞ জাল লকার লঙ্গে ভেজাল মেশানোর' হাঙ্গর অতিযোগে। প্রয়াত শ্রীমত হাই-কোর্ট থেকে তাঁকে তথু সন্মানে মুক্তিই করান নি দারোগার লাস পেমলনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

(২) জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রায় একশো জন রাজনৈতিক কর্মীকে ধরেই বাধাধরা 'ওয়ার্টগঞ্জ বড়বর মামলা' দেখিয়ে মিসা করে। তখন হেবিরাস কর্পাসও মিথি। লোক দেখানোভাবে একদম পুলিশ জেল গেট থেকে জনৈক মিসা বন্দীকে বের করে ডালহাউসি পাড়ার পকারেত ভবনে নিয়ে আসে অ্যাডভাইসারী বোর্ডের নামে হাঙ্গির করামোর জ্ঞ। বিচারকরা আসামীকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলা সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বস্তি ছিলে উক্ত বন্দী বলেন যে, 'ওয়ার্টগঞ্জ থানাধীন এফ আই আর এ বর্ণিত উক্ত বরে এতজন আসামী একসঙ্গে বসতে আদৌ পারে কিনা তাঁর বিচার প্রথম করা হোক, তারপর তো 'বড়বর', 'রাষ্ট্র উচ্ছেদের' পরিকল্পনা আসবে। আর দ্বিতীয়ত, এই আসামী বলেছিলেন আমরা 'নিজেদের মতামত গোপন করতে

স্বপা বোধ করি, আমরা বড়বরে অবিধাসী।' সত্যি ঐ টুকু বরে এক-সঙ্গে অতজন আসামীর বসাই সম্ভব নয়। কিন্তু মিসা তো এতটাই ছিল, তাই পুলিশ কনফারমেশন সার্টিফিকেটও পেল।

১৯৭১ সালে মিসা ১৭ (ক) ধারা চালু হলে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে স্বগ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দেয়। হঙ্গলীর রাজ্য সরকারী কর্মচারী শতু সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলার আইনজীবী নরনারায়ণ গুপ্তের সওয়াল তখন এক চাকল্য সৃষ্টি করে। ঐ ধারার আটক ১৭৫৯ জন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। তাঁদের মধ্যে একমাত্র শতু সরকার হঙ্গলী জেল থেকে ছাড়া পেলেন। বাকি ১৭৫৮ জনকে আবার মিসা ১৭ নং ধারার ঢোকানো হল।

১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল পহীলের পোরা হল পি ডি অ্যাক্টে। ১৯৭১, ৭২, ৭৩ সালে সি পি আই (এম) কর্মীদেরও ধরা হতে লাগল। তখন অনেকে মজা দেখেছেন, পরে প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে দেশাই, বাজপেয়ীর মতো দক্ষিণপহী নেতাদেরকে এমন কি দলের মধ্যে ন্যূনতম প্রতিবাদ করার জন্ত চন্দ্র-শেখর, মোহন ধারিয়া ইত্যাদিদেরকে পঁচাত্তর সালের পচিশে জুনের কালো রাতে ধরা হল। এঁদের ধরা হল

অকল প্রধানকে গ্রেপ্তার করে

হাতকড়া পরানোয় বিক্ষোভ

গত পরমা সেপ্টেম্বর বাবলা গ্রাম পকারেতের প্রথম নিখিল দাসকে মদীরার শান্তিপুর থানার গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাতকড়া পরিয়ে সরীতে করে রাণাঘাট কোর্টে চালান দেওয়া হয়। পরে শ্রীদাস আদালত থেকে জামিন পান।

শান্তিপুর থানার লেকেও অফি-লার সজীব বিশ্বাসের উপস্থিতিতে তাঁরই আদেশে শ্রীনিখিল দাসকে হাতকড়া লাগানো হয়। শ্রীদাস জামিন নিয়ে এলে সন্ধ্যার স্থানীয় সি পি এম মেহরুদু থানার সিরে সজীব বিশ্বাসের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বচসা

করেন, শ্রীদাসকে হাতকড়া পরানোর অস্ত্রাধীকার করতে বলেন। পরে স্থানীয় এম এল এও থানার সিরে অফিসারকে বোঝান যে পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের পর হাতকড়া পর্বানো অস্ত্র।

তথুযাত্র পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বলেই নয়, স্বগ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক এক রায় অস্বগ্রীম আসামীকে হাতকড়া পরিয়ে কোর্টে পাঠানো বেসাইনী ঘোষিত হয়েছে। স্বগ্রীমজী ব্যাপারটি সিরে খোজ খবর নিলে জনসাধারণ আনন্দিত হবে।

মিসা ১৬ (ক) ধারার, সংক্ষেপে 'এমার্জেন্সী মিসা' এই ধারার গ্রেপ্তারের কোম কারণ বর্ণিতে হল না। আর তদানীন্তন এটর্নি জেনারেল নীরেন দের সওয়ালে এবং দরকারী আবেশে হেবিরাস কর্পাসও বেসাইনী হল।

এইসব আইন থাকলে কি হয় তার একটা উদাহরণ দিই। দেবকান্ত বক্সার থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রয়াত লজ্জর গান্ধীর শান্তি ঠাকরন 'অস্ব-শাসন পর্বে' এক ব্যবসা কাঁধেন। টেক্সটাইল এক্সপোর্টের ব্যবসা, কোম্পানীর নাম 'ইন্দিরা ইন্টারন্যাশ-নাল।' এই কোম্পানীর রপ্তানীর বেসাইনী অর্ডারে মই দিতে প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর কয়েকজন অফিসার বিধা করেন মাত্র। বলিহারি, ওদের সাহস। শ্রীমতী গান্ধীর বেসানের ব্যবসা নিয়ে বিধা করেছেন, হোক না সে বেসাইনী। অমনি 'মিসা'র গ্রেপ্তার করা হল ওদেরকে। অফিসার মিঃ মুখার্জীকে রাত দুটোর পুলিশ দিল্লীর কোয়ার্টার থেকে ধরে নিয়ে গেল মিসা ১৬ (ক) ধারার। অস্তঃসত্তা শ্রীমতী মুখার্জী জ্ঞান হয়ে গেলেন, পেটের বাচ্চা নষ্ট হল। শাহ কবিশনে দাঁড়িয়ে পরে শ্রীমতী মুখার্জী বলে-ছিলেন, 'মিসা'র মতো দানবীর আইন বেন আর কখনো না আসে। ১৯৭০-৭৪ সালে ঐসব তিনহাজার টাকা মাইনের আমলারা বলতেন, 'ছোড়াগুলো অহেতুক চেঁচায়, মিসা জালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও,' কিন্তু পাশের বাড়ির আশ্রম বধন নিজের বাড়িতেও লেগেছে তখন ওদের লখিং ফিরেছে।

আজ আগ্রার সেই ঐশ্বরতান্ত্রিক শক্তি নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে পেছিয়ে থাকা ভোটারদেরকে ভুল বুঝিয়ে কয়তায় এসেছে। একটার পর একটা দানবীর আইন করছে। অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে, জনসাধারণও ক্ষোভে আন্দোলনে লালিত হচ্ছেন, তাই বেধে সরকার জাতীয় নিরাপত্তার নামে নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত এই অডিন্যাস জারী করলো এবং করলো সেই চিরচিরিত হেঁচো বৃত্তিতে, যে 'মুনা কা বা জ-কালোবালারীদেরকে ধরা হবে। রাজনৈতিক বিরোধী-দেরকে নয়।'

এই মুহূর্তের কাজ এইসব কাল-কাঙ্ক্ষা বাতিলের দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন লগপঠিত করা। সবাই-কেই বলে উঠছে হবে, 'বেজে উঠলো যে লম্বরের বড়ি, এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি.....'

'চে' নাট্যাভিনয়

গত ৪ সেপ্টেম্বর মৃত্ত অঙ্গনে দম-কালীন শিল্পীদল অরুণ রায়ের 'চে' নাটকটি বঞ্চু করে। জনৈক সাংবাদিকের লবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বর্ণকরা জেনেছেন আর্জ-ক্টিনার বনগ্রহণকারী, কিউবার বিপ্লবের নেতা তথা সমাজতান্ত্রিক কিউবার প্রথম অর্থমন্ত্রী আর্নেস্তো চে গুয়েরার জীবনী, ছোটবেলা থেকেই ধীর একমাত্র স্বপ্ন ধ্যান বিপ্লব, ধোবনে যিনি লংগ্রাবের আর্বে প্রেরণী হারিয়েও শ্রেনীপত্রের বিরুদ্ধে বন্দুক তুলে ধরতে ভুলে যাননি, ডাক্তার হয়েও যিনি সম্ভাব্য ভোগের বিলাসী জীবন ত্যাগ করেছেন তাঁকে আর কি করে ধরে রাখা যায় মজীধের ঠাণ্ডা বরে তাই 'চে' কিউবার জন-পণকে অভিনন্দন জানিয়ে চলছেন বলিভিয়ার। কারণ বলিভিয়া মৃত্ত কর্তে পারলে জাতিস আমেরিকার আর পাচটা লংগ্র দেশও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে স্ববিধেজনক হবে। কিন্তু মহান আন্তর্জাতিকতাবাদী 'চে' বলিভিয়ার বিফল হলেন। মৃত্তা হল তাঁর-বারিয়েন তোবের নেনা বাহিনীর হাতে।

অভিনয় খুব একটা উঁচু রানের না হলেও 'চে'র ভূমিকার স্বরত ঘোষ বঞ্চু করেন মি। ফিদেল কাস্ত্রোর ভূমিকার অশোক ঘোষকে বেসানান মনে হয়েছে।

স্বরতকে আঘাত

১ম পৃষ্ঠার পর নৈতিক কয়দা তুলতে চাইছে। এই লব নেতারা বলছেন, বর্তমানে দিল্লীর নির্দেশে স্বরতর গুরুত্ব সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেক কমে গেছে। বলতে গেলে স্বরত কোণঠাণা অবস্থায় আছে।

এই অবস্থা থেকে বের তেন প্রকারে বেরিয়ে এসে আবার লগ-ঠনকে নিজের কজায় আনার জন্ত স্বরত এখন মরীয়া। ছলল মণ্ডলকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তা আসলে দিল্লীর কাছে নিজের গুলু জাহির করার জন্ত যাতে দিল্লী ভাবতে বাধ্য হয় যে, স্বরতকে ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ অচল।

বিস্তৃত স্বরত আনা গেছে, রাজ্য কংগ্রেসের (ই) সভাপতি অজিত পাণা ছলল মণ্ডলকে একজন সমাজ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করে দিল্লীতে হাইকম্যান্ডার কাছে রিপোর্ট দিয়ে-ছেন। এই রিপোর্টে স্বরতর আন্দো-লনের বিরুদ্ধেও অনেক বঞ্চু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অজিত-বাবু নাকি কেন্দ্রীয় নেতাদের এও বলেছেন যে, স্বরতর আঘাত পাওয়া একটা লোক দেখানো ব্যাপার।

সুধীন কুমার অযোগ্য খাতিমদ্বী

বামরুপ সরকারের আমলে রায়ের খাতিম এবং সরকারি দপ্তরে এক অরাজকতা চলছে। বাধ্যমন্ত্রী সুধীন কুমার একজন অপদার্থ ব্যক্তি একথা আমরা বলতে চাই না। তবে একথা ঠিক যে তিনি ওই দপ্তরের সম্পূর্ণ অযোগ্য মন্ত্রী।

তার আমলে ওই দপ্তরের দুর্নীতি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে তা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। তাছাড়া তিনি খাতিম বিভাগের অফিসারদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এটাই তার অযোগ্যতার পরিচয়। বামরুপ বিরোধী মাহুদের কথা ছেড়ে দিলেও এক কথায় বলা যেতে পারে বামরুপ 'সমর্থক' মাহুদগুলি মন্ত্রী সুধীনবাবুর

কার্যকলাপে দারুণ ক্ষয় হয়ে পড়েছেন। প্রতিকার চেয়েও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

তার নিজের পার্টির কর্মসূচি-রও তার উপরে খুশি মম বলে আমরা বিশ্বাস করছি। বামরুপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বামরুপের নেতৃত্ব, বিশেষ করে বামরুপ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যদিও বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, তারা সাধারণ মাহুদের সহযোগিতা নিয়ে এই সরকার পরিচালনা করবেন, তথাপি খাতিমদ্বী সে সহযোগিতা নেন নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করেছেন। প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে মন্ত্রী

সুধীন কুমারের খাতিম ও সরকারি দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পরে তার সঙ্গে বেদনকারিতাবে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে তার দলেরই অন্ততম নেতা চিত্ত সিংহর প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে মীরা পালিবাটীর (প্রাক্তন ক্রি কুল ট্রি) খাতিম ও সরকারি দপ্তরের বাড়িতে যাতায়াত করে সাধারণ মাহুদের অভাব অভিযোগ শুনে কিছুটা প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। ছুটি অভিযোগের মধ্যে দুইটি চিত্তবাবু মহানগরীর ছুটি স্থানে স্থানীয় মাহুদের সহযোগিতার ছক অনুসারে রেশম হোকামের মালিককে দুর্নীতির অভিযোগে হাতেমতে আটক করে খাতিম বিভাগের কাছে আইন অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সুধীনবাবু তার দলের নেতার রিপোর্টে বিশ্বাস না করে খাতিম বিভাগের অফিসারদের ভয়ঙ্কর রিপোর্টের উপরই বেশি গুরুত্ব দেন। এতে দুর্নীতিবাজ রেশম হোকামদাররা লম্বা অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়ে যান। অসম্মান করা হচ্ছে, ওইদল রেশম-হোকামদার এবং খাতিম বিভাগের তদন্তকারী অফিসার-দের মধ্যে নেপথ্যে বেআইনী টাকার খেলা এবং খুয়ের লেনদেন হয়েছে। তাই অপরাধীদের হাতেমতে ধরা নেও ওরা রেহাই পেয়ে পেল। পরে সুধীন কুমারকে যদিও একথা বলা হয়েছে, তবু তিনি এর কোন গুরুত্বই দেন নি।

এরপরে সুধীন কুমারের ওই সহ-কর্মী এবং দলীয় নেতা চিত্তবাবু অপ-সম্মিত বোধ করেন এবং তারপর থেকেই তিনি খাতিম দপ্তরে যাতায়াত একদম বন্ধ করে দেন। তিনি বর্ত-মানে রাজনৈতিকভাবে সুধীন কুমারের উপরে এতটা ক্ষুব্ধ যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না, যেহেতু দলীয় ব্যাপার।

আরো একটি ঘটনা আমরা তুলে ধরছি। খাতিম দপ্তরের অধীনস্থ রেশমিং ডিরেক্টরেট—একজন ই ম ক র মেশন অফিসার বা পি, আর, ও আছেন। নাম মুকুল গাঙ্গুলী। খাতিম বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। অবসরের মাত্র কয়েক বছর বাকি। সবাই তাঁকে একজন দয়ালু মাহুদ বলেই জানেন। মন্ত্রী সুধীনবাবুও তা জানেন।

অথচ পি আর ও ওই মুকুলবাবু একজন অসম্মান লোককে টাকাসহ একদিন হাতেমতে ধরে পুলিশের

হাতে দেওয়া দিয়ে দেই লোকটি ছাড়া পেয়ে যায়। আমরা গেছে, যে লোকটিকে ধরা হয়েছিল সে একটি রেশম হোকাম মাহুদ করে দেওয়ার জন্য মুকুলবাবুকে একটি খামে মগধ দুই হাজার টাকা দেয়। মুকুলবাবু খামটি খুলে তাকাত বনে যান। সঙ্গে সঙ্গে লুপ্তি উদ্ভব কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকেও ঘটনাটি জানানো হয়। পুলিশ এসে ওই টাকা সহ ঘুমদামকারী মাহুদটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদে পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট আসে যে খত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুব

অচল লঞ্চ কবে সচল হবে?

সুন্দরবনের পরিবহন বলতে একমাত্র লঞ্চ লক্ষ্য। অবশ্য নৌকোও চলাচল করে খুব দ্রুত। কোনো ক্রমে সেই লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেলে সুন্দরবনের পরিবহন ব্যবস্থা এবং সংগে সংগে সুন্দরবনের অর্থনীতিও ভেঙে পড়ে। বর্তমানে হালনাবাদের লঞ্চ পরিবহন বন্ধ হয়ে যাবার ফলে হাজার হাজার যাত্রীর দুর্ভোগের দীর্ঘ মেই। তদ্ব্যতীত উল্লেখ্য হলো: ডাঙা হিলমগল চিমটে, মটবর-মোজাখালি এবং কুমিরমারীর অধিবাসীরা।

এই লঞ্চ বন্ধের অন্ততম কারণ হলো, ডাঙা বুকি। লক্ষ্য ডিজেল ও লঞ্চের যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মালিকপক্ষ পঞ্চাশ শতাংশ ডাঙা-বুকির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সুন্দরবন লঞ্চ প্রমিক ইউনিয়ন তার প্রতিবাদ করলে মালিকপক্ষ তিরিশ শতাংশ ডাঙাবুকির প্রস্তাব দিলেও লঞ্চ আজ অবধি অচল। অবশ্য লঞ্চ প্রমিক ইউনিয়ন কুড়ি শতাংশ বুকির অর্পা-রিশ করলেও সি পি এর দলের নেতারা দশ শতাংশ ডাঙাবুকিতে অটল। পরিচালকের বিষয় এই সি পি এর দলের নেতারা কালীনগরের অধিবাসী, যাদের সাধারণতঃ লঞ্চে যাতায়াত করতে হয় না। নৌকো বা বাসে চলাচল করে থাকেন।

হালনাবাদের লঞ্চ সার্ভিসকে সচল করার জন্য বহুবার বি ডি ও এবং এম ডি ও অফিসে মিটিং হয়েছে। নীট কল, কোনো সুরাহা হয়নি। যেমন, গত ১ সেপ্টেম্বরে হালনাবাদ বি ডি ও অফিসে হালনাবাদ পঞ্চায়েত কমিটির আহ্বানে সভা হয়। সভা-চলাকালীন হিলমগল কেন্দ্রের বিধান-সভা সদস্য সুধীন ও মণ্ডলের উক্তিতে লঞ্চ প্রমিকপন উদ্ভেজিত হয়ে ওঠেন, সুধীনবাবু সেই সভায় বলেন: "লঞ্চ প্রমিকরা যাত্রী সাধারণের সংগে দুর্ব্যবহার করে, এমন কি মহিলাদের

হেওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এতে রয়েছে নেওরা যেতে পারে যে, আদামত থেকেও পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতেই অসাধু ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, একে কবে খাতিমদ্বী সুধীন কুমারের কোন কর্মীর ছিল না? খুয়ের ওই আটক হু হাজার টাকা এলো কোথা থেকে? তা কি মন্ত্রী জানেন না? সাধারণ একজন পি আর ও তিনি তো আর পুলিশ কমিশনারকে এব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলতে পারেন না? এব্যাপারে সুধীনবাবু কি বলেন?

ধর্ম করা হয়।" এই উক্তি-প্রমিকরা উদ্ভেজিত হলে সুধীন-বাবুকে বলতে শোনা যায়—"কোথার দাঁড়িয়ে কথা বলছ, খেয়াল আছে? প্রয়োজন হলে লাশ পড়ে যাবে।" ফলে মিটিং সেদিনের মতো সেখানেই শেষ।

ডাঙাবুকির ব্যাপারে হালনাবা-দের লঞ্চ মালিক এ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য হলো: শুধুমাত্র ডিজেল এবং লঞ্চের যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধি নয়, এছাড়া কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত বোনাস, বেতনবৃদ্ধি ও ছুটির বেতন গুনতে হবে। এখানে উল্লেখ্য দশ বছরের মধ্যে হালনাবাদ লঞ্চ সার্ভিসের ডাঙা বাড়ে দ্বিগুণ। কিন্তু ক্যান্টিন-লাইনে দশ বছরের মধ্যে তিন থেকে চারবার খাশে খাশে ডাঙাবুকি পেয়েছে।

ডবলু বি সি এস অফিসারদের বিক্ষোভ

গত ১০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গলোরে বেশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সার্ভিস অফিসার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস সেনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কোন স্লোগান ছিল না। পরে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল বিভিন্ন সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীকমলেন্দু দাক্ষিত বলেন যে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে বামরুপ সরকার রায়ের বিভিন্ন সার্ভিস ক্যাডারের অফিসার-দের তেলী মাথায় তেল দিতে ব্যস্ত। অথচ এই আই এ এস অফিসাররা হলেন কেন্দ্রের ক্যাডার। সম্প্রতি রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত আই এ এস অফিসারের সংখ্যা ২৬৬ জন থেকে বাড়িয়ে তিনশো জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরফলে সিনিয়র ডাবলিউ বি সি এস অফিসারদের প্রোমোশন ব্যাহত হবে।

রাজ্যে আঠারো শত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছেন যারা বি সি এস পাশ করে গত পচিশ বছর ধরে পদেই বসেছেন। এ্যাসোসিয়েশনের আরো দাবি হল, জেলা শালক, এ ডি এম, সচিব, যুগ্ম সচিব পদে বি সি এস অফিসারদের নিতে হবে।

বিধানচক্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় লাটে উঠতে চলেছে

বিধানচক্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। ১৯৭৪ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অবস্থা চলছে।

১৯৭১ সালের জুন মাসে ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী চলে যাওয়ার পর থেকে কোন মিয়রিত উপাচার্য মেই। অধ্যাপক এম, বসু উপাচার্যের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার, ডাইরেক্টর অফ কার্গন, লাইব্রেরিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার ও বহু অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে আছে।

কলেজের অবস্থাও তথৈবচ। ডিগ্রী কোর্সের এগ্রিকালচার ক্লাস প্রায় এক বছর পর শুরু হয়েছে। ডেটারিমারী দারেসে এবার ছাত্র ভর্তিই নেওয়া হয় নি। গবেষণার কাজও যাত্রাকৃতভাবে কতি প্রস্তুত হচ্ছে। অডিট হয় না দেখে আই সি এ আর পূর্বের রত টাকা দিচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপা-চার্যের অধিক ও অযোগ্য পরিচালনা-তেই নাকি এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল ওহ দেখা-তনো করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ

পার্থক্য কিছুই করেন নি।

অধ্যাপকরা এই অবস্থার প্রতি-কার চাইতে গিয়ে প্রতিবিন্দুর শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মুক্তি পাণ্ডাকে শো করা করা হয়েছে।

এই অবস্থার প্রতিকারের দাবিতে অধ্যাপকরা আন্দোলনে নেমেছেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর তারা আচার্য ও কৃষিমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন। ১৮-২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা ৭২ ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট করবেন। ৬-৯ অক্টোবর, তিনদিন গণভূমি, লম্বাবর্তন বরকট, পুন্ডার পর পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অসহযোগিতা, ও ১৬ ডিসেম্বর থেকে অসিদ্ধি কালের অন্তর্ধর্মঘটের কর্মসূচী নিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কাউন্সিলের সভাপতি ডঃ এস পি রাইতি, সাধারণ সম্পাদক সোমেন-ব্যানার্জী, অধ্যাপক রঞ্জিত ঘোষ এই সকল তথ্য জানান। শিক্ষকদের সম্পূর্ণ দাবী হল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সাময়িক) অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৭ বাতিল করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্বে

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্বে প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

- ১। ভারতের খনিজ সম্পদ / প্রিন্সিপাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২.০০
- ২। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবঙ্গ / প্রিন্সিপাল কুমার / ১২.০০

৬৬, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

সঞ্জয়গহীরা বিতাড়িত হবার পর

রাজীব রাজনীতিতে আসছেন

দপন

ক্রিয়াকর্ম বর্ষ ১৯৬৭-৬৮ সংখ্যা ১০ ই অক্টোবর, ৮০ ৬০ পৃষ্ঠা

রাজ্যের দুই ই-কং গোষ্ঠীর

মারামারিতে ইন্দিরা জুড় ও হতাশ

গত সাতাশে সেপ্টেম্বর কল্যাণীয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সভায় কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মারামারিতে কংগ্রেস (ই) সভানেত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্বটিশচার্ট কলেজের দেড়শত বর্ষপূর্তি উৎসবে যোগ দিতে তিনি কয়েক ঘণ্টার জন্য সাতাশে সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন। এই সময় টিক হর কল্যাণীয়ে কংগ্রেস কর্মীদের সভায় শ্রীমতী গান্ধী ভাষণ দেবেন। এই সভার কারা কারা আমন্ত্রিত

হবেন তাই নিয়ে শুরু হয় টানা-পোড়াম। প্রত্যেকেই এই সভার আমন্ত্রণ পাবার জন্য তত্বির তদারক শুরু করে দেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজিত পাণ্ডার বিরুদ্ধে স্মরণীয় মুখার্জী সহ বেশ কিছু কংগ্রেস (ই) নেতা অভিযোগ করেছেন যে, পাণ্ডা তার খোলা খুঁশি মত আমন্ত্রণ লিপি বিলি করেছেন। এ ব্যাপারে দলের অধ্যক্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করেন নি।

শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

রাজীব গান্ধীর রাজনীতিতে আগমন বিলম্বিত হওয়ার অন্ততম এখনও পা টিতে লঙ্ঘনগহীনের সবাইকে বিতাড়িত বা কোণঠাসা করার কাজ শেষ হয় নি। তাই রাজীব গান্ধী কোনমতেই লঙ্ঘনগহীনের খপ্পরে পড়তে রাজী নন। এই লঙ্ঘনগহীনের বিতাড়ন প্রক্রিয়ার প্রথম শিকার হন জগদীশ টাইটলার। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক সচিব ছিলেন। এখন তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন ১নং সফটওয়্যার রোডে না আসেন। যেনকার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের শুভবেও ইন্দিরা গান্ধী নাকি ক্ষুব্ধ। টাইটলারের জায়গায় এখন কাজ করছেন ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী এজেন্ট কতদার। ডি পি দারের ছেলে এখন রাজীব গান্ধীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। এক সময় যে কাশ্মীরী লবী ইন্দিরা এবং পার্টিতে প্রভাব বিস্তার করে রাখতো তারা আবার সবাই ফিরে আসছে। পি এন হাসকার, পি এন দাস, টি এন কাউল প্রভৃতির আবার পাণ্ডাবী লবীকে কোণঠাসা করছেন এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ দিচ্ছেন রাজীব গান্ধী।

বেগতিক দেখে কলকাতা, মধ্যপ্রদেশ অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু তার বাড়ীতেও ইতিমধ্যে সি বি আই হানা দেয়।

রাজ্যে রাজ্যে লঙ্ঘনগহীনের শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

ভারতীয় ছিটমহলের ৪০ হাজার মানুষের জান-মাল বিপন্ন

বাংলাদেশের দীমানার মধ্যে অবস্থিত যেসব ভারতীয় ছিটমহল রয়েছে সেগুলি সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যদিও এই সব ভারতীয় ছিটমহলগুলি কাগজে-কলমে ভারতের কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্তৃত্ব প্রদানে চলে না। কারণ ভারত ক্ষুব্ধ থেকে এই সব ছিটমহল বিচ্ছিন্ন এবং দীমান্ড থেকে কয়েক মাইল দূরে বাংলাদেশে স্থগণের মধ্যে অবস্থিত। এই সব ছিটমহলে বাস করেন তারা তারা একরকম প্রশাসনহীন অবস্থাতেই বাস করেন।

বাংলাদেশের রংপুর এবং দিমানপুর জেলার মধ্যে ১২২টি ভারতীয় ছিটমহল রয়েছে। এলাকা ৩৪ বর্গ মাইল। বাংলাদেশের উপরোক্ত দুই জেলার সঙ্গে ভারতের কোচবিহার জেলার দীমান্ড এলাকা প্রায় ৪১০ কিলোমিটার। এই সব ছিটমহলে কত মানুষ বাস করেন তার কোন হিসাব করা হয়নি। তবে অনুমান করা হয় যে, এই সব ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। অধিকাংশই উপজাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

হলদিবাড়ির দহলা খাগড়িবাড়ি দীমান্ড থেকে প্রায় ২৮ মাইল দূরে

অবস্থিত। এই ছিটমহলটির দূরত্বই দীমান্ড থেকে সবচেয়ে দূরে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার।

ভারতের কোচবিহার জেলাভূগর্ভত বাংলাদেশী ছিটমহলের সংখ্যা ১২টি। মোট এলাকা ২৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। এগুলির অধিকাংশই ভারত ভূখণ্ডের ১০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। সবচেয়ে বড় বাংলাদেশী ছিটমহল হল হুগ্রাম। বাস করেন প্রায় ২০ হাজার মানুষ। তিনবিধা এলাকাটুক বাংলাদেশকে লজ্জা দেয়া হবে বলে প্রস্তাব উঠেছে। কোচবিহারের শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

রাজীব মাপা ছকে এণ্ডচ্ছেন

অবশেষে বোয়িং বিমানের ট্রেনিং নিয়ে রাজীব গান্ধী হারজাভাদ রওনা হবার পর দিল্লীতে রাজনীতির হাল-চাল সম্পর্কে হাড়ির খবর রাখেন বলে বার নিজেদের জাহির করে থাকেন তাঁরা বেশ খাঙ্কা খেলেন। কারণ, তাঁদের কাছে খবর ছিল মোদরা অক্টোবর রাজীবের সফির রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু রাজীবের বর্তমান দিকান্ত তা একেবারে মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। শুধু তাই-ই নয়, রাজীব এটা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ব্যাপার জ্ঞানার বুঝে গেছেন বলে বার দাবী করেন, বার তাঁকে ঘিরে তল্লাশী করনা করেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর অনেক ফারাক। তিনি অনেক গভীরের মানুষ। খুব ইশিয়ার হয়ে, খুব ভেবে চিন্তে তিনি এমন মাপা ছকে এণ্ডচ্ছেন যে তাঁর হালহাশি অত্যন্ত অন্তরঙ্গতাও তখন বুঝে উঠতে পারছেন না।

তবে সাময়িকভাবে তিনি যেভাবে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে ট্রেনিং এ গেলেন তাঁর মধ্যেও তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা এবং ভাবনা চিন্তা চলতেই থাকবে। তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। এখনই তাঁর জন্ত উপযুক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা জোর কন্ঠে শুরু হয়ে গেছে।

এর মধ্যেই তাঁর প্রয়াত ভায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের তিনি এড়িয়ে চলছেন। জে এন মিশ্রকে পছন্দ করেও এখন তাঁকে সরিয়ে বড় বিজয় দায়কে তাঁর রাজনৈতিক সচিবের পদে বসিয়েছেন। ডি পি দাস এর পুত্র বিজয়ের তাই প্রধান মন্ত্রীর মহলে খুব সমাদর বেড়ে গেছে। কোণঠাসা আর কে ধাওয়ায়, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব টি এম কল, মীর-কাশিম, বসন্তদাশা পাতিল বজ্র গুরু পাচ্ছেন ততই জগদীশ টাইটলার, আকবর ইদরাস, অর্জুন সিং, সি পি এন সিং, দীতারাম কেশরী, এ পি শর্মা, চরণজিত চানানা প্রমুখ উঠতি নায়করা ডুবতে বসেছেন। এখন এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা। রায়চন্দ্র রথ চাইছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় ভিড়ে যেতে। কল মাথ চেষ্টা করছেন রাজীবের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে। এরকম অবস্থায় প্রতাপশালী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীও বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না। তাঁর জায়গায় অল্প ব্রহ্মচারী বাবারা এগিয়ে আসছেন। প্যারিস থেকে উড়ে আসা এক প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে বেগ দিচ্ছেন বলে তিনি বেশ মুবড়ে পড়েছেন।

এদিকে তো যা মোদর কা রী। যোগ্যতাহীনদের সরিয়ে বেশ কিছু যোগ্যতাপূর্ণকে সুযোগ দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে তাতে খুবই উৎসাহিত হয়ে কংগ্রেস (ই) দলে চোকার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন করণ সিং, সিদ্ধার্থকর রায়, টি এ পাই প্রমুখেরা। আবার যাতে দুই কংগ্রেসের মিলনের নামে এই সুযোগ পাওয়া যায় সেজন্য জগজীবন, চাবন, দেবরাজ আর্স, চরণজিৎ যাদব, শারদ পাওয়ার প্রভৃতিরও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর ক্রমশ এটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যামেকা ও তাঁর সমর্থকদের এখন পিছু হটা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। কেউ কেউ মনে করেন, যখন শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

দিল্লীতে সি পি এম

সংসদ সদস্যদের

বাড়ীতে চুরি হচ্ছে

দিল্লীতে সংসদ সদস্যদের আবাসে চুরি হচ্ছে। বেছে বেছে তেলমহাজ সি পি আই (এম) দলের সংসদ সদস্যদের আবাসেই চুরি হচ্ছে। সম্প্রতি চুরি হয়েছে কনক মুখার্জী, হুশীল ভট্টাচার্য এবং বাহুদেব আচার্য্যর আবাসে। এরা থাকেন সংরক্ষিত এলাকার ভি ভি প্যাটেল হাউসে।

এর আগে চুরি হয়েছে সময় মুখার্জী, জ্যোতির্ময় বহু এবং দোমনাথ চ্যাটার্জীর বাসভবনে। বেছে বেছে শুধুমাত্র সি পি আই (এম) দলের সংসদ সদস্যদের বাড়িতে চুরির পেছনে চোরদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেইতো ?

শাত আল আরব

যা নদী, যা সতীন-বাড়ি,
দুই সতীনের কড় লেগেছে,
খোঁপায় রক্তজবার আড়ি;
জল চাইছে দুই পিয়ারী...
যা নদী, তোর ডাক পড়েছে।

তুফা ওদের আগুন; এখন
আগুন যবে, আগুন ফুলে।
দুই সতীনের চোখ নেচেছে;
কড় লেগেছে...বাক ডেকেছে
পাগলা মেহের আলির চুলে।

দুই সতীনের খোঁপায় আড়ি
তাদের ঘিরে নাচেছে পাগল।
যা নদী, যা সতীন বাড়ি,
বিশ যদি তোর পবিত্র জল।
টঙলে দুই চোখের পাতায়
তোরও মরণ ঘর দেখেছে...

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

জাতীয় বিকল্প গঠনের স্বেচ্ছা

ছ'টা বিরোধী দল ইতিহাসে মতামত একত্রিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। ছ'ই কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, আর এম পি, লোক দল ও কংগ্রেস (মার্গ) নয়টি দলই গঠিত হয়েছে। এটি একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ও বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় বিকল্প গঠনের পদক্ষেপ নিয়েছে। গত ন' মাসের মধ্যেও যখন ইন্দিরা সরকারকে তাদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা পালনে উদ্বোধিত হতে দেখা গেল না, বরং মূল্যবোধ, নারী হরিয়ান সংগ্রাম, নিগ্রোদের মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা গতিতে বেড়ে চলতে দেখা যাচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবে একটি বিকল্প পেতে অস্বীকার করে উঠেছিল। জনগণের সে-প্রত্যাশাই প্রতিফলিত হয়েছে ছয় পার্টির এক ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রূপ পরিগ্রহে। তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের দ্বারা এটাই স্পষ্ট করে তুলেছেন যে, কী আইন ও শৃঙ্খলা, কী অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা—কোমো সমস্যাই সামান্য দ্বিধা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পড়েছেন। সেজন্যই তিনি গণতন্ত্রকে বিদ্যায় দিয়ে অস্বীকার করে পড়েছেন। ক্যানিস্ট কার্যদায়ক ছিলেন। জাতীয় নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারীর অর্থ বৈরতন্ত্রের পক্ষেই একটি পা বাড়িয়ে দেওয়া নয় কি?

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে কোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ মুখ বুজে মেনে নিতে পারে না। গণ সংগঠন বা জনসমর্থনপূর্ণ রাজনৈতিক দল এ-আক্রমণের সামনে মাথা নীচু করে তাকে স্বাগত জানাতে পারে না। ছ'টা দলের সহস্রাধিক প্রতিনিধি তাই কনভেনশনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আক্রমণ প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছেন, বিকল্প গঠনের জন্য নেতাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন। সে দাবি উপেক্ষা করার অর্থ হত, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভীক কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়া, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, রাজনৈতিক আত্মহননকে বেছে নেওয়া। তরবার কণা, দল ছ'টির নেতৃত্ব প্রতিনিধিদের উদ্বাস্ত আত্মা দাঁড়া দিয়েছেন, বৈরতন্ত্র ও ইন্দিরা সরকারের ব্যর্থতা, নিগ্রো-তার বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়াবার কর্মসূচী নিয়েছেন। আপাততঃ বিকল্প গঠিত হওয়া সত্যগ্রহ সত্য লম্বা বেশ ইত্যাদির মাধ্যমে তারা দেশব্যাপী প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইন্দিরা গান্ধীর মতিগতি তার বাকচাতুরী ও রাজনৈতিক দুঃশক্তি-নক্ষি, দর্বেশপরি বৈরতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলই সম্পূর্ণ অবহিত, বিরোধী মেতারা পাল্লা করে প্রতিদিনই জনগণকে হুঁশিয়ারী দিয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে-চেতনা শেষ পর্যন্ত মানসিক জগতের থেকে পিছিয়েছে, শত্রু বোকাবিলা করার মতো বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় তারা (একবার স্ববেগে পেয়েও) তারা হেলায় তা নষ্ট করেছেন।) আজও দ্বিধা পারেননি। না পারার একটি প্রধান কারণ হল, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত অন্তর্বির্বাদ। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের বোল আমা মত বা পথের দ্বিধা হওয়া যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সাধারণ শত্রুকে প্রতিরোধ করাই রাজনৈতিক রণকৌশল। সেজন্যই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাগরিক স্বাধীনতার আদর্শকে ভিত্তি করে দল ছ'টি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। লক্ষ্যের দল তিনটি জনতার কোন দলই এ-কনভেনশনে লামিল হয়নি। অর্থ অত্যন্ত পরি-কার। বৈরতন্ত্রের হস্তে তারা বিরোধী ঠিকই, কিন্তু গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের হাতে কতটা নিরাপদ—সে বিষয়ে তারা নিজেসই নিঃসংশয় মন। দ্বিতীয় তাৎপর্যবাহক বিষয় হল, কনভেনশনে বামপন্থী দলগুলোর প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাস্তবপক্ষে বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এবং গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজী রাখতে পারে পারে কেবল বামপন্থীরাই। বাই হোক আজ ছ'টা দল একতাবদ্ধ হতে পেরেছে বলে আশ্বাস করার অবকাশ নেই। এই ছ' দলই যদি তাদের সংকল্পে অটল থেকে কর্মসূচী পালন করতে থাকে, তবে অস্বাভাবিক দলও ভেঙে পড়বে পাশে এসে দাঁড়াবে নিজেদেরই অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক আদর্শের সামঞ্জস্য ঘটানো না যায়, তবে আন্দোলন স্বাধীনপথে ধাক্কা খেতে পারে। কাজেই মতবর্তার সঙ্গে অগ্র-গতি হলেই এই এম এম নাহুদ্দিনের জাতীয় বিকল্পের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যদায় লাভ করবে এবং ছ'টি দলও ইতিহাস রচয়িতার চরিত্র লম্বায়ে স্থিত হবে।

সাবাস ডঃ অশোক মিত্র চিট ফাণ্ডের চিটিংবাজরা ঘায়েল

দেবশিস ভট্টাচার্য

গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শহরতলীতে আলোড়ন ওঠে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজ্য সরকারের একটা বিজ্ঞাপনে। ইন্ডো-স্ট্রীম বালু চারের বোকারে একটাই আলোচনা পিরারলেন, নক্ষিতা সব ব্যান্ড হয়েছে। ব্যাপারটা সাধারণত ভাষার খেলাসা করে পাঠকদেরকে জানানোটা সাংবাদিকদের কর্তব্য।

পিরারলেন, কেবাবিট, নক্ষিতা, স্বর্ধন, চিট ফাণ্ড ইত্যাদিদের ব্যবসার রকম একটু ভিন্ন হলেও মোটা দাগে একলোকেও বলা হয় নন ব্যাংকিং আর্থিক কোম্পানী। ১৯৬৬ সালের পরলা কেন্দ্রীয় পূর্বে এগুলোর উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কার্যকরী কোম নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আইন সংশোধন করে দাঁড়ালো এই যে, এই ধরনের কোম্পানীগুলো বছরে দুবার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে রিটার্ন দাখিল করবে। আর কোম্পানীগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবে কিন্তু সেই টাকার মোট পরিমাণ কখনই কোম্পানীর মোট সম্পদ ও কোম্পানীর দায়ের বিরোধকালের ২৫% এর বেশি হতে পারবে না। আইনের অমেকগুলো ধারা উপহারের সারকথা ছিল এই।

রিজার্ভ ব্যাংকে নন ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানীর কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য একটা দপ্তরকে ঢাকা করা হল। এরিকে ভূইকোডের মতো চিট ফাণ্ড গজিয়ে উঠতে লাগল। ৭১/৭২ থেকে পিরারলেন রমরমা বাজার শুরু করলো।

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার একটা আইন করলো। প্রাইম চিটস্ অ্যান্ড মানি লোকালেশন (ব্যাংকিং) অ্যাক্ট ১৯৭৮। পিরারলেন, কেবাবিট এর মতো করে কটা কোম্পানী কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলো যে এই আইন উক্ত কোম্পানী-গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এনিরে আদালতে মাথলা চলছিল। অন্তর্ভুক্ত শ্রীনিবাস কোম্পানী স্প্রিম কোর্টে এই আইনটার বিরুদ্ধেই মাথলা করে। বাধীপক্ষের অভিযোগ ছিল যে উক্ত আইনের মাধ্যমে সরকার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। দীর্ঘদিন পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর এই মাথলার রায় বেরিয়েছে। সরকার পক্ষের জয় হয়েছে। ইদ্বিন বিকেলেই এখানকার মহাকরণ থেকে অর্থদপ্তরের কমিশনার এম জি বুট্টি ১৯৬টি কোম্পানীকে নোটিশ পাঠান। নোটিশের বিষয়বস্তু হল, ১৯৮০ সালের ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে বর্তমান ব্যবসা পোটাতে হবে ও ভবিষ্যতের মতুন পরিকল্পনা জানাতে হবে। এ ধরনের নির্দেশ ৭৮ সালে আইন তৈরী হবার পরই বাস্তবিক সরকার দিয়েছিলো।

পরের দিনই পিরারলেন, কেবাবিট, উদ্বন ইত্যাদি লংগা হাইকোর্টে গিয়ে ইনজাংশন চায় ও চোখ বুজে এদেরকে মহামান্য হাইকোর্ট ইনজাংশন দেন। কাগজ-গুলো তারপর থেকে রোজ এই কোম্পানীগুলোর বিজ্ঞাপন লাভ করছে।

এই কোম্পানীগুলো কোন্ বক্তব্যের ভিত্তিতে ইনজাংশন চাইছে? এদের বক্তব্য হল, এরা চিট ফাণ্ডের ব্যবসা করে না। নতাই তো পিরারলেন, কেবাবিট, এমডাউয়েন্ট এরা চিট ফাণ্ড নয়। কিন্তু আইনটার মানেই আর একটা কথা আছে 'মানি লোকালেশন'—এরা তো তা করে।

এদের ব্যারসাটা কি?

চিট ফাণ্ডে কিছু লোক টাকা জমা রাখে, আর

লটারীর মাধ্যমে ছ' একজনকে টাকা অল্প স্বল্পে ধার দেয়। চিট ফাণ্ডে চিট দালিকরা এই জমা পড়া টাকা কলোবাজারে খাটায়।

অন্তর্ভুক্ত বি, কে, রায়ের 'পিরারলেন' নিরঞ্জন দেব 'কেবাবিট', বিজলার 'এমডাউয়েন্ট' ইত্যাদিরা মূলতঃ এম, আই, সির মতো ব্যবসা করে। ধরুন, রামবাবু বনবছর মেয়াদী পনেরো টাকার ইনসিওর করলেন। ছ মাস অন্তর ৭০০ টাকার প্রিমিয়াম দিতে হবে। একেটরা প্রথম বছরে দেয় প্রিমিয়ামের শতকরা ৩০% পার। এমডাউয়েন্ট ৩৫% দেয়। কিন্তু অফি-লাররা পাবে ৫%। এর উপরে সাব অরগানাইজাররা বাকসে ২৫% ও ২%। এক একটা ইউনিটের শীর্ষে ইন্সপেক্টররা পান বছরে বা মোট জমা পড়লে দাঁড়ায় এক লক্ষ টাকা। মানে ইন্সপেক্টরের মাসিক আয় দাঁড়ালো ৮০০০ টাকা, প্রায় দেশের রাষ্ট্রপতির সমান। পিরার-লেনের এ, বি, চৌধুরী, তাপস দত্ত ইত্যাদিদের মতো কিছু ইন্সপেক্টর মাসে দশ হাজারেরও বেশি কামিয়েছেন। এছাড়া কোম্পানী বোনাস-দিয়েছে, গাড়ী, আরও কত কি। আর গ্রাহক বন বছর বাধে পাবে ধরুন কুড়ি হাজার টাকা।

নক্ষিতা, নক্ষিতা এরা কি করে? এরা রামবাবুর কাছ থেকে একলটে বন হাজার টাকা কিস্তি ভিনোজি রাখলো। আগে নক্ষিতা স্ব দ্বিত মাসে ৪% (বছরে শেষাংশ ৮ম পটায়

দর্পণের ছুটি

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে আগামী দুই সপ্তাহ দর্পণের প্রকাশ বন্ধ থাকবে। দর্পণ পুনরায় প্রকাশিত হবে ৩১শে অক্টোবর। —কর্মসূচী, দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা

দর্পণ

একটি দীর্ঘ উপগ্রাস লিখেছেন মৈত্রেয়

পটভূমি দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ-পূর্ব কলকাতা। একটি শিল্প কৈশোরে পদার্থের কাহিনী। জন্ম তার বস্তুতে। বস্তুতেই বড় হয়েছে। চরম দারিদ্র্য তার দিন কেটেছে। তাকে ঘিরে রয়েছে তার আপনজনেরা আর বস্তির অন্ধার লোকেরা—তার বাজা দলের অভি-মেতা বাবা, বিনি অকালে মারা গেছেন, তার নিরক্ষর মা, শ্রমশীলা দিদি, রক্তের সম্পর্কহীন দাদু, মাসি, লম্বা নিমিত্ত বোশা এবং আরো অনেকে। চমৎকার অরুণের ভাষায় লেখক কতকগুলি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটা যুগ ও লম্বা একে ফুটিয়ে তুলেছেন।

চারটি গল্প। মিহির আচার্য অশোককুমার দেন্ডু চিত্ত বোঝাল লিডার্স বোব

একগুচ্ছ কবিতা

সাতটি প্রবন্ধ। অশোক মিত্র রঞ্জন নাগ শ্রীপতি মন্ডী নিত্যপ্রিয় বোব রঞ্জিতকুমার লেন লম্বা বন্দোপাধ্যায় বীরেন কর্মকার

দাম : ছয় টাকা

বিপজ্জনক নীতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কমতার ফিরে আসার পর ইন্দিরা সরকার জাতীয় অর্থনীতিকে খুব দ্রুত একচেটিয়া পুঞ্জির আর্থে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন। সমাজতন্ত্রের ক্ষমতার আড়ালে দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঞ্জির কাছে দেশের গোটা অর্থনীতিকেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে ইন্দিরা সরকারের নয়া শিল্পনীতি ঘোষণার তৎপর বিশ্লেষণ করে এই স্তরে দেখানো হয়েছিল যে এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট আরো তীব্র হবে। কনসেশনের পর কনসেশন দিয়ে এদেশের একচেটিয়া শিল্পপতিদের ক্ষুধা যেটানো যায় নি বরং তাদের মুনাকালালসা আরো বেড়ে গেছে। ফলে দারিদ্র্য দেশেই এখন মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক চলেছে। চিনির কারখানা জনসাধারণের কাছে থেকে মাত্র একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে সাড়ে বারোশ কোটি মুনাকা উত্তল করে নিয়েছে। অথচ এটা গত বছরের উৎপাদন থেকেই করা হয়েছে, সুতরাং উৎপাদন খরচ বাড়ার কথাই ওঠে না। ইন্দিরা সরকার বেশ হিসেব করেছে এই কাণ্ডটি করেছে। সুগার ব্যারমেন্টের উৎপাদন শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে। আবাচাধীদের কোটি কোটি টাকা বাকী রাখা সঙ্গেও চিনির কারখানা মালিকদের তা পরিদোধ করতে বাধ্য করা হয় নি। দশমফ টন চাল রপ্তানী করা হয়েছে, মাছ রপ্তানী করা হয়েছে ১৬২ কোটি টাকায়। আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানী করার চালাও অসুখাত দেওয়া হয়েছে। ফলে দেশে অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মুনাকাশিকারীরা দুহাতে জনসাধারণকে লুণ্ঠ করার মওকা পেয়েছে।

কমিশন এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিঃ এতদিন দায়িত্ব পালন করে এসেছে। এবার বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে এত বড় পরিহাসে ইতিপূর্বে আর কোন সরকার সাহস পায় নি।

আরো অনেকদূর এগিয়ে এখন মার্কিন কৃষিদপ্তরের সঙ্গে ভারতের কৃষি দপ্তর একসঙ্গে ভারতের কৃষি উৎপাদনে যৌথ প্রকল্প গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়েছে। গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ইকনমিক টাইমসে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এস পুরী এবং মার্কিন কৃষি দপ্তরের আন্তর্জাতিক বিষয় ও পণ্য প্রকল্পের সহকারী সচিব ডঃ ডি ই হাটওয়ার্ড কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার কতগুলি ক্ষেত্র সম্পর্কে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন।

ভাষ্য

ভারতের তৈল খনি ও কৃষি সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ভারত মার্কিন সহযোগিতার ছিদ্র ধরে মার্কিনী অর্থপ্রবেশ ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে বিপন্ন করার মোক্ষম উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত সরকার মার্কিনী অর্থপ্রবেশে বিশেষ স্বযোগ সুবিধা দিয়েছেন বদেই বোধ করি মার্কিনীরা মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর উপর যে আমদানী শুদ্ধ ধার্য করেছিল, তার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের শাখা লগ্নী সংস্থার পক্ষ থেকে একটি কমিশন এদেশে এসে পৌঁছেছে। তারা ভারতের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থায় অর্থ লগ্নী করার উৎসুক। এতকাল ভারত আন্তর্জাতিক লগ্নী কর্পোরেশনের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পায় নি। সরকারী শিল্পগুলির প্রসারের জন্তে অর্থ লগ্নী করা আন্তর্জাতিক লগ্নী কর্পোরেশনের অভিপ্রায় নয়। এই সংস্থার বিশেষ কমিশন এদেশে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পগুলিকে সাহায্য করার আগে ভারত সরকারের আর্থিক নীতিগুলি লগ্নীর পক্ষে উৎসাহব্রহ্মক করে তোলার দাবী করেছে। যদি তাদের দাবী মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক লগ্নী সংস্থা ভারতীয় শিল্পপতিদের ৩৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি টাকা সাহায্য করতে ইচ্ছুক।

সুতরাং ভারত সরকার এই সাহায্য পাবার জন্তে দেশের চিরচরিত অর্থনৈতিক নীতিগুলি বিসর্জন দিতেও বিচা করছেন না। মাত্র বারোটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জুড়াস যেভাবে বীণা ঐষ্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ভারত সরকারও সেইভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এর ফলে ভারতের কৃষি ও শিল্পে মূল্যবাহু পণ্য উৎপাদনে, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উপনিবেশিক অসম বিকাশের স্রষ্টাপাত জোরদার হয়ে উঠবে।

মার্কিনীদের অংশীদার ও মুখপেকী ভারতীয় একচেটিয়া বৃহৎ শিল্পপতিদের আর্থে ভারতসরকার নয়া শিল্পনীতি প্রবর্তন করেছেন। আর-করের ৭২ (ক) ধারা সংশোধন করে রপ-শিল্পকে অধীকৃত করার জন্তে যে বিশেষ ছাড় দেবার ব্যবস্থা ছিল তা যে কোন ধরনের কোম্পানী মার্জারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে স্থির করেছেন, রপ্তানী শিল্পের বিভিন্ন পণ্যের উপর যে বিশেষ শুদ্ধ প্রত্যাপনের সুবিধা রয়েছে তা আরো বেশী হারে ধার্য করেছেন। সুতরাং দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঞ্জির পক্ষে ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রম লুণ্ঠনের নতুন মতুন ব্যবস্থা দেখে তারা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। এই ছাড়ের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ৪৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০২৮ টাকা করা হয়েছে। সুতরাং রপ্তানী বাণিজ্যে যে লাভ হত, শুদ্ধ ছাড়ের পরিমাণ তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুঞ্জিপতিদের চাপের কাছে নতিশীকার করে ইন্দিরা সরকার ভারতের অর্থনীতিকে পছ করে তুলছে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিকে একচেটিয়া পুঞ্জির আর্থে বিপন্নীত দিকে মোড় ঘোরাবার উত্তোগ নিয়েছে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আরো বাড়বে, আরো গভীর হবে। স্বাধীন ও স্বনর্ভর অর্থনীতি পছ হবার ফলে একদিন হয়তো আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে। তাই সময় থাকতেই ইন্দিরা সরকারের এই জাতি বিক্রোথী আর্থিক নীতিকে পরাস্ত না করা হলে সমূহ বিপদ দেখা দেবে।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

বাৎসরিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে বেআইনীভাবে কর্মী ছাঁটাই

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র সংস্থা বেআইনীভাবে সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মী ছাঁটাই করেছেন। এই সংবাদপত্রটির নাম উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এটি প্রকাশিত হয় শিলিগুড়ি শহর থেকে। কয়েকজন দালাল কর্মচারীর সহায়তায় নিয়ে মালিকপক্ষ নির্বিচারে কর্মচারী ছাঁটাই করে চলেছেন তাঁদের ইচ্ছামত। এই সংস্থা কোনরকম আইন না মেনে ইচ্ছামত যা খুসি তাই করে চলেছে নিজেদের আর্থ বজায় রাখার জন্ত।

ছাঁটাই সাংবাদিকরা হলেন দময়ন্তীচাঁদ, গৌতম পাল, বিজয় রায়, স্বর্ধ ঘোষ এবং কল্যাণ ঘোষ। এই সংবাদপত্রটির লক্ষ্যই হল কম বেতন দিয়ে বেশী কাজ করানো। “লোকসেবকী” কারদার এই সংবাদপত্রটি কথায় কথায় কর্মচারীদের ছাঁটাই করার হুমকী দেয়।

এই সংস্থার মালিকানা তালুকদার গোঞ্জির। নামে মালিক শ্রীমতী মঞ্জী তালুকদার হলেন আসল মালিক সুহাস তালুকদার নামক জনৈক ব্যক্তি। এই ব্যক্তিটি নামে ও বেনামে আরও ১০টি সংস্থার মালিক। সম্প্রতি তাঁর নতুন পড়েছে সংবাদপত্র প্রকাশনার দিকে। উত্তরবঙ্গ সংবাদের পর তিনি চোটা করছেন আসানসোল থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের।

ছোকসেবক পত্রিকা থেকে “বিতাড়িত” গঠনক সাংবাদিক তাঁর পেশাগত আর্থে জমাজলি দিয়ে সাংবাদিকদের শোষণ করার নামান পরামর্শ দিয়ে চলেছেন তালুকদার মশাইকে। সুগান্তর পত্রিকা থেকে “বিতাড়িত” এক প্রবীণ সাংবাদিকও এই কাজে মালিকের হাতকে শক্ত করে চলেছেন।

এই সংস্থার সাংবাদিক নিয়োগ করার পদ্ধতিটাই প্রত্যারণ্য পর্যায় পড়ে। ৩৩ সাংবাদিক চেয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে যে সব আবেদন আসে সেগুলি বাছাই করে ইন্টারভিউতে ডেকে পাঠিয়ে দু’একজনকে নিয়োগ করা হয় “শিক্ষাবীণ” হিসাবে অভিজ্ঞতা বাচাই করে। কিন্তু এই সব সাংবাদিকদের পূর্ণ সময়ের সাংবাদিক হিসাবেই কাজ করতে হয় এবং দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে প্রায় প্রতিটি কর্মচারীকেই বাধ্য করা হয়। হাজিরা খাতায় সময় উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করতে দেয়া হয় না। শিক্ষাবীণ নিয়োগের একটা সময় সীমা নির্দিষ্ট

থাকে। এখানে তার কোন বালাই নেই। এরা প্রম আইন, ন্যূনতম বেতন আইন, সাংবাদিক আইন সহ বিভিন্ন প্রকারের আইন ক্রমাঘরে লঙ্ঘন করে চলেছেন।

যুগান্তরের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক এবং সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসুকে এই সংবাদপত্রে প্রধান সম্পাদক করা হয়েছে। বরং বলা ভালো এই সংস্থা দক্ষিণাবাসুর নাম ব্যবহার করেছে মালিক দেড় হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে। দক্ষিণাবাসুর কোন অধিকার নেই সম্পাদনার বিষয়ে। যা করার তা করেন যুগ সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায়। এই সংস্থার প্রতিটি কর্মচারীর মতে বিনয়বাবুই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মালিকের কাছে মিথ্যা নালিশ করে থাকেন। সাংবাদিক বিজয় রায় এবং সাংবাদিক কল্যাণ ঘোষকে ছাঁটাই করার পেছনে বিনয়বাবুর হাত আছে বলে অনেকে মনে করেন।

দক্ষিণাবাসু মান দমান নিয়ে সরে পড়ার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয় বিনয়বাবু চেপে রাখেন। সেটা তাঁর পক্ষে অসম্মানের বলে তিনি মনে করেন।

এখন দেখা যাক এই সংস্থার প্রাক্তন এবং বর্তমান সাংবাদিকরা কে কত বেতন পেতেন বা পান। প্রধান সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু ১৫০০ টাকা, যুগ সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায় ১০০০ টাকা, বার্তা সম্পাদক অরুণ দাশগুপ্ত ৬০০ টাকা, কলকাতা অফিসের চীফ রিপোর্টার রমেন দাস ৫০০ টাকা, সাব এডিটর যিহির কর্মকার ৪০০ টাকা, সাব এডিটর কল্পন নদী ৪০০ টাকা, সাব এডিটর পান্নালাল ঘোষ ৪০০ টাকা, সাব এডিটর বিপ্লব তালুকদার ২০০ টাকা, সাব এডিটর নবেন্দু গুহ ২০০ টাকা, সাব এডিটর স্বর্ধ ঘোষ ৪০০ টাকা, সাব এডিটর জামল চৌধুরী ১৭৫ টাকা, সাব এডিটর মমতা দিহা ১৫০ টাকা, চীফ রিপোর্টার বিজয় রায় ৫০০ টাকা, স্টাফ রিপোর্টার কল্যাণ ঘোষ ২০০ টাকা, স্টাফ রিপোর্টার তরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ২০০ টাকা, স্টাফ রিপোর্টার অমিত বসু ১০০ টাকা, স্টাফ রিপোর্টার গৌতম পাল ১৫০ টাকা, স্থানীয় রিপোর্টার দীপক ঘোষ ৫০ টাকা, স্থানীয় রিপোর্টার তপন প্রধান ৫০ টাকা, স্টাফ রিপোর্টার শৌনক জাহিড়ী ২০০ টাকা।

প্রথমোক্ত ছজন এবং কলকাতা শেখাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক অবনতির নেপথ্যে

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক অবনতির নেপথ্যে কলকাতার অবস্থানরত উপরাষ্ট্রদূত জনাব হাক নূর রশিদেব সক্রিয় ভূমিকা আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর মাধ্যমে আমেরিকা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ বাধাতে বন্ধপত্রিকর। অমেকে বলেন সি আই এর সঙ্গে জনাব রশিদেব যোগাযোগ আছে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত হিসাবে জনাব হাক নূর রশিদ গত ১৯৭১ সালের ৩রা আগস্ট কলকাতাতে নিযুক্ত হয়েছেন। লণ্ডনের লিংকনস্‌ ইন থেকে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর আইন ব্যবসারে তিনি মোটেই স্বযোগ সুবিধা ও খ্যাতি লাভ না করতে পারায় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে একজন উপ-আইন অফিসার হিসাবে জাতিসংঘ

ও আইন কার্যে দপ্তর দেখা শুনা করতেন। পাকিস্তান আমলে এই আইন অফিসারদেরকে কূটনীতিবিদ বলা হত না। এবং ফোন দেশে কূটনীতিবিদ হিসাবে বহুলী করাও হত না। এই ক্ষম পাকিস্তান আমলে জনাব রশিদেব বিশেষ কোন বদলী হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭০ সালে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং একই পদে বহাল থাকেন। ১৯৭৪ সালে আইন ও চুক্তি দপ্তরে মহাপরিচায়ক পদে উন্নীত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার পর জনাব হাক নূর রশিদেব ভারতীয় জনাব তবারক হোসেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পররাষ্ট্র সচিবের কার্যভার গ্রহণ করেন।

জনাব তবারক হোসেন বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোর বিরোধী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের প্রথম সারির দালাল

ছিলেন। ১৯৭১ সালের মন্তব্যে মাসে স্বাধীনতার ১ মাস পূর্বে জনাব তবারক হোসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানকে নাবিকভাবে মাহায্য করার জন্য চীন থেকে অস্ত্রপত্র আমদানী উপলক্ষে পিপিং যান। ইয়াহিয়া খানের বালগী হোসার হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু শেখ মুজিবের উদার মনোভাবের জন্য তিনিও স্বাধীনতা লাভের পর দেশে ফিরে আসেন। জনাব তবারক হোসেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের পদ গ্রহণ করে তার জায়গায় জনাব হাক নূর রশিদকে আইন অফিসার থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনৈতিক বিভাগে নিযুক্ত করতে চান; কিন্তু সরকার তার কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ করেন।

অবশেষে জনাব তবারক হোসেন জনৈক মন্ত্রী সহায়তার

জনাব রশিদকে এগারিশমেন্ট বিভাগে স্থানান্তরিত হিমাবে নিযুক্ত করতে সক্ষম হন। কিছুদিন পরই ঐ মন্ত্রীর মারফত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বহুলী করান। অপরদিকে জনাব তবারক হোসেনও পররাষ্ট্র সচিব থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত উন্নীত হন। ফলে হাক নূর রশিদেব ভাগ্যও স্বপ্নস্বরূপ হল। জনাব তবারক হোসেন ও জনৈক মন্ত্রী একান্ত সহায়তার জনাব হাক নূর রশিদ কলকাতার উপরাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হন। জনাব রশিদেব কূটনৈতিক কোন অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে; মূলতঃ তিনি একজন আইন ব্যবসায়ী।

সম্প্রতি হাক নূর রশিদেব জীর বড় বোন যিনি এখন আমেরিকায় আছেন তিনি সম্প্রতি কলকাতায় এসে তার বাড়ীতে একমাস অবস্থান করে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান জনাব নূর হোসেনের জী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খান মিসেস হোসেনকে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে পাকিস্তান সরকার বাঙালীদের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতাবাস থেকে কেন্দ্র আনছিলেন সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের উপর ভিত্তি করে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জনাব নূর হোসেন পুলিশের প্রধান কর্মকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং হাইকোরাল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। মিসেস হোসেনের অজ্ঞানতাবোধে তা করা হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান মিসেস হোসেনকে অষ্ট্রিয়ার না পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতির অতিথিশালার বিশেষ অতিথির পদমর্যাদায় রাখেন এবং মিসেস হোসেন জনাব ইয়াহিয়া খানের প্রিয়সঙ্গিনী ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে মিসেস হোসেনের কপালে বিজয় তিলকের ফোটা পরিয়ে অষ্ট্রিয়ার পাঠিয়ে দেবেন। কারণ মিঃ হোসেন ও মিসেস হোসেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোর বিরোধী শত্রু ছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় মিসেস হোসেনের জমাতে বিজয় তিলকের ফোটা ছুটল না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভের পর ইয়াহিয়া ও মিসেস হোসেন যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তা আর কেউই জানেন না।

মিসেস হোসেন এখনও বাংলাদেশের আত্মগত্যা স্বীকার করেন না। পাকিস্তানের পরাক্রমকে তিনি তার ব্যক্তিগত পরাক্রম বলে মনে করেন। জনাব নূর হোসেন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জীর অপকীর্তির কথা জানতে পেরে আত্মবিস্ময় হয়ে হাইকোরাল্যাণ্ডে গিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মন্তব্যে মিসেস নূর হোসেন জনাব হাক নূর রশিদেব বাসভবনে বিশেষ অতিথি হিসাবে এক মাস অবস্থান করে আমেরিকা চলে গিয়েছেন। কলকাতায় থাকাকালীন মিসেস হোসেনকে উপলক্ষ্য করে অনেক নৈশভোজের অল্পটানে তাঁর সঙ্গে আমেরিকাপন্থী অনেক উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে জনাব রশিদ পরিচয় করিয়ে দেন এবং অনেক থলাপরা-মর্শও হয়। থলাপরা মর্শের মূল ব্যাপার হলো ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি কি করে করা যায়। এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কি করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উত্থানী দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আরও জোরদার করা যায়? কারণ মিসেস হোসেন সি আই এর গুপ্তচর হিসাবে কলকাতা থেকে হাক নূর রশিদেব মাধ্যমে অনেক গোপন তথ্য নিজে এসেছিলেন।

তিনি আসার পরই এইজন্য নাকি হাক নূর রশিদ সাহেব উত্তর পূর্ব ভারতে যারার অল্প ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেছিলেন। ভারত সরকার জনাব রশিদেব আটক হন মজুর না করার উত্তর পূর্ব ভারতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমেরিকা থেকে গডম্যান নামে যে তরুণ যুবকটি ভারতে এসেছিল তার সঙ্গেও নাকি মিসেস হোসেনের যোগাযোগ আছে। তবে হাক নূর রশিদ তার ভারতীয় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জনাব তবারক হোসেনকে যে মিসেস হোসেনের মাধ্যমে অনেক গোপন তথ্য দিয়েছেন তাতে আর কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

হাক নূর রশিদ সাহেব সবচেয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তাকে নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় এসেই তিনি নিজেকে বড় পণ্ডিত ও কূটনীতিবিদ বলে ঘোষণা করেন। অজান্তে অজান্তে অফিসারদেরকে খুবই হেয় চোখে দেখেন এবং নিজেকে খুবই বিরাট বলে মনে করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের আইন অস্থায়ী একখানি গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তিনি নিজে একখানা গাড়ী তার জী একখানা ও তাঁর ছেলে মেয়েরা একখানা গাড়ী ব্যবহার করেন। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হাক নূর রশিদেব তিনখানা গাড়ী ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান শেখাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়



আপনার জীবনের কোনো কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই ইউকোব্যাক্সের জন্য

আজ অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আপনার বিদায় সংবর্ধনা।
অথচ এই মুহূর্তেই নানা চিন্তা আপনার মনে জড় করে
আসছে। ভাবছেন, সম্বল তো মাত্র
প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চেক।



এই স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার অবসর গ্রহণ কী করে এক সুখের স্মৃতি হয়ে উঠতে পারে, আমরা সেই পরামর্শ দেব। আগামী কাল থেকে আর অফিস নেই। প্রত্যেকদিন সকালে আর গাড়ি ধরার তাড়া থাকবে না। মাসের শেষে অবশ্য মাইনের চেকও আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি ও যদি কিছু সঞ্চয় থেকে থাকে তো তার উপর।

আপনার সহকর্মীরা আপনাকে বিদায় জানালেও ইউকোব্যাক্সে আপনার সাদর আমন্ত্রণ। আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনার সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। আমরা বলে দেব, আমাদের কোন সঞ্চয় প্রকল্পটি আপনার পক্ষে ভালো হবে। অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও মনে হবে, কাজে না গিয়েও মাস মাস মাইনে পাচ্ছেন। তাছাড়া দ্রুত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলতে চান—তেনম প্রকল্পও আমাদের আছে।



ইউকোব্যাক্সে কমাশিয়ারাল ব্রাঞ্চ
ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমান

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন ভাঙছে কেন

পার্থ মুখোপাধ্যায়

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন এ আই বি ই এর ভাঙন আসন্ন। ৪৬ মাসে সংগঠন পূর্ণ দীর্ঘ চৌদ্দশতা বছর যে সংগঠন অতিক্রম করে এমত্রে, সেই সংগঠন আজ এমন এক সময়ে ভাঙতে চলেছে যখন দেশব্যাপী বায় ও গণস্বাক্ষিত শক্তি নমুনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন, প্রয়োজন অধিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। তীব্র-সীমিতার উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে। তবে এই ভাঙন কেন? পি পি আই পি আই (এম)-এর টানাপোড়েনে যদি সংগঠন ভাঙতো তাহলে ৬৪ সালের পরও যোগ বছর পার হয়ে গেছে; আজ ৮০ সালের শেষে এই ভাঙনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন? এই ভাঙনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে এ আই বি ই এর জ্যেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, লুকিয়ে আছে নিজের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কজনক অধ্যায়ের মধ্যে।

এ আই বি ই এর দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন সম্পর্কে যারা সাহসাত্মক ওয়াকিবখাল তাঁদের কাছে একথা অজানা নয় যে এ আই বি ই এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কন্ডারমাস্ত। তাঁদের কার্যপদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সবই নির্ভর করে নর-দ্বিমার অজর ভবনের রঙ বদলের উপর। অর্থাৎ ভারত সরকারের প্রতি এ আই বি ই এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বহুস্তাবাপন্ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন সেই শ্রেণীর প্রতিও এদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমঝোতার। ১৯৭৩ সালের সংশ্লে-লনে প্রাপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর পুনর্গঠনকে বলা হল 'Selfish demand'; সম্পাদকীয় প্রতিবেদন রাখতে গিয়ে বলা হল "wages of bank employees have reached a saturation point." কেন্দ্রীয় সরকারের নিজের শ্রেণী স্বার্থে অহু-হুত নীতির ফলে উদ্ধৃত উদাহরণ মূল্য-বৃদ্ধি প্রমিত-কর্মচারীদের প্রকৃত মজুরী হারানভাবে হ্রাস করে চলেছে—এ দৃষ্টান্তেই সম্পূর্ণরূপে অধীকার করা হল। একই কারণে সরকার যখন বিভিন্নভাবে প্রচার করতে থাকলেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা 'high wage islanders' এবং প্রমিতকর্মচারীদেরই বিভ্রান্ত করে সংগঠিত করতে লাগ-লেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে

তখনও এ আই বি ই একেমন প্রতি-বাদ্য করে নি কারণ তাবাত মনে করে উচ্চ-মজুরির বীষণ বাসিন্দা ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। এমত্রে ১৯৭৩ সালের ২৬শে জুন যখন ভারতব্যানী আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরী আশ্রয় তারি করা হল, কেড়ে নেওয়া প্রমিত, কর্মচারীর, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পি পি আই-এর সঙ্গে ভাল মিলিয়ে এ আই বি ই এও অভিমতের ভাঙন। ইন্দ্রি গান্ধীর জরুরী অবস্থায়। এমত্রে বলা হল "The declaration of Emergency was rather belated." অর্থাৎ বড় দেরী হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশ ব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছিল জরুরী অবস্থার অধ-কারময় দিনগুলিতে তার প্রতিবাদ করারও কোন প্রয়োজন বোধ করেনি এ আই বি ই এ। তাই "ধীরে ধীরে সংগ্রামের মধ্যে পোড় বেয়ে গড়ে লড়াই এতিহাসে সংগঠন (১)" ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে পরিণত হয়েছে পুঁজিপতি সামন্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সর-কারের বিশ্বস্ত গৃহপালিত পাহারা-দারে। বাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই এ আই বি ই এ অহুসরণ করে চলেছে শ্রেণী সমঝোতার মীতি। জরুরী অবস্থার সমর্থন তারই চূড়ান্ত পরিণতি। বর্তমানে এ আই বি ই এর নেতৃত্ব পি পি আই এর ডাকে পছন্দ হতে। ডাকে সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমিত কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বর্তমানে সংগঠনের সমস্ত কার্যকলাপেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকলন ঘটছে এবং এ আই বি ই এ ক্রমাগতই মালিক শোষণ নীতি অহুসরণ করে চলেছে এবং অর্থনৈতিক সামাজিক, চাকুরীর নিরাপত্তা, গণ-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষার শাসক শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একই পতাকাতে সংগঠিত করে অবস্থার উন্নতি করার যে লক্ষ্য নিয়ে এ আই বি ই এ গঠিত হয়েছিল তার মূলেই ক্রমাগত কুঠারখাত করে চলেছে।

সংগঠনে কি ঘটছে?

এ আই বি ই এর সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রভাত কর ১লা সেপ্টেম্বর ৮০ তারিখের ৭৬৮-৮৮ নং সাক্ষ-লারে বলেছেন: "এ সব কমরেডদের এই নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে, সং-

গঠন বা অত্যন্ত বিষয়ে তাঁদের বৈ-নমত ফোভ আছে নেওজিকে সর্বব্যাপী-এমত্রে গণতান্ত্রিক নীতি অহুসারে এবং আত্মদের সাংগঠনিক কাঠামোর যথো, পারস্পরিক আলাপ আলো-চনার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে।" তিনি আরও বলেছেন: "এরই ভিত্তিতে যে সব ইউনিয়ন সাম্প্রতিককালে এসে নিয়েছে সেই-ওমিতে ভুলে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ বিভিন্ন ভাগ্যায় এ আই বি ই এ নেতৃত্ব যে-পাক্টা-সংগঠনের অন্ন দিয়েছেন মূল সংগঠনের কর্তৃত্বকে অধীকার করে একথা প্রভাত কর নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু পাক্টা সংগঠনের অন্ন কেন তাঁরা দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ সাক্ষ-লারে নেই। অথচ দাবি রয়েছে (১) কলকাতা হাইকোর্টে এ আই বি ই এর কর্তৃত্বকে অধীকার করে ইউকো ব্যাঙ্কের মূল সংগঠন যে মামলা করেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। (২) ইউকো ব্যাঙ্কের কলকাতা ইউনিয়নের কার্যকলাপের পরিধি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং অন্তত এ আই বি ই এ যে পাক্টা সংগঠন গড়ে তুলেছে ডাকে যেনে নিতে হবে। (৩) ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্ত পদে বাতে শুধু এ, আই, বি ই এ অহুসারিত সংগঠনগুলিকেই দিতে হবে। প্রভাত করের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ইউকো এবং ইউ-নিয়ন ব্যাঙ্কের মূল সংগঠনের সঙ্গে এ আই বি ই এর বিরোধ শেষ পর্যন্ত পৌছেছে।

প্রভাত কর যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলেছেন সংগঠনে সেই গণতন্ত্র বস্তুর চেহারা কেমন? কেউ যদি নেতৃত্বের সমালোচনা করেন তাহলেই আখ্যাত হন বিভেদপন্থী বলে। নেতৃত্বের কোণে পড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁকে দুই এসাকার বহলী পহ নানা রকম হররানির শিকার হতে হয়। অবস্থা বর্তমানে এমনই যে কর্মচারীরা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ থেকে ভয় বেশী করেন এ আই বি ই এ নেতৃত্বকে। এ আই বি ই এর সবুজ সংকেত না পেলে নিজ নিজ ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের সমস্তা নিয়ে কারো কথা বলার অধিকার নেই। যেমন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে এ আই বি ই এর সমালোচনার মূখর কর্ম-চারীর হাটাই-এর ব্যাপারে ইউনিয়ন ব্যবস্থা নেবে না, দামপণ্ড হয়ে

বছরের পর বছর পড়ে থাকলেও পেক্টাল ব্যাঙ্কে বাবা ভারকনাথের জোর না ধরলে সে চাকুরি ফিরে পাবে না, এ আই বি ই এর প্রিয় পাত্র ছাড়া কেউ চাকুরি পাবে না, যেমন ইউনাইটেড ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক এর উদাহরণ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই সে বিভেদপন্থী।

বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য সম্মেলন হবে কিনা তা সংগঠনের সংবিধান নির্ধারণ করবে না, নির্ধারিত হবে এ আই বি ই এর উদ্যোগের মনোমানে গরিষ্ঠতা থাকবে কি থাকবে না তাঁর ওপর। গুজরাট, আসাম, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এর জলন্ত উদা-হরণ। পশ্চিমবঙ্গে আজ তিন বছর ধরে রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে না যদিও সংবিধান অহুসারে প্রতি বছর সম্মে-লন হওয়ার কথা। ওয়ারিং কমিটির মিটিং হবে না—এরও প্রতিবাদ করা চলবে না। বিগত তিন বছরে সেনারেল ফাউন্সিলের সভাও হয় নি। তাও যেনে নিতে হবে। ১৯৬৯ সালে ওড়িশার রাজ্য সম্মে-লনের প্রস্ততি হল। যখন দেখা গেল সম্মেলনে ও নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব পরাজিত হবে, সম্মেলন প্রত্যা-হার করা হল। প্রতিনিধিদের ফিরে যেতে বলা হল। প্রতিনিধিরা ফিরে না গিয়ে যে সম্মেলন করে রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করলেন, এ আই বি ই এ তাকে স্বীকৃতিও দিল না। পরবর্তী সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি সমালোচনা করতে পারেন তাঁদের ভাড়াটে গুণা দিয়ে ডাকিয়ে দেওয়া হল। মারমতে ক্যাম্প থেকে জিমিনপজ রাষ্ট্রের কলে দেওয়া হল। সম্মেলনে গোপন ব্যালটের নির্বাচন এ আই বি ই এর চক্ষু-শূল। এ দাবী করার জন্য ইউ বি আই-এর সাম্প্রতিক কটক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের দৈহিক নির্বাচন করে সম্মেলন থেকে ডাকিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য সংগঠনের কাঠামো কি হবে তা নির্ধারণ ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা করবে না। এ আই বি ই এর নেতৃত্বকে কর্মতার রাখতে যেখানে যেমন প্রয়োজন এ আই বি ই এ সর্বভার-তীয় নেতৃত্ব তা ঠিক করে দেবে। এর উদাহরণ উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের সংগঠনগুলি। যে নেতারা নিজেদের ব্যাঙ্কের নির্বাচনে পরাজিত হন বা কর্মতার আপত্তে পারেন না তাঁদের অন্ন ব্যাঙ্কের সমাপতি হিসাবে নির্বাচিত করে রাজ্য নেতৃত্ব বা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এমন কি ইউকো ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে মনোনীত করা হয়। মূল সংগঠনগুলির বহুদিনের অহুমোদন থাকা সত্ত্বেও সংগঠন-গুলির অহুমোদন প্রত্যাহার

করে-নিজেদের উদ্যোগ লোকদের নিয়ে পাক্টা ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে এ আই বি ই এ নেতৃত্ব বহু ব্যাঙ্কে। এ সবই প্রভাত করের গণতান্ত্রিক নীতি নীতির প্রতি অসীম প্রচার পরিচায়ক।

কর্মচারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বেতন ও চাকুরীর অত্যন্ত শর্তা-বলী নিরপণের ক্ষেত্রে এ আই বি ই এর ইতিহাস মনোনিবেশ। কর্মচারী-দের বিশ্বাসের স্বার্থে নেতৃত্ব ক্রমা-গতই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে-ছেন। একের পর এক চুক্তি করে শক্ত করেছেন কর্তৃপক্ষের হাতকে। সাহায্য করেছেন কর্তৃপক্ষকে কর্ম-চারীদের একের পর এক অবিকার ছিনিয়ে নিতে। ১৯৬৬ সালের প্রথম ষিপাক্ষিক চুক্তির সময় ভাগ বাটো-রার ভিত্তিতে বেতন সংশোধনের পরিবর্ত হিসাবে যেনে নেওয়া হয়েছে মেকানাইজেশন বার রূপ কর্মেই ব্যাঙ্ক শিল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে, সঘৃচিত হয়ে আসছে কর্মসংস্থানের স্বযোগ। আন্দোলনের দারা স্ট্র অহুকুল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রী এওয়ার্ড দারা চাপানো সাম্প্রতিক বিধান দেখান যে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭০-এর দ্বিতীয় ষিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল।

সর্বাপেক্ষা দারাজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এ আই বি ই এ ১৯৭৯ সালে বার নাম তৃতীয় ষিপাক্ষিক চুক্তি। দুই দশক ধরে প্রচলিত মহা-ভাতার হার নামিয়ে দেওয়া হল, স্বীকার করে নেওয়া হল মহাভাতার সর্বোচ্চ নীমা। অত্যন্ত ভাতার ক্ষেত্রেও যা ছিল এতদিন মহাভাতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাও করে দেওয়া হল দ্বি। যেনে নেওয়া হল মালিক-পক্ষের দাবী প্যাকেজডল এবং যে বিষয়গুলিতে মতপার্থক্য থাকবে তার নিষ্পত্তি হবে আরবিট্রেশনে। এবং আরবিট্রেশন বোর্ড গঠিত হবে সর-কার পক্ষের একজন, মালিকপক্ষের একজন এবং কর্মচারীদের পক্ষে এক-জন নিয়ে। এদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং আইনগতভাবে উত্তর পক্ষের কাছে "binding"। ফলে সরকার এবং মালিকরা বাচিস্তা কর-বেন তাই চালু করা হবে ব্যাঙ্ক শিল্পে, কারণ তিনজনের মধ্যে দুজনই তাঁদের প্রতিনিধি। আরবিট্রেশনে মালিক পক্ষ ১০০ পৃষ্ঠার দাবীপত্র পেশ করেছেন আর মধ্যে রয়েছে প্রমিতস্বার্থবিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্বর্ধকারী বিধানবোধ। যেমন ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ব্যাঙ্ক যে কোন সময় যে কোন কর্মীকে যে কোন কাজ করতে পারবে। যে শেবাং ৬৪ পৃষ্ঠার

চেরবান্দারাজু ও তাঁর কবিতা

মিহির আচার্য

অজ্ঞেয় বিপ্লবী কবি বি, ভাস্কর রেড্ডি, ছদ্মনাম চেরবান্দারাজু নামে তিনি পরিচিত, তাঁর জন্ম হায়দরাবাদ থেকে মাইল জিশেক দূরে অন্ধ্র-প্রদেশ প্রদেশে এক পরিবারে। তেলুগুতে যখন কাব্য-চর্চা আরম্ভ করলেন তখন 'দিগম্বর গোপীনাথ' বিখ্যাত কবি নিখিলেশ্বরের সম্পর্কে আসেন। ফলত অচিরে চেরবান্দারাজু দিগম্বর গোপীনাথের অন্ততম হয়ে উঠলেন। এই 'দিগম্বর গোপীনাথ' 'রাগী ছোকরাদেব' 'গোপী'। কিন্তু এঁদের নির্দিষ্ট কোনো রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এই গোপী অন্ধ্রভূত থেকেও চেরবান্দারাজু নিঃসৃত প্রতিভা ও স্বাভাবিক পরিচয় রাখেন। 'বন্দেমাতরম্' 'নতুন প্রজন্মের কাছে', 'কোনোদিনই আর ভুলবে না ধান্দার', 'বাও' শীর্ষক উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি কবি এই পর্যায়েই লেখেন।

মকশালবাড়ি, মশজু কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারান্ডারতে যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হল

সাহিত্য দর্শন

তাঁর প্রভাব অজ্ঞেয়-লেখকদের উপরও এদে পড়ল। গঠিত হল বিপ্লবী লেখক সংঘ—'বিপ্লব রচয়িতা সংঘ', সংক্ষেপে 'বিরমর'। এই 'বিরমর' অন্ততম কবিকর্মী চেরবান্দারাজু।

১৯৭২-৭৪-এ সংঘের সম্পাদক।

রাষ্ট্রদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অপর্যায়ে বার বার অভ্যন্তরের সঙ্গে কবি নিগূহীত হন। ১৯৭১-এ নিবর্তন মূলক আটক আইনে, দু'মাস বাদে হাইকোর্টের নির্দেশে ছাড়া পেলেন, ১৯৭৩ পুনরায় মিলার। এবারও মুক্তি হাইকোর্টের নির্দেশে। ১৯৭৪-এ অজ্ঞেয় সরকার 'সেবেল্লাবাদ' বড়বড় মামলা' রুজু করলে কবি প্রাইমারি শিক্ষকপদ থেকে দ্রাবণেও হলেন।

১৭৫ এ সরকার আয়োজিত 'বিশ্ব তেলুগু সম্মেলন' কালে আবার কারারুদ্ধ। ১৯৭৭ এ শিক্ষামন্ত্রক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেও ডি, আই, জি-র হুমুনিয়ার পুনরায় সাময়িকভাবে বরখাস্ত। এ বছরের ২২ মার্চ অজ্ঞেয় রাজ্যপাল 'সাবিধানিক ক্ষমতার বলে' সরকারী শিক্ষকতার পদ থেকে চেরবান্দারাজু সহ আরেকজন বিপ্লবী কবি 'লোচন-কে'ও স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেছেন।

১৯৭৯ এ মজিফে টিউমার অপারেশনে কবির জীবন বিপন্ন হয়। দ্বিতীয়বারের অপারেশনে তাঁর ডান চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত। তাঁকে

বাঁচিয়ে রাখার জন্য আরেকটি অপারেশনের প্রয়োজন। দুটি পুত্র কন্যা ও অসামান্যিক হারিজো কাল-তিপাত করছেন কবিপত্নী।

বাঙালী পাঠকদের পক্ষে চেরবান্দারাজুর মূল কবিতার ভাষাগত বাধা দূর করার চেষ্টা করেছেন সংহতি প্রকাশনীর পক্ষে মনোজ্ঞন বিশাল কবির করেকটি নির্বাচিত কবিতার বাংলা তর্জমা দিয়ে। এঁদের নামকরণ করেছেন কবিতার উদ্ভৃতি ব্যবহার করে 'চেউয়ে চেউয়ে তলো-য়ার।' দাম ও সস্তা, মাত্র সাতটি তিন টাকা। পরিবেশনার রয়েছে কথাসিঁ, ১৯ আশাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। আমরা সচেতন পাঠকদের কাব্যগ্রন্থটি অবশ্যই সংগ্রহ করতে বলব। যেহেতু এই গ্রন্থের সমূহ লভ্যাংশ কবির চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হবে।

লংকনের বিভিন্ন কবিতার অঙ্ক-বাহ করেছেন লম্বা সেন, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, তন্ময় শিকদার, প্রদীপ গোস্বামী, শম্মি ঘোষ, বিপুল চক্রবর্তী, সব্যসাচী দেব, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দায়িত্বশীল বাঙালী কবিরা।

বলা বাহুল্য চেরবান্দারাজু দায়-বদ্ধ কবি, কবিতাকে তিনি শ্লোগানের মতো ব্যবহার করেও কাব্যের ব্যাকরণ লেখেন করেননি। কবির সংগ্রামী প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যভাষা এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে আলাদা করে তাদের বিচার করা চলে না। কবির বক্তব্যের গভীর প্রত্যয় অনাগ্রাসে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী রাজ-নৈতিক কর্মীদের আক্রমণ করে, উদ্ভূত করে, জীবন-উৎসর্গে প্রণোদিত করে। এটা কাব্যের বড় গুণ।

'জয় হবে আমাদের' কবিতার কবি বলেন:

এখন বুঝছি কী থেকে কী হয়,
লক্ষ্য আমাদের উত্তম
বিপ্লব আমরা আনব অস্ত্রাঙ্ক
সংগ্রামে;
তখন
তোমাদের হবে শেষ
আর আমাদের শুরু
বুজোরা নেতাকে লক্ষ্য করে
'কোনোদিনই আর ভুলবে না ধান্দার'
কবি তাঁর চালনা করেন;
আর কোনো গীতাপাণ্ডিতকে দরকার
নেই এই জাতির
বাইশ বাইশটি বছর গোলায় গেছে
বুজের
আদর্শের নকল জাতকটি স্বছে
তধু দাঁড়িক ভাষণ দিয়ে দিয়ে,
তাকে দেবতা বানাতে গিয়ে।

ব্যাক্ষ কর্মচারী

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

কোন কর্মীকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত চেক নিতে নিজেই পাশ করতে হবে, প্রয়োজন হবে না অফিসারের সই, লেজার সহ অন্যান্য চেকিং এর কাজ করতে হবে। এরকম অবস্থা কোন অতিরিক্ত তাতা দেওয়া হবে না কিন্তু এখন এই চেকিং-এর কাজের জন্য কর্মচারীদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হয় স্পেশাল এ্যাসিস্ট্যান্ট বারা অতিরিক্ত তাতা পান আর পৌনে তিনশ টাকার কাছাকাছি।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে যেখানে

'বাও' কবিতার মেকী বুদ্ধিজীবী দের কঠোর সমালোচনা করেন, এবং বলেন:

চিন্তা এক পলকের জন্য হলেও
নিজের আদর্শ থেকে দূরে যেয়ো না,
তোমার আদর্শ
খুঁধ।
যদি দরকার হয় জীবন দাও।
ছড়িয়ে দাও গভীর সমতার বীজ
সারা পৃথিবীতে।
এখন বাও,
বেরিয়ে পড়ো—
বাও।

'লড়ে নিতে হবে' কবিতার কবি মহেশ্বর মতন উচ্চারণ করেন:

দিনবদল তো গড়িমসি করে তুম্বোরে
আসে না তাই
প্রাণপণ তাকে লড়ে নিতে হবে
সময়ের কুটি ধরে।

'লাল সেলাম' কবিতার কবিতা গানের আদল পায় এই ভাষায়:
কমিউনিষ্ট ফিরা গৌড় সেলাম নাও
লাল সেলাম
কমরেড কুমাইয়া সেলাম নাও
লাল সেলাম

লড়াই সব গরিব লোক সেলাম দেয়
লাল সেলাম
সব মাজুদের লাল সেলাম সব পাহাড়ে
লাল সেলাম

সেলাম নাও লাল সেলাম ৥
গরিবখানার অন্ধকারেও হাসতে
পারো এমন বীর
এমনতরো ছুঁতিনেও হাসতে শেখাও
এমন বীর
নিষ্ঠার লব শিকানবীশ সেলাম দেয়
লাল সেলাম
বল্লমুটির লাল সেলাম বুনা ফল দেয়
লাল সেলাম
দকলপদ কেপের ধনি সেলাম দেয়
লাল সেলাম ৥

সেলাম নাও আগুয়ান তাই
সেলাম নাও লাল সেলাম
দব গায়ের এই লাল সেলাম
জাগরণের লাল সেলাম
মকশালবাড়ি শ্রীকাল্যাম
তেলেদনার লাল সেলাম
লাল নিশানের লাল সেলাম
সেলাম নাও লাল সেলাম ৥

যেহে মোট কর্মচারীর প্রায় দশভাগ বা দের মা ইনে এক পরমাণু বাড়েনি তৃতীয় বিপাকিক চুক্তির ফলে, তাঁদের কাজের কোন সময়সীমা থাকবে না। মকালবেলা বেরিয়ে যেতে হবে কৃষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে। নিজে আসতে হবে লম্বা দেবার টাকা, টাকা তোলায় স্লিপ। দশটা থেকে পাঁচটা কাজ করে আবার মধ্যবেলার যেতে হবে কৃষকদের বাড়ী তাদের দবারই টাকা কেবল দেবার জন্য।

তৃতীয়তঃ, ব্যাক্ষ-আদর্শে যেদিন, যে যেদিন দিনে কমপক্ষে ২০ ঘণ্টা কাজ না করলে উত্তর দেবে ভুল আর সে এক ঘণ্টার কাজ করবে ৭২ হাজার অ্যাকাউন্ট-এর প্রোডাক্ট, স্বদ, পোষ্টিং, ট্রেটমেন্ট সব কিছু।

এরকম বহুবিধ ব্যাপারই রয়েছে সরকার মালিক পক্ষের দাবীতে। এ আই বি ই এ কাগজে কলমে তীব্র বিরোধিতা করবে এ সব নিষাঙ্কের, কিন্তু যেহেতু প্যাকেজ ভীল ও আরবিট্রেশনকে খেনে নিয়েছে তারা তাই এ সবই চেপে বসবে ব্যাক্ষ কর্মচারীদের উপর। আর যে সরকারের প্রতিনিধি আরবিট্রেশন বোর্ডে রয়েছেন সেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

গত ১লা জুন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে সভা করেছেন, এবং যে সভায় প্রত্যাহার উপস্থিত ছিলেন সেই সভায় ইন্দিরা গান্ধী বক্তব্য রাখেন তিন ঘণ্টা ধরে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—মুদ্রাস্ফীতি রোধে সাধারণ কর্মচারীদের ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস ঘটানো অর্থাৎ মজুরী সংকোচন; (২) বর্তমান কর্মচারীদের মধ্যেই উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ কাজের বোঝা চাপানো; (৩) ট্রেড ইউনিয়নের সমাজবিরোধী চুকে গেছে এবং ধর্মঘট করছে—তাই ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ সরকারের কাছে প্রত্যাহার কর কি পেতে পারেন, আত্মদম্পর্ক করে এ আই বি ই এ ব্যাক্ষ কর্মচারীদের আর কি দিতে পার? কিন্তু এ আই বি ই এর পক্ষে সরকারী নীতির প্রতিবাদ তো করা চলবে না, কারণ ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে বরোদার অস্থিতি কেনারেল কাউন্সিল মিটিংয়ে নেতৃত্ব প্পট ভাষায় বলেছেন, "তিনি মত শোষণকারী কোন কঠোরই এ আই বি ই তে বরদাষ্ক করা হবে না।"

তাই পথ পরিবর্তনের কোন আশাও নেই। অন্ধকার ভবিষ্যত থেকে ব্যাক্ষ কর্মচারীরা নিজেদের উদ্ধার করতে কর্মচারীদের ওপর উত্তম খড়গকে প্রতিহত করতেই আজ ব্যাক্ষ কর্মচারীরা পান্টা সংগঠনের কথা চিন্তা করছেন, কারণ যেখানে তির

মত শোষণকারীদের কঠোর সেখানে আর বাই থাকুক সংগঠনের অভ্যন্তরে সংগ্রাম করার অধিকারও স্বীকৃত নয়। তাই এ আই বি ই এ তেহে তৈরী হচ্ছে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ব্যাক্ষ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

যে, তিনি নিজে, তার স্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েদের দ্বারা বিভিন্ন গোপন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনখানা গাড়ীর প্রয়োজন।

আরো জানা গেছে যে, তিনি হুতাবাসের সব টেলিফোনে ডালা লাগিয়েছেন এবং অফিসের কাউকেই টেলিফোন ব্যবহার করতে দেন না। কারণ তিনি যে সব গোপন তথ্য সংগ্রহ করেন তা সব তিনি তবারক হোসেনের নিকট পাঠান এবং তবারক হোসেন আমেরিকান সরকারের নিকট পেশ করেন।

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি বাংলা দেশ হুতাবাসের সকল কর্মচারীদের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু জনাব রশিদ সকল কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত ৩০ হাজার টাকা থেকে বঞ্চিত করে নিজে ২৫ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন। বাংলাদেশ সরকার অর্থ নৈতিক অনটনের অঙ্ক-হাতে তার অধীনস্থ গরীব কেরাণীদের টি এ, ডি এ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে নিজে সেই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন।

ক্রমশই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, হারু নুর্ রশিদ 'নাহেব কলকাতার উপরাষ্ট্রদূত হয়ে আসার পর কুটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা মোটেই কলগ্রন্থ হচ্ছে না। ভারত ও বাংলা-দেশের মধ্যে প্রধান সমস্যা সমূহ এখন বিপাকিক আলোচনার ফলগ্রন্থ হওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছে। তা হলো, কয়লা সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, সমুদ্রসীমানা সংক্রান্ত আলোচনা ও যৌথ নদী কমিশনের আলোচনা। উল্লিখিত সমস্যা সমূহের ফলগ্রন্থ সমাধানেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতি-বেশী রাষ্ট্র হিসাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কুটনৈতিক সম্পর্ক অবনতির নেপথ্যে জনাব হারু নু রশিদ অন্ততম দায়িত্ব পালন করেন। ভূমিকা পালন করছেন। কারণ আমেরিকা তাহার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশ সুসম্পর্কের অবনতি ঘটতে বদ্ধ পরিকর।

চিটফাণ্ড সম্পর্কে

২য় পৃষ্ঠার পর

৪৮)। এখন দিচ্ছে মাসে ৩% অর্থাৎ ৭৭ হাজার টাকা রাখলে প্রতি মাসের একটা নির্দিষ্ট দিনে কোড্ নাথার অস্থায়ী খামের মধ্যে রামবারু নামে আসবে তিনশো টাকা। শোনা যায়, কলকাতা মহানগরের তিন প্রধানের অনেক মামী ফুটবলার এখানে ১/১৫ লাখ টাকা রেখেছেন অর্থাৎ মাসে এরা স্বপ্ন পাচ্ছেন তিন হাজার টাকা। পিয়ারলেসে তো ১৯৭২-৭৬ সালে অনেক যুব কংগ্রেসী নেতা বেশ কিছু টাকা রেখেছেন ও কয়েক লক্ষ টাকার কেস করিয়েছেন।

পিয়ারলেস ইত্যাদিতে এত টাকা

জমা পড়ে কি করে?

এদের মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবসা পিয়ারলেস কোম্পানীর। এতে মোট বা টাকা জমা পড়েছে, বা মোট সার্ভিকিট হোল্ডারদের খুব বেশি হলে ২০% অধ্যবসিত। ১০% গ্রাহকদের সম্পদ কৃষক অথবা লোভহার। এই ৪০% এর বেশিরভাগই করেছেন এজেন্টদের ধরাধরির জন্ত, পেছনে লেগে পড়ে থাকার জন্ত। খেজার কমজনই করেছেন। আর ৬০% হল বড় বড় কোম্পানীর পারচেজ ম্যানেজারের করামো। এরা যুবের বিনিময়ে এখন সাধারণদের বলেন যে, 'আমার ছেলের এজেন্সিতে একটা ইনসিওর করাবেন।'

কোম্পানীগুলো এত চড়া মূল্য কেন করে?

কোম্পানীগুলো এই জমা টাকা আবার কালো-জিয়ারে, বোম্বো-মাল্যাজের দিনেমা শিল্পে, চোটার বাজারে খাটায়। অবিশ্যি হারে স্বপ্ন পায়, বছরে এমন কি ২০০% পর্যন্ত। যদিও কেবারিট বলে যে তারা টাকা খাটায় একমাত্র সরকারী সংস্থার। এ নিয়ে অনেক লন্ডেহ আছে। অনেক ব্যবসা আছে যেখানে একদিনে ৭৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করে জাহাজ থেকে খালি করা মাল কিমতে পারলে এক সপ্তাহের মধ্যে তা বেচে ছ/তিন হাজার টাকা লাভ হয়। এই ৭৭ হাজার টাকা লক্ষিতার মতো কোম্পানীগুলো ধার দেয়। এক সপ্তাহ পরে পাঁচশো টাকা স্বপ্ন পায়। কালোটাকার এক বিরাট চক্র বৃহৎ।

এছাড়া পিয়ারলেস, কেবারিট ইত্যাদিদের কেন্দ্রে দেখা গেছে যে, প্রথম একটা / দুটো প্রিমিয়ারের কেন্দ্রে এজেন্টরা তড়া দিয়ে জমা দেওয়ার। পরে এজেন্টদের আর গরজ থাকে না, কারণ দ্বিতীয় বছর থেকে এজেন্ট-দের কমিশন দাঁড়ায় মাত্র ৫%। আর এই যে অধিকাংশ কেস পচে থাকে, (Lapse হচ্ছে) সেগুলো ওদের পুরো লাভের হয়ে জমা হচ্ছে। এর সংখ্যাও বিরাট।

ডঃ অশোক মিত্রের নির্দেশের পর

এদের কারবার শুটিয়ে ফেলার নোটস দেওয়ার পর

থেকেই এরা তবির শুরু করেছে। কিন্তু ওদের অস্থবিরে হল বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র বেশ কড়া লোক। উনি লিখিক বলেছেন যে, এই সব কোম্পানীগুলোর বিরাট পরিমাণ কালোটাকা খাট-ছিল। অধ্যবসায় বৃদ্ধির মূল কারণ না হলেও এই কোম্পানীগুলোর ব্যবসা অন্ততম কারণ বটে। যমুনা কমিশনার ফিল্ডাল (প্রা) লিমিটেডের মতো আরো কিছু কোম্পানী আছে, যাঁদের নাম ঐ তালিকার ছিল না। সরকারি ব্যাপারে ডঃ অশোক মিত্র কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীভক্তসিংহকে চিঠি লিখেছেন। রিকার্ড ব্যাক রাজ্য সরকারের কাছে যে তালিকা পাঠিয়েছে তার মধ্যে সরকারি নাম ছিল না। ডঃ মিত্র বলেছেন, 'এই সংখ্যা কাগজে-কলমে ১২% স্বপ্ন দিলেও আসলে ৪৮% স্বপ্ন দেয়। এতথেকে কেন বেআইনী ঘোষণা করা হবে না।' শ্রীমিত্র কোর দিয়ে বলেছেন যে, যাঁদের নাম তালিকার পড়েনি তা শুধুমাত্র টেক্সটনিকাল ভুলের জন্ত। এ ধরনের সব প্রতিষ্ঠানকেই আজ হোক আর কাল হোক ব্যবসা পোটাতেই হবে। প্রয়োজনে আবার আইন সংশোধন করা হবে। এই কারবারের জন্ত পূর্বাকালে বহু লক্ষ বিভাগের প্রায় চারশো কোটি টাকা মার বাচ্ছে।

কোম্পানীগুলো যেমন কোর তবির চালাচ্ছে, তেমনি এখানে ওখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে শাখা অফিস খুলে এজেন্টদের চাকরিতে চাইছে। কেবারিট কোম্পানী গত ৫ই অক্টোবর পুর্নলিয়ার শাখা খুলেছে। কাগজে চালাও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এজেন্ট কিছু অফিসারদের মনোবল বাড়াবার জন্ত।

ইতিবাচক কাজও চাই

ডঃ অশোক মিত্র, আপনাকে ধন্যবাদ। বিভিন্ন নামের লাইনবোর্ডের আড়ালে ব্যবসারত চিটিংবারা কালোটাকার ব্যাপারীরা ভেঙ্গে পড়েছে। এ মুহুর্তে তিনটে কাজ করতে হবে। এবং কমতা অস্থায়ী সেগুলোকে করা যায়।

(১) সরকারকে কাগজে পাঠা প্রচার করতে হবে এই কোম্পানীগুলোর প্রতারণার বিরুদ্ধে। বামফ্রন্ট কমিটি ও হলীয়ার শাখা সংগঠনগুলো থেকে জনসাধারণের কাছে এই কোম্পানীগুলোর প্রতারণার শিকার না হতে অস্থরোধ করা প্রয়োজন।

(২) ১৯৭৯ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারত সভা হলে সুনীল মৈত্রের সভাপতিত্বে সমুদ্রস্থিত মনু ব্যাকিং ফিনান-শিয়াল কোম্পানীগুলোর কর্মচারীদের কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব অস্থায়ী অন্ততঃ পিয়ারলেস ও কেবারিট সংখ্যা দুটোকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা সরকার। কারণ এই দুটো সংখ্যার পাঁচ হাজার কর্মচারী কাজ করেন।

(৩) ব্যাক থেকে ছোট ছোট কারবারীদের উদ্ধার-ভাবে ঋণ দিতে হবে। মতুবা পিয়ারলেস, সরকারি ইত্যাদিদের কাজ পোপনে চলবে, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি থাকবে।

ইন্দিরা হতাশ

১ম পৃষ্ঠার পর

মতা শুরু হওয়ার আগে থেকেই কলামন্ডিরের সামনে প্রচণ্ড ভিড় জমতে শুরু করে। এই ভিড়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিচিত লমাজবিরোধীকেও দেখা যায়, অনেক কংগ্রেসী অভিযোগ করেছেন এদের সঙ্গে ছুরি এবং রিভলবার ছিল।

হলের মধ্যে যারা ঢোকে তাদের অনেকেই অবাকিত। মিটিং শুরু হওয়ার আগে থেকেই স্বরত মুখার্জীর সমর্থকদের সঙ্গে অজিত পাজার সম-র্থকদের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। প্রথমে স্বরত সমর্থক জটনক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে অজিত পাজার লোকেরা হলের মধ্যে থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করে। স্বরত সমর্থকটি এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে শুরু হয় মারধোর। স্বরত মুখার্জীর অস্থায়ী প্রদীপ ঘোষ, অশোক ঘোষ প্রমুখ ব্যা ছাড়া নেতারা এসে গণগোল খেটাতে উদ্যোগ নিলে অজিত পাজার লোকেরা তাদেরকেও মারধোর করে।

স্বরত মুখার্জী তখন মকে বনে আছেন। একদল অজিত পাজার সমর্থককে দেখা যায় মকের দিকে এগিয়ে যেতে। একদল কর্মী স্বরত মুখার্জীকে মক থেকে টেনে নামা-নোর জন্ত ঠেলাটেসি শুরু করে দেয়। এই সময় স্বরতের ওপর চড়াচাপাও

চলে। কিছু স্বরত সব কিছু সহ করেও মকে বনে থাকে।

এই ঘটনা দেখে শান্তিপ্রিয় কংগ্রেস নেতারা অনেকেই সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান। বেশ কিছু কংগ্রেস নেতাও হল থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেক মহিলা কর্মীও ভীত লম্বত হয়ে হলের বাইরে চলে আসেন। প্রধানমন্ত্রী বহন আসেন তখন হলের মধ্যে মর্যাদা জানসম্পন্ন কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই বাইরে চলে গেছেন। হলের প্রথমদিকের কয়েকটি সারি খালি পড়ে আছে। বাকী শ্রোতাদের অধিকাংশই লমাজ বিরোধী।

বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা প্রধান-মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন অজিত পাজা নিজের আবিপত্য বিভ্রাতের জন্ত লমাজবিরোধীদের সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশিষ্ট কংগ্রেসীদের সভা থেকে বের করে দিয়েছেন। তাছাড়া অজিতবাবুর বিরোধীদের অনেককেই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী কলকাতা ছাড়ার আগে অজিত পাজার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পত্র তাঁর হাতে মুখবন্ধ থামে জটনক কংগ্রেসী নেতা তুলে দেয়। জানা গেছে সাতাশে নোভেম্বরের ঘটনার প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড চটে গেছেন এবং এ ব্যাপারে অজিত পাজারে তার বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ

সোসাইটি অগ্রগতির পথে

হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ ফেডারেশনের কাজকর্ম বর্তমানে কিরকম হচ্ছে তা জনসাধারণকে জানানোর জন্ত সম্প্রতি উক্ত সোসাইটি এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। সম্মেলনে সংখ্যার চেয়ারম্যান শ্রীভবানীপ্রসাদ চ্যাটার্জী (এম,এল,এ) জানান, তিনি এই সংখ্যার কার্যভার গ্রহণের পর থেকে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শুধু যে টাকার অঙ্কে লেন-বেন বেড়েছে তাই নয়, অনেকগুলো প্রয়োজনীয় সামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে সহজভাবে বন্টন করা সম্ভব হচ্ছে। লবণ, ছাত্রছাত্রীদের জন্ত দস্তাদরে খাতা, বোর্ডিং ফুড, ডাল, খাটি সরবর-তল, হারিকেন, দস্তা কাপড় ইত্যাদি জিনিসগুলো হোলসেল কো-অপারেটিভের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। লাঞ্চে চার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বনস্পতি কারখানা বসানোর জন্ত শ্রীচ্যাটার্জী চেষ্টা করছেন। ভবিষ্যতে প্রতি তিন কিলোমিটারের মধ্যে একটা করে কো-অপারেটিভ খোলার

জন্ত রাজ্য ফেডারেশন বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীচ্যাটার্জী আরো বলেন যে, মোট ভাষা মূল্যের দোকান ও রেশন দোকানের মাত্র ৬% সমস্যারের আওতার পড়ে। উক্ত ভাষা মূল্যের দোকানগুলো মোটেই ভাষা নয় বরং দুর্নীতির আওতা। তাই তাঁদের দাবি হল, এসব ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক ভাষামূল্যের দোকানের লাইসেন্স আর না দিয়ে বরং এবার সমস্যার দোকানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সংকল্প গোষ্ঠী

সম্প্রতি স্বজাভা সদন হলে সংকল্প সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক অস্থঠান হয়ে গেল। গোষ্ঠীর সম্পাদক শ্রীউৎপল চট্টোপাধ্যায় জানান যে, গত বছর শ্রীমদ্বন্দ্যকান্ত চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে এই গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্ব স্ব সংস্কৃতি গড়ে তোলাই এই গোষ্ঠীর মূল কাজ। অস্থঠানে আবুতি ও গণ-দলীত পরিবেশিত হয়।

একটি সংবাদপত্রে

৩য় পৃষ্ঠার পর

অফিসের ছজন ছাড়া বাকি সকলকেই বৈমিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অথচ সাংবাদিকতা আইন অস্থায়ী বৈমিক ৬ ঘণ্টার বেশি কাউকেই কাজ করানো চলে না। আইনকে ফাঁকি দিতেই কর্তৃপক্ষ হাজিরা খাতার কাউকে স্বাক্ষর করতে বলেন না।

বিকাস রয়েছে। প্রতিরুপ্তি অস্থায়ী কর্তৃপক্ষ প্রেস কর্মীদের কোম সুবিধা বেননি। থাকার পরিবেশ অদহ-নীর।

কর্তৃপক্ষ পুকার পর বেশ কিছু কর্ম-চারী হাটাই করবেন এই জাতীয় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে তাই কর্মচারীরা এখন আতঙ্কিত।

জানা গেছে অস্থ আদালতে এই

প্রেসের কর্মীদের মধ্যেও সুমারিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের

করা হয়েছে। প্রতারণার অভিযোগ এলে খুব শীঘ্রই প্রকাশিকা এবং মালিক শ্রীমতী মঞ্জী তালুকদার, সম্পাদক সুহাস তালুকদার, চীফ একজিকিউটিভ মানবেশ তালুকদার এবং যুগ্ম সম্পাদক বিমল চট্টোপাধ্যা-য়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানা গেছে। হাটাই জটনক সাংবা-দিক এই মামলা করবেন।

রাজ্য চোরাপথে আগত বিদেশী পোষাকের রমরমা কারবার

চোরাপথে আমা বিদেশী রেডি-মেড পোষাক বিক্রী সম্প্রতি এত বেড়ে গেছে যে তার ফলে রাজ্যের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এবং পোষাকের ব্যবসা মার খাচ্ছে। কলকাতার চোরাকী, মিউ মার্কেট, ডালহাউসি, এম এম ব্যানার্জী রোড, পার্ক স্ট্রীট সহ কলকাতার বিভিন্ন জমজম এলাকার চোরাপথে নিয়ে আসা বিদেশী পোষাকের রমরমা কারবার চলে আসছে বিগত কয়েক বছর ধাবৎ।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে প্রচারিত এক প্রেস ইন্টারভিউ বলে হয়েছে যে, ৭০ জনের তরু থেকেই চোরাপথে বিদেশী পোষাক এদেশে আসছে। তবে তা যে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসছে সে কথা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জানা ছিল না। সম্প্রতি এই তথ্য জানা গেছে এবং বর্তমান বৎসরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ২৭ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের বিদেশী পোষাক সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আটক করেছে। প্রেস ইন্টারভিউ আরও বলে হয়েছে যে, শুধু কলকাতাতেই নয় সীমান্তবর্তী শহর-

গুলিতে এবং উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতেও বিদেশী পোষাকের রমরমা কারবার চলছে। এর ফলে স্থানীয় তাঁতি ও বস্ত্র নির্মাতারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী পোষাক চোরাপথে ভারতে প্রবেশ করে। এই কারবারের সঙ্গে প্রচুর মাহুস জড়িত এবং এর ফলে বেশ কিছু মাহুস আরও পথ ধরে পেয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৈনিক গড় আয় ১০ টাকা থেকে ২০০ টাকা।

সর্বশেষ পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা গেছে যে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রতি মাসে গড়ে তিন লক্ষ টাকার বিদেশী পোষাক রাজ্যে প্রাপ্ত করেছে। ১৯৭৮ সালে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার, ১৯৭৯ সালে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বিদেশী পোষাক রাজ্যে প্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৮০ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্রাপ্ত হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের বিদেশী পোষাক।

এই বিদেশী পোষাকের চোরা-

কারবারীরা যথেষ্ট সংগঠিত। মার্কিন মূলক এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ-গুলির কয়েকটি সমাজসেবী সংস্থা হরিজেনের বিতরণ করবার জন্য ব্যবহৃত পোষাক বাংলাদেশে পাঠাত। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের কারসাজীর ফলে সেই সব ব্যবহৃত পোষাক হাত বদল হয়ে চলে আসত পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। জলের দ্বারা তা বিক্রী হত। এই পদ্ধতি এখনও চালু আছে।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশের ২০০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা জুড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরা ও টহল জোরদার করা হয়েছে। এই চোরাকারবার রূপে স্থানীয় মাহুসদেরও সক্রিয় হবার জন্য অহুসি করা হয়েছে।

সমুদ্রপন্থীদের

১ম পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে সমুদ্র বিদ্রোহীরা জোট বাঁধছে। সমুদ্র যেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন টাকার তালিকা হচ্ছে সে ব্যাপারেও ইন্দিরা গান্ধী গৌরবঘর নিচ্ছেন। কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সমুদ্রের এক স্বেচ্ছাসেবক ইন্দিরা গান্ধীর বাওর কথা থাকলেও তিনি সেখানে যান মি এবং শুধুমাত্র এক বাণী প্রেরণ করেন। দিল্লীতে সমুদ্রের স্বেচ্ছাসেবক তাকার ব্যাপারটাও নিছক কোন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে নাকি রাজীব শ্রম এবং কর্মসূচি জিলাটাই উদ্যোগ নেয়।

এদিকে সি এম হাসকারের নেতৃত্বে এক “জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ” গঠিত হতে যাচ্ছে যার ছত্র-ছায়ায় পার্টির ক্রমসূচী এবং আর্প কংগ্রেসের কিছু নেতা জোট বাঁধছেন। সমুদ্র গান্ধীর আরেক বনিষ্ঠ সহযোগী আকবর ইসলাম এখন দিল্লী ছেড়ে লন্ডনে চলে গিয়েছেন কিন্তু সেখানেও তিনি পাস্তা পাচ্ছেন না। স্বাধীনপ্রদেশের সমুদ্র সিং এবং ওড়িশার রামচন্দ্র রথও এখন পরি-ত্যক্ত। তাদের আর আগের মতো কেউ সম্মুখ করে না। একসময় তারা সমুদ্রপন্থী ছিলেন—এই বদমাস বোচাতেই তারা ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-দের মধ্যে এ পি শর্মা, সীতারাম কেশরী, সি পি এন সিং প্রভৃতির অস্বাভাবিকতা। এরা এখন নিজেদের মন্ত্রি নিয়ে চিন্তিত। সব থেকে করণ অবস্থা যেনকা গান্ধীর। তাকে নিয়ে আজ দিল্লীতে নানা গুজব। “সমুদ্র ট্রাষ্ট” তৈরী হলেও তাতে কোন সমুদ্রপন্থী নেই। সমুদ্রের মুখা নিঃসন্দেহে কং (ই)র আভ্যন্তরীণ কথতা বিভাগে অনেক ওলট পালট এনেছে।

ছিটমহল

১ম পৃষ্ঠার পর

মাহুসদের ধারণা বহি এই লীজ মজুর করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এই ভিনবিধার হুজুম চাপতে চাইবে না এবং কার্যত এটিও ছিটমহলে পরিণত হয়ে যাবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে, ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে খুন, চুরি, ডাকাতি, হাঙ্গামা হাঙ্গামা মিত্য ঘটনা বাংলাদেশী অপরাধীরা এখানে এসে পা চাকা দেয়। কারণ, বাংলাদেশী পুলিশ এখানে আসে না। ভারতীয় পুলিশও যেতে পারে না। অহুসভাবে কোচবিহার জেলার বাংলাদেশী ছিটমহল নল-গ্রামেও ছুই রাষ্ট্রের অপরাধীরা এসে পা চাকা দেয়।

বহু অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ পুলিশের কাছে আসে না। প্রয়োজন দেখা দিলেও বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের অহুসি ছাড়া ভারতীয় ছিটমহলে ভারতীয় পুলিশের প্রবেশাধিকার নেই। অহুসি আসতে সময় লাগে। এর আগে অবশ্য বাংলাদেশের ছুই জেলার ডেপুটি কমিশনারেরা অহুসি দিতে পারতেন। তবে বর্তমানে সে নিয়ম উঠে গেছে। এখন অহুসি মেলে খোদ চাকা থেকে। এই বিলম্বের ফলে ভারতীয় পুলিশ ছিটমহলে আত্মপোষনকারী অপরাধীদের তল্লাশ করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সরকারী পরিদপ্তার ছিটমহলের অপরাধমূলক ঘটনাকে “সীমান্ত অপরাধ” হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় ছিটমহল হরিয়ার চরে একজন ভারতীয় খুন হয়। এই জারগা বাংলাদেশের ছুই মাইল ভেতরে। কোচবিহার জেলা কর্তৃপক্ষ ওখানে প্রবেশ করার অহুসি চায়। কিন্তু অহুসি মেলে মি। খুন এবং লুণ্ঠরাজ বেড়ে চলেছে। ভারতীয় পুলিশ ও সীমান্ত এলাকার মাহুসেরা ভাবতই উদ্বিগ্ন। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কয়েকশত প্রতি-বাদ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মিকট পাঠানো হয়েছে এই বলে যে,

বাংলাদেশী অপরাধীদের যৌগাঙ্ক ছিটমহলে বসবাসকারী ভারতীয়দের জান-মাল বিপন্ন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বাধা পড়ের জবাব আসে যে, এই সব ঘটনার কোন বাংলাদেশী নাগরিক জড়িত নয়।

ভারতীয় ছিটমহলে অপরাধ-মূলক ঘটনার কোন পরিসংখ্যান নেই। কারণ বহু ঘটনার কথা জানা থাকলেও প্রামাণিক কোন তথ্য না থাকার তা সরকারী নথিতে লেখা হয় না। তবে ভারতীয় পুলিশ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ভারতীয় এবং ভারতীয় সমাজবিদ্রোহীরা এই সব ভারতীয় ছিটমহলে বাঁচি পড়ে তুলেছে। এখানকার লাহারন মাহুস হয়েছেন এক অসহায় অবস্থায়। তারা কোন দেশেরই নাগরিক-স্বাধীন হুবিধা ভোগ করতে পারেন না। ভারতের পক্ষ থেকে কোন হুবিধাই এই সব ভারতীয় ছিটমহলে বসবাসকারীদের দেওয়া সম্ভব হয় না। কোন মহারতও ভারত করতে পারেনা। এই সব ছিটমহল থেকে কোন রাজস্ব আদায় হয় না।

বহু ছিটমহলে প্রায়ই সাম্প্র-দায়িক হাঙ্গামা হাঙ্গামা ঘটে বলে সংবাদে প্রকাশ। এখানকার মাহুস সর্বদাই আতঙ্কের মধ্যে বাস কর-ছেন।

এছাড়া সীমান্ত জুড়ে চোরা-কারবারের ঘটনাবলী ছুই দেশের সরকারের পক্ষেই উদ্বেগজনক। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্র-প্রতিনিধি চৌধুরী সীমান্তে চোরা-কারবার বৃদ্ধি পাবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মাপা ছকে এগুচ্ছেন

১ম পৃষ্ঠার পর

লম্বায় ইন্দিরা মানেকাকে রাজ-নীতিতে নারায় স্বাধীন করে দেবেন। কিন্তু এসময় তিনি চান তাঁর পুত্র-বঁধুগা ঘরের দিকেই মন দিয়ে চলুন। তাই মানেকা এখন রাজনীতিতে একলা হয়ে পড়ছেন। পুত্র ও পত্নী-কাতে মন দেওয়া ছাড়া আপাতত তিনি যেন সক্রিয় রাজনীতিতে না এগিয়ে আসেন সেজন্য তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যাবলিয়ে হাঙ্গামা রাজীবের রাজনীতি নারায় বাতাবরণ সৃষ্টি করার সব রকম চেষ্টাই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

ইন্টার্ন কোলফিন্ডস লিমিটেড

(কোম ইন্ডিয়া একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ষ্ট্রিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে সীল করা টেন্ডার:

বাল্ভ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেকা: নং: সি এম / কেডা / ই ই (সি) / টেন্ডার / ৩০১০ তাং ১৫-১৮-৮০
মিউ কেডার (১) মিউজী রোড থেকে ৪ পিট এবং (২) মিউ কেডা অফিস থেকে ৮ পিট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। রাস্তার আনুমানিক দৈর্ঘ্য ২'৫৪ কি মি। আনুমানিক খরচ ২,০৬,৭৬১'৫৬ টাকা। এরিয়া অফিসের কেমিসারের কাছে প্রতি সেটের জন্য নগদে ১০০ টাকা (একশত টাকা মাত্র) দিয়ে (অগ্রদানপযোগ্য) ২১-১৫-৮০ থেকে ২৮ ১০-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের সময়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের (সিভিল) অফিস, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেডা এরিয়া, পো: বহুলা, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে টেন্ডার দাখিল পাওয়া যাবে। ২১-১০-৮০ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে।

সাম্প্রদায়িক: আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা লঞ্জিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারের সঙ্গে জমা দিতে হবে, অতঃপর টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ মা যে খরচ যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দ্বারা অধিকার সংরক্ষিত রাখবেন।

শ্রুতিময় রাস্তা পুস্তক পর্ব

সাতক ও সাতকোত্তর পর্বের পর্ব প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

- ১। ঐতিহাসিক জ্ঞানকে জ্যামিতি / শ্রীমশোককুমার রায়/ ২১০০
- ২। গতিবিদ্যা / ডঃ প্রদীপ নিরোঙ্গী / ১২০০

৬৫, রাজা সুবোধ মল্লিক স্টোর, কলিকাতা-১০

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক: কলকাতা দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর কার্যালয় ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১০ থেকে প্রকাশিত।

ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মে সঞ্জয়ের সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ



ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৷ ৩৮শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৩১শে অক্টোবর, ৮০ ৷ ৬০ পয়সা

সঞ্জয়-সমর্থক শিল্পপতি ও লোকসভা সদস্যের বাড়ি সি বি আই

সঞ্জয় সমর্থক জনৈক শিল্পপতি লোকসভা সদস্যের বাড়ীতে হঠাৎ সি বি আই হানা দেওয়ায় রাজনৈতিক ল দাফন চাকলোর সৃষ্টি হয়েছে। এই শিল্পপতি লোকসভা সদস্যের কলকাতা এবং দিল্লীর বাড়ী এবং কারখানার হানা দিয়ে নাকি কয়েক লক্ষ হিসাব বহিষ্কৃত টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এই শিল্পপতি লোকসভা সদস্যটির বিরুদ্ধে নাকি কয়েকজন শিল্পপতি প্রথম থেকেই খাপ্পা হয়েছিলেন। এরা অনেক দিন ধরেই অযোগ্যের অপেক্ষায় ছিলেন। সম্প্রতি একটি কারখানা সরকারী তত্ত্বাবধানে বিক্রয় সময় উক্ত শিল্পপতি লোকসভা সদস্য নাকি কয়েকজন আমলার সহযোগিতায় মোটা টাকা কামিয়ে নিয়েছেন।

এই অভিযোগ নিয়ে কয়েকজন শিল্পপতি প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন বীজেন্দ্র ব্রহ্মচারীর শরণাপন্ন হন। বীজেন্দ্র ব্রহ্মচারী উক্ত শিল্পপতি লোকসভা সদস্যটির ওপর প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সুযোগে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ-স্বাক্ষরী শিল্পপতিদের নিয়ে হাজির হন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করে উক্ত শিল্পপতি লোকসভা সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগটি সি বি আইকে দিয়ে তদন্ত করানো হবে। এই লিডাফ অফিসাররা হঠাৎ উক্ত শিল্পপতির দিল্লী এবং কলকাতার বাড়ীতে হানা

দেয়। এবং বেশ কিছু কাগজপত্র এবং টাকা আটক করে।

এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে দাফন চাকলোর সৃষ্টি হয়েছে। কারণ উক্ত শিল্পপতি লোকসভা সদস্যটি প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর বালাবল্লভ এবং রাজনৈতিক মহলে দাফন প্রভাব-পালী। অনেকেই এই ঘটনা রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে

এক একদিন বিচিত্র ঘটনা ঘটছে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে। যা শুধু মজার নয় কোন কোন সময় তাৎপর্য-ময়ও বটে। সেদিন প্রধানমন্ত্রী যখন বসে পেলেন সেই সময় পুত্রবধূ মানেকাও পাড়ি দিলেন ওই শহরে। উদ্ভক্ত স্বামীর সহৃদয় ক্রিয়ী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দেওয়া। কিন্তু, কেউ কেউ এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পেলেন। এই সুজ্ঞে জামা পেল, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে ওরা দুজনে চলে যেতেই মানেকা-বাতা আমতেশ্বর আনন্দ সেখানে এসে মনাতি বরণকে দেখাশোনা করতে। আর তখন তড়িৎকণ্টকিত করে পুত্র কন্যা ও একজন সতীকে নিয়ে রাজীব জায়া সোনিয়াও সেখানে চলে এলেন। স্বামীর হারজাবাদে বোরিং বিমানের

ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মে প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থকরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সদস্যগণ এবং দপ্তর সদ-বদল নিয়ে এই বিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার নিয়েছে।

সঞ্জয় গান্ধীর সমর্থকদের ধারণা ছিল যে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যুর পর হত শ্রীমতী গান্ধী মৃত পুত্রের সমর্থক এবং বন্ধুবান্ধবদের (যাটা অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেউকেটা হয়ে উঠেছিলেন) উপযুক্ত স্বাধীন দিয়ে চলবেন। প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর সম-

র্থকদের এ ব্যাপারে একটা অধিকার-বোধও জমেছিল এই কারণে যে, তারাই শ্রীমতী গান্ধীর হৃদয়ে সর্বস্ব-পণ করে তার পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। রাজনৈতিক মহলেরও ধারণা ছিল যে, শ্রীমতী গান্ধী হত সঞ্জয় সমর্থকদের গুরুত্ব দিয়ে চলবেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল কি প্রশাসন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী তার পুত্রের সমর্থকদের প্রভাবকে খর্ব করতে শুরু করলেন। দিল্লী প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভা সদস্য জগদীশ টাই-টলারকে শ্রীমতী গান্ধী তার ব্যক্তি-গত দপ্তর থেকে সরিয়ে দিলেন।

আজ্ঞে আজ্ঞে দেখা গেল বিভিন্ন মন্ত্রীরাও আগের মত সঞ্জয় সমর্থক-দের কথার কোন কাজ করছেন না। শুধু তাই নয় সাংগঠনিক ব্যাপারেও সঞ্জয় সমর্থক যুব নেতা সঞ্জয় সিং, জগদীশ টাইটলার, কমল নাথ

প্রমুখদের কোন মতামতকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। কিছুদিন আগে কমল নাথের কথার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অনেক নেতার উত্থান-পতন ঘটত। কিন্তু কমল নাথকে এখন সোজা হুজি বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন এ রাজ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে একেবারেই মাথা না ঘামান।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সদ-বদলের সময় কোন সঞ্জয়গান্ধী যুব নেতাকে না নেওয়ায় এই সব যুব নেতারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে-ছেন। সঞ্জয় ভক্ত এ পি শর্মা সহ কয়েকজনকে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বদলী করার সঞ্জয় সমর্থকদের অসন্তোষ এখন প্রকাশ্যে ফেটে পড়ছে।

জানা গেছে, জগদীশ টাইটলার, সঞ্জয় সিং, কমল নাথ প্রমুখ যুব শেখাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



প্রভৃতি নানা বিষয়ে মাথা তো বাঁধাচ্ছেনই। হলের ভিতর ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজের প্রভাবকে প্রস্তত করার জন্তও তৈরী হচ্ছেন।

এসব হয়ে গেলে পর তিনি ধাপে ধাপে এগুবেন। নিবেদিত দেশ-সেবক হিসেবে নতুন নায়ক হিসেবে দবার সহযোগিতা পাবার জন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করার মত আহ্বান জানাবেন।

কমল নাথের সংযত পদক্ষেপ

কমল নাথ বন্ধু বিহনে এখন বড় কোণঠাসা। তার উপর মধ্যপ্রদেশে হিন্দু ওয়ারার এম পি হরে সেখানকার রাজনীতিতে তরুণ নায়ক হয়ে উঠছিলেন বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা এবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। যাতে কমল সেখান থেকে পিছু হটে যান। এবং তাঁর কোন ভিত যেন না থাকে। কিন্তু তিনি সংযতভাবে, মধুর ব্যবহারে মধ্যপ্রদেশের মানুষ-

জনের কাছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। এবং উঠে পড়ে লেগেছেন ধীরে ধীরে প্রধান-মন্ত্রী পরিবারের একান্ত কাছের মাহুস হিসাবে তাঁর পরিচয়টাকে ধরে রাখতে।

জ্যোতিষীদের মারাত্মক ভবিষ্যদ্বাণী

দেশে জিনিসপত্রের দাম কমবে কবে, সমস্ত আর সমস্তার সমাধান কবে মাপা হবে তা না বলতে পারলেও মন্ত্রী মশাইদের কাছে, রাজনীতিকদের কাছে তাঁদের নিজের নিজের জ্যোতিষীরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে কটা মাস চূপচাপ থাকুন। লামনে সতরংকর পরিবর্তন এগিয়ে আসছে। একটা বড় ধরনের ওলট পালট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লীর রাজনীতি তথা দেশের উপর তার প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠবে। তাই রাজধানীতে এখন এই নিয়ে জোর জল্পনা করনা চলছে।

সম্পাদকীয়

আসামে ইন্দিরা আবার ব্যর্থ

কী শীতে কী গ্রীষ্মে, কী খরার কী বর্ষার বিরোধী হলুলোর ওপর যথেষ্ট বেশিমগাম দাপা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটা স্বভাবধর্ম পরিণত হয়েছে। নিজের অক্ষমতা ব্যর্থতা চাকবার জুটই, দেশবাসীর ঘৃণিক বিপথচালিত করার জুটই যে শ্রীমতী গান্ধী এ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন, এটা আজকাল কাক-চক্র মতো ঘড় ঘরে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) পর-কারের শোচনীয় ব্যর্থতার সর্বশেষ দিকচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বুকে। পুলিশ মিলিটারী শান্তির-হমকি রক্তচক্ষু প্রগ্রাহ করেই আত্ম ও লংগ্রাম পরিষদ ২৭শে অক্টোবর আলাম বন্ধকে সাক্ষ্যমণ্ডিত করেছে। কাছাড় বন্ধের আফ্রানে দাড়া দেয়নি। কিন্তু বন্ধ বানচাল করে দেবার কৃতিত্ব শ্রীমতী গান্ধী কিছুতেই হাবি করতে পারেন না। সেটা প্রাপ্য সেখানকার ভাষা ও ধর্মগত সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্নতাবাদ-বিরোধী মনোভাব।

প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বতই এই বলে তারস্বরে

চোঁচাম না কেন যে আলোচনা তুল হয়ে যারনি, কার্ভত আত্ম বা লংগ্রাম পরিষদের কথার ও কাজে লক্ষ্যহী-তীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে 'বিদেশী' প্রাণে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যুক্তি আন্দোলনকারীদের গ্রহণ করতে পারে নি। পারেননি যে আলাম বন্ধ তো তারই অকাট্য প্রমাণ। শ্রীমতী গান্ধী নাকি আন্দো-লন দমনে বলপ্রয়োগ করতে ইচ্ছুক নন। ভালো কথা। কিন্তু বলে-বুঝিয়ে ১৪ মাসের মধ্যেও আন্দো-লনে তাঁটার টান ধরতে পারলেন কই? বরং মনিপুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তো ইতিমধ্যেই "বিদেশীদের" চিহ্নিত করে ফেলেছে শুধু তাই নয়, কিছু লোকের বিতাড়ন পর্বও সমাধা করে ফেলেছে। 'বিদেশী' বা ভারতের নাগরিকত্ব নিধারণের কস-তাও আজ আর ইন্দিরা গান্ধীর হাতে রইল না অথচ তিনি নিজের ঘোষ দেখতে না পেয়ে কেবলই বিরোধী হলুলোর খুঁত ধরে বেড়াচ্ছেন।

অশোক মিত্রের বিরোধিতায় কলিমুদ্দিন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর পিয়ারলেন্স, ফোরারিট ইত্যাদি ১১৩টি সংখ্যকে রাজ্য সরকার তাদের কারবার গোটাটোয় নির্দেশ দেয়। এরপর থেকেই চিট ফান্ডের মালিকেরা এদিক ওদিক ঘোড়াঘোড়ি করছেন। মিল্লী পর্বত ওয়া তবির করেছেন। ব্যবসা টিকিরে রাখার জন্য লাখ লাখ টাকা তবিরে খরচা করতে ওয়া রালি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র বড়া লোক, তাই ওকে ম্যানেজ করতে পারছেন না। ইতিমধ্যে মালিকেরা একটা এসোসিয়েশন গঠন করেছে যার সভাপতি ফোরারিট সংখ্যক মালিক ও

'দৈনিক আকর্ষণ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমিরজম দে। রাজ্য সরকারের মোটিশের বিরুদ্ধে ফোরারিট তাদের ফিল্ড অফিসারদের এক সম্মেলন ডেকেছে। শুক্রবার ৩১ অক্টোবর বেলা দুটোর সেক্ট জেভিয়ার্স কলেজে এই সম্মেলন হবে। উদ্বোধন করবেন বিধান-সভার উপাধ্যক্ষ ফোরারিট রকের এম, এল-এ শ্রীকলিমুদ্দিন লামসু। বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী একটা সম্মেলন বামফ্রন্টের সদস্য শ্রীকলি-মুদ্দিন লামসু উদ্বোধন করেন কোন্-নীতিতে?

ইন্দিরার কাজকর্মে

১ম পৃষ্ঠার পর নেতারা এখন নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। এইসব নেতারা লঙ্কায়ের বিধবা পত্নী মানেকা গান্ধীর সঙ্গে এ অবস্থার কি করা যায় তা নিয়ে শলাপমার্শ করছেন। এদের বনিষ্ঠ মহল থেকে এখন প্রকাশ্যেই প্রচার চালানো হচ্ছে যে, রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে

অনিশ্চিত করতেই শ্রীমতী গান্ধী প্রয়াত লঙ্কায় গান্ধীর সমর্থকদেরকে কোণঠাসা করে ফেলছেন। এমন কি এ ধরনের অভিযোগ মানেকা গান্ধীর বা আমাতেশ্বর আনবের মুখ থেকেও শোনা যাচ্ছে। দ্বিতীয় রাজনৈতিক মহলের ধারণা শ্রীমতী গান্ধী হয়ত নিজের ঘর থেকেই বিরোধিতার লক্ষ্য খুঁজি ন হবেন।

দেশ কাল বাডনীতি

সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা ভারতপুত্র

দীর্ঘ দশ মাসের প্রতীকার পর প্রথম সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয় সাংবা-দিকেরা প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রশ্নই করেছেন। কিন্তু এতদিন লংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের দ্বারা এড়িয়ে চলার (না অগ্রাহ করার?) পরেও যেম শ্রীমতী গান্ধী নিজেকে যথেষ্ট প্রস্তুত এবং সিরাগর মনে করতে পারছিলেন না। শেষজুটই বাইরের সেপাই-শাঙ্গী ছাড়াও ভেতরে আর কে খাওয়ার প্রমুখ পারিষদের নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানু-ষের জনসতাকে যেমন তিনি চমক দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেন, তেমনি সাংবাদিকদের মুখও আগে থেকে বন্ধ করে দিলেন এই বলে যে তাদের বিষয় ভাগ করে গ্রহণ করতে হবে এবং একজন সাংবাদিক একাধিক প্রশ্ন করতে পারবেন না।

কিন্তু এই শর্তের কটক জুড়ে প্রথম রাউন্ডে খীর জরলাত নিশ্চিত করার পরেও শেষ পর্যায়ের জড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী জরলাত নিয়ে গৃহে

প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন বলা যাবেনা। কারণ অধিকাংশ প্রশ্নের মোজাহলি উত্তর তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি প্রকৃত অবাব হয় এড়িয়ে গিয়ে-ছেন নয়তো দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতির উন্নতি বটছে বলে যে হাবি তিনি করেছেন তা প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে লংগতিপূর্ণ নয়। জব্য-মূল্য—কী পাইকারী কী খুচরো কোথাও হ্রাস পায়নি, বরং ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মুদ্রাস্ফীতির হারও কিছু কমেনি। এর দ্বারা তিনি বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং পূর্বতন জনতা ও লোকদল সরকারের উপর চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে বস-বান হয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে মুদ্রাস্ফীতি বা জব্যমূল্য কোনটিই বাড়েনি। ইন্দিরা গান্ধী না দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান? পুঁজিবাদের পুজো দিয়ে সমাজ-তন্ত্রের পথে যে এগোনো যাবেনা

স্বৈরতন্ত্রী ইন্দিরার মূল্যহীন প্রতিশ্রুতি

কল্যাণ ঘোষ

আজ থেকে ১৪ বছর আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। যখনই নির্বাচন আসে তখনই তিনি একটা নতুন স্লোগান বার করেন। ১৯৬৭ সালে প্রতিশ্রুতি ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৯ সালে তিনি প্রতি-শ্রুতি দিয়ে বললেন, কংগ্রেসে কিছু খারাপ লোক ছিল বলে কিছু করতে পারিনি, ওদের বের করে দিয়েছি এবার দেশে সোনা ফলাবে। ১৯৭১ সালের স্লোগান ছিল গরিবী হটাও, ১৯৭৭ সালে ছিল: বিরোধীরা আমাকে বিয়ে করেছে, আমাকে বাঁচাও। ১৯৮০ সালে তিনি স্বামী লঙ্কায় গড়ার স্লোগান দিয়ে দ্বিতীয় মনদ হুখল করলেন। এই ১৯৮০ সালেই নটি রাজ্য বিধানসভা নির্বা-চনে দ্বায় করাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কোন জিনিসের দ্বায় কত করেছে তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। হুতরাং সে প্রশ্ন তোলা থাকুক। ইন্দিরা গান্ধীর বিগত ১১ বছরের শাসনকালে টাটা বিড়লা সহ মোট

তিরিশটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরি-বারের সম্পত্তি মাত্র পাঁচ বছরের (৭২-৭৭) মধ্যে ৩০.৭১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৫৪.১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হয়েছে। এই হল ইন্দিরা-জীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমুদ্র। এগারো বছরের ইন্দিরা শাসনে মিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্বায় বেড়েছে ২৫০ শতাংশ। ওই এগারো বছরে অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দারিদ্র্যসীমার নিচে বদবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৭০ শতাংশ বেড়ে হয় ৩৩ কোটি। অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যান ওই ১১ বছরের ইন্দিরা শাসনে। সেই সময় মজুর, কৃষকের মার হ্রাস পায়, কারখানার শ্রমিকের মার কম যায়। ওই ১১ বছরে দারিদ্র্য বে কি হারে বেড়েছে তা কল্পনারও বাইরে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৮৫ হাজার থেকে বেড়ে হয় ১ কোটি ১ লক্ষ। বর্তমানের কথা বাইরে দিলাম। কর্মসংস্থানের সুযোগও

কমে যায়। ১৯৬৫ সালে রেজিস্টার্ড বেকারদের ২২ শতাংশ চাকরী পায়। ১৯৭৭ সালে তা ৪ শতাংশে নেমে আসে। এরই নাম গরিবী হটাও। ইতিমধ্যে সরকার গড়ার জন্ত তিনি ১৯৮০ সালে নটি রাজ্যের স্থিতিশীলতা তেজে নির্বাচন করা-লেন। নির্বাচনে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন জিনিসের দ্বায় কমাবেন এবং আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করবেন। জিনিসের দ্বায় কিরকম কমছে তা সফলেই দেখছেন। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন কমতার আসেন তখন তিনি ছিল-কিলো প্রতি চার টাকা আর এখন? ১০ টাকাতেও অরিল। মিত্য প্রয়োজনীয় জিনি-সের দ্বায়ও লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে। ইন্দিরা গান্ধী এবার একটু একটু করে স্বৈরতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নি বর্তন মূল ক আটক অভিনাঙ্গ জারী হল। বতই তিনি বলছেন কেন এই আইন রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর প্রয়োগ করা হবেনা—প্রয়োগ যে হবে তা আমরা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতে পারি। ওর আগে ইন্দিরাজী কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি করেছিলেন। এবার তিনি আটখাট বেঁধেই নাম-ছেন। বরং বলা চলে যে, তিনি একটু একটু করে "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা করার পথকে মশণ করছেন।

প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা শ্রবণ করিয়ে দেবার সুযোগ দেননি। প্রশাসনিক বা আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কী হয়েছে তা মোরাহাবাদ, আজগড় আনামের-বটমার মধ্য দিয়েই দেশবাসী দেখেছে। শুদ্ধিশার সাংবাদিকের জী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার কথা শ্রীমতী চাপা দেবেন কেমন করে? রেলের প্রশাসন লম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তো তিনি প্রায় রেলমন্ত্রী কমলাপতি জিপাঠিকে হারাতাই বলেছিলেন। ইন্সপাত করলা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষেত্রে কী অসাজকতা চলছে তাও তার অজানা নেই। অল্পপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে চেমা রেজিষ্ট্রকে অপসারণের ঘটনা কি এতই তুচ্ছ যে তা উল্লেখ পর্বত মিথ্রয়োজন? তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রতি নরম নরম আচরণ করার জন্ত প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। লংবাদ-পত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী রক্ত-মনোভাব প্রদর্শন করলেও পাট্টা আঘাত তাঁরা করেন না, তাঁরা শুধু প্রধানমন্ত্রীকে দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতির কথাই শ্রবণ করিয়ে দেন। এটা তো সাংবাদিকদের কাজ।

উত্তর প্রদেশের চিঠি

তাতানো সাম্প্রদায়িকতার পেছনে কি এবং কারা

রমাপ্রসাদ মল্লিক

১৩ই আগস্টের ঘটনা যদিও মোরাদাবাদ থেকে শুরু হয় তবুও টানের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত রয়েছে; মূলতঃ তা রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠী লক্ষ্যীতাবাদী। আ পা ত দৃষ্টি তে সংঘর্ষের স্বরূপাত্মক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ইন্ড-উল্ ফিত্-ব উপলক্ষে দেওয়া (নয়াজ অফে) ধর্মীয় উপদেশবাণী বিতরণের সময় ইদগাহ্ ময়দানে একপাল তরোয়ের চুকে পড়বার উপক্রমে। এটা নিত্যকৃত কাণ্ডাত্মক ঘটনা ছিলনা। বারম্বার হতে বলা, বগড়ার উপকানি চক্রান্তকৃত।

একটা ধাপের টুকরো দেখান জলে তেরছাভাবে মারলে তা চলতে চলতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়, তেমনি মোরাদাবাদের ঘটনা পরম্পরার প্রতিফলিত এক থেকে একাধিক কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত দ্রুত এবং পরস্পর বীধ। ফল হিসেবে। মোরাদাবাদ থেকে সমস্ত, প্রধান থেকে বেরিলী, রামপুর, আলীগড়, আগ্রা, পিলিভিত, এমন কি স্বল্প এলাহাবাদ এবং আজমগড় জেলায় মউ পর্যন্ত। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি, যদিও বীধাবার প্রয়াস ছিল উক্ত সবকিছু প্রায়গায় এবং তা বাদে কানপুর মীরাট ও লখনৌয়ে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো সম্ভব হ'ল না কেন চক্রান্তকারীদের ব্যাপক বন্দোবস্ত লক্ষ্যে? এর জবাব মিলবে উত্তরপ্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে বর্গ চেতনার প্রদারে—বিশেষতঃ শ্রমিক, শ্রমজীবী কারিগর এমনকি অসংগঠিত মজদুর ও ভূমিহীন (অথবা প্রান্তিক) কৃষকদের মাঝেও।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রের সরকারী প্রচারণার শক্তিশালী ধুমুসে যে তথ্য চাপা দেওয়া হচ্ছে, তা হল মোরাদাবাদের “হিংসাত্মক” ঘটনার স্বরূপাত্মক কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমনকি বগড়া থেকে নয়। এর শুরু মোরাদাবাদে মোতারেন ‘প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশ’ বাহিনীর (Provincial Armed Constabulary) আচরণে; তার পাওয়া অভ্যাসগত বেলগাম হিংস্র এবং ফলাফল-বিস্তৃত গুলী-চালনায়। যে সময় সবচেয়ে বেশী ধৈর্য, সাহস ও সংযমের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল সে-সময় তারা যে কাপুরুষের হস্তোক্তি ও ব্যবহার করলো তাই নয়, ইদগাহ্-ময়-

দানের বাইরে উপস্থিত মুষ্টিযের উচ্চাঙ্গকারীর মস্তব্যে এবং ব্যবহারে বেচাল হয়ে গিয়ে, ময়দানের ভেতরে উপস্থিত নমাজ অফে ধর্মীয় উপদেশ (ডাঃ ফাহিমের, যিনি মোরাদাবাদের শহরী ইমাম) প্রবণকারীদের ওপর চোখ-বুলে গুলিচালনার মত বে-আড়ালে শুধু নয়, নীতি-বিরোধী কাজ করল। ফল হল মোক্ষম, ভয়ঙ্কর, ভাব্যকমিক। শরে শরে নিয়মসম্মত আচরণে শরনে মূর্খের পড়লো। কাতরানি, চীৎকার, রক্ত-কাঁদায় মাথামাখি চেহারা অগভীর মাহুয়ের কাতার। প্রকৃত হিসেবের আফালন একদিকে, অপরদিকে ভীত অসহায় আহত, নিহত ও অল্প-আহত বা অনাহত পলায়নকারীদের জলম জটলা, ছুটোছুটি এবং পরিশেষে, অগভীর মাহুয়ের অধম প্রাণীর মত আপনাকে লুকোনো। হ্যাঁ, এটা সত্য, দু'একজন পুলিশ নিহত হয়েছে, জনতার মাঝে বিশেষ পাকা ভাড়াটে দম্ভাজ-বিরোধীদের হাতে, একজন এ ডি এমও। কিন্তু তার পূর্বেই শুরু আইন-ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের চরম অবিমূঢ়তার অভিযান। উদাহরণ স্বরূপ: একপাল তরোর যখন পর্দার-পেছনে-সক্রিয় চক্রান্ত-কারীদের কেরানীতে ভাড়াহত অস্ত্রের প্রাধান্যকে জমায়েতের দিকে আসছিল, তখন দেওয়ালকে অস্ত্রদিকে তাকিয়ে দেওয়ার ভুল কিছু উপস্থিত পি এ সি জওয়ানদের প্রাত্ন-সঞ্চালক অফিসারদের কারকে অল্প-রোধ করে। জবাব দেওয়া হল: “আমরা এখানে মাহুয়ের ওপর নজর ('মির্জানি') রাখতে এনেছি জানোয়ারের ওপর নয়।” অফিসারী কথা বলার দশী ভদ্রী নমাজীদের কানে স্পষ্টকটু ঠেকবারই কথা: অপমানকর ইজিত দ্বিতীয় মানেবহন করে এনেছে। তাছাড়া, পি এ সি বাহিনীর পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং তার মাঝে অল্পপ্রতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু সাম্প্রদায়িক উপকরণ থাকার ফলে, এই সংগঠনের সরকারী ভাবমূর্তি গতবছর আলীগড় দাঙ্গার সময় নষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ আলীগড়ের দাঙ্গা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনার কার্যকরণ মফক্কের জারিক অল্পসন্ধান উদ্দেশ্যে প্রাক্তন জনতা সরকার এক কমিশন বসায়। আল-কের কংগ্রেস (ই) সরকার সেই কমিশনের রিপোর্ট লম্বয়ে ধামাচাপা

দিয়েছে। কারণ অসম্মান করা কঠিন নয়। এই নিয়ে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ বিধান ভবনে বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে সরকারী প্রবক্তার ‘পরমা পরমী’ হয়। এতেন পি এ সি বাহিনীর লক্ষ্যাত্মক সূত্রিকা লম্বয়ে এ-প্রদেশের কংগ্রেস(ই) সরকার পূর্বাঙ্কে কেন সচেতন হয়নি, তা এক নিগূঢ় রহস্য! উল্লেখ্যমী বিষয় আরও হল, যে পি এ সি বাহিনী লম্বয়ে সম্মেল ও কোভ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন-সাধারণের মাঝে জমা হয়ে রয়েছে, সেই ঘটনাকেই উত্তরপ্রদেশ সরকার ইন্ড-উল্-ফিত্-ব-এর মত গুরুত্বপূর্ণ দিনে প্রায় ৫০,০০০ প্রার্থনা-কারীদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে মোতা-রেন করলো। শুধু তাই নয়, ১৩ তারিখের দুঃখজনক ঘটনাবলী লম্বয়ে যখন পুরোপুরি সূচনা কেন্দ্রের ও রাজ্য সরকারের হস্তগত, যখন কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মসম্মি খ্রীষ্টাল সিং এবং উঃ প্রঃ মুখ্যমন্ত্রী জিবিখনাপ্র প্রতাপ সিংয়ের ঘটনামূলে উপস্থিত (১৪ তারিখ), তখনই এই বাহিনীর আরও ১০টি কোম্পানী এই মোরাদাবাদেই নিয়োজিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ, যে বর্ডার সিকিউরিটি কোর্সের ওপর সংখ্যালঘুদের আস্থা ছিল, তারও ৪০টি ব্যাটেলিয়ন পাঠান হয়েছে। আরও বেশী শক্তিতে পরোক্ষ বহু-টাকেই ব্যবহার করা যদিও সমীচীন ছিল পি এ সিকে বাধ দিয়ে, কিন্তু তা করা হয়নি। আরম্ভাত্মী ব্রেদই-বজায় থেকে গেছে।

লক্ষণীয় বিষয়, বা পর্দার পেছনে চক্রান্তকারীদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর যোগাঙ্গ প্রমাণ করে, তা পরিহার রাখানী দ্বিতীয় বিস্তৃতিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত মস্তব্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কার্যপালি-কার বক্তব্যের মিলে। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে উক্ত শ্রেণী-শাসিত সংবাদপত্রের মধ্যে মুখ্য সূত্রিকা পালনকারী টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার মূল সূত্র: এবং মোরাদাবাদের ঘটনা বিশ্লেষণের ধারা নিছক প্রচোচনা-মূলক বগুদমনকারী। “Brazen defiance” শীর্ষক প্রকাশিত সম্পা-রকীরতে সরকারকে একদিকে আরও কঠোর ব্যবহার দিকে এগোবার জন্ত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অপর দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চালাও নিম্না চাপানো হচ্ছে যে, তারা নাকি একবছর থেকেই হরিজন-বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক! সেই দিনই আবার,

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া মোরাদাবাদ-পরিদর্শিত উল্লেখলেন এটাকে “সাম্প্রদায়িক” আখ্যা দিচ্ছেন। ইনিই আবার কিছু দিনের মধ্যে আর ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক নয়, কোনো অল্পপ্রতি বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ফল। মজার কথা, দ্বিতীয় বৈদেশিক-সম্মেলনকে এই “বিদেশী শক্তি”র নাম চাউর লিবারলের সর্বত্র, এবং সেই শক্তির ভাড়া বৈরতন্ত্রী শাসক-বৃন্দের সঙ্গে সরকারী স্তরে মাথামাখির চূড়ান্ত বহুদম-বহুদম চলেছে “সম্মেলন পুনঃস্বাভাবিকীকরণের” নামে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ভারতের গুপ্ত “বুদ্ধিমান” বিভাগ এত বছর ধরে এস্তার মাইনে ও আত্মসম্মিলিত স্ব-স্ববিধা ভোগ করে কোন গোপন তথ্য প্রকাশনকে দিয়েছে! নাকি তাদের এলেম শুধু স্বদেশের নাগরিকদের বিকছে লাগা, তথ্য-আহরণের অছি-লায় বিরোধী বিবেকবান রাজনৈতিক লেখক, বুদ্ধিজীবী, তথ্য রাজনীতিজ্ঞ ও কর্মীদের কঠোরোধ্য করা, তাদের

ডাক, কাগজপত্র, টেলিগ্রাম, টেলি-ফোনের ওপর দখলপনে ধবধারি করা, প্রতিবন্ধক লাগানো? Counter Intelligence, অর্থাৎ বিদেশী বহুদম্মীত্বের ওপর শোনাগুটি রাখা পান্টা ওপ্তের বিভাগ—যাটের দশকে যে-বিভাগের মহারথীরা আমেরিকার কুখ্যাত সি আই এ-র সঙ্গে গোপন ষাডাউ ও সহযোগিতার মহান দৃষ্টান্ত রেখেছিল, চীনের তিব্বত ও সিন্-কিয়াঙ স্থিত সামরিক ও শিল্প-যোগ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর গোপন-গিরি চালাবার গুপ্ত আর্থিক তথ্য সংগ্রাহক বহু হিমালয় পর্বতমালায় গোপন স্থানে বাসস্থান স্থাপন করে—সেই মহা ধুরন্ধর বিভাগ কি মোরাদাবাদের পেছনে কি ও কারা তা উদ্-ঘাটনে অপরগ?

অথবা তারা সকল তথ্যট জানে, কেন্দ্রের কাছে এবং উঃ প্রঃ রাজ্য-সরকারের কাছে এই দুই সরকারই চায়না, সেই তথ্যাহুয়ায়ী প্রাপ্ত প্রতিপত্তিশালী কুচক্রীদের ঠিকানা ও ডেরাগুলি ভেঙে দিতে? তারা কি শাসকবল কংগ্রেসের রাজ্যসং-গঠনের মাথা নয়? রামপুর থেকে মোরাদাবাদ, সাহারানপুর, সমস্ত বিজ্ঞানীর এবং আরও অনেক জায় গার প্রাক্তন সূত্রমীদের তোরাজ শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়



ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড

(বোম্বাই ইন্ডিয়ান একটি সংস্থা বিশেষ)

নিয়োক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি সি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অল্পমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক দীল করা টেন্ডার :

বিস্তৃত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং : ১-০৫ (বি) / ১৬৪১ তারিখ ৬-১০-৮০

(১) ১০০ ইউনিটের এন এইচ এস নির্মাণ (একতলা) (২) ৪০ ইউনিটের ‘বি’ টাইপ নির্মাণ (একতলা) (৩) ২০ ইউনিটের ‘সি’ টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ (একতলা) (৪) ৬ ইউনিটের ‘ডি’ টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ (একতলা) (৫) লালমাটিয়া কোলিয়ারী যাবার রাস্তা চওড়া করা ও ব্র্যাক টপিং (আনুমানিক দৈর্ঘ্য—১ কি মি) (৬) প্রস্তাবিত কোয়ার্টারীর প্রবেশ পথে যাবার রাস্তা নির্মাণের (আনুমানিক দৈর্ঘ্য—১.৬৫ কি মি) জন্য। উপরে প্রস্তুত সমস্ত কাজের আনুমানিক খরচ ৪১,২৭,১০০ টাকা। লালমাটিয়া কোলিয়ারী কেশিয়ারের কাছে প্রতি নেটের জন্য ২৫০ টাকা নগদে দিবে ৮-১১-৮০ থেকে ২৬ ১১ ৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে কাজের স্বাভাবিক সময়ে তেনারেল ম্যানেজারের অফিস, রাজমহল এগ্রিরা, পোঃ লালমাটিয়া কোলিয়ারী, তেলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার) থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২৮ ১১ ৮০ বেলা ৩ ৩০ টার টেন্ডার খোলা হবে।

সাধারণতঃ আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা হতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, অস্ত্রাধ্য টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ মা দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি ও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভূমিকা

সুপ্রিয় ধর

ধনতাত্ত্বিক ছনিয়ার সংস্কৃতি নিয়ে বিশ্ব আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ বহুদিন ধরে চলছে। সংস্কৃতি নিয়ে এই আলোচনার ধনতাত্ত্বিক কাঠামোর মাহুষের নৈতিক ও আত্মিক সমস্তাবলীও প্রাধান্য পাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর নৈতিক অবক্ষয়ের জটিল নানারকম বিষয়কে দারী করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অপর্যাপ্ত অবসর, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি সব বিষয়গুলিকেই বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক এবং মানবিক পতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে; এবং এমন কথাও শোনা যায় যে এ সমস্ত কারণের জন্মই মাহুষ অস্তিত্বিত ভোগের মধ্যে থেকেও হারিয়ে ফেলছে তার আত্মার তার-দাম্য ও স্বভাবাবে বাচার ইচ্ছাকে। সুদেহ নেই আধুনিক ধনতাত্ত্বিক বন্দোবস্তে সংস্কৃতি এবং মাহুষের অস্তিত্বের এ এক জটিল সমস্যা, এবং এ কথাও অনস্বীকার্য যে আধুনিক বয়সভ্যতার জট বিপর্যয়কর অগ্রগতি এই সমস্যাতে আরো বেশি তীব্রভাবে প্রকাশ করেছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো ধনতাত্ত্বিক বিবের লেখকেরা এই অবস্থার স্বযোগ নিয়ে, জীবনের এই আশাত ভাঙে বিভ্রান্ত হয়ে স্বকোশলে সামাজিক চেতনার স্তরে নৈরাশ্যের বিষ প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন। তার মানে এই নয় যে সমস্ত লেখকেরাই এ ধরনের কাজে লিপ্ত। কোন কোন লেখক, সমালোচক সংস্কৃতি ও জীবনের এই দুঃখজনক পরিণতিকে শুধুমাত্র বর্ণনা করছেন, অহত্ব করছেন, পথ খুঁজে না পেয়ে নিজেসাই ব্যথিত হচ্ছেন। এ ধরনের মনোভিত্তি ততটা কঠিন নয়, যতটা কঠিন সেই সব লেখক সমালোচকদের বিশ্লেষণের পদ্ধতি যারা এই সমস্যার কারণ হিসেবে আধুনিক সভ্যতার অজিত বিপর্যয়কর গুণগুলিকেই একমাত্র হেতু বলে বোঝানো করেন। এবং এই অজুত হেতু থেকে পথ খুঁজতে গিয়ে মাহুষের প্রাত্যহিক জীবনকর্ম, মাহুষের জীবন-যাত্রাকেই সম্পূর্ণ নেতিয়ুক্ত পর্দারে বিয়ে যান।

১৮৫৬ সালে দি পিপলস পেশার নামক একটি ভাষণে মার্কস আধুনিক ধাতাত্ত্বিক বিশ্বের সাংস্কৃতিক এবং মাহুষের অস্তিত্বজাত সমস্যার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছিলেন। মার্কস বোঝানো অব্যর্থভাবে দেখিয়েছিলেন যে বয়সভ্যতা মাহুষের আহারের প্রস্তুত সমাধান করবে। মাহুষের

সার্বিক উন্নতিসাধনে নিয়োজিত হবে; সেই বয়সের সামনে মাহুষ কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ। অসুস্থ, সম্পদ কি এক অলৌকিক হাতের স্পর্শে মাহুষের অস্তিত্ববোধকে প্রতিদিন আরো দৃষ্টিতেই তুলছে। যে মুহূর্তে মাহুষ প্রকৃতিকে তার নিজের কাজে ব্যবহারের জন্ত আবিষ্কার করছে সেই মুহূর্তেই সে অস্তিত্বের মাহুষদের জীবনধারায় পরিণত হচ্ছে। এমন কি বিজ্ঞানের আলো অজ্ঞানতার গভীর প্রবেশে এখনো আলো বিকীরণ করতে পারলো না। মার্কসের এই বক্তব্যের পর ধনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ধনতত্ত্ব ও আর শৈশবে নেই, তারও বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু ১৮৫৬ সালে মার্কস যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা আজো পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। সমস্ত কিছুই বৈপরীত্যে পূর্ণ এবং সে কারণেই সমাজের পার্থক্য অপর্যাপ্ত ভোগের বস্তুর সামনেও অবক্ষয়, জটিলতা, বিভ্রান্ততা, একাকিত্ব আজ ধনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা।

ধনতাত্ত্বিক কাঠামোয় এই সমস্যাজালো থাকবেই। মাহুষের অস্তিত্বের সমস্যা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, নৈতিক গ্র্যান-ধারণার অবক্ষয়, ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতির অসহ বিকাশ, লক্ষ লক্ষ মাহুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া পুঞ্জির প্রভাব, আধুনিক ধনতাত্ত্বিক নগরীর ভয় এবং হুমকিরই অপরিসীম ফলশ্রুতি। এমনকি পরিপূর্ণ ভোগের মুহূর্তেও ধনতাত্ত্বিক বন্দোবস্তে মাহুষ অস্থির, নিঃসঙ্গ, হতাশ যেহেতু তার পারিপার্শ্বিকের নিয়ন্ত্রণে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এবং তারই ফলে অপর্যাপ্ত প্রবণতা, যৌনতা, উদ্বেগক বস্তুর প্রবণতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে আর লোপ পাচ্ছে ব্যক্তির গঠনমূলক কাজের আগ্রহ। বিজ্ঞান পনের দৌলতে, প্রচার মাধ্যমের আত্মকল্যাণ বয়সকম উদ্ভট জিনিস—ত্রীনতা থেকে বিযুক্ত শিল্পকলা প্রচারিত হচ্ছে। মাহুষকে ক্রমাগত হতাশা থেকে আরো এক ব্যাপ্ত হতাশা, অস্তিত্বের জগতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ধনতত্ত্বের একমটা হওয়াই আত্মবিক, অপ্রতিরোধ্য। মাহুষের মনকে নানারকম উদ্বেগক নেশায় বুঁদ করে রাখা ধনতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থার একটি কৌশল। মাহুষের অবদমিত স্বাধীনতার ইচ্ছাকে এভাবে বিপথগামী করে সামাজিক স্বযোগ হ্রাস এবং অর্থ উপার্জন ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার ধারক এবং বাহকদের একটি পুরনো

কৌশল। আর এরই ফলে শিল্প-সাহিত্যে যে মাহুষগুলোকে আমরা পাই, সেই মাহুষগুলোর চরিত্র চিত্রণের পিছনে থাকে এক নয় অর্থ-করী মনোভাব, জীবনের চঞ্চলতা, বৈচিত্র্যময় ছন্দের কোন পরিচয় আমরা পাই না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাহিত্যের সেই মাহুষগুলো পূর্ব নির্ধারিত, বিজ্ঞাপিত মাহুষ বলে মনে হয়, নিজস্ব মজার জগতেই তারা পরবাসী। শিল্প-সংস্কৃতির কাজকারবার মাহুষকে নিয়ে, জীবন-ছন্দে আলোড়িত মাহুষকে নিয়ে। অথচ সেই মাহুষই সাহিত্যে, শিল্পে অহুশস্থিত। সুতরাং সংস্কৃতির সংকট তো একান্ত অপরিসীম। এবং এই সংকটের মূল লুকিয়ে রয়েছে ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার অবিরোধিতা এবং অবক্ষয়ের মধ্যে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ধনতাত্ত্বিক জগতের লেখক-সমালোচকেরা ধনতত্ত্বের নিজস্ব বস্তু এবং অবিরোধিতার মূল বাচ্ছেন না, বরঞ্চ পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি অবিশ্বাস, হতাশা এবং নানারকম উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়ের প্রতি মাতান্ত্রিক সচেতনাকে প্রকাশের এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, শিল্প সাহিত্যের এক অতিনব মাধ্যম আবিষ্কার করেছেন যার পিছনেও স্বতীকৃষ্টিতে ধরা পড়ে এক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। অর্থাৎ ধনতত্ত্বের অন্তর্গত জিনিসের মতো শিল্প সাহিত্যও অর্থ ও মুনাফা অর্জনের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছু নয়। ম্যাথু আর্নল্ড কি এ কারণেই তাঁর সময়ের উদীয়মান বুদ্ধোন্মাদার ফিলিস্টাইন বলেছিলেন?

এ ধরনের সংস্কৃতিকে আমরা অপসংস্কৃতি বা জীবনবিমুখ সংস্কৃতি বলে থাকি। উপরের আলোচনা থেকে একটা তথ্য পরিষ্কার যে ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থার অপসংস্কৃতি ঐতিহাসিক নিয়মেই অনিবার্য এবং অপসংস্কৃতি রাজনীতি বহিষ্কৃত কোন বাস্তবী বিষয়ও নয়। সুতরাং এ ধরনের সংস্কৃতি ধনতাত্ত্বিক প্রচার মাধ্যমের দৌলতে ধতই মনোহর হোক না কোন ডি এইচ লরেন্সের ভাষায় তা শেষ পর্যন্ত অ্যান্টি-লাইফ অপসংস্কৃতির এই বিকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্ত তাই প্রয়োজন স্বপ্ন, জীবননিষ্ঠ, বলিষ্ঠ সংস্কৃতি। অর্থাৎ যে সংস্কৃতি হবে প্রতিবাদী, প্রগতিশীল। সংস্কৃতি স্বভাবতই এ ধরনের সংস্কৃতির চেহারাটা হবে অনেক বেশি ব্যাপক, উদার এবং

অসীম। সংকীর্ণ জীবন চেতনার মধ্যে তা অবশ্যই আবদ্ধ থাকবে না। নতুন করে কোন কিছুর উদ্ভাবনই হবে এ ধরনের সংস্কৃতির প্রধান বিষয়বস্তু। এবং সেক্ষেত্রে মাঠে চাষ করে যে কৃষক; নদী, খাল, বিলে জাল ফেলে যে মাছ ধরে এবং মাছ চাষ করে—এই সমস্ত কিছুই, জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে মাহুষ যে সমস্ত নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে—এই সমস্ত কিছুই প্রতিবাদী, প্রগতিশীল সংস্কৃতির আওতার আসবে। প্রগতিশীল সংস্কৃতি মাহুষের প্রাত্যহিক জীবনকর্মের সঙ্গে হবে সংশ্লিষ্ট, মাহুষের জীবনবোধে হবে উজ্জল। এ প্রসঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের কাছে আলোকবতিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চীনে যা কিছু ঘটেছিল, তার সব কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু হটকারিতা বা বিচ্যুতি যে ঘটেনি এমনও বলা যায় না কিন্তু প্রগতিশীল শিল্পকর্ম যারা করবেন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব তাদের অবশ্যপাঠ্য, কেননা সাংস্কৃ-

তিক বিপ্লবের মাধ্যমেই মাও সে-তুং সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের মাহুষের জীবনকর্মের সঙ্গে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন। সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বলে চিৎকার করলেই তা স্বপ্ন বা প্রগতিশীল হয়ে ওঠেনা, তার জন্ত ব্যাপকতম মাহুষকে সংস্কৃতির আভিনায় নিয়ে আসতে হবে, ব্যাপকতম মাহুষের প্রাত্যহিক জীবনকর্মকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। সমস্ত স্তরের মাহুষকে সংস্কৃতির আভিনায় যদি প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয় তাহলে সে সংস্কৃতি খণ্ডিত সংস্কৃতি হতে বাধ্য; এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও যত্নপূর্ণ বুদ্ধিগোষ্ঠী স্বয়ং দৃষ্টিভঙ্গি এই খণ্ডিত সংস্কৃতির ফলে অর্জন করা সম্ভব হয়না। খণ্ডিত সংস্কৃতি, খণ্ডিত মাহুষ নিয়ে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে প্রগতিশীল, প্রতিবাদী সংস্কৃতির শরীরে যতটা পরিমাণে শিল্প-স্বয়ম্বা ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে, ঠিক ততটা পরিমাণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কাজকর্মকেও লিপ্ত করে নিতে হবে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের সামনে সংস্কৃতির এই ব্যাপকতম চেহারাটাকেই উন্মোচিত করার অবশ্যপাঠ্য, কেননা সাংস্কৃ-



ইস্টার্ন কোমার্শিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্ত ই সি এল / সি পি ডব্লু ডি / প্রেসওয়ে / কেম্রী ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অস্থায়ী/ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেন্ডার নং. কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল্য করা টেন্ডার :

জিনিসপত্র বিক্রয়

রেফা: নং : ০০ / টেও / ১৯৭৪ তার ২৪ ২-৮০

“অ্যাজ ইজ হোয়ার ইজ ভিত্তিতে” ইস্টার্ন কোমার্শিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেডের এক্স-কোলিয়ারী / ওয়ার্কশপ / ইউনিটের আত্মমানিক ৫৮২৫টি খালি ভেলের / গ্রীজের ড্রাম বিক্রীর জন্ত। ঐ পরিমাণের জন্ত প্রদত্ত মূল্যের ৫% স্বত্ব ছাড়া বায়নার টাকা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইস্টার্ন ভিভিসনের অস্থায়ী আদানসোলে গ্রেট ব্যাল অফ ইন্ডিয়া ওপরে দেয় ডিমাণ্ড ড্রাক্টের আকারে টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে। ইস্টার্ন কোমার্শিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড, সাকতোরিয়া পো: দিল্লেরগড়, জেলা বর্ধমান ঠিকানায় কেশিয়ারের কাছে ১০ টাকা (অপ্রত্যাশযোগ্য) নগদে / ১২.৫০ টাকা মনি অর্ডারে (টেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তর্ভুক্ত ১৫ দিন আগে পেতে হবে) দিয়ে ২৬ ১১-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত কন্ট্রোলার অফ টেন্ডার অফিস, সাকতোরিয়া, পো: দিল্লেরগড়, জেলা বর্ধমান থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২৭ ১১-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত কন্ট্রোলার অফ টেন্ডার অফিসে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে।

সাধারণ: টেন্ডারের সঙ্গে বায়নার টাকার রশিদ জমা দিতে হবে, অতথ্য টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গ্রহণ অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

বামফ্রন্ট সরকার কি সংগ্রামের হাতিয়ার ?

শ্রীপতি নন্দী

সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের পদক্ষেপগুলি কি কি? কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের ক্ষেত্রে এনবের কোন প্রতিফলন কি ঘটতে পারে? বৈরাচার বিরোধী লড়াইয়ের লাইন কি? সাংবিধানিক উপায়ে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ের স্বযোগ ভারতে কি আছে? বামফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামের লাইন কি এক ও অন্তিমমুখী? যদি তা না হয়ে থাকে তবে 'স্বাভাবিক হাতে অধিক ক্ষমতা' কি বৈরাচারিক ক্ষমতার ভাগ বসানো নয় এবং কারো ব্যাবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমতা সমাধানের অলীক আশা জাগিয়ে জনমনে মোহস্থিতির খেলা নয়? উপরন্তু আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী রাষ্ট্র-চরিত্রকে মেনে নিলে তার বৈরাচারিক উপাদানগুলিকেও জাতে ভুলে নিতে হয়, সেক্ষেত্রে ভারতীয় শ্রমিক কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের এ কোন গণস্বার্থমুখী পুনর্বিনীত আশা করা চলে কি? 'সংগ্রামের হাতিয়ার'-এর পক্ষে এ প্রশ্নগুলি এড়িয়ে চলা সম্ভবপর নয়।

বামফ্রন্ট কতটা 'বাম' কতটা সংগ্রামী তা বিচার হবে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে, জাতীয় চরিত্রহীন অর্থনীতির পাট্টা পরিকল্পনার গুণবিচারে, দেশী-বিদেশী বৃহৎপুঁজির যুগ্মক্ষেত্রে যুদ্ধ অর্থনৈতিক অনাচারের ব্যবস্থা-গণ্যাদি ছাড়া যার অস্ত্র কাজ নেই এরূপ ভারতীয় সংসদ সম্পর্কে তার ভূমিকায় এবং আধা-সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি তার হুনিদৃষ্টি কর্মপর্যায় বিচারে। অবশ্য বামফ্রন্ট সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, কেননা দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্ট ও নয়া পুঁজিবাদী বৈরাচারী রাষ্ট্রের প্রত্যঙ্গ 'বামফ্রন্ট সরকার' অবশ্যই একবস্ত্র নয়। কিন্তু দলীয় নীতি ও রাষ্ট্রীয় মারফৎ তার প্রয়োগগুলি এদের উভয়কেই যুক্তভাবে সমীক্ষা করছে।

দেশী-বিদেশী সহশোষণ ও গণসংগ্রামের পটভূমি

দেশী বাক, ভারতীয় নয়া পুঁজিবাদের পরদা কি কি? প্রথমতঃ ভারতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজি, তা সে দেশী হোক আর বিদেশী হোক—

এবং প্রতিষ্ঠাকামী পুঁজি, দেশী কিংবা বিদেশী—এদের খাই যেটাতে যে পরিমাণ প্রমশক্তি বা উৎপাদন শক্তি প্রয়োজন সেটুকু বাদ দিলে বাদবাকী উৎপাদন শক্তি তথা প্রমশক্তি সম্পর্কে ভারতীয় অর্থনীতি তথ্যমাত্র নিঃসঙ্গ নয়, এদের ক্ষুদ্র-তম একটা অংশকেও কর্মসংস্থান করে দিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, এমন কি বৈদেশিক 'সাহায্য' বস্তা ডেকে এনেও অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত টেকনোলজী বিদেশী-হওয়ার এবং তাদের উৎপাদন প্রধানতঃ রপ্তানী বানিজ্যের শর্তাধীন হওয়ার এহেন শিল্পগুলি দেশী অর্থনীতির বিকাশের প্রয়োজন তথা ব্যাপকতর জাতীয় শিল্পায়নের চাহিদা ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটার না, উপরন্তু যেকোনো চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে দেশের উৎপাদন ও জাতীয় সম্পদের এক বৃহৎ অংশ থেকে দেশের জনসাধারণকে বঞ্চিত রাখে, ভোগ্যপণ্যের দাম চড়ায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পায়নের পথে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক নীচ কাঠামোর এ শোচনীয় অবস্থার ফলস্বরূপে বৈদেশিক রপ্তানী বানিজ্যের উপর ভরসা রেখে ভাষাচোরা অর্থনীতির কাঠামোটা কোনমতে টিকে থাকতে চায়—প্রমশক্তির ও উৎপাদন শক্তির সংস্থানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে (বাধ্যতামূলক বেকারত্ব), জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ ও প্রমশক্তির লজ্জিতপূর্ণ সম্পর্কে হোয়াস্তানা করে (উপেক্ষিত ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প), উৎপাদন ও জনস্বার্থের মধ্যকার সম্পর্কে অগ্রাহ্য করে (ভোগ্যপণ্যের বাজারে নৈরাজ্য)। চতুর্থতঃ, বিদেশী উন্নত পুঁজিবাদীরা যুদ্ধন, মেশিন ও মেশিনগান না দিলে যাদের পুঁজিবাদী স্বপ্ন মচিরে মিলিয়ে যাবে সেই শাসকশ্রেণীর দামনে কোন বিকল্প নেই, বাছ-বিচার নেই; আবার লুটের ভাগ না পেলে যে বিদেশী তালেবররাই বা কেন এরূপ 'সাহায্য' নিয়ে ছুটাছুটি করবে? অতএব বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহশোষণ ও সহশোষণ যে দেশী পুঁজির একমাত্র গুপতপ, এবং তৎসহ সংসদীয় আলখাল্লায় গা-ঢাকা দিয়ে আধাসামন্তবাদী বৈরাচার তার দাঁতমুখ বিচিয়ে রয়েছে, তাদের শবসাধনার কোন

মূল্যবুদ্ধিরোধ, ক্ষত শিল্পায়ন, বিদ্যায় সমস্তার সমাধান, দুর্নীতিরোধ, স্বল্প সরবরাহ ব্যবস্থা, বেকার সমস্তার সমাধান, কৃষির পুনর্বিনীত, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শিকা-বাহ্য-সংস্কৃতির বিকাশ—ইত্যাদির কোন স্থান নেই, থাকতে পারে না। এদের গোল-গম্বী তবু তাগিদ সবই আলাদা—বিদেশী কুমীরকুলকে আমন্ত্রণ জানাতে আইনী খাল কেটে রাখতে হবেই নইলে দেশী লড়াই প্রম, পণ্য আর সম্পদ লুটের উপায় যোগাবে কে কিংবা গোষণ পুঁজি ও শোষণ যন্ত্র সরবরাহ করবে কে? দেশী কুমীরকুলের বৈষয়িক খাই ও রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা তো 'বৃহত্তম গণ-তন্ত্র' লাইফ-লাইন, আর নয়া-বুর্জোয়াদের শোষণ-শাসনের শাস্ত অধিকার—এগুলোকে যদি লোকে দৈবজ্ঞত কপাল জানে সাধারণ করে না রাখে তবে বেজরায় সংসদের বেদীমূলে সাধারণ লোকের কামা-কামনার ভোটাদিকারটুকুও গচ্ছা যাবে। এই হলো জাতীয়চরিত্রহীন নয়াবুর্জোয়ার অর্থনৈতিক সহবাস ও রাজনৈতিক কুল টা বৃত্তির পাচালী।

অতএব পক্ষমতঃ, এ আন্তর্জাতিক কুমীর প্রজেক্ট চালু রাখতে হলে যা দর্পপ্রথমে আবশ্যিক তা হলো দশা-সই রাষ্ট্রীয় তুখোড় যন্ত্রা, বলা বাহুল্য এক অতিশক্তি যন্ত্র আর অতি-নিষ্ঠ যন্ত্র—গত কেন্দ্র (সরকারী কেন্দ্র) বা বেক্সিয়া দেশী নয়া বৃহৎপুঁজির ও আধাসামন্তবাদের সহমিতার গড়ে ওঠা সর্বভারতীয় একমেবাবিধীয় ব্যবস্থাপক যন্ত্র—দেশের প্রম ও সম্পদকে দেশী বিদেশী পুঁজিশাহীর ও মালিকশাহীর ভোগে লম্বা দিতে যে শাসনযন্ত্র দায়বদ্ধ ('The Government that Works')। বিগত তিন দশক জুড়ে সাধারণ ভারতবাসী দেশী বিদেশী সহশোষণ সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পাঠ নিয়েছে সে একই অভিজ্ঞানের পাতায় পাতায় দুনিয়ার বৃহত্তম ও জটিলতম সংসদীয় বৈরাচারের জীবনীমুদ্রাগুলিও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বলা বাহুল্য এ পটভূমিকাতে গণসংগ্রামের লাইন নির্ধারিত এবং এ সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী গণসংগ্রামের পটভূমিকায় বামফ্রন্ট সরকারগুলির মূল্যায়ন করতে হবে।

নয়া পাতিবুর্জোয়া 'সংগ্রাম'

সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের পক্ষে প্রধান নীতিগত বিষয়টি হলো ভারতীয় পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রকে উদ্ঘাটন করে দেওয়া ও শাসক শোষণযন্ত্রের দমন-মূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মোকাবেলা করতে দর্পহার্য নেতৃত্বে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা, প্রয়োজনীয় কৌশল ও সাংগঠনিক সামর্থ্য অর্জন করা।

কিন্তু আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক (নয়াবুর্জোয়া) ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে চূরমার করার উপায় অবশ্যই নির্বাচন নয়। একথা বামফ্রন্টের তাগীদারগণও অন্ততঃ মুখে স্বীকার করেন। তাহলে, ব্যবস্থার উপরিকাঠামো ও ভিত্তি সারাদেশে এক ও অবিভাজ্য হওয়ার কোন স্থানীয় প্রাদেশিক (রাষ্ট্রিক) উপায়ে কিংবা 'হাতিয়ার' নিয়োগ করে কতটা এগোনো যায় কিংবা আদৌ এগোনো যায় কি না সে প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। সংসদীয় উপায়ে কৌশলগত যে কিছুটা সম্ভাবনা পক্ষপাতের দৃষ্টিকোণে দেখা দিয়েছিল, শাসকশ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক দলগুলি সেগুলির অবশেষটুকুও আজ আর রাখেন। ফলতঃ, সংসদীয় ও সাংবিধানিক উপায়ে 'কাঠামোর মধ্যকার লড়াই'-য়ের প্রশ্নগুলি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিরূপ দাঁড়িয়েছে তা সংগ্রামী-মার্ক্সের নিকট আর অজানা নয়, এমন কি সুবিধাবাদীদের কাছেও অজানা থাকার কথা নয়। বাস্তব পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট কিংবা তার যে কোন 'হাতিয়ার'-এর অবস্থানকে 'সংগ্রাম ও কৌশল'-এর উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

কৌশলগত উপায় হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নটি স্বভাবতই অগ্রাধী আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সংগ্রামের নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করা ও প্রয়োগ করার বিষয়গুলিতে বাদ দিলে নির্বাচনকে 'পদক্ষেপ' হিসাবে গ্রহণে ধরা তবুই লক্ষ্য বিচ্যুতি নয়, একেবারে আত্মনাশা পদক্ষেপ। আবার 'লড়াই'-এ কোনরূপ অগ্রগতি না থাকলে অর্থাৎ লড়াইয়ের স্বর উত্তরণ লজ্জবশ না হলে যখন শ্রেণীনীতিগত উপরোক্ত সমস্ত উদ্বেগ বারে বারে

ব্যর্থ হয় আর যখন সংসদীয় কৌশলটি অপকৌশল হয়ে জনগণকে কেবলমাত্র বিভ্রান্ত করে রাখার কাজ করে তখন গণসংগ্রামের লাইন ও সংসদীয় লাইন পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠতে বাধ্য। সাক্ষাৎ বামপন্থীরা এ অবস্থায় পথ চিনে পথ করে নেয়; প্রকৃত সংগ্রামী শক্তির পরীক্ষা এখানেই।

কিন্তু যারা নয়াবুর্জোয়া আধাসামন্তবাদী রাষ্ট্রীয় বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ করেন না, তথাকথিত 'গণ-তন্ত্রকে সম্ভারিত' করার 'লড়াই'-গুলিও তাদের অভিনব। একথাটি যেমন বামফ্রন্ট সংগঠন সম্পর্কে তেমনি বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কেও খাটে। সংসদপ্রভুত সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রীয় বৈরাচারের গোড়ায় জল ঢালা আবার একই সঙ্গে ইন্দিরামাক্তা খেচ্ছাচাওয়ার বিরোধিতা পরস্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, নেহরু ও ইন্দিরার তানাহাফী আশ পিতোশ ও অনাচারগুলো যে মাঠে সারা যায় নি তা কারো অজানা নয় এবং এরও মূলে রয়েছে একই আধাসামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও কিছুতাকমাকার ব্যবস্থাগুলো যা আমাদের সংসদীয় বৈরাচারের স্যামাজিক ভিত্তি। বৈরাচারের বাস্তব উপাদানগুলি নয়াপাতিবুর্জোয়াদের শ্রেণী দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। অনেক দেরীতে হলেও একথা দৃকপেরহ জানা উচিত, যারা সংসদীয় সাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় বৈরাচারের গোড়ায় জল ঢালে (নিজেদের অজ্ঞতাভাবতঃ হলেও) তারা যে কোনরূপ বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে—তা সে ইন্দিরার তানাহাফী হোক, মুনাকাপাহা খেচ্ছাচাও হোক কিংবা বৈদেশিক হস্তক্ষেপবাদ হোক—কোন কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। অতএব শক্তির উৎস জনগণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে যারা পাহানী পদক্ষেপ রাখতে ভয় পায় কিংবা জাতীয় স্বাধীনতা, সাব-ভোমস্ব ও আত্মনির্ভর জাতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে যাদের মূল্যবোধগুলি তাদেরই বিবোধিত জনগণতারক বিপ্লবের নীতিগত ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, তাদের বৈরাচার বিরোধী প্রচেষ্টাগুলি যেটা রপনজ্ঞ—এক-হীন, দীর্ঘতাহীন—হতে বাধ্য; তারা বৈরাচারবিরোধী যে কোন সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া দূরে থাক, আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে অক্ষম।

নয়াপাতিবুর্জোয়া রাজনীতিতে এহেন স্ববিদ্রোহিতা খুঁই যাওয়াবিক (লক্ষ্যগণ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বৈরাচার সম্পর্কে 'বামফ্রন্ট'-লজ্জবশ না হলে যখন শ্রেণীনীতিগত উপরোক্ত সমস্ত উদ্বেগ বারে বারে

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

এই সপ্তকের প্রকাশিত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের “সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে” একটি সমরোচিত আলোচনা। কিন্তু এর অন্তত দুটো গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি প্রতিলেখক ও দর্পণের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রামমোহন-বিজ্ঞানাগার-বজ্রমন্ডলের কাছে সাম্প্রদায়িকতার দায় চাপালেও, অশোকবাবু কিন্তু হুকোশলে আলোচনার বাইরে রেখেছেন এঁদের মতাবলম্বী উত্তরবঙ্গের রবীন্দ্রনাথকে, যিনি বিংশ-শতাব্দীতে উনবিংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন।

দ্বিতীয় ত্রুটি, অশোকবাবু এক-প্রকার গা-জোয়ারী করেই উনবিংশ শতাব্দীর উপেক্ষিত কবি মধুসূদনকেও সাম্প্রদায়িক করতে চেয়েছেন। পেটের দ্বারা “হিন্দু কনিকল” বা “হিন্দু প্যাট্রিস্টে” চাকরী করলে একজন খ্রীষ্টান কীভাবে সাম্প্রদায়িক হতে পারেন? মধুসূদন “হিন্দু সংস্কৃতির থেকে উৎসারিত এবং তাতেই নিপাতিত,” মধুসূদন জন্মদেব-আদির “স্ববিশেষ পক্ষপাতী”—এ জাতীয় উক্তি কি সত্যকে তেমন সন্মানিত করছে? মধুসূদন তো হোমার-দ্যু-ভার্জিল-মিলটনেরও সর্বশেষ পক্ষপাতী, আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে পুরুষ পক্ষপাতী; তিনি রামভক্ত বিভীষণের বিরোধী, যে বিভীষণ ইংরেজ-প্রিয় রামমোহন-বিজ্ঞানাগারদ্বির প্রতিনিধি; মধু দেশপ্রেমিক মেঘনাদের লক্ষ্যক, যে-মেঘনাদ তিতু-সিধু-কাহ্ন মজল পাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজের দেবাদাস অমিদার-মুন্সুফী ভক্তপ্রসাদদের বিপ্রতীপে মধুই প্রথম হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিরোধের নাট্যদর্পণ গড়ে তোলেন। নীলদর্পণ অহুয়া ও প্রচারেও মধুসূদনের ছিলো অমের

সহযোগিতা। কিন্তু আজও বুঝি তাঁর তীব্র হতাশা-আকোশ :—“কি ফল লভিহু হার।”

সে-যুগে মধুসূদনকে উৎসাহ দিয়ে কেউ বলে নি যে, “তুমি জিহ্বে যাও, অর্ধচন্দ্র তার আমরা নিছি।” বরং হানিফ গাজী ও মেঘনাদের রচিত শ্রদ্ধা ব্যারিস্টারির সোনার হরিণ দেখিয়ে বিমোহিত-পাঠিয়ে আমরা স্বস্তি পেতে চেয়েছি, স্বস্তি দিতে চেয়েছি ইংরেজ প্রভুকে। আর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-বুদ্ধদেব



বহুলা মেঘনাদের পৌষ্ট মর্মেণ করে ফেঁদা জারী করেছেন—মধুর মহাকাব্য কাব্যই নহে। বিধবির-বেয়াই বিহাঙ্গীলাল চক্রবর্তীকে করা হয়েছে বাংলা রোমান্টিক কাব্যের ভোরের পাখি; তাবথানা এমন যেমনো মধুসূদন ছিলেন দুপুর রাতের দাঁড়াক। আজও দিকে দিকে বঙ্কিমের ‘বন্দে মাতরম’ বা রবীন্দ্রকবির ‘বাঙ্গালী প্রতিভা’র শতবর্ষ, বিজ্ঞানাগারের বর্ণপরিচয়ের দোয়া শত, বা সত্যজিৎ-কিল্লের পোরা শত বছর পালিত হচ্ছে সাধুঘরে, আর মধুসূদনের কপোতাক্ষ এখন বিস্মৃত ভিনদেশ, তাঁর মেঘনাদের হয়তো পার্ক মার্কারের হ’তস্ত্রী কবরে, স্বতরাং বিভীষণপ্রেরী বেষ পৌষমাস ওয়কে পোয়াবারো। তবু পশ্চিমা হাওয়ার মাঝে হঠাৎ যেমনো মাঝে মাঝে শোনা যায় : ‘দাঁড়াও পথিকবর।’ অশোকবাবু বলতে পারবেন—এই পথিকবর হিন্দু কিনা। বিজ্ঞানাগারদ্বি হিন্দুগণ অবশ্য খ্রীষ্টান কবি মধুসূদনের শেষ যাত্রার সাথী হতে রাজী হন নি।

শেষ যাত্রার কথাই মনে এলো

বেআইনী কয়লা খাদে শ্রমিকের মৃত্যু

বর্ধমান জেলার জামুরিয়া থানা এলাকার পুলিশ কোল কোম্পানি লিমিটেডের বেআইনী কয়লা খাদে কয়লা চাপা পড়ে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে। কিন্তু শ্রমিকের মৃত্যু লক্ষ্যেও এই বেআইনী কয়লা উত্তোলন বন্ধ হয় নি।

১৯ সেপ্টেম্বরের দর্পণে এবং আসানসোলার স্থানীয় সাপ্তাহিক পূর্ববন্ধকে এই পুলিশ কোল কোম্পানি লিমিটেডের বেআইনী কারবারের কথা প্রকাশিত হওয়ায় এই পি সি সি এল-এর চেয়ারম্যান তথা জামুরিয়া থানার ও সি থানিগুলি থেকে কয়লা খনন বন্ধকরণের বন্ধ রেখেছিলেন। পরে সম্ভবত কারো

কাছ থেকে আশ্রয় পেয়ে পূর্ণোন্মেষে অব্যবহাবে পরিভ্রমিত খাদ থেকে কয়লা খনন আরম্ভ করে দিয়েছেন। এবার আরও দুটি পরিভ্রমিত খাদ বন্ধ হয়েছে। একটি হল ধন গ্রাম সংলগ্ন পরিভ্রমিত সিঁড়ি খাদ এবং অপরটি কইনি গ্রাম সংলগ্ন পুকুর খাদ।

দিন কয়েক পূর্বে বেআইনী এই কয়লা উত্তোলনের সময় কয়লার চাই চাপা পড়ে স্থানীয় লালবাজারের যে বাড়ির সম্প্রদায়ের শ্রমিকটি নিহত হয় তা প্রকারান্তরে ধনেরই সামিল। একজন দায়ী যারা তাদের পেছনে একটি ক্যামেরা চক্র জড়িত বলেই এই সব ঘটনা ধামাচাপা পড়ছে।

‘মহানারক’ উত্তমকুমারের শব-বাহকের সাম্প্রতিক আচরণের বিলাসিতার কাহিনী। বৃথাল দেন-সত্যজিৎ রায় ও সরকারী সংস্কৃতি প্রচারের এক অধিনায়ক অল্পকুমারের লাগামহীন প্রশস্তি ও উচ্ছ্বাস মানুষকে অবাক করে দিয়েছে, প্রেক্ষ অবাক। কেনোনা উত্তমকুমারের জীবনকালে তাঁকে এক অধিকারিত অস্তিত্ব নেতা তথা প্রতিক্রিয়ার শিবিরের মস্ত ভাবক বলে প্রচার করা হয়েছিলো—ঠায়েঠায়ে, প্রকাশ্যে। দোমিড-আদির নেতৃত্বে শিল্পী সংসদে বিপ্রতীপে অভিনেতৃত্ব লব্ধ নায়ে এই প্রচারকে জোরদার করা হয়েছিলো। বাহোক, বৃহৎ বুদ্ধিজীবীদের অস্বচ্ছ অশ্র, নির্লজ্জ উচ্ছ্বাসের বস্ত্র এড়িয়ে দর্পণের ‘চল-চিত্র ও নাটক’ বিভাগে সমর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তম-প্রতিভার তথা জনপ্রিয়তার মতাবলম্বী নীমা-নির্দেশে ফে-লাহসী-তুমিকা নিয়েছেন, তাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য নগ্নসকতার ভরাডুবি থেকে অন্তত কিছুটা বেঁচে গেছে, ধাক্কা খেয়েছে অপসংস্কৃতির চতুর কারবারীরা।

নির্মল সাহা

খাত্তমজী প্রসঙ্গে

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে সাপ্তাহিক “দর্পণ” পত্রিকার “স্বধীম কুমার অধ্যাপ্য খাত্তমজী” শিরোনামের প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বাস্তব সত্য এই যে, বিভিন্ন সময়ে খাত্তমজীর লরবরাহ সম্পর্কে কোন অব্যবস্থা বা হুঁসিতি থাকলে পাটি লদস্যের কর্তব্য হিসাবে আমি খাত্তমজী ও খাত্তমজীর দৃষ্টিতে-এনেছি, খাত্তমজী গুরুত্ব দেননি এই মন্তব্য আদৌ লভ্য নয়। মজী মহাশয় তৎপরতার সঙ্গেই তৎক্ষণে নির্দেশ দেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শান্তিও হয়। কিন্তু বর্তমান আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং আইনের ব্যবস্থা এমনই যে, লবল সময়ে অপরাধী শাস্তি পায়না। স্বতরাং আপনাদের সংবাদ অস্থায়ী আমার মজীর আচরণে অপমানিত বোধ করার কোন কারণ ছিলনা। আমি খাত্তমজীর যাত্রার বন্ধ করেছি এটাও সত্য নয়। খাত্তমজীর সঙ্গে আমার এবং আমার-পাটি আর সি পি আই-এর নিরমিত যোগাযোগ আছে।

নিজের পাটি কবরভরা তার ওপর খুশি নন এ সংবাদটিও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। দর্পণের সংবাদে আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলির সত্যাসত্য আমরা যাচাই করে দেখব-এবং তুলসান্তি ঘটলে নিশ্চয়ই সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। চিত্ত সিংহার

সংগ্রামের হাতিয়ার ?

এম পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচীর লাদ্ভ, বা কাম্পুচিয়া আক-পানিস্তানের প্রবে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এবং এ অবিরোধিতা অনেকটা ‘অরগ্যানিক’ বলেই এরূপ অবিরোধী রাজনীতিতে নয়াপাতি-বুদ্ধোদয় অস্ত্রের চাইতে অধিকতর মূখ্য থাকে। ফলতঃ, আগ্রাসী বৈরতন্ত্রের আক্রমণটি জনগণের বাস্তব সামাজিক অস্তিত্বগুলি এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক তাবা পার না, বৈরতন্ত্রবিরোধিতার স্লোগান আইনী শেলবস্ত্র অর্জন করে, গণ-উৎসাহে উদ্ভাস জোয়ার আনে না। আর ক্রমবর্ধমান অমিলগুলির ফারাক কাটাতে নয়া পাত্তিবুদ্ধোদয় ‘বাম-পন্থী’রা আরো বেশী করে বুদ্ধোদয় প্রেরী-শক্তিশালী প্রচার বহুগুলির উপর নির্ভরশীল হয়, এটাও ঘটনা। বামফ্রন্টের সাম্প্রতিককালীন নির্বাচনী লক্ষ্যগুলির মধ্যে এ গুরুতর ব্যর্থতা প্রতিকলিত না হতে পারে, কিন্তু বৈরতন্ত্র বিরোধিতার প্রবে বামফ্রন্ট ও জনগণের বৃহত্তম অংশের মধ্যকার আচরণ পার্থক্য পরস্পরের নিকট দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, চক্ষুমান ব্যক্তি মাত্রের নজরে তা এড়ান না। গণ-সংগ্রামের শক্তিশালীও নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়েছে।

‘বামপন্থী’ গণমগনগুলির কথাই ধরা যাক না কেন। গণমগনগুলি, সে টেড ইউনিয়ন হোক আর ছাত্র-যুব লগন হোক, নিশ্চয়ই নিত্যন্ত সমর্থক বাহিনী নয় (অন্ততঃ এমন মাত্র হবার কথা নয়)—সমাজ পরি-বর্তনের সমস্ত রূপ দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা ও লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারটাই বিবেচিত লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্যহীন রাজনীতিতে পরিবর্তন-শীল পরিস্থিতি ধরা পড়ে না। ফলে তথাকথিত রণকৌশলগুলিও অচিরে অপকৌশলে রূপান্তরিত হয়ে মূল বিবেচিত রাজনীতির বিরোধিতার পথ ধরে, বিশাল বিশাল গণমগনগুলিও বধ্য হয়, অকল্পে হয়। নির্মম শোষণে পিষ্ট, ধমন পীড়নে ক্রিষ্ট জনগণ বারে বারে গণ-লগনগুলিতে ভীড় করেছে, কিন্তু হতাশায় রাজনীতিগতভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, অনেকে আবার সুবিধা-বাহে গা ভানিয়ে দিয়েছে, আবার কারো কারো লালস্রোত নীলস্রোতের মদ্রিততা বাসা বেঁধেছে। দেশী বিদেশী অভ্যুত্থানের পাকে চক্রে পাক খেয়ে খেয়ে যারা আত্মবিলাস আত্মবাস্তী করেছে তারাও দেশী বিদেশী শোষণে নিষ্পেষিত, কিন্তু গলার-ঠেলে-ঘেঁষা বিবেক ক্রিয়ায় তারা যখন শক্তিময় চিনে উঠতে পারে না (তাদের অনেকেরই ভিন্ন

সম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া কেই শক্তমান করে), শাসকশ্রেণীর রাজনীতিকরা স্বতাবতই তখন আত্মাধে আটখানা হয়ে থাকে, কিন্তু সুবিধাবাহীরাও তখন মামুলী সত্য নমিতি বিধান-লভ্যমুখী শোভাযাত্রা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই জানে না, চেনে না।

যে আধাসামন্তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পাত্তিবুদ্ধোদয়ের দুর্গাপূজা দেও-রাজী ঈর্ষ এবং প্রমিত শ্রেণীকে বিধ-কর্মী এবং সর্বসাধারণকে ভাঙ্গাবাদ ও ভাববাহ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না তার জিরতিরে ভিতটাকে আঘাতে তেলেলা দিয়ে, তার শিকা-সংস্কৃতির নামে এর অপশিক্ষাকে ও অপসংস্কৃতিকে এবং আইন শৃঙ্খলার নামে প্রয়োচনা স্বপ্তিকারী অপ-আইন ও অপশৃঙ্খলাকে কুণিশ করে সামনে পা ফেলা যায় না। আর, গ্যাট হয়ে-বসা আধা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটাকে গণপ্রতিরোধের মাখনে ফেলে না দিয়ে, উপরন্তু এ জাতীয় চরিত্রহীন সংসদীয় খেলায় খেলো-য়াড় হয়ে আর বাই হোক গণসংগ্রামের হাতিয়ার হওয়া যায় না, এমন কি কোনরূপ বিচার বিভাগীয় বৈরা-চারকেও রোধ করা যায় না—বিশেষতঃ কোন প্রাদেশিক অধি-নিয়ে তো নয়ই (গণসংগ্রাম চাইবা-মাত্র হাইকোর্টের ইনজাংশন পায়, আগাম জামিন পায়, অস্ত্রেরা কদাচ পায় না)। সোজা কথা, ভারতে শাসনচক্র একটাই, দ্বিতীয় কিছুই না; কেন্দ্রীকৃত বৈরাচার কোনরূপ গণঅধিকারকে ধারণ করতে পারে না, অতএব জনগণকে, এমন কি কোন প্রাদেশিক সরকারকেও কোন অধিকার (কমতা) বিতরণ করতে অক্ষম। অতএব, ঈর্ষাক্রোধ হাতে অধিক কমতা-র স্লোগানটিও একটি নিষ্ফলা প্রার্থনার চেয়েও করণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আকর্ষক বিকাশের চাহিদাগুলির মতই সাধারণ মানুষের মামুলী অধিকারগুলিও নয়াবুদ্ধোদয় সর্বভারতীয় ভোগে জমা গেছে। এ-সত্যটি বৈরতন্ত্র কংগ্রেস জমানার তেমন জনতা সরকারের আমলেও সমানভাবে প্রমাণিত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৯০ টাকা

মাধ্যমিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গের পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের ব্যাপার নিয়ে কুৎসা রটানো হচ্ছে

গত কয়েকমাস ধরে খবরের কাগজ খুললেই পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। তবে এতে কয়েকটি বিশেষ দৈনিক পত্রিকার ও সাপ্তাহিক পত্রিকার পাওনা হা হ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য ভালো কাজ করবেন, তার প্রশংসা বেকবে কাগজে এটা তো বেশীদিন সহ করা যায় না। সুতরাং লাগো পেছনে।

পৌর সংস্থাগুলির স্থানীয় কংগ্রেস আমলে কোনও দিন ছিল না। ধান্দাবাজ মাল্ধেরা ছোট করে ইলেকশনে দাঁড়াতে। নির্বাচনে জিতে এসে নিজেরাই চেয়ারম্যান আইস-চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন কমিটির পদগুলি ভাগাভাগি করে মিতেন। সরকার থেকে যে ছিটে ফোটা

জিকের টাকা দেয়া হোত—সেটা জনসাধারণের কাছে লাগতো খুবই কম—নিজের পকেটে পুরে বাড়তি কিছু থাকতো না। কংগ্রেসী নেতারা নিজেরাই বলে বেড়াতেম মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে টাকা দিয়ে লাভ নেই। সব টাকাই ওরা খেয়ে ফেলে।

১৯৪৭ সালের পর যতো বছর কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছেন সে তুলনায় বামফ্রন্ট সরকারের গত তিন বছরের মধ্যে একবার গেল সর্বনাশা বস্তা, আর দুবছরেই খরা উঠলো চরমে। পৌর অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য টাকা চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার আগে ভাগেই লদেহ শুরু করেন। গ্রাম-গুলি তো হাড ছাড়া হয়েই গেছে, এবার শহরগুলিও বুঝি যায়। অথচ

মজার ব্যাপার বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যক্ষ দুর্নীতির সংগে জড়িত না থাকলে কোমণ্ড পৌর প্রধানকে উৎখাত করেননি। এখনও বহু পৌর সংস্থার চেয়ারম্যান ও কমিশনার অধিকাংশই বামফ্রন্টের বন্ধু মন। কিন্তু তার জন্তে বামফ্রন্ট সরকার—কোনও শহরকেই অবহেলা করেন নি উন্নয়নের ব্যাপারে।

গত পঁচিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা-হাওড়ার বাইরে সবকটি পৌর সংস্থা উন্নয়ন খাতে যে টাকা পেয়েছে পৌর দপ্তর থেকে, গত তিন বছরেই তার থেকে বেশী টাকা দেয়া হয়েছে এই সব শহরে। সুতরাং গত তিন বছরে চোখে পড়বার মতো কিছু কাজ হচ্ছে পৌর শহরগুলিতে। পৌর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কিছু কাজ করছেন পৌর কর্তৃপক্ষগুলি। এর জন্তে রাজ্য সরকার আশাততঃ ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে এমর চিন্তাই করা যেতো না। রাজ্য তৈরীর কাজ আগে অবহেলিত হোত। কাজের জন্ত রোড রোলার পাওয়া যেতো না। সরকার প্রতিটি পৌর সংস্থাকে রোড রোলার কিনে দিচ্ছেন। এর মধ্যেই কুড়িটি রোড রোলার (খার প্রতিটির মূল্য দু লাখ টাকারও বেশী) দেয়া হয়ে গেছে।

পৌর অঞ্চলগুলির কাজ যাতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা মালিক হতে পারে সেজন্য একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর কাজ করে চলেছে। এই দপ্তর অল্প দিনেই স্থানীয় অর্জন করেছে। সরকার এই দপ্তরের মাধ্যমে আরও অনেক কাজ করতে চান। পঞ্চায়েৎ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি এই দপ্তর করতে পারে ভবিষ্যতে।

সরকারের পেছনে লাগতে না পেয়ে কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি চোরের বাসা হয়েছ। সরকার টাকা দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না। টাকা অনেক কমিশনারের পকেটে যাচ্ছে। একজন চেয়ারম্যান লদেহ বলেছেন তাঁরা যে বেশী টাকা দিয়ে পৌর সংস্থা একটা জমি কিনেছে। অথচ এই শহরে কম দামে তাঁরা জমি জোগাড় করে দিতে পারেন একথা তাঁরা বলছেন না। গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপ (কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা) থেকে দু মাস আগে কেনা

একটা রোড রোলারকে বলছেন (এ কংগ্রেস (ই) সমালোচকেরা) যে এটা পুরোনো, রং করে দেয়া পুরনো জিনিস কিনেছে পৌরসংস্থা। একথাটা তাঁরা বুঝছেন না যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোমণ্ড সংস্থার কুৎসা রটনা করা—আর কংগ্রেস (ই)র নিজের মুখে চুনকালি মাখা একই জিনিস।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার মধ্যে সব চেয়ে কর্তৃত্ব ও জনপ্রিয় যে কজন সদস্য আছেন তাঁর একজন হলেন পৌর-মন্ত্রী প্রশান্ত শ্রী। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পরম শত্রুও দিতে পারে না। এই মন্ত্রীর গারেও, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা দুর্নীতির গন্ধ পেয়েছেন। খবরটা পড়ে আমরা মহাকরণের প্রেস কর্ণারে বসে হেসেছি।

তা এতো সব বলার পরও একটা কথা থেকেই যায়। বামফ্রন্ট সরকারের জনপ্রিয়তাটা বোধহয় অনেক আই এ এস আমলার কাছে ভালো লাগছে না। পৌর মন্ত্রী প্রশান্ত শ্রী মশাই সি এম ডি এ, দ্বিতীয় হপলী

সেভু, সি আই টি, ক্যালিকাটা কর্পোরেশন, সল্ট-লেক সব কিছুই হিয়ারিয়ে আছেন। পৌর দপ্তরটিও বেশ বড়ো। প্রশান্তবাবু অনেক কিছু করতে চাইছেন। তিনি সরকারী পংক্তির কাছের বিক্রেতা। তিনি কাজ চান—এং সেটা তাড়াতাড়ি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রশান্ত শ্রী মশাইয়ের নিজের পৌর দপ্তরে (মহাকরণ) উপযুক্ত প্রশাসনিক অফিসারের অভাবে কাজ এগুচ্ছে না। যে জিনিসটা মন্ত্রী মশাই জরুরীভাবে চাইছেন, সেক্রেটারীরা, তড়িৎ দিতে পারছেন না। এর ফলে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশান্তবাবু পৌর দপ্তরগুলির সেক্রেটারিদের ও অন্যান্য অফিসপজ সল্ট লেকে একটা বড়ো বাড়ীতে স্থানান্তরিত করবার কথা ভাবছেন। সি এম ডি এরও অফিস হবে এখানে। কংগ্রেস(ই) নেতারা ও কাগজ মালিকেরা-এর মধ্যেও দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন কিনা জানি না। হয়তো পাচ্ছেন।

উত্তরপ্রদেশের চিঠি

৩য় পৃষ্ঠার পর
করে-রাখা "নেতারা" কে না জানে, পূর প্রদেশে শাসক কংগ্রেস ইর তীয় দারিয় শীর্ষে। তাঁরা অনেকেই ছুন মাসে বিধানসভার নির্বাচনে পার্টির টিকিট পেয়েছিল; এবং বুঝি হলেন নির্বাচনী ধ্বজা আবার যোরাধাবাহে পুনরীর তুলেছে। [প্রদত্তঃ, উল্লেখ্য জাহ্নবীর লোকসভা নির্বাচনে একেজ থেকে লোকসভার গোলাম মুহম্মদ খাঁ জরী হন।]

বিবেচ্য, ঘটনা-পরস্পরার সঙ্গে প্রশাসকী মাধাঘের প্রতিজ্ঞা। অনেক পূর্ববেককের মতে সরকার মহাভক্ত তীর তেজের সঙ্গে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বি এস এক থেকে সি আর পি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিটিটারির প্রয়োগ। এতটা কি প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল? কেউ কেউ মনে করেন এমন বন্দোবস্ত মরাদ্ভীর সুপরিষ্কৃত—SHOW-OF-FORCE, অর্থাৎ রক্ত নথকত নিপীড়ক শক্তির ভয়াল চেহারা দেখানো, সজ্ঞানে। কেন? ওরা-কিফাল মহল মনে করেন যে, রাজ-ব্যবস্থা মাঝে মাঝে আংশিক-ক, বেছে-মেওরা জারগায় সামেলো করানো মাইনে-পাওয়া (সরকারী গুপ্ত বিভাগের কাছে) গুণাঘের দ্বারা, এটা প্রত্নশ্রেণীর মংশ বিশেষ সরকারী সহায়তার করিয়েই থাকে। পরে পাছে অবস্থা গারজের বাইরে চলে যায়, রাশ টনে ধরা। কিছু নিরপরাধ যারা

যার আহত হয় তারও বেশী, কিন্তু ভাড়াটে দারা তারা লুকিয়ে পড়বার সময় পার। প্রচার বর আইন-ও-শৃঙ্খলার মহিমার কীর্তন করে চলে এবং ভাবমূর্তি বজায় রাখবার জন্য কমিশন বসানো হয়। লোকে জানে, শব্দ-পতিতে কাজ হবার পর যত বিমে এর রিপোর্ট বেকবে, ততদিনে জনরোষ অপেক্ষাকৃত নিরস্তেজ। একেজও তাই হয়েছে। মোরা-দাবাঘের পেতল-শিল্পী, বাসনের ওপর নকশা কাটা কারিগররা যুগ-যুগান্ত ধরে শোয়িত; এরা অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু মধ্যযুগ-ভোগী ব্যাপারি তথা মহাজমরা কি হিন্দু কি মুসলমান (মতুন-বড়লোক পোজী; nouveau riche) এদেরকে বঞ্চিত করে উক্ত শিল্পের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে মোটা মুনাফা কামিয়ে থাকে। এরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কখনও বা ধর্মের নামে গরীব অন্ন বা অশিক্ষিত কারিগরদের বোকা বানায়, শিকার করে। ইমার্জেন্সীর এক বছর পূর্বে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণাকী Brassware Corporation চালু করেছিলেন কারিগরদের আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষার্থে। ইমার্জেন্সীর প্রথম বছরই তাঁর চাকরী যায়। তারপর, পুনরীর শুরু হয়েছে, উক্ত হঠাৎ উঠতি বড়লোক দুই গোজীর আত্মরক্ষা, রাজনৈতিক লড়াই-। কেন্দ্র জানে, এবং তোরাজ করে চলেছে দুপক্ষকেই। সাম্প্রতিক বিরোগাঙ্কিক ঘটনার কিয়দ-প্রতি-কিয়দা সরকারের গোপন পৃষ্ঠপোষক-তার কমতাবান পোজী-সংঘর্ষ।

জনতা অপেরার 'জীবন সঙ্গিনী'

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজা পালায় প্রথম নির্দেশনা ও সুর সংযোজনার দারিৎ নিয়ে উত্তম-কুমার জনতা অপেরাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। সে-দারিৎ তিনি পালমণ্ড করে গেছেন কিন্তু পালা-তিনের বেধে যেতে পারলেন না। আভ্যন্তর মুখার্জীর কাহিনী অবলম্বনে 'জীবন সঙ্গিনী' পালাটির নির্বাচনও উত্তমকুমারের। পালা-রূপ দিয়েছেন কানাই মাথ।

শেষ পর্যন্ত পালাটির উপস্থাপনার দারিৎ বহন করতে হয়েছে দলের প্রধান অভিনেতা তপনকুমারকে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর উত্তমকুমারের জন্মদিনে পালাটির প্রথম অভিনয় অল্পাধিত হল মহাজাতি পদমে। পালাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য জনতা অপেরার প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্ত, লদেহ নেই।

একানবর্তী পরিবারে সদাশর ব্রহ্মশীল দাদা, করুণাময়ী বৌদি ও অল্পপত ছোটভাই। সেই ভায়ের বিয়ে দিলেন দাদা। তারপর

সচরাচর যা হয়ে থাকে—বৌয়ের প্রয়োচনার, শ্বশুরের চকাত্তে সেই একানবর্তী পরিবার গেল ভেঙে—দাদারও মন গেল ভেঙে। সব রেহ ভালবানা অর্থহীন হয়ে পড়ল, আদরের ভাই হয়ে দাঁড়াল শ্বৈর। তারপর মামা ঘটনার শ্রোত—দাদার পূর্ব জীবনের কাহিনী—কি ভাবে এক বিপর মারীকে রক্ষা করে জীর মর্ষণা দিলেন—এককালের মস্তান জগা বর্তমানে পদু হয়ে দাদাকে র্যাকমেল করে যাচ্ছে ইত্যাদি। অবশেষে অবস্ত সমস্তার লমখাম হল, কিন্তু অনেক মূল্য খুইয়ে। বাই হোক কাহিনীর মধ্যে তেমন অতি-মব্ব না থাকলেও উপস্থাপনার রুতিম আছে। স্রাশব্যাকে দাদার পূর্ব জীবনের ঘটনা উপস্থাপিত। তবে পালাটিতে করুণারের প্রাধান্য বেশ নীড়াদারক।

দাদা শংকরের চরিত্রে তপন-কুমার আবেগপূর্ণ অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। গায়ত্রী ও কিশোরীমোহন চরিত্রে দুটি স্বভাব-নীত। জগা পাঠক রূপে অল্প হালদার বিশেষভাবে দৃষ্ট আকর্ষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র মুক্তক পর্বদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্বদ প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

- ১। প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যা / শ্রীমপূর্বকুমার চক্রবর্তী / ১০০০
- ২। পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ) / ডঃ দেবী প্রদাণ রায়চৌধুরী / ১০০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-১০

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সঠিক সমস্যার ভুল সমাধান

সুসম্পন্ন বন্দোবস্ত

উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি আর যে প্রশ্ন তুলে ধরেছে তা হল ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত? একটা বিশেষ ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের এমন এক অঞ্চলে কি স্থান হওয়া উচিত যেখানে অন্য একটি ভাষা প্রচলিত? আদিবাসীদের সঙ্গে অন্যদের কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত।

এই প্রশ্নগুলিকে পূর্বাঞ্চলীয় বিক্ষোভের কল হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কাছ থেকে রাজ্য স্থাপনার দাবী, উত্তর বঙ্গের নেপালীদের আলাদা নেপালী রাজ্যের দাবী এবং অন্যান্য অঞ্চলে অসুস্থ দাবীর কথা এটা প্রমাণ করে যে দেশের অন্তর্ভুক্ত উপরোক্ত প্রশ্নগুলি বর্তমান। 'এ থেকে এটা স্পষ্ট যে এই সম্প্রদায়গুলি অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিত্তি নিজস্ব সংস্কৃতি এবং পরিচয় হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় ভীত এবং তাই স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য ভিন্নতার দাবিতে নোচায়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিতে একটু ব্যাখ্যা করলেই সেখানকার সমস্যাগুলি স্পষ্ট হয়ে যায়। আসামে অসমীয়া ভাষাভাষী প্রাথমিক তত্ত্ব সেখানকার বসবাসকারী বাঙ্গালীদের সাম্প্রতিক প্রভাব। যদিও এই বাঙ্গালী সম্প্রদায় বহুকাল ধরে এখানকার বাসিন্দা কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশ থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোক আসার ফলে এই আশঙ্কা বাস্তবিকভাবেই আরো বেড়েছে। এছাড়া ব্যাপক বেকার সমস্যা এই রাজ্যের যুবকদের এই ধারণাও হরেছে যে যদি এট হারে বাইরে থেকে বাঙ্গালী আসতে থাকে তাহলে আসামীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাবে এবং চাকুরির বাজারে এর প্রভাব তাদের প্রতিকূলে দাঁড়াবে। ত্রিপুরা এবং মণিপুরে, যেখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়কে জমির মালিকানা থেকে সরিয়ে অ-আদিবাসীরা (বিশেষত বাঙ্গালী) যে জমি হস্তগত করেছে আজ পুনরায় সেই জমি ফিরে পাওয়ার দাবীতে আদিবাসী সম্প্রদায় আন্দোলনরত। নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আদিবাসী

সম্প্রদায় বহুকাল ধরেই ভারত সরকার থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে সংগ্রামরত।

উপরোক্ত সমস্যার অধিকাংশই আশাভেদে ঔপনিবেশিক অতীত থেকে প্রাপ্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের প্রশাসনের এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আসামে বসানো আরম্ভ করে। এইভাবে এই বাঙ্গালী সম্প্রদায় সেখানকার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে মিজোরামের প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে আসামীদের মূল সংস্কৃতি অনেক পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এই সম্পর্কে আসামীদের অভিযোগ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে বা অন্য কোনো রাজ্যে যদি আঞ্চলিক আদিবাসীদের উপর আরেকটি ভিন্ন ভাষার সম্প্রদায়কে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই আঞ্চলিক আদিবাসীরা মিস্ট্র তার বিরোধিতা করবে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালী শরণার্থী ত্রিপুরায় চলে আসে। তাদের অনেকেই সেই সময় জমিতে বসবাস আরম্ভ করে যা আদিবাসীদের অধিকারে ছিলো। ১৯৪৭ সালে যেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা ছিলো ৪৮% তা ১৯৭১ সালে হল ২২%।

আরো বেশী ভারত সরকারের দাবীতে সংগ্রামরত নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামের আদিবাসীদের ভারত সরকার দলদল ধরনের দাবী শেষ করার প্রচেষ্টা চালানোর ফলে এর বিচ্ছিন্নতার দাবী করতে বাধ্য হয়।

সরকারীভাবে গত ৩০ বছরের মধ্যে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত যেহেতু কার্যকরী হয়নি তাই মিস্ট্র হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণ তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এরা "বিশেষীকরণের তালিকা" পথ অবলম্বন করেছে যার ফলে আসাম, মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি ভারতীয় বাঙ্গালী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকানো আরম্ভ হয়েছে। ত্রিপুরায় এই বিশেষীকরণ আন্দোলনে এবারত কয়েকশো বাঙ্গালী এবং আদিবাসী নিহত হয়েছে।

এই খুবই স্পষ্ট যে এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পথ সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের প্রতি এই ধরনের অস্বাভাবিকতার দাবী পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা যদি আজ পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীরা অবাঙ্গালীদের তালিকানো অথবা মহারাষ্ট্রে অমহারাষ্ট্রদের তালিকানো আরম্ভ করে তাহলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা দেশের জনসাধারণকে আরো কলহের করবে এবং সমাজবাদ স্থাপনার কাজকে আরো পিছিয়ে দেবে। আজ আসাম এবং অন্যান্য ভারতীয় 'বিশেষী' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পরীচ চায়ী, চা বাগানের মজুর অথবা মিস্রমধ্যবিত্ত কেরানি এবং শিক্ষক যারা সমানভাবেই জমিদার এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা শোষিত এবং বর্তমান ব্যবস্থা উন্মুলনের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সমাজ ব্যবস্থা বদলাবার সংগ্রামে একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে এই সমস্যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং অ-আদিবাসীরা আজ পরস্পরের শত্রু হয়ে পড়েছে এবং কারোই স্বার্থের চক্রান্তে মিজোরামের মধ্যে লড়াই করছে। ত্রিপুরার বাহরুপী সরকার আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি দলনামিত জেলা তৈরী করার এবং তাদের জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। "লাহরা বাঙ্গালী" নামের একটি উৎকট প্রাথমিক দল এই সুযোগে বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা আরম্ভ করে। তারা বলে যে বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্য করে আদিবাসীদের জমি দেওয়া হবে। এর পরিণতি হয় বাঙ্গালী এবং আদিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি সমস্ত বাঙ্গালীদের তালিকানোর চরমপন্থী পথ গ্রহণ করে।

এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আসাম, মণিপুর, মেঘালয় সহ অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যদি সমস্ত 'বিশেষী'দের তালিকানো হয় তাহলে কি স্থানীয় আদিবাসীদের বেকারী এবং হারিজেনদের সমস্যা দূর হয়ে যাবে? অথবা মেঘালয়ের আরো সম্প্রদায়, যারা শাসী সম্প্রদায় শাসিত সরকার দ্বারা মিজোরাম অবহেলিত মনে করে, রোজগার এবং জমি সংক্রান্ত সমস্যায় নিয়ে আন্দোলনে নামবে।

বর্তমান না উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে, তাদের সমস্যার উদ্ভব বর্তমান আর্থিক সামাজিক কাঠামো থেকে হয়েছে এবং এর সমাধানও এই কাঠামোর উচ্ছেদে নিহিত ততদিন পর্যন্ত এই তথাকথিত 'বিশেষী'দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের শুধু শক্তির অপচয়ই হবে।



ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস লিমিটেড
(সেখানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস লিমিটেড)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি সি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রকৃত-কার্যকরী কাজ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দর ভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক নীল করা টেন্ডার :

উৎপাদন ও সরবরাহের কাজ
নিম্নোক্ত জমিদার সরবরাহের জন্য (ক) টেন্ডার নম্বর (খ) বিবরণ ও পরিমাণ (গ) টেন্ডার কী (ঘ) জমা দেবার শেষ তারিখ ও খোলার তারিখ নিম্নরূপ :
(১) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / ট্রান্সফর্মার / ৮০ / ১৬ (খ) নিম্নোক্ত রেটিং-এর ট্রান্সফর্মার (১) ১টি ৫ এম.ভি.এ. ৩৩/১১-৬৬ কে.ভি (২) ২টি ২ কে.ভি.এ. ৩৩/১১-৬৬ এম.ভি. (৩) ১টি ২ এম.ভি.এ. ১১/৬৬ কে.ভি (৪) ১টি ২ এম.ভি.এ. ১১ কে.ভি / ৭৪০ ভি. (৫) ২টি ৭৫০ কে.ভি.এ. ৬৬ কে.ভি / ৪৪০ ভি. (গ) ২০ টাকা (ঘ) ১৮-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (২) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / জিও হুইচ / ৮০ / ১৭ (খ) ৩০টি ৩০ কে.ভি. ৪০০ অ্যাম্পস প্যাং অপারেটেড হুইচ (গ) ১০ টাকা (ঘ) ১৮-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (৩) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / সি সি এম / ৮০ / ১৮ (খ) ২১টি অ্যাকসেন-টরিয়াল সহ কেবল তালিকামাইজিং মেশিন (গ) ১০ টাকা (ঘ) ১০-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (৪) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / হুইচ / ৮০ / ১৯ (খ) (১) ৩টি ৩০ কে.ভি. ১০০০ এম.ভি.এ. ও সি বি (২) ৪টি ৬৬ কে.ভি. ১৫০০ এম.ভি.এ. ও সি বি (৩) ১টি ১১টির প্যামেল ৩০ কে.ভি. ১০০ এম.ভি.এ. ও সি বি (৪) ২টি ১১টির প্যামেল ৪৪০ ভি. ১৬০০ অ্যাম্প. ও সি বি (৫) ১টি ৭টির প্যামেল ১১ কে.ভি. ১৫০ এম.ভি.এ. ও সি বি (৬) ১টি ৩টির প্যামেল ৬৬ কে.ভি. ১৫০ এম.ভি.এ. ও সি বি (গ) ২০ টাকা (ঘ) ১৯-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (৫) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / এক এল সি এল এক / ৮০ / ১০০ (খ) ১২৮৪টি স্ট্রিম প্রফ লাইটিং ফিটিংস (গ) ২০-টাকা (ঘ) ১২-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (৬) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / ক্যাপাসিটর / ৮০/১০১ (খ) ৩ টি ব্যাক অফ ক্যাপাসিটর ৩৭ কে.ভি. ১০০ কে.ভি.এ. আর (গ) ১০ টাকা (ঘ) ১৬-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। (৭) (ক) ই সি এল / সি সি ইউ আর / ০১ / এ কে আর / মিস / ৮০ / ১০২ (খ) (১) ১টি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তাই-ব্রেটর (২) ২টি ডি সি সোলনয়েড রেকটিফায়ার ইউনিট সহ (৩) ২টি ইলেকট্রিক লাইনারাকচুরেটর। (৭)(১), (২) ও (৩) নং দফাগুলির জন্য রেখাচিত্র দিতে হবে। (গ) ১০ টাকা (ঘ) ১৭-১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত এবং একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ প্রাপ্ত পরিমাণ কমতে / বাড়তে পারে। স্পেসিফিকেশনের দিভিউল এবং শর্তাবলী সহ টেন্ডার চলিল কন্ট্রোলার অফ পাবলিক ইয়ার্লি কোলকিন্ডস লিমিটেড, সাকতোগ্রিহা, পোঃ হিশেরগড়, জেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যে কোম কাজের দিনে একই ঠিকানায় কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট কী নগদে জমা দেবার ক্যাশ রসিদ দেখিয়ে পাওয়া যাবে। একই ঠিকানায় কন্ট্রোলার অফ ট্রান্সপোর্টের কাছে নির্দিষ্ট টেন্ডার কী ব্যবধ মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেন্ডার চলিল পাঠাবার ডাক খরচ বাবদ টেন্ডার সিডি লে অস্থায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) বা তার বেশি টাকা পাঠানো হয়। এইসব মণি অর্ডারের ক্ষেত্রে মণি অর্ডার ক্রমের টেন্ডার নং ও নির্দিষ্ট তারিখ সহ টেন্ডারদাতার পুরো পোষ্টাল ঠিকানা দিতে হবে। টেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে প্রাপ্ত মণি অর্ডার গ্রহণ করা হবে। টেন্ডার গ্রহণের তিনদিন আগে টেন্ডারপত্র বিক্রয় বন্ধ করা হবে।
সাধারণঃ আনুমানিক খরচের ১% বাবদ টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, অন্তর্ভুক্ত টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোম কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ত্যাগ করে টেন্ডারদাতাদের দ্বারা অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দপ্তর কার্যালয় ৩১, হট সেল, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

মজিত গাঁজাকে ই-কং সভাপতির গদ থেকে হটানর চেষ্টা হচ্ছে



ব্রজবংশী মিশনের সাধু ও মিথ্যা কথা বলেন

গত ১লা অক্টোবর বৃষ্টি কল-
কাতার বালের নীচে চাপা পড়ে
মারা য় রক্ত আতত হন আততায়
জের ছাত্র মিলন ঘোষ। তাঁর
বন্ধুতা বেলী ১৬টা মাপদ তাঁকে
খরাদির করে নিয়ে আসে জালাউদ্দিন
রোডের ব্রজবংশী মিশন সেবাশ্রমি-
ঠানে। কিন্তু তত্বেই সময়ে চিকিৎসা
দার খরচ বান্দ মিলন ঘোষের বন্ধু-
দের নিকট ৪০০ টাকা চাওয়া হয়।
বন্ধুরা সব ছাত্র, তারা অত
টাকা পাবে কোথায়? কিছুকণ
বাদেই মিলনের জন্ত তিন বোতল
রক্ত চাওয়া হয়। মিলনের বন্ধুরা
রক্ত দিতে চায়। কিন্তু তখন ঐ
হাসপাতালে রক্ত নেওয়ার ব্যবস্থা
ছিল না, বাইরে থেকে রক্ত আনতে
বলা হয়। বাইরে রক্তের খোঁজ

নিতে গেলে সেখান থেকে বলা হয়,
৪০ মিনিট পরে রক্ত পাওয়া যাবে।
তখন গেলে হবে কিনা জানতে
মিলনের ছই বন্ধু হাসপাতালে ফিরে
যায়। গিয়ে শোনে মিলনকে
অপারেশন থিয়েটারে পাঠানো
হয়েছে।

কিন্তু মিলনের এক বন্ধু শুভনাগর
পাল উপরে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে
তাঁকে ও-টিতে পাঠানো হয়নি, নীচে
ঝেঁকে রাখা হয়েছে। শুভনাগর
সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই
আবার তাকে ডেকে পাঠানো হয়।
এবং জানানো হয় যে, তার বন্ধু মারা
গিয়েছে, বন্ধুর বাড়িতে থবর দিন।
ইতিমধ্যে আততায় কলেজের
ছেলেরা থবর পেরে ব্রজবংশী মিশন
সেবাশ্রমি চম পুঠার পর

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজিত
পাঁজাকে হটানোর জন্ত রাজ্য কংগ্রেস
(ই) মহলে জোর তৎপরতা শুরু
হয়েছে। যারা অজিতবাবুর ওপর
কুখ্যাত অভিযোগ অজিতবাবু
সংগঠনকে শক্তিশালী করার পরি-
ষদে গোপীনাথী করে দলকে দুর্বল
করে ফেলছেন।

অজিতবাবুর বিরুদ্ধে রাজ্যের
বেশ কিছু প্রতাবশালী নেতাও চটে
আছেন। এর মধ্যে কংগ্রেস ওঠনক
প্রতাবশালী মন্ত্রীও আছেন। অজিত-
বাবু সভাপতি হবার পর সমস্ত সভা
বিলম্বিত হয়ে অপর এক মন্ত্রীর ক্ষেত্রে
পরিণত হয়েছেন বলে প্রতাবশালী
মন্ত্রীটি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ।

আই এম টি ইউ সি র পক্ষিমবল
শাখার সভাপতি আম্মগোপাল
মুখার্জী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি
অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে দিল্লীতে অভি-
যোগ করেছেন যে, প্রীপাঞ্জা আই এম
টি ইউ সি-কে ছুঁকরো করতে মদত
দিয়েছেন।

আই এম টি ইউ সি র
রাজা শাখার অপর নেতা হুতত
মুখার্জীও একই অভিযোগ করেছেন
অজিতবাবু বিরুদ্ধে। ট্রেড ইউ-
নিয়ন শাখার অনেক প্রবীণ নেতাও
হুততবাবু এবং আনন্দবাবু সঙ্গে এ
ব্যাপারে একমত।

রাজ্য যুব কংগ্রেসের সোমেন মিত্রের
বিরোধী বেতাগী পাণ্ডা যুব কংগ্রেস
কমিটি গঠন করেছেন। পাণ্ডা যুব কং-
গ্রেস কমিটির নেতারা অভিযোগ করে-
ছেন অজিতবাবু কার্যকলাপের-জুই
যুব কংগ্রেস ছুঁতাগ হয়ে গেল। এই
সেবাশ্রমি চম পুঠার

নরকারী টাকায় ই-কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারা ইন্দিয়ার ছবি সহ পোষ্টার ছাপান হয়েছে

গত যে বালের শেষে ন'টি রাজ্যে
বিধানসভার নির্বাচন হয়। ঠিক এর
পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের ডি. এ. ভি.
পি বিভাগের অফিসাররা মনে করেন
যে চারিদিকে যে অশান্তির আব-
হাওয়া বইছে তার বিরুদ্ধে একটা
প্রচার চালানো দরকার। অমনি
অজিতা অফসেটে 'আমুন দলকে
একযোগে কাজ করি' এই স্লোগান ও
ইন্দিরা গান্ধীর ছবি দিয়ে পোষ্টার
ছাপিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও
অন্ধ্র প্রদেশে দেওয়ালে দেওয়ালে মারা
হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, ভোটার
পূর্বে ভোটারদের মন রাজনৈতিক
ভাবে প্রতাবাধিত করা তথা শালক
দলের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করা।

৩০" X ৪০" এবং ২৮" X ৩৪"—
এই দুই সাইজে পোষ্টার ছাপানো
হয়। ৬০ হাজার কপি ইংরাজি ও
৪০ হাজার কপি হিন্দিতে বড়
পোষ্টারটা ছাপানো হয়। এ ব্যবস্থা
যেট খরচ হয়েছে এক লক্ষ সত্তরো
হাজার, নশো আঠারো টাকা

আট পরমা। ছোট সাইজের
পোষ্টার ইংরেজি, হিন্দি ছাড়াও
এপারোটি আঞ্চলিক ভাষায় যেট
চার লক্ষ ছাপানো হয়েছে। এ
ব্যবস্থা যেট খরচা হয়েছে দু লক্ষ
পঞ্চাশ হাজার টাকা।

প্রায় চার লাখ টাকা খরচ করা
হয়েছে ডি. এ. ভি. পি-র নামে,
শ্রীমতী গান্ধীর ছবি ছাপিয়ে কং(ই)র
ভোটার প্রচারাভিযানে। টাকার
মালিক ভারতের গণীক জনসাধারণ
আর প্রদেশের কাজ থেকে ডি. এ. ভি.
পি-র অফিসাররা একদিকে যেমনি
যেটা টাকার কমিশন পেয়েছেন
অন্যদিকে তাঁরা প্রাধান্য মন্ত্রী
স্বতন্ত্রেও পড়েছেন। সম্প্রতি এক
দাবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ
করেন লোকসভার সবচেয়ে কর্মক্ষম
মন্ত্রী শ্রী.জ্যোতির্ময় বসু।

পাঠকদের স্বরণ রাখা উচিত যে
বাহাদুর সালে নির্বাচনের পূর্বে শিল্প-
পতি গোয়েন্দা তেরো লাখ টাকা
খরচা করে শ্রীমতী গান্ধীর ছবিসহ
নব কংগ্রেসের পোষ্টার ছাপিয়ে
দিয়েছিলেন।

শিশুদের পাঠ সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত করতে চাই

—শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে

প্রাথমিক স্তরের নিলেবাস ও
পাঠ্যতালিকা প্রসঙ্গে সম্প্রতি কিছু
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক
নেতৃবৃন্দ রাজ্যের বায়ফ্রন্ট সরকারের
ভূমিকায় ক্রোধ প্রকাশ করে বহু

বিবৃতি দিয়েছেন। অনেকেই অবশ্য
সরকার কি করতে চান সে প্রশ্নে
সঠিক তথ্য না জেনেই সরকারের
লম্বাজোচনা করেছেন।

বায়ফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত
মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে এ প্রসঙ্গে এক বিবৃ-
তিতে জানিয়েছেন যে, ১৯৭০ সালে
প্রাথমিক নিলেবাসের শেষ সংশোধন
করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে
নির্ধারিত স্তরের সরকার মনে
করে যে ঐ পাঠ্যতালিকা পর্যালো-
চনা করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ব-
ভারতীর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষকে
চেয়ারম্যান করে এবং সমস্ত প্রাথমিক
শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও হাই-
স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে
একটা কমিটি গঠিত হয়। (সংবাদপত্রে
বিজ্ঞাপন দিয়ে তখন) উক্ত কমিটি
নিলেবাস প্রসঙ্গে শিক্ষাহরণী ব্যক্তি-
সেবাশ্রমি চম পুঠার

বায় ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা কে কেমন কাজ করছেন

বায়ফ্রন্ট সরকারের তিন বছর
পূর্ণ হবার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে
এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে বিভিন্ন
দপ্তরের কার্যকর্মের অগ্রগতি ও
কর্মশূচী বহুবায় আলোচিত হয়েছে।
বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রেতৃপত্র
প্রকাশ করা হয়েছে। বিগত ত্রিশ-
হইরে কংগ্রেসী আবধারায় কংগ্রেসী
মন্ত্রীরা যে ভাবে পরিচালিত হয়েছেন,
ঠিক সেইভাবে বায়ফ্রন্টের মন্ত্রীরা
পরিচালিত হয়েছেন, না নতুন কোম
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়েছেন এ প্রশ্ন
অনেকেই করেন। তাই গত তিন

বছরে বায়ফ্রন্টের মন্ত্রীরা কে কি
করলেন এরই কিছু কিছু অংশ তুলে
খরবার চেষ্টা করছি।

বায়ফ্রন্টের মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে
আগে যার নাম করতে হয় তিনি
পুতুমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। অনেক
দময় তিনি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বহু-
কেও অবাক করেন। বিশেষ করে
যতীনবাবুর নিজের নাম প্রচারে
বায়ফ্রন্টের যে কোম মন্ত্রীকেই হার
মানিয়েছেন। তাই রসিক ব্যক্তিরা
বলেম যতীনবাবুকে তথ্য ও লাংস্ফ-
তিক দপ্তরের ভার দেওয়া হলে বায়-

ফ্রন্টের প্রচার শক্তি আরো বাড়ান
যেত। কিন্তু এই প্রতিবেদক তাঁদের
সঙ্গে একমত হতে পারলেন না।
কারণ যতীনবাবুর মতো নিলজ্ঞ আত্ম
প্রচার লোভী মন্ত্রী বায়ফ্রন্টের মন্ত্রি-
সভার আর কেউ আছেন কিনা
সন্দেহ। যতীনবাবু দুটি বড় কাপ-
ড়ের কয়েকজন সাংবাদিককে হাতে
রেখেছেন তার ব্যক্তিগত প্রচারণার
জন্ত। যারা যতীনবাবুর সঙ্গী কাশি
হলেও থবর ছাপবেন। অথচ এই
প্রতিবেদক জানেন যে যতীনবাবু
মন্ত্রী হবার আগে মহাকরণের প্রেদ-

করণের বসে সমস্ত প্রবীর রিপোর্টা-
রের সঙ্গে আলোচনা
করতেন। কিন্তু মন্ত্রী-হবার পর
যতীনবাবু বেশ পরিবর্তন হয়েছে।
তিনি প্রিয়ের কয়েকজন রিপোর্টারের
সঙ্গে তার মাঝামাঝিটা পতীর
পথিয়ে নিয়ে গেছেন। তাতে বেশীর
ভাগ সাংবাদিক তাকে পদন্দ করেন
না। যতীনবাবুর ধারণা যদি কোন
রিপোর্টার তার কাছে থবর চাইতে
যান তাহলে সেই রিপোর্টারের
আঙ্গল উদ্বেষ্ট নাকি মন্ত্রীর কাছে
সেবাশ্রমি চম পুঠার

সম্পাদকীয়

সহজ পাঠ নিয়ে রাজনীতি

রাজনীতির সহজ পাঠ পশ্চিম-বঙ্গের প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে—এই সব তুলে প্রচণ্ড জল খোলা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাস্টার গুরু দুটি বাংলা সংবাদপত্র। এই দুটি সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন তথাকথিত কিছু পণ্ডিত (আনন্দবাজারের ভাষায় মম্বীষী) গেল গেল সব তুলে বাম-ফ্রন্ট সরকারের বাপান্তর করছেন। কিন্তু একথাটা কেউ বলছেন না যে, সহজ পাঠ পড়া বহর আপো লেখা হলেও প্রাথমিক স্তরের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র ১৯৬১ সালে যখন মুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই পণ্ডিতরা কেউই সহজ পাঠ দিয়ে প্রাথমিক স্তরে লেখাপড়া শুরু করেন নি। অতএব ধরে নেওয়া যায় এদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এবং এরা সর্বত্রই বিত্যা-বহার পক্ষে। কারণ দেশের কোন ভাল-মন্দেই এদের কোন যোগ নেই, শুধু কোন কারেমী ব্যবহার ওপর আঘাত এলেই এদের টনক নড়ে ওঠে। এই সব বুদ্ধিবীর্ষদের মুখপত্র আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষায় ভাষাই বলে দিচ্ছে এদের আঘাতটা কোথায় লেগেছে। আনন্দবাজারের আশঙ্কা দেশের ছেলেগুলো যদি “সুদে কমিউনিষ্ট” (ওদের ভাষায়) বনে যায় তাহলে কারেমী খার্ব রক্ষা, অতি-মুনাফা, জুয়াচুরি করে ও লোককে ঠিকিয়ে বহাল তবিরতে থাকা বাবে না। যদি সমাজ বিপ্লব আসন্ন হয়ে ওঠে তাহলে পাণ্ডিত্যের ধোঁয়া তুলে এই বুদ্ধিবীর্ষরাও নির্ধাতীত সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থেকে বাচতে পারবেন না। আনন্দবাজার বলেছে নীহাররঞ্জন রায়, প্রথমদাশ বিশী, অন্নান বসুদের নাকি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নীহারবাবুর কীর্তিকাহিনী অনেকেরই জানেন। তিনি এক সময় আর এম পি ছিলেন, তারপর স্বযোগ বুকে বংগের কাছাকাছি চলে গেছেন। প্রথম বিশী কংগ্রেসী ছিলেন এবং অতুল্য ঘোষের আমলে কংগ্রেস ভবনে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। অন্নান বসু এম এম রায়ের শিষ্য এবং মার্কিন প্রেরিক ও উগ্র কমিউনিষ্ট বিদ্রোহী। কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও হুচিলা মিত্ররা কোন অধিকারে পড়াশুনোর ব্যাপারে কথা বলেন?

যারা সহজ পাঠের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন তারা প্রকৃত-তথ্য সম্পর্কও ওয়াকিবখাল নন। এই বই নিয়ে যে সিলেবাস কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই কমিটি ১৯৭৪ সালে কংগ্রেসী সরকারের আমলে গঠন করা হয়। এবং এই কমিটি সহজ পাঠ বাইরে বাকি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেনি। একটি ইংরেজী দৈনিকের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, তারা শিকার সহজ পাঠের সহায়ক হিসেবে নতুন বই চালু করা হবে। বিস্তারিতভাবে সহজ পাঠ ছবির বই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক স্তরে তারা শিকার জন্ত অন্ত বই আছে। শুধু সহজ পাঠ দিয়ে অক্ষর পরিচয় ঠিক মত হয় না। ১৯৭১ সালে অক্ষর পরিচয়ের জন্য সহজ পাঠের সহায়ক রূপে বিভাগাগের বর্ণপরিচয় আমতে হয়েছিল। তবে যারা বামফ্রন্ট সরকারকে হের করার জন্য সহজ পাঠ নিয়ে একটা ইয়া তৈরি করেছেন কোন কথায় তারা মগজে নেবেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যে আনন্দ-বাজার মুগ্ধতার এবং তথাকথিত বুদ্ধি-বীর্ষরা বিভ্রান্ত করেছেন সে ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে বথাবথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। যখন হত্যারকীন স্ট্রীট ও বাগবাজার-প্রচার তুরঙ্গ তুলেছে, তখনও সরকার আশ্চর্য্য ভাবে নীরব। এই কাগজগুলোতে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন দেন। বড় বড় বিজ্ঞাপনে সরকার কি ঘোষণা করতে পারতেন না তাঁদের নীতি, বলতে পারতেন না যে, আমরাই তো ১৯৬১ সালে ‘সহজ পাঠ’ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করি, আমরাই তো ‘সহজ পাঠ’ বিনামূল্যে বিতরণ করি। এসব কিছুই করা হল না, কিন্তু হঠাৎ মূখ বুললেন মুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি কাটা-কাটা প্রেসবাস্ক কথার জল আরো বোলা করে দিলেন। এইভাবে প্রেব করে মাঠে ময়দানে বক্তৃতা করে হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু বোম্বা-নীতিগত ব্যাপারে শত্রুপক্ষ প্রতিবাদ সংগঠিত করছে সেখানে সরকারী নীতি ঠিকমত ব্যাখ্যা না করলে আক্রমণের স্বযোগ করে দেওয়া হয়। আনন্দবাজার সেই স্বযোগ নিয়ে জ্যোতিবাবুর লাঞ্চার করেছে। সরকারের উচিত অবিলম্বে এ সম্পর্কে পূর্ণোত্তম প্রচার চালানো।

বহু গুণার গতিবিধি

রাজধানী দিল্লীতে একদিকে যখন জোর জরমা করা চলছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নীলম গম্বী রজিডকে সরিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রপতি হবেন কিনা—এই নিয়ে, তখন একদিকে রাজীবের রাজ-নীতির আসরে আগার চেয়ে কম গুরুত্ব পাচ্ছে না জ্যোতিবীরের আলোড়ন তোলা নামান বক্তব্য। কিন্তু এসবের আড়ালে বহুগুণার আপাতদৃষ্টিতে তলিয়ে গেলেও সামনের বছর তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়া যেতে পারে। তিনি এখন বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের আহ্বান ই-কংগ্রেসী বিরোধে জনগণ সন্ত্রস্ত

দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ থানা এলাকায় যে কোন মুহুর্তে আগের মত আবার বোমাবাজি শুরু হয়ে যেতে পারে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করছেন। এই এলাকায় বোমাবাজি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ কোন মতুন ঘটনা নয়। এলাকার বাসিন্দাদের প্রাণ ওঠাগত। কিছুদিন পূর্বে এই এলাকায় কংগ্রেস (ই) কর্মী দেবালিস, দাশগুপ্ত ওরফে ভূতো নৃপসংভাবে যুন হর আর সেই যুনের দ্বারা কংগ্রেস (ই) কর্মী নীরেন চ্যাটার্জী ওরফে চীমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। চীনা বর্তমানে জামিনে মুক্ত হয়ে আবার এলাকার কিয়ে এসেছে এবং তার পর থেকেই সমগ্র এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে চীনা তার বাড়িতে কংগ্রেস (ই) দপ্তর খোলার তড়-জোড় করছে। অপর দিকে প্রতাপাদিত্য রোড এবং জিকোণ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় ছেলেরা কিছুতেই অফিস খুলতে হবে না। প্রায় রোজই এলাকার চীনা-বিরোধী মিছিল বের হচ্ছে। বিশেষ বুকে চীনা পুলিশী দাওয়া চেয়েছে এবং তার বাড়ীতে বর্তমানে পুলিশ পোষ্টি রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে, কংগ্রেস (ই) ছেলের উপরলীর কোম্পলের শিকার হয়ে পড়ছেন তারা। কেননা এলাকার তারা প্রকৃত চলাফেরা করতে সাহস পাচ্ছে না এই কারণে যে, কখন বোমাবাজি শুরু হয় তার কোন ঠিক নেই। এই সব সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ দমনে পুলিশের ভূমিকাও সন্দেহজনক বলে অনেক মনে করছেন।

জানিয়ে সমাজবাদী ও গণতন্ত্রকারী শক্তিগুলিকে নিয়ে একটা আটসাঁট জোট বাধার অরাজক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন বহিঃ তিনি দেশের বিভিন্ন ভ্রমণে চলে বেড়াচ্ছেন তবু তাঁর এই চেষ্টা এখনও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাই বলে তা আর অবশেষে হয়ে উঠবে না একবার তিনি ও তাঁর দলবর্গেরা আমল দিতে মোটেই রাজী নন। এখন দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও অশান্তিকর পরিবেশ যেভাবে বিপর্যয়িত হয়ে উঠছে উঠছে তাতে রাজধানী রাজনীতির মধ্যে আতঙ্ক অসম্ভবতা সম্ভব হয়ে ওঠার ব্যাপারটাই বরং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থাকে বিচার বিবেচনা করেই হেরবতীনন্দন বহুগুণা তাঁর লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেছেন।

ওয়াকিবখাল মহলের খবর হল : তাঁর উপর রাশিয়ার আশীর্বাদ রয়েছে। একজন কটি তেলের দেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচ্ছেন। পাচ্ছেন নানা সাহায্য ও মর্যাদা। রাশিয়ার জবি তাঁকে এখনও কেন্দ্র করে এগুচ্ছে বলে তিনি তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র ক্রমশঃ প্রস্তুত করে যাচ্ছেন। তাঁর লক্ষ্য পথে মুসলমান, হরিজন, গিরিজম ও বাম মার্গীদের আনাই মূল উদ্দেশ্য। এইভাবে তিনি এগিয়ে যেতে পারলে ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হবার পথ গড়ে নিতে পারবেন। লায়নের মাসে রাশিয়ার কর্ণধার রেজমেন্ট রাজধানীতে আসছেন। বহুগুণা এই লক্ষ্যের ব্যাপারে এখন থেকেই তীব্র মনোবলে রেখেছেন। কারণ, এই লক্ষ্য তাঁর উপর জিরা করবে অনেকখানি।

তিনি যেভাবে রাজধানী রাজ-

জ্যোতি বসু কলোনীতে হামলা

দক্ষিণ কলিকাতার আনোয়ার শাহ রোডে বাহুবপুর থানাধীন জ্যোতি বসু কলোনীতে প্রজাপিট পূর্ববঙ্গ থেকে বহুপূর্বে বিভাজিত পরিবার ছিটেবেড়ার বর তুলে বাস করছিলেন। প্রত্যেকেরই উদ্ভাস হিসেবে কাঁড় আছে। ঐ ৪১৫ বিঘে জমি প্রায় ষাট বছর পূর্বে ওঠাও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জৈনিক সর্দার এগারোটা প্রতে ভবিষ্যতের দখলীসম্ব পায়। হঠাৎ জৈনিক চতীচরণ সর্দার বাহুবপুর থানার একটা অভিযোগ দায়ের করে। তারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭ এবং ৫০৬ ধারা অত্যাচারী অন-বিকার প্রবেশ ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা একটা কেস হয়। বাহুবপুর

নীতিতে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, এমন কি চন্দ্রশেখর, জগজীবন রায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জ্যোতি বসু প্রমুখের পাশাপাশি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত একজন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য রণকৌশলের জাল বিস্তার করছেন তার কল একটা কিছু কলবেই। প্রধানমন্ত্রী বা অন্ত কোম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর পদ কিংবা সং-গঠনে বলবান মত ক্ষমতা ও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন পদ তিনি পাবেনই। না হয় দেখা যাবে অন্তেরা তো বটেই গান্ধীরাও অবশ্যই গুণে তাঁকে পাশে পেতে বড়ই আগ্রহী এরকম কিছু।

দুর্গাপুর এ্যালয় ফীল শ্রমিকদের দাবী

দুর্গাপুর এ্যালয় স্টীল প্রাইম ইউ-নিয়নের পক্ষ থেকে দশ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে জেনারেল সুপারিনটেন্ডেন্টের নিকট।

ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, কর্মচারীদের নামাবিধ সমস্যা সমাধানের দাবি দীর্ঘদিন ধাবৎ উপেক্ষিত রয়েছে। আলোচনা হয়েছে কিন্তু তার কোন সমাধান হয়নি। প্রাইম ইউনিয়নের মতে সম্প্রতি বিদ্যুৎ সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে মতুন করে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি বতাব্দী প্রাইম-কর্মচারীদের অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে।

দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বিভাগীয় আলোচনার দাবি, পারফরমেন্স বোনাসের দাবি, ক্যাটিনে টাটকা খাবারের দাবি, স্রষ্ট পরিবহন ব্যবস্থার দাবি। আবাসন সহ আরও বহু সমস্যা সমাধানের দাবি স্মারক-লিপিতে করা হয়েছে।

খামার কেস নং ৬১(৬)/১৯৮০। মন্ত্রী জীবতীন চক্রবর্তী স্থানীয় এম এল এ হিসেবে নাকি চতীচরণ সর্দারকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন। গত জুলাই মাসে পুলিশ এসে ২৩টি ঘর ভেঙ্গে দেয়। দুজনকে গ্রেপ্তারও করে।

হঠাৎ ৪ঠা নভেম্বর দেখা গেল এক বিরাট পুলিশবাহিনী এসে ঘর ভেঙ্গে দেয়। এর পূর্বে উদ্ভাস আলোকে থেকে ১৪৪ ধারা মতে একটা আদেশ বের করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিক্রম-গড় কলোনীর গুণ্ডা ও পুলিশ গত ৪ঠা নভেম্বর সব ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

● ১ মং মট জেন, কলিকাতা-১৩

শস্যবীজের ব্যবসায় বহুজাতীয় সংগঠন

রূপজিৎ মালিক

বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার আরেকটি মিতুন বিপ্লবের ঘোষণা করা হয়েছে। 'সবুজ বিপ্লবের' পদাঙ্ক অমুসরণ করে এবারে আসছে 'বীজ-বিপ্লব'। লক্ষ্যীয় ব্যাপার যে এই দুই বিপ্লবের ধ্বজাধারীরা হল কিছু শক্তিশালী বহুজাতীয় ব্যবসায়ী সংস্থা। এই জোটের মধ্যে আছে খনিজ তেল, কৃষি রসায়ন এবং ঔষধ নির্মাতা কোম্পানী, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে নামকরা যার রয়াল ডাচ, শেল, সিবা-গাইগী, স্যুগোজ কাই-জার, মনুভান্টো এবং ইউনিয়ন কার্বাইডের। চিমিতে সুখ্যাত আই. টি. সি. কোম্পানিও এদের মধ্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে এই বীজ বিপ্লবের সঠিক পরিভাষা কি? এবং বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ-গুলিতে এই বীজ বিপ্লবের ভূমিকা কি বা কি হবে?

শস্য বীজের উৎপাদনে বড় বড় কোম্পানিগুলির এই অগ্রগতির কারণ খেঁজলে পাওয়া যায়। শস্যবীজ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সমস্ত কৃষি এবং খাদ্য ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কেননা কি কি ফসল উৎপাদন করা হবে অথবা সেগুলো কোথায় বিক্রি করা হবে এবং এর জন্য কি কি সাধারণ প্রয়োগ করা হবে এ সমস্ত ব্যাপারে বীজ নিয়ন্ত্রণকারীদের বক্তব্যের একটা বিশেষ প্রভাব স্বভাবতই এসে যায়। এর মধ্যেই বিশ্বের বীজ সম্পদ কিছু কিছু কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ কলার বীজের অধিকার ইউনাইটেড ব্রাও কোম্পানির এজি-য়ার হুজ হয়েছে। আমেরিকার চারটি কোম্পানি ডেক্যান্ড পায়ো-নিয়ার ভাগোজ এবং সিবা-গাইগী আজ বাজারের দুই তৃতীয়াংশ শস্য বীজের ব্যবসা নিজেদের হাতে তুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীজ কোম্পানি হল রয়াল ডাচ। যারা ইয়োয়োগ এবং উত্তর আমেরিকার প্রায় ৩০টির মত বীজ কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত করে।

যথার্থই এই সমস্ত বড় কোম্পানির বীজ ভাণ্ডার এক রহস্য আবৃত অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, যেখানে এই বীজ উৎপাদিত হয় তারা নিজেদের দেশে এই বীজের প্রয়োগ এবং বণ্টন করতে পারেনি।

একটু তলিয়ে দেখলে বোকা যায় যে এই সমস্ত তেল, ঔষধ এবং

কৃষি রসায়ন কোম্পানিগুলি এক কারাগার এনে মিলেছে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' দৌলতে। সবুজ বিপ্লবের উত্তোক্তারা আজ বীজের করেন যে ঘোষণা গম, ভুট্টা এবং চালের উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে যার এবং রাসায়নিক কৃষি ঔষধের ব্যাপক ব্যবহারের উপর। এও বলা হয় যে এশিয়ার ৭৫ কোটি থেকে ১ কোটি টন চাল উৎপাদন আজ নির্ভরশীল পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোলিয়াম সাপ্লাইয়ের উপর। এবং সেই কারণেই তেল, ঔষধ এবং রসায়ন কোম্পানির কাছে সার এবং কৃষি ঔষধের ব্যবসা লোভনীয়। এবং এ থেকে এটাও স্পষ্ট যে বহুজাতীয় সংস্থা এবং উন্নত শ্রেণীর বীজ নির্মাণকারী অধিকর্তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। এই শ্রেণীর বীজকে আজ বলা হয় উচ্চ প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা এদের কার্য-কারিতা নির্ভর করে বেশী পরিমাণে রসায়ন ব্যবহারের উপর।

উন্নত শ্রেণীর ভুট্টা এবং গমের এই পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার সম্ভব হয়েছে মেক্সিকোর এল বাটান এলাকার স্থিত ভুট্টা এবং গমের আন্তর্জাতিক রিসার্চ সেন্টারের প্রচেষ্টায়। চালের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা নিয়েছে ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক চাল রিসার্চ সেন্টার। এই দুটো সংগঠনের নির্মাণ হয়েছে রক-ফেলার এবং ফোর্ড কাউন্সিলের সাহায্যে যাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে নিকট সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত।

এই উন্নত এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের আশ্রয়প্রাপ্ত এশিয়ার এবাবত কৃষি ব্যবস্থার কিছু দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। এখানে প্রায় বেশীর ভাগ কৃষকেরা এক সঙ্গে মেনে চলতো কিন্তু এই শ্রেণীর বীজকে অল্প শস্যের সঙ্গে বণ্টন করা সম্ভব নয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদনের আরগার এক ধরনের শস্য উৎপাদনে ব্যবস্থা দেখা দিচ্ছে এবং প্রাচীন প্রাপ্তির সুবিধাও এর ফলে তুলনা-মূলকভাবে কমে গিয়েছে। কিন্তু এই নতুন কাজে নামার ফলে এর বিস্তৃত এলাকার চাষ করার সুবিধার ফলে এই কোম্পানিগুলির লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সবুজ বিপ্লবের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করার ফলে বড় কোম্পানিগুলি বীজ বিপ্লবের ব্যাপারেও খেঁজ উৎসাহিত হবে।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে এই সমস্ত বাণিজ্যিক স্বার্থ যদি বীজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাকে নিজেদের আরম্ভে আনতে সক্ষম হয় তাহলে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই এই উচ্চ ফলনশীল শ্রেণীর বীজ বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্নতাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। আজ তাই অনেক কম ধরনের শস্য বণ্টন করার প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, যেখানে পৃথিবীর সর্বাধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান, আজ আমেরিকান কৃষি ব্যবস্থার মডেল রপ্তানি করা আরম্ভ হয়েছে। স্থিতির বিবিধতা এবং ফসলের বিভিন্নতা অনেকাংশে এই জ্ঞত প্রয়োজনীয় যে এর ফলে ফসলের কৃতির পরিমাণ অনেক কমে যায়।

বীজের ব্যাপারে পেটেন্টীকরণের

প্রসঙ্গ : প্রথম পাঠ

সুমনের রায়

কিছুদিন যাবত বিভিন্ন কাগজে 'সহজ পাঠ' নিয়ে বেশ একটা বিতর্কের ঝড় দেখছি। আমার এ লেখা অবশ্য 'সহজ পাঠ' নিয়েই নয়, সমস্ত প্রথম পাঠ নিয়ে। সেই আদিকাল থেকে আমাদের প্রথম পাঠগুলি যে ভুলের বোকা বা ভুতের বোকা বলে আসছে, মনে হয় আজ তা থেকে মুক্তি পাবার সময় এসেছে তার। যদিও এতদূর ধরা পড়েছে অনেক দিনই তবু পুরোনকে আঁকড়ে রাখার অভ্যাসবশতঃ এতদিন তা কেলেও কেলেতে পারিনি আমরা। আজকের এই ঝড় হঠাৎ আমার মনে করিয়ে দিল—এই তো প্রকৃত সময়। আবর্জনা ঘুরে মুছে পরিষ্কার হওয়ার এইতো সাহেজকরণ।

বর্ণ পরিচয়ের প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। 'ক', 'খ'—এই যে বর্ণ দুটি, এদের কি দাঁতাই কোম বিশেষ প্রয়োজন আছে? 'সহজ পাঠ' অবশ্য এদিক থেকে একথাও এগিয়ে। সেখানে 'ক'-এর স্থান দেই। এছাড়াও প্রশ্ন আছে। 'খ', 'ং'-কে স্বরবর্ণ ধরা হয় কোম হিসেবে?

এরপর আসছে 'ঐ (ওই), ঔ (ওউ)'। বর্ণমালার এদের স্থান হল, এই, আই, আও, উই, ইউ—এরাও তো এক একটি আলাদা বর্ণ দাঁত করতে পারে।

ব্যবস্থা শস্যের বিভিন্নতাকে আরো বেশীভাবে আঘাত করবে বলে মনে করা হয়। এই পেটেন্টীকরণ ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এবাবত ইংল্যান্ড ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই ব্যবস্থা বর্তমান এবং কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আরারল্যান্ডও এর প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছে। যে আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পেটেন্ট করা হয় সেগুলি হল প্রাক্ট ভ্যারাইটিস্ রাইট্‌স্। প্রাক্ট বীডারস্ রাইট্‌স্ প্রাক্ট ভ্যারাইটিস্ লেজিসলেশন অথবা 'রেসট্রিক্টেড ভ্যারাইটিক লেজিসলেশন'।

এই আইনের ফলে সরী অর্থের স্বাধীন নিরাপত্তা হয় এবং এর থেকে ঘোষণা অথবা বর্ণনায় উৎপাদন ব্যবস্থার নিরাপত্তা যায়। আমরা দেখেছি যে এই ঘোষণা উৎপাদন ব্যবস্থার কি কি বিকল্প ফল হতে পারে। এর থেকে আরও এক সমস্যা দেখা দেয় যে কৃষকদের এই বীজ রপ্তানিকারীদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়।

ঘোষণা থেকে সাধারণতঃ নিখোলা বীজ উৎপন্ন হয় যার ফলে কৃষকরা বীজ সংরক্ষিত করতে পারে না এবং পরের ফসলের জন্য আবার তাদের এই রপ্তানিকারীদের শরণাপন্ন হতে হয়।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য নিজেদের হাতে নেওয়ার যে পরি-কল্পনা এই বহু জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি করেছে, তার বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম এখনই আরম্ভ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত আইনের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক স্তরের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন যার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে স্বাধীনভাবে 'জমি প্রাজন্ম' বিনিময় করা সম্ভবপর হবে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে মট না হয় তার জন্য আন্তর্জাতিক সংকল্প প্রোগ্রামও তৈরী হওয়া উচিত। এবং তাই পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থাকে বহু জাতীয় সংস্থার কীটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাজনৈতিক কীটনাশক আবিস্কৃত হওয়া এখনই প্রয়োজন।

উচ্চারণে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, 'একটা' বলতে গিয়ে সাধারণতঃ আমরা এখানে 'এ'-এ যে রূপ উচ্চারণ করে থাকি তাই। কতকটা 'এ্যা'-এর মত। মনে হয় এটাকে একটা সমস্ত বর্ণ রূপে 'আমা'-দের বর্ণমালার স্থান দিলে তাতে বঙ্গলিপিমালা আরো শক্তিশালী হবে। শেষ কথা, বানানের জটিলতা যত কমেবে কলমও ছুটবে তত দ্রুত বেগে। আর এই দ্রুত পতির বর্ণে অথবা বোকা বইবার মানেই শক্তির অপচয় করা বা পিছিয়ে পড়া।

অভিযান প্রত্যাহারের দাবিতে কনভেনশন

গত ১১ অক্টোবর মধ্য কলকাতার ইন্ডেন্টস্ হল জাতীয় নিরাপত্তা অভিযান প্রত্যাহারের দাবিতে একটি কনভেনশন হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবী, চিকিৎসক, অধ্যাপক, সাংবাদিক কর্তৃক আহূত এই সভার সভাপতিত্ব করেন ঈকুপিল ভট্টাচার্য।

চরণ সিং-এর প্রাক্তন কেয়ার-টেকার ব্রহ্মসভার প্রত্যাখিত পি, ডি, অ্যাক্ট কংগ্রেস (ই) সরকার ক্রমতঃ বদেই গত ২ ফেব্রুয়ারী বর্ষের ক্রমতঃ কোরে সংসদে পাশ করেছে। এর উপর-হানবীর জাতীয় নিরাপত্তা অভিযান চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার বৈরতত্ত্বের পথে যাচ্ছে বলে উক্ত কনভেনশনের প্রত্যাগে উল্লেখ করা হয়। প্রত্যাগে পি, ডি অ্যাক্ট ও জাতীয় নিরাপত্তা অভিযান বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান থেকে ২২ (৩) (খ) ধারা বাতিলের দাবিও করা হয়। প্রত্যাগটি পাঠ করেন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ভট্টাচার্য।

বামফ্রণ্টের আইনী লাইন নয় গণফ্রণ্টের গণলাইন

শ্রীপতি নন্দী

"The line is the keylink ; once it is grasped, everything will fall into place"—Mao.

যে শাসকশ্রেণী কোটি কোটি মানুষের ভিটার ঘুঘু চরায়, সে শ্রেণী নিত্যই নির্বোধ নয়। অনাহত কেউ তাদেরই হাতে কৌশলে তামুক সেবন করে বাবে তেমন ধুমপানী অভাবি হয়নি। মৃত্যুর ধরা ধরকোটা যদি বা কাউকে হাতড়াতে দেয় তবে তা কলকেটা সাজিয়ে দেবার ভয়ে, কদাপি অত কারণে নয়।-প্রাদেশিক সরকার গঠনের মত কলকে সাজানোর বামফ্রণ্টী সুযোগ-টাও এরূপ অমায়িক আমন্ত্রণ। গণ লাইন ও আইনী লাইনের বিরোধের কারণগুলি একেত্রে স্পষ্ট।

অতএব, কলকে সাজানোর চমৎকার কাজটি যেখানে, একমাত্র সংবিধানগত সংসদীয় অধিকার, সেখানে 'সংগ্রাম' করে বৈরতন্ত্রকে কখনও ও 'গণতন্ত্রকে প্রসারিত' করার ঐরম্যতাত্ত্বিক উপায় ও পরিসর কোথায়? রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক উপরিকাঠামোগুলিতে সমস্ত রূপ পরিকল্পনা ও পরিচালনা যেকোনো দেশবিশেষে পিল্পপুঞ্জি, মহাজনী পুঞ্জি ও ফ্লাক শ্রেণীর অধিগত—অতএব জাতীয়চরিত্রহীন, দেশাত্ম-বোধহীন—সেক্ষেত্রে উপরিকাঠামোর প্রত্যক্ষমাত্র হয়ে এমন কি আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রমত্ত না তুলে, কোন রাজ্য- (প্রাদেশিক) সরকার কি করে একেবারে জনগণের 'সংগ্রামের হাতিয়ার' হয়ে উঠতে পারে? হাইকোর্টের অনগ্র্য ইন্জাং-শনের বিরুদ্ধে আদালতী 'লড়াই' চালিয়ে যেমন কৃষককুলের শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়া যায় না, আধাঔপনিবেশিক উপাদান ব্যবহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না চালিয়ে তেমনই প্রমত্তী জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়া দূরে থাক, লাচা দরদীও হওয়া যায়না। তাহলে কার বিরুদ্ধে কিসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার?

বাস্তবকে নিত্যই মনোপতভাবে দেখা আর সংগ্রাম বিমুখিতা একই চরিত্রের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। কোন প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের নিরমতাত্ত্বিক সম্পর্কগুলি, বৈর-তাত্ত্বিক রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের বৈরী-মূলক সম্পর্কগুলি, নরপুঞ্জিবাদ বিরোধী জনগণের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের সম্পর্কগুলি—এসব কিছুকে ভারতীয় পরিহিতের বাস্তব পট-

ভূমিকায় না দেখলে সংগ্রামের লাইন গড়ে উঠতে পারে না। ভারতীয় ব্যবহার বাস্তব পরিহিততে সাম্রাজ্য-বাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, মরা-পুঞ্জিবাদ ও আধাসামন্তবাদের পার-ম্পরিক যোগাযোগ ও ভূমিকাগুলি সম্পর্কে আমাদের বামমার্গীদের দৃষ্টি-শক্তি এমনই 'প্রবল' যে এরূপ নরা-বুর্জোয়া আধাসামন্তবাদী বৈরতন্ত্রের বেড়াভালে আঠে পুঠে জড়িয়ে-পড়া বামফ্রণ্ট সরকারগুলির করুণ অপমৃত্যু তাদের কারো চোখে পড়ে না। লক্ষ্যহীন রাজনীতির গোলকধাঁধার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালে এরূপই ঘটে থাকে। নরপুঞ্জোয়া-বৈরচাচার বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামা-জিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রা-মের ঐতিহাসিক পটভূমিকে যারা সংসদীয় আচার-বিচারের বাইরে প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম, তারাই বাম-পন্থী গণ সংগ্রামের সঠিক হাতিয়ার গণফ্রণ্টের সঙ্গে সমস্ত সরকারকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন, অতঃপর বৈরতন্ত্রের খাচারধরা প্রাদেশিক সরকারকে 'সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেন। অবস্থাটা এমনই করুণ হয়ে দাঁড়ায় যে, খোদ বামফ্রণ্ট সরকারগুলিকে রক্ষা করার মত কোন খুঁটিও থাকে না।

মূলকথা, কল আর গ্যাড়াকলের পার্থক্যটাই এদের নজরে আসে না। কিন্তু যারই হাতে গিয়ে পড়ুক না কেন, গ্যাড়াকলের উপাদান গ্যাড়া-কলই হবে, অতঃপর কদাপি ফলবে না। গ্যাড়াকলকে কাজের কল লম্বে ব্যবহার করতে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য; ভুলগুলি অতঃপর ভূত হয়ে রাড়ে চাপে, বাড় মটকায়।

গণ-সংগ্রামই ভারতীয় সংগ্রাম আধাসামন্তবাদ ও আধাঔপ-নিবেশিক ব্যবস্থা পরম্পর পরিপূরক, পরস্পর অপরিহার্য; নরপুঞ্জিবাদ যেমন সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করতে অক্ষম তেমনি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা-কেও উচ্ছেদ করতে পারে না বরং মতুন নতুন উপায়ে স্থান লঙ্ঘন করে দেয়। নীটফল বৈরচাচার—উত্তর প্রকার বৈরচাচারী উপাদানে গড়ে ওঠা বৈরচাচার। এদের উত্তর-কেই কোণঠাসা না করে এদের কোনটাকেই লাভাড়া করা যায় না, অতএব, গণসংগ্রামের লাইন একেত্রে স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক দৃষ্টবাদের দ্বারা নির্ধারিত। গণসংগ্রামের নেতৃত্ব সংসদ-নির্ভর কিংবা বিধানসভা নির্ভর নয় তা একান্তই গণসংগঠন-নির্ভর

—যে সংগ্রাম আইনী আদালতী ফুসফুস নিয়ে বাঁচে না গড়ে ওঠে না, যে সংগ্রাম পক্ষান্তরে অচল কৌশলকে বর্জন করে মচল কৌশল সহকারে শক্তিবৃদ্ধি করে গণজোয়ারে শ্রেণীশত্রুর বৈরচাচারী আইনের প্রাকার ভালে, জন সংগ্রামকে জনজীবনে ছড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, মুখে সংগ্রামের খোঁয়াটে স্লোগান তুলে যারা কার্যতঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টবাদের দ্বারা নির্ধারিত লড়াইয়ের কর্মসূচীকে অকেজো করে রাখে, সে আধাবোধবাদী সংস্কার-বাদীরা একমাত্র সুবিধাবাদের হাতিয়ার হতে পারে কিন্তু গণসংগ্রামের কেউ নয়।

অতএব, ফ্রণ্টপন্থী সরকার বিলাসীদের দুঃখ করে লাভ নেই। ওনারা নাকি 'মার্ক্সীয়' তাত্ত্বিক। বিমপুঞ্জিবাদের এ শেষ-দশায় আন্ত-জাতিক পুঞ্জি শিবিরগুলির যোগাযোগ ও বস্তুগতিকে কি ওনারা চেনেন না? ভারতীয় অর্থনীতির কাঠা-মোটাকে শ্রেণীবিচারে ও আন্ত-জাতিক পুঞ্জিশোষণের বিচারে প্রত্যক্ষ করেন না? কিংবা এরূপ রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাম্প্রদায়িক ব্যর্থতায় তথাকথিত রাজ্য সরকারের অধিকারগত ও ক্ষমতাগত অস্থান সম্পর্কে ওরা কি মোহগ্রস্ত? তা ওরা ইচ্ছামুখারী ওদের সাথ আচ্ছাদ ওরা ব্যস্ত করতে পারেন, কিন্তু বিদেশী পুঞ্জিধারগুলির অচ্ছেদ্য সুবিধাতোগ, ফেঁপে-ওঠা দেশী পুঞ্জির অর্থনৈতিক তাগিদ এবং ভারতীয় নরা-বুর্জোয়ার রাষ্ট্রনৈতিক অভিযের তাগিদ যে জীবনী সঙ্গ-রচনা করেছে, তার পুণ্য সলিলে ডুবে ডুবে থাকুকই প্রার্থনা করা হোক না কেন, প্রাপ্তিযোগ নাহি; সব প্রার্থনাই অতলে তলিয়ে যাবে।

আসলে রাষ্ট্রনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থার মানসিকতার যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইন্দিরা কংগ্রেস এমন কি আনন্দ-বাজারীদেরও গুরুতর বস্ত্র বলে মনে হয় সেগুলি বাস্তবে মোটেই তা নয়; এগুলি ভারতবর্ষের ভুলের মাস্তুল, 'এরিসার'-এর ফসল—প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ জোয়ার, ইতিহাসের জ্বাল, ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়ে যেতে বাধ্য।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিহিত থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে বাম-ফ্রণ্ট কিংবা তার কোন 'হাতিয়ার' যদি এ রাষ্ট্রীয় কলকজাগুলিকে বিকল করে দিতে সক্রিয় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে সেদিন তারা কীর্যপ্রাণ পরজীবীদের এ সংসদীয়

খোঁয়াড়ের আশ্রয় হারাবেন সম্ভব নেই, কিন্তু সে সঙ্গে তাদের সাম্প্রদায়িক শেকলটাকেও হারাবেন, আর অসুস্থ শক্তির উৎস ইতিহাসের মহা-মায়ক জনগণের মধ্যে তারা নতুন জীবন লাভ করবেন—অবশ্যই জনগণ বলতে এঁটো-চাটা 'বুদ্ধিজীবী', আইন-কিমি আইনবিদ, চিটিং-এ-উডীপ চিকিৎসক, তালকানা দাবা-দিক, অপোগণ্ড ভাষ্যকার, গণমুখ সংবাদপত্র সম্পাদক, গণ-স্ব-না-জানা তত্ত্ববিদ, বরাহবুদ্ধি আশ্রয়, হাড়ে-বজ্রাত গাছী ওয়ালী ইত্যাদি বাবতীর খাটের মড়াধরে বুঝার না—ভারতে জনগণ বলতে সোজা কথার ভাৱেই বুঝার যারা আজো ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমে পড়েনি।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটি যে অর্থে 'অর্থনৈতিক' সে একই অর্থে সংগ্রাম-হীন 'সংগ্রামের' সম্পর্ক। বিস্ময়-বোধের কোন অঙ্গে যেমন 'পৃথকভাবে' বিচ্ছিন্ন রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হয় না, সেরূপ কোনরূপ স্থানীয় সমস্যার বিষয়েও স্থানীয় কোন সমাধান নেই, এবং কনফারেন্স টেবিলে পরম 'যুক্তি-পূর্ণ' বাকবিত্তারগুলি যথাপূর্ব ভূতের পিণ্ডি চটকানো ছাড়া আর কিছু হয়

কলকাতা বন্দরের সাধারণ কর্মচারীরা বঞ্চিত অথচ চুপিচুপি অফিসারদের মধ্যে জন্মি বিলি

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্মচারীদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্ত জমি দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করার কোনরকম সদিচ্ছা কর্তৃপক্ষের কাছে বলে মনে হয় না। অথচ চুপি চুপি বন্দর কর্তৃপক্ষের উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের জন্ত জমি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তা নিয়ে কর্মচারী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৭৭ সালের ১৭ই জুলাই বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব কে এন গাঙ্গুলী এক সারকুলার জারী করে বললেন যে, বন্দরের কর্মীদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্ত তাঁরা জমি দেবেন। কর্মচারীরা বাসগৃহ নির্মাণের জন্ত সমবার সমিতি গঠন করতে পারেন। ১৯৭৫ সালের এই সারকুলার অনুযায়ী বন্দর কর্মচারীগণ পোটা ছয়েক বাসগৃহ নির্মাণের সমবার সমিতি গঠন করেন এবং তা রেজি-স্ট্রেশন করানো হয়। ১৯৭৭ সালের ২৭শে জুন আরও একটি সারকুলার জারী করে বন্দর-সচিব বলেন, বহু-আবেদন এসেছে। সেগুলি বিবে-চনার মত্রে। এর পর সব চূপ। কর্মচারীদের সমবার সমিতিগুলির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন করা হয়েছে কিন্তু তারা কোন জবাব পাননি। প্রধানমন্ত্রী, জাহাজী মন্ত্রী, কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান, সচিব লক্ষ্মী সঙ্কল-কেই এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

না। জীবনের সারাংশ-সবটে আধা-সামন্ততাত্ত্বিক খেজাচারের আশ্রয়-রীণ যুগা যুগা এতই অসহ্য হয়ে উঠেছে যে কেবলমাত্র দাঁতমুখ ধিঁচুনি ছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই। জাতীয় চরিত্রহীন রাষ্ট্রকাঠামোটি এতই Inflexible যে কোন সামন্ত কাঠামোগত বিবেচনাটুকু পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্পনীয়। সামাজিক-শাহী শয়তান কখনো মনো পাউটে তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে পারে কিন্তু তাঁর শিকারী আত্মা আশ্রয় ছাড়া বাঁচে না। অতএব, জনগণতাত্ত্বিক বিপ্লবের স্লোগান যদি মেকী না হয়ে লাচা হয় তাহলে অন্ধকারে হাতড়ানোর অধ্যবসায় ত্যাগ করে প্রকাশ্য দিবালোকে চোখ ফেলতে হবেই, নতুবা উপায় নেই। সমস্যার সমাধান আলাপে-প্রলাপে নয়, সংসদীয় খোঁয়াড়ে নয়, এসব কিছুই বাইরে একেবারে নীল আকাশের নীচে, যেখানে পেটের আগুন বুকের আগুন আর মাথার আগুন পূর্বের রক্তজটোর মাহবকে প্রতিদিন অজের করে তুলছে।

(সমাপ্ত)

কিন্তু অত্যাধি কিছুই হয়নি। অথচ কোনরকম সারকুলার ছাড়াই বন্দর অফিসারদের একটি সমবার সমিতিতে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে আলিপুর এভিনিউ এক্সটেন-শনে প্রায় দেড় দশক আগে। এই সমবারের সদস্য বন্দরের তৎকালীন চেয়ারম্যান পি সি মিত্র, আর এন বোমাল, এস কে বোম, এ এল কয়, এন-কে বোম, এস কে কুঁরাবহিয়া, এম আর সাহা, কে কে দাস। আগে বন্দর সচিব কে এন গাঙ্গুলীও এই সমবারের সদস্য ছিলেন। এই সম-বার সম্পর্কে অভিযোগ যে, একজনের জন্ত বরাদ্দ জমি নিরমবহিত্ব-তভাবে অন্ধকে দেয়া হয়। এরকম অভি-যোগও আছে যে, কোন কোন সদস্য একাধিক শেয়ার নিজের নামে করিয়ে নিয়েছেন ট্রান্সফার করিয়ে যাতে অবসর গ্রহণের পর তা নিজের কলার আনা যায়।

বন্দর কর্মচারীদের বক্তব্য হল এই যে, চুপেচাপে কোনরকম সারকুলার ছাড়াই আমলাদের জন্ত জমি দেয়ার ঘটনা নজীর বিহীন। অথচ সারকুলার দিয়ে প্রতিশ্রুত জমি আজও কর্মীদের সমবার সমিতির হাতে অর্পণ না করাটা প্রমিত বার্ষিক পরিপন্থী।

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

বাহারামের বাগান

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথমই বলে রাখি, ধীরেশ কুমার চক্রবর্তী প্রযোজিত ও তপন সিং পরিচালিত 'বাহারামের বাগান' ছবিটি সু-মিষ্টি, রসপূর্ণ সংলাপে সমৃদ্ধ, আবেগ ও আবেদন সঞ্চারেও সক্ষম। সহজ সরল পরিচালনা ও হিউমার স্ট্রির মধ্য দিয়ে ছবিটির জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও আছে বটে। কিন্তু মাঝে মাঝে ফ্যান্টাসির আয়োগ করে ছবিটিকে ফ্যান্টাসি করে তোলায় বাগান হারিয়েছে ভগ্নমিথ্যে, যে-বাগান, হুগের সংগে বলতে হয়, মোটেই পূর্ণ হয়নি তার। ছবির বিষয়বস্তুর যে-প্রকৃতি, তার সংগে হিউমার সারূপ মানানসই হলেও ফ্যান্টাসি সেখানে অচল। অতীত আত্মার শরীরী প্রকাশে যে ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড মাঝে মাঝেই ছবিতে দেখা গেছে, তাতে মনোবলক আকৃষ্ট করার একটা প্রয়াস যে আছে, তা বুঝতে কষ্ট হয়না কিন্তু ছবিতে রস-স্ট্রির ব্যতিরেকে তা যে শুধুই বিষ হুটি করে, তপন সিংয়ের মত পরিচালক সেটুকু উপলব্ধ করলেমনা—এটাই বিষময়কর।

মনোজ রিজের 'সাজানো বাগান' নাটকটি অবলম্বনে আলোচ্য ছবিটি নির্মিত। কাহিনীর মধ্যে দশকের ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার আশ্রয়গুলি এমন সুন্দরভাবে লাকানো আছে যে, তার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপাত ধারণার তেমন কোন প্রশ্ন সাধারণের মনে দেখা না দেওয়াটাই স্বাভাবিক। বাদ দেখা যায়, অত্যাচারী শোষক ধীরে ধীরে পরাজিত হলে, আর শোষিত দুঃখী কৃষক জমী হয়ে উঠবে, তবে সাধারণ দর্শকের চোখে বাগানই দেখানো চরিতার্থ হয়ে উঠে মনোবাহু পূরণ করে—এবং বাহারামের সুখের পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়ে দর্শক সাধারণের সেই ইচ্ছাপূর্ণক ব্যাপারটাই ঘটানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, মোটা প্রসংগটি কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরে বাস্তব মূল্যায়নে চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে ছবিটি তাৎপর্যমণ্ডিত বমনশাল না হয়ে শুধুই অর্থহীন আবেগধর্মী হয়ে পড়েছে।

এবল - প্রত্যাশিত জমিদার

তারই অধীন প্রজা বাহারামের সাজানো বাগানটি বলপ্রয়োগ করে অধিগ্রহণ করতে চেয়েছিল। বাহারামের বরষ হয়েছিল, তার জন্মবল নেই, একা। তবু প্রথম দিকে ছবিতে দেখি জমিদারের এই অত্যাচারের সে প্রতিবাদ করেছে—প্রতি-রোধও করেছে একবার। কিন্তু তারপর থেকেই দেখা গেছে, জমিদারের সব কৌশল ও ক্রমতা প্রয়োগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে অল্প কাকতালীর যোগাযোগে। ম্যানিফেস্টের এক শাসনানুষ্ঠানেই জমিদারের মুহুর্ত। জমিদার পুত্র শেষে জমিদার হয়ে বাহারামের বাগানটি দখল নেবার ক্ষমতা তিন কৌশল অবলম্বন করল। বাহারাম বৃদ্ধ, অশক্ত—কিছুদিন বাদেই মারা যাবে নিশ্চয়ই। সুতরাং জবরদস্তি না করে তার প্রতি লক্ষ্যকৃতিকে দেখিয়ে, মালিক চারপোঁটাকা বরাদ্দ করে অপেক্ষা করতে লাগল বাহারামকে মারা যাবে—মারা গেলেই বাগানটি হস্তগত করা যাবে—এই মর্মে একটি চুক্তি হলিল ও হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল—বাহারামের মরার কোন লক্ষণই নেই, বরং ভাল মন্দ খেয়ে খেয়ে শরীর ক্রমশঃ ভালই হয়ে উঠছে। তার পালিয়ে যাওয়া নাতি কিয়ে এসেছে বিয়ে করে বৌ সংগে নিয়ে। তখন জমিদার বাহারামকে মারার জন্য বিস্ময় লাগছে, ডাক্তার লাগিয়ে, দেবীর কাছে মানত করে যে সব কাণ্ড করল, এবং বাহারাম সে সব সাহেবও যে ভাবে বেঁচে রইল বহাল ভবিষ্যতে, তা যেমন অবাস্তব চেমনি হস্তকর। শেষ পর্যন্ত জমিদারেরই মুহুর্ত হল, বাহারাম বেঁচে রইল তার সাজানো বাগান নিয়ে। কিন্তু এই যে বাগানখানি বাহারাম তার নিজের দখলেই শেষ পর্যন্ত রেখে দিতে পারল, তা কিসের জোরে? অবশ্যই তথাকথিত দৈব শক্তিতে—আপন শক্তিতে নয়। সে তো জমিদারের কাছে আত্মসমর্পণই করেছিল। এখানে ছবিতে কোন সংঘাত নেই—নেই কোন বলিষ্ঠ পরিচর সাংগঠনিক শক্তির, যার জোরে শোষক জমিদারের লুপ্ত দৃষ্টি থেকে বাগানটির দখলকে কায়ম করে রাখার পথ দেখানো যেতে

পারত। বাহারামের নেতৃত্বে নাতি ও অন্ত বঞ্চিত প্রজাদের সংগঠিত করে জমিদারের শোষণ ও মিসীকনের উপরুক্ত অবাব দিতে পারলে এই ছবিটিই এক মতুন ডাইমেনশনে চিহ্নিত হয়ে সমাজসচেতনতার এক উজ্জল দিক তুলে ধরতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, উদ্বেগ ও নিশ্চয়ই সেরকম ছিলনা।

রঙীন ফটোগ্রাফিতে ছবির সৌন্দর্য কিন্তু অনেকগুলি বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্যামেরাম্যান বিমল মুখোপাধ্যায়। সুবোধ রায়ের সম্পাদনার গুণে ছবি তার বাস্তব গতি পেয়েছে। আর অভিনয়ে বিষময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন হীরাংকর দে ও মনোজ রিহ। জমিদারের দুই পুরুষের দুটি তিন্ন মান-নিকতাকে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন হীরাংকর দে। আর মনোজ রিজের 'বাহারাম' এক কথায় চমৎকার। এই প্রথম চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হয়ে হুগ চরিত্রটির অন্তর্দৃষ্টি যে মূল্যমানার তিনি ফুটিয়েছেন, তা তার অভিনয় কর্মতাকে লক্ষ্যাতীত প্রমাণে চিহ্নিত করে। মোক্তার চরিত্রটি, নির্মল কুমারের অভিনয়ে স্রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছবিতে আবহ সংগীত কিন্তু এক বিশেষ মাত্রায় যুক্ত হতে পারেনি।

সুন্দরম প্রযোজিত

'মেঘ ও রাক্ষস'

বর্তমান যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে একটি সত্য কথা রূপকথার আঙ্গিকে বক্তব্য হিসেবে ফুটিয়ে তুলে উপভোগ্য নাট্য পরিবেশনা করা খোটেই সহজ কর্ম নয়। কিন্তু সুখের কথা, সুন্দরম গোষ্ঠী তাদের মতুন নাটক 'মেঘ ও রাক্ষস' গত ২৭শে অক্টোবর অ্যাকাডেমিকে উপস্থাপনা করে সেই বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখল।

রূপকথার দেশ রূপনগর, রাজা রাক্ষস, তার বাছুরটির বলে অনন্তক ক্রিয়াকাণ্ড, নিবিচার শোষণ ও নির্যাতন, তার বিরুদ্ধে রাজবল প্রতিবাদ ও আক্রমণ, রাক্ষসের পরাজয় ও বন্দীদশা, রাক্ষস নিধনের অলৌকিক মন্ত্রগুণি, তিন তরুণের তা আরম্ভ করার জন্য হিম পাহাড়ে চুঃসাহসিক অভিযান, অল্প কথি কথের নেতৃত্বদান, হুগ পথে হিন্দো ও মোক্তার নানা মায়ারী ছলনা, মোতী ছুই তরুণের পদাশ্রম ও তাদের নির্মম শক্তি, রাক্ষসের পুনরাগমন ও শেষে তার নিধন পর্ব দিয়ে নাটকের উপসংহার এসেছে মেঘ থেকে মাছের উদ্ভব ঘটিলে। লক্ষ্যে নেই, রূপকথার মেজাজ যেমন পুরোটাতে আছে নাটকটিতে তেমনি

কিছু রেখার স্রীতির প্রয়োগও লক্ষ্য করা গেল প্রথম ও শেষ দৃশ্যে। নাটক রচমায় মূল্যমানার পরিচর রেখেছেন মনোজ রিজ নিঃসন্দেহে, কিন্তু রাক্ষসের অত্যাচার ও অত্যাচারিত দেশবাসীর প্রতিজ্ঞার দেশের চলমান পরিস্থিতির পটভূমির রচমায় বধ্যবন লহারক হয়েছে বলতে পারা যায় না। তবে তিন তরুণ—হীরাংকর, হুগ ও মীলকমলের মনের দৃঢ়তা, রাক্ষস রাজের অনাচারের বিরুদ্ধে লক্ষ্যমী চেতনা, শোষণ রোধের লক্ষে কথের বলিষ্ঠ প্রেরণা অনেকটাই যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের বাস্তবরণ সৃষ্টি করে। হীরাংকর ও হুগের মোত ও প্রেমের শিকার হয়ে যে সংকটচ্যুতি ঘটল—সেখানেও রয়েছে বাস্তবতার স্পর্শ। কিন্তু হিম পাহাড়ের সেই মহাজানী তাপসের মুখ দিয়ে যে কথগুলি বেরিয়ে এসেছে, নাটকের মূল বক্তব্য সেখানেই নিহিত। যে লং, নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী সেই শুপারে অত্যাচারী রাক্ষসটাকে বধ করতে। অর্থাৎ শোষণ নির্যাতনের অবসান ঘটতে গেলে প্রয়োজন লততা ও নিষ্ঠার। কিন্তু নাটকে দেখি, হীরাংকর যে রাক্ষসের বাহুবলে মেঘে রূপান্তরিত হয়েছিল ও বহু হত্যাও জড়িত ছিল, সেই পুনরায় বাহুবে উত্তীর্ণ হয়ে রাক্ষসকে

করল হত্যা। এই প্রসঙ্গে রাক্ষসের বাণীও বটেই অর্থহীন। হীরাংকর মোত ও প্রেমের আদর্শবলই ঠিকই কিন্তু হীরাংকর সেই রূপে থেকে শান্তি ভোগ করে, অহুশোচনীয় আলাপ বন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত হিম লংকর লততার প্রতিমূর্তিরূপে লক্ষ্যমী বাহুবে হল সমুদ্র ও অত্যাচারী প্রাণ মাশ করতেও সক্ষম হল নাটকটিতে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু সে নেই কোথাও।

মনোজ রিজ নাট্য নির্দেশনার দায়িত্বও পালন করেছেন নৈপুণ্যের সংগে। কিন্তু একটা কথা। হীরাংকর বাহুগুণি বন্দী রাক্ষসের হাতে তুলে দিল কি যুক্তিতে, সেটা বোঝাই ভার। বুদ্ধিবীর্ণ নির্দেশনার এ অংশটির উপস্থাপনা কেমন যেন অসংগত মনে হয়। তাব তার কল্প চরিত্রের রূপায়ণে দৃক অভিনেতার পরিচরই পাই। নটী ও চম্পলো রূপে জয়তী ঘোষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছলল সাহিত্যীর রাক্ষস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুভ মজুরদারের 'হীরাংকর' সুন্দর। অল্প চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। আলোক-পরিচরনা ও প্রক্ষেপণে তাপন সেন ও অমল রায় নাট্য মুহূর্তগুলিতে সীলচকল করে তুলেছেন। সঙ্গীত পরিচালনার ধোলালি হাসপুত রং সৃষ্টি করেছেন কম ময়।



ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

(কোল ইন্ডাস্ট্রির একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / বেলগুয়ে / কেমারী ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অল্পমোদিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী পরিত্তিক / পার্সেন্টেজ তিত্তিক সীল করা টেওয়ারী:

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেফা: নং: ১১ / জি এম-কে এম টি / ৭৮৮৭ তারিখ ২১-১০-৮০

এরিয়া কমপ্লেক্স এরিয়া হেড কোয়ার্টারের শোশাল ট্রাইকিং কোর্সের জন্য ১৬ ইউনিটের এম এইচ এম জি / এস কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য। প্রতি রকের আনুমানিক মূল্য ২,৪০,৭৪৮ টাকা। কেমারার / অ্যানিস্টাক কন্টোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা লগদে দিয়ে কেমারেল ম্যানেজারের অফিস, কুহটোরিয়া এরিয়া থেকে ২২ ১১ ৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে বেলা ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে। ২১-১১-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেওয়ার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩ ০০টার খোলা হবে।

সাধারণঃ আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা সংগ্রহিত অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রলিফ টেওয়ারের লগে পাঠাতে হবে, অস্ত্রায টেওয়ার বাতিল করা হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করা অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

মতামত

সহজ পাঠ প্রসঙ্গে

বর্তমান বায়ফ্রন্ট সরকার শাসন করতায় আদায় পর শিক্ষা সম্পর্কে মতুন করে কিছু ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষয় থেকে তার প্রয়োগনীতি নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন। বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিশু শিক্ষার নয়া পাঠক্রম কতখানি কার্যকরী হবে, অথবা তা কতখানি নৈজ্ঞানিক এবং কতখানি বিষয়মুখী হবে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করার পূর্বে প্রচেষ্টা বুদ্ধিজীবীদের একবার আমি ভেবে দেখতে বলি। সমালোচনা করে হয়ত কাজকর হয় কিংবা পরস্পরের গায়ে কালি ছোটান যেতে পারে কিন্তু তাতে আসল লাভ কিছু পাওয়া যায় না। তারা হয়ত সত্যিই দেশকে ভালবাসেন, দেশের কথা চিন্তা করেন কিন্তু শিক্ষানীতি কিরকম হওয়া উচিত তা কতখানি জীবনমুখী হয়ে উঠতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে তারা কখনও স্পষ্ট আলোক পাত করেছেন কিনা কিংবা তা জন-সমক্ষে তুলে ধরেছেন কিনা—আমার জ্ঞান নেই।

‘সহজ পাঠ’ বাদ দেওয়া মানেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া নয়। কারণ একটা জমিন দীর্ঘদিন ধরে চলার পর নেটা দবার কাছেই এক-ধেরে হয়ে উঠতে পারে। তাই নেই একধেরেমীর হাত থেকে রকা পেতে নাহয়কে নতুন কিছু ভাবতে হয়। পঞ্চাশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ‘সহজ পাঠ’ লিখেছিলেন এবং তারপর এই পত কয়েক বছর আগে তা আমাদের শিশু শিক্ষার পাঠক্রম হিসেবে চালু হয়। তার আগেও বিদ্যাপালের ‘প্রথম ভাগ’ বইটা হাতে নিয়ে বহু মাহুই শিক্ষার প্রাথমিক বৈতরণী পার হয়েছিল। তবে কি ‘সহজ পাঠ’র চেয়ে তার মূল্য আমাদের কাছে কম? মোটেই না। কিন্তু এখন নেই ‘প্রথম ভাগ’, ‘দ্বিতীয় ভাগ’ এর পাঠক্রমের পরিবর্তন করে অতীতে তার মূল্যকে খাটো করে দেওয়া হয়েছিল কই তখন তো আমাদের প্রচেষ্টা কোম বুদ্ধিজীবী সোচ্চার হয়ে ওঠেন নি?

রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের কাছে মমত, তেমনি বিদ্যাসাগর, স্কাক্স, নজরুল, সত্যেন্দ্র দত্ত এরাও মমত। ভারতবর্ষে আজ এখন দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভরাবহভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, বিজ্ঞানতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে কিংবা আসাধ, ওড়িশা,

ত্রিপুরা প্রভৃতি জায়গা থেকে বাঙ্গালী ত্যাগন হচ্ছে, এখন বাঙ্গালীরা তাদের নিজের দেশেও বিদেশীর মত বাস করছে, কই তখন তো বুদ্ধিজীবীরা কিছু করেন না, তাদেরও যে কিছু কর্তব্য আছে এবং তা হচ্ছে এই সমস্ত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জনমত গঠন করা, দেশীর অখণ্ডতা বোধ, জাতীয়তা বোধ প্রভৃতি জাগিয়ে তোলা—তা কি তারা তুলে গিয়েছেন?

রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত ‘মাইট’ উপাধি স্বপায় সঙ্গে ত্যাগ করেছিলেন। উপাধিটা সম্মানীয় কিন্তু তাকে ত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাঁর মনে এতটুকুও মোহ ছিল না। বর্তমান যুগে কোন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের মত এইরকম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচর কখনও রাখতে পেরেছেন কিনা বোধে সম্বোধন অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ করলেই বেশী করে রবীন্দ্রনাথ-রাগী হওয়া যায় না। তাঁর ভাবধারা, জীবন দর্শন এবং আদর্শবাহী আমরা কতটা কি করতে পেরেছি এটাই মূল কথা। রবীন্দ্রনাথকে কেউ যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করতে চান তবে তাকে অসংস্কৃতিক বা অগ্রাবীজিক বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশী করে সাধারণ জনসমক্ষে তুলে ধরা বা তাঁর জীবনদর্শনকে আরও বেশী বাস্তবমুখী করার কাজ বেকোন বুদ্ধিজীবী তথা লং মাহুই করতে পারেন।

শিশুরাই আগামী দিনের দেশের নাগরিক। তাদের সুস্থায়মতি মরল মনকে ভারমুক্ত রেখে যাতে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ হয়, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। আজ এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাশ্য, বেকারখের বয়না, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন ভরাবহ আকার ধারণ করেছে, এখন সর্বত্রই একটা অস্থিরতা ও অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে সেই সময় পড়াশুনার প্রতি ছাত্ররা যাতে আরও বেশী করে মনোযোগ দিতে পারে তার জন্য পড়াশুনাকে নিশ্চয়ই আরও আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। তা সম্ভব একেবারে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষয় থেকে যদি বিজ্ঞান সম্ভবভাবে শিক্ষানীতিকে নতুন করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়। ব্রিটিশরা তখনো বছর ধরে তাদের কারখানার শুধু মধ্যবিত্ত কেরানী তৈরী করে গিয়েছে, তাদের কিছু

ধরের বা মাহুইয়ের দৃষ্টি করেছে, আর আমরা নিরুপায় হয়ে সেই বিদেশী তথা বিদেশী ভাবার সেবা করে গিয়েছি। তারপর স্বাধীনতার তেজিগ বছর পরেও আজও কিছু আমরা সেই ধারা থেকে মুক্ত হতে পারিনি।

বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা প্রধানতঃ সমাজবদ্ধ মাহুইয়ের উৎপাদন, বস্টন, উৎপাদন সম্পর্ক, সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আদান প্রদান প্রক্রিয়া। তাই সমাজের প্রতিটি মাহুইয়েরই—তা সে সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হক অথবা গ্রামের খেটে খাওয়া রুবক কিংবা শহরের কল কারখানার প্রমিক হক প্রত্যেকেরই শিক্ষা পাওয়ার জয়-পত অধিকার আছে। আজ শিক্ষাকে আমরা বৃহত্তর অর্থে না নিয়ে কেবল-মাত্র ইংরেজদের ধার করা শিক্ষানীতি অর্থাৎ চাকুরী পাওয়ার শিক্ষার পর্ববসিত করেছি। পৃথিবীর সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ এমন কি ধর্মতান্ত্রিক দেশগুলোও শিক্ষাকে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছে। পুরনো ধ্যান ধারণা ত্যাগ করে শিক্ষাকে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তুলছে। আর আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়েও শিক্ষার সেই বৃহত্তর স্বার্থকে দূর করে সংকীর্ণ ভাবধারাকে সংস্কৃতি বলে আঁকড়ে ধরে বসে আছি।

‘সহজ পাঠ’ বাতিল হল কি হল না বড় কথা নয়, আসলে দেশকে আমরা ভালবাসি কিনা, রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি কিনা, অস্তিত্ব মনীষীদের বধ্যবৎ সম্মান দিই কিনা। যদি সত্যিই তাই হত তবে আজও কেন রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’র মত প্রকৃত একটা সমাজ আমরা গড়ে তুলতে পারছি না; পারছি না আনন্দময়ীর মত প্রকৃত ভারত-জননীকে আমাদের সমাজে তৈরী করতে, কিংবা ‘চতুরঙ্গ’র শচীনের জ্যোত্স্নাশয়ের মত একজন প্রগতি-শীল, সংস্কারমুক্ত, আদর্শ মাহুইকে গড়ে তুলতে। আসলে আমরা কেউই রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসিনা। তাই এখন দেখি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ও মাটা মকে বোনোদীপক অসংস্কৃতি মূলক নাটকগুলো দ্বিবি সংস্কৃতি মার্কা হয়ে দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করছে, সমাজের যুবশক্তির যেক্ষণকে বেকিরে দিচ্ছে, সমাজকে নোংরা আবর্জনার পক্ষে নিক্ষেপ করছে—কই তখন ত কোন বুদ্ধিজীবী এসিয়ে এসে সোচ্চার হয়ে—এই অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। আসলে আমরা মিছেদের বতটা সংস্কৃতিমান

ভাবি না কেন প্রকৃত অর্থে আমরা কিছু ঠিক তার বিপরীত।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সমাজের তথা দেশের জন্য কিছু করেছেন, তেমনি মজরুল, স্কাক্স, সত্যেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরাও কিছু করেছেন। মজরুল নিজে মূলমন্ত্র হলও সর্ব-দাই তিনি হিন্দু মূলমন্ত্রানের সন্তীতির কথাই ভেবেছেন। তাই তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আমরা উদাত্ত জাতীয়তা-বাহুই বাণী শুনে পাই, একক ভারতবর্ষের কথা শুনে পাই। তিনি যেমন বড়দের জন্য অসংখ্য কবিতা, গান লিখেছেন তেমনি শিশুদের জন্যও অনেক কিছু লিখেছেন। আবার স্কাক্স সত্যেন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তাই সহজ পাঠকে একক বই হিসেবে প্রকাশ না করে যদি তা রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা, স্কাক্স, মজরুল, সত্যেন্দ্র দত্তের কিছু লেখা নিয়ে কোন নতুন

বই হিসেবে প্রকাশ করা হয় আশা-করি তা কোন অংশেই শিশু অল্পবয়সী পাঠ হবে না। বরং তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আমরা মনে করি। অক্ষয় পরিচর, মুদ্রিত অক্ষর, লিপিশিলা ও অভ্যাস, শব্দ গঠন, উচ্চারণ রীতি, অল্পবয়সী শব্দ গঠন, বাক্য গঠন প্রভৃতির জন্য তো নতুন করে অল্প বইও প্রকাশ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেতো সেইরকম বুদ্ধি-জীবীরাও বোধে পরিমাণে আছেন। তারা যদি স্বতঃপ্রসূত হন বরং তাতে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেই বই লেখা যেতে পারে। আসলে কেন তা করা হয় না এটা আমার চেয়ে তারাই ভাল বলতে পারবেন বলে আমি মনে করি।

—সমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



ইস্টার্ন কোলফ্রিম লিমিটেড

(কোল ইন্ডাস্ট্রির একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / বেলগরে / ফেজার ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অধিবেশিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরতিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মূল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
 রেফা: নং : সি সি / কেও / ই ই (সি) সি-টেন্ডার / ৩৯১৫ তার ১৩-১০-৮০
 এরিয়া হেড কোয়ার্টারে (হেড অফিসের কাছে) ২০ ইউনিটের এন এইচ এস (একতলা) নির্মাণের জন্য। আনুমানিক খরচ এস ও আর ৭৭ অক্টোবরী ১,৩৪,৪১৫ টাকা। কেও এরিয়ার ক্যাপ অফিসে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা (সেলস ট্যাক্স সমেত) নগদে দিয়ে (অগ্রতাপ্রবোধ্য) ১২-১১-৮০ থেকে ১৭-১১-৮০ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে (রবিবার ছাড়া) কাজের সময়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের (সিভিল) অফিস, জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, কেও এরিয়া, পো: বহলা, দেলা বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে টেন্ডারপত্র পাওয়া যাবে। যারা ডাকে টেন্ডারপত্র পেতে চান, তাদের এস ও তে প্রতি সেটের জন্য অতিরিক্ত ৫ টাকা (পাঁচ টাকা রায়) পাঠাতে হবে। টেন্ডার দলিল ডাকে পৌঁছাতে দেরি হওয়ার দারিফ এই দপ্তর গ্রহণ করবে না। মূল করা খামে টেন্ডার দলিল নং, কাজের নাম, বারনার টাকা জমার বিবরণ, টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় লেখা টেন্ডার ১৮-১২-৮০ বেলা ২৩০ টার গ্রহণ করা হবে এবং তা একই দিনে বেলা ৩টার খোলা হবে। টেন্ডার প্রস্তাব টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে।

সাঁধারণ: আনুমানিক খরচের ১% বারনার টাকা সংগ্রহ অফিসারের কাছে / অফিসে অবস্থাই জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, অতথ্য টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারপত্র দেবার আগে টেন্ডারদাতাদের কাজ নেবার ক্ষমতা সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক প্রমাণ দাখিল করতে হবে, যে ব্যাপারে সংগ্রহ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

মন্ত্রী কে কেমন

১ম পৃষ্ঠার পর

স্টাট চাওয়া। এর কলে মতীনবাবু সম্পর্কে রিপোর্টারদের মধ্যে বিশেষ কনবরসী সাংবাদিকদের ধারণা বিশেষ ভাল নয়। মতীনবাবুর সঙ্গে যদি কোন কনবরসী রিপোর্টার খবরের জন্য দেখা করতে যান তাহলে তার লিখা রাকত দিনহার কাছে অসুস্থতি নিতে হবে। বাম-ফ্রন্ট সরকারের অন্ত কোন মন্ত্রীকে কেউ এটা প্রযোজ্য নয়।

এবারে আশা বাক মতীনবাবু গত তিন বছরে কি কি কাজ করলেন সে কথা। প্রথমেই আসা বাক কলকাতার বাইরে পুত হওয়ার যে সময় রাত্তা হয়েছে সেগুলি কি ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কলকাতার রাত্তাট বেধলে যেখানে চোব জড়িয়ে যায় সেখানে কলকাতা থেকে কিছুদূর বিজি রোডের অবস্থা দেখলে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায়। জগদীশ এলাকার ঘোষপাড়া রোড বা পুত হওয়ার তা আগে অব-হেলিত। সেখানে শুধু পুত হওয়ার পাথর পড়ে আছে, কলকাতার বাইরে পুত হওয়ার যে সময় রাত্তা হয়েছে তার বেশী ভাগই দেখা-শোনার অভাবে দুর্ভাগ্য। যে সব জায়গায় সন্ত্রাসি বসে আছে সে সব জায়গায় কথা বসে। কিন্তু সেখানে বস্তার নামগন্ধ নেই সেই সব জায়গায় রাত্তাঘাটের মেগামতির কাজ কেন হয় না একবার দৃষ্টিক্রমে জবাব পুত-হওয়ার লোকদের ঘোষা কথা নয়।

এই প্রতিবেদক সন্ত্রাসি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একজন বাস যাত্রী হয়ে উত্তরবঙ্গ গিয়েছিলেন। সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩৪ নং জাতীয় সড়ক মালদহ শহরে প্রবেশ করবার আগে যে অবস্থার রয়েছে তা দেখলে মনে হয় পুত হওয়ার অবস্থায় পড়ত্যাগ করা উচিত। বহরমপুর থেকে রত্ননাথগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ। এখানে যদি কোন অসুস্থ বা মহিলা বাসযাত্রী হন তাহলে তার প্রাণ-বাঁচা উঠতে ব্যাধ। মতীনবাবু কংগ্রেস মন্ত্রী ভোলা মেনকেও হার মানিয়েছেন। শুধু মতি স্থাপন। আর যেখানেই মতীনবাবু সেইখানেই টোলগুপ্ত। মেদিনীপুরে মতীনবাবুর মন্তব্যটী গেলেও টেলিভিশন লেজ যায়। তিন বছরে তার মন্ত্রণের কিছু কাজ হোক বা না হোক মতীনবাবু প্রচার যন্ত্রে আগে আস

পেরেছেন। মতীনবাবুর হাট্টালাও নাকি বহলে গেছে বলে তার সমালোচকেরা বলেন। অবশ্য মতীনবাবুর বিরুদ্ধে বড় কিছুই বলা হোক তার চামড়া এত মোটা গায়ে লাগে না।

বামফ্রন্টের এর পরের মন্ত্রী বার মাস করতে হয় তিনি ভক্তিভূষণ মণ্ডল। চীনা নেতা লিম পিয়াংয়ের অবস্থানে পশ্চিমবঙ্গের সব লিম পিয়াংয়ের আবির্ভাব ঘটিলে বামফ্রন্ট সরকার। এরকম বামফ্রন্ট নেতাদের অনেকেই ধস্তাবাহি হয়েছেন। লোকের হাসতে হাসতে বলে পশ্চিমবঙ্গের ফরওয়ার্ড ব্লক চাটটি পক্ষী বিচাচ্ছিল। পাক্ষীপক্ষী (শ্রীকান্তি ভট্টাচার্য) হস্তাব-পক্ষী (উদয়বাহী শ্রীমল গুপ্ত) মার্কন-বাহী (মহাপ্রাণ শঙ্কু ঘোষ) আর খাঁটি মিল্লবাহী (ভক্তিভূষণ মণ্ডল)।

এই প্রতিবেদককে ভক্তিভূষণ এক-দিন হাসতে হাসতে বললেন, “আমার বিরুদ্ধে গৌরনাথ ঘরের কাগজ বাই বল, আমি দুঃখের নির্দেশ যেনে চলি। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং লংগঠ-নের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক শ্রীমশোক ঘোষ।” ভক্তিভূষণ তার ব্যক্তিগত ইজিমে বিশ্বাসী। ভক্তি-বাবু মাকি ছোটবেলার খুব একটা হিঁসেল, বাবা মা তাই তাকে অনেক তিরস্কার করেছেন। একথা ভক্তি-বাবুর মুখে শোনা। ভক্তিভূষণ লঙ্কাবাহী, অদীম চ্যাটার্জী এবং তারত-চীন মৈত্রী সমিতি এদের সঙ্গে বনবন যোগাযোগ রাখা করে চলেছেন। একবার ভক্তিভূষণ-কাছে একটি বিদেশী প্রতিনিধি দল আসেন। তারা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্র উন্নয়নের ব্যাপারে বেশ কিছু টাকা খণ দেবেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে মোটামুটি ষ্ট্রি হয়ে গেছে। ভক্তিভূষণ এই প্রতিনিধি দলকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন চৈনিক প্রথার কিতাবে মাহ চাষ করা যায়। বিদেশী প্রতিনিধি দল বেশে গিয়ে রাজ্য সরকারকে জানালেন তারা খণ দিতে ইচ্ছুক নন। ভক্তিভূষণকে চরণ সিং নাকি খুব খাতির করেন। ভক্তিভূষণ নাকি শ্রীমতী ইন্দ্রা গাঙ্গীর সঙ্গেও চীন-ভারত সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলে এসেছেন।

ভক্তিভূষণকে নিয়ে যখন কিছুদিন আগে খুব সমালোচনা হচ্ছে তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের অপর নেতা এম এল এ শ্রীমঙ্গল বসু মন্ত্রী হবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এমন কি মমবার দপ্তর তাকে দেওয়া হচ্ছে বলেও

অনেক আশা প্রচার করা হয়। এই প্রতিবেদক তখন ভক্তিভূষণকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন তার হাতে তুপের তাল আছে। মমর এলেই তা ছাড়া হবে। মমবার আন্দোলনের নামে বিভিন্ন মমবার লম্বার কাছ থেকে যে টাকা মমবার ইউনিয়নকে দেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে কতটুকু আন্দোলন করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে এই টাকার মাকি নির্মলবাবু বিদেশ স্কর করেছেন। অথচ উপরুক্ত প্রচারের অভাবে বামফ্রন্ট সরকারের আন্দোলন মমবার আন্দোলন তেমন ফোর-হার হয়নি। ভক্তিভূষণ উত্তর এর জন্য মন্ত্রী হান, মন্ত্রী যে ইউ-নিয়ন মমবার আন্দোলন ফোরহার করবে বলে তার নিশ্চয়। ভক্তি-বাবুর মতে “মমবার মমবার” করে লম্বাই মাথা মাঝার কিছু মমবারের নামে যখন অস্ত্র কাজ হয় তখন এর জাগে না কেন।

মন্ত্র দপ্তরের ব্যাপারে ভক্তি-বাবুর মত, কংগ্রেস আমলে কুল-নীতির ফলে মন্ত্র উন্নয়নের কিছুই হয় নি। তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ঢোল মাকাম হয়েছে।

হলের এম এল এ ও তরুণ ফর-ওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীকান্তি সাহাকে কর্পোরেশনের কার্য-গী ডিক্টের করে সব কমতা দেওয়া হয়েছে। ভক্তিভূষণকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে কুপাসিদ্ধ সাহা মাহের ব্যাপারে কি অভিজ্ঞ ব্যক্তি? যখন তিনি পশ্চিম বঙ্গ হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান করেছেন তার হলের এম এল এ ভবানীপ্রসাদ চাটার্জীকে। যিনি ওখানকার একজিকিউটিভ অফিসারের ক্রীড়নক। রাজ্য সরকারের সব অফিসার বদলি হন কিন্তু এই একজি-কিউটিভ অফিসার গোপাল বিহারের কোন বদলী হয় না। তিনবার তিনি অল্প সময়ের জন্য বদলী হয়েও আবার মাহগুলাসনের জোরে বদলি করে এসেছেন। ডাঃ কয়াল আবেদিন, প্রফুল্ল সেন, বেণু চক্রবর্তী, অতীল সিংহা এবং ভক্তিভূষণ মণ্ডল তাকে খুব স্নেহ করেন। স্নেহের জোরে তিনি বহালতাবরতে রাজক চালায়ে যাচ্ছেন। কারণ যিনি চেয়ারম্যান তিনি কিছু বোঝেন না। তিনি শুধু রবার গ্যাম্প। টিক তেমন কুপাসিদ্ধ সাহা। কুপাসিদ্ধ সাহা মততা মন্ত্র কোন প্রশ্ন নেই। ১০৬ মাই চাষ মন্ত্র কোথা থেকে টি নং নিয়ে এসেছেন? তিন বছরে ভক্তি-বাবু মন্ত্র মাহ না খাওয়াতে পারলেও বিপ্লব এনেছেন।

অজিত পাঁজা

১ম পৃষ্ঠার পর

মেতারা অভিযোগ করেছেন, শুধু হুত মুখারী ওপর আক্রোশ যেটাতে গিয়ে অজিতবাবু খুব কংগ্রেস-টাকে হু একজন সমাজবিরোধীর হাতে গুণে দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন।

অজিত পাঁজার কার্যকলাপে প্রবেশ কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক লং বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অজিতবাবু সাধারণ সম্পাদকের এবং পেটোরা ছাড়া অজিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কোন রকমভাবে কান করতে বিচ্ছেদ না। গত মন্ত্রা-কলকাতার কেন্দ্রীয় লেচ মন্ত্রীর মতা দুই সাধারণ সম্পাদককে না জানিয়ে করার অনেক কংগ্রেস নেতাই মন্ত্র।

জানা গেছে সন্ত্রাসি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী প্রাণ মুখারীর সঙ্গে আন্দোলনোপাল মুখারী, কে বি হেজী, কাজী আবদুল গফফর, হুত মুখারী, আবদুল সাত্তার প্রভৃতি নেতাদের এক গোপন বৈঠকে টিক হয়েছে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাখা লংগঠনের তরফ থেকে লিখিত অভি-যোগ কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে পেশ করা হবে। তাছাড়া প্রবেশ কার্য-ক্রম পরিচালনা করছেন দিয়েও অজিতবাবুর বিরুদ্ধে লিখিত অভি-যোগ পেশ করা হবে।

প্রাণবাবুর কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে এই নেতারা এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে অজিত পাঁজার বিরুদ্ধে বলীর মূল্য তুলে অভিযোগ যোগাড় করছেন।

মিথ্যা কথা বলেন

১ম পৃষ্ঠার পর

সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হৈ চৈ করে। ও-টিতে পাঠানো হয়েছে বলা-সংঘ ও-টিতে কেন পাঠানো হয়নি জানতে চায়।

হেলের গোলমাল দেখে আমি তপনানন্দ মিত্র করে তপনানন্দকে ডাকেন এমালি ওয়াটে গিয়ে কথা বলার জন্য। কিন্তু তিরে, ঢুকে বড়

গেটে ভাড়া দিতে বলেন এবং তার-পর অগ্রিমুতি ধারণ করে ওয়াটে-র-মুখে তিনিও তপনানন্দকে কিল খুঁচি মারতে আরম্ভ করেন। আমিও নিজেই বাঁশ দিয়ে পেটাতে থাকেন। তপনানন্দকে কপাল ও চোখের নীচের অংশ কেটে গিয়ে রক্ত করতে থাকে। এই আক্রমণের সময় মিলম ঘোষের দ্বিধা পাঁজরে খুঁচি লাগে। কয়েক-জন ভক্তাদের হস্তক্ষেপে এই মারধর বন্ধ হয়।

ইতিমধ্যে টালিগঞ্জ থানার গুপ্ত-বাহু ও পুলিশ আসে। গুপ্তবাহুর পরামর্শেই তপনানন্দকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়াসহনে করে টালি-গঞ্জ থানার আমি তপনানন্দকে বিচ্ছেদ ডাকারি করা হয়। কিন্তু পুলিশ বাতে বাঁজী ও হালাকাণ্ডী ওয়াটে-বরদের বিরুদ্ধে কেনের তরফ না করতে পারে সেজন্য আমি তপনানন্দ ওয়াটে-বরদের আন্দোলনকার পজি-কার এমটা অধন্য বিবৃতি দিয়ে লাকাই গিয়েছেন যে, পুলিশ ডাক-হের উপর কোন লাঠি চার্জ করেনি। তিনি-বে ওয়াটে-বরদের সঙ্গে তপনানন্দ ও অজিতবাবু-পটিকেছেন, তা কিন্তু আমিও যেমলুম চেপে গিয়েছেন।

শিশুদের পাঠ্য

১ম পৃষ্ঠার পর

দেয় মতামত চান। কমিটি এ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে কমিটির বৈঠক শুরু হয়।

১৯৬৪-৬৬ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, আই. বি. প্যাটেল কমিটির রিভিউ রিপোর্ট ইত্যাদি গভীরভাবে বিবেচনা করা হয়। দু'ছয় পরিপ্রসর করে কমিটির সকল সন্ত্র একমত হয়ে একটি নতুন পাঠ্যতালিকা ও সিলেবাস তৈরী করেন যার মধ্যে প্রথম ভাবার কোর্সের কথাও ছিল।

কমিটির মতে, যদিও রবীন্দ্রনাথ অতুলনীর তথ্যপি স্কুলার রায়, লত্যান হুত ও নরুপ ইসলামের মজার লেখা পিত পাঠ্যতালিকাতুল্য না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। মেহনতী জনসাধারণ ও প্রবেশ প্রতি বঞ্চিত মাহা-মেহানোর শিক্ষাও পিতদেরকে দিতে হবে। এরকমই পিতদের উপরুক্ত প্রথম ভাবার একটি বহু তৈরী করা হয়।

জাতীয় ঐতিহ্যকে অদম্যমান করা কখনই বা-ফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছা নয়, বরং শিক্ষাকে আরো উন্নয়নক করাটাই ইচ্ছা। তবে এ বিষয়ে যে মতামতের বৃদ্ধি বহিছে তা অবশ্যই কাব্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পান্ড

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্যায় প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। পরমাণু ও কেন্দ্রীয় / ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / ২১০০

২। পরমাণু ও কেন্দ্রীয় গঠন পরিচয় / ডঃ মনোজনাথ ঘোষাল / ৩০০০

৩। রাজা হুবাথ রাজক ফোরার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং ১৯৭৭ কাষায় ৩১, মট সেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে রাজ্য ই-কংগ্রেসে প্রচণ্ড বিভেদ

দুপল

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : ৪০শ সংখ্যা : শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর, ৮০। ৬০ পয়সা

বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থে কেন্দ্র রঙিন টি ভি চালু ক'ছেন

তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের পরামর্শ-
তা কমিটির সভাপতি শ্রীযোতির্ময়
দুর্গমসম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে
বলেন যে, ভারতের মতো গণ্য
দেশে প্রায় চারশো কোটি টাকা খরচ
করে রঙিন টি ভি চালু করা খুবই
অর্থোক্তক, একটা বিজ্ঞানসিদ্ধান্ত।
পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকেও তিনি
একথা বক্তব্য করেছিলেন। রঙিন টি
ভি চালু হলে বর্তমান টি ভি সেট-
গুলো অকাজ হয়ে যাবে। শ্রীমন্ত
লক্ষ্মী-জাপানী এক মাটি-আশা-
নাল কোম্পানীর চাপে পড়ে কেন্দ্রীয়
সরকার এ কাজ করছে। এছাড়া
রঙিন টি ভি ছাড়াও পকেট কলিকর।
মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে সে
ফল পেয়েছেন। বোম্বের আরবান
ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের অধি-
কর্তা ডঃ রামেশ্বর রঙিন টি ভি চালু
করার বিরোধী কার্যক্রম এর
ফলে স্থানীয় হানি হবে। রঙিন টি
ভি অন্ততঃ দুই থেকে তিন বছর
উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে-
বিশ্বের ভাগ মানুষই ছোট ছোট ঘরে
বাস করে।

শ্রীমন্ত তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের
পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে দাবি
করেছেন যে ভারতের প্রতিটি বেতার
কেন্দ্রের জন্য একটি করে উপদেষ্টা
কমিটি চাই। উক্ত উপদেষ্টা কমিটিতে
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি
থাকবে। সমস্ত থাকবেন রাজ্য
থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য-
রাও।

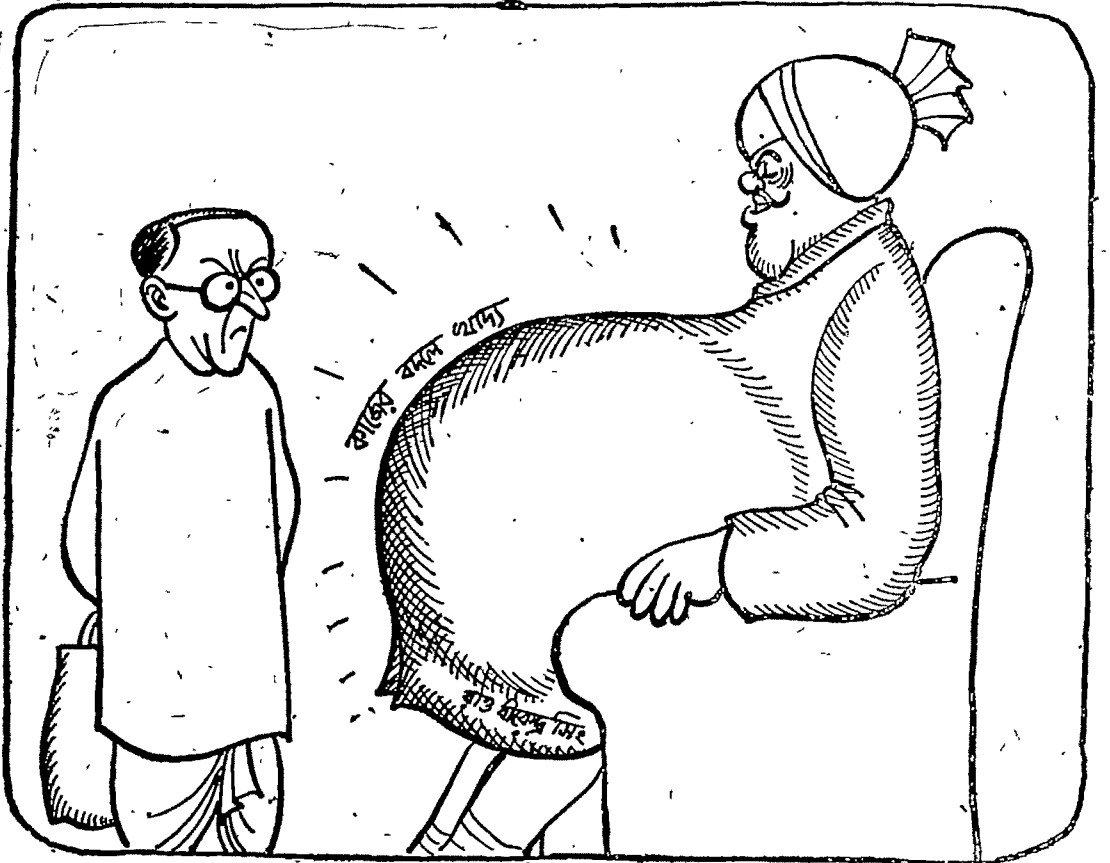
জ্যোতির্ময় বাবু কলকাতার
দুর্গমসম্প্রতি ব্যাপারে আগের প্রসারিত
করতে বলেছেন। আসানসোল ও
মুর্শিদাবাদের প্রসারিত কেন্দ্র দুটির
কাজ প্রসারিত করতে বলেছেন।
শ্রীমন্ত সাংবাদিকদের বলেন যে,
বম্বে ও মাদ্রাসার সিনেমা শিল্পের
রাবব বোম্বাইয়ের বাণী চলচ্চিত্রকে
গ্রাস করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে
সরকারের প্রসারিত বচরে বারো
মাসের বাংলা ফিল্ম অথবা পশ্চিমবঙ্গে
তৈরী ফিল্ম বাধ্যতামূলকভাবে
প্রতিটি হলে দেখানোর খাড়া আইনটি
কেন্দ্রীয় খণ্ডে মন্ত্রক কেন 'বিবেচনা
করবে তা' নিয়েও শ্রীমন্ত বক্তব্য
রাখেন।

জাতীয় নিরাপত্তা অডিটরিয়ে রাজনৈতিক বিরোধী গ্রেপ্তার

জাতীয় নিরাপত্তা অডিটরিয়ে গত
২২ সেপ্টেম্বর যে যিত হওয়ার পর
থেকে বিহার সরকার রাজনৈতিক
বিরোধীদের ধরশাকড় শুরু করেছে।
আগামী ২৭ নভেম্বর বিহার বন
উপলক্ষে ইতিমধ্যেই সেখানে পুলিশ
এ অডিটরিয়ে সি, পি, আই, এমের
বারোজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।
গত ১১ নভেম্বর বিহারের প্রখ্যাত
মার্কসিস্ট কো-অডিনেশন নেতা এ,
কে, রায় (এম, পি,) এবং কৃপাশঙ্কর
পার্মি।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মেতাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন
ভাঙার ব্যাপার নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস আর ছয় মাসের বেশী বামফ্রন্ট
(ই) বলে প্রচণ্ড মতভেদ দেখা সরকারকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায়
দিয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের বরকত- থাকতে দিলে বলের ভবিষ্যৎ
অভিত পাজী গোষ্ঠী এখন ক্রমশঃ অন্ধকার।
ইন্দিরা পাজী সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় বরকত নাহেবের নেতৃত্বে রাজ্য

কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা দিল্লীতে
সম্প্রতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতার সঙ্গে
বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়ার
ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন।
জানা গেছে বরকত নাহেব সব থেকে
বেশী উৎসাহ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
সি এম স্ট্রিকেনের আশ্বাসে। স্ট্রিকেন
মাকি বরকত নাহেবের সঙ্গে একমত
হয়ে বলেছেন এখুনি, বামফ্রন্ট সর-
কারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দর-
কার। স্ট্রিকেন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়
কেরল এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সর-
কারকে ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারেও
আগ্রহী।
শেষাংশ চম্পূর্ণ



চিটফাণ্ডের ফন্দি ফিকির তদন্তের জন্য রাজ্য পুলিশের বিশেষ সেল

চিটফাণ্ডের চিটিবাজীর ফন্দি
ফিকির খুঁজে বের করার জন্য সর-
কার নির্দেশক্রমে পুলিশের একটি
বিশেষ সেল খোলা হয়েছে বলে
জানা গেছে। এই সেল তৈরী
হয়েছে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য
পুলিশের বাছাই করা অফিসার
নিয়ে। এই সেলের কাজ হল চিট-
ফাণ্ডগুলির অর্থ সংগ্রহ করার কার্য
কাহনের খোঁজ নেয়া এবং তাদের
টাকা-খাটানোর বিষয়টি নিয়ে অন্-
বধান করা।

কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য যে
শতাধিক চিটফাণ্ড আছে সেগুলিকে
গুলিতে ফেয়ার জন্ম রাজ্য সরকার যে
নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশকে
উপেক্ষা করে বড় বড় চিটফাণ্ড সংস্থার
গুলি সুবাদপক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়ে
বলেছে যে, রাজ্য সরকার প্রদত্ত
নোটসের আওতায় তাদের সংস্থা
পড়েনা। এই বিজ্ঞাপন জনমানসে
মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।
বড় বড় চিটফাণ্ডগুলি শতকরা
৩৬ টাকা দিয়ে গ্রাহকদের আকৃষ্ট
করে অর্থ জমা রাখার জন্ত। তাই
বহু ব্যক্তি তাদের সঞ্চয়ের প্রায় সব-
টাই জমা দিয়েছে এই সব অর্থ জমী-
কারক সংস্থার কাছে ব্রাহ্মণিক

মোট। হুদের আশায়। তবে এদের
ধরা একটু সময় লাগে। কেননা
এরা কাগজে কলমে কোথাও ৩৬
শতাংশ হুদ দেবার কথা বলেনি।
সবটাই মো.বহ।

ডেপুটি স্পীকারের সরকার বিরোধী কার্যকলাপ

বামফ্রন্ট ভুক্ত কংগ্রেসার্ড ব্রহ্মচর্যের
এম, এল এ ও বিধানসভার উপাধক্ষ
জনাব কলিমুদ্দিন শায়ের কার্য-
কলাপ নিয়ে বহুদিন ধরেই বহু অভি-
যোগ উঠেছে। এবারের অভিযোগ,
তিনি মাকি বামফ্রন্ট সরকারের
বিরুদ্ধে যত্নব্র করছেন।
বামফ্রন্ট সরকার পিরারলেন,
ফেবারিট, সফিতা ইত্যাদি সংস্থার
কাজকর্ম গোটানোর আদেশ দিয়ে-
ছেন। এখন বামফ্রন্টের মত হল,
পিরারলেন, ফেবারিটের মতো সংস্থা-
গুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধি-
গ্রহণ করা উচিত।
অথচ গত ৩১ অক্টোবর সেপ্ট
শেষাংশ চম্পূর্ণ

সম্পাদকীয়

কমলাপতি ত্রিপাঠীর ভীষ্মরতি

উপস্থাপিত রাজনৈতিক ডিগবাজী থেকে থেকে কমলাপতি ত্রিপাঠী প্রকাশ করলেন যে, তাঁর বয়স হয়েছে; স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমত্তা এবং মনোবল চিত্তার শক্তি তিনি ক্ষত হারিয়ে ফেলছেন। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রেল দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিকল্প সমালোচনামূলক মন্তব্য করার ত্রিপাঠীকে সতর্ক করে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো চাকলা সৃষ্টি করেছিলেন। মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের প্রতি তাঁর এই তক্তি-প্রজ্ঞা দেখে ত্রিপাঠী সংসদীয় গণতন্ত্র-প্রিয় বাহুবীরের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন। বাস্তবিক, প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর মন্ত্রিসভার অন্ততম সদস্য সম্পর্কে নামোন্মেষ না করেও এ-ধরনের অসৌজন্যমূলক উক্তি করার শ্রীমতী গান্ধী বেশ খানিকটা বিপাকেও পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে একাধিকবার বেন বিবরণী হালকা করে খীর হঠ-হঠকারিতার দোষ কালন করার জন্য প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে, রেলমন্ত্রীর কাছে তিনি আদৌ অসন্তুষ্ট নন, ত্রিপাঠীর সমালোচনা করাও তার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কোণঠালা ইন্দিরাকে কমলাপতিই আবার সুবিধাজনক স্থানে টেনে নিয়ে এলেন।

এখানে-সেখানে পূর্বনির্ধারিত নুতা-সমিতির দায় সেয়ে ত্রিপাঠী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন - করেও যখন রেলদপ্তরে হাজিরা দিলেন না, তখন লজ্জাই ধরে নিয়েছিলেন যে তার পদত্যাগের সিদ্ধান্তই পাকা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপোষরকার পর অন্ত কোন দপ্তরে এসে কমলাপতি যোগ দিতে পারেন, কিন্তু রেল দপ্তরে কখনই নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ত্রিপাঠীকে বুড়ো বয়সে মাথা মুড়িয়ে রেলমন্ত্রীর সেই জীব, পরি-ত্যক্ত গৃহিতেই এসে বসলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পুনর্মুখিক হওয়া ছাড়া কমলাপতির সামনে বিতীয় কোন পথ ছিল না। বরং কিরে এসে তাঁর শূন্য আদন টি অপূর্ণ দেখে তিনি বেন হাতে বর্গ পেলেন। অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গিয়েছে বুকে তিনি প্রধান-মন্ত্রীর প্রশংসার উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠ-লেন, নিজের ভাগ্যতারকাৎকে ধন্যবাদ জানালেন। আর একদিন ঘেরি করে অফিসে গেলেই তাঁর চাকরিটি গিয়েছিল আর কি। তখন এই

বয়সে ক্যা-ক্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া ত্রিপাঠীর আর কী করার থাকত ?

বয়সের ভারে বুদ্ধি হ্রাসবাহী কমলাপতি রেলমন্ত্রীপদে ইচ্ছাকৃত মাধ্যমে বুড়ো হাড়ে ভেলু কি দেখা-তেই চেয়েছিলেন। তিনি ভেবে-ছিলেন, চাপ দিয়ে এবার তিনি ইন্দিরার কাছে থেকে সুদে-আসলে তাঁর প্রাণ্য আহার্য করবেন। দপ্তর গান্ধীর আপত্তির কারণে তিনি খীর পুত্র লোকপতি ত্রিপাঠীকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসাতে পারেন নি। এই মওকায় হরতো তিনি-নিজের জন্য একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এবং সেই সঙ্গে পুত্রের জন্য উত্তরপ্রদেশের সুবেদারী হুটোই পেয়ে যাবেন। তাগে এবার শিকে ছিঁড়বে ধরে-নিরেই তিনি প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে হয় কথাকথিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ইম্পাত বা বাণিজ্য কোন দপ্তরের প্রস্তাবের টোপ পেলা থেকে বিরত হয়েছিলেন। কিন্তু হায়, এত কাল ধরে নিত্যসঙ্গী থাকার পরেও কমলাপতি এখনো ইন্দিরাকে চিনতে পারলেন না, তার রাজনৈতিক অভি-দক্ষিতে ঠাহর দিতে পারলেন না। বনের পাখি ও হাতের পাখি হুই-ই উড়ে যায় দেখতে পেয়েই ত্রিপাঠীকে শেষ পর্যন্ত কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হলেন। মইলে যে বাকি জীবন তাকে হতাশার-আকশোষে মাথার চুল ছিঁড়ে ছিঁড়েই কাটাতে হবে। মাথার কমলাপতির চুল আর আছেই বা কটা? ত্রিপাঠীকে তার পুরনো দপ্তর কিরে পেলেন নত, কিন্তু তাঁর দপ্তরের কালক্রম যে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং তার দপ্তর দেশের শিল্প উৎপাদন তথা অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে বিপর্যয় ঘটেছে—সমীক্ষা রিপোর্টের মাধ্যমে একথা জানার পর ইন্দিরাজী এখন রেল বোর্ডের পরিচালক মণ্ডলীতে রত্নবদল ঘটিয়ে ঝিকে মেয়ে বোকে শিকার দিলেন। দেখার বিবর, বুড়ো বয়সে ভীষ্মরতির পরিচয় দিয়ে কেলে কমলাপতির কী ক্যানাই না হল। কিন্তু ত্রিপাঠীর যে সত্যই ভীষ্মরতি ধরেছে এবং ইন্দিরাজীর চাল বুঝতে তিনি যে সম্পূর্ণ অক্ষম তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে ইন্দিরাজী তা বুঝিয়ে দিলেন।

দেশ কাল রাজনীতি

ইন্দিরার উসকানি

ভারতপুত্র

মাস থেকে আগে মালদা-হাজিলিঙের মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম-বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে অশোভন প্রয়োচনামূলক সমালোচনা করে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিতীয় আঘাতটি হানলেন কেরালার বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যেরই হাওয়া-বাতাসে নিশাস নিয়ে। শ্রীমতী গান্ধীর অভিযোগ: কেরাল সরকার নাকি রাজ্যের বিরোধী দলগুলিকে মুছে ফেলে দিতে চাইছেন, সংখ্যা-লঘুদের প্রতি নির্ণয় ব্যবহার করছেন ইত্যাদি।

যতাবতই কেরাল সরকারের প্রধান দুই শরিক মার্কসবাদী কমি-উনিষ্ট পার্টি ও সি পি আই-র দুই নেতাই এম এম নাসিরুদ্দিন এবং এন ই বলরাম প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ ও অধোক্তিক আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর এ আক্রমণ যে পূর্ব-পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—এটা এখন দিবালাকের মতো স্পষ্ট। তিনি তথাকথিত নিখিল ভারত আইনজীবী সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে পরোক্ষে দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রচার বহলে প্রেসিডেন্ট প্রচার শাসন প্রবর্তন করতে চান। ফ্রান্সের দ্য গলের মতো রাষ্ট্রপতির হাতে সরকার বা প্রশাসন, আইন সভা এবং বিচারালয়ের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চান। আর অবশ্যই সংবিধানের তদ্বৎসারী সংশোধন করে সঙ্গীত রেডিকে রাষ্ট্র-পতির আসনে রাখতে চান না, নিজেই সে গদি দখল করতে চান। সেজন্যই তিনি লোকসভার নির্বা-চনের আগে কাজ করার মতো কেন্দ্র সরকার গঠনের ডাক দিয়ে প্রথমে কেন্দ্র সরকারী ক্ষমতা হাতে নিলেন এবং নিজে প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করলেন। বিতীয় কেন্দ্রে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই ধরনের সরকার চাই ধনি তুলে দেশে একতরঙ্গী সরকার গঠনের ক্ষেত্র রচনা করলেন। এক হল, এক নেতা—এ ধনিতো ক্যানি-জম বা বৈরতত্ত্বের বুলি। আর ইন্দিরা গান্ধীর লক্ষ্যই সংসদীয় গণ-তন্ত্রের সমাধি সম্পন্ন করে তার ওপর বৈরতত্ত্ব ও ব্যক্তি শাসনের ইমারত গড়ে তোলা। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার রয়েছে বামপন্থী সরকার,

সেজন্যই তার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কারণ সরকার তিনটিই যে কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্যগুলোর চেয়ে লব-দিক থেকে ধের, এটা আর ভারত-বাসীর কাছে গোপন করা যাচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের প্রতি কী আচরণ কংগ্রেস ই সরকার করে চলেছে, হরিজন আদিবাসীরা কী ব্যবহার পেয়ে এসেছে, নারীদের সম্মান কোথায় মেমে গিয়েছে তা আর কারো অজানা নেই। কেরালার সংখ্যালঘু বা বিরোধী দলগুলো যে ব্যবহার বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার কাছে পাচ্ছেন, ভারতে সংখ্যালঘু বা বিরোধী দলগুলো শ্রীমতী গান্ধীর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেই তা পান না। তবে কারেই খাওঁর তল্লাহাৎকরা

সুন্দরবনের নদীগুলিতে ডাকাতিদের বেপরোয়া উৎপাত

সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলিতে জলডাকাতের উৎপাত ইহা নিঃসংশয়। বেড়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। উৎপাত বরাবরই ছিল। তবে সম্প্রতি তা বেড়েছে। এই জল-ডাকাতদের আত্মা হল সুন্দরবনের পূর্বদিকে বাংলাদেশ সীমানার নিকট বিজ্ঞানদীর একটি দীপে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মাতলা, ঠাকুরম, মুড়িগলা ও মনি মাতলা প্রভৃতি মন্বীতে যারা মোটরলঞ্চ চালান তারা সকলেই জলডাকাত-দের আত্মা চেনে। এই সব জল-ডাকাতরা মাহ ধরা জেলের ওপর প্রায়ই লুণ্ঠরাজ চালায়। গোমরা, ভূবনেশ্বরী চর, বিনোদপুর, কুলতলী, কাকদীপ, বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি গ্রামের মাহ ধরা জেলেরা মতই ভয় করে জল ডাকাতদের। এই সব মাহ ধরা নৌকার জেলেরা প্রায়ই জল ডাকাতদের হাতে-ধরা পড়ে। দিতে হয় “বার্ষিক নজরানা”। জেলে নৌকোকে আটক করে জল ডাকাতরা কোন একজনকে জামিন রেখে বাকি-দের ছেড়ে দিয়ে তিনদিন অথবা চারদিনের মধ্যে মুক্তিপণ দিয়ে যেতে বলে। জল-ডাকাতরা বা দাবি করে তা অভিনব। এরা দাবি করে সুরের তেল, কেরোসিন তেল, নুদি, গুড়, পরিধের বস্ত্র ইত্যাদি। এসব পেলে জলডাকাতরা পরবর্তী

—বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ই জনসংখ্যার এম এম এবং শ্রীমানদের একাংশ এ-ভূমিকাই পালন করে থাকে—বামপন্থী সরকারের কাছে আগের মতো শোষণ ও নির্যাতনের সুযোগ পেতে পারেনা।

শ্রীমতী গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে একটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জনসাধারণকে উদ্ভান দিলেন। এ অসুত কাও অন্ত কোন কেডারেল রাষ্ট্রে অকল্পনীয়। ইতি-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ এবং দীনেশ সিং কমিটির মাধ্যমে ত্রিপুরার সরকারের বিরুদ্ধেও শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষকে ১৯৭১ সালে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। তাঁকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে এটা ১৯৮০ সাল। তার দলের আভ্যন্তরীণ কলহ কোঁদলের মানি চাকরার জন্য বিরোধী পক্ষ বা অকংগ্রেস (ই) সরকারের মুণ্ডপাত করার পুরনো কোণাল আজ অচল। তেমনি অচল আর এম এম জনসংখ্যী নিয়ে সুবিধাবাদী জোট গড়ার প্রচেষ্টা।

এক বছরের মধ্যে এই সব জেলের কিছু বলে না।

মাহ-ধরা জেলেরা পুলিশের কাছে জলডাকাত সম্পর্কে কিছু বলতে ভয় পায়। কেননা তারা জানে যে, পুলিশের সঙ্গে জলডাকাতদের মালিক বন্দোবস্ত আছে। রাসের একটা নির্দিষ্ট দিনে বিজ্ঞানদীর আশেপাশে কুলতলী ধানার লঞ্চ এবং জলপুলিশের লঞ্চকে ঘোরাকেরা করতে দেখা যায় বধরা নেবার জন্য। তাই জেলেরা পুলিশকে কিছু বলতে ভয় পায়।

জল-ডাকাতরা কখনও জেলের সঙ্গে নিজের জাল নৌকো বদল করে নেয়। জেলেরা ডাকাতদের কাছে কানাকাটি করলে জলডাকাতরা জেলের নিয়ে যার চুলকাটির খীপ বা শুকনীর খালে যেখানে অচল মাল। তবে চুক্তি যাতে মাহ বিক্রীর অর্ধেক টাকা ডাকাতদের দিতে হবে।

সুন্দরবন অঞ্চলে যেসব সরকারী লঞ্চ চলে তার চালকদের সঙ্গেও এই সব জল-ডাকাতদের বোঝাপড়া থাকে। জল-ডাকাতদের অত্যাচার রূপে বড় বড় অফিসার আসতে পারে তাই সরকারী লঞ্চ চালকদের সঙ্গে জল-ডাকাতদের চুক্তি থাকে যে বিপজ্জ থাকলে নির্দিষ্ট সংখ্যক হা-বাজালেই তারা পা-চাকা দেবে।

অসহায় জেলেরা জল-ডাকাতদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শোনা যায় এই জলডাকাতরা সকলেই নাকি বাংলাদেশি নাগরিক। জল-ডাকাতদের এই স্বর্গরাজ্যের পতন কবে ঘটবে তা কে জানে?

অর্থনৈতিক বিপদ সংকেত

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রোনাড রেগনের বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নতুন বিপদ সংকেত সৃষ্টি করেছেন। নব-নির্বাচিত তাবী মার্কিন রাষ্ট্রপতি আগামী ২০শে জানুয়ারী সরকারী-ভাবে কার্যভার গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে পরাক্রান্ত রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার অস্থায়ীভাবে সরকারী দায়িত্ব পালন করছেন।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তার প্রথম সাংবাদিক সন্মেলনে রিপাবলিকান দলের চরম রক্ষণশীল আশয়ের প্রতিনিধি রোনাড রেগন যে নীতি ঘোষণা করেছেন সেটা অর্থনৈতিক সংকট চর্কুরিত পুঁজিবাদী বিশ্বের পক্ষে রীতিমত আশঙ্কাজনক। রোনাড রেগন ঘোষণা করেছেন যে তার রাষ্ট্রপতিত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় একমাত্রকর্তৃত্বী সরকারগুলির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানাবেন, পশ্চিম ইউরোপ এবং সোভিয়েতভুক্ত দেশ-লৈকে মার্কিন নীতির প্রাধান্য বিনে নিতে হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তির অবস্থান থেকে আলোচনা করবেন।

এই ধরনের উপনিবেশবাদী রক্ষণশীল মনোভাব তৃতীয় বিশ্বের দ্বিধা দেশগুলির প্রতি এক সাংবাদিক-বাসী হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিদ্যায়ী প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মন্তব্য করেছেন যে দুনিয়ার সব দেশের উপর মার্কিন আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই। কিন্তু রোনাড রেগন তা মনে করেন না। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে আগামী চার বছরে মার্কিন অর্থনীতির আধিপত্য প্রসারের চেষ্টা সর্বপ্রথম ইউরোপের দেশগুলির দিক থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হবে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা-বাজারে প্রতিযোগিতায় জাপান ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের দেশ-গুলির কাছে পিছু হটছে। মার্কিন ইন্দ্রাণ্ড ও মোটরগাড়ি শিল্প ইউরোপীয় দেশগুলির রপ্তানীর উপর প্রচণ্ড মূল্যকম তক প্রবর্তনের ভয়ে ব্যতিত করেছে। বস্ত্র ও তৈরী পোশাক পরিচ্ছদের রপ্তানীকেও মার্কিন আন্তর্জাতিক তৎবুদ্ধির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে জাপান, ইউরোপ, এমন কি চীন, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধেও মার্কিন বাণিজ্যিক তৎপ্রাচীর খাড়া করা হচ্ছে।

অতদিকে রোনাড রেগন মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থব্যয়ের অঙ্গীকার করেছেন। অর্থাৎ এই সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল ক্ষতি ও মূল্যবৃদ্ধির পাপ-চক্র তৈরী করে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য হ্রাস করেছে। অতএব সেই পথে মার্কিন অর্থনৈতিক প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়ে থাক, বরং দিন দিনই আমেরিকার শিল্প সামর্থ্য, প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা এবং ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে। দেশে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চিরায়ত রক্ষণশীল কার-বার অর্থ দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে সামরিক বল-প্রয়োগের দিকে এগোতে হবে। অর্থাৎ অবিলম্বে পারস্য-উপদ্বীপের এলাকায় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধ এই হস্তক্ষেপের স্বযোগ ইতি-মধ্যেই সৃষ্টি করেছে। মার্কিন পদ-বন্দীদের সমুদায় এই হস্তক্ষেপের আওতাধীন হয়ে উঠতে পারে।

জানুয়ারী

বর্তমান বিশ্বে বছরে ৪৫০০০ কোটি ডলার সামরিক ব্যয়ে ব্যরত হয়ে বাবে বলে বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে। ১৯৭০ সালের ডলার মূল্যের ক্রয় ক্ষমতার অঙ্গুপাতে এর পরিমাণ ২৯০০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত দশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের মোট মূল ক্ষতিতির হার প্রায় ৩৬ শতাংশ। বহিন নতুন-প্রেসিডেন্ট রোনাড রেগনের রক্ষণশীল নীতি কার্যকরী করার চেষ্টা হয় তাহলে বিশ্বের ধনী ও হিত্তি দেশগুলির মধ্যে এখন যে বৈষম্য রয়েছে তা বছর বছর আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে এই বৈষম্যের হার নিম্নাট। যেমন ধনী শিল্পায়িত দেশগুলির মাথাপিছু গড়-উৎপাদ বার্ষিক আর ১৯৭৪ সালে ছিল ২২০৪ ডলার, এই দেশগুলির মোট জনসংখ্যা ১১০ কোটি (পূর্ব ইউরোপ সহ), সেখানে লাতিন আমেরিকার অল্পমাত্র হিত্তি দেশগুলির জনসংখ্যা বৎসরকমে ৩৫৮ কোটি এবং গড়পড়তা বার্ষিক মাথাপিছু আর মাত্র ২৭৮ ডলার। অত-দিকে ভারত সহ এশিয়া ও আফ্রিকার গরীব দেশগুলির জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আর বৎসরকমে ২২০ কোটি এবং ১৮৬ ডলার মাত্র।

রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর পদত্যাগের কারণ আরও গভীরে

রেলমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর পদত্যাগ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের জন্ম মন্ত্র। এর কারণ আরও গভীরে, নইলে প্রধানমন্ত্রী রেল মন্ত্রণের কাজ কর্মে ধনী মন এককম মন্তব্য করতেই কমলাপতি পদত্যাগ করে নিজের রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলবেন, এমন মাহুষ তিনি মন। অতঃত বৃদ্ধ বয়সে সর্বসর্বা ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি খানো রাজনীতির অভ্যন্তরে বাবার পথ ধরার প্রসঙ্গ উঠে না। তিনি পদত্যাগ করার নির্দেশ পেয়েই এরকম কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে নরকে দেবার ভয়েই ইন্দিরা

মহা রক্ষণশীল মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাড রেগন এই বৈষম্যকে কেবল স্বামী করতেই চান এমন মন্ত্র, তিনি যে আধিপত্যবাদী নীতি ঘোষণা করেছেন তার ফলে পুঁজিবাদী বিশ্বে ধনী ও হিত্তি দেশগুলির মধ্যে মনিব ও ক্রীতদাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আর্থিক বৈষম্যের মাত্রা অনেক বেশী বেড়ে যাবে।

বলা বাহুল্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পায়ে মার্কিনী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে কোন প্রয়াস ইউরোপ মহা-সম্মিলিত বিশ্বের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে বাধ্য। রোনাড রেগন-তার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। খাল মার্কিন মূল্যকেও তার নীতির প্রতি বিরোধিতা তীব্র হবে। ইতিমধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকার হাকার ছাত্র রেগন নীতির বিরুদ্ধে বিকোভ প্রদর্শন করেছে।

অতদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বেড়ে চলেছে। মন্ত্র শিল্প ও শেয়ারের বাজার তেজী হয়ে উঠেছে। কারণ অল্প ভবিষ্যতে বিরাট আকারে যুদ্ধ বেধে গেলে সামরিক লাজ সংগ্রামের চাহিদা বাড়বে বটে কিন্তু উন্নয়নের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাবে। তাই দক্ষিত অর্থ নতুন কৃষীর বহলে সোনা মজুতের দিকে ঘাবড়িয়েছে। এক কথায় রোনাড রেগন যে নীতি ঘোষণা করেছেন তার ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রচুর খোঁজাখোঁজ হয়ে উঠেছে। আগামী দিনের পক্ষে এটা এক অবশ্যজ্ঞাবী বিপদের সংকেত।

গান্ধী নিজেই এটা স্বচকুরভাবে নেপথ্য থেকে ঘটালেন। না হলে, অযোগ্য মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীমন্ত্রীর অনেকেই আছেন। আর যারা যেটুকু যোগ্য-তার পরিচয় এ পর্যন্ত দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কমলাপতি যে এককম স্থান পাবেন না এমনও নয়। তাছাড়া তাঁর ধরনের বহন ভাল ভাল কাজের নতীর সৃষ্টি করার বন্দোবস্ত চলছে তখন এরকম ঘট গেলে তার প্রতিফলিতা ভালর দিকে না গিয়ে সমস্তকেই বরং মর্জিত হবে। তা জানা-সত্ত্বেও গুরুতর দেরকর কিছু ঘটলেই প্রধানমন্ত্রী কমলাপতি-কীকে বেশ জোর রকম ধাক্কা এভাবেই দিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য উত্তর-প্রদেশে কমলাপতি ও তাঁর পরিবার যেভাবে রাজনীতিতে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং জনের মধ্যে ঘন ও হাকাতাভিত্তিতে মর্জিত বিচ্ছেদ তাকে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। একে সেখানে লাস্ত্রদারিক দ্বন্দ্ব হাকাতা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব, কালোবাজারী জাকিয়ে উঠেছে তার উপর নিজের হৃদয়ের ভেতরে কমতার ভোগ বহন নিয়ে দারুণ ঘন ও হাকাতা চলছে। আর এ অবস্থার মূল মায়ক কিনা কমলাপতি ত্রিপাঠীর পুত্র রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লোকপতি এবং তার ভাই মারা-পতি। এরা নিজেদের সমর্থকদের নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছেন। প্রশাসনে অনতিজ মুখ্যমন্ত্রীকে আমল দিচ্ছেন না। শুধু কি তাই? মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সমর্থক-দের হেনস্থা করার কাঁধে ফেলছেন। মুখ্য লচিব লম্বত কিছু মাথা মাথা অফিসার যারা ত্রিপাঠীর মনো-রঞ্জন বেশী প্রয়োগ ছিলেন তাঁদের বহল করে প্রশাসনে কাজের পরি-বেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেও মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ কোন কদই পাচ্ছেন না। আর জনের অবস্থা সামান্য দিতে তো নয়ই। তাই বিশ্বনাথ নিরপায় হয়ে কমলাপতির পুত্র লোকপতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে জানান কিভাবে লোকপতি আলাদা করে তাঁর মন্ত্রিমন্ত্রীর পাশাপাশি নিজের একটা মন্ত্রী পরিষদ গড়ে তুলেছেন। এবং তাঁকে পাত্তা দিচ্ছেন না, পদে পদে বিপাকে ফেলছেন। এসব শুনে প্রিয়নাথকে আশঙ্ক করতে প্রধানমন্ত্রী লোক-পতিকে ডেকে পাঠিয়ে বেশ কড়া বাক দেয়। অতদিকে লোকপতিও

অপ্রিয়োগ করেন, তাঁর এমন কি মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে তোন পরামর্শ না করেই গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বেশ কিছু অফিসারকে মুখ্যমন্ত্রী বদলী করে দিয়ে নিজের আত্মভাষ্যনদের স্বযোগ করে দিয়েছেন। যাতে মুখ্যমন্ত্রী একচ্ছত্র শাসন চালাতে পারেন। এখনও সেজন্য নিজের পকেট সরকারী মন্ত্রণের সৃষ্টি করে চলেছেন। এই অবস্থায় তিনি একা তো সহযোগিতা করে, মিলেমিশে কাজ করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী রও এতাপারে সবচেয়ে বেশী তাগিদ থাকা সরকার। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর কথার উত্তর মিলেমিশে চলবেন। এরকম আশান লোকপতি দিয়ে এলেও তলে তলে আবার আগের খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওপরে ওপরে বেধাচ্ছেন, তিনি প্রধান-মন্ত্রীকে দেওয়া কথা রাখতে খুবই চেষ্টা করছেন। কিন্তু গলচটা অল্প জায়গার। বা মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে দানা পাকিয়ে উঠেছে।

যতই হোক প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অনেক উপরে। তিনি বুঝতে পেরেছেন কমলাপতিতীর গোপন খেলা। বুঝতে পেরেছেন তাঁর এই বৃদ্ধ বিঘটন এখন আরও বড় ক্ষমতা চান। আর সে চাওয়াটা তাঁর পরিবারের পাত্তা নেওয়া ছাড়া অত কিছুই নয়। সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রায়ত পুত্র ত্রিপাঠীকীকে পাত্তা দিতে চাইছেন না। এখন প্রধানমন্ত্রী নিজেই চাইছেন না, কমলাপতি উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র হয়ে ওঠার চেষ্টার লক্ষ্য বোন। তাতে সেখানকার কোমল কাজিয়া মিটেবে না। সমস্তাগুলো অমার্যসে বাড়বে। নিজের দুর্বলতা বনিরে আসবে। তার চেয়ে অগ্নিগর্ভ উত্তর-প্রদেশে সময় থাকতে ব্যবস্থা নেওয়াই সমীচীন। কমলাপতিতীর পদত্যাগ তারই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এবং বিশ্বনাথ বর্তমান অবস্থা কোন রকমে সামলাতে পারলে ভাল নাহলে যোজনা মন্ত্রী নারায়ণ হস্ত ডেওয়ারীকে এতাপারে নিয়ে আগার ভাবনাচিন্তাও করা হয়ে গেছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা
 সাপ্তাহিক ১৫ টাকা
 ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা
 ★
 টাকাকড়ি ও চিঠি
 পাঠাবার ঠিকানা
 ম্যানেজার, দর্পণ
 ৩১ নং স্ট্রট লেন, কলিকাতা-১৩

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় পরিবার পরিকল্পনা

শেখ আমানুল্লাহ

পরিবার পরিকল্পনা তথা জন-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আশ্চর্যের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চোখে ঘূর্ণ নেই। বেন তেন প্রকারে জনবৃদ্ধি রোধ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে, ব্যানারে, রেডিও, টেলিভিশন মাধ্যমে এমনকি জোরপূর্বক নির্বীজকরণ করে পরিবার পরিকল্পনার বাধ্য করাতে তারা তৎপর হয়ে উঠেছে। আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশ ও পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ পাকিস্তানের দিকে তাকালেই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

কিন্তু আমাদের মতো সমাজ-তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় মানুষের কাছে এটা একটা dismal picture হিসাবে দেখা দেয়। একথা সত্য যে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামুতাবী পরিবার পরিকল্পনা মাধ্যমে পরিবারকে পড়ে তোলা। কিন্তু সত্য সমাজে পরিবার পরিকল্পনা বলতে শুধু পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করে ছোটো করা বোঝায় না। সুপরিবর্তিত পারিবারিক জীবন বলতে বোঝায় স্ব-ভাবে ও স্বমতভাবে বিচার অধিকার, শিকার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, বাসগৃহের অধিকার, কাজ রোজগারের অধিকার এবং সে সঙ্গে পরিবারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অধিকারও।

আধুনিক সত্য সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির স্ব-বাছ-দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমাজের সম্পদ উৎপাদন ও বন্টন থেকে সর্বপ্রকারে সমাজকে সুপরিবর্তিতভাবে পড়ে তোলার ইচ্ছা তাদের আছে। মানুষের সমস্ত অধিকারকে এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে বন্দি করে রেখে শুধুমাত্র জন নিয়ন্ত্রণ করে জনবৃদ্ধি রোধ করার পরিকল্পনা কখনও স্ব-সমাজজীবন পরিকল্পনা হতে পারে না। সমাজের সম্পদকে সমভাবে বন্টন করে সুপরিবর্তিতভাবে সমাজ জীবনকে পড়ে তোলার জন্য সমাজতাত্ত্বিক সমাজ-ব্যবস্থা তাই আজকের দিনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের সরকারের পরিবার পরিকল্পনার ভিত্তি ভ্রান্ত ও মেহনতী মানুষকে ধোঁকাবাজী ছাড়া কিছু নয়। তাদের জননিয়ন্ত্রণের যুক্তি অত্যন্ত অসার। যুক্তি হল ছেলে যখন ছোট ছিল তখন ২ মিটার লম্বা খাটির তার জায়গা হোত এখন ছেলে বড় হয়ে গেছে, অতএব তার পায়ের বে অংশ খুলে মাছে তাকে

কেটে খাটির তার সমান করে নাও। তাহলেই সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে। তারা খাটিকে বড় না করে পা কাটার চিন্তা করে সমস্তাকে আরও জটিল করে তুলছেন নাকি? বোকা কথা আসল সমস্তাকে তারা চাপা দিয়ে যাচ্ছেন। যখন খাটবস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যকর স্থল বন্টনের সমাধান করতে অক্ষম তখনই জনসংখ্যা কমাও। তারা মাংস খাটের বিরোধী দিকে আঙ্গুল দেখান।

কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে জন্মাবার পর কি চায়? খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কাজ রোজগার ও বেঁচে থাকবার গ্যারান্টি। কিন্তু মানুষ তো পেট নিয়ে জন্মায় না, মানুষের থাকে হাত পা, চোখ, কান, মস্তিষ্ক সব কিছু। যার নাহায্যে সে উৎপাদন করে পেটের জন্য খোরাক, পরবার জন্য বস্ত্র ও আশ্রয় ভোগ্যবস্তু পেতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে মানুষই সকল উৎপাদিকা শক্তির মূল। চারদিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাই মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য অসংখ্য ভোগ্যবস্তু ও সম্পদ বর্তমান রয়েছে। মানুষ প্রাণ দিয়েই তাদের বেঁচে থাকবার সমগ্র দায়িত্ব উৎপন্ন করে পুষে। এই সম্পদ উৎপাদন ও তার স্ব-বন্টন-ব্যবস্থা না থাকলে শুধু জন-সংখ্যা কমিয়ে কখনও পরিবার পরিকল্পনার স্ব-সমাধান হতে পারে না। যে মানুষরাই দেশের আসল উৎপাদিকা শক্তি, তাদের সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে, তাদের খর্ব করে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ও জন-সংখ্যা রোধ করার কথা বলে সমস্তার সমাধানের চেষ্টা তারা করছেন তারা আসলে মুখের গর্গেই বাস করছেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি দেশের অত্যন্ত অনটনের মূল কারণ হয়ে থাকে তাহলে যারা একা বা স্বামী স্ত্রী বা দু-একটি সন্তান দিয়ে জীবন বাপন করে তাদেরও আমরা অধাহারে অনাহারে থাকতে দেখি কেন। অব্যবহার্য পরিবারের জনসংখ্যা বেশি তাদের প্রাণাধীন বাস করতেও দেখি। জনসংখ্যা বৃদ্ধিই যদি মানুষের দুঃখ হারিয়ে দেয় মূল কারণ হয় তাহলে যুক্ত দাবী মহামারীতে আহ-পাতিক হারে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েও কেন খাট সমস্তার সমাধান হচ্ছে না? দেখা যায় একজন কৃষক বা শ্রমিক সারাদিন হাড়তলা খাটুনি খেটেও বিলাসিতা ও ভোগ্যবস্তু লাভ করা তো দূরের কথা, তাদের অধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। এমন কি অনেকে বিয়ে করতেও সক্ষম নয়।

পরিবার ছোট হলে যদি সমস্তা মিটত তাহলে তাদেরও তো স্ব-ভাবে জীবন বাপন করার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না কেন?

মনে রাখা দরকার পরিবার পরি-কল্পনাটা শুধুমাত্র পরিবারের সমস্তা নয়, এটা সামাজিক সমস্তাও বটে। কেননা প্রত্যেকটি পরিবার নিয়েই সমাজ। তাই এই সমস্যাকে বুঝতে হলে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করতে হবে—কেন এই সমস্তা? এই সমস্তার মূল কারণ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি? না প্রায়ের দ্বারা যে সম্পদ উৎপন্ন হয় তার ভাগ্য সে পার না বলে? নাকি পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি বলে? নাকি যে মানুষ প্রাণ দ্বারা উৎপন্ন করে তাকে তার থেকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তার মালিকানা করেমের স্বযোগ পাচ্ছে বলে? প্রকৃত সমস্তা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, মুষ্টিমেয় কয়েক জন সমস্তা সম্পদকে কুক্ষিগত করে শোষণ করাতেই এই অবস্থা। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই বলেছেন—“The most striking result of our present system of farming national land and capital to private individual has been the division of society into hostile classes, with large appetites and no dinners at all at one extreme and large dinners and no appetite at the other.” (বর্তমানে আমাদের জাতীয় সম্পদকে যেভাবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ফল হয়েছে এই যে, আমাদের সমাজ দুই বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিভাগের একদিকে রয়েছে প্রচুর ক্ষুধা ও খাটহীনতা, আর অপরদিকে রয়েছে ক্ষুধাহীনতা ও প্রচুর খাট।)

আমাদের দেশের পণ্ডিতরা যারা খাটির বাপে পা কেটে কেলার যুক্তি হাজির করেন তারা ঐ আসল সমস্তাকে উড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ ঐ শোষণের সাম্রাজ্যই যে যত অনাহার, বেকারত্ব ও দুর্ভিক্ষ এই সত্যটাকে গোপন করে কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই হারিয়ে দেয় আসল সমস্তা বলে দাবী করেছেন। তারা নিজেদের সুশ্রুতি কল্প চরিত্রটাকে ঢেকে রাখার জন্যই জনগণের ওপর ধোব চাপিয়ে দিচ্ছেন। জন নিয়ন্ত্রণ তথা পরিবার পরিকল্পনাকে নিয়ে হৈ চৈ করে তারা তাদের শোষণের দিকটাকে

চাপা দিচ্ছেন। এরপর বন্ধাকরণের প্রচেষ্টার কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে—এমন সর্বোপরি বিরোধ ব্যবহারের জন্য রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্র মাধ্যমে চালাও প্রচারের মাধ্যমে এ দেশের যুবক যুবতীদের অর্ধেক ঘোঁস সংযোগের দিকে প্রলোভিত করে তাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধের অভাব দেখা দিচ্ছে। শোষণ ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার জন্য ঐ নৈতিক শূন্যতা সৃষ্টির ফলে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদীদের পক্ষে যুব সমাজের ঐ নৈতিক দুরবস্থা খুব সুবিধাজনক। সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর করে পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা বহাল রেখে মানুষকে বন্ধাকরণ নীতি-নিষ্ঠা বন্ধানীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

সমাজের সম্পদ স্ব-বন্টন না হলে যেমন সমাজের অত্যন্ত পরি-কল্পনা ব্যর্থ হবে তেমনি ব্যর্থ হবে পরিবার পরিকল্পনা নীতিও। তারতের বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে নিজের সঞ্চিত সম্পদ না থাকলে ভবিষ্যতের কাজে বা বৃদ্ধ বয়সে ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা। কিন্তু সাধারণ মানুষের শতকরা ৯০ জনেরও সঞ্চয় করার নিশ্চয়তা নেই। সে অবস্থায় ভবিষ্যতের ভরসা একমাত্র পুত্র। বিপদের সময় বা দুর্দিনে একমাত্র কর্মক্ষম পুত্রই ভরসা। সুতরাং এই দুর্দিনের সম্পদ বা ভবিষ্যতের আশাকে পুত্র থেকে বঞ্চিত থাকতে চাওয়া কখনই সম্ভব নয়। যেমন পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা বাড়ী গাড়ী থেকে বঞ্চিত থাকতে চান না। তাদের বিপুল পুঁজি বা সম্পদ আছে তাদের দু-একটি সন্তানেই যথেষ্ট কিন্তু তাদের কোনো সম্পদ নেই তাদের ভরসা পুত্র সন্তানদের ওপর। ছেলে কবে বড় হবে এই আশাতেই বেশি পরিবারের দিন চলে। এখানে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে এজন্য যে এই সমাজে মেয়েরা অপরের অধীন। বাজ্যে তারা পিতার অধীন, স্বামীর অধীন বার্ষিক্যে পুত্রের অধীন। অতএব যারা নিজেরাই অপরের অধীন, পিতা মাতার ভবিষ্যতের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন না। একেজে তিন চারটে কন্যার পিতা হয়েও ভবিষ্যতে পুত্রের আশাকে খর্ব করে পরিবার ছোট করা তাদের পক্ষে আত্মহত্যার মামিল। তাই যে মায়ের পুত্র বেশি হয়, সেই মা আজ পরবিনী। কারণ সে ভবিষ্যতের ভরসা একটা পুঁজি বা মূল পেলো। কিন্তু কন্যাকে খাইয়ে

পরিবারে শিক্ষা দিয়ে স্থপায়ে অর্পণ করা আজকের সমাজে একটা গুরুতর সমস্যা। তাই আজকের কন্যা হওয়া মানেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে ভীষণ দার। একেজে অধিক কন্যা হলেও কি করে ভবিষ্যতে পুত্রের আকাংখাকে তরু করা যায়? এ ছাড়া মহামারি রোগ, মড়কের কথা চিন্তা করলে গরীবের একটি ছুটি সন্তানের ভরসা কি? কোনো ব্যাধির প্রকোপে সে ছুটো চলে গেলেই তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ভবিষ্যতে অবলম্বনহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা।

কোনো শোষণমূলক সমাজে, তা পুঁজিবাদীই হোক, সামন্তবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীই হোক না কেন তার উৎপাদন ও বন্টন কাঠামোর মধ্য থেকে জন নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের সর্ব বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কখনো সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থা কয়েক কয়েক মানুষ তার জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে তার কচিরোধ, ইচ্ছা বা প্রয়োজন অসুখারী সে নিজেই পরিবার পরিকল্পনা করবে।

আজকের বিজ্ঞানকেও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদীরা এ চেষ্টার পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছে তারা তাদের শোষণকে বজায় রাখার জন্য, ক্ষমতার থাকবার জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্তায় মানুষের প্রাণ ক্ষমতাকে সংগঠিত করে ঠিক-ভাবে কাজে লাগাতে পারলেই মানুষের সর্বপ্রকার অভাব অনটন মিটিয়ে এক শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠন করা সম্ভব। একমাত্র মার্কস ও লেনিনের নির্দেশিত পথেই এক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সেই স্বাধীন সমাজ পড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের এই শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কাজ রোজগার, বাস-স্থান ও ভোগ্যপণ্যের সমাধান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সমাজ-তাত্ত্বিক সমাজের মাধ্যমেই একমাত্র মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব। কাজ, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ভোগ্যপণ্যের ও ভবিষ্যতের ভরসার গ্যারান্টি দিতে পারলেই ইচ্ছামূলক পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে আপত্তি থাকবে না। যেমন থাকবে বেঁচে থাকার জীবন বাপনের নিশ্চয়তা তেমনি থাকবে প্রয়োজন মতো জন নিয়ন্ত্রণের অধিকার, এটা একমাত্র সমাজতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব, অতথ্য নয়। সেই সমাজতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থা গড়ার দিকেই আমাদের এগোতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী

অশোক চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহের বীজ বপনের কাজে প্রারম্ভিকতার সঙ্গে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারা স্পষ্ট-ভাই শিক্ত 'হিন্দু' এবং ১৯১৩-এর কর্ণওয়ালিস, প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' স্ট্রট ভূমি এবং তাদের সহযোগী শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব। সাম্প্রদায়িক চেতনাকে জালন করে তাকে প্রচার-কার্যে সামিল করতে শ্রেণী প্রতিনিধিদের 'শিক্ত' হবার ব্যাপারটা থেকেই যায়। উনিশ শতকের সমস্ত দশক পর্যন্ত শিক্ত শ্রেণীর পরিচিতির পরিসংখ্যান হিন্দুদের পক্ষেই থেকে গিয়েছিল। স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক চেতনাকে খুঁটিয়ে তুলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রদায়গত সম্প্রীতিতে ফাটল ধরিয়ে ১৯৫৭-র পর-বর্তী সময় থেকে কর্মসংঘটিতমান ব্রিটিশ-বিরোধী হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে নির্ধাতিত নৈপীড়িত কৃষকদের সমস্ত শ্রেণী-বৃদ্ধকে দুর্বল করে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থস্বার্থকরণের প্রয়াসী থাকার তাঁরা প্রারম্ভিকতার সঙ্গে রেখেছিলেন। স্বতরাং উনিশ শতকের ৩ ভাগ সময়-কালীন মুসলমান বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রপ্রণে কাজ চলেছে হিন্দুদের শিক্ত অংশের নেতৃত্বেই। শিক্ষাগতভাবে মুসলমানরা পিছিয়ে থাকার তাদের পক্ষে পাণ্টা সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাকে উদ্ধে দেবার মতো নেতৃত্বকারী শিক্ত মুসলমান প্রতিনিধির অভাব থেকেই গিয়েছিল। এই শিক্তদের হারের একটা নমুনা রাখলে বোধহয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ১৮৮১ সালে কলকাতার শিক্ত হিন্দু পুরুষদের সংখ্যা যেখানে ৩৬.১%, সেখানে শিক্ত মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪.২%। এবং এই সংখ্যা পরবর্তী দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে বেড়ে হিন্দু এবং মুসলমানের শিক্তদের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯% এবং ১৬.৭%। আবার ১৮৮১ সালে কলকাতার শিক্ত হিন্দু মহিলাদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬৮%, সেখানে শিক্ত মুসলমান মহিলাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১%। এবং পরবর্তী দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় শিক্ত হিন্দু মহিলা ও শিক্ত মুসলমান মহিলা যথাক্রমে ৭৫% এবং ১.৭%।

এ হিসেবে তো ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ দশক পর্যন্ত। তাহলেই বোকা যাচ্ছে

এর আগের এই হার আরও কত দুর্বল অবস্থানে (position) ছিল। ১৮৭১ সালের চাকরীর হিসেব থেকে জানা যায় শিক্ত-অধ্যাপকদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১০৬ জন, অপর পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে ঐ সংখ্যা ৫ ভাগেরও কম। হিন্দু মোজারের সংখ্যা ৪২০ র পাশে মুসলমান মোজারের সংখ্যা ৪৩ ভাগ কম। হিন্দু উকিলের সংখ্যা ২৭২-এর পাশে মুসলমান উকিলের সংখ্যা ১৬ ভাগ এবং হিন্দু ব্যারিষ্টারের সংখ্যা ১০-এর পাশাপাশি মুসলমান ব্যারিষ্টারের সংখ্যা ৩ ভাগ কম। তাহলে শিক্তদের এবং বুদ্ধিবীর পরি-সংখ্যানগত হারে দেখা যাচ্ছে যে হিন্দুদেরই ছিল আধিপত্য এবং স্বভাবতই এই কারণে উনিশ শতকের ৩ ভাগ সময়কাল ধরে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে আঘাত হেনে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পটভূমি প্রস্তুতির কাজে নিরলস প্রচেষ্টার অংশীদার হল হিন্দুদের শিক্ত অংশের প্রতিনিধিকারী নেতৃত্ব। এরপর থেকে শিক্তদের হার মুসলমানদের মধ্যেও বাড়তে থাকার একাধিক দৃষ্টান্ত নির্দ্বন্দ্ব রাখে তাড়াও আর পিছনা হয়নি। এটা আরও পরিষ্কার যে যখন দেখি ১৮৮১-৮২ সালে বাড়লার উচ্চ-বিভাগ-লব্ধলোতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা তারতের অন্তত প্রদেশকে পেছনে ফেলে ৩৬৩১-এ দাঁড়িয়েছে এবং ১৮৮৮ থেকে পরবর্তী ৩৫ বছরে শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই স্বাতন্ত্র্য মুসলমানদের সংখ্যা ২১০ অর্থাৎ ৩০০-র কাছাকাছি দাঁড়ায়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্তদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাকে নিয়ে নেতৃত্বকারী প্রতিনিধির অভাব পূরণ হলেও তার আগে শিক্ত শিক্ত হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের মুসলমান বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জনক প্রচার রাখা লক্ষ্যে শিক্ত মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশ কিছু এ ব্যাপারে মাথা গরম না করে এবং পাণ্টা সাম্প্রদায়িক বক্তব্য না রেখে স্বার্থ বিচার বুদ্ধি-পরিচয় রেখেছিলেন। এদের মধ্যে অন্ততম হলেন মীর মোশারফ হোসেন। উনিশ শতকের চরমতম হিন্দু সাম্প্রদায়িক বক্তব্য যখন দস্ত-ভরে মুসলমান বিরোধী হিন্দু জাতির 'মজলই' তাঁর কাম্য এবং একত্ব অর্থাৎ হিন্দুর মজলের স্বার্থে 'পরজাতি' (অর্থাৎ মুসলমান) পীড়ন করতে হলেও তিনি রাজী, এমনকি

'আমাদের (হিন্দুদের) মজলে তাহা-দের অমজল হইতে পারে' তবু 'আমরা সেজন্য আত্মজাতির (হিন্দু) মজল সাধনে বিরত হইব না; পর-জাতির (অর্থাৎ মুসলমানদের) অমজল সাধন করিয়া আত্মমজল (হিন্দু) সাধিতে হয় তাও করিব'—তখন স্বভাবতই মুসলমান লেখক হিসেবে এর প্রতিক্রিয়ার মীর মোশারফের কলম সাম্প্রদায়িক আগুন নিয়ে ঝলদে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। বক্তব্যের সাম্প্রদায়িক চিন্তার পরিচয় বহনকারী অন্যান্য লেখা এবং যার উচ্ছলতম নিদর্শন 'আনন্দমঠ'-এ তার বিরুদ্ধে মীর মোশারফ হোসেন কিন্তু আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার নজির রেখেছেন। তাঁর 'উদ্বাসীন পথিকের মনের কথা'র তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে বলতে গিয়ে লিখেছেন "এই বঙ্গদেশে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান, এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে—যে ভিন্ন কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক—সংসার কার্যে তাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না।" এ যেন পাণ্টা উনিশ শতকের শিক্ত হিন্দু প্রতিনিধিদের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পট-প্রস্তুতির নির্লজ্জ প্রয়োগের বিরুদ্ধে মোচারণ প্রতীবাধ এবং হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পক্ষে অমূল্য দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক মীর মোশারফ হোসেনের এই অসাম্প্রদায়িক এবং সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি রক্ষার নজির তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিশীড়িত নির্ধাতিত কৃষক শ্রেণীর সমস্ত শ্রেণী বৃদ্ধের পক্ষে মূলতঃ তাঁকে পাণ্টিকান করেছে, অপরদিকে বক্তব্যের সাম্প্রদায়িক চিন্তা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতিকে সেবা করে কৃষকের সমস্ত শ্রেণী বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে তাদের পাণ্টিকান করেছে।

বক্তব্যের মুসলমান বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মোচারণ প্রচার হিন্দু মহলে খুব লাভা লাগিয়েছিল। এবং এ ব্যাপারে মবীন প্রবীণদের এক বৃহদাংশ বক্তব্যী 'নবহিন্দুবাদ'কে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিল। ১৮৭৫ সালে দ্বানন্দ সরস্বতী 'আর্থ সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে 'বেদের যুগে ফিরে-মাওয়ার' স্বর্ঘবাণীকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হন। হিন্দুদের

ধর্মগত ব্যাপারটাকে এইভাবে খাড়া করে তিনি হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার মিছিলে মোচারণ সামিল হন। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বিরোধিতার কথা বললেও তাঁর মূল বিরুদ্ধতা ছিল মুসলমানদের সঙ্গে। তার 'আর্থ সমাজ'-এর তরুণরা প্রকৃতই বলতেন যে মুসলমান ও ইংরেজ-দের সঙ্গে হিসেব মিটিয়ে কেলার দিন তাঁরা গুণছেন। অর্থাৎ ইংরেজ হট্টয়ে এবং মুসলমান তাড়িয়ে এক বিশাল হিন্দু রাজ্য গড়ার স্বপ্ন এইভাবে জালন করে সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে জালন করেছেন। শুধু তাই নয় ভাগবত গীতার নতুন ভাষ্যে 'দ্রুত' শব্দের 'সংজ্ঞা' নির্ণয় না করেই একথা ঘোষণা করেছেন যে হিন্দু ধর্মের জন্তে দ্রুত অহিন্দুদের হত্যা করা সম্ভব। স্বতরাং মুসলমান বিরোধী এদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা কোন পর্যায়ে গিয়েছিল তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। বাল গদাধর তিলক-এর জাতীয়তাবাদী রাজনীতিও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত। গণপতি পূজা পুরোপুরি

পৌরাণিক হিন্দু আচার লম্বত অঙ্ক-ঠান ছাড়া কিছু নয়। স্বতরাং গণপতি পূজা বা উৎসব করার অর্থই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়গত চিন্তাকে লম্বত করে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে চালিত করা। মারাঠীদের মধ্যেও মারাঠার জুড়ে এক অখণ্ড হিন্দু রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন জালিত ছিল। এবং দৃষ্টি কণা বলতে কি শিবাজীর প্রতিষ্ঠাকামী সমাজ ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ, বা এমনকি স্ববীজনাথ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। আর মারাঠা রাজ্যের পতনের কারণও ছিল এই 'জাতি-ভেদের বিধ'। যাই হোক তিলক ছিলেন একজন প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু এবং সেজন্যই লম্বাস মনুষ্যত্ব আইনের বলে সাধিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের বিরোধিতা করেই তিনি কান্ড হন নি, ওই আইনকে যেমন প্রগতিশীল হিন্দু সমর্থন করেছিলেন তাঁদেরকেও ধর্মভ্রষ্ট ও দেশভ্রষ্ট বলে অতিমুক্ত করেছিলেন...। তাছাড়া গোরক্ষা সমিতি করে তার প্রকাশিত পুস্তকে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের তীব্র প্ররোচনার নজির রাখতেও তিলক-পিছনা হননি। এদেরই এই সাম্প্রদায়িক ধারার আরও উচ্ছল জোয়ার নিয়ে শেষাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়



ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়ায় একটি সংস্থা বিশেষ)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি সি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারীদের কাছে থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে মীল করা টেন্ডার :

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

যেকা: নং : জি এম (ডি এ) / এস ই (সি) / টেন্ডার / ৫১/১০৮৮ তাং ২৭-১০-৮০

(১) ৪ ইউনিটের 'সি' টাইপ (ডি / এস) কোয়ার্টার নির্মাণ (২) ৮ ইউনিটের 'এ' টাইপ (ডি / এস) কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য। দুটি কাজেরই জায়গা থেমোমাইন। উপরে প্রস্তুত কাজের মোট খরচ ৩,৩৪,৫২৩ টাকা। কেশিয়ারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা (অপ্রত্যর্পণযোগ্য) নগদে দিয়ে ২০-১১-৮০ থেকে ২৭-১১-৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে (বেলা ১০.৩০ থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২.৩০ টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এবং শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত) জেনারেল ম্যানেজারের অফিস, বিশেষগড় এরিয়া, বরাচক হাউস, পোঃ সীতারামপুর জেলা বর্ধমান থেকে টেন্ডার দলিল পাওয়া যাবে। ২৮-১১-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩.৩০টার খোলা হবে।

সাধারণ : আনুমানিক খরচের ১% বায়নার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে টেন্ডারের সঙ্গে জমা দিতে হবে, অত্রখার টেন্ডার বাতিল করা হবে। ডাকে বিলম্ব হওয়ার জন্য ইস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড দায়ী থাকবে না। পাঠ্যল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেক পাঠানো টেন্ডার ফী গ্রহণ করা হবে না। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

চলচ্চিত্র নাটক

গান্ধীচিত্র নির্মাণে এত দরাজ হাত

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা স্যার রিচার্ড আটেনবরোকে দিয়ে গান্ধী চিত্র নির্মাণের এক ব্যস্ত-বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোটামুটি স্থির হয়েছে, এ বাবদ ব্যয় হবে ষোল কোটি টাকা। এই টাকার অঙ্কের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে নয়, বাড়বে— কারণ দেখা গেছে, ছবি তৈরীর খরচ প্রথমে যা ধরা হয়, ছবি তৈরীর শেষে সেই খরচ আর বেড়েও পারে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচ কোটি টাকা অগ্রমোদন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে গান্ধীজীর ওপর ছবি তৈরী করার চেতনটা কি আর প্রয়োজনটাই বা কি? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন আগে প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, গান্ধীজীর ওপর এদেশেই একটি ভাল ছবি তৈরী হয়েছে, কিন্তু ছবিটি রীতিমত দীর্ঘ—প্রদর্শনের সময় লাগে সাত বটা। এত বেশী সময় নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি ব্যাপকভাবে দেখানোর অসুবিধে আছে সংগত কারণেই। তাই আড়াই বটার মধ্যে প্রদর্শিত হতে পারে এমন একটি উৎকৃষ্ট ছবি তৈরীর প্রয়োজন দেখা দেয়।

খুঁই ভাল কথা। কিন্তু এ যে স্বর্গীয় গান্ধী চিত্রটি, যা তৈরী হয়ে পড়ে আছে, তা অত দীর্ঘ হল কেন? যদিও বা হ'ল, মেটা স্বাক্ষর সম্পাদনার সংকেন্দিত করা কি এতই অসম্ভব ছিল? আর তা যদি সম্ভব নাও হয়, তবে এদেশেরই কোন নিপুণ পরিচালককে দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট অথচ নীতিমূলক দৈর্ঘ্য ছবি তোলা কি যেতনা? কোটি কোটি টাকা খরচ করে এক বিদেশী পরিচালকের পরিচালনার গান্ধী চিত্র নির্মাণের এই অহেতুক উৎসাহের উৎসটাই বা কোথায়?

জানি, এসব প্রশ্নের সহুস্তর পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবেনা তেমন কোন হিসেব এত কোটি টাকা খরচ করার। অথচ মজার কথা হল, এদেশের কোন চলচ্চিত্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক কোন বুদ্ধিদীপ্ত ছবি তৈরী করতে যেটুকু সরকারী খণ্ড পাম বর চেষ্টার শেষে, সেই খণ্ড সময়

বত পরিশোধ না হলে, কড়া নোটিশ পান। সেই সব ধেনহাট পরিচালক ছবির ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে তখন অমহার বোধ করেন—টাকা-পোষ কেবেন কোথা থেকে? কেন্দ্রীয় সংস্কার কর্তারা সবই জানেন—তবু তাঁরাও নিরুশ্বাস—সংস্কার টাকা তুলে নিতেই হবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী—বেআইনী কাজ বরাদ্দ করা কি স্বাভাবিক? কিন্তু এক বিশেষীকে দরাজ হাতে কোটি কোটি টাকা দেওয়া আর একটি ছবি তৈরীর কাজ।

আলোকচিত্রে

ঘরোয়া উত্তমকুমার

বিভাগ্যপ্রান্টেরিয়ামের বিপরীত মরদানে 'সোলাইটি' কর প্রয়োজন অফ কটেল ইনভার্ট প্রয়োজিত দেওয়ালী উৎসব বেলটিতে বৈচিত্র্যের প্রভাব নেই বললেই হয়। ছাত্র পাচটি বইয়ের স্টল; দুটি কুটির শিল্প জাত জুয়াড়ি ও দুটি কাপড়ের স্টল—সেগুলিও তেমন আকর্ষণীয় নয়। ওরই মধ্যে 'মহানায়ক মণ্ডপটিতে' কিছু লোকের দরবেশ লক্ষ্য করা গেল। সুখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী ধীরেন দেব উত্তমকুমারের কিছু ঘরোয়া পরিবেশের ছবি তুলেছেন, যা অনেককেই কৌতূহলী করে তুলবে। ১৯৭০ সালে তোলা ছবিতে দেখি মিথের বাড়িতে উত্তমকুমার দেওয়ালীর বাতী পোড়াচ্ছেন, ঐ পৌরী দেবী উত্তমকে খেতে দিচ্ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে বালক পুত্র পৌতম, বাট দশকের ছবিতে দেখি রিমীপ-কুমার ও রাজ কাপুরের সংগে উত্তম, সত্তর দশকের ছবিতে কানন দেবী ও শিবাজী পণেশনের সংগে, গ্রুপ ছবিতে দেখা যায় সুবক পৌতম, সুভাষা, তরুণকুমার ও গৌরী দেবীর সংগে, দেবকী বহু, তপন সিন্ধা ও অরুণভী দেবীর সংগেও তাঁকে দেখা যায়। বি এক জে এ অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের ও উত্তম-সুপ্রিয়র ছবিও উল্লেখযোগ্য। সুচিন্তা উত্তমের একটি হাস্যমুখর ফ্রো আপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে যুগের 'মনের মন' 'লাখ টাকা', 'রাইকমল' প্রভৃতি ছবির রূপসজ্জার উত্তমকুমারকে দেখতে অনেককেই আগ্রহ দেখাবেন ঠিকই, তবু পুরো প্রদর্শনীটার মধ্য দিয়ে উত্তমকুমারের ঘরোয়া জীবনকে তুলে ধরতে পারলে অভিনবত্ব দৃষ্টি হত সম্ভব নেই।

সাম্প্রদায়িকতা ও মধ্যবর্তী শ্রেণী

৭ম পৃষ্ঠার পর

এলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ স্পষ্টতই বলেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হল 'হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার'। ১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রথম ভাষণে তিনি অকপটভাবে বলেন যে ভারতবর্ষের রাজনীতি মধ্যবর্তী শ্রেণী বলতে হলে অবশ্যই 'ধর্মের ভাষায় কথা' বলতে হবে। অর্থাৎ ভারতে রাজনীতি হওয়া উচিত ধর্মীয় রাজনীতি এবং স্পষ্টতই সে ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম। 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি অকপটভাবে বলেছেন "পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিজ্ঞা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।" এখানে, স্পষ্টতই তিনি হিন্দু ধর্মের প্রচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা নিয়েছেন। ভাড়াটা ভারতীয় নারী-মুক্তির আদর্শ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন নীতা, সাবিত্রী, ইন্দ্রাভী-র কথা; উপাশা দেবতা হল শঙ্কর।

মহাত্মার জন্ম কাপুরুষতা দূর করার জন্য দিনরাত 'গৌরীনাথ' ও 'গঙ্গাধর'-র পথে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যে আরও কতদূর প্রবাহিত হয়েছে তার প্রমাণ "তুলিও না—নীচজাতি, মুর্থ, ধিক্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর..." ইত্যাদির বর্ষো। এখানে মূল মতানুসারে তাই বলে লক্ষ্য রাখতে তাদের প্রতি সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখানোর দুইভার পরিচর বিবেকানন্দ তুলেও রাখেন নি। অথচ বিবেকানন্দের পাঁচশ বছর আগে চৈতন্য হিন্দুও সঙ্গে সঙ্গে মূলমতানুসারে তাই বলে বুক টেনে নিতে পেরেছিলেন। এছাড়া আরও উল্লেখ্য যে বঙ্গিমের 'আনন্দমঠ', যা এদেশের মূলমতানুসারে বিচ্ছেদ হিন্দু-ধর্ম প্রেরী সংগ্রামের বঙ্গীয় সাম্প্রদায়িক ভাষার সাক্ষ্যস্বরূপ এবং ইতিহাস রচয়িতা হুজি বিবেক, সেই 'আনন্দমঠ'কে বিবেকানন্দ

আবার আবার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর 'পদ্মাবতী' থেকে জানা যায় বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিবেকানন্দের সম্মতির ঘাটতি ছিল আর অসুস্থ ব্যাপার এখানে অ্যানি বেসান্টের সঙ্গে তাঁর আশ্রয় মিল। অ্যানি বেসান্টও এদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তিনিও ছিলেন বিধবা বিবাহের বিরোধী অর্থাৎ সনাতন হিন্দু ধর্মের (যার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরকে প্রচণ্ড লড়াই করে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে হয়েছিল) অসুস্থতা এবং তাঁর উদ্ভোগে বারানসীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিভাগলয় শেষ অবধি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়েছিল। তাঁরও বক্তব্য ছিল 'পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো হিন্দুধর্ম'। বাস্তবিক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রচারক হিসাবে এখানে অ্যানি বেসান্ট আর বিবেকানন্দকে বেন গুরু-মাতা ও শিল্প বলেই বনে হয়।

(আগামী সংখ্যায় বঙ্গীয়)



আপনার জীবনের কোনো কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই ইউকোব্যাক্সের জন্য

গদোন্নতির খবর তো গেলেন। এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন, অনেকদিনের সাধ একটি স্কুটার কেনা কি করে সম্ভব হবে...



এই অস্বপ্নীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরাই পরামর্শ দেব, কেমন করে আপনার ইচ্ছে পূরণ হবে।

অফিসে পরিচর ও অধ্যবসায়ের ক্ষম আপনি পেয়েছেন। আপনার গদোন্নতি হয়েছে। নিশ্চয়ই ভাবেন আপনি কাজের স্বীকৃতির এই নিদর্শন! মাস গেলে এবার থেকে কিছু বেশি টাকা হাতে পাবেন। হঠাৎ এখনই তাই অনেক কিছু কেনার কথা একসঙ্গে মনে হচ্ছে। সব থেকে বেশি মনে হচ্ছে একটি স্কুটার কেনার কথা। কতোদিনের ইচ্ছে, নিজের একটি স্কুটার হোক। কিন্তু দরকার মতো টাকা পাওয়া মানে কেমন করে? ইউকোব্যাক্সে আপনি এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন। হিসেব করে আমাদের বলুন, মাসের খরচ বাদ দিয়ে এবার থেকে কতো টাকা বাঁচাতে পারবেন। আমরা পরামর্শ দেব আমাদের সক্ষম প্রকল্পগুলির কোনটা আপনার কাজে আসবে। আপনার সক্ষম দ্রুত কী ভাবে বেড়ে উঠবে।



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমান

আন্দোলন

পিয়ারলেস কর্মচারীদের সভা

কেন্দ্রীয় সরকারের আইনানুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত্বাক্রান্ত সরকার পিয়ারলেস সহ ১১৩টি সংস্থার কাজকর্ম গোটা-নোর যে নির্দেশ দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারীদের কর্তব্য নির্ধারণে গত ৮ নভেম্বর তারিখ সভা হলে একটি কনভেনশন হয়।

সভার মূল বক্তা পিয়ারলেস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীমতী মৈত্রী (এম, পি) বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ করার আমরা রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছি না, তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে পিয়ারলেসের মতো সংস্থাগুলোকে অধিগ্রহণ করতে হবে। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কয়েক হাজার কর্মচারীর বেকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কেন্দ্রীয় সরকারই এতদিন এইসব সংস্থাগুলোকে ব্যবসা করতে দিয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

শ্রীমতী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে এইসব সংস্থাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত্বাক্রান্ত করার প্রস্তাব দেন।

শ্রীমতী কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন যে, শুধু দাবি জানিয়ে বসে থাকলেই হবে না, সেই দাবিকে সোচ্চার করে তুলতে হবে কর্মচারীদের সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে।

ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি জানান যে, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, যাতে কেন্দ্র এই সংস্থা অধিগ্রহণ করে।

কারারক্ষী সমিতির সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ কারারক্ষী সমিতির ৬ষ্ঠ সম্মেলন বহরমপুরে গত ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটার বহরমপুর কেন্দ্রীয় কারা প্রাঙ্গণে সমিতির সভাপতি শ্রীবিমলকুমার বোস কর্তৃক পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে মালাধানের মধ্য দিয়ে ৬ষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৈত্রীকুমার সিংহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আর-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন। সম্মেলন থেকে ত্র্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ, পুলিশের ভার কারারক্ষীদের পণ্য রেশন ব্যবস্থা চালু, তিন শিকট ডিউটি চালু, মিলেকশন প্রভৃতি প্রবর্তন, ৫ বৎসর চাকুরীর পর পদোন্নতি, মহিলা কারারক্ষীদের নিয়মিতকরণ ইত্যাদি ১৯ দফা দাবী দখলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

প্রতিনিধি অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ আবদুল বাসি এবং লোকসভা সদস্য নৈয়দু মাহমুদ হোসেন সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

চিত্তরঞ্জন দেকৈ সভাপতি এবং অমৈত্রীকুমার সিংহকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ২৫ জনকে নিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ২৬ অক্টোবর বেলা ৪টার।

ডি ডি সির অধিকাংশ কর্মীই বর্তমানে অসম্পূর্ণ

সম্প্রতি কলিকাতায় এক সুবিদ্যাক সম্মেলনে ডি, ডি, সি, প্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক করুণাময় বটব্যাল বলেন যে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রেমচাঁদ সুখারের কাজকর্মের ফলে সংস্থার উচ্চপদস্থ বেশ কিছু অফিসারও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ার অপমান বোধে এখন চাকরী ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। ডি, ডি, সি-র আটটি ইউনিটের মধ্যে সাতটিই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে সোচ্চার।

চেয়ারম্যানের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে আই. এন. টি. ইউ. সি. ইউনিয়ন ছাড়া আর সকলেই ধর্মঘট করতে চায়। যোল হাজার কর্মচারীর অধিকাংশই বর্তমান অবস্থায় অসম্পূর্ণ। শ্রীবটব্যাল জানান, ধর্মঘট করার আগে তাঁরা গোপন ব্যালটে কর্মচারীদের মত নেবেন। তাঁদের মোট চারটি দাবি : (১) অবিলম্বে সমস্ত সাপেনশন, বদলি, বেতন কাটার নির্দেশ বাতিল করতে হবে (২) সবরকম ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। (৩) বেতন কাঠামোর পুনর্বিভাগ ও গড় বছরের হারে বোনাস (৪) সব ইউনিয়ন ও অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করা।

পাটচাষীরা মার খেলে, চটকল শ্রমিকরা বাঁচবে না

গত ৮ ও ৯ নভেম্বর বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের ৪২ তম সম্মেলন হল টিটাগড়ের তরুণ পেনগুট নগরে। সম্মেলনে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী মহম্মদ আমিন। সম্মেলন উদ্বোধন করে বামফ্রন্ট

কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত বলেন যে, প্রমিক শ্রমিককে এবার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইতে হবে।

রবিবার প্রকাশ্য জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, পাট চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে চটকল শ্রমিকদেরকে আন্দোলন করতে হবে। বছরের পর বছর পাট চাষীরা ভাষ্য মূল্য পাচ্ছে না। চাষীরা আর পাট চাষ করতে চাইছে না। পাট চাষ না হলে চটকল বন্ধ হয়ে যাবে।

দমাবেশে রাজ্যের প্রথমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সাধারণ মানুষ, প্রমিক কৃষকের সমস্যার সমাধান হয় না। প্রমিক শ্রমিকের নেতৃত্বে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। এছাড়া মহম্মদ ইদ্রিস আলী, নীরেন ঘোষ, কমল সরকার ও মহম্মদ আমিন বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন শেষে নীরেন ঘোষ (এম, পি) সভাপতি ও কমল সরকারকে (এম, এল, এ) সম্পাদক করে ১৭৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

শোলাপুরের বস্ত্রকল শ্রমিকরা লড়ছেন

মহারাষ্ট্রের শোলাপুর জেলার তিনটি বস্ত্রকলের শ্রমিকরা সম্প্রতি ঘোষিত ৮-৩০% বোনাস প্রদানের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। তাঁদের বক্তব্য মিলে আরো বেশি লাভ হয়েছে। ফলে বোনাস বাড়তে হবে। গত পরশা নভেম্বর ঐ তিনটি মিলের চার হাজার ক্ষিপ্ত শ্রমিক স্থানীয় আই. এন. টি. ইউ. সি. অফিস জালিয়ে দেয়। পুলিশ লাঠি চার্জ করে ও তেজিশ রাউণ্ড কাদানে গ্যাস ছোড়ে। পুলিশ-পাচজন শ্রমিককে গ্রেপ্তারও করে।

বোনাস প্রাপ্তি এল আই সি কর্মীদের জয়

জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোম্পানীর লভ্যাংশের উপর পনেরো শতাংশ বোনাস পাবে—গত ১০ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে একথা বলা হয়েছে। বিচারপতি জিডি. আর কৃষ্ণস্বামী এবং বিচারপতি আর. এম. পাঠক এই রায়ের পক্ষে মত দেন। কিন্তু বিচারপতি এ ডি. কোপল বিরোধিতা করেন।

রাজ্য ই-কংগ্রেসে বিরোধ

১ম পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসের (ই)-অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমহম্মদ মহাপাত্র এবং কল্লনাথ রাইও বরকত সাহেবকে বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছেন। সম্প্রতি শ্রীরাই কলকাতা নগরে এলে অজিত পাণ্ডা তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জানা গেছে শ্রীরাই নাকি অজিতবাবুকে বলেছেন দিল্লীতে এ ব্যাপারে তিনি দরবার করবেন।

বরকত সাহেব এবং অজিত পাণ্ডা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার জন্ত দিল্লীতে নানা মহলে তথ্য তদারক শুরু করেছেন। বরকত সাহেব এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বরকত সাহেবের বক্তব্য শুনে অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে প্রণব মুখার্জী এবং সুব্রত মুখার্জী সহ বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা কোন কৌশলে বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার যোত্রের বিরোধী। জানা গেছে সুব্রতবাবু দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে বামফ্রন্ট সরকার ভাঙার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সুব্রতবাবুর বক্তব্য, মেহরাব শেখ হবার আগে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হলে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলোই মজল হবে। ক্ষমতায় থাকার জন্ত তারা সাধারণ মানুষের কাছে বতর্তা অগ্রিয় হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেওয়া হলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিগীর তুলে শরিক দলগুলো হারানো জনসমর্থক আবার উদ্ধার করবে।

সুব্রতবাবুর বক্তব্যকে প্রণববাবুও পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। প্রণববাবু শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন, রাজ্যে সংগঠনের যে অবস্থা তাতে ফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিলেও দলের পক্ষে কোন লাভ হবে না। যে কোন অবস্থায় সি পি এম আবার নতুন করে ক্ষমতায় বসার সুযোগ পাবে। জানা

গেছে সুব্রতবাবু রাজ্য সংগঠনকে চাঙা করে তোলার জন্ত প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন।

সুব্রতবাবু তার প্রস্তাবে বলেছেন এখন থেকে কমল কাটার সময় গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দলকে সমর্থক চাষীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এবং সি পি এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। আন্তে আন্তে রাজ্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার গড়ে তুলতে হবে।

সুব্রত তার প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, রাজ্যের ছাত্র-যুবদের সংহত করে এই কাজে লাগাতে হবে। এবং এ ব্যাপারে প্রণব মুখার্জীকে রাজ্যের ছাত্র যুবদের সংহত করার ভার দেওয়া হোক।

প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে, শ্রীমতী গান্ধী এখন পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্ট সরকার ভাঙার ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি কাউকেই দেন নি।

ডেপুটি স্পীকার

১ম পৃষ্ঠার পর

জ্যোতিষার্ণ কলেজ হলে ফেব্রুয়ারি সংস্থার এক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব কলিমুদ্দিন শামস বলেন, “সকলের জগতে বেসরকারী সংস্থা হিসেবে ফেব্রুয়ারি সল ইনভেন্ট-মেন্ট লিমিটেড সত্যতার সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এবং এর অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি।”

গত ১১ নভেম্বর কয়েকটি দৈনিকে কোম্পানী জনাব শামসের ভাষণের উক্ত অংশ উদ্ধৃত করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কলিমুদ্দিন শামসের ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া নিয়ে কি বামফ্রন্ট কমিটিতে আলোচনা হবে না?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পূর্বদ প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা বই

১। জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান / শ্রীমধুনাগ নাগ / ১৯০০

২। ভাপগতিতত্ত্ব / শ্রীঅশোককুমার ঘোষ / ২৪০০

৬৫, রাজা স্ববোধ মন্ডিক স্কয়ার, কলিকাতা-১৩

ছোট ও মাঝারি পত্রিকাগুলোর
উন্নতির পরিকল্পনায় বামফ্রন্ট
সরকার পিছিয়ে আছে

বাংলা বন্ধের বিরোধিতা করতে অনেক ই-কংগ্রেস নেতাই নারাজ



অন্যবিশ্ব বর্ষ ১৪১৮ সংখ্যা ১১ শুক্রবার ২১শে নভেম্বর, ৮০। ৬০ পয়সা

মার্কতির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন নাগরওয়াল কলেংকরীর কেশিয়ার মালহোত্রা

মার্কতি সংস্থাগুলিকে সরকার
খিগ্রহণ করেছেন এবং সেই সংস্থার
মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা করা হয়েছে
বিত্তিকৃত ব্যক্তি বেদপ্রকাশ মাল-
হোত্রাকে। বেতন মাসে তিন
হাজার টাকা ও তৎসহ অন্যান্য ভাতা
ইত্যাদি। মালহোত্রার কথা নিম্নেই
সকলের মনে আছে। কেননা ইনিই
সেই স্টেট ব্যাংকের ক্যাশিয়ার যিনি
কিনা নাগরওয়াল নামক জনৈক
ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন নগদ

যাট লক্ষ টাকা। মালহোত্রার চাকরী
চলে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যান্ধী
সহায় আছে বলেই কপালগুণে তিনি
মার্কতি প্রকল্পের মুখ্য অর্থনৈতিক
উপদেষ্টা হতে পেরেছেন।
মার্কতি জাতীয়করণ করা নিয়ে
বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মাল-
হোত্রাকে এত বড় পদ দেওয়াতে তা
নিয়ে আরও বিতর্ক দেখা দিয়েছে।
সংসদের আসন্ন অধিবেশনে এ নিয়ে
ঝড় উঠবে বলে মনে হয়।

দাশাশে নভেম্বর বামফ্রন্ট আহত
বাংলা বন্ধের বিরোধিতা করতে
অনেক কংগ্রেস (ই) নেতা নারাজ
বলে বিশ্বস্ত হয়ে ধবর পাওয়া গেছে।
এইসব নেতারা মুখ্যতঃ কংগ্রেস (ই)
সভাপতি অজিত পান্ডার বিরোধী
গোষ্ঠীর।

অজিত পান্ডার বিরোধী গোষ্ঠীর
নেতারা নিজেদের মধ্যে এক বৈঠক
করে ঠিক করেছেন যে, অজিত
পান্ডার "ক্রেডিট" বাড়ানোর জন্য
আমরা সি পি এমের সঙ্গে, বন্ধের
ব্যাপারে কনক্লুসন করতে বাব
না।

শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

দেই চাকর্যকর নাগরওয়াল
মালহার কথা সকলের নিশ্চয়ই স্মরণ
আছে। মা ম লা টি ছিল স্টেট
ব্যাংককে ৬০ লক্ষ টাকা প্রতারণার।
নাগরওয়াল নামক জনৈক ব্যক্তি
নাকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী
ইন্দিরা গান্ধীর গলা নকল করে
টেলিফোনে স্টেট ব্যাংকের ক্যাশি-
য়ার বেদপ্রকাশ মালহোত্রার নিকট
৬০ লক্ষ টাকা চায় এবং তা একটি
শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

আরো দু'একজন মন্ত্রী বাদ পড়বেন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ থেকে আরও
দু-একজন প্রবীণ মন্ত্রী বাদ পড়বেন
মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয়
মন্ত্রিগণ থেকে কমলাপতি জিণাঠীকে
বাদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য জিণাঠী
পদত্যাগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী
শ্রী দেই পদত্যাগপত্র গ্রহণের অন্ত
রাষ্ট্রপতির নিকট স্থাপন করে-
ছিলেন। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল

অন্ত। জিণাঠীর সঙ্গে ইন্দিরার
মতপার্থক্য চলছিল অনেক আগে
থেকেই। মূল মতপার্থক্যটা ছিল
সঙ্কল্পকে কেন্দ্র করে। জিণাঠী
এর আগেও একবার পদত্যাগ করে-
ছিলেন।

ইরানীং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভেক্টরমণের
সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরসীমা

মাওয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা
গান্ধীর মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে
জিণাঠীকে কেন্দ্র করে।

সঙ্কল্প গান্ধীর মৃত্যুর পর সঙ্কল্প-
পন্থীরা কিছুদিন চুপচাপই ছিলেন।
এখন তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন
কতিপয় প্রবীণ মন্ত্রীকে কোণঠাসা
করতে তারা বরাবরই সঙ্কল্প গান্ধীর
বিরোধিতা করে এসেছেন।

জিণাঠী, ভেক্টরমণ এবং মাওয়ের
কোন গুরুত্ব সঙ্কল্প গান্ধীর জীবিত-
কালে ছিলনা। সঙ্কল্পের মৃত্যুর পর
এঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর
মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন।
বাকি দুজনের কি হবে? শেষ পর্যন্ত
তারাও কি জিণাঠীর পন্থা অহসরণ
করবেন?

চিটফাওগুলোয় যা চলছে

এ বছরের ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে
রাজ্য সরকার চিটফাওর চলতি
ব্যবসা সোটার্নোয় নির্দেশ দিয়েছে।
দুর্পণে গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে
যে জালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরে
চিট ফাওর কার্যকলাপ তদন্ত করে
দেখার জন্য একটা বিশেষ সেল খোলা
হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চিট ফাওর
মালিকরা রাতারাতি ব্যবসা তুলে
দূরে পড়েছেন, কলে আত্মদাক্ষী-

দের ভুগতে হচ্ছে।
বেশন, রাজ্য সরকারের প্রকা-
শিত ১১৩টি সংখ্যার তালিকার ৩১নং
খানাধিকারী প্রোভি ক্রেডিট চীট
এ্যাণ্ড সেভিং ইনভেস্টমেন্ট (প্রা)
লিমিটেড, রেজি নং ২২৬২৭। প্রধান
কার্যালয় ২৩৪ ডি রাসবিহারী এ্যাভি-
নিউ, কলিকাতা-১১। উক্ত সংখ্যার
চুঁচুড়া শাখার ১১৭৫ দায়ে চারশ
শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

দিল্লীতে এখন সাধু সন্ন্যাসীরা আখড়া গাড়েছেন

ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী নেপালে আশ্রয় নিচ্ছেন

মওকা বুকে বিহারের চম্পারণ থেকে দিল্লীতে ভিড়ে গিয়ে যতি বাবা এখন রাজনৈতিক মহলে বেশ মান সম্মান পাচ্ছেন। কয়েকজন মন্ত্রী তো তাঁকে মাথায় করে রেখেছেন। এই দেখে যতি বাবার পেছনে পেছনে কিছু ব্যবসায়ীও ঘুর ঘুর করছেন। যদি যতি বাবা কৃপা করে কিছু পাইয়ে দেন। তা তিনি ভক্তদের নিরাশ করছেন না। তিনিও বড় আশায় দিল্লীতে ভিড়েছেন। অস্ত্র-দেয়ও ভরসা দিচ্ছেন। অস্ত্রদিকে উত্তর প্রদেশের আজমগড়বাসী মৌনি বাবাও তাঁর এক বিশিষ্ট সেবককে ভরসা দিচ্ছেন। এই সেবকটি হলেন জনতা (জে পি) দলের সভাপতি চন্দ্রশেখর। এখন তিনি এবং তাঁর মত বেশ কিছু রাজনীতিজীবী অষ্টমুখী হয়ে বাবা-দের চরণ বন্দনা করছেন।

এদিকে রাজধানী গুলজার করে নতুন সাধু সন্ন্যাসীরা যখন আখড়া গাড়েছেন তখন সময় থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নিতে ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

বড়ই আতুল হয়ে পড়েছেন। এখন তিনি আর তেমন কবে পাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে। তাঁর একচ্ছত্র প্রভাবও খাটছে না। পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী হাজির হয়েছে। তাই তিনি নেপালের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা করতে চলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করছেন কিছু মারশাল বীর সামনের বাহাদুর। নেপালের ক্ষমতাসালী মহলে বীর এখনও প্রতাপ আছে। এই সামনের বাহাদুর ধীরেন্দ্র ব্রহ্ম-চারীকে সহযোগিতা করছেন তাঁরও বেশ বড়মুড়া লাভ বাতে হয়। ব্রহ্ম-চারীজী এতে অবশ্য পিছপা নন। তাই খুব শিগগিরই পদত্যাগ সাধ টাকা দায়ের একশ পঞ্চাশ ঘরের একটি প্রাসাদের মালিক হতে চলে-ছেন। কোটিপতি ব্রহ্মচারী এটিকে নিয়ে আর এক ব্যবসায়ীদ্বার ফিকিরে আছেন।

এবার হয়্যাং হয়্যাং আসছেন

দিল্লীতে আসার সময় যখন এগিয়ে আসছিল তখন বিয় ঘটায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়্যাং হয়্যাং ভারতের সঙ্গে ঐশ্বর্যী সম্ভাবনা উজ্জল করতে এলেন না। এতদ্ব্যতীত ভরসা কল্পনাই না হল। দেশের নেতৃমহলে রহস্যময়তার অন্ত আসি করেও তিনি এলেন না এরকম কথার সঙ্গে দিল্লীতে একথাটাও বেশ আমল পেল

যে, কম্পুচিয়ার হেং মায়রিন সন্-কারকে ভারত স্বীকৃতি দেওয়ার চীন যে খুশী নয় সেটা এইভাবে জানান হল। যাইহোক, এখন চীন বুঝেছে আর বেশী দেয়ী নয়। এবার পর-রাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারতে যাবার পথ তৈরী করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ভাড়াভাড়ি সম্ভব হয়্যাং-এর সফর পাকা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্বরক্ষানিয়ম স্বামী ই-কংগ্রেসে ?

এলিট রাজনীতিবিদ উচ্চশিক্ষিত স্বরক্ষানিয়ম স্বামী কি এবার ইন্দিরা কংগ্রেসে চলেছেন? সম্ভাবনাটা একদম উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা। কেননা জনতার (জে পি) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে তাঁর দলের মিলে যাও-রার গোপন চুক্তি হবার মত অবস্থা

দেখে তিনি খুব দৃঢ় হয়েছেন। প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করছেন। এর কারণ আদর্শগত নয়। তিনি এই মিলে যাওয়ার পর পাক্তা না পাওয়ার ভাবনায় ভুগছেন। এই অস্থিরতার স্বরূপে স্বরক্ষানিয়ম স্বামীকে টোপ দিয়ে কংগ্রেস (ই) দলে বাঁধার চেষ্টা চলছে।

কখনো চুলোচুলি কখনো গলাগলি

অকালে জনতা ভেঙে যে সব দলগুলি দেশের মানুষের সামনে নয় নৃত্য করে, চুনকালি মেখে ইন্দিরা গান্ধীকে আবার রাজনীতির শীর্ষে এনে দিয়েছিল এখন তারাই আবার ইন্দিরা বিরোধী জোট বাঁধছে। পালাপালি চুলোচুলি করার পর আবার গলাগলির পালা শুরু

হয়েছে। চলতি লোকসভা অধি-বেশনে ভাব ভালবাসার মহড়া দেওয়া শুরু হয়েছে। সি পি আই, সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, লোকদল, কংগ্রেস (আ), জনতা, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রভৃতি দলগুলি তাই বড় কাছাকাছি থেকে কাজ করছে।

সম্পাদকীয়

আসামে ই-কং সরকার ?

‘বিদেশী’ প্রায়ে আন্দোলন অব্যাহত, বন্ধ-সত্যাগ্রহে জনজীবন বিপর্যস্ত—মূল সমস্যার সমাধানে এক পা-ও অগ্রসর হবার সুযোগ বার নেই, সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং লোকসভায় ঘোষণা করেছেন যে আগামী ১২ ডিসেম্বরের মধ্যেই নাকি তার হল আসামে লোকায়ত সরকার গঠন করবে। তারুষ্কি এ-বাবদ ছুটো—এক, আগামী ১২ তারিখে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ খতম হয়ে যাচ্ছে, দুই, তার হলই রাজ্য বিধানসভায় ১২৬ জন সদস্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জৈল সিং সেদিন লোকসভায় মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে যে-কথা কবুল করতে পারেননি সেটা হল আসাম সমস্যার সমাধান তিনি এগারো মাসের মধ্যেও করতে পারেননি। সরকারী নিষেধাজ্ঞা, ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করে সরকারী কর্মচারীরা যে ধর্মঘট করেছেন, আন্দোলনের নতুন পর্যায়েও দিনের পর দিন আসামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যে পঙ্গু করে দিয়েছেন এবং সরকার বিক্ষাণিত মেজে কেবল সে দৃষ্ট যে অবলোকন করে গিয়েছেন—এসটাবাদী তিনি যেমালুম চেপে গিয়েছেন। আস্থ ও

পরিষদ মেতাদের তিনি আর একটি বৈঠকে বদার লজ দিল্লি নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে আন্দোলনের নেতারা এখন পৌহাটিতে বৈঠকের জের ধরলেন বৈল সিংকে তার কাছে কি মাথানত করতেই দেখা পেলনা ?

এ পর্যন্ত বিদেশী চিহ্নিতকরণে লবঙ্গলীর বৈঠকের প্রস্তাব ছাড়া বাকি সমস্ত প্রায়েই কেন্দ্রীয় সরকার আন্দোলনকারীদের কাছে মতি খীকার করে এসেছে। এর পরেও তারা আন্দোলনকারীদের সম্মতে আসামে জনপ্রিয় সরকার গঠনের আশ্বাস করেন কেমন করে। কী করে তারা বিশ্বাস করেন যে সে-সরকার স্থায়ী হবে ? যারা লোকসভায় নির্বাচন বানচাল করে দিয়েছে, তেল, বাঁশ, কাঠ, প্রাইউড ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, বিধান-সভায় সমস্তদের ঘেরাও করে রেখেছে তারা কি দাবি আদায়ের আপে জৈল সিংকে তার ইচ্ছে মতো সরকার গঠন করতে হবে ? তবে কি আবার এম এল এ কিনে, আন্দোলনকারীদের মস্তিষ্কের টোপ সিলিয়ে একটা সুবিধাবাদী জোড়াতালির সরকার গড়তে চান ? তার আস্থই বা কদিন ?

ধর্মণ এবং মদের দোকানের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

মন্ত্রি সীওতাল সমাজ ল মহলের ডাকে পুকলিয়ার মানবাজারে ৬ হাজার সীওতাল শোভাযাত্রা করে মানবাজার থানার দক্ষিণ পুকলিয়ার এস-ডি-ও এবং ডি-এস-পি আসামের নিকট আরকলিপি দেন। আরক-লিপিতে মানবাজার থানার মন্ত্রি এবং আগে অস্থিতি আদিবাসী রমণী-দের উপর পাশবিক অত্যাচারের লজ অপরাধীদের অবিলম্বে শাস্তিদানের দাবি জানানো হয়। তাদের বিতীরা দাবি ছিল পুকলিয়ার গ্রামাঞ্চলের সব মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা। কারণ সীওতালরা মদের দোকানে সব খেয়ে সব পরসী উড়িয়ে দিচ্ছে এবং সমস্ত জরি বিক্রি করছে। তৃতীয় দাবি ছিল, আদি-বাসীদের লজ আদালতে আদিবাসী দোতাবী নিয়োগ।

কারণ নিরক্ষর সীওতালরা বাংলা ঠিক মতো বুঝতে না পেরে মানবাজার হয়ে যায়। সীওতাল কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কুর নেতৃত্বে লাভজন সীওতাল কবি ও সমাজসেবী ওই আরকলিপি পেশ করেন।

মানবাজারে যাতে অশ্রীতিস্বর ঘটনা না ঘটে সেজন্য জেলা শাসক নিজে মানবাজার থানার উপস্থিত ছিলেন এবং বারাকপুর থেকেও সেশাল আর্ম পুলিশের একটা বড় হলকে মানবাজারে পাঠানো হয়েছিল। মানবাজারের বিক্ষোভে যাতে বেশী আদিবাসী না আসতে পারে সেজন্য কাড়খণ্ড মুক্তি মার্চা বাঁহুড়ার রাই-পুরে এবং পুকলিয়ার পুক থানার হুটি দতা করে এবং অজ একটা হল ওই এলাকার এটি দতা করে।

দেশ কাল রাজনীতি

সংসদে বাড়া হাওয়া

ভারতপুত্র

প্রচণ্ড স্বত্ব-কাপটার মধ্য-দ্বি-রে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হল। স্বত্বটা বইয়ে দিয়েছে সম্মিলিত বিরোধী শক্তি, স্বাধীনতা থেয়েছে ইন্দিরা সরকার বা ইন্দিরা কংগ্রেস। স্বত্বের পূর্বাত্মক আগেই পাওয়া গিয়েছিল স্বত্ব বিরোধী জননেতার দ্বারা স্বত্ব বৈঠকে মিলিত হয়ে সরকারী নীতি ও কার্যের একাবদ্ধ প্রতিরোধের কর্মসূচী গ্রহণ করে। অব্যাহত বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা অস্তিত্ব, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, কৃষি পণ্যের মহারক মূল্য, স্বাধীনতা কোম্পানীর স্বাধীনকরণ, পিটস বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে সরকারের সমালোচনা এবং জনগণের কাছে ইন্দিরা সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্র আর একবার উন্মোচন করাই হল বিরোধী দল-গুলোর উদ্দেশ্য। লোকদল, জনতা দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, কংগ্রেস-আর্গ, সি পি আই, সি পি আই-এম, কনগ্রেস রক, আর এম পি ইত্যাদি হল এই ধোঁ ধোঁ সংগ্রামে নামিল হয়েছে। তাদের পক্ষে থেকে নেতারা আলাদাভাবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে লাক্ষ্য করে একটি আরকলিপি পেশ করেছেন। সেই আরকলিপিতেও ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের আপত্তি প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। রাজ্য-গুলোর প্রতি কেন্দ্রের স্বত্বস্বাধীন প্রথা-বিরোধী আচরণ, বিচারপতি নিয়োগে বহুলিতে প্রধান বিচার-পতির সাংবিধানিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিষয়ও আরক-লিপিতে স্থান পেয়েছে। অধিবেশনের প্রথম দিকেই কয়েকটি বিষয় নিয়ে সমস্ত আলোচনার দাবি অধ্যক্ষের অগ্রাহ্য করলে প্রতিবাদে উত্তর দতা থেকেই বিরোধী সমস্তেরা ওয়াক আউট করেন। সমস্ত ছিলেন শাসক দলের সঙ্গে ডি এম কে ও মুসলিম লীগ।

গত এগারো মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশের কোন সমস্যারই সমাধানে আন্ত-রিক্তাটুও প্রদর্শন করতে পারেন নি। মূল্যবৃদ্ধি রোধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তিনি যে ব্যর্থ হয়ে-ছেন, একথা হলনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নিজেরই স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্যর্থতা স্বীকারের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হবার অর্থ্য পথত্যাগ করার

বদলে তিনি সমালোচক বিরোধীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার লজ দলীয় সংসদ সমস্তের প্রতি নির্দেশ দিয়ে-ছেন। অধিবেশনের প্রাকালে অস্থ-রিত কংগ্রেস-ই সংসদীয় দলের বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী কোন রকম রাধ-চাক না করেই বিরোধীদের প্রতি আক্রমণের প্রয়োচনা দিয়ে-ছেন। নিজের ব্যর্থতা চাকবার লজ বিরোধীদের টুটি চেপে ধরার এ হুমকি কেবল ডিক্টেটরেরই শোভা পায়। লোকসভায় বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিরোধী সদস্যের ভয়ে লজ কম্পমান কেমন ? কেন তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হয়ে অগণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতার লাহাঘো (সংসদে আনীত মোট ৩৮টি বিলের মধ্যে ১৪টিই অভিজ্ঞতা) দেশ শাসন করতে চাইছেন ? কেন তিনি জাতীয় সমস্যা নিয়ে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ভয় পান ? প্রশ্নগুলোর জবাব একটা ই। ইন্দিরা মনে প্রাণে ধৈর্যতন্ত্রী ও গণতন্ত্রে তাঁর আর আস্থা-প্রত্যা নেই, তিনি বুঝে গিয়েছেন গণতান্ত্রিক পথের

জটিল তথাকথিত আন্দামান বন্দীর কীর্তিকাহিনী

হাওড়া জেলার শিলধানার জি, টি, রোডে বাস করেন জটিল তথা-কথিত প্রাক্তন আন্দামান বন্দী। কেউ কেউ বলেন ইংরাজের গোয়েন্দাগিরি করার লজই তিনি সেখানে প্রেরিত হয়েছিলেন। পদবী বহলে ব্রহ্মচারী করেছেন, কিন্তু বহু মেয়ের লবঙ্গাশ করার লজ তিনি নাকি দারী। যে বাড়ীটার থাকেন তার বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া দেন না এবং বলেন পূর্তমন্ত্রী আবার বনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমতী আশি কলকাতার দ্যাট পেয়ে যাবো। হাওড়ার তার বাড়ীতে অশোকনগরের প্রাক্তন এম, এল, এর (কংগ্রেসী) নামে তার টেলি-ফোন। ঐ ভল্ললোককে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে আরো কিছু সূত্রা স্বাধীনতা সংগ্রামী বানান।

এই ভল্ললোকের বিরুদ্ধে অভি-যোগ হল—(১) তার বাড়ীটা সূত্রা

পদ্বিতে টিকে থাকার দিন তার হুরিয়ে গিয়েছে, তিনি সংসদীয় গণ-তান্ত্রিক প্রথার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্র-পতি-বাঁচের সরকার গঠন করতে চান এবং রাষ্ট্রপতির আসনে নিজেই চড়ে বসতে চান। অর্থ্য ডিক্টেটর। তার এ-লাগ পূরণে তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সেমাপতি ছিলেন, সেই লজ মুকলি অকালে হয়ে গিয়েছে। লেহজই তিনি লজ-গঠিত গেস্টাপো বাহিনীকে বহু দিয়ে সংসদে তাওব চালানোর হুকুম দিয়েছেন। সংসদের গত অধিবেশনে লজ গান্ধীর নেতৃত্বে তারা বিরোধীদের এতাবেই তো যোগ করে দিয়েছিলেন।

অধিবেশনের প্রথম দিনে যেভাবে সূচনা হয়েছে তাতে অস্থমান করা যায় নির্ধারিত চার লপ্তাহের বাকি দিনগুলো কী চেহারা নিয়ে হাজির হবে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বামপন্থী এম পিদের এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করে অস্থরোধ করেছেন রাজ্যের জায়সমস্ত দাবি হাওয়া নিয়ে তারা যেন কেন্দ্রের উপর নিরলসভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। অর্থ্য প্রথম দিনেই সংসদে যে স্বত্ব উঠেছে শেষ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। হলনেত্রীর নির্দেশ মাত করতে গিয়ে কংগ্রেস-ই সমস্তেরা আগামী দিনে সংসদে কী আল সৃষ্টি করেন, তার পরিণতিই বা কী হয়, দেশবাসী সেটাই দেখার অপেক্ষার থাকবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তৈরীর একটা ক্রেজ ; (২) এটা মেয়ে ধরারও ক্রেজ ; (৩) লোকের কাছ থেকে পেলন করে দেবেন বলে টাকা আদায় করেন,—এই ব্যবসা তার দীর্ঘ দিনের ; (৪) যাদের পেলন কোন-দিনই হবার নয় তাদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করেন এবং করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন ; (৫) দিল্লীতে নাকি তার একটা সংসার আছে আর দরিদ্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাজ হাঁসিল করে দেবেন বলে টাকা নেন ; (৬) স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিধবাদের অহেতুক হররাপি করেন এবং টাকা নেনও (৭) মিলিকের লজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আন্দামান বন্দীদের নাম জাদিয়ে তিনি মিলিকের মাল সংগ্রহ করেন—লেন্ডলির কিছু বিলি হয়েছে এবং বাকীগুলি তার ছাড়ের কুঠরীতে বন্দী আছে। (৮) তিনি রাইটার শেখাংশ :স পুঠার

শ্রমিক-কর্মচারী সংবাদ

রেল পাইকারী হারে কর্মী ছাঁটাই

রেল দপ্তরে নাকি সব বিভাগে কর্মী সংখ্যা কমানো হচ্ছে। ৬২ মাল থেকে প্রশাসনিক বিভাগে নতুন পদ সৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। রেলের ২০ লক্ষ কর্মচারী ১৯৮৫ সালের মধ্যে নাকি কমে ১১ লাখে দাঁড়াবে।

সম্প্রতি কলকাতার এক দাবাদিক সম্মেলনে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মিনিস্ট্রিয়াল ট্রাফ অ্যান্ড মার্শালিংয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এ. অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন, রেলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অটোমেশন চালু করার পদক্ষেপ হিসেবে আস্তে আস্তে সাধারণ কর্মী সংখ্যা কমিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ কর্মী বাড়লেও লক্ষণীয়ভাবে বড়োছে অফিসারদের সংখ্যা। গত ২২ মাসে অফিসারদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। আর ৮০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার। সাধারণ কর্মচারীরা সবদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর প্রতিবাদে ১০ই ও ১১ই নভেম্বর কলকাতায় অ্যান্ডালিমেশনের দ্বারা রেল সম্মেলনে একটি আন্দোলনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত

হয়েছে ৪ ডিসেম্বর রেলের প্রতিটি বিভাগে বিক্ষোভ দেখানো হবে।

রেলের ক্যাড্রাল কর্মীদের সভা

রেলের প্রকল্প ও নির্মাণ বিভাগের ক্যাড্রাল কর্মীদের ৩০ দফা দাবি আদায়ের জন্ত গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর নেতাজী স্তম্ভ ইনস্টিটিউটে দুদিনের সম্মেলন হল। সম্মেলনে বক্তারা ক্যাড্রাল কর্মচারীদের বঞ্চার দিকগুলো তুলে ধরে বলেন যে, রেল কর্তৃপক্ষ এদের সম্পর্কে উদাসীন। অথচ এই সব শ্রমিকরা রেলের যাবতীয় নির্মাণ কাজ বা দেশের অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজনীয় তার সঙ্গে যুক্ত। সম্মেলনে ক্যাড্রাল প্রথা বাতিলের দাবি জানানো হয়। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ক্যাড্রাল শ্রমিকদের দাবি দলদ পৌছে দেবার জন্ত পূর্ব রেল ও মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজারদের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। সম্মেলন শেষে ক্যাড্রাল কর্মচারীরা এক সশ্রুত মিছিল বার করেন।

বেহালা ট্রাম ডিপো এলাকায় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য

বেহালা ট্রাম ডিপো এলাকাটি কতিপয় সমাজবিরোধীর মুক্তাকলে পরিণত হয়েছে। এদের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় বাসব এবং ট্রাম ডিপো সংলগ্ন দোকানদাররা ভীত ও আতঙ্কিত। এরা করেনা এমন কোন কাজ মেনে। জানা গেছে যে, এই সমাজবিরোধীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে তপন দত্ত নামক জনৈক যুবক। তার পেশা হচ্ছে ট্রাম ডিপো এলাকার চোলাই মদ বিক্রী করা। এদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের নাম মনশক্তি দত্ত। এবার কালী পুজোর এদের টাঁহার জুলুম চরমে উঠেছিল। তবে প্রায় সব দোকানদারই এদের দাবি মত টাকা দিয়েছে। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ডাঃ বি সি চ্যাটার্জী। ফলে তার ওষুধের দোকানে গত ৯ নভেম্বর একরকম হামলা করে। রবি, কঠিক, বাবুরা প্রভৃতি পরিচিত সমাজবিরোধীরা ডাঃ চ্যাটার্জীকে চমকী দিচ্ছে প্রকাশ্যেই। থানার অভিযোগ করা হয়েছে। কোন দল হয়নি। এই সব সমাজবিরোধীদের

দাপটে সন্ধ্যার পর ট্রাম ডিপো এলাকার বাসবের চলাফেরা করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসবদের দাবি ট্রাম ডিপো এলাকার এই সব সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পুলিশ অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক যাতে নিরীহ পথচারীরা এবং স্থানীয় দোকানদাররা রক্ষা পেতে পারেন। ট্রাম ডিপোতে একটি সব সময়ের পুলিশ পিকেট রাখার দাবিও অনেক করেছেন। ইতিপূর্বে দর্পণে এই সব সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পুলিশ বাধ্যতায় ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিছু দিন সমাজবিরোধীরা পা চাকা দিয়েছিল। তারপর আবার বে কেমই। এবার তাদের দাপট আরও বেশি। অথচ এই ট্রাম ডিপো এলাকার অনতিদূরেই রয়েছে 'দি পি' এমের বেহালার পূর্ব ও পশ্চিম আঞ্চলিক অফিস। তাঁরা কি এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে সক্রিয় হতে পারেন না?

চাকীরাও ইউনিয়ন করলেন

অসংগঠিত ক্ষেত্রের খেটে খাওয়া মাছবের মধ্যেও বাঁচার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ তপশীল চাকী অ্যাণ্ড ব্যাণ্ড সমিতি নামে একটি নতুন ইউনিয়ন হয়েছে। সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন হাজার পাঁচশত। অফিসের ঠিকানা—৫/১২ -কল্যাণপুর রোড, বেলুড়, হাওড়া। চাকীদের অভিযোগ হচ্ছে, বিভিন্ন পুজার আসরে তাঁদের ঢাক বাজাতে বারণ করা হয়। কিন্তু বক্তৃতাতে তাঁদের প্রাণ্য মেটানো হয়না। প্রাণ্য চাইলে তাঁদের মারধোর পর্যন্ত করা হয়েছে। এমন কি মাতাল গুণ্ডারা তাঁদের ঢাকা পরমা পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্তই চাকীদের এই ইউনিয়ন।

করপোরেশন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ

কিছু কর্মচারীদের অসহযোগিতার ফলে 'করপোরেশন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের' কাজকর্ম প্রায় বন্ধের মুখে। চেকের শিফটে ট্যাম্প মারার কাজ তাঁরা না করতে চাওয়ার ব্যাঙ্ক ৪০ দিন বাবৎ কোন ক্লিরেন্স হচ্ছে না। এই অভিযোগ করেছেন এই ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার আর ভেঙ্কটচলম।

বন্দর ডক ধর্মঘট স্ফুগিত

দারাদারত বন্দর ও ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট আশ্রিত স্ফুগিত তাণ্ডা হয়েছে। ১৭ নভেম্বর থেকে এই ধর্মঘট শুরু হবার কথা ছিল। তেজীয়া কাছাল ও পরিবহনমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিলের সঙ্গে বন্দর ও ডক শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের দীর্ঘ আলোচনার দাবিহীনতার ব্যাপারে কোন মীমাংসা অব্যত হয়নি। কিন্তু শ্রীপাতিল, ১৭ নভেম্বর 'বিদেশ' বাজেন। সেজন্য তিনি ধর্মঘট স্ফুগিত রাখার জন্ত অহরোধ করলে নেতারা তা মেনে নেন।

খড়গপুরে আই আই টি কর্মীদের অনশন ধর্মঘট

খড়গপুর আই আই টি কর্মচারীরা তাঁদের মানা দাবিগুলির সম্মানজনক মীমাংসার প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাবার পর ব্যর্থ হয়ে, ১১ নভেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমিক অনশন ধর্মঘট শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি কর্তৃপক্ষ অনেকগুলি স্বীকৃত অধিকার ছিনিয়ে নেবার মতলব করছে।

[বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের খবর বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে দর্পণ পক্ষিলে পাঠানোর অহরোধ করা হচ্ছে।]

অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র আবার কেউটে সাপের গর্তে হাত দিয়েছেন

রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র মূর্খদের টাক ফোর্সকে সাঙোতালিতে ধোঁতে বাধ্য দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। শক্তিশালী জবীর মদতপুষ্টি পিরারলেন, কেবারিট সফরিডা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অস্ত্রবানে নামার একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রথম পাতার বড় বড় করে লিখলো, 'ডঃ অশোক মিত্র কলকাতা কাপিয়েছেন।'

বেপরোয়া বলেই তিনি বিধানসভায় বলেছেন 'ক্ষেত্রের ঘর তখন ছড়ে দেবো', 'জেলীক্ষদের ঘর কেড়ে নেবো।' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যখন প্রশাসন চালাবার প্রয়োজনে আই, পি, এম, অফিসারদের চটোতে রাঙ্গি হন না, রুগু গুহ নিয়োগীকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন মানপেণ্ড করতে সাহস পেলেন না, ইসলামপুরে গত এপ্রিলে যে পুলিশরা গ্রাম জালালো তাঁদেরকে জেলার বাইরে বদলী করতে পিছু হঠলেন সে সময় অর্থমন্ত্রী কেউটে সাপের গর্তে হাত দিয়েছেন।

পুলিশের কার্যকলাপ নিয়ে কাগজে, বহু লেখালেখি হয়েছে। যুগান্তরে শ্রীমনিষ ভট্টাচার্য 'যেমন দেখছি' কলামে পুলিশের বাধাহীন ঘুষের কারবারের ধাধাধা বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু পুলিশ এসবকে খোঁড়াই করার করেছে। এই বাজারে হাতে কেটেফুটে ৩০০/৩৫০ টাকা মাইনে পাওয়া কনস্টেবলরা ৮/১০ জনের পরিবার চালায়েও বাড়ি উঠিয়েছে। দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল উত্তর কলকাতা পুলিশের তথ্যিক এ্যানিস্ট্যান্ট কমিশনারের ছেলের পৈতৃক এলাহি আয়োজনের কথা। এই মাল দুই/তিন আগে সভায়গে তিন কিস্তিতে রেপিয়েছিল 'অর্থ জালবাজার ইতিকথা।'

পুলিশের উপর থেকে তলা পর্যন্ত ঘুষখোরে ভর্তি। ব্যতিক্রম ছ চারজন মাত্র। সংলোক এ মাইনে চাকরীতে এলে তার অসং পরিপতি হতে বাধ্য। পুলিশী ব্যবস্থার কাঠামো ও পরিবেশই এমন। সি'থির মোড়, চিড়িয়া মোড়, ধড়-বাজারে ডিউটি ফেলার জন্ত ট্রাফিক কনস্টেবলরা উপরওয়ালাকে ঘুষ দের।

এরকম একজন ট্রাফিক কনস্টেগত ১৬ নভেম্বর লকাল এগারোটা নাগাদ সি'থির মোড়ে ডিউটির নামে লতী চালকের কাছ থেকে ঘুষ নিতে গিয়ে ডঃ অশোক মিত্রের চোখে

পড়ে। অর্থমন্ত্রী দেখানে গাড়ি থামিয়ে ঐ কনস্টেবলকে গাড়িতে তুলে দোঙ্গা কাশীপুর থানায় আনেন। ও. সি, ডি. সি. (ট্রাফিক), এ. সি. (ট্রাফিক) সব ছুটে আনেন। কনস্টেবলটিকে জালবাজারে পাঠানো হয়।

ওমনি বড়কর্তারা বলে উঠলেন, ও মা, পে কি কথা। ডিউটিতে অবস্থায় কনস্টেবলটিতে তিনি হাতে নাতে পাঁকড়াও করে ভীষণ অত্যাচার করেছেন। বস্ত্রহঃ অর্থমন্ত্রী ঠিক কাজই করেছেন। শ্রীমিত্র ডিউটির সময় তাঁকে ধরেছেন কিন্তু ডিউটিরত অবস্থায় নয়, বরং ডিউটি অবহেলার সময়, যেসময়ে কলকাতার প্রবেশ-কারী অথবা বেআইনী হেতি দোড গাড়িকে ঘুষের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্ত।

ডঃ মিত্র নিজে ঐ কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা না বা দ করন। সংগৃহীত পুরসার সিংহভাগ কোথায় যায় তার হদিশ মিলবে। দেখবেন বিসাক্র দব কেউটে শাপ জালবাজারের বড় বড় পদে আসীন।

অরোভিলে গণ্ডগোল

৩য় পুটার পর সম্মেলনে। সভাপতিত্ব করেছিলেন মা নিজে। তিনি চেয়েছিলেন শ্রীমদবিন্দু সোমাইটিই এই শহর প্রতিষ্ঠা করুক এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করুক।

সদস্য সম্পত্তি রেজিস্টার্ড করা হয় এবং লেকারপেই এম এ 'এস-ই' তার বৈধ মালিক। এ পর্যন্ত ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আর মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা এসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে।

বিস্ময়ের বক্তব্য হল : মায়ের মৃত্যুর পর এম এ এম নামক সংস্থাটি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সেই কারণেই অরোভিলের কার্য পরিচালনার কোন নৈতিক অধিকার তাদের নেই।

১৯৭৬ সালে সোমাইটির কাজ-কর্ম পরীক্ষা করে দেখার জন্ত তিন সদস্যক, এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। তার নেতৃত্ব করেন পণ্ডিতের উপরাজ্য বি টি কুলকারী। সেই রিপোর্ট আজও অপ্রকাশিত। ব্যাবহার তাগাদা দেয়া সম্বন্ধে নাকি সেই রিপোর্ট প্রকাশ পায়নি। দণ্ডাহ চারেক আগে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অফিসাররা সোমাইটিতে হানা দেয়। সদস্য এবং কর্মকর্তারাও বাদ যান না।

বখরাদারের ওকালতি

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

জাতীয় সংসদ পরিষদের পুনরুদ্ধারিত প্রথম অধিবেশনে একচেটিয়া মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কে. আর. ডি. টাটা এবং কে. কে. বিড়লাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভারত সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই দুই মহারথী অধিবেশনে হাজিরও হয়েছিলেন। জাতীয় সংসদটির প্রাঙ্গণে সংবিধান পাঠানোর প্রথম প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু বিড়লাজী অতশত বুঝতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি বড় বড় শিল্পপতিদের কৃতজ্ঞতার লীমা নেই। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্থান অস্থান বিবেচনা করা চলে না। তাই বিড়লাজী জাতীয় সংসদ পরিষদের সভার রাষ্ট্রপতি-প্রধান সংবিধান রচনার ওকালতি শুরু করলেন। সুপেশ গুপ্ত ত্যাগড় বিরোধী নেতা। তিনি সবিনয়ে প্রিজ্ঞাসা করলেন, বিড়লাজী কি কংগ্রেস (ই)-দলের পক্ষ থেকে কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য হয়ে বলতে হল যে বিড়লাজী তার নিজের কথা বলছেন, তার সঙ্গে আলোচনা করে একথা বলেন নি। ব্যাপারটা সেখানেই ধামাচাপা পড়লো।

আসলে ব্যাপারখানা কি? ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবার পর গত ম'বাসে ১৮৮টি অভিজ্ঞতা জারী করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলি স্বাভাবিক ব্যবহার অচল; কারণ অভিজ্ঞতা জারী করার কতকগুলি শর্ত সংবিধানেই নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয় ইন্দিরা মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টকে তার পেতে শুরু করেছেন। কারণ এই অভিজ্ঞতাগুলি সংসদে পাশ করিয়ে নিতে হবে। কিন্তু পাশ করাবার সময় বিরোধী পক্ষ ছেড়ে কথা কইবেন না। যেমন, মার্কিতি অধিগ্রহণ অভিজ্ঞতা আইনে পরিণত করার সময়-শ্রীমতী গান্ধীকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। স্বতঃপাঃ পার্লামেন্ট না থাকলেই ভালো। বা খুণী করা বার। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস বা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মত নিক'ড়াই হয়ে বিরোধী পক্ষের মাথা হাতে কেটে নেওয়া সহজ হয়।

কোন দেশে এই ধরনের টাটা বিড়লা মার্কী রাষ্ট্রপতি শাসন কখন চালু করার কথা শোনা যায়? যখন দেশের অর্থনৈতিক লংকট লাগলানো যায় না, যখন বাবা বাবা পুঁজি মালিকদের খুশখোরালী মুনাফাবাজির

বিকছে, অতি মুশাকা ও চোরাবাজারীর বিকছে দেশের মানুষ দোচ্চার হয়ে ওঠেন, যখন দেশব্যাপী প্রতিবাদের-কড় ওঠে, তখনই একচেটে মালিকেরা মার্কোস বা জিয়া-মার্কী রাষ্ট্রপতি শাসনের ঘুরা তোলে।

ইন্দিরা গান্ধী যশ-রাস আগে কতবার ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর থেকেই তিনি একচেটে বড় বড় শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের হুহাতে মুশাকা উপলোকন দিয়ে চলেছেন। প্রথমেই তিনি বড় বড় মালিকদের বেআইনী ভাবে লাই-সেন্স বহিষ্কৃত উপাধনকে আইন-মুদত করে দিলেন। এর ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গহানি হলো, ভবিষ্যত উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হলো, কিন্তু টাটা বিড়লাদের অতি মুশাকা আইনমুদত হলো। তারপর কোর সেকটরের কোন কোন শিল্পে একচেটিয়া পুঁজি প্রসারের দুয়ার খুলে দেওয়া হলো। রুগ শিল্পের সঙ্গে সংযুক্তি হলে বড় বড় শিল্পকে আরকর ছাড় দেওয়া হল এবং তার পর লঙ্কার মাথা ধেরে যে কোন দুই বা ততোধিক ব্যবসায় সংযুক্তি হলে তাদের ক্ষেত্রেও আরকর ছাড়ের অঙ্গমতি দেওয়া হল।

ডেকে আনা হল বিদেশীদের। শোষণের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে দেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই বিদেশী পুঁজিমালিকদের ভারতের জম লাধারণকে অবাধ শোষণ করার পথ খুলে দেওয়া হল। বিদেশী মুদ্রা লেনদেন ও বিদেশে পাচারের কড়াকড়ি শিথিল করা হলো। দেশের গুরুত্বপূর্ণ তৈল সম্পদ আহরণ করার একচেটিয়া সুযোগ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের শর্ত মেনে নিয়ে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের অঙ্গমোদিত বিদেশী ঠিকাদার কোম্পানীগুলির খরচদারী করার অধিকার স্বীকার করে দেওয়া হল।

অঙ্গমিকে অবিরাম মূল্যবৃদ্ধির চক্র স্থাপন করে দেশের মানুষকে ছিড়ে করে কেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে অসাপু দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের। সরকার দ্বিভেই দায়, সিনেক্ট, ডিজেল পেট্রোলজাত জ্বালান দ্রব্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর এখন লাধারণ মানুষের রেশনের চাল, গম, চিনির দামও বাড়ানো হল। বিড়লাজী, মোদি কিজির

যে খবর আনন্দবাজার যুগান্তর গুরুত্ব দিল না

১৬ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার সভা সমাবেশ কলমে একটা কর্মসূচীর উল্লেখ ছিল। ভারত চেম্বার অফ কমার্স আরোজিত এক আলোচনাচক্রের কথা বলছি। স্বগ্রীষ কোর্টের সভা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও কেরালার সাতার দালের প্রথম বাসগহী মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ আর্যর সেখানে ভাষণ ঘেন।

নিঃসন্দেহে বুই শুক্লপূর্ণ রিপোর্ট। কিন্তু ১৭ নভেম্বর আনন্দবাজার-শা যুগান্তরে এর কোন খবর পেলার না। স্টেটসম্যান তো তখন বন্ধ। ভারত চেম্বার অফ কমার্সের রিপোর্ট না ছাপার কি কারণ? এতো

আর বাসগহী আন্দোলনের খবর নয়। উপরন্তু আছে বিজ্ঞাপন পাবার ব্যাপারটা।

শ্রীকৃষ্ণ আর্যের ভাষণ ওয়া শুক্ল ছিল না। ওদের বিবেকে বাধলো। ভাষণে শ্রীয়ারার বলেছিলেন, "ভারতে বর্তমান শিল্প বিপর্যক আইনে শিল্পপতিরা বেশ-স্থখেই আছেন। দেশে আইন কাছন বাই-খাক না কেন, লংবিধানের মৌলিক অধিকারের বলে তাঁরা যে কোন আদালত থেকে ইনজাংশন পেয়ে যান। আর তাঁরা দেশের মানুষকে না চিনলেও দ্বিতীয় অফিসারদের চেনেন এবং কেমন করে ঘুঁ দিয়ে

ছোটবড় অফিসারদের ধরে মজীঘের হাত করতে হয় তা জানেন। এই ভাবেই দেশে গড়ে উঠেছে অপারেশন করাশন। কোন রাজনৈতিক দলই এর বাইরে নয়।"

শ্রীয়ারার আরো বলেন, "দেশের শিল্প আইনে ক্রটি আছে-বলেই জি, এন, পি, এস ভাণ্ডারাল ইনকাম এর লদে লদে এস ভাণ্ডারাল পভারটিও বাড়ছে।" আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীমহরেশনাথ সেন। অঙ্গান্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, শিল্পপতি এন, জি খৈতাম, এম, এল, গুপ্তা, এ, এক, কংতা প্রমুখ।

অরোভিলে গুগুগোলের নেপথ্যে

লক্ষ্যীতি এবং একা সময়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে "স্বর্ষোদয়ের শহর" অরোভিল থেকে। অরবিবিল্ড ডিলেজ এই নামকে একত্রে এবং সংক্ষিপ্ত করে করা হয়েছে অরোভিল।

এখানকার বর্তমান বাসিন্দারা দরাসরি দুটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত।

কিকিরবাজ গুরুদয়েরা হুহাত তুলে যেই যেই করে আল্লাদী নাচ শুরু করেছেন।

তাই বলছিলেন ইন্দিরাগীর সঙ্গে, তার সরকারের সঙ্গে একচেটিয়া, মুনাফালোভী শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের যে গোপন আতাত আছে, জাতীয় সংসদ পরিষদের সভার বিড়লাজী আনন্দে বেসামাল হয়ে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এঁদের বধরদারী স্বার্থ প্রকাশ পেয়ে গেছে।

আমাদের দেশবাসীকে এখনি লতর্ক হতে হবে। দেশব্যাপী উদ্ভাল প্রতিবাদের রুদ্ধ তুলে এই গোপন আতাতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে হবে। দেবী করার সময় নেই। লাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণের খণ্ডা নেমে এসেছে। এবার তাদের ব্যক্তিগত স্বাধিকার, রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কারণ বর্তমান শাসক শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধি শাসক হল প্রতিবাদের কঠোরোধ করতে উত্তত। এরই অঙ্কে জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন জারী করা হয়েছে। যাতে কোম মাসগিরকের কঠোর প্রতিবাদের ভাবা প্রকাশ না পায়। মূল্যবৃদ্ধি ও অভাব অনটনের শিকার হয়েও কেউ যেন মাথা তুলে কথা বলার সাহস না পায়।

একটি গোষ্ঠী শ্রীমহরিশ্ব মোসাইটির এবং অপরটি বিষ্ণুদয়ের। অরোভিলের কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্যীতি গ্রহণ করার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে।

অরোভিলের এলাকার পরিমাণ ২ হাজার ২০০ একর। যার অধিকাংশই তামিলনাড়ুর দ্বিপ্প আরকট জেলায় এবং বাকিটা রয়েছে পণ্ডিচেরির সীমানার। এখানে প্রায় তিনশত বিদেশীর বাস। এরা ফ্রান্স, জার্মানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। এখানকার বেতনভূক কর্মচারীরা ছাড়াও শতিনেক ভারতীয় এখানে বাস করেন। ছোটখাট ঘটনা নিয়ে এখানে বিবদমান দুই গোষ্ঠীর প্রায়শই বাদানুবাদ হয়ে থাকে। কিছু কিছু বিদেশী এস এ এসের পক্ষে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রায়ই অপমানসূচক কথাবার্তা বলেন। এস এ এসের জনৈক মুখপাত্রের মতে ২৫ থেকে ৩০ জন বিষ্ণু ব্যক্তিই সবরকম গুগুগোলের হোতা।

কেন এই গুগুগোল? কি তার কারণ? এ বিষয়ে উত্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে, যে, কোন পক্ষই অপর পক্ষকে লক্ষ করতে রাজী নয়। যদিও দুই গোষ্ঠীই মিজে-ধেরকে মায়ের আদর্শ সন্তান হিসাবে দাবি করছে।

অরোভিলের মিকটবর্তী বেসব গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামের মানুষ সরকারী বস্তব্যোর পক্ষে। যদিও গ্রামবাসীরা অরোভিলের আদর্শে বিশ্বাসী নয়। অরোভিলের বহু জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেবার পর থেকে। অরোভিলে বেসব মানুষ

কাজ করেন তাদের বেতন খুব অল্প। তাঁদের ধারণা সরকার যখন এর কর্তৃক হাতে নিচ্ছেন তখন বেতন বাড়বে, কৃষি উপাধন হবে।

অরোভিলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেয় ১৯৭৩ সালে। মায়ের মৃত্যু কিছুদিন পর থেকে। বহুবাহই গুগোল হয়েছে। এমনকি হাতা-হাতিও। পুলিশ ডাকতে হয়েছে বহুবাহ। নিষেধাজ্ঞাও বলবৎ করা হয়েছে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিলে একবার এবং ১৯৮০ সালের মার্চে ভারত নিবাসে দুবার বড় ধরনের গুগুগোল হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। একপক্ষ অপরপক্ষকে অবৈধ প্রবেশকারী বলে দাবি করছে। যদিও এস এ এস একটি বৈধ-সংস্থা এবং ভারত নিবাসে এর কয়েকটি শাখা অফিস আছে।

অপর একটি ঘটনায় এস এ এস-পুদী একটি গোষ্ঠী বিষ্ণুদয়ের হাতে ঘেরাও ছিলেন মাতৃমন্দিরে প্রবেশের সময়।

১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ১২৪টি দেশের শিতরা তাদের নিজ নিজ মাতৃমন্দির এক মুঠো মাটি এনে একটি খেতপাথরের পায়ে রাখে এবং স্বর্ষোদয়ের শহর হিসাবে এবং একটি আদর্শ শহর হিসাবে গড়ে তোলার প্রকল্প নেয়া হয়। শপথ হয় একা এবং লক্ষ্যীতির। তৎক্ষণাৎ জমি নেয়া হয়। দামি গ্রহণ করা হয়। আজও হচ্ছে।

আসলে এই এলাকাকে আদর্শ শহর হিসাবে গড়ে তোলার নিষাঙ্ক নেয়া হয়েছিল ১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীমহরিশ্ব মোসাইটির বিশ্ব শেবাংশে ওষপ্ঠার

সাম্প্রদায়িকতা ও উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণী(২)

অশোক চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রচারের পাশাপাশি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু আবার একটু ভিন্নভাবে দেখা গিয়েছিল। ১৮৭৮ সালে এক ভাষণে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তার নিদর্শন রাখেন। এই ১৮৭৮ সালেই শিবনাথ শাস্ত্রীর মহারতায় তিনি যে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন তার 'কাজই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যবোধ বাড়ানো।' অপর দিকে ১৮৮৪ সালে এক বক্তৃতায় নৈয়দ আহমেদ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য বলতে শুধু 'ধর্মগত' ব্যাপারটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি। বাস্তবিক ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত নৈয়দ আহমেদের চিন্তাও মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যত্বের পক্ষে উচ্চারণ রেখেছে। মুসলমান লক্ষ্যত্বের উন্নতি-মনস্তদত্তভাবে হওয়া দ্বারা এ পর্যন্ত নৈয়দ আহমেদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক চিন্তার একটি বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি। আগেই বলেছি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষাগতভাবে 'এগিয়ে থাকার' ভাষার পাশাপাশি - 'অশিক্ষিত' মুসলমানদের শিক্ষাগতভাবে 'এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' ব্যাপারটা থেকেই গিয়েছিল। মূলতঃ এই চিন্তা থেকেই আবদুল লতিফ, নবাব আমীর আলী খান, হাজী মহম্মদ নৈয়দ আহমেদ প্রভৃতির এ ব্যাপারে উদ্ভোগী হয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলকাতায় মহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, পরে যার নাম হয় সেন্ট্রাল স্ক্যানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। উল্লেখ্য যে হিন্দুও এই সমিতির সভ্য হতে পারত। ১৮৭৭ সালে 'হিন্দুয়েলা'-র কথা মনে রেখে নবাব আমীর আলী খান ভারতীয় মুসলমানদের হিতসাধন ও রাজনৈতিক আগ্রহের উদ্দেশ্যে 'স্ক্যানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতায়। এর চার বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে হাজী মহম্মদ হুসাইনের চেষ্টায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় ইংরেজী শিক্ষার জগতে মুসলমানদের প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। ১৮৭৭ সালে নৈয়দ আহমেদের চেষ্টায় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় (৭ই জুলাই)। উল্লেখ্য থাকতে পারে যে সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে দূরে রেখে এ

ব্যাপারে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। বাই হোক মোটের ওপর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় রেখে নৈয়দ আহমেদ অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের দ্বার লকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য খোলা রেখেছিলেন এবং সেখানে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য ছিল না। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যত্ব অঙ্গুরাধার পক্ষপাতমূলক বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে শান্তি, সাম্য ও সৌহার্দ্যবোধই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের আদর্শ। তিনি আরও বলেন যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বলপ্রয়োগ করার অর্থ 'জব্রুজ' মুসলমান হলেও 'ধর্মজব্রুজ' অমুসলমান। লক্ষ্যমীর্ষ যে মুসলমান হিসেবে নিজেকে স্বচিহ্নিত করলেও, মুসলমানদের উন্নতির কথা ভাবলেও, ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত দেখা যায় নৈয়দ আহমেদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যত্ব রক্ষার প্রয়াসই পেয়েছেন। ইণ্ডিয়ান মিডিল সার্ভিসে পরীক্ষার্থীদের বয়স সীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করার দাবীতে সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারতীয় আন্দোলনে নৈয়দ আহমেদ ও সক্রিয় সমর্থন জুগিয়েছিলেন। এরপর নৈয়দ আহমেদের পরিবর্তিত মনোভাব লক্ষ্যমীর্ষ।

সুরেন্দ্রনাথের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবকে মেনে নেওয়া ইংরেজদের পক্ষে সহনীয় হয়নি। অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে টিকিয়ে রাখার সহযোগী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। এর স্বীকৃতি আছে হিউমের নিজের কথায়। ইংরেজদেরই চেষ্টায় স্বকোশলে ব্রিটিশ বিরোধী সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হল কলকাতায় অচ্যুত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ছোঁয়ায় এবং প্রভাবে দ্বিভূত কংগ্রেস ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে থাকে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়ই মোটামুটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসূত চিন্তা-ভাবনা নিয়ে এগিয়েছিল। এখন তাদের সম্মিলিত রূপ কংগ্রেসে সেই ভাবধারাপ্রসূত শ্রীবুদ্ধি এবং ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তাতে ভাঙন ধরানোর

জন্ত ব্যবহার করার চেষ্টা হলো সাম্প্রদায়িকতাকে। এবং এই 'শ্রীবুদ্ধি ও জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা' হলো দ্বৈত ঐক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ করা এবং যেহেতু রাজনায়ক বহু, বক্রিচন্দ্র, বামী হরানন্দ সরস্বতী, বাল গদাধর তিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট প্রভৃতির প্রভাবে ভারতীয় জনসমাজের অতীত হয়েও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক অন্তর্ভুক্ত ও স্বতন্ত্রভাবে আকাজক হয়, তাই তার স্বযোগে দ্বৈত ঐক্যের ভিত্তিকে চূর্ণ করা খুব সহজসাধ্য হলো। তিলক বেসান্ট প্রভৃতির হিন্দু ধর্মের প্রতি অতিমাত্রার আস্থা ও প্রচার-মুখিতাকে সামনে রেখে 'অসংগঠিত' মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় খোঁচা দেওয়া হতে থাকল। এখান থেকেই নৈয়দ আহমেদের পরিবর্তিত মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্যমীর্ষ। কেমনা ১৮৮৮ সালে মীরাতে প্রবৃত্ত এক ভাষণে তিনি স্পষ্টতই বললেন : ধর্ম স্বাক ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে গেলে তখন সিংহাসনে কে বসবে? এক সিংহাসনে তো আর হিন্দু ও মুসলমান দুজন বসতে পারবে না। সুতরাং একজনকেই বসতে হবে অপরকে পরাজিত করে।

নৈয়দ আহমেদের এই বক্তব্যই শিক্ষাক্ষেত্রে যা চলুছে

১৯৬৩ সালে উত্তর-চব্বিশ পরগণার রহডা সরকার পৃষ্ঠপোষিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ স্থাপিত হয়। জরুরী অবস্থার সময় এর নাম হয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ। মূলতঃ পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া ছাত্রদের সুবিধার্থে এই কলেজটি গড়ে ওঠে। ছাত্রদের হোস্টেল, ঠাক কোয়ার্টার, খেলার মাঠ সহ কলেজটি স্থাপনের পুরো খরচা দেয় রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গ্রহী কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি এড হক কমিটির পরিচালনাধীনে কলেজটি শুরু হয়। ১৯৬১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসনে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ একটা 'বিশেষ গঠনমত' বলে কলেজের গভর্নিং বডি গঠনের অহুমতি পায়।

১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষকের চাকরীর নিয়োগভা সম্পর্কে একটা আইন পাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে

তার আগেই বাবতীর সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের নজিরকে ধরে করে সন্ধানি বা উপস্থাপিত করল তা হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক চেতনায় কাটল ধরিয়ে মূলতঃ তা অধোভিত্তিক পটভূমি তৈরীর দায়িত্ব। এবং এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন বিওডর বেক। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্ত সর্বব্যাপ্ত করার কথা ঘোষণা করতেও তুললেন না। আলিগড় কলেজের অধ্যাপক হওয়ার পর থেকে নৈয়দ আহমেদের উপর তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তারে সর্ম্ব্ব হয়ে নৈয়দে সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যত্বের মনোভাবে রূপান্তর আনতেও সর্ম্ব্ব্ব হলেন। কলেজের উপর পুরো কর্তৃত্ব বজায় রেখে আলিগড় ইনস্টিটিউট গেলেট নামক পত্রিকার লম্বা দায়িত্ব নিয়ে নৈয়দ আহমেদের নামে নিজেই তা সম্পাদনা করতে থাকেন এবং তাতে নিয়মিতভাবে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিবোধগার শুরু করতে থাকেন। এর পর ১৮৯৩ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে এই বেকের প্ররোচনায় শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্ত স্থাপিত হলো অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব আপার ইণ্ডিয়া। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসল-

মানদের ক্ষেপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকেই বেক বলেছিলেন যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশের হাত থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে তা হিন্দুদের হাতে দেওয়া। তার ফল নৈয়দ আহমেদের কলেজের দ্বার জন্ত সুরেন্দ্রনাথ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন যে নৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বাধীন মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেছে।

বেকের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মিঃ মরিসন। তিনিও বধ্যমীতি বেকের নীতিকে পরিচালিত করতে থাকেন। কলেজের সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হতে থাকে। লক্ষ্যমীর্ষ যে অ্যানি বেসান্ট এনে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করেছেন আর অপর দিকে মিঃ বেক ও মরিসন এনে পুষ্ট করেছেন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে এবং একাধারে উভয়ই সাক্ষ্যজনকভাবে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বার্ষিক করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্বের পটভূমি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একাধারে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি-নিষিদ্ধা তাঁদের সহযোগিতা করে লফল করে তুলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুট কৌশলকে। এবং এর অন্ততম ফল হিসেবে আমরা দেখেছি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ কীর্তির প্রেক্ষিতে ঢাকার নবাব লসি মুজাহ ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষিত অংশের একটা দল বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে কার্জনকে সমর্থন করেন।

(সমাপ্ত)

রহডা বিবেকানন্দ কলেজে শিক্ষক আন্দোলন

১৯৬৩ সালে উত্তর-চব্বিশ পরগণার রহডা সরকার পৃষ্ঠপোষিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ স্থাপিত হয়। জরুরী অবস্থার সময় এর নাম হয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ। মূলতঃ পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া ছাত্রদের সুবিধার্থে এই কলেজটি গড়ে ওঠে। ছাত্রদের হোস্টেল, ঠাক কোয়ার্টার, খেলার মাঠ সহ কলেজটি স্থাপনের পুরো খরচা দেয় রাজ্য সরকার, ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গ্রহী কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি এড হক কমিটির পরিচালনাধীনে কলেজটি শুরু হয়। ১৯৬১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতির শাসনে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ একটা 'বিশেষ গঠনমত' বলে কলেজের গভর্নিং বডি গঠনের অহুমতি পায়।

১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষকের চাকরীর নিয়োগভা সম্পর্কে একটা আইন পাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ তাদের অহুমত গভর্নিং বডির সহযোগিতায় একটা যত্নবহু করে। উদ্দেশ্য হল, এই আইনে স্বীকৃত চাকরীর নিয়োগ থেকে অধ্যাপকদের বঞ্চিত করা, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও অবসরকালীন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বর্ষ করা।

যত্নবহুর ফলে, যা দাঁড়ালো, অধ্যাপকগণকে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মচারী গণ্য করা হবে, কলেজে তাঁদের নিয়োগ সাময়িক ও প্ররোচনায় কোন পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তাঁদেরকে রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনস্থ অন্যান্য এমন কি-কে জি স্কুলেও বদলী করা হতে পারে। অধ্যাপকরা মিশনের স্বামীজীদের এই আশ্বাস মানতে পারলেন না। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তাঁরা লংগ্রাম চালালেন এবং ২০ মে ১৯৭৮ ঐ নিয়মকানুন প্রত্যাহার করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন।

এ বছরের ২০ আগষ্ট বেনুজ বিজয়ন্যায় থেকে স্বামী শিবরত্নান-

কলেজ উক্ত কলেজে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এরপর থেকেই কলেজের অধ্যাপকগণ আন্দোলন করছেন। ঐদিনই তাঁরা ১ ঘণ্টা দাবির ভিত্তিতে কর্মবিরতি পালন ও অবস্থান ধর্মবর্ষ করে একটা স্মারক-লিপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান।

ঐ ১ ঘণ্টা দাবির মধ্যে অধ্যাপকরা কলেজের প্রশাসনিক ও তহবিলের কারচুপি নিয়ে তদন্ত করারও দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া বেআইনীভাবে নিযুক্ত অধ্যাপকদের অপসারণ তো আছেই। ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণ-ডেপুটেশনে যান। সেদিন সমিতির অন্যান্য দাবিওরার মধ্যে এই কলেজের অধ্যাপকদের দাবিও যুক্ত ছিল। রাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীমন্তু ঘোষ সেদিন প্রতিনিষি-বেশাণে ৩৪ পৃষ্ঠার

এশিয়ায় দুই মহাশক্তির রণকৌশল

রাজনৈতিক ভাষ্যকার

১৯৭০ সালে দুই মহাশক্তির মতন করে পৃথিবীব্যাপী রণকৌশল নির্ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র একটি কার্যক্রম ছিলো। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় (ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্পুচিয়া) ব্যর্থতা, দেশের মধ্যে অর্থনীতির ক্ষয়বৃদ্ধি হ্রাস ও পশ্চাদ-পসরণ, নাগরিকের মধ্যে অসন্তোষ এবং সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ার ফলে আমেরিকাকে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। অতীতকালে সোভিয়েৎ রাশিয়ার কাছে নিম্নপ্রভাব ও অধিকার বাড়ানোর এটাই সুবর্ণমুহুর্ত।

এবাবত আমেরিকা বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটানো এবং কমিউনিস্ট বিরোধী বৈরতাত্ত্বিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। এবং বহুজাতীয় সংগঠনগুলির ব্যাপক প্রসার যেখানেই কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছে তা দূর করার ব্যাপারে সক্রিয় থাকার নীতি অঙ্গগ্রহণ করেছে। এদের কৌশল সময় ৫০ এবং ৬০ দশক ধরে এশিয়ায় চীনের বিরোধিতার নিযুক্ত

বিবেকানন্দ কলেজ

৩য় পৃষ্ঠার পর
দেখতে বসেন যে বিবেকানন্দ শতাব্দিক কলেজ সরকার পৃষ্ঠপোষিত কলেজ আইনে চলবে এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ মতোই অধ্যক্ষ নিয়োগ করা উচিত ছিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী কলেজের সভাপতি বড়ির সঙ্গে সাক্ষাতে এই কলেজ নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের 'বিশেষ ব্যবস্থার' আকার বাতিল করে দেন। শ্রীবোধ পরিচালক সমিতির অধ্যক্ষ করেন যাতে ছাত্রসংখ্যাই এই অচলাবস্থার অবসানে স্বামী শিবস্বামিন্দ্রের স্থানে একজন প্রফেসর ইন-চার্জ নিয়োগ করা হয়।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন মন্ত্রী-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ঠিকের বক্তব্য, যেহেতু তাঁরা 'অহিন্দু ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু' তাই ভারতীয় সংবিধানের ৩০ম ধারা অনুযায়ী তাঁরা বিশেষ সুবিধাভোগের অধিকারী।

আজ প্রায় তিনমাস হল, অধ্যাপকরা বেতন পাচ্ছেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও অধ্যাপকরা সব জানিয়েছেন। ছাত্রসংখ্যাই কয়েক অধ্যাপকরা গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে কলেজের উঠানে রাস্তা নিচ্ছেন। এখন সকলের প্রশ্ন, রাজ্য সরকার কি এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব নেবেন?

ছিল। চীনের সংসদ রাধার জন্ত এবং দুর্বল করার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন অন্তর্গত চালানো হয় তেমনি অতীতকালে এর চারপাশের দেশগুলিকে আরো বেশী অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া এশিয়ায় বিশেষভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জনপ্রিয় আন্দোলনগুলি তাকার প্রচেষ্টাও সমানভাবে চালানো হয়, যেমন এই-আন্দোলনগুলি সকল হলো চীনের চারপাশের দেশগুলিতে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ অনেক কম হয়ে যেতে পারে। তাই সীরাটো এবং ভাটো সংস্থা তৈরী করা হয়। এগুলি সৈনিক চুক্তি এবং বিশেষভাবে কমিউনিস্ট ভীতির বিরুদ্ধে নিমিত। এশিয়ায় এই প্রায় অল্পসংখ্যে একদিকে সুদূর পূর্বে (জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান), অতীতকালে দক্ষিণপূর্বে (ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড) আমেরিকান বাহিনী নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়া (পাকিস্তান) এবং পশ্চিম এশিয়ায়ও (ইরান ও ইরাক) সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করা হয়। ওকিনাওয়া, কামরুজাল এবং দিয়োগো গার্ডিকা আমেরিকার বিখ্যাত এবং কুখ্যাত সৈন্য শিবির, যেখান থেকে বেশ ভালভাবেই প্যানিক মালভা প্রণালী এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। এছাড়া ভারত এবং পাকিস্তানেও আমেরিকার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ছিলো। ভারতের খাম্বা বিরোধীদের চীনের মধ্যে দক্ষিণ রাধার উদ্দেশ্যে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এছাড়া গুটোনিয়াম, শক্তি সম্পদ গুপ্তচর মেশিন বসানো হয় এবং চীনের উপর দিয়ে ইউ-২ নামক বিমান চালনাও করা হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকেই আমেরিকার কাছে অনেক ব্যাপার স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিলো।

(এক) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ধমনে ব্যর্থতা।

(দুই) গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনে ব্যর্থতা।

(তিন) চুক্তিবদ্ধ মিত্র দেশে সাহায্য না দিতে পারা। যেমন ১৯৭১ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানকে সহায়তা না দিতে পারা।

(চার) জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুর্কী সহ অন্যান্য পশ্চিম এশিয়ায় দেশে আমেরিকা বিরোধী আন্দোলন বৃদ্ধি।

এই অবস্থার চাপে পড়ে আমেরিকা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা 'গুয়াম সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কিছু কিছু অঞ্চল থেকে আমেরিকান সেনা বাহিনীর অপসারণ, কিছু জায়গায় তার সংখ্যা কমানো এবং আমেরিকার স্বার্থরক্ষাকারী কিছু আঞ্চলিক মিত্র-দেশের শক্তি বৃদ্ধি করা হোক। এবং ফলস্বরূপ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা হয়। আপরদিকে ইরান, সৌদি আরব, জাপান ইত্যাদি দেশগুলিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। কিন্তু ইরানের নিম্নবর্ণিত শব্দকে উল্লেখ করার ফলে এই 'গুয়াম সিদ্ধান্ত'র সার্বকর্তা কিছুটা কম হয়ে পড়েছে। আমেরিকা ক্রমশঃ এটা বুঝতে পারছে যে মিত্র দেশের উপর খুব একটা নির্ভর করা চলেনা এবং এই দেশগুলিও বুঝতে পারছে যে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করার জন্ত শুধু আমেরিকার উপর নির্ভর করা সম্ভব নয়।

ইথিওপিয়া, ইরান এবং পাকিস্তানের এই সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে আমেরিকান নৌ শক্তির বৃদ্ধি মরীচিকা হানি হয়েছে। এছাড়া দিয়োগো গার্ডিকা এবং সোমালিয়ার বারকেন্ডা স্থিত প্রায়শঃ ক্রয়ের পক্ষে এই বিরাট এবং মহত্বপূর্ণ এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। এবং মিত্র দেশগুলির অবস্থা আত্মরক্ষামূলক হয়ে পড়ার ফলে তাদের স্বাধীনতা বিশেষ সাহায্য পাওয়া সম্ভব পর হয়ে উঠবে না।

অতীতকালে, ১৯৬০ সাল থেকেই সোভিয়েৎ রাশিয়া তাদের সৈনিক শক্তি এবং পরাক্রম ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলে ৭০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে আক্রমণাত্মক সুসজ্জিত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এশিয়ায় সোভিয়েৎ উপস্থিতির আভাস ৬০ দশক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এরা ইন্দোনেশিয়াকে অস্ত্র সাহায্য দেয় (১৯৬৫-১৯৬৬) এবং ইরানকেও (১৯৬৭-১৯৭৪), ১৯৬৯ সালে এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার প্রায় এই বলে দেওয়া হয় যে চীন এশিয়ায় দেশগুলির জন্ত বিপদস্বরূপ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশকে চৈনিক সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। কিন্তু যেহেতু তারা এই বক্তব্যকে কাছে লাগাতে পারেনা তাই সেহেতু তারা প্রগতিশীল সরকার-

গুলির সঙ্গে মিলিটারি চুক্তি (যাকে মিত্রতা চুক্তিও বলা চলে) করা আরম্ভ করে। এই সরকার হল নিরিয়রা, ভারত, বাংলাদেশ ভিয়েতনাম, লাওস এবং আফগানিস্তান। এই সময়কালেই অস্ত্র, বাণিজ্য এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সোভিয়েৎ রাশিয়া মুখ্যত প্রভাবশালী। রাশিয়ার আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক আগ্রাসন এবং প্রায় ১ লাখ সৈন্য সমাবেশই এশিয়ায় সোভিয়েৎ নীতিকে স্পষ্ট করেছে। তাই ভারত মহাসাগরে সোভিয়েৎ নৌবহরের উপস্থিতির ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৯৬৮ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে সোভিয়েৎ নৌবহরের উপস্থিতি বৎসরান্তেই ছিলো। কিন্তু গত ১২ বছরে এর ব্যতিক্রম করা হয় তা আজ আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া, ভিয়েতনামের কাম্বান, ডানাং, হোচিমিন শহরে এবং হাইফংয়েও সোভিয়েৎ বায়ু এবং নৌসেনা উপস্থিত। ইরাকেও একটা নৌ কেন্দ্র আছে। কম্পুচিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, নিরিয়রা, দক্ষিণ ইয়েমেনেও তাদের উপদেষ্টা এবং সৈন্য বহাল করা হয়েছে। এই শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি?

এই উদ্দেশ্য বিমূখী। প্রথমতঃ ভারত মহাসাগর তাদের নীতি হল একদিকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার জন্ত থমকিয়ে তুলে উপদানকারী দেশগুলিতে এই মূল্যবান পদার্থ যাতে না পৌঁছতে পারে তার দিকে নজর রাখা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে কাকুল, যা পাকিস্তান গালফ থেকে মাত্র ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত, আজ সোভিয়েৎ সেনার প্রায় এক হাজার দখলে। এও খবর পাওয়া গিয়েছে যে রাশিয়ার থমকিয়ে এবং তেল ভাণ্ডারের অবস্থা খুব একটা ভাল নেই। বাকু অঞ্চলে যা তেল মজুদ আছে তা আর দেশের আত্মস্বার্থ চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। শুধু লাইবেরিয়ার তেল ভাণ্ডারই বা এখানো ছোঁয়া হয়নি, আশা করণ। এ ব্যাপারেও অনেক সমস্যা আছে। যদিও রাশিয়া এই থমকিয়ে রাখার ব্যাপারে উৎসাহী পশ্চিম ইউরোপ এ ব্যাপারে খণ্ডিত নারাজ। কেননা এ বাবত সোভিয়েৎ খণ্ড প্রায় ২০ শত কোটি ডলারের উপর হয়ে গেছে এবং তারা নিশ্চিত নয় যে লাইবেরিয়ার তেল ভাণ্ডার থেকে তাদেরও তেল দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, এশিয়ায় রাজনৈতিক এবং মিত্রতা নীতি স্থাপিত করে তারা চীনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। চীনের উত্তরাঞ্চলের দীর্ঘায় সোভি-

য়েৎ সৈন্য সমাবেশ ১০ লক্ষের বেশী। লাওস, ভিয়েতনাম, ভারত এবং আফগানিস্তানকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে। মানচিত্র দেখলে বোকা যায় যে চীনকে প্রায় চারদিক থেকেই ঘিরে রাখা হয়েছে। সোভিয়েৎ আজ কুৎসেহতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জনগণকে 'সুস্থ' করার 'অধিকার' গ্রহণ করেছে। এরই ফলে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা কম্পুচিয়া দখল, ইরানের কুদিত্তান, আজারবাইজান ইত্যাদি এলাকায় বিচ্ছিন্নতা-বাদকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অল্পসংখ্যে পাকিস্তানে বালুচ এবং পাখতুনদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা সমানভাবে চলছে। এছাড়া দক্ষিণ ভারত দ্বারা অধিকারও সোভিয়েৎ সমর্থন পেয়েছে। ভারতের ছোট ছোট পড়ানো দেশের স্বার্থে যে সমস্তাই উঠেছে তাতে সোভিয়েৎ সমর্থন সব সময়ই ভারতের দিকে হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'শঙ্কম বাহিনী' এবং 'চীনের মহত্বপূর্ণ এজেন্ট' অভিহিত করে জাতিগত কোন্ডল তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই ১৯৭৮-১৯৭৯-এ ইন্দোনেশিয়ার যে ব্যাপক আক্রমণ এবং চীন বিরোধী দ্বিগিরিয়া দেখা যায় তাতে সোভিয়েৎ সমর্থন কোনো বিশ্বাসের ব্যাপারই নয়।

দশকেপে এটা বলা যায় যে একদিকে আমেরিকা আজ তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বা রয়েছে তা বজায় রাখার জন্ত চেষ্টা করছে অতীতকালে রাশিয়া আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার ইচ্ছা যে চীনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পাকিস্তান গালফ এ হাত বাড়ানো যাতে এর তেল ভাণ্ডার থেকে লাভ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। একমাত্র ক্ষতির ব্যাপার হল আফগানিস্তানে আক্রমণ, যা থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে সোভিয়েৎ উপস্থিতি তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যাপারে অতিপ্রভু হয়ে উঠেছে।

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

সাপ্তাহিক ১০ টাকা

ত্রৈমাসিক ২৫ টাকা

★

ঢাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৩১ মং মট জেন, কলিকাতা-১৩

গ্রাম বাংলার কথা

জেলে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে ঘুম দিতে হয়

‘মেদিনীপুরের তমলুক সাব জেলে বিচারার্থী বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে হলে জেলার মহাপ্রদেহে বস-পনেরো টাকা এবং কারারক্ষীদের চার পাঁচ টাকা ঘুম না দিলে চলেনা। বন্দীদের জন্য কোন জিনিস নিরে পেলো তার অংশ দিতে হয়। এইসব ঘটনা জেল স্থপত্যকে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোন ‘সুফল’ পাওয়া যায়নি। আমাদের সংবাদদাতা এ বিষয়ে জেলারের সঙ্গে কথা বললে তিনি অভিযোগকারীদের উপর ক্রোধ হন।’ —সিগন্তা (তমলুক)

আলুর হিম্মতের আত্মকথা

আমি একটি হিম্মত। বর্তমানের শক্তিগড়ে অবস্থান। আমার মতো আরো ১১১টি হিম্মত বর্তমানে রাজ্যে চালু আছে। হগলী, বর্মান জেলার বেশি, বীরভূম ও হাওড়াতো কিছু আছে। প্রত্যেক বছর ১৫ নভেম্বর আমাকে খালি করা হয়।

আমি মেরামত ও খোঁজা মোছা হয়। আমার মার্ট মাসের প্রথম থেকে আলু রাখা শুরু হয়। আমার মালিকের জমিদার বন্ধুর ছুটি মিলিং আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কুহর-বেড়ালের নামে আমার উদরে আলু রেখে বসেছেন ‘কুহর প্রাচীর চাবীরা হিম্মতের আলু রাখছে।’

গত মার্ট মাসে আমার উদরে চোকানো হয়েছিল প্রায় সাত হাজার টন আলু। বাজারে তখন দর ছিল ৮ টাকা কুইন্টাল। কোলকাতার খোলাবাজারে বিক্রি হয়েছে কেজি প্রতি এক টাকা দশ পয়সা। প্রত্যেক মাসে গড়ে পাঁচশো টন মত আলু খালি করে এ রাজ্যের বাজারে পাঠানো হয়েছে। দু মাসে সাড়ে তিন হাজার টন মত আলু খালি হয়েছে।

আগষ্ট মাসের শেষে ছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার টন আলু। এর মধ্যে বীজ আলু দেড় হাজার টন। আর কাঁচা আলু শুকিয়ে ওজন ৬% হ্রাস পাওয়ার ও কিছু নষ্ট হওয়ার ক্ষয়বোশা আলুর পরিমাণ দাঁড়ালো ১১০০ টন।

রাজ্য সরকার দাম বাধলেন। আমার মালিক পাইকারকে বিক্রি করবে ১৫০ টাকা কুইন্টাল দরে। খোলাবাজারে মিলবে ১ টাকা ৭৫ পয়সা কেজি দরে।

সাতটা ব্যাপকভাবে চলছে

‘মেদিনীপুরের ময়নার মানাখানো সাতটাখোলা ব্যাপকভাবে চলছে। প্রতিদিন নাকি হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়। ময় ও জুয়ার চেয়েও সাতটা নাকি ভরৎকর। সাতটার টিকিট বিক্রি করতে এজেন্টরা অতি গোপনে যোগাযোগ করছে। এদের তেতরেও সাতটার টিকিট বিক্রি হচ্ছে, ফুলের ছেলেরাও নাকি সাতটার টিকিট কিনতে খুঁকছে। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়।’ —ধানক্ষেত (মেদিনীপুর)

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের প্রথম পক্ষে আমার উদর শেষ করে ১১০০ টন আলু নোওয়া হয়েছে। এ আলু আমার মালিক কিনেছিলেন ৮৬০ টাকা টন দরে মোট চোদ্দ লাখ বাণিজ্যিক টাকায়।

গত আড়াই মাসে আমাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ইলেকট্রিক বিল, লোড-শেডিং এর জন্য জেনারেটর বসিয়ে ডিজেল কিনতে বাবদ খরচ, ও কর্মচারীদের মাহিনা বাবদ মোট খরচ হয়েছে তিন লাখ তেইশ হাজার টাকা। তাহলে মোট খরচ হল, সন্তোষো লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। এবং আমার মালিক ১১০০ টন সরকারী দরে অর্থাৎ ১৫০০ টাকা টন দরে বিক্রি করে পেয়েছেন, পঁচিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। অর্থাৎ আড়াইমাসে লাভ লাভ লাভ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। ইয়া, এরমধ্যে অবশ্য সবটাই আমার মালিকের আলু ছিল না। কিছু কড়ে-পাইকার কুইন্টাল প্রতি দুই টাকা মত ভাড়ায় আমার উদরে তাদের আলু রেখেছিল। কিন্তু তার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের বেশি নয়। তাহলেও আমার মনিব গত আড়াইমাসে অন্ততঃ পাঁচ লাখ টাকা, অর্থাৎ মাসে দু লাখ টাকা লাভ করেছেন। এ আর এমন কি। আমার মনিবের চিনিকল বন্ধুরা তো এই মরতমে দু কোটি টাকা লুটেছে। অবশ্য বলতে পারেন, এরমধ্যে বেশ কিছু টাকা রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা দিতে হয়েছে নতুবা তারা এক একটা লোকসভা কেন্দ্রে লাখ টাকা খরচা করবে কি করে? আমার আত্মকথা হুয়ালো, নটে পাছটাও মুড়ালো।

নিরাময়ের ছাঁটাই কর্মীর পুনর্বহাল

‘দীর্ঘ আট বছর আগে সিউড়ির মিরায় টি. বি. ল্যামার্টোরিয়াবের বেলব কর্মী ছাঁটাই হয়েছিলেন, তারা আবার চাকরী করে পেয়েছেন। মিরায়বের এসব কর্মীদের মেদিনী ইউনিয়ন করার অনুরোধই তৎ-কালীন অর্থনৈতিক সম্পাদক ডাঃ গুপেন রায় ছাঁটাই করেছিলেন। ইউনিয়নের মেতুখে এতদিন এসব ছাঁটাই কর্মী পুনর্বহালের দাবীতে আন্দোলন করছিলেন। সেই আন্দোলন এতদিনে সফল হল। রাজ্য সরকার একজন প্রশাসক করে প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছে।’ —ধূসরমাটি (সিউড়ি)

৮২ রুটে বাস বন্ধ, যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ

২৪ পরগণার হাবড়া থেকে বসির-হাট দীর্ঘ রুটে চলাচলকারী একমাত্র বাস ৮২ নং আজ প্রায় একমাস যাবত বন্ধ। কলে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ চলছে। বাসকর্মচারীদের সঙ্গে



পুলিশের গাড়িতে তেলের অপচয়

বেশ কিছু দিন ধরে চারিদিকে তেল নেই তেল নেই রব। ডিজেলের অভাবে রাস্তার বাস কম চলার জন-সাধারণের অকিঞ্চিৎকর আসতে যেতে জীবন বিপন্ন হচ্ছে। অতঃপক্ষে সরকার মন্ত্রীদেব গাড়ীর তেল বরাদ্দ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ নিজের চোখে দেখলাম যে গত ১৪-১১-৮০ তারিখে কেওড়াতলা স্থানে রাজি নাড়ে নয়-টার চারিদিকে পুলিশ ভ্যানে ভর্তি। ভাবলাম এই এলাকার সব লম্বরে সমাজবিরোধীদের মারা-মারির জন্য এত পুলিশ ভ্যানের উপস্থিতি কিছ পরে জানলাম যে মারামারির কোন ব্যাপার নেই। এক ডিউটিরত পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এ, সি

মালিকদের করেকটি বাস নিয়ে বচসার কলেই এই অবস্থা হয়েছে। জেলা প্রশাসন জনসাধারণের দুর্ভোগে উদ্বাসীন।

দক্ষিণ বারাসতে পঞ্চায়তের কাজ

গত আটাত্তরের জুনে পঞ্চায়ত নির্বাচনের পর গ্রাম বাংলার বাস-কন্টের যে শক্ত ভিত তৈরী হয়েছে তা অনেকেই স্বীকার করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার দক্ষিণ বারাসতে অঞ্চল পঞ্চায়ত এ পর্যন্ত ১১টি রাস্তার কাজ শেষ করেছে। ২টি ইটের রাস্তা ও ১৭টি মাটির রাস্তা। এর জন্য পাওয়া গেছে পঁচিশ হাজার টাকা। একটি মতুন ফুলবাড়ি তৈরী হয়েছে। টিউবওয়েল বসেছে দুটি। মোট বোলজম তিরহলার সমস্ত নিয়ে এই পঞ্চায়ত ভালোই কাজ করেছে। কাজের বদলে খাজ প্রকল্পে ধারী টাকা বা পম পেয়েছেন, তাঁদেরকে পঞ্চায়ত অফিসে এসে সকলের উপস্থিতিতে তা নিতে হয়েছে।

[আপনার গ্রামের অবস্থা, লম্বাঘাট, বিশেষতঃ পঞ্চায়তের কাজকর্মের বিস্তৃত বিবরণ দর্পণ পত্রিকা দপ্তরে পাঠান]

হেড কোয়ার্টার জি-সি, ভব কক্ষরত অবস্থার মারা, গেছেন। লা ল বা জার থেকে ভববাবুকে নিয়ে কেওড়াতলা স্থানে হুড়ি থেকে পঁচিশটা জীপ, একটি লরীতে বৃত্তদেহ এবং তার সঙ্গে পুলিশের ব্রেক ডাউন ভ্যান। বেধে মনে হলো যেন রাজত্ব ভয় করতে বেরিয়ে পড়েছে। যখন গুগোল হয় তখন একটা গাড়ীরও দেখা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে এতগুলো গাড়ির জন্য তেল খরচ করার দরকার কি? প্রত্যেকদিন প্রত্যেক খানার ও, দিদের জীরা অফিসের জীপ নিয়ে বাজার করতে যানই বা কি করে? দেখিকে মধ্যমসী ও অর্থমন্ত্রী নজর দেবেন কি?

চিটফাণ্ড

১ম পৃষ্ঠার পর
দিনের জন্য বৈনিক, সাপ্তাহিক, ও মাসিক ভিত্তিতে ব্লক সফরের মাধ্যমে হগলীর শ্রীহর দাশ, বিমল মুন্ডিত, হুমদা বসু ও সুবিন্দ দে অর্থ লরী করেন। কিন্তু মেহরাব উদ্দীন হওয়ার আগেই রাজ্যরাতি উক্ত সংঘটিতাদের অকিঞ্চিৎকর উদ্বাস হয়। এ ব্যাপারে আমানতকারী চারজন লংগিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
ঐ তালিকার ৪৪ নম্বরে কৈলাস মেডিক ইন্ডিস্ট্রি (প্রা) লিঃ এর নাম আছে। উড়িষ্যার কাড়হুড়ার শ্রীদীপেশচন্দ্র দে ১৩/১১/৭২ তারিখে এই সংস্থা থেকে একটি ক্যান্সার ট্রি-কিকোট ছ বছরের জন্য কেনেন। (ইউনিট নং ৪৭২৫)। নির্ধারিত সময়ের পর ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে ঐ অফিসে টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য তিনি যান। তখন তাকে জানানো হয় যে, বর্তমানে তাদের ব্যবসা মন্দ চলছে বলে এক সঙ্গে টাকা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হবে না। হুদ সম্মত চার কিস্তিতে টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ১৯৭৯ সালের জুলাইর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রী দে তিন কিস্তির টাকা পেয়েছেন। চতুর্থ কিস্তির টাকা আজও পাননি।

[এই ধরনের সংঘাতগুলো সম্পর্কে আরো খবর দর্পণ অফিসে পাঠাতে অগ্ররোধ করা হচ্ছে]

আন্দামান বন্দী

১ম পৃষ্ঠার পর
বিক্রিঃ এর স্বাধীনতা লংগামীদের দপ্তরের পিয়নদের ঘুম দিচ্ছে পেণ্ডিং কেসগুলির তালিকা সংগ্রহ করেন, তাদের ডেকে পাঠান ও টাকা মেন, (৯) শ্রীকলোনীতে কার্তিকচন্দ্র দাস ১। ১৩০ শ্রীকলোনী, কলকাতা-৪৭) নামে তার এক চেল্লা আছে যে বলে বেড়ায় সি, পি, এম তার ছেলেকে হত্যা করেছে। (১০) একটা সংস্থার যদিও তিনি সম্পাদক নন তবুও সম্পাদকের আয়গার সই করে টাকা সংগ্রহ করেন। অনেকের ধারণা ইংরাজ আমলে ইংরাজের পোয়েন্দা হিসাবেই তিনি বিভিন্ন জেলে ছিলেন এবং আন্দামানে গোয়েন্দাশ্রিত করেন।

আলুর দাম বাড়ানোর জন্য বাম ফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়

—কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ

গত আগষ্ট মাসের শেষে আলুর দাম কেজি প্রতি ২.২০ টাকা হতেই সোরগোল শুরু হয়। রাজ্যের বাম-ফ্রন্ট সরকার কেজি প্রতি ১ টাকা ৭৫ পয়সা আলুর দর স্থির করে। কিছুদিন ১.৭৫ টাকা থেকে ২ টাকার বিভিন্ন বাজারে আলু পাওয়া যায়। বামপন্থী দলগুলির কর্মীরা বাজারের দিকে মজুর দেন। কিন্তু গত পনেরোদিন যাবত কলকাতায় আলুর দাম কেজি প্রতি ২ টাকা ৬০ পয়সা থেকে কোথাও কোথাও তিনটাকা হয়ে বিক্রি হচ্ছে। আলুর এই হঠাৎ দাম বৃদ্ধির কারণ জামতে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহের সঙ্গে লাক্ষ্য করি।

শ্রী গুহ বলেন, ভারতে মাত্র পাইকারদেরকে বিক্রির জন্য একটু

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানাতেই অর্থকরী ফসল হিসাবে ব্যাপকহারে আলুর চাষ হয়। এখন দারুণ ভারতেই আলুর দাম উঠতে। যে সব রাজ্যে বাম-ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন সেখানেও তো আলু মিলছে তিন টাকা কিলোর। দ্বিতীয় কথা, আলু নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বা সামগ্রীর তালিকায় নেই। আমরা হিমমতের মালিক বা পাইকারদের তীর চাপ দিলে ওরা আদালতে গিয়ে লহজই ইনজামান আদায় করতো। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি- আলুকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বায়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে। আর তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন

চুই দাম (কেজি প্রতি ১ টাকা ৬০ পয়সা) বেঁধেছিলাম।

শ্রী গুহের মতে, যতদিন এই পুলিশ-বাহী ব্যবস্থা থাকবে ততদিন জন-জীবনের আরও হাজারটা সমস্যার সঙ্গে আলুর দামবৃদ্ধির সমস্যাও থাকবে। বামফ্রন্ট সরকারে থেকে আমরা জামা বেধানে বেধানে ফেলে যাচ্ছে, সেখানে রিপু করছি মাত্র। মনে করি মৌলিক সমস্যা রিপু করে করে সমাধান করা যায় না। এখানেই কংগ্রেসের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য। কমলবাবু বলেন, প্রতি বছর ১৫ অক্টোবর মাগধ আলুর বীজ চাষ শুরু হয়। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে আলুর ফলন হয়েছিল তেইশ লাখ টন। পরের বছর ধরার জন্য কমে দাঁড়িয়েছিল উনিশ লাখ টনে। রাজ্যে প্রতিমাসে এক লাখ টন আলু লাগে। প্রতিবছরই বীজ আলু হিসেবে ছুলাখ টন মত রেখে দিতে হয়।

এটা সত্য কথা যে, চড়া দামের দার কিলে, ধোঁদে পুড়ে জলে ভিলে চাষ করে চাষী কিছু সব ফসলের মতোই আলুরও ভাষ্য দাম পায় না। মহাজন হিমমতের মালিক ফড়েরা চড়া মূল্যে তোলে। ১৯৭৮ সালে ২৫৩০ টাকার দাম নেমে এসেছিল একারণে রাজ্য সরকার গত মরশুমে পঞ্চাশ টাকা কুইন্টাল হয়ে চাষীর থেকে লাখ টন আলু কেনা রির করে। কিন্তু গত বছরে আলুর দাম একটু চড়া থাকে। পঁচাত্তর টাকা কুইন্টাল। সরকার পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় আর্থিক অসদৃশির জন্য।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তৈরী আলুর ঠক প্রায় শেষ। প্রতিবছরের মতো বাইরে থেকে যে আলু আসছে তার দাম তো সে রাজ্যেই চড়া। তার উপর ওয়ানন দল্লটের জন্য ট্রাকে করে সব আলু আসছে। আবার ডিজেল দল্লটের জন্য ট্রাকের ভাড়া হুগুন হয়েছে। কলে আনার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। বাজারেও দাম বাড়ছে।

কৃষিমন্ত্রী লাক্ষ্যকারে আরো বলেন যে, উত্তর ভারত বা পশ্চিম-ভারতে এবার আলুর দাম চড়া হওয়ার পেছনে নাকি দুটো বাড়তি কারণ কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যে আলু রপ্তানি বেড়েছে, দ্বিতীয়, শোনা কথা যে, সামনে একটা যুদ্ধ লাগতে পারে এই অস্থানে ব্যরদারীরা সেখানে দাম বাড়িয়েছে। এই তো সব কারণ, তা আলুর দাম বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী হবে কেন বলতে পারেন?

ই-কংগ্রেস

১ম পৃষ্ঠার পর

যারা বছর মোকাবিলায় কোম কার্যকর ফ্রমিকা মেবেন না বলে ঠিক করেছেন, তাদের মধ্যে বেশ কিছু বর্তমান প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য এবং প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন কিছু পৃথাককারীও আছেন।

অজিত পাণ্ডার বিরোধী গোষ্ঠির এই সব মেতারা জেলায় জেলায় তাদের সমর্থকদের কাছে গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে বলেছেন যে, আপনারা ২৭ তারিখে বছর ব্যাপারে শুধু পঞ্চমতা ও মিছিল করবেন। কিন্তু কখনই বন্ধ তাড়ার জন্য কোন ফ্রিকির মধ্যে যাবেন না। কারণ বর্তমান অকর্মণ্য প্রদেশ নেতৃত্বকে দিয়ে বন্ধ রোধার জন্য কোন কার্যকরী লগঠন পড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন শাখারও বেশ কিছু নেতা এই বছর ব্যাপারে এগিয়ে এসে কলকাতার খোলানোর দারিৎ নিতে রাজী নম। কারণ অজিত-বাবুর বিতর্কমূলক কার্যকলাপের ফলে রাজ্যের বেশ কিছু প্রাণী এবং প্রতাবশালী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বি পি এম টি ইউ নি-র পাণ্টা একটি লগঠন রাজ্যে সম্প্রতি পড়ে উঠেছে।

আগামী সাতাশ তারিখ থেকে জরপুয়ে আই এম টি ইউ নির যে প্রকাশ্য অবিবেশন বসছে তাতে যোগ দেবার জন্য আগে থেকেই অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রওনা হয়ে যাচ্ছেন, যাতে বছর ব্যাপারে তাদের জড়িয়ে পড়তে না হয়।

এদিকে অজিত পাণ্ডা গত মোম-বার রাজ্য কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারিয়েটের সভা থেকে বন্ধ বিরোধিতা করবার জন্য সবাইকে উঠে পড়ে লাগতে বলেছেন। অজিত পাণ্ডা রাজ্যের যুব ও ছাত্র নেতাদের সঙ্গেও এই বন্ধ কিতাবে বিরোধিতা করা যায় তার জন্য শলা পরামর্শ করছেন। তিনি ছাত্র যুব নেতাদের থেকে বলেছেন, তোমরা সবতোভাবে এই বছর মোকাবিলা কর।

বন্ধ বানচাল করার জন্য ছাত্র যুবদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও অজিতবাবু বেশ ক্যাসাধে পড়েছেন। তাদের সঙ্গে উনি কথা বলছেন তার বিরোধী গোষ্ঠীরা এতে অনন্ত হচ্ছেন। আবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অপর গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হচ্ছেন।

এই অবস্থা দেখে অজিতবাবু বরকত সাহেবকে অহরোধ করেছেন: আপনি কলকাতায় এলে সবাইকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিন। আমার পক্ষে সব গোষ্ঠীকে একযোগে বন্ধ বিরোধিতা করতে নামানো সম্ভব হচ্ছে না। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা দূরও অজিতবাবু এবং তার ঘনিষ্ঠ কিছু সহকর্মী জেলায় ঘুরে বছর মোকাবিলা করবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি পড়ে তুলছেন।

মালহোত্রা

১ম পৃষ্ঠার পর

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সরবরাহ করেন ক্যাশিয়ার মালহোত্রা।

এ নিয়ে বন্ধ জল খোলা হয়। সংসদে কড় গুঠে। নাগরওয়ালার ধরা পড়ে। টাকাও প্রায় সবটাই উদ্ধার হয়। নাগরওয়ালার ঘোষা খোকার করে এবং শ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে কারাগারে নাগরওয়ালার মুক্ত হয়। অনেকেই সে সময় বলোছিলেন এই যত্ন মহাশয়জনক।

অবৈধ উপায়ে টাকা সরবরাহের জন্য স্টেট ব্যাংক ক্যাশিয়ার মালহোত্রার চাকরি যায়। নাগরওয়ালার মামলা রহতেই থেকে যায়। কেননা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মনে করে টেলিফোনে এই রকম উপায়ে কেন মালহোত্রা টাকা ধরেছিলেন? তাহলে কি আগেও এইভাবে টাকা ধরা হয়েছে? পুরো ব্যাপারটা রহস্যই থেকে গেছে।

চাকরী হারানো ক্যাশিয়ার বেদপ্রকাশ মালহোত্রা শিরশাভের অগ্রহ হারাননি। এমন কি তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও মালহোত্রাকে ভুলে যাননি। সম্ভবত তাঁরই অগ্রহে মালহোত্রাকে এত বড় একটি পদে মালহোত্রাকে নিয়োগ করা হয়। মালহোত্রার এই নিযুক্তি নিয়ে রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে এবং আমলাদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন দেখা দিয়েছে।

ইন্টারকমার্শিয়াল লিমিটেড

(সর্বোচ্চ ইন্টার একট মাত্র মিলন)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল/পি ডাব্লু ডি/রেলওয়ে/কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্র সরকারী সংস্থা সমূহের অস্থায়ী/স্থায়ী/প্রত্যক্ষ/অপ্রত্যক্ষ কার্যে থেকে টেন্ডার নং কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার তারিখ লিখে দফাওয়াসী দর ভিত্তিক/পার্সেন্টেজ ভিত্তিক নীল করা টেন্ডার:

নির্মাণ ও সরবরাহের কাজ

টেন্ডার নম্বর: ই সি এল/পি ইউ আর/০৮/জি সি সি/সি. এম, গীয়ার/৮০/১০৫

৮০ সেট কেস ব্রিডল চেন এবং ৭.৫/৮ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ৫ টনের সেকটি ব্লক (ডি জি এম এস, ধানবাড়ী কর্তৃক অস্থায়ী/স্থায়ী) সরবরাহের জন্য। টেন্ডার জমা দেবার শেষ তারিখ ২১ ১২ ৮০ বেলা ১ টার আগে এবং তা একই দিনে বেলা ৩ টার খোলা হবে। পেনসিকেশন ও সরবরাহের শর্তাবলী সহ টেন্ডার দলিল কন্ট্রোলার অফ পার্টজের অফিস, ইন্টার কোমার্শিয়াল লিমিটেড, সীকতোরিয়া, পো: বিশেষগড়, জেলা বরদ্বান (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যে কোন কাজের দিনে একই ঠিকানার কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে নির্দিষ্ট কী ২০ টাকা (কুড়ি টাকা মাত্র) নগদে জমা দেবার রশিদ দেখিয়ে পাওয়া যাবে। একই ঠিকানার নির্দিষ্ট টেন্ডার কী হিসাবে কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে পাঠানো যাবি অর্ডার গ্রহণ করা হবে যদি টেন্ডার দলিল ডাকে পাঠানোর জন্য ডাক খরচ বাবদ টেন্ডার নির্ভিউল অস্থায়ী অতিরিক্ত ৩ টাকা (তিন টাকা মাত্র) বা তার বেশি পাঠানো হয়। টেন্ডার গ্রহণের তিনদিন আগে টেন্ডারপত্র বিক্রয় বন্ধ হবে।

সাদারণ: আহমানিক খরচের ১% ব্যরনার টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রশিদ টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, অন্তর্ভুক্ত টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত: ১৫ (পনেরো) দিন আগে প্রাপ্ত যনি অর্ডার কেবল গ্রহণ করা হবে। ডাকে বিশেষ দারিৎ ইন্টার কোমার্শিয়াল লিমিটেড গ্রহণ করবে না। পৌন্টাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাকট / চেং পাঠানো টেন্ডার কী গ্রহণ করা হবে না। টেন্ডারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

শ্রীমতী রাধা পুস্তক পর্ব

স্বাতক ও স্বাতকোত্তর পর্বের পর্ব প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষা / ডঃ দেবীপ্রসাদ মায়চৌধুরী / ১০.০০

২। আলোকের সমাবর্তন / শ্রীহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২.০০

৬-এ, রাজা হুবোধ মল্লিক বোয়ার, কলিকাতা-১৩

সমস্ত

প্ররোচনার

বাঁধ ভেঙ্গে

বাংলা বন্ধ

দাশাশে নভেম্বরের বাংলা বন্ধকে
কেস করে প্রচুর উৎসাহ-উত্তেজনা
সৃষ্টি হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে।
বামফ্রন্ট আনুত ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট ও
হরতাল যে সহজেই সাফল্য অর্জন
করবে—এ বিষয়ে কোথাও কোন
শংক্য ছিল না। বন্ধের আহবানে
জনগণের লাড়ার স্বতঃস্ফূর্ততাকে
মান করে দেবার জন্যই হিঙ্গি-হিজীতে
ফুঁ দিয়ে প্ররোচনার আঙুন জালা-
নোর কদর চলল। তিন কেন্দ্রীয়
মন্ত্রী বৈদ্য সিং, যোগেন্দ্র মাকওয়ানা
এবং বুটা সিং তিনজনে তিন আরগা
থেকে একই সুরে পশ্চিমবঙ্গের বাম
ফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশে হংকার ছেড়ে-
ছিলেন। সুরটা ছিল কাঁকালো,
চঙটা ডিক্টেটরী আর ভাবটা 'দেখে
নো'। বন্ধের দিন পশ্চিমবঙ্গে
বিস্তৃত কেন্দ্রীয় সরকারী অফিস-
গুলো খোলা রাখার নির্দেশ দিয়ে
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং মুখ্যমন্ত্রী
জ্যোতি বসুকে একটা জরুরী পত্র
নিক্ষেপ করেছিলেন। যেন কেন্দ্রীয়
অফিস ঘরের চাবির গোছাটা
জ্যোতিবাবুর কাছেই পড়িত রয়েছে,
যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের
গোমস্তাগিরি করা।

বাংলা বন্ধের প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-
দের এ রোষপূর্ণতার কারণ বোঝা কিছু
শক্ত নয়। প্রথমত গণতান্ত্রিক
আন্দোলন, প্রমিত কৃষক মেহনতী
মাল্হের দাবিদাওয়া সম্পর্কে কংগ্রেস-
ই সরকার বরাবরই উদাসীন ও
বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। ফ্যা সি স্ট
পহার ধর্মঘট হরতাল বামচাল করে
দিতেই কংগ্রেস সরকার অত্যন্ত।
কংগ্রেসীরা পিতল-পাইপগান, বোমা-
বন্দুক নিয়ে ধর্মঘটদের ওপর হিংস্র
নেকড়ের মতো কাঁপিয়ে পড়ার
মহত্বই পেয়ে এসেছে। দমনপীড়ন
ভীতিপ্রদর্শনই কংগ্রেস অমানার
স্বাধীন নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধি-
কার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জবাব
হিসাবে দেওয়া হয়েছে। গত ১৯৭৫
সালের রেল ধর্মঘটের মোকাবিলা
ইন্দিরা সরকার কীভাবে করেছিলেন
মাহুষ কি তা বিস্মৃত হয়েছে? কিন্তু
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি বাম
ফ্রন্টের মনোভাব কংগ্রেসের বিপরীত-
মুখী। বাম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাস্থার
শেবাংশ ২৭ পৃষ্ঠার

রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ইন্দিরা গান্ধী কিছু ই-কং এম গিকে জেলে পাঠাবেন : বহুগুণা

দমন

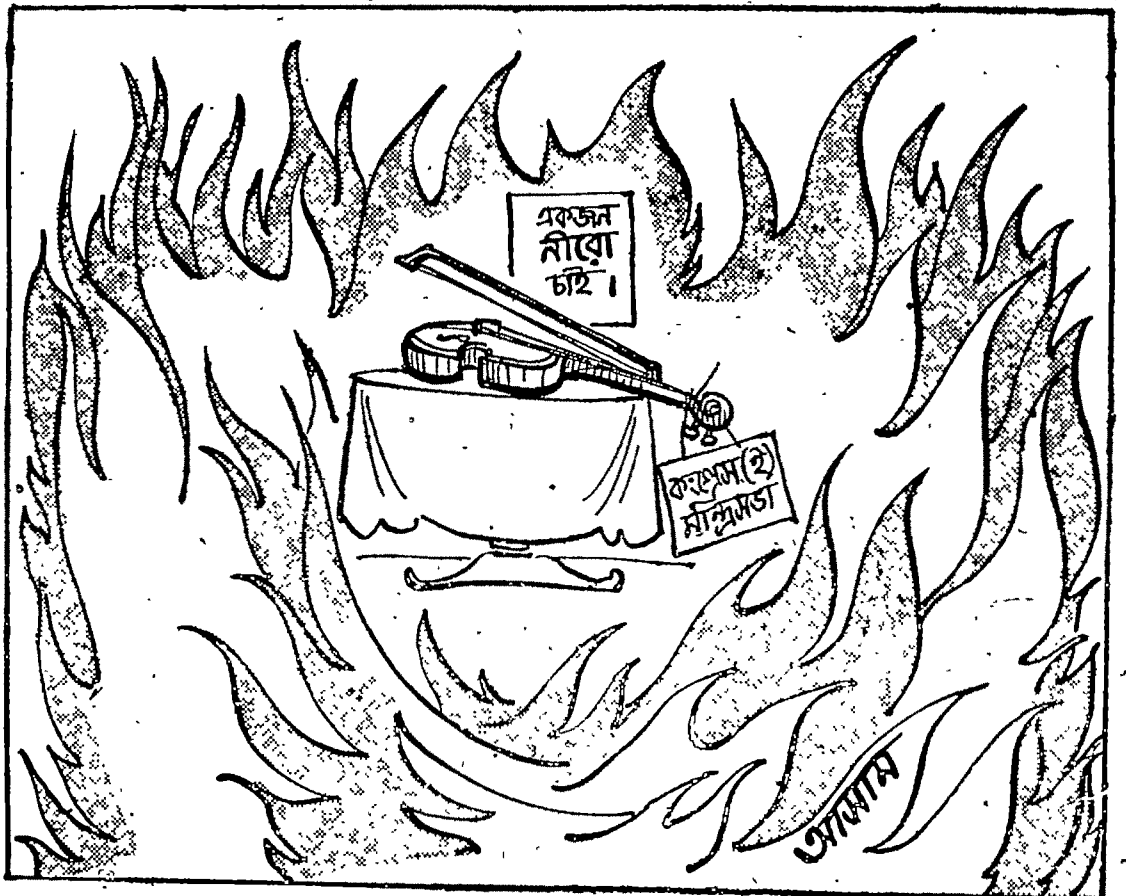
প্রকাশিত বর্ষ : ৪২শ সংখ্যা : শুক্রবার ২০শে নভেম্বর, ৮০। ৬০ পয়সা।

ইন্দিরার বিরোধিতায় মানেকা যুব কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারলেন না

প্রয়াত যুব কংগ্রেস নেতা দত্ত
গান্ধীর পত্নী মানেকা যুব কংগ্রেসের
সভাপতি হতে পারলেন না ইন্দিরা
গান্ধীর আপত্তিতে। মানেকা গান্ধীর
বনিষ্ট মহলের স্ত্রী জ্ঞান। পেতে যে,
ইন্দিরা গান্ধীর চরম বিরোধিতার
ফলেই মানেকা সমর্থক যুব নেতারা
তাদের প্রস্তাব কার্যকরী করতে
পারেন নি।

যুব কংগ্রেস (ই)-র বিহারী সভা-
পতি রামচন্দ্র রথকে শ্রীমতী গান্ধী
পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এর
পরই শুক হর পরবর্তী সভাপতি ঠিক
করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের যুব
মহলে প্রচণ্ড তৎপরতা।

জগদীশ টাইলার, দত্ত সিং,
কমল নাথ প্রমুখ দত্তের বনিষ্ট বন্ধুরা
শেবাংশ ৭৭ পৃষ্ঠার



‘মারুতিরাজ নাহি চলেগা’ ‘কার নাহি রোটি দো’

সেদিনটা ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধীর চৌব্বি তম জন্মদিন। দিল্লীর
এক নতুন লফটরুম মোড়ে তখন
এলাহি কারবার চলছে। ম্যাডামের
শুভবুদ্ধি থাকার আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়-
দর্শিনীর দর্শনপ্রার্থী-কৃপাপ্রার্থীদের
তিড় সামলাতে সিকিউরিটির
লোকেরা হিমলিম খাচ্ছেন।

ওদিকে দিল্লীর-হরিয়ানার সীমান্ত
গুরগাঁওয়ে তখন যুব কংগ্রেসের জনা
বাট যুবক মারুতি কারখানার গিয়ে

দখল নেন। হ্যা, ওরা যুব কংগ্রেস
হলেও ব্র্যাকেটে ছিল ‘ইউ’।
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী থেকে সব
জড়ো হয়েছিল।

ওরা কারখানার তেতর ঢুকে
পরিদর্শন করলো। কারখানার
তেতর ছোট গাড়ি তো দুয়ের কথা
হু/একটা যন্ত্রপাতিও চোপে পড়লো
না। পড়ে আছে কিছু রুদ্রি মোহা-
লজড়। জ্যাপ বলে বার করেকশো
শেবাংশ ৮৭ পৃষ্ঠার

ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম উপদেষ্টা সদাচারী বাবার কাহিনী

আটাত্তর সালে শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধী বলেছিলেন, ‘দত্ত আর
রাজনীতি করবে না।’ সেই দত্ত
শু এম, পি বাঁ কং (ই) দলের
অন্ততম সম্পাদক হলেন না, জীবনের
শেষ ছয়মাসে তার আঙনে স্বদেশের
প্রবীণ রাজনীতিবিদদের প্রায় ছাই
করেছেন। তারপর শোমা গেল
না বলছেন, ‘রাজীব ইচ্ছে হলে
রাজনীতি করবে’ আর পুত্র বলছেন
‘মায় উপকার হলে রাজনীতিতে

নামবো।’ অবশেষে এ নাটকের
পর্দা উঠছে। রাজীব গান্ধী পশ্চিম-
বঙ্গের মালদায় কং (ই) দলের
সম্মেলন উদ্বোধন করবেন আগামী
২৮ ডিসেম্বর। এবং এটাও প্রায়
ঠিক যে, আগামী ফেব্রুয়ারীতে
এলাহাবাদের ফুলপুর কেন্দ্রে থেকে
তাকে এম, পি, করা হবে। এবং
দর্পণে বা প্রকাশিত হয়েছিল তাও
আজ দেখা যাচ্ছে ঠিক যে দত্তপত্নী-
শেবাংশ ৭৭ পৃষ্ঠার

সম্পাদকীয়

প্ররোচনার বাঁধ ভেঙ্গে বাংলা বন্ধ

১ম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা ধর্মবর্জিত ভাষার জন্ম, মিল-মালিক জোতদারের আর্থিক করার জন্ম পুলিশ ব্যবহার করবেন না। কংগ্রেস তিরিশ বছর ধরে একচেটিয়া পুলিশি স্বার্থই পাহারা দিয়ে এসেছে, কল তার জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কিন্তু বাম ফ্রন্টের রাজ-নৈতিক দর্শন বৃহৎ পুলিশি স্বার্থ-সংরক্ষণ মন্ত্র, সম্পদ ও উৎপাদনের উপায় সমূহের সামাজিকীকরণ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রপতি যোগেন্দ্র মাকওয়ানা ভিক্টোরী চালে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, বন্ধের দ্বি-ধা কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে বা কোন সমস্তার উদ্ভব হয়, তবে তার দায়িত্ব বাম ফ্রন্ট সরকারের। বাংলা বন্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যই যে এ-ধর্মিক, তা সকলেই ধরে ফেলেছে। সেই লক্ষে তিনি আগাম হিংসা-সমস্তার দায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে কংগ্রেস-ই মস্তানদের ক্ষেপিয়ে দিলেন তারা যেন তাদের গোপন অস্ত্রাগার উজাড় করে দিয়ে বন্ধের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে-অস্ত্রের আঘাতে অবশ্যই কিছু নিরীহ লোককে হারিয়ে যেতে হবে, তা নইলে বাম ফ্রন্ট সরকারের ওপর ঘোষণারোপ করা যাবে না, আইন ও

শৃঙ্খলার অবমতির প্রশ্ন তোলা যাবে না, সেই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক করণা লোটা যাবে না। কোথায় বাংলা বন্ধের দিনে শান্তিকার আবেদন জানাবেন—তা না করে কংগ্রেস-ই নেতারা দল-কর্মীদের সর্বশক্তি দিয়ে বন্ধ বানচাল করে দেবার ডাকই দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অজুত পর্যবেক্ষণ হল, কংগ্রেস-ই কর্মীদের ওপর আক্রমণ হানার উদ্দেশ্যই নাকি বাম ফ্রন্ট বন্ধু ডেকেছে। কলকাতার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৃটা সিং-এর কঠোর প্রতি-ধর্মি শোনা গিয়েছে। শান্তিপূর্ণ ধর্মবর্জিত ও হরতাল পালনের মহান ঐতিহ্য কংগ্রেস-ই-র তো নেই, তাই এর মাহাত্ম্যও তাদের উপলব্ধি বাইরে। গান্ধীজীর নীতি ও কর্ম-পন্থাকে তারা তার মরদেহের সঙ্গেই শান্তিবনের মাটিতে সমাধি দিয়ে মিস-কুট করেছেন।

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই প্ররো-চনা মূলক উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সন-কারকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কথা, আইন ও শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের হাতে থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং ফ্রন্টের অন্তর্গত শ্রমিক নেতারাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় বা কংগ্রেস-ই নেতারা (তার শানাইয়ের পৌ কংগ্রেস-আর্গ ও জমতা নেতাদের ধরতে দেখে কৌতুক বোধ করছি।) মূল প্রশ্নটা সম্বন্ধে এড়িয়ে চলেছেন যে, বামফ্রন্ট ধর্মবর্জিত হরতালের পথ বেছে নিল কেন? জৈল সিং যোগেন্দ্র মাকওয়ানা বৃটা সিংয়ের উচিত ছিল বন্ধের দিনে হিংসাত্মক ঘটনার উল্লেখ না দিয়ে যে পাঁচটি দাবিতে বামফ্রন্ট প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে সে দাবিগুলো পূরণ করা। কিন্তু দাবি পূরণ বা সমস্তা সমাধানের ক্ষমতা বা রাজনৈতিক ইচ্ছা ও সততা তো এই কংগ্রেসের বা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। 'তাই তারা জাতীয় নিরাপত্তা অভিযান জারী করেছেন আন্দোলন ধমনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সে অভিযান প্ররোপ করবেন না। সেজন্যই তার বেধিয়ে বাংলা বন্ধ বানচাল করার জন্ম কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস-ই নেতারা। তা নইলে হগলী জেলা ই ছাত্রপরিষদের আইন অমান্ত কর্মহতা পালন করার জন্ম অজিত পাণ্ডা, আবদুল মাদার হু ব ত মুখার্জী কলকাতা থেকে চুঁচুড়ার ছুটে বাবার দরকার কী ছিল। কিন্তু এত উল্লেখ, এত প্ররোচনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ২৭শে নভেম্বর বাংলা বন্ধ পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বক্তৃতা ও বৈষম্যের এটাই বোধ্য জবাব।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্মাবেশে সরকারী গাড়ী

ফরোয়ার্ড ব্লকের গত ২৩ নভেম্বর ব্রিগেডের জনসভার প্রচারের জন্ম সম্ভ্রতি দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেখানে সাংবা-দিকদের তিনি জানান যে, রাজ্য সরকারে সাড়ে তিনবছর থেকে এখন মনে হচ্ছে যে পার্টির কর্মীদের জঙ্গী মনোভাব নষ্ট হয়েছে।

নীচুতলার কর্মীদের জঙ্গী মনো-ভাব নষ্ট হলেও উপর থেকে মাঝারি তলার নেতাদের অনেক কিছু হয়েছে। এতদিন জানা ছিল যে, একমাত্র সি পি আই (এম) ও শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতিতেই কংগ্রেস বিগ্রেডে জনসমাবেশ করতে সক্ষম হয়। এ বছরই প্রথম আর এম পি গত ৬ এপ্রিল ব্রিগেডের দক্ষিণ-পূর্ব এক-কোণে সমাবেশ করে। ফরোয়ার্ড ব্লকও ২৩ নভেম্বর জনসভা করলো। অতবধি ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের মাঝখানে স্ট্রোট মার্চের খুব বেশি হলে দিকি শতাংশ জায়গা জুড়ে জনসভা। মকের

চারিদিক পানের বরোজের মতো ছাউনি দিয়ে বেঁধা হয়েছে। জেলা থেকে আগের দ্বি-ধা এসেছিলেন, তাঁরা সেখানে ছিলেন।

জনসভার বিশ হাজার মতো লোক হয়েছিল। বীরভূমের রাজ-নগর ও বীরভূমের ওয়া থেকে যারা এসেছেন, তাঁদেরকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করার বললেন, 'কলকাতার গল্পাঙ্গন করতে এসেছি।' উত্তর পূর্ব কোণে খাণ্ড্যস্টোর করা হয়ে-ছিল। সেখানে খাবার বিলি নিয়ে ছোটোখাটো হাতাহাতি হয়েছে। জনসভার তখন শ্রীমতী অপরাধিতা গোস্বামী (এম এল এ) কবিতা পাঠ করছিলেন। বেজালেনবন্ধের হাতে লাঠি দেখে আশ্চর্য হলো। জেলা থেকে আসা গান্ধী চাবীধার বলা-নোর জন্ম ঐ বেজালেনবন্ধরা লাঠি হাতে যে উদ্ভত ব্যবহার করেছিলেন তা দেখে বোকাই যার না যে ওদের জঙ্গীভাব নষ্ট হয়েছে।

দবচেয়ে বড় কথা হল দলীয় জন-

সভার সরকারী গাড়ির ব্যবহার। কিছুদিন আগে সরকারের ধরত কমা-বার জন্ম অর্থমন্ত্রী প্রত্যেক মন্ত্রীর গাড়ির তেল বরাদ্দ বৈধনিক ও লিটার কমিয়ে মাত্র ৫ লিটার করেছেন। এ লক্ষেও মন্ত্রীদের জন্ম বরাদ্দ সরকারী গাড়ি ঘুরেছে দলের কাজে। ঐ গাড়িগুলোর নম্বর হল, ডবলু এম সি ৬৬, ডবলু এম সি ৬৯২৩, ডবলু এম সি ৮৭৬৫, ডবলু এম সি ৮৮০৪, ডবলু এম সি ২১১৩।

মুখ্যমন্ত্রী কি একটু দয়া করে থোকা খবর নিয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য উপদেষ্টা শ্রীমতীর চক্রবর্তীর মাধ্যমে জানাবেন যে কি কারণে জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকার কেনা গাড়ি ফরোয়ার্ড ব্লকের সভার ঘুরেছে। লজী করে লোক আসা বেআইনী তবুও লজী করে লোক আসা হয়েছে, ট্রাক্টিক পুলিশ নির্বাক ছিল কেন? বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার তাগিদেই এ তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া দরকার।

ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে কল্কে পাচ্ছেন না

এখন আর প্রবল প্রতাপ দেখা-মর দিন নেই, তাই দিল্লীর সব চাইতে মনোযোগের টানা স্বামী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী ক্রমশঃ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছেন। এই সেদিনও তাঁর দাক্ষিণ্য পাবার জন্ম দেশের তাবড় তাবড় লোকেরা কত কসরতই না করতেন। তাঁর প্রশস্ততির কত জনেরই না উল্লেখ হয়েছে। আবার তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার জন্ম কত যাত্রাঘর জীবনে কি ছুঁইনি-না নেমে এসেছে। কিন্তু বিশাল ধর্মসম্পদের মালিক ব্রহ্মচারীজী এখন খোদ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারে কল্কে পাচ্ছেন পাচ্ছেন না। তাঁকে সম্রাটে অস্ত্র প্রতিষেধীরা জোট বেঁধেছেন। সেজন্যই কংগ্রেসের অনেককেই তাঁকে পাতা দিচ্ছেন না। পছন্দ করছেন না আমলা এবং ব্যবসারীরা।

কংগ্রেসের (ই) নেতারা সম্মত মানেকা গান্ধীর সমর্থকরা তো বটেই এছাড়া নতুন কাম্বোজী লবি যারা প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছাকাছি এসে গেছেন তাঁরাও ব্রহ্মচারীজীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাই ক্রান্ত থেকে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দিল্লীতে আখড়া গাড়া বাবাগা এঁদের মধ্যতে ঠর তীব্র প্রতি-ধর্মী হয়ে উঠছেন। এছাড়া ঠর সম্পত্তির উৎস এবং পরিচাপ কত তা জানার জন্ম পাতা লাগান হয়েছে। চেষ্টা চলেছে অস্ত্র দেশের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক ব্রহ্মচারীজীর আছে সে সম্পর্কে খবর বার করার। এবং এ সম্পর্কে ঠকে দিয়ে কিছু কবুল করার জন্ম জোর চাপ দেওয়াও হচ্ছে।

খোদ প্রধানমন্ত্রী ও অস্ত্রাস্ত্র প্রতাপশালী এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অশঙ্কনের জন্ম যুব

অবশ্য ধীরেন্দ্রজীও কঠিন পাত্র। তিনিও লড়তে জানেন। তাঁর অবশিষ্ট সমর্থকদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শেবাংশ ২য় পৃষ্ঠার

বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ফৌজদারী

মামলায় এক অভিনব দৃষ্টান্ত

সাধারণভাবে আমাদের দেশে দেখা যায় কোন ফৌজদারী মামলা পাঁচ লাখ অথবা দশ বছর অবধি বিচারার্থীন অবস্থায় পড়ে থাকে। অবশ্য সরকারের নিজের সুবিধার্থে আবার কখনো কখনো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার নিষ্পত্তি ঘটানো হয়। সেটা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী-দের ক্ষেত্রে। কিন্তু সম্প্রতি পূর্ণিয়া (বিহার) জেলায় সরকারী বিচার ব্যবস্থা এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পূর্ণিয়া জেলার এবং বিশেষত বৈশালী অঞ্চলের জোত-দার জমিদারদের গুণ্ডা বাহিনীর হিংস্র অত্যাচারে ওখানকার মানুষের বৈধন্য জীবন বিতীষিকার হয়ে উঠেছিল। বরের জি নি ম প জ, ধামের গোলা, গুরু-বাহুর লুট করা থেকে শুরু করে মারী ধর্ষণ নিষ্ঠ-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশাসন সি আর, সি, ও মিলিটারীর সহযোগিতায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে গ্রোথার করে। সরকারের তরফে এপ্রিল মাসের মধ্যেই বৈশালীর কৃষক-মজদুর যুক্ত-সংগ্রাম কমিটির লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে না গ সিং হত্যার মামলা শুরু করা হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই মামলার রায় দেওয়া হয়।

মামলার রায়ে বধাক্রমে, হরিম্বর সিং, বিজয় ও কেদার এই তিনজনের মৃত্যুও সহ পাঁচ জন কৃষক কর্মীর বাবজীবন কারাদণ্ড ও আরো কয়েকজনের ১০ বা ১৫ বছর কারা-দণ্ড হয়। বুদ্ধবাজীরা অবস্থার সাময়িক আদালতে অথবা উপজুক্ত দেশগুলি ছাড়া শুধু আমাদের দেশে কেন, কোন দেশেই এত তত্ত্বিবাড়ি খুনের মাংসার নিষ্পত্তি করার উদাহরণ নেই।

এই অবস্থার হরয়ান হয়ে গ্রামের মানুষ একজোট বেঁধে ঐ ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রত্যেক সংঘর্ষে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী সহ-জোতদার বাহিনীর একজন মাত্র জ্ঞাতা নাপি সিং মারা যায়। এরপর পুলিশ

আর একটি ঘটনা হলো। গত সেপ্টেম্বর মাসে ও সি সি আর নামক বিপ্লবী লগঠনের জনৈক লক্ষ্য বিন্দ্য। সিংকে বৈশালীর জোতদার বাহিনীর গুণ্ডারা বলপূর্বক পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে নির্মম প্রহার করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। পরে জানা যায় গুণ্ডা বাহিনীর সঙ্গে পুলিশও ছিল।

ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও বিব্রত অবস্থায়

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

অবশেষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমণ স্বীকার করলেন যে তার বাজেটের ফলে অর্থনীতির অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে পড়েছে। স্বীকার না করে উপায় নেই কারণ কেউ অঙ্ক হলে স্বর্গলোক নিতে যায় না। অথচ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এতদিন ধরে অর্থনীতির বিশদ বিশ্লেষণ করে এসেছেন। বলেছেন মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে এসেছে, মূল্যস্তর স্থিতিশীল হয়েছে। সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে কংগ্রেস (ই) সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের স্বীকার করেছেন যে অনেক চেষ্টা করেও মূল্যবৃদ্ধি রোধা সম্ভব হয় নি।

সাধারণ মানুষ জানতে চাইবেন, তার সরকার এমন কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন যা ফলে মূল্যস্তর স্থিতিশীল হতে পারে? তার অর্থমন্ত্রী বা তিনি কেউ জবাব দিতে পারবেন না। বরং মূল্যস্তরের সরকারী হিসাবেও অবাধ মূল্যবৃদ্ধির স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃক দ্রুতমূল্যভাতা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। পাইকারী মূল্যস্তর যে হারে বেড়েছে খুচরা দাম তার চাইতে অনেক গুণ বেশী। এমন কি পাইকারী মূল্য স্বেচ্ছক এবং ক্রেতা মূল্যস্বেচ্ছকের তুলনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? জাহ্নবী নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের মূল্যস্তর নামিয়ে এনে স্থিতিশীল করার প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। মধ্য ভোক্তাবৃন্দের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কেন? কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলেন?

এই ব্যর্থতার মূলে তারের কৃতকর্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্ষমতার এসে যমার পরমুহুর্তেই তারা ইম্পাত, ফেল, কয়লা, সিমেন্ট, ডিঙ্গেল, প্লাস্টিক প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি করে বাণিক প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা মূল্যবৃদ্ধির দায় সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বাজেটে পরোক্ষ কর, সাধারণ উৎপাদন কর, বিদ্যুত কর ইত্যাদি বাড়িয়ে দিলেন। তবু ১৪০০ কোটি টাকার বাটতি বাজেট হল। এই বাটতি নতুন নোট চাপিয়ে পূরণ করা হচ্ছে। এদিকে এসোপাখাড়ি আমদানী বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী হ্রাস, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার

করতে ব্যর্থতা মূল্যবৃদ্ধির আগুনে যুতাহুতি দিল। অর্থমন্ত্রীর র অসুমান চলতি বছরে বাণিজ্য বাটতির পরিমাণ দাঁড়া ৪১০০ কোটি টাকা, বাজেট বাটতি হবে ৪০০০ কোটি টাকা। এই বাটতির দায় মূল্যবৃদ্ধির আকারে জনসাধারণের ঘাড়েই চাপানো হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি রেশনে দেওয়া চাল, গম, চিনি এবং কাগজের দাম আবার বাড়ানো হয়েছে।

এই জনবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে দেশে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে কারণ মূল্যস্তর সর্বদা জলন্ত মত চড়িয়ে পড়ে। এক টি মৌলিক জিনিসের মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব জিনিসের দাম বাড়ে। যেমন বহুলা পেটল প্রভৃতি জালানির দাম বাড়লে প্রত্যেকটি পণ্যের দাম বাড়তে বাধ্য। কারণ চাষীকেও দাব, ডিঙ্গেল ব্যবহার করতে হয়। পাট

আর্থনীতি

আখ, তামাক, তুলার উৎপাদন খরচ বাড়লে অস্বাভাবিক কৃষিজাত পণ্যের দামও বাড়ে। সুতরাং কাঁচামালে মূল্যবৃদ্ধির দরুন শিল্পজাত পণ্যেরও পড়তা খরচ বৃদ্ধি পায়। মূল্যবৃদ্ধির এই পাপচক্র কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করেছেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভাঙতাবাজিতে পরিণত হয়েছে।

বামপন্থী দলগুলি দাবি করেছিলেন খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, চিনি, লবণ, কেরোসিন, কাগজ, দেশলাই ইত্যাদি চৌকটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য রেশনে নিয়ন্ত্রিত সত্তা হয়ে সরবরাহ করা হোক। এতে সাধারণ মানুষের কষ্ট কিছু কমবে। ইন্দিরা সরকার এতে রাজি নন। কারণ এর ফলে মাকি ৫০০ কোটি টাকা তরতুকি দিতে হবে।

সাধারণ মানুষের প্রতি এই কঠোর মনোভাব থাকলেও ইন্দিরা সরকার বড় বড় দেশীবিদেশী পুঁজি মালিকদের প্রতি অত্যন্ত সন্মম। সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রতিমন্ত্রী বলেছেন তাদের সরকার ক্ষমতার আসার পর শুধু “ফেরা” কোম্পানী-গুলিকেই (বিদেশী) ৪৫০ কোটি টাকা মগধ অর্থ সাহায্য করা হয়েছে। এর উপর নানা ধরনের তরতুকির পরিমাণও প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যায়

প্রধানমন্ত্রীর পছন্দসই পররাষ্ট্র মন্ত্রী নরসীমা রাও ইতিমধ্যে বেশ কড়া ধমক খেয়েছেন কেবল তাই-ই নয়, অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার মত নানান ঘটনার ব্যাপারে তাঁর নেত্রী তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এরকমভাবে চললে বর্তমান পদ হারাতে হবে। ইরাক ইরানের যুদ্ধ রীধারণ খবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দিয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। দুঃশেষে ভারতের বন্ধু। তাদের কাছে তেল আমদানি ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া ভারতীয় নাগরিকদের ওই দেশ-

গুলিতে উপযুক্ত সহযোগিতার জন্য দূতাবাসগুলি কাজের কাজ করতে গিয়ে যা করেছে সে বিষয়ে অনেক অভিযোগ উঠেছে। অযোগ্যতার পরিচয়ও বেশ কিছু পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা পররাষ্ট্র বিভাগের গোয়েন্দারা আগে থাকতে ভারত সরকারকে ওই যুদ্ধ সত্তারনার কথা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং এই ব্যর্থতার বোঝা ভারতের পক্ষে বিরাট দম্ভা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারত ওই যুদ্ধের শান্তি প্রচেষ্টার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কৃমিকা নিতে পারেনি। মন্ত্রী হিসেবে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার দরকার ছিল নয়-

নীমা রাও দেখাতে পারেন নি। বরং এরকম একটা সময়ে আজ কিউবা কাল মেক্সিকো দফরে ব্যস্ত থেকেছেন। ক্রমশঃ বয়ে যেতে দিয়ে এখন শাকিরে তঁরা যুদ্ধের সময় তিনি ভাল খুঁজে পাচ্ছেন না কি করবেন। এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। পররাষ্ট্র বিষয়ে ভারতের কৃমিকা উজ্জ্বল করার বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা করতে পারছেন তার ব্যাখ্য তথ্য তাত্ত্বিক দ্বিভে বলেছেন। এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, কাজের কাজ চাই। না হলে, প্রিয়পাত্র হলোও অন্ধকার ভবিষ্যতের কথাটা পরিচয় দেওয়ার দরকার ছিল নয়- যেন নরসীমা ভাল করে মনে রাখেন।

সি পি এম কি পি ইউ সি এল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে?

জরুরী অবস্থায় চণ্ডীগড় জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ভরপ্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের আন্দোলনে দল-হীন ব্যক্তিদের নামিল করার জন্য পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন

(অক্টোবর, ১৯৭৬) গঠিত হয়। ভি এম তারকুণ্ডে ওই সংস্থার আহ্বায়ক হন। আহ্বায়কের কাজ ছিল বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী দল-গুলির পরামর্শ অনুসারে দলহীন ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিটি গঠন করতে এসে শ্রীতারকুণ্ডে মশকিলে পড়েছিলেন। কারণ শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ সি পি এম নেতারা দলহীন লোকদের নিয়ে পি ইউ সি এল গঠন করতে রাজী হননি। তাঁদের মতে নাকি পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে কোনো দলহীন লোক পাওয়া সম্ভব ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে যে কমিটি হয়, তার তিন সম্পাদক হন প্রফুল্লচন্দ্র সেন (সংগঠন কংগ্রেস), অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জী (সি পি-এম) এবং ভক্তিব্রত মণ্ডল (করোয়ার্ড ব্লক)। জ্যোতি বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন চেয়েছিলেন নিউজেল্যান্ড ডেমোক্রেসিসের সঙ্গে যুক্ত অরুণা-শঙ্কর রাওকে ওই কমিটির সভাপতি করতে। কিন্তু অরুণাশঙ্কর রাওর শরীর পারাপ থাকার সিটিজেনস ফর ডেমোক্রেসিসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার তৎকালীন সভাপতি শৈবাল গুপ্তকে সভাপতি করতে বলেন। কিন্তু শৈবালবাবুর নাম সি পি-এম অনুমোদন না করার কমিটি মণ্ড-হীন থাকে।

নিখিরাই আদামের আন্দোলনকে বাঙালী-বিরোধী, কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে রিপোর্ট দেন।

সম্প্রতি পি-ইউ-সি-এলকে নতুন ভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। ভি এম তারকুণ্ডে, সাংবাদিক প্রাণ চোপরা, সুরেন্দ্রমোহন, মানজিং সিং এবং সাংবাদিক অরুণ শৌরী (আহ্বায়ক) সংস্থার এক খণ্ডা গঠনতন্ত্র রচনা করে ২২ ও ২৩ নভেম্বর দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ওই খণ্ডা সংবিধান অনুসারে কোনো রাজ-নৈতিক দলের সদস্য সংস্থার সভাপতি, সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হতে পারবেন না। জাতীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটিগুলিতে কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকতে পারবেন না। কোনো রাজনৈতিক দল কোনো রাজ্যে ওই সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হলেও কমিটিতে সেই দলের এক দলমান্দের বেশী সদস্য থাকবে না। সি-পি-এম পি ইউ সি এলের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সভার বিজ্ঞপ্তি পেলেও কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি। প্রস্তাবিত সম্মেলনের চিঠি পাওয়ার পর শ্রীমন্ত প্রসাদ সি ইউ সি এলকে জানিয়েছেন যে, তাঁদের মতামত না নিয়ে সি ইউ সি-এলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। চিঠির বরান দেখে মনে হচ্ছে সি-পি-এম পি ইউ সি-এল থেকে থাকবে না। কারণ সি-ইউ-সি-এল অস্বাভাবিক রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও কেরলেও নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করবে। এক্ষেত্রে ফরোয়ার্ড ব্লক কী করবে? ভক্তিবাবু কি সি-ইউ-সি-এল থেকে থাকবেন?

ইন্দিরা সরকার দেশী বিদেশী বাবা বাবা পুঁজিপতিদের প্রতি বতটা লম্বা, তার শতাব্দীর যদি সাধারণ মানুষকে দেখাতে তাহলে দেশ জুড়ে এত কষ্ট, এত দুঃখ এত অনটন দেখা যেত না। কিন্তু লাইসেন্স-পারমিট রাজের সরকার তো তা চান না। তারা সব মূল্যবৃদ্ধির দায় চাপিয়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে।

এর ফলে সারা দেশে বিক্ষোভ এবং ক্রোধের আগুন জ্বল উঠেছে। অপদার্থ সরকারের ভাঙতাবাজি বরদাস্ত করতে দেশের মানুষ আর প্রস্তুত নন। ইতিমধ্যে ওজ্জ্বল, কর্ণাটকে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। বন্ধ ডেকেছে বিহার, ওড়িশার জনগণ। পশ্চিম-বঙ্গের মোটা পূর্বাকল ২৭শে নভেম্বর প্রতিবাদ ‘বন্ধ’ পালন করতে চলেছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে চাষী আন্দোলন ফেট পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঙতাবাজি আর বন্ধনার প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তাল। ভারতের ইতিহাসে এমন ব্যাপক বিক্ষোভের নজীর আর কোনদিন দেখা যায় নি। ইন্দিরা সরকারের ব্যর্থতা ও অপদার্বতা সারা দেশে যে বিক্ষোভের আগুন ধুসারিত করেছে, এর আগুনে তাদেরও পুড়ে মরতে হবে।

মতামত

সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে

গত ২৫ই সেপ্টেম্বর 'দপণে' প্রকাশিত 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে' শীর্ষক আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে নির্মল সাহা 'হুটো গুরুতর ত্রুটি' বের করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

নির্মলবাবুর প্রদর্শিত ত্রুটি বিশ্লেষণ করলে যা বেরিয়ে আসে তা হল—(১) রামমোহন-বিজ্ঞানাগর-বন্ধিরঙ্গের সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার যথার্থ উত্তরসূরী হলেন রবীন্দ্রনাথ (২) তিনি বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দীরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন (৩) অথচ আমি আমার আলোচনার সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করিনি এবং (৪) নির্মলবাবুর মতে আমি 'স্বকোণে' রবীন্দ্রনাথকে এ ব্যাপারে রেহাই দিয়েছি।

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হল : রামমোহন-বিজ্ঞানাগর-বন্ধিরঙ্গের সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার যথার্থ উত্তরসূরী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আমি নির্মলবাবুর সঙ্গে একমত। এমনকি তিনি বিংশ শতকে উনবিংশ শতকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন—এ ব্যাপারেও আমার বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাহলে আমার আলোচনার রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আসেনি কেন সে প্রশ্ন থেকে যায়। আসলে আমার লেখাটি 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে' নামক প্রস্তাবিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথমার্ধ মাত্র। সমগ্র স্বযোগ মতো প্রবন্ধটি কয়েক কিস্তিতে লেখার ইচ্ছা নিয়েই কলম ধরেছিলাম। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আলোচনার জায়গা প্রকাশিত প্রবন্ধে খুব লজ্জতভাবেই আমি নি। যথাসময়েই সে ব্যাপারে আসব। যেহেতু একেবারে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নি, সেজন্মে লেখাটাকে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (অথচ মূল প্রবন্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ) হিসেবে প্রকাশের জন্ত পাঠিয়েছি। সুতরাং রবীন্দ্র প্রসঙ্গ অহুজ্জ্বলিত থাকার নির্মলবাবুর কাছে এটা প্রশ্ন হিসেবে খুব লজ্জতভাবেই এসেছে এবং প্রশ্নের জবাব এতক্ষণ যা বললাম তার মধ্যেই নিহিত। কিন্তু নির্মলবাবু জানলেন কি করে যে আমি 'অত্যন্ত স্বকোণে' রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত না করার প্রয়াস পেয়েছি? এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশের ভিত্তি কি? যদি Assumption হয় তবে নির্মলবাবুকে স্মরণ

করিয়ে দিই যে Assumption-এর একটা নীমা আছে। এ ধরনের একটা নিছক অহুমানভিত্তিক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করার পদ্ধতি হল জনসত্তার রুচিবিকারগ্রস্ত মানসিকতার প্রকাশ।

নির্মলবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা হলো : (১) মধুসূদন হলেন উনিশ শতকের একজন উৎপাদিত কবি এবং (২) আমি গায়ের জোরে-মধুসূদনকে 'সাম্প্রদায়িক করতে' চেয়েছি।

এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো : মধুসূদন উনিশ শতকের একজন উৎপাদিত কবি কিনা সে প্রশ্নে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তাছাড়া সেটা আমার বর্তমান প্রসঙ্গও নয়। তাই সে প্রশ্নে যাচ্চিনা। তবে মধুসূদনকে 'সাম্প্রদায়িক করতে' চেয়েছি এবং গায়ের জোরে—একথা বলে নির্মলবাবুই হাতামুখি হয়েছেন। গায়ের জোরে কাউকে সাম্প্রদায়িক করা যায় কি? এটা কি কোম পারের জোরে ব্যাপার? আর তাছাড়া আমি মধুসূদনকে সাম্প্রদায়িক বলেছি কি? অজ্ঞাত: সেই অর্থে যে অর্থে অজ্ঞানের বলেছি? মনে হচ্ছে নির্মলবাবু যেন আক্রমণ করার মানসিকতা নিয়েই লিখেছেন এবং নিজের আক্রমণের স্বার্থেই মধুসূদন সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্যকে একদম এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। মধুসূদন সম্পর্কে আমার বক্তব্য ছিল "মধুর কোন সাম্প্রদায়িক চিন্তার উৎকট প্রকাশ পাওয়া না গেলেও বলতে হয় মধুসাহিত্যে কিন্তু মূলত: হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত এবং তাতেই মিশ্রিত।" সুতরাং স্পষ্টতই যে কেউ লক্ষ্য করবেন আমি মধুকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করেছি কিনা। উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর মুখপাত্ররা 'হিন্দু' শব্দটির একটু সাজাতিরিক্ত ব্যবহারে উদ্যোগী ছিলেন। মধুসূদনও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। এই 'হিন্দু' কথাটার উচ্চকিত প্রয়োগধারা ছিল বাস্তবিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। মধুর বেলায়ও এ ব্যাপারে সেই ধারার ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। তবে আবাবও বলছি মধু বন্ধিমের মতো কোম-মতেই উৎকট সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রকাশ দেননি। অথচ নির্মলবাবু আমার মূল বক্তব্য থেকে দূরে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন

যে আমি মধুসূদনকে সাম্প্রদায়িক বলতে চেয়েছি। তাছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে "পেটের দ্বারে 'হিন্দু ক্রনিকল' বা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ার্টে' চাকরী করলে একজন খ্রীষ্টান কিভাবে সাম্প্রদায়িক হতে পারেন?" নির্মলবাবু এখানেও দেখাতে চেয়েছেন যে মধুকবি নিতান্ত পেটের দ্বারে 'হিন্দু ক্রনিকল' বা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ার্টে' চাকরী করতেন অর্থাৎ তাঁর 'হিন্দু' শব্দপ্রীতি সজ্ঞাত কোন অন্তর্ক সাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রকাশ ঘটে নি। নির্মলবাবু এখানেও আমার বক্তব্যকে অহুজ্জ্বলিত রেখে বলতে চেয়েছেন আমি 'হিন্দু ক্রনিকল' বা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ার্টে' কাজ করার জন্ত তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেছি। অথচ আমি বলেছি মধু নিজেই 'হিন্দু ক্রনিকল' সম্পাদনা করতেন, যে পত্রিকার নামকরণে হিন্দু শব্দের বিসদৃশ উপস্থিতি। এরপর তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করে যে মধুসাহিত্যে 'হিন্দু' সংস্কৃতির থেকে উৎসারিত এবং তাতেই মিশ্রিত এবং মধুসূদন 'জরদেব এবং কৃষ্ণলীলা লহরী প্রভৃতির সবিশেষ পূর্ণপাতী'—এ বক্তব্য নেনে নিতে বিভ্রান্তি বোধ করেছেন। এখানে

যেহেতু সে আলোচনার অবকাশ নেই, সেই হেতু বিনীতভাবে নির্মলবাবুকে অহুরোধ করি 'তরঙ্গ' পত্রিকার শায়রীর ১৩৮৬ সংখ্যাটি পড়ে দেখতে, কেননা তাতে এ ব্যাপারে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

নির্মলবাবু লিখেছেন যে মধুসূদন রামকৃষ্ণ বিজ্ঞানের বিরোধী, যে বিজ্ঞান ইংরেজ-প্রিয় রামমোহন-বিদ্যাসারসাদির প্রতিরূপ—তাঁর এই বিজ্ঞানকে এ ধরনের প্রতীকীকরণ না মিলে নির্মলবাবুর কল্পনা। তাছাড়া মেঘনাদকে ত্রিত্ব-নিধু কাল-মঙ্গল পাণ্ডুর প্রতিরূপ হিসাবে কল্পনাও চরম হঠকারিতা, কেননা মধুর রাজনীতি কখনও এ বক্তব্যের সপক্ষে অবস্থান নেননি, বরং বিপরীত অবস্থানের সাহিত্যিক স্বাক্ষর রেখেছেন সমকালীন কৃষকবিদ্রোহগুলোর সময়।

অবশেষে নির্মলবাবুকে অহুরোধ করার জন্য কোন ত্রুটি দেখলে তা নিশ্চয়ই দেখানো তাঁর দায়িত্ব কিন্তু কখনই আক্রমণের জন্তই আক্রমণ করা উচিত না, কেননা তাঁর রাজনীতি—দর্শনই এর বিরোধী।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন প্রাথমিক স্তর থেকে ইরাজী তুলে দেওয়া, অরেক্ট একটা পরীক্ষা তুলে দেওয়া এবং শেষ সংযোজন সহজপাঠ তুলে দেওয়া। তাই স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এটাকি জনসাধারণের দৃষ্টি অত্যধিক ঘুরিয়ে দিয়ে যাওয়ার একটা পন্থা। সহজপাঠ উঠিয়ে অল্প কোন শিশু পুস্তক পাঠ্য করার দিকেই বা তাঁরা এত মজর দিলেন কেন? যে দেশের সাম্যবাদী নেতাদের সম্বন্ধে অসংখ্য অভিযোগ তাঁরা কি করে শিশুদের সমাজ-সচেতন করবেন এটা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের আওতার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ উঠিয়ে দিয়ে অল্প কোন বই চালু করলেই কি তাঁরা সমাজ সচেতন হয়ে উঠবে? কোন বুদ্ধিজীবীর মতে সহজপাঠ নাকি সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে লেখা। কিন্তু একটা প্রশ্ন ভারতবর্ষ থেকে কি সামন্ততন্ত্র নির্বাসিত? এর জবাব উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষ এবং বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামে গেলেই পাওয়া যাবে। কাজেই সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না নিয়ে সহজপাঠ উঠিয়ে দিলেই কি সমস্তার সমাধান হবে?

যে দেশের ১২ কোটি শিশু (১৪ বছরের কম বয়সের বহুল) হারিজন্য নীমার নিচে বাস করে, আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ শিশু যে পরিবেশে জীবন বাপন করে তা জীবন ধারণের অযোগ্য, প্রতি বছর ১০ লক্ষ শিশুকে তাদের মা রাস্তার ফেলে চলে যায়—যার একমাত্র কারণ হারিজন্য এবং প্রতি বৎসর ৩২ লক্ষ শিশু মারা যায় [ইউনিসেক এর বৎসরিক (১৯৭৮) বিবরণী]। সেই দেশে শিশু পাঠ্য সহজ পাঠ উঠবে কিনা এই চিন্তা করা চিন্তাবিদগণ এবং বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যবিত্ত মানসিকতারই পরিচায়ক। কোম বিশেষ লম্বা সৃষ্টি করে আসল সমস্যাতে চাপা দেওয়া শাসকশ্রেণীর এক বিশেষ কৌশল। অতীতের ঘটনাবলী আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

অভিতান্ত বোম
রবি দেন

সহজ পাঠ নিয়ে বাদ প্রতিবাদ

রবীন্দ্রনাথের শিশুপাঠ্য সহজপাঠ নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তাতে বর্তমান পত্রলেখকরা বিশ্বর বোধ করেছেন। বিব্রিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

সহজপাঠ উঠিয়ে দিয়ে সেখানে অল্প কোন শিশুপাঠ্য নির্বাচন করা যায় কিনা এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তর একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন এবং বলা নিশ্চয় যোজন তাঁরা উঠিয়ে দেবার পক্ষে (এই পত্রলেখা পূর্বস্ত সর্বশেষ খবর মুখ্যমন্ত্রী সহজপাঠের সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটা শিশু পাঠ্য নির্বাচনের পক্ষে)।

অত্যধিক বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকাগুলোও যথেষ্ট লরব। অর্থাৎ বিষয়টা এখন একটা পর্বাণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে এক শ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গবাসীদেরও এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়েছে।

যতদূর জানি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী খগীর সত্যপ্রিয়-স্বায় এই পুস্তকটি নির্বাচন করেছিলেন। তার আগে বর্তমান বুদ্ধিজীবীরা পুস্তকটি শিশুপাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে কোন জোরাল দাবী তুলেছিলেন কিনা অধিশিক্ত

পত্রলেখকদের জানা নেই। কেউ জানালে বাধিত হব। আজ সহজপাঠ নিয়ে যেমন বুদ্ধিজীবীরা রবীন্দ্র প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনীত নিবেদন রবীন্দ্রনাথ শুধুই কয়েকটি পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ? রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও মানবাবিকারের যে আদর্শ সে সম্বন্ধে আপনার কি করেছেন? জরুরী অবস্থাকালীন অস্তায়, অত্যাচার, মারুতের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিন্তু আপনাদের কলম সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের মানব-ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও আপনাদের কোম মাথাব্যথা নেই। তবে কি আমরা ধরে নেব আপনাদের এই সোচ্চার সমালোচনা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত?

এবার পশ্চিমবঙ্গের "জনপ্রিয়" বামফ্রন্ট সরকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বামফ্রন্ট সরকার ক্রমতাসীম হবার পর আজ পূর্বস্ত কোন মৌল সমস্তার সমাধান চো হয়ই নি, উপরন্তু ক্রমবর্ধমান সমস্তার চাপে মাহুয হি পো হা রা। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্তা, জিনিসপত্রের আকাশ হোয়া দাম আজ মাহুযকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আজ সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে অসম্ভব "গুরুপূর্ণ" সব সিদ্ধান্ত

দপণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

মাগাধিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭'৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠ্যার ঠিকানা

ম্যানেজার, দপণ

৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

বাঙলাদেশের সাহিত্য : ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রশীদ আল ফারুকী

১৯৪৭ সালে মুসলমানেরা একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার মুসলমানদের ভেতর একটা প্রবল প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। নেটি হলো, তাঁরা কি মুসলমান থেকে যাবেন, নাকি একটা সাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচিতি করবেন। যদিও বিংশ শতাব্দীতে এটি একটি বাতুল প্রশ্ন। কারণ, কোন জাতিই এই যুগে নিজেকে ধর্মের আবরণে আচ্ছন্ন রাখতে চায় না। তবু মুক্তিযুদ্ধের আত্মিক ক্ষেত্রে এই বড়ন স্বীকার করে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়। সে হলো, সাহিত্য ও জাতীয়তাবোধ এক নয়। তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস এবং জাতির ইতিহাসও এক নয়। মুসলিম জাতির (আরব দেশে) ইতিহাসের শুরু হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। কিন্তু আরবি সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়া আরো পেছনে। আরো পেছনে বলে আজকের মুসলিম আরবেরা তাদের ইসরাউল কায়দকে সাহিত্য থেকে বাদ দিতে পারছেন। সে কারণেই কায়দার শিল্পকর্ম জো আরবি সাহিত্যের ঐতিহ্য বলে সমাদৃত হয়ে আসছে। অল্পকাল মাকিন দেশেও আজ ইংরেজ কবিরা তাদের ঐতিহ্যের একটা অঙ্গ হিসেবে সমাদৃত। ঐতিহ্যের এই ভাষা-ভিত্তিক ধারাকে স্বীকার করেই সেখানে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্য-সৃষ্টিও তদনুরূপ—যার ভিত্তি বহু বিস্তৃত।

আমাদের সাহিত্যের একটা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসের রয়েছে একটা সুস্পষ্ট পতি। ষাটশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। এই পথে আমরা যেসব ঐতিহাসিক পুরুষের সন্ধান পাচ্ছি তাঁরা সবাই একটামাত্র যোগসূত্রে এখিত। কাফু পাদ, চণ্ডীদাস, গুণরাজ ষাঁ, ভারতচন্দ্র, দ্বৈধর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মশাররফ হোসেন, নজরুল থেকে শুরু করে হালের মানিক-বিহুতি-তারাপ্রসন্ন, আবুল ফজল ওকত ওসমান শামসুর রাহমান সবাই বাঙলা সাহিত্যের এই প্রবাহমান ধারার এক একটি ডেউয়ের মত। বাঙলার মুসলমানদের ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

মুসলমানেরা বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, একথা বলে

আমরা গৌরববোধ করে থাকি। কিন্তু তাঁরা যে শুধু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি সে কথা বলতে লজ্জা কিম্বদ? আজ ইতিহাসের অবিস্মরণীয় পাতাটি যদি খুঁজি তা হলেও আমাদের সাহিত্য ঐতিহ্যের উৎস কোথায় তার সন্ধান পাবো। আলাউল হুদর আরকান রাজসভায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর সাহিত্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম বাঙলা সাহিত্যকে ধর্মীয় গতি থেকে মুক্ত করে মানবীয় প্রয়োজনীয়তার অবতারণা করেছেন। অতএব তাঁকে বাঙলা সাহিত্যে রোমান্টিকিজমের প্রথম ধ্যানী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি পদাবলী রচনা করলেন কেন? যেহেতু বাঙলা সাহিত্যের আদি উৎস গীতিকবিতার ভেতর (চর্যাপদ) এবং পরিণতি পদাবলী সাহিত্যে, যেহেতু একজন মুসলমান লেখক হয়েও তাঁর পক্ষে সেই প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতে তখন মুসলমান রাজত্ব চলছিলো। পক্ষান্তরে তখন বাঙলা সাহিত্যের মূল ঐতিহ্য বিরোধী অস্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধারাও আমরা দেখি—যা ‘ইতসলিকজোলেবা’, ‘জায়লী-মজলু’, ‘হাতেম তাই’ ইত্যাদি কাব্যে বিদ্যুত। এদবও মুসলিম ঐতিহ্য নয়। কারণ এদব রূপকথাজাতীর লোককাহিনী প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে চলে আসছে। এদব কাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক ধর্মীয় সূত্রে এখিত নয়, এবং ভৌগোলিক ঐক্যের দ্ব্যোতক। এবং এ জাতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ ভৌগোলিক ঐক্যের প্রশ্ন আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব একদোর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র কী?

বাঙলার অধিবাসী আমরা। বাঙলার শ্যামল প্রান্তর জুড়ে সবুজের সমারোহ। এই সবুজের লালম-পালনে যে কৃষক প্রাণপাত করে চলেছেন এর একটা নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে। এর সঙ্গে বাঙলার যে কোন মানুষের সম্পর্ক বিস্তারিত। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে এই পূর্ব বাঙলাকে একটা নির্দিষ্ট অবয়ব প্রদান করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ সবের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। এটা শুধুই প্রভাব। এই সর্বগ্রাসী প্রভাব সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ

করেছে। অতএব রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য যা আধুনিক সাহিত্যে বিদ্যুত। প্রাচীন ও মধ্যযুগেও আমরা এই ঐতিহ্যের একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা লক্ষ্য করি। চর্যাপদের ঐতিহ্য গীতিকায় গ্রাম-বাঙলার সাধারণ জীবী, মজুর, জোলা কথা কয়। এ সবের সঙ্গে আমাদের যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তাই আমাদের ভেতরে আসল সত্য। এবং তাই আমাদের ঐতিহ্য। স্বভাব ও পেশ্যে প্রেমধর্ম বাঙলার আদিধর্ম। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রেমধর্মেরই জয়জয়কার ঘোষিত হয়েছে। অতএব বৈষ্ণব গীতিকার আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য। বাঙালী সর্বদাই সাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। ধর্মনিরপেক্ষ একটা নির্দিষ্ট রূপ সর্বদাই আমরা বাঙলাদেশে পাই। এই ধর্মনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আজকের কথা নয়—শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙালী সর্বগ্রাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে। আরকান রাজসভায় দৌলত কাজী আলাউলের ভেতর আমরা সেই রূপ লক্ষ্য করি। অতএব আলাউল আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য।

॥ দুই ॥

আমি শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পসৃষ্টিতে বিশ্বাসী নই। কলাকৈবল্যবাদের দিন বহু আগেই ফুরিয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বাঙলার নব্য লেখক-দিগের প্রতি নিবেদন’ প্রসঙ্গে বলেছেন, “যদি এমন বুদ্ধিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা নোম্বর্ষ সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন...সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অস্ত্র উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।” (বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড সংস্করণ, (২৭২ পৃষ্ঠা) অতএব শিল্পসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা বাতুলতা। তবু দেখা যাচ্ছে, আজ আমরা জীবন-বিমুখ হয়ে পড়েছি। আর এই বিমুখতাই আমাদের পঙ্কু করে রেখেছে। বিভাগ পূর্ব-বাঙলার মুসলমান লেখকদের ভেতর সমাজ-সচেতনতা ছিলো বলেই তাঁরা মুসলিম সমাজচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। কারণ সংখ্যালঘু হিসেবে সেদিন সত্যি তাঁদের কিছু সমস্যা ছিলো এবং তার ভেতর জটিলতাও কম ছিলোনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো,—যারা স্বাধীনতা লাভের আগে মুসলিম সমাজজীবনে এত পলঙ্গ অবলোকন

করেছিলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁরা নিজের হয়ে পড়লেন কেন? তাঁরা কি স্বাধীনতা লাভ করা-টাকেই সকল সমস্যার সমাধান মনে করেছিলেন?

যতদূর মনে হয়, এই সমস্যার সঙ্গে দেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারেরও কিছুটা সম্পর্ক ছিলো। রাজনৈতিক অস্থিরতাই এর প্রধান কারণ। সেদিন যারা মনে করেছিলেন, আলাদা বাসভূমি ব্যতিরেকে মুসলমানদের সামাজিক নিরাপত্তাবিধান সম্ভব নয় তাঁরা আলাদা বাসভূমি পেয়ে কি দেখলেন? তাঁরা দেখলেন, যে সংগ্রামকে তাঁরা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে রাজনীতিতে রূপদান করেছিলেন তা ছিলো মূলতঃ অর্থনৈতিক। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের নামে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক যড়যন্ত্র দবার অলক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে গেছে। তা হলো, একদিকে বিদেশী পুঁজিবাদীদের বাজার লংরক্ষণের স্বার্থে নিজেদের তাবোদার সৃষ্টির প্রয়াস; অন্যদিকে দেশীয় পুঁজিবাদীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পরাজিত হয়ে দেশ বিভাগের নামে একচেটে মুনাফা লুণ্ঠনের তাগিদ। সাম্প্রদায়িক খোলাসের দৌলতে পরিশেষে উভয় যড়যন্ত্রই সফল হলো। এতে সহায়তা করলেন মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা—বিশেষতঃ লেখকশ্রেণী। স্বাধীনতা পাওয়ার পর তাঁদের চমক ভাঙলো। দেশ বিভাগের মূল উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করে তাঁরা শিউরে উঠলেন। কারণ, দেশে শুরু হলো রাজনৈতিক অরাজকতা। রাজনৈতিক হত্যা থেকে শুরু করে নির্বিচারে ক্ষমতার হাত বদল হতে লাগলো, দেশের সেরা সেরা দেশপ্রেমিকদের কারাগারে নিক্ষেপ করে বেপরোয়া অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের জন্তে চলতে লাগলো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রতিযোগিতার মারকের সূত্রিকা গ্রহণ করলো বিদেশী পুঁজিবাদীরা—যারা একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দুশো বছর ধরে এই দেশের অধিবাসীদের পশা-ধীন করে রেখেছিলো।

এই অবস্থার প্রতি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ফলে বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশ হতাশার পতীর আওতে মিমজ্জিত হলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই হতাশার

চরম শিকার হলেন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত মুসলিম সাহিত্যিক সমাজ। সাতচল্লিশের আগে যে উৎসাহ ও অল্পপ্রেরণা নিয়ে তাঁরা কাজে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর তাঁদের ভেতর সে উৎসাহ রইলোনা। ফলে তাঁরা বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান পতনের নীরব দর্শকে পরিণত হলেন। তাঁরা হারিয়ে ফেললেন নিজেদের সত্তা। প্রত্যেকে যেতে উঠলেন নিজেদের স্বপ্ন-স্বপ্নে নিয়ে। অবশ্যই এর জন্তে শিল্পীদের পুরোপুরি দায়ী করা চলেনা। কারণ কোন দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাই স্বপ্ন শিল্পকর্মের অল্পকাল নয়। যুগে যুগে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি লক্ষ্য করেছি। এদেশেও এমন অনেক সময় গেছে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন অনেক প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটেছে। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একবার সত্যতা নহলেই চোখে পড়ে। এবং যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশে এসেছে তখন সাহিত্য ফলে ফুলে ভরে উঠেছে। সাতচল্লিশের পর একারণেই আমরা পূর্ব বাঙলার সেরা বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যু মিছিল অবলোকন করেছিলাম।

। তিন ।

এতো গেলো প্রাক-সাতচল্লিশ বাঙলার মুসলমান লেখকদের কথা—যারা সত্যিকার সরলতা এবং অগাধ শক্তি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েও রাজনৈতিক চক্রান্তে ব্যর্থতা বরণ করেছেন। তাঁদের ব্যর্থতার পর এই গুরুদায়িত্ব তরুণ লেখকদের উপর এসে পড়লো। কিন্তু কয়েক বছর পরই দেখা গেলো তরুণ লেখকদের অনেকেই যেন দিন দিন যিম্মিয়ে পড়ছেন। আবায়ো দেখা গেলো সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁটার টান। প্রবীণদের জন্তে আমাদের কোন দুঃখ ছিলোনা। কারণ তরুণদের ভেতর আমরা যে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করেছিলাম, তা বেশ উৎসাহ-ব্যঞ্জক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই আমরা হতাশ হলাম। দেখা গেলো, রাজনৈতিক অরাজকতা প্রবীণদের মত নবীনদের ভেতরও প্রচুর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এমন কি অনেক প্রতিশ্রুতিবান সাহিত্যিক এই জব্বল অরাজকতার প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হলেন। পূর্বেই বলেছি, আমি কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী নই। অতএব আমি মনে করি, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে কোন আত্মঘাতী রাজনৈতিক অরাজকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা একজন শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়



সিনেমার টিকিট হবে আরো দামী

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমার টিকিটের দাম যে আরও বাড়তে পারে, তা মনে করার মধ্যেই সংগত কারণ আছে। দীর্ঘদিন ধরে সিনেমা টিকিটের দাম বাড়েনি। সিনেমা মালিকদের দাবী, আই, এম, পি এ অনেকদিন ধরেই রাজ্য সরকারের কাছে বলে আসছে, সিনেমা টিকিটের দাম না বাড়ালে সিনেমা-কর্মচারীদের কোন দাবী পূরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর তারা সরকারকে পত্রি জানিয়ে দিয়েছিল, আমরা সিনেমা ধর্মঘট এড়াতে হলে অবিলম্বে টিকিটের দাম বাড়ানোর অনুরোধ দিতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম, ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমা ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল আর মালিকপক্ষ তাদের সিনেমা হাউসে লক আউট ঘোষণা করে দিল। লক্ষ্যীয় এই যে, দারুণ পশ্চিমবঙ্গের সাদে লাভশো সিনেমা হাউসে ধর্মঘট হলেও লক আউট হয়েছে খুব কম সংখ্যক হাউসে এবং এই ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হয়নি। অগত্যা পরদিন দ্বিধা ধর্মঘট চলার পর অবশ্যই দেখা গেল তার অবসান এবং যে শর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহত হল তাও রীতিমত বিশ্বকর ও হত্যাশা-জনক।

বেতনহারার পুনর্বিন্যাস, বোনাস ও বন্ধ সিনেমাগুলি খোলায় দাবীতে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, এই দাবীগুলির স্থানান্তরিত হওয়ায় কোন ক্ষেত্রে না পৌঁছেই আচম্ভ্য ধর্মঘট তুলে মেওয়া হল। এমন কি ধর্মঘট চলাকালীন পরদিন ধর্মঘটের বেতন পর্বত কর্মীরা পেলেন না—পেলেন শুধু এক মাসের অগ্রিম টাকা, যা পূর্ববর্তী পর্বতে কেটে নেওয়া হবে ক্রমান্বয়ে। বেতন ও বোনাস সম্পর্কে শুধু আশ্বাস বাণী শোনানো হয়েছে। কয়েকটি সিনেমা হল খুলেছে বটে তবে তা কিম্বদ

শর্তাঙ্কধারী নয়। হুতরাং ধর্মঘটের কলেই যে হলগুলি খুলেছে—এমন দাবী কেউ করতে পারে না। বেতন শোষণ পিকচার্স এমপ্লয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘটের নামে এই যে প্রতারণা হয়ে গেল, তার পেছনে কি কোন উদ্দেশ্য নেই? ই, আই, এম, পি, এ-র টিকিটের দাম বাড়ানোর দাবীকেই কি পরোক্ষ মধ্যস্থতা দেওয়া হল না? টিকিটের দাম না বাড়ালে প্রমিকদের দাবী পূরণ করা যাবে না। ধর্মঘট শেষ হয়েছে, এবার প্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী মেটাতে হবে। অতএব সরকারের ওপর এবার বেশী করে চাপ এসেছে—টিকিটের দাম বাড়াতে হবে। আর উপায় কি?

কিন্তু সিনেমার টিকিট তো এখনতেই দামী হয়ে রয়েছে, তার ওপর আরও দামী হলে সাধারণ দর্শকদের ওপর চাপের বোকা আরও বাড়বে না কি? আসলে সিনেমা টিকিটের ওপর সরকারী করের হার এত বেশী যে, সিনেমা শিল্প টিকিট বিক্রী থেকে যে টাকা পায়, তা দিয়ে প্রমিক কর্মচারীদের বাড়তি দাবী মেটানো সত্যিই কষ্টকর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সিনেমার টিকিট বিক্রীর টাকার শতকরা একষষ্ঠি ভাগ কর বাবদ আদায় করে নেন, আর বাকি উনচল্লিশ ভাগ সিনেমা শিল্পের হাতে আসে। হুতরাং টিকিট বিক্রীর নিহতভাগটাই ধখল করে বসে আছেন সরকার। বিমিসর হারের এত বৈষম্য কিন্তু সিনেমার টিকিট ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন, এমনটা হবে কেন? সিনেমাকে বলা হয়, 'শস্যের প্রমোদ মাধ্যম'—তার কি এই মনুনা? পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা-প্রদর্শনী থেকে সরকার বৈনিক পক্ষে তের লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকার অল্প

কিছুটা হ্রাস করে যদি সরকার করের বোকা কিছুটা কমান, তাহলে টিকিটের দামও যেমন আর বাড়েনা, তেমনি সিনেমা শিল্পের হাতেও কিছু বেশী টাকা আসে, যার ফলে সিনেমা কর্মীদেরও অর্থনৈতিক দাবীগুলির পূরণ কিছুটা হতে পারে। কিন্তু তা বৃষ্টি হবার নয়—সরকার করের বোকা হাক্কা করতে চাননা। অতএব, প্রয়োজনাতেও এগোবেন, এগিয়েছেনও কিছুটা—কিন্তু প্রাপ্য কর আদায়ের কথামাত্র হ্রাস করতেও নারাজ। অতএব, সিনেমার টিকিট আরও দামী হতে বাধ্য।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের নাট্যাংসব

সম্প্রতি এক মাংসাত্মক সম্মেলনে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের নেতৃত্ব দান জনাব, ফেডারেশন আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ৮১ মার্চের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত একটানা প্রায় তিন মাসের এক নাট্যাংসবের আয়োজন করেছে। দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অঙ্গন হচ্ছে। মোট প্রায় ৬০টি অপেশাদারী নাট্যাংসব এই উৎসবে যোগ দিচ্ছে।

এই উৎসবের মধ্যে নাটকের অভিরিক্ত আছে তিনটি সেমিনার। তার মধ্যে প্রথম দিন পুরনো দিনের অভিনেতা ও কলাকুশলীদের সম্মেলন আয়োজন হবে। অতীত দিন নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। দ্বিতীয় দিনের সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন কৌতুক অভিনেতারা। অভিনয়ের এই বিশেষ দিনটি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করার দায়িত্ব নিয়েছেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দিনের সেমিনারে নাটক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনয় নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হবে।

'সুকান্ত' তথ্যচিত্র

বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রযোজিত তথ্যচিত্র 'সুকান্ত' ২২ নভেম্বর প্রথম দেখানো হল গোকী লবন হল। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম থেকে মৃত্যু জীবনের ঘটনাবলী, কবির কবিতার আলোকে তদানীন্তন অবস্থা এই চিত্রে বর্ণিত হয়েছে। বহিঃ পরিসর খুবই অল্প তথাপি পরিচালক সুধীপ রায় চেষ্টার কৃতি করেননি। স্মরণে রাখতে চাইব যে চৌধুরী।

তথ্যচিত্র শুরু হবার পূর্বে 'সুকান্ত স্মরণে' এক আলোচনাচক্র লক্ষ্যবাহী পরিচালক কবিতাভাষী শ্রীশোক ভট্টাচার্য বলেন, বহু আশংকা কাটিয়ে আসা বাধ্য হয়েছি, যা খুবই বেদনাদায়ক। রাজ্য সরকারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীমুখের ভট্টাচার্য আলো-

বাঙলাদেশের সাহিত্য

এম পূজার পর

লেখকের উচিতই নয় শুধু, পবিত্র দায়িত্বও। দৌত্যগ্যবশতঃ আমাদেব অনেক সাহিত্যিকের ক্ষুধার লেখনী গণজীবনের নিরাপত্তার তাগিদে কিংবদন্তিতে চলেছিলো। কিন্তু তদানীন্তন সরকার এসব ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা অধীকার করলেন। বেশ কিছু সংখ্যক লেখক কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ হলেন। সাহিত্যিক মহলে নেমে এলো গভীর হতাশা। প্রকটিত হলো নীতি-বিচ্যুতি ও স্বার্থপরতা। দেখা গেলো, কোন কোন লেখক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর লিখে জনসাধারণের প্রচুর অভিনন্দন ও সাধুস্বপ্ন পেয়েও শেষে এমন বিষয়ের উপর লেখনী ধারণ করলেন, যার গণবিরোধী রূপ ছিলো প্রস্রাবীত। তবু কেন তিনি লিখে গেলেন? টাকার লোভে কি? না, টাকার লোভে নয়, শুধু সামাজিক নিরাপত্তার লোভেই লেখক এমন গহিত কাক করতে পিছপা হলেন না। কারণ শিল্পীর যে স্বাধীনতা স্বাধীন বিকাশের একমাত্র উপায়, পাকিস্তানে সে জিনিসটির নিরাকরণ অব্যবহিত ছিলো। এতে একদিকে ঐতিহ্য গণ সাহিত্য তথা সাহিত্যে স্বাধীনতা

চলার বলেন, কর্মতার আসার পর থেকেই কবি সুকান্তকে নিয়ে এ ধর্মের একটা চিত্র করার কথা আমরা ভাবি। সেই ভাবনা আজ বাস্তব হয়েছে। ঐ আলোচনার শ্রীধ্বংস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকরণ মিত্র বক্তব্য রাখেন। সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য শ্রীজ্যোতিবিকাশ দত্ত।

ইসক্রা থিয়েটারের 'স্বপ্নের নগরী'

সম্প্রতি যোগেশ মাইমের ইসক্রা থিয়েটার গোপীন্দ্র 'স্বপ্নের নগরী' প্রদর্শিত হলো। রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীকান্তরঞ্জন রায়। নাটকটির মূল বিষয়বস্তু হলো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কলকাতাকে ঔপনিবেশিকতার কেন্দ্রস্থল করে লারা দেশে কিতাবে শোষণ ও শাসন চালিয়েছিল। এবং নাটকে এদেশের মুজিপতিরা কিতাবে সাম্রাজ্যবাদী-দের টায়েদারি করে প্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়েছিল তার ছবিও আছে। এলবার্ট লাহেব ও উমানাথ এই বৈত কৃষিকায় শ্রীকান্ত রায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। অন্ত্যস্তের অভিনয়ও মোটামুটি ভালোই হয়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসা ভেঙ্গে ওঠেনি। অতীতকে প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের পশ্চাদপসরণের সুযোগে কিছু পেশাদারী লেখক সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসলেন বলে সাহিত্যের মান শূন্যের কোঠার গিয়ে ঠেকেলো। একমাত্র এই কারণেই এমন বহু স্থিতি পুরস্কৃত হলো, যাতে না ছিলো ঐতিহ্য শিল্পগুণ, না গণজীবনের ছাপ। শুধু শিল্প স্থিতি করে এখানে জীবন-ধারণ করা বা সামাজিক নিরাপত্তা অক্ষর রাখা অসম্ভব বলেই হয় শিল্পীর জীবিকার তাগিদে এটিকে তথু লেখক-পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, অথবা নিজস্ব হস্তে বসেছিলেন।

এ ভাবে প্রায় দেড় দশক চলে গেলো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা 'বা পেলাম তাতে আমাদের কলঙ্ক' খুঁচলো না। প্রবীণেরা বিদায় নিলেন, নবীনরা সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার লোভে প্রতি-ক্রিয়ালীলতার কাছে আত্মদমর্পণ করলেন। কিন্তু তাই বহু সাহিত্যের গতি শুষ্ক হবারে? শুষ্ক হয়ে যাবে এর অগ্রাভি-ধান? এবার এগিয়ে এলেন আমাদের তরুণেরা। বয়েস ও অভিজ্ঞতা এদের কম কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপে তাঁরা জীবন্ত। তাঁরা সাহিত্যচর্চার মনোনিবেশ করলেন দকল প্রকার সামাজিক আচার ও নীতিবোধকে অধীকার করে। এই অধীকৃতিই তাঁদের শক্তিকে পাঠকের—বিশেষ করে প্রাপবান পাঠকের দৃষ্টিভীমায় নিয়ে এলো। কিন্তু তাঁরাও স্বাভাবিকভাবে শিল্পচর্চার মনোনিবেশ করতে পারলেন না। তাঁদের অসাধারণ প্রত্য-বের সামনে পশুস্বপ্ন হয়ে প্রবীণ নবীন লকলেই তাঁদের বিকছে বড়োহস্ত হয়ে গেলেন। এরা তাঁরা ঐরা রাজনৈতিক অরাজকতার কাছে নতি অধীকার করে সাহিত্যকর্ম ছেড়ে দিয়েছিলেন, এবং ঐরা সামাজিক ও আর্থিক প্রতিশ্রুতির লোভে নিজে-দের বিবেক ও বুদ্ধিকে বিক্রিয়ে দিয়ে ছিলেন। এই দুই দলের লম্বিমিত্ত-আক্রমণে আমাদের তরুণরা আত্ম-দমর্পণ কয়েমনি, এটাই ছিলো এক-মাত্র আশার কথা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

স্বাতক ও স্বাতকোত্তর পর্বায় পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

- ১। গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব / শ্রীমতী পূর্ণিমা চৌধুরী / ১২'০০
- ২। নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান / ডঃ হিমালীপূর্ণিমা চক্রবর্তী / ১২'০০

৩ এ, রাজ্য স্ববোধ মন্ডির গোয়ার, কলিকাতা-১৩

এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছে কনফেডারেশন, লাবা ভারত লংবাশনজ কর্মীদের ফেডারেশন, ভারতীয় বার্ডালীবী লংব, নি টি আই ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন এবং ইউ এন আই কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ ।

সিগ্নিকেট ব্যাংকের মালিকপক্ষ
চতুর্থ শ্রেণীর কর্তৃত্ব নিয়েগে
অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন—
এই অভিযোগে সিগ্নিকেট ব্যাঙ্ক স্টাক
ইউনিয়ন লাগাতার আন্দোলন

দ্বিতীয় রাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষক-
দেয় মতে, সম্প্রতি ঐমতী গান্ধীর
কাছে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর আকর্ষণ
কমেছে। এখন ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারী
ঐমতী গান্ধীর বাড়িতে চুকতে গেলে
নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা তাঁকে
বাধা দেয়। মহাচারী বাবা ঐমতী
গান্ধী সম্পর্কে বলেন, “তিনি একজন

আমি গেছে, যানেকা গাছের
মা লীমতী আশাতের আনন্দ
মেয়েকে ঘব কংগ্রেসের সাপতি করার

কলকাতা পৌর সভার স্বাস্থ্য
বিভাগ থেকে আদানতে অভিযোগ
করা হয়েছে যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের
কুকর্মি ব্রাহ্মণ সত্কার গুঁড়ো মশলার
তেজাল পাওয়া গেছে। পৌরসভার
পাবলিক এমালিস্ট'র অভিযত
অন্তর্ধানীই ঐ মামলা চলছে।

রূপবাণী, অরুণা, ভারতী
(প্রভাহ—৩, ৬, ৯)
শ্রী, নেত্র, জয়, অনকা, বা
জয়শ্রী, কৈরী, উদয়ন,
পদ্মা (সোদগুরু)

ওড়িশার সাংবাদিক মহাপাত্রের কাহিনী

ছবিরাণী হত্যা মামলা এক নতুন পথে বাক নিয়েছে। তাঁর সাংবাদিক স্বামী নবকিশোর মহাপাত্রকে অতি মন্থ্রতি জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি লাধা কাগজে ছাকর করিয়ে এবং লিখিত বিবৃতি পড়তে বাধ্য করে তা টেপ করে রেখে তার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

ওড়িশার বিলুপ্তাধীন নদীর পারে গত তেরগা অক্টোবর বলাংকারের পর সাংবাদিক স্বামীর সামনেই ছবিরাণীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। স্বামীর উপস্থিতিতেই ছবিরাণীকে পরপর ১১ ব্যক্তি ধর্ষণ করে। এর মধ্যে ছিল বিরোধী রক কংগ্রেস (ই) দলের আহ্বায়ক-দ্বিধাকর নায়ক এবং রক কংগ্রেস (ই) সম্পাদক নন্দকিশোর মোহাঙ্গী। এই দুই কংই নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং কটকের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট গত ২৯শে অক্টোবর এদের শর্তাধীনে জামিন দেন।

ওড়িশার বিরোধী হলগুলির লক্ষ্য এই মামলাকে কেন্দ্র করে কংই দলের বিরুদ্ধে জনমত পঠন করছেন। অপরদিকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী কে বি পট্টনায়ক বিরোধীদের

এই প্রয়াসকে বামচাল করতে প্রাশনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

বিরোধী হলগুলির জনমত গঠনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে গত ২৮শে অক্টোবর বিরোধীতে কংগ্রেস (ই) দলের পক্ষ থেকে একটি জনসভা ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই জনসভা অচলিত হতে পারেনি। ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা নথিও স্থানীয় সুবকেরা কালো পতাকা নিয়ে বিকোভ দেখান এবং দাবি করেন যে, ছবিরাণী হত্যা মামলাকে ধামাচাপা দেবার যে প্রাশনিক প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক। বিকোভ প্রদর্শনকারীরা বলেন যে, বিরোধী জনসভায় ভাষণ দেবার কোন নৈতিক অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর নেই। পুলিশ বিকোভ প্রদর্শনকারীদের মিথিচারে লাঠিপেটা করে এবং প্রায় শতাধিক বিকোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২৯শে অক্টোবর আরও একটি ঘটনা ঘটে। ছবিরাণীর সাংবাদিক স্বামী নবকিশোর ভুবনেশ্বরে ছিলেন দৈনিক প্রগতিবাহীর ম্যানেজিং এডিটর রবি দাসের বাড়িতে। পুত্র ভ্যানিকে দেখার জন্য তিনি নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হেন ২৯শে অক্টোবর সকাল পাঁচ

ছটার। রিকশা করে তিনি বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিছুক্ষণ পর একটি কালো অ্যামবাসাভার গাড়ি তাকে অচলরপ করে এবং নিরাপা স্থানে রিকশার গতিরোধ করে জোর করে সাংবাদিক নবকিশোর মহাপাত্রকে ঐ গাড়িতে তুলে নেয়। গাড়ির আরোহী ছিল পাঁচ জন। নবকিশোরের চোখ বেঁধে দেয়া হয়। প্রায় বটাধানে চলাই পর গাড়ি এসে দাঁড়ায় একটি বাড়ীর সামনে। মহাপাত্রকে নামিয়ে একটি ঘরে নিয়ে এসে তার চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হয়।

নবকিশোর মহাপাত্রের বিবৃতি মোতাবেক ঐ ঘরে গাড়ির পাঁচ জন আরোহী ছাড়াও তিন ব্যক্তি ছিলেন। বসটিকে কোন আইন-ভাবীর চেয়ার মনে হচ্ছিল। তাঁকে দিয়ে জোর করে জুডিসিয়াল কাগজে লাকর করা হয়। তারপর তাঁকে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করতে দেয়া হয়। মহাপাত্র বলেছেন যে, ঐ বিবৃতি পাঠ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয় এবং তা টেপ করে রাখা হয়। লিখিত বিবৃতিটি ছিল এইরূপ “নন্দ মোহাঙ্গীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। সে সব সময়ই ছিল আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। গত তেরগা অক্টোবর নন্দ আমাকে অপমান এবং মারধোরের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে এবং আমাকে যেখানে আটক রাখা হয়েছিল নন্দ সেখানে ছিল খুবই অল্প সময়।”

এরপর মহাপাত্রকে একপাছ জল পান করতে দেয়া হয় এবং কিছু পরে তার ডান হাতে ইনজেকশনের দ্বারা লাল রঙের কোন জলীয় পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তাঁকে বলা হয় যে, সে যদি এদের কথামত চলে তাহলে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার টাকা জমা করে দেয়া হবে এবং একটি ভাল চাকরীও দেয়া হবে। তাঁকে বলা হয় যে, আদালতে যেন বলা হয় যে, ছবিরাণীর যুগিরোগ ছিল এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

এরপর মহাপাত্রের চোখে বাঁধন দেয়া হয় এবং পুনরায় গাড়িতে তোলা হয়। পরে তাঁকে ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে আচার্য বিহারে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে যায়। তখন রাত সাড়ে ৮টা। পরন্তু দিন তাঁকে কিছু খেতে দেয়া হয়নি।

পরদিন সকাল পাঁচটা দশটা নাগাদ মহাপাত্র ধামার প্রাথমিক এডেল্টা (এফ আই আর) করেন।

পুলিশ ৩৬৫ এবং ৩৪২ খারার মামলা চাফ করে। বিবেক চারটে নাগাদ ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মহাপাত্রকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সাংবাদিক মহাপাত্রকে পরীক্ষা করেন ডাঃ ভরত দান। সাংবাদিকদের নিকট এবং হাসপাতালে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের নিকট ডাঃ ভরত দান বলেন যে, মহাপাত্রের হাতে ছোট ফোটানোর ক্ষত তিনি পেরেছেন এবং তিনি মহাপাত্রের শরীর পরীক্ষা করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তার শরীরে কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, যদি না অবিলম্বে মহাপাত্রের উপযুক্ত চিকিৎসা করা হয় তাহলে তার মৃত্যু লোপ পেতে পারে এবং অজ্ঞাত অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। ডাঃ দান যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন সেখানে এসে হাজির হন ভুবনেশ্বরের ডি এন পি দায়েব। ডি এন পি ডাঃ দাসকে একরকম প্রায় টেনেই নিয়ে যান সাংবাদিক এবং অজ্ঞাতদের সম্মুখ থেকে। ডাঃ দান কয়েক মিনিট পরে আশ্রয় বসে যান। কিন্তু যখন তিনি আসেন তখন সকলে চলে যান। পরের দিন সকালে উক্ত চিকিৎসক তাঁর বলা সমস্ত কথা অধীকার করেন। এছাড়া চিকিৎসা

এবং কয়েকজনিক বিষয়ক বহু গুপ্ত গোলের ব্যাপারও রয়েছে।

মামলার তদন্ত যখন চলছে তখন ওড়িশার মুখ্য সচিব এস এম পট্টনায়ক হঠাৎ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলে বসলেন যে, মহাপাত্রের বিবৃতি সন্দেহজনক। মুখ্য সচিবের এই বক্তব্য তদন্তকে প্রভাবিত করবে বলে অনেকে সন্দেহ করছেন। যদিও ওড়িশার সাংবাদিক ইউনিয়ন একটি মেডিকেল বোর্ড গঠনের দাবি জানিয়েছেন কিন্তু রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

তথ্যাত্তি মহলের ধারণা যে, ছবিরাণী হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীকে সরাবার জন্যই লক্ষ্যত মহাপাত্রকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ছবিরাণীর মৃতদেহের কোন ছবিও পুলিশ তোলেনি এবং মৃত অস্তিত্বের পোশাক পরিচ্ছদ এবং অন্তর্ধান বাজেয়াপ্ত করে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হয়নি। ছবিরাণীর মৃতদেহ মরনা তদন্তে পাঠাতে এবং মৃত ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষার পাঠাতেও বিলম্ব করা হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন কংগ্রেস (ই) দলের দ্বারা পুলিশ ছবিরাণী হত্যাকাণ্ডকে ধামাচা দিতে চাইছে এবং তা অত মিলে যেতে চাইছে।

ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী

২য় পৃষ্ঠার পর

কাছাকাছি থাকতে খুব চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাধ সেধেছেন রাজীব গান্ধী স্বয়ং। তিনি ঠেকে আগাগোড়া লক্ষ্য করে আসছেন। এখন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। পারছেন না একদা প্রিয়-ভাঙন কমল নাথ, জগদীশ টাই-টিলারও। ওরা দুজন তাঁদের সঙ্গী-লাখীদের নিয়ে বিরুদ্ধাচারণ করছেন। চাইছেন ব্রহ্মচারীর অজানা তথ্য ফাঁদ করে দিতে। আর কাছারী লবিতো তাঁকে শত্রু মনে করে। এই লবিতো, উনি কত ভয়ানক। আমেন মানেকা গান্ধীও। তিনি স্বামীর বিরোধাত্মক ঘটনার ব্যাপারে তাঁকে অনেকখানি দারী বলে মনে করেন। তাছাড়া সবচেয়ে বেশী করে বুকেছেন শ্রীমতী গান্ধী। সে, দেহজ ধীরেন্দ্র এখন তাঁর চক্ষু শূল।

এই অবস্থায় ব্রহ্মচারী প্রায়ই এখান ওখান যাচ্ছেন আসছেন। কাঠমাড়তে বিরাট প্রাঙ্গণ বাড়ি কেনার মাঝেও যাচ্ছেন। যাচ্ছেন বা হা মায়া। একসময় বিশেষ

করে গুরুতর জরুরী পরিস্থিতির দিনগুলিতে আকাশবিহারী বাবা হিসেবে নাম করে বিতর্কিত ধীরেন্দ্র আবার তাঁর চারপাশে রহস্যের সৃষ্টি করছেন। তাঁর গতিবিধি ভাল ঠেকেছে না। ভাল ঠেকেছে না হঠাৎ হঠাৎ এখান ওখান উড়ে যাওয়া। কারণ, তিনি বোম্ভোলা, কর্ণক-পুত্র লাধু নন। তিনি বিজ্ঞান, উড়ো-জাহাজে চড়া তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আর বড় বড় ঘরে যাতায়াত করা ছাড়া দেশ দেশান্তরে বড় গভীর বোগাযোগও তাঁর আছে। তিনি জানেন যারা তাঁকে অপছন্দ করছেন, বেপাতা করে দিচ্ছেন তাঁদের অনেক কেছা কাহিনী, গোপন কথা। তাই তাঁর তুণে আছে অনেক শক্তিশালী অস্ত্র। তিনি সেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন। তবে তিনি দেয়কম কিছু করলে নিজেও বড় রকম বা ধাবেন। তাঁর বিরোধীরা দেয়কম ব্যবস্থাই করছেন। একদিকে তিনি যেমন লড়াইয়ের আল বিছোছেন অতদিকে বিপক্ষরা তাঁকে শক্তিশালী করার উপযুক্ত বাহ্য সাপাচ্ছেন।

জেলে পাঠাবেন

১ম পৃষ্ঠার পর

ধান সংশোধন যেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু জনতা পার্টির আগমন বেধে বশবদ্বারাও আজ হিসেব করবেন। শ্রীমতী গান্ধী এটা ভালো করেই জানেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর দলে দুটেছে দেশের যত হলত্যাগী আর স্বাধেবাহী লোকেরা। অস্বার্থে দলের ভিতরে বা অবস্থা তাতে প্রধানমন্ত্রী ঘুরে মধ্যেও আতকে ওঠেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা আইনে বিরোধীদের সঙ্গে স্বলেনও করেকজন এম পি, এম এল একে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাবেন, অন্তরা বা বেধে ভীত হবেন। নতুবা রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সংবিধান সংসদে অম্বোদন পাবে না, বংশতন্ত্র কায়ম হবে না। আর স্বলেন এম পি, এম এল গ্রেপ্তার তো তিনি পঁচাত্তরেই করেছিলেন। চন্দ্রশেখর, মোহন দারিয়া ইত্যাদিকে মিসার গ্রেপ্তার করেছিলেন।

মন্ত্রি এই অভিযোগ করেছেন ই-কং দলের প্রাক্তন এম পি বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী কণ্টের নেতা শ্রীহেমবতীমন্ডন বরুণা। শ্রীবরুণা

সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের মতো ক্যানিষ্ট কাল কাহন বাতিলের দাবিও করেছেন।

মারুতি রাজ

১ম পৃষ্ঠার পর

টাকা দাম পাওয়া যেতে পারে। এরজন্য কতিপূর্ণ বাবদ দেওয়া হয় চার কোটি চৌত্রিশ লাখ টাকা।

কার টাকা কে পেয়েছে? পথের ধারে যে ভিথরীটা ভিকে করে থার সেও দেখল। ই কিনতে গিয়ে পরোক কর বাবদ টাকা দিয়েছে। আর পেয়েছে কে, না শ্রীমতী গান্ধী। তদ্য পুত্র, ইতালিয়ান পুত্রবধু আর শ্রীমতী গান্ধীর ছুধের নাতি রাজল পর্বত।

আগ কংগ্রেসের ছেলেরা কারখানা দখল করে ওদের দলের পতাকা পেটে ওড়ালো। ওরা বললো মারুতির হাজার একর জরি হাজারটা শিকিত বেকারের মধ্যে বিলি করা হবে। গড়ে উঠবে হাজারটা ছোট কারখানা। ওরা ঐ হাজারটা ছোট কারখানা শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিনে উপহার দিলেন।

ওদের মুখে ছিল ‘মারুতিরাজ নাহি চালেগা’, ‘কার নাহি মোটি দো’ গোপান।

কিছু ই-কংগ্রেস নেতার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ইন্দিরা গোয়েন্দা লাগিয়েছেন

দপন

স্বয়ংক্রিয় বর্ষ ১৪৩৩ সালখ্যা ১ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর, ৮০। ৬০ পরসী

রাজীব আসছেনই

কংগ্রেস-ই দলের যুব সিন্ধুগঠনে রাজীব-জোয়ার আনার যে প্রস্তুতি চলছিল এবার তার রূপ দেওয়া শুরু হয়েছে। রামচন্দ্র রথের বদলে জয়প্রসাদ সিংহকে যুব কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছে। ইনি রাজীবের স্বর্গ দেখাশোনার বড়ই আশ্বাসদায়ক এবং মুসলমান ভোট টানার জন্য নিজের মহলে প্রভাব সৃষ্টি করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এছাড়া আজাদ হুসু ও কান্দীরের যুগ্মসভা শেষ আবহাওয়ার সঙ্গে দলের হয়ে দর কষাকষিতে মধ্য ভূমিকার হয়েছেন। একই সঙ্গে শেখের দল আশানাল কর্মকারকে ই-কংগ্রেসে সঙ্গে তিড়িয়ে দিতে জোর উত্তোলন শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

দিল্লীতে কিছু আমলাকে কাজ না করিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে

সাতাত্তরে জনতা সরকার কর্ম-তার এসে কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরের বেশ কিছু যুগ্ম সচিব পর্যায়ের আমলাকে নিষ্ক্রিয় করেছিলেন। কারণ এই সব সচিবরা ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর ভক্ত। এ বছরে আবার কর্মতার এসে ই-কংগ্রেস সরকার সেই সব আমলাকে পুরানো পদে বা উচ্চ-তর পদে এনেছে এবং জনতা সরকারের স্বনামের ধারা ছিলেন তাঁদের। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বদলী করা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরে আনা হয়েছে অথবা কাজ না

দিয়ে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ত্রিশজন যুগ্ম সচিবেরও উপরতলার নিম্নায় অফিসার পদ ছ'মাসে অফিসে বসে কোন ফাইল দেখার কাজ পাচ্ছেন না। কয়েকজন আবার এখন আলাদা কোন দর ও অফিসে পান নি। যদিও তাঁদের মোটা মাইনে, ইচ্ছেমতো পাড়ি-টেলিফোন ব্যবহারের সুবিধে দেওয়া হয়েছে। প্রায় দু লাখ টাকা মাসে তাঁদের পেছনে ব্যয় করা হচ্ছে। টাকা বোপাচ্ছেন দেশের গরীব জনসাধারণ

নিজের দলের মধ্যে ক্রমশঃ বিকোত এবং বিতর্কের তাব লক্ষ্য করে ই-কংগ্রেস, সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন। বিকো-ভের গতি প্রকৃতি মজার রাখার জন্য শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা লোকজনকে বেশ কিছু ই-কংগ্রেস নেতার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে বলেছেন বলে বিশ্বাস হচ্ছে খবর পাওয়া গেছে। পুরো এক বছর এখনও পূর্ণ হয় নি শ্রীমতী গান্ধী কর্মতার এসেছেন। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে রাজ্যে রাজ্যে দলের বিকোত এমন পর্যায়ে পৌছেছে যার ধাক্কায় বিভিন্ন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের প্রশাসনও অচল হয়ে পড়ছে।

সব থেকে শোচনীয় অবস্থা উত্তর-প্রদেশে। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বরুণ অতিবেগি করেছেন যে, রাজ্যে একটা প্রশাসন প্রশাসন চলছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিদ্যুৎ। কর্মসূচি ত্রিাটিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েও উদ্ভব-প্রদেশের রাজনীতিতে খুব একটা পরিবর্তন আনা যায় নি। ত্রিাটী-জীর পুত্র এবং পুত্রবধূ এখন মরীয়া হয়ে বিশ্বনাথ প্রতাপকে গদী থেকে সরানোর জন্য চেষ্টা করছেন। বিশ্বনাথ জেজ্ঞা গেছে, ত্রিাটী-জীর পুত্র লোকপতি ত্রিাটী এবং তার পুত্রবধূ সহ বিদ্যুৎ নেতাদের গতিবিধি নজর রাখার জন্য কেন্দ্রীয় শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়



পর্যাক কর দিয়ে। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের করিডরে এই সব অফিসারদেরকে এখন বলা হয় 'অফিসারস ইন সার্চ অফ ডিউটি'। এঁদের মধ্যে অনেককেই এই প্রশাস-নিক কাঠামোর অতি দৃক অফিসার হিসেবে পরিচিত। এঁদের মধ্যে প্রাক্তন সচিবরাও টি সি এ শ্রীনিবাস বর্মন, প্রাক্তন তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিব এস কে দেগাল, সচিব দপ্তরের প্রাক্তন সহসচিব কে এন প্রসাদ, সি বি আই এর প্রাক্তন অধিকর্তা সি ভি নরসিং এবং প্রাক্তন শিল্প সচিব শ্রীকৃষ্ণবর্ত্তির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন ছাড়া সকলেই আই এ এস অথবা আই পি এস সদস্য। এছাড়া আছেন আর্মারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব শ্রীপরমেশ্বর, শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

কেন্দ্র খাদ্য নিয়ে দুমুখো রাজনীতি করছে

গত ২৪ নভেম্বর লোকসভার বিতর্কে অংশগ্রহণ করে শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বলেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের বিধে নিয়ে রাজনীতি করছে। 'কাজের জন্য খাদ্য' খাতে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ নিয়ে শাসক দল বিধে বলছে। কেন্দ্রীয় সরকার ই-কং শাসিত রাজ্য-গুলোর সঙ্গে একরকম ও বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে অপরকম ব্যবহার করছে।

প্রিন্স চার্লসের শ্রেণি অ্যাটাশের ভারতীয় নাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার

ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স চার্লসের সফরসম্পন্ন ইংলণ্ডের রাণীর সহকারী, শ্রেণি অ্যাটাশে ওয়ারউইক হ্যাচিংস ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫শে নভেম্বর। প্রিন্স চার্লস যখন দিল্লী শহর পরিদর্শন করতে যের হন তখন ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রেস ইনক্লুসশন ব্যায়ের (সি আই বি) কাছে জানতে চান যে, তাঁরা প্রিন্সের সঙ্গে যাবেন কিনা। প্রোটোকল প্রধান এম এ আনসারী ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন-যে, তাঁরা অবশ্যই যেতে পারেন। প্রিন্স চার্লস নেহরু মিউজিয়ামে গেলে ভারতীয় সাংবাদিকরা তাঁকে অহুসরণ করেন। কিন্তু উক্ত শ্রেণি অ্যাটাশে হ্যাচিংস সাহেব ভারতীয় সাংবাদিকদের পথ আগলে দাঁড়ান এবং খুবই উদ্ধতভাবে বলেন যে, তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের কোন-মতেই প্রিন্সের সঙ্গে যেতে দেবেন না। হ্যাচিংস ভারতীয় সাংবাদিক-দের বীতিমত ধমকে দিয়ে বলেন যে, সি আই বি-কে তিনি আপেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতীয় সাংবাদিকরা যেন প্রিন্সের সফরসম্পন্ন না হয়। শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

-জ্যোতির্ময় বসু

শ্রীবসু কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্বিধিত পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিজের গত ১২ নভেম্বরের লেখা একটি চিঠির অংশ পড়ে শোনান যে, '১৯৭৭-৮০ সালেও মধ্য পশ্চিমবঙ্গের জুজ ৪ লাখ ১৬ হাজার টন খাদ্য কেন্দ্র বরাদ্দ করেছিল। এর মধ্যে ৩,৭৪, ৩৫১ টন পাওয়া যায়। ৩১ মার্চ, ১৯৮০-র মধ্যে ৩,২০১২ টন বিলি করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ের শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

এ লজ্জা ভারতের নয়, ইন্দিরার

বাগপতের পর ভাগলপুর। বিশ্ব-
সভার ভারতের মুখ লজ্জার মত হয়ে
গিয়েছে। তার সম্মান ধুলোর
লুটিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বাগপতে
প্রকাশ্যে একজন নারীর ইচ্ছা পূর্তি
হয়েছিল। বিহারের ভাগলপুরে
চোখে অ্যানিড চলে ৩১ জনকে অন্ধ
করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশেই
কীর্তির মায়ক আইন ও শৃঙ্খলা
রক্ষার দায় বাহের ওপর ভরত নেই
পুলিশ। উত্তর রাজ্যেই ইন্দিরা
কংগ্রেস রাজত্ব চালাচ্ছেন। তাই
এ-লজ্জা ভারতের নয়, ভারতের
দরবার কণ্ঠী ইন্দিরা গান্ধীর।

ভাগলপুর জেলে ৩১ জন বিচার-
াধীন বন্দীকে চোখে প্রথমে খুচ
হুটিয়ে এবং পরে অ্যানিড চোখে অন্ধ
করে দেবার ঘটনা যেমন মর্মান্বজ,
তেমনি বর্বরোচিত। আজকের দৃশ্য
হুমায়ার মাহবুবের প্রতি এ-ধরনের
অমানুষিক মধ্যস্থতীর আচরণ কখনাই
করা যায় না। গত প্রায় একবছর
ধরেই যে কাণ্ড চলে আসছে এককাল
কী করে তা অজ্ঞাত থাকতে পারে,
সেটাও এক বিশ্বাসের বিষয়।
কয়েদীরা নাকি কোজদারী মারজার
আসামী। কিন্তু তাদের বিচারের
অন্ত দেশে তো রাশি রাশি কোজ-
দারী আইন রয়েছে, বিচারালয়
রয়েছে। তা লম্বাও কেম চোখ
উপড়ে কেলে বেচারাদের জীবন পক্ষ,
অর্থহীন করে দেওয়া হল? এ-বাবদে
অজুহাত দেখানো হয়েছে যে, অপ-
রাধ প্রবণতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই
নাকি আটক ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি
দেওয়া হয়েছে যাতে তারা দৃষ্টিশক্তি
সাহায্যে খুন করতে না পারে,
ভাঙাতি করতে সক্ষম না হয়।
হতভাগ্যদের জেলে রাখা হয়েছিল
তো বিচারের অপেক্ষায়, আদালতে
অপরাধ প্রমাণিত না হতেই তবে
তাদের শাস্তি কী করে বিধান হতে
পারে? দেশের বেকার সমস্যা,
অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের
কোন সুযোগ নেই, অপ-
রাধ প্রবণতা কমানোর পথ জানা

নেই, কংগ্রেস-ই সরকার তবু গরি
আকড়ে থাকবেন বর্বর সংখ্যাগরিষ্ঠ
তার জোরে। সেই বর্বর পন্থাতেই
কংগ্রেস-ই সরকার সমস্ত মামলা
মোকদ্দমার ফয়সালা করতে চান,
অথচ তারাই অ-কংগ্রেস-ই শাসিত
রাজ্যে আইনের শাসনের কথা,
আইন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে অভিযোগের
কিরিতি দেন। চতুর্থমাস ব্যক্তির চক্ষু
উৎপাটন করা একটা মানসিক
বিকার ছাড়া আর কিছু হতে পারে
না। এবং এর জন্ত দারী কেবল
ভাগলপুর জেলার পুলিশ প্রশাসন
নয়, বিহারের রাজ্য সরকারও।
সেজন্তই বিরোধী মেতারা মুখ্যমন্ত্রী
অপরাধ মিশ্রের পন্থাভাঙ্গের
দাবিতে-নগরবাসীর ভিতরে ও বাইরে
সোচ্চার হয়েছেন, রাজ্যসভা থেকে
ওরাক আউট করেছেন। কারণ
মানবিকতার বিক্ষেপে এই অপরাধ
কেবল জমা পনেরো পুলিশ অফিসার
র নয়, দার নিতে হবে গোটা
রাজ্য সরকারকে, খরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও।

কতিপুত্র ব্যক্তিদের আর্থিক
কতিপুত্র, সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি,
কেন্দ্রীয় তদন্ত, চক্ষু বিশেষজ্ঞ প্রেরণ,
তারের চিকিৎসা ইত্যাদির বিলম্বিত
ব্যবস্থা অবশ্য জনমতের চাপে পড়ে
কংগ্রেস-ই সরকারকে নিতে হয়েছে।
সংসদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
থেকে শুরু করে খরাষ্ট্র হস্তের জুই
মন্ত্রী জৈল সিং ও বোম্বের মাকোরানা
এ-বেদনাধারক ঘটনার জন্ত হুং
প্রকাশ করে দারী ব্যক্তিদের শাস্তি-
দানের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন। শ্রীমতী
গান্ধী সেই স্বপ্নে আর একবার
পুরোনো ভাঙা রেকর্ডটি বালিয়ে
নিরেছেন যে, পুলিশ বাহিনীতে
নিয়োগের ক্ষেত্রে আত্মল সংস্কার করা
হবে। কিন্তু সংস্কার-পরিবর্তন যে
তার শাসন-ধারাতেই আপে দরকার
এটা তাঁকে আমরা মনে করিয়ে
দিতে পারি কি? সমাজ বা রাষ্ট্রের
শীর্ষদেশে যদি বৈষম্যের বোঁক দেখা
যায়, তবে বাগপত-ভাগলপুরের
ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেশে ঘটতেই
থাকবে।

দিল্লীতে আমলারা

১ম পৃষ্ঠার পর
কেন্দ্রীয় খরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখ্য সচিব
জে পাণ্ডে ও এস আর শাস্তি, শিল্প
মন্ত্রকের মুখ্য সচিব আর কৃষ্ণাচারী,
শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রকের মুখ্য সচিব আই
মহাধবেন, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী প্রাক্তন
বিশেষ সচিব অশোক জাইদলে।
এরা লকলেই বেশাই বা চরণ
নিং-এর কেন্দ্রীয় টেকার মন্ত্রিসভার

সময়ের এসব মন্ত্রকের দারী অফিসার
ছিলেন। এখন এইসব অফিসাররা
লকলে বেশ কিছুক্ষণ গলক খেলে
অ্যানিডেপারাম কুতুরকে নিয়ে বেড়িয়ে
আর প্রেক আড্ডা মেরে সময় কাটাতে
বাধ্য হচ্ছেন। অসবর গ্রহণের পর-
বর্তী জীবন ওরা ভোগ করছেন
কর্মকর্ম অবস্থায় এবং পুরো মাইনে
নিরে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা
চরিতার্থ করতেই শ্রীমতী গান্ধী
এঁদের হেনস্থা করছেন।

আশাহি সিন্ধবুন কাহিনী

আপানের একটি বৃহৎ দৈনিকের
নার আশাহি সিন্ধবুন। বরদ এখন
একশো জুই। পত্রিকার দ্বিতীয়
সংবাদদাতা হুমিসি ওশিমুরা গত ১৮
মত্বেষর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী
শ্রীজ্যোতি বসুর লাক্ষ্যকারের জন্ত
কলকাতা আসেন।

এ লাক্ষ্যকারের পর তাঁর সঙ্গে
আপানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু-
ক্ষণ আলোচনা হয়। শিরোনত
দেশ আপানে আশাহি সিন্ধবুনের
প্রচার সংখ্যা দৈনিক আশি লক্ষ।
একই সঙ্গে চারটি কেন্দ্রে থেকে প্রকা-
শিত হয়। একটা কর্পোরেট বিভিন্ন
মালিকানাধীন। কোন শিল্প পুতি
পরিবার এর পরিচালক সমিতিতে
নেই। এছাড়া আপানী ভাষার

গোয়েন্দা লাগিয়েছেন

১ম পৃষ্ঠার পর
গোয়েন্দা লংঘার লোকজনদের
নির্দেশ দিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আবহুল
রহমান আত্মলে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে
বার বার অভিযোগ করছেন রাজ্যে
প্রশাসন হুঁতাবে চালানোর জন্ত
তিনি বিক্ষুব্ধের কাছ থেকে বাধা
পাচ্ছেন। জানা গেছে, নাসিকের
কৃষক আন্দোলনের পেছনে কিছু
ইংকংগ্রেস নেতার হাত আছে বলে
মুখ্যমন্ত্রী আত্মলে অভিযোগ
করেছেন।

শ্রীমতীকে নাকি এমন অভি-
যোগও করেছেন যে, শালিনী
পাতিলের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধরা এ আই
নি সি-র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক
বলসুদাধা পাতিলের কাছ থেকে
সহত পাচ্ছেন।

বিহার, ওড়িশা, রাজস্থানেও
ঘরের অবস্থা সক্রীম। এইসব রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রীরা প্রশাসনিক কাজের থেকে
বিক্ষুব্ধ নেতাদের রাজনৈতিক আক্র-
মণ ঠেকাতেই বেশী ব্যস্ত।

ই-কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে
কি অব্যমূল্য, কি আইন শৃঙ্খলা
কোনটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই।
পন্থামূল্যের আকাশ হোঁরা হয়
রাজ্যের জনগণকে ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ করে
তুলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা-
লম্বা ভীত দরজা। লব মিলিয়ে
গোটা অবস্থাটাই শ্রীমতী গান্ধীর নিয়-
ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে যেখানে তিনি
খুব উদ্বিগ্ন।

তাই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী নেতাদের
কার্যকলাপ এবং বিরোধী দলগুলোর
সঙ্গে বিক্ষুব্ধ নেতাদের যোগস্বত্ব
কতটা গভীরে এইসব দলিত্ত জ্ঞানার
জন্ত কেন্দ্রীয় লংঘার এক বিরাট অংশ
এই কাজে নিয়োজিত।

আরো কয়েকটা বৃহৎ দৈনিক পত্রিকা
আছে। ইংরেজিতেও 'আ শাহি
ইভনিং নিউজ' প্রকাশিত হয়।

আশাহি সিন্ধবুন মূলতঃ সরকার
বিরোধী। কমতানীন রাজনৈতিক
দলের প্রান্ত নীতির বিরোধিতাই-এর
রাজনৈতিক লাইন। এক প্রের
অবাবে ওশিমুরা বলেন আপানে
পত্রিকাগুলোর সাধারণতঃ শতকরা
৫৫ ভাগ লংঘার ও ৪৫ ভাগ বিজ্ঞাপন
থাকে। বিজ্ঞাপন মূলতঃ আইভেট
সেইটাই হয়।

আপানের রেডিও-টেলিভিশন,
অনামরিক বিমান চলাচল, প্রতিরক্ষা
উৎপাদন, জাহাজ তৈরী কারখানা,
ইল্যাত কারখানা সবই ব্যক্তিমালি-
কানাধীন। রেলওয়ে, ডাক-তার,
সিগারেট শিল্প সরকারী মালিকানা
ধীন। আমাদের দেশে যখন জন-
সংখ্যার প্রায় ৭৫% কৃষিতে নিযুক্ত
ওদেশে তখন মাত্র ২৫% কৃষিকাজ
করেন। আপানে ক্ষুধারিতের কৃষিকা
শ্রমতপূর্ণ। বড় বড় কারখানাগুলি
ছোট ছোট কারখানা থেকে উৎ-

প্রিন্স চার্লস

১ম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু প্রেস ইমকরমেশন ব্যুরোর
তরফ থেকে এজাতীয় বক্তব্যের কোন
সমর্থন মেলেনি। হাচিংস সাহেবের
দাবি : ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রিন্সের
লক্ষ্যে লক্ষী হতে তো পারবেনই না,
এমন কি প্রিন্স যে বাড়িতে থাকবেন
তার জিনিসমানাতে পর্বন্ত ভারতীয়
সাংবাদিকরা আসতে পারবেন না।
জুমা মসজিদেও এই হাচিংস
নামক বীরপুত্রটি প্রেস ফটোগ্রাফার-
দের অপমান করেছেন এবং কোন
ছবি তুলতে না দিয়ে তাঁদের বের
করে দিয়েছেন।

প্রিন্স চার্লসের কাছে কোন
ভারতীয় সাংবাদিককে ভিত্তে
দেওয়া হচ্ছে না সম্ভবত এই কারণে
যে, ব্রিটেনে ভারতীয়দের মানা-
প্রকার হয়রানি সম্পর্কে যদি ভারতীয়
সাংবাদিকরা প্রিন্সকে জিজ্ঞাসাবাদ
করেন তাহলে তিনি বিরত হবেন।

ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতি
এই অপমানের বিষয়ে ভারত সরকার
কি কোন ব্যবস্থা নেবেন? প্রিন্স
চার্লস এসেছেন- ভারত সরকারের
অতিথি হয়ে। তাঁর সম্পূর্ণ নিরা-
পত্তার দায়িত্ব ভারত সরকারের।
লংগিষ্ট বিষয়টি যদি নিরাপত্তাভিত্তি
হত তাহলে হয়ত মেনে নেয়া যেত।
কোন ভারতীয় সাংবাদিক রাষ্ট্রীয়
অতিথির ভ্রমণসঙ্গী হতে পারবেন কি
পারবেন না তা মিথারপের দায়িত্ব
ভারত সরকারের। হ্যাচিংস
সাহেবের নয়।

পাছনের অংশবিশেষ করিয়ে দেয়া
এবং ভারতের মতো ক্ষুদ্র কারখানা
গুলো দেখানো পাওনা টাকা আদায়
য়ের জন্ত ছ / আট মাস ভোগে না।

যদিও বর্তমানে আপানে মুদ্রা
স্ফীতির হার বছরে ১৫% তথাপি
সেখানে বাসপন্থী আন্দোলন দুর্বল
মাকে মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন
লনে চাকাভাব দেখা যায়। কলেজে
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন আছে
এবং কিছুক্ষেত্রে বাসপন্থীদের প্রত্যা-
লক্ষণীয়।

চিত্র প্রদর্শনী

বিড়লা এ্যাকাডেমীর প্রকাশ
কক্ষে একই সঙ্গে দু'জন প্রতিভাশালী
শিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী গত ২৫
মত্বেষর লক্ষ্যায় শুরু হয়েছে। এ
অংশে কলকাতার অগ্রসারী আধুনিক
শিল্পী রবীন মণ্ডল তাঁর 'রাজা'কে
কিছুটা বা নতুন সাজে উপস্থাপন
করেছেন। কিছুদিন পূর্বে প্রদর্শিত
'রাজা' চিত্রাবলীর মধ্যে সাম্প্রতিক
যুগযুগান্তকে যে নিপুণ স্বল্প রেখা
উপস্থাপিত করেছিলেন এবারে
রাজারানী ও মহিলাদের মধ্যে যুগ
রেখার ও গভীর রঙে নিবদ্ধ পো-
বাধ্যর স্বল্প অল্পপঙ্খিত থাকলে
মাহবুবের নিরুপায় একাকীত্বের
বর্তমান সামাজিক পরিবেশের অ-
হনমের হতাশাস মিষ্ট নিরুপায়
জিহ্বাজিক ভাঙবের প্রতিভাসে সম-
প্রভাবিত করে, শান্তি কেড়ে মের
আধুনিক লোকশিল্পের অগ্রসারী ইচ্ছা
কৃত রূপ বুনোটির আশ্চর্য শৈলী
অনিবারিত উজ্জল রঙের বি-
লম্বিগণ ছবিগুলিকে বিশেষ তাৎপ-
পূর্ণ করে তুলেছে আর রবীন মণ্ডল
আরো আত্মপ্রকাশিত অথচ অতিজা-
দূরত্বের অনন্তই অল্পপঙ্খিত শিল্পী
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পাশাপাশি বোম্বাই প্রবাসী বট-
মর্শশালী ছিল চক্রবর্তীর বিমূর্ত ছবি
পশরাটি কিছুটা নিপুণত লাগলে
শিল্পীর পেশাদারী নিপুণত
রঙ ও রেখার স্বল্প সন্নিবে-
ময়নানন্দকর, তাতে লম্বা নেই
বড় কালের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী
মানসিক অবসাদ কাটাবার জন্ত মা-
মাকে বিমূর্ত ছবি জন্মসাত করে
কিন্তু গত দশবছরে কোনো শিল্পী
তুধু ধরনের ছবির একক প্রদর্শন
করেন নি। বোধহয় অতি আধুনিক
শিল্পীরা এই অধ্যায়টি পার হয়ে এ-
ছেন। শ্রীচক্রবর্তী বোধহয় ক-
কাতার নবাপত। তাঁকে অবশ-
আমরা সাহস অভ্যর্থনা জানাবে
তবে এখনকার মাহবুবকে কত
আকর্ষণ করতে পারবেন তা বল-
পারবো না।
এঁদের এই যুগ প্রদর্শনীটি ডি-
বরের প্রথম দশাহ পর্যন্ত চলবে।

ব্রিটিশ অর্থনীতির আসল রোগ

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

গত দশাধে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকার ব্যাঙ্ক রেট ১৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৪ শতাংশ করেছেন। উদ্দেশ্য মজুদ স্তরী উৎসাহ পেয়ে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন বাড়বে। এদিকে কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিয় বা সি বি আই কর্তারা বলছেন যে স্বল্প কমানোর পরিমাণ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তারা আশঙ্কা করছেন যে বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়েছে স্বল্পের হার হ্রাস করেই এর লক্ষ্যণীয় প্রতিকার সম্ভব নয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার গোড়া রক্ষণশীল। তাঁর স্বামী আন্তর্জাতিক তৈলবাজারে প্রভাবশালী ব্যক্তি। গোড়া রক্ষণশীলদের ধারণা যে বাজারে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা সম্ভব এবং মুদ্রাস্ফীতির হার মাথিয়ে আনা হলে উৎপাদন খরচ কমবে, জিমিসপত্র দ্রুত হবে, চাহিদা বাড়বে এবং শেষ পর্যন্ত কর্মদক্ষতাও বেড়ে যাবে। কেইমনীর অর্থনৈতিক ভাবের বিপরীতে এই মনিটারিং তত্ত্ব এখন অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত বড় বড় পুঁজিবাদী ধনী দেশে রক্ষণশীল মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

কিন্তু মনিটারিং মতবাদের অর্থী টাকাকড়ির যোগান সংকোচ করে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর মতবাদের পরিণামে মুদ্রাস্ফীতি দ্বিগুণ করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ হতে পারে না। টাকাকড়ির যোগান হ্রাসের উদ্দেশ্যে মনিটারিং তাত্ত্বিকেরা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেন, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খরচ হ্রাস করে দেশের মোট টাকাকড়ির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে চান। ব্রিটিশ সরকার ইতিপূর্বে প্রথম বাজারে শিকার, চিকিৎসা, বেকারী ভাতা ইত্যাদি বাবদ খরচ কমিয়ে দেন প্রায় ছশো কোটি পাউণ্ড। ব্যাঙ্কের প্রাথমিক স্বল্পের হার বাড়িয়ে ১৬ শতাংশ করে দেন। কলে সেখানে বেকারের সংখ্যা ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়ের মত ছিল তার চাইতেও বেশী বেড়েছে। এখন বুটেনে প্রায় ২২ লক্ষ কর্মপ্রার্থী বেকার অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রতি ১ জনের মধ্যে ১ জন বেকার। সরকারী অর্থায়ন বন্ধ হবার কলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখার খরচ বেড়েছে। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ছাত্র বেতন খুবই কম ছিল, কোথাও বা একেবারেই ছিল না। এখন প্রত্যেক অভিভাবককে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার

অন্তে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফ্রিকার প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রী-দের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হার অনেক বেশী। অনেকেরই লেখাপড়া মাঝ পথে বন্ধ হয়ে বাবার হাথিল।

চাকুরী বাকুরীর ক্ষেত্রেও একই দশা। আগে বুটেনে বহু ভারতীয়, পাকিস্তানী বা অন্যান্য দেশের লোক চাকুরী পেত। কারণ ইংল্যান্ডের চাইতে এদের মাইনে কম ছিল ও চলে। অবশ্য স্বদেশের তুলনায় তবুও এরা অনেক বেশী বেতন মজুরী পেতেন। এখন খাস ইংল্যান্ড ছেলে-মেয়েরাই বেকার হয়ে পড়ছে। সুতরাং যব উঠেছে কাল। নিগারদের তাড়াতে হবে। বুটেনের ক্যান্সিস পাটি নেশনেনলিষ্ট ব্রুট কুফার মাহু-দের তৈরি। ব্রিটিশ পুলিশও কখনে কখনো তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।



রক্ষণশীল সরকার অধিবাসন আইন সংশোধন করে ব্যবস্থা করেছেন যাতে অশেতাল লোকেরা দলজে বুটেনে আসতে বা এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে না পারে। ব্রিটিশ আইনে যে কোন ব্রিটিশ নাগরিকের স্বামীরা স্ত্রী ও ব্রিটিশ নাগরিক। সুতরাং আইনের ফাঁকে বহু ব্রিটিশ মহিলা অশেতালকে অস্থায়ী ভাবে পাইকারী হারে বিয়ে করছে। এরফলে স্বামীর মতো বোটা-কী দিতে হচ্ছে। ব্রিটিশ সমাজে এর ফল ভালো হতে পারে না। সুতরাং কড়াকড়ি করেই আইনের ফাঁক বন্ধ করা যাচ্ছে না। অতএব পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার বা অশেতাল মহিলাদের উলঙ্গ করে কুয়ারীতে পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীরা করেছেন। বলতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই এমন এক বিস্ময়কর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যার ফলে বিভিন্ন অ-ইউরোপীয় এবং অশেতাল দেশের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত বাদ প্রতিবাদ ও মনোমালিন্য শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটের তত্তাব্ধ বিস্তার এভাবেই একটা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বিস্ময় করে।

ব্রিটিশ মনিটারিং তাত্ত্বিকেরা এখন পিছু হটেতে শুরু করেছেন। ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রে যে স্বল্প দিতে হয় তার হার এখন কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রচেষ্টা

এই সব নেতারা

দেবশিস ভট্টাচার্য

কলেজের ছাত্ররা যাতে দেশের প্রকৃত হাল না জানতে পারে, সেজন্য একপ্রকার রাজনৈতিক নেতা বলে থাকেন যে, "ছাত্রদের তপস্বাই হবে শুধু পড়াশুনো করা। আর কোন ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাবে না।" শিক্ষিত বেকারের তত্তাব্ধ সংখ্যা কমানোর জন্য সরকার কলেজে আসন সংখ্যা কমাতে অথবা পরীক্ষার পণ্ডের হার ইচ্ছাকৃতভাবে কমাতেও ছাত্র অসন্তোষের মুখে ওরা বলে থাকেন "শিকটি মট, আবার পড়ো।" এ কথা শুধু এদেশে নয়, যাদাতার আমল থেকে সর্বদেশে টেপেরকর্ডের মতো বাজিয়ে শোনাচ্ছেন দেশ নেতারা। আসলে ছাত্ররা দেশের অবস্থা বুঝলেই যে এই ধরনের নেতাদের বিপর্য হবে।

ছাত্রাবস্থা শেষ হলে বলা হয়, রাজনীতি করোনা। কারণ "রাজনীতি হলো বহুলোকেদের জীবনের শেষ আশ্রয়স্থল।" সবচেয়ে বহুলোকটি একথা বলছে, কারণ লং আদর্শবাদী যুবকেরা বেশি করে রাজনীতিতে মাথা গুলালে ওদের বাড়ি-পাড়ি-চর্ব-চোষা লেজ-পের জুটবে না। ই্যা, আর একটা পদ্ধতি আছে। লম্বাক ব্যবস্থার লংকট তীব্র হলে, বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে, অব্যবস্থা বৃদ্ধি হচ্ছে—এ অবস্থায় সরকার থেকেই মতত দিয়ে একজন মধ্যস্থিত যুবককে বড় বড় চটককারি কথা দিয়ে, চাকরীর লোভ দেখিয়ে অথবা পুলিশী জুজু দেখিয়ে লজ্জাবদ্ধ করা হয়। কোম আদর্শের বালাই নেই, ইট, ড্রিক, বিয়েরী ধরনের মা কালী থেকে লগজাজী, মার কাতিক পুজোর মানে টাকা ভালো, বেলেলাপানো করে আর পলার করেকটা করে পুলিশ কেসের কীস খোলাও। এই নৈদিক ওড়িশার বিরুদ্ধে লাংবাহিক নব-কিশোর মহাপাণ্ডের গ্রী ছবিরাণীকে ধর্ষণ করে খুন করলো কারা? উত্তর, ব্রক ই-কংগ্রেসের নেতারা। আচ্ছা, আজ পশ্চিমবঙ্গে স্বরূপ মুখার্জী আর সোমেন মিত্র গোড়ীঘরের ছেলেদের নামে কটা করে পুলিশ কেস আছে একটু খোঁজ নেবেন। পুলিশ কেস না থাকলে তো বেশিদিন আটকে রাখা যাবে না। তাই আর কি? অবশি আজ নাকি যুবকদের এই ছুঁশার কারণ 'যুবস্বর্ধ'-র অসময়ে অস্তাগমন। দ্বিতীয় শাতিবনে তাঁর দলভাঙ্গা বেদী বিরে বনে আছেন কতিপয় চেলা, দারাদিনে ধর্মমার্গীরা বেদীতে পরমা ছুঁছেন। ওরা তা দিয়ে পাইট কিনছেন আর বলছেন,

"যব তব স্বরূপ-চাঁদ রহেগা—সবর তেরে নাম অমর রহেগা।"

আর এই লজ্জকে নিয়ে ভারতের দল সন্তোষারিত বাইশতম রাজ্যের রাজনীতিতে যা হচ্ছে তা জানলে আপনায় শিরায়-উপশিরায় খেলবে বিদ্যুৎ।

সিকিমের রাজনৈতিক নেতাদের ধান্ডাই অস্বতপূর্ব। লজ্জী অবস্থার সময় মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেনজুপ দরজী পহ রাজ্য শালক হল হার গেল কংগ্রেস। আবার জনতা আনানার পুরো হলটাই, বা বলা ভালো, হলের অফিসটার দাইনবোর্ড পান্টে হল সিকিম জনতা হল। ওদের ব্যাখ্যা হল, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উন্নয়নে ওরা দ্বিতীয় সঙ্গে সংঘাত চান না। আর এটাও তো ঠিক যে, দ্বিতীয় সাউথ ব্রকে মোরারজী বা ইন্দিরা, বেই বহুদন না কেন, রাজ্যে তিন্ন হলের সরকার হল ওরা অপছন্দ করেন, রাজ্যের উন্নয়নে পাওনা বরাদ্দও ছাটাই করেন।

সিকিমে হু বছর আগে ভোট হল। সিকিম জনতা পরিষদ কমতানীন হল। নর বা হা ছু স্ব ভাগ্যী মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এবছরের লোকসভা নির্বাচনের পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কাজি লেনজুপ দরজী ব্যাপার-ভাপার বুকে দ্বিতীয় গিরে ম্যামেন করে ই কং হয়ে গেলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও কমতার থাকার জন্য ম্যাডামের শুভবুদ্ধি থাকতে চাইলেন।

গত তেইশে জুন এই 'যুবস্বর্ধ' মারা

নদীয়া জেলায় ই-কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মারপিট

নদীয়া জেলায় ই-কংগ্রেস নেতা এবং কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড উপহাসীয় কোন্দল শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব এবং বধরা নিয়ে ওদের মধ্যে খেরোখেরি হাতাহাতি এবং মারপিট হচ্ছে। লব সংবাদ পুলিশের কাছে যাচ্ছে না। রানাঘাট নবাবীপ, হালখালি ও কুমুগরের আশে পাশে এখন কাণ্ড হচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ পেরেছি তাতে জানা গেছে গত অক্টোবর মাস থেকেই এই কগড়া এবং বিবাহ জেলাতে তুলে উঠেছে। শুরু হয়েছে জেলা ই-কংগ্রেস সম্পাদক এবং প্রাক্তন এম এল এ নরেশ চাকীর বাড়ী আক্রমণ করে। পুলিশ এক মামলা রুজু করে এ ব্যাপারে প্রদত্ত রিপোর্টে বলেছে যে, গত ২৭

বেতেই ভাগ্যী দ্বিতীয় ছুটলেন সময় জন্ম নিয়ে আনার জন্ম। গ্যাংটকে বিমান থেকে ঐ ছাই ছড়ানো হবে। তিনি খাওয়ারে না পারলেও নেতারা ছাই তো দিতে পারেন। ধরলিও ছুটলেন। ছাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। শেষ পর্যন্ত বাহরের পিঠে ভাগের মতো ঝটক বৌদ পুরোহিত ঐ ছাই ম্যামেন করলেন। বোধহয় এবার মন্দিরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য ভালোই জুটবে।

এখন ভাগ্যী ও ধরজী উভয়েই ই-কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক সেজেছেন। ধরজী সিকিম থেকে নির্বাচিত একজন রাজ্যসভার সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী গাড়ীর কাছে ধরবার করলেন যে, তিনিই খাটি ই-কং এবং নরবাহার ভাগ্যী গত বছরেও রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন বা তিনি পছন্দ করেন না।

নরবাহার ভাগ্যীও কম খান না। তিনি শ্রীমতীর মহাপাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সিকিম জনতা পরিষদকে ই-কংগ্রেসে ঢুকিয়ে নেবার অনুরোধ করেছেন এবং কথা দিয়েছেন আশ্রয় এ আই সি সি (ই) সম্মেলনে বিরাট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে তিনি উপস্থিত থাকবেন। এরাও তো খবর রাখেন যে, রাজ্য হল পরিচালনার জন্য হাইকম্যাও মাদে মোটা টাকা দেয়। পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ ই-কং সভাপতি অজিত পাণ্ডার হাতে মাদে পকাশ হাজার টাকা আসে। এছাড়া তো রাজ্য করে ব্যবসায়ী ও অন্ত লবি থেকে পুণি আছেই। এই সব নেতাদের দাবি ক্ষমতা আর টাকা, দেশ চুলোর বাক পে, এই ওদের মনোভাব।

অক্টোবর বেলা ২টা ৩ মিনিটে জেলার অন্ততম ই-কংগ্রেস নেতা আমনমোহন বিশ্বাসের গ্রুপের শুভেন্দু চ্যাটার্জী এবং ৮ জন লম্বা কংগ্রেস তত্ত্ব রানাঘাটের মরেশ চাকীর বাড়ীর সামনে প্রচণ্ড বোমারাজী করে। তাছাড়া, ওরা নরেশ-বাবুর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে। নরেশ-বাবু ঐ সময়ে বাড়ী ছিলেন না। বাড়ী থাকলে তখন তাঁর দশা কি হতো তা বলা মুশকিল। কারণ ই-কংগ্রেসের দলজ কর্মীরা পুরো মস্ত অবস্থায় ছিল। রানাঘাট থানা পুলিশ এ ব্যাপারে ২৭ অক্টোবরের ৬০নং রেকর্ডে একটি মামলা রুজু করেছে।

দি গভর্নমেন্ট ড্যাট ওয়ার্কস

শ্রীপতি নন্দী

পাণের তেওঁ একমাত্র পানীরাই সৃষ্টি করতে পারে, নিজেদের রেকর্ড আবার নিজেরাই ভাঙতে সক্ষম। অতএব, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অহুষ্ঠিত কুর্কিগুলির রেকর্ড বাবে বাবে ভেঙে দিয়ে নিজের রেকর্ড মালা সৃষ্টি করতে পেরেছিল 'মহান নেজী'র প্রতিষ্ঠিত দলটি। শুধু তাই কেন মহান নেজী তার নিজের অতুলনীর রেকর্ড সমূহকে ততোধিক বাড়াছুরী সহকারে নতুন করে দিয়ে প্রজা-কুলকে বাবে বাবে তাক লাগিয়ে দিতেও পারেন। একদা বিনি কালো টাকাকে সাধা করার অকল্প-মীর যুবহা প্রবর্তন করে গোটা বিশ্বকে ট্যাগ করে দেন, কীর্তিমান পুঞ্জের কীর্তিমালাকে অক্ষয় করে রাখতে তিনি যে রাজস্বাণ্ডারের লবন দরজা খুলে দিতে পারেন তা প্রত্যক্ষ করে দরিদ্র দেশবাসী মোটেই বিশ্বিত হরনি, বরং তার কাছে এমনটাই শুধু প্রত্যাশা করেছিল। শ্রীমতী গান্ধী ধানিকটা শিক্ষা পেরেছেন এমনটি কেউ ভেবে থাকলে তিনিও এখন মূর্খ-দের জ্ঞান সংরক্ষিত স্বর্গকে আর নিরাপদ বাসস্থান রূপে গণ্য করেন না; বিশেষতঃ রাজস্বগুটি হাতে পেয়েই নিজেদের ও নিজ বাছাধনের কেচ্ছা-কলঙ্কে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে তিনি স্বপ্ন সংবি-ধানের ফাঁকিঝুকিগুলোকে নির্বিঘার কাজে লাগালেন, অসংখ্য আদালতী প্রক্রিয়াকে মাঝপথে বানচাল করে দিয়ে রাজ্য শুরু করলেন, তখন থেকেই নতুন নতুন মারকীর দুর্গের নির্মাণকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, দরিদ্র দেশবাসীর 'জমি-বাধা রক্ত' এ রাজকোষটি রাজস্ব ও রাজবংশের সেবার বধ্যস্থানে জিয়া হয়ে আছে।

আকাশভেদী কীর্তিগুণটি ক্রমে মহাকাশভেদী হয়ে উঠেছে। বনামে ইমার্জেন্সী, বনামে ইমার্জেন্সী বিপত বিশ বছরে মিত্যকার ব্যাপার। সরকারী মূল্যবৃদ্ধি, বেসরকারী মূল্যবৃদ্ধি তো আরো ধান-ধানি আরো ঐতিহ্যবাহী ব্যাপার। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধরন-ধারন-গুলি স্বভাবতই এখন তুচ্ছ; অবিস্মর-নীয় 'বিশেষ ইমার্জেন্সী' কালেও অধ্যাত্ম লাগিয়ে লাগিয়ে একেবারে মগডালে ঠাই নিয়েছিল, কিছু কিছু জিনিষপত্রের দাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যাবার পর তার কাছাকাছি অবস্থায় বেঁধে ধরা হয়েছিল। তবু ভারতীয় রেকর্ড। মূল্যফীতির রেকর্ড। বিড়লা-টাটা-নিংহানিয়ারের

উদ্বাস্থ্যফীতির রেকর্ড; চাষীকুলের কৃষিগচ্ছা ভিটেগচ্ছার রেকর্ড। 'দি গভর্নমেন্ট ড্যাট ওয়ার্কস'-এর রেকর্ড। বছরে বছরে চাপিয়ে-দেওয়া নতুন নতুন করগুলি ছাড়া যে সরকারী বাজেটগুলি অস্ত্র কিছুই প্রসব করে না তার পরিসংখ্যানগুলি অচিরেই স্বতের অস্ত্র হয়ে দেখা দেয়—সঙ্কচিত প্রত্যক্ষ কর ও সম্প্রসারিত পরোক্ষ করের তৈলার। বাজেটের বাটতি অনেক বেড়ে যায়; তাহলে চাই আরো পরোক্ষ কর, আরো বৈদেশিক ঋণ। এভাবেই বছরে বছরে বাজেট চলে, চলে মূল্যবৃদ্ধির বাৎসরিক উদ্বোধন।

মূল্যবৃদ্ধির বেসরকারী বিধাতাপন এ সমস্ত সরকারী ইজিত বোঝেন, 'গো-এহেড' বোঝেন, বাজেট কিচকেল (Fiscal) বুদ্ধির সমার্থ জানেন অতএব সরকারী 'গো-এহেড' সঙ্কট পাবার আগেই দেশবাসীর ট্যাক শুদ্ধ টান মারেন। বাজেট অষ্টটি তো তারাই করে দেবেন (শোনা যায়, 'ফিজি'-র প্রভুদের সহায়তার শ্রীযাম সঙ্কট এবারকার বাজেট রচনা করে দেন)। এ বেসরকারী মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা মালিক তারাই তো 'মহান নেজী'-রও মালিক, তারাই তো দেশী পুঁজি আর জমির মালিক, বিদেশী বর অস্ত্র আর জাহাজের মালিক, আমদানী আর রপ্তানীর বিধায়ক, ডলার-রুপ-টালিং তক্ ইউরোডলার পেট্রোডলারের সঙ্গে 'রুপেরা'-কা মূল্যমান নির্ধারণের মালিক—অতএব, 'গভর্নমেন্ট ড্যাট-ওয়ার্কস'-এরও মালিক।

আর দেশের হওদাতা মা হলেও তারাই সুগের কর্তা তো বটেন, কিছু কিছু মুণ্ড কিনে রাখেন, বাছবাকী মুণ্ডগুলিকে 'খেদা' করে পোষ মানিয়ে রাখতে। পোষ মা মানলে হওপানি দিল্লী ব্যবস্থা নেন, 'পরিজ্ঞাপার ছুড়তাং বিনাশার চাধুনাং' বনামে বনামে 'বিনা' রয়েছে কি করতে? অবশ্যই অসাধু ব্যবসারীকুলের প্রতিবন্ধক জন-সাধারণকে 'কড়কে' দিতে।

মহান নেজীর জমানায় ছেদ পড়ার পর বছর দু'তিন মূল্যফীতিতে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল সন্দেহ নেই। অতএব, 'কাজের সরকার' চালু হতেই কাজ শুরু হয়ে গেল পুরোদমে—আবার মূল্যফীতির মহোৎসব—চিরকালের রেকর্ড তল করে, এমন কি '১৯-১৯৬-এর রেকর্ডকেও তলিয়ে দিয়ে শ্রীমতী দেশকে জুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু কোন্ পথে? 'গভর্নমেন্ট ড্যাট-ওয়ার্কস' কর হোয়াট?

—এর অহুচ্চারিত উত্তরাংশ তাহলে 'ইতি গজ', হাতিকুলের খোঁরাক খোঁগাতে।

দেশের লোকগুলি প্রদেশে ছড়িয়ে থাকে, রাজধানী দিল্লীতে নয়। কিন্তু দিল্লী বতই কাছে হোক দিল্লী চিরদিনই এদের থেকে দূরে, এমন কি পাঞ্জাব থেকেও লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে। অতএব, দিল্লী থেকে বঙ্গচালিত জাল ছড়িয়ে দিয়ে দেশের লব্ব লুটে মেয়ার কাজটা যেমন সহজ, বেসরকারী দেশীবিদেশী লুট-পাটের সংস্থান করে দেয়াটাও তেমনটি নিরাপদ। ভাবনা আর কাজের মধ্যে বার ফারাক নেই সে নিজেকে ফাঁকি দেয় না, 'গভর্নমেন্ট ড্যাট ওয়ার্কস'টি সেদুপ পদার্থ। সাধারণ মানুষকে ঠেড়ানোর কাজে চাইতে না চাইতে দুি আর পি, বি এস এক, সি আই এস এক দৌর-পোড়ার হাজির থাকে, কিন্তু আন্ত-র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে বিনামূল্যে বছরে বছরে ধৈ বিপুল পরিমাণ অর্থ দিল্লী পেয়ে থাকে, তার কোন ক্ষত্রাংশটুকুও প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে দেশবাসীর কাজে লাগে না (পেলেও তা চড়া হুদে); 'কাজের সরকার'র কার্যাবলীর সঙ্গে এর সমার্থটি অচ্ছেদ্য। বৈদেশিক ঋণ, অহুদান, ঋণ ছাড়; বিনামূল্যে ঋণ ও ধরোয়া করনীতি (প্রত্যক্ষ করের ইটকটি, পরোক্ষ করের বিকোরণ) ও অরাজক মুনাকামুগয়ার দেশে মূল্যবৃদ্ধি-মূল্যফীতি কোন নৈসর্গিক ব্যাপার নয়—'গভর্নমেন্ট ড্যাট ওয়ার্কস'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বৈকি।

অতএব, 'কাজের সরকার'র অধীনস্থ প্রত্যক্ষ সরকারগুলি (আজুরে নাম 'রাজ্য সরকার') সংসদীয় বিশ্ব-কর্মীর প্রদানে টুটো জগদাধ—জন-সাধারণের আক্রোশ আর অভি-যোগের প্রত্যক্ষ দায়ভার নিয়ে, কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের তিলমাত্র অধিকার না পেয়ে, কলতঃ দেশী বিদেশী শোষণের আঞ্চলিক প্রতি-রক্ষক রূপে দিল্লীর পাণের ভাগীদার হয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলি এক করুণ অস্তিত্বে সমাদীন; ভোট পরি-সংখ্যানের তেজীবাঞ্জীতে 'জন প্রতি-মিথি' হয়ে প্রতিনিধিষ্ করতে অক্ষম। তবে মেকী গণতন্ত্রের মেকী প্রতিনিধিষ্ বাছের কোন খেদ নেই, বরং মনের সুখে পুলিশী প্রশাসনটি চালিয়ে যেতে পারলেই বাবা সুখী, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু বাবা কিছু কিছু সমাজসেবা মূলক কাজকর্ম-টুকু করতে আগ্রহী—মেঘন বস্তা ও

ধরায় জাপ ব্যবস্থা, পুত্র সংস্কার, নলকূপ স্থাপন, অন্ন বিস্তার ভূমি বটন, এটা ওটা শিল্পায়নের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান, মজুরী বৃদ্ধি, কাজের বহলে খাদ্য, বার্ষিক ভাতা ইত্যাদি—তাদের অবস্থা বৃষ্টিপ জমানায় প্রাদেশিক সরকারের চাইতেও করুণ; এ জনপ্রতিনিধিরা বিল পাশ করতে পারে, কিন্তু আইন করতে পারে না, বড়জোর 'রিকো-মেন্ড' করতে পারে, তার বেশী নয়; কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজস্বতির করবৃদ্ধি ও মূল্যবৃদ্ধির করবানের ঠেলা তাকেই লমলাতে হয়; তেমন জনপ্রতিনিধি-দের তেমন বাছার কে কবে কোথায় যেতেছে? বস্ততঃ, অপরের কাঁধে-চড়া মো বন্দুকের ঘোরে জনসাধারণের দানাপানি কেড়ে নিয়ে অতি ক্ষীণ পুঁজি-উদ্বায়ের ভোজ্যি দেবার হিংস্র ধরণ ধারণগুলি যেমন 'ফুলপ্রক' তেমন বিভ্রান্তিকর। কলতঃ আধাশাসনবাদী ব্যবস্থার আগ্রাসে সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বতই তলিয়ে যাচ্ছে, সম্প্রদায়গত ও জাতপাতের নরকে 'জনপ্রিয়তা' কুড়োতে 'মহান নেজী'র দলদল জাতিভোদী 'জাতীয়তাবাদী' দলগুলি ততই নারকী গুসজারে মস্ত হয়ে ঘুরছে; 'ভাষাভাষা ইন্টিগ্রা-শন' তাহলে কোন পথে আসবে? অপরদিকে, আধা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপনার সহযোগীরূপে অপ-সংস্কৃতি আপন রসদ সংগ্রহ করে চলেছে, জনসাধারণের এক বহুহাংশের

রাজনৈতিক মানসিকতার প্রাদেশিক-বুঁকি দানা বাঁধছে। স্বভাবতই মরা পুঁজিবাদের অপদর্শনের আশ্র-ও প্রদ্রয়ে আধা-দামস্তান্ত্রিক-দল ঔপনিবেশিক বৈরাচারী ব্যবস্থার তুচ্ছ শীর্ষে ফ্যানসিবাধ প্রতিনিয়ত তার দানাপানি সংগ্রহে ব্যস্ত—বুড়ি বুড়ি মানলা প্রত্যাচার, কাম্পুচিয়া-আক-পানিস্থানে বিদেশী-দখলদারীর পরোক্ষ স্বীকৃতি, মার্কতির রাজ্যীকরণ, 'জাতীয়' নিরাপত্তা আইন ইত্যাদি ছাড়া বিপত দশমানে বার কিছুই অবদান নেই, সে 'গভর্নমেন্ট ড্যাট ওয়ার্কস'-এর সর্বশেষ পাপাচার দেখতে হরত আমাদের বাকী আছে, তবে 'সংসদীয় বনার প্রেসিডেন্সী' ধাঁচ সংক্রান্ত তথাকথিত 'বিতর্কে'র মাধ্যমে ভারতীয় জাতি সমূহের, জাতীয় সংখ্যালঘুদের, ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে-সমস্ত ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে হাইল পাণ্টে আক্রমণের যে তোড়জোড় চলছে, তা নিতান্তই 'ডিবেট' নয়—অনেক ঠকে বাবা শিখেছে তারা এটুকু অস্ততঃ বোঝে।

কিন্তু অত্যাচারী ও পাপাচারীর কামনা বাসনাগুলি যায় তলার তলিয়ে যায় সে ইতিহাসের মহাশক্তি, যে শক্তিতে জনগণ স্বজের ঐহ, শোষিতেরা শাসনদণ্ড হাতে তুলে নের। দেয়ালে দেয়ালে তার লিখন পড়তে যারা অক্ষম, 'দি গভর্নমেন্ট ড্যাট-ওয়ার্কস'-এর মত তাদের শোকেও চোখের জল ফেলতে কেউ সেদিন থাকে না।

পুলিশ ও খাত্ত বিভাগের মদতে

সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরি

কলকাতার সিমেন্ট ব্যবসারীদের একাংশ রাজ্য সরকারের খাত্ত এবং সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে ছলচাতুরি-প্রতারণা শুরু করেছে। এদের সঙ্গে খাত্ত ও সরবরাহ বিভাগের অফিসারদের একাংশ এবং পুলিশের একটি অংশ পুরোপুরি মদত দিচ্ছে বলে বিশ্বস্তস্বত্বে জানা গেছে।

জানা গেছে, রাজ্য সরকার ঐ সব ব্যবসারীকে সিমেন্টের যে কোটা দিচ্ছেন তার একটা বড় অংশ সরকারী পারমিটের বলে এবং অবশিষ্ট ওদের ইচ্ছামত খোলা বাজারে সে সিমেন্ট বিক্রীর নির্দেশ আছে তার কথা এখানে না বলাই ভাল। কারণ, এ সিমেন্ট আকাশ ছোঁয়া দামে ওরা বিক্রী করছে। এখানেও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবসায়িত কারচুপি চলছে। অপর-দিকে বলতে চাই, সরকারী পার-

মিটের বলে যে সিমেন্ট বিক্রীর নির্দেশ আছে তার একটা অংশও সরকারী পারমিট ছাড়াই অসং ব্যবসারীরা চোরাবাজারে আকাশ ছোঁয়া দামে বিক্রী করে দিচ্ছে।

এরপরে পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা-মত থানার এক ভিত্তিহীন অভি-যোগে বলা হচ্ছে যে, সরকারী পারমিটের ঐ সিমেন্ট গুদাম থেকে চুরি হয়ে গেছে। খাত্ত এবং সরবরাহ বিভাগেও একই কথা বলা হচ্ছে। এই সব ধর উচ্চ পর্যায়ে বী মজীর কাছে পৌছাচ্ছে না। সরকারী অফিসারদেরই একাংশ ব্যবসারীদের সঙ্গে রফা করে ঐ সব সংশ্লিষ্ট ব্যবসারীকে রেহাই বা মুক্ত করে দিচ্ছে। এরফলে সিমেন্ট ব্যবসারীদের লুটের রাজস্ব আরো লুট করার সুযোগ এনে দিচ্ছে।

বাঙলাদেশের সাহিত্য : ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২)

রশীদ আল ফারুকী

॥ চার ॥

আধুনিক যুগের সাহিত্যে ভেতর অনেক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তন শুধু বৈয়াকরণিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। শিল্প সাহিত্যেও এই পরিবর্তন চক্ষুগ্রাস্য। যে স্বল্প চিন্তাভাবনা সাহিত্যের ভেতর একটা মহৎ অহুত্বের সৃষ্টি করে এবং তার প্রকাশ বৈচিত্র্যময় অথচ পরস্পর সংযুক্ত তা যেন আর নেই। আধুনিক যুগ অহুত্বের যুগ নয়, যন্ত্রণার যুগ। এই যন্ত্রণা সমাজনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ না আত্মনির্ভর। আত্মনির্ভর অর্থ শুধু আত্মার অহুত্ব নয়, আত্মার সাধনা—যা মহৎ শিল্পে বিদ্যুত। যে গ্রামীণ জীবন মাত্রের মহিমাকে অপার করে তোলে সবুজের সমারোহে, পেঁজা জীবন ধীরে ধীরে বিলীনমান। যন্ত্রণাতার ক্রমবিকাশ তাই মানব-সত্যতার ইতিহাসে নতুন যুগের উদ্বোধন। সাহিত্যের একক সত্তা এই সত্যতার প্রবল পেশে খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে আর এই খণ্ডিত সত্তা প্রতিনিরত নতুন নতুন অংগবল লাভ করছে। আধুনিক যুগের ছোটগল্প মানবসত্যের সেই খণ্ড বিখণ্ড রূপ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এই রূপ ছিলো অজ্ঞাত। অজ্ঞাত—কারণ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত-প্রভুত্বের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত হয়েও যন্ত্রণাসত্যের একজন প্রত্যক্ষ-দর্শী। তিনি এই সত্যতার সংগে পরিচিত এবং এই পরিচিতির বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় বলে তাঁর উপলব্ধিও খণ্ড বিখণ্ড। রবীন্দ্রনাথকে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিকতা প্রভাবিত করেছিলো বলে আমরা জানি এবং আরো জানি এই প্রভাব তাঁর সমগ্র ছোটগল্পে স্পষ্ট। তবু একবার কতটুকু লভ্য?

শুধু বিষয়বস্তু কখনো কোন শিল্পের প্রেরণায়ুল হতে পারে না। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রেরণায়ুলও শুধু পদ্যের ছুপাশের জনপদ নয়। পদ্য তাঁকে উৎসাহিত করেছে, মনে মগন দিচ্ছে, কিন্তু শিল্প দ্বৈধ। শিল্প দিচ্ছে আধুনিক যন্ত্রণাসত্য—যা তিনি সমগ্র ইউরোপ চর্চা প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে বাঙলা আধুনিক ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের মত একজন যন্ত্রণাক্রান্ত প্রতিভার উত্থানের অপেক্ষার ছিলো। নচেৎ তার আগে ছোটগল্প লিখিত হতোনা কেন? কেনই বা রবীন্দ্রনাথ পূর্ব সাহিত্য প্রতিভা শুধু উপলব্ধিই সীমাবদ্ধ থাকলো? বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব বা, প্রজাতি কিছুইতো কম

ছিলনা। তবু তিনি ছোট গল্প লিখতে পারলেন না কেন? শরৎচন্দ্র কেন ছোটগল্পে অমনোযোগিতার পরিচয় দিলেন? শরৎসাহিত্যে তো শুধু পদ্য নয়, তাবৎ গ্রামবাংলা বিদ্যুত। বঙ্গবন্ধু শিল্পী হিসেবে মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং উভয়ের শিল্পকর্ম আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রণাসত্যের যে যন্ত্রণা একজন শিল্পীকে উদ্ভূত করে তোলে, করে তোলে উদ্ভেজিত ও উবেজিত তা এঁদের কারো ভেতর ছিলোনা। ছিলনা বলে তাঁরা ছোটগল্পে উৎসাহিত হননি। প্রজাতি ও মননের দীর্ঘযাত্রা সমীকরণে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই শিল্প সাহিত্যের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু মুহূর্তের ভেতর সাহিত্যকে অভিত্ব করে ফেলা যে বস্তু তা তাতে নাও থাকতে পারে—যা একমাত্র কোন যন্ত্রণাকাতর খণ্ড বিখণ্ড আত্মার স্পর্শেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সেই আত্মা ছিলো—যা ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও অহুত্বশীলনে লব্ধ।

তাহলে কবিতা? কবিতা কি যন্ত্রণাভূত শিল্পকর্ম নয়? নিশ্চয়ই এবং তা আধুনিক কবিতা—রবীন্দ্রনাথের জীবনসারাংশে যে রূপ স্থিতিশীল হয়ে উঠে ছিলো। 'বলাকা' পূর্ববর্তী কাব্যে বস্তু না যন্ত্রণাশীড়ন আছে, তার চাইতেও বেশি আছে দার্শনিকতার সুকোচুরি। সেই দীপ্তি ও অনীষের ভেতর একটা যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রাণান্তকর প্রয়াস।

সাহিত্যের জীবন সীমিত হোক না হোক, আধুনিক যুগে তার অংগসীমিত। চিন্তা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যে অবসরের প্রয়োজন তা আর আজকাল পাওয়া যায়না। একটা জিনিস যে চিহ্নে চিহ্নিত তার স্বাধীন দীর্ঘযাত্রাভাবে গ্রহণ করার বদলে সাহিত্য আজ ক্রতবেগে গিলে-বাঞ্ছন—ছোটগল্পে সে স্বযোগ বেশি। গল্পকার যুহুতের ভেতর এক নিঃশব্দে যেমন তাঁর মনের তাব ব্যক্ত করছেন, তেমনি পাঠক তা চেখে আবারো নতুন দিকে হাত বাড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে আধুনিক ছোটগল্প বেশি লিখিত ও পঠিত হচ্ছে। উপলব্ধির এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আজ তা তেমন না হওয়ার (মন্তব্য: পূর্ব বাঙলার) একমাত্র কারণ সেই তির্যক সীমাবদ্ধতা, সাহিত্যকে যেখানে প্রতিটি পৃথক

মেপে মেপে গ্রহণ করতে হচ্ছে, সেখানে বিপুল কলেবরের উপলব্ধি রচনার বা পাঠের অবসর কোথায়? পূর্ব বাঙলার ছোটগল্পও মূলত: এই যন্ত্রণার জারক রসে সিক্ত। তখন যেন প্রতিটি গল্পকারকে এক অদ্ভুত উদ্ভাদনার পেয়ে বসেছিলো তা হলো মুহূর্তের ভেতর নিজেকে বিনীত করে দেবার উদ্ভাদনা, নিজের গল্পকে স্ত্রীত কঁাকানী দিয়ে জাগিয়ে তোলার উদ্ভাদনা। সবাই ছোটগল্প লিখছেন—ছোট ও বড়—এবং সবাই যেন তীব্রবেগে এর পেছনে ছুটে চলেছেন। বাজারের যে কোন উচ্চমানের পত্রপত্রিকা দেখলে একবার সত্যাসত্য দেখিন উপলব্ধ হতো। এই প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা আশার ব্যাপার ছিলো, সেদিন তাঁদের লেখা দেখে লেখকের বয়েস নির্ণয় করা যেতোনা। সাহিত্যের একেবারে তরুণতম ছাত্র থেকে শুরু করে একেবারে প্রবীণতম শিক্ষক পর্যন্ত এই উত্থাপে ঝলমানো বলে মনে হয়। এর কারণ কি?

সাতচল্লিশের পর আমাদের ছোটগল্পের কোন বিশিষ্ট চেহারা ছিলোনা। বিভাগপূর্ব কালের ধারাকে শিল্পীরা সঘরে বহন করে চলেছিলেন। এই ধারা বহনে অহুত্বের যেমন ছিলো, তেমনি ছিলো এক স্নেহ-মি। সবাই লিখেছেন, গাধার গাধার লিখেছেন। মজার কথা হলো, কি লিখছেন কেউ একবারের জন্তে ভেবে দেখেননি। এমতাবস্থাতে না ছিলো ঐতিহ্যচেতনা, না ছিলো কোন প্রকার-পরীক্ষা-নিরীক্ষা। (কবিতা যদিও বা যন্ত্রণালব্ধ শিল্পকর্ম তবু এসব কথা কবিতা সম্পর্কে তেমন খাটেনা যেমন খাটে ছোটগল্প সম্পর্কে। আমাদের কবিতা সর্বদাই প্রাণময় ছিলো—যা যন্ত্রণালব্ধ অহুত্বভিত্তিক প্রদীপ্ত।) ছোটগল্পকে এই বস্তু অবস্থা প্রায় দেড় দশকের (১৯৬২) কাছাকাছি পর্যন্ত গ্রাস করে রেখেছিলো। সবাই সাহিত্যচর্চা করেছেন,—লিখেছেন, পড়েছেন আর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সাহিত্য নিয়ে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি একটা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার আত্মনিয়োগ করে তা পূর্ব বাঙলার লেখকদের ভেতর বেশ পরে সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের নবীনরাই এই সাহিত্য

আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁরা প্রেরণা পেয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে, উপাদান গ্রহণ করেছেন আধুনিক সত্যতার নয় অবস্থা থেকে। যন্ত্রের পেশে সাহিত্য কিতাবে দিন দিন মহাব্যবোধ হারাচ্ছে এই আশঙ্কা তরুণদের উপলব্ধি অবলম্বন নয়—একথা বলতে কোন বাধা নেই। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যন্ত্র সাহিত্যের যৌবনকে ব্যঙ্গ করেছে। যে পৌরুষ একজন মানবসত্যামের গৌরবের আধার তা যেন দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। (প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, প্রবীণ ও বয়স্ক নবীনদের গল্প বোকাই নীতিকথা ও সংসারের পেছনে কোন প্রকার পৌরুষ সোচ্চার ছিলোনা। এক একটা বিশেষ বিশেষ সমস্যাতে কেন্দ্র করে তাঁরা যেসব ছোটগল্প লিখেছেন তাতে আমাদের সমাজ ও সংসার ছিলো কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের যে তীব্র অহুত্ব ও আত্মচীৎকার তার পৌরুষকে খোঁচা দেয় তা ছিলো সম্পূর্ণ ভাবে অহুত্বময়।) এই নিস্ত্রাণ আবহাওয়ার আমাদের তরুণেরা আশ্রয় খুঁজলেন বিদেশী সাহিত্যে। এই পলারমে তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের পচা আবর্ত থেকে যেমন বেঁচে গেলেন, ঠিক তেমনি জীবনের ক্ষেত্রে নতুন উপলব্ধির একটা আঁচও তাঁরা পেলেন। স্বাধীনতালভার দ্বিতীয় দশকের শেষে (১৯৬৬-৬৭) পূর্ব বাঙলার সাহিত্যে তাঁরা প্রবেশ করলেন কবিতার মাধ্যমে। এই কবিতার সমাজ নেই, রাষ্ট্র নেই, নেই দেশকাল কিছুই। আছেন শুধু দুটো ব্যক্তি—লেখক ও পাঠক। লেখক তার নিজের কথা বলছেন মনের আনন্দে, যা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি ব্যক্তি অহুত্ব বসতে বুঝলেন যৌনাহুত্ব। তাকেই তিনি জীবনের চূড়ান্ত অহুত্ব মনে করে চালালেন তাঁর অগ্রাভিযান। এই অভিযান অল্পকালের ভেতর স্পষ্ট ও জোরদার গতিপথ লাভ করলো। প্রবীণ ও বয়স্ক নবীনদের উদাসিন দীর্ঘশ্বাস এই আন্দোলনকে বারিবার ব্যাহত করতে চাইলো। কিন্তু করতে চাইলে কি হবে, এঁরা তো সাহিত্যে যুগযুগের মূল চাবিকাঠি হস্তগত করে কলেছেন—তা হলো কিছু বলা, নতুন করে বলা এবং অভিমত ও শিল্পময় ভাষার বলা। প্রবীণেরা এই নতুন ও অভিনবের কাছে হেরে গেলেন। পশ্চাত্যের

নতুনদের অগ্রাভিযান অব্যাহত গতিতে চললো নতুন দিগন্তের পানে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তরুণদের এই আন্দোলনের বিকশে সব মহল থেকে একটামাত্র অভিযোগই উত্থাপিত হয়েছিলো। তাহলো—তাঁরা অশ্লীল, অশালীন, তাদের রচনা রুচি বিগর্হিত। কিন্তু তাঁদের শিল্পজ্ঞান, উপলব্ধির ব্যাপকতা, আত্মার উজ্জীবন—যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য—সম্পর্কে কোন মহল থেকে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য ছিলো না। তরুণদের বিকশে অশ্লীলতার অভিযোগ স্বীকার্য। স্বল্প রুচিবোধ নিয়ে তাঁদের সাহিত্যে প্রবেশ করার জো নেই, স্বীকার্য। কিন্তু কেউ যদি এই বিকৃতরুচিকে প্রবীণদের উদাসিনতার ফল বলে আখ্যায়িত করেন, তবে তাঁকে খুব বেশি দোষী করা যাবে কি? এই যে 'গেল-গেল' রব পূর্ব বাঙলার আকাশে বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলেছিলো, এই 'গেল'টা কি? সাহিত্যের রুচি ও নীতিবোধ, নাকি প্রবীণদের বহু বিবেচিত স্বনাম ও যশ?

কিন্তু এই 'গেল-গেল' রব বৈশিষ্ট্য দিন শোনা যায়নি। তাঁরা ধীরে ধীরে এসব তরুণ কবি ও গায়িকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁরাও তরুণদের মত লিখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের তখনকার তরুণ-স্বলভ আধুনিক হবার প্রাণান্তকর প্রয়াস এই আন্দোলনের সার্থকতা ও বিজয়ের স্বাক্ষর বহন করে। যেসব তরুণ একদিন পূর্ব বাঙলার সাহিত্য-জনকে বিবাস্ত করে তুলেছিলেন, তাঁরাই সাহিত্যে নতুন স্বাধীন-লেন। সামগ্রিক যে উদ্ভাদনা তাদের রুচিহীন ও প্রগলভ করে তুলেছিলো তাও ধীরে ধীরে অহুত্বিত হলো। পুরনো লেখকেরা তাঁদের অহুত্বপূর্ণ ছোটগল্প লিখতে লাগলেন—সেই ভাষার চটক, অঙ্গদর্শনতা সবই থাকলো। তার সংগে নতুন যোগ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। বারা আকো পুরনো ধাঁচে লিখছেন তারা অক্ষম এবং সাহিত্যের ইতিহাস অক্ষমদের ওয় হাই চরম

তিরিশের রবীন্দ্রবিরাগী আন্দোলন যে কারণে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য, ঠিক একই কারণে পূর্ব বাঙলার সাহিত্যের ইতিহাসে তরুণদের এই অভিযান উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন যদিও কাব্যক্ষেত্রে সূচনা হয়েছে সবার আগে, তথাপি এর প্রভাব ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও কম নয়। তাকপোর শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

খহ পরিচয়

কিশোরদের অভিনব সংকলন

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান। সম্পাদক :
সমরজিৎ কর। শৈব্যা প্রকাশন,
৮/১ দি ভাষাচরণ বে স্ট্রিট,
কলকাতা-১৩।

রূপকথা পুস্তক আরব্য উপত্যাসের
যুগ পেরিয়ে - বাংলা শিশু ও কিশোর
সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ উপজ্যকিশোর
অবনীন্দ্রনাথ - যোগীন্দ্রনাথের হাতে
কিছুটা সাবালক পেনে ও সাম্প্রতিক
বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে
সেই রম্যগীত ভূতপ্রভূত রূপকথারই
আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এগুলির
মুদ্রণ নতুন করে মুদ্রিত হয়েছে অ্যাড-
ভেক্টর বা thriller-রূপক এক-
শ্রেণীর রচনা বা বাজারের অধিকাংশ
কিশোর পত্রপত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবরের
সিংহভাগ স্বত্ব করে থাকে। এগুলির
অতি সামান্য অংশ কিশোর-কল্পনাকে
রূপকথা-নীতিকথার স্তর পেরিয়ে

চারপাশের চেলা জগৎকে চিনে
নিতে উৎসুক করে তোলে।

বস্তুত কালটি ছুটছে। যে যুক্তি
ও তথ্যের সিঁড়ি বেয়ে একজন বয়স্ক
পাঠক পারিপার্শ্বিক জগৎকে চিনে
মের, একজন শিশু বা কিশোর সেই
পন্থি, অল্পমরণ করতে পারেনা।
কল্পনা, বিস্ময়, আবেগ-অনুভূতির
পথ বেয়েই তাকে এগিয়ে চলতে
হবে—আর এই পথেই তার সিঁড়ি।
পরিদৃষ্টমান জগৎকে সে চিনে নেবে,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামা রাখার সে পা
বাড়াবে—কিন্তু তার পাথের হবে
আনন্দের ব্যাকরণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের
খাসমহলে পৌঁছে দেবার পন্থি হবে
কিশোর-কল্পনার উপযোগী—এই
লক্ষ্য নিয়ে সাম্প্রতিক কালে কিছু
উদ্যোগ আরম্ভ করা গেছে।
কিন্তু সে উদ্যোগ ব্যক্তিগত প্রয়াসের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই পটভূমিকায় শৈব্যা প্রকাশনের
উদ্যোগে প্রকাশিত শারদীয় সংকলন
'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' একটি অতি-
মব উত্তম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
নেই। কিশোর মনের দিকে লক্ষ্য
রেখে জ্ঞান বিজ্ঞানের মানা শাখার
বিচিত্র রসের অবতারণা করে কিশোর
মনের কোঁড়হলকে আগিয়ে তোলার
চেষ্টা করেছে সম্পাদক। প্রকৃতি
বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান,
রসায়ন বিজ্ঞান, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায়
সব শাখার বিশেষজ্ঞের রচনা-
সম্ভারে সংকলনটি পুষ্ট হয়েছে।
বিজ্ঞানের মানা তথ্য, বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কারের মানা কাহিনী ও
ইতিহাস একদিকে যেমন সংকলনটির
গুণগত মান বাড়িয়েছে, অন্যদিকে
বিজ্ঞান নির্ভর কিছু কিছু গল্প ও
উপন্যাস বা কল্প-বিজ্ঞান কাহিনী
সংকলনটির রসগত আকর্ষণ বাড়ি-
য়েছে।

পট পাখি ও পাছপালা,
বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার
এবং নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থের
এই তিনটি অংশ বিশেষজ্ঞের রচনা-

সম্ভারে পুষ্ট। জগদীশচন্দ্র বসুর
যায়োয়া ভনীতে বলা পাছের প্রাণ-
ধর্মের কথা, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের
পতপাখীর স্বভাব বৈচিত্র্য নিয়ে
লেখা নিবন্ধ, সুনীল সরকারের
দৃষ্টিহীনতার চশমা বা তাপবিহীন
চুলী অবিকারের কাহিনী বা ডঃ
সুনীলকুমার ঘোষের আকস্মিকভাবে
প্যারাহুট, সেলাইকলের সূঁচ বা
রটিং পেনার আবিষ্কারের কাহিনী,
ডাঃ অরুণকুমার চক্রবর্তীর প্রথম
শব্দব্যবহারের ইতিহাস, ডঃ ব্রজেন্দ্র
প্রসাদ গুহের অস্থি বিকৃতি রোগের
কথা প্রকৃতি রচনাগুলি শুধু কিশোর
মনের নয় বয়স্ক পাঠকের জিজ্ঞাসা-
কেও পরিতৃপ্ত করে।

এই বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধগুলির
পাশাপাশি বিজ্ঞান নির্ভর কিছু গল্প
ও উপন্যাস সংকলনটিতে—যান
পেয়েছে যেগুলির আকর্ষণ কিশোর
মনের কাছে জুড়িবার হয়ে উঠবে।
এগুলির মধ্যে সম্পাদক সমরজিৎ
করের হাওরের স্বভাব নিয়ে লেখা
উপন্যাসটি বা দ্বিতীয়মাত্রার

দর্পণ শুক্রবার, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮০

ভট্টাচার্যের লেখা তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে
বিজ্ঞান নির্ভর গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

এইচ জি ওয়েলস প্রমুখ পশ্চাত্য
বিজ্ঞান নির্ভর গল্পলেখকের মধ্যে
কয়েকজনের রচনার অন্তর্ভুক্ত
সংকলনটিতে স্থান পাওয়ার গ্রন্থটির
মর্যাদা বেড়েছে। সব কিশোরের
অভিপ্রায় ও পরিচিত সত্যজিৎ
মায়ের প্রফেশন শব্দ এবং প্রেমেন্দ্র
মিত্রের বনাদা এই সংকলনটিতে
নিজেরে আরপা করে নিয়েছে।
কিন্তু এরা দুজন ইতিপূর্বে একই
ভূমিকায় অল্প পত্রপত্রিকায় আগেই
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, একথা বাংলা
দেশের সব কিশোরই মনে করে
রেখেছেন। বহু বিজ্ঞাপিত 'কিশোর
জ্ঞান বিজ্ঞান'-এর এই অভিনব
শারদীয় সংকলনে একেবারে শব্দ এবং
বনাদাকে মতুন ভূমিকায় দেখা যাবে
এ জাতীয় আশা অনেক কিশোরই
মনে মনে পোষণ করতেন।

গ্রন্থটির বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ
সম্পর্কে প্রকাশন লক্ষ্য আরও মনো-
মিবেশ করলে গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসম্মত
বলা যেত।

সমাজমনস্ক গল্পগ্রন্থ

আকালের ঈশ্বরগঞ্জ এবং
জগদীশচন্দ্র বসুর হুগলি
সময় প্রকাশন। ২৭/ডি, হরিতকী
বাগান লেন, কলকাতা-৬। দাম :
চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হুগলি ভট্টাচার্য বেশ কিছু কাল
ধরে ছোট গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে
সমাজমনস্কতার ছাপ পাওয়া যায়
টিকই কিন্তু যে বহু বলিষ্ঠতা শিল্পীর
দৃষ্টিকে করে গভীর ও ব্যাপক, তার
অভাব অবশ্যই লক্ষ্য পড়ে। তবে
পরিবেশ-ও চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর
আন্তরিক প্রয়াসটুকু প্রশংসনীয়।
লবচেরে বড় কথা, গল্প লেখার তাঁর
আংগিক মূল্যায়নটুকু অস্বীকার
করা যায় না। তাহা আরোণে
কিছু ক্ষেত্রে প্রগল্ভতা মজরে পড়ে
বটে, কিন্তু তাহা মাধ্যমে চিত্রকল্প
স্থিতিতে তাঁর কৃতিত্বটুকু নজর এড়ায়
না। তিনি যে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন
লেখক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে ম'টি
ছোটগল্প স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন
সময়ের 'অগ্রণী', 'মধ্যাহ্ন', 'একাল',
'অবসর' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্পগুলি
একথা প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প-
গুলি বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে
রচিত হলেও—চরিত্র কিন্তু এক—
এবং সে চরিত্র হল, সমাজের বৈষম্য,
অবক্ষণ ও শোষণকে ফুটিয়ে তোলা।
এ দায়িত্ব পালনে তিনি যতখানি
রোমাঞ্চিক, ততখানি কিন্তু রিয়ালি-
স্টিক মন। রিয়ালিস্টিক হলে
বিষয় বস্তুত রূপায়ণে উচ্ছ্বাস নয়,

ভাবার সাহায্যে ভাব-প্রতিমা রচনা
নয়, স্থির প্রত্যয়ের বাস্তবতাই
প্রতিফলিত হয়। 'পূর্বস্মরণের
আরনা', 'আত্মহত্যার কাহাকাহি',
'অশানবাড়ী', 'গ্রামে চলো' প্রভৃতি
গল্পে ভাবাভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটায়
বাস্তব মিথীকার সেই দৃঢ়তাটুকু
হারিয়ে বসে। 'পিতা' গল্পের অতি
মাটকীরতা বক্তব্যকে অস্পষ্টই করে
কোলে। তবে 'ঈশ্বরের রাজ্য'
গল্পটির আংগিক বৈশিষ্ট্যটুকু
উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের এই
সংকলনটির মধ্যে 'মাংস' ও
'আকালের ঈশ্বরগঞ্জ' গল্প দুটি প্রোত্থের
হাবী রাখে। প্রচ্ছদ ব্যক্তনামর,
মুদ্রণও ভাল, তবে কীপ কলেবরের
তুলনায় দামটা কিছু বেশী মনে হয়।

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দন বসুর বিদ্যুত
কারখানার বিদ্রোহ

সম্প্রতি হুগাপুরে প্রভাবিত
শ্রীচন্দন বসুর ইষ্টাঙ্গ বিদ্যুত কারখানার
স্থানীয় বেকারদের চাকরীর দাবিতে
ই-কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ
মেঘানো হয়। কম বিমিয়োগ কেন্দ্রের
মাধ্যমে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ
স্থানীয় বেকার যুবকদের নিয়োগ
তাঁরা দাবি করেন। মালিকপক্ষে
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র শ্রীচন্দন বসু ও
শ্রীশশীল ওয়াহীদ অল্পশাসিততে
উক্ত কারখানার উচ্চপদস্থ অফিসার
শ্রীভট্টাচার্যের হাতে বিদ্রোহকারীরা
সার্কালপি হেন। আলোচনার সময়
উপস্থিত ছিলেন হুগাপুরের এম-
কিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীধর দাশ।

আপনার জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তগুলি ইউকোব্যাক্সের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান



সেই সমস্ত স্মরণীয় মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার ও আপনার
প্রিয়জনের সুদূর ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে তোলা যায়—আমরা সেই পরামর্শ দেব।

এমন মুহূর্ত নিশ্চয়ই কখনও আসে, যখন নিজের
অথবা প্রিয় কারো জন্য কিছু করার কথা জরুরি
বলে মনে হয়। এমনই কোনো মুহূর্তে ইউকোব্যাক্সে
আসুন। আপনার সেই মুহূর্ত স্থিতির স্মৃতি হয়ে
হাতে থাকে আমরা সেই বাঁধা করব।

আপনার ভাবনার তেমনই কোনো বিশেষ
মুহূর্তে আমাদের ব্যাক্সের কোনো শাখায় আসুন।
আপনার বাড়ি অথবা কাজের জায়গার কাছাকাছি
ইউকোব্যাক্সের কোনো শাখা অবশ্যই আছে।
আপনার ভাবনার অংশীদার আমাদেরও হতে দিন।

ইউকোইউইট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক



ইউকোব্যাক্স কাছেই আছে, ইউকোব্যাক্সে টাকা জমান

বাংলাদেশের সাহিত্য

১ম পৃষ্ঠার পর

যে উদ্ভাপ আমাদের ছোটগল্পকে বলিয়ে ইন্দ্রপাতে পরিণত করেছিলো, উপভোগ্য তার ছোঁয়া পায়নি। কলে তরুণের রঙিত জীবনের উপলব্ধি সবার চুটিগোচর হলেও জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে তা আজো অস্পষ্ট। এবার যদি এই উপলব্ধিতে ব্যাপকতা আসে তাহলে এই দেশের সাহিত্যমোদন সার্থক হবে। তবে আর বিকৃতির ভেতর নয়। কারণ বিকৃতির কোন স্বামী মূল্য নেই বলে তা কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম নয়। কাব্যমোদনে তরুণের পট পরিবর্তন তাই প্রমাণ করে। আমি যেন করি কাব্যক্ষেত্রে আমাদের প্রবীণেরা আজো মবীন।

৥ পাঁচ ৥

আজ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তার অর্থ, বাংলাদেশে

রাজীব আসছেনই

১ম পৃষ্ঠার পর

নিরেছেন ও শেখকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। উত্তর প্রদেশের ফুলপুর কি অত কোন কেন্দ্রে যাতে রাজীব বন্ধুত্ব উপ-নির্বাচনে জিতে যেতে পারেন সেজন্যও মবীর তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে চরণ সিং এর ডান হাত নরিন্দর সিং কুমার নেতা বলে স্বীকৃত হবার পর কং-ইতে চোকার সুযোগ পেয়েছেন। আর বন্ধু দেবীলাল এখনও সেখানে ঠাই না পেলেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি হাতে নেওয়ার জন্য দলের যুব সংগঠনকে দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব ডায় কাছের সাক্ষরদের মধ্য থেকেও সহকর্মী নির্বাচন করছেন। জে পি ধরের পুত্র তো তাঁর জন্ম প্রধানমন্ত্রীর মহলের বিশেষ একজন হয়ে উঠছেন। এদিকে কর্ণ সিং, ডি পি মিশ্র একপ্রকার অপেক্ষার আছেন। বাবুজী, চ্যবন, চরণসিং বাবু, দেবরাজ আর্গ ও তাঁর কিছু অঙ্গগামী রাজীবের জড় আশ্রয় কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীবতী গাঙ্গীর কাছে বলে চোকার একটা সুযোগ চাই-

আর কতগুলো সমস্যা থাকছে না। শিক্ষার মাধ্যম, সাহিত্যের ঐতিহ্য জাতীয়তা ইত্যাদি কিছু কঠিন সমস্যা থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যমোদনী ও বুদ্ধিবাহীরা মুক্ত। আমরা পূর্বে দেখেছি, ১৯৭৪ সালে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের জন্তে স্বাধীন মূল্যবোধ নেতৃত্ব আন্দোলনকে বিপদগামী করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে পূর্ব বাঙলার সমগ্র জাতীয় জীবনে এর একটা অশুভ ছায়াপাত পড়েছিলো। আজ আর সে অবস্থা নেই। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বতন্ত্রতাবোধ উপর স্বাধীনতার যে সৌধ আজ নির্মিত হয়েছে তাকে আর কোন বিকৃত বুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা বা দল নিজের স্বার্থনিষ্ঠির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেনা। সাত-চল্লিশের স্বাধীনতা ছিলো সাম্রাজ্য-বাহীরের দান-যার প্রেরণামূল

কেলু খাত্ত নিয়ে

১ম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে ৭৭% খাত্ত ব্যবহারের সার্টিফিকেট ছিল। পরে যা দাঁড়িয়েছে ৮৬ শতাংশে।”
শ্রীবত্ন বলেন, বরাদ্দ হলে যেও পরিমাণ খাদ্য রাজ্য সরকার হাতে পেল না, যতটা বিলি হল তার বেশি ফুলিয়ে রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব নয়। শ্রীবত্ন প্রস্তাব করেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা যুক্ত কমিশন করা হোক। তাহলেই ধরা পড়বে কোন পক্ষ মিথ্যে কথা বলছে। কাজে পরিমাণ দেখলেই হবে না, প্রকৃতই কতটা রাজ্য সরকার পেয়েছে তা দেখতে হবে।
অভিযোগের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং বলেন, কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচীতে কেন্দ্র পশ্চিম-বঙ্গের জড় প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাদ্য শত্বেদ্যাক করেছে।” মন্ত্রী এই কথা বলতেই সভার হৈ চৈ বাধে। বীরেন্দ্র সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জড় একমাত্র দায়ী নন। কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের দেখার দায় বারিষ রয়েছে।”

তারতবর্ষে নিজের কীপতর একটু খানি স্বার্থ হলেও অঙ্গুর ধারা। তাদের সহযোগী ছিলো দেশী পুঁজিপতি, স্বাধীন এবং একচেটিয়া মুনাকালোভী ব্যবসায়ী শ্রেণী। পক্ষান্তরে আজকের স্বাধীনতার ভিত্তিমূল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী—তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান। অতএব উত্তরের ভেতর পার্থক্য মৌলিক।

যেহেতু আজকের স্বাধীনতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রবণতার ফল নয় সেহেতু প্রতিটি বাঙালী এর অন্তর্গত প্রহরী। বিশেষ করে আমাদের সাহিত্যিক শ্রেণী এই প্রহরার অগ্রভাগে থাকবেন, তাহলে আর বিচিৎ কি? যে প্রবীণ সাহিত্য-সেবীরা একদিন এদেশে মুসলিম স্বার্থ লংকণের নমুনা দেখে ব্যথিত চিত্তে সাহিত্যের আলর থেকে বিদায় নিরে-ছিলেন তাঁরা এবং বারা আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে সরকারী পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করে-ছিলেন তারা—আজ আবাবো নতুন করে তাদের শক্তি সত্তার পরিচয় প্রদানের সুযোগ পাবেন। আমাদের বিশ্বাস আজ সাহিত্যিকরা মুক্তবুদ্ধি হবার সুযোগও পাবেন আগের চেয়ে বেশি।

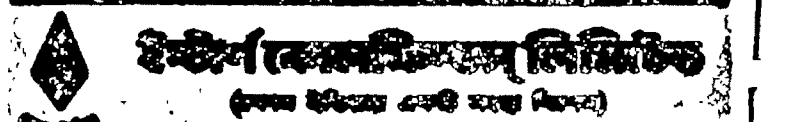
আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে থেকে আরো একটা অশুভ প্রভাব অপহৃত হয়েছে। তাহলো ধর্মীয় উগ্রাধন। অবশ্য একথা ঠিক যে, আমাদের সাহিত্যিকেরা বত ধোবেই ধোবী হোন না কেন, তাঁদের বেশির ভাগই ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার ও নিরপেক্ষ।—তথাপি একেই ধর্মীয় বাধা-বিপত্তি তাঁদের দামনে কম ছিলো না। বিশেষতঃ এমন একদল সাহিত্যিক ছিলেন, বারা ধর্মকে বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য বিবেচনা করে তাদের বিপদগামী করতে চেয়েছিলেন। আজ ধর্ম যখন আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যনিষ্ঠির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, ধর্ম ভিত্তিক ঐতিহ্যকল্পনা যখন আজ অব্যাহত হয়ে পড়েছে, এখন ধর্মভিত্তিক সর্বমানবিক আবেদনকে ও আমাদের সাহিত্যে ছুটিয়ে তুলতে কোন বাধা নেই—যেমন রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন। আজ শুধু চাই চিন্তা ও অহুসিলনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সাহিত্য এই স্বাধীনতার জন্তে উন্মুখ হয়ে আছে—তা রাজনৈতিক হোক কি অর্থনৈতিক, সামাজিক হোক কি সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত হোক কি সমষ্টিগত। আপোষ বা আত্মসমর্পণের ভেতর শিয়ার মুক্তি নেই, বুদ্ধি ও বিবেকের জাগ্রত অভিযুক্তি-তেই তার মুক্তি।

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

তার ফলে কি শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে? আদৌ না। বেকার সংখ্যা কমবে? না, বরং বাড়বে। ব্রিটিশ শিল্প বাণিজ্যের প্রদান বটবে? তাও সম্ভব নয়। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রিটিশ মূল্যের দাম স্থিতিশীল নয়। মার্কিন ডলার ও অস্ত্রান্ত ইউরোপীয় মূল্যের মত আজ বাড়ছে কাল কমছে। সুতরাং বাবের হাতে এই সব মূল্য আছে তারা শিল্পবাণিজ্যে লবী না করে সোমা রপো, তেলের ফাটকাবাজিতে লবী করছে। এমন কি বহু খ্যাতনামা বড় বড় আন্তর্জাতিক ব্যাংকও শিল্প বাণিজ্যে লবী না করে সোমা ও অস্ত্রান্ত মূল্যবান ধাতু, হীরা প্রভৃতি ছুঁল্য পাথর, প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক বৃত্তি, সোমগ্রী ইত্যাদিতে লবী করছে। কারণ এতে খুব তাড়াতাড়ি খুব বেশী মুনাকা হয়। অতর্কিত শিল্প বাণিজ্যের মুনাকা অনেকদিন পরে পাওয়া যাবে। উৎপাদন ও বিক্রী হলে পর পণ্যের দাম পাওয়া যায়। তখন মুনাকা হয়। তার আগে হয় না। আর যেহেতু পুঁজিবাহী দেশে শিল্পোৎপাদন টাকাকড়ির ক্রয়-কমতার উপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ মালবের চাহিদা পূরণের মত টাকাকড়ি হাতে থাকা চাই সেই হেতু মূল্যের দামের যখন স্থিতি থাকে না, যখন দেশে বেকার সংখ্যা বাড়তে থাকে (অর্থাৎ লোকের কেনাকাটা করার ক্ষমতা কমে যায়) তখন স্বয়ং হটক বা না থাকুক টাকা কড়ির সর্বজ।

মালিকেরা কিছুতেই হাতের কড়ি শিল্পে লবী করতে উৎসাহিত হবে না। কারণ কম দামের সর্বাধিক মুনাকাই পুঁজি লবীর একমাত্র লক্ষ্য থাকে। দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, স্বাভাবিকতার বিচার এসব পুঁজির মালিকদের স্বার্থের আদে না, আগতে পারে না। সব দেশের পুঁজিবাহীরাই এরকম। তারা মুনাকা রকার স্বার্থে এক সময় বা বলে, অত্র সময় তার উলটো বলে বা উলটো কাজ করে। ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার বাবের স্বার্থ রক্ষা করার জন্তে এই মনিটরিং তত্ত্ব প্রয়োগ করছেন এখন তারা তা থেকে পিছু হটছেন। কারণ পুঁজিবাহী এখন ক্রয়রোগে ভুগছে। তবু তাদের দেশের স্বার্থ, জনসাধারণের স্বার্থ চিন্তা করার সময় নেই। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের খরচ কমিয়ে সাময়িক খরচ বাড়ায়। সরকারকে দিয়ে লাভ পরকায় কেনার। তাই আসলে সরকারী খরচ কমে না, বরং বাড়তে থাকে। সুতরাং মুনাকাত্তিও বাড়তে থাকে। দেশের মালবের দুঃখকষ্টও বাড়তে থাকে। আমেরিকা হটক, বুটেন হটক, ফ্রান্স হটক বা জাপান, জার্মানী যে কোন পুঁজিবাহী দেশ হটক, তাদের টিকে থাকার সামাজিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন দুঃখকষ্ট দিন দিন বাড়বে, অশান্তি ও উদ্বেজন বাড়বে, স্বাস্থ্য থাকবে না। আশা ভরসা থাকবে না। ব্রিটিশ অর্থনীতির আসল রোগ এখানে। আমাদের দেশও। পুঁজিবাহী জুনিয়ার কম হটক বা না থাকুক টাকা কড়ির সর্বজ।



নিয়োজক কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডবলু ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থা সমূহের অহুমোহিত টিকাদার / সনসরাহকারী / প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টেওয়ার নং, কাজের নাম এবং টেওয়ার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজভিত্তিক মূল্য করা টেওয়ার।

বিল্ডিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
রেফা: নং: ১১ / জি এম-কে এন টি / ৮৮৩৭ তারিখ ১৮-১১-৮০.

(১) অমৃতনগরে সি ডি এম কন্ট্রোল কম নির্মাণ (২) অমৃতনগরে মেল সাব-স্টেশন নির্মাণের জন্য। উপরে প্রদত্ত সমস্ত কাজের মোট খরচ ২,০২,৯৩০ টাকা। কেশিয়ার / অ্যান্ডিগাস্ট কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টসের কাছে প্রতি সেটের জন্য ৫০ টাকা অথবা ১০০ টাকা নগদে দিয়ে কুহুটোরিয়া এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে ১১-১২-৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে দফা ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত টেওয়ার দলিল পাওয়া যাবে।

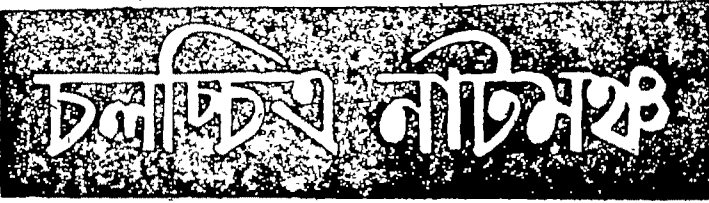
সামান্যতঃ আনুমানিক খরচের ১% বাবনার টাকা সংগ্রহ অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার রসিদ টেওয়ারের সঙ্গে পাঠাতে হবে, অস্ত্রাধার টেওয়ার বাতিল করা হবে। টেওয়ারদাতা অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেওয়ার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেওয়ার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেওয়ারদাতাদের দ্বারা অবিকার লংকিত রাখছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

সাতক ও সাতকোত্তর পর্ষদে পর্ব প্রকাশিত
করেকটি বাংলা বই

- ১। ইলেকট্রনিক্স / ড: অমাদিনাথ দা / ১৫.০০
- ২। ভৌত আলোক বিজ্ঞান / ড: বিজয়শঙ্কর বসাক / ১৫.০০

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ফোরার, কলিকাতা-১৩



দাদার কীর্তি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

কৈশোর উত্তীর্ণ প্রথম যৌবনের প্রেমকে উপলব্ধি করে হালকা রসের ছবি তৈরীতে তরুণ মজুমদার আগেও একাধিকবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেশ বোকা বাবু, এটি তাঁর প্রিয় প্রদর্শন এবং ছবি জন্মিয়েও যেন মানা রক্ত কোতুকুর উপকরণে। দেশ ও দেশের অবস্থা বাই হোক না কেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতই অচল হোক, দর্শক-সাধারণকে ছুঁতেই ছবি আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। এ দেশের তিনি নিপুণ চলচ্চিত্রকার তিনি ধরেছেন নেহাতই বিনোদন মাধ্যম হিসেবে।

রাম গুপ্ত প্রযোজিত তরুণ মজুমদারের 'দাদার কীর্তি' ছবির অলঙ্ঘন শরদ্বন্দ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের এক অপরিণত রচনা। রোমান্টিক কাহিনীর রূপায়ণও রঙে রসে সজীবিত লক্ষ্য নেই। তবে মূল কাহিনীর অতি বিস্তারিত নিখিলতা বোঝা থেকে চিত্রনাট্য মুক্ত নয়, কলে ১৫ রীলের দীর্ঘ ছবির বেশ কিছু অবশ্যই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। ছবিতে আটটি গানের সমাবেশ ছবির গতিককে করেছে মধুর। তবে রমেশ বোশী ও শক্তিধর রায়ের সম্পাদনার গুণে ছবিটি অনেক স্থলে কিংবদন্তি হতে পেরেছে। ছুটি রবীন্দ্র-সংগীত অবশ্য সংযুক্ত হয়েছে।

কাহিনীতে অবাঞ্ছিত আছে। তাই চিত্রনাট্যে প্রসারিত পেয়ে বেশ কিছু দৃশ্য আড়ম্বর মনে হয় ছবির পর্দায়। কলেজে যে পড়ে, তার সেই নিশাট তামসাহসী নিরীহতা স্বপ্ন আহাসুকি পর্দায় পড়ে, তখন মোটা ব্যাপারটাই অবিস্মৃত হয়ে

দাঁড়ায়। তার সেই নিবৃত্তিতা নিয়েই ছবির মজার দৃশ্যগুলি রচিত হয়েছে, যেখানে কীর্তিমান নায়ক হচ্ছে ভোমল, কেদার নয়। কেদারকে নিয়েই ভোমল রগড় করেছে, কিন্তু সত্যবাতার সীমা লঙ্ঘন করে। পশ্চিমের প্রচণ্ড ঝড়ে ভোমলের পরামর্শে বি. এ. ক্লাসের ছেলে কেদার মদীর জলেগলি পর্বত নেমে যে ভাবে লবণতীকে স্মরণ করল জান বুঝি বুঝির অভ তা মোটেই বিশ্বাস নয় বলেই দৃশ্যটি মনে কোম আবেদন দর্শক করেন। যে ছেলেকে একেবারেই গোবর গণেশ মার্কা করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—তারই কণ্ঠে একাধিক রবীন্দ্রসংগীত পাকা পাইয়ের মত পাওয়ারো একটা লজ্জা স্টান্ট, ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। ভোমল তাকে বজল ঘোড় দিতে, আর সে অবিরাম মাঠের ঘোড় অতঃপর পড়ল—এটাই বা কেমন ধরনের কীর্তি, ধরা মুশকিল। ভাগলপুর থেকে পাজ আসছে ট্রেনে, অমনি হঠাৎ দেখা গেল কেদারকে তাড়ের মালপত্র ট্রেন থেকে নামাতে, মাল বইতেও হল তাকে, আবার তারই প্রেমিকার হবু বরের ছুতো জোড়াটা হাতে করে নিয়ে পালিশ করে আনল। এভাবে হতাপ প্রেমিক কেদারের প্রতি সাধারণ দর্শকের লহরীভূতি আগে, না বিরক্তির দর্শক হয়? ছবির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে 'চিত্রনাট্য' নীতিমাটোর চিত্রায়ণ। বিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ দৃশ্য প্রদর্শনীয় হলেও ছবির কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার তেমন দাবী রাখেনা। হোলি দুতের লংবোজনও আরও ব্যঙ্গাত্মক হতে

পারত। ডিটেলসের প্রতি অমন-কতার অভ্যাসীতেও কোকিলের তান শোনা গেছে।

তবে রোমান্টিক দৃশ্য রচনার পরিচালক তাঁর স্বাভাবিক মূল্যবান অঙ্গ রেখেছেন। কি রঙে, কি পরিবেশে আর কি অভিনয়ে রোমান্টিক মুহূর্তগুলি চিত্রিত হয়েছে চরম লাকসে। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামেরা এখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। অস্বস্তিতে হেরত মুখো-পাধ্যায়ও কিছুটা মহারক্ত হয়েছেন ছবির মুড় ফুটিয়ে তুলতে। পরিচালনার আতিশয্য তেমন প্রদর্শন না পেলে আর পরিমিতবোধটুকু বজায় থাকলে এ ছবিটিই রীতিমত উপভোগ্য হতে পারত। হাতরল সৃষ্টিতে যে অতিশয়তা, তাও লজিক লব্ধ হওয়া উচিত বাস্তব চেতনার।

অভিনয়ে নবাগত তাপস পাল 'কেদার' চরিত্রে ফুটিয়েছেন ভালই। মহরা রায়চৌধুরী ও দেবপ্রী রায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। অমন বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বল্প অভিনয়ে করেছেন। অল্পকুমারের 'ভোমল' আতিশয্য ছাড়া। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্য রায়ের অভিনয় চরিত্রোচিত।

বি. এন. সরকার স্মরণে

ভারতে-চিহ্ন প্রয়োজনার ক্ষেত্রে একদা মধ্যমণি, উজ্জল গৌরব স্মৃতির অধিকারী, বহু অসামান্য চিত্র সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র 'নিউ থিয়েটার্স'-এর অধিকর্তা কীর্তিমান বীরেন্দ্রনাথ সরকার অবশেষে চির বিদায় নিলেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র মণ্ডলে স্বহস্তে অর্জন। ফলে গেলে চলবে না যে, তিনিই এদেশে প্রথম বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষী চিত্রের জন্ম দিলেন; বাংলার তৈরী ছবিকে সারা ভারতে জনপ্রিয় করে তুললেন, তাঁরই ছবি নির্মাণ লাকসে অল্পপ্রাপিত হয়ে ভারতে দিকে দিকে চিত্র প্রযোজনার জোয়ার এসেছিল, 'নিউ থিয়েটার্স'-এর পতাকাভলেই প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীতিন বসু, কবি মজুমদার, রিমল রায়ের মত সৃষ্টিধর্মী চলচ্চিত্রকার স্রষ্টার ছবিগুলি উপহার দিয়েছিলেন, 'চণ্ডীদাস', 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'মুক্তি', 'অধিকার', 'রক্ত অরুণী', 'বিভাপতি', 'লাপুড়ে', 'দ্বিধা', 'জীবনমরণ', 'দেশের মাটি', 'সাদী' 'ভাস্কর' 'উদয়ের পথে', 'মহাশূন্য' প্রভৃতি ছবির আবেদন আলো অধীকার করার নয়, কৃকচ্ছ যে,

কুমললাল দারগল, রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিকের মত শিল্পীকে আকরা তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেই পেরেছি, চুর্ণাধার বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাশানী, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, মলিনা দেবী প্রমুখের প্রোডাক্স অভিনয় কৃতিত্বের আকর নিউ থিয়েটার্স ছাড়া আর কোথাও যেতে পাওয়া যায় না।

বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। পিতা স্ত্রী এন. এম. সরকার ছিলেন এন্ড্রিউ আইম-বিদ। বীরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড থেকে সিন্ডিক এন্ডিনিয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে বহু অমন মল্লিক ও হরেন মোহের পরামর্শমত বিশ দশকে ছবির ব্যবসায়ে নামেন। প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইন্টারভিশনাল ফিল্ম ক্র্যাফট কোম্পানী'। ছুটি নির্বাক ছবি তৈরী হল বিশ দশকের শেষ লগ্নে—'চোর কাটা' ও 'চাষার মেয়ে'। তারপরই লবাক ছবির যুগ এস। বীরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন নিউ থিয়েটার্স ১৯৩১ সালে।

তাকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, ফিল্ম কোম্পানীর নাম আপনি 'নিউ থিয়েটার্স' রাখলেন কেন? তিনি বলেছিলেন, ফিল্মের ব্যবসা করব আমি—এটা ছিল সেই যুগে আমা-দের বাড়ির কল্লার বাইরে। বাবা তো এ ব্যাপারে একেবারেই রাজি হবেন না, জানতাম। প্রথম দিকে খুব পোপনে ছোটো নির্বাক ছবি করি। তারপর টকী এস—বেশী টাকার না হলে আর ছবি করা বাবেনা—বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে হবে—কি বলা যায়। সেবে বাড়িতে বসলাম, একটা থিয়েটার কোম্পানী করব—নিজেই বললেন তো অল্পমতি পাবনা। এভাবেই আমার সিনেমা কোম্পানীর নাম হল 'নিউ থিয়েটার্স'। দিবস

হল হাতির মাথা—সিদ্ধিহাতা গণেশের মাথার বিকল্প আর কি।

সেই যুগে এক রক্ষণশীল বনো-বংশের উচ্চ শিক্ত সন্তান হয়ে বীরেন্দ্রনাথ কেরিয়ার বিমর্জন দিয়ে অনিশ্চিত ফিল্মের ব্যবসায়ে নেমে যে হুনাহস দেখিয়েছিলেন, তা আজকের দিনে অনেকেই ভাবতে পারবেন না। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব ও সুযোগ্য মেত্বের ফলেই সেই জিন ও চল্লিশ দশকে হাতি মার্কা ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্র-ইতিহাসে স্বর্ণরূপ প্রবর্তন করেছিল। প্রায় পৌনে দুশো ছবি প্রযোজনার রেকর্ড কৃতিত্বও তাঁর। পরবর্তী কালে যোগ্য শিল্পীর অভাবে পরপর ছবি রূপ করতে লাগল, প্রতিষ্ঠানে দেখা দিল অকল্পনীয় হলাদলি এবং আরও নানা কারণে নিউ থিয়েটার্সের ছবি-প্রযোজনা বৃদ্ধ হয়ে গেল—সে এক বেদমারাত্মক পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্রনাথ অবদর নিয়েছিলেন দীর্ঘকাল আগেই—সেই বাট দশকে। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের লগ্নে তাঁর যোগ ছিল হরনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কমিটির কখনো সভাপতি, কখনো উপদেষ্টা ছিলেন। দেশীয় সরকার তাঁর অবদান স্মরণে তাঁকে পদ্মভূষণ খেতাব দিয়েছিলেন, দাদা নাহেব কালকে পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ আজ নেই, কিন্তু সেই বহু স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক 'নিউ থিয়েটার্স' ইউওটি আজও আছে—তাই বিধান করতে ইচ্ছে করে, বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের লগ্নেট মোচমের আশাবহী সংগীত একদিন ঐ ইউওটি স্রোত থেকেই ভেদে আসবে।

An Approach to Naxalbari

by

ASIT SEN

Price Rs. 20/-

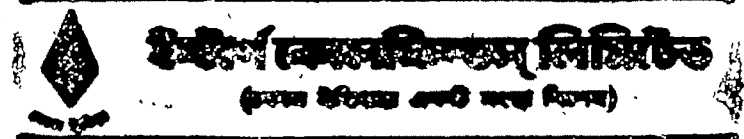
Available at:

Radical Book Club

6, Bankim Chatterjee St.
Calcutta-700073

New Book Centre

14, Ramanath Mujumdar St.
Calcutta-700009



টেগার নোটিশ নং ০০ / টেও / ১৯৩৯ তার ২৪ ১-৮-৩৯

"সংশোধনী"

জিনিসপত্র বিক্রয়

মূল টেগার নোটিশ নং ০০ / টেও / ১৯৩৯ তার ২৪-১-৮০ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট লকলকে জানানো হচ্ছে যে, খালি অয়েল গ্রীক ড্রাম বিক্রয়ের টেগার খোলার শেষ তারিখ ১৬ ১২-৮০ বেলা ১টা পর্যন্ত বধিত করা হয়েছে। অতীত পর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চীক যেটিরিয়ালস ম্যানেজার (অস্থায়ী), চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের অফিস, সীকতোরিয়া, পো: বিশেষগড়, জেলা বর্ধমান।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩ থেকে মুদ্রিত এবং দর্শন কাব্যালয় ৩১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

মোরাদাবাদ দাঙ্গার বলি ৬০০ঃ নেপথ্যে দুই ই-কংগ্রেস নেতা

দুপ্পন

অগ্রবংশ বর্ষ ১৪৪৩ সংখ্যা ১ : শুক্রবার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০১ ৬০ পৃষ্ঠা

রাজ্য ই-কংগ্রেসের দুই বিরোধী গোষ্ঠীর অভিযোগ পাণ্টা অভিযোগ

প্রদেশ ই-কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি অজিত পাণ্ডাকে নাগরালে হলের মধ্যে ঐক্য আনা সভার মত বলে রাজ্যের বেশ কিছু প্রবীণ ও

অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশ কর্তৃক যুবক হত্যা

অন্ধ্রপ্রদেশ নাগরিক স্বাধীনতা কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সেই পুরাতন কার-দার যুবকের আটক করে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, এমকাউন্টারে এই যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের নাগরিকগণ জেলায় ৪ জন এবং ওরারান্দ জেলায় ২ জন যুবকে এমকাউন্টারের নামে হত্যা করা হয়েছে।

এই জাতীয় ঘটনা ঘটান নাগরিকদের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, পুরনায় বৈর-ত দ্বিক শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং এই জাতীয় ঘটনা যদি চলতেই থাকে তাহলে নাগরিক স্বাধীনতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তারিফনাদু এবং মহারাষ্ট্রেও এই জাতীয় ঘটনা ঘটে গেছে।

পুলিশ এই বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার জন্য অন্ধ্র-প্রদেশ নাগরিক স্বাধীনতা কমিটির পক্ষ থেকে দাবীকর্মী জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

অন্ধ্র কংগ্রেস নেতা ইন্দিরা গান্ধীকে লোভাভূজি ভাসিয়ে এসেছেন।

এ আই সি সি-র অধিবেশন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব দ্বিতীয় গিরেছিলেন অধিবেশনে যোগ দিতে। দ্বিতীতে যাবার আগে প্রদেশ ই-কংগ্রেসের কয়েকজন কার্য-করী সমিতির সভাপতি, কয়েকজন বিধানসভা সভাপতি এবং আরও কংগ্রেস থেকে আসা হলের কিছু প্রবীণ নেতা এক বৈঠকে বসেছিলেন।

এ বৈঠকে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সংঘটিত একটি স্মারকলিপি তৈরী করা হয়। অজিত-বাবুর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির মধ্যে আছে নতুন করে গোষ্ঠী তৈরী করা, উপরত্নীয় কোর্সে যত্ন দেওয়া, লংগঠনের টাকার নিজের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের খরচ বেটান, হলের প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে লাংগঠনিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এছাড়া আরও কিছু অভিযোগ অজিত পাণ্ডার বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

দ্বিতীতে যাবার আগে গোপাল দাস নাগ, ভোলাসেন, সুরত মুখার্জী, আম্বসোপাল মুখার্জী রজনী রসুট, কাজী আবদুল গফ্ফর, আবদুল দাভার প্রমুখ নেতারা দীর্ঘ আলো-চনা করে অভিযোগের খসড়া তৈরী করেন।

দ্বিতীতে এ আই সি সি-র অধি-বেশন চলাকালীন সময়ে পাণ্ডা-নেপাং ১ম পৃষ্ঠা

লোকসভার সাপ্তাহিক পরি-ষিতি ও মোরাদাবাদ দাঙ্গা সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজিত্ব বহু বসেন যে, এ বছরেই অন্ততঃ সাতশো জন সাপ্তাহিক দাঙ্গার বলি হয়েছেন। সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে ভোটার আগে অনেক স্তোকবাক্য শোনানো হলো এবং শালক হলের কাছে তাঁদের প্রয়োজন কুরিয়েছে।

ঐক্যী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে মোরাদাবাদের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। বলা হচ্ছে যে, মুসলমান

ভাইয়েরা সেদিন দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর পকাশ দাঙ্গার মুসল-মান ভাই ঐ উপলক্ষে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, আর তারা যদি দাঙ্গার প্রস্তুতি নিয়েই আসতেন, তাহলে দলে শিশুদেরকে সেখানে নিয়ে যেতেন না। ঐক্য মোরাদা-বাদের ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালা-বাগের সঙ্গে তুলনা করে অভিযোগ করেন যে মহান্নার মহান্নার সংখ্যালঘু-দের লাড়ো ছশো বাড়ি ও দোকান লুণ্ঠ করা হয়েছে। হতাহতদের সংখ্যাও আত্মমানিক ছশো হবে। হাতে আইন নিয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠ-পোষকতার পুলিশ ঐ অঞ্চল কাজ করেছে। অঞ্চল বরাইটমন্ত্রী পুলিশের ক্ষমিকার প্রশংসা করেছেন। এর কলে বিবে-ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে।

মোরাদাবাদের দাঙ্গার পেছনে

জনৈক ধর্মমন্ড গুণা ও কাউন্সিল দ্বারা মায় শিবু উল্লেখ করেন। ছতনেই মোরাদাবাদ টাউন ই-কং কমিটির নেতা এবং শেখোক্ত-জন সি বি গুপ্ত নেতৃত্বাধীন প্রাক্তন উত্তর-প্রদেশ মহান্নার সভাপতি ছিলেন এবং যেনে প্রাণে তিনি মুসলমান বিধেবী। ঐক্য উত্তরপ্রদেশের ই-কং এম এল এ ও কুখ্যাত বিমান ছিনতাইকারী ঐক্যদ্বারা পাণ্ডা ও ঐক্যমোহনদ্বারা গুণার বিরুদ্ধেও এ প্রসঙ্গে অভিযোগ করেন। ঐক্যগার লেখা "মোরাদা-বাদের বার্নিং" দীর্ঘকাল বইতে লেখা হয়েছে যে "মোরাদাবাদ মুসলমান-দের দ্বারা বেষ্টিত হয়েছে।" এই বই বিবেশেও গেছে। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির চোখে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ঐক্য আরো অভি-যোগ করেন যে, দাঙ্গা পীড়িত ও শেখোক্ত ৮ম পৃষ্ঠা

বন্ধুত্বের
হাতি!



শিল্পপতি গোষ্ঠীর স্বার্থে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক হাসপাতালের সুযোগ বঞ্চিত

নয়া দিল্লী : দক্ষিণ দিল্লীর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ই এস আই হাসপাতা-লের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। ১০ একর জমি ই এস আই হাস-পাতালের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ব্যবস্থা টাকাও করা করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিল্পপতি গোষ্ঠী "মোহি গ্রুপ"কে গুপ্ত করার জন্য তা মাকচ করা হল। এটা এই ভিত্তিতে একটি হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ করতে চায়।

জানা গেছে, দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃ-পক্ষের ও দিল্লী প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সমস্ত সূত্র ও অহুগোষ উপেক্ষা করে লেকটেন্যান্ট গভর্নর "মোহি গ্রুপ"র পক্ষে মায় বেন।

ব্যাপারটার এত তাড়াতাড়ি করা হয়েছে যে, এটা কয়েকদিনের মধ্যেই কমিটির দফল পার এবং চারদিকে প্রাচীর তুলতে শুরু করে দেয় মাপ সম্পূর্ণ হওয়ার অথবা আরবাম আর্টস কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অহুগোষন পাবার আগেই।

দক্ষিণ দিল্লীর কলোনি লাকোতে ই এস আই হাসপাতালের জমি ১০ একর জমি বরাদ্দ ছিল। এই হাস-পাতাল লক্ষ লক্ষ শ্রমিকেরা মাল্যবের দেবা করতে পারত মাল্যবের পক্ষে দক্ষিণ দিল্লী থেকে সূত্র বাসাই দ্বারা পূর্ব হাসপাতালে মাতারাত কট-কর ছিল। টাকা দেবার পর ই এস

আই কর্তৃপক্ষ বলেন যে, ঐ ভিত্তিতে যে স্থপতিগণ আচ্ছাদিত এটা সরিয়ে দেবার পর টাকা কমির দফল নেবেন। কিন্তু যখন দফল দেবার সময় এসে তখন তাঁদের বলা হল যেতেই টাকা কমির দফল নেননি তাই এই বন্ধোবস্ত নাকচ করা হল।

প্রকৃত পক্ষে, মোহি গ্রুপকে ৩৭ লক্ষ টাকার ১৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে, যার বর্তমান মূল্য ১০ কোটি।

মোহিদের বক্তব্য, তাঁদের হাস-পাতালে ও রিসার্চ সেন্টারে তাঁদের চিকিৎসা করা হবে এবং ইংল্যান্ডে নিউইয়র্ক, লন্ডন ও টোকিওর মান অহুগোষ চিকিৎসা করাতে চান।

সম্পাদকীয়

আবার সেই ভয়ঙ্কর দিন আসন্ন ?

আবার সেই - রতনের দাপি-
দাপি, শকুনের ডানা কাপটাদি দেখা
গেল রাজধানীর বুকে। নয়াদিল্লীর
তালকাটোয়ার এ আই সি সি (ই)
সম্মেলন আবার বেশে জরুরী অবস্থা
ও বিনা জারী করার, রাষ্ট্রপতি ঘাঁচে
পরকার গঠনের এবং পশ্চিমবঙ্গ
জিপুরা ও কেরলের বায়-গণতান্ত্রিক
ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর
সপক্ষে আওরাজ তোলাকে আর
কিদের সঙ্গে তুলনা করা চলে ?
প্রাথমিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক
ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা
বক্তৃতা সবই হয়েছে। হয়নি কেবল
দেশের পরিহিতের বস্ত্রিষ্ঠ মূল্যায়ন
বা তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

বিদ্যা সমেত জরুরী অবস্থার ঘটিয়ে
প্রতি কংগ্রেসের (ই) হাত আবার
ধাক্কাধাক্কি করছে কেন? করছে
একজ্ঞ বে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশের
কোন সমস্তার সমাধান করা ইন্দিরা
সরকারের ক্ষমতার সীমারে না
বলে। কি প্রযুক্তি বুদ্ধি কি সাম্প্র-
দায়িক বা বর্ণগত বিরোধ, কিবা
আইন ও শৃঙ্খলা পরিহিত, মহা-
রাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন কোনটারই
কোন স্তরোহা করে উঠতে শ্রীমতী
গান্ধী পারছেন না। তার অঙ্গগামী
মুখ্যমন্ত্রীদের তো কথাই নেই।
বিরোধী হলগুলো সরকারের ব্যর্থ-
তাকে তুলে ধরে দেশবাসীর রাজ-
নৈতিক চেতনার উদ্বোধন ঘটাবার
চেষ্টা করছে। আর সেটাই ই-কংগ্রে-
সের চোখে বিরোধীদের পক্ষে
কমার অযোগ্য অপরাধ। সেজন্যই
বিরোধীদের চিট করার ক্ষমতা ১৯৭৫-
৭৬ সালের মতো বিরোধী নেতাদের
জেলে পুরে দাপটে রাজত্ব চালাবার
অজ্ঞ আজ ই-কংগ্রেসের বিনা ও
জরুরী অবস্থা জরুরী হয়ে পড়েছে।
আর কী কী চাই? চাই রাষ্ট্রপতি
প্রধান সরকার যেখানে সংসদীয় গণ-
তন্ত্র, গণতান্ত্রিক নির্বাচন ইত্যাদির
কোন মুখা সূক্ষ্মা থাকবে না, রাষ্ট্র-
পতিই হবেন দেশের সমস্ত দণ্ডমণ্ডের
কর্তা, লংঘনের কাছেও তাকে কোন
কাজের ক্ষমতা জবাবদিহি করতে হবে
না। সেই গণিটিকার দৃষ্টে যাবে
তা আপোনাগো টিক করে নিয়েই
ই-কংগ্রেসীরা সরকার ব্যবস্থার ধাঁচ
পাটোতে উড়োশালা হয়েছেন। রাষ্ট্র-
পতির আসনে শ্রীমতী গান্ধী ছাড়া
আর কাউকে বসতে দেওয়া হবে
না। আর কী? আর চাই
একজন জবরদস্ত সেনাপতি,

সমস্ত গান্ধীর আকস্মিক অস্ত্রধানে কে
আসন্নটি শূন্য পড়ে রয়েছে। সে-পক্ষে
চাই রাজীব গান্ধীকে। রাজীবের
প্রাথমিক বিধার কোনো তোরগাই
ই-কংগ্রেসীরা করতে না যদি
সমস্ত তনয়ের মুখে পৌঁছের রেখাটি
দেখা যেত। আরো, আরো চাই।
পশ্চিমবঙ্গ, জিপুরা ও কেরলে বায়ফ্রন্ট
সরকারের উদ্বেগ চাই। কারণ
তার উত্তরোত্তর দাক্ষ্য শ্রীবুদ্ধি ও
অমগ্রিতার পাশাপাশি কংগ্রেস-ই
রাজ্যলোভের ব্যর্থতা অপদার্বতা ও
জনবিরোধিতা চোখে বড় বিসদৃশ
ঠেকেছে। বেন ই-কংগ্রেসের পালে
কেরল জিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ঠান ঠান
করে চড় মারছে। পশ্চিমবঙ্গের
সাম্প্রতিক লক্ষ্য বঙ্ অজিত পাণ্ডা
ভোলা দেবের মুখে আলকাতরা
মেপে দিয়েছে। কাজেই কেন্দ্রীয়
সরকার যদি নিজের "শক্তি" প্রয়োগ
করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এখনই
গণিচ্যুত না করেন, তবে রাজ্যের
ই-কংগ্রেসীদের পক্ষে কালো মুখ
নিরে রাজ্যের বেরোনো, লোকের
দামনে দাঁড়ানোই দার হবে।

কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেসীরা কেন
বিস্মত হন বে, ১৯৭৫ সাল বা তার
পারিপার্শ্বিক সব্বা, সেদিনের রাজ-
নৈতিক ক্রীড়াভা জীকতা আজ ১৯৮০
সালে উপস্থিত নেই? একথা ঠিক
বে, ১৯৭৭-৭৯র বৈরতন্ত্র বিরোধী
নেতাদের একাংশকে ইন্দিরা গান্ধী
টোপ পেলাতে লক্ষ্য হয়েছেন,
তারের কিনে ফেলেছেন, বিরোধী
এক্যে ফাটল ধরতেও লক্ষ্য হয়ে-
ছেন। কিন্তু ভাড়াচোরা হল নিয়েও
বিরোধী পক্ষ বে ইন্দিরা সরকারকে
যথেষ্ট বেগ দিচ্ছেন তার প্রমাণ তো
আবার বেশে জরুরী অবস্থার লাঠি
হাটানো। ইন্দিরা গান্ধীর হাতে
আজ যথেষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, তা
সব্বও তাকে আজ নতুন অস্ত্রের—
আর সেটা পারমাণবিক অস্ত্রের
মতোই অযোগ্য—সন্ধান করতে হচ্ছে
কেন? কারণ তার আচরিত নীতি
ও দৃষ্টিভঙ্গিটাই স্রাঙ্ক। সেজন্যই
এগারো মাস ধরে নিরুপুক্ষ ক্ষমতা
ধারণ করে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েদ
করেও আসার সমস্তার কোন ফর-
লালা তিনি করতে পারলেন না।
সেখানে কংগ্রেস-ই সরকার কার্যে
করে তিনি নতুন করে পরীক্ষানিরী-
কার মামলেন বটে, কিন্তু তার এ-
মোহ ভাঙতেও দেরি হবে না। তাল-

পরিকল্পনা দপ্তরের কিছু রহস্য

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক
শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যের
কিছু সরকারী অফিসার বায়ফ্রন্ট
সরকারের পতন ঘটানো ও সি সি
এম হলের ইমেজ খসে করার চক্রান্ত
চালিয়ে যাচ্ছেন। বাধা পাচ্ছেন না,
কারণ রাজ্য কো-অভিযোজন কমিটির
কিছু শাণ্ডার প্রতিক্রিয়াশীল ভূত
চুকেছে পরসার জোরে। চক্রান্তের
পিছনে আছে পরিকল্পিত পদ্ধতি বার
প্রথম ধাপ বিভ্রাৎ, দ্বিতীয় ধাপ পরি-
কল্পনা দপ্তর, তৃতীয় ধাপ বাত দপ্তর।
আপাততঃ পরিকল্পনা দপ্তরের কিছু
রহস্য তুলে ধরা যাক।

(১) পরিকল্পনা দপ্তরে গত তিন-
বছরে প্রায় কিছুই কাজ হয়নি। সি
এম ডি এ এলাকার বাইরে পঃ বনের
উন্নয়ন না থাকায় বায়ফ্রন্ট সরকারের
প্রতি মাহুকের বিশ্বাস থাকার কারণে।
আগামী নির্বাচনে এ ঘটনার প্রতি-
কলম অনিবার্য। বিরোধী হল এসব
ঘটনা প্রচারের সুযোগ নিতে
চলেছে।

(২) ডঃ অশোক মিজ পরিকল্পনা
দপ্তরের কাজ করার কিছুই উৎসাহ
দেখান নি, প্রকৃত পরিহিত নিরে
কোনও বিবৃতি দেন নি।

(৩) অবাকালী শিল্প প তি র
বিরাট বাড়ীতে (১৮ মং রবীন্দ্র সরণী,
কলি-১) হু'দানা প্রকাশ ফোর (প্রায়
তিরিশ হাজার বর্গফুট) ভাড়া নিরে
অফিস রাখতে বায়ফ্রন্ট সরকারের
চূর্বল তহবিল থেকে গান্ধী দেশের
টাকার বিরাট অপচয় হচ্ছে। অথচ
কাজের ক্ষেত্রটি সি এম ডি এ-এলা-
কার বাইরে। কিছু পত্রিকা সাংবা-
হিক এই বিরাট সেনদেবনের পিছনে
রহস্যের পক্ষ পেয়ে পোদার বিলম্বি-
য়ের মালিকদের লক্ষ্যানে ঘুর ঘুর
করছেন।

(৪) পোইল খরচ ও বহুদণ্ড্যক
বহু অফিসারের বেতন বাবদ প্রচুর

কোটরাজ এ আই সি সি সম্মেলনে
দেশের আগামী দিনের রাজনৈতিক
পরিহিতরই জুস্ট ইন্টি পাওয়া
গেল। সেটা হল, গণতন্ত্রকে গোর
দিয়ে কবরের ওপর বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার
আয়োজন করা। সে-লক্ষ্য সামনে
রেখেই কংগ্রেস-ই শিবিরে 'মাতো'
'মাতো' রব পড়ে গিয়েছে। শ্রীমতী
গান্ধীতো বিরোধীদের মোকাবিলায়
লক্ষ্যমাত্রের সে-প্রস্তুতি গ্রহণের
নির্দেশই দিয়েছেন। কিন্তু ভাবক
মোদাহেবদের সমর্থনের ওপর ভরসা
করার পরিণামহেতু ইন্দিরার ডিক্টেটর
হয়ে বসা যদি না ঘটে, তবে কি সাম-
রিক বাইনীর হাতেই তুলে দেবেন?
বিরোধী নেতারা আকাশের সিঁচুর
মেঘ লক্ষ্য করছেন তো?

খরচ হচ্ছে, বা' প্রকাশিত হলেন
সাধারণ চমকে উঠতে পারেন।

(৫) দপ্তরে কাজ না হওয়ার
প্রধান করেন নন্ গেজেটেড টেকনি-
ক্যাল স্টাফের উপর দপ্তরের লেক্চ-
চারিয়েটের কিছু অফিসারের
আক্রোশপূর্ণ অত্যাচার। নন্ টেক-
নিক্যাল কোনও স্টাফের ইনক্রিমেণ্ট,
সিলেকশন গ্রেড বা টি এ বিল এক-
দিনও আটকে থাকে না। কিন্তু
টেকনিক্যাল স্টাফের সে সব পাওয়া
দীর্ঘকাল বাবৎ জবরদস্তি আটকে
রাখা হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত পুরের
দপ্তরের প্রচুর কর্মীও এই বড়বড়ের
শিকারে পরিণত হয়েছেন। টেক-
নিক্যাল স্টাফকে বিচ্ছিন্ন, উত্তেজিত,
কর্মবিমুগ্ন করে পরিকল্পনা দপ্তরকে
এবং শ্রীপ্রশান্ত পুরের আরবান
ডেভেলপমেন্ট দপ্তরকে অচল করার
এই স্ট্রাটেজি এনেছে এক প্রতিক্রিয়া-
শীল রাজনৈতিক হলের কাছ থেকে।
শ্রীপুর এখনও তার মতন দপ্তর খর-
সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।

(৬) পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মীদের
সংখ্যা "কো-অভিযোজন কমিটি"র কিছু
নেতাকে (লক্ষ্যকে নয়) বায়ফ্রন্ট
বিরোধী এক রাজনৈতিক হল প্রচুর
টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে বলে
গোপন খবর পাওয়া যাচ্ছে। ডঃ মিজ
বখনই পরিকল্পনা দপ্তরকে আশান-
মোল প্রানিং ও শিলিঙি (উন্নয়-
বল) প্রানিং-এ নিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ
কাজ করার চেষ্টা করেছেন তখনই
এই নকল নেতা (অর্থাৎ কো-অভি-
যোজন কমিটির শত্রু) প্রবল বাধা
দেন। এর ফলে বায়ফ্রন্ট সরকারের
প্রচুর বহনায় ও ভবিষ্যত নির্বাচনী
ক্ষতি হতে চলেছে।

এই হ'ল দপ্তরের প্রকৃত হাল-
চাল। মন্ত্রী ডঃ মিজ সবই বুঝতে
পারেন, কিন্তু প্রতিকার করেন না।

দীর্ঘ চার বৎসরের বকেয়া
সিলেকশন গ্রেড আদায় করার ক্ষমতা
হতভাগ্য কারিগরী কর্মীরা মহাভাঙ
হাইকোর্টের আশ্রয় নেন। হাইকোর্ট
থেকে কর্মীদের অস্থূল কিছু আদেশ
দেওয়া হয়। লেক্চচারিয়েট অফি-
সার সে আদেশ দেড় বৎসর চাপা
দিয়ে রাখেন। সম্প্রতি দপ্তরের নতুন
বড়কর্তা হাইকোর্টের নির্দেশ কার্ভ-
কর করার অজ্ঞ ফাইলে লিখিত
আদেশ দেন। কিন্তু দপ্তরে সংবাদ
প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সে আদেশ
নাকি কার্ভকর হয় নি। দপ্তরের
লেক্চচারিয়েটের জটিল অফিসার
(কংগ্রেসী আমলে তিনবার প্রমো-
শন প্রাপ্ত) নাকি টেকনিক্যাল কর্মী-
দের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন—

"কিছুতেই আপনাদের পাওয়া
সিলেকশন গ্রেড পাবেন না। অপদার্ব
মন্ত্রী একজ্ঞ দারী। কিছুদিন পরে গান্ধী
হারিয়ে মন্ত্রীমশাই হবেন Common
man। তখন হাইকোর্টের অর্ডার
হাতে নিয়ে মন্ত্রীকে সাধর করবেন।
ওর নির্বাচনে দাঁড়ানোর সময় সব
কীর্তি জানিয়ে প্রচার চালাবেন,
বায়ফ্রন্টকে জড়িয়ে দেবেন। মন্ত্রীর
গোপন নির্দেশেই আপনাদের সিলে-
কশন গ্রেড ও পে-কিকসেশান আটকে
থাকবে। চ্যালেঞ্জ। রাজ্যের ট্রাফিক
জ্যাব যদি পিছনের দিকে হয় তবে
দামনের দিকের পাড়ীগুলিকেও
জোর করে আটকে রাখার ঘটনা
ওনেছেন কখনও? শোনেম নি।
আপনাদের গ্রেডেশন লিস্টের নীচের
দিকে একজন প্রার্থীর কেস নিয়ে একটু
গুণগোল আছে এই ধরনের হাতকর
অস্থূহাত দেখিয়ে লিস্টের উপর দিকের
প্রার্থীদেরও জোর করে আটকানো
হবে। হাইকোর্টের মারজার আদৌ
জড়িত নন্ এমন কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রেও
একই গ্রেডেশন লিস্টের মধ্যে জোর
করে জড়িয়ে আটকানো হচ্ছে দেখ-
ছেন না? বড়কর্তার গ্রীন সিগনাল
ও অর্ডার থাকা সত্ত্বেও ঐ জবরদস্তি
চলবে। আপনারা বতকপ মন্ত্রীর
কুকীর্তি প্রচার না করবেন ততকপ
এসব চলবে এবং ডঃ মিজর দপ্তর ও
প্রশান্ত পুরের আরবান ডেভেলপ-
মেন্ট অচল করা থাকবে। আবার
বায় জুহু মদকা, হ' হ'।"

অভিযোগ

হুগলী চিণ্ডীতলা ধানার ২মং
পকারেত সুরিত্তির এলাকার বেলে-
ডালা গ্রামে গভীর মলকুপের সরকারী
কর্মচারীরা বেশ কিছুদিন ধরে টাকা
নিরে কোন ক্ষেত্রে রনিধ না দিয়ে,
কোন ক্ষেত্রে কাঁচা রনিধ দিয়ে জল-
কর মিছে বলে অভিযোগ গ্রাম-
বাসীরা মহাকরণে জানিয়েছেন।
কাঁচা রনিধ দেবার একবছর পরেও
পাকা রনিধ দেওয়া হয়নি। কোন
কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে কাঁচা ও
পাকা রনিধে টাকার অঙ্কে মিল
নেই। এই বিভাগের তলা থেকে
উচ্চ স্তর পর্যন্ত এই ধরনের দুর্নীতি
চলে। এমন কি বি ডি ওর কাছে
অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া
যায়নি।

রুগ্ন শিল্পের বহুস্ত

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনাধীনে রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে একটা সমীক্ষা হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল গণিত ২০১০০টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং ৩৪৫টি বৃহৎ-কার শিল্প রুগ্ন। সংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি অসংখ্য অনেক। কিন্তু ৩৪৫টি বৃহৎ শিল্প দেশের সমীক্ষাগত বৃত্তমূল্য ভূমির দ্বিগুণে, ২০১০০টি ক্ষুদ্র শিল্প সেই ভূমির নিম্নাংশ অকিঞ্চিৎকর।

৩৪৫টি বৃহৎকার শিল্পে ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণ ছুঁতে ১১০১৭২ কোটি টাকা। কারো ব্যাঙ্ক ঋণই এক কোটি টাকার কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশী। আর ২০১০০ ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাঙ্ক ঋণ মোট ২৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান শিল্প গড়ে ১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলি রুগ্ন হওয়ার কারণ বোঝা যায়। দেশে বহন বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে তখন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে আর্থিক অসমন, কাঁচামাল ও বাজারের অভাব তাদের রুগ্ন করে তুলতে পারে। যদি অর্ডার থাকে তো বরাদ্দ কিন্তু কাজে লাগানোর টাকা থাকে না। বহু কষ্টে হাতে পারে ধরে যদি বা টাকার যোগাড় হয় তাহলে কাঁচামাল থাকে না; লাইসেন্স পারমিট সুপারিশ মানা বাট ঘুরে বহন উৎপাদন শুরু হয় তখন বৃহৎ ব্যবসায়ীরা এসব প্রতিযোগিতা ও অর্ধেক উপায়ে তাদের মাথা তুলতে দেয় না। এদিকে সরকার ও ব্যাঙ্কের ঋণ, অবিক্রীত পণ্য এবং কর্মীদের দাবি সব মিলে ব্যবসা লাটে ওঠে। আমি এমন বহু উপায়ে তরুণ ক্ষুদ্র-শিল্পের লগ্ন্যর্থকে জানি, যারা শেষ পর্যন্ত আর্থিক দাব্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে ব্যবসা হুলে দিয়ে চাকরী বাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

অতীতের সরকার যুগে বাই বসুন, কাজের পছন্দি ও নিয়ন্ত্রকালন বা করে রেখেছেন তাতে পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোর গিরে পড়ে। সম্ভ্রান্ত সরকার এক কাছন করেছেন যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি কোন রুগ্ন শিল্পকে অস্বীকৃত (মার্জার) করে দেয়, তাহলে রুগ্ন শিল্পের লোকসান বাবদ অর্ধ মৌট আয়কর থেকে রেহাই পাবে। এহেন ক্ষুদ্র কারখানার কলে বহু লাভজনক শিল্প লগ্ন্য লোকসানে ছুঁত লগ্ন্য কিনে অস্বীকৃত করেছে। আবার একই বা লি বা নার বিভিন্ন

কোম্পানীকে হিসাবপত্রের কারকা করে রুগ্ন করে অস্বীকৃত করেছে। বাবের হারীর বহলে বহু বোমপো এসে লব গ্রহণ করেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রের বহিষ্কারি বাই।

রহস্যটা এখানে ভাল ভাল। আরো একটু গভীরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে শিল্পকে রুগ্ন করে তোলার কার্যক্রমী খার্ব খটি হয়েছে।

এই খার্বচকের চকীরা হলেন অনেকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সূতপূর্ব কর্মকর্তারা। এই ব্যাঙ্কগুলি বহন ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল তখন টাটা, বিজলী, সিংহানিয়া, ভালমিয়া, গোয়েন্দারা দেশের বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মালিক ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব-করণের আগেকার এক রিপোর্টে জানা যায় যে তখন ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণ-

আর্থনীতি

পের লক্ষ্য আদানত রেখে নিজেরা পোপন চুক্তি করে লবাই নারবাজ হুহ দিত আর আদানত জয়ার অর্থ এই রাখব বোয়ালদের বিনা হুবে অথবা বিনা জামিনে ধার দিত। ব্যাঙ্ক বহন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হল তখন এই লক্ষ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের কর্তব্যেরা বেশ কাপরে পড়েন। কারণ প্রচলিত ব্যক্তি আইনে ধার দেবার কিছু কড়াকড়ি ছিল।

ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করার ইচ্ছা বৃহৎ ও একচেটিয়া মালিকদের ছিল কি না জানি না, কিন্তু সরকার বহন তাদেরই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব ছিলেন তখন তারা কীকি দেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। অর্থ-বর্ধ কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্বি রুগ্ন হয়ে পড়ল। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ কোটি মূলধন দিয়ে আই আর, সি, আর্টি গড়লেন। তারের রুগ্ন শিল্পগুলিকে তুলে ধরে আবার চালা করে তোলার কথা। কিন্তু শিল্পাল পত্তিতের হাতে কুহীরের ছায়া তুলে দেওয়া হল। আই, আর, সি আই-এর পরিচালকবর্গী ও কর্মকর্তা বারা হলেন তারাও গ্রাফন ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাঙ্কের পরিচালক ও কর্মকর্তা। এরা এবার আগেকার বোমাইনী দায়ন নতুন কোম্পানীগুলির বাড়ে চাপালেন আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে এই লোকসান খাওয়া দায়ন তুলে নিলেন। রুগ্ন শিল্পগুলির খায়া ভালো হতে পারল না।

সেবাংগ ৪র্থ পৃষ্ঠায়

২৭শে নভেম্বর ১৯৮০

শ্রীকান্ত বসুসার

কেন্দ্রীয় ইন্দিরা সরকার কোম ব্যাংকেই জনগণের আশীর্বাদপুট নয়; শতকরা মাত্র বিশ-পঁচিশ জন গ্রাণ্ডবরদের লম্বনে কোন জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার হয় না, এইটুকু বুঝতে হলে কোন দিব্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এরূপ গাণিতিক লভ্যের আর একটা বহুতা হয়ে গেল গত ২৭শে নভেম্বরের বাংলা বন্ধে। কেন্দ্র-পন্থী লবীগুলি এ বন্ধের পেছনে গণসমর্থনের পরিমাণকে লম্ব করে দেখানোর বহুই চেষ্টা করুক না কেন, রাজ্য সরকারের অপ্রতিরোধ্য-মূলক এবং মৈত্রিক লম্বনমূলক ছুরিকাকে বন্ধ দাকল্যের প্রথম কারণ হিসেবে বহু খুশী অভিরঞ্জন করুক না কেন, পাপের কেন্দ্র দ্বিতীয় মনোবল এত লম্বকে বেড়ে বাবে না। বন্ধের বহু বিস্তৃত পটভূমিকার রাজ্য সরকারের অকিল আদালতই বা কটা? শিল্পাঙ্গের লম্ব লম্ব কলকারখানা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক লম্ব অভ্যন্তর ব্যাঙ্কের অকিলগুলি, বেসরকারী বামবাহন ব্যবস্থা, বাজার কোমপাটি এসব কিছুতেও কি রাজ্য সরকারের তালো তুলছিলো? কেন্দ্রীয় লগ্ন্যগুলিতে কি খাওয়া শোয়ার এলাহি বন্দোবস্ত লম্বও হাজিরা এমন হয়ে গেল কেন? গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ ক্ষেতরজুর কলি রোজগার বহু রেখে বিকোত জানালো কেন? বলা বাহুল্য, গণ-জোহী জাতিজোহী দেশজোহী শক্তি-গুলির বিভিন্ন মহল কোন কালেই ঘেরালেন। লিখন দেখতে পায় না, গণমেজাজকে চেমে না; নিজ নিজ অস্ত্রের কারণেই এরূপ জনশত্রুতা পাথরে মাথা ঠুকে পাথর ভাঙতে চায়, গাছার লম্ব লম্বাই করে গাছার তলার তলিয়ে যায়। ২৭শে নভেম্বরের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মুখেরা নিজ নিজ ঐতিহ্য থেকে একতুলও বিচ্যুত হয় মি।

২৭শে নভেম্বরের বাংলা বন্ধ, পাশাপাশি বিহার বন্ধ, মিম কয়েকের মধ্যেই ওড়িশা বন্ধের ভাং-পর্ব অবতাই নিত্যন্ত বাবুলী হতে পারে না। বাংলা বন্ধের আপাত উদ্যোগী বাবুলী হলো এ কেন্দ্র বিরোধী বিকোতে জনসাধারণের লক্ষ্য লম্বমিচ্ছা এক অখণ্ড রূপ নিরেছিল লম্বহ নেই। যে দ্বিতী দেশী বিদেশী পুঁজি শোষণের অলম্ব-নীর্ বাজাকে আরো অলম্বনীর করে তুলতে কোন আচরণ বিধির বিন্দুমাছ তোলার করে না, বকার বকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের বখা করলো কেরোলিন-ডিজেল চাল

চিনি নিমেন্ট ইত্যাদির দাম চড়িয়ে জনজীবনে আগুন ধরিয়ে দিতে এবং লম্বরূপ অসুভাবিকতাকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চিরঅভ্যন্ত, তছপরি প্রাণেপিক আকলিক লম্ব-হারগত জাতপাতগত লম্বাগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক কাজে লাগিয়ে কলম তুলতে চায়, শোষণে অভ্যাসারে জর্জরিত বাবুলীকে ঠাণ্ডা করে রাখতে বহনমূলক উপায়ের লম্ব লম্ব হাতিয়ার তাক করে রেখেছে; সে দ্বিতীয় জন্তে কল চলান নিরে বসে আছে কে? অবতাই পশ্চিমবাংলা নয়, বিহার কিংবা ওড়িশাও নয়।

তবে বারা কারক-পুঁজির এটো-কাটা চেটে জীবনের আশ-পিতোপ মেটাতে অভ্যন্ত তাদের কথা আলাদা; অবস্থা সুগতিক নয় রেখে তারা যদি 'মায়ের' আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে আশ্রয়ের কিছু নেই। দৈনিক পত্রিকার প্রগল্ভ লম্বাঙ্গক মশাইরা—তা সে আনন্দ-বাকার যুগান্তর হোক আর ঐটু-ম্যান-ই হোক—বতাবতই একেজে

আনন্দবাজারী ভূমিকায় যুগান্তর

বুটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অসুভাব্যতার পত্রিকা পরিবারের বিশেষত: প্রগল্ভ শিশির ঘোষের লম্বাঙ্গনাকালে জাতীয়তাবাদী লম্ব, নিত্যক ভূমিকা আঙও সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক কর্মতা হস্তান্তরের পরই লম্ববাজার-যুগান্তর লম্বাঙ্গন ছুটি লম্বাবাহিক-পত্র তার লম্বতা নিত্যকতা হারিয়ে বিজ্ঞাপনের লোভে অথবা হীন রাজ-নৈতিক আশ্রয়ে প্রথম যুগের চরিত্র হারিয়েছে।

রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে লম্বাবহ পরিবেশনের ও বহর বিকৃতির ছুটো উদ্যোগ হিচ্ছি। জাতীয়-নিরাপত্তা অভিভালের প্রতিবাদে লম্বা মিহি-লের খবর এই কাগজ হুটোর অতি অল্প প্রকাশিত হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর কলকাতার টুডেইল হল এই অভিভাল বাতিলের দাবিতে আহত এক কনভেনশনে ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীহরিপদ তারতী, শ্রীঅমর চক্রবর্তী (এম পি) প্রমুখ বক্তৃতা দেন। যুগান্তর পত্রিকার একজন লম্বাবাহিক প্রায় বহু বটা লম্বার থেকে রিপোর্ট চৌকেন। কিন্তু কোন খবর প্রকা-শিত হল না। আলজে এই লম্বাবাহিক রিপোর্ট হিলেও বাঙা লম্বাবাহিক তা প্রকাশ করেননি। অকরী অবস্থার

ব্যতিক্রম হতে পারে না। অল্প-বিভার তরুণী কলরং দেখিয়ে নিজেদের বাহাছুরীতে এরা নিজেরাই যোদ্ধা। এদের বারা ভেবেছিল বাবুলী সরকারের ছলচ্ছারায় বসে 'এক লম্ব পুঁজিবাদের কল খেয়ে আর লম্বাজতরের শয্যায় শুয়ে' থাকার মোহে পশ্চিমবঙ্গের তারার জনগণ বুঁদ হয়ে আছে, অতএব কেন্দ্র-রাজ্য বহু তথা 'শাসক-শাসিত বহু তথা রাষ্ট্র-জনগণ বহু জনসাধারণের লম্বরের বাইরে চলে গেছে, সে গণ-বুঁদদের তুল ভাঙানো কারো দায় নয়, তাদের শেখগতি ইতিহাসে মিথারিত। এ লম্ব তুল তাদের বহুই হয় ততই মজল। মার লম্বাটি এই যে, আন্দোলনের দুরদৃষ্টি ও ধারা-বাহিকতা তার গতিপ্রকৃতিকে মিথার-রণ করে; স্তরায় বাবুলীকে নয়-পাতিবুঁজোয় লম্বত বিচ্যুতির বিশল লম্বকে লম্বাগ থেকেও একথা বলা যায় যে, এ কেন্দ্র বিরোধী জনমেজাজ যদি আগামী দিনের রাষ্ট্র ও জনগণের লম্বক নিধারণের সংগ্রামের উদ্যোগনী লম্বীত হয়ে থাকে, তবে ২৭শে নভেম্বর ঐতিহাসিক হয়ে উঠবে লম্বহ নেই।

পর লম্বাঙ্গন মালিকদের স্বাধীনতা থাকলেও লম্বাবাহিকদের যে স্বাধীনতা নেই, এ বটমা তারই প্রমাণ।

গত ২৬ নভেম্বর লি পি আই (এম) রাণ্য দপ্তরে বাবুলী এক লম্বাবাহিক লম্বলন ভাকে। বিবরণ লম্ব ছিল বাবুলী বন্ধ। এ প্রসঙ্গে বাবুলী কলিটির চেয়ারম্যান শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত লম্বাবাহিকদের বলেন যে, বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে হবে। এটা ঠিক যে বন্ধ উপলক্ষে ই-কংগ্রেস বেশ কিছু মতামত জোগাড় করেছে। বহুমতী, মতামত, টেটলম্যান এমন কি আনন্দবাজার পত্রিকাও ছাপলো, "বন্ধ উপলক্ষে ই-কং বেশ কিছু মতামত জোগাড় করেছে।" ২৭ নভেম্বরের যুগান্তর প্রথম পাতার শ্রী বজ্জের মধ্যে এই লম্বাবাহিক লম্বলনের রিপোর্ট প্রকাশ করলো, কিন্তু লেখা হল যে, "শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত স্বীকার করেন যে, কং (ই) বন্ধ উপলক্ষে বেশ কিছু লোক জোগাড় করেছে।" তদুপায় যুগান্তরের পাঠক এই লম্ব বিকৃতি বুঝতে পারবেন না। "মতামত"-এর পরিবর্তে যুগান্তর ব্যবহার করলো "লোক"। আশা করি, পাঠকেরা এ ধরনের বিকৃতি লম্বকে লম্বক হবেন।

আনন্দবাজারী সহজ পাঠ

শ্রীপতি নন্দী

আনন্দবাজার থেকে অনেক আনন্দ প্রত্যাশা করে পারেন, কিন্তু আনন্দ প্রত্যাশা কেউই করেন না, অবশ্যই। আনন্দবাজার থেকে চার, চিত্রাশীল পাঠক চার না, অত পাঠক বাজারের মত। কেনাবেচার বাজারে সবই পণ্য—আনন্দ পণ্য, সম্পাদক পণ্য, সম্পাদকীয় পণ্য এবং পাঠকীয় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্য ব্যবসায়ী। বলা বাহুল্য, মাঝেমাঝে জীবনে এ চরম লক্ষ্যকে আনন্দ-বাজারীকে গিয়ে মাথলে চলে না। ছাইয়ের গাধার মূখ খুঁড়ে বাগা পড়ে থাকে, কার লাভ তাইয়ের মূখে ছাই মাখে? অতএব, বিকিকিনির বাজার বণ্যরীতি চলেছে, চলবে। কেননা, যেমনি আনন্দবাজার তেমনি তার বিবরণ বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠকবৃন্দ, তড়ি-মাতালের এ হুমধূর আঙিনার এরা ছুটছে ছুটবে।

পেচকজলত পাঠ্যই সম্পাদিত

‘সীতার’গুলির কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক জীবাশ্ম-সর্বব ‘কলম’গুলির বিনো-দ্বিনী রূপটি আকর্ষণীয় সম্বন্ধে নেই, কিন্তু মাঝেমাঝে তার ছিটেফোটা পরিচয়টুকু কোনমতে বজায় রেখে লেখক হোকামদারী প্রতিভার একটা ছাপাখানাকে বহুৎদা পাঠ্যর মত লক্ষ্যমত করে তোলাটা বলতে গেলে একটা অকল্পনীয় সাফল্য। তাহলেও ব্যবসায় বাজারীর একপ অনাধারন দণ্ডা-লাফল্যকে দৈব রহস্যবর্তিত বলে মনে করার কোন কারণ নেই; বরং সমসাময়িক ভারতে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়কে কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক বিকার রূপে বিচার না করে লক্ষ্য-ধরা ফাঁদ রূপেও চিনে নিলে আনন্দ-বাজারী অধ্যবসায়কে আর রহস্যজনক মনে হবে না। আসলে কল্পিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও পচনশীল সমাজ ব্যবস্থার ধোঁয়াসোগটি মতীয়। শিত সাহিত্য সম্পর্কে গুরুগম্ভীর

শিত সাহিত্য সম্পর্কে গুরুগম্ভীর

সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে ‘হরিশাল পাল’ বিবরণ বহু-কাল অসীল কাব্যকে অরণ করিয়ে দেয়াটা কিংবা দাপী পাঠ্যওয়ালার ‘বরাহ-নৈতিক মনীষী’ রূপে পরিচিত করিয়ে দেয়াটা দুবণীর স্বর্ণামি হতে পারে, কিন্তু লয়াবীরের ‘ভাড়া’ হানা যে বাজারে বিতরু ছাড়া বলে লয়াবৃত্ত দে বাজারে শিতবৃত্তের ও অতিভাবক-কুলের ‘হিতার্থে’ নিবেদিত ঐরূপ এঁড়েরি লম্বাও কোন পজ-পত্রিকার পক্ষে ‘ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত’ হয়ে থাকে। বেরানাম কিছু নয়। আসলে যে ব্যবসায়ীনে শিকারীকার মালমশলাগুলি চিত্রাবৃত্তিতে কোন-রূপ আশ্রয়প্রদায় এনে দেয় না, বরং বৃহত্তর সামাজিক অস্তিত্ব সম্পর্কে মাহুকে নিকংদাহ করে রাখে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তুতি শক্তি-শালী হয়ে না ওঠা অবাধি প্রতি-ক্রিয়ার শক্তিগুলি তাদের শিবির-গুলিকে অবিরাম লক্ষ্যগারন করে চলে, বাজার বাজার, মিত্য নতুন পেকুলেশমে আপন আপন ট্রাটেবী গড়ে তোলে। অরধর্মী আত্মবোধের

বুদ্ধি বাওয়া মাল্য-সর্বব বিবরণ-বেরতের শোশাকী অণসংক্টিয় যে পলরাগুলি লাকানো থাকে নেওলি জীবনমর্মী রবীজনাথকেও বোল খানা অপাঙকোর করে রাখে। লাকমরে লাকিয়ে রাখা ‘সীতার’লী নৈবেদ-চিত্রাশীল-র ভাবমর্মী রবীজনাথের চারিত্রিক বিবরণ আনন্দবাজারী খেই খেই বুড়োর কাপটার জীবন জিজ্ঞাসু বিবরণি জাহি জাহি আর্ভমাহ করে চলেছেন।

রুক্মারমতি শিতবীর কাছে ‘বোর পুরাতন তুড়োর’ ‘মাহর্ষ’-কে ধরে রাখতে—‘বাজার’-মালিক লর-কার মশাইয়ের তাগিদ মিশরই আছে—তাবী দ্বিমের আনন্দবাজার-সম্পাদক পোড়াতোই তালিম নিয়ে গলিয়ে উঠুক এমন তুড়োয়া থাকতে পারে—কিন্তু তুড়োয়া এঁড়ের অঙেই ‘হরিশাল পালে’র পরিচয় কাব্যকে আধো চাকা অবস্থায় তুলে ধরা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসু শিত মানদের দামনে অতিভাবকুলকে বিপন্ন করা

হয়েছে এরূপ মনে করার কারণ নেই। লম্বা নেই, ব্যবসায়ী ভাববিকার ও বুদ্ধোন্নত হতাশার তাকরার এ লম্বা মহাপ্রকৃতা কখনো লখনো নিজ মস্তিষ্কেই ২২০০ কোটির শক চালিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু লয়াবরণ অংগাতেও এঁদের আচার আচরণে কোন আত্মবিকতা থাকে না। চিত্রাশক্তি এঁদের চিরকাল দুর্বল। এঁদের বিচারে বাগা মনীষী তারাত তেমন রূপ প্রাতঃমণীয়। এ লম্বারে বাঁধের করণীর তেমন কিছু নেই, বাগা বড়কোর আতিকালীন চিত্রা-রদের বড় লম্বায়ের তুহ দ্বিয়ে ওমট-পালট, তন মারতে পারে, বেড়াচিদের দৃষ্টিতে তারাই দ্বিত ‘মনীষী’ হয়ে থাকে। এ হেন ‘মনীষী’দের হুচিভিত মতামতকে চকুতে চেপে বিজ সম্পাদক মশাই একেবারে এক-খানা সম্পাদকীয় সংলগাঠি লিখে ফেলে তার পাঠকবৃন্দকে উপহার দিলেন। এমন সম্পাদক আর কে আছে?

ই-কং নেতার যৌন লালসা

আমি বীরভূমের মহেশ্বরবাজার থানার অন্তর্গত লোহাবাজার গ্রামের এক বিবাহিতা হরিশাল মলিলা। গত ১৯১০-৮০ তারিখ (বিজয়া দশমীর রাতে) রাত প্রায় ১১টার সময় মনীষ কং (ই) নেতা ও শেওড়াবুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীজনাথ দাশু (বাহু দাশু) আমার খামিকে বাইরে মন আনতে পাঠিয়ে তার অরূপমিত্তির সুযোগে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার উপর বলাৎ-কার করে। আমার খামী কিয়ে আমার আগেই উক্ত হুড়ুতকারী পালিয়ে যায়।

নারী-দের চরম অবমাননার অত প্রথমটা আমি মূখ্যে পড়ি এবং পরে এর প্রকাশ ও প্রতিকার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সমস্ত বন্ধন বাধা অগ্রাহ করে খামীর খামার তারেদী করি। তারপর থেকেই ছোট বড় বহু ইন্দিয়া কংগ্রেসের নেতার আপদন ঘটে

আমার জীর্ণ কুটীরে। মোটা টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে আমাকে। হুমকিও দেখানো হচ্ছে।

এখনও তিনি শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন আর তাছাড়া কংগ্রেস দলের নেতৃত্বও দিচ্ছেন। বিরতি

মতামত

মবকিশোর মহাপাত্রের জীকে ধরণ ও খুন করার মতোই এ ঘটনাতোও কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বা অস্তিত বেখে রাজ্যে রাজ্যে এই দলের নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে না।

বিজলী বায়েন
লোহাবাজার, মহেশ্বরবাজার

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর

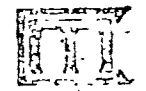
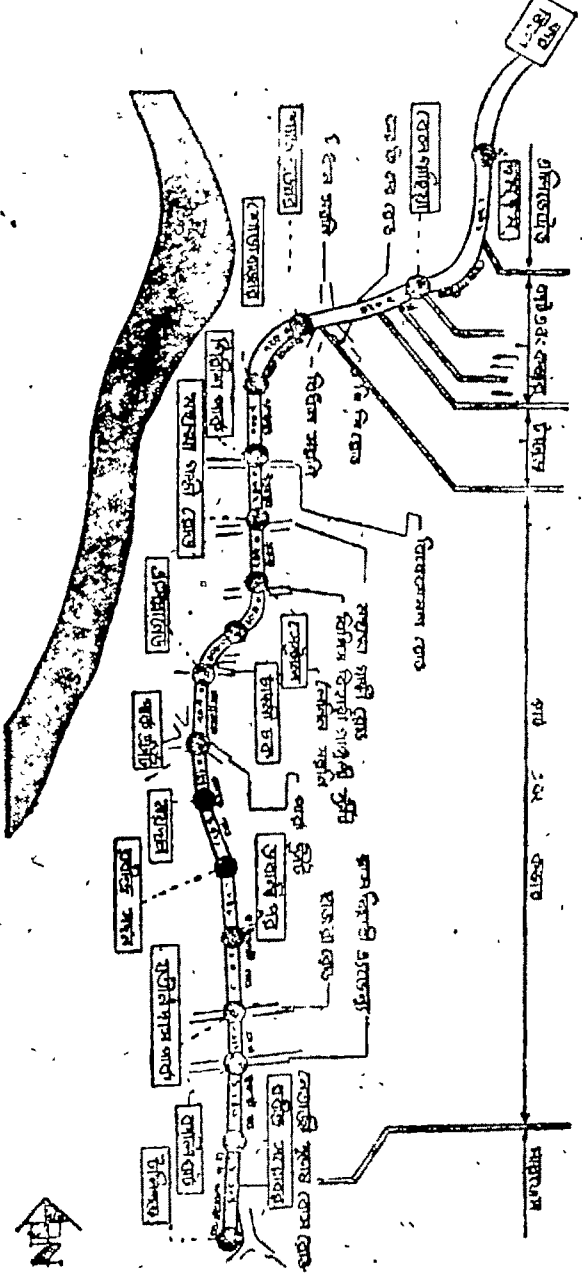
লালুপ্রতিক লম্বীকার বা আমা পেছে পেটা তালমামি তুড়ার শিলার মাজ উপরটুকু। বিশাল অংশ এখনো গভীর জলে। তারতের পরীব মাহু, বাগা দ্বিমের দু কাপ চা ও তিন পিন কটি খেতে গেলেও বছরে বাইশ টাকা কেন্দ্রীয় ট্যাক্স হিতে বাধ্য হন আঁধের কষ্টাকিত্ত অর্থের ১১-২ কোটি টাকা টাটা বিড়লা প্রমুখ বোটিপতিদের ঘরে উপচোকন দ্বিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। একটা লম্বা নমুনা দ্বিই। টাটা বিড়লা মিথ্যামিরাধের রমরমা প্রথম এনেছে কাপড়ের কল থেকে। এখন তারা লম্ব কাপড়ের কলগুলির

হারিষ ভাণামেল টেক্সটাইলদের উপর চাপিয়ে মরে পড়েছেন। আরো লাভজনক পলিয়েস্টার, টেরিকটন ও কিলামেন্ট হুতোর শিলে তারা লম্বী করছেন। পুরনো জীর্ণ শিলকে লরকারের বকলমে জনসাধারণের খাড়ে চাপিয়ে দ্বিয়ে অতি মূল্যাকা লাভের শিলগুলি করারত করাই তাঁদের লক্ষ্য। লরকার তাঁদের এই লক্ষ্য পূরণের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, আর জনসাধারণের খাড়ে অপব্যয় ও হুম্মেল্যর বোকা দ্বিম দ্বিম বাড়ছে।

কর শিলের রহস্য এখানেই। বড় বড় ও একচেটিয়া শিলগুলিকে তেদে দ্বিয়ে সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হলে লম্বাই ধরা পড়বে।

এক নজরে মেট্রোরেলা

পরিকল্পিত প্রস্থের দৈর্ঘ্য	১৬৪৩ কি: মিটার
স্টেশন : মাটির উপরে	২ টি
তুংগভে	১৫ টি মোট ১৭ টি
স্টেশন থেকে	
স্টেশনের গড় দূরত্ব	১.০২ কি: মিটার
ট্রেনে কোচ সংখ্যা	৮ টি
ক্রমী	১ টি
কোচের দৈর্ঘ্য	১৯.৫ মিটার
কোচের প্রস্থ	২.৭৫ মিটার
গাড়ির গতি (সর্বোচ্চ)	ঘণ্টায় ৮০ কি: মি:
গাড়ির গড় গতি	ঘণ্টায় ৩০ কি: মি:
বিদ্যুৎ	৭৫০ ডি. সি.
বিদ্যুৎ চাহিদা	৪৫ এম. ডি. এ.
বিদ্যুৎ সরবরাহ	তৃতীয় রেলের মাধ্যমে
পরিবহণ সময়	ঘনঘন থেকে টালিগঞ্জ ৩৩ মিনিট
	টালিগঞ্জ থেকে এসম্পান্ড ১৫ মিনিট
	এসম্পান্ড থেকে দামদম ১৮ মিনিট
যাত্রীবহন ক্ষমতা	দাঁড়িয়ে ২৩০ জন
	বসে ৬০ জন
প্রতিট্রেনে যাত্রীসেবন ক্ষমতা	২৫০০ জন
ট্রেনে ট্রেনের সময়	আড়াই মিনিট



মেট্রো রেল
কলকাতা
(নির্মাণের পথে)

नोछि यशछि

ইতিপূর্বে দিনে করিউন স্থানীয় জনপথের পক্ষ থেকে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ রাখার জন্য সরকার হলের কর্তৃপক্ষকে অস্বস্তি প্রদান করি। তিন-দিন আগে এলাকার প্রচারপত্র বিলি ও পণ্ডিত করা হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্রগুলো বিকোভ দেবিরে বন্ধ রেখে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ রাজ্য সরকারের সহিত থাকলেও বন্ধ করার মতো কোন আইনী ব্যবস্থা আইনের বইগুলোয় নেই।

শ্রমিক-কর্মচারী সংবাদ

সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের রাজ্য সম্মেলন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারদের ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বেকার হলে গত ১৭ই, ১৮ই, এবং ১৯শে নভেম্বর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বাকুড়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি ও বহু দর্শক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের দর্বাচীন লাক্ষ্য কামনা করে অভিনন্দনবাহী প্রেরণ করেন। প্রাক্তন সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য সন্মর কল। কল তাঁর ভাষণে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জনসাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তী লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের নামাধি বাধা বিপত্তি ও অগ্রবিধা লক্ষ্যে তাঁদের উপর তত্ত্ব হারিষ ও কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে আবেদন করেন। আমাদের দুই জনসাধারণ যাতে সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য তিনি লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের বিশেষভাবে উদ্বোধনী হতে আহ্বান জানান। সম্মেলনে গৃহীত লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের দাবীসমূহ অত্যন্ত সুস্থিভূক্ত বলে শ্রীকান্ত তাঁর অভিরত প্রকাশ করেন এবং এই দাবীসমূহের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন জানান করেন এবং জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে বায়কট সরকার লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের এই ভাষ্য দাবীদায়কগুলি পূরণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। সম্মেলনের শেষদিন “বহুবী বাধ্য প্রকল্প” ও “কমিউনিটি সেলফ হীল” সম্পর্কে রিভিউমাল হেলথ এডুকটর বিষয় বাসাজীর লক্ষ্যপতিবে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সব বক্তাই “বহুবী বাধ্য প্রকল্প” “কমিউনিটি হেলথ ভলান্টিয়ার হীল” ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, এবং লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অগ্রবাহী হওয়া ও উপযুক্ত হার হারিষ পালনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভি-

যোগ করেন এবং এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে বৃহত্তর জনস্বার্থে যথোচিত হার সারিষ অর্পণ করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে লক্ষ্যকল্যাণ আধিকারিকদের তত্ত্ব একটি নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক কর্তব্যভিত্তিক প্রদর্শন করার তত্ত্ব জোরালো দাবী জানান।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন

লক্ষ্য তারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আগামী ৬-৮ ডিসেম্বর কোরালার রাজধানী জিলায় হবে। বেশের লাক্ষ্যভিত্তিক পরিষিতি, বহুবল্য বুদ্ধি নিয়ে ওখানে আলোচনা হয়। এছাড়া অন্তত ইট ইউনিয়ন সংগঠন, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের লক্ষ্যে যোগ আন্দোলন প্রদর্শনও আলোচনা হয়।

এফ-আই-সি অফিসারদের গণচুটি

বেতন কাঠামোর অলঙ্ঘনীয় করা সম্পর্কে জীবনমণী কর্পোরেশনের প্রথম প্রেনীর অফিসাররা বে দাবি তামিয়ে আলছিলেন, তার স্বরাহা মা হওয়ার ২৮ নভেম্বর লক্ষ্য বেশে তার হাকারের বেশি প্রথম প্রেনীর অফিসার গণ চুটি মেন।

সি এম ডি এ কর্মচারীরা আন্দোলনে নামবেন

সি এম ডি এ কর্মচারী লক্ষ্য কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বোনাল লক্ষ্য ১২ বলা দাবির ভিত্তিতে তাঁরা ২৪ নভেম্বর গণ ডেপুটেশন মেন এবং ২৫-২৭ নভেম্বর দাবি ব্যাঙ্ক ধারণ করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট দিনে নভেম্বরের বেতনও তাঁরা বরকট করেন। ডিসেম্বর মাস থেকে তাঁরা বিবিধ ধরনে লাক্ষ্যতার আন্দোলন চালাবেন।

ব্রিটিশ ফার্মের ঠিকা শ্রমিক গ্রেপ্তার

লক্ষ্যপুর্বে ডেভিডালপুর্ ব্রিটিশ কার্বে কর্তৃত ঠিকা শ্রমিকদের হাটাই করার এ, আই, টি, ইউ, সি, নিয়মিত ইউনিয়ন প্রতিবাদ জানায়। অতর্কিত কর্তৃপক্ষ গোপনে কিছু ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে। ২২ নভেম্বর এ নিয়ে লক্ষ্য হয় ও কর্তৃকলম আহত হয়। পুলিশ এলে এ, আই,

টি, ইউ সি ইউনিয়নের লাক্ষ্যকলমকে প্রেরণ করে।

তি তি সি কর্তৃপক্ষকে কোম সিদ্ধান্ত না নিতে নির্দেশ

তি, তি, সি তে এখন চেয়ারম্যানের বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদে কর্মচারীদের বিক্ষোভ বিবিধ কার্যক্রম চলছে। লক্ষ্য আর, এল, সি, নিয়মিত তি, তি, সি, টাক এসোলিওরেশনের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেছেন। বেশ কর্তৃকলম টে ইউনিয়ন কর্তৃকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

অতর্কিত দিল্লীর শক্তি বরক থেকে তি, তি, সি, কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বরখাস্ত করা, বেতন কাটা ও বহুদিক আবেশ হানের ব্যাপারে কোমরকম সিদ্ধান্ত মেন মেন না দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে শক্তি বরকের দিচি তি, তি, কাপুর্কে শ্রমিক ইউনিয়ন লক্ষ্য শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি ও কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য লক্ষ্যবি নিয়ে আলোচনা চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বন্দর ধর্মঘট হল না অর্থনীতি- বাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল

২৮ নভেম্বরের মারকাত থেকে দেশের দশটি বড় বন্দরে এক লাখ সাইক্লিং হাকার শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘট হবার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধাপে ৮০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা মাইনে বুদ্ধি পাওয়ার লে ধর্মঘট আর হল না। লক্ষ্য তাত্ত্বিক অতর্কিত দাবি দায়ক নিয়ে পুরে আলোচনা হবে। এই চুক্তি ১৯৮০ লালের পরলা আহ্বারী থেকে আগামী তার বছরের তত্ত্ব কার্বেক হবে।

চারটি ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য কেন্দ্রীয় আহ্বান ও পরিবহন মন্ত্রী শ্রীমীরেজ পাতিল, অর্থমন্ত্রী ডেবটরমণ ও পূর্বতম ও অদারকিক বিধান যোগাযোগের মন্ত্রী শ্রী, সি, শর্মা আলোচনা করে এ চুক্তি করেন। কেন্দ্রীয় সরকার মোট ছাপিয়ে, বন্দরের চার্জ থাকিয়ে এই টাকা ভুলবেন। কলে লক্ষ্যল্যবুদ্ধি আরো ঘটবে। শ্রমিকদের কিছু টাকা আপাতভাবে পাইয়ে দিয়ে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাহী জোরদার করলেন।

আন্দোলনকারী কর্মচারীরা

ফুটপাথ দখলের ফলে উত্তেজনা

বেহালার শ্রীর্গা ইউনিয়নের কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের দাবিতে বিপত বেচ মাল বাবত আন্দোলন করছেন। হোকান মালিকের অসমমীর আচরণের প্রতিবাদে গত ডেলরা অক্টোবর থেকে শ্রীর্গা ইউনিয়নের কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেন এবং হোকানের প্রবেশ পথ অবরোধ করে মিছিলেই হোকান আরম্ভ করেন ফুটপাথে। মিটার তৈরীর কারখানাও কর্মচারীদের দখলে। সেখানে হোকান মালিক প্রবেশ করতে পারছেন না। কর্মচারীদের দাবিগুলির অতর্কিত হল অবিলম্বে ১০০ টাকা বেতন বুদ্ধি, উপযুক্ত বাসস্থান ইত্যাদি। কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন সি আই টি ইউ-র ব্যানারে।

হোকান মালিক শংকরপ্রসাদ চ্যাটার্জীর লক্ষ্য যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কর্মচারীদের প্রতি তাঁর কোম বিরূপ মনোভাব নেই। দাবি দায়কগুলি লক্ষ্যে তাঁর বক্তব্য হল: আলোচনার মারকাত তিনি বিমোহ মিটরে ফেলতে রাজি ছিলেন। কিন্তু কোম রকম আলোচনার আগেই কর্মচারীরা ধর্মঘট আরম্ভ করে মেন। হোকানের প্রবেশপথ অবরোধ করে কর্মচারীরা ফুটপাথে হোকান করছেন। এই অবস্থার কোনমতেই দাবি মেনে দেওয়া যাবনা। আহ্বান থেকে ১৪৪ ধারা জারী করে হোকানে অবৈধ জটলা খুটি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মহিলাদের বিক্ষোভ

ওড়িশার বিবিধিত লাক্ষ্যবাহিক মনকিশার মহাপাঞ্জের শ্রী ছবিরাণী মহাপাঞ্জকে বর্ষণ ও খুন করার প্রতিবাদে গত ২৮ নভেম্বর প্রগতিশীল মহিলা পরিষিতি নেতৃবৃন্দ এক-হল মহিলা ধর্মজতার সেমিন হুটির কাছ থেকে মিছিল করে উৎকল মেন গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীরা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানকী-বরত পট্টমায়কের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য এক মারকালিপি উৎকল ভবন কর্তৃপক্ষের হাতে মেন, এ মারকালিপিতে তাঁরা হোকানের কঠোর শাস্তি ও লাক্ষ্যবাহিক শ্রীমহাপাঞ্জের নিরাপত্তার দাবি করেছেন।

এদিকে শ্রীর্গার কর্মচারীদের ফুটপাথে হোকান করা নিয়ে বেহালার বাজার এলাকার হকারদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ফুটপাথে বাধা ব্যবস্থা করতেন তাঁদের বক্তব্য হল: শ্রীর্গা জোড় আগে - খেলে বেহালার পুলিশ ফুটপাথে কাউকে হোকান করতে দেয়নি এবং এখনও বিচ্ছেদ। ফুটপাথের হকারদের অভিযোগ: আমাদের বহন ব্যবসায় করতে দেওয়া হচ্ছেনা তখন শ্রীর্গার কর্মচারীদেরই বা ফুটপাথে কাঠামো করে হোকান করতে দেয়া হচ্ছে কেন? এ বিষয়ে বেহালার ধানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, ফুটপাথে হোকান করতে না দেবার বিষয়ে জেলা শাসকের দাবী মির্দেশ আছে। তবে শ্রীর্গার কর্মচারীদের ফুটপাথের হোকান সম্পর্কে তিনি কোম বক্তব্য করতে রাজী হন সি।

আদানমোলে

সম্পাদক আক্রান্ত

আদানমোলের ‘প্রতিনিয়ত’ নামে একটি পাকিক পত্রিকার আদানমোলের বিশেষ বিশেষ কর্তৃকটি জায়গায় লক্ষ্যকল-বিরোধীদের কার্বেকলাপ ও তাড়ের আক্তার হানগুলো উল্লেখ করার গত ৪ঠা নভেম্বর বিকেল গাঁচটা মাপাফ ‘প্রতিনিয়ত’র সম্পাদক কর্তৃকলম অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হন। তারা ঘুবি চালায় ও গুলি-গালান করে। ঘটনাস্থলে আক্রান্ত সম্পাদকের পরিচিত এক ব্যক্তি এসে পড়ার তিনি উদ্ধার পান। এই ঘটনা আদানমোল ধানার ও অভিরিক্ত পুলিশ জ্ঞপার শ্রীঅমীন চ্যাটার্জীকে জানানো হয়।

আদানমোল প্রেল রাবে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে এক জরুরী বৈঠকে-উল্লেখ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা করা হয়। তাঁরা অভিরিক্ত জেলা শালক শ্রীমহর সরকারের লক্ষ্যে লক্ষ্য করে এই ঘটনার হোকী ব্যক্তির কঠোর শাস্তি দাবি করেন।

ভূর দশক ও মার্কসবাদী লেখক র আচার্য

এদেশের সামগ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে দশক দশককে পরিচয় করে যেখানকে আমি বর্ষা তিহাসিক পুস্তিক বসে বসে রিমে।

বলতে থিবা নেই আমরা যখন ষেতে তরু করলাম তখন আমাদের রপাশে কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই গারর, যতাবত আমরা তার সঙ্গে তঃপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেলাম।

সাহিত্য ছিল আমাদের কাছে ত, নিছক কেরিয়ার নয়। লিখে টাকা পাওয়া যায় প্রগতিশীল লখকেরা সেখানে তা চিন্তাও করতে পারতেন না। কলে লেখক জীবনে ঐতিহ্য ছিল, সে-সাহিত্য দেশবাসীর হস্তর দারিত্র্যের সঙ্গেই অঙ্গীভূত। ঐটি বড় মাঝারি—নব লেখকেরাই ছুর মতো বিশতে পারতাম, মতার তারতম্যে ঐরা যে একে-রেই ছিল না তা নয়, তবে সেটা হল স্বল্প প্রতিযোগিতামূলক।

বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি মতা হস্তান্তরের সন্ধিক্ষে তৎ-জীন সমাজমানদের যে নিতুল তিবিধ আমাদের শিবিরের লখকেরা হজিলের মতো যেখে রেছেন, সে-ইতিহাস উদ্বেগ-বশিতভাবে লোপ করবার নৈতিহাসিক চেষ্টা। যুদ্ধ ভূক্তিক-গা-দেশবিভাগ—এই জাতীয় লভ ঘটনাগুলো আমাদের লেখক-র দ্বারা বর্ণিত হয়ে রয়েছে। তারপর স্বয়ং হস্তান্তর হল। শবিতাগও রক্তের মূল্যে বাস্তব-্য বলে পরিগণিত হল।

এই লম্বে কমিউনিস্ট পার্টি াঙ্গ্রেশে ভেসে গিয়ে আদিত্তে 'ইরে 'জাতী মুটা হার', দেশবিভাগের তা নৈতিহাসিক প্রসঙ্গটাকেও লমানদের self detremination-ন মনগড়া বিত্তর সৃষ্টি করে যেমে ল। বরাবরই দেখা গেছে এদেশের ইউনিস্ট পার্টি 'জাতীয় প্রসঙ্গলির' পারে তার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ তে পারেনি। বুর্জোয়া নেতৃত্বের ছে, বিশেষ করে গাভীজীর ব্যক্তি-া সামনে নিঃশব্দ আত্মসমর্পণই ায়ার। হীরেন মুখার্জি বা নাথু-পাণ্ডের গাভীচর্চা তার দ্রাস্তিকর ধরণ নয় কী? কিংবা গোপাল দ্বারের গোপালপর্বে গাভী-স্বীক্-সমপিত প্রাণের দৃষ্টান্ত? পঞ্চাশোদর্ এই বয়সে প্রসঙ্গলো-বিকভাবেই আত্মসমর্পণী কার-বল উপস্থিত হয়। যাকে বলে লম্বী হওয়া, আমাদের কমিউনিস্ট-র নেতৃত্ব সে ব্যাপারে মাথা

মাঝারি। তার কারণ কী এদেশে স্বল্পমণীল তাতিক নেতার অভাব? জমাল থেকে অন্যথ বাসকের মতো জাতীয় কংগ্রেসের বুট ধরে-খাকা, নেতৃত্ব প্রগতিশীলতা, সরদার প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করা, শ্রেনী সত্ত্বের বুর্জোয়া নেতা পাণ্ডী-জীর আশ্রয়, নোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে স্বদেশ-সমগ্যাকে বিশিয়ে-কেনা, গ্রেট ব্রিটেন কম্যুনিস্ট পার্টির মুক্টির নির্বাধ শিকার ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্টি চরিত্র পড়ে ওঠেনি। কলে ৪২-এর আন্দোলনে বিরোধিতা, ইংল্যান্ডের যুদ্ধ আয়োজনে নির্লজ্জ সমর্থন, সোভিয়েতের অহু-করণে রাতারাতি 'মাস্ত্রাজ্যবাদী' যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' অতিহিত করা, Patriotic war-এর শুরু উৎসাহি না করতে পেয়ে স্বতাবচক্রকে কুইলিং বানানো—বিশদূশ ব্যাপার-ঘটে গেছে।

সাহিত্য দর্পণ

এদেশে মাস্ত্রাজ্যবাদী আগ্রাসন কিংবা এদেশের বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেনীর নিরন্তর শ্রেনী সংগ্রামই যেখানে বাস্তব লভ্য, তখন সোভিয়েত অহু করণে সম্পূর্ণ তাৎপর্য-হীন 'শান্তির' আন্দোলন করেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলেও জানানো প্রয়োজন সে সময় পরিচয় সম্প্রাদক-মণ্ডলী থেকে আমাকে 'শান্তির' ওপর গল্প লিখতে অহুরোধ করা হলে আমি স্পষ্টই জানাতে থিবা করিনি যে, এ দেশে তথাকথিত শান্তি আন্দোলনের লার্ধকতা আমি অহুতব করতে পারিনি।

এর থেকে যেন কেউ অপব্যাখ্যা না করেন যে প্রমিকশ্রেনীর আত্মজা-তিকতাকে আমি পারিঙ্গ করে দিছি। সোভিয়েত বিপ্লবের শিক্ষাকে অবতাই আমরা এদেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে কালে-লাগাব, যেমন মহাচীনের অভিজ্ঞতাকেও কালে লাগাতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে সোভিয়েত কী চীনের অহু অহু করণ করে যাওয়া! অর্থাৎ আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে দেশীয় জাতীয় প্রসঙ্গলি তন্নরভাবে মোকাবিলা করাটাও যেমন অরুরি তেয়নি আত্মজাতিক প্রসঙ্গলিও। জাতীয় চেতনার বিস্তার ছাড়া শূভ আত্মজাতিকতাবোধ, অর্থহীন। এ দেশের মাহুয়ের পক্ষে ক্যালিবার যেমন বিপদ ব্রিটিশ মাস্ত্রাজ্যবাদও তেয়নি প্রধান বিপদ। সোভিয়েতের

নদে ইংল্যান্ড-আমেরিকা াটহতা বৈধেছে বলেই 'মিত্রপক্ষের' সমর্থক হতে হবে এ কোনো বৃত্তি নয়। হীর চুপো বচর ব্রিটিশ শাসন এমন কিছু প্রমাণ করেমি যে জাপান বা জার্মা-নীর ক্যালিবার থেকে তারা কিছু উন্নত।

মার্কসীর জ্ঞান যেটুকু আমরা আরতে আছে তাতে আমি মনে করি সব বুর্জোয়া 'রাষ্ট্রের' প্রমিক শ্রেনীর অগ্রগামী অংশ কমিউনিস্ট পার্টিরই একমাত্র লক্ষ্য বলপ্রয়োগে রাষ্ট্ররকে উচ্ছেদ করে প্রমিকশ্রেনীর রাষ্ট্র প্রবর্তন করা। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি থিবা হল। থেবা গেল ছোটো কমিউনিস্ট পার্টিই এতদিন যা করেছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া তিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের বহু-লার 'আটকে' রইল। এবং নির্বাধে পক্ষবাবিক-সাধারণ নির্বা-চনের ব্যাপারটাই তার একমাত্র ধ্যানভঙ্গ হল। নির্বাচনের বাইরে, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার অতিরিক্ত, প্রমিক শ্রেনীকে রাজনৈতিক সচেতন করবার প্রয়োজন বোধ করল না। এমনকি পার্টির নেতৃত্বে একদা যে কাকদ্বীপ-তেলেনানা-সরমসদিংহে হাঙ্গ-চাষিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রিণী ক্ষু-ণ থেবা বিরোধিল পর-বর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে তার দ্রুটি নিরেই আলোচনা হয়েছে, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অতিবাচক শিক্ষা আমরা কিছুই গ্রহণ করিনি।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের এমন যখন অবস্থা তখন কাকদ্বীপ-তেলে-নানার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মারকত ভারতের রাটিতে নতুন করে হাতে কলমে তর ও প্রয়োগের বে-ইজিত আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তাকে-অভিনন্দন জানাতে থিবা করিনি। নির্বাচনে নয়, অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার মধ্যেও নয়, শোষিত শ্রমজীবী মাহুয়ের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই 'স্বহস্তর জনগণের সৃষ্টি। সচেতন মাহুয়ের হাতে রাইফেলই ক্ষমতার উৎস।

একজন রাজনীতি সচেতন লেখক হিমেবে স্বস্তর দশকের এই বিপ্লবী আন্দোলন আমাকে নাড়া দিয়েছে। নানাবিধ কারণে এই আন্দোলনও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে এগোতে না-পারলেও সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষার লগতে এ আন্দোলন বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণাকে যেভাবে আক্রমণ করেছে মতলববাক্ত বুদ্ধিজীবী ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারেন না। উপরিতল নিরেই মূলত আমার কার-বার বলেই এই পুমু-ল্যারন আমার দক্ষিত ফিউডাল-বুর্জোয়া-উপনিবে-দিক সংস্কারকে কাটাতে সাহায্য

করেছে। লর্ঘোপরি আমার মার্কস-বাদী চৈতন্যকেই ভাবর করেছে। আবারও বলছি স্বস্তর দশকে আমি এদেশের সামগ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখতে অচ্যুত নই। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছি, 'স্বস্তর দশক' বিষয়টা আজকাল একটা ভালো ব্যবসারে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে তরুণ মহলে, যাদের সামগ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে সামান্ত বোধও নেই। তাদের সম্পূর্ণ বোধও দিতে পারিমে যেহেতু এই আন্দোলনকে সচেতনভাবে ব্যবহার করবার অহু-শীলন সাপেক্ষ কমিউনিস্ট এডুকেশন তথা ট্রেনিং ছিল না। এই রাজ-নীতিতে অ্যাকশনটাই প্রবল হয়ে ওঠাতে তারপোর উচ্চাঙ্গ ও আবে-পের সঙ্গে তা থাপ থেয়ে গিয়েছিল। অথচ লম্বা পরিবর্তনের কাজটা যে

রাজ্য ই-কংগ্রেস

এম পুঠার পর বছর এই সব বিক্ষুব্ধ নেতারা প্রধীন-মন্ত্রীর কাছে অজিত পাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্রটি জমা দেন। এই লম্বা নেতারা ইন্দিরা গান্ধীকে বলে ছেন, পক্ষিবলকে দলের সাংগঠনিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। এবং এই অবস্থার জন্ত দায়ী সভাপতি অজিত পাজা বরং। কারণ, তিনি গোঞ্জি দ্ব্যয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

এই সব বিক্ষুব্ধ নেতারা ২৭শে নভেম্বরের বামফ্রন্টের ডাকা বাংলা বন্ধ সম্পর্কেও বিস্তারিত রিপোর্ট দেন। অজিতবাবুর বিরুদ্ধে অভি-যোগ এনে স্বস্তর মুখার্জী শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন বাংলা বন্ধের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের কার্যকরী সূত্রিকা মিতে অজিতবাবু কোন ব্যবস্থাই করেন নি। তিনি শুধু-কগলে বিবৃতি দিয়ে বাংলা বন্ধের বিরোধিতা করে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন। স্বস্তরবাবু আরও অভিযোগ করেছেন বাংলা বন্ধ পুরো-পুরি হয়েছে এবং এর জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী অজিত পাজা।

অজিত পাজাও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে থেবা করে রাজ্যের কয়েকজন কংগ্রেস নেতা সম্পর্কে অভিযোগ

অন্ত তাকাকো করে করবার নয়, তার জন্তে দীর্ঘস্থায়ী প্রতি হরকার, এই চেতনাটাও লোপ পেয়েছিল। এই আন্দোলনে টুকল কলেজ-বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে আধর্মবাদী দেগা যুবকেরাই এগিয়ে এসেছিলেন। বলাবাহল্য এরা, মধ্যবিত্ত শ্রেনীর, আত্মত্যাগের প্রেরণাই কাজ করে-ছিল, কমিউনিস্ট কর্মীর থেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই dedication একটি মহৎ গুণ, যা বিভিন্ন রাজ-নৈতিক পার্টির কমিউনিস্ট কর্মীদের চরিত্রে তেমন চোখে পড়েনি। এই আত্মত্যাগ থেকে আমরা প্রেরা গ্রহণ করতে না পারলে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন কথার ও কাছে পার্বতী-পরমেশ্বর হতে পারবে না এবং অতীত লক্ষ্যও পৌছতে পারবে না।

করেন। বিশেষ করে তিনি স্বস্তর মুখার্জীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ আনেন। অজিতবাবু তার অভিযোগের সমর্থনে বিভিন্ন কগলে প্রকাশিত স্বস্তরবাবুর বিবৃতি কাটি করে শ্রীমতী গান্ধীর অস্ততম সচিব বিজয় দ্বারের হাতে দেন।

এরপর শ্রীমতী গান্ধী পক্ষিবলকের বিববমান লম্বা গোঞ্জির নেতাদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে কয়েকজের দুই মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং বরকত পনিধান চৌধুরী হুজমেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী পক্ষিবলকের নেতাদের দিলেরিশে কাজ করতে বলেন এবং সবাইকেই একটা আচরণ বিধির ভিত্তিতে কাজ করতে বলেন।

কিছু অনেক নেতাই শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন যে, সংগঠনকে ডেলে না লাঙ্গালে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং ঐক্য আনা সম্ভব হবে না। কয়েকজন নেতা বর্তমান এ্যাডহক ভেঙে দিয়ে নতুন এ্যাডহক গঠন করার জন্ত শ্রীমতী গান্ধীকে অহুরোধ করেন।

প্রতিম্বক রাজ্য পুস্তক পর্বে

মাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বারে পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

- ১। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (গ্রেটো ও এরিস্টটল)
/ ড: নীরদবরণ চক্রবর্তী / ৮.০০
- ২। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (লক, বার্কলি, হিউম)
/ ড: নীরদবরণ চক্রবর্তী / ৭.০০

৬-এ, রাজ্য স্ববোধ মল্লিক বোয়ার, কলিকাতা-১৩



মৃণাল সেনের 'পরশুরাম'

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিরন্মূল ফুটপাথ বাসিন্দাদের জীবনের চূর্ণ বর্ণনা, হাসি কান্না নিয়ে এই বাংলায় বোধকরি প্রথম একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছবি তৈরী হল। ছবিটি করেছেন মৃণাল সেন এবং প্রযোজনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। ইন্টরন্যাশনাল কালার 'পরশুরাম' ছবিটিতে মৃণাল সেনের পরিচালনগত স্টাইল, বা আমরা তাঁর 'ইন্টারভিউ' থেকে 'কোয়ার্টার' পর্যন্ত দেখে এসেছি, বধাত্রীতি বজায় আছে। পূর্বের ছবি 'একদিন প্রতিদিন' আগেই দেখেছি এবং সে ছবিতেই আমরা প্রথম লক্ষ্য করি তাঁর সেই নির্দিষ্ট স্টাইলের এক ভিন্ন রাজার অভিমুখীয় উত্তরণ।

'পরশুরাম' ছবিতে নর বাহুবল আছে, আছে পথের আত্মার প্রকটরূপ এবং ফুটেছে উজ্জ্বল জীবনের সর্বস্ব জালা। দৈনন্দিন অভিনয়ের স্নানিক বৃষ্টি তুলুজাম করেই তারা অভিনয় করার লক্ষ্যে গিল্প। কিন্তু যে-বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে এই অভিনয় সংকটের উত্তরণ ঐশ্বরিক চেতনার ভাবন হয়ে উঠতে পারত। ছবির পর্দায়, তারই একান্ত অভাব বিশেষভাবেই মন্ডরে পড়ে। আর তা পড়ে বলেই ছবিতে দেখি, বাস্তব বহুপার প্রতিজ্ঞার স্বপ্নে লড়াই, বা লড়াইয়ের ক্যারিকচার হাড়া কিছু মনে হয়না। এখানে প্রাণের যে ভঙ্গীটুকু দেখি, তা নেহাতই প্রতিবাহী, বিকোচে অপ্রিয় ভাব্য তা রচনা করেন। গভীর তীরে ধর্মীর পুণ্যার্জনের খেয়ালে ভুগুনো পরমা নিয়ে অতাবী অভ্যন্তরের কাড়া-কাড়ি যেখানে ছবির পরশুরামের কাছে লড়াইয়ের আখ্যা পাত, তখন আর অলপ থাকে না কিছু।

ছবির নাম 'পরশুরাম'—বিশ্ব পরশুরাম রূপে পর্দায় থাকে দেখি তার সংগে সেই প্রচলিত 'মিষ্টি' এর কোম 'মিষ্টি' বুঝে পাওয়া যায় না। পরশুরাম যদি শুধু জটিলতার নাম হত—এমন তো কতই আছে আজও—তাহলে তেমন বক্তব্য কিছু থাকে না। কিন্তু ছবিতে পরশুরামকে দেখি কঠোর কাঁধ—মিষ্টিও কিছু

শোমানো হয়েছে—তবে সেই বীরবাহু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই কেন? আর সেই আদি পরশুরামকে যদি বর্তমানের বুদ্ধিজীবীর পরশুরামের প্রেক্ষাপটে 'ক্রিটিকাইজ' করা হয়, তবে সেখানেই বা নগ্নতা রক্ষা করল কতটুকু? অস্ত্রের বিক্রেতা দোস্তার হয়ে যে-পরশুরাম একুশবার ক্রিয় পুত্র করেছিলেন পৃথিবীকে, সেই মারকে ধারণ করে ছবির চরিত্রটি শত জন্ম লয় করে শুধুই হুঁসেছে বুধা আকালনে। এমন অসামর্থ্য বাতাবরণ হুটির বৌদ্ধিকতা কোথায়?

ব্রজিত রায়ের কটোগ্রাফী প্রাণলম্বী র। গভীর নব্বয়ের সম্প্রদায়। কিন্তু পরিচালকের সেই বিশেষ ঝোঁকটুকু থাকার জন্য ক্যামেরা প্রায়শই অস্থির পতি, একই ইমজের বার বার প্রক্ষেপ, গাড়ীর বিকট শব্দের ক্রমাগত আরোপ লক্ষ্য করা যায়। বি, ভি, কন্ট্রোল সুর প্রয়োগও বাবে অস্থানে দোস্তার লেগেছে। মাটা লম্বা হুটির খাতিরে 'লাউড' এর ব্যবহার বাহুমীর লম্বাহ নেই, কিন্তু তার পুনঃপুনঃ প্রয়োগ রল হুটির বহলে রলাভানই হুটি করে। পরিমিত-বোধ একেজ্ঞে একান্ত জরুরী। প্রায়শই মানা একেজ্ঞে 'লাউড' করে তুললেই বাস্তব আবেদন লক্ষ্য করেন।

কতকগুলি কন্ট্রোল একেজ্ঞে ছবিতে চমৎকার এসেছে। জাতীয় বাস্তবতায় আদর্শ ও উচিত্যের অনেক ভাল ভাল বানী বিতরণ হেথানোর লগে লগে বাস্তব সত্যের নর উল্কাটম দৃষ্টের কল্যাণ করাটা অভিনব না হলেও আবেদন হুটি করে। বলকাতার বহুতল ওটালি-কার পাশেই নিরাপত্তার অন্তরায় হাহবের আশ্রয়ের ঠিকানা পেতে কামড়াকামড়ি অহরূপ ভাবেই লক্ষ্য করে। পরশুরামের সবহারা জীবনে বহু প্রথম আল্লাহী এল, তখনকার সিচুয়েশন রচনার মূল্য-হানার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বপ্ন পরশুরাম, যখন আল্লাহীকে

দেখে, তখন আল্লাহীরা ছবি অত বেশী ব্যবহৃত হল কেন? এর কলে দৃষ্টি আতিশয্য ছুই হয়ে পড়েছে।

মৃণাল সেনের ছবির সমাপ্তি কিন্তু এত অতিরিক্ত বখানো মনে হয়নি। পরশুরামের আকস্মিক বৃত্তান্তেই যেখানে ছবির পরিসমাপ্তি হাবী করে, সেখানে তার দেহটিকে আমূলজে হাদপাতালে নিয়ে আলা, অপারেশন টেবিলে রাখা, তার বৃত্তা ঘোষণা করা, বৃত্তদেহটির নামনে রেখে হারান খুড়োর পরশুরামের জয় ঘোষণা—একান্ত বাহুল্য-ছুই মনে হয়েছে। শেষের দৃশ্য-গুলি ছবির বক্তব্য ও ভাবকে কতখানি দৃষ্ট করতে পেরেছে? শেষ মুহুর্তে আল্লাহীরা প্রত্যাবর্তনও কতখানি বুদ্ধিসংগত?

নাম ছবিটার অরূপ মৃণো-পাধ্যায়ের অভিনয় রণোভীর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রীলা বহুমহারের 'আল্লাহী' কিন্তু প্রশংসার হাবী করতে পারে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বক্তৃতামালা

দিনে রাব অক ক্যালকাটার উজোগে গত ২৯শে নভেম্বর শ্রীলঙ্কার তম প্রেক্ষাগারে ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বক্তৃতামালায় দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। প্রতি বছর এ জাতীয় বক্তৃতা-সভার আয়োজন করার উদ্দেশ্যে দিনে রাব অবস্থাই প্রশংসা পাবে। কারণ এ ধরনের আলোচনা চক্রের বিশেষ উপযোগিতা আছে। এবারের বক্তা ছিলেন মৃণাল সেন। সভার শুরুতেই প্রয়াত বি. এম. নর-কারের স্মৃতির প্রতি লক্ষ্য আনানো হয়।

মৃণাল সেন দু বটা বললেন দিনে রাব সংকটের ওপর। তিনি ব্যাতিমান চলচ্চিত্রকার। তাঁর

বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অনেকেই হাজির হয়েছিলেন সেদিন রাত্রে। কিন্তু মৃণালবাবু নিজের ছবি ও ছবি করার সমস্তা সম্পর্কেই বক্তব্যকে মূলতঃ সীমাবদ্ধ রাখেন এবং তাঁর তেমন আকর্ষণীয় গুরুত্ব পারিনি। অবশ্য আলোচ্য বিষয়টি অনেক ব্যাপক ও বহু শাখা প্রশাখার তার বিস্তার। তাই তিনি বিচলিততার লগে বক্তব্য বিষয়কে কিছু প্রসঙ্গে ভাগ করে আলোচনা সীমিত রাখেন।

মৃণালবাবু প্রথমেই দিনে রাব দৃষ্টকে দুভাগে ভাগ করেন—আর্থিক ও আর্থিক সংকট। দিনে রাব আর্থিক সংকট প্রসঙ্গে না গিয়ে

পার্ক সার্কাস ময়দানে বই মেলা

আগামী ২০ ডিসেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বইমেলা শুরু হচ্ছে। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত আটটা এবং রবিবার ও শুক্রবার দুটি দিন বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা অবধি মেলা খোলা থাকবে। টিকিটের দাম করা হয়েছে দ্বিগুণ।

ঐতিহাসিক শ্রীলঙ্কার বহু গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলিকাতা মেট্রোপলিটান লাইব্রেরীর উদ্বোধন করবেন। রাজ্য সরকারের সহযোগিতার বজায় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এই মেলায় আরোজন করেছেন। এই মেলায় বিভিন্ন মেলায় সরকার পুষ্টপোষিত গ্রন্থাগারের অধিকারীরা দেখে জেনে বই পছন্দ করে ক্রমতে পারবেন। মেলায় গ্রন্থাগারকে দেওয়া হবে ১৫% কমিশন ও ব্যক্তিগত ক্রেতা-দেয়কে দেওয়া হবে মাত্র ১০%। মূলতঃ এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকরাই ঈদ দেবেন। তিনু রাজ্যের প্রকাশকরা ইচ্ছে হলে যোগ দিতে পারেন। প্রায় ৪০০টি ছোট

তিনি আর্থিক সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেন। আর্থিক সংকট তিনি বলেছেন, মননভাবিক এবং আরও বলেছেন, এই থেকে কিছু আর্থিক সংকটও বিন্ন। কিন্তু একথা তিনি বললেন না যে, তথাক্রমে চাকরনৈতিক ছবিগুলি তিনি কেন বিন্ন আর্থিক সংকট চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।

তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় তুলতে দর্শক, সমালোচক ও নির্মাতার মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনো-অবশ্যই কিছুটা আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য পরিষ্কার হয় না।

বক্তৃতা শুধু ইল হবে। সরকার মেলায় ভবিষ্যৎ থাকনা বহু করে ও সরকারী অস্থান থেকে বহু টাকারও বেশি মূল্যের বই সরকার গ্রন্থাগারের জন্য কেয়ার প্রতি দিচ্ছেন। ডিসেম্বর মাসে পুস্তক প্রকাশনার ব্যয় থাকা দ্রুত প্রকাশকরা রাজ্য সরকারের সাহায্য নিয়ে এই মেলা করছেন। সম্রাতি এক সাংবাদিক সম্মেলন পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি একথা জানিয়েছে। সম্রাতির এই বই মেলা হবে অতুলনীয়।

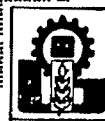
মোরাদাবাদ

১ম পৃষ্ঠার পর জাপ কার্বে রত খেজালেবকদের উত্তরণপ্রদেশ সরকার জাতীয় নিপত্তা অভিজ্ঞানে প্রেরণ করছে যাতে মেলা শাপকের নেতৃত্বা তদন্ত কমিশনের সামনে তারা না দিতে পারেন। শ্রীলঙ্কার দেশের জনসাধারণ এখন ই-কোট দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আকর্ষণ করছেন।

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনগণের প্রত্যেক গড়ে তোলার প্রতী

**ইউনাইটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ**

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০০১
রেজিঃ অফিস : ৭১রত্ন রাস রোড, কলিকাতা : ৭০০ ০০৬
ফোননম্বর : ৫৫ এম বিয়াস

Progressive-UIB-18-80

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক বক্তব্য দীপানী প্রেস, ১২৩/১, আচার প্রকল্প রোড, কলিকাতা-৩ থেকে বৃত্তি এবং চন্দ্র কাব্যিক ৩১, বট লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

ইন্দিরার গণন ঘটানোর জন্য সঞ্জয়ের সমর্থকেরা গোপনে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে

দপন

সংস্করণ বর্ষ ১৪৩১ সংখ্যা ১৩৩০ শুক্রবার ১৯শে ডিসেম্বর, ৮০। ৬০ পৃষ্ঠা

‘মহাকরণ অবরোধে’র দিন নিয়ে ই-কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিরোধ

আগামী বাইশে ডিসেম্বর ই-ছাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান স্বরত মুখার্জী তাকে প্রত্যাখ্যাত মহাকরণ অবরোধের দিন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস বিরোধ ঘোষণা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

প্রথম দিকে স্বরতবাবু ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বাইশে ডিসেম্বর মহাকরণ অভিযানের কর্মসূচী ঘোষণা করলে প্রদেশ ই-কংগ্রেস এই কর্মসূচীকে সমর্থন করে।

স্বরতবাবু দাদা রাজ্য জুড়ে তার সমর্থকদের নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছেন যাতে এই সমাবেশে বেশী লোকজন যোগাভ করা যায়।

এদিকে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আবার ঐ দিনই তাদের সমর্থকদের কলকাতায় এক সমাবেশ ডাকা হয়েছে। রাজ্য ই-কংগ্রেসের অনেক নেতাই অংশগ্রহণ করছেন ঐ দিন একটা ব্যাপক হাঙ্গামা হতে পারে।

বিষয় শুনে জানা গেছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অজিত পাণ্ডা লম্বা বেশ কিছু মেতা স্বরতবাবুর মহাকরণ ঘোষণার তারিখ পরিবর্তন করার পক্ষে। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নতুন মেতা স্বরতবাবুর লম্বা বেশা করে তাকে অস্বস্তি করিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বাইশ তারিখের মহাকরণ ঘোষণা অভিযান স্থগিত রাখা। কারণ আমরা অনেকেই অংশগ্রহণ করছি ঐ দিন একটা হাঙ্গামা হতে পারে। এই মুহুর্তে আমরা চাই না হল কোন ভরতর হাঙ্গামার জড়িয়ে পড়ুক।

স্বরতবাবু ঐ নেতাকে পাঠ করে বলেছেন, “আমি মহাকরণ অবরোধের তারিখ পেছোতে বা এগোতে রাজী নই। যদি নি পি এমের কর্মীরা সেই দিন কোন হাঙ্গামা বাধার তবে তার মোকাবিলা কংগ্রেস কর্মীরা করবে। আমি আপনাদের উপদেশ মানতে পারছি না।”

জানা গেছে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজিত পাণ্ডা এ ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টি করতে হলেন দুই দাবারন সম্পাদক কাজী আবদুল গফ্ফার এবং কে বি ছেজীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। তাছাড়া অজিতবাবু হলেন কিছু প্রবীণ নেতার সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে প্রবীণ নেতারা দাবাই-ঐক্যমত হতে পারেন নি। কারণ কিছু প্রবীণ মেতা স্বরতবাবুর মহাকরণ অবরোধের তারিখ পরিবর্তন করার বিপক্ষে। আবার বেশ কিছু প্রবীণ মেতা ২২ তারিখের পরিবর্তে অন্য কোন দিন প্রত্যাখ্যাত অবরোধ অভিযান করার পক্ষে।

এদিকে স্বরতবাবুর বিরোধী যুব কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ হচ্ছে না বলে অজিতবাবুকে জানিয়ে দিয়েছে।

যেহেতু এ ব্যাপারে কেউই নিশ্চিন্ত নিতে পারছেন না, তাই অজিতবাবু লম্বা অবস্থা জানিয়ে এ আই পি সি-র দপন দফতরে মোট পাঠিয়েছেন নির্দেশ চেয়ে।

ইন্দিরাকে কি আর বেশিদিন মেই? মৃত্যুশ্রী বাজব বাজব করছে? রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যে করে রাষ্ট্রপতি হবার দাখ ইন্দিরাজীর থেকে পেল-অপুর্ন। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে এখনই রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যে করা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্যসভার সংখ্যা-পরিষ্ঠতা না হলে এবং বর্তমান রাষ্ট্র-পতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বেরাধ

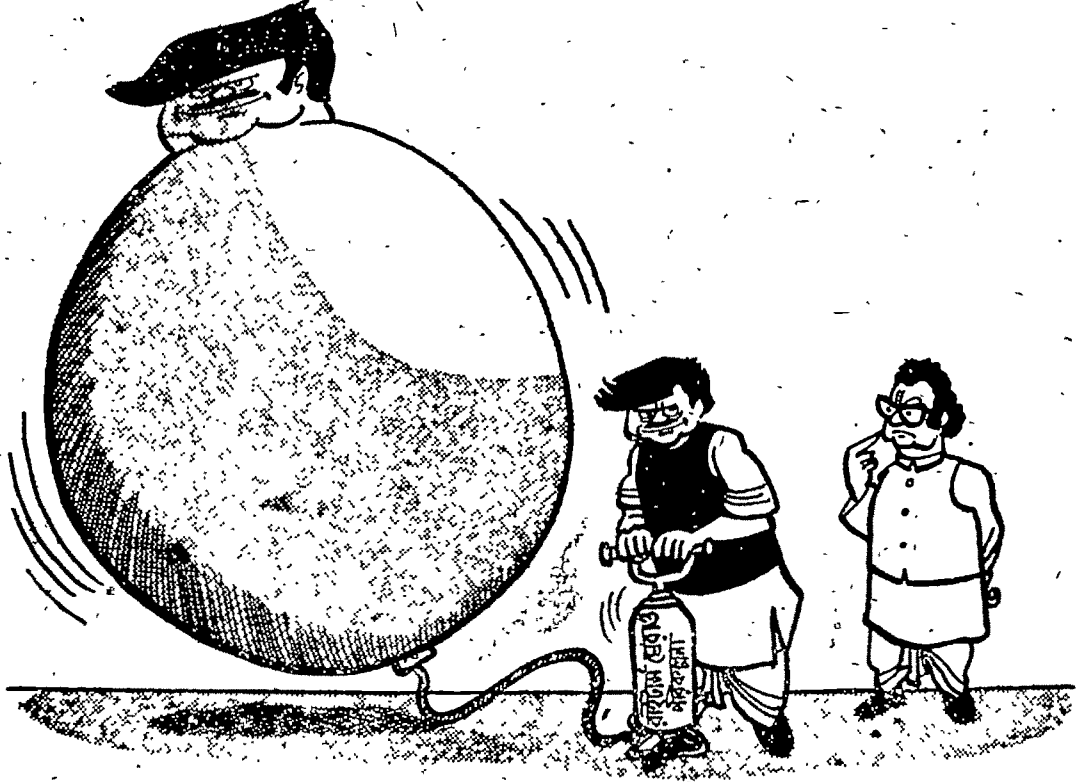
শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইন্দিরাজী কিছুই করতে পারবেন না।

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেয়া হয় যে, রাজ্যসভায় ই-কংগ্রেস হল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বেরাধ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাহলেও কি ইন্দিরাজী বহু আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যে করতে সক্ষম হবেন? এই

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইন্দিরাজীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

বর্তমান লোকসভায় ই-কংগ্রেস হল নিরুপস্থ হলেও রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যে করার প্রভাবে হলের কতজনকে ইন্দিরাজী সঙ্গে পাবেন তা ইন্দিরার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তিনি একথা খুব ভাল করেই জানেন যে বাধাটা আসবে তাঁর হলের সমস্তদের কাছ থেকেই। রাজ্যে রাজ্যে ই-কংগ্রেস হলের গোষ্ঠী কোমল দেখখাই প্রমাণ করে।

একথা কারো অস্বাভাবিক নয় যে, বর্তমান লোকসভায় দপন সমর্থকদের সংখ্যা বেশি। দপন গান্ধী বেঁচে থাকার সময়ে দপনপন্থীদের দাপট শোষণ ৮ম পৃষ্ঠায়



কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড় রকমের রদবদল আসন্ন

চলতি অধিবেশনের শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড় রকমের রদবদল হবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে এবং পাওয়া গেছে। কিছু মন্ত্রী দফতর রদবদল করা হবে এবং নতুন মুখকে মন্ত্রিসভায় আনা হবে বলে খবর পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মন্ত্রী বরকত পনি-খান চৌধুরীকে অল্প দফতরের মারিফ দেওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। শিল্প, প্রথম, অসামরিক সরবরাহ, জাহাজ দফতরও রদবদল হতে পারে বলে ওয়াশিংটন হোল শ্রুতি খবর পাওয়া গেছে।

শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের শ্রুতি জানা গেছে যে, বর্তমান মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যের কাজ করবে শ্রীমতী গান্ধী মোটেই সম্ভব নয়। তিনি হয়ত প্রশাসন এবং মন্ত্রিসভাকে চাড়া করে তোলার জন্য কিছু অযোগ্য লোককে মন্ত্রিসভা থেকে বার দিতে পারেন।

মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই এখন বিভিন্ন রাত কাটাচ্ছেন তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। এমন কি বেশব মন্ত্রীর বাহ-পড়ার কোন সম্ভাবনাই মেই মেই দব মন্ত্রীরা, বেশব প্রথম মুখার্জী, বেক্টরমন, বীরেন্দ্র পাতিল, নরসিমা রাও, কেশব পাণ্ডে প্রমুখও নিশ্চিত নন যে বর্তমান দফতর তাদের হাতে থাকবে কিনা।

রাজধানীতে এখন ই-কংগ্রেস মহলে জোর তৎপরতা চলছে মন্ত্রিসভার সম্ভারনের ব্যাপার নিয়ে। অনেক প্রবীণ এবং তরুণ ই-কংগ্রেস এম পি মন্ত্রিসভার চোকার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীণেশ সিং, ই-কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী-র ভাসবস্বর মহাপাণ্ড, কলমাপ রাই, গোরালিরয়ের রাজকুমার বাধবরাও দিছিয়া, বিহারী যুব কংগ্রেস সভাপতি রামচন্দ্র রথ প্রমুখ

নেতারা প্রচণ্ডভাবে তদ্বির করছেন মন্ত্রিসভার জায়গা পাবার জন্য।

কলমাপ রাই এবং ভাসবস্বর মহাপাণ্ড বহুদিন ধরেই মন্ত্রিসভায় যেতে আগ্রহী। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এদেরকে মন্ত্রিসভায় নেননি। এবার যাতে সুযোগ মট না হয় তার জন্য ছুজনেই আলাদা আলাদা ভাবে রাজীব গান্ধীকে নানানভাবে সম্ভট করে চলবার চেষ্টা করছেন। রাই এবং মহাপাণ্ড ছুজনেই চাইছেন এ ব্যাপারে রাজীবের সমর্থন।

বীণেশ সিং এখন শ্রীমতী গান্ধীর সমজয়ের জন্য নানানভাবে চেষ্টা করছেন। একথা ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোগী বীণেশ সিং এখন ইন্দিরার মন পেতে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে তার জখানোর চেষ্টা করছেন। তাছাড়া উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ শোষণ ২য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয় নাৎসী কার্যদায়

ওপরতলার লৈল সিং বোম্বেয়
মাকোরানা বুঠা সিং এবং মীচের
তলার অজিত পাড়া তোলা সেনদের
চোখে সর্বে সুল খবে দিবে লাভাশে
মন্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য-
মূলক নীতির বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট ঐতি-
হাসিক বাংলা বন্ধ পালন করার পর
এখন স্বতন্ত্র মুখার্জীরা পশ্চিমবঙ্গের
নাড়ী টিপতে বসেছেন। বাইশে
ডিসেম্বর নাকি তাঁর মেতুখে ছাত্র
পরিষদ মহাকরণ অবরোধ করবে।
এর পরে নাকি ই-কংগ্রেস কলকাতা
থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত মার্চ অভি-
যানও করবে। এদের উদ্দেশ্য
আর কিছুই নয়, রাজ্যের বাম ফ্রন্ট
সরকারকে লংঘন লিগ করে কেন্দ্রের
মাধ্যমে তাকে কেলসে দেওয়া।

একই দিনটিকে রাজ্য সরকারের
সমর্থনে মিছিল সমাবেশ দিবস
হিসাবে পালন করার জন্য
বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আগেই
ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু
স্বতন্ত্র মুখার্জীরা যেন পারে পা
লাগিয়ে বাম ফ্রন্টের সঙ্গে সংঘর্ষ
অনিবার্য করে তোলায় অন্য বাইশে
ডিসেম্বরকে বেছে নিয়েছে। শ্রীমুখার্জী
সিদ্ধার্থ সরকারের তথ্যমন্ত্রী ছিলেন,
সেই সুবাদেই 'যেন মন্ত্রিপদে না
থেকেও এমদো রাজ্যের সমস্ত পোশন
তথ্য ও লাক্সারও তার হাতে না-
চাইতেই এসে পড়ছে। তার খবর,
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে অযোগ্য
প্রশাসক প্রমাণ করার জন্যই প্ররোধ
দাশগুপ্ত ওই দিন মিছিল সমাবেশ
ডেকেছেন। সমাবেশের সিদ্ধান্তটি
যে প্ররোধবাবুর একক নয় বাম ফ্রন্টের
শরিক নেতাদের যৌথ ও সর্বদলভিত্তি-
কর্মে গৃহীত এবং জ্যোতিবাবুরও
তাতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বৈরতন্ত্রের
মানসিকতার থাকার কারণে সে-তথ্য
স্বতন্ত্রবাবুর ধারণার বাইরে থেকে
সিঁরেছে। তার আরো খবর, বাম
ফ্রন্ট সেদিন নিজেরাই ট্রাম-বাস

পুড়িয়ে তার দ্বার ই-কংগ্রেসের ওপর
চাপাবে। অপরাধীর মনোবৃত্তি
থেকেই যে ই-কংগ্রেস নেতারা
বিরোধীদের ওপর হুঁতুটি করে
থাকেন, একথা আজ আর কারো
জানতে বাকি নেই। অবশ্য গোপ
মেজী ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী
বহিঃবাং ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ই-
কংগ্রেস কর্মীদের অনবরত প্ররোচনা
দিতে থাকেন, তবে রাজ্যের নেতা-
দের মধ্যে তো এমন চ্যাটাং চ্যাটাং
কথাই শোনা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের
ই-কংগ্রেস আজ হতাশা রোগাক্রান্ত।
পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও কেরালার বাম
ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকারের সাফল্যে
পাশে কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য সরকার-
গুলো ব্যর্থতার রান হয়ে পড়েছে।
এখন তাই যেন তেমন প্রকারেই এই
দিন রাজ্যের সরকারকে পরিচ্যুত
করার জন্য ই-কংগ্রেস আঁচা কল
থেকে লেগে সিয়েছে। মালদার
ব্যক্তিগত পুরনো আক্রোশ থেকে
উজ্জ্বল চার ব্যক্তিকে অঙ্ক করে দেবার
(তারা লকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে
পাচ্ছে) ঘটনার ওপর রাজনীতির
প্রলেপ লাগানোর উদ্দেশ্যও একই।
অথচ স্বল্প লবল বেকার যুবকদের
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে অপারগ
ইন্দিরা কংগ্রেসই যে অঙ্ক করে দিয়ে
বীর অক্ষয়তা থেকে পরিজ্ঞান পেতে
চার বিহারের ভাগলপুরের পর
পশ্চিমবঙ্গের বনুয়াপুরে তার আর
একটি অলঙ্কার বাকর মিলেছে।

স্বতন্ত্র মুখার্জীরা রাজনৈতিক
বিরোধিতার মন্থন রাজ্য ছেড়ে
প্ররোচনা লংঘনের পথ চেয়ে বাম
ফ্রন্ট সরকারের মোকাবিলা করতে
চাইছেন। এটাকে ঠিক মোকাবিলা
বলাও যায় না, 'আমলো কমত
দখলের জন্য এটা একটা হিটলারী
বা নাৎসী প্রচেষ্টা।' কিন্তু ১৯৩০
সাল আর ১৯৮০ সাল যে একই
পরলয়েবার অবস্থিত নয়, দেখা
কংগ্রেস-ই তুলে যাচ্ছে কেন?

এইসব নেতারা

দেবশিশু ভট্টাচার্য

ছদ্মপাত্র পূর্বে দর্পণে লিখেছিলাম
তারতের বাইশতম রাজ্য শিকিমের
রাজনীতির কথা। প্রায়ত লঙ্ঘন
পাড়ীর ছাই তামানো নিয়ে শিকিমের
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মনবাহাচর তাগা-
রীর সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কালী
সেমচুপ হরজীর বগড়া বা এই
হুতোয় শ্রীমতী গান্ধীর শুভবুদ্ধি থাকার
প্রতিবোধিতার কথা জেনে অনেক
পাঠক আশ্চর্য হয়েছেন।

এবার চলুন হিমালয়ের কোল
থেকে পোদাবরীর তীরে। অল্প-
প্রদেশের কথা বলছি। তেলেনানা
শ্রীকালমায়ের কুবক আন্দোলনের
ঝড়ের পরেও যে রাজ্য আজ ব্যালট
বাক্সের নিরিখে কংগ্রেস বা এখন
ইন্দিরা কংগ্রেসের শক্তিশালী বাণী
বলে পরিচিত হয়েছে।

এ রাজ্যের কংগ্রেসীদের কথা
অবুত লম্বান। বাহাস্তর লালে রাজ্য
বিধানসভার নির্বাচন হল। কংগ্রেসী
মহিমতা হল। ছ মাস বেতে না
বেতেই কিছু বিধায়ক বহলীর মুখ্য-
মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনায়া জানিয়ে হাই
কম্যাণ্ডকে লিখলেন, রাজ্যপালের
কাছে দরবার করলেন, বড়বয়ের
রাজনীতি চললো পুরোহমে।

এতেও বধন বহলীর মুখ্যমন্ত্রীকে
সরিয়ে বউপহলীর মুখ্যমন্ত্রীকে আনা
পেল না তখন রাজ্য জুড়ে শুরু হল
বিশৃঙ্খলা। এমন কি রেল লাইন
উপড়ে ফেলা হয়েছে। কুকা-গোদা-
বহী দিয়ে কোটি কোটি কিউসেক তল
পড়িয়ে পেল। ভেলল রাও এর
হাত থেকে হারজাবায়ে মুখ্যমন্ত্রীর
ধারিত্ব বুকে নিলেন ডঃ চেমা রেড্ডী।
মব কংগ্রেস তাগ হল তখনই রেড্ডী
কংগ্রেস আর ইন্দিরা কংগ্রেস।
ভেলল রাও এখন প্রথমেজদের সঙ্গে
আগ কংগ্রেসে আছেন। ডঃ চেমা
রেড্ডী ইন্দিরা কংগ্রেসে।

উদ্বাস্থি থেকে শুরু হল ডঃ
চেমা রেড্ডীর বিরুদ্ধে অভিযান।
কংগ্রেসী এম এল এ, এম পিরা
বলতে লাগলেন পরলা মন্থর অপদার্য
ছনীতিপরাগ মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার

ইংরেজি দাপ্তরিক 'সামতে' ডঃ
রেড্ডীর ছনীতির ফিরিতি দিয়ে
বলতে গেলে একটা বিশেষ লংঘ্য
প্রকাশ করে। একজন ব্যক্তি
কতটা ছনীতিগ্রস্ত হতে পারেন এর
দোড়ে কংগ্রেসীদের মধ্যে দু মন্থর
মকল প্রতিযোগী কে বলা
কঠিন। আবার থেকে কতাকুমা-
রিকা, জম্মু-কাশ্মীরের নৈয়র মীর-
কাশিম থেকে স্বন্দরবনের পোবিন্দ
মন্থর—এ ব্যাপারে ওরা লবাই দল।
দু মন্থরটা বললাম এ কারণে, যে
কাঠ প্রাইজ তো শ্রীমতী ইন্দিরা
গান্ধীর বাধা আছেই।

অবশেষে ডঃ চেমা রেড্ডীকেও
শ্রীমতী গান্ধী লরালেন। কেন্দ্রীয়
মন্ত্রমন্ত্রী টি. এন. আমলাইয়াকে মাল
তিম/চার আগে অল্পপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী
করে পাঠালেন।

আমলাইয়া কমতার বলেই বু-
লেন যে বিরোধীরা বিধানসভার
তাকে কাবু করতে পারবে না। কিন্তু
বহলীর এম এল এ, এম এল সিংয়ের
মতিপতি বোকা দার। লকলের
দাবি, আমরা বধন ইন্দিরা কংগ্রেস
হল করি, অতএব আরাধের প্রত্যেক-
কেই মন্ত্রিপতায় নিতে হবে। 'মন্ত্রী
বলে কথা, পরকাণী পাড়ি, বাড়ি,
ফোন লব জি, মার পাড়ির নামনে
লাল আলো অনবে নিতবে—এ
ছাড়ার পাড় ওরা মন।

আমলাইয়াকী লবাইকেই তাঁর
মন্ত্রিপতায় নিতে লাগলেন। দু/
চারদিন অন্তর রাজ্যপালের কাছে
লিট দার যে, কাল অমুক মন্থরের
মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী লপথ
নেবেন। রাজতবনে লপথ অহুঠান
লেগেই থাকে। মন্ত্রিপতায় লপথ
লংঘ্য এখন দাঁড়ালো তেবট্টী জমে।
বাইশটি রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম মন্ত্রি-
লতা। অথচ ওদের হলরই বিশ্বমাধ
প্রতাপ সিংয়ের উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রি-
লতার মোট বিশজন মন্ত্রী আছেন

৪২৫ জন বিশিষ্ট বিধানসভার বধ্য
থেকে। লারা দেশ চালাতে বধন
শ্রীমতী গান্ধী ক্যাবিনেট, রাষ্ট্র, উপ
এই তিন ভরে মোট ৪১ জন মন্ত্রী
নিরেছেন, টি এন আমলাইয়া তখন
১৯৪ সালন বিশিষ্ট অল্পপ্রদেশ বিধান-

সভার নেতা হিসেবে হল গড়েছেন
৬০ জনকে নিয়ে। কংগ্রেস হাই-
কম্যাণ্ডের একটা নিয়ম ছিল
বিধানসভার মোট আসনের বধ
পতাংশের বেশি লংঘ্যক মন্ত্রী হতে
পারবে না। বহিও দেশের সংবিধানে
এনিরে কিছু লেখা নেই।

মন্ত্রী না করলেই যে মাথা বিপক্ষে
বিস্ক হরে যাবে। উক্ত ৬০ জন
ছাড়া আছে বিধানসভা ও বিধান
পরিষদে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হিসেবে
চারজন। এই চারজনের হুবিধে বেশি,
কারণ এরা ভারতীয় সংবিধানের
অনুত শুপে রাষ্ট্রপতি শাপন কালেও
মোটা মাইনে পাবেন। এছাড়া ছোটো
হাউসেই দুজন করে চীক ও ডেপুটি
আছেন।

এতেও লকলকে লম্বট করা যাচ্ছে
না। আমলাইয়া মাথা বাটালেন।
ইউরেকা, ইউরেকা বলে মন্থর মোরে
মুখ্যমন্ত্রী টেচিয়ে উঠলেন। রাজ্যে
ছাত্রাঘটা ব্যস্ত শাসিত কর্পোরেশন
আছে। সরকারী না হলও মাথা
লরকারী লংঘা বলা দার। বিভিন্ন
রাজ্য মন্ত্রকের অধীনে এগুলো কাল
করে। ৬৬জন ইন্দিরা কংগ্রেসী
এম এল এ, এম এল সিকে বদানো
হল চেয়ারম্যানের আসনে। মন্ত্রী
মতনই সুযোগ হুবিধে পাড়ি, বাড়ি,
ক্যান, ফোন, টি. ভি, রেডিও লব।
জনসাধারণের ট্যাক্সের পরদার
বিল মেটানো হবে। মাইনে অনেক
কেজে মন্ত্রীর চেয়ে বেশি। বিববিভা-
লয়ের উপাচার্যও করা হল।

আর বাঁরা বাট পেরিয়ে গেছেন
তাঁদের অন্য তো মাতার চিত্ত
করছেন কোন্ রাজ্যে তাকে রাজ্য
পাল করা যায়। এ চাকরীকে
কোরালিকেশন—এক, শ্রীমতী
গান্ধীর প্রতি অঙ্ক আহুগতা; ছোট
তিম হলর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে
বড়বলে দকতা। কেন্দ্রীয় সরকার
পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাও
ইনকমীরের চাকরী কিছু ই-কংগ্রেস
পাবেন।

পাঠকগণ, হয়তো বলবেন
কুবক আন্দোলনের পীঠস্থানে এ
রকম কমতালোভী-ছনীতিপরাগ
ব্যক্তির তোটে কেতেন কি করে
উত্তর হবে, বামপন্থীদের তাবনা
প্ররোগে হুর্লতা এই কারণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড়রকমের রদবদল

১ম পৃষ্ঠার পর।

লিং-এর সঙ্গেও মনিষ্ট লম্পর্ক বজায়
রেখে চলেছেন। যাতে বিশ্বনাথ-
প্রতাপ তার হয়ে দিল্লীতে দরবার
করেন।

নূর কংগ্রেসের কিছু নেতা এখন
মন্ত্রিসভার চোকার জন্য আগ্রহী।
জানা গেছে লঙ্ঘন সিং, জগদীশ চাই-

টলার, রাহচন্দ্র রথ, কমল নাথ
প্রভৃতি লঙ্ঘনের বন্ধুরা শ্রীমতী গান্ধীর
কাছে দরবার করেছেন যাতে মন্ত্রি-
লতার কিছু নূর কংগ্রেস (ই) নেতাকে
নেওয়া হয়। এদের কেউ কেউ
রাজীব গান্ধী এবং প্রধানমন্ত্রীর

রাজনৈতিক লিচি বিজয় দারের সঙ্গে
যোগাযোগ রেখে চলেছেন।
অনেকে আবার শুধু লুকনি ধরেও
কাভ মন। তারা নানা লাক্স-লঙ্ঘ-
দের কাছে গিয়েও ধর্না দিয়েছেন
মনোবাহা পুরণের আশায়।

শিল্পপতিদের কাছে নিষ্ফল আবেদন

নন্দিনী-জানকীবল্লভ গোপন রফা

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আর ভেক্টরমণ শিল্পপতিদের বলেছেন, “আপনারা তো অনেক নিয়েছেন, এবার কিছু দিন।” দেওয়ার অর্থ কি জানি না। অর্থমন্ত্রী সম্ভবতঃ জাতীয় অর্থনীতিকে চালা করে তোলায় ভুলে শিল্পপতিদেরও কিছু করার আছে এবং নেটা তারা করছেন না, এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন। শিল্পপতিদের বার্ষিক অধিবেশনে অর্থমন্ত্রীর আবেদন বিশেষ লাড়া ভাগাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ এদেশের শিল্পপতিরা কাজে কর্মে জাতীয় অর্থনীতি বিনোদিত করেছেন মনোফা। বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না।

তারা সরকারের কাছে কেবল দাবী করেন। দাবীগুলি প্রধানতঃ মুনাফাবুদ্ধি, মজুরি। যেমন আরকর থেকে বেহাই, বঙ্গমূল্যে বিদ্যুৎ, রেল যোগে মাল চলাচলের ব্যবস্থা, মজুরি তরুত্ব, কম স্বল্পে ব্যাঙ্ক ও সরকারী জমীন্দার থেকে ধ্রুপদীয় স্বযোগ, আমদানী রপ্তানী নীতি যাতে তাদের মুনাফার বরফ বাড়ায় সরকারি সরকারী ব্যবস্থা। এগুলি করা হলেই তারা জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এককোষী দায়বদ্ধতা পালন করা হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দেন। সরকারকে লক্ষ্য করেন। দেশের বড় বড় ওগরের কাগজগুলি তাদের হাতে। যেমন টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের সব কাগজের মালিক বৈদ্যনাথ গোপী, ইন্ডিয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রুপের মালিক গৌরেন্দ্রা, হিন্দুস্তান টাইমসের মালিক বিজলা, এমন বড় সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ইত্যাদি একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয়। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর অধিকার। বরং একটু বেশীই। জাতীয় অর্থনীতির অবনতির মুখে যে তাদেরই মালিকগোষ্ঠী একথা তারা কখনো উচ্চারণ করে না।

ভেক্টরমণের খোঁজাফি শুনে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর অধিকার হলে এমন ভাবার কারণ নেই। বরং তাদের মূল লক্ষ্যে হাস্যবোধই কথা। ধরুন না কেন, তাদের কতক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে তাদের প্রচুর স্বার্থ প্রদর্শন করেছেন। তরুত্ব বাড়িয়েছেন। আরও ছাড়ের স্বযোগ অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। রেলের কাজকর্ম উন্নতি তেমন হয়নি বলে তাদের কোন কমলাপতি জিপাটির মত ছড়ানোও রেলমন্ত্রীর পক্ষে বহাল

থাকতে পারেন নি। সুতরাং ভেক্টরমণ এদের খোঁজাফি না করে চোখ-রাখাবেম এমনটা ভাবাও যায় না। খোঁজাফিই একচেটিয়া শিল্পপতিরা তুই হন না। তাদের নগদ বিদ্যায় চাই। নগদ বিদ্যায় এখন পর্যন্ত কম হয় নি। ৩১৮টি একচেটিয়া শিল্প সংস্থা সরকারী জমীন্দার ১১০২ কোটি টাকা মেরে দিয়ে লাভ-বাতি জেলেছে। তারা এখন কণ্ঠ শিল্প। কলে সরকারকে দ্বিতীয়বার নগদ শুধে দিয়ে কলকারখানা চালু রাখতে হচ্ছে। শিল্পপতিরা গত বছরও ১৩০০ কোটি টাকা তরুত্ব পেয়েছেন। এবারের বাজেটে তার পরিমাণ প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। আর ট্যাক্স-ফাঁকি ও বাকী পড়ার কথা? সংসদের প্রস্তাবের বাবের নাম ফাঁকিহাতা ও বাকী-রাখার তালিকার শীর্ষে তারা অনেকই শিল্পপতি ও বনিক সমিতির সভাপতি বসে মুচকি হাসছিলেন এটা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না।

ভারতের একচেটিয়া শিল্পপতি গোষ্ঠী জনসাধারণকে লুণ্ঠন করছে, সরকার কোষাগার লুণ্ঠন করছে, এমন কি দেশজাত কাঁচামালের উৎপাদক কৃষকদের উৎপন্ন আধ, তুলো, পাট, গম, চাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি কেনার সময়ও মুনাফা করে চলেছে। আর ভেক্টরমণের মত অর্থমন্ত্রী, রাও বীরেন্দ্র সিং-এর মত কৃষিমন্ত্রী এবং অন্যান্য দায়বদ্ধ দেওয়ার মন্ত্রী থাকতে তাদের অসুবিধেও নেই। আইন কাছের ইচ্ছামত বাকিরে ভেঙে চুরে তারা নিজেদের মুনাফা বাড়িয়ে চলেছেন। সরকার তাদের কতক পালন করছে। দেশ জোড়া কৃষকেরা এখন লাভজনক দায়ের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। সরকারের তাই টমক নড়েছে। তারা আবেদন করছেন, অনেক ভো মিলেন, এবার কিছু চাউন। কিছু ছাড়বে কে? কেনট বা ছাড়বে? সরকার যদি হাতের মুঠোর থাকে, মন্ত্রীর পক্ষি নিশানা করে ছে বনবে, কে ছাড়বে তার কমতা বাবের হাতে তারা কেন কিছু দেবে? তারা তো আরো চাইবে।

যেমন এক কুইন্টাল আধে ২০ কেজি চিনি হয়। উৎপাদন খরচ কাঁচামালের দ্বিগুন। সরকার স্থির করেছেন কৃষকদের আধের দাম হবে ১৩ টাকা কুইন্টাল। তাহলে ২৬ টাকা ২০ কেজি চিনি উৎপাদনের শেবাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

জনতা হচ্ছে সভাপতি-চন্দ্র-শেখরের অভ্যন্তর কাছের জম হলো ভাড়া জনতার বেহাল অবস্থার আগে থেকেই ওড়িশার নন্দিনী সংগঠী গোপনে গোপনে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেসে (ই) একটু শাসন করে নেবার। এতদিন তা হয় নি। কিন্তু এবার আশা করার মত ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তাই কংগ্রেস, জনতা হয়ে যুক্তফ্রন্ট দলীয় তরুত্ব চলেছে। মান ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি হতে হয়ে ই কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন রফা করেছেন। সেই গোপন রফায় বাধা হেট হলেও নিজের লাভটা বেশ বড়দড়। তিনি ওড়িশার রাজনীতিতে এখনকার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়ককে মত দিচ্ছেন যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাস্কর মহাপাত্রকে দাবিয়ে রাখা যায়। পট্টনায়কও তাই চান। হলের দরবারতীর সম্প্রদায়ের পক্ষে বনে মহাপাত্র পট্টনায়ককে তেমন আয়ল দিচ্ছেন না বলে রাজনৈতিক রণে পট্ট নন্দিনীকে পাশে পেয়ে নিজের প্রতাপ বজায় রাখতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। এই জানকীবল্লভ তাঁর ছেড়ে দেওয়া

লোকসভা মিটিংর উপনির্বাচনে সং-পার্থীকে হলের টিবিট পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাওয়া করে রাখছেন। এবং মন্ত্রীপ্রকরণও চেষ্টা চালাচ্ছেন। অতীতকে ভাস্করমণও এটা লক্ষ্যে মেনে নিতে পারছেন না। বরং একটা গোলমাল পাকানর তালে আছেন। যাতে নন্দিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু নন্দিনী ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। নন্দিনীর বন্ধন দুঃসময় কেটে যেতে শুরু করেছে তখন তাঁর কাছের মাহুচ চন্দ্রশেখরেরও সুসময় আসবে এমন কথা নেই। কিছু কান্ডিডাই দেশাইয়ের ছেলের বিয়েতে বাকালোরে একটি বোমা ফাটিয়েছেন স্বামী নন্দাচাট্টী। তাবড় তাবড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিকদের সামনে তিনি দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, দেশের রাজনীতি ক্ষত বদলে যাবে। এর কলে চন্দ্রশেখরজী পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাঁর দিকে সুসময়ের ঢাকা ঘুরতে শুরু করেছে।

মন্ত্রিসভার রদবদল

লোকসভার শীতকালীন অধি-

পাতাল রেলের কাজে বাধা

সম্প্রতি সংসদে রেল দপ্তরের উপ-মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, কলকাতার পাতাল রেলের কাজ ২৬% হয়েছে। বাকি কাজ ক্ষত শেষ করার জন্য পাতাল রেলের কর্তৃপক্ষ খুব চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রথম থেকেই যে সকল লবি পাতাল রেল প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিল আজও তারা এই প্রকল্পের অগ্রগতিতে বিবিধ কার্যস্বার্থ ও বিবিধ অজুহাতে বাধা দিচ্ছে। পাতাল রেল চালু হলে এই সকল লবির কার্যস্বার্থ আর ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে হয়।

মধ্য কলকাতার লোয়ার মার্-লার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলের উত্তর পশ্চিম কোণে পাতাল রেলের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচার-পতি জিটি, কে, বহু। বিরুদ্ধতা ফাঁড়ি ও বিরজী মন্দির সান্নিধ্য এই জমির মালিক ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ। রাজ্য সরকারের বরাট্ট (পুলিশ) বিভাগ যেখানো করে।

পাতাল রেলের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাতাল রেল কর্তৃপক্ষকে এই জমি দেয় জাহাজী

১৯৮০তে। মার্চ থেকে কাজ শুরু হয়। হঠাৎ বিরজী মন্দিরের মালিক কিছু যোগাযোগী হাইকোর্টে প্রতিকরণ করার বছর আদালতে এই স্থানে পাতাল রেলের কাজ স্থগিত রাখার জন্য ইমজাশান চায়। ২৪ এপ্রিল ইমজাশান পেয়েও যায়। কেস নম্বর ৩৫২৮০। বাদীর নাম হল (১) লর্ড শিব (২) চন্দ্রানন্দ পাঠক (৩) বৈদ্যনাথ সিংহ (৪) ভাস্করমণ লাখোটিয়া (৫) বিজয়শঙ্কর পাণ্ডে ও প্রদীপ ব্যানার্জী। প্রতিবাদী: (ক) ভারত সরকার (খ) রাজ্য সরকার।

মামলা চলতে থাকল। আদালত তিনেক সৌদীপ্রদাদ পালকে এই জমি মাপার জন্য পরিদর্শন করতে আদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, মহামান্য আদালত জিপালকে একে যেতে বলেন যে, বিরজী মন্দিরের পেছনের জমিতে পাতাল রেলের কাজ করা সম্ভব কিনা। যদিও সে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখাটা আদালতের এজিয়ারে পড়ে না। শোনা যায়, বর্তমান জাহাজী পাতাল রেলের কাজ হলে বিরজী মন্দির ফাঁড়িটা এগিয়ে আসবে, যা এই অবস্থানের ঠিক সম্মুখে

বেশন শেষ হলে পর আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদল শুরু হবে। কেউ কেউ বাধ পড়তে পারেন। নতুন মুখও কিছু দেখা যাবে। এনিমেষ জমরা কল্পনা চলতে থাকার কল্পনাও রাই, শ্যামসুন্দর মহাপাত্র মন্ত্রী হবার খুঁই চেষ্টা করছেন। অনেকটা এগিয়ে গেছেন রাজামহা-রাজা ঘরের কুশীলবরা। এরা হলেন, হীমেশ সিং জয়দীপ সিং বারিয়া এবং মাধব রাও সিংহিয়া।

কমলাপতি বহুগুণা

কমলাপতি জিপাটী কি বহুগুণার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইছেন। এরই মধ্যে তাঁদের মধ্যে একটা লম্বোতা হয়ে গেছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে লোকপতি জিপাটী বহুগুণাটীর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ যেভাবে রাখছেন তাতে রাজনীতি সম্পর্কে ওরাকিফাল ব্যক্তিরা এই ব্যাণ্ডারটাকে উড়িয়ে না দিয়ে বরং গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অবস্থিত আমলা ব্যাবিস্টার জম্বের প্রতিজ্ঞাত কালকাটা ক্রাবের চোখে যে রাডা দেখায়। বা দীপকে ব কৌতুকী মওজাল করার সময় একথা বহবার বলেছেন। ক্যালকাটা ক্রাবের সুবিধে অসুবিধে বিচার করাটা বিচারকের চোখে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের ছুড়োপের চেয়েও অগ্রাধিকার পেয়েছে।

এদিকে জিপাল জমি মাপার জন্য দিন ঠিক করেন ১০ মে, ১৯৮০। দিনটা ছিল মাসের দ্বিতীয় শনিবার, কেন্দ্রীয় সরকারের ছুটির দিন। চিঠি পাঠানো হল আগের দিন রাতে। পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ থাকতে পারলেন না। পরিদর্শনে একতরফা বিচার হল। হাইকোর্ট মূলে শোনা যায়, পুণ্ডা ব্যাণ্ডারটাক মাজানো। এখন পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল মাইন্ডের ডিক্রিশন থেকে (জিরমেন দত্ত ও জিপি, কে, ব্যানার্জী) আপীল করেছেন। পাতাল রেলের সঙ্গে মামলা হচ্ছে বরং ভগবান মহা-দেবের। শোনা যাচ্ছে, কোন কারণে ভগবানের উপর মদ্র ভাব দেখা জন্ম বিচারব্যবস্থা। এ অঞ্চলে পাতাল রেলের কাজ এখন বন্ধ রয়েছে।

সহজ পাঠ ও প্রতিক্রিয়াশীল আর্ন্তনাদ

৪ম পৃষ্ঠার পর

এক বিশেষ শ্রেণীতে তথাকথিত একটি সামাজ্য প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নিয়ে 'এত আলোড়ন? পূর্বেই উল্লেখ। কুচেতি এ কারণ অনেক গভীরের ও উদ্ভেদ গুণ। মনস্তো বাজারী প্রথম শ্রেণীর হৈনিকের প্রথম সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয়তে অধিব্য, অশালীন, উন্নাদনা, সৃষ্টিকারী শব্দসমূহের জোয়ারে কচিলী ল চিত্তা শী ল পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ও স্থানান্তরিত বিরক্তির সৃষ্টি হতম। কেন এই শ্রেণীর কয়েক হাজারী ভাড়া করা তথাকথিত 'দাব্যবিক্রয়' এই সামাজ্য নগণ্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে প্রায় উন্নাদবাহার শালীনতার নীমারেখাটাও বিস্মৃত হয়ে কেবল মতানৈক্যের লজ্জা মাননীয়দের সম্বন্ধে কুণ্ডলিত কটুক্তি ও বিশেষণাদি প্রয়োগে দাব্যবিক্রয় প্রাঙ্গণে কালিয়া লেপন করছেন? এটাকে কোম বিচ্ছিন্ন ও সাময়িক ঘটনা হিসাবে গণ্য করা উচিত হবেনা।

আমরা জানি আমাদের রাজ্যের তথা দেশের আশি শতাংশ মানুষের বাস গ্রামাঞ্চলে যেখানে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবন ধারণই স্বীকৃত সত্য ও বাস্তব। এই আশি শতাংশের সৃষ্টিমের তুলনামূলক বহুল চাষী পরিবারের কথা বাহ দিলে প্রায় সকলেই নিরঙ্কর ও চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করেন। সরকারী অবৈজ্ঞানিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রকল্প ও প্রয়াস মূলতঃ এদেরই লক্ষ্য। আবার একথাও অতিজ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিশু বালক-বালিকাই

পরিবার পরিকল্পনা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

অংশ চার্চের এই মনোভাব সমর্থন করেন নি। কিন্তু ভারতীয় ক্যাথলিকগণ এর বিরোধী কিম্বা তা জানা যায়নি।

যাই হোক, ভারতের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং সমীকার দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক।

উপসংহারে বলা যায় যে, ধর্মীয় আশঙ্কি সম্বন্ধে নব ধর্মের মোকদ্দমাই বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ, কিছু সংখ্যক পোড়োপন্থী ছাড়া, পরিবার পরিকল্পনার কোনো না কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর মুখ্য কারণ হলো, বড় পরিবার প্রতিপালনের আর্থিক চাপ।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীমারেখার বাইরে প্রধানতঃ পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণেই বেড়ে পারে না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লব্ধি-ধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মধ্যে ঐ বিশেষ শ্রেণীসমূহেই স্বাধীনতার তেজস্বী বহুর পরেও না পড়ার এখনও গ্রামাঞ্চলের মোট বালক-বালিকার অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষার স্বযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এই জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই দেশের প্রশিক্ষিত ও উৎপাদিকাশক্তির আধার বা মূল উপাদান। সুতরাং এই মূলের উপর সমাজের যে উপরিকাঠামো (super structure) প্রতিষ্ঠিত তাদের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আর এই কারণেই সমাজের উপরিকাঠামোর এই বিশেষ শ্রেণীতে তথাকথিত আপাতদৃষ্টিতে একটি সামাজ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে এত আলোড়ন।

কেন এই আলোড়ন? প্রাথমিক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের মৌলিক ও গুণগত (Qualitative) পরিবর্তন না হলেই কেবল বর্তমানের এই সামাজিক স্থিতিবস্থা বজায় থাকবে। অর্থাৎ অবহেলিত-বঞ্চিত-শোষিত শ্রেণী বতর্নিত তাদের এই হতদরিদ্র অবস্থার প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পার, বুঝতে না পারে তত-দুঃখই সমাজের উপরিস্থিত স্থিতি-ভোগী শোষকশ্রেণীর শোষণের অধিকার ও স্বযোগ বজায় থাকবে। শহরগুলোর এখানে-ওখানে কিছু পরিবর্তনকারী বিপ্লবী, অতি-বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাময়িক আন্দোলন মূলে আলোড়ন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে স্থায়ীভাবে অক্ষম তাই এই শ্রেণী খুব বেশী শুকনু এতে কোনদিকই ঘেরনি। কারণ এরা জানে জনগণের বৃহত্তর অংশের চেতনার ক্ষয় ও সমাজচেতনা এমনই পর্দায় ও স্থিতিবাহার আছে যে কোন মৌলিক ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে মৌলিক প্রকৃতির ও গতিশীলতার প্রয়োজন তার অভাব। এমতাবস্থায় গ্রামীণ জনগণের যে বৃহত্তর অংশ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার স্বযোগ পায় তার প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা অক্ষয় থাকলেই এই স্থিতিবস্থা বজায় থাকবে। প্রকারান্তরে এটাই এই অতি উৎসাহী প্রতিবাদ-কারীদের স্থিতিবোধে ও শ্রেণীস্বার্থেই কার্য।

রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' সংখ্যা-গঠিত প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর শ্রেণীচেতনা ও প্রকৃত সমাজচেতনা বিঘাশে পিতৃ-স্বপ্নত উপায়েরই দ্বারক

না হওয়ার এই শ্রেণীর নিকট স্বাভাবিক কারণেই উপযুক্ত বলে বিবেচিত। বহিঃবিশ্বীতে এর পরিবর্তে এমন কোন পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয় যা শিশু ও অপরিশুদ্ধ বালক-বালিকা-রাও তাদের সহজাত অপরিশুদ্ধ বুদ্ধি-জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অহু-হুতি দিয়ে তাদের এই শোষিত অবস্থার লজ্জা দ্বারা মূল কারণগুলি খুব সহজভাবে বুঝতে আরম্ভ করে তবে অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতে এই সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতিবাহার মূলেই আঘাত পড়বার সম্ভাবনা সমধিক। এই সম্ভাবনার পক্ষপন্থি এই বিশেষ শ্রেণীকে আতঙ্কিত উত্তেজিত করেছে ও করাটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রজন্মী নৃত্যোপরিষ্ঠ অংশ যদি কোনদিন ভবিষ্যতে উপযুক্তভাবে মূলেই সমাজসচেতন হয় এবং এই শ্রেণী বিত্তম সমাজের শোষক-শোষিতের সম্পর্কের মূল কার্য-কারণ সম্পর্কটি লম্বা-বিজ্ঞানমন্ডলভাবে স্থায়ী নিক্ষেপে উপনীত হয় তবে সেদিনই এই স্থিতিভোগী শোষক-শ্রেণীর চরম দুঃখ ঘনিয়ে আসতে বাধ্য। এই আশঙ্কা অবৈজ্ঞানিক ও অমূলক নয়।

সমাজের বৃহত্তর প্রজন্মী-শ্রেণীর যদি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার শেব নীমারেখা বাস্তব সত্য হয় ও এই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য-সূচীর মধ্যেই যদি কোন প্রগতি-শীল সরকার শ্রেণীচেতনা ও বিজ্ঞান-মন্ডল সমাজ চেতনার বীজ প্রোথিত করে দেবার প্রচেষ্টা করেন বা ভবিষ্যতে বরল ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অজুরোদগম হয়ে মরীকহে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে তাতে এই বিশেষ শ্রেণীর নিকটই আনন্দিত হবার কথা নয়। সমাজ কাঠামোর মূলেই আঘাত পড়লে সমাজের উপরিকাঠামোর নিক্ষেপ পরিবেশে বাঁধা বাস করেন, তাদের এ আত্মীয় আপাতরম্য নন্দনতত্ত্বের দুঃখ ঘনিয়ে আসাই স্বাভাবিক। তাই এরা এত বেশী আতঙ্কিত-সম্রক্ত উত্তেজিত।

সহজ পাঠের উগ্র সমর্থক স্থধী-বিদগ্ধজনদের বিভিন্ন রচনায় একটা বিষয় সারাস্বকভাবে অগ্রসর থেকে গেছে বা ইচ্ছাকৃত লুপ্ততভাবে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গেছেন সেই বিষয়টির উল্লেখ করতে চাই। যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্তিম অবস্থায় বা তাঁর ব্যাপক সৃষ্টির দর্পণে পর্দায় যে একমাত্র কোভ বা হতাশা নিজেই ছড়ে ছড়ে উল্লেখ করে গেছেন সেই স্বীকারোক্তি লম্বা-বিজ্ঞান-মন্ডল কল্পতে হবে? তাঁর একমাত্র আবেগ বা কোভ পরম পরিপূর্ণতা ও চরম পরিণতির সমন্বয় ছিল বা নিয়ে তিনি

ইহলোক ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা হল জনগণের ব্যাপক অংশের নিকট-তম পারিষদ্য বা একান্ততার উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই বিরাত প্রতিভা একথাও বুঝেছিলেন কোম সৃষ্টিই পরিপূর্ণ অর্থে পার্শ্বক হতে পারেনা যদি না তা সাধারণতম মানুষের সঙ্গে একাত্ম (Identified) হতে পারে। বাস্তবের অবিভক্তিত নিয়মাহুদারই পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই স্বযোগ তাঁর ছিলনা বা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষকে তিনি দেখেছিলেন বুঝেছিলেন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে বার লজ্জা তাকে দোষারোপ করাও অসম্ভব—এটাই প্রাকৃতিক ও সামাজিক অপ্রতিরোধ্য নিয়ম। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মন ও গভীরতর সৃষ্টি এক শ্রেণীর মধ্যে আন ও নীমাবদ্ধ থেকে গেছে। জনগণের ব্যাপক-তম অংশ না বুঝেই সৃষ্টিগাঠে অন্ধ মোহে আবিষ্ট। শরৎচন্দ্র তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশে পঠিত ও প্রচারিত একই কারণে। কিন্তু শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবেগদর্পণ ক্ষেত্রে নীমাবদ্ধ। অনেকের মতে মূলী প্রেমচন্দ্র আরও ব্যাপকতর অংশের সঙ্গে একাত্মতার তুলনামূলকভাবে পার্শ্বক। এই-ভাবেই স্রষ্টার সৃষ্টির পরিমাপগত নীমারেখা ও ব্যাপ্তি নিরূপিত হয়ে থাকে। এখানে সৃষ্টির মৌলিকতা বা গুণগত গভীরতর মানবীয় শাস্ত মূল্যবোধের প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বা স্থধী-বিদগ্ধজনদের প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করতে চাইছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন যে নীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা লম্বা-বিজ্ঞান-মন্ডল ছিলেন তাঁর পরম পরিণত অবস্থাতেও সেই বিষয়েই তাঁর অতি-উৎসাহী উগ্র-অন্ধ-স্বার্থাধেবী লম্বাকেরা যে ভাবে এই মন ও স্রষ্টার মায় মিল সংকীর্ণ শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করছেন তা দেখে যে কোম অন্ধ মোহমুক্ত ব্যক্তিরই ব্যক্তি-বিচলিত বোধ করাই স্বাভাবিক।

বারংক্রুট সরকারের নেতৃত্বে বর্ধন এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই একটি মার্কসবাদী নামধারী রাজনৈতিক হল আছে তখন এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত যে রাজ্যের শিক্ষা অর্থনীতি ইত্যাদি দর্পণবিষয়েই মার্কসীয় দর্পণের ও লম্বা-বিজ্ঞানের সামাজ্য হলও প্রভাব পড়বেই এবং এটাই প্রত্যাশিত। লম্বা-বিজ্ঞান-গণ-তন্ত্রের সাংবিধানিক নীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রকৃতই কতটা এই দর্পণ অর্থ-নীতির বিপ্লবী চিন্তাধারার পার্শ্বক রূপায়ণ লক্ষ্য এই বিতর্কিত প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ না করেও বলা যায়

জনগণের বৃহত্তর অংশের বর্তমানে ও ভবিষ্যতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন্য করাই এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ও সেটাই যুক্তিসঙ্গত। আর সেটুকুও যদি সম্ভব না হয় তবে কোন মার্কসবাদী নামধারী দলের এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাংবিধানিক নীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিয়ে শাসন-কর্মতার অংশ গ্রহণই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আত্মই না হক ভবিষ্যত প্রজন্মের বৃহত্তর অংশের মধ্যে মার্কসীয় তাবধারার মূল বক্তব্যটি যদি কেজাজ-সারে উপযুক্তভাবে বীজাকারে প্রথিত করা না যায় বার কটিপাথরে বাচাই করে তাহা প্রথম সমসাময়িক বাস্তবকে বিলোপন করে বাস্তবিক বস্তব-দেয় শাস্ত নিয়মাহুদারে এগিয়ে যেতে পারে তবে এই সরকারের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর তাত্ত্বিকালে এই এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার বর্তমানি কল্পনার তম স্বকল্প হবে, সম্রক্ত হয়ে আর্ন্তনাদ করবে সে এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে প্রাথমিক শ্রেণীর নীমারেখা পেরিয়ে উচ্চতর শিক্ষার রাজ্যে প্রবেশ করার স্বযোগ লম্বা জীবনে অধিকাংশ জনগণেরই হয় না। সেই প্রথম পদক্ষেপেই—মোহমুক্ত স্থিতিবস্থা কাটিয়ে উঠে সমগ্র জাতিতে মূলেই নাড়া দেবার এই বিজ্ঞানমন্ডল প্রচেষ্টা একমাত্র মার্কসবাদী চিন্তা-ধারার পক্ষেই যেমন সম্ভব তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মিল শ্রেণীর এর কলে বিলুপ্তির প্রকৃতির আশঙ্কায় আর্ন্তনাদ ও অস্বাভাবিক নয়। একটি যদি অ্যামটিভিসিস হয় অর্থাৎ থিসিস—প্রকৃতির শাস্ত নিয়মাহুদারই—দ্বি-থিসিসও অবশ্যম্ভাবী—অপ্রতি-রোধ্য। পরিবর্তিত পরিবর্তিত বৃহত্তর প্রজন্মী-তাবী জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপাধ্য-পরিবর্তনের মধ্য থিসিস ও গুণাত্মক পরিবর্তনের (Qualitative change to Qualitative change) যে পক্ষপন্থি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রত হুচ্ছে প্রকৃতিরই নিয়মাহুদার মত সাময়িকপূর্ণ। কোন সৃষ্টিমের বিশেষ শ্রেণীর আর্ন্তনাদে এই পতি বোধ-কৃত হবার নয়।

সহজ পাঠ এবং প্রতিক্রিয়াশীল আওনা

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজপাঠ-কে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের প্রিন্সিপালের একটা বিশেষ প্রেক্ষিতে যে বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে সহজ পাঠের সঙ্গে প্রত্যেক এমন কি পরোক্ষভাবেও এই প্রেক্ষিতা জড়িত সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। অনেক বনামধর্ম জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বৎ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতার এ বিষয়ে বক্তব্য ও প্রচার পড়লাম ও শুনলাম। কিন্তু আমার বিনীত ও ক্ষুদ্র প্রাণ এই মূল বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত মোট আশি শতাংশ গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী ও তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার মতামতের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একটা বিমূর্ত বিতর্কের - প্রকৃত সার্বকতা সত্ত্বেও প্রাণ কাগাই বাতাবিক। সরকারের তরফেও অনিচ্ছা স্বীকার একটি সংকীর্ণ বিবৃতি ও কিছু সরকারি বিজ্ঞপ্তি তির জনসাধারণ খুব বেশী জানতে পারেননি, যেটার খুবই প্রয়োজন ছিল মনে হয় প্রতিপক্ষের সুস্থিসমূহকে বিশদভাবে খণ্ডন করার জন্য। একাঙ্গে উপস্থিত ও অভিজ্ঞ কোন প্রাথমিক শিক্ষক যার শতকরা আশিজন-গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী ও পরিবেশ সত্ত্বেও প্রত্যেক বৈধ অভিজ্ঞতা ও কিছুটা প্রচেষ্টা সহ সমাজচেতনা আছে তিনিই বর্ণনাগোপ্য ব্যক্তি একথা সুস্থির মন থেকে স্বীকার করার নয় নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে নিছক তথ্য-কথিত পাণ্ডিত্য বৈদগ্ধ্য বা সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতির ক্ষেত্রে সুনামই বৈধ নয়।

রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিনামূল্যে প্রাথমিক প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন মূলতঃ যাদের জন্য সেই অসহায়, দরিদ্র গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রী বা অতিভাবকদের প্রেক্ষিতে তাঁরা পড়েন না বরং এই বিতর্কে ও আলোড়নে অতি উৎসাহ নিয়ে সরিয়া হয়ে নেবেছেন। কিন্তু অকারণে নিশ্চয়ই নয়। একটা সুদূরপ্রসারী ও গভীর অন্তর্নিহিত কারণ অবশ্যই আছে। সে বিষয়ে পরে আসছি। ব্যক্তিগতভাবে গ্রামীণ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় দশে দুই দশত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে আমরা এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে বরং এর প্রতিবাদে সর্বাধিক

মোচ্চার হয়েছেন এঁদের অধিকাংশেরই কেউ কোনভাবেই এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এঁদের অধিকাংশেরই বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা হয় এমন সব ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে বা অতিমাত্রার আদিক্স যেখানে সহজপাঠের প্রাঙ্গণে নেই। আবার শহরগুলোর অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার প্রদত্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণিত হলেও একমাত্র এই পাঠ্যসূচীর ওপরই এই সব বিদ্যালয় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। প্রায় প্রতিটি বিষয়েই অত্যন্ত একাধিক পুস্তক নগদমূল্যে কিনতে হয় ও বৈধাচিত পঠন পাঠনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে হয় যুগ্ম বা প্রি-প্রাইমারী প্রেক্ষিতে অক্ষরজ্ঞান বা বর্ণ পরিচয় হওয়ার পরই সহজপাঠ পাঠ্য হিসেবে পঠিত হয় যা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্ভব হয় না। সুতরাং এঁদের এ বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশের নৈতিক অধিকারই নেই। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা বনামধর্ম হলেই যে সবক্ষেত্রেই সমপরিমাণ অধিকার জন্মায় একথা বিজ্ঞানসম্মত সুস্থিগ্রাহ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

যে কোন বিষয়ের পরিমাপ ও মূল্যায়ন হয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তব পরিবেশ ও পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে। আর তা যদি না হয় তবে তা বিমূর্ত (Abstract) বা ইউটোপিয়া (utopia)।

সহজপাঠ কে সরকার পরিচালিত প্রাথমিক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না রাখলেই যে রবীন্দ্রনাথের মূল্য ও গুরুত্ব কমে যাবে এমন অসার ও উদ্ভট যুক্তি গ্রহণযোগ্য কি? রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় সৃষ্টির মূল্য ও তাঁর প্রতিভার প্রকৃত মর্যাদা কি এতই তদুৎসাহ ও কপন্যায়ী যে কোন একটি বিশেষ রাজ্য সরকারের পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ওপরই একমাত্র নির্ভর করে? কোন প্রতিভাকে প্রকারান্তরে এভাবে দীর্ঘাবদ্ধ করে প্রকৃত অর্থে অপমানিত করার অধিকার এই তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের কে দিলেন? এই সংকীর্ণতার পেছনে কোন প্রকৃত গুণ ও অগ্রিম উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে তারই কিঞ্চিৎ অসুসন্ধান প্রয়োজন। সম্মানে-অজ্ঞানে এই প্রেক্ষিতা স্বামী ও কায়েরী স্বার্থের একটা বিভাবনার মূলেই আবারের সম্ভাবনায় এত বেশী

বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জনসাধারণের অধিকাংশেরই যে একটি ঐতিহ্যগত প্রচলিত দুর্বলতা আছে যার প্রায় সবটাই না বুঝেই, তাই ভাবিয়ে, তারই স্বযোগ নিয়ে বৃহত্তর জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের প্রেক্ষিতা স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন আবার না পড়ে সেই দুর্বাবনারই কি এত মোচ্চার হয়েছেন?

সহজ পাঠের ঐকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও অনেক বনামধর্ম সাহিত্যিক বিদ্বৎের বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হবার মতোগোর জন্য তাঁদের মস্তকচিন্তে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েও কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই বলতে চাওয়ার পেছনে কোন সমালোচনা বা অস্বীকারের উদ্দেশ্য নেই। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে আরও গবেষণাও কার্য। কিন্তু একেজে আমার কথা যে সমসাময়িক শতকরা আশিজন গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর-অর্ধোন্নত প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবেশ এবং তাদের অতিভাবকদের অধিক অংশ। তাইই পটভূমিতে বিষয়টিকে সবসময় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের শিশু ও বালক-বালিকা-দের প্রয়োজনীয়তার দিকে চোখ দিয়েই যেমন বিষয়টিকে চিন্তা করেছিলেন ও অগ্রপ্রাণিত হয়েছিলেন সহজ পাঠ রচনার আশাও তেমনই বর্তমান বিতর্কটির বিষয় চিন্তাতারনা সত্ত্বেও একান্ত হতে হবে আমি বছরের পর বছর প্রত্যাশ্যভাবে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে। এর দ্বারা কোনটিকেই ছোট বা বড় করা হয়না নিশ্চয়ই। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব পটভূমিতে মূল্য ও গুরুত্ব আছে। এককে অস্ত্রের ওপর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরোপিত করে স্বকলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করলে তা বিকৃত ও প্রতিদ্বন্দ্বিত হতে বাধ্য প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মসমূহ সাংগেই।

এই প্রেক্ষিতা সমাজে একটা কথা স্বীকার করলে চলবে না রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশ থেকে এসেছিলেন সেই পরিবেশে শিশু বয়সে তাঁর নিজস্ব অসুস্থিসমূহ ও শান্তিনিকেতনে যে শিশুসুল বেখেছিলেন বুঝেছিলেন বাহ্যের প্রয়োজনে অগ্রপ্রাণিত হয়েছিলেন সহজ পাঠ রচনার তার মধ্যে একটা মৌলিক

মিল বা সাদৃশ্য ছিল। সেই কারণে তাঁর প্রথমদিকের প্রায়ের কল সার্বক হয়েছিল বা সমপ্রেক্ষিতা শিশু-দের হয়তো এখনও মানসিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণে সার্বক ও সক্ষম। বরং এই বিতর্কে সোৎসাহে নেবেছেন তাঁদের সমর্থনেই বলছি নির্দিষ্ট পটভূমিতে তাঁদের বক্তব্য সঠিক ও যুক্তযুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিশু বালক সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা ও আবার মত হাজার-হাজার গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা সর্বাংশে এক ও অভিন্ন হওয়া বাস্তবিক নয় নিশ্চয়ই। অনেকেই দেখছি শিশুদের এই প্রেক্ষিতা ভেঙে বিশ্বাসী নন। কিন্তু রূঢ় মন-বাস্তব অতি-নরলীকরণের পরিপন্থী এমন অনেক উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনার সমাবেশ করে যে এই অতি-নরলীকরণ অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অলৌকিক কল্পনাগ্রন্থত প্রমাণিত হয়।

যদি রবীন্দ্রনাথের বা সহজ পাঠের অতি-উৎসাহী সমর্থকদের একটিও এমন অভিজ্ঞতা ছিল না বা সম্ভব নয় বা আমার মত গ্রামাঞ্চলের শত-শত শিক্ষকের হাজার-হাজার অভিজ্ঞতা আছে।-এসব নিছক পাণ্ডিত্য বা বৈদগ্ধ্যের অপেক্ষা রাখে না। সহজপাঠের কোন অংশকে গ্রামীণ শিশু-চিন্তে বর্তমুর সম্ভব স্তরগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টার বখান হয়তো আমি একাধিক বার তখন হয়তো দেখেছি অনেক শিশুই কেমন যেন অগ্রমনন হয়ে পড়েছে। প্রত্যাশিত আকর্ষণ অসুতব করছে না। প্রথম দিকে ভাবতাম হয়তো আমার শিশুচিন্তে সাদা লাগানোর অপটুতা বা অক্ষমতার জন্যই এটা হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষণ ডিগ্রীধারীর অহংবোধ এতে সুর হত। কিন্তু প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটিত হবার পর সহজপাঠের বিষয়বস্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুচিন্তে কতটা অকার্যকরী তা বুঝতে পারি যা শহরগুলোর মধ্যবিত্তপ্রেক্ষিতার একজন হিসাবে আমারও প্রথমে বুঝতে অস্বীকার হয়েছিল। দিনের পর দিন প্রকৃত কারণ অন্বেষণে নগ্ন বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রাক্তি নিরসনে ও প্রকৃত কার্য কার্য সম্পর্ক নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। এই জাতীয় ঘটনা ও অভিজ্ঞতা গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিত্য-সঙ্গী।

এই জাতীয় ঘটনা ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন ও একান্ত হবার স্বযোগ ও সম্ভাবনা কি যখন রবীন্দ্রনাথের বা তাঁর অতি উৎসাহী সমর্থক রবীন্দ্রভক্তের নিকট সহজপাঠ্য কার্য এই প্রেক্ষিতা সমাজের যে ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তাঁরা আত্মজীবন বিচরণ করেন ও তৎপ্রসূত মূল্য-বোধের অন্বেষণে তা বৃহত্তর ও সামগ্রিক অর্থে কৃত্রিম ও অবাস্তব। এই মূল্যবোধের বশবর্তী হয়ে অতি-নরলীকরণের প্রচেষ্টাও কৃত্রিম ও অবৈজ্ঞানিক। এরা উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বহুল প্রেক্ষিতার যে স্ব-সবল-সন্তোষ বৈদগ্ধ্যের পরিপূর্ণ প্রেক্ষিতার তাহের ক্ষেত্রে হয়তো বর্ণ-পরিচয়ের পর সাহিত্য-কাব্যরসে মিলিত কল্পনাশ্রয়ী সহজ পাঠের আকর্ষণ থাকতে পারে। কিন্তু অসুস্থ অর্ধোন্নত বৃহত্তর শিশুসুলের কাছে কল্পনা-প্রবণ স্ব-শিশুচিন্তের প্রত্যাশাই যুগুত। আমার মতে এঁদের জীবনের প্রথম পাঠ হওয়া উচিত জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেদের এই অবস্থার মূল কারণ কি ও কোথায় তা জানার ও বোঝার অধিকার ও উপায়। শূন্য উদ্বার কাব্যিক কল্পনাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বর্ণ জ্ঞানের পথ বা পদ্ধতির চেয়ে তাদের নিজস্ব বৈদগ্ধ্য অসহ বয়সের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি কোন অক্ষর-বর্ণপরিচয়ের বা জ্ঞানলাভের উপায় বা পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রয়োগ হয় তা নিছক শিক্ষা-বিজ্ঞানের নিয়মসমূহেরই অধিকতর কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত হবে। বাস্তবিক সরকার এই পদ্ধতি আবিষ্কারে ও তার সার্বক রূপায়ণে কতটা সফল হবেন জানিনা, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য বা মূল নীতি যে বৃহত্তর স্বার্থে বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তব পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোন স্ব-সবল-নিরোগ শিশুর ক্ষেত্রে যেমন উচ্চ স্নেহ ও আশ্রয় জাতীয় খাদ্য আশ্রয় পরিপাক/ব্রহ্মের স্বচ্ছতা ও সক্রিয়তা শক্তির জন্য সহজপাঠ্য ও বসবসক উপাধান আবার ঐ একই খাদ্য বিপরীতে আশ্রয় দুর্বল-অসুস্থ-অনভ্যস্ত শিশুর ক্ষেত্রে দুপাচ্য ও কৃতিকারক হিসাবে গণ্য হয়। এর দ্বারা উন্নত খাদ্যগুণ-সম্পন্ন খাদ্যের কি প্রকৃত মূল্যবান বা অবমাননা করা হয়? এই উদাহরণ সহজপাঠের তার শিশুপাঠ্যের ক্ষেত্রেও শিশুমনের চাহিদার ক্ষেত্রেও সম-ভাবেই প্রযোজ্য।

এখন মূল প্রশ্ন তবে কেন এই অতি উৎসাহী রবীন্দ্রভক্তদের এত মোচ্চার প্রতিবাদ? কেন যাদের ঘোষণা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ধর্ম কি অন্তরায় ?

টি এস রামারাও

(আইন বিভাগের প্রধান, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়)

কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে ভারতে সফল পরিবার পরিকল্পনার পথে ধর্ম একটা প্রধান বাধা। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের উক্তি দিয়ে ডেপথ্‌ নিউজের বর্তমান প্রবন্ধে বলী হয়েছে যে, এ বিষয়ে ধর্ম কোনো সময় প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

ভারতের মতো ঐতিহ্যবাহী সমাজে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পড়ে কঠোর পন্থায় ধর্মের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। পারিবারিক জীবন এবং পরিবারের আওতায় ওপরও ধর্মের একটা প্রভাব আছে।

ভারতে তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় রয়েছে। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান। সমাজের দেখা যে এই তিনটি ধর্মের কোনোটিই পরিবার পরিকল্পনার অন্তরায় হয়নি। ধর্ম-শাস্ত্র 'হয়েছে' তা প্রমাণ করা হয়েছে। হিন্দু মনোভাব

বৈষ্ণব যুগে পুত্রবতী মাতার এক বর্ষাভাষ্য আদর্শ ছিল। ঋগ্বেদে আছে, 'সবধুকে আশীর্বাদ করা হলো। "কৃষ্ণি তম পুত্রং ভবতী হব।" পুত্র সন্তানের জন্মদান হিন্দুশাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। কারণ পুত্র পিতাকে 'পুত্র' অর্থাৎ মহত্ব থেকে রক্ষা করে। সে ভুলেই যে পুত্র। অমতে - অধিক পুত্র সন্তান রাখা কংকণে এই আশায় যে, একজন পুত্র সন্তান: তাঁর আত্মার শান্তিও রক্ষা পায় নিশ্চয়ই হবে।

কৌতুকাবহ বিষয়: স্মৃতিতে রয়েছে যে যতকাল তাকে গ্লীণ যৌন আকাংক্ষা চরিতার্থ করা হাম্বল্য জীবনে স্বামীর পক্ষে বাধ্যতাবদ্ধত। যতকালই পুত্র জন্মে, ততঃপ্রবণের পর পুত্র হিন্দু পুরুষের হৃদয় পূর্যক্ষ সুখের বসন্ত:প্রবণে প্রথম চারজন এবং একজন - সর্বোচ্চ হিন্দুস বাচ্য হতে পারে। (মহাভারত। ৪৬. ৪৭)। সন্তানজন্মের তত্ত্বগত কুণ্ডলা বলেছেন যে যতকাল তালে যৌন সংসর্গের নিয়ম উল্লংঘ্য প্রতিই প্রত্যেকা, স্বামীর পুত্র-সন্তান নষ্ট। অজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা। সন্তানসমূহক নয়" তার অর্থ হলো, স্বামীর পুত্র-সন্তান আছে, তাঁরও যৌন সন্তানকে থেকে নিবৃত্ত হলে পরোক্ষ ভাবে, সন্তান নিঃসরণ ও প্রসারিত হয়।

মত থাকে। বলেছেন, যতকাল সন্তান জন্ম হতে পারে (৭৫ ৭ ৪. ৬. ৮,

১০, ১৪, ১৬) তাঁর সংপ্নে মিলিত হলে পুত্র সন্তান হবে এবং বিজ্ঞোড় রাত্রে যৌন মিলনে কন্যা সন্তান হবে। (মহাভারত। ৪৮)। যতকাল সন্তান গর্ভ সঞ্চারের পক্ষে অস্বকূল। তাই ঐ সময়ে যৌন মিলনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সন্তান-বাসে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা কম থাকে। প্রাচীনকালে হিন্দু নারীরা গর্ভসঞ্চারের অস্বকূল বা প্রতিকূল সময় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতেন। এই সময় গর্ভাশ্রয় করেই হিন্দু সম্প্রদায় সন্তান প্রসূত হতেন বা জন্ম-নিঃসরণ করতে চাইলে নিরাপদ সময়ের সহবাস করতেন।

হিন্দুধর্মের কঠোর ঐতিহ্যের মধ্যেই জন্ম নিঃসরণের ইচ্ছা নিহিত আছে। এমনিতে মনু বলে গেছেন, 'নাথারণ ভাবে মনু' বাসে যাওয়া বা অবাধ যৌন সংগমের মধ্যে কোনো পাপ নেই, কারণ এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তবে সময় বিশেষে বিরত থাকতে হয়কার (প্রবৃত্তি স্তূতামাস, নিবৃত্ত মহাপাশম্)। পুত্র লাভের জন্য সহবাস—এই নীতিই অমূল্য হতো। হিন্দুশাস্ত্রে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়কেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্মৃতিতে কৃত্রিম জন্ম নিরোধক (কন্ট্রাসেপ্টিভ) ব্যবহারের কোনো উল্লেখ নেই। মনে হয়, বিবাহের আগেই বাতে যৌন সংগম না করা যায়, তার জটাই করা হয়েছে। না হলে হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান জন্ম নিরোধক লাক্সসংগ্রাম ছিলনা—একথা মনে করার কারণ নেই। অতীতকালে গর্ভপাতকে খুবই ঘৃণা এবং পাপ কাজ মনে হতো। গর্ভপাত করলে সেই নারী পরিত্যক্ত হতো। মহাভারত এবং মহাভারতে গর্ভপাতকে জঘন্য পাপ বলা হয়েছে।

কিন্তু আধুনিক হিন্দু সমাজ জন্ম নিরোধক লাক্স সংগ্রাম গ্রহণ করে চলেছে (পাকীজি অবস্ত কন্ট্রাসেপ্টিভের মাধ্যমে জন্ম নিঃসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না)। বর্তমান সমাজ অর্থনৈতিক কারণে গর্ভপাতকেও মেনে নিয়েছে।

মুসলিম মনোভাব

ভারতে অনেক মুসলমান মনে করেন পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম নিঃসরণ ইনশা'আ ধর্মের পরিপন্থী। যার জন্য মুসলমানরা হিন্দুধর্ম মতো পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অত আগ্রহী নয়। কিন্তু অধ্যাপক ডাইর

হামুথ "পরিবার পরিকল্পনা এবং মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী" নামে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার বৈধিগেছেন যে, কোরাণের মত মুসলিম আইন, হজরত মহাম্মদের নীতি শিক্ষা এবং প্রাচীনপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কেউই গর্ভপাত এবং জন্ম নিঃসরণের প্রচলিত পদ্ধতি সহ-জন্ম শাসনের বিরোধী নয়। তবে গর্ভপাতের ক্ষেত্রে তা যেম ১৭ সপ্তাহের বেশী না হয়। কাজেই ধর্মের দিক থেকে ভারতীয় মুসলমান-ধর্ম-জন্ম নিঃসরণে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের অসিদ্ধার কারণ সম্ভবতঃ সংখ্যাগুরু হয়ে যাওয়ার আশংকা।

খ্রীষ্টান মনোভাব

সারা বিশ্বের খ্রীষ্টানদের মধ্যে শুধু ক্যাথলিকগণ জন্ম নিরোধক ব্যবহারের বিরোধী। তবে সব খ্রীষ্ট - ধর্মাবলম্বীগণই গর্ভপাতের বিরোধী। তাঁদের মতে গর্ভপাত হত্যার শামিল।

ইংলণ্ডের চার্চ ১৯৫৮ সালে লানবেথ্‌ সম্মেলনে জন্ম নিঃসরণ সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। সম্মেলনে তাঁদের বক্তব্য ছিল, "পুত্র পরিবারের সমৃদ্ধ সংখ্যা, এবং সন্তানজন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নির্ধারণ করবে পিতা-মাতার বিবেকের ওপর। কাজেই জন্ম নিঃসরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে পিতামাতার খ্রীষ্টান বিবেকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়" এই নমনীয় মনোভাব গ্রহণের কারণ সম্ভবতঃ জন্মসংখ্যার বিক্ষোভ বিশেষ করে ভারত, আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অন্য ক্যাথলিক চার্চ কখনও কৃত্রিম জন্ম নিঃসরণ পদ্ধতি মেনে নেয়নি। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত মহামান্য চতুর্থ পোপ পলের নির্দেশে ছিল, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিঃসরণ উৎসাহ দিচ্ছে নিঃসরণের পরিপন্থী। এই নির্দেশ-ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিভঙ্গীকে বহুপ্রভাবিত করেছিল। এই নির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিঃসরণের ফলে মানুষের নৈতিক অবমতি ঘটবে এবং পারিবারিক জীবনের অগুণতা নষ্ট হবে। কিন্তু বিশিষ্ট পণ্ডিত ডাঃ রবার্ট সেন্ট জম প্রিন্সিপের মত ক্যাথলিকদের একটা শ্রেণীও ৬৪ পৃষ্ঠায়

মেঘনাদ বধ প্রসঙ্গে

২৮শে নভেম্বর দর্পণে 'সাম্প্র-হারিকতা প্রদর্শন' লেখক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের "পায়ের জোরে কাউকে সাম্প্রদায়িক করা যায় কি?" এ প্রশ্নটির উত্তরে আমার কৈফিয়ৎ 'পায়ের জোরে' কথাটা আমি ব্যবহার করেছিলাম। এই বাক্যে যে, অশোকবাবুর প্রবন্ধে যুক্তির জোরে পীড়াদায়ক অব্যবহিত। বিতর্কিত রামমোহন বিদ্যালয় এবং মেঘ-নাথী তিতু-সিধু কান্না মজল পাড়ে-কেন্দ্রিত যে, প্রতীকী বক্তব্যের বিষয়টি আমার প্রতিবাদ-পত্রে ছিলো,



অশোকবাবু তাকে "চরম হঠকারিতা" আখ্যা দিয়েছেন, কেননা "মধুর রাজনীতি" নাতি "কখনও এ বক্তব্যের সপক্ষে অবস্থান নেয়নি, বরং বিপরীত অবস্থানের সাহিত্যিক স্বাক্ষর রেখেছে সমকালীন কৃষক-বিজ্ঞানজ্ঞান, সমগ্র।" মধুরনের এই "বিপরীত অবস্থানের" প্রদর্শন-প্রমাণ উপস্থিত করে অশোকবাবু আমার মতো মানুষের চেতনাকে চমুকে তুলে, আমাদের হঠকারিতা-মুক্ত হতে সাহায্য করুন—এই নির্বিকল অনুরোধ রইলো।

প্রসঙ্গত বলি, সাঁওতাল-লিপাটী আদির বিজ্ঞানের পরিবেশ ছাড়া "মেঘনাদ বধ"-এর রূপক কাব্যটির

প্রতিবাদ এবং প্রকৃত তথ্য

দর্পণের ৩৮শ সংখ্যা ৭ই নভেম্বর ৮০তে প্রকাশিত "বায়ুস্রষ্ট সরকারের মন্ত্রীকে কেন কাল করছে" প্রতিবেদনে আমার সম্পর্কে অহেতুক অসম্মত মন্তব্য করা হয়েছে। আমি আমার সম্পর্কে বিবৃত ও বক্তোক্তি-পূর্ণ মন্তব্যের ভিত্তি প্রতিবাদ করে প্রকৃত তথ্য নিচে দিচ্ছি।

১। খ্রীষ্টবানী চ্যাটার্জি এম, এল, এ একজন ডক্টর, বুদ্ধিমান ও ভোয়ালো নাথারণ কাণ্ডজানসম্পন্ন লং রাজনীতিক। হোলমেন কন-জিউমার্স কো-অপারেটিভের কাজ এমন কিছু হাতি-বোড়া মন, যার জন্য একজন এম, এল, একে আমার মতো হাকারি গোলের আমলার হাতে "ক্রীড়নক" হতে হবে।

২। আমার কাজ কাউকে "ক্রীড়নক" বানানো নয়, এর জন্য সরকার আমাকে নিয়োগ করেন নি।

৩। পঃ বজ হোলমেন কন-জিউমার্স ফেডারেশনের ১৬ বছর বয়সে আমি তৃতীয় একজিকিউটিভ অফিসার, যার তিন বছরে তিন বার বদলী হয়েছে, অর্থাৎ আগের দু'জন

জন্ম হতে পারতো। বলে আমি মনে করিনা। ১৬০০-বৈশাখের 'চতুর্দশ' বিশেষ সংখ্যায় লুই রেনো নামক করাণী বামপন্থী আইনজীবীর পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ-অজ্ঞানতা (মাইকেল এম-এস-হস্ত : কবি ও বিদ্রোহী) লাকী, মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" মূলত "ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে অবলম্বন করে লেখা।" উৎপল হস্তের সাম্প্রতিক নাটক "দাঁড়াও পথিকবর" মূলত প্রতিক্রিয়ার যুগ সম্পর্কে বিচিত্র কিছু উচ্ছাসকে ধ্বনি দিয়ে বর্ণনা করে। বটে, কিন্তু "মেঘনাদ বধ" যে দেশ-প্রেম ও সমকালীন ভারতবর্ষের সংগ্রামশীলতার দর্পণ, তাকে স্পষ্ট ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পেরেছে। তাছাড়া, বিজ্ঞানগতেরা যখন বায়ু-মাতের তিতু-সিধুকে উপেক্ষা করে জর্ড বেটিককে "চিরস্থায়ী" করে তুলতে উদ্যমিত, তখন মধুর একমাত্র বুদ্ধিভাবী মাজুয়, যিনি ইংরেজেরই ভাষায় সাবিক চর্পে বলে উঠেছেন—Where is Porus, পুরু কোথায় যে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণ-পন্থকবে? হুতরাং মধুরে অস্বাভাবিক করবেন না, পারলে তাঁর "বিপরীত অবস্থানের" লন্ডান দিন—অশোকবাবুকে এ-অ হু রো ধ আমারও জামাতি।

নির্মল সাহা

একজিকিউটিভ অফিসার কিং "মাজুপুলসনে" ৫ বছর ৭ মাস ৬ বছর ৩ মাস ছিলেন।

৪। আমি রাজপুত্র নই যে রাজত্ব চালাবো, সরকারী চাকরি সরকারী নিয়মে কাজ করি। একই নিয়মে ও আবেশের বলে বর্তমান পদে আছি, এ পদ আমার "সপন" নয়, নিয়োগবলে পদাধিকারী।

৫। একটি মন্তব্যের জন্য প্রতিবেদকে অশেষ ধন্যবাদ। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন সময়ের সমস্যার মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতা নিয়ে-সরকারী কর্মচারী স্নাতক নিরপেক্ষতা যারা যেহ অর্জন করতে পেরেছে তার জন্য গৌরব বোধ করি। নিরপেক্ষতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দক্ষতা বজায় রেখে কর্তব্য করেছি ও করছি, এ নীতি-বজায় রেখে কাজ করলে কেউ সং-কর্তৃপক্ষের মেহ থেকে বঞ্চিত হয় না।

গোপাল বিশ্বাস একজিকিউটিভ অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জেলা সন্থা ফেডারেশন লিড

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু অনিশ্চয়তার মুখে

দীর্ঘদিন আমরা শুনে আসছি যে, দেশবিশ্ভাগের বলি-পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু-বহর পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই সব ছিন্নমূল বাস্তু-হারারা সব পুনর্বাসন পাননি। উদ্বাস্তু সমস্যা প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার/কোম-মিসিই শুরু হয়। কেবলমাত্র উদ্বাস্তু বহরের জন্য কোন পূর্বসূরী কোনদিনই কেন্দ্রীয় সরকারে ছিল না আজও নেই। বাড়তি বহর হিসাবে কোন না কোন সূরী বাড়তে এই বহরের তার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আজ থেকে দুই দশক আগে উদ্বাস্তুদের হুঁ পুনর্বাসন দেবার জন্য যে হওকারণ্য উন্নয়ন প্রকল্প গঠিত হয়েছিল তা গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে তেলে দেওয়া হচ্ছে হুঁয়ার মুখে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সূরী বসন্ত শাঠে বলেছেন হওকারণ্য প্রকল্পের কাজ গুটিয়ে নেয়া হবে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে-ছিলেন যে সমস্ত উদ্বাস্তুকেই পুনর্বাসন দেয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতির কি হল? আসল কথা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্দিরা কংগ্রেস নামক দুটি উদ্বাস্তুদের জন্য বড় বড় কথাই বলুক না কেন তা মারাকারা ছাড়া আর কিছুই নয়। হওকারণ্য প্রকল্প গুটিয়ে নেবার অর্থই হল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে হুঁয়ার মুখে তেলে দেয়া।

এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত বর্তমান চেয়ারম্যান এসেছেন তাঁদের কেউই ঠিকমত কাজ করতে পারেননি।

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর পড়তা থরচ। হুনাকা ও অজান্ত থরচ ধরন বেশী করে আরো ২৬ টাকা অর্থাৎ মোট বিক্রয় মূল্য হওয়া উচিত ২০ কেজি ৫২ টাকা। অর্থাৎ এক কুইন্টাল চিনির দাম হওয়া উচিত ২৬০ টাকা কেজি ২৬০ পরমা। কিন্তু বাজারে বিক্রয় ৮/১০ টাকা হয়ে। তাহলে কৃষকের আয়ের দাম বিগুন বাড়ালেও তো বাজারে চিনির দাম এত বাড়তে পারে না। তবু বাড়ছে। একদিকে কৃষক মরছে, অন্যদিকে ক্রেতা মরছে। কৃষক ও ক্রেতা উভয়কে যেতে শিল্পপতিরা ফীতকার হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী এই বের লব্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্ততম কার্যপত্র। এখন প্রত্যা তীর আবে-হন কেন তমবে? ইন্দিরা সরকার যে ভয়াবহ লেজী দানব গুটি করেছেন, তাহদের হাতেই তাহদের অধম হতে হবে। অর্থনৈতিক হত্যাঘের কাছে আবেহন নিবেদন বুঝ।

১৯৭৮ সালে ভেটেরম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ হতে পারেননি আরলা ও হুনীতিবাহকের অসহযোগিতার জন্য। এই প্রকল্প গুটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার হিসাবে বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই একশত কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, হুঁয়ার হও-কারণ্য প্রকল্পের তার চারটি রাক্যের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। রাজ্যগুলি হল ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র। এই হুঁজির কোন বখার্বতা এবং দার্বকতা নেই, বরং সর্বনাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে উদ্বাস্তুদের জীবনে মেঘে আসবে সর্বনাশ।

বেশ খাবীম হবার পর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে রাজ্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা যে তিরিমে সেই তিরি-য়েই রয়ে গেছে। কোন হুঁয়া বা লম্বাখান হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রায়শই বলে থাকেন যে, দেশের জনগণের বিশেষ করে তপশিলীকে উপর থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অবসান না করতে পারলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল করা বাবে না। যদি তাই হয় তাহলে হওকারণ্য প্রকল্প গুটিয়ে নেবার যৌক্তিকতা কোথায়? পূর্ববঙ্গের ১০ পতাল উদ্বাস্তুই তো তপশিলী এবং আদিবাসী সম্ভারভুক্ত।

বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা

কেডারেশন অফ কিন্দ সোলাইটিজ অফ ইন্দিরা আগামী ২০শে ডিসেম্বর লুম্বা গাটার হুঁটনানী হলে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছে। বিষয়: পথের পাচালীর পরবর্তী যুগে বাংলা চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ধারা। মূখ্য বক্তা: প্রব গুপ্ত।

আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিত। টানাপোড়েন সুরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারণেই যাতে অল্প বিস্ত-বান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আড়িনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রান্ডস লিমিটেড

(কেন্দ্রীয় ইন্দিরা একটি সংস্থা হিসেবে)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অগ্রমোহিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত-কারকের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মীলকরা টেন্ডার :

বিজ্জিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেকা: নং : এন কে এ ও / ইজ (সি) ৮০/১৫৬৩ তাং ২-২-৮০

(১) নব কালোরা কোলিয়ারীতে আইসোলেশন ইঞ্জিং ও ক্রিমিং ডেব্রিস নির্মাণ (২) নব কালোরা কোলিয়ারীর এল কে নীয়ে আইসোলেশন ইঞ্জিং নির্মাণ (৩) মাধবপুর কোলিয়ারীর সোনাচোরা নীয়ে আইসোলেশন ইঞ্জিং নির্মাণ (৪) মাধবপুর কোলিয়ারীর সোনাচোরা নীয়ে আইসোলেশন ইঞ্জিং নির্মাণ (৫) মাধবপুর কোলিয়ারীর ১নং পিটে হেড গিয়ার কাউণ্ডেশন নির্মাণ (৬) ৭/৮ পিট থেকে নব কালোরা কোলিয়ারী পর্যন্ত টিঙ্গলার রোড নির্মাণের কাজ। মোট আনুমানিক খরচ ৪,৮৭,৮৮৩.১৫ টাকা। বারমার টাকা টেন্ডার মূল্যের ১% (এক) এবং তা ৪,৮৭৯ টাকার দাঁড়ায়। কেশিয়ার / অ্যাকাউন্ট অফিসারের কাছে প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা (একশো টাকা) ও ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা) নগদে দিয়ে ২০-১২-৮০ থেকে ২৬-১২-৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে মিতিল ইঞ্জিনীরারের অফিস, নব কালোরা এজেন্টের অফিস থেকে টেন্ডার হলিল পাওয়া বাবে।

সাধারণ: আনুমানিক খরচের ১% বারমার টাকা টেন্ডারের সঙ্গে লগ্নিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে পাঠাতে হবে, অন্তর্গত টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাহদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্রান্ডস লিমিটেড

(কেন্দ্রীয় ইন্দিরা একটি সংস্থা হিসেবে)

নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি পি ডব্লিউ ডি / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাসমূহের অগ্রমোহিত ঠিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুত-কারকের কাছ থেকে টেন্ডার নং, কাজের নাম এবং টেন্ডার খোলার নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরভিত্তিক / পার্সেন্টেজ ভিত্তিক মীলকরা টেন্ডার :

বিজ্জিং নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রেকা: নং : ই সি এল / এ-৭ / ইজ (সি) / টেন্ডার / ৮০৮১ / ১০/ ১০১৮৭ তাং ২৫ ১১-৮০

(১) পুরুষোত্তম ও সি পি-৩ সি পি ওয়ার্কিংপে পাকা স্লোরিং (বোন্ডার পোলিং ইত্যাদি) নির্মাণ (২) পুরুষোত্তমপুর ও সি পি-তে আর সি সি র্যাক সহ ট্রোর-কাম-অফিস/নির্মাণ (৩) ভালুংবাধে ও সি পি-তে পাকা স্লোরিং নির্মাণ (৪) মলারবানি কোলিয়ারীতে (আর সি সি ব্লক কানেল) সংশোধিত ডিজাইন অনুযায়ী ইমক্লাইন (কাটা ও ভর্তি করা) নির্মাণের কাজ। উপরে প্রস্তুত সমস্ত কাজের আনুমানিক খরচ ৩৬,১৩,৬৪৬ টাকা। কেশিয়ার, কেনারেল ম্যানেজারের অফিস, পাণ্ডেশ্বর এরিয়ার কাছে ক্রমিক সংখ্যা ৪ বাবদ প্রতি সেটের জন্য ২০০ টাকা এবং ক্রমিক সংখ্যা (১), (২), (৩) বাবদ প্রতি সেটের জন্য ১০০ টাকা নগদে দিয়ে ১৫-১২-৮০ থেকে ২২-১২-৮০ পর্যন্ত কাজের সময়ে পাণ্ডেশ্বর এরিয়ার কেনারেল ম্যানেজারের অফিস থেকে টেন্ডার হলিল পাওয়া বাবে। ২৪-১২-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩-৩০টার খোলা হবে।

সাধারণ: আনুমানিক খরচের ১% বারমার টাকা টেন্ডারের সঙ্গে লগ্নিষ্ট অফিসারের কাছে / অফিসে জমা দিতে হবে, অন্তর্গত টেন্ডার বাতিল করা হবে। টেন্ডারদাতা অথবা তাহদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেন্ডার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেন্ডার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ ভাগ করে টেন্ডারদাতাদের দেবার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

দাঁড়াও পথিক বর

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১০ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট থেকে উৎপল বসু রচিত ও পরিচালিত নতুন নাটক 'দাঁড়াও পথিকবর' অভিনীত হল। এ নাটকের প্রধান চরিত্র মাইকেল মধুসূদন বসু। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ছবি বহু-পন্থ থেকে নাটকের সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে। সেই যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মধু কবির সাংস্কৃতিক জীবনের বিদ্রোহী লভ্যার স্বাধীন বিবেচনা ও মূল্যায়ন হল এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

উৎপল বসু মধুসূদনকে রাজনীতি লচেতন বিপ্লবী কবি ও নাট্যকার হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন, পাঠাই বোকা যায় কিন্তু একটি জীবনের পূর্বাপর ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুই আপন পছন্দমত মধ্যবর্তী ঘটনাক্রমকে অবলম্বন করে সেই জীবনের এক বিশেষ রাজ্য বোঝানো করা আর যাই হোক, জীবনী মাটের স্বাধীন পায়-মা-পায় মা, কারণ সেখানে বিচ্ছিন্ন আরোপের এক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। নাটকের মারক হিসেবে মধুসূদনকে গণ্য না করলেও একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, তৎকালীন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মধুকবির রাজনীতি লচেতনতার পরিচয় পাঠ করে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এই যে রাজনীতি চেতনার বিদ্রোহী রূপ, তার পেছনে

যে হতাশা, অপমান আর অভিমান প্রকীর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন মনে বিদ্রোহের দফার করেছিল, তার বিকসির্ণ না থাকলে তা খতিত, অপর্যবেক মনে হবেই।

মধুসূদনের ষট্ঠবর্ষ অবলম্বনের প্রসঙ্গটিই তাঁর জীবনে প্রধান লংঘাত সৃষ্টি করেছিল। রেতারেও কক-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনার ও তাঁর কস্তা দেবকীকে বিবাহ করার উদ্যোগ কামনার মধুসূদন ঐষ্টান হয়ে-ছিলেন। প্রচণ্ড পৌড়ামির দে যুগে নিজ বর্ষ ভ্যাগ করেও যখন তিনি দেবকীকে জীবনে পেলেন না, তখনই তাঁর জীবন হয়ে উঠল উৎকর্ষিক, প্রচণ্ড বেদনা আর নিরাশার অধির। তার ওপর বোর্ডিং প্রতাপশালী পিতা রাজনারায়ণ বসুর লংঘন লাগল পুত্রের ছরম লংঘাত। হুঃখে অভিমানে আর অন্তর্জালার মধুসূদন হয়ে উঠলেন ক্রমে বিদ্রোহী বেপারোরা। এদর-প্রসঙ্গে উৎপল বসু লংঘে এড়িয়ে 'শ্রিষ্ঠা' নাটকের রূপকার হিসেবে কবিকে প্রথম রকে এনে হাজির করলেন। কলে চরিত্রটিকে বুদ্ধিগোপ মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কখনই জঘন্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। আবার ক্রান্তের ভেদেই শহরে নানাসাধেব লংঘেই মধুসূদনকে প্রেরণ করার পরই নাটকের অবসান পতন নাট্য-কার ও নির্দেশকের বিশেষ উদ্দেশ্যকেই অস্বস্তি লংঘে চিহ্নিত করে এবং তা

হল, মধুসূদনকে রাজনীতি লচেতন রূপে ছুটিয়ে তোলার অতি আগ্রহ। যে ঘটনা এক আকস্মিক বোম্বাধোণে কাকতালীয় পর্যায়ে পড়ে—তার পেছনে লবিশেষ উৎসাহে বিশেষ অর্থ ও ব্যক্তিগত আরোপ করা আভিলাষ্য ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। মধু-সূদন তাঁর কাব্যে ও নাটকে বর্ষের গৌড়ামি ও ভগ্নামিকে আকর্ষণ করে-ছেন, পরাধীনতার জালাকে ছুটিয়ে-ছেন, শোষণ ও অত্যাচারকে খিঁচিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে 'মেঘ-দাহ-বন' কাব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরতে এক ভারতীয় মূলমামকে বেদনাক্ষর্যে এবং এক ইংরাজ দেমাকে লংঘনরূপে করণা এবং স্বীর্ণ লংঘাপ্রবোজনা আদৌ রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে কি? একটা খেউক হল হঠাৎই মধুসূদন পার্শ্ব পানের মান উন্নত করে কেলল সেই যুগেই—এমনটা ভাবা চলে কি? কলীন কল-নিবির যুগে অমর্গল তুল ইংরেজী তনিয়ে কোতুক রসের বহলে ভাঙা-রিই প্রজ্ঞার পেয়েছে তু। নাটকে লংঘিত কোন বিশেষ রাজ্য বসু করতে পারেনি।

মকারে বিভ্রান্তাগর প্রসঙ্গটি মধুর ছুটেছে। মীলমর্পণ নাটকের ইংরাজী অম্বাব্য করার বৃত্তে মধুসূদন ও হেমরিয়েটাকে চরংকার ছুটিয়ে তোলা হয়েছে। রেবেকার সাবি-র্ভাব সেখানে প্রকিষ্ট মনে হলোও যম রচনার মহারক হয়েছে। মীল-মর্পণ ইংরাজী নাটকের প্রকাশকরূপে জেম্‌স লঙের কুমিকা প্রসঙ্গটিও সুরচিত। বৃত্তলঙ্কা ও আলো প্রসংগীয়।

মধুসূদনের কুমিকার উৎপল বসুর অভিনয় লয়স ও ব্যক্তিবর্পূ। বিভ্রান্তাগর চরিত্রে দত্য বন্দ্যো-পাধ্যায় নিপুণ অভিনয় করেছেন। মীলমা হাসের হেনরিয়েটা উন্-ধের দাবী রাখে। শোভা দেব লয়মূহনি রূপে মধুর এক টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'পিপলল লিটল থিয়েটার' প্রযোজিত এ নাটকের অভ্যন্তর কুমিকাও মোটামুটি স্মৃতিমীত।

শৈলেন মোহান্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লংঘলনের লংঘাধক ও ঐতিহ্যবাহী লত্যবর অপেরার সত্যধিকারী শৈলেন মোহা-ন্তর জীবনাবলম্ব রাজ্য জগতে এক বিরাট শ্রুততার সৃষ্টি করল। তাঁর মত লংঘতিবাম ব্যক্তিবের অধিকারী চীংপুর পাড়ার বিরল দৃষ্ট ছিল। তাঁর বাসপন্থী রাজনৈতিক চেতনা ও উচ্চশিক্ষা সর্বদাই অপর্যাপ্ত বসুপতি থেকে তাঁকে বিশেষ স্বাধীন্য সৃষিত

করত। স্বরূপ প্রযোজনার স্তর তিনি রাজ্য লয়কার কর্তৃক পুষ্কৃত হয়েছিলেন।

শৈলেন মোহান্ত যৌবনে বকিং-পূর্ব রেলের কর্মচারী ছিলেন। স্বত্তর পৌরচল হাসের বৃত্তার পর তিনি লত্যবর অপেরার মালিক হল। রাজ্যশিল্পের মানোন্নয়নের লায় উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি রাজ্য জগতে প্রবেশ করেন। তিনি একথা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' পালটি ময়ূধ রায়কে দিয়ে রচনা করিয়ে আলম্ব্য করেছিলেন ও সূরনী প্রাশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত অনেক বিখ্যাত পালার মধ্যে 'একদিন রাজ্য', 'লোমাই দীর্ঘ' ও 'একটি পরমা'র মাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই হল অভিনয় করে বিল্লীপ চট্টোপাধ্যায় তপমকুমার, জ্যোৎস্না বসু, ছন্দা চ্যাটার্জী, শিবদাস মুখার্জী, তোলা পাল, মীমাকী দে, শিবানী ভট্টাচার্য ওরফাল বাড়া পতপতি যৌব প্রকৃতি অভিনয় শিল্পী বিখ্যাত হল।

ইরানীং তিনি অম্ব্য অবস্থাতেও রাজ্যশিল্পের বিবিধ লম্বতা লংকট নিয়লনে লায়ম্বত চট্টা করতেন ও পরামর্শ দিতেন। বোণ্য নেতৃত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লংঘলনের লায় লংকর তিনি লায়বায়িত করে গেছেন। নানা কারণে তাঁর মন বেদনা ক্ষুণ্ণ ছিল। বহর মধ্যে তাঁর একটা বিশেষ কোত ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাসককট লয়কার রাজ্য শিল্পের সৃষ্টি মোচনে কেন তংপর হতেন মা।

যাত্রা ও সাংস্কৃতিক সন্মেলন

কল্যাণ লম্বিতের পরিচালনার লাতদিম ব্যাপী পূর্ব কলিকাতা রাজ্য ও লায়কৃতিক লংঘলন স্কর হুচ্ছে আগামী ২১শে ডিসেম্বর কাঁকু-পাহি নি আই টি বড় পার্কে। গত ১৪ই ডিসেম্বর এক লায়বায়িক লংঘলনে একথা যৌবণ করেন লংঘাধক শ্রীঅমলেশ মিজ।

সঙ্ঘর্য সমর্থক

১ম পৃষ্ঠার পর

ছিল লায়ক। লয়রের বৃত্তাতে ইন্দির পুষ্করা হলো রাজনীতিক হিন্দা তিনি সৃষ্টি পেয়েছেন। কেননা লয়রের কার্যকলাপ ইন্দিয়ার রাজ-নৈতিক ব্যক্তিবকে ক্রমশই লায় করে তুলছিল। তাই একথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, লয়রের বৃত্তা ইন্দিয়ার নিকট বতটা হুঃখের তার চেয়েও বেশি আনন্দের।

লয়রের বৃত্তার পর লয়রপন্থীবেব অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে ককণ। কল লায়, জগদীশ টাইটলার প্রমুখেরা একবয়ে হয়ে পড়েছেন। অথচ লয়র পাণ্ডী লয়ম বেচেছিলেন তখন এঁদের লায়টের ঠ্যালার লকলেই অধির ছিলেন। এমন কি ইন্দিরাজীও। যে জগদীশ টাইটলার ছিলেন প্রধান-মন্ত্রীর রাজনৈতিক লচিব তার এখন প্রধানমন্ত্রীর বাসতবনে চোকার অম্ব-মতি নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার লয়র-পন্থী বসতে একজনই ছিলেন। তিনি হলেন সি পি এন সিং। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যে লয়বল হল তাতে লয়র সমর্থকদের কারো মাম হওয়া হয়ে থাকুক সি পি এন সিংকে লয়র বহলে অপেক্ষাকৃত কক ওরফণ্য লয়রে এনে বলানো হয়েছে। এতে লয়রপন্থীরা খুব ক্ষুণ্ণ।

লয়র সমর্থকরা এখন রাজধানীতে-এবং রাজ্য রাজ্য ইন্দিয়ার বিকছে খুব গোপনে লবির করছেন। লয়রের অম্বগামীরা চাইছেন লতিক নেতৃত্ব পেলে তারা লংঘে ই-কংগ্রেস লয়ের ওপর থেকে লম্বর্ন তুলে মেবেন এবং বিকল্প একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়বেন।

বিশ্বস্তৃত্তে জামা গেছে যে, লয়র স্তর জর্নৈক ব্যবসায়ী লংঘ লয়ত এই মর্মে ভারতীয় জমতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের লকে কথাবার্তা বহু-স্তর করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই লাকি কয়ক লফা আলোচনা হয়ে গেছে। লয়র সমর্থক লংঘ লয়তদের প্রধান পরামর্শদাতা ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী লয়রপন্থীবেব সৃষিয়েছেন যে, ইন্দিরা পাণ্ডার বিরোধিতা করতে পারে এক-মাত্র ভারতীয় জমতা পার্টি লায়ম্বারী প্রাভিন জলসজ্জীরাই। লয়রপন্থীবেব এই প্রায়স কতটা কার্যকরী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।



১৯শে ডিসেম্বর থেকে পার্ক সার্কাস ময়দানে

প্রত্যহ তিনটি খেলা ১, ৪, ৭টা

টিকিট : ২, ৩, ৫, ৭, ১০

৭ ও ১০ টাকার টিকিট পার্কাস তাবুতে

লকাল ১টা হইতে লক্ষ্য ৭টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

শ্রাশনাল সার্কাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে

স্বাতক ও স্বাতকোত্তর পর্যায়ে পূর্ব প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। ভারতীয় কর্মল/ ডঃ দেবব্রত সেন / ১৬০০

২। ধর্মমর্শন / শ্রীকল্যাণচন্দ্র ওপ্ত, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৫০০

৬-এ, রাজ্য স্রবোধ মলিক জোয়ার, কলিকাতা-১৩

সম্পাদক—হীরেন বসু

লংঘাধক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/৬, আচার্য ঐয়্যজ্ঞ জোত, কলিকাতা-৬ থেকে সৃষিত এবং লম্ব্য কার্যালয় ৩১, বট সেন, কলিকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত।

দপন

অগ্রাবশ্য বর্ষ ১৪৬৭ সংখ্যা ১ শুক্রবার ২৬শে ডিসেম্বর, ৮০ ৬০ পয়সা:

ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদত্ত রঞ্জিত গুপ্তর গোপন রিপোর্টে কি আছে

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই জি রঞ্জিত গুপ্ত এই রাজ্যের ব্যাপারে যে গোপন রিপোর্ট দিয়েছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে রাজীব গান্ধীর ইচ্ছাতেই রঞ্জিত গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এই রাজ্যের ব্যাপারে একটি গোপন রিপোর্ট দেন। তেজিশ পাতায় এই রিপোর্টে শুধু বামফ্রন্ট সরকারের কাজের সমালোচনাই যে আছে তা নয়, রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেস সংগঠনের তথ্য অজিত পাচার বিরুদ্ধেও নানা অভি-

যোগ আছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতা যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিতে খুবই আগ্রহী সে খবর মর্পণের পাঠকদের অজানা নয়। এই সমস্ত নেতারা সম্প্রতি জনৈক প্রভাবশালী প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে বামফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন।

জানা গেছে উক্ত প্রাক্তন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার উদ্যোগেই রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাজ্যের বামফ্রন্ট বিরোধী ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের এক বৈঠক হয়। রাজীব গান্ধীর

জনৈক বনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে রাজীবকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত করা হয়। তারপর ঠিক হয় রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন যাতে তিনি প্রাক্তন আই-জি রঞ্জিত গুপ্তকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেন।

এরপর রাজীব গান্ধীর নির্দেশ মত রাজ্যের ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতারা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব বিজয় দারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যবস্থা পাঠ করে ফেলেন। এরপরই দিল্লী থেকে রঞ্জিত গুপ্তকে ডেকে পাঠানো হয়।

রঞ্জিত গুপ্ত তার রিপোর্টে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে নানা অভিযোগ এনেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসনে বেছে বেছে কাজ দি পি এর কর্মীদেরকে নিয়োগ করছে যাতে প্রশালন এবং পুলিশকে নিজেদের কাজে ভবিষ্যতে লাগানো যায়। রিপোর্টে শিক্ষা-সেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

ইন্দিরার পতন ঘটাতে কমলাপতি ও সঞ্জয়ের সমর্থ করা একাবন্ধ

শুধু সঞ্জয় সমর্থকরাই নয়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী কমলাপতি জিণাঠিও ইন্দিরা সরকারের পতন ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। সঞ্জয় সমর্থকদের সঙ্গে কমলাপতি জিণাঠির বিরোধের কথা রাজনৈতিক তথ্যভিজ্ঞ মহলের কারো অজানা নয়। কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নব্বই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে সঞ্জয় গান্ধীর চ্যালেঞ্জের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে কমলাপতি রেলমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ইন্দিরাগান্ধী বৃষ্টিয়ে বৃষ্টিয়ে কমলাপতিকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়েছিলেন।

মর্পণে সেই সংবাদ প্রকাশিতও হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও প্রকাশিত হয়েছিল যে, কমলাপতি সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একত্রেই হয়েছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে আকস্মিক এক ছুঁটনার ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধীর জীবনাবলান ঘটে। তারও পরে কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন কমলাপতি জিণাঠিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয় সে কথা লকলেরই জানা। সেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

ইন্দিরা গান্ধীর বই নিয়ে নানা প্রশ্ন নানা রহস্য

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লেখা বই বাজারে বেরিয়েছে। বইয়ের নাম 'এটারনাল ইন্দিরা', দাম মাত্র চারশো টাকা। আটাত্তর লালে নাকি শ্রীমতী গান্ধী বইটা লিখেছেন। অবশ্য বইয়ের প্রকৃত লেখক নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। ম্যাডামের বনিষ্ঠ লোকেরাই কানায়ুখো করেছেন যে, বইটা শ্রীনারদী প্রসাদ লিখেছেন। বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকা এ কথা লিখেছিলেন।

গত ২১ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এর উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী অনাবশ্যক ধান তানতে শিবের গীত গান এবং বলেন যে বইটা লিখে মাত্র পাঁচ ছাত্রের টাকা তিনি রয়্যালটি বাবদ পেয়েছেন। সাধারণতঃ প্রকাশকরা বইয়ের দামের ১০% রয়্যালটি

লেখককে দেন এবং নামী লেখকের ক্ষেত্রে ১৫% দেন। শ্রীমতী গান্ধীর দামে যে বই কাটবে, এ বিষয়ে প্রকাশকের সম্মত নেই। ১৫% রয়্যালটি পেলে বুঝতে হয় ৪০০ টাকা দামের বই বিক্রি হয়েছে মাত্র ৮০ কপি আর ১০% রয়্যালটি পেলে ১২০ কপি। শ্রীমতী গান্ধীর নামে বই বিক্রি হয়েছে মাত্র ১২০ কপি, এ অবিষ্মত। আবার কোন প্রকাশকের স্পর্শ আছে যে 'এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে' ঠকাবে, বেশি লোককে বই বিক্রি করে বলবে যে কম বই বিক্রি হয়েছে। দিল্লীতে নাকি শোনা যায় যে, বইয়ের আলপ লেখক প্রকৃত রয়্যালটি পাচ্ছেন। 'এটারনাল ইন্দিরা'র 'এটারনাল মহিলা—প্রভাবক লেখিকা' কি বলেন!

ই-কংগ্রেসের আঞ্চলিক নেতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছেন ই-কংগ্রেসেরই ছাত্র নেতা

কিছু ইন্দিরা কংগ্রেসের আঞ্চলিক নেতার বিরুদ্ধে দুটি কিশোর কিশোরীকে খুনের অভিযোগ এনেছেন ইন্দিরা কংগ্রেসেরই ছাত্র নেতা শেখর পাল। শেখর পাল রায়গঞ্জ কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক।

গত ৫ই ডিসেম্বর শেখর পালের বাড়ীতে অস্ত্র গোপীর একদল কংগ্রেস কর্মী রাজে আক্রমণ করে। বাড়ীতে তখন শেখর বা ভোলা কেউই ছিল না। আক্রমণকারীরা "শিকারকে" না পেয়ে শেখরের বৃদ্ধ বাবা-মাকে মারধোর করে। এতেও ভয়ের আক্রোশ মেটে না। আক্রমণকারীরা

এরপর শেখরের ঘুমন্ত ছুই শিশু ভাই-বোনকে তুলে নিয়ে যায় এবং রাস্তার মধ্যে ভোলাকে দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দিয়ে যায়। নিহত ছুই শিশুর নাম কুশাল পাল (৯) এবং তজ্জা পাল (১১)।

এই দুশংস ঘটনার পেছনে কংগ্রেসের উপস্থলীয় কোন্সল বলে শেখর পালের অভিযোগ। অভিযোগ প্রকাশ শেখর নাকি কংগ্রেসের একটি গোপীয় পক্ষভুক্ত ছিল। নানা কারণে বর্তমানে সেই গোপী থেকে সরে দোমেদ মিত্র সমর্থিত ছাত্র পরিষদে যোগ দেয়। ঘটনার স্মরণাত নাকি এখানেই।

পুরনো গোপীর কিছু দাগী আসামী এ ব্যাপারে কিপ্ত হয়ে শেখর এবং তার ভাই ভোলাকে খুন করার নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু শেখর ও তার ভাইকে স্বযোগ মত না পেয়ে ওরা বাড়ী আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এই আক্রমণের ব্যাপারে নাকি মদত যোগায় পশ্চিম দিনালপুর জেলা কংগ্রেসের জনৈক সম্পাদক।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, তজ্জা এবং কুশালের হত্যাকারী বলে অভিযুক্ত পদ্মব বলাক, তপন পাল, নিমাই শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়



সম্পাদকীয়

পরাজয়ে পরাজয়ে ক্ষতবিক্ষত

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ আর আম্বেদকর ও জেহের বশে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার না করতে পারেন, আম্বেদকর বিজয় মার্চ-কৃষক অভিযাত্রীদের কাছে তাঁর সরকারের নৈতিক পরাজয় হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের ই-কংগ্রেস সরকারের পরাজয় প্রতিটি মুখ্যমন্ত্রীরই ঘটেছে, চূড়ান্ত পরাজয়টি বটে ২৬শে ডিসেম্বর বেদীন লং মার্চে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার কৃষক খেতমজুর সরকারী বাধাবিপত্তির প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়ে তাদের লক্ষ্য নাগপুরের বিধানসভা ভবনের ফটকে পৌঁছাবে। কী করবেন তখন আবহুজ রহিম আম্বেদকর? পরভাগ করবেন কি? পরাজয়ের কালিমালিষ্ট মুখখানি প্রিয়দর্শিনীকে আর দেখাতে পারবেন কি?

কৃষিপণ্যের ভাষ্য মূল্যের দাবিতে ছ'টি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক পার্টি যে যৌথ ক্রান্তি পঠন করেছে তারই উত্তোগে এই ইতিহাস কৃষক জনতার ঐতিহাসিক পরাজয়। গত ৭ই ডিসেম্বর জলগাঁও এ দশ হাজার কৃষকের যোগদানে এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বে এ অভিযানের সূচনা। এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের যোকাবিলা করতে গিয়ে রাজ্যের ই-কংগ্রেস সরকার গোড়া থেকেই পরাজিতের সমোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন। পূর্বসংঘটিত কর্মসূচীর লক্ষ্যে রূপায়ণে বাধা ও গণতান্ত্রিক ক্রটকে যে কোন বেগ পেতে হবে না—এ বিবাস অতিজ্ঞতা থেকেই স্রীমাতুলের জন্ম-ছিল। তাই তিনি প্রথমে রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনের বর্তমান মেয়াদ ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ২৬ ডিসেম্বরে ছেঁটে দিয়ে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেন। তাঁর বুদ্ধিতে ক্রটের কোশলে ঠাঁহর দেওয়া সম্ভব হয়নি যে ক্রটও লং মার্চের নাগপুর পৌঁছানোর দিন এগিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয় রণক্ষেত্রে আম্বেদকর পরাজয় বরণ করতে হল তখন, যখন তিনি সর্বস্বাত্মিক পদ-যাত্রীকে গ্রেপ্তার করলেন এবং প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ওয়াই বি চবন, শরদ পাওয়ার প্রমুখ নেতাদের গারে হাত দিতেও কুণ্ঠিত হলেন না। ইন্দিরা কংগ্রেসী রাজ্য সরকারের তৃতীয় পরাজয়ে পরাধিকৃত কৃষক দাবি করতে পারেন চান্দ্রের বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বিনি পুলিশের আধিপত্যে হাকতবান প্রাণনাকে

অগ্রাহ্য করে দ্রুত সমস্ত কৃষকের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আম্বেদকর চতুর্থ রাউণ্ডের লড়াইয়ে পরাজয় বরণ করেছেন শেতকারী লংপঠনের নেতা শরদ পাওয়ার লঙ্গে যৌথ ইতিহাস জারী করে। অরাজনৈতিক ব্যক্তি শরদ পাওয়ার অবশ্য তার দাবি পূরণ সম্পর্কে আম্বেদকর সরকারের “সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি” লাভ করার তাঁর আন্দোলন এই জানুয়ারী পর্যন্ত বসিত রেখেছেন, কিন্তু পরাজয়ী কৃষকদের দাবি যে জারনংপত পেটাই মুখ্যমন্ত্রী আম্বেদকর পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন। সরকারের পঞ্চম পরাজয়টি সূচিত হয়েছে ২১শে ডিসেম্বরের লক্ষ্য মহারাষ্ট্র বন্ধ-এর মধ্য দিয়ে।

কাজেই বামবাম পরাজয়ে ক্ষত-বিক্ষত পশুপক্ষ জতমর্দা। মিরে কংগ্রেস-ই মহারাষ্ট্রে কখনও আঁকড়ে রয়েছেন কেমন করে? ইন্দিরা এ আই সি সি'র অন্ততম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্তের মহাপাত্র আবার এই মর্মে লতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কোন ই-কংগ্রেসী যদি কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন, তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি অবশ্য কংগ্রেস-ই লম্বা নন, কিন্তু এ আন্দোলনকে সমর্থন করার ক্ষমতা তাঁর নিম্না সমালোচনা তো করা হয়নি। বস্তুত, রাষ্ট্রপতির এ সমর্থনেই কংগ্রেসের আর এক দফা পরাজয় চিহ্নিত হয়েছে।

বিত্তীয়তঃ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যখন শেতকারী লংপঠনের অধিকাংশ দাবি মেনে নিয়েছেন তখন তিনি কি পরোক্ষে কৃষক আন্দোলনের পক্ষে সমর্থনই প্রকাশ করলেন না? দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা আম্বেদকর সাহেবকে কী শাস্তি দেওয়া হবে? জনতা, লোকহল, কংগ্রেস (আপ) সি পি আই এম, সি পি আই ও পেজেন্টল এ্যাণ্ড ওয়ার-কার্স পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এত বড় সাফল্য অর্জন করার পর বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি কি বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হবে না?

বইয়ের দুনিয়া : স্বজনপোষণ ও শত্রুতোষণ

বিশেষ প্রতিনিধি

পার্কদার্কাসে সম্প্রতি এক পুস্তক মেলা বসেছে। উল্লেখ্য: পশ্চিম-বঙ্গ সরকার, বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যান্ডোমিয়েশন ও বকীর প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। এই মেলার উদ্বোধন কালে একটি নির্বাচিত পুস্তক তালিকা বিতরণ করা হয়। তালিকাটি “রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন-এর অর্থে ক্রয়-যোগ্য পুস্তকের একটি নির্বাচিত তালিকা”, যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। এই পর্ষদের মধ্যে মাননীয় শ্রীমন্তী বহু (ডাইরেক্টর, তাম্রনাথ বুক এজেন্সি) ও জনাব সৈয়দ শহীদুল্লাহ-র মতো প্রগতিশীল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার (পুস্তক তালিকার তাঁদের নাম সূত্রিত আছে) স্বাভাবিকভাবেই আমরা একটি সুনির্বাচিত পুস্তক তালিকা আশা করতে পারি। বিশেষ করে যখন বই কেনার ক্ষমতা বরাদ্দ করা সরকারী টাকার ৩০% ভাগ মূল্যের বই এই তালিকা থেকেই বাছাই করতে বাধ্য করা হচ্ছে গ্রন্থাগারের। টাকা বা বরাদ্দ হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে মেটাও কম নয়—দশ লক্ষ টাকা। তালিকাটি হাতে নিয়ে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েকজন প্রকাশকের তাগোই (!) শিকে ছিঁড়েছে—

গণতন্ত্রের অবস্থা

কেরালায় পুলিশ লক-আপে

পিটিয়ে মারার জন্য বিক্ষোভ

গত ১৮ ডিসেম্বর জিলাঙ্গারের কোর্ট এলাকার পুলিশ লক-আপে জ্বলন্ত নাকের জলৈক পান দোকানের মালিক মারা যায়। বামপন্থী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ক্রট তথাই, দে, নাকারের পুলিশ জ্বলন্ত নাকের নকশালপন্থী লম্বাচ্ছে গ্রেপ্তার করে লক-আপে অত্যাচার চালিয়ে খুন করেছে। এর প্রতিবাদে পরের দিন নকশালপন্থীদের নেতৃত্বে জিলাঙ্গার শহরে মিছিল বের হয় ও সেখানে আংশিক বন্ধ পাতিত হয়। নকশালপন্থী লম্বাচ্ছে ও মিছিল বার করার অপরাধে পুলিশ ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করে, এর মধ্যে তিনজন ছিলেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী। রাজ্যের বাদ ছিল না বললেই চলে। প্রত্যেক রাজ্যের মোড়ে যুবকেরা জটলা করে, নাকলেই পুলিশী ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

- (১) তাম্রনাথ বুক এজেন্সির ৪০টি বই।
- (২) নবজাতক প্রকাশন-এর ১৮টি বই (প্রকাশকের সূত্রিত পুস্তক সংখ্যা ২৪)।
- (৩) পপুলার লাইব্রেরি-র ১২টি বই (প্রকাশকের সূত্রিত পুস্তক সংখ্যা ১৬)।
- (৪) এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং-এর ১০টি বই।
- (৫) সারথত লাইব্রেরি-র ১১টি বই।
- (৬) সুবর্ণরেখা-র ১১টি বই।
- (৭) চিত্রা রত-র ১টি বই (প্রকাশকের সূত্রিত পুস্তকসংখ্যা-১৫) তালিকাতুক্ত।

ব্যাপারটি আরোই দৃষ্টিকটু হয় যখন তালিকা প্রণয়নকারীদের অন্ততম সৈয়দ শহীদুল্লাহ-র তিনটি বই তালিকাতুক্ত হয় এবং তাঁর বই ছেপেছেন নবজাতক প্রকাশন ও পপুলার লাইব্রেরি। এরপর এটা কি খুব কঠিন বা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা হবে যে এই দুই প্রকাশকের ভাগ্য ফেরাবার চাবি এইটাই। প্রকাশকরা এ হরহের বিকল্প হিসাবে বিশেষ কিছু লেখককে ধারণ করে অনেক বেশি স্বকল পেয়েছেন। মারায়ণ চৌধুরীর ২টি বই ওই পপুলার-ই ছেপেছেন, আরো ২টি ছেপেছেন এ, কে, মুখার্জী অ্যান্ড সন

এবং তাঁরাও কৃপাধর হয়েছেন। অত্যধিক নবজাতক প্রকাশন শহী-দুল্লাহ ২টি বই ও বহরদীন উমরের ১টি বই ছেপে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। চিত্রা রত-ও বহরদীনের ২টি বই ছেপেছেন, অধিকতর তাঁদের তালিকা-র আছে কৃষ্ণ চক্রবর্তীর গল্প ‘পাটা মারিয়ে বহন’ (কৃষ্ণ চক্রবর্তীর তিনটি উপজাত পূর্ববর্তী তালিকাতুক্ত হবার পরও এটি বোধহয় এখনো উদ্বৃত্ত)। সারথত লাইব্রেরি লম্বাচ্ছে: প্রথমে মুক্তকর আহমেদ-কে আঁকড়ে তরিয়ে গেছেন। তবে পপুলার লাইব্রেরির সাফল্য তুলনা-হীন। তাঁদের সূত্রিত ১৬টি গ্রন্থ আছে, তাঁর মধ্যে ১২টিই তালিকাতুক্ত। তাই শুধু নয়, তাঁদেরই বই অবিনাশ ঘোষালের ‘শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী’ তালিকাতুক্ত হয়েছে তাঁর প্রকাশকের (শ্রীমন্তী সংখ্যার) নামে। তাছাড়া আনা লুই ফ্র্যাং-এর ‘স্টালিন এরা’ (ইংরাজী) বইটি তালিকাতুক্ত হবার পরও দ্বিতীয়বার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শেখাঙ্গী নন্দী লিখিত পুস্তক হিসাবে। এরমই দাঁশট পপুলার লাইব্রেরির শেখাঙ্গী নন্দী লিখিত ‘বেঙ্গলি কবির ফরেনারস’ নামে একটি বই অবশ্যই পপুলারের তালিকার আছে। উল্লেখযোগ্য, পপুলার-এর প্রগতিশীল বই নন্দিনী শতপথীর গল্প লক্ষনমণ্ড তালিকাতুক্ত। অশোক বিজয় চারটি বইও পুস্তক তালিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। এবং হয়তো অশোক বিজয় বই ছাপার ক্ষমতা স্ববর্ণরেখার ভাগ্য ফিরে গেছে।

বিচক্ষণ পাঠক বলতে পারেন, লং জীবনধর্মী বই ধারা ছাপেন, তাঁদের বই নিশ্চয় বেশি নির্বাচিত হবে। খুবই দৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় গল্প-উপজাতের তালিকার স্থানীয় জানা, মিথিরা আচার্য, চিত্ত ঘোষাল বা পূর্ণ রিতের কোনো নাম-গন্ধ নেই। তাঁর জারগার বহু অপ-রিপত লেখা নাম পেয়েছে। ছবি বহুর গুরুত্ব ‘আঙনরাডা’-র নির্বাচন যদি স্থানীয় বহুর লঙ্গে তাঁর কোনো একটি সম্পর্কের কথা (অবশ্যই আইনামুগ) স্মরণ করিয়ে দেয় তবে কি মেটা প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা? কালিদাস রক্তিতের ‘বাবলুর জয়ধ্বনি’ কোন্ গুণে বুদ্ধমার্গ প্রকাশিত ‘স্থানীয় জানার শ্রেষ্ঠ গল্প’কে পরাজয় করল? কবিতার ক্ষেত্রে কণক মুখোপাধ্যায়, নন্দহুলাল গুপ্তাচার্য, প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও শ্যাম হুন্দর-র শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যমূল্যের সমতা

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

মহারাষ্ট্র থেকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কৃষকদের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। মহারাষ্ট্রের কৃষক জাতি। নান্দপুরে বিধানসভা অধিবেশনের সামনে ভাষ্যমূল্যের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্তে শত শত মাইল পদ পরিভ্রমণ করে চলেছেন। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের তামিল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুও কৃষক আন্দোলনে উদ্ভল।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল রহমান আনন্দে স্পষ্টাঙ্গি এই কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন,

ভাষ্যমূল্য

অন্তর্দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস (ই) কমিটির অন্ততম সাধারণ সম্পাদক বসন্ত দাশা প্রাতিভ প্রকাশ্যেই কৃষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের শাসক কংগ্রেস (ই) দলের বিধায়কেরাও দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের বর্তমান আন্দোলন কসলের ভায়সরয় দ্বারা ধার্য করার দাবী তুলে ধরেছে। কিন্তু শাসক ইন্দিরা কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত এই ভাষ্য দাবী সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন না।

সুতরাং এই অর্থনৈতিক দাবী উপেক্ষিত হলে অদূর ভবিষ্যতে গভীর রাজনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে। শাসকদলের অভ্যন্তরীণ কারণ এটাই।

কৃষকের কসলের দাম কতটা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কেও মিমত দেখা দিতে পারে। শাসক দলের কোন কোন নেতা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং এর ধারণা যে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা বিচার করেই কৃষি পণ্যের মূল্য ধার্য করা উচিত। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে কৃষি পণ্যের দাম ক্রেতাদের স্বার্থে কম হওয়া উচিত। মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের কাছে রাও সাহেবের মতামত সহজবোধ্য। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষক অথবা কৃষিনির্ভর সেই দেশে কৃষিজাত পণ্যের ভায়সরয় দ্বারা উপরোক্ত শতকরা মাত্রের জন-ক্রেতার কেনাকাটার সামর্থ্য নির্ভর করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী দল ও তাদের পেটোরা অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকেরা এই আদর্শ তথ্যটি গোপন করে

কৃষক ও ক্রেতাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী বলে দেখাতে চান। সাধারণ পাঠকদের কাছে এই অর্থনৈতিক পৌলক ধারণা কাল অতিক্রম করা সহজ নয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে কৃষকই হোন, শ্রমিকই হোন অথবা বিভিন্ন পেশা ও অফিস কাছারীতে নিযুক্ত মধ্যবিত্তই হোন, তারা প্রত্যেকে একই মূল্যে উৎপাদক ও ভোক্তা অর্থাৎ বিক্রেতা ও ক্রেতা।

টাকাভিত্তিক মাধ্যমে তারা নিজেদের পণ্য ও সেবা বিনিময় করেন। সুতরাং দাম জিনিসটা সহজ ও দাবীলীন বিনিময়ের সহায়ক হওয়া দরকার। না হলে খাণ্ড ভাণ্ডার উপচে পড়বে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ স্বার্থ থাকবেন, দোকানে দোকানে ধরে ধরে ভোগ্য জিনিস দাখানো থাকবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা কেনাকাটা করার সামর্থ্য রাখবেন না।

কৃষিজাত বহু পণ্য—এমন কি খাদ্যশস্য দামাশস্য প্রভৃতিও শিল্পোৎপাদনের কাঁচামাল। চিনি, কাপড়, সার, চট, হুয়াসার, চা ও কফি, রবার এমন বহু পণ্য আছে যা সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত শিল্পের উৎপন্ন পণ্য কৃষিজাত কাঁচামালের দ্বারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে, এমন কি পরাধীন ব্রিটিশ আমল থেকেই কৃষিজাত পণ্যের দামের সঙ্গে শিল্পজাত পণ্য মূল্যের হারাহারি সম্পর্ক একটা নিরমশ্বালাহীন অর্থনৈতিক অরাজকতার মধ্য দিয়ে চলেছে। কসলের মরুতমে কৃষকের কসলের দাম পড়ে যায়, মরুতমের পর ধনীরা গোলাকাত হওয়ার পর তার দাম বাড়তে থাকে। শিল্প মালিক, তাদের ফড়ে দালাল, গ্রামের ক্ষোভ-দ্বার মহাজিন সবাই মিলে কৃষকের নারাবছরের শ্রম ও আশার কসল বাজারের কলকৌশলে লুণ্ঠন করে নেয়।

কৃষক প্রতি কুইন্টাল মাথের দাম পায়ে ১৩ টাকা। এক কুইন্টাল আধে বিশ কেজি চিনি তৈরী হয়। চিনির দাম কেজি প্রতি ৮ টাকা অর্থাৎ বিশ কেজির বাজার দাম ১৬০ টাকা। উৎপাদন খরচের হিসেবে কাঁচামালের দিগুন উৎপাদন খরচ। কোথাও কম, কোথাও কিছু বেশী। তাহলে ২০ কেজি চিনির উৎপাদন খরচ ২৬ টাকা, সরকারী শুধু ১৩

ইন্দিরা ক্রমশ স্বৈরাচারী হচ্ছেন

কল্যাণ ঘোষ

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছে। ১২ মাস অতিক্রান্ত। জনসাধারণের সমস্তাগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়ে স্বৈরাচারী কার্যক্রম প্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠেছেন “এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ” শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর ই-কংগ্রেস দল।

বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ই-কংগ্রেস দল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেসব প্রতিশ্রুতি পালন করার পরিবর্তে জনবিরোধী কালাকাহন প্রণয়নের দিকেই যেন ই-কংগ্রেস দলের নজর বেশি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের ১০ মাসে ১৮টি বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা জারী করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল জাতীয় নিরাপত্তা

টাকা ও পরিবহন, বস্তা ইত্যাদি খরচ আরো ১০ টাকা ধরলে মোট উৎপাদন খরচ ৪১ টাকা অর্থাৎ কেজি প্রতি ২'১১ পরস্যা। মুনাকা ধরে ২'৫০ পরস্যা। দক্ষিণ ভারত চিনি কল নির্মিত ও এটা যেনে নিচ্ছে। তাহলে ক্রেতাদের বাজারের কেজি প্রতি আট টাকা দিতে হয় কেন?

যদি কৃষকদের দাবী মত আধের দাম ৩০ টাকা কুইন্টাল দেওয়া হয় তাহলে ৩০ চিনির পড়তা খরচ ৩ টাকা ও বিক্রীর দাম ৫ টাকার বেশী হবে না। সুতরাং কৃষকদের দাবী মত লাভজনক কসলের দাম দিলে ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হবে এমন ধারণা দৃঢ় নয়। খাণ্ড-শস্যের ব্যাপারেও একই কথা। কৃষকের চাল ১০৫ টাকা কুইন্টাল আর রেশনে বিক্রীর দাম প্রায় ২ টাকা কেজি বা ২০০ টাকা কুইন্টাল। মাথের এই প্রায় একটাতা ফড়ে দালাল ও সরকারী অপস্বার্থতার দাম ক্রেতাদের বহন করতে হয়। সুতরাং কৃষকদের কসলের দাম লাভজনক হলেই ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হবে না বরং কৃষকদের কেনাকাটার ক্ষমতা বাড়ার ফলে অন্তত পণ্য ও সেবা বিক্রেতার আয় বেশী হোক কসমে বিক্রী বাড়তে পারবেন, আর বাড়তে পারবেন। অর্থনীতি চাকা হয়ে উঠবে। সুতরাং কৃষি পণ্য মূল্য তহবল কমিশন ও বুয়ো অব কন্ট্রোল বোর্ড কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের মূল্যে একটা সমতা বিধান করতে হবে।

আটক আইন। যদিও চলতি সংসদের অধিবেশনে নিরাপত্তা আটক আইনটিকে বর্জ্যের জন্ত কার্যকরী করতে বিল আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তা লোকসভায় পাশ হয়ে গেছে।

ইন্দিরা শাসনে দেশের অবস্থা তরাবহু এবং অগ্রগত। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দিনে দিনে দাধারণ মাহুকের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কালোবাজারী এবং মজুতদারদের হাতে সবকিছু নিঃশূন্য ক্রমতা চলে গেছে। বেকার দমিয়া বাড়ছে। শিকা সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ছে। কাগজের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাড়তে জনগণের বিক্ষোভ।

দেশের এই যে অগ্রগত অবস্থা তার মোকাবিলা করার মত সাহস শ্রীমতী গান্ধীর নেই এবং সেই কারণেই বিরোধীদের জব্ব করতে একে একে কালাকাহন জারী হচ্ছে। জব্বী অবস্থার সময় যেসব জন-বিরোধী কালাকাহন জারী হয়েছিল, নাম বহলে সেইগুলিই একে একে ফিরে আসছে বিরোধী দল-গুলির মোক্তার নেতাদের শায়েস্তা করতে।

কিন্তু শ্রীমতী হস্ত ভুলেই গেছেন যে, এটা ১৯৭৫ দাল নয়। দেশের মানুষ আজ অনেক সচেতন। নাগরিক স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হলে দেশবাসীই তার মোকাবিলা করবে এবং সেই বিক্ষোভের আগুনে ইন্দিরার রাষ্ট্রপতিত্ব কার্যকর করার স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আটক আইন জারী করে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর তা প্রয়োগ করা হবে না। সুতরাং মিসা যখন জারী করা হয়েছিল তখনও এই কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধীদের কার্যকলাপ রোধ করতে তাঁদের ওপর মিসা প্রয়োগ হয়েছিল। এবারও যে আটক আইন চালু করা হয়েছে তা রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর প্রয়োগ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে তার প্রমাণ মিলেছে। বিহারে সংসদ সদস্য অরুণ রায় এবং বিধান সভা সদস্য কৃপাশংকর চ্যাটার্জীকে আটক আইনে প্রোথার করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সি পি আই (এম-এল) নেতা মত্যানারায়ণ শিং ও তার ছদ্মন সঙ্গীকে বিহারেই

আটক করা হয়েছে নিরাপত্তাভঙ্গক আটক আইনে।

সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার মোহে শ্রীমতী গান্ধী হয়ে উঠেছেন মরিয়া। বিভিন্ন এলাকাকে উপজ্ঞত ঘোষণা করে কেন্দ্রবিশেষের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রে নিয়ে নিয়েছে। যেমন মৌর্যাবাদ ও অ্যানিগড়। ইতিমধ্যেই প্রথমমন্ত্রীত্বের সম্মেলনে মালিকদের স্বার্থে ধর্মটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজস্ব মন্ত্রীত্বের সম্মেলনে রাজ্যের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবার হুকুমী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মুখে বাই বলুন না কেন—তার আসল উদ্দেশ্য হল বিরোধীদের দমন করা এবং গণআন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের শায়েস্তা করা।

আজ দেশবাসীকে যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করার শপথ নিতে হবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করতে হবে। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে হবে আদমুদ্র হিমাচলে। স্বৈরাচারী ইন্দিরার অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করার শপথ নিতে হবে।

কলকাতা থেকে বাজালীর বিদায়

নলিনী পাল

কলকাতা মহানগরী বাঙ্গালীদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মারোয়াড়ী এবং শুজরাটি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ এখন কলকাতা দখলে নেমে পড়েছেন। বিভিন্ন চেয়ার অব কমার্স এবং কিছু ব্যাঙ্ক এঁদের মদত দিচ্ছে।

আপে ওরা বড়বাজার এলাকার বাইরে যেতেন না। এখন ওরা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছেন এবং সুযোগ পেলেই অর্থহীন বাঙ্গালী বাড়ীওয়ালাদের প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে তাঁর বাড়ীটি ছলে বলে কৌশলে দখল করে নিচ্ছেন। এছাড়া, বামফ্রন্ট সরকারের সরকারী গৃহ ক্রাফ্ট বন্টনের মন্ত্রী জ্যাকিরা বা হরতালদ্বার নেপথ্য সহযোগিতায় এবং ইজিতে বহু আবাসিক গৃহ বাঙ্গালীর পরিবর্তে ঐ সব অব্যবহালী শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের নামে বন্টন হচ্ছে।

কলকাতা পৌর এলাকার প্রায় দেড় লক্ষ বাড়ী এবং প্রায় দু হাজার বস্তি আছে। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে যদিও সঠিক তথ্য নেই, তবু তারা এর একটা ধর্মীকার কথা ভাবছেন বলে বিশ্বস্তভাবে জানা গেছে।

অপর দিকে, কলকাতার বাস্তব্যুত বাঙ্গালী বাড়ীওয়ালারা শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠছে

বাদলকৃষ্ণ সেন

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর শাসন করে বৎসর দেখানে অসামরিক শাসন চলেছে। সিয়াকত আলী খাঁর মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তানে স্থায়ী কোন অসামরিক শাসন বেশীদিন টিকে থাকতে পারে নি। সামরিক নেতা ইকবাল হুসাইন শাসন করতে দখল করার মধ্যে দিয়ে পকাশ দশকে যে সামরিক শাসন পাকিস্তানে আরম্ভ হয়, তারপর থেকে প্রায় একটানা সেই শাসন চলে আসছে যাকে যাকে সময়কালের বিবর্তিত ছাড়া।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে অস্ত্রসহ হবার পর সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁর থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের শাসন ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল পর আবার বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে। কিন্তু এই শাসনও বেশীদিন স্থায়ী হতে পারল না। ১৯৭৭ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে সমগ্র দেশকে আবার সামরিক শাসনের অধীনে নিয়ে এলেন। ভুট্টোর কতকগুলি অগণতান্ত্রিক কার্যাবলীর জন্য জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, তাই ভুট্টো বিরোধীরা জিয়াকে সমর্থন জানিয়েছিল। ভুট্টো নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্বাচনে কাচুপি করে জয়লাভ করেন। এই সব অসন্তোষকে দিয়া খুব সূচকসূত্রের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন।

জিয়া ক্ষমতা দখল করে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ১৯৭৭ সালের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে অসামরিক শাসন প্রবর্তন করবেন। ভুট্টোর বিরোধীদের সমর্থন আদায় করে তিনি প্রথম আশাত হানলেন ভুট্টোর দল পিপলস পার্টির ওপর। এক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা ভুট্টোকে আদামী করে দীর্ঘদিন ধরে সেই মাথাটাকে উপলব্ধ করে লোকের মনকে অত্যন্ত দাবিত করার

প্রয়াস চালান জিয়া সাহেব। শেষ পর্যন্ত জিয়া নামান প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচনার মধ্যেও ভুট্টোর ফাঁদীর আদেশ কার্যকর করে নিজেকে একজন শক্ত মানুষ হিসাবে প্রমাণ করেন। এই সব ঘটনার আড়ালে ১৯৭৭ সালের প্রতিশ্রুতি নির্বাচন চাপা পড়ে গেল। এই সময়ে কোন উচ্চবাচ্য না করে দখলে এড়িয়ে চলতে লাগলেন জিয়া। দেশের লোক-বুকে তার উন্নয়ন অভিযুক্তি। লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এইটা বুঝতে পেরে ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হল। সেইভাবে নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনিবেশ পত্রও প্রাধিকার করা হয়। জিয়া বুঝতে পারলেন নির্বাচন হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। হঠাৎ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বন্দী করে রাখলেন। কারণ দেখালেন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নির্বাচনের অঙ্গুল নয়। কোন সামরিক শাসক খেজার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথা অস্বাভাবিক নির্বাচন করে ক্ষমতা ছেড়ে সামরিক ছাউনীতে ফিরে গেছে এই রকম ঘটনা পৃথিবীতে খুবই বিরল।

জিয়া সাহেব ক্ষমতায় আসলে তাঁর বিদেশী প্রভুর প্ররোচনায়। পাকিস্তান স্বাধীন থেকেই-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেখানকার আত্মসম্মতিতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। হালে ইরান ও আফগানিস্তানের ঘটনাবলী আমেরিকাকে বেশ বিব্রত করে তুলেছে। তাই পাকিস্তানকে এই সব দেশে অন্তর্ভুক্ত চালাবার জন্য নানানভাবে দাবাষ্য করে চলেছে। ইরানের মার্কিন ও শাহ-বিরোধী আন্দোলনে জিয়া প্রথমে একেবারে নীরব সুমি-কায় ছিলেন। যখন দেখলেন শাহ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন তখন জিয়া সাহেব মুখ খুললেন। ইরানের প্রতি তাঁর ক্ষীণ সমর্থন প্রকাশ পেল। যাতে তাঁর মার্কিন

বন্ধু কষ্ট না হয় তার জন্য ১৯৭৮ সালের আফগানিস্তানের বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী-দের সঙ্গে এক হয়ে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। আফগানিস্তানের প্রতি-বিপ্লবীদের সামরিক শিকার দিয়ে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করে চলেছেন। দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হচ্ছে সীমান্তে সোভিয়েট সৈন্যের উপস্থিতি পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে, তাই মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই সব কথা বলে নিজের ক্ষমতার সমর্থনদীর্ঘায়িত করে চলেছেন।

এখন পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারছে সামরিক শাসন তাদের ঘাড়ে দীর্ঘকালের জন্য চেপে বসেছে, তাই জিয়া বিরোধী দলগুলি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমে পড়েছে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি, ওয়ালি খানের জাশনা ল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাউন বন্দের পাকিস্তান জাশনা ল পার্টি ও আগর খানের তেহরি ইজ্জতলাল পার্টি প্রভৃতিকে নিয়ে এক দল জিয়া বিরোধী একটি মোর্চা গঠন করার জন্য চেষ্টা চলেছে। বামপন্থী চারটি দল এই সব মধ্যপন্থী দলগুলির সঙ্গে বৈরাচারী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছে। সেই আহ্বানে মধ্যপন্থী দলগুলি এখনও কোন সাড়া দেয় নি। গত ৮ই আগস্ট তেহরি ইজ্জতলাল পার্টির প্রতিনিধি সভাপতি আসফ ভারদার জিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য দল দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, “পাকিস্তান জাতীয় ঐক্যীকরণ” গঠন করে সব দলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তভাবে সংগ্রামে নাম-বায় জন্ত। পাকিস্তানে প্রায় রাজনৈতিক দলই নিষিদ্ধ। হালে করাচী বন্দরে ৭৫ দিন বাবত ধর্মঘট হয়ে গেছে। এর নেতৃত্ব দিয়েছেন বামপন্থী দলের সংযুক্ত মোর্চা। ২১শে আগস্ট করাচীতে আইনজীবীদের সম্মেলনে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের দাবী জানানো হয়েছে।

২২শে আগস্ট আইনজীবীদের এক বিরাট মিছিল বের করা হয় করাচীতে। সেই মিছিলের ওপর সাঠি চালান হয় এবং ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সব আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে বামপন্থী দলগুলি।

অন্য তথ্যেও যাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হতে না পারে তার জন্য জনস্বতকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিয়া সরকারী ভাবে খোলাখুলিভাবে ধর্মাত্মকতা আহ্বান করে চলেছেন। জিয়া সাহেব ইসলামাবাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে পাক জনগণের বিক্ষোভকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য ২৮শে আগস্ট মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিদ্যানদের নিয়ে এক বোর্ড গঠন করেছেন। তাঁদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মের নীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং পাকিস্তানকে ইসলামের পথে নৈতিকভাবে পরিচালনার জন্য। এই সব কার্যের জন্য ছয়টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই প্রলভে জিয়া সাহেব বলেছেন পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ আইনসভার ‘মুসলিম’ ছাড়া অন্য কাউকে বসতে দেওয়া হবে না। মুসলিমের কথা বলে এবং অন্যান্য দোষ দেবিয়ে আন্দোলনে ভাবন সৃষ্টি করার প্রয়াস চালান হচ্ছে। এই সব করেও জিয়া হালে পামি পাচ্ছেন না।

বারে বারে দেখা গেছে পাকিস্তানী শাসকবর্গ স্বয়ং দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভের লক্ষ্যবিন্দু হন তখনই ভারত বিবেকের আগুনে দেশকে জাগিয়ে তুলে দেশের অন্তোষকে ভিন্ন পথে ধাবিত করতে চেষ্টা করেছেন। এখন জিয়া সাহেব ও সেই পথই ধরেছেন। হালে ইসলামাবাদে ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীদের প্রহার থেকে আরম্ভ করে পত্র পত্রিকার ভারত বিবেকী জিগির তুলে সেই দেশের সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলেছে। জিয়া সাহেবের আদর্শ যতই টলমল করে উঠছে ততই তিনি ভারত বিবেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত চুক্তি অস্বাক্ষর করে বার বার কাশ্মীরের প্রশ্ন তুলে দেশের লোকের কাছে বাহবা পাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। দেশের জনরোষকে এখন ভিন্ন পথে চালাতে চাইছেন। তার মূল লক্ষ্য হল নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করা।

ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় যুক্ত প্রভৃতির জন্য পাকিস্তানে ১৯৮০ সালে বাণিজ্য বাটতি দাঁড়াবে ৫০০ কোটি টাকার। পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রী এই কথা প্রকাশ করে-

ছেন। অর্থনৈতিক দলট দিন দিন চরমে উঠতে আরম্ভ করেছে। চারিদিক থেকে জিয়ার অবস্থা ধারাপ হয়ে উঠছে। তিনি বেশীদিন গদী ধরে রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

পাকিস্তানের গণ বিক্ষোভ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আবার আর একটা সামরিক ক্যুতে জিয়ার ছিটকে পড়া অনন্তব কিছই নয়। প্রয়োজন হুরিয়ে এলে তাকে পদ থেকে সরিয়ে অন্তের পথ করে দিতে তাঁর মার্কিন বন্ধু এতটুকুও বিধা করবে না। এর নজীর খুব বিরল নয়।

পাকিস্তানের মৈত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়াস চালান হচ্ছে। জিয়া পাকিস্তানকে একটা সামরিক কেন্দ্রীয় পরিণত করতে চাইছেন। তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়ে ভীত হয়ে আছেন। এর জন্য দেশে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছেন। পৃথিবীর চারিদিক থেকে অন্য আর অর্থ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। দেশের অর্থনীতি চুলোয় যাক, তাতে তাঁর তাবনা নেই। চীন আমেরিকা ও সোভি আরব পাকিস্তানকে সমর সজ্জার মদত দিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে পড়ে উঠেছে এক সামরিক চক্রান্ত ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। জিয়া সাহেব এই কথা-বোশ ভালভাবে বুঝতে পারছেন যে বেরনেট ও বোমার্ক বিমান দেখিয়ে দেশের আত্মসম্মতি বিক্ষোভ বন্ধ করা যাবে না।

একথা বুঝতে পেরে তিনি মাঝে মাঝে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন পাকিস্তানের পক্ষে সহায়ক হবে না এই কথাও বলেছেন। তাঁর মন্ত্রিসভার অসামরিক লোকদের নেবার লোভও দেখাচ্ছেন। ভুট্টোর দলের লোকদের মন্ত্রিদের লোভ দেখিয়ে কুৎসিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মোট কথা, জিয়া দমন্ত রকম ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন ক্ষমতা রক্ষার জন্য। কিন্তু যারা তাঁকে চেমেন তারা এই ছলনার ফাঁদে পা বাড়াবেন মনে হয় না। সবাই একথা ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছেন জিয়া সাহেব প্রাণ খাততে কখনই খেজার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না।

পাকিস্তানের মৈত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়াস চালান হচ্ছে। জিয়া পাকিস্তানকে একটা সামরিক কেন্দ্রীয় পরিণত করতে চাইছেন। তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়ে ভীত হয়ে আছেন। এর জন্য দেশে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছেন। পৃথিবীর চারিদিক থেকে অন্য আর অর্থ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। দেশের অর্থনীতি চুলোয় যাক, তাতে তাঁর তাবনা নেই। চীন আমেরিকা ও সোভি আরব পাকিস্তানকে সমর সজ্জার মদত দিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে পড়ে উঠেছে এক সামরিক চক্রান্ত ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। জিয়া সাহেব এই কথা-বোশ ভালভাবে বুঝতে পারছেন যে বেরনেট ও বোমার্ক বিমান দেখিয়ে দেশের আত্মসম্মতি বিক্ষোভ বন্ধ করা যাবে না।

একথা বুঝতে পেরে তিনি মাঝে মাঝে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন পাকিস্তানের পক্ষে সহায়ক হবে না এই কথাও বলেছেন। তাঁর মন্ত্রিসভার অসামরিক লোকদের নেবার লোভও দেখাচ্ছেন। ভুট্টোর দলের লোকদের মন্ত্রিদের লোভ দেখিয়ে কুৎসিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মোট কথা, জিয়া দমন্ত রকম ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন ক্ষমতা রক্ষার জন্য। কিন্তু যারা তাঁকে চেমেন তারা এই ছলনার ফাঁদে পা বাড়াবেন মনে হয় না। সবাই একথা ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছেন জিয়া সাহেব প্রাণ খাততে কখনই খেজার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না।

পাকিস্তান প্রত্যক্ষ পুস্তক পর্ব

প্রাক ও প্রাককালের পর্যায়ে পর্ব প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। প্রতীকিত্তায় / প্রিইকুমার রায় / ৭০০

২। ইমানুয়েল কান্ট / হুমায়ুন কবির / ৫০০

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক কোয়ার, কলিকাতা-১৩

আকুপাংচার চিকিৎসায় কি কাজ হয় ?

আইম খান

আকুপাংচার ক্রমশই জন-প্রিয় হয়ে উঠছে। কেন? কারণ চিকিৎসায় অনেক দুঃস্বাস্থ্য রোগ ভালো হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত নুনিক চিকিৎসার তুলনায়, এই চিকিৎসার খরচ অনেক কম। তৃতীয়ত নিউজ ইন্ডিয়া সংবাদদাতার কয়েকজন আকুপাংচার চিকিৎসকের ক্রিনিকে গিয়ে কয়েকটি লিখেছেন।

মহম্মদ নাভিদের বয়স বয়স ছয়, তখন তার পোলিও হয়। আট বছরে তার বাবা ম্যালেরিয়ায় মারা যান, কিন্তু কোনো ফল পায়নি। ধীরে ধীরে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝেঁঝে লাগলো। সে দাঁড়াতে পারতো না। তখন একজন আকুপাংচার চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। দু'মাসের চিকিৎসাতে সে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে গেল। গল্পের বা বলালে, "সে এখন ত পারবে।"

আকুপাংচার হলো ৫০০০ বছরের পুরনো চৈনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। দ্বিতীয় পীত. সম্রাটের চিকিৎসা গ্রন্থে উল্লেখিত এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সালে ভারতে এই চিকিৎসা প্রবর্তন করেন ডাঃ হুয়াং বন। ডাঃ হুয়াং বন চিকিৎসা আরও ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ডাঃ বন চীনে গিয়েছেন। তিনি বর্তমানে এই আরও চিকিৎসার প্রচারণা চালিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নাতে। ডাঃ বনকে দেশে এই চিকিৎসা পদ্ধতির একজন পথিকৃৎ হওয়া উচিত। এইসব আকুপাংচার চিকিৎসা সমাজ সেবার ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া উচিত। তাই এর ফি গুলি কম—৩০ টাকা মাত্র। গল্পবাহিনীর তালিকাও মুদ্রণ করা হয়। ফোটা-মেমোরিয়াল কমিটি বিনামূল্যে পাংচার সম্পর্কে একটি প্রসিক্ষণ চর্চা করে।

ব্যাপক ভিত্তিতে না হলেও আকুপাংচার ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ এর নিয়মের কমেতা থেকে ১০ শতাংশ। নতুন দিল্লীর মিনামুদ্বিনে একটি আকুপাংচার গবেষণা ক্রমিক আছে। আলনা করেন ডাঃ এম আর

খান। ডাঃ খান কলকাতার আরকা-নাথ কোর্টিন্স প্রতিষ্ঠানে আকুপাংচারের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তারতের চীন ও জাপানী মিশনও তার প্রশিক্ষণে সাহায্য করেন। ডাঃ খান তার ফি বাবদ প্রাপ্ত ৩ টাকা থেকে ৩০ পরশা দান করেন কোর্টিন্স মেমোরিয়াল কমিটিকে।

ডাঃ খানের চিকিৎসায় শত শত রোগী ভালো হয়ে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই একসময় নিরাময়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যেসব রোগী ভালো হয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন, তার মধ্যে আছে—পোলিও, পক্ষাঘাত, হাঁপানী, বাত, ক্রনিক মাথা-দুঃখ, ক্রনিক পায়ের ব্যথা, ক্রনিক আমাশয়, একজিমা, পিঁপড়া-লাইটিস, প্রাথমিক পর্যায়ের স্ক্রু ও বহির, স্ট্রোক, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ।

নিরাময়ের কাহিনী
জৈনক মধ্যবয়সী ব্যক্তি শোখ ভাতীর রোগে আক্রান্ত হন। রোগীর দেহে বিক্রিয়ার কলে পচনক্রিয়া শুরু হয়। প্রচণ্ড ঘর্মস্রাব রোগী ঘুমতে পারতেন না। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতে আক্রান্ত পা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া পথ নেই। শেষ পর্যন্ত আকুপাংচার চিকিৎসাতে সেই ব্যক্তি "সম্পূর্ণ ভালো" হয়ে গেলেন।

মিশেল জে. পিটার। বয়স বছর তিরিশ। ৮ বছর ধরে কোমরের ব্যথা ভুগছেন। কোনো ওষুধেই কাজ হয়নি। আকুপাংচার ক্রমিক মাত্র ১২ দিনের চিকিৎসাতেই তিনি আশাতীত ফল পেয়েছেন। বছরের মধ্যে এই প্রথম তিনি শান্তিতে ঘুমতে পেরেছেন। তদ্রূপেই ক্রনিকের বেডে শুয়ে আছেন। দারী শরীরে দু'চ ফোটা নো। যেখানে যেখানে যেন হলো, আকুপাংচারে কি খুব কষ্ট হয়। ডাঃ খান বলেন, "ইন্ডেক্সনে যা বাধ্য হয়, আকুপাংচারে তার থেকেও কম। পরন্তু দু'চ ফোটানোর পর কণী অনেক আরাম অনুভব করেন।"

তিনি আমার দেখালেন। পোলিও রোগে আক্রান্ত ছয় বছরের শিশু মহম্মদ নাভিদের দেহে ডাক্তার এটি দু'চ ফোটালেন। পায়ে, গোড়ালীতে এবং পায়ের। বিছানার শোয়াবার সময় বাচ্চা একটু কেঁদেছিল, কিন্তু ডাক্তার জানালেন যে, দু'চ ফোটাবার পর বাচ্চা হয় খেলবে, না হয় ঘুমিয়ে পড়বে। মতিহাই দেখলাম, ২০ সেকেন্ডের মধ্যেই বাচ্চা গভীরভাবে ঘুমিয়ে

পড়লো। দু'চ ফোটানো অবস্থা-তেই।

চিকিৎসা
আকুপাংচারে যে দু'চ ফোটানো হয়, তা ভালো ইন্দ্রিয় তৈরী। হাতালটা তামার। এই দু'চ লম্বা হয় আধ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি। কতটা গভীরে এই দু'চ ফোটানো হবে তা রোগের ওপর নির্ভর করে। দেহের কোন্ কোন্ অংশে এই দু'চ ফোটানো হবে তা নির্ভর করে রোগ এবং রোগের প্রকৃতির ওপর।

প্রাচীন মত অনুযায়ী, বেহে-মোট ৩৬১টি আকুপাংচারের জায়গা বা পয়েন্ট আছে, কিন্তু আধুনিক মতে এই পয়েন্টের সংখ্যা হলো এক হাজার। তার মধ্যে শুধু কণ-বেশেই আছে ৬২টি। ক্রিয়া হিসেবে পয়েন্টগুলিকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, টোনিকেশন, সিম্পেন, এনার্জ পয়েন্ট। একটি মিটিং এক সংকে থেকে ২৫টির মত দু'চ ফোটানো হয়।

আকুপাংচারে কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না। বড় জোর ভিটা-মিন খেতে বলা হয় যাতে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ দেহে যা আছে, তাই কাজে লাগানো হয়।

আকুপাংচারে কেমন করে কাজ হয়? ডাঃ খানকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বোঝালেন যে, শরীরে দুটি শক্তি কাজ করে। একটি পজিটিভ, অপরটি নেগেটিভ। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য এবং লম্বায়তন্যে এই দুটি শক্তি দেহে প্রবাহিত হয়। কোনো কারণে এই স্বাস্থ্য প্রবাহ যদি বাধা-প্রাপ্ত হয়, তখনই দেখা দেয় রোগ। বয়স দু'চ ফোটানো হয়, তখন রোগীর দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত অনুভূতি হয়। মনে হয় যেন একটা অর্গন খুলে গেল এবং শক্তি প্রবাহ অব্যাহত চলতে পারছে।

অপর একজন ডাক্তার ব্যাখ্যা করে বললেন যে, "এই শক্তি প্রবাহের সংকেত রক্ত চলাচল বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো লম্পর্ক মেই। আকুপাংচার একটি স্বাধীন প্রবাহ যা দেহের ১৪টি প্রধান প্রধান পথে প্রবাহিত হয় এবং এই চ্যানেল-গুলি ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে। কখনও যদি তা বাধা পায় বা শর্ট-সার্কিট হয়, তখনই রোগের উৎপত্তি হয়।"

আকুপাংচারের চৈনিক জনকের উপদেশ, "শক্তির যেখানে অভাব সেখানে শক্তি জোগাও, যেখানে উদ্ভ্রান্ত তা নিয়ন্ত্রণ কর।"

রোগ-নির্ণয়

আকুপাংচারের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে নাড়ীর স্পন্দন হিসেবে করে রোগ নির্ণয় করা হয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকেও অপাংক্বেয় করা হয় নি। রোগীর হলে আকুপাংচার চিকিৎসাধীন ব্যক্তি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও নিতে পারেন। ডাঃ কে, হুয়াংজিয়াও জানালেন "আকুপাংচার অস্ত্র কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা র বিরোধী নয়, তার পরিপূরক।"

মাল্যাজের ডাঃ হুয়াংজিয়াও একজন এম, বি, বি, এম। ২০ বছর আইভেট প্রাকটিস করার পর তিনি আকুপাংচার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর, লম্বা এবং কতিদীন। ডাঃ রাও তারত-চীন মৈত্রী কমিটির একজন সভাপতি। মতুন দিল্লীতে তার আকুপাংচার ক্রমিক রয়েছে। রোগাক্রান্ত বহু রোগী ভালো হয়ে গেছেন তার চিকিৎসায়।

আরো কয়েকটি উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্যে ডাঃ রাও তার দেটারের লগবই থেকে কয়েকজন রোগীর নাম বললেন, যারা তার চিকিৎসায় ভালো হয়ে গেছেন।

শ্রীমতী জনক ওবেরয়। আর্থা-রাইটিংয়ের রোগী। দিল্লীর অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে নানা রকম পরীক্ষা এবং চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু উপশম হয়নি। তিন বছর ধরে ভুগছেন। শেষে ১৫ দিনের নিরন্তর আকুপাংচার চিকিৎসায় তিনি ৮৫ শতাংশ আরোগ্যলাভ করেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ধরচ কত পড়েছে?" "এ পর্যন্ত মাত্র ১০০ টাকা।"

শ্রী, এম, নাথিয়ারের ছিল কানের অসুখ। তিন বছর অনেক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু ফল না পেয়ে আকুপাংচারে চেষ্টা করলেন। ১ দিনের চিকিৎসায় তার আর অস্ত্র কোনো ওষুধের

দরকার হলো না। ভালো হয়ে গেলেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, আকুপাংচারে কাজ হয় ঠিকই তবে ঠিক-ঠিক কীভাবে ঠিক নির্ভর করা চলে না। কারণ এর ফল ধীরে আসে। আকুপাংচার যদিও কার্যকর, লম্বা এবং নিরাপদ, তবুও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আকুপাংচারিষ্ট বৈদ্য না থাকায় লম্বা মত এবং নিরন্তর মত তাঁদের চিকিৎসা পাওয়া যায় না। এটা এই চিকিৎসার একটা বড় অসুবিধা। দ্বিতীয়তঃ কোর্টিন্স মেমোরিয়াল কমিটির শ্রীমতী কুলুবে আলি খান বলেন, লম্বায়তনের কাছ থেকে উপ-যুক্ত স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি এবং এই পদ্ধতিকে এখনও জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ডাঃ রাও বললেন, "যদি এটা করা হতো, তাহলে ওষুধের বিশেষ কোনো দরকারই হতো না, কারণ আকুপাংচার ওষুধহীন চিকিৎসা। লম্বায়তনের অসুখ অর্ধের লম্বায়তন হতে পারতো।"

বাই হোক, লম্বায়তন এ বিষয়ে মনোযোগী হতে শুরু করেছেন। গবেষণা প্রকল্প হিসেবে দিল্লীর শঙ্ক-লম্বায়তন হাসপাতালে আকুপাংচার পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে। ষোড়শটিক এবং অ্যানাস্থেশিয়ায় আকুপাংচার প্রয়োগ করে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অধীনে প্রতি বছর লম্বায়তন একজন ডাক্তারকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য চীনে পাঠিয়ে থাকেন। তারতের লম্বায়তন বাহিনীর মেডিক্যাল দাপ্তরিক আকুপাংচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কার্যকর, লম্বা এবং নিরাপদ হলেও আকুপাংচার দেহের লম্বায়তন ব্যাধি দূরীতে পায়নি বটে তবে ডাক্তারের হাতে এটা অবশ্যই একটা অতিরিক্ত কার্যকর হাতিয়ার, সেই লম্বা ডাক্তার যদি জানেন, "কখন এবং কোথায় তা ব্যবহার করতে হবে।"

To know the ins and outs of 'Rape incidents, from Mathura rape case to Nischinta incident, where police dared to rape even during Left Front regime, you are to read

RAPES IN LIGHT

Edited by Debasis Bhattacherya

Price—Rs. 1'50/- only

Available in Book Stalls

DESHKATHA PRAKASHANI

61, Mott Lane, Calcutta-13

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কেন এত হতাশ?

কে জে সিং

প্রতিভা ও দক্ষতার দিক থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বের অধিকারী হওয়ার ক্ষমতাশালী দিক থেকে তারা এত পেছিয়ে কেন? বিজ্ঞানীরা আত্মহত্যা পথে যাচ্ছেন? কেন তাঁদের মনে হতাশা? কেন তাঁরা পশ্চিমী দেশগুলিতে চলে যাচ্ছেন?

১৯৬০ সালে ডঃ এম. টি জোনে-ফের আত্মহত্যা থেকে এর শুরু। তারপর অল্প বার্ষিক এই পথের পথিক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের জে. রায়চুঙ্গ, ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডঃ বিনোদ শাহ, জাতীয় ডেরারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কে জোতি এবং ডঃ এস. এস. বাটরা প্রমুখ। আরলাতন অবস্থ প্রেরণিত অথবা পারিবারিক সমস্যাকে এই সব আত্মহত্যার কারণ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহল তা কখনও স্বীকার করে নেননি।

১৯৭২ সালে ডঃ শাহ যখন আত্মহত্যা করেন, তখন তিনি সব সরকারী অজুহাত এবং হুজুতর্ককে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে চরম হতাশাই এর কারণ।

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডায়-রেক্টরকে আত্মহত্যার ঠিক আগে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, “অবিশ্রুত বিজ্ঞানীরা যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পান, তার জন্য ভগ্নহৃদয় একজন বিজ্ঞানীর আত্মবলি দেবার সময় এসেছে।”

এই চিঠি জমমানদে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। সরকার তখন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচার প্রতি লীগজেন্স গাধকরের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির ওপর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম তদন্ত করে দেখার ভার দেয়। কারণ ডঃ শাহের আত্মহত্যার দীর্ঘ চিঠিতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে বহু অভিযোগ ছিল।

বিচারপতি লীগজেন্স গাধকরের রিপোর্টে ডঃ শাহের চিঠিতে উল্লিখিত সব অভিযোগকে সত্য বলে রায় দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, উপরতন কর্তৃপক্ষের মনোমত না হলে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো জুনিয়র বিজ্ঞানীকে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রকাশ করতে দেওয়া হতো না। কমিটির মতে, চরম স্বজন পোষণ এবং দুর্নীতিই ডঃ শাহকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে

দিয়েছিল। এমন কি দেশে বা বিদেশে, কোনো সম্মেলন বা আলোচনাচক্রে যোগ দিতে দেবার ক্ষেত্রেও বিভাগীয় প্রধান বা লম্বা প্রধানগণ, বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকেন।

গুজর গাধকর কমিটির কয়েক বছর আগে সরকার কমিটিও বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে অসুস্থ মত ব্যক্ত করেছিলেন।

দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ

নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পক্ষপাতিত্ব ও স্বজন পোষণ এবং অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক দুর্নীতি বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদের ২৫,০০০ বিজ্ঞানীর মনে নিদারুণ নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছে বলে সরকার কমিটি রায় দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত দুটি কমিটি ছাড়াও ভারতীয় চিকিৎসা পরিষদ এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের কাজকর্ম সমীক্ষা করে দেখার জন্য আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এবং তাঁরাও এই একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

এসব কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বৈজ্ঞানিকদের মনে হতাশা সৃষ্টির দুটি মূল কারণ হলো, বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্মের ওপর অত্যধিক আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং নিদারুণ গ্রহণ কর্মবিধির কেন্দ্রীকরণ।

প্রতিরূপা বিজ্ঞান গবেষণাপত্রের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক ডঃ এস. কে. শর্মা বলেন “দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ উন্নতির পথে দুটি প্রধান অন্তরায় হলো, আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং মাল ফিতার বাধন।”

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকদের পদোন্নতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, রাজনৈতিক আত্মকূল্য অথবা মর্যাদার তোষামোদের ফলে হয়। এইভাবে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ, প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন তরুণ বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে ভীত ও দ্বিধাগ্রস্ত হন।

নিজের দুর্বলতা চাকতে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক আনুষ্ঠানিক তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের উন্নতি বানচাল করে দিতে নানারকম পথ অবলম্বন করেন। সেমস তাঁদের গবেষণাপত্র চেপে রাখা বা কিছু পরিবর্তন করে নিজের নামে তা প্রকাশ করা, কিংবা পেশাপত উন্নতির

পথ রুদ্ধ করা, বা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার দাবী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজন পোষণের পথ আরো সুগম হয়েছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের জনৈক প্রাক্তন ডায়রেক্টর জেনারেল একই সময়ে ২৭টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ২১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও আর্থিক বিষয়ের দর্বেসর্বা ছিলেন। বিধে এর কোনো তুলনা নেই।

ডাবা-পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অ্যাসোসিয়েশন সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র পেশ করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পৌর এলাকা উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ব্যাপক পরিকল্পনা

নলিনী পাল

পশ্চিমবঙ্গের পৌর এলাকার সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থে পৌর এলাকাগুলিকে চেলে দালালদের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের নব-গঠিত কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ (সি. ডি. বি) এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যদি এতে কোন বাধা সৃষ্টি করে তবে তারও মোকাবিলা করা হবে বলে রাজ্যের পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শ্রু হাশিমারি দিয়েছেন। দীর্ঘায় সমুদ্র দৈর্ঘ্যে ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ ব্যাপারে তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা চক্র অসম্পন্ন হয়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং ২০ জন পৌর প্রধান এই আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য, মহানগরী কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পৌর এলাকার গ্রামীণ এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবনজীবীকার স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এই কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্ষদ গঠন করেছে।

পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত শ্রু ওই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে বলেন যে, বাস্তবিক সরকার রাজ্যের পৌর ক্ষমতা এবং অধিকারগুলিকে আরো গণতান্ত্রিক এবং বিবেচনীয় করতে চান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন

সংশোধনী ব্যবস্থা

প্রথমতঃ বিজ্ঞানীদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার-লিক সার্ভিস কমিশন বা অনুরূপ কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর ভরসা দেওয়া উচিত। তবে তা কৃষি বিজ্ঞানী-নিয়োগ পর্ষদের মত বেন না হয়। এই পর্ষদের চেয়ারম্যানের হাতেই বাণ্যতীয় ক্ষমতা। বিজ্ঞানী-দের নিয়োগ এবং পদোন্নতির দায়িত্ব-তার থাকা উচিত, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-দের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির ওপর।

দ্বিতীয়তঃ অর্থবা হয়রানি অথবা অন্তর্যভাবে শাস্তিবিধানের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিটির উচিত সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী সম্পর্কে বিভাগ বা প্রতি-ষ্ঠানের প্রধানের রিপোর্টের চেয়ে তাঁর ও বছরের রিপোর্ট খতিয়ে দেখা।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানীদের নিয়ন্ত্রণ-কারী কার্যনির্বাহক ব্যবস্থাপনার বিবেচনীয়।

দে, কলকাতা-মহানগরীতে এবং তার আশেপাশে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জন বসবাস করছেন সেখানে গড়ে উঠেছে, পরবর্তী যুগে তাঁদের সহযোগিতা নিয়েই সেখানে পৌর সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সরকার হলে পকারে এলাকার মানুষের অভিজ্ঞতা ও শ্রম এলাকার মানুষের স্বার্থে কাজে লাগানো হবে। বলে তিনি সম্ভাব্য করেন।

আলোচনা চক্রে বার্ষিক অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের পরিকল্পনা-উপদেষ্টা এস. বি. সেন, কলকাতা পৌরসভার প্রশাসক ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, মরা-দিল্লীর অন্ততম অর্থ-নীতিবিদ ডঃ ভাসুনাথ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ডঃ অমীত দাসগুপ্ত, সি এস ডি এর পরিকল্পনা-বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এস. কে. রায় এবং পশ্চিম-বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়ে-শনের সাধারণ সম্পাদক এবং কামারহাটির পৌর প্রধান শচীন মুখার্জী, দক্ষিণ বঙ্গের পৌর প্রধান হুম্মীল মৈত্র, বরানগরের পৌর

চতুর্থতঃ কোনো বিজ্ঞানী বা দুটির বেশী কমিটির সদস্য পাবেন না।

পঞ্চমতঃ কোনো বিজ্ঞানীর ও তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বা কোনো আ-চর্যচক বা সম্মেলনে অংশগ্রহণ ক্ষেত্রে কোনো রকম অন্তরায় হলে তাঁর আবেদন করার রাখতে হবে। এবং সেই আবেদন বিবেচনা করবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-এমন একটি কমিটি, যার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে আনু-ষ্ঠানিক বজ্রমুষ্টি ভাঙতে হবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্বি-এমনভাবে করতে হবে যা বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজে উৎসাহ পায়।

যদি তা না করা হয়, তাহা প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের সাম-তিনটিই বিফল পথ আছে। আ-হত্যা, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি অবলম্বন অথবা বিদেশে চলে যাওয়া

দুর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৬০ টাকা

বাৎসরিক ১৫ টাকা

জৈমিনিক ৭৫০ টাকা



টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দুর্পণ

৩১ নং মট লেন, কলিকাতা

ত্র আন্দোলন চলছে চলবে

কাজেই বাংলা প্রগতি সাহিত্যের
স্বপ্নের উদ্দেশ্যে বলি, এই নির্বা-
চিত তালিকাটি লক্ষ্য কারণেই
আপনাকে বিয়ক্ত ও উদ্বেজিত
রবে। উপায় নেই। শেষ কথাটা
বুঝা বাকি। শত্রু-শিবির, অর্থাৎ
আনন্দ পাবলিশার্স-এর ১৩টি বই
লক্ষ্য তালিকার স্থান পেয়েছে।
স্বাক্ষর !



‘হীরকরাজার দেশে’ অসাধারণ ভাল ছবি

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন পর সত্যজিৎ রায় এক উজ্জল নৃত্য উপহার দিলেন। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক—এই দুয়ের মহিমাযুক্ত সমন্বয় যে চমৎকারিতা রচনা করেছে, তাঁর সাম্প্রতিক কালের কোন ছবিতে তার স্বাক্ষর পড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা, ছেলে বুড়ো সকলের ভাল লাগার মত সহজ সরল আবেদনশীল অথচ শিল্পমূল্যবোধের পরিমাণ ছবিটিতে আশ্চর্য বজায় আছে। ছবিটি যদিও অবশ্য ক্রটিমুক্ত নয় মানা কেজ্জেই, তবুও একথা স্বীকার না করেও উপায় নেই যে, ছবিটির মধ্যে এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় ক্ষমতা রয়েছে। রসোত্তীর্ণ নৃত্যের এটাই প্রসাদপুণ্য।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনার কলেবরকে অনেক বাড়িয়ে সত্যজিৎ একদা ছবি করেছিলেন ‘গুপী গায়ের বাবা বায়েন।’ সে ছবিতে ক্যানটামির সঙ্গে রিয়ারিটির মিশ্রণ ঘটেছিল, প্রকরণগত ভুলিলা ছিল, ভিন্ন রাজ্যের বক্তব্য তুলে ধরার উৎসাহও ছিল কিছু বেশী। সে ছবির বোণস্ফূর্ত ধরে সত্যজিৎ এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনার ‘হীরকরাজার দেশে’ নামক যে ছবিটি করলেন, তার কাহিনী তাঁর নিজের রচনা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়াবলু লংলাপ রচনা এই ছবিটিতে এক উজ্জ্বল রাজ্য বোঝানো করে। বাংলা ছবিতে এটি অবশ্য প্রথম মজির নয়। বহু আগে ত্রিশ দশকের মধ্য গড়ে ব্যাক্তকীতি ভুলসী লাহিড়ী ‘মারাকাজল’ নামে এক ছোট মাপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি করেছিলেন, যার আদ্যন্ত লংলাপ ছিল কবিতার। মধু বহুর বিখ্যাত ‘আলিবাবা’ ছবির লংগে এ ছবিটি সে সমর দেখানো হত।

‘হীরকরাজার দেশে’ ছবিতেও ক্যানটামির লংগে রিয়ারিটি মিশেছে। রসের বিচারে এটি দোষ বলে গণ্য হলেও, পরিবেশনের কৃশলতা উপভোগের ক্ষেত্রে তেমন অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেয়নি। গোটা ছবির ছড়াবলু লংলাপের কিছু অংশে ছন্দপতন ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ কেজ্জেই ছড়া লংলাপ যেমন সুরচিত,

তেমনি কোতুকপ্রহ। বাচালতাও অনেক সময় রসিকতা হয়ে দাঁড়ায় দৃশ্য উপস্থাপনার গুণে।

এ ছবির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বক্তব্য-বিষয়ের সমাজ সচেতনতা। হীরকরাজার অত্যাচারী ডিক্টেটরি রূপ, তার শোষণ নিপীড়নের শিকার সাধারণ অত্যাচারী মানুষ, কৃষক, মজুর, শিককের মানসিকতা বিশ্লেষণ, আমলাদের ‘জোহকুম’ কুশি ও খোশামুদ্রি, দহর গুপী ও বাবার বিচরণ ও আচরণ সত্যজিৎ সন্তোষ: এই প্রথম মস্তক দৃষ্টিকোণে চিত্রায়িত করলেন। অথচ গোটা ব্যাপার-টাই এত সরল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন যে, ছোটদের পক্ষে তা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় না গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস না পেয়েই, আবার বড়দের কাছে এটি হয়ে দাঁড়ায় তাৎপর্ষ্যে চিহ্নিত। বিষয়গত দিক থেকে অভিনব কিছু না হলেও প্রকাশ ব্যক্তনায় এর মহিমা শুধু দর্শনীয় নয়, রসবোধও হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কোতুক, স্নেহ ছবিটির চালচিহ্নে এমন সূক্ষ্ম প্রলেপ বুলিয়েছে যে, ‘কি নাবালক আর কি নাবালক’ দলের কাছেই চিত্র-বিশোধনের লংগে লংগে উদ্দীপ্ত মানবিক বার্তাও পৌঁছে দেয় অনা-রাস সরল গতিপথে। অসামান্য ক্ষমতাস্বরূপ শিল্পীর পক্ষেই এটা সম্ভব।

ছবিতে মগল খোলাইয়ের প্রসংগটি এসেছে স্বন্দর, কিন্তু মগল খোলাইয়ের রহস্যময় ককটি হত্যাশ করে। বৈজ্ঞানিকের দাখনা শুধুই কথাসর্বস্ব, কখনই তা অর্থবহ হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে চুকিয়ে কিছু মন উচ্চারণ করে ছুটো মড়ার খুঁসি আর বজাল, ছুটো ক্রাক আর শিশি দামমে রেখে মগল খোলাই ব্যাপারটা পাঠ হয়ে ওঠেনা—মেথানে আরো কিছু কেমামতির প্রয়োজন ছিল বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য। আচমকা হীরকরাজার যে ভাবে মগল খোলাই হয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল, এই ক্যানটামির ছবিতেও তা মেনে নেওয়া শক্ত। শেষদিকে এত সরলীকরণ যে, প্রসংগটি আরো-

পিত মনে হয়। যে গুপী বাবা ইচ্ছা-শক্তি বরে বলীমান, হীরা রয়ের কোবাগারে প্রবেশ করতে তাদের এত পরিচর ও কোশল করতে হল কেন, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। উদয়নের বিজোহ পরিকল্পনা, আমলা সেনাঘের গুপী বাবার হীরক খণ্ড ঘুস বেওয়া, বতী জালিয়ে বেওয়া প্রসংগগুলি যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। যে সাংগঠনিক চিন্তা ভাবনার কদমে বিজোহ রূপ পায় তার কোন স্বাক্ষর কোন দৃষ্টে পড়েনি। তবে নিজের তৈরী যুক্তিকে ভেঙে ফেলার অস্ত্র লকলের লংগে স্বয়ং হীরকরাজার হাত মেলানো যথেষ্ট অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্রের রূপলক্ষ্য বৈশম্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি রঙের বাহার করে দৃষ্টিকে মুগ্ধ। গান আছে লাক্জ্যে ১২টি। তবুও ছবিটি কখনো তারাকান্ড হয়ে পড়েনি। যেমন রচনা তেমনি সুর—মনকে মাতিয়ে তোলে। গীত রচনা ও সুর প্রয়োগে সত্যজিৎ এ ছবিতে বাজি-মাং করেছেন নতুন করে। অল্প বোবাল ও অল্প পালের গাওয়া তো চমৎকার। ক্যামেরার সৌমেন্দু রায়, শিল্প নির্দেশনার অশোক বোস ও সম্পাদনার হুসাল হস্ত অসামান্য নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছেন।

উৎপল হস্তের ‘হীরকরাজ’ এক খেরালী অত্যাচারী ডিক্টেটরের যেন নিখুঁত রূপ। গুপী ও বাবা রূপে যথাক্রমে তপেন চ্যাটার্জী ও রবি বোব আবার মাতিয়ে দিয়েছেন এ ছবিতেও। সৌমিত্র চ্যাটার্জী ‘উদয়ন’কে ভাল লাগবে সকলের। শুভীরাঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক বৈত চরিত্রে লুস্তাব হস্ত মুল্লাননা দেখিয়েছেন। অত্যন্ত ভূমিকাও স্বাভাবিক।

ব্যাপিকা বিদায়

রসরাজ অমৃতলাল বহুর বিখ্যাত প্রহসন ‘ব্যাপিকা বিদায়’-এর চিত্ররূপ অক্ষয় পরিচালনার অস্ত্র দার্বিকতার দাবী করতে পারল না। বিভাস চক্রবর্তীর দুর্বল চিত্রনাট্য অবলম্বন করে পরিচালক অর্চন চক্রবর্তী শুধু ব্যবহার পরিচরই রেখেছেন। এমন সরল কাহিনী এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটল শুধুই চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্রকারের রাজাজ্ঞান ও রস-বোধের অভাবের কারণে। এরই কলে ছবিতে আতিশয্য প্রদ্রয় পেয়েছে, হাঙ্গির বহলে এসেছে বিরক্তি। একরাজ দাখনা শুধু মুল্লি চৌধুরীর সুর। তাঁর সুরে গাওয়া গানগুলি শুনে ভাল লাগে। বিমান সিন্হার চিত্রগ্রহণও উন্নতমানের নয়। ছবিটি দাখা কালোর তোলা।

বেশ কয়েক বছর আগে দলিতা-ব্রত দত্ত এই প্রহসনটিকে নিয়েই মঞ্চ মাতিয়ে তুলেছিলেন। সেখানে শাওড়ীর ভূমিকায় কালিন্দী সেন অবদান অভিনয় করেছিলেন। বঙ্গির বোবের অভিনয় পারদর্শিতাও সেই প্রথম লক্ষ্য করা গিয়েছিল বনভাষের চরিত্রে। আর জ্যাঠা-মশাই রূপে দলিতাব্রত মাত করে দিয়েছিলেন গানে গানে। কিন্তু ছবিতে কোন চরিত্রই সেই রসের মাপকাঠি কখনই ছুঁতে পারে নি।

শাওড়ী হুজাল ঠিকই, কিন্তু তার সেই হুজালপনা কখনই শুধু বিকট চীংকারে আর হিষ্টিরিয়ার ভঙ্গীতে কোটে না। গীতা যে ঠিক অল্পরূপ চও দেখিয়ে চরিত্রটির প্রতি কমাধীন অবিচার করেছেন। বনভাষের ক্যাবলমি আর তোতলামি যখন রাজ্যান্তরিক হয়ে পড়ে, তখন মজাও থাকে না, তার প্রতি বহরও উবে যায়। চিত্রায় রায় ভঙ্গীতে সেই অতিশয়তা এনে ‘বনভাষের’ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। অমিল চ্যাটার্জী ‘জ্যাঠামশাই’ও কেমন যেন মিস্ত্রীপ। লোমা যে আড়ষ্ট, শমিত ভক্ত আর দলু মুখার্জী চলনগৈ। হাঙ্গির ছবি জমাতে গেলে পরিমিতবোধটুকু যেমন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তেমনি ছবিতে গতির ক্রিয়াতা আনাও দরকার। হুংখের কথা, ছবিটিতে এ দুটিরই একান্ত অভাব। শেষ দৃষ্টে বাহিনী শাওড়ীর স্বভাবের হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও তার বিহারকালে অত্যন্ত পাজ পাজীর চোখে জল নেহাতই বেমানান, দামজতহীন ও অযৌক্তিক মনে হয়। তবে ছবিটিতে সেই বিগত যুগের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা, লাক্সলক্ষ্য ও গাড়ীঘোড়ার ব্যবহার তারিফ করার মত।

দোস্তানা

হিন্দি ছবিতে দোস্তী বড় দারুণ ব্যাপার, অন্ততঃ ‘দোস্তানা’ ছবিতে তো বটেই। ডিটেকটিভ ডিপার্ট-মেন্টের পুলিশ অফিসার অমিতাভ বচ্চনের লংগে ক্রিমিনাল কোর্টের উকিল শফর সিন্হার দোস্তী, সেই দোস্তী ভেঙে গেল জীনত আমনের জন্ত। শফর প্রথম দেখেই জীনতের প্রেমে পড়ে গেল এমন কি বিয়ে করার স্বপ্নও দেখল, একটা বাংলাও তৈরী করে ফেলল প্রেমিকার জন্য। এদিকে শফরর অসাক্ষাতে অমিতাভর লংগে জীনতের মন বেওয়া নেওয়ার পালা চলতে লাগল। শফর এসব বুঝতে পারে জামতে পেয়ে অমি-তাভকে কিছু বলতে না দিয়েই একটা প্রচণ্ড ঘুবি মেরে বন্ধুদের ছেদ ঘটাল।

এতদিন অমিতাভ যে সব ম্যাগ-দের ধরত, শফর ওকালতিত তাহেরকেই বেকসুর খালাস দিত। তাতে ওদের বন্ধু-ফাটল ধরেনি—ফাটল ধরল জীন-মিরে। এখানেই ছবি শেষ পাবে না—বন্ধু ‘জোড়া লাগ-হবে—তাতে বড় খুশী’ গাও-ব্যাপার জোড়া লাগানো হো-কেন। কাহিনীকার মেলিম-দের কল্পনার দোড় বেধে তাছ-বেতে হয়। পরিচালক রাজ-প্রেম, অপ্রেম, আস্থারিক চী-থেকে শুরু করে মারদালা-লাজিরে দিয়েছেন ১৬ রীলের-রঙীন ফটোগ্রাফীর বাহার-দেখবার মত।

কালাকানুনের নিন্দায় লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী

গত ২০০২ ডিসেম্বর হুদিন লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা যে কাতার ইন্ডেন্ট হল এক কন-শমে বিভিন্ন ধরনের সরকারী কা-বাহনের মিন্দা করেন। লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী আস্থারিক পরিবহ বর্জক হুদিমের এই কনভেনশনে বিহার প্রভৃতি রাজ্য থেকেও জন প্রতিনিধি এনেছিলেন। তার প্রতিনিধিরা ঐ রাজ্যে হামলা অব্যাহত থাকার অভি-দিয়েও আসতে লক্ষ্য হননি।

কনভেনশনে লক্ষ্য ব-জাতীয় নিরাপত্তা আইন, কো-বিধির দস্ত্যতি লংগোধিত-জিপুরা টাইবুতাল আইন ও ‘উপ-অকল’ বোষণা আইনে উদ্বেগ-করেন। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন স্তর ও পেশার নিযু-দের গণতান্ত্রিক অধিকারে-করা হচ্ছে দভায় তার-বক্তব্য রাখা হয়। মহারাজে-তান্ত্রিক অধিকার রক্ষা-ক-সম্পাদক কোবাধ গাঙ্গী-অতিথি হিসাবে ‘গণতন্ত্রের উপ-শীর্ষক তাঁর একটি লেখা-পড়েন। এছাড়া বিশিষ্ট বক্তা-মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক জো-ভট্টাচার্য, হেমাংগ বিশ্বাস প্রমু-হুদিনই বক্তৃতার পর সাংস্কি-অস্থান হয়।

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে ব্রহ্মিত এবং হর্ষ কাব্যালয় ৩১, মট লেন, কলিকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত।

কংগ্রেসে ঢোকান জন্য সিদ্ধার্থ রায় জোর তদ্বির শুরু করেছেন

দপন

১৯৭৭ সালের ১০ নভেম্বর ২২ জামুয়া ১৮১ : ৬০ পৃষ্ঠা

অবস্থা

জম্মীর তিন গোয়েন্দা অফিসার সমিতি গড়ার দায়ে ছাঁটাই হলেন

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সমিতি-সংগঠন করেন। চৌদ্দ গোয়েন্দা সংস্থা আই বিয় তিনজন হাজার কর্মচারীর মধ্যে লাড়েন ম উচ্চপদস্থ অফিসারকে গত ২৬ ডিসেম্বর ছাঁটাই করা হয়েছে। এরা হলেন, বিবি রাতুল, এ কে কাউল এবং তি সোসেক। প্রত্যেকেই গেজেটেড অফিসার। এদের অপরাধ এরা সংবিধানের ১১ (ক) ধারার বর্ণিত মণ্ড মৌলিক স্বাধীনতা অস্থায়ী

লেক গার্ডেন্স কি কসবার ব্যানাজিপাড়া হবে ?

শেরালদা-বজবজ লাইনে লেক রোড স্টেশনের দক্ষিণে টালিগঞ্জ ধানাতীন তনং লেক গার্ডেন-সমাজবিরোধীদের মুক্তাঙ্গল হয়েছে। লক্ষ্যে ছটার পর পাঁচ/ছটা বাঁটিতে চলে চোলাই মদ আর সাটার আসর। রাতে এই রাজ্য দিয়ে চলা ফেরা করা যায় না। রাজা সিং, কটি ও মটর থেকে মটর, বেজি, মপন, পায়া, শাভি, নির্মল সিং চোলাই মদের ব্যবসা করে। আর চক্রবর্তী, লক্ষ্যাব, জুই ইত্যাদিরা সাটার বুকি ও পেমসিলায়ের কাজ করে। একটু রাত বাড়লে নানী ব্যবসাও চলে। এদের সঙ্গে স্থানীয় ধানার যোগাযোগ আছে। প্রতি-মাসে ধানার বড়বাবুরা এখান থেকে একটা মোটা টাকা রোজগার করে। ধান থেকে বধানময়ে একজন আসে ও পাওনাটা বুকে চলে যায়। এর

ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকান জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় লক্ষ্যবিশেষ করে কসবার রাজীব গান্ধীর সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন বলে বিশ্বাস হচ্ছে খবর পাওয়া গেছে।

সিদ্ধার্থবাবু ইন্দিরা কংগ্রেসে সমর্থন দান ঢোকান জন্য বহুদিন ধরেই চেষ্টা করেছেন এ খবর রূপ-পাঠকদের অজানা নয়। সিদ্ধার্থ-বাবুকে সঙ্গে নেয়ার জন্য বিজলা-বাড়ীর কয়েকজনও খবর ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দরবার করেছেন।

কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুর ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধী চট করে সিদ্ধান্ত নিতে রাজী নন। তিনি সিদ্ধার্থবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু না বললেও একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অতীতের কথা এখনও ভোলে ননি।

সমস্ত গান্ধী জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় সিদ্ধার্থবাবু একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকান ব্যাপারে। কারণ সমস্ত গান্ধী সোজা হুজি সিদ্ধার্থবাবুকে বলে দিয়েছিলেন আপনাকে আমরা কোন অবস্থাতেই সঙ্গে নিতে ইচ্ছুক নই।

অবস্থা এখন অনেক পার্টে গেছে। সমস্ত আত্ম নিশ্চিন্ত প্রায় অধ্যায়। ভক্তরা ছত্রভঙ্গ হতাশাগ্রস্ত। ইন্দিরা কংগ্রেসে এখন রাজীব হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সমস্ত যেভাবে সংগঠন পরিচালনা করতেন আজকে সেভাবে সংগঠন চলছে না। শুধু তাই নয় সমস্ত যে সব লোকদের সংগঠন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বসিয়েছিলেন তাদেরকেও সরে যেতে হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুও এগিয়ে এনেছেন যাতে আবার সঙ্গে ঢোকা যায়। জানা গেছে রাজীবের জটিল বনিষ্ট বহু দিল্লীতে “শান্তিনিকেতনে” সিদ্ধার্থ-বাবুর প্রতিবেশী। ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে এই প্রতিবেশীটির সম্পর্ক খুবই ভাল।

বিশ্বস্ত হুজি খবর পাওয়া গেছে, রাজীবের বক্তৃতির উদ্যোগেই সিদ্ধার্থ-বাবুর সঙ্গে রাজীবের বেশ কয়েকটি গোপন বৈঠক হয়। এই হুজি আরও খবর পাওয়া গেছে যে, সিদ্ধার্থবাবু ভালভাবেই রাজীবকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসে সিদ্ধার্থবাবুর বেশ কিছু সমর্থক আছেন। এরা রাজ্যের

উত্তরপ্রদেশে অনেক কাণ্ড

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে বিরুদ্ধে কত ঘটনাই না ঘটে যাচ্ছে। তার কিছু কিছু মুখোমুখি লংঘন হিসেবে মূল্য পাচ্ছে শুধু নয় এই সঙ্গে এটাও বোঝা যাচ্ছে দেখানো কি রকম প্রশাসন চলছে। পেচ ও পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী বীর বাহাদুর এতদিন অধোবিত উপমুখ্যমন্ত্রীর মত নিজের প্রদেশে চলছিলেন এখন তিনি আরও বেশী কমতাবান হয়ে উঠেছেন। এতে এদে তিনি যেভাবে থাকেন, চলেন, বলেন

তাতে স্ব রাজ্যের কোন কোন এম পি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর উপরে বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এদিকে একটা কথা উঠেছে যে, উত্তর প্রদেশে অন্য একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করার। সেজন্য নীমা কাউল এর নাম শোনা যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের টি, আনকাইয়ার মত কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী বনে যাওয়ার ব্যাপারও শীঘ্রই পক্ষে ঘটা বিচিত্র নয়। কারণ, উনি আস্তে আস্তে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন।

রাজীবের মন জয়ের চেষ্টা

অতীতের সি এম টিকেনের অবস্থা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বেশ কখন হয়ে উঠেছে। টেলিফোনের ব্যাপার নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারগুলির বিপরীতপন হয়েছেন। এবং তাঁর উল্টোপাটা কথাও বলছেন ও মন্ত্রী সভার পক্ষে সমর্থন পূর্ণ। এমত তিনি যাকে যাকে খবর মেজীকে অতীতের কাছে বিব্রত করে ফেলছেন। তাই তাঁর চূড়ান্ত ক্রমশ এগিয়ে আসছে বলে অনেকেই মনে করছেন বিশেষ করে ধীরা তাঁর

কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত। তবে টিকেন রাজীবের মন জয় করার জন্য খুব খাটছেন। তাই, হয়ত কোন রকমে মন্ত্রিসভার আগামী মধ্যমধ্যে মাথা বাঁচাতেও পারেন।

রাজীবের মন জয় করে নিজেই মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিতে তলিয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনেছেন মনোহর বৈরাগী। দেখানকার যুব কংগ্রেসের (ই) সভাপতি হয়ে আরও বড়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন।

অনেক ই-অনুগতর বিদায় বেলা

গুরুতর জরুরী অবস্থার সময় কুখ্যাত হবার পর আশিতে ইন্দিরার জয়ে ধারা কিংবে এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ পদে এবার তাঁদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে পরিষে দেবার কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত অঙ্গুগত হয়েও ধারা নিজেদের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলে-

ছেন তাঁদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত পাওয়া হয়ে গেছে। তাই রাজনীতির রাজমহলের বজ্রা এখন দিল্লীর উপ-রাজ্যপাল জগমোহন, পুলিশ কমিশনার প্রিতম সিং তিনের প্রমুখের সঙ্গে এড়িয়ে চলছেন, কেননা এদের বিদায়ের বেলা কাছে এসে গিয়েছে।

দিল্লীর পথে আরও অনেকে

যখন দিল্লীতে সংগঠিত কংগ্রেস (ই)তে ঢোকান পদ পাওয়া করে আন-ছেন-তখন তাঁর সময়ের আর এক প্রাক্তন ইন্দিরা প্রিয় আবার আসল পেতে চলেছেন। ইনি হলেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয় দামমুকী প্রমুখদের নিয়ে সিদ্ধার্থ এবার জোর কদমে এগিয়ে বনে অনেকেরই আশা

হচ্ছে। কেননা, বিজলাদের ধারণার এবার তাঁর ই কংগ্রেসে একটা বিশিষ্ট স্থান হতে সাহায্য করেছেন খবর রাজীব গান্ধী। এই অবস্থায় প্রীমতী গান্ধী তাঁর উপর যে দৃষ্টি হবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে তিনি সিদ্ধার্থকে বেশ কড়কে ধরে আবার কাছে টানছেন।

প্রভাবশালী নেতা। এদের মধ্যে আছেন রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিষদীয় বজের নেতা তোলা মেন, প্রাক্তন মন্ত্রী গোপালদাস নাগ, নন্দোষ রায়, প্রজ্ঞাভক্তি রোষ প্রভৃতি নেতারা।

এই সব নেতারা নানাতাবে দিল্লীর নেতাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ রাজ্যে সিদ্ধার্থবাবু ছাড়া সংগঠন ঠিক রতো চালানো যাবে না। অজিত পালার নেতৃত্বা-

ধীন ইন্দিরা কংগ্রেসের শোচনীয় ও আত্মকলঙ্ক জীব নাগেঠনিক অবস্থাকে বার বার দিল্লীর নেতাদের কাছে তুলে ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সিদ্ধার্থবাবুই একমাত্র দলকে এক্যবদ্ধ রাখতে পারেন।

বিশ্বস্ত হুজি খবর পাওয়া গেছে রাজীব গান্ধী নাকি সিদ্ধার্থবাবুকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন।

সম্পাদকীয়

পরের সমালোচনা অত্রান্ত আত্মসমালোচনা হয়নি

বোম্বাইয়ের সামান্যপরে অস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী দেশের বর্তমান পরিস্থিতির যে-বিশ্লেষণ করেছেন তা কী শাসক দল, কী বিরোধী দল কারো পক্ষেই উপেক্ষা করার উপায় নেই। সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবও বলা হয়েছে যে, কোনো সরকারের প্রতিশ্রুতি দান করে তারা ক্ষমতাসীন হয়েছেন, তারা এখন এমন এক প্রশাসন হাঙ্গির করেছেন যারা কাজ করতে অক্ষম; বংশোদ্ভূত শাসনের প্রতি অস্বস্তিক্রমের জাবকদের কাছে এর বেশি কিছু অবশ্য প্রত্যাশাও করা যায় না।

শ্রীবাজপেয়ী তার চূড়ান্ত বিশ্লেষণের দাবীতে বর্তমান পরিস্থিতিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দেশবাসী আজ দুই দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের সম্মুখীন। তার একদিকে রয়েছে বৈয়তন্যের বিপদ, অন্যদিকে অরাজকতার। মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি থেকে শুরু করে হরিজন, উপজাতি, মারীর সমস্যা ও মর্যাদা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্দিরা সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয়, সারা দেশের সামাজিক জীবন আজ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ-পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আধার নেই। কারণ তিনি চান, এই পরিস্থিতি থেকে করা উচিত সংসদীয় পন্থায়ই ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করা এবং তার চিতার ওপর রাষ্ট্রপতি-প্রধান সরকারের দায়িত্ব তুলে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ করা। বিজেপি তার ২৫ লক্ষ সমস্ত মিলে দেশবাসীকে এই জোড়া বিপদ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তুলবে, ইন্দিরা কংগ্রেস শাসনে মাহুয়ের হুত নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের যুগের মহান ভারতের অসমাপ্ত কাজকে সম্পন্ন করবে, এ-লক্ষ্যেই সম্মেলনে ব্যস্ত হয়েছে। এ-লক্ষ্যে তাদের পথের কী? শ্রীবাজপেয়ী তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বাধীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে তারা চান না, কিন্তু সে-পরিস্থিতি যদি দেখা দেয়, তবে সংঘর্ষের পথ করতেও তারা স্তুতি হবেন না।

পরিস্থিতির বিশ্লেষণও ঠিক, রোগের নির্ধারণও অত্রান্ত। কিন্তু সে-রোগের নিরাময় বিজেপি করবে কেমন করে? বৈয়তন্যের সঙ্গে এক-বার তারা পালা কবেছিল, কিন্তু সে-শক্তি পরীক্ষায় যে তারা উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল সে-কি একক লড়াইয়ে, না সমস্ত বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে? একথাও ঠিক যে, বিজেপি একটা মজবুত, সুঅলাপনীয় সংগঠন। কিন্তু তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ কি আজকের ভারতের চাহিদা ও প্রয়োজন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? গান্ধী বা দী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যেখানে দল এখনই বিভক্ত, সেখানে এই আদর্শকে পুঁজি করে বিজেপি কতটা এগোতে পারবে? আসামের - 'বিদ্রোহী' সমস্যা সম্পর্কে বিজেপি যে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার তত্ত্ববর্তী - 'জন সংঘের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই' বলে বতই প্রচার করা যোক না কেন, পুরনো জনসংঘী পন্থা থেকে আসলে তারা এখনো মুক্ত হতে পারেননি। জনতা দল বৈয়তন্য ইন্দিরার কংগ্রেসকে পরাস্ত করে ১৯৭৭ সালে জনমনে গণতন্ত্রের তবিত্ত সম্পর্কে বিরাট আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সেই জনতা পার্টি ভেঙে যাওয়ার একটা বড় কারণ যে সেদিনকার জনসংঘীদের আর এম এম লম্পর্ক একথা তো অস্বীকার করার যো নেই। বস্তুত এই আর এম এম-লম্পর্কের একটি কারণই আজ বিজেপি দ্বিধা-বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অজ্ঞান। অথচ এই গোড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা ভাগ করে তারা যদি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বরণ করে নেন, তবে দেশের জনশ্রোতে তারা সহজেই মিশে যেতে পারেন। একক শক্তিতে বৈয়তন্যের মোকাবিলায় ক্ষমতা বিজেপির অবশ্যই নেই, তাকে দাবী মিতে হবে অত্রান্ত বিরোধী, বাম ও গণতান্ত্রিক দল-গুলোর। কিন্তু তার আগে সেই পরিকল্পনা পাবার যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও আদর্শ বর্জন করে। মইলে রোগ নির্ধারণ করাই হবে কেবল দায়, সে-রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা তার হবেনা, রোগী তার চোখের দামনেই মৃত্যুর কোলে চলে পড়বে।

আনন্দবাজারী আফালন

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৫-শে ডিসেম্বর আনন্দ-বাজারে বঙ্গ সেনগুপ্ত মিথিত 'শাসনিক ভয়ে বা বিজ্ঞাপনের সোতে বাধা মত করব না' মিছক অমূলক-অকারণ-অশৌচিক বস্তু নয়। আনন্দবাজারের এই বস্তুপূর্ণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত ক্ষমতা বা দায়িত্ব শ্রীদ্বৈপায়ণের হারের ছিলনা বা শ্রীদ্বৈপায়ণ হারগুপ্তের বাহকটেরও নেই একথা বাস্তব সত্য। কিন্তু কেমনেই? কারণ একাধিক। এর মূল যেমন মিথিত রয়েছে প্রচলিত জাতীয় মিশ্র অর্থনীতির মধ্যে তেমনি রয়েছে শাসকদলের অন্ত-মিথিত দুর্বলতা, বিজ্ঞানমন্ডল দলীয় গঠন ও বিজ্ঞান-প্রগতির অতাবের মধ্যে। এই দুইয়ের পারস্পরিক সুবিধাদানের ফলেই এই আনন্দ-বাজারী দুঃসাহস সম্ভব হয়েছে। আনন্দবাজারেরও অবশ্যই একটা নীতি বা উদ্দেশ্য আছে বা কোন সময়েই সমসাময়িক শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয় অথচ বা নিজ শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থেরও পরিপন্থী নয়। এই নীতি ও শ্রেণী স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধনে কোন বিশেষ শাসকশ্রেণীরই তোয়াক্কা না করেও কিতাবে দিনে দিনে এই প্রকাশম গোষ্ঠী বেধ সঞ্চারে ক্ষীত হচ্ছে তার সংক্ষেপে অঙ্গুদান করলেই এই দ্বৈত উৎস প্রকট হয়ে পড়বে।

এই বৈশ্যবৃগের আর্থিক সামাজিক কাঠামোতে আনন্দবাজার যে কোন পন্থার মত 'সাম্প্রদায়িকতা' কেও দাবীকভাবে ও মূল্যপোষ্যী বিজ্ঞানমন্ডল ব্যবসায়িক প্রয়োণে সক্ষম হয়েছে বাকি সর্বভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অন্ততম প্রথম বলে গণ্য করা যায়। কোন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা অঙ্গুদানের ওপর খুব বেশি নির্ভর না করেও এই গোষ্ঠী আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও ব্যক্তিমানিকানাধীনে যে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়মকি যে সমান্তরাল কানো টাকার অর্থব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতিতে বাস্তব ঘটনা সেখানে মিছার্থবাবুর বা প্রমোদবাবুর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করাও অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নয়। এরই কলে বঙ্গ সেনগুপ্তের মত তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা নির্ভীক নিরপেক্ষ বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মিডিওকার শ্রেণীর পাঠক-দের কাছে পরিচিত-অতিহিত। এই বিশেষ ২৫শে ডিসেম্বরের বায়ো পৃষ্ঠার আনন্দবাজারে প্রায় তিন চতুর্থাংশ জুড়ে বেসরকারি ব্যক্তি-

মানিকানাধীন শিল্পমন্ডল, তথাকথিত নাট্যশিল্প চিত্রপুর্নী বাজা পাল ও 'বধু মারিকা', 'প্রিয়ার খোজে' জাতীয় নিকট বিকৃত যৌন আবেহন-কারী বিজ্ঞাপনের কল্যাণে দম্বুত। স্তত্রাং এই বুদ্ধোত্তর পন্থার মিশ্র অর্থনীতিতে বতদিন এদের অস্তিত্ব ও অবাধ স্বাধীনতা থাকবে ততদিন এদের আদর্শবাপুত্র বঙ্গ সেনগুপ্ত তথা আনন্দবাজার গোষ্ঠীরও 'বাধা মত করবনা' বস্তু অব্যাহত থাকবে। অহরত ও বিকাশশীল অর্থনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির কুল ও জাতীয় চেতনার এর কতিকারক প্রভাব দৃষ্টে পল হুইজী প্রমুখ অর্থনীতি-বিদরা কয়েক দশক পূর্বেই যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তারই প্রকট নয় প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এই মিশ্র অর্থনীতির তাত্ত্বিক সমর্থনে একে অস্ত্রের পরিপূরক জাতীয় বেসব কথা বলা হয় তা বাস্তবে দেখা যাচ্ছে একে অস্ত্রের বিমোহকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ।

এই মিশ্র-অর্থনীতিমাত্র ব্যক্তি মানিকানাধীন শিল্পগোষ্ঠীমন্ডলের সক্রিয় সমর্থন ছাড়াও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অন্য যে প্রথম পক্ষ আছে সেই পাঠক সাধারণের কথাও প্রাদিক-ভাবেই এসে পড়ে। একথা অনস্বীকার্য যে কেবল বঙ্গভাষাতেই নয় সর্বভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও বোধহয় আনন্দবাজার সর্বাধিক প্রচারিত ও পঠিত সংবাদপত্র। এটা কেবলমাত্র এই গোষ্ঠীর আর্থিক কোলিনোয়ই নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি যদিও এর পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই আছে। একট নয়-রক্ত বাস্তব সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দেশের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকেরা প্রকৃত রা জ নী তি অর্থ নী তি-শিল্প কৃষ্টি সচেতনতাবিহীন মিডিওকারশ্রেণীর। যে প্রকৃত শিকা-দীক্ষা ও সমাজ-চেতনার বিজ্ঞানমন্ডল প্রভৃতি থাকলে প্রকৃত পাঠক সমালোচক শ্রেণীভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব তার জয়বিহারক অব্যবই পরি-লক্ষিত হয়। আনন্দবাজার স্কোপলে এই শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠককুলকে আশাত মুক্তিগ্রাহ্য অমায় উপহারের কারকরলে সিক্ত করে আকর্ষণ-ভাবে সংবাদ পরিবেশন করার 'মহৎ আর্ট' রপ্ত করেছে কেবল নয় এ বিষয়ে যে পরিপক বিশেষজ্ঞতার অধিকারী তা এক কথায় অনন্ত-প্রতিযোগিতাহীন। সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ পাঠককুল চেতনার কোন স্তরে

অবস্থান করেন ও কিতাবে ও মতামত ও চিন্তাধারাকে প্রত্যা-করা যায় এ বিষয়ে এই গোষ্ঠী প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ-এই শ্রেণীর পাঠককুলে মোহাবিষ্ট অবস্থার মনোবিজ্ঞানমন্ডল উপারে মঙ্গল-খোলাই কিতাবে করতে হয় আনন্দবাজার গোষ্ঠী তুলনায় 'গণশক্তি', 'কালান্তর' প্রমু-নয় প্রচারধর্মী আকর্ষণহীন ইচ্ছা-জাতীয় সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতি ব্য-ও অকার্যকরী। মুষ্টিমের সচেত-পাঠককে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করলে আনন্দবাজারের তেমন কিছু বা-আলে না, যেমন আর্থিক প্রা-সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার এরা তে-তোয়াক্কা করেন না। প্রধানত-হুই কারণেই এঁদের আনুষ্ঠানিক-আফালন সীমাহীন পর্যায় পৌ-বার প্রকাশ ২৫ শে ডিসেম্বরের-সেনগুপ্তের রচনার ছেড়ে ছেড়ে

সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক দা-বিত্তিমুখী মানসিক চাহিদার-দৃষ্টি রেখে, বিকৃত মূল্যবোধকে-জীব্য করে এই গোষ্ঠী রাজনী-ক্রীড়া, কুবি, চলচ্চিত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায়-সর্ব বিষয়ে-দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসি-বিভিন্ন প্রকাশনার বিরাট যজ্ঞে ত-বিশ্লিষ্টবৎ মূলাকাভিত্তিক কার-লিপ্ত। যে কোন দাবীক এমনতালি-উৎপাদন ব্যবহার মতোই এই গে-কাচা মাল হিসাবে এইসব উপাদা-গুলিকে ব্যবহার করে ঐ বিশে-শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতাসাধারণ-কাছে পরিবেশন করছেন। শি-সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি-সবকিছুই এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদ-ব্যবহার দৃষ্টিতে মিছক উৎপাদন-কাচামাল হিসাবে গণ্য হয় মূলাকা-তৎপ্রসূত মস্তদায়কের উদ্দেশে-ব্যবহৃত হয়, যার কিঞ্চিৎ প্রসাদপু-মোটো মামোহারার মোদায়েব-শ্রেণী-তথাকথিত সাম্প্রদায়িকেরা এই উ-পাদন ব্যবস্থাকে মচল ও গতিশী-করার-অন্ত যন্ত্রাণ তথা লেখনি-ধারণ করেন। এখানে মানিক-কারী উভয়েই পারস্পরিক অবি-আর্থিক স্বার্থেই আবদ্ধ। আদর্শ বা-একাত্তই কিছু থাকে তবে তা কে-রাজ পারস্পরিক বা শ্রেণীগত আ-সম্বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথ-এটাকেই এক শ্রেণীর সংখ্যাগরি-পাঠক নিরপেক্ষ-নির্ভীক সাম্প্রদায়িক-তার পরাকাষ্ঠা মনে করেন। ব-সেনগুপ্তের দলও এর কলে নিজে-সকল 'হিরো' মনে করে আনুষ্ঠানিক-ভোগেন।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কি-সামাজিক বিকৃতি ও অবক্ষয়-শেষাংশ ৮৮ পৃষ্ঠায়

দাম মজুরী ও মুনাফা

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং তার পরামর্শদাতারা অহুহে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। এই তারতবাহীরা এমনই মনস্তাপ্য যে এদেশে উৎপাদন বাড়ালেও দাম কমে না, বরং বেড়ে যায়। দামধারণ অর্থনৈতিক নিয়মে যোগান বাড়লে দাম কমে, চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে। কিন্তু এটা আংশিক সত্য মাত্র। কারণ কোন জিনিসের চাহিদা বা অত্যাচার মৌচেনের কমতা ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির সামগ্রিক রূপ শুধু উৎপাদন বা ভোগ্যপণ্য বন্টন নয়। ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করার অর্থ এটা নয় যে সব উৎপন্ন পণ্য ভোগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। আর সব চাহিদাই অর্থনৈতিক বিচারে সক্রিয় চাহিদা নয়। কারণ যার পকেটে কেনাকাটার পরমা থাকে না তার চাহিদা পূজিবাদী অর্থনীতির বিচারে অগ্রাহ্য।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে শুধু উৎপাদন করা হলেই দাম কমে না। তারতে এবং অন্যান্য পূজিবাদী দেশে গত বিশ বছরে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই কিন্তু দামও বেড়ে চলেছে। সুতরাং উৎপাদন বাড়ালে দাম কমে এমন কোন ভরসা অসম্ভব: পূজিবাদী সমাজে যেওনা যায় না। সমাজতান্ত্রিক দেশে অবশ্য এটাই ঘটে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি বাড়ে, যোগান বৃদ্ধি বাড়ে দাম তবু কমে যায়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে জাতীয় উৎসবের পরভ্রমে ভোগ্যপণ্যের দাম বিশেষভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্ধারক তারা মাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চান না। তারা যথেষ্ট সমাজতন্ত্রের বুলি আওতান ঠিকই, কিন্তু কাজের বেলায় তারা পূজিবাদী ব্যবস্থাই চালু রাখেন। এখন, আমাদের দেশে চিনি, মসুরি, দাধান, মোড়া, কাগজ, মসুরি, মিসের এগুলি সহজে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে সরকার নিষিদ্ধ করে তোলে। যে করেকটি পণ্যের উৎপাদন করলাম, সেগুলির উৎপাদন, মিসের বাড়ীঘর, সেচ ইত্যাদি তৈরী করতে সরকার মূলধনী প্রব্য, অসুখালভোগ্যপণ্য। যৌনতার পর এসবগুলি পণ্যেরই উৎপাদন বেড়েছে। দামও বেড়েছে। সরকারী ভরও দাম বেড়েছে। কিন্তু

সরকারী দামের চাইতে বাজার দাম অনেক চড়া। অথচ সরকার পড়তা খরচ একটু বেশী ধরেই দাম ঠিক করে দিয়েছেন। সরকার নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যের চাইতে বাজার দাম এত বেশী চড়া থাকার প্রতিবন্ধ এই করেকটি পণ্য বাবদই পূজিবাদী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ক্রেতা দামধারণের পকেট কেটে বছরে ৪০০০ কোটি টাকারও বেশী কেড়ে নেয়। অর্থাৎ তারা দেশের জনসাধারণের

আর্থনীতি

মোট ক্রয়ক্ষমতার একটা মোটা অংশ অর্থের মুনাফার আকারে ক্রেতাদের পকেট হস্ত করে দেয়। তখন ক্রেতাদের অন্তত জিনিস কেনাকাটার মত যথেষ্ট টাকা পরমা হাতে থাকে না।

সাম্প্রতিক ইকনমিক টাইমস পত্রিকার জনৈক লেখক মোট উৎপাদনের হিসাব ধরে সরকার নির্ধারিত এবং বাজারের চলতি দরের পার্থক্য দেখিয়ে একটা হিসাব দাখিল করেছেন। ঐ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে সিমেন্টের মোট উৎপাদন ২ কোটি টন, সরকার নির্ধারিত দাম প্রতি টন ৬০০ টাকা কিন্তু বাজার দাম ১২০০ টাকা। এর শতকরা ৬০ ভাগও যদি দামধারণ ক্রেতাদের বাজার দামে কিনতে হয় তাহলে বছরে তাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় ২৪৪০ কোটি টাকা। এইভাবে ইম্পোর্টের নির্ধারিত দাম ২৫০০ টাকার জায়গার বাজার দর ৩০০০ টাকা। ফলে ক্রেতাদের দিতে হয় অতিরিক্ত ১৬০০ কোটি টাকা; চিনির দাম টন প্রতি ২৭৫০ কোটি টাকা কিন্তু বাজার দাম ৮০০০ টাকা। এর ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ বাজারে বিক্রী করা হলে ক্রেতাদের অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে ১১০২ কোটি টাকা। এমনি কাগজ, বনস্পতি, মোড়া, কপ্তিক মোড়া ইত্যাদি বাবদ আরও অতিরিক্ত ২৭৪ কোটি টাকা ক্রেতাদের পকেট কেটে নেওয়া হচ্ছে। সরকার যুগে হা হুতাশ করে দুঃখ প্রকাশ করছেন কিন্তু তারাই যে এই লুণ্ঠনের রাত্তা বাংলা দিয়েছেন, সেটা কবুল করছেন না।

সুতরাং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী উৎপাদন বৃদ্ধির যে হাওয়াই বাতলেছেন আললে সেটা একচেটিয়া কারবারীদের মুনাফা বৃদ্ধিরই যে সহায়ক হবে।

পুরুলিয়ায় ঝাড়খণ্ডী সমর্থকদের গ্রামে গ্রামে পুলিশী অত্যাচার ও মামলা

ঝাড়খণ্ড মুক্তি ফোর্সের ডাঙা হাজার হাজার মানুষের সংগঠনতা, অবহেলিত, নিপেষিত মানুষের জন্ত পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবী, বন, আবগারী, পুলিশের শোষণ, ক্ষেত্রে খামারে জল, স্থানীয় বেকারদের চাকরীর দাবীতে আজ সমগ্র পুরুলিয়া, বাকুড়া উদ্ভাল। ঝাড়খণ্ডী সমর্থকদের গ্রামে গ্রামে চলছে পুলিশের নীতন্ত্র অত্যাচার। কান্দিপুর, হুড়া, পাড়া, রঘুনাথপুর, আড়মা, আলহা, জয়পুর, মানবাজার, বাম্বোয়ান প্রভৃতি থানাতে পুলিশ প্রশাসন দলদল চালায়ে অসহায় আদিবাসী

মচার কথা, যখনই ক্রেতার ভাষা দামে জিনিসপত্র পাবার দাবী জানান, অথবা মেহনতী মানুষেরা নিজেদের ক্রয়ক্ষমতা বাঁচানোর জন্তে টাকার অঙ্ক মজুরী ও বেতনবৃদ্ধি দাবী করেন তখনই সরকারী কর্তাদের মুখে অর্থনীতির খই কোটে। তারা বলতে থাকেন বেতন মজুরি বোনাস এসব বাড়লেই দাম বেড়ে যায়। সুতরাং এসব দাবী নয়, কেবল উৎপাদন বাড়িয়ে যাও। কিন্তু তারা একবার চোখ খুলে দেখেনও না যে অল্প সরকারী তথ্য পরিদপ্তরানে এর বিপরীত দাখ্যই মেলে।

১৯৭২ সালে রিভার্ড ব্যাল্কের এক বৃহদতিনে দেখানো হয়েছে ১৯৬০-৬১ সালে যে কোন জিনিসের মোট বাজার দামের মাত্র ৫৫ শতাংশ উৎপাদন খরচ এবং এর মধ্যে শতকরা মাত্র ১৭.৩ শতাংশ মজুরী, মাইনে ও বোনাসের খরচ। ১৯৭০-৭১ সালে মোট উৎপাদন খরচের মাত্র ১৪.৭ শতাংশ মজুরি, মাইনে ও বোনাস বাবদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম এই দশ বছরে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে সরকারী তথ্য থেকেই প্রমাণিত হল যে উৎপাদন খরচের মধ্যে মজুরী, মাইনে ও বোনাসের অংশ কমেছে অথচ বাজার দাম বেড়ে গেছে। এই লুণ্ঠনের কাহিনী আড়াল করার জন্তেই বড় বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং তাদের পৌরষা সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি আওয়াজ তোলে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ জনসাধারণের ভোগবৃদ্ধি, পূজিবাদী সমাজে মজুরী বেতন বোনাস না বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ কেবল মুনাফাবৃদ্ধি। সরকারী কর্তারা খোঁরালা গুটি করে এই দত্যটিকেই আড়াল করতে চাইছে।

রমণী, গৃহস্থ বৃদ্ধের হেনস্থা, তাদের প্রতি অশোভন উক্তি করে বেড়াচ্ছে রাতের অন্ধকারে।

কান্দিপুর থানার আগুড়ি অঞ্চলের মেজা গ্রামে ২২/১১/৮০ তারিখে রাজি ৮১ টার সম্মুখ মোট চোফটি মোটর গাড়ীতে (মিনিবাস নং) প্রায় দুশো লম্বা বন্দুকধারী পুলিশ ডাকাতি কার্যক্রমে চড়াও হয়। গ্রামের মেয়েরা প্রতিরোধ করলে উদ্ভেজননা বাড়ে। পুলিশ পাঁচ বার কাঁকান গ্যাসের সেল কাটা। গ্রামের পুরুষ মানুষেরা ভয়ে পালিয়ে যান। সেজা সাঁওতাল ও ময়রা অধিবাসিত গ্রাম। লেখানকার মহাজন ও বোনামী বৃদ্ধদের দাম কেটে নিয়ে গিয়েছিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি ফোর্সের সমর্থকরা। অবশেষে লাভজন আদিবাসী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। সাধারণত জনদের মধ্যে ছুজন শিশু সম্ভ্রানের মাকে ঐ গভীর রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অল্পরূপ ঘটনা ঘটে জীবনপুর গ্রামে। গ্রামের শিক্ষক তারাপ্রসাদ মাকিকে রাজ্যে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ যখন তিনি ইন্সপেক্টর জন্ম প্রাপ্ত রুট পরিহার করছিলেন। অথচ সরকারী মতে বলা হয় সেখানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

কালাকোর গ্রামে সি পি আই (এম) সমর্থিত তাম্র বর্গারদের দাম ফটি নিয়ে এক ঘটনা ঘটে। গ্রামের ঐ ভূমির অস্ত্রাভাগাচাষী ছিলেন, চৌরাস লিং, আদর মহাতো, কালচাঁদ মহাতো প্রমুখ। কিন্তু কান্দিপুরের সি পি আই (এম) নেতা প্রবোধ মহাপাত্রের পুত্রপোষিতার সেই ভিত্তিতে একা বর্গারদর হন পাছ মহাতো। আসলে সেই ভূমির মূল ভূস্বাম্যক বিশ্বনাথ মুখার্জী। ঐ ১৫ বিঘা ভূমির ভাগ পেতেন তিনি। গরীব লোক। গ্রামের দলেই তাঁকে কৃষিকার্যে সাহায্য করেন। যদিও এস ডি ও কোর্টে ঐ ভূমি নিয়ে মামলা চলছে তবুও পাছ মহাতো গত বছর দাম কাটেন। পুলিশ তখন তাঁর বিরুদ্ধে দাম চুরির মামলা আনে। এ বৎসর ঐ ভূমির দাম ঝাড়খণ্ড সমর্থক কেটে নিয়ে চলে যায়। ঘটনার সময় থানার দায়োপা বি ডি ও সি আই (কান্দিপুর) দকে ২৫ জন লম্বা পুলিশ উপস্থিত।

থানা অফিসারের অহুরোধ লঙ্ঘন সি, পি, আই (এম)-এর কর্মীরা কেউ সেখানে থাকতে চাননি। দাম-

কাটার সময় প্রায় ৪০০ জন মেয়ে দাম কাটতে থাকেন, পুরুষেরা তাঁর ধুক নিয়ে দল্লিত। মাঝে মাঝে উঠতে ধমকায় বোল—দেখ দে পটম, তান গিড় গিড়।

দক্ষাবেল্য দাম কাটা হলে শান্তি-পূর্ণ ভাবে ঝাড়খণ্ডীরা চলে যান। পুলিশও চলে যায়। কিছুদূর যাবার পর পুলিশ আবার ফিরে আসে। গ্রামবাসীর খামারের দাম তারা বাজেয়াপ্ত করতে থাকে। চলে মার-ধোর। গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় আবার ঝাড়খণ্ডীরা খবর পেয়ে ধমসা বাড়িয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ বিপদ লঙ্ঘতে যেন গ্রামের দিকে আসতে থাকে। পুলিশ বীরেরা ভয়ে তখন বাজেয়াপ্ত দাম ফেলে ফোনমতে পালিয়ে যায়। কাকর ক্ষতো খুলে, পা কেটে, হোঁচট খেয়ে তারা কান্দিপুর ফিরে গেল।

সি, পি, আই (এম) কর্মীরা বসে-ছিলেন হুতাষজ্ঞ মোধ চৌধুরীর কাছে আনেকটা সাঁওতাল বিক্রোহ ধমনের কাহিনী শোনার অন্ত। তিনি ভয়ে মোটো কেশ করেন আট জন মূল আদায়ী ও ৫০০ জন অন্যান্য সাঁওতালদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দাম চুরি সহ জাতীয় দণ্ডবিধির ২৪৭/২৪৮/১৭৯ ৩৭৯/১৮৬/১১৪/ ১২০ ধারাতে। গুণী মাকি, মদ সুখ মাকি, রবীন মাকি, টপন মাকি। অজুন মাকি, গুরুচরণ মাকি, বিশ্বনাথ মুখার্জী, আনন্দ মহাতো প্রমুখ অতি যুক্ত।

কান্দিপুর কেস নং ৮, তারিখ ১৯/১১/৮০তে অভিযোগ দায়ী হচ্ছেন হুতাষজ্ঞ মোধ চৌধুরী, থানার সাবইন্সপেক্টর। থানা র ডাইরী অল্পমাত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বনাথ মুখার্জী ও আনন্দ মহাতো ঝাড়খণ্ডী-দের প্ররোচিত করেছেন। কিন্তু দাম কাটার সময়, না দাম কাটতে যাবার অন্ত? কোন সময় তারা প্ররোচিত করেন হাজার হাজার ঝাড়খণ্ড যেজ্ঞানবককে তার কোন নির্দেশ ডাইরীতে নেই।

মহামাত্র বিচারপতিদের মহামাত্র আদালতে যথার্থীতি আনন্দ মহাতো ও বিশ্বনাথ মুখার্জী আন্টিসিপেটরী আদিনি নিয়ে চলে গেছেন।

ভূমি সংস্কারের প্রতিবন্ধকতা

বিশেষ সংবাদদাতা

জমির সুষম বন্টন কল্যাণ রাষ্ট্রের অগ্রতম মৌলিক লক্ষ্য। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও ভারতে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা সব থেকে বেশী। পশ্চিম বাংলার ওপরে লেখা ডেপুটি কমিশনার এই প্রবন্ধে সার্থক ভূমি সংস্কারের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রত্যেকেই আশা করেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভূমি সংস্কারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু গত ২০ বছরে তা হয়নি। এমন কি মার্কসবাদী রাষ্ট্র পশ্চিম বাংলাতেও স্বার্থ ভূমি সংস্কার বলতে কিছুই হয়নি। পশ্চিম বাংলা সরকারকে অবশ্য চেষ্টা করতে গিয়ে বহু সময়ের সম্মুখীন হতে হলো। “অপারেশন বর্গা” নামে এক অভিযান চালিয়ে জমি জব্বীপের কাজ হাতে নিলেন। বর্গাদার বা তাগচাষীরা বছরের পর বছর ধরে জোতদারের জমি চাষ করে আসছে। জমির মালিক হিসেবে জোতদার পেয়ে আসছে কসলের অর্ধেক। অথচ জমির ওপর বর্গাদারের কোনো

স্বত্ব থাকছে না। সে শুধু চাষ করবে। “অপারেশন বর্গা” অভিযানে বর্গাদারদের নাম মণ্ডিত করার ব্যবস্থা করা হলো। কাজটা কিছু খুব সহজ-সাধ্য নয়। ভূস্বামী বা জোতদার হলেন গ্রামের সব থেকে কবজাশালী। কাজেই বর্গাদারগণ তাঁদের বর্গা (বা তাগচাষ) মণ্ডিত করার আগে হাজারবার চিন্তা করছেন কারণ মণ্ডিত করার অর্থ হলো, জমির মালিকানা স্বত্ব কিছুটা তাঁদের হাতে আসবে। কলে, জোতদারদের তাগের কসলের পরিমাণ আরো কমে যাবে।

গ্রামের অধিকাংশ জমি মাধারপত: ছ’ একরের হাতেই থাকে। তাঁরা নানারকম কারখানা কোম্পানির দ্বারা বর্গাদারদের ওপর নাম রেজিস্ট্রি না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। মারধর, মিথ্যা মামলা, চাটুকারিতা, ভোকবাক্য সব রকম অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়।

কাজনাগো প্রাথমিক জব্বীপ করে দাবী এবং পাট্টা দাবীর ভিত্তিতে নিষ্পত্তি গ্রহণ করেন। পরে তা যার

জমিয়ার ল্যাণ্ড রিকর্ড অফিসারের কাছে। কিন্তু জুজুগোর বিবর বাকস-বাদী রাজ্যে জোতদার জে, এল, আর, ওকে কিম্বদন্তি রাখতে পারে।

বলা হয় যে ভারতের প্রায়াকলে আদালত ও পুলিশ পরিশ্রমীরা লোকদের পকেটই খান। পশ্চিম বাংলার হরত এর কিছুটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু রাজ্যের সব পকারেত্তগুলি তো আর দি, পি, আই (এম) পরিচালিত নয়। আদালত লক্ষ্যত: অচেতনভাবে কিংবা লর-কারের অভিপ্রায় সম্পর্কে সঠিকভাবে ওরাকিবহাল না থাকার ফলে অত-বর্তী নিবেদ্যতা বা ইনজাংশন জারী করে বসেন। আর জোতদাররা সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকেন। কারণ এই ধরনের ইনজাংশনের ফলে কোর্টে পাহাড় প্রমাণ মামলা জুড়ে থাকে। চূড়ান্ত করণালা হতে কয়েক বছর কেটে যায়। এই অবসরে জোতদাররা বর্গাদারদের ওপর বেশ নামা চাপ। জোতদারদের পরমা আছে তারা চালিয়ে যেতে পারে আনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, কিন্তু বর্গাদার

পরিব। মাথা নত না করে থাকবার মনোবল কমবার। এ পর্যন্ত ২০ লক্ষ তাগচাষীর মধ্যে ‘রাড-৮ লক্ষ ৫৫ উদ্বৃত্ত জমি

উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে তা বন্টনের ব্যবস্থা করাও খুব সহজ কাজ নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২৪ পরগণার মত কয়েকটি জেলার উদ্বৃত্ত জমি বলতে বিশেষ কিছু নেই। মুন্সিবাধ জেলার উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ অনেক বেশী। অনেক সময় সরকারের খাম জমি চিহ্নিতকরণের পরও তার দখল নেওয়া খুবই কঠিন। যেখা যায়, খাম জমিতে হয় বাড়ী উঠেছে, মা হয় পুত্র তৈরী হয়েছে। কিংবা

বেআইনীভাবে তা বিক্রি করা হয়েছে অথচ কারোয় কাছে। কাজেই সেই সব জায়গার কোনো কৃষকে বলাবোঁর অর্থ, রক্তপাতের আশংকা তাকে আনা।

ভূমি সংস্কার কালে পশ্চিম বাংলা সরকার ভূমিহীন কৃষক মজুরদের কথা ভুলে যাননি। ভূমি ব্যবহার এরাই হচ্ছে সব থেকে নিম্নতম ব্যক্তি। অথচ বছরে বছরে এদের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। এরা আবেদন করলে আদ-০০৪ একর বাত জমি পেতে পারেন, কিন্তু দেখানো তাঁদের তর।

রাজ্য সরকারের রেকর্ড খরাপ দেখাংশ ৭৮ পৃষ্ঠায়

অনুবাদক হিসাবে সরোজ দত্ত নাম বাদ দেওয়ায় প্রতিবাদ

কয়েকজন লেখক ও সম্পাদক একটি অস্থায়ী গ্রন্থ থেকে অনুবাদক হিসাবে কবি ও রাজনৈতিক নেতা সরোজ দত্তর নাম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেছেন, “বিশ্ব প্রলেতারিয়ান সাহিত্যের অন্ততম স্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক ম্যাক্সিম গোর্কীর ‘আর্টিস্টস অ্যান্ড প্যাম্-ক্রেটস’-এর বাংলা অনুবাদ ‘নামা লেখা’ নাম দিয়ে আটোবর ১৯৫৪ স প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থটি অনুবাদ করেন প্রখ্যাত সাংবা-হিক, অনুবাদক, রাজনৈতিক নেতা এবং কবি সরোজ দত্ত। অনুবাদে তাঁর দাবীল তলিরা এবং হকত বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে চিরদিন এক নিখর স্থান নিয়ে থাকবে।

“প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্ততম কর্ণধার। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক ‘স্বাধীনতা’ এবং সাংস্কৃতিক মুখপত্র ‘পরিচর’-এর লেখক তিনি মুক্ত ছিলেন। দি, পি, আই, এম এর রাজনৈতিক মুখপত্র ‘দেশহিতৈষী’র সম্পাদক মণ্ডলীর তিনি অন্ততম সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে দি, পি, আই, এম এম এর মুখপত্র ‘দেশব্রতী’ এবং পার্টির অন্ততম সংগঠক ও নেতা হিসাবে তিনি কাজ করেন। এই নিষ্ঠুর বোঝা লেখককে খুব সম্ভবত পুলিশ হত্যা করে। আজও তাঁর এই মৃত্যু দখলে কোন তথ্য উল্লেখিত হয়নি।

“এই জনপ্রিয় সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক নেতা স্রষ্টার মৃত্যুর অন্তিম ‘নামা লেখা’ দীর্ঘ ছাপের বছর পর আবার ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে এই একই প্রকাশন সংস্থা জাশনাল বুক এন্ডেলি। প্রথম সংস্করণের বইটিরই

সব্বদ ফটো অকশন প্রিন্ট। শুধু অনুবাদক হিসাবে কোথাও স্রষ্টার নাম নেই। তাঁরা নিবন্ধের নামটি মুছে দিয়েছেন।

“আমরা অত্যন্ত ক্ষোভ এবং দুঃখের সঙ্গে এই গৃহীত কাজের প্রতিবাদ করছি। কোন পণ্ডিত এবং স্বাধীনতাকামী মানুষই এই অপ-প্রচেষ্টাকে মৃগ বুঝে গ্রহণ করবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই বিবাদের বলীমান হয়েছে আমরা এগিয়ে চলেছি। আপনাদেরও প্রতিবাদ জানাতে বলছি।”

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন মর-হরি কবিরাজ, নিমেষর দেন, মহাশেতা দেবী, রাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, দিয়ার খোব, হোমাব বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রনাথ ওপ ও বীরে-বর বন্দ্যোপাধ্যায় (এশিয়াটিক সোসাইটি), কটিক রায়, উদারজন তট্টাচার্য, নিমল ব্রহ্মচারী, শ্যামল গণেশাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, কমলেশ সেন, শান্তি রায়, স্বপ্নম দেব, অম্বতীহুয়ার সাতাল, অসিত সেন, নবীন দাস, আশুতা ওপ, সদয় রায়চৌধুরী, লম্বীর রায়, অমর বিজ, মোমেনবর ভৌমিক, পব-মুখোপাধ্যায় (মাহু), সুপীল জাম-পার্ব চক্রবর্তী, পুলক চন্দ (প্রজা-পর্ব), অবনী রায় (কথামিত), মনে রজন বিশ্বাস (নাট্যপ্রসঙ্গ), অদি আচার্য (অগ্রহণ), প্রবীর সে স্ববিশ্বল মুখাণী, চন্দন ঘোষ (শিদ প্রদীপ গোস্বামী (ম্যানিফেস্ট), বিশ্বনাথ মৈত্র (দৈনন্দিন, বনগী), গৌর চক্রবর্তী (উত্তরবেশ), চক্রবর্তী, প্রাবুট দাশমহা আশিব সাহিত্যী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিহির চক্রবর্তী (সাহিত্য), লব্যসাতী দেব, অরিন্দি মিত্র ও আরো অনেকে।

বিদেশ দর্পণ

বাংলাদেশ সংসদে যৌতুক বিরোধী বিল গৃহীত

গত ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংসদে বাংলাদেশ যৌতুক বিরোধী বিল, ১৯৭৯ পাশ হয়েছে। মারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা এবং সংস্ক-পের বিধান প্রণয়ন করে এই বিলটি আনীত হয়। এই বিলে যৌতুক গ্রহণকারীর জন্য জরিমানা ও কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই বিলের কারণ সম্পর্কে

বিবৃতিতে বলা হয় যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক মনস্তা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। যৌতুক নিয়ে বিবাহ উত্তর কালে অনেক দ্বন্দ্বী প্রের মধ্যে তালন দেখা দিয়েছে। অনেক সংসারে অশান্তি নেমে এসেছে। এত্যাগারে সংসার নেতা ও প্রধামমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন যৌতুক বিরোধী বিল একটি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে আন্দোলন।

বিরোধী দলের নেতা জমাব আনোয়ার হান বিলটিকে খাপত জানিয়ে বলেন, বিলটি সংশোধন করে আরো সুস্বত্বভাবে পেশ করা যেত।

বিলটির উপর বিরোধী দলের দ্বারা আলোচনা করেন তাঁদের লবাই মীতিপতভাবে বিলটিকে সমর্থন করলেও সংশোধনী ও তন-মত বাচাইয়ের প্রস্তাব করেন।

মার্কিন বন্ধী মুক্তি নিয়ে ইরাণ যা বলছে

এদোনিয়েরেড প্রেসের এক খবরে জানা গেছে যে, মার্কিন বন্দীদের মুক্তির জন্য ইরাণ যে ২৪০০ কোটি ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছে, তা মেটানোর জন্য ইরাণের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এর ফলে একুনি ৫২ জন মার্কিন বন্দীর মুক্তি হয়ে যাবে।

২৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি রাজাই বলেছেন যে, ইরাণের অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলজেরিয়ার কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে। কারণ ইরাণের এই অর্থ দিয়ে যেওয়ার জন্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী হয়েছে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে উত্তরপকই ভিন্নমত পোষণ করে তা না যেটা পর্যন্ত বন্দী-দের মুক্তি সম্ভব নয়। আমেরিকায় ইরাণীয় টাকাকড়ি বাত্রেয়াও হবার পর-ইরাণ যে মামলা রুজু করেছে, ইরাণ সেই ধরত আমেরিকার বাড় দিয়ে আদায় করে নিতে চায়। এখানেই উত্তর দেশের মতপার্থক্য। রাজাই মতপার্থক্য বলতে এই প্রস্তাবেরই উল্লেখ করে থাকবেন।

ইরাণী প্রধানমন্ত্রী মুক্তি পনের তিনটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। তার প্রথমটি উল্লেখ করা হয়েছে এই মতপার্থক্য মিটিয়ে কেলার জন্য।

যতদিন না তা হয় ইরাণী সম্পত্তির মূল্য বাবদ একটা প্যারাটি টাকা আদ-জেরিয়ার কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে। মীমাংসার পর ইরাণ পাই পরমাটি বুকে নেবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যে সব ক্ষেত্রে দু’দেশের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই, সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় বিকল্পে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের বিরুদ্ধে বতকণ পর্যন্ত বড়বর অব্যাহত রাখবে কিংবা ইরাণের বিরুদ্ধে ব্যাপারে নাক গলাবে ততকণ পর্যন্ত কোন মার্কিন বন্দীই ছাড়া পাবে না।

গোকির 'মা' চলচ্চিত্র পাশ্চাত্যবঙ্গে ?

সোমেন গুহ

ম্যানিষ গোকির 'মা' উপজাতির একটি মাত্র বাংলা পূর্ণাঙ্গ অল্পবয়সী পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গী বয়স এই অল্পবয়সী রাশিয়ার প্রগতি প্রকাশন কিছু বছর পর পর বাংলা বাজারে পাঠায়। বয়স রাশিয়ার থেকে আসে তখনই শুধু 'মা' বইটা চোখে দেখা যায়। এখন দেশীয় ভাগ মাহুই জানেন না এর আগে বা এর থেকে ভালো কোনো বাংলা পূর্ণাঙ্গ অল্পবয়সী হয়েছে কি না। 'মা' উপজাতির প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ অল্পবয়সী করে- ছিলেন অশোক গুহ (ভারতী লাইব্রেরী ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে)। আজ কিছু অশোক গুহের অল্পবয়সী আর পাওয়া যায় না। তার পরই সুপেজকৃত চট্টোপাধ্যায় আবার বাংলা পূর্ণাঙ্গ অল্পবয়সী করেন মা' বাংলা ভাষায় (গুপ্ত জেওন্ প্রকাশ করে)। এ অল্পবয়সীও আজ পাওয়া যায় না।

গোকির 'মা' উপজাতির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বের্টোল্ট ব্রেশ্ট। গোকির উপজাতির ঘটনা আগামী ১৯০০ সালকে আসাম দিয়ে শেষ, কিন্তু ব্রেশ্ট নতুন করে চরিত্রকে দিয়ে দেখিয়েছেন ১৯১৭ সালকেও। ইংরেজীতে এ নাটক পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় এ বাবে আমরা বঞ্চিত। ব্রেশ্ট নিয়ে, গোকির নিয়ে বা নাটক নিয়ে অল্প আলোচনায় এ নাট্যরূপের প্রসঙ্গ বাধ থাকে।

বিশেষ বশকে রাশিয়ার একটা ক্ষেত্রে বিখ্যাত কাপিয়েছিলো—সেটা চলচ্চিত্র। নতুন সংস্কৃতি পড়ার মাধ্যম দিয়ে একজন তরুণ নৈবেদ্যে চলচ্চিত্রের মর্যাদা। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তারের কয়েকজন আঙুলে পাঠা বিশেষ আদর্শ। মা'দীনের সংস্কৃতি প্রথম পোয়েটস ল' চাঁকায় করেছিলো, 'মা'দীনের একটা 'ব্যটলিশিপ পটেকিন' চলচ্চিত্র' তৈরী করার জন্য। অত্যাতে দিল্লি ইঞ্জিনিয়ার মেগেই আইডেনস্টাইন বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নতুন পথ দেখিয়ে ছিলেন 'ব্যটলিশিপ পটেকিন' করে। তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বন্দী, অত্যাতে গণিতের ছাত্র ড. ই. পুথকিন জেল থেকে পালিয়ে এসে মক্কাতো ১৯১৮ সালে—পরে বিরাট তথ্যচিত্র তুললেন বিজ্ঞানী পাতল-তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। পুথকিন এর পরই তৈরী করেছিলেন এক নির্বাক চলচ্চিত্র 'মা'। ম্যানিষ গোকির উপজাতির এই প্রথম চলচ্চিত্ররূপ। রাশিয়ার 'মা' চলচ্চিত্র

আজ প্রকাশ করে ১৯২৬ সালে। কিন্তু বুটেনে ছাড়পত্র ছিলো না, তাই বুটেনের বেনরকারী ফিল্ম সোসাইটিতে ১৯২৮ সালে 'মা' দেখানো হলো। ১৯৩৫ সালে পুথকিনের চলচ্চিত্রে কিছু শব্দ-সঙ্গীত যোগ করলেন ডি এম ব্রুক।

ভারতের একমাত্র লংগ্রেশনাল National Film Archive-এ পুথকিনের 'মা' চলচ্চিত্র আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে চমকে যেতে হয়—১৯২৬ সালে এমন চলচ্চিত্র তোলা সম্ভব? পঞ্চাশ বছর পরও মনে হয় সেই চলচ্চিত্রের কম্পোজিশন আর সম্পাদনা কি অসাধারণ! শুধু কলকাতাতেই পুথকিনের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির থেকে ভালো যন্ত্রপাতি আছে, কিন্তু এমন কম্পোজিশন কে করবে? পুথকিন নিজে এক পুলিশ অফিসার লেজেছেন, পুথকিনের স্ত্রী আমা জেমসমতা অভিনয় করেছেন মা'র স্ত্রীকার। এমনি আরো অল্পত সব ব্যাপার করে যা দাঁড়িয়েছে খুঁজ হয়ে চেয়ে দেখতে হয়।

চলচ্চিত্রটির গল্পের কাঠামো অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়। ১৯২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বয়স বিবৃতি-ভূষণের 'পথের পাচালী' চলচ্চিত্র-রিত হওয়ার পর লম্বাই নতুন যোড় মেওয়ার কথা বলাবলি করছে, ঠিক সময় রাশিয়ারে আত্মপ্রকাশ করলো নতুন চলচ্চিত্র গোকির 'মা'। পুথকিনের চলচ্চিত্রের ত্রিশ বছর পরে এ চলচ্চিত্র অনেক আধুনিক-ভার হযোগ নিয়ে তৈরী করলেন মার্ক বনকর। মার্ক বনকরের মা' জানে 'মা', এমন লোকের সংখ্যাই বেশী, অল্প বইয়ে মা'টা পর্যন্ত লেখে না। 'অথচ আজ বুক, রাশিয়ার ভীতি পরিচালকের দর্পণে দমনে দমনানিত মার্ক বনকর সম্ভবত শুধু গোকির মা'ত্রীত্ৰী (Gorky Trilogy) বয়েই বিখ্যাত হতে পারেন। গোকির 'মা'য়ে গোকিরীয় অহমতি বেনমি—বনকর পর পর তিনখানা বই করে ফেলেন গোকির কথার নিরুৎসাহিত না হয়ে। বনকর অল্পতজির 'ইম্পাত' চলচ্চিত্রান্বিত করেছেন। খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার ব্যানিল রাইট লিখেছেন—অনেকে বলে মতাবিৎ রায়ের অল্প জরী বনকরের গোকির জরীর দ্বারা প্রভাবিত, অবশ্য গোকির জরীর লংগ্রামী চরিত্র বাধ দিয়ে। একথা অবশ্য মতাবিৎ রায় স্বীকার করেন নি, কিন্তু মনে আসে কথাটা। বাই হোক বনকরের 'মা' চলচ্চিত্র এ

দেশে একেবারেই অজানা ব্যাপার, এমন কি National Film Archive-এও নেই। বিশেষত বনকরের 'মা' চলচ্চিত্র বেশী প্রচলিত নয়।

তবে কি গোকির 'মা' উপজাতি বা চলচ্চিত্র শুধু রাশিয়ার, আর কারো নয়? অথচ আমার মনে হয় আর হোক না কেন, 'মা' চলচ্চিত্র (দেশের আঞ্চলিক ভাষায় ভাবি বা লাবটাইটল বা করে হোক) প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত, নিরবিত অতি অল্প খরচে দেখার ব্যবস্থা করা উচিত, প্রত্যেক দেশের প্রমিক লংগঠন, পুথকিন, কবিতামিষ্ট পাঠি বা প্রমিত-শীল গোকির হাতে এ চলচ্চিত্র থাকা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য কেউ করে নি এ কাজটা কোনো মনরে?

পশ্চিমবঙ্গের সুলীম চলচ্চিত্র-কার কখনোই গোকির 'মা' উপজাতি নিয়ে চলচ্চিত্র করার চেষ্টা করেন নি। আবার তাদের হাতেই অল্পত হযোগ ও কথতা আছে, তাদের তেল চকচকে মাথাপেই বনকরী ও বেনরকারী তেল সব থেকে বেশী মাথানো হয়। স্বে চলচ্চিত্রকাররা পারতেন হয়তো 'মা' চলচ্চিত্র করার মরল নিভাত নিতে। বরপাতি আর প্রমর্শন 'মা' চলচ্চিত্রের সমতা নয়, আপাতত সমতা টাকার। বাব্রকট লরকারের কাছেই অর্থ লাহায়া আশা করা যেতো।

১৯১৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ নামে কখনোই ১৯১৭-৩০ সালের রাশিয়ার নয়। তবুও ভেবেছিলো, পশ্চিম-বঙ্গের সংস্কৃতির অতিভবকরা হয়তো পুরোমো রাশিয়ার বা বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনগুলোর খোঁজ খবর রাখলেও রাখতে পারেন। আর আকর্ষণীয় ব্যাপার জানতাম, পশ্চিমবঙ্গ লরকার চলচ্চিত্রের প্রো-কেনস মাজা-বার জন্ত শুধু পোটা পচিশেক চলচ্চিত্র তুলে ফেলেছেন (বার মধ্যে ছ'একটি দেখিয়ে বাঙালীরাই স্বস্তা আমা হয়েছে, 'পরশুরাম' মাহেবদের দেখিয়েই খরচ উঠেছে, আবার বহু-দিন আগে সেনরের ছাড়পত্র পাওয়া 'জরী অবস্থার হুঃখণ' আয়েকবার জরী অবস্থা জরীর অপেক্ষার)। তা ছাড়া তমেনি লবপহুদে পাঁচ কোটি টাকার মতিম ফিল্ম ল্যাবরেটরী তৈরীর পরিকল্পনার ইতিমধ্যে চোদ কোটি টাকা উঠেছে। কাজেই প্রচুর টাকা খরচের লম্বা কিছু টাকার একটা 'মা' চলচ্চিত্র তুলেও ফেলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ লরকার মনে হলো।

তাই নিভাত উটকো লোক দেশে প্রায়শই বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হিন্দেবে ১৯১০ সালের শেষে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের কাছে 'মা' চলচ্চিত্র বাংলা ভাষায় তোলার প্রস্তাব পাঠা-লায়। এ বছরের প্রথমে আবার 'মা' চলচ্চিত্র তোলার বিভিন্ন খরচের বাজেট ছিলো, মোট চার লক্ষ টাকা ('কড়', 'দীর্ঘকরাকার দেশে', 'পুথকিন', 'পরশুরাম' ইত্যাদি চলচ্চিত্রের প্রত্যেকটির থেকে কম খরচ এটা)। কলকাতা জানার জন্ত ক'মাল আপে চিঠি দিয়েও সেই একই আশা—নিরুত্তর। এমন কি লিখেছি 'মা' চলচ্চিত্রের জন্ত বন ছিলো চলবে (আলোচ্য বন নেওয়ারটাই আরি অগ্রাধিকার দিই)। কেউ বহি বাব-পহী সরকার হিন্দেবেও গোকির 'মা' সম্পর্কে একটু অধিক মনোযোগ আশা করে; তা হলে তার হতাশা অনিবার্য।

কি কি যোগ্যতা থাকলে সরকারী অর্থ লাহায়া পাওয়া যায়, সেটা অল্প আলোচনা। কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্ত অযোগ্য—এটা প্রমাণ করার জন্তও এতটা ডাক বা দাঙ্কাকার নেলাম না। নিজের অযোগ্যতা দানতে পারলে 'মা' চলচ্চিত্র করার পরিকল্পনাই চিরদিনের মতো ত্যাগ করা চলতো। লরকারী লাহায়া ছিলো না—নিজের অযোগ্যতাও বুঝতে পারছি না। অতএব, দ্বিতীয় শব্দ চড়া স্বে ব্যাকের কাছ থেকে বন নেওয়ার চেষ্টা। ব্যাক বিষয়-টিবর বোকে না—লেক টাকা শোধ করতে পারলেই হলো। কাজেই 'মা' চলচ্চিত্র থেকে টাকাটা উঠবেই এটা এদের বোকামোর চাইতে লাহা-মটা পার্যটি দেখানোই ভালো। মোটা টাকাওয়ালালোক পাবো না। কিন্তু বন বা বিশ বা পঞ্চাশ জন বাঙালী শিকিত চাকুরে যোগাফ করতে হবে, বাবের মাইনের টাকা আর চাকুরীর পরটা 'পাতা' পাবার মতো।

শেষ পরা, অমেকের কাছে হাত পেতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা। তখন খরচটা ভীষণরকম করিয়ে আনতে হবে। গুপ্ততমান কিছুটা পড়ে যাবে। কিন্তু উপায় কি। আর টাকা তুলতে গেলে চেষ্টা করতে হবে 'মা' চলচ্চিত্র বাংলা-হিন্দী বা বাংলা হিন্দী-ইংরেজীতে এক লম্বা করা যায় কি না। সেটাও করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয় পুথকিন। পরিচালিত 'মা' চলচ্চিত্র নিয়ে সে মনরে রাশিয়ার বাইরে শক্তা ও বিজ্ঞতার বড় বয়ে গেছে। বুটেনের লম্বা লম্বা তেনমার্ক, ক্রাজের মতো দেশগুলোতেও 'মা' চলচ্চিত্র দেখানো ব্যয়ন হলো। বিভিন্ন

দেশে প্রায়শই বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হলো। বয়স বুটেনে যুক্তি দেখানো হলো—দর্শকদের, অপরোধপ্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বাল লওনে বয়স ১৯২৫ সালে প্রথম ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হলো, তখন রাশিয়ার চলচ্চিত্র দেখার এক শক্তি-শালা হযোগ হয়ে গেল। এ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন আইতার মর্ডাও—মর্ডাও প্রত্যাকভাবে পুথকিনের লম্বা বন্ধু করেছেন শুধু তাই নয়, পুথকিনের 'কিনম টেকনিক' গ্রন্থের অল্পবয়স ও সম্পাদনা ইংরেজী ভাষায় মর্ডাওই প্রথম করেন। পুথকিন বয়স 'মা' চলচ্চিত্র তৈরী করছিলেন তখন একই লম্বা চলচ্চিত্র সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যেগুলো এই ফিল্ম টেকনিক গ্রন্থের বড় অংশ। আইতার মর্ডাও আরো স্পষ্ট এক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন—১৯২৯ সালে প্রমিক জনপণের ফিল্ম সোসাইটির ফেডারেশন তৈরী হলো। খুব কম খরচে মাধারণ মাহুস সংগ্রামী চলচ্চিত্র দেখতে পারতো এই ফেডারেশন। বুটেনে এই ফেডারেশনের একটি সংগঠন 'মা' চলচ্চিত্র ব্যাপক লাহায়া মাহুসকে দেখাবার ব্যবস্থা করলো। মেহনতী মাহুসের সংগ্রামী চেতনার আগেরে তোলার এক অভিনয় হাতি-রার হয়ে উঠলো 'মা' চলচ্চিত্র। কিন্তু দেখানো হলো না। লওন কাউন্টি কাউন্সিল সরাসরি বাবা নিবেদ জারী করে বন্ধ করে দিলো এভাবে 'মা' চলচ্চিত্র দেখানো। অতি মাধারণ মাহুসের অল্প খরচে 'মা' দেখতে পাওয়ার হযোগ বন্ধ হলো, কিন্তু বেশী খরচ করে ফিল্ম সোসাইটির লম্বাঘের দেখা বন্ধ করা হলো না।

খুব পরিহার ব্যাপার ছিলো বুটেনে। 'মা' চলচ্চিত্র ব্যাপক জনপণকে দেখানোটা বিপজ্জনক, কিন্তু যুক্তির বিস্তারন তল্লোকের দেখাটা বিপদের নয়। পঞ্চাশ বছর পরে ভারতে কিংবা এই পশ্চিমবঙ্গে এ ব্যাপারটা একবারে খাপ খেয়ে যায়। কোন না কোন যুক্তিতে 'মা' চলচ্চিত্রের মতো স্পষ্ট সংগ্রামী শিল্পকে সব সময়ই চেষ্টা হয়েছে ব্যাপক জনপণ থেকে দূরে রাখার। দেখানোর বাধার লম্বা তৈরী করার বাধার মতাদর্শগত ভিত্তি এক। এখন পশ্চিমবঙ্গে দারুণ সব 'দাঙ্ক-নৈতিক চলচ্চিত্র' বিস্তারন তল্লোকেরা দেখি, এমন কি 'মা' চলচ্চিত্রও হয়তো। এতে বিপদ নেই, লারা বিবেই মরকালে এটা দেখাও পম পৃষ্ঠার

শ্রমিক-কর্মচারী সংবাদ

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে বাতাজীবীদের স্মারকলিপি

ইণ্ডিয়ান কনালিট এ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল ১১ ডিসেম্বর মহাকরণে শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণ বোমের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধিদল তাঁকে বলেছেন যে, পালেকর ট্রাইবুনালের স্থাপনিত বের হবার মুখেই কয়েকটি সংবাদপত্র আংশিক সময়ের লংবাহকাদের হাটাই করতে শুরু করেছে। লংবাহকদের কোন পেনশন নেই। প্রতিডেক্ট ফাও বা আছে তা পেতে অনেকদিন লাগে।

শ্রমমন্ত্রী বলেন, আমি প্রতিনিধিদলকে বলেছি লংবাহকদের একটি দাবি মন্ব দিয়ে যেতে। সেটা দেখার পর প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে। তিনি বলেন, ওরা বলছেন, বহুমতী থেকেও আংশিক সময়ের লংবাহকরা হাটাই হচ্ছেন। বহুমতী নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না। এ ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলবো। আই জে এ প্রতিনিধিদল

গোবিন্দ 'মা' চলচ্চিত্র পশ্চিমবঙ্গে?

৪য় পৃষ্ঠার পর জানা। তাই কোন সরকারই লাভ করে 'বিপদ' ডাকতে পারে না। এই নিদারুণ বাধা-বিপত্তিতেও চলচ্চিত্রটা করা যাবে তো? মতুম শিল্পীদের অভিনয়, নতুন শিল্পীদের গান, বা টেকনিক্যাল ব্যাপারে কিছু দাবির অসুবিধা—না, মোটেই এগুলো প্রধান বাধা নয়। বরঞ্চ কিছু আইন-কানুন, বহির্ভূত গ্রহণের অসুবিধা, কাঁচা ফিল্ম, কুলীনদের সর্দারি বা লুপ্তদের মতানি, এমন

পূর্তমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করেন। পূর্তমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়ে লংবাহকদের আবাসন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

আই, জে, এ স্ত্রে জানা গেছে, লংবাহকদের পেনশন সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা শ্রমমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়েছে। আগামী লগ্নাহে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছেও পেশ করা হবে। জে, এ-র জনৈক মুখপাত্র জানান, শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, কোন মক্কেল ও আংশিক সময়ের লংবাহক বাতাজীবী হাটাই না হন সেটা তিনি দেখবেন।

বেঙ্গল এনামেল মালিকের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

বেঙ্গল এনামেল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে গত ১৬ই ডিসেম্বর ই, এল, আই রিজিওনাল ডাই-রেক্টর (কলকাতা)-এর মিকট করেক শত শ্রমিক কর্মচারী মিছিল লঙ্কারে ডেপুটেশন দেন। ধ্বংস প্রকাশ বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ

কি সেলস—এগুলো অনেক গও-মোলের। বিশেষত আশ্রয়শীল বা উটকো চলচ্চিত্রকারের কাছে তো বটেই। পশ্চিমবঙ্গের 'সুখ' চলচ্চিত্র তৈরীর মুখ্য সমস্যা কি কি, বা যন্ত্রপাতি ও পরিবেশনের গুরুত্ব বা লক্ষ্যটা কেমন, এ সবের তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধে আলোচনা করতে হবে। এ প্রবন্ধ শেষ করেও মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, গোবিন্দ 'মা' উপভোগ্য চলচ্চিত্র করা যাবে—এই পশ্চিমবঙ্গেই।

এর কর্তৃপক্ষ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা না দেওয়ার শ্রমিক কর্মচারীগণ ই, এল, আই কীমে স্বীকৃত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ৪ জনের এক প্রতিনিধিদল ই, এল, আই ডাই-রেক্টরের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডাই-রেক্টর আশ্বাস দেন শ্রমিক কর্মচারীগণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে সরকারী অর্থ বাতাজীবী হর তার সন্ত তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উক্ত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ১৮ই ডিসেম্বর শ্রমিক কর্মচারীগণ প্রতিডেক্ট ফাওর অব্যবহার বিরুদ্ধে, বেঙ্গল এনামেলের মালিক প্রতিডেক্ট ফাওর টাকা জমা না দেওয়ার প্রতিবাদে ও প্রত্যক্ষভাবে কর্মশমারের অধীনে শ্রমিক কর্মচারীগণের প্রতিডেক্ট ফাওর টাকা রাখার দাবীতে মিছিল লঙ্কারে প্রতিডেক্ট ফাও (পূর্বাঞ্চল) কর্মশমারের মিকট ডেপুটেশন দেন। শ্রমিক কর্মচারীগণের প্রতিনিধিগণ জানান বেঙ্গল এনামেল কর্তৃপক্ষ প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা জমা না দেওয়ার শ্রমিক কর্মচারীগণ প্রতিডেক্ট ফাওর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ৪ জনের প্রতিনিধি দলকে কর্মশমার জানাম ইতিমধ্যেই উক্ত মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা খতিয়ে দেখবেন। ইউনিয়নের নেতৃত্ব আয়ো জানাম যে, শ্রমিক-কর্মচারীরা শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা দণ্ডেও মালিকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বড়সের লিগ্ন হয়েছেন। কারখানাটি যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মী ধর্মঘট

গেণের বজ্রিটি অভিভাঙ্গ ফাই-রীতে, গত ১৮ ডিসেম্বর একদিনের প্রতীক ধর্মঘট হয়। বেতন হার সংশোধন, দফতর ভক্ত বোনাস, পদোন্নতির সুব্যবস্থা, শান্তিসূচক ব্যবস্থার অবলান, পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ইত্যাদির দাবিতে অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স এমগ্রয়িক ফেডারেশন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন।

কৃষক ও ভূমি মজদুর সংঘের দাবি পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ভূমি মজদুর সংঘ রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের মজুরী আঠারো টাকা এবং কৃষি পণ্য মূল্য নির্ধারণে অবিলম্বে একটি কমিশন নিয়োগ চায়। কৃষক ও মজদুর সংঘের পক্ষে বিমান মিত্র এই দাবি জানান।

শ্রীমতি বলেন, মহারাষ্ট্রের কৃষি পণ্য মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন তারা সমর্থন করেন। সেই সঙ্গে তারা চান কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধারণে

রায়কৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে

বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার স্মারকলিপি

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার (Scientific Workers Forum, West Bengal) পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ৩৭ জন গবেষক, শিক্ষক ও অধ্যাপক বিজ্ঞান কর্মীর স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে—“বোধহয় আপনি জানেন যে বিবেচনামূলক শতাব্দিকী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিকার একমাত্র স্নাতক কলেজ। আপনি এ ঘটনাও অবগত হতে পারেন যে, এই পদক্ষেপে স্পনসর্ড কলেজের পরিচালকসমূহী বিগত কিছু বছর বাতল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ধ্বংস করে চলেছে। আমাদের আতঙ্কিত করে, রায়কৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল বিজ্ঞানশিল্প থেকে জনৈক লাগুকে বহলি করে বিবেকানন্দ শতাব্দিকী কলেজের অধ্যাপক-পদে বসিয়ে এখন কলেজের শিক্ষকের চাকুরী নিরাপত্তা নিয়মের (Service Security Act) ভিত্তি-ভূমিকেই চ্যালেঞ্জ করেছে। আমরা মনে করি যে, রায়কৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দ শতাব্দিকী কলেজকে ধর্মীয় ও পেশাসূচক প্রতিষ্ঠান করে তোলায় এবং তাহের দক্ষীণ বার্ধে লংবিধানের ২৬ এবং ৩০ নম্বর ধারার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কর্মীবৃন্দ এবং রায়কৃষ্ণ

একটি কমিশন নিয়োগ করা হোক। এই কমিশনকে তিন মাসের মধ্যে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন

কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দাবিতে সি পি আই (এম এল) লক্ষ বনধের আন্দোলন করবে। সি পি আই (এম-এল) দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে গত ২২ ডিসেম্বর থেকে তারা কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করেছেন। এদিন ১৫০ টাকা ধামের কুইন্টাল, ১০০ টাকা আলুর কুইন্টাল ও ৩০০ টাকা এক কুইন্টাল আখের কুড়ের মূল্যের দাবিতে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও হয়। এতেও সরকার দাবি মেলে না মিলে তারা রাজ্য বন্ধের আন্দোলন শুরু করবেন। এই দলের নেতা সত্যোদয় রায়ের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই লক্ষ নির্মাণের দাবিতে গোপীবন্দনপুর এলাকার অবস্থান ও অনশন আন্দোলন শুরু করা হয়েছে।

মিশন কর্তৃপক্ষের মধ্যকার সংঘর্ষ বর্তমানে অচল অবস্থায় স্থিতি করেছে।

“তাই আমরা দাবী করি: ধর্মীয় গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপমুক্ত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে কলেজটিকে চালাবার জন্য এবং স্পনসর্ড কলেজে প্রযোজ্য চাকুরীর নিয়মকানুন পালনের জন্য সরকারের অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে।”

এই স্মারকলিপির অপর একটি স্বাক্ষরিত কপি শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হয়েছে। লাহা ইমিটিউট অফ মিউজিকের ডিরেক্টর, প্রতিনিধিত্বের কর্মী ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কর দি কান্ট্রিভেশন অফ ল্যারেজেন্স, বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দির, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, JACARI, মরলিংহ হস্ত কলেজ, বিভাগগর দাওয়া কলেজ, রায়লহর কলেজ, কাড়গ্রাম রাজ কলেজ, বিভাগগর কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, শিক্ষক ও অধ্যাপক বিজ্ঞানকর্মীরা এই চুক্তি স্মারকলিপিতেই স্বাক্ষর করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা



ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী



সেবার মাধ্যমে
জনসংখ্যার এক গড়ে তোলায় রত্নী
**ইউনাইটেড
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাঞ্জ লিঃ**

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন : অফিস : ৭ রোড কল : ৭০০ ০০৬
কন্সার্নম্যান : জে এন বিহার্স

চলচ্চিত্র নাট্যমঞ্চ

‘কস্তুরী’ উল্লেখযোগ্য হিন্দি ছবি

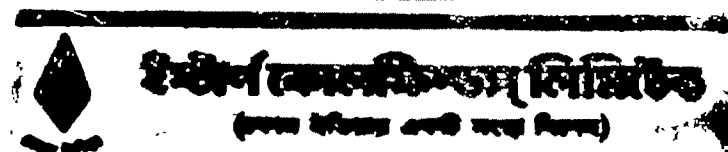
সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বহন করে ‘কস্তুরী’ নামক হিন্দি ছবিটির মুক্তি ব্যতিক্রম সম্বন্ধে নেই এবং তা অভিনন্দন লাভের যোগ্যতাও বহুগুণে রাখে। কাহিনী রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একাই বহন করেছেন বিমল রত্ন পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সংগে। ইতিপূর্বে তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এবার এই প্রথম চিত্র প্রযোজনা ও পরিচালনার হাত দিয়ে তিনি যে-মননধর্মী কুশলতার স্বাক্ষর রাখলেন, তাতে তাঁকে দাব্যবাহু জানাতে বিধা থাকার কথা নয়।

মধ্য প্রদেশের বস্তার অঞ্চলের আরণ্যক পরিবেশে সেখানকার আদিবাসীদের সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, দেবভীতি যেমন বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনই উক্ত প্রেক্ষাপটে শরয়ে উচ্চ শিক্ষিত যুক্তিবাদী মনের সংঘাতও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে ছবি-

টিতে নাটকীয় স্বাদের বতঃসূর্ত প্রকাশের সংগে সংগে এক পরি-শীলিত রূপ ফুটে ওঠে, যেখানে প্রাথমিক প্রেমের এক মরমী ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এক অনিবার্য পরিণতি পায়। এই পূর্বে প্রকাশিত মুদ্রিত ছবিটিকে বুদ্ধিবীর্ণ করে তোলে ঠিকই, কিন্তু তেমনভাবে হৃদয়ধর্মী করে তুলতে পারে না—পারেনা, কারণ সেখানে বিষয়গত বাধা, যার অপসারণ জটিল আঙ্গিকে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হয়তো আঙ্গিকের সরলীকরণেও তা সম্ভব হোত না—হয়তো কেন মিস্টারই, চলচ্চিত্রকারের উদ্বেগও তা ছিল না।

চলিত পাখি কস্তুরিকে কেন্দ্র করেই দুই বন্ধু অতীত ও প্রাশস্ত এবং প্রাশস্তরী প্রেমীলার মধ্যে যে বন্ধু সংঘাত ক্রমে ক্রমে বিস্তার করে, তার রূপায়ণে পরিচালকের বক্তব্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পষ্টই ফুটে ওঠে।



নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই সি এল / সি সি ডব্লিউ / রেলওয়ে / কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী সংস্থাদ্বারা অর্থায়নিত টিকাদার / সরবরাহকারী / প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে টেগার নং, কাজের নাম এবং নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দফাওয়ারী দরতিত্ত্বিক / পান্ট্রেন্টে ভিত্তিক মূল্য করা টেগার :

পরিবহন ও স্থানান্তরের কাজ

রেফা: নং ৫৮২৭ তারিখ ১০-১২-৮০
২/১ টেনশন থেকে ৪ লক্ষ টন বালি বোম্বাই ও পরিবহন এবং ৬ কি মি দূরত্বের মধ্যে ঘনশস্যের কাছে সেন্ট্রাল ডাম্পে খালাস করার জন্য। এই ধরনের কাজে অতিজ্ঞতা থাকা দরকার এবং তাদের নিজেদের গাড়ি থাকা বাঞ্ছনীয়। কেশিয়ান / এ ও র কাছে প্রতি মেটের জন্য ১০ টাকা (অপ্রত্যাশিতব্যয়) নগদে দিয়ে যে কোন কাজের দিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারের অফিস (সি এম এ্যাও আর) কে কে রোপওয়েজ, পো: কালোরাগ্রাম, জেলা বর্ধমান থেকে টেগার দলিল পাওয়া যাবে। ১৬-১-৮০ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেগার গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ৩:৩০টার খোলা হবে। টেগার খোলার তারিখের ২ (দুই) দিন আগে টেগার দলিল বিক্রয় বন্ধ করা হবে।

স্বাক্ষর: আনুমানিক খরচের ১% বাবদ টাকা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে / ফিলে জমা দিতে হবে। তাকে বিলব হওয়ার দায়িত্ব ইষ্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড গ্রহণ করবে না। পোটাল অর্ডার / ব্যাঙ্ক ড্রাকট / চেক পাঠানো টেগার ফী গ্রহণ করা হবে না। টেগারদাতা অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে টেগার খোলা হবে। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়ে যে কোন টেগার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার অথবা প্রয়োজন হলে কাজ তাগ করে টেগারদাতাদের দ্বারা অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

অরণ্যের আদিম বাসীর গৌড়া বিশ্বাসের ভয়ংকরী প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত মনকেও সমর বিশেষে যেমন হুবল করে ফেলে, মুমূর্ষু বাসীকে অস্বীকার না করেও গ্রী তার বাসীর অবিবাহিত বন্ধুর আকর্ষণকে কোন্ আবেগে স্বীকার না করে থাকতে পারেনা, প্রেমিক বন্ধুও কোন্ অস্ত-জালার বন্ধুগতীর এই প্রেমকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনা—তার চিত্ররূপ মনে গভীর ছাপ ফেললেও, স্বয়ং তা অস্পষ্টই থেকে যায়। প্রাশস্তর অস্বস্তিকে ঘিরে অতিশ ও প্রেমীলার মনে যে অন্ধ-বিশ্বাস ছায়া ফেলছিল, প্রাশস্তর মৃত্যুর সংগে তার কিন্তু অবসান হল। যুক্তিনিষ্ঠ মনেও অসহায় রূপে মুহূর্তে যে-সম্বন্ধে সংসার অল্পপ্রবেশ করে, তা যেন রক্তমাংসের বাস্তবতা নিয়ে হালিস হয়। আসলে যে প্রাশস্তর মৃত্যু অরণ্যদেবতা বাস্কির অভিশাপে নয়, প্রেমীলার জীবনে যে এক বলিষ্ঠ পুরুষের প্রয়োজন—এই ইতিবাচক বক্তব্যই ছবিটি শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্যের সংগে তুলে ধরতে পেরেছে। সংগে সংগে বিশ্বাস, অবিশ্বাস, দোলাচল প্রেমের আকৃতি মানসিক অস্তব্ধ চিত্রধর্মী বাস্তবায়ন ফুটেছেও চমৎকার। তবে বাসীর মৃত্যুর পর প্রেমীলার কলেজে প্রত্যা-বর্তন ও জন্মে অতিশের কাছে পুনরাগমন পর্যায়ে কিছু দৃষ্ট অতিরিক্ত মনে হয়। সম্পাদনার আরও বড় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কে, কে, মহাজনের কটোয়াকী ও আশাহরণ মনে হল না। উত্তর সিংয়ের সংগীত পরিচালনা কিন্তু ছবিটির ‘মুদ্র’ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

এখনও নতুন যে কত সজীব আর নিপুণ, তার উজ্জল পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ‘প্রেমীলা’ চরিত্রের অতিনয়ে। বাসীর প্রতি কর্তব্য, আবাধ্য প্রেমের আকর্ষণ ও বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মনের সংঘাত তাঁর দৃষ্ট অভিনয়ে প্রতিফলিত হয়েছে দারুণ। পটীকিং সাহনীর ‘অতীশ’কেও ভাল লাগে। প্রাশস্তরুণে ত্রিধার লাও হৃদয়তার পরিচয় রেখেছেন। একটি পার্শ্বচরিত্রে দাধু মেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিয়ও দি পসিডন অ্যাডভেঞ্চার

আরউইন অ্যালেন প্রযোজিত ও পরিচালিত ‘বিয়ও দি পসিডন অ্যাডভেঞ্চার’ ছবিটি রহস্য রোমাঞ্চ ও সংঘর্ষে তাত্বেদিক এক শিহরণ আগার সম্বন্ধে নেই। সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাওয়া এক জাহাজের খোলের মধ্যে আটক বাজীঘের উদ্ধার পর্ব চলছে একদিকে, অপরদিকে চলছে জাহাজের চত্ববেশে শত্রুতানের এক ধলের গুপ্ত ধনের সন্ধানে অল্পপ্রবেশ আর চক্রান্ত। শেষে উত্তরণের মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট, হতাহত হল কেউ কেউ। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার কারী দলটি জরী হয়ে বাজীঘের নিয়ে জাহাজটি থেকে বেরিয়ে এল। অ্যাকশন দৃশ্যগুলি চমকপ্রদ। জলের তলার দৃশ্য গ্রহণও প্রশংসনীয়। তবে এ জাতীয় ছবিতে যা হয়ে থাকে—সেই চিন্তা ও যুক্তির একেবারেই বালাই নেই। মাইকেল কেন, জালি ফিল্ড, টেলি স্ত্রাভানাস, পিটার বরল। শালি নাইটও শালি লোন্স প্রভৃতি পিল্লী অভিনয় করেছেন।

ভূমি সংস্কার

৪র্থ পৃষ্ঠার পর বলা যায় না। ভারতে ৪০ লক্ষ একর কৃষি জমি উর্বৃত্ত দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার অংশ হলো, ১১ লক্ষ ৭০ হাজার একর। এর মধ্যে ৬ লক্ষ ১১ হাজার একর বন্টিত হয়েছে লক্ষাধিক ব্যক্তির মধ্যে, যাদের ৫৭ শতাংশ তপশীলি জাতি ও উপজাতিভূক্ত। নীতি-বাসিন্দগণ হয়ত বলবেন খুবই মন্দ গতি, কিন্তু একথা অস্বীকার করতে পারবেন না, ভারতে অল্প যে কোনো রাজ্য থেকে অনেক ভালো।

একটা বিষয় আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে ভূমি সংস্কার কোন বাস্তবও নয়। কৃষি সালসরঞ্জাম, পরিচালনা সাহায্য এবং অন্যান্য সহায়তা না দিলে কৃষকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে না। পশ্চিম বাংলা সরকারের লক্ষ্য হলো, ভূমিসংস্কারের সংগে এইমত বিষয়গুলিকে যুক্ত করা। বহু প্রতি-কূলতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার একাই হাল নিয়ে মাঠে নামতে চাইছেন এটাই আশার কথা।

গণতন্ত্রের অবস্থা

১ম পৃষ্ঠার পর লকল দিনিয়ার আই সি এস অফি-সাররা ডেপুটেশনে আনেন তাঁদের হুম্মীতি ও স্বজনপোষণের দৃষ্টান্তগুলো এঁরা ফাঁস করেন, জনা বায়ো অফি-সারের বিরুদ্ধে ভজন চুরক অতি-যোগ কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশনে পাঠান।

বটনার পেছনে একটু খোজ নেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিনতার ইচ্ছাছায়া আই বিয় ডিরেক্টর ব্রিটিশি তিরাজের আদেশ দিলেন যে, সমিতি করা চলবে না। এসো-নিরেশন এই আদেশের বিরুদ্ধে গত জুলাই মাসে যুক্তী কোর্টে আপীল করলো। আদালত সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল যে, সমিতি করার দ্বারা কার্য বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না। এবং সংগঠন গোটানোর যে আদেশ সরকার দেয় সে প্রসঙ্গে মামলাটি এখনও আদাল-তের বিচারধীন আছে।

এদিকে আই বিয় কর্মচারীদের অস্তাব অভিযোগ নিয়ে সমিতি আন্দোলনে নামার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সচিবের মাধ্যমে খবর পাঠান যে, আলোচনার মাধ্যমে অভিযোগের মীমাংসা করতে। সে অস্থায়ী সমিতি ২ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত আন্দো-লনের কর্মসূচী স্থগিত রাখেন। সর-কার পক্ষের সঙ্গে কর্মচারীদের অবস্থার পর্ববেকপে একটা ‘পেশ্যাল কমিটি’ নিয়োগের আলোচনা চলছিল, এ সময়ই নেমে এল সংগঠনের তিনজন নেতার মাধ্যম হাটাই এর ৭৫য়।

হাটাইয়ের যে নোটিশ ওঁরা পেয়ে-ছেন সেখানে কোন কারণ দেখানো হয়নি। তধু বলা হয়েছে ‘সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারা অস্থায়ী আপনা-দেরকে হাটাই করা হল।’

সমিতি সংগঠন গড়ার দ্বারা এর পূর্বে একাধিকবার সরকারী চাকুরে-দেরকে হাটাই করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডি-নেশন কমিটির তেরোজন নেতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বজ্রজন কর্মচারী সংগঠকে চিঠি দিয়ে বলা হলো, রাজ্যপাল বা কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্ত্রক সংবিধানের ৩১২ (২) (গ) ধারা অস্থ-যায়ী আপনা-দেরকে হাটাই করতে পেরে খুশী বোধ করছেন।

ভারতীয় সংবিধানের সাহায্যে এখানেই যে, ১১ (ক) ধারার সমিতি লুপ্ত করার অধিকার দিয়ে ৩১১ (২) (গ) ধারার পেটে লাথি মারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই আজ গণ আন্দোলনের দাবি হবে, সংবিধান থেকে দানবীর ৩১১ (২) (গ) ধারা বাতিল করে।

শ্রীমতী রাধা পুস্তক পর্ষদ

স্রাতক ও স্রাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ব প্রকাশিত
করেকটি বাংলা বই

- ১। কাস্টের ফর্ম / শ্রীমদবিহারী দাস / ১৫.০০
- ২। লক্ষন তত্ত্ব / ডঃ সুধীরকুমার নন্দী / ২০.০০

৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ফোরার, কলিকাতা-১৩

রিলিয়েন্স জুট মিলে হত্যার নেপথ্য কাহিনী

নলিনী পাল

ব্যারাকপুর মহকুমার জগদল থানার তাটগাড়া এলাকার রিলিয়েন্স জুট মিলে গত ২৮ ডিসেম্বর বে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল, একদিকে যেমন তা মর্যাদাসিক, অপরাধকে মজির-বিহীন। কারণ, এতদিন পর্যন্ত যে মালিক পক্ষ নিজেদের স্বার্থে সি সি আই (এম) প্রভাবিত সি আই টি ইউর শক্তিশালী ইউনিয়নকে এড়িয়ে ই-কংগ্রেস প্রভাবিত আই এন টি ইউ নিয় ইউনিয়নকে মত দিয়েছেন, আজ সেই কংগ্রেসী ইউনিয়নেরই নেতা এবং কর্মীদের একাংশ সেই মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হত্যার বা জব্বার কান্দ করেছে। তাদের হাতেই মালিকপক্ষের “মিজব কর্মচারী” বলে পরিচিত মিলের পার্গোনা ম্যানেজার জীবল মিলের মধ্যেই কর্মরত অবস্থায় খুন হয়েছেন বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ খুন একদিনের উদ্বেগময় হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে মালিকের কাছে “মাই” পেয়ে ঐ সব কংগ্রেসী স্বতন্ত্র মিলের অফিসারদের প্রায় মাথায় চড়ে বসেছিল। উল্লেখযোগ্য, মালিকপক্ষ পুরোপুরি ইন্দিয়া তক্ত।

অথচ, স্বপ্নের পাতায় রিলিয়েন্স জুট মিলে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আই এন টি ইউ সি প্রভাবিত ইউনিয়নের নেতা এবং প্রমিক-কংগ্রেসীরা দফায় দফায় মারপিট এবং অপার ইউনিয়নের কর্মীদের ওপরে যে হামলা করেছে তা অনেক বার প্রকাশিত হয়েছে। ওদের নিজেদের মধ্যে জরুরী অবস্থার আগে যে খুনোখুনি হয়েছে স্বপ্নের পাতায় তাও প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সব প্রকাশিত সংবাদের কোন প্রতিবাদ কিন্তু আজো হয় নি। প্রতিবাদ হতে পারে না। যেহেতু, ও সংবাদ ছিল সবই দৃষ্টি। আদালতের মাফলার মতর দিয়ে ওগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল। একেজো আরো বলা মরকার যে, জীবলের মৃত্যুর ছক একদিনেই তৈরী হয় নি।

২৮শে অক্টোবর থেকেই ঐ ছক তৈরী হয়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, এবছর ২৮শে অক্টোবর বিকেলে আই এন টি ইউ নিয় অফিসে ই ইউনিয়নের নেতৃত্বে বেশ কিছু প্রমিক রিলিয়েন্স জুট

মিলের তেতরের ক্যান্টিনে এবং অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা করে। এতে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়। ওরা সে সময়ে জীবলকে খুন করার জন্য জীবলের ওপরে আঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু, উপস্থিত অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বাবধিসম্পন্ন প্রমিকদের আগ্রাণ চেষ্টায় তিনি তখনকার মত রক্ষা পান। হামলাকারীরা ক্যান্টিনের কাশ-কাউটার থেকেও ৪৪৫৬ টাকা লুট করে।

সংবাদ পেয়ে বহিঃ থানা পুলিশ ছুটে আসে, তবু তাদের মিলের তেতরে চুকতে দেওয়া হয়নি। হামলাকারীরা তেতর থেকে মিল গেটে তাল লাগিয়ে দেয়। এর পরে পুলিশ মিলের সুউচ্চ দেওয়াল টপকে মিলের তেতরে যেতে বাধ্য হয় এবং জীবলকে তখনকার মত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এরপরে পুলিশ ২৮শে অক্টোবরের জগদল থানার ৬৪ নং কেসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ৩০৩, ৩০৪, ৪২৭, ৪৩৭, ৩০৭ এবং ৩০৯ নং ধারার ঐ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করে।

অবশেষে এল ২৮শে ডিসেম্বর। ঐদিন সকাল নাড়ে মটার পরে পার্গোনা ম্যানেজার জীবল যখন মিলের ডাকিং ইউনিট এবং উত্তিং সেকশন যথারীতি পরিদর্শন করছিলেন তখন জে, বাইরের নেতৃত্বে কয়েকজন হামলাকারী প্রমিক জীবলের উপরে আঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থানে গোরক লাউ এবং অন্যান্য নাকি ধারালো অস্ত্র-ঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে বলে অভিযোগ করা হয়। জীবলের তখন মদী ছিলেন মিলের ওভারসিয়ার ক্রিকে ডি পাণ্ডে। তিনি ক্ষত মিলের মেন অফিসে ছুটে যান এবং লোকজন সহ ফিরে এসে দেখেন যে, জীবল রক্তাশ্রুত অবস্থায় ওখানে পড়ে আছেন। অবশেষে জীবলকে বহিঃ ক্ষত কল্যাণীর একটি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়, তথাপি তাঁকে আর একেজো বাঁচানো যায় নি। পথিমধ্যেই তিনি মারা যান।

পুলিশ এ ব্যাপারেও যথারীতি জগদল থানার ২৮শে ডিসেম্বরের ৭৭নং কেসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/১২০ বি ধারায় একটি মামলা রুজু করে “তদন্ত করছে।” পুলিশ জানিয়েছে, ঐ দিনই তাহ-প্রমাণ কইদাস নামে এক প্রমিকের বিরুদ্ধে বেআইনী কাজের অভিযোগ এনে মিল কর্তৃপক্ষ একটি চার্জশীট দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজারী আফালন

২য় পৃষ্ঠার পর

পতি কত বা ব্যহত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে? পতীর দুঃখের এবং বড়ই পরিতাপের বিষয় এই বিধবানী পতিকে কত করায়, বাধা দেওয়ার কোন প্রয়াস এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না বাক্যে বিজ্ঞানমন্ডিত ও ব্যাপক আকারে কার্যকরী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রিল-অর্থনীতির মূল্যবোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মালিকাবীরা এ জাতীয় সংস্কার প্রত্যক্ষভাবে প্রতিহত করার সংবিধানগত অস্বীকার অনস্বীকার। কিন্তু পরোক্ষভাবে জমমত ও জনকটিকে প্রভাবিত করার, বৃহত্তর জনগণকে প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক চেতনার, লম্বাচতাবনার উদ্বুদ্ধ করার কোন বিজ্ঞানমন্ডিত পরিকল্পিত প্রচেষ্টা কি অসম্ভব? বৃহত্তর জনগণের দৃষ্টান্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রত্যাখ্যান মৃত্যুর ভবিষ্যতে হলেও এই আপাত অপ্রতিরোধ্য সাংবিধানিক অস্বীকার হ্র করতে লক্ষ্য। কিন্তু কে বা কারা এই কাজে পরিকল্পিত বিজ্ঞান-মন্ডিত উপায়ে এগিয়ে আসবে? এর একমাত্র উত্তর মিস্টার বৃহত্তর সংগঠিত প্রগতিশীল মার্কসবাদ-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও তাদের মূখপত্রসমূহ। কিন্তু এ বিষয়ে যে হতাশাব্যাক্ত বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে তা হল এই জাতীয় বিকৃত দৃষ্ট ও আফালন নীরবে গভীর ছাড়া উপায় নেই। এই কারণেই এ জাতীয় আনন্দবাজারী দৃষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রতিপক্ষের স্বল্প শক্তিশালী ভিত্তির অবস্থানকে অস্বীকার করে, উপেক্ষা করে নিজের অবস্থানকে উপযুক্তভাবে সূচু করবার বিজ্ঞান-মন্ডিত প্রচেষ্টা না করে কেবল জন-মতের হাজার রবে করতালি প্রাপ্তিতে লুপ্ত থাকলে শত্রুর দৃষ্ট ও কটাক্ষই একমাত্র প্রাপ্য। নেতিবাচক তোটে সীমিত সাংবিধানিক কয়তানহ শাসনময় হস্তগত হওয়া এক কথা ও বুজোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসন-কয়তায় এসে লেনিনের মিহে-শাস-যায়ী এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবকে অস্বীকার ও গতিশীল করার লক্ষ্য প্রচেষ্টা করা অস্ত্র কথা। জনমত ও লক্ষ্য মূল্য-বোধ সৃষ্টিতে সংগঠনকে কিতাবে বিজ্ঞানমন্ডিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কিতাবে প্রতিটি দৃষ্ট-কর্মী ও লম্বককে প্রাথমিক পর্যায়েই মীর মূল আধর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রবুদ্ধ হতে হবে সে বিষয়ে

ব্যাপক পরিকল্পনা ও বাস্তব প্রয়াস না থাকলে যে কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা অসম্ভব। কিন্তু অস্ব-প্রোগামসর্ব্ব, বাইরের মূল মার্কসবাদের সঙ্গে বিস্ম-মাত্র পরিচয় মেই সেই প্রেরণীয় লম্ব-কর্মী-লম্বকদের দ্বারা উপযুক্ত-ভাবে জমমত গঠন ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম কোনটাই সম্ভব নয়। আনন্দবাজারী পোড়ির প্রায় প্রত্যেকেই চেতনা-অবচেতনে, দজ্ঞানে-অজ্ঞানে মীর প্রেরণার্থে তথা জীবন-দর্শন মত্রে উপলব্ধির পথের লম্বক অবস্থিত। কিন্তু বিপরীতে বিরোধী প্রধান মার্কসবাদভিত্তিক দলগুলির সাধারণ কর্মী লম্বকদের কথা বাদ দিলেও এমনকি মধ্যম পর্যায়ের তথাকথিত মেতৃমাদীররাও নিজ মূল আধর্শ ও তাদের সঙ্গে পরিচয়হীন মিডিকার প্রেরণীয়। তাই তথাকথিত মার্কসবাদী তারেকম্বরে মামত করেন, অজুগীয়েতে দৌতাগ্য-যায়ী প্রস্তরবণ্ডে বিধানী। এঁদের মার্কসবাদের বিকৃত, প্রতিদ্রুত রূপ ভয়াবহ। চেতনার মূলই এই ব-বিরোধিতাপূর্ণ নৈমিত্তিকুলের সাহায্যে সংগ্রাম ঘোষণার পূর্বে এই দলের মেতৃমাদীরদের লম্বক্রে অস্বরোধ করি নিজ সংগঠনের প্রকৃত তত্ত্ব ও আধর্শগত শক্তি লকারে মনোনিবেশ করতে। কারণ কোন মার্কসবাদী দলের প্রকৃত শক্তি মিহিত-মুগ্ধ থাকে মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের উপলব্ধিতে—অস্ব-আত্মগতাসর্ব্ব গোড়া কতাজ্ঞা প্রেরণীয় লম্ব-কর্মী লম্বকদের কেবলমাত্র সংখ্যা বা পরিমাণগত পরিমাপে শক্তি মিত্রপিত হয়না। গুণহীন পরিমাণই কোন মার্কসবাদী দলের বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা বা তুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান মার্কসবাদে বিধানী দলগুলির বৈশিষ্ট্য বলা যায়। ইন্দিয়া কংগ্রেস বা জমতা দলে এই প্রেরণীয় লম্ব-কর্মী-লম্বকদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকলেও থাকতে পারে কারণ এঁদের কোন অস্ব-লম্ব-দর্শন-অর্থনীতি-স মাজ বিজ্ঞান-লম্ব-ভিত্তি-মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নেই। কথিক ও সাময়িক পরিমিত ও প্রয়োজনে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবারের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে উপজীব্য করে এই গুরুত্ববাদের বেশে এঁদের আবি-র্ভাব। কিন্তু মার্কসবাদ এ ধরনের কোন অবৈজ্ঞানিক আবির্ভাব নয়—তা পরিপূর্ণ ও সাময়িক বিজ্ঞান। হুতরাং এই দলে বতদিন না পরি-মাণের সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্যতার ও

গুণের ও গুরুত্ব দেওয়া হবে ততদিন এই দল উপযুক্ত ও লম্বকভাবে আনন্দবাজারী প্রেরণীয় প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবেন। শূন্যগত হত্যার নিদানের, বিমিশ্রিত কুটবে এই জাতীয় চ্যালেঞ্জ, উপহাস, বিদ্রোহ, কটাক্ষ। এই লম্বকদের অধিকাংশই শাসনকয়তা হস্তগত হলেই ভাসমান পত্রাশির মত বিপরীত প্রোভে ভেলে বাবে কারণ এঁদের মূল আধর্শ বা তত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে কোন যোগই নেই। কিন্তু সেদিনও আনন্দবাজারী মিজ কংগ্রেস ও ধর্ম আভকের মতই অবিচল থাকবে।

প্রমোদবাবুর দল বতক্ষণ না কোনটা প্রকৃত তত্ত্বাধ্যায়ী যোগ্যের গঠনমূলক সমালোচনা ও কোনটা মিডিকার প্রেরণীয় লম্বকদের অস্ব-আত্মগত ও ভাবকতা বিলম্ব করতেন পারবে ততক্ষণ কোন মার্কসবাদী দল প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী হতে পারবেনা। আর এই শক্তি অর্জন না করলে বরুণ সেনগুপ্তের মত অতি সাধারণ যেধার ব্যক্তি প্রমোদবাবুর মত ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস পাবেন।

দলের কর্মসূচী যে মার্কসবাদের তত্ত্বের উদ্দেশ্যে রচিত তথা যে বৃহ-তত্ত্বের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল সে লম্বক প্রত্যেকের নিজ নিজ পরি-পতন (maturation) অহমারে লম্বক উপলব্ধি না থাকলে বিকৃতি ও প্রতিদ্রুত অস্বীকার পরিণতি। তৃতীয় প্রেরণীয় মেধা, লম্বকীর্ণ গোড়ামী ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রোগাম-লম্বক লম্বকীর্ণ স্বার্থাঘেবী কর্মীকুল তথা সৈন্তবাহিনীর সাহায্যে তার পরিমাণ ও আকারগত গুরুত্ব বাই হকনা কেন আনন্দবাজারের স্বল্প-অবস্থান থেকে প্রকৃষ্ট চ্যালেঞ্জ-এক গ্রহণ করে অস্থানচ্যুত করা কোন-দিনই সম্ভব নয়। প্রমোদবাবু, সয়োজবাবু মত শীর্ষ লম্বক এক-উপলব্ধি করবেন ততই দেশের মজল। কারণ দেশকে লক্ষ্য নেতৃত্ব দেবার একমাত্র সম্ভাবনা মার্কস-বাদেই আছে।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৩১ নং মট সেন, কলিকাতা-১০

সম্পাদক—হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাৰ্যালয় ৩১, মট সেন, কলিকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত।

দপন

স্বরবিংশ বর্ষ । ৪৮শ সংখ্যা । শুক্রবার ৯ই জানুয়ারী '৮১ । ৬০ পৃষ্ঠা

গণি খানের সঙ্গে প্রিয় মুন্সীর গোপন বৈঠক



সম্প্রতি ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে রাজ্য আর্স কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয় দাসমুন্সীর এক গোপন বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৈঠকটি বসে গত ৩১শে ডিসেম্বর কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে। প্রায় চল্লিশ মিনিট স্থায়ী এই গোপন বৈঠকে বরকত সাহেব এবং প্রিয় দাসমুন্সী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা ভোলা সেন।

হঠাৎ প্রিয়র সঙ্গে বরকত সাহেবের এই বৈঠক নিয়ে রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহা কলহা শুরু হয়ে গেছে। অনেকই মনে করছেন প্রিয় বোধহয় এবার ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢুকে পড়বেন।

বিষয় সূত্রে জানা গেছে বরকত-প্রিয় বৈঠকে প্রিয় ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদানের দাবীনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রিয় নাকি এখন ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার ব্যাপারে খুব একটা অনাগ্রহী নন।

বেশ কিছুদিন ধরে প্রিয় তার রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করেছেন। সাত্তান্তর পালের পর প্রিয় ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোন বক্তব্য রাখেন না। শুধু তাই নয় রাজ্যের বামফ্রন্ট পরকায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের তু্যদ্যকাকে প্রিয় এবং তার দল মোটামুটি সমর্থনই করছেন।

ইন্দিরা কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে প্রিয় সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইন্দিরার সঙ্গে দাকাতের সময় প্রিয় তার মত পরিবর্তনের কথা ইন্দিরাগান্ধীকে জানান এবং বলেন যে, “আপনি চাইলে আমি আবার আপনার দলে যোগ দিতে পারি।”

আরও জানা গেছে যে, শ্রীমতী গান্ধীর কাছে প্রিয় পশ্চিমবঙ্গে

বরকত সাহেবের বনিষ্ট সূত্রে জানা গেছে প্রিয় এখন দলবলে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার উদ্ভ্র প্রস্তুত। তবে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার আগে প্রিয় আশঙ্ক হতে চান তাঁকে এবং তাঁর সমর্থকদের দলের মধ্যে উপস্থিত মর্ষাধা দেওয়া হবে। বিশেষ করে প্রবীণ ভট্টাচার্য, স্ববীণ ব্যানার্জী, কুমুদ ভট্টাচার্য, নবীরা রায় প্রমুখদের সংগঠনের কোন কোন দাবি হেওয়া হবে এ ব্যাপারেও প্রিয় আগাম আশঙ্ক হতে চান।

প্রিয় বরকত সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করেছেন যে, প্রুনি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ব্যাপক একাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট তথা দি পি এমতে গোবা ঘটন হবে।

বরকত সাহেব সাংগঠনিক ব্যাপারে প্রিয়র সমস্ত বক্তব্যই শুনেছেন। কিন্তু প্রিয়কে দলে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানোরও তাকে কোন রকম আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হননি। বরকত সাহেব বলেছেন সব সুনসান দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্তান্ত নেতাদের সঙ্গে কথা বলব। তার আগে আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে প্রিয়কে নাকি বরকত সাহেব মাকে মাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

রাজ্যে রাজ্যে ই-কংগ্রেসীদের কোঁদলে ইন্দিরার মহা দুশ্চিন্তা

বিভিন্ন রাজ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের উপস্থলীর কোঁদল এখন তুলে। অধিকাংশ রাজ্যেই বিদ্রোহী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়েছে এবং নানন-তপ্তে অধিষ্ঠিত গোষ্ঠীকে কমতা-চূড় করতে চাইছে। এই পরি-স্থিতি এবং এর ফলে পার্টির মধ্যে বে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দিয়েছে তাতে ই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারণ এই অবস্থা চলতে থাকলে রাজ্য প্রশাসনে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কী করে বিদ্রোহমান গোষ্ঠীর মধ্য শান্তি স্থাপন করবেন? ধাত্যব্যব কমতালোভী অর্থলোভী ই-কংগ্রেসীদের সংযত করার চেষ্টা বোধহয় এতদূরেই বিজয়ও সহজসাধ্য কাজ।

মধ্যপ্রদেশে অর্জুন সিংয়ের বিরোধিতায় নেমেছে তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দী গোষ্ঠী যাহেরু আহমদত দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতি। এবং এই

দুই মন্ত্রী অর্জুন সিংকে চাপ দিচ্ছেন তাঁদের অমুগামীদের নানা স্ববিধা দেবার জন্য। ফলে সিং সাহেব দুই পক্ষের টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত।

কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী ওয়ু রাও বড়ই বেকায়দার পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। মন্ত্রিসভা থেকে স্বর্ষিও তিনি তার প্রতিদ্বন্দী বঙ্গরাজাকে বিচ্যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, বিদ্রোহীরা তাতে জোর চ্যালেঞ্জের নমুনা বয়েছেন। কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী—বার মদে ওয়ু রাওয়ের চির-শত্রু হাঙ্গল—মুখ্যমন্ত্রীর পথ আরও কট পাকীর্ণ করতে বিদ্রোহ বাঙ্গালো উড়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীর নামে লিখিত পদত্যাগপত্র দিল্লীতে প্রধা, মন্ত্রীরা তাতে পেশ করে বঙ্গ-রাজা কর্ণাটকের পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রোকে অবহিত করেন। বঙ্গরাজা বলেছেন, কর্ণাটকে যা ঘটছে প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে তাঁকে নিজের থাকতে বলেন নি। যদিও দিল্লীতে সংবাদটিতে, কাছে বঙ্গরাজা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে মুখ খোলেন নি, তবে তাঁর হাবকাবে মনে হয় যে, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ওয়ু রাওকে স্বস্থিতে থাকতে দেবেন না।

রাজস্থানে ই-কংগ্রেসী রাজনীতি ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠছে। ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীমতী গান্ধী মুখ্য-মন্ত্রী অগরাধ পাহাড়িয়াকে ডেকে ধমক দেন। পাহাড়িয়া প্রধান-মন্ত্রীর ঘর থেকে মুখের-বে চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন তাতেই একথা বোকা গেল। রাজস্থানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত হাত বলা হয়েছিল। শেবাংশ চম পঠায়

চটকল মালিকদের নেপথ্য চক্রান্ত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ঝটিকা সরকারের প্রাকালে এ রাজ্যের চটকলের মালিকরা একটি বিশেষ সভা করে চটকলে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী বা পার্গোনাল ম্যানেজারদের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। ব্যারাকপুর মহকুমার ভাটপাড়ার রিলারেল জুট মিলে সম্প্রতি ঐ মিলের পার্গোনাল ম্যানেজার শ্রীমতী এম বলেন হত্যাকাণ্ডের পরেই তাঁরা ঐ দাবী জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকালে বণিকদের এক সমাবেশে চটকল

মালিকদের ঐ দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। এক ভড়ুত ব্যাপার। সম্পূর্ণ অপ্রতিকল্পিত ঘটনা।

কিন্তু, একেজে প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি যে, চটকল মালিকরা বা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হত্যাকারীদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করছেন না কেন? স্বপ্নের পাতায় আমরা তো পুলিশের সমস্ত রিপোর্ট তুলে ধরেছি। আমরা জানি, মালিকরা এবার বিপাকে পড়েছেন। কারণ, তাঁরা তেবেছিলেন যে, এ ব্যাপারে দি পি আই (এম)-কে জড়ানো যাবে। কিন্তু

তা সম্ভব হয়নি। তাতেই তাঁরা এবার বড় বেকায়দার পড়েছেন।

আমরা জানি, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা পুলিশও (এম আই বি) শ্রীমতীর হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট বখাপময়ে নরা-দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে-ছেন এবং তাতেও হত্যাকারী কারা পরিচয় উদ্ভেদ আছে। ঐ রিপোর্টটা যেখানেই প্রধানমন্ত্রী সব কিছু জানতে পারবেন।

প্রথমত বলা দরকার, প্রথের হেমন্ত বহু এবং কংগ্রেস এম এল এ মেপাল রায় এবং বামবপুর্ন বিশ্ববিদ্যা-শেবাংশ চম পঠায়

সম্পাদকীয়

সুবিধাভোগী শ্রেণীর আত্মনাদ

বাম ফ্রন্ট সরকার গ্রামের মানুষ-
দের চিকিৎসার জন্য তিন বছরের
লক্ষিণ মেডিকেল শিক্ষাক্রম চালু
করার ইতিয়ান মেডিকেল এগো-
নিমেশন প্রকল্পে। এই শিক্ষাক্রম
যাতে চালু না হয় তার জন্য তারা
বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু
এদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে
বামফ্রন্ট সরকার নতুন করে এই
পরিকল্পনা কার্যকর করতে অগ্রসর
হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থার সুপারিশে ঐতিহ্যেই মহা-
রাষ্ট্র সরকার ও উত্তরপ্রদেশে এই
লক্ষিণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

আই এম এর কেন এই আপত্তি ?
কারণ এই পরিকল্পনার নাকি কিছু
হাতুড়ে ডাক্তার তৈরি হবে। কিন্তু
আমল আপত্তি হল এইখানে যে,
চিকিৎসা বিভাগে বচ্ছল পরিবারের
কার্যসীমার স্বার্থে কবল থেকে মুক্ত
করা হচ্ছে এবং গ্রামের গরীব মানুষও
নাধারণ অল্প-চিকিৎসিত হবার
সুযোগ পাচ্ছে বাম ফ্রন্ট সরকারের
নয়া ব্যৱস্থায়। আর যদি তিন
বছরের শিক্ষাক্রমে হাতুড়ে ডাক্তার
তৈরি হয় তো হোক। তথাকথিত
এম বি বি এস ডাক্তাররা যখন গ্রামে
পহুঁচি দিতে চান না তখন হাতুড়ে
ডাক্তাররাই গ্রামের গরীব মানুষের
কাছে বসবাস করবে। বড় বড় বিশেষজ্ঞদের
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ
তাঁদের অনেকেই একশ্রেণীর কালো-
বাজারী এবং আঁকড় ফাঁকির কার-
বাহী, কিন্তু সাধারণ চিকিৎসক ও
হাউস ষ্টাফ ইনটার্নরা তাঁদের সেবা-
পরায়ণ পেশা সম্পর্কে কতটুকু
দেখেন? আর পাঁচটা পেশার মতই
তাঁরা একে অর্ধদলী পেশা বলে মনে
করেন এবং যেন তেন প্রকারে অর্ধ
রোজগারই এঁদের লক্ষ্য। তাঁরা
আসেন সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে।
তরুণ চিকিৎসকদের লক্ষ্য থাকে কি
করে বিশেষ পাড়ি দেবে এবং এই-
ভাবে ৩০ শতাংশ বিশেষ চলে যান।
যারা বিশেষে যাবার সুযোগ পান না
তাঁরা শহরেই থাকতে চান এবং
প্রথমত কলকাতা শহরেই। এই
অবস্থায় গ্রামের মানুষরা কি যুগ যুগ
ধরে বিনা চিকিৎসার মরবে? আরও
একটা প্রশ্ন, এম বি বি এস
ডাক্তারদের হাতে কি চিকিৎসা
বিভাগে বটেমাত্র অথবা বিশেষজ্ঞরা কি
তুল চিকিৎসা করে রোগীর মৃত্যু
ঘটান না?

যেখানে আছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট

সরকার যে কোন ক্ষেত্রে সামান্যতম
পরিবর্তন আনতে চাইলেই অমনি
সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোকদের
চীৎকার শুরু হয়ে বাজে আর দুটি
বাংলা বৈদিক মুখের আছে এদের
বক্তব্য দাড়াইয়ে প্রচার করে জনগণকে
বিস্মিত করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের
সহজ পার্থের পালা দাদ হতে না
হতেই কিছু তথাকথিত জামী ওদী ও
বিধান ব্যক্তি ইংরেজীর জন্য নাকি-
কান্না শুরু করেছেন।

বাম ফ্রন্ট সরকারের কী পেরতর
অজ্ঞান! প্রাথমিক শিক্ষা থেকে
ইংরেজী তুলে দেওয়া হচ্ছে। দাদ
তৈরির মূল ভিত্তিতে নতুন করে
দেওয়া হচ্ছে। এই বিধান জামী
ওদীরা তুলে দাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে
উপযুক্তভাবে মাতৃভাষা শেখা শিশুর
অগ্রগতি অধিকার এবং তার ওপর
জবরদস্তি করে একটি বিদেশী ভাষা
চাপালে মাতৃভাষা শিক্ষা ব্যাহত
হবে। মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন,
শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন নৈরাজ্য চলছিল,
যখন গণটোকাটুকি চলছিল, যখন
হাউস হোটেলে বোমার কারখানা
তৈরি হয়েছিল তখন কি এঁরা
কোন প্রতিবাদ করেন নি। আমরা
আরো বলি, যখন বিধান সারের
রাজত্ব লতিকা সেনরা রাজপথে
পুলিশের গুলিতে মারা যান, যখন
১৯৭১ সালের খাদ আন্দোলনে ৮১
জন লোক পুলিশের লাঠি পেটা ও
গুলিতে মারা যান, যখন ১৯৬৬
সালের খাদ আন্দোলনে সারা
পশ্চিমবঙ্গ জলছিল তখন এই বিধান
জামী ওদীরা কি জলটুকি ধরে
আত্মপোষণ করেছিলেন? যখন
পুলিশ মকশাল যুবকদের বেপরোয়া
গুলি করে মারছিল তখনই বা
এঁদের কণ্ঠ নীরব ছিল কেন? আসলে
এঁদের সঙ্গে দেশের কিছা সাধারণ
মানুষের স্বার্থের কোন যোগ নেই।
আত্মপোষণ ও শ্রেণীস্বার্থেই এঁদের
লাঞ্ছন তাই প্রচালিত ব্যবস্থার সামান্য
কোন পরিবর্তন আনতে চাইলেও
এই সুবিধাভোগী শ্রেণী “গেল গেল”
রব তোলে। কিন্তু দরকাজে
যদি আমূল পরিবর্তন ঘটান সম্ভাবনা
যেখা দেয় কোনদিন তখন এঁরা
কী করবেন? আত্মহত্যা, না দেশ
থেকে পলায়ন?

গণতন্ত্রের অবস্থা

আসামে টেইকেন হিসাবে প্রেস সেন্সরশিপ চালু হল

আসামের আন্দোলনের মোকা-
বিলায় কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে
‘উপকৃত অফিস’ বোষণা করে কীকে
কীকে দৈনিক পাঠিয়েছে আর কীকে
কীকে বন্ধ এল এ কিনেছে। এক-
বছর আগে আসামে ১৯৮০ দশক
বিপ্লবী বিধানসভার কং (ই)র মাজ
আটকন মদ্য ছিলেন। ৪৪ জন এম
এল একে শ্রীমতী গান্ধী কিনেছেন।
গত ৬ ডিসেম্বর শ্রীমতী আনোয়ারা
তৈমুরের নেতৃত্বে কং (ই) মন্ত্রিসভা
আসামে গরীতে বসেছে। আসামকে
ঠাণ্ডা করতে নয়া তৈমুরলঙ্কা তু-
লাঠি গুলি-দৈনিক নয়, ২৩ ডিসেম্বর
থেকে করেছে প্রেস সেন্সরশিপ।
আসামের কাগজগুলো এখন বেরুচ্ছে
বটে, তবে নেই অকরী অবস্থার
নয়নের মতো অনেকটা দাড়া, কীকা
পূর্ণ। কারণ তথ্য ও প্রচার দপ্তরের
আমলারা কাঁচি চালাচ্ছেন। আসাম
‘বন্ধ’-এর ধবন, আসামের কাগজে
বেচ হয়নি।

আসাম ট্রিবিউন ও দৈনিক অগম
পত্রিকা দুটোর মালিক ‘আসাম
ট্রিবিউন গ্রুপ অফ নিউজপেপারস’,
আসাম সাংবাদিক সমিতি,
২ জুলাই ১৯৮১ গোহাটি হাই-
কোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে
বিশেষ ক্ষমতা (সংবাদপত্র
সংক্রান্ত) ১৯৮০ আইনটি চালু
করার জন্য মামলা করে। কেন্দ্রীয়
সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার
এ আইনী ক্ষমতার প্রয়োগে সংবাদ-
পত্র সমূহে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে।
গোহাটি হাইকোর্টের ভিত্তিগত বেঞ্চ
৬ জুলাই আসাম সরকারকে নির্দেশ
দিয়েছে যে পি টি আই ও ইউ এম
আই প্রেরিত রিপোর্ট স্বাধীন প্রকাশ
করা যেতে পারে যদি না রাজ্য তথ্য
অধিকর্তা উক্ত সংবাদ অনুমোদন
নকশে কতকগুলি মনে করেন।
আদালত নির্দিষ্ট সংবাদ বাতিলের
কারণ লিখিতভাবে নির্দিষ্ট পত্রিকাকে
জানাতে তথ্য অধিকর্তাকে আদেশ
করেছেন। আদালত আসাম
ট্রিবিউন ও অগম দৈনিক-এর
মালিককে আসাম আন্দোলন
সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করতে
নির্দেশ দিয়েছেন। মজার ব্যাপার
হল, পি টি আই ও ইউ এম আই
প্রেরিত সংবাদ সারা দেশের হাজার
হাজার বিভিন্ন ভাষার কাগজে ছাপা
হচ্ছে আর গোহাটিতে সেন্সর হচ্ছে।
সরকারী মহলের বক্তব্য হল,
আসামের উক্ত দুটি কাগজ বর্তমান

আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে।
এর মানে হল, এরপর ‘নাগপুর
টাইমস’ মালিকের কৃষক আন্দোলনের
সমর্থনে, মাজাজের, ‘দি হিন্দু’
তামিলনাড়ুর কৃষক আন্দোলনের
নেতা নারায়ণ স্বামীকে গ্রেপ্তারের
প্রতিবাদে রিপোর্ট ছাপলে সেন্সর
সেন্সর করা হবে, মানে নিয়ন্ত্রণ করা
হবে। ব্যাপারটা তাই, কং(ই) হল
আসামে এই প্রেস সেন্সরের ব্যাপার-
টাকে ‘টেইকেন’ হিসেবে দেখছে।
পরীক্ষাগারে পিনিপিনের প্রতিক্রিয়া
দেখে অস্ত্র বা সারাদেশে আগামী
দিনে চালু হবে। আর যারা যাদের
কাগজ বাঁটাবাঁটা করেন, তাঁরা
জানেন যে, কে, কে, বিড়ম্বার ‘হিন্দু-
হান টাইমস’ ছাড়া দেশের বড়
কাগজগুলোও শ্রীমতী গান্ধীর রাষ্ট্র-
পতি ঘোচের সরকার গড়ার ইচ্ছে
সমর্থন করেনি। এরকমপন্থে পুলি-
শিদের গোষ্ঠীত্ব। এ কারণেই
শ্রীমতী গান্ধীর সরকার সংবাদপত্রের
স্বাধীনতা হানতে চান না। এডিটরস
গিল্ডের মতো সংস্থাও বুর্জোয়া রাষ্ট্র
কাঠামোর কোর্স এগেট সন্দর্ভে শ্রীমতী
গান্ধীর মনোভাবে আশঙ্কা প্রকাশ
করেছে। প্রেস কাউন্সিলের চেয়ার-
ম্যান বিচারপতি এ, এন, গোস্বামীর
সেন্সর চাপানোর প্রতিবাদ
করেছেন।

আসামে প্রেস সেন্সরের
ব্যাপারটা কাগজ পড়ার মতো মনে
এলেও অমোকেই একটা খবর জানেন
না যে, গত ১৭ জুন কেন্দ্রীয় সরকার
এক নির্দেশে জৈনক স্বাধীনতা
সংগ্রামী লেখা ‘আসামে গণতন্ত্র
ধর্মিত’ শীর্ষক একটা বই বেআইনী
করেছে। তুখ আসামকে নিয়ে
হলেও আমরা না হয় একটু অত-
চিন্তা করতাম, কিন্তু অত রাজ্যের
ঘটনাবলীতেও তো কং(ই) হল
সংবাদপত্রকে তর দেখিয়েছে।

মনে নেই, বালাজোরের ডেকান
হেরাল্ড ও মেথানকার ইতিয়ান এক-
প্রেস সংকল্পে কর্ণটকের মুখ্যমন্ত্রী
গুণ্ডাও প্রসঙ্গে ধবন প্রকাশের
প্রতিক্রিয়া? মুখ্যমন্ত্রী জনতার হাতে
চড় বেলেম, কাগজ পড়ের দিন প্রথম
সংবাদ হিসেবে তা প্রকাশ করলো।
অমনি পরের দিন ২২ সেপ্টেম্বর যুব
কংগ্রেস (ই) জুভারা এসে কাগজ
অকিলে হামলা করলো, বোমাও করে
রাখলো। ওড়িশার বি রি ডিতে
সাংবাদিক বনকিশোর মহাপাত্র
স্বাধীন কিছু বুলোকে কার্যকলাপ

নিরে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। রক
ই-কংগ্রেস সভাপতি সহ আরো
কয়েকজন ঐ দলের গুণী রাজার
ফেলে শ্রীমহাপাত্রকে সারধোর
করলো, ও তাঁর জী ছবিরাণীকে ধর্ষণ
করে খুব করলো।

২১ আগস্ট ’৮০ নয়াদিল্লীতে
অনুষ্ঠিত সারাতারত সংবাদপত্র সম্পা-
দক সম্মেলনের ২০তম অধিবেশনে
সংবাদপত্রের উপর বিভিন্ন মহলের
চাপের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
২৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে
প্রেস কাউন্সিল জানায় যে, লক্ষ্য
থেকে প্রকাশিত ‘চরিত্র বিকাশ’
পত্রিকার সম্পাদকের অভিযোগ সভ্য
যে, রাজনৈতিক কারণে ই-কং রাজ্য
সরকার ঐ পত্রিকাকে উত্তরপ্রদেশ
রাজ্য বিদ্যায় পূর্ববঙ্গের বিজ্ঞাপন দেয়
নি। ইতিয়ান কেডারেশন অফ
ওরাকিং জার্মালিস্টস অ্যান্ড জার্মাল
ইউনিয়নের রাজধান শাখা ২১
সেপ্টেম্বর ’৮০ এক সভায় বলেন, ঐ
রাজ্যের দুটি হিন্দী বৈদিকের বিজ্ঞা-
পন রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কারণে
বন্ধ করে দিয়েছে।

আর্গ কংগ্রেস নেতা মহেশ্বর ইউ-
জুন সালেম ২৭ সেপ্টেম্বর এক
বিবৃতিতে ‘হাকুম’ ও ‘দেহাত’ নামক
দুটো উচ্চ মাধ্যমিকের প্রকাশনা
বন্ধ করে দেওয়ার দ্বিতীয় প্রশাসক
অগমোহনের স্বেচ্ছাচারের নিন্দে
করেন। ইষ্টার্ন নিউজপেপার
সোসাইটির ৪১ অধিবেশনে (১৪
অক্টোবর ’৮০) সভাপতি শ্রীশান্তিনাথ
শাহ অভিযোগ করেন যে, সম্প্রতি
হারজাবাদের একটি ভেলেগ পাবলিক
পত্রিকার সম্পাদককে দাতার টেনে
এনে মারধোর করা হয়েছে।

এই হল শ্রীমতী গান্ধীর শাসনে
সংবাদপত্রের অবস্থা। আসামের
প্রেস সেন্সরশিপ চালু করার বিরুদ্ধে
কাগজে প্রতিবাদ হয়েছে। চাই
দক্ষিণ প্রতিবাদ। কলকাতার
সাংবাদিকরা পালেকার টাইবুতাল
নিরে সভা-মিছিল করেছেন। এ
ব্যাপারেও সাংবাদিক-অসাংবাদিকরা
মোপান তুলন ‘মানবো না এ বন্ধনে,
মানবো না এ শৃঙ্খলে।’ সাংবাদিক
বহুগণ, মনে রাখবেন, শ্রীমতী গান্ধী
আপনার উপর অনন্ত, নববর্ষের
প্রথম দিনেই তিনি বলেছেন, ‘সংবাদ-
পত্র প্রকৃত ছবি ছাপানো হচ্ছে
না।’

দেশ কাল রাজনীতি

ইন্দিরা গান্ধীর হরেক রকম

ভারতপুত্র

অল্প সময়ের ভিত্তি পশ্চিমবঙ্গে এনে প্রধানমন্ত্রী, বিজয় কথা বলে ফেলেছেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তার প্রবক্তা ভাষণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কিছু কথা তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং কিছু কথা ই-কংগ্রেস প্রধান হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। মোটের ওপর, রাজ্যের বাম ফ্রন্ট সরকারের প্রতি তার রোষ প্রধানমন্ত্রী গোপন করেননি তার পেছনে কারণ বাই থাকুক না কেন। একই ব্যক্তির হাতে দুটো দায়িত্বপূর্ণ পদ থাকলে তাতে সুবিধা অসুবিধা; শত্রুকে যেমন ছড়িক থেকে আক্রমণ করা যায়, তেমনি দুমুখো কথা বলেও পার পাওয়া যায়। কিন্তু এতে অসুবিধা হল, দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন উক্তি করলে উভয় পক্ষেরই অস্বার্থী হয়ে। শ্রীমতী গান্ধীর কথাবার্তা কোন প্রতীক, তা প্রোভা-পাঠক-দেরই বিচার্য।

তবে পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে অভিযোগ করে এবং বাম ফ্রন্ট সরকারকে হিংসাজনিত ঘটনা রূপে শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনার উপদেশ দিয়ে যে কথাগুলো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তা কি আসলে আস্ত-প্রত্যক্ষ পর্দার ভেতর দিয়ে পড়েনি? কংগ্রেস-ই শাসিত রাজ্যগুলোর তুলনায় বাম ফ্রন্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো তোকা। উত্তর-প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র কর্ণাটক বিহার ওড়িশা আসাম অন্ধ্রপ্রদেশে ইন্দিরা সরকার কেমন আইন ও শৃঙ্খলা কিংবা সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ বিধান করছেন? প্রকাশ্যে বিবাক্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রহরীর হাতে মারীর ইচ্ছা লুপ্ত হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে বাম বাম দহন হয়েছে যে রাজ্য সে উত্তরপ্রদেশের শাসনভার কোন হলের হাতে? বিচারার্থী বন্দীদের তাগলপূর জেলে অধ করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কার শাসন? নাৎসিবাদের পরী ছবিরাণীকে ধর্ষণ ও খুন করা হল ওড়িশায়। জে বি নারায়ণ কোন দলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রী? বিশেষের মহারাজ মূল্যে দাবিতে লং মার্চ হল মহারাষ্ট্রে। সেখানকার পুলিশের গুলিতে মারা যায় দুজন কৃষক। গ্রেপ্তার করা হয় দুজন হাজার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী

আজকের রাজনৈতিক দলগত পরিচয় কী, প্রধানমন্ত্রীর মনে পড়তে তো? আসামে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে আরো দুজন; শ্রীমতী তাইমুর বে শ্রীমতী গান্ধীরই মগোড়—তা কি প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেছেন? ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকার যে সমস্ত রাজ্যে রয়েছে তার প্রতিটিতেই চলছে অরাজকতা, নিরাপত্তা সেখানে বেপাক্ত। পশ্চিম বঙ্গে হিংসা রুখে হলে তো ই-কংগ্রেসের পায়ে আগুন লাগে হাত দিতে হয়। কিন্তু তখন প্রধানমন্ত্রী আবার 'গেল' 'গেল' সব তুলবেন না তো? সে সব কথা প্রধানমন্ত্রীর ভালোই জামা রয়েছে; কিন্তু তা নিয়েও তাকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিরাট সম্ভাব্য করতে হয়েছে কখনো ফিরে পাবার জন্য মরিয়া রাজ্য কংগ্রেস ই নেতাদের খুশি করার তাগিদে। একই তাত্ত্বিক তিনি দেশের সর্বত্র সি পি আই-এমের আন্দোলনে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। শান্তি পূর্ণ আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকার বধন শ্রীমতী গান্ধী এখনো কিছুটা অবশিষ্ট রেখেছেন তখন তার জন্য তাকে তো তৈরী থাকতে হবে। বিশেষতঃ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একাগ্রচিত্তে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকার বদলে আন্দোলনের পথে প্রমিত কৃষক কর্মচারীদের ঠেলে দেবার রাজ্য ইন্দিরা সরকারই হো প্রস্তুত করে রেখেছেন। শ্রীমতী গান্ধী আর একবার এ-রাজ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে, বাম ফ্রন্ট সরকারকে তিনি ফেলে দেবেন না। নিজের ক্ষমতা জাহির করা ছাড়া এ-ঘোষণার অস্ত কোন মার্ককতা ছিল কি? সেই সঙ্গে তিনি কখনই কোন সরকারকে তেড়ে দেননি বলে উক্তি করে শ্রীমতী গান্ধী অহেতুক লোক হানিরেছেন। নিজেকে বিজয়ের পাখী করেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের স্বত্বাধিকার, তিনি যতটা কামনা করেন, ততটা দুর্বল নয়। তিনি গর্হিত বসেই টপাটপ ন'টা সরকারকে অকালে গ্রাস না করতেন, তবে আজ নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ফেলার প্রশংসাবাদিকেরা তার কাছে তুলতেন না। আসলে সরকার ফেলে দিলেও তার দলের পশ্চিমবঙ্গে বিরাট সরকার গঠনের ক্ষমতা নেই বুঝেই ইন্দিরা গান্ধী লাধু সাজতে চেষ্টা করেছেন। বকেরা যেমন চোখ বুজে থেকে মাছ শিকার করে ধর্ম পালে।

উদ্বৈগজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক ভাব্যকার

আশির দশকের দ্বিতীয় বছর শুরু। গোড়াতেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হ'শিরার করে দিচ্ছেন, একাধি মাসে বাজেট বাটতির বহর বেড়ে যাবে। কতটা বাড়বে তা অবশ্য অজ্ঞাত। কিন্তু বৃদ্ধিসম্মত অর্থমন্ত্রী, ৪০০০ কোটি ছাপিয়ে যাবে। ১৯৮০-৮১ সালের বাজেটের অঙ্কিত বাটতির প্রায় আড়াই গুন। কোন সরকারের পক্ষেই এই রকম পরিস্থিতি উদ্বৈগজনক না হয়ে পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাটতি ৪২০০ কোটি টাকা হবে বলে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। সুতরাং কয়েক বছর স্বল্পিত কটানোর পর আবার আমাদের বিদেশী মুদ্রার দরদানে ইতিউতি ধরণী দিতে হবে। গত বছরের বাজেটে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে ৫৪০ কোটি টাকা ধার করে বাজেটে বাটতির পরিমাণ কম করে দেখানো হয়েছিল। এই আন্তর্জাতিক ঋণ কেন্দ্রীয় বাজেটের অঙ্গভুক্ত করা স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি বলে অনেকেই মনে করেন নি। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বা শাসকদল তাদের আপত্তিতে কান দেন নি। আত্ম অবস্থা বেগতিক। কারণ বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বিকাশমুখী দেশগুলির উপর যে সব শর্ত চাপাচ্ছে তা পূরণ করতে হলে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিতে হয়। পরিণামে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও নিতান্ত আন্তর্জাতিক বিশ্বের পরিণত হয়। যেমন বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার মূলত আমেরিকা জাপান ও ইউরোপের ধনীদেশগুলির কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। মাসে বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক হ'লেও, কার্যতঃ এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কয়েকটি ধনী দেশের,—বিশেষতঃ আমেরিকা আর জাতীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। আপেক্ষিক দিনের মত বর্তমান হুনিয়ার লরাসরি ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ সম্ভব হয় না। বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত সরকারকে স্থানীয় অসন্তুষ্ট শক্তিগুলির মাধ্যমে অপসারিত করার একটা কার্যদীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। চিলির ঘটনার পর এখন সেটাও কঠিন হয়ে পড়েছে। আকগানিহান বা কম্পুচয়্য ওভাবে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি। ইরানেও নয়। সুতরাং আজকাল প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি নতুন কার্যদা নিয়েছে। তারা ক্রমাগত আরো বেশি পরিমাণে

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং তাদের সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে অপারেশন চালাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এখন বিভিন্ন বিকাশমুখী দেশের আমদানী ও রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরামর্শ চাপ দিচ্ছে। ভারত-সহ বিভিন্ন বিকাশমুখী দেশ যাতে সম্ভাব্যে কাঁচামাল ও অন্যান্য পণ্য ইউরোপ আমেরিকার রপ্তানী করে এবং আন্তর্জাতিক অনটনের অজুহাতে এই সব দেশ থেকে পণ্য আমদানী বৃদ্ধি করে তার ক্ষেত্রে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। এখনই কোন বিকাশমুখী দেশ বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছে বাণিজ্য বাটতি বা অন্য কোন সাময়িক প্রয়োজনে ঋণ প্রার্থী হয় তখনই তাদের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চাহিদা এবং রপ্তানীযোগ্য উৎপাদনের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে



বিচারিত তথ্য জানাতে হয়। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মাধ্যমে ঐ জাতীয় তথ্যগুলি আমেরিকা, ইউরোপের হাতে চলে যায়। তখন তারা আবার ঐ দুটি সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রার্থী দেশগুলির কাছে এমন সব শর্ত হাজির করে যা কোন স্বাধীন, আত্মস্বার্থী সম্পন্ন দেশ যেনে নিতে পারে না। যেমন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার তৈল আমদানী বাবদ বাড়তি ধরনের দরপ বহির্বাণিজ্যে বাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত তহবিল যোগানোর সুবিধা দেয় তার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতা দেশে প্রমিত কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী কমানোর শর্ত জুড়ে দেয়।

গত বছর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে মুক্ত বাৎসরিক অধিবেশনে জ্যামাইকার অর্থমন্ত্রী এই শর্তের উল্লেখ করে জানান যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে ঐ অতিরিক্ত সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে তাদের শর্তসত্তা জ্যামাইকা যে সকল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয় তার ফলে ১৯৭৮ সালে প্রমিত কর্মচারীদের প্রকৃত মজুরী ৩৫ শতাংশ কমে যায় এবং ১৯৭৯ সালে আরো ১০ শতাংশ কমে যায়। তিনি প্রশ্ন করেন কোন সভ্য গণতান্ত্রিক ধনী দেশে এরকম ব্যবস্থা নিলে ঐ দেশের কার একদিনও ফি টিকে থাকতে পারতো?

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থমন্ত্রী গোপন শর্ত কটকিত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করে কোন উদ্বেগ সাধন করেছেন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাওয়া দরকার। রপ্তানী বৃদ্ধি ও কালতির পেছনে এবং আমদানী নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে কোন গোপন শর্ত বিচার্য করছে দেশের মানুষকে তা জানতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট দেশবাসী সৃষ্টি করেন নি। তারা কলে কারখানায়, কেতে খামারে, অফিস আদালতে অবিরত যে প্রমিত করে চলেছেন তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা উচিত নয়, নীতিমত নয়। সংকট বাদেই নীতির ফলে হয়, সংকটের গুণাগুণ তাদেরই দিতে হবে। ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ ফল অতীত হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণের কৌশল আজও সমান প্রাচুর্যে অব্যাহত। বৃজ্জীয়া জমিদার শাসক দল এই সংকট সৃষ্টি করে। তাদের প্রতীকী এই সংকটকে গভীর থেকে গভীর তর করে। সুতরাং নীতি বদল না হলে অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবেলা করা যায় না।

আর ভেকটরমণ শুধু নয়, তার ও তার দলের প্রধান মুকবী দেশের একচেটে কোটিপতি ও ভূমিপতির দল এই সংকটের দায় জনসাধারণের ওপর চাপাতে চায়। রপ্তানী সংকট আমদানী সংকট, টাকার মূল্য হ্রাস, স্বদেশীয় হার বৃদ্ধি; বাজেট বাটতি, তত্ত্বকি এসবই তাদের দেশবিরোধী নীতির পরিণাম। দেশবাসীকে এর ক্ষেত্রে দায়ী করা অথবা সংকটের গুণাগুণ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার দেউলিয়া নীতি আরো গ্রহণযোগ্য নয়।

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

- বার্ষিক ৩০ টাকা
- ষাণ্মাসিক ১৫ টাকা
- ত্রৈমাসিক ৭.৫০ টাকা
- টাকাকড়ি ও চিঠি
- পাঠাবার ঠিকানা
- ম্যানেজার, দর্পণ
- ৩১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩

মতামত

মধুসূদন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ?

গত ২৮শে নভেম্বর বর্ণনামূলক নির্মল সাহাচার জগতের আমার বক্তব্য প্রকাশিত হবার পর গত ১১শে ডিসেম্বর বর্ণনামূলক নির্মল সাহাচার আমার আমার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। অল্পত ব্যাপার, নির্মলবাবু আমার বিতর্কিত প্রবন্ধের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবার মধুকবির 'মেঘনাধ বধ' কাব্য প্রসঙ্গে এসে মধুকবির বিপ্লবী ধারার লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে স্পষ্ট তই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

'মেঘনাধ বধ' আমার আলোচ্য বিষয় ছিল না। সেই হেতু সে ব্যাপারে নির্মলবাবুর জবাব দেওয়ার মূলতঃ কোন দায় আমার থাকে না। কিন্তু যেহেতু তিনি মধু সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্যকে সামনে রেখে 'মেঘনাধ বধ' প্রসঙ্গে এসেছেন, সেই হেতু সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি।

নির্মলবাবুর মেঘনাধকে তিতু-কাছ সিধু-মল্লিক পাণ্ডুর প্রতিভা হিসেবে কল্পনা করার ব্যাপারটাকে আমি চরম হঠকারিতা বলেছিলাম। আর জ্ঞান তিনি অগ্রসর, এবং 'মধুর রাজনীতি' কখনও এই বক্তব্যের লক্ষ্যে অবস্থান মেননি বরং বিপ্লবীত অবস্থানের সাহিত্যিক দাবির রেখেছিলেন। মমকালীন কৃষক-বিদ্রোহ-গুলোর সময় বলেছি বলে তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি 'মধুই একমাত্র বুদ্ধিজীবী' নাহয়, তিনি ইংরেজেরই ভাবার কাব্যিক রূপে বলে উঠেছেন—Where is porus, পুরু কোথায় যে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণপণ যুগবে? জাতীয় বক্তব্য হাজির করে আসলে মধুকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

এবার আমার বক্তব্যগুলোকে এক এক করে রাখছি : (১) প্রাগৈতিহাসিকভাবে মধুসূদন ছিলেন জমিদার। পিতার মৃত্যুর পর বজ্রার্গের সহযোগিতার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সামলানো-মোকদ্দমার জয়লাভ করে তিনি তৎকালীন বাজারে ১৫০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক অবস্থানের দিক থেকে তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'ের স্বরূপ সম্পর্কে স্বাধীন উপলব্ধিতে এসেই এই সম্পর্কে নিরুচ্যর থেকে এই বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছিলেন। সামসোহম, বিভাগাগর, বজ্রহরা এ বন্দোবস্তকে সমর্থন করে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি পূর্ব আনুগত্যের নজির রেখেছিলেন। মধুসূদনও এই

বন্দোবস্তের বিরোধিতা না করার মধ্যে দিয়ে নিজের প্রাগৈতিহাসিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা স্পষ্টতই ইংরেজ শক্তিকে সহায়তা দিয়েছে। ১৮৪৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে এই বন্দোবস্তের সমালোচনা করেছিলেন। অল্পত বক্ত এই বন্দোবস্ত-স্বত্ব জমাদারদের বিরোধিতা করেছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রও এই প্রকার বিরোধিতা করেছিলেন। অল্পত মধু এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস নিবিকার।

(২) ১৮৫৫-তে যখন সাওতাল বিদ্রোহের মতো ব্রিটিশ বিরোধী গৌরবময় কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হচ্ছে, যখন 'স্বত্ব ও অব ইতিহাস' পত্রিকা এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে পাটীগাম হয়ে লরাসরি এই বিদ্রোহকে নিষ্ঠুরভাবে হুমের মিথস্ক্রিয়া পরামর্শ দিচ্ছে ব্রিটিশ সরকারকে, তখন মধুকবির কৃষিকাটা কি ছিল? তিনিও তো তখন মাদ্রাজ শহরের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'স্পেকট্রেটর' এর সহ-সম্পাদক। এ সময় তো তাঁর কৃষিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত। তিনি স্বতাবতই তখন সাওতাল বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ অত্যাচারের ব্যাপারটা জানতেন। অল্পত তিনি সে সময়ও আত্মবিশ্বাস নিবিকার। সে সময় এ ঘটনা যে তাঁর মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি তা তাঁর তৎকালীন সাময়িক স্বস্তির কথা উচ্চস্বরের সঙ্গে বন্ধুকে চিঠিতে লেখার মধ্যেই নিহিত।

(৩) ১৮৫৭-তে যখন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তখন মধুসূদন কলকাতার পুলিশ কোর্টের চাকরীতে দিম্বাপন করছেন এবং এসময়ই লিখছেন 'শরিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' 'মেঘনাধ বধ' ইত্যাদি, আর সঙ্গে এই বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নেই। ১৮৫৮-তে 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ করে ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন।

(৪) ১৮৬০ এ যখন মীলচাষীদের সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে, এবং এই আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম মর জেমে যখন বাঙালার অনাথ্য বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনে দামিল হয়েছিলেন সু্যতঃ এই আন্দোলনকে একটা পাইরে ঘেবার আন্দোলনকে রূপ দিয়ে ব্রিটিশ রাজ-শক্তিকে অল্পত রাখার রাজনীতিকে

সামনে এনে তখনও মধুসূদন একই নিবিকার কৃষিকার মিসল। অল্পত 'মীলচাষদের ইংরেজী ভাষান্তর' করলেও (যার জন্য তিনি অল্পতই প্রশংসার) তা কখনই তাঁর লেখকত্ব মানসিকতার প্রকাশ নয় বরংই বাহ্যিক। মমকালীন সময়ে বহুল প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত ইংরেজী জানা ব্যক্তি হিসেবেই তিনি একাধে ব্রতী হয়েছিলেন।

(৫) মধুর লবচাইতে উল্লেখ্য সাহিত্যিক দাবির যে চেষ্টা প্রহসনকে, কিন্তু, আর একটাতে তিনি অত্যাচারী জমিদারী সম্প্রদায়ের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন, অত্যাচারিতার বিষয় যে তিনি নিজেই পরে এই প্রহসনময় প্রকাশ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ছিলেন। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? জমিদারী-অত্যাচারের ও সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা প্রকাশ করে ব্রিটিশ চিন্তাশক্তির সাময়িকতার বিরোধী যে কাজ করে ফেলেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া করেছিলেন এইভাবে। নয় কি? তিনি এরপর লেখেন যে 'এই প্রহসনের বদলে তাঁর চিরায়ত নাটক লেখা উচিত ছিল, যে চিরায়ত নাটকের উদাহরণ তাঁরই ভাষার 'শরিষ্ঠা'। মধু-মানসিকতার আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট মনেত-মতা এখানে।

(৬) 'হিন্দু পেট্রিফট'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব বিভাগাগরের অগ্ররোধে ফেলতে না পারলেও, এবং এরকম সম্পাদকীয় লেখার জন্য প্রতিশ্রুত হওয়া লক্ষ্যে মিস্রক পারিশ্রমিক না পাওয়ার (৭) অল্পত 'পেট্রিফট'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁতে করেন। 'আমলে 'পেট্রিফট'র মতো সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

(৭) ২০.২।১৮৬১ তারিখে মধুসূদন এক বাঙালী বক্তার লরাসরি স্বীকার করেন যে, যদিও ব্রহ্মেশ্বর উপকার করা মানবজাতির ধর্ম তবু তাঁর দ্বারা 'যে এদেশের তাদৃশ কোন কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক ইহা একান্ত অনাবশ্যকীয়'। মীলবিদ্রোহের ঠিক পরপরই এ বক্তব্য লক্ষ্যীয়।

এবং (৮) মধুসূদন কন্নড়ী বিপ্লব-বাহীরা বিরুদ্ধবাহী ছিলেন।

সুতরাং উদাহরণের আভিধান্য না ঘটিলেও বোধকরি প্রমাণ করা গেল যে মধুসাহিত্য মমকালীন কৃষক বিদ্রোহগুলির বিপ্লবীত অবস্থান নিয়েছিল, যে কৃষক বিদ্রোহগুলোকে সমর্থন করার ওপরই দাঁড়িয়েছিল মমকালীন সময়ে প্রগতির অবস্থান। আর স্পষ্টতই এই বিদ্রোহগুলোর বিপ্লবীত অবস্থান উন্মোচিত করেছিল ব্রিটিশ নিবিকার।

নির্মলবাবুর 'where is Porus'

পুরু কোথায় যে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রাণপণ যুগবে?—এ বক্তব্যও দাঁড়ায় না। কেননা King Porus—A Legend of old নামক বক্তব্য কবিতাটি লেখা হয়েছিল মধুকবির বিশেষ বয়সে। তাকে প্রতীকিকরণের মাধ্যমে নির্মলবাবুর উচ্ছলিত হবার ব্যাপারটাও পরবর্তীকালে মধুসূদনের পরিপক্ব প্রাগৈতিহাসিকতার রাজনীতিতে আলগা হয়ে যায়। তাই মমকালীন বন্দোবস্তপ্রাধিকারের 'স্বাধীনতা' হীনতার কে বাচিতে চায় যে, কে বাচিতে চায়?—এর মতো উদ্ভীপিত লাইনও মধুকবির মনে রেখাপাত করে না, রেখাপাত করে না ঈশ্বর গুপ্তের 'স্বাধীনতার জন্তে' উচ্ছলিত কিছু ব্যঙ্গাত্মক লাইনও। তাছাড়া মধুসূদনের প্রায় সব প্রবন্ধেই প্রথম লক্ষ্যের 'মদ্রাজ ধনী' সাহিত্য-সুসঙ্গীত' অর্থে মূল্যিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন বহু জমিদার তাঁকে রীতিমতো আর্থিক সহায়তা দিতেন। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক হিসেবে মধুসূদন ধনী-জমিদারদের ও ধনী-জমিদারী মধুসূদনকে লক্ষ্যিতাবেই

ভারতে ইংরাজ শাসন এবং মধুসূদন ও বিভাগাগর

উৎপল দত্ত তথা সি-এল-টির 'দাঁড়াও পথিকবর' সমালোচনার সময় বন্দোবস্তপ্রাধিকার মধুসূদন-পর্বকে বলেছেন 'খণ্ডিত, অপূর্ণ'; আবার খণ্ডিত এবং অসত্য হওয়া লক্ষ্যেও বিভাগাগর-এর লক্ষ্যে 'স্বন্দর ফুটেছে' বলে প্রশংসা করেছেন। নির্ভীক, স্পষ্টবাক্য ঈশ্বরগুপ্তের একটা চাপা ইংরেজ বিরোধী, স্বাধীনতা-কারী কৃষিকা ছিলো,—ঈশ্বরের এই অমৈতিহাসিক আবিষ্কারটিকে নির্ভীক-চারে যেমন নেওড়াটাও মমকালীন-চমার পরিপন্থী বলে মনে করি। নাটকের মায়—'দাঁড়াও পথিকবর', অল্পত মধুর শব্দভাষাই নেই। কবির শব্দভাষাকালে বিভাগাগরের অল্পত-স্থিতির কথা ভেবেই কি এই ব্যবস্থা?

দেশের চারদিকে যখন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যমযম কৃষক বিদ্রোহ, আর সেই পরিবেশের স্বীকৃতিতেই জন্ম নিচ্ছে 'মেঘনাধ বধ', মীলচাষ, বুড়ো শালিকের বাড়ে রোঁ, তখন ইংরেজ সম্পর্কে উচ্ছলিত হয়ে বিভাগাগর লিখছেন : 'সর্বাপেক্ষে এ দেশের ঈশ্বরিক সাধনই তাহাজের রাজ্যাধিকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।' মধুসূদন কিন্তু ইংরেজের মাঝে প্রীক-রাজ আলেকজান্ডার থেকে স্বাধীনতার নির্মমতার শক্ত আবিষ্কার করে লেখেন হাজার ছাড়ছেন—Where is Porus? অল্পতিকে তিতুমীরের বাঁশের কেলাটাকে পূর্বত উপেক্ষা

চিনে প্রাগৈতিহাসিক নির্মমতার রেখে-ছিলেন। ১৮৬১ সালে অর্থাৎ মীল-বিদ্রোহের পরপরই তাঁর 'ব্রজাঙ্গন কাব্য' আসলে তাঁর 'জয়দেব' এর কৃষ্ণলীলা-সহরী প্রভৃতি কীর্তনের সবিশেষ পক্ষপাত-কেই প্রকাশ করেছে। মেঘনাধ বধ যদি 'সাওতাল নিপাহী' আদির বিদ্রোহের পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ১৮৬০ এর মীলবিদ্রোহের শেষ না হতেই 'ব্রজাঙ্গন কাব্য' কোন পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে সে জবাব দেবার দায় কি নির্মলবাবুর থেকে যায় না? একই সঙ্গে 'মেঘনাধ বধে' মধুসূদন বিপ্লবী এবং 'ব্রজাঙ্গন'র বৈকল্য?

পরিণেবে বলি, পত্রাকারে এ আলোচনা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন প্রবন্ধের, এখানে আর অবকাশ নেই। নির্মলবাবু আমাকে উপদেশ দিয়েছেন 'মধুকে অবধা-তেতো করবেন না', আর তাঁকে আমার অগ্ররোধ মধুকে বিপ্লবী বানাবার হঠকারী প্রয়াস নিয়ে মধুকে অবধা বিতর্কিত করবেন না।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

করে বাঙালার ইতিহাসে বিভাগাগর লিখেছেন—এদেশে 'চিরস্থায়ী' লর্ড বেকিঙ্গের আমলে 'এক দিবসের জন্তও শক্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই।... তাঁহার অধিকার-কাল কেবল প্রাচ্য-বিদেশের ঈশ্বরিক কল্লিত হইয়া-ছিল।' মদ্রাজ পাণ্ডুর মতো ব্রহ্মেশী নিপাহীদের শাসনভা করতে আগত ইংরেজ সেনাদের অবস্থানের জন্য বিদ্রোহানের পবিজতা শিকের তুলে লক্ষ্যত কল্লিত-প্রাণ নিবিকারেই তিনি ছেড়ে দিলেন। এই বিভাগাগরেরই উৎসাহে লেখা এক নাটকের বিধবা নারিকা বলে উঠলো : 'লাগর মহাশয়ের ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।... যখন এই বিধবা-বিবাহে উদ্যোগ হতেছিলো, প্রায় সেই সময় ছুট নিমকহারাম সিপাইগণ বাহারা এত বছর অবধি সন্তান-সন্ততির ভার রাজ্যেতে প্রতিপালিত হইল, তাহার একেবারে রাজ্য নিবার আশায় রাজ-বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।... এখন চির-ছুঃখিনী বিধবা যে আমরা, আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা লতত তগবান-চন্দের নিকট এই প্রার্থনা করি, যেম তিনি আমাদের মহারানীকে জয় করেন, আর ছুট সিপাইগণকে নিপায় করিয়া দেশে কুশল ঘেন।' কী বিভীষণী মিলজতা তাবুন!

স্বতাবতই বিভাগাগর Companion of the Order of the শেবাংশ ১ম পৃষ্ঠায়

পাঠ্যপুস্তকে চলচ্চিত্র কেন নয় ?

গুরুদাস ভট্টাচার্য

মান কয়েক আগে মতাজিৎ রায় বাবুপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় চলচ্চিত্রকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন। 'দর্পণ' ২৩.১০ সংখ্যায় (২৮ মার্চ ৮০) শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন "পাঠ্যপুস্তকে চলচ্চিত্র কেন" শিরোনামে। মতাজিৎ বাবু কী কী যুক্তি দিয়েছিলেন, তা আমার জানা নেই, প্রয়োজন নেই, কারণ তাকে সমর্থন বা অসমর্থন করা আমার আপাত-উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার নিজস্ব বক্তব্য পেশ করতে চাই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের শৃংখলিত বাক্যোক্তির বিপরীতে। সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে প্রদর্শিত যেহেতু নবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিলম্বিত উদ্ভবের ও তার মূল্য সীমাহীন বলেই বিশ্বাস করি।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র পড়ানোর প্রস্তাবটিকে সমরবাবুর "মনে হয়, আকস্মিক ও অব্যবহািক প্রস্তুত"। তিনি না জানতে পারেন, কিন্তু প্রস্তাবটি চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমাবধি বিনিষ্ঠভাবে জড়িত। ও নিয়ে প্রচুর লেখালেখি (এমনকি 'দর্পণেও'), আলোচনা (এমনকি আকাশবাণীতেও) হয়েছে, গড়ে উঠেছে এক এক এস আই-এর তাত্ত্বিক পক্ষ 'ফিল্ম স্টাডী গ্রুপ'। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অজান্তে-বেগে সংশ্লিষ্ট আমিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম, এবং সুবীজ্ঞতারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের 'চলচ্চিত্র পাঠ্যক্রমকে পঞ্চপতি ভট্টাচার্য এবং আমি এই পথেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। তখন হয়ত এদব কিছুই হয় না; কিন্তু ১৯৭০ পর্বত এটাই ছিল ইতিহাস। অর্থাৎ এক দশক পরে তার পুনরুত্থান—বিনিই করুন—'আকস্মিক বা অব্যবহািক প্রস্তুত' আদৌ নয়।

বলা বাহুল্য, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি একমত যে, চলচ্চিত্র একটি জীবন্ত প্রয়োগবিজ্ঞা এবং অজুত মিনি আকারের পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম ইনস্টিটিউট একটা না থাকলে চলচ্চিত্রে শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হতে পারে না। মতাজিৎ-মুখাল স্বত্বিক যে যুগে আবিস্কৃত হয়েছিলেন এবং যে বিরল প্রতিভা দিয়ে, সে-জ্ঞান এখনি আর নেই, সে-কমতাও না। এবং এও স্বীকার যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্বাঞ্চলে 'বিত্তীয় পুণা' গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও অত্যন্ত। আমার বক্তব্য: ঠিক এই কারণেই, চলচ্চিত্র-শিক্ষার নেই বলেই কি বিভারতনে চলচ্চিত্র-

পাঠ আরও বেশি করে জরুরী হয়ে পড়ে নি? আমার আরও বক্তব্য: চলচ্চিত্র-শিক্ষার, একটা কেন, একাধিক থাকলেও শিক্ষারতনে অজান্তে-বেগে চলচ্চিত্রেরও পঠন-পাঠন অতি প্রয়োজনীয় পূর্বা-চীন শিক্ষার খাতিরেই। নাটক যদি 'পড়ানো' যেতে পারে, চলচ্চিত্র- 'পাঠ' নয় কেন?

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে কাহিনী ও তথ্যচিত্র ছাড়াও শিক্ষা-মূলক ছবি এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ছবি ব্যবহার সর্বজনীন। এগুলো দেখানোর পুরোদস্তুর ব্যবস্থা আছে শুধু আকাঙ্ক্ষমী বা ইনস্টিটিউটে নয়, খোদ বিদ্যালয়তনে, অজান্তে-বেগে সংগে, প্রাইমারী স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত। 'চলচ্চিত্রের পড়া-শোনা'ও হয় সাহিত্যের নাটকের আটের বিজ্ঞানের ইতিহাসের সমাজ-

তত্ত্বের ক্রাশে ক্রাশে। ইংলেণ্ডে এই রকম একটি কোর্সে ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের রেকার্ডেন্স হিসেবে মতাজিৎ রায়ের 'অপূর সংসার' অজুতম "টেক-নট, বুক।" এইভাবে, বিদ্যালয়তনে আপন-আপন অ্যাকাডেমিক ডি-প্লিমেন্ট সংগে সংগে চলচ্চিত্রের নির্মাণ বর্ষন শুধু নয়, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, জ্ঞান ও রুচির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, নিছক ফিল্ম ইনস্টিটিউটে তা অসম্ভব। চারপাশের জানাচেনা জীবন ও জগৎ নিয়ে, নানান বাস্তব ঘটনা ও রুচি নিয়ে ছেলেবেলা থেকেই স্কুলে ছবি তৈরি করা, দেখা এবং / অথবা পড়াশোনা এইই মধ্যে দিয়ে ঘটে ওঠে ভবিষ্য-তের চলচ্চিত্রকার, সমালোচক এবং দর্শক, তাদের দেশ ও সমাজচেতনা, রুচি ও জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। নিছক ছবিকর শেখার চেয়েও এটা

জরুরী; যেহেতু, সমরবাবু যে প্রস্তা-পার কথা বলেছেন—"দেশের বহুবিধ অরিপর্ভ লমস্যা রয়েছে। সে সম্পর্কে শিল্পী কথা বলবেন, সাধারণকে সঠিক দৃষ্টিকোণে লক্ষ্য করে তুলবেন"—একমাত্র তখনই তা পূরণ হতে পারে, বস্তুর-বা ওঠে (এমনকি বিত্ত কমানিশ্রীল ছবিও, যেমন 'পড়কা-হার'), তা দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করে দেশের মানুষ। আর, এই শিক্ষা না থাকলে কী হয়? পুস্তক সমরবাবুর ভাবতেই বলি: "মতাজিৎ রায় শিল্পী, কিন্তু তিনি কতখানি সমাজচেতন ও দেশচেতন, তাতে সন্দেহের বশেষ অবকাশ আছে"—অর্থাৎ, এক বিরাট প্রতিভার মূলেই বিরাট ধামতি। ঠিক একই কারণে, মূখাল সেম তৈরি করে চলেছেন রাজনৈতিক রোমান্স। এবং তাৎ-মৌলিকতা ও গণমুখিতা সন্দে-স্বত্বিক ষটক ডিসিমিলিও হতে পার-লেন না কোনদিন। তবু, বাঙ্গালীর অহংক্রত ইতিহাস যেটুকু, এঁরাই করেছেন। কিন্তু তারপর-১২ আগের 'দর্পণে' সমরবাবু নিজেই তার বর্ণনা

দিয়েছেন: "কিন্তু তারপর? প্রত্যাব-গেল কোথায় হারিয়ে? নবতরু-বেনোজলের চোরা ঘুঁতে কোথায় গেল মিলিয়ে?" (স্মৃতি সত্য তবিসাং)। এর পটভূমিকার রয়েছে বাস্তব কার্যকারণসমূহ, শিক্ষাব্যবস্থার গলদ, শুধুই ফিল্ম ইনস্টিটিউটের অভাব নয়। তা যদি হত, একা পুণাই বোঝাই ছবির চেহারা-চরিত্র বদলে দিত এতদিনে।

সমরবাবুর আপত্তির আর একটি কারণ "শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে পুরো-পুরি নৈরাশ্য চলছে, সেখানে আবার একটি নতুন পাঠ্যপুস্তক 'চলচ্চিত্র'র অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব নিতান্ত অবাস্তব বলেই মনে হবে।" নৈরাশ্য কোথায় নেই? তাই বলে কি কাজ কোথাও বন্ধ আছে? কবে স্বরাজ্য আসবে, তার প্রতীকার হাত-পা গুটিয়ে ব'লে থাকতে হবে? যে অপসংস্কৃতির প্রমত্ত জোয়ারে বর্তমান কলকাতার পথবাট ভাঙছে, তাতেই হাবুডুবু খেতে হবে? বারপাহী শেবাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার

ব্যানার্জী-গুহ মজুমদার চক্র এন টি সি ধ্বংস করছে

শেষপর্বত এন, টি, সি পূর্বাঞ্চল শাখার চেয়ারম্যান বাস্তবযু সলিল ব্যানার্জীর ডানা কেটে দেওয়া হয়েছে। ক্রয় বিক্রয় এবং কারিগরী সংক্রান্ত বিভাগের পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হু'জব সর্বকণের জগৎ নিযুক্ত ডাইরেক্টরের উপর।

বাকী শুধু এখন বিদ্যে হওয়ার। তারও বোধহয় বিশেষ ঘেরী নেই। ইতিমধ্যেই বিহার সরকারের শির-মন্ত্রী ব্যানার্জীর অপসারণ দাবী করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছেন। গত ২১শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পাটনার গেলে বিহার সরকার তাঁদের বক্তব্য পরি-কার করে বলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীতো অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ব্যানার্জীকে এন, টি, সি তে রাখা চলবে না। স্বতরাং ব্যানার্জী এখন বড় বেকার-দার। আসল মধু হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন বাকীটুকুও না যায়।

গদী সামলাতে ব্যানার্জী চার-দিকে দৌড়দৌড়ি শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কলকাতার এলে তো কথাই নেই। মন্ত্রী মহোদয়কে চাঁদবদন দেখাতে নিমন্ত্রণ ছাড়াই চোরের মত ঢুকে পড়ছেন সেই সব দতাসমিতিতে যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষণ দেওয়ার কথা। কয়েকদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারদের এমন একটা সভায় ঢুকতে গিয়ে সান্তানাবুও হয়েছেন খুব। কী লজ্জা!

কিন্তু লজ্জাতো নারীর কৃপণ। পুস্তকনির্মে ব্যানার্জীও লজ্জা স্বপার ধার ধারেন না। উনি এখন নরা উদ্যমে নরা দোস্ত খোঁজার ব্যস্ত। পেরেও-ছেন একজন। ইনি আর কেউ নন, ব্যাপক দুর্নীতির দ্বারে দ্বার বিকছে তরঙ্গ সম্পূর্ণ করে সি, বি, আই ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং বাকি অর্থ সংক্রান্ত কোন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হবেনা বলে সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে ইনি পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের সেই কৃপাত আই, এ, এম অফিসার শ্রীচন্দ্রগন গুহ মজুমদার।

বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার শ্রীগুহ মজুমদার, বিনি সম্প্রতি প্রেসি-ডেন্সি ডিভিশনে বদলী হয়েছেন, হু-বছর আগে এন, টি, সি পূর্বাঞ্চল শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু চলে যাবার পরও তিনি এন, টি, সি কে ভুলতে পারছেন না। এত মধু ফেলে চুঁচুড়ার শুকনো 'ডুপে-হাউসে' তাঁর মন ধরছিল না কিছু-তেই। তাই তিনি বর্তমান চেয়ার-ম্যান অপদার্থ সলিল ব্যানার্জীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কিছু করুণা লোটার।

শ্রীগুহ মজুমদার আর শ্রীব্যানার্জীর মধ্যে দৌড়োয় কাল করেন 'বুড়ো-খোকা' এম, এল, চ্যাটার্জী। শ্রীচ্যাটার্জীকে রাইটাং বিল্ডিং দ থেকে তুলে এনে লোয়ার ডিভিশনম কেন্দ্রীয় থেকে এনিটেট ম্যানেজার (পারচেজ) পদে বসিয়ে-

ছিলেন শ্রীগুহমজুমদার। 'স্বযোগ্য-মহাকারী, শ্রীচ্যাটার্জী 'বাবু' মনো-রঞ্জে ক্রটি রাখেননি।

শ্রীচ্যাটার্জী একজন গুণধর ব্যক্তি। সর্বগুণে গুণনিধিই বলা যায়। হোম ডিপার্টমেন্টের বিরাট অফিসার সেরে উনি শিরালদহ থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত রোজ বাতায়ত করেন। তাঁর বিকছে মাজ উজমখানেক সি, বি, আই কেস আছে। একবার দাপেওও হয়ে-ছিলেন।

মাজ কয়েকমাস শ্রীচ্যাটার্জী বেকারদার ছিলেন শ্রীগুহ মজুমদার চলে যাবার পরে। বর্ণের দরজা আবার খুলে গেল শ্রীব্যানার্জী চেয়ারম্যান হয়ে আসার। রতনে রতন চেমে! শ্রী ব্যানার্জী ও শ্রীচ্যাটার্জীর মাধ্যমে যোগাযোগ করলেন শ্রীগুহ মজুমদারের সঙ্গে। রাজঘোটক আর কি।

শ্রীগুহমজুমদারও এই স্বযোগটাই খুঁজছিলেন। উনি এই তালে বাজারে ছাড়লেন যে উনি এন, টি, সি হোল্ডিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়ে আসছেন। স্বতরাং কিছু এলেক্ট-আর ধামাঝাল কিছু অফিসারও সঙ্গে জিড়ে গেল। প্রয়োজনীয় টনিকের ব্যবস্থা গাফা রাখলেন শ্রীচ্যাটার্জী।

চলছিল তা মই। কিন্তু বাধ সাধলেন নতুন হুই সর্বকণের ডাই-রেকটর। বিশেষ করে নতুন কারি-গরী অধিকর্তা খুব জাঁদরেল লোক। তিনি বিশেষ দক্ষ এবং কারিগরী জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর হাতে

শ্রীব্যানার্জীর সব ধামাঝাল ধরা পড়ে গেল। সবাই জানতে পারলো শ্রীব্যানার্জীর কাজ-কারবার।

নতুন কারিগরী অধিকর্তাকে শারেকা করতে ব্যানার্জী-গুহমজুমদার চক্র নানান কুৎসা রটনা শুরু করলেন। অ কি সারদের নির্দেশ দেওয়া হল কারিগরী অধিকর্তার সঙ্গে সহযোগিতা না করার। জেনা-রেল ম্যানেজার (পারচেজ) শ্রীঅজিত মজুমদারকে পাঠানো হল কারিগরী উপদেষ্টা করে। তাঁর কাজ কারিগরী অধিকর্তার সব দল পরিকল্পনা বান-চাল করা। শ্রীমজুমদার শ্রীব্যানা-র্জীকে খেলার টিকিট জোগাড় করে দেন আর বিশেষ এক স্ট্যাটে ব্যককা করেন ব্যানার্জী-গুহ মজুমদার মিলনের।

ব্যানার্জী-গুহমজুমদার চক্রের নতুন বস্ত্র বস্ত্রী নোদপূর-পরা কটন মিলের চীক এক দিকি উটিত অফিসার।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সন্ধ্যায় টাউট শ্রীএম, এল, চ্যাটার্জী সম্পূর্ণ বেসামান অবস্থায় ওই অফিসারটির বাড়ী গিয়ে একটা চির-কুট দিয়ে আসেন। চিরকুটে লেখা ছিল: 'চেয়ারম্যান আপনাকে অনতিবিলম্বে শ্রীগুহমজুমদারের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

বাড়ী ফিরে চিরকুটটি পেয়ে অফিসারটি জড়িত। তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার মননিত একজন শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠার

মাদক বজ্রনের অভিনব পথ

ভারত ভোগরা

মাদক দ্রব্য বর্জন আইন সাধা-
রণভাবে লক্ষ্য হয়নি। মস্তপানের
বিরুদ্ধে বহি গণ আন্দোলন এবং
সামাজিক অভিযান গড়ে তোলা না
হয়, তাহলে মাদক বর্জন সংক্রান্ত
আইনের ফলে একটা বিশ্রীত
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।
বর্তমান প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পশ্চিম
হিমালয়ের গারোয়াল অঞ্চলে
কিভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন
লক্ষ্য হয়েছিল।

পশ্চিম হিমালয়ের তেহরী
শহরের একটি গ্রাম। কিছু লোক
একটি ঘরে দাওয়ায়ে অপেক্ষা করছে
তাদের বন্ধুরা শহর থেকে কিয়বে।
কিছুক্ষণ পর সশিলা পাহাড়ী পথ
দিয়ে উঠে এলো বন্ধুরা। পিঠে
ব্যাগ। অপেক্ষমান বন্ধুরা তাদের
দেখে সোজাসে চিংকার করে
উঠলো। ব্যাগ খুলে বেরলো
ডজন খামেক “টিংটুরি” মদের
বোতল। “টিংটুরি” হলো জমগ্রিয়
স্থানীয় মদের নাম। লবলে বেশ
আরোহণ করে বসেছে খাবে বলে।
এমন সময় দরজায় জোরে জোরে
ধাক্কা পড়লো। গালাপালি দিতে
দিতে একটা লোক উঠে গেল দরজা
খুলতে। মনে হচ্ছিল, যে দরজা
ধাক্কা দিচ্ছিলো, তাকে বুঝি সে
ঘুষিই মারবে। কিন্তু একি অভাব-
নীর কাণ্ড। দরজা খুলতেই এক
হাল মদ্রীলা ও শিশু বয়ে ঢুকেই
মদের বোতলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে
কেলে দিল। তুষার্ত লোকগুলি
কিছু করতে গিয়েও শুরু নির্বাক হয়ে
রইলো। এই সব মহিলা ও শিশু
তাদেরই পরিবারের। তাদেরই
পাড়ার। তাদেরই বয়ের।

গারোয়ালে পরীক্ষা

গারোয়াল অঞ্চল এক দশক ধরে
ড্রাই বা মাদক দ্রব্য বজ্রিত। স্বদূর
এই গ্রামে এই আইন কার্যকর করার
কৃতিত্ব কিন্তু এই গ্রামেরই পুরুষ,
মহিলা এবং শিশুদের। তারাই
লম্বাকর্মী হিসেবে কাজ করেছে।
এই সব গ্রামবাসীরা গণগঠিতভাবে
মস্তপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে
তুলেছে। মদের দোকানের সামনে

গিয়ে পিকেটিং করেছেন। মদ-
ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা গুণ্ডাদের
শাণামিকে তারা তোরাকী করেনি।
মাদক দ্রব্য বর্জন সংক্রান্ত আইন
চালু হবার পর এই অঞ্চলের বিভিন্ন
গ্রামে “মহিলা মণ্ডল” গঠন করা
হয়েছে। মস্তপান বর্জনের আইন
ঠিক ঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা
তা দেখাই এই সব মহিলা মণ্ডলদের
প্রধান কাজ। মস্তপায়ীরা তখন
পড়লেন মহাকাশে। কারণ
আন্দোলনকারীরা তাদেরই পরি-
বারের লক্ষ্য। মহিলা মণ্ডলদের
লক্ষ্যরা মদের চোরাই চালান বন্ধ
করার জন্য বান ও অন্যান্য বানবাহনে
হঠাৎ তল্লাশী চালিয়ে প্রচুর পরি-
মাণ বেআইনী মদ উদ্ধার করে
অপরাধীদের পুলিশের হাতে তুলে
দিতে লাগলেন।

সূচনা

প্রথমে এই অঞ্চলের অধিবাসী-
দের মধ্যে মস্তপানের ব্যাপকতা দেখে
কিছু লবোদর এবং কংগ্রেস কর্মী
আশঙ্কিত হয়ে দু দশক আগে এই
আন্দোলন শুরু করেছিলেন।
গারোয়াল পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক
ভারসাম্য ধীরে ধীরে মট হয়ে যেতে
থাকায় এখানকার অধিবাসীদের
হাতিয়া চরমে ওঠে এবং জীবন
লংগ্রাম আরো কঠিন হয়ে পড়ে।
এ থেকে মুক্তির সহজ উপায় হিসেবে
তারা মস্তপানের দিকে ঝুঁকে
পড়লো। যারা পারলো, জীবিকার
লক্ষ্যে অন্তর চলে গেল, যারা
পারলো না তারা মদের মধ্যে ডুবে
থাকতে চাইলো। ফলে এক দাকন
লম্বায়ার সৃষ্টি হলো। যার বোকা
এসে পড়লো মহিলাদের ওপর।
বর-বাইরের কাজের হারিত্ব এবং
অর্থনৈতিক হারিত্ব এলো মহিলাদের
ওপর। তার ওপর আছে সাম্প্রতিক
অশান্তি। মাতাল অবস্থায় বয়ে
এসে মারধর, চিংকার চেঁচামেচি,
বগড়া ইত্যাদি। মদ খেয়ে বাড়ী
ফেরার পথে নানারকম পথ দুর্ঘটনাও
বিরল নয়। এইভাবে গারোয়ালী
গ্রাম জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক
বনিস্রাদটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে
বসলো।

শুরুতে কিছু লম্বাকর্মী প্রভাত-
ফেরার মাধ্যমে মস্তপানের কুফল
প্রচার করতে লাগলেন। পরে
তেহরী শহরে দস্তা প্রতিষ্ঠা করে
এই বার্তা প্রচার করা হলো।
মহিলাদের দিক থেকে দাকন সাড়া
পাওয়া গেল। মহিলারা দলে দলে
মদের দোকানের সামনে পিকেটিং
শুরু করলেন। জেলা প্রশাসন
তখন বাধ্য হয়ে বাজার এলাকা
থেকে মদের দোকান সরিয়ে ফেলার
নির্দেশ দিলেন।

মস্তপান বিরোধী আন্দোলনের
এটা হলো প্রথম বিজয়। ধীরে
ধীরে লোকালয় থেকে মদের
দোকান তুলে দেবার জন্য আতুর এবং
পার্বত্য কুমায়ুন অঞ্চলেও এই
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। পরি-
ণামে গারোয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চলে
লম্বাকর্মী মাদক দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন
দেখা দিল।

তেহরী শহর

তেহরী শহরের লম্বাকর্মীরা
মাইক হাতে বেরিয়ে পড়লো আপ
পাশের গ্রামেগঞ্জে এই আন্দোলনের
বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য। গ্রাম্য
মায়ীরা প্রথমে কিছু বিধাবিত ছিল।
এই আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে
তাদের মনে সংশয় ছিল। কিন্তু
ধীরে ধীরে যখন তাদের জানানো
হলো, তেহরীর মহিলাগণ কি
ভাবে সফল হয়েছিলেন তখন তাদের
মধ্যেও মস্তপান বিরোধী একটা
মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।
এই “বিষ”পানের বিরুদ্ধে লংগ্রাম
শেষ পর্যন্ত এসব গ্রামের মহিলারাও
নেমে পড়ল।

ক্রমশঃ এই আন্দোলন রীতিমত
হানা বেঁধে উঠতে লাগলো।
শহরের এবং গ্রামের মহিলাগণ এই
আন্দোলনের সমর্থনে আরো বেশী
লংগ্রাম এগিয়ে আসতে শুরু করল।
মদ ব্যবসায়ী এবং তাদের দালালরা
আতঙ্কিত হয়ে প্রাদেশিক সশস্ত্র
পুলিশ বাহিনী (পি, এ, এস,)
তলব করলো। কিন্তু কোনো ফল
হলো না। কারণ এই আন্দোলন
ছিল শান্তিপূর্ণ। কোনো প্রয়ো-
চনাত্তে তারা শান্তি ত্যাগ করেনি।

তা সত্ত্বেও, এই আন্দোলনের
নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো।
নেতাদের মধ্যে এমন কয়েকজন
বিশিষ্ট এবং লবজনপ্রভের নেতা
ছিলেন, যাদের গ্রেপ্তার করার জন-
মানসে বিরটি কোত্তের লক্ষ্য
হলো। যে সব ব্যক্তি এই আন্দো-
লনের প্রতি সহায়ত্বাঙ্গী ছিলেন
বিশ্ব লক্ষ্য ছিলেন না, তাঁরাও

এরপর এই লংগ্রামে নিজেদের
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করলেন। এই
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তেহরী বাজার
বন্ধ রাখা হলো। সরকারী অফি-
সারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ
বিক্ষোভ এবং পিকেটিং এতটুকুও
ভাটা পড়লো না। এমন কি পাড়
মাতালরা পর্যন্ত এই প্রতিবাদ
আন্দোলনে যুক্ত হয়ে চাঁদা দিতে
কম্বল করলো না।

অবশেষে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তার
জয় হলো। সরকারকেও শেষ পর্যন্ত
আন্দোলনকারীদের দাবী মেনে
মিতে হলো।

মস্তপান বিরোধী মনোভাব স্বদৃঢ়
এবং সংবদ্ধ হয়ে ওঠার ফলে পাহাড়ী
এলাকার মস্তপান বিরোধী আইন
ব্যর্থতার পর্যবসিত হলো না।

কিন্তু পুরোনো কর্মীরা জুং করে
বলেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ এবং

অন্তান্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য
এই আন্দোলনের স্কল পুরোপুরি
ভোগ করা যায়নি। সরকারী
কর্মচারীরা মদ ব্যবসায়ীদের কাছ
থেকে ঘুষ পেয়ে চোখ বন্ধ করে
থাকেন। তাঁদের সামনে দিয়ে
আইন সত্ত্বেও চলে গোপনভাবে মদ
বিক্রি ও পাচারের কারবার। প্রকাশ্যে
মদের দোকান সরাসরি বন্ধ করা
যায়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে মদের
গোপন বিক্রি বন্ধ করা খুবই মুশ্কিল।
তবে, বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ করে
মহিলাদের উদ্যোগে, মদ্যপান
নিবারণী কমিটি গঠন করা হয়েছে,
যার ফলে মদ ব্যবসায়ী এবং মদ্য-
পায়ীরা কিছুটা বেকায়দার পড়েছে
নন্দেহ নেই। কাজেই গণ আন্দো-
লনই শেষ পর্যন্ত মদ্যপান নিবারণের
কার্যকর পন্থা প্রমাণিত হলো।

ডেপথ্ নিঃজ ইণ্ডিয়া

পাঠ্যপুস্তকে চলচ্চিত্র

মে পৃষ্ঠার পর

আন্দোলন কি এই কথাই বসে ?
এবং সমগ্রবায়ুই ভাষায় “এভাবে কি
বাঁচা যায় ?”

যায়ই তো না। তাহলে, “ট্রেনিং
দেবেন কারা ?” এই প্রশ্ন তাঁর করা
উচিত ছিল খোদ সত্যজিৎবাবুকেই।
প্রস্তাব যেখান থেকে এসেছে, দায়িত্ব
তাঁদেরই মিতে হবে, সেই সঙ্গে চল-
চ্চিত্র এবং লংগ্রাম সংগঠিত অস্ত্রাভ্যাসের।
অভিজ্ঞ বেকার কলাকুশলীদের
একালে লাগাতে হবে এবং নিঃস্বার্থ
স্টুডিওগুলিকেও। কোথাও
না কোথাও একটা আরম্ভ করতেই
হবে। আগাপাশতলা খোলনলচে বহলে
শিক্ষাকে প্রয়োজনভিত্তিক, সমাধ-
মুখী এবং লবজনীন রূপ দিতে হবে।
সেখানে অন্তান্ত শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে
চলচ্চিত্রও থাকবে।

সবচেয়ে বড়ো মুশ্কিল হল,
চলচ্চিত্র বলতেই আমরা বুঝি এক-
মেবদ্বিতীয়ম্ কাহিনীচিত্রকে, তার
সঙ্গে (অনুগ্রহপূর্বক) তথ্যচিত্রকে,
তাও লক্ষ্যসূচিকেন্দ্র হওয়া চাই।
শিক্ষামূলক ছবি, শিক্ষার মাধ্যম
ছবির কথা মনে রাখিনা, গ্রাহ্য করি
না কাটুনও সিরীয়াস হতে পারে,
ছোট ছোট শিশু চলচ্চিত্র গড়ে
তুলতে পারে কচি কচি মনগুলিকে।
ফলত, আমাদের দেশে এসবের পাট
নেই, টিভির গুরুত্ব বিবেচনের ছবি
হি কেবলম্। অথচ, বর্তমান যুগের
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে টিভি রেডিও ফিল্ম
থিয়েটার লংবাদপত্র তথা তাবৎ
‘মাস মিডিয়া’র ওতঃপ্রোত বনিততা।
ইউনেস্কোর (বিশেষত উন্নতিশীল
ও অনগ্রসর দেশের জন্যে প্রস্তাবিত)
‘এডুকেশন প্রোগ্রাম’-এ এবিষয়ে বারং-
বার উল্লেখ করা হয়েছে। মিডিয়াগুলি
কিভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে, তাও।
জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডও এদের লম্বান

প্রাধান্য। পৃথিবীব্যাপী কৃষি শিল্প-
খাদ্য-বাহ্য-বা লম্বা ন-লো ক লং খা
ইত্যাদি লম্বাগুলির অলম্বান,
বিচার ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের
লম্বাগুলি (যা নিয়ে জাতিসংঘের
বিভিন্ন লম্বা বহুরের পর বহুর কাল
করে চলেছে, এবং যার খবর শিক্ষিত
ব্যক্তিরাও কম রাখেন) সাধারণ
মাছের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা
ক্রমেই জোরদার করে তোলা হচ্ছে।
ইউনাইটেড নেশন্স-এর ‘হাম-
মিডিয়া-ক লম্বা লটান্ট’ হিসেবে
আমার প্রধান কাজ এটাই—মিডিয়া-
গুলি কিভাবে ব্যবহার করলে এবিষয়ে
জ ল গ লকে সত্যাপ-সত্যক সক্ষম
করে তোলা যায়, তার প্রস্তাবনা।
একেকের চলচ্চিত্রের স্থান যে কতো
বড়ো। তা ব্রুতে পারি যখন মুখো-
মুখি হই ইউ, এন, ফিল্ম লাইব্রেরীর।
বক্তার ওপর আর্টিষ্টিক ছবি বা
ভিথারিদের ওপর ক্যামেরার কাক-
কাজ নয়, মল্লুমির বুক বক্তার লম্বা
বইয়ে দেওয়া, উদয় জমিতে ফল
ফলানো, পরিবেশকে মাছের বাস-
যোগ্য করে তোলা। বাস্তবভিত্তিক
চলচ্চিত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে
এখানেও, এখানেই।

আমাদের দেশে এ-ছবির ভীষণ
দরকার, যেখানে আর্ট-ফিল্মের
চেরেও বেশি—এ-ছবি আশা করি
ব্যাপ্যার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু
এছবি উঠতে পারে একমাত্র তখনই
যখন চলচ্চিত্র-মম্বক্তার জন্য হবে
শৈশবেই বিভ্রান্তন থেকে, অন্তান্ত
শিক্ষার সমান্তরালে। সত্যক হবে
বল্লজীবনদার্শনিক; জনতা হবে
‘মহান জনগণ’; অশম্বুতির বিরুদ্ধে
হুঁয়ার হেমে জয় হবে নব্য স্বপ্ন
সম্বুতির। ফলত, চলচ্চিত্রকে
(শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গুরু-
বিশ্বস্ত গোটা) বিদ্যায়তনের পাঠ্য-
স্থলী করার প্রস্তাব “ভাববিলাসী
মনের অলম্ব চিন্তা” মোটেই নয়,
জাতীয় অগ্রগতির কঠিন পথে অগ্র-
স্থতির অপরিহার্য ও বজ্রিত পদক্ষেপ।
লেনিনের বহুশ্রুত উক্তিটির উৎস
এখানে, খুজ এখানে, ব্যাপ্যার
বিভারও এখানে।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পর্ব প্রকাশিত
কয়েকটি বাংলা বই

১। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (২য় সংস্করণ) / ডঃ সুনীল রায়চৌধুরী / ১৬.০০

২। সমাজ তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) / ডঃ পরিমলকৃষ্ণ কর / ১৫.০০

৩-এ, ব্রাহ্মী স্ববোধ মল্লিক কোয়ার্টার, কলিকাতা-১৩

এন টি সি

६५ पूर्णोदय पत्र

ডাইরেকটরের সঙ্গে যোগাযোগ
করেন। পরের দিন সকালে ওই
ডাইরেকটর অফিসারটিকে নিয়ে
সুচরুয়াদারের কাছে যান।

লক্ষিদারটি মিলে দিয়ে এনে
হুটির দরখাস্ত করেন। কিন্তু, হুটিতে
থাকাকালে ঠেকে গত ১০ই ডিসেম্বর
বরখাস্ত করে নোটিশ জারী হয়।
কোন কারণ ঘর্ষানো হয়নি।
শ্রী এম. এল, চ্যাটার্জীর দেওয়া
দেই চিরকুটের ফটোস্টাট কপি
পশ্চিমবঙ্গের যুগ্মমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী.

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, বিহারের মুখ্য-
মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, এন, টি, সি হোল্ডিং
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এবং পূর্বাঞ্চল শাখার সর্ব ডাইরেক-
টরের কাছে পাঠানো হয়েছে।
জানতে চাওয়া হয়েছে : বেশে কোন
আইন আছে কিনা ? থাকলে, এন,
টি, সি কে তা প্রযোজ্য কিনা ?

টিক তিনটি বছর। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০। শিল্প পেয়েছে নতুন জীবন। নতুন জীবন পেয়েছে সেই সব মানুষগুলো যাদের হাতের ছোঁয়ায় ঘোরের কলের ঢাকা। পশ্চিমবঙ্গের গোটা প্রাণশক্তিই হয়েছে উজ্জীবিত।

নক্ষা আমাদের সহজ, স্বচ্ছ। দূর করতে হবে শিক্ষের বহুত্ব। প্রসারিত করতে হবে চাকুরির সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করতে হবে বেকারীর দানবকে। প্রসারিত করতে হবে কুঠীর ও ক্ষুদ্র শিল্পকে। একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক শিল্প সংস্থার কঠিন মৃত্তিকে করতে হবে শিথিল। দেশী প্রযুক্তিবিদ্যা আর শিল্পগত স্বনির্ভরতাকে উৎসাহিত করতে হবে। সম্প্রসারিত করতে হবে রাষ্ট্রীয়ত্ব ক্ষেত্রকে। শ্রমিকরাই সত্যিকারের উৎপাদক। তাদের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অগ্রাধিকার দিতে হবে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে।

গত তিন বছরে এই সব ক্ষেত্রেই এসেছে সাফল্যের পর সাফল্য। আর এই সাফল্য এসেছে দ্রুত গতিতে।

কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছেন ২৭৭টি প্রকল্প, বিনিয়োগ করা হয়েছে ৪৬৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

আরও ১৫৩টি অতি সূক্ষ্ম প্রকল্প তৈরী হয়েছে। লক্ষনী কর্তৃক
হয়েছে ১১৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই সব প্রকল্পের আওতায়
পড়ে উঠেছে ডোমেষ্টিক গ্যাস মিটার, ক্যামেরা, থাইরিস্টোর
কন্ট্রোল্ড মডেলার ড্রাইভ সিস্টেম, মিনি গটাল প্ল্যাণ্ট, রবার
কেমিক্যাল ইত্যাদি বহুমুখী ও প্রয়োজনীয় উৎপাদন সংস্থা।
আরও ৯৪টি প্রকল্প রূপায়ণের মধ্যে।

বান্ধ এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহের আর্থিক সহায়তা বেড়েছে
বহুগুণ। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধির হার ৬৯.৯০ শতাংশ।
এছাড়া আছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মতো
সংস্থাগুলির সহায়তা।

কর্ম বিনিয়োগও বেড়েছে প্রচুর। শুধু সংগঠিত ক্ষেত্রেই এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজারে। কল্যাণী, ষাড়গপুর, হুদাদিয়ার নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৭৪ একর জমি পেয়েছে ৩৩টি নতুন শিল্প সংস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তভাগিতে কুটারে বসে যে সব গ্রামীণ
কারিগর তৈরী করে চলছে হরেক রকম জিনিস তাদের
দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অমূল্য ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে, করতে
হবে প্রসারিত। ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সেই চেষ্টাই
চালিয়ে যাচ্ছে।

তিন বছরে ৬৮৫০টি শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। অনুমতি
মিলেছে ৪১৫৮টি নতুন সংস্থার। লব্ধির পরিমাণ ৩০ কোটি
টাকা। ২৮৪৮২ জনের চাকরির সৃষ্টি হয়েছে।

বড় বড় শিক্ষা সংস্থাগুলি থেকে বেশ ভাল রকম আর্ডার পেয়েছে।
দুর্গাপুর আসানসোল সহায়ক শিক্ষা সংস্থাগুলি।

প্রাথমিক স্কুলের ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিপণন শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত।
সমিতিগুলির মাধ্যমে।

বছরে ২৮৮০ টন জেলার বোর্ড উৎপাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্মশিল্প উন্নয়ন করপোরেশন পেমেন্টে অনুজ্ঞা-পত্র ১ এর ফলে সহায়ক শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড়রকম অগ্রগতি ঘটিছে।

হস্তচালিত ভাত সমবায় সমিতির অধীনে বেড়েছে ৩৯ শতাংশ ভাত। ভাতহীন ভাড়িদের জন্য তৈরী হয়েছে ৬টি সমবায় সমিতি। এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে একটি হোসিয়ারী ফ্যাক্টরি।

রেশম গুটির উৎপাদন বেড়েছে। উন্নত মানের সিল্কের
বিপণনও বেড়েছে। মৌমাছি পালন প্রশিক্ষণ ছাড়িয়ে পড়েছে
মালদহে, মুন্সিবাগে। দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে গুরু হয়েছে।
কাপেট ও ছাতা তৈরীর কাজকর্ম।

৩৫টি বহু কারখানা খুলেছে। ২৪৯২৯ জন শ্রমিক নতুন করে, কাজ শুরু করেছে।

শিক্ষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সহায়তায় অনেকখানি এগিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, শিকড় পাড়তে পারেনি আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণতা। প্রমিত আপোজন দমনে রাজ্য প্রশাসন হাত বাড়ায় নি।

ত্রিাপক্ষিক শ্রম উপদেষ্টা পৰ্যদ তৈরী হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে বোনাসের অধিকার। আলাপ আলোচনার মধ্যমে বোনাস বিরোধের মীমাংসা হয়েছে। ত্রিাপক্ষিক চুক্তির দ্বারা লাভবান হয়েছেন ৫৪,০০০ সূতীকল শ্রমিক। ৩০০,০০০ ইজিনিয়ারিং শ্রমিকের মাসে গড়ে ৫২ টাকা থেকে ৫৬ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে কলকাতা বন্দর ও ডক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধ মিটে গেছে। একটি পৃথক চুক্তিতে লাভবান হয়েছেন ২২ লক্ষ চা শ্রমিক। সরকার এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রেস শ্রমিকদের পেছনে। রাজ্যের চটকল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪৭০'৩০ টাকাশ্রম। সর্বোপরি, শ্রমিকরা ফিরে পেয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার।

৪০,০০০ কর্মহীন কর্মী বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ পেয়েছেন। এই প্রথম রাজ্যে চালু হয়েছে বেকার ভাতা। এতে মনস্তত্ত্ব হবেন ও লক্ষের মতো বেকার যবক যাবতী।

पश्चिमवर्ग सरकार

শিক্ষা ও আমির

পশ্চিমবঙ্গে
এ দুয়েরই জয়যাত্রা
অব্যাহত



নিবেশ্বর সেন



ই-কং নতর কার্যকলাপে শিয়ালদা ডিভিশনের ষ্টেশন হাট্টাররা ক্ষুব্ধ

রাংতার মুকুট

সমর বন্দোপাধ্যায়

গত ১৭ই ডিসেম্বর বিকল্প থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল থিয়েটার মুকুট প্রযোজিত নাটক 'রাংতার মুকুট'। রচনা ও নির্দেশনা অসিত বসু। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক দল নেতার কার্যবুদ্ধি ও ভণ্ডামি, শাসক-দলের শোষণ ও অন্যায়, সাধারণ বৈষ্যমীর বিলম্বিত আর বিরক্তি যে-আংগিকে এ নাটকটি প্রকাশ করেছে, তার মধ্যে কিছু নতুনত্বের চমক আছে। নাট্যকার আদালতে অভিযুক্ত। গুণ্ডাশাসনের মধ্য থিয়েটার মুকুট চরিত্রগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে মকের ওপর। নাটকের পাঁচপাণ্ডী সামাজিক বৈষ্যমীর শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ পর্বীয়ে উন্নীত হয় স্বপ্ন দেখার মধ্য থিয়েটার—তখন স্বপ্নের রাংতার মুকুট পরে একজন হয় রাণাপ্রতাপ সিংহ, অসংখ্য অমর সিংহ, মেবার জমীদার হয়ে ওঠে অপরাজিত। ইতিহাসের সেই উজ্জল অধ্যায়ভূক্ত পরাধীনতার মুখল মোচনে যে শৌর্য বীর্য, তারই আরোপ করার প্রয়াস বর্তমান সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির উদ্দেশ্যে। কল্পনার মধ্যে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু সেই সেই বলিষ্ঠতার প্রকাশ, যা মানুষের কর্মনার জগতকে বাস্তবায়িত করার সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারে। ইংগিতধর্মী রূপকের প্রকাশে আভি-শযা খটলে বস্তব্যবস্ত্র পরিবেশনের লক্ষ্যটুকু দিক হারায়। এরই ফলে রাংতার মুকুটের নকল শোভাই অভিব্যক্তির প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, আর মধ্যবিত্তস্বভাব তর ও দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েন স্বপ্ন নাট্যকার। এর মধ্যে বাস্তবতা থাকতে পারে, কিন্তু যখন দেখি স্টে চরিত্রগুলি বিপ্লবের শপথ নিয়ে তেড়ে আসে মৃত নাট্যকারের দিকে, তখন সাম্প্রতিক অভিশ্রুতায় পোটা ব্যাপারটাই স্পষ্ট হয়ে পড়ে, আরোপিত মনে হয় তাপস মেনের আলো, অতি হাদের মক পরিকল্পনা ও মুরারী রায়-চৌধুরীর দীপ্ত নাট্যটির মধ্যকারে সহায়ক হয়েছে। দীপক সরকার, সুবিনয় মুখার্জী, তাপস ঠাকুর, নীহার রায়, অরুণ পাণ্ডী ও ভ্রাতা বসু অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালিশ শাহ

শ্রীমত সন্দী শিকচাঁদের চরিত্র হকের উচ্চ ছবি 'সৈয়দ ওয়ালিশ শাহ' দেখান হোল গত ২৭শে ডিসেম্বর রঞ্জি থিয়েটার সিনেমায়। দিল্লিতে সমুদ্রিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের মার্কেট সেকশনে ছবিটি দেখানোর পূর্বে সাংবাদিকদের দাবীতে দেখানোর ব্যবস্থা হয়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন আর শর্মা এবং তারতলক্ষী শিকচাঁদের অধিকর্তা বাবুলাল চৌধুরী।

ওয়ালিশ শাহ ছিলেন বিপ্লব যুগের এক প্রসিদ্ধ উচ্চ কবি, গীতিকার ও দার্শনিক। তাঁর সাধক জীবনের প্রেম ও বৈরাগ্য অবলম্বন করেই ছবিটি মূলতঃ নির্মিত হয়েছে। প্রায় চরিত্র বছর আগের এই জীবন-ধর্মী চলচ্চিত্রটি দেখে ছবি নির্মাণের সং উদ্দেশ্যটি সে যুগেই কত আন্তরিক ছিল, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির টেকনিক্যাল দিকের উন্নত মানও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজকের দৃষ্টিতে ছবিটিকে বেশ দীর্ঘ মনে হয় কারণ শেষ পর্বে ছবিটির বেশ কিছু দৃশ্য আতিশয্যে ভারাক্রান্ত। তবে ছবিটির সংগীত অলঙ্কার মুগ্ধ হয়ে শোনার মত। সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গণপত রাও। জগদীশ মিত্র ও কোশল্যার কণ্ঠসংগীত অলঙ্কার আবেদন সঞ্চার করে। জি, কে, মেহতার কটো-গ্রাফীও প্রশংসনীয়। অজিত ও কোশল্যার অভিনয় সমিতি।

শ্যামাল সার্কাস

১১ ডিসেম্বর থেকে পার্ক সার্কাস ঘরঘানে চলছে শ্যামাল সার্কাস। প্রত্যহ তিনটে শো হচ্ছে বেলা ১টা, বিকেল ৪টা, সন্ধ্যা ৭টা। ট্রাপিডের খেলা, জোকারের খেলা ইত্যাদি চমকপ্রদ খেলা হাজার হাজার দর্শকেরকে আনন্দের ধোঁরাক জুগিয়েছে। শীতের দিনে, পরীক্ষার পর নতুন ক্লাস চালু হবার মুখে বাবা-মা, দাদু-দিদিমার হাত ধরে তাই-বোন সব চলছে পার্ক সার্কাস ঘরঘানে। কোলকাতা ও শহর-তলীর জনসাধারণ উপভোগ করছে ও সবাই একবাক্যে শ্যামাল সার্কাসের প্রশংসা করছে।

নলিনী পাল

নদীরা জেলা কংগ্রেসের নেতা এবং প্রাক্তন কংগ্রেস এম এল এ মরেশ চাকীর কার্যকলাপে পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনের ষ্টেশন হাট্টারদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাণাবাটে শ্রীচাকীর বিক্ষোভ বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা হয়েছে।

ষট্টিয়ার বিবরণে জানা গেছে, শ্রীচাকী ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ করকজন সঙ্গী-সাথী-দল রাণাবাটে ষ্টেশনে গিয়ে কর্মসূত ষ্টেশন হাট্টারের কৈকির তলব করে

রাজ্যে রাজ্যে ই-কংগ্রেস কোন্ডল

১ম পৃষ্ঠার পর

পুরনো যুগু মোহনলাল স্বাধীনতা অবসরের বিশ্বাস থেকে পুনরাবির্ভূত হতে চাইছেন। যদি স্বাধীনতা স্বয়ং রাজনীতিতে প্রবেশ করতে নাও চান তিনি নিশ্চয় চাপ দেবেন তাঁর অঙ্গুষ্ঠের ক্ষমতার ভাগ পাইয়ে দিতে। পার্শ্বাভিমানের দিন ধরে এতে বাধা দিয়ে আসছেন। কিন্তু কে জানে আর কতদূর তিনি বিদ্রোহীদের রাজ্য স্বাধীনতার প্রবেশ আটকে রাখতে পারবেন।

একই ঘটনা মহারাষ্ট্র উত্তর-প্রদেশ এবং ওড়িশায়। শোনা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী এ. আর. আব্দুলে অন্তত তিনজন মন্ত্রীকে বরিসভা থেকে সরিয়ে চাইছেন। এবং তা তাঁর পক্ষে বেশ সমস্তার স্থিতি করবে। উত্তরপ্রদেশের বিশনাথ প্রতাপ সিং তার দুই মন্ত্রীকে বর-খাস্ত করার ফলে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা থেকে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেন নি। ওড়িশায় নলিনী সংসদীয় ই-কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের সম্ভাবনায় এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। অল্প প্রবেশও উপলব্ধী কোঁদল, যেখানে আত্মীয়্য বরিসভার আয়ত্তন বহু আলোচ্য বিষয়। গুজরাটে গঙ্গোল মুখ্যমন্ত্রী মাধব সিং মোলায়ী রাজ্য ই-কংগ্রেসের সমাপতি থাকবেন কিনা তাই নিয়ে। তিনি থাকতে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বোগেন্দ্র মাকওয়ানা তাঁর প্রচণ্ড বিরোধী। ফলে মোলায়ী যে নিজের অঙ্গুষ্ঠ

ভয় দেখান ও তরফী দেন যে নিয়-মিতভাবে ট্রেন তেন চলছে না। এরপরেই ষ্টেশন হাট্টারদের মধ্যে ঘটনাটি কোনে কোনে জানালাসি হয়ে যায়।

পরের দিন (৩১-৮-১) বিকেলে রেল কর্মচারী এবং রাজীদেব যুক্ত কাউন্সিলের নেতা চিত্ত বসু নেতৃত্বে শ্রীচাকীর বিরুদ্ধে কিছু বাহ্য ষ্টেশনের ২নং প্রাটফর্মে বিক্ষোভ জানান। শ্রীচাকীও তখন অর্থাৎ এক বকটা বাধে দলবল নিয়ে এক নং প্রাটফর্মে গিয়ে হাজির হন।

কাউকে বসাবেন-তাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় চিন্তিত ও আশঙ্কিত ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করেছেন দোক-মতার বাড়তি অধিবেশনের আগে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বিদ্রোহী ই-কংগ্রেসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। জানা গেছে, তিনি কর্মলাপতি ত্রিপাঠীকে দলের ওয়া-ফিং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যত্নসহকারে বলেছেন। অবশ্য ত্রিপাঠীও এখনও এ বিষয়ে মনস্থির করেন নি।

উদ্ভেজনা চরমে ওঠে। কিন্তু পুলিশ গিয়ে অবস্থা আরও আনেন।

ষ্টেশন হাট্টারদের পক্ষ থেকে প্রশংসা করা হয়েছে যে, শ্রীচাকী তি জানেন না যে, তাঁরই হৃদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের প্রশা-লনিক গাফিলতির জন্য শিয়ালদা ডিভিশনের লোক্যাল ট্রেনের এই চরম দুর্গতি চলছে। অনিয়মিত ট্রেন চলাচল ছাড়াও সমস্ত গাড়ি নড়বড়ে হয়ে গেছে। এরফলে ষ্টেশন হাট্টাররা হারী নন। কেন্দ্রীয় ই-কংগ্রেস সরকার এবং রেল প্রশা-দনই এর উত্তর দায়ী। ঘটনাটি মহা-করণে উত্তম সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

চটকল মালিক

১ম পৃষ্ঠার পর

লয়েট উপাচার্য ডঃ গোপাল মেনের হত্যাকাণ্ডের পরে সি. পি. আই. (এম) এর উপরে যেভাবে অসম্ভব কথা প্রচার করে দোষ চাপানো হয়েছিল এক্ষেত্রে তা না হওয়ায় মালিকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। উল্লেখযোগ্য, তাতেও সি. পি. আই. (এম)-কে জড়ানো যায়নি।

উল্লেখযোগ্য রিজার্ভেল স্ট্রট মিলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চটকল মালিক এবং শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বিপ্লবের ঘণ্টা তুলে প্রচার অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, কংগ্রেসী চটকল অধিকারের এতাদেশের দোষাত্মক ফলে সবই ভেঙে গেল।

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মস লিমিটেড
(কোলকাতা-৩ থেকে সপ্তাহে একবার সিনেমা)

টেওয়ারের সময় বুজির নোটিস

বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

সেফা: নং: ই সি এল / এ-৭ / ইজ (সি) / টেওয়ার / ৮০-৮১ / ১১ এ / ১১০১২ তার ১১-১২-৮০

(১) পূর্বঘোস্তমপুর ও সি. পি. ও সি. পি. ওয়ার্কশপে পাকা ফ্লোরিং (২) পূর্বঘোস্তমপুর ও সি. পি. ও সি. পি. ওয়ার্কশপে পাকা সড়ক টোর-কাম-অফিস (৩) ডালুবাধে ও সি. পি. ও সি. পি. ওয়ার্কশপে পাকা ফ্লোরিং (৪) দংশোধিত ডিভাইন অলিম্পিক মন্ডারবানি কোলিয়ারীতে (আর সি সি বস্তু টানেল) ইন্সটলেশন (খনন ও তরাত করা) নির্মাণের জন্য মূল টেওয়ার নোটিস নং ই সি এল / এ-৭ / ইজ (সি) / টেওয়ার / ৮০-৮১ / ১১ / ১০১৮৭ তার ২০-১১-৮০ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, এতদ্বারা টেওয়ার গ্রহণের শেষ দিন ১০-১১-৮১ বেলা ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হল এবং তা একই দিনে ৩০-টার থো হবে। ১-১১-৮১ পর্যন্ত টেওয়ারপত্র বিক্রয় করা হবে। এটাও জ্ঞাতব্য "ডাকে পাঠানো দীল করা টেওয়ার গ্রহণ করা হবে, ডাকে পৌছতে বিল ইত্যাদির জন্য কোম্পানী দায়ী থাকবে না।" অতীত শর্তাবলী অপরি-বর্তিত থাকবে। জেনারেল ম্যানেজার, পাণ্ডবের এগ্রিয়ার।

আসাম আন্দোলনকারীদের প্রতি আসুর বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বাঙ্গালী-বিরোধী ৩৫ দফা গোপন নির্দেশনামা

দপন

অগ্রবিশ্ব বর্ষ ১৯৭৭ সংখ্যা ১ শুক্রবার ১৬ই জানুয়ারী ৮১ ১৬০ পৃষ্ঠা

রাজ্য ই-কংগ্রেসে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির খেলা

বরকত ও সুব্রতের তৎপরতা

রাজ্য ইন্দিরা কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখার্জী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরীকে স্বপক্ষে আনার জন্য নানাভাবে প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। সুব্রতবাবুর এই চেষ্টার কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক আই এ এস অফিসার মদত-যোগাচ্ছেন বলে ই-কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে।

বরকত সাহেব রাজ্যের অবিসম্বাদী নেতা হওয়ার জন্য সম্প্রতি উঠে পড়ে লেগেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্যের ছুই যুব নেতা সোমেন মিত্র এবং সুব্রত মুখার্জীকে নিজের সমর্থনে আনারও খুব চেষ্টা করছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বরকত সাহেব কিছুদিন আগেও প্রচণ্ডভাবে সুব্রত বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু তিনি এটা ভালভাবে বুঝেছেন যে, এ রাজ্যে দর্শনমত নেতা হতে হলে শুধু দোষেদের সমর্থনই যথেষ্ট নয়, সুব্রতের সমর্থনও প্রয়োজন। বিষয়ময় যুব নেতারা যাতে বগড়া কমিয়ে এসে দবাই মিলে বরকত দায়েদের পাশে দাঁড়ান, তার জন্য তার চেষ্টার কসর নেই।

শাওকে মাঝেই তিনি কলকাতার এসে সুব্রত, সোমেন, হুসন প্রভৃতি যুব নেতাদের নিয়ে কোল ইন্ডিয়ান অফিসে বলে বৈঠক করছেন। দবাইকে বোঝাচ্ছেন তোররা একত্ব বন্ধ হওয়া না হলে ইন্দিরাজী রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সাম ব্যাবস্থা নেবেন না।

অবশ্য বরকত দায়েদের সঙ্গে বৈঠক করার সময় কেউই যুগের ওপর “না” করছেন না। কিন্তু সোমেন, সুব্রতরা কেউই কমতার ভাবনা দাবী বরদাস্ত করতে রাজী নয়। দবচেরে কেনে আছেন সুব্রত। শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়

রাজ্য ইন্দিরা যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সোমেন মিত্রের বিদায় আসন্ন

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ইন্দিরা যুব কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সোমেন মিত্রকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বরকত বলা ভাল যে, সভাপতির পদ থেকে সোমেন মিত্রকে অপসারিত করা হচ্ছে। পরকায়ীভাবে এই ঘোষণা করেছিলেন যথেষ্ট করা হবে বলে বিশ্বাস করে জানা গেছে। এখান প্রায় হচ্ছে যে, সোমেন মিত্রের পরে রাজ্য ই-যুব কংগ্রেসের সভাপতি কে হবেন? বর্তমান কমিটির কর্মকর্তাদের কেউ, নাকি সুব্রত মুখার্জী পক্ষী ই-যুব কংগ্রেসের কেউ? এ বিষয়ে তিনটি নাম শোনা যাচ্ছে। সোমেনপক্ষী ই-যুব কংগ্রেসের মুখ্যকার খান, সুব্রতপক্ষী ই-যুব কংগ্রেসের প্রবীর খোব এবং শিলাভিত্তিক ভট্টাচার্যের নাম নিয়ে রাজধানীতে আলোচনা চলছে। খোব নেতা চলছে যে, এই তিন-

উত্তর পূর্বকালে আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর ও ত্রিপুরার দাবী-দাবী, খুন, রাহাজানি ও লুণ্ঠন সৃষ্টি করে গভ এক বছরে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে এক প্রবীর স্বার্থবুর। যুগে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা বললেও এটা যে উগ্র আত্মীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতা বা বী আন্দোলন এটা বুঝতে আর আর অসুবিধে হয় না বলে পূর্ববক্তক মহল মনে করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি-আই-এর পরিকল্পিত ‘অপারেশন ব্ল্যাকপুজ’-র মতকা হচ্চে কি? কলকাতায় মার্কিন কর্মস্থলে-টের জনৈক রাজনৈতিক উপদেষ্টার আদ্যে বন বন রহস্যজনক লকর ও আসাম-আন্দোলনের মেতুবুন্দের লড়ে সি আই এ-র চরমের গোপন মৈত্রী লাক্ষ্যকারের ঘটনা উত্তরপূর্ব ভারতে অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি দাবী বলে ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন। ভারতের সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের রহস্যজনক গতিবিধি, মার্কিন চর গভয়ানের আসাম সরকার আসাম-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বলে ওয়াকিফহাল মহল আরও মনে করেন।

জনের মধ্যে কাকে সভাপতি করা হলে তা সব পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। পালাটা ভারি মুক্তাকার খামের দিকেই। সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে দিল্লীতে যে অভিযোগ সুব্রতপক্ষীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল সে বিষয়ে অস্বস্তান করতে দবভারতীয় ই-যুব কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন এই রাজ্য যুগে গেছেন। রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। জানা গেছে যে, ঐ রিপোর্ট সোমেন মিত্রের অস্বস্তানে নয়। তারই কলকাতা হিঙ্গাবে সোমেন মিত্রকে রাজ্য ই-যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় মেতুবুন্দের দ্বিগ করেছেন যে, সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে এখনই কোন শুল্লভাতকের অভিযোগ জানা হবেনা। সোমেন মিত্রকে বলা হবে যে, তরুণদের জারগা করে দেবার

আসাম আন্দোলনের নেতা, নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন বা আহর মেতুবুন্দের যুগে “বিশেষী সমতা” সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাঁদের আসাম আন্দোলনের যে অস্ত উদ্দেশ্য তা আহর প্রচারিত গোপন হলিল বা দাবীলারে জানা যায়। আদ্যে বাঙালী নিধন ও আসাম-উপজাতি-নিধনের কার্যক্রম এখনও

১৮ অক্টোবর বেলায় দিকে বিব্রোহী করেদীরা জেলের মধ্য একটা টিনের চালার উপর থেকে চোকা হুঁকে তাঁদের দাবী-দাবী পেশ

বাঙলাদেশের খুলনা জেলে বন্দীহত্যার কাহিনী

গত বছরের ১২ অক্টোবর থেকে ২০ হকা দাবীর সমর্থনে খুলনা জেলের করেদীরা একজন ডেপুটি জেলার সহ ২৪ জন জেল কর্মচারীকে জিন্মা হিসেবে আটক করে। করেদী-দের আন্দোলনের বোকাবিলার প্রাথমে পুলিশ জেলের চারিদিকে, উত্তরে রূপনা নদী, দক্ষিণে কোর্ট বিল্ডিং, পূর্বে বার লাইব্রেরী ও পশ্চিমে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত এলাকার এক অঘোষিত কাছ জারি করে রেখেছিল।

বন্ধ হয়নি। আহর মেতুবুন্দের তাঁদের দাবীলার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে জানা নেই।

আহর ৩০ হকা নির্দেশনামা

চিহ্নিত চাকল্যকর হলিলটি সি আই এর ‘অপারেশন ব্ল্যাকপুজ’র পরি-কল্পনা অস্বস্তানে রচিত হয়েছে কি? —এই প্রশ্নটিও রাজনৈতিক মহলে উঠছে। থবরে জানা যায়, ভারত সরকারও আহর এই তরুণ হলিলটি নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন।

আসাম আন্দোলনের পেছনে শেবাংশ-২য় পৃষ্ঠায়

করতে থাকে। ছোট ছোট কাপড়ে তাঁদের দাবীলার লিখে জেলের পাচিলের বাইরে তাঁরা ছুঁড়ে মারে। জেলের প্রশালন অতীতে তাঁদের সঙ্গে বেইদারী করার তাগা বলে যে, খরাব্রদী, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক হলের মেতুবুন্দের দাবীলারে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখতে চায়। দাবীলার আক-লিক ও আত্মীয় পর্যায়ে কারা সংস্থা-দের দাবীলারে থাকলেও মূলত করেদীদের দাবী ছিল, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘজিহ্বা ত্যাগ করে ক্ষত বিচার সম্পন্ন করা এবং বছরের পর বছর বিচারহীন অবস্থায় হাজতী করে মা রাখা।

পেছিন জোররাতে স্বল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। মই ও কাঠের মাচা বেঁধে পুলিশ পাচিল টপকে জেলে ঢোকে আর গ্যাস ওয়েজার দিয়ে জেলের মেন গেট খুলে ফেলে। করেদীরা বাধা দিলে দমকলের হোস পাইপ থেকে তীব্রবেগে জল ছড়িয়ে তাঁদের তাড়ানো হয় ও পরে পুলিশ টিয়ার-গ্যাস চালায়। এরপর শতশত পুলিশ নির্মমভাবে বেরোমেট ও লাঠি হাতে নিরস্ত্র অসহায় করেদীদের উপর কাঁপিয়ে পড়ে ও বেপরোয়া গুলি চালায়।

পরকারী প্রেদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে ঐ ঘটনার মোট ৩৯ জন করেদী মারা গেছে। এবং গুলি কাঁদা হল যে, তারা মারা গেছে নিজেদের মধ্য মারামারি করে। করেদীদের আন্দোলন ‘প্রত্যাহারে ইচ্ছুক’ ও ‘উচ্ছ্বল লাগাতার’ আন্দোলনের পক্ষপাতীদের মধ্যে সংঘর্ষে নাকি ওরা মারা গেছেন। অথচ সেখানে দাবীলার বেতে দেওয়া হল না, শেবাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম-বঙ্গের বায়ফ্রন্ট সরকারই প্রথম এ রাজ্যের ছোট ও মাঝারী পত্রিকা-গুলোর অসহন্যে ক্রীশনাঙ্কশেখর সান্ত্বালের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির রিপোর্ট আজও রাজ্য সরকার জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করেনি। আজও বায়-ফ্রন্ট সরকারের রাজস্বে বৃহৎ দৈনিক-গুলোর সাংবাদিকদের প্রতি সরকারী অফিসদাররা এমন কি বায়ফ্রন্টের মজুরী একরকম ব্যবহার করেন ও সাপ্তাহিক বা ছোট-মাঝারী পত্রিকার সাংবাদিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগ-রিক মনে করেন। রাজস্বমে সাপ্তা-হিক পত্রিকার সাংবাদিকদেরকে সরকারী এক্সিভিশন কার্ড দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গে ব্যতিক্রম হবে কেন? ছোট পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্রের লালকিতের বীধন এ আমলে চলছে।

দেশ কাল রাজনীতি

আন্দোলন বাঁচার তাগিদে

ভারতপুত্র

মশাননের কথা হেঁড়ে দিলাম, মশটি মুখ দিয়ে মশ রকমের কথা বলা লংকারাজ রাবণের পক্ষে সম্ভব ছিল, তার বহুবিধ দুর্ভিক্ষ সম্পন্ন করার জন্য রামায়ণের অষ্টকর্তা কৃষ্ণবাস তাকে প্রতীক হিসাবে প্রতিভাত করার বার্ষিক দশ দিকে মশটি মুখ নিয়ে হাজির করেছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অবশ্য মাজ একখানা মুখ সম্বল করেই অগ্নি ছিলেন; কিন্তু ত্রেতাযুগের রাবণ-রাজাকে পরাস্ত করে তিনি যেন আজ সহস্র মুখের অধিকারিনী। একই নিঃশ্বাসে মশ রকমের কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতা তিনি রাখেন। একে কী বাচ্চাতুরী, না রাজনৈতিক প্রগলভতা আখ্যা দেওয়া যায়, তা অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদের বিচার। কিন্তু বিদেশীদের কাছে ভারত-প্রতীক হিসাবে মশ রকমের কথা বলার মর্যাদাই স্মরণ করলেন তাই নিজেও আর একবার খেলো গেলেন। শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম আফ্রিকার ওয়াশিংটন ও অক্সফোর্ডে ১৭টি বিদেশী রাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধিদের সম্মেলন করেছিলেন যে, “আন্দোলনের বিলাসিতায় গা তামানো ভারতের দাজে না। পরমুহূর্তেই তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে, মর্যাদাহীন ভারতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব না। মর্যাদা হীন দেশের যথেষ্ট অভাব-অভিযোগ রয়েছে। আন্দোলন তো সেই অভাব-অভিযোগের প্রতিফলনই; খেয়ে পরে বেঁচে থাকার তাগিদেই আন্দোলন কি বিলাসিতা? তবে কেন প্রধানমন্ত্রীর এত প্রশ্ন? আমজিত অতিথি নিমন্ত্রণকারী নিম্না সমালোচনা কখনো করেন না, আরোজনের সহস্র জটিল কাজেও তাকে অপরোধী হিসাবে সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। বিদেশী অতিথিরা সে মৌখিক নিষ্ঠার ও ভজতাই শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছেন। সর্বোপরি, তারা বিদেশী এবং বাড়ীর ভাষায় দেশের প্রধানমন্ত্রী, সরকার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। এই তার কোন রকম অসম্মান করা কখনো করতে পারেন। অতিথিরা নিজ নিজ দেশবাসীর এবং বিদেশী মানদণ্ডের অটুট রাখ-

লেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার দেশবাসী সম্পর্কে সে বাস্তবিক মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেন নি। ভারতে স্বল্পকাল অবস্থানকারী বিদেশীরা ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন কি না জানা নেই, তবে তার এই উক্তি মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বরূপ আরো নয় হয়ে পড়ল। শ্রীমতী গান্ধী যে আগামী দিনে বৈরতন্ত্রীর মূর্তি নিয়ে হাজির হতে চলেছেন বিদেশীদের দোঁটাই তিনি আগাম জানিয়ে দিয়েছেন যাতে বিদেশী রাষ্ট্রের সমর্থন তার প্রতি অব্যাহত থাকে, আন্দোলনকারীদের ওপর তিনি কাঁপিয়ে পড়লেন যে ১৯৭৫-৭৬ সালের মতো ‘মুদ্র-হস্তা’ হিসাবে তিনি আবার চিহ্নিত না হন। গত কিছুকাল ধরেই শ্রীমতী গান্ধী গণ আন্দোলনের প্রতি বিবোদ্ধার করে চলেছেন যদিও তিনি স্বীকার করেন যে আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে লংগত কারণ রয়েছে। কিন্তু আর তিনি কার্য-কারণ, মুক্তি-তর্কের ধার ধারবেন না, কঠোর হস্তে হিটলার মুসোলিনী ও নাসী-ফ্যাসিস্ট কারাগার সে-আন্দোলন দমন করার ক্ষেত্রে তিনি তৈরী করেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা আইন তার একটি প্রধান ধান ধার সাহায্যে আন্দোলনকারী ও রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের বিনা বিচারে তিনি জেলে দেই বাহেজ মুহর্তটি পর্যন্ত আটক রাখবেন বতরুণ না তিনি দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের চিত্তার ওপর রাষ্ট্রপতি-প্রধান সরকারের ইমারত তুলছেন এবং সে-ইমারতের একমাত্র মালিকানা লাভ করেছেন। আমাদের খেল সেলসাপন সে-লক্ষ্যপথেরই দ্বিতীয় সোপান।

বিরোধী দলনেতারা দেশের আলম বিপদ সম্পর্কে, শ্রীমতী গান্ধীর সতর্ক, হিসাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে কতখানি লজাপ ও লচেতন আমরা জানি না। কারণ তাদের মধ্যে সে-চেতনার উদ্ভূত হয়ে একেবারে প্রতি-রোধ-প্রচীর গড়ার আন্তরিক ও অর্ধবহ প্রচেষ্টা এখনো তেমন দেখা যাচ্ছে না, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ছাড়া। অন্তরিক্ত বিরোধী শিবিরে ফাটল ধরাবার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর চেষ্টায় কোন স্রাস্তি নেই, কাস্তি নেই। কিছু কংগ্রেস (আর), জনতা

ফসলের লাভজনক দর দিলে মুদ্রা ক্ষীণি হবেনা

অর্থনৈতিক ভাষ্যকার

মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন ভারতের শাদক শ্রেণীর হৃদয়ঙ্গম কারণ হয়ে উঠেছে। কৃষকদের আন্দোলন শুধু মহারাষ্ট্রেই নয়, অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। কার্যতঃ এই আন্দোলন কৃষিক্ষেত্রে পণ্যের লাভজনক দর নিশ্চিত করার আন্দোলন। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে একচেটে, বৃহৎ শিল্পপতি এবং গ্রামীণ কৃষির মালিকদের জোট বৃত্তভাবে দেশ শাসন করে এসেছে। সত্তরের দশক থেকে এই জোটে ভারতের তরু। কারণ শিল্প মালিকেরা যে কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে তার ভাষা দাম তারা দেয় না। কাঁচামালের কম দাম এবং শ্রমিকদের কম মজুরী দিয়েই তারা একচেটে অতি মুনাফা অর্জন করে এসেছে।

এতদিন গ্রামীণ কলসের দরদাম নিধারণে যে কারচুপি করা হতো, তার প্রধান শিকার ছিল গ্রামের গরীব ও মাঝারী কৃষক এবং ক্ষেত-মজুরেরা। যেমন চটকলের মালিকেরা, কিংবা কাপড়ের কল বা চিনি কলের মালিকেরা পাট, তুলো বা আখের দাম কম দেবার জন্য গ্রামে ক্ষেত-মালিকদের ব্যবহার করতো। গ্রামের জমিদার মহাজনেরা ফসলের মরতমে কৃষি পণ্যের দাম নামিয়ে আনতো-তারপর অধিকাংশ গরীব ও মাঝারী কৃষকের ফসল হাতছাড়া হয়ে যাবার পর তা চটকল, কাপড়ের কল, চিনিবল ইত্যাদির মালিকদের হস্তগত হতো। গ্রামীণ জমিদার মহাজনেরা আগাম দামন পেত এবং নিধারণিত দরের চাইতেও কম দাম দিয়ে পাট, তুলো, আখ, বাহার, তিল তিলি ইত্যাদি কৃষিপণ্য কৃষক-দের কাছ থেকে কিনে নিত। ফলে আমাদের দেশে চাষীরা কোনদিনই ফসলের ভাষা দাম,—এমন কি পড়তা থরচ পুথিয়ে যাবার মত দামও পেত না। এই শোষণের ভাস্কর্য ও লোক দল নেতা তো ইন্দিরা শিবিরের দিকে যেন এক পা বাড়িয়েই রেখেছেন। বিরোধীদের মধ্যে, এ-পরিহিতিতে মজবুত এক প্রতীকার উদ্যোগ কেবল বামপন্থী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক দলগুলিই নিতে পারে, তারাই জীবন মৃত্যুকে পারের ভৃত্য জ্ঞান করে লড়াইয়ে কাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর আগামী দিনে বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ব্যক্তি ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠাকারী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে গণতন্ত্রের এটাই তো হবে শেষ বা চূড়ান্ত লড়াই।

শহরের বুজোরা শ্রেণী এবং গ্রামের জমিদার-মহাজন ধনী একচেটে হয়ে শোষণের রাজত্ব চালিয়ে এসেছে।

শহরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একচেটে মালিকদের হৃদয়ের বিষ। শিল্প মুনাফার শিকার হয়ে শহরের শ্রমিকেরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। তারা যৌথভাবে দর কবাকষি, ধর্মঘট, আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মজুরী বেতন ও বোনাস আদায় করে নিচ্ছে। যদিও একচেটে মালিকদের অতি মুনাফার দামান্ত তরোপেই এর ফলে তাদের হাতছাড়া হচ্ছে তবু

শহরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একচেটে মালিকদের হৃদয়ের বিষ। শিল্প মুনাফার শিকার হয়ে শহরের শ্রমিকেরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। তারা যৌথভাবে দর কবাকষি, ধর্মঘট, আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে মজুরী বেতন ও বোনাস আদায় করে নিচ্ছে। যদিও একচেটে মালিকদের অতি মুনাফার দামান্ত তরোপেই এর ফলে তাদের হাতছাড়া হচ্ছে তবু

শহরের বিবাহ বনে দেখাতে ব্যস্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর আই জি প্যাটেল, অধ্যাপক দাওকর প্রমুখ বুজোরা অর্থনীতিবিদগণ এক “সংগঠিত শ্রমিকশ্রমী” এবং শহরে ক্ষেতাদের সঙ্গে গ্রামের কৃষকশ্রেণী স্বার্থসংঘাত বলে দেখাবার চেষ্টা করছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর প্যাটেল দাব্যে কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্যের দাবী মুদ্রা ক্ষীণি বাড়িয়ে তুলবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের প্রচারণার পেছনে অভিনয় রয়েছে।

গ্রামের কৃষকশ্রেণী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তাদের সকলের জমি ও ফসল সমান নয়। বরং অনেকেরই জমি নেই। তারা হয় বর্গাধারী প্রধার কিছুটা ফসলের অংশ পান, না হয় টাকা ও ফসলে মজুরী পান। কিন্তু ফসলের দাম লাভজনক নাহলে তাদের দাবাই কতি। লাভ খালি অতি মুনাফালোভী চটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল ইত্যাদির মালিকদের। চাষীরা চাষবাসের জন্য বেশী দামে সার, বীজ, পুষ্টিগুণ, জল ও বিদ্যুৎ কিনে কম দামে ফসল বেচতে পারেন না। সুতরাং ফসলের লাভজনক দাম-আদায়ের জন্য তারা আন্দোলন করবেন এটাই বাস্তবিক।

অন্যদিকে শহরের শিল্পমালিকেরা ‘সংগঠিত’ শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলেও মুনাফার সামান্য তরোপও ছাড়তে নাহাজ। তাই তারা কাঁচামালের দাম কমাতে চান আবার নিজেদের উৎপন্ন সার, পুষ্টিগুণ, কীটনাশক প্রযাধি ও চাষের অন্যান্য সামগ্র্যজাতের দাম চড়া রাখতে উৎসুক। অর্থাৎ শ্রমিক ও চাষীদের মেরে তারা নিজেদের অতি মুনাফা আরো বাড়াতে চাইছে। গ্রামের ধনী খামার মালিকেরা এই অতি মুনাফা লোভের বলি হতে রাজী নয়, যদিও তারা খামার ও বাগিচা শ্রমিক এবং ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরী দিতে রাজী নয়। এই দুই শ্রেণীর বৃদ্ধিপ্রীতিই যেমন অধ্যাপক দাওকর বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর আই জি প্যাটেল এই স্বার্থ সংঘাতকে এক কথনের নীচে ঢেকে দিয়ে এটাকে গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্বাত বলে চিত্রিত করার অপকৌশল অবলম্বন করেছেন। এই অপকৌশলের প্রয়াস হিসেবে সাধারণ ক্ষেতাদের বিমুগ্ধ করে শহরের শ্রমিক ও গ্রামের শোষণ ও পৃষ্ঠার

বাম ফ্রণ্টের এম এল এর বিরুদ্ধে বেআইনী কাজের অভিযোগ

গভীরামপুর থেকে নির্বাচিত বাম ফ্রণ্টের উন্নয়ন বিধানসভা সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং বে-আইনী কাজের অভিযোগ এনেছেন ইন্ডোনায়েসিয়ায় ওয়েলফেয়ার কমিটি।

এই কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, উক্ত বিধানসভা সদস্যটি বাড়ী তৈরী করবার জন্য পূর্ণতবা নদীর পার থেকে রাজ্য সরকারের পাওনা রয়্যালটি না দিয়ে ইচ্ছাকৃত বাজি তুলে নিয়েছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, পূর্ণতবা নদীর পার থেকে বাজি তোলার দায়িত্ব ইন্ডোনায়েসিয়ায় ওয়েলফেয়ার কমিটির। এই কমিটির পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে বাজি-তোলা হয় বখারীতি রাজ্য সরকারকে রয়্যালটি দিয়ে। এবং বাজি বিক্রীর টাকা এই কমিটি এলাকার নানা উন্নয়নমূলক কাজে

ব্যয় করে থাকে।

অভিযোগ, সম্প্রতি উক্ত বিধানসভা সদস্যটি গভীরামপুরে একটি বাড়ী কিনেছেন। বাড়ীটি কেনার পর তা ভেঙে ফেলা হয়েছে মতন করে পাকা বাড়ী তৈরী করার উদ্দেশ্যে। এই পাকা বাড়ী তৈরী করার জন্য ইতিমধ্যে কয়েকশো গাড়ী বাজি বিধানসভা সদস্যটি নিয়েছেন।

বাজি মেওয়ার জন্য প্রতি গাড়ী পিছু পচিশ টাকা রয়্যালটি দিতে হয়। উক্ত বিধানসভা সদস্যটি কোন রয়্যালটি না দিয়েই প্রায় দেড়শো গাড়ী বাজী নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এ বাবদ সরকারের রয়্যালটি কীকি দেওয়া হয়েছে প্রায় পৌনে চার হাজার টাকা।

শুধু তাই নয় সরকারী নিয়মে

পূর্ণতবা নদীর দেতুর একশো গজের মধ্যে বাজি-তোলা বে-আইনী। কিন্তু উক্ত বিধানসভা সদস্যটি এই আইন ভেঙে একশো গজের মধ্যে থেকেই বাজি তুলে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের কেউ কেউ বাধা দিলে উক্ত বিধানসভা সদস্যটি বিধানসভার প্যাডে একটি সাধারণের জন্য হুপিয়ারী জারী করেছেন যাতে তার লোকদের কাছে কেউ কোন বাধা না দেয়।

উক্ত বিধানসভা সদস্যটির কাজে ওয়েলফেয়ার কমিটি তথা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ হানি হচ্ছে। কারণ বাজি বিক্রীর টাকা থেকে ওয়েলফেয়ার কমিটিকে বঞ্চিত করে উক্ত বিধানসভা সদস্যটি এলাকার অধিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছেন। তাছাড়া ওয়েলফেয়ার কমিটির আশঙ্কা, একজন বিধানসভা সদস্য যেভাবে বে-আইনী কাজ করছেন, তাতে অন্যান্যদের কাছে একাজ পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

অভিযোগটি ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষ থেকে সরকারী দপ্তরে জানানো হবে ও এ পৃথক তার কোন প্রতিকার হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

বই নির্বাচন নিয়ে কিছু বক্তব্য

আপনাদের পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮০ লিখিত 'বইয়ের দুনিয়া' বিষয়ক প্রতিবেদন পড়ে প্রথম চোটে খুবই আনন্দ এবং উৎসাহ হয়েছি। বক্তৃতাই পারছেন এটা হয়েছে বামপন্থী সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের স্বস্তার প্রমাণ। অতঃপর রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির 'নির্বাচিত পুস্তক তালিকা' সংগ্রহ করে খুঁটিয়ে পড়ার চেষ্টায় আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

প্রথমেই বলি, যে সব বই এই তালিকায় স্থান পেয়েছে সেগুলি আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে পড়লে খুবই ভাল। যে কোন গ্রন্থাগারে গেলে যেখানে রোমাক সিরিজ, খুন্-রাহাওয়ানির ডিটেকটিভ গল্প, বোন আকর্ষণের উপন্যাস, আর অলীক উদ্ভট রাজ্যের শিশু সাহিত্য মুড়ি-মুড়কির মত পাওয়া যায়, সেখানে এইসব বই গ্রন্থাগারগুলির চরিত্র কিছুটা বদলে দিতে পারবে।

এটা গেল সাধারণ কথা। এবার আপনাদের প্রতিবেদনকে সমর্থন করে দু'চারটি বক্তব্য বলতে চাই।

আমাদের সমাজটা যদি বদলে যেত তাহলে হয়ত আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধিকে এত কষ্ট পেয়ে ঐ রকম একটা অপ্রিয় মন্তব্যের প্রতিবেদন রচনা করতে হত না। কিন্তু কী করবেন বলুন। বাঁরা এই রকম কাজ করেছেন তাঁরা সবাই কি ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবসায়িক স্বার্থ বিলুপ্ত দিয়ে, নিজেদের পাতি-বুজোরাহুলত নীমাবস্থতাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পেরেছেন? আপনি কিংবা আপনার বিশেষ প্রতিনিধি যদি ঐ কমিটিতে থাকতেন তাহলেও কি পারতেন?

কাজেই যেহেতু বইয়ের তালিকাটির মূল্য ৩০% বই কেনার সরকারী নির্দেশ রয়েছে, তাই তালিকা রচনার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই টাকার সম্পর্ক রয়েছে। প্রকাশকদের সঙ্গে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির কিছু সদস্যের পরামর্শ এবং পরোক্ষ টাকার বাঁধন এবং কোন ক্ষেত্রে বাকীর প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থার অগ্রনী ভোটার মধ্যে পরস্পর গা-চাটাচাটির রেশ কাজ করেনি, এ কথা জোর দিয়ে বলা সুখারি।

অর্থাৎ বর্তমান সমাজ কাঠামোতে অব্যবহৃত এই রকম জালের বহুনি থাকবেই। আগে বই কেনা ও কেনানোর ব্যাপারটা পুরোপুরি এবং স্থূলভাবে ঘূষ লেন-দেনের বৃত্তে, কাটকাবাড়ি ও ঝালান-কমিশনের

বৃত্তে, তেজা বাধার তেল দেওয়ার বৃত্তেই ঘুরপাক খেত, এবার দেখা গেল অস্তিত্ব 'অধ্যাত' অথচ প্রগতি-শীল বই ছাপেন, এই রকম কিছু প্রকাশকও বায়গা পেয়েছেন। এটা মিনেমোহে মন্দের ভাল ঘটনা।

কিন্তু নির্বাচন কমিটির মধ্যে দৈনন্দ শাহেজাদা, এম, পি মার্কম-বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি (আপনার 'কনাব শাহীজাদা' লিখেছেন) অধ্যাপক অশোক দাশগুপ্ত (যদি ইনিই গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতা হন), সন্তোষ শেন, সুনীল ব (জামদাম ইনি জামদাম বই এজেন্সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং প্রবীর রায়চৌধুরীর মত বিবি-গণ-সংস্থার স্বয়ং-মনস্ক প্রতিনিধি থাকতে কোন নিষিদ্ধ বা স্বজ্ঞে ভিত্তিতে পুস্তক তালিকাটি তৈরী হ-দেটা নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে বের করতে পারলাম না। আপা যদি এ ব্যাপারে সাহায্য করে পারেন বাধিত হবো।

মতামত

আপনাদের প্রতিবেদনে দুটি ভাবেই ধরেছেন, একই প্রকাশ ১০ থেকে ৩০ খানি বই বি-ব্যবস্থাপন দেওয়া হয়েছে। অশোভন। কিন্তু এটাকে বি-বলে ভাবতে (আনন্দ পাবলি-মিড বোব ইত্যাদি হাতে-গোনা কয়েকটি ব্যবসায়িক সংস্থার এ-চেটিয়ায় ভেঙে দিলেও) অস্বস্তি ও এবং এই অস্বস্তিকে সংশ্লিষ্টরা ব-তাঁদের বজুয়া যদি নিছক জালা বলে ভেবে উড়িয়ে দেন তবে তাঁদের প্রতি আগ্রহ কখনো জানি কমিটির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক-শেষ বক্তব্যটি বজুহি—প্রতিটি পাবলি-শায়ের ২টির বেশি নয় এবং প্রি-লেখকের ১টির বেশি নয়—এই রক-স্বজ্ঞে যদি তালিকা নির্মাণ করতে তাহলে সাধারণভাবে কিছুটা স্বাভাব-ঘটনার জন্য দিতে পারতেন।

সুনীতা ব

আমরা মনে করি

★ কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্ব-দলীয় মতামত নিয়ে।

★ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।

★ কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার সমগ্র ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দর্পণ

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

বার্ষিক ৩০ টাকা

সাপ্তাহিক ১৫ টাকা

ত্রৈমাসিক ৭৫০ টাকা

টাকাকড়ি ও চিঠি

পাঠাবার ঠিকানা

ম্যানেজার, দর্পণ

৬১নং মট লেন, কলিকতা

মুগাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি ও কিছু সংশয়

শ্রী দত্ত

শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিহ্নিত
যদি 'বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব' বলে
বিচার প্রচেষ্টা হয় তাহলে বুঝতে
কোন এক পক্ষের অবস্থানের
উদ্ভব হচ্ছে। পরিচালক মুগাল
ক'আনন্দবাজারের মতো জন-
প্রিয় পত্রিকাগুলিও এখন কয়-
প্রশংসা করছে। কিছুদিন
এই নাক চেপে ধরে মুগাল
এর ছবির প্রতিটি লিখতে।
বাজার পত্রিকা সম্বন্ধে আশা-
কোন এলাজ নেই, তবে এদের
মুগলের পদ্ধতি সম্বন্ধে সতর্ক
টি সঠিক বলে মনে করি।
র টিকি বাঁধা আছে ছিন্নিয়ার
মাহুদ থেকে সাদ্রাজবাদের
এদেশী শানক শ্রেণীর কাছে।
জই সঙ্গত কারণে এই চিন্তার
শ আছে যে, সেই আনন্দবাজার
মুগাল সেনের ভক্ত পরিণত
হবেন?

সংস্কৃতির হালচাল সম্বন্ধে ধারা
রাখেন তাঁরা একটা সাধারণ
জানেন যে, আনন্দবাজার যে
ছবির প্রশংসা করে থাকে সে
না কোমভাবে জনবিরোধী।
সেনের সাম্প্রতিক ছবি
'মুগল' এবং 'একদিন প্রতিদিন'
কি প্রশংসা অর্জন করেছে বলেই
চিন্তা দেখা দিচ্ছে। আমাদের
মূল্যায়ন বিষয়, কার অবস্থান পরি-
ত হচ্ছে।

বাংলা ভাষাভাষীদের সংস্কৃতি
এখন গোটা কতক নাটক আর
একটি চলচ্চিত্র ছাড়া তেমন আর
কিছুই চোখে পড়ে না। সাহিত্য
মিলিয়ে যে সংস্কৃতি তার নিমজ্জ-
ন অবস্থার মধ্যেও বিনয় বোধের
মাহুদের মাথাটিকে দেখা
জল। তিনি চলে যাবার পর
চটোপাধ্যায়, পরেশ ধর,
চৌধুরী প্রভৃতি গুটি কয়েক
তার আড়লে গোনা যায়।
গল্প লিখছেন জনগণের
স্থিত হতে পারছেন
ছোট পত্রিকাকে
অবস্থান। মং-
সংস্কৃত সুনীল-
মতো প্রচার
এবং চল-
মুগাল

বোস বা উত্তমকুমারের থেকে খুব
দূরে নয়। এটি একটি তথ্য; মুগাল
শেনকে আশা করা এর উদ্দেশ্য
নয়। এমন কি ধারা মুগাল সেনের
ছবি দেখেন না তাঁরা অনেকেই
ভেবেচিন্তেই দেখেন না।

প্রশ্ন হলো, এত বিস্তৃত পরিচিতি
নির্যে কী করছেন তিনি। জনগণ
অর্থাৎ যে জনগণ কোন না কোন-
ভাবে লড়াই করে চলেছেন তাঁরা কি
পাচ্ছেন তাঁর কাছ থেকে। তাঁর
বহুখণ্ডিত 'কমিটমেন্ট' কতটা কার্যকর
হচ্ছে তাঁর ছবিতে এবং একজন
সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে তিনি
কিভাবে সারিলা হচ্ছেন সে
লড়াইয়ে।

একথা মানতেই হবে, 'ইন্টার-
ভিউ' 'কলকাতা-৭১' থেকে তিনি
ছবিতে বেশব প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন
তার সঙ্গে বহুধরনী-নাসীকার-চেতনা
নামধারী সংস্কারের উত্থাপিত
প্রসঙ্গের কারাক আসমান জমির।
রুজ্জুসাদ-অজিতেশ বা অরুণ মুখো-
পাধ্যায়ের দল শব্দ মিজ বা উৎপল
দত্তের তুলনায় কর্মের দিক থেকে
সামান্য কিছুটা এগিয়ে গেলেও বিপ্লবী
সংস্কৃতি বা জনগণের সংস্কৃতি উপস্থাপ-
নার দিকে খুব সামান্যই এগুতে
পেরেছেন। কিন্তু জনগণের সংস্কৃতি
মুগাল সেনকে যেখান থেকে পেয়েছে
তার মূল্য স্বীকার করতেই হবে।
একাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালে চামুণ্ডা-
বাহিনীর আক্রমণে যখন সি সি এম-
এর মতো বিরাট রাজনৈতিক
দল পালিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি
এককভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে-
ছিলেন। মহান কবি সাংবাদিক
দয়াল দত্তের মতো তাঁরও একই
পরিণাম অসম্ভব ছিল না। সে ক্ষেত্রে
জনগণ তাঁকে মর্যাদার আদর্শে
বসিয়েছেন।

কিন্তু এই সাহস তাঁর আগে
অনেক গুলীজন দেখিয়েছেন। জন-
গণের পক্ষে থেকে চরম বিপক্ষে
বরণ করার পরীকার উত্তীর্ণ হয়েও
তাঁরা জনগণের সঙ্গে চরম বিবাদ-
যাতকতা করেছেন। এ দেশের
সাংস্কৃতিক কর্মীদের সারনে দলিল
চৌধুরী এবং উৎপল দত্তের মতো
নজিরের অভাব নেই। অনেকটা
সেই কারণে পৌরবের ইতিহাসের
উপর দিয়ে চলে আসা মাহুদের
সম্বন্ধেও ভাবনার অবকাশ আছে।
নির্মম ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা
হতে গিয়ে সব সময় আমরা যে
আচরণ বা বিশ্লেষণ করতে

পারি তা নয়, কিন্তু সে কারণে
বিচার-বিশ্লেষণের মুখ বন্ধ করে
ধেওয়া যেতে পারেনা।

'ইন্টারভিউ' 'কলকাতা-৭১'
'পদাতিক' 'কোরান' কতখানি শিল্প
হয়েছে এবং কতটা প্রোগান হয়েছে
সে আলোচনা রাখছি না। এই
ছবিগুলি প্রমাণ করছে মুগলসেনের
চলমান লড়াইয়ে মুগালসেন সারিলা
হয়েছেন এবং এ লড়াইয়ের সূক্তি-
যুক্তা তিনি মনে প্রাণে মেনে নিয়ে-
ছেন। 'এক আধুরী কাহানী' এবং
'মুগল'তেও দেখা গেছে তিনি
রিয়াস্টি করছেন। এখন দেখা গেল
'পরশুরাম' 'একদিন প্রতিদিন'ও
তাঁর বাম কোঁক অগ্ৰাহ্যত। তাহলে
সংশয় কোথায়? সংশয় আট নিয়ে
নয়, সংশয় প্রতিবাদের ধারা নিয়ে,
সংশয় একজন পরিচালকের অবস্থান
সম্বন্ধে বুজোয়া সমালোচকের চিন্তা-
ধারার পরিবর্তন নিয়ে।

এখানে অবশ্য শিল্প বনাম বক্তব্য
নিয়ে সেই চিরকোলে বিতর্কটো এসে
যাচ্ছে। এবং এই বিতর্কের অবস্থান
নিশ্চয়ই বুজোয়া পদ্ধতিতে হবে না।
যে কোন সমস্যার মতো শিল্পের
সমস্যার সমাধান হবে বস্তুগত এবং
পারিপার্শ্বিকের অবস্থান প্রসঙ্গে।
আমাদের রাজনীতি এবং সংস্কৃতি
এখন যে ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে চলেছে
সেদিক থেকে এখন বক্তব্যপ্রধান
ছবির প্রয়োজন কোন আলোচনার
অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত এই পরি-
কীর্ণ বিতর্কিতার মধ্যে বক্তব্যবিহীন
শিল্পমরতা নিঃসন্দেহে প্রতি-
ক্রিয়াশীল আচরণের মধ্যে পড়ে।
এমন কি যখন সাম্রাজ্যবাদের নয়
ধরন হিংস্র আক্রমণের পথ নিয়েছে
তখন পাখি শিকারের সঙ্গে হালকা
চালে ঘুঘু-বিরোধী বক্তব্যের ছবি
অসঙ্গত এবং বিপ্লবী সংস্কৃতির পথ
থেকে পিছিয়ে পড়। 'ভুবন মোহন'র
সীমারেখা যে তিনি অতিক্রম করে-
ছিলেন অসীম দক্ষতার খেঁটা স্বপ্নের
কথা, কিন্তু সে স্বপ্ন প্রলম্বিত হচ্ছে
কিনা সাম্প্রতিক ছবিগুলি দিয়ে
আবার সে সংশয় দেখা দিচ্ছে।
বুজোয়া সমালোচকের অববরত
জতি সেই আশংকাকে আরো
জোরালো করেছে।

'পরশুরাম' পেরিয়ে 'একদিন
প্রতিদিন'। 'পরশুরামে' শ্রীমেন
যে বিষয় নির্বাচন করেছেন তা অতি-
নব এবং নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক।
তিথারীদের অবলম্বন করে তিনি ব্যঙ্গ
বিদ্রোহে কোথাও কোথাও কেটে

পড়েছেন। কিন্তু একথাও মানতে
হবে সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন থেকে
তাঁর নজর বেশী ছিল প্রধান দুটি
চরিত্রের ওপর। এবং সেই সূত্রে
চরিত্র হিসাবে পরশুরাম যতোটা
শিল্পমর ততোটা বিজোহী নয়।
শ্রীম মজুমদারের চরিত্রটিও প্রতি-
বাদের পথ থেকে সরে গেছে এবং
একটি সাধারণ বিভ্রান্তিকে তুলে
ধরাই যেন তাঁর লক্ষ্য। সর্বোপরি,
পরশুরামের তথাকথিত ওপরে ওঠার
সঙ্গে মৃত্যুকে যোগ করলে তার নিঃ-
বিশ্বস্তত বিপ্লবীমানার কোন
সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং
মনে হয় এ জাতীয় পরিণাম বাস্তবিত
ছিল। বাচার যুদ্ধে নেমে মৃত্যু এবং
সে যুদ্ধ থেকে দূরে সরে প্রতিরোধ-
হীন বক্তার মধ্যে মৃত্যুর ব্যবধান
অনেকটা। বস্তুত প্রতিবাদহীন
পরশুরাম বা পরশুরামের দুর্গমার
কিছু চিহ্ন ছাড়া আমরা বিশেষ কিছুই
পেলায় না। পরশুরামের কাল্পনিক
বিজোহকে পরিচালক কলনার উপে-
নিয়ে যেতে চাননি। ঠিক এইখানেই
অর্ধেক পথ থেকে সঠিক পথ ছেড়ে
ছবিটি তথাকথিত আট ফিল্মের দিকে
ঝুঁকি পড়েছে।

এই কাহিনীর সূত্রধর হিসাবে
রাস্তার খেলা দেখানো যে যোগা
ছেলেটিকে বাঁপের ডগার ঝুলতে
দেখা যাচ্ছে তার ইতিহাসটি নিঃসন্দেহে
অসাধারণ। কিন্তু ঐরকম চড়া সূত্রে
তো মূল কাহিনীটি বলা হলো না।
যে ছেলেটি বাঁপের মাথার ঝুলছে
সেও তো একরকম করে সংগ্রাম
করছে কিন্তু তার সঙ্গে পরশুরামের
সংগ্রামের গভীরতার পার্থক্য আছে।
আর এই পার্থক্যটাই ছবির
বক্তব্যের ধার কবিরে দিয়েছে।
তাছাড়া পরশুরামের অভিনয়ে ফ্যান-
টাসি কমিক ইত্যাদি টেকনিকের
আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে দেখে দৃষ্টিই
বোকা যায় যে শ্রীমেন সহজ পথে
যেতে চাইছেন না। তিনি পদার
ঘাটে পদা কুড়ানোর যে দৃষ্ট দেখি-
য়েছেন তার স্বেল যে থাকছে না,
আঙনের তাপ যে কমে যাচ্ছে এ
তিনি ভাল করেই জানতেন।
তিথারীদের ভেরাগুলিকে ভেঙে
দেবার মতো করণ দৃষ্টকে তিনি ইচ্ছা
কৃতভাবেই পরশুরামের 'বিলি
হয়ে গেছে' বলে অটহাস্যের
প্রতিশোধাত্মক বিষয়ে পরিণত
করেছেন। এখানে ব্যক্তি পুলিশের
ঘাড়ের দিয়ে আঘাত পেয়েছে।
পরশুরামের এই আঘাতটি নিশ্চয়ই

বাস্তবিক এই সূত্রে এই জাতীয়
বাস্তবের অনেক ওপরে প্রাধান্য দাবী
করছে বিশাল হতভাগ্য মাহুদের
প্রশ্ন, নিরাপত্তার প্রশ্ন, মাহুদকে
সাধারণ করে মাহুদ বলে গ্রহণ কর-
বার প্রশ্ন। মুগাল সেন কিন্তু
আর্টের প্রয়োজনে একটি পরশুরামকে
বাস্তব করে তুলবার জন্যে হাজার
পরশুরামের অপমানকে মেনে
নিলেন। বরং ভেলে আবার বর
হলো এবং তার ফলে সমস্ত অ্যা-
চারকে শেন গা-দওয়া করে দেখানো
হলো। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বদলে
মেনে-নেওয়া প্রাধান্য পেয়ে গেল।
পরিচালক যে রি-এ্যাক্টি করতেন তা
বোকা গেল না। এখানে উল্লেখ
করতেই হয় যে তাঁর ছবিতে আমরা
আপাত উদ্বেগবিহীন কিন্তু পরিণামে
কারোমী কার্যের সেবার নিমুক্ত
মৃত্যুঞ্জয় রায়ের মতো পাট ফিল্ম বা
বিশ্ববিখ্যাত ফিল্ম আশা করি না।
মৃত্যুঞ্জয় রায় অথবা এরকম ছোট-
জোকদের নিয়ে ছবি করার কথা
ভাবতেই পারেন না।

পরশুরামের এই বাটটি 'একদিন
প্রতিদিন' আরো প্রকট হয়ে দেখা
দিচ্ছে। এ ছবিটি স্বাভাবিক
ভাবেই 'ভুবন মোহন' কথা মনে
করিয়ে দেয়। এটি যে একটি নিচ্ছিন্ন
আর্ট ফিল্ম হয়েছে তাতে সন্দেহের
কোন অবকাশ নেই। একেবারে
বিষয় নির্বাচন থেকেই ছবিটির
গলহ। ভেলে যাওয়া সাংস্কৃতিক
ব্যবস্থায় কলকাতার মতো কস্মো-
পলিটান নগরে একটি চাকুরে মেয়ে
রাতে বাড়ি ফেরেনি—বিষয় হিসাবে
খুবই সাধারণ। একে অবলম্বন করে
পারিপার্শ্বিকের আক্রমণ সাদৃশ্যী
আক্রমণের মতো হয়নি, হওয়া
সম্ভবও ছিল না। বরং বাড়ির
মধ্যেই এক প্রগতিশীল তাড়াতের
কার্যক্রমী মর্মবন সমস্ত পরিবেশটিকে
সহায়ত্বমূলক করে তুলেছে।
চাকুরে মেয়ে বাড়ি এল না বলে
বাঁপ-রা তাইবোনের চিন্তা-ভাবনা
মূলত অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিক
থেকেই যেন বেশী প্রকট হয়ে দেখা
দিচ্ছে এবং এই ভাবনা সামন্ত-
তান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে তেমন খাপ
যায় না। তাছাড়া এই ঘটনা অব-
লম্বন করে যেভাবে সারাসাত
আলোকময় কলকাতা, ঝকঝকে
তক্তক্তে বর্গ হাসপাতাল, দাক্ষণ
কর্তব্যপূরণ পুলিশ দেখানো হয়েছে
তা যেমন হাস্যকর তেমনই অবাস্তব।
অবাস্তব আরো অনেক কিছু। অবাস্তব
ঐ বাড়িগুলি, থাকে ক্রেমে আটা
সামন্ত প্রভুর মতো মনে হয়। অস্ত
তাড়াতের আচরণ ঘোটেই স্বাভাবিক
শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়

গ্রন্থ পরিচয়

রাজনীতি-সচেতন কবিতা

অরবিন্দ পোদ্দার

ব্রাহ্ম্য পদাবলী ১১

সম্পাদনা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিবেশক : উচ্চারণ, কলকাতা-৭০। চার টাকা।

মাহুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আলোকে নিজেকে ও জীবনকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁরা নিঃসন্দেহে লক্ষ্যের অন্বেষণে। নিত্যই অল্প, বিশেষ করে বর্তমান কালে ও সমাজে যেখানে ভালবাসাহীনতাই মেঘমাংসে ফীত হওয়ার একমাত্র উপাধান। সেই অল্প সংখ্যক মাহুষেরাই তাই এখানে কোনপ্রকার স্বত্ত্ববোধ করেন না, তাঁদের অল্পতবে ধরা পড়ে পৃথিবী এক অরণ্যের ভয়ঙ্কর, বার্ষিক শুভবুদ্ধিহীন, হিংস্র। এই সামাজিক রাজ্যিক ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁদের চিত্ত হয় বিমূঢ়, হৃদয় বেদনাহত, আর ক্রোধে হয় দীপ্ত। পুনশ্চ, বাকহীন মাহুষের যুগ্মকে বাণ্য করে তোলা এবং শাস্ত আকৃতিতে প্রবাহমান রাধার যে কবিতাজল হারিয়ে, সেই হারিয়ে যে স্বীকৃতিতে তাঁদের কবিতাপন হয় চকল, পতিময়।

এমনি সামলভবির অধিকারী বীরেন্দ্র কবির কিছু সংখ্যক “ছড়া ও সাধামাটা” কবিতা নিয়ে এই সংকলন। বৃহৎ কিছু দাবি এই সংকলনে নেই, যেমন নেই এই বিশেষ কালের প্রতিনিষিদ্ধ করার অহংকার। তবুও একটা কথা থেকেই যায়, সংকলিত এইসব ছড়া ও কবিতার যে স্পষ্ট বক্তব্য, বাচনভঙ্গি ও প্রেরণের বোধ তা নিশ্চয়ই এই সময়েরই। একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, স্পর্ষিত ধারা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনীতি সচেতনতা এই সংকলনের প্রাণ; ব্রাহ্ম্য শব্দটিতে তারই ইঙ্গিত বহমান। নব্ব্বক যে অস্তিত্ব বা হ্রত আশ্রয় দেয়, আশ্রয়ের ও নিশ্চিন্তির আশ্রয় দেয়, তা তাঁদের

কাম্য নয়; হলে, এসব ছড়া ও কবিতা কখনো রচিত হতো না। বরং একটি সর্বক আশ্রয় ঘোষণা দ্বারা ব্যক্তি ও সামাজিক চৈতন্যকে প্রহার করে করে মাহুষকে আন্তরিক জানা যায়, ভাগ্যত করা যায়, এক প্রবল লক্ষ্যে সমবেতভাবে উন্নীত হওয়া যায়, সেই উদ্বিগ্ন বোধ তাঁদের মানস পরিমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে গেছে। পুনরায় বলি, প্রবল মানসের মধ্যেই এই প্রত্যয় অল্পচ্যুত থেকে গেছে।

অতীবই, বদশ, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, এবং এই রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারক ও বিধায়ক অথবা পুতুল, তাঁরা বিভিন্ন রূপে ও উপলব্ধিতে কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছেন। প্রথম বদশ অল্পতবেই একটি মজির উপস্থাপিত করা থাকে। দ্বিতীয় প্রাণ সমস্ত কবিতাতেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে এই উপলব্ধি পাওয়া যায় আছে; তথাপি সামলভব হক ও পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের করে কবিতা পৃথিবীর মহারতায় লকল উপলব্ধি করে করা যাবে। সামলভব উপলব্ধি করেছেন

তবু খুশি হাট্টা
জন্মেছে এই দেশে
তবু, শাশান বাটটি মা
খাঙ্ক রাঙার বেশে (তবু খুশি)
এবং পুনরায় বেদনার বিজ্ঞে আর্ত
নাড় করে উঠেছেন
তুই যদি মা খেতে না হিস
মাংস খাবো তোর
বলে দিলুম দিখা
ঘাট ঘাট ঘাট তুই যদি খাস
রাঙার খাবে কিতা
(বাওরা)

এর লগ্নে পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরোদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলো সংযোগ করলেই আজকের ভারতবর্ষের আর্ত ক্রিষ্ট চিহ্নটি পূর্ণ হয়—
জ্বলা জ্বলা বলে কার

অল্পতবে খাত।
তুমি তবু নির্মমতা দেখছো
হুঁবেলা।
হৃদয়ের শিক্তকে হৃদয় দিতে গিয়ে তবু
নারীও দেখেছে তার বুকের
কলসে আর হৃদয় নেই,
বা আছে তা বিব ত—ধু বিব।
পবিত্র গঙ্গার জলে ভেসে যায়
নীল শিক্ত
ভেসে যায় আশ্রয়নাশী
দুখার শরীর
(কার অল্পতবে)

এই রচনা বাস্তবের অপর নাম ভারতবর্ষ। অল্পতবে লকল গৌরব আজ অগৌরবে পর্যবসিত, যা প্রতি মুহূর্তে লকলকে কণাঘাত করছে, চৈতন্য শানিত উদীপ্ত হবার উপাধান উপহার দিচ্ছে।

তেরমি প্রথম ও লকলভেদী ভারতীয় দোআঁশলা গণতন্ত্রের বোধ। চকল চট্টোপাধ্যায় তো বহুদিন আগেরই একে “সঙবিধান” বলে উপহাস করেছেন; তাঁর অনবত্ত কবিতাটি “অথ সঙবিধান” এই প্রবল সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে তারাপদ লাহিড়ীর ছড়া “গণতান্ত্রিক সমাজবাদ”, দেবব্রত ভট্টাচার্যের “বুঝিনে বাপ লম্বা-তনতর”, দামহুদ হকের “গণতন্ত্র” প্রভৃতি উদীপক কবিতা। লভ্যই বিচিত্র এই ব্যবস্থা—এখানে লাপ, নেউল, ছাগল, বাঘ লকলের মুখেই গণতন্ত্র ও লম্বাভবের বুলি। এর মধ্যকার যে রাঙ্কসে ফাঁকিটুকু তা লবে দমন শীল কবি চিত্তে বিকোলের কোথের সকার না করে পারে না। এই সব গণতন্ত্রী এবং গণতন্ত্রের ক্রীতদাস পুতুলগুলোর প্রতি সব কবিই নির্মম, নির্মমতম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছুটি উদ্ভৃতি দেবার মোড় সংবরণ করতে পারছি না। প্রথমটি “অথ মন্ত্রী কথা” থেকে—

মেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো
মরে রয়েছে;
মন্ত্রী হবার সময় বুড়ো
নেচে উঠেছে।

দ্বিতীয়টি “ভারতবর্ষ ও গোপালের মা” শীর্ষক ছড়া-কবিতা, যেখানে তিনি বিপদগ্রামী বিদ্রোহীস্বপ্নকারী প্রাজ্ঞান বিপ্লবীদের চরিত্র উন্মোচিত করেছেন। বিপ্লবী লস্কাৎ বিকিয়ে দিয়ে বীরেন্দ্র আশ্রয়ের এবং আর্থিক নিশ্চিন্তির পথ ধরেছেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

কল্য হিনেন টেরোরিস্ট
অন্ত তাঁরাই-ট্যারিস্ট;
দিল্লী থেকে জিতে আনলেন
‘হিপ, হিপ, হুরিস্ট’—

একটি করে তামর পাত।
কারণ তাদের লম্বা হাত.....
দিয়েছে হুরহুরিস্ট।
কিন্তু; এই ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তি শেষ বা চরম কথা নয়। তার পরেও থেকে যায় অপেক্ষা-ভীষণ, দীপ্তির, প্রতি-রোধের কথা। সে কথাও এই বঙ্গ-কলসের গ্রন্থটির পাতার পাতায় ছড়ানো। এই কথার মধ্য দিয়ে মাহুষের যুগ্ম চিত্রিত বিকৃত হয়েছে, আর বর্তমান কাল কবিত্রয়ের আশ্রয়তর্য অমির ভক্ত আনিচ্ছে আকুল আবেগ। হু-একটি উদাহরণের মহারতায় তা পরিচর গ্রহণ করা থাকে। লম্বীর রাঙ্ক অল্পতবে তাঁর লম্বী অথবা ধার্মীর নির্দেশ ভ্রমকে পেয়েছেন রঙের প্রবাহে—
সর্বশাসীর জলে ভেসে
বলেছে সে
তোম শরীরে একটি মন্ত্রীই গর্তমান

পাথর ভাদে গান : ‘মামি মা’। আর এই ‘মামি মা’র লকলই অমিত হানের কবিতার বৃত্ত হয়ে ওঠে এক অপরিস্রব আশ্রয়বাসে : লাপের মাধার পা দিয়ে সে নাচে—
কান্না কেন কান্না কেন তোর ?
বক্তা থরা মড়ক বুকে বাঁচে,
ভাবনা কেন ভাবনা কেন তোর ?
তুই কি ভাবিস
তার ঘুরে নেই যুগ্ম নেই ?
আছে ;
লাপের মাধার পা দিয়ে সে নাচে।
কান্না কেন ? কান্না কেন তোর ?

(কান্না কেন ?)
না, কান্না নয়; কবিরের সমবেত আশ্রয় আর মুখর বাণী, কেউ যেম আর না কাঁদে। কেন না কান্নার দিন আর নেই। এখন অল্পতবে-ভর বিশ্বাসে দ্বিত হবার লগ্ন; ‘পায়ের নিচে হুঁসছে মাটি/মাধার ওপর রক্তমাধা প্রাকাল/তাকাল, তোরা বাজাপথে মাধার ওপর তাকাল।’ (পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়) এই যুগ্ম আশ্রয় প্রতিরোধ প্রলয়ের কলরব পার হয়ে মানব-বিশ্বের লভ্যতার উপনীত হবার আশ্রানে হৃদয় পুঙ্কিত রোমাঙ্কিত হয়। মতুম জীবনের বাণী অমিত ভক্ত হুর বাক্যে। লকলক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক ভক্ত আশ্রয়ের লকলের ধন্যবাদের পাঙ্ক।

অবশ্য, উপরি উক্ত বিশ্লেষণের অর্থ এ নয় যে, কবি-কৃতিতে সব কবিই লম্বার সার্বক, অথবা লম্বার দল। তা নয়, এবং হতেও পারে না কখনও। তারাপদ লাহিড়ী একটা লম্বার মধ্য সার্বক; বঙ্গ-সাজিক বাক্য-বন্ধ বা মাতিদীর্ঘ কবিতার তাঁর মনন ক্ষুতি লাক করে, কিন্তু লম্বা অতিক্রম করলেই তা শিথিল হয়ে পড়ে, কাণ্ডিক একা-গ্রতা বিনষ্ট হয়। আরও হু-একজন কবি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য; নামোজেন থেকে বিরত থাকলাম। তথাপি, সামগ্রিক উদীপনার ভক্ত বর্তমান আলোকে লকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

চৌদশ হিজরী মহাসম্মেলন

আন্তর্জাতিক ১৪০০শ উৎসব উদযাপনের যোগসজ্জা রেখে কলকাতার শহীদ মিনার হানে ১১শে জানুয়ারী থেকে কাল ব্যাপী শুরু হচ্ছে চৌদশ মহাসম্মেলন। কলকাতার মিনার ময়দানে মুসলমানের ধর্মের ধর্মীয় ও লাতুফি এই প্রথম। সম্মেলনে কল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ব বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম ও সংস্কৃতির নানা অবদান ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সেমিনার, ভাষাতাত্ত্বিক লাহিড়ীর এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে লম্বী ভাবধারার রচিত গ্রন্থাবলী পাণ্ডুলিপি ও প্রবন্ধাদির প্রবাহ অহুস্তিত হবে। এছাড়াও হবে লম্বী জালসা, লম্বীভারতীয় মুশলিম কবি সম্মেলন ও মুশাওয়ারা। মুসলিম ইনস্টিটিউটের দোতালার গঠিত ১৪০০শ হিজরী সেমিনেশন কমিটির উদ্যোগে এই মহাসম্মেলনের আয়োজনের প্রস্তুতি জোর কন্ডে এগিয়ে চলেছে। কমিটির সভাপতি বিচপতি জমাব এস, এ মামুদ, জেনা সেক্রেটারী ডঃ বানাল শাহ, কাদ, কমিটিতে রয়েছেন জমাব এরাফ-তাহের, কলিমুদ্দিন শামশ, ইক, হারাত খান, এস এম আব্বাস, তান আহমেদ, শেখ আনো আলী, তাহের চিটিওয়াল, আতা করিম বার্ক, কে, জি, হোশান প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অর্থনীতি

৩য় পৃষ্ঠার পর
কুবক ও ক্ষেত মজুরদের আন্দোলনে
বিক্রমে বিক্রয় করে তুলতে চাইছেন
এই পরিস্থিতি লম্বা নয় বা
অত্যন্ত কঠিন। শহরের ট্রেন ইউ
নিয়ন আন্দোলন ও গ্রামীণ ক্ষেত
মজুর ও কুবক আন্দোলনকে একত্ব
করে গ্রাম ও শহরের এই উজ্জ্বল
শোবক প্রতীকেই আজ পরাত
লম্বা। এই একত্ব করার
লম্বা হতে পারে যদি গ্রাম ও
ক্ষেতের তরতুকি দিয়ে
প্রয়োজনীয় জিনিস
হয় এবং এই তরতুকি
গ্রামের বিস্তারিত
বলিয়ে আদায় করা
উৎপাদন খরচের
জাত পণ্যগুলির
ধেওয়া হয়।
বাড়বে না
দেখা যাবে
মামি

শান্তিফল গ্রন্থ পুস্তক পর্বে

সাতক ও সাতকোত্তর পর্বে পর্ব প্রকাশিত
করেকটি বাংলা বই

১। ভারতের শাসন ব্যবস্থা / শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য / ২০০০
২। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (২য় সংস্করণ) / ডঃ সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য / ১৮০০

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক ঘোষার, কলকাতা-১৩

টম ও নবজীবনের গান

হির সেনগুপ্ত

বাধীনতা মানুষের অঙ্গগত অধি-
শিত যখন পৃথিবীতে আসে
কিছু নিয়মেই নে বাধীন, কিন্তু
কিছু মানুষের লোভ, নীচতা,
স্বার্থকে কলুষিত করে। ধীরে
মানুষে মানুষে ভেদ-বিষেবের
বনের পথকে বন্ধ করে
করে মানুষ সামাজিক
জীবন তিত গড়েছিল। মুক্ত পানীকে
জী করার অস্ত্রকে স্বীকার
নতে হয়েছিল সমাজের সাম-
কলাপের খাতিরে, কিন্তু এই
কে ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-
মুনাফার প্রয়োজনে ব্যব-
বটনা মানব সভ্যতার ইতি-
বিবল নয়। এরই জের টেনে
যুগে যুগে মানুষ মানুষকে দাসে
পত করেছে। ধর্ম ও আইনকে
বিকৃত করে সমাজকে করেছে দূষিত।
এর স্রষ্টা উদাহরণ দাস ব্যবস্থা।
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান
স্বর্গের পেছনে দেই সব হতভাগ্য-
অবদান অপরিণীত, যার সঠিক
রন আজও হয়নি। সমাজ
র থেকে পায়ের জোরে যাদের
করে এনে আমেরিকার
কর বেচা হত তাদের অপমান,
তুল, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও
যের ইতিহাস আজও পাথর
। আহন আমরা তাঁদের কথা
তু ভাবি।

আলেক্স হেলি র উল্লেখ সপ্তম
কুণ্ডা কিওকে গহন আফ্রিকার
রা রাজ্যের এক শাস্ত, নিবিড়
ন সভ্যতা সংস্কৃতিতে সমাহিত
থেকে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছিল

না জেলে বন্দীহত্যা

তার পর
দের লাশ তাঁদের আত্মীয়
র কাছে ফেরৎ দেওয়া হল
ই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে
ধী হলগুলি বোধভাবে ২২
ই বিকেলে শহীদ হাদিস পার্কে
জনসভা করে, মিছিল বের
গোপান উঠে, 'জেল হত্যার
র চাই।'

স্বদেশী মুকুলকে কিভাবে মারা
হয়েছে, শুধন। খুলনা জেলের
ওয়ার্ড। চারিদিকে আহত
ও হাজতী, ডাক্তার নার্স
দের পরিচর্যা ব্যস্ত। সময়,
৩০-৩০ মি, যন্ত্রণার কাণ্ডার
গরে গেছে ওয়ার্ড। কয়েক-
শ এসে ঢুকলো। আহত
মুকুল চন্দ্র হাত ধরলো।
কমল মেঝেতে বিছিয়ে তাকে

সাদা চামড়ার সভ্য কিশোরী দাস-
ব্যবসায়ীরা এবং বেচে দিচ্ছেছিল
আমেরিকার দাক্ষিণাত্যের - এক
চাবীর কেত কাহারে কাজ
করে পত্তর ও অধম জীবন যাপনের
জন্ম। কিন্তু মুহূর্তের অন্তঃসে মুক্তির
স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি। চেষ্টা করেছে
বার বার পালিয়ে যেতে। ধরা
পড়ার মাতুলও দিতে হয়েছে অমায়-
বিক অত্যাচার সহ্য করে। এমনকি
সে যাতে পালাতে না পারা এতজ
তাই পায়ের পাতা কেটে নেওয়া
হয়েছে। তারপর একদিন একটি
কালো মেয়েকে ভালবেসেছে সে,
বিয়েও করেছে তাকে। কন্যাকে
শিখিয়েছে আফ্রিকার ভাষা, সেখান-
কার মানুষের সংগ্রাম, সভ্যতা ও
সংস্কৃতির কথা, মেয়েটিও বিক্রি হয়ে
গেছে একদিন। এইভাবে চলছে
অনেকদিন। বংশোদ্ভূতভাবে তারা
কিন্তু দেখেছে মুক্ত আফ্রিকার স্বপ্ন।
রক্তের ভেতর রয়ে গেছে সাহস ও
আত্মসম্মানবোধ, শত অত্যাচারেও
যাকে নষ্ট করা যায়নি। পরে আইন
করে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে,
অবশ্য কালোদের প্রতি মহাহুত্বভিত্তে
নয়, বাহ্যিক সভ্যতার বিকাশের
প্রয়োজনে। পূর্বপুরুষের আত্ম-
সম্মানবোধ অক্ষুর রেখে বেঁচে থাকার
সংগ্রামকে জুটিয়ে তুলেছেন হেলি তার
'কটন' উপন্যাসে।

টি. ভি.র জন্ম উপন্যাসটিকে চল-
চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়। কাহিনী
চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের দুই ভঙ্গীকে
মিলিয়ে তৈরি এই ছবিটির দৈর্ঘ্য প্রায়
ন বট্টা, যা সম্প্রতি কলকাতায়

ভাইয়ে ছিল।
মুকুল বুঝতে পারে, কি ঘটতে
চলেছে। এমনি করেই নিয়ে
যাওয়া হয়েছে আলী আকবর, তার
বড় ভাই দাসহ ও আরো অনেককে।
ওরা কেউ ফিরে আসেনি। মুকুল
আবেদন করলো, বা হবার হয়ে
গেছে, আমরা তো সারেগার
করেছি। আবার কেন নিয়ে
যাচ্ছে?
কমলটাকে উঁচু করে ওয়ার্ডের
বাইরে নেওয়া হল। মুকুলকে জোর
করে কমলের মধ্যে মুড়িয়ে দেওয়া
হল। একজন পুলিশ এবার একটা
মোটো রড নিয়ে কমলের উপর
শিটিকে চললো। কমলের মধ্য
থেকে মুকুলের গোড়ানির আওয়াজ
জেলের বাইরে পশ্চিমে সদর হাস-
পাতালের মধ্যেও শোনা গেছে।
হঠাৎ মোড়ানো কমল খুলে গেল।
বিদ্যুৎ গতিতে মুকুল ছুটে ১১নং
ওয়ার্ডে ঢুকলো।

ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন
এজেন্সির উদ্যোগে দেখান হয়েছে।
সোজাজি গল্প বলে যাওয়া হয়েছে
ছবিটিতে কিন্তু প্রথমার্ধের নিপুণতা
শেষের দিকে অনেক তলে হয়ে
আসে। আফ্রিকা, জাহাজের খোলে
বেঁধে রাখা কালো মানুষগুলি, তাদের
বিক্রি, খামারের জীবন, পালানোর
চেষ্টা থেকে কন্ডার বিক্রি অধি
বক্তব্য ও উপস্থাপনার যে নিগূঢ়
বাস্তবতার ছাপ আছে তা আমাদের
মনের ভেতরকেও নাড়া দেয়। কিন্তু
পরবর্তীকালে উদ্ভেদক ঘটনা তৈরির
চেষ্টা অনেক কষ্টকল্পিত বলে মনে
হয়, ফলে সত্যের স্বাদ ছবিসম
ছড়িয়ে থাকলেও রাঁধুনি ঢিলে হয়ে
আসে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে
ইতিহাসকে বিচারের চেষ্টা নিশ্চয়
যুক্তিযুক্ত কিন্তু তা সবেও মনে হয় এ
ধরনের তুলনাবিহীন অত্যাচার-
অবিচারের ঘটনাবলী চিত্রিত
করতে গেলে অসুস্থতির
আরো তীব্রতা প্রয়োজন। নির-
পেক্ষতার ঘোহাই দিয়ে অত্যাচারী
শোষকের প্রতি মহাহুত্ব বিন্দুস্বাক্ষ
দেখানও অমার্জনীয় অপরাধ বলে
গণ্য হতে পারে। ছবিটির কিছু কিছু
অংশ এ দোষে ছুট। ছবিটির বিভিন্ন
অংশ একাধিক চলচ্চিত্রকার পরি-
চালিত বলে এ ঘটনা ঘটেছে এ ধারণা
হতে পারে।

কলাকৌশলের দিক থেকে ছবিটি
অতি উচ্চমানের। বিগত দিনের
রূপায়ণ নিখুঁত। অভিনয়ে অধি-
কাংশই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে
বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেগুলিকে জুটিয়ে
তুলেছেন। ছিন্নমূল মানুষের মাটির
মলে যোগ স্পর্শ করে নতুন করে
নতুনভাবে বাঁচার সংগ্রামে এ ধরনের
ছবির সম্মান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

ছ-তিনজন পুলিশ মুকুলের হাত
ধরে টানতে থাকলো। পুলিশ
তাকে টেনে নিয়ে আবার কমলে
পেঁচালো। তারপর অমায়িক-
ভাবে লোহার রড পেটাতে
লাগলো।

মুকুলের গোড়ানি থেমে যেতে
ওরা মনে করলো যে মুকুল মরে
গেছে তাই কমল খুললো। না,
এখনও বেঁচে আছে। অপ্রাণ্য
গালি দিয়ে আবার শুরু হল রডের
ধোলাই। একটা চোখ তার
বেরিয়ে এল। না, মরেনি এখনো।
তার অগোষ্ঠ্য চ্যাপ্টা করে দেওয়া
হল। তবুও মরেনি। এখন
পুলিশ তার গলার উপর উঠে
দাঁড়লো। এবার সব শেষ। এট
রকম শৈশাচিকভাবে অজ্ঞদেরকেও
মারা হয়েছে।

মৃণাল সেনের সাম্প্রতিক ছবি

এম পূষ্ঠার পর

হয় নি। তাছাড়া সমস্ত ছবিটিতে
কোনো ঘটনা না ঘটলে নারিক
উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রাকশন ঘটলে
দিয়ে তার অভিমান-কোডের উত্তর
যুগিয়ে দেওয়াও খেন কেমন অসম্ভব
বলে মনে হয়।

এই ছবিতেও মৃণাল সেন প্রতি-
বাদের সোজা পথ ছেড়ে অস্ত্র পথের
আশ্রয় খুঁজেছেন। মেয়েটির বিপ্লবী
প্রেমিকের প্রসঙ্গটি তুলে ধরলেন না।
অকিলে ডেমলফ্রেশনের জন্তে সে যে
কিয়তে পারেনি সে তথ্যটি পর্যন্ত
তিনি পরিবেশন করলেন না। দর্শক
জানতেই পারলেন না মেয়েটির
ত্যাগের উৎস কি এবং এই রাতে
তার বাড়ি কিয়তে কেন দেয়ী-হলো।
আমরা শুধু বুঝলাম মেয়েটি কোন-
রকম রাজনীতির সংস্পর্শ ছাড়াই
এককভাবে সংগ্রামী বা ভাল মেয়ে।
আর তার অভিমানে বুঝলাম তার
জীবনব্যাপী ত্যাগের বিনিময়ে
মাত্র কয়েক বট্টা দেয়ী করে বাড়ি
কেন্নাকে কেউ মেনে নিচ্ছে না।
কিন্তু এর মূল কোথায় এবং ঠিক
কিভাবে এ সমাজে মেয়েরা অত্যা-
চারিত হচ্ছে তার কোন বিশদ
বিবরণ ছবিটিতে অসুপস্থিত। শুধু
একটি উৎকর্ষকে শাস্ত মেজাজে
সারাক্ষণ উপস্থিত করে রাখা হলো।
মেয়েটিকে যখন দেখা গেল তখন তো
মনেই হলো না সে ও বাড়ির মেয়ে।
তার বোনের কৈফিয়ৎ সবেও তার
সফিসটিকেশন আড়াল করা যায়নি।
অতএব দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের শুধু
মেয়ে বলে শোষণ করবার যে সামন্ত-
তান্ত্রিক কার্যদা, বা প্রমিক বলে
নিঙড়ে নেবার যে বুর্জোয়া কৌশল
কোনটিই ছবিটিতে প্রাধান্য পায়নি।
অথচ এই বিষয়ে একটি অতি
সাধারণ গল্প 'মেয়ে ঢাকা তারা'কে
ঋদ্ধিক বটক অনেক দূর নিয়ে
গেছেন, অনেক গভীরে নিয়ে
গেছেন।

তবু 'একদিন প্রতিদিন' এমন
অরূপণ প্রাণশো পেল কেন। কেনই
বা বিশেষে মুহূর্তটীনে রাজার সম্মান
পেল এইটিই আমাদের প্রশ্ন। যে
কারণে মৃণাল সেন নিপীড়িত
মানুষের পক্ষের পরিচালক সেকারণ
এ ছবিতে কোথাও খুব একটা
প্রাধান্য পায়নি। উন্নত মানের শিল্প-
কর্ম থাকলেও উন্নত মানের বক্তব্য
আছে কি? আন্তর্জাতিক সম্মানের
প্রশ্ন তুলে লাভ নেই কারণ এ
মানকাঠিকে ভুবিরে ছেড়েছে
সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত'।
অবশ্য মৃণাল সেনের প্রেষ্টম
সম্মোহাভীত। কারণ অশনি
সংকেতের ক্ষেত্রে একটি ভাল গল্পকে

জোলাকরে দেওয়া হয়েছে, অস্ত্রদিকে
'একদিন প্রতিদিন' একটি অতি
সাধারণ গল্পকে অসাধারণ করে
দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য
পরিচালকের এই প্রচেষ্টা খুব একটা
কলপ্রস্থ হয়নি কারণ তিনি হাস-
পাতাল, অপারেশন থিয়েটার, নার্স-
ডাক্তার সব দেখালেন, কিন্তু অসুস্থ
মানুষটিকে দেখালেন না আর
দেখালেন না তার রোগটি কী,
সারবেই বা কেমন করে।

পরিচালকের প্রতিক্রিয়া মোট-
কথা প্রতিবাদের রূপ নিল না।
তিনি আটখাটী বাধলেন কিন্তু যুক্তি
হলো না। সম্ভবতঃ এই পরিমিত
অর্থাৎ অনাক্রম্যাত্মক প্রগতিশীল
আচরণ বুর্জোয়া বুদ্ধিবীর্ষদের পক্ষে
বড় আনন্দদায়ক, বড় সুখের। এই
কারণে শ্রীমেনের মাথার ওপর বসিত
হয়েছে অস্ত্র চাটুগাফা। 'দেশ'
পত্রিকার 'একদিন প্রতিদিনকে'
দেখানো হয়েছে তারতীর মনীষার
সবচেয়ে উজ্জল উদাহরণ হিসাবে।
এইসব স্তুতি প্রমাণ করছে মৃণাল সেন
এই ছবিটিতে তিনি পক্ষের কাউকে
ঠকিয়ে থাকতে পারেন—মানন্দ-
বাক্যের মতো পত্রিকাগুলোকে,
সংগ্রামী জনগণকে, না হয় নিজেকে।

আমরা, তাকে একটি তথ্য স্মরণ
করিয়ে দিতে চাই। তিনি সত্যজিৎ
রায়ের মতো নাম কিনতে পারেন নি
এবং তাঁর ছবি যাদের জন্তে নির্মিত
এখনো তাদের কাছে পৌছাতে তিনি
পারেন নি। তা সবে সারা তারতের
বেশ কিছু নয় এবং যোগ্য পরিচাল-
কের নেতৃত্ব কিন্তু তাঁর উপরই
বর্তিয়েছে। অস্ত্রদিকে এত নাম করে
এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে
সত্যজিৎ রায় আজ অধি একজনও
পরিচালক সৃষ্টি করতে পারেন নি।
জনগণের পক্ষে না থাকলে কোন-
দিনই তা পারা যাবে না। এই
কারণেই মৃণাল সেনের কাছে
আমাদের অনেক আশা। আমরা
চাই তিনি তাঁর কমিউনিস্টকে তাঁর
মিডিয়ামের মাধ্যমে আরো জোরালো
ও তির্যক করে তুলবেন এবং এই
দুটটা শেষ পর্যন্ত তাকে জনগণের
কাছে পৌঁছে দিতে পারবে এও
আমাদের কামনা।

ভ্রম সংশোধন

দর্পণের ২৬শে 'ভ্রম সংশোধন'
"বইয়ের ছবিরা: স্বজনশোধন ও
শক্ততোষণ" শিরোনামের সংবাদে
ভ্রমবশতঃ লেখা হয়েছে স্বর্ণরেখা
অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের চারখানি
বই প্রকাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে
স্বর্ণরেখা অশোক মিত্রের কোন বই
প্রকাশ করেনি।

**ভারতীয় জবতা পার্টি সাম্প্রদায়িক
দল নয়—এম সি চাগলা :**

তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশের
বালগণের দলে লোকসভার প্রথম
রাজ্য সভার বার বার যোগাযোগ
হয়েছে কিন্তু তর্ক বিতর্কের সময়
বালগণের দলগত ক্রটি ও লঙ্ঘনের
পরিচয় দিয়েছেন। জনগণ যখন
জনতা পার্টিতে প্রবেশ করে তখন
আমি খুব খুশি হই কারণ আজকার
যখন চারদিকে অসং রাজনীতির
জলজল তখন একমাত্র জনসভা
জুগ্ম্ম এবং লং রাজনৈতিক দল
লং রাজনৈতিক দল থেকেই দল
যখন আবারও রাজনীতির
পরিচিত ঘটনা, তখন একমাত্র
লং থেকেই কখনো দলত্যাগ
দেখা যায় না, যখন অন্য পার্টি থেকে
দলত্যাগ করে লোকে জনগণকে
হান করে।"



इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिमिटेड
(एनएल ईंजीनियरिंग एंड टेक्निकल डिप्लोमा)

সংশোধনী

विन्दिः निर्माणे च रक्षणावेक्षणैश्च काज

স্বাক্ষর: নং : এন কে / ইঞ্জ (সি) / ৮০ / ২৩৪৮ তারিখ ৩১-১২-৮০

মূল টেক্সট মোটপ নং : এন কে এ ও / ইন্ট (সি) / ৮০ / ১৬৬৩ তার ১-১২-৮০ / ২ ১২-৮০ লস্কর্কে সংশ্লিষ্ট লকসকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কমিটি সংখ্যা ১ থেকে ৪-এর টেক্সট গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯শে জানুয়ারী ৮১ বেলী ৩'৩০টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হল। অন্ত্যন্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

সম্পাদক—হীরেন বসু

নন্দাৰূপ কৰুণ হী-গীৰী-গ্ৰন্থ, ১২৩/১, আচাৰী প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ ঘোষ, কলিকাতা-৬ থেকে বহুতঃ এবং হৰ্ষণ কাৰীন্দ্র ৬১, বট গ্ৰন্থ, কলিকাতা ১৩ থেকে প্ৰকাশিত।